'চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চল'
চল' চল' হে।
টগ বগ-উচ্ছল
কাথলিতল-জল
কল কল হে॥'
—রবীন্দ্রনাথ
সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

পূজার আয়োজন
স্কাউট
সাইজ ৯-১১½ ৮৸৶
" ১২-১৩½ ৯৸৶
২-৫ ১১॥০
নীতা
সাইজ ১-৭ ১০৸৶
পাঠান
সাইজ ৪-১০ ১২৸৶
ata

সূচীপত্র

সূচী-পত্র

শারদীয়া দেশ পত্রিকা

মহালয়া ১৩৬০

মাতৃপূজা

মাতৃপূজা সমাগত। ঢাক-ঢোল কাঁসী বাজাইলেই কি পূজা হয়? যাঁহার জন্য বাজাইব, যাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এই আয়োজন, তিনি কোথায়? আমাদের যিনি জননী, সদাভ্যুদয়দা তিনি। মাকে যাহারা প্রসন্ন করিতে পারে, দেশে দেশে তাহাদের সমাদর। তাহাদের ধন-সমৃদ্ধি অফুরন্ত। যশ তাহাদের সর্বত্র। তাহারা ধর্মবলে বলিষ্ঠ। নৈতিক শক্তিতে তাহারা দুর্জয়। কিন্তু আমরা দুর্বল, ভীরু, উপেক্ষিত, দুর্গত। সুতরাং আমরা মায়ের কৃপালাভ করিব, মহাশক্তিস্বরূপিনী যিনি সেই জননীকে অঙ্গনে বরণ করিয়া আনিব, এ সৌভাগ্য কি আমাদের আছে?

তবু ডাকিব, সদার্দ্র-চিত্তা শুভঙ্করী যিনি তাঁহার নাম করিব। এসো মা রুদ্রারূপে যদি আসিবে তবে সেই বেশেই এসো এলোকেশী! অসি নাচাইয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া এসো। ভক্ত-রক্তে রণরঙ্গিনী মা তোমার চরণ অলক্তকে রাঙাইয়া এসো। তোমার সেই অতিরুদ্র লীলার অতিসৌম্য ছন্দটিই যেন আমাদের ধমনী ধমনীতে দোল দেয়। আমরা সকল দুর্বলতা, সর্ববিধ কার্পণ্য হইতে মুক্ত হইয়া যেন জয় মা বলিয়া তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি। এসো মা, টঙ্কার দাও, তোমার ধনুকে—জ্যা-নিঃস্বনে ধরণী-গগনান্তর পূর্ণ কর—আমাদের সব বাঁধন ছুটুক। বাজাও মা তোমার বিষাণ; মরণত্রস্ত মরণ-গ্রস্ত এই জাতিতে জাগিয়া উঠুক মহাপ্রাণ!

অতি-সৌম্যাতিরুদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ
নমো জগৎ-প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ॥

চিঠিপত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লিখিত

ওঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে কয়েকদিন ছুটি অতিক্রম করিতে যদি বাধ্য হন তবে আপত্তি প্রকাশ করিব না। যত শীঘ্র পারেন যোগ দিবেন। নানা উপলক্ষ্যে ছুটি লওয়া সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের নিকট আপনার ঋণ অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।

পালি ব্যাকরণ পরিষৎ পত্রিকায় ছাপাইয়া তাহার পরে গ্রন্থাকারে বাহির করিতে দোষ কি? ইহাতে পরিষদের ছাপানো খরচটা বাঁচিয়া যাইবে, আপনারো বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

ক্ষিতিবাবুকে পত্র লিখিয়া দিয়াছি। মীরার শরীর ভাল নাই সেই জন্যই কলিকাতায় আবদ্ধ আছি। আমিও বিশেষ সুস্থ নহি।

বিদ্যালয়ের অতিথি বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অযথা নহে। কিন্তু একটি কথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, দেশের লোক কোনো সংকল্পকে কাজে খাটাইবার জন্য নিজেও চেষ্টা করে না অন্যকেও সাহায্য করে না এমন অবস্থায় কোনো কর্ম সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইতেই পারে না। শুধু দোষ ধরিয়া কোনো উপকার হয় না—কারণ, বিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণতা আমরা যেমন জানি এমন কেহই নহে। উপকরণ যেমন পাইয়াছি তাহা লইয়াই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি—যদি অতিথি মহাশয় এই কাজকে সম্পূর্ণতর দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাকে পরামর্শদান নহে ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। আমরা মানুষ চাহি উপদেশ চাহিনা। যতক্ষণ তাহা না পাই এমনি করিয়াই জোড়াতাড়া দিয়াই কাজ চালাইব। সৎপাত্রে কন্যাদান করিয়া নিশ্চিন্ত হউন। মিষ্টান্নমিতরে জনা প্রবাদটি যদি বিস্মৃত হন তবে আপনার স্মরণশক্তিকে যথাকালে সাহায্য করা যাইবে সে ভার আমরাই লইব। ইতি ২৯শে বৈশাখ, ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রীতি নমস্কারপূর্বক নিবেদন

আমার বিজয়ার প্রীতি আলিঙ্গন গ্রহণ করিবেন।

অনেকদিনের বিচ্ছেদের পর পুনরায় আশ্রমে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছি। কিন্তু বড় অভাব বোধ করিতেছি। এখানকার ভাণ্ডারে আপনার জিম্মায় যে রসভাণ্ডটি ছিল সেটি পূর্ণ করিয়া দিবার লোক দেখিতে পাই না। ভাণ্ডটি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিবার মত বড় বড় ষণ্ডা লোক অনেক জুটিয়াছে। যাহা হউক আপনার ভক্তিস্নিগ্ধ পুণ্য-জীবনের রসমাধুর্যের স্মৃতিটুকু আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিল এই আমাদের যথেষ্ট লাভ।

আপনার সংস্কৃত সন্দর্ভের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমার পাণ্ডিত্য ত আপনার অগোচর নাই। আমি এইটুকু নিশ্চিত জানি সংস্কৃত শিক্ষার বই আপনার হাত দিয়া যাহা বাহির হইয়াছে তাহা সর্বতোভাবে উপাদেয় হইয়াছে। আমাদের বিদ্যালয়ে আপনার এই গ্রন্থটি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, অন্যত্র যদি হয় তবে বালকদের পক্ষে তাহা সৌভাগ্যের বিষয়। ইতি ৫ই কার্তিক ১৩২০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন

এতদিন নানা রথে নানা পথে ঘুরিতেছিলাম—ডাকের পেয়াদা কিছুতে আমার নাগাল পাইতেছিল না। ফিরিয়া আসিয়া আপনার পত্র ও পত্রিকা পাইলাম। মডার্ণ রিভিয়ুতে আপনার লেখাটি পড়িয়াছি—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আপনার সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে সে কথা আপনার অগোচর নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে লেখালেখি করিয়া কোনো ফল হইবে না—খুব

ছোটো করিয়াও যদি কোথাও কাজ আরম্ভ করিতে পারেন তবেই আপনার মত যে সত্য তাহা সপ্রমাণ হইবে। যাহারা সাধারণের কাছ হইতে ভিক্ষা লইয়া কোনো অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় তাহারা নূতন পথে চলিতে সাহস করেনা কারণ তাহাদিগকে সকলের মন জোগাইতে হইবে। যদি কাহারো দিকে না তাকাইয়া দুঃসাহসের তাড়নায় একটা কিছু করিয়া ফেলিতে পারেন তবেই ভালো—নহিলে আপনার কথা কেহ শুনিবে না এবং আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। দেখা হইলে সকল কথার আলোচনা হইবে। ইতি ২১ কার্তিক ১৩২১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্বক নিবেদন

শিলাইদহে পদ্মাতীরে চক্রবাক্‌পাড়ায় আশ্রয় লইয়াছি। দিন দশেক নিভৃতে কাটাইবার ইচ্ছা। রথীকে তাড়া দিয়া চিঠি লিখিয়াছি। আমাদের ভূখণ্ডের এক ক্ষুদ্র অংশ শান্তিনিকেতনের রুগ্‌ণ ছাত্র ও অধ্যাপকদের বায়ু সেবনের জন্য রাখিতে ইচ্ছা করি। বিঘা পাঁচেক হইলেই চলিবে—এটুকু আপনার ছাত্রদিগকে দান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যুদ্ধাবসানে টাকা পাইলে সেখানে একটা ঘর তুলিয়া দিব। কুমারকৃষ্ণ বাবুর আশ্রয়ে কাজ শুরু করিয়া দিতে বিলম্ব করিবেন না। তিনি যাহা শ্রদ্ধা করিয়া দিতেছেন তাহা শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করিবেন। সরস্বতী যখন আপনার কাছে লক্ষ্মীর বেশ ধরিয়া দেখা দিয়াছেন তখন তাঁকে ফিরাইয়া দিবেন না—তিনি যে আসনটি পাতিলেন তাহা আপনারা জুড়িয়া বসুন। কল্যাণেরই লক্ষণ দেখিতেছি। আপনাদের মালদহের আম্রকুঞ্জ দেবীর পছন্দ হয় নাই বলিয়াই তিনি সেখান হইতে আপনাদিগকে তাড়া করিয়া আনিয়াছেন। এখানে তাঁর মানসসরোবরের রাজহংসগুলি ডানা মেলিবার একটু জায়গা পাইবে।

মাঘ সংক্রান্তি ও ফাল্গুনের ১লা নাগাদ কলিকাতায় আমার খবর লইবেন এবং ইতিমধ্যে রথীকে উত্তেজনা করিতে ছাড়িবেন না। ইতি ২১ মাঘ ১৩২১

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

De Duinen
Huizen, N H
১০ই আশ্বিন? ১৩২৭

সাদর নমস্কারপূর্বক নিবেদন—

আপনি ভয় পাবেন না, বিশ্বভারতীর উদ্যোগপর্ব সমুদ্রের দুইতীরেই চলছে। আপনি যদি আমার সঙ্গে আসতেন তাহোলে বুঝতেন বিশ্বভারতীর আয়োজন এখান থেকেই যথার্থভাবে পূর্ণ করে নেওয়া সম্ভব, আমাদের দেশ থেকে নয়। এ পর্যন্ত আমাদের কাজ যতদূর অগ্রসর হয়েছে তাতে আমার মন আশায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। অচিরে আপনারা আমার ভ্রমণের ফল দেখতে পাবেন। ইতিমধ্যে আশ্রমে হয়তো সামান্য উপলক্ষ্য নিয়ে অসামান্য উপদ্রব ঘটতেও পারে, কেননা আমরা সেখান থেকে আশ্রমের বিরাটরূপ দেখতে পাইনে, এই জন্যে নিজেকে বড়ো করে দান করবার উৎসাহ আমাদের ঘটে না, আমরা সংশয়ের প্রদোষান্ধকারে ছোটোখাটো ব্যাপারের ছায়ায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। যাই হোক্, বিশ্বের একটা দিক আছে যেটা সংসার, যেখানে নিত্য পরিবর্তন ঘটছেই, কিন্তু তার অন্তরের মধ্যে যদি ধ্রুবত্বের কোনো নিরবচ্ছিন্ন সূত্র না থাক্‌ত তাহোলে পরিবর্তনও ঘটতে পারত না। বিশ্বভারতীর বিশ্বেও একটা সংসারের রূপ আছে সেইখানে বেশি করে মন দিলেই মন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌বে, নানা বিভীষিকা এসে আক্রমণ করবে। কিন্তু এর অন্তরের মধ্যে ধ্রুব আছেন সেইখানে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁরাই জানেন বিশ্বভারতী অমৃত বহন করছেন। আমি যদি না জানতুম তাহোলে আপনাদের অধ্যাপকসভার ভেলা আঁকড়ে ধরে তর্কতরঙ্গে নিরন্তর দোদুল্যমান থাকতুম, এই প্রবাসদুঃখ বহন করবার শক্তি আমার থাক্‌ত না। এ দুঃখ বড়ো কঠিন; কিন্তু এ দুঃখ ক্ষতির দুঃখ হোলে অসহ্য হোতো, এ সৃষ্টির দুঃখ। দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে সেই সৃষ্টি চল্‌ছে—আপনারা দূর থেকে সেটা দেখ্‌তে পাচ্চেন না বলে কেবল এর বেদনাই অনুভব করছেন। আমি আপনাকে বলে রাখ্‌ছি আমার পাত্র দক্ষিণায় প্রতিদিন পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছে—আপনি মনে ভরসা রাখ্‌বেন, ধৈর্য রাখবেন, কিছুতেই বিচলিত হবেন না।

এখানে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে এসেছিলেম, কাল আমার সেখানকার কাজ হয়ে গেছে, আগামী কাল এখানে আম্‌স্টারডামের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার আমন্ত্রণ আছে। এই সকল বক্তৃতার ভিতর দিয়ে যে সব পথ কাটা হচ্চে সমস্ত পথই শান্তিনিকেতনের অভিমুখে। এ আমার কবিকল্পনামাত্র নয়—সকল সংবাদ যখন জান্‌বেন তখন আপনাদের সংশয় দূর হবে। সংবাদ দেবার সময় এখনো হয়নি—সব জমে উঠছে—একদা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাবে। ইতিমধ্যে মনকে শান্ত রাখুন, কোনো ক্ষুদ্র আন্দোলনে বিচলিত হবেন না। যিনিই থাকুন আর যিনিই যান তাতে আমাদের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। যিনি সাধক তিনি স্থির থাকবেন, যিনি পথিক তিনি চলে যাবেন—এই হচ্চে নিয়ম, এ নিয়ে আক্ষেপ করবার কোনো কারণ নেই।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতি নমস্কারপূর্বক নিবেদন

অধ্যাপক বিণ্টরনিট্স্ অত্যন্ত সরল, নম্র এবং সহৃদয় লোক। মিতভাষী, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোধ হয় মুখ খুলবে। পুণার পণ্ডিতেরা এঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, সেখানে ইনি খুব আদর পেয়েচেন। আশ্রমে এঁকে আপনারা যথারীতি বরণ করে নেবেন। আতিথ্য সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে কারণ ইনি শিশুর মত, আত্মপালনে সম্পূর্ণ অক্ষম—যাতে ভৃত্যের হাতে এঁকে উপদ্রব সহ্য করতে না হয় সেটা দেখবেন। অধ্যাপক আবেস্তার চর্চ্চাও করেছিলেন, যদি আবেস্তার ক্লাস খুলতে চান তাহলে ওঁর কাছ থেকে সহায়তা পাবেন।

ভিক্ষাব্রতে দীক্ষা নিয়ে অবধি মানবচরিত্র সম্বন্ধে আমার নানা প্রকার শিক্ষা চলচে। কালক্রমে পরিপক্কতা সম্বন্ধে পরীক্ষা দিতে পারব এমন আশা আছে—এমন কি, মৃত্যুর পূর্বে হয়ত বা পণ্ডিত মালব্যজির আসনের এক প্রান্তে স্থান পেতেও পারব।

মহাভারত প্রকাশকার্যে অধ্যাপকের পরামর্শ গ্রহণের জন্যে পুণা ভাণ্ডারকর ইনস্টিটুট থেকে সম্ভবত তিনজন পণ্ডিত আমাদের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। বাংলা দেশ থেকে সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্র কি কাউকে পাওয়া যাবে? উপযুক্ত এবং যথেষ্ট ছাত্র না পেলে এই সকল পণ্ডিতের সমাগম ব্যর্থ হয়ে যায়। সম্প্রতি আশ্রমে ছাত্রদের মধ্যে তেমন কেউ আছে কি? অযোগ্য ছাত্রকর্তৃক বিশ্বভারতীকে ভারগ্রস্ত করা উচিত হবে না। দেখা হলে বিস্তারিতভাবে কর্তব্য বিচার করা যাবে। ইতি অগ্রহায়ণের কোন্ তারিখ জানিনে। ১৩২৯।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোরবন্দর
[চৈত্র, ১৩২৯]

প্রীতি নমস্কারপূর্বক নিবেদন—

প্রথমে কাজের কথাঃ—

উত্তর বিভাগে যে সব ছাত্র এখন আছে বিশ্বভারতীর জন্য তাদের প্রস্তুত হতে বলতে হবে, সেজন্য তাদের দুই বছর সময় দেওয়া যেতে পারে। নিম্নলিখিত তালিকা থেকে তাদের দুই বা দুইয়ের অধিক শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করতে হবে ঃ

বৈদিক সংস্কৃত	আয়ুর্বেদ	
সংস্কৃত সাহিত্য	প্রাচীন হিন্দীসাহিত্য	ক্ষিতিবাবু
পালি আবেস্তা	তিব্বতীয়	
প্রাকৃত	চিনীয়	
ভারতের পুরাতত্ত্ব	ফারসী আরবী	(যদি অধ্যাপক জোটে)
	সাধারণ হিন্দী ও হিন্দুস্থানী	
বাংলা (বাংলার বাহিরের প্রদেশের ছাত্রদের জন্য)		
ফরাসী	দ্রাবিড়ীয় ভাষা	
জর্মন (যখন জর্মন পণ্ডিত পাওয়া যাইবে)	য়ুরোপীয় ইতিহাস	(নেপালবাবু)
শব্দতত্ত্ব (Collins-এর কাছে	ন্যায় সাংখ্য বেদান্ত ইত্যাদি	
য়ুরোপীয় দর্শন (সরোজবাবুর কাছে		

তালিকা আমার আন্দাজমত করে দিলুম। আপনারা বিচার করে এর থেকে পরিবর্জন পরিবর্ধন পরিবর্তন করে মনের মত তালিকা তৈরি করে নেবেন।

ইংরেজি সাহিত্য এখনও পড়াবার লোক পাওয়া যায় নি। অমিয় অনায়াসে এই ভার নিতে পারেন। দুই বৎসর পরে পরীক্ষার পর অথবা অধ্যাপকদের মতে যে ছাত্র উপযুক্ত গণ্য হবে তাদের নেওয়া যাবে।

নারী বিভাগ একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। এই বিভাগের ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষভাবে করা কর্তব্য। আমাদের সামর্থ্যমত এদের ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত ভাষায় যথোচিত পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত হবে। যাতে আমাদের আশ্রমে নারীদের শিক্ষার উপযুক্ত বিদ্যালয় ভালো করে গড়ে ওঠে তার বিশেষ চেষ্টা করা চাই। এই নারী বিভাগের ছাত্রীরা কালক্রমে কেহ কেহ বিশ্বভারতীতে স্থান অধিকার করতে পারবে।

বিশ্বভারতীর কলাবিভাগ ও কারুবিভাগের নিয়ম স্বতন্ত্র।

অধ্যাপকদের প্রধান কর্তব্য হবে ছাত্রদের বিশ্বভারতীর জন্যে তৈরি করে তোলা। আচার্যদের প্রধান কর্তব্য হবে তত্ত্বানুসন্ধান ও তত্ত্বপ্রচার। বিশ্বভারতীর উপযুক্ত ছাত্রদের মধ্যেও কাউকে কাউকে কোনো কোনো বিষয়ে গোড়ার দিক থেকে শেখানো দরকার হবে। কেউ হয়ত য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত কিন্তু সংস্কৃত জানেন না বা অল্পই জানেন, এঁদের খেয়া পার করবার ভার অধ্যাপকদের উপর। বলা আবশ্যক বিশেষ প্রয়োজনস্থলে বা স্বেচ্ছাক্রমে আচার্যেরাও এই ভার গ্রহণ করতে পারবেন।

আপাতত নূতন অধ্যাপক ও আচার্য নিয়োগের সামর্থ্য আমাদের বেশি নেই। কেবল আমার ইচ্ছা কালিদাস নাগকে আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়—তাঁর কাছ থেকে অনেক বিষয়েই আমরা সাহায্য প্রত্যাশা করি। এ ছাড়া ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক দরকার হবে। চেষ্টা করে দেখব যদি এদিক থেকে কাউকে পাওয়া যায়। আপাতত যাঁরা আচার্য ও অধ্যাপক আছেন বা শীঘ্র হতে পারেন তাঁদের নাম দিচ্ছি—আমার স্মৃতিশক্তির ত্রুটিবশত কিছু ভুল হতে পারে সংশোধন করে নেবেন।

আচার্য	অধ্যাপক	
বিধুশেখর শাস্ত্রী	নেপালচন্দ্র রায়	সন্তোষ
ক্ষিতিমোহন সেন	বেনোয়া	লাল
কলিন্‌স্‌	মিশ্রজী	
কালিদাস নাগ	সাংখ্যতীর্থ	
নন্দলাল বসু	ভীমশাস্ত্রী	
এল্‌ম্‌হর্স্ট	সুরেন্দ্রনাথ কর	সরোজ দাস

আর কে কে আছেন আপনারা ভেবে স্থির করবেন।

বিশ্বভারতীর ছাত্র

ফণীন্দ্র গোস্বামী, অমিয়, অনুজান—আর কারো নাম আমি জানিনে।

কলা ও কারুবিভাগের ও সুরুলবিভাগের ছাত্রদের নাম দেওয়া বাহুল্য।

জর্মন শিক্ষা দিবার জন্য আপনি যে ভ্রমণকারীকে কিছুদিনের জন্য সংগ্রহ করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা উত্তম। আশা করি Winternitzএর ছাত্রটিও যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিবেন। ছাত্র গ্রহণ ও বর্জন সম্বন্ধে বর্তমান অধ্যাপক সমিতিকে ব্যবহার করিলে বোধ করি আপনাদের সংস্থিতির বিধিবিরুদ্ধ হইবে না।

সোনার মায়ামৃগের পিছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেড়াচ্ছি, কবে ছুটি পাব কে জানে? এখানকার মহারাজা চমৎকার লোকটি। তাঁর সঙ্গ লাভ করে খুসি হয়েচি। তিনি পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েচেন। আজ আর সময় নেই। ইতি তারিখ জানিনে। [এপ্রিল ১৯২৩]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতি নমস্কার সম্ভাষণ

আজ প্রভাতে নববর্ষের উৎসবের কাজ শেষ করে আপনার পত্র পেলুম। চিঠির পরিবর্তে আপনাকে পেলেই উৎসব সম্পূর্ণ হোত। এবারে রথী বৌমাও দেশান্তরে—নববর্ষের আনন্দে অভাব রয়ে গেল।

আমার মাটির বাসা অনেক দূর এগিয়েছে। আমার জন্মদিনে গৃহপ্রবেশ করতে পারব এমন আশা পেয়েছি। যদি উপস্থিত থাকতে পারেন আনন্দিত হবো। পুরাতন বন্ধুরাই নূতন বাসায় পৌঁছিয়ে দেবার ভার নিলে সেটা কল্যাণের হয়। সর্বান্তঃকরণে আপনার শুভ কামনা করি। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪২

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতি নমস্কার

নিজের সম্বন্ধে নূতন নূতন সংবাদ সর্বদাই পেয়ে থাকি, এইজন্যেই আপনার চিঠি পড়ে যথোচিত বিস্ময় অনুভব করিনি। কবিত্বের উত্তেজনায় মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তি করেছি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের অবতারণায় আজ পর্যন্ত আমি কোনো উৎসাহ বাক্য ছন্দে বা অছন্দে প্রয়োগ করিনি। মেয়েদের স্বভাবেও যুদ্ধস্পৃহা হয়তো আছে কিন্তু ঘরের মধ্যেই তার পরিতৃপ্তির যথেষ্ট অবকাশ ঘটে। এই বিষয় নিয়ে কাউকে যদি দোষ দিতে হয় তো সে কবিকে নয়, দায়ী করবেন পুরাণকারকে। তাঁরা যুদ্ধ করিয়েছেন নারীদেবতাকে দিয়েই, দেবীর খর্পরেই রক্তের নৈবেদ্য, আর পুরুষদেবতার ভোগে বিল্বপত্র। রণরঙ্গিণীর হিংস্রোপচারে পূজাই যদি শ্রেয়স্কর হয় তবে তার দৃষ্টান্ত নিন্দনীয় হবে কেন?

এখন সময়টা হোলিউৎসবের, তাই পত্রযোগে আপনার চক্ষে কিঞ্চিৎ রক্তরাগ প্রক্ষেপ করা গেল। ইতি ১৭ চৈত্র, ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৌরীপুর লজ
কালিমপং

ওঁ

প্রীতি নমস্কার সম্ভাষণ

অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আপনার আমের পেটক পাওয়া গেল—কিছুকালের জন্যে আনন্দে আমার ফলাহার চলবে।

একটা প্রশ্ন আছে এখন আমরা যে অর্থে ভারত-নামটা ব্যবহার করি প্রাচীনকালে কি সেটা প্রচলিত ছিল। আমি যতদূর জানি অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্ক দ্রাবিড় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সংজ্ঞায় সেখানকার অধিবাসীরা পরিচিত হত কিন্তু তাদের ভারতবর্ষীয় আখ্যা তখন ছিল না। পুরাণে ইলাবতবর্ষ প্রভৃতি কতকগুলি বর্ষের সঙ্গে হয়ত ভারতবর্ষের উল্লেখ থাকতে পারে কিন্তু সাহিত্যে ইতিহাসে লোকমুখে তার কি ব্যবহার ছিল। বরঞ্চ মনে হয় জম্বুদ্বীপ শব্দটা আরো বেশি খ্যাত ছিল। এই বিষয়টা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। কতকগুলি দ্বীপ নদী পর্বত প্রভৃতির নামমালা এককালে আমাদের আবৃত্তির বিষয় ছিল কিন্তু সেই সকল নদী পর্বত কোন্ দেশকে আশ্রয় করে।

বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয় এই পর্বতশৃঙ্গে আষাঢ় মাসটা মেঘদূতের ছাঁদেই আসর জমিয়েছে। কিন্তু দৌত্যে লাগাবার পক্ষে এখানকার মেঘের চেয়ে চার পয়সার টিকিটের প্রতিই বেশি নির্ভর করা যায়। ইতি ১০ আষাঢ় ১৩৪৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"নটীর পূজা"

কল্যাণীয়াসু

তুই বিদায় নেবার একখানি চিঠি তো পাওয়া গেল কিন্তু আমাদের নটীর পূজার বাসবীকে কি উপায়ে পাওয়া যায় এই এক দুঃখের উদ্বেগ মনের মধ্যে বিরাজ করচে। ওর দ্বারা ভাবনাকে কিন্তু সেই উৎকলবাসিনী বাসবীকে যে বিচলিত করব এত বড় দুরাশা মনে নেই। কিন্তু রিহার্সাল সভায় পৌরাঙ্গনাদের মধ্যে একটি প্রবীণ জ্যোতিষীর স্থান খালি শূন্য দেখি তখন মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। খবর নিশ্চয় পেয়েছিস যে নটীর পূজার আয়োজন চলচে — পৌষীর সমারোহ হবার পূর্বেই একবার এই নাটকের পালা শেষ করে দিতে হবে — তার পরেই এই শুভ মাঘমাসের শেষেই একেবারে উপসংহার। নটীর পূজা খামারের মধ্যে শুভক্ষণে সর্বতোভাবে যে চেষ্টা করেছিলেম এবার প্রজাপতি দেবতার উদ্যোগে সে চেষ্টা বেশ সফল হল। সেই কাজে ঐ দেবতাটির উপর আমার মন এ বছর তিনি প্রসন্ন নেই। বয়স যদি অল্প হত তাহলে সাবধান হতুম কিন্তু এখন ঐ দেবতা আমার নাগাল কিছুতে পাবেন না সেই নিশ্চিন্ত আছি। তোরা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিস। ইতি ৩০ পৌষ ১৩৩৩

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৩৩৩ সালের ১৪ই মাঘ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে "নটীর পূজা"র দ্বিতীয় অভিনয় উপলক্ষ্যে শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী মমতাকে এই পত্র লিখিত — ইনি 'বাসবী'র ভূমিকাভিনয় করেন; 'শ্রীমতী'র ভূমিকাভিনয় করেন শ্রীনন্দলাল বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গৌরী — এই সময় তাঁর বিবাহ স্থির হয়।]

মাইকেল মধুসূদনের সনেট

শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

কোন এক ইংরেজ লেখক তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইংল্যান্ডকে ভালবাসিতে হইলে কিছুকাল দেশত্যাগী হইয়া বিদেশে বাস করা উচিত। মাইকেল ইংলন্ডে যাইতে চাহিয়াছিলেন ইউরোপের সাহিত্য, সভ্যতা ধ্যান-ধারণা মর্মে মর্মে গ্রহণ করিবার এক বিশেষ সুযোগ লাভ করিবার মানসে। কিন্তু তাঁহার বিদেশ যাত্রার প্রধান ফল তাঁহার গভীরতর স্বদেশ-প্রীতি। "বীরাঙ্গনা", "মেঘনাদ", "ব্রজাঙ্গনা" প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থ অসাধারণ প্রতিভাশালী কবিযশপ্রার্থীর রচনা; চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কবি এক গভীর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ। "মেঘনাদের" কবি স্বীয় প্রতিভার গৌরবে পুলকিত, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষায় বিভোর। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কবি তাঁহার দেশীয় সাহিত্যের পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধা জানাইতে তৎপর। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যে মাহেন্দ্র-ক্ষণে তিনি এক বিদেশী ভাষার কবি হইবার 'বিফল-তপ' ছাড়িয়া দিয়া "মাতৃকোষে রতনের রাজি" চিনিয়া লইলেন তখন হইতেই তিনি বাঙালি কবি, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পরম ভক্ত। কিন্তু তখন তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অনুশীলনে মগ্ন নিজের সাহিত্য-প্রতিভার সার্থক উন্মেষের আশায়। তাঁহার প্রধান কাম্য তখন মহৎ কব্য-সৃষ্টি—বিরাট কবি-খ্যাতি লাভ। তাঁহার প্রবাস-জীবনের কবি-কর্মে দেখি এক অন্য উদ্দেশ্য—অন্য ভাব। সেখানে প্রমত্ত আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটিয়াছে; উচ্ছল আত্ম-গৌরবের নামগন্ধ নাই। দারিদ্র্য পীড়িত, নির্বাসিত জীবনের নানা দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়া তিনি যেন নিজেকে এবং নিজের দেশকে নতুন করিয়া লাভ করিয়াছেন। যে আত্মগ্লানি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রচিত "আত্মবিলাপ" কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই বিদেশ-জীবনের তীব্রতর দুর্ভোগে গভীরতর হইয়া এক শান্ত সরল আত্মোপলব্ধির পরিপোষক হইয়াছে। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর প্রধান সুর আধ্যাত্মিক। কবি আত্মস্থ হইয়া নিজেকে এবং নিজের দেশের ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে গভীরভাবে আপনার মধ্যে পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার প্রশ্ন ভারতবর্ষের আদি প্রশ্নঃ

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য-কথা বিশ্বে, আমি মন্দমতি?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি;—
দেহ মহাদীক্ষা, দেবি। ভিক্ষা চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,—
ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে। কহ, হে, আমারে
কে তিনি দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁর আদি-জ্যোতিঃ, হেম-আলোক-সঞ্চারে
তোমার বদন দেব প্রত্যহ উজ্জ্বলে?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি হিন্দু-ধর্মের দেব-তত্ত্বের মর্ম উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহার গভীর তাৎপর্য তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। একটি সনেটে বটবৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর, তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি!

সূর্যের দেবত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার এই বিশ্বাসঃ

এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে
দেব ভাবি পূজে তোমা, রবি দিন-মণি!
দেখি তোমা দিবা-মুখে উদয়-শিখরে,
লুটায় ধরণী-তলে, করে স্তুতি-ধ্বনি!
আশ্চর্যের কথা, সূর্য, এ না মনে গণি।

এবং এই দেবতত্ত্ব হইতে তিনি উপনীত হইয়াছেন ঈশ্বরতত্ত্বেঃ

কিন্তু কি মহিমা তাঁর কহ, দিনপতি,
কোটি রবি শোভে নিত্য যার পদতলে!

'শ্রীপঞ্চমী' কবিতায় কবি বলিতেছেনঃ

নহে, দিন দূর, দেবি, যবে ভূভারতে
বিসর্জিবে ভূভারত বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল মূর্তি সুদল কমলে,—

একথা পৌত্তলিকতা বিরোধী খৃষ্টানের কথা নয়। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে মূর্তি-পূজার সহজ গভীর ভক্তির অবসানের আশঙ্কা। কারণ আশ্বিন মাস সম্বন্ধে কবিতায় পাই মহিষমর্দিনী দুর্গা-প্রতিমার অতি সুন্দর কল্পনা। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ পরিবৃতা দেবী যেন

একপদ্মে শতদল! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্র গগনে!—

এই মূর্তির কল্পনায় কবির

কি আনন্দ! পূর্বকথা কেন ক'য়ে স্মৃতি,
আনিছ, হে, বারিধারা আজি এ নয়নে?
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব ভকতি?

এই ধর্মবোধ কবিকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। ধর্ম এখন কবির কাছে

সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণ-তরী
তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময় জলে?
দুদিন বাঁচিতে চাহে, চিরদিন মরি।

কাব্য-সৃষ্টি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদঃ

দয়া ক'রি নরে,
কবি-মুখ ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণী-রূপে বীণা-পাণি এ নর নগরে।

আবার এই গভীর ধর্মবোধই তাঁহাকে দিয়াছে তাঁহার দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে এক নূতনতর এবং গভীর শ্রদ্ধা। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তাঁহার শেষ প্রার্থনাঃ

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।

বাংলার কবি, বাংলার পূজা, মন্দির, বাংলার নদী বৃক্ষ বাংলার সর্বকিছুই তাঁহার কাছে সুন্দর, পবিত্র। জয়দেবের গান "মাধবের রব," কাশীরাম দাস "কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান," কীর্তিবাসের "সুমধুর তান" "কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট" করিয়াছে, মুকুন্দরাম "কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ," ভারতচন্দ্রের "অন্নদা-মঙ্গল যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভিতরে", ঈশ্বরগুপ্ত "কোবিদ বৈদ্য"। আবার অন্যদিকে শ্রীপঞ্চমী, দুর্গা-পূজা, বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির, বিজয়াদশমী, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি বাংলার ধর্ম জীবনের

দান্তের ষষ্ঠ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফরাসী ভাষায় রচিত মাইকেলের সনেটের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি

বিশিষ্টরূপের মাধুর্য আস্বাদন করিতেছেন অন্য কতকগুলি কবিতায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কবির প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকট পাইয়াছে অন্য কতকগুলি কবিতায়। কালিদাস "কবিতা-নিকুঞ্জে পিক-কুলপতি" বেদব্যাস "ঋষি কুল-ধন", সংস্কৃত "দেবভাষা মানব-মণ্ডলে, সাগর কল্লোল ধ্বনি, নদের বদনে," বাল্মীকি "হাতে বীণা ধরি, গাইলা সে মহাগীত যাহে তিয়া জননে", তাঁহার রচনা "সুধাময় গীত-ধ্বনি।" ভার্সাই শহরে রচিত শতাধিক সনেটের মধ্যে মাত্র ছয়টি অভারতীয় বিষয় লইয়া লেখা। পেত্রার্কা, দান্তে, ভিক্তর হ্যুগো, টেনিসন ও গোল্ডস্টুকর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন পাঁচটি আর ভার্সাই নগর সম্বন্ধে একটি।

অনুমান করা যায় বিদেশে রচিত তাঁহার সনেটগুলির মধ্যে তাঁহার জন্ম স্থানের কবতক্ষ নদ সম্বন্ধে কবিতাই সর্ব প্রথম লিখিত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে গৌরদাসকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলিতেছেন:

"I have been lately reading Petrarca, the Italian Poet, and scribbling some sonnets after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ। I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Raj Narain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet চতুর্দশপদী will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume one of these days. I add a third; I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র **never** had such an elegant compliment paid to him. There's a variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of poetry." ২৯শে মার্চ (১৮৬৫)।

গৌর দাস বসাককে লিখিত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি পত্রে জানা যায় যে মধুসূদন তাঁহার এই চিঠিতে তিনটি সনেটের উল্লেখ করিলেও তিনি মোট চারিটি সনেট পাঠাইয়াছিলেন, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, জয়দেব, সায়ংকাল ও কবতক্ষ নদ। যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের নির্দেশ মত কবিতাগুলি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার রহস্য-সন্দর্ভ পত্রিকায় কবতক্ষ নদ ও সায়ংকাল কবিতা দুইটি একটি ছোট্ট ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন। মধুসূদন তাহার প্রথম সনেট অবশ্য ইংল্যান্ড রওনা হইবার পূর্বে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে রাজনারায়ণকে এক পত্রে লেখেন:

I want to introduce the sonnet into our language and, some morning ago, made the following.... .... **what say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would** rival the Italian.

এই সনেটটির নাম কবি-মাতৃভাষা। পরে ভার্সাই শহরে তিনি বঙ্গভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত সনেটটি রচনা করেন।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর দেশাত্মবোধ প্রসঙ্গে মাইকেল চরিত্রের একটি সুস্পষ্ট অসঙ্গতির কিঞ্চিৎ আলোচনা অপরিহার্য। মাইকেল ভাবে ও চিন্তায় বাঙালী; কিন্তু আচার, ব্যবহার, চালচলনে তিনি বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই; ফরাসী জীবনের বিলাস বৈভব তাঁহার বিলাসী সৌন্দর্য-পিপাসু মনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। ভার্সাই হইতে গৌর-দাস বসাককে লিখিত এক চিঠিতে তিনি অকপটে লিখিতেছেন:

"I wish I could live here all the days of my life, with means to take occasional runs to India, to see my friends:... ... ...This is unquestionably the best quarter of the globe ....This is the অমরাবতী **of** our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race. Here, you are the master of your masters."

স্বদেশে ফিরিয়া তিনি বিলাতি কায়দায় জীবন যাপন করিতে পছন্দ করিতেন। এ অসঙ্গতি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনের অসঙ্গতি। বিলাতী পোষাক ছাড়িয়া এই অসঙ্গতি এড়াইবার উপায় ছিল না। মাইকেলের ক্ষেত্রে অবশ্য এই ধরণের বিদেশী চালচলনের প্রতি প্রবণতার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। তিনি বিলাসী, তাঁহার স্ত্রী বিদেশিনী, তাঁহার নিকট আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে নানা কারণে তাঁহার সম্পর্ক অতি অল্প। দেশের মানুষ বলিতে তিনি তাঁহার বন্ধুদেরই বুঝিতেন; তাঁহার স্বজন বা জ্ঞাতিদের সঙ্গে তাঁহার তেমন কোন সামাজিক সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ভাব-জীবন ও বাহিরের চালচলনের মধ্যে এই অসঙ্গতির প্রধান কারণ গত শতাব্দীর জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে বিভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী চিন্তার সংঘাত। চিন্তার এই অন্তর্বিরোধিতা ও সংঘাত হইতেই প্রগতি ও সংহতি সম্ভব। গত শতাব্দীর এই অসঙ্গতি নানাভাবে নানা লেখক ও চিন্তানায়কের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। মাইকেল হ্যাটকোট পরিয়া অন্তরে অন্তরে ভাবপ্রবণ বাঙালী; বিদ্যাসাগর ধুতি চাদর পরিয়া প্রচার করিলেন পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও বলিলেন—**Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy;** বঙ্কিমচন্দ্র "সাম্য" প্রবন্ধে সাম্যবাদ প্রচার

(কবি দান্তে)

নিশান্তে সুবর্ণ কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জ; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে,
অজ্ঞান। জনম তব পরম সুক্ষণে!—
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে!— তোমার সেবনে,
পরিহরি নিদ্রা, পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে,
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া ত্যজি আশা পশে
পাপী প্রাণ; তুমি সাধু, পশিলা পুরকে!
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র? কোন কীট কাটে এ কোরকে?

শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

— The great [illegible]
Byron

Per me si va tra la perduta gente —
Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.
(Dante)

দান্তের ষষ্ঠ-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাইকেল রচিত সনেটের মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি

করিয়া পরে ঐ গ্রন্থ প্রত্যাহার করিলেন; কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদের জয়গান করিলেন, কিন্তু বলিলেন, "ভারতে ইংরাজ-শাসন ঈশ্বরের কৃপারই নিদর্শন"।

বাহিরের কতগুলি চালচলনের কথা ছাড়িয়া দিলে মাইকেলের জীবনেতিহাস এক বিদেশীভাবে বিভোর, স্বধর্মত্যাগী ঘরছাড়া বাঙালির ক্রমে বাঙালি হইবার ইতিহাস। ইংল্যান্ড রওনা হইবার পূর্বে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মাইকেল রাজনারায়ণকে লিখিলেন :

"No more Madhu the 'কবি,' old fellow, but Michael M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barrister-at-Law! Ha!! Hah!! Isn't that grand"

কিন্তু তাঁহার শেষ পরিচয় রাখিয়া গেলেন—কবি শ্রীমধুসূদন—জন্ম সাগরদাঁড়ী গ্রামে—পিতা রাজনারায়ণ, জননী জাহ্নবী।

মাইকেলের এই 'ঘরে ফেরা'র একটি বাহ্য ঐতিহাসিক কারণ যেমন বীটন সাহেবের বিখ্যাত পত্র আর একটি তেমন তাঁহার বিদেশ ভ্রমণ। বিদেশে বসিয়া বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিয়া নানা সাহিত্যের রসগ্রহণ করিয়া তিনি নিজের সাহিত্যের কথাই ভাবিতেন। এই সম্বন্ধে ভার্সাই শহর হইতে লিখিত নানা পত্রে তাঁহার নানা মন্তব্য এবং ঐ শহরেই রচিত তাঁহার সনেটগুলি হইতে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে তিনি কি চিন্তা করিতেন অনুমান করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে তাঁহার মূল বক্তব্য তিনটি। (১) সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি একমাত্র নিজের ভাষায়ই সম্ভব। (২) বিদেশী সাহিত্যের অনুশীলন ও প্রভাব জাতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করে। (৩) দেশের সমগ্র সাহিত্য-কীর্তিকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিয়াই নতুন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। এই ঐতিহ্য বোধ হইতেই আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়া থাকে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারীর পত্রে তিনি গৌরদাসকে লিখিতেছেন :

"When we speak to the world let us speak in our own language. Let those who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother-tongue. Here is a "lecture" for you and the gents who fancy that they are swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays! I assure you they are nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man to be called educated who is not master of his own language".

এই চিঠিতেই তিনি বিদেশী সাহিত্যের অনুশীলন সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"... ... ...the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well-cultivated state .... Should I leave to return, I hope to familiarize my educated friends with these languages through the medium of our own".

সংস্কৃত এবং বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে সনেটগুলির মধ্যে কবি তাঁহার নিজের সাহিত্যের সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করিতেছেন। বিদ্রোহী আধুনিক কবি তাঁহার পূর্বগামীদের সর্বকালের কবি বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। বিদেশী সাহিত্যের অনুরাগী, "পর-ধন-লোভে মত্ত" কবি যেন পরদেশে ভ্রমণ করিয়াই খুঁজিয়া পাইলেন তাঁহার নিজের সম্পদ। তাঁহার কবি-মানসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব এই আত্মস্থতা দ্বারা অতি স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। যদি পেতরার্কা তাঁহার আবিষ্কৃত

"ক্ষুদ্রমণি"
স্বর্মন্দিরে প্রদানিল বাণীর চরণে

মধুসূদন তাহা আহরণ করিবেন তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করিবার মানসে।

ভারত-ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি'
উপহার রূপে আজি অর্পি রতনে॥

সাহিত্যের রসাস্বাদনে মধুসূদন সর্ব রকম সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত। সেখানে তাঁহার ক্ষেত্র সমস্ত পৃথিবীর সঞ্চিত সাহিত্য-সম্পদ। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টিতে তাঁহার মধ্যে এক স্বাভাবিক জাতিবোধ সুস্পষ্ট। সাহিত্য কর্মে সৌখিন সার্বভৌমিকতা হইতে বিদেশী সাহিত্যের দুর্বল অনুকরণ সম্ভব; তাহা হইতে কোন দেশে কোন কালে মহৎ সাহিত্যের উদ্ভব হয় নাই।

মধুসূদনের কবিমানসের এই স্বাভাবিক কুলগর্ব তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল বাঙলা ভাষায় রচিত একটি সনেট এক ইউরোপীয় সাহিত্য সভায় প্রেরণ করিতে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারীর চিঠিতে তিনি গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন :

European scholarship is good, in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilised quarters of the globe; but when we speak to the world let us speak in our own language.

এই বিশ্বাস হইতেই তিনি দান্তের ষষ্ঠ জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত বাঙলা সনেটটি ইতালি-রাজ ভিক্টর ইমানুয়েলের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ফ্লোরেন্স শহরে দান্তের জন্মশত-বার্ষিকী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে নানা সাহিত্যিক দান্তের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিতে ফ্লোরেন্স শহরে সমবেত। মধুসূদন তখন ভার্সাই শহরে ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুশীলনে ও সনেট রচনায় মগ্ন। ইতালীয় সাহিত্যেই দেখি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই বিদ্যা-সাগরকে লিখিত এক পত্রে বলিতেছেন—

"You cannot imagine what beautiful poetry there is in Italian. Tasso is really the Kalidas of Europe."

এই ইতালি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম দান্তের ষষ্ঠ শতবার্ষিকী উৎসবে এই বাঙালী কবির কোনভাবে যোগ দিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। একদিকে যেমন দান্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আগ্রহ অন্য দিকে আবার ইউরোপীয় সাহিত্য সমাজে বাঙলা সাহিত্যের কথা শুনাইবার উৎসাহ। দান্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অবশ্য একটি বিশেষ কারণ মধুসূদনের সনেট-প্রীতি। যদিও পেত-রার্কা সম্বন্ধে সনেটটিতে তিনি তাঁহাকে এই ক্ষুদ্রমণির আবিষ্কারক বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন দান্তেই যে প্রথম বড় সনেটকার তাহা নিশ্চয় মধুসূদন জানিতেন। এবং "কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্রমণি" বলিতে কবি পেতরার্কাকে প্রথম সনেটকার বলিয়া অভিহিত করিতেছেন এমন অনুমান করিবার কোন হেতু নাই। ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত মধুসূদন দান্তে ও পেতরার্কার রচনার ঐতিহাসিক পারম্পর্য জানিতেন। তিনি ইহাও নিশ্চয় জানিতেন যে, দান্তেও প্রথম সনেটকার নন। দান্তের জন্ম ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে। ইতালি সাহিত্যে সনেটের আবির্ভাব ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে।

এইখানে দান্তে সম্বন্ধে সনেটটির রচনার এবং তাহা ইতালিরাজের নিকট প্রেরণের ইতিহাসটুকু আলোচ্য। ভার্সাই শহর হইতে লিখিত মধুসূদনের যে সমস্ত চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এই বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু এই তথ্যটি কবিবন্ধু মনো-মোহন ঘোষের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত" গ্রন্থে (প্রথম সং বঙ্গাব্দ ১৩০০) সন্নিবিষ্ট করেন। এই গ্রন্থে (৪র্থ সং পৃঃ ৫৮৪) তিনি লিখিয়াছেন :

মধুসূদন যখন ফ্রান্সে অবস্থান করেন, সেই সময় দান্তের মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎসরিক মহোৎসব সম্পন্ন হয়। য়ুরোপীয় অনেক কবি তদুপলক্ষে কবিতা উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনও এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করিয়া তাহা ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় অনুবাদপূর্বক ইতালী-রাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইতালী-রাজ ভিক্টর ইমানিউয়েল তাহা পাঠ করিয়া প্রীতি প্রকাশপূর্বক, মধুসূদনকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, "আপনার কবিতা গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে"।

(It will be a ring which will connect the orient with the occident)

ইতালিরাজের চিঠি সম্বন্ধে যোগীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : "মূল পত্রখানি পাওয়া যায় নাই। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ, স্মরণ করিয়া, গ্রন্থকারকে তাহা হইতে এই পংক্তিটি বলিয়াছেন।"

ইহার পর নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁহার "মধু-স্মৃতি" গ্রন্থে এই তথ্যটি সন্নিবিষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, "সেই দুর্লভ পত্র ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের নিকটে ছিল" (পৃঃ ৪১৮)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "মধুসূদন দত্ত" জীবনী-গ্রন্থে এই সম্বন্ধে

নগেন্দ্রনাথের উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া (২য় সং, পৃঃ ৭৪—৭৫) এই তথ্যের একটি সুস্পষ্ট ভুল সংশোধন করিয়াছেন। দান্তের জন্ম ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যে দান্তে-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা ত্রিশত-বাৎসরিক উৎসব নহে, ষষ্ঠ শতবাৎসরিক উৎসব। এই ভুলটি মনোমোহন ঘোষই প্রথম করিয়া থাকিবেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধি-ক্ষেত্রে মধুসূদনের সমাধি স্তম্ভের উন্মোচন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় মনোমোহন বলেন ঃ

"....his well-known sonnet on Dante, which most of you have read........ was composed for the then approaching tercentenary festival of the great Italian poet" (The Indian Mirror, December 5th, 1888).

ইতালী-রাজের নিকট প্রেরিত মধুসূদনের সনেট ও কবির নিকট লিখিত রাজার পত্রের উদ্ধারকল্পে গত জানুয়ারী মাসে এই প্রবন্ধের লেখক ইতালির প্রসিদ্ধ ভারতীয়-তত্ত্ববিদ অধ্যাপক তুচির নিকট পত্র লেখেন। অধ্যাপক তুচি তখন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। পত্রোত্তরে তিনি জানান ঃ

"I shall try my very best to procure the information you want as soon as I am back to Italy. I know very well that Madhusudan Dutt knew Italian and shall be delighted to find some new material about him (New Delhi January 16, 1953).

এই বিষয়ে আরও পত্রালাপের পর রোম হইতে লিখিত ১২ই জুনের পত্রে অধ্যাপক তুচি প্রবন্ধকারকে জানান যে, ইতালির রাজ-প্রাসাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দপ্তরের সহায়তায় দান্তে সম্বন্ধে মধুসূদনের বাঙলা সনেট, তাঁহার ফরাসী অনুবাদ, রাজার কাছে ফরাসী ভাষায় লিখিত মধুসূদনের চিঠি এবং ফরাসী ভাষায় কবির নিকট লিখিত রাজমন্ত্রীর চিঠি এই চারখানি কাগজ পাওয়া গিয়াছে। ইতালিয়ান রিপাব্লিকের জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ কারবোন ৬ই জুন অধ্যাপক তুচির নিকট ফরাসী সনেট ও পত্র দুই-খানির প্রতিলিপি প্রেরণ করিয়া বলেন যে, কবির চিঠি ও ফরাসী এবং বাঙলা সনেটের ফটোগ্রাফ তিনি পাঠাইতে প্রস্তুত। অধ্যাপক তুচির নিকট হইতে ফরাসী পাণ্ডুলিপি তিনটির প্রতিলিপি পাইবার পর প্রবন্ধকার সমস্ত পাণ্ডুলিপির ছবির জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি লেখেন। ১০ই আগস্ট ডাঃ কারবোন তুচি সাহেবের নিকট ছবিগুলি প্রেরণ করেন এবং ১৯শে আগস্ট তাহা রোম হইতে প্রবন্ধকারের নিকট প্রেরিত হয়।

রোম হইতে প্রাপ্ত এই পাণ্ডুলিপি ও মন্ত্রীর চিঠির নকল হইতে আমরা কতগুলি নতুন তথ্য পাইতেছি। ইতালীরাজের কাছে লিখিত মধুসূদনের পত্রের কোন উল্লেখ যোগীন্দ্রনাথ বা নগেন্দ্রনাথের জীবনীতে

ইতালিরাজ ভিক্টর ইম্যানুয়েলের নিকট ফরাসী ভাষায় লিখিত মাইকেলের পত্র

নাই। এই পত্রে কবি কি লিখিয়াছিলেন তাহা এ যাবৎ আমরা জানিতাম না। দ্বিতীয় কথা মধুসূদন যে তাঁহার বাঙলা সনেটটিই পাঠাইয়াছিলেন তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ এই দুই জীবনী-গ্রন্থের কোনটিতেই নাই। মধুসূদনের ফরাসী চিঠি হইতে বুঝি তিনি এই বাঙলা সনেটটিই তাঁহার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য হিসাবে পাঠাইয়াছিলেন। সনেটের ফরাসী অনুবাদের কোন উল্লেখ রাজার নিকট লিখিত পত্রে নাই। যোগীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্র-নাথ দুইজনেই বলিতেছেন যে, মধুসূদন সনেটটির ফরাসী ও ইতালীয় অনুবাদ পাঠাইয়াছিলেন। ইতালীর সরকার অনুসন্ধান করিয়া কোন ইতালীয় অনুবাদ পান নাই। ইতালীয় কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত ইতালীরাজের নিকট প্রেরিত সনেটটি যদি ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠাইতেন তাহা হইলে ফরাসী অনুবাদ পাঠাইবার কোন প্রয়োজন হইত না। কারণ এই ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞান বা বিদেশী ভাষায় রচনা শক্তির পরিচয় দিবার ইচ্ছা হওয়া একান্ত অসম্ভব। ইতালীয় ভাষা মধুসূদন আয়ত্ত করিয়াছিলেন নিঃসন্দেহ। তিনি ত্যাসো, পেতরার্কা প্রভৃতি ইতালীয় কবির কাব্য মূল ইতালীয় ভাষায় পাঠ করিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুলাই বিদ্যাসাগরকে লিখিত এক পত্রে পাই ঃ

"I wrote a long letter in Italian to Satyendra, the other day, but he has replied in English; I wonder why; I know he did a little Italian last year."

মধুসূদনের ইতালীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তির আর একটি স্পষ্ট প্রমাণ ইতালীরাজের নিকট প্রেরিত বাংলা সনেটের পাদটীকায় দান্তের ডিভাইন কমেডি হইতে মূলে ইতালীয় ভাষায় একটি উদ্ধৃতি। কবি ভাষার সুষ্ঠুতা ও পারিপাট্য সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ। অনুমান করা যায় যে, ইতালীয় ভাষা হইতে ফরাসী ভাষায়ই তাঁহার ব্যুৎপত্তি অধিক ছিল এবং সেই জন্যই ইতালীরাজের নিকট তিনি ফরাসী ভাষায়ই পত্র লেখেন। এই বিষয়ে মনোমোহন ঘোষের এক উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, এমন কি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিতে যাইয়াও

কবির মনে হইয়াছে যে, এ অনুবাদ কাব্যাংশে তেমন উচ্চাঙ্গের হইতে পারে না। মনোমোহন ঘোষ তাঁহার ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের বক্তৃতায় বলিয়াছেন ঃ

"he remained, referring to his own attempt in translating his sonnet into the French language, that no man, however' great his mastery in a foreign language, should even attempt to write poetry except in his own mother-tongue".

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মনোমোহন ঘোষের এই বক্তৃতায় ফরাসী অনুবাদের কথাই আছে; ইতালীয় অনুবাদের কথা নাই।

যোগীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, ইতালীরাজ স্বয়ং মধুসূদনের পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে উত্তরটি রাজার পক্ষ হইতে মন্ত্রী লিখিয়াছিলেন। মনোমোহন ঘোষ এই পত্রের যে অংশটি মনে করিয়া যোগীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন তাহাও ভ্রমাত্মক। যোগীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ দুইজনেই মনোমোহনের উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্তি করিয়া লিখিয়াছেন যে, পত্রে ছিল এই সনেটটি "will be a ring which will connect the orient with the occident"! মূল চিঠিতে ঠিক এই কথা নাই। সেখানে বলা হইয়াছে ইতালী দেশ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই মিলন ঘটাইবে।

মধুসূদনের চিঠিখানির তারিখ ৫ই মে ১৮৬৫ : চিঠিখানির বাংলা ভাবানুবাদ এইরূপ—

মহাশয়,—

।এই পত্রলেখক। এক সামান্য পদ্যকার; তিনি কবি বলিয়া পরিচয় দিবার স্পর্ধা করেন না। তাঁহার জন্ম গঙ্গার তীরে এবং তিনি ইতালিয় কাব্যের জনকের একজন অনুরাগী ভক্ত। এই পত্রের সঙ্গে তিনি মহারাজের চরণে একটি বাংলা সনেট উপস্থিত করিতে সাহসী হইলেন। তাঁহার প্রার্থনা প্রাচ্যের এই ক্ষুদ্র ফুলটি ইতালি আপনার উদ্যোগে যে মালা দ্বারা মহান দান্তের স্মৃতিস্তম্ভ ভূষিত করিবেন তাহার সঙ্গে যুক্ত হয়।

বিনয়াবনত সেবক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মধুসূদন বাংলা সনেটটি কেন পাঠাইলেন তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। তিনি বাঙালী কবি, নানা দেশের কবিদের মধ্যে তিনি বাঙালী কবি হিসাবেই পরিচিত হইতে ইচ্ছুক। দান্তের কাব্যের মধ্য দিয়া সমগ্র ইতালী একটি সার্বভৌম সাহিত্য ভাষা খুঁজিয়া পাইল। দান্তের মাতৃভাষা তাসকান সমস্ত ইতালীর ভাষা হইয়া উঠিল। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে বোধ হয় কোন ফরাসী উপভাষা ইতালী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। মধুসূদন ইতালীর এই জাতীয় কবির প্রতি শ্রদ্ধা যে তাঁহার জাতীয় ভাষায় নিবেদন করিবেন ইহাও একান্ত স্বাভাবিক।

এই চিঠিতে যে বিনয়ের ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও দ্রষ্টব্য। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে মধুসূদনের যে বেশ উচ্চ ধারণা ছিল তাহা তিনি কথায়, পত্রে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই আত্মপ্রত্যয় কখনও দম্ভের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা প্রতিভার লক্ষণ। কিন্তু এখন এত বিনয় কেন? পূর্বেই দেখিয়াছি যে, মধুসূদনের উদ্দামতা ও উচ্ছলতা ক্রমে প্রশমিত হইয়া আসিয়াছিল। বিদেশে রচিত তাঁহার কবিতার মধ্যে পাই এক স্থির, শান্ত চিত্তের বাঙময় প্রকাশ। ইহা ছাড়া মধুসূদন এখানে নিজের গুণপনা প্রচার করিতে ব্যস্ত নন—তাঁহার উদ্দেশ্য বাংলা ভাষায় রচিত একটি কবিতা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় রচিত নানা কবিতার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া।

রাজমন্ত্রী এই পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন ঃ

মহাশয়,—

আমাদের জাতীয় কবি দান্তের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আপনি যে কবিতাটি উপহার হিসাবে পাঠাইয়াছেন তাহা আমাদের মহামান্য নৃপতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইতালিয় কাব্যের গভীর ও

মধুর ঝঙ্কার যে গঙ্গার তীরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে ইহা জানিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত। আলিগ্যারির সমাধিস্তম্ভে অর্পণ করিবার জন্য আপনি যে প্রাচ্যদেশীয় ফুলটি পাঠাইয়াছেন তাহা তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তিনি আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে মৈত্রীর সূত্রে আবন্ধ করিবার যে ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য এতকাল ইতালি পোষণ করিয়াছে তাহা পূর্ণ হইবে।

আপনার এই উপহারে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তিনি তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন এবং তাঁহারি আজ্ঞায় আমি তাঁহার পক্ষ হইতে আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনার প্রতি তাঁহার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবার অধিকার পাইয়া আমি ধন্য। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন।

এই পত্রের তারিখ ১৫ই জুন ১৮৬৫, মন্ত্রীর নাম ব্যারন নিগরা।

এই পত্রালাপে মাইকেলের নামের ইংরাজী বানান লক্ষ্য করিবার বিষয়। মধুসূদন তাঁহার নাম সহি করিতেন Michael M. S. Dutt এই ইংরাজী কায়দায়। কিন্তু এই চিঠিতে লিখিতেছেন—

Michel Madhusudana Dutta

একেবারে পুরাপুরি বাংলা নামটি ইংরেজী অক্ষরে বসাইয়াছেন। ইহাও সেই ঘরে ফেরার একটি লক্ষণ। কবির পরিচয় তিনি গঙ্গাতীরবাসী। যে স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্মবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার চরম পরিচয় রাখিয়া গেলেন—তিনি কবি শ্রীমধুসূদন ইত্যাদি এই স্বাক্ষরের মধ্যেও সেই মনোভাব সুস্পষ্ট।

দান্তে সম্বন্ধে সনেটটি ভার্সাই শহরে রচিত অন্যান্য শতাধিক সনেটের সঙ্গে ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। তবে ইতালী-রাজের নিকট প্রেরিত পান্ডুলিপিতে একটু অভিনবত্ব আছে। পান্ডুলিপির সঙ্গে প্রচলিত সংস্করণে মুদ্রিত কবিতার প্রভেদ মাত্র একটি স্থানে। পান্ডুলিপিতে দ্বাদশ লাইনে দেখি 'পাপী-প্রাণ'—ইহা পরে সংশোধিত হইয়া "পাপ-প্রাণ" হইয়াছে। কিন্তু এই পান্ডুলিপির বৈশিষ্ট হইতেছে ইহার পাদটীকা দুইটি।

একাদশ পংক্তির শেষে (ক) চিহ্ন দিয়া নীচে দান্তের ডিভাইন কমেডির ২টি লাইন (তৃতীয় সর্গ) উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ডিভাইন কমেডির এ ভাগের (ইনফার্নো) এই সর্গে ভার্জিল কবিকে নরকের দৃশ্য দেখাইয়া উহার নানা তাৎপর্য বুঝাইতেছেন। তৃতীয় সর্গের প্রথমেই দৃষ্ট হইতেছে, নরকের দ্বার এবং সেখানে লেখা আছে—"এখানে যাহারা প্রবেশ করিবে তাহাদের সমস্ত আশা-ভরশা ত্যাগ করিতে হইবে।" মধুসূদন এই স্থান হইতেই লাইন দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া এই সনেটটির আরও কয়েক স্থানে ডিভাইন কমেডির এই সর্গের দুই একটি কথার প্রতিধ্বনি আছে। যেখানে মধুসূদন দান্তের নরক প্রবেশের কথা বলিতেছেন সেখানে আছে—

"তুমি সাধু, পশিলা পুলকে।"

ইনফার্নোতে আছে—

"..... .. I was cheered
Into secret place he led me on
(III-pp-19-20)

পরে ষষ্ঠ লাইন (খ) চিহ্ন দিয়া কবি নীচে দান্তে সম্বন্ধে বাইরনের প্রসিদ্ধ উক্তিটি লিখিয়া দিয়াছেন—

"the great Poet-Sire of Italy"

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রচিত বাইরনের Prophecy of Dante নামক কবিতার Dedicationএ ইংরাজ কবি দান্তে সম্বন্ধে এই উক্তি করিয়াছেন। বাইরনের এই কবিতায় দান্তে বলিতেছেন ঃ

Poets shall follow in the path I show,
And make it broader

সম্ভবত এই ভাবের অনুসরণেই মধুসূদন দান্তেকে তপনের অনুচর সুবর্ণ কান্তি নক্ষত্র বলিয়াছেন—তপন বলেন নাই।

এই পান্ডুলিপির সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে চিঠি ও বাংলা সনেটের কাগজের নীচে মধুসূদনের প্রিয় সাংকেতিক চিত্রটি মুদ্রিত আছে। এই সাংকেতিক চিহ্নটির ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্বন্ধে দীননাথ সান্যাল নগেন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল ঃ

"বহুকাল পূর্বে যখন আমি 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের টীকা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মধুসূদনের গ্রন্থগুলির আলোচনা করিতেছিলাম তখন তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থের মলাটের উপর মুদ্রিত সাংকেতিক চিত্রটি এবং তৎসংলগ্ন শ্লোকার্ধটি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ঐ শ্লোকার্ধ—"শরীরং বা পাতয়েয়ম্ কার্যং বা সাধয়েয়স্" তাঁহার সাহিত্য সাধনার বীজমন্ত্রস্বরূপ; এবং উহার উপরিস্থিত সাংকেতিক চিত্রটি ঐ বীজমন্ত্রের দ্যোতক। মধুসূদনের কাব্য ও নাটকাদি যিনি পড়িয়াছেন তিনিই জানেন যে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার ঐ কাব্য নাটকাদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন। এই কার্য সাধনই ঐ বীজমন্ত্রের "কার্যং বা সাধয়েয়মের" লক্ষ্য। এখন দেখুন যে ঐ সাংকেতিক চিত্রটি কবির ঈপ্সিত "কার্যের" কি সুন্দর দ্যোতক। একদিকে প্রাচ্য-নির্দেশক হস্তী, অন্যদিকে প্রতীচ্য নির্দেশক সিংহ এবং এই দুই এর মধ্যস্থলে থাকিয়া ভাস্বর কাব্য-প্রতিভা তাহার সহস্র রশ্মি দ্বারা সাহিত্য-শতদলকে সুপ্রস্ফুটিত করিতেছে।" (মধুস্মৃতি, পৃঃ ৪১৯)

যে কাগজখানিতে মধুসূদন তাঁহার সনেটের ফরাসী অনুবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহাতে এই সাংকেতিক চিহ্ন নাই। এখন অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই ফরাসী সনেটটিকে কবি তাঁহার কাব্যসাধনার বহির্ভূত মনে করিতেন বলিয়া তিনি ইহার জন্য সেই সাংকেতিক চিহ্নটি ব্যবহার করেন নাই।

সনেটের মিলবিন্যাসে মধুসূদন দান্তে ও পেতরার্কার অনুগামী। তাঁহার প্রিয় কবি মিলটনও এই ইতালিয় রীতিতে সনেট রচনা করিতেন। দান্তে সম্বন্ধে সনেটটির মিল-বিন্যাস দান্তের স্বরচিত সনেটের অধিকাংশ কবিতার অনুযায়ী—ক খ ক খ, খ ক খ ক, গ ঘ গ, ঘ গ ঘ। এবং এখানে অক্টেভের ভাবটি সেস্‌টেটের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে প্রবেশ করিতেছে। দান্তে ও পেতরার্কার সনেটে সাধারণত প্রধান ভাবটি প্রথম লাইনেই প্রকাশ পায়। মধুসূদনের এই সনেটেও প্রধান কথা এই যে দান্তে নিশান্তে সুবর্ণ কান্তি নক্ষত্র।

মধুসূদনের সনেটের ভাবে বা ভাষায় কোন-রূপে চপলতার বা লঘুতার লেশমাত্র নাই। ইহার ভাব গভীর ও শুদ্ধ—ইহার ভাষা ও ছন্দ সুনিবদ্ধ। অনুভূতির তীব্রতা ও ভাষার গাম্ভীর্যে এই সনেট মিলটনের সনেটের সমতুল্য। এই সনেটের রূপটি বিদেশী—কিন্তু ইহার ভাবে কোন অনুকরণের গন্ধ নাই। প্রমথ চৌধুরী তাঁহার সনেট সম্বন্ধে সনেটে বলিয়াছেন ঃ

ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙ্গালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট।

মধুসূদনের সনেট সম্পূর্ণভাবে বিজাতীয় গন্ধ বর্জিত। সনেট সম্বন্ধে মধুসূদনের কবিতার সুর ভিন্ন ঃ

"কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্রমণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
মনোনীত বর দিয়া এ উপকরণে।
ভারত-ভারতী পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে॥

যাঁহারা সনেটকে লঘুভাব বা সৌখিন প্রেমবিলাসের উপযোগী এক ক্ষুদ্র কাব্য-রূপ বলিয়া মনে করেন মধুসূদন তাঁহাদের দলভুক্ত নন। ইংরেজ কবি ডান্ রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

He is a fool which cannot make one Sonnet, and he is mad which makes two!"

মধুসূদন সনেট-রচনাকে এক লঘু সাহিত্য-কর্ম বলিয়া মনে করিতেন না। ইহার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার অন্তর্জীবনের বহু গভীর ভাব উজ্জ্বল অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। সনেটের কঠিন ছন্দবন্ধের শাসনে ভাবের তরল উচ্ছ্বাস অন্তর্হিত হইয়াছে—মাত্র চিত্তের অন্তস্থলের গভীর ভাবটি বিশুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। মধুসূদনের সনেট একদিক দিয়া মধুসূদনের ন্যায়ই—ইহা পরিধানে বিদেশী, অন্তরে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত বাঙালি কবি।

নিজস্ব সম্পদ
MBS
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

পরশুরাম

বরুণ বিশ্বাস একজন বড় অফিসার, যদিও বয়স ত্রিশের কম। ছেলেবেলায় মা বাপ মারা যাবার পর তার পিতৃবন্ধু গদাধর ঘোষ তাকে পালন করেন। তিনি খুব ধনী লোক, বিস্তর খরচ করে বরুণকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বরুণ ছেলেটিও ভাল, ছ মাস হল আমেরিকা থেকে গোটাকতক ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছে। গদাধরের মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গে তার বিয়ে আগে থেকেই ঠিক করা আছে, তিন মাস পরে বিয়ে হবে।

গদাধর ঘোষ প্রতিপত্তিশালী লোক, মুরুব্বীর জোর খুব আছে। তাঁর চেষ্টায় বরুণ একটা বড় চাকরি পেয়ে গেছে—বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা, অর্থাৎ ডিরেক্টর অভ মংকি ডিপোর্টেশন। এই সরকারী বিভাগটির উদ্দেশ্য মহৎ। এদেশে মানুষ যা খায় বাঁদরও তাই খায়, তার ফলে মানুষের ভাগে কম পড়ে। সরকার স্থির করেছেন দেশের সমস্ত বাঁদর ক্রমে ক্রমে আমেরিকায় চালান দেবেন, সেখানে চিকিৎসা আর শারীরবিদ্যার গবেষণার জন্য মুখপোড়া রূপী মর্কট প্রভৃতি সব রকম শাখামৃগের খুব চাহিদা আছে। বানরনির্বাসনের ফলে দেশের খাদ্যাভাব কমবে, আমেরিকান ডলারও ঘরে আসবে। কিন্তু শ্রেয়স্কর কর্মে বহু বিঘ্ন। যাঁরা জীবহিংসার বিরোধী তাঁরা প্রবল আপত্তি তুললেন। বিদেশে গিয়ে বাঁদররা প্রাণ বিসর্জন দেবে এ হতেই পারে না। তারা শ্রীহনুমানের আত্মীয়, ভারতীয় রামরাজ্যের প্রজা, মানুষের মতন তাদেরও বাঁচবার অধিকার আছে। ভারতবাসী যেমন গরুকে মাতৃবৎ দেখে তেমনি বাঁদরকে ভ্রাতৃবৎ দেখে। সরকার যদি নিতান্তই বানরনির্বাসন চান তবে এদেশেরই কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে তাদের জন্য উপনিবেশ নির্মাণ করুন, প্রচুর আম কাঁঠাল কলা ইত্যাদির গাছ পুঁতুন, ছোলা মটর বেগুন ফুটি কাঁকুড় ইত্যাদির খেত করুন, তদারকের ভাল ব্যবস্থা করুন। উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসনে যে বেবন্দোবস্ত হয়েছে বাঁদরের বেলা তা হলে চলবে না। এই রকম আন্দোলনের ফলে বানরনির্বাসন আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে, বরুণ বিশ্বাসের উপর হুকুম এসেছে এখন শুধু গনতি করে যাও, পরিসংখ্যান তৈরি কর। বরুণের অধীন বিশ জন পরিদর্শক আছে, তারা জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ায় আর রিপোর্ট পাঠায়—বাঁদর এত, বাঁদরী এত, বাঁদরছানা এত। কলকাতার অফিসে এইসব রিপোর্ট ফাইল করা হয় এবং মোটা মোটা খাতায় তার খতিয়ান ওঠে।

আজ বরুণের হাতে কাজ কিচ্ছু নেই, মনেও সুখ নেই। সে তার অফিসঘরে ঘূর্ণিচেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে দিয়ে সিগারেট টানছে আর আকাশ পাতাল ভাবছে, এমন সময় সামনের বাংলা কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি তার চোখে পড়ল—

যদি মনে করেন সময়টা ভাল যাচ্ছে না, মুশকিলে পড়েছেন, তবে আমার কাছে আসতে পারেন। যদি অবস্থা এমন হয় যে উকিল ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার পুলিস জ্যোতিষী বা গুরুমহারাজ কিছুই করতে পারবে না, তবে বৃথা-দেরি না করে আমাকে জানান। এই ধরুন, আপনার সম্বন্ধী সপরিবারে আপনার বাড়িতে উঠেছেন, ছ মাস হয়ে গেল তবু চলে যাবার নামটি নেই। অথবা আপনার পিসেমশাই তাঁর মেয়ের বিয়ের গহনা কেনবার জন্য আপনাকে তিন হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু রেস খেলতে গিয়ে আপনি তা উড়িয়ে দিয়েছেন। অথবা পাশের বাড়ির ভবানী ঘোষাল আপনাকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে, কিন্তু সে হচ্ছে ষণ্ডামার্ক গুণ্ডা আর আপনি রোগাপটকা। কিংবা ধরুন আপনার স্ত্রীর মাথায় ঢুকেছে যে তাঁর মতন সুন্দরী ভূভারতে নেই, তিনি সিনেমা অ্যাকট্রেস হবার জন্য খেপে উঠেছেন, আপনি

কিছুতেই তাঁকে বুঝতে পারছেন না। কিংবা মনে করুন আপনি একটি মেয়েকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেবার পর অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ঘোরতর প্রেমে পড়েছেন, আগেরটিকে খারিজ করবার উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। ইত্যাদি প্রকার সংকটে যদি পড়ে থাকেন তো সোজা আমার কাছে চলে আসুন। শ্রীসরলাক্ষ হোম, তিন নম্বর বেচু কর স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। সকাল আটটা থেকে দশটা, বিকেল চারটে থেকে রাত নটা।

বিজ্ঞাপনটি পড়ে বরুণ কিড়িং করে ঘণ্টা বাজালে। লাল চাপকান পরা একজন আরদালী ঘরে এল, বরুণ তাকে বললে, মিস দাস। একটু পরে ঘরে ঢুকল খঞ্জনা দাস, বরুণের অ্যাসিস্টাণ্ট. রোগা লম্বা, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা ঢেউ তোলা রুক্ষ ফাঁপানো চুল, চাঁচা ভুরু, গোলাপী গাল, লাল ঠোঁট, লাল নখ, নখের ডগা টিকে দেবার লানসেটের মতন সরু। সস্তা সিন্থেটিক ভায়োলেটের গন্ধে ঘর ভরে গেল।

বরুণ কাগজটা তার হাতে দিয়ে বললে, এই বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখ।

বিজ্ঞাপন পড়ে খঞ্জনা বললে, যাবে নাকি লোকটার কাছে? নিশ্চয় হামবগ জোচ্চোর, কিছুই করতে পারবে না, শুধু ঠকিয়ে পয়সা নেবে। আমার কথা শোন, দু নৌকোয় পা রেখো না, মাণ্ডবী আর তার বাপকে সোজা জানিয়ে দাও যে তুমি অন্য মেয়ে বিয়ে করবে।

—তার ফল কি হবে জান তো? আমার আড়াই হাজার টাকা মাইনের চাকরিটি যাবে। আমাদের চলবে কি করে? মাণ্ডবীর বাপ গদাধর ঘোষকে তুমি জান না, অত্যন্ত রাগী লোক।

—অত ভয় কিসের? তোমার সরকারী চাকরি, গদাই ঘোষ তোমার মনিব নয়, ইচ্ছে করলেই তোমাকে সরাতে পারে না। আর যদিই চাকরি যায়, অন্য জায়গায় একটা জুটিয়ে নিতে পারবে না?

বরুণ বললে, আজ বিকেলে এই সরলাক্ষ হোমের কাছে গিয়ে দেখি। যদি কোনও উপায় বাতলাতে না পারে তবে তুমি যা বলছ তাই করব।

এখন সরলাক্ষ হোমের পরিচয় জানা দরকার। লোকটির আসল নাম সরলচন্দ্র সোম। বি-এ পাস করে সে স্থির করলে আর পড়বে না, চাকরিও করবে না, বুদ্ধি খাটিয়ে স্বাধীনভাবে রোজগার করবে। প্রথমে সে রাজজ্যোতিষীর ব্যবসা শুরু করলে। কিন্তু তাতে কিছু হল না, কারণ সামুদ্রিক আর ফলিত জ্যোতিষের বুলি তার তেমন রপ্ত নেই, মক্কেলরা তার বক্তৃতায় মুগ্ধ হল না। তার পর সে সরলাক্ষ হোম নাম নিয়ে ডিটেকটিভ সেজে বসল, কিন্তু তাতেও সুবিধা হল না। সম্প্রতি সে একেবারে নতুন ধরনের ব্যবসা ফেঁদেছে মক্কেলও অল্পস্বল্প আসছে।

সরলাক্ষ হোমের বাড়িতে ঢুকতেই যে ঘর সেখানে একটা ছোট টেবিল আর তিনটে চেয়ার আছে, মক্কেলরা সেখানে অপেক্ষা করে। তার পরের ঘরটি কনসল্টিং রুম, সেখানে সরলাক্ষ আর তার বন্ধু বটুক সেন গল্প করছে। বটুক সরলাক্ষর চাইতে বয়সে কিছু বড়, সম্প্রতি পাস করে ডাক্তার হয়েছে, কিন্তু এখনও কেউ তাকে ডাকে না। ঘরের ঘড়িতে পৌনে চারটে বেজেছে।

বটুক সেন বলছিল, খুব খরচ করে ব্যবসা তো ফাঁদলে। ঘর সাজিয়েছ, দামী পর্দা টাঙিয়েছ, উর্দি পরা বয় রেখেছ, কাগজে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছ। মক্কেল কেমন আসছে?

সরলাক্ষ বললে, দুটি একটি করে আসছে। বেশীর ভাগই স্কুলের ছেলে, ষোল টাকা ফী দেবার সাধ্য নেই, টাকাটা সিকেটা যা দেয় তাই নিই। এক-জন প্রেমে পড়েছে, কিন্তু সে অত্যন্ত বেঁটে বলে প্রণয়িনী তাকে গ্রাহ্য করছে না। আমি অ্যাডভাইস দিয়েছি—সকালে দু পায়ে দুখানা ইট বেঁধে দু হাতে গাছের ডাল ধরে আধ ঘণ্টা দোল খাবে, বিকেলে মাঠে গিয়ে মনুমেণ্টের মাথার দিকে তাকিয়ে এক ঘণ্টা ধ্যান করবে, ছ মাসের মধ্যে ছ ইঞ্চি বেড়ে যাবে। আর একটি ছেলে কাশী থেকে পালিয়ে এখানে ফূর্তি করতে এসেছে, টাকা সব ফুরিয়ে গেছে, বাপকে জানাতে লজ্জা হচ্ছে। আমি বলেছি—লিখে দাও, ছেলেধরা ক্লোরোফর্ম করে নিয়ে এসেছে, মিস্টার সরলাক্ষ হোম আমাকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, পত্রপাঠ এক শ টাকা পাঠাবেন। আর এই দেখ বটুক-দা—শ্রীগদাধর ঘোষ চিঠি লিখেছেন, আজ সন্ধ্যা সাতটায় আসবেন।

বটুক বললে, বল কি হে! গদাধর তো মস্ত বড় লোক, তার আবার মুশকিল কি হল? তাকে যদি খুশী করতে পার তো তোমার বরাত ফিরে যাবে।

সরলাক্ষর প্রতিহাররক্ষী ছোকরা সোনালাল একটা স্লিপ নিয়ে এল। সরলাক্ষ পড়ে বললে, এ যে দেখছি একজন মহিলা, মাণ্ডবী ঘোষ। পাঠিয়ে দে এখানে।

কুড়ি-বাইশ বছরের একটি মেয়ে ঘরে এল। দুজন লোক দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললে, মিস্টার হোমের সঙ্গে কিছু প্রাইভেট কথা বলতে চাই।

সরলাক্ষ বললে আমিই হোম, ইনি আমার সহ-কর্মী ডাক্তার বটুক সেন। আপনি এঁর সামনে সব

'এই বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখ'

কথা বলতে পারেন, কোনও দ্বিধা করবেন না। বসুন আপনি।

মাণ্ডবী কিছুক্ষণ ঘাড় নীচু করে বসে রইল। তার পর আস্তে আস্তে বললে, আমার বাবার নাম শুনে থাকবেন, শ্রীগদাধর ঘোষ।

সরলাক্ষ বললে, ও, তাঁরই কন্যা আপনি?

—হাঁ। বরুণ-দার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা অনেক কাল থেকে ঠিক করা আছে—বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা বরুণ বিশ্বাস।

—হাঁ হাঁ, এই নতুন পোস্টের কথা কাগজে পড়েছি বটে। খুব ভাল সম্বন্ধ, কংগ্রাট্স মিস ঘোষ।

মাণ্ডবী বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বললে, একটা বিশ্রী গুজব শুনছি, বরুণ-দা তার অ্যাসিস্টাণ্ট খঞ্জনা দাসের প্রেমে পড়েছে।

—আপনার বাবা জানেন?

—জানেন, কিন্তু তিনি তেমন গা করছেন না। বলছেন, ইয়ংম্যানদের অমন একটু আধটু বেচাল হয়ে থাকে, বিয়ে হলেই সেরে যাবে।

—কথাটা ঠিক, চটপট বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভাল।

—এক জ্যোতিষী বলেছেন আমার একটা ফাঁড়া আছে, তিন মাস পরে কেটে যাবে। তার পর বিয়ে হবে। কিন্তু তার মধ্যে বরুণ-দা কি করে বসবে কে জানে।

—দেখি আপনার হাত।

মাণ্ডবীর করতল দেখে সরলাক্ষ বললে, হুঁ, ফাঁড়া একটা আছে বটে, কিন্তু তিন মাস নয়, মাস খানিকের মধ্যেই আমি কাটিয়ে দেব। খঞ্জনা দাসের খপ্পর থেকে আপনি শ্রীবিশ্বাসকে উদ্ধার করতে চান তো?

—হাঁ। আপনি দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিন, ভীষণ ঝগড়া, যাতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়। খরচ যা লাগে আমি দেব, এখন এই এক শ টাকা আগাম দিচ্ছি।

সরলাক্ষ সহাস্যে বললে, ব্যস্ত হবেন না, আমার প্রথম ফী ষোল টাকা মাত্র। কাজ উদ্ধার হলে আরও যা ইচ্ছে দেবেন।

বটুক বললে, মিস ঘোষ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সরলাক্ষর অসাধ্য কিছু নেই, ঠিক ঝগড়া বাধিয়ে দেবে।

মাণ্ডবী মাথা নেড়ে বললে, উঁহু, অত সহজ ভাববেন না। খঞ্জনাকে আপনারা চেনেন না, ভীষণ বদমাশ মেয়ে, দারুণ ছিনে জোঁক, সহজে ছাড়বে না। আর বরুণ-দাও ভীষণ বোকা।

সরলাক্ষ প্রশ্ন করলে, বরুণ-দাকে আপনি কত দিন থেকে জানেন?

—সেই ছেলেবেলা থেকে। আমার বাবাই ওকে মানুষ করেছেন, চাকরিও জুটিয়ে দিয়েছেন।

সোনালাল আবার ঘরে এসে একটা কার্ড দিলে। সরলাক্ষ দেখে বললে, আরে, স্বয়ং বরুণ বিশ্বাস দেখা করতে এসেছেন!

মাণ্ডবী চমকে উঠে বললে, সর্বনাশ, আমাকে তো দেখে ফেলবে! কি করি বলুন তো?

সরলাক্ষ বললে, কোনও চিন্তা নেই, আপনি ওই পিছনের ঘরে যান, মোটা পর্দা আছে, কিছু দেখা যাবে না। শ্রীবিশ্বাস চলে গেলে আপনি আবার এ ঘরে আসবেন।

মাণ্ডবী তাড়াতাড়ি পিছনের ঘরে গেল এবং পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পাততে লাগল।

বরুণ বিশ্বাস ঘরে ঢুকে বললে, মিস্টার হোমের সঙ্গে আমার কথা আছে, অত্যন্ত প্রাইভেট।

সরলাক্ষ বললে, আমি সরলাক্ষ হোম, ইনি আমার কোলীগ ডাক্তার বটুক সেন। এঁর সামনে আপনি সচ্ছন্দে সব কথা বলতে পারেন।

বরুণ তবু ইতস্তত করছে দেখে বটুক বললে, মিস্টার বিশ্বাস, আপনি সংকোচ করবেন না। শার্লক হোম্‌সের জুড়িদার যেমন ডাক্তার ওআটসন, সরলাক্ষ হোমের তেমনি ডাক্তার বটুক সেন—এই আমি। তবে আমি ওআটসনের মতন হাঁদা নই। আপনিই বাঁদর দপ্তরের কর্তা তো?

বরুণ বললে, আমি হচ্ছি ডিরেক্টর অভ মংকি ডিপোর্টেশন। সরলাক্ষবাবু, আমি একটি অত্যন্ত ডেলিকেট ব্যাপারের জন্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।

সরলাক্ষ বললে, কিচ্ছু ভাববেন না, আপনি খোলসা করে সব কথা বলুন।

—শ্রীগদাধর ঘোষের নাম শুনেছেন তো? তাঁর মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গে আমার বিবাহ বহু কাল থেকে স্থির হয়ে আছে।

—চমৎকার সম্বন্ধ, কংগ্রাট্‌স মিস্টার বিশ্বাস।

—কিন্তু আমি অন্য একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি।

—বেশ তো, তাঁকেই বিবাহ করুন না।

—তাতে বিস্তর বাধা। শ্রীগদাধর আমার পিতৃবন্ধু, ছেলেবেলার অভিভাবক, এখনও মুরুব্বী। তিনিই আমার চাকরিটি করে দিয়েছেন, চটে গেলে তিনিই আমাকে তাড়াতে পারেন। অথচ তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে আমি বিস্তর সম্পত্তি পাব, চাকরিও বজায় থাকবে।

—তবে তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করুন না।

—দেখুন, মাণ্ডবীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, তাকে ছোট বোন মনে করতে পারি, কিন্তু তার সঙ্গে প্রেম হওয়া অসম্ভব।

—দেখতে বিশ্রী বুঝি?

—ঠিক বিশ্রী হয়তো নয়, কিন্তু আমার পছন্দর সঙ্গে একদম মেলে না। মোটাসোটা গড়ন, ডলি-পুতুলের মতন টেবো টেবো গাল। ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে বটে, কিন্তু চালচলন সেকেলে, স্মার্ট নয়, ভুল ইংরিজী বলে। এখনও জরির ফিতে দিয়ে খোঁপা বাঁধে, এক গাদা গহনা পরে জুজুবুড়ী সাজে।

—যাঁকে ভালবেসে ফেলেছেন তিনি কেমন?

—খঞ্জনা? ওঃ, সুপর্ব্, চমৎকার। মেমের মতন ইংরিজী বলে, তার সঙ্গে মাণ্ডবীর তুলনাই হয় না।

সরলাক্ষ বললে, দেখুন মিস্টার বরুণ বিশ্বাস, আপনার ইচ্ছেটা বুঝেছি। আপনি চাকরি বজায় রাখতে চান, গদাধরবাবুর সম্পত্তিও চান, অথচ তাঁর কন্যাকে চান না। এই তো?

বরুণ মাথা নীচু করে বললে, সমস্যাটা সেই-রকমই দাঁড়িয়েছে বটে। কোনও উপায় বলতে পারেন?

সরলাক্ষ বললে, একটা খুব সোজা উপায় বাতলাতে পারি। আপনি হিন্দু তো? এখনও বহু-বিবাহ-নিষেধের আইন পাস হয় নি। শ্রীগদাধরের কন্যাকে বিবাহ করে ফেলুন, যত পারেন সম্পত্তি আদায় করে নিন। ছ মাস পরে মিস খঞ্জনাকেও বিবাহ করবেন, তাঁকেই সুয়োরানীর পোস্ট দেবেন।

বরুণ বললে, আপনি গদাধর ঘোষকে জানেন না, ধড়িবাজ দুর্দান্ত লোক। সম্পত্তি যা দেবার তিনি মেয়েকেই দেবেন। খঞ্জনাকে বিয়ে করলে তৎক্ষণাৎ আমার চাকরিটি খাবেন আর মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন।

বটুক সেন বললে, আমি একটি ডাক্তারী উপায় বলছি শুনুন। মিস মাণ্ডবীকে বিয়ে করে ফেলুন। আপনাকে দু পুরিয়া আর্সেনিক দেব, একটা শ্বশুরকে আর একটা শ্বশুর-কন্যাকে চায়ের সঙ্গে খাওয়াবেন। দুজনেই পঞ্চত্ব পেলে সম্পত্তি আপনার হাতে আসবে, চাকরিও থাকবে, তখন মিস খঞ্জনাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করবেন।

—বিষ দিতে বলছেন?

—আর্সেনিকে আপত্তি থাকলে কলেরা জার্ম দিতে পারি, কাজ সমানই হবে।

বরুণ রেগে গিয়ে বললে, আপনাদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতে এখানে আসি নি, আমার সময়ের মূল্য আছে।

সরলাক্ষ বললে, না না রাগ করবেন না, আপনার প্রবলেমটি বড় শক্ত কিনা তাই বটুক-দা

'আপনি ত বড্ড আপসেট হয়ে পড়েছেন দেখছি'

একটু ঠাট্টা করেছেন। আমি বলি শুনুন—আপনার আকাঙ্ক্ষাটি বড্ড বেশী নয় কি? কিছু কমিয়ে ফেলুন, দুধও খাবেন তামাকও খাবেন তা তো হয় না।

—আচ্ছা, সম্পত্তির আশা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি এমন উপায় বলতে পারেন যাতে মাণ্ডবীর সঙ্গে আমার বিয়ে ভেস্তে যায় অথচ চাকরির ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ গদাধর ঘোষ রাগ না করেন?

—আমাকে একটু সময় দিন, ভেবে চিন্তে উপায় বার করতে হবে। আপনি সাত দিন পরে আসবেন। ফী জানতে চান? আজ ষোল টাকা দিন, তার পর কাজ উদ্ধার হলে তার গুরুত্ব বুঝে আরও টাকা দেবেন।

বরুণ টাকা দিয়ে চলে গেল।

মাণ্ডবী পর্দা ঠেলে ঘরে এল। তার গা কাঁপছে, মুখ লাল, চোখ ফুলো ফুলো, দেখেই বোঝা যায় যে জোর করে কান্না চেপে রেখেছে।

বটুক সেন বললে, একি মিস ঘোষ, আপনি বড্ড আপসেট হয়ে পড়েছেন দেখছি! স্থির হয়ে বসুন, আমি দু মিনিটের মধ্যে একটা ওষুধ নিয়ে আসছি।

মাণ্ডবী বললে, ওষুধ চাই না, একটু জল।

সরলাক্ষ তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে দিলে। মাণ্ডবী চোখে মুখে জল দিয়ে ভাঙা গলায় বললে, সরলাক্ষবাবু, আর কিছু করবার দরকার নেই, বরুণ-দাকে আমি বিয়ে করব না।

সরলাক্ষ বললে, না না, ঝোঁকের মাথায় কোনও প্রতিজ্ঞা করবেন না। আপনার বাবা খুব খাঁটী কথা বলেছেন, বিয়ে হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—খঞ্জনার খপ্পর থেকে আপনার বরুণ-দাকে উদ্ধার করবই। যদি তিনি অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চান তবে তাঁকে বিয়ে করবেন না কেন?

সজোরে মাথা নেড়ে মাণ্ডবী বললে, না না না। আমি মুটকী ধুমসী, আমি সেকেলে মুখ্খু জুজু-বুড়ী, আর খঞ্জনা হচ্ছে বিদ্যাধরী—

—ও, আপনি বুঝি আড়ি পাতছিলেন! ভেরি ব্যাড। ওসব কথায় কান দেবেন না, বাঁদরের কর্তা হয়ে আপনার বরুণ-দা বাঁদুরে বুদ্ধি পেয়েছেন, খঞ্জনার মোহে পড়ে যা তা বলছেন। মোহ কেটে গেলেই আপনার কদর তিনি বুঝবেন। আপনি হচ্ছেন সেই কালিদাস যা বলেছেন—পর্যাপ্তপুষ্প-স্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, আপনি হচ্ছেন—শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা—

—চুপ করুন, অসভ্যতা করবেন না। এই নিন আপনার ষোল টাকা, আমি চললুম।

সরলাক্ষ হাতজোড় করে বললেন, মাণ্ডবী দেবী, মন শান্ত করুন, ধৈর্য ধরুন। যত শীঘ্র পারি খঞ্জনাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। দোহাই আপনার, তত দিন কিছু করে বসবেন না।

মাণ্ডবী নমস্কার করে চলে গেল। বটুক বললে, নাও, ঠেলা সামলাও এখন। সবাই দেখছি ভীষণ, খঞ্জনা ভীষণ বদমাশ, বরুণ-দা ভীষণ বোকা, আর মাণ্ডবী ভীষণ ছেলেমানুষ। পাত্রী এক দিকে যাচ্ছেন, পাত্র আর এক দিকে যাচ্ছেন, কার মন রাখবে? আবার পাত্রীর বাপ আসছেন, তিনি কি চান কে জানে।

সন্ধ্যা সাতটায় শ্রীগদাধর ঘোষ প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে উপস্থিত হলেন। সরলাক্ষ খুব খাতির করে তাঁকে নিজের খাস কামরায় নিয়ে গিয়ে বসালে এবং বটুকের পরিচয় দিলে।

পকেট থেকে বিজ্ঞাপনটা বার করে শ্রীগদাধর একটু হেসে বললেন, খাসা ব্যবসা খুলেছেন সরলাক্ষবাবু। ডেলিকেট ব্যাপারে মতলব দিতে পারে এমন একজন তুখড় চৌকশ লোকের বড়ই অভাব ছিল। আপনি বিজ্ঞাপনে ঠিকই লিখেছেন, ডাক্তার উকিল পুলিস জ্যোতিষী গুরু—এদের কি সব কথা বলা চলে, নাকি এরা সব সমস্যার সমাধান করতে পারে? আপনার তো বয়স বেশী নয়, ব্যবসাটি শিখলেন কোথায়? ডিগ্রী কিছু আছে?

সরলাক্ষ বললে, আমি হচ্ছি সাউথ আমেরিকার মায়া-আজটেক-ইংকা ইউনিভার্সিটির পি-এচ-ডি, আমার রিসার্চের জন্য সেখানকার অনারারী ডিগ্রী পেয়েছি। বাগবাজার বিবুধসভাও আমাকে বুদ্ধি-বারিধি উপাধি দিয়েছেন।

—বেশ বেশ। এখন আমার মুশকিলটা শুনুন।

শ্রীগদাধর তাঁর মুশকিলটা সবিস্তারে বিবৃত করে অবশেষে বললেন, আপনি ওই খঞ্জনা মাগীর কবল থেকে বরুণকে চটপট উদ্ধার করে দিন, আমার মেয়েটা বড়ই মনমরা হয়ে আছে।

সরলাক্ষ বললে, আপনার তো শুনেছি খুব প্রতিপত্তি, মন্ত্রীরা আপনার কথায় ওঠেন বসেন। আপনি মনে করলেই খঞ্জনাকে আণ্ডামানে বদলী করাতে পারেন।

—সেটি হবার জো নেই। খঞ্জনা হচ্ছে চতুর্ভুজ খাবলদারের তৃতীয় পক্ষের শালী। চতুর্ভুজকে চটানো আমার পলিসি নয়, আমার ছেলে দিল্লিতে তারই কম্পানিতে কাজ করে।

—বরুণকে দূরে বদলী করিয়ে দিন।

—সে কথা আমি যে ভাবি নি এমন নয়। কিন্তু বিচ্ছেদের ফলে প্রেম যে আরও চাগিয়ে উঠবে, চিঠিতে লম্বা লম্বা প্রেমালাপ চলবে, তার কি করবেন?

—তারও উপায় আছে। অন্য কারও সঙ্গে চটপট খঞ্জনার বিয়ে দিতে হবে।

—খেপেছেন! খঞ্জনা আমাদের ফরমাশ মত বিয়ে করবে কেন?

—জুতসই পাত্র পেলেই করবে। শুনুন সার—বরুণকে দূরে বদলী করান, তার জায়গায় এমন একজন বাহাল করুন যে খঞ্জনাকে বিয়ে করতে রাজী আছে।

—কোথায় পাব তেমন লোক?

বটুককে ঠেলা দিয়ে সরলাক্ষ বললে, কি বল বটুক-দা?

বটুক প্রশ্ন করলে, মাইনে কত?

শ্রীগদাধর বললেন, তা ভালই, আড়াই হাজার।

সরলাক্ষ বললে, রাজী আছ বটুক-দা? এমন চাকরি পেলে খঞ্জনাকে আত্মসাৎ করতে পারবে না?

—খুব পারব, খঞ্জনা গঞ্জনা ঝঞ্জনা কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।

শ্রীগদাধর বললেন, বরুণকে ছেড়ে খঞ্জনা তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? চাকরির বদল যত সহজে হয় প্রেমের বদল তত সহজে হয় না।

বটুক বললে, সেজন্যে আপনি ভাববেন না সার, আমি খঞ্জনাকে ঠিক পটিয়ে নেব।

—কিন্তু জন্তুর সায়েন্স না জানলে তো বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা হতে পারবে না। তুমি তো নাড়ী-টেপা ডাক্তার?

সরলাক্ষ বললে, শুনুন সার। এমন বিদ্যে নেই যা ডাক্তাররা শেখে না, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বটানি জোঅলজি আরও কত কি। নয় বটুক-দা?

বটুক বললে, নিশ্চয়। জোঅলজি, বিশেষ করে মংকিলজি, আমার খুব ভাল রকম জানা আছে।

গদাধর একটু ভেবে বললেন, বেশ, কালই আমি মিনিস্টার ইন চার্জকে বলব। কিন্তু প্রথমটা টেম্পোরারি হবে, যদি দু মাসের মধ্যে খঞ্জনাকে বিয়ে করতে পার তবেই চাকরি পাকা হবে, নয়তো ডিসমিস।

বটুক বললে, দু মাস লাগবে না, এক মাসের মধ্যেই আমি তাকে বাগিয়ে নেব।

গদাধর বললেন, বেশ বেশ। বড় আনন্দ হল তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে। কাল আমাকে একবার দিল্লি যেতে হবে, গিন্নীকে ছেলের কাছে রেখে আসব, পাঁচ দিন পরে ফিরব। তার পরের রবিবারে বিকেলে চারটের সময় তোমরা আমার বাড়িতে চা খাবে, কেমন? আমার মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেব।

সরলাক্ষ আর বটুক সবিনয়ে বললে, যে আজ্ঞে।

শ্রীগদাধরের সুপারিশের ফলে তিন দিনের মধ্যে বরুণের জায়গায় বটুক সেন বাহাল হলে এবং বরুণ দহরমগঞ্জে বদলী হয়ে গেল। তার নতুন পদের নাম—কুক্কটাণ্ড-বিবর্ধন-পরীক্ষা-সংস্থা-আয়ুক্তক, অর্থাৎ অফিসার ইন চার্জ হেন্‌স এগ এনলার্জমেণ্ট এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশন।

নির্দিষ্ট দিনে সরলাক্ষ আর বটুক গদাধরবাবুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। গদাধর বললেন, এই যে, এস এস। ওরে মাণ্ডবী, এদিকে আয়। এই ইনি হচ্ছেন শ্রীসরলাক্ষ হোম, মুশকিল আসান এক্সপার্ট। আর ইনি ডাক্তার বটুক সেন, আমাদের নতুন বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা। খাসা লোক এঁরা।

নমস্কার বিনিময়ের পর বটুক বললে, সার, একটি অপরাধ হয়ে গেছে, আপনাকে আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল, বড্ড তাড়াতাড়ি হল কিনা তাই পারি নি, মাপ করবেন। শ্রীমতী খঞ্জনার সঙ্গে কাল আমার শুভ পরিণয় হয়ে গেছে।

বটুকের পিঠ চাপড়ে শ্রীগদাধর বললেন, জিতা রহো, বাহবা বাহবা, বলিহারি, শাবাশ! আমরা ভারী খুশী হলুম শুনে, কি বলিস মাণ্ডবী? খেতে শুরু কর তোমরা, আমি চট করে গিন্নীকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে আসছি।

মাণ্ডবী বটুককে বললে, ধন্য রুচি আপনার, বাবার কাছে ঘুষ খেয়ে সেই শূর্পণখাটাকে বিয়ে করে ফেললেন! খঞ্জনাই বা কি রকম মেয়ে, দু দিনের মধ্যে বরুণ-দাকে ভুলে গিয়ে আপনার গলায় মালা দিলে!

সরলাক্ষ বললে, তিনি অতি সুবুদ্ধি মহিলা, বরুণ-দার চাকরিটি মারেন নি, বটুক-দার চাকরি পাকা করে দিয়েছেন, আমারও মুখরক্ষা করেছেন।

মাণ্ডবী বললে, আপনার আবার কি করলেন?

—আপনাকে কথা দিয়েছিলুম দুজনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বাধিয়ে দেব, মনে নেই? আপনি শুনে খুশী হবেন, খঞ্জনা বউ-দি মিস্টার বরুণকে ভীষণ গালাগাল দিয়ে একটি চিঠি লিখেছেন, আমিই সেটা ড্রাফট্ করে দিয়েছি। এখন আপনার লাইন ক্লিয়ার। যদি বরুণ-দাকে আপনি একটি মোলায়েম চিঠি লেখেন তবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার ফীএর বাকী টাকাটা আপনাকে আর দিতে হবে না, আপনার বাবাই তা শোধ করবেন।

—উঃ, আপনাদের কি কোনও প্রিনসিপ্‌ল নেই, সেণ্টিমেণ্ট নেই, হৃদয় নেই, শোভন অশোভন জ্ঞান নেই? কি ভীষণ মানুষ আপনারা! মাপ করবেন, আপনাদের কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে যা তা বলে ফেলেছি।

গদাধর ঘোষ ও সরলাক্ষ হোম

গদাধরবাবু তার পাঠিয়ে ফিরে এলেন। অনেকক্ষণ নানা রকম আলাপ চলল, তার পর সরলাক্ষ আর বটুক চলে গেল।

পরদিন বরুণের কাছ থেকে মাণ্ডবী একটা আট পাতা চিঠি পেলে।

এখানেই থামা যেতে পারে, কারণ এর পরে যা হল তা আপনারা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু এমন পাঠক অনেক আছেন যাঁরা নায়ক নায়িকার একটা হেস্তনেস্ত না দেখলে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তাঁদের অবগতির জন্য বাকীটা বলতে হল।

সন্ধ্যার সময় শ্রীগদাধর সরলাক্ষর কাছে এলেন। সে একাই আছে, বটুক সস্ত্রীক সিনেমায় গেছে। গদাধর বললেন, ওহে সরলাক্ষ, এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল! মাণ্ডবীকে বরুণ মস্ত একটা চিঠি লিখেছে, বেশ ভাল চিঠি, খুব অনুতাপ জানিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা চেয়েছে। আমিও অনেক বোঝালুম, কিন্তু মাণ্ডবী গোঁ ধরে বসে আছে। চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, ছুঁচোকে আমি বিয়ে করতে পারব না। বাবা সরলাক্ষ, তুমি কালই তার সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে ব'লো। বরুণের মতন পাত্র লাখে একটা মেলে না। তোমার অসাধ্য কাজ নেই, মাণ্ডবীকে রাজী করাতে যদি পার তো তোমাকে খুশী করে দেব।

সরলাক্ষ বললে, যে আজ্ঞে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সাধ্যমত চেষ্টা করব।

পরদিন শ্রীগদাধর সরলাক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল হে, রাজী করাতে পারলে?

—উঁহু, বরুণের ওপর ভীষণ চটে গেছেন, শুধু ছুঁচো নয়, মীন মাইণ্ডেড মংকিও বলেছেন। আমার মতে চটপট তাঁর অন্যত্র বিবাহ হওয়া দরকার, নয়তো মনের শান্তি ফিরে পাবেন না। দারুণ একটা শক পেয়েছেন কিনা। তাঁর হৃদয়ে যে ভ্যাকুয়ম হয়েছে সেটা ভরতি করাতে হবে।

—কিন্ত এত তাড়াতাড়ি অন্য লোককে বিয়ে করতে রাজী হবে কেন? ভাল পাত্রই বা পাই কোথা?

—যদি অভয় দেন তো নিবেদন করি। অনুমতি পেলে নিজের জন্যে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—তুমি! তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? ধর মাণ্ডবী রাজী হল, কিন্ত আমার হোমরা চোমরা আত্মীয় স্বজনের কাছে জামাইএর পরিচয় কি দেব? মুশকিল আসান অধিকর্তা বললে তো চলবে না, লোকে হাসবে।

—আপনার কৃপা হলেই আমি একটা বড় পোস্ট পেয়ে যেতে পারি, আপনার জামাইএর উপযুক্ত।

—কোন্ কাজ পারবে তুমি?

—সরকার তো হরেক রকম পরিকল্পনা করছেন, মাটির তলায় রেল, শহরের চারদিক ঘিরে চক্রবেড়ে রেল, সমুদ্রের ধারে নতুন শহর, ড্রেনের ময়লা থেকে গ্যাস, আরও কত কি। আমিও ভাল ভাল স্কীম বাতলাতে পারি।

—বল না একটা।

—এই ধরুন উপকণ্ঠ-গির্যাশ্রম।

—সে আবার কি, গির্জে বানাতে চাও নাকি?

—আজ্ঞে না। গিরি-আশ্রম হল গির্যাশ্রম, উপকণ্ঠ-গির্যাশ্রম মানে সাবর্বান হিল স্টেশন। সহজেই হতে পারবে। কলকাতার কাছে লম্বা চওড়ায় এক শ মাইল একটা জমি চাই, তাতে প্রকাণ্ড একটা লেক কাটা হবে, তার মাটি স্তূপাকার করে লেকের মধ্যিখানে দশ-বারো হাজার ফুট উঁচু একটা পিরামিড বা কৃত্রিম পাহাড় তৈরি হবে। দার্জিলিং যাবার দরকার হবে না, পাহাড়ের গায়ে আর মাথায় একটি চমৎকার শহর গড়ে উঠবে, বিস্তর সেলামি দিয়ে লোকে জমি লীজ নেবে। আঙুর আপেল পীচ আখরোট বাদাম কমলানেবু ফলবে, নীচের লেকে অজস্র মাছ জন্মাবে। পাহাড়ের মাথা থেকে বিনা পয়সায় বরফ পাবেন, ঢালু গা দিয়ে আপনিই হড়াক করে নেমে আসবে—

—চমৎকার, চমৎকার, আর বলতে হবে না। কালই আমি মিনিস্টার ইন চার্জ অভ ল্যাণ্ড আপ্‌লিফ্‌টের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু তোমার পোস্টের নামটা কি হবে?

—পরিকল্পন-মহোপদেষ্টা, অর্থাৎ অ্যাডভাইজার-জেনারল অভ স্কীম্‌স। সাড়ে তিন হাজার টাকা মাইনে দিলেই চলবে।

—নিশ্চিন্ত থাক বাবাজী, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমি সব পাকা করে ফেলব। তুমি আর দেরি ক'রো না, লেগে যাও, এখন থেকেই মাণ্ডবীকে বাগাবার চেষ্টা কর।

মাণ্ডবী অতি লক্ষ্মী মেয়ে, আর সরলাক্ষর প্রেমের প্যাঁচ অর্থাৎ টেকনিকও খুব উঁচুদরের। পাঁচ দিনের মধ্যেই সে মাণ্ডবীকে বাগিয়ে ফেললে।

কিন্তু বরুণ বিশ্বাসের কি হল? তার কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। তাকে বিয়ে করবার জন্যে একটা মাদ্রাজী, দুটো পঞ্জাবী আর তিনটে ফিরিঙ্গী মেয়ে ছেঁকে ধরেছে, তা ছাড়া ওখানকার জজ-গিন্নী ডেপুটি-গিন্নী আর উকিল-গিন্নীও নিজের নিজের আইবড় মেয়েদের বরুণের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছেন। বেচারা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

দেবীর বাহন — শ্রীনন্দলাল বসু

[বিজয়ার আশীর্বাদসূচক এই পোস্ট-কার্ডের স্কেচের পিছনে শিল্পাচার্য যে পত্র ছাত্রকে লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।]

মা দুর্গা এবার সিংহকে নিয়ে জান নি। বড় মুস্কিল হয়েছে। সিংহ শিবের ষাঁড়টা খেয়ে ফেলেছে এখন গণেশকে খাবার জন্য তেড়ে যাচ্ছে। কার্তিক রাইফেল চালাচ্ছেন। সিংহটা Man eater হয়ে দাঁড়িয়েছে। British Armyকে হয়তো ডাকতে হবে. বা নিরাপত্তা পরিষদে খবর দিতে হবে।

আশীর্বাদক
নন্দলাল বসু

[শ্রীরথি দের সৌজন্যে]

শিবের বাহন — শ্রীনন্দলাল বসু

[লণ্ঠন হাতে রাধাকান্ত ও অধিকারীর প্রবেশ]

অধিকারীঃ বলি ও রাধাকান্ত, এখানে আলোর অভাব দেখি যে, মেয়েদের জায়গা একেবারে অন্ধকার।

রাধাকান্তঃ মেয়েদের পাছে দেখা যায় তাই ওধারটা—

অধিঃ ও বুঝেছি। তা ভাল। চল ওধারে দেখি। ও রাধাকান্ত, বলি পুরুষ-দের দিকটাও যে কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি দেখছি!

রাধাঃ মোট কয় পয়সার তৈল হল বরাদ্দ, তাতে হবে কি? এই যে হয়েছে তাই ঢের।

অধিঃ তাই তো! আসল যাত্রার দিনেও এমনি অন্ধকারে 'পেলে' হবে নাকি? বলি ও রাধাকান্ত, শোন এদিকে। দেখো আমি এখানে বসি, তুমি দৌড়ে গিয়ে আমার লণ্ঠন কয়টায় তেল ভরে আনো। এই নাও পয়সা, আর দেখো—আচ্ছা থাক। দাও আফিমের কৌটোটা আর দুটো পান।

[রাধাকান্তর প্রস্থান]

[ব্যাণ্ডমাস্টার র‍্যাং-এর প্রবেশ]

র‍্যাংঃ Hell and Black hole in total Eclipse, অন্ধকারের একেবারে পূর্ণগ্রাস—No light.

অধিঃ গুড্ মর্নিং স্যার, আলো আসবে স্যার, এক্সকিউজ ইয়োর অনার স্যার, মশালচি চোট্টা স্যার, অল্ তেল পকেট। বাড়িওয়ালা স্যাংকশন নো অয়েল, ভেরি স্ট্রিক্ট্।

র‍্যাংঃ হারমোনিয়াম এসেছে?

অধিঃ সব হাজির—হারমনি, ছাগল, গরু, মোষ, কেবল—

র‍্যাংঃ কেবল কি?

অধিঃ কাউকে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।

র‍্যাংঃ আলো নেই, জায়গাটা দেখাচ্ছে যেন হারমোনিয়ামের সাদা দাঁতের পাটি পড়ে গিয়ে হাসছে শুধু কালো দাঁত ক'টা মিশি দিয়ে।

অধিঃ ভেরি রাইট স্যার। ইয়োর অনার, এটা হচ্ছে কিনা বৈতরণী ঘাট জবর জংশন; ফর্ দ্যাট্ রীজন স্যার, লুক্ ভয়ংকর একটু খালি। 'সিন পেণ্টার' গুড্ ম্যান। ততক্ষণ এখানে বসে একটু 'ইস্মোক' স্যার? ও কর্তা, কর্তা?

[কর্তার প্রবেশ]

কর্তাঃ কি কি কি হল?

অধিঃ এতক্ষণে কি হল, দেখচোনা, স্যার এসে গেছেন? আলো নেই, ঘণ্টা দেবো, কিন্তু রামশর্মার টিকিও দেখছিনে। টিকিট নিয়েছে কিন্তু এক গোছা।

..."বিধুন্তুদ বিধুমুখী...বিলম্বিত বেণী ফণী ..বিস্ফারিণী রাজনন্দিনী"

কর্তাঃ সে যে ওখানে বসে লুচি ভাজছে দেখলুম।

অধিঃ আরে তাকে যে আত্মারাম সেজে এখনি বেরতে হবে! কি আক্কেল দেখতো, লুচি ভাজছে!

কর্তাঃ রামশর্মা নেই তো লক্ষ্মণশর্মাকে পাঠাও আসরে।

অধিঃ বিলক্ষণ! তোমার কথা শুনলে গা' জ্বলে। হচ্ছে "নহুষের আত্মচরিত"—না তুমি কও ভাই লক্ষ্মণকে আসরে পাঠাতে? তড়ি-ঘড়ি তাকেই বা পাই কমনে?

কর্তাঃ তা হলে নহুষকেই দাও চালান, সে বেলা পাঁচটা থেকে রাজা সেজে বসে আছে।

অধিঃ আরে, আগে চলবেন আত্মারাম যিনি হন নহুষের সূক্ষ্ম শরীর। পরে যাবে তার স্থূল দেহ গজেন্দ্র গমনে। ভুললে নাকি?

কর্তাঃ কিছু ভুলিনি। তুমি একটু ঠাণ্ডা হও দেখি! নিজের পার্টটা ঝালিয়ে নিই।

অধিঃ ঝালাও ঝালাও, তোমাকে তো জানি, আসরে নামলেই সব বিস্মরণ!

কর্তাঃ সে তোমাদের দোষ, ইলেবেন আওয়ারে দেবে পার্ট!

অধিঃ দু' ছত্তর তো পার্ট, এক মাসেও মুখস্থ হল না?

কর্তাঃ ছত্তর হ'লে কি হয়! কথাগুলো যে চোয়াল ধরানো! "বিদ্যুদ্দন্ত-বিস্ফারিত ঘোরতর অট্টহাসত্রাস চিৎকৃত ঝঞ্ঝাবিদারিত রজনী!"—

অধিঃ আরে আমারি কি কিছু কম নাকি? "বিধুন্তুদ বিধুমুখী বৈরী কটক বেষ্টিত বিলম্বিত বেণী ফণী মণি কটি কিঙ্কিনী বিস্ফারিণী রাজনন্দিনী!"

কর্তাঃ কই আত্মারাম শর্মা। এখনো দেখা নেই যে! দাও ফাস্ট বেল্ চটপট, অডিয়ান্স ক্ষেপে উঠেছে।

[নেপথ্যে গোলমাল]

অধিঃ স্যার, ফাস্ট বেল্। গীভ্ ইংলিশ সঙ্।

র‍্যাংঃ ঠিক আছে। বাজাও।

[ইংরেজি গৎ]

[আত্মারামের প্রবেশ]

আত্মাঃ রও বাপু একটু মাথা ঠান্ডা করে নিই, শিঙে ফুঁকেই চললো!

অধিঃ আর মাথা ঠান্ডা করে না।

কর্তাঃ ফলার হয়ে গেছে তো? পেট ঠান্ডা হয়েছে? এখন চট্পট্ সেজে নাও।

আত্মাঃ কি সাজতে হবে?

অধিঃ আত্মারাম ভুললে নাকি?

আত্মাঃ কিছু ভুলিনি। শুধু আসরে গিয়ে কি করতে হবে তা তরমুজ চাপা পড়ে গেছে।

কর্তাঃ ব্যাস্, মুশ্কিল করলে তো!

অধিঃ দুত্তোর! চলে এসো হে কর্তা আমরা সেজে নিই গে'। স্যার গীভ্ একেবারে তেজে সেকেন্ড্ বেল্।

[কর্তা ও অধিকারীর প্রস্থান]

র‍্যাংঃ ওহে লাগাও তাহ'লে—নাও বাজাও।

[ইংরেজি গৎ]

আত্মাঃ চুরুট খায় কে? ধূমপান নিষেধ দেখতে পাচ্ছ না?

র‍্যাংঃ যে অন্ধকার—দেখছি নিজের মুখের কাছে একটি রামপাখী!

আত্মাঃ আমি রামশর্মা। আমি রামপাখী? কুঁকড়ো? হিন্দুর ছেলেকে তুমি কুঁকড়ো বল! ফেলে দাও চুরুট; নইলে রিপোর্ট করবো তোমার নামে —ইনসাল্ট!

[কুঁক্ড়োর ডাক]

র‍্যাংঃ ও মাই প্যারট্! পড়তো শুনি বুলি, পাখি, ডারলিং!

আত্মাঃ তুমিই কালিঘাটের পোটো? উপরন্তু অবনবাবুর ছাত্তর?

র‍্যাংঃ ছুট্! আমি কেন পোটো হবো! আমি মিঃ র‍্যাংস্যাং, ই আই আর গ্লাস্গো। ঐ যে পোটো তো এই দিকেই আসছে।

[চিত্রকরের প্রবেশ]

চিত্রকরঃ আমি কালিঘাটের পোটো নই। আমি চিত্রকর, অবনবাবুর ছাত্র।

আত্মাঃ ভালো, বলি রং টং কিছু সঙ্গে এনেছো? নাকি ওর মত গেলাস্গো পর্যন্তই?

চিত্রঃ বাজে বকো কেন বলো তো?

আত্মাঃ বাজে বকতেই শিখেছি সেই এত্টুকু বেলা থেকে। এখন একটা কাজ করতে পার? বলি আমাকে

আমি চিত্রকর, অবনবাবুর ছাত্র।

একটু রং করে সোন্দর করে দাও দেখি। কেমন রং করা, ওর নাম কি, কি বলে ভাল চিত্রকর?

চিত্রঃ আগে তোমার কি পার্ট করতে হবে তাই বল—তবে তো বুঝি কি রং কি সাজ মানাবে তোমায়?

আত্মাঃ আমি, আমি, ও পম্টার, বল নাহে আমি কে—হাঁ আত্মারাম।

চিত্রঃ আত্মার তো রং নেই। তা ছাড়া, আত্মা হল সূক্ষ্ম। তুমি যে দেখি বিষম স্থূল। তোমাকে তো এ পার্ট মানাচ্ছে না। এতো পুরু পালকের তোষকখানা চাপিয়েছ কেন? তোমায় খুব মিহি কাপড় পরতে হবে। হাওয়ার মতো একেবারে ফিন্‌ফিনে।

আত্মাঃ শীতকালে যাত্রা! এই হিমে পাত্লা পাত্লা কাপড় পরে কেঁপে মরি আর কি! যাও আমায় সাজাতে হবে না।

চিত্রঃ দেখ, তুমি তাহলে আত্মারাম পাখি সেজে নাও। ঠোঁট লাল করে দিই এসো। আর গায়ে একটু সবুজ—

আত্মাঃ না না না লাল ঠোঁট পর্যন্তই থাক। যে অন্ধকার, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সাজটা কেমন হলো।

চিত্রঃ রোসো, একটা রংমশাল জ্বালি।

আত্মাঃ এঃ এ যে একেবারে রঙিন আলোর ভেল্কী-বাজি লাগিয়ে দিলে হে। আমার যে নেচে যেতে ইচ্ছে করছে।

র‍্যাংঃ তা নাচো না? ইচ্ছে যদি হচ্ছে তো নেচে ফেলো। যাত্রার আগে একটু হাত পায়ে খিল ছাড়িয়ে নেওয়া চাই তো?

আত্মাঃ তাহ'লে একটু হরিবোল দিয়ে নাচি!

র‍্যাংঃ হরিবোল? Horrible! একি গঙ্গাযাত্রা পেলে নাকি?

চিত্রঃ তাহ'লেই কিন্তু দপ্ করে আলো নিভে যাবে।

আত্মাঃ আমি তো নাম করতেই শিখেছি। ওহে চিত্রকর, তুমি একটা পাখির গান শিখিয়ে দাও না?

র‍্যাংঃ আচ্ছা, শেখ তবে, এই জুড়ি আর তুড়ি, ধর ধর গান

[জুড়ি ও তুড়ির প্রবেশ ও গান]

গান

ও মন দেখরে চেয়ে আজব তামাসা
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে এক পাখির বাসা।
এক এক ডিমে কত কারখানা
ও তা' গনা যায় না
কেউ জানেনা কত হয় ছানা।
এক পাখিতে সবার আহার যোগায় রে—
সবে সমান তার ভালবাসা॥

[তপসী মাছওয়ালার প্রবেশ]

মেছোগণঃ চাই তপ্‌সীমাছ, অন্ডালী তোপ্‌সীমাছ, ম্যাংগো ফিশ্।

চিত্রঃ এই এই এদিকে এদিকে। এঃ এযে তিন তোপ্!

আত্মাঃ কত করে, কত করে?

কালুঃ আমাদের যাত্রা করতে দেন তো—

আত্মাঃ তো কত করে হবে বলে ফেলো না?

জালুঃ যা খুশী দেবেন।

র‍্যাংঃ যা খুশী! এ্যাজ ইয়ু প্লীজ? এবারে ভালো সুর ধরেচো। ছোকরা-গণ, গান গাও। খুশী কর আমাদের সাথে—কাম্ অন্।

গান

আমায় যা খুশী তাই দিও
আমার যা আছে তাই নিও।
শুধু কাঁদিয়ে দিও না রে
তুমি কেঁদে চেও না—
তোমায় আমায় দেখা হল
দুধ-সাগরের ধারে
চোখের জলে মিলন মালা
ভিজিয়ে দিও না রে।
হাসি দিয়ে করব বরণ
বাঁশী আমার ভরবো গানে
পরাণ ভরা সুরের টানে
টানে টানে টেনে নিও
তোমার পানে॥

চিত্রঃ বাহবা; সুবোধ ছেলেরা, দেখি কেমন মাছ?

আত্মাঃ আরে রও, টানাটানি কর কেন?

কালুঃ দেখুন মশায়, যেন কদমফুলের গড়ে মালা!

আত্মাঃ যাত্রার আরম্ভে, নারদমুনি যেন দাড়ি গোঁফ নিয়ে দেখা দিলেন, দাও।

জালু ঃ ও হবে না মশায়, বলুন আমাদেরও যাত্রার দলে নিলেন ভর্তি করে?

আত্মা ঃ নিলেম, নিলেম। এই তোমাদের মাছ—

চিত্র ঃ এই তোমাদেরও। এই বেশ হ'লো।

আত্মা ঃ এখন আমাদের সেই মাছভাজা ঠাকুরটা এলে যে হয়!

র‍্যাং ঃ ততক্ষণ একটু নেচে কুঁদে ক্ষিদেটাকে চাঙ্গা করে রাখা যাক। "শরীর করে তাজা—নাচ মাছ-ভাজা"।—

কালু ঃ নাচতে হবে?

আত্মা ঃ হবে না! মাছ কি অমনি ভেজে খাওয়াবো? তেল দাও এখন!

জালু ঃ এই সবার মাঝে নাচবো, গাইবো, লজ্জা করবে যে!

চিত্র ঃ যাত্রার দলে ঢুকে লজ্জা? নাও নাচো।

জালু ঃ এখনই?

কালু ঃ এইখানেই?

আত্মা ঃ এইখানেই। ফ্রীশিপ দিয়েছি মনে রেখো। নাও নাচ গাও।

গান

এই খানে সখা তোমায় নাচতে হবে।
আসতে যেতে নাচতে হবে সভার মাঝে
নাচতে হবে নাচতে হবে
তেমনি করে নাচতে হবে,—চলে যাবার সময়
তোমায় এমনি করে নাচতে হবে।
শহর বাজার দিনে রাতে, ছেলে বুড়ো সবার সাথে,
নাচতে হবে নাচতে হবে, আসতে যেতে
নাচতে হবে॥

আত্মা ঃ ক্যাপিটাল! পাক্কা যাত্রার দলের ছোকরা!

কালু ঃ আমরা শিঙিগবাজারে নাটশিং সাজতেম।

চিত্র ঃ এসব ভালো গান শিখেছো বুঝি সেখানে?

জালু ঃ না অবনবাবুর আর্ট ইস্কুলে শিখেছি।

চিত্র ঃ আর্ট জানো? আরে আমিও তো আর্টিস্ট! এসো শেক্‌হ্যান্ড।

কালু ঃ আমাদের একটু রং করে দাও না?

আত্মা ঃ রং অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। বাঁশি বাজালেই ছুটে আসবে।

কালু ঃ ধর বাঁশি।

জালু ঃ ধর গান।

চিত্র ঃ এই দেখ রং এসে গেল হারমোনিয়ামের হাপরের বাতাসে ডানা মেলে।

গান

দিনে রাতে মিলিয়ে দেবার গান, রঙে রঙে—
ঐ আকাশে লুকিয়ে ছিলো, বাতাস বয়ে সেইতো
এলো বাঁশীর সুরে—
রইলো বাঁধা সুরে সুরে, এই বাতাসে
লুকিয়ে ছিল,
আলো ছায়ার মিলিয়ে দেবার গান,
বাঁশী তার বাজলো সুরে সুরে
এই বাতাসে রঙে রঙে॥

দেখুন মশায়, যেন কদম ফুলের মালা

আত্মা ঃ তোমরা থামো আমি যাত্রা করি।

চিত্র ঃ যাত্রা করলেই হল ঝুপ করে?

আত্মা ঃ গান শুনে কি চুপ করে বসে থাকা যায়?

চিত্র ঃ তা'বলে যখন খুশী যাত্রা করবে নাকি? সময় অসময় নেই?

আত্মা ঃ অধিকারী তো এই রকমই হুকুম দিয়ে লিখন পাঠিয়েছে।

চিত্র ঃ বটে, বটে। ভুলে গিয়েছিলেম। আচ্ছা, তাহ'লে তুমি নির্ভয়ে যাত্রা কর—ওধারে।

আত্মা ঃ ওধারে ভারি অন্ধকার। আমি এইখানেই বসে রইলাম।

...উনি যেন প্রকাশ করতে চাইছেন মনের কথা

চিত্র ঃ যাত্রা করবে না?

আত্মা ঃ না। আমার খুশী, আমি বসে বসে তোমাদের যাত্রা দেখবো, গান শুনবো, নাচ দেখবো। তারপর মাছভাজা খেয়ে, ট্যাক্সি করে গোলাপী বিড়ি ধরিয়ে, বাড়ি যাবো আরামে। তবে আমার নাম আত্মারাম।

চিত্র ঃ তোমার মত আর কি কেউ আরামে যাত্রা করতে আসছে?

আত্মা ঃ আসছে কি? ঐ দেখো এসে পড়েছে!

[নহুষের প্রবেশ]

নহু ঃ কই কোনদিকে গেলেন?

চিত্র ঃ কি খুঁজছো? মাছভাজা নাকি?

নহুষ ঃ আত্মারাম গান শুনে এদিকে এলেন। তারপর আর দেখতে পাচ্ছি না। হারিয়ে গেছেন।

গান

আমার প্রানারাম আত্মারাম কোথায়?
যারে শুধাই কাতরে সেই মোরে ফেলে পলায়।
কারে জিজ্ঞাসি ব্যথিত কে এমন
উপদেশদানে প্রাণধনে মিলাবে আমায়॥

কালু ঃ এই যে এখানে চুপটি করে—

জালু ঃ লুকিয়ে আমাদের গান শুনছেন।

আত্মা ঃ আরে চুপ! আমার এখনও আত্ম-প্রকাশের সময় হয়নি।

চিত্র ঃ সময় আবার কি? আমাদের খুশী আত্মপ্রকাশ করতেই হবে তোমায়।

আত্ম ঃ আমি আত্মপ্রকাশ করলে শুধু ছেলেরা নয়, তুমি শুদ্ধু অস্থির হয়ে পড়বে। রাগে, ভয়ে, দুঃখে, সুখে, হাসি, কান্নায় মিলে একটা বিপর্যয় ঝড় বয়ে যাবে এখানটায়।

কালু ঃ তা যাক্ আমরা ভয় পাই পাবো।

জালু ঃ ঝড় বইলে ভয়টা কি?

আত্মা ঃ আত্মারাম যেদিন আত্মপ্রকাশ করবেন, সেদিন ভয় পাও কিনা দেখা যাবে। এখন ঐ রাজা নহুষের মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, উনি যেন প্রকাশ করতে চাচ্ছেন মনের কথা।

নহুষ ঃ হে আত্মারাম! স্বর্গ মর্ত্য পাতালের মুখে এসে আটকে থেকে, আমার মন চঞ্চল হয়েছে। আমাকে যেখানে হোক্ একটা জায়গায় পাঠিয়ে দাও। খেয়া-নৌকোর মত খালি এপার আর ওপার, দুটোর মাঝে বাঁধা থাকতে চাচ্ছে না মন।

আত্মা ঃ ক্যা-পি-টা-ল!

চিত্র ঃ গান গেয়ে মনটা খুশী করে নাওনা কেন?

নহুষ ঃ স্বর্গে যাবার পথ পরিষ্কার করতেই আমার দিন গেছে। গান শেখবার বা শোনবার সময় পাইনি। কেউ যে

এখানে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে গান গাইবে, তেমন জায়গাও নয় এটা। দিন নেই, রাত নেই, এই বৈতরণীর ধারে বসে কেবলই শুনেছি 'পার কর, পার কর' বলে সবাই ছুটেছে। জল ডাকছে 'পার কর'; বাতাস গর্জে বলছে 'পার কর'। 'গান কর' একথা কেউ বলে না।

চিত্রঃ ইনি ছটফট করছেন, ঘাটে বাঁধা ঐ খেয়া-নৌকোটার মত।

আত্মাঃ তা তো দেখছি। কিন্তু ও বলতে চায় কি তা বলে ফেলুক না?

নহুষঃ মন যে কি করছে—কোথায় যেতে চাচ্ছে—তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু চাচ্ছে কিছু।

র‍্যাংঃ রাজাবাবু, তোমার 'হাওয়ান-দেলকী' বিমারি আছে। দেখি হাত—অতিশয় চঞ্চল এবং দ্রুত যাচ্ছে যেন হাওয়া গাড়ি। জিব দেখাও। দন্ত বাহির কর। দন্ত উৎপাটন। ইস! গজ-দন্ত!!

নহুষঃ হে আত্মারাম!

র‍্যাংঃ মুখ বন্ধ কর। দেখি পেট—ও ম্যাজেস্টিক! ডবল ফিফ্‌টিফোর ইঞ্চেস্‌।

আত্মাঃ ইঞ্চি কি! গজ বল সাহেব।

র‍্যাংঃ নাউ হার্ট।

[নহুষ ঘাড় দেখায়]

আত্মাঃ বৃড়োরস্ক বৃষস্কন্ধ দেখছে কি সাহেব, অজরাজ গজরাজ এক সঙ্গে।

র‍্যাংঃ ভয় নাই ভয় নাই, তোমার বিমারিটা সামান্য মেণ্টালো গ্রামাফোনিয়া। মনের মধ্যে কালো একখানা জাঁতা ঘুরেছে, ভাল হয়ে যাবে। ভাল হাওয়া খাও; আহ্লাদ আমোদ কর। তোমার শরীরে একটু স্পিরিট দরকার এবং এক কুড়ি রামপাখির ডিম্ব ও বাচ্চা পথ্য কর, ভয় নাই।

নহুষঃ আমি যে হিন্দু আর্যবংশ। ওসব কুপথ্যি খাই কেমন করে? জাত যাবে যে!

র‍্যাংঃ মেণ্টালো গ্রামাফোনিয়া! যখন জাতের জাঁতাকলে পিসে মারবে তোমায় তখন ডবল ফী দিলেও আমায় পাবে না।

নহুষঃ মন যে কি চাইছে—কবিরাজি না হমোপাথি না হেলোপাথি না গঙ্গাজল না রামপাখির জুস্‌, কিছুই ঠিক পাচ্ছি না।

র‍্যাংঃ আমি জানি তোমার যা বিমারি। শোন মন দিয়া—

গান

এপারে ওপারে যাওয়া আসা করে
ভরল না তোর মন;
সে যে কাঁদে সে যে বলে
বাঁধা রইব না রে—॥

[র‍্যাং-এর প্রস্থান]

নহুষঃ মনের কথা টেনে বলেছ—খুলে দেরে খুলে দে কাজের বাঁধন, কুলের বাঁধন, বাঁধা পথের বাঁধন।

গান

আমি করবো এ রাখালী কত কাল
পালের ছয়টা গরু ছুটে করেছে আমায়
হাল বেহাল
আমি সোজা পথে যদি নিতে চাই
তারা ঘুরে ফিরে বাঁকাপথে চলেছে সদাই,
আমি যদি যাই তাদের ফিরাতে
তারা ছুটে দলায় ক্ষেতের আল॥

আত্মাঃ নহুষ, আমার শরীরটার মত দৃষ্টিটাও সূক্ষ্ম জানই তো?

নহুষঃ জানি।

আত্মাঃ আমি সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখছি, তুমি এদের সঙ্গে গান গেয়ে যে দিকটায় গা ভাসান দিতে চাচ্ছ, সে দিকটায় কি রয়েছে।

চিত্রঃ বলতো শুনি কি রয়েছে?

আত্মাঃ রসাতল। একেবারে তল্‌তলাতল্‌ রসাতল!
ঘোরতর ব্যাপার!

নহুষঃ আর ওদিকে?

আত্মাঃ স্বর্গলোকের গোলকধাঁধাঁ!

নহুষঃ ওধারে?

আত্মাঃ মর্তভূমির দিল্লীকা-লাড্ডু!

চিত্রঃ আর এদিকটা সবদিকের বার—যেন খাঁচার মাঝামাঝি জায়গায় ঝোলান দাঁড় একটা!

জালুঃ কি বলিস ভাই, এ জায়গাটায় একটু রয়ে বসে গেলে হয় না?

কালুঃ আরে না রে না পারে যেতে হবে।

জালুঃ চলে আয় আর মজলিশ করে না।

[কালু জালুর প্রস্থান]

আত্মাঃ রয়ে যাবার পক্ষে এ জায়গাটা মন্দ নয়। এসনা সব, বসে যাও। আমি একটা পাঁচালী জানি, সেইটে বলি মজলিশ্‌ সরগরম্‌ হোক।

"মধু-মাসরে গুড়োকু ফুঁকি—
তেরেকিটি ধাঁই করি বৈঠকী।
তরো বেতরো তাকিয়া হেলানে—
মহা মজলিস বসিলা এহানে।
রসিক মিলিলা গণ্ডা গণ্ডা,
রঙ্গে ঢঙ্গে বিবিধ পাণ্ডা।
রসনা রোচক খাণ্ডারবাণী,
সরস কথা মানসহরা,
পান বিড়া আর ধুম্‌-পত্‌ড়া॥"
আসর জমক ঠাণ্ডা পানি,

নহুষঃ আত্মারাম, চল ওধারে যাবানা? বসেই রইলে যে? এইতো খট্‌কা লাগালে!

আত্মাঃ কেন, এতে আবার খট্‌কা কি? ওরা যাত্রা করুক, তোমায় আমায় বসে থাকি আরামে।

নহুষঃ আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি আমারি আত্মাপাখি কি না!

আত্মাঃ সন্দেহের কারণ কি শুনি?

নহুষঃ রাজ আত্মা হলে তোমার ধরণধারণ অন্যপ্রকার হতো। বুক ফুলিয়ে চলতে ডরাতে না অন্ধকার দেখে।

আত্মাঃ আমি নিজের সিংহাসনে গট্‌ হয়ে বসে আছি দেখ রাজার মত। আর—

নহুষঃ আর কি?

আত্মাঃ তুমি একটা ঝরাপাতা কি ফুলের মতো ফুঁয়ে উড়ে পড়তে চাচ্ছ। এতেই বুঝছি তুমি আমার স্থূল শরীর নও একেবারেই।

নহুষঃ কে জানে, এসব যেন সমিস্যে বলে ঠেকছে! ও আত্মারাম!

[হর্তা কর্তার প্রবেশ]

হর্তাঃ এই, গোলমাল হচ্ছে—

কর্তাঃ যাও এখান থেকে—যাত্রা শুরু হচ্ছে।

চিত্রঃ কে হে বট তুমি?

আত্মাঃ হুকুম চালাও এহানে?

কর্তাঃ চিনতে পারলে না?

হর্তাঃ লেখন চেন তো দেখ।

চিত্রঃ ইনি?

কর্তাঃ ঐ লেখনেই জবাব পাবে!

হর্তাঃ যাও, লিখনমত যাত্রা চলবে।

চিত্রঃ পালাটা উল্টে পাল্টে গেছে। আগা এসেছে গোড়ায় গোড়া গেছে আগায়।

আত্মাঃ আলো-আঁধারে ধাঁধাঁ লেগে যাওয়ার মত। কিছুই ঠিক নেই।

কর্তাঃ এইভাবেই যাত্রা করে চল।

[হর্তা কর্তার প্রস্থান]

নেপথ্যেঃ এটা রয়বার জায়গা নয় বয়বার জায়গা—বয়ে চল—গান গেয়ে। রয়ে বসে চলা চলবে না—নেচে যাও।

[মেঘ বিদ্যুত গর্জন]

সকলেঃ চলে চল, রয়োনা এখানে।

নহুষঃ কোথায় যাব কোন্‌ পথে?

আত্মাঃ নহুষ কি কর, যাচ্ছ কোথায়?

নহুষঃ তাই তো কি করি কোথায় যাই?

চিত্রঃ কথার খেউ হারাও কেন?

নহুষঃ সব হারিয়ে গেল তো খেউ! নিজেই যাই কোন দিকে ভেবে পাচ্ছিনে।

আত্মাঃ ছোঃ যাত্রা করতে এসেছিলে কি বলে?

নহুষঃ হাওয়ায় মনটাকে শুদ্ধু উড়িয়ে নেবার যোগাড় করেছে।

চিত্র: এই নাও লেখা কাগজ—এইটে দেখে পাঠ বলে যাও।

[ষাঁড় ও মহিষ মুখোশধারী হর্তা কর্তার প্রবেশ]

আত্মা: ওহে মস্ত একটা ষাঁড় আর বিপর্যয় মোষ আসে দেখ। ওরে বাবারে অন্ধকারে চাইছে দেখ! তেড়ে আসে যে—পালাই চল।

[নহুষ আত্মার প্রস্থান]

চিত্র: ভয় কি? সাজা ষাঁড়, সাজা মোষ।

[পলায়ন]

কর্তা (ষাঁড়): এরা বলে কি? সাজা ষাঁড়! হাঃ হাঃ, ও হর্তা!

হর্তা (মোষ): আবার হর্তা কি? এখন আমি মহাকালের মহিষ। আর তুমি—

কর্তা: আমি যা তাই। কি করতে এখানে এলেম মনে পড়ছে না!

হর্তা: তোমায় নিয়ে কাজ চলা মুশকিল। আচ্ছা, আমি কি করতে এসেছি মনে আছে?

কর্তা: তুমি কে! ভালো রোসো—

হর্তা: চিনতে পারছো না? বাতাসটা পর্যন্ত যাকে ছুঁয়ে কালো হয়ে যায় সেই কালপুরুষকে বহন করে চলি আমি। আমাকে চিনতে পারছো না?

কর্তা: দেখতে পেলে তো চিনবো! তুমি আসামাত্র যেটুকু বা আলো ছিলো এখানে, সেটুকুও পালাই পালাই করছে।

হর্তা: রসিকতা রাখ। যাত্রা হচ্ছে মনে থাকে যেন। ঐ দিক দিয়ে প্রস্থানের পথ। ওদিকটার ভার তোমার উপর, তুমি ওধারে দাঁড়াও।

কর্তা: আর তুমি?

হর্তা: ঢুঁসিয়ে যাত্রা করানোর ভার হয়েছে আমার উপর। এই পথ আগলে রইলেম—দেখি কে আসে এ বাগে।

কর্তা: আমি দেখি কে যায় ওবাগে।

[নেপথ্যে বেড়াল ডাক]

কর্তা: ডাকলো কি ও?

হর্তা: এ যে ভয়ের ডাক!

কর্তা: এ যে বলছে খেলুম!

হর্তা: তাই তো দেখছি!

কর্তা: আরে দেখলে তো বুঝতুম—সত্যি ভয় না মিথ্যে ভয়!

হর্তা: এ যে খালি শুনছি—গেলুম, খেলুম, এলুম। ভয় কি? ঐ শোনো না—

কর্তা: ঠিক বুঝতে পারলুম না। মনে হচ্ছে যেন বলছে—এই ঘাড় ভাঙলুম!

হর্তা: বোধহয় কেউ যাত্রা করতে আসছে। ঠিক হয়ে থাক ওর প্রবেশ পথে তুমি। প্রস্থানের পথে আমি।

কর্তা: প্রস্থানের পথে তো আমার থাকার কথা—বাঃ!

হর্তা: না হে সেটা তখন আমার বলার ভুল হয়েছিল।

কর্তা: তা হবে না। ভুলটা এ ক্ষেপের মত বজায় থাক। ভাল বুঝি তো পরে শুধরে নেবো।

হর্তা: ও তো দেখি এই দিকেই যাত্রা করতে আসছে। আমরা তাহলে আমাদের যাত্রাটা ওদিকে গিয়ে করি —কি বল?

একটু চুলকে দিচ্ছি বইতো নয়!

কর্তা: কোন দিকে? অন্ধকারে যে দিক্-ভির্‌মি লেগে গেছে।
"মনতর মনতর বাঘের মনতর,
বাঘ ঢুকলো ঘরের ভিতর—
ওরে বাঘ বেরোবিতো বেরো—
নইলে মানুষ খুন হবে বাবা"

হর্তা: আরে চটপট চলে এসো না?

কর্তা: কারো প্রবেশ না হতেই আসর খালি রেখে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? এই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায় না?

হর্তা: বাঘে-গরুতে একসঙ্গে যাত্রা তো কেতাবে লেখা নেই। এই দেখ, তোমার আমার নামের নীচে, অধিকারী স্বয়ং লিখে রেখেছেন ব্র্যাকেটের মধ্যে 'প্রস্থান কর'।

কর্তা: প্রস্থান তো দেখছি আছে লেখা। কিন্তু ভয়ের ডাক শুনে হাতে পায়ে যে খিল ধরে গেল।

হর্তা: দেখ! না যাও তো তোমাকে আমি ঢুঁসিয়ে প্রস্থান করাবো!

কর্তা: আমার বোধহয়, ছাপাব ভুল হয়েছে আগাগোড়া বইটাতে। আমাদের প্রস্থানের পর তো কারো প্রবেশ থাকা চাই,—দেখ ফাঁক।

হর্তা: সে কাজে তোমার দরকার কি? আমাদের পার্ট আমরা এক্ট করে গেলুম—ব্যাস্ ফুরিয়ে গেল কাজ।

কর্তা: আবার যদি এখানে পুনঃ প্রবেশ করতে হয়?

হর্তা: আবার ঘাড় ধরে ঠেলে পাঠাবে অধিকারী।

কর্তা: এ কিরকম যাত্রা ভাই বে-হিসাবি রকম?

হর্তা: মাথামুণ্ডু কিছুই নেই—প্রস্থান আর প্রস্থান।

কর্তা: ঐ দেখ, রক্তমূর্তি কে আবার আসে এধারে। কপালে সিঁদুর, গলায় জবাফুলের মালা—খাঁড়া হাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। পাশ কাটাই চল।

[হর্তা কর্তার প্রস্থান]

[রক্তমূর্তির প্রবেশ]

রক্তমূর্তি: ঘোরে বন্ বনাবন্ সন্ সনাসন্ ধর্ম মুষল ঘোরে—যেদিকে মুণ্ড় ঘোরাবে মুণ্ডু ঘুরবে মুণ্ডু আটকা পড়বে ঘাড়ে। ভক্ত রক্তমূর্তি! আমার প্রবেশে বাধা? বলিদান না দিতেই বলে প্রস্থান! হাঃ হাঃ হাঃ, রোস্-তো খাঁড়াখানা ঘুরিয়ে নিয়ে মারি এক কোপ্। সাবাড় করি মাথামুণ্ডু বিশ পঁচিশটা এক সঙ্গে। কই পলায়ন করলি যে সবাই—হাঃ হাঃ—মা ভৈঃ।

[সবেগে ছাগলের প্রবেশ]

ছাগল: (ঢুঁ মারিয়া) ডাকছো?

রক্ত: গেলাম—মা—(ঢুঁ) রও রও গতিরোধ কর না।

ছাগল: গতি হবে এখন। (ঢুঁ) পাঁঠার মুড়ো মিষ্টি লাগছে না?

রক্ত: উঃ লাগেরে বাপু লাগে। আরে বাপু তোকে বলি দিয়ে, তোর সঙ্গে যে ছয়টা রিপু আছে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তোর যা হয় একটা সদ্গতি করে দিতে চাইলেম। তার বখশিশ কি এই হল?

ছাগল: রক্ত মেখে মেখে তোমার পিঠে ঘামাচি হয়েচে। আমি সেইগুলো একটু চুলকে দিচ্ছি বইতো নয়! উঁ-আঁ, কর কেন? (ঢুঁ)

রক্ত: গেলাম গেলাম ঢুঁসিয়ে মারলে। বাবারে গেছিরে, কে আছ কোথায়? দৌড়ে এসো প্রাণ যায়। মা-গো-মা!!

[সবেগে নহুষের প্রবেশ]

নহুষ: রহ রহ। এযে ব্রহ্মহত্যা (রক্তকে ধরে) অ-আত্মারাম! সর্বনাশ উপস্থিত। কনস্টেবল, পুলিস—!

রক্ত: যাও ছাড়। আমার এখনো শেষ হয়নি। কথা রয়েছে বাকী। ছেড়ে দাও এক্ট করি।

নহুষ: ও হর্তা, ও কর্তা—দেখসে!

ছাগল: (নহুষকে চঁদু দিয়া) পালাও ওধারে। (ক্রমাগত চঁদু)

নহুষ: গেছি গেছি! ও—কে আছ? নরহত্যা হত্যা হল। ও জমাদার, ও চাপরাসী, ও ইনস্‌পেক্‌টার।—হে আত্মারাম!

রক্ত: (নহুষকে ঘুঁষি) আমার যাত্রা ভঙ্গ করলে, রাস্‌কেল কোথাকার! আসরে ঢুকলে কার হুকুমে? নিকালো বদমাস্‌, বে-আক্কেল, বে-আদব!

নহুষ: মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না। কলিকালে ধর্ম নাই? হে আত্মারাম!

[আত্মার প্রবেশ]

আত্মা: কি কি কি হয়েছে, এ কি ব্যাপার?

নহুষ: গেছি। একেবারে ঘুঁষিয়ে ঘুঁষিয়ে দফা নিকাশ করেছে।

আত্মা: এঃ এ যে দেখি রক্তগঙ্গা!

নহুষ: ঐ ঐ রক্তমূর্তিটার কাজ।

রক্ত: এ্যাক্‌টিংএর সময় বাধা দিতে আস কেন? মাতাল কোথাকার!

ছাগল: ঠিক হয়েছে। উত্তম মধ্যম হয়েছে।

রক্ত: ইন্‌টারপট করেছে মশায়। রাগে আমার গা' কাঁপছে। আমার অমন শ্যামাসঙ্গীত মাটি করে দিলে।

নহুষ: ইন্‌টারপট্‌ না করলে,—চক্ষের সামনে ব্রহ্মহত্যা হয়ে যেতো যে!

আত্মা: তোমার মাথামুণ্ডু হতো। প্লে হচ্ছে বুঝলে না?

রক্ত: জমা আসরটা ভেঙ্গে দিয়ে তছনছ করলে এমন প্লেটা!

নহুষ: কি বললে 'প্লেলে'! আমি বলি খাঁড়ার লড়াই! দেখে হৃদকম্প হলো, সামলাতে এলাম ছুটে।

রক্ত: আমার এমন এ্যাকটিং মাটি হল। তোকে ধরে বলিদান দিলে তবে আমার রাগ পড়ে।

ছাগল: আর হাঁ! এই ফাঁকে আমিও বেঁচে যাই।

নহুষ: কি ইই! ভদ্রসন্তানকে বলিদান দিতে চাও, নরহত্যা করবে? জান এ কোম্পানীর মুল্লুক! তোমায় ফাঁসিকাষ্ঠে না ঝোলাই তো—

রক্ত: তো কি, তো কি?

আত্মা: আঃ নহুষ! ঠাণ্ডা হও ঠাণ্ডা হও।

নহুষ: পামর, নররাক্ষস, পাঁঠা পেয়েছ আমায়—বলিদান দিয়ে মস্তক চর্বণ করবে?

রক্ত: দেখেন মশায়রা! যাত্রা ভঙ্গ—আবার রোখ দেখেন? ওরে—

[হর্তা কর্তার প্রবেশ]

কর্তা: ও হর্তা, ব্যাপার দেখছ কি?

হর্তা: ব্যাপার ক্রমেই গড়াচ্ছে।

নহুষ: দেখেন কর্তা আমি নিরপরাধ।

রক্ত: আবার বলে নিরপরাধ! তোমার তো এ সময়ে আসবার কথা নয়।

নহুষ: জানি জানি। কিন্তু মশায় যে তারস্বরে চিৎকার করলে।

রক্ত: আমি চিৎকার করে মাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম তোমায় তো নয়?

নহুষ: কে জানে, ডাক শুনে কেমন হয়ে গেলাম। ভাবলাম গো-হত্যা কি ব্রহ্মহত্যা হচ্ছে।

ছাগল: দেখেন, এখনও ভদ্রলোক গরু বলছে!

নহুষ: যত নষ্টের গোড়া এই ছাগলটা। ওর শৃঙ্গ মুড়োয়ে, ঘোল ঢালায়ে, শহর ঘুরায়ে আনেন। দেন কড়া শাস্তি। বড় চঁদুয়েছে কর্তা।

ছাগল: বটে বটে—

আত্মা: যেতে দাও যা হবার হয়েছে।

কর্তা: মাঝে গ্যাপ পড়লো, যাত্রা চলে কেমন করে—ও হর্তা?

হর্তা: একটা ইন্‌টারবেল দিয়ে দাও।

আত্মা: তা হয় না, এ তো থিয়েটার নয়। ঐ নহুষ যেমন করে পারেন আসর জমান। আমরা চল মাছভাজা খাইগে'।

[নহুষ ছাড়া সকলের প্রস্থান]

নহুষ: বড়ই তো বিপদে পড়লাম। শ্যাম রাখি না কুল রাখি? মাছ ছাড়ি না আসর ছাড়ি? হায় বিধাতা এ তোমার কেমন বিচার হল? নহুষের জিহ্বা, দন্ত, পেট এখানে রইলো উপোস করে, আর সেখানে নহুষের আত্মাপাখি রইলো মাছ-ভাতে!

গান

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা বাসরে নাহিকো দিয়া,
সাজিয়া গুজিয়া রহিনু বসিয়া
পুঁথিখানা হাতে নিয়া
খালি এ আসরে কে বা গান ধরে,
কে বা ধরে হারমোনিয়া।
রাজা আছে ভাই রাণী কাছে নাই
সখি গেছে পলাইয়া॥

নহুষ: বলি মহিষী, ও সখিগণ।

[দুই ছোকরার প্রবেশ]

১ম: চাই সোড়া লেমনেড?

২য়: পান বিড়ি সিগারেট?

নহুষ: বলি তোমরা কে, পরিচয় দাও।

১ম: আমি পূর্বকালে ছিলাম কালু ব্যাধ। এখন বিলাতি পানির দোকান খুলেছি।

২য়: আর আমি ছিলেম চোর চক্রবর্তী। এখন তামাকের দোকান খুলেছি।

নহুষ: দেখ ব্যাধ, ফাঁদ পেতে আমার আত্মারামপাখিকে যদি তুমি বেঁধে আনতে পারো তো তোমায় কোতোয়ালীর কাজ দিতে পারি।

১ম: রাজি। আমি গুর্জর দেশ জয় করেছিলেম। আমার দেবীও আমার ফাঁদে পড়েছিলেন। এ সহজ কাজ আর পারবো না?—চল্লাম ধরতে আত্মারামপাখি।

নহুষ: আত্মারাম আমায় বড় ফাঁকি দিয়েছে। খাওয়াচ্ছি তারে মাছ ভাজা। দেখো চোর চক্রবর্তী, তোমায় আমি রাজমন্ত্রী করবো। যদি আত্মারামের মুখের গ্রাস তপ্‌সী মাছ ভাজা দুই কুড়ি এখানে উড়ায়ে আনতে পার।

২য়: এ আর শক্ত কাজ কি! এক শেঠির বাড়িতে সিঁদ দিতে দেওয়াল চাপা পড়েও সিঁদকাঠিটা ছাড়িনি।

১ম: যে অন্ধকার, এখানে ছুঁচ গলে না। তবু তোমায় চিনি চিনি করছি!

২য়: তোমার গলাটা যেন শোনো শোনা বোধ হচ্ছে!

১ম: আমার দিকে চেনা, তোমার দিকে শোনা!

২য়: চেনা-শোনা হয়ে গেল তো এখন?

১ম: তোমার সঙ্গে সন্ধি।

২য়: সন্ধি দিতে আমি চিরকালই মজবুত।

১ম: ফন্দিতে আমায় পেরে ওঠা শক্ত।

২য়: কিন্তু যমের ফাঁদ তো এড়াতে পারছো না দাদা!

১ম: তুমিই কি যমের ঘরে সন্ধি দিয়ে বসে আছ নাকি?

২য়: যমের বাড়িতে সিঁদ দিয়ে সোজা গিয়ে যখন উঠবো স্বর্গের দুয়ারে, —তখন দেখবে!

১ম: দেখবো, স্বর্গের দুয়ারেই চোর আমাদের আটকে আছেন!

২য়: এবং আস্তে আস্তে দেবলোকের দেউড়িতে সিঁদ কাটছেন।

১ম: তারপর?

২য়: সব কথা তোমার কাছে ফাঁস করবো নাকি? এইখান থেকে আরম্ভ করলেম সিঁদ দিতে—

"ওরে ওরে সিঁদকাটি তোরে বিশাই গড়িল
সিঁদ কেটে বিঁধ কর কামিনা কহিল।
ইট কাট মাটি কাট মেদিনী পাহাড়
অথর পথর কাট কেটে ফেল হাড়।"
"নাগ নাগ মোহিনী ফাঁস, নাগ দেশ জুড়ে
আনাচে কানাচে নাগ, নাগ ঝাড়ে ঝোড়ে।"

[১ম ও ২-এর প্রস্থান]

গান

নীল আকাশের রঙীন পাখী
তোমারে আমারে এই বাঁধনে, ধরে রাখি কেমনে
অচিন পাখী লুকিয়ে থাক ফুলবনে
শুধু ডাক মোরে ডাক গোপনে,
ভাবি মনে কেমনে; নয়নে নয়নে ধরে রাখি॥

নহুষ: আঃ! নিদ্রা আসছে। (নিদ্রামগ্ন)

[আত্মার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ]

আত্মা: নহুষ, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওরে আমার বড় সাধের ধন—হায় হায় আমার সাতরাজার ধন মাণিক কোথা গেল রে! আ হা হা, উঃ কি জ্বালা কি জ্বালা। আমার হাতের সোনা ছিনিয়ে নিয়ে গেল! ও-হো-হো......।

নহুষ: কি হল? কি বিপদ উপস্থিত হলো দেখ! আত্মারাম যে নির্জীব হন দেখি!

আত্মা: নহুষ কি হল! প্রাণ বাঁচে কিসে? হায় হায় একেবারে শূন্য করে গেল!

নহুষ: সে কি? সংসার শূন্য হল, হ্যাঁ? ডাক্তার বদ্যি কি কিছুই করতে পারলে না, হ্যাঁ?

আত্মা: বেড়ালে মাছ খেয়ে গেল—ডাক্তার বদ্যি কি করবে? আ হা হা—!

নহুষ: রোদন কোর না স্থির হও। সব তাঁরই ইচ্ছা!

আত্মা: কাঁটাটি পর্যন্ত পড়ে নেই। বেড়াল হয়ে ঐ মাছ ভাজা ঠাকুরটাই পার করেছে সব কটা। ও নহুষ কি করি এখন?

নহুষ: তাই বল, বিড়ালে মাছ গিলেছে! এ যে দেখি, মাছের শোকে বিড়াল কাঁদে। যাকগা, অমন কত মাছ মিলবে! বস এখানে।

[আরব্য উপন্যাসের মাহিগীরের প্রবেশ]

মাহি: চার মছলি'ও চার রং কি,—সফেদ, সুর্খ, জর্দ, ঔর সিহা।

নহুষ: ও আত্মারাম, এ মছলির কথা কয় বোধ হচ্ছে যে।

আত্মা: রও রও। শোন হে, এসো তো এধারে, বস। তারপর?

মাহি: রায়সাহিবকী খিদমৎমে বন্দাগী আরজ্ করতা হুঁ।

নহুষ: হুঁ হুঁ, তারপর?

মাহি: সবেরে ম্যায় মহারাজ বাহাদুরকে গুলবাগমে গয়াথা। বাগকো ই হাতে মে, কোয়ী তালায়ে' হ্যায়। উনকে দরমিয়ান এক তালাওঁ ব্যয়ঠক-খানেকে সামনে, জিস্‌মে ইত্‌নি মছলিয়াঁ হ্যায়—কি কিয়া কহুঁ!

নহুষ: ইনি কি কইছেন?

আত্মা: আরে উন্দু গো, বুঝলে না? ইনি তোমার বাগানে এক পুকুর মাছ দেখে এসেছেন।

নহুষ: শুধাও তো ধরেছেন নাকি দু'চারটে?

মাহি: বাবুজী দেখিয়ে ম্যায়নে মছলীকা পেটসে কিয়া খুবচিজ পায়ী হো? দেখো, ইয়েঃ দেখো! ক্যায়সা খিলৌনা হ্যায়!

আত্মা: এযে একটা সিসের আংটী!

নহুষ: দেখি দেখি, এযে আসল সুলেমানি তক্তি!

আত্মা: এর কিছু গুণ আছে না কি?

নহুষ: ওর সামনে এসব কথা কয়ো না। দু'টো পয়সা দিয়ে বিদায় কর। তাহলে এ আংটীটার কিম্মত কত হবে বলতো সাহেব?

মাহি: ক্যা, দো পয়সাকি চিজ্ রাজা সাহিবকো নজর দেতা হুঁ?

...এ যে দেখি মাছের শোকে বিড়াল কাঁদে!

নহুষ: হুঁ! তা দাওনা হে আত্মারাম দুটো পয়সা ফেলে।

আত্মা: ট্যাঁক খালি—না না এই যে আছে দু'টো, এই নাও সাহেব।

মাহি: বাবুজি ম্যায় কারপেট বুন্ সক্‌তা হুঁ। তুমকো একঠো কাগজকা টোপী বনা দেয়েঙ্গে। ম্যায় গীত করনে ভি জানতা। কুছ্ কাম মিল যায় তো—

আত্মা: এও যে 'গেলাস্‌গো'র দলের! একটু নাচ গান করতো শুনি। তবে তো কাম মিলবে।

মাহি: শুনিয়ে বাংলা থিয়েটার কা গীদ—

গান

জাল ফেলেছি, ফেলেছি জাল
বারে বারে ফেলেছি জাল
তোমারে ধরব বলে।
নয়ন জলে ফেলেছি জাল।
ধরা দিল না রে চপল চোখের চাহনি,
তাও ধরা দিলনা দিলনা রে॥

নহুষ: এই! এই! এযে জলে ভেসে যায় সব!

আত্মা: এ কি! কলের জলের বাম্বা ফাটলো না কি?

নহুষ: আরে না না। ভুল করে সোলেমানী তক্তি ঘসে ফেলেছি। (স্বগত) চোরটা টিউবওয়েল খুঁড়ে ফেললে না কি!

আত্মা: আংটীর তাহলে গুণ আছে বল?

নহুষ: অরগুণ না বরগুন বুঝতে পারছি না। বেলা অতিক্রম করেন যদি সমুদ্র, তো গেলুম আমরা। জল যে ক্রমেই বাড়ে হে আত্মারাম! হায় হায়! আত্মারামের মুখের গ্রাস মাছভাজা হরণ করেই এই বিপদ ঘটালাম। ও আত্মারাম আমায় ক্ষমা কর। তোমায় বন্ধন করতে ব্যাধকে পাঠিয়েছি। মৎস চুরি করিয়েছি। অপরাধ স্বীকার করচি। স্মরণা-গতকে রক্ষা কর এ যাত্রা?

আত্মা: কি বললে একি সত্য না স্বপ্ন?

নহুষ: সত্যি, সত্যি, সত্যি।

আত্মা: আমি এই দিলাম উড়ন। বিশ্বাস-ঘাতক নহুষ, সুরের এই পর্বতের চূড়া থেকে দেখি আমি, কে তোমার রক্ষা করে।

নহুষ: কি করি! হে মা ভাগিরথী, বাঁচাও। আমি সাজা নহুষ মা; সগর-সন্তান নয়। বৃথা কেন আমায় উদ্ধার করতে দৌড়ে আসছো মা? ওরে, কোটালের বাণ ডাকলো এবারে বুঝি! ও আত্মারাম! ডুব জলে পড়লাম!

আত্মা: বোঝাপড়ার সময় নেই,—ঐ দেখ উত্তাল তরঙ্গ আসছে!

নহুষ: আমি সোনা দিয়া তোমার ঠোঁট বাঁধাবো। পক্ষ বাঁধাব গজমুক্তা দিয়া। চরণ বাঁধাব মাণিক্য দিয়া। এবারে রক্ষা কর; এ যে অকূলে ফেল্লে আমায়! আমি না পারি উড়তে না জানি সাঁতার, তোমার পায় ধরি আত্মারাম।

আত্মা: আরে টানাটানি কর কেন?

নহুষ: এযে দেখি একটা বয়া। বিষম পিছল—ধর ধর।

আত্মা: ঝাপাঝাপি করো না। উঠে এসো, মাফ করলেম।

নহুষঃ আঃ! এযে লাটিমের মত একাত ওকাত করে! আর সকলে গেল কোথায়?

আত্মাঃ ঐ দেখ, সব ভেসে আসছে। নাচ, গান, একটার, একট্রেস—মায় রিভার পুলিস!

নহুষঃ চমৎকার দৃশ্য! হাঃ হাঃ—

[জলমগ্ন পুরোপার্টির প্রবেশ]

নহুষঃ ঐ দেখ আত্মারাম; মৃদং ভিজে বিগলিত প্রায়। বেয়ালাটা ফুলে যেন হয়েছে ঢাকাই জাল একটা। হাঃ হাঃ, বলি ও রেং সাহেব ব্যাণ্ড-মাস্টার! যন্তরগুলোকে ধরে বাজাও না একটা 'কুইক্ মার্চ' ইংরাজি গৎ।

র‍্যাংঃ অল্ রাইট রাজাসাহেব।

গৎ

A : B: C: D: E: F: G:
H: I: J: K: L:M:N:O:P:
Q: R: S: T: U—V
W:X: Y: Z: A: B: C.

আত্মাঃ বলি ও পুলিস, তুমি একটা সুরটুর ধরে নাও এই বেলা?

পুলিসঃ আমি সুর ধরি, চোর ধরি, ফাঁসিও করি।

২য় চোর! ও জমাদার আমি রাজমন্ত্রী, চোর নই।

১ম ব্যাধঃ আমি শহর কোটাল, কেউ কেটা নই।

নহুষঃ ওরা নির্দোষ ওদের ছাড়। বরং গোটা কতক মাছ ধরে দাও। তোমায় খুশী করে দিচ্ছি, এই নাও বখশীশ্। নেচে গেয়ে বাড়ি যাও।

পুলিসঃ বহুত আচ্ছা রাজাসাহেব।

গান

মন আমার হাকিম হতে পার এবার।
মন যদি হও হাকিম,—
আমি হই চাপরাশী,
চাপরাশী ব্রজবাসী।

তলরাইট রাজাসাহেব!

নহুষঃ ঐ দেখ আত্মারাম, কেমন সকল 'সফরী ফরফরায়তে' আসছে এধারে!

গান

অতল জলের তলে তলে
মাণিক জ্বলে প্রদীপ ঝলে।
আমার মনের মানস যত
সেই আকাশে তলিয়ে চলে।
সুনীল জলের ফেনিল মালা
সাজিয়েছে যার বরণ ডালা
তার মিলনের বাসর পানে
পলে পলে মানস চলে॥

আত্মাঃ সাত সুরের সাত রঙের রামধনু দেখা দিল। আর ভয় নাই। আকাশ পরিষ্কার।

নহুষঃ কি আনন্দ, কি আনন্দ, প্রলয় পয়োধি জলে চরা জেগেছে হে আত্মারাম!
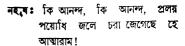
আত্মাঃ কেমন শোভা হয়েছে দেখ, যেন বল্কা দুধে সর পড়েছে।

নহুষঃ যেন দুগ্ধফেননিভ শয্যা পেতেছে আসরে। চল নামা যাক। আহা এই সমুদ্র যদি লবণাম্বু না হয়ে ক্ষীর-সমুদ্র হতো,—আর চরখানা হ'তো একটা আস্ত পুরু সর,—তবে মনের সাধ মিটিয়ে,—কজনে আমরা—বুঝেছ?

আত্মাঃ তা আর বুঝিনি! চল, দেখি চরখানা ঘুরে, কোথাও একটা চায়ের দোকান পাই কি না। বড় কাহিলি বোধ করছি। চলে এসো হে নহুষ।

নহুষঃ দেখ আত্মারাম; আমারও কিছু ক্ষুধা লেগেছে। রামছাগলের শৃঙ্গের মত যেন কি একটা প্যাঁচায়ে প্যাঁচায়ে উঠছে। মনের মধ্যেটায় যেন শূলে বেদনা ধরেছে।

আত্মাঃ মন্তর পড়া চোর চক্রবর্তী সিঁদ দিচ্ছে হে তোমার মনে, মাছ ভাজার সন্ধানে,—এই বেলা সাবধান হও। সরে পড় এখান থেকে।

নহুষঃ কিন্তু কর্তা যে চটবেন, যাত্রা ভঙ্গ করে গেলে অকালে।

আত্মাঃ অকাল কি? ঐ দেখ সকাল হলো। নানা পক্ষী, যারা এক বৃক্ষে ছিল তারা উড়ান দিল একে একে,—কুঞ্জভাঙ্গার গীত গেয়ে—।

গান

এক দুই তিন চার, চল ঘরে যে যার।
পাঁচ ছয় সাত আট, মাঠে ঘাটে ভাঙে হাট।
নয় দশ দশ নয়, পাঁচে পাঁচে দশ হয়
দুয়ে দুয়ে হয় চার, চল সবে খাল পার॥

| যবনিকা পতন |

পৃথিবীতে সাধনার বৈচিত্র্যের আর অন্ত নেই। তার মধ্যে ভারতের সাধনারও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভারতীয় সাধনাতেও নানারকম পথ আছে—তবে সব পথেরই চরম কথা হল এক। বেদান্ত বলেন এক ব্রহ্মই নানারূপে বিরাজিত এবং নানারূপের সার্থকতাও এক ব্রহ্মে। ভাগবত মতও এই কথাই আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, তাঁরা বলেন তুমি অনন্তরূপ। নানারূপে বিশ্বে তোমারি লীলা,

ত্বয়া ততং বিশ্বম্ অনন্তরূপ

(গীতা, ১১, ৩৮)

আবার শাক্ত সাধনাও এই কথাকেই আরোও স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁদেরও চরম কথা হল—

**"সর্বরূপময়ী দেবী
সর্বদেবীময়ং জগৎ"**

এই কথাই শ্রীশ্রীচণ্ডীর পরম সত্য।

বেদান্তে যে সব কথা দেখানো হয়েছে যুক্তিতে, তর্কে ভাগবত সাধনায় ও শাক্তমতের সেই কথাই দেখানো হয়েছে আরোও প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টভাবে।

"সর্বদেবীময়ং জগৎ" কথাটাকে দেখানো যেতে পারে শাক্তসাধকদের নানা উপাখ্যানে। তার মধ্যে বাঙলাদেশের একটি উপাখ্যান আজ বারে বারে মনে আসছে।

গল্পটার স্থান হল পূর্ববঙ্গে—অর্থাৎ এখনকার পাকিস্থানের মধ্যে। নানা কারণে গ্রামটির নাম নাই করা গেল।

গ্রামটি পূর্ববঙ্গের একটি প্রাচীন গ্রাম। সেখানে ঠারৈন-দীঘি (ঠাকুরাণীর দীঘি) নামে একটি দীঘি খ্যাত। হিন্দু মুসলমান সবাই এই দীঘিটার মাহাত্ম্য জানেন এবং মানেন। গ্রামের জমিদারদের বংশ প্রায় চারশ' বছর ধরে সেখানে প্রভুত্ব করছেন, তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন একজন তান্ত্রিক সাধক। তিনি "পঞ্চমুণ্ডী" আসনে বসে শব-সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই সাধনার অন্তর্নিহিত কথা নিয়ে এখন পাঠককে বিব্রত করা হয়তো সংগত হবে না। তাঁদের পুরোহিত বংশও তান্ত্রিক শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ও তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

পুরোহিত ও যজমান দুই বংশই চিরদিন পাশাপাশি গ্রামে থেকে পরস্পরের সাধনায় সহায়তা করে আসছিলেন। পুরোহিত বংশ যেমন পণ্ডিত ও ভাবুক যজমান বংশও তেমনি সমৃদ্ধ জমিদার ও পরাক্রান্ত।

এমনিভাবেই প্রায় দুশো বছর কেটে গেল। জমিদার বংশ পরে মুসলমান রাজাদের সামরিক পদ নিয়ে আরোও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করলেন।

খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়লো বটে কিন্তু সাধনার আদর্শে কি কিছু ক্ষতি ঘটলো না? এই বংশ পূর্বে নারীদের সম্মানের জন্য যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করেছেন। তাঁদের প্রতাপে তাঁদের চারদিকে কোথাও নারীজাতির অপমান ঘটতে পারে নি। এমনিভাবেই চলেছিল তাঁদের পুণ্যসাধন-ধারা। তাঁরা সবাই একনিষ্ঠ এক-পত্নীক জমিদার ছিলেন। ধনী হলেও বিলাসব্যসনে যোগ দিয়ে বহুবিবাহে বা বাইজী খ্যামটাওয়ালী প্রভৃতির সংস্পর্শে নিজেদের চরিত্র বা সাধনাকে নষ্ট হতে দেন নি।

কিন্তু ক্রমে ধন-সমৃদ্ধি বাড়তে লাগলো, নানাবিধ নৈতিক উপসর্গও এসে জুটতে লাগলো। তার মধ্যে জমিদার বাবুর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটলো। তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। কেউ কেউ বললেন আপনাদের সাধক বংশে এই বয়েসে আর কি বিয়ে করার প্রয়োজন আছে? আপনি সাধনায়ই এগিয়ে চলুন।

বলা বাহুল্য, উপদেশটা গ্রহণ করার উপায় ছিল না। বাবু তখন সুরাসক্ত বাইজীভক্ত ও নৈতিক আদর্শ হতে ভ্রষ্ট। ধনীরা তো কেউ তাকে কন্যা দেবেন না। এক ধনলোভী স্বার্থপর গৃহস্থ ধনের লোভে আপন কচি মেয়েকে ঐ বুড়োর হাতে সঁপে দিলেন।

বাবুর বিয়ে করবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি তো মদ খেয়ে পতিতাদের নিয়েই বৈঠকখানা ও বাগান বাড়ীতেই পড়ে থাকেন। অথচ ক্রমে সেই কচি বৌটি ডাগর ও অত্যাচারী হয়ে উঠলেন। তিনি স্বামীর তো নাগাল পান না। তাঁর যত অত্যাচার চলে তাঁর সতীনের রেখে-যাওয়া একটিমাত্র মেয়ের উপর।

মেয়েটি দেবীর প্রতিমা। পুণ্যাত্মা ঠাকুর্দা ও ঠাকুরমার হাতে মানুষ। তাঁরা অকালে মারা না গেলে মেয়েটির হয়তো এ দুর্গতি ঘটতো না। এই বাবুও হয়তো এত সহজে ভার্যান্তর গ্রহণ করতে পারতেন না। কারণ এই বংশে এই ধারা পূর্বে চলিত ছিল না। এই বাবুই নবাব সরকারের বড় পদ অধিকার করে নবাবী ব্যসনে আকণ্ঠ ডুবে গেছেন।

সতীনের মেয়ে দেবী মূর্তি। গৃহদেবীর কাছে নিঃশব্দে সে আপন দুঃখ জানায়। মুখফুটে আত্মীয়জনের কাছে সৎমার অত্যাচারের বিন্দুমাত্র খবর কখনও জানায় না। সে ছেলেমানুষ, দীক্ষা পায়নি। গৃহদেবীই নাকি তার মায়ের মূর্তি হয়ে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার আপন পাষাণ পীঠে অধিষ্ঠিত হয়ে পুরোহিতদের ও পূজকদের পূজা গ্রহণ করেন।

দেবীর সঙ্গে মেয়েটির অতি মধুর সম্বন্ধ। দেবী হলেন মা, আর ঐ কন্যাটি তাঁর মেয়ে। মায়ের রূপেই সে দেবীকে পেল। মায়ের রূপেই সেই "সর্বরূপময়ী দেবী" কন্যাটির কাছে নিত্য দেখা দেন, আশ্বাস দেন। তার সকল শোকদুঃখের ভার হাল্কা করে দেন।

সৎমা মেয়েটিকে তাই ভাল করে জব্দ করে উঠতে পারছেন না। কারণ ঠাকুরঘরেই ঐ কন্যার অধিকাংশ সময় কাটে। ঠাকুরঘরেই ঐ কন্যার সব শান্তি ও সান্ত্বনা। ঠাকুরঘর থেকে মেয়েটিকে ডাকতে গেলে বুড়ো বুড়ির দল "হাঁ হাঁ" করে আসেন, আর বলেন ঠাকুরঘর থেকে ডেকে এনে মেয়েকে সংসারের জাঁতাকলে ফেললে দেবী রুষ্ট হবেন—অকল্যাণ হবে।

স্বার্থপর সৎমা একটু ভয়ও পান। কাজেই তাঁর দুঃখ দেবার উপায় হল ঠাকুরঘরের সব কাজের ভার কন্যাটির উপরই চাপিয়ে দেওয়া।

তখনকার দিনে ঠাকুরঘরে একদল চাকর চাকরাণী থাকতো, তাদের বলা হত "মণ্ডপী", অর্থাৎ দেবমণ্ডপের বা ঠাকুরঘরের সেবক। তারা জমিদার বাড়ী থেকে মাইনে পেতো, ভূমি পেতো, আর পুরুষানুক্রমে বাবুদের ঠাকুরঘরের কাজ করতো।

সৎমা "মণ্ডপী"দের একে একে ঠাকুরঘরের কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কাজে লাগাতে লাগলেন। ঠাকুরঘরের ভোগের বাসন-মাজা, রান্নার পোড়া বাসন মাজা, ধোয়া মোছা, ভোগ বানানো প্রভৃতি সব কাজ ক্রমে একা ঐ কচি মেয়েটার উপরই গিয়ে বর্তালো।

অথচ কাজ কিছুই পড়ে থাকে না! একলা ঐ কচি মেয়ে কি করে অত কাজ সম্পন্ন করে! কেউ কি তার তত্ত্ব রাখেন? যখন প্রথমে এইসব কাজের ভার মেয়েটির উপর এসে পড়লো, তখন ঐ ছোট্ট মেয়ে কেঁদেই আকুল কি করে সে কাজগুলি সারবে। ঠাকুরঘরের নিচেই যে দীঘি সেই দীঘিতে কি করে সে একলা এই ভারি ভারি বাসনগুলো নিয়ে যাবে, পোড়া বাসনগুলো মাজবে! আর এইসব কাণ্ড বাইরের লোকে দেখলে জমিদার-বাড়ীর মানই বা থাকবে কি করে? অথচ দেবীর ঘরের কাজ ফেলেও রাখা চলে না। সৎমাকেও অপদস্থ করা চলে না।

ভেবেচিন্তে মেয়েটি আঁধার রাতে বাসনগুলো একে একে দীঘির ঘাটে নিয়ে যাবে এই মনে করে একখানি বাসন কায়ক্লেশে তুলে ঘাটে নিয়ে গিয়ে দেখে ঠাকুরঘরের সবগুলো বাসন কে যেন ঘাটে আগেই এনে জলে ভিজিয়ে রেখেছে। মেয়েটি তার বাসনখানি কোনমতে মেজেঘষে ঠাকুরঘরে পৌঁছাতে যাবে এমন সময় তাকিয়ে দেখলো দেবী জগন্মাতা ঘাটে বসে বাসনগুলো আপন হাতে মাজছেন। ঠাকুরঘরে মেয়েটি আপন বাসনখানি পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য বাসনগুলোও কি জানি কেমন করে পৌঁছে গেল।

মেয়েটি ভেবে পায় না কি করে রোজ রোজ এই কাণ্ড ঘটে। কাকেই বা সে বলবে। তার ঠাকুর্দার আমলের এক বুড়ো "মণ্ডপী"-দাদু ছিল। তার সঙ্গেই মেয়েটির সব সুখ-দুঃখের কথা চলতো। মেয়েটি তার আপন মনের কথা জানালো তার প্রিয় মণ্ডপী-দাদুকে।

মণ্ডপী-দাদু ভৃত্য হলেও ছিলেন সাধকতপস্বী। তিনি সব শুনে একদিন অহোরাত্র উপবাস করে রইলেন। সারাদিন জপ ও পুরশ্চরণ করে দিন কাটালেন। শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে রাত্রে মেয়েটিকে বল্লেন, এইবার তোমার বাসন নিয়ে তুমি ঘাটে যাও দেখি।

মেয়েটি বাসন নিয়ে ঠাকুরঘরের দুয়ার ভেজিয়ে ঘাটের দিকে চলেছেন, আর মণ্ডপী-দাদু দেখলেন যে, পীঠস্থান হতে পাষাণীদেবী মানুষের মত নীচে নামলেন, আর সব বাসন মেয়েটির অলক্ষ্যে ঘাটে পৌঁছে দিলেন, মেজেঘষে সাফ করলেন, আবার ফিরে এসে ঠাকুরঘরে সব গুছিয়ে রাখলেন।

সাধনার বল ছিল বলেই মণ্ডপী-দাদু দেবীর এই লীলা দেখতে পেলেন। রাতের পর রাত জানলার ফাঁক দিয়ে দাদু দেখেন দেবী তাঁর পাষাণপীঠ হতে নামছেন, ঠাকুরঘরের সব বাসনপত্র দীঘিতে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার দীঘি হতে নিয়ে ঠাকুরঘরে সব গুছিয়ে রাখছেন। তার পর আবার যেমন পাষাণমূর্তি তেমনি পাষাণী হয়ে পুজো নিচ্ছেন।

ক্রমে মণ্ডপী-দাদু এই তত্ত্ব মেয়েটির কাছে বললেন—মেয়েটি কেঁদে দেবীকে বললেন— "মাগো, তুমি যদি এমন করেই আমাকে সাহায্য করবে, তবে গোপনে করবে কেন? দেখা দিয়ে কেন সাথে সাথেই প্রত্যক্ষ হয়ে আমার সঙ্গেই কাজ করো না!"

দেবী মেয়েটির বাসনা পূর্ণ করলেন—লোক নেই জন নেই, অথচ ঠাকুরঘরের কাজ দিব্যি চলে যাচ্ছে। সবাই খুসি, মদ্যপানরত বাপ এসব কোন খবরই রাখেন না। সৎমা কিন্তু মেয়েকে জব্দ করতে না পেরে জ্বলে পুড়ে মরছেন।

দেখতে দেখতে সে বছর পুজো এলো। জমিদারবাড়ির পুজো—কত লোক আসছে, কত লোক যাচ্ছে। একা মেয়ে কাজ করে, অথচ কোন কাজই পড়ে থাকছে না। মেয়ের সৎমা কথাটা একদিন স্বামীর কানে তুললেন—স্বামী অর্থাৎ জমিদার উঁকি মেরে দেখেন, মেয়েটি ঠাকুরঘর থেকে বেরুচ্ছে একখানি বাসন হাতে করে, সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরঘরের দেবীমূর্তি আর তার পাষাণবেদীতে নেই; বাসনগুলোও নেই। বাসনগুলো ফিরে এলো। পাষাণ-পীঠে আবার দেবীমূর্তি দেখা গেল। পাষাণীমূর্তি তিনি দেখতে পেলেন বটে, কিন্তু দেবীর কল্যাণী জঙ্গম-মূর্তি তাঁর প্রত্যক্ষগোচর হলো না। হবেই বা কেন? তাঁর তো অধিকার নেই।

বাসনাসক্ত হলেও তিনি কথাটা জানালেন তাঁর পুরোহিতের কাছে। পুরোহিতঠাকুর ছিলেন পণ্ডিত ও সাত্ত্বিক মানুষ। তিনি বুঝলেন এ তো সব দেবীর লীলা। তিনিও তপস্যাপূত হয়ে মণ্ডপী-দাদুর সঙ্গে আড়ি পেতে দেবীর লীলা দেখলেন। আর সেই কথা যজমানকে অর্থাৎ জমিদারবাবুকে ভাবে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন।

জমিদারপত্নীর কানেও ক্রমে কথাটা উঠলো। প্রথমে তিনি তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন। এমন ঘটনাও কি কখনো ঘটে? পুরোহিত বললেন, "কেন ঘটবে না মা, আমার মা যে—

"সর্বরূপময়ী দেবী
সর্ব দেবীময়ং জগৎ"

তিনিই একাধারে জগন্মাতা, জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রী জগৎ-সেবিকা। ডাকতে জানলে তিনি যেমন সেবা করতে পারেন, এমন সেবা কে করতে পারে? তোমার এ মেয়ে চরম সিদ্ধি লাভ করেছেন, একে কোন্ বলে তুমি সমর্পণ করবে। আমি ভাবটি এই কন্যার উপযুক্ত পাত্র তুমি পাবে কোথায়?"

জমিদার কন্যাকে ডেকে সব তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ে চুপ করে রইল। মায়ের নামে কোনও অভিযোগ করলো না। দেবীর লীলার কথাও কিছু ব্যক্ত করলো না।

সেদিন দুর্গাসপ্তমীর রাত্রি। লোকে লোকারণ্য। পুজো শেষ হয়ে গেল। উৎসবমুখর দিনের অবসান হলো। গভীর রাত্রি। মণ্ডপ ও মন্দির সব শূন্য। সবাই ঘুমিয়েছে। মেয়েটি ঠাকুরঘরের কাজে তখন এসে হাত দিল। সঙ্গে সঙ্গেই আছেন দেবী। সেদিন সেই বাসনী জমিদারবাবু এক জানলার ফাঁক দিয়ে উৎসুক হয়ে সব দেখছেন।

যে দেবী মণ্ডপী-দাদুর কাছে আপন লীলা দেখিয়েছিলেন, তপস্বী পুরোহিতকে যিনি আপন সব লীলা বুঝতে দিয়েছিলেন, আর অবোধ শিশুকন্যার কাছে যিনি একেবারে হাতে হাতে আপনাকে ধরা দিয়েছিলেন, সেই দেবী এই বাসনী জমিদারের কাছে আপন লীলা কিছুতেই প্রকট হতে দিলেন না।

যেই বুঝলেন, জমিদারবাবু আড়িপেতে দেখছেন, দেবী তখনি মেয়েটির হাত ধরে সেই যে দীঘির জলে ডুব দিলেন, আর উঠলেন না।

পরদিন মহাষ্টমী। প্রভাতে সবাই দেখলো যে, ঘাটে ঠাকুরঘরের সব বাসন পড়ে রয়েছে। ঠাকুরঘরে পাষাণপীঠ শূন্য। পুজো পূর্ণ করবার জন্যে নতুন করে মৃন্ময়ী মূর্তি স্থাপন করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করতে হলো। সেই যে দেবী সেই রাত্রে দীঘিতে ডুব দিলেন আর উঠলেন না।

সেই অবধি দীঘির নাম "ঠারৈনদীঘি" অর্থাৎ ঠাকুরাণীর দীঘি। হিন্দু মুসলমান সবাই স্থানটির মাহাত্ম্য স্বীকার করেন ও মানৎ করেন। কেউ কেউ নাকি এখনও রাত্রে দেখতে পান, দেবীমাতা একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে কল্যাণ ও সেবাব্রতে দীঘির তীরে বসে আছেন। কখনও বা জগন্মাতা একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে দীঘির মাঝপথে পদ্মদলে বিরাজ করছেন।

রামপ্রসাদের কাছে যে দেবী এসেছিলেন কন্যারূপে, যুগাদ্যার দীঘিতে শাঁখারির কাছে যে দেবী দেখা দিয়েছিলেন কিশোরীরূপে, যুগাদ্যামন্দিরের পুজারীর কাছে যিনি পরিচয় দিয়েছিলেন কন্যারূপে, অর্ধকালীরূপে যিনি দেখা দিয়েছিলেন গৃহবধূরূপে, ঠারৈনদীঘিতে তিনি দেখা দিয়ে গেলেন মায়ের মূর্তিতে।

এই কথাই বুঝিয়ে গেলেন—

সর্বরূপময়ী দেবী সর্বদেবীময়ং জগৎ।

এক রাত্রি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রাত এখন ক'টা? গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড দিয়ে একটা মোটর চলে গেল পশ্চিমে। যত রাতেই হোক, দাঁড়াও এসে জানালার সামনে, দেখতে পাবে একটা মোটর সাঁ করে বেরিয়ে গেল। কোথায় যায়, কোথায় থামে কে জানে।

ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছে। শীতের শেষে বসন্তের বৃষ্টি। শীতকে মনে করিয়ে দেওয়ার বৃষ্টি। আকাশের করুণা। সবাই ঘুমুবে শান্ত হয়ে। বৃষ্টির শব্দে পায়ের শব্দটি শোনা যাবে না।

যদি আসে নিশ্চয়ই খালি পায়ে আসবে। অনেক রাতে হঠাৎ-ওঠা চাঁদের হাসিটির মত আসবে। কিংবা গহন অরণ্যে ভয়-পাওয়া কৃষ্ণসার হরিণীর মত।

কিন্তু আসবে কি? কেউ আসে?

আজ যদি না আসে তবে আর আসবে কবে? এমন শুভরাত্রি বিধাতা ফরমায়েস দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। জামাইবাবুর মায়ের অসুখের খবর পেয়ে দিদি আর জামাইবাবু চলে গিয়েছেন কলকাতা। পরাশরবাবু হাসপাতালে। তার স্ত্রী কাছাকাছি কাকার বাড়িতে। উপরে শুধু ও আর ওর মা। মাকে একটু ফাঁকি দিতে পারবে না তো মেয়ে হয়েছে কেন?

প্রথম দিনের ঝগড়ার কথাটাই মনে পড়ছে ভবদেবের।

একটা গাছ এসে পড়েছিল ভবদেবদের এলেকায়। গোলাপ গাছ। আর ধরবি তো ধর সেই গাছেই ফুল ধরল।

সেই ফুলই নৃশংস হাতে ছিঁড়ে নিয়েছিল ক্ষণিকা। ভেবেছিল কেউ দেখতে পাবে না বুঝি। তাড়াতাড়িতে ছিঁড়তে গিয়ে নরম ডালটাকে জখম করে ছেড়েছে।

'ও কি, ও ফুল ছিঁড়লেন যে?' চকিতে সামনে এসে হুমকে উঠেছিল ভবদেব।

'এ গাছ আপনাদের ভাড়া দেওয়া হয়নি।' রূঢ় উপেক্ষায় পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল ক্ষণিকা।

'সে কি কথা! ঘরের সামনেকার এ ফালিজমিটুকু যদি আমাদের, জমির উপরকার এ ফুল-গাছও আমাদের। একেবারে আমার ঘর ঘেঁসে এই গাছ—হাত বাড়ালেই ধরা যায় রীতিমত।'

কি অপূর্ব যুক্তি। মনে-মনে হেসেছিল নিশ্চয়ই ক্ষণিকা। যেহেতু হাত বাড়ালেই ধরা যায় সেহেতু আমার অধিকার! বাঁকা ভুরু সংকুচিত করে বলেছিল ক্ষণিকা, 'কিন্তু এ গাছ আপনারা পোঁতেননি, আমরা পুঁতেছি—'

'আপনারা তো আরো অনেক পুঁতেছেন। বাগান সাজিয়ে বিলিতি তারের-বেড়া দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ফুল হয়েছে একটাতেও? গাছ পোঁতা আর তাতে ফুল ফোটানো এক কথা নয়। পুকুর অনেকেই কাটে কিন্তু পুণ্য না থাকলে তাতে জল হয় না।'

কি অপূর্ব উপমা! উপেক্ষার ভঙ্গিতে আবার পিঠ ঘুরিয়েছিল ক্ষণিকা। দীর্ঘ-বৃন্ত ফুলটা। খোঁপায় গুঁজতে-গুঁজতে বলেছিল, 'ফুল যদি ফুটে থাকে তবে ভাড়াটেদের পুণ্যে ফোটেনি, যাদের বাড়ি তাদের পুণ্যেই ফুটেছে।'

'কিন্তু ছিঁড়ে নেবার সময় তো পুণ্যবানের ভঙ্গি বিশেষ ছিল না হাতে-চোখে। যেন কেউ দেখতে না পায় এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে চোরের মত পালিয়ে যাওয়ার মতলব।'

'নিজের পাঁঠা যে ভাবে খুশি সে ভাবে কাটাব তাতে অন্য লোকের কি।'

'কী হয়েছে রে ক্ষণু?' আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলেন সুনয়নী।

এক মুহূর্ত দেরি হয়নি বুঝে নিতে। কত দিন বহু যত্নে দুই চোখের ভালোবাসা দিয়ে যে ফুলটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ভবদেব, তা আর নেই। মোচড় খেয়ে ডালটাও হেলে পড়েছে। কতবার বলেছে সুনয়নী, ফুলটিকে তুলে এনে ফুলদানিতে রেখে দে। বলেছে, তেমন কেউ যদি থাকত দেবার মত তার জন্যে তুলে আনতুম। তেমন যখন কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা তখন গাছের ফুল গাছেই থাক।

'আমিই ফুলটা ছিঁড়েছি দিদি।' পিঠ ঘুরিয়ে খোঁপাটা দেখিয়েছিল ক্ষণিকা। ঘষা-ঘষা ওড়া-ওড়া চুলের শুকনো খোঁপার মধ্যে টাটকা একটা রক্ত গোলাপ।

'বা, চমৎকার।' গাল ভরে হেসে উঠেছিল সুনয়নী। বলেছিল, 'কেশবতী রাজকন্যের মাথায় উঠেছে, ফুলের আর কি চাই।'

সুন্দর করে হেসে উঠেছিল ক্ষণিকা। বিজয়িনীর ভঙ্গিতে মাথা উদ্ধত করে চলে গিয়েছিল সমুখ থেকে।

কোথায় যাবে! অহংকারে মাথা চাড়া দিয়ে চলতে গেলে আলতো খোঁপায় থাকবে কেন গোলাপ! খসে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে।

যাক পড়ে। নেব না কুড়িয়ে। পিছন ফিরে তাকিয়েও দেখব না।

সোজা চলে গিয়েছিল গরবিনী। সকালের রোদ্দুরে সারা গায়ে যৌবনের ঝলক দিয়ে।

ছিন্নবৃন্ত বিধ্বস্ত গোলাপটার দিকে তাকিয়ে ছিল ভবদেব। বিহ্বল বৃন্তাশ্রয় ছেড়ে মাটিতে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে থাকলেও কম সুন্দর নয় গোলাপ।

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল। এখনো ঘুমুতে যায়নি ভবদেব। চেয়ারে বসে সিগারেট টানছে। পরিপাটি করে বিছানা পাতা। একটিও ভাঁজ নেই রেখা নেই। উচ্ছ্বসিত কোমলতায় প্রসারিত হয়ে আছে। সমস্ত ঘর অন্ধকার। খানিক আগে একটা মোমবাতি জ্বালিয়েছিল ভবদেব। পরে কি ভেবে নিবিয়ে দিয়েছে ফুঁ দিয়ে।

অন্ধকারেই আসুক পথ চিনে। আকাঙ্ক্ষার তাপ লেগে-লেগে অন্ধকারই তার মূর্তিতে দীপায়িত হোক।

কিন্তু সত্যি কি আসবে? বলে গেলেও আসা কি সম্ভব? আসা কি মুখের কথা?

এখনো বৃষ্টি চলেছে ঝিরঝির। এলো-মেলো হাওয়া উঠেছে। দুদিকের দু দরজাই ভেজানো ছিল এতক্ষণ। হাওয়ায় শব্দ হতে পারে ভেবে ছিটকিনি লাগালো ভবদেব। কথা আছে, ঠেলে যদি বোঝে দরজা বন্ধ, আঙুলের টোকা মারবে। তার দরকার হবে না। এ অঞ্চলে চলে এলেই অনায়াসে বুঝতে পারবে ভবদেব। হাওয়ায় পাবে তার গায়ের গন্ধ, শুনবে তার শাড়ির খসখস।

হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে আলগোছে। মা আর মেয়ে এক ঘরে শোয়, হয়তো মা-ই এখনো আচ্ছন্ন হয়নি। অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ক্ষণিকা। প্রতীক্ষা করছে। এদিকে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মোমবাতি।

নিয়তির পরিহাসের কথা কে না শুনেছে! হাতের পেয়ালা মুখে তোলবার আগে হাত থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্যে আরেকটা সিগারেট ধরালো ভবদেব।

ফুলটাকে মাটিতে অমনি ফেলে যাবার পর, মনে আছে, সুনয়নী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলঃ 'দে ঐ গাছের নির্বংশ করে একেবারে শেকড় উপড়ে। কত দিনের চেষ্টায় কত কষ্ট করে ফুল ফোটানো হল।

এখন বলে কিনা বাড়ির মালিক বাড়িউলি। এর পর হাটে-মাঠে-ঘাটে যেখানেই থাকি না কেন, মাথার উপরে বাড়িওলা নিয়ে যেন না বাস করতে হয়।'

কি সব দিনই গিয়েছে! নিচের তলার ভাড়াটে, বাড়িওলার ভাব, সব রকমেই যেন নিচের তলায়। কুয়োর থেকে পাম্প করে জল দিত, তা ভাড়াটেরা সব শেষে। পাঁচ মিনিট হতে না হতেই সুইচ-অফ। কী ব্যাপার? ঝামা-মারা টান জায়গা মশাই, কুয়ো শুকিয়ে এসেছে। এমনি নিত্যি। ভর-গ্রীষ্মের দিনে কলসী-কুঁজোও ভরাট হয়নি। বর্ষায় যখন সচ্ছল জল তখনও চৌবাচ্চা ভরেনি পুরোপুরি। তখন বড়-জোর দশ মিনিট। সট করে সুইচ অফ করে দিয়ে বলেছে, মফস্বলে ইলেকট্রিক কারেন্টের দাম কত!

প্রথম সরকারী ঝগড়া হয়েছিল চাকর রামলখনকে নিয়ে। নিচে আলাদা-মতন একটা ফালতু ঘর ছিল, ভাড়া দেওয়ার সময় বলা হয়েছিল, ওটা চাকরের ঘর, ভাড়াটেদের এজমালি। কিন্তু থাকবার বেলায় বাড়িওলার ড্রাইভার আর দারোয়ান। চলবে না কথার ঘোর-ফের, চাকরের জায়গা দিতে হবে। মুখে হার মেনেছিল পরাশর, কিন্তু টিপে দিয়েছিল দারোয়ানকে। তার দাপটে সাধ্য কি রামলখন শোয় সেই ঘরের মধ্যে। তার জায়গা বারান্দায়।

সত্যি, রামলখন আজ বারান্দায় শোয়নি তো? ভবদেব বলে দিয়েছে বাইরের ঘরে শুতে। কিন্তু বলা যায় না, যেমন বুদ্ধি, হয়তো প্রভুর নিরাপত্তার কথা ভেবে একেবারে বাইরের দরজা ঘেঁসে শুয়েছে। কে জানে সেইটেই হয়তো মস্ত বাধা হবে ক্ষণিকার!

খুট করে ছিটকিনি খুলে দরজা ফাঁক করে তাকাল একবার বাইরে। না, বারান্দা ফাঁকা। আশপাশ নিঃঝুম। দূরে স্টেশনের লাল-শাদা-সবুজ আলোর পিণ্ড-গুলি জ্বলছে স্থির হয়ে। আপ দুন আর ডাউন দিল্লি এক্সপ্রেস চলে গিয়েছে এতক্ষণে। আরো কত ট্রেন আসবে যাবে। যে ট্রেনের অবধারিত স্টেশন এই ঘর সেই আর এসে পৌঁছুল না!

যা অবধারিত তার জন্যে কেন এই অধীরতা?

চোখের উপরে একটা তারা জ্বলছে দেখতে পেল। যা অবধারিত তাতে সুখ নেই যা অভাবনীয় তাতেই সুখ। মেঘলা আকাশ দেখবে ভেবেছিল দেখল একটা তারা! অত্যাশ্চর্য আনন্দে ভরে উঠল মন।

এমনি একটা অত্যাশ্চর্যের জন্যে প্রতীক্ষা করছে ভবদেব। অবধারিতের জন্যে নয়।

চরম ঝগড়া হয়েছিল সেদিন।

উপর থেকে ভিজে কাপড় ঝোলায় এই নিয়ে ভবদেবরা আপত্তি করেছে বহুদিন —বারান্দায় উঠতে-নামতে ঠিক নাকের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়, মাথার উপরে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ে। শোনেনি বাড়িওলারা। বলেছে, ও ছাড়া জায়গা নেই কাপড় মেলবার। মুখের প্রতিবাদে কাজ হয়নি, তাই গেরো মেরে ভিজে কাপড়ের কুণ্ডলী পাকিয়েছে নিচে থেকে। ঢিল বা অন্য কিছু ধুলো-বালি বেঁধে দিয়েছে।

কিন্তু সেদিন অন্যরকম হয়েছিল। শুকিয়ে এসেছে একটা শাড়ি, খসে পড়েছিল নিচে, নিচের বারান্দার সিঁড়ির উপর। বিকেলের ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল রামলখন, চোখে পড়তেই কুড়িয়ে নিয়েছিল ব্যস্ত হাতে। ভবদেব সেইমাত্র ফিরেছে আপিস থেকে, চোখোচোখি হতেই বলেছিল, 'রেখে দে।'

গুটিয়ে-পাকিয়ে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল রামলখন।

আর তক্ষুনিই তরতরিয়ে নিচে নেমে এসেছিল ক্ষণিকা।

সুনয়নীকে জিগ্‌গেস করেছিল, 'আমাদের একটা শাড়ি পড়েছে দিদি?'

'কই না তো!' সুনয়নী ভিতরের বারান্দায় চা করছিল, অবাক মানল। 'কি রকম শাড়ি? কার শাড়ি?'

'বৌদির শাড়ি। তেমন দামী কিছু নয়। কিন্তু নিচে পড়লেই যদি তা আর ফেরৎ না পাওয়া যায়—'

'বা, সে কি কথা? রামলখন তো এইমাত্র ঝাঁট দিচ্ছিল বাইরে। হ্যাঁ রে, রামলখন, বাইরে শাড়ি দেখেছিস একটা?'

মাটি-লেপা উনুনের মত মুখ করে রামলখন বললে, 'বা, আমরা দেখতে যাব কেন?'

'বেশিক্ষণ হয়নি। আমিই তুলছিলুম, গেরো খুলতে পড়ে গিয়েছে—'

'হাওয়ায়ও তো উড়ে যেতে পারে—' ভিতর থেকে টিপ্পনি কেটেছিল ভবদেব।

উড়নতুবড়ির মত ঝলসে উঠেছিল ক্ষণিকা। বলেছিল, 'মাপ করবেন দিদি, আমি সার্চ করব।'

'সার্চ করবে!' প্রথমটা থমকে গিয়েছিল সুনয়নী। পরে মুখে হাসি টেনে বলেছিল, 'এই দেখ না আমাকে।' বলে আঁচল ঝাড়া দিয়েছিল।

'বডি-সার্চ নয়, বাড়ি-সার্চ।'

'আপনি মেয়ে-পুলিশ নাকি?' ভবদেব এবার এসেছিল মারমুখো হয়ে: 'সঙ্গে ওয়ারেণ্ট আছে?'

'ও সব চোর ধরতে ওয়ারেণ্ট লাগে না। কলকাতার বাসে, ট্রামে পকেট মারা গেলে প্যাসেঞ্জারদের পকেট সার্চ করার রীতি আছে।'

'এ একটু বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছেনা ক্ষণু?' আপত্তি করেছিল সুনয়নী।

'হয়তো হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই।'

'উপায় নেই?' আবার ঝাঁজিয়ে উঠেছিল ভবদেব: 'আপনি কাউকে দেখেছেন চুরি করতে?'

'চোখে দেখিনি, কিন্তু কানে শুনেছি। শুনেছি, শাড়িটা নিচে পড়ামাত্রই একজন বলছেন আরেক জনকে, রেখে দে। পরের জিনিস জেনে তা ছলনা করে রেখে দেওয়াটাও অসাধুতা।'

'এতই যখন জানেন তখন সোজাসুজি এসে ভালোমানুষের মত চাইলেই হত!'

'ভিক্ষে করে নেওয়ার চাইতে দাবি করে নেওয়ার মধ্যে গৌরব আছে।' যৌবনের অহঙ্কারে সারা গায়ে ঝঙ্কার তুলেছিল ক্ষণিকা। বলেছিল, 'দিয়ে দিন।'

রামলখনকে ভবদেব বলেছিল দিয়ে দিতে।

শাড়িটা পেয়ে ছেলেমানুষের মত হেসে উঠেছিল ক্ষণিকা। মনে হয়েছিল যেন তার গায়ের অঞ্চল থেকে শূন্যে একঝাঁক বক উড়িয়ে দিলে।

অবাক যত না হয়েছিল তার চেয়ে বেশি রেগে উঠেছিলো সুনয়নী। 'তুই দিতে গেলি কেন? সার্চ করা বের করে দিতাম।'

'তুমিই তো লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ! নইলে ও কোন্ সুবাদে তোমাকে দিদি বলে? মাসি না, পিসি না, বৌদি না—'

'মনে হচ্ছে তোর সুবাদে।' ঠাট্টা করেছিল সুনয়নী।

'আমার সুবাদে! দেখি আজ থেকে সমস্ত সুবাদ দিলাম, দিদি। বাসাড়ে যখন হয়েছি তখন চাষাড়েই হব ঠিকঠাক।'

লজ্‌ঝর একটা ফ্যান ভাড়া করে এনেছিল ভবদেব। এ-সি কারেণ্টের পাখা, বাটি-শুদ্ধ ঘোরে। পুরো দমে চালালে এমন প্রলয়ঙ্কর শব্দ হয়, ঘর-দোর কাঁপে, মনে হয় সিলিং বুঝি ফেটে পড়বে। সেই শব্দ উপরে যায়, উপর থেকে ফেরাফিরতি বল্ খেলে, দুপ-দাপ চালায়, কিন্তু কতক্ষণ চালাবে, এদিকে পাখা ঘুরছে দিন-রাত।

শুধু তাই নয়, শুরু করেছিল দেয়ালে পেরেক ঠুকতে, সার্শি ভাঙতে, মেঝেতে হাতুড়ি পিটতে। আর কি করা, উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছিল বাড়িওলা। উলটে রেণ্ট কণ্ট্রোলারের কাছে নালিশ করল ভাড়াটে। জল বন্ধ, আলো বন্ধ।

লাগ ভেলকি লাগ।

এমনি যখন জলদতালে বাজনা বাজছে, তখন খবর এল ভবদেবের চাকরি স্থায়ী হয়েছে। প্রমোশান পেয়েছে ইউরোপীয়ান গ্রেডে। কিছুকাল পরেই কোয়ার্টার দেবে কোম্পানি।

দেখতে-দেখতে একটা ভোজবাজি হয়ে গেল। খারিজ হয়ে গেল সমস্ত মালি-মামলা। আকাশ-বাতাসের বদলে গেল চেহারা। নিচের ঘরে আলো জ্বলল শুধু নয়, নতুন পয়েণ্ট বসালো পরাশর। জল দিতে লাগল চৌবাচ্চা ছাপিয়ে। বন্ধ হয়ে গেল উপরের দুপদাপ। কাপড় শুকোতে লাগল ছাদের উপরে প্রসারিত হয়ে। শুধু তাই নয়, পরিতোষ নতুন একটা নিঃশব্দ পাখা দিলে ভবদেবকে। ভাড়া? ভাড়ার জন্যে কি।

আশ্চর্য, সময়ে অসময়ে নিচে নামতে লাগল ক্ষণিকা। সুনয়নীর কাজে-কর্মে হাত মেলাতে লাগল। দুএকটা রান্নাও নাড়ল-চাড়ল। কখনো-সখনো হাত রাখতে লাগল ভবদেবের টেবিলে। ভবদেবেরও ঘন-ঘন নেমন্তন্ন হতে লাগল উপরে। পরাশরের মা আর বৌদিও চলে এল সামনে, নতুনতরো আত্মীয়তার আলো ফেলে।

পরাশরের মা বললেন, গায়ের রঙ একটু কালো হলে কি হবে, দিব্যি স্বাস্থ্য।

'আর লেখাপড়া?' ফোড়ন দিল বৌদি।

সব জানা আছে। মনে-মনে হেসেছিল ভবদেব। আসলে চাকরি, বড় বাহালি চাকরি। আসলে টাকা। আসলে কোয়ার্টার।

হাল ছেড়ে দেয়নি, কিন্তু মুঠিটা একটু শিথিল করেছিল ভবদেব। দেখি হাওয়ার টানে কোথায় গিয়ে উঠি, কোন রোমাঞ্চের বন্দরে। দেখি উদ্ধত কি করে বিগলিত হয়। দুরূহ-দুর্গেয় কি করে সরল হয়ে আসে।

দক্ষিণের আকাশ অনেকখানি জুড়ে লাল হয়ে উঠেছে। বার্ণপুরের ফার্নেস। যেন উদাত্ত বজ্রের মতো জ্বলছে কোথায় মহা-ভয়ঙ্করা। দাতের ওপারে নির্দয় শাসনের মত। যেন বলছে রূঢ়ভাষে, তর্জনী আস্ফালন করে, কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম চলবে না, কোনো স্খলনের ক্ষমা নেই, নেই কোনো বিচ্যুতির নিস্কৃতি।

তাই, ভয় পেয়ে গিয়েছে ক্ষণিকা। কুঁকড়ে-সুঁকড়ে ভয়ের কুণ্ডলীর মধ্যে অভ্যাসের জড়পিণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

যদি এই ভয়টুকু না থাকে তবে কিসের জয়! এই ভয়টুকু আছে বলেই তো নির্জন গিরিশিখরের ডাক। ডাক সেই পথ-হারানো গহন অরণ্যের। সঙ্গলেশহীন সমুদ্রতীরের। সেই ডাকটি কি এই মহান রাত্রি পেঁৗছে দিতে পারেনি ক্ষণিকার কানে-কানে?

বটেই তো। সেও নুন-নেবু মেশানো ফিকে জল-বার্লি। একটি অভ্যস্ত জীবনের জীর্ণতার জন্যে অপেক্ষা করছে ধৈর্য ধরে। রাত্রির ক্লান্তিতে প্রতিটি প্রভাতকে মলিন দেখবার বাসনায়। নেই তার মধ্যে সেই আনন্দোদ্ভব উদ্ঘাটনের স্বপ্ন! সর্ব-অর্পণের ব্যাকুলতা! রাজকন্যার ভিখারিণী সাজবার তাপসশ্রী! তাহলে তাকে দিয়ে আর কি হবে? যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে আজ দেখা হবে মহারাত্রির মৌনে, সমস্ত হিসেব-কিতেবের বাইরে, কোনো রকম কৃত্রিম মীমাংসা না মেনে—এই উজ্জ্বলতাটুকু এই নবীনতাটুকু যদি সে উপহার দিতে না পারে, তবে তার দাম কি, তবে তার মহত্ত্ব কোথায়!

ভালোবাসা না ছাই! মোটা জাঁকালো চাকরি। টাকা। স্ববাসের কাছে কোয়ার্টার।

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে দিয়েছিল পরাশর। চলুন যাই কল্যাণেশ্বরী, বরাকরের ডাকবাংলো। ওবার তোপচাঁচি। এবার আরো দূরে, পরেশনাথ।

কেমন একটা ঘোর-ঘোর নতুন দৃষ্টি এসেছিল ভবদেবের চোখে। রক্তে নতুনতরো আস্বাদ। হঠাৎ ঘুম-ভেঙে যাওয়ার মধ্যে হঠাৎ মনে-পড়ে-যাওয়ার সুগন্ধ। নতুন দৃষ্টির সঙ্গে নতুন দৃষ্টির যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন সমস্তই যেন চক্ষুময় হয়ে ওঠে। অলক্ষ্য একটি নিমন্ত্রণের ভাষা নীরবে গুঞ্জরণ করতে থাকে। আশ্চর্য, যে চোখে আগে চকমকি পাথর ছিল তাতে এখন একটি লজ্জা একটি গম্ভীর কোমলতা দেখা দিয়েছে। একটি ধরা-পড়ার প্রস্তুতির লাবণ্য। কি করে এ সম্ভব হতে পারে ভেবে পায়নি ভবদেব। কে রচনা করল এই রুক্ষ মাটির শ্যামায়ন! নিষ্পাদপের দেশে অজানা পক্ষীকাকলী।

কিন্তু ঐখানেই শেষ। আর কোনো ঐশ্বর্য নেই। শুধু একটি দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে সমাপ্তি পাবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

সুনয়নীকে বলেছিলেন পরাশরের মাঃ 'তুমিই তো কর্ত্রী। এখন বলো কি তোমার দাবিদাওয়া!'

'দাবিদাওয়া যে কিছু নেই তা আমি জানি।' সুনয়নী বলেছিল হেসে হেসে, 'কিন্তু আমিই কর্ত্রী কিনা তাই জানি না।'

সেই দাবিদাওয়া জানবার জন্যেই সেদিন এসেছিল ক্ষণিকা। ছুটির দ্বিপ্রহরে। সুনয়নীর সুতো ধরে ভবদেবের নির্জনতায়।

ভবদেব বলেছিল, 'একদিন মধ্যরাতে আসতে পারো?'

দু চোখে অন্ধকার দেখেছিল ক্ষণিকা। ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছিল।

'চার দিকে এত ভিড়, কোনো সম্ভাবনা নেই, তা আমি জানি।' রাজনীতিকের নিরুদ্বেগ গলায় বলেছিল ভবদেবঃ 'কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের ষড়যন্ত্রে যদি কোনো দিন সেই মসৃণ মহারাত্রি আসে, আসবে?'

মুচকে হেসে সম্মতির ঘাড় নেড়েছিল ক্ষণিকা।

সেই মহারাত্রি সমাগত। কিন্তু ক্ষণিকার সাড়া নেই। আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতির নিচে আত্মদানের স্বাক্ষরটি ছিল না। পরিমিত জীবনের অপ্রমত্ত শান্তির রূপে তৃষা নিবৃত্তির অপেক্ষা করতে লাগল। রাত্রির মঞ্জুষায় দিল না তাকে একটি উজ্জ্বলতম দিনের উপহার। দিল না তাকে একটি বাঙ্ময়ী নিস্তব্ধতা। তার পৌরুষকে মহিমান্বিত করল না একটি বলবান বিশ্বাসে।

সত্যিই তো, বিশ্বাস কি। যদি অবশেষে ছিন্নসূত্র মালার মত ধুলোয় ফেলে দেয় ভবদেব! কে না জানে অবিবেকী পুরুষের খামখেয়াল! যদি তার কাছে সহসা সমস্ত মূল্য খুইয়ে বসে! যদি এক লহমায় সমস্ত রহস্যের অবসান হয়! যদি শেষ ছত্রের সঙ্গে-সঙ্গেই কবিতাটি থেমে যায়, সমস্ত কথা, সমস্ত সুর যায় ফুরিয়ে।

তার চেয়ে নিষ্পত্তির দৃঢ়ভূমি অনেক ভালো। অনেক ভালো ধৈর্যের ফুলশয্যা।

সে তো শুধু একটা নিয়ম পালনের রাত্রি। সে সব ফুল তো বাজারে কেনা। কিন্তু সে ফুলশয্যার চেয়ে এ তৃণশয্যার অনেক ঐশ্বর্য। আকাশের অনাবৃতির নিচে শ্যামলতার উন্মুক্তি।

তবে তাই হোক, এখানেই ইতি পড়ুক। তোমার অক্ষত অন্তরের পুণ্যস্থানে ফটক এঁটে দাও। তুমি থাকো তোমার অক্ষোভে অক্ষুণ্ণ হয়ে। আমি এবার শুয়ে পড়ি। ভবদেব বিছানার দিকে তাকালো। এবার শুয়ে পড়ি। বৃষ্টিটি আর নেই।

অন্যায্য অভিমান করে লাভ কি। বাধা-বিঘ্নগুলোও বুঝতে হয়। বড় বন্ধনগুলো নেই বটে কিন্তু ছোট কণ্টক অনেকগুলি।

'বিমলাকেই আমার বেশি ভয়।' বলেছিল ক্ষণিকা। 'ওর দুটো রোগ, দুটোই সাংঘাতিক। এক হিংসে, দুই অনিদ্রা।'

'দুটো বড়ি দিচ্ছি, খাইয়ে দিয়ো চালাকি করে।' বলেছিল ভবদেব।

এটুকু এলেকার মধ্যে চার-চার ঘর ভাড়াটে বসিয়েছে পরাশর। সাধে কি আর ভবদেব তাকে হাড়কিপ্পন চশমখোর বলে! গ্যারাজের উপরে দুখানা ঘর তুলে ভাড়া দিয়েছে বিমলা আর বিমলার মাকে। বিমলার মা ধাইগিরি করে। রাত্রে যদি কল আসে তবে বিমলাকে ক্ষণিকার কাছে শুতে পাঠায়। তেমন যদি কিছু ঘটে আজ অঘটন, তাহলেই তো বিপদ! একে পাশে শোবে তায় আবার ঘুম নেই!

কিন্তু ভবদেবের নিজের ভয় নাগমশাইকে। ভাড়াটে বসাবার আগে আর বাছবিচার করেনি পরাশর। কোথাকার এক বিপত্নীক নিঃসন্তান ঠিকেদারকে ঘর দিয়েছে একখানা। জীবনে দুটি মাত্র ব্যসন, রাতে চোর ধরা ও দিনে নাকের ডগায় চশমা বসিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে ইতি-উতি উঁকিঝুঁকি মারা। পাড়ার রক্ষীদলের সর্দার। জানলা দিয়ে কোন চোর হাত বাড়াল কোন মশারির মধ্যে, কোথায় গার্ড-ড্রাইভারে ষড় করে ট্রেন থামিয়ে ওয়্যাগন ভাঙাল—এই সবেরই ফিরিস্তি করে। বাড়ির আনাচে কানাচে, কখনো বা ট্রেনের লাইনের ধারে-ধারে টহল দেয়। যখন ঘরে থাকে, জানলার ভাঙা খড়খড়ির ফাঁকে চশমা ঠেকিয়ে চেয়ে থাকে। শুধু নাগ নয়, কালনাগ। দুপেয়ে সাপ। তার উদ্যত ফণা ডিঙিয়ে আসা কি সহজ কথা?

তারপর ওদিককার একতলার সেডের খগেন মিত্তির। সে আবার যোগধ্যান করে। করবি তো কর ঘরে বসে কর। তা নয়, ঘরের বাইরে এজমালি গেটের কাছে আম গাছটার তলায় চেয়ার পেতে বসে থাকে। চোখ বুজে শিরদাঁড়া খাড়া করে। সত্যিকার হলে ভাবনা ছিল না, টের পেত না কিছু। ভণ্ড বলেই ভয়। চোখ চেয়ে দেখে ফেলবে ঠিক সময়।

বৃষ্টিতে উপকার করেছে। যোগীবর ঘরে গেছেন। কিন্তু নাগমশায়ের খড়খড়িটির কি দশা কে জানে। কে জানে বড়ি খেয়ে কেমন আছে বিমলা! কে জানে তার মা কোথায়!

ভুল করে না ইচ্ছে করে নিজেই বড়ি খেয়ে ফেলেছে কিনা তার ঠিক কি।

বাধা হয়তো আর কোথাও নয়, বাধা তার মনে। সে আত্মীয় হতে চায়, আপন হতে চায় না। সংহত তুষারপিণ্ড হয়ে থাকবে না সীমাতিক্রান্তা নির্ঝরিণী। এও একরকম অহঙ্কার। আমি পবিত্র, আমি অব্যাহত, আমি অপ্রমত্ত এই অহঙ্কার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ভবদেব। বি-এন-আরের রাত্রের ট্রেনটাও চলে গেল এতক্ষণে। আর কি। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল এক গ্লাস। এবার পরাভূত শয্যায় গিয়ে লজ্জিত ঘুমটুকু সেরেনি।

ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক।

হৃৎপিণ্ড শব্দ করে উঠল নাকি? রুদ্ধ-দ্বার দেবমন্দিরে কি আপনা থেকেই ঘণ্টা বেজে উঠল?

ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক।

কোন দিকের দরজা? ভিতর বারান্দার, না, বাহির বারান্দার? কোন্ সিঁড়ি দিয়ে নামল? বিমলা কি ঘুমিয়েছে? তার মার আর কল আসেনি? নাগমশায়ের খড়খড়ি কি বুজে গেছে? ছাড়া চেয়ারে আবার এসে বসেনি তো যোগীবর?

ও কি, কতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে? দরজা বন্ধ দেখে ও আবার ফিরে যাবে নাকি?

খুট করে ছিটকিনি টানল ভবদেব। দরজাটা একটু ফাঁক করল। সুট করে ঢুকে পড়ল ক্ষণিকা। নিয়তির পরিহাস নয়, সত্যি-সত্যি ক্ষণিকা।

কাঁপছে, লতার মত কাঁপছে। যত ঠাণ্ডায় নয় তত ভয়ে। যত উচ্ছ্বাসে নয় তত উৎকণ্ঠায়। শুধু বললে, অস্ফুট নম্রস্বরে বললে, আমি এসেছি।

মাধুর্যসিন্ধুর দুটি তরঙ্গের মত মনে হল শব্দ দুটোকে। আমি এসেছি। হে গুহাহিত গোপন পুরুষ, আমি এসেছি। হে আকর্ষী বংশী, আমি শুনেছি তোমার ডাক, চিনেছি তোমার পথ। তুমি এবার আমাকে ধরো, আমাকে নাও, আমাকে ভাঙো। আমাকে শূন্য করে পূর্ণ করো।

কি করবে কিছু বুঝে উঠতে পারল না ভবদেব। হাত ধরে টেনে আনল না কাছে, বসতে বলল না বিছানায়, কি আশ্চর্য, দরজার ছিটকিনি লাগাতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে।

ইলেকট্রিক লাইট নয়, মোমবাতি জ্বালাল ভবদেব। স্নিগ্ধ আলোতে দেখল ক্ষণিকার ক্ষণকরুণ মুখখানি। ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনীর মুখ।

বললে, 'তুমি এসেছ। এর উত্তরে আমি কী বলতে পারি? বলতে পারি, আমি আছি। একজন আছে, আরেকজন আসে। এ আছে বলেই তো সে আসে। আর সে আসবে বলেই তো এ বসে আছে অন্ধকারে। তাই নয়?'

অদ্ভুত সুন্দর করে হাসল ক্ষণিকা।

'তোমাকে কী দিই বলো তো?' পরি-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ভবদেব। খোলা জানলা দিয়ে হাত বাড়াতেই পেল সেই গোলাপ গাছ। বৃন্তাশ্রয়ে বিহ্বল একটি গোলাপ জেগে আছে। ঘ্রাণে-বর্ণে গদ্গদ হয়ে। শুষ্ক গর্বরূপে নয়, সুধাসরস প্রেমরূপে। নিবেদনের বেদনায় আনন্দময় হয়ে।

সন্তর্পণে ফুলটি ছিঁড়ল ভবদেব। ক্ষণিকার স্তূপীকৃত চুলের মধ্যে গুঁজে দিলে।

দরজা খুলে এগিয়ে দিতে গেল ক্ষণিকাকে।

ক্ষণিকার চোখে জলের ছোঁয়া লেগেছে। ছোঁয়া লেগেছে কণ্ঠস্বরে। আর্তস্বরে বললে, 'এ কি, আপনি চললেন কোথা?'

'বা, সে কি কথা? তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'আপনি?' দেয়ালের পাশে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়াল ক্ষণিকা। ছায়া হয়ে মিশে যেতে চাইল। বললে, 'যদি কেউ দেখে ফেলে, সব বুঝে নেবে।'

'যাতে ভুল না বোঝে তাই তো আমি চাই। বলো কোন্ সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলে? বিমলাকে কটা বড়ি দিয়েছ? নাগমশায়ের খড়খড়ির ফাঁক ন্যাকড়া দিয়ে বন্ধ করেছ নাকি? আর যোগীবরের কি খবর? যোগ-নিদ্রার চেয়ে সুখনিদ্রা অনেক আরামের। যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও গে। কোনো ভয় নেই—'

পরিত্যক্ত বিছানায় এসে শুলো ক্ষণিকা। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

বিশ্বভারতীর আমার এক স্নেহাস্পদ সংস্কৃত অধ্যাপক গত বিজয়াদশমী উপলক্ষ্যে আমাকে প্রণাম জানাইয়া এই সংবাদ দিয়াছিলেন যে, পূজার ছুটির পূর্বে তাঁহারা সেখানে বিদুষাম্ আপরিতোষাৎ... সাধু" করিয়া অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অভিনয় করিয়াছেন, আর সবিনয়ে অনুরোধ করিয়াছেন, "এবার আপনি শাপ উদ্ধার করিবেন!"

এ কার শাপ? কাকে শাপ? কী পাপে? কী কারণে? ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই স্বভাবত উঠে। পাঠকের যদি কৌতুক থাকে, শুনিতে পারেন, আমিও বলিতে পারি।

অনেক দিন হইল, আমি তখন শান্তিনিকেতনে। পূর্ব বৎসর লেবি সাহেব (Sylvain Levi) প্রথম পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে আশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবার (১৯২৮) আসিয়াছিলেন প্রাগ্ হইতে উইণ্টারনিট্‌স সাহেব (Maurice Winternitz)। ইঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার অধ্যাপক লেস্‌নি (V. Lesney)। উইণ্টারনিট্‌স সাহেব তখন শান্তিনিকেতনে ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যান দিতেছিলেন।

ইহা ছাড়া তাঁহার আর একটি কাজ ছিল। এই সময়ে পুণায় ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট মহাভারতের একটি বর্তমান কালোচিত পদ্ধতিতে সংস্করণ করিবার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশীয় পুঁথিগুলি সংগৃহীত করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছিল শান্তিনিকেতনে। উইণ্টারনিট্‌স সাহেব এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এখানে আসিবার পূর্বেই দক্ষিণ ভারতের গ্রন্থ অক্ষরে লিখিত কতক পুঁথির পাঠ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাঁহার শান্তিনিকেতনে আসা স্থির হইলে তাঁহার সাহায্যে এই বিপুল কার্যের সংসৃষ্ট বিবিধ আলোচ্য বিষয় বিচার ও আলোচনা করিয়া স্থির করিবার উদ্দেশ্যে ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে শ্রীযুত নারায়ণ বাপুজি উৎগিকর এম এ মহাশয় কয়েক মাস এখানে বাস করিয়াছিলেন।

বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে পুঁথি হইতে প্রথমে পাঠ সংগ্রহ করিয়া ও সংগৃহীত পাঠসমূহকে যুক্তির দ্বারা গ্রহণ বা বর্জন করা ছিল মুখ্য কার্য। যদিও ইহা খুব শ্রমসাধ্য ও বাহ্যত শুষ্ক বলিয়া প্রতিভাত হইত, তথাপি যাঁহারা ইহা করিতেন, তাঁহারা ইহাতে বিশেষ আনন্দই অনুভব করিতেন।

সেই সময়ে বিদ্যাভবনে আমরা যে কয়জন ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলাম, তাঁহাদের অধিকাংশই একসঙ্গে মিলিয়া এই কাজ করিতাম। এই কাজটি করা হইত বেণুকুঞ্জে। উইণ্টারনিট্‌স সাহেবকে কেন্দ্র করিয়া যতটা সম্ভব এক-এক খানি পুঁথি লইয়া আমরা চারিদিকে বসিতাম, আর বিভিন্ন পাঠ তুলিতাম। পাঠ তুলিয়া প্রত্যেকটি পাঠ বিচার করিতাম। কোন্ পাঠটি কেন বর্জন বা গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যুক্তি দেখাইতে হইত। পুঁথিতে পাওয়া প্রত্যেকটি পাঠ সন্তোষাবহভাবে ব্যাখ্যা করা ছিল কর্তব্য। আমাদের সংস্করণকর্তার তো ইহাই মুখ্য কার্য। এই প্রসঙ্গে আমাদের নিজের মধ্যে যে আলোচনা বা তর্ক হইত, তাহা খুব মনোরম ছিল।

এস্থানে একটা কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের সেই সময়ের কাজটার শেষে পুণায় প্রতিবেদন পাঠাইবার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিগুলির উল্লেখের জন্য বঙ্গীয় শব্দের বকারটি কিরূপে লিখিত হইবে, অর্থাৎ ইংরাজী হরফে Vangiya, না Bangiya লেখা হইবে। প্রচলিত লিপ্যন্তর করার পদ্ধতি অনুসারে Vangiya লিখিতে হয়, কেননা বঙ্গীয় শব্দের বকারটি অন্তস্থ। অতএব প্রথমে আমরা সকলেই V লেখাই স্থির করিলাম। কিন্তু পরে উইণ্টারনিট্‌স সাহেব বলিলেন, আচ্ছা, দেখা যাউক, সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষেরা নিজে কী লেখেন, V না B? দেখা গেল ইঁহারা লেখেন B। তখন ইহাই লেখা বলিয়া স্থির হয়। তাহা হইলেও ইহা উল্লেখ্য যে, ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে যখন ছাপা পুস্তক বাহির হইল, তখন দেখা গেল, তাহাতে ঐ শব্দটি V দিয়াই লিখিত হইয়াছে।

'ভাল, কিন্তু ইহাতে শাপের কি?'

সেইটাই তো বলিতে যাইতেছি। অধ্যাপক উইণ্টারনিট্‌স এখানে যে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা শেষ হইয়া আসিল। তিনি দেশে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহার বিদায়-সংবর্ধনার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। স্থির হইল, উত্তর রামচরিতের তৃতীয় অঙ্ক অভিনয় করা হইবে। গুরুদেবকেও ইহা জানান হইল। আমাদের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল। নন্দবাবু যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন, যাঁহারা চাহিতেন না যে, পুরুষেরা মেয়েদের পাঠ করে। তথাপি এ বিষয়ে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। যদিও কাহারও কাহারও মনটা ইহাতে সুপ্রসন্ন হয় নাই। যাহাই হউক, অভিনয় হইয়া গেল এবং ইহা 'অখাদ্য' হয় নাই। অধ্যাপক উইণ্টারনিট্‌স সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

তথাপি এই অভিনয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল যে, গুরুদেব ও দিনুবাবু[১] প্রমুখ কয়জন আসেন নাই—যাঁহারা আসিবেন বলিয়া অনেকের সঙ্গে আমি আশা করিতেছিলাম, শেষ পর্যন্ত গুরুদেব আসিবেনই না, ইহা আমি ভাবিতেই পারি নাই। যাহাই হউক, সত্য কথা বলিতে, আমি ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিলাম।

পরদিন বৈকালে গুরুদেবের কাছে গেলাম। আমি যে তখন যাইব ইহাতে গুরুদেব নিশ্চিতই ছিলেন। আমার মুখের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়াই তাঁহার আমার চিত্তবৃত্তি বুঝিতে বিলম্ব হইল না। প্রণাম করিয়া একটু উত্তেজিতভাবেই বলিলাম "গুরুদেব, আপনার নন্দীভৃঙ্গীরা কখন আসিয়া কী বলে, আর আপনি তাহাই বিশ্বাস করেন! কালকার অভিনয়ে এমন কী দোষ হইয়াছিল যে, আপনি উপস্থিতই হইলেন না?"

এই সময়ে বাণভট্টের হর্ষচরিতে বর্ণিত সরস্বতীর প্রতি দুর্বাসার শাপের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি বলিয়া

---

১ স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফেলিলাম, "আমি শাপ দিতেছি এই আশ্রমে সংস্কৃতের বৃদ্ধি হইবে না!"

গুরুদেব তৎকালোচিত কথায় আমার ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার ফল হইতে কিছু বিলম্ব হইলেও উহা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আশ্রমে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সকলেই ঐ কথাটা শুনিয়াছিলেন।

এখানে একটা কথা বলিবার আছে। হর্ষচরিতে সরস্বতীর শাপের কথাটা সংক্ষেপে এইরূপঃ—শুনা যায় পুরাকালে কোন এক সময়ে ভগবান ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে এক অতিবৃহৎ সভার মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার চারিদিকে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, মনু-দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও সপ্তর্ষি প্রমুখ মহর্ষিগণ রহিয়াছেন। সেখানে তাঁহাদের নানাবিষয়ে নানাবিধ কথাবার্তা তর্ক-বিচার বাদ-বিসংবাদ হইতেছে। আবার কেহ কেহ বিভিন্ন বেদ পাঠ করিতেছেন। ক্রমশ তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাবিবাদ উপস্থিত হইল। সেখানে ছিলেন প্রকৃতিকোপন মহাতপা মুনি দুর্বাসা। তাঁহার সঙ্গে মুনি মন্দপালের কলহ উৎপন্ন হয়। দুর্বাসা ক্রোধান্ধ হইয়া বিকৃত স্বরে সাম গান করিয়া ফেলেন। শাপের ভয়ে যখন অন্য সকলেই চুপ করিয়া থাকিলেন, আর স্বয়ং ব্রহ্মাও অন্যের সহিত আলাপ করার ছলে দুর্বাসাকে তিরস্কার করিলেন, তখন সরস্বতী মৃদু-মন্দ হাস্য করিলেন। তিনি সেই সময়ে চামর ধারণ করিয়া ব্রহ্মাকে বাতাস করিতেছিলেন। দুর্বাসা ইহা দেখিয়াই "আঃ কুপণ্ডিতে, বিদ্যায় তুমি গর্বিত হইয়াছ! আমাকেও তুমি উপহাস কর! যাও, তুমি মর্ত্য-লোকে!" এই বলিয়া তিনি শাপ-জল ত্যাগ করিলেন। ক্ষিপ্ত বাণকে যেমন সংহরণ করা যায় না, তেমনি শাপ একবার দিলে তাহা ঠেকান যায় না।

কিন্তু তাহা যাহাই হউক, দুর্বাসার সরস্বতীকে শাপ দেওয়ার সঙ্গে আমার শাপ দেওয়ার সম্বন্ধটা কী? সাদৃশ্যই বা কী? দুর্বাসার শাপ দেওয়ায় যাহাই হউক সরস্বতীর কিছু অপরাধ ছিল, সরস্বতী দুর্বাসাকে অশিষ্টভাবে উপহাস করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি এখানে সরস্বতীকে শাপ দিলাম কেন? সরস্বতীর অপরাধ কী? অপরাধ করিল একজন, আর দণ্ড পাইল অন্য জন। চমৎকার বিচার। কিন্তু আমি কি সত্য সত্যই শাপ দিয়াছিলাম? মনে হইল ঃ

"অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে—ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল? সে যে মিথ্যা কতদূর।
তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর।
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা।
শোনোনি কি জননীর অন্তরের কথা।"

মনে পড়ে গেল ইংরাজী ১৯৪০ সালের কথা। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গুরুদেবকে ডি লিট উপাধি দিবেন, স্থির হইয়াছে। স্যার মরিস গয়ের সাহেব (Sir Maurice Gwyer) দিল্লী হইতে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে শান্তিনিকেতনে আসিয়া ঐ উপাধি প্রদান করিবেন, স্থির হইয়া গিয়াছে। ইহাও স্থির আছে যে চিরাচরিত প্রথানুসারে গয়ের সাহেব ঐ উপলক্ষ্যে লাতিনে ভাষণ করিবেন। গুরুদেব আমাকে এই বিবরণটি জানাইয়া লিখিলেন যে, উপাধি প্রদানে অকস্‌ফোর্ডের প্রতিনিধি নিজেদের আচার অনুসারে যখন লাতিনে ভাষণ দিবেন, তখন আমরা আমাদের পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃতে উত্তর দিব, অন্য আর কোন ভাষাতেই নহে। অতএব আমি যেন তাঁহার প্রত্যুত্তররূপে একটি সংস্কৃত লেখা রচনা করিয়া তাহা লইয়া অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে আসি। মূল লেখাটা তিনি ইংরেজীতে লিখিয়া তাহার এক খণ্ড আমাকে পাঠাইয়া দেন। আমি তাহা সংস্কৃতে পরিবর্তন করিয়া যথাসময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম।

সিংহসদনের বৃহৎশালায় উপাধিদান-সভা বসিয়াছে। সদস্যগণ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তদুচিত আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সভায় উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছিল। অকস্‌ফোর্ড ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কতিপয় সদস্যের বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল পরিচ্ছদের সৌন্দর্য আমার মনে পালি সাহিত্যের "ইসিবাতং পবাতেসি" এই কথাটা মনে করাইয়া দিয়াছিল।১ গয়ের সাহেব উপাধি দান করিয়া লাতিন ভাষায় অভি-ভাষণ করিলেন, আর গুরুদেব নিজের উত্তর প্রদান করিলেন, সংস্কৃত ভাষায়। সবই হইয়াছিল সর্বাঙ্গসুন্দর।

ইহাতে বুঝা যাইবে সংস্কৃতের প্রতি আমার শাপ সত্য সত্যই ছিল না। অন্যথা তখন সেখানে সংস্কৃতের সেই গৌরব থাকিবার কথা নহে।

কিছু কাল পরেই অন্য একটা ঘটনা হইল। চীনের সংস্কৃতি-প্রতিপুরুষগণ ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা শান্তি-নিকেতনেও আসেন। বলা বাহুল্য, সেখানে তাঁহাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে যে অভ্যর্থনা করা হয়, তাহা চীনা ভাষায়, সংস্কৃতে নহে। অপর পক্ষে চীনের প্রতিপুরুষগণ নিজেদের চীন ভাষাতেই উত্তর দিয়াছিলেন।২

মনে বড় লাগিল। আর গুরুদেবের পূর্বোক্ত ঘটনাটি স্মৃতিপথে উদিত হইল। তাঁহার তিরোভাবের এত অল্পকালের মধ্যে তাঁহার ঐ আদর্শ এত নিম্ন হইয়া গিয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে হইল হা শান্তি-নিকেতন-সংস্কৃত-সরস্বতি এবমবজ্ঞাতাসি। হন্ত ভোঃ, অবজ্ঞাতায়াং ত্বয়ি সর্বমেবাবজ্ঞাতং ভারতীয়ম্।

তবে কি আমি সরস্বতীর প্রতি সত্য সত্যই শাপ দিয়াছিলাম! আমি কি ক্ষণেকের জন্য বাক্‌সিদ্ধ হইয়াছিলাম, যাহা বলিতাম তাহাই ফলিত।

দৈবের কী দুর্বিপাক। কিছু দিনের মধ্যে আরো কিছু ঘটিল। পূর্বে একবার বলিয়াছিলাম, আবার আজ বলিতে হইতেছে। কথাটা এই যে,বিপদ্ সম্পদের আকারে দেখা দিতেছে। বিশ্বভারতীর পাকাপোক্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয় হইবার বেশী দিন হয় নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে সেখানে কোন কোন বিষয়ে চেয়ার বা বিশিষ্ট অধ্যাপক-আসনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভাল কথা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সংস্কৃতের নাম দেখা যায় না, যদিও হিন্দীর হইয়াছে। আমি কি ঘুমাইতেছি? সংস্কৃতের কথা মনে করিয়া কেবলই মনে হইতেছে—হা শান্তিনিকেতন-সংস্কৃত-সরস্বতি কিমেতদা-পতিতং তে। ভগবতি ভবিতব্যতে, পূর্ণাস্তে মনোরথাঃ। দেবি আশ্রমদেবতে, এতদপি তে দ্রষ্টব্যমাসীৎ। অথবা অলমতিবহুনা।

"স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য।"

"ব্রহ্ম বিহার,"
৩১শে আশ্বিন, ১৩৫৯

১। ইহার তাৎপর্য এই যে, ভিক্ষুগণ নিজে-দের পীতরঞ্জিত চীবরের দ্বারা ঋষিদের বাতাস প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

২। এখানে একটা কথা বলা যাইতে পারে। অনেকেরই মনে হইবে, কিছুদিন হইল এখানে (কলিকাতায়) "চী ন - ভা র ত সং স্কৃ তি" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে চীনা ছাত্রগণকে কোন কোন ভারতীয় ভাষা এবং ভারতীয় ছাত্রগণকে চীনা ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্বোল্লিখিত চীন প্রতিনিধি পুরুষগণ পরিদর্শনের জন্য এই সমিতিতেও আমন্ত্রিত হইয়া শুভাগমন করেন। তাঁহাদিগকে এখানে সংস্কৃত ভাষাতেই অভ্যর্থনা করা হয়, আর তাঁহারা উত্তর দেন নিজেদের চীনা ভাষায়। সেই সময়ে সমিতির অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা চীন ভাষায় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয় করে। আমাদের অতিথিগণ ইহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

॥ রানীপসন্দ ॥ অন্নদাশঙ্কর রায় ॥

লঞ্চ পাওয়া গেল অনেক দিনের অপেক্ষায়। কয়েকটি পরিদর্শনের কাজ বাকী ছিল। বছর শেষ হবার আগে ইনস্পেকশন শেষ হওয়া চাই। দুধারে নদীতীরের দৃশ্য সামনে রাঙামাটি অঞ্চলের পাহাড়ের সারি কর্ণফুলীর বুকে লঞ্চ ভাসিয়ে দিতে না জানি কেমন রোমান্টিক লাগে। সঙ্গে কাগজ কলম নিয়েছিলুম। বহু কাল পরে কবিতা লিখব। সহযাত্রী বলতে সারেঙ, সুখানি ও তাদের দলবল· আর আমার চাপরাশি খানসামা। তাদের উপর কড়া হুকুম ছিল কেউ যেন আমার কাছে না ঘেঁষে।

ডেক চেয়ারে বসে নোঙর তোলা দেখছি, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন দারোগা সাহেব। হাতে একখানা চিঠি। কী ব্যাপার। আবার কোথায় কী বাধল! আমাকে কি এরা স্টেশন ছাড়তে দেবে না। চিঠিখানা খুলে দেখা গেল, তা নয়। কলকাতা থেকে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী এসেছেন। তাঁকেও যেতে হবে রাউজান। তিনি যদি আমার সঙ্গে যান, তাহলে কি আমার খুব বেশী অসুবিধা হবে? নয়তো তাঁকে একদিন চট্টগ্রামে বসে থাকতে হয়। পুলিশের লঞ্চ কাল ফেরবার কথা আছে।

অসুবিধা হবেই তো। কিন্তু সে কথা কি লেখনীর মুখে জানানো যায়! হয়ে গেল আমার কবিতা লেখা। মনে মনে বাপান্ত করলুম· আর দেঁতো হাসি হেসে বললুম, "সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।" দারোগা সাহেব গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি ঠুকে লম্বাচওড়া সেলাম করলেন। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, আপত্তি করলে এমন কী অভদ্রতা হতো! এমন কী জরুরি কাজ যে লঞ্চের জন্যে একদিন বসে থাকলে অপূরণীয় ক্ষতি হবে!

শিষ্টাচারে খান বাহাদুরের জুড়ি মেলে না। তিনি কী বলে যে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবেন বাংলাভাষায় শব্দ খুঁজে পেলেন না। ইংরেজী ও উর্দুর আশ্রয় নিলেন। পাঞ্জাবী মুসলমান। বয়সে অনেক বড়। গোঁফ দাড়ি রাখেন না বলে কতকটা কমবয়সীর মতো দেখায়। হাসিখুশি দিলদরিয়া মেজাজের লোক। ইতিমধ্যেই খবর নিয়ে জেনেছেন যে, আমি একজন সাহিত্যিক। বললেন—"আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আমার অনেক দিনের সাধ। সে আলাপ যে এই ভাবে হবে তা কে জানত! সত্যি, আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না আপনার নির্জনতা ভঙ্গ করতে। আমি তো একদিন বসে থাকতেই চেয়েছিলুম, কিন্তু এস পি আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিল আপনার সঙ্গে লঞ্চে। শুনেছেন বোধ হয় খবরটা?"

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললুম, "কই, না! কোন খবর?"

"খুব খারাপ খবর।" ভদ্রলোক আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "তা নইলে, মশায়, ট্রাঙ্ক কল পেয়ে সোজা কলকাতা থেকে ছুটে আসি? আরে ছি ছি! শেমফুল! বেশরম!"

আমি রীতিমত উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম। কিন্তু জানতুম খান বাহাদুর আপনা থেকেই বলবেন, ভাণ করলুম যেন পরের কেচ্ছায় আমার কিছুমাত্র রুচি নাই।

"আপনারা সাহিত্যিক, আপনারা কথায় কথায় বলেন, সত্য শিব সুন্দর। কিন্তু আমার এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের অভিজ্ঞতা বলছে, যা সত্য তা সুন্দর নয়, যা সুন্দর তা শিব নয়। আমি যদি কোনো দিন কেতাব লিখি আমি কী লিখব, শুনবেন? লিখব, সুন্দর মেয়েরা প্রায়ই মন্দ হয়, মন্দ মেয়েরা প্রায়ই সুন্দর হয়।" এই বলে খান্ বাহাদুর হো হো করে হেসে উঠলেন।

হাসলুম আমিও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বললুম, "আমাদের বাংলা দেশে নয় কিন্তু।"

ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করে বললেন, "না বাংলা দেশে নয়! বাংলাদেশে কাজ করতে করতে চুল পেকে গেল, দাদা! আর এই যে রাইজান যাচ্ছি—"

"রাউজান।"

"রাউজান যাচ্ছি এটা কি বাংলাদেশের বাইরে!"

আলাপ দেখতে দেখতে জমে উঠল। আমি আমার খানসামাকে ডেকে পাঠাতেই তিনি বলে উঠলেন, "আরে না, না, দাদা। আপনি আমার মেহমান।"

কেমন করে আমি তাঁর মেহমান হলুম! লঞ্চ তো আমার বলতে গেলে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! বিকেলের চা'র অর্ডার তিনিই দিলেন। লঞ্চ ততক্ষণে সদরঘাট ছেড়ে দিয়েছে।

পাশাপাশি দু'খানা ডেক চেয়ার পেতে পাহাড়ের দিকে মুখ করে আমরা জাঁকিয়ে বসলুম। খান্ বাহাদুর বলতে লাগলেন, "যে সে লোক নয়, দাদা। একটা সার্কলের ইন্‌স্পেক্টার। এক কালে আমি ওর এস পি ছিলুম। ওর কাজ দেখে তারিফ করেছি। প্রোমোশনের জন্যে সুপারিশ করেছি। মাথাপাগলা নয়, কবি নয়,—মাফ করবেন বেআদবি। সচ্চরিত্র বলে সুনামও ছিল ওর। এমন মানুষ কিনা চাকরির মায়া কাটিয়ে ছেলেমেয়ের দিকে না তাকিয়ে— বিবি নেই, নইলে আরো আফসোসের বাত হতো—এমন মানুষ কিনা হঠাৎ উধাও হলো।"

"উধাও হলো" আমি চমকে উঠলুম।

"আর বলেন কেন লজ্জার কথা!" খান্ বাহাদুর রেশমী রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন, চোখ মুছলেন। "গিয়েছিল খুনী মামলার তদন্ত করতে। বর্মী মেয়ে, মশায়। শয়তানকী লড়কী। তোরা বাঙালী মুসলমান, তোদের বরাতে সইবে কেন! বিয়ে করে এনেছিল রেঙ্গুন থেকে। যে লোকটা খুন হয়েছে তার কথা বলছি। অমন রূপসী নাকি বর্মাতেও নেই। সতীন আছে দেখে অমনি খসমের গলায় ছুরি দিয়েছে।"

আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলুম। কই, এ মামলার খবর তো আমার কাছে আসেনি!

"যা বলছিলুম। গিয়েছিল তদন্ত করতে। দারোগাই করছিল তদন্ত। তবে মেয়েটা বাংলা বোঝে না বলে ইন্‌স্পেক্টারকেও যেতে হয়েছিল। ওই তদন্তই ওর কাল হলো। এক দিন যায়, দু'দিন যায়, তদন্ত আর ফুরোয় না। শেষ কাণ্ডে দেখা গেল আসামীও নেই, অফিসারও নেই। হো হো! হা হা!"

হাসির কথা নয়। নারীহরণের মামলায় আমি কোনো দিন কাউকে ছাড়িনি। আমি বেশ একটু উষ্ণ হয়ে বললুম, "এত দিন আপনারা করছেন কী? কেন ওকে গ্রেপ্তার করা হয়নি? এ শুধু ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার নয়। কোর্টের ব্যাপারও বটে।"

খান্ বাহাদুর একটু কঠিন হয়ে বললেন, "কোর্টের ব্যাপার কি না সেইটেই তো প্রশ্ন। মেয়েটা বিধবা, সুতরাং ফুসলানির অভিযোগ টেকে না। মেয়েটার বয়স হয়েছে, সুতরাং হরণের অভিযোগ খাটে না। কোন ধারায় আপনি ওকে অপরাধী করবেন, শুনি?"

আমি নিরুত্তর। তিনি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, "তার পর যদি ওরা বিয়ে করে থাকে? না, দাদা, অত সহজ নয়। চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে সকলে পারে, কলকাতার পুলিশ দপ্তর থেকে সে ব্যবস্থা হবে। কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে আপনার হাত নিসপিস করলেও তার আগে আইনটা একটু মন দিয়ে পড়া লাগবে।"

সত্যি তাই। বড় মাছটা ছিপ থেকে ফস্কে গেলে যেমন কষ্ট হয়, তেমনি কষ্ট হলো আমার। খান্ বাহাদুর কিন্তু এর জন্যে দুঃখিত নন। বললেন, "শুনছি ওরা পার্বত্য চট্টগ্রামে গা ঢাকা দিয়েছে। সেখান থেকে বর্মা চলে যাবে হাঁটা পথে। তারপর ক'দিন রূপসীর অনুগ্রহ থাকবে কে জানে। লোকটাকে বাঁদর নাচিয়ে একদিন জবে করবে কি লাথি মারবে খোদা জানেন। সুন্দর মুখ দেখলে আমি দূর থেকে সেলাম করে সরে পড়ি।"

আইনের বই আমার সঙ্গে ছিল না। সেইজন্যে জোর করে বলতে পারছিলুম না যে আসামীকে যদি কেউ ফেরার হতে সাহায্য করে আইনে তার সাজা আছে। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিলুম, তা লক্ষ করে ভদ্রলোক বললেন, "যে দিনকাল পড়েছে আপনি হয়তো ভাবছেন আমি পুলিশ বলে পুলিশের জন্যে আমার দরদ, আমি মুসলমান বলে মুসলমানের জন্যে আমার দরদ। সত্যি বলছি, তা নয়। আমি পুরুষ বলে আমার দরদ পুরুষের জন্যে। মেয়েটাই নরহরণ করেছে।"

এ কথা শুনে আমার ভিতরে যে ফেমিনিস্ট ছিল, সে প্রতিবাদ না করে পারল না। সে বলল, "যার মধ্যে বিন্দুমাত্র শিভ্যালরি আছে সে কখনো নারীকে দোষ দিতে পারে না। দোষ সব সময় পুরুষের। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারুর নয়। নিয়তির।"

"হাঁ, হাঁ। এ বাত ঠিক। নিয়তির।" খান বাহাদুর প্রীত হয়ে বললেন, "ঠিক এই রকম নিয়তির খেলা দেখেছি আমার প্রথম যৌবনে। আমার এক বন্ধুর জীবনে। বন্ধুটি হিন্দু। আপনি হয়তো মনে করবেন, এ কী কথা! হিন্দু কবে থেকে মুসলমানের বন্ধু হলো? কিন্তু আজকের এই বিশ্রী আবহাওয়া বিশ বছর আগে ছিল না। মহাযুদ্ধের শেষে আমরা দু'জনে যখন মিলিটারি থেকে বেরিয়ে পুলিশের চাকরি পাই, তখন কে হিন্দু কে মুসলমান! আহা, সে সব দিন কি আর ফিরবে না!"

তাঁর কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর। স্মৃতির সরণি বেয়ে তিনি বিশ বছর নিচে নেমে গেলেন, যেখানে সঞ্চিত ছিল পুরাতন মদিরা। অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "ঘটনাটা কতকালের পুরোনো। আমারই মনে ছিল না। হঠাৎ কেমন করে মনে পড়ে গেল। এই যে, বেশ স্পষ্ট মনে পড়েছে। দেখতে দেখতে সব উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।"

তাঁর দিকে চোখ ফেরালুম। তিনি কি সেই মানুষ না আর কেউ! একজন নওজোয়ান অর্ধশয়ান হয়ে স্বপ্ন দেখছে। হুহু করে ছুটে আসছে বাতাস। বাতাসকে ঠেলা দিয়ে ছুটে চলেছে লঞ্চ। জল দু'ভাগ হয়ে চিরে চিরে যাচ্ছে কাটা কাপড়ের মতো। ঢেউ পড়ে থাকছে পিছনে। ঢেউয়ের দোলা লেগে উঠছে ও নামছে পেছিয়ে যাওয়া সাম্পান।

খান্ বাহাদুর বলতে লাগলেন।

২

মেহেরবান সিং রাজপুত ঘরানা। আমার পূর্বপুরুষরাও রাজপুত ছিলেন। যে যাই বলুক, রক্তের টান বলে একটা কিছু আছে। রাজপুতের সঙ্গে আমি যতটা আত্মীয়তা বোধ করি এ দেশের মুসলমানদের সঙ্গেও ততটা নয়। তা বলে হিন্দু ধর্মে আমার বিশ্বাস নেই। ধর্মের বেলা আমি গোঁড়া

মুসলমান। তখন এই সারেঙ সুখানি চাপরাশি খানসামা আমার নিজের লোক। আর মেহেরবান সিং আমার এমনি একজন দোস্ত।

কিন্তু ওর মতো দোস্ত তখনকার দিনে কেউ আমার ছিল না। রোজ আমাদের দেখা হতো। আর দেখা হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত খোশ গল্পে আর দিবাস্বপ্নে। খেলার শখ ছিল দু'জনেরই। শিকারের বাতিকও দু'জনেরই। তখনকার দিনে সিনেমা ছিল না এখনকার মতো। আমাদের যেখানে চাকরি সেখানে মাঝে মাঝে সিনেমা আসত কিছু দিনের জন্যে। সে ক'টা দিন আমরা দু'জনে একসঙ্গে সিনেমায় যেতুম। তামাশা দেখতুম। অন্যান্য অফিসারদের মতো আমরা গান শুনতে বাঈজীর বাড়ী যেতুম না। দু'জনেই ছিলুম পিউরিটান কিসমের লোক। ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছিল, আমার বিবি তখন বাপের বাড়ীতে। ও চায় শিক্ষিতা মেয়ে। তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না।

এখন হয়েছে কি, পাঞ্জাবের ঐ ক্যান্টনমেন্ট শহরটিতে এক মিলিটারি কণ্টাক্টর ছিল, তার অনেক লাখ টাকা। আমরা যখন সেখানে যাই, তখন সে মারা গেছে। তার সম্পত্তির অর্ধেক পড়েছে তার বড় বৌয়ের হিস্সায়, অর্ধেক তার ছোট বৌয়ের হিস্সায়। বড় বৌ থাকে ঠাকুর দেবতা নিয়ে। আর ছোট বৌ থাকে আমোদ প্রমোদ নিয়ে। দু'জনের একজনেরও বালবাচ্চা হয়নি। যে যার নিজের মহলে থাকে। নিজের দাসদাসী, নিজের গাড়ীজুড়ি। বিলকুল আলাদা বন্দোবস্ত। লোকে বলত বড় রাণী ছোট রাণী, কারণ স্বামীর রাজা খেতাব ছিল।

আমরা যখন সেখানে যাই তখন সকলের মুখে শুনি সুরযভান যেমন সুন্দরী তেমন সুন্দরী কেউ কোথাও দেখেনি। কিন্তু সুন্দরী হলে হবে কী, তার চালচলন তেমন ভালো নয়। সে পর্দা মানবে না। ক্লাবে যাবে। সাহেবদের সাথে নাচবে। স্টেশনের যত অফিসার সবাইকে ডেকে পার্টি দেবে। কেউ তাকে দু'বার একই শাড়ী পরতে দেখেছে বলে শোনা যায় না। তার জুতো কমসে কম দু' পাঁচশো জোড়া হবে। সে নাকি দুধের সর মাখে আর দুধের হাউজে গোসল করে। আর সেই দুধ নাকি পরে বাজারে বিক্রী হয়।

জোর গুজব সে যাকে একবার নেক্ নজরে দেখবে তার কোনো কামনা অতৃপ্ত রাখবে না। সে যেই হোক্ না কেন। তার কাছে জাতের বিচার নেই, ধর্মের বিচার নেই, সে ধন চায় না, উপহার চায় না। কেবল তার পছন্দ হলে হলো। পছন্দ কিন্তু সহজে হয় না।

জয়েন করার দু'তিন সপ্তাহ পরে আমার নামেও সুরযভানের নিমন্ত্রণপত্র এলো। গার্ডেন পার্টির নিমন্ত্রণ। মেহেরবানকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলুম তার নামেও এসেছে। কিন্তু সে যাবে না। কেন যাবে না? কারণ, সে অমন স্ত্রীলোকের সংস্রব রাখতে চায় না।

আমি রসিকতা করে বললুম, "এক জাতের আম আছে, তার নাম রানীপসন্দ্। তোমার ইচ্ছা করে না রানীপসন্দ্ হতে?"

"আমি তো আম নই। আমার আত্ম-সম্মান আছে। চিরকাল পছন্দ করে এসেছে পুরুষ। পছন্দের অধিকার পুরুষের। এ ক্ষেত্রে তা নয়। সুরয ভান আমাকে চোখ দিয়ে যাচাই করবে! আর চাইকি আমাকে নাপছন্দ করবে!" বলতে বলতে তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

"কেন? স্বয়ংবর তো রাজপুত্তদেরই প্রথা।"

"হাঁ, কিন্তু স্বয়ংবরে যারা নাপছন্দ হতো তারা লড়াই করে কেড়ে নিত। তা ছাড়া কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! কোথায় কুমারীর স্বয়ংবর আর কোথায় বিলাসিনীর লীলামৃগয়া!"

মেহেরবানকে আর এ নিয়ে উত্যক্ত করলুম না। আমি একাই গেলুম। সুন্দরী বটে সুরযভান। কী করে তার বর্ণনা দেব! আমি তো আপনার মতো কবি নই। অন্ধকার রাত্রে আতসবাজি ছাড়লে যেমন আসমান উজালা হয়, নানা রঙের তারা ফুটে ওঠে, ক্ষণকালের জন্যে ভুলে যাই যে যা দেখছি তা বারুদ গন্ধক সোরা ইত্যাদির খেল, তেমনি বহুজনের মেলায় সুরযভানের উদয়। প্রত্যেকেই বেশ কিছুটা আত্ম-সচেতন হলো। আয়না থাকলে আয়নায় মুখ দেখে নিত। কে জানে মুখখানা রানীপসন্দ্ কি না!

তারপর যতবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি তত-বার গেছি। রানীপসন্দ হতে নয়। এমনি আতশবাজি দেখতে। কিন্তু মুশকিল হলো মেহেরবানকে নিয়ে। সে না পারে যেতে, না পারে থাকতে, না পারে বদলি হয়ে পালাতে। তার গর্ব তাকে যেতে দেয় না। তার কৌতূহল তাকে থাকতে দেয় না। তার কর্তব্যবোধ তাকে পালাতে দেয় না। আমি বুঝতে পারি সে ছটফট করছে। তাকে বলি, "তুমি ছুটি নিয়ে বাড়ি যাও। সাদী করো।" সে চুপ করে শোনে। উত্তর দেয় না।

একদিন সুরযভান আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, মেহেরবান সিং আপনার বন্ধু না? তিনি কেন আসেন না? আপনি তাঁকে নিয়ে আসতে পারেন না?"

আমি কোনো মতে পাশ কাটিয়ে যাই। সত্যি কথা বলি কী করে? সদা সত্য কথা বলিও, পাঠ্যপুস্তকেই শোভা পায়। কিন্তু ফিরে গিয়ে মেহেরবানকে খুলে বললুম। সে ও কথা শুনে কেমন যেন দিশাহারা বোধ করল। খুশি হবে, না রাগ করবে, না কী করবে বুঝতে পারল না। আমাকে ফেলে বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

পরের বার সুরযভানের পার্টিতে দেখি মেহেরবান হাজির। আমিই পরিচয় করিয়ে দিলুম। আয়না কোথায় পাব? থাকলে একখানা এনে দিতুম। তবে তার দরকার হলো না। সুরযভানের চোখই তো আয়না। সেই সুন্দর কালো চোখে মেহেরবান দেখতে পেলো তার নিজের আরক্ত মুখ। লজ্জায় আরক্ত। এক দু' সেকেণ্ডের মধ্যে কত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। কেউ টের পেলো না। আমি ছাড়া।

মেহেরবানকে আমি ক্ষ্যাপাতে চেয়ে-ছিলুম, কিন্তু সাহস হয়নি। তার চেহারা দেখে পেছপাও হয়েছি। সে কলের মতো কাজ করে যায়। ডিউটি বাজিয়ে যায় সমানে। আমার সঙ্গে মেলামেশারও বিরাম নেই। তবু ভিতরে ভিতরে বদলে যেতে থাকে। আপনা থেকে আমাকে যদি কিছু বলে তো শুনি। গায়ে পড়ে আমি কিছু বলিনে।

তার সর্বশরীর উন্মুখ হয়ে রয়েছে একজনের জন্যে। সমস্ত মন পড়ে আছে ওর কাছে। অথচ স্বীকার করবে না। মুখে বলবে অন্য কথা। বলবে, "আমি ওকে ঘৃণা করি। ওর অঙ্গ দূষিত। ওর সঙ্গ দূষিত। ওটা একটা গণিকা ভিন্ন আর কী। টাকা নেয় না, এই যা তফাৎ। আমার যদি খেয়াল হয় আমি সরাসরি কোনো এক গণিকার কাছে যাব। সেখানে আমার পছন্দ খাটবে। আমি দাম দিয়ে ভোগ করব। কিসের দুঃখে সুরযভানের স্বারস্থ হব! হলে যে সে-ই আমাকে পছন্দ করবে, সে-ই দাম দিয়ে ভোগ করবে। আমি কি রানীপসন্দ্?"

এমনি কত লেকচারই না শুনতে হতো আমাকে দিনের পর দিন। তার ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। আমার কাছে কবুল করবে না যে সে আকৃষ্ট হয়েছে। আমি বুঝি সবই, কিন্তু জানতে দিই না যে আমি বুঝি। আমি বলি, "কেউ তোমাকে যেতে সাধছে না। তুমি না গেলে যে কেউ কিছু মনে করবে তাও নয়। সুরযভান যেমন সবাইকে নিমন্ত্রণ করে তেমনি তোমাকেও করে। কাকে ওর পছন্দ কাকে নয় তা কি ও

প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দেয়? ওসব ইশারায় ঠিক হয়ে যায়। অনেক রাত্রে কোনো এক সংকেতস্থলে ওর গাড়ী এসে দাঁড়ায়। কোনো একজনকে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়। কেউ লক্ষ্য করে কি না সন্দেহ। তার পর ফিরিয়ে দিয়ে যায় আরেক জায়গায়।"

"পাজি মেয়েমানুষ! বদমায়েস মেয়েমানুষ!" মেহেরবান তেতে উঠে গালাগাল দেয়। "ডাকু মেয়েমানুষ! শয়তান মেয়েমানুষ!" আর যা যা বলে তা অশ্রাব্য অশ্লীল।

আমি প্রতিবাদ করি, "তোমার তো কোনো লোকসান করেনি। তুমি কেন ইতর ভাষায় আক্রমণ করছ? এটা কেমন ধারা সভ্যতা?"

কয়েকদিন পরে মেহেরবান বলে, "সেদিন যে বলছিলে সব ঠারে ঠোরে ঠিক হয়ে যায়, কী ঠার? বাজারে একখানা চটি বই পাওয়া যায়। তাতে একরকম ঠার আছে।"

আমি বলি, "তোমার তাতে কাজ কী? তুমি তো যাচ্ছ না। না যাচ্ছ?"

"আমি যাব ঐ খানকিটার বাড়ি! অসম্ভব। আমার নাম মেহেরবান সিং। আমরা চৌহান রাজপুত। অবস্থার ফেরে পুলিশের চাকরি করতে হচ্ছে। তা বলে কি আমাকে অধঃপাতে যেতে হবে! শেষকালে তুমিও আমাকে ভুল বুঝলে! তুমি রাঠোর বংশধর!"

কী আর করি! চুপ করে শুনে যাই। লোকটা দিন দিন বাউরা হয়ে উঠছে। যা করতে তার প্রাণ চায় তা করলে তার মান যায়। আর কী দুর্বার আকর্ষণ ওই সুন্দরী নারীর! ঐ মন্দ নারীর! ও যাকে কামনা করবে তাকে পাবেই। চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যাবে লোহাকে।

আমার বরাত ভালো আমাকে চায়নি। কিন্তু মেহেরবানকে যেন টোনা করেছে। বশীকরণ বলে একটা বিদ্যা আছে, তা আগে বিশ্বাস করতুম না। ক্রমে প্রত্যয় হলো। মেহেরবান আমার পাশের বাসায় থাকত। তার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখলুম। রাত দশটায় বেরিয়ে যায়। শেষ রাত্রে ফেরে। উস্কোখুস্কো চেহারা। পাগলের মতো চাউনি। কথাবার্তার বাঁধুনি নেই। কী যে বলে যায় আবোল তাবোল! বুঝতে পারি কেবল অশ্লীল শব্দগুলো। ঝুড়ি ঝুড়ি অশ্লীল কথা। হিসাব করে দেখি দিন দিন বাড়ছে তাদের সংখ্যা।

ইচ্ছা করে ওর বাড়িতে খবর দিয়ে গুরুজনকে আনাতে। এখনো বেশিদূর গড়ায়নি। যা ঘটবার তা ঘটেনি। এই বদ্ খেয়াল এক দিনে মিটে যায় সুন্দর মেয়ে দেখে বিয়ে দিলে। তারপর শিয়ালকোট থেকে বদলি হয়ে লাহোর বা অমৃতসর গেলেই সুরযভান ঠিক আতশবাজির মতো নিবে যাবে। কিন্তু মেহেরবানের গুরুজনকে খবর দিতে আমার সাহসে কুলোয় না। ও যদি রাগ করে। মানুষটা এমনিতে বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের। কিন্তু রাগলে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়।

এর পরে যেদিন সুরযভানের পার্টিতে যাই সেদিন মেহেরবানও যায়। সেদিন ঠারেঠোরে সব ঠিক হয়ে যায়।

৩

দিন কয়েক পরে আমি পরেডের জন্যে পোষাক পরছি মেহেরবান সিং এসে বাগড়া দিল। তার চোখে মুখে প্রতি অঙ্গে জয়ের উল্লাস। তবু বিষাদের ভঙ্গী করে বলল, "আমি মরে গেছি।"

আমি অনুমান করলুম এর অর্থ কী। তা হলেও ভড়কে গিয়ে বললুম, "কেন! কী হয়েছে!"

"আমি রানীপসন্দ্ বনে গেছি!" সে করুণ স্বরে বলল।

"হুঁ!" আমি গম্ভীরভাবে বললুম, "কাজটা ভালো হয়নি। তার প্রমাণ তুমি পরেডে ফাঁকি দিচ্ছ। অমন করলে চাকরি রাখতে পারবে না।"

সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। "আমি অসহায়। আমার নিয়তি আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে! তুমি তো আমার বন্ধু। তুমি আমাকে একটা পরামর্শ দিতে পারো?"

"কী পরামর্শ?" তার জন্যে সমবেদনায় আমার দিল দরদ হয়েছিল।

"আমি দাম দিতে চাই।" সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "না দিলে আমি বান্দা বনে যাব। আমার ইজ্জত থাকবে না।"

আমি ভেবে বললুম, "ওর কিসের অভাব যে ও তোমার কাছ থেকে টাকা নেবে? আর উপহার তুমি পঞ্চাশ টাকার দিলে ও পাঁচ হাজার টাকার দেবে।"

"আমি লাখ টাকার দেব।" সে তেজের সঙ্গে বলল। "কিন্তু কোথায় পাব লাখ টাকা? কার তোশাখানায় হানা দেব? ট্রেজরি লুট করলে কেমন হয়?"

আমি তার কথাবার্তা শুনে আঁতকে উঠলুম। সেইদিনই তার বাড়িতে চিঠি লিখে দিলুম। অবশ্য রেখে ঢেকে। তার উপর কড়া নজর রাখতে হলো। পাছে বাটপাড়ি রাহাজানি করে। পরেড ফাঁকি দেবার জন্যে সে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। ডাক্তারকে আমি বলে এলুম তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে। অবশ্য ওসব কথা ভেঙে বলিনি।

তার বড় ভাই ছুটে এলেন তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। ছুটি না পেলে সে যায় কী করে! ছুটির জন্যে দরখাস্ত করতে হলো। যতদিন মঞ্জুরী না আসে, ততদিন সবুর করতে হবে। ইতিমধ্যে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। একদিন সকালবেলা উঠে শুনলুম মেহেরবান সিং নিরুদ্দেশ। খোঁজ নিয়ে জানতে পেলুম সুরযভানও নিরুদ্দেশ।

ঢি ঢি পড়ে গেল শহরময়। সুরযভানের যারা ভক্ত তারা বলাবলি করল, হায়! হায়! সামান্য একটা পুলিশওয়ালার জন্যে কুলে কালি দিল! আর মেহেরবানের যারা বেরাদার তারা বলাবলি করল, হায়! হায়! সাময়িক একটা মোহের জন্যে সারা জীবনের কেরিয়ার মাটি করল।

কেবল দু' পাঁচজন লোক রসিয়ে রসিয়ে বলল, রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব পেলে আমরাও নিরুদ্দেশ হতুম। আর সুরযভানও কম বুদ্ধিমতী নয়। ছোকরা যেমন খানদানী তেমনি সুপুরুষ।

আমার মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। বড় ভাই যখন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন তখন আমিও তাঁর সঙ্গে কিছু দূর গেলুম। তিনি বললেন, "অদৃষ্ট!" আমি বললুম, "কিসমৎ।" আমরা হিন্দু মুসলমান এক মত। যার নসীবে যা আছে তা তো ঘটবেই।

মাসের পর মাস যায়। মেহেরবানের খবর পাইনে। ওদিকে সুরযভানের বাড়ী অন্ধকার। তার কর্মচারীরা বলতে পারে না সে কোথায়। আমি আমার ডিউটিতে মন দিই।

এক বছর বাদে মেহেরবানের পাত্তা মিলল। সে তখন আজমীর শরিফে। আমাকে লিখেছে আজমীর গিয়ে তীর্থ করতে। বুঝতে পারলুম আমার পরামর্শ চায়। ছুটি নিয়ে আজমীর গেলুম জেয়ারত করতে। মেহেরবান আমাকে ধরে নিয়ে গেল তার কোয়ার্টার্সে। দেখলুম বেশ আছে ওরা দুটিতে। বৌ সেজে সুরযভান খুব লাজুক হয়েছে। আমার সামনেও আধা পর্দা।

মেহেরবানের কাছে যা শুনলুম তা বলছি।

শিয়ালকোট থেকে পালিয়ে ওরা নানা জায়গায় যায়। যেখানেই যায় সেখানেই কথা ওঠে, তোমাদের পরিচয় কী? স্বামী-স্ত্রী? এর উত্তরে সুরযভান বলে, হাঁ। কিন্তু মেহেরবান মুখ বুজে থাকে। কিছুতেই তার মুখ দিয়ে বার হয় না যে, তারা স্বামী-স্ত্রী। শুধু অসত্য নয়, অপ্রিয়ও বটে। অথচ ও রকম একটা পরিচয় না দিলে ঘর পাওয়া যায় না, চাকর পাওয়া যায় না, সাহায্য পওয়া যায় না, সমাজ পাওয়া যায় না। তাহলে থাকতে হয় গিয়ে বাজারে। তেমন প্রস্তাবে সুরযভান জ্বলে উঠবে। সেও কম গর্বিতা নয়। সে কি বাজারের বেশ্যা!

তারপর যেখানেই যায় সেখানেই অবশেষে জানাজানি হয়ে যায় যে ওরা বিবাহিতা নয়। একদল যুবক জোটে ভাগ দাবী করতে। সৌন্দর্য এমন সামগ্রী যে, ভাগ না দিয়ে ভোগ করতে গেলে কেউ সহ্য করবে না। ঢিল মেরে তাড়াবে। পুলিশের কাছে নালিশ করতে যাও, পুলিশ চাইবে বিবাহের প্রমাণ। নয়তো মোটা ঘুষ। মেহেরবান হৃদয়ঙ্গম করল যে একা ভোগ করতে হলে শুধু দখল নয়, স্বত্ব থাকা চাই। সুরযভান যে তার বিবাহিতা পত্নী এর দলিল দাখিল করতে হবে।

রাজপুতের ছেলে। বিয়ে করবে কিনা বেনের বিধবাকে! তাও যদি সে সতী নারী হয়ে থাকত। বুক ফেটে কান্না আসে। এমনিতেই তার মাথা হেঁট। এর পরে কি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে! মেহেরবান ভেবে দেখলে পালাবার পথ নেই। চাকরি তো জুটবেই না, গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষ করতে গেলেও গুরুজনের তিরস্কার দুবেলা শুনতে হবে। কেই বা তাকে বিয়ে করবে তখন! বিয়ে না করলে স্ত্রীসহবাসের কী উপায়! তবে কি সে এই বয়সে সন্ন্যাসী হবে!

যদি না পালায় তাহলে দুটি মাত্র পন্থা। হয় বিয়ে, নয় ভাগ। দুটোতেই মেহেরবানের সমান বিতৃষ্ণা। আর সুরযভানের? মেহেরবানের বিশ্বাস দুটোতেই সুরযভানের সমান তৃষ্ণা।

ভাগ সে প্রাণে ধরে করবে না। তার চেয়ে মরণ ভালো। তাহলে বাকী থাকে—বিয়ে। বিয়ের নাম করলে তার চোখে জোয়ার আসে, তার হৃদয় হা হা করে। তার জাতকুলের গর্ব, তার পৌরুষের দর্প, তার নীতিবোধ বিষম ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়।

বাধ্য না হলে সে কিছুতেই ও কাজ করত না। বিয়ে! রাঁড়কে বিয়ে! বেনেনীকে বিয়ে! অসতীকে বিয়ে! বাধ্য হলো ভাগীদারদের দাবীদাওয়া এড়াতে। ভাগ না করে নির্বিঘ্নে ভোগ করতে। অবিভক্ত স্বত্বে স্বত্ববান হতে।

বিয়ের পরেই ফতোয়া দিল, পর্দানশীন হতে হবে।

সুরযভান এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বিয়ের জন্যে সে মনে মনে কৃতার্থ বোধ করছিল। রাজপুত্র তাকে বিয়ে করবে এ যে তার শৈশবের স্বপ্ন। এমন অলৌকিক ঘটনা যদি বা ঘটল তবে তার জন্যে কিছু কষ্ট সইতে হবে বৈকি।

স্ত্রীকে পর্দায় পুরে মেহেরবান এবার নিশ্চিন্ত হলো। এর পরে তাকে জীবিকার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্যে পাঞ্জাবের বাইরে যাওয়া স্থির করল। যেখানে গা ঢাকা দেওয়ার দরকার নেই। সোজা নিজের পরিচয় দেওয়া চলে। ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলো আজমীরে। তার জঙ্গী রেকর্ড দেখিয়ে রেলওয়েতে কাজ পেলো। মাইনে বেশি নয়। কিন্তু নিজের অন্ন।

এখানে দেখা দিল নতুন এক সমস্যা। রেলওয়ের কাজে মাসে বিশ দিন সফর করতে হবে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া শক্ত। একা রেখে গেলেও ভাবনা। অমন একখানি সাত রাজার ধন মাণিক যার ঘরে সে যদি বাইরে বাইরে রাত কাটায় তাহলে কেউ হয়তো মওকা পেয়ে সিঁদ কাটবে। আর থানার খাতায় লেখা হবে গয়না কাপড় তৈজসপত্র চুরি গেছে। আসলে কী চুরি গেল তা তো লেখবার মতো কথা নয়। যার চুরি গেল সে তখন সফরে।

মেহেরবান তা হলে করবে কী! ঘর সামলাবে না বাহির সামলাবে! বৌ রাখবে না চাকরি রাখবে! সুরযভানের তেমন কোনো সমস্যা নেই। তাকে দেখলে মনে হয় সে একটা স্থিতি পেয়েছে। সে রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখেছিল, রাজপুত্র পেয়েছে। কিন্তু মেহেরবান কি এই চেয়েছিল! এই স্বপ্ন দেখেছিল!

আমাকে ডাক পড়ল এমন সময় আজমীরে। পরামর্শ দিতে।

ওরা বিয়ে করেছে শুনে আমি সত্যি খুব খুশি হয়েছিলুম। আমি মুসলমান, আমার তেমন কোনো সংস্কার ছিল না। মেহেরবান রাগ করবে বলে আমি ওকে সে পরামর্শ প্রথম থেকে দিইনি। এখন সে আমার বিনা পরামর্শে যা করেছে তা ঠিকই করেছে। কিন্তু এই ঈর্ষাকাতরতার অর্থ আমি বুঝিনে। এই সন্দেহকাতরতার। যার সঙ্গে সারা জীবন ঘর করবে তাকে পদে পদে অবিশ্বাস করলে চলে?

এর উত্তরে মেহেরবান বলে, "ও যে ভয়ানক সুন্দর। সুন্দর না হলে সন্দেহ করতুম না। কুৎসিত হলে বিশ্বাস করা সহজ হতো।"

বোঝা গেল সৌন্দর্যকেই তার ভয়। এ ভয় কিসে ভাঙবে? সাত আটটা সন্তান হলে? দুশ্চিকিৎসা স্ত্রীরোগে ভুগলে? যৌবন অপগত হলে? কিন্তু এসবের তখন অনেক দেরি। সুরযভান আমাদেরই সমবয়সী। অকালে স্থবির হতে তার কিছুমাত্র ত্বরা ছিল না।

আমি বললুম, "ভাই, যাই করো স্ত্রীর কুরূপ কামনা কোরো না। তোমাদের

কোনো দেবতা যদি তোমার প্রার্থনা পূরণ করেন তখন ভুগতে হবে তোমাকেই।"

দেখলুম ওর মতিগতি সুবিধের নয়। য়্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে বিশ্রী করা যায় কিনা ভাবছিল। এমনভাবে ঘটাবে যেন একটা আকস্মিক ঘটনা। আমি কড়া গলায় শাসিয়ে দিলুম। তলে তলে শিউরে উঠলুম। বললুম, "তাহলে তুমি তালাক দাও। নয়তো ছাড়াছাড়ি করো।"

সে ও কথা কানে তুলবে না। বলবে, "পুলিশের চাকরিতে থাকলে মাইনে ও পেনসন মিলিয়ে আমি কয়েক লাখ টাকা কামাতে পারতুম। খরচ খরচা বাদ দিলে আমার নীট সঞ্চয় হতো এক লাখ টাকা। সেই লাখ টাকা আমি বলতে গেলে যৌতুক দিয়েছি। মোফত নিইনি। তবে কেন আমি তালাক দেব? আর ছাড়াছাড়ি কিসের? নিয়তি আমাদের একসূত্রে গেঁথেছে।"

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললুম, "আচ্ছা, ও যদি তোমায় লাখ টাকা ফেরৎ দিত তুমি ওকে ছাড়ন দিতে?"

মেহেরবান একদম থ বনে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কী ভাবল ওই জানে! বলল, "ঠাট্টা করছ?"

"না। ঠাট্টা নয়।" আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললুম, "এই একমাত্র সমাধান।"

"তুমি যদি ওকে ও কথা বলো", মেহেরবান আর্ত কণ্ঠে বলল, "ও সত্যি সত্যি লাখ টাকা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তাহলে আমিই ওর কাছে কেনা হয়ে রইব। রানীপসন্দ্।"

ওর মনের কথাটা এই যে, সুরযভান ওর মালিক হবে না। ওই হবে সুরযভানের মালিক। তার পর সুরযভান সুন্দরী নায়িকা হবে না। হবে কুরূপা বধূ। তাহলেই ও নিশ্চিন্ত হবে, নিরুপদ্রব হবে। কিন্তু সুরযভানকে সেকথা মুখ ফুটে জানানো যায় না।

খাজা সাহেবের দরগায় নজরানা দিয়ে চেরাগ দিয়ে আমি আজমীর থেকে চলে আসি। তার কিছু দিন পরে অবাক হয়ে দেখি যে সুরযভানের বাড়ী আলো দিয়ে সাজানো। কী হয়েছে? কী হয়েছে? রানী ফিরে এসেছেন। আর কেউ সঙ্গে এসেছে কি? না, আর কেউ তো আসেনি।

৪

খান বাহাদুর বলতে লাগলেন।

"তারপরে মেহেরবানের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। চিঠি লেখালেখিও হয়নি। পাঞ্জাব থেকে আমি বাংলা দেশে বদলি হই। বদলি হই ঠিক নয়, গোপনীয় বিভাগে নিযুক্ত হই। তারপর থেকে এই প্রদেশে আছি। আমি যত দূর জানি এই শেষ।"

"এই শেষ!" আমার কৌতূহল নিবৃত্ত হতে চায় না। "বলুন, বলুন। তার পরে কী হলো? সুরযভানের কী হলো? মেহেরবানের কী হলো?

লঞ্চ জল কেটে চলছিল। জলের ছিটে উড়ে এসে লাগছিল আমাদের গায়ে। কখন এক সময় চা পান সারা হয়েছে। ডিনারের অর্ডার দিয়েছি আমি। খান বাহাদুর আমার মেহমান।

"আর, দাদা! বলে সুখ নেই। মানুষ চিনতে চিনতে বুড়ো হয়ে গেলুম। কিন্তু তখন তো চিনতুম না। তাই স্তম্ভিত হয়েছিলুম।"

"কেন? কেন?" আমার কৌতূহল বাগ মানছিল না।

"লোকটা সত্যি সত্যি গিয়েছিল স্ত্রীর মুখে য়্যাসিড ঢালতে। এক ফোঁটা পড়েছিল তার গালে কি ঘাড়ে। সেইজন্যে সুরযভান আর পার্টি দেয় না। বেরোয় না। কিন্তু খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। সুরযভানের সঙ্গে লাখ খানেক টাকার জহরৎ ছিল। সমস্ত মেহেরবানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে এক দৌড়ে রেল স্টেশনে হাজির হলো। তারপর সটান শিয়ালকোট।"

আমি ঘেন্নায় কানে হাত দিয়েছিলুম। আর শুনতে রুচি ছিল না।

"মেহেরবান তো জহরৎ সামলাতে ব্যস্ত। তাড়া করে যাবে কী করে? কোনটা বেশি মূল্যবান? জহরৎ না আওরৎ? কার্যকালে দেখা গেল, জহরৎ।" খান বাহাদুর খেদোক্তি করলেন। মনে হলো তাঁর সহানুভূতি আওরতের প্রতি। হাতটা একটু ফাঁক করলুম।

কিন্তু সেটা আমার ভুল।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। পৌঁছতে দেরি আছে। খানারও দেরি। গল্পটা শেষ হয়ে গেলে কী নিয়ে আমরা থাকব? কান থেকে হাত সরিয়ে নিলুম।

খান বাহাদুর বললেন, "ও ঠিকই হয়েছে, মশাই। অল্পের উপর দিয়ে গেছে। ঘটনা তো এই একটা দেখলুম না। মেহেরবান একদিন ওকে খুন করতে পারত। সুন্দরীরা চঞ্চলা হয়েই থাকে। একদিন হয়তো একটু চনমন করত আর অমনি জানটা হারাত। বেঁচে গেছে এই ঢের। য়্যাসিডের দাগ লেগে সৌন্দর্যের যদি বা একটু হানি হয়ে থাকে সেটা মনে করুন, ওর পাপের সাজা।"

আমি কথাটি কইলুম না। পাপতত্ত্বে আমার আস্থা ছিল না। পাপের সাজা আবার পাপীতে দেবে, এটাও আমার অসহ্য। মেহেরবানও তো কম পাপী নয়।

"বিচার করে দেখবেন", খান বাহাদুর বলতে লাগলেন, "নারীর কী এমন ক্ষতি হলো! ক্ষতি যা হলো তা পুরুষের। ঐ জহরৎ কি তার ক্ষতিপূরণ নাকি! সে ক্ষতি অপূরণীয়। চাকরিতে থাকলে সে এতদিনে ডি আই জি না হোক এ আই জি হতো। হায়, হায় রে তকদির! নসীবে যা আছে তাই তো হবে। আর ঐ রেলওয়ের কাজটাও রাখতে পারল কই! লাখ টাকার জহরৎ পেয়ে মাথা ঘুরে গেল। সাদী করে বসল ঐ জহরৎ যৌতুক দিয়ে। রাজপুতানার মহা সম্ভ্রান্ত সরদার পরিবারে। ওঁরা ওকে ইংরেজের নোকরি করতে দিলেন না। দেশীয় রাজ্যের ফৌজে ভর্তি করে দিলেন। তাতে পদ ছাড়া আর কী আছে, মশায়!"

আমি গুম হয়ে বসেছিলুম। কী বলব ভেবে পাচ্ছিলুম না।

"এখন আমাদের ইন্‌স্পেক্‌টারের কী হয় দেখা যাক। ইনি আর এক রানীপসন্দ্। মেয়েটি নাকি অপরূপ সুন্দরী। সুন্দরী হলে মন্দ হবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে! যে যত মন্দ সে তত সুন্দর।" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন খান বাহাদুর।

কর্ণফুলী নদী। নামটি বড় শ্রুতিমধুর। চট্টগ্রামে দেখিয়াছিলাম সমুদ্রসঙ্গিনী প্রবল প্রবাহিনী তরঙ্গময়ী গৌরবিনী কর্ণফুলীকে। কর্ণফুলী সেখানে যেন রাণীর আসনে অধিষ্ঠিতা। অকূল জলরাশি, কত রকমের ছোট বড় নৌকা স্টীমার ও জাহাজ সেই জলরাশির বুকে ভাসিয়া চলিয়াছে। ভাটিয়ালী সুরের তরঙ্গ জলতরঙ্গের তালে তালে তাল রাখিয়া অবিরাম প্রবাহের সহিত যেন মিলিয়া মিশিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সুরময়ী সুরতরঙ্গিনী কর্ণফুলী।

কত ইতিহাস, কত কাহিনী, কতই না জনশ্রুতি কর্ণফুলীর জলকল্লোলে মিশিয়া আছে। কল্লোলের গুঞ্জনে এখনও যেন নিয়ত সে কাহিনী গুঞ্জরিত হইতেছে। সেই গুঞ্জরণ অনুবর্তন করিয়া যদি আগাইয়া চল সমতল হইতে উপরের দিকে, কর্ণফুলীর জন্মনিকেতনের অভিমুখে, তবে ক্রমশ তাহার রূপান্তরও দেখিতে পাইবে। প্রবলা ক্রমশ ধীরস্রোতার রূপ ধারণ করিতেছে। কর্ণফুলী তখন যেন তাহার শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্রে তাহার কুমারী জীবনে আবার ফিরিয়া গিয়াছে।

আমি চট্টগ্রামের কর্ণফুলীকে দেখিয়াছি, আবার রাঙ্গামাটীর কর্ণফুলীকেও দেখিয়াছি। একই নদী অথচ যেন এক নয়। নদীর পথে যদি নৌকায় যাও দুই তীরের শোভা দেখিতে দেখিতে দেখা যেন আর ফুরাইবে না। অপরূপ সেই শস্য সমৃদ্ধি পরিপূর্ণ অথচ পার্বত্য শ্রীমণ্ডিত তীরভূমি। মাঝে মাঝে বসতি। বসতির বেশির ভাগ চাকমা জাতির বসতি। বাড়িগুলির ভিত্তি মজবুত কাঠের খুঁটি, সেই খুঁটির উপর কাঠের তক্তা পাতিয়া মেঝে তৈয়ার করা হইয়াছে। ঘরগুলির দেয়াল পাতলা বাঁশ ও বেতের বুনানী দিয়া নির্মিত। উপরেও বেতের ছাউনী এবং তাহার উপর করগেট টিনের চাল। যখন নদীতে বন্যা আসে, নদীর জল আবর্জনাপূর্ণ ও ঘোলা হইয়া যায়, তখন ঐ টিনের ছাদের সাহায্যে বৃষ্টির জল ধরা হয়, সেই জলই তখন নদীতীরবাসীর তৃষ্ণা দূর করে।

চট্টগ্রাম হইতে রাঙ্গামাটি যাইবার পথে কর্ণফুলীর তীরের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করিতে হইলে জাহাজে না গিয়া নৌকায় যাওয়াই ভাল। প্রথম যখন আমি রাঙ্গামাটি যাই সে প্রায় ছত্রিশ বা সাঁইত্রিশ বৎসরের আগের কথা। আমার অগ্রজ ডাক্তার সরসীলাল সরকার মহাশয় তখন রাঙ্গামাটিতে সিভিল সার্জন হইয়া গিয়াছেন। তিনি সেখান হইতে কলিকাতায় আমাকে একখানি চিঠি লিখিলেন, চিঠির ভাব এইরূপ "রাঙ্গামাটী কবি নবীন সেনের রঙ্গমতী। বন জঙ্গলের শোভা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, এসো এখানে। শিবরাত্রি আসছে, সীতাকুণ্ডে নেমে চন্দ্রনাথ দর্শনও হবে। আমি এদের সঙ্গে নিয়ে আগেই রওনা হয়ে যাব। বাসা আগে ঠিক না করলে পরে বাসা পাওয়া যাবে না। আমি গণেন মহারাজকে আজই চিঠি লিখছি, তিনি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। কাদম্বিনী যদি আসতে চান তবে তাঁকেও সঙ্গে আনতে পার। গণেন মহারাজ যখন কলকাতায় ফিরবেন তিনি তাঁর সঙ্গেই ফিরে যেতে পারবেন।"

এই চিঠি পাইয়া আমরা রওনা হইয়াছিলাম, সঙ্গে ছিলেন ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, ইনি 'গণেন মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু, তখন বাগবাজারে উদ্বোধন মঠে থাকিতেন।

গোয়ালন্দে স্টীমারে উঠিয়া হঠাৎ পেটে কলিক ব্যথা হওয়ায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই পদ্মানদীর শোভা উপভোগ করা সম্ভব হয় নাই। সীতাকুণ্ডে পৌছাইয়াও শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল ও মরফিয়া ইনজেকশন লইতে হয়।

একাদশী দ্বাদশী আচ্ছন্ন ভাবেই কাটিয়া গেল, ত্রয়োদশীতে বিছানায় উঠিয়া বসিলাম, সেইদিনই রাত্রে চতুর্দশী পড়িবে। দলে দলে যাত্রী চলিয়াছে, আমাদের বাড়িতেও সকলেই প্রস্তুত হইতেছিলেন চন্দ্রনাথ-পাহাড়ে যাত্রা করিবার জন্য। আমার অবস্থা শোচনীয়। দাদা যখন বলিলেন, "তুই কি আর পাহাড়ে উঠতে পারবি? বরং এইখানেই থেকে মনে মনে চন্দ্রনাথকে ধ্যানে দর্শন কর আর ধ্যানে দর্শনই তো সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ দর্শন।" তখন আমার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এ বিষয় বাড়ির সকলেই দাদার সহিত একমত। ননদিনী কাদম্বিনী বলিলেন, "বৌদিদি, সিঁড়ি অনেক বেশী, অত সিঁড়ি ভাঙ্গতে গিয়ে শেষে পথেই হয়তো মূর্ছা যাবে। শেষে কি একটা বিভ্রাট বাধাবে?"

গণেন মহারাজ বারান্দায় একটা বেতের মোড়ায় বসিয়াছিলেন। আমি উঠিয়া তাঁহার কাছে গেলাম, আমার চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছে। তাঁহাকে বলিলাম, "মহারাজ, আমার কি চন্দ্রনাথ-দর্শন হবে না?"

তিনি যেন আশ্চর্য হইয়া গিয়াছেন এইভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "চন্দ্রনাথ দর্শন হবে না? সে কি? এতদূরে এসেছেন কেন তবে? যান, যান, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিন, এখনি বেরোতে হবে।"

তাঁর এ কথায় আমার কি যে মনে হইয়াছিল এখন তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। মনে হইল যেন সাক্ষাৎ চন্দ্রনাথ আসিয়াই আমাকে আশ্বাস দিতেছেন।

হায়রে! সেদিনের মন আজ কোথায়! দুদিন নির্জলা উপবাস, শরীরের দারুণ দুর্বলতা এক মুহূর্তে যেন কোথায় চলিয়া গেল। স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি সকলের সঙ্গে পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

চন্দ্রনাথের মন্দির পাহাড়ের উপর। ঢেঁকানালে কপিলাস পাহাড়ে আছে চন্দ্রশেখর শিবের মন্দির, সেখানেও পাহাড়ের উপর পাহাড়িয়া পথ ধরিয়া উঠিতে হয়, আর উঠিতে অনেক সময়ও লাগে বটে; কিন্তু সে ওঠা আর এখানে ওঠার মধ্যে অনেক তফাৎ। কপিলাস পাহাড় চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চেয়ে যদিও অনেক উঁচু—এমন কি তাহার শিখর পর্যন্ত পৌঁছাইতেই পারা যায় না; কিন্তু পাহাড়ে উঠিবার পথ কঠিন পাথরের পথ, সে পথের দুধারে গাছ, লতা ও ঝোপের জঙ্গল, সে পথে চলিতে কোন কষ্ট হয় না। পথের দুধারের অতি মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অনায়াসে পথ পার হইয়া গিয়াছি, পরিশ্রম মনে হইলে মাঝে মাঝে পথে বসিয়া বিশ্রামও করিয়াছি।

কিন্তু চন্দ্রনাথ পাহাড় ন্যাড়া পাহাড়, শিখরের উপরেই খানিকটা সমতল স্থান, সেখানে চন্দ্রনাথের মন্দির, আর পাহাড়ের আর এক পাশে চন্দ্রনাথ মন্দির হইতে কিছু দূরে বিরূপাক্ষনাথের মন্দির। চন্দ্রনাথের

মন্দিরের সম্মুখে পাহাড়ে উঠিবার বাঁধানো সিঁড়ি আছে। কিন্তু যাত্রীরা সে পথে না উঠিয়া বিরূপাক্ষ-নাথের মন্দিরের দিকের পথে পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে ওঠে এবং নামিবার সময় চন্দ্রনাথের মন্দিরের সম্মুখের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামে। এই সিঁড়ির নীচেই আছে একটি বাঁধানো চত্বর, এখানে যাত্রীরা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ এবং পিন্ডদান করে। ইহার পাশেই আছে একটি কুন্ড এবং এই কুন্ডটিরই নাম সীতাকুন্ড। এই কুন্ডের নামেই জায়গাটির নাম ও স্টেশনের নাম হইয়াছে সীতাকুন্ড।

সীতাকুন্ডের সম্বন্ধে পান্ডাদিগের মুখে নানাপ্রকার কাহিনী শোনা যায়। সব কাহিনী যদিও একরকম নয়, তবে একটা বিষয়ে মিল আছে। সেটি এই যে, সীতাদেবীর অশ্রুজলে এই কুন্ডের উৎপত্তি হয়, আর এই কুন্ডের তীরে দেবী জানকী তাঁহার স্বর্গগত শ্বশুর মহারাজ দশরথের তর্পণ করেন।

যেখানে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করা হয় পান্ডারা সে স্থানটিকে বলেন 'শিরোগয়া'। তাঁহারা বলেন, "গয়াক্ষেত্র তিনটি আছে, একটি বৈতরণী নদীর তীরে বিরজা ক্ষেত্র বা নাভিগয়া, দ্বিতীয়টি গয়াক্ষেত্রে ফল্গু নদীর তীরে 'পাদগয়া' এবং তৃতীয়টি সীতাকুন্ডের তীরে চন্দ্রনাথক্ষেত্রে 'শিরোগয়া'। তিনটি গয়াধামেরই সমান মাহাত্ম্য, তীর্থকৃত্যের পুণ্য ফলও সমান।"

চন্দ্রনাথ মন্দিরের দিকে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়া যাত্রীরা না উঠিয়া বিরূপাক্ষের দিক দিয়া কেন ওঠে? এ প্রশ্নের উত্তরে যাত্রীরা কেহ কেহ বলিল, "সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে উঠবার সময় বুকে ব্যথা ধরে যায় ও খুবই কষ্ট হয়; কিন্তু নামা অতি সহজ। আবার বিরূপাক্ষের পথে বরং কোনরকমে ওঠা যায়, কিন্তু নামবার সময় পায়ের চাপে পাহাড়ের বালি ও কুচোপাথর খসে খসে পা পিছলে যায়, কেন না পাহাড়টি বেলে পাহাড়, শক্ত পাথরের পাহাড় নয়। গাছপালাও বিশেষ নেই যে ধরে ধরে নামা যাবে, কাজেই ও পথে নামা বিপজ্জনক, নামতে গেলে গড়িয়ে পড়বার ভয় আছে।" আবার কেহ কেহ বলিল, "বিরূপাক্ষনাথ চন্দ্রনাথের দ্বাররক্ষক। আগে দ্বারীর অর্চনা করে তবে চন্দ্রনাথের মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করবার অধিকার হয়।"

কিন্তু গণেশ মহারাজ ও সকল মন্তব্য গ্রাহ্যই করিলেন না, চিরকালই তাঁহার ছিল এক বিদ্রোহী মনোবৃত্তি। তিনি বলিলেন, "ওসব কেবল সংস্কার। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কষ্ট কেন হবে, বরং মাঝে মাঝে একটু ধাপের উপর বিশ্রাম করে চলতে পারা যাবে। আর বিরূপাক্ষের পথে উঠবার সময়েও তো পড়ে যাবার ভয় আছে, নামবার সময়ই বা বেশী করে গড়িয়ে যাবার ভয় থাকবে কেন। আসুন, সকলে সিঁড়ি দিয়েই উঠুন, আর নামবার সময় আমি আগে নেমে একে একে আপনাদের সকলকেই হাত ধরে ধরে নামিয়ে দেব।"

তিনি আমাদের পরিচালক, সুতরাং তাঁহার নির্দেশই মানিয়া লইতে হইল। তবে বিরূপাক্ষনাথের পথে নামিবার সময় খুবেই কষ্ট হইয়াছিল এবং বারবার পদস্খলনও হইয়াছিল। গণেশ মহারাজের সাহায্যে এবং চন্দ্রনাথের দয়ায় একেবারে গড়াইয়া পড়িয়া যাই নাই।

চতুর্দশীর রাত্রে পাহাড়ের উপর এবং পাহাড়ের নীচেও মহাসমারোহ হয়। অনেক যাত্রী, বিশেষত সাধু সন্ন্যাসীরা পাহাড়েই রাত্রি যাপন করেন। রাত্রে চারি প্রহরে চারিবার পূজা হয়। সমবেত স্তোত্র পাঠ, অনবরত হর হর ব্যোম ব্যোম ধ্বনি, নীলপদ্ম ও অন্যান্য সুগন্ধি ফুলের সৌরভের সহিত মিশ্রিত সুগন্ধি ধূপের গন্ধ, শত শত পূজার্থীর একান্ত তন্ময়তা শিবরাত্রি তিথিকে সার্থকনামা করিয়া এক অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। মনে হইয়াছিল যেন এখানেই কৈলাসের আবির্ভাব হইয়াছে। পরদিনই রওনা হইবার কথা ছিল। কিন্তু এদিন পারণ প্রভৃতির জন্যও বটে এবং সীতাকুন্ড স্থানটি একটু ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্যও বটে আরও দু'একদিন থাকা হইয়াছিল।

সীতাকুন্ডে লবণহ্রদ নামে একটি জলাশয় আছে, তাহার জল বিষম লবণাক্ত। বাড়বানল নামে একটি জলাশয় আছে, সেখানে জলের উপর আগুন জ্বলিতেছে। সব সময় অবশ্য আগুন জ্বলে না, তবে মাঝে মাঝে ভাসমান অগ্নি জলের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়। ইহার কারণ, এখানে পাহাড়ের পাথরে পাথরে ফস্‌ফরাস্ আছে, সেই ফস্‌ফরাস্ ঝরণার জলের সহিত যখন জলাশয়ে আসিয়া পড়ে তখন একটুখানি আগুনের ছোঁয়া পাইলেই সমস্ত জলই যেন অগ্নিময় হইয়া উঠে। পান্ডারা মাঝে মাঝে দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়াও আগুন ধরাইয়া দেয়। সীতাকুন্ডের কাছেও পাথরের গায়ে আগুন জ্বলিতে দেখা যায়, পান্ডারা বলে, "অগ্নিদেব প্রত্যক্ষ হইতেছেন।"

সহস্রঝোরা নামে একটি প্রপাতও দেখিলাম। বহু ঝরণা একত্রে মহাশব্দে পাহাড়ের উপর হইতে যেন লাফাইয়া পড়িয়া প্রকান্ড এক জলাশয়ের সৃষ্টি করিতেছে।

কুমিল্লা, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানের অনেক লোক চাকরীসূত্রে এখানে আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে কর্তাবার্তা বলা যায় কিন্তু যাঁহারা সীতাকুন্ডের নিজ অধিবাসী তাঁহাদের কথা আমরা যেমন একেবারেই বুঝিতে পারি না, তাঁহারাও সেই রকম আমাদের কথা বুঝিতে পারেন না।

মনে আছে, ঘুরিতে ঘুরিতে ছেলেদের পিপাসা পাইয়া গিয়াছে দেখিয়া একটি বাংলোবাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম যদি একটু জল পাওয়া যায়।

বাড়িটি মনে হইল কোন গভর্নমেন্টের উচ্চকর্মচারীর বাড়ি। সম্মুখে বারান্ডায় সারি সারি বেতের চেয়ার সাজানো আছে, গৃহকর্ত্রী একটি চেয়ারে বসিয়াছিলেন, তাঁহার কোলে একটি সেলাইয়ের চুবড়ী। বোধহয় কিছু বুনিতেছিলেন। আমাদের দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সসম্ভ্রমে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন এবং ইঙ্গিতে চেয়ারগুলি দেখাইয়া দিলেন।

তাঁহার পরিচ্ছদ কতকটা অসমিয়া মেয়েদের মত। তিনি হাততালি দিবামাত্র একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, সম্ভবত সে পরিচারিকা। তিনি তাহাকে কী যে বলিলেন আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমরা যত কথা বলিতেছি সকল কথাতেই একটিমাত্র উত্তর পাইতেছি, উত্তরটি "হু"।

ঝি অনেকগুলি গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া আনিল এবং প্রত্যেক চেয়ারের সম্মুখে এক একটি গড়গড়া রাখিল। ছেলেদের জন্য জল ও মিষ্টও আসিল, সেগুলি বেতের টেবিলের উপর রাখা হইল। গৃহকর্ত্রী তখন ইঙ্গিতে আমাদের চেয়ারের উপর উপবেশন ও ধূমপান করিয়া শ্রান্তিদূর করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন।

বুঝিতে পারিলাম, এইটিই এদেশের পদ্ধতি। রাঙ্গামাটীতে গিয়াও মেয়েদের ধূমপান করিতে দেখিয়াছি। এক ওভারশিয়ারবাবুর স্ত্রীর অসুখ হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। রাঙ্গামাটীতে কর্ণফুলীর তীরে সারি সারি বাড়ি। প্রত্যেক বাড়ির পরিবারগণের সঙ্গেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, কেননা, রাঙ্গামাটী স্থানটি সঙ্কীর্ণ, সেজন্য সকলের সহিত সকলের হৃদ্যতা হওয়াই স্বাভাবিক। যাহা হউক, গিয়া দেখিলাম, রোগিনী শয্যাগতা, বাঁশের মাচার উপর বিছানা, তাহাতেই শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার স্বামী সম্ভবত তাঁহার কাছেই ছিলেন, আমাদের আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু একটু পরেই ফরসীতে তামাক সাজিয়া হাত বাড়াইয়া ঘরের মধ্যে ফরসীটি ঢুকাইয়া দিলেন। আমরা যে তামাক খাই না তাহা অবশ্য তিনি জানেন, কিন্তু পীড়িতা পত্নীর অবশ্যই প্রয়োজন হইবে, তাই পত্নীব্রত স্বামী তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া ঘরের ভিতর দিয়াছিলেন।

ধূমপানের প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া এখন আবার কর্ণফুলীর প্রসঙ্গে আসিতেছি। চট্টগ্রামে যাইবার পথে একটি উল্লেখযোগ্য

স্থান তখনকার দিনের জগৎপুর আশ্রম। আশ্রমটি ছিল পাহাড়ের উপর, পূর্ণানন্দ স্বামী নামে একজন গৃহী সন্ন্যাসী এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সস্ত্রীক এই আশ্রমে থাকিতেন। আশ্রমটি প্রধানত মেয়েদেরই আশ্রম, পূর্ণানন্দ স্বামী ও তাঁহার পত্নী এইসব মেয়েদের পিতামাতার মত ছিলেন। সন্ন্যাসিনী মেয়েরা সংস্কৃত চর্চা ও পূজা-অর্চনা করিতেন, আবার চায়ের কাজও করিতেন। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সমতল জমিতে নানা ফসলের ক্ষেত করা হইয়াছিল। সন্ন্যাসিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ ন্যায় ও দর্শনে উপাধিলাভ করিয়াছিলেন! ইঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে ও ধাত্রীবিদ্যাতেও পারদর্শিনী ছিলেন। আশ্রমে একটি প্রসূতি আগার ও একটি হাসপাতালও ছিল। অনেক পিতৃমাতৃহীনা বালিকা এই আশ্রমে প্রতিপালিতা হইত। তাহাদের শিক্ষার ভার, এমনকি যদি তাহারা বিবাহ করিতে চায় তবে বিবাহ দিবার ভারও স্বামী পূর্ণানন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃহীন ছেলেরাও পাহাড়ের নীচে একটি আশ্রমে আশ্রয় পাইত। এইসব ছেলেদের তিনি সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতেন, তাহারা তখন ইচ্ছামত জীবিকা অর্জনের জন্য কোনও কাজে গিয়া যোগ দিত এবং অনেকে গার্হস্থ্য আশ্রমেও প্রবেশ করিত। রাঙ্গামাটীর স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন এই ছেলেদেরই ভিতর একটি ছেলে। তাঁহার সহিত স্বামী পূর্ণানন্দ একটি আশ্রমে প্রতিপালিতা বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন। এইসব পরিণীতা বালিকারা বিবাহের পরও আশ্রমের মেয়েই থাকে এবং মেয়ে যেমন অসুখের সময় অথবা সন্তান প্রসবের সময় বাপ মায়ের কাছে যায় সেইরূপ মাঝে মাঝে আশ্রমে যায় এবং যতদিন প্রয়োজন ততদিন সেখানে বাস করে।

আমি যখন রাঙ্গামাটীতে ছিলাম তখন পূর্ণানন্দ স্বামী সেখানে আসিয়াছিলেন। শুভ্রকেশ সৌম্য ও শান্ত মূর্তি। চোখের দৃষ্টিতে যেন স্নেহ উচ্ছলিত হইতেছে। হেডমাস্টারবাবুর স্ত্রী সন্তানসম্ভাবিতা, তাই তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে দুইজন সন্ন্যাসিনীও আসিয়াছেন, তাঁহাদের একজনের নাম চিন্ময়ী দেবী। ইনি সাংখ্য ও দর্শনে তীর্থ উপাধিধারিণী। ইঁহাদের আশ্রমের নিয়ম লবণ বর্জন এবং চাতুর্মাস্যের সময় ফলাহারের ব্রত গ্রহণ। বিনা লবণে অনেক তরকারিই রাঁধা হইয়াছে দেখিলাম, বাঁধা-কফির ডালনাও রান্না হইয়াছে। যাঁহারা গৃহী হইয়াছেন তাঁহারাও নুন খান না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আলুনি তরকারি তাঁহাদের কেমন লাগে। উত্তরে বলিলেন, উদ্ভিদ্ মাত্রেরই ভিতর কিছু কিছু নুন আছে, আর সেইটিই পরিমিত লবণ। রান্না করিতে গিয়া যে নুন দেওয়া হয় সেটি হয় অতিরিক্ত লবণ।

রাঙ্গামাটীতে যাইতে হইলে নৌকায় যাইতে হয়, আবার দোভাষী কোম্পানীর জাহাজও আছে। এই কোম্পানীর মালিক দুই ভাইকে কর্ণফুলীর তীরে লুঙ্গি পরিয়া জাহাজের কাজের তদারক করিয়া ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াছি। আবার চাদর বিছাইয়া সন্ধ্যার সময় নমাজ পড়িতেও দেখিয়াছি। তাঁহারা নমাজ পড়িতেছেন, আর তাঁহাদের পাশেই দুইজন ছেঁড়া পায়জামাপরা কালীঝুল মাখা খালাসীও নমাজ পড়িতে বসিয়াছে ছেঁড়া গামছা বিছাইয়া। চট্টগ্রামের লোকেরা বলে 'দুই ভাই কোটিপতি'।

জাহাজে করিয়া যেবার রাঙ্গামাটী যাই, সেবারে তীরের দৃশ্য তেমন করিয়া উপভোগ করিতে পারি নাই। নদীর জল কাটিয়া জাহাজ চলিতেছে, আর সেই ঢেউয়ের মুখে ভাসিয়া আসিতেছে কচুরীপানার স্তূপ। প্রবল স্রোতের বাধা ঠেলিয়া অনায়াসে এই স্তূপগুলি ভাসিয়া চলিয়াছে নিজের যাত্রাপথে। এমনভাবে তাহারা পরস্পর বাহুবন্ধনে বন্ধ যে, জলের তরঙ্গের আঘাতও তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেছে না।

কর্ণফুলী যত উপরের দিকে উঠিতেছে ততই শান্ত হইয়া আসিতেছে আর ততই ক্ষীণা হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর যাতায়াতের জন্য দুটি করিয়া নৌকা থাকে, কেননা, প্রায়ই তাঁহাদের টুরে যাইতে হয়। আমার দাদা পার্বত্য চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন, কাজেই এ বিভাগের সমস্ত হাসপাতালগুলিই তাঁহাকে মাঝে মাঝে পরিদর্শন করিতে যাইতে হইত। কেবল হাসপাতাল নয়, এই পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছোট ছোট দ্বীপগুলিতেও তাঁহাকে মাঝে মাঝে যাইতে হইত, কেননা, সেই সব দ্বীপে বাংলার বিপ্লবী ছেলেরা অন্তরীণ হইয়া থাকিত।

দাদার সেই নৌকা চট্টগ্রামে আসিয়া নোঙ্গর করিয়াছিল, একটি রাঁধিবার নৌকা ও অন্যটি বসবাসের জন্য। মাঝিরা সকলেই চট্টগ্রামের কায়স্থ, লেখাপড়া জানে, বাংলা বেশ ভালই বলিতে পারে এবং সকলেই সুরজ্ঞ। এ অঞ্চলে এমন একটি দাঁড়ি বা মাঝি নাই যে গান গাহিতে জানে না।

নৌকাপথে রাঙ্গামাটীতে পৌঁছিতে প্রায় তিনদিন লাগে, আর স্টীমারে মাত্র একদিন। তবু নৌকায় যাওয়াই অনেকে পছন্দ করে। দুই তীরের চাকমা গ্রাম, জুম্ অর্থাৎ ক্ষেত-খামার। স্থানে স্থানে আখের খোসার স্তূপ, এইগুলি জ্বালাইয়া মাঠের ভিতর বড় বড় উনান পাতিয়া লোহার কড়াই করিয়া রস জ্বাল দেওয়া হয়। ফুটন্ত গুড়ের গন্ধে তখন চারিদিক আমোদিত হয়।

বিচিত্র লতা, বিচিত্র বৃক্ষপত্রের সৌন্দর্য। পাতা যখন শুকাইয়া যাইবার সময় হয় তখনও কোন কোন গাছে তাহা ঘোর রক্তবর্ণে রঞ্জিত ও নয়নমনোহর। দাদা আমাকে সেই পাতা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "বুড়াবয়সেও যদি মানুষ ঐরকম সরস আর ঐরকম সুন্দর থাকতে পারে তবেই মানুষ-জন্মের সার্থকতা।"

মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়, পুষ্পময় বনলতা সেই পাহাড়কে এমন করিয়া ঢাকিয়াছে যে, কঠিন পাথর আর চোখে পড়ে না। আবার মাঝে মাঝে শিলাপট্ট নদীতীরে যেন আসন বিছাইয়া রাখিয়াছে, উপরে বৃক্ষপল্লবের চন্দ্রাতপ। পথিককে যেন বিশ্রামের জন্য আহ্বান করিতেছে।

মৃদুস্রোতা স্বচ্ছসলিলা কর্ণফুলী। হাঁটিয়া এপার ওপার হওয়া যায়। অতি উচ্চ নদীর পাড়, স্তরে স্তরে নামিয়া গিয়াছে নদীর গর্ভে। এক একটি স্তরে এক একরকম শস্য বোনা হইয়াছে। লঙ্কা, ধনে তামাক প্রভৃতি।

ছোট নদী তবু নৌকায় নৌকায় ভরপুর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁশের চালি; চালির সঙ্গে চালি—শিকলে গাঁথা, ভাসিয়া চলিয়াছে ভাসমান শৃঙ্খলাবদ্ধ রেলের কামরাগুলির মত। সম্মুখের চালিতে মাঝির ঘর ও ঘরকন্না। কিন্তু বর্ষা নামিলে যখন বন্যা আসে তখন এই নদীই আর এক মূর্তি ধারণ করে। "ঐ এলো, বান এলো" সাড়া পড়িয়া যায়। চাষীরা তাড়াতাড়ি নদীর পাড়ের ফসল কাটিয়া ঝুড়ি ভরিয়া ঘরে তোলে। আজ যতটা ফসল ঘরে তোলা হইয়াছে কাল হয়তো দেখা যাইবে সেখানে জমির চিহ্নমাত্রও নাই।

পাহাড় হইতে বন্যা নামিতেছে। কর্দমময় তীব্র জলস্রোত—ফেনা, গাছপালা, আগাছা প্রভৃতিকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া ভাসাইয়া নিয়া যাইতেছে নীচের দিকে। বড় বড় প্রকাণ্ড গাছ ভাসিয়া আসিতেছে। খুঁটি উপড়াইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে বড় বড় বাঁশের চালি ও নৌকা। সাঁতার দিয়া যে ধরিতে পারিবে এগুলি তাহারই হইবে।

তাই সাঁতার দিবার ও কাঠ ধরিবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। এই কাঠেই রাঙ্গামাটীর লোকেদের সারা বৎসরের রান্না চলে। কাঠ ধরা সহজ, কিন্তু ধরিয়া রাখা কঠিন। আজ যে কাঠ ধরিয়া মোটা খুঁটি উঁচা জায়গায় পুঁতিয়া মোটা মোটা দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছ, কাল সকালে হয়তো দেখিবে, কাঠ, খুঁটি ও দড়ি সমস্তই ভাসিয়া গিয়াছে।

বহুদিন পূর্বে, ইস্কুলের ছাত্র তখন আমি, মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতা আর ঐ দেশের প্রাচীন জাতি সুসভ্য Aztec আস্তেকদের কথা, কি ক'রে Hernan Cortes হের্নান কর্তেস-এর অধীনে মুষ্টিমেয় হিস্পানীয় বা স্পানিশ সেনা বিরাট্ আস্তেক্ সাম্রাজ্য জয় ক'রলে সে ইতিহাস প্রথম জানতে পারি। তার পরে, বিখ্যাত আমেরিকান ঐতিহাসিক Prescott প্রেস্কট্-এর সুপরিচিত বই The Conquest of Mexico পাঠ করবার সুযোগ হয় কলেজে অধ্যয়নকালে। এই থেকেই মেক্সিকো দেশের প্রতি আমার মনে একটা আকর্ষণ এসে যায়। মেক্সিকো নানা দিক্ দিয়ে এক অদ্ভুত দেশ ব'লে মনে হয়। প্রথম, এদেশে আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা, খ্রীষ্টীয় ষোলর শতকের বহু পূর্বে, ও-দেশে হিস্পানীয় বিজেতাদের আগমনের সহস্র বৎসরেরও অধিক পূর্বে, এক অতি উচ্চ দরের সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল, যে সভ্যতা তার নিজ নানাবিধ বৈশিষ্ট্যে জগতে ছিল অতুলনীয় আর একক। মানবমনের আর মানবকৃতিত্বের এক অপূর্ব বিকাশ দেখা যায় এই সভ্যতার মধ্যে। হিস্পানীয় বিজেতারা শক্তির গর্বে আর ধর্মের গোঁড়ামির অন্ধত্বের বশে এই সভ্যতাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছিল। স্থানীয় সুসভ্য অধিবাসীদের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ওরা হত্যা করে, অবশিষ্ট সকলকে প্রায় ক্রীতদাসের পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। জোর ক'রে তাদের রোমান কাথলিক ধর্ম নিতে বাধ্য করে, মন্দির ইমারত পুঁথি-পত্র শিল্পদ্রব্য যতদূর সম্ভব ধ্বংস ক'রে দিয়ে তাদের সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা করে। কিন্তু মেক্সিকোর লোকেদের একেবারে সম্পূর্ণরূপে মেরে ফেলতে পারে নি। তারা এখন তাদের অটুট প্রাণশক্তি নিয়ে বেঁচে র'য়েছে। মেক্সিকোর প্রাচীন স্থাপত্য ও অন্য কীর্তির প্রচুর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান র'য়েছে, আর দেশের অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদান ক'রছে। ঘটনা পরম্পরায় প্রাচীন মেক্সিকোর মানুষ আবার যেন নবকলেবর ধারণ ক'রে বেঁচে উঠছে। বিদেশাগত হিস্পানীয়দের সঙ্গে মিশ্রণ হ'য়ে এক নোতুন মিশ্র Hispano-Amerindian হিস্পানীয়-আমেরিণ্ডিয়ান, আর্য্য-মোঙ্গোল 'মেক্সিকান' জাতির উদ্ভব ওদেশে হ'চ্ছে, যে জাতি ভাষায় স্পানীয় হ'য়ে যাচ্ছে, ধর্মে আদিম মেক্সিকান ধর্মের রঙে রঙানো রোমান কাথলিক, আর জাতীয়তা-বোধে পুরাপুরি মেক্সিকান—আমেরিকান বা আমেরিণ্ডিয়ান, অথবা হিস্পানীয় নহে। এই অভিনব মিশ্রজাতির আবির্ভাব মেক্সিকোর আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার—এটী এখনও আমাদের চোখের সামনে ঘ'টছে। এই নবীন মিশ্রজাতির জীবনীশক্তির প্রমাণ আমরা দেখছি এদের শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যকলায়। এইসব কারণে বহুদিন ধ'রে প্রাণের এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, একবার মেক্সিকো দেশ চাক্ষুষ ক'রে আসবো।

আমায় আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্রের তুলনায় মেক্সিকো এমন আবিষ্ট করে যে, যদি আমাকে আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্র আর মেক্সিকো, এই দুই দেশের মধ্যে একটীতে মাত্র যাবার সুযোগ কেউ দিত, তাহ'লে আমি মেক্সিকোই ঠিক ক'রতুম। কারণ আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক কিছুই ওদেশে আমরা না গেলেও অল্পবিস্তর জানি। সংযুক্ত-রাষ্ট্র ইউরোপেরই একটা পদক্ষেপ মাত্র, মেক্সিকোর মতন আদিম আমেরিণ্ডিয়ান জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার অভিনবত্ব, সংযুক্ত-রাষ্ট্রে কোথায়? ইংরিজি ভাষা আর সাহিত্যের মাধ্যমে, সিনেমার দৌলতে, আমেরিকার ঘরের খবর জানতে আমাদের বাকী নেই। কিন্তু মেক্সিকো তার স্বকীয় গুণে, তার নিজের ইতিকথার রমন্যাসের জন্য আমাদের কাছে যেন অন্য গ্রহেরই রাজ্য। সেইজন্য বরাবরই মেক্সিকো সম্বন্ধে আমার দুরপনেয় আগ্রহ ছিল।

মেক্সিকো দর্শনের এই আগ্রহকে এবার আমেরিকায় পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হ'য়ে গিয়ে সেখানে প্রবাস করবার সময়ে কার্য্যে পরিণত ক'রবার সুযোগ আমার ঘটে। আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক্-এর Rockefeller Foundation নামক প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে আমি পুরো একটী মাস মেক্সিকোতে গিয়ে কাটিয়ে আসতে পারি। ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে মেক্সিকোর অনুরূপ সভ্যতা-বিষয়ক ইতিহাসের সাদৃশ্য আর সাম্য আছে। ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি আর বিকাশ সার্থকভাবে আলোচনা ক'রতে গেলে, এক পর্য্যায়ের মিশ্রজাতি আর মিশ্রসভ্যতার দেশ ব'লে মেক্সিকো দেখে আসতে পারলে আমার নিজের অনেকগুলি ধারণা আরও একটু পরিস্ফুট হ'তে পারে। রকেফেলার ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষদের কারো কারো সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলাপ হয়। তাঁরা এইভাবে তুলনামূলক সভ্যতার আলোচনাকে উৎসাহদানের উপযুক্ত বিষয় ব'লে মনে করেন। আর আমার ফিলাডেলফিয়া থেকে মেক্সিকো বিমানপথে যাতায়াতের আর মেক্সিকোতে এক মাস ধ'রে অবস্থানের আর ভ্রমণের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেন একটী থোক টাকা Subvention বা বিশেষ গবেষণার জন্য অর্থানুকূল্যরূপে আমায় দান করেন। এই Subvention-এর কোনও শর্ত তাঁরা রাখেন নি। এ'দের এই বিদ্যোৎসাহিতার জন্য আমি ঋণী। আর কৃতজ্ঞচিত্তে সে ঋণ স্বীকার ক'রছি।

আমার যাত্রার জন্য হাওয়াই জাহাজের যাতায়াতের টিকিট রকেফেলার ফাউণ্ডেশান থেকে আমায় কিনে দেন—প্লেনে ফিলাডেলফিয়া থেকে ওয়াশিংটন, সেখানে প্লেন বদলে ওয়াশিংটন থেকে Houston হাউস্টন (Texas টেক্সাস রাজ্যে), হাউস্টনে আবার মেক্সিকোগামী প্লেন ধ'রে সোজা মেক্সিকো শহর; তারপরে এক মাস মেক্সিকো শহরে আর অন্যত্র কাটিয়ে, মেক্সিকো থেকে প্লেনে Merida মেরিদা (Yucatan যুকাতান প্রদেশের প্রধান নগর), মেরিদায় থেকে মায়াজাতির প্রাচীন কীর্তি দেখে, আবার প্লেনে ক'রে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন।

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, বৃহস্পতিবার, আমার যাত্রার দিন স্থির হয়। তার আগে

২।৪ দিন ফিলাডেলফিয়াতে একটু বেশ ব্যস্ত থাকতে হয়। জিনিসপত্র গুছানো, বইটই সমস্ত দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। কারণ ঠিক এক মাস পরে ফিলাডেলফিয়াতে ফিরে মাত্র ২।৪ দিন তখন সেখানে থাকতে পারবো, তার পরেই দেশমুখো হ'য়ে আমায় পাড়ি দিতে হবে। আমাদের বাসায় রাম রেদ্দি ব'লে একটী তেলুগু ছেলে থাকত, চমৎকার ছোকরাটী; তার কাছে কিছু জিনিসপত্র জমা দিলুম, ধোবার বাড়ী থেকে আমার ময়লা কাপড় কাচিয়ে এনে সে-ই রেখে দেবে, এসব ঠিক ক'রলুম। ডাক্তার ভট্ট, ফিলাডেলফিয়ায় ডাক্তারী করেন, চল্লিশ বছর ধ'রে আমেরিকায় বাস ক'রছেন, ভারতীয় (বাঙালী) বিপ্লবী, আর তাঁর আমেরিকান্ স্ত্রী, এঁরা ফিলাডেলফিয়ার ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের বাপমায়ের মতন, ভারতীয় মাত্রেরই অকৃত্রিম সুহৃদ্, আমাকে একেবারে ছোট ভাইয়ের মত ডাক্তার ভট্ট গ্রহণ ক'রেছিলেন, এঁরা আমার বাক্স পেঁটরা কিছু কিছু রাখবার ভার নিলেন।

আগের দিন রাত্রে ফোনে ট্যাক্সিওয়ালাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, কথামত ঠিক ভোর ছ'টায় ট্যাক্সি এসে হাজির। আমি পূর্ব রাত্রেই মালপত্র গুছিয়ে রাখি, ভোর পাঁচটায় উঠে তৈরী হ'য়ে থাকি। রেদ্দির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা ক'রলুম। ফেব্রুয়ারির ১৮ই তারিখ, পুরো শীতকাল। দু'দিন আগে বেশ বরফ প'ড়েছে, রাস্তায় অনেক জায়গা শক্ত জমাট বরফে ঢাকা। ফিলাডেল-ফিয়ার বিমান-ঘাটী আমাদের বাসা থেকে বেশ একটু দূরে। ছ' মাস আমেরিকায় কাটানো গেল, এখানকার হাল-চাল একটু দেখে নেওয়া গেল। মোটের উপরে, আমেরিকা ভালই লেগেছিল। ফিরে এসে মাত্র ২।৫ দিন থাক্‌তে পারবো—দেশটার প্রতি একটু মায়া প'ড়ে গিয়েছে মনে হ'চ্ছিল।

পৌনে-সাতটার দিকে বিমানঘাটায় পৌঁছুলুম। তখন ভোরের আলো-আঁধারী, সূর্য্য ওঠেনি। দুজন একজন ক'রে অন্য যাত্রীরাও এসে জ'মছে। নিগ্রো পোর্টার বা কুলী, নীল-কালো উর্দী-পরা মাথায় ছাজা-ওয়ালা টুপী, যথারীতি ট্যাক্সি থেকে মাল তুলে নিলে, ঠেলাগাড়ী ক'রে যে হাওয়াই জাহাজ কোম্পানির প্লেনে ক'রে যাবো তার আপিসের সামনে নিয়ে এল'। প্রায় গোটা আটেক বিভিন্ন লাইন। আমাদের প্লেন আটটার পরে ছাড়বে, যেখান থেকে আসছে সেখান থেকে এখনও এসে পৌঁছায় নি, কাজেই অপেক্ষা ক'রতে হবে। সামনে খবরের কাগজ সচিত্র পত্রিকা আর নানা টুকি-টাকি জিনিসের দোকান। পথের সম্বল খানকতক সচিত্র কাগজ কেনা গেল। এক পাশে ছোট আপিস ক'রে বীমা কোম্পানির লোক — মেয়ে কেরাণী — ব'সে আছে। আমেরিকায় আজকাল বিমান-ভ্রমণের রীতি খুব বেশী ক'রে প্রচলিত হওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে জীবনবীমার রেওয়াজও বেড়ে গিয়েছে। বিমানযাত্রায় বিপদের সম্ভাবনা খুবই বেশী, অনেকে তাই বিমানযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে জীবনবীমা ক'রে নেন, এতে কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, দু মিনিটের মধ্যে বীমা হ'য়ে যায়—ফর্মে নাম-ঠিকানা, বিমানযাত্রার তারিখ নম্বর কোম্পানির নাম, টাকা পাবে কে তার নাম-ঠিকানা লিখে টাকা জমা দিলেই, জমা-দেওয়া এই প্রিমিয়মের অনুপাতে, কোনও বিপদ হ'লে, প্রাণ গেলে বা হাত-পা বা অন্য অঙ্গ গেলে, প্রাপ্য টাকা যার উদ্দেশ্যে বীমা করা হ'ল, বেঁচে থাকলে নিজে বা মারা গেলে অন্য কেউ, তারা তখনি পেয়ে যাবে। বীমা ক'রেই, সঙ্গে সঙ্গে যার সুবিধার জন্য বীমা করা হ'ল তার নামে একখানা ছাপা চিঠি তাতে বীমার সংখ্যা প্রভৃতি সব দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বিপদ ঘটলে টাকা প্রাপ্তির প্রমাণ-পত্র তার হাতে গিয়ে পেঁছয়। আমেরিকা gadget বা কলকব্জার দেশ, থাম-ডাক-বাক্সর মত স্বয়ংক্রিয় বীমা-সাধক যন্ত্র আছে তার একটা মুখে রূপোর টাকা (ডলার, বা আধা ডলার, বা অন্য টাকা) হিসাবমত ফেলে দিলেই, তদনুযায়ী টাকার বীমা-পত্র, ষ্টাম্প সমস্ত বেরিয়ে আসে, মায় খাম কাগজ আত্মীয়ের কাছে প্রেষ্য প্রমাণপত্র, ডাকটিকিট সব—সেগুলি ভ'রে লিখে দিয়ে আবার সেই থাম-বাক্সের ভিতরে ফেলে দিলেই হ'ল।

নিগ্রো কুলী যে আমার মাল নামালে সে যথাস্থানে মাল ওজন ক'রলে, তার পরে বিমান-কোম্পানির কেরাণী কখন আসবে তার অপেক্ষায় রইল। আমি গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগলুম। লোকটীকে দেখলুম, যুবক, খুব বুদ্ধিমানের মত মুখ, তার সঙ্গে আর একটী ছোকরা নিগ্রো তার সহকারীরূপে র'য়েছে। আমার এক ক্যাম্বিসের কাপড়ের ব্যাগের উপরে, চামড়ার মুখপাটায়, হাতের লেখায় ইংরিজিতে একদিকে আর দেবনাগরীতে অন্য দিকে, আমার নাম, পরিচয় সব লেখা ছিল—দেব-নাগরীতে "সুনীতিকুমার চাটুর্জ্যা, অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ভারত" আর ইংরিজিতে এর অনুবাদ। দেখলুম, নিগ্রো পোর্টার এই লেখা নজর ক'রে দেখছে। আমি মজা করবার জন্য জিজ্ঞাসা ক'রলুম, তুমি এই লেখা প'ড়তে পারো? সে ব'ললে, মশায়, আপনি ইণ্ডিয়া থেকে আসছেন, এ ইণ্ডিয়ান লিপি, আমি তো প'ড়তে পারি না। আমি ব'ললুম, এ হ'চ্ছে নাগরী লিপি, এতে ভারতের সরকারী ভারতীয় ভাষা হিন্দী লেখা হয়, আর সংস্কৃত ভাষাও লেখা হয়—সংস্কৃত ভাষার নাম শুনেছ? তখন আমাকে তাক্ লাগিয়ে দিয়ে এই নিগ্রো মুটিয়া বা ভারিয়া ব'ললে, হাঁ, ভারতের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত, ইউরোপের লাতীন আর গ্রীকের মত। আমি তাকে বললুম, বেশ, তুমি তো খুব ওয়াকিফ-হাল ছোকরা, নিশ্চয়ই তুমি কলেজে পড়ো? কলেজে বা কোনও অন্য বিদ্যালয়ে পড়ে, আর মুটেগিরি ক'রে বা অন্য ভাবে গায়ে খেটে অর্থসংস্থান করে, এটী আমেরিকায় খুবই সাধারণ। তখন ছোকরা আমায় ব'ললে, হাঁ সার, আপনি অধ্যাপক মানুষ, আপনি বুঝবেন, আমি কলেজের ছাত্র, ডাক্তারী পড়ি, অবসর কালে আমার বন্ধু আর আমি এই কুলিগিরি করি। তাদের নামের কার্ড দিলে আমায়;—দেব-নাগরীতে একদিকে ছাপা, আর একদিকে ইংরিজিতে, আমার নাম ধাম পরিচয় ইত্যাদি ছিল, আমার কার্ডও আমি ওদের দিলুম। নিগ্রো যুবকটির নাম Charles Harol Rodgers, তার সহযোগীর নাম Ferdinand A Johnson. এরা করে বেশীর ভাগ মুটিয়ার কাজ, কিন্তু দুজনে যেন এক firm চালাচ্ছে, নাম দিয়েছে Travel Bureau ভ্রমণসহায়ক প্রতিষ্ঠান; ব'ললে, মাঝে মাঝে তারা বিমানযাত্রার টিকিটও যাত্রীদের জন্য কিনে দেয়, তাতে একটু কমিশনও পায়। এই নিগ্রো যুবক, রজার্স-এর সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব আনন্দ পেলুম। যুবকটী নানা বিষয়ের খবর রাখে। অশ্বেতকায় জাতির মানুষদের জন্য ভারতের সহানুভূতির কথা জানে, ভারতকে শ্রদ্ধা করে সেজন্য। সাংস্কৃতিক জীবনের নানা কথা ব'ললে—Pattern of Life বা জীবনপদ্ধতি সর্বত্র এক হ'য়ে যাচ্ছে, ইউরোপের নকলে ভারতের বাইরেকার জীবনে পরিবর্তন হ'চ্ছে কিনা জানতে চাইলে। তার নিজের আকাঙ্ক্ষা, একবার সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আসবে, আর বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষ দেখে আস্‌বে।

কেরাণীরা ইতিমধ্যে এল, আমার সঙ্গের মালপত্র ওজন হ'ল, টিকিট ওরা দেখে দিলে, ব'ললে সওয়া আটটায় প্লেন আসবে, অপেক্ষা করুন। আমি নিগ্রো যুবকটীকে ট্যাক্সি থেকে মাল নামাবার মজুরী ২৫ সেণ্ট-এর বদলে ৫০ সেণ্ট বা আধ ডলার দিলুম। যুবক ব'ললে, এক কোয়ার্টার বা ২৫ সেণ্ট-ই হ'চ্ছে দস্তুর, আপনি তার ডবল দিচ্ছেন

কেন? আমি বললুম, তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে খুশী হ'য়েছি, তাই না হয় একটু বেশীই দিলুম। সে বললে, মশাই, আমিও তো আপনার সঙ্গে কথা কইতে পেয়ে উপকৃত হ'লুম, এ তো পরস্পরের আদান-প্রদানে লাভের কাটাকাটি হ'য়ে গেল —তবে হাসতে হাসতে ব'ললে, আমি পোর্টারের কাজ ক'রছি, বখশিশ পেলে "না" বলা রীতিবিরুদ্ধ—ধন্যবাদের সঙ্গে আপনার বখশিশ নিচ্ছি। দেবনাগরী আর ইংরিজিতে ছাপা আমার কার্ড পেয়ে খুব খুশী হ'য়ে সেটাকে রাখলে।

নিগ্রো যুবকটীর সঙ্গে হাওয়াই জাহাজ কোম্পানির কাউণ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছি, এমন সময়ে আমাদের সঙ্গে ঐ প্লেনেই এক পথের যাত্রী আরও দু'তিনটী লোক এসে জুটল। দুটো শ্বেতকায় ছোকরাও, বেকার জাতীয়, কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনতে লাগ্‌ল। মুখ ময়লা, ময়লা কাপড়-পরা, মুখে নেভানো সিগারেটের টুকরো মনে হ'ল যেন দাঁতে ক'রে চিবোচ্ছে—এরা অর্থহীন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ দৃষ্টিতে খানিক নিগ্রো যুবকটীর দিকে খানিক আমার দিকে তাকিয়ে চ'লে গেল। অন্য যাত্রীরা ব্যস্ত। খালি একটী লোক দেখলুম, নিজের টিকিট দেখিয়ে, সঙ্গের মালপত্রের মধ্যে একটী মাঝারি আকারের চামড়ার ব্যাগ ওজন করিয়ে তাতে টিকিট লাগিয়ে নিয়ে, আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনতে লাগল। শ্বেতকায় বেঁটে-খাটো মজবুত চেহারার মানুষটী হিন্দীতে যাকে "হট্টা-কট্টা" বলে, যেন আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় এই রকম একটু আগ্রহপূর্ণভাবে আমার দিকে চাইতে লাগ্‌ল। আমিও দুবার তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ক'রলুম, সেও সৌজন্য ক'রে আমার দিকে চেয়ে হাস্‌ল, আমিও হাসলুম। তার পরে ব'ল্‌লে, স্যর, আপনি ইণ্ডিয়ার লোক? আমি ব'ললুম, হাঁ, আমি ইণ্ডিয়ার লোক; ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে কৌতূহল আপনারও আছে দেখছি। সে ব'ললে—ব'ললে পরে আপনি বিশ্বাস ক'রবেন না, আমিও আসলে ইণ্ডিয়ার মানুষ। শুধালুম, কি রকম? ব'ল্‌লে, মশায়, আমি জাতে Gipsy জিপ্‌সি। তিনপুরুষ মাত্র আমরা আমেরিকায় এসেছি—আমার ঠাকুরদাদা ইংলাণ্ড থেকে সপরিবারে এসে এদেশে উপনিবিষ্ট হন, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, জিপ্‌সিরা কতদিন আগে কেউ জানে না ভারতবর্ষ থেকেই ইউরোপে আসে, আমাদের জাত ইউরোপের সব দেশে ছড়িয়ে আছে, আর কিছু কিছু লোক আমাদের ইউরোপের অন্য মানুষের সঙ্গে এদেশেও এসে গিয়েছে।

লোকটীর মুখে এই কথা শুনে ভারী খুশী হলুম। ইউরোপের জিপ্‌সিদের সম্বন্ধে অন্যত্র আমি কিছু কিছু লিখেছি। সম্ভবত দু' হাজার বছর আগে, উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ থেকে তখনকার দিনের প্রাকৃত ভাষা ব'লত এমন একটী ভারতীয় দল, দেশ ছেড়ে, কি কারণে জানা যায় নি, পশ্চিমের দিকে যাত্রা করে। এরা প্রথমে পারস্যে উপনিবিষ্ট হয়, এদের কিছু লোক কয়েক পুরুষ পরে পারস্য থেকে আরও পশ্চিমে, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, পালেস্তীনে আসে; তার পরে ধীরে ধীরে কয়েক পুরুষ আরও কাটিয়ে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিকে, গ্রীসে আসে। গ্রীসে এদের অনেকে এখনও র'য়ে গিয়েছে। গ্রীস থেকে ম্যাসিডোনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেখো-শ্লোভাকিয়া, হঙ্গেরি, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, তার পরে জরমানি আর ফ্রান্স হ'য়ে ওদিকে ইটালি আর স্পেন, পরে ইংলাণ্ড। এই দু' হাজার বছর ধ'রে, ইংলাণ্ডে এদের কোনও কোনও দল ছাড়া, প্রায় সর্বত্রই নিজেদের পুরাতন ভারতীয় ভাষা এখনও বজায় রেখেছে। এই ভাষা প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত, পাঞ্জাবী আর হিন্দীর ধরণের ভাষা। বিভিন্ন দেশের জিপ্‌সিদের ভাষার চর্চা হ'য়েছে। Paspati-র গ্রীসের জিপ্‌সির ব্যাকরণ, Miklosich-এর যুগোশ্লাভিয়ার জিপ্‌সির ব্যাকরণ, Sampson-এর ওয়েলস্‌-এর জিপ্‌সিদের ভাষার তুলনাত্মক ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (সংস্কৃত আর প্রাকৃত আর অন্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে) প্রভৃতি বেরিয়ে গিয়েছে, আর এর অনেকগুলি আমার দেখা বই। ভাষার দিক থেকে এরা আমাদের জ্ঞাতি। গ্রীসে এদের Athingoi বলে, মধ্যইউরোপে Tsigan, জরমানরা এদের বলে Zigeuner, স্পেনে বলে Zincali, আর ফ্রান্সে Bohemian; আর এক ভ্রান্ত ধারণার বশে, যে এরা আসলে মিসর বা Egypt-এর লোক, ইংরেজরা এদের Egiptian নাম দেয়; Egyptian শব্দের বিকারে Gipsy. এদের ভাষার দু' চারটে কথার নমুনা—Cahin tiro kher, পোলাণ্ডের জিপ্‌সী—কাঁহাঁ তেরা ঘর? Gurrala pani piava (স্পেনের জিপ্‌সী)=ঘোড়া-লাই (=ঘোড়াকো) পানি পিয়াও। ইংলাণ্ডের জিপ্‌সিরা তাদের ভাষা প্রায় সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে এখন ইংরিজি-ভাষী হ'য়ে গিয়েছে —ওয়েলস্‌-এ কিন্তু জিপ্‌সিরা এ বিষয়ে রক্ষণশীল। তবে অনেক ভারতীয় শব্দ তাদের ইংরিজির মধ্যে তারা ব্যবহার ক'রে থাকে, তাতে ক'রে সাধারণ ইংরেজের কাছে তাদের ভাষা বোধগম্য হয় না, আর জিপ্‌সিরা সাধারণ ইংরেজের কাছে একটু পৃথক্ একটু দুর্বোধ্য হ'য়েই থাকতে চায়। যেমন, I saw the man না ব'লে ইংলাণ্ডের জিপ্‌সিরা ব'লবে—I dicked the manchy —এখানে dick=দেখ্‌ manchy=মানুষ।

জিপ্‌সিরা ইউরোপের খ্রীষ্টান সমাজের বাইরে বাস ক'রত। এরা ছিল ভবঘুরে—হাঘরে' বা যাযাবর; বাড়ী-ঘর-দোয়ার ক'রে থিতু হ'য়ে কোথাও থাক্‌ত না। বড় বড় বাসের মত ঘোড়ার গাড়ী (আজকাল মোটর বাস হ'য়েছে এদের ঘোড়ার গাড়ীর বদলে),

তাকে ব'লত Caravan, তাইতে ঘর-সংসার নিয়ে, স্ত্রীপুরুষ, ছেলেমেয়ে সারা দেশে ঘুরে বেড়ায়। পেশা—মেয়েরা হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে, দৈবজ্ঞের কাজ করে; পুরুষেরা টিনমিস্ত্রীর, তৈজসপত্র মেরামতীর কাজ করে। আবার জঙ্গলে জানওয়ার-টানওয়ার হরিণ খরগোস চুরি ক'রে মেরেও খেত, ভেড়া গোরুও চুরি ক'রত। কোনও জায়গায় মেলা ব'সলে, জিপ্‌সিরা তাদের Caravan গাড়ী নিয়ে সেখানে হাজির হয়, তাঁবুতে fortune-teller বা ভবিষ্যৎ বলার দোকান সাজিয়ে বসে, ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয়েরা দুর্বোধ্য প্রাচ্যজাতির লোক ব'লে জিপ্‌সিদের ভবিষ্যদ্বাণী করবার ক্ষমতায় বিশ্বাস করে।

এই হ'ল জিপ্‌সি জীবনের পটভূমিকা। এরা এখন ইউরোপীয়দের সঙ্গে এক পর্যায়েরই হ'য়ে গিয়েছে। গায়ের রঙ এদের একটু ময়লা ধরণের ইউরোপীয়ের মত। চুল চোখের তারা কালো। এরা বড্ড সংগীতপ্রিয়। গান বাজনা নাচ না হ'লে এদের চলে না। মধ্যইউরোপে, স্পেনে, সর্বত্রই ঐসব দেশের গ্রাম্য উৎসবে জিপ্‌সি বাজিয়ে না হ'লে চলে না। আমি জানতুম যে ইংলাণ্ডের জিপ্‌সিরা অনেক সময়ে ইংরিজি পদবী নিচ্ছে—Boswell এই পদবীর মধ্যে অন্যতম। আমি এই জিপ্‌সি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলুম—আপনারা এখানে কি ইংলাণ্ডের মতন পূর্বেকার পেশাই বজায় রেখেছেন? আপনার পদবী কি Boswell? Boswell পদবীর কথা শুনে মহা খুশী—ব'ললে, মশাই, আপনি তো অনেক কিছু আমাদের জানেন দেখছি—আমার পদবী হ'চ্ছে Boswell—নাম আমার Thomas Boswell। ব'লে একখানা খবরের কাগজ থেকে কাটা বিজ্ঞাপন দেখালে—পেশা, ভবিষ্যদ্বাণী করা। ব'ললে, আর সেকালের মত গাড়ী ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে বেড়ানো পোষায় না। আমরা এখন এক এক শহরে ব'সে, আপিস মতন ক'রে সেখানে ব'সে ব'সেই লোকের হাত দেখে দু' পয়সা উপার্জন করি। জানেন তো, মানুষের সনাতন দৌর্বল্য আছেই, তারা আসে মানসিক শান্তি পাবার জন্য দু'টো আশার কথা শুনে, আমরা তাদের আশার বাণীই দিয়ে থাকি, তাতে তারা খুশী হয়, দু' পয়সা খরচও করে, আমাদেরও চ'লে যায়। খালি চলে যায় না মশায়, আপনি ভারতীয়, প্রায় আমাদের স্বজাতি, আপনাকে ব'লতে বাধা নেই—বেশ ভালই চ'লে যায়। কিন্তু মশাই, আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য আর থাকবে না, আর ২।৩ পুরুষ পরেই আমেরিকানদের সঙ্গে আমরা কালোরা (জিপ্‌সিরা নিজেদের ভাষায় নিজেদের বলে Kalo কালো, আর Romani রোমানি—শেষোক্ত নামটী, তারা এক সময়ে যে রোমক সাম্রাজ্যের অধীন ছিল তারই স্মৃতি বহন ক'রে আছে) মিশে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাবো। এই দেখুন না, এখনই আমাদের অনেক জমীজেরাৎ ঘরবাড়ী ক'রে পাকা ঘরবাসী হ'য়ে যাচ্ছে। তবে যতদিন আমাদের এই হাত-দেখা ব্যবসা বাপপিতামহের পেশা হিসাবে আর লাভের পেশা হিসাবে আমরা চালাবো, ততদিন আমরা ঠিক থাকবো।

লোকটীর সঙ্গে আলাপ করে এইসব কথা জানলুম। সে আরও ব'ললে, আমেরিকার নানা শহরে তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী আর নিকট আত্মীয়েরা ছড়িয়ে আছে। সে নিজে নিউইয়র্কে থাকে, তার স্ত্রী দক্ষিণে নিউ-অর্‌লিয়ান্স-এ একটি হাতদেখার আড্ডা খুলে আছে। ব'ললে, লেখাপড়া জানা আমেরিকানরা বাইরে তাদের এই পেশা দিয়ে ঠাট্টা করে, তাদের "চোর জুয়াচোর ঠগ" অপবাদ দেয়, কিন্তু একটু ঠেকায় প'ড়লে তারাও আসে। লুকিয়ে চুরিয়ে হাত দেখিয়ে যায়, স্ফটিকের গোলার সাহায্যে ভবিষ্যতের খবর নিয়ে যায়। টমাস বসওয়েল মাঝে মাঝে হাওয়াই জাহাজ ক'রে নানা শহরে ঘোরে, নিয়মিতভাবে নিউ-অর্‌লিয়ান্স-এ তার স্ত্রীর কাছেও যায়। এখন সে সেখানেই যাচ্ছে, আমায় ওয়াশিংটন শহরে প্লেন বদল ক'রতে হবে—সে সোজা আর দক্ষিণে এই প্লেনেই নিউ-অরলিয়ান্সের দিকে যাবে।

আমাদের প্লেন এসে গেল। প্রায় ৪।৫ জন যাত্রী এখানে আমাদের প্লেন থেকে নামলে, আমরাও প্রায় ৫।৬ জন যাত্রী ছিলুম, সকলে হাতব্যাগ নিয়ে প্লেনে উঠে ব'সলুম। Flight 515—৫১৫ সংখ্যার বিমান-যাত্রা। আটটা পঁচিশে যাত্রা ক'রে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা প্রথম অবতরণ-স্থান ওয়াশিংটনে পৌঁছুলুম। বসওয়েল খুব হৃদ্যতার সঙ্গে হাত ঝাঁকি দিয়ে বিদায় দিলে। ব'ললে ভবিষ্যতে যদিও কোথাও আবার দেখা হয়, খুশী হবে। আমার কার্ড একখানা চেয়ে নিলে। ওয়াশিংটন হাওয়াই জাহাজের আড্ডা থেকে আমেরিকায় ভারতের রাজদূত শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন, আই-সি-এস আমার ভূতপূর্ব ছাত্র, তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা কইলুম। বিনয়রঞ্জন এক সঙ্গে আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্র আর মেক্সিকো এই দুই দেশের ভারতীয় রাজদূত। তিনি আমার মেক্সিকো পৌঁছুবার দু'দিন পরে সস্ত্রীক মেক্সিকোতে উপস্থিত হবেন, মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ভারতের প্রতিনিধিরূপে প্রথম সাক্ষাৎ ক'রে আসবেন। আমার যাত্রার কথা তাঁকে জানিয়ে দিলুম।

দশটা প'য়ত্রিশ মিনিটে আমাদের নূতন প্লেন ছাড়্‌ল। Flight 501 ৫০১-এর যাত্রাপথ। Texas টেক্সাস রাজ্যের Houston হাউস্টন শহরে আমার নামতে হবে, সেখান থেকে অন্য প্লেনে সোজা মেক্সিকো। বিকালবেলা সেখানে পৌঁছুলুম। পথে নীচে আমেরিকার বিরাট বিশাল তিনটী নদী দেখা গেল—Tannessee, Mississippi আর Red River. আমেরিকার এই অঞ্চলটা সমতল ক্ষেত্রময়। Houston হাউস্টন-এ নামলুম অল্পক্ষণের জন্য। আমরা Gulf of Mexico মেক্সিকো উপ-সাগরের উপর দিয়ে খানিক চ'লে সোজা মেক্সিকো শহরে গিয়ে নামবো। হাউস্টন-এ আমাদের মেক্সিকোগামী অন্য নোতুন প্লেন তৈরী ছিল, বেশী দেরী হ'ল না প্লেন ব'দলে উঠতে। পাসপোর্ট নিয়ে কোনও ঝঞ্ঝাট পোহাতে হ'ল না। হাউস্টন আমেরিকার নিগ্রো অধ্যুষিত দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্য—এখানে বর্ণবৈষম্য খুবই বেশী। হাওয়াই জাহাজের আড্ডায় নিগ্রো বিস্তর দেখলুম, কিন্তু তাদের মর্য্যাদা নেই, শ্বেতকায়দের সম্মান আগে। মুখ হাত ধোবার জায়গা শৌচাগার নিগ্রোদের জন্য পৃথক্, শ্বেতকায়দের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তাদের প্রবেশ নিষেধ; যথাস্থানে এই ভাবের ধাতু বা কাষ্ঠফলকের উপরে বিজ্ঞাপন লেখা—For Whites only—For Coloured Men, For Coloured Women—এ বিষয়ে ভীষণ কড়াকড়ি এই দক্ষিণের সংযুক্ত-রাষ্ট্রে। পরে এ বিষয়ে আরও অভিজ্ঞতা হয়।

হাউস্টন থেকে বোধ হয় ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে নির্ব্বিবাদে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমাদের প্লেন এল মেক্সিকোতে। এখানে পাসপোর্ট আপিসে কোনও রকম অনাবশ্যক দেরী হ'ল না। মনে একটা বেশ আনন্দ হ'ল—কতদিনের আকাঙ্ক্ষিত মেক্সিকো দেশে আজ সশরীরে অবতীর্ণ হ'লুম! নোতুন নোতুন অভিজ্ঞতার জন্য উৎসুক হৃদয়ে মেক্সিকোর মাটিতে পদার্পণ ক'রলুম। এক মাসের জন্য মেক্সিকো প্রবাস চ'লবে—সানন্দ-হৃদয়ে মেক্সিকো মহানগরীর মধ্যে পূর্ব-নির্দিষ্ট হোটেল—নগরের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত Hotel Plaza প্লাসা হোটেলে গিয়ে ওঠবার জন্য ব্যবস্থা ক'রতে লাগলুম।

থির বিজুরি

চিত্রা রায়ের স্বামী নিখিল রায়। লোকে বলে, হ্যা, তা তো বটেই। বিয়ে যখন হয়েছে তখন স্বামী না ব'লে আর উপায় কি? কিন্তু আসলে নিখিল রায় হলো একটা সাইফার।

মাত্র চার বছর হলো বিয়ে হয়েছে নিখিলের। আর বিয়ের মাত্র এক মাস পরেই নিখিলের সঙ্গে চিত্রা যেদিন ধানবাদের কাছে এই কলোনীতে কেরাণী কোয়ার্টার্সের এই ছোট বাড়িটার ভেতরে এসে ঢুকলো, সেদিন অবশ্য কলোনীর সকলেই বলেছিল, হেড-ক্লার্ক নিখিল রায়ের বউ এসেছে, বড় সুন্দর বউ।

নিখিল রায়ের স্ত্রী বেশ সুন্দরী, সংবাদটা রটে যেতে বেশি দেরী হয়নি। অফিসেও কাজের ফাঁকে নানা মুখের খোসগল্পের মধ্যে মাঝে মাঝে এই প্রসঙ্গটা ঝিলিক দিয়ে উঠতো। বাস্তবিক, সত্যিই নিখিল রায় একটা বিদ্যুৎ নিয়ে এসেছে।

—আনলো কোথা থেকে?

যারা জানে তারাই উত্তর দেয়—কলকাতা থেকে।

—কলকাতার দয়া তো খুব, এমন জিনিস এমনিতেই ছেড়ে দিল?

সুবোধ ঘোষ

—এসব তো ভাই দয়া-টয়ার ব্যাপার নয়। এসব হলো ভাগ্যির ব্যাপার। খুব ভাগ্যি করেছিল নিখিল রায়।

সেদিন হেড ক্লার্ক নিখিল রায়ের ভাগ্যকে অফিসের খোসগল্পগুলি হিংসে করলেও নিখিল রায়ের ভাগ্য তাতে একটুও বিচলিত হয়ে ওঠেনি। পথে বেড়াতে বের হতো নিখিল আর চিত্রা। যারা নিখিলকে চেনে, কিন্তু চিত্রাকে কখনো দেখেনি, তারাও দেখেই বুঝে ফেলতো, এই সুন্দরী মহিলাই হলো হেড ক্লার্ক নিখিল রায়ের স্ত্রী।

আর দু' মাস যেতে না যেতেই সারা কলোনীতে আর একটা সংবাদ রটে গেল খুব ভাল ক'রেই এবং তার পর কলোনী ছাড়িয়ে ধানবাদেরও নানা মহলে, আসরে, কোয়ার্টারে। বেশ সুন্দর গলা, খুব ভাল গান গাইতে পারে হরিনগর কলোনীর এক নিখিল রায়ের স্ত্রী।

—কি নাম যেন ভদ্রমহিলার?

যারা শুনেছে নাম, তারাই উত্তর দেয়,—নাম হলো চিত্রা রায়।

গানের খ্যাতির সংগে সংগে চিত্রা রায় নামটাও খ্যাত হয়ে গেল।

তারপর, চারটি মাস যেতে না যেতে নানা জলসা ও সভা-সমিতির আহ্বানে আসতে আসতে আর উদ্বোধন সংগীত গাইতে গাইতে চিত্রা রায়ের মুখটাও চিত্রিত হয়ে গেল ছেলেমহল আর মেয়েমহল থেকে সুরু ক'রে শিশুমহলের মনে মনে। পথে চিত্রা রায় যদি একাই বেড়াতে বের হয়, তবুও কেউ আর চিনতে ভুল করে না। —ঐ, উনিই হলেন চিত্রা রায়, নিখিল রায়ের স্ত্রী চিত্রা রায়।

সেদিন এই রকমই ছিল চিত্রা রায়ের পরিচয়। সে পরিচয় নিখিলের নামের সংগেই বাঁধা। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই উল্টে গেল সেই পরিচয়।

সন্ধ্যাবেলা মার্কেটের আলোয় ঝলমল একটা দোকানের ভেতরে এসে দাঁড়ায় চিত্রা। জিনিসের দাম নিয়ে দরদস্তুর করে চিত্রা, আর নিখিল দাঁড়িয়ে থাকে চিত্রার পাশে। দোকানের কাঁচের ওপর চিত্রা রায়ের সুন্দর চেহারার প্রতিচ্ছায়া ঝকমক করে।

দোকানের ভেতরেই হোক, আর দোকানের বাইরে পথের ওপরেই হোক, চিত্রাকে আর নিখিলকে দেখতে পেয়ে লোকের মুখে আলোচনা চলে।—ঐ ভদ্রলোক কে মশাই?

—ঐ তো, উনিই হলেন চিত্রা রায়ের স্বামী নিখিল রায়। সরকার এন্ড সিন্হার হেডক্লার্ক নিখিল রায়।

এক বছরের মধ্যেই উল্টে গেল পরিচয়। চিত্রারই নামের ছায়ায় ঘুরে বেড়ায় নিখিলের নাম। চিত্রাই হলো আসল অস্তিত্ব, আর তার পাশে আছে নিখিল। চিত্রার নামের গৌরবই মানুষ ক'রে রেখেছে নিখিলকে।

তবু তো মানুষ হয়েই ছিল, আর চিত্রার পাশেই ছিল নিখিল। কিন্তু এক বছর আগের সেই পরিচয়ও একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল আর তিন বছরের মধ্যে। তাইতো আজ লোকে বলে, নিখিল রায় একটা সাইফার।

চিত্রার পাশে আর নেই নিখিল। এখন চিত্রার পিছনে পড়ে গিয়েছে নিখিল। সিনেমা দেখতে, বেড়াতে, সভা-সমিতিতে বা মার্কেটে, যেখানে যখন যায় চিত্রা, তখন নিখিল তার সংগে সংগেই থাকে, কিন্তু পেছনে। নিখিলের সংগে যখন কথা বলে চিত্রা, তখন পেছনে মুখ ফিরিয়ে তাকাবারও কোন দরকার হয় না চিত্রার। চিত্রা যেন তার সম্মুখের পথের বাতাসকে উদ্দেশ্য ক'রেই কথা বলে,—সংগে টাকা এনেছ তো?

ঠিক শুনতে পায় নিখিল। শুনতে একটু ভুলও হয় না। সংগে সংগে উত্তর দেয়—এনেছি।

এতদিনে ধানবাদের কাছে এই হরিনগরে এসে চার বছরের মধ্যেই চিত্রা তার জীবনের সম্মুখের পথ একেবারে অবাধ ক'রে নিয়েছে। অথচ, চার বছর আগে একদিন এক সকালবেলায় হরিনগর কলোনীর সব বাড়ির জানালাগুলিতে থরে থরে সাজানো কৌতূহলী চক্ষুগুলি দেখতে পেয়েছিল, হেডক্লার্ক নিখিল চলেছে আগে আগে, আর তার পেছনে মাথা হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে হেঁটে চ'লছে বড় সুন্দর ও শান্ত আর একটু গম্ভীর একটি মুখ নিয়ে একটি বউ। আর আজ? আজ আর সেই বউ-এর মুখটি দেখতে ঠিক সেই রকম শান্ত তো নয়, আর সেই একটু গম্ভীরতার একটুও আজ আর নেই। বউ-এর মাথার কাপড় যেন এই চার বছরের মধ্যেই কোন্ এক ঝড়ের ঝাপটা লেগে খসে পড়ে গিয়েছে ঘাড়ের উপর। পড়েছে তো পড়েই গিয়েছে, আর উঠতে পারছে না। আজ চিত্রা রায়ই চলে আগে আগে, আর নিখিল পেছনে।

পেছনে হোক, তবু তো চিত্রার সংগেই আছে নিখিল। তবে লোকে বলে কেন, একেবারে সাইফার হয়ে গিয়েছে নিখিল?

লোকে বলতে একটু ভুল করেছে। সামান্য একটু বাড়িয়ে বলেছে। সত্যি কথা হলো, সাইফার হয়ে যেতে চলেছে নিখিল। আর আজ অফিস যাবার সময় যখন চিত্রার হাত থেকে একটা চিঠি সচ্ছন্দে হাত বাড়িয়ে নিয়েছে নিখিল, তখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, এইবার সত্যিই সাইফার হয়ে যাবে নিখিল।

অফিস যাবার জন্য তৈরী হয়ে প্রতিদিনের নিয়মের মত চিত্রার কাছে এসে দাঁড়ায় নিখিল,—তাহ'লে আসি।

চিত্রা বলে—শোন।

খামে বন্ধ একখানি চিঠি রয়েছে চিত্রার হাতে। হয়তো পোস্ট করতে হবে এই চিঠি। নিখিল বলে—চিঠি পোস্ট করতে হবে?

চিত্রা—না।

নিখিল—তবে?

হাত কাঁপে না চিত্রার, বোধ হয় মনও কাঁপে না। শুধু অন্যমনস্কের মত অন্য দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে। তারপরেই প্রশ্ন করে—ভুল করবে না তো?

নিখিল—ভুল হবে কেন? কি এমন কঠিন কাজ করতে বলছো যে ভুল হবে?

চিত্রা—তবে শোন।

বলতে গিয়ে চিত্রার গলার স্বরও একটুও কাঁপে না।

নির্দেশের প্রতীক্ষায় ব্যগ্রভাবেই চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিখিল। কিন্তু চিত্রা তাকায় না নিখিলের মুখের দিকে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? এটা নতুন কিছু নয়। আজ চার বছরের মধ্যে এই ঘরের ভেতর ক'দিনই বা নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়েছে চিত্রা? আর তার জন্য কোন দুঃখ ও দুশ্চিন্তা জাগেনি নিখিলেরও মনে। আজ নতুন করে হঠাৎ জাগবারও কথা নয়।

চিত্রা বলে—তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই বলছি।

নিখিল হাসে—আমাকে বিশ্বাস করবে না তো কা'কে করবে?

নিখিল একটু আশ্চর্যই হয়। আজ একেবারে এরকম নতুন একটা প্রশ্ন কেন করছে চিত্রা? আজ পর্যন্ত তার ব্যবহারে এমন কোন ভুল কি দেখতে পেয়েছে চিত্রা, যার জন্য বিশ্বাসের কোন কথা উঠতে পারে? মনে তো পড়ে না নিখিলের, কখনো একটা প্রতিবাদ করে, কোন অভিযোগ করে কিংবা কোন কথায় উত্তর দিতে একটু দেরি ক'রে চিত্রার মনে কষ্ট দিয়েছে নিখিল।

চিত্রা বলে—তবে, এই চিঠিটা নিয়ে......।

বলতে গিয়ে কেন জানি চুপ ক'রে যায় চিত্রা। বিদ্যুৎ খেলে যায় যে সুন্দর চোখের দৃষ্টিতে, সেই চোখ দুটো যেন হঠাৎ একটা ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়।

কিন্তু তার পরেই আর কিছু নয়। ঝক্-ঝক্ ক'রে চিত্রার চোখ দুটো।

চিত্রা বলে—এই চিঠিটা নিয়ে গিয়ে মিস্টার সরকারের হাতে দিতে হবে।

নিখিল—দেব।

চিত্রা—মিস্টার সরকারের টেবিলের ওপর ফেলে রেখে আসলে চলবে না।

নিখিল—না, তাঁর হাতেই দেব।

চিঠি নিয়ে চলে গেল নিখিল। এইবার, আর বেশি দেরি হবে না। বোধ হয় আজ সন্ধ্যে ফুরোতে না ফুরোতে সত্যি সাইফার হয়ে যাবে নিখিল।

প্রস্তুত হয় চিত্রা— সন্ধ্যে আসতেই বা আর কতক্ষণ! চিঠি নিয়ে চলে গিয়েছে নিখিল, আর চিত্রা জানে, ও চিঠি খুলে পড়বার জন্য মনে একটু কৌতূহলও জাগবে, সেরকম কোন সন্দেহের বস্তু দিয়ে তৈরীই নয় লোকটা। আর যদি কৌতূহল হয়, আর চিঠিটা পড়ে নিখিল তবুও কি কিছু বুঝবে বা মনে করতে পারবে ঐ মানুষ? কখনই না। 'ভেবে দেখলাম, আপনি আমার আপন-জনের চেয়েও বেশি। আমি যাব।'—এইটুকু পড়ে কি-ই বা বুঝবে, আর বুঝেই বা কি করতে পারে নিখিল? এতদিন ধরে সবই দু' চোখে দেখেও যে কিছু বোঝেনি, সে আর ঐ সামান্য কয়েকটা লেখা কথা পড়ে আর কি বুঝবে?

আর বুঝলেই বা। নিখিল চিত্রার সম্মুখ পথের বাধাই যে নয়। বাধা না হয়েই সে ধন্য হয়ে আছে। বাধা দেবে না নিখিল, বাধা দিতে জানে না নিখিল।

নিঃশব্দে স্থির হয়ে ঘরের ভেতর একা দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে ঝক্ ঝক্ ক'রে চিত্রার চোখ, দুরন্ত বিদ্যুতের জ্বালার মত সেই বেদনাটাই মনের ভেতর ছটফট ক'রে ওঠে। চার বছর আগে হঠাৎ বাড়ির লোকের এক নিষ্ঠুর ঝোঁক আর সদিচ্ছার আঘাতে যেদিন চূর্ণ হয়ে গেল তার মনের স্বপ্ন, সেই দিনটার কথা আজও জ্বলছে তার মনের মধ্যে। সেদিনের আক্ষেপ, আর ঘৃণা একসঙ্গে মিলে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল তার জীবনের একমাত্র একটা কল্পনার বুকে, সেই ক্ষতের জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই অশান্ত হয়ে রয়েছে জীবন। কে বলেছিল ওরকম না বলে-কয়ে আর হঠাৎ ধরে-বেঁধে একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। কি দরকার ছিল? আর যদি বিয়েই দেওয়া হলো, তবে চিত্রার মত মেয়ের জন্য পৃথিবীতে কি আর কোন মানুষ ছিল না? যেন আড়ালে আড়ালে হঠাৎ একটা ষড়যন্ত্র এ'টে ফেললেন জেঠামশাই, আর জেঠাই মা। একটি বারের মত একটি কথাতেও কোন আভাস দিলেন না যে, বাপ-মা মরা মেয়েকে পার ক'রে দেবার জন্য তাঁরা একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন। যদি বিয়ের পিঁড়িতে বসবার এক মিনিট আগেও বুঝতে পারতো চিত্রা, ধানবাদের কাছে এক দেশী কোম্পানীর এক ক্লার্ক এসেছেন বরের সাজ পরে, তবে পৃথিবীতে কারও সাধ্য ছিল না যে, চিত্রাকে সেই পিঁড়ির ওপর বসিয়ে দিতে পারে। সেদিনই সেই মুহূর্তে জেঠামশাইয়ের সব চক্রান্তের উৎসব ভেঙে দিত চিত্রা, যেমন ক'রেই হোক্।

সেই সন্ধ্যাতে লগ্ন ঘনিয়ে আসবার একটু আগে বরং মিথ্যে কথাই বলেছিলেন জেঠাই মা। ছেলে নাকি খুব ভাল ছেলে, যে শুনেছে এই সম্বন্ধের কথা সে-ই নাকি খুশি হয়েছে।

চিত্রা জানে, কেন এমন কাণ্ড করলেন জেঠামশাই, জেঠাই মা আর, আর সকলেই। লোকের অভিযোগ শুনতে শুনতে আর ভয় পেয়ে পেয়েই এরকম একটা ষড়যন্ত্র করে ফেললেন জেঠামশাই। —এ মেয়েকে বেশি দিন ঘরে পুষে রাখবেন না ধীরেনবাবু। বন্ধুদের আর প্রতিবেশীদের এই অভিযোগের ভয়েই সারা হয়ে গেলেন জেঠামশাই আর জেঠাই মা। তাঁরা যদি বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত না হয়ে উঠতেন, তবে কোন ক্ষতি হতো না কারও। জেঠামশাইয়ের না, প্রতিবেশীদেরও আর আত্মীয়দেরও না। আর চিত্রারও না। চিত্রা নিজেই পৃথিবীতে খুঁজে নিত তার জীবনের সঙ্গী।

বেশি খুঁজতে হতো না চিত্রাকে। পারুল আর প্রীতির মত মেয়ে যখন নিজের চেষ্টায় মনের মত সঙ্গী খুঁজে নিতে পেরেছিল, তখন চিত্রাই বা পারতো না কেন? কিন্তু চিত্রার মনের আশা ও কল্পনাগুলিকে সেটুকু সুযোগও দিলেন না জেঠামশাই।

সুযোগ বড় বেশি ক'রেই আসছিল, তাই তো দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়লেন জেঠামশাই। অদ্ভুত মন ও'দের। চিত্রার বাক্স নানারকম সনামী আর বেনামী চিঠিতে ভরে উঠলো যে! শুনতে পেয়ে আর জানতে পেরে আতঙ্কিত হলেন জেঠাই মা। কিন্তু সে কি চিত্রার অপরাধ? চিত্রা কি জীবনে কোনদিন চেয়েছিল এই সব চিঠি। চিত্রার সুন্দর মুখ দেখে মানুষ যদি পাগল হয়ে যায়, যে দোষ চিত্রার নয়। বরং, জেনে নিশ্চিন্ত হওয়াই উচিত ছিল জেঠাই মা'র কোন চিঠিরই উত্তর দেয়নি চিত্রা। কারণ চিঠিদাতাদের কাউকেই একটা মানুষ ব'লে মনে করতে পারেনি চিত্রা।

বিয়ের পর হরিনগরের এই কলোনীতে প্রথম এসে চুপ করে বসে ভাবতে ভাবতে একদিন হেসেই ফেলেছিল চিত্রা, সেইসব চিঠির মানুষগুলি যে এই হেডক্লার্ক ভদ্রলোকটির চেয়ে অনেক অনেক বড় মানুষ। আজ তারা হয়তো মুখ টিপে হাসছে। শুনে অবাক হয়ে গিয়েছে পারুল আর প্রীতি, শেষে এটা কি একটা কাণ্ড করে বসলো চিত্রা! সন্দীপের মত এত গুণের রূপের ও টাকার মানুষ, এত বড় একজন চীফ অফিসরের ব্যাকুলতাও যে চিত্রার মন টলাতে পারেনি, সেই চিত্রা বিয়ে করেছে এক দেশী কোম্পানীর বড় কেরাণীকে, যার মাইনে দুশো টাকা। প্রেম হলে না হয় বোঝা যেত। কিন্তু প্রীতি আর পারুল জানে, চিত্রা কি সেই মেয়ে যে প্রেমের আবেগে কাঙালের গলায় মালা দেবে। যে-সে একটা লোকের মুখ দেখে মনে প্রেম জাগবে, এমন মনই করেনি চিত্রা।

চার বছর আগে চিত্রার জীবনের আকাঙ্ক্ষা যে ব্যথা পেয়েছিল, সেই ব্যথা মিটে যেতে পারেনি এক মুহূর্তের মতও, বরং দিন দিন আরও অস্থির, আরও উন্মত্ত এবং আরও দুঃসাহসে শাণিত করে তুলেছে চিত্রার সংকল্প।

জীবনে কি চেয়েছিল চিত্রা? আজ এখন নিজের মনকে পরীক্ষা করলে, আর স্মৃতি সন্ধান করলে ঠিক বুঝতে পারবে না চিত্রা, বিয়ের আগে কি-ধরণের সুখী জীবন কামনা করেছিল চিত্রা। আজ শুধু মনে হয়, এই কলোনীরই মালিক সরকার এণ্ড সিন্‌হা কোম্পানীর বার আনা স্বত্বের অধিকারী বিনায়ক সরকারের মত মানুষের পাশে যদি ঠাঁই পাওয়া যেত, তবে ধন্য হতো আর সুখী হতো চিত্রার জীবন।

তবে কি বিনায়ক সরকারের টাকার পুঁজির পরিচয় জানতে পেরে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে চিত্রা? না, ঠিক টাকার জন্য তো নয়। বিনায়ক সরকারের চেয়ে বেশি টাকার মানুষ কি ধানবাদের এই বিরাট কয়লা আর শিল্প রাজ্যের কোন অট্টালিকার মধ্যে নেই? টাকার জন্য নয়। বিনায়ক সরকার শুধু টাকার জন্যই বড় মানুষ নয়। বিনায়ক সরকার বড় সুন্দর ও বড় উজ্জ্বল এক বড় জীবনের মানুষ। ঐ রকমই এক জীবনের আলো হাসি ও উল্লাসের মধ্যে দাঁড়াবার জন্য চিত্রার মন স্বপ্ন দেখে এসেছে। নইলে বড়মানুষ তো কত রকমেরই আছে।

কিন্তু বিনায়ক সরকারের মত মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা, জানে না চিত্রা। আজ মনে হয়, এই মানুষটি তাঁর প্রসন্ন জীবনের সকল দীপ্তি নিয়ে এইখানে যেন চিত্রার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। সরকার এণ্ড সিন্‌হার বার আনা মালিক, এতগুলি ফ্যাক্টরী যার দৌলত সৃষ্টি করেছে দিনরাত, সেই মানুষও স্পষ্ট মুখ খুলেই মনের বেদনা প্রকাশ করেছে চিত্রারই কাছে, এইসব দৌলতই সার্থক হতো, যদি চিত্রার মত মেয়ের ভালবাসার একটু ছোঁয়া লাগতো তার জীবনে।

তাই জীবনে যাকে দেখে, আর যাঁর মুখের হাসি আর ভাষা শুনে প্রথম মুগ্ধ হয়েছে চিত্রা, তারই কাছে চিঠি দিল এই প্রথম। বিনায়কের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পরেও তিনটি বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু বিনায়কের আহ্বানে এত স্পষ্ট ভাষায় সাড়া দিতে পারলো চিত্রা, এই প্রথম।

চিঠি দিতে হাত কাঁপবার কথা নয়।

চিত্রার হাতের সব দ্বিধা ও ভীরুতা মুছে গিয়েছে অনেক দিন আগেই। বিনায়কের গাড়ি আসবার আগে যে হাত দিয়ে নিজেকে এতদিন সাজিয়ে এসেছে চিত্রা, সে হাত আজ একটা চিঠি দিতে কাঁপবে কেন? শুধু একবার নিঃশ্বাসটা কেমনতর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেন, কিসের জন্য? চিত্রা নিজেই জানে না, কেন।

নিশ্চয়ই নিখিলের কথা ভেবে নয়, যে নিখিল চিত্রার জীবনে একটা অস্তিত্বই নয়। বোধ হয় বিনায়কেরই কথা ভেবে। স্ত্রী আছে বিনায়কের, বিবাহিতা স্ত্রী। সেই স্ত্রীকে বর্জন করবার সাধ্য নেই বিনায়কের। বিনায়কই বলেছে, এইখানেই তার জীবনের দুঃখ একটু জটিল ও গ্রন্থিল হয়ে গিয়েছে। বিনায়কের স্ত্রী মৃদুলা সরকার জীবনে স্বামী ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সে এক অদ্ভুত বিস্ময়ের নারী। দশ বছর হলো বিয়ে হয়েছে বিনায়কের, ইওরোপ থেকে ফিরে আসার পরেই। বোম্বাইয়ের এক হোটেলে প্রথম দেখা হয়েছিল বিনায়কের সঙ্গে মৃদুলার। সেই যে দেখা, সেই দেখাই মৃদুলার জীবনের পরিণাম রচনা করে দিল। মৃদুলার ভালবাসা বুঝতে সেদিন যদি ভুল করতো বিনায়ক, তবে আজ আর পৃথিবীতে থাকতো না মৃদুলা। এ কাহিনী নিজেই চিত্রার কাছে অকপটভাবে বলতে কোন কুণ্ঠা হয়নি বিনায়কের। মৃদুলা নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসার সম্পদ ব'লে মনে করে বিনায়ককে। সেই মৃদুলাকে অস্বীকার করবার মত শক্তি নেই, আর সে-রকম নির্মম হবার মতও শক্তি নেই বিনায়কের। তাই... তাই বিনায়কের সেই ইচ্ছাই ভাল। বিনায়কের ইচ্ছাই জীবনে বরণ করে নিতে আজ আর মনের মধ্যে কোন কুণ্ঠা নেই চিত্রার। বিনায়কের শুধু একজন আপন-জন হয়ে যাবে চিত্রা। চিত্রার যে হাত কতবার কত আগ্রহে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছে বিনায়ক, চিত্রার সেই হাত আজ শেষ কুণ্ঠা চিরকালের মত দূরে ছুঁড়ে ফেলবার জন্য সংকল্পে কঠিন হয়েই উঠেছে।

নিখিল আছে, চিত্রার স্বামী নিখিল। নিখিল থাকবে, ঠিক যেমনভাবে সুখী মন নিয়ে আর ধন্য হয়ে সে আছে। চিত্রার পেছনে পেছনে থাকতে হয় নিখিলকে, এই বৃথা সাথীপণার মিথ্যা স্পষ্ট করেই মিথ্যে করে দেওয়া ভাল। আর সঙ্গে সঙ্গে বস্তু-হীন ছায়ার মত মানুষটাকে পিছনে পিছনে আসতে দিয়ে লাভ কি? যে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও গিয়ে দাঁড়ালে কোন গর্বের আনন্দ নেই, সেই মানুষকে একটা ছায়ার মত সঙ্গে রেখে লাভ কি?

এইভাবেই আজ একেবারে সাইফার হয়ে যেতে চলেছে নিখিল। অফিসের নানা মুখের খোসগল্পও আজকাল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। —এই অবস্থার জন্য দায়ী স্বয়ং নিখিল রায়। একটা বিশ্বাসী নির্বোধ। স্বচক্ষে সব দেখেও এতদিনে সাবধান হতে পারলো না, তাইতো... তাইতো স্বামী হয়েও সাইফার হয়ে গিয়েছে নিখিল।

বড় সাহেব বিনায়ক সরকারের চকচকে টুরারের পেছনের সীটে যদি চুপ করে বসে থাকে স্বামী নিখিল রায়, আর স্ত্রী চিত্রা রায় বসে থাকেন সামনের সীটে বড়সাহেবের পাশে, তবে কি এ সন্দেহ না করে থাকতে পারে হরিনগর কলোনীর সাধারণ ভদ্রলোক আর অফিসের সাধারণ কেরাণীর দল?

বাধা? কে বাধা দেবে চিত্রাকে? বাধা দেওয়া যার কথা, সেই যে সবচেয়ে বেশি বাধ্য। সরকার এণ্ড সিন্‌হার হেড ক্লার্ক নিখিল রায় যেন স্ত্রী-গরবেই গরবী হয়ে রয়েছেন। ভগবান জানে, লোকটার চোখ কি ধাতুতে তৈরী, আর মনটাই বা কিরকমের প্রশান্ত মহাসাগর!

চার বছরের মধ্যে কেরাণীর বউ হয়ে যে নারী একটু গম্ভীর মুখ নিয়ে অথচ শান্ত-ভাবেই এসেছিল এই কলোনীর একটি টালি-ছাওয়া চালের ক্ষুদ্র গৃহে, সেই নারী এ রাজ্যের যত চোখ বিস্ময়ে ধাঁধিয়ে দিয়ে সরকার এণ্ড সিন্‌হার বড়সাহেবের পাশে রাজেশ্বরীর মত বসে থাকে। চকচকে টুরারের ইঞ্জিনের গুরুগুঞ্জন ছাপিয়ে ওঠে চিত্রার মুখের হাসি-ফোয়ারার কলনাদ। সরকার ভিলার ফটকে ইউকালিপটাসের ছায়া থেকে সোজা নীল পরেশনাথের পায়ের কাছে তোপচাঁচির লেক পর্যন্ত, বিনায়কের টুরার চিত্রার মুখের মিষ্টি কলরব বুকে নিয়ে ছুটে যায় আর আসে। পেছনের সীটে বসে নিখিলও মাঝে মাঝে হেসে ওঠে।

অফিসের নানা মুখে নানা খোসগল্প মাঝে মাঝে নানা ধিক্কারেও তিক্ত হয়ে ওঠে। —মেয়েটার আর দোষ কি? এরকম বেকুবের হাতে পড়লে সব মেয়েই ওরকম হয়ে যায়।

অফিসের মধ্যেই একজন মাদ্রাজী কেরাণীর সঙ্গে একজন বাঙালী কেরাণীর একদিন হাতাহাতি হয়ে গেল। মাদ্রাজী কেরাণী বলেছিল, বাঙালীরাই এরকম হয়। এই ধরণের মাত্র একটা কথা সহ্য করতে না পেরে টেম্পোরারী মহিম সেই মাদ্রাজীর সঙ্গে সেদিন যে মারামারি কাণ্ড করে বসলো, সেটা স্বচক্ষে দেখেও, আর কারণটা বুঝতে পেরেও হেডক্লার্ক নিখিলের মনে কোন উত্তাপ জাগেনি। কথাগুলি যেন কথাই নয়, একেবারে বাজে মিথ্যা ও কুৎসিত কতগুলি ছোট কল্পনার আক্রোশ। যত ছোট মনের পরিচয়।

নিখিলই যখন এসব চায়, তখন কে আর বাধা দেবে চিত্রার মত মেয়েকে, চোখে যার বিদ্যুৎ খেলে, আর শাড়িপরার আর বেণী বাঁধবার ভঙ্গীতে ফ্যাশান উথলে পড়ে। হরিনগর কলোনীর সকলের চক্ষুতে ভৎর্সনা জাগিয়ে দিয়েছে চিত্রা নামে এক নারীর এই ভয়ানক অভ্যুত্থান। কিন্তু কোন তিক্ততা বিরাগ ও ভৎর্সনা নেই শুধু এক-জনের চোখে, চিত্রার স্বামী নিখিল রায়ের চোখে।

লোকে আলোচনা করে, অফিসের নানা মুখে একটা হতভম্ব অবস্থাও মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে।—এরকম হয়ে গেল কেন নিখিল রায়? কোনরকম প্রমোশন বা লিফ্‌টও তো পাচ্ছে না নিখিল। সরকার এণ্ড সিন্‌হার বার আনা প্রভু বিনায়ক সরকার যদি ইচ্ছা করেন, তবে নিখিলকে এই অফিসের অন্ততঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক'রে দিতে পারেন। কিন্তু সে রকম কিছুর আঁচ-আভাসও তো পাওয়া যায় না।

তাই টেম্পোরারী মহিম বলে—সব দোষ ঐ ভয়ংকর বড় সাহেবটির। এই-রকম কীর্তি করা ওর অভ্যেস আছে। অনেক করেছেন, আপনারা কোন খবর রাখেন না।

সত্যিই কেউ খবর রাখেন না। টেম্পোরারী মহিম কোথা থেকে এত খবর জানলো কে জানে। হয়তো একেবারে বাজে কথা। ছাঁটাইয়ের লিস্টে নাম চড়েছে বলে রাগের মাথায় যা-তা বলছে মহিম।

মহিম বলে—ও'দের যে একটি ক্লাব আছে, আর সেই ক্লাবে কি হয়, সে-খবর আপনারা কেউ জানেন না।

তা কেউ জানে না ঠিকই। ক্লাব আছে, মাত্র এইটুকু সকলেই জানে।

মহিম বলে—কারা সেখানে আসে তাও আপনারা কিছু জানেন না।

আসে কত বড়লোক এইটুকু সকলেই জানে। পায়ে-হাঁটা মানুষ সেখানে কখনো আসে না, আসতে পারে না, আসবার নিয়মও নেই।

মহিম বলে—কতগুলো হোমরা-চোমরা অফিসার আসে, আর আসে কতগুলো সাহেব, আর কতগুলো লেডি। আর পিপে পিপে মদ।

—থাম থাম মহিম। বড় বেশি রঙ চড়াচ্ছ তুমি।

মহিম বলে—আমি সত্যি কথা বলছি কি না, সেটা নিখিলবাবুই জানেন। তিনি সেখানে সস্ত্রীক ঘুরে এসেছেন কয়েকবার।

—অ্যাঁ?

সকলে চমকে ওঠে আর বুঝতে পারে আসল দোষ তাহ'লে নিখিলেরই।

কিন্তু যার জীবনের পরিণাম নিয়ে এত আলোচনা, সেই চিত্রা রায়ের মন এই সব খুঁটিনাটির আর বিচারের অনেক উপরে চলে গিয়েছে। আজও তো ভুলে যায়নি চিত্রা, সেই একটা ঘটনার কথা। বিয়ের পাঁচ মাস আগে দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়েছিল চিত্রা, জেঠাই মা'র বোন জয়া মাসিমার সঙ্গে। লেবং-এর মাঠে চিত্রাকে দেখতে পেয়ে

অপলক চক্ষে তাকিয়েছিল কোন্ এক স্টেটের রাজকুমার। আর সত্যিই, এক ভদ্রমহিলা এসে জয়া মাসিমাকে ইংরাজী ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঐ মেয়ের বাপ কোন্ স্টেটের চীফ?

এই পৃথিবীর এক স্টেটের রাজকুমারী বলে মনে হয়েছিল যে মেয়েকে, সেই মেয়ের শাড়ি-পড়ার স্টাইল দেখেই ভয় পেয়ে গেলেন জেঠামশাই। সে-মেয়ের মনের স্টাইলের কোন খবর নিলেন না। খবর নিলে বুঝতে পারতেন জেঠামশাই, চিত্রাকে এভাবে একজন যে-সে লোকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা।

সেই নিষ্ঠুরতাকে ক্ষমা করতে পারেনি চিত্রা। সেই চক্রান্তের দান নিখিল রায় নামে এই ভদ্রলোকটিকে জীবনে আপন ব'লে মনে মনে গ্রহণ করতে পারেনি চিত্রা। আর এই জন্য মনে কোন দুঃখ নেই চিত্রার। আর দেখে আরও সুখী হয়েছে চিত্রা, এই ভদ্রলোকের মনেও কোন দুঃখ নেই। চিত্রা ডাক দেওয়া মাত্র কাছে এসে দাঁড়ায়, বলা মাত্র চলে যায়, আর আসতে বললেই সঙ্গে আসে নিখিল।

স্বামী নামে পরিচিত এই মানুষটিকে একদিনের জন্য একটি রূঢ় কথা বলতে হয়নি চিত্রার। ভদ্রলোকই সে সুযোগ দেননি চিত্রাকে। নিখিল যেন চিত্রার নীরব চিন্তার বেদনাগুলিকেও শুনতে পায়; এমনই প্রখর তার কান।

ভোরে, টালি-ছাওয়া চালের ক্ষুদ্রকায় এই বাড়ির ভেতর বারান্দায় চেয়ারের ওপর বসে আর সামনের ছোট টেবিলের ওপর এক পেয়ালা চা রেখে যখন চুপ ক'রে বসে থাকে চিত্রা, তখন যেন ঘরের ভেতরে থেকেও চিত্রার চোখ দুটোকে দেখতে পায় নিখিল। চিত্রার চোখ দুটো যেন উদাস হয়ে কুয়োতলার পেয়ারা গাছটার ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে এসে দেখতেও পায় নিখিল, তার ধারণা মিথ্যে নয়। চিত্রার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু চায়ের কাপের দিকে চোখ নেই চিত্রার। অন্যমনা হয়ে কি-যেন ভাবছে চিত্রা।

নিখিল আর তার নিজেরই হাতের চায়ের কাপে চুমুক দিতে পারে না।
—তোমার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

নিখিলের কথায় চিত্রার স্তব্ধ হাতটার শুধু চমক ভাঙ্গে। চায়ের কাপ হাতে তুলে নেয় চিত্রা। কিন্তু একজন যে হঠাৎ এসে চা খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিল, সেটা চিত্রা বুঝতেও পারে কি না সন্দেহ। নিখিলের মুখের দিকে তাকায় না চিত্রা। একটা কথা বলবার জন্যও কোন সাড়া জাগে না চিত্রার দুই ঠোঁটে, রক্তগোলাপের আভা দিয়ে আঁকা দুটি ঠোঁট।

এক-একদিন মাঝরাতেই নিজের ছোট ঘর থেকে ব্যস্তভাবে চিত্রার ঘরে ঢোকে নিখিল। ঘুমিয়ে আছে চিত্রা, কিন্তু যেন একটা দুঃখের স্বপ্ন দেখে বিড়বিড় করছে চিত্রা। অস্পষ্ট সেই স্বপ্নাতুর ভাষার মধ্যে যেন অভিমানের মত একটা বেদনা বিড়বিড় করে। পাখা হাতে নিয়ে ঘুমন্ত চিত্রার মাথায় কিছুক্ষণ বাতাস দিয়ে চলে যায় নিখিল।

পরদিন কথায় কথায় নিখিল তার মনের উদ্বেগ প্রকাশ না ক'রে দিয়ে পারে না।
—কাল ঘুমের মধ্যে তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ।

চুপ ক'রে থাকে চিত্রা, কোন উত্তর দেয় না, আর নিখিলের মুখে এই ধরণের কথাগুলি শুনতে ভালও লাগে না।

বোধ হয় স্বপ্নের কথাগুলিই মনে পড়ে যায়, তাই। যেন ঘুমের মধ্যেই বড় স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায় চিত্রা, নিজেকে
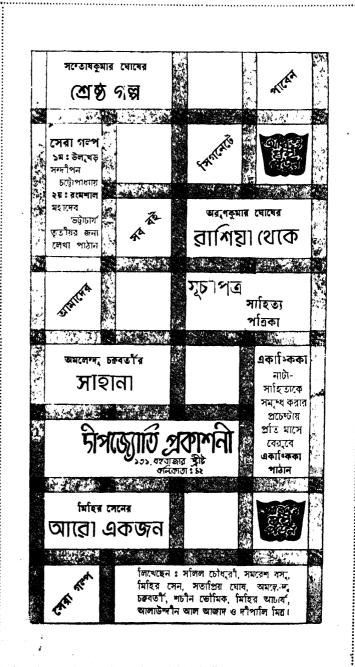
আর নিজের মনটাকেও। শাড়িতে আর বেণীতে স্টাইল আছে, মনের সখ-সাধ আর কল্পনাগুলির মধ্যেও স্টাইল আছে, কিন্তু এই স্টাইলগুলিই কি তার জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল? বোধ হয় না। ঘুমের মধ্যেই নিজের সাদা-মাঠা মনটাকে যেন দেখতে পায় চিত্রা, আর বুঝতে পারে, মনের মত স্বামীর গর্বে গরবিনী হবার একটা আকাঙ্ক্ষা শুধু পড়ে আছে সেখানে। সে আকাঙ্ক্ষা পাথর-চাপা পড়ে এখনো রয়েই গিয়েছে তার পাঁজরের আড়ালে এক কোণে।

নিখিলের কথা শুনে চুপ ক'রে থাকে চিত্রা। বলতে ইচ্ছা করলেও বলে না: আমার স্বপ্নের খোঁজ নেবার জন্য তোমার আবার এত গরজ কেন?

স্বামীর পরিচয় চিত্রার জীবনে কোন গর্ব আনেনি, আনবেও না কোনদিন। তার জীবনের এই শূন্যতা একটা চিরকেলে শ্মশানের মত মনের মধ্যে জ্বলতো, যদি বিনায়ক সরকারের সঙ্গে দেখা না হতো একদিন, এক গানের সভায়। চিত্রা জানে, ভাগ্য তাকে অন্ততঃ এইটুকু কৃপা করেছে, অন্ততঃ এইটুকু গর্ব এনে দিয়েছে চিত্রার মনে, বিনায়কের মত মানুষও দুঃখ পায় মনে মনে, চিত্রার মত মেয়েকে জীবনে সঙ্গিনী করতে পারেনি ব'লে। গর্ব তো বটেই, মৃদুলা সরকারের মত লেডি যার স্ত্রী, সেই বিনায়কও আজ চিত্রাকে পাশে নিয়ে ইউকালিপটাসের ছায়ায় দাঁড়াতে পারলে সুখী হয়ে যায়। হরিনগর কলোনীতে এসে চার বছরের মধ্যেই চিত্রার চোখের বিদ্যুৎ জয়ী হয়েছে। যে-মানুষকে দেখে হাজার মানুষে প্রতিদিন সেলাম, আদাব ও নমস্তে জানায়, যে-মানুষের মুখের দিকে অনেক লেডিই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে, যে-মানুষের সঙ্গে সস্ত্রীক অন্তরঙ্গ হবার জন্য অনেক কনট্রাক্টর অনেক চেষ্টা করে, সেই মানুষ, সেই বিনায়ক সরকার শুধু বলে, এইবার শুধু তুমি আর আমি চিত্রা, আর কেউ নয়; মাঝে মাঝে এই আলো আর ধোঁয়ার ভীড় থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে শালবনের কিনারায় ছোট্ট একটি জলস্রোতের কাছে......।

হ্যাঁ, তাই হবে। তাই বিনায়কের চিঠির উত্তর দিয়েছে চিত্রা। অনেকবার এই আহ্বানের ভাষা বুকে লুকিয়ে নিয়ে চিত্রার কাছে এসেছে বিনায়কের অনেক চিঠি। আজ প্রথম উত্তর দিল চিত্রা। কারণ, চিত্রার মনে আর কোন প্রশ্ন নেই।

সন্ধ্যার জন্য বিকেল থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল চিত্রা। আর সন্ধ্যে হবার আগেই বিনায়কের কাছ থেকে চিঠির উত্তর নিয়ে অফিস থেকে বাসায় ফিরলো নিখিল।

জানিয়েছে বিনায়ক, সুখী হলাম চিঠি পেয়ে। আজ আমার সরকার এণ্ড সিন্হার সিল্ভার জুবিলী। কিন্তু তুমি বুঝবে চিত্রা, আজ আমার জীবনেরই এক তৃপ্তির জুবিলী। কারণ চিঠিতে তোমার মন চিনতে পারলাম, এই প্রথম। গাড়ি যাবে।

চিঠি পড়ার পর চিত্রার চোখে পড়ে, নিখিলের হাতে আর একটি চিঠি রয়েছে। সোনালী অক্ষরে ছাপানো একটি কার্ড।

চিত্রা—ওটা কি?

নিখিল—নেমন্তন্নের কার্ড।

চিত্রা—কার নেমন্তন্ন?

নিখিল—মিস্টার ও মিসেস নিখিল রায়ের।

চিত্রা—তার মানে?

নিখিল—সরকার এণ্ড সিন্হার সিলভার জুবিলী আজ। সরকার ভিলাতে ককটেল পার্টি আছে। নেমন্তন্ন করেছেন মিস্টার সরকার।

চিত্রা—তোমাকেও?

নিখিল—হ্যাঁ, তাই তো নিয়ম।

চিত্রা চুপ ক'রে থাকে কিছুক্ষণ। তার পরেই যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে—নিয়ম তো আছে জানি। কিন্তু......।

কিন্তু আর এই নিয়মের অর্থ খুঁজে বের করার কোন অর্থ আজ আর নেই। বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হয় না চিত্রাকে। বড়সাহেবের চকচকে টুরার পেঁছে যায় হেডরার্কের কোয়ার্টারের সম্মুখে। একই সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে গাড়ির ভেতরে গিয়ে উঠে বসে নিখিল আর চিত্রা, মিস্টার ও মিসেস রায়, স্বামী আর স্ত্রী।

গাড়িতে শান্তভাবেই বসে রইল চিত্রা, কিন্তু রাগ হয় বিনায়কের ওপর। আজ এত স্পষ্ট ক'রে জানতে পেরেও এরকম ব্যবস্থা করলো কেন বিনায়ক? চিত্রা রায়ের জীবনের প্রথম প্রণয়ের অভিসারে নিখিল রায় নামে লোকটিকে চিত্রার সঙ্গে কেন যেতে বললো বিনায়ক? বিনায়ককে চিঠি দেবার সময় হাত কাঁপেনি যার, সেই শক্ত মনের চিত্রা রায়ও তার পাশের এই তুচ্ছ একটা অস্তিত্বকে সহ্য করতে কেমন অস্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু সব অস্বস্তি মুহূর্তের মধ্যেই দূর হয়ে গেল। ইউকালিপটাসের পাশে মস্ত বড় সামিয়ানা টাঙানো আর আলোয় আলোকিত আসর। চকচকে টুরার যেন একেবারে এক নতুন জগতের সিংহদ্বারে নিয়ে এসে পেঁছে দিল চিত্রাকে। এগিয়ে এল বিনায়ক, আর বিনায়কের অভ্যর্থনার হাতে হাত দিতেই ঝলক দিয়ে হেসে উঠলো চিত্রার চোখের বিদ্যুৎ।

যেন ছোট ছোট কুঞ্জ দিয়ে সাজানো ছোট একটা জগৎ। প্রতি কুঞ্জের ফুলের স্তবকের মধ্যে বিদ্যুতের রঙীন বাতি জ্বলে। প্রতি কুঞ্জে একটি ক'রে টেবিল আর দুটি চেয়ার। একদিকে নাচের আসর তৈরি করা হয়েছে। ছোট একটি ডায়াস, তার দু' পাশে বসে জ্যাজ বাজায় কলকাতার বিলিতী হোটেল থেকে ভাড়া-করে আনানো গোয়ানীজ বাদকের দল।

বিনায়ক সরকার তার হাসিভরা মুখ চিত্রার কানের কাছাকাছি এনে তার জীবনের পরম তৃপ্তির সিলভার জুবিলীর অর্থ বুঝিয়ে দেয়। —আজ এই উৎসবের এক কোণে এক টেবিলের পাশে শুধু তুমি আর আমি। আজ পৃথিবী জানবে, তুমিই আমার আপন-জন হয়ে গিয়েছ চিত্রা।

চিত্রার হাসিতে বিদ্যুৎ খেলে যায়।—তাই বলো। আমি ভুল বুঝে তোমার ওপর রাগ করেছিলাম।

বিনায়ক হাসে—আমাকে এখনো ভুল বুঝবে তুমি?

চিত্রা—না, আর কখনো না।

জ্যাজ বাজে মত্ত হয়ে। গেলাসে গেলাসে শেরি আর হুইস্কির পেগ ট্রের উপর সাজিয়ে নিয়ে ছুটোছুটি করে বয় আর বাটলার। সরকার এণ্ড সিন্হার সিলভার জুবিলী বিহ্বল ও উচ্ছল হয়ে ওঠে মদিরতায়। গেলাস হাতে নিয়েই কোন সজ্জন উঠে দাঁড়ান আর টলতে টলতে আর এক টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। ওয়েলকাম্ জানিয়ে সেই টেবিলের সজ্জন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। আর সেই চেয়ারের লেডি খিল-খিল ক'রে হেসে ওঠেন।

জ্যাজ বাজে আরও প্রমত্ত হয়ে। অভ্যাগতা লেডিদের শেরিসিক্ত ওষ্ঠে

লিপস্টিকের রঙও লাস্যে তরল হয়ে ওঠে। এক একটি টেবিলে এক একটি বিহ্বল যুগলমূর্তি। মিসেস ফর্দুনজীর টেবিলের কাছে উঠে এসে বসেন মিস্টার চৌধুরী। মিসেস চৌধুরী এই টেবিল আর সেই টেবিলের এক এক দম্পতির সঙ্গে হাস্যালাপ বিনিময় করতে করতে গিয়ে বসেন মিস্টার পাত্রের পাশে শূন্য চেয়ারে। দেখা যায়, আসরের ঐ দিকে মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে আলাপ করছেন মিসেস পাত্র।

আর চিত্রা বসে থাকে আসরের প্রায় মাঝখানে নীল আলোকের এক স্তবকের কাছে একটি টেবিলে, বিনায়ক সরকারের পাশে।

আর এই নতুন জগতের ভীড়ের মধ্যে কে জানে কোথায় হারিয়ে গেল নিখিল রায় চিত্রা রায়ের স্বামী মিস্টার রায়!

জানে না চিত্রা, দেখতেও চায় না চিত্রা, আজ তার এই জীবনান্তরের শুভক্ষণে পিছনের কোন মিথ্যা ছায়ার বাধাও আর রাখতে চায় না চিত্রা। পৃথিবীর সব চক্ষুর সম্মুখেই বিনায়কের পাশে বসে চিত্রা আজ অকুণ্ঠচিত্তে জানিয়ে দিতে চায়, সে আজ বিনায়কেরই জীবনের সঙ্গিনী।

পরিশ্রান্ত জ্যাজ থামে কিছুক্ষণের জন্য। তার পরেই সারা আসর যেন সম্মিলিত কণ্ঠে হুররে জানিয়ে অভ্যর্থনা করে এক অতি মাননীয়া আগন্তুকাকে।

চিত্রা জিজ্ঞাসা করে—ইনি কে?

বিনায়ক হাসে—মৃদুলা!

চমকে ওঠে চিত্রা।—মৃদুলারও কি এখানে আসবার কথা ছিল?

বিনায়ক—ছিল বৈ-কি।

চিত্রা—আমাকে তো বলোনি যে, মৃদুলা আসবে এখানে।

বিনায়ক—এর মধ্যে বলবার কি আছে? এটা তো সাধারণ একটা নিয়ম।

চিত্রার মনের প্রথম চমকানি শান্ত হবার পর বুঝতে পারে চিত্রা, হ্যাঁ, এটা তো সাধারণ নিয়ম। সে নিজেও সেই নিয়মেই এখানে এসেছে।

এই টেবিল থেকে ও টেবিল, তারপর আর এক টেবিল, শেরিতে উৎফুল্ল এক-একটি মুখের আনন্দধ্বনিকে যেন বিনম্র ভঙ্গীতে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আপ্যায়িত করে ঘুরতে থাকেন মৃদুলা সরকার। বিরাট একটি জড়োয়া নেকলেস মৃদুলার গলা জড়িয়ে রয়েছে। ব্রোকেডের একটি স্কার্ফ এলোমেলো হয়ে লুটিয়ে রয়েছে কাঁধের আর পিঠের ওপর। পা টলছে মৃদুলা সরকারের। মৃদুলার এত জমকালো ক'রে সাজানো চেহারাটা কেমন-যেন আলু-থালু আর উদ্‌ভ্রান্ত। শুধু এক জোড়া ডাগর চক্ষু এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাঝে মাঝে কট্‌কট্‌ ক'রে হেসে ওঠে।

নিজের কানেই শুনতে পায় চিত্রা, তার কাছের টেবিলের এক অতিথি তার পার্শ্ববর্তিনীকে বলছেন, মৃদুলা সরকার আজ সকাল থেকে শেরিতে ভাসছেন বলে মনে হচ্ছে?

চিত্রা তাকায় বিনায়কের মুখের দিকে।—মৃদুলার কি হয়েছে বলতো? ও রকম করছে কেন?

বিনায়ক বলে—চিরকাল যা ক'রে এসেছে, তাই করছে।

চিত্রা—কি?

বিনায়ক—টিপ্‌সি, মাত্রা বেশি হয়ে গিয়েছে।

আলোর আসরের মধ্যে একটা অন্ধকার যেন ধুকপুক করে উঠলো। এ কি কথা বলছে আজ বিনায়ক তার নিজের মুখে? এই কি বিনায়কেরই গল্পের সেই পতিব্রতা প্রেমিকা স্ত্রী মৃদুলা সরকার?

চিত্রা বলে—তোমার কথা শুনে মৃদুলার সম্বন্ধে আমার অন্যরকম ধারণা হয়েছিল।

বিনায়ক—কি ধারণা হয়েছিল।

চিত্রা—মনে হয়েছিল এই সব শেরি-টেরির মানুষ মৃদুলা নয়।

বিনায়ক—শেরি সম্বন্ধেই তোমার মনে ভুল ধারণা রয়েছে ডিয়ার চিত্রা!

চিত্রার মুখের দিকে অদ্ভুত এক অলস-ভঙ্গীতে তাকিয়ে কথা বলে বিনায়ক। আর বিনায়কের অনুরোধে শেরির গেলাসে চুমুক দিতে গিয়েই থেমে যায় চিত্রা। মনে হয় চিত্রার, শেরির নেশায় টলমল দুটি চক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে আর বাঘিনীর মত দুর্দান্ত একটা আগ্রহ নিয়ে কি-যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে মৃদুলা সরকার। কটকট ক'রে হেসে উঠছে মৃদুলার চোখ।

দেখতে নেহাৎ অসুন্দর তো নয় মৃদুলার মুখ, নিজের রূপ সম্বন্ধে চিত্রার মনের ধারণায় যথেষ্ট অহঙ্কার থাকলেও মৃদুলাকে সুন্দর ব'লেই স্বীকার করতে পারে চিত্রা।

যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল চিত্রা। জ্যাজের শব্দে চমক ভাঙ্গে, আর দেখতে পায়, দূরে দাঁড়িয়ে আসরের মাঝখানে এই টেবিলের দিকেই তাকিয়ে কটকট করে হাসছে মৃদুলার দুই চক্ষু।

থর-থর ক'রে কেঁপে ওঠে চিত্রা। প্রশ্ন করে চিত্রা।—মৃদুলা এখানে এসে বসবে নাকি?

বিনায়ক—ওগো না, না, না।

কিন্তু একটা ভয়ের শিহরণ যেন ধীরে ধীরে চিত্রার শরীরের রক্তে ঠাণ্ডা সাপের মত সিরসির করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিনায়ক সরকারের পরিণীতা স্ত্রীর এ কি জীবন। বেশ তো অদ্ভুত রকমের উজ্জ্বল জীবন। আলোর মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে কটকট করে হাসছে যার চোখ।

এদিকে আসে না, ওদিকেই ঘুরে বেড়ায় মৃদুলা। তবু দেখতে ভয় করে চিত্রার, বিনায়কের মত মানুষের পরিণীতা প্রেমিকা হয়েও এরকম হয়ে গেল কেন মৃদুলা? এই কি নিয়ম?

কি-যেন সন্ধান করে ফিরছে মৃদুলা। আর টেবিলের পর টেবিলের ছায়া পার হয়ে চলে যাচ্ছে আসরের একেবারে শেষে, একেবারে সামিয়ানার রঙীন ঝালরের গা-ঘেঁসা ছায়া-ছায়া একটি নিভৃতের একটি টেবিলের কাছে।

পাথরের চোখের মতই স্তব্ধ আর অপলক
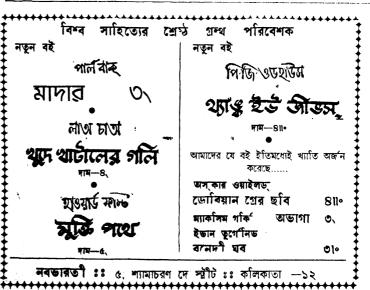
হয়ে তাকিয়ে থাকে চিত্রার চোখ। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে থাকে চিত্রা, সুন্দর ব্রোকেডে জড়ানো একটি বাঘিনীর কৌতূহল যেন এতক্ষণে শিকারের সন্ধান পেয়েছে। একটি টেবিলের পাশে মাত্র বসেছিল একজন, তারই পাশে গিয়ে বসলো মৃদুলা। টিপ্ করে একটা শব্দ যেন হঠাৎ বেজে উঠলো চিত্রার বুকের ভেতর। ওখানে কেন মৃদুলা? ঐ নিরীহ নির্বোধ মানুষটার কাছে কেন মৃদুলা? হেডক্লার্ক নিখিল রায়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে কি লাভ হবে মৃদুলার?

বিনায়ক ডাকে—চিত্রা।

শুনতে পেয়েও মুখ ফিরিয়ে বিনায়কের দিকে তাকায় না চিত্রা। যেন সুদূর এক সংসারের রঙ্গমঞ্চের দিকে এক অদ্ভুত অদৃষ্টের খেলা দেখবার জন্য তাকিয়ে আছে চিত্রা। দেখতে পায় চিত্রা, বয়ের হাতের ট্রে থেকে দুটি গেলাস তুলে নিল মৃদুলা। একটি নিজের কাছে রেখে, আর একটি গেলাস নিখিলের হাতের কাছে সমাদরের ভঙ্গীতে এগিয়ে দেয় মৃদুলা।

—সাবধান! চিত্রার মুখ থেকে যেন তার এই মুহূর্তের অসাবধান মনের এক নতুন দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে চমকে উঠলো ছোট একটা অস্ফুট কথা। বিনায়ক বলে—তুমি এদিকে ঘুরে বসো চিত্রা।

জ্যাজ বাজে মত্ত হয়ে। নাচের আসরে দশ জোড়া মূর্তি দুলে দুলে পা ফেলে। কিন্তু চিত্রার মনের চাঞ্চল্য যেন হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে, কোন ভাষা আর বাজনার স্বর কানে আসছে না চিত্রার। মনে হয় শুধু, আসরের শেষ দিকে সামিয়ানার ঝালরের কাছে একটা শিশুর বুক একা দেখতে পেয়ে এক বাঘিনী গিয়ে সম্মুখে বসেছে লুব্ধ হয়ে। শেরির নেশায় তৃপ্ত হয়নি মৃদুলা, আরও কিছু খুঁজছে মৃদুলা।

—নো লাইট, ওয়ান মিনিট! কে যেন চেঁচিয়ে ফূর্তির মাথায় হাঁক দিল, সঙ্গে সঙ্গে আসরের সব আলোক যেন একটি ফুৎকারে নিভে গেল।

—এ কি! সেই মুহূর্তে চীৎকার করে উঠে দাঁড়ায় চিত্রা। হঠাৎ ভীত একটা পাখির আর্তনাদের মত করুণ চিত্রার গলার সেই শব্দ। হঠাৎ অন্ধকার যেন চিত্রার বুকের ওপর তীক্ষ্ণ একটা ছুরির আঘাতের মত লাফিয়ে পড়েছে। চেয়ার থেকে উঠে, যেন ছুটে যাবার জন্যই অন্ধকারের মধ্যে পথ খোঁজে চিত্রা।

বিনায়ক হেসে ওঠে—আঃ, বসো চিত্রা। ম্যানারস্ ভুলে যেও না।

পথ না পেয়ে, আর যেতে না পেরে অন্ধকারের মধ্যেই থমকে দাঁড়িয়ে আসরের শেষ প্রান্তের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে চিত্রা। ঝন্ করে আর্তনাদ করে সশব্দে একটা কাঁচের গেলাস যেন চূর্ণ হলো কোথাও। দপ্ করে জ্বলে ওঠে আলো।

এই কয়েকটি মুহূর্তের অন্ধকারে আসরের মধ্যে যেন একটা নাটক চমকে উঠেছিল, তারই চিহ্ন দেখা যায় আসরের দু জায়গায়। ভীত ও উদ্‌ভ্রান্ত দুটো চক্ষু নিয়ে চিত্রা রায় দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত আসরের শেষ প্রান্তের এক টেবিলের দিকে তাকিয়ে। আর শেষ প্রান্তের টেবিলের কাছে একটি চেয়ার থেকে যেন হঠাৎ এক রূঢ় আঘাতে উল্টে পড়ে গিয়েছে মৃদুলা সরকার। মৃদুলার গেলাস হাত থেকে ছুটে গিয়ে দূরে পড়েছে, আর চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

তাকিয়ে থাকে চিত্রা রায়ের পাথরের মত স্তব্ধ দুটি চক্ষু। তার পর ধীরে ধীরে বিচিত্র এক হাসির জ্যোৎস্না যেন ফুটে উঠতে থাকে সেই চক্ষে। আসরের সব চক্ষু তাকিয়ে দেখে, সত্যিই এক গরবিনী রাজেশ্বরী মত ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রা রায়।

হ্যাঁ, গর্ব ছাড়া আর কি? বাঘিনীর আগ্রহ অন্ধকারের সুযোগে মত্ত হয়ে ছুঁতে গিয়েছিল চিত্রা রায়ের স্বামীকে। ভুল করেছে মৃদুলা, বুঝতে পারেনি মৃদুলা, চিত্রা রায়ের স্বামী বড় কঠিন স্বামী।

বিনায়ক ডাকে—এসে বসো চিত্রা।

—হ্যাঁ, বসছি। হেসে হেসেই বিনায়কের আহ্বানে সাড়া দেয় চিত্রা।

কিন্তু এই অন্ধকারে-ভরা কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে নতুন কোন্ গর্ব পেয়ে গেল চিত্রা, যার জন্য এমন করে বিনায়কের দিকে করুণার চক্ষে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে অবাধে নিঃসঙ্কোচে আর মুখর হয়ে হেসে চলেছে চিত্রা!

বোধ হয়, চিত্রাই তখনো বুঝতে পারেনি যে, তার জীবনের সকল ক্ষোভের গভীরে লুকানো সেই বেদনার বিদ্যুৎ জ্বালা হারিয়ে একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছে। জ্যাজ বাজে মত্ত হয়ে, নাচের আসরে জোড়া জোড়া নৃত্যপর মূর্তির ছায়া দোলে। চুপ করে, নিজের বুকের ভেতরের অদ্ভুত এক প্রসন্নতার ভারে অলস ও স্নিগ্ধ হয়ে চেয়ারের ওপর বসে থাকে চিত্রা।

আবার নো লাইট। দপ্ ক'রে নিভে গেল সব আলোক।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঁচের গেলাস চূর্ণ হয়ে যায় অন্ধকারে, একটি চেয়ার উল্টে পড়ে যায়, অন্ধকারের স্পর্ধা দুই হাতের ঘৃণাকঠিন একটি ধাক্কায় শেষবারের মত ধূলিসাৎ করে দিয়েছে চিত্রা রায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে চিত্রার দেহ। যেন তার দুঃস্বপ্নমুক্ত জীবনই এতক্ষণে এক গর্বের আবেশে কাঁপছে।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে আলো। সারা আসরের চক্ষু দেখতে পায়, বিনায়ক সরকার চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে গিয়েছেন, আর তাঁরই হাতের গেলাস ছিটকে পড়ে গিয়ে চূর্ণ হয়েছে।

আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সামিয়ানার শেষ প্রান্তের ঝালরের দিকে ছায়া-ছায়া এক নিভৃতে দাঁড়ানো একটি মূর্তির দিকে তাকিয়ে হাত তুলে আহ্বান জানায় চিত্রা।

—এস।

সারা আসরের চক্ষু কিছুক্ষণের জন্য বিস্মিত অভিভূত ও একটু বিরক্ত হয়েই দেখতে পায়, আসর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা। কিরকম যেন ওদের দুজনের চলবার আর তাকাবার ভঙ্গী। মনে হয়, একেবারেই ম্যানার্স জানে না।

স্কেচ

শ্রীনন্দলাল বসু

সঙ্কল্প
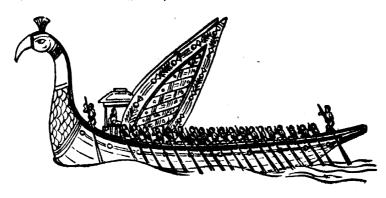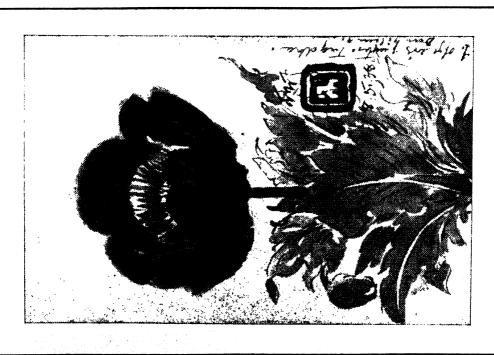
নিশিকান্ত

চলা যখন হ'ল শুরু,
যাবই যাব;
দীর্ঘ-পথের প্রান্তখানি
পাবই পাব;
বাধা-বাঁধন
ফেলব টুটে,
চলব ছুটে,
কুজ্ঝটি-জাল ছিন্ন করি' রবির মত উঠব ফুটে।

কোথায় আছে, কোন্ পুরীতে,
কত দূরে!
সেথায় যাব, চিনব আমি
সে-বন্ধুরে।
সফল হবে
আমার আশা—
ভালোবাসা,
সুদূরকে জয় ক'রবে আমার দুঃসাহসী এই দুরাশা।

এই দুরাশা ধূলার পরে
দুলায় তারা,
কঠিন-পাষাণ ফাটিয়ে ঢালে
উৎস-ধারা,
বিশ্বাসে তার
বিশ্ব ঘনায়
শিশির-কণায়,
মলিন-মাটির পাত্র ভরে সৌর-রসের সুধার সোনায়!

আঁধার রাতের কাঁটার বনে
রয় সে জাগি',
কোন্ প্রভাতের কোন্ গোলাপের
বিকাশ লাগি';
মন্ত্র-বলে
সেই তো আনে
ধরার প্রাণে
ইন্দ্র-ধনু-পারের পারিজাতের খবর সেই তো জানে।

সেই তো জানে, কোন্ অতলের
মর্ম্ম হ'তে
সৃষ্টি ভেসে চলে অপার
স্বপন-স্রোতে,
কোন্ সে বিপুল
আকর্ষণে
ক্ষণে ক্ষণে
সারা ভুবন আবর্ত্তিয়া চলেছে কার গভীর মনে।

গভীর মনে মনের মানুষ
লুকিয়ে থাকে,
মনকে আমার জানব আমি,
জানব তাকে।
তাই যা-কিছু
বাহিরে পাই
মনে মিলাই,
দিক্-দিগন্ত জড়িয়ে নিয়ে আপন মনের অতলে চাই।

জানি জানি, নীলাম্বরের
ভালের লিখা,
এই ধরণীর শ্যামলিমার
লালের শিখা।
জানি, আমার
জীবন-জ্বালা
শিখার মালা—
সাজিয়ে চলি কোন্ সে গোপন হিরন্ময়ের বরণ-ডালা।

চলা যখন হ'ল শুরু
যাবই যাব,
গতিতে মোর জ্যোতির অতল
পাবই পাব;
বাধা-বাঁধন
ফেলব টুটে,
চলব ছুটে,
কুজ্ঝটি-জাল ছিন্ন করি' রবির মত উঠব ফুটে।

যদিও দিন

জীবনানন্দ দাশ

যদিও দিন কেবলি নতুন গল্পবিশ্রুতির
তারপরে রাত অন্ধকারে থেমে থাকা;—লুপ্তপ্রায় নীড়
সঠিক ক'রে নেয়ার মতো শান্ত কথা ভাবা;
যদিও গভীর রাতের তারা (মনে হয়) ঐশী শক্তির;

তবুও কোথাও এখন আর প্রতিভা আভা নেই;
অন্ধকারে কেবলি সময় হৃদয় দেশ ক্ষ'য়ে
যেতেছে দেখে নীলিমাকে অসীম ক'রে তুমি
বলতে যদি মেঘনা নদীর মতন অকূল হয়েঃ

'আমি তোমার মনের নারী শরীরিণী—জানি;
কেন তুমি স্তব্ধ হয়ে থাকো।
তুমি আছ ব'লে আমি কেবলই দূরে চলতে ভালোবাসি,
চিনি না কোনো সাঁকো।

যতটা দূর যেতেছি আমি সূর্যকরোজ্জ্বলতাময় প্রাণে
ততই তোমার সত্ত্বাধিকার ক্ষয়
পাচ্ছে বলে মনে কর? তুমি আমার প্রাণের মাঝে দ্বীপ,
কিন্তু সে দ্বীপ মেঘনা নদী নয়।'—

এ কথা যদি জলের মতো উৎসারণে তুমি
আমাকে—তাকে—যাকে তুমি ভালোবাস তাকে
ব'লে যেতে;—শুনে নিতাম, মহাপ্রাণের বৃক্ষ থেকে পাখি
শোনে যেমন আকাশ বাতাস রাতের তারকাকে।

ঊর্ধ্ববাহু

অজিত দত্ত

এখানে আকাশ আসে না মাটির কাছে,
এখানে কেবল আকাশের দিকে দু'হাত বাড়ানো আছে।
দুটি হাতে যদি ও-নীল সাগর থেকে
সুদূরের রঙ কোনোমতে পারি চোখে মুখে নিতে মেখে—
তবে মনে হয়, বনরাজিনীল দিগন্ত সীমানায়
আকাশে মাটিতে কী ক'রে মিলেছে, কিছু কিছু জানা য

এখানে রুক্ষ উষর কৃপণ মাঠ,
কাড়াকাড়ি করে যারা বেশি নেয়, তাদেরি রাজ্যপাট।
এ-মাটির রঙে গেরুয়া ছোপালে ভিক্ষা ভাগ্যলিপি,
যতই উঁচুতে উঠি, বড় জোর সেটা বল্মীক ঢিপি।
দূরে যেতে গেলে পিছে গাঁটছড়া-বন্ধন দেয় টান,
বাসর ঘরের অন্ধকূপেই মানুষ ভাগ্যবান।
তবুও আকাশে নীলের জোয়ার এলে
সব সীমান্ত ছাড়িয়ে যাবার কিছু ইঙ্গিত মেলে।
দু'হাত বাড়ায়ে ভাবি,
ওই নীলে যদি হৃদয় ছোপাই পাবো স্বর্গের চাবি।

সারাটা জীবন খুঁজেও মেলেনা উপরতলার সিঁড়ি,
আকাশ ছোঁয়ার মত উঁচু নেই কোনো কাঞ্চন-গিরি।
তবুও ঊর্ধ্ব কেবলি উঁচুতে টানে,
ক্ষণবন্যায় মুছে দিতে চায় গৃহস্থালির মানে।
জানি ও-স্বর্গ আসে না ধরার কাছে,
তবুও এখানে আকাশেরে ছুঁতে দু'হাত বাড়ানো আছে॥

শান্তি

হরপ্রসাদ মিত্র

প্রগাঢ় সব মনের কথা ফুরোয় বল্‌তে—বল্‌তে।
বাড়ন্ত তেল শুকিয়ে শেষে ছাই হয়ে যায় শল্‌তে।
হঠাৎ বুদ্ধি-বিবেচনা একযোগে চায় শুদ্ধি।
প্রবৃত্তি আর বিবেক থামায় সকল যোদ্ধাযুদ্ধি।
শান্ত হয়ে আসেন স্মৃতি বসেন জাজিম-প্রান্তে,
স্মিত হাস্যে বলেন যেটা অট্টহাস্যে জান্‌তে।

দুঃসহ দিন গেছে,—গেছে ছেঁড়া মালার কান্না।
ছাড়িয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে অনেক চুনি-পান্না।
অ-পরিণামদর্শী এবং অন্ধ অনুসন্ধী—
লোকসানে আর লাভে ঘটায় শেষ পারাণীর সন্ধি।
গিঁঠ দিয়ে আর তালি দিয়ে বানিয়ে বাউল-সজ্জা
সংসারে সে ঢাকে আপন পোড়া দেহের লজ্জা।

নির্বোধেরা উঞ্ছ খোঁটে, নিরীহ চায় শান্তি।
সর্বশোধন কৃতান্ত কাল ধরেন কুঠারকান্তি।
দিব্য দীপন, দীপ্র প্রকাশ কে বলে নয় সাধ্য?
অনন্তকাল কে রাখে মন তুচ্ছ বেগের বাধ্য?
যখনই বাক্‌-রুদ্ধ আকাশ শিয়রে হয় সঙ্গী—
জানি সে রূপ—নীল আকাশের আত্মগোপন-ভঙ্গি!

স্বশ্রমে প্রাণ সর্বজয়ী। মেহনতের মূল্যে
হাজারোবার বন্ধ কপাট হিম্মতে যে খুল্‌লে—
সে করে চাষ, সে কাটে পথ, তার অফুরান দাস্যে
এই দুনিয়ার মেঘ কেটে যায় অপরিসীম হাস্যে।
কালপেঁচাদের হল্লা যখন রুদ্ধ ঘরের গন্ধে,
কালপুরুষের নির্মম হাত নামে কোমরবন্ধে।

ফুলের আঘ্রাণ

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

যদি এ জীবনটারে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে
ছড়িয়ে ছড়িয়ে দুই হাতে,
হাসি মুখে আগে চলে' যাই
বলে' যাই দূরবর্তিনীরে—
আমার মতন যেন হাওয়ায় হাওয়ায়
ভেসে যায় তোমারও সে ফুলন্ত আঘ্রাণ।
বসন্তের দিনে নয়, শ্রাবণ রাত্রিতে
যেমন হেনার গন্ধ, তেমনি তোমার
দেহের সুগন্ধ যেন আজন্মর পবনে অস্থির
ভেসে আসে আমার এ দেহের দুয়ারে।

বল ত কেমন হয়, আশ্চর্য কেমন?
কোথা কোনও চিহ্ন নাই তোমার আমার,
শুধু মৃদু গন্ধটুকু পারাপার করে,
ভোগবতী নদী নাই, নাই বৈতরণী
ভুলিবার কথা নাই, মনে রাখিবারও অর্থ নাই,
দয়া নাই, প্রেম নাই, নাহিক প্রত্যাশা—
সন্দেহ-অতীত এক উপন্যাস যেন।

গতি তা'র দ্রুত নয়, বৈচিত্র্যবিহীন
হংসমিথুনের ছবি তবুও প্রচ্ছদপটে আঁকা।
আসলে কিছু নাই, মুনাফা বাতিল।
আদান প্রদান নাই মুলতুবী বকেয়া,
ডানে আন্‌তে বাঁয়ে নাই হিসাব নিকাশে
শুধু আছে হাওয়া আর তোমার দেহের গন্ধটুকু
আর আছে বিশ্বজোড়া ফুলের আঘ্রাণ।

বলত কেমন হয়?
কোনও এক নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়
যদি কোনও অশরীরী মোহিনী মায়ায়
আমারে প্রলুব্ধ করে' তুমি ফিরে আস;
বাতাসে তোমার স্পর্শ,
দূরাগত বীণার ঝঙ্কারে
তব কণ্ঠস্বরে শুনি পুরাতন গান;
ছায়া ফেলে চলে যাও সীমার বাহিরে;
ফুলের পাইনা দেখা শুধু গন্ধ তার
অনুরাগে ছেয়ে ফেলে আমার ভুবন।

তৃণ

সুনীলচন্দ্র সরকার

'স তস্মৈ তৃণং দধৌ'
কে এ যক্ষ, তৃণখণ্ড নিয়ে
বলে, এই নাও?
সেই দান হাত পেতে নিতে
কত জীব এল ধরণীতে
কত লক্ষ বছর পারিয়ে
এখনো উধাও।
কে এ যক্ষ সেই তৃণ নিয়ে
আজো বলে, নাও?

আগুন দহে না সেই তৃণে,
পায় না হাওয়া-ও,
ডাইনোসর টেরোডেক্টিল
মাছ সাপ পাখীর মিছিল
আরো যত পশু ও মানুষে
বলে, কই দাও—
জঠর পায় না সেই তৃণে,
ঘ্রাণের হাওয়া-ও!

সেই তৃণে জাবর কেটেছে
কত তৃণ-ভুক্‌,
তাদের শরীরে সেই তৃণে
ক্ষুধার চাঞ্চল্যময় দিনে
বাঘেরা কবল হেনেছিল
সন্ধান-উৎসুক;
সেই তৃণে শয্যা পেতে শুত
দুটি সারী শুক।

সেই তৃণে ফলেছে ফসল
স্বপ্নের মতনঃ—
মানুষ তা মন-মুঠি দিয়ে
হেথা হোথা ছিটিয়ে ছড়িয়ে
অনেক প্রতীক্ষারত কাল
করেছে যাপন,
সেই তৃণ আজো তবু শুধু
ফলায় স্বপন।

কী এ তৃণ, সব রসনায়
মেশে, মেশে না-ও?
এরই রস প্রাণীকে বাঁচায়,
তবু ধরা পড়ে না খাঁচায়,
কামনার, ধারণার হাত
যত না বাড়াও,
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ হয় তৃণ—
মেলে না কোথাও!

যক্ষ তুমি তৃণখণ্ড নিয়ে
কি খেলা খেলাও!
দেখি যে চোখের সামনেই
এই আছে, এই কিছু নেই!
পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিয়ে
পূর্ণ হাতে পাও!
কণামাত্র এ মায়া, মায়াবী,
কবিকে শেখাও।

সাদা অন্ধকার

দিনেশ দাস

সন্ধ্যায়
স্বচ্ছ মেঘ ডুবে যায়,
চোখের পাতার মত নামে অন্ধকার :
অন্ধকার-ডুবজলে
একা আমি ডুবে যাই নিবিড় অতলে।
হঠাৎ নিশুতি রাতে শুনি যেন কার হাহাকার--
মুখ আছে জিভ নেই, চোখ আছে পাতা নেই তার।

কালো রাত্রি গেছে স'রে
শহরে বিদ্যুৎ-সাদা রাত :
শুকনো জলের মত আলো পড়ে ঝ'রে
ফুলে ওঠে করুণ কান্নার এক জলপ্রপাত।

জল লাগে চারপাশে ঘরের দেয়ালে
চেয়ার টেবিল ডোবে ভিজে-ভিজে ছায়ার আড়ালে,
স্যাতসেঁতে বই, আলমারি,
আমার মনের মত হ'য়ে ওঠে ভারী।

লোহার সমুদ্র ফোলে :
টল্‌টলে
কান্নার নদী এঁকেবেঁকে ঘোরে,
সময় ধোঁয়ার মত, হৃদয় ছাইয়ের মত ওড়ে—
বেদনার হিমালয় বিষণ্ণ, কঠিন।

তবু একদিন,
ছিঁড়ে এই সাদা রাত—সাদা অন্ধকার
জাগবে আলোর বীজ সোনালী আশার :
মাটির কানায়,
নামবে সবুজ ভোর হলুদ ডানায়॥

দূরযান

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

যাই চলে যাই অনেক দূরে,
কান্নাভেজা গানের সুরে
আবার যদি ডাকো
সকল দুঃখশোক হয়ে পার
হয়তো ফিরে আসব আবার
তবুও ডেকো নাকো।

ডেকো না আর, জানত কে যে
যে-অশ্রুতে হৃদয় ভেজে
যে-গান পোড়ায় ঘর,
যে-দুঃখ আর যে-যন্ত্রণায়
সকল স্বপ্ন হারিয়ে যায়
তাও এত সুন্দর।

সকল স্বপ্ন হারিয়ে গেলে
অন্য আর-এক স্বপ্ন জেলে
অন্য সুরের গানে
যত কিছু আছে পাবার
কুড়িয়ে নেব সবকিছু তার
অন্য কোনোখানে।

যাই চলে যাই অনেক দূরে
কান্নাভেজা এই দুপুরে
আবার কেন ডাকো,
সকল দুঃখশোক হয়ে পার
হয়তো ফিরে আসব আবার
তবুও ডেকো নাকো।

কাচঘর

অশোকবিজয় রাহা

সকালের কাচঘরে আলো হয় হীরা
উড়ে এসে বনের পাখিরা
দলে দলে রং মেখে যায়
বিচিত্র পাখায়।
তুলির ছোঁয়ায়
ঘাসফুল চোখ মেলে চায়
পথের দু'পাশে
টগরেরা ভিড় ক'রে আসে।

হঠাৎ পর্দা ওড়ে ওদিকের খোলা জানালায়
এলোচুলে কে এসে দাঁড়ায়
চেয়ে থাকে একা
মুখখানি কবেকার দেখা?
শিরীষের কচি ডালে পাতার ভিতরে

একটি ছায়ার পাখি নড়ে
ঘাসে ঘাসে শালিকেরা নাচে
বুদ্ধের মূর্তির কাছে চুপ ক'রে আছে
একটি অবাক মেয়ে, খোঁপায় মালতী,
নয়নতারার বনে দু'টি ফুল হল প্রজাপতি।

ছবি মুছে যায়
আবার সে কাচঘর একা,
ঝাউয়ের পাতায়
কাঁপে শুধু হিজিবিজি রেখা
চারদিকে ঝ'রে পড়ে আকাশের নীল
ডানার ঝিলিকে ভাসে চিল
কোথা হতে এসে এক সুর
হয়ে যায় মাঠ মেঘ দূর।

সময়ের পাখি

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথায় ওদের নীল আকাশের ছাতি
উড়ে চলে ওরা উদয়ের থেকে অস্তের দিকে রোজ
মানুষ দেখেছে নিত্য তবুও মানুষ পায়নি খোঁজ
এরা কি বলাকা? এরা শকুনের পাঁতি?
এরা কি আদিম স্ফুলিঙ্গ সেই সৃষ্টির আগুনের
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত ফাগুনের
গলায় ওদের অবিরাম দোলে ষড়ঋতু ফুলমালা
রবি-রশ্মির খর গতিবেগ ওদের ডানায় ঢালা?

প্রত্যহ এক পাখি উড়ে আসে
প্রত্যহ চ'লে যায়—
মানুষের আয়ু থর থর কাঁপে
চঞ্চল দু'ডানায়
মহাচেতনার গোল গবাক্ষে
নিত্যই ব'সে দেখি
কেন আসে এরা কী এমন কাজে
কেন চ'লে যায় এ কি?

একটি পাখায় দিবালোক ওড়ে
আরেক পাখায় রাত ঢাকা পড়ে
দিনে-রাতে মিলে প্রবাহের তোড়ে
কোথা যে গিয়ে হারায়!
প্রতি দিবসের মরু-পার-ছলে
সারাটি বছর এরা দলে দলে
কোলাহল ক'রে কেন আসে আর
কোন্ অদৃশ্যে যায়
সবার চেতনা সচকিত ক'রে দু'খানি পাখার ঘায়?
কতো দিন গেলো, কতোগুলো পাখি?
কতো রাত সেও কেউ গোনে তা' কি?
[নেপথ্যে কেউ আছে কি একাকী?]

সবার জীবন এ-ভাবেই যেন
চল্‌ছে নিয়ত মাপা!

...মনের জান্‌লা ভেজিয়ে দিলেই
সব প'ড়ে যায় চাপা।

তমসা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

বিদ্যুতের ঢেউ-তোলা র‍্যাডারের সতর্ক ডায়ালে—
শব্দের ধূসর মাছি
যত কেন দূর অন্তরালেঃ
তাদের ডানার ছায়া গোল হয়ে কাঁপে।
অন্ধকার কোন সূর্য—তীব্র-বিষ গ্যাসের উত্তাপে
স্ফুরিত লাভার মত
ফোটায় সে টগবগে—ফেনিল দুধের ছায়াপথ;
মঙ্গলে বর্সাত যদি, শনিতে সবুজ হ'য়ে নামে কি শরৎ!
পলে পলে, প্রহরে-প্রহরে
উল্কা খসে, ধূমকেতু কতটুকু নড়ে—
দূরবীণে খুঁটে খুঁটে সব রাখি টুকে;
এখন আকাশ যেন পান করি পানীয় তরল,
অবিকল একটি চুমুকে।

অবিরাম, অবিরত
প্রাণপণে মহাঋষি অগস্ত্যের মত
তুমুল সাগর—তারে ফেলিনি কি সবটুকু শুষে—
হাতের তালুতে তুলে, রুদ্ধশ্বাস শপথের একটি গণ্ডূষে!
ইতালীর ঘাটে নেমে, ছুঁয়ে গ্রীস, সৌদী আরবে
এই ত' কয়েকদিন হবে—
ডুবে-ডুবে, চুপি-চুপি, পা-টিপে পা-টিপে

লোহিত সাগরে উষ্ণ 'আবুলত' প্রবালের দ্বীপে
খুঁজি নি কি তন্ন-তন্ন বাসুকির মণিময় মরকত পুরী?
পৃথিবীর প্রাণবায়ু অতলান্তে টেনে
পাতালবিস্ময়টুকু ইঁদুরের মত তাও করেছি ত' চুরি!

অবাধ আকাশ আর অবাধ সাগর
এখন আমার যেন এ দুখানা মুখোমুখি ঘর
পৃথিবী মাঝের 'করিডর'।
আকাশে মরাল হই, মাছ হ'য়ে ঘুরিফিরি মাছের জগতে—
কিলিমিনজারো হ'তে
কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে নেপালে-তিব্বতে
চলে যাই; পামিরেও দু' দণ্ড বা পা ঝুলিয়ে বসি।
রুদ্র বা বরুণ-অগ্নি, রবি-তারা-শশীঃ
সকলেরি হাতে রাখি মৃদু হেসে মিত্রতার হাত;
তবুও ভয়াল কি-যে বোধহীন অন্ধকার রাত
পিচের গুঁড়োর মত নিরবধি দু'চোখ ভরায়!
একটি কুয়াশা নামে—
জীবনের দিক হ'তে দিগন্তে ছড়ায়—
খুঁজে যার এতটুকু মেলে না কারণ;
আকাশের, পাতালের, পৃথিবীর থেকে
আরো কি গহন, গূঢ় মানুষের বিচিত্র জীবন।

সাগরিকা

দেবদাস পাঠক

একটি পাহাড়ী নদী দিনরাত ছলছল সুরে
গান গায়। পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে
নাচে তার শাদা ফেনা, নটিনী সে-নদী
নিমেষে প্রলয় করে বাধা পায় যদি।

একটি পাহাড়ী মেয়ে সে-নদীর পাশে
বিকেলে কলসী নিয়ে জল নিতে আসে।
কলসী নামিয়ে রেখে জলে দেখে মুখ,
জীবনে কেবল তার এইটুকু সুখ।

জল নিয়ে ঘরে যায় পাহাড়ী সে মেয়ে,
শাল-সেগুনের বনে রাত আসে ছেয়ে।
নদীতো যায়না ঘরে, পাহাড় ছাড়িয়ে
দূর সমতলে যায় হঠাৎ হারিয়ে।

নদীতো সাগরে যাবে, মেয়ে যাবে ঘরে,
সমুদ্রপিপাসা তবু তারও অন্তরে।
কবে সে আসবে—সেই ছেলে—আর কবে,
যার চোখে সমুদ্রের ছবি দেখা হবে!

ফেরার পথে

অরুণকুমার সরকার

এই পথে যদি কেউ আসেই আবার
তাকে বোলো
যদি কেউ ভালোবাসে গাছের ছায়ায়
আলোর আলপনা ঘাসে বাতাসের ঢেউ
তাকে বোলো
দূর গ্রামে কেউ নেই আর
পুকুরের পাড়ে বউ তেঁতুলতলার হাট
কপাট সিঁদুরমাখা ছবিআঁকা মাদারের ফুল
কিছু নেই ধুলোর চিৎকার।

এই পথ যাবে শূন্যে অরণ্যের নিরুদ্দেশে যাবে
হারাবে ভীরুতা প্রেম স্নেহের শপথ মাটি
মমতার খুঁটিনাটি বাগানের পরিপাটি মুখ
হারাবে ছড়াবে সবই রেখে যাবে মুক্তির অসুখ
রিক্ততার বেদনার চিহ্ন চেতনায়
তাকে বোলো।

শূন্য পুরাণ

হীরালাল দাশগুপ্ত

বন্ধ আঁখির অন্ধকার
মহা সমুদ্র শূন্যতার।
স্মৃতি ছায়াপথে হলুদ-বেগুনী আলো-তরঙ্গ নিষ্প্রভ
তিমির সূর্য শিখায় শিখায় রক্ত-করবী নীল নভ!

গাছে গাছে আর পাহাড়ে পাহাড়ে
কুসুম তুষার ছন্দিত।
কোথা গেল তারা
ভুল ক'রে যারা
মন নিত আর মন দিত?
বন্ধ আঁখির অন্ধকার
মহা সমুদ্র শূন্যতার।

স্বপ্ন-শীতল কোথা কল কল জল ধ্বনি!
চূর্ণ গোলাপ গোধূলি লগ্ন চিরন্তনী?

তমালী তালের ছায়া নাই
নব ফাল্গুনী মায়া নাই।
শূন্য কুটীর জীর্ণ দ্বার
একতারাটার ছিন্নতার।

ব্যর্থ দিনের ক্লান্ত বিদায় সাগর উর্মি চুমি
বন্ধ্যা রাত্রি বক্ষে রিক্ত সাহারার মরুভূমি!
একখানি মুখ
ম্লান উৎসুক
শুধু একতারা
আপনাতে হারা
একটি গোপন কম্পিত হাতছানি
একটি পাখীর ভীরু ডানা ঝাপ্‌টানি।
তীরহীন তীরে নীরবতার
শুধু হাহাকার শূন্যতার।

দুপুর

শিবদাস চট্টোপাধ্যায়

অজস্র দুপুরে ভরে
ছোটো ছোটো ঘুম আসে
শিশু-কবরের মতো
করুণ, সুদূরে--
সঙ্গীহীন
রৌদ্রদগ্ধ,—
বিস্মৃতির তটপ্রান্তে অতীতের অনুনয় যেন।

বেকারের বিপুল আকাশে
তাম্রশান্ত শব্দহীন সীমাহীন নীল,
ক্লান্তডানা চিল
বার বার
বৃত্ত টানে ছোটো হতে ছোটতর করে
ছোটো ছোটো ঘুম আসে
ক্লান্তডানা নীল চিল বেকার আকাশে।

আশ্বিনে

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

বহুতর শংখচিল নির্জন নিরালা নদী-তীরে
আশ্বিনের স্বপ্ন বোনে, অবসন্ন নীলিম আকাশ
রিক্ত মেঘে সমাচ্ছন্ন, দিগন্তের দূরাবর্ত ঘিরে
উড়ে গেল এক ঝাঁক হীরা-শ্বেত যাযাবর হাঁস!
সূর্যের দক্ষিণায়ন; পূর্বাহ্ণেই ঈষদুষ্ণ রোদ
উত্তাপে জুড়ায় প্রাণ কামরার জনপ্রাণীদের,
আঁকাবাঁকা রেলপথে চলে রেলগাড়িদের স্রোত—
দীর্ঘ এই অবকাশে স্বপ্ন সুরু সবার মনের।

সেই ত পদ্মার পাড়ে বালুকীর্ণ বিস্তীর্ণ চরের
অবাক প্রান্তরশায়ী সবুজের আস্তরণে মুড়ে
ধানের মঞ্জরী ফোটে ঠাণ্ডা মধু বুকে নিয়ে ফের,
মৃত্তিকার অনুভব গন্ধে-স্পর্শে এ-হৃদয় জুড়ে!
সেখানে পদ্মার ধারে চঞ্চলের প্রাণস্ফুট হল,
আশ্বিনের রেলগাড়ি, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো

অসম্পূর্ণ

মণীন্দ্র রায়

আশ্বিনে বুঝি সবই আজ লাগে তুচ্ছ?
সোনালী দিনের খুশীর আভায়
দীপ্ত সবুজে গিনি ঝরে যায়,
মাটির কামনা মিটেছে ধানের গুচ্ছে!
তবু কি তৃপ্ত হ'য়েছে আমার ইচ্ছা?

মনে আছে সেই গ্রীষ্মের দিনপঞ্জি।
রোদে ফুটিফাটা মাঠের পাঁজরে
কচি শস্যের চারা ধুঁকে মরে--
ঘূর্ণি ধুলোয় এসেছে নকল পাঞ্জা,
আসেনি প্রবল বর্ষণে মেঘপুঞ্জ!

এল তারপরে ঢলনামা ক্ষ্যাপা বন্যা।
ক্ষুব্ধ নদীর ঢেউয়ের ঝাপটে
মনে ভয় জাগে কখন কী ঘটে!

সর্বনাশের বাঁধভাঙা পৈশুন্যে
বুঝি ডোবে মাঠে সারা বছরের অন্ন!

সে ফাঁড়া কেটেছে, ফিরে গেছে সেই দস্যু।
চৈত্র-শ্রাবণ পার হ'য়ে আজ
শরতের মাঠে পেয়েছি স্বরাজ,
প্রাণপ্রাচুর্যে দেখি নই বটে নিঃস্ব।
তবু কী চিন্তা ছায়া ফেলে সেই দৃশ্যে!

মনে হয় তবু আজও মেটেনি তো স্বপ্ন।
ফসলের আশা যতোই ভোলায়
দেখি আজও তাকে তুলিনি গোলায়,
ভরা আশ্বিনে জ্বলি তাই খর প্রশ্নে—
কবে যে পৌষলক্ষ্মী মিটাবে তৃষ্ণা!

মিষ্টি দিদির গল্প তো আপনারা শুনলেন। এবার আর একজনের গল্প বলি—সে আমার মিছরি বৌদির গল্প। মিছরি বৌদি কিন্তু আমার সাত কুলের কেউ নয়। আপন বৌদি তো দূরের কথা, দূরসম্পর্কেরও নয় কেউ। মোট কথা মিছরি বৌদিকে আমি জীবনে দু'বারের বেশি দেখিওনি। তবু মিষ্টি দিদির কথা মনে পড়লেই আমার কেমন মিছরি বৌদির কথা মনে পড়তো। কোথায়

শ্রী বিমল মিত্র

যেন মিষ্টি দিদির সঙ্গে মিছরি বৌদির একটা মিলও ছিল। হয়ত সে-মিল তাদের চেহারায়। মিষ্টি দিদির মত মিছরি বৌদিও ছিল পাতলা ছিপছিপে রোগা। মনে হতো ফুঁ দিলে উড়ে যাবে বুঝি। মনে হতো দু' পা হাঁটলেই বুঝি হার্ট ফেল করবে। মনে হতো—আর ক'দিনইবা বাঁচবে......একদিন একটু জ্বর হলেই মিছরি বৌদি মারা যাবে হঠাৎ।

অন্তত অমরেশ মিছরি বৌদিকে নিয়ে যা করতো—আমার তো রীতিমত ভয় হয়েছিল।

অমরেশটা ছিল গুণ্ডা-চেহারার মানুষ। বলতো—এই দেখ মিছরিকে নিয়ে কেমন লোফালুফি খেলি—এই দেখ—এক—দুই তিন—

আমার অন্তরাত্মা তখন শুকিয়ে গেছে। মিছরি বৌদিও কম ভয় পায়নি। মিছরি বৌদিকে টপ্ করে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে লোফালুফি সুরু করে দিত অমরেশ। একটু যদি হাত ফস্‌কে যায়, তো মিছরি বৌদির ওই শুক্‌নো হাড় ক'খানা আর আস্ত থাকবে না তা'হলে।

বলতাম—থাম্ — থাম্ — করিস্ কি অমরেশ থাম্—

মিছরি বৌদিও তখন বেশ ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। কাপড়চোপড় নিয়ে ব্যস্ত। মাথার ঘোমটা খসে গেছে। খোঁপা খুলে গেছে। অমরেশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে বাঁচে যেন।

বললে—দেখছেন তো ঠাকুরপো—দিনরাত এই রকম—যদি পড়ে যেতুম—

অমরেশ তখন হাতের মাস্‌ল্ দুটো ফোলাচ্ছে।

বললে—পড়েই যদি যাবে তো চেহারাটা বাগিয়েছিলুম কেন——এতদিন মাখন, ডিম, ছোলা খেয়েছি কি শুধু মিছিমিছি—

তা এই মিছরি বৌদিকেই বহুদিন পরে

একদিন দেখলাম জব্বলপুর স্টেশনে। জব্বলপুর স্টেশনে বম্বে মেল থেকে নেমে ছোট লাইনের গাড়িতে উঠবো। তাড়া-তাড়ি করছি।

হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে বললে—ঠাকুরপো না—

ফিরে চাইলাম। কিন্তু সামনে যাকে দেখলাম তাকে আমার চিনতে পারার কথা নয়। বেশ মোটাসোটা মেয়ে। মাথায় আধ-ঘোমটা। হাতে একটা এম্ব্রয়ডারি

করা ব্যাগ। ফরসা মাজা-ঘসা রং। আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছেন।

আমার মুখ-চোখের ভঙ্গি দেখে বললেন—এরি মধ্যেই ভুলে গেলেন নাকি মিছরি বৌদিকে—

মিছরি বৌদি!

আমি সবিস্ময়ে আর একবার চেয়ে দেখলাম। কিন্তু আমার চেনা মিছরি বৌদির সঙ্গে এ-চেহারার মিল নেই কোনওখানে। কেমন যেন হতবাক হয়ে গেলাম। এমন তো হবার কথা নয়। এমন পরিবর্তন তো হয় না মানুষের।

মিছরি বৌদি তখনও হাসছিলো। বললে—আমার বাড়িতে চলুন—আজকে আর কোথাও যেতে পাবেন না—

মিছরি বৌদি কাদের বুঝি ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলো।

বললাম—আমার যে জরুরী কাজ ছিল একটা—

—তা থাকুক কাজ,—বলে আমাকে টেনে নিয়ে চললো।

আমি কিন্তু তখন অন্য কথা ভাবছি। অমরেশ অবশ্য চিকিৎসা করাতো মিছরি বৌদির। দেখেছিলাম মিছরি বৌদির টেবিলে অনেক রকম ওষুধের শিশি। অনেক রকম লিভার টনিক। অনেক রকম লিভার এক্সট্র্যাক্ট।

অমরেশ বলতো— মনটা খুশি রাখতে পারলেই মিছরির শরীরটা চড় চড় করে সেরে উঠবে—

তা মিছরি বৌদির মন প্রফুল্ল রাখবারই কি অমরেশ কম চেষ্টা করেছে। বাগানে দোলনা টাঙিয়ে দিয়েছে। সে-দোলনাও আমি দেখেছি। কিন্তু অমরেশের তো কান্ড। দোল খেতে খেতে অমরেশ এমন জোরে দোল দিত যে মিছরি বৌদির বুক তখন কাঁপছে থর্ থর্ করে। নামতে পারলে বাঁচে।

মিছরি বৌদি বলেছিল—দেখেছেন তো ঠাকুরপো—আপনি না থাকলে আমি মরেই যেতাম—

আমি সেবার বলে এসেছিলাম—খুব সাবধানে থাকবেন বৌদি—অমরেশ সব পারে।

অমরেশকে আমি চিনতাম ছোটবেলা থেকে। মিত্র ইনস্টিটিউশন্ থেকে এক ক্লাশে পড়ে একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম দুজনে। অমরেশকে চিনতে আমাদের আর বাকি নেই। কতদিন কতবার অমরেশের কত ঘুষি কত কিল খেয়েছি তার আর হিসেব পত্তোর নেই। অথচ আদর করেই করতো সে-সব। অমরেশের আদরের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম ছোটবেলায়।

হঠাৎ হয়ত আদর করেই পিঠে একটা ঘুষি মেরে বললে—কিরে পল্টু কোথায় যাচ্ছিস্—

কিম্বা হয়ত হাসির গল্প করতে করতে খুব ফুর্তি হয়েছে অমরেশের, হঠাৎ ফুর্তির আবেগে দুদিকে দুজনের পিঠে দুই কিল মেরে হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললে আর হাসাস্ নে ভাই—দম ফেটে যাবে এবার—

অমরেশের পক্ষে যা খেলা, আমাদের পক্ষে তা-ই ছিল মর্মান্তিক। আমরা তখন হয়ত কিল খেয়ে আর শিরদাঁড়া সোজা করতে পারছি না। যন্ত্রণায় পিঠ কন্‌কন্ করছে।

অমরেশ বলতো—আমার মতো ছোলা খা, দুধ খা, ডিম খা, মুগুর ভাঁজ—তোদেরও আমার মত চেহারা হবে—ও রকম দশটা কিলেও কিছু হবে না—

অমরেশের ঘরে গিয়ে দেখেছি—চারদিকে কেবল স্যাণ্ডো, হারকিউলিস, এ্যাপোলোর ছবি। নানা রকমের চার্ট। শরীর সারাবার কৌশল লেখা সব বই। বারবেল, মুগুর, ডাম্বেল এই সব। যত রকমের কলা-কৌশল আছে, সব শিখে নিত অমরেশ। ভারি ভারি লোহার বল ছুঁড়তো। দেড় মণ দু' মণ ওজনের বারবেল অনায়াসে তুলতো মাথার ওপর।

বলতো—জানিস্—কাল হঠাৎ স্যাণ্ডোকে স্বপ্ন দেখেছি—

বললাম—স্যাণ্ডো?

—হ্যাঁরে, দেখলুম স্যাণ্ডো যেন আমার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে, আমি স্যাণ্ডোকে দেখেই বাইসেপটাকে ফুলিয়ে দিলুম, স্যাণ্ডো বললে—সাবাস্ বেটা জীতা রহো—

আমাদের কুস্তির আখড়াতে একলা অমরেশই শুধু শেষ পর্যন্ত টিকেছিল। চাঁদা করে কুস্তির আখড়া করেছিলুম। নিম পাতা দিয়ে আখড়ার মাটি মেখেছিলুম। ভোর বেলা উঠে আখড়ার মাটিতে গিয়ে গড়াগড়ি দিতুম। প্যারালাল বার, হোরাই-জেণ্টাল বার, রিং—সব রকমের ব্যবস্থা ছিল। তারপর বাড়িতে এসে কল্ বেরোন ছোলা আর আদা নুন খেয়ে চান করে ফেলতুম। সে-সব কতদিন আগেকার কথা। আমরা অমরেশের মত চেহারা করবার চেষ্টা করতুম। অমরেশ ছিল আমাদের পাণ্ডা। অমরেশের উৎসাহেই আমাদের উৎসাহ, অমরেশই আমাদের আদর্শ! মাসে একদিন হনুমানজীর পুজো হতো। আখড়ার এক কোণে হনুমানজীর মূর্তি তৈরি করেছিল আমাদের আর্টিস্ট জয়ন্ত। সেদিনটা আমাদের উৎসব। সকাল থেকে সিঁদুর মাখানো হচ্ছে হনুমানজীর গায়ে। চাঁদার পয়সায় ছোলা খাওয়া হতো, মাখন আসতো, মর্তমান কলা আসতো। অমরেশ বলতো—খুব করে ভিটামিন খাবি—তাতে শরীরে জোর হয়—

মনে আছে ভিটামিন কথাটা অমরেশের মুখেই প্রথম শুনি। সেই ভিটামিন খেয়ে কিনা জানি না অমরেশের চেহারা দিন দিন দৈত্যের মত হয়ে উঠলো। আমরা যে-যার দিকে ছিটকে পড়লাম। কেউ চাকরিতে, কেউ ব্যবসায়, কেউ বা দালালিতে। ভুলে গেলাম আখড়ার কথা। শেষে আখড়ার জমিতে কে এক ভদ্রলোক বাড়িও করলেন। কুস্তির আখড়ার ঠিক ওপরেই বানালেন ইট ভিজাবার চৌবাচ্ছা।

কিন্তু অমরেশ স্বাস্থ্যচর্চা ছাড়লে না। ক্লাবের বারবেল, ডাম্বেল, মুগুর সব কিছু নিয়ে ছাদের ওপর তুললো। বললে—ওটা কি ছাড়তে পারিরে—তাতে যে বাত হবে—

বললে—তোরাও ছাড়িস্‌নি—এখন ছেড়ে দিলে বাতে পঙ্গু হয়ে যাবি সব—

মনে আছে আমার এক দূরসম্পর্কের দাদা ইনসিওরের দালালি করতো। একবার এসেছিল কিছু কেস্ জোগাড় করে দিতে। বললে—তোর বন্ধুবান্ধবরা তো চাকরি-বাকরি করছে এখন—দে না দু' একটা কেস্ করিয়ে—দু' একটা পলিসি করিয়েও দিয়েছিলাম। কেউ বা স্বার্থের তাগিদে করেছিল, কেউ বা উপরোধে পড়ে। কিন্তু অমরেশের কাছে কথাটা পাড়তেই রেগে গেল।

বললে—ইনসিওর করবো কেন?

দাদা বুঝিয়ে বলতে গেল—এই তো জীবন আমাদের, কখন আছি, কখন নেই... আপনার অবর্তমানে......

কথাটা শেষ হলো না। অমরেশ বললে, —মরবো কি মশাই, মরে ওমনি গেলেই হলো......

বলে গেঞ্জিটা খপ্ করে খুলে ফেলে আবার বললে—স্বাস্থ্যটা দেখছেন, অনেক বারবেল মুগুর ভেঁজে গড়েছি চেহারাটা...

তারপর গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে বললে—অত সহজে মরছি না আমি মশাই—

তা সেই অমরেশ শেষকালে একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে গেল হঠাৎ। আর তার খবর পাইনি। পরে শুনলাম, সে নাকি মোরাদাবাদের এক পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখতে গেছে। তারপর আরো কয়েক বছর পরে যখন আমি

বাইরে চাকরি করছি, তখন একবার কলকাতায় এসে শুনলাম—বক্সিং-এ ট্রফি জিতেছে অমরেশ সেবার। এমনি করে কয়েক বছর পর পর সামান্য একটু একটু সংবাদ পাই অমরেশের। কখনও খবরের কাগজে খেলাধুলোর পাতায় ছবি বেরোয়, কখনও শুনি সে লক্ষ্মৌতে ড্রিল মাস্টারি করছে কোন্ সরকারী ইস্কুলে। আবার কখনও শুনি বোম্বেতে মিউনিসিপ্যালিটির চাকরি নিয়ে গেছে ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকটার হয়ে। এই রকম ছাড়া-ছাড়া খবর সব। কিন্তু মনে মনে বরাবর একটা শ্রদ্ধা ছিল অমরেশের ওপর। একমাত্র আমাদের মধ্যে ও-ই কেবল স্বাস্থ্য-চর্চা নিয়ে রইল। মনে হতো বাঙালীর বদনাম ঘোচাতে পারবে বটে অমরেশ!

তারপর যেবার জব্বলপুরে গেলাম আপিসের কাজে, সেইবার হঠাৎ রাস্তায় অমরেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নেপিয়ার টাউনে লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে আছি। গেট বন্ধ। ট্রেন আসছিল।

হঠাৎ পিঠের ওপর এক ভীষণ মর্মান্তিক ঘুষি!

মনে হলো পিঠটা যেন আর নেই আমার। সমস্ত চোখে তখন আমি সরষের ফুল দেখছি। কোনও রকমে চোখের জল সামলে সামনে চেয়ে দেখি হো হো করে বিকট হাসি হাসছে আর কেউ নয়, অমরেশ। হাতে সাইকেলটা ধরা।

বললে—তুই এখেনে?

আমারও ও-ই ছিল প্রশ্ন! প্রশ্ন না করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে অমরেশের দিকে চেয়ে রইলাম শুধু। অমরেশ একহাত দিয়ে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—তুই এখেনে কেনরে?

আমিও বললাম—তুই?

কিন্তু এবার সরে এলাম। কাছে থাকলেই গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা অমরেশের স্বভাব।

গেট তখন খুলে দিয়েছে। একটা ট্রেন ডানদিক থেকে বাঁদিকে চলে গেছে। অনেক-গুলো গরুর গাড়ি, সাইকেল রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি আটকে ছিল এতক্ষণ। তারাও চলতে লাগলো।

অমরেশ বললে—আমার বাঙলোয় চল্—

বললাম—তুই এখেনে কেন? কবে থেকে?

অমরেশ বললে—সে-সব কথা পরে হবে, তুই আমার সাইকেলের পেছনে ওঠ্—

বললাম—কতদূর?

—বেশি না, মাইল ছ'এক—

ছ'মাইল সাইকেলের পেছনে চড়াও যেমন বিপদ, আমার মত ভার নিয়ে এতখানি চালানোও শক্ত। বললাম—না থাক, তোর কষ্ট হবে—

—কষ্ট! তোকে কাঁধে করে দশ মাইল নিয়ে যেতে পারি জানিস্—মুগুর ভাঁজি কি মিছিমিছি নাকি?

তারপরে বললে—তুই আমায় আজ লজ্জা দিলি পল্টু—

বললাম—এখনও মুগুর ভাঁজিস তুই?

যাহোক, সেদিন শেষ পর্যন্ত সাইকেল রিক্সাতে চড়ে অমরেশের বাঙলোয় গিয়ে-ছিলাম। নেপিয়ার টাউন থেকে গান্ ক্যারেজ ফ্যাক্টরি। রাস্তা অনেকখানি। মাঝে অনেক চড়াই উৎরাই। কিন্তু সারা রাস্তা অমরেশ আমার পাশে পাশে গল্প করতে করতে চলেছিল।

বলেছিল—জব্বলপুরে এলি আর আমার বাঙলোয় উঠবি না—শুনলে মিছরি রাগ করবে যে—

বুঝেছিলাম—মিছরি অমরেশের বউ-এর নাম। মিছরির কথা বলতেই অমরেশ পঞ্চমুখ। মিছরি বড় রোগা। মিছরি যা খায় হজম হয় না। মিছরির শরীরের ওজন। এই সব।

বললে—দ্যাখ্, আজ পর্যন্ত কত ছেলেকে মানুষ করলুম, কত হাড় জিরজিরেকে মাসল্ ফুলিয়ে দিলুম, কত ছেলে আগে ভাত হজম করতে পরতো না, তাদের দিয়ে লোহা হজম করিয়ে দিলুম তার গোনাগুন্তি নেই। কিন্তু মিছরিকে পারছি না। কেবল আজ অম্বল, কাল চোঁয়াঢেঁকুর—

বললাম—ডাক্তারে কী বলে?

তারপরে অমরেশ আরো অনেক কথা বলেছিল। বলেছিল—তা ছাড়া, ও-মেয়েকে বিয়ে না করলে অমন চাকরিটা প্রায় তখন হাতছাড়াই হয়ে যায়—শ্বশুরে নিজে হলো তখন ওয়ার্কস্ ম্যানেজার—

অমরেশ রাস্তায় যেতে যেতে অনেক গল্পই করেছিল সেদিন। কিন্তু অমরেশের কথা শুনে আমার যেন সেদিন খুব আনন্দ হয়েছিল মনে মনে। রোগা চেহারার ওপর অমরেশের বরাবর রাগ ছিল। আশে পাশে ক্ষীণ-স্বাস্থ্য লোক দেখতে পারতো না মোটে। দুর্বল লোক দেখলে কিল-ঘুষি আবার বেশি চালাতো। দুম্ দুম্ করে ঘুষি মারতো তার বুকের পাঁজরার ওপরে। বুক ফুলিয়ে বলতো—স্বাস্থ্য হবে এই রকম—এই দ্যাখ্—

বলে নিজের বুকটা ফুলিয়ে ডবোল করতো অমরেশ।

সেই অমরেশ এবার সত্যিই জব্দ হয়েছে ভেবে খুব আনন্দ পেলাম। মিছরিকে

নিশ্চয়ই ঘুষি মারতে পারবে না। মিছরির জন্যেই তার চাকরি। শুধু চাকরি নয়, ভালো চাকরি। নইলে বাঙলো পায়।

কিন্তু অমরেশের বাঙলোয় গিয়ে সে-ভুল আমার ভাঙলো।

বাঙলোর সামনে সাইকেল থেকে নেমেই কিন্তু অমরেশ চীৎকার জুড়ে দিলে—মিছরি—মিছরি—

চাকর-বাকর দৌড়ে এল অমরেশের সাড়া পেয়ে, কিন্তু যাকে ডাকা সে কিন্তু এল না।

একজন চাকরকে অমরেশ জিজ্ঞেস করলে—মেম-সাহেব কোথায়?

সে বললে—বিছানায় শুয়ে আছে—

আমাকে ঘরে বসিয়ে অমরেশ দৌড়ে ভেতরে গেল। বললে—তুই বোস পল্টু, আমি মিছরিকে ডেকে আনি—

ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলাম। সাহেবি কেতায় সাজানো ঘর। একপাশে দেয়ালের গায়ে ম্যান্টেলপিসও রয়েছে। তার নিচে আগুন জ্বালাবার জায়গা। ওপরে অমরেশের নানা বয়সের ফোটোগ্রাফ। কোনওটা খালি গায়ে। শরীরের নানা অংশের মাসল্ দেখাচ্ছে অমরেশ। অনেক মেডেল ঝোলানো গলায়। সার্টিফিকেটগুলো ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে দিয়েছে। আর দেয়ালের চারদিকে বড় বড় পালোয়ান কুস্তিগীরদের ছবি। অমরেশের সব দেবতা-মণ্ডলী।

খানিক পরে যেন মেয়ে মানুষের গলার আওয়াজ পেলাম—ওমা করো কি, ছি ছি—করো কি......

দেখি অমরেশ বউকে একেবারে পাঁজা-কোলা করে নিয়ে এসে হাজির।

বললে—দেখলি পল্টু, এই হলো মিছরি—আর ও হলো পল্টু—

আমি যতটা না অপ্রস্তুত হলাম, মিছরি বৌদি আরো অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে অমরেশ ঘরের ভেতর ঘুরতে লাগলো।

মিছরি বৌদি বললে—কী লজ্জা বলো তো—ছাড়ো—

কিন্তু মনে আছে অমরেশ সেদিন, সেই প্রথম দিন, কী কাণ্ডই যে করেছিল।

বললে—এই দ্যাখ্ পল্টু, মিছরিকে লুফবো দেখবি—

কিন্তু আমি হতবুদ্ধি হয়ে ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করবার আগেই অমরেশ মিছরি বৌদিকে সত্যি সত্যি লুফতে আরম্ভ করেছে।

বললে—এই দ্যাখ্ এক, দুই, তিন......

আমি আর দেখতে পারলুম না। আমার বুকটা তখন ধড়াস ধড়াস করছে।

মিছরি বৌদিও তখন অনুনয় বিনয় করে বলছে—ছাড়ো ছাড়ো, পড়ে যাবো যে—ছি ছি—কী তুমি—

মিছরি বৌদির মাথার খোঁপা তখন খসে গেছে। সাড়ি অবিন্যস্ত। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই অমরেশের। সে তখন গুনছে—তিন, চার, পাঁচ........

আমি আর পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—ছাড় না অমরেশ—ওকি—ছাড়—

প্রথম দিনেই অমরেশ এমন কাণ্ড করবে ভাবতে পারিনি আমি। তা হলে আসতামই না এখানে। দেখলাম—অমরেশ এতদিন পরেও একটুকু বদলায় নি। গুণ্ডামির ভাবটা তার চরিত্র থেকে এখনও যায়নি। নিজের স্ত্রীর ওপরেও সে তেমনি নিষ্ঠুর!

মিছরি বৌদি তখন হাঁফাচ্ছে। চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। নামিয়ে দেবার অনেকক্ষণ পরেও সেদিন মুখে কথা বেরোয় নি মিছরি বৌদির। চেয়ারে বসে পাখার তলায় অনেকক্ষণ জিরিয়ে তবে মুখে কথা ফুটলো।

বললে—দেখলেন তো ঠাকুরপো, আপনি না থাকলে আমি আজ মরেই যেতাম—

মিছরি বৌদিকে এবার ভালো করে দেখলাম। কাঠির মত পাতলা শরীর। গলায় কণ্ঠা বেরোন। গালের চোয়াল দুটোও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, তীক্ষ্ম। কোথাও কোনও চর্বি যেন নেই শরীরে।

অমরেশ বলেছিল—দেখলি তো পল্টু, এই রকম সারাদিন—খালি বিছানায় শুয়ে থাকবে—

খেতে বসে দেখলাম মিছরি বৌদি খাবার-গুলো টেবিলের নিচে একটা বাটিতে লুকিয়ে ফেলছে। অমরেশ মিছরি বৌদির উল্টো দিকে বসেছিল। খাওয়া দেখছিলাম আমি অমরেশের। এক প্লেট ভাত, চার বাটি মাংস, এক ডিস্ ফল, তারপর প্রায় দু'সের দুধ, আর একুনে তিরিশখানি রুটি। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। আর এক-একবার মুখ তুলে বলছে—খা পল্টু—খা। ফেলে রাখিস নে—সব খেতে হবে—

তারপর মিছরি বৌদিকে লক্ষ্য করে বললে—ক'টা রুটি খেলে তুমি?

মিছরি বৌদি অক্লেশে বললে—এই তো বারোখানা হচ্ছে—

—আর মাংস?

মিছরি বৌদি অম্লান বদনে বললে—তিন বাটি—

অমরেশ বললে—আর চারখানা রুটি খেলে তবে তোমার ছুটি—

মিছরি বৌদি কিছু বললে না। কিন্তু দেখলাম খুব সন্তর্পণে মাংস, রুটি, তরকারি, ফল সমস্ত টেবিলের নিচে একটা পাত্রে লুকিয়ে ফেলছে।

পরে আমাকে মিছরি বৌদি বলেছিল—ওকে যেন বলবেন না—ত হলে আমায় একেবারে খুন করে ফেলবেন, ষোলখানা রুটি খেয়ে কি মরবো নাকি পেট ফুলে ঠাকুরপো—

—ক'খানা খেলেন সত্যি সত্যি?

—মাত্র দু'খানা, দু'খানা খেলেই আমার পেট ভরে যায়—

খেতে খেতে অমরেশ বলেছিল—খাবে, দৌড়বে, লাফাবে, ঝাঁপাবে, হৈ হৈ করবে, তবে না লাইফ্—আর তা না হলে কুড়ি বছরেই বুড়িয়ে গিয়ে একদিন রক্ত আমাশা হয়ে টুপ করে মরে যাও—বাঙালীর তো ওই এক পরিণতি—

মিছরি বৌদি পরে বলেছিল—এ আর কী দেখছেন ঠাকুরপো, আপনি এসেছেন তাই, নইলে দুপুরবেলা যেদিন বাড়ি থাকেন সেদিন হঠাৎ যদি খেয়াল হয় তো স্কিপিং করতে হবে ওর সঙ্গে......সে আর শেষ হতে চায় না—পা হাত কন্ কন্ করলেও রেহাই নেই, শেষকালে একেবারে আমার অজ্ঞান হয়ে যাবার মত অবস্থা হয়—

বলতে বলতে মিছরি বৌদির যেন ভয়ে মুখ শুকিয়ে এল।

—আর ওই দেখুন দোল্না, বিকেল বেলা এসেই দোলনা চাপতে হবে—ওতে নাকি পায়ের আর বুকের জোর বাড়ে—আবার মাঝখানে একবার ঘোড়া কিনেছিলেন একটা, বললেন—রাইডিংটা সব চেয়ে ভালো একসারসাইজ্—

—সে ঘোড়া কোথায় গেল?

—সে মরে গেল তাই, কিন্তু ক'দিন যে সে কী গায়ে ব্যথা, ঘুমোতে পারি না, শুতে পারি না, দাঁড়াতে পারি না, বসতে পারি
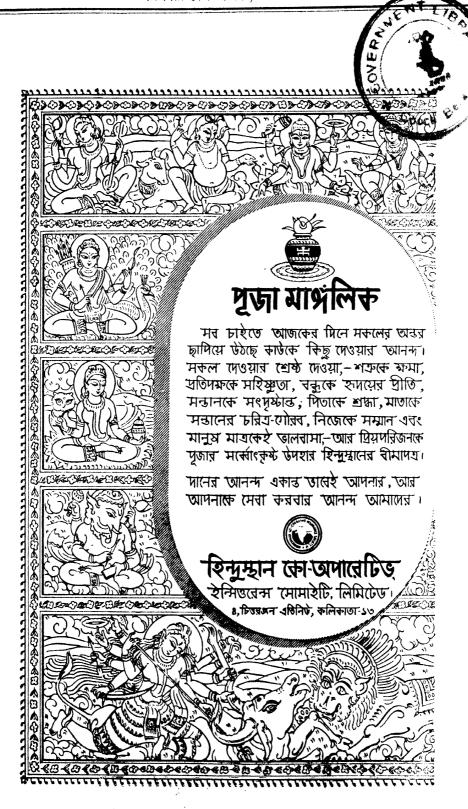
না—সে কি অশান্তি, শেষে ঘোড়াটার বোধ হয় মায়া হলো আমার ওপরে, মরে গেল একদিন দয়া করে—

অমরেশের ব্যাপারটা আমার বরাবরই কেমন যেন একটা ব্যাধি বলে মনে হতো। সব শুনে সেদিনও মনে হয়েছিল ব্যাধিটা যেন বেড়েছে বই কমেনি। আর একটা দিন মাত্র ছিলাম জব্বলপুরে, কিন্তু সেই একদিনেই মিছরি বৌদির জন্যে আমার সত্যিই মায়া হলো। এমন স্বামীর হাতে পড়ে মিছরি বৌদি নিশ্চয় একদিন মারা যাবে মনে হলো। ওই শরীর নিয়ে যে কী করে বেঁচে আছে, এইটেই আশ্চর্য মনে হয়েছিল সেদিন। ওই স্বাস্থ্য উদ্ধারের নামে অত্যাচার—এ অমরেশের আর একরকম চরিত্র বিকৃতি! ওর চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসা নয়। রোগটা মানসিক। মনের নিভৃতে কোথায় যেন পোকা ধরেছে অমরেশের।

আসবার দিন মিছরি বৌদিকে কথা দিয়েছিলাম—এদিকে এলে নিশ্চয় উঠবো আপনার এখানে—

মিছরি বৌদি বলেছিল—এলে আমাকে আর দেখতে পাবেন না ঠাকুরপো, তবে আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে ঠিকই—

মিছরি বৌদি অবশ্য হাসতে হাসতেই কথাটা বলেছিলো, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম, তার মনের গোপন ব্যথাটুকু। সেদিন মিছরি বৌদির কথার প্রতিবাদও করতে পারিনি সেই জন্যে। জানতাম অমরেশের হাতে মিছরি বৌদির ইহলীলা একদিন হঠাৎ অকালে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবেই শেষ হয়ে যাবে। কোনও সন্দেহ নেই আর তার!

অমরেশ গাড়িতে তুলে দিতে আসার সময় বলেছিল—তুই বোধ হয় ও-সব চর্চা-টর্চা ছেড়ে দিয়েছিস—নারে—

আমি কিছু উত্তর দিইনি।

খানিক থেমে অমরেশই বলেছিল—যদি দীর্ঘ পরমায়ু পেতে চাস তো একসারসাইজটা ছাড়িস নে বুঝলি—

কিন্তু তখন আমার চোখের সামনে মিছরি বৌদির জ্বলন্ত উদাহরণটা স্পষ্ট ভেসে রয়েছে। আমি সেদিন ভালো করে কথাই বলিনি অমরেশের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত।

এ-ঘটনার পর অনেক দিন কেটে গেছে। জব্বলপুরের দিকে আর যাওয়া হয়নি। মিছরি বৌদির খবরও আর পাইনি। অমরেশের সঙ্গেও আর দেখা হয়নি।

এতদিন পরে আবার জব্বলপুর ষ্টেশনে মিছরি বৌদির সঙ্গে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত ঘটনাটা মনে পড়লো।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে—সেই মিছরি বৌদি এমন স্বাস্থ্যবতী হলো কেমন করে। তবে কি অমরেশ শেষ পর্যন্ত নিজের সিস্টেমে সব রোগ সারিয়ে দিলে মিছরি বৌদির! নাকি ডাক্তারের কোনও ভালো ওষুধে কাজ হলো শেষ পর্যন্ত।

সাইকেল রিক্সায় চলেছিলাম দুজনে। নেপিয়ার টাউনে বাজারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মিছরি বৌদি বললে—ওই দেখুন ঠাকুরপো, এই আমাদের ইস্কুল—

—ইস্কুল! ইস্কুলে কি পড়েন নাকি?

—না বুড়ো বয়েসে আর পড়বো কেন, পড়াই—

—মাস্টারি করেন?

মিছরি বৌদি বললে—হ্যাঁ, মাস্টারিই তো, আজ সাত বছর হয়ে গেল এই এক ইস্কুলেই কেটে গেল—

কিন্তু কথাটা শুনে কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম। অমরেশ কি শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে দিয়ে চাকরি করাচ্ছে। তবে হয়ত চাকরি করছে বলেই স্বাস্থ্যটা ভালো হয়েছে মিছরি বৌদির। সারাদিন ঘরে বসে থাকলে শরীর মন কিছুই কি ভালো থাকে। ভালোই হয়েছে মনে মনে ভাবলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—মাস্টারি আগে কি করেছিলেন কখনও?

মিছরি বৌদি বললে—ওমা, মাস্টারি করতে যাবো কেন, আমারই বলে তিনটে মাস্টার ছিল, তখন বাবা বেঁচে ছিলেন—সকালে একজন পড়াতো ইংরিজী, বিকেলে অঙ্ক আর রাত্রে হিস্ট্রি, কিন্তু তখন অত পড়েও দেখুন স্বাস্থ্য খারাপ হয়নি, বিয়ে হবার পর থেকেই কী যে হলো—

বললাম—কিন্তু এখন তো আপনার চেহারা একেবারে বদলে গেছে—

মিছরি বৌদি বললে—তাই তো আপনি আমাকে চিনতে পারেননি—আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনেছি ঠাকুরপো—

একটা দোকানের সামনে এসেই মিছরি বৌদি রিক্সাওয়ালাকে থামতে বললে।

আমাকে বললে—আপনি একটু বসুন ঠাকুরপো, দোকানে একটা জিনিস কেনবার আছে আমার—
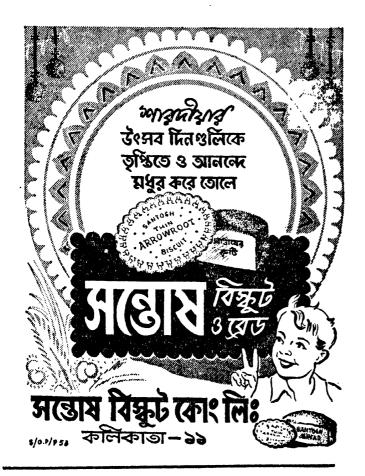
মিছরি বৌদি নেমে গেল। আমি ভালো করে দেখতে লাগলাম পেছন থেকে। আশ্চর্য! চেনাই যায় না আর সেই আগেকার মিছরি বৌদিকে। সারা শরীরে আগে যেখানে তীক্ষ্ণতা ছিল এখন সেখানে নিটোল নিভাঁজ লাবণ্য। সুডৌল, পরিপূর্ণ, নরম মিছরি বৌদি। অথচ অমরেশ মিছরি বৌদিকে নিয়ে কী লোফালুফিই না করেছে একদিন। দোল খাইয়ে, ঘোড়ায় চড়িয়ে মোটা করবার জন্যে অমরেশের বকুনির আর অন্ত ছিল না। কিন্তু এ পরিবর্তন হলো কী করে।

মিছরি বৌদি ঘামতে ঘামতে এল। হাতে একগাদা জিনিস পত্তোর।

আবার রিক্সায় উঠে আমার পাশে বসে রিক্সাওয়ালাকে বললে—চল্— জল্দি জল্দি চল্—

আমার দিকে চেয়ে মিছরি বৌদি বললে—মোটা হওয়ার অনেক বিপদ ঠাকুরপো—দেখছেন কী ঘামছি—অথচ আগে কত ওষুধ খেয়েছি, কত বকুনি খেয়েছি ও'র কাছে এই জন্যে—বলতেন—তোমাকে নিয়ে সমাজে বেরোতে আমার লজ্জা করে—তা বলুন তো ঠাকুরপো, এখন কি আমাকে ভালো দেখায়?

বললাম—তা দেখায় বৈকি!

—আর আগে?

বললাম—আগেও ভালো দেখাতো—তবে এখন আরো ভালো দেখায়—তা অমরেশ কী বলে?

মিছরি বৌদি বললে—উনি আর কী বলবেন—আমার দিকে চেয়ে দেখলে তো, কেবল নিজের স্বাস্থ্য নিয়েই ব্যস্ত—এই দেখুন না বিস্কুট, লজেন্স নিয়ে যাচ্ছি ও'র জন্যে—

—অমরেশ লজেন্স খাবে নাকি?

মিছরি বৌদি বললে—কেবল খাবার জন্যে যখন বায়না ধরেন, তখন দুটো লজেঞ্জ দিয়ে বলি চোষো—নইলে বড় বিরক্ত করেন কি না—আর আমি তো সারা দিন ইস্কুলে, সকাল বেলা খাইয়ে দাইয়ে রেখে ইস্কুলে চলে আসি—সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি ঘুমিয়ে পড়েছেন—

কেমন যেন অবাক লাগলো। কিছুই বুঝতে পারলাম না। বললাম—আজকাল অমরেশ সন্ধ্যে বেলায় ঘুমোয় নাকি?

মিছরি বৌদি বললে—সকাল সন্ধ্যে বিকেল সব সময়েই ঘুমোচ্ছেন, আমি তো তাই বলি—অত ঘুম ভালো নয়, সারাদিন ঘুমোলে ক্ষিদে তো পাবেই, তাই বিছানার পাশে এই বিস্কুট, লজেঞ্জ, আপেল, কমলা লেবু ছাড়িয়ে কেটে রেখে আসি—আমারও তো চাকরি ঠাকুরপো, বেশি কামাই করলে আমাকেই বা চাকরিতে রাখবে কেন—আজকাল তো পয়সা ফেললে লোকের অভাব হয় না—চাকরির বাজার তো দেখছি—

আরো আশ্চর্য লাগলো।

বললাম—সারাদিনই ঘুমোয় অমরেশ তো আপিস যায় কখন?

মিছরি বৌদি বললে—উনি তো রিটায়ার করেছেন—

রিটায়ার করেছে অমরেশ। এই বয়েসেই রিটায়ার করলো। চল্লিশও হয়নি যে।

মিছরি বৌদি বললে—না, বুঝলুম না হয় যে রিটায়ার করলে পুরুষ মানুষের খারাপ লাগেই—বিশেষ করে ও'র মতন ছটফটে মানুষের পক্ষে—কিন্তু তা বলে ঘুমোনো কেন পড়ে পড়ে? বই পড়লেও তো হয়, ভালো ভালো বই লাইব্রেরী থেকে আনাতে পারি, বললে উনি বলেন—পড়তে আর ভালো লাগে না। তা আমি বলি—বই পড়তে ভালো না লাগে ছবি আঁকো, ছবি আঁকা শেখো—আমি তুলি, রং, কাগজ কিনে দিচ্ছি—ছবি আঁকতে কী আর হাতী ঘোড়া দরকার হয়, সময় কাটানো নিয়ে তো কথা—ভালো ছবি হতে হবে তার কী মানে আছে, তাতে অন্তত মনটা প্রফুল্ল থাকবে, মনটাই তো সব। মন খারাপ হলেই স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে—তা আমার কথা তো কোনওদিনই শুনলেন না—

জিজ্ঞেস করলাম—অমরেশ একসারসাইজ করে আজকাল—?

মিছরি বৌদি বললে—সেসব এখন চুলোয় গেছে ঠাকুরপো, অন্য কিছু না করুন ডাম্বেল দুটোও তো ভাঁজতে পারেন—সে-সব মরচে পড়ছে, এবার ভাবছি বেচে দেব সব এতোয়ারি বাজারে পুরোন লোহার দোকানে, কত টাকার সব জিনিস বলুন তো ঠাকুরপো, শুধু শুধু ফেলে রেখে লাভ কী—

জিজ্ঞেস করলাম—আর খাওয়া! খাওয়া সেই রকম আছে। তিরিশ খানা রুটি, আর...

মিছরি বৌদি হাসলো, বললে—আছে, তবে সে-রকম আর নেই, সে-রকম তো আর পরিশ্রম হচ্ছে না, আগে ফ্যাক্টরীতে পরিশ্রম ছিল খুব, ফ্যাক্টরির ইলেকট্রিক করাতটা চালাতেন—সমস্ত প্ল্যাণ্টটারই তো ইনচার্জ ছিলেন, তা বাবা মারা না গেলে ও'কে আরো উন্নতি করে দিয়ে যেতেন—বাবাও হঠাৎ মারা গেলেন আর ও'রও... কিন্তু বাবাও বলেছিলেন ও'কে—ফ্যাক্টরির কাজে অত ছটফটে স্বভাব হওয়া ভালো নয়, বেশ ধীর স্থির হতে হবে—শুধু গায়ের জোরের কাজ নয়—

চড়াই উৎরাই রাস্তা। হঠাৎ যেন মনে হলো এ তো অন্যদিকে চলেছি।

জিজ্ঞেস করলাম—এ কোন দিকে চলেছেন বৌদি?

—কেন, ঠাকুরপো, ঠিক দিকেই তো চলেছি,—আমরা তো ফ্যাক্টরির বাঙলো ছেড়ে দিয়েছি বহুকাল, এখন তো এতোয়ারি বাজারের কাছে বাড়ি ভাড়া নিয়েছি একটা, আমার ইস্কুলটা কাছে পড়ে, আর তা ছাড়া ওদিকে বাড়ি ভাড়া একটু সস্তা—উনি পেনসন পান আর, আর আমার ইস্কুলের চাকরি—সবদিক বুঝে শুনে তো চলতে হবে—একটা চাকর শুধু রেখেছি ও'কে দেখবার জন্যে আর রান্নাবান্না আমি নিজের হাতেই করে নিই—দুটো লোকের তো রান্না, সেই চাকরটাই মাইনে নেয় কুড়ি টাকা করে—

—এখানে চাকরের তো অনেক মাইনে?

মিছরি বৌদি বললে—তা অনেক মাইনে কি সাধ করে দিই ঠাকুরপো, সবই তো করতে হয় তাকে—বাজার করা, হাট করা, জল তোলা, ও'র দ্বারা তো একটা কুটো পর্যন্ত নেড়ে উপকার হবার নয়—

বললাম—একেবারে স্রেফ বসে বসে খাচ্ছে নাকি—

—বসে হলে তো বাঁচতুম ঠাকুরপো, শুধু শুয়ে, জানালা খোলা থাকলে পর্যন্ত বলেন—ওটা বন্ধ করে দাও, চোখে আলো লাগছে। তা বলুন তো ঠাকুরপো, শরীরে একটু আলো হাওয়া লাগানো ভালো না? মনটা না হলে ভালো থাকবে কেন?

কী জানি কেমন যেন অবাক লাগছিল। অমরেশ শেষকালে এমন হয়ে গেল! অথচ কতদিন কতভাবে নিজেই তো ওসব উপদেশ দিয়েছে আমাদের। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ওমনিই হয়।

মিছরি বৌদি বললে—এই তো আজ ছুটির দিন, আমাদের ইস্কুলের সেক্রেটারীর ফ্যামেলি বম্বে যাচ্ছিল তাই স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলাম, গিয়ে এখন চান করানো ওঁকে—রান্না চড়ানো কত কাজ পড়ে আছে—

বললাম—তা হলে অমরেশের বাত হয়েছে বুঝি বৌদি? খুব যারা একসারসাইজ করে, তাদের কিন্তু এরকম বাত হয় শুনেছি—

মিছরি বৌদি বললে—হয়নি, কিন্তু বাত হতে আর দেরিও নেই ঠাকুরপো, এই আপনাকে বলে রাখলুম—

বলে রিক্সাওয়ালাকে বললে—এই রাখ—রাখ্—

রিক্সা থামতেই নামলাম আমরা। সামনে চেয়ে দেখলাম পুরোন ইটের গাঁথুনি করা একটা বাড়ি। কয়েকটা ছাগল ছানা, দু'টো মুরগী চরে বেড়াচ্ছে সামনে। একটা মটরের পুরোন মার্ডগার্ড মরচে পড়ে ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে আছে বাড়ির পাশেই। মিছরি বৌদিকে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগলো এই পরিবেশের মধ্যে। সেদিন সেই অমরেশের বাঙলোতে যেমন সেই মিছরি বৌদিকে মানায়নি, আজকের মিছরি বৌদিকেও যেন এই এতোয়ারি বাজারের ভাড়াটে বাড়িতে মানালোনা একেবারে।

জিনিসপত্তোর গুলো হাতে করে নিয়ে মিছরি বৌদি বললে—আসুন ঠাকুরপো এই আমাদের বাড়ি—

যেখানে যে ঘরে গিয়ে বসলাম সেটাও যেন কেমন নোংরা নোংরা মনে হলো।

বললাম—অমরেশ কোথায়?

মিছরি বৌদি বললে—শুয়ে আছে নিশ্চয়ই—দেখি—

বলে পরদা সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। আমি একলা চুপ চাপ বসে রইলাম। দেয়ালে সেই সব ছবিগুলো ঝুলছে। স্যাণ্ডো, এ্যাপোলো, হারকিউলিস।

মিছরি বৌদি হঠাৎ দরজার পরদা সরিয়ে বললে—যা বলেছি তাই—এই দেখুন ঠাকুরপো—আপনার বন্ধুকে দেখে যান—

গেলাম।

দেখলাম খাটের ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে অমরেশ। কিন্তু যাকে দেখলাম তাকে অমরেশ বললে একটু ভুল হয়। সে অমরেশের প্রেতাত্মা যেন।

মিছরি বৌদি বললে—দেখলেন তো ঠাকুরপো আমি যা বলেছিলুম—এই এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে শরীর থাকে—না মন ভালো থাকে—

বলে হঠাৎ ডাকতে লাগলো—শুনছো—ওগো—শুনছো—কে এসেছে দেখ—

একটু ডাকতেই ঘুম ভেঙে গেল অমরেশের। ভাবলাম—এখনি আমাকে দেখে হয়ত উঠে পিঠে একটা কিল্ বসিয়ে দেবে আনন্দের চোটে! কিন্তু কিছুই করলে না অমরেশ। শুধু বললে—পল্টু এসেছিস?

বললুম—শুয়ে আছিস কেন? বাইরে আয় না—

অমরেশ বললে—বাইরে?......বাইরে নয়, তুই এখানে বোস—ওই চেয়ারটা টেনে নে—

বললাম—ঘরের ভেতরে কেন—বাইরে ওই ঘরে চল্ না—

অমরেশ বললে—বাইরে যেতে পারি না—

—কেন?

—পা যে কাটা, দু'টো পা-ই......জানিস না তুই?

পা কাটা! কেমন যেন হতবাক হয়ে গেছি।

অমরেশ বললে—কেন, খবরের কাগজে তো বেরিয়েছিল, ইলেকট্রিক স' মেসিনে পা ঢুকে গিয়েছিল—এই দেখ্—

বললো কি, সেদিন অমরেশের বাড়ি গিয়ে দিনটা যে কী করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। আমি তখন আকাশ পাতাল ভাবছি। কিন্তু খানিক পরেই অবশ্য মিছরি বৌদি আমার দুর্ভোগ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

ঘরে ঢুকে বললে—আপনি একটু ও-ঘরে গিয়ে বসুন তো ঠাকুরপো—চান করিয়ে দিই ওঁকে—বেলা একেবারে পড়ে এল, আপনার কিন্তু খেতে একটু দেরি হয়ে যাবে ভাই, কিছু মনে করবেন না যেন—

চেয়ে দেখি মিছরি বৌদির হাতে বেড-প্যান।

তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে এলাম।

কিন্তু আজ এতদিন পরে একটা সত্যি কথা বলবো। সেদিন অমরেশের কাটা পা দু'টোর চেহারা দেখে মুখ দিয়ে যে একটা 'আহা' শব্দও বেরোয়নি, সে শুধু মিছরি বৌদির কথা ভেবেই। আমার যেন কেমন মনে হয়েছিল মিছরি বৌদি অমরেশের ওপর তার বহুদিনের পোষা রাগের প্রতিশোধ নিচ্ছে! আর তাছাড়া অমরেশের পা না কাটলে কি মিছরি বৌদির স্বাস্থ্যই ফিরতো, না মিছরি বৌদি সুন্দরী হতো।

মনোজ বসু

কোর্ট থেকে ফিরে, হিমাংশু পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলেন। লনের ওরা টের না পায়। ধুতি পরে বাঁচলেন এতক্ষণে।

কমলবাসিনীর কাছে একেবারে রান্না-ঘরের ভিতর চলে গেলেন।

কি আছে, দে শিগগির। আসন পাতছিস কেন, হাতে দিলেই তো হত!

হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে আরও ব্যস্ত হলেন।

ইস, বড্ড দেরি করে ফেলেছি। রওনা হবো, সেই সময়টা এক শাঁসালো মক্কেল এসে পাকড়ালো। আমার মন এদিকে পড়ে, কে শুনছে তার কথা? তবু সে বলেই চলল—

কমল বলেন, কোর্ট আর ক্লাব—এই দুটো জায়গা তোমার। আর কোন দিকে তাকাবে না, কোন কিছু কানে নেবে না—

গোলমেলে প্রসঙ্গে হিমাংশু বিব্রত হলেন। যাই হোক, লুচির রাশি শেষ করতে কিছু তো সময় লাগবে। ততক্ষণ আলোচনা চালানো যেতে পারে। কমল তাতে খুশি হবে।

কোন জিনিসটা তাকিয়ে দেখি নে, তোর কোন কথাটা কানে নিই নে? মিথ্যে যা হোক বলে দিলেই হ'ল!

দেখ তবে ঐ তাকিয়ে—

লনের দিকে কমলবাসিনী আঙুল দেখালেন। ব্যাডমিণ্টন খেলছে ওরা। হিমাংশু তারিফ করেন, বাঃ, দিব্যি হাত খুলেছে তো অনীতার! ছেলেটাকে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে—। কে ওটি?

মুখ বাঁকিয়ে কমলবাসিনী বলেন, নামটাই শুধু জানি—অলক। আর কোন কাজকর্ম আছে বলে তো ঠেকে না—চারটে বাজতে না বাজতে ঠিক এসে হাজির হবে। অনীতার তবু দু-দশ মিনিট দেরী হয় কলেজ থেকে ফিরতে। ও একেবারে ঘড়ির কাঁটা।

এ হেন নিয়মানুবর্তিতায় হিমাংশু যেন খুশিই হলেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন ঘন ঘন। বললেন, সীতা কোথায়রে?

সেলাইফোঁড়াই করছে—

বিকেলবেলা খেলাধুলো করা উচিত। ঘরের কোণে কলের ধারে মুখ গুঁজে থাকা অতি-যাচ্ছেতাই। কেন যে তুই আস্কারা দিস কমল—

আমাদের মতো ঘরের মেয়ের বল-খেলা চলে না—

হিমাংশু তাড়া দিয়ে ওঠেন।

আলবৎ চলে। কাল থেকে নামিয়ে দিবি। শাটলকক, দেখিস, অচল হয়ে থাকবে না।

কমল বলেন, কিন্তু আসল কথাটা কানে নিলে না দাদা। অলকের ওই যে ঘড়ি- ঘড়ি আসা-যাওয়া—

তোর ঐ সীতার জন্যে! কষ্ট করে আসে, নয় তো পার্টনার অভাবে খেলাই হত না বেচারির। তখন বুড়ো বাপকে নিয়ে হয়তো দাঁড় করাতো। তা ছেলেটা বাড়ি বয়ে আসে—যত্নটত্ন করিস কমল, রোজই যাতে আসে।

এই কথার এই জবাব! এ মানুষ কি করে যে নাম-করা উকিল হয়ে পয়সা রোজগার করেন, কমল বুঝতে পারেন না। দাবার নেশা—একটু-কিছু মুখে দিয়ে ক্লাবে ছুটতে পারলে হয়—নিজের মেয়ের কথাও কানে নেবার সময় নেই।

কিন্তু যে ভয় করছিলেন হিমাংশু! সাড়ে-পাঁচটা বাজে, বাপের দেখা নেই, তাই কেমন সন্দেহ হয়েছে অনীতার। হঠাৎ এক সময়ে খেলা বন্ধ করে সে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। এবং ঠিকই এসেছে—রান্নাঘরে।

বাবা!

সিঁদের মুখে চোর ধরা পড়েছে—এমনি ভাব হিমাংশুর চোখে মুখে।

আমায় কেন ডাকো নি বাবা?

স্ফূর্তিতে খেলছিলি। ভাবলাম, হাঁক-ডাক করে খেলাটা মাটি করে দেবো?

কাল থেকে আর খেলছি নে। গেটে দাঁড়িয়ে থাকব।

তা যাই ভাবো, মেয়ের তাড়নায় হিমাংশুর আনন্দও কম নয়। ক্লাবে যাবার জন্য পাগল, সকলের ধারণা তাই। মেয়ের কাছে হেনস্তা দেখে কমল ঐ মুখ টিপে টিপে হাসছেন। দাবাখেলা উত্তম বস্তু—তা বলে অনীতা বাপকে নিয়ে যে খেলা করে, তার চেয়ে কখনো নয়। বসতে না বসতে দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে, জুতোর ফিতে খোলে, ছুটে গিয়ে কোঁচানো ধুতি বের করে এনে দেয়। হাত-মুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরুলে তোয়ালে দিয়ে আরও পরিপাটি করে মুখ মুছিয়ে দেয়, বুরুশ-চিরুনি দিয়ে

স্বল্পাবশেষ চুল ক'টির পরিচর্যা করে। এই ক'বছর আগেও অনীতা পুতুল খেলত—কলেজে ঢুকবার পর বন্ধ হয়েছে বোধ করি সঙ্গিনীদের কাছে লজ্জায় পড়বার ভয়ে। বাপকে নিয়ে সেই পুতুলখেলার সাধ মেটায়! তা মেয়ের হাতে অবোধ অসহায় পুতুল হয়ে থাকতে এত বড় ধুরন্ধর উকিল হিমাংশুরও নিতান্ত মন্দ লাগে না।

কিন্তু বুড়ো বাপকে নিয়ে সমস্ত বিকেলটা মাটি করবে, এই বা কি করে হয়? লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াবার বয়স—তাই করুক। আহা, সর্ববঞ্চিতা মেয়েটি—এক বছর বয়সে যে মা হারালো, এ জগতে পেয়েছে সে কী?

চারটে থেকে গেট পাহারা দেবো বাবা। দেখি, কেমন করে তুমি লুকিয়ে আসো—

হিমাংশু যেন শুনতে পাচ্ছেন না, ঘাড় হেঁট করে মনোযোগ সহকারে খেয়ে যাচ্ছেন। অপরাধী যখন, কথার মধ্যে যেতে নেই। কিন্তু ছাড়বে কি অনীতা?

হাত-মুখ ধুয়েছ ভাল করে? সাবান দিয়েছ?

হুঁ—।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপাদ-মস্তক পরীক্ষিত হচ্ছে, হিমাংশু চোখ না তুলেও টের পাচ্ছেন।

গেঞ্জি ওটা পরেছ কেন?

এ তো ভালো—

ভালো কি মন্দ—তুমি তার কি বোঝো? সকালে ওটা ছেড়ে গিয়েছিলে। নতুন-ধোয়া গেঞ্জি বের করে আমি আলনায় রেখেছি—

সকালের গেঞ্জি বিকেলে পরলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না—

আর কোথায় যাবে! অনীতা আগুন হয়ে বলে, কেন ডাকো নি আমায়, তাই জিজ্ঞাসা করি। ময়লা নোংরা ঘামে-ভেজা—একেবারে বিষাক্ত হয়ে আছে। এই থেকে সাংঘাতিক একটা অসুখ বেধে যেতে পারে, তা জানো?

হিমাংশু মরীয়া হয়ে বললেন, দেখ—খাবার সময় ঝগড়া করবি তো এখুনি আমি উঠে চলে যাবো।

এত সাহস বাপের নেই, অনীতা নিঃসংশয়ে বুঝে বসে আছে। তবু নীরব হল, খাওয়াটা শেষ হয়ে যাক। বাঘ শিকারের জন্য যেমন থাবা পেতে থাকে, তেমনি বসে রইল সামনে মেজের উপরে।

হিমাংশু বলেন, খেলা ছেড়ে চলে এলি, ছেলেটা আবার কি মনে করছে—

অনীতা বলে, ও পিসিমা লক্ষ্মীসোনা, অলককে চলে যেতে বলে এসো তো! আর খেলা হবে না।

হিমাংশু তাড়া দেন, ছিঃ! খেলার কি যাচ্ছেতাই নেশা, আমিও জানি কিছু কিছু। কতদূর থেকে আসে—রাগ করবে।

রাগ? পিসিমা বলে দাও, কাল থেকে যেন মোটেই না আসে—

হিমাংশু রীতিমতো চটে উঠলেন।

এই ও—এই শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে তোমার! অভদ্রতা করবে না।

থতমত খেয়ে অনীতা বলে, বাঃ রে, কথাই তো হয়ে গেল—কাল থেকে খেলা বন্ধ। আমি ফটকে থাকব—খেলা হবে তা হলে কি করে?

খাওয়া শেষ হয়েছিল। বাইরে এসে হিমাংশু অলককে ডাকলেন, শোন—

কাছে এসে দাঁড়াল। চমৎকার চেহারা। চালাক-চতুর ছেলে—চেহারা থেকে তা-ও মালুম হয়। হিমাংশু বললেন, তোমাদের খেলায় বাধা পড়ে গেল বাবা। আলোর বন্দোবস্ত করে নিস নে কেন রে অনীতা? তা হলে সন্ধ্যের পরেও একটু খেলা হতে পারে—

অলক তটস্থ হয়ে বলে, খেলা যথেষ্ট হয়েছে। বেশি খেলাধুলো ভালও নয়—শরীর খারাপ করে।

অনীতাকে বলে, আজকে তো রিহার্শাল আবার আপনার কলেজে—

অনীতা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, আমি যাবো কিনা কিছু ঠিক নেই। বাবা মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে!

হিমাংশু বিপদ গণেন। যা অবস্থা—মেয়ে না গেলে তাঁরও যাওয়া ঘটবে কি? হাত ধরে তাকে কাছে টেনে নিয়ে আসেন।

বকাঝকা তোরই তো একতরফা বেবি। মেজাজ আমারই খারাপ হবার কথা—তা ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে তোর সামনে মেজাজ দেখাতে যাবো?

মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করছেন। বলেন, তুই না গেলে অভিনয় পণ্ড হবে, কে পারবে তোর মতন? চলে যা বেবি, এত লোকের আমোদ মাটি করতে নেই।

অনীতা তখন হেসে ফেলল।

তা বুঝেছি। সেই লোকের মধ্যে তুমিও একজন—

সকালবেলা কমলবাসিনী আবার সেই প্রসঙ্গ তোলেন।

কিছু তো চেয়ে দেখবে না দাদা। ফেরা হয়েছে পৌনে দশটায়। ছোঁড়াটাও ঐ রাত্রি অবধি পিছন ধরে আছে।

নথিপত্রে ডুবে ছিলেন হিমাংশু। বিরক্ত-মুখে চোখ তুললেন।

মেয়েটা রাত্রিবেলা একা-একা আসুক—এই তুমি চাও? চমৎকার!

একা আসতে যাবে কেন?

তার মানে, আমিও মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলেজে গিয়ে বসে থাকি! সারাদিন গাধার খাটনি খেটে ঐ যে ঘণ্টা দুই ক্লাবে গিয়ে জিরোই—তোমাদের সকলের নজর সেই দিকে।

মরমে মরে গিয়ে কমল বলেন, তাই বলেছি নাকি? কিন্তু রাত্তিরবেলা একা-একা আসে জোয়ান ছেলের সঙ্গে—

হিমাংশু কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, বুড়ো-থুত্থুড়ে লোক-দেখানো একটাকে না নিয়ে জোয়ান ছেলের সঙ্গে ঘোরে—ভালই তো! যা গুণ্ডা-বদমায়েসের উৎপাত—দরকার হলে দুটো-পাঁচটা ঘুষি মেরে সামাল দিতে পারবে—

কমল বলেন, আমিও তাই বলি দাদা, মেয়ের পাকাপাকি পাহারাদার করে দাও ছেলেটাকে—

হিমাংশু গোড়ায় কথাটা বুঝে উঠতে পারেন না, সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। বুঝে ফেলে তারপর হো-হো করে হেসে ওঠেন।

মন্দ বলিসনি কমল। ওর বাপের নাম-ধাম জেনে নিস আজকে। ভাল ছেলে সত্যি—যেমন চেহারা, তেমনি কথাবার্তা। আর পরোপকারীও বটে, নইলে কি দায় পড়েছে কাজকর্ম ফেলে বেবির কলেজ অবধি গিয়ে বসে থাকা!

অনীতা কম মেয়ে—আড়ি পেতে সমস্ত শুনে ফেলেছে।

পিসিমা বাবার সঙ্গে কি ষড়যন্ত্র করছ?

জেনে বুঝেও কমলবাসিনী বোকা সাজেন।

কিসের গো?

অনীতা বলে, আমি অবাধ্য বজ্জাত মেয়ে, তোমাদের কথা শুনি নে, রাত দুপুরে কলেজ থেকে ফিরি—

কমলও সেই সুরে বলেন, আর উঠতে বসতে শাসন করিস দাদাকে, কচি খোকার মতো দোলনায় তুলে রাখতে চাস—ভয়ংকর রেগে গেছি আমরা এবার।

তাই বিদেয় করে দিয়ে বাড়ি ঠাণ্ডা করবার জোগাড় হচ্ছে—

কমলবাসিনীর কণ্ঠ অন্য রকম হয়ে যায়। বললেন, বাড়ি এমন ঠাণ্ডা হবে যে, তারপরে কেমন করে থাকব জানি নে। ও'র দাদা তো, মনে হয়, আইন-আদালত ছেড়ে অলকদের বাড়ি উঠে বসবেন। সেকালে ঘরজামাই হত, উনি হবেন ঘর-শ্বশুর।

কথা মিথ্যা নয়। অনীতার চোখ ছল-ছলিয়ে ওঠে বাপের সেই সময়কার অবস্থা ভেবে। রাগ হয়ে যায়। বলে, আর যে এক থুবড়ো মেয়ে বাড়ির মধ্যে রয়েছে, তাকে দেখতে পাও না? সে এমনি ঠাণ্ডা যে বাড়িতে রয়েছে, তা কেউ টের পাচ্ছে না, বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও জানা যাবে না। সে তো দু বছরের বড় আমার চেয়ে।

কে নিচ্ছে তাকে?

দিদি আমার কত সুন্দর, চোখ মেলে দেখলি কোন দিন? না, নিজের মেয়ে বলে বিনয় হচ্ছে?

কমল বলেন, সুন্দর কে বলে—রং একটু-খানি চড়া হতে পারে।

একটুখানি? জানো, আমি ওর পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারলে বর্তে যেতাম?

কমলবাসিনী ম্লান মুখ তুলে চাইলেন।

সে যাই হোক মা, বিয়ের বাজারে তার কাণাকড়ি দাম নেই—

অনীতা বলে, চেষ্টা করে দেখেছ কখনো? জলে না নেমে বলো অথই সমুদ্দুর। হাত-পা কোলে করে বসে বসে খালি নিশ্বাস ছাড়ো—

তাই বটে!

কত জায়গায় কত জনের কাছে ছুটো-ছুটি হয়েছে, সীতার বাপ যখন বেঁচে-ছিলেন। ভুগে ভুগে জীবন স্তিমিত হয়ে আসছে, তখনো আশা—মেয়ের গতি করে যাবেন। এখন কে কি করবে, টাকাই বা কোথায়?...কিন্তু কি হবে এত সমস্ত বলে এই শিশুটার কাছে? উনিশ বছরের মেয়ে, কিন্তু মনে মনে শিশু একটি। আর অনীতারও ধৈর্য আছে কি ওর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট শোনবার? দুমদুম করে সিঁড়ি ভেঙে সে একেবারে উপরতলায়।

ঝকমক করছে অনীতা।

দিদি, বসে আছিস এখানে। মস্ত খবর ওদিকে। বাবার কাছে এক গুঁফো এসে-ছিল এই মাত্র—

সীতা বলে, কতই তো আসে—

মক্কেল নয়। তারা এসে বাবাকে টাকা দেয়—এ লোক বাবার কাছ থেকে এক কাঁড়ি টাকা খসাবে, তার বন্দোবস্ত করে গেল।

সীতা অবাক হয়ে তাকায়।

বুঝতে পারলি নে? আমি বাবার কালো-কুচ্ছিৎ মেয়ে—টাকা না দিলে ঘরে নেবে কেন? গুঁফো ভদ্রলোক হলেন অলকের মামা।

সীতা জড়িয়ে ধরল অনীতাকে।

পাকাপাকি হয়ে গেল! সত্যি, আমি যেন কি! বাড়ির মধ্যে থেকেও নেই। কেউ আমায় কিছু বলে না। আর আমারও দোষ, দশের সঙ্গে কেমন যেন মানিয়ে নিতে পারিনে।

রুষ্ট হ'য়ে অনীতা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

এমন একটা খবর দিলাম, তুই মুখ ভার করলি কেন দিদি?

সীতা আকাশ থেকে পড়ে।

কোন চোখে দেখলি তুই অনীতা? ছি-ছি, মিছে কথা বলিস নে—

মুখ না হল, মন ভার বটে তো! মনে মনে সংসারের বিচারটা ভাবছিস। পটের পরী গড়াগড়ি যায়, বজ্জাত বিশ্রী মেয়েটাকে লুফে নিয়ে নিচ্ছে। নিচ্ছে অবিশ্যি পণের টাকা, হারেমুণ্ডোর গয়নাগাটি—মেয়েটা তার সঙ্গে ফাউ—

সীতা লাল হয়ে ওঠে। আহত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলে, কি ভাবিস তুই আমায়? কথা বলতে পারিনে তোর মতন করে, কিন্তু আজকে আমার যে কি আনন্দ—

অনীতার সুর বদলাল সঙ্গে সঙ্গে। বলছি তো তাই, আনন্দে ডগমগ! আচ্ছা দিদি, একটা মানুষ চিরদিনের জন্য বিদায় হয়ে যাবে, বাড়ির কুকুর-বিড়ালটা গেলেও লোকে একবার 'আহা' বলে—তোরা আনন্দ করছিস। আমি কি কুকুর-বিড়ালেরও অধম হলাম?

কণ্ঠ ছলছলিয়ে ওঠে, চোখে জল এসে গেল নাকি? এর পর কি বলবে, সীতা দিশা করতে পারে না।

অনীতা বলে, বেশ আমিও দেখছি। আমায় সরিয়ে দিয়ে মা-মেয়েয় তোরা একেশ্বর হয়ে থাকবি, আর বাবা আমার মুখ লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে সে আমি কিছুতে হতে দেবো না।

যেন ঝড় উঠিয়ে দিয়ে অনীতা চলে গেল। সন্ধ্যার কাছাকাছি সেজেগুজে আবার এসেছে।

কাপড়-চোপড় পরে নে শিগগির। মোটে সময় নেই।

আবার এ কোন মূর্তি। ক্ষণে ক্ষণে রূপ পালটাবে, ও মেয়ের অন্ত পাওয়া ভার।

কোমল কণ্ঠে অনীতা বলে রাগ করে বসে আছিস? বাইরে চল দিদি, মনের গুমট কেটে যাবে।

সীতা ভয়ে ভয়ে বলে, রাগ করেছি—কে বলল?

তখন যে গুচ্ছের শুনিয়ে গেলাম,—তা কানেই নিস নি বুঝি?

তোর কথায় কি রাগ করি?

অনীতা গরম হয়ে ওঠে।

তা করবে কেন? আমি জলজ্যান্ত মানুষ তো নই—যা বলি সে কোন কথাই নয়। এক এক সময় আমার মনে হয় দিদি, বিষ খেয়ে তোদের অপমানের হাত এড়াই—

সীতা হতভম্ব। অনীতা বলে, রাগ হয় নি—তবে হাসি পাচ্ছিল? একা একা হেসে কুটিকুটি হচ্ছিলে। তা চলো, এ-ও এক হাসিস্ফূর্তির ব্যাপার—সাজের দরকার নেই। ঈশ্বর নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন যেখানে যেটুকু হলে ভাল দেখাবে।

দাঁড় করিয়ে মুগ্ধ হয়ে অনীতা দেখছে। সীতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, কোথায়?

কলেজে। থার্ড ইয়ারের রিসেপসন আজকে। মানুষ বলে তো মানিস নে, কিন্তু ক্ষমতা দেখিস অভিনয়ের। এই খিলখিল করে হাসছি,—এই কেঁদে ফেললাম, চোখের জল পড়ছে টপটপ করে।

সে তো বাড়িতেও দেখছি অহরহ—

অদ্দূর তবে কষ্ট করে কেন যাবি—এই তো?

হাত ধরে টেনে অনীতা বলে, বিদেয় হয়ে যাচ্ছি—আর জ্বালাবো না। শ্বশুরবাড়ি কি স্টেজে নামতে দেবে? এই হয়তো শেষ। বাড়িতে তোকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেবো না আজকে। চল—

অনেক রাত্রি। অভিনয়ের শেষে ফিরবে এবার।

অনীতা বলে, কেমন লাগল?

সীতা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। বলে, এত তোর ক্ষমতা!

বস্তু জমেছিল। এতদূরে আশা করতে পারিনি। সকলে ধরাধরি করছে, আঠাশে এই পালা আবার করতে হবে।

নিশ্বাস ফেলে বলল, ওরাই সব করবে। আমার তখন কারাগার—

সীতা বলে, ভয় পাচ্ছিস কেন? শ্বশুর-বাড়ি যাওয়া তো খুশির ব্যাপার।

অনীতা বলে, হ্যাঁ—কতবার গিয়ে গিয়ে সর্বজ্ঞ হয়ে আছিস? দেখছি তাই সংসারের বিচার—খুশির ব্যাপার যার কাছে, সে বেচারি হা-পিত্যেশ করে থাকে। টানাটানি আর একজনকে নিয়ে।

মোটরের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। উঠছে না।

হল কি?

অলককে এক নজর দেখলাম যেন অডিটোরিয়ামে। স্টেজের দরজায় গিয়ে বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে। এত শিগগির বেরিয়ে পড়বার কথা তো নয়, কিন্তু অত লোকের মধ্যে তুই হাঁপিয়ে উঠছিস—তোর জন্যে তাড়াতাড়ি করলাম।

সীতা প্রশ্ন করে, আচ্ছা, কোনটি বল তো অলক?

এত আসা-যাওয়া, তা একবার চোখ তুলেও দেখিস নি? এটা কিন্তু দেমাকের কথা হল দিদি, রূপের গরব—

বেকুব হয়ে গিয়ে সীতা আমতা-আমতা করে।

দেখেছি নিশ্চয়। কত লোকই তো আসে, মামার মক্কেলরা যখন-তখন আসছে—ঠিক ধরতে পারছি নে। কেমন দেখতে বল দিকি—

খুব কালো আর রোগা—

তা হলে বুঝলাম, খুব ফর্শা আর মোটা—

এই যে বললি, দেখিস নি? ডুবে ডুবে জল খাস দিদি—

থিয়েটারি ভঙ্গিতে বলে ওঠে, পাপীয়সী, মনোবাঞ্ছা কিবা তোর বলহ আমারে—

হেসে ফেলল সীতা। ভাব দেখে না হেসে পারা যায়? বলে, না যদি দেখে থাকি—সত্যিই অন্যায় আমার। চিরকাল পাড়াগাঁয়ে কাটিয়ে এমন হয়েছে, জানলার বাইরে তাকাতে বুক দুরু-দুরু করে। শহরের মানুষ এরা যেন আজব এক জাত—

বলতে বলতেই অলক এসে পড়ল।

আমার দিদি। অমন করে দেখতে নেই অলকবাবু। এমনিই বলছে, শহুরে মানুষ আজব এক জীব—

গোটা কয়েক বড় বড় গাছ জায়গাটা আচ্ছন্ন করে আছে। রাস্তার আলো অনেকখানি দূরে—ভালো করে দেখবার উপায়ও নেই। হাত তুলে অলক নমস্কার করল।

সীতার মুখখানা অলকের দিকে তুলে ধরে অনীতা বলে দেখ্ দিদি, মিলিয়ে দেখে নে, যে রকম বলেছিলাম ঠিক সেই চেহারা কিনা—

অলক বলে, অনেক বুঝি কথা হয়েছে আমার সম্বন্ধে? কারও আলোচনার বস্তু হতে পারি, এমন অহমিকা আমার কিন্তু ছিল না।

অনীতা ভাল মানুষের ভাবে বলে, কি করব—দিদি যে ছাড়ে না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

যাঃ—

এই একটুখানি কথা বলতে হয় প্রথম অনীতাকে সামলাতে গিয়ে।

অনীতা বলে, বুড়োরা কি সব মতলব আঁটছে, তার জন্য আমাদের খেলা বন্ধ করবার কি হয়েছে? কাল থেকে যাবেন আবার অলকবাবু, দিদির সঙ্গে আলাপ-সালাপও হবে।

অলক বলে, এত দিনের মধ্যে হয়ে উঠল না—চোখেও দেখতে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

বেরুবার উপায় ছিল না যে!

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে এমনিভাবে তাড়াতাড়ি অনীতা অন্য কথা পাড়ে।

রাত্রিবেলা সূর্য লুকিয়ে থাকে কেন বলুন তো? তারা ঢাকা পড়ে যায় বলে। বেচারিরা মিটমিট করে—সূর্য দয়া করে তাদের ঐটুকু কেড়ে নেয় না। দিদিরও হল তাই—বোনের উপর দয়া। ঐ দেখুন লুকোচ্ছে আবার—গাড়ির খোপে ঢুকে পড়ল।

সীতা ভিতর থেকে বলে, আবোল-তাবোল বকবি—কান পেতে কতক্ষণ মানুষে শুনতে পারে?

তুই বল তবে ভাল কথা। আমার কথা শুনবেই না তখন লোকে।

অলককে বলে, শুনলেন? দিদি কথা বলছে, তা-ও যেন গান। উঃ, হিংসেয় জ্বলে জ্বলে কালো হয়ে গেলাম। নইলে যা দেখেন, এতখানি কালো আমি নই—

খিলখিল খিলখিল করে পর্বতের ঝরণার মতো অনীতার হাসি ছড়িয়ে পড়ছে, ছিটকে পড়ছে।

গাড়ি চলে গেল। তারপরেও অলক দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। অন্ধকার হলেও একেবারে দেখেনি কি সীতাকে? কাপড়-চোপড়ের প্যাকিংএ জবড়জং লজ্জা একখানি। তার এই মেয়ের সম্বন্ধে ব্যাখ্যান শোন অনীতার মুখে। অলক কিছু কিছু শুনেছে এদের কথা; পূর্ব-বাংলা থেকে মায়ে মেয়েয় এসে উঠেছে। কিছু বলে ডাকতে হয়, অনীতা তাই ডাকে দিদি। এরা আশ্রয় দিয়েছে, আর যা কেউ দেয় না—দিয়েছে সম্মান। কি সুন্দর তুমি অনীতা! সুন্দর তুমি মহত্ত্বে আর প্রাণোচ্ছলতায়। দেহের কানা ছাপিয়ে প্রাণ যেন উছলে পড়ে যে জায়গায় তুমি একটুখানি দাঁড়াও। কতক্ষণ চলে গেছ—এখানো ঝলমল করছ এখানে—তোমার রেশ রয়ে গেছে।

অলক এসেছে পরের দিন।

দিদিকে ডাকছি দাঁড়ান।—

কেন ওঁকে টানাটানি করা? বেশ তো আছি। উনি সোয়াস্তি পান না, আমরাও পাবো না—

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিম্ন কণ্ঠে অনীতা বলে, সোয়াস্তি পাবার কথা তো নয়। ঘরের বাইরে এলে রক্ষে ছিল? এখন অবশ্য আর কোন বাধা নেই—

ফিক করে হেসে বলে, কাজ গোছানো হয়ে গেছে, আবার কি!

অলক বুঝে উঠতে পারে না।

কি কাজ?

মেয়েদের যা জীবনের মোক্ষ। বল্লরী কিনা আমরা! মাচায় না তুলে দিয়ে আপন জনের সোয়াস্তি নেই। তা আমার জন্য মাচা বাঁধা হয়েই তো গেল! কি বলেন? ...এই দেখুন, সমস্ত বলে বসি—কোন-কিছু লুকোতে পারিনে আপনার কাছে।

খুশি হয়ে অলক বলে, তাই তো স্বাভাবিক। জীবন সুখের হবে এমনি যদি আমরা থাকতে পারি চিরদিন।

একটু ইতস্তত করে অনীতা বলে, খুলেই বলছি আপনার সামনে, দিদির বেরুনো এদ্দিন মানা ছিল।

কেন? আমি বাঘ না ভালুক?

তা বুড়োরা ঐ রকম হিংস্র জন্তু ভাবেন ছেলেদের। পাছে দিদিকে আপনার মনে ধরে যায়। নইলে নিজের ইচ্ছেয় চার দেয়ালে দিনরাত আটক থাকতে কে চায়? তার উপর ওরা ছিল কত ফাঁকার মধ্যে! বাড়িটাই নাকি

বিশ বিঘের উপর, ছাতে উঠলে মেঘনা দেখা যায়। গিয়েছেন কখনো পূর্ব-বাংলায়?

অলক কি ভাবছিল। ঘাড় নাড়ল। গিয়েছে সে একবার। ম্লান হেসে বলে, আপনাদের ধারণা দেখতে পাচ্ছি খুব উঁচু আমার সম্বন্ধে?

অনীতা বোঝাচ্ছে, দোষ দিলে হবে কেন? আমার মা নেই—একলা বাবা মা-বাপ দুই হয়ে আছেন। মেয়ে কালো-কুচ্ছিৎ হলে ভয় তো হবেই—

তারপর আবদারের ভঙ্গিতে বলে, অন্য লোকের কথা ধরিনে,—আপনি বলুন তো অলকবাবু, সত্যি সত্যি কালো কি আমি?

অলক বলে, কোন চোখে দেখে কালো বলে জানিনে। এই যদি কালো রং হয়, তবে তো বাঙালী মেয়ে শতকরা নব্বইটার দিকে মুখ তুলে চাওয়া যায় না—

সোয়াস্তির হাসি হেসে অনীতা বলে, আমিও তাই বলি বাবাকে। অলকবাবু সে রকম নন। ও'র চোখ আলাদা। যখনই আসবেন, ওরা আমায় সেজে গুজে রং মেখে থাকতে বলে—বলুন তো ঘরের মধ্যেও থিয়েটারি মেক-আপ ভাল লাগে?

চমকে অলক তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকায়। সে চমক অনীতার নজর এড়ায় না।

কই, এমন কি বেশি টয়লেট করেন আপনি?

হেসে উঠে অনীতা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলে হাত পাকা হয়েছে তবে। উঃ, মেয়েদের চেহারা এমন-অমন হলে কত যে ভোগান্তি! আপনাদের এ হাঙ্গামা নেই। স্টেজে কাল আরো খোলতাই দেখাচ্ছিল—কি বলুন? রেবা তো জড়িয়ে ধরে বলে, প্রেমে পড়ে গেছি ভাই। দিনরাত অমনি যদি ফ্লাশ-আলোর সামনে থাকতে পারতাম, বাবার তাহলে ভাববার কিছু থাকত না—

বলা নেই, কওয়া নেই—অনীতা বেরিয়ে চলে গেল। অলক বেকুবের মতো ঠায় বসে। রাগ হচ্ছে—ডাকিয়ে নিয়ে এসে এ কি ব্যবহার? চলে যাবে কিনা ভাবছে। কিন্তু মন-কষাকষির ব্যাপার হতে দেওয়া উচিত হবে না এখন।

অনীতা এসেছে সীতার কাছে। হাত ধরে টেনে বলে, চল্—

ঘাড় নেড়ে সীতা আপত্তি করে, সঙের বেশে কিছুতে আমি যাবো না। এ তো বড় বিষম মেয়ে—তোর খেয়াল মতো সবাইকে চলতে হবে?

সং কিসে হল? আয়নায় দেখ। মুণ্ডু ঘুরে যাবে তোর নিজেরই—

মুণ্ডু ঘুরোবার দরকার তো নেই! আচ্ছা, তুইই বল্— মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে বল্ দিকি—বড় বোন হয়ে এমন সাজে তোদের মধ্যে দাঁড়াবো কি করে?

অনীতা বোঝাচ্ছে, সাজের দোষ নয় দিদি, দোষ হল বিধাতাপুরুষের। দু হাতে যিনি রূপ ঢেলেছেন তোর সর্বাঙ্গে। কাদা-মাখা হীরে একটুখানি জল দিয়ে ধুয়ে দিলেই জ্বল-জ্বলিয়ে ওঠে—আর কিছু করতে হয় না। কি সাজিয়েছি বল্—জড়োয়া চাপিয়েছি গায়ে, বেনারসি পরিয়েছি?

বিরক্ত হয়ে শেষে হুমকি দিয়ে ওঠে, যাবি কিনা স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দে। একলাটি বসে আছে। এমনিই নিন্দে করছিল, যা দেমাক তোমার দিদির—মানুষকে পোকা-মাকড়ের সামিল জ্ঞান করেন।

সীতা শঙ্কিত হল। মুখচোরা স্বভাবই কাল হয়েছে। মা ঠেলেঠুলে পাঠান। যা মামার কাছে। অনীতার মতো জুতোর ফিতে খুলুক, কারণ-অকারণে ঘুরে বেড়াক দশবার সামনে দিয়ে। তা বুক ঢিবঢিব করে নাকি পোড়ারমুখী মেয়ের, দু-পা গিয়েই ফিরে আসে। এর জন্য চুপিসারে কম বকুনি খেয়েছে কমলবাসিনীর কাছে! এতদিন রয়েছে, মায়া পড়ে যাবার কথা—তা হিমাংশু চেনেনই না বোধ হয় ভাল করে। আবার নতুন যে জামাই হতে যাচ্ছে, সেও যা-তা ভাবছে সীতার সম্বন্ধে। বাড়ির ঐ তো একমাত্র জামাই।

সীতা ব্যাকুল হয়ে বলে, দেমাক করতে যাবো—কি আছে আমাদের? ঘরবাড়ি মানসম্ভ্রম সমস্ত ফেলে ভিখারি হয়ে এসেছি—দয়ার পাত্র আমরা। কিসে ওঠে ওসব কথা?

সীতা ভাবে অনেক, কিন্তু এমন করে বলে না কখনো। আজকে যেন কি হয়েছে। অনীতা তা বলে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। বলে, মোটে সামনে যাবিনে—কালকে দেখা হল, তা তিনটে কি চারটে গোণা-গুণতি কথা। আমি আগড়ুম-বাগড়ুম বকে সামাল দিলে কি হবে—লোকে তবু ভুল বোঝে।

সীতা বলে, আমার ভয় করে। জানিস তো, কোন জায়গায় উঠেছিলাম এই শহরে এসে। পথের ধুলো থেকে অট্টালিকায় এনে তুললি—আমি কি জানি আদব-কায়দা, কি কথা বলতে হয় ওদের সঙ্গে?

বল্তে হয় 'প্রাণেশ্বর'—দেখলি নে থিয়েটারে, রেবা সেজেগুজে রাজপুত্তুর হয়ে দাঁড়াল—আমি কেমন গলা কাঁপিয়ে বল-ছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে অনীতা হাত উঁচিয়ে আবার বলে, তা যদি বলেছ, দেখো কি করি। খুন করে ছাইয়ের গাদায় পুঁতে সত্যি সত্যি সেই রাজকন্যার মতো সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবো।

সব সময় রসিকতা, সকল কথায় হাসি। আহা, এ হাসি কোন দিন যেন মুছে না যায় ওর মুখ থেকে! সীতা বলে, যাচ্ছি আমি—কিন্তু কথা তুই শিখিয়ে দিবি।

বাপরে বাপ! কলেজে পার্ট শেখাবো, আবার ঘরেও? সত্যি মিথ্যে যা মনে আসে বলে যাবি। বেদ পাঠ হচ্ছে না তো! কথাই শুনতে চায়, মানুষে, চোখে মুখের ঝিলিক হানা দেখে—

অনীতা আর সীতা এসে হাত-ধরাধরি করে দাঁড়াল।

ফাঁকা লন—পশ্চিমে বহু দূরে এক বড় বাড়ির মাথায় সূর্য। আকাশে মুঠো মুঠো সোনা ছড়ানো। কি চমৎকার দেখাবে কেউ যদি ভাবনা ভুলে এমনি মুহূর্তে চারদিক চোখ মেলে তাকায়। কন্যাসুন্দর বেলা বলে পাড়াগাঁয়ে—কুৎসিত মেয়েটাও অপরূপ হয়ে ওঠে এই গোধূলি আলোয়।

এসেই অনীতার এক রাশ কথা।

বই পড়ছিল—দুনিয়ার হেন বই নেই যা দিদি পড়ে না। এস্ট্রোফিজিক্সের বই—দেখুন তো বিদঘুটে রুচি! আমার বাপু আধ-পাতা নবেল পড়তেই জ্বর এসে যায়—

এমন বেপরোয়া মিথ্যা বলতে পারে! একটা বাংলা মাসিকপত্র আছে সীতার শয্যার পাশে। নক্ষত্র সম্বন্ধে একটা লেখা—সেইখানটা একটু আধটু ওল্টাচ্ছিল বুঝি, তারই এই গালভরা নাম। লোকে ভাববে, না জানি কত বড় পণ্ডিত!

সীতাকে আরও লজ্জায় পেয়ে বসে। যা-ই বলো, লজ্জাতেই মানিয়েছে ভালো। পাতার মধ্যে অর্ধেক-ঢাকা একটি গোলাপ। হঠাৎ কি দেখে অনীতা ছুটল—

বাবা এখন ফিরলেন ক্লাব থেকে!

ছুটে একেবারে উপরতলায়।

অলক বলে, বসুন—

কিন্তু বসবার জায়গা এখানে কোথায়? যাওয়া যাক অনীতার পড়ার ঘরে। সঙ্কোচ লাগছে সীতার, পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

আর অনীতা যেন কি- গেছে তো গেছেই। অলককে আহ্বান করে নিয়ে এসে...কি ভাবছে, বলতো ভদ্রলোক মনে মনে?

কমলবাসিনী চা দিতে এলেন। ভাবী জামাই—চা-খাবার তাই নিজেই হাতে করে নিয়ে এসেছেন। আবছা-আঁধার ঘরের মধ্যে দুজনে বসে। কমল কেমন-কেমন চোখে তাকান—সীতার ভয় করে। যাবার সময় তিনি সুইচ টিপে আলো জেলে দিয়ে গেলেন।

কথা নেই—নিঃশব্দে মুখোমুখি দুটি প্রাণী। কিন্তু কত কথা মনে মনে! ঢাকা জেলার এক বন্ধুর বাড়ি অলক সেবারে গিয়েছিল। খিড়কির পাঁচিলের বাইরে খাল। জোয়ারে জল উঠে পাড়ের আমবাগান ছাপিয়ে যায়। ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ছলাৎ-ছলাৎ করে পাঁচিলের গোড়ায়। চিলের ছাতে উঠলেই দেখা যায় মেঘনা। ধানবন সবুজ নয় সে অঞ্চলে। ঘন নীল। হু-হু করে হাওয়া বয় দিনরাত—মেয়ে তোমার আলুল কেশ উড়ছে তোমার শাড়ির আঁচল ফেরতা দিয়ে বাঁধো। ...খাঁচায় এনে পুরেছে আহা, আকাশের সেই বিহঙ্গম! মানান করে নিতে পারে না সে এখানকার এই মাপের হাসি, ঠোঁটের কথা। তার বুলি ফেলে এসেছে মেঘনার তীরে।

আর সীতা ভাবছে, এ কি শাস্তি দিয়ে গেল অনীতা! চোখে জল না এসে পড়ে—ঈশ্বর, সামলে থাকতে পারি যেন অলক যতক্ষণ না চলে যাচ্ছে।

আরও অনেক পরে এক সময় সে উঠে পড়ল।

দেখে আসি অনীতা কি করছে। আসছি।

অনীতা শুয়ে শুয়ে পা দোলাচ্ছে দেয়ালের দিকে চেয়ে।

টিকটিকি লুকিয়ে আছে দেখ্ পোকাটাকে ধরবে বলে। পোকা-বেচারি কিচ্ছু জানে না।

আমায় বসিয়ে রেখে খাটে শুয়ে শুয়ে টিকটিকি দেখছিস?

অনীতা লজ্জা পায় না।

একা ছিলিনে তো—সামনে আর একটিকে বসিয়ে দিয়ে এসেছি। বাবা এসেছেন, এমনি মনে হয়েছিল—তা নয়, এত সকাল সকাল তিনি আসবেন কি করে?

দু হাত জোড় করে একেবারে রাজসভার কঞ্চুকীর মতো অনীতা গিয়ে অলকের সামনে দাঁড়াল।

মার্জনা করুন। এমন মাথা ধরল—বিছানায় শুয়ে পড়লাম, আসতে পারিনি। চা-টা দিয়েছিলে দিদি? সত্যি, কত দূর যে অন্যায়—নিশ্চয় খুব খারাপ লাগছিল আপনার—

সীতার দিকে একনজর তাকিয়ে অলক বলে, খারাপ কেন লাগবে?

কথা লুফে নিয়ে অনীতা বলে, আমিও জানি তাই। দিদি রয়েছে—আমার যদি অসুখ করে কিম্বা মরেই যাই, তা বলে এ বাড়ি কেউ কি আসবে না? খেলাটা হল না—তা আমি থাকলেও হত না। দোষ আপনার—বুঝলেন, বড্ড দেরি করে এসেছেন। কাল সময়মতো আসবেন—নয় তো দেখবেন কি হয়—

অলক পরদিন সকাল সকাল এসেছে, কিন্তু কলেজ থেকে ফেরেই নি অনীতা।

কমলবাসিনী অনুযোগ করেন, অমনি কাণ্ড ভুলে মেরেছে হয় তো! তা কি করবে বাবা? কাজকর্ম ফেলে হা-পিত্যেশ বসে থাকাও তো যায় না—

অলক বলে, কাজ তেমন কিছু নেই। বসি একটু পিসিমা। বার বার আমায় বলে দিয়েছিল—

গলা পেয়ে সীতা তাড়াতাড়ি চলে আসে।

বসতে বলে গিয়েছে আপনাকে। ফিরতে দু দশ মিনিট দেরি হতে পারে। শেষ ঘণ্টায় প্রিন্সিপালের ক্লাস—ঘড়ি-টড়ি তিনি বড় মানেন না। ভাল লাগল তো পড়িয়েই চললেন।

কমল কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। কিছু বলা চলে না। ছেলেটি একা থাকবে, সেই বা কেমন করে হয়! পোড়া মেয়ে নিজে থেকে অবস্থা বুঝে চলে না কেন? রাগ হচ্ছে অনীতার উপর—ডেকেডুকে নিয়ে এসে নিজের আর পাত্তা নেই। আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে দাদা এক বাঁদর তৈরি করেছেন—আখের খোয়াবে হতভাগী এমনি করে।

দেরি দু-দশ মিনিট নয়—পাক্কা তিন ঘণ্টা। সাতটায় অলক উঠি-উঠি করছে, সেই সময়টা অনীতা এলো। প্রিন্সিপালের ক্লাস নয়—মুখে এলো, তাই একটা বলে গিয়েছিল। কলেজ থেকে রেবা টেনে নিয়ে গিয়েছিল তাদের বাড়ি। খিল-খিল করে হাসে, যেন বিষম বাহাদুরির কাজ করে এসেছে।

অলক সত্যি বিরক্ত হয়েছে। মুখে না বলুক, মনে মনে গর-গর করছে। মাতব্বর হয়ে উঠেছ ছাত্রী-মহলে, বেশ তো—থাকো সেই সব নিয়ে। আমার কি দায় পড়েছে এখানে আসতে—এসে তো এমনি অবাঞ্ছিত-ভাবে বসে থাকা! কমলবাসিনী মুখে হাসেন বটে, কিন্তু ভাবখানা যেন চুরি-জুয়াচুরির তালে আছি আমি—ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তাই কমলবাসিনী আগুন। চেঁচামেচি করা চলে না, চাপা গলায় মেয়েকে তর্জন করেন। লজ্জাসরম নেই তোর? পথের কুকুর আদর পেয়ে এখন মাথায় চড়বার শখ হয়েছে?

সীতা বুঝতে পারে না, সভয় দৃষ্টি মেলে মায়ের দিকে তাকায়। কিছু নরম হয়ে কমল বললেন, চার চোখে এক হয়ে অমনি ধারা বসে থাকিস—দাদা দেখলে কি বলবেন? আর অনীতা তোর ছোট বোন—তারই বা কি মনে হবে?

সেই তো আমাকে কাছে থাকতে বলে—চটেমটে অলকবাবু যাতে চলে না যান।

কমল বিরক্ত স্বরে বলেন, বলবে বই কি! যে রকম বুদ্ধি, তেমনি বলে। দিনরাত খালি নেচে বেড়াবে। কিছু কি তলিয়ে দেখে—দেখার সময়ই বা কখন?

ঘণ্টাখানেক পরে অলকের গলা।

পিসিমা—

কমলবাসিনী বেরিয়ে এসে বলেন, এসো বাবা—

অনীতা নেই নিশ্চয়! ক'দিন আসতে পারিনি, অমনি এক চিঠি—

হেসে বলে, কিন্তু ডাকে ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় চিঠির সব কথা বেমালুম ভুলে যায়।

চিঠি লিখবার কায়দাটা রপ্ত করেছ বটে! এমনটি আর কক্ষণো হবে না......ঐ একটা কথা, অনীতা, কতবার হল বলো দিকি? তোমার চিঠি বড়শীর কাঁটার মতো—গলায় নয়, আরও নিচে বুকের ভিতরে বিঁধে হিড়হিড় করে টানে। টেনে নিয়ে আসে এ বাড়ির লনের ধারে—সেখান থেকে পড়ার ঘরে। তারপরে যথারীতি কমলবাসিনীর শুষ্ক মুখের আপ্যায়ন, সীতার সঙ্গে ধ্যানস্থ হয়ে থাকা মুখোমুখি। কেউ গেট দিয়ে ঢুকছে, অমনি সচকিত হয়ে তাকানো—আসা হ'ল বুঝি অবশেষে! কিন্তু দর্শন তো দুর্লভতম ইদানীং—প্রায় ঈশ্বরের মতো। বসে বসে তারপর এক সময় বলতে হয়, উঠি আজকে তবে......

আজকে কিন্তু চিঠি ছাড়াও অন্য ব্যাপার আছে—এক জবর খবর। অলকের বাবা কলকাতায় থাকেন না—একটু আগে এসে পেঁাচেছেন। কনে আশীর্বাদ কাল বিকেলবেলা। সকলের আগে অনীতাকে বলে যাবে সেই খবরটা। কিন্তু মন বিগড়ে যাচ্ছে। যেমন ভাবে বলবে ভেবেছিল—এখন মনে হচ্ছে—এ মেয়ে সে পাত্র নয়। যদি এসে পড়ে, একটি কথাও বলবে না তাকে।

সীতা মুখ গুঁজে পড়ে আছে সেই থেকে। কমলবাসিনী এসে ডাকেন, ওঠ—উঠে খাবারগুলো হাতে করে নিয়ে যা—

সীতা বলে, না—কক্ষণো যাবো না আর সামনে। সকলে মিলে পাঠাবে, আবার কথা শোনাবে তার পরে।

আর্দ্রকণ্ঠে কমল বলেন, কত জ্বালায় পড়ে বলি, সে তো বুঝিস নে মা! দোষ আমাদের অদৃষ্টের। ভেবে যে কুলকিনারা পাইনে! আবার ঐ যে অলক একা-একা রয়েছে, তাতেও দোষের হবে। যা মা, ঘাট হয়েছে। শুভকাজটা শিগগির চুকে গেলে বাঁচি। বলি, মা হয়ে কি পায়ে ধরতে বলিস তোর?

খাবার দিয়ে সীতা সামনের সেই চেয়ারে বসল। চোখ-মুখ ধুয়ে এসেছে, তবু অলকের নজর এড়ায় না।

কি হয়েছে?

কিছু না—

হয়েছে নিশ্চয় বাড়াবাড়ি রকমের কিছু।

সীতা উড়িয়ে দিতে চায়, সর্দিভাব হয়েছে একটু—

বলতে গিয়ে চোখে জল টলটল করে ওঠে। তাড়াতাড়ি সে মুখ ফেরাল। অলক গম্ভীর হয়ে আছে। খাবার একটুখানি তুলে নিয়েছিল হাতে করে, সেটা নামিয়ে রেখে দিল।

আপনার উপর অনেক অত্যাচার হয় জানি—

কে বলল?

আমি জানি। ঘরের মধ্যে নজরবন্দি করে রাখে। অনীতা স্বীকার করেছে আমার কাছে—

এদিক-ওদিক তাকিয়ে শশব্যস্তে সীতা বলে, চুপ করুন। কে শুনে ফেলবে। কিচ্ছু হয়নি আমার।

বেশ, না হোক! আমি এখন কি করতে পারি, সেইটে বলুন দয়া করে—

আপনি আর আসবেন না এখানে—

অলক কেমন এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। থতমত খেয়ে সীতা কথাটা লঘু করতে চায়। ঠোঁটে একটু হাসির ভাব এনে বলে, শিগগিরই বিয়েথাওয়া হয়ে যাচ্ছে, কি দরকার ছুটোছুটির? অনীতা লিখলেও আসবেন না।

যদি বলি আসি আপনার জন্যে—আপনি আমার জীবনে আসবেন সেই আশায়—

সীতার সর্বাঙ্গ ঠক-ঠক করে কাঁপছে। পড়ে যায় বুঝি বা! তবু অলক থামে না। মন তার তিক্তবিরক্ত হয়েছে অনীতার অবহেলায়।

এ বাড়ি গোড়ায় আসা-যাওয়া অবশ্য অনীতার সম্পর্কে। কিন্তু দু দিনে তার ভিতরের হীনতা ধরা পড়ে গেছে। থাকুক সে বড়লোকি দম্ভ আর সস্তায় হাততালি কুড়নোর প্রবৃত্তি নিয়ে—কোন মোহ নেই তার সম্পর্কে। আরও স্পষ্ট করে বলছি, ঘৃণাই করি তাকে—

অনীতা। —ছায়ামূর্তির মতো অনীতা ঘরে ঢুকল। নাটকের মধ্যে ঠিক সময়টায় যেমন স্টেজে এসে ঢোকে। ফিরেছে কখন—বাইরে আড়ি পেতে ছিল নাকি? উত্তেজনায় কাঁপছে।

এই ছিল তোর মতলব—বর ভাঙিয়ে নিলি? দিদি বলে আর ডাকবো না তোকে, মুখ দেখবো না জীবনে—

তারপর হাহাকারের মতো চেঁচিয়ে ওঠে, শোন পিসিমা, শুনে যাও এদের কথা। আমি হীন—ঘৃণা করে অলক আমায়।

বাড়ি থমথম করছে। খণ্ডপ্রলয় আসন্ন। হিমাংশুর ক্লাব থেকে ফিরতে যা দেরি। ভাঙা কুড়ে থেকে বোন সম্বোধনে তিনি অট্টালিকায় এনে তুলে-ছিলেন, আবার যেতে হবে ফিরে—কোথায়? সে কুড়েঘর এখন অন্য একদল উদ্বাস্তু দখল করে নিয়েছে।

ক্লাব থেকে ফিরেই রাতের খাওয়া। আজকে একটা আসন। হিমাংশু আশ্চর্য হয়ে কমলবাসিনীর দিকে তাকালেন।

বেবি কোথায়?

শুয়ে পড়েছে—

আজ বড় শুয়ে পড়ল আমি না আসতে? অসুখ-বিসুখ করে নি তো?

না—

তবু স্থির হতে পারেন না। বললেন, রোসো কমল—লুচিটা পরে দিও। বেবিকে ধরে নিয়ে আসি।

অনীতা শোয় নি। নিজের ঘরে খাটের উপর বসে।

নিপাট ভালোমানুষটি। কাল আশীর্বাদ সেইজন্যে নাকি? দেখ—শ্বশুরবাড়ি যখন যাবি, তখনকার কথা আলাদা। আমার বাড়িতে এমন বিয়ের কনে হয়ে থাকা চলবে না।

জবাব দেয় না অনীতা। কাছে এসে হিমাংশু ঠাহর করে দেখেন। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে দুগাল বেয়ে।

কান্না কেন—কি হয়েছে মা?

অনীতা ধপ করে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ল। সর্বদেহ আকুঞ্চিত হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। হিমাংশু কি করবেন ভেবে পান না। মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। তারপর জোর করে মুখ তুলে ধরেন।

হল কি রে?

তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

এই ব্যাপার! সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন হিমাংশু। মনে মনে একটু যেন প্রসন্নও হলেন। ক্লাবে খবর পেলেন, অলকের বাপ এসে গেছে। শুভ সংবাদ শোনার পর থেকে তাঁরও মনটা খারাপ হয়ে আছে।

অনীতা বলে, বিয়ে ভেঙে দাও। আমি মরে যাবো বাবা—

দূর পাগলী! সমস্ত ঠিকঠাক, বেহাই চলে এসেছেন এলাহাবাদ থেকে—

তবে দিদির সঙ্গে দাও বিয়ে। সে তো বড়—তার বিয়ে আগে হওয়া উচিত।

হিমাংশু বলেন, এ কি বাজারের মাছ-তরকারি যে এটা সুবিধা হল না তো ঐটা।

অলকের মতো ছেলে হাজারে একটা হয় না—সে-ই বা রাজি হবে কেন?

সে চায় তো এই। আমি জানি, আমি জানি—

গলা ধরে আসে। হিমাংশু চমকে তাকালেন, বলছিস কি তুই?

আমায় ঘৃণা করে অলক, আজকে আমায় যাচ্ছেতাই করে বলল—

হিমাংশু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়ের কাছ থেকে শুনলেন। শুনে কঠিন হলেন।

বিয়ে তোর ওখানে হচ্ছে না, সে ঠিক। কিন্তু মুশকিল হল, আমার চিঠির উপর নির্ভর করে ভদ্রলোক অতদূর থেকে এসে পড়লেন—

অনীতা অধীর হয়ে বলে, ছেলের বউও তো পেয়ে যাচ্ছেন তিনি। আরো সুন্দরী বউ—

হিমাংশু চিন্তিতভাবে বলেন, চিঠিতে টাকাপয়সারও আঁচ দেওয়া হয়েছিল। অদ্দূর থেকে ছুটে আসার এ-ও একটা কারণ বটে!

অনীতা বলে, টাকার চেয়ে বাবা তোমার সুনাম বড়। কথা যখন দিয়ে বসেছ, পেছুবে কেমন করে? তা তোমার যদি আর একটা মেয়ে থাকত! তাই বলে দাও না —আমার এই বড় মেয়ের বিয়ে—

আরও ভাবলেন হিমাংশু। বললেন, সে যা হয় হবে। সারা রাত্তির—তারপর বিকেল অবধি ভাবনার সময় আছে। এখন খেতে-টেতে দিবি আমায়, না তোর মতন মুখ আঁধার করে আমিও বিছানায় গিয়ে পড়ব?

বেরুলেন বাপে মেয়েয়। এবং যেমন হয়ে থাকে—হাসি-গল্পে খাওয়া শেষ হল। উঠবার সময় হিমাংশু কমলবাসিনীকে ডেকে বললেন, সীতার আশীর্বাদ কাল পাঁচটা-পঁয়ত্রিশে। তিনটের ভিতর আমি কাছারি থেকে ফিরব। এদিককার সব ব্যবস্থা তুমি করে রেখো কমল—

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল! কি লজ্জা, কি লজ্জা! সীতার দোষ নেই—কে মানছে সে কথা? অন্য লোক যা ভাবে ভাবুক, অনীতাকে সমস্ত বলে হালকা হতে হবে। কিছু জানিনে ভাই,—বিশ্বাস কর্, আমি এসব স্বপ্নেও ভাবিনি। আহা অনীতা, বেচারি আজ সারাদিন কোথাও বেরোয়নি; বাড়িখানার মধ্যে মুখ ঢেকে ঢেকে বেড়াচ্ছে। নিরিবিলি চাই যে তাকে একটুখানি।

উপরের বড় ঘরে বরপক্ষ এসে বসবেন —সেখানে সাজানো গোছানো হচ্ছে। সীতা ওদের মধ্যে থাকতে পারে না। সে নিচে চলল। ওদিককার বারান্ডায় —অনীতা না? একলা পাওয়া গেছে তাকে। বারান্ডা থেকে অতি সতর্কভাবে উঁকি দিচ্ছে যে ঘরে সীতা আর কমলবাসিনী থাকেন। যেন চোরের ঘরে বামালের খোঁজ নেওয়া। চোরই সে বটে? অনীতার কত সাধ আর স্বপ্ন চুরি করে নিয়েছে। কতকাল ধরে লালিত স্বপ্ন!

পিছন থেকে গিয়ে সে অনীতার হাত জড়িয়ে ধরল। এক ঝাঁকিতে নিল অনীতা হাত ছাড়িয়ে। তাকাল তার দিকে—দৃষ্টিতে আগুন।

জানতাম না এই করবি তুই শেষ পর্যন্ত। দিদি বলতাম তোকে—দিদি নয়, ডাকাত। এমন জানলে যেতে দিই অলকের কাছে?

বলতে বলতে মুখে আঁচল দিল। বোধকরি কান্না চাপতে চাপতে ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল। খিল এঁটে দিয়েছে। ধুপাস করে শব্দও হল যেন। মেঝেয় পড়ল আছাড় খেয়ে? বাড়ির মধ্যে আহ্লাদে অভিমানী মেয়ে আঘাত পায়নি তো কোনদিন!

কি করে সীতা এখন! দোতলায় আসন্ন উৎসবের জন্য সকলে ব্যস্ত। খিল-আঁটা দরজার সামনে হতভম্ব হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। ভয় হচ্ছে। যা মেয়ে—কোন কিছু অসম্ভব নয় ওর পক্ষে। বিষ-টিষ না খায়! পাবে কোথায় বিষ? বিষ তো বিষ—মনে করলে ও বাঘের দুধ দুইয়ে আনতে পারে।

দরজায় টোকা দিচ্ছে। সাড়া নেই। ব্যাকুল হয়ে ওঠে সীতা।

অনি, অনীতা, দরজা খোল ভাই—

আছে কি মারা গেছে এতক্ষণে, কে জানে? যত ভাবছে অধীর হয়ে উঠছে ক্রমশ। শেষে কেঁদে ফেলে, আমি কিছু জানিনে ভাই। দরজা খোল্, সমস্ত বলছি—

কবাটের তক্তার জোড়ে একটুখানি ফাঁক —সেখানে চোখ রেখে ভিতরটা দেখে। গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। চেয়ারের উপরে দাঁড়িয়েছে অনীতা। দেয়াল ধরে আরও উপরে উঠবার চেষ্টা করছে।

কমলবাসিনী কি কাজে যাচ্ছিলেন। উত্তেজিত স্বরে সীতা তাঁকে ডাকে।

মা, এসো শিগ্‌গির—সর্বনাশ হয়ে যায়—

তাই বটে! ছাতের কড়িকাঠে আংটা লাগানো। অনীতা শাড়ি বাঁধবে বোধ হয় ঐ আংটায়। আংটায় শাড়ি ঝুলিয়ে গলায় দড়ি দেবে।

মায়ে-মেয়েয় দরজা ঝাঁকাচ্ছেন।

অনীতা, ওরে অনি, খোল্ বলছি—নইলে ভেঙে ফেলব। খুলবি নে? লোক ডেকে জমায়েত করব।

খিল খুলে গেল। খুলে দিয়ে অনীতা মুখ গুঁজে পড়ল সীতার বিছানায়।

রকম-সকম ভাল বোধ হয় না। কিছু খেয়ে বসেছে নিশ্চয়। কমল ব্যাকুল হয়ে বলেন অনীতা, লক্ষ্মীসোনা, মুখ তোল্। কথা বল্, মা আমার—

কথা শুনবার মেয়ে কি অনীতা? প্রাণপণে আরো মুখ এঁটে আছে।

হাঁ কর্—

জোর করে হাঁ করানো হল। খেয়েছে বটে—বিষ নয়, সন্দেশ। অনেক রকম মিষ্টান্ন এসেছে—সন্দেশটা সাবধান করে তোলা ছিল আলমারির মাথায়। দেয়াল বেয়ে উঠে তাই খোঁজাখুঁজি হচ্ছিল। খিল খুলে দেবার পরেও মুখের ভিতর অবশিষ্ট ছিল কিছু। চুপিসারে সেটা শেষ করতে চেয়েছিল, হল না।

ওরে বজ্জাত—

মুখ এখন খালি, তাই অনীতা খিল-খিল করে হেসে উঠল—

সীতা রাগ দেখিয়ে বলে, হাসি আসছে তোর? আর এই অবস্থায় সন্দেশ খাওয়া—মানুষ না কি তুই?

অনীতা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, কি করব! একগাদা গালি দিয়ে গেল কাল অলক—শুনেছিস তো নিজের কানে? সেই থেকে মনটা এমন খারাপ হয়ে আছে—

কমল হেসে বললেন, সন্দেশ খেয়ে তাই মন ভাল করে নিলি?

অনীতা তাঁকেই সালিশ মানে।

বলো পিসিমা, নিজের বিয়ের ব্যাপারে যদি সন্দেশ খেতাম, নিন্দের হত। বিয়ে যে আমার দিদির! খাবোই তো আমি সকলের আগে। আমি বলে এইজন্যে কলেজ পালিয়ে সারাক্ষণ বাড়ি বসে আছি!

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দু-হাত মাথায় তুলে যেন চাঙ্গা হয়ে নিচ্ছে।

উঃ, কি ফাঁড়াটাই কাটল! মরুকগে দিদি রান্না করে ভাঁড়ার গুছিয়ে শতেক জনের বকুনি খেয়ে। আমি পারি ওসব! এই আবার আঠাশে অভিনয় কলেজে—তার কত রকম জোগাড়যন্তোর—

সীতা আর্দ্র কণ্ঠে তার কানে কানে বলে, আর এই ঘরের অভিনয়—এর জোগাড় কিছু কম হয়েছে?

এতদিন যাহা শহরশুদ্ধ লোকের হাসি-ঠাট্টার বিষয় ছিল, তাহাই হঠাৎ অত্যন্ত ঘোরালো ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আদা বাঁড়ুয্যের কন্যা নেড়ীকে লইয়া কাঁচকলা গাঙ্গুলীর পুত্র বদাই উধাও হইয়াছে। শুধু তাই নয়—

কিন্তু ব্যাপারটা আরও আগে হইতে বলা দরকার।

শহরের এক প্রান্তে নির্জন রাস্তার ধারে ঘেঁষাঘেঁষি দুটি বাড়ি। পঞ্চাশ বছর আগে শহরের পৌরসঙ্ঘ বোধ করি হাত-পা ছড়াইবার মানসে এইদিকে হাত বাড়াইয়াছিল, তারপর কী ভাবিয়া আবার হাত গুটাইয়া লইয়াছে। অনাদৃত পথের পাশে কেবল দুটি বাড়ি একঘরে ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। পিছনে এবং সামনে ঘন জঙ্গল।

বাড়ি দুটি করিয়াছিলেন দুই বন্ধু। তাঁহারা বহুকাল গত হইয়াছেন; তাঁহাদের দুই ছেলে এখন বাড়ি দুটিতে বাস করিতেছেন এবং পৈতৃক বন্ধুত্বের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরস্পর শত্রুতা করিতেছেন। শহরের লোক তাঁহাদের নামকরণ করিয়াছেন—আদা বাঁড়ুয্যে এবং কাঁচকলা গাঙ্গুলী।

কলহের কোনও হেতু ছিল না; একমাত্র গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বাস করাই কলহের কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আদা বাঁড়ুয্যের ছাগল যদি কাঁচকলা গাঙ্গুলীর পালং শাকে মুখ দেয়, অমনি শহরে ঢি ঢি পড়িয়া যায়; আবার কাঁচকলা গাঙ্গুলীর একমাত্র বংশধর বদাই যদি বাঁড়ুয্যে-কন্যা নেড়ীকে জানালায় দেখিয়া চক্ষু মিটিমিটি করে, তাহা হইলে এই দুর্বৃত্ততার খবর কাহারও অবিদিত থাকে না। ভাগ্যক্রমে দুইজনেই বিপত্নীক, নহিলে দুই গিন্নীর সংঘর্ষে পাড়ায় কাকচিল বসিতে পাইত না।

মহকুমা শহর, আকারে ক্ষুদ্র; চারিদিকে জঙ্গল। মাঝে মাঝে চুরি-ডাকাতিও হয়। আদা বাঁড়ুয্যে পৌরসঙ্ঘের কেরাণী। দীর্ঘকাল কেরাণীগিরি করিয়া তাঁহার শরীর কৃশ ও মেজাজ রুক্ষ হইয়াছে। উপরন্তু বাড়িতে অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা এবং পাশের বাড়িতে অবিবাহিত শত্রু-পুত্র। বাঁড়ুয্যের বদ্-মেজাজের জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

কাঁচকলা গাঙ্গুলীর শহরে একটি মনিহারীর দোকান আছে। হৃষ্টপুষ্ট মজবুত চেহারা, গালভরা হাসি। বাঁড়ুয্যে ছাড়া আর কাহারও সহিত তাঁহার বিবাদ নাই। সকলের সঙ্গেই দাদা-ভাই সম্পর্ক।

দুজনেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, অতি সাধারণ অবস্থা।

আদা বাঁড়ুয্যে সকালবেলা অফিস যান; পথে যাইতে হয়তো দেখেন কাঁচকলা গাঙ্গুলীর দোকানের সামনে কয়েকজন ছোকরা উত্তেজিতভাবে জটলা করিতেছে। গাঙ্গুলীর দোকানে প্রত্যহ সকালবেলা খবরের কাগজের আড্ডা বসে; কিন্তু আজ যেন উত্তেজনা কিছু বেশী। নানাপ্রকার জল্পনাকল্পনা চলিতেছে, গাঙ্গুলীও দোকানে থাকিয়া আলোচনায় যোগ দিয়াছেন। একজন ছোকরা বাঁড়ুয্যেকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠে—'এই যে বাঁড়ুয্যে-দা, খবর শুনেছেন? পেরুমল মারোয়াড়ীর গদিতে কাল রাত্রে ডাকাতি হয়ে গেছে।'

নেড়ীকে জানালায় দেখিয়া চক্ষু মিটিমিটি করে

বাঁড়ুয্যে স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষতার সহিত বলেন—'বটে, ডাকাত ধরা পড়েছে?'

একজন বলে—'ডাকাত কোথায়, পুলিস পৌঁছুবার আগেই পেরুমলের যথাসর্বস্ব নিয়ে কেটে পড়েছে।'

বাঁড়ুয্যে বলেন,—'পুলিসের চোখ থাকলে ডাকাত ধরতে পারত। এ শহরে ডাকাতের মত চেহারা কার তা সবাই জানে।' বলিয়া গাঙ্গুলীর দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিয়া চলিতে আরম্ভ করেন।

ছেলেরা হাসিয়া ওঠে। গাঙ্গুলী দোকান হইতে গলা বাড়াইয়া বলেন, 'তোমাদের বাড়ি থেকে যদি কখনো ঘটি-বাটি চুরি যায়, কে চুরি করেছে বলতে হবে না। ছিঁচকে চোরের মত চেহারা শহরে একটাই আছে।'

বাঁড়ুয্যে শুনিতে পাইলেও কানে তোলেন না, হন্ হন্ করিয়া অফিসের দিকে চলিয়া যান।

এইভাবে চলিতেছে। কলহের কটু-কাটব্য কখনও বা থানা পর্যন্ত পৌঁছয়। থানার দারোগা উভয়ের পরিচিত, সহাস্য সহানুভূতির সহিত নালিশ চাপা দেন।

কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপর্যুপরি দুইটি ঘটনা

মিঃ অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

"MISSION WITH MOUNTBATTEN"

গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ

ভারত-ইতিহাসের এক বিরাট পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে ভারতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আবির্ভাব। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, জুনাগড়, হায়দরাবাদ প্রভৃতি নিয়ে ভারতে যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ঝটিকার সৃষ্টি হয়েছিল সে-সবের সাক্ষী মাউণ্টব্যাটেন; তাঁর জেনারেল স্টাফের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম কর্মসচিব মিঃ অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসনও অন্তরালের সকল ঘটনার দ্রষ্টা। ভারতের বহু রাজনৈতিক ঘটনার ভিতরের রহস্য এবং তথ্যাবলী তাঁর এই গ্রন্থে প্রকাশিত হলো।

সচিত্র : মূল্য— সাড়ে সাত টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী

ভা র ত ক থা

ভারতের কথা নয়—মহাভারতের কথা। সহজ ও সুললিত ভাষায় লিখিত মহাভারতের কাহিনী।

মূল্য : আট টাকা

ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ

খ ণ্ডি ত ভা র ত

(INDIA DIVIDED-এর বাংলা সংস্করণ)

খণ্ডিত ভারতের অখণ্ডতা প্রমাণে এনসাইক্লোপিডিয়া।

মূল্য : দশ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকার

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

বাংলার জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বকবির কর্ম, প্রেরণা ও চিন্তার সুনিপুণ আলোচনা।

দ্বিতীয় সংস্করণ : দুই টাকা

অ না গ ত

বাংলার অগ্নিযুগের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস।

দ্বিতীয় সংস্করণ : দুই টাকা

ভ্র ষ্ট ল গ্ন

বিপ্লব আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রোমাঞ্চকর উপন্যাস।

দ্বিতীয় সংস্করণ : আড়াই টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকার

অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন)

'একখানি কাব্যগ্রন্থ। ভক্তি ও ভাবমূলক কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়।'

মূল্য : তিন টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরু

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

(GLIMPSES OF WORLD HISTORY-র বাংলা সংস্করণ)

শুধু ইতিহাসই নয়—ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় গৃহীত মানব-গোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের ক্রমিক চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা শাশ্বত গ্রন্থ।

মূল্য : সাড়ে বারো টাকা

জওহরলাল নেহরু আত্ম চরিত

শুধু ব্যক্তিগত কাহিনীই নয়—জাতীয় আন্দোলনের এক গৌরবময় অধ্যায়।

তৃতীয় সংস্করণ : দশ টাকা

শ্রীস[illegible]নাথ মজুমদার

বিবেকানন্দ চরিত

সপ্তম সংস্করণ : পাঁচ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

পঞ্চম সংস্করণ : পাঁচ সিকা

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ)

জেলে ত্রিশ বছর

একজনের কথা নয়—বহুজনের কথা। মহারাজের আত্মজীবনীই নয়—বাঙলার বিপ্লবেরই আত্মজীবনী।

মূল্য : তিন টাকা

গীতায় স্বরাজ

মূল শ্লোক, সহজ অনুবাদ এবং অভিনব ব্যাখ্যা সমন্বিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় সংস্করণ : তিন টাকা

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু (মেজর, আই-এন-এ)

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে

সুদূর প্রাচ্যের পথে ও প্রান্তরে, সমুদ্রগর্ভে ও শৈলশিখরে নেতাজী ভারতীয় শৌর্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের যে অমর কাহিনী রচনা করেছেন, এ বইটি তারই ঘটনাবলীর চিত্তাকর্ষক দিনপঞ্জী।

মূল্য : আড়াই টাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড ॥ ৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা—৯

ঘটিয়া শহরশুদ্ধ লোককে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় পোস্ট অফিসের ঠেলা-গাড়ি চিঠিপত্র লইয়া স্টেশনে যায়। স্টেশন ও ডাকঘরের মাঝে মাইলখানেক রাস্তার ব্যবধান; তাহার মধ্যে খানিকটা রাস্তা জঙ্গলের ভিতর দিয়া গিয়াছে। সেদিন ঠেলাগাড়ি যথাসময় স্টেশনে যাইতেছিল, সঙ্গে ছিল তিনজন পিওন। জঙ্গলের মধ্যে দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ একটা মুখোশ-পরা ডাকাত দমাদ্দম বোমা ফাটাইতে ফাটাইতে তাহাদের আক্রমণ করিল; তাই দেখিয়া পিওন তিনজন ঠেলাগাড়ি ফেলিয়া থানার অভিমুখে ধাবিত হইল।

পুলিস আসিয়া দেখিল, বোমারু ডাকাত একটি ব্যাগ কাটিয়া রেজিস্ট্রি ইন্সিওরের খামগুলি লইয়া গিয়াছে। একজন পিওন দূর হইতে ডাকাতকে দেখিয়াছিল, মুখ দেখিতে না পাইলেও চেহারাটা তাহার চেনা-চেনা মনে হইয়াছিল। অনেকটা যেন কাঁচকলা গাঙ্গুলীর মত।

রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় দারোগা সদলবলে গাঙ্গুলীর বাড়িতে হানা দিলেন। গাঙ্গুলী সরকারী মেল-ব্যাগ লুঠ করিয়াছেন, একথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করিলেও একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া দারোগা যে ব্যাপার দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। গাঙ্গুলীর দরজার সম্মুখে বাঁড়ুয্যে এবং গাঙ্গুলীতে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে। উভয়ে পরস্পরকে যে ভাষায় সম্বোধন করিতেছেন, তাহা ভদ্র-সমাজে অপ্রচলিত। দুজনের হাতেই লাঠি। লাঠালাঠি বাধিতে আর দেরী নাই।

দারোগাকে দেখিয়া বাঁড়ুয্যে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। বলিলেন,—'দারোগাবাবু এসেছেন, ধরুন ব্যাটাকে। কড়াক্কড় করে বেঁধে নিয়ে যান।'

হতভম্ব দারোগা বলিলেন—'কী হয়েছে?'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'আমার সর্বনাশ করেছে হতভাগা। বাপ-ব্যাটায় সড় করে আমার মেয়েকে কুলত্যাগিনী করেছে। আমার জাত মেরেছে।'

গাঙ্গুলী বলিলেন—'মিছে কথা—মিছে কথা। আমার ছেলে একটা পঞ্চাশের গাড়িতে বর্ধমান গেছে মামার বাড়িতে। কোন্ শালা বলে—' ইত্যাদি।

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'দারোগাবাবু, এই দেখুন চিঠি। আমার মেয়ে কি লিখে রেখে গেছে দেখুন।'—

দারোগা চিঠি পড়িলেন। তাহাতে লেখা ছিল—

'ছিঁচকে চোরের মত চেহারা শহরে একটাই আছে—'

বাবা,

গাঙ্গুলী মশাইয়ের ছেলের সঙ্গে তুমি তো আমার বিয়ে দেবে না, তাই আমি ওর সঙ্গে পালিয়ে চললুম। প্রণাম নিও।

ইতি—নেড়ী।

দারোগা মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'আপনার মেয়ে নাবালিকা নয়। সে যদি নিজের ইচ্ছেয় কারুর সঙ্গে পালিয়ে থাকে, আমরা কিছু করতে পারি না। আপনি কখন জানতে পারলেন?'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন,—'ছটার সময় অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, এই চিঠি রয়েছে, মেয়ে নেই। ঐ নচ্ছার গাঙ্গুলীটা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল, দোর ঠেলাঠেলি করে বার করলুম। এতবড় বেহায়া, বলে তোমার মেয়ের খবর আমি জানি না, আমার ছেলে মামার বাড়ি গেছে। চোর—ডাকাত—বোম্বেটে—'

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সেই ছ'টা থেকে আপনারা ঝগড়া করছেন।'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—' সেই ছ'টা থেকে; এখনও জল দিই নি মুখে। আমার গায়ে যদি জোর থাকত, ঘাড় ধরে শালাকে থানায় নিয়ে যেতুম।'

দারোগা চিন্তা করিলেন। রাস্তায় ডাকাতি হইয়াছে সাতটার সময়। এদিকে আদা ও কাঁচকলার ঝগড়া বাধিয়াছে ছটার সময়। সুতরাং পিওনটা ভুল করিয়াছে সন্দেহ নাই। তবু—

দারোগা বলিলেন,—'গাঙ্গুলী মশাই, আপনার বাড়ি আমরা খানাতল্লাস করব।'

গাঙ্গুলী বলিলেন—'আসতে আজ্ঞা হোক। আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখুন, ওর মেয়ের গন্ধ যদি আমার বাড়িতে পান, আমি বেগের গাঙ্গুলী নই।'

দারোগা ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ গাঙ্গুলীর বাড়ি তল্লাস করিল। দারোগা অবশ্য বাঁড়ুয্যে-কন্যাকে খুঁজিতেছিল না; কিন্তু তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহাও পাওয়া গেল না। চোরাই ইন্সিওর চিঠি-গুলির চিহ্নমাত্র গাঙ্গুলীর বাড়িতে নাই। প্রস্থানকালে দারোগা বলিলেন, 'গাঙ্গুলী মশাই, কিছু মনে করবেন না, আপনার ওপর অন্য কারণে সন্দেহ হয়েছিল। আজ শত্তুরের সাক্ষীতে আপনি বেঁচে গেলেন।'

গাঙ্গুলী ও বাঁড়ুয্যে যুগপৎ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

* * *

গভীর রাত্রে বাঁড়ুয্যের দরজায় টোকা পড়িল।

বাঁড়ুয্যে দ্বার খুলিয়া বলিলেন,—'এস ভাই—এস।'

আদা বাঁড়ুয্যে কাঁচকলা গাঙ্গুলীর হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে তক্তপোশে বসাইলেন। তক্তপোশের উপর অনেকগুলি ইন্সিওর খাম খোলা অবস্থায় পড়িয়া ছিল। বাঁড়ুয্যে বলিলেন,—'কুড়িয়ে বাড়িয়ে দেড় হাজার টাকা হল। তাই বা মন্দ কি?'

গাঙ্গুলী বলিলেন,—'হ্যাঁ, ওই টাকায় বদাই কলকাতায় মনিহারীর দোকান খুলতে পারবে।'

উভয়ে মধুর হাস্য করিলেন। বাঁড়ুয্যে বলিলেন, — 'তারপর — কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো?'

গাঙ্গুলী বলিলেন,—'কিচ্ছু না। দুটো পট্‌কা ছুঁড়তেই পিওন ব্যাটারা মাল ফেলে পালাল।'

'কিন্তু পুলিশ গন্ধ পেয়েছিল।'

'হুঁ। ভাগ্যিস অ্যালিবাই তৈরি করা গেছল!—কিন্তু এবার উঠি। খামগুলো পুড়িয়ে ফেলো বেহাই।'

'সে আর বলতে'—বাঁড়ুয্যে অন্যমনস্ক-ভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'বিয়েটা দেখতে পেলুম না এই শুধু দুঃখু।'

গাঙ্গুলী ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন,—পৌনে বারোটায় লগ্ন। তার মানে এতক্ষণ সম্প্রদান হয়ে গেছে।—তা দুঃখ কি বেহাই, কালই না হয় বর্ধমানে গিয়ে মেয়ে-জামাই দেখে এস। আমার শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা তো তুমি জানোই।'

প্রাচীন চিত্রে মহিষাসুরমর্দিনী

প্রভাতকুমার দত্ত

বাংলাদেশে বর্তমানে শরৎকালে যে দুর্গাপ্রতিমার পুজা হয়ে থাকে তার প্রচলন খুব বেশী দিনের নয়। পন্ডিতেরা বলেন, বিগত মাত্র এক শ' বছর এই ধরণের প্রতিমার পুজা হয়ে আসছে। আজকাল দুর্গাপ্রতিমায় লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশের মূর্তি সংযোজিত করার প্রকৃত কোন হেতু লক্ষ্য করা যায় না। লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুর্গারই শক্তি। আমাদের পুরাণগ্রন্থে দেখা যায়, লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গার কন্যা নন। দুর্গা কার্তিক গণেশেরও মাতা নন। কারণ গণেশ রুদ্রদেবেরই বিকৃত মূর্তি। কার্তিকের মাতা কৃত্তিকা, পিতা অগ্নি। দুর্গাপ্রতিমায় অপ্রয়োজনীয় মূর্তিগুলি সংযুক্ত হওয়ায় দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপের যে বৈশিষ্ট্য তা ক্ষুন্ন হয়েছে। বস্তুত খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত আমাদের ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় নানা ভঙ্গিতে মহিষাসুরমর্দিনীরূপে দুর্গার একক মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। দুর্গাপ্রতিমার যে ভাব প্রকাশ মহিষাসুরমর্দিনীরূপে—তা একান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আনুষঙ্গিক মূর্তি-সংযোজনার উপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। দুর্গার প্রতিমা গুণ ও কর্মের প্রতিমা। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনীর রণচন্ডী প্রতিমা থেকে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও বরাভয় লাভ করেছে। দুর্গা প্রতিমায় গুণ ও কর্মের অভিব্যক্তিকে গ্রহণ করায় তাদের কোন অসুবিধা হয়নি।

বাঙলাদেশে দুর্গাপ্রতিমায় লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশকে সংযোজিত করার অন্য একটি কারণ রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে দুর্গাপ্রতিমায় যে বীর ও রৌদ্ররসের প্রকাশ দেখা যায়, তা বাঙলাদেশে বাৎসল্যরসে পরিণত হয়েছে। শরৎকালের দুর্গোৎসবকে বাঙালীরা পুত্রকন্যাসহ পার্বতী উমার পিতৃগৃহে আগমনরূপে কল্পনা করে থাকে। বাঙলাদেশে শরৎঋতু যেন একান্তভাবে ঘরে ফেরার কাল। মেঘনির্মুক্ত আকাশ ও মাঠের কাশফুল থেকে আরম্ভ করে পারিপার্শ্বিকের সব কিছুই এই সময়ে মানুষকে গৃহের প্রতি আকর্ষণ করে। তাই বাঙলার গৃহী ও গৃহিণী উমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করে শরৎঋতুতে তারই অপেক্ষায় থাকে এবং দুর্গোৎসবের তিন দিনে কন্যা ঘরে ফিরলে তাকে নিয়ে আনন্দ আহ্লাদ করে। উমা-পার্বতীর এই যে পিতৃগৃহে আগমন এবং তারপরে তিনদিন অতীত হলে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী তার সাক্ষ্য প্রতিমার চালচিত্রে নন্দীর মেলানি মোট বাঁধা প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, বর্তমানে বাঙলাদেশ এবং উড়িষ্যা ও আসামেও দুর্গাপ্রতিমার যে ধরণ দেখা যায় তার উৎপত্তি খুব বেশিদিনের নয়। তাছাড়া, প্রাচীন চিত্রে দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনীর যে রূপ প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে এর পার্থক্য রয়েছে।

শিব-দুর্গার উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের দেশে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। এই সমস্ত অসংলগ্ন কাহিনীর জটিল রূপ থেকে মোটামুটি জানতে পারা যায় যে, দেবাসুরের সংগ্রাম ভারতে প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতি এবং বৈদিকপূর্ব যুগের সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘর্ষের ফল। অনেকে মনে করেন,

দুর্গা-অসুরমর্দিনী: অষ্টাদশভুজা, পাহাড়ী (জম্মু) সপ্তদশ শতাব্দী
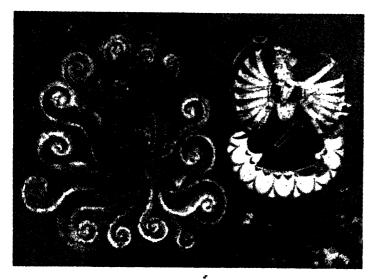
শিব প্রাক্-আর্যজাতির মধ্যে বীর হিসাবে পরিচিত ছিলেন। পার্বতী বোধ হয় মূলে বন বা নদীনালার শক্তিবিশেষ রূপে পূজিত হতেন। কারণ বাঙলাদেশে এখনও বনদুর্গার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এই শিব-পার্বতীই নানা মিশ্রণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হিন্দুদের দেব-দেবীরূপে গৃহীত হয়েছেন। এই গ্রহণের ব্যাপারে দেবীকে দেবতার সমমর্যাদা দেওয়ার মধ্যে বৈদিক মতাদর্শের ছাপ চোখে পড়ে। এরপর আমরা দেখি বৌদ্ধধর্মে মহাযান পন্থে পুরুষদেবতাদের মত স্ত্রীদেবীদের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের যুক্ত উত্তরাধিকার তন্ত্রে আবার লক্ষ্য করা যায়, স্ত্রী-শক্তিই সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎসরূপে পরিগণিত হয়েছে। এই স্ত্রী-শক্তিই সাধারণভাবে শক্তি নামে আখ্যাত যাকে আমরা পরবর্তীকালে দুর্গারূপে গ্রহণ করেছি। তন্ত্র এবং শাক্ত সংস্কৃতির যুগে শ্রেষ্ঠ দেবীরূপে দুর্গার পূজা আরম্ভ হয়। এখানে মনে রাখতে হবে, এই পূজা কিন্তু একমাত্র দুর্গারই অর্থাৎ তাঁর মহিষাসুরমর্দিনী রূপের, যাকে আমরা শক্তি এই নামেও অভিহিত করতে পারি। অবশ্য বাঙলাদেশে এবং পূর্ব-ভারতের অন্যান্য অংশে শক্তিপূজার ফলে দেবী মহিষাসুরমর্দিনীর বিভিন্ন ধরণের মূর্তির প্রচলন হয়েছে। কোন কোন মূর্তিতে বিষ্ণুসংক্রান্ত বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দেবী-দুর্গার আটটি হাত এবং আয়ুধই আমাদের মূর্তিতে সর্বাধিক প্রচলিত বৈশিষ্ট্য। তবে দশভূজা মূর্তির প্রচলনও কম নয়। চার হাত বা আঠারো হাত দুর্গার পরিচয়ও আমরা প্রাচীন চিত্রে পেয়ে থাকি। এছাড়া মহিষাসুরেরও বিভিন্ন ধরণ দেখা যায়। কোনটাতে অসুরের মস্তক মহিষাকার, আবার কোনটাতে মহিষের কাটা গলা থেকে নির্গত অসুরকে চোখে পড়ে। যাই হোক, এই যে বিভিন্ন ধরণের মূর্তি তা ভক্ত শাক্তদের cult emblems বা ধর্মমতের চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের প্রাচীন চিত্রকলায় মহিষাসুর-মর্দিনী দুর্গার রূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, কাঙরা চিত্রকলার নিদর্শন থেকেই এই আলোচনার সূত্রপাত। এর আগে ভারতীয় শিল্পে দুর্গার যে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না তা মোটেই নয়। খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত এবং মধ্যভারতে নাগোড রাজ্যে আবিষ্কৃত মূর্তিটিই ভারতের সর্বপ্রাচীন মহিষমর্দিনী দুর্গার মূর্তি। এরপর আমরা জানি, সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত ইলোরার রামেশ্বর গুহায় ও মামল্লপুরমের মহিষমর্দিনী গুহায়, সুদূর জাভায় এবং বাঙলার

দুর্গা-মহিষমর্দিনী: দশভুজা, পাহাড়ী (কাঙরা) অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ

পালযুগের দুর্গামূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সে তুলনায় চিত্রকলায় দুর্গার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলারও সম্যক্ বিকাশ ঘটেছিল। সুতরাং যে বিষয়বস্তু ভাস্কর্যে শিল্পরূপ লাভ করেছিল তা যে চিত্রকলায় একেবারে অবজ্ঞাত হবে একথা আমরা আশা করতে পারি না। তবে ভাস্কর্যের তুলনায় চিত্র

হুগলীর প্রাচীন পট কমলেকামিনী
(আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে)

তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয় বলেই দুর্গার অপেক্ষাকৃত প্রাচীন চিত্রবর্ণিত রূপ পাওয়া যায় না। অজন্তা-ইলোরার দেয়ালের গায়ে আঁকা গুহাচিত্র থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত আমাদের চিত্রকলার যে ঐশ্বর্যময় বিবর্তন তার মধ্যে কাঙরা চিত্রের আমল থেকে দুর্গার সুস্পষ্ট রূপ আমরা পাই।

কাঙরা চিত্রকলার অপূর্ব বিকাশ রাজা সংসারচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৭৬ থেকে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়। কাঙরা চিত্রপদ্ধতি পাঞ্জাব অঞ্চলের হিন্দু পাহাড়ী চিত্রধারায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পূর্বোল্লিখিত সময়ের মধ্যে কাঙরা শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত দেবী-দুর্গার তিনটি অনবদ্য চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই তিনটি ছবিই কুমারস্বামীর রাজপুত চিত্রকলা পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীপর্বে কিভাবে দেবীদুর্গা দেবতাগণের পক্ষ নিয়ে মহিষ-দানব মহিষাসুরকে পরাজিত করেছিলেন তার বর্ণনা আছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যযুগের শিল্পের মত পাহাড়ী চিত্রকলায়ও প্রধানত দেবীর মহিষমর্দিনী রূপকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কাঙরা চিত্রে বর্ণিত দুর্গার সঙ্গে মামল্লপুরমের সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত মহিষমর্দিনী গুহার দুর্গামূর্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কাঙরার একটি চিত্রে দেখি, রাজসিক ভঙ্গীতে দশভূজা দুর্গা ডানদিক থেকে তাঁর সিংহচালিত রথে অগ্রসর হয়ে চলেছেন, তাঁর হাতে তরবারি, কুঠার, ধনুক, সড়কি, ঢাল, চক্র ইত্যাদি আয়ুধ শোভা পাচ্ছে; তাঁর সঙ্গে

দুর্গা সরা—বাঙলা
(আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে)

শিবের অল্পবয়স্ক গণেরাও এগিয়ে চলেছে। বাঁদিক থেকে মহিষাসুর আক্রমণে উদ্যত; এছাড়া এদিক থেকে ঝোড়ো বাতাস আর ঘন মেঘ গাছপালা নুইয়ে দিয়ে গণদের মাথার চুল বিশ্রস্ত করে দেবীদুর্গার প্রতি ধাবিত। মহিষের লম্বা শিঙের দ্বারা মেঘপুঞ্জ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; তার প্রবল নিঃশ্বাসে চারিদিকের পাহাড় আর আকাশ শতধা খণ্ডিত; অসুর রাগে গর্জনরত। কাঙরা চিত্রকলার সমগ্র পরিসরে এমন জীবন্ত আর চিত্তাকর্ষক চিত্র কমই লক্ষ্য করা যায়। কাঙরা-শিল্পীরা বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমগত শান্ত ভাবকে চিত্রে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু তাঁরা যে বীর ও রৌদ্ররসের রূপায়নেও সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার নজীর আলোচ্য চিত্রটি। কাঙরার আর একটি চিত্রে দেখা যায়, অষ্টাদশভুজা দুর্গা রাজসিক ভঙ্গীতে বিভিন্ন আয়ুধে শোভিত হয়ে পদ্মের উপর সমাসীন। তাঁর এক পাশে সুউচ্চ পর্বত; তাঁর হাত থেকে এক অস্ত্র প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় সামনে কিছুদূরে অসুর অগ্নি দ্বারা পরিবৃত হয়ে ভস্মীভূত হচ্ছে। ছবিটিতে লাল রঙের সাধারণ পটভূমিকায় ঘনকৃষ্ণ রঙের পাহাড়টি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। আলোচ্য চিত্রটি পূর্বেরটির মত অত মজার না হলেও বিষয়বস্তুর নাটকীয় রূপ আমাদের মুগ্ধ করে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দুর্গার রাজসিক ভঙ্গীর বিচার করলাম। পরের কাঙরা চিত্রটিতে দুর্গার তামসিক ভঙ্গী দৃষ্টিগোচর। এখানে দেবতাদের প্রার্থনার ফল হিসাবে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুরকে বধ করার জন্য রাজসিক দুর্গা থেকে তামসিক রূপে শিব বা কৌশিকী আবির্ভূত। মাঝখানে অষ্টভূজা দুর্গা তাঁর সামনে বিরাজমান এবং তিনি বিভিন্ন হাতে তীর, মুষল, সড়কি, চক্র, ধনুক, লাঙল, ঘণ্টা ও শঙ্খ ধারণ করে আছেন। নীচের দিকে দুটি অগ্নিকুণ্ড, যুক্তকর দেবতাদের ঠিক উপরে এবং দেবীর ডান পাশে কৌশিকী দণ্ডায়মান; আর বাঁ পাশে শুম্ভ ও নিশুম্ভের আজ্ঞাবাহক শুণ্ড ও মুণ্ড এই দুইজনকে চোখে পড়ে। চিত্রটির পটভূমি হচ্ছে দেওদার ও তালগাছ সম্বলিত সাদা হিমালয়ের সারি। ছবির সামনের অংশে রয়েছে পদ্মফুল সমেত ক্ষুদ্র জলাশয়। আলোচ্য চিত্রে দেবীর তামসিক রূপকে তাঁর নিজ কোষ অর্থাৎ দেহ থেকে নির্গত হওয়ার দরুণ কৌশিকী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তামসিক ভঙ্গীতে দেবী হচ্ছেন একান্তভাবে ভয়ংকরী এবং শাক্তেরা একথা বলেন যে, 'শক্তি'র এই ভীষণ রূপের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করাটাই আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম পর্যায়। কাঙরা চিত্রে আরেক ধরণের দুর্গামূর্তি পাওয়া যায় যা প্রাচীন ভাস্কর্যমূর্তির সঙ্গে নিকট সম্পর্কযুক্ত; এখানে দুর্গার পা মহিষের উপর স্থাপিত এবং তিনি মহিষের ছিন্ন গলা থেকে নির্গত বামনাকার অসুরকে বধ করতে উদ্যত আর দেবীর বাহন সিংহ মহিষের ছিন্ন মস্তকে কামড় দিতে ব্যস্ত। দেবতা এবং ঋষিরা উপর থেকে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখায় রত। অন্যান্য কয়েকটি দুর্গার চিত্রে দেবীর তামসিক রূপ কালীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া এমন চিত্রও আছে যেখানে দেবীর সংগ্রাম কোন বিশেষ মহিষের সঙ্গে নয়, বরং সাধারণভাবে অসুরগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এই সমস্ত চিত্রেই নমুণ্ডমালিনী চতুর্ভুজা কালীর মূর্তি অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে।

মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার রূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এখন বাঙলার পটচিত্রে আসতে হয়। আমাদের লোকশিল্পের ঐশ্বর্যময় ধারায় পটচিত্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাঙলাদেশে পটচিত্রের প্রচলন বৌদ্ধযুগ থেকে লক্ষ্য করা যায়। পটের সঙ্গে কাহিনীর ওতপ্রোত সপর্ক থাকায় আমরা দেখি, বৌদ্ধযুগের পটগুলিতে জাতকের নানা কাহিনী বর্ণিত। পরবর্তী যুগগুলিতে সামাজিক আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পটের বিষয়বস্তু হিসাবে স্থান লাভ করেছে হিন্দুদের নানা উপাখ্যান ও রাধা-কৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, যমরাজ, গাজী ও কালু প্রভৃতির কাহিনী। পটে আমাদের সমাজে প্রচলিত দেব-দেবীর মূর্তিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও বাঙলাদেশে যমপট, গাজীপট, কৃষ্ণলীলা পট প্রভৃতির মত দুর্গাপটেরও প্রচলন ছিল। বাঁকুড়া, বীরভূম অঞ্চলেই দুর্গাপটের প্রচলন বেশী ছিল এই ধরণের পট লক্ষ্মী-সরার মত দুর্গোৎসবের সময় পূজা করা হোত। প্রথমদিকে দুর্গাপটে কেবল মহিষাসুর নিধনরত সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্তি আঁকা হোত। এইটি ছিল আসল দুর্গা-পট। পরে রূপান্তরিত দুর্গাপটে দেখি, সিংহবাহিনী দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশের মূর্তিও সংযুক্ত হয়েছে। বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের এই ধরণের একটি দুর্গাপট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। এই পটটির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় এইরূপঃ পটের উপরের অংশে মাঝখানে বৃষপৃষ্ঠে শিব বর্তমান এবং তাঁর দুই পার্শ্বে দুর্গার তামসিক রূপ কালীর মূর্তি অংকিত। অসুর মহিষের ছিন্ন গলা থেকে অর্ধেকটা নির্গত এবং ঐ অবস্থাতেই সে দেবীর সঙ্গে সংগ্রামে উদ্যত। আলোচ্য পটের সমস্ত প্রধান মূর্তিগুলিই বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে

ভাগ করে আলাদাভাবে আঁকা হয়েছে। কেবল দুর্গার মূর্তি সম্বলিত আসল দুর্গাপট এখনও মিউজিয়মে সংগৃহীত হয়নি। তাই এর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানেও সম্ভব হোল না। তবে বাঙলার অন্যান্য জড়ানো (scroll) পটের বিভিন্ন স্তর বা প্যানেলের একটিতে মাঝে মাঝে দুর্গা মহিষমর্দিনীর সাক্ষাৎ মেলে। উদাহরণস্বরূপ আমরা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হুগলী জেলার যোগীন পটুয়ার আঁকা 'কমলে কামিনী' জড়ানো পটটির কথা উল্লেখ করতে পারি। এই পটটিতে সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তনরত শ্রেষ্ঠীর কমলে-কামিনী দর্শন ও পরে স্বদেশে (অর্থাৎ বাঙলায়) ঐ দেবীর প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিভিন্ন স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আমরা দুর্গার দু' ধরণের মূর্তির পরিচয় পাই। একটি দুর্গার গণেশজননী রূপ, অপরটি মহিষাসুরমর্দিনী। প্রথম মূর্তিটি জড়ানো পটের একেবারে উপরের স্তরে এবং দ্বিতীয়টি মধ্যেকার স্তরে অবস্থিত। এখন শেষোক্ত মূর্তি যা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় তার প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখি, এটি অষ্টাদশভুজা। বর্ণের গভীরত্বে, রেখার নিখুঁতরূপে এবং প্রকাশভঙ্গীর আদিমসুলভ বলিষ্ঠতায় মহিষাসুর-মর্দিনীর এই রূপায়ন এক অনবদ্য সৃষ্টি। বাঙলার সংগৃহীত পটচিত্রে এই ধরণের দুর্গামূর্তি খুব অল্পই চোখে পড়ে। এছাড়া, আশুতোষ মিউজিয়মে মানভূমের যে 'শক্তি পট' সংগৃহীত আছে তাতেও দশভূজা মহিষাসুরমর্দিনীর চমৎকার রূপ নেই। পুরোনো পট হওয়ায় চিত্রের বেশীর ভাগ অংশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু এর মধ্যেই মহিষাসুরমর্দিনীর যে প্রাণস্পর্শী ও বলদৃপ্ত পরিকল্পনা লক্ষ্য করি তা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল সৃষ্টি। এই সমস্ত উদাহরণ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, বাঙলাদেশে দেশজ লোক চিত্রকলার বিশিষ্ট ধারা, বিশেষ করে দুর্গামূর্তি অঙ্কণের রীতি বহুদিন থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে কারণ তা না হলে 'কমলে-কামিনী' বা শক্তিপটের দুর্গার অদ্ভুত রসোত্তীর্ণ আলেখ্যগুলির সাক্ষাৎ পেতাম না। বাঙলাদেশে পট ছাড়া সরাচিত্রেও দুর্গার মূর্তির পরিচয় মেলে। লক্ষ্মী-সরার মত দুর্গার মূর্তি আঁকা সরা-গুলিকেও গৃহলক্ষ্মীরা কুলুঙ্গীতে আড়া-আড়ি ঠেসান দিয়ে ধূপ-ধুনায় পূজা করে থাকে। পটের মত সরার উপর দুর্গার রূপায়ন অতটা জাঁকজমকপূর্ণ নয়; নিরাভরণ বাইরের গড়ন এবং দু'একটি রঙের সাদাসিধে ব্যবহারেই তা সম্পূর্ণ। আমাদের পটচিত্রের ধারায় কালীঘাটের পট

উড়িষ্যার প্রাচীন পটচিত্র দুর্গা-মহিষাসুরমর্দিনী
(আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে)

এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই সমস্ত পটের রচনাকালে ১৮৩০ থেকে ১৯২৬ খৃঃ মধ্যে সীমাবদ্ধ। কালীঘাটের পটে ধর্মীয় এবং অধর্মীয় দুই ধরণের বিষয়বস্তুই রূপায়িত হয়েছে। ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে দেবদেবীর মূর্তিই প্রধান; অধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে পাই ব্যঙ্গসহ সম-সাময়িক নানা সামাজিক খণ্ডচিত্র। এখন দেব-দেবীর মূর্তির মধ্যে দুর্গার উপস্থিতি রয়েছে বটে কিন্তু তা অন্নপূর্ণারূপে মহিষাসুরমর্দিনীরূপে নয়। এ পর্যন্ত কালীঘাটের পটের বিভিন্ন সংগ্রহে দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী মোটেই চোখে পড়ে না। সম্প্রতি লণ্ডন থেকে মিঃ আর্চার কালীঘাট পটের উপর যে বই প্রকাশ করেছেন, তাতে অন্যান্য দেবদেবীর সাক্ষাৎ মিললেও মহিষ-মর্দিনীর রূপ দৃষ্টিগোচর নয়। শক্তির পীঠস্থান কালীঘাটে অবস্থান করে পটুয়ারা মহিষমর্দিনীর বদলে দেবীর অন্নপূর্ণা রূপকে প্রাধান্য দিয়েছেন এটাই আশ্চর্য মনে হয়।

বাংলাদেশের মত উড়িষ্যাতেও শক্তি-পূজার প্রচলন আছে। তাই ঐ প্রদেশের পটেও মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার রূপায়ন পরিলক্ষিত হয়। অবিশ্যি মূলভাব এক হলেও এদিকে উড়িষ্যা আর বাংলার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বাংলায় যেমন বিভিন্ন স্তর বা প্যানেল সমন্বিত জড়ানো পটের প্রচলন আছে উড়িষ্যাতে তা নেই। সেখানে পটের কোন বড় কাহিনী বর্ণনা না করে একটি বিষয়বস্তু ও তার ভাবরূপই পটে ফুটিয়ে তোলা হয়। সেজন্যে উড়িষ্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ পটে কেবল মহিষাসুর-মর্দিনী মূর্তি পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার পটে দুর্গাকে বিভিন্ন স্তরের একটি স্তরে অন্তর্ভুক্ত করে অঙ্কিত করা হয়েছে। অঙ্কনপদ্ধতির দিক থেকে বাংলার মত উড়িষ্যারও নিজস্ব রীতি আছে। উড়িষ্যার অঙ্কনপদ্ধতি হিন্দু 'মিউরাল' এবং মুসলমান মিনিয়েচার রীতির সংমিশ্রত সৃষ্টি। সেজন্যে এখানকার পটে মূর্তির গড়ন চ্যাপ্টা ধরণের এবং অন্যান্য কাজ খুবই খুঁটিনাটি ও অলঙ্কৃত। উড়িষ্যার পটের মূল মাধুর্য তার রেখায় কিন্তু বাংলার হচ্ছে মূর্তির মন (ভলিউম) রূপে। উড়িষ্যার চিত্র সাধারণত দুইভাবে আঁকা হয়; কতকগুলি হচ্ছে রঙীন ড্রয়িং যাদের সম্পূর্ণ পটের পর্যায়ে মোটেই ফেলা যায় না; অপরগুলি দেশজ ভার্নিশ লাগানো মসৃণ সম্পূর্ণাঙ্গ পট। এই দুই

শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত দেবী দুর্গা

ধরণের চিত্রেই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার আলেখ্য পাওয়া যায়। উড়িষ্যার দুর্গা-মূর্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এখানে দুর্গা এবং মহিষাসুর দুয়ের রূপায়নেই সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলা দেশের মূর্তিতে দুর্গাকে প্রাধান্য দিয়ে মহিষাসুরকে আকারে এবং ভাবে দুই দিক থেকেই খর্ব করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু উড়িষ্যায় দুর্গার রূপায়নও যেমন দৃপ্ত ও আড়ম্বরপূর্ণ মহিষাসুরের রূপায়নও তেমন। ঠিক এই জিনিসটাই ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্যের দুর্গামূর্তিতে অর্থাৎ মামল্লপুরম কি ইলোরায় লক্ষ্য করা যায়। রাজপুত পাহাড়ী চিত্রকলাতেও এইভাবের পরিচয় পাই। এদিক থেকে আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে উড়িষ্যার মহিষাসুরমর্দিনীর যে অঙ্কনভঙ্গী তা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অনুসারী। এছাড়া দেবী দুর্গা সাধারণ নিয়মে অষ্ট বা দশভূজা এবং অসুরের বরাহমস্তক। শেষোক্ত ব্যাপরটি অবিশ্যি বাংলার চিত্রে বড় একটা দেখা যায় না।

বাংলাদেশে আজকাল আর পট তৈরীর রীতি নেই। কিন্তু তাই বলে মহিষাসুর-মর্দিনীর চিত্ররূপ দেওয়ার আমাদের যে প্রাচীন ধারা তা একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। দুর্গার রূপায়নে বাংলার পটের যে গৌরবময় ঐতিহ্য তারই নতুন পরিণতি লক্ষ্য করা যায় শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর দেবী দুর্গার চিত্রাবলীতে। নন্দলাল তাঁর সুদীর্ঘ শিল্পসৃষ্টির অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে পটের অঙ্কণ-রীতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজের করে নিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে ও ভঙ্গীতে দেবী দুর্গার আলেখ্য রচনা করেছেন। তাঁর এই সৃষ্টি যেমন রস-সম্ভারে বৈচিত্র্যময় তেমনি অভিজ্ঞ মিউ-রালিস্টের নিপুণ অঙ্কনভঙ্গীতে উজ্জ্বল। এককথায় বলতে গেলে নন্দলালের দেবী দুর্গার চিত্রাবলী আমাদের শিল্প ঐতিহ্যের ওতপ্রোত অংশরূপে আজ পরিগণিত। এই মন্তব্যের তাৎপর্য আমরা আরো ভালো ভাবে বুঝতে পারি যখন দেখি আজকাল সার্বজনীন পূজায় নানাস্থানে খেলো এবং চটকদার মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির প্রচলন ঘটছে। 'যে কথা আমরা প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছি, দুর্গার প্রতিমা একটা ভাবের প্রতিমা অর্থাৎ গুণ ও কর্মের প্রতিমা। দেবী দুর্গার পূজা শক্তির পূজা। সুতরাং তাঁর মূর্তি রচনায় আমরা নতুনত্ব নিশ্চয় কামনা করি কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের ঐতিহ্য যেন একেবারে পদদলিত না হয়।

সেদিন একটা ভালো মামলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদম ডাহা হেরে গেলুম। বড় কষ্ট হল। মনে হতে লাগল, হয়তো জজকে আর একটু বেশি করে বোঝানো উচিত ছিল। কতক পয়েণ্টের উপর আরো খানিক জোর দিলে ভালো হত। জজের শেষ প্রশ্নের জবর উত্তরই ছিল। তবে তাড়াতাড়িতে জবাবটা তখন মাথায় আসে নি। আমি তখন সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছি। তখনো জানতুম না যে, মামলায় হার-জিত দুই-ই নসীবের ফের।

এখন হলে অবশ্য কোনো দুঃখই হত না। কত বড় বড় ইলেমদার কৌঁসুলীকেও কত ভালো ভালো মামলা হেরে ঢোল হতে দেখেছি। আবার কত ছোকরা কৌঁসুলীকে কত হেরো মামলা জিতে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। কিছুই ঠিক নেই। কিন্তু তখন জাস্টিস রাইটস—এসব জিনিসের উপর প্রচণ্ড আস্থা ছিল। তাদের ঘোড়দৌড়ের বাজি খেলার মতো একটা ব্যাপার বলে ভাবতে কিছুতেই মন সরত না। তাই ভালো মামলা হারলে সত্যিই আফসোস হ'ত।

সেদিন আর চেম্বার্সে ফিরে গেলুম না। চাপরাশির হাতে কালো কোট ওয়েস্ট কোট শক্ত কলার গাউন ব্যাণ্ড চেম্বার্সে পাঠিয়ে দিয়ে, সাদা কোট নরম কলার টাই টুপি আনিয়ে নিলুম। স্থির করলুম, পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরব। যদি তাতে করে মনের ক্ষোভটা তরল হয়ে গলে বেরিয়ে যায়। ঠিক তাই মাঠের উপর দিয়ে সোজা পথে গেলুম না। সবচেয়ে ঘোরালো দীর্ঘ পথটাই ধরলুম।

হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে টাউন হল ট্রেজারি বিল্ডিংস পেরিয়ে গভর্নমেণ্ট হাউসের পাশ কাটিয়ে এসপ্ল্যানেডে এসে পড়লুম। এস্প্ল্যানেড ছাড়িয়ে চৌরঙ্গী। চৌরঙ্গী পার হয়ে করপোরেশন স্ট্রীট। কর্পোরেশন স্ট্রীট দিয়ে ওয়েলেসলির দিকে আনমনে চলতে চলতে মাঝপথে একটা বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। বাড়ির সদর দরজার উপর প্রকাণ্ড এক প্ল্যাকার্ড মারা। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—জ্যোতিষালয়।

পড়ে দেখলুম, আরো লেখা আছে—সেখানে নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার, ঠিকুজি কোষ্ঠী গণনা, হস্তরেখা বিচার ইত্যাদি সবই করা হয়। কোষ্ঠী কি হাত-গণনায় আমার নিজের কোনোকালে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু মন খারাপ থাকলে, অনেক উৎপাতই ঘাড়ে এসে চেপে বসে। অনেক অসম্ভব জিনিসকে নিঃসন্দেহে সম্ভব বলে মনে হয়। তাই দরজা ঠেলে জ্যোতিষালয়ে ঢুকে পড়লুম।

ঢুকেই সামনে যে ঘরটা, সেটা বোধ হয় ওয়েটিং রুম। মাঝখানে একটা বড় গোল টেবিল। তার চারধারে পাঁচখানা কাঠের চেয়ার। টেবিলের উপর নানা রকমের গত বছরের পত্র-পত্রিকা। একদিককার দেওয়াল ঘেঁষে একটা আবলুস কাঠের লম্বা টেবিল। তার উপর এক নর-মুণ্ড। সেটা গ্লাস-কেসে ঢাকা। মাঝখানের দেওয়ালে বসানো একটা কাঁচের আলমারি। তাতে যত রাজ্যের পুরনো পাঁজি গাদা করে রাখা। আর এক দিকের দেওয়ালে শিরা-উপশিরা বের করা এক মানুষের ছবি টাঙানো। তাতে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না ইত্যাদি নাড়ি, মূলাধার সহস্রদল কুলকুণ্ডলিনী ইত্যাদি চক্রাকারে মার্কা করা।

ঘরের এক কোণে এক চাকর বসে বসে ঢুলছিল। আমার জুতোর শব্দ পেয়ে সে ব্যক্তি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, এক হাতে চোখ মুছতে মুছতে অন্য হাত দিয়ে আমাকে এক লম্বা সেলাম ঠুকল। অত বড় সেলামটা বোধ হয় আমার কোট-প্যাণ্টের খাতিরে। তখন স্বাধীনতার যুগ নয়। তখন যে-সে সব্বাই এত কোট-প্যাণ্ট পরত না। প্যাণ্ট-কোটধারীদের তখন আলাদা কদর। চাকরটার কাছে কোনো ঝাড়ন ছিল না। সে খালি হাতটাই একবার চেয়ারের সিটে বুলিয়ে নিয়ে চেয়ারটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

ঘরটা সাধারণ দিশি ওয়েটিং রুমের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আসবাব-পত্তর বেশি না থাকলেও কোথাও একটুও নোংরা-ময়লা নেই। দেওয়ালে পানের পিচের ছোপ নেই। ছোট ছেলেপিলেদের হাতে আঁকাজোকারও দাগরাজি নেই। ঘরের কোণগুলো ঝুলে ভর্তি নয়। আমি ছাড়া, আর একটি লোক ওয়েটিং রুমে চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর চেহারা দেখে মনে হল, পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বিধাতা বুঝি বেছে বেছে তাঁরই ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁর হাতে হলদে তুলট কাগজের এক চোঙা। আমায় আসতে দেখে তিনি সসঙ্কোচে একটু জড়োসড়ো হয়ে বসলেন।

ওয়েটিং রুমের মধ্যে দিয়েই পাশের ঘরে যাবার দরজা। সেই দরজার উপর এক কালো পর্দা ঝোলানো। পর্দার মাঝখানে লাল সুতোয় তোলা এক রাশিচক্রের ছক। চক্র ঘিরে মেষ বৃষ মিথুন ইত্যাদির ছবি। পাশের ঘরটা বোধ হয় কন্সাল্টিং রুম। যাক বাঁচা গেল। জ্যোতিষীর তাহলে প্রাইভেসির জ্ঞানটা আছে দেখছি। আমি বেশিক্ষণ স্থির হয়ে চেয়ারে বসে থাকতে পারলুম না। তখনো গায়ের জ্বালা মরে নি। ঘরের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে পাইচারি করতে লাগলুম।

কলিং-বেল বেজে উঠল। একটি লোক একগাল হাসিমুখে কন্সাল্টিং রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি বোধ হয় আভাস পেয়েছিলেন, তাঁর শনির দশা কেটে গিয়ে বৃহস্পতির দশা চলছে। লোকটি বেরিয়ে আসতেই জ্যোতিষীর ভৃত্যপ্রবর আমাকে ঠেলেঠুলে কন্সাল্টিং রুমে ঢুকিয়ে দেবার উদ্যোগ করলে। যে ভদ্রলোকটি রাজ্যের ভাবনা নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলেন,

তিনিও ভাব দেখালেন, আমি তাঁর আগেই আমার কাজ সেরে নিলে তিনি কৃতার্থ যেন হন। তা হয় না—কিছুতেই হয় না—বলতে বলতে আমিই তাঁকে দরজার দিকে এগিয়ে দিলুম।

আধ ঘণ্টা পরে আবার ঘণ্টা বাজল। সেই লোকটি পর্দা সরিয়ে কন্‌সাল্‌টিং রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। তখনো তাঁর মুখ চিন্তায় ভারাক্রান্ত। তখনো বোধ হয় তাঁর রাহুর দশা কাটে নি। আমার পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় ভদ্রলোক ঘাড় নিচু করে আমাকে একটা সেলাম ঠুকে গেলেন। খাশ বিলিতী সুট পরা দিশি সাহেবকে নমস্কার করেনই বা কি করে? চাকরটা পর্দা উঁচু করে তুলে ধরল। আমি কন্‌সাল্‌টিং রুমে ঢুকলুম।

ঘরটা ওয়েটিং রুমের চেয়ে কিছু বড়। কিন্তু তাতে জিনিসপত্তর বড় কিছু নেই। একদিকে কেবল লম্বা-চওড়া একটা তক্তাপোশ। তার উপর সমস্তটা জুড়ে ধবধবে সাদা জাজিম পাতা। তক্তাপোশের একপ্রান্তে বাঘের ছালের আসন। তারই উপর শিরদাঁড়া সোজা করে যোগাসনে বসে জ্যোতিষী মশাই। অদ্ভুত চেহারা! সমস্ত মুখটা দাড়ি-গোঁফে ভরা। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। কপালে দুই ভুরুর মাঝখানে রক্ত-চন্দনের লাল টিপ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বাঁ হাতের কনুইএর উপর সোনার তাগায় লটকানো আরো দুটো রুদ্রাক্ষ। জ্যোতিষীর পরনে লাল চেলি। তারই কোঁচাটা খালি—গায়ের উপর চাদরের মত করে জড়ানো। চাদরের ফাঁক দিয়ে পৈতের গোছাটা দেখা যাচ্ছে।

ঘরে ইলেকট্রিকের বাতি জ্বলছে না। জ্যোতিষীর ডাইনে-বাঁয়ে দুদিকে দুটো সেজ। তারই ভিতর মোটা লম্বা মোমবাতি। সমস্ত ঘরটায় আলো-অন্ধকারে মিলিয়ে বেশ একটা থমথমে রহস্যের ভাব। আমি জ্যোতিষীর পাশেই তক্তাপোশের একধারে বসতে যাচ্ছিলুম। এমন সময় বোধ হয় জ্যোতিষীর ইঙ্গিত পেয়েই, চাকরটা বাইরের ঘর থেকে একটা চেয়ার তুলে এনে হাজির করলে। আমি তারই উপর পায়ের উপর পা রেখে বসলুম।

জ্যোতিষী অত্যন্ত ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি চাই? অতি মধুর কণ্ঠস্বর। আমি চমকে উঠলুম। মনে হল এরকম মিষ্টি গলার আওয়াজ ইতিপূর্বে কোথাও যেন শুনেছি। পরিচিত স্বর, কিন্তু কোথায় যে শুনেছি, তা ঠাওর করে উঠতে পারলুম না। জ্যোতিষীর দিকে তাকিয়ে দেখলুম। নাঃ! ওরকম চেহারার কোনো লোক আগে দেখেছি বলে তো মনে হল না। আমি তাঁর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে আমার ডান হাতের তেলোটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম।

জ্যোতিষী আমার হাতটা টেনে নিয়ে, দশ মিনিট ধরে সেটাকে এধার-ওধার উলটিয়ে-পালটিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। তারপর বাঁ-হাতের চেটোটাও একবার দেখে নিলেন। কী স্নিগ্ধ স্পর্শ! আমার মনের সমস্ত গ্লানি সেই স্পর্শে এক নিমেষে যেন উবে গেল। বহুকালের এক পুরনো স্মৃতি মনের মধ্যে দোলা দিয়ে উঠল। এরকম সুখস্পর্শ আগেও ঘটেছে। কিন্তু কোথায় কি করে কি সূত্রে, কিছুতেই আর মনে করে উঠতে পারলুম না।

জ্যোতিষী আমার হাত ছেড়ে দিয়ে, আমার চোখের উপর চোখ রেখে বললেন, আপনি ব্রাহ্মণ?

আমি বললুম, হ্যাঁ, ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম বটে।

—তবে কি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে চান না?

—না। কারণ, কাজ করি চামারের।

—তা কেন হবে? আমি তো দেখছি, আপনার আইনবৃত্তি।

—সে ঠিক। তাইতেই তো বলছি, কাজ করি চামারের।

আর কথা কাটাকাটি না করে জ্যোতিষী বললেন, বছর দেড়েক ব্যবসায় নেমেছেন?

আমি বললুম, আজ নিয়ে ঠিক এক বছর দশ মাস তেরো দিন।

—বছর পাঁচেক পূর্বে বিদেশ যাত্রা করতে হয়েছিল।

—হ্যাঁ। আইন পড়বার জন্যে বিলেত গিয়েছিলুম।

—জন্ম ধনু লগ্নে কন্যারাশিতে। বয়েস পঁচিশ বছর।

—লগ্ন-টগ্ন রাশি-ফাশি অতশত জানি নে। তবে বয়েসটা ঠিকই অনুমান করেছেন।

—অনুমান নয়। লেখা আছে।

—কোথায়?

—আপনার হাতের রেখায়।

—কপালে নয়?

জ্যোতিষী একটু মৃদু হাসলেন। বললেন, বিশ্বাস হল না বুঝি?

কি করে আর ভদ্রলোকের মুখের উপর বলি, একবিন্দুও না। অনেকগুলো কথা অবশ্য জ্যোতিষী ঠিকই বলে গেলেন। কিন্তু মানতে প্রবৃত্তি হল না, সেগুলো হাতের রেখা দেখে। আন্দাজটা কেমন উতরে গেছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, জ্যোতিষী জিজ্ঞেস করলেন, আর-কিছু জানবার আছে? জ্যোতিষীর গলার স্বরে একটু পরিহাসের আমেজ।

আমি বললুম, একটা বিষয় জানবার জন্যে অনেকদিন ধরে মনে মনে কৌতূহল আছে। বলতে পারেন, আমার মৃত্যু কবে হবে?

জ্যোতিষী তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আমি মৃত্যুর কথা কাউকে গুণে বলি নে।

—তবে কি বলেন? অধিকাংশ লোকই তো গণৎকারের কাছে আসে, হয় অর্থলাভ আছে কিনা, আর না হয় আয়ু কতদিন—এই দুই জানবার জন্যে।

—সে-কথা ঠিক। কিন্তু মৃত্যুর কথা জানতে চাইলে, আমি শুধু বলি, অমুক সময় যেন এক ফাঁড়া আছে দেখছি।

—কেন বলুন তো?

—মৃত্যুর কথা গুণে বলব না—দিব্যি দেওয়া আছে।

আমি মনে মনে বললুম, দিব্যি না আর-কিছু? ঢের ঢের কেরামতি বোঝা গেছে। মৃত্যুর সন তারিখ গুণে বলা অত সোজা কিনা? একটু মুচকে হেসে নিলুম।

জ্যোতিষী রহস্য করে বললেন, কিন্তু আপনার বিবাহের সন তারিখ আমি গুণে বলে দিতে পারি। এখনো তো বিয়ে করেন নি, দেখছি।

কথাটা সত্যি। তখনো বিয়ে করিনি। সম্বন্ধ অনেক আসছে বটে, কিন্তু আমার তেমন গা নেই। আমার পণ, ভালো রোজগার না হলে বিয়ে করব না। আমার এক বিষম বদরোগ, ঠাট্টার সুযোগ পেলে সহজে তা ছাড়িনে। আমি বললুম, ও-খবর জানবার জন্যে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠিনি মশায়। তবে কথা দিয়ে যাচ্ছি, বিয়ের সময় আপনার নেমন্তন্ন বাদ যাবে না। বরযাত্রী হয়ে দুখানা লুচি খেয়ে আসবেন।

জ্যোতিষী হেসে বললেন, ভানু চাটুয্যের বিয়েতে বরযাত্রী যাব না তো কি আমাদের হরি গোয়ালার বিয়েতে যাব? কি বল তুমি?

আমি তো অবাক! কে এ-লোকটা? আমার নাম জানে যে দেখছি। একেবারে তুমি বলতে শুরু করলে যে।

আমাকে অপ্রস্তুত হতে দেখে জ্যোতিষী হো-হো করে হেসে উঠলেন। এতক্ষণ কথায়বার্তায় যেটা ধরা পড়েনি, ঐ এক হাসিতেই সব প্রকাশ হয়ে গেল। এ হাসি অশেষ চক্কোত্তির না হয়ে যায় না। তবু তার ঐ বদখদ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে, কেমন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগল। আমি একটু ইতস্তত করেই বললুম, অশেষ নাকি?

—কে বলে মনে হয় ভানু?

নাঃ, অশেষই বটে। আর সন্দেহ নেই। আমার মন উড়ে চলে গেল দশ বছর আগের এক বর্ষার দিনে। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার ক্লাশের প্রথম দিন। একটি অত্যন্ত লাজুক ধরণের ছেলে খানিক ভয়ে ভয়ে মাথা নিচু করে এসে আমার পাশে বেঞ্চিতে বসল।

তার রোল-নম্বর ঠিক আমার পরেই। ছেলেটির মুখে কেমন যেন মায়া-মাখানো। দেখলেই তার উপর মন পড়ে যায়। আমার মন-মেজাজ হাবভাব চালচলন কথাবার্তা— সবই অশেষের বিপরীত। তবু কেমন করে জানিনে, দুদিনেই অশেষের সঙ্গে রীতিমত প্রণয় জমে উঠল।

অশেষের বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না। কৃষ্ণনগরে তার দেশ। সেখানকার স্কুল থেকে ভালোরকম পাশ করে বেরিয়ে স্কলারসিপ নিয়ে সে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের সঙ্গে পড়তে আসে। এখানে সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে এক অখাদ্য মেসে সে থাকে। মাঝে মাঝে আমার বড়ই ইচ্ছে যেত অশেষকে কোনোরকমে কিছু অর্থ সাহায্য করি। কিন্তু অশেষ সেটা কিছুতেই ঘটতে দেয়নি। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ সে বরাবরই কৌশলে এড়িয়ে গেছে।

কেবল একবার সে আমার কবলে পড়েছিল। কিছুদিন ধরে অশেষ কলেজে আসে না। সে কলেজ-ফাঁকি দেবার ছেলে নয়। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে ভেবে আমি তার মেসে গিয়ে খোঁজ করে দেখি, অশেষ বেঘোর জ্বরে পড়ে আছে। তার ঘরের চারধার এমন অসম্ভব নোংরা যে সেখানে থাকলে সুস্থ মানুষই দুদণ্ডে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অথচ অশেষ নিজে সবসময় খুব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। তার কাপড়-চোপড় কমদামী হলেও তাকে কখনো ময়লা কাপড় পরতে দেখিনি।

আমি তখুনি এক বন্ধ সেকেন্ড ক্লাশ ছ্যাকড়া গাড়ি ডাকিয়ে অশেষকে তাতে তুলে আমাদের বাড়ি নিয়ে এসে ওঠালুম। কুড়ি বাইশ দিন আমাদের বাড়ি থেকে অশেষ সুস্থ হয়ে উঠল। একটু বল পেতেই দেশে চলে গেল। আমাকে বিশেষ করে জপিয়ে গেল, পুজোর ছুটিতে আমি যেন কৃষ্ণনগরে ওদের ওখানে যাই। কোনোক্রমে যেন অন্যথা না করি। গেলুম সেখানে পুজোর ছুটিতে।

অশেষের বাপ তখন বেঁচে নেই। মা আর এক অবিবাহিত বোন নিয়ে তার সংসার। অশেষের বাবা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন। বিয়ে-পৈতে দিয়ে যজমানী করে দিন গুজরান করতেন। তিনি ফলিত জ্যোতিষ ভালোরকমই জানতেন। কিন্তু লোকের কোষ্ঠী ছকে দিলেও কখনো তাই দেখে বিচার করে ফলাফল বলে দিতেন না। লোকে ঐ নিয়ে উপদ্রব করতে থাকলে হেসে বলতেন, আমি ছক পর্যন্ত কেটে দিতে পারি, গোণার ঝকি কিছুতেই পোয়াতে পারি নে।

অশেষদের বাড়ি খুব ছোট। কিন্তু তার সব কিছু বেশ লেপা-পোঁছা মাজাঘষা-নিকোনো-পাড়ানো। সবই বেশ ঝকঝকে, তকতকে। ওদের জীবনযাত্রার উপকরণ অতি সামান্য। কিন্তু অশেষের মা-বোনের অমায়িক স্নেহ সমস্ত অভাব-অনটন দুগুণ পুষিয়ে দিত। তাঁদের যত্ন-আত্তিতে বেশ আরামে কিছুদিন কাটল। পনেরো দিন অশেষদের বাড়িতে থেকে আমি কোলকাতায় ফিরে এলুম।

অশেষ আই-এ এগজামিন ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করলেও সেবার আর স্কলারশিপ পেল না। কি করে যে তার পড়াশুনোর আর মেসের খরচ চলল, তা সে ঘুণাক্ষরে কাউকে জানতে দেয় নি। আমাকেও না। পাছে আমি তাকে আর্থিক সাহায্য নেবার জন্যে আবার পেড়াপিড়ি করি। কিন্তু দু'বছর পর সংস্কৃত অনার্সে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়ে অশেষ বি-এ পাশ করল। এম-এতেও তাই। অশেষ যখন সংস্কৃত পড়ে, আমি তখন পড়ি ইংরিজি। সব সময় অশেষকে ধরে ঠাট্টা করতুম। মুরুব্বিয়ানা চালে বলতুম, সংস্কৃত পড়ে কি হবে হে ছোকরা? যেটুকু কমনসেন্স অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও যে যাবে। অশেষ কিছু বলে না, শুধু হাসে। অশেষের মুখে বরাবরই খুব অল্প কথা। কথা দিয়ে সে যা কইতে না পারে, তা হাসি দিয়ে ও পুরিয়ে দেয়।

তারপরই আমাদের ছাড়াছাড়ি। আমি বিলেত চলে গেলুম। সেখান থেকে গোড়ায় গোড়ায় আমাদের মধ্যে দু-চারখান পত্র লেখা চলেছিল। কিন্তু যেমন সর্বত্র হয়, দেখাশুনা না হওয়াতে বন্ধুত্বের পাকটা এলিয়ে গেল। কোন্ এক সময় যে চিঠি লেখাও বন্ধ হয়ে গেল, তা ঠিক মনে পড়ে না। তাই বছর চার-পাঁচ অশেষের কোনো খবর রাখিও নি, পাইও নি। এতদিন পরে আবার এই দেখা।

আমাকে অতক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে অশেষ জিজ্ঞেস করল, অত কি ভাবছ ভানু?

আমি কবিত্ব করে বললুম, পুরনো সেই দিনের কথা। কিন্তু থাকগে ওসব। এখন তোমার নিজের কথা কি, তাই দু-চারটে বল।

অশেষ বলল, আমার নিজের কথা শোনাবার মতো কিছু নেই। এম-এ পাশ করে কিছুদিন চাকরির চেষ্টায় ঘুরি। কিন্তু পাই নি। একেই তো সংস্কৃতে পাশ, তার উপর জানই তো আমি কি রকম মুখচোরা মানুষ ছিলুম। ভালো করে উমেদারি করতে পারি নে। গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে। সুপারিশ করবার লোকও ছিল না। দরখাস্ত লিখি, ডাকে দি, কিন্তু কোনো জবাব আসে না। লজ্জায় কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাই না। এই করে করে দিক্‌দারি ধরে গেল।

অশেষ খানিক চুপ করে রইল।

আমি বললুম, তারপর?

—তারপর মা মারা গেলেন। মা থাকতেই বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সংসারে আমি একা। কৃষ্ণনগরের পৈতৃক বাড়ির সঙ্গে কর্তার একরাশ সংস্কৃত বাঙলা বই পুঁথি আমার হাতে এল। তাতে অনেক রকমের জ্যোতিষের বই ছিল। পুরনো পাঁজিও ছিল বিস্তর। তারই সঙ্গে বালির কাগজের প্রকাণ্ড এক বাঁধানো খাতা। সেই খাতায় হরেক রকমের কোষ্ঠীর ছক কাটা, আর তার বিচার আধা সংস্কৃতে আধা বাঙলায় নোট করা।

অশেষ আবার থামল।

আমি ধমক দিয়ে উঠলুম, থাম কেন? বলে যাও না।

—কৃষ্ণনগরের বাড়ি বিক্রী করে দিলুম। বোনের বিয়েতে যে দেনা হয়েছিল, সেটা সুদ শুদ্ধু শোধ করে হাতে দু'হাজার টাকা উদ্বৃত্ত রইল। সেই টাকা আর বাবার পুঁথি-পত্তর পুঁজি করে কোলকাতায় এই বাড়িতে এসে উঠলুম। এসে জ্যোতিষীর ব্যবসা খুলে বসলুম। দেখ ভানু, আমাদের শাস্ত্রে আছে, যে-ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর কি হাত-দেখার ব্যবসা করে, সে পতিত হয়। আমারও মনে মাঝে মাঝে ঐ নিয়ে বড়ই গ্লানি উপস্থিত হয়।

—তা কেন? পেটের জন্যে একটা তো কিছু করতে হবে? চাকরির উমেদারিতে পরের দ্বারস্থ হয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে এ ঢের ভালো। কিন্তু তোমার কথাটা শেষ করে ফেল।

—শেষের বড় কিছু আর বাকি নেই। কোলকাতায় এসে বসতেই প্র্যাকটিস জমে গেল। আমার ভাগ্যক্রমে পর পর কতকগুলো গণনা ঠিকঠাক মিলে যাওয়াতে লোকের মুখে মুখে আমার নাম চাউর হয়ে গেল। পয়সাও আসতে লাগল। এই বাড়িটে সস্তায় পেয়ে কিনে ফেলেছি। ছোট হলেও আমার পক্ষে যথেষ্ট।

—তাহলে সব ভালোই তো দেখছি। আচ্ছা অশেষ, তোমার অমন ভালো চেহারাটা এরকম বদখত করে তুললে কেন বল তো?

—ওটা ভাই, ব্যবসার অঙ্গ। তোমাদেরও তো ব্যান্ড গাউন কত কি আছে?

—তা আছে। কিন্তু আমাদের ও রকম একমুখ জঙ্গুলে দাড়ি-গোঁফ রাখতে হয় না। একেবারে চাঁচাছোলা। তবে ওটারও একটা খারাপ দিক আছে। রোজ রোজ সকালে উঠে দাড়ি কামানোটা এক যন্ত্রণাবিশেষ। আচ্ছা, সত্যি করে বল দিকি অশেষ, এসব কোষ্ঠী দেখা, হাতদেখায় তোমার বিশ্বাস হয়?

—ওকথা জিজ্ঞেস করো না ভাই। ওটা আমাদের ট্রেড-সিক্রেট।

বুঝলুম, অশেষ কথাটা এড়াতে চায়। ঠাট্টাচ্ছলেই বললুম, না বল তো নেই বললে। কিন্তু তোমাদের গণনাতে অ্যাও হয়, অও হয়। ভুল হলে ধরা পড়বার জো নেই। টীকাটিপ্পনী দিয়ে কোনোরকমে ঠিক লাগিয়ে দেবে।

অশেষ স্বীকার করল, কতকটা তাই বটে।

তারপর সে আমায় জিজ্ঞেস করলে, এখন তোমার কথা সব খুলে বল দিকিন. শুনি।

আমি বললুম, সে তো তুমি সবই হাত গুণে বলে দিলে।

অশেষ বলল, কিছু মনে কোরো না ভাই। তোমার খবর আমি বরাবরই রেখে এসেছি। যখন তোমার কাছ থেকে আমার শেষ চিঠির কোন জবাব এল না, তখন মনে অভিমান উথলে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, তুমিও আমায় ভুলে গেলে। আমি খবর নিয়ে জেনেছিলুম, তুমি বিলেত থেকে ফিরে এসেছ। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছ। এরই মধ্যে ব্যবসা একটু জমিয়েও নিয়েছ। কিন্তু মান করে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাই নি।

—দোষটা আমার, স্বীকার করছি।

—না, না, তা কেন ভাই? আমারও দোষ আছে।

—যাক ওসব কথা যেতে দাও। এখন আবার যখন দেখা পেয়েছি, তখন সহজে আমার কাছ থেকে ছাড়ান পাচ্ছ না। এই বলে আমি অশেষের হাতটা আমার হাতের মধ্যে টেনে নিলুম।

অশেষ বললে, ছাড়ান চাই নে।

—বেশ, তাহলে এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ঠিক উত্তর দাও।

—তা দিচ্ছি। বল, তোমার প্রশ্ন কি?

—তুমি যে বললে, কারুর মৃত্যুর কথা তুমি গুণে বল না। কার যেন মাথার দিব্যি দেওয়া আছে, না ঐ রকম কি একটা আছে বললে। সত্যি দিব্যি? না, আসলে গুণতে পার না?

—মন দিয়ে গুণলে বলে দিতে পারি। কিন্তু সত্যি দিব্যি দেওয়া আছে।

—কার দিব্যি?

—আমার গৃহিণীর।

—তোমার গৃহিণীর? বিয়ে করেছ নাকি?

—করেছি। গৃহিণী বাড়িতেই আছেন। দেখতে চাও তো দেখিয়ে দিতে পারি।

—সে পরে হবে। কিন্তু ভূভারতে এত জিনিস থাকতে তোমার গৃহিণীর হঠাৎ এ দিব্যি দেবার মানে?

—খুব বড় একটা মানে আছে।

—সেটা কি?

অশেষ চুপ করে রইল। আমার তখন মজা লেগে গেছে। আমি জুতো খুলে চেয়ার ছেড়ে, তক্তাপোশে চড়ে অশেষের গা ঘেঁসে বসলুম। তাকে খোঁচাতে লাগলুম, ব্যাপারটা কি হে? বলতে কোন বাধা আছে নাকি?

—তোমাকে বলতে কোনো বাধা নেই। তবে আর কাউকে একথা আমি কখনো খুলে বলি নি। অশেষ একটা ঢোঁক গিলে নিল। *তারপর এক জোর নিশ্বাস ছেড়ে বলে চলল—*

—আমি তখন সবে জ্যোতিষীর ব্যবসা শুরু করেছি। প্রাণে দারুণ উৎসাহ। যে যা প্রশ্ন করে, না-ভেবে না-চিন্তে সব গুণে বলে দি। সেদিন বিশেষ কিছু রোজগার হয় নি। সন্ধ্যের দিকে পাট সেরে উঠি উঠি করছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। ভালোই হল। কিছু প্রাপ্তি হবে। লোকটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। দাড়ি-গোঁফ কামানো। পিছন করে চুল ফেরানো। বেশ ছিমছাম পরিপাটি চেহারা। সুশ্রী পুরুষ বলতে হয়। বয়েসে ঠিক বুড়ো বলতে পারা যায় না। তবে পঞ্চাশের খানিক উপরেই গেছেন।

—ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই কোনোরকম ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করলেন, কোষ্ঠী দেখে বলে দিতে পারেন, মানুষ কবে মরবে? আমি কিছুমাত্র দ্বিধা না করে সোজা জবাব দিলুম, খুব পারি। সঙ্গে ঠিকুজি আছে নাকি? লোকটি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে সেটা বের করে আমার চোখের সামনে ধরলেন।

—আমি অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে কোষ্ঠীটা উল্টে-পাল্টে দেখলুম। পুঁথি বার করে বার কয়েক পড়লুম। বাবার নোটবুকটা খুলে দেখলুম। তারপর ভদ্রলোকের হাতের চেটো নিয়ে দু-চারবার এদিক-ওদিক নেড়ে-চেড়ে দেখলুম। সব-শেষে গম্ভীর হয়ে বললুম, আপনার মৃত্যুর সময় অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক দিনে। দেখলুম, ভদ্রলোকের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

—তিনি ক্ষীণস্বরে বললেন, গণনায় কোনো ভুল নেই তো? আমি একটু ঝাঁঝালো স্বরে বললুম, আপনার কোষ্ঠী যদি ঠিক থাকে, তাহলে আমার গণনায় কোনো ভুল নেই। বলেই সঙ্গে সঙ্গে গোটা কয়েক সংস্কৃত বচন আউড়ে দিলুম। লোকটি আর কিছু বললেন না। পকেটে হাত দিয়ে চার টাকা বের করে আমার সামনে রাখলেন। হাতটা তাঁর থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। দ্বিতীয় কথা না বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

—এই ঘটনার দু' বছর পরের কথা। সেদিনও কাজ শেষ করে উঠব, এমন সময় চাকর এসে খবর দিল, একটি বাবু এসেছেন। আমি তাঁকে ভিতরে আনতে বললুম। অনেক রকমেরই লোক আমার কাছে আসে। কিন্তু যে লোকটি ঘরে ঢুকলেন, তাঁর মতো চেহারার ইতিপূর্বে আমার কন্‌সালটিং কখনো প্রবেশ করেন নি। মাথায় রাশ ঝাঁকড়া চুল। তাতে কতদিন তেল পড়ে নি, তার ঠিক নেই। সাদা পাকা চুলে তামাটে আভা। সাতদিনের না-কামানো খোঁচা খোঁচা *হাতপাগুলো সব লিকলিকে পাঁকা মতো। পরণে তালিমারা এক ময়লা ধু গায়ের পাঞ্জাবীটা তার চেয়ে এক পরিষ্কার হলেও, শতছিন্ন। পায়ে রবা সোল ক্যাম্বিসের জুতো। তার দুকোণা দুই ছেঁদা দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙু দুটো সিকি ইঞ্চি করে বেরিয়ে। সব নিয়ে এক দারুণ দুর্দশার প্রতিমূর্তি।*

—জুতো খুলে লোকটি তক্তপোশের উপর উঠলেন। সাদা জাজিমের উপর দুপায়ের তেলোর ছাপ পড়ে গেল। সেখানটায় একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে তিনি তারই উপর বসে পড়লেন। তারপর অতিশয় সরু গলায় বললেন, আমি দুবছর আগে কোষ্ঠী গণাবার জন্যে আপনার কাছে এসেছিলুম। আমার মনে পড়ল না। দু'বছরে অনেক লোকই আমার কাছে আনাগোনা করেছে। বড় বড় মক্কেল ছাড়া আর কারোর কথা বড় মনে নেই। লোকটি আবার বললেন, আপনি আমার মৃত্যুর তারিখ গুণে বলে দিয়েছিলেন। সে-তারিখ কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

—এবার মনে পড়ল। কিন্তু সেদিনকার সেই চেহারার সঙ্গে ভদ্রলোকের আজকের চেহারায় যে সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর তফাত! দুই মূর্তি যে এক ব্যক্তিরই তা কে বলবে? মুখখু আমি। আমি মনে করলুম, লোকটি বুঝি আমার গণনার ভুল নিয়ে আমার সঙ্গে তকরার করতে এসেছেন। তাই আমি একটু গরম হয়েই বললুম, আমার গোণার ভুল কিছুতেই হতে পারে না। নিশ্চয়ই আপনার কোষ্ঠী ভুল ছিল।

—লোকটি ধীরে ধীরে শান্তভাবেই বললেন, ভুল কার, সে তর্ক করবার জন্যে আমি আসি নি। আপনার যদি কোনো বিদ্যে থাকে তো দোহাই আপনার, দয়া করে বলে দিন—আর কত দিন? লোকটার রকমসকম দেখে আমি অবাক! আমায় চুপ করে থাকতে দেখে তিনি আবার বললেন, আমাকে শিগগিরই মরতে হবে। না মরলে আমার চলবে না। আমি আশ্চর্য হয়ে শুধু বললুম—চলবে না, সে কী কথা?

—ভদ্রলোক বললেন, তাহলে শুনুন। আপনার কাছে মরার তারিখ জেনে নিয়ে সেটাকে যাচাবার জন্যে আমি এক নামজাদা জ্যোতিষীরও কাছে গিয়েছিলুম। তিনি

কিছুতেই কিছু বলতে চান না। শেষে অনেক ধরপাকড় করায় যা বললেন, সেটা আপনার গণনার সঙ্গে মিলে গেল। অনেকদিন ধরে আমার মনে হচ্ছিল, এতদিন তো কেবল ইহলোকেরই কথা ভেবে এসেছি, পরলোকের কথাটা তো একবারও মনে তুলি নি। দিন ঘনিয়ে এসে থাকে তো দুনিয়াদারি ব্যাপার আর নয়। দেখলুম, বড্ডই দেরি হয়ে গেছে। পরপারের কড়ি জোগাড় করার মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

—লোকটি এক গেলাস জল চাইলেন। জল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে আবার বললেন, কাজ ছেড়ে দিলুম। আর বছর-খানেক কাজ করলেই পেন্সন হ'ত। কিন্তু নাঃ, ওসব আর না। ওসবের একেবারে মূল ছিঁড়ে না ফেলতে পারলে উদ্ধার নেই। আসক্তি বেড়েই যাবে। তারপর মন্ত্রতন্ত্র, জপতপ, শাস্ত্রপাঠ, ন্যাস-মুদ্রা—এইসব নিয়েই আমার দিন কাটতে লাগল। এক মেয়ে ছাড়া, সংসারে আমার আর কেউ নেই। মেয়েটি হবিষ্যি রাঁধে, তাই খাই একবেলা। মেয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলুম, এখন ভগবানের নামে তাকে ছেড়ে দিলুম। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, যা করবার তিনিই করবেন।

—গেলাস থেকে আর এক ঢোঁক জল চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, হাতে পুঁজিপাটা যা কিছু ছিল, সব গেল। বিক্রী করবার মতো যা ছিল, সবই একে একে বিক্রী হয়ে গেছে। তাঁর জিনিস তিনিই নিয়েছেন, আমার তাতে কোন দুঃখ নেই। কিন্তু এখন না মরলে আবার সেই সংসারের মায়াজালে জড়িয়ে পড়তে হবে। আবার তাতে বাঁধা পড়লে শুধু নরকেরই পথ সাফ হতে থাকবে। আপনি আর একবার দয়া করে গুণে বলে দিন, আর কত দিন?

—এবার আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, আমি বলব না। কথাটা রূঢ়ই শোনাল। লোকটি কাতর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রাগ করলেন নাকি? আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, রাগটাগের কোনো কথা নয়। আবার আমার তো ভুল হতে পারে? তাহলে আপনি গুণে দেবেন না দেখছি, আচ্ছা তবে উঠি—এই বলে. ভদ্রলোকটি তক্তাপোশ থেকে নেমে জুতোয় পা গলালেন। যাবার সময় বললেন, বিশ্বাস করুন, আমার হাতে আর একটি পয়সাও নেই। আপনার দক্ষিণা দিতে পারলুম না।

—তোমার দিব্যি ভানু, তোমায় সত্যি বলছি, আমি এ পর্যন্ত অনেক দক্ষিণা পেয়েছি, আবার কখনো কখনো কিছু পাইও নি। কিন্তু দক্ষিণার কথা তুলে কেউ যে আমাকে এতটা আঘাত দিতে পারে, তা কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি। ঠিক মনে হল যেন একটা ধারালো তীর ছুটে এসে পট করে আমার বুকে বিঁধল।

এতক্ষণ আমি একটি কথাও বলি নি। চুপ করে অশেষের কথা শুনে যাচ্ছিলুম। এইবার মুখ খুললুম। অশেষকে জিজ্ঞেস করলুম, ভদ্রলোকটির তুমি আর দেখা পেয়েছিলে অশেষ?

অশেষ বললে, আর একটিবার মাত্র পেয়েছিলুম। কিন্তু সে তাঁর জীবিত অবস্থায় নয়। দীননাথ ভট্চাজকে আমি শেষ-দেখা দেখি মৃত অবস্থায়।

—মৃত অবস্থায়?

—হ্যাঁ। আমার কাছ থেকে যাবার দশ-বারো দিন পরে একদিন কে এসে হঠাৎ আমায় খবর দিয়ে গেল, দীননাথ ভট্চাজ মরণাপন্ন। আমায় একবার দেখতে চেয়েছেন। গেলুম। কিন্তু যখন তাঁর ওখানে পৌঁছলুম তখন সব শেষ। দীননাথের মৃতদেহ এক ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়ে আছে। জানলুম, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

অশেষ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। মনে হল যেন এক দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ পেলুম। অশেষ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দীননাথ ভট্চাজের অর্থবলও যেমন কম, লোকবলও তেমনি অল্প। ঐ একটি মেয়ে ছাড়া তিন কুলে আর কেউ নেই। মেয়েটি জানলার ধারে বাইরের দিকে মুখ করে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। চোখে জল নেই। মুখে একটি কথা নেই। তাঁকে দেখে, আমার কেবলই মনে হতে লাগল, দীননাথের মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী।

—সব কাজ আমাকেই করতে হল। সৎকার সমিতির লোক ডাকা, ডাক্তারের কাছ থেকে কাকুতি-মিনতি করে সার্টিফিকেট আদায় করা, পুলিশের হাত এড়ানো, শ্মশানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হাত করা—সবই আমায় করতে হল। এমন কি দীননাথ ভট্চাজের মুখাগ্নি পর্যন্ত আমাকেই সম্পন্ন করতে হয়েছিল। দীননাথের মেয়ে একটিবার মাত্র জানেলার কাছ ছেড়ে উঠেছিলেন। মৃতদেহ ঘর থেকে বার করার একটু আগে, তিনি এসে বাপের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে মিনিট কয়েক সেখানে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রইলেন। তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, ঠিক তেমনি নিঃশব্দে ফিরে গিয়ে আবার জানলার ধারে বসলেন।

ঘর নিস্তব্ধ। আমাদের কারুরই মুখে একটি কথা নেই। কেবল দেওয়ালের ঘড়িটা যেন একটু জোরে জোরে টিক টিক করতে লাগলো।

শেষে আমিই সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললুম, অশেষ, সেই মেয়েটির কোনো খবর জানো কি?

অশেষ বলল, জানি। দীননাথ ভট্চাজের কন্যা এখন আমারই গৃহিণী।

আমি বললুম, বল কি হে?

অশেষ বলল, কি করে যে কি ঘটল—সে অনেক কথা। আর একদিন তোমায় সব খুলে বলব এখন। দেখ ভানু, আমাদের শাস্ত্রে বলে, আত্মহত্যা করলে লোকের গতি হয় না। কিন্তু যে-ব্যক্তি পরলোকে মৃত্যুর আশায় ইহলোকের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করলেন, তাঁর কি সদ্গতি হবে না?

আমি তক্তাপোশের উপর হাতের মুঠি ঠুকে জোর গলায় বললুম, নিশ্চয়ই হবে। হতে বাধ্য। শাস্ত্রে তো সাধারণ নিয়মেরই কথা লেখা থাকে। বিশেষ নিয়মের কথা তো তাতে উল্লেখ থাকে না। সেটা পুঁথিতে থাকবার কথাও নয়। সে থাকে মানুষের বুকের মধ্যে আত্মগোপন করে।

অশেষ বলল, দেখ ভানু আমার স্ত্রী আমার গণনার কথা সব শুনেছিলেন। কিন্তু তাই নিয়ে একদিনের তরে ভুলেও কখনো অনুযোগ করেন নি। সেইটেই সময় সময় আমায় সবচেয়ে বড় কষ্ট দেয়। কেবল, তিনি দিব্যি করিয়ে নিয়েছেন, আমি গুণে কারুর মৃত্যুর কথা যেন কখনো না বলি।

অশেষ আবার চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল। তার মন যেন অন্য কোন [illegible] জগতে। হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে একটু অপ্রতিভভাবেই অশেষ আমায় বলল, কথায় কথায় অনেক রাত্তির হয়ে গেল। আচ্ছা ভানু, আজ রাত্তিরের মতো এখানেই যাহোক দুটো কিছু মুখে দিয়ে গেলে হত না?

আমি জানালুম, আমার কোনোই আপত্তি নেই।

আপত্তি করবার কারণ ছিল না। দেরি করে বাড়ি ফিরলে তাই নিয়ে মুখভার করবার লোক তখনো আসেন নি। মনে মনে দেরির জন্যে কোনো কৈফিয়তও খাড়া করে রাখতে হত না।

অপরিচিতা

সতীনাথ ভাদুড়ী

পিকাডিলি-সার্কাসের বিখ্যাত কন্দর্প-মূর্তিটির নীচে অপেক্ষা করছিলাম দত্তর জন্য এক রাত্রে। করোনেশনের আরও এক সপ্তাহ দেরী আছে। কিন্তু এখনই চেনা লন্ডনকে আর চিনবার উপায় নেই। ভিড়ের ঠেলায় পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে থাকা দায়।......বছর চারেক থেকে দত্ত বিলাতে আছে; তবু এখনও এতটুকু সময়ের জ্ঞান হ'ল না! মন বিরক্ত হয়ে উঠছে তার উপর। এসেই হয়ত বলবে, এক বান্ধবী তাকে কিছুতেই আসতে দিচ্ছিল না নেহাৎ আমাকে কথা দিয়েছিল বলে একরকম জোর করে চলে এল; কাল আবার এর জন্য অভিমান ভাঙ্গানোর পালা আছে।...... আরও কত কথা। রোজ শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে এসব। এক এক সময় সন্দেহ হয় যে মিছে কথা বলছে। আবার পর মুহূর্তে মনে হয় যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে কি কেউ এত বিশদ ও সুনিশ্চিত বিবরণ দিতে পারে, তার বিভিন্ন প্রেমের পাত্রীর! দত্ত বড়লোকের ছেলে। ব্যারিস্টারির ছাত্র। চার বছর আগে এসেছে বিলাতে; কিন্তু সব পরীক্ষাগুলো পাশ করা তার হয়ে ওঠেনি। যে কোন গল্পই আরম্ভ কর না তার সঙ্গে, সে তার মধ্যে মেয়েদের প্রসঙ্গ, আর প্রেমের রাজ্যে নিজের দিগ্বিজয়ের অসংখ্য কাহিনী, এনে ফেলবেই ফেলবে। আমি যতদূর বুঝেছি, প্রেমে বিজয়লাভ বলতে সে বোঝে একজন সদ্যপরিচিতা মহিলার সঙ্গে রেস্তরাঁয় অনেকক্ষণ বসে খাওয়া এবং তারপর সময় থাকলে, বড় রাস্তার উপর দিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ানো। এই নিয়েই তার এত লম্বা লম্বা গল্প, এত লম্ফঝম্ফ। তবু একথা অস্বীকার করতে পারব না যে, তার এই সব গল্প আমার খারাপ লাগে না আজকাল। এত ঝাড়া-হাত-পা ইংলণ্ডে আসবার পর আর কখনও হইনি। পড়াশোনার চাপ নেই মাথার উপর। যে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য এদেশে আসা তা পেয়ে গিয়েছি। পরীক্ষায় ভাল করবার পর বিবেক একটু ভোঁতা হয়ে এসেছে। বাড়ি থেকে মিছে কথা বলে টাকা আনিয়ে থেকে গিয়েছিলাম করোনেশন দেখবার জন্য। প্রায় তিন বছর এদেশে হল। কিন্তু এতদিন পড়াশোনার দায়িত্ব মাথায় থাকায়, এদেশকে উপভোগ করতে পেরেছি খুবই কম। লোকজনের সঙ্গে ভাসাভাসা পরিচয় হয়েছে, কিন্তু আলাপ জমেনি। সত্যি কথা বলতে কি লোকজনের সঙ্গে মিশবার ক্ষমতা আমার নেই। বুড়ী ল্যান্ডলেডি ছাড়া অন্য কোনও ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আলাপ করবার সুবিধা আমার হয়নি। নাচতে জানি না, খেলাধুলোয় রুচি নেই, বড়লোকের ছেলে নই, আমার মত লোক নতুন আলাপ জমা-

বার সুযোগ পাবে কি ক'রে এদেশে! সাধে কি আর দত্তদের দলে ভিড়বার চেষ্টা করছি ইদানীং! আমার মত আনাড়ীকে, তালিম দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে একটু চালাকচতুর করে দেবার জন্য, তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। যে তার সবজান্তা ভাবটাকে স্বীকার করে নেয়, তাকেই দত্ত বন্ধু বলে স্বীকৃতি দেয়। আমার চেয়ে এক বছর আগে বিলাতে আসবার দাবীতে, সে নিজেকে সব বিষয়ে অনেক উঁচুতে মনে করে। আমিও নির্বিরোধে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিই বলেই সে আমার উপর এত সদয়।......দত্তর এখনও আসবার নাম নেই!......একখানি খবরের কাগজ কিনলাম। করোনেশনের হিড়িকে আর কিছু না হোক, আলোর জলুস বেড়েছে; কাগজ পড়তে কোন কষ্ট নেই।......বড় বড় অক্ষরে—করোনেশন!...... করোনেশন!...করোনেশন!...কাগজে করোনেশন ছাড়া আর অন্য কোন খবর নেই!... "স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বড়কর্তাদের ভিতর করোনেশনের মরশুমে লন্ডনে নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার জন্য বিশদ আলোচনা।"

......"টিলবেরি ডকে অস্ট্রেলিয়া হইতে করোনেশন উপলক্ষে আগত পুলিস দলের সহিত আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।—দুর্বৃত্তদের করোনেশনের সময় মোটেই সুবিধা হইবে না।"......

"পুলিসের ধারণা যে ক্যানাডার দাগী হীরা চোর রবার্টসন সম্ভবত করোনেশন উপলক্ষে ইংলন্ডে আসিয়াছে......।"

"দেরী করে ফেললাম না কি? লিজা কিছুতেই"......দত্ত এসে গেল তাহলে। তাকিয়ে দেখি সে ঘড়ি দেখছে। লিজার গল্প এখনই শেষ করে লাভ নেই।......

"না না দেরী আর কি। আমিও তো এই আসছি। চল!"

সম্মুখের কর্নার হাউস রেস্তরাঁয় আমাদের যাবার কথা ছিল। খাবারের ট্রে নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম।

"নতুন স্যুট তয়ের করালে যে দেখছি!"

"হ্যাঁ দেশে যাওয়ার আগে একবার করিয়ে নেওয়া গেল।"

"বুঝেছি বুঝেছি দাদা, করোনেশনের মরশুমে কাজে লাগাবে। ঠিকই করেছ। অপরিচিতাদের সঙ্গে আলাপ করতে হলে ভাল দরজী-বাড়ির স্যুটই হচ্ছে প্রারম্ভিক পাসপোর্ট এদেশে।"

"না না সেজন্য পোশাক তয়ের করাইনি। আর আমার মত চেহারায় যত দামী স্যুটই পরি না কেন, কোন মেয়ে ফিরেও তাকাবে না।"

"এ তোমার ভুল ধারণা। ভাল পোশাকে লোকের চেহারা বদলে দিতে পারে। খেঁদি পেঁচিকে রাণীর পোশাক পরিয়ে দাও; দেখবে ঠিক রাণী রাণী দেখতে লাগছে। তবে হ্যাঁ, ভাল দরজী-বাড়ির সেলাই হওয়া চাই। এদেশে থাকতে থাকতে এমন হয়ে গিয়েছে আজকাল যে পোশাকের কাটছাঁট সেলাইএর ভালমন্দ দেখা মাত্র বুঝতে পারি। তুমি করালেই যদি, তবে আর একটু বেশী খরচ করে একটা ভাল দোকান থেকে করালে না কেন?"

আমার জামার ভিতরে অস্টিন রিড এর দোকানের নাম লেখা আছে। নিজের সামর্থ্যের চেয়ে বেশী খরচ করে ঐ ভাল দোকানটির থেকে জামা তয়ের করিয়েছি। ইচ্ছা হল দত্তকে সেই লেখাটা দেখিয়ে দিই। কিন্তু তাতে লাভ নেই। তাহলে আজকে রাত্রের গল্প আর হয়তো ভাল করে জমবে না। বরঞ্চ ইংলন্ড সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতার দিকটা বাড়িয়ে বললেই সে খুশী হবে বেশী। তাই তার প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে বললাম "আমি যেদিন প্রথম লন্ডনে আসি সেদিনও এই কর্নার হাউস রেস্তরাঁয় খেতে এসেছিলাম। একটা 'Lancashire Hot-Pot' নিয়ে কি অপ্রস্তুত! পাত্রটিকে নাড়িচাড়ি উবুর করি, কিছুতেই ভিতরের মাল বার হয় না। সবাই তাকিয়ে আমার টেবিলের দিকে। ময়দা না কি দিয়ে যেন মুখটা আঁটা থাকে না, সেটিকে কেটে যে ভিতরের তরকারি বার করতে হয়, তা' কি তখন জানি?"

"এখনও যে তখনকার চেয়ে বিশেষ বেশী জেনেছ এদের সম্বন্ধে তা' ভেবোনা। এখানকার কোন নামজাদা হোটেলেতো একদিনও খাওনি বোধ হয়?"

তার ভাবখানা যে ভাল হোটেলে খেতেই সে অভ্যস্ত। নেহাত আমার খাতিরে আজ এই সস্তা রেস্তরাঁয় ছকে ফেলা রুটিন-ডিস খাওয়ার জন্য এসেছে। "বলেছ ঠিকই! ভাল হোটেলে খাওয়ার রেস্ত কোথায় পা'ব। দেশে কাত্যায়নী কেবিনে চা খাওয়া অভ্যাস ছিল; এখানে তাই এই সস্তা রেস্তরাঁর জাঁকজমকেই আজও হকচকিয়ে যাই। ঐ শোন হোটেলের মিউজিক! যে রেস্তরাঁয় খাওয়ার সময় ভদ্রমহিলারা পিয়ানো বাজিয়ে শোনান, তাকে কি আমি বাজে হোটেল ব'লে ভাবতে পারি?"

"এখানকার এই তৃতীয় শ্রেণীর পিয়ানোর গৎগুলোকে আর মিউজিক ব'ল না! আর প্রত্যেকবার বাজানোর পর পিয়ানিস্ট মহিলাটি অপেরার সেরা নর্তকীর ধরণে কি রকম করে সকলকে ঝুঁকে কুর্নিশ করেন হাততালি পাবার জন্য লক্ষ্য করেছ?"

"ভদ্রমহিলার হাবভাব দেখে শুধু আমরা কেন, এই রেস্তরাঁর প্রত্যেক খদ্দেরই হাসে। অথচ মজা দেখেছ, প্রত্যেকেই যথাসময়ে হাততালিও দিতে ভোলে না। অদ্ভুত এই ইংরেজ জাতটা! আমিতো এদের মতিগতি কিছুই বুঝতে পারলাম না তিন বছরেও।"

"ও সব কি আর বইয়ে লেখা থাকে; ও সব চেষ্টা করে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শিখতে হয়।"

"আমাদের প্রোফেসার ব'লছিলেন যে, আসল ইংরেজ-চরিত্র দেখতে হয় যুদ্ধের সময়, আর করোনেশনের সময়। যুদ্ধের সময়ের ইংলন্ড দেখবার সুযোগ না হয় হয়নি; কিন্তু করোনেশনের সময়ের ইংলন্ডতো দেখছি। ইংরাজদের মধ্যে নূতনত্বতো কিছু চোখে পড়ছে না। শুধু রাস্তার ভিড় খানিকটা বেড়েছে আগের থেকে।"

"তোমার প্রোফেসার ভেবেছিলেন বোধহয় যে তুমি করোনেশনের সময় এখানে থাকবে না; তাই খানিকটা বাড়িয়ে বলেছিলেন। যে দেশে রাজারাণী আছে, সেখানেই লোকে করোনেশনের সময় হুজুগে মাতে। এর মধ্যে ইংরেজ জার্মান কিছু নেই! তুমি ব'লছ রাস্তায় লোক বেড়েছে; আমার তো তা নজরে পড়ে না। আজকের ভিড় দেখে ব'লছতো? পিকাডিলি-সার্কাসে প্রতি শনিবারেই এই রকম ভিড় হয়। বরঞ্চ আজকে একটু কম মনে হ'ল। করোনেশন হচ্ছে শনিবার সন্ধ্যার একটা পরিবর্ধিত সংস্করণ। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।"

এইরে! একটু বিরক্ত বিরক্ত ভাব যেন দত্তর! কি আবার বেফাঁস ব'লে ফেললাম? তা'র চেয়ে বেশী জানি এমন কোন কথা বলেছি বোধহয়! সামলে নেবার জন্য ব'লতে হয়—"পিকাডিলি-সার্কাস অঞ্চলে আমার যাওয়া আসা এতকাল কম ছিল কিনা, সেইজন্য এর আগে হয়তো ভাল করে লক্ষ্য করিনি এখানকার লোক-জনের ভিড়। এই রেস্তরাঁয় প্রথমদিনই আর এক কাণ্ড করেছিলাম। শোন বলি। খেয়ে দেয়ে বার হ'বার সময় দেখি দরোয়ান আমাকে যেতে দেবার জন্য দরজা ফাঁক করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গট্‌গট করে বেরিয়ে আসবার পর বুঝি যে সে দরোয়ান নয়; আমারই মত একজন খদ্দের। আমারই জন্য ভদ্রতা দেখিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল। একটা ধন্যবাদও দেওয়া হয়নি। প্রথম দিনের এই দুদুটো কাণ্ড থেকেই বোধহয় পিকাডিলি-সার্কাসের দিকটা এড়িয়ে চলবার একটা চেষ্টা ছিল, আমার অবচেতন মনে।"

"তুমি যে মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে চলে যাচ্ছো! সাবধান! থিয়োরী শিখতে শিখতেই তোমাদের জীবন কেটে গেল! কাজে খাটাতে না পারলে শুকনো মনোবিজ্ঞান শিখে লাভ কি? ইংরেজদের সাইকোলজি শুনবে? স্বাভাবিক ইংরেজ অস্বাভাবিক মানুষ। এই অমানুষ জাতটা মানুষ হয় সপ্তাহে একদিন—শনিবারে সন্ধ্যায়। আজ একটু অন্য-রকম অন্যরকম লাগছে না? শুধু যে পানশালা, নাচঘর, সিনেমা, থিয়েটার আজ ভরা তা' নয়; শনিবারে সমাজ একটু রাশ

আলগা দেওয়ায়, আসল ইংরেজ ফুটে বার হয় নকলের মধ্যে থেকে। বলছিলাম না যে করোনেশনের সময়ের ইংরেজ, শনিবারের রাতের ইংরেজের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ; কথাটা হয়ত ঠিক হয়নি। পরিবর্ধিত ও অমার্জিত সংস্করণ বলাই ঠিক হবে। আর এক কথা। আমার বদ্ধমূল ধারণা কি জান? জাতীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হয় মেয়েদের মধ্যে। চেহারা আর পোশাকের কথা বাদ দিলে পুরুষ সব দেশে মোটামুটি একই রকম। কিন্তু মেয়েরা তা' নয়। কোথাও মেয়েরা দেখবে কেঁদে জেতে, কোথাও হেসে; কোথাও ঠাণ্ডা বরফ কোথাও গরম আগুন; কোথাও গম্ভীর, কোথাও চটুলা; কোথাও দেহসর্বস্ব, কোথাও ভাবপ্রবণ; কোথাও দেখবে তোমাকে খাইয়ে খুশী করতে চায়, কোথাও তোমার পয়সায় খেয়ে তোমাকে খুশী করতে চায়। আমিতো যে কোন দেশে গিয়ে, মেয়েদের শুধু চলার ভঙ্গী দেখে ব'লে দিতে পারি, সেখানকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য কি কি। চোখের চাউনি দেখতে পেলেতো কথাই নেই!"

"বোরকা পরা থাকলে কি করবে? সেখানে না দেখতে পাবে চোখের বিজুলী, না বুঝতেপারবে চলার ভঙ্গী ঢিলে আলখাল্লার মধ্যে দিয়ে?"

"বোরকা পরা মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই। জানবার আছেই বা কি? বোরকাই সেখানকার স্ত্রী-পুরুষের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তুমি হঠাৎ বোরকার কথা তুললে কেন? আমায় ঠাট্টা করে নাকি? সত্যিই মেয়েদের চোখের চাউনির ভাষা আমি বুঝতে পারি। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?"

" না না সে কথা কে বলছে। মনের ছাপ চোখে পড়ে বই কি। মেয়েদের চোখের ভাষা [illegible] ক্ষমতা তোমার আছে জেনেইতো, তোমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করি।"

"শিখে যাবে হে। এই করোনেশনের সপ্তাহেই সব চাউনির ভাষা পড়তে শিখে যাবে। 'বিলোল-কটাক্ষ' কথা দুটো বইয়ে পড়েছে তো? কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তুমি কারও চাউনি দেখে চিনতে পারবে না সেটা বিলোল-কটাক্ষ, না অন্য কিছু। যতই অভিধান দেখে তার মানে খুঁজে বার কর না কেন। সারাজীবনের পুঁথিগত বিদ্যার চাইতে এক ঘণ্টার অভিজ্ঞতায় যে লোকে বেশী শিখতে পারে, এ তোমায় আমি হাতেনাতে দেখিয়ে দেব। ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের কথা হচ্ছিল না? পাঁজি দেখে যেমন আমরা আমাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করি, ওদেরও সেই রকম গোছেরই ব্যাপার। শনিবার ছাড়া রোজই অশ্লেষা মঘার পালা, নীতিবাগীশদের যাত্রা নাস্তি। মহাশনিবার হচ্ছে করোনেশন; একেবারে চূড়ামণিযোগের ব্যাপার। লোকাচার শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী ওরা প্রত্যেকে সেই সময় একখানি করে সাময়িক ছাড়পত্র পায়—একেবারে travel-as-you-like টিকিট। এই জিনিসকেই তোমার প্রোফেসার বলেছিলেন ইংরেজদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। করোনেশনের হুল্লোড়ের মধ্যে এ কয়দিন নিজেকে ডুবিয়ে দাও; করোনেশনের আবহাওয়া প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে একেবারে আপন করে ফেল; করোনেশনের উদ্দাম আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়! তবে না ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবে। বুঝবে যে এরাও জীবনের স্বাদ নিতে জানে। ভয় ক'র না! সঙ্কোচের কারণ নেই। শুচিবাইগ্রস্তা ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে বসবার সপ্তাহও সে যুগের লম্বা-জুলফিওয়ালা ইংরেজরা যেমনভাবে উদ্‌যাপন করেছিল, আজ তাঁর নাতির-নাতনীর যুগে তার চেয়ে অনুদারভাবে এ যজ্ঞ সমাধা হবে না। এই সপ্তাহের স্মৃতি তোমার জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে!"...

দস্তুরমত লেকচার দেওয়া আরম্ভ করেছে দত্ত, আমার ভয় ভাঙ্গানোর জন্য। গত কয় মিনিটের মধ্যে করোনেশনের সম্বন্ধে তা'র মত বদলেছে। আমি এতে আশ্চর্য হইনি। তা'র মতের নড়চড় হয় না ততক্ষণ, ঠিক যতক্ষণ তুমি তা'র কথার প্রতিবাদ করছ। আমি যে অকুণ্ঠভাবে নিজেকে তা'র হাতে সঁপে দিয়েছি, এ বিষয়ে দত্তর আর সন্দেহ নেই। সেইজন্য তা'র অপদার্থ শিষ্যকে উপদেশ দেবার প্রেরণা পাচ্ছে সে।—কানে ভেসে আসছে তা'র কথার স্রোত।...এখন চলছে একটি ইংরেজী কবিতার কয়েকটি লাইন।—নীরস জীবন নিয়ে বিরাট ওকগাছ কতকাল বেঁচে থাকে। কিন্তু তাতে লাভ কি? লিলি বাঁচে মোটে একদিন—সৌন্দর্যের রসে ভরপুর জীবন। বসন্তের ঐ একদিনই যথেষ্ট। ....তবে মিশতে হবে ওদের সঙ্গে। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।......এক এক জায়গায় আলাপ করবার নিয়ম এক এক রকম। নাচ ঘরে যে নিয়ম কার্যকরী রাস্তায় সে নিয়ম অচল। হাইড পার্কে উপবিষ্টা মহিলার সঙ্গে প্রথম আলাপের কৌশল কখনও রেস্তরাঁয় আহাররতা মহিলার বেলা চলতে পারে না। ....যত খারাপ ডিশই দিক, এই সব সস্তা হোটেলের একটা মস্ত গুণ যে এখানে যারা খেতে আসে, তাদের সঙ্গে আলাপ করা সহজ। এদের অধিকাংশই প্রেম করবার জন্য উদ্‌গ্রীব, সব শনিবারে। এই করোনেশনের বাজারে তো কথাই নেই! তবু এদের মধ্যে থেকেও মেয়ে চিনে বার করতে হয়। সে চোখ থাকা চাই। চাউনির ভাষা বুঝবার চোখ।......বুঝতে শেখো, জানতে শেখো, চিনতে শেখো!"........

বহুদূরে হলঘরের কোণার দিকের একটি টেবিল দেখিয়ে দত্ত ব'লল—"ঐ যে দুটি মহিলা দেখছ, ও'দের সঙ্গে আলাপ করা যেতে পারে।"

দত্তর লেকচার একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু এখন আর শুধু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নয়—একেবারে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চেয়ারে নড়েচড়ে বসলাম মহিলা দুটিকে ভাল করে লক্ষ্য করবার জন্য। একজনের পোশাক সবুজ রঙের; আর একজনের গোলাপী। ...মহিলা দুজন মৃদু হাসতে হাসতে গল্প করছেন নিজেদের মধ্যে। ... খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন মধ্যে মধ্যে চারিদিকের টেবিলের লোকজন আড়চোখে দেখে নিচ্ছেন, নিজেদের হাসিগল্পের খোরাকের জন্য বোধ হয়। হাবভাবে এখানকার অন্য মহিলাদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য আমার কিছুই নজরে পড়ল না। ...

দত্তকে জিজ্ঞাসা করি, 'কি করে বুঝলে?'

এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিল সে। ডিটেকটিভ বইয়ের শেষের দিকে গোয়েন্দা যেরকম করে নিজের যুক্তির শৃঙ্খলের বলয়গুলো এক এক করে তুলে ধরে পাঠকদের সম্মুখে, সেইরকমভাবে দত্ত আরম্ভ করে।

'প্রথমত বেশভূষা দেখে।'

এই পয়েন্টটি এত সংক্ষেপে সেরে দিল যে, আমি জিজ্ঞাসা করবারও সুযোগ পেলাম না যে, বেশভূষার মধ্যে বিশেষত্ব কি দেখলে? পোশাকের রঙের মধ্যেই কিছু আছে নাকি? কে জানে!

"দ্বিতীয়ত, ওদের খাবারের ডিশগুলো লক্ষ্য করেছিলে? সস্তায় পেট ভরানোর চেষ্টা। গরীব। তা না হ'লে এখানে আসবেই বা কেন! একটু একটু করে খাচ্ছে, ছোট ছেলেপিলেদের মত। যাতে অনেকক্ষণ ধরে স্বাদ পাওয়া যায়। গরীবরা মনের দিক থেকে উদার হয়।"

"বেশী খিদে নেই বোধ হয়। খিদে থাকলে তবে তো গোগ্রাসে গিলবে।"

"যা বলছি শোন। জানবার ইচ্ছে থাকলে বাজে তর্ক কর না। অন্তত এখন নয়। ওতে চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেবো আমি পরে। ... ঐ! ঐ! তাকিয়েছে! তাকিয়েছে!... তাকাচ্ছে আমাদের দিকে! এইভাবে তাকানোটাই আসল! ...অব্যর্থ লক্ষণ।" ...

সত্যিই সবুজ পোশাক পরা মহিলাটি আবার যেন এদিকে তাকালেন মনে হ'ল। ...কি যেন বলছেন ফিসফিস করে সঙ্গিনীকে। ...দুজনেই প্লেটের উপর ঝুঁকে পড়েছেন। ...ঠিকই তাকিয়েছেন! ... আর কোন সন্দেহ নেই!... দত্তর চোখ আছে! ...

"হ্যাঁ মুখার্জি, তোমাকে আর একটা কথা

সৈন্ধবা

শিল্পী: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

সবিতা দেবীর সৌজন্যে

সেদিন বলেছিলাম মনে আছে বোধ হয়? এসব ক্ষেত্রে দুই সংখ্যাটি বড় পয়মন্ত; বড় ভাল। ওরা দুজন আছে। প্রেমিকারা একা বার হওয়া শোভন মনে করেন না। দুজন একসঙ্গে বার হ'লে নানান দিক দিয়ে সুবিধা। সেসব তো তোমাকে সেদিন বলেইছি। ওরা খোঁজেও দুই বন্ধুকে। নইলে দু'য়ে দু'য়ে চার মিলবে কি করে? তোমাকেও বলে রাখি, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ যদি করতে চাও, তবে খবদ্দার একা বেরিয়ো না। আবার তিনজনও থাকবে না। সুবিধা আছে হে, সুবিধা আছে এতে; চালাক লোকের পক্ষে একটি ইশারাই যথেষ্ট। একদিনে রংরুটকে কতটুকুই বা শেখানো যায়।"......

দত্তর কথা মনে বসছে। মেয়েটি এদিকে তাকানর পর আর দত্তর গল্পকে অতিরঞ্জিত ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

"দুজন থাকার এক মস্ত সুবিধে—একজন বসে থাকতে পারে, আর একজন উঠে যেতে পারে বাইরে।" দত্তর কথার মানে ঠিক বুঝতে না পেরে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম।

সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

"আর কত পরিষ্কার করে বোঝাই? মার্জিত সমাজে কি মেয়েরা—ওগো আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করতে চাইগো ব'লে সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসে থাকবে।"

ব্যাপার আমার পক্ষে বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠল দেখছি! তবু বাঁচোয়া যে, হঠাৎ হাততালির শব্দে দত্ত আর কথা বলতে পারছে না। পিয়ানো এই মুহূর্তে থেমেছে। পিয়ানিস্ট ভদ্রমহিলা সম্মুখে ঝুঁকে কুর্নিশ করবার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে হতাশ না করবার জন্য সকলেই হাততালি দিচ্ছে। এখানকার বাঁধা খদ্দেররা এরই প্রতীক্ষায় ছিল এতক্ষণ, প্রাণ খুলে হেসে নেবার জন্য। ...দূরের টেবিলের সেই সবুজ আর গোলাপী পোশাকপরা মহিলাদুটির উপর আমার দৃষ্টি নিবন্ধ।...তাঁরাও হাততালি দিতে দিতে হাসছেন।...চারিদিকের লোকজনের মুখের দিকে দেখছেন। ... এইবার আমাদের দিকেও নিশ্চয়ই তাকাবেন। লক্ষ্য করতে হবে সেই সময় তাঁদের চাউনির ভঙ্গী। ... অবশ্যম্ভাবীর প্রত্যাশায় মন মেতে উঠেছে। ...প্রাণপণ শক্তিতে হাততালির ঐকতানে যোগ দিয়েছি হাসতে হাসতে। ... তাকিয়েছেন! ঐ তাকাচ্ছেন সবুজ পোশাকপরা মহিলা আমারই দিকে! শুধু আমার দিকে! দত্তর দিকে নয়! ঘরভরা এত লোকের মধ্যে আর কারও দিকে নয়! এ এক নতুন উদ্দীপনা। দ্বিগুণ উৎসাহে হাততালি দিচ্ছি।...

যখন থামলাম, দেখি আমার একার হাততালিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু লোক আমার দিকে তাকিয়ে। কেউ কেউ আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে, সেই সবুজ পোশাকপরা মহিলাকেও মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছেন। ... ঠিক 'সবুজপরী'র মত দেখতে লাগছে ওকে!!......

"এই!"

দত্ত জুতোর ঠোকর মেরে আমায় সাবধান করে দিল। সে খুশী হয়েছে তার যুক্তির সত্যতা প্রমাণ হওয়ায়। আরও বেশী খুশী হয়েছে শিষ্যের পরিবর্তন দেখে।

সে কি সোজা পরিবর্তন! এক নম্বরের চালিয়াত ভেবে যে দত্তর কাছে ঘেঁষতাম না এক মাস আগে পর্যন্ত, তারই কাছে সত্যেন দত্তর 'সবুজ-পরী' কবিতার দু লাইন আউড়ে দিলাম এখন। সবুজ ছাড়া আর সব রঙ পৃথিবীতে নিরর্থক, সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। দত্ত চোখের চাউনির ভাষা বোঝে; আমার চোখে যে সবুজের নেশা লেগেছে, একথা বুঝতে তার দেরী হয়নি।

...সবুজপরী ঘড়ি দেখলেন।...আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন।...আমার সাহস বেড়েছে; তাই চোখ ফিরিয়ে নিলাম না। চোখাচোখি হ'তেই তিনি সঙ্গিনীর দিকে ফিরে তাকিয়ে কি যেন ব'ললেন।...দুজনেই হাসছেন।... ফিকে সবুজ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ঘরের ঐ কোণটি!...গোলাপীর পাশে সবুজ যে এত সুন্দর মানায় তা' আগে জানতাম না! সবুজ পাতার মধ্যে গোলাপ ফুল দেখতে ভাল লাগে, চিরকাল; কিন্তু তখন যে নজর থাকে গোলাপী রঙের ফুলটির দিকে; সবুজের দিকে কে তাকায়?

দত্ত উপদেশ দিচ্ছে—"দেখেছ! বলেছিলাম না! ওরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করছে কে আগে উঠবে। আজকের এমন আলাপের সুযোগ নষ্ট হতে দিও না! মন তৈরী করে ফেল! নার্ভাস হবার কিছু নেই। কি ব'লে কথা আরম্ভ করবে সেটা আগে থেকে ভেবে রেখো। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা লেগে গেলে বলবে "মাপ করবেন। যা ভিড় করোনেশনের মরশুম!" না হয় দেশলাই আছে কিনা খোঁজ নিতে পার মহিলাটির কাছে। তোমার পক্ষে বোধ হয় সব চেয়ে সহজ হবে বলা "ভারি সুন্দর রাতটা!" ভাব দেখাবে যে কথাটি কাউকে উদ্দেশ্য না করেই বলা। তারপর মুখে হাসি এনে মেয়েটির দিকে তাকাবে। মেয়েটি অবধারিত হেসে তোমার কথার সমর্থন করবে। ব্যস! তারপরেই আরম্ভ করবে গল্প। এত খুঁটিনাটি কি কাউকে মুখস্থ করে শিখিয়ে দেওয়া যায়?"

আর শেখানোর দরকারও ছিল না। আমি মন স্থির করে ফেলেছি।...দত্ত ঠিক বলেছে। কথার আরম্ভটাই আসল। পরের কথাগুলো আপনিই মুখে জোগাবে।

সবুজপরী হাত ঘড়িতে আর একবার সময় দেখে নিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে।

"মুখার্জি ওঠ!"

দত্ত একথা বলবার আগেই আমি উঠে পড়েছিলাম।...পান্নার দ্যুতি ছড়াতে ছড়াতে সবুজপরী এগিয়ে চলেছেন দরজার দিকে। যেমন করে হ'ক তাঁর কাছে পৌঁছতে হবে। আর দ্বিধা করবার অবকাশ নেই। একখান চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম প্রথমেই। কে কি ভাবল সে কথা ভাববার সময় নেই আমার এখন! একটি সবুজ জ্যোতির্মণ্ডল ছাড়া আর সমস্ত পৃথিবী মুছে গিয়েছে আমার চোখের সম্মুখ থেকে। এখন যদি উনি সত্যিকার সবুজপরী হয়ে উড়েও যান ডানা মেলে, তবু তাঁর পিছু নিতে হবে! কার সাধ্য আমাকে আটকায়! সবুজপরী দরজা দিয়ে বাইরে বেরুলেন! এখন প্রত্যেক সেকেণ্ডের মূল্য আছে আমার কাছে। প্রায় ছুটে চলেছি। আমার আগের ভদ্রলোকটি বার হ'বার সময় দরজাটি খুলে ধরে দাঁড়ালেন, খোলা কপাটের চার্জ আমার হাতে সঁপে দেবার জন্য।...

"ধন্যবাদ।"

দারোয়ান ব'লে ভুল না করলেও, আজও সেই লণ্ডনে প্রথম দিনের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল। ভদ্রলোকটির মুখখানি কেমন হয়ে গিয়েছিল দেখবার সময় পাইনি।...সবুজপরী পেভমেণ্টের উপর দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছেন। এমন হন হন করে চলবার দরকার কি? এইটাই নিয়ম না তো? একটি খুব জরুরী কাজের ভান দেখাতে চান বোধ হয়! তাঁকে ধরতে হ'লে আমার দৌড়ানো ছাড়া উপায় নেই!... ছুটতে আরম্ভ করেছি হন্তদন্ত হয়ে।... তিনি কন্দর্পমূর্তিটির পাশ দিয়ে গিয়ে ওদিককার পেভমেণ্টে উঠলেন।...আমিও প্রায় পৌঁছে গিয়েছি তাঁর কাছে। হঠাৎ নার্ভাস হয়ে গিয়েছি শেষ মুহূর্তে। হাঁটুর কাছে কি রকম যেন অসাড় অসাড় ভাব, কি ব'লে কথা আরম্ভ করা যায় ... ঠিক করতে পারছি না।...দেশলাই চাওয়া ঠিক হবে না।...

...তাঁর পাশে পৌঁছে গিয়েছি। আর এক মুহূর্তও দেরী করা চলে না! মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম—"ভারি সুন্দর রাতটি!"

নজর আমার তাঁর মুখের দিকে। সবুজপরী অবাক হয়ে তাকিয়েছেন।...অল্প হাসি হাসি মুখ। হাসির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চাচ্ছেন যে, সত্যিই আজ রাতটি অতি সুন্দর।...তাঁর চাউনির ভাষা বুঝতে চেষ্টা করছি, দত্তর নির্দেশ মত।...তিনি চিনতে চেষ্টা করছেন আমায়। প্রশ্ন করছেন। আমার কাছ থেকে বোধ হয় অন্য কথার আশা করেছিলেন। সলজ্জ আরক্তিম মুখে ও চাউনি ঠিক খাপ খাচ্ছে না। একটা কিছু বলতে হয় এখন।

"মাপ করবেন; যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তা'হলে চলুন কোথাও ব'সে কিছুক্ষণ

গল্প করতে করতে খাওয়া যাক একটু কিছু।"

এতক্ষণে তিনি যেন বুঝলেন, আগাগোড়া ব্যাপারটা। কাঠিন্যের আভাস পড়ল কেন দৃষ্টিতে? দস্তুর শেখানো সব হিসাব গুলিয়ে দিয়ে সবুজপরী জবাব দিলেন—"আমি দুঃখিত। আমার এখন বিশেষ কাজ আছে।"

গলার স্বর বেশ শান্ত ও সংযত।

দত্ত এর আগে আমায় আর একদিন বুঝিয়েছিল, অনেক সময় এদের "না" মানেই "হ্যাঁ"। তাই নয়তো?

"আচ্ছা তবে কাল বিকেলে আপনার যদি সময় হয়..."

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সবুজপরী বললেন "না দুঃখিত! কালও আমার কাজ আছে।"

এবারে গলার স্বর দৃঢ়তর। চোখে বিরক্তির আভাস সুস্পষ্ট। ভদ্রতার খাতিরে মুখে হাসি আনবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা আছে। ...একটা মাকড়শা কিম্বা শুঁয়োপোকাকে দেখছেন যেন তিনি?...

আর ভুল বুঝবার অবকাশ মোটেই নেই। এক মিনিটের অভিজ্ঞতায় মেয়ে মানুষের চোখের ভাষা জলের মত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে আমার কাছে। সে দৃষ্টি বলতে চায়- নেহাত তুমি বিদেশী ছাত্র বলে পুলিশ ডাকছি না, নইলে তোমার মত লোকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়, তা' আমার বিলক্ষণ জানা আছে!...

...ধরণী দ্বিধা হও!...আমার নিজের চোখের চাউনি কোথায় লুকোই, তা সুদ্ধ ভেবে ঠিক করতে পারছি না লজ্জায়!...

কিন্তু মহিলাটি ভদ্র। মনের উষ্মা কথাবার্তায় প্রকাশ না পেয়ে যায়, এ বিষয়ে শিক্ষা আছে, অধিকাংশ ইংরেজের মত। আমার দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে, তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন নিজের গন্তব্যের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। ফুট ছয়েক লম্বা দুজন লোক দুদিক থেকে এসে আমার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছে! ছিল কোথায় এরা? এরা কি ঐ মহিলাটির প্রণয়ী? না নিকট আত্মীয়? না আমার আস্পর্ধা দেখে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে দুজন পথচারী ইংরেজ আমায় উচিত শিক্ষা দেবার জন্য? ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁপছে। এখন কি করা উচিত সে কথা ভাববার ক্ষমতা পর্যন্ত আমার লুপ্ত হয়েছে। এদের সঙ্গে মারামারি করবার কথা ভাবাও যায় না। ও জিনিস কোনকালেই আমার আসে না। পুলিশ ডাকবার সাহস নেই, নিজের বিবেক পরিষ্কার নয় ব'লে। এখনই লোক জড় হয়ে যাবে আমাকে ঘিরে! এরা যখন আমায় ধরেছে, তখন কি আর ঘা কতক না দিয়েই ছাড়বে! সিনেমায় দেখেছি ঝগড়ার সময় ইংরেজরা আমাদের মত চড়চাপড় মারে না, ঘুঁষি মারে; নাকে, মুখে, চিবুকে! নিজের মুখখানিকে আসন্ন আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য, অজ্ঞাতে হাত উঁচুতে তুলবার চেষ্টা করতেই সেই দুজন আমার দু' কাঁধে হাত রাখল। ছাঁত করে মনে পড়ল, লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে পুলিশ যখন কাউকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তখন একজন ডান বগলের মধ্যে দিয়ে তার হাতটি চালিয়ে দেয়, আর একজন দেয় বাঁ বগলের মধ্যে দিয়ে তার হাত। দুজন দু পাশে, মার্চ করবার তালে চলেছে দুবৃত্তকে ধরে নিয়ে, এ দৃশ্য বহুবার দেখেছি। এরা তো দেখি তা-ই করছে! কলোনির পুলিশ? দুজনেই লণ্ডন পুলিশের মত লম্বা! সেই রকমই দৃঢ় অথচ সংযত এদের ভাব! মাথার উপর এখন যদি এদের বাজও পড়ে, তবু এরা নিজেদের কর্তব্য করতে ভুলবে না! কালকের কাগজে পড়েছিলাম যে, করোনেশনের সপ্তাহে প্রতি রাস্তায় সাদা-পোষাক-পরা পুলিশের লোক থাকবে, দুবৃত্তদের ঠাণ্ডা করবার জন্য। তবে তো এরা ঠিকই সাদা পোষাক পরা পুলিশ! ভয়ে ঘেমে উঠেছি। বেশ জোরেই তা'রা জিজ্ঞাসা ক'রল "তুমি ঐ ভদ্রমহিলাটিকে কি বলছিলে?"

এরা নিশ্চয়ই সব দেখেছে। কোন জবাব জোগায় না আমার মুখে।

"আমি—আ—আমি বলছিলাম যে... যে..." কথা খুঁজবার ব্যর্থ চেষ্টা আর আমায় করতে হ'ল না। সবুজপরী অল্প কিছুদূর মাত্র গিয়েছিলেন। তিনি থমকে ফিরে দাঁড়ালেন! বোধ হয় কানে গিয়েছে এখানকার পুলিশের কথাবার্তা! এই দিকেই যেন এগিয়ে আসছেন! আর রক্ষা নেই! এতক্ষণে ষোল কলা পূর্ণ হ'ল! আমার দুঃসাহসের কথা হয়তো অতিরঞ্জিত করেই বলবেন পুলিশের কাছে! এখনই পেনি কাগজের ফটোগ্রাফার আমার ছবি তুলে নেবে! আর কাল সকালের কাগজেই পিকাডিলি সার্কাসে ভারতীয় দুর্বৃত্তের চাঞ্চল্যকর সংবাদ বেরিয়ে যাবে! ভারতবর্ষের কাগজেও বেরতে পারে! ভারতীয় হাই-কমিশনারই হয়ত বাড়িতে চিঠি লিখে দেবেন! এত বড় বিপদে আমি জীবনে পড়িনি এর আগে!

সবুজপরীর মুখে হাসি! তবে কি এদের মধ্যে একজন তাঁর প্রণয়ী? সবুজপরী খানিক দূর থেকেই হাসতে হাসতে বললেন "আচ্ছা, কাল তিনটের সময় তোমায় আমি ফোন করব। বুঝলে? এখন আসি; আবার কাল ফোনে জানাবো, কখন তোমার বাড়িতে যাব।"

অবাক হয়ে গিয়েছি। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার সম্মুখের লোক দুই-জনের মধ্যে কাউকে বলছেন বুঝি। তা' তো নয়! উনি বললেন আমাকেই! আমার নাম ধাম কিছুই তো উনি জানেন না! আমার বাড়ির ফোন নম্বর উনি পাবেন কি করে?...

মুহূর্তের বিস্ময়। তারপরই জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা আমার কাছে। উনি লোক দুটিকে শুনিয়ে দিলেন, যে আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে আগের থেকে। এ না করলে আজ আমার নিস্তার ছিল না।

সেই লম্বা চওড়া জোয়ান দুজন অবাক হয়েছে আমার চেয়েও বেশী। শুধু অবাক নয়, অপ্রস্তুতও। সবুজপরীর কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই তা'রা হাত নামিয়ে নিয়েছে, আমার গায়ের থেকে। ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে, পালাবার পথ খুঁজছে তখন তা'রা।

...অপরিচিতা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। রঙবেরঙের আলো পড়েছে অন্ধ কন্দর্প মূর্তিটির গায়ে।

কন্নড় ভাষায় "হালে" শব্দের অর্থ পুরনো আর "বিড়ু" মানে রাজধানী। বাসে হালেবিড়ের কাছাকাছি এসে সহযাত্রী বন্ধুটির উৎসাহে এই ভাষাজ্ঞান লাভ করে বড় আনন্দ হল। আজকের মহীশূর রাজ্যে হালেবিড় এক নগণ্য গ্রাম মাত্র। আজকের রাজধানী মহীশূর, বাঙ্গালোর। তবু হাজার বছর আগেকার প্রবল প্রতাপ হয়শালা বল্লাল সাম্রাজ্যের রাজপীঠকে অদ্যাবধি রাজধানীর মর্যাদা দিয়ে মনে রাখবার মধ্যে পুরাতন কৃষ্টির প্রতি মহীশূরবাসীর শ্রদ্ধার নিদর্শন পরিস্ফুট। বাংলাদেশে আমরা সপ্তগ্রাম বা গৌড়কে নিছক সপ্তগ্রাম বা গৌড় বলেই জানি। বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাসে ওকীবহাল নন, এমন বিদেশীয়ের পক্ষে অধুনা হতগৌরব এই জনপদগুলির এককালীন গুরুত্বের কথা তাদের নাম থেকে আজ আর আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু হালেবিড় নামটির মধ্যেই বিগত দিনের এ তথ্য পরিবেশিত রয়েছে; উৎসাহী পর্যটকের পক্ষে বাকিটুকু আবিষ্কার করা শক্ত নয়।

কিন্তু মহীশূরবাসীর এ শ্রদ্ধা নামটুকুকেই শুধু বাঁচিয়ে রেখেছে কোনোগতিকে; সর্বজয়ী কালের কর্কশ হাত থেকে পুরনো রাজধানীর গৌরবকে বাঁচাতে পারেনি। পল্লব ও রাষ্ট্রকূট শক্তির পতনের পর খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণপ্রান্ত ভারতবর্ষে যে রাজবংশের অভ্যুত্থান কন্নড় সভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ রচনা করেছিল, তা হল হয়শালা বল্লাল রাজবংশ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, স্থাপত্য, শিল্পকলা, ভাস্কর্য—দিকে দিকে যে নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল সে যুগে, তা প্রধানত এ রাজবংশেরই দান। আজও কর্ণাটকী সঙ্গীত দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত; কন্নড় ভাস্কর্য দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য। এই বিপুল সাংস্কৃতিক সমারোহের কেন্দ্রপীঠ হালেবিড় আজ হৃতসর্বস্ব, রিক্ত। শুধু দুটি ভগ্নপ্রায় মন্দিরের গৌরব সে এখনও করতে পারে—তার জয়যাত্রার মিছিল থেকে পেছিয়ে-পড়া দুটি ভীত, অবসন্ন মন্দির—যা সম্ভবত হয়শালা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শেষ কথা। হয়শালেশ্বর ও কেদারেশ্বর এ দুটি মন্দিরের প্রশস্তিতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ভারী ভারী প্রামাণ্য পুস্তক আকীর্ণ। কলকাতার লাইব্রেরীর অন্ধকার কোণে এ প্রশস্তি এতদিন অধ্যয়ন করেছি আর মনটা আনচান করে উঠেছে। প্রায় দেড় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে হালেবিড় গ্রামে এসে যখন পৌঁছলুম, ধৈর্য তখন আর বাঁধ মানে না। পুঁথিতে পড়িনি এমন একটি তথ্য পরিবেশন করে সহযাত্রী বন্ধুটি আমার অস্থিরতাকে আরও বর্ধিত করলেন। কন্নড় ভাষার এক স্থানীয় প্রবচনের ইংরেজী তর্জমা করে বোঝালেন,—হালেবিড় মন্দিরের বাইরের সজ্জা ও বেলুড় মন্দিরের ভেতর, এ দেখা হলে দুনিয়ায় দেখবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

*

মহীশূর শহরের প্রায় এক শো মাইল উত্তর-পশ্চিমে, বেলুড় গ্রামে, দু' দিন আগে এসে পৌঁছেছি। বেলুড়, মহীশূর রাজ্যের হাসান জেলার একটি মফঃস্বল তালুক, বাংলায় যাকে আমরা বলি মহকুমা শহর। সেখানকার বিখ্যাত চেন্ন কেশবের মন্দিরটি যত্ন করে দেখবার ও ফটোগ্রাফ করবার ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করে সহযাত্রীটি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বস্তুত, শ্রীযুত কৃষ্ণ আয়েঙ্গারের সহযোগিতা ছাড়া আমার উদ্দেশ্যের সিকিভাগও সিদ্ধ হত কি না সন্দেহ। দশ মাইল দূরে হালেবিড় ভ্রমণের আজকের প্রোগ্রাম তিনিই করেছেন। স্থানীয় পূর্তবিভাগের ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে এ মন্দিরগুলির তদারকের ভার তাঁরই ওপর। সরকারীভাবে আজ তিনি হালেবিড় সফরে আসছিলেন; তাঁর সঙ্গী হবার এ মহার্ঘ্য সুযোগ আমি পরিত্যাগ করিনি।

বাসের পেছনে ধাবমান ধুলো চারিদিকে ছড়িয়ে থিতিয়ে পড়লে আমরা নেমে এলুম। দু' একটা দোকানপাট, কয়েকখানা চালাঘর —এই আজকের হালেবিড়। বাস স্ট্যান্ডের কাছে তরকারিপাতির ঝুড়ি নিয়ে রাস্তার দুপাশে মাটিতে বসে গুটিকয়েক স্ত্রী-পুরুষ। সাপ্তাহিক হাটবার আজ। দেখে দুঃখ হল। উত্তর ভারতের নগণ্যতম গ্রামেও হাটের দিনে এর দশগুণ লোক জড়ো হয়ে থাকে। হয়শালা বল্লাল সাম্রাজ্যের রাজপীঠ আজ সত্যিই রিক্ত। গ্রামটুকু পার হয়ে আমরা বাইরের মাঠে এসে পড়লুম। কিছু দূরেই সেই আশ্চর্য কীর্তি—হয়শালেশ্বর মন্দির। প্রাঙ্গণে ঢুকে বিস্তীর্ণ মন্দিরগাত্রে অতি সুনিপুণ ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলুম।

পাথর-বাঁধানো উঁচু ভিত্তির ওপর পূর্বমুখী মন্দির। উত্তর-দক্ষিণেও দ্বারপাল-রক্ষিত দুটি প্রবেশপথ আছে। প্রায় [illegible] ফুট চওড়া বেদী মন্দির প্রদক্ষিণ করে এসেছে। প্রাথমিকভাবে একবার চারিদিক ঘুরে এসে গভীর হতাশায় ছায়ায় বসে সিগারেট ধরালুম। কোথা থেকে শুরু করব, কোন্ মূর্তিটিকে ফেলে আর কোন্‌টিকে দেখব, এই অফুরন্ত ভাস্কর্য-ভাণ্ডারের কতটুকুই বা ধরে নিয়ে যেতে পারব স্মৃতির জাল ফেলে—এসব বিবিধ প্রাসঙ্গিক চিন্তায় বিলক্ষণ বিব্রত বোধ করলুম। শিল্পকলায় সমৃদ্ধ বিখ্যাত ভারতীয় মন্দিরগুলি যত্ন করে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। হালেবিড়ের দেওয়ালে, প্রথম দৃষ্টিতে, ভাস্কর্যের যে মহোৎসব দেখলুম আর কোথাও তেমনটি দেখেছি বলে মনে হয় না; বেলুড়েও নয়, খাজুরাহো কোনারকে ত নয়ই। অবস্থাটা অনুভব করলেন কৃষ্ণ আয়েঙ্গার। হালেবিড়ে এরকম হতবুদ্ধি দর্শক তিনি আগেও দেখেছেন। উৎসাহ দিয়ে বললেন, ফিরবার বাস ছাড়বে একেবারে

বাইরের দেওয়ালের একাংশ ঃ ভাস্কর্যের মহোৎসব

সন্ধ্যের সময়; সারা দিনটা হাতে রয়েছে; দেখা আরম্ভ করুন। হায় কৃষ্ণ আয়েঙ্গার! তুমি পি ডবলিউ ডি'র ইঞ্জিনীয়ার। এ মন্দিরের দেওয়ালে কোথায় ফাটল ধরেছে, কোথায় সিমেন্টের পলস্তারা খসে পড়ছে, সেই দিকেই তোমার সমগ্র মনোযোগ। তাঁকে কি করে বোঝাই যে, দু' চার সপ্তাহব্যাপী এক অনির্বচনীয় মানসিক ভোজকে আমায় মাত্র একটি দিনের মেয়াদে আস্বাদন করতে হবে। স্থানীয় ডাক-বাংলোয় দুপুরের আহারাদির ব্যবস্থা করতে বন্ধুটি সাময়িকভাবে বিদায় নিলেন। আমার সিগারেট শেষ হয়েছিল; দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালুম।

উত্তর-পল্লব ও হয়শালা যুগের মন্দির স্থাপত্যশৈলীতে যে ধারা প্রাধান্য পেয়েছে, তাতে গোপুরম বা দেবালয়ের উচ্চতার দিকে গুরুত্ব না দিয়ে মন্দির-গাত্রের আয়তনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে অনেক বেশী। মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের গোপুরমের মত বা তাঞ্জোরের বৃহদিশ্বর মন্দিরের শিখরের মত বেলুড় হালেবিড় বা সোমনাথপুরের হয়শালা মন্দিরগুলিকে দশ মাইল দূর থেকে দেখা যায় না; কাছে এসে অভিনিবেশ সহকারে এগুলিকে অধ্যয়ন করতে হয় এবং সে মনোযোগের প্রায় সবটাই আকৃষ্ট করে বাইরের দেওয়াল-ভাস্কর্য। অসংখ্য প্রস্তরমূর্তির স্থান সঙ্কুলানের জন্য যে বিশেষ স্থাপত্যরীতিটি অনুসৃত হয়েছে, তাতে এ মন্দিরগুলির কোনোটিই চতুষ্কোণ নয়; তারকার ছটার আকারে মন্দিরের দেওয়াল পর্যায়ক্রমে বাইরে প্রসারিত হয়ে আবার সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরকম ষোলটি ছটার সমন্বয়ে নক্সা তৈরী করা হয়েছে, যে জন্য পরিমিত ভূমির ওপর মন্দির-গাত্রের আয়তন বর্ধিত করা সম্ভব হয়েছে কয়েক গুণ। আর এই বিস্তীর্ণ দেওয়ালে হয়শালা ভাস্করেরা তাঁদের আশ্চর্য শিল্প-প্রতিভা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। হয়শালা মন্দিরশৈলীতে ভাস্করই প্রধান কর্মী; স্থপতি তাঁর তল্পি-বাহক মাত্র।

পরিধি-অনুসারী বেদী থেকে মন্দিরের দেওয়াল পঁচিশ ফিটের বেশী উঁচু হবে না, কিন্তু কণামাত্র স্থানও সেখানে ভাস্কর্য-বিরহিত নয়। সব থেকে নীচে চলেছে হস্তিযূথের শোভাযাত্রা। বিচিত্র আভরণে তাদের সর্বাঙ্গ সজ্জিত। হাবভাবের কারিগরী এত নিপুণ যে, হাজার বছর পরে আজও সেগুলিকে প্রায় জীবন্ত মনে হয়। তারপরে পৌরাণিক শার্দূল শ্রেণী। হয়শালা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শল একক যুদ্ধে একটি ব্যাঘ্র নিহত করেছিলেন বলে যে কিংবদন্তী প্রচলিত, তার প্রতীকরূপে এই শার্দূল-মূর্তি সমস্ত হয়শালা মন্দিরেই অগণিত সংখ্যায় উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এর ঊর্ধে, অপূর্ব লালিত্যের একটি লতাবেষ্টনী সমস্ত মন্দির প্রদক্ষিণ করে এসেছে। তার ওপরে পর্যায়ক্রমে অশ্বারোহী বাহিনী ও স্বর্গীয় পশুপক্ষীর দল। কার্নিশের নীচে সর্বশেষ পঙক্তিতে অপূর্ব দেবদেবী ও নায়িকামূর্তি—হালেবিড় ভাস্কর্যের যা শেষ কথা। এ মূর্তিগুলিতে পরিধেয় ও বিবিধ আভরণের যে জটিল বিন্যাস আশ্চর্য সূক্ষ্মতা ও রুচিবোধের সঙ্গে করা হয়েছে, হয়শালা মন্দির-গুলির বাইরে তার তুলনা ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। বস্তুত, নিছক লাবণ্যের দিক থেকে খাজুরাহোর কিছু কিছু নায়িকামূর্তি যে বিশেষ সমাদরের যোগ্য, তাতে সন্দেহমাত্র নেই; কিন্তু ভাস্কর্যের সূক্ষ্মতায় হালেবিড়ের এ মূর্তিগুলির সঙ্গে তাদের কোনো তুলনাই হয় না। আর এদের সংখ্যা? হয়শালেশ্বর মন্দিরেই এরকম সহস্রাধিক মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রায় তিন ফুট উঁচু, এই আশ্চর্য সৃষ্টি-গুলি দেখলে সহজেই বোঝা যায়, এ মন্দির নির্মাণে শতবর্ষকাল ব্যয়িত হলেও কেন এটিকে শেষ অবধি অসমাপ্ত অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া হয়েছিল। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে দিকপাল পণ্ডিত ফার্গুসন সাহেব হালে-বিড়ের বহিসজ্জা সম্বন্ধে বলেছেন—"ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ শৈলী এইখানে বিকশিত। মন্দির পরিক্রমকারী শ্রেণী-গুলিতে ভাস্কর্যের সূক্ষ্মতা এতই নিপুণ যে, কেবলমাত্র ফটোগ্রাফী দ্বারা তার নকল করা সম্ভব। ধৈর্যশীল প্রাচ্যেও এগুলি অমানুষিক শিল্প-শ্রমের বিশিষ্ট নিদর্শন। হালেবিড়ে সমান্তরাল ও লম্ব রেখাগুলির সুচারু সমন্বয় ও আলোছায়ার বিন্যাসে যে কৃতিত্ব দেখানো হয়েছে, তা গথিক আর্টের যে কোনো কিছুর থেকে শ্রেষ্ঠ।" ফার্গুসনের মতে, দুনিয়ার স্থাপত্য-ভাস্কর্যকলায় হালে-বিড় ও পার্থিনন দুই প্রান্তিক উদাহরণ।

আমার দিশাহারা অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন কৃষ্ণ আয়েঙ্গার। দাক্ষিণী ভোজ্যতালিকায় মারপ্যাঁচ কম; বোধ করি রাঁধা-বাড়া সব শেষ করিয়েই ফিরে এলেন এতক্ষণে। মন্দিরের ভেতরে দ্বিপ্রাহরিক আরতি আরম্ভ হয়েছে; জুতো খুলে আমরা ভেতরে এলুম। হয়শালা বংশের আরাধ্য দেবতা শিব ও পার্বতীর মূর্তি আজও এখানে নিয়মিতভাবে পূজিত হয়ে থাকে। কতগুলি আশ্চর্য স্তম্ভ ছাড়া ভেতরের

ভাস্কর্য উল্লেখযোগ্য নয়। মুসলমান আক্রমণে হালেবিড় একাধিকবার বিপর্যস্ত হয়েছে। বাইরে ও বিশেষ করে ভেতরে তার ছাপ সুপরিস্ফুট। যে মদনিকা মূর্তিগুলি বেলুড়ের গৌরব এবং সম্ভবত অধিকতর সংখ্যায় যেগুলি একদা এ মন্দিরটিকেও অলংকৃত করেছিল, তার একটিও আজ অবশিষ্ট নেই। কয়েক ঘণ্টার উন্মত্ততায় যে অনুপম ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়েছে, তিল তিল করে তা সৃষ্টি করতে অসামান্য প্রতিভাশালী শিল্পীদেরও শতবর্ষকাল সময় লেগেছিল। একথা বলে আমি শুধু একটি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত সত্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র করছি যে, বিজয়ী তরবারির আশ্রয়ে মুসলিম পৌত্তলিকতা-বিদ্বেষ ভারতীয় কৃষ্টির বহু অমূল্য সম্পদের বিনাশের কারণ হয়েছে।

মন্দিরের বাইরে এসে কৃষ্ণ আয়েংগার যে ভাস্কর্য কীর্তিগুলিকে বিশেষ যত্ন-সহকারে দেখালেন, তা পূর্বমুখী দুয়ারের সামনে মণ্ডপের নীচে দুই বৃহদাকৃতি প্রস্তর-বৃষ। দাক্ষিণাত্যের বহু শিব-মন্দিরে এ এক আবশ্যিক অনুষঙ্গ। মসৃণ পাথরে তৈরী, প্রায় ষোল ফিট উঁচু এই শিববাহনগুলি কৃষ্ণ আয়েংগারের ইঞ্জিনীয়ারসুলভ কল্পনাকে বিশেষ নাড়া দিয়েছে মনে হল।

বন্ধুটির অনুযোগে অদূরবর্তী কেদারেশ্বর মন্দিরটি দেখে এসেই আহারে বসতে হবে। বারংবার পেছনে তাকাতে তাকাতে প্রাঙ্গণের বাইরে চলে এলুম। জঙ্গলাকীর্ণ পথ। এখানে সেখানে এখনও ইট-পাথরের টুকরো ছড়িয়ে। ইতস্তত মাটির ঢিপির নীচে হয়ত পুরনো রাজধানীর ভগ্নাবশেষ। পথের পাশে কয়েকটি জৈন মন্দির জীর্ণদশায় এখনও টিকে আছে। হিন্দু হয়শালা রাজবংশের পরধর্মসহিষ্ণুতার প্রমাণ ছাড়া তাদের আর কোন গুরুত্ব নেই। সাবধানে কাঁটা-গাছের ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে আমরা কেদারেশ্বর মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালুম। আয়তনে অনেক ছোট হলেও, স্থাপত্যরীতিতে এটি হয়শালেশ্বর মন্দিরেরই অনুরূপ। বহুকাল আগে এ দেবালয়টির চূড়ায় এক বটগাছ পুষ্টি-লাভ করে সমস্ত মন্দিরটিকেই ভূপাতিত করে। প্রচুর অর্থব্যয়ে মহীশূর সরকার এর দেওয়ালগুলিকে শুধু মেরামত করতে সক্ষম হয়েছেন। মন্দিরগাত্রে যে ভাস্কর্য-গুলি এখনও অক্ষত আছে, ফার্গুসন সাহেবের মতে, তারা হয়শালেশ্বরের থেকে হীন নয়। "এ-মন্দিরটিকে কোনোদিন যদি সম্পূর্ণ অবয়বে দেখা সম্ভব হত, তাহলে ভারতীয় ভাস্কর্যপ্রতিভা যে অবলীলাক্রমে কি উচ্চস্তরে আরোহণে সক্ষম তার আর একটি প্রমাণ মিলত।"

হর-পার্বতী মূর্তি : হয়শালা ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন

এ প্রমাণ আর মিলবে না। এই হয়-শালেশ্বর আর কেদারেশ্বর—ভগ্নদশায় আজ যেটুকু বা টিকে আছে—কালপ্রবাহে তাও একদিন অন্তর্হিত হবে যেমন হয়েছে হয়শালা রাজবংশের দিগন্তবিস্তৃত গৌরব। এই চারিদিকে বিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপ, এই লতাগুল্মের ঘন আস্তরণ, প্রবলপ্রতাপ বিনয়াদিত্য আর বিষ্ণুবর্ধনের খ্যাতিকে চিরদিনের মত আবৃত করে দিয়েছে। এই শ্যামল আবরণ দীর্ণ করে সে খ্যাতি আবার নিজেকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবে এত সাধ্য তার নেই। পাথরের চেয়েও কঠিন প্রকৃতির এই অন্তিম আচ্ছাদন।

এই শ্যাম উত্তরীয়ের নীচে প্রসুপ্ত রয়েছে হয়শালা রাজপীঠ ডোরাসমুদ্রের কিংবদন্তী বিজড়িত করুণ কাহিনী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে, ডোরাসমুদ্র যখন সমৃদ্ধির মধ্যগগনে, তখন এক অসহায়া নারীর অভিশাপ বর্ষিত হল এই মন্দভাগ্য জনপদের ওপর। সমসাময়িক হয়শালা সম্রাটের বিধবা ভগ্নী তাঁর দুই যুবক পুত্রকে সঙ্গে করে কিছুদিনের জন্য ডোরাসমুদ্রে এলেন। রাজপ্রাসাদে আদর-আপ্যায়নে তাঁদের দিন সুখেই কাটছিল; বিপদের সূত্রপাত হল যুবক ভাগিনেয় দুটির প্রতি রাজমহিষীর অসঙ্গত আচরণে। তিনি দুজনের কাছেই প্রেমভিক্ষা করে ব্যর্থ হলেন। তারপরে, যা স্বাভাবিক, তাদের বিরুদ্ধে রাজসকাশে নালিশ করলেন তারা নাকি রাজমহিষীর প্রতি কামাসক্ত আচরণ করেছে। রাজরোষ দেখা দিল সংহারমূর্তিতে। বিধবা জননীর কাতর অনুনয়ে সে রোষ প্রশমিত হল না। নিরপরাধ যুবক দুটির শিরচ্ছেদ করা হল। রাজমহিষীর দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠাধারে হয়ত বিদ্রূপের একটু মৃদু হাসি মিলিয়ে গেল। প্রাসাদপ্রহরীরা বিনা আড়ম্বরে রাজ-ভগিনীকে বার করে দিলে ডোরাসমুদ্রের রাজপথে। পুত্রশোকাতুরার হাহাকারে রাজরোষভীত নগরবাসী সভয়ে দুয়ার বন্ধ

বিস্রস্ত-বসনা নায়িকা

করলে। তৃষ্ণার একটু জলও কেউ তাকে দিলে না। দিনশেষে, অবসন্নদেহে, তিনি নগরপ্রান্তের কুমোরপাড়ায় এসে পৌঁছলেন। সেখানে এক বৃদ্ধ কুম্ভকার ভবিষ্যৎচিন্তা না করে সসম্ভ্রমে তাঁকে কুটিরের দাওয়ায় এনে বসালে; সাদামাঠা মাটির পাত্রে এনে দিলে সুপেয় পানীয়। হয়শালা শক্তির আশু সর্বনাশ কামনা করে পুত্রশোকাতুরা সারাদিন যে অভিশাপ দিয়েছিলেন এখন তাতে এ প্রার্থনা যোগ করলেন যে, সে বিনষ্টি থেকে এই কুম্ভকারপল্লী যেন রক্ষা পায়। আজকের হালেবিড়ে যে কয়টি কুটির অবশিষ্ট আছে তা নাকি এই কুমোরপাড়াতেই অবস্থিত। এ কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিক সমর্থন নেই, তবু এর অনতিকাল পরেই, ১৩১০ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খিলজীর প্রখ্যাতনামা সেনাপতি মালিক কাফুর ডোরাসমুদ্র আক্রমণ করে হয়শালা রাজশক্তির সমাধি রচনা করলেন। বিজিত রাজভাণ্ডারের ধনরত্ন বয়ে নিয়ে যেতে যে শত শত ভারবাহী পশু ব্যবহার করা হয়েছিল একথা সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকেরাই লিপিবদ্ধ করেছেন। মালিক কাফুরের অভিযানের পর, রাজা নরসিংহের রাজত্বকালে ডোরাসমুদ্র আর একবার মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল। লুণ্ঠিত রাজধানীর হৃতগৌরব নরসিংহ কিছুটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু আবার, ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে, মহম্মদ তোগলকের বাহিনীর আক্রমণে ডোরাসমুদ্র চিরদিনের মত শ্মশানে পরিণত হল।

*

বাকি দুপুর ও সমস্ত বিকেল আচ্ছন্নের মত ঘুরে বেড়িয়েছি হয়শালেশ্বর মন্দিরের চারিদিকে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যেন শুনেছি অগণিত শিল্পীর কর্মব্যস্ততা আর স্তব্ধদৃষ্টিতে সে মুখর অতীতকে দেখবার চেষ্টা করেছি। দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল কৃষ্ণ আয়েঙ্গারের কর্কশ আহ্বানে; বাস ছাড়বার আর দেরী নেই। নতমস্তকে উঠে এলুম। কেন জানি না, অকস্মাৎ এক তীব্র বিতৃষ্ণা অনুভব করলুম এই উপকারী ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুটির প্রতি। আগামীকালের এরাই স্থপতি, এরাই ভাস্কর। বড় বড় নদীর এপার-ওপার এরাই বানাবে অতিকায় বীভৎস বাঁধ আর বানাবে ঝুলকালিমাখা রাক্ষুসে কারখানা। তামাম দুনিয়ায় এদেরই এখন জয়জয়াকারের মরশুম। আমাদের শিল্পসরস্বতীর ভাল উদ্ভাসিত করে এ রকম একটি মন্দিরও আর তৈরি হবে না ভারতবর্ষে। অতীতের এই অনির্বচনীয় শিল্পসৃষ্টিগুলিকে এযুগে আর মনে রেখে লাভ কি!......

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

ব্যাঘ্র ও সিংহ

যতীন্দ্রকুমার সেন লিখিত-চিত্রিত

বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে এক জায়গায় শীতের রাত্তিরে ভূরি-ভোজনের পর, কালী দত্ত ও হরু ঘোষাল মোড়ার ওপর মুখোমুখি বসে গল্প করছেন ও তামাক টানছেন। দুজনের মাঝে আগুনের ভড়সী অর্থাৎ মালসা। পাশে তামাক সাজা কয়েকটা কলকে ও গুলের গামলা।

এঁরা দুজনে এক কণ্ট্রাকটারি ব্যবসার অংশীদার। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব অনেক-দিনের। রেল স্টেশন থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে এক রাজার কাজের সূত্রে তাঁরই একটা কাছারিবাড়ির এক অংশে বাসা নিয়েছেন। কণ্ট্রাকটারি সংক্রান্ত কাজের লোকজন দরোয়ানদের ব্যারাকের একধারে ও কুলি-মজুরেরা এরই লাগাও এক আউট হাউসে ডেরা ফেলেছে।

দরোয়ানরা রাত্তিরে তাদের আস্তানার সামনে কাঠের আগুনের চারপাশে ঘিরে বসে সিদ্ধি খায়, ভজন গায়, রামচরিত-মানস পড়ে ও গল্প করে। কুলিরা খাপরেলের ভেতর লুকিয়ে তাড়ি খায়, আগুন পোয়ায় ও ঢোলের বাদ্যির সঙ্গে গান গেয়ে আনন্দ করে।

প্রায় প্রতি রাত্তিরেই দূর গ্রাম থেকে হৈ হৈ শব্দ ও টিন পেটার আওয়াজ ওঠে। ক্ষেতের মধ্যে হরিণের পাল ঢোকে, ফসল খায় ও তাদের দলের দু' একটাও বড় জানোয়ারের পেটে চলে যায়। চাষীরা টিন পিটে দুপক্ষকেই তাড়াবার চেষ্টা করে। এ অঞ্চলের এ সব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। লোকের গা-সওয়া হয়ে গেছে। রাত্তিরে বড় একটা কেউ ঘরের বার হয় না। নেহাত দরকার পড়লে সঙ্গী জুটিয়ে বিশেষ সাবধানে পথ চলে। শীতে সাপের ভয় থাকে না। কিন্তু অন্য সময় গোহুমন অর্থাৎ গোখরো ও করাইত সাপের ভয় লেগেই থাকে।

কালী দত্ত ও হরু ঘোষাল কণ্ট্রাকটারি কাজে অনেক দেশ ঘুরেছেন ও নানা জায়গার হরেক রকম অভিজ্ঞতায় পোক্ত হয়ে উঠেছেন। এখন যেখানে কাজ নিয়ে এসে-ছেন, সে অঞ্চলটার বদনাম আছে। এই বদনামের জন্য এদিকে কেউ সহজে কাজ নিতে চায় না। কিন্তু এঁরা পয়সার জন্যে কিছুই গ্রাহ্য করেন না। বলেন,—অদৃষ্টে থাকলে বাঘের থাবায়, ভাল্লুকের নখে, বরার দাঁতে বা সাপের কামড়ে মরা কেউ আটকাতে পারে না। প্রাণ নিয়ে দিনরাত পুতু পুতু করে বেড়ালে পয়সার মায়া ছাড়তে হয়।

কালী দত্ত মজলিসি লোক। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গোঁফ ওঠবার আগে থেকে। বয়োজ্যেষ্ঠের খাতিরে এঁকে আমরা কালী-ঠাকুদ্দা বলে ডাকতাম। ঠাকুদ্দার মতই নানারকম গল্প বলবার ক্ষমতা অসাধারণ। এঁর মুখ থেকে শুনেছি,—একবার খবর পেলাম ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে জলের দরে জঙ্গল বিলি হচ্ছে। এক বছরের মধ্যে শতাবধি বিঘে জমির মধ্যে যত পাকা গাছ আছে কেটে বার করে নিয়ে যাও। এক অংশীদার জুটিয়ে কাজটা নিয়ে ফেললাম। ময়ূরভঞ্জের জঙ্গল ট্র্যাক্ট অতি ভীষণ জায়গা। বাঘ থেকে হাতি, নেই এমন জানোয়ার নেই। অংশীদার জোটানো বড়ই মুশকিল হয়েছিল। যে শোনে সেই বলে,—টাকার চেয়ে প্রাণটা বড়। শেষে যাঁকে পেলাম, তিনি এক কায়স্থকুলতিলক, গোবিন্দচন্দ্র সেন। জমিদার বংশের ছেলে। বদখেয়াল নেই। যে কোনও ব্যবসায় টাকা খাটাতে বিষম আগ্রহ। লম্বাচওড়া জোয়ান। বংশগত শিকারের শখ। বন্দুকে সিদ্ধহস্ত। সাহসে দুর্জয়। একদিন জঙ্গলে গাছ কাটাতে কাটাতে সন্ধ্যে হয়ে এল। কাটিয়েরা বললে, বাবু এখনি কাটা বন্ধ করে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে না পারলে বাঘের পেটে যেতে হবে। গাঁয়ে এখন ফিরতে গেলে রাত হয়ে যাবে। এই জঙ্গলের ধারেই একটু দূরে পশ্চিমা গোয়ালারা মহিষের বাথান করেছে। সেখানে কোনও রকমে আজ রাত কাটাতে হবে। গোবিন্দর সঙ্গে পরামর্শ করে কাটিয়েদের কথামত গোয়ালাদের আড্ডায় গিয়ে হাজির হলাম। সব শুনে তারা খুব খাতির যত্ন করলে ও বললে,—আপনাদের সঙ্গে যারা আছে তাদের খুব কষ্ট হবে না; তবে আপনারা রৈস লোক, একটু তকলিফ করে রাত কাটাতে হবে। আমরা যতদূর পারি আপনাদের আরামের বন্দো-বস্ত করে দোবো। কিন্তু বাবুজী রাত কাটাতে হবে গাছের ওপর। সন্ধ্যের একটু পরেই আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে, ভঁইসদের দানাপানি দিয়ে জমিনের ঘর ছেড়ে গাছের ওপর মাচানে উঠে যাই। ভোর হলে নাবি। দু'তিনটে গাছে আমাদের মাচান তৈরী আছে। তারি একটাতে আজ রাতে আপনারা থাকবেন। মাচানটা সাফসুদরা করে খুব মোটা করে পোয়াল বিছিয়ে, ওঠবার জন্যে সিঁড়ি লাগিয়ে দোবো। মাচানে উঠে সিঁড়িটা টেনে নেবেন। সময় সময় সিঁড়ি বেয়ে বাঘ ও ভাল ওপরে উঠে যায়। হুঁশিয়ারি দরকার। আমি একটু দমে গেলাম এই রাত কাটাবার অদ্ভুত ব্যবস্থায়; কিন্তু গোবিন্দ তার বন্দুকটা মাটিতে ঠুকে বেজায় খুশী হয়ে বলে উঠল,—বাঃ, বাঃ, বেড়ে হবে।

গোয়ালারা বাজরা ও গমের আটার সঙ্গে ছাতু মিশিয়ে রুটি বানিয়ে কুমড়োর ছোঁকার সঙ্গে খেয়ে নিলে। তখন ওদের ঘরে ঘি তৈরী না থাকায় আমাদের দিলে মহুয়ার তেলে ভাজা মোটা মোটা গরম গরম পুরী, কুমড়োর ছোঁকা, নুনে জরানো কয়েকটা মিরচাই ও খাঁটি মোষের দুধের ঘন ক্ষীর। সেদিন ঐ জঙ্গলে যা খেয়ে-ছিলাম তার কাছে কোনও ভোজের হরেক-রকম রান্না লাগে না। একেবারে রাজভোগ। পেটভরে খেয়ে ওদের কথামত মাচায় উঠে

মইটা টেনে নিলাম। গোবিন্দ টোটার বেল্ট কোমরে বেঁধে রাইফেলে গুলিভরে পাশে রেখে দিলে। জঙ্গলে কাজ। কখন কি বিপদ হয় তাই লোকটি বন্দুক ছাড়া কখনও জঙ্গলে ঢুকত না। আমরা নিশ্চিন্ত থাকতাম। সে বলত,—দাদা এই মার্টিনি হেনরি রাইফেলটার খেল তোমাকে একদিন দেখিয়ে দোব। দেখিয়েও দিয়েছে। বাঘ লাফ মারবার আগে তার হাতের একনলা বন্দুক ডাকলে—গুড়ুম। আঠার ফুটে জানোয়ার একবার গাঁক শব্দ করে পড়ে রইল। আর উঠল না। কালীঠাকুদ্দা বললেন,—তার পর শোনো। আমাদের মাচানের কাছে একটা গামহার গাছ ঘিরে বাচ্চাদের মাঝখানে রেখে গোটা পনের ভঁইস গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক ওদিক মোটা মোটা কাঠের ডালের আগুন জ্বলছে। এই গামহার গাছের ওপর একটা মাচানে বাঁশের বল্লম হাতে গোয়ালারা গিয়ে উঠল। বাঁশের বল্লম শুনে ভাবছ, ওটা আবার কি? আচ্ছা, বলি শোনো। হাত চার লম্বা প্রায় নিরেট একটা বাঁশের একদিক ছুঁচলো করে কাটা। লোহার ফলা নেই। জোরালো হাত থেকে ছুটলে মারাত্মক অস্ত্র। বাঘ ভাল্লুক কাবু হয়ে যায়।

রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলটা যেন কিরকম হয়ে গেল। মশার ভীষণ উপদ্রবের ওপর চারিদিক থেকে নানারকম শব্দ আরম্ভ হল—খ্যাঁক খ্যাঁক, বোয়া বোয়া, ঘোঁত ঘোঁত, হুক্কাকা হা, চ্যাঁও চ্যাঁও, টিরর টিটি টিররর, ঘ্যাঁকর ঘ্যাঁকর, গররর ঘররর, কিচি কিচি কিচির। একটু পরেই একটা বোটকা গন্ধ নাকে এল। অংশীদারকে বললাম,—ভায়া বন্দুকটা বাগিয়ে ধর। বড় জানোয়ার বেরিয়েছে। গোয়ালারা চেঁচিয়ে বললে,—বাবুজী হুঁশিয়ার। আগুনের লাল আলোয় দেখলাম, মোষেরা চঞ্চল হয়ে উঠে একরকম গোঁ গোঁ শব্দ করে শিং তুলে মাটিতে খুর ঘষতে লাগল। মাচানের ওপর থেকে গোয়ালারা হৈ হৈ শব্দ করে বাঁশের বল্লম তুলে ধরলে। গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলাম,—ভায়া কিছু দেখছ কি? আস্তে আস্তে জবাব দিলে, হাঁ, দুটো আগুনে চোখ। ঐ দেখ। জানি, বাঘ ও বেরালের চোখ রাত্তিরে জ্বলে। বেরালের চোখ দেখেছি, বাঘের জ্বলন্ত চোখ রাত্তিরে দেখলাম। না দেখলে বুঝতে পারবে না সে কি ভয়ানক চোখ। দেখতে দেখতে আগুনের ভাঁটা নিবে গেল। অত বড় জানোয়ার যেমন প্রায় নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। একটু পরেই মোষেরা শিং নাবিয়ে নিলে। কাছাকাছি জায়গা থেকে মাঝে মাঝে হো হো চিৎকারের সঙ্গে টিন ও চেরাবাঁশ পেটার আওয়াজ উঠতে লাগল। ভোর হওয়া পর্যন্ত বার কয়েক এই রকম হল।

ওটা অনেকদিন আগের কথা। কালী দত্তর মুখে এরকম অনেক গল্প শুনেছি। চাকরি-সূত্রে এঁদের বাপদাদারা বিহারে আসেন। পূর্ণিয়ার এক স্কুলে পড়বার সময় ঘোষালের সঙ্গে এঁর পরিচয় হয়। দুজনে বারকয়েক এন্ট্রেন্স ফেল করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। দুজনেরই দুঃসাহসিক প্রবৃত্তি—adventurous spirit ছিল। এই জন্যে এঁদের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল গভীর। এঁরা নানা কাজের পর কন্ট্রাকটারি আরম্ভ করে দেন। এখন এতেই লেগে আছেন। অনেক বয়সে হলেও শরীরে শক্তি-সামর্থ ও মনে উৎসাহ প্রচুর। দুজনেই খুব কাজের লোক ও ভোজনপটু।

এঁদের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর মূল কাহিনীতে ফিরে আসা যাক—

দুটো আগুনে চোখ

কালী দত্ত বললেন,—আজকের খাসীটা সের দশেকের কম নয় কি বল? এর প্রায় অর্ধেকটা তোমাতে আমাতেই শেষ করে দিলাম। গত সোমবার রাজবাড়ির সিধের সঙ্গে ম্যানেজারের বন্দুকে মারা যে নধর হরিণটা এসেছিল, সেটা তুমি নিজে রাঁধলেই ভাল হত। তোমার কথামত ত্রিহুতে ভানসাইয়া রাঁধলে বটে, কিন্তু ভাল বানাতে পারলে না। খাসি পর্যন্তই ওদের দৌড়। হরিণের মাংস রাঁধা ওদের কম্ম নয়। একটা দিন পুরো না রেখে রাঁধলে ওসব মাংসের সোয়াদই পাওয়া যায় না। এর পর একটা চিতল যদি জোটে তুমি নিজেই লেগে যেয়ো।

ঘোষাল জানালে,—লেগে যেতে নিশ্চয়ই পারি। রান্নার শখও আমার খুব। কিন্তু মুশকিল এই যে বাঙালীর হাতের রান্না সবাই খায় না। আমি ব্রাহ্মণ ওরা জানে তবুও বাছবিচার করে।

কালী দত্ত বললেন,—হুঁঃ। সবাই না খায়, বয়েই গেল। যারা খাবার তারা ঠিক খাবে। এখন আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে চল নেপের মধ্যে ঢোকা যাক।

ঘোষাল ঘাড় নাড়লেন, হাঁ চল। আচ্ছা, সেই বাঙলা বইটা দেখেছ—'ভারতবর্ষের সিংহ', দিনচার আগে যেটা তোমাকে পড়তে দিয়েছি?

কালী দত্ত জিজ্ঞেস করলেন,—কোত্থেকে পেলে? এই জঙ্গুলে জায়গায় থেকেও সিংহরা ঠিক তোমার কাছে আসছে। কিন্তু সিংহের চাইতে বাঘ এলে আরও ভাল হত। মানাত। ঘোষাল বাঘের কথা কানে তুললেন না, বললেন,—কালীচরণ মুন্সী মাঝে কলকাতায় গেছল জান ত? এক হুকারের দোকানে বইটার মলাটের ওপর একজোড়া সিংগির ছবি দেখে, আর সিংগির গল্প আমি পড়তে খুব ভালবাসি বলে কিনে এনেছে। এর আগে ঐ রকম একটা বই অনেক সিংগির ছবি দেখে বারিয়ারপুরের কোনও এক লোকের কাছ থেকে এনে দিয়েছিল। বইটার নাম ছিল—'লায়ন্স অফ্ উগান্ডা।' উঃ, এই লায়ন্স কি দুর্দান্ত জানোয়ার। কি জোর। কি সাহস। বইটা তোমাকে পড়তে দিয়েছিলাম। কেমন লেগেছিল? নিশ্চয়ই ভাল। সায়েবটার লেখা পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

কালী দত্ত মুখ বাঁকালেন, দেখ উগান্ডার সিংহে আমার কোনও উৎসাহ নেই।

ঘোষাল বলে উঠলেন,—আচ্ছা, উগান্ডার সিংহ থাক। হালের বইখানা—'ভারতবর্ষের সিংহ' এ তোমার নির্ঘাত ভাল লেগেছে। আমি চার পাঁচ বার পড়েছি। খুব ভাল বই। এদেশের সিংগির ছবি দিয়েছে—চমৎকার ছবি। আর নিজের, অন্য লোকের ও সায়েবদের লেখা দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে, এদেশে সিংগি ছিল। তুমি কেবল মিছে তর্ক কর, ভারতবর্ষে সিংগি ছিল না। এখন এই বইটা পড়ে নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছ ওরা এদেশে ছিল।

কালী দত্তর মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব খেলে গেল। বললেন,—শোন ঘোষাল, উগান্ডা দেশ আফ্রিকা মুলুকে। ওখানে গন্ডা গন্ডা সিংহ আছে একথা অনেকেই জানে, কিন্তু তোমার ঐ ভারতের ভূরি ভূরি পশুরাজ, একেবারে গালগল্প। ভারতবর্ষের সিংহের একটা বালামচিও ভাললোকে এদেশে কেউ দেখেনি। সব ঝুটে বাত। ছবি দুটো কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকার সিংহ ও সিংহীর ছবি। বিলিতি বই থেকে ছবি নিয়ে লোক ঠকাবার জন্যে ভারতবর্ষের সিংহ ও সিংহী বলে ছেপে দিয়েছে। আর, প্রমাণ? সব ভুয়ো। সব বানানো কথা। এদেশী লোক বা বাঙালী ইংরেজদের মত অত মিথ্যে কথা বলে না। বাঙালীদের তবুও একটু চক্ষু-লজ্জা আছে। ইংরেজদের তা নেই। ওরা মনে করে কালা আদমীদের যা বুঝিয়ে দোব তাই তারা বুঝবে। হয়কে নয় ও নয়কে হয় করতে এমন জাত আর দুটি নেই। মিথ্যে কথার ধুকুড়ি।

আপকা পিছে জানোয়ার হ্যয়'

কালী দত্তর কথা ঘোষালের ভাল লাগল না, বললেন,—ইংরেজদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু ঐ বই লিখিয়ে ত বাঙালী। উনিও কি সব বাজে কথা লিখেছেন?

কালী দত্ত জবাব দিলেন,—বিলকুল। নিজে আর কি লিখেছেন? এর তার কথা তুলে দিয়ে বই ছাপিয়ে বাহাদুরী নিয়েছেন। ঘোষাল চটে গেলেন,—এদেশে সিংগি ছিল না এ হতেই পারে না। দুর্গাঠাকুর, জগদ্ধাত্রী এ'রা সিংহবাহিনী হলেন কি করে? সিংগি না থাকলে ওদের মূর্তি এলো কোত্থেকে? গায়ের জোরে সিংগির কথা উড়িয়ে দিচ্ছ। তা কি কখনও হয়?

কালী দত্ত আর একটা নতুন কলকেতে আগুন ধরিয়ে হুঁকোয় বসিয়ে বললেন,—গায়ের জোরে নয়। এদেশে সিংহ ছিল না। ছিল সিংঘ্র।

ঘোষাল অবাক হয়ে গেলেন,—সিংঘ্র! সে আবার কি জন্তু? কালী দত্ত বলতে লাগলেন,—তুমি ভুলে গেছ ঘোষাল, আমাদের হাই ইস্কুলের পণ্ডিত হরদত্ত চৌবে সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে হিন্দীতে তার মানে বুঝিয়ে বলত—ব্যাঘ্র এ দেশের আদিম পশু। যখন আফ্রিকা দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, সেই সময় এক বর্ণসংকর জীব ভারতে দেখা দেয়, ব্যাঘ্রের পরে। এদের মুখে ও অঙ্গে ব্যাঘ্রের মত কৃষ্ণরেখা। মস্তকে ও কর্ণের উভয় দিকে হ্রস্ব কেশর। এই প্রাণী সিংঘ্র নামে খ্যাত হয়। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে অল্পকালের মধ্যেই এই অভিনব জীব বিলুপ্ত হয়ে যায়—ঘোষাল বাধা দিয়ে বললেন,—বর্ণসংকর ত আর ভুঁইফোঁড় হয় না। অপর একটা জন্তু নিশ্চয়ই ছিল। সেই জন্তুটা যে সিংহ নয়, এ তুমি কি করে বুঝলে?

কালী দত্ত মুচকে হাসলেন,—ওহে ঘোষাল, কি থেকে কি হয় তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি? সংস্কৃতয় যা লেখা থাকে তা অকাট্য। বেদে ও পুরাণে যেসব কথা লেখা আছে সে বিষয় নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও কি?

ঘোষাল বললেন,—বেদ ও পুরাণে যা আছে ও সব ঋষিদের কথা। আর পণ্ডিত হরদত চৌবে যা বলত সে ত আর ঋষি বাক্য নয়। মিথিলার টোলে পড়ে সংস্কৃতর পণ্ডিত হয়ে নিজে থেকে শ্লোক বানিয়ে আমাদের বোকা বোঝাত। তোমার স্মরণ শক্তি অন্য দিকে তেমন না থাকলেও, পণ্ডিতের শ্লোক ও শুদ্ধ কথায় তার মানে বেশ মনে আছে দেখছি! তোমার ঐ সিংঘ্র টিংঘ্র বেবাক বাজে কথা। হরদত পণ্ডিতের কথায়,—আদিম কালে দুটো দেশে যদি যোগাযোগই ছিল, তাহলে তোমার ঐ সিংঘ্রর ভাইরাভাই ব্যাংঘ্র বলে কোনও জীব যে ও দেশে দেখা দেয়নি, এ হতেই পারে না। কালী দত্ত বিরক্ত হয়ে বললেন,—তার কোনও প্রমাণ নেই। আর বাঘ হল—রয়েল বেংগল টাইগার। নিজের রাজপাট ছেড়ে ভ্যাগাবণ্ডের মত কোথাও যায় না।

ঘোষাল চটে উঠলেন,—যত প্রমাণ তোমার ঐ পণ্ডিতের বাজে বানানো সংস্কৃত বুলিতে। আসল কথা এই যে তুমি সিংগি ভালবাস না। বাঘের ওপর তোমার প্রচণ্ড ভক্তি। বিষম উৎসাহ। বাঘের কথায় তুমি শতমুখ। তোমার কাছে বাঘ ছাড়া যেন কোনও জানোয়ারই ভূভারতে নেই।

কালী দত্ত মুখ বাঁকালেন,—নেই-ই ত। সিংহ আবার একটা জানোয়ার? আরে রামঃ। চিড়িয়াখানাতেই মানায়। নাদাপেটা। কেষ্টর মত মাথায় ও কানের দুপাশে বাবরি চুল। আফ্রিকা থেকে সায়েবরা ধরে এনে কয়েকটাকে খাঁচায় পোরে ও এদেশে জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। তারা অনেক দিন বাঘের পেটে চলে গেছে। জোরে পারবে কেন। ভীতু জানোয়ার। দেশে দল বেঁধে ঘোরে। একলা একলা শিকার ধরবার ক্ষমতা নেই। ছোট ছেলে তাড়া দিলে পালায়। আফ্রিকা মুলুকের লোকেরা ওদের ঠেঙিয়ে মারে। বাঘের কাছে কি কোনও জানোয়ার লাগে? রয়েল বেংগল টাইগার, চিতেবাঘ, প্যান্থার, কালোবাঘ—সব কটাই ভয়ানক। রাজপুতেরা বলে—গড় তো চিতৌর গড়, ঔর সব গড়াইয়া! আর আমি বলি—শের তো বাঘোয়া শের ঔর সব বিলারোয়া। হ্যাঁ, একটা কথা ঘোষাল, আজ পেটে বেশ চাপ আছে। সকালে গাছির দিকে যাবার সময় চারদিক দেখে যেয়ো। পরশু দিন টাট্টিখানার দিকে কয়েক পা যেতেই, ঐ যন্দুসিং যদি সাবধান করে না দিত—'এ কালীবাবু আপকা পিছে জানোয়ার হ্যয়'—তাহলে কি হতো বল দেখি? বাঘ না হলে এত সাহস কার? সকাল বেলাতেই বেরিয়েছে।

ঘোষাল হুঁকোয় জোরে টান দিয়ে বললেন,—দেখ কালী, বাঘের ওপর তোমার যেমন মতিগতি তুমি একদিন বাঘের পেটে যাবে দেখছি।

কালী দত্ত নির্বিকার ভাবে বললেন,—বাঘের দেখা ও সাপের লেখা বলে একটা বচন আছে—আরে ও কি!

প্রচণ্ড ক্যানাস্তারা পেটার শব্দ, বন্দুকের আওয়াজ, হৈ হৈ চেঁচামেচি গোলমালের ওপর কয়েকজন লোক চেঁচাতে চেঁচাতে এসে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল—জলদি কেওয়াড়া খোলিয়ে। দরজা খুলে দিতেই দুজন দরোয়ান ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে,

আরে বাপরে বাপ। বিশমভর সিং চলা গয়া। নব্বু সিং দো দফে বন্দুক চালায়া। মুঙ্গেরী বন্দুক মে গোলি ঠিকসে নহি চলা। কুছ নহি হুয়া কালীবাবু, কুছ নহি হুয়া। কালী দত্ত ও হরু ঘোষাল দুজনে একসঙ্গেই তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,—আরে, ক্যা হুয়া কুছ মালুম তো হোতা নহি। ঠিকসে বাতলাও। তারা জবাব দিলে, বাবুজী বাতলানেকো কুছ হ্যয় নহি। ক্যা বোলে'? বিশমভর সিং রামচরিত মানস শুনতে শুনতে এক দফে খাড়া হুয়া, মালুম নহি কাহে। পিছে গাছি থা। ওহি গাছিসে একঠো কমলি উড়কে আয়া, ঔর বিশমভর সিং গায়েব হো গয়া! বাস বাবুজী একঠো কমলি। হায়, হায়।

কালী দত্ত হরু ঘোষালের দিকে তাকালেন—কি ভয়ানক সাহস দেখ। আগুন ও একদল লোককে গ্রাহ্য না করে কাছেই ওত পেতে ঐ আমগাছের জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যেই সুবিধে পেলে অমনি একলাফে এসে একটা জোয়ানমদ্দ মানুষকে কামড়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ফিরতি লাফে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল! এই উড়ন্ত কমলিটা কি, কিছু বুঝলে?

হরু ঘোষাল জবাব দিলেন না।

কালী দত্ত বললেন,—ব্যাঘ্র।

বাণিজ্য

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিসিল্‌স্ দ্বীপপুঞ্জ আমার কাছে নতুন নয়, এর আগেও একবার গিয়েছিলাম ওখানে। গিয়েছিলাম সেবার কোচিন হ'য়ে,—পশ্চিম উপকূলের কোচিন-বন্দর থেকে হাজার মাইল দূরে ভারত মহাসাগরে। আঠাশটি প্রধান দ্বীপ নিয়ে ওই সিসিল্‌স্। প্রধান বন্দর ভিক্টোরিয়ায় বর্তমান সভ্যতার ছাপ পড়েছে। নইলে বহু দ্বীপ এখনো বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা, চাঞ্চল্য আর বিবর্তন থেকে শত যোজন দূরে। বহু জিনিসের ব্যবসা চলে ওই দ্বীপ-পুঞ্জের সঙ্গে, তার মধ্যে নারকেলের শুকনো শাঁস, নারকেল তেল, সুবৃহৎ সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলা, এইগুলিই বিখ্যাত......।

কথা হচ্ছিল বম্বের জনাকীর্ণ চৌপাট্টির বালুবেলায় ব'সে। এপাশে-ওপাশে ফেরীওয়ালার চাঞ্চল্য, বাচ্চাদের চীৎকার, মেয়েদের কলগুঞ্জন, আর পুরুষদের ব্যবসায়িক আলাপ-পরিচয়। সন্ধ্যা নামছে। ঝানু ব্যবসায়ী মিস্টার মাথু ওরই মধ্যে ব'সে সিসিল্‌সের গল্প বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। সমুদ্রের ভাঙা ঢেউয়ের ক্ষীণ ধারা পায়ের কাছ পর্যন্ত পেঁাছে আবার ফিরে যাচ্ছে। সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন আচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠলেন মিস্টার মাথু, বললেন,—'আমি বম্বের লোক কিন্তু সেদিন সিসিল্‌স্ থেকে ফেরা অবধি বম্বেকে যেন নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছি! এই যে উদয়াস্ত অর্থের পিছনে ছুটোছুটি,—এর শেষ কোথায় বলতে পারেন?

চমকে উঠলাম মনে মনে,—মিস্টার মাথু উঠ্‌তি ব্যবসায়ীদের অন্যতম, এঁর মুখে আজ এ কী কথা শুনছি!

মাথু সাহেব উত্তেজিত হয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরলেন,—'আমার কথাই শুনুন। টুঁটি টিপে বিবেককে হত্যা করেছি। আমরা নীতিভ্রষ্ট, চরিত্রভ্রষ্ট,—অহংকারে উত্তাল দম্ভে স্ফীত।

নিষ্প্রাণ নিরস পুরোপুরি কমার্শিয়াল লোক আমরা! আত্মাকে বিক্রয় করেছি অর্থের কাছে।'

বলে উঠলাম,—'না-না, এসব কী বলছেন! এসব……'

বাধা দিয়ে বললেন,—'ঠিকই বলছি। টাকা—মেয়েমানুষ—আর অশ্বক্ষুরধূলি,—এছাড়া কী জেনেছি জীবনে?'

ঠিক এই সময়ে একটা দমকা ঘূর্ণি হাওয়া জাগলো,—বালির কণা উড়তে লাগল এলোমেলো। জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগল, অনেকেই উঠে যেতে লাগল তীরভূমি ছেড়ে। ধীরে ধীরে রাত্রি নামতে লাগল। মাথু সাহেব ততক্ষণে নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। বালির ঝড় অতর্কিতে উঠে আবার অতর্কিতেই এক সময় মিলিয়ে গেল।

'কী জানেন? সিসিলসের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আপনাকে বলতে হবে আমার ওখানকার বন্ধু মিস্টার অ্যাডামসের কথা। 'বন্ধু' কথাটা ব্যবহার করলাম বটে। উনি ওখানকার একজন গণ্যমান্য প্রতিপত্তিশালী লোক। কী ক'রে ও'র সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল সেকথা আপনার না শুনলেও চলবে। তবে, এটুকু বলতে পারি, সিসিলসে ও'কে ধ'রেই আমি ব্যবসায়ে নামব, এ রকম ইচ্ছা ছিল। আমদানী-রপ্তানির ব্যবসা। ও'কে খুশী রাখতে পারলেই যে আমার ব্যবসা চালু হ'তে পারবে,—এটা আমি আমার ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। প্রথম যেবার কোচিন হ'য়ে ওখানে যাই, তখন গিয়েছিলাম দেশ দেখতে,—আর এই যে সেদিন গেলাম এখান থেকে, এ গেলাম সম্পূর্ণই ব্যবসায়ের ফন্দিতে, সেকথা আগেই বলে রাখা ভালো।

মিস্টার অ্যাডামস্ একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। অসাধারণ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোক, কিন্তু দুটো লম্বা হাত দুলিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে চলেন,—মনে হয়, একটা বন্য দানব হে'টে চলেছে। ভাব-ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে একটা ভয়ানক বন্যতা—রুক্ষতা ফুটে ওঠে। নইলে লোকটি সিসিলসের অধিকাংশদেরই মতো মিশুকে, স্ফূর্তিবাজ এবং অতিথিবৎসল। বয়স? ধরুন, মধ্যবয়সী। কিন্তু স্বাস্থ্য চমৎকার। বাড়িতে আগেরবার দেখেছিলাম ও'র স্ত্রীকে,—এবার দেখি—একা, স্ত্রী নেই। বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'য়ে গেছে। সিসিলসে এই ব্যাপারটা বড়ো সহজ ব্যাপার। বিবাহ আর বিবাহ-বিচ্ছেদ,—এটা যখন-তখন ঘটছে,—এটা নিয়ে কড়াকড়ি তেমন নেই। লোকে বলে, মূল দ্বীপে ছেলেদের থেকে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। বিচিত্র দ্বীপ। আজ বৃটিশদের হাতে এলেও আগে ছিল ফরাসীদের দখলে। তারও আগে এ ছিল আরব-জলদস্যুদের লুকিয়ে-থাকার জায়গা।

ফরাসীরা ভারত থেকে বহু দাসদাসী ধরে এনে এখানে কাজে নামিয়েছে একদিন। আফ্রিকা থেকেও এসেছে লোক। নানান্ জাতির সংমিশ্রণ। ধর্মে অধিকাংশই রোমান ক্যথলিক। মূল ভূখণ্ডে শ্রমিকদের অবস্থা মোটামুটি ভালো হলেও ছোট ছোট দ্বীপ-গুলিতে শোনা যায় সভ্যতার আলো আজও প্রবেশ করেনি; বর্বরতা এখনো চলেছে কোন কোন দ্বীপে। অসহায়দের কান্না সমুদ্র পার হয়ে দূরে পৌঁছয় না।

ভিক্টোরিয়াতে মিস্টার অ্যাডামসের ওখানে পৌঁছলাম এবার ঊষাকে নিয়ে। ঊষার বড়ো শখ ছিল সিসিলস্ দেখবার, তাই নিয়ে গেলাম সঙ্গে। যাবার আগে ও যখন বাক্স গুছোচ্ছে, তখন হেসে বলে-ছিলাম,—'কিছু গাউনের অর্ডার দি?'

'ওমা কেন!'

'কেন আবার! পড়বে। ওখানে শাড়ী কেউ পরে না। সব গাউনের ব্যাপার।'

ও শুধু বলল,—'না বাপু, আমি শাড়ীই পরব।'

বললাম,—'প'রো। শুধু লোকে যখন হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে—!'

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, বলল—'হিংসা হচ্ছে বুঝি। তাহলে বলো ত, গাউনই নিই। গাউন আমার আছে।'

সিসিলস্ দ্বীপপুঞ্জ যে পুরাকালের কোনো বিপুল মহাদেশের ভগ্নাংশ, তা বহু মনীষীই ব'লে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, এপাশে ভারতবর্ষ, ওপাশে মাদা-গাস্কার পর্যন্ত এই মহাদেশ বিস্তৃত ছিল। কেউ কেউ বলেন, অবলুপ্ত আটলান্টিস্ মহাদেশের অবস্থিতি ছিল ওই ওখানেই।

ঊষা খুব খুশী এই দেশ দেখে। নাতি-শীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত এই দ্বীপে যেন সব সময় বসন্তের হাওয়া বইছে। আমরা কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে খুব ঘুরতে লাগলাম। একদিন মিস্টার অ্যাডামস্ প্রস্তাব করলেন, প্রাসলিন্-দ্বীপটিতে ঘুরে আসবার। ভিক্টোরিয়া থেকে উত্তর-পূর্বে কুড়ি মাইল মাত্র। মোটর-লঞ্চে যাওয়া যায়। অ্যাডামস্ বললেন,—'কাজকর্ম পরে হবে মিস্টার মাথু। মিসেস্ এখানে হাঁপিয়ে উঠেছেন এ কয়দিনে। চলুন ও'কে প্রাসলিন ঘুরিয়ে আনি।'

'কিছু দেখবার আছে ওখানে?'

'দেখবার?—অ্যাডামস্ হেসে উঠলেন,—'জগতের বিখ্যাত 'কোকো-ডি-মার' গাছ একমাত্র ঐ প্রাসলিনেই আছে। যে-ই এদেশে আসে, পৃথিবীর এ' অন্যতম জিনিস,—সৃষ্টির এ' অপূর্ব বিস্ময় না দেখে কেউই ফিরে যায় না।'

'ব্যাপারটা কী খুলে বলুন ত!'

'না দেখলে কী ক'রে বোঝাই? আপনারা ভারতের লোক, জানেন না এর কথা? শোনেন নি এর নাম? শুনেছি, পুরাকালে ভারতের কোন অংশে এই কোকো-ডি-মার'-এর সুবৃহৎ ফলকে অতি পবিত্রজ্ঞানে পূজা করা হ'তো, মন্দিরে মন্দিরে রাখা হ'তো। এখনো পর্যন্ত এই সুবৃহৎ ফল ভারতে চালান যায়। শুনেছি, 'Nux Medica' এই নামে ভারতে এই ফলের চূর্ণ বিক্রী হয় প্রচুর।'

'কী কাজে লাগে, বলতে পারেন?'

চাপা হাসিতে ভরে গেল অ্যাডামসের মুখ, প্রথমে ঊষার দিকে, তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'পরে বলব 'খন।'

সাত মাইল লম্বা, আড়াই মাইল চওড়া এই প্রাসলিন দ্বীপটি। মাঝখানে মেরু-দণ্ডের মতো অথচ আঁকাবাঁকা চ'লে গেছে একটা পাহাড়ের শ্রেণী,—সর্বোচ্চ চূড়াটা বারো শ' ফিট্ উ'চু হবে,—দু'পাশে তীরের দিকে ঢালু হ'য়ে নেমেছে।

কিন্তু দ্বীপে পা দিয়ে আমরা একটা আলোড়নেরই সৃষ্টি করলাম বলা চলে। ঊষার শাড়ীই হ'লো বিশেষ ক'রে সবার লক্ষ্য। গ্র্যান্ড্ অ্যানসে গ্রামটির ছোট্ট হোটেলে জিনিসপত্র রেখে বেইসেণ্ট অ্যানি গ্রামের দিকে যে চার মাইলের রাস্তাটা চ'লে গেছে, সেই পথেই গেলে পড়ে 'কোকো-ডি-মার' গাছের বিখ্যাত জঙ্গল। খাওয়াদাওয়ার পর তিনজনে সেই পথ ধ'রে চলেছি, ক্ষেতে কাজ করতে করতে লোকগুলি কাজ থামিয়ে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে, কেউ কেউ মাথা থেকে টুপি খুলে জানাচ্ছে সম্ভাষণ। আবার কেউ কেউ কৌতূহলী হ'য়ে পিছনে পিছনে হে'টে আসতেও দ্বিধা করেনি।

'কোকো-ডি-মার' গাছ দূরে থেকেই নজরে পড়ে। বাস্তবিকই দেখবার মতো জিনিস। কয়েকটি পুরানো গাছ একেবারে একশো ফিটের মতো উ'চু। পাতাগুলি পনেরো থেকে বিশ ফিট পর্যন্ত লম্বা। সবুজ এবং মসৃণ। আমাদের দেশের তালপাতার মতো বিস্তারের ভঙ্গী হ'লেও সে রকম উদ্ধত নয়, কোমল হ'য়ে যেন বাতাসের বেগের কাছে নতি স্বীকার করেছে। সমস্ত বৃক্ষকাণ্ডটা আমাদের মেয়েদের বিনুনীর মতো ক'রে যেন বোনা ব'লে মনে হয়। ফলগুলি সুবৃহৎ, তিরিশ থেকে চল্লিশ পাউণ্ডের মতো ওজন হয় এক-একটা ফলের। অদ্ভুত দেখতে। আমাদের দেশের পাকা তালের কালো কালো শুকনো আঁটির মতো অনেকটা দেখতে লাগে, কিন্তু আকারে সুবৃহৎ। ভাঙলে মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত দু'টি

দুগ্ধধবল শক্ত শাঁস। কাঁচা অবস্থায় ভাঙলে দেখা যায়, শাঁস থাকে তরল—দুধের মতো।

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম বাগানটা। এদিকে-ওদিকে দু'-একটা ম্যাঙ্গালোর টাইলে-ছাওয়া পাকা খেত-বাড়ী। কয়েকজন কর্মী কাজ করছে, নিড়ুনি দিয়ে কেটে কেটে দিচ্ছে কোকো-ডি-মারের পায়ের কাছে জন্মানো আগাছার দল। চিহ্নিত গাছগুলি থেকে ফল পেড়ে আনছে। অ্যাডাম্‌সের হাঁকে সন্ত্রস্ত হ'য়ে এগিয়ে এলো কেউ-কেউ, কাছে এসে সেলাম জানিয়ে হাতের কাছে এগিয়ে দিলো একটি ফল। অ্যাডাম্‌সের হাঁক ডাক আর ওদের ঐ ভীতিবিহ্বল ভঙ্গী,—সাদা আর কালো চামড়ার প্রভেদটা যেন স্পষ্ট ক'রে মনে করিয়ে দিলো আমাকে। লোকগুলি কালো, কিন্তু বলিষ্ঠ। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, পুরু ঠোঁট, ছোট-ছোট চোখ, নাকের ডগাটা স্থূলে। কিন্তু এদের মধ্যে কর্মরত আরেকটি লোককে যেন হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটু অন্যরকম। ওদের চেয়ে একটু ফর্সা, চুলগুলি অত কোঁকড়া নয় এবং অত ছোটও নয়। নাকের ডগাও নয় অত স্থূল, ঠোঁটও নয় অত পুরু। কিন্তু অবিশ্বাস্য হচ্ছে চোখদুটি। বড়ো-বড়ো, একটু যেন ভাসা-ভাসা। হয়ত ফলপাড়ার কোন একটা কাজে ছিল ব্যস্ত, একটা হাতে একটা ফল, স্তব্ধ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে ঊষার দিকে তাকিয়ে। একেবারে যাকে বলে অপলক দৃষ্টি। অ্যাডাম্‌স্ কাছে এসে একটা প্রচণ্ড ধমক দিতেই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি সেলাম জানালো লোকটি। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি ওর চোখ থেকে। আমরা ওকে ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গেছি, লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এলো পিছনে। কৌতূহলী হ'য়ে পিছনে পিছনে এ পর্যন্ত ত অনেকেই এসেছে, নীরবে এসেছে, নীরবে গেছে। কিন্তু এ লোকটি সরব,—ভাঙা-ভাঙা ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলে একেবারে সরাসরি ঊষাকে,—'আপনারা কী ভারতবর্ষের লোক?'

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডাম্‌সের ছড়ি পড়ল লোকটির পিঠে, আর সমভাবে বর্ষিত হ'লো অসংখ্য গালাগালি। মনে হ'লো একবার যেন স্ফীত হ'য়ে উঠল লোকটির উজ্জ্বল স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ দেহের বাহু দু'টি, কিন্তু পরক্ষণেই হ'য়ে গেল কোমল, মুখটি নীচু করল, নীচের ঠোঁটটি থরথর ক'রে কাঁপছে। ব্যাপারটা ঘটে গেল এত আকস্মিক যে, আমরা বাধা দেবারও সময় পেলাম না. ঊষা ছুটে এসে আশ্রয় করল আমার বাহু। অ্যাডাম্‌সের এ উদ্ধত ব্যবহার আমারও ভালো লাগেনি, একটু এগিয়ে গেলাম লোকটির কাছে, বললাম, 'হ্যাঁ। আমরা ভারতবর্ষের লোক।'

মুখ তুলল লোকটি, একবার আমাদের দু'জনের দিকে তাকালো, তারপর তাকালো অ্যাডাম্‌সের দিকে, মুখ নীচু করল আবার, বলল,—'আমিও ভারতবর্ষের লোক!'

'ননসেন্স্!'—চীৎকার করে উঠলেন অ্যাডাম্‌স্,—'মিথ্যা বলবার আর জায়গা পাও না! খাঁটি ইন্ডিয়ান হ'য়ে তুমি করবে এখানে কুলিগিরি! ইন্ডিয়া দেখেছ কখনো?'

লোকটি মাথা নেড়ে জানালো,—না। সে দেখে নি।

অ্যাডাম্‌স্ জিজ্ঞাসা করল,—'তোমার নাম কী?'

'জন।'

অ্যাডাম্‌স্ হেসে উঠলেন হা-হা ক'রে, বললেন,—'যাও, তোমার কাজ করো। কখনই তুমি ইন্ডিয়ান নও। ইউ আর এ' ম্যান্ অব্ দিস্ স্ট্রেঞ্জ্ আইল্যান্ড! যাও, কাজে যাও। কুইক্!'

লোকটি চ'লে গেল মাথা নীচু ক'রে। অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটায় যেন মুহূর্তে আবহাওয়াটা থম্‌থমে হ'য়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ আমরা কেউই কথা বলতে পারি নি, মনে আছে। অনেকক্ষণ পরে চলতে চলতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন অ্যাডাম্‌স্, ঊষার দিকে তাকিয়ে বিনীত ভঙ্গীতে বললেন,—আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করবেন ম্যাডাম। আপনার সামনে ঐ লোকটাকে মেরে হয়ত আপনার কোমল মনে ব্যথাই দিয়েছি। কিন্তু না মেরে উপায় ছিল না। এরা যে কী ভয়ানক প্রকৃতির লোক তা' আপনারা জানেন না। মার খেয়েছে, এইবার দেখবেন, আপনারা একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এ দেখেও কেউ বিরক্ত করতে আসবে না।'

আমি বললাম,—'কিন্তু মিস্টার অ্যাডাম্‌স্...'

বাধা দিয়ে উঠলেন,—'জানি মিস্টার মাথুর, আপনার মনে কী প্রশ্ন উঠছে। একটা লোক এসে একটা কথা আচম্‌কা জিজ্ঞাসা করল, এতে দোষ কী থাকতে পারে, এই ত? আছে দোষ। এ' বড়ো স্ট্রেঞ্জ আইল্যান্ড! এখানে আপনাদের ভারতবর্ষীয় নীতি, অনুশাসন আর সামাজিক গণ্ডীর কথা একেবারে ভুলে যান। এ' অদ্ভুত দেশ! এখানে বিয়ে মানে কী জানেন? এখানে বিয়ে মানে একটা চুক্তি বা কন্‌ট্রাক্ট্। সে চুক্তি সাত দিনও টিকতে পারে, সারা জীবনও টিকতে পারে। জুয়ার মতো। Anybody Can propose to any girl!...এ'ত গেল মাহে-সিসিল্‌সের কথা। এ' প্রাস্‌লিন দ্বীপ আরো আদিম—আরো বন্য। এ আদিম অরণ্যে আদিম মানুষকে আপনি আটকাবেন কোন্ মন্ত্র দিয়ে?'

অ্যাডাম্‌সের কথার মধ্যে একটা যুক্তি আছে স্বীকার করি, এবং সে যুক্তি এই অদ্ভুত অরণ্যের একেবারে ক্রোড়ভূমিতে দাঁড়িয়ে সহসা অস্বীকারও করা চলে না। এ' অরণ্যে শ্যামলতা ও স্নিগ্ধতার চেয়ে একটা ভয়াবহ বন্যতা,—একটা কেমন-যেন উদ্দাম আদিমতা, নিবিড় হ'য়ে মিশে আছে! কোকো-ডি-মারের কোমল-ভঙ্গী পত্রাবলীর আড়াল থেকে প্রমত্ত উল্লাসে যেন মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে একটা উদ্দাম আদিম পশু!...অরণ্যের এ রূপের সঙ্গে আপনি ইতিপূর্বে পরিচিত হয়েছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি সেদিন যা দেখে এসেছিলাম, তা' জীবনে ভোলবার নয়! আজ সেই কথা বলব ব'লেই আপনাকে ডেকে এনেছি এখানে।'

কিন্তু যা বলছিলাম। অ্যাডাম্‌স্ তার কথা শেষ ক'রে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন, প্রথমে আমার, তারপরে ঊষার। মুহূর্তে কেমন-যেন আরক্ত হ'য়ে উঠল ঊষার মুখখানা, লজ্জাবিজড়িত ব্রীড়া-ভঙ্গীতে অন্যদিকে ফেরালো মুখ, ঠিক-করা বুকের আঁচলটা টেনেটুনে আরেকবার অকারণেই ঠিক ক'রে নিলো। অ্যাডাম্‌স্ ব'লে উঠলেন,—'এ কী! কোথায় ফেলে দিলেন কোকো-ডি-মার ফলটা, অ্যাঁ?' ঊষার পায়ের কাছেই পড়ে আছে ফলটা, নীচু হ'য়ে সেটা তুলে নিলেন অ্যাডাম্‌স্, একটু হেসে বললেন,—'এটা আপনি নিন ম্যাডাম্। যদিও যে-কুলি এটি আপনার হাতে দিয়েছে, তার এ খয়রাৎ করার অধিকার নেই, কিন্তু এ জঙ্গলের মালিক আমার বিশিষ্ট বন্ধু, তার হ'য়ে আমি এটা আপনাকে উপহার দিচ্ছি। কিন্তু ম্যাডাম্, একটা কথা। ফলটা পাকা নয়, কাঁচা। পাকা ফল আরো অনেক বড়ো হয়।'

ঊষা তবুও মুখখানা ফিরিয়ে রইল, লাল শাড়ীর প্রান্তটা টেনে মুখের কাছে নিয়ে এসেছে। একটু হেসে বললাম,—'উত্তর দাও মিস্টার অ্যাডাম্‌সের কথার!'

মৃদুকণ্ঠে ঊষা বলল, 'ফলটা কাট্‌তে বলো না? শাঁস খাবো!'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন অ্যাডাম্‌স্, বললেন.—'শাঁস কোথায় ম্যাডাম? দুধের মতো তরল পানীয় এর ভিতরে টলোমল করছে!'

বললাম,—'কিন্তু এর তরল পানীয় খায় না কেউ?'

হাসতে লাগলেন অ্যাডাম্‌স্,—বললেন, —'খায় না আবার! পেলেই খায়!'

ঊষা অনুচ্চকণ্ঠে আমাকে বলল,—'এই বলো না ওকে? আমি খাবো।'

অ্যাডাম্‌স্‌ গম্ভীর হ'য়ে গেলেন মুহূর্তে, বললেন,—'না ম্যাডাম্‌। এ' ফল আপনি খাবেন না।'

'কেন, কী হয় খেলে?'

অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন,—'পরে বলব মিস্টার মাথুর। এ হচ্ছে forbidden fruit—নিষিদ্ধ ফল!'

আমাদের হোটেলের বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। এটুকু বলতে পারি, বেশ খোলা-মেলা। সন্ধ্যার পরই রাত্রের খাওয়ার পালা সেরে নেবার নিয়ম। কচ্ছপের ডিম ও মাংস এখানকার অন্যতম প্রধান খাদ্য। খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনজনে ব'সেছি অ্যাডাম্‌সের ঘরের সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে। আকাশটা কালো। নক্ষত্র উঠেছে। যেন একটা কালো পর্দার ওপরে অনেকগুলি তারা ঝিলমিল করছে। তারই নীচে একটা অতিকায় কালো শ্লেটের মতো সমুদ্রটা প'ড়ে আছে। শাদা ব্রেকার ভাঙছে মাঝে মাঝে, যেন শ্লেটের ওপরে শাদা খড়ি দিয়ে টানা কতগুলি বলিষ্ঠ শুভ্র রেখা! কতগুলি রেখা ফস্‌ফরাসের আধিক্যে নীল হ'য়ে জ্বলে উঠছে!

কোথায় কতদূরে বাজছে একটা গীটার, —অভিমানিনী প্রেমিকার কাছে আবেগ-কম্পিত ব্যাকুল প্রেমিকের থেমে-থেমে অস্ফুট কথা বলার মতো! ঊষা স্নান ক'রে এসেছে একটু আগে। আধো আলো আধো ছায়ায় যেন একটি ফুল ফুটেছে আমার হাতের কাছে!

অ্যাডাম্‌স্‌ একটা চুরুট ধরালেন, বললেন, 'হঠাৎ কী রকম গুমোট পড়ল, দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন ত?'

'স্বাভাবিক। সমুদ্রের ধারে সন্ধ্যার সময় হাওয়া বন্ধ হ'য়ে যায়। অপেক্ষা করুন, একটু পরেই বইবে ভিতরের হাওয়া, সেই কোকো-ডি-মার অরণ্যের মাতাল হাওয়া আর কি!'

অরণ্যের কথায় অনেক কথাই উঠ্‌ল। অ্যাডাম্‌স্‌ জ্ঞানী লোক, পড়াশোনা করেন বিস্তর এবং যা বলেন, বলেন ভারী সুন্দর ক'রে, গুছিয়ে। ও'র কথার মধ্যে প্রায় ডুবে গেছি, হঠাৎ আমরা উভয়েই চম্‌কে গেলাম ঊষার প্রশ্নে। ঊষা আচম্‌কা প্রশ্ন করে বসল অ্যাডাম্‌স্‌কে,—'যে লোকটিকে আপনি তখন ছড়ি দিয়ে মারলেন, তার কথা একটু বলুন না!'

অ্যাডাম্‌স্‌ একটু যেন অবাক্‌ হ'লেন ওর ওই অদ্ভুত কৌতূহল লক্ষ্য ক'রে। আমি অবাক্‌ হ'লাম আরও বেশী। ও' যেন আমার নীরব প্রশ্নটাকেই টেনে বার ক'রেছে! সেই থেকে ঐ ব্যাপারটিই আমার অন্তরের অন্তস্তলে থেকে থেকে ধরাচ্ছিল জ্বালা,—বাইরের বহু আলোচনায় সেটা চাপা প'ড়েও পড়ছিল না। আমি নিজে ভারতীয়, তাই আমার কাছে লোকটি নিজেকে ভারতীয় ব'লে পরিচয় দেওয়াতেই বোধহয় এই ক্ষীণ আত্মীয়তা-বোধ! ভাবতে গেলে এটা কিছুই নয়, কিন্তু ভারত থেকে সহস্র মাইল দূরের ঐ নির্জন নিভৃত দ্বীপে এর মূল্য কম নয়, এটা আমি রক্তে রক্তে বুঝে এসেছি!

অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন,—'লোকটি কুলি, এছাড়া আর কী পরিচয় দেবো? শত-সহস্র কুলির মতোই ওর জীবন। এর বেশী ওর কোনো পরিচয় আমি জানি না।'

বললাম,—'মিস্টার অ্যাডাম্‌স্‌, ও' লোকটি ভারতীয় নয় বলছেন আপনি, অথচ ভারতীয় ব'লে পরিচয় দিতে ও এত আগ্রহশীল কেন?'

'সেটাই আশ্চর্য!' অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন, —'হয়ত ও শুনেছে ওর কোনো পূর্ব-পুরুষ ছিল ভারতীয়। ভারতীয় কুলি হ'য়ে হয়ত এসেছিল ওর কোনো পূর্ব-পুরুষ!'

'সেটাই সম্ভব।'

অ্যাডাম্‌স্‌ একটু হেসে বললেন,—'কে জানে! হয়ত আমারও রক্তে মিশে আছে কোনো ভারতীয়ের রক্ত!'

এ কথায় আমাদের মনটাও মুহূর্তে হ'য়ে গেল হাল্‌কা! এই এতক্ষণে অ্যাডাম্‌স্‌কে অতি অন্তরঙ্গ মনে হ'তে লাগল। ঊষার কথাবার্তাও হ'য়ে এলো অনেক সহজ। অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন,—'কি জানেন? এ'দেশটাকে দেশ ব'লে আমরা যেন কেউ-ই মনে করতে পারি না! এ যেন বিরাট এক অতিথিশালা, আমরা বংশপরম্পরা অতিথির মতই এখানে বাস ক'রে চ'লেছি! কেউ স্বপ্ন দেখে স্পেনের, কেউ আরবের, কেউ আফ্রিকার, কেউ ভারতের। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন ভাঙলেই এই স্ট্রেঞ্জ আইল্যান্ড্‌—এই বিচিত্র সিসিল্‌স্‌!'

রাত বাড়ছে। ঊষা একসময় উঠে দাঁড়ালো, বলল, 'ঘুম পাচ্ছে।' আমি কিছু বলবার আগে ব'লে উঠলেন অ্যাডাম্‌স্‌—'যান, ম্যাডাম্‌, আপনার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। কোনো ভয় নেই। আপনার মিস্টারকে আমি একটু আটকে রাখলাম।' ঊষা একটু মুখ টিপে হেসে বলল,—'রাখুন গিয়ে।'

চ'লে গেল। অ্যাডাম্‌স্‌ ধরালেন আরেকটা চুরুট, বললেন, 'অনেক কথাই বলার আছে, মিস্টার মাথুর। আপনার মিসেসের সামনে সব কথা বলতে পারছিলাম না। বলা উচিতও নয়।'

হেসে বললাম, 'তাতে কী হয়েছে? ওর সামনে...'

'ওর সামনে সব কথা বলা যায় না'—অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন, 'উনি সিসিল্‌সের নয়, ভারতের। ভারতের কথা আমি অনেক প'ড়েছি মিস্টার মাথুর—ভারতীয় মহিলার সম্ভ্রমবোধের কথা অনেক জেনেছি।

হেসে উঠলাম। চলতে লাগল কথাবার্তা। এভাবে কেটে গেল বহুক্ষণ। এসব কথা থেমে গেল। তন্দ্রাও আসছে। একসময় হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন অ্যাডাম্‌স্‌, বললেন, 'চলুন মিস্টার মাথুর, একটু ঘুরে আসা যাক্‌।'

'কোথায়?'

'উঠুন না?'—অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন, 'জঙ্গলে। কোকো-ডি-মারের অরণ্যে নিয়ে যাব আপনাকে। ভয় নেই, হাতে ছড়িও রইল, টর্চও রইল।'

হেসে বললাম, 'ছড়ির হয়ত দরকার আছে, টর্চের দরকার নেই। চেয়ে দেখুন আকাশের দিকে।"

অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন, 'ওর জন্যই ত অপেক্ষা করেছিলাম। জ্যোৎস্না দিয়ে ধুইয়ে দিক সমস্ত! আলো আর ছায়ায় উত্তাল হয়ে উঠুক আদিম কোকো-ডি-মার!'

বললাম—'কিন্তু এই শোবার পোষাকে, মিস্টার অ্যাডাম্‌স্‌?'

নিজের ড্রেসিং গাউনটা টান মেরে খুলে ফেললেন অ্যাডাম্‌স্‌, বললেন, 'কোনো পোষাকেরই দরকার নেই মিস্টার মাথুর, কোকো-ডি-মারের অরণ্য আদিম অরণ্য—Garden of Eden ড্রেসিং গাউন আমিও খুলে ফেলেছি। পাৎলা পাৎলুন আর জামা, এই ঘুমের পোষাকেই পার হয়ে এলাম হোটেলের সীমানা। নীরবে ধরলাম জঙ্গলের পথ। ঊষা হয়ত এতক্ষণে তার ঘরে ঘুমের গভীরে ডুবে গেছে।

অ্যাডাম্‌স্‌ এক জায়গায় এসে আমার হাতটা ধ'রে একটা খাড়া বেয়াড়া পাথর পার করে দিলেন, বললেন, 'কিরকম মহিমান্বিত সম্রাটের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কোকো-ডি-মার, দেখেছেন? মজা এই, ধারে-কাছে অন্য কোনো গাছকে উনি জন্ম নিতে দেন না। অদ্ভুত ব্যাপার, এদের কাছাকাছি অন্য কোনো গাছ নেই!'

ততক্ষণে অদ্ভুত একটা মদির গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে এই গন্ধ একটা গানের সুরের মতো বেজে উঠছে! আপনাকে ঠিক ভাষায় বোঝাতে পারছি না, এ অনুভূতি আমার জীবনে এই প্রথম!

অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন, 'পুরাকালের ভারতীয়রা ভাবতেন এ'ফলের গাছ জন্মায় সমুদ্রের অতলে, ফল পেকে প'ড়ে যায় না, জলে ভেসে উঠে আসে তীরে।'

আমরা অরণ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। রুপালী আলোয় ভ'রে গিয়ে অপরূপ হয়ে উঠেছে দ্বীপের দৃশ্য! অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন,

স্কেচ্
গোপাল ঘোষ

'আপনি ফলটা ভালো করে লক্ষ্য করেছিলেন?'

'করেছিলাম।'

'এ' এক অদ্ভুত ফল মিস্টার মাথুর। পবিত্র মানবদেহের সঙ্গে ওর সাদৃশ্য বিস্ময়কর। হয়ত এই জন্যই একে ঘিরে প্রাচীন ভারতে এর এক উপাসক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। যাঁরা পূজা করতেন এ'র, এ'কে শিবলিঙ্গের মতো স্থান দিয়েছিলেন মন্দিরে। হয়তো লক্ষ্য করেছেন যোনিসদৃশ এর আকৃতি।'

বিস্মিত হয়ে বললাম—'তাই নাকি!'

হেসে অ্যাডামস্ বললেন, 'দেখেননি লক্ষ্য ক'রে? আশ্চর্য! মিস্টার মাথুর, ও নিষিদ্ধ ফল। এ খেলে উদ্দাম হয়ে উঠবে মানুষের আদিম বৃত্তি! এই ফলের চূর্ণ আজও সেই উদ্দেশ্যে বিক্রী হয়ে থাকে। এই ফলের Aphrodisiac গুণাবলী জগৎবিখ্যাত!'

ততক্ষণে এসে প'ড়েছি অরণ্যে। আসা মাত্রই মনে হলো, দূরে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! অ্যাডামসের কাছ ঘেঁষে চেপে ধরলাম ও'র একটা হাত, বললাম, 'শুনছেন? কে যেন কাঁদছে! কে একটি মেয়ে যেন কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!'

অ্যাডামস্ ঘুরে দাঁড়ালেন আমার সামনাসামনি, বললেন, 'ঠিক বলেছেন! সমস্ত অরণ্য প্রকৃতি কাঁদছে। অরণ্য-দেবী! বলছেন মুক্তি দাও, আমাকে মুক্তি দাও! আদিম প্রকৃতি আজকের সভ্যতার কাছে ফিরিয়ে পেতে চাইছে তার উন্মুক্ত আদিমতাকে! পারেন দিতে?'

বললাম, একটু উত্তেজিত হয়েই বললাম, 'বলছেন কি আপনি! শুনছেন না একটি মেয়ের কান্না? নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে। চলুন দেখি!'

হেসে উঠলেন অ্যাডামস্, বললেন, "উত্তেজিত হবেন না, এ' কোকো-ডি-মারের কান্না! রাত্রে আচমকা শুনলে ভৌতিক বলেই বোধ হয়। পাতার মধ্য দিয়ে যখন হাওয়া বয়, তখন ঠিক মেয়েদের কান্নার মতই শোনায়। চলুন, আরও ভিতরে। আপনি ফিরে যাবেন শহরে, কিন্তু ঠিক এ আনন্দ কোথাও পাবেন না! আমি মাঝে মাঝে আসি, আর অন্তরের দুরন্ত শিশুটাকে অনুভব করে যাই! কয়েক মুহূর্তের জন্য খেলা ক'রে যাই শিশু হ'য়ে মায়ের কোলে!'

এসে দাঁড়িয়েছি একটি ছোট কোকো-ডি-মারের পাতার নীচে। গন্ধ আরও তীব্র হয়ে স্নায়ুতে এসে বাজছে! যেন দুরন্ত নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছি। চাঁদের আলো আর এই রহস্যময় কোকো-ডি-মার সব মিলিয়ে যেন রক্তে বাজাচ্ছে ঝঞ্চনা! সেই দূর থেকে শোনা গীটারের আকুতি প্রিয়ার অভিমান যেন ভাঙাতে পারেনি এখনো! অনন্তকাল ধ'রে

যেন এই আকুতিই কেঁদে কেঁদে ফিরবে, প্রিয়ার দুর্জয় অভিমান দূরে হবে না তবু!

অ্যাডামস্ আর আমি ব'সে পড়েছি একটা পাথরের ওপরে। পাথরের আসনে দুটি পাথরের মূর্তি। অনেকক্ষণ কেটে গেল নিশ্চুপ। কথা বলার পালা অ্যাডামসেরই। বললেন, 'এই-ই হচ্ছে Garden of Eden স্বর্গোদ্যান। বহু মনীষীর অভিমত, এই অরণ্যই হচ্ছে বাইবেলকথিত স্বর্গোদ্যান। আদম আর ইভের লীলাভূমি।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ। আর এই কোকো-ডি-মারই হচ্ছে সেই নিষিদ্ধ ফল, যা ইভ আস্বাদ করে প্রথম, তারপরে প্ররোচিত করে আদমকে গ্রহণ করতে। আসে প্রথম লজ্জা। সভ্যতার প্রথমতম বাণী উচ্চারিত হয়েছিল এই আদিম অরণ্যে।'

•

কতক্ষণ এই অপরূপ আদিমতার মধ্যে নিমগ্ন হয়েছিলাম মনে নেই, অ্যাডামসের কথায় চমক ভাঙল। অ্যাডামস্ ঠেলছেন আমাকে কনুই দিয়ে। বললাম—'কী?'

উত্তেজিত অ্যাডামসের কণ্ঠস্বর, 'ঐ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন?'

উঠে দাঁড়িয়েছি, বললাম—'কী?'

'ঐ সামনের গাছটার আড়ালে।'

'কী?'

'এগিয়ে আসুন আমার সঙ্গে।'

আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল সামনে। এক জায়গায় এসে থেমে গেল, বলল,—'সাবধানে আসুন, সাড়া পেয়ে পালিয়ে না যায়।'

'কী বলুন ত?'

অ্যাডামস বলল, 'আপনাকে আমি জগৎ-বিখ্যাত কালো রঙের টিয়াপাখী দেখাতে যাচ্ছি না। সে-ও অবশ্য এ' অরণ্যের এক বিস্ময়। এবং সে একমাত্র ওখানেই দেখা যায়!'

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কী বকছেন পাগলের মতো!'

অ্যাডামস্ আমাকে সঙ্গে নিয়ে আরো একটু এগিয়ে গেল, বলল, 'ঐ দেখুন। একটি নর আর নারী। আদম আর ইভ।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে আরো এগিয়ে গেল অ্যাডামস্, গাছের আড়ালে থেকে কী যেন দেখতে লাগল একমনে, তারপরে হঠাৎ একটা পশু যেমন মাথাটা নীচু করে গোঁ ধ'রে এগিয়ে যায় তেমনি এগিয়ে এল আমার কাছে, অস্বাভাবিক উত্তেজনায় সে কাঁপছে, কণ্ঠস্বর তার বিকৃত, বলল,—'আপনি জানেন ওরা কে? আপনি জানেন মেয়েটি কে? আপনার স্ত্রী!'

'এ কী কথা বলছেন?'

হাত ধ'রে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল আরও সামনে। পাথরের ওপরে বসে আছে দুটি মূর্তি। মেয়েটি ছেলেটির দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছে। জ্যোৎস্না পড়েছে মেয়েটির মুখে, ওর পিছনটা ছায়ায় কালো, আমরা পিছন থেকেই দেখছি ওদের।

অ্যাডামস্ অদ্ভুত উত্তেজিত, যেন পাগল হ'য়ে উঠেছে মুহূর্তে, বললে, 'এ' তোমার স্ত্রী মাথু। শাড়ীপরা মেয়ে এ'দ্বীপে একটিও নেই। তোমার স্ত্রী লুকিয়ে লুকিয়ে উঠে এসেছে ওখানে। নিষিদ্ধ ফল! The Forbidden Fruit!

কথাটা ঠিক। এই দ্বীপে শাড়ীপরা মেয়ে আর আসবে কোথা থেকে?

'She must be your wife নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রী।'

আমার হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে গেল ওদের সামনে। দুটি ক্ষুধিত সিংহের মতো আমরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদের ওপরে। একহাতে ছড়িটা শক্ত ক'রে ধরা, অপর হাতে টর্চ। টর্চের আলো গিয়ে পড়ল ওদের মুখে। বিস্মিত হ'য়ে অ্যাডামস্ বলল, 'এ কী! এ-কে? এত তোমার স্ত্রী নয়! কিন্তু শাড়ী......!'

পুরুষটি শাড়ীপরা বেপথুমতী মেয়েটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সেই লোকটি,—ভারতীয় ব'লে পরিচয় দিয়েছিল যে। জন।

অদ্ভুত মুহূর্ত! অ্যাডামস্ হেঁকে বলল,—'কে এ'মেয়েটি?'

জন কী বলতে গিয়েও বলল না, মুখ-খানা নীচু করল। অ্যাডামস্ উঠল চেঁচিয়ে, '—চুলোয় যাক্ মেয়েটার পরিচয়। শাড়ী তুমি কোত্থেকে পেলে?'

মেয়েটি ভয়ে কেঁপে উঠল। জনকে জড়িয়ে ধরল শক্ত ক'রেই। ব'লে উঠল অ্যাডামস্,—'নিশ্চয়ই চুরি করেছো কোনো সুযোগে এই এ'র স্ত্রীর ঘর থেকে!'

জন এবারও রইল চুপ ক'রে। পাছে অ্যাডামস্ কিছু করে বসে, তাই ধরতে যাব ওর ছড়িটা। হঠাৎ দেখি অভাবিতরূপে অ্যাডামস্ টর্চ নিভিয়ে হন্ হন্ করে হাঁটা শুরু করেছে ফেরবার পথটি ধ'রে। আতঙ্কিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে লাগলাম ওর পিছনে।

'অ্যাডামস্—অ্যাডামস্!'

অ্যাডামস্ হাঁটছে আরো জোরে।

'অ্যাডামস্—কী করছ—অ্যাডামস্!'

ছুটতে ছুটতে শেষে এক সময় ধরলাম ওকে। বাহু দুটো ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম,—'অ্যাডামস্, কী করছ তুমি! যাচ্ছ কোথায়?'

হাত থেকে ওর প'ড়ে গেল ছড়ি—টর্চ, —হাত দুটি দিয়ে ঢাকল ওর মুখ, বলল,—

'জন চুরি করেছে তোমার স্ত্রীর শাড়ী। কেন, জানো?'

একটু থেমে বললাম, 'বোধহয় জেনেছি। তার প্রণয়িনীকে শাড়ী পরিয়ে সে তার ভারতবর্ষকেই অনুভব করতে চেয়ে ছিল নিবিড় ক'রে।'

উত্তেজনয়া অ্যাডামস্ জড়িয়ে ধরল আমাকে,—'ঠিক বলেছ। ঠিক বলেছ!'

তারপরে একটু থেমে আবার ঢাকল তার মুখ, বলল, 'আমার রক্তেও হয়ত ভারতীয়ের রক্ত বইছে, কে জানে! অথচ, তার ঐতিহ্য কোথায় বহন করছি আমরা! আমরা ব্যভি-চারী, আমাদের নীতি নেই কিছু নেই! আমরা দ্বীপবাসী এক অদ্ভুত জীব!'

'ওসব কথা কী বলছ তুমি!'

আমার হাত দুটো টেনে নিলে হাতের মধ্যে। অ্যাডামস্ কাঁপা গলায় বলতে লাগল, —'আমাকে ক্ষমা করতে পারবে বন্ধু? আমি কী করে তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে একথা ভাবলাম! তিনি ভারতীয় মহিলা! আমি তাঁকে অপমান করেছি! আমার অবচেতন মনে নিশ্চয়ই জেগেছিল তাঁর প্রতি কু-ভাব! বলল—'পারো তো আমাকে ক্ষমা কোরো বন্ধু!

বলেই হাত ছাড়িয়ে আবার ছুটতে লাগল।

ডাকতে লাগলাম,—'অ্যাডামস্—অ্যাডামস্—শোনো শোনো!'

কে শুনবে আমার কথা! সে পাহাড়ী পথে কেবল নেমেই চলেছে! নেমেই চলেছে!

'অ্যাডামস্—অ্যাডামস্'

মিস্টার মাথুর 'অ্যাডামস্ অ্যাডামস্' ধ্বনি আর্তনাদের মতো শোনালো। মধ্যরাত্রির বম্বের সমুদ্রতীরে। আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন মিস্টার মাথু, হয়ত এমনি করেই ওর হাত ধরেছিল প্রাস্‌লিন দ্বীপের মিস্টার অ্যাডামস্। আবেগকম্পিত স্বরে মাথু বললেন,—'ভারতীয়দের প্রতি এত ওদের শ্রদ্ধা! আমার ব্যবসা করা আর ওদের সঙ্গে হলো না মিস্টার ব্যানার্জি। পরের জাহাজেই ফিরে আসতে হলো!'

'কেন?'

মাথু বললেন,—'এতদিন এই ব্যবসায়ী নগরীতে রইলেন, বুঝলেন না এটুকু? মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি ঊষাকে চেনেন, কিন্তু আমি ওর পরিচয় ওদের কাছে দিতে পারলাম কই? এর পরে, আপনিই বলুন, কী করে ওদের বলব যে, ঊষাকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওদেরই জন্য। ঊষা আমার স্ত্রী নয়, ঊষা আমার......আপনি বুঝেছেন আমার মর্মবেদনা?'

শিল্পতীর্থ বাঘ

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

উজ্জয়িনীর থেকে 'বাঘ'এর পথে যাত্রা করলাম। তখন প্রায় সাতটা। সবে শীতের ভোরের আবছা আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হোটেল থেকে স্টেশন খুব কাছেই। মালপত্র কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এখান থেকে 'মাও' প্রায় ৫৩ মাইল দূর—কিন্তু পৌঁছুতে লাগলো তিন ঘণ্টা। 'মিটার গেজ' লাইন—ধীরে ধীরে চলাই এর স্বভাব।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে 'ধর-ট্রান্সপোর্ট'এর সুন্দর সুন্দর বাস, পাকা সুন্দর বাড়ি আর তার সঙ্গে ওয়েটিংরুম। আমাদের বাস যখন ছাড়লো তখন বেলা এগারোটা পেরিয়ে গেছে। মাও-এর থেকে ধর-এর সাদা মাটা রাস্তা ধরে প্রায় ৪৫ মাইল পৌঁছুতে দুটো বেজে গেল। এখান থেকে ধর-কুক্‌সি বাস ধরে আমাকে আমার গন্তব্যস্থান 'বাঘ'-এ পৌঁছুতে হবে। নির্ধারিত সময় তিনটে হলেও শুনলাম সাড়ে পাঁচটার আগে বাস ছাড়া সম্ভব হবে না। তা ছাড়া বাসের টিকিট পাওয়া এক নিতান্ত ভাগ্যের কথা। প্রায় দেড়শ লোক বুকিং অফিসের সামনে জমায়েত হয়েছে। টিকিট বাবুকে কাকুতি মিনতি করছে একটি করে টিকিট বিক্রয়ের জন্যে। ব্যাপার দেখে খুবই মুহ্যমান হয়ে পড়লাম। কি আর করি—অপেক্ষা যখন করতেই হবে—অগত্যা 'ধর বাস স্ট্যান্ড'এর একটি স্কেচ্ করতে বসলাম। ক্রমেই ভীড় জমে উঠলো পাশে। 'কলাকার' বলে সবাই বেশ উৎসাহী হয়ে পড়লো আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য। —বিশেষ করে ওইখানকার কয়েকটি কলেজীয় ছাত্র। তারাও বাসের টিকিটের প্রার্থী হিসেবে এখানে উপস্থিত। তাদের কাছেই জানতে পারলাম—এখানেও একটি 'কলা বিদ্যালয়' আছে এবং 'কলাকার' সম্বন্ধে তাই এরা বেশ সজাগ। শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের অনুরোধেই বাসের টিকিট-বাবু নির্বিবাদে আমাকে একটি টিকিট দিয়ে দিলেন আর আমি বাকি প্রায় ৬০ মাইল বিন্ধ্যের নানা উত্থান পতনের সঙ্গে সমতালে সুন্দর পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে পার হতে লাগলাম। মাঝে বাস খারাপ হয়ে যাওয়ায় খানিকক্ষণ দেরি করে—রাত প্রায় সাড়ে আটটায় পৌঁছালাম 'বাঘ'-এ।

এখানকার ডাকবাংলোর চৌকিদার যেন খানিকটা ক্ষুণ্ণ হলো আমার এই অসাময়িক উপস্থিতিতে। কারণ ডাকবাংলোয় কোন খাবার তৈরির ব্যবস্থা নেই। কোনরকমে রাজী করিয়ে তাকে দোকানে পাঠালাম রাত্রের খাবার জোগাড়ে। পরোটা আর অমৃতের তুল্য এক তরকারি যাকে ওরা বলে শাক—তাই হলো আমার রাত্রের আহার্য। শাকের স্বাদ জীবনে ভুলবো না। এত ঝাল আর বিস্বাদ বস্তু এর আগে খাবার কখনো সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু সে রাত্রের আরামের ঘুম যেন বিস্বাদ তরকারির কথা ভুলিয়ে দিল। এবারে আমার যাত্রার পূর্ণতা পাবো। তাই মহা আনন্দে অনেক আশা নিয়ে রওয়ানা হলাম শিল্পতীর্থ বাঘ গুহার পথে। মাঝে ওই গুহার তত্ত্বাবধায়ক এবং গাইড শর্মাজীর সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাকে সঙ্গী করলাম।

উজ্জয়িনীর ধর-বাস-স্ট্যান্ড

পাঁচ মাইল পাকদণ্ডী অর্থাৎ হাঁটাপথ পেরিয়ে আমাকে পৌঁছুতে হবে আমার লক্ষ্যে—'বাঘ'-এ। বিন্ধ্যে চড়াই উৎরাই গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাকদন্ডী থেকে থেকে লুকোচুরি খেলছে। আর আমি আর শর্মাজী এগিয়ে চলছি গভীর খাদের পাশ দিয়ে ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে ঝর্ণার জল ভেঙে। এমনি করে পৌঁছুলাম বাঘ রেস্ট হাউসে। ছোট্ট একটি ঘর আর তার সামনে তার চেয়েও ছোট এক ফালি বারান্দা। অল্প দূরে একটি ইঁদারা। শর্মাজী তাঁর নির্জনতা কাটাবার জন্য রেস্টহাউসের সামনে ছোট একটি বাগান করবার জন্যে দুশ্চেষ্টা করেছেন। রাত্রে এখানে কেউ থাকে না। শর্মাজীও ফিরে যান তাঁর বাঘ গ্রামের বাসায়। আর তখন এখানে আস্তানা গাড়ে চোর বা ডাকাত। এবং তাদের নির্জনতার সঙ্গী হিসেবে অল্পদূরে ঘোরাঘুরি করে বাঘ এবং চিতাবাঘ।

কিছুক্ষণ পর শর্মাজীর সহকারী দুটি স্থানীয় ভীল এসে পৌঁছুল। শর্মাজীর সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারলাম,—শর্মাজীর মত অসাধারণ ভদ্র অথচ একজন সাধারণ গাইড আর তার সহকারী এই ভীল দুটির উপরই মধ্যভারত সরকার বাঘ গুহার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পতীর্থের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন। 'বাঘ' মধ্যভারতের তথা ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমন্দির। যেখানে দেশী বিদেশী বহু শিল্পরসিক গমনাগমন করে থাকেন সেখানের এই রেস্ট হাউসটিতে না আছে রাত্রিবাসের যথাযোগ্য ব্যবস্থা, না আছে ক্ষুধা নিবারণের সামান্যতম উপকরণ। কোন নিবর্তনের (সিকিউরিটি) প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

বেলা দশটা নাগাত উঠলাম বাঘ গুহায়। বাঘ গুহা নামটা বোধহয় কাছাকাছি গ্রাম বাঘ-এর নাম অনুসারে। অথবা—গুহার নীচে 'বাঘিনী' নামে যে নদীটি ধীরগতিতে বেয়ে চলেছে তার থেকে। বিন্ধ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে
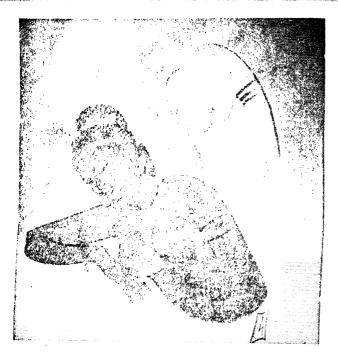
শোক ও সান্ত্বনা

যে ছোট পাহাড়ের সারি চলেছে তারই একটি খাড়া বুকে নির্মিত হয়েছে 'বাঘ' গুহা—ভারতীয় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এখনো পর্যন্ত নয়টি গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে। আয়তনে অজন্তা গুহার অনেক ছোট হলেও—স্থাপত্যে এবং দেয়াল চিত্রের শিল্পগুণে বাঘ গুহার স্থান অজন্তার মতই বিশিষ্ট। উজ্জয়িনী থেকে বাঘের পথে রাস্তায় যাকেই প্রশ্ন করেছি বাঘ গুহা সম্বন্ধে—সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পেয়েছি, পঞ্চপাণ্ডব সংক্রান্ত নানা মজার মজার উক্তিপূর্ণ মহাভারতের গল্পে। এমন কি একদিন এখানে স্থানীয় কয়েকজন ছাত্র এবং শিক্ষিত দর্শকের সাক্ষাৎ পেলাম। তারাও দেখি—বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে চেনবার চেষ্টা করছে—কোনটি যুধিষ্ঠির, ভীম বা অর্জুন। যদিও গুহার বাইরে বেশ বড় হরফে গুহার ইতিহাস লিখে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে এটা যে পাণ্ডব-গুহা নয় সে কথাটা বেশ স্পষ্ট করেই লেখা আছে।

ওইখানেই একদিন সকালে যখন ২নং গুহায় বসে বসে মূর্তির স্কেচ্ করছি হঠাৎ কানে এলো বিদেশী কথাবার্তা। পেছনে তাকিয়ে দেখি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক সঙ্গে দুটি যুবক ও যুবতী। তিন জনই পশ্চিম দেশীয়। বৃদ্ধ পাশে বসলেন এবং ঘনিষ্ট হয়ে জানতে চাইলেন যে, আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র কিনা। উত্তরে জানালাম, বাংলা থেকে এলেও দুর্ভাগ্যবশত শান্তিনিকেতনের ছাত্র আমি নই! আলোচনায় জানলাম—ইনি জগৎ-বিখ্যাত প্রাচ্য কলাবিদ্ ইতালীয় পণ্ডিত অধ্যাপক তুচ্চি। সম্প্রতি ইনি তাঁর নেপাল ভ্রমণ শেষ করে বোম্বাইর পথে বাঘ, অজন্তা প্রভৃতি শিল্প-তীর্থগুলি আবারও দেখে যাচ্ছেন। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তাঁর অদম্য উৎসাহ। গুরুদেব, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ভোলা চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে নানা ঘনিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। ওঁর সঙ্গী হয়ে গুহার প্রত্যেকটি দেয়াল চিত্র এবং স্থাপত্য দেখবার সুযোগ পেলাম। অসামান্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক অন্যান্য গুহার শিল্প-কর্মের তুলনামূলক বিচার করে অত্যন্ত

দূর থেকে বাঘ গুহার দৃশ্য

অল্প সময়ে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে আমার ব্যক্তিগত বিচারের সাহায্য করলেন।

এখানকার গুহাগুলির বিশেষত্ব হলো, এগুলির কয়েকটি একাধারে বিহার এবং চৈত্য। গঠন বৈশিষ্ট্যে অজন্তা গুহার সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বাঘের ২নং, ৩নং এবং ৪নং গুহার সঙ্গে অজন্তার ৪নং এবং ১২নং-এর গঠনে বেশ খানিকটা মিল আছে। গুহাগুলির সামনের বারান্দা-গুলি যা একদিন অপূর্ব চিত্র ও মূর্তিতে অলংকৃত ছিল তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। শুধু উপরের ঝুলে থাকা ছাদের অংশ, নীচের থামের ধ্বংসাবশেষ, দেয়ালের ক্ষয়প্রাপ্ত ছবির ও মূর্তির টুকরা টাকরা দেখে আর সামনের বিস্তীর্ণ বিন্ধ্যের ও বাঘিনীর পশ্চাদপটের দিকে তাকিয়ে যতটুকু কল্পনা করা যায়—তাই রোমাঞ্চকর।

২নং ৪নং ইত্যাদি গুহাগুলি সাধারণত ১৫০´×৯৪´ ফুট করে লম্বা এবং চওড়া। ৫´×১৬´ মাপের মোটা মোটা থামবিশিষ্ট হলঘরগুলির গঠন প্রণালী দেখবার মত। পাশে পাশে ২০ বা ২৫টি করে ভিক্ষুদের ছোট ছোট আবাস গৃহ চওড়া ৯´ ফুট এবং লম্বা ১০´ ফুট। একমাত্র ৪নং গুহাটিতে ২৮টি কক্ষ দেখা যায়।

এর পরেই আগে উপগৃহ (এণ্টি রুম) এবং শেষে স্তূপ গৃহ। বাকীগুলিও মোটা-মুটি একইরকম। কেবল স্তূপ গৃহ ছাড়া। কারণ সেগুলি বিহার। থামগুলি মোটা এবং নীচে থেকে উপর পর্যন্ত নানা ঢঙে খোদাই করা। আবার কোন কোন থামটি বা সম্পূর্ণই অপূর্ব দক্ষতায় খোদাই করা বন্ধনী দ্বারা অলংকৃত।

বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ইত্যাদির মূর্তি ছাড়াও এখানে অজন্তার মতই গুপ্ত যুগের সম-সাময়িক আরো কিছু হিন্দু ও অনার্য দেব-দেবীর মূর্তি আছে। প্রবেশ দ্বারে সুন্দর খোদিত অলংকরণের সঙ্গে দুই পাশে রয়েছে গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি।

গুহার ভেতরে ঢুকেই স্তম্ভিত হতে হয় তার গভীর গম্ভীর পারিপার্শ্বিকতায়। চতুর্দিকে মোটা মোটা থাম। তাতে সুন্দর ও সরল অলংকরণ। সামনের দিকের আলোর স্পষ্টতা ক্রমেই পেছনের আলোর অস্পষ্টতা হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। ২নং গুহার দেয়ালচিত্রগুলি কালের এবং মানুষের অত্যাচারে প্রায় সম্পূর্ণ মুছে গেছে। শুনলাম গুহাগুলি পুনরুদ্ধারের আগে স্থানীয় সাধুসন্ন্যাসীদের আবাস গৃহ হয়ে উঠেছিল। তাদের ধুনির এবং উনুনের ধোঁয়ায় চারিদিকের দেয়ালগুলি কালো হয়ে গেছে। তা থেকে কিছু উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। শুধু প্রবেশদ্বারের কাছে আর উপরের ছাদের কিছু কিছু দেয়াল-চিত্র তাদের পূর্ব গৌরবকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় যাই যাই করেও চলে যায়নি। ভিক্ষুদের ছোট ছোট থাকবার ঘরগুলি একেবারেই অন্ধকার। শোবার জন্য আছে ছোট প্রস্তর বেদী এবং পাশেই দেখা যায় দীপাধার। গভীর অন্ধকারের মধ্যে পেট্রোমাক্স-এর আলোয় এসে উপস্থিত হলাম উপগৃহে। এই উপগৃহের মধ্যেই স্তূপগৃহের প্রবেশদ্বার। এবং দুপাশে দুটি বোধিসত্ত্ব মূর্তি—প্রায় আট ফুট লম্বা। বামদিকের মূর্তিটি ডানদিকের তুলনায় বেশী অলংকৃত। মাথায় জটামুকুট আর তার মধ্যে অভয় মুদ্রা যুক্ত ক্ষুদ্র বুদ্ধ মূর্তি শোভিত। খালি গা', পরনে ধুতি প্রায় পা' পর্যন্ত প্রসারিত।
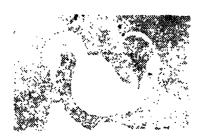
অলংকরণ চিত্রে হংসবলাকা

দুই পাশের দেয়ালে প্রায় একই ঢঙের বুদ্ধ এবং অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয় দুটি বোধিসত্ত্ব মূর্তির এক একটি দল। মধ্যে বুদ্ধ মূর্তি প্রায় ১০½´ ফুট লম্বা আর দুপাশে দুটি বোধিসত্ত্ব মূর্তি অপেক্ষাকৃত ছোট। ডানদিকের মূর্তিটি খুবই অক্ষত আছে। মধ্যের বুদ্ধ মূর্তি পদ্মের উপরে দাঁড়ান। ডান হাতটি বরদা মুদ্রা আর বাঁ হাতটি কাপড় ধরা। বোধিসত্ত্বদের ডান হাতে চামর। বাঁ-হাতে কাপড়ের বন্ধনী ধরা। ঢঙটির সঙ্গে কুশান ও গুপ্তযুগের মূর্তির বেশ খানিকটা মিল আছে। অজন্তার মত এখানেও কয়েকটি "নাগ" ও "যক্ষ" মূর্তি আছে। তবে সেগুলি গুহার বাইরের বিধ্বস্ত বারান্দার অংশে থাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা থেকে কিছু খুঁজে বার করা মুশকিল। বাঘের মূর্তিগুলির মধ্যে আর একটি জিনিস দেখা গেল। মূর্তিগুলির উপরে সম্ভবত কোন বিশেষ ধরণের আস্তরণ দেওয়া ছিল যার উপরে হয়তো নানা রঙে চিত্রিতও করা ছিল। কিন্তু সে আস্তরণ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু চিহ্ন এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধরণের চিত্রিত বুদ্ধ মূর্তির ছবি চীনের তুন-হুয়াং গুহার ছবির মধ্যে দেখেছি। স্থাপত্য ও মূর্তি সম্পর্কে আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আর একটি বিশেষ ধরণের অলংকরণের কথা বলবো যা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে। বাঘের বিরাট বিরাট থামগুলির সঙ্গে যে ব্রাকেট ব্যবহার করা হয়েছে তার কয়েকটিতে আছে একটি বিশেষ ধরণের খোদিত সিংহ মূর্তি। সিংহের এমন সরল অথচ রাজকীয় বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী খুবই ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

প্রতীক্ষারতা সুন্দরী

দুঃখভারনত রমণী

বাঘের স্থাপত্য এবং মূর্তিকেও বৈশিষ্ট্যে হারিয়েছে তার অপূর্ব দেওয়াল চিত্রগুলি। যদিও তার বেশীর ভাগই মানুষের চোখের সামনে থেকে নিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং যেতে চলেছে। গুহাগুলির পুনরাবিষ্কারের পর থেকে অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত অজ্ঞ জনসাধারণ ধ্বংসাবশিষ্ট অস্পষ্ট দেয়াল চিত্রগুলিকে স্পষ্ট করে দেখবার জন্য জলে ভিজিয়ে নিত। যার ফলে আজ সেই অমূল্য শিল্পের নিদর্শনও সম্পূর্ণ বিলীন হতে চলেছে।

২নং গুহার ছাদে যে দেয়াল চিত্রগুলির অংশ দেখা যায়, মূলত অলঙ্করণই এর উদ্দেশ্য। তবে অলঙ্করণের সঙ্গেই আছে বিভিন্ন পত্রপুষ্প ও পশুপক্ষীর প্রতিচ্ছবি। ৪নং গুহার ছাদের দেয়ালচিত্রের সঙ্গেও এর ঘনিষ্ট মিল আছে। এই গুহার কোন দেয়ালেই দেয়ালচিত্র আজ আর দৃশ্যমান নয়।

৪নং গুহার বারান্দায় যে দেয়ালচিত্রগুলির একটি মালা আবছা আবছা দেখা যায়, মূলত ঐগুলিই বাঘের বিশেষত্ব। অজন্তা এবং বাঘের দেয়ালচিত্রগুলি শিল্পদক্ষতার বিচারে সমপর্যায়ভুক্ত। দুই গুহারই দেয়ালচিত্রগুলি এক স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে এবং দক্ষ তুলির টানে জীবন্ত। কিন্তু বাঘ এবং অজন্তার মূল প্রভেদ তাদের বিষয়বস্তু নির্বাচনে। অজন্তার দেয়ালচিত্র ধর্মমূলক। জাতক এবং বৌদ্ধ জীবনী ধরেই তার বিন্যাস। বাঘ কিন্তু মানবীয় আবেগে মূর্তিমান। সমসাময়িক মানুষের দুঃখ, আনন্দ, জীবন ও ধর্মের অভূতপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এই অসাধারণ চিত্রগুলিতে।

৪নং গুহার বারান্দায় দেয়ালচিত্রের অবশিষ্টাংশের প্রথম ছবিটি অত্যন্ত মানবীয়। দুটি নারী মূর্তি মুক্ত কক্ষে উপবেশিতা। তার মধ্যে দ্বিতীয়া শোকে মুহ্যমানা। প্রথমা সেই শোকে সমব্যথিতা ও চিন্তাগ্রস্থা হয়ে দ্বিতীয়ার শোক কাহিনী শুনছে। শোকের এমন অপূর্ব জীবন্ত মূর্তি চিত্রজগতে দুর্লভ।

এই চিত্রমালার চতুর্থ চিত্রে ফুটে উঠেছে আনন্দের এক বাস্তব রূপ। দুইদল বাদ্যকারিণী এবং দুজন নর্তকী মন্দিরা, কাঠি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আনন্দে বিভোর।

এই সারির শেষ চিত্র একটি হাতির মিছিল। অজন্তার মতই এই ছবিটি অন্য ছবির থেকে পৃথক করা হয়েছে মাঝখানে একটি সুদৃশ্য ফটক এঁকে। এই চিত্রের "পরিপ্রেক্ষিত চিত্রণ" অত্যন্ত বাস্তবতায় রূপায়িত হয়েছে। নানা শিল্পী ও শিল্পরসিকদের মুখে শোনার ফলে আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল "ভারতীয় চিত্রের পরিপ্রেক্ষিত চিত্রণ" বাস্তব নয়। এতদিনের শিল্প সাধনায় পরিপ্রেক্ষিত চিত্রণ সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান হয়েছে তাতে এর চেয়েও "বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত চিত্রণ" আমার কল্পনাতীত।

৪নং গুহার ভেতরের দেয়ালে এবং ছাদে দেয়ালচিত্র এখনো কিছু অক্ষত আছে। তার মধ্যে আছে কমললতার ঢঙের সঙ্গে অজস্র হংস বলাকার প্রাণবন্ত ছবি। প্রতিটি রেখা এবং চিত্রসংস্থাপনে ছবিগুলি অতুলনীয়। ৪নং গুহার পেছনে স্তূপগৃহের সামনাসামনি স্তম্ভের উপর কয়েকটি অলংকরণ আছে। তার মধ্যে কয়েকটিতে যে মৃণাল ও মৃণালিনী বাস্তব ঢঙে চিত্রিত করা হয়েছে তা সত্যই অবর্ণনীয়।

এই গুহাটির স্থানীয় নাম রঙমহল। ১১৪´×১৫০´ ফুট মাপের এই হলঘরে ঢুকে ছাদ থেকে দেয়াল পর্যন্ত চোখ বুলালে এমন কোন শিল্পরসিক নেই যিনি সম্পূর্ণ অভিভূত না হয়ে পারবেন। অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণবিন্যাস, চিত্র সংস্থাপনের চাতুর্য এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের বিশিষ্টতা দেখে মন বিস্ময়ে ভরে যায়,—সেই মহান্ শিল্পী, তিনি এক জন কি একই গোষ্ঠী, যার সমকক্ষ সমসাময়িক এবং আধুনিক জগতে বিরল। একথা বিশ্বাস করতে আর অসুবিধা হয় না যে—বাঘ ও অজন্তার এই শিল্প উৎস থেকেই একদিন গোটা পূর্ব এশিয়ার শিল্পধারা জীবনরস আহরণ করেছিল।

কমললতা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ঢেউ-খেলানো চুলে, টানা দুটি চোখে, নিটোল চিবুকের গড়নে আর শাঁখ-সাদা রংয়ে নিখুঁত রূপসী। চোখ তুলে দেখলে আর চোখ নামানোর কথা মনেই হয় না। কিন্তু ওই গোড়ালি পর্যন্ত। তারপরই খুঁতের শুরু। পায়ের পাতা দুটি সম্পূর্ণ ওল্টানো, শুরু-শীতের হাওয়া-লাগা মরা ডালের মতন শীর্ণ, নির্জীব। আজ বলে নয়, দীর্ঘ আঠারোটি বছর, মানে বাণীর জন্ম থেকেই।

বাপ নামী প্রফেসর। চোখ দুটো শুধু নোটবইয়ের পাতাতেই নিবদ্ধ নয়, আশে-পাশের ব্যাপারেও সম্পূর্ণ সজাগ। নয়তো এত কম সময়ের মধ্যে আড়াইতলা বাড়ি আর ব্যাঙ্কের মজুদ টাকার পরিমাণ এত বাড়াতে পারতেন না। মেয়ের পায়ে কম

এক দুই থেকে শুরু করে... বাণী শুনলো

টাকা ঢালেন নি, কিন্তু ভস্মে ঘি ঢালার সমানই হয়েছে। চমক লাগানো ডিগ্রির মালাপরা অস্থিবিদরা চেষ্টা করেছেন, শহরের নামকরা চিকিৎসকরাও, কিন্তু পায়ে ধরাই সার। পায়ের মোড় ফেরাতে কেউ পারেন নি। শেষে প্রফেসর হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাণীও তাই। চিনেবাড়ির গোল প্যাটার্ন ফরমায়েসী জুতো পায়ে দিয়ে স্কুলের বাসে গিয়ে উঠেছে। প্রবেশিকার বেড়া ডিঙোতে কোন অসুবিধা হয় নি, আই-এ পরীক্ষাতেও নয়, কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়তে হলো থার্ড ইয়ারে উঠে।

ভরা যৌবন। দেহের দুকূল ছাপিয়ে। কিন্তু ভরা জোয়ারে পলিমাটি বয়ে আনার মতনই প্রচুর মেদভার দেহের খাঁজে খাঁজে জড়ো হলো। বাহুমূলে, কটিতটে, নিতম্বে। অক্ষম পা দুটি নোটিশ দিলো। যৌবনভার সামলাতে দেবতারাই হিমসিম খেয়ে যান, তো তুচ্ছ পদপল্লব। চলাফেরা দায়। দেয়াল ধরে ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা কিছুদিন। কিন্তু তাতেও অসুবিধা। গোড়ালি ফুলে ঢোল। ক্লাশে দু হাতে মুখ ঢেকে থার্ড ইয়ারের ছাত্রী বাণী ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না, অথচ উপায় কি?

এক উপায় সব ছেড়ে ছুড়ে বাড়িতে বসে থাকা। চলাফেরা না করা। কিন্তু সে তো মৃত্যুরই নামান্তর। আঠারোটি বসন্তের মালাকে অনাদৃত ফেলে রাখা ঘরের এক কোণে। একটি একটি করে খসে খসে পড়বে কোমল পাপড়ি, শুকিয়ে বিবর্ণ হবে ফুলের রাশ। কোন কিছু করার থাকবে না, তা কি হয়!

বখাটে সহপাঠির দল যারা মুখের সামনেই বলতো, 'থির বিজুরী' কিংবা 'অয়ি মরাল গামিনি!' তারাও ব্যাপার দেখে থেমে গেলো। পরিহাসের পর্যায় ছাপিয়ে বেদনার স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। এ নিয়ে রসিকতা অমানুষিক।

প্রফেসর বাপ আবার তৎপর হলেন। প্রথমে মেয়েকে কলেজ ছেড়ে দেবার উপদেশ! নড়াচড়া বন্ধ করলেই কমে যাবে পায়ের ব্যথা। বেশ কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। 'বেশ কিছুদিন নয়, অনন্তকাল' বাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো।

আবার বড়ো, মাঝারী নানারকম ডাক্তারের আনাগোনা শুরু হলো। বিলাত-ফেরৎ থেকে আরম্ভ করে হাতুড়ে পর্যন্ত। অস্থিবিশারদ থেকে পাঁচনবিশারদ। পা ফেরাতে তো পারলেনই না, উপরন্তু মুখ ফেরালেন, 'একটু আগে ডাকতে হয়, হাড় যখন নরম ছিলো। এই শক্ত হাড়ে কখনও কিছু করা যায়।' অর্থাৎ নরম মাটি না হলে বেড়ালের আঁচড় সম্ভব নয়। কিন্তু হাড়ের যখন তুলতুলে অবস্থা তখনও চেষ্টা করা হয়েছে এমন কথার উত্তরেও তাঁরা মুখ বেঁকালেন, 'চেষ্টা করেছেন তেমনি ডাক্তারের কাছে।' এক কথায় সোনার বাউটি গড়াতে কামারের কাছে গিয়েছেন।

যখন প্রায় হাল ছাড়ো-ছাড়ো অবস্থা, তখন খবর আনলো সুনীতি সেন-জায়া। বাণীর সংগেই পড়ে। আগে সুনীতি গুপ্ত ছিলো, মাসখানেক হলো সদ্য-পাশ-করা ডাক্তার বিমল সেনের গলায় ঝুলিয়েছে নিজেকে, তা বলে গলগ্রহ নয়। কথায়

কথায় ক্লাশে আনকোরা ব্যাধি আর টাটকা সব ওষুধের ফিরিস্তি। সহজ অসুখের বিদঘুটে যতো নাম। বাণীর ব্যাপারে এতোদিন কোন আশ্বাসই দিতে পারে নি। কিন্তু এবারে শুধু আশ্বাসই নয়, অভয়-বাণীও বয়ে আনলো। সোজা বাণীর বিছানার পাশে চেয়ার টেনে বললো, 'নানা-রকম তো করলে, এবার একবার ডাক্তার ভাদুড়ীকে দেখাও।'

'ডাক্তার ভাদুড়ীকে?' বাণী পায়ের যন্ত্রণায় মুখ বেঁকালো। কিন্তু ভুল বুঝলো সুনীতি, 'ওই তো তোমার দোষ। সব কিছুতে মুখ বেঁকাও। এদিক-ওদিক তো যথেষ্ট পয়সা ছড়াচ্ছো, একবার কল দিয়েই দেখো না। দোষটা কি?'

'দোষ-গুণের কথা হচ্ছে না ভাই, তুমি একবার বাবাকে ডাক্তার ভাদুড়ীর ঠিকানাটা বরং দিয়ে যাও। কিন্তু এ ডাক্তারের তেমন নাম তো শুনি নি?'

'প্র্যাকটিস শুরু করার আগেই নাম শুনবে নাকি? দাঁড়াও ভালো করে বসতে দাও, সবে তো মাস দুয়েক ভিয়েনা থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছেন।' সুনীতি রুদ্ধ-নিঃশ্বাস।

'কিন্তু' বাণী সন্দেহ করার মুখেই বাধা পেলো। সুনীতির গলা আরো জোর, 'সাতটি বছর ভিয়েনাতে এই কাজই করেছেন ডক্টর বনের তদারকে। ডক্টর বনের নাম নিশ্চয় শুনেছো?'

বাণী শোনে নি। বাণীর বাপও নয়। কাজেই সুনীতিকে বিস্তারিত বোঝাতে হলো। বিখ্যাত অস্টিয়োলজিস্ট। স্কিন গ্রাফটিংয়েও অদ্বিতীয়। সর্বাধুনিক ডাক্তারী জার্নালের রিপোর্ট সুনীতির কণ্ঠস্থ। সব শুনে প্রফেসরও ঘাবড়ে গেলেন। এত বড়ো জাঁদরেল একজন চিকিৎসক রয়েছেন হাতের কাছে অথচ তিনি কিছুই জানেন না। নিজের অজ্ঞতায় প্রথমে ম্রিয়মান, তারপর টেলিফোনের শরণ নিলেন।

মরা বিকেল। গাছে পাতায় একটা থমথমে ভাব। বত্রিশ ইঞ্চি ব্লেডের তলায় বাণী ঘেমে নেয়ে উঠছিলো। হাতের বই ছুঁড়ে ফেলে দুহাতে ভিজে জবজব চুলের গোছা জড়াতে গিয়েই থেমে গেলো। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ, পর্দার ওপারে ফিসফিসানি, তারপরই বাপের গলা 'বাণী'।

বেসামাল শাড়ি ঠিক করে নিয়ে বাণী উত্তর দিলো, 'এসো বাবা।'

কিন্তু শুধু বাপই নয়, বাপের পিছন পিছন মানানসই সুটপরা দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক। ব্যাকব্রাশ চুল, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ, সুগৌর বর্ণ। ঠোঁটের গড়নে হাসি হাসি ভাব।

'ডক্টর ভাদুড়ী' প্রফেসর পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার মেয়ে বাণী।'

ভাদুড়ী দু হাত তুলে নমস্কার করলেন। সপ্রতিভ হাসি, কিন্তু লজ্জা কাটিয়ে উঠতে বাণীর সময় নিলো। 'অমিয় মথিয়া কে বা লাবনি তুলিল গো, তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।' বার বার মনে পড়ে গেলো। পাশাপাশি আরো দু-একটা সংস্কৃত শ্লোক। এই ভাদুড়ী, বিখ্যাত অস্থি-বিদ। এমন চেহারায় মন নিয়ে খেলা ছেড়ে শুধু হাড় নিয়ে নাড়াচাড়া। বাণী নিঃশ্বাস ফেললো।

ভাদুড়ী বিছানার পাশে এসে বসলেন। সন্তর্পণে বাণীর পা-দুটো টেনে নিলেন নিজের দিকে। অনেকটা যেন দেহি পদ-পল্লব মুদারম। নিস্তেজ শিরা, অস্পষ্ট পায়ের গোছ, কিন্তু তবু স্পর্শে শিহরণ। মেরুদণ্ডে তুষারের স্রোত। বুকে অশান্ত দাপাদাপি। অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। দু-তিন রকম যন্ত্রের মাধ্যমে। তারপর পা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'একটু দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু চিকিৎসার বাইরে নয়। অভয় দিতে পারছি না, তবে যদি বলেন একটা অপারেশন করে দেখতে পারি।'

'অপারেশন' ভয় থম থম গলার আওয়াজ প্রফেসরের। বাণী কিন্তু মরিয়া। এমন পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকার চেয়ে এসপার-ওসপার কিছু একটা হয়ে যাওয়াই ভালো। মরতেই যদি হয় তো ভাদুড়ীর কোলে মাথা রেখে না হয়, ওঁর অপারেশন টেবিলেই মরা ভালো। গুণ গুণ করে গানের একটা কলি মনের কানাচে আনা-গোনা করলো 'সে মরণ স্বরগ সমান।'

'আপনি দ্বিধা করবেন না, অপারেশনই যদি প্রয়োজন হয়, তাই হবে। আমি রাজী।' বাণীর গলা।

দ্বিধা! ভাদুড়ী ফিরে দাঁড়ালেন। দু-চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। দ্বিধাহীন দৃষ্টি। অম্লান হাসলেন, 'বেশ তাই হবে। কিন্তু তার আগে দিন কুড়ি আমার চিকিৎসায় থাকতে হবে। হয়তো এ কদিন রোজই আমায় আসতে হবে একবার করে।'

একবার করে! সকাল-বিকেল আসলে হয় না, এত বড় একটা রোগ। বাণীর মনের ইচ্ছা অবশ্য তাই। কিন্তু প্রফেসর বাপের দিকে চেয়ে সামলে নিলো নিজেকে। দর্শন তো আর বিনা দর্শনীতে সম্ভব নয়। প্রফেসরেরও বোধ হয় এমন একটা কথাই মনে পড়ে থাকবে। তিনি ভাদুড়ীকে বল্লেন, 'চলুন ও ঘরে গিয়ে সব ঠিক করে ফেলি। যদি অপারেশন করা প্রয়োজন মনে করেন, তাই করতে হবে।'

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত বাণী চুপচাপ বসে রইলো। যেটুকু রোদ ছিলো, ভাদুড়ী বুঝি সেটুকুও মুছে নিয়ে গেলো। আবছা অন্ধকার। কোনরকমে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো আর একবার দেখা যেতে পারে, কিন্তু উঠে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা শুধু ব্যাধির নয়, আর একটা হাতের স্পর্শেরও।

প্রথম প্রথম রোজ, তারপর সত্য সত্যই ভাদুড়ী সকাল-বিকাল আসতে শুরু করলেন। একলা নয়, সঙ্গে নার্স। নার্স সঙ্গে রইলো বটে, কিন্তু নার্সের কাজ ভাদুড়ীই করতে লাগলেন। হাঁটু মুড়ে বসে বাণীর পায়ের পাতা দুটি টেনে নিয়ে ওষুধ মালিশ। খুব সন্তর্পণে প্রথমে, তারপর একটু একটু করে জোরে। শিরা সতেজ হবে, রক্ত-চলাচল স্বতঃস্ফূর্ত। মাঝে মাঝে কবোষ্ণ জলে স্পঞ্জ করাও চললো। দিন সাতেক এ সবের পরে তারপর ইনজেকশন শুরু হবে। এ যেন বলির পাঁঠাকে হাঁড়িকাঠে ফেলার আগে তরিবৎ।

গোড়ার দিকে ভাদুড়ীর সঙ্গে প্রফেসর বাপও থাকতেন, কিন্তু কয়েকদিন পর তিনিও গা-ঢাকা দিলেন। সভা-সমিতি থাকে প্রায় রোজ বিকালেই, তাছাড়া ভাদুড়ী তো ঘরের লোক। পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে ভাদুড়ী মোলায়েম গলায় বলেন, 'আসতে পারি?'

বাণী তৈরীই থাকে। তবু ইচ্ছা করে দেরী করে। আঁচলের খুঁট দিয়ে কপালের দু-পাশ আলতো মুছে নেয়। এধার-ওধার পাউডারের প্রলেপ। ঘাড় ফিরিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায় নিজের ছায়ার ওপর চোখ বুলোয়। ভাগ্যিস আয়নাটায় শুধু কোমর পর্যন্ত ছায়া পড়ে, বাণীর অঙ্গের যেটুকু খুঁতহীন সেইটুকু। দুহাতে এলিয়ে পড়া খোঁপাটা জড়িয়ে নিয়ে মিহি গলায় বলে, 'বারে, আসুন।'

ভাদুড়ী ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে বসে পড়েন। হাতের ছোট ব্যাগ মেঝের ওপর রেখে বলেন, 'কই পা দেখি।'

'বাবা, বাবা'—কপট রাগে বাণী মুখটা আরক্তিম করে তোলে, 'মানুষটার কুশল-প্রশ্ন চুলোয় গেলো, কেবল পায়ের খোঁজ-খবর।'

ভাদুড়ী মুখ না তুলেই হাসেন, 'মানুষটা তো পায়ের ওপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে। পা না সারিয়ে পদকর্ত্রীর কুশল জিজ্ঞাসা করার সাহস কোথায়?' কথা শেষ করে মুখ তুলেই ভাদুড়ী অবাক। আয়ত দুটি চোখ জলে টলমল। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ার আর দেরী নেই।

দু-একটা হাল্কা সান্ত্বনার কথা ভাদুড়ীর মনে আসে, সহানুভূতির ছিটে-দেওয়া আশ্বাসবাণী, কিন্তু সাহস হয় না স্তোক-

বাক্যে রোগিণীর মন ভোলাতে। ছেলেমানুষ নয়। মিষ্টকথায় সব কিছু বোঝানো যাবে এ আশা করা ভুল।

বাণীই কথা বলে, 'আপনি সত্যি করে বলুন তো, পা আমার সারবে না। তাই না?'

মুখ তুলতে ভাদুড়ীর সাহস হয় না। পায়ের পাতার ওপর সন্তর্পণে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, 'আপনি নিজে বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। চেষ্টা করেই দেখা যাক না। এর চেয়ে অনেক কঠিন কেস ভিয়েনায় সারতে দেখেছি। মিস এথেল অ্যাগানুরের ব্যাপার শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন।'

এরপর সবিস্তারে এথেলের কাহিনী শুরু হয়। ডাক্তার বনের চিকিৎসায় কিভাবে একটু একটু করে বিদেশী মহিলা আরোগ্য লাভ করেন, তার অলৌকিক কাহিনী।

পলকহীন চোখ বাণীর। ভাদুড়ী যেন অস্থিবিদ নন, কথক। ইনিয়ে বিনিয়ে কুব্জার কাহিনী বলে চলেছেন অনবদ্য ভঙ্গীতে।

নানান ধরণের কথা। ইনজেকশন দেওয়ার পরও ভাদুড়ীর ওঠার নামগন্ধ নেই। খাটের এপাশে বসে অনর্গল গল্প। 'জানেন আপনার পায়ের ওপর আমার কপাল নির্ভর করছে।' যন্ত্রপাতি হাতব্যাগে ভরতে ভরতে ভাদুড়ী অম্লান হাসেন।

'ওমা, ওকি কথা!'

'বিশ্বাস করুন। এদেশে এই আমার প্রথম কেস। যদি সারাতে পারি'—কথার মাঝখানেই ভাদুড়ী বাধা পান।

'যদি না সারাতে পারেন সেই কথাই বলুন আগে' আবছা অন্ধকারে চকচক করছে দুটি চোখের তারা, সাপের মণির মত।

ভাদুড়ী কিছু বলার আগে বাণীই উত্তর দেয়, 'খুব কড়া বিষ এনে দেবেন আমায়। ভয় নেই স্বীকারোক্তি রেখে যাবো, আপনাকে জড়াবো না।'

অনেক পরে ভাদুড়ী কথা বলেন। বাণীর উত্তেজনা স্তিমিত হবার পর।

'এত ছোট জিনিসকে এত বড়ো করে তুলছেন কেন। হাঁটু পর্যন্ত পা নেই দুনিয়ায় এমন লোকও তো বেঁচে থাকে?'

'তাকে আপনি বাঁচা বলেন? সারাজীবন হুইল চেয়ারে বাপের গলগ্রহ হয়ে থাকা। চমৎকার জীবন। হাড় নিয়ে কারবার, মনের খবর আপনার জানবার কথা নয়।'

গরম জল হাতে নার্স ঢুকতেই বাণী থেমে যায়। থমথমে মুখের ওপর আঁচল টেনে দেয়। কিন্তু ফুলে ফুলে ওঠা দেহটা ভাদুড়ীর নজর এড়ায় না।

সকাল থেকে প্রফেসর মেয়ের কাছ ছাড়লেন না। প্রায় ভোর থেকেই রইলেন সঙ্গে সঙ্গে। এটা ওটা এগিয়ে দিলেন। খবরের কাগজ হাতে ছুটকো আলোচনা। দেশকালের সমস্যা নিয়ে আলতো তর্ক। দু-একবার হালকা পরিহাসেরও চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাণীর মুখ মেঘ-থমথম। খাটের বাজুতে মাথা রেখে চোখ বুজিয়ে বসে রইলো। হাজার ডাকে সাড়া নয়, একটি কথাও না।

'তোর যদি আপত্তি থাকে বাণী, তবে অপারেশন থাক না হয়' প্রফেসর ঝুঁকে পড়লেন মেয়ের দিকে।

বাণী মাথা নাড়লো। না। এসপার নয় ওসপার। বালির চরের ওপর বসে থেকে ঢেউ গোণার জীবনের কোন মানে হয় না। ভয় বাণীর অন্য কারণে। সারবে যে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। একথা ভাদুড়ী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। প্রফেসরকে সামনে রেখে। কোন গ্যারাণ্টি দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। চেষ্টা করবেন আপ্রাণ, না সারে তো অদৃষ্ট। তবু চেষ্টা করা একবার দরকার। বিজ্ঞান ঠকাবার যেমন ভান করে না, তেমনি জেতবার মিথ্যা আশ্বাসও দেয় না কাউকে।

কিন্তু তারপর। অপারেশন টেবিলে জেগে যদি বুঝতে পারে বাণী, ভাদুড়ীর মেহনতই সার। এ পঙ্গুতা যাবার নয়। তখন। বুকটা ধড়ফড় করে উঠতেই বাণী বালিশে বুক চেপে শুয়ে পড়লো। এমন কেউ নেই, পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে আলোর ইশারা আনে। মৃতজনে প্রাণ দেওয়ার প্রচেষ্টা।

ভাদুড়ী ঘরে ঢুকে রোগিণীর মুখ দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। বেশ নার্ভাস। আরক্তিম মুখে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটায়, দুটি চোখের তারায় সে ভাব স্পষ্ট। এমন অবস্থায় অপারেশন করাটা সমীচীন হবে না। শুধু ওষুধে আর ছুরিতে রোগ সারে না। রোগ তাড়াতে হয় মনের জোরে।

'কি ব্যাপার' ভাদুড়ী এগিয়ে এসে বাণীর কাছাকাছি দাঁড়ালেন। খুব কাছাকাছি।

বাণী মুখ তুললো। বুকের দ্রুত স্পন্দন হয়তো ভাদুড়ীর চোখে পড়ার কথা নয়; কিন্তু থরথর করে কেঁপে ওঠা দুটো ঠোঁট কতক্ষণ বাণী আঁচল আড়াল করে রাখবে!

'ভয় পাচ্ছেন নাকি?' ভাদুড়ী বিছানার এক পাশে বসে পড়লেন, 'আপনাকে তো আগেও বলেছি ভয় পাবার মতন এতে কিছু নেই।'

বাণী হাসলো। ফিকে জ্যোৎস্নার মতন নিস্তেজ হাসি॥ 'মরার ভয় আমার ততটা নেই। পূর্ণচ্ছেদের পরে কিছু কল্পনা করতেও চাই না। কিন্তু জীবন্মৃত হয়ে থাকার কি বিড়ম্বনা সে আপনি বুঝবেন না।'

গুমোট গরম। বাতাসের ছিটে ফোঁটা নেই। জানলার ওপারে নিস্পন্দ কৃষ্ণচূড়ার ডাল। সিলিং ফ্যানের একটানা শব্দ। দু এক মিনিট সব চুপচাপ। তারপর ভাদুড়ী ঝুঁকে পড়ে বাণীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন।

'আশ্চর্য কেবল জীবনের অন্ধকার দিকটাই দেখবেন। আলোর আঁচড়ের দিকে চোখ ফেরাবেন না?'

বাণীর বুকের স্পন্দন দ্রুততর। হাতটা ভাদুড়ীর দুটো হাতের ফাঁদে ভীরু কপোতীর মতন কাঁপছে। খুব আস্তে অস্পষ্ট গলায় শুধু উচ্চারণ করলো, 'আলোর আঁচড়!'

'হ্যা, বাঁচবার আশ্বাস। নীড় বাঁধার স্বপ্ন' কথার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা হাত ভাদুড়ী রাখলেন বাণীর খুলে পড়া খোঁপার ওপরে। খুব সন্তর্পণে।

চোখ তুলে চেয়েই বাণী চোখ নামিয়ে ফেললো। জোনাকীর মতন জ্বলে জ্বলে উঠছে ভাদুড়ীর দুটি চোখ। সে দৃষ্টিতে কি নীড় বাঁধবার স্বপ্ন, দৃঢ় সংবদ্ধ দুটি ঠোঁটে বুঝি বাঁচবার অনন্ত আশ্বাস!

'বাণী' আশ্চর্য অস্থিবিশারদের গলায় মোলায়েম সুর। সব ভুলে বাণী ভাদুড়ীর দিকে ঝুঁকে পড়লো।

'তোমায় বাঁচতে হবে। নতুন করে জীবন শুরু করবো আমরা। পুরনো সব কিছু ভেঙে নতুন জীবন।'

সেই মুহূর্তে বাণী ছোট ছোট সুখ দুঃখ পার হয়ে গেলো। নিজের পঙ্গুতাও। নতুন এক জগত। যেখানে দেহের অপূর্ণতা নেই, মনেরও। আর কোন ভয় নেই বাণীর। না-ই যদি সারে দেহের এ ব্যাধি, মনে কোন ক্ষোভ নেই। নির্ভর করার মতন এমন মানুষ যদি থাকে মনের কাছাকাছি, তাহলে কিসের অসুবিধা!

অপারেশনের দিন আরো এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেলো। এমন ভেঙে পড়া মন নিয়ে ছুরি কাঁচির ব্যাপারে না যাওয়াই ভালো। আরো দু-একটা ইনজেকশন চলুক। বাণীর কোন আপত্তি নেই। এক সপ্তাহ কেন, অনন্ত কাল পিছিয়ে যাক অপারেশন, শুধু পায়ে পায়ে ভাদুড়ী এগিয়ে আসুক। দেহের কাছেই নয়, মনেরও সান্নিধ্যে।

পায়ে পায়েই এগিয়ে গেলেন ভাদুড়ী। নিঃশব্দে। আচমকা পিছন থেকে বাণীর চোখ চেপে ধরলেন। পায়ের পাতা দুটোই না হয় নির্জীব কিন্তু যৌবনপুষ্ট শরীরটা তো আর নয়। সারা দেহের রক্ত মুখে এসে জমলো। অদম্য উন্মাদনা। একটা হাত দিয়ে বাণী আলতো ছুঁলো ভাদুড়ীর দুটো হাত। নিশ্চয়কে সুনিশ্চয় করে নেওয়া, তারপর মুচকি হেসে বললো, 'কে নার্স?'

ভাদুড়ী চোখ ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'নার্সের সাহস তো কম নয়?'

বাণী হাসি থামালো না, 'ডাক্তারের চেয়ে নিশ্চয় বেশী নয়? হঠাৎ অবেলায় কি মনে করে?'

'সব সময় কি বেলা থাকতে আসা যায়?' ভাদুড়ী বালিশ সরিয়ে বিছানার এক পাশে বসে পড়লেন।

'এদিকে এসেছিলেন বুঝি?'

বাণীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে ভাদুড়ী হাত বাড়িয়ে বাণীর একটা হাত চেপে ধরলেন।

ঘাড় ফিরিয়ে বাণী এদিক ওদিক দেখে নিলো। নার্সের আসার সময় হয়নি। চাকর-বাকর চট করে ঢুকবে না এ ঘরে। বাবাও ঢোকবার আগে কাশির টুকরো পাঠাবেন। সে সব ভয় নেই। কিন্তু নাই বা দেখলো বাইরের লোক, নিজের মনও তো কম কৌতূহলী নয়।

'তোমাকে সকাল থেকে বড়ো মনে পড়লো, তাই চলে এলাম।' ভাদুড়ী আস্তে আস্তে বললেন কথাগুলো। থেমে থেমে।

দু-একবার চেষ্টা করেও বাণী পারলো না। কথা বলতে গেলেই কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠা পুঞ্জীভূত কথার স্তূপ ঠোঁটের ওপারে ভেঙে ভেঙে পড়ে। ঠোঁটের শুধু কাঁপনই সার, একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারে না।

ভাদুড়ী হাত ছেড়ে পা ধরলেন। টিপে টিপে দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপর হেসে বললেন, 'কাল অপারেশন করাতে আপত্তি নেই তো, নাকি ভয় করবে?'

বাণীর দু'চোখে বিদ্যুতের ঝলক, 'ভয় আমার আর কিছুতেই করবে না।'

'তাই নাকি' ভাদুড়ী বাণীর গালে আলতো টোকা দিলেন, 'হঠাৎ এমন অভয়-মন্ত্র পেলে কার কাছে?'

বাণী একটু এগিয়ে ভাদুড়ীর বুকের ওপর মাথাটা রাখলো।

নিচের এদিকের ঘরটাই ঠিক হলো। ভাদুড়ীই সব বন্দোবস্ত করেসেন। অপারেশন-টেবিল থেকে এ্যানাসথেটিক-এক্সপার্ট। ভোর ভোর কাজ শুরু করাই ভালো।

ঘরে ঢুকেই ভাদুড়ী থমকে দাঁড়ালেন। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বাণী উপুড় হয়ে রয়েছে বিছানায়। কোন সাড়াশব্দ নেই। এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন, 'বাণী।'

বাণী উঠে বসলো। চোখের জল শুকিয়েছে, কিন্তু দাগ নয়। ভাদুড়ী একটা হাত বাড়িয়ে দিতেই হাতটা বাণী আঁকড়ে ধরলো।

'কোন ভয় নেই, সারিয়ে তোমাকে তুলবোই। আমি কথা দিচ্ছি।'

এবারও কোন উত্তর দিলো না বাণী। কেবল মুখ তুলে চাইলো।

পর্দার ওপারে জুতোর শব্দ। বাপের গলা। বাণী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। ভাদুড়ীর হাত ছাড়লো না।

বাপ এগিয়ে এসে বাণীর পিঠে হাত রাখলেন, 'কোন ভয় নেই মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সব ঠিক হয়ে যাবে! জীবন্মৃত হয়ে বাঁচার শেষ। প্রেমাস্পদকে নিয়ে নতুন জীবন-যাত্রা। সামনের অন্ধকার দিনগুলো পার হতে পারলেই আলোর দেশ। নিকষকাজল জীবনের অবসান।

ক্লোরোফর্ম দেবার সময়ও বাণী একদৃষ্টে চেয়ে রইলো ভাদুড়ীর দিকে। শুধু ডাক্তারই তো নয়, একটা নারীর জীবনের পূর্ণতার প্রতীক, বাঁচার সংকেত। এক দুই থেকে শুরু করে সতেরো পর্যন্ত বাণী গুণলো। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার রাশ, অস্পষ্ট, কেবল গভীর উজ্জ্বল দুটি চোখ, চাপা ওষ্ঠাধর আর তুহিন সাদা এপ্রনের ইশারা। ঠোঁট দুটো অল্প কেঁপে উঠে স্থির হ'য়ে গেলো।

বিশ্রী ওষুধের গন্ধে বাণীর ঘুম ভেঙে গেলো। একটা যন্ত্রণা। ঠিক কোনখানে আন্দাজ করতে পারলো না। প্রথমে মনে হ'লো হাঁটুর কাছাকাছি, তারপর নিচে, আরো নিচে গোড়ালি বরাবর। অস্ফুট একটা চীৎকার ক'রে উঠতেই নার্স এগিয়ে এলো। কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, 'কষ্ট হ'চ্ছে?'

কষ্ট! বাণী চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো এদিক ওদিক। মানুষটা কোথায় গেলো? চোখ বন্ধ করার আগে পর্যন্ত যাকে দেখেছে, চোখ খুলে সে মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না কেন।

'ডাক্তার ভাদুড়ী' আস্তে আস্তে বাণী উচ্চারণ করলো।

'তিনি চলে গেছেন। বিকালের দিকে আসবেন বোধ হয়।' নার্স চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললো।

রোদের তেজ দেখে মনে হলো সবে হয়তো দুপুর। বেলা গড়িয়ে এলে তবে আসবেন ডাক্তার। এখনও অনেক—অনেক দেরী। বাণী চোখ বুজলো।

শার্শীর ফাঁক দিয়ে রোদটা গায়ে লাগতেই বাণী জেগে উঠলো। দু হাতে চোখ মুছে নিলো। কোণের দিকে মেঝেয় বিছানা পাতা। ঘুম ভেঙে নার্সও উঠে বসেছে।

আশ্চর্য, একি অফুরন্ত বেলা। দুপুর শেষ হবার নাম নেই। অথচ বিকাল না হ'লে ডাক্তার ভাদুড়ী আসবেন না।

'এখন বিকাল হ'তে অনেক দেরী না?' নার্সের দিকে বাণী মুখ ফেরালো।

'বিকাল হ'তে?' নার্স অল্প হাসলো, 'তা একটু দেরী আছে বই কি! সবে তো সকাল সাড়ে সাতটা!'

সাড়ে সাতটা! সে কি! একটা পুরো রাত কেটে গেছে। কিছু জানতে পারে নি বাণী।

'ডাক্তার ভাদুড়ী'—বাণীর কথা শেষ হতেই নার্স উত্তর দিলো, 'কাল সন্ধ্যার ঝোঁকে ডাক্তার এসেছিলেন। আপনি তখন ঘুমে অচেতন। ডাক্তার অনেকক্ষণ চেয়ার নিয়ে আপনার পাশে বসে ছিলেন।'

বসেছিলেন পাশে? ঠোঁট কামড়ে বাণী চুপ ক'রে শুয়ে রইলো। পুরনো গানের কলি মনের আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করতে লাগলো।

'কাছে এসে ব'সেছিলো তবু জাগিনি।'

মুখ ঘুরিয়ে নার্সকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই বাণী থেমে গেলো। পর্দার নিচে বার্নিশ-চকচকে জুতো। মালিক অচেনা নয়।

চোখ বুজিয়ে ফেললো বাণী। চোখ খুলতেই যাতে ডাক্তার ভাদুড়ীকে দেখতে পায়। পেলোও তাই। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ভাদুড়ী আলতো হাসলেন, 'কেমন আছেন?'

একি, 'তুমি'র অন্তরঙ্গতা থেকে 'আপনি'র উত্তুঙ্গ শিখরে! কিন্তু একটু পরেই খেয়াল হলো, নার্স রয়েছে ঘরের মধ্যে। তার সামনে এ ছাড়া উপায় নেই।

নার্স বেরিয়ে যেতেই বাণী একটা হাত বাড়িয়ে দিলো। স্পর্শ করলো ভাদুড়ীকে। আর ব্যবধান নয়, মিলনের সেতু। এ ছোঁয়া যেন শুধু হাতে হাতেই নয়, মনে মনেও।

ভাদুড়ী সাবধানে বিছানার পাশে বসলেন, 'জানো, কাল কতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মাথায় হাত বুলিয়েছি!'

'সত্যি?'

'ঘুমোলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায়।'

'আর জেগে থাকলে?'

'সুন্দরতর' ভাদুড়ী তরল হাসলেন।

'তুমি ডাক্তার না হ'য়ে কবি হ'লেই পারতে?'

'সত্যি, তাহলে পা ছুঁয়ে সাধনা করতে হ'তো না। একেবারেই মনের নাগাল পেতাম।'

'আমি সারবো?' ব্যাকুল প্রশ্নে বাণীর মুখের পেশী কঠিন হ'য়ে এলো।

'নিশ্চয়, অপারেশন খুব ভালো হ'য়েছে। মাসখানেকের মধ্যে তুমি নিখুঁত হ'য়ে উঠবে।'

বাণীর সারা মুখ আনন্দে ঝলমল ক'রে উঠলো। কিশলয়ে যেন বসন্তের স্পর্শ।

'বেশি কথা বলো না, ঘুমোবার চেষ্টা করো।' ভাদুড়ী শিয়র থেকে সরে পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। রোগিণী ছেড়ে রোগের সান্নিধ্যে। ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ

ধ'রে দেখলেন, তারপর খুশী ঝলমল মুখে আবার এসে দাঁড়ালেন মাথার কাছে।

'আপনার সেরে উঠতে মাসখানেকও লাগবে না।' আড় চোখে বাণী দরজার কাছে এসে দাঁড়ানো নার্সের দিকে নজর ফেরালো তারপর চোখ বন্ধ করলো। ক্লান্তি-শীর্ণ দুটি ঠোঁটে চাপা হাসির আভাস।

বাণী উঠে বসলো সতেরো দিন পর। ওঠা হাঁটা একেবারে বারণ। পিঠে বালিশ দিয়ে দেয়ালে ঠেস। প্রায়-সেরে-ওঠার আনন্দটুকু নিভে যাওয়ার দাখিল। ভাদুড়ীর মুখ গম্ভীর, তার ছায়া কিছুটা প্রফেসর বাপের মুখেও।

বিকালে ভাদুড়ী আসতেই বাণী জিজ্ঞাসা করলো,

'কি ব্যাপার একটু গম্ভীর ঠেকছে যে?'

ভাদুড়ী পাশ কাটাবার চেষ্টা করলেন, 'অবিবাহিতের চাপল্য কি আর শোভা পায়। ঘরণী আসার আগে থেকে সংযত করছি নিজেকে।'

'আহা, খালি কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা! বলো না। পায়ের ব্যাপার সুবিধার নয়, না?'

'উঁহু, পা ঠিক আছে।'

'তবে?'

'মানে' ভাদুড়ী আমতা আমতা করলেন, নকল কাশির আওয়াজ, তারপর কি ভেবে ব'লেই ফেললেন কথাটা, 'অপারেশন এখনও তো সম্পূর্ণ হয় নি কিনা। স্কিন-গ্রাফটিং শুরু হবে এবার।'

'আবার' আর বেশী কিছু বলতে পারলো না বাণী। নিস্তেজ মুখের ভাব। স্নায়ু শিরাও অবশ।

ভাদুড়ী এগিয়ে এলেন, 'কি নার্ভাস মেয়ে তুমি গো।' নার্ভাস! বাণী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখলো ভাদুড়ীকে। আপাদ-মস্তক। তিলে তিলে একটা মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কি মানে? জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মতন দেহ নিয়েও এ খামখেয়ালী কতদিন চালাবে এরা!

ভাদুড়ী মোলায়েম করলেন গলার স্বর। আবেগ তরল।

'বাণী, প্রতিমা ঘরে তোলবার আগে তার কোন খুঁত আমি রাখতে চাই না। ভয়ের কিছু নেই, আমায় বিশ্বাস করো।'

আবার সেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন। কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রুপোলী ইশারা। বর্তমান ভোলানো রঙিন ভবিষ্যত। তবে তাই হোক, ভেঙে গড়ে বাণীকে তোমার মতন ক'রে নাও। পাথর কুঁদে কুঁদে ভাস্করের মানস প্রতিমা গড়ার মতন।

বাণী হাত দিয়ে ভাদুড়ীর একটা হাত চেপে ধরলো। স্পর্শে মাদকতাই নয়, আশ্বাসও পায় বাণী, পরম নির্ভর।

আবার সব কিছুর পুনরাবৃত্তি। ক্লোরোফর্মের গন্ধ, যন্ত্রপাতির আওয়াজ, আশে পাশের মানুষের ফিসফাস শব্দ। নার্স, ভাদুড়ী আর প্রফেসর বাপের অস্পষ্ট কাঠামো। ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব তারপর গভীর সুষুপ্তি।

এবারের যন্ত্রণা আরো বেশী। কোমর পর্যন্ত নড়াবার উপায় নেই। জ্ঞান হ'তেই দাঁতে দাঁত চেপে বাণী চীৎকার ক'রে উঠলো। ভাদুড়ী কাছেই ছিলেন। প্রফেসর বাপও। দুজনেই ঝুঁকে পড়লেন দুদিক থেকে। বাণী একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখের দিকে চোখ ফেরালো। বাপের কপালের হিজিবিজি বলিরেখার মধ্যে সান্ত্বনার ইঙ্গিত নেই, কিন্তু ভাদুড়ীর দুটি চোখ আশ্বাস-উজ্জ্বল। বাণী ক্লান্তিতে নিজের চোখ বন্ধ করলো।

বিছানায় উঠে বসতে আরো দিন চারেক। তারপর সব কিছু শুনে অবাক। হাঁটুর মাংস নিয়ে পায়ের পাতায় লাগানো হ'য়েছে। বিধাতার ওপর কারিগরি! এক অঙ্গ ছেদন ক'রে অন্য অঙ্গের পুষ্টি সাধন।

'তুমি সত্যি অদ্ভুত' ভাদুড়ীর কাঁধে মাথা রাখলো বাণী।

বাইরে চাপ চাপ অন্ধকার। ঘরেও তাই। বাতি জ্বালতে গিয়েও কি ভেবে ভাদুড়ী আর উঠলেন না। এই ভালো। উৎকট আলোয় মানুষকে বড় বেশী চেনা চেনা ঠেকে। আলো-ছায়ার রহস্যে ঘেরা সন্ধ্যায় যৌবন যেন আরো দুর্বার, আরো মধুর।

'আরো কদিন গো' খুব নিরুত্তেজ গলা বাণীর।

'দিন পনেরোর বেশী নয়' আধো অন্ধকারে ভাদুড়ীর গলা বেশ গম্ভীর।

বাণীর দুটো হাত নিজের বুকে জড়ো করে রাখলেন ভাদুড়ী। বাণীকে নিজের দিকে নিবিড় ক'রে টেনে নিয়ে বললেন, 'তারপর তোমার সিঁথির মাঝখানে আমার পরমায়ুর নিশানা।'

'যাও' বাণী মুখ লুকোলো ভাদুড়ীরই বুকের মাঝখানে।

'তুমি সেরে ওঠো তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীটি! যেদিন তুমি হাঁটতে শুরু করবে সেদিন থেকেই আমি হাঁটাহাঁটি শুরু করবো তোমার বাপের কাছে। এক কথায় মেয়েকে ছেড়ে দেবেন ব'লে তো মনে হ'চ্ছে না।'

'যদি নাই ছাড়ে' কৌতুকে ফেটে পড়লো বাণী।

'তা হ'লে' ভাদুড়ী উঠে দাঁড়ালেন, 'ক্লোরোফর্ম তো রইলোই হাতের কাছে রুক্মিণী হরণের চেষ্টা করবো।'

বাইরে পায়ের আওয়াজ হ'তেই দুজনেই থেমে গেলো। ভাদুড়ী দাঁড়ালেন জানলার কাছ ঘেঁষে। বাণী চুপচাপ বিছানায়।

'আপনার পেশেণ্ট কেমন?' হাসতে হাসতে প্রফেসর ঘরে ঢুকলেন।

'পেশেণ্টের খবর যে তাঁর জানা, হাসিতেই তার হদিশ রয়েছে। কথাটা কিন্তু বাণীর ভারি ভালো লাগলো। আপনার পেশেণ্ট। সত্যিই তো ভাদুড়ীরই পেশেণ্ট। দেহমন দুইই। দেহ সমর্পণ করতে ক্লোরোফর্মের সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু নিঃসঙ্কোচে মন অর্পণ করেছে প্রথম চোখে দেখার পরম লগ্নে।

'পেশেণ্টকেই জিজ্ঞাসা করুন' ভাদুড়ী হেসে উঠলেন।

খুট ক'রে সুইচ টেপার শব্দ হ'তেই বাণী দুহাতে চোখ ঢাকলো। শুধু জোর বাতির তেজ ঢাকতেই নয়, তার উপচে পড়া খুশীর খোঁজ যেন না পায় কেউ। আশে পাশের কেউ না। এ শুধু তার নিজস্ব, আর কিছুটা বুঝি জানালার পাশে দাঁড়ানো লোকটার।

আর দিন দুয়েক। তারপরেই বাণী উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবে। প্রথমে খুব আস্তে আস্তে। পায়ের পাতা চেপে। এ ঘর থেকে ও ঘর। আগের মত হাঁসের মতন হেলে দুলে চলা নয়, ময়ূরীর মতন পেখম মেলে। কথাটা অবশ্য ভাদুড়ীর।

বিছানাটা টেনে জানলার কাছ বরাবর আনা হ'য়েছে। এখান থেকে ফটক পর্যন্ত দেখা যায়। পিচঢালা পথের কিছুটাও। ভাদুড়ী ফটক পার হবার আগেই নজরে পড়বে।

আশ্চর্য লাগে বাণীর। কতদিনের বা আলাপ, অথচ এমন করে নিজের ক'রে নিলো কি ক'রে। স্কুল কলেজ জীবনেও দু-তিনজন ছেলের সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছিলো। বই বগলে বাবার ছাত্রও কয়েকজন। কিন্তু আলাপের বহর ঠোঁটের সীমানা পর্যন্ত। বুকে কেউ দাগ কাটতে পারে নি। ভাদুড়ীর ব্যাপার অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। কোথা থেকে যেন কি হয়ে গেলো।

মাঝে মাঝে কয়েকজন সহপাঠিনী দেখতে এসেছে বাণীকে। দু-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুও। বাণী কারুর কাছে বলে নি কিছু। এখন কোন কথা নয়। আচমকা বিয়ের চিঠি পাঠিয়ে চমকে দেবে সবাইকে। সব চেয়ে অবাক হবে সুনীতি সেনজায়া। ব্যাপার শুনে চেঁচামেচি করবে 'ওসব শুনছি না, ঘটকালি বিদায় আমার প্রাপ্য।'

শব্দ হতেই বাণী মুখ ফেরালো। নার্স এসে দাঁড়িয়েছে মালিশের শিশি হাতে। এক ঘন্টা ধ'রে চলবে মালিশ। ভুরু কুঁচকে বাণী পা দুটো এগিয়ে দিলো।

মালিশ শেষ। ক্লাব খতম ক'রে ওপরে ওঠবার মুখে বাপ একবার উঁকি দিয়ে

গেলেন। পর্দা সরিয়ে হাসলেন একটু 'আর কি, আর দু'দিন পরেই তো আমার বাণীমা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে সারা ঘরময়।'

বাণী খাবার প্লেট থেকে মুখ তুললো, 'সত্যি, এবার সেরে উঠে কেবল ছুটে ছুটে বেড়াবো। কতদিন ধরে পড়ে আছি।' কাবুলী বিড়ালের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে বসলো বাণী। মনে মনে ভাবলো, হুঁ, ছুটা-ছুটি তো করতেই হবে। নতুন ঘরগেরস্থালী আরম্ভ করার মেহনত কম নাকি। নিজের সংসার নিজের মনের মতন করে সাজাতে হবে না। কল্পনায় দেখলো ভাদুড়ীর প্রশংসা চকচক চোখের দৃষ্টি। গৃহিনীপনার কৃতিত্বে নিজেই হেসে উঠলো।

দেয়ালঘড়ির দিকে নজর পড়তেই বাণী থেমে গেলো। আটটা দশ। আশ্চর্য মানুষটার আসবার নাম নেই এখনও। অন্যদিন ছটার মধ্যেই হাজিরা দেয়, থাকে রাত নটা পর্যন্ত। আজ বলে গেছে' কথা পাড়বে বাণীর বাপের কাছে, সেইজন্যই বুঝি দেরী করছে আসতে। মনে মনে কথা সাজিয়ে নিয়ে তবে এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবে।

শয়তানের কথা চিন্তা করলেই সে নাকি এসে দাঁড়ায়, দেবতাও বুঝি তাই। পর্দা সরিয়ে ভাদুড়ী ঘরের মধ্যে ঢুকলো। আজ আর সার্ট প্যান্টের আঁট বাঁধন নয়, পায়ে ডার্বি জুতো আর হাঁটু ছুঁই ছুঁই মোজার বাহার নেই। গরদের পাঞ্জাবী আর ফরাস-ডাঙ্গা এগারো হাতি, কাকের চোখকে লজ্জা দেওয়া কুচকুচে পাম্পসু। ছাদনা তলায় যাবার পোশাক। কিন্তু লগ্ন না আসতেই নটবর বেশ যে? নাকি সেই মাহেন্দ্রক্ষণের মহলা!

বিছানার পাশে নয়, চেয়ার টেনে ভাদুড়ী একটু দূরে বসলেন। অবশ্য এমন কিছু দূরে নয়। হাত বাড়ালে বাণীকে বেশ ছোঁয়া যায়।

'কেমন আছো', চেয়ার শুদ্ধ ভাদুড়ী বাণীর দিকে কাত হলেন।

এ কথার উত্তর দিলো না বাণী। ভুরু দুটো তুলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো ভাদুড়ীর দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'বাবার কাছে যাবে না?'

'যাবো। ফেরবার মুখে তোমার বাবার কাছে হয়ে যাবো। রোজই একবার তোমার খবর দিয়ে যেতে হয়।'

ওঃ শুধু বাণীর খবর দেবার জন্য বাপের কাছে যাওয়া দরকার, কতটুকু উন্নতি করেছে বাণী, সেই খবরটুকু! আর কিছু বলবার নেই, ভাদুড়ীর নিজের কোন কথা? ভাদুড়ী আর বাণী দুজনের?

অভিমানে ঠোঁট ফোলাবার আগেই বাণী থেমে গেলো। ভাদুড়ী উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন পায়ের কাছে। হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখলেন পা দুটো। স্কিনগ্রাফটিংয়ের অভূতপূর্ব সাফল্যে বোধ হয় উল্লসিত হলেন। তারপর চেয়ারে ফিরে এসে হেসে বললেন, 'আর ঠিক দু'দিন। শনি, রবি। সোমবার থেকে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো সারা ঘরময়। এ দু'দিন কিন্তু খুব সাবধান। এখনও চামড়া খুব নরম। চলাফেরা করার চেষ্টা করলেই সর্বনাশ।'

অস্থিবিদের ফাঁকে ফাঁকে আসল মানুষটার খোঁজে বাণী এধার ওধার নজর চালালো। আশ্চর্য, আজ আর বুঝি হালকা কোন কথা বলবেনই না এই প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন ভাদুড়ী। বাণী তাঁর পেশেণ্ট, আর কেউ নয়।

'তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো?' বাণী বালিশে ঠেস দিয়ে সোজা হ'য়ে বসলো।

'কেন, কি হয়েছে?' ভাদুড়ী খাঁজ ফেললেন দুটি ভুরুর মাঝখানে।

'আজ কি কথা ছিলো মনে আছে?'

'আছে বৈকি। সব কথাই আজ বলবো।' ভাদুড়ীর স্বরে গাম্ভীর্যের মিশেল।

কপট বিরক্তিতে বাণী ঠোঁট ওল্টালো, 'বলো বাপু কি তোমার কথা। এই হাত জোড় ক'রে বসলাম। কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।'

কিন্তু হাতজোড় ক'রে বেশীক্ষণ বাণী বসতে পারলো না। ভাদুড়ীর মুখের ভাঁজে, চোখের তারায়, অমঙ্গলের ইশারা। দৃঢ়-সংবদ্ধ ঠোঁটে কঠিন প্রতিজ্ঞার আভাস।

'লুকোচুরির নয়, কথাটা স্পষ্ট ক'রেই তোমাকে জানানো দরকার।' চেয়ার টেনে ভাদুড়ী আরো এগিয়ে এলেন। বাণীর আরো কাছে।

দু' এক মিনিট। কুয়াশার অস্পষ্টতা কেটে যাবার মতন একটু একটু করে সমস্ত ব্যাপারটা স্বচ্ছ হ'য়ে এলো। এই রকমই কিছু একটা বাণী আন্দাজ করছিলো। আবছা অন্ধকারে তিলে তিলে ছড়িয়ে পড়া একটা ভয়ের মতন, চাঁদের আলো ঢেকে ফেলা অতিকায় বাদুড়ের ডানার মতন, একটা অস্বস্তি শরীর আর মন দুই ছেয়ে ফেলে-ছিলো। এরকম কিছু যে হবে এ যেন ওর জানা।

নিজের ব্যাণ্ডেজকরা পা দুটোর দিকে একবার দেখে নিলো বাণী তারপর ভাঙ্গা গলায় বললো, 'এ তোমাকে বলতে হবে না, এ আমি জানতাম। অপারেশন করার আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম আমি।'

'কি' ভাদুড়ী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাণীর আপাদ মস্তক দেখলেন, 'কি তুমি বুঝতে পেরেছিলে?'

'আমার পা সারবে না। এ পঙ্গুতো আমার যাবার নয়।' বাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। চাপা গলায়।

'পা তোমার সেরে যাবে। কোন খুঁত থাকবে না।' প্রত্যেকটি কথা ভাদুড়ী স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন। আরোগ্য বাণী নয়, ফাঁসির হুকুম শোনাচ্ছেন, এমনি ভঙ্গীতে।

সেরে যাবে? তবে? বাণী মুখ তুললো। জলটলমল আয়ত দুটি চোখ।

ভাদুড়ী চোখ ফেরালেন অন্ধকার বাইরের দিকে। সেই দিকে চেয়েই বললেন, 'আপনার কাছে আমি মাপ চাইতে এসেছি।'

'মাপ?'

'হ্যাঁ, এ কদিনের অভিনয়ের জন্য। কিন্তু বিশ্বাস করুন এ ছাড়া আমার আর উপায় ছিলো না।'

সিনেমার ছবির মতন অল্প অল্প কাঁপতে শুরু করলো। ডিসটেম্পার করা আকাশ-নীল দেয়াল, রঙ চঙে বাতির শেড্, এমন কি এত কাছে বসা ভাদুড়ীর ঋজু সুঠাম দেহটাও। খুব আস্তে দুলছে। মৃদু ভূকম্পনের তালে তালে। দুটো হাতে দেয়াল ধরে বাণী টাল সামলালো।

কিন্তু কিসের অভিনয়! কিসের উপায় ছিলো না!

ভাদুড়ী উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন মুখের রেখা। দুটো হাত আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর। অভিনয় শেষে এমন একটা ঘোষণা করতেই যেন নাটকীয়ভাবে দাঁড়িয়ে উঠলেন। পর্দা পর্যন্ত মেঝে মাড়িয়ে মাড়িয়ে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এলেন বাণীর মুখোমুখি।

'সত্যি, এ ছাড়া আর উপায় ছিলো না। আপনাকে যেরকম নার্ভাস দেখলাম অপারেশনের আগে, সাহস হলো না। হার্ট দুর্বল, এমন একটা অপারেশনের কষ্ট কিছুতেই আপনি সহ্য করতে পারতেন না। হিতে বিপরীত হতো। আপনার কল্পনা-প্রবণ মন। ঝাঁঝালো ওষুধের বদলে তাই এ অভিনয় শুরু করতে বাধ্য হলাম। মনের মাধ্যমে দেহের চিকিৎসা, ও দেশে এর রেওয়াজ খুব বেশী।'

ভাদুড়ী একটু থামলেন। পকেট থেকে বর্ডার দেওয়া রুমাল বের করে কপালে বিন্দু বিন্দু জমে ওঠা ঘাম মুছলেন সন্তর্পণে। আবার দাঁড়ালেন জানালার কাছ বরাবর।

দু হাতের মুঠোতে বাণী শক্ত ক'রে খাটের বাজু চেপে ধরলো। সামনে পাঁশুটে ধোঁয়ার স্রোত। ক্লোরোফর্ম করার আগের অবস্থা।

'এ অভিনয় করতে আমার বুক ফেটে গেছে। বারবার নিজেকে আমি অভিশাপ দিয়েছি। প্রতি মুহূর্তে সুমিত্রার কথা মনে পড়েছে, কিন্তু উপায় ছিলো না।' একটু থামলেন ভাদুড়ী। কথার মাঝখানে দম দিলেন। তারপর শুরু করলেন আরো দ্রুতলয়ে, 'সত্যি উপায় ছিলো না। আমার যশ, প্রতিষ্ঠা, ভবিষ্যত সব নির্ভর করছিলো আপনার আরোগ্য লাভের ওপর। আপনি আমার প্রথম রোগী, আমার প্রথম এক্সপেরিমেণ্ট।'

'নিজের ভবিষ্যতের জন্য আমার ভবিষ্যত এমনি করে'—কথা শেষ করতে পারলো না বাণী। শাড়ীতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। খুব জোরে অবশ্য নয়। আওয়াজ কানে গেলে প্রফেসর ক্ষিপ্র পায়ে নেমে আসবেন সিঁড়ি দিয়ে। মুখোমুখি দাঁড়াবেন। তারপর! কি করবে বাণী। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কাহিনী শোনাবে বাপকে। অভিনয়ের পঞ্চমাঙ্কের ইতিহাস বলবে ফেনিয়ে ফেনিয়ে।

চাপা হাসিতে ঘর ভরে গেলো। ভাদুড়ী হাসছেন। মৃদু অথচ সুরেলা। এ হাসি আয়ত্ত করতে হয়তো অনেক সময় লেগেছিলো। 'বিনিময় প্রথার ওপর সারা দুনিয়া চলেছে সে কথা নিশ্চয় আপনার অজানা নয়। প্রস্তর যুগ থেকে প্লাস্টিক যুগ পর্যন্ত একই নীতি। অর্থের বদলে ইজ্জৎ, ইজ্জতের বদলে অর্থ এ যুগেরও রেওয়াজ। আমি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছি, কিছু পরিমাণে যশও। ইতিমধ্যেই দু একটা ডাক্তারী কাগজে আপনার কেসটা ছাপা হয়েছে। আপনার বাবার স্বাক্ষারত প্রশংসাপত্রও পেয়েছি, আশা করছি পসার জমাতে খুব অসুবিধা হবে না। কিন্তু তার বদলে আপনিও কম পান নি। পঙ্গুতা থেকে পূর্ণতা পেয়েছেন, অচল পয়সা বলে যে সমাজ সরিয়ে রাখতো আপনাকে সেই সমাজই আপনাকে পুরোভাগে বসাবে। লাভ আপনারও কম হয় নি। আমায় মাপ করবেন, যেটুকু করেছি বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে, আপনার মুখ চেয়ে।'

ভারি পর্দাটা দুলে উঠলো। জুতোর শব্দ প্রথমে কঠিন মোজেইক মেঝেতে, তারপর মখমল নরম ঘাসের ওপর। লোহার গেট বন্ধ করার যান্ত্রিক শব্দ।

সব থেমে যেতে বাণীর খেয়াল হলো। মানুষটা নেই, আর কোনদিনই হয়তো থাকবে না। স্কিনগ্রাফটিং। দেহের এক অংশ ছেদন করে অন্য অঙ্গের পুষ্টি-সাধন। ঠিক তাই, মনকে পঙ্গু করে পায়ের পাতার শ্রীবৃদ্ধি। কোন ক্ষতিই তো হয় নি বাণীর। একজনের প্রাণের বদলে আরেক জনের প্রতিষ্ঠা।

হঠাৎ বাণীর নজরে পড়লো সামনের সেলফে সাজানো সারি সারি মালিশের ওষুধ। 'বিষ' কথাটা রক্তের অক্ষরে খুব বড়ো করে লেখা। এ ছাড়া আর উপায় কি? সারাজীবন এ অপমানের বিষ মেখে নীলকণ্ঠ হওয়ার চেয়ে এতো ঢের ভালো।

কিন্তু নামতে গিয়েই বাণীর মনে পড়ে গেলো। দু-তিন দিন চলাফেরা একেবারে বারণ। নরম মাংস পায়ের পাতার। শিরা ছিঁড়ে বিপত্তি ঘটাও আশ্চর্য নয়। মালিশের শিশি থেকে চোখ ফিরিয়ে বাণী নিজের পায়ের দিকে চাইলো। নরম তুলতুলে গোলাপী মাংস। আর শরীরের বুঝি কোথাও কোন অপূর্ণতা নেই বাণীর। নিটোল নিখুঁত।

আমার বন্ধু নামজাদা লেখক। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গেছে আমার। নিজে এখন পর্যন্ত কিছু আমি লিখিনি—লেখা আমার আসেও না। ছেলেবেলায় স্কুল ম্যাগাজিনের দপ্তর থেকেও যখন আমার কবিতা ফেরৎ এল, সেই থেকেই ও পথ আর মাড়াইনি। এখন আমি আমার বন্ধুর অকৃত্রিম গুণগ্রাহী সহচর। মনে মনে আশা আছে, ও যদি ডক্টর জন্‌সন্ হতে পারে, আমি বস্‌ওয়েল হয়ে অমর কীর্তি লাভ করব।

অতএব বন্ধু যখন পশ্চিমের একটা শহরে সাহিত্য সভার উদ্বোধন করতে গেল—আমি সঙ্গ নিলাম। নিজের ট্রেন ভাড়াটা অবশ্য পকেট থেকেই দিতে হয়েছিল, কিন্তু সাহিত্যিকের সঙ্গী হিসেবে আপ্যায়নের পালাটা কিছু কিছু আমারও যখন জুটল, তখন আর ক্ষোভ রইল না। তা ছাড়া বন্ধুর দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করে কিছু কিছু আত্মপ্রসাদও মিলল বইকি। অটোগ্রাফ-শিকারী গুণমুগ্ধ এবং হাতে লেখা পত্রিকার সম্পাদকের হাত থেকে ওকে পরিত্রাণ করাও কি কম কাজ!

মফঃস্বলের সাহিত্যরসিকেরা কলকাতার লোকের মতো উন্নাসিক নয়। এবং তারা অতিথিবৎসল। সুতরাং সভায় মঞ্চের ওপরে বন্ধুর পেছনের চেয়ারটায় আমি বসতে পেলাম। এমনকি দু তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আমার সামনে পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলে অটোগ্রাফের খাতা। ফোটো তোলবার সময় গলাটাকে জিরাফের মতো যথাসম্ভব সামনে এগিয়ে দিলাম, যাতে ব্যাক্‌গ্রাউন্ড হিসেবে বাদ পড়ে না যাই।

সভা শেষ হল প্রায় রাত ন'টায়। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় কে একজন এক-টুকরো চিঠি গুঁজে দিলে আমার হাতে। অভ্যাসবশে বন্ধুকে দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়ল বড় বড় অক্ষরে আমারই নাম লেখা ঃ সুকুমার গুপ্ত!

দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলাম ভাঁজ খুলে। একটা চিরকুট।

সুকুমারবাবু, কাল সকাল সাতটায় চা খেতে আসুন আমার এখানে। বাজারের দক্ষিণে যে ব্রিজ্‌লাল রোড—তাই দিয়ে একটু এগোলে বাঁ দিকে একতলা হলদে বাড়িটা—নাম 'হরদেও নিবাস।' নিশ্চয় আসবেন। অনেক কথা আছে।—শেফালী মিত্র।

শেফালী মিত্র। শেফালী? বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ল। আর কেউ? না—হতেই পারে না। শেফালী মিত্র নামে আর কোনো মেয়েকে জীবনে আমি দেখিনি।

গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে। আমি চিঠিটার দিকে তাকিয়ে আছি আচ্ছন্নভাবে। বন্ধুর ডাকে আমার সম্বিৎ ফিরে এল।

—একেবারে তলিয়ে গেলে যে? কার চিঠি?

ছোঁ মেরে তুলে নিল চিঠিটা। পড়ে চোখ টিপল একবার।

—কিহে, এখানে এবার শেফালী মিত্রকে জোটালে কোত্থেকে? অতীতের রোম্যান্টিক ব্যাপার নাকি কিছু?

আমি হাসলাম ঃ রোম্যান্স নয়—রোম্যান্স-বধ কাব্য। তাও আমার নয়, পরস্মৈপদী।

—সে আবার কী?

বললাম, ফিরে গিয়ে বলব। সে একটা চমৎকার কাহিনী। তোমার গল্পের খোরাক হয় একটা।

বন্ধুর ঠোঁটে তির্যক হাসির রেখা ফুটল ঃ ও নয়। অরিজিন্যাল কিছু বলো সুকুমার। লেখক হওয়ার পর থেকে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই বলে একটা চমৎকার কাহিনী বলার আছে তার—আর তাই শুনে আমি নাকি খুব ভালো গল্প লিখতে পারব। কিন্তু বিশ্বাস

করো তুমি—আজ পর্যন্ত এরকম শ' তিনেক কাহিনী শোনবার পরে আমার ধারণা হয়েছে—বাংলা দেশের মানুষের জীবনে চতুর্থ শ্রেণীর রোম্যান্স ছাড়া আর কিছুই ঘটে না।

বললাম, বলেছি তো এটা রোম্যান্স নয়—রোম্যান্সবধ কাব্য। ইচ্ছে হয় লিখো, নইলে লিখোনা। তা ছাড়া তোমার গল্পে সমাপ্তি চাই—কিন্তু জীবনের সত্যি গল্পের মতোই এটা অসমাপ্ত। সেদিক থেকেও এ হয়তো তোমার কাজে লাগবে না। তবু যদি শুনতে চাও—আমি পূর্ব মেঘটা শোনাতে রাজী আছি।

—তথাস্তু।

যেখানে আমরা জায়গা পেয়েছিলাম, তার কাছেই গঙ্গা। তেতলায় আমাদের ঘরের সঙ্গেই টেনিস-লনের মতো একটা লম্বা ছাত। রাত্রির গঙ্গা থেকে বাতাস উঠে আসছে—ছাতের টব থেকে যুঁইয়ের গন্ধ মিশেছে তার সঙ্গে। দুখানা ইজিচেয়ারে মুখোমুখি বসলাম আমরা।

বন্ধু বললে, একটার আগে আমার ঘুম আসে না—তুমি জানো। অতএব শুরু করতে পারো তোমার পূর্ব মেঘ। লোকের আত্মজীবনী শুনতে শুনতে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। তবু শোয়ার আগে আর কিছু না পেলে আমি পুরোনো পড়া নভেলেরও খানকতক পাতা উল্টে নিই। তোমার কাছেও এর চেয়ে বেশি কিছু আমি আশা করি না।

বললাম, আমি স্বগতোক্তির মতো আউড়ে যাব। তোমার ভালো না লাগলে এই ফাঁকে তুমি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা চিন্তা করতে পারো। কখনো কখনো নিজের সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে করে মানুষের। আমিও ঠিক তাই করব।

—তাই হবে—বন্ধু চুরুট ধরালো।

আমি শুরু করলাম।

শেফালী মিত্রের আগে বলা দরকার অমিয় মিত্রের কথা।

এই ছেলেটিকে তুমি চেনো কিনা জানি না, কিন্তু দেখেছ যে সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নেই। এক একজন থাকে—তাদের চোখে পড়বার ক্ষমতা অলৌকিক। একটা বড় সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে যেমন এক একটি বিশেষ লোকের ওপর তোমার দৃষ্টি আটকে যাবে—এ সেই দলের। ছটফট করছে, লাফিয়ে ট্রামে উঠছে এবং অকারণে তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ছে। কখনো আধ হাত দাড়ি রাখছে, কখনো ভ্রূশ্মশ্রু সব কামিয়ে ফেলছে। ভ্রূ কামাবার জন্যে একবার পুলিসে পর্যন্ত ধরেছিল ওকে।

প্রথম অমিয়কে দেখলাম আমাদের তাসের আড্ডায়।

কার সঙ্গে এসেছিল মনে নেই—হঠাৎ চোখে পড়ল একা একাই নানারকম মুখ-ভঙ্গী করছে সে। তারপর ঘরের আলোটায় দেওয়ালের ওপর হাতের নানা ভঙ্গীতে ছায়াবাজি শুরু করে দিলে।

ভাবলাম, পাগল নাকি!

কিন্তু তাসের অবস্থা সঙ্গীন—গোটা পাঁচেক টাকা হেরেছি এর মধ্যেই। খেলার ভেতরে তলিয়ে গেলাম। বেশিক্ষণ নয়। এর পরেই একরাশ প্রবল বক্তৃতায় ভেসে গেল সমস্ত।

এক প্যাকেট তাস হাতে তুলে নিয়ে অমিয় শুরু করে দিয়েছেঃ আজ তাসের যে সব ট্রিক্‌স আপনাদের দেখাবো—একমাত্র হুডিনি ছাড়া এ আর কেউ দেখাতে পারে নি। হুডিনির নাম নিশ্চয় আপনারা শুনেছেন—

বলেই ফটাফট তাস ভাঁজতে লেগে গেল।

আমার পাঁচ টাকা তখন পাঁচ টাকা চোদ্দ আনায় পেঁাছেছে। বলা বাহুল্য, ক্ষেপেই গেলাম। বলে ফেললাম, কী ছেলেমানুষী করছেন মশাই? আপনার ম্যাজিক কে দেখতে চায় এখন?

—দাদা বুঝি ম্যাজিক ভালোবাসেন না? কিন্তু তাস খেলতে বসে চুরি করাটা কি ঠিক হচ্ছে?—বলেই সঙ্গে সঙ্গে আমার কানের ওপর থেকে সে একটা ইস্কাবনের টেক্‌কা বের করে আনল।

হাসির শব্দে ফেটে পড়ল ঘর। অগত্যা আমাকেও হাসতে হল সকলের সঙ্গে। গা জ্বলে যাচ্ছিল, কিন্তু দেখলাম এক আমি ছাড়া বাকী সকলেরই মনোহরণ করে বসেছে অমিয় মিত্র।

এই হ'ল শুরু।

তারপরে নানাভাবে দেখেছি নানা বার। সিনেমা হাউসে দুর্দান্ত ক্রাইম স্টোরি দেখতে গিয়ে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অংশে ঘুমিয়ে পড়েছে, আচমকা জেগে উঠে হাততালি দিয়েছে অশোভন জায়গায়। মোহনবাগানের খেলায় মোহনবাগান গোল দিলে আনন্দে জুতো ছুড়েছে আকাশে, আর গোল খেলেও গ্যালারীর ওপরে উঠে নাচতে শুরু করে দিয়েছে।

পাগল? ঠিক তা নয়। ওটা শক্তি। এমন এক ধরণের যৌবন—আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারে যার পক্ষপাত নেই। সব সময়ে ছুটছে—উছলে পড়ছে—উপছে পড়ছে। এমন কি ওর পক্ষে বখাটে হওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। বয়ে যেতে গেলেও একটা রাস্তাই ধরতে হবে—ও দশ দিকে পরিব্যাপ্ত।

শেষ পর্যন্ত ওকে আমার নেহাৎ মন্দ লাগত না। বাঁধা কাজের ভেতরে এসে হানা দিত—সব এলোমেলো করে দিয়ে চলে যেত। কলকাতার এই বদ্ধ গলিতে এমন একটা জিনিস ও বয়ে আনত—যা কলকাতা নয়; যার সঙ্গে সুরভিত হয়ে আছে আমাদের দেশের মেঘনা নদীর জল, ঝড়-ওঠা বিকেলে ঢেউ-খাওয়া সুপুরীর বন, মাঠে চরা ঘোড়ার পিঠে অনধিকার আরোহণ করে কঞ্চির চাবুক মেরে তাকে প্রাণপণে ছোটানো। অর্থাৎ ছেলেবেলার আকাশ আর ছেলেবেলার মন।

ব্যতিক্রম ঘটল একদিন। গম্ভীর মুখে এসে বললে, দাদা, বিপদে পড়ে গেছি।

অমিয়র বিপদ! আমি হেসে ফেললাম।

—না দাদা, হাসির কথা নয়। একটি মেয়ের জীবন-মরণের ভার এখন আমার ওপরে।

—সে কি অমিয়! বিয়ে করছ নাকি?

—না, না, বিয়ে-টিয়ে নয়। আমার বয়েস পঁচিশ আর তাঁর বয়েস বত্রিশের ওপর। ছেলেপুলেও আছে।

—বিপদটা কিসের? খেতে পান না তিনি?

—বিলক্ষণ! খাবার ভাবনা কী? জমিদার-বাড়ির বউ। স্বামী মোটা টাকা রেখে গেছেন ওঁর জন্যে।

—তা হলে তোমার হঠাৎ এমন মাথা-ব্যথা কেন?

—একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্ত চলছে দাদা—চক্রান্তটা যেন অমিয়ই করছে, কথাটা বললে এমনি ফিসফিসে গলায়ঃ সম্পত্তির লোভে ওঁর দেওরেরা ওঁকে বিষ খাওয়াবার প্ল্যান করছে।

—তা তুমি কী করবে?—আমি সভয়ে বললাম, পুলিশে খবর দাও।

—পুলিশের সাধ্য কী? স্লো পয়জন। প্রমাণ নেই কিছু। সন্দেহের বশে দেওরদের মতো মানী লোকের গায়ে হাত দেবে কে? এখন বলুন দেখি—কী করা যায়?

—বাপের বাড়ি যেতে বলো।

—সেদিকে অল ক্লিয়ার। নোয়াখালির রায়টে বাপ-মা, ভাই-বোন, বাড়ি-ঘর সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমার কী করা উচিত, তাই বলুন।

বললাম, অবিলম্বে ওঁকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত কোনো নারী-কল্যাণ আশ্রমে। আর তোমার উচিত এসব গোলমালের মাইল দশেকের ভেতরেও না থাকা।

হতাশ হয়ে অমিয় বললে, এই আপনার অ্যাডভাইজ?

—একমাত্র।

অমিয় দাঁড়িয়ে উঠল। করুণ গলায় বললে, আপনার ওপর আমার বড্ড ভরসা ছিল দাদা—ভারী নিরাশ করলেন।

অমিয় চলে গেল, জিনিসটা সঙ্গে সঙ্গে মুছে গেল মন থেকে। ওকে আমি জানি। কাল সকালেই আজকের দুশ্চিন্তার চিহ্ন-মাত্রও থাকবে না ওর। সমুদ্রের বালির

ওপরে একটা ঢেউয়ের ফেন-স্বাক্ষর; আর একটা এসে আছড়ে পড়বার সময়টুকুই শুধু ওর দরকার।

কিন্তু এবারে আমি ভুল চিনেছিলাম ওকে। এটা হয়ে দাঁড়াল জোয়ারের শেষ ঢেউ—একটা স্থায়ী চিহ্ন এঁকে ফেলল। ফলে একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটল দিনদশেক পরে।

বৃষ্টির সন্ধ্যা। রাত সাড়ে ন'টার কাছাকাছি। সবে খাওয়া শেষ করে দোতলায় উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

দেখি, একটা লেডীজ্ ছাতা মাথায় অমিয়। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা।

—ব্যাপার কি হে? এমন অসময়ে? এসো—এসো—বোসো—

—বসব না দাদা। আপনাকে নিতে এলাম।

—তার মানে? এখন কোথায় যেতে হবে?

—সাক্ষী হতে হবে আপনাকে। এখনি চলুন। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে এসেছি।

—কিসের সাক্ষী?—আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

—রেজিস্টার্ড ম্যারেজের। তিনজন সাক্ষী নইলে ভ্যালিড্ হবে না। দুজনকে জোগাড় করেছি, আপনি হলেই হয়ে যায়। চলুন—চলুন—দশটায় টাইম দিয়েছেন রেজিস্ট্রার।

—কার বিয়ে?—মুখরোচক প্রসঙ্গটা কানে যেতেই কৌতূহলী হয়ে ঘটনাস্থলে দেখা দিলে আমার স্ত্রী কুন্তলা।

—এই যে বৌদি, বোঁ করে একটা আশীর্বাদ করে ফেলুন দেখি!—অমিয় চট করে নুয়ে কুন্তলার পায়ের ধুলো নিয়ে ফেললঃ বিয়ে করতে যাচ্ছি।

আমরা দুজনেই একটা অব্যক্ত আওয়াজ করলাম। সামলে নিয়ে কুন্তলা বললে, পাত্রী কে?

—তিনি এক এবং অদ্বিতীয়া। ক্রমশ প্রকাশ্য।

কুন্তলা বললে, তোমার বিয়ে? সে দায়িত্ব নেবার মতো মন তৈরি হয়েছে নাকি তোমার? সর্দা আইনে পড়বে যে!

—সেই জন্যেই তো দাদাকে দরকার। সাবালকত্বের সার্টিফিকেট দেবেন। নিন দাদা, চট করে জামাটা গলিয়ে নিন গায়ে।

দরজা বন্ধ করে ভূমিকম্প ঠেকানো যায় না—অমিয়ও দুর্নিবার। পাঞ্জাবীর ওপরে ওয়াটারপ্রুফ চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গলি দিয়ে বেরুতে বেরুতে জিজ্ঞাসা করলাম, এমন বিনা নোটিশে বিয়েটা ঠিক করলে কী করে?

গলির আবছা গ্যাসের আলোয় গোয়েন্দা কাহিনীর নায়কের মতো হাসল অমিয়ঃ নোটিশ তো আপনাকে আগেই দিয়েছিলাম।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। পায়ের ঠোকর খেয়ে একটা ছুঁচো চিক চিক করে উঠল। গভীর সন্দেহে আমি বললাম, মানে?

—আপনার কাছে এলাম অ্যাডভাইজের জন্যে, গা করলেন না। অগত্যা ভেবে-চিন্তে এই উপায়টাই বের করে ফেললাম।

—সেই বত্রিশ বছরের বিধবা?—খাবি খেলাম আমিঃ ছেলেপুলে শুদ্ধ?

—হুঁ। সপরিবারে বিয়ে করতে চলেছি।—অমিয়র মুখে সেই নাটকীয় হাসি।

—তুমি কি পাগল হয়েছ অমিয়?

—না দাদা, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

—তুমি সুইসাইড্ করতে চলেছ।

—না, বিয়ে করতে।

রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল ঃ ইয়ার্কির একটা মাত্রা আছে অমিয়। জীবনটা মোহনবাগানের খেলার মাঠ নয়। এ বিয়েয় আমি যাব না।

বাড়ি ফেরবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াব—অমিয় নীচু হয়ে পা জড়িয়ে ধরল আমার। গলায় ফুটে বেরুল কান্নার স্বর।

—আমার আর ফেরবার পথ নেই দাদা। গাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে ওকেও বসিয়ে রেখে এসেছি। ছেলেটাকে রেখে এসেছি ওর দূর সম্পর্কের এক বোনের কাছে। এ বিয়ে আজ হতেই হবে। শুধু আমার কথাই ভাববেন না—ওর দিকটাও দেখুন একবার।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় দুলে উঠল মন। একবার ভাবলাম, জোর করে পা ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরে যাই বাড়িতে। কিন্তু গ্যাসের আলোয় অদ্ভুত করুণ আর আর্ত মনে হল অমিয়র চোখ। এমন চোখ ওর কখনো আমি দেখিনি।

যা থাকে কপালে। বললাম, চলো তবে।

বড় রাস্তায় ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। সামনে ড্রাইভারের পাশে দুটি অমিয়র বয়সী ছেলে—ওদের আমার চেনা নেই। পেছনের আবছায়া অন্ধকারে একটি মেয়ে বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। ভালো করে তাকে দেখা যাচ্ছে না—একটুখানি লাল শাড়ী আর গলায় সরু সোনার হারের আভাস পাওয়া যাচ্ছে শুধু।

অমিয় বললে, শেফালী ব্যানার্জি। শেফালী মিত্র হতে চলেছেন আজ। আর—ইনি সুকুমারদা।

একটা ভীরু স্বর শোনা গেল, নমস্কার। দু'খানা সরু হাত উঠল কপালে।

অমিয় বললে, উঠুন দাদা।

—তুমি ওঠো আগে।

—আপনি উঠুন না দাদা। বৌমা—লজ্জা কী!

আমার চাইতে বড়ই হবেন ভদ্রমহিলা—বৌমাই বটে! ঠাস্ করে একটা চড় বসাতে ইচ্ছে করল অমিয়ের গালে। কড়া গলায় বললাম, পাকামি করতে হবে না—ওঠো।

অমিয় উঠল। পাশে উঠে বসে আমি দরজা টেনে দিলাম।

ট্যাক্সি চলল। সামনের ছেলেদুটি সিগারেট ধরিয়ে চাপা গলায় কী বলাবলি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম—বাদুড়ের ডানার মতো নিয়মিত ছন্দে স্ক্রীনের ওপর কিভাবে সঞ্চালিত হচ্ছে ওয়াইপার দুটো, মুছে চলেছে বৃষ্টির বিন্দু।

হ্যারিসন রোড ছাড়িয়ে বর্ষণরিক্ত চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে পড়ল গাড়ি। আমি স্তব্ধতা ভাঙলাম।

—কতদূরে?

—বাগবাজার।

—কলকাতায় আর কি ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ছিল না? একেবারে বাগবাজারে যেতে হল?

অমিয় আমার কানের কাছে ঝুঁকে পড়লঃ একটু অবস্কিয়োর জায়গাই ভালো। নইলে ওরা টের পেতে পারে।

—কারা?

—দেওরেরা। শুনলাম, ছোরা নিয়ে ঘুরছে লোক। বিয়ে বন্ধ করবে।

আতঙ্কে রক্ত চলকে উঠল আমার ঃ অমিয়!

—কিছু ভাববেন না দাদা। আমি সঙ্গে আছি, আঁচড়টিও লাগতে দেব না আপনার গায়ে।

—কিন্তু একি সর্বনাশের মধ্যে পা দিয়েছ তুমি! সাপ নিয়ে খেলা করছ?

—আমার উপায় ছিল না।

উপায় ছিল না? আমি কী একটা চীৎকার করতে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার খেয়াল হল। মনে পড়ে গেল, আমার কাছ থেকে মাত্র হাত দেড়েক দূরেই অন্ধকারে ছায়ার মতো মিলিয়ে আছে মেয়েটি। তাকে আমি চিনি না, তার মুখ আমি এখনো দেখিনি। আষাঢ়ে গল্পের মতোই বর্ষা রাত্রির এই যে নাটক—সেই-ই তার নায়িকা। অমিয়ের চাইতে সে আট-দশ বছরের বড়—জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার স্তরগুলো পার হয়েছে সে, সে মা; তবুও কেন যে এই ক্ষ্যাপামির খেয়ালে সে সম্মতি দিয়েছে নিশ্চয় একটা যুক্তিসম্মত কারণ আছে তার। এমন একটা কিছু সে নিশ্চয় অমিয়র মধ্যে পেয়েছে—যা আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি; অমিয়র সমস্ত তরলতার ভেতরেও এমন কোনো প্রত্যয়ের ভিত্তি পেয়েছে—যেখানে দাঁড়াতে পারে নিশ্চিন্ত হয়ে।

ছায়াময়ী মেয়েটির সেই দুর্জ্ঞেয় মনের কল্পনা করে আমি আর কথা খুঁজে পেলাম

না। গাড়ি চলল। বৃষ্টির কুয়াশা-ছাওয়া ম্লান আলোয় গ্রে স্ট্রীটে এল—ধরল চিৎপুর, পার হল কুমারটুলী, তারপর বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে একটা অপরিচ্ছন্ন গলিতে পড়ল। ধীরে ধীরে এসে থামল প্রায় পোর্ট কমিশনারের লাইনের কাছাকাছি। একটি তেতলা বাড়ির দরজায় গাড়ির আলোয় পড়া গেল ঃ এস্ কে সোম, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার।

—নামুন দাদা, এসে গেছি।

আমরা চারজনে নামলাম। মেয়েটি বসে রইল গাড়িতেই।

কড়া নাড়তে আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে দরজা খুলে দিলে। বললে, বসুন—বাবাকে খবর দিই।

অফিসঘর। টেবিল-চেয়ার-আলমারী-বই-পত্র। একটা বোর্ডের ওপর আট-দশখানা নোটিশ ঝুলছে। সিভিল-ম্যারেজ প্রার্থী আর প্রার্থিনীদের আবেদনপত্র। বিয়ের সময় আর তারিখ তাতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা বসে রইলাম চুপ করে। পেছনে শাড়ী আর চুড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল—হাওয়ায় ভেসে এল পাউডারের মৃদু গন্ধ ছাপিয়ে ন্যাপথালিনের উগ্রতা। পনেরো বছর পরে হয়তো বাক্স থেকে বিয়ের শাড়ী বের করে এনেছে মেয়েটি। কিন্তু সেই সতেরো বছরের প্রথম পক্ষের মতো মনটিকেও কি সে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে কোনো ন্যাপথালিন দিয়ে? সেদিনের সেই আশ্চর্য আস্বাদনটিকে আজো কি আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে সে?

পেছনে একটা চেয়ারে বসেছে মেয়েটি—তার নিশ্বাসও শুনতে পাচ্ছি আমি। ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হল—কিন্তু কেমন সংকোচ বোধ হল যেন।

সেই ছেলেটি আবার ফিরে এল।

—ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর-জ্বর হয়েছে বাবার। ওপরে যেতে বললেন আপনাদের।

গেলাম। ঠিক আমার পেছনেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল একটা ভীরু জুতোর শব্দ, শাড়ীর আওয়াজ—ন্যাপথালিনের গন্ধ। পনেরো বছর আগে বধূবেশে কেমন করে বাসরে এসেছিল মেয়েটি? কোন্ শঙ্খে, কোন্ উৎসবে, কোন্ হুলুধ্বনিতে? নোয়াখালির সুদূর শান্ত আকাশে কোন্ সপ্তর্ষি উঠেছিল সেদিন? কারা মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলঃ যদিদং হৃদয়ং তব—

আর আজ?

রেজিস্ট্রার ডাকলেন ঃ আসুন—আসুন—নমস্কার।

খাটের ওপরে বালিশে হেলান দিয়ে বসে-ছিলেন প্রৌঢ় প্রিয়দর্শন মানুষটি। ক্ষমা চেয়ে বললেন, আমি অসুস্থ, নীচে যেতে পারিনি। শুভ কাজটা এইখানেই শেষ করে ফেলা যাক বরং।

খানকয়েক চেয়ার সাজানোই ছিল, আমরা বসলাম।

আর এইবার আমি শেফালী ব্যানার্জিকে দেখলাম—আজ রাতে যে মিত্র হতে চলেছে। মাথা নীচু করে বসে আছে সে। পনেরো বছর আগে তাকে নিঃসন্দেহে সুন্দরী বলা যেত—পনেরো বছর আগে হলে অভিনন্দন জানানো যেত বইকি অমিয়কে। কিন্তু আজ? দীর্ঘ বৈধব্য। সংযম আর অন্তর্দহনে একটা রুক্ষ কঠিন রূপ নিয়েছে শরীর—গালে-মুখে লালিত্যের তরঙ্গগুলো বয়সের ভাঁটার টানে নেমে গিয়ে পার্বত্য উপকূলের মতো জাগিয়ে তুলেছে অস্থিবলয়। পাউডারের অবলেপে আরো কুশ্রী দেখাচ্ছে তাদের। সংস্কৃত কবিদের ভাষায় আজো সে সুভ্রূ, কিন্তু ভ্রূর নীচে একদা-উজ্জ্বল চোখদুটি আজ তিমির-স্তব্ধ। গাঢ় লাল রঙের শাড়ী—গয়নার সোনালি ঝিলিক—সব কিছুই একান্ত বেমানান। মনে হল, এর চেয়ে বৈধব্যের শুভ্রতাতেই তার সামঞ্জস্য বজায় থাকত বেশি।

রেজিস্ট্রার প্রতিজ্ঞাপত্র মেলে ধরলেন।

—তোমার বয়স কত?

অমিয় বললে, পঁচিশ।

—মা, তোমার?

আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মেয়েটি দ্বিধাহীন গলায় বললে, বত্রিশ।

রেজিস্ট্রার যেন চমকে উঠলেন একবার। চোখ বুলিয়ে নিলেন দুজনের ওপর দিয়ে। কিন্তু এ রকম আরো অনেক অভিজ্ঞতাই হয়তো তাঁর আছে। তাই সামলে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

শান্ত গলায় বললেন, ও। তাহলে তোমরা দুজনেই সাবালক।—একজনকে সাবালিকা বলা উচিত ছিল, হয়তো ঘাবড়ে গিয়েই বলতে পারলেন না।

তারপরে চলল বাঁধা প্রতিশ্রুতির পুনরা-বৃত্তি। এল ফর্ম। অমিয়র পাশে একটা কাঁচা ইংরেজি সই পড়লঃ শেফালী ব্যানার্জি। আমরা তিনজনে সাক্ষীর স্বাক্ষর রাখলাম।

অফিশিয়াল রীতিতে নয়—বাঙালি কায়দায় দুজনের হাত মিলিয়ে দিলেন রেজিস্ট্রার। হাজারবার হাজার জনকে বলেছেন হয়তো, তবু আজ তাঁর গলায় যেন আবেগের রেশ কাঁপল একটা ঃ সুখী হও—সুখী হও তোমরা।

রেজিস্ট্রারকে প্রণাম করল ওরা— ফীয়ের খামটা রাখল পায়ের কাছে। তারপর আবার আমরা পাঁচজন বেরিয়ে এলাম বাড়ির বাইরে।

অন্ধকারে ট্যাক্সিটা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। মীটারে বারো টাকা চার আনা।

অমিয় বললে, একটু চলুন দাদা। একটা হোটেলে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। সামান্য প্রীতিভোজ।

বললাম, মাপ করো ভাই—বাড়ি থেকে খেয়েই আমি বেরিয়েছি। তোমরা চলে যাও—আমি চিৎপুর রোড থেকে বাস ধরব। সাড়ে দশটা বাজেনি এখনো।

—সে কি দাদা! আমি পৌঁছে দিই—

—না, না, কিছু দরকার নেই।—আমি দ্রুত পা চালালাম।

—তবে ট্যাক্সি ভাড়াটা—

—ক্ষেপেছ নাকি অমিয়?—একটা ধমক দিয়ে আমি এগোলাম। আবার বৃষ্টি নামছিল—পরে নিলাম বর্ষাতিটা।

অমিয় ডেকে কী একটা বলছিল, হয়তো এগিয়ে দিতে চাইছিল রাস্তা পর্যন্ত। কিন্তু আর আমি ফিরে তাকালাম না। সমস্ত জিনিসটাই যেন আমার স্নায়ুর ওপরে একটা কঠিন ভারের মতো চেপে বসেছিল—কেমন চাপ পড়ছিল হৃৎপিণ্ডের ওপর। ওদের কাছ থেকে এখন দূরে পালানো দরকার। বড় রাস্তায় এসে বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় আমার পাশ দিয়েই ওদের ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল। এবারেও আমি মেয়েটির মুখ দেখতে পেলাম না। কিছু-ক্ষণের জন্যে আলোতে উদ্ভাসিত হয়েই আবার সে তার ছায়ার আশ্রয়ে নিলীন হয়ে গেছে।

—একি! তোমরা! এসো—এসো—ওপরে উঠে এসো—

কুন্তলার অভ্যর্থনার আহ্বান। আমার ঘরে বসে তখন আমি ম্যাট্রিকের খাতা দেখ-ছিলাম। অভ্যর্থনার চোটে বানান-ব্যাকরণের প্রেতলোক থেকে চোখ তুললাম।

অমিয়। সস্ত্রীক। এবং স-শিশু!

ম্যাট্রিকুলেশনের বাংলা খাতার চেয়েও যে বিভীষিকা সংসারে আছে সে দৃশ্য এই প্রথম দেখলাম আমি। অমিয়র মুখে দিন চারেকের দাড়ি। শৌখিন ফিটফাট অমিয়কে চেনবার উপায় নেই আর। গায়ে একটা বিবর্ণ বুশশার্ট—পরনের ট্রাউজারটা রাতে ঘুমুনোর একটা মলিন পায়জামার মতো আকারহীন। কোমরে কার্টুন ছবির মতো মস্ত মাথাওলা ক্ষীণদেহ একটি শিশু—গায়ের লাল ফ্রকটার ওপরে অনর্গল গড়িয়ে পড়ছে মুখের লালা। রিকেটস। ডিফর্মিটি। সেই জাতের শিশু—যাকে দেখে অনুমান করা যায় না বয়েস সাত বছর, না সাত মাস!

আর—আর পেছনে সেই মেয়েটি। এক মাস আগেকার বিবাহ-রাত্রির সে ছায়াচ্ছন্নতা নেই—সেই ক্ষণিক উদ্ভাসও নেই। সম্পূর্ণ নিরাবৃত হয়ে গেছে দিনের তীক্ষ্ন নগ্ন আলোতে। ধুলো-ভরা জীর্ণ একটা পুরোনো ফুলদানির মতো চেহারা। কুশ্রী

মেয়ে আরো কুশ্রী হয়ে গেলে খারাপ লাগে না—কিন্তু সুন্দরের শ্মশান অসহ্য।

প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে আমি বললাম, বোসো অমিয়—বোসো তোমরা।

ওরা বসল। কাঁধ থেকে নামিয়ে রিকেটি ছেলেটাকে কোলের ওপর বসালো অমিয়। সে তখন একমনে কী একটা চুষে চলেছে—খুব সম্ভব একটা কাঠি-লজেন্সের ধ্বংসাবশেষ। লালার একটা আঠালো ধারা তেমনি গড়িয়ে পড়ছে ফ্রকের ওপরে।

শেফালী বললে, দাও—দাও, ছেলেটা আমার কোলে দাও।

ছেলেটার প্রায়-ন্যাড়া মস্ত মাথাটাতে অসীম স্নেহে আঙুল বুলিয়ে দিলে অমিয়। বললে, থাক না—বেশ তো আমার কোলে বসে আছে। বৌদি, আপনাকে আমার বউ দেখাতে আনলাম। আর এ আমার ছেলে—চার বছরে পড়ল!

কুন্তলার হাতে তখনো একটা জাঁতি, বোধ হয় সুপুরী কাটছিল। 'আমার ছেলে' কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাঁতিটা খচ্ করে পড়ল তার বুড়ো আঙুলের ওপর।

—ও-কি! ও-কি!—অমিয় চেঁচিয়ে উঠল: কাটল নাকি আঙুলটা?

শাড়ীর আঁচলে আঙুল জড়িয়ে কুন্তলা বললে, না না ও কিছু না। বউ এনেছ ভাই, বড় খুশি হয়েছি। বোসো—তোমাদের জন্যে চা করে আনি।

চলে গেল। পালালো নিঃসন্দেহ। ওর দোষ নেই—পালাতে পারলে আমিও বাঁচতাম। এক মাস মাত্র বিয়ে হয়েছে—এরই মধ্যে চার বছরের একটা রিকেটি ছেলের বাপ অমিয়! এবং সে ছেলের দিকে তাকালে করুণায় অন্তর গলিত হওয়া তো দূরের কথা ঘৃণায় সারা শরীর শিউরে উঠতে থাকে! আমি ভাবলাম, জীবনটা কি আজো ওর কাছে মোহনবাগানের খেলার মাঠ! মোহনবাগান গোলই খাক কিংবা গোলই দিক কিছুই ওর আসে-যায় না!

শেফালী আবার বললে, দাও না ছেলেটাকে আমার কোলে।

কেমন উগ্র দৃষ্টিতে তাকালো অমিয়—ওর চঞ্চল চোখদুটো হঠাৎ একটা চাপা উত্তেজনায় স্থির হয়ে এল: কেন? আমার কোলে থাকলে তোমার কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?

আচমকা বেসুর বাজল নিভে গেল শেফালী। ভাঙা মুখটাকে আরো ভাঙাচুরো মনে হল। মনে হল: অমিয়র সঙ্গে ওর বয়েসের ব্যবধানটা সাত আট বছরের নয়—কুড়ি বছরেরও বেশি।

আবহাওয়াটা তরল করার জন্যে বললাম, বোধ হচ্ছে ও তোমাকেই বেশি পছন্দ করে।

অমিয় অপরিমিত খুশি হয়ে উঠল: যা বলেছেন। আমার হাতে ছাড়া আর কারো হাতে খায় না আজকাল—আমাকে একদণ্ড বাড়িতে না দেখলে কেঁদে অনর্থ বাধায়। ছেলেটা আমার বড় হলে মানুষের মতো মানুষ হবে—কী বলেন?

কুন্তলা ঘরে ঢুকছিল, থমকে দাঁড়িয়ে গেল দোর গোড়ায়। বুড়ো আঙুলে একটা ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ।

অমিয় বলে চলল, যত দুঃখ-কষ্ট হোক—ওকে আমি বড় করে তুলব। সন্তান মানুষ করার দায় অনেক দাদা। শুনেছেন বোধ হয়, বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন?

শুনিনি। কিন্তু আন্দাজ করা শক্ত নয়। আমি বাবা হলে এ রকম গুণী ছেলেকে শুধু তাড়িয়ে দিতাম না—জেলে দিতে চেষ্টা করতাম। নিদেনপক্ষে কাঁকের মেণ্টাল হসপিট্যালে।

তবু বলতে হল, তাই নাকি! ভারী অন্যায়!

শেফালী বসে রইল মুখ নীচু করে। জল দুলছে চোখের কোলে। কিন্তু অমিয় নিরঙ্কুশ। ছেলেটার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে চলল, তাতে ভারী বয়ে গেছে আমার। আমিও জীবনে সীরিয়াস হতে পারি—হতে পারি সেলফমেডম্যান। এই এক মাস যে বস্তিতে রয়েছি—কী হয়েছে আমার? তেতলার ঘরে পাখার হাওয়া না জুটলেই কি জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে? বেঙ্গল কেমিক্যালে একটা চাকরিও হব-হব করছে। আমার কিসের ভাবনা?

নিঃসন্দেহ। ভাবনার কিছুই নেই।

দেওয়ালে কুন্তলার সেতারটা ঝুলছে। সেদিকে চোখ পড়ল অমিয়র। সঙ্গে সঙ্গে বদলে ফেলল প্রসঙ্গটা।

—বৌদি বুঝি সেতার বাজান? শেফালীর গান শোনাব একদিন।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা বিহ্বল কুন্তলা কথা খুঁজে পেল এতক্ষণে।

—শেফালী, গান জানো নাকি? শোনাও না তাহলে। হার্মোনিয়াম আছে বাড়িতে।

শেফালীর চোখে যেন মুক্তির আলো ঝিকমিক করে উঠল। আগ্রহভরা মৃদু গলায় বললে, বেশ তো।

কুন্তলা হয়তো পাশের ঘর থেকে হার্মোনিয়ামই আনাতে যাচ্ছিল, থেমে গেল অমিয়র ডাকে।

—না—না বৌদি, আজ নয়। আজ ওর গলা খারাপ।

শেফালী বললে, তাতে কিছু হবে না।

—হবে না মানে? তোমার গলায় ফেরিঞ্জাইটিস্ হয়েছে—খেয়াল আছে? ডাক্তার কী বলেছে—ভুলে গেলে? অমিয় বললে।

কিছু মনে করবেন না বৌদি—সময় হলে ও-আপনিই এসে গান শুনিয়ে যাবে।

শেফালী আর কিছু বললে না। শুধু আহত পশুর মত বিমূঢ় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল দেওয়ালের সেতারটার দিকে। লজেন্সের কাঠিটা মেজেতে ফেলে দিয়ে হঠাৎ ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে উঠল ছেলেটা। অমিয় বললে, ষাট—ষাট! মাণিক আমার—লক্ষ্মী আমার—

—চায়ের জলটা ফুটে গেছে বোধ হয়—কুন্তলা অন্তর্ধান করল। পালালো ঊর্ধ্বশ্বাসে।

এর কিছুদিন পরে আবার দেখা রাস্তায়।

টাঁকে সেই শিশু—একটু কাত হয়ে হাঁটছে অমিয়। পরনে ধুতি আর লংক্লথের পাঞ্জাবী। পায়ের চটিতে বোধ হয় পেরেক ফুটেছে—চলেছে অল্প অল্প লাফানোর ভঙ্গীতে। পেছনে অর্ধগুণ্ঠিতা শেফালী।

—কোথায় চলেছ অমিয়?

—থিয়েটার দেখতে। একটা বেড়ে বই হচ্ছে দাদা। পুরোনো হলেও খাসা। 'পাণ্ডব-গৌরব'।

থিয়েটার! পাণ্ডব গৌরব! চৌরঙ্গী-পাড়ার সিনেমা ছাড়া আর কোনো জায়গায় বসে ভদ্রভাবে ছবি দেখা যায়না—এক অমিয় মিত্র বলত সেকথা। লোকটা সত্যিই মারা গেল নাকি?

অমিয় বললে, চলি দাদা। ছটা প্রায় বাজে।

আমি আর একবার দেখলাম শেফালীর চোখ। হঠাৎ প্রশ্ন জাগল: 'পাণ্ডব গৌরব' কি খুব কান্নার বই? আর তারই জন্যে কি আগে থেকে মহলা দিয়ে নিচ্ছে শেফালী?

চরম বিস্ময়কর খবর এল মাস ছয়েক পরে। আমাদেরই তাসের আড্ডায়।

অমিয় অফিসে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে বাড়ি থেকে পালিয়েছে শেফালী—তার রিকেটি ছেলেটা শুদ্ধু। কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। অমিয় প্রায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। খালি বলছে, উঃ ভাইপার—ভাইপার! ওর মনে এই ছিল!

সে আজ চার বছর হয়ে গেল। এখন অমিয় বোম্বাইতে—কী একটা ফিল্ম-স্টুডিয়োতে নাকি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়েছে। আর আজ আমার হাতে এল এই চিঠি—শেফালী মিত্রের খবর।

আমি থামলাম।

রাত সাড়ে বারোটা। তারা ভরা আকাশ। দূর থেকে গঙ্গার হাওয়া ছাতের যুঁই-ফুলগুলোর ওপরে সমানে ডাকাতি করে চলেছে। বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছিল কিনা জানিনা—হঠাৎ উঠে বসল সোজা হয়ে।

হাতের নেভা চুরুটটা ছুড়ে ফেলে দিলে দূরে।

—হুঁ, মন্দ লাগল না। তা গল্পের শেষটা তো চাই।

বললাম, হয়তো কাল সকাল সাতটায় সেটা পাওয়া যাবে। তাও জোর করে বলা যায়না। জীবনের সত্যি গল্পগুলোর রস সমাপ্তিতে নয়—অসমাপ্তিতে। শেষ হয়ে গেলেই তার আর জীবন থাকে না—গল্প হয়ে দাঁড়ায়।

একটা হাই তুলে বন্ধু উঠে দাঁড়াল।

—অচ্ছা, দেখা যাক।

* * *

বাজারের দক্ষিণে ব্রিজলাল রোড। তার বাঁ দিকে হলদে রঙের বাড়িটা। গেটের একধারে হিন্দী আর একদিকে ইংরেজিতে লেখা নাম। হরদেও নিবাস।

কিন্তু এতটা দেখবারও দরকার ছিল না। গেটের সামনে আমার অপেক্ষাই করছিল শেফালী। চওড়া লাল পাড়ের শুভ্র শাড়ী —কপালে সিঁদুরের টীপ। দুহাতে একগাছা করে চুড়ির সঙ্গে শুভ্র শঙ্খ-বলয়। চার বছর আগেকার সেই অমানান প্রসাধন নেই—সেই বৈধব্যের রিক্ততাও নয়। একটা চমৎকার সামঞ্জস্য করে নিয়েছে। বয়েসের নির্ভুল ছাপ ধরা শরীরে এইটেই ভালো হয়েছে সব চেয়ে।

রিকসা থেকে নামতেই শেফালী এগিয়ে এসে আমার পায়ের ধুলো নিলে মাথায়। পিছিয়ে যেতে পারলাম না—নিতে হল প্রণাম।

—ভালো আছেন দাদা? বৌদি?

—সবাই ভালো আছি।

—ভেতরে চলুন।

ছোট একটি বসবার ঘর। খানকয়েক চেয়ার-টেবিলের ওপরে সুতোর কাজ করা নীল রঙের টেবল-ক্লথ।

—বসুন দাদা।

বসলাম। সর্বপ্রথম প্রশ্নটা এতক্ষণ পরে করলাম এইবারঃ তুমি কী করো এখানে?

—একটা মেয়েদের স্কুলে সেলাই শেখাই, গান শেখাই। গোটা আশী টাকা মাইনে দেয়। চলে যায় একরকম।

রিকেটি ছেলেটার কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, থমকে গেলাম। একটু দূরে টিপয়ের ওপর ফোটো স্টাণ্ডে ছোট একখানি ছবি। আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করল শেফালীঃ খোকা চলে গেছে।

—চলে গেছে? —কী সুরে কথাটা যে বললাম জানি না। আমি কি ব্যথা পেলাম? আমি কি খুশি হলাম?

—হয়তো ওঁরই জন্যে! —শেফালীর মৃদু শ্বাস পড়লঃ ওঁর কাছ থেকে চলে আসার 'শক'টা হয়তো সইতে পারল না। কিন্তু ও তো এমনিই বাঁচত না। দু দিন আগে আর পরে।

প্রথম দিন কুন্তলা যেভাবে শেফালীকে দেখে পালিয়েছিল, সেইভাবে পালালো শেফালী। ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। হাতে একটা খাবারের প্লেট।

—নিন্।

—আর তুমি?

—সকালে আমি তো কিছু খাইনা দাদা। চা খাব আপনার সঙ্গে।

আর কিছু করবার না পেয়ে খাবারের প্লেটেই মন দিলাম আমি। চুপ করে দেখতে লাগল শেফালী।

—আর একটা মিষ্টি দিই? খুব ভালো এখানকার বালুসাই—

—না—না, আর দরকার নেই।

যেন কোনো অর্ধপরিচিত বাড়িতে সামাজিক নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছি—এইভাবেই খেয়ে চললাম। ভেতর থেকে শুধু একটা স্টোভের আওয়াজ আসছে একটানা। আমার একটা ব্রাউনিংকে মনে পড়ল—মনে পড়ল একটা অচেনা সমুদ্রের তীরকে।

শেফালী আবার উঠে গেল—একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিভে গেল স্টোভ। চায়ের পেয়ালার আওয়াজ—দুধের টিনের শব্দ। খাবারটা শেষ করে আমি তেমনি চেয়ে রইলাম ছবিটার দিকে। খোকা চলে গেছে। একটা ডিফর্মড রিকেটি শিশু। ফ্রকটার ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে লজেন্সের লালা। আমি কি খুশি হয়েছি? আমি কি ব্যথা পেলাম?

সময়। ব্রিজলাল রোডে ভোঁপ ভোঁপ করে সাইকেল রিকসার ভেঁপু বাজল। কোথায় রেডিয়োতে হিন্দী খবর বলছে। সময়। পাশের ঘরে চায়ের পেয়ালায় চামচের আওয়াজ। আমি কি কিছু জিজ্ঞাসা করব শেফালীকে? অনেক কথা বলবার আছে ওর। ও নিজেই বলবে।

শেফালী এল। চা রাখল টেবিলে। বসল মুখোমুখি। এইবার বলবে ওর কথা। তারি জন্যে সমস্ত আবহাওয়াটা প্রস্তুত হয়ে আছে।

কিন্ত আমি উত্তর দেব, না শেফালী? চায়ে চুমুক দিয়ে একটা লঘু জিজ্ঞাসা ছেড়ে দিলেঃ আমি চলে আসাতে উনি কি খুব দুঃখ পেয়েছেন?

—সেইরকমই শুনেছিলাম।

শেফালী চুপ করে রইল। চামচেটা নাড়তে লাগল পেয়ালার ভেতরে।

—ওঁকে বাঁচানোর জন্যেই আমাকে পালাতে হল।

দৃষ্টি তুলে ধরলাম আমি।

—কী করব বলুন? —শেফালী উত্তেজিত হয়ে উঠলঃ ওঁর যৌবনের শক্তিতে আমি নিজেকে ফিরে পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম কী মারাত্মক ব্যাধি আমি বয়ে এনেছি! আমার জড়তা—আমার জরা। এর চাইতে সংক্রামক বুঝি সংসারে আর কিছুই নেই!

থিয়েটার! 'পাণ্ডব গৌরব'! একটা অর্থ যেন ধরা পড়তে লাগল আমার কাছে।

—প্রতি মুহূর্তে মনে পড়িয়ে দিতে লাগলেন, ওঁর যৌবনে আমাকে দীক্ষা দেননি—পাঠ নিয়েছেন আমারই বার্ধক্যের। উনি আমাকে জয় করেননি—হার মেনেছেন আমার কাছে। নইলে ভাবতে পারেন—আমার ওই রুগ্নী বিকলাঙ্গ ছেলেটা, তার ওপরে কেন ওঁর অমন সস্নেহ দৃষ্টি? যাকে মা হয়ে আমারই ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয়েছে—তাকে উনি আঁকড়ে ধরেছেন অমনভাবে? একবারও ভুলতে পারেননি আমার বয়েস হয়েছে, আর আমার সঙ্গে ছন্দ মেলাবার জন্যে বাড়িয়ে নিয়েছেন মনের বয়েস? এই দুর্ঘটনা—এতবড় ট্র্যাজেডি —একি আমি সহ্য করতে পারি?

আমি বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলাম। কোটর-গত চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে শেফালীর। পাংশু মুখে রক্তের আভা। এই মুহূর্তে কুড়ি বছর বয়েস কমে গেল নাকি ওর?

বলতে চেষ্টা করলামঃ হয়তো তোমাকে খুশি করার জন্যে—

—অভিনয়?—শেফালীর চোখ আরো জ্বলন্ত হয়ে উঠলঃ তাই যদি হয়—তাহলে অতবড় মিথ্যাকেই বা আমি বইতাম কী করে? —শেফালীর গলার আড়াল থেকে যেন আর কেউ কথা কইতে লাগলঃ জানেন সুকুমার দা—ওঁর কাছ থেকে পালিয়ে না এলে একদিন হয়তো ওই রিকেটি ছেলেটার গলা টিপে খুন করতে হত আমাকেই!

শিউরে উঠে আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম। সময়। শব্দহীন। রেডিয়োর আওয়াজ নেই—সাইকেল রিকসার সাড়া নেই। কী বলব ফিরে গিয়ে বন্ধুকে? একটা গল্পের শেষ?

না, আর একটা গল্পের সূচনা?
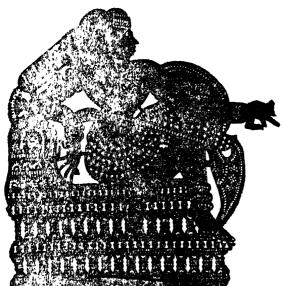
দক্ষিণ ভারতের ছায়ানাট্য

শান্তিদেব ঘোষ

সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্র

ছায়ানাটক বলতে আমরা যাভা ও বালিদ্বীপে প্রচলিত নাটকের কথাই বিশেষ করে শুনে থাকি। এর কারণ হল ঐ দুই দেশে ধনী দরিদ্র সকলের মধ্যেই ছায়ানাটকের চর্চা আছে, আজও তারা তা দেখে আনন্দ উপভোগ করে। এছাড়া ঐ ছায়ানাটক নিয়ে সে দেশের ও বিদেশের পণ্ডিতেরা এত বিস্তারিত আলোচনা ও অনুশীলন করেছেন যে, তাদের সেই বই পড়েই আমরা সব খবর পেতে পারি।

ভারতের ছায়ানাটক নিয়ে এ ধরণের আলোচনা ও অনুশীলন আজ পর্যন্ত হয়নি। ইদানীং সবেমাত্র জানা যাচ্ছে যে, ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ঐরূপ নাটকের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এ যুগে সেইসব দেশের শিক্ষিতদের মধ্যেও তার খবর নেই। প্রাচীন নাট্যকলার দলে এরও যে একদিন বিশেষ স্থান ছিল সেকথা আজ সকলেই ভুলেছে। এখন একদল দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে এই শিল্প প্রচলিত বলে শহরের শিক্ষিতরা এর শিল্পগত মর্যাদা পর্যন্ত স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করে।

ভারতের ছায়ানাটক নিয়ে পণ্ডিতমহলে কোন আলোচনা না হওয়ার দরুণ ভারতের বাইরে, বিশেষ করে যাভা ও বালি অঞ্চলে, পণ্ডিতদের ধারণা, সে দেশের ছায়ানাটকের মধ্যে ভারতের কোন প্রভাব নেই। সেদেশে আলোচনাকালীন এ ধরণের কথা অনেকের মুখেই আমি শুনেছিলাম।

উত্তর ভারতে কোথাও প্রাচীন প্রথার ছায়ানাটক আছে বলে শুনিনি। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র, কানাড়া, তামিল ও মালাবার প্রদেশের বহু গ্রামে এই নাটক সুপরিচিত। এখনো তার অভিনয় দেখানো হয়। গ্রামবাসীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ঐ ছায়ানাটক আজও দেখছে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে ছায়ানাটক ছিল তার নাকি উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ কোথাও নেই। 'অশোক শাস্ত্রী মহাশয় বছর কয়েক আগে এ বিষয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন এক প্রবন্ধে; কিন্তু পরিষ্কার করে কিছুই বলতে পারেননি। তিনি বলেন, মহর্ষি পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ সূত্রের উপর পতঞ্জলি যে মহাভাষ্য লিখেছিলেন, তার এক জায়গায় তিন শ্রেণীর শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। যেমন 'শৌভিক' বা 'শোভনিক', 'গ্রন্থিক' ও 'চিত্রকর'। দেশ বিদেশের কোন কোন পণ্ডিত 'শৌভিক' শব্দের অর্থ করে বলছেন, 'শৌভিক' হল নাট্যাচার্য। আবার কেউ বলছেন মূকাভিনেতা, কেউ বলছেন, মূকাভিনেতাদের ক্রিয়াকলাপ যারা দর্শকদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন তাঁরা। অন্য পণ্ডিতরা বলেন, যারা ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও তার ব্যাখ্যা করে তারাই 'শৌভিক'। 'শাস্ত্রী মশায় আরো বলেন— "মধ্যযুগে আসিলে দেখা যায় যে, 'ছায়ানাট্য' নামে একশ্রেণীর সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য তখনকার দিনে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সংস্কৃত 'ছায়ানাট' ও ইংরাজী 'shadow-play' এক জাতীয় বস্তু নহে। তাঁহার মতে একখানি বড় দৃশ্য কাব্যের অংকদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিরামকালে যে ক্ষুদ্র সংস্কৃত নাট্যের অভিনয় হইত, তাহারই নাম 'ছায়ানাট্য' (entr'acts)।

"মহাভারতের শান্তিপর্বে 'রঙ্গাবতরণ' ও 'রূপোপজীবন' এই দুইটি শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের (১৭শ শতাব্দী) মতে তার অর্থ হইল 'ছায়া সম্পাতের সাহায্যে অভিনয়'। তাঁহার সময়ে দাক্ষিণাত্যে এইপ্রকার অভিনয়ের পারিভাষিক নাম ছিল 'জলমণ্ডপিকা'। একখানি পাতলা কাপড় পর্দার মত করিয়া খাটাইয়া উহার উপর চর্মময় পুত্তলিকার ছায়া ফেলিয়া রাজা, অমাত্য প্রভৃতি নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির কার্যকলাপ প্রদর্শনের নাম ছিল 'রূপোপজীবন'। নীলকণ্ঠকৃত 'রূপোপজীবন' শব্দের ব্যাখ্যা অনেকেই সমীচীন বোধ করেন না।

"অন্ততঃ মধ্যযুগে ভারতে কোন না কোনরূপে ছায়া নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল। আর এখন হইতে অন্তত তিন শত বৎসর পূর্বে ভারতে ছায়া সম্পাতের দ্বারা অভিনয় প্রথা (জলমণ্ডপিকা) খুবই চলিত—ইহাতেও সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।"

প্রাচীন ভারতের ছায়ানাটকের আলোচনার চেষ্টা ত্যাগ করে বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের গ্রামাঞ্চলে ছায়ানাটক কিভাবে দেখানো হয়, তারই একটু বর্ণনা করবো।

দক্ষিণ ভারতের এই চার অঞ্চলের ছায়ানাটক একই দলের হলেও অন্ধ্র ও কানাড়ায় প্রচলিত ছায়ানাটক দেখে মনে হবে যেন একটি আর একটিকে হুবহু অনুকরণ করেছে। ওদিকে তামিলদের প্রভাব মালাবারের ছায়ানাটকে যে পড়েছিল তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে।

মালাবারের ছায়ানাটককে বলে "পারকুট্টু"। কোচিনের গ্রামাঞ্চলের "ভগবতী" ও "ভদ্রকালী"র মন্দিরে এ নাটকের অভিনয় প্রচলিত। বসন্তকাল হল অভিনয়ের উপযুক্ত সময়। তামিলদেশের বিখ্যাত কবি কাম্বারের রচিত রামায়ণের ঘটনা নিয়েই মালাবারের ছায়ানাটক দেখান হয়। মালাবারে বর্তমানে ছায়া নাটক যেভাবে গঠিত এর প্রচারক হলেন "যামানারুল" ও "চতুরা"

নামে দুই ব্যক্তি। এরা তামিল দেশ থেকে কাম্বারকৃত রামায়ণসহ এই ছায়ানাটক এদেশে আনেন। সেই কারণে মালাবারে ছায়া-নাটকের আরম্ভে সব সময় এই দুই ব্যক্তির নাম স্মরণ করা হয়। তামিল ভাষায় 'কাম্বার' কৃত রামায়ণ সেই কারণে আজও মালাবারের ছায়ানাটকের শিল্পীরা গেয়ে থাকে। জনসাধারণ তা অনায়াসে বুঝতে পারে বলেই তার পরিবর্তন করা হয়নি। অন্যান্য গ্রাম্যপ্রচলিত নাটকের মত এই ছায়া-নাটকও সমস্ত রাত ধরে দেখানো হয়। যারা দেখায় তাদের ওরা বলে "পুলাব্বার," অর্থাৎ গীতকার।

ছায়ানাটকের পুতুলগুলি তৈরি হয় পাতলা হরিণের চামড়ায়। গরু বা মোষের চামড়া ব্যবহার নিষিদ্ধ। পুতুলের

ভাঁড়ের ভূমিকায় স্ত্রৈণ পুরুষ-পুতুল। প্রাচীনকালের যোদ্ধার বেশে সজ্জিত, কিন্তু পর্দায় স্ত্রী প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে সর্বাঙ্গ বাঁশপাতার মত কাঁপতে থাকে। পুতুল নাচিয়ের হাতের ছায়া পর্দায় প্রতিফলিত

সাজপোশাক অলংকার রঙের দ্বারা পুতুলের গায়েই আঁকা হয়। এছাড়া ছোট ছোট ফুটোতে এমনভাবে পুতুলের উপর নক্সা কাটা হয় যে, যখন আলোর সাহায্যে পরদার উপর সেগুলির ছায়া পড়ে তখন ফুটোগুলিকে দেখতে মনে হবে তুলির টানের মত। পুতুগগুলি আকারে নানারকমের হয়। কিন্তু সে অঞ্চলে আড়াই ফুটের চেয়ে বড় পুতুলের ব্যবহার নেই। পুতুলগুলি বাঁশের বা কাঠের পাতলা ডান্ডার সঙ্গে আটকানো এবং প্রত্যেক পুতুলের পায়ের দিকে বিঘৎ খানিকের মত ডান্ডাটি বেরিয়ে থাকে। সেইটি ধরেই পুতুলের খেলোয়াড়রা পরদায় পুতুলগুলিকে খেলায়। পুতুলগুলি নানা রঙের দ্বারা চিত্রিত হলেও তার রঙ লাগাবার একটি বিশেষ নিয়ম আছে। যেমন রামের গায়ের রঙ হবে ঘন নীল বা সীতার গায়ের রঙ হবে চাঁপা ফুলের মত।

ছায়ানাটকের জন্যে স্বতন্ত্র একটি "মঞ্চ" থাকে। এটিকে তাদের ভাষায় বলে "কুট্টিমেডুম।" যেখানে 'ভগবতী' ও 'ভদ্রকালী' মন্দিরে ছায়ানাটকের অভিনয় প্রচলিত, সেখানেই মন্দির-সংলগ্ন মাঠে এ ধরণের একটি রঙ্গমঞ্চ থাকবে। বেশির-ভাগ মঞ্চকেই একদিক খোলা চালাঘর বলা চলে। চার-চালা টালির ছাদ এবং সে অঞ্চলের লাল শক্ত মাটির দেয়াল দেওয়া ঘরও অনেক দেখা যায়। নিয়ম হল মঞ্চের মুখ, অর্থাৎ যেদিকে সাদা পরদা খাটানো হয়, তা সব সময়েই দক্ষিণমুখী হবে। দর্শকেরা উন্মুক্ত আকাশের তলে মাটিতে বসে। মঞ্চটির তিনদিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণ দিকে উপর থেকে পাঁচ ফুট চওড়া ও ১৮ ফুট লম্বা সাদা চাদর টান করে বাঁধা থাকে। মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু একটি দেয়াল তোলা হয় চাদরটি যে পর্যন্ত ঝুলে আছে, সেই পর্যন্ত। মঞ্চের সামনে যেদিকে চাদরটি বাঁধা, ঠিক তার মাঝামাঝি নিচ থেকে চালা পর্যন্ত একটি সরু কাঠের থাম দেখা যায়। দেখে মনে হয় উপরের চালটিকে ধরে রাখবার জন্যেই থামটির প্রয়োজন। কিন্তু থামটি আরো একটি কাজ করে। তা হল পরদাটিকে দুই ভাগে ভাগ করার জন্যেই ঐভাবে তাকে রাখা হয়েছে। পরদার ডানদিকে ভিতরে কাঁটার সাহায্যে আটকানো থাকে রামায়ণের গল্পের ভাল পক্ষ। যেমন রাম লক্ষ্মণ সীতা প্রভৃতি, আর বাঁদিকের চাদরে থাকবে রাবণ ও রাক্ষসগণ।

ছায়ানাটকের আরম্ভের আগে নিকটবর্তী মন্দিরে পূজা, দীপারাধনা ও গণপতি পূজা করার নিয়ম। পরে কথক বা গায়ক দলবলসহ একটি শোভাযাত্রাযোগে ঢাক ঘণ্টা বাজিয়ে মন্দির থেকে বের হবে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে, এবং একটি বড় পেটিকায় চামড়ার পুতুল ও রামায়ণের পুঁথিগুলি মাথায় নিয়ে। মন্দিরের ঐ প্রদীপের আলোতেই রঙ্গমঞ্চের প্রদীপ-গুলি জ্বালাবার নিয়ম। পুতুলের খেলোয়াড়রা মন্দির থেকে বেরিয়ে সোজা মঞ্চে প্রবেশ করে না। তিনবার মঞ্চ-গৃহটিকে প্রদক্ষিণ করে। প্রদীপটিকে বাইরে রেখে অন্ধকারে মঞ্চগৃহে প্রবেশ করবার নিয়ম। অন্ধকারেই কিছুক্ষণ ভগবানের বন্দনা গান ও বাজনা বাজাবার পর মন্দির থেকে আনা বাতির আলোতে এক এক করে প্রায় ৪১টি প্রদীপকে জ্বালানো হয়। প্রদীপগুলি মাটির কিম্বা নারকেলের মালায় তৈরি। তাতেই সলতে ও তেল দিয়ে মোটা চেরা বাঁশের উপরে সার করে সাজিয়ে দেয়। গায়ক ও কথকদের মাথার উপরে এমন জায়গায় ঝোলানো থাকে যে, তাদের ছায়া চাদরে পড়তে পারে না। আগেই বলেছি, পর্দার নিচটি চার-পাঁচ ফুট দেয়ালে আড়াল করা আছে বলে পুতুল নাচিয়েদের বাইরে থেকে দেখা যায় না। এরা যে দুটি হাত ব্যবহার করে, তারই ছায়া পরদায় প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

ছায়ানাটকের আরম্ভেই বিশেষ দুটি পুতুলকে পরদার ছায়ায় দেখানোর নিয়ম।

দশানন। চামড়ার উপর রঙ দিয়ে তৈরী পুতুল। যে কাঠির সাহায্যে পুতুলকে পর্দায় চালানো হয় তা সামনে দেখা যাচ্ছে। পুতুলের উচ্চতা ৪′ থেকে ৭′

এরা হল পুতুলের ব্রাহ্মণ। এরা ছায়া-নাটকে প্রাচীন ভারতীয় নাটকের সূত্রধারের মত কাজ করে। প্রথমে এসেই গণেশের বন্দনা গান করবে, অভিনয়ের বিঘ্ননাশের জন্যে। তার পরে বারে বারে এসে সমগ্র নাটকটির খেই ধরিয়ে দেওয়া হল এদের প্রধান কাজ। আর আরম্ভে আগের দিনে কি নিয়ে অভিনয় হয়েছিল, সেকথাও তারা বলে দেয়।

ছায়ানাটকের কথকরা গায়কদের, যাকে ওরা বলে 'পুলাব্বার', রামায়ণ মহাভারত ও নানাবিধ শাস্ত্র বিষয়ে সুপণ্ডিত হতে হয়। ঐসব প্রাচীন সাহিত্যের যাবতীয় বিষয় তাঁদের নখদর্পণে। তামিল ভাষায় রামায়ণ গান করলেও নানারূপ কথাবার্তায়

ঠাট্টা-তামাসায় এরা যে রকম উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাতে এদের ক্ষমতার তারিফ না করে পারা যায় না। নিজেরাই নানারূপে নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করে তাদের অভিনয়কে আরো মধুর করে তোলে। নিয়ম হচ্ছে পরদার পুতুলগুলির চরিত্রানুযায়ী পিছন থেকে কথক বা গায়কেরা সেই স্বরে ও ঢঙে কথা বলবে। এইভাবে পুরো রামায়ণের গল্প শেষ করতে অনেক রাত্রি দরকার হয়। যে রাত্রে রাবণ-বধের পালা শেষ হবে, তার পরের রাত্রিতে কোন অভিনয় হয় না। দিনের বেলা গোবর-জল দিয়ে মঞ্চকে লেপাতে হবে, মন্দিরের মণ্ডপে জল ছেটাতে হবে ও সাদা পরদাটি জলে ধুতে হবে। পরেরদিন মন্দিরে মহাভোজের আয়োজন। রাত্রে রামের রাজ্যাভিষেক পালা। এই দৃশ্য শেষ হলে পরে পরদিন রাম-সীতার পুতুলকে মালা পরিয়ে শোভাযাত্রা বের করে।

ছায়ানাটকের পুতুলগুলির চালচলনে খুব একটা বৈশিষ্ট্য দেখি না। সহজভাবেই নড়েচড়ে বেড়ায়। কেবল যুদ্ধের দৃশ্যে নড়নচড়নে বৈচিত্র্য ও কলাকুশলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। তবুও গায়কের গান, কথাবার্তা, ছায়াদৃশ্য ও বাজনার ছন্দে মিলে একত্রে দর্শকদের মনের উপরে বেশ একটা মধুর ছাপ রেখে যায় এবং কল্পনায় মনে ছবি আঁকবার যে অবসর দেয়, তারও মূল্য কম নয়।

মালাবারের মত ছায়ানাটক বংশগত ব্যবসা হিসেবে চলে আসছে অন্যখানেও। তবে অন্যত্র মালাবারের মত কোন বিশেষ মন্দিরের সঙ্গে তা যুক্ত নয়। বায়না নিয়ে পুরুষ মেয়ে শিশু সমেত এইসব পরিবার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় অভিনয় দেখিয়ে। এরা নিজেরাই অভিনয়ের আগে বাঁশের খুঁটি দিয়ে রঙ্গমঞ্চ রচনা করে নেয়। ঘরটির তিনদিক মোটা কালো কাপড়ে ঢাকা থাকে। সামনের দিকে মাটি থেকে খানিকটা উঁচুতে সাদা একটি পরদা খাটিয়ে দেয়। সাদা চাদরের নিচটাও ঢাকা থাকে খড় বা বেড়ার মত কিছু দিয়ে। তাতে সামনে থেকে ভিতরের মানুষকে দেখা যায় না। চাউনী তালপাতার। সাদা চাদরের পাঁচ ফুট তফাতে ঘরটির ভিতর দিকে মাটির প্রদীপগুলি সারি করে ঝোলানো। এরাও দুই হাতে

রামায়ণের 'লংকাদহন' পালায় হনুমান। পুতুল-খেলোয়াড়ের হাত ও কাঠি ধরার কায়দা পর্দায় দেখা যাচ্ছে

পুতুলগুলি নাচায় বা গানের কথার সঙ্গে মিলিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে নাড়ায়। মালাবারের চামড়ার চেয়ে এই চামড়াগুলি আরো পাতলা। চামড়ার এপিঠ থেকে ওপিঠ স্পষ্ট দেখা যায় বলে, চামড়ায় আঁকা যাবতীয় রঙীন নক্সাগুলি চাদরের উপর সুন্দর ফুটে ওঠে। সব অঞ্চলের পুতুলের হাতগুলি আলাদা আটকানো থাকে বলে সুতোর সাহায্যে খেলোয়াড়রা অভিনয়ের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে নাড়াতে পারে। শরীরের আর কোন অংশ নড়ে না। অন্ধ্রের পুতুলগুলি আকারে এক ফুট থেকে সাত ফুট পর্যন্ত বড় হয়। এই আকার নাটকের চরিত্রের মর্যাদানুসারে নাকি দেওয়া হয়। প্রথম থেকেই পুতুলগুলি দুপাশে বিভক্ত হয়ে পরদার গায়ে আটকানো থাকে। এরাও আরম্ভে গণেশের বন্দনা করে। প্রত্যেক বড় দৃশ্যের মাঝখানে হালকা ধরণের রস সৃষ্টির জন্যে আলাদা পুতুলের নাচ দেখানো হয়। এই নাচগুলি উপভোগ করার মত। তারপরে আসে বিদূষক। এর অভিনয় ও ভাঁড়ামি দর্শকদের মনে খুবই আনন্দ দেয়। অন্ধ্রদেশে ছায়ানাটকের অভিনয় দেখা দেশের পক্ষে মঙ্গল বলে গ্রামবাসীরা মনে করে। তাদের ধারণা এর দ্বারা দেশে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অন্ধ্র দেশে কেবল রামায়ণ নয়, মহাভারতের গল্পও অভিনীত হয়। এরা নিজেদের ভাষাতেই গান ও কথাবার্তা বলে। অন্ধ্র দেশে ছায়ানাটকের গান করে মেয়েরা। পুতুলের মেয়ে চরিত্রের কথাগুলি তারাই বলে। পুরুষেরা বলে পুরুষ পুতুলের সঙ্গে। অন্ধ্ররা ছায়ানাটককে বলে 'বোম্মলাত'।

মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধরত ইন্দ্রজিৎ। পুতুলের গায়ে সাদা অলংকরণ তুলির কাজ নয়, চামড়া কেটে আলোর সাহায্যে এই অলংকরণ ফুটিয়ে তোলা হয়

দক্ষিণ কানাড়ার তাঞ্জোরের কোনো অঞ্চলে এই ছায়ানাটকের বংশ আজও দেখা যায়। সেসব অঞ্চলে ছায়ানাটক তারা দেখিয়েও থাকে। কিন্তু এই অভিনয়কলার প্রতি কারু নজর নেই বলে সবেরই অবস্থা আজ ধ্বংসের পথে। এদের পিতা, প্রপিতামহদের আমলে ছায়ানাটকের যে আদর ছিল আজ আর তা নেই। এই পুতুলগুলি রচনার দ্বারা তখনকার গ্রামবাসীরা যে শিল্পবোধের পরিচয় দিত তা সত্যই প্রশংসনীয়। আজ তাদের সে রুচিটি প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে। আগের মত সর্বাঙ্গ সুন্দর পুতুল তৈরি করার ক্ষমতাও তাদের আর নেই। দেশকে সত্যিই ভাল করে চিনতে হলে দেশের সর্বাঙ্গীন বিকাশের অংশবিশেষ এদেরও ভাল করে জানতে হবে, এদের সমাদরের সঙ্গে আমাদের মধ্যে টেনে নিতে হবে এবং এই কলাকেও সমাদর করতে হবে।

"অমা', দাদা যাবে না বলছে—এ"—চেঁচিয়ে মাকে জানালে মাধুরী।

"চুপ কর রাক্কুসী—শাকচুন্নী কোথাকার—যা ভাগ্"—পানু একটা ধাক্কা মারল মাধুরীকে। দু'চক্ষে সে ওটাকে দেখতে পারে না—বোন না শত্তুর। আঠারো বছরের ধিঙ্গি ছুঁড়ি, অথচ একটু দয়ামায়া নেই, চার বছরের বড় দাদার জন্য এতটুকুও সম্ভ্রমবোধ নেই! যেমন বিচ্ছিরী দেখতে তেমনি বিচ্ছিরী ওর ব্যবহার, আর মুখ তো নয় যেন আঁশবঁটি। ওর মেছুনী হলেই মানাত।

ধাক্কা খেয়ে মাধুরী চীৎকার করে উঠল "অ'মা গো-ও-ও—আমায় মেরে ফেল্লোও-ও-ও"—

চীৎকার শুনে ছোটবোন বুধু ছুটে এল, ছোটভাই ভানু ছুটে এল। সবশেষে ছুটে এল বাবা আর মা।

মাধুরী যদি আর একটু জোরে চেঁচাত তাহলে বোধ হয় মনসাতলা বাইলেনের বাকী সব বাসিন্দারাও ছুটে আসত।

"কি—হয়েছে কি? অত চেঁচাচ্ছিস কেন?" প্রভাবতী জিজ্ঞেস করল।

"দেখনা বাবা—দাদাকে র‍্যাশন আনবার কথা বলতে আমার ওপর খেঁকিয়ে উঠল, আমায় ধাক্কা মেরে রাক্কুসী শাকচুন্নী কত কি বলতে শুরু করল"—

বুধু খিলখিল করে হেসে উঠল।

"এ্যাই—চুপ্"—ব্রজেশ্বর গর্জন করল, তারপর ব্রহ্মের মত নির্গুণ তার বড়ছেলের দিকে তাকাল। সবাই ঘরে আসার পর পানু কাঁথামুড়ি দিয়ে শুধু উঠে বসেছিল, সবার দিকে কটমট করে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল সে।

"এ্যাই শুয়োর—ওঠ্—ওঠ্ বলছি"—ব্রজেশ্বর আবার গর্জাল।

কাঁথাটা গা থেকে ফেলে পানু উঠে দাঁড়াল। সোজা দেয়ালের কাছে গিয়ে এক-পাশে হেলে-পড়া ব্রাকেট থেকে তার বহু-পুরোনো স্ট্রাইপ-সার্টটা টেনে নিয়ে হাত গলাল।

ব্রজেশ্বর তার সকালবেলার নিত্যকৃত্য শুরু করল, "জ্বালিয়ে খেল শুয়ার—বাইশ বছরের ধেড়ে ছেলে, কোন কাজেরই যুগ্যি হল না! দেশ গেল, সম্পদ গেল, এই বুড়ো বয়েসে দেড়শ' টাকা রোজগার করতে রক্ত জল হয়ে গেল—তবু শুয়ারটার হুঁশ হয় না। এত্তবড় ছেলে দেখলে মানুষের বুক ফুলে ওঠে অথচ আমার ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়! হতভাগা ষাঁড়ের গোবর, ইস্টুপিড—

না করল একটু লেখাপড়া, না শিখল কোন কাজ—দু'দিন বাদে মরেও যে আমি শান্তি পাবনা—ওর হাতের পিণ্ডি গিলেও আমার সদ্গতি হবে না"—

ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পানু, রান্নাঘরের পাশে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "টাকা আর কার্ড কই-ই-ই-ই"—

প্রভাবতী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ব্রজেশ্বর বিছানায় বসে গজ্‌গজ্ করতে লাগল। মনসাতলা বাইলেনের নীচেরতলার এই দুটো খুপরীর মত ঘর আর ভিজে স্যাঁতসেঁতে খোলা বারান্দায় রান্না করতে হয় তাদের। অন্ধকার, দুর্গন্ধ এই লেনটার মত তাদের জীবন—আলোবাতাসহীন, আশ্বাসহীন। দেড়শ টাকায় কোনমতে মৃত্যুকে এড়ানো যায় কিন্তু ভালোভাবে বাঁচার কোন আশ্বাস পাওয়া যায় না। দেশে যা কিছু ছিল তা এক ঐতিহাসিক ঘটনার চাপে তার নাম থেকে মুছে গেছে। বড় ছেলেটা গুণ্ডামী করে চিরমূর্খ রয়ে গেল, বড় মেয়েটা রাতের ঘুম হরণ করছে—তারপর আছে বুদ্ধু, ভানু ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার—

প্রভাবতী টাকা আর র‍্যাশন কার্ড দিল ছেলের হাতে, বলল, "তোর কি হয়েছে বলত—এই"—

পানু মুখবিকৃত করে বলল, "ভূতে ধরেছে"—

"শোন কথা ছেলের—এইভাবে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হয়!"—

"উঠতে বসতে ঝ্যাটা মারলে বলতেই হয়"—

পানু থলি দুটোকে একটানে তুলে নিয়ে গলিতে বেরিয়ে গেল।

প্রভাবতী স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে, বিড়বিড় করে বলল, "কি যে করি ওকে নিয়ে—কি যে হবে ওর"—

একটা বেড়ালের বাচ্চা সামনে পড়ল। কষে একটা লাথি মারল তাকে পানু। শা—লা। মাধুরীটা হতচ্ছাড়ী, দেব আজ ওর কান ছিঁড়ে। উঠতে বসতে বকবে সবাই, যেন বাড়ির চাকর! শা—লা—। কেন, কি দোষ করেছে সে? লেখাপড়া হয়নি তো কি করবে সে? কতদিন সে বলেছে একটা মাস্টার রেখে দিতে—দিয়েছে? টেনুটা কি করে পাশ করল? দুটো মাস্টার দু' বেলা পড়াত তাকে—সে তো শুধু একটা চেয়েছিল। গরীব? বোঝে সে। তাহলে আর তাকে দোষ দিয়ে হবে কি? বাজারে যা, তেল আন্, লঙ্কা আন্, হাসপাতাল যা, ডাক্তারের কাছে যা—দিনরাত হুকুম করলে কি লেখাপড়া হয়? লেখাপড়া যে একটা সাধনা তা তার জানা আছে। আসলে দুঃখু আছে বাবা মার—বেশী বক্‌লেঝক্‌লে যাবে একদিন সে শিকলি কেটে। বাপ-মা হয়েছে তো মাথা কিনেছে নাকি? শা—লা—

গলির শেষে মাধব চ্যাটার্জি রোড—সেটা গিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে। সেই মোড়ে র‍্যাশনের দোকান। পানু গিয়ে কিউতে দাঁড়াল। আজ শনিবার, ভীড়টা বেশী—অজগরের মত এঁকে বেঁকে গেছে কিউটা। দেরী হবে বেশ।

পানু একটা বিড়ি বের করে ধরাল।

অজগরের মত কিউটা অজগর হয়েই রইল। অবশ্য পানু ধীরে ধীরে ল্যাজ থেকে পেটে, পেট থেকে গলায়, গলা থেকে মুখে গিয়ে পৌঁছোল এক সময়ে। কার্ড আর টাকা দিয়ে সে রসিদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সামনের দিকে তাকাতে ঘড়ির ওপর নজর পড়ল—ইস্, সাড়ে নটা! 'জগন্নাথ কেবিনে' চায়ের আড্ডা এতক্ষণ তাকে ছাড়াই খুব জমে গেছে।

অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল, "সা—লা—"

ছোক্‌রা কেরানী কটমট করে তাকাল, "কি বলছেন?"

একগাল হাসল পানু, "বেলা দেখে বলছি দাদা—আপিসের টাইম যে হয়ে এলো—"

পাঁচসিকে পয়সা ফেরৎ পাওয়া গেল। সিকিটা টাঁকে গুঁজে টাকাটা পকেটে রাখল পানু, তারপর থলি দুটো তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

মনসাতলা বাই লেন আর মাধব চ্যাটার্জি রোডের মোড়ের বাড়ীটার রং লাল। রক্তের মত লাল আর দামী। সেই বাড়ীর নীচের তলায় থাকেন কৃপানাথবাবু—কোথায় কোন্ আপিসের বড়বাবু। তাঁর একমাত্র মেয়ে নাম পারুল। পারুল নামটা যে ভারী মিষ্টি, একথা পানু চার-পাঁচ মাস আগেও জানত না। এ অঞ্চলের আর কেউ হয়ত তার মত জানে না যে, পারুলের মত মেয়ে এক যুগে একটা জন্মায়।

পারুলের সঙ্গে মাধুরীর ভাব আছে। কিন্তু বড়বাবুর মেয়ে পারুল মনসাতলা বাই লেনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যায় না—মাধুরীই আসে এ-বাড়ী। মাধুরীর সঙ্গে যেদিন ঝগড়া হয়না, সেদিন সে-ও মাধুরীর সঙ্গে পারুলদের বাড়ী আসে। পারুলের ছোটভাই বাবুন স্কুলে পড়ে—পাড়ার মধ্যে পানুর প্রতাপ এবং খাতির পরিমাণ কতটুকু, তা সে জানে, দিদির কাছেও তা বলেছে। পারুল, ওরা বেশ খাতির করে তাকে। শুধু বাড়ীতেই—সা—লা—।

পানুর এখনো মনে আছে সেদিনকার কথা। এই তো পাঁচ মাস আগেকার কথা। বসন্তকালের সন্ধ্যায় তখন গলির মধ্যে সবে ল্যাম্পটা জ্বলেছে, কয়লার ধোঁয়ায় মেশানো আলো তখন এক রহস্য-কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে, দিনের বেলাকার নোংরা, অন্ধকার মনসাতলা বাই লেন তখন যেন পরী রাজ্যের কোন গলি হয়ে উঠেছে। ঠিক তেমনি সময় পারুলকে দরজার গোড়ায় দাঁড়ানো দেখেছিল সে, পারুল চানাচুর কিনছিল। আহা, সে কী রূপ! ল্যাম্পের আলো এসে পড়েছিল তার মুখের ওপর। বিকেলের যত্নরচিত সাজ তার পরনে, ফর্সা রংয়ের ওপর পাউডারের মৃদু প্রলেপ। হাল্কা নীল রংয়ের পাৎলা শাড়ীর বন্ধনে মোড়া তার উদ্ধত যৌবন—মাইরি, সে কী চেহারা! ঠিক যেন নার্গিস—

পানু থমকে দাঁড়াল গলির মুখে।

পারুলদের জানালার গোড়া থেকে কে যেন সরে গেল। পারুল নাকি! বিপরীত দিকে তাকাল সে। রামহরিবাবুর বারান্দাতে বসে একটি সুবেশ ফুলবাবু ছোক্‌রা বসে একটা বই পড়ছে। খুব মন দিয়ে পড়ছে—যেন বেদব্যাস মুনি বেদ পড়ছে। সা—লা—।

ছোক্‌রা তো এ-গলির নয়। কোথায় দেখেছে তাকে?

র‍্যাশন নিয়ে বাড়ীতে ঢুকল পানু।

মাধুরী কাছে এল। একেবারে বেহায়া হতভাগী, একটু আগের কথা তার মনে নেই।

"দেখি দাদা, এবারকার চালটা কেমন?"

কাছে এসে দাঁড়াল সে। প্রভাবতীও এল।

একটা টাকা ফেরৎ দিল পানু।

"আর বাকী চার আনা?" প্রভাবতী সব হিসেব রাখে একটি পয়সাতেও মনসাতলা বাই লেনে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারে।

পানু মুখখানা করুণ করে বলল, "হারিয়ে গেছে মা"—

"হারিয়ে গেছে!" প্রভাবতী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, "চার আনা পয়সা হারিয়ে ফেললি তুই!"

মাধুরী মুখ বেঁকাল, "মোটেই হারায়নি মা—দাদা মিছে কথা বলছে—"

"মুখপুড়ী—তুই সব সময়ে পেছনে লাগবি?" দুম্ করে মাধুরীর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে পানু বাইরে বেরিয়ে গেল।

"নাঃ—বড় বাড় বেড়েছে—জ্বালিয়ে খেল হতভাগা"—

গলির মধ্যে চলতে চলতে মায়ের কথাগুলো শুনতে পেল পানু। বয়ে গেছে—সব কথা কানে তুলতে নেই।

কিন্তু রামহরিবাবুদের বারান্দায় সেই ছোকরা তখনো বেদপাঠে রত।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, "বলি অ' মসাই"—

"এ্যাঁ!" ছোকরা তাকাল তার দিকে, পানুর চওড়া কব্জি আর হৃষ্টপুষ্ট

শরীরটাকে আড়চোখে দেখে নিয়ে মুখ ফেরাল সে, বলল, "বলুন"—

"তাহলে পষ্ট করেই বলছি মসাই—এটা ভদ্দরলোকের পাড়া—বুয়েচেন"—

"তার মানে?"

"তার মানে, নিজের বাপের বাড়ীর বারান্দায় বসে অ-আ-ক-খ পড়ুনগে, বুয়েচেন—আপনি যে কিসের পাঠ পড়তে এয়েচেন, তা কি বুঝিনা মসাই! যান্, কেটে পড়ুন—"

"আপনি গালাগালি করছেন কেন—আপনি কি এ-গলির—"

"হ্যাঁ বাওয়া—আমি এ-গলির জমিদার, আমি এ-গলির রাষ্ট্রপতি—সা-লা, ফের তক্ক করবি তো কেটে ফেলব—পানু মজুমদারকে চিনিস না সা—লা"—

"বাঃ—গাল দিচ্ছেন কেন? যাচ্ছি তো"—একটি মেয়েলি ও করুণ ভাব ফুটে উঠল ছোকরার মুখে।

পানু বুক ফুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ বাওয়া—যাও—আর কোনদিন যদি এদিকে দেখি তো টের পাবে—লভ্যোনি করার আর জায়গা পাওনি তুমি? পড়ার নামে মেয়েছেলেদের দেখা?"—

ছোকরা দ্রুত পালিয়ে গেল।

সা—লা—প্রেম করতে এয়েচেন! পানু মজুমদার যার স্বপন দেখে, সেই মেয়েকে জয় করতে এসেছে। ঐ মেনীমুখো মেয়েলি ছাঁদের ছোকরা!

পারুলদের বাড়ীর দিকে তাকাল পানু। জানালার গোড়ায় পারুলের মুখ। ঘুরে সে সেখানে গেল।

"পারুল—"

পারুল দরজা খুলল, পানু ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়াল। তাদের ঘরের চেয়ে বেশী ভাল নয় দেখতে পারুলদের ঘর, কিন্তু অদ্ভুত পরিচ্ছন্ন আর অল্পের মধ্যে নিখুঁত সাজানো। এই ঘরে দাঁড়িয়ে পারুলকে দেখলেই কেমন যেন বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে পানুর। এ যেন একটা অন্য জগৎ। রাস্তায় চলতে চলতে, চায়ের দোকানে বসে, মা-বাবার বকুনি খেতে খেতে, নিজেদের নোংরা ঘরের রিক্ততার মধ্যে যে জগৎটার ছবি মাঝে মাঝে জোনাকি-দীপ্তির মত জ্বলে আর নেভে, সেই জগৎটাকে যেন এখানে পুরোপুরি অনির্বাণ পাওয়া যায়।

"গলিতে কার সঙ্গে কথা বলছিলে পানুদা?" পারুল জিজ্ঞেস করল। ওর ঠোঁটের কোণে একটা তির্যক আভাস, চোখের তারাটাতে তীক্ষ্ণ একটা জিজ্ঞাসা।

"কার সঙ্গে আবার—কানাই—ও-পাড়ার কানাইটার সঙ্গে—"

"কানাই কে?"

"বদমাস—এক নম্বরের ইয়ে"—

"হুঁ"—

পারুলের দিকে তাকায় পানু। পারুল দাঁড়িয়েই থাকে, পানুকেও সে বসতে বলে না। কেমন যেন লাগে পানুর। রামহরিবাবুর বারান্দায় পাঠরত সেই মেয়েলি ছাঁদের ছোক্রার সামনে যে আত্মবিশ্বাস তার ছিল, তা এখন অন্তর্হিত হয়ে গেছে। পারুলকে দেখলেই এমন হয়। কি যেন আছে ওর মুখে। লম্বা, ছিপছিপে গড়ন পারুলের, বয়সে সে মাধুরীর সমানই হবে, কিন্তু বুদ্ধিতে আর কথাবার্তার ভঙ্গীতে ওকে যেন নিজের চেয়েও বড় মনে হয় পানুর। সাদা জমির ওপর কালো ফুলতোলা মাদ্রাজী শাড়ী পরেছে পারুল, চুলগুলো ফেঁপে-ফুলে রয়েছে মাথায়। ঝকঝকে গায়ের রং পারুলের—কেমন, তার উপমাটা চট করে ভেবে পায়না পানু—সব মিলিয়ে শুধু একটা ছবি মনে পড়ে তার—নার্গিস।

"তোমার এই শাড়ীটা ফাইন পারুল"—

"বাবা দিয়েছেন কাল"—

"হুঁ—চমৎকার—অবশ্য তুমি যা পরো, তাতেই বেশ দেখায়"—

"অনেকবার শুনেছি ওকথা"—পারুল ঠোঁট উল্টিয়ে হাসে আর পানুকে দেখতে থাকে। ওর চোখে কেমন যেন একটা নির্লজ্জ ভাব, পানুর অস্বস্তি লাগে।

"এক গেলাস জল দেবে পারুল?"

"এত সকালে তেষ্টা পেল?"

পানু হাসবার চেষ্টা করে, "কি জানি—তোমার কাছে এলেই আমার এমনি হয়—মাইরি বলছি"—

পারুল মুখটা বিকৃত করে সরে গেল। পানুর হাসি বন্ধ হয়ে গেল। কি হল বাবা?—মেয়েগুলোকে সে বোঝে না—। রাজকাপুর-নার্গিসের ছবিটা আজ দেখতে হবে। একটু শিখে নিতে হবে।

পারুলের ছোটভাই রাতুল জল নিয়ে এল ঘরে।

"জল খাও পানুদা"—

"এ্যাঁ! —ওঃ—"

জল যে এমন বিস্বাদ লাগে, তা কি পানু আগে জানত! পারুলকে সে বুঝতে পারে না।

"আরো জল চাই?"—পারুলের ভাই রাতুল বলল।

"না"—

পানু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাধব চ্যাটার্জি রোড ছাড়িয়ে ডানদিকে—বড় রাস্তার ওপর। 'জগন্নাথ কেবিনে' তখন জমজমাট ব্যাপার। পানুর বন্ধু তিলু, ছটক, অজিত—তিনজনেই বসে আছে। পানুকে দেখেই বিরহের খাস্তা বুলি বেরোতে লাগল।

"এতক্ষণ বাদে এলি?—সা—লা"—

"সালা যে উড়ছে আজকাল"—

"সালা রাজকপুর হয়েছে"—

পানু হ্যা—হ্যা করে হাসল, "আরে চোপ্ সালারা, বেশী ইয়ার্কি করিস্ না"—

তিলু বলল, "সালা বোস্"—

"চা খাওয়া মাইরি"—

"খা সালা—'জগন্নাথ কেবিন' তো আমার বাপের কাছে ধার নিয়েছিল"—

"হ্যাঁরে তিলু, রাজকপুর নার্গিসের নতুন ছবিটা দেখেছিস?"

"'আহ্'?"

"হ্যা"—

"না ভাই—আজ যাব—চল্‌না"—

"যাব"—

অজিত মাথা নাড়ল, "কি হবে হিন্দী ছবি দেখে—চল্ বাংলা ছবি দেখি"—

পানু মুখ বাঁকাল, "থুঃ—সালা কি যে বলিস্। দিনরাত যে হালতের মধ্যে আছি তাই ছবিতে দেখব? বাপ চোখ রাঙাচ্ছে, আমি র‍্যাশানে দাঁড়িয়ে বিঁড়ি ফুঁকছি—ঘরে বোনের অসুখ—এইসব দেখব নতুন করে? গুষ্টির পিণ্ডি—তার চেয়ে 'পাসের বাড়ি', 'শ্বশুর বাড়ি', 'সতীর বাড়ি'—এইসব দেখলে তবুও মন্দ লাগে না"—

তিলু মুচকি হেসে বলল, "আর 'পারুলের বাড়ি'?"

পানু তিলুর পিঠে একটা কিল মারল, "যাঃ সালা—ইয়ার্কি করিস্ না"—

বন্ধুরা হেসে উঠল।

চা এল।

চায়ে চুমুক দিয়ে পানু জিজ্ঞেস করল, চাকরিবাক্‌রির কোন খবর পেলি রে তিলু?"

তিলু বুড়ো আঙুল নাচাল, "লবডঙ্কা"—

"কি করা যায় বল্ তো?"

"কি আবার? আমার তো এখন শনির দশা চলছে—কিস্যু হবে না"—

"কে বলেছে?"

"ঐ মোড়ে যে যতীশ ভট্টাচার্যের জ্যোতিষালয় আছে না? ঐ বুড়ো"—

"চল, আমিও দেখাব"—

"পাঁচ টাকা নেয় সালা বুড়ো"—

"তাহলে তো আর হল না"—

"আরে তোর তো ভালো সময়ই যাচ্ছে—এমন খাসা"—

"এ্যাই—রাগাস্ না মাইরি"—পানু হেসে সুড়ুৎ করে এক চুমুক চা গিলল, পরে হাত পাতল অজিতের দিকে, "একটা বিড়ি দে তো"—

অজিত বিড়ি দিল। সেটা ধরিয়ে সজোরে একটা টান দিল পানু, রাস্তার দিকে তাকাল। ট্রামবাসের ধারা বয়ে চলেছে। ব্যস্ত মানুষের মিছিল চলছে একটানা।

শব্দ কোলাহলে বিচিত্র, যন্ত্র ও মানুষের দ্বৈত গতিতে কম্পমান মহানগরী। ওদিকে তাকিয়ে কি যেন চায় মনটা। কি যেন—সা—লা—।

"মার—মার—মার"—

একটা কোলাহল উঠল রাস্তার ওদিক থেকে।

"মার—মার—ধর"—

তিলু উঠে দাঁড়াল, "কি ব্যাপার রে পানু?"

"চল্ তো"—

রাস্তায় গিয়ে দেখল যে, একজন পকেট-মারকে ধরে মার দিচ্ছে সবাই। ভীড় ঠেলে এগোল চারজনে। বেশ তাগড়া জোয়ান একজন লোক—পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে, বাবু মত চেহারা। চারদিক থেকে লোকেরা কিল চড় বর্ষণ করছে তার ওপর।

"শালা—পকেটমার"—

তিলু বলল, "মার সালাকে"—

পানু এগিয়ে চটাপট দুটো চাঁটি কষিয়ে দিল লোকটার মাথায়। অদ্ভুত একটা তৃপ্তির শিহরণ খেলে গেল তার শরীরে। সা—লা—।

পুলিশ এল, ভীড় কমে গেল। পকেট-মারকে কেন্দ্র করে যে লোকেরা এতক্ষণ হল্লা করছিল, তারা পাঁচ-সাত মিনিট বাদে কর্পূরের মত উড়ে গেল। তারপর আবার সেই ট্রাম বাস আর জনতার স্রোত।

"মেরেছি সালাকে কয়েকটা"—পানু হেসে বলল।

চায়ের দোকানে ফিরে চার বন্ধুর পয়সা জড় করে দাম শোধ হল। তারপর ফুটপাথে গিয়ে একটি দোকানের বাইরে বসে চারজনে কিছুক্ষণ বিড়ি টানল।

উজ্জ্বল, ঝকঝকে দিন। আকাশে সাদা মেঘের মিছিল। বড় বড় বাড়ী, নানা রঙের পোশাকে পরা নরনারী। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কাজ করে। কিন্তু তাদের মত লোকও তো কম নেই। কাজ নেই দেশে—তাদের উপযুক্ত কাজ নেই।

"একটা লাণ্ড্রি দিবি পানু?" —তিলু বলল।

"মন্দ নয় মাইরি—বেড়ে চলে"—

"হাজার খানেক টাকা হলে শুরু করা যায়"—

"টাকা কোথায় পাব?"

"বিয়ে কর না সালা—তোর শ্বশুর দেবে?"—

অজিত ফুট কাটল, "মানে পারুলের বাবা"—

পানু কিল মারল তাকে, "মেরে ফেলব সালা"—

ছাটুক্ বলল, "বেলা হয়েছে মাইরি—চল্ এবার"—

"চল্"—তিলু বলল, 'তাহলে আজ বিকেলে সিনেমা দেখবি তো সবাই?"

"দেখব"—পানু বলল, "রাজকপুর আর নার্গিস—আঃ"—

বাড়ী ফিরতে গিয়ে গলির মধ্যে আবার সেই মেয়েলি ছাঁদের ছোকরাকে দেখতে পায় পানু। মুহূর্তের জন্য। তারপরেই ছোকরা হাওয়া হয়ে গেল গলি থেকে। মনসাতলা বাই লেনের ভেতর থেকে চাঁদমণি লেনের শরু ফালিটা দিয়ে কোনদিকে যে গেল সা—লা!

ভয় পেয়েছে। পানু মজুমদারকে দেখে, ও সারা জীবন ভয় পাবে। আঃ, পকেট-মারটাকে কষে দুটো থাপ্পড় মেরেছে সে, ব্যাটা সারা জীবন মনে রাখবে। পারুল এখন কি করছে?

আবার বাড়ী।

মাধুরী হাঁক দিল, "মা, দাদা এয়েছে"—

প্রভাবতী বেরিয়ে এল ঘর থেকে, হাত পেতে বলল, "চার আনা পয়সা দে পানু—হাতটান চলছে বড়"—

"নেই"—

"দে বাবা একটা পয়সাও কত কাজে লাগে"—

"হারিয়ে গেছে"—

"হতভাগা—তুই জীবনভোর জ্বালাবি?"

"নেই পয়সা—হারিয়ে গেলে কি করব?" পানু ঘরে ঢুকে গেল।

মায়ের গজগজানিকে অগ্রাহ্য করেও চটপট খেয়ে নিল সে, তারপর ছেঁড়া কাঁথাটা টেনে নিয়ে বিছানায় গড়াল।

মায়ের রাগ এক সময় পড়ে এল, মধ্যাহ্নের আলস্য তার হাড়-জিরজিরে শরীরটাকে এক সময়ে অনাবৃত বারান্দাতেই কাৎ করে দিল। মাধুরী ভাঙা চিরুণী দিয়ে মাথার অল্প চুলে পাতাবাহার কেটে হয়ত কোনো বান্ধবীর বাড়ী গেল। বুধু পাশের বাড়ীতে। ভানু গেছে কর্পোরেশনের ফ্রি-স্কুলে। বাবা আপিসে। শহর কলকাতা ব্যস্ত। কিন্তু মনসাতলা বাই লেনের এই উদ্বাস্ত আর উদ্বাস্তুদের জীবনে ব্যস্ততা কোথায়? অনন্ত, অবয়বহীন ভবিষ্যতের অন্ধকারে সাঁতার কাটতে কাটতে ডুবে যায় সবাই, ভাবতে ভাবতে ভাবনাকে এড়ায়, এড়িয়ে চলে পড়ে ঘুমের ঘোরে। কিন্তু ঘুমও গাঢ় হয় না, এক সময়ে ভেঙে যায়। তাতেও যন্ত্রণা, দৈহিক অতৃপ্তির একটা জ্বালাময় অবসাদ নিয়ে সারা জীবনের অতৃপ্তিকে বার বার তুলোধনো করে আবার দৈনন্দিন জীবনের পুনরাবৃত্তি চলে। মনসাতলা বাইলেনের জীবন একটা যন্ত্রণা। সা—লা—

পানু উঠে দাঁড়াল। সন্ধ্যেবেলায় রাজ-কপুর আর নার্গিস। কম করেও একটা টাকা তো চাই। পারুলে অনেকটা নার্গিসের মত দেখতে। তিলু বলেছিল যে, নার্গিস মানে ফুল। পারুলও ফুল। সেকি রজনীগন্ধা? একটা টাকা চাই। কি যেন চায় মন? এই রিক্ততা, এই দারিদ্র্য, এই ঘ্যান-ঘ্যানানি, ঝগড়া, বকুনি—সব ছাড়িয়ে—সা—লা—টাকাটা পাব কোথায়? বড়লোকদের বাড়ীতে ডাকাতি করলে বেশ হয়। ছিঃ—পকেট-মারকে সে না আজ মারল। না না—বাড়ী থেকে এক টাকা নেওয়া যায়। মায়ের টাকা কোথায় আছে?

তোষক ওল্টায় পানু, বালিশ ওল্টায়, এখানে ওখানে নিঃশব্দ তস্করের মত সতর্কে দেখে। হঠাৎ এক সময়ে বারোটা টাকা আবিষ্কার করে টিনের বাক্সটায়। দু টাকার নোট একটি আর একটা দশ টাকার নোট। না, সে অবুঝ নয়, সে জানে যে, প্রাণ ধারণের এই নিদারুণ গ্লানিকেও কিনতে হয়। দু টাকাটাই নেবে সে। উপায় নেই, দিনকালই এমনি পড়েছে—

দু টাকার নোটটা মুঠোয় করে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পানু। বাইরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল নিঃশব্দে। মনসাতলা বাইলেনে একদল হন্যে কুকুরও আছে—মা তাদের দুচক্ষে দেখতে পারে না।

গলিতে বেরিয়েই দূরের দিকে নজর পড়ল পানুর। রামহরিবাবুর নিকুম বারান্দাটাতে আবার সেই সা-লা। আচ্ছা দাঁড়াও যাদু। পা টিপে টিপে এগোল সে ডানদিকের প্রান্ত দিয়ে। প্রশান্তবাবুদের বারান্দা দিয়ে, কিষণের মুড়িমুড়কির দোকানের প্রায় গা ঘেঁষে, নিতাই বোসের মুদি দোকানের ঝাঁপির তলা দিয়ে। ব্যস্—তারপর এক দৌড়।

সেই মেয়েলী ছোকরা তাকে দেখে সরে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু পানুর সঙ্গে পারা কি চাট্টিখানি কথা। এক লাফে হাতটা চেপে ধরল পানু।

পারুলদের জানালার দিকে ত্রস্তে তাকাল ছোকরা। পানুও তাকাল। পারুল সরে গেল জানালা থেকে। ছোকরাকে দেখেই হয়ত পারুল লজ্জা পাচ্ছে কথা বলতে। আচ্ছা যাচ্ছে সে।

"কি? তোমায় না মানা করেছিলাম—"

"বাঃ—আমার মনে তো কোন কুমতলব নেই দাদা—এমনি"—

"হ্যাঁ হ্যাঁ—এমনিই বটে—তুমি ভাবদশায় এগিয়ে আসো, তাই না মানিক—সা—লা—

ধাঁই করে এক ঘুষি বসিয়ে দিল পানু।

"বাপ্"—বলে ছোক্‌রা ছিট্‌কে পড়ল বাঁধানো গলির ওপর। তারপর কোনমতে উঠে এক দৌড়। পানু দৌড় দেখে হাসল, শরীরের পেশীগুলো যে টান টান হয়ে উঠেছিল তা আবার শিথিল হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু কেমন যেন একটা তৃপ্তি আর অতৃপ্তি মেশানো অবসাদ এল মনে।

ঘুষি মেরে বেশ আনন্দ হয়েছিল—আরো না মারার জন্য কেমন যেন অতৃপ্তি বোধ হচ্ছে।

কড়াটা নাড়ল সে।

জানালার গোড়ায় পারুলকে দেখা গেল। চুলগুলো তার তেলেজলে চক্‌চক্‌ করছে, পিঠের ওপর ছড়ানো। বাতাসে বোধহয় মৃদু একটা সুবাসও ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে পানুর চেতনায়। পারুলের দেহসৌরভ।

"সেই ব্যাটা কানাই—মনসাতলা লেনকে কদমতলা ভেবেছিল"—

"তা কি করলে?" পারুল কঠিন একটা ভঙ্গী করে বলল।

"দিলাম সালাকে একটু ভদ্রতা শিখিয়ে"—

"ওঃ"—

"ভাল করিনি?"

"তুমিই জানো"—

"অমন করে কথা বলছ কেন পারুল—মা কোথায়?"

"ঘরে"—

"দরজাটা খোল না—একটু গল্প করি"—

"আমার সময় নেই"—

পারুল বিদ্যুদ্বেগে জানালা থেকে সরে গেল। যাঃ সা—লা—। মেয়েমানুষদের নাকি দেবতারাও বোঝে না। তিলু তাকে বার বার সাবধান করে বোকার মত ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিল। সে কি কোন বোকামী করে ফেলল! না মাইরি, এ এক যন্ত্রণা। যাকগে ছাই, পরে দেখা যাবে। এক লাফে কি প্রেম হয়? সিনেমাতে কত দেখেছে সে—

বড় রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় সে।

সেই একই জীবনের ধারা। নদীর ধারার মত। সকাল থেকে আর এক সকাল পর্যন্ত তার নানা রূপ। ঋতুচক্রের আবর্তনে যেমন নদীর চেহারা বাড়ে, কমে। শব্দ আর কোলাহলে স্পন্দিত, কম্পিত মহানগরী। যেন ঘোর লাগে পানুর। দু'ধারের ফুটপাতে কত রকমের দোকান, কত রকমের ফেরি করছে রিফিউজি ছেলেরা। একটা কিছু করতে হবে। মনসাতলা বাই লেন থেকে সে তাদের পরিবারকে তুলে নিয়ে যাবে বালীগঞ্জে। না তো অন্য কোন সুন্দর জায়গায়। মাধুরী হতচ্ছাড়ীকে একটা কানা দর্জির সঙ্গে বিয়ে দেবে। বুধুটাকে একটা মেমদের স্কুলে দেবে। ভানুটাকে মাস্টার রেখে পড়াবে। বাবাটা তার দুঃখটা বুঝল না। চুলোয় যাকগে তার দুঃখ—সব ঠিক হয়ে যাবে। মনসাতলা বাই লেন থেকে সরে যাবার সময় সে জীবনে একটি ডাকাতি করবে। একটা মেয়েকে।

শব্দ—কোলাহল—যেন ঘোর লাগে। শরীরের মধ্যে একটা দুরন্ত বাসনা। কি করবে সে? কি কাজ করবে সে? তার ঘুষিতে জোর আছে, তিন মিনিট দম বন্ধ করে থাকতে পারে সে, সাঁতারে তাকে ক'জন হারাবে? মাঝে মাঝে শরীরের মধ্যে উদ্দাম একটা শক্তির আলোড়ন টের পায় সে। সে সব পারে কিন্তু কি করবে এখুনি? কে বলে দেবে? হাতের আঙ্গুলগুলো নিস্‌পিস্‌ করে।

একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগল।

লোকটা মোটা সোটা, সাহেবী পোশাক পরা।

"চোখে দেখেন না—নাকি?" লোকটা মুখ বিকৃত করল।

"খুব দেখি"—

"ছাই দেখেন—মনে তো হচ্ছে চোখ নেই"—

"মুখ সামলে মশাই"—

"চড়িয়ে মুখ তোমার"—

"তবেরে সা—লা—"

বিদ্যুতের মত হাতটা সামনে ছুটে গেল। ভদ্রলোক ফুটপাথে চিৎপাৎ। ছোট্ট খাট্ট একটা ভীড় জমে গেল। দুটো পক্ষে বিভক্ত হয়ে গেল সে ভীড়। কিন্তু ততক্ষণে 'জগন্নাথ কেবিনে'র লোক এসে গেল, ছুটকু এসে গেল। কিছুই হল না। ভদ্রলোক নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সরে পড়ল।

তৃপ্তি আর অতৃপ্তির একটা অন্তর্দাহী জ্বালা নিয়ে পানু বলল, "একটা বিড়ি দে তো ছুট্‌কু"—

বিড়ি ধরিয়ে জোরে জোরে টানতে লাগল পানু। অরো কয়েকটা ঘুষি মারলে হত। শক্ত, নিরেট দেওয়ালের ওপর একদিন সে অনেকক্ষণ ধরে ঘুষি মেরে মেরে ভেতরের এই অন্ধ আবেগকে শেষ করে দেবে।

"চল্‌ চা খাই"—ছুটকু টানল হাত ধরে।

খানিক বাদে তিলু, অজিত এসে পড়ল।

এক পেয়ালা করে চা নিয়ে ওরা অনেকক্ষণ কাটাল, তারপর বেরোল।

সিনেমাতে খুব ভীড়। ধাক্কাধাক্কি করে কিউয়ের মধ্যে ওলটপালট করে ওরা টিকিট কাটল। তারপর সিনেমা হল।

অন্ধকারে এক নতুন জীবন আর জগৎকে দেখে পানু। বড় বড় চকচকে বাড়ি, ঝকঝকে পোশাক, মিষ্টি-মিষ্টি প্রেমের কথা, হাসি ও অশ্রুর হাট। দেখে ভাল লাগে, বারবার পারুলের কথা মনে হয়, তার সঙ্গে অসহ্য একটা জ্বালা বোধও হয়। কেন তা সে বোঝে না—সা-লা—।

সিনেমা শেষ হয়।

বাইরে রাতের মহানগরী। সিনেমা হাউসের আলো, এবাড়ী-ওবাড়ী আর দোকানপাটের আলো, ট্রাম-বাসের আলো। কত আলো! মনসাতলা বাই লেনেও তো আলো আছে, তবু কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হয়, কেমন যেন—

"ইস্‌—কী বই মাইরি—"

"নার্গিসটা দেখতে একটু ভাল ছিল বলেই যা—নইলে সালার বই—"

"খিধে পেয়েছে মাইরি—"

"চল্‌ পুরীধামে—"

আবার চায়ের দোকানে বসে তারা। গল্প হয় সিনেমার। তা থেকে যুদ্ধের। তারপর এটম বোমা। তিলু বলে যে এবার সব শেষ হবে। অজিত বলে যে বাঁচা যাবে।

পানু বলে, "দূর সালারা—বাজে বক্‌বক্‌ করছিস্‌—একটা বিড়ি দেতো কেউ—"

কিছুই ভালো লাগে না। এ কি রোগ হয়েছে পানুর!

রাত এগারোটা নাগাদ গলিতে ঢুকল পানু। পারুলদের বাড়ির সামনে ঢুকে দেখল যে জানালা দিয়ে আলো এসে বাইরে পড়েছে। পারুল কি জেগে?

পা টিপে টিপে জানালার ধারে গেল সে। ও বাবা, কৃপানাথবাবু পা নাচিয়ে গড়গড়া টানছেন। দেয়াল ঘেঁষে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে, পায়ের তলা থেকে একটা ইঁটের টুকরো তুলে ছাঁতলা-ধরা দেয়ালে লিখল—'পারুলকে ভালবাসি'—। দূরে গলির ল্যাম্পটা—আলোটা পড়েছে তার সেই ঘোষণার ওপর—একবার তা দেখে পানু এগিয়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকতেই ব্রজেশ্বর সামনে এসে দাঁড়াল।

"বেরো বাড়ি থেকে"—সুস্পষ্ট তার আদেশ।

"কেন?" বন্য একটা হিংস্রতা পানুর চোখে জ্বলে উঠল।

"চোর—হতভাগা ইস্টুপিড— বদমাস্‌—বেরো বলছি—"

মাধুরী আর বুধুরা ছুটে এল। প্রভাবতী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

"আমি কিছু নিইনি"—পানু দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

প্রভাবতী গালে হাত দিল, "তুই দু'টাকা নিসনি?"

"না"—

ঠাস্‌ করে একটা চড় কষিয়ে দিল ব্রজেশ্বর, "মিথ্যুক—শয়তান—বেরো—বেরো এখান থেকে। আজ ওকে যে বাড়ি ঢুকতে দেবে সে আমার মরা-মুখ দেখবে—"

পানু ঝড়ের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চড় মারল তাকে! বাবা তাকে মারল!

মাথার ভেতরে যেন আগুন জ্বলতে লাগল তার, সমস্ত শরীরে রক্ত ক্ষুধার্ত জঠরের জ্বালায় পীড়িত হয়ে কিছুক্ষণ টগবগ করে তারপরে আবার এক সময়ে নিস্তেজ হয়ে এল। সোডার উত্তেজনার মত।

গলির মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারী করল পানু। একে একে এবাড়ি সেবাড়ির আলো নিভল, মনসাতলা বাই লেনের একমাত্র ক্ষীণ-জ্যোতি ল্যাম্পটির টিমটিমে আলোতে গলিটা ভুতুড়ে হয়ে উঠল। আত্মমর্যাদার হিম-শিখর থেকে একপাও নড়ল না পানু--রাম-হরিবাবুর বাড়ির বারান্দাতে গিয়ে সটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

ভোর হবার সঙ্গেই রামহরিবাবুর বারান্দা থেকে সরে পড়ল পানু। বাড়ি? না, ঐ গোঁয়ার বাপ থাকতে সে যাবে না এখন। বুড়োটা আপিসে যাক্, তারপর। তার কি দোষ? কি করবে সে? এক-আধটা পয়সার বুঝি দরকার হয় না তার? কে দেবে তাকে? চুরি করবে সে? লেখাপড়া? টেবুটার জন্য দুটো মাস্টার রেখেছিল ওর বাপ। তার জন্য ক'মাস কি একটা রাখা যেত না। অভাব! তার সে কি জানে? বাপের দায়িত্ব পালন না করতে পারলে বাপ হওয়ার কি দরকার ছিল। কে চায় মানুষ হয়ে জন্মাতে? পানুও চাইত না--শুধু আজকাল মনে হয় যে, জীবনটা নেহাৎ নিরর্থক নয়। মনসাতলা বাই লেনের নোংরা জীবনের মধ্যে হঠাৎ কটা রামধনুর রঙীন শোভা ঝলমল করে উঠেছে--জীবনের আনাচে-কানাচে যে ঝিলমিল তারার আলো লুকিয়ে আছে তা আজকাল মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত চোখের সামনে দিয়ে কেঁপে কেঁপে চলে যায়। একটা কিছু করতে হবে--সা--লা--।

জগন্নাথ কেবিনের ওদিকে গিয়ে দাঁড়াল সে ভোরের আলোতে। রাস্তাটা এরি মধ্যে ধুয়ে দিয়ে গেছে--চকচক্ করছে তা। কিন্তু আজ সব বন্ধ কেন? কি ব্যাপার? মাঝে মাঝে এক আধটা ট্রাম যাচ্ছে, কিন্তু বাস তো চলছে না।

মনে পড়ল পানুর। ট্রামের ভাড়া বাড়ানোর জন্য আজ স্ট্রাইক। দূর সালা, আজ চা জমবে না। কিন্তু চা-তো খেতেই হবে। মনোহর দত্ত লেনে ঢুকে ছোট্ট একটি চায়ের দোকান খোলা দেখল পানু।

"এক পেয়ালা চা দাও তো"--

"আজ স্ট্রাইক"--

"জানি--এক পেয়ালা দাও ভাই--বড় মাথা ধরেছে"--

সেই এক পেয়ালা চা খেয়ে এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে লাগল পানু। এ-গলি, সে-গলি, তারপর বড় রাস্তা।

বেলা বাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল। ট্রাম চালাতে দেবে না লোকেরা। এলোমেলো, বিশৃঙ্খল জনতা হৈ হৈ করে ট্রামের রাস্তা আটকাচ্ছে, ইঁট মারছে, ট্রাম থামিয়ে যাত্রীদের বের করে দিচ্ছে।

দেখতে বেশ মজা লাগে পানুর। মনের মধ্যে চাপা একটা হিংস্রতা যেন খুশী হয়ে ওঠে এতে। লাগ্ ভেলকী--লাগ্। দেখতে দেখতে দুপুর হল। খিদেটা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠল। এতক্ষণে বাবা নিশ্চয়ই ঘানি ঘোরাতে গেছে। বাড়ী যাওয়া যাক্।

বাড়ী যেতে গিয়ে পারুলদের দেয়ালের দিকে নজর পড়ে তার, হাসিতে মুখটা ভরে যায়। বাঃ বেশ দেখাচ্ছে তো--পারুলকে ভালবাসি। পারুল এখনো দেখেনি কি? দেখে নিশ্চয়ই রাগবে সে--ভাববে যে, পাড়ার কোন বখাটে ছেলে--

নিজের মনে হাসে পানু।

তারপর বাড়ী ঢোকে।

সামনেই মাধুরী।

মাধুরী হাত নেড়ে বাবার ঘরের দিকে দেখিয়ে আস্তে আস্তে আসতে ইশারা করে। পানু পা টিপে টিপে এগোয়।

"বাবা আপিস যায়নি?" ফিসফিস করে প্রশ্ন করে পানু।

মাধুরী মাথা নাড়ে, বলে, "যাবে কি করে?"

"হুঁ"--

চান করবে

"না।"

"খাবে চল"--

"মা?"

"খায়নি"--

"বাবা?"

"ঘরে"--

আস্তে আস্তে গিয়ে খেতে বসে পানু। মাধুরী পরিবেশন করে। পানুর বড় অবাক লাগে--মাধুরীটা মাঝে মাঝে বেশ ভালো ব্যবহার করে তো!

"এই যে--বাবু ফিরেছেন! হুঁ হুঁ বাবা--পেটের টান যে বড় টান"--

বাবা সামনে দাঁড়িয়ে।

প্রভাবতী অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এল। "কি, বাইরে রাত কাটালে তো ভাত জোটাতে পারলে না?"

আর ভাত খাওয়া যায় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণাকেও অগ্রাহ্য করা যায় এমন জ্বালা আছে।

থালা ফেলে উঠে দাঁড়াল পানু।

"পানু, ভালো হবে না"--প্রভাবতী বলল।

"ওকে যেতে দাও--অত মেজাজ ভালো না"--

"পানু"--

"ও যাক্"--

হ্যাঁ সে যাবেই।

পানু বেরিয়ে গেল।

"পা--নু--উ--উ"--মায়ের একটা ডাক শোনা গেল। না, আর ফেরা যায় না।

দরজার গোড়ায় পারুল।

দাঁড়াল পানু।

"কি কচ্ছ পারুল?"

"দেখতে পাচ্ছ না?" পারুল মুখটা ফিরিয়ে নিল।

পারুল কি জানতে পেরেছে? দেখেছে তার ঘোষণা?

"এখানে দাঁড়িয়ে যে?" পানু হাসল।

"এমনি--তোমায় দেখতে পাব বলে"--পারুল তিক্ত মধুর হাসি হাসল। কেন অমন হাসছে পারুল?

"আমায় দেখতে পাবে বলে?" কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না পানুর, এত তাড়াতাড়ি তো এমন কথা শুনবে বলে আশা করেনি সে।

"হ্যাঁ"--

"সত্যি?"

"হ্যাঁ"--টিপি টিপি হাসছে পারুল। ছিপছিপে গড়নের তন্বী পারুল, পরনে তার কমলা নেবু রংয়ের তাঁতের সাড়ী, এলোচুল পিঠের ওপর অলসভাবে ঝোলানো।

কি যেন চাই। এবার তা হবে। ক্ষুধা-তৃষ্ণাকেও জয় করে এবার পথ করেছে সে--এবার সব কিছু পাবে। মনসাতলার বাই লেন থেকে সবাইকে নয়, শুধু একজনকেই ডাকাতি করে নিয়ে যাবে সে।

এক পা এক পা করে কাছে গিয়ে দাঁড়াল পানু, বলল, "যদি অনেকদিন দেখা না হয় পারুল?"

"কেন?" পারুল যেন অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে।

"এমনি--একটা কিছু করতে হবে না?" এমনি দিন কাটবে নাকি?"

"এমনি দিন কাটাবে না? সে কি!" পারুলের কণ্ঠে ব্যঙ্গ ধ্বনিত হ'ল।

"কি বলছ পারুল?"

"তুমি কবে যাবে?"

"আজ--কাল--দু'চারদিনেই"--

"গেলে বাঁচা যাবে"--

"এাঁ!"

পারুল হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, তার দুচোখে আগুনের আভা, দ্রুতকণ্ঠে সে বলল, "তা নয়তো কি? গুন্ডা বদমায়েস, যত সব নিরীহ আর ভদ্রলোকদের তুমি মারধোর কর। অশিক্ষিত গোঁয়ার ভূত কোথাকার"--

"পারুল!"

"খবরদার--আর কোনদিন তুমি এ বাড়িতে আসবে না--আমার বাবা-মা ভয় পেলেও আমি গুন্ডাদের ভয় পাই না"--

দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল পারুল।

কি হল? পারুল অমন রাগল কেন? কি করেছে সে? তাহলে—তাহলে কি ঐ মেয়েলি ছাঁদের ছোকরাকেই—সা—লা।

কিন্তু আজ তার কি হল? সব দরজাই যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! হাতটা নিস্‌পিস্ করছে—দেয়ালে ঘুষি মেরে দেখলে কেমন হয়?

রাজপথই ভাল। এখানে আজ খুব উত্তেজনা। তিলুদের কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না আজ—কি হল ওদের? বড় একা লাগছে। একা একা কিছু জমে না। ঠিক আছে। একটু পরে তিলুদের বাড়ীতেই যাওয়া যাবে। ভবিষ্যৎটা নিয়ে একটা আলোচনা করতেই হবে। জীবনটা বড় জটিল, বড় অন্ধকার হয়ে উঠল। কি হবে? কি করবে সে? কেউ যদি বলে দিত—কেউ যদি হাত ধরে টেনে নিত—যদি কেউ বলত, 'পানু, তুমি মস্ত বড় বীর হবে।' কিন্তু কেউ বলল না। বাবা মা অপদার্থ বলল, পারুল বলল গুন্ডা। অথচ সে নিজে জানে না সে কী।

ঢং ঢং ঢং—

একটা ট্রাম সবেগে ছুটে আসছে।

"মার শালাকে—মার শালাদের"—

"বন্ধ কর গাড়ী"—

"মার—মার"—

চারদিক থেকে লোক জড় হল—ঢিল, ইঁট ছুঁড়তে লাগল ট্রামটির গায়ে। ট্রামের জানালার কাঁচ ভাঙল, ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল। দু' একজন যাত্রী যারা ছিল, তাদের হিড় হিড় করে টেনে নীচে নামাল সবাই। ভয়ে তাদের কাছা আলগা হয়ে গেল, ছাড়া পেয়েই প্রাণভয়ে চোঁ চাঁ দৌড় মারল তারা—সা—লা—।

পানুর হাসি পেল। একটা বিড়ি ধরাল সে। বেড়ে জমেছে চারদিকে। সিনেমার চেয়েও মজেদার—নাঃ, সিনেমার চেয়ে জীবন ঢের বেশী উত্তেজক। উদাহরণ সে নিজে। তার জীবন কি কম রোমাঞ্চকর? আজ কি তার জীবনে কম ঘটনা ঘটেছে। অশোককুমার, দিলীপকুমার, রাজকপুর—সব ব্যাটারাই বর্তে যাবে পানুর পার্ট পেলে। শুধু তার গল্পের শেষটা নেই। চারদিকে বিশৃংখল অরাজক আবহাওয়া—তার মাথার মধ্যেও একটা অরাজক অনুভূতি।

ঢং ঢং ঢং ঢং—

আর একটা ট্রাম আসছে।

খিদে পেয়েছে।—সা—লা!

"মার—মার শালাকে"—

ইঁট ছুটছে।

কাঁচ ভাঙছে।

ড্রাইভার পালাচ্ছে।

"ধর—ধর সালাকে—মার"—

পানু দাঁত মেলে হাসল, এগিয়ে গেল ট্রামটার দিকে। বাঃ, ট্রামের চেহারাটা বেশ বিগড়ে দিয়েছে।

একজন বাবুকে ওঠবোস করাচ্ছে ক'জন ছোক্‌রা। পানু এক পাশে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল হ্যা হ্যা করে।

মোটামত বাবু ঘেমে উঠেছে।

"আর ট্রামে চড়বি যাদু—ওঠ্ সা—লা"—

"বোস্"—

"ওঠ্"—

"বোস্"—

"দে সালার ট্রামে আগুন লাগিয়ে"—

"হাঃ হাঃ হাঃ—দে"—

চারদিকে কারা? এদের সংগে তার যেন কোথায় মিল আছে। দেয়ালে ঘুষি না মেরে ওরা ট্রামে আগুন দেয়। কিন্তু যাই বল, বেশ মজা। যদি কেউ বলে দিত কী করব, কী হব!

"দেশলাই—একটা দেশলাই"—

দূরে কোলাহল। অন্য ট্রাম থামাচ্ছে।

"তেল ঢেলেছিস?"

"পুলিশ—পুলিশ"—

পুলিশ ভ্যান আসছে দূরে।

জনতা ছড়ায়, সরে, একটু সতর্ক হয়ে দাঁড়ায়।

"দে না দেশ্‌লাই—কোথায়?"

কে যেন ওদিকে ঢিল মারছে।

"মার—মার শালাদের"—

"একটা দেশ্‌লাই"—

পানু দেশলাই বের করে ছোকরার পাশে দাঁড়ায়। এ কি, ছোকরা যে অবিকল তার মত দেখতে!

"জ্বালান দেখি"—

পানু দেশ্‌লাই জ্বালে।

"দিন"—সেই ছোকরা কাঠিটা টেনে নেয়। অবিকল তার মত চেহারা! এই উত্তেজিত ধ্বংসের জীবন—এ দেখেও যেন মনে পড়ে। কী যেন চাই।

"মার মার—মার"—

"পুলিশ—পুলিশ"—

"পালা"—

"মার"—

একটা হুড়োহুড়ি। দাউ দাউ করে জ্বলল ট্রামটা। আগুনের শিখাটা থেকে সরে যায় পানু। কিন্তু বড় ঠেলাঠেলি।

"সরো—সরো"—

"পুলিশ"—

হঠাৎ এক রাউণ্ড গুলি এল।

"পালাও—পালাও"—

দুড়দাড় পায়ের শব্দ। রাস্তা প্রায় পরিষ্কার। শুধু জ্বলন্ত ট্রামটার পাশে পানু পড়ে থাকে। তার বাঁ পাঁজরার দিকে গুলি লেগেছে। রক্ত কল্ কল্ করে বেরোচ্ছে—যেন শিবের জটাজাল থেকে সুরধনী মুক্তি পেয়েছে। চারদিকে দেয়াল দেখে দেখে দিশেহারা প্রাণটা আজ মুক্তি পাচ্ছে। সব দরজা বন্ধ হয়েছে আজ। বাবা—পারুল—কিন্তু তার বদলে একটা নতুন দরজা আজ খুলল। কিন্তু এতো চায়নি সে, এতো চায়নি। অনন্ত আশ্বাসে ভরা অনন্ত প্রাচুর্যে ভরা জীবনের যে পথ—কেউ যদি বলে দিত—কেউ যদি—

মনসাতলা বাই লেনে এখন কতটা অন্ধকার? চোখের সামনেকার এই পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের মত? জীবনে যে এত অন্ধকার তা তো পানু জানত না—সব অন্ধকার হয়ে আসছে—চোখের দৃষ্টি, চৈতন্য, শক্তি—। শুধু একটা জিনিস স্পষ্ট, স্পষ্টতর হয়ে উঠছে—মনসাতলা বাই লেনের ছাতিলাধরা দেয়ালের ওপর ইঁটের টুকরো দিয়ে লেখা দু'টি কথা—

[এই গল্পের নাম মিলনান্ত, ঘটনা-প্রবাহও তাই। কাহিনীর শেষে হঠাৎ-স্টিয়ারিং-ঘোরান সারপ্রাইজ নেই। সহসা ব্রেক-কষা সাসপেন্সও না। লোকহিতায় এ-গল্প লিখিনি, যাঁরা এর মধ্যে জটিল মনস্তত্ব বা সমাজতত্ব খুঁজবেন তাঁরা হতাশ হবেন।

কোথায় শুরু করব বুঝতে পারছিলুম না। শেষ পর্যন্ত মনে হল সূত্রপাতটা মাঝামাঝি কোথাও হলেই ভাল হয়, সেই যেদিন নায়ক টেড দিল্লীতে গাড়ি বদলে সিমলা যাত্রা করেছিল। পিছনে যা রইল সেটা পরে আভাসে বলা আছে। সুতরাং সরেজমিনে কথারম্ভ করে দিই, বেতারের পরিভাষায় Over to Delhi]

এই মুখটি টেড খুঁজতে শুরু করেছিল দিল্লী জংশন থেকেই। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিল, মীটারটাও দেখল না, আনা আষ্টেক বোধ হয় বেশিই তুলল, সেলাম পেল কি পেল না নজর করল না, কুলীগুলো মালের ওপর ছোঁ দিয়ে পড়েছিল, তাদের হাত এড়াতে প্রথম যাকে দেখল তার হাতেই জিনিসপত্র সঁপে দিল, ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে গাড়ির নম্বর বলে জিজ্ঞাসা করল কোন প্ল্যাটফরমে। তারপর এদিক-ওদিক তাকাল। না, সেই পরিচিত মুখখানা নেই। স্টেলা আসেনি।

'চলিয়ে সাব', বলেই কুলীটা ছুটতে শুরু করেছিল, ভাঙা-পা আর কাঠের ক্রাচ নিয়ে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলে না. হাজার লোকের ঠেলাঠেলি। ইনকোয়ারি অফিসের দিক থেকে একটি মেয়ে খুট-খুট করে এগিয়ে এল, তার মুখে মৃদু লিপস্টিক হাসি, টেড মুহূর্তমাত্র থমকে দাঁড়াল। না, সে-মুখ তো নয়। মেয়েটি গেটকীপারের দিকে চেয়ে ভ্রূভঙ্গ করল, তারপর হেসে কি বলে অন্যদিকে চলে গেল।

কুলীটা ততক্ষণ ওভারব্রীজের মাঝামাঝি। অকারণেই টেড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, প্ল্যাটফর্মের পূর্ণচন্দ্র ঘড়িটার হিসাবে সময় এখনও প্রায় বিশ মিনিট, ক্রুদ্ধ হল নিজের ওপর, কেন ছুটতে পারছে না, স্টেলার ওপর, কেন আসেনি, কুলীটার ওপর, কেন এগিয়ে গেল এতটা। শেষ রাগটা একটা স্বগত শপথে রূপ নিল, 'ব্লাডি, উল্লু।' যথেষ্ট জোরাল হল না, রাগ পড়ল না, টেড ফের মনে মনে বলল 'Sonofa—' শেষ করবার আগেই ওভারব্রীজের সিঁড়িতে হোঁচট খেল।

গাড়িতে উঠতে যাবে, রেল-কর্মচারী একজন টিকিট দেখে বলল, 'এটা নয় পরেরটা।' টেড্ খেঁকিয়ে উঠতে গেল, 'like hell you know,' শেষ পর্যন্ত কিছু বলল না কেন না, এ-লোকটা অন্তত পোশাকে তার স্বজাতি, সুরসুর করে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসল। স্টেলা আসেনি।

এখনও দশ মিনিট। কামরাটা খালি, টেড কপালের ঘাম মুছল, মুখ-ফেরান পাখাটাকে ঘুরিয়ে নিল, পাইপ বার করে পোচ থেকে মিকশ্চার ভরতে লাগল টিপে টিপে।

টফি-বিস্কুট-চা-রুটি নিয়ে একটা পেডলার প্ল্যাটফরমের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত গড়-গড় করে চলে গেল, তার পিছন পিছন তকমা-আঁটা একটা লোক, 'সাব, খানা?' টেড জবাবে বলল 'ভাগো।' সব শেষে এল কাগজ আর বইওয়ালা, টেড কিনলে দু'খানা থ্রিলর আর হাল-হপ্তার সচিত্র একটা ম্যাগাজিন, প্রচ্ছদ স্বল্প-স্বচ্ছবাস কয়েকটি নর্তকীর ছবি। টেড সুডোল শুভ্র সুঠাম কয়েকটি পায়ের দিকে এক পলক চেয়ে রইল, তারপর ছুঁড়ে ফেলল কাগজটা। পৃথিবীতে এমন অপর্যাপ্ত, অপরূপ চলৎ-শক্তি, শুধু টেড স্থির, স্থানু, দম-বন্ধ ঘড়ির কাঁটার মত।

সবুজ আলো জ্বলেছে, সবুজ নিশান উড়েছে, টেড শেষবারের মত জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল না, সেই মুখখানি নেই, স্টেলা এল না।

সোনেপত, পানিপথ, কারনাল। কয়লার গুঁড়োর জামা-কাপড় কালি, একটার পর একটা হল্ট, টেড জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে আছে। আম্বালাতে টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হল, পাইপটা বারবার নিবে যাচ্ছে, টেড বলতে যাচ্ছিল 'ড্যাম', সামলে নিল; বোধ হয় মনে পড়ল, এটা তো নেটিব নয়, পাইপ, খাঁটি ব্রায়ার।

আবার সবুজ আলো দিয়েছে, গাড়ির চাকায় চাকায় টান। প্ল্যাটফর্মের শেষ-প্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে একটি মেয়ে, টেড উৎসুক মুখ বাড়িয়েছিল, কিন্তু এ-মেয়ে সে নয়। মেয়েটি ওর কামরার সুমুখেই দাঁড়িয়ে পড়ল, দরজার হাতলে ব্যর্থ একটা মোচড় দিয়ে বলল, প্লীজ—প্লীজ লেট মি ইন।

ততক্ষণে হুইসল দিয়েছে, টেড বিনা-বাক্যব্যয়ে দরজা খুলে দিল। আড়চোখে চেয়ে দেখল, মেয়েটির সর্বাঙ্গ সিক্ত, হাতে ছোট্ট একটা ব্যাগ, নখে, গালে, ঠোঁটে ছোপ-ছোপ লাল। ওর সামনের সীটে বসেই মেয়েটি হেঁট হয়ে মোজা খুলতে লাগল, টেড আবার মুখ বাড়িয়ে দিল জানালার বাইরে।

রাত শেষ হয়ে এসেছে, তারাগুলো ছুটছে যেন রীলে করে, একজন পিছিয়ে পড়ে তো আরেকজন সঙ্গ নেয়, দুর্বোধ্য স্বরলিপির মত টেলিগ্রাফের তার আছে পাশে পাশে। এতক্ষণে টেড যেন টের পেল বর্ষার হঠাৎ জোর বেড়েছে, বড় বড় ফোঁটায় ওর মুখ ভেসে গেল। জানালা নামিয়ে দিয়ে ফিরে বসবে সে সাহস হল না, টেড নির্ভুল জানে মেয়েটি নিশ্চয় এক-জোড়া কালো কৌতূহলী চোখ ওর পিঠের ওপর রেখেছে। সামনে বৃষ্টির কাঁটা, পিছনে দৃষ্টির ছুরি, মাঝখানে ভোজ্য মাংসখণ্ডের মত টেড অস্বস্তির পিণ্ড হয়ে বসে রইল।

খস খস শব্দ হল, মেয়েটি মেজে থেকে ম্যাগাজিনটা বুঝি কুড়িয়ে নিয়েছে। মুখ ফেরাতেই টেড লজ্জিত-অপ্রতিভ এক টুকরো হাসি দেখতে পেল, মেয়েটি বলল, 'মে আই—'

টেড আবার মুখ ফিরিয়ে নিল।

ভরসার কথা, রাত কেটে যাচ্ছে, চণ্ডী-গড় ছাড়িয়ে গেল, এবারে চড়াই, আর একটু পরেই দেখা দেবে শিভালিক রেঞ্জ, কালকা। সেখানে স্টেলা নিশ্চয় থাকবে।

টেড টের পেল মেয়েটি ঝুপ করে কাগজটা ফেলে দিয়েছে, ফশ করে দেশলাই জেলে ওঠার শব্দও শুনল, বোধ হয় সিগারেট ধরিয়েছে। টেড ফের পাইপটা ধরাতে গেল, দেশলাই খুঁজে পেল না।

একটা পীত-রক্তাভ হাত ওর দিকে এগিয়ে এসেছে, প্রজ্জ্বলন্ত একটা কাঠি, হিয়ার ইউ আর। টেড কৃতজ্ঞ, তবু বিরক্ত, বিড় বিড় করে বলল, থ্যাংকস্—থ্যাংকস্ এ লট।

সীটের পাশে-রাখা ক্রাচটার দিকে মেয়েটির বোধ হয় এতক্ষণে নজর পড়েছে, মিষ্টি, রিনরিনে গলায় বলল, 'বীন টু ওঅর?'

টেড ঘাড় নাড়লে।

—দেন্ এ্যাকসিডেণ্ট?

—নো।

মেয়েটি এবার মুষড়ে পড়ল, কতকটা কৈফিয়তের স্বরে বলল, 'ওয়েল, আই সও দ্য ক্রাচ—'

টেড গম্ভীর গলায় বলল, নেভার মাইণ্ড দ্য ক্রাচ।

এর পরে আর আলাপ চলে না।

মেয়েটির আক্রমণ এবার কোন্ দিক থেকে আসবে টেড ভাবতে লাগল। জলের ধারায় আসন ভিজে যাচ্ছে, মেয়েটি হয়ত বলবে ইউ উইল প্লীজ পুল দ্য শাটার ডাউন, ওণ্ট ইউ?

টেড বলবে, আই ডোণ্ট থিঙ্ক আই উইল। অভদ্রতা হবে, ম্যানার্স-বাইবেল অশুদ্ধ হবে, কিন্তু কেন স্টেলা এল না, কেন, কেন।

গাড়ির গতি কমেছে, গ্লোরি টু মেরি, আর ভয় নেই, কালকা এসে গেছে। টেড জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। মেয়েটি কখন খুট করে দরজা খুলে নেমে গেছে।

কালকাতেও সেই মুখ দেখা যায়নি, দেখা গেল একেবারে সিমলায় পৌঁছে, কার্ট রোডে গাড়ি দাঁড়াতে।

স্টেলা ছুটে এল, জড়িয়েও ধরল দু'-হাতে, তবু সেই স্পর্শে নিবিড় উত্তাপ সঞ্চারিত হল না তো, সেকি শুধু টেড দস্তানা পরে আছে সেইজন্যে।

—টেডী ডিয়ার, ইউ মাস্ট নো বব্, রবার্ট ড্রেক। ডাক্তার, আমাদের বন্ধু।

স্টেলার পাশেই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে-ছিলেন, গায়ে পুরু ওভারকোট, মাথায় অন্তত সওয়া ছ'ফুট, টুপিতে হাত দিয়ে-ছিলেন, টেড হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, হাউ ডু ই ডু, মিঃ ড্রেক।

প্রত্যুত্তরে ড্রেকও ওই কথাটাই বললেন।

বরফের শাদা চাদর পড়েছিল রাস্তায়, স্টেলার কনুইয়ে ভর দিয়ে টেড এগোতে গেল, স্টেলা বলে উঠল ওয়াচ ইয়োর স্টেপস্, ডিয়ার। দেখে দেখে পা ফেল।

টেড তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'ইউ থিঙ্ক আই হ্যাভ টু?'

স্টেলা বরফে হীল ঘষতে ঘষতে বলল, 'ইয়েস', আর পিছন থেকে কে যেন গলা কেশে বলল, 'ইউ নো মিঃ সাটন, দেয়ার্স এ স্লিপারি স্লোপ এহেড্—'

টেড্ পিছনে চেয়ে দেখল কালো ওভার-কোট আর টুপিতে প্রচ্ছন্ন একটা মূর্তি, ডাঃ ড্রেক। একটু হাসল টেড, পাইপটা ঠোঁটে রেখেই জড়িত স্বরে বলল, আই থট্ এ্যাজ্ মাচ্। আমি জানতাম।

ঠিক তখুনি শিষ দিয়ে উঠলেন ড্রেক, জন চারেক লোক একটা রিক্সা নিয়ে ছুটে এল, চোখের ইশারায় ড্রেক টেডকে বললে উঠে বসতে। টেড একবার ভাবল উঠবে না, স্টেলার হাত ছেড়ে দিয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়াতে গেল, পারল না, ক্রাচটা পিছলে গেছে, টলে পড়ল।

ড্রেক তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেললেন। আর প্রতিবাদ করার সাহস হল না, টেড সুবোধ শিশুর মত রিক্সায় উঠে বসল, ওর পিছনে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল স্টেলা আর ড্রেক।

ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় বুকের ভিতরটাও যেন হিমে জমে গেছে, টেডের অনেককাল পুরনো একটা ছবি মনে পড়ল। ওর বাবাকে তুলে দিয়েছে কালো ঘোড়ায় টানা গাড়িতে, পিছনে ওর হাত ধরে চোখ মুছতে মুছতে চলেছেন টেডের মা। ফুলের মালায় কফিন পুরোপুরি ঢেকে গেছে। Say it with flowers. যেদিন সবাই মিলে টেডকে তুলে দেবে কালো ঘোড়ার গাড়িতে, সেদিনও কি স্টেলা এমনি পিছে-পিছে আসবে, ওর পাশে থাকবে ওই দৈত্যাকার ওভারকোটটা—বব্ ড্রেক? Say it with flowers. ফুলে কি এত কাঁটা।

ড্রেক বাড়ির ভিতরে এল না, সিঁড়ির কাছ থেকেই বিদায় নিল। ওরা নিঃসঙ্গ

হতেই স্টেলা আবার দু'হাত জড়িয়ে দিল ওর গলায়। উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, I'm glad, dear, you've hurried home to me. কী-যে খুশি হয়েছি আমি।

এখন দস্তানা নেই, কী ঠান্ডা, শাদা স্টেলার আঙুল, টেডের গলার শিরাগুলো পর্যন্ত নীল হয়ে উঠেছে। ঠোঁটে দাঁত চেপে টেড ধীরে ধীরে বলল, You rather would I stayed away? দূরে থাকলেই কি খুশি হতে?

স্টেলার মুখে রক্ত ছড়িয়ে গেল, কোন মতে বলল, হোয়াটেভার ইজ দি ম্যাটার উইথ ইউ। কি হয়েছে তোমার বল ত।

টেড এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল; এই ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখ-খানাই কি সে দিল্লী থেকে সারা পথ খুঁজতে খুঁজতে এসেছে। আস্তে আস্তে বরফ বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে বলল, 'ইউ আর কোল্ড্, ডিয়ার।'

জবাবের প্রতীক্ষা করল না, ঘরের কোণে একটা লোহার শিক পড়ে ছিল, সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে আগুনটা খুঁচিয়ে দিতে লাগল। নিবে যেন না যায়, হে ঈশ্বর অন্তত একটু উত্তাপ যেন অবশিষ্ট থাকে।

বিকেলে ওরা সকলে এল একে একে। টেড দাড়ি কামিয়ে পোশাক বদলে এখন দস্তুরমত স্টেলার স্বামী এড্ওয়ার্ড সাটন—সকলকে স্মিত হেসে অভিবাদন করল। সামার হিল থেকে এসেছেন জোসেফ ক্রিফটন একদা পুলিশে বড় চাকরি করেছেন; তারা দেবী থেকে জিমি ওয়ালেস, রেলের চাকুরে; প্রসপেক্ট পাহাড় থেকে জর্জ রে: জ্যাকো থেকে ফ্রেডারিক, আর মোসারা থেকে ডাঃ ড্রেক। এই তো ক' মাস মোটে হাসপাতালে চাকরি নিয়ে এখানে এসেছে, এরই মধ্যে এত বন্ধু স্টেলার?

পাথরে পাথরে ঘা খাওয়া ঝর্ণার মত, সদ্য খোলা সোডার বোতলের মত ফেনায়িত হয়ে উঠছে স্টেলা, স্বচ্ছ চপল, লীলায়িত। ও ডিয়ার, রীয়েলি, আর ক্রাইস্টের বুদ্বুদে ছেয়ে গেছে হাওয়া। এত কথা জানে স্টেলা!

হাসতে হাসতে স্টেলা গ্রামোফোনে কখন চড়িয়ে দিল নাচের একটা গৎ,

"Sweetheart, if you stay
A million miles Away"

ডিস্ক পুরোপুরি না ঘুরতেই সেটা থামিয়ে দিল, বলল, 'awful'

জিমি বলল, চলুক না, উঠে গিয়ে দাঁড়াল স্টেলার পাশে, সাউন্ড বক্সের ওপর ঝুকে পড়ে সামান্য একটু হাতাহাতি, স্টেলার হাতে পিন ফুটে গেল, এক ফোঁটা রক্ত, বলল, উঃ।

ঘরের এক কোণে বসে আছে টেড, দেখছে। চোখ দুটো ওষ্ঠ লগ্ন পাইপটার চেয়েও প্রজ্জ্বলন্ত, বাইরে চেয়ে দেখল, শাদা শাদা পালকে আকাশ ঢেকে গেছে, হিম-মৃত্যু! বেশ হয় যদি দরজা জানালা সব ঢেকে যায় বরফে, কঠিন স্তরের পর স্তর, নীরন্ধ্র একটা তুহিন কবরে বরাবরের মত থেমে যায় একটি প্রগলভ নারী-কণ্ঠের কাকলি, পরপুরুষের সঙ্গে কপট কলহ।

একদা পুলিশের বড় চাকুরে ক্রিফটন তখনও ওর পাশে বসে। চিনির একটা ডেলা চায়ে মেশাতে মেশাতে বললেন, রিমাইন্ডস মী অব এ্যান আফটারনুন ইন কেনসিংটন। কেনসিংটনের সেই বিকেলটি মনে পড়ছে।

টেড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, সব মিথ্যে, সে জানে ক্রিফটন কখনও কেনসিংটনে যায়নি এরা কখনও যায় না, কিন্তু সুযোগ পেলেই বড়াই করে।

সাড়া না পেয়ে ক্রিফটন আবার বললেন, এভর বীন হোম?

হোম? টেড এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'নো—নট ইয়েট।'

ক্রিফটন নীরব দৃষ্টি দিয়ে বললেন, পিটি।

হঠাৎ ওর পাশে এসে টপ করে বসল জর্জ। বলল আজ আর ক্লাবে যাওয়া হল না, দেখছি। হেল, দিস ব্লাইন্ডিং স্নো। ডু উই প্লে ব্রিজ?'

টেড ঘাড়টা ঈষৎ সঙ্কুচিত প্রসারিত করে উত্তর দিল, যার অর্থ শালগ্রামের আবার শোয়া আর বসা। ঘরের অপর প্রান্ত থেকে হাত তালি দিয়ে উঠল স্টেলা।

কাট ফর পার্টনার? জিমি তাস গোছাতে গোছাতে বলল।

পার্টনার? টেড চমকে উঠল, মুহূর্ত-মাত্র বলল, অলরাইট।

স্টেলা গেল বব ড্রেকের দিকে, জিমি আর টেড একদল হল। ড্রেক বলল, 'স্টেক্স'?

টেড পকেটে হাত ঢুকিয়ে যত পেল সব টেবিলের ওপর উপুড় করল। বলল, 'এভরি ডো।'

স্টেলা আড়চোখে টেডের দিকে তাকাল, ঘন ভ্রূর নীচে তখনও দুটো মণি ঠক ঠক জ্বলছে, বেশিক্ষণ তাকাতে পারল না, চোখ ফিরিয়ে নিল।

তারপর টেড একটানা জিতে গেল। প্রতিটি রবারের শেষে হিংস্র আগ্রহে টেবিল থেকে পয়সা কুড়িয়ে কুড়িয়ে পুরল পকেটে, খসখসে নোটের তাড়ায় বুক পকেট উঁচু হয়ে উঠল।

দশম রবারের শেষে, দু'হাত মাথার ওপর তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ড্রেক বলে উঠল 'ওয়েল আই'ম লিকড্। লেট'স কল ইট এ ডে।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে টেড উঠল টেবিল ছেড়ে, ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে গেল, সেলার থেকে একটা শিশি বার করে মুখের ওপর উপুড় করল। কী জ্বালা, কী শান্তি।

বরফ পড়া বন্ধ হয়েছিল। সবাইকে এগিয়ে দিয়ে এসে দরজা ভেজিয়ে দিল স্টেলা, কবাটে পিঠ রেখে টেডের চোখে চোখ রেখে অস্ফুট গলায় বলল, 'বীস্ট।'

হাতের শিশিটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে টেড হেসে বলল, 'ইয়েস, ডিয়ার। বাট আই কুড্'ন্ট হেল্প উইনিং, কুড আই?'

তারপর যত নোট, খুচরো পয়সা ছিল, সব টেবিলের ওপর ঢেলে দিয়ে বলল, 'টেক ইট্।'

সেই ধক ধক দৃষ্টি নিবে গেছে, ক্রাচে ভর দেওয়া, হৃতস্বাস্থ্য একটা ত্রিভঙ্গ দেহ, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবির মত।

হঠাৎ থেমে গেছে বরফের ঝড়, পুরু শ্লেটের শাদা আস্তরের নিচে কঠিন পাথর বেরিয়ে পড়েছে, কার্ট রোডে কুলু ভ্যালী সঞ্জাউলির বাসের ভীড়, প্রসপেক্টে পিকনিক; ম্যালে সেই দুমুখী জনস্রোত, স্ক্যান্ডাল পয়েন্টে পরিচিত জটলা। কুয়াসা আর মেঘ যেন এক ফুঁয়ে মুছে গেছে, নীল-নির্মল দিগন্তে জ্যোতির্লেখার মত হিমালয়ের তুষার কিরীট।

রিজের বেঞ্চে বসে বসে টেডের কোমর ধরে যায়, এই পথ এঁকে বেঁকে হাসপাতাল হয়ে গেছে মোসারার দিকে। স্টেলা এখনও এল না?

অসহিষ্ণু হয়ে টেড পাইপটা তুলে নিল, হাওয়ায় কাঠিগুলো বারবার নিবে যাচ্ছে, টাইটা উড়ে এসে নাকে পড়ল,—হেল। দুটি পাহাড়ী মেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল, টেডের দিক চাইল একবার, টেড তো নয়, তার ক্রাচটার দিকে, কী বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে, তারপর হাসতে হাসতে ঢালু পথে নেমে গেল। পথের ওপরই ক'জন কিউরিও সওদা বিছিয়ে বসেছে, পিতলের ওই বড় মূর্তিটা কী, বোধহয় বুদ্ধ। আরও টুকিটাকি কিছু জিনিস, ব্যাংগলস এ্যান্ড ব্রেসলেটস, সেগুলো নিয়েই উৎসুক কটি হাত কাড়াকাড়ি করছে। হোয়াট এ ফান।

টেড আর একটা শপথ উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দূরে দেখা গেল স্টেলাকে, থেমে গেল।

'এত দেরী হল?'

'কী করি, কাজ ছিল।'

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তর, টেড ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, স্টেলা এগিয়ে এসে ওর কনুইয়ে হাত গলিয়ে দিল, 'বাড়ি চল।'

'চল।'

ঢালু অনেকখানি পথের পর আবার চড়াই, স্টেলা বলল, 'রিক্সা নিই?'

কথাটা বলল টেডকে, কিন্তু সন্দেহ নেই স্টেলা চেয়ে আছে ক্রাচটার দিকে, ঈষৎ করুণা, অনুকম্পা, অবহেলা। হা-ঈশ্বর, একটা মানুষের চেয়ে তার ক্রাচটাই বড় হল?

মুহূর্তে টেডের শরীরের পেশী কঠিন হয়ে উঠল। 'আই'ম অল রাইট। গেয়েস, আই'ল ওয়াক।'

বাড়ি ফিরেই স্টেলা স্টোভের প্লাগ এ'টে দিয়েছিল, চা তৈরি হতে মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগল না। রুটির টুকরো ছি'ড়তে ছি'ড়তে টেড বলল, 'এবার কী করব।'

তাই তো, কী। বাইরে মেঘ মুছে যাওয়া প্রসন্ন বিকেল, তিনশো ফুট নীচে রেল স্টেশনে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে দিনের শেষ গাড়িটা এসে দাঁড়াল, জ্যাকো পাহাড়ের ঝকঝকে টালির বাঙলোগুলো স্পষ্ট দেখা যায়, নীচের গভীর খাদ থেকে উঠে এসে ফারগাছের ডালগুলো সার্শির ওপর সরসর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। টিকটিক দেয়ালের ঘড়িতে, টিপ টিপ টেডের কপালের রগে, কিছু কাজ-না-থাকা ভারী সীসে সন্ধ্যাটা যেন সাঁড়াশির মত কঠিন আঙ্গুল নিয়ে ওর কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

ঘরের কোণে রাখা বাজনাটার দিকে তর্জনী দেখিয়ে টেড বলল, 'ওণ্ট ইউ প্লে মি সামথিং।'

স্টেলা উলের কাঁটা নিয়ে বসেছিল, পোষা কুকুর প্রিন্স সেই মাগাজিনের মেয়েদের পা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, টেড হঠাৎ বলে উঠল, ওণ্ট ইউ প্লে মি সামথিং—কিছু বাজাও না।

'কী শুনবে।'

'জাস্ট এনিথিং।'

যা হোক কিছু। শুধু একটু সঙ্গীত চায় টেড, রিনরিন টুংটুং মিষ্টি সুরে এই ঘরটুকু ভরে উঠুক, ঢেকে দিক ওদের দু'জনকে, নরম বরফের প্রচ্ছদ যেমন কঠিন পাথর ঢেকে দেয়। 'জাস্ট এনিথিং।'

বিয়ের পরের প্রথম দিককার অপরাহ্ন-গুলি একটির পর একটি ভীড় করে এসেছে আজ, মাঠ থেকে ফিরে এসে ওরা যখন পাশাপাশি বসেছে, আট ফার্লং দৌড়ের বাজি জিতে তখনও টেডের রক্ত তপ্ত, নাড়ি দ্রুত।

স্টেলা বলত, 'টেড তোমার নেশা হয়েছে।'

নেশা বইকি। টেডের কানে বাজছে গ্যালারি থেকে ঝড়ের মত হাততালি, জোরে আরও জোরে, শুয়ে পড় ঘোড়ার পিঠে, বিদ্যুতের আগে ছুটুক মাই হার্ট, তার ক্ষুরে আগুনের ফুলকি, দৃষ্টি গতি-অন্ধ, নাকে-মুখে ফেণা।

'কী ভাবছ, মাই হার্ট কেমন দৌড়েছিল?' স্টেলা কখন গলায় জড়িয়ে দিয়েছে দুখানা নবনীত হাত, তখন স্টেলা দস্তানা পরত না, হাতে রক্ত মাংস ছিল, টেড ঘ্রাণ নিয়েছে সেই কবোষ্ণ করপল্লবের, আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চেতনা, তারপর বুকভরা সেই তৃপ্তি, অতৃপ্তি, পাওয়া, আরও চাওয়া, স্ফীত নাসারন্ধ্রে তপ্ত নিঃশ্বাসের রূপ নিয়েছে।

'তোমার মাই হার্টকে আজ মাঠে দেখলুম। কী জোরে দৌড়য়, বাপরে, আমার ভয় করে। আই হেট দ্যাট এনিমল্।'

'শী'জ গ্লোরিয়স। হ্যাজ নেভার লেট মি ডাউন' কখনো মাই হার্ট টেডের মুখ হাসায়নি, স্পার্টে না, গ্যালপে না, বাজিতে না। মাইনর প্লেট থেকে মেজর কাপ—একটানা উইন।

সেই মাই হার্টই শেষ পর্যন্ত ডোবালে ওকে। কলকাতার কোর্সে হঠাৎ বেন্ডের মুখে কাৎ হয়ে পড়ল, বিউটি কুইন ছিল দু'লেংথ পিছনে, সে কোথা থেকে এসে পড়ল ঘাড়ে, আর কিছু মনে নেই। গ্যালারিতে সোরগোল, একটু পরে সব অন্ধকার।

মাই হার্টও বাঁচেনি। ওকে ওরা গুলী করে মেরেছিল। সেই মাঠেই।

ছ' মাস পরে হাসপাতাল থেকে ক্রাচে ভর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে টেড, চ্যাম্পিয়ন জকি ওল' টেডী নয়, নিনখদাঁত জেণ্টলম্যান, মিঃ এডওয়ার্ড সাটন। পিছনে পড়ে রইল মুহুর্মুহু করতালিমুখরিত গ্যালারি, বিদ্যুৎগতি ঘোড়ার পিঠে কয়েকটি স্বেদাপ্লুত মুহূর্ত হ্যান্ডিক্যাপ, স্টেকস, টোট, ট্রট আর গ্যালপের পৃথিবী। পকেটে সামান্য কিছু টাকা, ক্ষতিপূরণের আর ইনসিওরেন্সের, তারও কিছু চেয়ে নিয়েছে ওর সেরা দোস্ত ট্রেনার আবদুল আলি।

পিয়ানোয় বেজে উঠল একটা গৎ; টেড শিস দিলে, মেজেয় তাল ঠুকলে জুতোর গোড়ালি দিয়ে, সহর্ষ একটা অব্যয় উচ্চারণ করলে। স্টেলা বাজিয়ে চলেছে 'Is it true your love is burning low?'

ঠিক তখুনি বাইরের দরজায় কে বোতাম টিপলে, প্রিন্স লেজ নাড়া মুলতুবী রেখে এদিক ওদিক কী শু'কল, তারপর লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল বাইরের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে বাজনাটা আর্তনাদ করে থেমে গেল।

'কে' ডালাটা বন্ধ করে স্টেলা জিজ্ঞাসা করল অস্ফুট স্বরে। টেড উঠে গেল।

টুপি ছু'য়ে ড্রেক অভিবাদন করল ওকে। ছ'ফুট লম্বা ওভারকোটে ঢাকা দৈত্য, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'আসতে পারি?'

পিয়ানো ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্টেলা বলে উঠল, 'মাই! ইট'স্ বব্।'

অনুমতির অপেক্ষা করল না, কার্পেটের ওপর ওর ঢাউস-নৌকো জুতোর ছাপ এ'কে দিতে দিতে রবার্ট ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

প্রিন্স লেজ নাড়তে নাড়তে ফিরে গেল আগুনের পাশে, হার্থ-রাগের ওপর কুন্ডলী-কৃত হয়ে বসল। কু'কড়ে গেছে টেডের ভিতরটাও, সেও ফিরে এল অগ্নিকুন্ডের পাশে, প্রিন্সে'র গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। একজনের জিভ লকলক করছে আরেকজনের ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, একটা কুকুর আর একটা মানুষের মনের মধ্যে সেই মুহূর্তে একটা সাঁকো তৈরি হয়ে গেল।

পরদিন আবার বরফপড়া শুরু হল। সকাল থেকে আকাশ থেকে যু'ই-ফুল ঝরছে তো ঝরছেই, শোঁ-শোঁ হাওয়ার রুদ্ধ মুষ্টি শার্সির কাচে, ছাইরঙ আকাশে অগুনতি সাপের কিলবিলি।

স্টেলা ছুটি নিয়েছে হাসপাতাল থেকে, কিন্তু আনাণ্ডেলের স্কেটিং লিঙ্ক-এ যেতে ভোলেনি। সেখান থেকে ক্লাব।

ক্লাব ঘরে নিরিবিলি কোণে গ্লাস সমুখে নিয়ে টেড। কিছু ভাল লাগে না তার এসব, সব ছেড়ে-ছু'ড়ে ছুটে পালাতে পারলে ভাল হত, কিন্তু কোথায় যেন শিকল আঁটা আছে, বসে বসে চুমুক দেয়, আড়চোখে দেখে।

কাটা কাটা কথা কানে আসে।

—Know who the man is?

—O, it's that bloke invalided home, husband of that Sutton woman.

ইনভ্যালিডেড হোম। ব্যস আর কেউ নয়, কিছু নয়। এ মীয়র নোবডি। টেড ফের গ্লাসে চুমুক দিল।

ঘরের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে, আলকোভে মিষ্টি একটা সুর বেজে উঠল, এবার নাচ শুরু হবে। প্রায়ান্ধকার ঘরে খিলখিল হাসি, কার গলা। স্টেলার।

স্টেলাও নাচবে। ওর কোমর বেষ্টন করে একটা লোক দাঁড়িয়েছে, ওকি বব্ ড্রেক, ওকি জিমি। টেড কিছু দেখতে পাচ্ছে না, নিষ্প্রভদীপ ঘর, ঘোলাটে চোখ, সব একাকার, ফ্লোরের দুপ্দাপ আর বাইরের শোঁ শোঁ ঝড়, সব। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে সাগর তোলপাড়, টেড নামেনি, অশক্ত অক্ষম দেহ নিয়ে তীরে বসে বালুসৈকতে নখের আঁচড় কাটছে।

অনেক পরে সম্বিৎ ফিরে এল, কানের কাছে প্রমত্ত দুটি কথায়, 'মিঃ সাটন, তুমি নাচবে না?'

ড্রেক কখন এসে ওর পাশে বসেছে, আরক্ত আবিল দৃষ্টি, শ্রমস্বেদাক্ত কপাল রুমালে মুছতে মুছতে লঘু চপল গলায় বলছে, 'সাটন তুমি নাচবে না?'

এত অপমান টেডকে কেউ করেনি। কপালের শিরা স্ফীত হয়ে উঠেছে, টেডের বাঁহাতের গ্লাস কাঁপছে থরথর করে, ডান-

হাতে সে ক্রাচটাকে শক্ত করে চেপে ধরল।

কানের কাছে মুখ নামিয়ে ড্রেক ফিসফিস করে বলল, 'আইম আউট। ইয়োর ওয়াইফ স্টিল সীমস ফিট ফর এ গুড ফাউ ডান্সেস, হোয়াই নট পার্টনার হার হোয়েন দি গোয়িং ইজ গুড?'

অনেক কাচের পাত্র যেন একসঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল এমনি হাসির তোড় উঠল ঘরে। স্টেলাও হাসছে।

ক্রাচটাকে কঠিন মুঠিতে চেপে ধরে টেড উঠে দাঁড়াল। বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠল, 'ইয়েস, হোয়াই নট।' ক্রাচটা তুলে সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে আঘাত করলে ড্রেককে। টলতে টলতে বসে পড়ল নিচে।

নিমেষে থেমে গেল এ্যালকোভের আবহ-সঙ্গীত, কক্ষের সব ক'টি আলো প্রখর হয়ে উঠল। ক'জন লোক ধরাধরি করে ড্রেককে নিয়ে গেল বাইরের ঘরে, স্টেলা কোমরে হাত দিয়ে টেডের সমুখে দাঁড়াল।

'বীস্ট, বীস্ট, বীস্ট।'

টেডের গালে ওর রক্তচাঁপা আঙুলের দাগ গভীর হয়ে বসে যাচ্ছে, আর হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে বীস্ট। টেড অবাক হয়ে বসেই রইল, আত্মরক্ষার জন্যে হাত তুলল না পর্যন্ত, সম্মোহিত, মুগ্ধ, প্রলুব্ধ চোখে একটি কুপিত আঁখির ফুলকি আর উদ্ধত বুকের স্পন্দনের দিকে চেয়ে রইল।

স্ক্যান্ডাল পয়েন্টে কাণাঘুষো শোনা গেল, স্টেলা, দ্যাট সাটন ওম্যান, আর তার স্বামী এডওয়ার্ডের ছাড়াছাড়ি হবে।

প্রাক্তন পুলিশ অফিসার ক্লিফটন মধ্যস্থতা করেছেন।

সাটন, সীমস্ ইয়োর ম্যারেজ ডিড্‌ন্ট ওয়ার্ক। তোমাদের এ-বিয়ে সুখের হয়নি।

আরক্তনেত্র টেড মুষ্টি তুলে বলেছে, 'সো হোয়াট।'

'হোয়াই নট পার্ট।'

সব তেজ নিমেষে উবে গেছে, বিবর্ণ মুখে টেড বলেছে, সে-যে বড় কেলেঙ্কারি—

কাছে এসে ওর পিঠে হাত রেখে ক্লিফটন বলেছেন, 'কিন্তু এই একমাত্র পথ। ফর ইয়োর হ্যাপিনেস, ফর স্টেলা।'

স্টেলা? স্টেলাও তবে এই চায়?

ক্লিফটন শান্ত গলায় বলেছেন, 'চায়।' শ্রান্ত ভগ্ন কণ্ঠে টেড বলেছে, বেশ, আমি রাজি। কিন্তু টাকা? I'm nearly broke. কোটের পকেট থেকে লাইনিং শুদ্ধ বের করে ক্লিফটনকে দেখিয়েছে।

ক্লিফটন বলেছেন, '-খরচ স্টেলা দেবে। টেডের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বলেছেন, 'সব ব্যবস্থা আমরা করে দেব,— তোমাকে শুধু নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট হোটেলে যেতে হবে।'

টেড তবু চুপ করে বসে আছে দেখে ক্লিফটন ওর একটা হাত টেনে নিয়ে বললেন, অমত কর না। ভেবে দেখ, এতে তোমারই সুখ, তোমারই শান্তি।'

'আমার সুখ, আমার শান্তি।' নির্জীব স্বরে পুনরাবৃত্তি করল টেড, একটু থেমে আবার বলল, 'এই সুখ আর এই শান্তি পাব বলেই বুঝি আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই এতখানি পথ ছুটে এসেছিলাম ক্লিফটন।'

তারপর সেই স্তম্ভিত গম্ভীর রাত্রি এল।

সন্ধ্যা থেকেই দিগন্ধ বৃষ্টি; বজ্রবুট পরে অশরীরী কারা যেন আকাশের এপার থেকে ওপার মার্চ করে গেছে, বিদ্যুতের তীর টর্চ ফেলে খুঁজে ফিরেছে ফেরারী আসামী। পথে কোথাও টিপটিপ করে জ্বলছে দু'একটা বাতি, কোথাও বা নিবে গেছে, জ্যাকো-প্রসপেক্ট-মোসারা কালীদহে স্নান করে নিরাকার।

চারজন লোক রিক্সা করে টেডকে নিয়ে এল হোটেলের দরজায়, রিসেপ্‌শন কাউন্টারের লোকটা এগিয়ে এল। টেড নিজের নামটা বলতেই লোকটা ফিসফিস করে কী বলাবলি করল আরেকটা লোকের সঙ্গে, কুলীকে হুকুম দিল ওকে ঘর দেখিয়ে দিতে।

ল্যাচ-কী হাতে কুলীটা আগে আগে আছে, ক্রাচ-নির্ভর টেড পিছে, সরু দীর্ঘ প্যাসেজ, গোলক ধাঁধাঁ করিডরের পর করিডর, দু'পাশে নম্বরী খুপরির সারি। কোনটা ভেজান, কোনটা বন্ধ, কোনটার ভেতরে বা চাপা-হাসির আভাস।

সেই স্বল্পালোক প্যাসেজেও কুলী নির্দিষ্ট নম্বর খুজে পেল ঠিক, ফোকরে চাবি গলিয়ে দিল, সেলাম করে বলল, 'ইয়ে কামরা হ্যায় সাব।'

বিয়ের দিন টেড পাদ্রী সাহেবের নির্দেশে একটির পর একটি আচার পালন করেছিল, সেদিনও বুক দুরু দুরু, ঘন ঘন চোখের পলক পড়েছে, কপালে জমেছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। সেদিনের মন্ত্রমুগ্ধ প্রশ্নহীন তিথিটাই কি আজ এতদিন পরে ফিরে এল যৌবন শেষের এই রোমাঞ্চিত রাতে, তুহিন শৈল-শিখরের এই হোটেলটিতে।

টেড ভেতরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এখনও সে আসেনি তো। চার ধারে চোখ বুলিয়ে টেড আশ্বস্ত হল। আসবাব বেশি নেই, টি-পয়, টেবিল আয়না, কৌচ, বিছানা, সংলগ্ন স্নানের ঘর।

জানালাটার ছিটকিনি খুলে দিতেই দুটো পাল্লা সশব্দে ছিটকে ঠেকল দেয়ালে, ডানা ঝটপট করে হাজার বাজপাখি যেন ঘরের দেয়ালে আছড়ে পড়ল। সভয়ে টেড পিছিয়ে গেল। ঘরের মেজে ভেসে যাচ্ছে, যাক, টেড কিছুক্ষণ খোলা জানালায় মাথা রেখে দাঁড়াবে।

পিছনের দরজায় খুট করে শব্দ হল, টেড চমকে ফিরে তাকাল। ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে একটা মেয়ে, থরথর হাত দুটি পিছনে নিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছে।

'ইউ!' টেডের গলা দিয়ে অতিশয় বিস্মিত একটি শব্দই বেরিয়ে এল।

'ইয়েস।' মেয়েটি মাথা নীচু করে বলল।

উত্তেজিত টেড কী করবে ঠিক পেল না, পাইপটা খুজল, পেল না, কোটের সবকটি বোতাম একবার এ'টে দিয়ে ফের খুলে দিল।

টক—টক; টক—টক,—ছোট্ট হাই হীল সময়ের পায়ে, সেকেন্ডের স্পাইরাল সিঁড়ি অনায়াসে টপকে যাচ্ছে। কপালের রগে হাত দিয়ে কৌচে বসে আছে টেড, মেয়েটি বিছানায় পা ঝুলিয়ে। অনেক পরে টেড হঠাৎ মাথা তুলে বলে উঠল, 'Say, haven't we met before?'

কুণ্ঠিত ক্লিষ্ট হেসে মেয়েটি মৃদুস্বরে বলল, 'ইয়েস, ওয়ান্স।' একবার দেখা হয়েছিল।

কোথায়, কোথায়, কবে—টেড প্রায় চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। মনে পড়েছে। আম্বালায় যাকে দরজা খুলে কামরায় তুলে নিয়েছিল, এ তো সেই। সেও এক দুর্যোগের রাত্রি।

শন শন হাওয়ায় জানালার পাল্লা থর থর কেঁপে উঠল, মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ম্যান, আর ইউ ক্রেজী?' ভাল করে ছিটকিনি এ'টে দিল। একটা সুইচ টিপে দিতেই অগ্নিকুণ্ড গনগনে হয়ে উঠল।

সেখানে দুটি চেয়ার টেনে নিয়ে মেয়েটি বলল, কাম, ওয়ার্ম ইয়োর লেগস। পা দুটি গরম করে নাও।

লেগস? মৃদু হেসে টেড বলল, 'আই'ভ্ বাট ওয়ান।'

মুহূর্তগুলি ফোঁটা ফোঁটা ঘাম হয়ে কপালে জমল, শুকিয়ে গেল, শব্দ নেই, কথা নেই, হৃৎপিণ্ডে সময়ের হাই-হীলের প্রতিধ্বনি।

হঠাৎ সমস্ত সঙ্কোচ জয় করে টেড বলে উঠল, 'লেট মী গেট ইউ সাম ফুড। আই বেট ইউ আর হাঙ্গরী মিস্—'

'কোলেট, সারা কোলেট।'

'তৃষিত আকুল আঁখি'

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শিল্পী : রামকিংকর

খাবার আসতেই সারা মাংস কেটে নিল ছুরি দিয়ে, অর্ধেকটা টেডের প্লেটে তুলে দিল। রুটির বড় একটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরে চিবোতে লাগল।

কৌতুকে, বিস্ময়ে চেয়ে আছে টেড।

খাওয়া শেষ হতে সারা ঢক ঢক করে জল খেল, মুখ মুছে লজ্জিত হাসল।

এতক্ষণে টেড স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেয়েছে, মনের ভিতরটা যেন ভিজে দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে ছিল, হঠাৎ জ্বলে উঠেছে।

মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'সারা, তোমার কে আছে।'

সারা জবাব দিল না। রক্তমুখ নখ দিয়ে হাতের আঙুল খুঁটতে লাগল।

—কেউ নেই?

তেমনি, মাথা নীচু করেই, সারা ঘাড় নাড়ল।

কেউ নেই সারার, জন্মাবধি ছিল অরফ্যানেজে। বয়স বেশি হতেই কী একটা গোলমাল হল ওকে নিয়ে, মিশনরী সাহেবরা দূর করে দিলেন। যাকে নিয়ে এই কলঙ্ক, সে চম্পট দিয়েছিল আগেই। তারপর থেকে কত ঘাটে যে ভিড়েছে সারা, হিসেব নেই, ঘাটে ঘাটে শুধু জলই খেয়েছে।

টেলিফোনে কাজ পেয়েছিল, প্রাইভেট ফার্ম, সুইচ বোর্ড চিনতে চিনতেই কাটল মাস তিনেক, সেই তিন মাস শুখো। টেলি-ফোনের সুইচ বোর্ড থেকে রিসেপশনিস্ট।

বাধা দিয়ে টেড বলল, 'কিন্তু তোমার চেহারা ভাল। উইথ ইয়োর লুকস, ইউ শুড্যাভ ডান বেটার।

ম্লান হেসে সারা বলল, "মেবী, আই ওয়াজ নট কাট আউট ফর এনিথিং বেটার—'

নইলে চেষ্টা তো সারা কম করেনি। রিসেপশনিস্ট যখন ছিল, তখনই টাইপ শিখেছে, ভর্তি হয়েছে শর্টহ্যান্ড ক্লাশে, হাড়ভাঙা খাটুনি, তবু পরিশ্রমের ত্রুটি ছিল না।

লক্ষ্য ছিল বড় সাহেবের স্টেনোর পোস্টটা।

পায়নি। যে পেল, তাকেও সারা চেনে, ম্যাগি—মার্গারেট হবসন—দি বস্ ইউজড টু টেক হার আউট টু ডিনার; দি জব ওয়াজ হার।

তারপর?

তারপর একদিন সামান্য কারণে রিসেপশনিস্টের চাকরিটাও গেল। ম্যাগিই খেয়েছিল চাকরিটা, সারা জানে। তারপর থেকে সারা পা পিছলে কেবলই গড়াতে গড়াতে গেছে, রেলওয়ে বুকিং অফিস, সেখান থেকে শপ গার্ল—

কত পাও?

কত আর। হার্ডলি এনাফ টু বাই মী এ ডিসেণ্ট ড্রেস। ভাল পোষাক কেনার পয়সা জোটে কি জোটে না। সেই গ্ল্যামার আর নেই শিমলার, দিল্লী থেকে অফিস আসে না, দোকানে বেচাকেনা প্রায় নেই, শুধু ট্যুরিস্টে আর কত হয়, একদা-মসৃণ ম্যলে খোয়া উঠে গেল, কেউ দেখে না, রিট্রেঞ্চমেণ্টের নোটিশ ঝুলছে মাথার ওপর, তবু ভাগ্য, মাঝে মাঝে কেস জোটে—

'কেস্? হোয়াট কেস্?'

চোখের পাতা কাঁপতে থাকল সারার, স্নায়ুভীতি দূর করতে একটা সিগারেট ধরাল, নীচু গলায় বলল, 'তুমি যেমন এসেছ।'

আহত কণ্ঠে টেড বলল, 'আমি কি তোমার একটা কেস্ মাত্র, সারা?' মৃদু হেসে সারা দুটি চোখ নত করল। ক্লিফ্‌টনের হাত দিয়ে পাঠান স্টেলার দুশো টাকা এখনও আছে ওর হাতব্যাগে। এই টাকায় একটি ফার-কোট কিনবে সারা, আর নাইলন মোজা।

বাইরে ঝড় থেমে এসেছে, সার্শির ওপর শ্রান্ত জন্তুর নিঃশ্বাসের মত ঘর্ঘর। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে পীত-বিষণ্ণ একটুকরো চাঁদ, স্তব্ধ ওক গাছের ভিজে পাতায় জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি।

সিগারেটটা অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে সারা বলল, 'রাত শেষ হয়ে এল।'

উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিয়েছে সারা, ঈষৎ জ্যোৎস্নালোকে ইথর ম্লান পিঙ্গল, নীচের পথে পাতলা বরফের মৃত্যুচ্ছদ, ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে পাহাড়ের রেঞ্জ কত-দূরে চলে গেছে ঠিকানা নেই। বিদ্যুতের টর্চ ফেলে যারা আকাশ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করেছিল, তারা নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছে।

চোখ ফেরাতেই টেড দেখতে পেল সারা ওর দিকে চেয়ে আছে।

'কী ভাবছ।'

বুক ভরে ফার-ওক পাতার গন্ধগুরু হাওয়া টেনে নিয়ে টেড আস্তে আস্তে বলল, 'ভাবছি, স্টেলাই শেষ পর্যন্ত জিতে গেল।'

পীত-মৃত চাঁদ ঢলে পড়েছে পাহাড়ের পিছনে, নীচের দেবদারু গাছের ঘন-রহস্য ছায়ায় শোনা যায় প্রথম ভোর-পাখির কাকলি; অভ্র আকাশে প্রসন্ন সুন্দর শুকতারা। হঠাৎ টেডের মনে পড়ল, স্টেলা তাকে ছেড়ে গেছে। বিবাহ-ডোর ছিন্ন হতে আর বাধা নেই।

মূর্ছাতুর কয়েকটি মুহূর্ত, টক, টক, টক, স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে সময়ের ওঠা শেষ হয়নি। আকাশের কমনীয় নীল লালে-লালে ফেটে পড়ছে। নীচে ওৎ পেতে বসে আছে ওরা—হোটেলের ম্যানেজার, খানসামা, স্টেলার তরফের সাক্ষী। ওরা জানে এই হোটেলের কামরায় টেডের রাত কেটেছে, আর সে কামরায় টেড একলা ছিল না। অকাট্য প্রমাণ। এই একটি প্রমাণের জোরেই মিথ্যে হয়ে যাবে একটি সম্পর্ক,......স্টেলা হয়ত, হয়ত নূতন করে সংসার রচনা করবে ড্রেককে নিয়ে। মস্তিষ্কের মধ্যে একসঙ্গে হাজার মৌমাছির গুঞ্জন উঠেছে, ভগ্ন, শ্রান্ত, কম্পিত কণ্ঠে টেড বলে উঠল, 'আইম্ এ লস্ট ম্যান, সারা।'

সারার ঠোঁট দুটি কাঁপল, কী যেন বলতে চাইল, পারল না।

দরজা খুলে দাঁড়াল টেড, ক্রাচে ভর দিয়ে বলল, 'চলি!'

সেই গোলকধাঁধা করিডর, দুধারে নম্বরী খুপরির সারি। নীচে ওকে দেখে ক্লার্ক উঠে দাঁড়াল, বিচিত্র হেসে অভিবাদন করল ম্যানেজার। সদর দরজার সমুখে এসে টেড এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। এই পথ গেছে কোন আমস্-হাউস বা ইনফার্মারিতে, সেখানেই বাকী জীবন কাটবে। শিরশিরে একটা অনুভূতি নামল মজ্জা বেয়ে, ওরা তো মাই হার্টকে গুলী করে মেরেছিল, টেডকে বাঁচিয়ে রাখল কেন। দু চোখ জলে ঝাপসা, আস্তে আস্তে পথ ঠাহর করে টেড এগোতে লাগল।

ওর পিছে পিছে নীচে নেমে এসেছিল সারাও। ম্যানেজার ওকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এভরিথিং ও-কে?'

বরফঢাকা ঢালু রাস্তা, পঙ্গু একটি মানুষের দেহ দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে সারা হঠাৎ বলে উঠল, 'এখনও একটু বাকি আছে।'

দুশো টাকা গুঁজে দিল ম্যানেজারের হাতে, বলল, 'স্টেলাকে দিও'; কোন প্রশ্ন করার অবকাশ দিল না, সারা ছুটতে শুরু করল।

* * *

ফিরে দাঁড়িয়ে টেড বলল, 'একী।'

শক্ত করে ওর কনুই ধরল সারা। এইটুকু পথ ছুটে আসার পরিশ্রমে মুখ টকটকে। নীচু কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল, 'তোমাকে বাকী পথটুকু পার করে দিতে এলাম।'

সে-মুখে টেড কী দেখল সেই জানে। কিছুটা অবিশ্বাসী, কিছুবা অস্থির গলায় বলে উঠল, 'বাট্ আই'ম এ লস্ট ম্যান, সারা।'

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এল সারা, মৃদুকণ্ঠে বলল, 'হোটেলেও একথা বলে-ছিলে। তখন বলতে পারিনি—এখন বলি। আই'ম্ এ লস্ট গার্ল টু।' আমারও তো কিছু নেই।

পায়ের চাপে বরফ গুঁড়ো হয়ে গেল, এখানে চড়াই। হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে বিস্মিত ম্যানেজার দেখল, আলো-অন্ধকারে দুটি মূর্তি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, পঙ্গু আর পতিত দুটি সত্তা।

আর একটু এগোলেই সেই মোড়, লোকে যাকে বলে স্ক্যান্ডাল-পয়েণ্ট। কিন্তু ওরা বুঝি স্ক্যান্ডাল-পয়েণ্টও ছাড়িয়ে যাবে।

বিষয় না থাকলে বক্তব্য সম্ভব হয় কি করে, তা জানিনা। অভাব থেকে ভাবের সৃষ্টি হয় শুনেছি এবং বিশ্বাসও করি, যেহেতু পকেট খালি হলে অপরের পকেট সম্বন্ধে একটা সচেতন ভাব হয়। নয়তো বিশ্ব-সংসারকে ধরে মারতে ইচ্ছা করে, যখন অনটন আর অনশন মস্তিষ্ক উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। গৃহিণী লোকান্তরিত হলে আগে জন্মায় উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, তারপর বিরক্তিকর অস্বস্তি, তারপর ভাব ও ভাবনা। এবং তার পরেই ভদ্রগোছের ব্যবধান-অন্তে দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ।

এ সবই সত্য, পরীক্ষিত অথবা প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু কোনও কিছু বলবার বিষয় নেই, অথচ বলতে ইচ্ছা করছে এবং ক্রমাগত বলা হচ্ছে যেন-তেন প্রকারেণ, এমন কথা শোনা যায় না, দেখাও যায় না। একমাত্র বোধ হয় আমাদের মতন লেখক-সম্প্রদায়ের অপচেষ্টাই তার নিত্য ব্যতিক্রম। অবশ্য, বেলক-চেস্টারটনের মতন অদম্য উৎসাহী ধুরন্ধর লেখক অনেক সময়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, 'কিছুই না' থেকে বেশ 'কিছু' সৃষ্টি করেছেন। দুজনের সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছিল অনেকটা এক ধরণের। চেহারাও ছিল জোরালো লেখার মতই শাঁসালো। হঠাৎ পিছু-হঠার পাত্র তাঁরা ছিলেন না। তবু অনেক লিখে আর সাময়িক পত্রিকার খোরাক্ জুগিয়ে তাঁরাও যেন ফুরিয়ে এলেন। আগে গিয়েছেন চেস্টারটন আর এই সেদিন অনুসরণ করলেন বেলক সাহেব। এখন দুজন ওপারে গিয়ে যদি নতুন প্রসঙ্গ খুঁজে পান, তাহলে আবার চেস্টার-বেলক কমেডি'র সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের বেলায় সে কথা খাটে না। সাংখ্য-দর্শনে অভ্যস্ত দেশে শূন্যদর্শন সহজেই হয়। তার ওপর কলম ভোঁতা এবং তুলিও মোটা হয়ে পড়েছে। কাজেই মন ও জগৎটা যদি ঘষা পয়সার মতন হয়ে যায়, বেবাক্ খালি-খালি লাগে, তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বর্তমানে আমারও সেই অবস্থা হয়েছে। দেহ ভালো কখনোই থাকে না। মন আরও খারাপ। হেমন্তের ঠিকাদারি মুনাফার আশায় চিত্ত উল্লসিত বোধ করছে না। শারদীর সুর তাই বেসুরো লাগছে এবং ভাষণ মুখর মনও কেমন যেন নিরুৎসাহে ঝিমিয়ে পড়ছে। এইসব কারণেই দার্শনিক-তার আভাস এসে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় স্মিতমুখে রসসাহিত্য-চর্চা বিয়োগান্ত নাটক বিশেষ। বক্তব্য অথবা দৃষ্টিভঙ্গী—এ দুটোই নাকি প্রাণবস্তু। কিন্তু প্রসঙ্গ-চিন্তায় অথবা দুশ্চিন্তায় যদি অর্ধেক পাতা এবং পাঠকের মূল্যবান্ সময় নষ্ট হয়, তাহলে দোষ আমারই।

নিরস্থি দেহযন্ত্র-নিষ্কাসনে এক ফোঁটাও রস বেরুচ্ছে না, ঠিক এমনি সময়ে ঘরে এসে 'ইনি' বললেন, 'শুধু পেটে আর কত চা গিল্‌বে? ঘরে বিস্কুটের টিন্ খালি। একটু বেরিয়ে কিনে আনলেই পারো! চাকর কেবল বাজার ঘুরে এসে বলে, দোকানে বিস্কুট পাওয়া যাচ্ছে না। এত পরনির্ভর হলে চলে না। সমস্তক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে, সিগরেট মুখে...' তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচনান্তে 'বদ্‌অভ্যাসগুলো ছাড়ো দিকি এবার! যত বয়স বাড়ছে তোমার, ততই... আমার অদৃষ্ট!' অবশ্য নিয়তির ওপর আপীল চলে না। অন্য সময়ে মেজাজ ভাল থাকলে অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথা বলতুম—সত্যিই বিস্কুট পাওয়া যাচ্ছে না, অথবা মেশাবার জন্যে উপযুক্ত চর্বি মিলছে না, কিংবা ধর্মঘট চলছে কারখানায়—এমন কি সরকারের আমদানি নিয়ন্ত্রণ-নীতি নিয়ে অনতিদীর্ঘ একটি অধ্যাপকীয় বক্তৃতা দিয়ে ফেলতুম। কিন্তু আমার সাহিত্যিক তথা দার্শনিক জল্পনা ভ্রূণাবস্থায় বিনষ্ট হতে দেখে, কথা না বাড়িয়ে, গম্ভীর অনুতপ্ত-মুখে সরল কণ্ঠে স্বীকার করে নিলুম, 'ত্রুটি আমারই এবং মার্জনীয়।' এ রকম সংকটে এই বিশেষ ধরণের উত্তরে আমি সুফল পেয়ে থাকি। কথা বাড়ে না, অল্পেই মিটে যায়। ঐ যা আগে বলেছি প্রসঙ্গটাই বড় কথা। তার চেয়ে পদ্ধতিটা দামী নয়। ভাববস্তু যদি পেয়ে গিয়ে থাকেন, আঙ্গিকের সাজসজ্জা কলা-কৌশল একটু চেষ্টা ও অভ্যাসেই আয়ত্ত হয়ে আসবে। কলম এবং ধাপ্পা, দুটোই বাজি-বিশেষ। গর্ভে বারুদ ঠাসা থাকলে, কথার ফুলঝুরি নিয়ে আবার ভাবনা! তবে মানুষ মাত্রেই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে এবং সে ত্রুটি মার্জনীয়। স্বীকৃতিতেই পাপক্ষালন হয়। নইলে মানুষ বলেছে কেন! অভ্যাস ও প্রবৃত্তির দাস আমরা সবাই।

কিন্তু কোনও বিশেষ অভ্যাস যদি অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তার ধাতুরূপ হয়েছে বলতে হবে, অর্থাৎ ধাতে বসে গেছে। এক কথায়, বারে বারে সেই একই প্রবৃত্তির পুনরাবৃত্তি। অভ্যাস মাত্রেই বদ্‌অভ্যাস। ওর মধ্যে ভালো-মন্দ নেই। সু-অভ্যাসও যদি হাড়ের মধ্যে ঢুকে যায় কিংবা সীমা লঙ্ঘন করে, তা হলে সেটা বদ্‌অভ্যাসেরই সামিল। কাজেই সত্যকারের কু-অভ্যাস না থাকলেও বদ্‌অভ্যাস থাকতে পারে। এবং থাকলেই লোকে সেটা দেখিয়ে দেবে, অনেক সময়ে চোখে আঙুল দিয়ে। মানবচরিত্রে সংস্কারক প্রবৃত্তিটা খুবই প্রবল, বিশেষ করে মানবী-চরিত্রে। যাঁরা সাহিত্য করেন, তাঁরা আজকাল অধিকাংশই বাস্তববাদী। অতএব যা দেখেন ও বোঝেন, তাই আঁকেন ও লেখেন। বঙ্কিমী যুগে রং ফলানো এবং চোখ রাঙানো চল্‌ত। শরৎবাবু এসে সে পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। পল্লী-সমাজ চিত্রিত করেছেন, প্রতীকার-ব্যবস্থার ফর্দ দেন নি। কারণ সাহিত্যিক সমাজ-সংস্কারক নন। সেই থেকে আর একটা জিনিস এসে গেল। ব্যক্তিগত জীবনে ও অভ্যাসে লেখকের দল কেমন যেন বোহি-মিয়ন, একটু অসংস্কৃত থাকার পক্ষপাতী হয়ে উঠলেন। তারপর সে যুগও প্রায় কেটে গেল। বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়-গৃহিণীরা সময়ে-অসময়ে এসব অর্থহীন বদভ্যাস নিয়ে টিট্‌কারি দিতে লাগলেন, কেউ কেউ আবার প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। এখন আমরা আবার মানুষ হয়েছি। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় আর কেতাদুরস্ত সৌজন্য নিয়ে সমাজে বাস করছি। সুখেই আছি। মনে বিদ্রোহ নেই। সমালোচনা কিংবা জিজ্ঞাসা জাগে না। সমাজ, সংসার ও সরকার বলেন, এইভাবেই থাকো চিক্কণ ইঁদুরটির মতো। এইতেই স্বস্তি।

কিন্তু স্বস্তি কোথায়? তন্দ্রার আমেজ এসেছে, পরিপাটি একটি ঘুমের জোগাড়।

এমন সময়ে যদি কেউ গায়ে পিন্ ফুটিয়ে দেয়, তাহলে কেমন লাগে? কিংবা কেউ যদি কানের কাছে বক্তৃতা দেয়,—'ভরপেটে দিবা-নিদ্রা স্বাস্থ্যহানি করে, ওটা খারাপ অভ্যাস,' তা হলে? উঠে পড়ে সে ব্যক্তির মাথায় সুপুরি বসিয়ে হাতা দিয়ে ঠুক্‌লেও ঘুম চটবেই, মাথাধরাও ছাড়বে না। বাস্তবিক, অপরের চরিত্র-উৎকর্ষ সাধনের এই যে দুর্দমনীয় স্পৃহা আর অকারণ মাথাব্যথা, এর কোনও অর্থ হয় না। উদ্যোগী পুরুষ-সিংহের কাছে হয়তো একটা অর্থ আছে। মানুষ, চাই কি সমগ্র সমাজকে, চেপে ধরে তার রূপান্তর সাধনায় হয়তো একটি পার-মার্থিক তৃপ্তি পাওয়া যায়। কিন্তু যিনি ভুক্তভোগী, সংস্কারকের 'ভিক্‌টিম', তিনিই বুঝবেন জ্বালাটা কোথায়।

কতকগুলি মানুষ জন্মায় জাত-শিক্ষক। পৃথিবীটাকে চুনকাম না করতে পারলে তাঁদের আদর্শচ্যুতি ঘটে। যেখানে যত অদৃশ্য ছোট ছিদ্র, সেখানেই তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টি সমালোচনা, ধৈর্যচ্যুতি আর সঘোষ শিক্ষা-দানে অমানুষিক উল্লাস। অথচ যেখানে আসল গলদ, বড় রকমের ধাপ্পা, সেখানে তাঁরা নীরব। হয় সামর্থ্যের অভাব, নয় সৎ-সাহসের। আমার তো মনে হয়, অনবরত খিটিমিটি করে যাঁরা অপরের বদ্‌অভ্যাসগুলো শোধ্‌রাবার চেষ্টায় মুখিয়ে থাকেন, তাঁরা আসলে ভীরু ও কাপুরুষ। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মেজাজ, সহিষ্ণু স্বভাব দেখলে তাঁরা ঘাড়ে চেপে বসেন। প্রতিবাদ আসছে না দেখলেই 'ন্যাগিং' শুরু হয়। এসব ব্যক্তি সদুপদেষ্টা বলে নিজেদের জাহির করলেও আসলে 'ব্যুলিজ্'।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এ'দের কখনও উৎসাহ দিতে নেই, প্রশ্রয় দিতে নেই। অষ্টাবক্র মুনিদের টেনে সোজা করা শক্ত, মানি। কিন্তু পাল্‌টা জবাবে ভাঙ্গা ও বাঁকা মনকে আরও ভেঙ্গে-চুরে দিতে পারলে কিছুটা কাজ হয়। পৃথিবীর ক'টা অন্যায় সংশোধন করেছেন তাঁরা, যার বলে বলীয়ান হয়ে আপনার কানে হাত দিতে আসেন? হাতটা সজোরে ফিরিয়ে দেবেন এবং মুখটা আচম্‌কা খুলে দেবেন। আপনার অজস্র বাক্যস্রোতের উৎসারিত ফোয়ারায় কটু বিরক্তির স্পষ্ট ভাষণেই তাঁরা কুপোকাৎ অথবা ধূলিসাৎ হবেন। অন্যথা নয়।

মার্কিন লেখক স্বনামধন্য বিদ্রূপরসিক মার্ক টোয়েন লিখে গেছেন, অপরের অভ্যাস-ত্রুটির মতন সংশোধনীয় বস্তু আর পৃথিবীতে কিছু নেই। অত্যন্ত মর্মান্তিক সত্য। একমাত্র ভুক্তভোগীই এ কথার সত্যতা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করবেন। ত্রুটি যতই সামান্য হোক্, উপদেশের বহরটা অসামান্য হয়ে থাকে। কত সময়ে দেখেছি, ভালো করতে গিয়ে উলটো ফল হয় এবং সেটাও দোষ, যেহেতু ভালো করতে যাওয়াও একটা বদ্‌অভ্যাস, হস্তক্ষেপেরই নামান্তর। কিন্তু যিনি সমালোচনা করছেন নিছক্ 'অ্যাল্‌ট্রু-য়িজম'-এর প্রেরণায়, তাঁর ক্ষেত্রে ওটা অযথা হস্তক্ষেপ নয়, নিতান্তই পরহিতৈষণা। এক এক সময়ে ব্যাপারটা হাস্যোদ্দীপক হয়ে ওঠে, যেমন সাহিত্যে অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তখন সেটা উপভোগ্য গল্পের মতই উপাদেয় লাগে, যেহেতু আমরা তখন নিরাসক্ত দর্শক হয়ে অপরের শোচনীয় অবস্থাটি এক নিরাপদ দূরত্বের ব্যবধান থেকে লক্ষ্য করি।

মানুষের মধ্যে যেমন সংস্কারক প্রবৃত্তি সুপ্তাবস্থায় থাকে, সাহিত্যেও তেমনি মিশনারি শিল্পের নমুনা পাবেন। অতিরিক্ত উপদেশ আর অযথা হস্তক্ষেপের ফলে হয়তো কারুর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কিন্তু গল্পের পাতায় সেটা মন্দ লাগে না। বরং মজাই লাগে, যখন দেখি নির্যাতিত মানুষটি শত ভালোমানুষি সত্ত্বেও রুখে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবাদ করেছে এবং উৎপীড়নকারী উপ-দেষ্টাকে সুদসমেত ঋণ শোধ করেছে। বেলক্, চেস্টারটন, রবার্ট লিন্ড, ল্যুকস্, প্রীস্‌টলি এই কারণেই আমাদের অতিপ্রিয় লেখক। তাঁরা সব সময়েই আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য 'টিপ্‌স' দিচ্ছেন। এ হিসাবে আর্নল্ড বেনেট হলেন অদ্বিতীয় 'টিপস্টার'। দুনিয়ায় এমন জিনিস খুঁজে পাবেন না যা নিয়ে এ'রা মাথা ঘামাননি, পাঠকদের স্যজেশান দেননি। উদাহরণ স্বরূপ জেরোম্ কে জেরোম্ আর জেকব্‌স্-এর নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। কারণ এই দুজন লেখকের অধিকাংশ গল্প বা নক্‌সাই হচ্ছে অপরের ত্রুটি সন্ধান এবং জোর করে তার সংশোধনের শুভেচ্ছা-প্রণোদিত চমৎকার প্রহসন।

কিন্তু সাহিত্যের কথা থাক্। স্বদেশী হোক্ আর বিদেশীই হোক্, জীবনটা সাহিত্য নয়। আর কমেডি তো নয়ই। যদি সবটাই প্রহসন হ'ত, তাহলে কিল-ঘুঁষি আর ভাঁড়ামি দিয়ে জীবনের অর্থহীনতা আর মস্তিষ্কের দৈন্য ঢেকে দেওয়া যেত। কিন্তু তা হয় না। অপরের হিতৈষী নির্দেশে দেহ-মন যখন উত্যক্ত, আপনার ক্ষুদ্রতম ত্রুটি-সমালোচনায় শুভার্থীর পুনরুক্তি-বাণে আপনার প্রাণটা যখন কণ্ঠাগত, তখন মুখের সৌম্য প্রশান্তি আসতে পারে না। যদি কেউ দিনে দশবার আপনার কানের কাছে বলতে থাকেন, 'তোমার দ্বারা কিছু হবে না...যা বদ্‌অভ্যাস তোমার! এত আল্‌গা হলে কি চলে? যেমন দেহ অপটু, তেমনি শিথিল তোমার মন!', তখন পরিত্যক্ত ভিটের শূন্য অঙ্গনে পড়ে থাকা কুকুরের মতই করুণ দৃষ্টি ফুটে উঠবে চোখে। মেরুদণ্ড সোজা করে, বুক চিতিয়ে চলবার ইচ্ছা হবে না। মানুষের কণ্ঠস্বরে অরুচি, এমন কি আতঙ্ক লাগবে। হাসি-হাসি মুখ নিয়ে আপনারই নিত্য সমালোচনা শোনবার মতন সহিষ্ণুতা যে ব্যক্তির আছে, মন-মেজাজ খারাপ না করে যিনি উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন নির্বিকার-চিত্তে, তাঁর ধৈর্য একমাত্র জোব্-এর দৈব সহন-শক্তির সঙ্গেই তুলনীয়। সাধারণ ঠাণ্ডা-মাথা হলে মাথা বাঁচিয়ে স্থান ত্যাগ করতে হয়। অথবা কানে তুলো দিয়ে পিঠে কুলো বেঁধে উদাসীনতার অভিনয় করা চলে। কিংবা আমি যেমন প্রায়ই করে থাকি, হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে কথা উল্‌টে দিই, সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ পেড়ে আগামী সমালোচনা-স্রোতের মোড় ঘুরিয়ে দিই। অথবা অত্যন্ত কৌশলে একটা চিত্তা-কর্ষক গল্প ফেঁদে বসি। তাতেও যদি না শানায়, দুর্মূল্য জিনিস-পত্তর, অসাধু ভৃত্যের চাতুরী কিংবা পড়ন্ত সোনার দর মারে কে! ওতেই তাল সামলে নেওয়া যায়। ইচ্ছাকৃত বধিরতায় তেমন ভালো কাজ হয়না বলেই আমার বিশ্বাস। ওতে উপন্যাসের আত্মস্থ, নিঃস্পৃহ নায়ক হওয়া চলে কিন্তু গৃহদাহ আট্‌কানো যায় না।

অবশ্য আপনার যদি সাহস থাকে, সে কথা আলাদা। 'রিংজ'-বিধ্বস্ত দেশে জমি অফ্‌রন্ত বলে যদি ফুল অথবা সব্‌জির বাগান করার মতন আপনার মানসিক উদ্যম থাকে, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই ধৈর্য সীমাহীন নয়। তাই বিরক্তি এবং উত্তেজনা আসাই স্বাভাবিক। আর সেই উত্তেজনাই হল মাহেন্দ্র ক্ষণ। অনেকক্ষণ বাক্য-বাণ সহ্য করার পর যদি টেম্প্যার উত্তপ্ত হতে থাকে, তাহলে তাপের মাত্রাটুকু বাড়তে দেবেন, এই আমার 'টিপ'। তারপর অতর্কিতে পাল্‌টা আক্রমণ চালাবেন, দেখবেন শত্রুপক্ষের মুখের চেহারা কেমন বিস্মিত হতবাক্ লাগে। আপনার চরিত্রের এই অভাবিত দিক্ সমালোচককে অভিভূত করে দেবে। যেখানে মৃদু-করুণ হাসি, এড়িয়ে-যাওয়া কিংবা বিদ্রূপের ভঙ্গিমায় কাজ হয়নি, দেখবেন কয়েকটি চোখা-চোখা কথায়, তীব্র ঝাঁঝালো প্রতিবাদে আর দোষারোপে কি অদ্ভুত সুফল পাওয়া যায়। মোট কথা, কথার তোড় থামাবেন না। গ্রীক ট্র্যাজেডির 'ফ্রেন্‌জি'-র কথা শুনেছেন তো? সেই ভাবটা আনতে হবে মুখে-চোখে। প্রয়োজন হলে, গালি-বর্ষণ ও অভিশাপ। দেখবেন 'নেমেসিস'-এর দৈবলীলা। এক-দিনের একটি নাটকীয় অপ্রীতি-রচনায় চির-দিনের রেহাই ও শান্তি!

লেক্‌চার দেবার স্পৃহা আমাদের জন্মগত অধিকার। একবার মুখ অথবা কলম যদি খুলে যায়, তাহলে থামানো কঠিন। পৃথিবীতে এমন মানুষ কমই আছে যে বক্তৃতার সুযোগ পেয়েও নীরব থাকে। বিষয়-

বস্তুটা যদি মুখরোচক হয় অর্থাৎ পর-ছিদ্রান্বেষণ তা হলে কথাই নেই। সামাজিক শিষ্টাচারই হোক আর রস-সাহিত্যই হোক্, বিশ্রম্ভ-আলাপের মূল সূত্রই হল হাল্কা মেজাজে একটু ব্যক্তিগত এবং অন্তরঙ্গ হওয়ার ইচ্ছা ও চেষ্টা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে শ্রোতাকে নিয়ে। যিনি আমাদের আলোচনার সামগ্রী তাঁর মনের অবস্থা একটু কল্পনার প্রয়োগে বুঝে নিতে হবে। যেমন ধরুন, আপনারই কোনও শ্রদ্ধেয় আত্মীয় যদি হামেশাই আপনাকে উপদেশ দিতে থাকেন, "সময় থাকিতে আখের গুছিয়ে নাও বাবাজি! ওসব সাহিত্য-টাহিত্য ছাড়ো......দুটো গল্প কবিতায় পেট ভরবে না। তার চেয়ে বাজারে দুখানা মানের বই, অভিধান ছাড়ো দিকিন! দেখবে পাঁচ বছরে পাঁচ কাঠা জমির সংস্থান হয়েছে। এদিকে বৌমার হাতদুখানি তো খালি-খালি! ওসব একগুঁয়েমি আর তোমাদের ঐ চোস্ত স্নবারি কিছু কাজের কথা নয়...আমরাও এককালে ও-সব ডি এল রায়, রবি ঠাকুর করেছি...কিছুই কিছু নয় বাবাজি...শেষ পর্যন্ত ভুষি-মাল আর তিসির কারবারে ঐ চারতলা মোজেইক-ফ্ল্যাট তুলেছি...মানে, তুলিয়েছেন ঠাকুর। লেখা-পড়া তো আর ভেসে যাচ্ছে না, কিন্তু সংসারী তো হতেই হবে। পড়, পড়াও... ক্ষতি কি? কিন্তু ঐ যা বললুম, কাজ-হারানো পুরুষ হলে চলবে কি করে? আঙুলের টিপে বেহাগ-খাম্বাজ লাগাও আপত্তি করব না। তবে বাঁ হাতে আঙুলের ঘর ছেড়ো না, টিপ্ ধরে থেকো। নয়তো হিসেবে ভুল হবে। আর সে ভুল জীবনে শোধ্রায় না...তোমরা আবার আজকালকার সব অভিমানী ছেলে...বলতে ভরসা পাইনে। নইলে বুঝিয়ে দিতুম, মেয়েরা ওসব কালচার-টালচার নিয়ে মাথা ঘামায় না। ন্যাকা-ন্যাকা ফোড়ন কাটে, এই পর্যন্ত। চোখ পড়ে থাকে গয়না আর আসবাবে, মন বাঁধা রয় চাবির রিংএ...হেঁ, হেঁ, হেঁ,—ঠিক কি না, বলো বাবাজি?" এ রকম কথা-বার্তার জন্যে বড় জোর দশ মিনিট দেওয়া যায় যদি হাতে কিছু কাজ না থাকে। নইলে, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ...

বেশ মনে পড়ে...সে সময়টা আমি এক রকম বেকারই ছিলুম। হরেক মানুষ হরেক কথা শুনিয়ে দিয়ে গেছে গায়ে পড়ে। তারপর চাকরি যখন মিলল, সেও এক বিপদ্! তার ভালো-মন্দ, ভবিষ্যৎ ভাবনা, কাজ গুছিয়ে নেওয়া আর কর্তৃপক্ষকে বাগানোর আর্ট নিয়ে এত উপদেশ-বক্তৃতা শুনেছি ও নীরবে হজম করেছি যে সব কথা মনে থাকলে মহাভারতের শান্তি এবং অনুশীলন পর্ব নতুন করে লেখার প্রয়োজন হত। বাস্তবিক অবস্থাটা কি শোচনীয়, একবার ভেবে দেখুন। দিনের পর দিন আপনি লেক্চার শুনছেন, সত্য এবং কাল্পনিক দোষ-ত্রুটির ফিরিস্তি মিলিয়ে নিচ্ছেন, নিজের অধম উদ্যমহীন দেহ-মন নিয়ে লুকোতে পথ পাচ্ছেন না। কিন্তু শুভার্থীর উৎসাহের মাত্রা বেড়েই চলেছে। তিনি আপনাকে উন্নতির পথে দাঁড় না করিয়ে ছাড়বেন না...আপনাকে নীরন্ধ্র, সম্পূর্ণ কৃতিত্বের পাদপীঠে সুপ্রতিষ্ঠ না করে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন না। আপনি তখন কি করবেন? এতখানি 'স্ট্রেন' সহ্য করার মতন হয়তো আপনার মনের জোর নেই। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কায়-মন নিজস্ব হলেও, সদ্‌বাক্য অপরের এবং সাংসারিক ও সামাজিক জীবের পক্ষে তা অবশ্য শ্রোতব্য। এর পরে কথা চলে না।

আপনি হয়তো প্রাণপণ চেষ্টা করছেন জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্যে। অথচ

...শেষ পর্যন্ত ভুষি-মাল আর তিষির কারবারে ঐ চারতলা মোজেইক ফ্ল্যাট তুলেছি...

পারছেন না। তার প্রধান কারণ—আপনার হিতৈষী সমালোচকের মতে, কয়েকটি ছাগ-বুদ্ধি সুবিধাবাদীর উল্লম্ফন-কৃতিত্ব নয়। আপনারই নির্বুদ্ধিতা অথবা অযোগ্যতা। মেরুদণ্ডের একান্ত অভাব। কিন্তু মেরুদণ্ড-খানি নমিত, বক্র ও শীর্ণ হল কিসের চাপে, কাদের জন্য, সে কথা আপনার আশ্রিত পোষ্যবর্গও বলতে পারবেন না ও চাইবেন না। বড় জোর বলবেন, সংসার-সৃষ্টি সরীসৃপও করে থাকে। সচ্ছল সংসার-চালনাতেই যূথপতির আসল পৌরুষ। আপনি হয়তো যথাসম্ভব ভব্য বেশে ঘোরা-ফেরা করেন। তবু একটা বড় রকমের ওয়ার্ড-রোব্ না থাকাটাই আপনার অভদ্র অপরাধ। শুনতে হবে, নিম্ন-কেরানির মতন আপনার চাল-চলন, বেশ-ভূষা। সকলের প্রতি কর্তব্য-দায়িত্ব সেরে যেটুকু উদ্‌বৃত্ত থাকে, তাতে আধ ডজন ধুতি আর আধ ডজন পাঞ্জাবি কালোবাজারি দরে তৈরি করা চলে না। আবার যদি অল্প কাপড়-চোপড় ঘন ঘন কাচিয়ে নিয়ে পরিচ্ছন্ন থাকতে চান, তাহলে লণ্ডনের লণ্ড্রির সঙ্গে বড়মানুষি যোগাযোগ আছে, এ অপবাদও কানে আসতে পারে। মানে, কোনও দিকেই ফাঁক পাবেন না। ত্রুটি ধরব বলে যে মুখ আর যে চোখ সদাই বেজার এবং জাগ্রত হয়ে আছে, সে মুখ আর সে চোখকে শত আরাধনাতেও আপনি প্রসন্ন করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

কাগজে-কলমে বেশ গুছিয়ে বিশদ্ করে বোঝানো যায়। মুশকিল হচ্ছে, মুখোমুখি উত্তর জোগায় না অনেক সময়। এইটেই দুঃখ। একজনের শরীর হয়তো বারো মাসই খারাপ, মানে সামান্য তারতম্য তেমন ধরা যায় না। তিনি কি করবেন? বেমজবুত দেহ চিকিৎসায় কখনোই পুরোপুরি সারে না। মনও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তার ওপর ধরুন অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। প্রাণান্ত পরিশ্রম করে মোটামুটি রোজগার করেও কিছুতেই কুলোন যায় না। তখন এই দেহ-মনের ওপর ভদ্রতা-রক্ষার অমানুষিক চাপ পরমাত্মীয়রা দেখেও দেখেন না। হয়তো বলেন, 'খাও দাও, ফূর্তি করো। আসলে তোমার নিউরাসিস্, মানসিক ব্যাধি।' রক্তচাপ দুশো'র কাছা-কাছি। হৃদযন্ত্র বিগড়ে যাবার দাখিল। বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। উপদেশদাতারা কিন্তু মানবেন না বলবেন,—দুশ্চিন্তাটাই রোগ। তখন যদি ক্রিষ্টপিষ্ট ভদ্রলোক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন,—ওটা উপসর্গ, আর কোন্‌টি কার্য আর কোন্‌টি কারণ তার যথার্থ নির্ণয় ডাক্তারই পারেন না, তা হলে শুনতে হবে রোগের ভয়টাই হচ্ছে আসল কারণ। অতএব এ অবস্থায় ত্রুটি-স্বীকার করে নিয়ে ঈশ্বরকে জানাতে হয়, মৃত্যুই দাও। তিলে-তিলে মিথ্যে মরার চেয়ে চটপট সাবাড় হওয়াই ভালো। তাতে অন্তত সত্যেরই জয়, অসুখ এবং ক্লান্তিই যে জীর্ণতার কারণ, এটুকু প্রমাণ হবে।'

একজনের মেজাজ হয়তো রুক্ষ, সহজেই চটে। কিন্তু খড়ের আগুনের মতই আবার দপ্ করে নিভে যায়। ব্যক্তিবিশেষ যদি বিরক্তির লগ্নে সেই কথাটা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেন, তাঁর সত্যপ্রিয়তার প্রশংসা করেও বলব এর চেয়ে অবিবেচনার কাজ আর কিছু নেই। চটার সময়ে আরও চটালে ত্রুটি তো শোধ্রাবেই না, নতুন ত্রুটি জমে উঠবে। আর একটি কথা। বদ্‌অভ্যাসের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ সচরাচর শুনতে হয়, সেগুলো সৃষ্টি করেছে কারা, সেটাও ভাববার বিষয়। যদি স্নায়ুদৌর্বল্য ঘটে থাকে, স্নায়ু-শীতল রাখার উপকরণ কে দিচ্ছে? পৃথিবী আপন গতিপথেই ঘোরে এবং পথটা সিধে নয়। তার হালচাল এতই বাঁকা যে সেখানে বাস করে মাথা উঁচু করে সোজা চলার

টেক্‌নিক শেখাচ্ছে কে? চারদিকে এতই নির্বোধ কথা আর আচরণ, এত মূঢ় অসঙ্গতি যে তার সঙ্গে নিত্যসংস্পর্শ সত্ত্বেও মেজাজ অসহিষ্ণু হতে পাবে না, এটা দাবি করার আগে সমাজ ও সংসারকে আশ্রমতুল্য করে তোলা দরকার। পরিবেশ অভদ্র, বাসস্থল পঙ্কিল আর আমরা সবাই ছবিতে আঁকা পদ্মফুল হয়ে ফুটে থাকব, এমন প্রত্যাশা যুক্তিসঙ্গত নয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে ঘাড় নুয়ে পড়ছে, শীর্ণ বুক আর শূন্যে উদর নিয়ে তখন ঊর্ধ্বায়িত অচল পাবকশিখার মুদ্রাসাধনা নিরর্থক শিল্প নয় কি?

মনে করুন, আপনি লেখক। খান কয়েক বই বেরিয়েছে। বন্ধুরা মৌখিক প্রশংসা করেছেন। প্রকাশক দিন দুপুরে, ভর সন্ধ্যেয় আপনাকে টাইম দেন কিন্তু থাকেন না কখনোই। তারপর পাকড়াও করলে, কফি হাউসে বসিয়ে, বর্তমান দিনে পুস্তক-ব্যবসায়ীর দুরবস্থা, আর্থনীতিক সঙ্কট, বিজ্ঞাপনের হার, খরচের চূড়ান্ত প্রভৃতি যাবতীয় সুসংবাদ আপনাকে তিনি যখন শোনাতে থাকেন, তখন কফিটাই শুধু বিস্বাদ হয়ে ওঠে না—মেজাজটাও। কড়া জবাব জিভের আগায় সামলে নিয়ে আরও চিনি ঢালতে হয়। তারপর যখন কিছুতেই কাজ হয় না এবং ক্রমাগত আপনি বঞ্চিত হতে থাকেন নিতান্তই ন্যায্য প্রাপ্য অংশ থেকে, তখন আপনি সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী হতে বাধ্য। এ ছাড়া, সমালোচনা সম্বন্ধেও আপনার বিতৃষ্ণা আসা অস্বাভাবিক নয়। আপনি যা-ই লিখুন অথবা যত ভালোই লিখুন, আপনার উচিত মর্যাদা পেতে যথেষ্ট বিলম্ব হবে। মলাট-সমালোচনা এবং পিঠ-চাপড়ানোর বহর দেখে, 'হুইসপ্যারিং ক্যাম্পেন' এবং পারস্পরিক প্রচার-সহযোগিতার নমুনা দেখে, সমালোচনার ওপর যদি আপনি বিরূপ ও বীতরাগ হন, তা হলে সেটা একেবারে ব্যক্তিগত অভিমান বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আপনার হিতৈষী ও তথাকথিত সমঝদার বন্ধুগণ যখন আপনার মনোভাব নিয়ে তামাসা করেন অথবা অনুযোগ করেন যে আপনি বড় স্পর্শকাতর, অভিমানী কিংবা আত্মম্ভরী, আপনার 'ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্‌স্‌-এর ফলেই আপনি তিক্ত-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছেন, তখন এর উপযুক্ত প্রত্যুত্তর আপনার নিশ্চয়ই জানা থাকা উচিত। কৃতজ্ঞ পাঠক-দলের শ্রদ্ধা-প্রীতি, সমালোচকের যথার্থ পরিচিতি এবং প্রকাশকের সততার ওপর অনেকটা নির্ভর করে না কি আত্ম-প্রত্যয়, শিল্পনিষ্ঠা ও মানুষের প্রতি আস্থা? সামাজিক, সাহিত্যিক ও ব্যবসায়িক জগতে যদি দেখেন অনাচার, যদি দেখেন প্রতি পদেই প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ, তা হলে আপনারই রচনা থেকে প্রতিভা ও প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবী করেন কিসের জোরে পয়োমুখ বিষ-কুম্ভ সমালোচকবর্গ?

সুদূর অতীতে যদি কেউ কোনও অবিবেচনার কাজ করে থাকেন, যাবজ্জীবন তাঁকে সেই প্রথম স্খলনের দায়িত্ব বহন করতে হবে। হয়তো আত্মীয়-স্বজনের মতের বিরুদ্ধে কেউ মনোনীতাকে গৃহিণী করেছেন। চলল আজীবন সেই অনুযোগের পুনরাবৃত্তিঃ 'ওদিকে তো লাভ্‌-ম্যারেজ—ঠ্যালা সামলাও এবার!' অর্থাৎ সংখ্যা-তত্ত্বের গণনায় যেন ধ্রুব নির্ণয় হয়ে গেছে সনাতন বিবাহ-বিধির চিরস্থায়ী পবিত্রতা। প্রণয়জ মিলনের সবটাই নাকি রূপজ মোহ, দৈহিক আবেদন। আর আত্মীয়-ঘটকতায় অনুষ্ঠিত বিবাহ হল স্বর্গীয় বন্ধন, মৃত্যুর পরেও নাকি তার শৃঙ্খল খোলে না· একথা শুনে অনেক স্থিরবুদ্ধি গৃহস্থ হয়তো সন্ত্রস্ত হবেন। কিন্তু শাস্ত্র আর লোকাচার অমান্য করে যে ত্রুটি প্রচারিত হল, তার তুলনায়

তখন কফিটাও শুধু বিস্বাদ হোয়ে ওঠে না —মেজাজটাও

দাম্পত্য ব্যাভিচার ও অশান্তি নাকি কিছুই নয়। কিংবা মনে করুন, যৌবনসুলভ হঠ-কারিতায় আপনি একটা অসমীচীন কাজ করে ফেলেছিলেন। সেই দিন থেকে আত্মীয়-বান্ধব আপনাকে অপরিণামদর্শী বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। জীবনে চাকুরির ক্ষেত্রে হয়তো একটা ভুল করে ফেলেছেন কিংবা ভালো 'চান্স' পেয়েও রজত-কৌলীন্য উপেক্ষা করে' একটি মধ্য-বিত্ত শিক্ষকতা বরণ করেছেন। এই অবি-বেচনার বহু-দূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া আপনার শয়ন-স্বপন, তন্দ্রা-জাগরণ, কর্ম ও চিন্তাকে কলঙ্কিত করে রাখবে। পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুল, আত্মীয়-বন্ধু-সতীর্থ কেউই এই মারাত্মক ত্রুটি ভুলবেন না এবং বিশেষ করে অসময়ে দুর্দিনে আপনা থেকে এগিয়ে এসে আপনাকে সূচীমুখ সহানু-ভূতির রসে স্নিগ্ধ করে দেবেন। জীবনে কতই তো ভুল হয় এবং প্রত্যেকেই করে থাকেন। লোকে সামলে নেয়, ভুলে যায়। কিন্তু আপনার যে ভুল, সেটি অমার্জনীয়, অবিস্মরণীয়। তাই চিরদিনই সপ্তরথী-বেষ্টিত ব্যূহের মধ্যে অভিমন্যু-জীবন আপনার অদৃষ্টে তোলা রইল, ললাটে আঁকা রইল লাঞ্ছনার রাজটীকা। অথচ আপনি সে ভুলের জন্য সজ্ঞানে-অজ্ঞানে যথেষ্ট দুঃখিত। আপনার শুভার্থী আত্মীয়-বন্ধুদের চেয়ে আপনি সে কারণে কিছু কম অনুতপ্ত নন। তথাপি আপনাকে সেই 'অ্যান্টিক ট্র্যাজেডি'র জাজ্জ্বল্য উদাহরণ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। সমালোচকের দল যদি আদম-কে সামনে পেতেন, তা হলে সেই আদিম পাপের জন্য তাঁকে নরক-বাস করাতেন শয়তানের বদলে।

আপনারা হাসছেন! কিন্তু রসিকতার ব্যাপার নয়। আমরা সবাই এই কাজ করে থাকি অথচ মজা এই, জোর গলায় অস্বীকার করি। অন্য মানুষকে নিরন্তর উপদেশ দেব, তার ত্রুটির কথা ভুলতে দেব না। কিন্তু অপরে যদি কিছু বলে, তা হলে চটব এবং উচিত মত শুনিয়ে দেব। সহ্য করব না কিছুতেই, যেহেতু অন্যায় রকমের হস্তক্ষেপ অমার্জনীয় অভদ্রতা। আরও মজা, এই সব লোকেরা নিজেদের 'স্পোর্ট' বলে জাহির করেন, রসবোধ আর সামঞ্জস্য-জ্ঞানের গর্ব করেন। আপনারা অনেকেই এ ধরণের মানুষ দেখেছেন, হয়তো তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন। কল্পনায় নিজের নিজের মানসিক অবস্থা আস্বাদ করে নেবেন। আমার এক বন্ধু আছেন, তিনি উন্নাসিক সমাজে ঘোরা-ফেরা করেন। আজ ডিনার, কাল লাঞ্চ, পরশু কক্‌টেল লেগেই আছে। তিনি বিবাহিত এবং দাম্পত্যজীবনের যে সব লিখিত-অলিখিত আইন-কানুন আছে, সেগুলি তাঁর কণ্ঠস্থ। তিনি তার একটাও পালন করেন না, অথচ আমাদের সকলকেই উপদেশ দিয়ে থাকেন অযাচিতভাবে। ঘরেতে কার একটু মনোমালিন্য হয়েছে, খবর পাওয়া মাত্রই তিনি পুলকিত হয়ে ছোটেন সেই বাড়ীতে এবং অন্তরঙ্গভাবে পরামর্শ দেন। এটা তাঁর বিশুদ্ধ পরহিতব্রত। তবে কার্য-ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি বন্ধুদের শেষ পর্যন্ত ডোবান। অর্থাৎ অনর্গল কথা কয়ে, 'বৌদি'দের পক্ষ সমর্থন করে' তাঁদের অমায়িক দেবরত্ব অর্জন করে, তিনি হঠাৎ এমন দু একটা বেফাঁস খবর বের করে দেন যার ফলে আবার সাত দিন কথা বন্ধ, বাড়ীর আবহাওয়া থমথমে হয়ে ওঠে। আজকাল আমরা একটু সচেতন হয়ে থাকি এবং তিনি এলে পরেই বাইরে নিয়ে বসাই। এমন গৃহস্থ নেই যাঁকে নিত্য দু চারটে ছোটো-খাটো মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় না। কিন্তু কথাবার্তার মাঝখানে দুম্‌ করে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা কেউই পছন্দ করেন না। এই তো সেদিন মেয়ে-দের সঙ্গে মেলামেশা নিয়ে একটা কথা

উঠল। বন্ধুবর এক অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা-শেষে বলে বসলেন, 'কিন্তু তোমাকে নিয়ে বিপদ্। কোনও মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া মুশকিল......'

আমার গৃহিণীর হাস্যমুখে সহসা ভ্রূকুঞ্চন দেখা দিল। প্রশ্ন করলেন, "কি রকম......?" মানে, নতুন অপরিচিতার সঙ্গে প্রথম আলাপের পর 'হাঁ' করে তাকিয়ে থাকে, এই আর কি! যেন কখনোও শাড়ী-পরা জীব দেখেনি এ রকম ভাব। এই তো সেদিন মিসেস বিশ্বাসের সঙ্গে 'ইন্‌ট্রোডিউস্' করে দিলুম আর ও এমনভাবে 'স্টেয়ার' করে রইল যে ভদ্রমহিলা 'ব্লাশ্' করতে আরম্ভ করলেন...'

গৃহিণীর ক্রম-আরক্তিম আননে যে ছায়া পড়ছে, তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষকালে ঠাট্টা দিয়ে কোন রকমে ব্যাপারটা হাল্‌কা করে দিলুম। বললুম, 'তাই বলে মুখ নিচু করে নতুন জামাইয়ের মতন উজ্‌বুক হয়ে থাকব! কোথায় মাথা লঙ্ঘন হচ্ছে আর কোথায় অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে সেটুকু বোঝবার মতন বুদ্ধি আমাদের আছে, যেহেতু আমরাও বিবাহিত। এটা আসলে তোমারই কম্‌প্লেক্‌স্......তোমারই দেখতে ইচ্ছে করছিল......দোষটা চাপাচ্ছ আমার ঘাড়ে।' তারপর গৃহিণীর প্রসন্নতর মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁপ্ ছেড়ে বললুমঃ 'তা ছাড়া, সুন্দর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবেই। লুকিয়ে দেখা আরও অভদ্রতা। তুমিই না বলেছিলে সুশ্রী মুখের ভৌলটি হবে পানের মতন, যেন বিজ্ঞাপনের ছবি? মনে হবে পান-পাত্রে......'

বন্ধু নিজেই কথা চাপা দিলেন। বললেন, 'তা বটে! দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আগত মানুষের লোলুপতা যেমন অভব্য, আবার চোরা চাহনিও তেমনি গাত্রদাহ সৃষ্টি করে......' ভস্মকারী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বন্ধুকে বললুম, 'না দেখলে ছটফটানি অথচ নিঃসঙ্কোচে তাকাবার ভরসা নেই, এটা অবাঢ় মূঢ়েরই মনোভাব। দর্শনীয় বস্তু হলেই দৃষ্টিদান অবশ্যম্ভাবী। তবে তোমাদের মতন ত্রুটিসন্ধানী মানুষের অভিমত হচ্ছে, যে চোখ ফেরাতে না পারলে ঝপ্ করে চোখ বুজে ফেলো আর গায়ত্রী জপো। নয়তো পিসিমা আর আরশোলা... রসিকতার হাল্‌কা হাওয়ায় খণ্ড মেঘ উড়ে গেল বটে, কিন্তু সেই থেকে সাবধানে আছি।

দরকার পড়লে অবশ্য একটু জানিয়ে দেওয়া ভালো। ছিদ্রান্বেষণ সুখের কাজ নয়। কিন্তু যেখানে সত্যিই বদ্‌অভ্যাস অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে, নাগরিক জীবন সেখানে অভিশাপ। কেউ-কেউ নোংরা না হলে পরিবেশ পছন্দ করেন না। কেউ বা প্রতিবেশী সম্পর্কে অবিবেচক। কারুর বা 'হ্যাক-থুঃ' করে পরের উঠোনে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা অভ্যাস। কারুর পাশে বসলে একজন হাঁটু দিয়ে দু পাশে চাড়া দেন, কেউ বা নাকে-মুখে কাসেন বা হেঁচে দেন। কেউ-কেউ হুড়মুড় করে ঘুমন্ত অবস্থায় চমকে ওঠার মতন আপনার পা মাড়িয়ে জামায় ছাতার খোঁচা আর চোখে কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে বাস্ থেকে নামেন। পাশের বাড়ীর দোতলার ফ্ল্যাট্ থেকে কোনও প্রতিবেশী বা নেবুর খোসা, পানের পিক্ বা মলিনতর জঞ্জাল নির্ভুল তাক্ করে আপনার অঙ্গনে নিত্যই ফেলে থাকেন। ভদ্র প্রতিবাদ করলে অস্বীকার করেন, নয় তো অশিক্ষিত ভৃত্য-পরিচারিকার ওপর দোষ চাপিয়ে সাধু সাজেন। কোনও কোনও স্বল্প-পরিচিত ব্যক্তি অকারণ অন্তরঙ্গতার নজির দেখিয়ে পেছন থেকে আচম্‌কা কাঁধে থাপ্পড় দেন, যাতে মেরুদণ্ডের দু এক-

মেরুদণ্ডের দু-একখানা চাকতি খুলে যাওয়ার আশংকা জাগে

খানি চাকতি সরে যাওয়ার রীতিমত আশংকা জাগে। কেউ বা সাংঘাতিক অপ্রিয় কথা সত্যনিষ্ঠার অভ্রান্ত নমুনা হিসাবে অযাচিত শুনিয়ে দেন। কারুর বা ওপর ঠোঁট এক রকম কথা বলে, নীচের ঠোঁট আর এক রকম। এ সব স্থলে ভদ্রতার খাতিরে দু একদিন চুপ করে থাকা যায়। কিন্তু বেশি দিন নয়। নীরব থাকাই মানে প্রশ্রয় দেওয়া এবং বিশেষ ক্ষেত্রে, সামাজিক অপরাধ। তাই বলে নাক উঁচু, চোখ খোলা আর কান সজাগ রেখে খরগোশের মতন ছিদ্র থেকে ছিদ্রান্তর-ভ্রমণ খুব বাহাদুরির কাজ নয়। শেষ পর্যন্ত এই ধরণের মানুষ জগতে লোকসান আর মতান্তরের বোঝা বাড়িয়ে চলেন। লোকেও তাঁর বিপজ্জনক সঙ্গকে তপ্ত অঙ্গারের মতই ফেলে দেয়। শিক্ষকের স্বভাব ছাত্র-সংশোধন, পিতা-মাতার স্বভাব অতি-স্নেহে পাপশঙ্কী, প্রভুর স্বভাব ভৃত্য-সংশয়, গৃহিণীর স্বভাব কুটিল ঈর্ষা এবং অধিকার-বোধ, স্বামীর স্বভাব পত্নী-অবহেলা, কর্মকর্তার স্বভাব সন্দেহ আর দাবে-রাখা। কিন্তু যিনি একাধারে গুরু, প্রভু, পতি ও নিশ্ছিদ্র সম্পূর্ণতার দেবতা, তিনি জটিল জগতের সংস্কার-সাধক বলে প্রতীয়মান হলেও সর্বমানবের শত্রু। এঁদের কর্তৃত্ব অদম্য, উৎসাহ অপ্রতিরোধ্য। পরের দোষ ধরবার জন্যই এঁদের জন্ম, অপরের ত্রুটি-সংশোধনেই এঁদের জীবন-সার্থকতা। কোথায় কোনও ছিদ্র দেখলেই এঁদের যেমন লালাক্ষরণ হতে থাকে, তা ভাবলে মনে হয়, 'কন্‌ডিশান্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্'-প রী ক্ষা র পাভলোভ্ এঁদের স্বভাব কি ভুলে গিয়ে-ছিলেন?

শুনেছি, দাম্পত্য নীতির ভিত্তিই নাকি গলাধঃকরণ-প্রক্রিয়া। সপ্তপদীর পর থেকেই সুরু হয় গ্রাস-চেষ্টা। নববধূ এক মাসের মধ্যেই বুঝে নেয় স্বামীর দুর্বলতা, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি। তখনই শুরু হয় সংস্কারের পালা। যতদিন যৌবনের তেজ, ততদিন মূলধনী অহংকার। পুঁজিবাদীর নিশ্চিত আত্মবিশ্বাসে স্ত্রী আরম্ভ করে ধোলাই এবং রং-ফেরানোর কাজ। প্রতিবাদ আসে, বাধে দ্বন্দ্ব। কিছু দিন চলে ঝাপটা-ঝাপটি, হয়তো বা চুলোচুলি। আবার আসে আপোষের দুর্নিবার তাগাদা। এইভাবে প্রৌঢ় কাল পর্যন্ত রাগ-অনুরাগ, বিসংবাদ-মিলন আর ক্রোধ-অনুতাপ-ক্ষমার পালা-গান চলে। দৈহিক সামর্থ্য আর অভিনয়-পটুতা নিস্তেজ হয়ে এলে তখন আপদঃ শান্তিঃ। বাকি জীবনটুকু অঞ্চলছায়ায় নিশ্চিন্ত আবরণ, আত্মসমর্পণ এবং শ্মশান যাত্রার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বিনা অনুমতিতে নিঃশ্বাস রক্ষা। এই হল বাস্তব ইতিহাস। চন্দ্রগ্রহণে তিনটি স্তর পঞ্জিকায় লেখা থাকে, স্পর্শ, গ্রাস এবং মোক্ষ। দাম্পত্য-পঞ্জিকায় পাণিগ্রহণে মাত্র একটি পর্যায়ঃ পূর্ণ গ্রাস। এর অন্তিমে যে মোক্ষ, সেটা চিতাবহ্নি। মধ্য অবস্থার সবটুকুই নিমীলন।' উন্মীলন বলে কিছু নেই। জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হতে পারে একমাত্র তুরীয় সন্ন্যাসে, গার্হস্থ্য আশ্রমে কদাচ নয়। অবশ্য এ সব শোনা কথা। আপনাদের মধ্যে যাঁরা আশাবাদী, আদর্শ সংস্কারক, তাঁরা হয়ত অন্য বক্তব্য খাড়া করবেন।

এই প্রসঙ্গে আমার এক শ্রদ্ধেয় গুরু-জন-সম্পর্কীয় ব্যক্তির অমূল্য উপদেশ মনে পড়ছে। মেয়েদের মধ্যে এই সংস্কার-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন, আর দাম্পত্য জীবনে মাখামাখির আতিশয্য ব্যাপারে তাঁর ছিল প্রচুর অবজ্ঞা। একবার এক নববিবাহিত যুবক তাকে প্রণাম করতে এসেছিল। তাকে তিনি নিম্নলিখিত বাণী শুনিয়েছিলেন, আপনারাও শুনে রাখুনঃ "সবে তো বিয়ে করেছ, বাপু! এখনও চোখ-মুখের জেল্লা কাটে নি। যদি ওটুকু রাখতে পারো, ভালোই। তবে পালিশ চড়িও না,

ওটা নিতান্তই ভাল্‌গার। একটি কথা বলে রাখি তোমায়, কিছু মনে কোরো না। বয়েস হয়েছে, অনেক দেখলুম কি না। দাম্পত্য আশ্রম নাকি লেন-দেনের কারবার। ও সব ছেঁদো কথা...এ কারবারে খালি দিয়ে যেতে হবে। ফেরৎ পাবে না কিছুই। অবশ্য দেওয়া-নেওয়া থাকলে জমে ভালো। কিন্তু নিচ্ছে তো সবাই, দিচ্ছে কোন স্ত্রী? একা তোমারই কর্তব্য আর দায়িত্ব, যেহেতু মাথায় সিঁদুর চড়িয়েছ। প্রতিদান আশা কোরো না। শুনতে হবে, সংসার সৃষ্টি করে এমন কারুর মাথা কেনো নি। তবে হ্যাঁ", এইখানে বলির জন্য চিহ্নিত নধর জীবের প্রতি করুণ দৃষ্টি নিয়ে তিনি বললেন, "এখানে একটা বিষয়ে তোমাদের সাবধান করে দিতে চাই। সাতদিনের মধ্যেই হৃদয়ের কবাট খুলে ধরো না, যা অনেক পেট-আল্‌গা ছোকরা করে থাকে এবং পরে পস্তায়। ওসব ভালো-টালো বেসো, বাপের বাড়ী গেলে দিনে দু'খান চিঠি ছেড়ো। ক্ষতি নেই। তবে গোড়াতেই যদি বুঝিয়ে দাও, তোমার পৃথক্ সত্তা নেই, ব্যক্তিত্ব নেই—তা হলে পরিণামটা কি, বুঝতে পারছ?" এই বলে, তিনি পাশের আস্তাবলে ছ্যাকড়া গাড়ীর শীর্ণকায় ঘোড়াটির দিকে আঙ্গুল দেখালেন। যুবকটির চকিত ভাব দেখে একটু আশ্বাস দেবার ছলে আবার বললেনঃ 'ভয় পেয়ো না হে! ভয় পেয়েছ কি মরেছ! মাথাটা উঁচু রেখো। যখন দেখছ, রাশ বাগিয়ে নিচ্ছে, তখন সজোরে পদক্ষেপ করে গাড়ি ওল্টাতে হবে, উপায় কি? মেয়েদের মধ্যে কর্তৃত্ব-স্পৃহা হল জন্মগত। জাপানী ছবির মতন এক রত্তি মেয়ে হলে কি হয়, ভয়ানক শক্ত হতে জানে ওরা, যখন দেখে তুমি সম্পত্তি হয়ে গেছ। চাবি দিয়ো, কিন্তু প্রাণের নয়। তাহলে দেখবে—আজ তোমার পোশাক বদলাচ্ছে, কাল তোমায় পা নামিয়ে টান হয়ে চেয়ারে বসতে বলছে, পরশু বলছে রাত দশটার পর আলো নেভাতে হবে, তরশু হুকুম দিচ্ছে চিৎ হয়ে শুয়ো না, মুখ হাঁ করে খেয়ো না...আরও কত কি! আমাদের যৌবনে আমরা এসব হতে দিই নি। আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের মেরুদণ্ড কেবল পলিটিক্‌সে...বাইরে যত হাঁক-ডাক, ঘরে সব এক তাল কাদা। আর একটি কথা মনে রেখো বাপু। ব্যক্তিগত ইচ্ছা, রুচি বিসর্জন দিয়ো না। 'পার্সোন্যাল হ্যাবিট্' শোধ্‌রাবার ছলেই ওরা মনের ঘরে সিঁদ্ কাটি দেয় সন্তর্পণে। গৃহস্থ, সজাগ থেকো। তোমরা তো পুঁজিবাদের বিপক্ষে। তবে, ঘরে ক্যাপিটালিজ্‌ম বরদাস্ত কর কেন, জানি না। এই দেখ, ষাট বছরেও আমার বুক-পিঠ সোজা। কেন বলতে পারো? আমার বই, কাপড় আর নেশার জিনিসে হাত দিতে দিই নি কখনো। ঐ যা বললুম, আপন সত্তার সিকি ভাগ অন্তত আলাদা রেখো। ওখানে আর যুগল-মিলন চালিও না। কবি ডন্ সাঁচ্চা কথা বলে গেছেন, নেভার গিভ্ দাই সেল্‌ফ হোল্‌লি..."

এই অমর বাণীর পর আর পুনশ্চ চলে না। এই কথাটাই এতক্ষণ বলতে চাইছিলুম। ঘরেই হোক্ আর বাইরেই হোক্, শত্রু অসংখ্য। ত্রুটি সংশোধনের অছিলায় সবাই ওৎ পেতে আছে। মনে রাখবেন, খোলা মাঠে আপনি আনন্দমগ্ন অসতর্ক শশক-শিশু। শিকারীর দল আপনার সুখ-শান্তি তাড়নায় উদ্‌গ্রীব। এ অবস্থায় আপনাকে বাঁচতে হবে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার প্রয়োজন। দরকার হলে শক্ত মুঠিতে জীবনের হাল বাগিয়ে ধরতে হবে। প্রথমটা অশান্তি হয়তো অনিবার্য, কিন্তু শেষে আপনারই জয়। ছোটবেলায় একটি গল্প পড়েছিলাম ভারি মজার। আজও ভুলিনি। এক সরল চাষী তার স্ত্রীকে যমের মতন ভয় করত। সমস্তক্ষণ খিটিমিটি। যা করে, সেইটেই ভুল। সব তাতে দোষ ধরে, খুঁৎ বার করে আর সংশোধনের চেষ্টা করে তার দজ্জাল বৌ। একদিন চাষী খুব ব্যস্ত হয়ে বাড়ী ঢুকে চেঁচিয়ে বলল, "একবার এদিকে এসো শিগ্‌গির। কি হয়েছে দেখে যাও। গাধাটা সেই গম-পেষার চাকিটা বেমালুম খেয়ে ফেলেছে।" কথা শেষ হবার আগেই বৌ মুখ ধরেছে, "ও তো হবেই! যেটি না দেখ্‌ব...সেটিই ভণ্ডুল। কতবার বলেছি, চাকিটা ঘরে তুলে রেখো! আমার কথায় তো কান দাও না...ঐ একগুঁয়েমি তোমার মস্ত দোষ!"

আর যায় কোথায়! বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল চাষী তার বৌ-এর পিঠে। চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। ঘা কতক বসায় আর চেঁচায়ঃ "সব আমার দোষ? আর বলবি? তুই যা বলিস্, সব সত্যি? দেখে যা একবার ...এবার ছাড়ছি না তোকে...দেখে যা গাধায় কেমন চাকি খেয়েছে! এবার থেকে যদি মুখ বন্ধ না করিস্, তা হলে ঐ চাকি তুলে তোর বুকে চাপিয়ে দেব..." বলা বাহুল্য, চাষীর বৌ জীবনে আর কোমরে কাপড় জড়িয়ে এগুতে ভরসা পায়নি।

কিন্তু সব চেয়ে চমৎকার সাহিত্য হয়েছে ম'মের লেখা গল্প 'ঘুড়ি'। আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে পড়েছেন। যারা পড়েন নি, তাঁদের অতি অবশ্য পঠনীয়। ছোট বেলা থেকেই হার্বার্ট ঘুড়ি ওড়াতে ভালোবাসত। ছুটির দিনে কখনো একলা, কখনো বাপের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানোই ছিল তার পরম আনন্দ। বেটি'র সঙ্গে বিয়ে হল, তারপর বাধ্‌ল দ্বন্দ্ব। বেটি পছন্দ করে না এসব ছেলেমানুষি। হার্বার্ট তবু লুকিয়ে আসে বাপ-মায়ের কাছে। ছুটির দিনে প্রকাণ্ড এক রঙীন্ ঘুড়ি নিয়ে মাঠে গিয়ে মনের সুখে ওড়ায়। বাপ দেখে, কখন বা তোল্লা দিয়ে উড়িয়ে দেয়। উভয়েই কিশোর-সুলভ পুলকে মগ্ন। বেটি রাস্তায় যেতে যেতে দেখলে। বুঝল, স্বামী মিথ্যা বলে' ওজর দেখিয়ে ছুটির দিনে এখানে এসে এই কর্ম করে। বাড়ী ফিরে সেদিন তুমুল ঝগড়া। হার্বার্ট রাগ করে বাপ-মায়ের কাছে চলে এল। শখের ঘুড়িটা যখন বেটি ছিঁড়ে ফেলল, তখন তারও রোখ্ চেপে গেল। বাড়ী ফিরল না, বেটিকে টাকাও দিল না। নালিশ হল, মোকদ্দমা শুরু হল। হার্বার্টের অটল জিদ্, খোর-পোষের দাবি সে মেটাবে না। একটি পয়সাও দিল না বেটিকে। কারাবাস হ'ল। কিন্তু তার জিদ্ বজায় রইল তো! ব্যক্তিগত স্বভাব-অভ্যাস নিয়ে স্ত্রীর হস্তক্ষেপ সে মানে নি। বিজয়ী হয়েছে, এইতেই তার পরম তৃপ্তি।

এবার শেষ কথাটি বলি। এতক্ষণ ধরে ছিদ্রান্বেষীর ছিদ্র দেখিয়ে এত কথা বললুম। আপনারা মনে করবেন না যেন, আমিও ঐ দলে। আমি শুধু টুকে দিলুম। কেস্‌টার বিশদ ব্যাখ্যা করেই আমি ক্ষান্ত। আপনারাই ভেবে দেখুন, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ কি না। একে তো ইঁদুরের গর্তে বাস করি সব। সেখানেও যদি খোঁচা খাই নিয়ত, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যে যার ত্রুটি খুঁজুক্। ত্রুটি সন্ধান করে' জীবন-সমস্যাকে আরও জটিল করে লাভ কি! কেউ যদি দোষ দেখান, উপদেশ দেন, আমরা গললগ্নীকৃতবাসে বলব, 'মেনে নিচ্ছি সবই, কিন্তু ত্রুটি মার্জনীয়।' আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যদি এরকম সংস্কার-প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, তা হলে বলব, 'মাই ডিলাইট' আর 'দাই ডিলাইট' এক তালে ছন্দ রাখছে না, খুবই দুঃখিত।' আর যদি কোনও ঘরে পরমাত্মীয়া এই ত্রুটি-ধরা মিশ্যনারিরূপে অবতীর্ণা হন, তাহলে খুবই শোচনীয় ব্যাপার। আজীবন অশান্তি। এ যেন পাহাড়ী পথ, জুতোয় কাঁকর ঢুকেছে। তবু, সেই জুতো পরেই চলতে হবে। পথের শেষ না হওয়া পর্যন্ত নরক-যন্ত্রণা। প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ!

স্ত্রী না পুরুষ?

বিজয়কেতু বসু

রবিবারের সন্ধ্যার আড্ডাটি তখন বেশ জমে উঠেছে। 'মলিন তাস সজোরে ভেঁজে' আমরা সবে নতুন ডিল শুরু করেছি। একজন করে উপদেষ্টা ও একজন করে খেলোয়াড় নিয়ে মোট আটজনে তক্তাপোশটার প্রায় সমস্তই ভর্তি। আমাদের নবগ্রহের নবম গ্রহটি কেবল তখন কক্ষচ্যুত হয়ে আপন মনে একটা খবরের কাগজ পড়ছিল। খেলার খুব সঙ্গীন মুহূর্ত—হেস্ত নেস্ত হবার উপক্রম এমন সময় আচমকা বিনয়ের গলার আওয়াজে খেলায় একটা বাধা পড়ল।

দলের মধ্যে পাত্তা না পেয়ে বিনয় একটু মন দিয়েই কাগজ পড়ছিল। আমরাও তার সাড়া শব্দ না দেখে নিশ্চিন্তই ছিলাম, কিন্তু "সাঙ্ঘাতিক খবর!" কথাটা সে যখন বেশ উৎকণ্ঠাভরে বলে উঠল তার উৎকণ্ঠার ছোঁয়াচটা সকলকেই অল্প-বিস্তর ধাক্কা দিয়ে গেল। জনকয়েক একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, "কি রে! কি হয়েছে?"

বিনয় জানালে কাগজে বেরিয়েছে বিলেতের একটা মেয়ের এমনই অসুখ হল যে আস্তে আস্তে তার শরীরের পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে কিছুদিনের মধ্যে পুরোদস্তুর সাহেব বনে গেল—ডাক্তাররা তাতে বলেছে এতে নাকি আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এরকম পরিবর্তন দুতরফাই হতে পারে অর্থাৎ পুরুষের পক্ষেও স্ত্রীলোক হয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। শরীরের এক শ্রেণীর গ্রন্থির অপক্রিয়াই এর মূল কারণ। ডেনমার্কের এক বিশেষজ্ঞ নাকি হাতে কলমে কাজটা করেও দেখিয়ে দিয়েছেন।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নেড়ুবাবু বলে উঠলেন "তখনি বলেছিলাম বেশীদিন আইবুড়ো থেকে বিয়ে করিসনি বিনে। কখন কি হয় বলা যায় না। এই দ্যাখ দিকি আমায়—এখন আমার এসব হলেই বা কি আর না হলেই বা কি!"

সাতটি সন্তানের জনক নেড়ার বেপরোয়া ভাব দেখেও কিন্তু সকলে যেন আশ্বস্ত হতে পারল না। সদ্যবিবাহিত বিনয় ত নয়ই। বিশু বললে, "হ্যা হে ডাক্তার ব্যাপারটা কি? খবরটা আমিও পড়েছি। আচ্ছা সত্যিই কি এরকম হতে পারে, না ওটা কাগজের কাটতি বাড়াবার একটা ফন্দি?"

নারীতে রূপান্তরিত জর্গেনসেন

ছাপার অক্ষরের ওপর অতিরিক্ত আস্থা রাখেন যাঁরা তাঁদের কথা বাদ দিলেও বেশীর ভাগ লোকই এটাকে আমাদের বিশুর মত কাগজে হুজুগ মনে করবেন কিন্তু যা রটে তা কিছু বটে। কাগজে যা প্রকাশিত হয়েছিল তার সবটা নির্ভুল হয়ত নাও হতে পারে তবে তাতে কিছু সত্য আছে।

জর্গেনসেনের মোহিনীমূর্তি

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য দেখতে আমরা এতই অভ্যস্ত যে, আমরা ধরে নিয়েছি মানুষের মধ্যে কোন মিশ্র ভাব থাকার কথা নয়। যে পুরুষ সে কেবল পুরুষই, যে স্ত্রী সে কেবল স্ত্রীলোকই। একটু তলিয়ে দেখলে এ মত বদলাতেই হয়। যতদূর মনে আছে, বার্নার্ড শ' এক জায়গায় বোধহয় বিরক্ত হয়েই লিখেছিলেন—Manly man ও Womanly woman বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে, আর ভাল লাগে না। এবার manly woman ও womanly man চাই।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে জীবের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দুটো ভাবই যুগপৎ বর্তমান। প্রকৃতির নিয়মে অবশ্য বাহ্যত একটা ভাবেরই প্রাধান্য থাকে যদিও অন্তরে দু-ই রয়েছে। অতএব স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ হওয়ার সম্ভাবনা এবং পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ই আছে। কিন্তু সম্ভাবনা থাকলেই কোন ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে ঘটে না। সম্ভাবনা কি করে ঘটনায় পরিণত হচ্ছে

সেটা না বোঝা পর্যন্ত ব্যাখ্যার কোন মূল্য থাকে না।

জন্ম থেকে যদি বার্ধক্যে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের দেহ ও মনের গতি লক্ষ্য করা যায় তাহলে সহজেই নজরে পড়ে যে প্রকৃষ্ট বয়স্ক অর্থাৎ ১৬ থেকে ৬০-এর মধ্যে নরনারীর পুংস্ত্রীভেদিকা যেমন প্রখর শৈশবে বা বার্ধক্যে তেমন নয়। যদি জন্মের পূর্বে ভ্রূণের শারীরিক লক্ষণগুলি বিচার করি তাহলে দেখতে পাই যে যতই আমরা আদ্যাবস্থার দিকে যেতে থাকব ততই ভেদলক্ষণগুলি মিলতে থাকবে। শেষে এমন অবস্থায় পৌঁছব যেখানে দৃশ্যত কোন পার্থক্যই নজরে পড়বে না। ভ্রূণ যখন এরকম অবস্থায় থাকে তখন আমাদের পছন্দমত রাস্তায় ভ্রূণের বিকাশকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি অর্থাৎ বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োগে ভ্রূণকে স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন রকম জীবেই পরিণত করা যেতে পারে। কিন্তু যদি কৃত্রিম উপায়ে ভ্রূণকে চালিত করা না হয় তবে স্বভাবের নিয়মেও ভ্রূণ একটা নির্দিষ্ট পথেই চালিত হয়। এই নির্দিষ্ট পথ প্রত্যেক ভ্রূণের উৎপত্তির সময়ই ঠিক হয়ে যায় এবং পুংবীজের বৈশিষ্ট্যের উপরেই তা নির্ভর করে।

উপরের কথা থেকে ধরা যাচ্ছে যে ভ্রূণের জীবনপথে এমন একটা সময় আসে যখন জীব বাহ্যত হয় স্ত্রী নয় পুরুষ যা হ'ক একটা হবার রাস্তা বেছে নেয়। কোনটা বাছবে তা অনেক আগেই ঠিক হয়ে থাকলেও প্রতিবেশের গলদ অনেক সময় গোড়ার পছন্দকে উল্টে দিতে পারে। সময় সময় এমন হয় যে, বাছাবাছিটা করতে জীব যেন ইতস্তত করে, ফলে না পুরুষ না স্ত্রী অবস্থাটা অনেকদিন পর্যন্ত গড়িয়ে চলে এবং জন্মাবার পরও এই অন্তর্দ্বন্দ্বের চিহ্ন-স্বরূপ জননেন্দ্রিয়ের খানিকটা বৈকল্য থেকে যায়। এমন ক্ষেত্রে জাতকের জাতি বিচার সাধারণ লোকের পক্ষে বেশ শক্ত হয়ে পড়ে। মূলত স্ত্রী এমন জাতক পুরুষ হিসাবে লালিত হতে পারে পক্ষান্তরে মূলত পুরুষ এমন জাতকও স্ত্রী হিসাবে বর্ধিত হতে পারে। শৈশবে যা অস্পষ্ট থাকে যৌবনে তা অনেক সময়ে পরিস্ফুট হয় এবং নবজাতকের জাতি নির্ণয় শক্ত হলেও প্রাপ্তবয়স্কের জাতি নির্ধারণ সহজসাধ্য হয়। এই ধরণের কোন কোন ক্ষেত্রে তখন আধুনিক শাস্ত্রবিদ্যা ও গ্রন্থিবিদ্যার কল্যাণে দৈহিক ত্রুটি সংশোধিত করে নেওয়া যায় এবং সংবাদটিও সর্বত্র চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে। কিন্তু এ-জাতীয় সংবাদে আসল খবরের অনেকটাই চাপা থাকে। বিশেষ করে অস্ত্রোপচারের পূর্বে শারীরিক লক্ষণগুলি কি ছিল, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল কি না, এসবের কোন উল্লেখ থাকে না।

আধুনিক বিজ্ঞান যে সব তথ্য আমাদের সামনে এনে হাজির করছে তাতে স্ত্রীভাব অথবা পুংভাব কোনটাকেই মৌলিক গুণ বলে আর মনে করা যায় না। এদুটি কতকগুলি মৌলিকতর গুণের সমবায়েই গঠিত। যেমন ইট, কাঠ, চুন, সিমেণ্ট প্রভৃতি কয়েকটা প্রাথমিক উপাদানের সাহায্যে নানারকমের বাড়িঘর তৈরী করা যায় এবং রকমারি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় তেমনি স্ত্রীভাব ও পুরুষভাব দুইই কয়েকটা একধরণের মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে তৈরী। খালি মাত্রা আর সজ্জার পার্থক্যে দুয়ের মধ্যে পরিণামে এতটা বৈপরীত্য দেখা দেয়। ভ্রূণ-বিদ্যা ও শারীরবৃত্ত যেমন এই তত্ত্বের সিদ্ধত্ব শরীরের ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছে তেমনি ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ এই তত্ত্ব মনের দিক থেকেও সিদ্ধ বলে প্রমাণ করেছে। ফ্রয়েডের মতে মানুষের সহজাত কাম প্রবৃত্তি, বয়ঃ-প্রাপ্তিতে যা সাধারণত পুরুষের ক্ষেত্রে স্ত্রী-অভিমুখী হয় এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে পুরুষ অভিমুখী হয়, তা আসলে 'একল' নয় 'বহুবৃত্তি সংগ্রহ'। এই বৃত্তি সংগ্রহের আদ্য উপাদান প্রত্যেকটি বৃত্তিই কোন না কোন শরীর স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে আমাদের শারীর ক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। জীবের জন্মগ্রহণের পর থেকেই এই বৃত্তিগুলি শরীরকে আশ্রয় করে পূর্ণতা লাভের পথে অগ্রসর হয়। নানা রূপান্তরের পর এবং নিজেদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে অন্তর্মিশ্রণের ফলে কৈশোরে এসে পূর্ণাঙ্গ যৌনবৃত্তিতে পরিণত হয়। তাই স্ত্রীভাব ও পুংভাব দুইই একসঙ্গে বিদ্যমান দেখা যায়—একটিকে ব্যক্তরূপে, অপরটিকে গূঢ়রূপে।

প্রাচীন ভারতেও এই তত্ত্ব প্রচলিত ছিল, ভাগবতের পুরঞ্জন উপাখ্যানে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভাগবতে আছে—পুরঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুরান সখা ছিল। সখার নাম বা কর্ম কি কেহই জানিত না। একদা রাজা একটি মনোমত বাসস্থানের অন্বেষণে পৃথিবী পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। হিমালয়ের দক্ষিণে সানু দেশে নয়টি দ্বার সমন্বিত এক অতি সুলক্ষণ পুর তাঁহার নয়নগোচর হইল। প্রাকার, উপবন, অট্টাল, পরিখা, গবাক্ষ, তোরণ প্রভৃতিতে নগরটি সুসজ্জিত। স্বর্ণ, রৌপ্য, আয়স শৃঙ্গসমূহ তাহার গৃহশোভা বর্ধন করিতেছিল। নাগ রাজপুরী ভোগবতীর তুল্য নীল, স্ফটিক, বৈদূর্য মুক্তা, মরকত ও অরুণ প্রভৃতি মণি সেই নগরকে প্রদীপ্ত রাখিয়াছিল। সভা, চত্বর, রথ্যা, আক্রীড়ায়তন, চৈত্য, মনোরম তরুলতাদি বেষ্টিত জলাশয় সমস্তই ছিল। নগরোপকণ্ঠে কোকিল-কূজিত-স্নিগ্ধ কুসুমাকর বায়ু-শীতল জলাশয়-তটে বিচরণ কালে মহাবীর পুরঞ্জনের সহিত এক উত্তমা প্রমদার সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি পরিচারক পরিচারিকা পরিবৃতা হইয়া ভর্তার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। পঞ্চমুণ্ড এক সর্প প্রতিহাররূপে সর্বদা তাঁহার রক্ষণে নিযুক্ত। সেই সুকপোলা, বরাননা পিনঙ্গ-জীবী, সুশ্রোণী, বাঞ্জিত কৈশোরা, সলজ্জস্মিতশোভনা কুঞ্জপলা-শাক্ষী কন্যাকে দেখিয়া পুরঞ্জন অধীরবৎ প্রশ্ন করিলেন, "ভীরু! তুমি কে? তোমার অভিভাবক কে? কোথায় যাইবে? এখানেই বা কি জন্য বেড়াইতেছ?" তদুত্তরে বালা কহিল, "আমাদের কর্তা কে কিছুই জানি না—এই পুরে চিরদিনই আমি অধীশ্বরী। আমি এখনও কুমারী এবং এ-সকল লোকজন সকলেই আমার অনুচর। পঞ্চমুণ্ড সর্প এই পুরের রক্ষক। আমি আমার সমস্ত অনুচরসহ আপনার দাসী হইলাম আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া এই পুরের অধিপতি হউন।" এইরূপে সেই দম্পতি পুরীতে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর পুরঞ্জন মহিষীর মনোরঞ্জনপূর্বক সেই পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বহু পুত্র পৌত্রাদি হইল এবং পুরঞ্জন মহিষীর মনস্তুষ্টিতে ব্যস্ত থাকায় রাজ্য শাসনে অমনোযোগী হইলেন। তখন বহিঃশত্রু চণ্ডবেগ নামে গন্ধর্বরাজ, ভয় নামে যবনরাজ ও কাল দুহিতা জরা তাহার স্বামী প্রজ্বারের সহিত পুরঞ্জন-পুরী আক্রমণ করিল। পঞ্চমুণ্ড সর্প বহুদিন ধরিয়া একা যুদ্ধ চালাইয়া ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তখন শত্রুরা পুরঞ্জনের পুরীর মধ্যে প্রবেশপূর্বক পুরঞ্জনকে বাঁধিয়া ফেলিল। পুরী ভ্রষ্টশ্রী হইতে দেখিয়া এবং পুরঞ্জনের দুরবস্থা দেখিয়া স্ত্রী-পুত্রকন্যা ও আত্মীয়গণ সকলেই পুরঞ্জনের প্রতি বিমুখ হইল। পুরঞ্জন কিন্তু মায়াত্যাগ করিতে না পারিয়া ভার্যার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন, নিজ সখার

কথা তাহার মনে হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া পুররক্ষক সর্প একদিন পুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অন্তিমকাল উপস্থিত হইলেও পুরঞ্জন ভার্যার চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্ত্রী চিন্তার জন্য মৃত্যুর পর তিনি বিদর্ভরাজ-দুহিতারূপে জন্ম নিলেন মলয়ধ্বজ নামে দ্রাবিড়রাজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। সতী বৈদর্ভীর ক্রমে অনেক পুত্রকন্যা হইল এবং বানপ্রস্থের সময় আসিলে স্বামীর সহিত তপস্যার্থ বনগমন করিলেন। তিনি নিজেকে বৈদর্ভীই ভাবিতেন এবং পূর্বজন্মের কোন স্মৃতি তাঁহার ছিল না। বনমাঝে একদা স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ শোক করিয়া স্বামীর সহমরণে যাওয়াই স্থির করিলেন। চিতায় যখন উঠিতে যাইবেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া রাণী বিস্মিত নয়নে ভাবিতে লাগিলেন যেন ব্রাহ্মণ কতই পরিচিত—কোথায় তাহাকে দেখিয়াছেন! রাণীকে বিস্ময়ে নির্বাক দেখিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তোমার ভয় নাই, আমি ব্রাহ্মণ সকলের কল্যাণ কামনাই করিয়া থাকি। তুমি কে? যিনি চিতায় শায়িত তিনিই বা কে? কাহার জন্য এত কাতর হইতেছ? তোমার কি মনে নাই আমরা উভয়ে পরমবন্ধু ছিলাম? তারপর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া সংসার করিতে গেলে তাহাতেই তোমার এই রূপান্তর ঘটিল। আমায় ছাড়িয়া প্রথমে তুমি এক পুরে প্রবেশ করিলে সেখানে পুরঞ্জন নামে খ্যাত ছিলে। পরজন্মে বৈদর্ভীরূপে নারী হইলে· কিন্তু আসলে তুমি পুরঞ্জনীর স্বামী পুরঞ্জনও নহ অথবা মলয়ধ্বজের স্ত্রী বৈদর্ভীও নহ। আমার সহিত বন্ধুত্বের কথা ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়াই এসব ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।"

উপাখ্যানটি পুরোপুরি রূপক। বলা বাহুল্য যে উদ্দেশ্যে এটা লেখা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে এখানে উল্লেখ করছি না। বিজ্ঞানের দুটি অঙ্গ এক তথ্য অপর তত্ত্ব। এই উপাখ্যানটি তথ্যের দিক থেকে বিচার না করে তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে এর সৌন্দর্য আর প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি হবে। জন্মান্তরে পুরঞ্জনের নারীরূপ ধারণ তার বাসনারই ফল বলে বলা হয়েছে। কাজেই স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্বর প্রতীতি আমাদের মনের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করছে এ ধারণা ভারতে নতুন নয়। কেউ কেউ এতে আপত্তি তুলবেন তাহলে ইচ্ছা করলেই ত' আমরা এই প্রতীতি পালটাতে পারতুম, তা যখন পারা যায় না তখন কথাটা অশ্রদ্ধেয়। এ যুক্তির মস্ত গলদ যে এখানে আমরা ইচ্ছাকে আমাদের আজ্ঞাধীন মনে করছি। আসলে ব্যাপারটি একটু অন্যরকম—আমরাই ইচ্ছার অধীনে চালিত হয়ে থাকি। মনঃসমীক্ষণ দেখিয়েছে আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ ইচ্ছা ছাড়াও বহু ইচ্ছা আমাদের নির্জ্ঞান মনে অবদমিত অর্থাৎ ঢাকা পড়ে রয়েছে। এসব ইচ্ছা অপ্রত্যক্ষ থেকেও আমাদের গতিবিধি সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত করছে ইচ্ছাজগতের যে অংশ আমাদের আজ্ঞাধীন তা সামান্যই, বেশীর ভাগই আমাদের উপরওয়ালা। যে কোন ব্যাপারে আমাদের মানসিক প্রতীতি প্রত্যক্ষ ও গূঢ় দুরকম ইচ্ছার মিশ্রণ পরিণামের উপরই নির্ভর করে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র মতে অবশ্য মনের যাবতীয় ইচ্ছাকেই আজ্ঞাধীন করে তোলা যায় তবে তার সত্য মিথ্যা যাচাই করার মত বিদ্যা উপস্থিত আমাদের বিজ্ঞানে নেই।

রঙরেজের

প্রমথনাথ বিশী
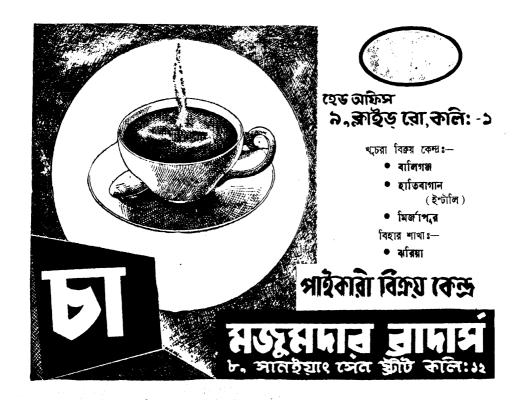
আমি ঐতিহাসিক নই, ইতিহাস লিখিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি বা অভিপ্রায় আমার নাই। তবে একথা সত্য যে আমি ইতিহাসের একজন অনুরাগী পাঠক। ইতিহাস পড়িয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, ইতিহাস গ্রন্থের পাতায় যেসব তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়, অনেক সময়েই সেসব সত্যের ছিবড়ে. প্রকৃত তথ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছায় না। পৃষ্ঠার চেয়ে পাদ-টীকার মূল্য অনেক সময়েই অধিক, আর লোকের মুখে মুখে ও জনশ্রুতিতে যেসব কথা বাতাসের বেগে ধুলোর মতো ভাসিয়া বেড়ায় তাহাতেই সত্যের উজ্জ্বলতম প্রকাশ।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত তথ্য জানিবার আশায় উত্তর ভারতের শহরে গ্রামে বাজারে বাজারে আমি অনেক বেড়াইয়াছি, এখনো বেড়াইতেছি। এই রকম ভ্রমণের মুখে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঝান্সী শহরে উপস্থিত হইয়া ডাক বাংলোয় আশ্রয় লইলাম। ঝান্সী শহর সিপাহী বিদ্রোহের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।,যদিচ সে অনেক দিনের কথা, তবু এখনো এখানে এমন লোক নিশ্চয় অনেক আছে, যাহারা সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে জীবিত ছিল, আমি নিজেও তো সেই রকম একজন লোক; এমন লোক নিশ্চয় অনেক আছে, যাহারা সে সময়ে কোন না কোন পক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, আমি নিজেও তো সেই রকম একজন লোক। আমি তাহাদেরই সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু বিপদ এই যে, যাহারা সে সময়ের কথা হাতে নাতে জানে, তাহারা মুখ খুলিতে চায় না। নিজেদের মধ্যে খুব সম্ভব সেসব কাহিনীর আলোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু অপরিচিতের কাছে একেবারেই মূক। আমি মূককে বাচাল করিবার অসাধ্য সাধনে বাহির হইয়াছি, আর পংগুর গিরি লঙ্ঘন! তাহার দৃষ্টান্ত তো আমি স্বয়ং, সিপাহীর গুলীতে আমার একটি পা বিকল।

ডাক বাংলো প্রায় খালি, কেবল আভাসে বুঝিলাম যে, একটি ঘরে আর একজন লোক আছে। কিছুক্ষণ পরে সেই লোকটি বাহিরে আসিলে দেখিলাম যে, তাহার বয়স আমার চেয়ে কমতো নয়ই, বরঞ্চ বেশি হইবে বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই, কেননা, লোকটি একেবারে শুকাইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, বয়স চল্লিশ হইতে আশির মধ্যে যে-কোন অংকে স্থাপন করা যাইতে পারে। চৌকিদার তাহাকে মুন্সিজী বলিয়া সম্বোধন করিল, আমিও তাহাই করিব; অনেকবার তাহার উল্লেখ করিতে হইবে; তাহার মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে যে কাহিনীটি শুনিলাম তাহাই এখন বলিব।

আমি বারান্দায় যেখানে বসিয়াছিলাম, তাহার নিকটে মুন্সিজী আর একখানি চেয়ারে বসিলেন। এখন দুজন প্রায় সমবয়স্ক লোক নির্জন এক গৃহে অবস্থান করিলে আলাপ পরিচয় হইবে না, এমন প্রায়শ হয় না, তা তাহাদের মধ্যে জাতিগোত্রের যতই ভেদ থাকুক না কেন?

বিশেষ আমার কেমন যেন ধারণা হইল যে, এই রকম জীর্ণ ভাণ্ডারেই আমার আকাঙ্ক্ষিত সত্য থাকিবার সম্ভাবনা, সীসার বাক্সেই তো পোর্শিয়ার চিত্রপট রক্ষিত ছিল।

তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সবিনয়ে শুধাইলাম আপনি কোথায় যাবেন?

কানপুরে

কানপুরে? আমি তো সেখান থেকেই আসছি

সেখানে আপনার কি কাজ ছিল?

ঘুরে বেড়ানোই এখন কাজ

সরকারী চাকুরীতে আছেন?

এক সময় ছিলাম, এখন পেন্সন পাই।

আপনি?

আমিও সরকারের পেন্সনভোগী

কি কাজ করতেন?

মাস্টারী করতাম, লোকে তাই মুন্সীজী বলে

কোথায় মাস্টারী করতেন?

উনাও শহরে

সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও তাহলে উনাও শহরে ছিলেন

তখন কি ইস্কুল, কলেজ খোলা ছিল? তাছাড়া বিদ্রোহের পরে আমি মাস্টারীতে ঢুকি

তখন কি করতেন?

এমন কিছু নয়

বুঝিলাম রহস্যদ্বার এবারে বন্ধ হইল। আরও কৌশল চাই, আরও ধৈর্য চাই

আপনি কি করতেন?

এবারে প্রশ্নটা আমার প্রতি।

৯৩ নম্বর সাদারল্যান্ড হাইল্যান্ডার রেজিমেন্টের সার্জেণ্ট ছিলাম

বটে? দিন হাত দিন, আমি কিছুদিন ঐ রেজিমেন্টের নেটিভ হিসাবরক্ষক ছিলাম।

তখন বোধহয় আমি সামরিক পদ থেকে বিদায় নিয়েছি,

তা হবে, আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না। তা হোক, তবু তো এক রেজিমেন্টের লোক।

এবারে রহস্যদ্বার আবার খুলিল।

মুন্সীজি পুরানো দিনের খাতিরে দু' একটা পেগ খেতে আপত্তি আছে কি?

আপত্তি! বিলক্ষণ। মুন্সী হ'বার পরে ওসব ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন তো মুন্সীগিরির পূর্বজীবনে ফিরে গিয়েছি। তা ছাড়া রাতের বেলায় দেখছেই বা কে?

আর দেখলেই বা দোষ কি?

দোষ কি জানেন, লোকে ইস্কুল মাস্টারদের সাধারণ ক্ষুধাতৃষ্ণা লোভ কামনার উর্ধ্বে বলে জানে। তারা একজন সামান্য কেরাণীকে মদ খেতে দেখলে বলবে বাহাদুর ছেলে বটে। কিন্তু একজন স্কুল মাস্টারকে যদি একটা মাতালের সঙ্গে পথে যেতেও দেখতে পায়, অমনি বলবে এই যে দেশটা জাহান্নমে গেল!

তাই নাকি? আমাদের দেশে তো এমন নয়

সেইজন্যই তো আমাদের দেশে ইস্কুল মাষ্টারের বেতন এত সামান্য, যাতে তারা শাক-ভাতের বেশি কিছু খেতে না পারে।

এই বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল, মুখের গহবরে দন্তের আত্যন্তিক অভাব; হাসির তালে তালে গালের রেখাগুলি সংকুচিত বিস্ফারিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে হাসিলাম, কতকটা তাহার কথায়, কতকটা তাহাকে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে।

তা আপনি এমন ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? পেন্সন পান, তোফা কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করুন।

তাই তো করা উচিত, কিন্তু মাথায় এক ভূত চেপেছে, তাই ঘুরে মরছি। আমি সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি

সরকারের তরফ থেকে?

না, না সরকারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। তাছাড়া যে-ঘটনা অনেক কাল চুকে বুকে গেছে, তার তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে সরকার কেন টাকা খরচ করতে যাবে?

আপনি যখন সরকার পক্ষের কেউ নন, আর আমরা যখন এক রেজিমেন্টের লোক, তখন আপনাকে গোপনে বলি, between ourselves বুঝলেন কিনা, কিছুই চুকে যায়নি।

আবার বিদ্রোহ হবে নাকি?

তার কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। আমি বলছি পুরাতন বিদ্রোহের জের আজও চলছে

আজও চলছে? সে আবার কি রকম?

কিছু দিন আগে জব্বলপুরের কাছে মেজর নীল তার বডিগার্ড মজর আলির হাতে নিহত হ'য়েছিল মনে আছে?

আছে বই কি! বোধ করি মার্চ মাসে হবে ১৪ই মার্চ।

মনে থাকবার কারণ হচ্ছে যে, মজর আলি মেজর নীলের পেয়ারের লোক, আরও কারণ আছে হত্যার কোন অভিপ্রায় খুঁজে পাওয়া যায়নি

কিন্তু কাগজে কি পড়েননি যে, মজর আলির জেনানার সঙ্গে মেজর নীলের যোগাযোগ ঘটে ছিল, দুজনেরই অল্প বয়স

এসব কথা বেরিয়ে থাকবে হত্যার পরে, সব কাগজ পড়িনি, বিশেষ তখন আমি পথে পথে ঘুরছি, সব কথা জানিনে

সব কথা কেউ-ই জানে না

আপনি জানেন কি?

জানি বই কি! সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। শুনবার কৌতূহল থাকে বলবো। তার আগে একটা তথ্য শুনুন—সেই একটা তথ্যের আলোতে অনেকটা অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে আসবে। মেজর নীল সিপাহী বিদ্রোহ দমনে বিখ্যাত জেনারেল নীলের পুত্র

জেনারেল নীলের পুত্র!

আমি চমকিয়া উঠিলাম। মুন্সীজির কথাই সত্য, এই একটিমাত্র তথ্যে মেজর নীলের হত্যার সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের একটা যোগাযোগ স্থাপিত হইয়া গেল বটে কি বিশ্বাস হচ্ছে না। চুপ যে।

বিশ্বাস হয়েছে বলেই চুপ ক'রে আছি। কিন্তু মজর আলির পরিচয় কি?

মজর আলি হচ্ছে সফর আলির পুত্র।

সফর আলি কে?

সব বলছি। আর দুটো পেগ আনতে হুকুম দিন, গলাটা ভিজিয়ে নিই, অনেকক্ষণ থেকে বকছি।

আমার চাপরাশি পেগ আনিল, দুইজনে পান করিলাম, মুন্সীজি রুমালে বেশ করিয়া মুখ মুছিয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিলেন—

সফর আলি জেনারেল নীলের আদেশে নিহত হ'য়েছিল

নিহত হ'য়েছিল?

জেনারেল নীলের অবশ্য বিশ্বাস তিনি বিচার ক'রে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন

তার অপরাধ?

তখন ৯৩ নম্বর কি কানপুরে ছিল না?

৯৩ নম্বর জেনারেল নীলের অনেক পরে কানপুরে এসে পোঁছেছিল। আর কানপুরে উপস্থিত থাকলেই বা কি তখন প্রত্যহ এত লোকের ফাঁসির হুকুম হ'ত যে কারো কথা বিশেষ ক'রে মনে থাকবার নয়। কিন্তু আমি ভাবছি কি জানেন মুন্সীজি, সে ঘটনার ত্রিশ বছর পরে আজ কোন্ সূত্রে জের টেনে চলেছে এই দুই ঘটনার মধ্যে!

রক্তের সূত্র, সার্জেণ্ট সাহেব, রক্তের সূত্র। রক্তের জের পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে চলে, জন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চলে। পিতার রক্ত পুত্রে সংক্রামিত হয়, সেই রক্তের সঙ্গে তার আশা আকাঙ্ক্ষা, দোষ এবং গুণ, সমস্ত সংক্রামিত হয় পুত্রের দেহে, পুত্রের ব্যক্তিত্বে! যাক ব্যাখ্যা যাক্, এখন ঘটনাটা বলি শুনুন।

জেনারেল নীল আর জেনারেল হ্যাভেলক কানপুরে পোঁছবার আগেই বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। তার নৃশংসতায় তার বীভৎসতায় ইংরেজ সৈন্য আর সেনাপতিদের মন চড়া সুরে বাঁধা। সূক্ষ্মভাবে আসামী অনুসন্ধান করবার মতো স্থৈর্য্য তাদের ছিল না, যার উপরে সন্দেহের একটুখানি ছায়া পাওয়া গেল তাকেই ফাঁসি দেওয়া হ'ল—বাছবিচার নেই। সফর আলি ছিল কোম্পানীর কোন্ এক রেজিমেন্টের দফাদার। নীল কোন্ সূত্রে জানতে পেলেন যে, সফর আলি জেনারেল হুইলারের হত্যার জন্য দায়ী।

সে তো বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের আগের ঘটনা

অবশ্যই আগের। নানার সঙ্গে চুক্তির সর্ত মতো হুইলার পাল্কী চ'ড়ে সতীচৌরা ঘাটের দিকে যাত্রা করেছেন, সেখানে নৌকো আছে—হুইলার ও অন্যান্য গোরা লোক কলকাতায় যাত্রা করবে। অন্য সকলে হেটে গিয়ে নৌকো চড়লো, কেবল হুইলার গেলেন পাল্কীতে, তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন।

তিনি সতীচোরা ঘাটের কাছে যেমনি পাল্কী থেকে নামতে যাবেন, পিছন থেকে কে তাকে হত্যা করলো। নীলের বিশ্বাস হ'য়েছিল সফর আলিই সেই হত্যাকারী।

প্রমাণ ছিল?

আসল প্রমাণ ছিল নীলের মনে, তার চোখে প্রত্যেকটি সিপাহীই কোন-না-কোন দোষে দোষী।

নীল হুকুম দিল সফর আলির ফাঁসির।

সফর আলি কোরাণ স্পর্শ ক'রে বলল, সে নির্দোষ। সে বলল যে, সে বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হ'য়েছিল, কিন্তু তার মতে সে দোষটাও কোম্পানীর, কেননা, কোম্পানী বিদ্রোহীদের পীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু হুইলারের দূরে থাকুক, কোন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সে জড়িত নয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

তার পরে?

এখনি শেষ হয়নি, আরও আছে শুনুন। সিপাহীপক্ষের নৃশংসতা গোরা লোকের মন কি রকম নৃশংস, কি রকম বীভৎস ক'রে তুলেছিল শুনুন।

যাদের ফাঁসির হুকুম হ'ত ফাঁসির আগে তাদের কি করতে হ'ত মনে আছে?

শুনেছি

আর একবার শুনুন। বিবিঘরের মেঝেতে জমাট বাঁধা রক্ত জিব দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতে হ'ত, তার পরে ফাঁসি। সফর আলিকে বিবিঘরে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সে অস্বীকার করলো

তখন?

তখনকার জন্যও ব্যবস্থা ছিল, নীল সাহেব বিচক্ষণ সেনাপতি। মেজর ব্রুসের মেথর বাহিনী চাবুক নিয়ে প্রস্তুত থাকতো। সফর আলির পিঠের চামড়া কেটে রক্ত পড়তে লাগলো। তাকে করতে হ'ল নির্দেশ মতো কাজ।

তখন তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল ফাঁসি-তলায়। অন্যান্য শহরে কাজটা যে-কোন গাছের ডালে সমাধা হ'ত, কিন্তু কানপুর শহরে পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছিল, নীল সাহেব বিচক্ষণ ব্যবস্থাপক। সফর আলি নির্ভয়ে ফাঁসির মাচানে উঠে দাঁড়ালো। নীল সাহেবের আর একটা হুকুম ছিল এই যে, শহরের নেটিভদের সকলকে হাজির হয়ে ফাঁসি দেখতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে সতর্ক হ'তে পারে। সফর আলি সেই সুযোগটুকু গ্রহণ করলো। সমবেত জনতাকে সম্বোধন ক'রে সে বল্‌ল—

ভাই সব হিন্দু মুসলমান, তোমরা সবাই দেখো নীল সাহেব নিরপরাধ একজনকে হত্যা করছে। ভাই সব হিন্দু মুসলমান তোমরা সবাই জেনে রাখো হুইলার সাহেবের বা কোন লোকের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই!

ভাই সব তোমরা দেখো, তোমরা জানো, তোমরা বোঝো যে আমি নির্দোষ! যে-লোক নিতান্ত মিথ্যাবাদী, তারও মুখ থেকে মৃত্যু-কালে মিথ্যা বের হয় না! আমি জীবনে কখনো মিথ্যা বলিনি! তোমাদের সকলের কাছে নিরপরাধ মুমূর্ষু সফর আলির এই শেষ আরজি যে তোমরা কেউ বিষণগড়ে গিয়ে সফর আলির পুত্র মজর আলিকে তার বাপের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ জানিয়ে বলো, সে যেন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়। এখন মজর আলির বয়স দুই বছর, কিন্তু সময় তো ব'সে থাকে না, একদিন সে লায়েক হবে, জোয়ান হবে, আমি আশীর্বাদ করছি সোরাবের মতো পালোয়ান হবে, তখন যেন প্রতিশোধ নিতে ভুলে না যায়। ততদিনে নীল সাহেব যদি দোজকে গিয়ে থাকে তবে তার ছেলেকে যেন হত্যা করে, সে বেটাও যদি দোজকে যায়, তবে যেন তার ছেলেকে হত্যা করে। তোমরা তাকে বুঝিয়ে বলো এই হচ্ছে গিয়ে তার বাপের শেষ আকাঙ্ক্ষা। তাকে বুঝিয়ে বলো পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যদি তার কাল হয়, তবে তুমি হিন্দু ভাই তাকে বুঝিয়ে বলো সে স্বর্গে যাবে, তুমি মুসলমান ভাই তাকে বুঝিয়ে বলো সে বেহেস্তে যাবে! তাকে বুঝিয়ে বলো রক্তের বদলে রক্ত না পাওয়া অবধি তার বাপজীর তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই, আল্লার কাছে গিয়েও তার নিবৃত্তি নাই। যাও ভাই সব উত্তরে যাও, দক্ষিণে যাও, পূবে যাও, পশ্চিমে যাও, যেখানে খুশী সেখানে যাও, কেবল বিষণ-গড়ে যেতে ভুলো না, ভুলো না যে সফর আলির পুত্রের নাম মজর আলি! আল্লা তোমাদের কৃপা করবেন।

তারপরে সফর আলি নতজানু হ'য়ে ঊর্ধ্বমুখে, আকাশের দিকে হাত দুটি প্রসারিত ক'রে বল্‌তে লাগলো, আল্লা, রক্তের বদলে রক্ত না পাওয়া অবধি তোমার বেহেস্তেও যেন আমার শান্তি না হয়, আমার তৃপ্তি না হয়! আল্লা মজর আলিকে আয়ু দাও, শক্তি দাও, বীরত্ব দাও, বাপের শেষ আকাঙ্ক্ষা না ভুলবার মতো স্মৃতি দাও, ধৈর্য দাও, বুদ্ধি দাও! তারপরে তাকে বাপের কাছে পৌঁছে দাও! আল্লা, পীর ফকিরের মুখে শুনেছি মৃত্যুকালে লোকে শত্রুকে ক্ষমা ক'রে মরে, কিন্তু মনে যদি ক্ষমার ভাব না থাকে মুখে ক্ষমার কথা আসবে কি ক'রে! আল্লা, তোমার সফর আলির মুখে যে মিথ্যা কথা বের হয় না সে তো তোমারই মরজিতে! আমার এই মৃত্যু আকাঙ্ক্ষার জন্য যদি তুমি আমাকে দোজকে প্রেরণ ক'রে থাকো সে-ও ভালো, সে-ও ভালো, কিন্তু প্রতিশোধ বিনা বেহস্ত-লাভ! না, না, আল্লা, তেমন বেহস্তে তোমার নফর সফর আলির কিছুমাত্র লোভ নেই!

এই রকম কত কথা বল্‌লে, আজ ত্রিশ বছর পরে সে সব আর মনে নেই। সে থামলে তার ফাঁসি হ'য়ে গেল।

তারপরে?

জনতা নিঃশব্দে সরে গেল

তুমি কোথায় ছিলে?

সে কথা থাক্।

সফর আলির শেষ আকাঙ্ক্ষা মজর আলির কাছে পেঁাছেছিল?

নইলে মেজর নীলের মৃত্যু হ'ল কেন?

এতকাল পরে?

শয়তানের চাকা শীঘ্র ঘোরে, ভগবানের চাকা ঘুরতে সময় নেয়

মজর আলিরও তো শুনেছি যে, ফাঁসি হ'য়ে গিয়েছে

নইলে সফর আলি তাকে আশীর্বাদ করবে কি উপায়ে

তুমি এত কথা জানলে কি ক'রে?

আরও অনেক জানি, শোনো।

আবার একটু গলা ভিজাইয়া লইয়া মুন্সীজি পুনরায় আরম্ভ করিল—

ক্রমে মজর আলি বয়ঃপ্রাপ্ত হ'ল। তার বাপ যেমন অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রে ছিল তেমনি জোয়ান হ'য়ে উঠল, আর লাঠি, সড়কি, তলোয়ার ও বন্দুকে হ'য়ে উঠল ওস্তাদ। সেই সঙ্গে সামান্য লেখাপড়াও শিখলো। তার পরে চাকুরীর সন্ধানে বেরিয়ে মেজর নীলের বডি গার্ডের চাকুরী পেলো

সেটা কি তাকে হত্যা করবার অভিসন্ধি নিয়ে

না, পিতার আকাঙ্ক্ষা তখনো জানতে পায়নি। ওটুকু ভাগ্যের খেলা। তার পরে মেজর নীল জব্বলপুরে বদলি হলে মজর আলিও সঙ্গে গেল।

খবর পেল কোথায়?

ওখানে

কি ভাবে?

একজন ফকির একদিন এসে তার হাতে একখানা ছাপা কাগজ দিয়ে চলে গেল। কাগজখানা পড়বার পরে সে যখন ফকিরের সন্ধান করলো তখন কোথাও তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না

কে সেই ফকির?

সে কথা থাক্।

কি ছিল কাগজখানায়

সফর আলির অন্তিম অভিপ্রায়

কে ছাপালো?

কেউ জানে না। ঐ কাগজের হাজার হাজার কপি সারা উত্তর ভারতের হাটে বাজারে গঞ্জে তখন প্রচারিত হচ্ছিল। খুব সম্ভব তারই একখানা ফকিরের হাতে এসে পড়েছিল আর সে ঘটনাক্রমে মজর আলিকে জানতো—তাই সে তার হাতে পেঁাছে দিয়েছিল

আপনি সে কাগজ দেখেছেন?

দেখেছি। খুব সম্ভব এখনো এক কপি কাছে আছে। দাঁড়ান দেখছি আছে কিনা

এই বলিয়া মুন্সীজি ঘরের মধ্যে চলিয়া

কিছুক্ষণ পরে একখানা ছোট আকারের জীর্ণ কাগজ হাতে ফিরিয়া আসিল

এই দেখুন

দেখিলাম যে প্রথমে উর্দুতে পরে ইংরাজিতে লেখা। পড়িলাম, সফর আলির অন্তিম অভিপ্রায় মজর আলির উদ্দেশ্যে লিখিত।

এই কাগজ পড়েই কি সে সব কথা জানতে পারলো?

না, আগেও কানাঘুষায় কিছু শুনেছিল, কিন্তু মেজর নীলের নামটা জানতে পারেনি

মেজর নীল যে জেনারেল নীলের পুত্র তা জানলো কি ক'রে?

সেটা আগেই জানতে পেরেছিল, মেজর নীলের বসবার ঘরে জেনারেল নীলের একখানা ছবি ছিল,

তখন সঙ্কল্প স্থির করে ফেল্‌লো

অত সহজে স্থির করতে পারেনি। একদিকে মেজর নীল তার প্রভু, তাকে খুব স্নেহ করেন, আর একদিকে পিতার অন্তিম অভিপ্রায়—কঠিন পরীক্ষা। তাছাড়া ইতিমধ্যে—

আবার কি হ'ল?

আমিনা বলে' একটা মেয়েকে সে ভালোবেসেছে—বিবাহের দিনও প্রায় স্থির। ইতিমধ্যে ফকিরের হাতে এলো এই ফর্মান। মজর আলি মনঃস্থির করতে না পেরে পাগলের মতো হয়ে গেল, কি করবে, কি তার কর্তব্য। কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে বেঁচে যেতো, কিন্তু কার সঙ্গে পরামর্শ করবে—এ কথা কি কাউকে বলা যায়?

কেন ঐ আমিনাকে

সে যে স্ত্রীলোক, সে কি কখনো সম্মতি দিয়ে ভাবী স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিতে পারে?

মজর আলি একবার ভাবলো, দূর ছাই এসব শয়তানের কারসাজি, যেমন চলছে চলুক; আর একবার ভাবলো চাকরী ছেড়ে দিয়ে আমিনাকে বিয়ে ক'রে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু মা তা হবার নয়, দিনে রাত্রে পিতার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা তাকে প্ররোচিত করতে লাগলো।

তার ভাবগতিক দেখে মেজর নীল শুধালো, মজর আলি তোমার হ'ল কি?

মজর আলি প্রভুর মুখের দিকে তাকায় তার পিতার অভিপ্রায়কে শয়তানের কারসাজি মনে হয়। সে ভাবে জেনারেল নীল যদি অপরাধ ক'রেই থাকে তার জন্য মেজর নীলের অপরাধ কি? আবার ভাবে এত ভাববার অধিকার তার নেই, পিতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সে বাধ্য

আমিনা শুধায় তোমার কি হ'ল? মজর আলি কিছু বলে না, বলে কিছু না।

আমিনা বিয়ের তারিখ স্থির করতে বলে, মজর আলি টালবাহানা করে। এই রকম চলতে লাগলো।

একদিন বিকালে মজর আলি জব্বলপুরে টাউনে গিয়েছে, কেনাকাটা সেরে ফিরবার সময়ে দোকানে একখানা ছবি দেখতে পেলো —একজন আসামী ফাঁসির মাচানের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, নীচে চারপাশে জনতা, লোকটি হাত নেড়ে কি যেন বলছে। ছবির পরিচয়লিপি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে পড়তে পারলো না। তখন সে দোকানীকে শুধালো, মিঞা—এ কিসের ছবি?

দোকানী বল্‌ল, সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার ছবি, কোম্পানী একটা লোকের ফাঁসির হুকুম দিয়েছে, আর জনতাকে সে বলছে সে নির্দোষ

আসামীর নাম কি?

তা কে জানে?

সে সময়ে এরকম ছবি চারদিকে দেখতে পাওয়া যেতো, লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধ করছে, নানাসাহেব পালাচ্ছে, জেনারেল উট্রাম সসৈন্যে লখনো চলছে। মজর আলি সে-সব ছবি দেখেছে, কিন্তু এ ছবিটা তার কাছে নূতন, তার মনে হল ঐ আসামী তার বাপ।

তখন সে পকেট থেকে ফকিরের দেওয়া সেই কাগজখানা বের ক'রে দোকানীকে বল্‌ল—মিঞা আমি ইংরেজি পড়তে পারি না, তুমি বুঝিয়ে দাও তো

দোকানী কাগজখানা দেখে বল্‌ল—নূতন ক'রে আর কি পড়বো? এ কাগজ অনেকবার দেখেছি।

মজর আলি শুধালো, মজর আলির খোঁজ জানো

দোকানী বল্‌ল—সে বেইমানের খোঁজ কে জানতে চায়

বেইমান কেন?

কেন আবার? বাপের শেষ আকাঙ্ক্ষা যে পূর্ণ করতে পারে না, সে বেইমান ছাড়া আর কি? যাও, যাও, সে বেটা বেইমানের কথা তুলো না।

মজর আলি নীরবে চলে গেল। আর ফিরবার পথে একখানা শাড়ী, আর কয়েক গাছা কাঁচের চুড়ি কিনে নিয়ে সন্ধ্যার পরে আমিনার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল।

আমিনাকে বল্‌ল—কেমন হয়েছে দেখো তো

তুমি যা দাও তা কি খারাপ হতে পারে?

আমার বুঝি কিছুই খারাপ নয়

কেবল তোমার গম্ভীর ভাব ছাড়া। আচ্ছা ক'দিন থেকে তুমি এমন বিষণ্ণ কেন?

তুমি তো কেবলই আমাকে বিষণ্ন দেখো।

কই আর কেউ তো বলে না

আর কেউ তোমাকে এমন ক'রে জানে কি? আমি তোমার মনের ভিতর পর্যন্ত দেখতে পাই।

কি দেখছ বলো তো?

দেখছি যে শীগ্গীরই তুমি কাজে ইস্তাফা দেবে

কেন?

কানপুরে ফিরে যাবে

কেন, সেখানে ফিরবো কেন?

সাদি করতে

কাকে সাদি করবো

খুব সুন্দর একটা মেয়েকে

তোমার চেয়ে সুন্দর আর কে?

তবে আমাকেই

তখন দুজনে হেসে উঠল। তারপরে মজর আলি বলল—এই যদি আমার মনের কথা তবে আমি বিষণ্ণ হ'তে গেলাম কেন?

তা-ও জানি

বলো

মেজর সাহেব তোমাকে খুব ভালবাসে, তাকে ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে

মোটেই নয়। দরকার হ'লে মেজর সাহেবকে আমি খুন করতে পারি।

তবে আমাকেও খুন করতে পারো

না তা পারি না,

তবে কি মেজর সাহেবের চেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাসো?

তোমার কি মনে হয়?

এখন বলবো না, খাওয়ার পরে যাওয়ার সময়ে বলবো। তোমাকে খেয়ে যেতে হবে

আচ্ছা তাই হবে

আজ যে বড় ভালো ছেলে

কোন্ দিন আমি খারাপ

বিয়ের পরে ভালো ছেলে থাকো, তবে তো বুঝি।

এই বলে আমিনা হেসে উঠল, আর বলল একটু অপেক্ষা করো তোমার খাওয়ার যোগাড় করিগে।

আহারান্তে মজর আলি বিদায় নেবার সময় বলল, আমিনা এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দাও

আমিনা এমন নিঃসংশয়ভাবে উত্তর দিল যে, তাতে মজর আলির মুখ বন্ধ হ'য়ে গিয়ে তাকে সম্পূর্ণ নিরুত্তর ক'রে দিল

মজর আলি বলল—এমন উত্তর পেলে মৃত্যুকে আর ভীষণ মনে হয় না

মৃত্যুর কথা কেন বলছ?

মারতে গেলেই মরতে হয়, আমরা সৈন্য, লোক মারাই তো হচ্ছে আমাদের কাজ।

অন্যের যাই হোক, তোমার কাজ লোক মারা নয়; তোমার কাজ মেজর সাহেবকে রক্ষা করা।

তা বটে!

আর ওসব অলক্ষণে কথা এখন থাক।

আচ্ছা থাক।

এই বলে' সে বিদায় নিলো।

পরদিন সকাল বেলায় প্যারেডের সময়ে মজর আলি মেজর নীলকে গুলী ক'রে হত্যা করলো।

সবাই অবাক হ'য়ে গেল। এমন অকারণে হত্যা! অনেকেই ভাবলো মজর আলি সাময়িকভাবে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছিল।

কয়েক দিন পরে বড়লাট বাহাদুরের এজেণ্ট স্যার লেপেলে গ্রিফিনের বিচারের ফলে মজর আলির ফাঁসি হ'য়ে গেল।

এতক্ষণ আমি নীরবে শুনছিলাম, এবারে বললাম, এখানেই তাহলে রক্তের জের টানা শেষ হ'ল।

মুন্সীজী বলল,—কে জানে শেষ হ'ল কি না

কেন?

জেনারেল নীলের আর যদি কোন পুত্র থাকে, তবে তারাও রক্ষা পাবে না

কেন?

তাদের হত্যা করবার জন্যেও হাজার হাজার ছাপা বিজ্ঞপ্তি বিলি হচ্ছে

তাদের অপরাধ কি?

মেজর নীলের অপরাধ কি ছিল?

একজনের রক্তপাতেই কি একজনের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি?

একটি বীজ থেকে যে গাছ জন্মায় তাতে কি মাত্র একটি ফল ফলে? সার্জেণ্ট সাহেব প্রথম বিন্দু রক্তপাতের আগে চিন্তা করে দেখা দরকার। সে রক্তবিন্দু মাটিতে পড়লে তার যে কোথায় শেস হবে, কি প্রকার ফসল যে ফলবে তা কে বলতে পারে? রক্তের বদলে রক্ত একথা সবাই জানে, কিন্তু একবিন্দু রক্তপাতের পরিণামে কত ভয়াবহ রক্তবৃষ্টি হ'তে পারে তার হিসাব তো হয়নি। সার্জেণ্ট সাহেব, রক্তপাতের উৎসটাকে মাত্র আমরা মানি, সে প্রবাহ যে মহাসমুদ্রে গিয়ে অবসিত তার মানচিত্র কি অঙ্কিত হ'য়েছে? তবে? সফর আলির রক্তবিন্দু অজস্র শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হ'য়ে গিয়ে কোন্ সর্বনাশের বনস্পতিকে সৃষ্টি করবে তা তুমিও জানো না, আমিও জানি না। তবে?

জেনারেল নীলের অন্য পুত্রদের হত্যা করবার বিজ্ঞপ্তি তোমার কাছে আছে কি?

খুব সম্ভব আছে। কিন্তু অনেক রাত হ'য়েছে, এখন আর নয়। কাল সকালে খুঁজে দেখবো এখন

আর একটা কথা

মজর আলি সম্বন্ধে এত কথা তুমি জানলে কি ক'রে?

সে-কথাও কাল সকালে।

এই বলিয়া সে দ্রুতপদে নিজ কক্ষে প্রস্থান করিল।

আমিও ঘরে গিয়া শুইলাম বটে, তবে ঘুম আসিল না, কেবলি সফর আলি, মজর আলি, জেনারেল নীল, মেজর নীল নামগুলি মনের মধ্যে মাকুর মতো চলাচল করিয়া একখানি স্বপ্নবসন বয়ন করিয়া তুলিতে লাগিল—আর তার উপর মাঝে মাঝে কৌতুকময়ী আমিনা তারার মতো, হীরকের মতো, দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পরে ঘাসের ডগায় সঞ্চিত অশ্রুবিন্দুর মতো ফুল কাটিয়া কাটিয়া দিতে লাগিল।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙিলে বেয়ারা চা লইয়া আসিল, প্রথমেই শুধাইলাম, মুন্সীজী কোথায়,

লোকটা বলিল—হুজুর, তিনি ঘণ্টা দুই আগে চলে গিয়েছেন

কোথায়?

তা তো জানি না

তিনি কোথাকার লোক

তা কেউ জানে না

তাঁর আসল নাম কি?

জানি না হুজুর

ডাক-বাংলোর রেজিস্ট্রি বইয়ে নিশ্চয় আছে

ইংরাজিতে লেখা আছে, পড়তে জানি না।

আচ্ছা বইখানা এখানে নিয়ে এসো।

রেজিস্ট্রি বই আনীত হইলে দেখিলাম। সেদিনকার পাতায় দুটি মাত্র নাম লিখিত আছে। একটি আমার, অপর নামটি ধুন্দুপন্থ, বন্ধনীর মধ্যে আছে নানা সাহেব, পেশা মহারাষ্ট্র রাজ্যের পেশবা, নিবাস পুণা, হাল মোকাম বিঠুর!

ঘরের মধ্যে বজ্র পড়িলেও বোধ হয় এমন চম্‌কাইয়া উঠিতাম না, হাত কাঁপিয়া খানিকটা চা পড়িয়া গেল। ভাগ্যে তখন বেয়ারাটা ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলে ভাবিলাম Bosh! সবটাই ধাপ্পা। ভাবিলাম ওর নাম নানা সাহেবও যেমন সত্য, ওর গল্পও তেমনি সত্য। ভাবিলাম মজর আলির হত্যাকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া একটা উপন্যাস বুনিয়া আমাকে বোকা বানাইয়া গেল। Bosh!

যতই ধাপ্পা মনে করি না কেন, কিছুতেই ঘটনাটার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলাম না। তারপরে অনেক বছর চলিয়া গিয়াছে; আজও ভুলিতে পারি নাই। তাই লিপিবদ্ধ করিলাম, একজনের অভিজ্ঞতা দশ জনের হইয়া উঠিলে এবারে বোধ হয় ভুলিতে পারিব।

অরণ্যকুমারী

রমাপদ চৌধুরী

এমন একটা দুর্ঘটনা না ঘটলে লাটুয়া ওঝাকে আবিষ্কার করতে পারতাম না।

বাঁশরিয়ায় পৌঁছেছি তার হপ্তা খানেক আগে। বাসিন্দেদের সঙ্গে জান পয়ছান হতে তখনও অনেক বাকী। অতিথি হয়েছিলাম ঠিকেদার আত্মীয়ের, আর সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে কোলিয়ারীর দু দশ-জন কেরাণী কম্পাসবাবু, মুনশি মহাজন ডিউটি-ফাঁক দুপুরে বাড়ী ফেরার সময় সেলাম জানিয়ে যেত।

প্রথম যেদিন এসেছিলাম, সময়টা তখন চাঁদনী রাত, বাহন ছিল ঝরঝরে একখানা জীপ, যার স্টিয়ারিং ঘোরার আগেই চাকা ঘুরতো, হেড লাইটের একটা চোখ কানা, ব্রেক ছিল কি না ছিল বোঝা দায়। আর সেই জন্যেই সারা পথটা শুধু ভয় ছিল মনে। ভয় ছিল, কিন্তু দুর্ভাবনা ছিল না। অর্থাৎ যে-কোন মুহূর্তে অ্যাকসিডেণ্ট ঘটতে পারে এইটুকু আশঙ্কাই ছিল, সেটা যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে তা ঠাওর করতে পারিনি।

রাতের অন্ধকারে দু'পাশের শাল শালাই হরিতকী আর বহরার ঝোপঝাড় ভেদ করে পাহাড়ী পথের 'ঘাট' ঘুরে ঘুরে গাড়ীটা যখন ওপরে উঠছিল তখন বুঝতে পারি নি ইঞ্চি ছয়েক চাকা পিছলে গেলেই দু' হাজার ফিট নীচে ছিটকে পড়বো। কথাটাই তখন অবধি শোনা ছিল, মৃত্যুর পার ঘেঁষে পাহাড়ে পাক দিয়ে দিয়ে ওঠা রাস্তাটিকেই যে 'ঘাট' বলে তা জানতাম না।

সারা পথটা পার হয়ে এসে গাড়াজোড়ের ওপর পাশাপাশি পাঁচখানা গুঁড়ি ফেলে দিয়ে বানানো ব্রিজ। তারপর সরু ধুলো ওড়ানো রাস্তা, একপাশে তার একসারি কোয়ার্টার।

আর সেই সারিরই একটি কোয়ার্টারের সামনে যখন জীপ থামলো তখনই ঠিকে-দার আত্মীয়টি বোঝালেন কি বিপদের পথ অতিক্রম করে এসেছি। বোঝালেন, সে পথে রাতবিরেতে হামেশাই নাকি যাতায়াত করেন তাঁরা।

তাঁরা মানে বাঁশরিয়া কোলিয়ারীর সবাই।

পরের দিন সকালে উঠে ভোরের চোখে জায়গাটা পরখ করে নিয়ে কিন্তু ভালই লাগলো। যতখানি বন্য আর বিপজ্জনক ছবি এঁকেছিলেন আত্মীয়টি, মনে হল তার কানাকড়িও নেই।

তখন কি ছাই জানতাম দুর্ঘটনা ঘটতে সময় লাগে না, না কি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছিলাম, লাটুয়া ওঝাকে আবিষ্কার করবো।

কিন্তু লাটুয়া ওঝাকে আবিষ্কার করার আগেই অন্য একজনকে খুঁজে পেলাম।

রাত্তিরে কোয়ার্টারগুলোর রূপ স্পষ্ট দেখতে পাইনি। দিনের আলোয় চোখের চাহনি মনটা দমিয়ে দিলো।

সিমেণ্ট নয়, কাদা আর ইঁটের গাঁথনি। মাথায় খাপরার চাল। এক ইঁটের দেয়াল কমজোড় হয়ে পড়বে বলে জানালার নাম-গন্ধও নেই।

পাশাপাশি এমনি ধারার খান-পাঁচেক কোয়ার্টার ঠিকাদারদের।

আত্মীয়টি তাই বললেন, তোমরা শুধু টাকাটাই দেখো, আর গালাগালি দাও আমাদের। আছি কি সুখে সেটা চেয়ে দেখো।

চেয়ে না দেখেও বুঝলাম নেহাৎ জীবিকার তাগিদেই মানুষ দারাপুত্রপরিবার ফেলে এসে এমন জায়গায় আস্তানা গাড়তে পারে।

অবশ্য কোলিয়ারীর বাবুদের কোয়ার্টার-গুলো তবু ভালো। দু' চারজন তাঁদের স্ত্রীপুত্রও এনে রেখেছেন, দেখতে পেলাম। তবে তাদের মুখেচোখে সংসারের ছাপই আছে, সুখ নেই।

সুখ?

হ্যাঁ, সুখ স্বস্তি সবই আছে শুধু বাংলো পাড়ায়। জানালেন প্রতিবেশী মিশিরজী।

ছিমছাম বাংলো, সামনে পাতাবাহার আর সিজন ফ্লাওয়ারের বাগান। বারান্দায় শান্ত নির্জন বেতের চেয়ার, চায়ের টেবিল।

আত্মীয়টি আমার মুগ্ধভাব লক্ষ্য করে জিগেস করলেন, কোথায় যেতে চাও? খাদে, না ম্যানেজারের বাংলোয়?

মাথার ওপর দিয়ে ঝিরঝির ঝিরঝির শব্দ তুলে রোপ-ওয়ে চলছিল। বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে দেখছিলাম কয়লা ভর্তি বাকেটের সারি দুলতে দুলতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বোনঝোপের আড়ালে, আর খালি বাকেটের সারি ফিরে আসছে। তাই কথাটা কানে গেলেও মনে যায়নি।

হঠাৎ অচেনা গলা শুনলাম, ম্যানেজার, ম্যানেজার। খাদ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

চমকে ফিরে তাকিয়ে চোখোচোখি হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। খাঁকি প্যাণ্ট, খাঁকির সার্ট, মাথায় কাঁচা পাকা চুল। হাতে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে হেঁটে চলেছেন।

ঠিকেদার আত্মীয় আলাপ করিয়ে দিলেন।—আমাদের কম্পাসবাবু।

কম্পাসবাবু ইঙ্গিতের হাসি হাসলেন, সাঠে সাহেবের মেম এই সপ্তাহেই চলে যাবে, আলাপ করে আসুন এই বেলা।

বলে ডান দিকের ঢালু রাস্তাটায় নেমে পড়লেন।

আত্মীয়টি বললেন, তাই চলো।

আমিও সায় দিলাম। সায় না দিলে হয়তো দুর্ঘটনাটা এড়ানো যেত। কিন্তু দুর্ঘটনা এড়িয়ে গেলে লাটুয়া ওঝাকে আবিষ্কার করতে পারতাম না।

শুধু কি লাটুয়া ওঝা? সুতপার সঙ্গেও হয়তো দেখা হত না আর।

খাপরার চালের নীচে মাথা গুঁজলে কি হবে, ঠিকেদার আত্মীয়টির প্রতিপত্তি দেখে অবাক হলাম।

ম্যানেজার সাঠে সাহেবের বাংলোয় ঢুকতে না ঢুকতেই বেয়ারা বাবুর্চি তটস্থ হয়ে চেয়ার এগিয়ে দিলো। ছুটে গেল সাহেবকে খবর দিতে।

খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে সাঠে সাহেব বেরিয়ে এলেন। নমস্কার, প্রতিনমস্কার। বুঝলাম সাহেব আসলে মারাঠি। আর বুঝলাম আত্মীয়টির এ প্রতিপত্তির মূলে আছে মাসকাবারী ডালি যা সাহেবের মূল বেতনের ডবলে পৌঁছয় কখনো সখনো।

গল্প জমে উঠলো। আর জমে ওঠা গল্পের মাঝখানে হঠাৎ ছন্দপতন করে এসে দাঁড়ালো সাঠে সাহেবের ঘরণী।

—মুখে কথা জোগালো না আমার। বিস্ময়ের চোখ তুলতেই চোখোচোখি হ'ল। অস্বস্তিতে নামিয়ে নিলাম।

লাবণ্যে টলমল একখানি হাসি হাসি মুখের আড়ালে এক ফালি খাটো ঘোমটা। কিন্তু সে মুখ থেকে হাসি মুছে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

তারপর সপ্রতিভ হয়ে সুতপা বললে, তুমি?

বললাম, এসেছি বেড়াতে।

দু'জনে দুজনকে কত কি প্রশ্ন করলাম, কত কি উত্তর। সাঠে সাহেব খুশি হলেন তাঁর মেমসাহেব আমার কলেজের বান্ধবী জেনে। কিন্তু গল্প আর জমলো না। কোথায় যেন বারবার সুর ভুল হয়ে গেল।

ফেরবার সময় ঠিকেদার আত্মীয়টি বললেন, যাক ভালই হল, বারো নম্বর প্লটটা বোধ হয় আমিই পাবো।

কোন উত্তর দিলাম না। তখনও মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে একটি নাম—সুতপা। বারবার রোমন্থন করছি তার স্তম্ভিত চোখের বিস্ময়।

বিকেলের রোদ একটু ঠান্ডা হতেই জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়বো বলে ঠিক করছি এমন সময় রাস্তার ধুলো উড়িয়ে বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো একখানা টু-সীটার গাড়ী। আর তার জানালায় মুখ বাড়ালো সুতপা।

ছুটে গেলাম।

এক মুখ ঝর্ণার মত হাসি ছিটিয়ে সুতপা বললে, চুপচাপ একা একা বসে আছো তো সারাদিন, চলো বেড়িয়ে আসি মারাং গাড়ার ওদিকে।

বলে গাড়ীর দরোজাটা নিজেই খুলে দিলো।

দু' পাশের বোনঝোপের মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা পার হয়ে বাঁশরিয়াকে পিছনে ফেলে গাড়ী থামলো পাহাড়ী ঝর্ণাটার ধারে। সাঁওতালী ভাষায় যার নাম মারাং গাড়া, অর্থাৎ বড়ো নদী।

দু'জনে এসে বসলাম এক টুকরো ঘাসের জাজিমে। জলে পা ডুবিয়ে।

—কতদিন পরে দেখা বলো তো। সুতপা বললে। কথা নয়, যেন ব্যথার স্বর।

বললাম, সত্যি, আবার যে দেখা হবে ভাবিনি কোনদিন।

সুতপা চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। স্রোতের জলে পা নাচাতে নাচাতে উঠে বসলো হঠাৎ। একটা ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে কাটতে তন্ময় হয়ে গেল। যেন অনেক অতীতের গভীরে নেমে গেল, সেই পুরোনো দিনের হাসি আর আনন্দে।

—কেন এমন হ'ল বলো তো! সুতপার গলার স্বরে কেমন যেন কান্নার আভাস।

বললাম, এই তো ভাল। ভালই হয়েছে।

—আজ যদি এত সহজে আসতে পারলাম কাছাকাছি...দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুতপা।

জবাব দিলাম না।

বুঝলাম, চুপচাপ এই স্মৃতির সমুদ্রে গা ডুবিয়ে বসে থাকা অসহ্য।

তবু চুপচাপ বসেই রইলাম।

অনেক দূর থেকে একটা বাঁশীর সুর ভেসে আসছিলো। ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে এলো সেটা। তারপর এক সময় পাশের ঝোপটার পাতার সরসরানি শুনলাম। ফিরে তাকাতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মেয়েটি।

ঝোপ থেকে মুখ বাড়িয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সাঁওতালী মেয়েটি, ত্রস্তা হরিণীর ভীতচকিত চোখ মেলে।

—থামলি কানেরে, কুমরু না চুড়িন?

ডাকাত না শয়তান? কথার শেষে হো হো করে হেসে উঠলো একটা পুরুষ গলা।

তারপর নাচের ভঙ্গিতে দু'জনে লাফাতে লাফাতে নেমে গেল জলের ধারে।

স্পষ্ট চোখে এতক্ষণে দেখতে পেলাম দু'জনকে। শক্ত সমর্থ সাঁওতালী জোয়ান পুরুষ আর মেয়েটির সর্বাঙ্গে অর্ধাবৃত যৌবনের উচ্ছ্বাস। পুরুষটির কাঁধে টাঙি, মেয়েটির মাথায় একটি কাপড়ের পুঁটুলি। গাড়ার জলে নেমে গিয়ে এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে হেসে উঠলো খিলখিল করে। আর মেয়েটি আমাদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চাপা হাসির কণ্ঠে কি যেন বললে। তারপর স্নান সেরে চলে গেল কৌতুকের হাসি হাসতে হাসতে।

সুতপাকে বললাম, চলো একটু ঘুরে আসি বোন-ঝোপের ভেতর দিয়ে।

সুতপাও লাফ দিয়ে উঠলো—চলো।

মনের মধ্যে তখনও বেশ বাজছিলো বাঁশীর। ভাবছিলাম, কত সুখের জীবন নির্লজ্জ সাঁওতালীদের।

সুতপাও বোধ হয় ভাবছিল ওদেরই কথা। হঠাৎ বললে, ঐ যে মেয়েটা! লাটুয়া ওঝার মেয়ে ও। দু' টাকা করে বখশিষ পায় লাটুয়া, আর নিতে আসে ঐ মেয়েটা। ভীষণ গরীব তবু কেমন প্রাণ খুলে হাসছে দেখলে?

বললাম, মনটাই সব। আমরাও হয়তো...

কথা শেষ করতে দিলো না সুতপা। হঠাৎ একটা ডাল ধরে বললে, এ গাছটার নাম জানো!

—না তো।

—ওমা, এটা চেনো না, এ তো শিরীষ!

খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠলো সুতপা। গাছের পরিচয় আর নাম শেখাতে সুরু করলো ও। এই যে গাছটা, এটা হ'ল শাল, দেখেছো কেমন ঝাউ গাছের মত দূরে থেকে দেখায়। আর এটা, এটার নাম শালাই, দেশলাইয়ের কাটি হয়। ওটা আমলকী, খাবে? একটা ডাল টেনে নামালো ও, বললে, পেড়ে নাও না গোটা-কয়েক। এটা কি বলতো? বাবলা? খিল-খিল করে হেসে উঠলো সুতপা। বাবলার কাঁটা থাকে না? কাঁটা কৈ ওর গায়ে? ওটা হল খয়ের গাছ—এখানে বলে কাথা। বাঃ রে, ওটা তো হত্তুকী, আমাদের দেশেও হয়। ওমা! তুমি দেখছি কোন গাছই চেন না। বহরা, বহরা জানো না? আমলকী হত্তুকী আর বহরা এই তিন নিয়ে তো ত্রিফলা।

এমনি ধারা একটা না একটা কথা বলে আর খিলখিল করে হেসে ওঠে ও আমার অজ্ঞতায়।

আমিও হাসি, কথায় ছেলেমানুষি ভাব ফোটাই, আর মনে মনে বুঝতে পারি কেন এই খুশিয়াল চঞ্চলতা সুতপার চোখেমুখে। বুঝতে পারি অতীত দিনের যৌবনস্মৃতিতে ডুব দিতে চাইছে ও।

ঝোপেঝাড়ে প্রজাপতির মত উড়তে উড়তে আবার সেই মারাংগাড়ার ধারে এক টুকরো ঘাসের জাজিমে পা ছড়িয়ে বসে পড়লো সুতপা।

তারপর হঠাৎ একসময় প্রশ্ন করলো, একটা কথা জিগ্যেস করবো?

কি?

—বিয়ে করেছো?

—না।

—জানতাম।

জানতাম? কি জানতো সুতপা? কি জানে ও? রাত্তিরের তপ্ত শয্যায় ছটফট করতে করতে বারবার কথাটা মনে পড়ে। কৌতুকের হাসি মেশানো একটি মাত্র কথা—জানতাম।

রঙিন চোখের অহঙ্কার কি আজও মুছতে পারলো না সুতপা? ওর কি ধারণা, ওকে পাইনি বলেই জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে আমার? ভালবাসার উষ্ণ পালকে আর কাউকে আলিঙ্গন করিনি, সে কি সুতপার ওপর অভিমান করেই?

স্কেচ : গোপাল ঘোষ

ঐ একটি কথাই যেন কত ছোট করে দিলো আমাকে। সুতপা যেন এইটুকুই বলতে চাইলো যে, আমাকে হারিয়েও ঘর খুঁজে পেয়েছে ও আর আমি ঘর পেয়েও ঘরণী পাইনি।

পরের দিন তাই অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে ফেললাম সুতপাকে, কোলিয়ারীর ওভার-বার্ডেনের পাশ দিয়ে বেড়াতে যাবার সময়।

বললাম, তুমি তো বেশ সুখেই আছো। টাকার ছড়াছড়ির মধ্যে। আমাদের দশাটা হয়তো ভাবতেও পারো না।

হাসলো সুতপা। —টাকাই কি সব? একটা সংগী সাথী নেই তা জানো? একা একা কাটাতে হয়, উল বুনে আর বই পড়ে।

বললাম, তাও ভালো। আমাদের দিন কাটে টাকার পিছনে ঘুরে ঘুরে, ঘর সংসারের কথা ভাবতেও সময় জোটে না।

কথাটা শুনলো ও, ভুরো দুটো কুঁচকে।

তারপর কি যেন বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই সামনে এসে দাঁড়ালো একটি সাঁওতালী মেয়ে।

আর পাঁচজন কুলিকামিনের মতই এতক্ষণ কাজ করছিলো মেয়েটি। মাটি কাটার প্লট থেকে বালি পাথর তুলে তুলে ওভার বার্ডেনের ওপাশে ফেলে আসছিলো।

ঝুড়িটা ঘোমটার মত মাথায় ঝুলিয়ে সামনে এসে বললে, জংলোকে একটো খাদানের কাম দে মেম্‌সায়েব।

—আমিও মেমসাহেব! কৌতুকে হাসলো সুতপা আমার দিকে তাকিয়ে। তারপর বললে, কাজ কি আমি দোব, মুনশিকে বলিস।

—মুনশিটা উয়াকে কাম দিবে নাই মেম্‌ছায়েব।

মেয়েটির পিছনে আরেকটি পুরুষ চেহারা এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। সেই বললে, দিবেক নাই, দিবেক নাই। লাটুয়া ওঝার মাইয়ার সাথে ঠিগিয়া হইছে জংলোর, মুনশি উয়ারে কাম দিবেক নাই।

সুতপা বললে, আচ্ছা আমি দেখবো।

সেখান থেকে সরে এলাম দুজনেই।

ঠিকেদার আত্মীয় এমনিতেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন সুতপার সঙ্গে আমার এই ঘনিষ্ঠতায়। আমাদের এই হাসি কথা উচ্ছলতায় চোখ টাটিয়ে উঠছিল মিশিরজী, উপাধ্যায় আর গোপী সিংয়ের।

কম্পাসবাবু আর জেপিও সাহেবও ইঙ্গিত করতে ছাড়তেন না। তাই দুপুরবেলা যখন সটান ঘরে ঢুকে ঘুম থেকে আমাকে ঠেলে তুললো সুতপা তখন আমিও অস্বস্তি বোধ করলাম।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, কি ব্যাপার?

গম্ভীর মুখ করে সুতপা বললে, ব্যাপার গুরুতর।

অর্থাৎ ম্যানেজার সাহেব জরুরী টেলি-ফোন পেয়ে হাজারীবাগ চলে গেছেন গাড়ী নিয়ে। ফিরবেন পরের দিন।

সুতপা কপট শঙ্কায় চোখ কাঁপিয়ে বললে, ঐ ফাঁকা বাংলোয় একা থাকতে পারবো না আমি।

কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না।

সুতপা হাসি লুকোলো। —এত ভয় কিসের তোমার। সারাটা রাত নয় গল্প করেই কাটিয়ে দোব।

আর আমার মনে পড়লো সেই সব দিনের কথা যখন সারাটা রাত শুধু গল্প করে কাটাবার বাসনায় কত না স্বপ্ন বুনতাম মনে মনে।

বললাম, সে পরের কথা। এখন চায়ের ব্যবস্থা করি।

ফিরে এসে বললাম, জংলো না কি নাম যেন তার কাজের ব্যবস্থা করলে?

সুতপা হাসলো। বললে, না, ডাক্তার সেন রাজি ন'ন। লাটুয়া ওঝার কেউ খাদে কাজ পাবে না। জংলোকে কাজ দিলেই আজ একে ডাইনীতে পাবে, কাল ওর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে, এর বৌ ওর কাছে বশ হবে এমনি সব ঝামেলা।

খানিক চুপ করে থেকে সুতপা হেসে বললে, আসলে সব রুগী ওর কাছে চলে যাবে, ডাক্তার সেনের এই ভয়, বুঝলে না?

বললাম, লাটুয়া ওঝার কথা শুনে শুনে লোকটাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—সে অনেক দূর। ভুরকুন্ডায়, ঐ পাহাড় পার হয়ে হয়ে। উনি ফিরে আসুন, তারপর নয় গাড়ী করেই যাওয়া যাবে।

বলে, চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে সুতপা উঠলো।

—রাত্তিরে আমার ওখানেই খাবে কিন্তু। ঠিক তো?

সম্মতি জানাতেই হ'ল।

বললাম, যাবো, কিন্তু যেতে একটু রাত হতে পারে।

এ-কথা না বললে হয়তো দুর্ঘটনা ঘটতো না। আর দুর্ঘটনা না ঘটলে লাটুয়া ওঝাকেও আবিষ্কার করতে পারতাম না। আর লাটুয়া ওঝাকে আবিষ্কার না করলে খুঁজে পেতাম না একটি অরণ্য-যুবতীর নরম বুকের মন।

আত্মীয়টির অনুমতি নিয়ে যখন বাংলো পাড়ার দিকে পা বাড়ালাম এক একা তখন পথঘাট সব অন্ধকার।

অন্ধকার রাস্তায় টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এসে হাজির হ'লাম সুতপার বাংলোর ফটকে। আর ফটক খুলে ভেতরে ঢুকতেই এলসেশিয়ান কুকুরটার বিকট চিৎকার শুনলাম। টর্চ ফেলতেই চোখে পড়লো কুকুরটা ছুটে আসচে আমার দিকে। কিন্তু পালাবার পথ পেলাম না। বাংলোর বারান্দা থেকে সুতপা বোধহয় চিৎকার করে ডাকলো কুকুরটার নাম ধরে। কিন্তু তার আগেই হাঁটুর কাছে কামড় বসিয়ে দিয়েছে সারমেয়টি।

বেয়ারা বাবুর্চি সুতপা সবাই ছুটে এলো।

সাঁওতালী মরিয়ম বুঝি বললো, কুকুরটা পাগল হয়ে গেছে ক'দিন থেকেই। আরো দুটো লোককে কামড়ে দিয়েছে এর আগের দিন।

সুতপাও ধমক দিলো মালীটাকে, বার-বার নিষেধ করা সত্ত্বেও কেন খুলে রেখেছিস!

বাবুর্চি ছুটে গেল ডাক্তারকে খবর দিতে। ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার সেন এলেন ব্যাগ হাতে। মুন্ডা ধাওড়ায় রুগী দেখতে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে তাঁর, সখেদে জানালেন। তারপর কি একটা এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন দাঁত বসা জায়গা-গুলো।

পরের দিন একে একে কোলিয়ারীর সবাই এলেন সহানুভূতি জানাতে, আর সান্ত্বনার বদলে ভয় বাড়িয়ে দিলেন সকলেই।

ডাক্তার সেন বললেন, কুকুরটাকে দেখে কিন্তু ভালো মনে হচ্ছে না। অ্যান্টি র‍্যাবিট ইনজেকসন নিয়ে নিন একটা কোর্স।

শুনে পাগলা কুকুরের কামড়ে কি ফল দাঁড়াতে পারে ভেবে ভয় পেলাম না, ভয় পেলাম ইনজেকসনের রীতিনীতির বিবরণে। আধ হাত লম্বা ছুঁচ নাকি পটাপট পেটের মধ্যে ঢোকানো হবে—বললেন কম্পাসবাবু।

আর মিশিরজী বললেন, লাটুয়া ওঝার কাছে বিষ ঝাড়িয়ে আসুন বাবুজী, কিচ্ছু করতে হবে না।

লাটুয়া ওঝা?

লোকটাকে দেখার আগে যে কতবার শুনেছি নামটা। আপনা থেকেই কেমন একটা ঔৎসুক্য বোধ করছিলাম।

মরিয়ম বললে এ তল্লাটে নাকি অমন ওঝা আর একজনও নাই। মুর্দার বুকে প্রাণ বসাতে পারে সে, সাপকে মন্ত্র দিয়ে এমন বশ করে যে চুমুক দিয়ে নিজের বিষ নিজেই টেনে নেয়।

ও'রাও পট্টির বালোয়া কুড়ুখও সায় দিলো।

বললে, বাবুজী আপাঙের মুলে ফুঁ দিয়ে আপনার হাতে দিয়ে দেবে লাটুয়া ওঝা, কাঁকড়া বিছের গর্তে হাত দিলেও কিচ্ছু হবে না আপনার।

রতনা মাঝিন বললে, লাটুয়া ওঝার মন্ত্রপড়া পাতা দিয়ে মারাং গাড়ায় মাছ ধরি বাবু আমরা। জলে পাতা বিছিয়ে দিলে সব মাছ মরার মত পড়ে থাকে তার ওপর।

শুধু ডাক্তার সেন হাসলেন তাদের কথা শুনে। বললেন, সব বোগাস। লাটুয়া ওঝার যদি এতটুকু বিদ্যে থাকতো তা হলে আর হাসপাতালে এসে ভিড় করতো না ও'রাও মুন্ডা খরিয়া আর ভূমিপেরা।

তবু কেমন যেন বিশ্বাস হ'ল মরিয়ম আর বালোয়া আর রতনা মাঝির কথাটাই।

সুতপাও ছলছল চোখে বললে, দেখই না একবার পরখ করে, এত লোক যখন বিশ্বাস করছে।

ঠিকেদার আত্মীয়টিও বললেন, ইনজেক-শন তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, লাটুয়াকে আগে দেখানোই যাক্ না।

শুনে উপাধ্যায়জী হাসলেন। —দেখাবেন কি। চোখ আছে নাকি লাটুয়ার। সে তো অন্ধ।

অন্ধ সত্যিই।

বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ী পথ হেঁটে যখন ভুরকুন্ডার সারনা পার হয়ে লাটুয়া ওঝার বাড়ির সামনে পৌঁছলাম তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

মাথায় এক বোঝা কাঠ নিয়ে ফিরছিলো একটি সাঁওতালী মেয়ে, প্রশ্ন করতেই প্রথমটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো সে। তারপরে দেখিয়ে দিলো লাটুয়া ওঝার বাড়িটা।

কাদামাটির দেয়াল দেয়া এক টুকরো খাপরার চাল। সামনে একটা চবুতরার নীচে হাল্কা ছোট একটা ঢেঁকি। ঢেঁকি না ঘানি ঠিক মনে নেই।

সঙ্গে এসেছিলেন ঠিকেদার আত্মীয়টি, আর মরিয়ম।

মরিয়মই ডাক দিলো লাটুয়ার নাম ধরে। আর বার কয়েক ডাক দিতেই কপাটের ভাঁজ সামান্য আলগা করে উঁকি দিলো একটি মেয়ে।

কপাটের আড়ালে শরীর ঢেকে রাখার চেষ্টা করে।

উদ্দেশ্যের কথা শুনে ভেতরে ডাকলো সে ইশারায়। ঢুকলাম। অন্ধকূপের মত ছোট্ট একখানি ঘর—নোংরা। পচাই মদ আর বাসি ভাতের গন্ধ। চাল থেকে দড়িতে বাঁধা অসংখ্য জিনিষপত্তর ঝুলছে বাদুড়ের মত। হাঁড়ি, কুমড়ো, বাঁশের চোঙা, তামাক পাতা।

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। এতক্ষণে দেখতে পেলাম লাটুয়া ওঝাকে। এক কোণে বসে বসে ঢুলছে। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, দুটি অন্ধ চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। পাশেই একটা বুড়ি, বেশ বুঝলাম লাটুয়ার বৌ, হুঁকোয় গুড়ুক গুড়ুক টান দিচ্ছে আর খক্‌খক্ করে কাশছে।

আর, আর ও পাশে দু'হাতে বুক ঢেকে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, এতক্ষণে

বুঝলাম কেন কপাটের আড়ালে শরীর ঢাকার চেষ্টা করছিলো সে।

বাইশ চব্বিশ বছরের একটি ভরাযৌবন মেয়ে। কালো কুচকুচে রঙের মধ্যেও যে রূপ থাকতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না। একটি নিটোল কালো পাথরের মূর্তি যেন। টানা টানা শরমকাতর চোখ, টিকোলো নাক। আর বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা দুটি মসৃণ হাতের আড়ালে উদ্দীপ্ত যৌবনের তরঙ্গ। কোমরের কাছ থেকে হাঁটু অবধি শুধু একখানা শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড় তার দেহে। লজ্জায় তাই মুখ তুলতে পারছিলো না মেয়েটি।

বাবু দেখলেই ওদের লজ্জা। এ কদিনের অভিজ্ঞতায় সেটুকু লক্ষ্য করেছি।

অন্ধ লাটুয়া ওঝা অনুভবেই বুঝলো কারা যেন ঘরে ঢুকেছে। কি একটা প্রশ্ন করলো সে।

আর সে প্রশ্ন শুনে বুঝলাম মেয়েটির নাম সুরমণি।

সুরমণি ডাকলো, আপুং।

বাপ লাটুয়া ওঝা সাড়া দিলো।

মরিয়ম আর ঠিকেদার আত্মীয়টি এবার ওদের ভাষাতেই বোঝালো ব্যাপারটা।

আর সুরমণি এতক্ষণে এক মুখ হেসে বললে, আপুং বংলা জানে গো বটে।

লাটুয়া ওঝাও হাসলো সে-কথা শুনে। অন্ধ দুটি চোখ মেলে কি যেন দেখবার চেষ্টা করে বললে, বসেন বাবুরা।

সুরমণি এগিয়ে এলো, দেখতে চাইলো কুকুরে কামড়ানো দাগগুলো। তারপর লাটুয়ার হাতখানা টেনে নিয়ে রাখলো ক্ষতটার ওপর। বেশ টের পেলাম, থরথর করে কাঁপছে বুড়ো। আনন্দে, না আশঙ্কায়, বোঝা গেল না।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে লাটুয়া ওঝা বললে, বিশ নখুনে বিষ, আঠারো নখুন পানি।

কিছুই বুঝতে পারি নি দেখে সুরমণি ব্যাখ্যা করলো। অর্থাৎ কুকুরটার চার পায়ে যদি বিশটা নখ থাকে তাহলে বিষ আছে। আর তা না হ'লে জল।

সঙ্গী আত্মীয়টি জানালেন, ক'টা নখ তা তো দেখিনি।

অন্ধ লাটুয়া হাসলো সে-কথা শুনে। দুটো হাত আন্দাজে আন্দাজে কি যেন খুঁজলো।

—ডুডাং নিখা? প্রশ্ন করলো সুরমণি। ঘাড় নাড়লো লাটুয়া। সুরমণিও ওপাশে গিয়ে বসলো।

এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম এক কোণে অসংখ্য ছোট বড়ো কৌটো, হাঁড়ি মাটির সরা। তারই ভেতর থেকে সুরমণি একটা কৌটো এগিয়ে দিলো লাটুয়াকে। লাটুয়া বললে, ইটা ডুডাং গাছের মূল। চন্দন আর ডুডাং ঘষে তিন দিন লাগাবি কত্তা। বিষ আখন বুকে উঠছে, ডুডাং লাগালি মাটিতে ঝইরবে।

শিকরটা হাত বাড়িয়ে নিলাম। সুরমণি খানিকটা ঘষতে সুরু করলো। দেখিয়ে দেবে কি করে লাগাতে হয়।

শিকর ঘষার শব্দে লাটুয়া হেসে বললে, আমার মায়েটাও বড়ো ওঝাঁ কর্ত্তা, সব ঝাড়ফুঁক শিখ্যে লয়ছে।

শুনে লজ্জার হাসি হেসে মুখ লুকোলো সুরমণি, মাথা হেঁট করে কাজে মন দিলো।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, আর কি ওষুধ আছে তোমার কাছে?

বুড়ো হাসলো আমার কথা শুনে। বললে, আমার নাম লাটুয়া ওঝা। সকল রোগের দাওয়া আমার ঘরে।

বুড়ি এতক্ষণ হুঁকো টানছিল, সেটা নামিয়ে রেখে বললে, ডাটুন সাইবের কথাটা ক'ইয়ে দাও উদের।

—হুঁ ডাটুন সাহেবের কথাটা। মাথা নাড়লো লাটুয়া। তারপর আবার দুটি অন্ধ চোখ মেলে কি যেন হাতড়াতে সুরু করলো।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কৌটো এগিয়ে দিলো সুরমণি।

লাটুয়া কৌটোটা খুলে সামনে ধরলো। বললে, ইটা কুণ্টি পাথর। নাগবংশী পুজা করে পাইছিলাম। শুনো তবে কথাটো। ডাটুন সাহেবেরে সাপে কাঁটিলো সিবার। খবর পাইয়া ছুইটলি। কণ্টি পাথরটা গাড়ার জলে ধুইয়ে লাগায় দিলি সাহেবের গোরে, সাপে কাটছিলো যিখানে। মন্তর পড়লি। পাথরটা লাইগা রইলো তবু। ফের মন্তর পড়লি, পাথর তবু ঝরো না। তেজী মন্ত্র পড়লি পরে পাথর ঝরলো, সব বিষ মাটিতে ঝর্যে পড়লো।

সুরমণি বললে, আর আপাংটো?

—হুঁ, ঐ আপাংটো। আবার দু'হাত কি যেন খুঁজলো।

একটা মাটির সরা এগিয়ে দিলো সুরমণি।

লাটুয়া বললে, ই হ'ল আপাং। কাঁকড়া বিছার যম বটে। মুনশিবাবুর বাচ্চারে কাটছিলো বিছায়। আপাং লাগায়ে মন্তর পড়লি, মাথার বিষ চোক্ষুর পানি হ'য়ে ঝইরা গেল।

লাটুয়ার থুখরে বুড়ি হুঁকোটা আবার

তুলে নিয়ে বললে, আর মাংরী মুরমুর উদ্‌রী?

—হুঁ। মনে পড়লো লাটুয়ার, অন্ধ চোখ দুটো আমাদের দিকে ফেলে দুটি হাত তার বাতাসে ঘুরে বেড়ালো।

সুরমণি আবার একটা মাটির হাঁড়ি এগিয়ে দিলো লাটুয়া ওঝার দিকে। আর সেটার স্পর্শ পেয়েই স্বস্তির হাসি দেখা দিলো তার মুখে।

বললে, উদ্‌রীটো শয়তানী রোগ কত্তা, পট্টিতে উ শয়তান ঢুইকলোন তো পট্টি সাফ হ'য়ে যাবে। ত' সিবার মাংরী মুরমুর বাপটো ছুটে আঁয়লো। বুড়া কান্দে তো বুড়ার মায়া কান্দে। তো দিইলাম ই কোঁকড়াইনের চক্ষু আর উদ্‌রী গাছের ঘাম। গাঁ ছাইরে ভাগলো শয়তান। বলে হাঁড়িটা দেখালো লাটুয়া।

সুরমণি আবার কি একটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিলো, বললাম, আজ চলি, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। আবার শুনবো একদিন এসে।

সম্মতি জানালো লাটুয়া। বললে, ডুডাংটো তিনবার কইরে লাগাইবি কত্তা। আর তিনদিন পরে আবার আইসবি।

সুরমণিও এলো চবুতরা অবধি। বাইরের আলোয় এতক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওকে। দেখলাম রূপ আর দারিদ্র্যের হাত ধরাধরি। যৌবন আর অলজ্জতা।

কাপড় নয়, এক টুকরো নোংরা গামছা সুরমণির কোমরে। কিন্তু কালো পাথরের এমন নিটোল মূর্তি এর আগে দেখি নি। কোন অভিজ্ঞ শিল্পীর হাতে গড়া নিখুঁত একটি যৌবনবতী নারীদেহ।

পাশাপাশি হেঁটে এলো সুরমণি, আর ওর সমস্ত শরীর ঘিরে যেন নাচের ছন্দ বাজলো।

সুরমণি হাসলো হঠাৎ।

বললে, তুয়ারে আগেই দেখছি আমি। মেন্ছায়েবের সাথে মারাং গাড়ায় ব'ইসেছিলি ওদিন।

—আর তোর সঙ্গে কে ছিল? হেসে প্রশ্ন করলাম।

—উ আমার ঠিগিয়া পুরুষ বটে, বাপলা হবে উয়ার সাথে।

দুটি রূপোর টাকা গুঁজে দিলাম ওর হাতে। ডুডাং শিকরের দাম। তারপর দ্রুত পায়ে কোয়ার্টারের পথ ধরলাম।

কয়েক পা এগিয়ে এসে আবার ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হ'ল। দেখলাম, তেমনি দুটি বড়ো বড়ো কৃতজ্ঞতার চোখ মেলে সুরমণি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় চুলের জট, কিন্তু স্বাস্থ্যের জোয়ার তার লাবণ্য ছিটোনো মুখে। আর বুকের উদ্দাম তরঙ্গের মাঝখানটিতে দুলছে লাল পাথরের হার। কানের লাল কুণ্ডল দুটো জ্বলছে রক্ত পলাশের মত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে এলাম। সুরমণির স্মৃতি নিয়ে।

ঠিকেদার আত্মীয় ছুটলেন সুতপার এলশেসিয়ান কুকুরটির নখের সংখ্যা গুণতে। বিশ নখুন বিষ, আঠারো নখুন পানি। বলেছে লাটুয়া ওঝা।

শুনে ডাক্তার সেন হাসলেন। বললেন; সব বুজরুকি। ও'রাও মুণ্ডা সাঁওতালরা একদিন ডাক্তারের নাম শুনলে মারতে আসতো, আজ হাসপাতালে ভিড় দেখবেন চলুন। লাটুয়ার ওষুধে কাজ হ'লে ওরা আর আমার কাছে আসতো না।

কম্পাউণ্ডারবাবু হেসে বললেন, ওসব ছেড়ে দিন, রাঁচীতে ফোন করে বারোটা অ্যাণ্টি-র‍্যাবিট ইনজেকশন আনিয়ে নিন।

সুতপা শুধু ভয়ের চোখে বললে, না না। উল্টো বিপত্তি হতে পারে ইনজেকশন নিতে গিয়ে...সে আমি দেখেছি, আধ হাত লম্বা ছুঁচ, পেটে দিতে হয়। তার চেয়ে কুকুরটা পাগলা কিনা দেখাই যাক না।

ভয় যে আমারও কম ছিল তা নয়। তাই সুতপার কথাতেই সায় দিলাম।

বললাম, সাঁওতালী ওষুধে এমন সব কাজ হয় যা ভাবা যায় না।

ঠিকেদার আত্মীয়টি ইতিমধ্যে ফিরে এসে জানালেন, বিশও নয়, আঠারোও নয়—উনিশটি নখ কুকুরটার পায়ে।

আর ডাক্তার সেন বললেন, ওসব ছেড়ে দিন। পাগলা কুকুরের কামড় বড়ো ভীষণ জিনিষ। নিজের চোখে দেখেছি। জ্বর হবে, ভয়ে চিৎকার করে উঠবে অনবরত। জল দুধ তেল যা দেখবেন মনে হবে কুকুর তাড়া করে আসছে—জলাতঙ্ক রোগ বড়ো ভীষণ রোগ। ছ' মাস পরে হয়তো জানা যাবে কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না, দশ দিনের মধ্যে সব শেষ।

সুতপা ধমক দিলো।—কেন ভয় দেখাচ্ছেন মিছিমিছি। কুকুরটা যদি দশ দিনের মধ্যে মারা যায়, তবে তো বুঝবো পাগলা কুকুর।

ডাক্তার সেন সায় দিলেন, হ্যাঁ তা ঠিক্।

সুতরাং লাটুয়া ওঝার চিকিৎসাই চললো। আর তিনদিন পরে যেতে বলেছিল বলে আবার ভুরকুণ্ডার সারনা পার হয়ে এসে দাঁড়ালাম লাটুয়া ওঝার চবুতরার চৌকিটার পাশে।

ডাকলাম সুরমণিকে।

কোন উত্তর পেলাম না।

বারকয়েক ডেকেও যখন সাড়া পেলাম না, তখন ঝাঁপ খুলে আমি আর মরিয়ম ভিতরে ঢুকবো কিনা ভাবছি, হঠাৎ দেখি এক কলসী জল নিয়ে ফিরছে সুরমণি। গাড়ায় স্নান সেরে আসছে মনে হল। সারা শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে, আর মুখে খিল-খিল হাসি।

—দূরে থেকে দেইখ্যা ভাবলি খাদানের বাবু বটেন। ছুটে আসছি বাবুরে দেইখ্যা।

বলে আরো এক মুখ হেসে ঝাঁপ খুলে ধরলো সুরমণি।

ভেতরে ঢুকলাম।

লাটুয়া বসে বসে ঝিমুচ্ছিল।

বললাম, বিশও নয়, আঠারোও নয়। উনিশ নখের কুকুর।

শুনে আতঙ্ক দেখা দিলো লাটুয়ার মুখে চোখে। পাপ্পী কুকুর বটে। সুমগিয়া শয়তান আছে উয়ার বিষে।

বলে তেমনি অন্ধ চোখ দুটো আমাদের দিকে রেখে দু' হাত বাতাসে কি যেন খুঁজলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌটো তুলে ধরলো সুরমণি।

বিড় বিড় করে কি এক মন্ত্র পড়লো লাটুয়া, তারপর বললে, ইটা কাঁর্টিক গাছের মূল বটে। তিনদিন লাগালি সুমগিয়া বিষ খায়ে নিয়ে ভাগবে শয়তানটো।

সুরমণি শিকরটা নিয়ে ঘষতে সুরু করলো আগের মতই। আর লাটুয়া বলতে সুরু করলো কোন রোগ কি দিয়ে তাড়িয়েছে ও।

বললে, নাগবংশী পূজা দিয়ে জড়ি পাইলি আমি। খাদানে সাপ উঠলো সিবার, কাম বন্ধ কইরে দিলো কুলিরা।

অন্ধ লাটুয়ার হাত দুটো কি যেন খুঁজলো। খুঁজলো সাপের জড়ি। সুরমণি সঙ্গে সঙ্গে একটা মোড়ক তুলে ধরলো। আর সেটার স্পর্শ পেয়েই স্বস্তির হাসি হাসলো লাটুয়া।

বললে, কুলিদের হাতে বাইন্ধে দিলাম জড়িটো, খাদান থেকে সাপ পালায় গেল। ম্যানেজার সায়েব দশটো রুপেয়া দিলি বখশিষ।

মরিয়ম হেসে বললে, হাঁ বাবু, খাদান আপিস হর মাসে দু' রুপেয়া বখশিষ দেয় ওঝারে।

কথা শেষ হতেই বুড়ি মনে পড়িয়ে দিলো, আর মাঝিনদের কথাটো।

—হুঁ। মারাং গাড়ায় সিবার মাছ মিললো না। সান্তালরা ভাবলো বটে পাপ হইছে তাই মাছ মিলছেক না। তো আমি কইলাম...

ওষুধটা তৈরী হয়ে গিয়েছিল, নিয়ে বললাম, আজ উঠি, সাঁঝ হয়ে যাবে। আবার আসবো।

লাটুয়া প্রথমটা অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। তারপর ঘাড় নেড়ে বললে, হুঁ, তিন দিন বাদে নুতন মূল দিব কত্তা।

বাইরে বেরিয়ে এলাম, সুরমণিও এলো।

আগের মতই হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, সুরমণি, কি করে চলে বলতো তোদের? আর কেউ আসে ওষুধ নিতে?

মাথা নাড়লো সুরমণি। চোখে মুখেও কেমন যেন বিষণ্ণতার ছাপ পড়লো তার। না, কেউ আসে না আর লাটুয়া ওঝার কাছে।

—তবে?

চোখ ছলছল করে উঠলো সুরমণির।

বললে, আধা বিঘান ক্ষেতি আছে, আমি আর জংলো চাষ কইর‍্যা চালাই বাবু।

লজ্জার হাসি হাসলো সুরমণি। আর কৌতুকে হেসে উঠলো মরিয়ম। বোঝালে জংলোর সঙ্গে নেপা মিলানা হয়েছে ওর। পীরিত হয়েছে।

সুরমণি লাজুক হেসে বললে, হুঁ ঠিগিয়াটোও হ'য়েছে বাবু।

অর্থাৎ বাপ্‌লাও ঠিকঠাক। তাই দু'জনে মিলে চাষ করে, আর সেই অন্নেই লাটুয়া আর লাটুয়ার বুড়ির দিনগুজরান হয়।

বললাম, লাটুয়া এত বড়ো ওঝা, ওর কাছে আসে না কেন সান্তাল রুগীরা?

শুনে চোখ ছলছল করে উঠলো ওর।

তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললো সুরমণি। বললে, তুই ডাক্তারের কাছে যা বাবু, ডাক্তারের কাছে যা। ই দাওয়াতে কাম হবেক নাই তুর।

বলে আমার হাতখানা চেপে ধরে টাকা দুটো ফেরৎ দিতে চাইলো সুরমণি।

বললে, ইটা ফিরায়ে লে বাবু। কাম হবে না তুয়ার, ই দাওয়াই মিছা বটে।

সুরমণি হঠাৎ যে এমন কথা বলতে পারে ঘূণাক্ষরেও মনে হয় নি। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

টাকা দুটো দিতে চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই নিলো না ও।

বললে, আমার পাপ হবে রে বাবু, ই রুপেয়া দুটো তু ফিরায়ে লে।

তারপর একে একে সব কথা বলে গেল সুরমণি। এতদিনের গোপন কাহিনীটা সহানুভূতির ছোঁয়াচ পেয়ে প্রকাশ করে ফেললো।

সব ছিলো লাটুয়া ওঝার। সব রোগের ওষুধ জানতো ও। ডাইনী যুগিন তাড়াতে পারতো, সাপের বিষ ঝাড়তে পারতো। নাগবংশীর পূজো দিয়ে সব শিখেছিল লাটুয়া ওঝা।

তারপর বুড়ো বয়সে জঙ্গলে মূল খুঁজতে খুঁজতে নাকি রাত হয়ে গেল একদিন।

পাগলের মত ও তখনও একা একা কি একটা গাছের মূল খুঁজছে। খেয়াল করে নি, কখন একটা ভালুক পিছন থেকে এসে জাপটে ধরেছে ওকে।

জান বেঁচে গেল, কিন্তু ভালুকের থাবার ঘায়ে চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেল লাটুয়ার।

তখন থেকে আর ঘরের বাইরে যায় না ও। কিন্তু গাছের মূল তো আর চিরকাল থাকে না, কবে শেষ হয়ে গেছে সে সব ওষুধ। আর সে সব গাছের নামও জানে না কেউ, চেনেও না।

বুড়ো বাপ দুঃখ পাবে বলে আজেবাজে যা পেয়েছে ঘাস পাতা শিকড় নিয়ে এসে কৌটোগুলোয় সাজিয়ে রেখেছে রূপমতী।

রুগী না এলেও রোজ বসে বসে গল্প করে লাটুয়া, কোন ওষুধে কি কাজ হয়, কোনটা কাকে দিয়েছিল। আর ভাবে, ওর কাছে শুনে শুনে সুরমণিও বড়ো ওঝানি হয়ে উঠবে।

কিন্তু লাটুয়া তো জানে না যে সে মূল শেষ হয়ে গেছে। জানে না, চোখ ফিরে পেয়ে গাছগুলো চিনিয়ে না দিলে সুরমণি কিছুই শিখতে পারবে না। তাই দিনের পর দিন শুধু গল্প শোনে সুরমণি। আর শুনতে শুনতে চোখ ঠেলে কান্না আসে ওর।

তাই রুগীরাও কেউ আসে না আর, লাটুয়া ওঝার ওষুধে কাজ হয় না বলে ডাক্তারের কাছে ছুটে যায়।

সব কথা খুলে বললো সুরমণি।

বললে, তু ডাক্তারের কাছে যায়ে দাওয়াই নিবি বাবু, ই মূল লাগায়ে কাজ হবে নাই।

দীর্ঘশ্বাস লুকোতে পারলাম না। দেখলাম দু'চোখ চকচক করছে মরিয়মেরও।

মরিয়ম ফিরে আসার পথে বললে, মেন্ছায়েবকে বলে জংলোর একটা কাম ঠিক করে দে বাবু। কাম না পেলে উরা বাঁচবে নাই। লাটুয়া ওঝার মায়াটা মরবে, বুড়িটো মরবে, লাটুয়াও বাঁচবে নাই!

ফিরে এলাম। সমস্ত কাহিনীটা বললাম সুতপাকে।

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও।

বললে, সত্যি, কি সরল এই মানুষগুলো। আর কেউ হলে কি এ-কথা বলতো?

ডাক্তার সেন বললেন, আমি আগেই জানতাম। সব বুজরুকি।

শেষ অবধি বারোটা অ্যাণ্টিব্যায়টিক ইনজেকশনই নিতে হ'ল। কারণ ঠিক দশ দিনের দিন চোখ ঘোলাটে হয়ে মারা গেল কুকুরটা।

কিন্তু ইনজেকশন নিয়ে পড়ে থাকতে হল বলেই সুতপাকে কাছে পেলাম। কত কথা, কত হাসি।

দুটি সপ্তাহ মাত্র, তা হোক্। দুটি সপ্তাহের মধ্যে তো অতীতের দুটি বছরকে নতুন করে ফিরে পেলাম।

তারপর বাঁশরিয়া থেকে বিদায় নেবার দিনে গাড়ীতে তুলে দিতে এলো সুতপা, আঠারো মাইল দূরের রামগড় স্টেশন অবধি।

হুইসল বাজলো, গার্ডের পতাকা নড়লো।

সুতপা বললো, শুধু কষ্টই দিলাম। শুধু আমার দোষেই তোমার এই দুর্ভোগ।

হেসে বললাম, লোকসান নয়, লাভই হ'ল আমার।

—কি আর লাভ হ'ল। বিষণ্ণ দেখালো সুতপাকে।

বললাম, এমন একটা দুর্ঘটনা না ঘটলে কি লাটুয়া ওঝাকে আবিষ্কার করতে পারতাম। না জানতে পারতাম সুরমণির মত মেয়ে আছে।

ট্রেন ছেড়ে দিলো সেই মুহূর্তে। ঠিক্ বুঝতে পারলাম না, কেমন যেন সন্দেহ হ'ল ছলছল চোখ লুকোলো সুতপা। ঠিক্ এই কথাটা শোনবার জন্যেই কি এতখানি পথ এসেছিল ও?

পটচিত্রে শেষ স্বাক্ষর

রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

খ্যাতির আড়ালে থেকে ১১০ বৎসর বয়স্ক এক অজ্ঞাত পটুয়া শিল্পের ক্ষেত্রে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এসেছেন তারই আলোচনা করেছেন লেখক। এই সার্থক পটুয়া শ্রীযোগেন চিত্রকরের একটি ত্রিবর্ণ পট 'শ্রীশ্রীদুর্গা' এবারের শারদীয়া দেশ, আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

জনবহুল কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশের মধ্যে একটি ছোট গ্রাম—নাম চণ্ডীপুর—হাওড়া জেলার কুলগেছিয়া থেকে মাত্র এক মাইল দূরে। গ্রামের এক প্রান্তে উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোডের ঠিক ধারেই কয়েক ঘর পটুয়ার বাস। হুগলী নদীর একটা ছোট শাখা এই পোটোপাড়ার সামনে দিয়ে প্রবাহিত।

কয়েক বছর আগে আশুতোষ মিউজিয়মের গবেষকরূপে আমি একবার এই পোটোপাড়ায় গিয়েছিলাম। এখানকার লোকশিল্পীদের অবস্থা ও তাদের তৈরী শিল্পদ্রব্য পর্যবেক্ষণই ছিল আমার উদ্দেশ্য। একটা ভাঙা চালাঘরের দাওয়ায় বসে আমি এক অতি বৃদ্ধ লোকশিল্পীর কাজ দেখছি—নাম তার যোগেন চিত্রকর। বৃদ্ধ একমনে একটা কালীঠাকুর গড়ছে। তার দেহ অতি শীর্ণ—হাত পা তার রীতিমত কাঁপছে। তবু মূর্তিটিকে যতদূর সম্ভব নিখুঁত ক'রে গড়বার তার কি চেষ্টা! বৃদ্ধের বয়স সম্বন্ধে আমার বিশেষ কৌতূহল হোলো—জিজ্ঞাসা করলাম, সে উত্তর করল, "১১০ বছর"। আশ্চর্য! বিশ্বাস করতে পারলাম না। অন্যান্য চিত্রকরদেরও জিজ্ঞাসা করলাম। সকলেই তার কথার সমর্থন জানালো। সত্যিই যদি তার বয়স একশ' দশ বছর হয় ত যোগেন চিত্রকর শুধু হাওড়া জেলার কেন, বোধহয় সারা বাংলার সবচেয়ে বৃদ্ধ জীবিত লোকশিল্পী। মূর্তিগড়া ছাড়া আরও কিছু সে করে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, "পুতুল গড়ি"। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে আগে চণ্ডীপুর গ্রামে অনেকঘর পটুয়ার বাস ছিল। দেশের অবস্থা খারাপ হ'য়ে গিয়ে ও গত দুর্ভিক্ষের ফলে তাদের সংখ্যা এখন অনেক কমে গেছে—মাত্র ৩।৪ ঘরে এসে ঠেকেছে। তারা সকলেই এখন মাটির পুতুল তৈরী করে ও পূজোর সময় মূর্তি গড়ে। আশেপাশের গ্রামে বেশীর ভাগ মেলার সময় কিংবা হাটের দিনে তাদের তৈরী পুতুল কিছু কিছু বিক্রী হয়। আগে সে পুতুলের যথেষ্ট কদর ছিল, এখন আর লোকে এসব বড় একটা কিনতে চায় না। দেশের অবস্থা বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ও বিলিতি খেলনার কদর বেড়ে যাওয়ায় লোকের রুচিও নাকি বদলে গেছে—বেশ দুঃখের সঙ্গে যোগেন চিত্রকর বললে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যোগেন চিত্রকর হঠাৎ আবার বলে উঠলো, "এসব কাজ কি আর আগে করতুম, এখন ঠেকায় প'ড়ে করছি। কি করব—পেট চলে না। আগে রাজার কাজ করতুম বাবু, রাজার কাজ করতুম।" কথাটা বলে যোগেন চিত্রকর বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করল। নিজের জাতিগত পেশার বেশ একটা গর্বের ভাব তার চোখে মুখে ফুটে উঠল। রাজার কাজ কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম। সে বললে, "পট লিখতুম"। এতক্ষণে বুঝলাম যে এই বৃদ্ধ আসলে একজন পটুয়া—সারা জীবন পট এঁকে এসেছে এবং সমাজ ও দেশ তার প্রতিভা ও কৃতিত্বের মূল্যস্বরূপ তাকে কিছু না দিলেও নিজের জাতিগত পেশার গর্ব তার এখনো অটুট রয়েছে। সমাজ সে কাজকে যত ছোট বলেই মনে করুক না কেন—সে মনে করে যে তার জাত-ব্যবসা মোটেই ছোট নয়। সমাজ তাকে জাতে তুলে না নিলেও নিজের অধিকারে সে থাকে ঠিক রাজার মত।

পট সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা ব'লে নিলে যোগেন পটুয়ার কাহিনীটি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যাত্রা, পুতুল নাচ, পাঁচালী গান, কথকতা প্রভৃতি সরল ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানাদি বাংলার প্রাণকেন্দ্র পল্লীগুলিকে যেন আনন্দমুখর ক'রে রাখতো। কেবল আনন্দদানই এই সব অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। নিরক্ষর ও স্বল্পজ্ঞ সাধারণ পল্লীবাসীদের মধ্যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি আদর্শ ও ভাব ছড়িয়ে দিয়ে তাদের অজ্ঞতা দূরীকরণ ও যথার্থরূপে শিক্ষিত ক'রে তোলার ক্ষেত্রেও এদের অবদান কম ছিল না। পল্লী অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে পটুয়া নামে একশ্রেণীর লোকশিল্পীদের আঁকা ছবি। পটুয়ারা দীর্ঘ কাগজ বা কাপড়ের উপর পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত, শ্রীচৈতন্য, বেহুলা, নরমেধ যজ্ঞ কমলেকামিনী প্রভৃতির কাহিনী অবলম্বনে **পট নামে একপ্রকার ছবি আঁকতো।** ৮।১০ হাত হ'তে ২০।২৫ হাত পর্যন্ত বহুচিত্রসমন্বিত এই দীর্ঘ পটগুলির দুই প্রান্তে দুটি বাঁশের দণ্ড লাগানো হাতো। সাধারণত পটটি শেষের দিক থেকে গুটিয়ে রাখা হোতো ব'লে এই প্রকারের পটকে বলা হোতো "জড়ানো পট"। পট দেখাবার সময় প্রদর্শক বা পটুয়া জড়ানো পটটি একটি বাঁশের ছোট চার পায়ার উপর রেখে বাঁ হাতে উপরের দণ্ডটি ধ'রে ধীরে ধীরে সেটিকে ঘুরিয়ে ডান হাতে পটে আঁকা ছবির বিষয়গুলি নির্দেশ করত আর সে সম্বন্ধে তাদের স্বরচিত কাহিনীগুলি সুর সহযোগে দর্শকদের কাছে বিবৃত করত। এইভাবে বিভিন্ন পল্লীতে ঘুরে ঘুরে পট দেখিয়ে ও ছড়া গেয়ে পল্লীবাসীদের মনে আনন্দ বর্ধন ক'রে বাংলার পটুয়াগোষ্ঠী যুগ যুগ ধ'রে শুধু তাদের জীবিকা অর্জনই ক'রে আসেনি—তাদের এই শিল্পসাধনা এবং দেশবাসীর মধ্যে এই ধর্মভাব ও সৎ আদর্শ প্রচার দেশের গৌরবময় কৃষ্টিকেও বহুল পরিমাণে উজ্জ্বল ও পরিপুষ্ট ক'রে এসেছে।

রেখাচিত্র অঙ্কনরত হাওড়া জেলার চণ্ডিপুর নিবাসী যোগেন চিত্রকর। ১১০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ পটুয়া

যোগেন পটুয়ার আদিম নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলায়। উক্ত জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত অগরুপলামপাই নামক গ্রামে এক নামকরা পটুয়া পরিবারে তার জন্ম হয়। পট নির্মাণের ক্ষেত্র হিসেবে বাঁকুড়া ও বীরভূমের মত মেদিনীপুরেরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। যোগেন চিত্রকরের বাবা 'পরাণচন্দ্র চিত্রকর সেখানকার এক প্রসিদ্ধ পটুয়া

যোগেন চিত্রকরের আঁকা 'মনসা পট'.
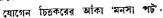
'কমলে-কামিনী' পটে 'উমেশচন্দ্র চিত্রকর অঙ্কিত' গণেশ-জননী

ছিলেন। সারা জেলার মধ্যে তিনিই নাকি ছিলেন সেরা পট লিখিয়ে। যোগেন পটুয়ার দুই ভাই 'উমেশচন্দ্র চিত্রকর ও 'ক্ষেত্রমোহন চিত্রকরও খুব ভাল পট আঁকতে পারতো। ছোটবেলায় কাকার সঙ্গে যোগেন চিত্রকর একবার চণ্ডীপুরের পোটোপাড়ায় তাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে আসে। পরে ঘটনাচক্রে তাকে সেখানেই থেকে যেতে হয়। সে পট লিখতে শুরু করে চণ্ডীপুরেই। এ বিষয়ে তার বড় ভাই 'উমেশচন্দ্র চিত্রকর তাকে বিশেষ সাহায্য করে। ক্রমে যোগেন পটুয়া নিজেকে সে অঞ্চলে বেশ প্রতিষ্ঠিত ক'রে নেয়। চণ্ডীপুর ও প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে পট দেখিয়ে ও ছড়া গেয়ে সে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। তখন অবস্থাও ছিল তার বেশ ভাল। কিন্তু আজ তার আর সেদিন নেই। বার্ধক্যের কবলে প'ড়ে ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে জাতিগত পেশা চালনা করতে সে এখন অক্ষম। আজ জীর্ণ কক্ষে তার বিগত জীবনের আশ্চর্য শিল্পশক্তির সাক্ষীস্বরূপ প'ড়ে আছে শুধু সামান্য কয়েকটি তুলি ও রঙের পাত্র।

যোগেন চিত্রকরের নাম হিন্দুদের মত হোলেও আসলে পশ্চিম বাঙলার অধিকাংশ পটুয়াদের মত সে জাতিতে মুসলমান। কিন্তু হিন্দু দেবদেবী নিয়েই তার কারবার। তার পেশা হিন্দুদের কাজেই নিয়োজিত। আগে সম্ভবত তার পিতৃপুরুষ ছিল হিন্দু। পরে কোন সামাজিক বিপর্যয়ে প'ড়ে তাদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তারা তাদের পুরোনো পেশা ত্যাগ করতে পারেনি, ত্যাগ করতে পারেনি তাদের হিন্দু দেবদেবীর প্রতি, পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস--যোগেন পটুয়ার মধ্যে যে জিনিসটি আমি লক্ষ্য করি বিশেষ ক'রে। জাতিতে মুসলমান হ'লেও আসলে সংস্কারের দিক থেকে সে যেন হিন্দু। তার শিশুসুলভ সরলতা, তার অবিচলিত ধর্মবিশ্বাস, তার বিনম্র আচরণ তার চরিত্রের বৈশিষ্টাই প্রমাণ করে।

পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন জেলার পট সম্বন্ধে একটা তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, শুধু অঙ্কনরীতিতেই তাদের নিজস্ব এক একটি বৈশিষ্ট্য র'য়ে গেছে তা নয়—বিষয়বস্তুর দিক থেকেও তাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য বর্তমান। বিভিন্নপৌরাণিক কাহিনীর বিশেষ একটি অথবা কখনো কখনো একাধিক কাহিনীও এই সকল পটে প্রাধান্য লাভ করেছে। যোগেন পটুয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু হয়েছে এর ব্যতিক্রম। বিষয়বস্তু নির্বাচনে সে নিজেকে নির্দিষ্ট কোন গণ্ডী দিয়ে ঘিরে রাখেনি। তার পটে রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, মনসালীলা, কমলে কামিনীর কাহিনী প্রভৃতি সকলেই সমান সমাদর পেয়েছে। হিন্দু দেবদেবীর কাউকেই যেন সে বাদ দেয়নি তার বুকের রক্তের রঙ ও ভক্তি বিশ্বাসের তুলি দিয়ে তার পটে চিত্রিত করতে।

আজকালকার শিল্পীদের মত যোগেন পটুয়া পট আঁকতে গিয়ে কখনো বিলিতী রঙ ও তুলির সহায্য নেয়নি। রঙ, তুলি মাধ্যমিক, বার্নিশ সবই সে প্রয়োজন অনুযায়ী ঘরে তৈরী ক'রে নিত। এলামাটি, গেরিমাটি, খড়িমাটি, হরিতাল, দেশী নীল, মেটে সিঁদুর প্রভৃতি দেশী ধাতব ও উদ্ভিজ্জ রঙের সাহায্যেই সে তার ছবি আঁকতো। বিভিন্ন রঙ মিশিয়ে রকমারি রঙ তৈরী করার পদ্ধতিও যোগেন পটুয়ার জানা ছিল। কালো রঙ সে পেতো প্রদীপের শিখার উপর উপুড় করা একটা সরা থেকে। তার বেশীর ভাগ পটই কাগজের উপর আঁকা। কখনো কখনো একাধিক কাগজ একটির উপর আর একটি জুড়ে পটটিকে পুরু ক'রে নেওয়া হোতো। খবরের কাগজের উপর পট আঁকার কথাও যোগেন পটুয়ার মুখে শুনতে পাই। পট আঁকার আগে কাগজের উপর খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে ভূমি তৈরী ক'রে নিতে হোতো। তার পর সে লাল রঙে প্রথমে ছবিগুলির out line বা সীমারেখা টেনে নিত এবং শেষে বিভিন্ন রঙ দিয়ে সেগুলি তাকে পূরণ করতে হোতো। তেঁতুলবিচি সিদ্ধ আঠা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রঙের মাধ্যমিক হিসেবে ব্যবহৃত হোতো। কখনো

কখনো বেলের অথবা বাবলার আঠাও সে ব্যবহার করতো। সাদা রঙ ছিল সব রঙেরই মাধ্যমিক। সরা অথবা নারিকেলের মালা ছিল রঙের পাত্র। তুলি তৈরী হোতো ছাগলের ঘাড়ের লোম দিয়ে। সূক্ষ্ম তুলির জন্যে তাকে বাচ্চা ছাগলের ঘাড়ের লোম সংগ্রহ করতে হোতো। মোটা তুলি তৈরী করতো সে পাট দিয়েই। তুলির উল্টোদিকে খানিকটা কাপড় জড়িয়েও কখনো কখনো সে তুলির কাজ চালিয়ে নিত। বাঁশের একটা খোপের ভেতরে সে এই তুলিগুলো রাখতো। কাজেই অতি সামান্য সাজ-সরঞ্জাম ও মালমসলা দিয়ে এবং নিতান্ত সরল ও সাদাসিধে পদ্ধতির সাহায্যে যোগেন পটুয়া তার পট আঁকতো—তাতে আজকালকার শিল্পীদের মত বাহুল্য অথবা পারিপাট্যের কোন বালাই ছিল না।

যোগেন পটুয়ার আঁকা সব পটগুলিই যে খুব উচ্চাঙ্গের হোতো তা নয়। তার কোন কোন পটে সরল শিশুর কাঁচা হাতের মত অপটু কাজ, বর্ণবিন্যাস ও রচনা-ভঙ্গীর যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে যেত। কিন্তু তাই ব'লে যে কোথাও তার পটের এতটুকু রসভঙ্গ হয়েছে সে কথা বলা চলে না। তার আঁকা পটের প্রাণই হচ্ছে সরলতা—ভাব ও রচনা-ভঙ্গীর, বর্ণবিন্যাস ও কল্পনার সরলতা। যোগেন পটুয়া পট আঁকতো না, আঁকতো কতকগুলি ঘটনা, এমন সব ঘটনা যা সে সত্য বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত। তাই তার পটে আমরা পাই "একটা বিরাট মনুষ্য-সমাজ, যারা বাস করে পল্লীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে, বিশ্বাস করে অসংখ্য দেবদেবীতে, জীবনের আদর্শের সন্ধান নেয় পৌরাণিক গল্প ও উপাখ্যানের মধ্যে, উচ্চ রাজনীতির মর্ম যারা বোঝে না, তাদের বিশ্বাস, তাদের আদর্শ, তাদের সমাজ জীবন সব কিছুরই নিখুঁত চিত্র।" তার আঁকা একটা পট দেখে মনে হয় যেন পল্লীর মেটে পথ বেয়ে কোন বাউল সরল মনে সরল বিশ্বাসে কোনরকম ওস্তাদি কালোয়াতির ধার না ধেরে হাতে একটা একতারা নিয়ে তার প্রাণের গান গেয়ে চলেছে—যে গানের কোথাও ছেদ নেই, রসভঙ্গ নেই, যে গান শাশ্বত ও চিরন্তন, চিরমধুর ও চিরনূতন, চিরসত্যেরই অপূর্ব প্রতিধ্বনি, সরলতার প্রতিমূর্তি। ধর্মপ্রাণ যোগেন পটুয়ার নির্মল অন্তরের অভিব্যক্তি, তার সরলতা ও ভক্তি-বিশ্বাসের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশই তার পটের মর্মকথা।

যোগেন পটুয়া আজ পর্যন্ত জীবনে বহু পটই এঁকেছে। কিন্তু অভাবে প'ড়ে প্রায় সবগুলিই সে একে একে বিক্রী ক'রে দেয়। তার শেষ সঞ্চিত পট তিনটি এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত। এগুলি বাঙলার লোককলার অপূর্ব নিদর্শন বললে অত্যুক্তি হয় না। পট তিনটির একটি রাসলীলা বিষয়ক, আর একটি কমলে-কামিনী ও তৃতীয়টি মনসা পট। পট তিনটির মধ্যে কমলে-কামিনীর পটটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পটটির মধ্যে আমরা যোগেন পটুয়ার অপূর্ব শিল্পশক্তির চরম বিকাশের পরিচয় পাই। কি রেখাঙ্কন, কি রঙের কাজ, কি রসাত্মক ভাব প্রকাশের বৈশিষ্ট্য—সব দিক দিয়েই পটটি অতুলনীয়। পটটিতে বর্ণিত অন্যান্য ছবির মধ্যে বিশেষ ক'রে দুর্গার বিভিন্ন রূপের ভাবতরঙ্গ-

যোগেন পটুয়া অঙ্কিত 'কমলে-কামিনী'

সূচক অপূর্ব রেখার কাজ ও বর্ণবিন্যাস বাস্তবিকই প্রসংশনীয়। প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক Dr. Stella Kramrisch এই পটের আশ্চর্য রেখার কাজ দেখে বলেন যে, পটটির অনেকগুলি অংশের কাজ, এমন কি কালীঘাটের পটের চেয়ে উৎকৃষ্ট। পটটির নীচের দিককার কয়েকটি খোপ (panel) যোগেন পটুয়ার বড় ভাই 'উমেশ-চন্দ্র চিত্রকরের আঁকা। সেগুলির কাজ আরও ভাল বলে মনে হয়।

যোগেন পটুয়ার কমলে-কামিনী পটে দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী, গণেশজননী ও আঠারো-হাত দুর্গারূপে চিত্রিত হয়েছে। বাঙলার পটচিত্রে রামলীলা, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতির যে স্থান দুর্গালীলার কিন্তু সে স্থান নয় যদিও দুর্গাপূজা আসলে বাঙলারই পূজা। দুর্গার ছবি বাঙলার পটে বড় একটা দেখা যায় না। দুর্গাকে আমরা আগমনী গানের মধ্যে দিয়ে যেভাবে পাই, লক্ষ্মীর সরায় যে রূপে তাঁকে পেয়ে থাকি, পটুয়ার শিল্পে ঠিক সেভাবে পাই না। এদিক দিয়েও যোগেন পটুয়ার কমলে-কামিনী পটটি তাই আমাদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

বিষয়বস্তুকে বিষদরূপে ব্যাখ্যা করা ও অঙ্কনক্রিয়াকে যতদূর সম্ভব কারুকার্যময় ও সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তোলাই যোগেন পটুয়ার পটের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ২০।২৫ বছরের পুরোনো রামায়ণ পটটি বুড়ো বয়সের শিথিল হাতে আঁকা তার শেষ পট। তার মধ্য দিয়েও যোগেন পটুয়া এই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার বিশেষ চেষ্টা করেছে। কৌতুকপ্রদ ছবি আঁকার কাজেও যোগেন পটুয়া কম পটু নয়। রামায়ণ পটটিতে রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্যে হনুমানের রগুড়ে কান্ড দেখে দর্শকরা না হেসে থাকতে পারবেন না। শুনতে পাই 'যোগেন বুড়ো' নাকি আগে ছিল বেজায় রসিক। এখনও তার কথার মধ্যে যথেষ্ট হাসির খোরাক মেলে।

যোগেন পটুয়ার রঙ ও রেখার কাজ যে কত সূক্ষ্ম ও চমকপ্রদ হ'তে পারে তার নিদর্শনস্বরূপে আমরা মনসার খন্ড পটটির উল্লেখ করতে পারি। চিত্রটির বিশেষ দ্রষ্টব্যের বিষয় হোলো অপূর্ব ভাব ও সৌন্দর্যের গম্ভীর রস-সংযোগে মনসা দেবীর চক্রবোড়া মঙ্গলা সাপের সিংহাসনের উপর বসবার মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিমাটি। যোগেন পটুয়ার কাছ থেকে এই মনসা পট সংক্রান্ত যে পটুয়া-সংগীতাংশটুকু আমি সংগ্রহ করি তা হোলো এইঃ—

"মনসা জগৎগৌরী জয় বিষহরি।
অষ্টম নাগের মাথায় পরমা সুন্দরী॥
নাগের হোলো ঘাটপাট নাগের সিংহাসন।
মঙ্গলে বোড়ার পৃষ্ঠে দেবীর আসন॥
তরজে গরজে বেনে মোচড়ায় দাড়ী।
কাঁধে তুলে নাচে বেনে হে'তালের বাড়ি॥
বেটির নাগাল যদি পাই।
মারিব হে'তালের বাড়ি কম্বুরে চুড়াই॥
সেই গাল মা মনসা আপনি শুনিল।
ফুরোতে পড়িয়া চাঁদের ছয় বেটা খেল॥
ছয় বেটা খেয়ে ছয় ব'ধু কৈল রাঁঢ়।
তবু নাইক দিল বেনে কড়ায় পড়ল প্রাণ॥
তিন গায়নে গীত গায় মধুরস বাণী।
সদায় পূজেন বেনে চ্যাং মুড়ি কানি॥"

রামায়ণ পট সম্বন্ধেও খানিকটা পটুয়া-গীতি যোগেন পটুয়া আমায় গেয়ে শোনায়। সেটুকুও আমি এখানে উদ্ধৃত করলামঃ—

"রাম রাম প্রভুরাম সর্বদেবের দয়া।
রাজ্য গেলে রাজ্য পায় রাম নইলে পদছায়া॥
কুশাসনে বৈসে রাম ধনুকে দিয়া চড়া।
আঁটিয়ে বেঁধেছে রাম মালতী কুসুমের বেড়া॥
মালতী কুসুমের গন্ধ অতি দূরে যায়।
গুণ গুণ শব্দ করে ভ্রমরা বেড়ায়॥"

আশ্চর্য! এত বুড়ো বয়সেও যোগেন পটুয়ার গলার মিষ্টতা বিশেষ নষ্ট হয়নি। পল্লীগীতির বিচিত্র ছন্দসহযোগে মিঠে সুরে পটচিত্রের এরূপ নাটকীয় বিবৃতি না জানি কি অপূর্ব দৃশ্যই না রচনা করত। এই পটুয়া-গীতিগুলি যোগেন পটুয়ার

পিতামহের রচিত। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও পট লিখিয়ে। তাঁর কাছ থেকে যোগেন পটুয়া এগুলি উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিল; কিন্তু যোগেন পটুয়ার কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে এগুলি পাবার মত কোন বংশধরই তার নেই। দুঃখের বিষয় স্মৃতিশক্তির অভাবে এখন সে এগুলির সবই প্রায় ভুলে গিয়েছে।

আড়ম্বরহীন, অতি সহজ, সরল ও পল্লীর নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় লিখিত পটুয়া-গীতির সামান্যতম নিদর্শনরূপে উপরের ছড়া দুটি হতে আমরা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, বাঙলার গণ-সাহিত্য ক্ষেত্রে পটুয়া-গীতি এক বিশেষ গৌরবময় স্থান অধিকার করে। জাতির আত্ম-সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করতে গেলে এই পটুয়া-গীতি বাঙলার শাশ্বত আত্মার চিরন্তন ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশমাত্র। তাই এই পটুয়া-গীতির মধ্যে বর্ণিত হিন্দুদের ধর্ম, দর্শন ও পুরাণের মূল তত্ত্বগুলি বাঙালী হিন্দু সমাজের গণ-জীবনের দৈনন্দিন ভাব ও চিন্তাধারার অপূর্ব অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকশিল্পের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'গুরুসদয় দত্তের কথায়, 'এই জাতীয় শিল্পিগণের ধ্যানে দেবতাগণও বাঙালীর রূপ ছাড়া অন্যরূপে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হন নাই। বাঙালীর সাধারণ জীবনকে দেবভাবে পরিকল্পিত করিয়া ইহারা জাতির আত্মাকে পরম গৌরবদান করিয়াছে। পটুয়া শিল্পীর বৃন্দাবন বাঙলা দেশে, অযোধ্যা বাঙলা দেশে, শিবের কৈলাস বাঙলা দেশে, তাহার কৃষ্ণ, রাধা, গোপগোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙালী। রামের বিবাহ হইয়াছে ছাতনা তলায়। পার্বতীর কাছে সব অলঙ্কার হইতে শাঁখার মর্যাদা ও আদর বেশী।"

পটচিত্র ও পটুয়াগীতি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। পটচিত্র পটুয়া-গীতির হুবহু প্রতিকৃতিমূলকভাবে আঁকা নয় অথবা পটুয়া-গীতিগুলিও পটের হুবহু বর্ণনাত্মক নয়। চিত্রে যা উহ্য থাকে গীতিকায় তার অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হয় এবং সঙ্গীতের যা উহ্য থাকে তার অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হয় চিত্রে। তাই পটচিত্র ও পটুয়াগীতির উভয়েরই নিজ নিজ ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা থাকলেও আসলে পটুয়াদের শিল্প পূর্ণতা লাভ করে পরস্পরের পূর্ণ সহযোগিতায়। পটুয়া-গীতিকে বাদ দিয়ে পট দেখলে অথবা পটকে বাদ দিয়ে পটুয়া-গীতি শুনলে কোনটাই সার্থকতা লাভ করে না। পটুয়া-গীতিগুলিতে মধ্যযুগীয় বাঙলা ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। বলাবাহুল্য যে পটুয়া-গীতিগুলি পুরুষানুক্রমে প্রায় একই রকম থেকে যেত।

যোগেন পটুয়া সম্বন্ধে যে জিনিসটি আমায় সবচেয়ে অবাক করে তা হচ্ছে এই যে, এই ১১০ বছরের বৃদ্ধ পটুয়ার তুলির আঁচড়েও এখনো কিন্তু জীবন্ত ছবি সৃষ্টি হয়ে থাকে যদিও চোখে সে এখন ভাল দেখতে পায় না এবং তুলি ধরতে গেলে তার হাত এখনো কাঁপে। সাধারণত হিন্দু দেব-দেবী, পৌরাণিক ছোটখাট কাহিনী ও বিভিন্ন মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে তার এখনকার আঁকা রেখা চিত্রের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ। বুড়ো বয়সের শিথিল হাতের ছাপ এই ছবিগুলির মধ্যে রয়ে গেলেও যোগেন চিত্রকর যে পটুয়া হিসেবে কত পারদর্শী ছিল এবং তার আঁকা পট যে পটুয়া শিল্পের নিদর্শন হিসেবে কত উৎকৃষ্ট একথার সত্যতা প্রমাণের মত গুণাবলী তার এখনকার আঁকা রেখা চিত্রগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। নিজের শিল্প-প্রতিভা সম্বন্ধে যোগেন পটুয়া এমনই সচেতন যে আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষণের জন্য তার এখনকার আঁকা কতকগুলি রেখা চিত্র আমাকে দেবার সময় সে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করে বলে, "বাবু, আপনি এগুলো নিয়ে যাচ্ছ বটে; কিন্তু আমার আপনাকে এগুলো দিতে মোটেই মন উঠছে না। অগ্রে যা* লিখতুম এখন তার ষোল আনার এক আনাও লিখতে পারি না। আমার এ পট কাউকে দেখাবার মত নয়—নেহাৎ আপনি বললে তাই লিখতে বাধ্য হলুম।" আহা, কি নির্মল অন্তর, কি সরল ও দরদভরা কথাবার্তা এই দরদী পটুয়ার—বাঙলার নিরক্ষর ধর্মপ্রাণ লোক-শিল্পী-গোষ্ঠীর সে যেন মূর্তিমান প্রতিনিধি।

কিছুদিন আগে আমি আরও একবার চণ্ডীপুর গিয়েছিলাম। যোগেন পটুয়া তখন রোগের কবলে। জীর্ণ কুটীরের এক কোণে একটা নোংরা ছেঁড়া কাঁথার উপর তার শীর্ণ দেহ পড়ে রয়েছে। চিকিৎসা বা সেবাশুশ্রূষার নেই কোন ব্যবস্থা। অসহ্য রোগ যন্ত্রণায় তার বাকশক্তি পর্যন্ত রহিত। কিন্তু আশ্চর্য, আতিথেয়তার হুঁশটুকু সে তখনো পর্যন্ত হারায়নি। আমাকে দেখে হাত তুলে সে নমস্কার জানালো। কি মর্মন্তুদ সে দৃশ্য! কত বড় প্রতিভা—কি পরিণতি! জানিনা যোগেন পটুয়া আজও বেঁচে আছে কিনা। তবে জানি যে তার মৃত্যুর খবর দুনিয়ার লোক জানতে পারবে না। নির্বিবাদে, বুকভরা ব্যথা ও অভিযোগ নিয়ে সে পৃথিবীর বুক থেকে চলে যাবে—যে পৃথিবী তাকে দিয়েছিল তার সরল ধর্ম-বিশ্বাস, দিয়েছিল তাকে পৌরাণিক গল্প ও উপাখ্যান, দিয়েছিল পট ও তা আঁকবার জন্যে তুলি রঙ ও প্রতিভা যা দিয়ে সে তার গ্রামিক শিল্পীমনের সোনার স্বপ্ন রচনা করে গেছে সারাজীবন ধরে—যে পৃথিবী তাকে দিয়েছিল দারিদ্র্য ও ক্ষুধার তাড়না, দিয়েছিল দুর্ভাগ্যরাশি—দেয়নি কেবল অন্ন, পেটভরা দুটো খেতে পাবার এতটুকু সুযোগ বিলাসিতা ও সুখের সামগ্রীর কথা দূরে যাক। যোগেন পটুয়ার অভাবে চোখের জল ফেলবে না কেউই—কেউই তার মৃত্যুতে দেখাবে না এতটুকু সহানুভূতি। তার বিচিত্র জীবনের মর্মন্তুদ ও করুণ কাহিনীর সামান্য স্মৃতিটুকুও কি লোকশিল্পের অনুরাগী রসিকবৃন্দের মনের কোণে পাবে না এতটুকু স্থান?

* পটুয়ারা পট আঁকাকে পট লেখা বলে থাকে। এই "লেখা" কথাটা থেকে আমরা তাদের সঙ্গে প্রাচীন চিত্রলেখকদের সংযোগের কথা অনুমান করতে পারি। "চিত্রলেখা" কথাটি অতি প্রাচীন। প্রাচীন ভারতে 'চিত্র' শব্দে অঙ্কিত ছবি ও খোদিত বা উৎকীর্ণ ভাস্কর্য শিল্প দুই-ই বোঝাতো। তখন তুলি দিয়ে আঁকা ছবিকে "লেপ্য" চিত্র ও উৎকীর্ণ চিত্র থেকে আলাদা করবার জন্যে "লেখ্য" চিত্র বলা হোতো এবং ছবি আঁকাকে বলা হোতো "চিত্রলেখন।" বর্তমানে পটুয়ারা 'চিত্রলেখা' কথাটির এরূপ অর্থ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থেকেও 'পট আঁকা' না বলে 'পটলেখা' কথাটাই ব্যবহার করে থাকে। বাঙলার পটুয়াগোষ্ঠী ছাড়াও ভারতের অন্যান্য যুগের কোন কোন চিত্রশিল্পী নিজেদের চিত্র-লেখক বলে পরিচয় দিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সভাশিল্পী আবুল হাসানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ "গোষান" নামক ছবিতে নাম স্বাক্ষর করবার কালে নিজেকে "রাকিম" বলে অভিহিত করেন। রাকিম অর্থে লেখক।

আমার বাবার নাম হরমোহন আইচ। আমি বাবার ছোট মেয়ে। তাঁর শেষবয়সের সন্তান। আমরা নয়জন ভাইবোন। সবচেয়ে বড় দিদি, তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। এখন দেরাদুনে আছেন। মাঝে সাতটি ভাই, তারপর আমি। আমার তাই খুব আদর ছিল। আমাকে বাবা আদর করে ডাকতেন ছুটকি বলে। বাবা বুড়ো হয়েছিলেন, মনটা তাই সেকেলে। সোহাগ ক'রে আমার ভালো নাম রেখেছেন ফুলেশ্বরী। ভারী বিশ্রী লাগে নামটা। বলতে কি, এমন নাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিতেই লজ্জা করে।

আমার আর একটা নাম আছে—মহুয়া। এ নাম ধরে আমাকে কেউ ডাকে না। এ কথা ভাবলেই খুব কষ্ট পাই।

আমার আরো একটা নাম আছে। উল বোনায় আমার হাত ছিল খুব পাকা; আর কাঁটা চলত খুব চটপট, তাই আমাদের ইস্কুলের সেজদিদিমণি আমার নাম দিয়েছিলেন একটা। বলতেন উলেশ্বরী। —এ নাম ধরেও কেউ ডাকে না, কিন্তু এতে কোনো কষ্ট পাইনে।

দৌলতপুরে আমরা অনেকদিন ছিলাম, সেখানেই আমার জন্ম। বাবা সেখানে প্রফেসার ছিলেন। তারপর সংসার বড় হয়ে গেল, সংসার চালানো তাঁর কঠিন হয়ে উঠল, তাই কলকাতায় মোটা মাইনের একটা চাকরি জোগাড় করলেন সদাগরী আপিসে। আমরা কলকাতায় এলাম। আমার বয়স তখন তেরো।

এখন আমার বয়স সাতাশ। তেরো বছর বয়সে দৌলতপুর থেকে কলকাতায় আসার রোমাঞ্চটা আজো মনে পড়ে। সেইটেই জীবনের স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকত, যদি-না মাঝখান থেকে জীবনের সঙ্গে এসে জুড়ে যেত—

নামটা লিখতে ভয় পাচ্ছি। এই লেখাটা যদি দৈবাৎ পাঁচজনের চোখে পড়ে তাহলে যে-গ্লানিটা এখন আছে আমার একার, তা হয়ে যাবে পাঁচজনের। আমার বাবাই বা আমাকে কি ভাববেন, আর আমার স্বামীই-বা আমাকে কী চোখে দেখবেন।

বাবার আমি আদুরে মেয়ে, বাবা বলতেন, তোকে আমি রাজার ঘরে বিয়ে দেব।

আমি জিজ্ঞেস করতাম, কোন্ রাজা, কোথাকার রাজা?

দাদারা আমাকে এই নিয়ে ক্ষ্যাপাত, রাতদিন আমাকে 'রাণী' 'রাণী' বলে পাগল করত, আমি রাগের ভান করে বলতাম, ধ্যেৎ।

আমার মেজদা দিনেন্দ্র ইতিহাস নিয়ে এম এ পড়ছিল, তার ধারণা ছিল সে সারা পৃথিবীর ইতিহাস জানে, তাই আমাকে কত দেশের রাণীর যে গল্প করেছে, তার শেষ নেই। আমি দেখেছি, সেইসব রাণীরা অনেক টাকাকড়িই ঘেঁটেছে, খুব বাবুগিরি করেছে, কিন্তু তাদের মনে সুখ ছিল না। তারা খুব কষ্ট পেয়েছে। এইসব শুনে রাণী হতে আমার খুব ভয় করত।

বলতাম, রাণী আমি হব না।

বাবা বলতেন, কেন রে?

উত্তর দিতাম না। বাবা হেসে বলতেন, তাহলে এক কাজ করব। তোর নাম ফুলেশ্বরী, তোকে এক মস্ত বাগানের মালিকের সঙ্গে বিয়ে দেব।

দাদারা আমাকে এই নিয়েও ক্ষ্যাপাতে আরম্ভ করল। আমাকে রাতদিন বলত—মালিনী। যেন, আমার কোনো মালীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। আমার রাগ হত, বলতাম, ধ্যেৎ।

এখন রাত হয়েছে অনেক। তেত্রিশ আপ ট্রেন চলে গেল। আমার ঘুম পাচ্ছে না। বুকে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে আমি লিখছি।

কলকাতায় এসে উঠলাম—রাস্তাটার আসল নামই না হয় লিখে ফেলি—কেয়াতলা লেন। বাবার এই নতুন চাকরি নেওয়ায় আমাদের অবস্থা অনেক ভালো হয়ে গেল। আজ আমি সাতাশ বছরের নারী, আজ আমি তা বুঝেতে পারি; কিন্তু তখন সেই তেরো বছর বয়সের মেয়ে হয়েও যে বুঝতে পারিনি, এমন নয়। ভালো খাওয়া-দাওয়া, ভালো-ভালো জামা-কাপড় তো হতে আরম্ভ করলই, তার উপর বাবার মেজাজও গেল বদলে। দৌলতপুরে তিনি কথায় কথায় মায়ের উপর চটে উঠতেন, এখানে এসে দেখলাম—বাবার আর মায়ের যেন নতুন করে ভাব হয়ে গেছে। আমার কিন্তু এসব ভালো লাগত না। দৌলতপুরে বাবাকে যতটা পেতাম, এখানে এসে ততটা আর পেতাম না—মায়ের উপর তাই বড় রাগ হত, বাবার উপরেও।

আমার মনটা তাই ঠেকত ফাঁকা ফাঁকা। এই ফাঁকাটা কিভাবে ভরাট করা যায়, আমি শুধু তাই ভাবতাম।

বাবা ডাকলেন, ছুটকি।

ছুটে তাঁর কাছে গেলাম। বললেন, ক'দিন থেকে দেখছি, তুই কী-যেন ভাবিস। এত কিসের ভাবনা তোর।

বাবার এই আদরের ডাক শুনে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। কিন্তু আমি তখন বড় হয়েছি, আর বাবার উপর মনে-মনে রেগে আছি, তাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, পরীক্ষা এসে গেল না?

বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন, মাকে ডাক দিয়ে বললেন, ওগো, শুনছো।

আবার মা কেন। আমাদের কথার মধ্যে আবার মাকে ডাকা কেন। আমি গুম্ গুম্ করে পা ফেলে চলে গেলাম।

বাবা বললেন, ছুটকি বেজায় রেগেছে।

শুনতে পেলাম মা বলছেন, তোমার আদরের দুলালী, সবার মাথা কিনে রেখেছেন। নুন থেকে চুন খসলেই ইয়ে আর-কি। আদর করা ভালো, আস্কারা দেওয়া ঠিক না।

বুঝতে পারলাম, আমিই শুধু মায়ের উপর রেগে নেই, মা-ও আমার উপর রেগে আছেন।

বাবাকে গিয়ে আমি বললাম, মার সঙ্গে কথা বলব না।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কেন।

—ইচ্ছে। এমনি। মা আমাকে ভীষণ গাল দেয়।

বাবা আমার মাথার উপর হাত বুলিয়ে বলতেন, ছি, বলতে নেই। জান না, জননী স্বর্গাদপি—

বললাম, থাক্ গে। শুনতে চাই নে।

কেয়াতলার বাড়িতে আসার পর দেড় বছরের উপর কেটে গেল। আমাদের অবস্থা আরো ভালো হয়ে উঠতে লাগল। বাবা বললেন, সব ভালো যার শেষ ভালো। এতদিন জীবনটা গেছে খুব কষ্টে, শেষের দিকে একটু যে সুরাহা হয়েছে—এই আনন্দ। ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলতে পারি এখন, তবেই রক্ষে।

মেজদা এর মধ্যে এম-এ পাশ করেই বাবার আপিসে ঢুকে পড়েছে। তাতেও বাড়ির আয় বেড়েছে। কিন্তু এত বাড়া সত্ত্বেও আমি কোনো-কিছুর কোনো সুরাহা দেখতে পেলাম না। বাবা ক্রমেই আমার থেকে তফাত হয়ে যেতে লাগলেন।

মাকে বললাম, তোমরা ভারি স্বার্থপর। বাবার সঙ্গে রোজ সন্ধ্যেয় বেড়াতে যাও, আমাকে নিয়ে যাও কখনো?

মা ঝামটা দিয়ে উঠলেন। আমার মনের ভিতরটা যে একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে, কিছুতে তা বুঝতে চাইলেন না।

বাবার এখন টাকা হয়েছে, আমাকে রাজার ঘরে দেবার যে স্বপ্নটা তাঁর দৌলতপুরে ছিল, এখন সেটা আর স্বপ্ন নয়। এখন ইচ্ছে করলে তিনি হয়তো সত্যিই তা পারেন।

সত্যিই, বাবা পেরে গেলেন। আমি আই-এ পড়ছিলাম, এক বছর ফেল করে গেলাম। বাবা বললেন, থাক্, আর পড়া দিয়ে দরকার নেই। এবার বিয়ে দিয়ে দিই।

বাবার বয়সও বেড়েছিল, আমাকে বিয়ে দিয়ে দিতে পারলেই তাঁর কন্যাদায় চোকে, এবং হয়তো নির্বিঘ্নে মাকে নিয়ে তীর্থ দেখতেও যেতে পারেন, তাই তিনি আমার বিয়ে নিয়ে উঠে-পড়ে লাগলেন। আমার বিয়ে হল। বয়স তখন আমার উনিশ। বিয়ে হল, এবং রাজার ঘরেই বটে—আমার স্বামী স্টেশনমাস্টার। অনেক আয় করেন।

বাবার আনন্দ ধরে না। আমার মনের কথাটা আমি বলব না। কেবল একটা কথা বলতে পারি যে, বাবার মুখের দিকে চেয়ে আমি বাবার কথায় আপত্তি করিনি—আর-কারো মুখের দিকে আমি তাকাই নি, আমারও না।

এতদিন মনের মধ্যে যে কথাটা চেপে রেখেছি, তা আর চেপে রাখতে পারছি নে, একজনকে ডেকে মনের কথাটা জানাব এমন লোকও নেই। তাই নিজের মনে লিখে যাচ্ছি, এ দিয়ে কার কি কাজ হবে জানি নে। শুধু জানি আমার মনের ভারটা একটু হালকা হবে।

যে কথা বলার জন্যে আজ এই কাহিনী লিখতে বসেছি, সে কথা কিছুতেই লিখতে পারছি নে। লিখেই কেটে দিতে হচ্ছে, কখনো-বা ঠিক ওই জায়গাতে এসেই কলমের কালী শুকিয়ে যাচ্ছে।—কেয়াতলার বাড়িতে আসার কিছুদিন বাদেই আমি প্রেমে পড়ি। কাক-কোকিল কেউ তা জানে না; কেবল আমি জানি আর জানে—

নামটা লিখতে ভয় পাচ্ছি। যা আমার একার গ্লানি, তা আমি দশের কলঙ্ক করে তুলি কী করে? আমি তাকে এতটা ভালো-বেসেছিলাম যে, কাল রাত্রে আমি তাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তার মনের দিকে তাকাবার আমার অবসর হয় নি, আমি আমার সুখের পথ থেকে কাঁটার মত তাকে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

মৃগাঙ্ক আজ ভোরে চলে গেছে। ইশ, নামটা হঠাৎ লিখে ফেললাম। লিখে যখন ফেলেছি, তখন আর কেটে দিতে চাই নে। থাক্। সে তো চলে গেছে। তার নামটা অন্তত থাক।

কেয়াতলার বাড়িতে আসার বছর খানেক পরের কথা। আমি তখন বাবাকে দৌলত-পুরের মত অত কাছে না পাওয়ায় তাঁকে জব্দ করার জন্যে নানারকম প্ল্যান করছি—বাবা আমাকে উপেক্ষা করে যে ভাবে কষ্ট দিচ্ছেন, বাবাকে ঠিক সেইভাবে কষ্ট দেওয়া যায় কী করে। সন্ধ্যের সময় বাবা ও মা বেড়াতে বেড়িয়ে যেতেন, দাদারাও ফিরে আসত না তখনো, আমি তখন একা। আমি দোতলার বারান্দায় একা একা দাঁড়িয়ে থাকতাম। আকাশের পশ্চিম দিকে চাপচাপ সাদা মেঘ দেখতে-দেখতে রক্তরাঙা হয়ে উঠত, বকের ঝাঁক দল বেঁধে উড়ে যেত পুবের দিকে, কেয়াতলার নির্জন রাস্তায় নারকেলগাছেরা পাতা নেড়ে নেড়ে খেলা করত আবছা অন্ধকারের সঙ্গে। টুপটুপ ক'রে ফুটে উঠত দু-একটা তারা, একটা ফ্যাকাশে বাঁকা চাঁদ ধীরে ধীরে হলুদ রঙের হয়ে উঠত। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম। ভাবতাম, জীবনে সকলেরই সঙ্গী আছে, কিন্তু আমার কোনো সঙ্গী নেই।

রোজ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকি, রোজ এই রকম সন্ধে-গোধূলি দেখি; কিন্তু এই সময় সামনের দোতলার বাড়ি থেকে আমাকে কেউ দেখে কি না জানতাম না। হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল। চোখে পড়ার পর থেকে আমি সেদিকে না তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতাম, যেন কিছুই আমি জানি নে, কিছুই আমি বুঝি নে। আমার বয়সও তখন খুব বেশি না, খুব বেশি বোঝারও কথা না। আমি তখন নাইনে পড়ি। আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম বাঁ-পাশের ছোট একটা বাড়ির দিকে চেয়ে। কেয়াতলাটা খুব নির্জন জায়গা। বেশি বাড়ি ওঠেনি, তাই যে-কোনো একটা অবলম্বন থাকা চাই, এইজন্যে বাঁদিকে কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে ঐ

বাড়িটার ছাতের দিকে চেয়ে থাকতাম। ছাতের সঙ্গে একটা মই লাগানো, ছাতে ঘ'ুটে শ্বকতে দেওয়া আছে, আর আছে নারকেল-গাছের পাতা।

আমি ইস্কুলে যেতাম। এক-একদিন দেখতাম ছেলেটা আমার পিছন-পিছন চলেছে। মজা লাগত। গায়ে একটা সাদা শার্ট, পরনে খাকির প্যাণ্ট, হাতে বড় বড় স্কেল। পরে শ্বনেছি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। দেখতেও মন্দ না। আমার পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় কী যেন মন্তব্য করত—ব্বঝতে পারতাম না। রাগ হত।

আমি ক্লাস টেন-এ উঠলাম। তখনো ছেলেটা আমার পিছনে লেগে। এর মধ্যে তার কয়েকটা মন্তব্য কানে গিয়েছে। বিশ্রী লেগেছে।

বাবা বললেন, জীবনে শ্রী যেমন দরকার, অর্থও তেমনি দরকার। আমার এই স্বশ্রী মেয়েটাকে আমি ভালো ঘরে বিয়ে দেবই। তাতে আমার যত টাকা লাগে।

মা বললেন, মান্বষ আসে নিজের বরাত নিয়ে, যার যেখানে হবার সেখানে হবেই।

আমি নাকি দেখতে খ্বব ভালো ছিলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং-পড়া ছেলেটা আমার পিছনে তাহলে কি লেগেছিল এই র্বপের জন্যেই?

আয়নায় দাঁড়িয়ে একদিন আমি আমার এই নিজের র্বপের দিকে চেয়ে আছি হঠাৎ দেখলাম সেই আয়নায় ছায়া পড়েছে আর একটি। টাটা রোদের মধ্যে ছাতে এসে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা।

আমি জামা গায়ে দিচ্ছিলাম, এই সময় তার কাণ্ড দেখে আমি চটে গেলাম। ছ্বটে গিয়ে টেনে আনলাম মাকে।

মা আমাকেই ধমক দিলেন। আমি দরজার পরদা না ফেলে অসাবধানে কাজ করি কেন, এ নাকি আমারই অন্যায়।

ছেলেটা নিশ্চয় ভয় পেয়ে গেছে। ক'দিন সন্ধেয় আর তাকে দেখলাম না; স্কুল যাবার পথেও না। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এই ভাবে দিন চলেছে। বাবা ও মা সন্ধের সময় নিয়মিত বেড়াতে চলে যান। আমি গিয়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়াই। সেই রক্ত-সন্ধ্যা, সেই বকের সার—আমি চেয়ে চেয়ে দেখি, আর ভাবি—যদি ঐসব ছবি এ'কে রাখতে পারতাম।

সামনের ছোট বাড়িটায় আলো জ্বলে। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই একটা হারিকেন এঘর ওঘর করছে। তারপর এসে সেটা রাখা হয়, এ ঘরের টেবিলে। কে-যেন পড়তে বসে মাথা নীচু ক'রে। আমি দেখার চেষ্টা করি, দেখতে পাইনে। বেশি রাত্রেও এক এক দিন এসে উ'কি দিই, কিন্তু দেখি একটা মাথা নীচু হয়েই আছে।

বাবা বললেন, টাকা দরকার। কিন্তু টাকা হলে মান্বষের সাবধান হওয়া দরকার। রাশ আলগা দিলেই তা না হলে অমান্বষ হয়ে যেতে হয়।

কথাটা আমার মনের মত লাগল। বাবা যে এখন আমাকে এমন তফাত ক'রে দিয়েছেন, এ নিশ্চয় তাঁর টাকার জন্যেই। বাবা যখন জানেন, তখন রাশ কেন টেনে ধরছেন না।

মা চান করে এসে চুল ঝাড়ছিলেন; বাবার কথা শ্বনে বললেন, ব্বড়ো বয়সে বউ হলে প্বর্বষরা বউ-পাগলা হয় শ্বনেছি, ব্বড়ো-বয়সে টাকা হয়েও তুমি যে তেমনি টাকা-পাগলা হলে। সব কথায় শ্বধ্ব টাকা আর টাকা।

বাবা একটা রসিকতা করলেন। চাপা গলায় বললেন, বউ যখন এ বয়সে নতুন ক'রে হল না, তখন তার বদলে কিছ্ব নিয়ে তো পাগল হব।

মা চুলের উপর গামছার একটা বাড়ি দিয়ে বললেন, মেয়ে বড় হচ্ছে না? ব্বদ্ধিস্বদ্ধি লোপ হয়ে গেল দেখছি।

কেয়াতলায় আমাদের প্রতিবেশী বিশেষ ছিল না। দৌলতপ্বরে আমাদের যেমন এবাড়ি-ওবাড়ি যাতায়াতের স্বযোগ ছিল, এখানে তা না থাকায় ভালো লাগত না। সন্ধেয় বারান্দাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি এই-সব কথা ভাবতাম। একদিন এই রকম ভাবছি, হঠাৎ শ্বনি সিটি দিয়ে আমাকে কে-যেন ডাকছে। চেয়ে দেখি, সেই ছেলেটা।

ভিতরে চলে এলাম। পরদিন থেকে বারান্দায় যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। জানলায় বসে বসে সন্ধে দেখতাম, আর দেখতাম বকের ঝাঁক। বাঁ-পাশের ছোট বাড়িটার ছাতে বসে দ্ব-একটা কাক ডাকত। একট্ব পরেই চারদিক হয়ে যেত অন্ধকার।

আমি ফাঁদে পা দিয়ে ফেললাম। আমার অজানিতে, আমার অনিচ্ছায়। আমি একদিন সন্ধ্যার একট্ব আগে ঐ বাড়িতে গেলাম। অনেক দিন থেকে এই বাড়িটা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে কৌতূহল ছিল, আজ তা প্বরণ হল।

উঠোনে ব'সে এক ব্বদ্ধা নারকেলের পাতা চে'ছে কাঠি বা'র করছিলেন। আমি যে তাঁর সামনের বাড়ির লোক, তা নিশ্চয় জানতেন, আমাকে দেখেই তিনি উঠে এসে আমাকে বসতে দিলেন, ডাকলেন, এই ম্বগ, দেখ্ কে এসেছে।

আমি তাকে দেখার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে তাকালাম। ম্বগাঙ্ক এসে দাঁড়াল। একেই তাহলে দেখি রোজ টেবিলে মাথা গ'বজে ব'সে থাকতে।

আমাদের ধনদৌলত হয়েছে, তাই দৌলতপ্বরের জীবন আমরা একেবারে ভুলে গেছি। আজ হঠাৎ এই বাড়িতে এসে যেন সেই প্বরনো আটপৌরে জীবনের সাক্ষাৎ পেলাম।

রোগা লম্বা আর কালো, চোখে প্বর্ব কাঁচের চশমা। খ্বব লাজ্বক বলে মনে হল। আমার কেন-যেন ভালো লেগে গেল একে।

ব্বদ্ধা বললেন, এম-এ পাশ দিয়েছে গেল বছর। চাকরি করতে বলি। বলে, চাকরি করব না।

ম্বগাঙ্ক লজ্জা পেয়ে গেল। কিছ্ব বলল না। আমার দিকে কিছ্বক্ষণ চেয়ে থেকে ঘরে চলে গেল।

জীবনের প্রথম আমল থেকে যে-জীবনের সঙ্গে পরিচয়, যে-জীবন আমার রক্ত-মাংসের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে, কেয়াতলার এই জাঁকজমকের জীবনের সঙ্গে তার কোন মিল পাইনে। রোজ সন্ধ্যায় তাই আমি চলে যেতাম ওই বাড়িতে।

আমার মত শ্রোতা পেয়ে অনেক কথাই ধীরে ধীরে বলত ম্বগাঙ্ক। ছোট একটা চাকরি নিয়ে জীবনকে টানা স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া আত্মহত্যারই শামিল। সে চায় শ্বধ্ব পড়তে আর পড়তে, নিজের যাতে উন্নতি হয় তাই তার কাম্য—তাতে যদি দৈন্য না ঘোচে, না ঘ্বচুক। দ্বটি তো প্রাণী—মা ও সে—এক রকম ক'রে চলে যাবে।

তার কথায় ধার ছিল না, কিন্তু ভার ছিল। আমি বসে বসে শুনতাম। আর রোজ যেতে ইচ্ছে করত, আর কিছু না, তার কথা শুনতে।

মা একদিন ধমক দিলেন। বললেন, কক্‌খনো যাবে না যেখানে-সেখানে। আবার যদি যেতে দেখি তাহলে পা ভেঙে দেব।

মায়ের রূঢ়তার প্রতিবাদ করি নি। যাওয়া বন্ধ করেছি। আজ মনে হয়, মা যদি অমন বাধা না দিতেন, তাহলে আমার ভালো-লাগাটা ঐ পর্যন্তই হয়তো থাকত, আর বাড়ত না।

একটা সামান্য স্রোতের মুখে মাটি চাপা দিলে সে উপছে ওঠে। আমারও হল সেই দশা। আমার মনের কথাগুলো যেন উপছে উঠতে লাগল।

উপরের জানলায় বসে আমি খড়খড়িতে খুটখুট ক'রে আওয়াজ করছি, কিন্তু ওবাড়ির জানলার ভিতরের নীচু মাথাটা কিছুতেই ওঠে না। একবার জোরে আওয়াজ করতেই পাশের ঘর থেকে মা বললেন, কী রে?

বললাম, বেজায় মশা।

মৃগাঙ্ক রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই আমি ছুঁড়ে দিলাম একটা কাগজের ছোট গুলী। ওর ভিতর আমার মনের উপছানো কথা-গুলো জমা আছে।

জড়তার যে বাধা ছিল, আমি এই ঘা দিয়ে সে বাঁধ ভেঙে দিলাম। অজস্র ধারায় বয়ে চলল স্রোত। আমরা সেই স্রোতে গা ভাসালাম।

মৃগাঙ্ক বলল, কবে কে দেখে ফেলে তার ঠিক নেই।

বললাম, দেখুক। বয়ে গেছে।

মৃগাঙ্ক মুচকে হেসে বলল, সাহস থাকা ভালো। কিন্তু দুঃসাহস ঠিক না।

গড়ের মাঠের বড় বড় ঘাসের উপর পা ফেলতে ফেলতে দুজনে গিয়ে বসলাম একটা ফাঁকা জায়গায়। ডানে বাঁয়ে সম্মুখে পিছনে চারদিকে ভিড়, সকলে ফুটবল পিটছে। এত ভিড়ের মাঝখানেও জায়গাটা খুব ফাঁকা ঠেকল।

মৃগাঙ্কর কথা ছিল খুব পালিশ-করা, চালচলনে সে খুব সতর্ক ও সাবধান। আর, সে ছিল সামান্য একটু ভিতুই। তার চোখেমুখে যখন এই ভয়ের ভাবটা ফুটে উঠত, তখন তাকে, সত্যি বলছি, ভারী মিষ্টি লাগত আমার।

মাঠের ঘাসের উপর থেকে রোদ সরে গেছে। বিশাল একটা সবুজ গালিচার মত দেখাচ্ছে এটা। আমরা দুজন প্রায় মুখো-মুখী বসে। তার মুখের দিকে তাকালাম, চোখের কাঁচে ঘাসের ছায়া পড়েছে, সাদা ধবধবে জামার সঙ্গে তার মুখের কালো রং যেন মানিয়েছে অদ্ভুতভাবে, আমি তার হাত চেপে ধ'রে বললাম, তুমি আমার কি সর্বনাশ করেছ জান না।

আমার কথা শুনে চমকে উঠল মৃগাঙ্ক, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, কি করলাম?

—কিছু না। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।

আমি আমার মনের আসল কথাটাই বলে ফেলে লজ্জা পেলাম। সর্বনাশ ছাড়া কি। তাকে যদি জীবনে না পাই, তাহলে সেটা কি সর্বনাশ নয়।

মৃগাঙ্ক কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, হয়তো ভুলপথে চলেছি আমরা। এ-পথ হয়তো আমাদের পথ নয়। এই ছেলে-খেলার জন্যে হয়তো পরে খুব কষ্ট পেতে হবে।

বললাম, হোক কষ্ট। কষ্টকে ডরাই নে।

আমি ব'সে ব'সে তার কাপড় থেকে চোর-কাঁটা খুঁটেখুঁটে তুলে দিতে দিতে বললাম, তুমি বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দয়।

প্রতিবাদ করল না মৃগাঙ্ক, কেবল হাসল।

বললাম, মন ভরে না। এত বড় একটা পৃথিবী, আমাদের জন্যে এখানে এতটুকু জায়গা নেই।

নিস্তব্ধ রাত্রি ভেদ ক'রে চলেছে ভারি মালগাড়ি। মনে হচ্ছে, আমার বুকের উপর দিয়েই যেন চলেছে ওটা। জানলা দিয়ে দমকা হাওয়া এসে হারিকেনের শিখায় ধাক্কা দিয়েছে—দপদপ করে উঠেছে আলো। আমি কোনো দিকে না চেয়ে এক মনে লিখে চলেছি। এ লেখার হেতু কি, মানে কি—কিছু জানি নে। একদিন মনের মধ্যের জমানো কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়েছিলাম মৃগাঙ্কের উদ্দেশে, আজ আবার বুঝি তেমনি একথাগুলোও ছুঁড়ে ফেলে দেব—সেদিনও হাল্কা হয়েছিল মন, আজও হয়তো তাই হবে। কিন্তু আজকের এ লেখা কা'র হাতে প'ড়ে নতুন কোন্ সংকট সৃষ্টি করবে জানি নে।

মার উপর রাগ করে আর কোনো দিন যাই নি মৃগাঙ্কদের বাড়ি। কিন্তু, আজ অকপটে জানাতে আনন্দ হচ্ছে যে—প্রায় প্রত্যহ মৃগাঙ্কর সঙ্গে দেখা আমার হয়েছে।

আমি ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ঢুকেছি। কেয়াতলা থেকে আমার কলেজ ছিল অনেক দূরে। আমাদের দেখা হত প্রায় রোজ।

—কেন, এই যে এত বড় মাঠ। এই বিরাট আকাশ, তার নীচে এই জায়গাটা মন্দ কি।

তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললাম, কিছু বোঝ না তুমি।

মৃগাঙ্ক বলল, বুঝি। পাই কোথায়?

খেলার মাঠে ঘুরে ঘুরে একঘেয়ে হয়ে গেল। একটু নির্জনতা, একটু নিভৃতি না হলে কিছুতেই মন যেন ভরে না। কিন্তু আমাদের জন্যে তেমন কোনো জায়গা নেই।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে ঢুকলাম আমরা জাদুঘরে। বড় বড় মূর্তিরা আমাদের দুজনকে দেখে যেন পাথুরে দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রইল। এই মূর্তিগুলির চোখের সামনে মৃগাঙ্কর গা ঘেঁষে দাঁড়াতে পারলাম না। তার হাত ধরে টানলাম। মৃগাঙ্ক বলল, দ্যাখো দ্যাখো, নতুন এসেছে। দুর্গামূর্তি—হায়দরাবাদ থেকে।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ঘরে চলে এলাম আমরা। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সাজানো। এইখানে আমরা দুজন এসেছি যেন আদিম দুজন অভিযাত্রী, প্রাগৈতিহাসিক পিপাসা নিয়ে। একেবারে নির্জন ঘর, মৃগাঙ্ক আমাকে আকর্ষণ করল। আমি বিরাট একখণ্ড পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে মাথা রাখলাম। মৃগাঙ্কর হাত কাঁপছিল। সেই হাত দিয়ে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হয়ে ওপারের মাঠ ডিঙিয়ে চললাম দুজন।

মৃগাঙ্ক আমার হাত ধরে জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, বলতে ইচ্ছে করছে—আমরা দুজনে দুর্গম পথে পন্থী।

বললাম, ইচ্ছে ক'রে দরকার কী? বলই না!

মৃগাঙ্ক আজ যেন নতুন চেতনায় সচকিত হয়ে উঠেছে, তার মুখে আজ বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিচ্ছে হাসি। আমরা বসলাম, মৃগাঙ্ক ফিস ফিস করে বলল, কানে কানে বলতে ইচ্ছে করছে নতুন কথা, ইচ্ছে করছে নতুন নাম ধরে ডাকতে।

—কি নাম?

মৃগাঙ্ক বলল, মহুয়া।

তার হাত ধরে বললাম, মনে থাকবে, চিরদিন মনে থাকবে এই কথা?

মৃগাঙ্ক বলল, তা বলতে পারিনে। আসছে কাল কি ঘটবে, তাই যখন বলতে পারিনে, আমরা যখন এতটাই অসহায়, তখন চিরকালের কথা বলি কি ক'রে। কিন্তু এটা ঠিক—এখন মনে হচ্ছে, এ যেন চিরকালই মনে রাখার মত।

আমাদের জীবনে এসে গেল বন্যা। গঙ্গায় নৌকো ভাসালাম আমরা। বড় বড় ঢেউয়ের উপর দিয়ে নাগরদোলার দোল খেতে খেতে আমরা পৌঁছলাম, মাঝগাঙে।

বললাম, সাঁতার জানিনে। যদি নৌকো উলটে যায়।

মৃগাঙ্ক নির্লিপ্তের মত বলল, তাহলে কিন্তু ভীষণ বিপদ। সব জানাজানি হয়ে যাবে।

—কি?

আমাদের এই প্রেমোপাখ্যান। তারচেয়ে এক কাজ ক'রো, পিঠের দিক থেকে গলা জড়িয়ে ধ'রো আমার।

বললাম, আচ্ছা।

যতক্ষণ নৌকো ওপারে না ভিড়ল, ততক্ষণ আমি প্রায় দম আটকে বসে রইলাম। প্রাণের ভয়ে হয়তো ততটা নয়, যতটা জানাজানি হবার ভয়ে।

পৃথিবীতে শান্তি নেই কোথাও। তার উপর মৃগাঙ্ক বড় ভিতু ধরনের। আমরা বটানিকাল বাগানে গিয়ে বসেছি একটা গাছের তলায়। রোদের আলপনা যেন আঁকা হয়েছে সেখানে, পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ পড়েছে এমনি পরিচ্ছন্নভাবে। সেই আলপনার উপর আমরা দুজন সন্তর্পণে এসে বসলাম যেন উৎসব করতে। মৃগাঙ্ক শুয়ে পড়েছে, তার মাথাটা আমি তুলে নিলাম আমার কোলের মধ্যে।

মৃগাঙ্ক বলল, এ যদি রোদ না হয়ে হত জ্যোৎস্না।

বললাম, তাহলে এ বাগানকে আমি বলতাম কুঞ্জ।

মৃগাঙ্ক আমার কোলের মধ্যে মাথা ঘষে চোখ ঘুরিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, কি বলতে জানতে চাইনি, কি করতে তাহলে।

নিশ্বাস ফেলে বললাম, তাহলে তোমাকে আমি আরো ভালো করে চাইতাম। তুমি জান না, তুমি আমার কি সর্বনাশ করেছ।

মৃগাঙ্ক লাফ দিয়ে উঠে বসল, বলল, তার মানে।

তার কাঁধে হাত বুলিয়ে বললাম, রেগ না। আমাকে তুমি গ্রাস করেছ। তোমার কথা চিন্তা ছাড়া আমার আর কোনো চিন্তা নেই। তুমি বিদ্বান, তুমি বুদ্ধিমান। তুমি এত বোঝ, এটুকু বোঝ না যে আমার মনের মধ্যে কি রকম আলোড়ন চলেছে। তোমাকে আমি যেমন ভাবে চাই তা যেন পাইনে, কোথায় যেন ফাঁকা, কোথায় যেন ফাঁকি। আমার মনে তাই একটা হাহাকার আছে।

একসঙ্গে হাহাকার করে উঠল যেন কা'রা। ঝরা শুকনো পাতা বেজে উঠল মচমচ শব্দে। চেয়ে দেখি চার-পাঁচটা ছেলে। অট্টহাস্য করে তারা এই দিকে এগিয়ে আসছে।

মৃগাঙ্কর মুখ শুকিয়ে উঠল। ফিসফিস করে বলল, বিপদ বাধল দেখছি।

বললাম, চুপ কর। যা বলার আমি বলব।

—কি বলবে?

—তা দিয়ে দরকার কী?

ছেলেরা অল্প দূরে এসে জড়ো হয়ে যেন তামাশা দেখছে, এইভাবে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর শুকনো পাতা পা দিয়ে গুঁড়ো করতে করতে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করতে আরম্ভ করল।

আমি উঠে তাদের কাছে গিয়ে বললাম, কী চাই তোমাদের। স্বামী-স্ত্রী ব'সে একসঙ্গে কথাও বলতে পারবে না তোমাদের জন্যে।

কথাটা এমন ভাবে বললাম, যাতে মৃগাঙ্ক না শুনতে পায়। ছেলেরা কথাটা মানল কি না বুঝতে পারলাম না, একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল মাত্র।

আমার জীবন হয়ে উঠল মৃগাঙ্কময়। সামনের বাড়ির ইঞ্জিনিয়ারিং-পড়া ছেলেটাকে আর আমি ভয় পাইনে। আমার জীবনে আমি যেন পেয়ে গেছি অদৃশ্য একটা রক্ষাকবচ। আমার শিরায় শিরায় তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এখন নূতন সংগীতের সুর বেজে চলেছে।

বাড়িতে আমি আছি নীরব ও নির্বিকার। অনেক রাত্রে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলে একবার গিয়ে দাঁড়াই উপরের বারান্দায়। দেখতে পাই, জানলার ওপাশে টেবিলের উপর হারিকেন, তার কাছে একটা ঝুলন্ত মাথা। আর দেখতে পাই, দোতলা বাড়িটার ছাতে পায়চারী করছে একটা ছায়া।

এত কাছে থেকেও এত দূরে, একথা ভাবতেই যেন কেমন লাগে। আরো আশ্চর্য লাগে—ওই লোকটা আমার এমন আত্মার আত্মীয় তা আমরা দুজন ছাড়া কাক-কোকিল কেউ জানে না।

আমি যে আমার জীবনের এই নিভৃত কাহিনীটা লিখে চলেছি, তাও কেউ জানে না। আমার স্বামী রাশভারী লোক, তাঁকে আমি ভালোবাসি কি না জানিনে, তবে তাঁকে শ্রদ্ধাও করি ভক্তিও করি ভয়ও করি। তিনি পাশের কামরায় অকাতরে ঘুমুচ্ছেন, তাঁর নাক ডাকছে। আমার সত্যিই দুঃসাহস, হারিকেনের আলো জেলে আমি পাতার পর পাতা লিখে চলেছি এভাবে। এ আর

কী দুঃসাহস, এর চেয়েও বড় দুঃসাহস গেছে আমার গত রাত্রে। সে কথা এখন থাক। চৌত্রিশ ডাউন যাবার সময় হয়ে এসেছে। ভোর হতে আর খুব বেশী দেরী নেই। তার আগে লেখাটা সেরে ফেলা চাই। এই ঝোঁকে না শেষ করলে আর হয়ে উঠবে না।

আমি পরীক্ষায় ফেল করায় বাবা মনে মনে খুব রাগ করলেন, প্রকাশ করলেন না। তিনি যে এতে আঘাত পেয়েছেন তা বুঝতে পারলাম। বাবা কিছু প্রকাশ করলেন না বটে, কিন্তু প্রকাশ করলেন মা। তিনি বললেন, আর ঘরে রাখা ঠিক না। টাকার শ্রাদ্ধ করে আর দরকার নেই। এবার মানে মানে বিদেয় কর।

বিদেয় করার জন্যে বাবাও হয়তো তৈরি ছিলেন। তাঁর এখন আর কোনো ভাবনা নেই। জমি কিনেছেন, বাড়ি উঠছে। সুখের ঘর বাঁধবেন, এখন আমিই তাঁর যেন একমাত্র গলগ্রহ।

কথাবার্তা এদিকে পাকাপাকি হয়ে গেছে কবে জানিনে, যেদিন জানলাম সেদিন আমি চুপ করে বসে রইলাম। কথাটা মৃগাঙ্কর কানে গিয়ে পৌঁছল কি না, এইটেই আমার লজ্জা। রাজার ঘরে আমাকে বিয়ে দেবার জন্যে যাঁর বরাবরের শখ, তাঁর কাছে গিয়ে মৃগাঙ্কর কথা বলি কী ক'রে? মনে হল, ইঞ্জিনিয়ারিং-পড়া ছেলেটার ডাকে সাড়া দিলেই হয়তো ভালো হত। বড়লোকের ছেলে সে, তার কথা বললে বাবা হয়তো রাগ করতেন, কিন্তু আঘাত পেতেন না এবং রাজিও হয়ে যেতেন। তাহলেও আমার জীবনের আকাশেও এই পরিপূর্ণ মৃগাঙ্কের উদয় হত না। কিন্তু মৃগাঙ্ক আমার চোখে যা-ই হোক, আমার বাবার চোখে তার কি কোনো মূল্য আছে?

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম দিন কয়েক, মৃগাঙ্কর সঙ্গে আর দেখা করতে পারলাম না। আমার কেবলই মনে হতে লাগল সে আমাকে ভুল বুঝে বুঝি-বা ঘৃণা করছে। কেবলই মনে হতে লাগলো, সাধ করে কেন গরীব হয়ে আছে ও, কেন একটা কাজ ও নিচ্ছে না।

জীবনের একটা পর্ব যেন শেষ হয়ে গেল। এখন এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। আমি সেই অধ্যায়ের অধিনায়িকা। আর নায়ক হচ্ছেন আমার স্বামী ত্রিপুরারি মুনশি। অল্পবয়সে তিনি স্টেশনমাস্টার হয়েছেন। স্টেশন যেমনই হোক, তিনি তার মাস্টার—এইটেই তাঁর গর্ব। এবং বলতে কি, আমারও।

বদলির চাকরি। অনেক স্টেশন ঘুরেছি। বাংলার মধ্যেই ছিলাম এতদিন। কিছু দিন হল এসেছি এখানে, বাংলার সীমানা থেকে বাইশ মাইল দূরে। স্টেশনগুলির নাম আর লিখলাম না। তা দিয়ে আমার কাজও নেই। আমার কেন, কারোই তা দিয়ে দরকার নেই।

খুব ধুম ক'রে বিয়ে হল আমার। সানাই বাজল, ব্যাগপাইপ বাজল, আলোর ঝাড় জ্বলল। সূর্যের তীব্র আলোর তেজে যেমন আবছা হয়ে যায় চাঁদ, এই আলোর দাপটে তেমনি নিভে গেল মৃগাঙ্ক। কিন্তু সে নিভল না আমার মন থেকে। আমার মনের আকাশে আর তো কোনো আলো নেই, কেবল তার দীপ্তিটাই আমার সম্বল, আর সে দীপ্তিটাও তাই উজ্জ্বল হয়েই রইল। মৃগাঙ্ক নিশ্চয় আমার মনের এ ছবিটা কখনো কল্পনাও করেনি, সে আমাকে নিশ্চয় ভুল বুঝেছে। যা বুঝুক, পুরুষরা অমনি ভুলই বুঝে থাকে।

আমি আর মহুয়া নই, আমি এখন ফুলেশ্বরী মুনশি। আমার দৌলতপুর ইস্কুলের সেজদিদিমণির দেওয়া নামটাও এখন ব্যর্থ হয়ে গেছে, আর আমি উল্ নিয়ে বসিনে। আমার এই আট বছরের বিবাহিত জীবনে আমার ঘরে এসেছে দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। তারা পাশের ঘরে তাদের বাবার কাছে ঘুমচ্ছে।

জীবন এমন বদলে গেল, এমন রকমারি হয়ে উঠল, তবু পুরাতন স্মৃতিটা কেন যেন মুছল না।

এই আট বছরের মধ্যে বার-চারেক কলকাতায় গিয়েছি, কিন্তু কেয়াতলার রাস্তায় আর যাওয়া হয়নি। বাবা উঠে গেছেন নতুন বাড়িতে। আমার জীবন থেকে কেয়াতলাটা স'রে গেছে, কিন্তু ম'রে যায়নি। ইচ্ছে করছে, একদিন অন্তত ঐ রাস্তা দিয়ে গিয়ে দেখে আসি তার এখনকার চেহারাটা। আর কিছু হেরফের হল কিনা এর মধ্যে।

এমন সময় আবার বদলির ডাক এল। এক জায়গায় শিকড় গাড়তে-না-গাড়তেই সব উপড়ে নিয়ে অন্যত্র রওনা হওয়া লেগেই আছে। বাবা বলেন এবং আমার স্বামীও বলেন, বড় চাকরির ঐ নাকি ল্যাঠা।

আমরা এখানে এলাম। বাংলার সীমানা থেকে বাইশ মাইল দূরে। রিজার্ভ-করা গাড়ি আমাদের, লটবহর নিয়ে এসে সদলবলে নামলাম। নতুন মাটিতে পা দিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করতে হবে।

কুলীর মাথায় মাল তোলাচ্ছি, হঠাৎ চোখ পড়ল স্টেশন-ঘরের দরজায়। যেন চেনা, যেন জানা। চোখটা আটকে গেল। পাথরের

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আমার দিকে পাথুরে দৃষ্টিতে তাকিয়ে কে ও?

চোখ নামিয়ে নিলাম। কিন্তু বুক কাঁপতে লাগল দুরু দুরু করে। বাচ্চাদের সামলাব, না, নিজেকে সামলাব—বুঝে পেলাম না।

অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন মাস্টাররা এসে দাঁড়িয়েছেন, কুলীরা এসেছে ভিড় করে। যেন বরযাত্রী এসেছি আমরা।

সেই ভিড়ের মধ্যে আবার চোখে পড়ল একটা চেনা মুখ, একটা জানা চোখ। কথা বলতে পারলাম না। এই ভিড় ডিঙিয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হলাম।

কুলীর দল চলেছে সার বেঁধে আগে আগে, আমরা পিছনে। পিছন থেকে তীব্র আকর্ষণ বোধ করতে লাগলাম, কিন্তু ফিরে চাইতে পারলাম না। আমরা চলে এলাম কোয়ার্টার্সে।

বললাম, কি জায়গায় এলে? আবার বদলির ব্যবস্থা দেখ। বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

গায়ের ধড়াচূড়ো ছাড়তে ছাড়তে আমার স্বামী বললেন, আমাকে একথা বলে লাভ কি। আমাদের বড়সায়েবকে গিয়ে বল।

আমাদের মনে হতে লাগল, এ দেশটা বুঝি ভূমিকম্পের দেশ। এখানকার মাটি সব সময়ই কাঁপে। আমি পা ঠিক রাখতে পারিনে। রাত্রে ঘুম হয় না, দিনে বাইরে বেরতে পারিনে।

মৃগাঙ্ক এখানে বুকিং ক্লার্ক। ক'দিন বাদে শুনলাম। তাকে এর আগে দু'বার বলেছি যে সে আমার সর্বনাশ করেছে। কিন্তু সে সর্বনাশকে সে নিশ্চয় সর্বনাশ বলে ধরেনি। তাই আমার সত্যিকার সর্বনাশ করার জন্যেই আগাম এখানে এসে বসে আছে। সেই চাকরিই সে নিল, হয়তো আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই।

আমার স্বামী নাকি কিছুদিন থেকেই আমাকে লক্ষ্য করছেন, বললেন, অত শুকিয়ে উঠলে কেন।

হাতের রুলি পাক দিয়ে বললাম, কী জানি। এগুলোও দেখছি বড় হচ্ছে এখন হাতে। এ-মাটি আমার সহ্য হচ্ছে না।

—তোমার বাবার ইচ্ছে ছিল তোমাকে রাজরাণী করার। তাই হলেই ভালো হত।

না না। তা বোধ'য় হত না ভালো। আমাকে গরিব-ঘরে দিলেই হয়তো সুখে থাকতাম আমি।

দিন দিন আমার অসহ্যবোধ হতে লাগল সব। আমার পাগল-পাগল ঠেকতে লাগল। আমি মরিয়া হয়ে উঠতে লাগলাম। কি ক'রে এই ভীষণ অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি এই হল চিন্তা।

হরমোহন আইচের কন্যা আমি, ত্রিপুরারি-মুনশির স্ত্রী। কিন্তু এ পরিচয় যেন আমার আসল পরিচয় নয়। আমার নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ আলাদা। সে হচ্ছে আমার সেই নতুন নামটা।

দূরে-কাছে ওই গাছের মিছিল, ওরা যেন আমারই সগোত্র। ওদের নামের সঙ্গে আমার একটা অজ্ঞাত নামের যোগ আছে। সাঁওতাল মেয়েরা যখন নাচে আর গান গায়, তখন বার-বার ঐ নামটা উচ্চারণ করে আমাকে কেবলই বিব্রত করে তোলে।

সাঁওতাল পল্লী কাছেই। তাদের কাউকে দেখলেই আমি ভয়ার্ত হয়ে উঠি। মনে হয়, ওদের গায়ে যেন আমার নামের বিজ্ঞাপনটা আঁটা।

তেত্রিশ আপ চলে গেল। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। আমাদের কোয়ার্টার্সে সকলে অকাতরে ঘুমিয়ে। অভিসারে ঠিক নয়, আমি অভিযানে বের হয়ে পড়লাম। দরজার কব্জায় শব্দ হতেই থমকে দাঁড়ালাম। আবার ফিরে গিয়ে দেখলাম সকলে ঠিকমত ঘুমুচ্ছে কি না। আমি শক্ত হয়ে নিয়েছি, পা তাই আর কাঁপছে না। একটা নীলাম্বরী প'রে নিয়েছি, অন্ধকারে যা'তে মিশে যেতে পারি।

রাস্তা কম নয়। সান্টিংএর লাইনের ওপারে তার বাড়ি। মাঝে মাঝে আবার গাদি করা স্লিপার। সব এড়িয়ে আমি চললাম হন হন ক'রে। সিগন্যালের আলো-গুলো মাথা উঁচু ক'রে লাল লাল চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু আমার আর কোনো ভয় নেই। তিলে তিলে ক্ষয় হওয়ার চেয়ে এক ধাক্কায় একটা কিছু হয়ে যাক।

কড়া নাড়লাম। একবার, দুবার, তিন বার। সাড়া এল, কে?

বললাম, আমি।

নিশির ডাক নয়, এই গভীর নিশিতে কেবল তাকে ডাকতে এসেছি।

মেয়ে-গলা শুনে হয়তো সে চমকেছে। আমার গলার স্বরের কোনো পরিবর্তন হয়নি, তার কি মনে নেই এই গলা?

—আমি কে?

এবার বললাম চিনবে না। আমি। আমি মহুয়া।

আলো হাতে নিয়ে দরজা খুলে মৃগাঙ্ক এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য হয়ে গেছে সে। আলো তুলে ধ'রে বলল, তুমি? কেন?

—অনেক দিয়েছ, অনেক পেয়েছি। আর একটু চাই।

ব্যস্ত হয়ে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল সে। টেবিলের উপর আলো রেখে বলল, মনে আছে তাহলে।

—আছে। যা তুমি ভেবেছ আমাকে সব ভুল ভুল ভুল। আমি ম'রে যাব, আমাকে বাঁচাও।

মাথা নীচু করে দাঁড়ালাম, তার চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না, সে-চোখে কেবল বেদনা নয়, ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণাও আছে।

বললাম, তুমি চলে যাও এখান থেকে।

মৃগাঙ্ক শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলল। জবাব দিল না।

আর কোন কথা না বলে আমি পালিয়ে এসেছি।

কাল রাত্রের আমার এই দুঃসাহস কী করে হল আমি জানি নে। যে-কেউ দেখে ফেলতে পারত, যে-কেউ জেগে উঠতে পারত। কিন্তু আমার ভাগ্য—আমি বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার বাঁচা উচিত হয়নি।

আজ সকাল থেকে শুনছি মৃগাঙ্ককে পাওয়া যাচ্ছে না। তার খোঁজ হচ্ছে চারদিকে। আমার মনে হচ্ছে, সে আর ফিরবে না। আমি তাকে চলে যাবার জন্যে যে অনুনয় জানিয়েছি, সেটা সে অনুনয় মনে না করে হয়তো আদেশ বলে মেনেছে। তার সঙ্গে আমার যে পুরাতন সম্পর্ক, তা তো কবে বাতিল হয়ে গিয়েছে। এবং তার জন্যে আমার দায়িত্ব কম নয়। তার কথা মনে করে সেদিন আমি একবার তার দিকে তাকাই নি। জীবনে সে যদি সত্যিই একজন বিদ্বান ও পণ্ডিত হয়ে উঠতে পারত, তাহলে আমি একটা কৈফিয়তের কথা পেতাম। অবশেষে সে হল এখানকারই একজন কেরানী—আমার স্বামীর অধীনেই একজন সামান্য কর্মচারী।

এ-গ্লানি একা তার নয়, আমারও। একথা সে জেনে গেল না, এই আমার আক্ষেপ।

যে-গ্লানি কেউ জানল না, আমি তা লিখে রাখলাম—যদি কেউ কোনো দিন দেখে। যদি এ-লেখা যোগ্য লোকের হাতে পড়ে তবে যেন তিনি অনুগ্রহ করে এর নাম-ধাম সব বদলে নেন, আর লেখাটা মেজে-ঘষে নেন—এই অনুরোধ। একটা ইচ্ছা শুধু এই—এটা যেন একবার মৃগাঙ্কের চোখে পড়ে। সে আমাকে না চিনেই চলে গেছে; আমার ভিতরটা সে দেখেনি।

চৌত্রিশ ডাউন আসার সময় হল। এবার এগুলো বাণ্ডিলে বেঁধে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আমার ছুটি। চিরদিনের ছুটি। তার-পর আমার কি হবে জানি নে। এই ট্রেন লাইন কাঁপিয়ে হুড়মুড় করে যখন এসে পড়বে, তখন সেই দারুণ শব্দে ভয় পেয়ে আবার না ফিরে আসতে হয়—এই প্রার্থনা।

কপোত কপোতী উচ্চ বৃক্ষচূড়ে নীড় বেঁধে যে সুখে থাকে, বাংলার নরনারীর ঘর বাঁধবার নিয়ম তা নয়। বহু জন পরিজন নিয়ে তাদের সংসার। দশের ইচ্ছা বোঝাই করা তাদের জীবন। তবু সে জীবনে বারেবারে আসে নানা উৎসব। আনন্দ দিতে, বৈচিত্র্য আনতে, পালা-পার্বন, উৎসবের অন্ত নাই বাংলার ঘরে ঘরে।

পুরুষ শক্তিমান সে আরাধ্যকে উপাসনা করে পূজা করে, প্রণাম করে সাষ্টাঙ্গে, প্রার্থনা করে, আলো দাও, প্রাণ দাও দাও বীর্য, দাও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দীর্ঘ পরমায়ু। পৌরুষের সাধনায় পুরুষ ধরাকে সরা জ্ঞান করে চলে, অন্তরঙ্গকে নিয়ত আহ্বানে তার প্রয়োজন নাই; তাই কখনো তাকে দেখা যায় না বরণ ডালার কাছাকাছি। কিন্তু বাংলার কোমল মেয়েদের কাছে বরণের মত সুন্দর আকাঙ্ক্ষা আর কিছু নাই। উৎসবের বাড়ীতে বরণডালা সাজাবার কাজে অনেক মেয়ের হাসিমুখের সমাবেশ দেখতে পাই।

দুর্বল মেয়ের দুর্বল মন সর্বদাই সঙ্গ চায়। অসহায় তারা, তাই সহায় খোঁজে। বরণ অর্থ বন্দনা, আবাহন করা। প্রাণপ্রিয়জন আরো কাছে এসো, এই যে আজ তোমারই জন্য এই উৎসবের আয়োজন, একে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করো। বরণ করবো বলে আমি সেজেছি নানা আবরণে, আভরণে, সিন্দুরে আলতায়। বেনারসীর এই আঁচলে তোমার মুখের ঘাম মোছাবো। শঙ্খবলয়ে কঙ্কন-শোভিত হাত কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে আরতি করবো তোমায় বার বার। এসো প্রদীপ দিয়ে তোমায় বরণ করি, এর স্নিগ্ধ আলোতে আলোকিত হোক তোমার হৃদয়। এরই মত উজ্জ্বল কোমল চক্ষে দেখো তুমি আজ আমাদের। পানের পাতা, পাটের পাতা, চন্দন, কাজল, ঘি, ধানদূর্বা সবই আছে আমার বরণডালায়। পান, পাট, ধান বাংলার ভূমি লক্ষ্মীর অক্ষয় দান। বরণের অপরিহার্য্য সম্পদ, ঋণ করেও যে ঘি খাবার উপদেশ দিয়ে গেছেন প্রাচীন কালের ঋষিরা তাকে বাদ দিয়ে কি দিয়ে তোমায় বরণ করি? চন্দন কাজলের চেয়ে কোন্ প্রসাধন সামগ্রী সুন্দর? বাজনাদার বাজাও বাজাও, ভালো করে বরণের বাজনা বাজাও। আমার সমস্ত হৃদয়, আমার আঙুলের ডগায় এসে নাচুক, আমি আরতি করি বরণ করি। বরণ শেষে ধান আর দূর্বা দিলাম তোমার মাথায় লক্ষ্মীকে দিলাম, দিলাম অপরাজেয়কে। শত অযত্নে দলনেও অক্ষয় থাকে যে দূর্বাদল তার মত হও। বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো, আর কিছু চাই না। প্রাণের ধন সকল সম্পদ নিয়ে বেঁচে থাকো—অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকো—বরণ নানাভাবে এই কথাই বলে।

যদিও বরণডালা তাকে বলে, যাতে বরণের নানা সামগ্রী রাখা হয়। কিন্তু
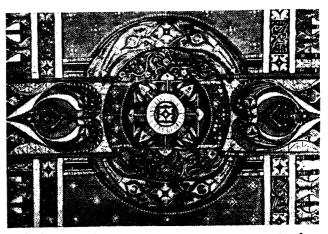
পিঁড়ি চিত্র — শ্রীগৌরী ভঞ্জ কর্তৃক অঙ্কিত

পূর্ব বাংলার বরণডালা ডালা নয়, সে কুলো। বাঁশের তৈরী গৃহস্থালীর অপরিহার্য্য পাত্রগুলির মধ্যে কুলোকে শ্রেষ্ঠ বলে জানি। সোহাগা ছাড়া যেমন সোনা পরিষ্কার করা যায় না, তেমনি কুলো ছাড়াও আবর্জনা মুক্ত হয় না শস্যভার। হেমন্তের সোনার ফসল যখন গৃহস্থের ঝকঝকে তকতকে উঠোনে এনে স্তূপীকৃত করা হয় তখন সেই সোনালী ধানের পাশে এই সব সোনালী কুলোর শোভা যে না দেখেছে, তাকে কেমন করে বুঝাব। সারা বৎসরের আশা, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা সব আজ একত্র হয়েছে এই সব বাংলার মেয়েদের বুকে। এক সংগে সব ধান ঝাড়বে তারা। এই সোনার ধানে তাদের ক্ষুধার অন্ন আছে। যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তবে হতেও বা পারে একখানা রঙিন তাঁতের সাড়ী, হাতভরা কাঁচের চুড়ি, ফুলকাটা বা চুল বাঁধবার রঙিন ফিতা, তাই দু'হাতে তারা আঁকড়ে ধরবে কুলোকে। তালে তালে টোকা দেবে কুলোতে সবাই মিলে। যেন তবলচি ধরেছে তবলাডুগি গানের আসরে। গানের আসরকে রক্ষা করে তবলার বোল্। প্রাণের আসরকে কুলো। কুললক্ষ্মীদের হাতের কুলোর বাজনায় অন্নরূপী নারায়ণের নূপুরের ধ্বনি শুনতে পাই। কুলোকে বরণডালা রূপে গ্রহণের ভিতর—বাংলার মেয়ের গভীরতম রসবোধের পরিচয় মেলে।

বরণের জন্য কুলোর সংগে আরো অনেক পাত্রের প্রয়োজন হয়। ছোট ছোট মাটির ঘট পাঁচটি, তাদের মুখে ঢাকনা, এক জোড়া বড় সরা এবং একখানা সুন্দর কাঠের পিঁড়ি জোগাড় করতে হয়। এই সব জিনিসই সুন্দরভাবে "চিত্রি" করে নেওয়া হয়। দৈনন্দিন জীবনে যা প্রয়োজনীয়। উৎসবের দিনে তাকে সাজিয়ে না নিলে কি মন ভরে। তাই একে নানাভাবে রঙ করা। ঘসা চন্দনের মত মাটির প্রলেপ দিয়ে কুলোকে আগে 'লেপা" হয়। তার উপর খড়িমাটিতে গদ বা তেঁতুল বিচির কাত মিশিয়ে নিয়ে সেই খড়ি গোলাতে কুলো, ঘট, সরা, পিঁড়ি, সম্পূর্ণ ডুবিয়ে সব জিনিস সাদা করা হ'য়ে থাকে। এবার একে মনের খুশীতে "চিত্রি" করো। ঘটের গায়ে তুলি আর রঙ দিয়ে, কলকা, ফুল, পাতা, ছোট ছোট ঢাকনীগুলিতে একটি বড় ফুল বা পদ্মই সাধারণত আঁকা হয়। বড় সরা দুটিতেও এই জিনিসই একটু বড় করে আঁকা হয়।

কুলোর উপর বরণের নানা জিনিস থাকে। তার উপরে থাকে পঞ্চশস্যভরা পাঁচটি ঘট। কাজেই কুলোর মাঝখানেও যতটা সম্ভব বড় একটি পদ্ম আঁকতে হয়। ফুল, পাতা, প্রজাপতি এই সব দিয়ে "কুলো চিত্রি"র শোভা বাড়ানো হয়। আঁকবার সময় যতই যত্ন করে আঁকা হোক্ দেখে লোকে যতই তারিফ করুক, কাজের সময় এর সবই প্রায় ঢাকা পড়ে যাবে। শিল্পী এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না। "পিড়ি চিত্রির" বাহার উৎসব ক্ষেত্রকে বাস্তবিকই আকর্ষণীয় করে থাকে। পাড়ার বা গ্রামের এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিনী যিনি, বহু মিনতি করে হলেও, তাঁকে দিয়ে এই কাজটি করানো হয়। যতই তাঁর সংসারে ঝামেলা ও অনবসর থাকুক এ কাজে তাঁর না বলবার উপায় থাকে না। নানা রঙ ও তুলি দিয়ে বহু যত্নে, বহু সূক্ষ্ম ও সুন্দর কাজ পিড়িতে করা হয়। আমাদের ছোটবেলা দেখেছি পিঁড়িতে হাতী ঘোড়া আঁকবার খুব চলন ছিল। লতা পদ্ম গোলাপের সংগে মাছ, প্রজাপতি, পাখী এই সবও খুব আঁকা হোত। নানা উজ্জ্বল রঙ দিয়েই পিঁড়ি "চিত্রি" করার নিয়ম ছিল।

পূর্ব বাঙলা জলের দেশ, ভাদ্রের ভরা নদীতে খেয়াল খুশীতে যে নৌকা চলে সে-রূপের তুলনা কোথায়? কিন্তু পিঁড়িতে তাকে আঁকতে কখনো ত' দেখি নাই। যে হাতী ঘোড়ার পা ফেলবার জায়গা নেই সেই দেশে সেই হাতী ঘোড়াকেই সর্বদা দেখেছি। হাতের তুলি রূপকথার স্বপ্ন যদি ফোটায়, অতি সাধারণ বাঙলার মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে যদি রূপকথার রাজবাড়ীর হাতীশালার হাতী আর ঘোড়া শালার ঘোড়াকে টেনে আনে উৎসবের মাঝখানে, তবে তার সরলতা ভরা মনকে বাহবাই দিতে হয়, নিন্দে করা চলে না। ঐশ্বর্য্যকে সাধারণেরা সকলেই সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে, আকাঙ্ক্ষাও করে। হাতীঘোড়ার আকাঙ্ক্ষা যদি অবচেতন মনে লুকিয়েও থাকে সরল বাঙলার মেয়ের এই সহজ প্রকাশে আনন্দ পাই। মস্ত বাড়ি আর দামী মোটর গাড়ীতে যতই আমার লোভ থাকুক বিয়ের "পিঁড়ি চিত্রি" করতে বসে তাকে আমি কিছুতেই আজ আঁকতে পারব না। কারণ গ্রামের সরলতা আমি বহুদিন হারিয়ে ফেলেছি।

"পিঁড়ি চিত্রি"র কথা বলতে গিয়ে এক মজার কথা মনে পড়ে গেল। সে চৌদ্দ পনেরো বছর আগের কথা। এক বিয়ে বাড়ীর "পিঁড়ি চিত্রি"র ভার নিয়েছি। পিতৃমাতৃহীনা মেয়ে। কাকা কাকিমা বিয়ে দিচ্ছেন। তাঁদেরও সাধ যত সাধ্য তত নয়। বরপক্ষ 'কলেরগান' চেয়েছেন কাকার সাধ্যে কুলায় নাই, দিতে পারেন নাই। এই কারণে বরপক্ষ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। দুগ্ধধবল মস্ত কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি। হিজ মাস্টারস্ ভয়েসের সেই টকটকে লাল চোঙায়ালা গ্রামোফোন আর সংগীতরসিক কুকুরটিকে খুব যত্ন করে এঁকে দিলাম পিঁড়ির উপর। আর কোন লতাপাতা কি কোন কিছু নেই। বিয়ের আসরে পিঁড়ি নেওয়া মাত্র সমস্ত আসর হাসিরভারে ভেংগে পড়ল। বরপক্ষের ক্ষোভের লেশমাত্র আর অবশিষ্ট রইল না। হাসিতে তাঁরাও খুশীমনে যোগ দিলেন। মেয়ের কাকিমা আমাকে অনেক মাছ-মিষ্টি উপহার দিলেন। যে "পিঁড়ি চিত্রি" করে, তাকে সিঁদুর মাছ-মিষ্টি দিয়েই পিঁড়ি উৎসবের বাড়ীতে নিয়ে যেতে হয়—পূর্ব বাঙলার এই নিয়ম। পরকে আপনার করবার এই এক সুমধুর পরিকল্পনা।

বিয়েতে পিঁড়ি লাগে দু'খানা। অন্নপ্রাশন, চূড়ো পৈতে ইত্যাদিতে একখানা দরকার হয়। এই পিঁড়ির উপর বরবধূর কুলগৌরবের হিসাবও একটা আছে। সমান বংশ মর্যাদার ছেলেমেয়ে হ'লে দু'বাড়ীতেই একখানা করে "পিড়িচিত্রি" করা হয়। বরকে যখন তাঁদের নিজের বাড়ী থেকে রওয়ানা হোতে হয় সংগে পাল্কীতে "চিত্রি" করা পিঁড়িটাও তুলে দেওয়া হয়। সে পিঁড়ি বরের সংগে বিয়ের আসরে যায়। মেয়ের বাবা যদি বংশে ছোট হন তবে বরের বাড়ীর পিঁড়ি তাঁর বাড়ী আসবে না। আসরে দুখানা পিঁড়ি মেয়ের বাড়ী থেকে দিতে হবে। বর বংশে খাটো হ'লে সমান ঘরের মতই তার ব্যবস্থা। জামাতা নারায়ণ এখনই তার হাটু স্পর্শ করে কন্যা সম্প্রদান করতে হবে। নারায়ণের স্থান সবচেয়ে উপরে, বংশ বিচার সেখানে হাস্যকর ব্যাপার।

বরণডালা উৎসবে সব সময়েই দরকার হয়। শারদীয়া দুর্গা পূজায়ও তার স্থান সবার উপরে। কাঁচা হলুদ সূচ-সুতো দেয়শলাই যা কিছু দরকার হতে পারে 'চিত্রি' করা কুলোতে সবই রাখা হয়। বড় দুখানা সরা যে 'চিত্রি' করা হয় তার একটির বুকে একটি বড় মাটির প্রদীপে খুব মোটা সলতে দিয়ে প্রদীপ জেলে বসান হয়। অপরটি প্রদীপের শিখাকে বাতাসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ঢাকনা দেওয়া হয়। উৎসবের প্রথম এই বাতি জ্বলবে, উৎসবের শেষ পর্যন্ত নিববে
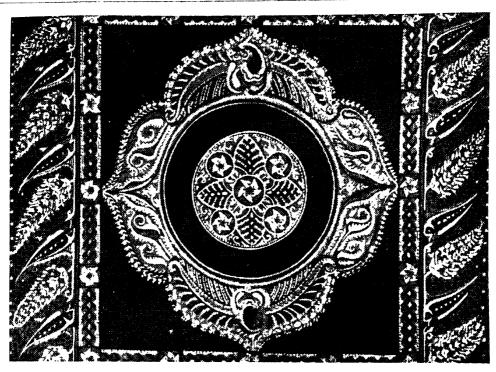
পিঁড়ি চিত্র শিল্পীঃ শ্রীযমুনা সেন

না। তাই অন্নপ্রাশনাদিতে একদিনে তার কাজ শেষ হয়। বিবাহে ৮।১০ দিন তাকে জ্বলতে হয়। মাঝে মাঝে স্ত্রী-আচারে এই সরা-জোড়া মেয়েদের কাজে লাগে। প্রদীপটিকে নাবিয়ে রেখে সরা-জোড়া স্থাপন করে তারা বরকনের সামনে। কনে ঢাকনার সরাটি খুলে মাটিতে রাখবে, আর বর অতি সন্তর্পণে আবার সেই ঢাকনাটি তুলে ঢেকে দেবে। সাবধান! শব্দ যেন না হয়। বর! বল, তোমার দোষকে ঢেকে রাখি আর গুণকে প্রকাশ করি। কনের কাছে এই প্রতিজ্ঞা কর। তরুণ বর কৌতুকভরে কিশোরী নববধূর দিকে আড়চোখে তাকায়। উনি যে কোন্ দোষের আকর আর কোন্ গুণের অধিশ্বরী কিছুই তো এখনো তার জানা নাই। তবু হাসিমুখে সে প্রতিজ্ঞা করে। বাসর-সঙ্গিনীরা খুশিতে কলকলিয়ে উঠে।

কুলো, পিঁড়ি, ঘট "চিত্রির" প্রসঙ্গ শেষ করবার সময় এসেছে, বাইরের বরণডালার প্রদীপ এবার নেবাতে হবে। মনের বরণডালার প্রদীপ নেবাতে গেলেও নিবতে চায় না। আমার পিসিশাশুড়ী ছিলেন অল্প বয়সের বিধবা। দু'টি শিশুকন্যা নিয়ে ভাইয়ের আশ্রয়ে এসে আপন মহিমায় আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে চিরজীবন কাটিয়ে গেছেন। তাঁর ছিল "চিত্রি"র হাত আর সরঞ্জাম। একটি বেতের ঝাঁপি, তাতে সহজ প্রাপ্য অল্প দামের নানা উজ্জ্বল রংয়ের পুরিয়া, নিপুণ হাতের তৈরী নানা রকম তুলি আর অনেকগুলি জলঝিনুক তাতে থাকতো। এই ঝিনুকে তিনি রং গুলতেন। সমুদ্রের নানা কারুকার্য করা ঝিনুক নয়। গ্রামের পুকুরে কাদামাটিতে যে ঝিনুক জন্মে তাকে তুলে এনে অতি যত্নে মেজে ঘসে তিনি এই রংয়ের পাত্র তৈরী করতেন। যখন তাঁর বয়স হোল, হাত কাঁপল, চোখে আর ভাল দেখতে পান না, তাঁর বড় সাধের ঝাঁপিটি আমায় দিয়ে বললেন, "রাঙাবৌ, তুমি এইসব ভালোবাস, তুমি নাও এই দিয়ে 'পিঁড়ি চিত্রি' করবে আর আমাকে মনে করবে"। আমার ভবঘুরে লক্ষ্মীছাড়া জীবনে সেই রংয়ের ঝাঁপি নানা-স্থানে বহন করে নেওয়া সম্ভব নয় বলে তাকে আমি যত্ন করে তুলে রাখলাম নিজের বাড়ীতে নিজের ঘরের "কাড়ের" উপর। যে ঘর রাঙিয়েছে আমায় নানা রঙে, কত মধু রাতে, কত রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে! আজ দেশ আমার বিদেশ, আমার ঘর আমার নয়, তাই জানিনা আমার সেই রংয়ের ঝাঁপির কি দশা হয়েছে। মনে হয় সেই ঝাঁপি আমার আবর্জনা বলে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে বাড়ীর সামনের পুকুরে। বড় বড় ধবধবে সাদা ঝিনুকগুলির খালি বুক সে খালিই থাকলো। রাঙাবৌয়ের অশ্রুবিন্দু তো রাঙা নয়, সে তো নিটোল মুক্তার মতই, তাই দিয়ে যদি ভরে দিতে পারতো সে সেই শুক্তির বুক, দুঃখ করবার আর কিছু থাকতো না।

নিরুপমা আর অনুপমা। ছোট করে নিরু আর অনু। দুই বোন। বড় নিরু, ছোট অনু। বড়োয় ছোটোয় তফাৎটা বাইশ মাসের। তবু দুয়ের পিঠে দুইয়ের মতই পিঠোপিঠি দুই বোনকে ষোলো আর আঠারোয় এসে তফাৎ করা যায় না। আর এই দুয়ে মিলে যে একুশ তার ভারে মাধববাবুর ঘাড় সর্বক্ষণ টনটন করা উচিত। মেয়েদের মা শৈল। আই-বুড়ো ধুমসো দুই মেয়ে পাথর হয়ে বুকে বসে আছে মার। বয়স বেশি হলে যে কাজে আসতো, নিরু-অনুর সেই ভাই ফটিক, মাত্র ন' বছরের। শৈলর কাছে এটা একটা প্রকাণ্ড পরিহাস। ফটিক যদি আঠারোয় পড়তো এই ভাদ্রতে—উনি বলে-কয়ে হাতে-পায়ে ধরে ঢুকিয়ে দিতে পারতেন মাল খালাসের অফিসে। তাতে কম করেও হোক রেশন আর মাসকাবারি কয়লা, ঘুঁটের খরচটাও তো উঠে আসতো। কিন্তু এমনই ভাগ্য শৈলর—ফটিকটাই পেটে এলো শেষে। বেশি গজ গজ করলে মাধববাবুও বিগড়ে যান, 'আমি কি করবো? পাত্র তো আর আমাদের ম্যাক্‌কেনা সাহেবের মুখের বাক্যিতে গজিয়ে উঠবে না। তা যদি উঠতো কবেই তোমার জামাই ধরে এনে দিতাম। হ্যাঁ, চাকরী-বাকরীর কথা হতো বুঝতাম, হতো ফটকেটা বড়-সড় দেখতে ছোঁড়াটাকে ম্যাট্রিকটাও পাশ করতে হতো না, বেটাকে জুতে দিতাম কবেই।'

নিরু-অনুর বিয়ে নিয়ে যে তাদের বাপ-মার দুর্ভাবনার অন্ত নেই; পয়সাও নেই ছেলে কেনার, দুই বোনই তা স্পষ্টাস্পষ্টি বোঝে, জানে। এ নিয়ে হয়তো বেফাঁস একটা কথাও বলে বসে নিরু, 'অনুর তুমি বিয়ে দাও মা, দেখতেও ও ভালো। আমার বাবা বিয়ে-ফিয়ের দরকার নেই।' অনু বলে, 'বয়ে গেছে আমার বিয়ে করতে। তুই না আমার দিদি, তোর আগে বিয়ে হোক। আমার জন্যে তোর কপাল ব্যথা রাখ্।' দুই বোনের তর্কাতর্কি আরও একটু চড়ায় উঠলে শৈল ধমক দেয়, 'থাম তো তোরা, আর ক্যাচ্‌ম্যাচ্ করিস না বাপু। ঝালাপালা হয়ে গেল কান। কে দিচ্ছে তোদের বিয়ে, কার গরজ পড়েছে? (ইঙ্গিতটা মাধববাবুকে। কারণ মাধববাবু তখনই বাজারের থলে হাতে বাড়ি ঢুকলেন এবং রান্নাঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে।) সকালে একবার বাঁজারটা ঘুরে এলুম, এরপর অফিস, অফিস থেকে ফিরে তাসের আড্ডা, রাত্রে ঘুম।'

—ভাদ্র মাসে বিয়ের বায়না কে ধরলো? মাধববাবু বাজারের থলেটা হাত ঝাড়িয়ে

এগিয়ে দিতেই অনু গিয়ে ধরে ফেললো। নিরু ঢুকলো ভাঁড়ার ঘরে আনাজের ঝুড়ি আর বঁটি বের করতে।

ডাল সাঁতলাতে সাঁতলাতে শৈল চোখ মুখ কুঁচকে তুলোছিলো এমনিতেই, ফোড়নের ছিটেতে ফুঁসে উঠলো, 'কে আবার আমি—আমি।'

'—তুমি?' মাধববাবুর এমনিতে রসিক মেজাজ। ফোড়নের ঝাঁঝে কাশতে কাশতেও রস নিঙড়ানো মন্তব্য করলেন, 'গেরস্থর অকল্যাণ করে ভাদ্র মাসেই তোমার পাত্র খুঁজতে পারবো না আমি।'

শৈল শব্দ করে ডালের কড়াইটা নামিয়েছে—তার আগেই মাধববাবু সরে গেলেন। ফলাফলটা তাঁর তো অজানা নয়।

—ঢঙ্! শৈল পলাতক স্বামীর দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানলো।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মাধববাবু হাঁকলেন, 'নিরু, একটু চা দে। চান-টান করা যাক্—।'

নিরুকে বলতে হয় না। চায়ের কেটলিটা উনুনে বসিয়ে দিয়েছে আগেই। সকালের চা আবার সেদ্ধ হচ্ছে। এমনিই হয় এ বাড়িতে।

চায়ের ভাঙা কাপ হাতে শৈলই গেল। রান্নাঘরের একপাশে আনাজ কুটতে কুটতে, একই কাঁচের গ্লাসে চুমুক-ভাগ করে চা খেতে খেতে দুই বোনে গা টেপাটেপি করে, হাসে, ফিসফাস করে।

—মা এতোক্ষণে বাবাকে—ঃ অনু বাক্যটা শেষ না করে উহ্য রাখে।

—বাবার কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। নিরু কড়াইটা উনুনে বসিয়ে দেয়, 'আর তুইও মার সামনে অমন বিয়ে বিয়ে করিস না তো। বড় বদ অভ্যেস তোর। হাজার হোক মা গুরুজন।

—গুরুজন তো তুইও। পাল্টা জবাব অনুর, 'বিলুদার গল্পও তাহলে আমার কাছে তুই করবি না।'

নিরুর মুখে আঁচ লাগে হঠাৎ।

—আহা, নিজে যেনো ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। অশোক ছোঁড়াটার অতো কি রোজ বই দিয়ে যাওয়া রে? লাইব্রেরীটা যেন ও'র। নিরু এবার উল্টো চাপ দেয়।

—চুপ্, মা আসছে—।

দুই বোনই চুপ করে যায়। দুজনেই একটু হেসে হঠাৎ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

শৈল রান্নাঘরে এসে দাঁড়ায়। বড় মেয়েকে সরিয়ে নিজেই খুন্তি ধরে। মুখের কোথাও আর ঝাঁঝ নেই—মার। দু'বোনই আড়চোখে সেটা দেখে এবং চোখাচুখি করে হাসে। অনুমান করে নিয়েছে দুজনেই অদৃশ্য দৃশ্যটা।

এমনি অদ্ভুত তাদের সংসার। সব রকম দুঃখ-কষ্ট, মালিন্য আছে। তবু সব থাকার ওপর আছে তাদের বাবা-মা। বড় নরম, বড় ভালো—আর অনেক ভালোবাসা যাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে।

দুপুরে শৈল কখন একটু ঘুমিয়ে পড়ে। ফটিক স্কুলে। চোখে চোখে বাক্য বিনিময় হয় দুই বোনে। নিরু ওঠে। আস্তে আস্তে একটা দেওয়াল-খোপের আড়াল থেকে এক টুকরো পেন্সিল তুলে নেয়—হাতড়ে হাতড়ে এক ফালি কাগজও। তারপর পা টিপে টিপে বাইরে চলে যায়। মার পাশে শুয়ে শুয়ে অনু এক চোখ বইয়ের পাতায় আর এক চোখ মার দিকে রেখে কি ভাবে যেন। আচ্ছা, অশোকদা তাকে যে বই এনে দেয়, তাতেই ওই এক ভালোবাসাবাসির গল্প কেন? পড়তে পড়তে সারা গা কেমন করে ওঠে, মনটাও ফাঁকা ফাঁকা লাগে। দু-একদিন স্বপ্নও দেখেছে অনু।

শৈল পাশ ফিরলেই ধড়াস করে ওঠে

উৎসবের
আয়োজনে বর্ষে বর্ষে ঋতুর রঙ্গমঞ্চে প্রকৃতি সাজিয়ে নিয়ে আসেন তাঁর রম্য অর্ঘের ডালি। বর্ণ, রূপ ও গন্ধের বিচিত্র সমারোহে সেই ডালি চিরদিনই পূর্ণ। এই পূর্ণতার অনুভূতিই উৎসবের অন্তরের কথা। প্রসাধন-বিলাসীদের মনেও "লক্ষ্মীবিলাস" তেমনি একটি সুরভিত অনুভূতির স্পর্শ এনে দেয় বলে সকল উৎসবেই এর আবেদন চিত্তাকর্ষক।
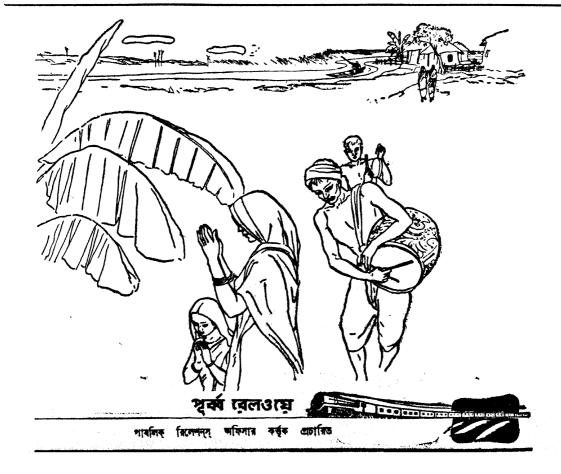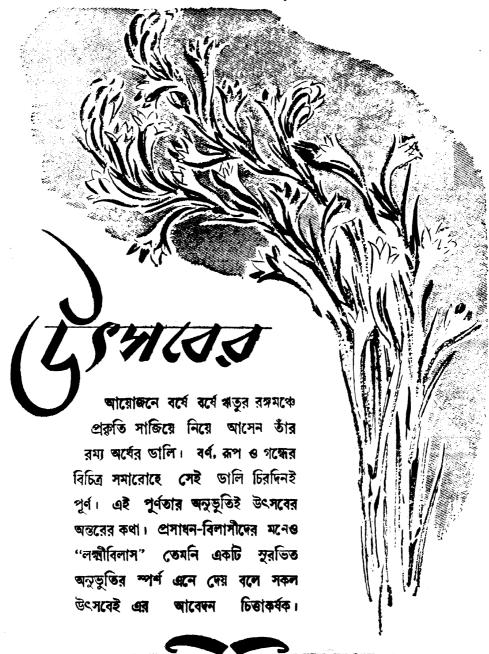
অনুর বুক। দিদিটাও যেন কি? লেখা আর হয় না ও'র। ঠিক একদিন হাতে নাতে ধরা পড়বে। দেওয়ালে টিকটিকিটাও ঠিক এ সময়ে টিক টিক করে ওঠে। ইস—!

শেষ পর্যন্ত ধৈর্য রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে অনুর। উঠে পড়ে সেও।

—কি রে, হাঁ করে কাক দেখছিস যে? হলো তোর?

নিরু চমকে ওঠে। অনু দেখে, নিরুর হাতের কাগজ-পেন্সিল উধাও। নিরুর বুকের দিকে তাকিয়ে অনু ফিসফিস করে বলে, 'দিয়েছিস?'

মাথা নাড়ে নিরু। হ্যাঁ, দিয়েছে।

—ও দিয়েছে? অনু জানতে চায়।

—হ্যাঁ।

—কই দেখি?

—যা! নিরু লজ্জা পায়।

—দিবি না দেখতে? আচ্ছা—? অনু শাসায়, একটু অভিমানও আছে তার সঙ্গে।

—তুই যেন কী—নিরু বুকের মধ্যে থেকে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বের করে দেয় অনুর হাতে, "এখানে দাঁড়িয়ে পড়িস না। কলঘরে যা। মা এসে পড়বে।'

কলঘর থেকে ফিরে এসে চিঠির টুকরোটা নিরুর হাতে গুঁজে দেয় অনু।

—ধোপায় কাপড় দিয়ে গেছে কাল। আমার সেই খয়েরী শাড়িটা তুই পরিস দিদি, বিকেলে গা ধুয়ে। আমি তোর চুল বেঁধে দেবোখন।

—কি হবে শাড়ি পরে, চুল বেঁধে?

—আহা, শাড়িটা তোকে ভালো মানায় কি না তাই আদিখ্যেতা হচ্ছে। বেশ তো মার কাছেই চুল বাঁধিস, ঝুঁটি টেনে বেঁধে দেবে।

—শাড়ি পরে চুল বেঁধে বসে থাকবো, আমায় কি দেখতে আসছে? নিরু আনমনা।

—আসতেও তো পারে তোর বিলুদা। ফিক্ করে হেসে ফেলে অনু, 'একটু ভালো করে সেজেগুজে থাকলেই বা। আজ তো বিকেলবেলায় ও আসবে লিখেছে মার কাছে। সেই ফাঁকে না হয়—'

—বয়েই গেছে আমায় দেখতে। ও আসবে ওর কাজে. আমার কি তাতে?

—বলা কি যায়? অনু একটা চিমটি কেটে দেয় নিরুর গায়ে। ঘুম ভেঙেগেছে মার।

বই দিতে এসে অশোক সদর থেকেই চলে যায়। নিরু এই সময়টুকু মাকে আটকে রাখে বাবার ঘরে: নানা ফন্দি-ফিকির করে।

অশোক চলে গেলে নিরু ফাঁক পেয়ে অনুকে বলে, 'ওই কটকী ছোঁড়াটা অত ঘটা করে সেজে এসেছিলো কেন রে অনু?'

—কটকী ছোড়া—মানে—?

—তা ছাড়া কি? কটকী শুঁড় তোলা চটি পায়ে. ফিনফিনে পাঞ্জাবী?

—আছে তাই পরে।

—ও। আর আছে বলেই বুঝি তোকে একা একা মঠোয় গুঁজে—

—দিদি? অনু ভয় পেয়ে এদিক ওদিক তাকায়।

—দে তবে—। নিরুও এবার শাসায়।

—শকুনির চোখ তোর। অনু নিরুকে একটু আড়ালে টেনে আনে। বুকের মধ্যে থেকে টফি বের করে ওর হাতে দেয়।

—কি করে জানলি তুই? অনু শুধোয়, 'আমি কিন্তু তোকে না দিয়ে খেতাম না।'

পরমানন্দে টফিটাকে জিবের ডগা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিরু হাসে, 'তা কি আর জানি না।'

দুই বোনেই জানে দুজনকে. দুজনেরই নাড়ি-নক্ষত্র। ওদের খাওয়া, বসা, শোওয়া এক সাথে। এর ছায়ায় ওর ছায়া। এর শাড়ি ওর গায়ে, ওর ব্লাউজ এর। নিরুর চুলের কাঁটা অনুর মাথায়, অনুর ফিতে নিরুর খোঁপায়। কালে-ভদ্রে কোথাও বেড়াতে যেতে হলে দুই বোনে ঘোঁট পাকায় বসে বসে। নিরুর একটা ঢাকাই শাড়ি আছে, গোলাপী রঙের। অনুকে সেটা পরলে মন্দ মানায় না। নিরু সেটা অনুকে পরতে দেয়। আর অনুর আছে আকাশী রঙের সিল্কের এক শাড়ি, হাতে বোনা লেসের কাজ করা ব্লাউজ। অনু দেয় সেটা নিরুকে পরতে। দু-জোড়া জুতো আছে দুই বোনের। তাও অদল-বদল হয়। অদল-বদল হয় তাদের যৎসামান্য গায়ের গহনাগুলো। কানপাশা অনুর কানে মানায়, রিঙ মানায় নিরুর—অতএব বদলা-বদলি করে নেয় দুজনেই।

ষোলোয় আর আঠারোয় যে কোন তফাৎ থাকতে পারে না, অন্তত নিরু-অনুর মধ্যে নেই তা ওরা নিজেরাই ভালো করে জানে। কারুর কাছে অন্যের গোপন কিছু লুকোনো থাকে না। যেন থাকতে নেই। সেটা দোষের। বরং যাই হোক, নিরুর অনুকে না বললে, তার পরামর্শ না নিলে নিরুর শান্তি নেই। অনুরও তাই। অশোক অনুর কাছে কি একটা খেতে চেয়েছিলো, অনু বোকার মত সেটাও নিরুকে বলে দিলে। শুনে নিরুর বুক ধুকপুক করে উঠলো। বড় বড় চোখ করে নিরু বললে, 'খেয়েছে—?

—না। অনু দিদির দিকে তাকিয়ে বললে, 'অমন করছিস কেন?'

—ছি, ছি! নিরু লজ্জায় অসাড়, 'খবরদার অনু, ওসব না।'

অনু মাথা নাড়লো। না, না।

সেদিন বিকেলেও শরতের আশ্চর্য একটা সোনালী রোদ ছিলো আকাশে। বাতাসটাও মিহি। ঝাঁক বেঁধে চড়ুই নেমেছিলো উঠোনে।

মাধববাবু বাড়ি ঢুকেই হাঁক দিলেন, কই গো শুনছো?

শৈল এলো। মাধববাবু হাসি খুশী হয়ে বললেন, 'এবার নাও, শানাই বায়না দাও।'

শানাই বায়না দেবার কথা জড়িয়ে আরো যতো কথা ছিল দুই বোনই তা শুনে ফেললে। বাবার অফিসের বড়বাবু চাটুয্যে মশাই, তাঁর ছোট শালার বিয়ে দিচ্ছেন। শালাকে নিয়ে চাটুয্যে মশাই নিজেই আসবেন কাল মেয়ে দেখতে। দেনা-পাওনার কথাটা আগেই হয়ে গেছে। চাটুয্যে মশাই বলেছেন, টাকাপত্রে আটকাবে না, মেয়ে পছন্দ হলেই আমি তাকে ঘরে নিয়ে আসবো। তোমার তো দুই মেয়ে আছে মাধব, দু'জনকেই দেখিয়ে দিয়ো। যাকে পছন্দ হয়।

শুনে পর্যন্ত শৈল মেয়েদের কাছে আপন মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথাটা অনেকবার বললে, এখন আমার কপাল। ছেলে নিজেই আসছে, চোখে ধরলে বাঁচি।

সব কথা শোনার পর নিরুর মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। অনুর দিকে কয়েকবারই আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে নিরু।

শৈল বলেছিলো, সাজগোজটা তোরা দুই বোনে মিলে সেরে নিস বাপু, আমার মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। একটু শুয়ে নি। দেখিস, বিকেল গড়িয়ে বসে থাকিস না যেন।

শৈল ঘুমোতে গেল, বাবার ঘরে। শেষ দুপুরটুকু যেন ঘড়ির কাঁটায় টাইফয়েড জ্বরের মত জুড়ে বসে থাকলো। যায় যায় করেও যায় না।

অনেককালের রঙ-ওঠা, বেঢপ আলমারিটা খুলে বসে আছে দু'বোন। শাড়ি, ব্লাউজ ছড়ানো।

—আর দেরি করলে কিন্তু মা উঠে বকাবকি করবে দিদি, নে চুলটা আগে বেঁধে নে, বাপু।

ফিতে কাঁটা সাজিয়ে চুল বাঁধতে বসলো নিরু আর অনু।

নিরুর চুল বাঁধা শেষ হলো।

—তুই বড় ঝুলিয়ে দিস খোঁপাটাকে অনু, ঘাড়ের কাছে বিচ্ছিরি লাগে! নিরু ঠোঁট কুঁচকে বললে ডান হাত খোঁপায় দিয়ে।

—আহা, ঝুলিয়ে দি? দেখনা একবার ঘাড় বেঁকিয়ে আয়নায়?

দেখলো বটে নিরু আয়নায়, তবে বিশেষ খুশী হলো না।

এবার অনুর চুল বাঁধছে নিরু।

—কতো তেল দিয়েছিস চুলে রে—চট্‌চট্‌ করছে হাত—নিরু গা বিড়োনো ভাব করলে।

—কোথায় আর তেল দিলাম? তেলই ফুরিয়ে ছিলো শিশিতে। বললে অনু।

চুল বাঁধা শেষ হলে অনুও বিরক্তি প্রকাশ করে, 'এটা কি করলি? ঝুটি বাঁধা উড়ে নাকি আমি?'

—বাজে বকিস না অনু, অতো কষ্ট করে ভালো করে বেঁধে দিলাম, পছন্দ হয় না মেয়ের।

—ভালো করে না ছাই। অনু নিজে নিজেই খোঁপাটা একটু এদিক ওদিক করে মানিয়ে নিলে মনোমত।

—অতোর দরকার নেই, বাপু; তোকেই পছন্দ করবে। নিরু ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করবার চেষ্টা করলে, ঠোঁটের কোণে কঁচকোনো হাসি জমলো।

—বয়েই গেছে। অনু দিদির দিকে না চেয়েই বললে, 'দরকার নেই আমায় পছন্দ করে। তোকে করলেই বাঁচি।'

—কালো মেয়েকে কি পছন্দ হয়?

—কেনো হয় না! কতো লোকই তো করছে। তুই তো কত কাজ জানিস, গান পর্যন্ত। অনুর গলায় যেন বেশ একটু ক্ষোভ।

দু'পাঁচ মিনিট চুপচাপ। অনু বললে হঠাৎ 'স্নো পাউডার মাখবি না? চল্‌, মুখটা সাবান দিয়ে ধুয়ে আসি।'

নাক কুঁচকোলো নিরু। বললে, ও সব ছাই ভস্ম মাখতে পারবো না। যা আছি তাই আছি।

একটু পরে নিরু বললে, অনু একটা কাজ করবি, ভাই?

—কি?

—বড্ড মাথা ধরেছে। যা না একটু চা করে নিয়ে আয় চুপি চুপি। উনুনে মা আঁচ রেখেছে আজ।

অনু কি একটু ভেবে চা করতে চলে গেল। ওই ফাঁকে মুখটাও একবার সাবান দিয়ে ধুয়ে আসবে ও।

অনু চলে গেলে নিরু দরজাটা বন্ধ করে দিলে। সাবান দিয়ে মুখ ধোওয়ার পাট ও আগেই সেরে এসেছে। ছেলে নিজেই আসছে দেখতে। পছন্দ হলেই বিয়ে করে ফেলবে। এই কালো মুখ নিয়ে নিরু দাঁড়ায় কি করে ছেলের সামনে—? পাশেই তো থাকবে অনু, রঙটা ফর্সাই তার।

মেয়ে দেখানোর প্রথম ঘটায় শৈল কয়েক শিশিই হোয়াইটেক্স আনিয়েছিল। পর পর মাখিয়েছে মেয়েকে, কনে দেখাবার সময়। কিন্তু তাতেও যখন মেয়ে পছন্দ হলো না শৈল ও পাট তুলে দিলে। তারই একটা শিশিতে এখনো খানিকটা রঙ আছে গোলা। নিরুই রেখে দিয়েছে লুকিয়ে। কেন যে কে জানে। অনুর পাশে নিরুকে দাঁড়াতে হবে, আর পাত্র আসছে নিজেই, পছন্দ করবে তার চোখে—এতোগুলো কথা ভাবলে নিরু অসাড় হয়ে আসে। কেমন করে দাঁড়াবে নিরু অনুর পাশে কালো কুটকুটে মুখ নিয়ে। রঙের জন্যই হয়তো নিরুর দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না একবার ছেলে।

হোয়াইটেক্স থেকে সবটুকু রঙ হাতের চেটোয় ঢেলে তাড়াতাড়ি মেখে নেয় নিরু। পাছে অনু এসে পড়ে, পাছে দেখে ফেলে।

খালি শিশিটা লুকোতে না লুকোতে অনু এসে পড়লো চা নিয়ে। ঘরে ঢুকে দিদির দিকে তাকিয়ে অনু অবাক। অমন টক্‌ টক্‌ করছে কেন দিদির মুখ? পরীক্ষকের চোখ নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে অনু বলে, 'এই না বললি স্নো পাউডার মাখবো না? এদিকে তো ধবধবে দেখছি তোর মুখ।'

চায়ের গেলাসটা অনুর হাত থেকে নিয়ে নিরু একটা নিরুপায়-ভঙ্গী করে বললে, 'বলিস না—যতো রাজ্যের সঙ সাজা। ভাবলুম, কি জানি মা আবার উঠে বকাবকি না করে।'

অনু আর কোন কথা বললে না।

একটু পরে নিরু বললে, 'আমার এই তোলা কাণের ঝুমকো দুটো তুই পর।'

—না। মাথা নাড়লো অনু, 'কাণে আমার ভীষণ ব্যথা হয়েছে কাল থেকে।'

—বলিস নি তো আগে? নিরু খোঁচা দিল।

অনু খোঁচাটা হজম করে নিলো চুপ করেই। সত্যি তো আর তার কাণে ব্যথা হয়নি; আসলে ঝুমকো দুটোই পুরোনো আর মেড়মেড়ে। অনুর কাণে একদম মানায় না। নিরুরও নয়। কাণপাশাটা অনুকে ভালোই মানায়, আর ঝুমকো দিয়ে নিরু কাণ-পাশাটা বাগাতে চায়। কেন দেবে ও? ছেলে কি একলা ওকেই দেখতে আসছে?

দিদিকে আজ অনুর আর বিশ্বাস হচ্ছে না। দিদির সেই ঢাকাই শাড়িটা আজ কি আর দিদি পরতে দেবে তাকে? কখনোই নয়। অথচ ওই শাড়িটায় অনুকে সত্যিই খুব সুন্দর দেখায়।

স্নো পাউডার মাখা শেষ করে অনু একটু বসলো। আর তো দেরি করা যায় না। মা এখুনি উঠলো বলে। বিকেলও হয়ে গেছে।

—এই যাঃ—সর্বনাশ হয়েছে রে! অনু চোখ কপালে তুললো। নিরু বিস্ময়ভরা চোখে তাকালো অনুর দিকে।

—দিদি, লক্ষ্মীটি ভাই—একটা কাজ কর না। উনুনে কয়লা দিয়ে আসতে একদম ভুলে গেছি। আগুন পড়ে গেলে মা আর আস্ত রাখবে না। একটু কয়লা দিয়ে উনুনটা ঠিক করে আয় লক্ষ্মীটি, আমি ততক্ষণে ঘরটা গুছিয়ে নি।

নিরুরও যেন কি একটা দরকার ছিলো। চায়ের গেলাস তুলে নিয়ে নিরু চলে গেল।

খানিক পরে ফিরে এসে দেখে দরজা বন্ধ ভেতোর থেকে। অনু কি ঘর ঝাঁট দিচ্ছে? নিরু ধাক্কা দিলো দরজা, 'খোল অনু।'

—খুলি। উত্তর এলো অনুর।

একটু পরে দরজা খুললো অনু। নিরু ঘরে পা দিয়েই দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো। অনু সেই ঢাকাই শাড়িটা দিব্যি পরে নিয়েছে—এমন কি শাড়ির সঙ্গে মিশ খাওয়া ব্লাউজটা পর্যন্ত। সেজে গুজে একেবারে ফিটফাট বিবি।

নিরু হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে ছোট বোনের শাড়ির আঁচলটা খপ্‌ করে ধরে ফেলে।

—নিজের শাড়ি নেই তোর? আমার শাড়ি কেন পরেছিস—খোল্‌,—খোল্‌ শিগ্‌গির! নিরু টানাটানি করতে থাকে বেপরোয়া হয়ে।

—ছিঁড়ে যাবে দিদি, টানিস না।

—যাক ছিঁড়ে, খোল্‌ তুই আমার শাড়ি—

বেহায়া কোথাকার? ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দেয় নিরু অনুর গালে।

অনুও ক্ষেপে যায়। শাড়ি সে দেবে না; কিছুতেই না। ক্ষিপ্তস্বরে অনু বলে, 'আমার, আমার করছিস কি, তোর বিলুদা তোকে কিনে দিয়েছে গাঁটের পয়সায়? আমার বাবা কিনে দিয়েছে। বেশ করবো আমি পরবো। পেত্নীর আবার কতো সাজার সাধ!'

দুই বোনের টানাটানি, খিমচা-খিমচি, ফোঁস ফোঁস আর চীৎকারে শৈল এসে দাঁড়ায়। কান্ড দেখে তার চক্ষুস্থির। জীবনে শৈল এই প্রথম দেখলো পিঠোপিঠি দুই বোনে প্রলয়ঙ্কর কান্ড বাঁধিয়েছে। কি হয়েছে শৈল আর তা জানতে চাইলো না। অনেক কথাই তার কানে গেছে। শুধু বললে, 'যে যার নিজের জিনিস পরো। অনু, তুমি নিরুর শাড়ি খুলে দাও।'

অনু শাড়ি ব্লাউজ দুই খুলে দিলে। আর মনে মনে এই প্রথম বুঝলো, দিদি তার শয়তানী। আচ্ছা সেও দেখে নেবে, এক মাঘে শীত যায় না। নিরুও তাই ভাবলে, অনুটা সাঙ্ঘাতিক মেয়ে। এমনিতে মার কাছে কতো লম্বা চওড়া কথা, মা, দিদির বিয়ে আগে দাও। এ দিকে তো বাপু ঠিক সময়ে উর্বসী সেজে বসে আছো!

চাটুজ্যে মশাইয়ের শালার মেয়ে পছন্দ হয় নি। কথাটা রাস্তায় বেরিয়েই চাটুজ্যে মশাই সোজাসুজি বলে দিলেন।

বাড়ি ফিরে এসে মাধববাবুও সোজাসুজি কথাটা স্ত্রীকে জানিয়ে দিলে।

শৈল সব শুনলো। এই তো প্রথম নয়; কতোবারই তো শুনেছে শৈল। শুনে শুনে সয়ে গেছে সব। মুখ গম্ভীর করে মেয়েদের শুধু একবার দেখে নিলে শৈল। বড় করুণা হলো আজ মার মেয়েদের জন্যে। মার চেয়ে মেয়েদের মনটাই যে বেশি খারাপ হলো আজ এ সংবাদে শৈল তা বুঝতে পারলো। বললে, 'পছন্দ হয় নি তো হয় নি—কি হয়েছে, তাতে? তুমি অন্য সম্বন্ধ দেখো। তবে এক সঙ্গে দুই মেয়ে আমি দেখাবো না, বাপু।'

দুই বোনে কথা বন্ধ ছিল এতক্ষণ। রাত্রে ওদের ঘরে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে দুজনে দুদিকে মুখ করে ছিলো। দুপুরে আর বিকেলের ঘটনাটাই ভাবছে দুজনে। ছি, ছি, কি কান্ডটা করলো ওরা—কেন এমন করলো? কাউকেই তো পছন্দ করেনি ছেলে।

—অনু : নিরু ফিস ফিস করে ডাকলো। কোন সাড়া নেই। অনু কি ঘুমিয়ে পড়লো?

—অনু? নিরু পাশ ফিরে অনুর গায়ে হাত দিলো।

—রাগ করেছিস আমার ওপর, না—?

—না। অনু বললে, রাগ করি নি। মনটা বড় খারাপ লাগছে।

নিরুরও মন খারাপ লাগছিলো।

একটু পরে নিরু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার ঢাকাই শাড়িটা আমি তোকে দিয়ে দিলাম। বরাবরের জন্যে। তুই পরিস।'

—আর তুই? অনু জানতে চায়।

—যা হয় পরবোখন।

—আমার কমলানেবুটা তুই নে। বরাবরের জন্যেই নে, দিদি।

দুই বোন পাশাপাশি গলা জড়াজড়ি আবার শুয়ে পড়লো। ঘুমিয়ে পড়লো বোধ হয়। কিম্বা হয়তো ভাবছিলো বিলু, অশোককে নিয়ে তো এমন হয় না! হয়তো এও ভাবতে পারে, ষোলোয় আঠারোয় এসে যে তফাৎটুকু হয়ে গেল আজ, আর কি তা ঘুচে যাবে!

গাড়িটা ছাড়বার আগে একবার সরোজ নেমে গেল।

স্ত্রীকে ইঙ্গিত করে' নীহার বললে, ব্যাপারটা বুঝলে? শুয়োরের কাণ্ড দেখ!

রেবা মুখ তুলে চাইলে, কিছু বললে না। নির্জন, ফাঁকা কম্পার্টমেণ্ট, তবু কেমন যেন কথা কওয়া যায় না—স্বামী-স্ত্রীর নির্জনতা এ নয়। রেবা কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছে।

নীহার হেসে বললে, বুঝতে পারলে না ওর মতলবটা?

কি? রেবা তেমনি অন্যমনস্ক হ'য়ে বললে।

বিচ্ছেদের আগে আমাদের কিছুক্ষণ একলা থাকতে দিতে চায়। হঠাৎ বাসর ঘর ফাঁকা করে দেওয়া আর কি! নীহার বন্ধুর উদ্দেশ্য ফাঁস করার কৌতুকে হাসে।

এতক্ষণে রেবা ম্লান হাসলে। মুখে কোন কথা জোগাল না। হোক কৌতুক, তবু যে মর্মান্তিক! গাড়ি ছেড়ে দিলে নীহারের ঐ কথাগুলো কেবল মনে হ'বে। সে তো সঙ্গে যেতে পারবে না ইচ্ছে করলেও।

স্ত্রীর মন-মরা ভাবটা কাটাতেই যেন নীহারের হাসিটা উচ্চ হ'য়ে ওঠে: নাও, কিছু বল! ঘণ্টা পড়লো বলে।

রেবা অস্ফুটে বললে, বলবার আর কি আছে!

কিছু নেই? বল কি! কানে কানে বলে ফেল এই বেলা, নীহার রগড় করে, রজনী এখনো বাকি!

কেমন শূন্য দৃষ্টিতে রেবা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বোবা হ'য়ে থাকে। এ বিপর্যয়ে কি বলবে সে ভেবে পায় না। সান্ত্বনা? নিজের মনে যার কোন সাড়া নেই, অন্যকে দেবে কি করে। সহ্য করাই তো ভাল!

নীহার সরে এসে স্ত্রীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললে, তুমি বড় মুষড়ে পড়েচো। এত নার্ভাস হ'লে চলে! হ'য়েচে কি, বদলী হ'য়েচি বলে তো আর মারা যাইনি? মিথ্যে মন খারাপ করচো!

সজল চোখে রেবা বললে, তোমার সঙ্গে যদি যেতে পারতুম!

তা হ'লে মন-মরা হ'তে না! নীহার কথা কেড়ে নিয়ে বললে, না, সঙ্গে গেলেও তোমার মন খারাপ হ'তো আমি বলচি। কলকাতার ওপর মায়া কি কম!

ঠিক এই মুহূর্তে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে রেবার নেই। আর লাভও নেই, যা হ'চ্ছে তাকে রদ করবার ক্ষমতা যে তার নেই! চাকরি যখন, হুকুমে নড়তেই হ'বে।

রেবা বললে, যে দরখাস্তটা করেছিলে তার কোন জবাব আসেনি? কিছু 'কনসিডর' করেনি?

নীহার হেসে বললে, জবাব আর কি কি আসবে—'কেয়ারফুলি কনসিডারড এণ্ড রিগ্রেটেড'—সি-সি-আর, জানা কথা! ওর আশা আমি ছেড়েই দিয়েচি।

স্বামীর হাসিটা রেবার ভাল লাগে না, মরার ওপর খাঁড়ার ঘা! গম্ভীর হয়ে বললে, দু'দিন দেখে গেলেই হ'তো। হয়তো—

নীহার উড়িয়ে দিয়ে বললে, ও তোমার ডুবে গিয়ে কুটি আঁকড়ান। মাঝখান থেকে প্রবাস-বাসের মেয়াদের ঐ দুটো দিনই নষ্ট।

রেবা চুপ করে গেল। সে মনে মনে বড় আশা করেছিল, নীহারের দরখাস্তের জবাব আসবে, বদলী রদ হবে। তাদের পক্ষে যুক্তি কম 'স্ট্রং' ছিল না। এখন সেগুলো ব্যাঙ্গের মত মনে হ'চ্ছে—নামঞ্জুর দরখাস্তের কথাগুলো এখন প্রলাপ। স্বামীকে তখন করতে না দিলেই হ'তো। ছি ছি, একজনের বদলী মানে যে উভয়ের বিচ্ছেদ, এতে সহানুভূতির চেয়ে বরং কৌতুকেরই উদ্রেক করে।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনের চাকরি করার মজাই বোধ হয় এই!

নীহারের বদলীতে আজকে রেবাই যেন অপ্রস্তুত হ'য়েছে সব চেয়ে বেশী। বড় বাগে পাওয়া গেছে আজ তাদের!

আশ্বাস দিয়ে নীহার বললে, জয়েন করেই আমি ছুটি নিয়ে চলে আসবো।

তারপর চেষ্টা-চরিত্তির করে যদি কিছু হয়।

আশার কথা কি না কে জানে, রেবা নির্ণিমেষে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

নীহার নিজের মনে বলতে লাগল, কি ভুলটাই করেচি তখন, এত চাকরি থাকতে বেছে বেছে এই চাকরি করতে গেলুম, তাও এতদিন! এখন সাপের ছুঁচো গেলা!

স্বামীর মুখ চেয়ে ভয়ে ভয়ে রেবা বললে চাকরিটা তুমি ছেড়ে দাও।

হঠাৎ একটা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কথা যেন শুনে ফেলেছে, নীহার স্ত্রীর মুখের ওপর চেয়ে রইল খানিক নির্বাক বিস্ময়ে। আশ্চর্য, তার বদলীর খবর বেরনর পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে, সংসার নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ নিয়ে, কিন্তু চাকরি ছাড়ার কথা ঘুণাক্ষরে হয়নি। এর আগে বদলীর আশঙ্কায় নীহার অনেকবার চাকরি ছাড়ার কথা বলেছে, রেবাই বরং আমল দেয়নি তখন ; আগে বদলী তো হও, তারপর।

নীহার বললে, সত্যি বলচো? দুর-র, মাথা খারাপ নাকি! ক্ষেপেচো!

রেবাও বোঝে সে কথা, দুজনের কারো একজনের চাকরি ছাড়া পোষায় না, উপায়ও নেই। এমন কিছু বিরাট চাকরি তারা করে না—একটি আর একটির পরিপূরক মাত্র।

রেবার চোখে জল। শান্ত স্বরে বললে, কিন্তু এমনি করে তুমি এক জায়গায়, আমি এক জায়গায়, কদ্দিন চলবে?

নীহার সচ্ছন্দে বললে, যদ্দিন না আবার আমার বদলী হ'য়ে আসবার সুযোগ হয়—সে পাঁচ বছরও হ'তে পারে, আবার দশ বছরও হ'তে পারে!

মনে মনে তারা অনেকবার জেনেছে, অনেক রকম করে ভেবেছে—তবু ভাবনার শেষ হয়নি, তবু প্রশ্ন ফুরোয়নি।

রেবা বললে, অতদিন! না, তুমি ছেড়ে দাও—আমি চালাব।

স্ত্রীর হাতটা গাঢ় করে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নীহার বললে, তার চেয়ে তুমি ছেড়ে দাও, আমি চালাব। বিদেশে কম খরচে চলবে আমাদের।

গাড়িটা নড়ে উঠলো। কোথায় ছিল সরোজ জানালার সামনে এসে হাঁক দিলে, গাড়ি ছাড়চে! গাড়ি ছাড়চে!

রেবা নেমে এল। পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত এসে মুখ বাড়িয়ে নীহার বললে, একটু দেখা-শোনা করিস, ভুলে যাসনি যেন।

সরোজ উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে নাড়তে লাগল। রেবা চুপ ক'রে প্ল্যাটফরম-এর ওপর দাঁড়িয়ে রইল—চলন্ত ট্রেনের সামনে সব যেন কেমন ঘুরতে আরম্ভ ক'রেছে। গাড়ির গতি তাকে আকর্ষণ করছে।

ট্যাক্সি ভাড়াটা সরোজই মিটিয়ে দিলে। রেবা মৃদু আপত্তি ক'রলে, আপনি দিলেন কেন শুধু শুধু!

সরোজ বললে, যে হোক দিলেই হ'লো!

না, আমাদের কাজে এসে আপনি কেন খরচ করবেন! ভারি অন্যায়! রেবা আপত্তির সুর ভোলে না।

সরোজ হেসে বললে, আর একদিন আপনি দিয়ে দেবেন, তা হ'লে হবে।

রেবা মাথা নীচু ক'রে ভ্যানিটি ব্যাগটা বন্ধ ক'রতে লাগল।

সরোজ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ইতস্তত ক'রলে।

খানিক পরে পিছন ফিরে রেবা বললে, আসবেন নাকি ভেতরে?

সরোজ বললে, দরকার আছে কিছু?

সপ্রতিভ কণ্ঠে রেবা বললে, না দরকার কি আর! একটু চা খেয়ে যেতেন। আমাদের জন্যে ক'দিন ধরে আপনার আর বিরাম নেই!

অপ্রস্তুতের মত সরোজ বললে, কি যে বলেন! কি আর করেচি আপনাদের জন্যে!

না করুন, আসুন আপনি চা খেয়ে যান, হঠাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে রেবা বড় উজ্বল হ'য়ে ওঠে।

সরোজ আর আপত্তি ক'রলে না। গুটি গুটি এসে নীহারের পরিত্যক্ত ঘরে ঢুকলো।...

মাঝে একদিন কথায় কথায় রেবা বললে, আপনার বন্ধুটি কি বলুন দেখি, কোন বিষয় যদি খেয়াল থাকে!

চায়ের কাপটা সন্তর্পণে টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে সরোজ বললে, কেন, কি হ'য়েছে?

স্বামীর উদ্দেশ্যে দোষারোপ করে' রেবা বললে, আপনার সেই আত্মীয়ের কথা ওকে জানিয়েছিলুম—সময় করে' একবার ওখান থেকে দিল্লীতে গিয়ে দেখা করতে বলে-ছিলুম; সে সম্বন্ধে কোন কথাই লেখেনি।
ছিলুম; সে সম্বন্ধে কোন কথাই লেখেনি।
ভেবেচে কে জানে! আপনাকে কিছু কি লিখেছে?

না, সরোজ অন্যমনস্কের মত উত্তর দিলে। কথাটা তার মনে পড়ল, নীহার চলে যেতে একদিন বন্ধু পত্নীকে আশ্বাস দিয়ে সে বলেছিল—দেখুন না, দুদিনের মধ্যে ওর বদলীর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দিল্লীতে আমার

এক আত্মীয় আছেন তাঁকে বললে আর কারো কিছু ভাবতে হবে না—এক কথায়!

দু'দিনের জায়গায় কত দিন হ'য়ে গেছে! এক কথার জায়গায় কত কথা! সরোজের সে আত্মীয়ের কানে উঠেছে কি না কে জানে! প্রকারান্তরে রেবা সরোজের বাহাদুরীর কথা তুলে খোঁচা দিচ্ছে না তো?

রেবা জিজ্ঞেস করলে, ওকে আপনি কিছু লেখেননি এ সম্বন্ধে? বলেননি আপনার 'সোর্সের' কথা?

সরোজ বললে, ঐ আপনার মত! গ্রাহ্যই করে না। হয়তো ভাবে আমার করবার কোন ক্ষমতা নেই!

সরোজের ক্ষুণ্ন ভাবটা লক্ষ্য করে' রেবা বললে, আরো ওখানে গিয়ে যেন কেমন হ'য়ে গেছে। অপিস কি চাকরি সম্বন্ধে কোন কথা বিশ্বাস করতে চায় না।

সরোজ বললে, সেই জন্যে তো বলতে ইচ্ছে করে না। না হ'লে ধরবার লোক থাকলে আর বদলী হওয়া যায় না!

স্বামীর একগুঁয়ে বোকামীর জন্যে রেবা মনে মনে দোষারোপ করে। ঠিক বুঝতে পারে না, নীহারের এ নিশ্চেষ্টতার কি মানে হয়।

সরোজ বললে, আর একবার লিখবো, দেখি কি উত্তর দেয়।

স্বামীর ওপর রাগ করেই যেন রেবা সঙ্গে সঙ্গে বললে, না, আপনি আর লিখবেন না। আপনার কি গরজ, যেমন কে তেমন! থাক না।

কি ভেবে সরোজ হাসলে।

খানিক চুপ করে থেকে রেবা বললে, আমাকেও কোথাও বদলী করে দেয় তো ভাল হয়—একেবারে নিশ্চিন্ত!

সরোজ জিজ্ঞেস করলে, কেন, কোন কথা হচ্ছে নাকি?

রেবা উত্তর দিলে না, চুপ করে জানলার বাইরে চেয়ে রইল। প্রবাসী স্বামীর উদ্দেশ্যে কি না কে জানে।

সরোজ আবার বললে, আপনার তো বদলীর চাকরি নয়—তবুও বদলী করবে?

মুখ ফিরিয়ে রেবা বললে, করলে ভাল হ'তো! যার দরকার তাকে তো ক'রবে না!

কথাটা ঠিক সরোজ ধরতে পারে না। রেবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মুখ নামিয়ে রেবা বললে, উনি কিচ্ছু ক'রবেন না, আমার কি! আমিও চলে যাবো একদিন।

শুনে সরোজ হাসলে। মিথ্যে কথা আশ্চর্য সত্যি মনে হয়, কিন্তু!

সেদিন রাগ করেই রেবা নীহারকে চিঠি লিখেছিল। জানতে চেয়েছিল তার মতলবটা কি। সুযোগ পেয়ে সুযোগ গ্রহণ করছে না কেন। লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লী তো বেশী দূর নয়—সরোজবাবুর আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে আপত্তি কি। চিরকাল কি এমনিভাবে থাকতে হ'বে! চাকরিটাই কি বড়?

কি মনে হ'য়েছিল রেবার চিঠিটা ভাঁজ করে' খামে ভরতে ভরতে চোখে জল ভরে এসেছিল। তার জীবনে এ নিষ্ঠুর পরিহাস কেন? কি অপরাধ করেছে সে?

লেখা চিঠিটা আবার খুলে চোখের ওপর মেলে ধরলে রেবা। নীহারকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। বিদেশে সে বেচারী কি করবে! তার তো কোন হাত নেই। কর্তব্যের অবহেলা সে তো কিছু করেনি—নিয়মিত চিঠি দিচ্ছে, টাকা পাঠাচ্ছে। সামান্য চাকুরীজীবি আর কি করতে পারে?

কাটতে কাটতে প্রায় সব চিঠিটাই রেবা কেটে ফেললে। না, প্রবাসী স্বামীকে কেউ অমন করে চিঠি লেখে না। তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই ঐসব যা তা লিখেছিল। ছি, ছি।

কাটা চিঠিটা প্যাডের তলায় লুকিয়ে রেখে আর একটা শাদা পাতায় হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ ঢেলে দিতে চাইলে রেবা। বার বার একই কথা কলমের মুখে আসতে লাগল: ছুটি নিয়ে চলে এসো, আমার একা একা ভাল লাগে না। তুমি বিদেশে মেসে কষ্ট করে আছ, আর আমি এখানে একটা বাড়িতে একলা আছি! রাত্তিরে ঘুমতে পারি না—বড্ড ভয় করে—

চিঠিটা বোধ হয় আজ আর শেষ হবে না রেবার। ঠিকে ঝি সদর দরজা বন্ধ করবার জন্যে বার দুই ডাক দিলে। রেবার খেয়াল নেই। কিছুতেই সব কথা যেন সে গুছিয়ে লিখে উঠতে পারছে না। প্রোষিতভর্তৃকার মনের কথার কি শেষ আছে!

ঝি আবার ডাক দিতে রেবা চমকে উঠলো। কলমের মসিতে রাত্রির মসিময় গভীরতা যেন উপলব্ধি করলে।

কলমটা রেখে রেবা উঠে পড়ল: চল্ কামিনী—

ঝি বললে, আপনার খাওয়া হয় নি এখনো, বাসনগুলো মেজে দিয়ে যাব।

তাড়া দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রেবা বললে, আমি খেয়ে নেব'খন। চল্, রাত হয়ে গেছে। কাল এসে বাসন মাজিস।

রাত অবশ্য হয়েছে। তবু এক বেলার কাজ আর এক বেলার জন্যে ফেলে রাখতে কামিনী রাজী নয়।

বললে, হোক, আমি বসচি, আপনি খেয়ে নিন। কাল আপনার আপিস আছে।

রেবা এগোতে এগোতে বললে, কাল আমি অফিস যাব না। আজ তুই যা, কাল এসে করিস তখন।

সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে রেবা আবার টেবিলে বসল। আর যেন সে-একাগ্রতা নেই, সে-উত্তাপও যেন নিভে গেছে। সময় নেই, অসময় নেই, কামিনীর এই দরজা খুলে দিন, দরজা বন্ধ করে দিন! অসমাপ্ত চিঠিটা বার বার পড়ে পড়ে হৃদয়ের উত্তাপটা লেখনীতে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করে রেবা। নিজের লেখা নিজেরই মনঃপূত হয় না। কেমন একটা জড়তা বোধ করে। মনে হয়, মিছিমিছি।

মাঝে মাঝে আজকাল কেন এমন হয়, কে জানে। কোন জিনিসেই সে মন বসাতে পারে না—এই এক ভাবছে, পরমুহূর্তে আর এক, কেমন যেন এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত সব।

উঠে এসে জানালায় দাঁড়াল রেবা। শব্দহীন এমন একটা মুহূর্ত সে আর কখনো অনুভব করে নি। ঐ তো সদর রাস্তা, আশ্চর্য ওখানেও সব শব্দ ডুবে গেছে—ভাড়াবাড়ির একফালি আকাশ, তাও কত নিশ্চুপ, তারার ভিড়ে কি অন্ধকার আজ। আলো নিভিয়ে চোখ বুজলে কি এ অনুভব এড়াতে পারবে?

হঠাৎ সারা দেহ শিউরে ওঠে। ভয় কণ্টকিত হয়ে মনে হলো, কে যেন তার জানালায় উঁকি দিচ্ছে। তার আলো নেভানর অপেক্ষা করছে।

কিছু না, চোখের ভুল, হয়তো মনেরও। তার ঘরের আলোর রেখাটা যেখানে শেষ

হয়েছে, সেখানে একটা বেড়াল নড়ছে—হয়তো ঘুম ভেঙে নৈশ বিহারে বেরবে।

মনে মনে হাসলে রেবা, ছেলেমানুষের মত মুখে বেড়াল-তাড়ান শব্দ করলে রাত-দুপুরে। আলোর মুখে চোখ তুলে বেড়ালটা কট্-মট্ করে চেয়ে দেখলে। ক্ষীণ প্রতিবাদ করলে, ম্যাও, ম্যাও।

শুতে যাবার আগে রেবা আর একটা চিঠি লিখলে নীহারকে। আগের লেখা চিঠি দুটো একদম বাতিল করে' দিলে। স্পষ্ট কাজের কথা লিখলে সোজাসুজি ঃ যা বুঝচি, তাতে ছুটি না পেলে তুমি আসতে পারবে না। আর আমি এখান থেকে গেলে তোমার থাকতে দেবার জায়গা নেই, মেসে গিয়ে উঠতে তো পারি না! দু'জনের একজনকে চাকরি ছাড়তেই হবে যদি পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করি। ঠিক করেচি, আমিই চাকরি ছেড়ে দেব, কলকাতার বাসা তুলে দেব। তুমি ওখানে একটা বাসা ঠিক করে রেখো এর মধ্যে। তোমার একার মাইনেতে ঠিক চালাতে পারবো। তুমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিও, অযথা বই কেনা বন্ধ করো, আমি সাড়ি-সিনেমা ভুলে যাব—মোটা ভাত কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকবো। খুব চলবে। কেন চলবে না? একা স্বামীর রোজগারে তো কত স্ত্রীর চলে যাচ্ছে। কি মানে হয় খেটে খাবার যদি চিরকাল এমনি ছাড়াছাড়ি থাকতে হয়!

সরোজ বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করেছিল। নিয়মিত বন্ধুপত্নীকে সে দেখাশোনা করে' যেত। অত্যধিক কর্তব্যনিষ্ঠায় কখনো আবার তার সময়-অসময়ের কিছু ঠিক থাকতো না। কোনদিন সকালে, কোনদিন বা দুপুরে, কোনদিন আবার রাত্রে বন্ধুর বাড়ি এসে হাজির হতো। প্রথম প্রথম রেবা বড় সংকোচ বোধ করতো—একলা ঘরে এ আবার কি উৎপাত! ভদ্রলোকের কোন কান্ডজ্ঞান নেই, যখন-তখন এলেই হ'লো! কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারতো না, স্বামীর হিতৈষী বন্ধু—বিদেশে একমাত্র ভরসাস্থল, স্বজন। যদি কোন বিপদ ঘটে স্বামীর অবর্তমানে উনিই রক্ষা করবেন। রক্ষণাবেক্ষণের ভার নীহার ও'কেই দিয়ে গেছে!

সরোজ আসতো, চুপচাপ বসতো, বার বার ঘড়ি দেখতো, তারপর একসময় ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়তো। দু একটা কথা যা বলতো তা বেশীর ভাগ বন্ধুর বদলী নিয়ে। কি করে' কি ব্যবস্থা করা যায় তার মিথ্যে জল্পনা-কল্পনা। সে ভেবে রেখেছে, শেষ পর্যন্ত যদি কিছু না হয়, নিজেই একদিন দিল্লী চলে যাবে, নীহারের জন্যে সুপারিশ করবে।

রেবার সঙ্গে সরোজ একমত, যারা অল্প মাইনে পায়, তাদের চাকরিতে 'বদলী' থাকা উচিত নয়। বিশেষ করে আজকালকার দিনে!—আর স্বামী স্ত্রী দু'জনে যদি—

একটু যেন কৌতুক প্রকাশ পায় সরোজের কথায় আজ। মনে মনে সে কি ভেবেছে কে জানে।

হয়তো রেবা বোঝে সে কথা। হেসে বলে, শুধু আমাদের কেন, আরো তো অনেক আছে আমাদের মত!

যে কথাটা তখুনি বলতে রেবা ইতস্তত করে সরোজ যেন ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে, করলেও, দুজনকেই করা উচিত।

কিছু মনে করে না রেবা, সরোজের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলে, দেখুন দিকি কি জ্বালা!

সরোজ আর কোন কথা বলে না। রহস্যালাপটা তার পক্ষে হয়তো উচিত হ'লো না!

মাঝে মাঝে সরোজের এই বন্ধুকৃত্য রেবার আদৌ ভাল লাগে না। সদর দরজার কড়াটা

অনেকক্ষণ ধরে নড়লেও সে উঠে গিয়ে খুলে দেবার উৎসাহ বোধ করে না। জানা আছে, কে অমন খুট-খুট করে কড়া নাড়ছে। লোকটা যদি তেমন আলাপী হ'তো! সেই তো পাহারাদারের মত গম্ভীরমুখে এসে বসবে, সময় হ'লে ধীরে সুস্থে উঠে যাবে। বড় জোর যাবার সময়, দরজাটা বন্ধ করে' দেবার জন্যে বলবে।

ক'দিন স্বামীর কথার চেয়ে যেন সরোজের কথাই বেশী করে' ভেবেছে রেবা। লোকটা যেন কি এক ধরণের! বাঁধা-ধরা কটা কথা ছাড়া আলাপের আর ভাষা ওঁর জানা নেই! অদ্ভুত মানুষ।

একদিন সরোজ আসতে রেবা বললে, চলুন আজকে একটা সিনেমা দেখে আসি। অনেকদিন যাইনি।

সরোজ এখন ভাবে বন্ধুপত্নীর দিকে চাইলে যেন কথাটা সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না।

মনে মনে রেবা কৌতুক বোধ করে। অধিকতর আগ্রহে বললে, চলুন না যাই। আপনার কাজ আছে কিছু?

তবু সরোজের দৃষ্টির বিহ্বলতা কাটে না। অস্ফুটে বললে, চলুন, কাজ আর কি! এটাও তো একটা কাজ!

রেবা পরখ করবার জন্যে বললে, তবে থাক। আপনার যখন ইচ্ছে নেই।

সরোজ ব্যস্ত হয়ে নিজের-কান-নিজে-মলার মত বললে, না না, আমার ইচ্ছে নেই কে বললে। চলুন, কোন্ সিনেমায় যাবেন?

কিন্তু সিনেমায় এসে রেবার মোটেই ভাল লাগে না। সিনেমা দেখার নাম করে' কি যে সে চেয়েছিল কে জানে। মাঝপথে সরোজকে বিদায় দিয়ে রেবা বললে, আপনি যান, আমি যেতে পারবো।

সরোজ ইতস্তত করলে, পা ঘসলে।

রেবা বললে, আমার জন্যে ভাববেন না, ঠিক যাব'খন। ভয় নেই গাড়ি চাপা পড়বো না।

সরোজ অপ্রস্তুত হয়ে পিছন ফিরলে। উনি যদি একলা যেতে চান তার 'এস্‌কর্ট' করার কি মানে হয়।

বাড়ি এসে স্বামীকে রেবা চিঠি লিখলে, আচ্ছা লোককে আমার ভার দিয়ে গেছো। দেখবার শোনবার! ভাগ্যে অফিস করতে হয়, না হ'লে মনে হ'তো জেলখানায় আছি। তোমার বন্ধুর ধৈর্য আছে, নিষ্ঠা আছে। রোজই আসছেন, আমাকে দেখে যাচ্ছেন, ঠিক প্রহরীর মত। তুমি আস না আস, দোহাই তোমার পাহাদার সরিয়ে নাও। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আর পারি না!

উত্তরে নীহার লিখলে, মানুষ তুমি ঠিক চিনলে না, বন্ধু আমার খাঁটি সোনা। সাধে কি আর ওর ওপর ভার দিয়ে এসেছি! সরোজ কেবল রক্ষকই! তোমার যা দরকার, তুমি অকপটে ওর কাছে বলতে পার। আমি তো ওর ভরসায় বুক বেঁধে আছি। এ সংসারে সরোজই একমাত্র আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। ওকে তুমি ভুল বুঝো না, লক্ষ্মী!

সত্যি, কে জানে রেবার বোঝবার ভুল কিনা। অধিকতর আগ্রহে ইদানীং সে সরোজের সঙ্গ গ্রহণ করলে। নিজেকে বড় খুসী আর বাধিত করে' সরোজের সামনে তুলে ধরলে। পরম আপ্যায়িত করতে লাগল সরোজের প্রতিটি আগমন। বাড়িতে অকারণে খাওয়া-দাওয়ার পাট আরম্ভ করলে। আবার বোধ হয় নিজেকে সে ফিরে পাবে। মিছে দুঃখ করে লাভ কি!

বোধ হয় সরোজ একটু মুস্কিলে পড়ে। বন্ধুপত্নীর এ ভাবান্তরের সে কি মানে করবে ভেবে পায় না। নারীর এ কি রহস্যময়ী রূপ! ক'দিন যেন নেশার মত মনে হয় বন্ধুপত্নীকে রক্ষণাবেক্ষণ। কি করবে, কি বলবে কিছু যেন সে ভেবে পায় না—কাঁচপোকার তেলাপোকা ধরার মত অবস্থা।

প্রায় বেরতে হয় আজকাল রেবাকে নিয়ে এখান-ওখান। আজ তার এ বান্ধবী, কাল ও বান্ধবী—এ-দোকান, সে-দোকান। এটা কেন, ওটা বদলাও। যেন বিকল্প স্বামী তার। চেনাশোনা বন্ধুরা কেউ কিছু মন্তব্য করলে, রেবা চোখ টেপে—ভয় নেই!

আশ্চর্য, সরোজেরও কোন আপত্তি নেই। নির্বিকার সে। নিজে কিছু যদি সে ভেবে না থাকে লোকের ভাবনা নিয়ে তার দুশ্চিন্তা নেই। হোক খেলা, তবু তার মাদকতা তো কম নয়!

রেবার মানসিকতারও বুঝি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নীহারের জন্যে তার আর মনমরা ভাবনা নেই। স্বামীর চিঠি এলে সরোজকে পড়িয়ে শোনায়। অসংকোচে পাশাপাশি বসে সময় কাটায়। নীহারের কোন বিশেষ বক্তব্যে সরোজের সঙ্গে একমত হয়ে মন্তব্য করে। নীহার ছুটি নিয়ে হঠাৎ চলে আসতে পারে না বলে আর আক্ষেপ করে না রেবা। বরং আসা-যাওয়ার খরচটার কথা ভাবে। চাকরি যখন, বেচারা কি আর করবে! দুর্ভাগ্যকে মেনে নেবার মনের জোর রেবার আছে।

একদিন রেবা সরোজ আসতে বললে, আপনার বন্ধুর মতলব শুনেছেন, চাকরি ছেড়ে দেবে!

চিঠিটা সরোজের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, পড়ুন, ছেলেমানষী দেখুন—কি যা-তা লিখেছে! চাকরি ছেড়ে দেব, খবরের কাগজের ঠোঙা তৈরী করবো, বিড়ি পাকাব মুটেগিরি করবো, তবু নাকি ও চাকরি করবে না।

হাত বাড়িয়ে সরোজ চিঠিটা নেবে কি না ভেবে পায় না। বন্ধুর চিঠি তাঁর স্ত্রীকে লেখা, পড়তে দিলেও কি পড়া উচিত? ভদ্রমহিলার আজ কি হ'লো কে জানে।

সরোজ বন্ধুর হয়ে বললে, হয়তো আর পারচে না। এমন কি চাকরি—কেরাণী-গিরি, ছাড়লেই বা!

নির্বুদ্ধিতার জন্যে যেন স্বামীকেই রেবা ধমকাচ্ছে : বলেন কি! এই বাজারে কেউ অমন কাজ করে? মুখে তো অনেক কথা বলা যায়, কাজে আমাদের কি হয়! সেই কেরাণীগিরি!

সরোজ সায় দেয়, তা বটে! হুট করে' ছাড়া উচিত নয়। একটা দেখেশুনে বরং—

অবিশ্বাসে রেবা ঠোঁট উল্টে বলে, হুঃ, এই বয়েসে আর হয়েছে! পাগল না হ'লে অমন কাজ করবে না।

একটু কেন খুবই বিস্মিত হয় সরোজ রেবার কথাবার্তায়। কদিন আগেও স্বামীর চাকরিতে লাথি মারার পৌরুষটা সে-ই বৃথা জাগাতে চেষ্টা করেছিল। যতদিন না নীহারের আর কিছু হয়, কেমন করে' সে সংসারটা চালাবে তার ক্লেশকর চিত্র অকপটে ব্যক্ত করেছে সরোজের কাছে। সরোজ চুপ
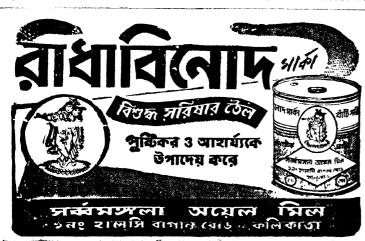
করে শুনেছে, কোন উচ্চবাচ্য করেনি। ভেবেছিল, তাও বুঝি কোনদিন সম্ভব হবে এই পতিপ্রাণা নারীর পক্ষে।

খানিক চুপ করে' থেকে সরোজ বললে, আপনাদের আর ভাবনা কি, স্বামী-স্ত্রী! একজনের রোজগারই—

কপালে চোখ তুলে রেবা কথাটা সম্পূর্ণ করলে, চলে না। আমার রোজগারে বাড়ি ভাড়া, আলো আর ঝি-এর মাইনে দিতেই ফুরিয়ে যায় আর ওর মাইনের বাদ বাকি সব খরচ। তাও তো দেনা, দেনা চারদিকে। সাধ করে' কি আর চাকরি করি! ওকি জানে না?

সরোজ অপ্রস্তুত বোধ করে, না, তা নয়।

হঠাৎ রেবা গম্ভীর হয়ে বললে, ও যদি চাকরি ছেড়ে আসে, তখন আপনাদেরই সামলাতে হবে! আপনাদের মত যাঁরা ওর বড়লোক বন্ধু আছেন।

এতক্ষণে সত্যি সত্যি সরোজ লজ্জায় পড়ে। অস্ফুট প্রতিবাদ করলে, কি যে বলেন! ছি ছি।

সহসা রেবা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, ঠিকই বলচি। তখন কি এসব ভেবেছিলুম—চাকরি ছাড়া স্বামী-স্ত্রী হিসাবে আমাদের কারো কাছে কোন মূল্য নেই। শিক্ষিত মেয়ের শুধু স্ত্রী হ'য়ে বে'চে থাকবার কোন উপায়ও নেই।

সান্ত্বনা দেবার কথা সরোজের মনে হয়। কিন্ত এসবের কি সান্ত্বনা সে দেবে? আর দিয়ে লাভই-বা কি!

দুজনেই খানিক চুপ করে' থাকে। খেলা ক'রতে ক'রতে যেন গুরুতর একটা ভুল হয়ে গেছে। দুজনেই একটা সমাধান ভাবছে।

তা বলে সরোজের দিক থেকে এতটা সাহস রেবা কোনদিন কল্পনা করেনি। এত নীচও তাকে কোনদিন ভাবেনি। তারই দোষ. সে-ই আস্কারা দিয়েছে!

তবু নিজেকে সংযত করে' রেবা বললে, ভেবে বলবো আপনাকে।

চোখের কোণে রেবার কঠিন মুখটা দেখে সরোজ বললে, সে আপনার খুসী! এ'ছাড়া আর কিছু উপায় দেখি না।

রেবার চোখে জল দেখা যায় বুঝি। ধরা গলায় বললে, আমিও কিছু দেখি না!

ওঠবার সময় সরোজ বললে, নীহারকে জানাবার কিছু দরকার নেই। জা[illegible]তে সে তো পারবেই একদিন।

রেবা চুপ করে রইল। কি ক[illegible] কি করবে সে ভেবে পায় না। এত [illegible] সরোজ আজ কোন সাহসে তাকে [illegible]বে। [illegible]হারকে সে ত্যাগ করুক, সরো[illegible]না পোস্ট করুক। চাকরি তাকে করতে [illegible]আজ বেয়ারি[illegible] স্ত্রীর সমস্ত মর্যাদা সে পা[illegible]রিয়া মজা দে[illegible]তন- [illegible] একটি পয়সাও [illegible]

পুরুষ কিছু না করে' খেয়েছে, আরো চার পুরুষ খেতে পারবে! স্বামী সৌভাগ্যে সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে, গর্ব করতে পারে। তা ছাড়া, যারা স্ত্রীর রোজগারের প্রত্যাশা করে তারা পুরুষ নয়, কাপুরুষ! স্ত্রীর সম্মান আলাদা। সরোজ তাকে মাথায় করে রাখবে।

উঠে সরোজ সবে দোর গোড়ায় গেছে, রেবা কঠিন স্বরে বললে, দাঁড়ান।

সরোজ ঘুরে দাঁড়াল আগ্রহ ভরে। বললে, কিছু বলবেন?

ধীরে ধীরে উঠে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাষ্পাকুল কণ্ঠে রেবা বললে, আপনার সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা করেছিলুম তার যেন এখানে ইতি হয়।

সরোজ কি ভাবলে কে জানে। ব্যগ্র হাত দুটো বাড়ালে। দু'পা পিছিয়ে এসে রেবা বললে, সব মেয়ের সম্বন্ধে কি আপনার এই ধারণা?

সরোজ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তেমনি কঠিন সুরে রেবা প্রশ্ন করে, সম্মান আপনি আমাকে এর পরও কি করতে পারবেন?

সরোজ কি যেন বলতে চেষ্টা করে মৃদু কণ্ঠে।

রেবা বললে, থাক। আমি কিন্তু আর কোনদিন আপনাকে সম্মান করতে পারবো না। যান আপনি।

চোরের মত সরোজ গুটি গুটি দোরের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে শুনিয়েই যেন রেবা পৈশাচিক সুরে হেসে উঠলো খিল খিল করে।

তারপর ক'দিন নিজেই ঘোরাঘুরি করে' জিনিষপত্তর রেবা সব সরিয়ে ফেললে। বেশীর ভাগই বিক্রী, বাকি 'অকসন হাউসে' জমা দিলে। বাড়িওলাকে নোটিশ দিলে।

শেষে কামিনীকে ডেকে রেবা জবাব দিলে, তোকে আর আসতে হবে না কাল থেকে।

স্থির হয়ে কামিনী শুনলে কারণটা। সায় দিয়ে বললে, সত্যিই তো আর কতদিন একলা-একলা থাকবেন। ভালও দেখায় না—আপনাদের বলে সখের চাকরি! তা বলে সোয়ামীর সঙ্গে থাকবেন না? আমাদের মত তো আর আপনারা ছোট জাত নন যে, পেটের জন্যে এ একখানে, ও একখানে! যান, যান, ভাল বুদ্ধি করেচেন! আমরা হ'লে এক দন্ডও থাকতুম না।

রেবা হাসলে। কামিনীর কথা শুনে সে বোধ হয় কে'দেই ফেলবে। কোন্ অংশে তারা কামিনীদের চেয়ে আজ বড়? জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে তারা যে এক, তফাৎ শুধু পোষাক-পরিচ্ছেদের আর কিছু শিক্ষার।

সদ্য বিধবার নিরাভরণ রিক্ততার মত বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। শোবার ঘরে একটি মাত্র আলো, অশ্রুসজল চোখের চাওয়ার মত নিষ্প্রভ। কাল আর এমন সময় এ ঘরে কেউ আলো জ্বালবে না, সারা বাড়িটা অন্ধকার হয়ে থাকবে। কামিনী এসে আর ভোর বেলায় কড়া নাড়বে না। অফিসের তাড়া থাকবে না।

বাঁধা বেডিংটার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে রেবা খানিক বসে রইল। আর এক মুহূর্ত যেন তর সইছে না তার। তবু তো এখনো রাত পোহাতে বাকি!

সারারাত আলোটা জ্বলে যদি তাকে পাহারা দেয় ক্ষতি কি। এ বাড়ির, এখানের, এ জীবনের সঙ্গে তো সব দেনা-পাওয়া সে চুকিয়ে দিয়েছে। জ্বলুক, সে পারে জেগে থাকুক, না-পারে ঘুমিয়ে পড়ুক।

না, শব্দই তো! আর একটু উৎকর্ণ হ'লো রেবা। হ্যাঁ, কড়া নাড়ার শব্দ। সারা দেহে একটা অজানা ভয়ের শিহরণ বয়ে গেল। এত বড় নির্লজ্জ, আবার এসেছে? ঘৃণায় রেবার নাসিকা স্ফুরিত হয়ে ওঠে।

কাঠ হয়ে রেবা বসে রইল। দরজা যদি ভেঙেও ফেলে কিছুতেই সে অর্গল মুক্ত করবে না আজ। নাড়ুক কতক্ষণ পারে কড়া নাড়তে।

মনে হলো, ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দে বাড়িটা কাঁপছে, রেবার দেহটাও বুঝি সেই সঙ্গে।

নীহার সাগ্রহে হাত বাড়ালে। রেবা দু'পা পিছিয়ে এল। নিঃশব্দে জিনিসগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে রেবার পিছু পিছু নীহার এগিয়ে এল। বিরহ-মিলন বড় গম্ভীর।

কিছু বুঝতে না পারায় সবিস্ময়ে নীহার জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার?

বাঁধা বিছানাটা খুলে স্বামীকে বসতে দিয়ে রেবা বললে, বস, বলচি।

নীহার সম্পূর্ণ খালি ঘরটা নিরীক্ষণ করতে লাগল।

স্বামীর জিনিষপত্তরগুলো এক এক করে ঘরের মধ্যে এনে রেবা বললে, এত জিনিষ আনলে যে বড়?

তেমনি শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে নীহার বললে, সেখানকার বাসা তুলে দিয়ে এসেছি যে!

আগ্রহ-উত্তেজনায় বুঝি রেবার দম আটকে আসে, কেন, কেন? তুমি বদলী হ'য়েচো?

না, চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেচি! বদলীর কোন চান্স নেই। রহস্য নয়, সত্যি বললে নীহার।

অপরিসর বিছানাটা খোলা পড়ে রইল, আলোটা তেমনি জ্বলতে লাগল। রেবা স্বামীর বুকে মুখ লুকলে।

চিঠি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

খাকিপরা পিওন ঘরের সামনে এসে হাঁক দিল, 'চিঠি আছে।'

ঘরে এক ছটাক চাল কি আটা নেই। মাস শেষ হওয়ার অনেক আগেই হাতের টাকা ফুরিয়ে গেছে। রেশন কি ক'রে আনবে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল বাপ আর ছেলের মধ্যে। পিওনের ডাক তাদের কানে গেল না।

তারাপদ আর হরিপদ রেশনের কথাই বলাবলি করতে লাগল।

তারাপদ বলল, 'একটা টাকাও তোর কাছে নেই?'

হরিপদ লজ্জিত হয়ে বলল, 'না বাবা। থাকলে কি আর—'

তারাপদ বলল, 'তাইতো, তোর কাছেই বা কোত্থেকে থাকবে।'

পিওন এবার বিরক্ত হয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'বলছি যে চিঠি আছে তা শুনতে পাচ্ছনা? নিজেরা কেবল গল্পই ক'রে যাচ্ছ।'

তারাপদ এবার ঘরের ভিতর থেকে মুখ বাড়াল। মাথার চুল বেশির ভাগই সাদা। ভ্রূ দুটিতেও পাক ধরেছে। সারা মুখে কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গালের আর কণ্ঠার সবগুলি হাড় বেরিয়ে এসেছে। সে মুখ এমনিতেই বিকৃত মনে হয়। তবু আরো বাঁকিয়ে আরো খিঁচিয়ে তারাপদ বলল, 'চিঠি এসেছে তো ফেলে দিয়ে যাও না। চেঁচাচ্ছ কেন।'

পিওন বলল, 'ভালো জ্বালা। চেঁচাচ্ছি কি সাধে! একি ফেলে দেওয়ার মত চিঠি! বিনা টিকিটে লেখা। বেয়ারিং হয়ে এসেছে। চার আনার পয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে নাও।'

'বেয়ারিং। দেখি, কার চিঠি দেখি।' তারাপদ তার শীর্ণ হাতখানা পেতে দিল। চিঠিখানা নিয়ে লেখাটার উপরের ঠিকানাটিতে চোখ বুলাল। হ্যাঁ, তারই চিঠি। শ্রীযুক্ত তারাপদ দাস—শ্রীচরণ কমলেষু। কাঁচা অসমান পরিচিত অক্ষরগুলি দেখে কার লেখা তা বুঝতে আর বাকি রইল না। আর বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল তারাপদ, 'হরি, ও হরি। এদিকে আয়, দেখ এসে মাগীর কাণ্ড। খাওয়া জোটে না আবার এনভেলপ ফুটিয়েছেন।'

হরিপদ এবার ভিতর থেকে বেরিয়ে দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। বছর আঠের হবে বয়স। শ্যামবর্ণ, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ঠোঁটের নিচে কচি গোঁফ। প্রথম যৌবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য কি লাবণ্য কিছুই নেই। রোগা শরীর। খোলা গায়ে হাড়গুলির আভাস দেখা যায়। যৌবনের সঙ্গে অর্ধাশন অনশনের এক চিরস্থায়ী সংগ্রাম তার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। তবু উঠতি বয়স সব বাধা ঠেলে ঝাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে।

বাপের দিকে তাকিয়ে হরিপদ বলল, 'ছিঃ বাবা ও সব কি বলছ।'

তারাপদ তেমনি চেঁচিয়ে উঠল, 'কি আবার বলব? চার আনা দণ্ড দিয়ে এ চিঠি কে রাখবে। তুমি এ চিঠি ফেরৎ নিয়ে যাও।'

পিওনের দিকে তাকিয়ে তারাপদ আবার বলল, 'যাও, ফেরৎ নিয়ে যাও চিঠি।'

পিওন বলল, 'বেশ দাও, সেখানে আবার আট আনা লাগবে।'

হরিপদ বলল, 'বাবা তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে।'

চিঠিটা অবশ্য নিজের হাতে রেখেই মুখে গালমন্দ চালাচ্ছিল তারাপদ। এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি করবি কর। আমার কাছে চার আনা তো ভালো, চারটি পয়সাও নেই।'

স্কুলের বেয়ারা দপ্তরীদের থাকবার জন্য ছোট্ট ঘর। খান দুই টুল জোড়া দিয়ে তারই মধ্যে একটু তক্তাপোশের মত করা হয়েছে। তার ওপর পুরোন মাদুর, গোটা দুই বালিশ। আই এ ক্লাসের পাঠ্য খান কয়েক বই খাতা গুছানো রয়েছে। শিয়রের দিকে একটা ছোট্ট তাক। তাতেও কিছু বই-পত্র, দেয়ালে সস্তা একটা আলনা। তাতে গোটা দুই ছেঁড়া আর ময়লা জামা ঝুলানো। জামা দুটোর প্রত্যেকটা পকেট হাতড়ে দেখল হরিপদ, মিলল সাত পয়সা, মাদুরের তলা থেকে বেরোল একখানা দু'আনি। কুড়িয়ে নিয়ে তারাপদের হাতে দিয়ে বলল, 'একটা পয়সা কম হচ্ছে বাবা, হবে না তোমার কাছে?'

'জ্বালাতন, এই নাও, বিড়ি খাওয়ার জন্যে রেখেছিলাম' বলে তারাপদ ট্যাঁক থেকে একটা ডবল পয়সাই বের ক'রে দিল।

হেসে একটা পয়সা বাবাকে ফেরৎ দিল হরিপদ, তারপর পিওনকে চার আনা বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে চলে এল।

তারাপদ চিঠিখানা ছেলের হাতে দিয়ে বলল, 'নাও পড়। কদিন ধ'রে চোখে আবার কেমন ঝাপসা ঝাপসা দেখছি। হাসপাতালে গেলেই তো বলবে চশমা নাও, কিন্তু চশমার টাকা দেবে কে। নে পড় এবার চিঠিখানা।'

খামের মুখটা এবার ছিঁড়ে ফেলল হরিপদ, কাগজের ভাঁজ খুলল, তারপর পড়তে শুরু করল, 'প্রিয়তম!'

সঙ্গে সঙ্গে একটু জিভ কেটে চিঠিটা উলটে রাখল হরিপদ। লজ্জায় মুখ নিচু ক'রে বলল, 'তুমি পড় বাবা।'

ভারি অপ্রস্তুত হোলো হরি। আচ্ছা বোকা তো সে ছি ছি। বাবার কাছে লেখা মার খামের চিঠি কেন হরিপদ খুলতে গেল, কেন পড়তে গেল? এটুকু তার আক্কেল-বুদ্ধি হোলো না। পোস্ট কার্ডের চিঠি পড়ে বলে স্বামীর কাছে লেখা স্ত্রীর খামের চিঠিও কি পড়া যায়?

হরিপদ বলল, 'আমি বাইরে থেকে ঘুরে আসছি বাবা, তুমি ততক্ষণে চিঠিটা পড়ে নাও।'

হরিপদ উঠে বাইরে যেতে চাচ্ছিল, তারাপদ তাকে হাত ধ'রে থামাল। ছেলের এত লজ্জায় সেও প্রথমে একটু লজ্জিত হয়েছিল। বউটার কাণ্ড দেখ! এতদিন বাদে ফের আবার কি সব লিখতে শুরু করেছে। কিন্তু লজ্জা পেয়ে ছেলে একেবারে উঠে বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে তাকে হাত ধ'রে টেনে বসাল তারাপদ, 'বোস বোস। তোর আর যেতে হবে না। ওতে কি হয়েছে। ও তো শুধু একটা পাঠ। বাকি চিঠিখানা পড়ে ফেল এবার। ও রকম আর কিছু নেই।'

হরিপদ এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমিই তো পড়তে পার বাবা।'

তারাপদ হেসে বলল, 'আরে পারলে কি আর তোকে বলতাম। আমার চোখ দুটো কি আর আছে রে। এখন তোর চোখই আমার চোখ, পড় তুই।'

আর কোন তর্ক না ক'রে হরিপদ এবার সশব্দে পড়তে শুরু করল।

'পর পর তোমাকে আর হরিকে তিনখানা পোস্ট কার্ড দিয়াছি। টাকা পাঠাইবার কথা বলিয়াছি। কিন্তু টাকা পাঠান দূরে থাকুক, তোমরা কেউ একখানা চিঠির উত্তরও দিলে না। এক একখানা পোস্ট কার্ডের তিন পয়সা করিয়া দাম। এই তিনটি পয়সা কত কষ্টে আমাকে জোগাড় করিতে হয়, কত দরকারী জিনিস না কিনিয়া একখানা পোস্ট কার্ড কিনিতে হয়, তাকি তোমরা জান না? এই নয়টি পয়সা এক জায়গায় রাখিয়া দিলে তাহা দিয়া ছোট খুকির সাগু-বার্লি কিনিতে পারিতাম। কিন্তু চিঠি না দিয়াই বা পারি কি করিয়া। চিঠি দিলেই কেউ খোঁজ নাও না। আর না দিলে তো একেবারেই ভুলিয়া যাইবে। ভুলিতে পারিলেই তো বাঁচ। তিনখানা পোস্ট কার্ডের কোন জবাব না পাইয়া আজ বেয়ারিং খামে চিঠি দিতেছি। রাগ করিয়া মজা দেখিবার জন্য না। আমার হাতে একটি পয়সাও নাই যে চিঠি দেই। ধার কর্জ কার কাছে আর করিব। চার দিকেই দেনা। যে দেখে সেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। কাহারও কাছে আমার আর হাত পাতিবার জো নাই।

তোমরা টাকা পয়সা পাঠান যদি এখন বন্ধ করিয়া দাও, পাঁচ পাঁচটি ছেলে-মেয়ে লইয়া আমি কি করিয়া থাকি। গাছ গাছালি যা ছিল বিক্রি করিয়া খাইয়াছি। আর কুটা গাছটিও নাই। এখন কোন্ পোড়া ছাই খাইব।

তোমার ক্ষমতার দৌড় তো দেখিলাম। হরিপদর পড়া ছাড়াইয়া তাহাকে কাজে ভেজাইয়া দাও। ভাল চাকরি বাকরি না পায় কুলিগিরি মুটেগিরি করুক। দিন যদি কখনও ফেরে তখন পড়িবে। আর আমাকেও কলিকাতায় লইয়া যাও। দেখি পেটের ভাত জোগাড় করিতে পারি কি না। আর কিছু না পারি ঝি-গিরি তো করিতে পারিব। যাহার বাছারা দুই বেলা ক্ষিদায় কাঁদিয়া মরে তাহার আর লজ্জা ভয় রাখিলে চলে না। ইতি, তোমার সরোজিনী।'

চিঠিখানায় অনেক বানান ভুল আছে। অক্ষরগুলিও কাঁচা কাঁচা। কিন্তু মুশাবিদা একেবারে পাকা উকিল মুহুরীর মত।

পড়া হয়ে গেলে ছেলের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল তারাপদ।

প্রথম যৌবনে বাপ-মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাত জেগে স্ত্রীকে নিজেই লেখা-পড়া শিখিয়েছিল তারাপদ। সরোজিনীর তখন পড়ার দিকে মন ছিল না। কিন্তু তারাপদ নাছোড়বান্দা। একটু আধটু লিখতে পড়তে না জানলে তারাপদ যখন বিদেশে বিভূয়ে যাবে তাকে চিঠিপত্র-লিখবে কি করে সরোজিনী! কেমন করে জানাবে ভালবাসার কথা বিরহ-বেদনার দুঃখ! কিন্তু আজকালকার স্ত্রীর চিঠিপত্রের ধরণ দেখে তারাপদর মনে হয় এর চেয়ে সরোজিনীকে নিরক্ষরা করে রাখাই ঢের ভালো ছিল। তাহলে অমন শ্রীছাঁদহীন কেঁচোর মত অক্ষরের মধ্যে অত তীব্র সাপের বিষ ভরে পাঠাতে পারত না।

মায়ের লেখা প্রিয়তম কথাটি দেখে প্রথমে হরিপদের যে পরিমাণ লজ্জা হয়েছিল পুরো চিঠিটা পড়বার পর রাগ তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি হোলো। জ্বালা ধরে গেল মনে। দূর থেকে এমন চিঠিও কোন মেয়ে মানুষ তার প্রিয়জনকে লিখতে পারে। সমস্ত চিঠিখানার মধ্যে প্রিয় কথা একটিও

নেই। স্বামীর জন্য একটু সহানুভূতি, দেশের জন্য একটু উদ্বেগ উৎকণ্ঠার আভাস মাত্র পাওয়া যায় না। কেবল টাকা আর টাকা, কেবল দাও আর দাও, ক্ষিদের আগুনে মায়ের মায়া মমতা সব যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রিয়তম পাঠটির কথাও মনে হোলো হরিপদর। কথাটি নিশ্চয়ই বাবাকে পরিহাস করে ব্যঙ্গ ক'রে লিখেছে মা। তাছাড়া এচিঠিতে ও পাঠের আর কোন অর্থ নেই। কিন্তু ব্যঙ্গ যে করে মা কি নিজেই জানে না কি অবস্থায় এখানে তার স্বামী-পুত্রের দিন কাটে। ক্ষিদের ধাক্কা কি হরিপদ তারাপদর পেটেও নেই? কিন্তু উপায় কি? দিনের বেলায় স্কুলের বেয়ারাগিরি করে তারাপদ মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা পায়। এখন এই হয়েছে সকলের সম্বল। বাকি টাকা ধার কর্জ ক'রে তোলে। একজনের কাছ থেকে টাকা এনে আর একজনকে শোধ দেয়। তা ছাড়া স্কুলের সেই পঁয়ত্রিশ টাকাই কি সব মাসে জোটে? আগাম নিয়ে নিয়ে বেশির ভাগ টাকাই তারাপদকে খরচ ক'রে ফেলতে হয়। নিজেদের খোরাকীটা পর্যন্ত হাতে থাকে না। মাসের মধ্যে কতদিন যে ছাতু খেয়ে মুড়ি খেয়ে দুই বাপ বেটাকে দিন কাটাতে হয় তার ঠিক নেই। দু' এক বেলা না খেয়েও কাটে।

বছরখানেক আগেও অবস্থা এত খারাপ ছিল না তারাপদের। এক দৈনিক কাগজের অফিসে রাত্রের চাকরি করত। তাতেও পেত টাকা চল্লিশেক। কিন্তু একটানা ক'বছর করবার পর শরীরে আর সইল না। অসুখে বিসুখে কেবলই কামাই হ'তে লাগল। অফিসে গিয়েও ভালো ক'রে কাজ করতে পারত না।

বাবুরা রিপোর্ট করলেন, 'এর দ্বারা চলবে না।'

হরিপদ বলল, 'আমার দ্বারা তো চলবে, আমি যাই বাবা।'

তারাপদ তাকে আঁকড়ে ধ'রে বলল, 'না তোকে কিছুতেই যেতে দেব না। তুই পড়। বেয়ারাগিরি তোর জন্যে নয়। ভালো ক'রে পরীক্ষা দিলে তুই বৃত্তি পাবি।'

ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট বয় ছিল হরিপদ। কিন্তু পরীক্ষার ফল যা আশা করেছিল তা হয়নি, বৃত্তি পায়নি। শুধু প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। তারাপদ বলেছে 'এ পরীক্ষায় না পেলি, পরের পরীক্ষায় পাবি। তুই পড়।'

বাপের অনুরোধ এড়াতে পারেনি হরিপদ। চেষ্টা-চরিত্র ক'রে ফ্রীশিপ জোগাড় করেছে। মোটামুটি ভালো কলেজ দেখে ভর্তি হয়েছে আই এস সি'তে। স্কলারশিপ এবার তার পাওয়াই চাই।

কিন্তু মায়ের চিঠি পড়ে হরিপদের আজ বার বার মনে হ'তে লাগল কলেজে তার আর ভর্তি না হওয়াই উচিত ছিল। সংসারে যার এই অবস্থা পড়াশুনো তার পক্ষে বিলাসিতা, মা ঠিকই লিখেছে। কি হবে হরিপদের কেমিস্ট্রি ফিজিকসের তত্ত্বে। সে কুলী মজুরীই করবে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর তারাপদ বলল, 'শুনলি তো হারামজাদীর চিঠির বয়ান। এখন কি করবি কর।'

হরিপদ রূঢ়ভাবে বলল, আমি আর কি করব। আমি তো তখনই বলেছিলাম আমার আর পড়ে কাজ নেই বাবা। তা তুমি কিছুতেই ছাড়লে না। যদি বল পুরোন ছেঁড়া বই-কখানা কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে বিক্রি ক'রে আসি। আর আমার কি করবার আছে।'

তারাপদের দুই চোখ ছল ছল করে উঠল, 'হরি তুই এই কথা বলতে পারলি। বই বিক্রির কথা তুই উচ্চারণ করতে পারলি মুখ দিয়ে।'

হরিপদ লজ্জিত হয়ে চুপ ক'রে রইল। এসব কথা তার বাবা কোন দিন সহ্য করতে পারে না। সে ছাড়া তারাপদর আর কোন গর্বের সামগ্রীই নেই। সে বিদ্বান হবে, বড় হয়ে অগাধ যশ আর অর্থের অধিকারী হবে, এ-ছাড়া তারাপদের আর কোন স্বপ্ন নেই, সাধ নেই মনে। তারাপদ জানে নিজের যা হবার হয়ে গেছে। এখন সমস্ত সম্ভাবনা

শুধু হরিপদর মধ্যে। ছেলের মধ্যেই এখন সমস্ত কামনা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত ক'রে রেখেছে তারাপদ। সে কথা হরিপদ জানে। স্কুলে যখন সে পড়ত তারাপদ তার প্রোগ্রেস রিপোর্ট আর প্রাইজের বইগুলি নিয়ে অফিসের বাবুদের দেখিয়ে বেড়াত। তাঁদের কাছ থেকে টাকা চাইত, বই চাইত। হরিপদ বলত, ছিঃ বাবা, তুমি আমার নাম ক'রে অমন ভিক্ষে করে বেড়াও, আমার ভারি লজ্জা করে।

তারাপদ বলত, 'লজ্জা কিসের রে? বড় হয়ে তুই আবার কতজনকে ভিক্ষা দিবি।'

হরিপদের সংকোচ দেখে, আত্মাভিমান দেখে তারাপদ তাকে বাইরে কারো কাছে হাত পাততে পাঠায় না। ধার কর্জ নিজেই ক'রে আনে। সময়মত শোধ দিতে না পেরে পাওনাদারদের গালমন্দ সহ্য করে। তবু ছেলেকে পারতপক্ষে অভাবের আগুনের মুখে এগিয়ে দেয় না।

কিন্তু আজ সেই তারাপদই বলল, 'আমি চেষ্টায় বেরোই। তুইও একটু ঘুরে দেখ গোটাকয়েক টাকা জোগাড় করতে পারিস কিনা।'

হরিপদ একটু যেন বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি বেরোব?'

তারপর নিজের প্রশ্নের ধরণে নিজেই লজ্জিত হোলো।

তারাপদ বলল, 'বেরোবিনা কি করবি বল। চিঠিখানা তো নিজেই পড়লি।'

চিঠির কথা মনে পড়ায় হরিপদের বুকের মধ্যে আবার জ্বালা করে উঠল। মা তাকে পড়া ছেড়ে কুলীগিরি ধরতে বলেছে।

হরিপদ বলল, 'হ্যাঁ পড়েছি। কিন্তু কি করব বল।'

তারাপদ লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'কলেজে তোর বন্ধুবান্ধব প্রফেসাররা তো আছে, তাদের কাছে—'

হরিপদ রুক্ষস্বরে বলল, 'তাদের কাছে আমি হাত পাততে পারব না বাবা। আর হাত পাতলেই বা আমাকে দেবে কে।'

তারাপদ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আচ্ছা তাহলে আমিই বেরোই। উল্টাডিঙির আড়তের শ্রীবিলাস কুণ্ডু নাকি আজই দেশে যাবে। তার কাছে গোটাকয়েক টাকা গছিয়ে দিতে পারলে কাজ হোত। দু'দিনের মধ্যে টাকাটা তারা পেয়ে যেত। হাতে টাকা আসলেই তো আর মনি-অর্ডার করবার জো নেই। ভেবেছিলাম শ্রীবিলাসের সঙ্গে পাঠাব। কিন্তু টাকার জোগাড়ই হোল না। সে নাকি আজই ঢাকা মেলে যাবে।

হরিপদ বলল, 'যায় যাক। গেলে আর কি করব।'

টাকা হাতে এলেও হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের গোলমালে তা পাঠাবার জো নেই। দুই দেশের মধ্যে মনি-অর্ডারের ব্যবস্থা বন্ধ। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার সেই সোনাপুর গ্রামে কি তার কাছাকাছি কে কখন যাবে অপেক্ষায় থাকতে হয়। সোনাপুরের পাশের গ্রাম চণ্ডীপুরের কুণ্ডুরা উল্টাডিঙিতে এখানে তেল আর আলকাতরার ব্যবসা করে। সেই আড়তে মাঝে মাঝে টাকা জমা দেয় তারাপদ। সেখান থেকে লোক মারফৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করে। হরিপদ সবই জানে। তবু জেনে শুনেও চুপ ক'রে ব'সে রইল।

খানিকটা কি ভেবে তারাপদ উঠে দাঁড়াল। চৌদ্দ পয়সা দিয়ে ছেলের কেনা সেই সস্তা আলনাটায় গোটা দুই ছেঁড়া জামা ঝুলানো আছে। তার একটা তুলে নিল। আজকাল আর বাছাবাছির দরকার হয় না। ছেলে বড় হওয়ার পর সুবিধা হয়ে গেছে। তার জামা গায়ে দিয়ে বেরোলেই চলে।

হরিপদ বলল,—'ওকি ওই ছিটের সার্টটা নিলে কেন। ওটা তো কাঁধের কাছে একেবারেই ছিঁড়ে গেছে। ওই সাদাটা নাও, ওটা অত ছেঁড়েনি। আমার তো আজ আর কলেজ নেই। ভালোটাই নিয়ে যাও তুমি।'

ইচ্ছা ক'রে বেশি ছেঁড়া জামাটা গায়ে দিয়ে কেন বাবা বেরোয় তা হরিপদ জানে। তাদের দুরবস্থাটা লোকের যাতে আরো বেশি করে চোখে পড়ে, যাতে লোকের মনে আরো বেশি রকম অনুকম্পা জাগে সেই চেষ্টা। ছেঁড়া স্যাণ্ডাল জোড়া থাকতেও তো তালিটালি দিয়ে ঠিক ক'রে আনলেও তা ফেলে রেখে ধার-কর্জের সময় খালি পায়েই বেরিয়ে পড়ে তারাপদ। অর্ধাশনে গলা অমনিতেই চিঁ চিঁ করে তবু পাছে কেউ মনে করে ওদের খাওয়া দাওয়া বেশ চলছে তাই আরো নীচু গলায় আরো অস্পষ্ট অস্ফুট স্বরে তারাপদ কথা বলে। বাবার এই কাণ্ড দেখে মাঝে মাঝে হরিপদের লজ্জা হয়। তারা কি যথেষ্ট দরিদ্র নয় যে ভিক্ষার জন্য আরো ভোল চাই।

তারাপদ এগিয়ে এসে বলল, 'চিঠিখানা দে তো।' হরিপদ বলল, 'চিঠি, চিঠি দিয়ে তুমি কি করবে। তারাপদ ছেলের কথার জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করল, আস্তে আস্তে বলল, 'এই নিতাম একটু।'

বাপকে ধমকে উঠল হরিপদ 'নিতাম একটু। তুমি ভেবেছ ওই চিঠি লোককে দেখিয়ে ধার করবে, ভিক্ষে করবে। তা আমি তোমাকে করতে দেব না বাবা। ও চিঠি আমি কাউকে দেখাতে দেব না।'

ছেলের এই দীপ্ত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে তারাপদ যেন একটু খুশি হোলো। এ যেন নিজেরই বিবেকের ধমক, নিজেরই যৌবনের জেদ। লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কাউকে দেখাতাম না। আচ্ছা, ও চিঠি তোর কাছেই রাখ তুই।'

সামনেই স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। রক্তরঙের ফুল আর ফুল। গাছের পাতা দেখা যায় না। কিন্তু

দুই ডালের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নীলচে রঙের একটি দোতলা বাড়ি। দেখা যায় তার ছাদে নানা রঙের শাড়ি উড়ছে পতাকার মত।

ঘরের বাইরে এসে তারাপদ আর হরিপদ দুজনেই সেই বাড়িটির দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারাপদ বলল, 'হরি, যাব নাকি একবার উকিলবাবুর কাছে? তিনি তো এখন কোর্টে গেছেন, গিন্নীর কাছে আর একবার গোটাকতক টাকা চেয়ে দেখব নাকি?'

হরিপদ চেঁচিয়ে উঠল, 'ফের আবার ওখানে যেতে চাইছ? তোমার লজ্জা করল না বাবা? কি করে কথাটা তুমি বললে!'

শেষের দিকে শুধু ধমক নয়, খানিকটা আক্ষেপ আর অনুযোগের সুরও ফুটে উঠল হরিপদর গলায়। নই বিক্রির কথায় তারাপদর যেমন উঠেছিল।

তারাপদ ছেলের দিকে একটুকাল চেয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা তবে থাক।'

তারাপদ ফুলে ঢাকা কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশ দিয়ে স্কুলের বড় গেটটার দিকে এগিয়ে গেল। ডাল থেকে একটা ফুল ঝরে পড়ল তার সেই ছেঁড়া জামার ওপর। অন্যমনস্কের মতই তারাপদ বাঁ হাত দিয়ে সেই ফুলটা ঝেড়ে ফেলে দিল।

হরিপদ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তার বাবা সেই নীলচে রঙের বাড়ির পাশ দিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।

আকাশ রঙের ওই বাড়িটির কাছ থেকে হরিপদরা এক সময় খুব সমাদর পেয়েছিল। আজ সেই সমাদর ঔদাসীন্যে এমন কি অপমানে এসে ঠেকেছে।

তারাপদ যেমন আরো পাঁচজনকে বলে ওই বাড়ির কর্তা উকিল জগন্ময় সেনকেও তেমনি হরিপদর কৃতিত্বের গল্প শুনিয়েছিল। ক্লাসে হরিপদ ফার্স্ট হয়, সব বিষয়ে বেশি বেশি নম্বর রাখে, অঙ্কে একটি নম্বরও কেউ তার কাটতে পারে না; তারাপদর মুখে এসব গল্প শুনে জগন্ময় বলেছিলেন, 'আচ্ছা নিয়ে এসো একদিন তোমার ছেলেকে, আলাপ করে দেখব।'

তারপর বাপের সঙ্গে একদিন গিয়ে হাজির হয়েছিল জগন্ময়ের ড্রয়িং রুমে। একতলায় সোফা কোচে সাজানো গুছানো ঘর। বড় একখানা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে জগন্ময় আইনের বইতে চোখ বুলাচ্ছিলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না।

তারাপদ বলল, 'ছেলেকে নিয়ে এসেছি বাবু।'

'নিয়ে এসেছ? বেশ বেশ, বোসো ওখানে।'

বলে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দিলেন জগন্ময়। আর সঙ্গে সঙ্গে হরিপদ তাতে বসে পড়ল। জগন্ময় একটু হেসে তারাপদর দিকে তাকালেন, 'তুমিও বোসো না ওখানে।'

তারাপদ জিভ কেটে বলল, 'আজ্ঞে না বাবু, ও বসেছে তাতেই আমার হয়েছে। আমি একটু ঘুরে কাজ সেরে আসি। আপনি ওকে যা জিজ্ঞাসাবাদ করবার করুন।'

জগন্ময়বাবু হেসে বললেন, 'জিজ্ঞাসাবাদ আবার কি করব। ও কি আসামী।'

তারাপদ চলে গেলে অত বড় একজন গম্ভীর স্বভাবের মানুষের সামনে বসে থাকতে থাকতে হরিপদ কেমন যেন অসহায় বোধ করল।

বইএর মধ্যে ফের খানিকক্ষণ ডুবে রইলেন জগন্ময়বাবু। তারপর কি খেয়াল হওয়ায় আবার মুখ তুললেন, 'বেশ বেশ। মনোযোগ দিয়ে পড়। ভালো রেজাল্ট কর। দুঃখকষ্টের মধ্যেই মানুষ বড় হয়।'

পাশের ঘর থেকে একটি মিষ্টি গুনগুনানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। জগন্ময় সেদিকে তাকিয়ে একটু হেসে ডাকলেন, 'মিলি, এদিকে এসো।'

'কি বাবা।'

আঠার উনিশ বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে ঘরে ঢুকল। জগন্ময়বাবু হরিপদকে দেখিয়ে বললেন, 'একে চেন?'

মিলি হেসে বলল, 'চিনব না কেন। সামনের স্কুল-বাড়িটায় থাকে।'

জগন্ময়বাবু বললেন, 'সেকথা বলছি না। ছেলেটি খুব ভালো তা জানো? ওই স্কুলের ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। ফার্স্ট হয়। অঙ্কে ফুল মার্কস পায়। তোমাদের মত নয়, অঙ্কের নাম শুনলেই তো তোমাদের মাথা ঘোরে।'

মিলি হেসে বলল, 'বাবা, অঙ্কের এলাকা কবে পার হয়ে এলাম, তবু তোমার সে আফসোস গেল না?'

জগন্ময়বাবু এবার পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার ছোট মেয়ে। স্কটিশে পড়ছে। থার্ড ইয়ার। ইংরাজীতে অনার্স নিয়েছে। আমি ম্যাথেমেটিকসটাই ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা কেউ ওদিকে যায়নি। মিলি, ছেলেটিকে একটু মিষ্টি টিষ্টি এনে দাও। বলে দাও না রাণীকে।'

হরিপদ অস্ফুট স্বরে বলল, 'না না।'

মিলি বলল, 'এদিকে এসো।'

অভিভূতের মত হরিপদ তার পিছনে পিছনে গেল।

ভিতর দিকের একটা বারান্দায় নিয়ে গিয়ে মিলি ডেকে বলল, 'রাণী ওকে একটু জলখাবার আনিয়ে দাও তো। আচ্ছা, আমি এবার যাই। একটু তাড়া আছে। আর একদিন আলাপ হবে।'

জলখাবারে তেমন যেন আর রুচি রইল না হরিপদর। একটু বাদে প্লেটে করে দুটি রসগোল্লা আর দুটি সন্দেশ এনে সামনে রাখল আর একটি মেয়ে। বছর ষোল সতের বয়স। কালো হ্যাংলা চেহারা। হরিপদ ওকে চেনে। এ বাড়ির ঝিয়ের কাজ করে মেয়েটি। কখনো কখনো রাঁধেও। জগন্ময়বাবু তাঁদের গ্রাম থেকে ওকে নিয়ে এসেছেন।

আসন পেতে খাবার দিয়ে মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

হরিপদ বলল, 'তুমি হাসছ যে।'

রাণী বলল, 'হাসছি তোমার রকম সকম দেখে। জানলা দিয়ে সব আমি দেখছিলাম। কি স্পর্ধা বাপরে বাপ। বাবু বলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাঁর ওই সামনের সোফায় বসে পড়লে? একটু লজ্জা হোলো না, ভয় হলো না? কই তোমার বাবা তো সাহস পেল না বসতে। তোমার এত সাহস এলো কোত্থেকে।'

এই মুখরা মেয়েটির সামনে লজ্জায় অপমানে হরিপদ মাথা নীচু করে রইল। মিষ্টিগুলি গলা দিয়ে যেন নামতে চাইল না।

'কার সঙ্গে কথা বলছিস রে রাণী।'

মোটা সোটা একটি মহিলা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

রাণী বলল, 'এই হরিপদর সঙ্গে মা। না হয় পড়েই ফার্স্ট ক্লাসে। তবু এত সাহস, বাবুর সামনে সোফায় গিয়ে বসল। কিন্তু বসে থাকতে পারবে কেন, অভ্যেস তো নেই। উসখুস, উসখুস। যেন ছার-পোকায় কামড়াচ্ছে।'

মহিলাটি হেসে তাকে তাড়া দিয়ে বললেন, 'তুই যা তো এখান থেকে। আর জ্বালাসনে। ছেলেটাকে তুই কি খেতে দিবিনে?'

মহিলাটি জগন্ময়বাবুর স্ত্রী—মিলিদির মা হরিপদ তা দেখেই বুঝেছিল।

তিনি সস্নেহে বললেন, 'তুমি খেয়ে নাও বাপু। ওর কথায় কিছু মনে করো না।'

সেই থেকেই পরিবারটির সঙ্গে হরিপদর আলাপ। তারপর যাতায়াতের পথে মিলি তাকে দেখতে পেলেই হেসে কথা বলেছে। পড়াশুনোর খবর জিজ্ঞাসা করেছে। মাঝে মাঝে যেতেও বলেছে তাদের বাড়িতে।

কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর হরিপদর সঙ্কোচও অনেকখানি কেটে গেছে। মিলি কি মিলির মা তাকে মাঝে মাঝে এটা ওটা দোকান থেকে কিনে আনতে বললে ভারি কৃতার্থ বোধ করেছে হরিপদ। এ'রা যে এত আদর-যত্ন করেন, তার বিনিময়ে কিছু না দিলে যেন স্বস্তি পায় না হরিপদ। কিন্তু মিলিদিকে কি দেওয়ারই বা তার সাধ্য আছে, তার ফুট ফরমায়েস খাটা ছাড়া।

অবশ্য খাটাবার সময়ও খুব ভদ্রতা করে কথা বলে মিলি। মিষ্টি হেসে বলে, 'যাও তো ভাই, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে কিছু ফুল নিয়ে এসো।'

কিংবা 'বিডন স্ট্রীটে আমার একজন বন্ধু থাকেন। ঊর্মিলা সান্যাল। তার কাছ থেকে আমার হিস্ট্রির নোটটা এনে দিতে পারবে? ট্রাম ফেয়ারটা নিয়ে যাও।'

হরিপদ বলে, 'না না, ট্রাম ভাড়া আমার কাছে আছে।'

মিলিদির কাছ থেকে পয়সা না নিয়ে সে হে'টেই চলে যায় বিডন স্ট্রীট। বাড়িতে এত লোকজন, এত চাকর-বাকর, মিলির পরে ছোট দুই ভাই। তবু এসব শৌখীন কাজে হরিপদকেই তার পছন্দ।

এই পছন্দের সুযোগ নিয়ে তারাপদ ওদের কাছ থেকে টাকা ধার করে। কোন মাসে কর্তার কাছে চায়, কোন মাসে গৃহিণীর কাছে, কোন মাসে বা মিলির কাছে হাত পাতে।

হরিপদর এটা পছন্দ নয়। একদিন সে বলল, 'বাবা, আর যাই করো, ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ো না।'

তারাপদ বলল, 'কেন রে।'

হরিপদ বলল, 'আমার ভালো লাগে না।'

তারাপদ ছেলের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি তো একেবারে নিই না; ধার নিই, আবার দু'চার টাকা করে শোধও দিয়ে দিই।'

হরিপদ মিলিদের বাড়িতে আসে যায়। রাণীর দিকে তাকায় না, তার সঙ্গে পারতপক্ষে কথাও বলে না। লেখা পড়া শিখে সে যেন মিলিদি আর তার ভাই অমল বিমলদের একজন হয়ে গেছে।

বছর খানেক মেলামেশা ঘনিষ্ঠতার পর হঠাৎ এক কান্ড ঘটল। মিলির দেওয়া শরৎচন্দ্রের একখন্ড বাঁধানো গ্রন্থাবলী হাতে সে তরতর করে সি'ড়ি বেয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, পাশের রান্না-ঘর থেকে রাণী বেরিয়ে এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল, 'এই শোন, এই হরিপদ শোন।'

হরিপদ থমকে দাঁড়াল, 'কি বলছ।'

রাণী বলল, 'আমাকে ওই মোড়ের দোকানটা থেকে চার আনার হলুদ এনে দাও তো।' হলুদ আনার কথায় হরিপদ ভারি অপমান বোধ করল। মনের রাগ চেপে বলল, 'আমার হলুদ আনার সময় নেই। আর কাউকে বলো।'

রাণী বলল, 'আর আবার কাকে বলব। গণেশ, গোবিন্দ কাউকেই তো দেখছিনে, তুমিই এনে দাও।'

গণেশ গোবিন্দ এ বাড়ির চাকর। তাদের সঙ্গে তুলনা দেওয়ায় রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল হরিপদর। চড়া গলায় বলল, 'আমি পারব না। আমি কি তোমার চাকর?'

রাণী হেসে বলল, 'আমার চাকর হবে কেন, তুমি কার চাকর তা সবাই জানে।'

হরিপদ যেন গর্জে উঠল, 'কি কি বললে।'

রাণী বলল, 'মিথ্যে কিছু বলি নি। বেয়ারার বেটাকে চাকর বলেছি।'

কথাটা শেষ হতে পারল না রাণীর। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিল হরিপদ।

রাণী চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা গো মেরে ফেললে।'

চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে হরিপদকে ধরে ফেলল। দোতলা থেকে মিলি নেমে এল, এলেন মিলির মা। গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন, 'ছোট-লোকটাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দাও। এতবড় স্পর্ধা, আমার বাড়ির ঝিএর গায়ে হাত তোলে। আমি গোড়াতেই বলেছি মিলি, ওর চালচলন আদবকায়দা ভাল না। ওকে অত আস্কারা দিসনে। বলে কি না লেখাপড়ায় ভালো। আরে লেখাপড়া শিখলেই কি ছোটলোক ভদ্র-লোক হয়ে যায়?'

মিলি ফোঁস করে উঠল, 'আমাকে আবার এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন মা, আমি কি আস্কারা দিলুম।'

মিলির মা বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক বাপু, থাক।'

ঘাড় ধরে কেউ অবশ্য বের করে দিল না। হরিপদ নিজেই মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল। ক্লাসে টি টি পড়ে গেল। হরিপদ ভালো ছেলে হলে কি হবে—অভদ্র, মেয়ে-ছেলের গায়ে হাত তোলে। স্কুলের হেড-মাস্টার পর্যন্ত ডেকে নিয়ে তাকে শাসন করে দিলেন, 'এমন করলে তোমাকে আমি আর স্কুলে রাখতে পারব না হরিপদ।'

হরিপদ নালিশের ভঙ্গিতে বলল, 'ও আমাকে বাপ তুলে গাল দিয়েছে।'

হেডমাস্টার মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'ভারি অন্যায় করেছে। বেয়ারাকে বেয়ারা বলেছে। তাই বলে তুই ওই সোমত্ত মেয়ের গায়ে হাত দিবি?'

জগন্ময়বাবু স্কুল কমিটির বিশিষ্ট সদস্য।

তারাপদ নিজেও ছেলেকে খুব গালমন্দ করল। বলল, 'ওকে তুই মারতে গেলি কেন?'

ছেলের অনুরোধে মাস তিনেকের মধ্যে তারাপদ জগন্ময়বাবুদের সব টাকা শোধ করে দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হরিপদর আর সে বাড়িতে ডাক পড়ল না। ভেবেছিল মিলিদি অন্তত একবার ডাকবেন, সব কথা শুনতে চাইবেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কিছুদিন বাদে হরিপদ লক্ষ্য করল মিলিদির কলেজের প্রফেসার হিরন্ময়বাবু ও বাড়িতে খুব যাতায়াত করছেন, প্রফেসর হলে হবে কি, মিলিদির সঙ্গে তাঁর আলাপ ব্যবহার বন্ধুর মত। গান শোনেন, তাস খেলেন, সিনেমা দেখেন, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোন। আরো মাসচারেক পরে শোনা গেল মিলিদির পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে দুজনের বিয়ে হবে।

বেলা আড়াইটা তিনটায় তারাপদ ফিরে এল ঘরে। বৈশাখের কড়া রোদ গেছে মাথার ওপর দিয়ে। চেহারাখানা পুড়ে অঙ্গার। ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করছে হরিপদ। একবার ঘরে ঢুকছে আর একবার বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছে।

বাপকে দেখে এগিয়ে গেল কাছে। বলল, 'পেলে কিছু?'

তারাপদ সংক্ষেপে বলল, 'না।'

তারপর বসল গিয়ে ঘরের কোণে—দেয়ালে ঠেস দিয়ে। সেই শ্যামবাজার থেকে হেঁটে এসেছে এই বউবাজার পর্যন্ত। এখন আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। শক্তি থাকত যদি টাকা আসত হাতে।

তারাপদ ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, 'খেয়েছিলি কিছু?'

হরিপদ খেঁকিয়ে উঠল, 'কি আবার খাব? ঘরে কি কিছু আছে?'

তারাপদ বলল, 'চার আনার পয়সা খরচ করে চিঠিটা না রাখলেই পারতি, কাল-পরশু নিতাম। না হয় ফেরৎই যেত।'

হরিপদ চুপ করে রইল—এখন তারও সেই কথা মনে হচ্ছে। চিঠিটা না রাখলেই হোত। চার আনা থাকলে দুজনে চিঁড়ে-মুড়ি খেয়ে এবেলা কাটাতে পারত।

হঠাৎ তারাপদ বলল, 'সেখানেও সব শুকিয়ে মরছে। আজই শ্রীবিলাস চলে যাবে। কিছুই করে উঠত পারলুম না। যার কাছে চাই, সেই বলে মাসের শেষ, পাঁচ সাতদিন পরে এসো দেখব চেষ্টা করে।'

হরিপদ রেগে উঠে বলল, 'চেষ্টা না ঘোড়ার ডিম করবে।'

তারপর জামাটা তুলে নিয়ে গায়ে দিল হরিপদ। চিঠিটা পড়ে ছিল তক্তাপোশের ওপর। বুকপকেটে পুরল।

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় চললি।'

হরিপদ কোন জবাব দিল না।

হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদহের মোড়ে এসে দাঁড়াল। চারদিক থেকে লোকজন আসছে যাচ্ছে। ট্রাম-বাস-ট্যাকসীর শব্দ। এখানে এমন কিছু ঘটে না যে, হরিপদকে কেউ ডেকে নিয়ে চাকরিতে বসিয়ে দেয়। স্টেসনের ভিতর থেকে একজন লোক দু'হাতে দুই স্যুটকেস ঝুলিয়ে বেরোল। হরিপদ তাঁর দিকে দু'পা এগিয়ে গেল। একবার ভাবল, ভদ্রলোকের হাত থেকে স্যুটকেসটা চেয়ে নেয়, বলে, 'বাবু, আমাকে দিন। চার আনার পয়সা দেবেন, যতদূর বলেন, ততদূর বয়ে নিয়ে যাব।'

কিন্তু মনে যা আসে, মুখে কি সব সময় তা বলা যায়—হরিপদ চেষ্টা করেও একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না। ভদ্রলোক তার দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত-পায়ে চলে গেলেন। হয়ত ভাবলেন, গুণ্ডা কি পকেটমার।

হরিপদ বুঝতে পারল এই মুহূর্তেই কুলিগিরি মজুরীগিরি করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। বাপের মত তাকেও ঘরের

চেষ্টায় বেরোতে হবে। কিন্তু যায় কার কাছে। টাকা চাওয়ার মত ঘনিষ্ঠ আলাপ কারো সংগেই হয়নি হরিপদর। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল সুবিনয় চাটুয্যের কথা। ওর বাবার রেডিও আর ইলকট্রিক যন্ত্র-পাতির দোকান আছে চিত্তরঞ্জন এভিনিয়ুর মোড়ে। কলেজে প্রায়ই হরিপদর পাশাপাশি বসে। ভালো ছেলে বলে হরিপদকে খাতিরও করে। দু'দিন বাড়িতে ডেকে এনে চা খাইয়েছে।

খানিকটা এগিয়ে বৈঠকখানা রোডের মোড়ে এসে তেতলা বাড়িটার সামনে এসে হরিপদ কড়া নাড়ল। প্রথমে বেরিয়ে এল চাকর, বলল, 'খোকাবাবু তো ঘুমুচ্ছেন।'

হরিপদ বলল, 'ডেকে দাও, বল জরুরী দরকার আছে।'

লোকটি হরিপদর চেহারার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'এখন ঘুম ভাঙালে খুব চেঁচামেচি করবেন। দরকার থাকে বৈঠকখানা ঘরে বসুন। চারটেয় ঘুম ভাঙবে।'

হরিপদর ভাগ্য ভালো। আধ ঘণ্টা খানেক আগেই ঘুম ভাঙল সুবিনয়ের। ড্রয়িং-রুমে ঢুকে বলল, 'কি আশ্চর্য, ফ্যানটাও খুলে দাও নি, এই গরমে মানুষ থাকতে পারে। আমি তো ফ্যানের নিচেও হাঁফিয়ে উঠেছি। কলকাতা থেকে এখন পালাতে পারলে বাঁচি। এই গরমে মানুষ থাকে এখানে?'

হরিপদ একটু হাসতে চেষ্টা করল, 'তা ঠিক। তোমাদের বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। যাও নি যে।'

সুবিনয় বলল, 'যেতে আর পারলাম কই, কলেজ ছুটি হয়ে গেছে কবে। তবু এখানেই পচে মরছি। বাবার হুকুম বাড়ি আগলাতে হবে। চাকর-বাকরের ওপর বিশ্বাস নেই। একদল গেছেন কালিম্পংএ। তাঁরা ফিরে এলে আমি ছুটি পাব। তারপর তোমার কি খবর। তুমি যে এই অসময়ে। ভালো-ছেলেরা কি বেড়ায় নাকি? কখনো বই ছেড়ে ওঠে? অবাক কাণ্ড।'

হরিপদ চোখমুখ বুজে বলে ফেলল, 'বড় বিপদে পড়ে এসেছি ভাই, আমাকে গোটা পাঁচিশেক টাকা ধার দিতে হবে।'

সুবিনয় কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বলল, 'টাকা! ধার! তুমি কি বলছ হরিপদ।'

কিন্তু হরিপদ মরিয়া হয়ে উঠেছে। বলল, 'আমাকে না দিলেই চলবে না সুবিনয়।'

সুবিনয় বলল, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু অত টাকা আমি পাব কোথায়।' এই দিন-কয়েক আগে ও একশ টাকা পিকনিকে খরচ করে এসেছে কলেজের বন্ধুদের কাছে সেদিন সুবিনয় গল্প করছিল। ওর নিজের নামে ব্যাংকে এ্যাকাউণ্ট আছে সে খবরও হরিপদ জানে। এ সব কথা মনে উঠলেও হরিপদ চুপ করে রইল।

সুবিনয় বলল, 'কিছু মনে কোরো না। অত টাকা ধার দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি কোনদিন বলনি। এই প্রথম মুখ ফুটে চাইলে। আমি যা পারি দিচ্ছি।'

ভিতর থেকে একখানা দশ টাকার নোট নিয়ে এল সুবিনয় বলল, 'আমি এ সব ধার দেওয়া টেওয়া পছন্দ করিনে হরিপদ। বন্ধুদের সংগে এতে শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। বাবাও তাই বলেন। এমনি করে তিনি অনেক বন্ধু হারিয়েছেন। আজ-কাল আর দেন না। বলেন, না দিয়ে কষ্ট একবার আর দিয়ে কষ্ট একশবার।'

হরিপদ ভাবল নোটটা সুবিনয়কে ফেরৎ দেয়। কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল, দিতে পারল না। কিছু বলতে পারল না। শুধু মনের ভিতরটা জ্বলে যেতে লাগল।

সুবিনয় একটু বাদে হেসে বলল, 'কিছু মনে কোরো না ভাই, আমি শুধু আমার প্রিন্সিপলের কথা বললেম। ও টাকা তোমাকে ফেরৎ দিতে হবে না।'

হরিপদ বলল, 'নিশ্চয়ই দিতে হবে। আমিও আমার প্রিন্সিপলের কথা বলছি।'

অন্য দিন বাড়িতে এলে চা খাওয়ায় সুবিনয়। কিন্তু আজ আর বোধ হয় ওর সে উৎসাহ নেই। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামল হরিপদ। পেটের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি জ্বলছে মন। মার জন্যই এই অপমান সে সইল। না হলে নিজের জন্য কারো কাছে সে হাত পাতত না। সুবিনয়ের দশ টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসত। বুক-পকেটে চিঠিটা এখনো আছে। ওর ভিতরের অক্ষরগুলি তো অক্ষর নয়, জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরো।

হরিপদ আর দেরি করল না। কোথাও কোন দোকানের সামনে দাঁড়াল না। টাকাটা নিয়ে আপার সার্কুলার রোড ধরে সোজা হেঁটে চলে গেল উল্টোডিঙ্গির সেই কুণ্ডুদের আড়তে। শ্রীবিলাস কুণ্ডু বাঁধা-ছাঁদা শুরু করেছেন। তার হাতে দশ টাকার নোটটা গছিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন। পাকিস্থানী হিসাবে যা পাওনা হয়, মাকে দেবেন।'

শ্রীবিলাস বলল, 'দেব। চিঠিপত্র কিছু দেবে নাকি আমার কাছে।'

হরিপদ বলল, 'না। বলবেন আমরা ভালো আছি। চিঠিতে কিছু লেখার নেই বলেই চিঠি দিলাম না। আর বলবেন যেন কক্ষণো অমন বেয়ারিং চিঠি না দেয়।'

শ্রীবিলাস মৃদু হেসে বলল, 'বলব।'

হরিপদ আড়ত থেকে ঝড়ের মত বেরিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে ঘুরতে বাসায় গিয়ে যখন পৌঁছল, সন্ধ্যা উৎরে গেছে। তারাপদ তখনও দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে আছে। চোখ দুটো বোজা। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। হরিপদর সাড়া পেয়ে উঠে বসল, বলল, 'হরি এলি।'

'হুঁ।'
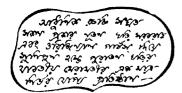
'খেয়েছিলি কোথাও কিছু?'

'কোথায় আবার খাব।'

'না বলছিলাম কোন বন্ধু টন্ধুর বাড়িতে যদি—'

'কত বন্ধু আমার জন্যে রাজভোগ সাজিয়ে বসে আছে। দশ টাকা শ্রীবিলাসের হাতে দিয়ে এলাম। মাকে দেওয়ার জন্যে।'

তারাপদ খুশি হয়ে বলল, 'দিতে পেরেছিস তাহলে কিছু? ওর থেকে ভেঙে আট আনা এক টাকার খেলেই পারতিস।'

হরিপদ রুক্ষ স্বরে বলল, 'ওর থেকে আবার কি খাব। যার পেটে সর্বগ্রাসী ক্ষিদে সেই সব খাক। আমাদের কিছু খেয়ে কাজ নেই।'

কুজো থেকে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে বাপের দিকে পিছন ফিরে তক্তা-পোশের ওপর শুয়ে পড়ল হরিপদ। তারাপদ সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটু-কাল কি দেখল। তারপর উঠে বাইরে চলে গেল।

খানিক বাদে ফিরে এসে ছেলের পিঠে হাত রেখে বলল, 'হরি, শোন।'

হরিপদ এদিকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'কি বলছ।'

তারাপদ বলল, 'এবেলা তোর খাওয়ার ব্যবস্থা করে এলাম।'

হরিপদ এবার সাগ্রহে মুখ ফেরাল, 'কোথায়?'

তারাপদ বলল, 'ওই উকিলবাবুর বাড়িতে। গিন্নীমাকে বলে এলাম, এবেলা যেন তোর জন্যে—'

হরিপদ আর্তনাদ করে উঠল, 'বাবা, ফের তুমি ওই বাড়িতে ঢুকেছ? তোমার কি মান সম্মান বলতে কিছু নেই?'

অন্ধকারে তারাপদ আর একবার ছেলের পিঠে হাত রাখল, মাথার চুলে হাত বুলাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না হরি, আর কিছু নেই। বেচবার মত আর কিছু নেই আমার, ঘরে নেই, দেহে নেই। মনের ওই একফোঁটা মান সম্মান, ওই এক ছিটে ধর্ম। তোর প্রাণের চেয়ে কি তার দাম বেশি হরি। না বেশি না। প্রাণটুকু রাখ। তারপর যদি দিন আসে আবার সব ফিরে পাবি।'

হরিপদ আস্তে আস্তে বলল, 'বাবা'।

তারাপদ বলতে লাগল, 'আমার কাছে আর কিছুর দাম নেই। জানিস আজ শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতবার কত কাপড়ের দোকান, কত গয়নার দোকানের সামনে থেমে দাঁড়িয়েছি। ইচ্ছে হয়েছে চুরি করি, ডাকাতি করি।'

হরিপদর এবার হাসি পেল, 'বাবা, চুরি করবার কি কোন কায়দা-কানুন তুমি জানো যে চুরি করবে। গায়ে কি একফোঁটা বল আছে যে, ডাকাতি করবে তুমি।'

তারাপদ বলল, 'তা নেই। কিন্তু চেষ্টা করলে জেলে যেতে তো পারি। সেখানকার চোর ডাকাতের দলে ভিড়ে গেলে ক'দিন আর লাগবে আমার খাঁটি চোর খাঁটি ডাকাত হতে। আমি সব পারি হরি, কেবল তোর মুখের দিকে চেয়েই কিছু করতে পারিনে।'

হরিপদ বলল, 'ও সবে তোমার কাজ নেই বাবা, ওসব তোমার ভেবে কাজ নেই।'

তারাপদ একটু যেন লজ্জিত হলো। খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে বলল, 'কথাটা তোর কাছেই বললাম, আর কারো কাছে বলিনি। কেবল দোকানের সামনেই দাঁড়াইনি। আজ সারাদিনভর চেনা শোনা অফিস, আদালতগুলিতেও কি কম ঘোরাঘুরি করেছি। কতজনকে বলেছি, বাবু আমি ভিক্ষে চাইনে, ধার চাইনে কাজ করতে চাই। একমাস আমি না খেয়েও খাটতে পারব। একমাস পরে আমাকে পয়সা দেবেন।'

একটু যেন কৌতূহল বোধ হল হরিপদর জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলল তারা।'

'কি আবার বলবে। রোজ যা বলে তাই বলল কাজ নেই কাজ কোথায়, আর এক বাবু তো হেসেই অস্থির। তিনি বললেন বুড়ো তোমার আর কাজের বয়স নেই, তোমার এখন কথার বয়স। ওই কাঠামোয় আর হবে না। এ জন্মে নয়, আর এক জন্মে এসো।'

হঠাৎ ছেলেকে তারাপদ শক্ত ক'রে ধরল 'আর এক জন্ম আমার তুই হরি। তোকে আমি কিছুতেই শুকিয়ে মরতে দেব না। মান যাক সম্মান যাক আমি আর কিছু চাইনে, তোর প্রাণটুকু বাঁচুক।'

হরিপদ চুপ করে রইল।

তরাপদ বলল 'আমি সব বলে এসেছি। তোর মুখ ফুটে কিছুই বলতে হবে না। তুই গিয়ে দাঁড়ালেই সবাই বুঝতে পারবে। ঘাড় গুঁজে মুখ বুজে খেয়ে আসবি। আজকের রাততো কাটুক, কালকের ভাবনা কাল।'

তারাপদ জামাটা ফের গায়ে দিতে লাগল।

হরিপদ বলল, 'আবার কোথায় চললে বাবা।'

তারাপদ বলল, 'যাব একটু পার্ক-সার্কাসে। সুরেনবাবুর বাসায়। তিনি দেখা করতে বলেছিলেন। দেখি যদি কোন সুবিধে টুবিধে হয়।'

সুরেন রায় কলেজের প্রফেসর। সকালে বিকালে রাত্রে সব সময়ই আজকাল কলেজ চলে। সেই কলেজে রাত্রে একটি বেয়ারার কাজের জন্য অনেকদিন থেকেই যে চেষ্টা করছে তারাপদ হরিপদ তা জানে। আশা প্রায় নেই বললেই চলে। তবু তারাপদ যাতায়াত ছাড়ছে না।

হরিপদ বলল, 'কিন্তু আজই কেন রাত্রে?'

তারাপদ বলল, 'যাই গিয়ে হাঁটিতে হাঁটতে। সেখানে গেলে তারা খালি চা-ই দেয় না মুড়ি হোক, রুটি হোক, কিছু না কিছু দেয়।'

লজ্জিত-ভঙ্গিতে তারাপদ একটু হাসল।

হরিপদ বলল, 'তবে যাও'

তারাপদ বেরোবার আগে আর একবার বলে গেল 'তুই কিন্তু যাস। আমি যা বললাম করিস আমার কথা শুনিস হরি।'

হরিপদ বলল, 'আচ্ছা।'

তারাপদ চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ সে বিছানায় শুয়ে রইল। বাবা তাহলে সব ব্যবস্থা করে এসেছে গিয়ে বসলেই হয়। কিন্তু কি ক'রে যাবে। যে বাড়ির লোক তাকে ঘাড় ধ'রে অমন করে বার দিয়েছে সে বাড়িতে অনাহূতভাবে ফের গিয়ে কোন মুখে পাত-পাতবে হরিপদ। তাছাড়া ওদের হেঁসেলের ভার তো সেই রাণীর ওপর। তার কথা মনে হতেই বুকের ভিতরটা ফের জ্বালা করে উঠল হরিপদর। সেই ঘটনার পর আসতে যেতে তাকে অনেকবার দেখেছে হরিপদ। কিন্তু প্রত্যেকবারই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পাছে চোখ পড়ে, পাছে বড়লোকের বাড়ির ওই সোহাগী ঝি মেয়েটার চোখে ব্যঙ্গের হাসি মজা দেখার হাসি দেখতে হয়। না কিছুতেই আর ও বাড়িতে যাওয়া চলে না, কিছুতেই যাবে না হরিপদ।

কিন্তু রাত যত বাড়তে লাগল মনের জ্বালা মানের জ্বালাকে ছাড়িয়ে চলল পেটের জ্বালা। হরিপদ ছটফট করতে লাগল ঘর-বার করতে লাগল।

উঠানে সেই রাঙা কৃষ্ণ-চূড়ার গাছটা ফুলের রাশ মাথায় ক'রে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে ফুলের রঙ কালো রাত্রের অন্ধকারে সব ঢেকে গেছে। গা ঢাকা দিয়ে হরিপদও চলে যাবে নাকি আস্তে আস্তে—কে দেখবে। নিজেকেই নিজে দেখা যায় না। আর কোন দিকে তাকাবে না হরিপদ। শুধু ভাতের দিকে ছাড়া।

কিন্তু গলির ওপারে ও-বাড়িতে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় সব দেখা যাবে যে। সেই আলোয় আর একজন সব দেখবে। না কিছুতেই যেতে পারে না হরিপদ, কিছুতেই না।

সদরের ফটকের কাছে অনেকবার গেল হরিপদ আবার ফিরে এল। দেউড়িটুকু আর পার হ'তে পারে না। দিনভর কলকাতার কত জায়গাতেই তো ঘুরে এল কিন্তু গলির এই পথটুকু পার হ'তে হরিপদর পা অবশ হয়ে আসছে।

ক্রমে ও-বাড়ির আলোও নিবে এল। খেয়েদেয়ে সবাই ওপরে চলে গেল। সব অন্ধকার। হরিপদর চোখের সামনে অন্ধকার জগৎটা ঘুরপাক খাচ্ছে। ফের ঘরে এসে ঢুকল হরিপদ। কুঁজোটা ধরল মুখের সামনে উপুড় ক'রে। শূন্য, জল ধরার কথা কারোরই মনে নেই।

'ভূতের মত অন্ধকার ঘরে কি করছ?'

'কে?' ঘুরে দাঁড়াল হরিপদ, 'কে তুমি।'

ফিক ক'রে একটু হাসির শব্দ শোনা গেল।

'পেত্নী।'

হরিপদ অস্ফুট-স্বরে বলল, 'রাণী?'

'হ্যাঁগো হ্যাঁ, শুধু রাণী নয়, রাজ-রাণী, মহারাণী, আলো জ্বালো এবার। হাত ভেঙে গেল। ভাতের থালাটা কোথায় রাখি, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। স্যুইচটা কোথায়।'

হরিপদ বলল, 'স্যুইচটা নষ্ট হয়ে গেছে। মিস্ত্রী ডেকে সারিয়ে নিতে হবে।'

রাণী বলল, 'তবেই হয়েছে। ততক্ষণ বুঝি এই অন্ধকার ঘরে থাকব তোমার সঙ্গে? লোকে কি বলবে শুনি।'

হরিপদ বলল, 'শোনাশোনির দরকার কি, ভাতের থালা তুমি নিয়ে যাও। ও-বাড়ির ভাত আমি খাব না।'

'ও-বাড়ির ভাত নয়, আমার ভাগের ভাত। মানী-পুরুষকে কি আমি যার তার ভাত খাওয়াতে পারি?'

রাণী ফিক ক'রে ফের একটু হাসল।

খুঁজে খুঁজে চারপয়সা দামের একটা আধপোড়া মোমবাতি হরিপদর বিছানার তলা থেকে পাওয়া গেল। ভেঙে দু' টুকরো হয়ে গেছে। দেশলাইও মিলল একটা। একটি কি দুটি কাঠি এখনো আছে।

আলো জেলে রাণী বসল পাতের কাছে। থালাভরা ভাত আর মাছ তরকারী। ভাত মেখে মুখে দেওয়ার আগে হরিপদ রাণীর চোখের দিকে একবার তাকাল।

রাণী বলল, 'কি হলো,' এমন মানী পুরুষ এমন তেজী পুরুষের চোখে জল। ছি ছি ছি।'

হরিপদ বলল, 'তা নয়, আমার মার কথা মনে পড়ছে।'

এঁটো বাসন কুড়িয়ে নিয়ে রাণী চলে গেল। আর তার খানিক পরেই ফিরে এল তারাপদ। এসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, 'গিয়েছিলি? খেয়েছিলি?'

হরিপদ মুখনিচু করে বলল, 'যেতে হয়নি বাবা সে নিজেই এসেছিল।'

তারাপদ বলল, 'কে?'

হরিপদ আরও মুখ নামাল, অস্ফুট লজ্জিত স্বরে বলল, 'রাণী।'

তারাপদ কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার সেই হাড় বের করা ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখ প্রসন্ন হাসিতে কোমল হয়ে উঠেছে।

একটু বাদে তারাপদ বলল, 'চিঠিখানা কি করেছিলিরে হরি।'

হরিপদ বলল, 'আমার কাছে আছে বাবা দেব?'

তারাপদ একটু যেন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'দে তো দেখি চারগণ্ডা পয়সা দিয়ে রাখলাম, ভালো ক'রে শোনাই হোল না।'

হরিপদ উঠে গিয়ে বুক পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে আনল। মোমের যে টুকরোটা পড়ে ছিল সেটা জেবলে দিল। তারপর বাপের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বলল, 'নাও বাবা পড়।'

তারাপদ একটু হেসে বলল 'কেনরে সকালের মত তুইই পড়না।'

হরিপদ বলল, 'না বাবা, তুমিই পড়, মনে মনে পড়।'

তারাপদ বলল, 'আচ্ছা দে।'

হরিপদ ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছিল তারাপদ তার হাত ধরে থামাল, সস্নেহে একটু ধমকের সুরে বলল,

'বোস এখানে। ভারি তো ইয়ে হয়েছে।'

হরিপদ আর কোন কথা না বলে বাপের পাশে বসে পড়ল। ছেলের এক হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আর এক হাতে স্ত্রীর চিঠি খুলে ধরল তারাপদ। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, মোমের বাতি নিবু নিবু। যে চিঠির অর্থ দিনের সেই প্রখর আলোয় ভালো করে ধরা পড়েনি এখন এই আধো অন্ধকারে যদি তার রহস্য কিছু বোঝা যায়।

(এক)

সেদিন, চিনি চিনি মনে হচ্ছিল, কিন্তু মুখখানা ফেরানো ছিল বলে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম না। তাছাড়া বছর পাঁচেক পরে দেখা, কেমন বাধ বাধ ঠেকছিল। বাসে ভীড়। খানিকটা জায়গা যা খালি আছে তাও করবীদির পাশে। বসব কি বসব না করতে করতেই করবীদি মুখ ফেরালেন। ভাব দেখে মনে হল চিনেছেন। হাসলুম।

করবীদি একটু সরে গিয়ে বললেন, "বোস।"

বসলুম। বললুম, "কোথায় চলেছেন?"

"পার্ক সার্কাস। ওখানেই বাসা। তারপর তুমি? তুমি তো এখন বিখ্যাত লোক। খুব মার টার খেলে পুলিশের। অ্যাঁ। তাইতে তো তোমার খবর পেলাম। জানলাম, এখন সাংবাদিক হয়েছ।"

করবীদি একটু মোটা হয়েছে। আগের চাইতে যেন রংটাও খুলেছে। সিঁথিতে সিঁদুরও উঠেছে। চুপ করে আছি দেখে খোঁচা মারলেন।

"কি, এখনো সেই পুরানো দলেই আছ?"

হেসে বললুম, "হ্যাঁ"।

"নবদ্বীপ যাও?"

বললুম, "না।"

"কতদিন?"

জবাব দিলুম, "বছর খানেক।"

"তাহলে তো তুমি শরৎদার খবর জান না?"

বললুম, "না।"

করবীদি গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, "ওঁর মেয়েটি মারা গেছে।"

করবীদি হাত ব্যাগ খুলে এক চিঠি বের করে দিল। পড়লুম। ধনুদা লিখেছে।

"করবী, শুনে দুঃখিত হবে, শরৎদার মেয়েটি মারা গেছে। যদিও ওঁর সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ হারিয়েছিলুম, কিন্তু এই ব্যাপারের পর দেখা করতে গিয়েছিলুম। গিয়ে আরো দুঃখ পেলুম। শরৎদা নিজের বাড়ীতে ফিরে গিয়েছিলেন মেয়েকে নিয়ে। সেখানেই মারা গেছে। মেয়েটি জন্ম থেকেই রুগ্ন ছিল। পাছে অহিত হয়, তাই শরৎদা বন্ধ ঘরে তাকে রেখেছিলেন। চার বছরে মেয়েটি আলো দেখেনি, হাওয়া লাগেনি তার গায়ে। এ অবস্থায় সুস্থ লোকই টিকতে পারেনা, তো রুগ্ন শিশু। শরৎদাও সেই ঘরে বসে থাকেন। তেমনি অন্ধকারে। কখনো বের হন না। বললুম, তো অসহায়ের মতো বললেন, "বাইরে যাবো? কোথায়?" আমার মুখে জবাব জোগাল না। যদি কখনো আসো, একবার দেখা করো।"

করবীদি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "কাজ আছে নাকি ভাই হাতে? যাবে নাকি আমার বাসায়, এই তো কাছেই, কণ্ডাক্টর রোক্‌কে।"

ইস্ট রেঞ্জের একটা দোতলা ফ্ল্যাটে থাকে করবীদি আর তার স্বামী ভূপতি দত্ত। স্বামিটি এ জি বেঙগলে কাজ করেন, করবীদি টেলিফোনে। অথচ করবীদি বড় গোঁসাই বাড়ীর মেয়ে। ঠাকুরবাড়ীর কল্যাণে বেশ দুপয়সা আছে। করবীদি বিয়ে করেছে বাড়ীর অমতে। তাই পরিবার থেকে ত্যাজ্য হয়েছে। বেশ সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট। কোথাও একটু ময়লা পড়ে নেই। মনে হল করবীদি সুখেই আছে।

বললে, "ভাই আজ আর আমার কোনো পলিটিকস নেই। আমার চোখে তোমরা সবাই সমান। ধনুদা আসে মাঝে মাঝে। ঘোর পলিটিকস করছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হয়েছে। বস ভাই, কিছু খাবার করে আনি।"

করবীদি ভেতরে চলে গেল। আমার শুধু শরৎদার কথা মনে পড়ছিলো। শরৎদার ছাত্রী ছিল করবীদি। ওকে পলিটিকসে নামিয়েছিল শরৎদা। একদিন করবীদি পলিটিকস ছাড়া আর কিছুই বুঝত না। আজ বলে গেল, আমার কোনও পলিটিকস নেই। আহা এটা যদি

করবীদি কয়েকবছর আগেও বুঝত! তবে বোধ হয় শরৎদার জীবনে এত বড় ট্র্যাজেডি ঘটত না। একটা অফুরন্ত সম্ভাবনাময় জীবনীশক্তি এমনি করে নিজেকে কামড়ে কামড়ে মেরে ফেলত না। শরৎদা আমারও মন্ত্রদাতা। জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্য পলিটিকস্ না করে, আমরা অন্য বৃত্তে ঘুরেছিলুম, পলিটিকসকেই জীবন করে তুলেছিলুম। হয়ত সেই ভুলেই এত বড় প্রতিভার এমন শোচনীয় আত্মাহুতি হল।

(দুই)

শরৎদাকে তিন অবস্থায় আমি দেখেছি। এক, যখন ইস্কুলে আমাদের পড়াতেন, দুই, যখন ও'র সঙ্গে পার্টি করেছি আর তিন, তাঁর শেষের দিকের অবস্থায়।

শরৎদা আমাদের ইস্কুলে খুব নামকরা মাস্টার ছিলেন। ছেলেরা তাঁকে খুবই ভালবাসত। আমরা ও'র কাছে নিচের দিকের ক্লাসে, মাত্র ক'মাস পড়েছিলুম। আমাদের ক্লাস থেকেই ও'কে ধরে নিয়ে যায়। তারপর প্রায় বছর চার পাঁচ বাদে যখন তাঁকে দেখি তখন আমার ইস্কুল ছাড়ার সময় প্রায় হয়ে এসেছে।

পুলিশ যেদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করে, আমাদেরই চোখের সামনে, সেদিনটা মনে আছে। আমাদের তখন মর্নিং ইস্কুল চলছে, সেইদিনই ইস্কুল বন্ধ হবে। বোধ হয় থার্ড পিরিয়ডে, ঠিক মনে পড়ছে না, শরৎদা ক্লাশে ঢুকলেন। আমরা উসখুস করছি, কথাটা বলি বলি করে। ইস্কুল বন্ধের আগের দিনটা পড়াশুনো হয় না। আমরা মাস্টারদের খাওয়াই। শরৎদা কিছুতেই খেতে চাইতেন না। বলতেন, এ সব ঘটা এদেশের লোক হয়ে করা শোভা পায় না। যে দেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক নিরন্ন, সে দেশে এই ধরণের অপব্যয় মহাপাপ। তোমরা ছাত্ররা, দেশের ভবিষ্যৎ। এ দায়িত্বহীনতা তোমাদের সাজে না। আরো অনেক শক্ত শক্ত কথা বলতেন, আমরা যার মানে বুঝতুম না। কতক কানে ঢুকত, কতক নয়। এবার আমরা ঠিক করেছিলুম, ও'কে কিছু খাওয়াবোই।

সতীশকে দিয়ে বলাতেই, এবারে রাজি হয়ে গেলেন। সতীশ ও'র খুবই প্রিয় ছিল। শুধু বললেন, খাওয়াবে? দাও। আবার দেখা হয় কি না হয়, ঠিক কি, একটা আক্ষেপ থেকে যাবে।

ও'র সম্পর্কে এইটুকুই শুধু মনে আছে। হ্যাঁ, আরোও একটা ব্যাপার সেদিন ঘটেছিল। হঠাৎ দলে দলে পুলিশ এসে ইস্কুল বাড়িটা ঘিরে ফেলেছিল। হেড্মাস্টার মশায় ছিলেন রায়সাহেব। তাঁর সে কি বিপর্যস্ত অবস্থা সেদিন। হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছিলেন। আর বারে বারে পুলিশ সুপারের কাছে গিয়ে হাত কচলাচ্ছিলেন। 'স্যর বলুন, কি করতে পারি।'

কিন্তু হেড্মাস্টার মশায়ের অনুনয় বিনয়ে কোনই ফল ফলেনি। শরৎদাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল। শরৎদা সে সময়ে খাচ্ছিলেন। সতীশ ক্লাসের বাইরে কি করতে যেন গিয়েছিল। হুড়মুড় করে ঢুকে বললে, "ওরে বাপরে, কত পুলিশ।"

মনে আছে, শরৎদা খেতে খেতে একবার মুখ তুলেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কত
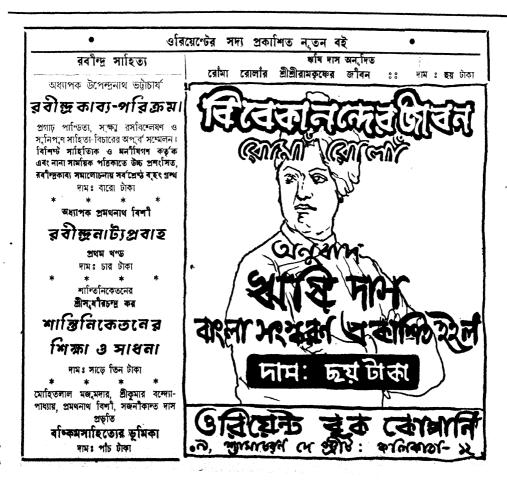
পুলিশ, সতীশ?" সতীশ জবাব দিয়েছিল, "অনেক স্যার, অনেক।"

"অ" বলে শরৎদা খাওয়া শেষ করলেন। জল খেলেন ধীরে সুস্থে।

ক্লাশে ক্লাশে তখন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি আমরা। কেউ কেউ কাঁদতে শুরু করেছে। শরৎদা বললেন, "ছি, কে কাঁদে? কেঁদনা। আজ তোমরা ছোট আছ, কাল বড় হবে। তোমাদের উপর দায়িত্ব পড়বে, দেশকে স্বাধীন করবার। কত লড়াই করতে হবে, ঠিক কি। ভয় পেলে লড়াই করবে কি করে?"

লেকচারে কি ভয় কাটে? ধপাস ধপাস শব্দ করতে করতে কতকগুলো বুটের শব্দ আমাদের ক্লাসের দিকেই এগিয়ে আসছিল। হেড্মাস্টার মশাইকে দরজার কাছে দেখলুম। পেছনে বেল্ট আঁটা বুট পরা, খাকীর প্যান্ট শার্ট পরনে আর সোলার হ্যাট মাথায় এক সাহেব। তারপরেই সাত আটজন পুলিশের লোক।

হেড্মাস্টার মশাই ঢুকলেন। ভয়ে, বিরক্তিতে রাগে সে এক অদ্ভুত অবস্থা হয়েছে তাঁর। বললেন, "শরৎবাবু আপনাকে ডিসমিস করলাম। পলিটিক্যাল ক্রিমিন্যাল-দের স্থান আমার ইস্কুলে নেই। ওঃ ডেঞ্জারাস্।" তারপর বাইরের সাহেবটির দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি আসুন, গ্রেপ্তার করুন।"

সাহেবটি ক্লাশে ঢুকবে শুনেই আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম করল। সাহেব ক্লাসে ঢোকবার উদ্যোগ করতেই শরৎদা বললেন, "বাইরে থাকুন, আমি যাচ্ছি। ক্লাসের পবিত্রতা নষ্ট করতে দিতে চাইনে।" তারপর শরৎদা প্ল্যাটফরমের উপর উঠে গোটা ক্লাসের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভারী ভারী বুটগুলো নিচে নেমে গেল। ইস্কুলময় উত্তেজনা। ক্লাস ভেঙে ছেলে বাইরে বেরিয়ে গেল। দেখলুম, শরৎদাকে হাতকড়ি পরিয়ে গাড়িতে তুলছে।

হঠাৎ ধনুদাকে দেখলুম, ফার্স্ট ক্লাসের লম্বা-চওড়া জোয়ান মর্দ ছেলে ধনুদা সেই প্রথমদিন চোখে পড়ল। ধনুদা ইস্কুলের পাঁচীলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে "শরৎদা কি জয়" বলে চেঁচিয়ে উঠল। কেউ সাড়া দিলে না। হেডমাস্টার মশাই চমকে, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন, ধমক লাগালেন, "এই উল্লুক, নেমে আয়।" ধনুদার ভয় নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। ধনুদা আবার আওয়াজ তুললেন, "বন্দে মাতরম।" সে ধ্বনি আমাদের পরিচিত। নিষিদ্ধ ধ্বনিটাতে এবার আমাদের বুকে ঢেউ উঠল, মুখে প্রতিধ্বনি ফুটল। "বন্দে মাতরম্।" কয়েকশত কণ্ঠ একই সংগে সাড়া জাগালে। পাড়া জাগালে। পুলিশের ভয়, হেডমাস্টারের ভ্রূকুটি কোথায় ভেসে গেল। সেদিন ধনুদার নেতৃত্বে ইস্কুলশুদ্ধ ছেলেরা সারা শহর ঘুরেছিলুম।

শরৎদা সম্পর্কে অনেক কথা ধনুদার মুখ থেকে শুনেছি। ধনুদা বলতেন, "জানিস, এমন লোক হয় না। শরদ্দার বাড়ি তো দেখিস নি, সেই এক বিরাট পুরী। চার-পাঁচ পুরুষের ডাকসাইটে জমিদার বংশ। এখন অবিশ্যি প্রায় কিছুই নেই। তাও, নেই নেই করেও যা আছে না, দেখলে অনেকেই ভিরমি খেয়ে পড়বে। কিন্তু শরদ্দা জ্ঞানবুদ্ধি হওয়া ইস্তক সেসব পয়সা হাতে ছোঁয় নি। বি-এ, এম-এ পাশ করেছেন টিউশনি করে করে। বলতেন, ওসব পয়সা অন্যায়ের কড়ি, কত লোককে শোষণ করে ও টাকা আমাদের গুষ্ঠি জমিয়েছে, আমাকে তো তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এই জন্যে শরদ্দার বাবাও ওকে দেখতে পারতেন না। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কি মহৎ প্রাণ, বল দিকিনি।"

শুনেছিলুম, রাজদ্রোহিতার চার্জে তাঁর পাঁচ বছর জেল হয়েছে। হেডমাস্টার মশাই শরৎদাকে বড্ড ঘৃণা করতেন। ওকে মাস্টারী দেওয়ায় তাঁর ইস্কুলের গ্র্যাণ্ট কাটা গিয়েছিল। রায় বাহাদুর হবার সম্ভাবনাও দূরে সরে গেল। পাঁচ বছর জেল—তিনি নাকি দুঃখিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, মহামান্য সম্রাট দয়া দেখান বলেই এই ধরণের ক্রিমিন্যালরা বড্ড প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। যেখানে লোকটার ফাঁসী হওয়া উচিত, সেখানে তার সাজা হল কি না মাত্র পাঁচ বছর জেল।

তবে শরৎদা পাঁচ বছরের আগেই খালাস পেয়েছিলেন। আমি তখন ম্যাট্রিক দিয়ে প্রেমসে পলিটিকস্ করছি। আমাদের এলোমেলো কাজে শরৎদা শৃঙ্খলা আনলেন। আর আনলেন এই করবীদিকে। করবীদি নিজেই এসেছিল। জেলে যাবার আগে শরৎদা করবীদিকে পড়াতেন, ওদের বাড়িতে গোঁড়ামি খুব। ওরা নন্দের গোঁসাই বংশ কি না। করবীদিই বোধ হয় বাড়ির প্রথম মেয়ে, যে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। কলেজে পড়ারও ইচ্ছে ছিল, বাড়ির অনুমতি না পাওয়ায় সেটা আর হয়ে ওঠে নি। শরৎদা ফেরার পর বোধ হয় করবীদির সে ইচ্ছেটা আবার জেগে উঠেছিল। বাড়িতে বললে, প্রাইভেটে আই-এ দেবে। শরৎদা যদি এখন পড়ান। শরৎদারও একটা সংস্থান হয়ে গেল। শরৎদাকে ওরা বাড়িতে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু শরৎদা বাপ-ঠাকুরদার অর্থটাই ছাড়তে পেরেছিলেন, আভিজাত্যটুকু নয়। তাই করবীদিদের বাড়িতে থাকতে রাজী হননি।

করবীদি আই-এর পড়া কতটুকু পড়ল কে জানে, তবে পলিটিকসে দড় হয়ে উঠল। ধনুদা ছাড়া অত ভাল ওয়ার্কার আমাদের পার্টিতে ছিল না। আর শেষ পর্যন্ত রেশারেশি যেটা শুরু হয়েছিল শরৎদা আর ধনুদার মধ্যে, তাও বোধ হয় করবীদিকে নিয়েই। সেটা অবিশ্যি আমার অনেক পরে মনে হয়েছে।

সূত্রপাতটা হয়েছিল থিওরী নিয়ে। ধনুদা ফিল্ড ওয়ার্কার। খুবই কাজের লোক। পার্টিকে দেখতে দেখতে কেমন সুন্দরভাবে গড়ে তুললে। যে কোনও কাজের সমর্থনে মার্কস এঙ্গেলস্ লেনিন থেকে উদ্ধৃতি ঝড়াঝড় তুলে দিতেন। শরৎদা অতি ধীর স্বভাবের লোক। চিন্তাশীল। জেলে বসে বিস্তর পড়াশুনা

করেছেন। বহুক্ষেত্রে ধনুদার কাজ সমর্থন করতে পারতেন না। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঘোরতর তর্ক চলত।

শরৎদা বলতেন, "ধনু একখানা বই না পড়েও কেমন করে মার্ক্সিস্ট হল, বুঝিনে। ও যা বলে, তার সঙ্গে মার্কসবাদের সম্পর্ক কোথায় খুঁজে পাইনে। সস্তা কতকগুলো প্যামফ্লেট পড়েই ভেবেছে বুঝি মার্ক্সিস্ট হলাম।"

ধনুদা বলতেন, "গুচ্ছের বই পড়লেই মার্ক্সিস্ট হওয়া যায় না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ আপনিই উপলব্ধি করা যায়।"

আসলে ধনুদা শরৎদা থেকে ঢের বেশী পলিটিশিয়ান, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ধীরে ধীরে পার্টিকে নিজের হাতের মুঠোয় করে ফেললে। শরৎদার প্রভাব যে পার্টি থেকে প্রায় মুছে যাবার মত হয়েছে, তা শেষ দিন পর্যন্তও তিনি বুঝতে পারেন নি। রাতদিন পড়াশুনো নিয়ে থাকলে চোখ খোলা রাখবেন কি করে?

ধনুদার একমাত্র ভাবনা এখন করবীদিকে নিয়ে। করবীদি বিপক্ষে থাকলে মুশকিলের সম্ভাবনা থেকে যায়। শরৎদাকে আমি শ্রদ্ধা করতুম। রাজনীতিতে যে স্বল্প পরিমাণ জ্ঞানও আমি পেয়েছি, সে সবই শরৎদার কাছ থেকে। কিন্তু তাতে কি? যদি পার্টির জন্য প্রয়োজন হয় শরৎদাকে সরাবার, তার জন্যে যে কোন রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হব না, এমন বুর্জোয়াসুলভ মনোবৃত্তির প্রশ্রয় কখনো দিই নি। এ শিক্ষা ধনুদার কাছ থেকে পাওয়া। করবীদি সংক্রান্ত ভারটি ধনুদা আমার হাতে তুলে দিলেন।

করবীদির সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই আমার সঙ্গে ওর ভাবও ছিল একটু বেশী। আমি জানতুম করবীদি যত আগ্রহে পলিটিক্স করছে, তার সবটাই পলিটিকসের জন্য নয়। ও শরৎদাকে ভালবাসত; কিন্তু শরৎদা বোধ হয় সেটাকে আমল দেন নি। তাঁর চোখে তখনো শুধু পলিটিক্স আর পলিটিক্স। বলতেন, "দুজন মনিবকে এক সঙ্গে সেবা করা যায় না।"

আমার মনে হয়, করবীদি বোধ হয় খানিকদূর এগিয়েও গিয়েছিল। কি করে সে কথা মনে হল বলছি। একদিন শরৎদার বাসায় গিয়েছি। কিছুদিন আগেই শরৎদা অসুখ থেকে ভুগে উঠেছেন। ঘরে ঢুকতে যাব, দেখি শরৎদা করবীদিকে বকছেন, আর করবীদি কাঁদছেন।

শরৎদা বলছেন, "এই মতলবে তুমি পার্টি করতে এসেছিলে! ছিঃ, ঘেন্না ধরিয়ে দিলে। দ্যাখ করবী, রাজনীতি করবে তো তাই কর, বিয়ে করে সংসার পাতবে তো তাই পাতো, কিন্তু দুটো এক সঙ্গে করতে যেও না। দুটো মুনিবকে এক সঙ্গে সেবা করা যায় না।"

আমি ঘরে ঢুকতেই সে প্রসঙ্গ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুজনের মধ্যে অস্বস্তির ভাবও দেখেছিলুম। ধনুদাকে রিপোর্ট দিয়েছিলুম বিস্তারিত। আর তাতেই কাজ হয়েছিল। বাকীটা ধনুদাই ম্যানেজ করেছিল।

সত্যি, ছয় মাসের মধ্যে করবীদির এতটা পরিবর্তন হবে, ভাবতে পারি নি। করবীদি যে এতটা পারবে, তাও আমার কল্পনার অতীত ছিল।

সেবার ওদিকে ভীষণ বন্যা হয়েছিল। সমস্ত পার্টি মিলে এক সংযুক্ত বন্যাত্রাণ তহবিল খোলা হয়েছিল, শরৎদা ছিলেন তার সেক্রেটারী। সেই তহবিল থেকে রহস্যজনকভাবে দশ হাজার টাকা উধাও হয়ে গেল। শরৎদা পাগলের মত হয়ে গেলেন, হদিশ বের করতে পারলেন না। শুধু শরৎদা কেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের পার্টির ঘাড়েও বদনাম পড়তে লাগল। ধনুদা আর করবীদি পার্টির সুনাম বজায় রাখতে যে কাণ্ড করলেন, তা আমি কখনো পারতুম না। সেইদিনই বুঝতে পেরেছিলুম, পলিটিক্স করবার মত স্নায়ুর জোর ধনুদার আছে, করবীদির আছে, আমার নেই।

স্পষ্ট মনে পড়ে কুণ্ডুদের বাড়ির দরদালানটা। হ্যাজাগ লণ্ঠনের আলোয়

অন্ধকার সরে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মওকা পেলেই লাফিয়ে আসবে। সারা ঘর ভর্তি লোক। তহবিল তছরুপের সভা। শরৎদার চোখে মুখে কেমন যেন অসহায় ছাপ। চশমাটা ঝুলে ঝুলে নাকের ডগায় নেমে আসছে। ওই কালো আঁচিলটায় বাধা না পেলে হয়ত পড়েই যেত। আর কি প্রচণ্ডভাবে ঘামছেন। একজনের পর একজন উঠে বক্তৃতা দিচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে শরৎদাকে চোর বলে। আমাদের পার্টিও বাদ যাচ্ছে না। আমাদের রক্ত গরম হয়ে উঠছে। শরৎদার জন্য আমরাও গাল খাচ্ছি, তাঁর উপরও রাগ হচ্ছে জোর। শরৎদাকে কেউ কিছু বলতেই দিচ্ছে না। বলতে চেষ্টা করলেই "চোর চোর" বলে তাঁকে বসিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ করবীদি উঠে দাঁড়ালেন। হৈ-চৈ একটু কমে গেল। বললেন, "শরৎবাবু যদি টাকা চুরি করে থাকেন"—তাঁর কথা বেরুতে না বেরুতেই শরৎদা যেন বৈদ্যুতিক শক খেয়ে লাফিয়ে উঠলেন। "কি কি বললে, আমি টাকা চুরি করেছি। আমি—" "চোর চোর" "বসো বসো" বলে সভাশুদ্ধ লোক তাঁকে বসিয়ে দিলে। শরৎদা ধপ্ করে সেই যে বসে পড়লেন, আর ওঠেন নি। চেয়ে দেখলুম তাঁর মুখ থেকে কে যেন সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। করবীদি অকম্পিত কণ্ঠে বলে গেলেন "শরৎবাবু যদি টাকা চুরি করে থাকেন তো তার যাবতীয় ঝক্কি তিনিই সামলাবেন, আমাদের পার্টিকে এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন? আমরা পার্টি মিটিংএ শরৎবাবুকে হিসাব দাখিল করতে বলেছিলাম, কিন্তু দুঃখের কথা তিনি সন্তোষজনক হিসাব দেখাতে পারেন নি। সে কারণ পার্টির স্পেশ্যাল মিটিংএ ও'র সভ্যপদ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।" করবীদি আর কিছু না বলে বসে পড়ল। করবীদির বক্তৃতা এতই আকস্মিক যে, আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। কিছুতেই মনে করতে পারছিলুম না কোন মিটিংএ আমরা শরৎদাকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। পিছন থেকে ধনুদার ফিস ফিস আওয়াজ শুনলুম, "বেশ বলেছ। তুমি এমন সুন্দর বলবে ভাবি নি।" দেখলুম করবীদি আর ধনুদা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে। কবে ওরা এত ঘনিষ্ঠ হল! বাঃ! করবীদি এতক্ষণ পরে যেন একটু নার্ভাস হয়ে পড়ল। তবু মুখে জোর দেখিয়ে বলল, "পার্টির থেকে শরৎদা বড় নন।" ধনুদা তার পিঠ চাপড়ে দিলেন "সাবাস"।

কিন্তু আমি। আমি কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলুম, শরৎদা চোর। উত্তরকালে ঘটনাটা কতবার মনে হয়েছে। কতবার মনকে জিজ্ঞাসা করেছি, শরৎদা কি চোর? স্পষ্ট করে মনের কাছ থেকে হাঁ জবাব পাই নি। তবে টাকাটা কি হল? শরৎদা কেন হিসেব দিতে পারলেন না? এটা এক রহস্য থেকে গেল আমার কাছে।

সেদিন সেই সভায় শরৎদার প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করা হয়েছিল। তাও কখনো ভুলব না। কেউ বললে, পুলিশে দাও, কেউ বললে মার। চোরের শাস্তি হওয়া দরকার। শরৎদা হাঁ-না কিছুই করলে না। উত্তেজনা যখন চরমে উঠেছে, তখন সিদ্ধান্ত হল, ওর মাথা-ভুরু কামিয়ে জুতোর মালা পরিয়ে শহরে ঘোরাও। একজন নাপিত ডাকতে গেল। এই সময় পিঠে ধাক্কা খেয়ে পেছনে ফিরলুম। দেখি আমাদের পার্টির সব উঠে যাচ্ছে। করবীদি বলছেন, "উঠে এসো।" সত্যি, বলছি, উঠে যাবার অনেক চেষ্টা করলুম, পারলুম না। ওই যে রক্তহীন ফ্যাকাশে মর্মর মূর্তির মত শরৎদা বসে আছেন, তাঁর আকর্ষণ আমাকে জোর করে বসিয়ে রাখলে।

নাপিত এল। শরৎদার মাথা কামিয়ে ফেললে। তিনি একটুও বাধা দিলেন না। আমার কেমন ভুল হয়ে যায়। তারপরের ঘটনাটা আর কিছুতেই মনে করতে পারিনে। ভুরু কি কামিয়েছিল? আমার একবার মনে হয়, আমি বাধা দিয়েছিলুম, ভুরু কামাতে দিই নি। কিন্তু আমার মত ভীরু লোকের পক্ষে অতটা সাহস দেখান সম্ভব কি?

তারপর তাঁকে শহর ঘোরান হল। পোড়ামাতলা, যুগনাথতলা, বুড়ো-শিব-তলা, বাজার, চারচারা পাড়া ঘুরে ঘুরে প্রোসেসন চলল। "চোর চোর" চিৎকার। মন্ত্রমুগ্ধের মত শরৎদা জুতোর মালা গলায় পরে চলেছেন। প্রায় চল্লিশজনের একটা দল তাঁকে ঘিরে

চলেছে। আমাদের ইস্কুলের কাছে এসে প্রোসেসনটা দাঁড়াল। "চোর চোর" চিৎকার উঠতেই ক্লাসশুদ্ধ ছেলে ভেঙে পড়ল মজা দেখতে। তারাও চেঁচিয়ে উঠলে "চোর চোর।" মনে পড়ল আরেকদিন সকাল-বেলার কথা। শরৎদাকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছিল, এই ইস্কুল থেকে। ওই তো সেই পাঁচিল, ধনুদা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়েছিল, "শরৎদা কি জয়।"

বকুলতলা থেকে কে একজন বললে, "যথেষ্ট হয়েছে আর না। এবার ওকে ছেড়ে দাও, বাড়ি যাক।" কে আরেকজন বললে, "কেউ একজন সঙ্গে যাক।" কে যাবে, কে যাবে, একজন আমাকে দেখিয়ে দিলেন, "ও তো ওরই দলে। ওই যাক না।"

আমার উপর ভার দিয়ে সবাই সরে পড়লেন। গনগনে রোদ্দুর। লোকজন সব চলে গেছে। শুধু আমি আর শরৎদা। চুপচাপ পথের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ ফ্যাকাশে। চোখ বোঁজা। আমি গলার জুতোর মালাটা খুলে দিলুম। চশমাটা ঝুলে প্রায় পড়ে যাবার মত হয়েছিল, ঠিক করে দিলুম। শরৎদার নড়ন-চড়ন নেই। পথের পাশে বারান্দায় বসিয়ে দিলুম তো বসে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলুম, "কোথায় যাবেন, শরৎদা।" চোখ খুলে আমার দিকে চাইলেন। জিজ্ঞাসা করলুম, "কোথায় যাবেন?" ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। বললুম, "বাসায় যাবেন?" ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে জানালেন, না। আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "তবে? বাবার কাছে যাবেন?" ঘাড় নাড়লেন, হ্যাঁ।

ধনুদা ভুল লিখেছে। মেয়ে নিয়ে নয়, বিয়ে হবার আগেই শরৎদা নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন। আমিই পৌঁছে দিয়ে এসেছিলুম। পার্টির আর কেউ শরৎদার খোঁজ তো করত না। জানবে কি করে?

সেদিন করবীদি যখন বললে, আজ আমার কোনো পলিটিকস্ নেই। তখন ইচ্ছে হয়েছিল একবার, জিজ্ঞাসা করি শরৎদা টাকা চুরি করেছে, এটা ও বিশ্বাস করে কি না। কিন্তু পুরানো কথা তুলে লাভ কি? রহস্যটা আমার কাছে রহস্যই থাক। আরো একটা রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি নি। পরের কয়েক বছর পার্টির কাজ অত ভালভাবে চলেছিল কি করে? আমরা অনেক পুস্তিকা ছাপিয়েছিলুম, তিনজন হোলটাইম ওয়ার্কার রেখেছিলুম, তিনটে মহকুমায় বছর দুই ধরে আফিস রেখেছিলুম। কোথা থেকে এই খরচ মেটাতুম, তাও বলতে পারিনে। করবীদি হয়ত পারতে পারে; কিন্তু সে কথাও আর জিগ্যেস করলুম না। প্রয়োজন কি?

(তিন)

করবীদি সামনে বসে আমাকে খাওয়ালে। শরৎদার কথা জিগ্যেস করলে। ওর কথা-বার্তায় কোথাও তো আন্তরিকতার অভাব

দেখলুম না। অথচ এই করবীদিই না একদিন শরৎদাকে প্রকাশ্যে চোর বলতেও বাদ রাখেনি। শরৎদাকে যখন পার্টি থেকে খেদিয়ে দেওয়া হ'ল, সেইদিনও এই করবীদিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পরে অবশ্য জেনেছিলুম, করবীদি পুতুলমাত্র, অদৃশ্য থেকে যেমন ইঙ্গিত পাচ্ছিল, অভিনয়টা তার সেই মতই চলছিল। এই মেয়ে আর সে মেয়ে, ব্যক্তি তো একই। কিন্তু তবু কেমন দুটো আলাদা ব্যক্তিত্ব হয়ে গিয়েছিল। কেন, পার্টি পলিটিক্সের মধ্যে কি এমন রহস্য আছে, যা মানুষকে মানুষ রাখে না, আজ্ঞাবহ পুতুল করে তোলে? এ প্রশ্নের হদিশ আজও আমার মেলেনি।

আজ শরৎদার দুর্ভাগ্যে করবীদি আমার সামনে দীর্ঘশ্বাস ফেললে। এর মধ্যে একটুও ফাঁকি নেই। আমি চলে গেলে হয়ত চোখের জল ফেলবে। কিন্তু এই করবীদিই আর একদিন, পার্টি মিটিং-এ শরৎদার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তুলে দেবার প্রস্তাব অকম্পিতকণ্ঠে সমর্থন করেছিল, আমি সে প্রস্তাবে সায় দিতে পারিনি বলে আমাকে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছিল। শুধু কি তাই, সেই প্রস্তাবের একটা কপিও শরৎদার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। রাজনীতি কি মানুষকে এত নিষ্ঠুর করে?

শরৎদা বাড়ী ছেড়ে বেরুতেন না। করবীদিরা তার কারণ খুঁজে পায়নি। বলত, মুখ দেখাবার জো নেই, তাই। হয়ত তাই। আমার সঙ্গে যে কয়েকবার শরৎদার দেখা হয়েছে, হয়েছেও বার দুই-তিন, শরৎদাকে শুধু বাড়ীর মধ্যে নয়, একেবারে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে দেখেছি। বন্ধ ঘরে বসে থাকতেন। দরজা জানালা তো বন্ধই থাকত, ফাঁক ফোকরগুলোও কালো পর্দা দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন। সে ঘর ছেড়ে বেরুতে চাইতেন না। বলতেন, বাইরে বড় নোংরা, বড় নোংরামী।

শুনেছি বিয়ে করতে গিয়েছিলেন ঢাকা গাড়ী করে। দুর্ভাগ্যত বৌও বেশীদিন বাঁচেনি। একটি মেয়ে প্রসব করে হাসপাতালেই মারা যায়।

শরৎদার বৌকে আমি দেখিনি, মেয়েকে দেখেছি। বছর তিনেক বেঁচেছিল। আমি যখন দেখি, তখন মেয়েটিও ভুগছে, বছর আড়াই বয়েস হবে। আমাদের এক ডাক্তার-বন্ধু চিকিৎসা করত। বলত, মেয়েটা ভাই বাঁচবে না, আলো নেই, হাওয়া নেই, এর মধ্যে যে এতদিন বেঁচে আছে সেই যথেষ্ট।

বলতুম, তুই বলতে পারিস নে সে কথা?

ডাক্তার-বন্ধু বলত, কাকে বলব? শরৎদাকে বললেই, শরৎদা শিউরে ওঠেন। বলেন, না না, দরজা জানালা বন্ধ থাকবে। আমি দেখেছি বাইরের হাওয়ায় বড় নোংরামী। আমি চাইনে আমার মেয়ের গায়ে সে হাওয়া লাগুক। নিজেই মেরে ফেলবে মেয়েটাকে। আর ফেললেনও।

আমি নিজেও একবার বলেছিলুম শরৎদাকে, কিন্তু শরৎদার এক কথা। নোংরা, নোংরা, বাইরে বড় নোংরামী। প্রথম যখন ও'র ঘরে ঢুকতে যাই, বলেছিলেন, ওই দরজার কোণে লাইজল আছে, হাত ধুয়ে ঢোকো। তোমরা তো রাজনীতি কর, তোমাদের হাত বড় নোংরা থাকে।

এটা শরৎদার বাড়াবাড়ি। পলিটিক্স জীবনেরই একটা অংশ। জীবনের বহুবিধ লীলার মধ্যে একটা। পার্টি পলিটিশিয়ানরা সে কথা ভুলে গিয়ে পলিটিক্সের কাছে জীবনকে বিকিয়ে দিয়েছে। আমি মনে করি, এ এক মহাভুল। তেমনি ভুল কি শরৎদা-ও করছেন না? পলিটিক্সের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াও কি সমান ভুল নয়?

করবীদির কাছ থেকে বিদায় নিলুম। আসবার সময় করবীদি বললে, "শরৎদাকে কি আর বাইরে আনা যায় না?"

চুপ করে রইলুম। করবীদি বললে, "তুমি কি এর মধ্যে নবদ্বীপ যাবে?"

বললুম, "যেতে পারি হয়ত।"

করবীদির কণ্ঠে মিনতি ফুটে উঠল, "ফিরে এসে, একদিন আসবে এখানে? এসো ভাই, শরৎদার খবরটা দিয়ে যেও।"

হালে আমলের ছবি ও নাটকের বিষয়বস্তু

অর্ধেন্দু দত্ত

যে শিল্প-সাহিত্য রচনার ওপরে সমসাময়িক কালের ছাপ মূর্ত্য থাকে সে শিল্প-সাহিত্য হয় একটি বিশেষ যুগধর্মী; আর যে-শিল্প ও সাহিত্য রচনা সমসাময়িক কালের ওপরেই একটা নূতন কোন প্রভাব ছড়িয়ে দেয় সেই শিল্প-সাহিত্য রচনাকেই বলা হয় যুগান্তকারি মৌলিক সৃষ্টি। প্রথম ধারাটি হচ্ছে কালের অনুসরণ বা অনুগমন, আর দ্বিতীয় হচ্ছে কালের পথনির্দেশক বা দিকনির্ণায়ক। সমস্ত শিল্পসাহিত্য রচনাই এই দু'টি ধারার কোন একটির মধ্যে পড়বেই। তার কারণ, এর মূলে রয়েছে, হয় বর্তমান নিয়ে চিন্তা বা চিন্তার ওপরে বর্তমানের অর্থাৎ সমসাময়িকতার প্রভাব, আর নয়তো বর্তমানকে অতিক্রম ক'রে উত্তরকালের চিন্তা বা বর্তমানের মধ্যেই উত্তরকালের রূপ পরিকল্পনা।

শিল্পসৃষ্টির মনের কথা ঐভাবে ভাগ ক'রে নিয়ে বাঙলা ছবি ও নাটকের বর্তমান ধারাটা বিচার করা যাক। নাটক বা ছবির বিষয়বস্তুতে সমসাময়িক ভাবধারার প্রভাব অবশ্যই থাকবে কিন্তু বর্তমান বাঙলা নাটক ও ছবিতে যে ধরণের বিষয়বস্তু দেখা দিয়েছে ব্যাপকভাবে, তা জনগ্রাহ্য হয়েছে কিনা বা হওয়া উচিত কিনা, বিবেচনা করে দেখা দরকার। নাটক বা ছবিকে সমাজসেবায় প্রয়োগ করার চেতনা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। সবাই ভাবছেন একটা কিছু করা দরকার। সবাই চাইছেনও একটা কিছু করতে। এবং সবায়েরই অনুভূতিতে সমাজের দুঃখ ও নিপীড়িত-দের আকুতি প্রবল বেগে যেন উপচে পড়তে আরম্ভ করেছে। সমাজের গলিঘুঁচি আনাচে-কানাচে খোঁজাখুঁজি চলছে কে কোথায় ডুকরে মরছে জীবনায়নের

উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন ও চন্দনকুমার—প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত এবং সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত "ওরা থাকে ওধারে"র প্রধান চরিত্র কটি

জ্বালায়। এইভাবে আগে লোকে যাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতো না, নাটক ও ছবির মধ্যে দিয়ে তারা তাদের জ্বলনের চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে—কিন্তু তাদের বিধ্বস্ত চেহারাটাই শুধু।

কেরাণী চরিত্র নিয়ে নাটক ও ছবি আগে হয়েছে, ওদের জীবনের বহুবিধ বিড়ম্বনা ও বিপর্যয়কেও সামনে তুলে ধরা হয়েছে। ওদের জীবনের নানা সমস্যার কথাও উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে আসল বক্তব্য ছিল অন্য কিছু, কেরাণীর জীবনকে পরিবেশ হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এখন এসেছে "কেরাণীর জীবন" সর্বতোভাবে কেবলমাত্র কেরাণীদের কথাই জানাবার জন্য। এমন একজন কেরাণীকে নিয়ে এর গল্পটি তৈরী করা হয়েছে, মোটামুটিভাবে যাকে সমগ্র কেরাণীকুলেরই প্রতীকী চরিত্র ব'লে ধরে নেওয়া যায় এবং উদ্দেশ্যও যে তা-ই ছিলো বুঝতে পারা যায় স্পষ্টভাবেই। তেমনি এসেছে "জীবনটাই নাটক" যার মধ্যে দিয়ে বাঙলার মঞ্চের কর্মী ও শিল্পীদের নিদারুণ দুরবস্থার চেহারাটাই ব্যক্ত করা হয়েছে। তেমনি "পথিক"-য়ে পাওয়া গেল কয়লাকাটাদের জীবনের কথা। "নতুন ইহুদী" নিয়ে এলো উদ্বাস্তুদের মর্মন্তুদ বিকারের চেহারা। "বনহংসী" দেখালো ক্ষয়িষ্ণু বনেদীয়ানার হতাশা। "ভোর হয়ে এলো" বেকার জীবনকে নিরাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে উপস্থিত হ'লো। "আদর্শ হিন্দু হোটেল" হাজির হলো সমাজের আর এক অবজ্ঞাত শ্রেণীর কথা নিয়ে—রসুই বামুনদের কথা, তাদের দুঃখ ও স্বপ্ন। আরও আসছে, যেমন ছেঁড়া কাগজ নিয়ে যারা জীবনধারণ করে তাদের নিয়ে "ময়লা কাগজ"; ভিক্ষুকদের নিয়ে "দুর্লভ জনম" এবং হয়তো আরও কতো শ্রেণীর জীবনযাত্রা নিয়ে আরও কতকগুলি ছবি ও নাটক।

সমাজের সকল স্তরের, সকল শ্রেণীর লোকেরই জীবন আজ বিপর্যস্ত ও অশান্ত। এ সময়ে সেই বিপর্যয় ও অশান্তিই সব মানুষেরই মনে ছেয়ে থাকা স্বাভাবিক। কাজেই এখনকার শিল্প-সাহিত্য রচনাও ওরই প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাটাও স্বাভাবিক। সে-বিচারে ওপরে যে নাটক ও ছবিগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিকে যুগধর্মী ব'লে আখ্যাত করা যায় এবং ঐ ধরণের বিষয়-বস্তুই যখন ব্যাপকভাবে প্রমোদক্ষেত্র অধিকার করে নিচ্ছে তখন একথা বলা যেতে পারে যে, এখন যারা নাটক ও ছবি রচনা করছেন, তাঁরা সমসাময়িক কালের অবস্থা সম্পর্কে কাতর বলেই ঐসব ছবি ও নাটক পরিকল্পনা করতে পেরেছেন। কিন্তু ঐমাত্রই সব, সমসাময়িক অবস্থার ওপরে তাদের সহানুভূতি কতটা, যেসব শ্রেণীর লোকেদের কথা তাঁরা সামনে তুলে ধরেছেন তাদের জন্যে সত্যিই মন কতটা কেঁদে উঠেছে সেটা বিশ্লেষণ করা দরকার। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত নামের তালিকায় যে ছবি বা নাটক এখনও আত্মপ্রকাশ লাভ করেনি সেগুলি এই বিশ্লেষণের মধ্যে ধরা যাবে না।

"কেরাণীর জীবন"-এর মধ্যে পাই এক প্রৌঢ় কেরাণীকে; কর্মপটু ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। যৌবনকাল থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত দীর্ঘকাল কেরানীগিরি করে আসছে। যথাকালে বিবাহ করেছে, যথানিয়ম সন্তানাদিও হয়েছে। গল্পের পত্তন তার এই প্রৌঢ় কালটি নিয়ে। দেখা যায়, তার যা মাইনে সংসার চালাবার খরচ তার চেয়ে বেশী। ফলে খাওয়া-পরার দিকেও যেমন অনটন, তেমনি ছেলেমেয়েদের মানুষ ক'রে তোলারও অসুবিধে। সুতরাং তার সংসারে একটার পর একটা ট্র্যাজিডিই ঘটতে থাকে। সব ট্র্যাজিডিরই কারণ হচ্ছে আর্থিক অস্বাচ্ছল্য এবং এমন সব ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে যার প্রতিপাদ্য এইমাত্রই দাঁড়ায় যে, ঐ কেরাণী ভদ্রলোকের আয়টা বেশী হলে কোন দুঃখই থাকতো না।

"জীবনটাই নাটক"-এর ভিত্তিও আর্থিক দুর্গতি। থিয়েটারের অভিনয়শিল্পী ও কর্মীদের অবস্থার কথা রয়েছে এতে। নাটক ক'রে অন্নের সংস্থান করা যায় না। কাউকে স্ত্রী ফেলেই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়; কারুর সন্তান বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। একদিন যে ব্যক্তি দলের মালিক ছিল অবস্থার ফেরে পরে সে সেই দলেরই বেতনভুক্ শিল্পী; অবশ্য তারও বেতন বাকী থাকে। একদিন যার অভিনয় দেখার জন্য দূর দেশান্তর থেকে লোক ভেঙে পড়তো, তার বার্ধক্যে লোকের কাছে তো আদর থাকলই না, এমন কি অতীতে যারা তারই অধীনে থেকে তাকে অনুসরণ ক'রে অভিনয় করতে কৃতার্থ হয়ে যেতো তারাই এখন অসম্মান ক'রে পাশে ঠেলে রেখে দেয়। অভিনয়ের ওপরে এদের সবায়ের প্রাণাধিক নিষ্ঠা, মঞ্চই এদের মোক্ষস্থান; খেতে না পেলেও এরা আঁকড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু কাহিনীতে শিল্পীর ঐ মাহাত্ম্যই বড়ো কথা নয়। এখানেও কেরাণীদের মতোই অর্থের অভাবটাই গল্পের আসল

প্রতিপাদ্য বিষয়, যেন শিল্পীরা পয়সাওয়ালা লোক হ'লেই ওদের সব দুঃখ ঘুচে যেতো।

"পথিক"-এর সুরটা একটু অন্যরকমের। কয়লাকাটাদের নিদারুণ দুঃখময় জীবনের অভিজ্ঞতাও যেমন মূর্ত্ত ক'রে তোলার চেষ্টা হয়েছে তেমনি ভালো জীবনের একটা পথেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লোকে গ্রহণ করুক বা না করুক, সেটা পরে বিচার্য, কিন্তু তবু একটা আদর্শ তো জাহির করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানেও কয়লাকাটাদের সমস্যা হচ্ছে আর্থিক।

"নতুন ইহুদী"-তে পাওয়া যায় একদল উদ্বাস্তুকে। বিকৃত জীবনের দিকে ওদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আর সেই সঙ্গে দেখানো হয়েছে সমগ্র পৃথিবীটাই কত অকরুণ, নির্ম্মম, চরিত্রহীন। গ্রাম ছেড়ে এলো ওরা, ধরতে গেলে, কোন পুঁজি সম্বল না ক'রেই। যা কিছু ঘটনা দেখানো হয়েছে তাতে ওদের সমস্ত কিছু দুঃখ দুর্দশাকে কেবলমাত্র অর্থচক্রেরই পাকে পাকে চরকি খেতে দেখা গেল। যেন বাস্তু ছেড়ে আসার সময়ে হাতে বেশ কিছু টাকা থাকলে ওদের আর কোন দুঃখই থাকতো না।

"বনহংসী" নিয়ে এলো ক্ষয়িষ্ণু বনেদীয়ানার দুর্বিপাক। এখানেও সমস্যা টাকা নিয়েই। টাকা থাকলে যেন বনেদীয়ানা অটুট রেখে দেওয়া যেতো। এক সময়ে সম্পদ, প্রতিপত্তি ও আভিজাত্য ছিল, কিন্তু এখন তার কিছুই নেই। গল্পের সম্বল শুধু অতীতের বড়াইটুকু। টাকার জন্যেই সংসারটা ছারখার হয়ে গেল, আর ঐ টাকার লজ্জাতেই নায়ক নায়িকা প্রেম করেও মিলিত হতে পারলো না।

"ভোর হয়ে এলো"-তে দেখা যায়, বেকারত্বের অভিশাপ। অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দু'টি যৌবন হাত-ধরাধরি ক'রে জীবনের পথে পা বাড়ালো, কিন্তু এগিয়ে যাওয়া আর হ'লো না। আর্থিক সমস্যার একটা অনড় পাহাড় ওদের ঘাড়ে চেপে বসলো, সব স্বপ্ন ও আশা চেপ্টে ধূলো হয়ে গেলো, আর সেই সঙ্গে ওরা নিজেরাও।

আরও পরে এসে হাজির হ'লো "আদর্শ হিন্দু হোটেল"। রসুই বামুনদের জীবনের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী। কেরাণী বা নাটুকেদের মতোই সেও কর্ম্মনিষ্ঠ; ওদের

মতোই সেও সমাজযন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ একটি, এবং ওদের মতোই একেও ভাঙিয়েই লোকে কোরে খায় কিন্তু এর ভাগে জোটে ছাই। তবুও সে স্বপ্ন দেখে নিজের পায়ে দাঁড়াবার এবং একদিন সে বিদ্রোহও ক'রে বসে।

এইসব নাটক ও চিত্রনাট্যের উদাহরণ তোলা হ'লো এখনকার শিল্পস্রষ্টাদের চিন্তার প্রকৃতিটা বিশ্লেষণ করার জন্যে। এবং একথাও বলা যেতে পারে যে, এই উদাহরণগুলি মোটামুটিভাবে চলতি ধারারই প্রতিনিধিমূলক দৃষ্টান্ত। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সবারেরই চেষ্টা একেবারে বেআব্রু বাস্তবকে সামনে এনে হাজির করার। এমন বাস্তব যা সবায়েরই গোচরের মধ্যে তো আছেই, হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভও ঘটে থাকতে পারে। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সকলেই এক এক-রকমের চরিত্র এবং ভিন্নতর ঘটনাবলী রচনা করলেও মূল দৃষ্টিভঙ্গীটা সবায়েরই এক। সবাই দেখা যায়, এমন একটি চশমা ব্যবহার করেছে যার মধ্যে দিয়ে শুধু অর্থাভাবের দুর্গতিটাই দৃষ্টিতে পড়তে পারে। তাও তারা দেখতে পেয়েছেন ঠিক যতটুকু দৃষ্টির পরিধির মধ্যে পড়ে। শুধু আর্থিক সমস্যাই এরা দেখছেন, আর কিছু নয়। কিন্তু আর্থিক সমস্যাটা কেন প্রকট হ'য়ে উঠেছে, সত্যিই তার মূল কোথায়—সেই ভিতরকার কারণটা টেনে বের করে দেখানো ব্যাপারে সবাই সমান উদাসীন, —অজ্ঞতাও হতে পারে, আবার ইচ্ছে করেই পাশ কাটিয়ে যাওয়াও হতে পারে।

কেরাণীদের অবস্থা কে-না চোখের সামনে দেখছে রোজই। অভিশপ্ত বেকার জীবনের একটা না একটা পরিণামের তো রোজই সাক্ষী হয়ে পড়তে হচ্ছে। উদ্বাস্তুদের অবস্থা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় কা'র নেই আজ? বনেদীয়ানা নামতে নামতে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে তা জানতে বাকী আছে কার? পথে প্রান্তরে, গৃহে প্রাঙ্গণে সর্বত্র অহোরহ যা ঘটছে সেই সবই আবার পর্দা বা মঞ্চের ওপরে এনে ফেলবার কি সার্থকতা থাকতে পারে? —আর তার মধ্যে সৃষ্টিমৌলিকত্বই বা কোথায়? অথচ এই হচ্ছে হাল আমলের ছবি ও নাটকের বিষয়বস্তুর ধারা! নিপিষ্ট মানুষকে দীপ্ত চেতনায় অনুপ্রাণিত ক'রে ভালোভাবে বাঁচবার পথের দিকে যাবার কথা কারুর রচনার মধ্যে নেই, যেমন নেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের যাদের নিয়ে এইসব রচনা তাদের অবস্থান্তরের আসল হেতুটা খুঁজে এনে দেবার কোন চেষ্টা।

সুন্দরতর জীবনের চেহারা সামনে তুলে ধরাটা কি শিল্পীর কর্তব্যের বাইরে পড়ে? কিভাবে সুন্দরতর জীবনে পৌঁছতে হয়, তর্কের খাতিরে না হয় মেনেই নেওয়া গেল যে, শিল্পী বা রচয়িতার তা দেখিয়ে দেবার কথা নয়। কিন্তু শিল্পীই যে স্রষ্টা, তার কল্পনা যে তাকিয়ে থাকে ভবিষ্যতের দিকে—তবেই না সে স্রষ্টা পদবাচ্য হয়। আজ যাঁরা ছবি ও নাটক করছেন তাঁদের সে দৃষ্টি কোথায়? তাহলে তাঁদের আদপে শিল্পীই বা বলা যায় কি হিসেবে?

বাস্তব জীবন নিয়ে যাঁরা ছবি তুলে যাচ্ছেন অতি একচোখো নজরের পরিচয় দিচ্ছেন তাঁরা। সমাজে ক্লেদ, কালিমা, দীনতা, ছলনা, প্রবঞ্চনা, দুঃখ ও অশ্রু যেমন আছে, তেমনি তারই পাশে পাশে পড়ছে মহত্বের ছায়া, জীবনের মাধুর্য, আনন্দ ও প্রশান্তি। দুঃখ ও দারিদ্র্য পরিতাপের বিষয়, কিন্তু জীবনের ব্যতিক্রম নয়; তেমনি সুখ ও শান্তি পরম আনন্দের বিষয়, কিন্তু তাও জীবনের ব্যতিক্রম নয়। এর কোন একটা মাত্র দিক নিয়ে জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ফোটানো যায় না। কিন্তু আজ যাঁরা ছবি ও নাটক তৈরী করছেন তাঁরা সেই চেষ্টাতেই লিপ্ত হচ্ছেন এবং সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র ক্লীন্ন, নিপিষ্ট, আশাভরসাহীন জীবন্মৃত মানুষদের কথাই সামনে তুলে ধরে এরা ভালোভাবে থাকবার কামনাকে হতাশায় মুষড়ে দিচ্ছেন। আর সর্বোপরি এ'রা মঞ্চ ও পর্দার আসল ধর্ম ও বৃত্তিটাই লোপ পাইয়ে দিতে চাইছেন। মনকে উদ্দীপ্ত ও প্রসন্ন ক'রে তোলার জন্যই যে নাটক ও ছবির সার্থকতা, এদের আমলে দিন দিনই তা ভুলে যেতে হচ্ছে।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহালয়া · ১৩৬১

মাতৃপূজা

মা আসিয়াছেন। জটাজূটসমাযুক্তা জননী। শরতের স্বর্ণাভ সূর্যকিরণে যে মায়ের উন্নত কিরীট আকাশের কোলে ঝলমল করিত, আজ তাহা নিষ্প্রভ। মাতৃগলদেশে বিলম্বিত পদ্মরাগ-মহানীল ইন্দ্রনীলে বিভূষিত মহার্ঘ মৌক্তিক হার ব্যত্যস্ত, বিচ্ছিন্ন। কোটি চন্দ্র-নিভাননা জননীর মুখচ্ছবি বিমলিন। মায়ের কনকোত্তম কান্তি কজ্জলে লিপ্ত হইয়াছে। সন্তানস্নেহে তিনি উন্মাদিনী। এমন মায়ের পূজা করিতে হইলে যে উন্মত্ত হইতে হয়। মাতৃ-বেদনার বিগাঢ় অনুভূতিতে অন্তরে জ্বলদগ্নিশিখার উদ্দীপ্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অগ্নিময়ী আমাদের মা। মায়ের পূজায় মায়ের দুঃখে জ্বলিতে হয়, পুড়িতে হয়। অন্তরে এই আগুন যদি না থাকে, তবে পূজার সব আয়োজন বৃথা—বন্ধ কর তোমাদের পূজা। মিথ্যাচারে মায়ের বেদনা আর বাড়াইও না দোহাই তোমাদের। মা আমাদের কাঙ্গালিনী। মায়ের মুখের দিকে আকাও। তাঁহার সন্তানের দুঃখ দূর কর। বড় আর্ত, পীড়িত, বুভুক্ষিত তাহারা। তাহারা আজ বড়ই নিরাশ্রয়। তবেই মায়ের মুখে হাসি ফুটিবে। তোমাদের অঙ্গনতল মায়ের চরণ-কমলের অমল আভায় উদ্ভাসিত হইবে। সার্থক হইবে মাতৃপূজা।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র
শ্রীহীতেন্দ্রনাথ নন্দীকে লিখিত

॥ পত্র দুইটি বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত ॥

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া।

কল্যাণীয়েষু

জগতে আমি সকলের কাছে কেবল প্রশংসাই পাইব এমন আশা আমাকে মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। আমার অনেক ত্রুটি আছে — তা ছাড়া সকলেরই মনের মত হওয়া অসম্ভব। নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসার মত অনিষ্টকর কিছুই হইতে পারে না। নিন্দায় আমার উপকার হয়। এইজন্য আমি নিন্দা শিরোধার্য্য করিয়া লই তুমি ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইয়োনা।

ছুটিতে এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ছেলেরা আশ্রমে থাকিলে তোমাদের পড়াশুনার বিশেষ সুবিধা হইত। ওখানে জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি শিক্ষকেরা আছেন তাঁহারা তোমাদের সাহায্য করিতে পারিবেন। ইংরেজিতে তুমি কাঁচা আছ এইজন্য তোমাকে বিশেষ উদ্যোগী হইতে হইবে।

আমি এখন শিলাইদহে আছি — ভালই আছি। রথী আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছে। ছুটির কয়দিন আমরা এখানেই থাকিব।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি
২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্কেচ: শ্রীনন্দলাল বসু

গোলাপফুলের সৌন্দর্য ও সুষমার অন্তরালে কাঁটা থাকে, রূপালি ঝরনা স্ফটিকস্বচ্ছ ধারার নেপথ্যেও থাকে কর্দম। খ্যাতির সঙ্গে অখ্যাতিও তেমনি চলে পাশাপাশি। খ্যাতনামা ব্যক্তিদের এইজন্য নানারকম বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন।

চিত্রাঙ্গদা প্রকাশের পর (২৮ ভাদ্র, ১২৯৯) এই কাব্যটি অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট—বিভিন্ন সমালোচক এই অভিযোগে রবীন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করেন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে এ সম্বন্ধে বিবিধ কটু মন্তব্যও করা হয়। পূর্ব পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চিঠি সেই সূত্রে লিখিত।

তারপর যখন তাঁর খ্যাতিসূর্য মধ্যগগনে সমুপস্থিত সেই সময়ে নানারূপ জল্পনা ও কল্পনায় রচিত কাহিনী তাঁর নামে প্রচারিত হয়। তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের জন্য উদ্যত হয়েছেন এই সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

সংসারে নানা ধরনের লোক আছে। কারো স্বভাব মৌমাছির মত—ফুল থেকে মধু-সঞ্চয় করাই তার ব্রত। কারো স্বভাব আবার মাকড়সার মত—ফুলের মধু ফেলে বিষ সংগ্রহেই আগ্রহ তার বেশি।

যে-ঝরনার কাদা নেই সেখানে কর্দম রচনা না করলে তাই তার চলে না; যে ফুলে বিষ নেই সেখানে গরল সিঞ্চন তাই তাকে করতে হয়। এই রকম ঊর্ণনাভ-প্রবৃত্তি-পরায়ণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথও যে আক্রান্ত হয়েছিলেন পার্শ্বে প্রকাশিত পত্রটি তার প্রমাণ।

১৩০৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪১। এই পত্রটি প্রকাশিত হয় এরও আট বছর পরে।

বিপত্নীক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা ও কল্পনা চলে এবং কোনো উৎসাহী পত্রিকা সংবাদটি ছাপার হরফে প্রকাশ করে বিশেষ উৎসাহ দেখায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে লিখিতভাবে এই আজগুবি খবরের প্রতিবাদ করা ছাড়া উপায় ছিল না। পদ্মিনীমোহন নিয়োগী তখন 'বেঙ্গলী' পত্রের সহকারী সম্পাদক। পদ্মিনীমোহনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ ছিল। খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পত্রালাপ ক'রে পরিচিত হবার আগ্রহ পদ্মিনীমোহনের ছিল। এরই ফলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রযোগে আলাপ।

দেখা যাচ্ছে, এই সংবাদ যখন প্রকাশিত হয় (১৩১৭) রবীন্দ্রনাথ তখন ৫০ বৎসর বয়সের প্রৌঢ়। কিন্তু অপবাদকারীর কাছে কোনো হিসাবই হিসাবের মধ্যে গ্রাহ্য নয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি কেবল দেশের গণ্ডীর মধ্যেই অবশ্য সীমাবদ্ধ ছিল না, বিদেশেও তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতি বলতে যে কথা বোঝায় রবীন্দ্রনাথ তা লাভ করেন ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৩ ইং)। এই বছর তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

রবীন্দ্র-জীবনী প্রকাশের উৎসাহ পদ্মিনী-মোহনের ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই প্রতিবাদপত্রটি পাবার পরই সম্ভবত তাঁর উৎসাহ প্রবল হয়। এবং তাঁর অনুরোধে ১৩১৭ সালের ২৮ ভাদ্র তারিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্তসার জানিয়ে পদ্মিনী-মোহনকে একখানি পত্র পাঠান। সেই পত্রটি রবীন্দ্র-তিরোধানের কিছু পরে ১৩৪৮ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত হয়। পত্রটি বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-নাথের 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন—
আমি
দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে উদ্যত
হইয়াছি এরূপ সম্পূর্ণ অমূলক
সংবাদ কোনো বাংলা সংবাদ-
পত্রে প্রচার করা হইয়াছে শুনিয়া
আমি বিস্মিত হইয়াছি — দয়া
করিয়া আপনাদের পত্রে ইহার
প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া আমাকে
বাধিত করিবেন। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩১৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

To Padmini Mohan Neogi
Sub-Editor "Bengalee"
70 Colootola Street
Calcutta

স্কেচ্ শ্রীনন্দলাল বসু

পর্বত ও প্রান্তর

ম্লান গোধূলি

শালবীথিকা

শারদীয়া পূজা ও বিজয়া

ক্ষিতিমোহন সেন
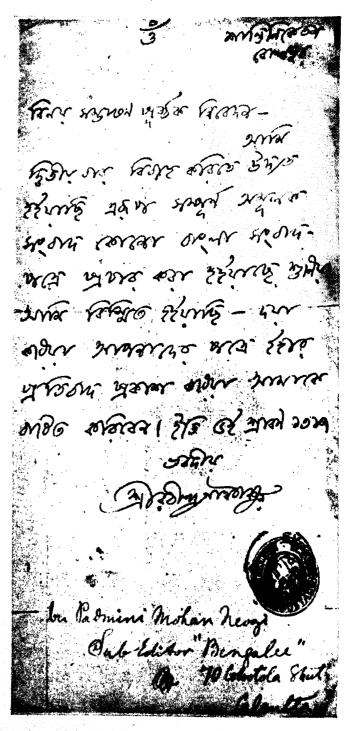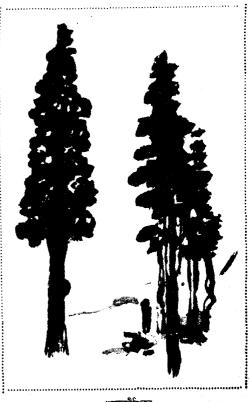
শারদীয়া পূজার অর্থই হইল বিজয় যাত্রা। এইজন্য শারদীয়া পূজার সম্পূর্ণতা হইল "বিজয়ায়"।

যাহার উদ্দেশ্য হইল বিজয়, তাহার সাধনা হইল পূজা। এ এক অদ্ভুত কথা। পূজা বলিতেই বুঝিতে হয় প্রেম মৈত্রী অহিংসা ভক্তি। আর বিজয়া বলিতে সাধারণত বুঝায় যুদ্ধ, রক্তারক্তি ও মারামারি। কাজেই মৈত্রী ও বিজয় এই দুইয়ের সংগতি কোথায়?

এই সমস্যা যুগ-যুগান্ত চলিয়া আসিতেছে। মহাত্মা গান্ধী যখন অহিংসা দ্বারা বিজয়ের কথা বলিলেন, তখন আমাদের দেশেও অনেকে চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া, সর্বদেশে সর্ব-মহাপুরুষের মুখে এই একই সত্য ঘোষিত হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের মৈত্রী দ্বারা বিজয়ের কথা সকলেই জানেন। অথচ এই একই সত্যকে বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠেও নানাভাবে বিঘোষিত হইতে শুনি।

সংহিতার সারমর্ম হইল, বিজয়ার আসল পথই চিন্ময় সাধনা। উপনিষদেরও সারকথা তাহাই। আবার বেদ-পন্থের সংগে সংগে দেখি, মহাবীর, বুদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক মহাপুরুষদেরও নির্দেশ এই পথেই।

ভর্তৃহরি ছিলেন একাধারে যোগী ও মনীষী রাজনীতিজ্ঞ। তিনিও এই অদ্ভুত সমন্বয়ের কথাই বলিলেন। তাঁহার মতেও যদি বিজয় চাও তবে মৈত্রীকে আশ্রয় কর। বিরুদ্ধতা দেখিয়া ভড়কাইলে চলিবে না। তাঁহার তিনখানি গ্রন্থ শতকত্রয় নামে বিখ্যাত। নীতি-শতক, শান্তি-শতক, বৈরাগ্য-শতক। নীতি-শতকের একটি বিখ্যাত শ্লোকের বংগানুবাদ হইল "যদি উন্নত হইতে চাও তবে নম্র হইতে হয়। যদি আত্মগুণ প্রচার করিতে চাও তবে আত্ম-গৌরব না করিয়া পরের খ্যাতি কীর্তন কর। যদি যথার্থ স্বার্থ সাধন করিতে চাও তবে বিশেষ করিয়া উদারভাবে পরার্থ সাধন কর। যদি দুর্মুখ শত্রুদের যথার্থভাবে জয় করিতে চাও তবে ক্ষমা ও মৈত্রী-বাণীকে আশ্রয় কর।" সকল মহাপুরুষের এই একই উপদেশ। অর্থাৎ যে পথে, আপাতত সাধনা বিরুদ্ধ পথে গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেই পথই যথার্থ পথ। সেখানেই চিন্ময়-বিজয়, শাশ্বত সার্থকতা।

১৯২১ সালে মহাত্মাজী যখন এই অহিংস বিজয়ের কথা বলিলেন, তখন কেন যে দিকে দিকে এত প্রতিবাদ উঠিল তাহা দুর্বোধ্য।

মহাপুরুষ খৃষ্ট তাঁহার বিখ্যাত শৈল উপদেশে (Sermon on the mount) ঘোষিত করিলেন "নম্রতাই ধন্য তাহাই জয়যুক্ত হইবে"। মহাপুরুষ খৃষ্ট তো ইহুদীদের প্রতিহিংসাপরায়ণ পথের জয়গান করিলেন না।

সূফী সাধকদের মধ্যেও এই সত্যই নানাভাবে দেখা দিয়াছে। একটি সূফী গল্প আছে।

এক সাধক রাজা, তাহার পুত্রকে বীরত্বের সাধনা শিক্ষার জন্য সদ্‌গুরুর কাছে পাঠাইলেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শক্তিশালী হইতে চাও, না বীর হইতে চাও? যদি শক্তি চাও তবে ভাল ঘোড়-সওয়ার হও, ভাল অস্ত্র-কুশলী হও। আর যদি বীর হইতে চাও তবে নম্র হও, অহিংস হও, মৈত্রী সাধনা কর, সেবা পরায়ণ হও।

সেই সদ্‌গুরুর আশ্রমে, একদিন এমন একজন লোক আসিলেন যাঁহাদের বংশের সংগে রাজপুত্রের বংশের চিরাগত বিরোধ। মৈত্রী ও সেবা-পরায়ণ হইলেও রাজপুত্র এই লোকটীর সেবা করিতে পারিলেন না। গুরু বলিলেন যদি আপনার সাধনাকে সার্থক করিতে চাও তবে এই আতিথিরও সেবা করিতে হইবে।

রাজপুত্র বিরক্ত হইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন। বলিলেন কেমন গুরুর কাছে আপনি আমাকে বীরত্ব শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন? নির্বিচারে সকলকে প্রীতি-মৈত্রী করার তাৎপর্য কি? রাজা বলিলেন ইহার উত্তর এখন দিব না পরে বলিব।

একদিন রাজা পুত্রকে লইয়া সায়ং-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পর্বতের কোলে অপূর্ব অরণ্য। সন্ধ্যা আসিতেছে। রাজা পুত্রের সহিত গল্প করিতে করিতে ক্রমাগতই আগে চলিয়াছেন, যখন আর পথ দেখা যায় না, তখন বাধ্য হইয়া নিবৃত্ত হইতেই হইল। অন্ধকারে শিলাময় পথে রাজা হোঁচট খাইলেন। রাজার কণ্ঠের একটি বহুমূল্য মণি কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল। রাজা বলিয়া উঠিলেন এই নুড়িগুলির মধ্যে বহুমূল্য মণিটি পড়িয়া গেল। রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার জোব্বা খুলিয়া অন্ধকারের মধ্যেই পাতিলেন এবং কাছাকাছি সবগুলি নুড়ি অন্ধকারের মধ্যে কুড়াইয়া লইয়া জোব্বায় বাঁধিলেন।

রাজা বলিলেন, আমার তো একটিমাত্র রত্ন হারাইয়াছে, আর তুমি রাশিকৃত নুড়ি পাথর কেন বহিয়া মরিবে? বৃথা পাথরগুলি ফেলিয়া দাও।

রাজপুত্র বলিলেন এখন অন্ধকার, কোনগুলি বৃথা আর কোনটা আসল তাহা চিনিব কিসে। সবগুলি বহিয়া আলোক পর্যন্ত পৌঁছাইতেই হইবে। খাঁটি নকলের বিচার সম্ভব হইবে তাহার পরে।

নৃপতি বলিলেন, এইবার হয় তো তোমার পূর্ব প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছ। যাহার সেবার প্রয়োজন তাহাকেই সেবা করিতে হইবে। কোথায় কোন্ রূপে ভগবান আমাদের কাছে সেবা চাহিতে আসেন তাহা কি আমরা জানি? সে আলোক কোথায়? কাজেই সার্বভৌম মৈত্রীর পথই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথ। এই মনুষ্যত্বের উপরেই যথার্থ বীরত্ব প্রতিষ্ঠিত। কাজেই তোমার গুরু যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা অসংগত নয়। (কবির "পরশ-পাথর" কবিতা তুলনীয়)

১৯২১ সালে, মৈত্রীর পথে জয়যাত্রার যে সাধনা, মহাত্মাজী ঘোষণা করিলেন, তাহার অনুশীলন আপন জীবনে তিনি আরো আগেই করিয়াছেন। যে সব মনীষীর বাণীতে তিনি এ বিষয়ে আলোক পাইয়াছেন, তাঁহারা আরো আগেকার কালের। এমন সর্বকালগত সত্যকেও অনেকে ভালভাবে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না।

এই সত্যকেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে চিরদিন বলিয়া আসিয়াছেন এবং বহুলোকের বিরাগভাজন হইয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার রচিত নাটক শারদোৎসবের জন্মকথা আলোচনা করিলে অসঙ্গত হইবে না।

১৯০৮ সালের গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রত্যেকটি ঋতুকে উৎসবের দ্বারা অভিনন্দিত করিবার সংকল্প করেন। বিদ্যায়তনের পক্ষে কেহ কেহ এই ব্যাপারকে একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে করিলেন। এমন কি ইহাকে পাগলামী বলিতেও ছাড়েন নাই। তবু কবিগুরু নিরুৎসাহ হন নাই। তিনি সর্বপ্রথম আয়োজন করিলেন বর্ষা-উৎসবের। কারণ গ্রীষ্মকাল শেষ হইয়া গিয়াছিল।

বেদগান, রামায়ণের বর্ষা সংগীত, কালিদাস প্রভৃতির কবিতা, বর্ষার হিন্দি ও বাংলা গান কবিতা লইয়া আয়োজন চলিল।

হঠাৎ কবিকে বিশেষ কাজে বাহিরে যাইতে হইল। অগত্যা তাঁহারই নির্দেশ অনুসারে তাঁহাকে ছাড়াই শান্তিনিকেতনে সেইবার বর্ষা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইল।

শরতের জন্য রচিত বহু গান লইয়া কবিগুরু আশ্রমে ফিরিলেন। ছেলেদের ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁহাকে পুরাপুরি শারদোৎসব নাটক রচনা করিতে হইল। এই সব কথা অন্য প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। কাজেই এখানে পুনরালোচনার আর প্রয়োজন নাই। তবে প্রয়োজন আছে শারদোৎসব নাটকের কথাবস্তুর আলোচনা।

শারদোৎসব নাটকের প্রধান নায়ক বিজয়াদিত্য শুধু সম্রাট নহেন, তিনি একজন উঁচুদরের সাধক।

বিজয়াদিত্য বাহির হইয়াছেন জয়যাত্রায়। ছোটো রাজারা ভাবিলেন তাঁহার জয়-যাত্রা বুঝি সৈন্য-সামন্তাদিসহ সমরোপকরণ লইয়া। বিজয়াদিত্য দেখাইলেন আসল জয়-যাত্রায় এসব আয়োজন নিষ্ফল। আসল জয়-যাত্রার জন্য চাই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি। অহিংসা মৈত্রী প্রেম প্রভৃতি ছাড়া এ বিজয় সম্ভব হয় না। সুরসেন গুণী, বীণাতে তাঁর গুণের পরিচয়, কিন্তু তার চেয়েও তাঁর বড় গুণের পরিচয়, উপানন্দের প্রতি প্রেমে। উপানন্দ অস্পৃশ্য জাতের বালক। কিন্তু অপূর্ব তার মনুষ্যত্ব। এই নিরাশ্রয় অস্পৃশ্য জাতের বালককে পুত্রবৎ প্রতিপালন করায় সুরসেনের প্রেমের বীণায় যে সুর বাজিয়াছে তাহা অতুলনীয়। তাঁহার তারের বীণায় সেই রাগিণী বাজানো অসম্ভব।

বিজয়াদিত্যের এইসব অশাস্ত্রীয় আচরণ অনেকের পক্ষে রীতিমত আপত্তিজনক হইয়াছিল। তাঁহারা কবির এসব বিষয়ে রীতিমত প্রতিবাদ জানাইলেন।

রাজনীতিক্ষেত্রেও তখনকার দিনে নানা দল ছিল। যে দল, শারীরিক শক্তির উপাসক, তাঁহারা রীতিমত চটিলেন এবং বহু তর্ক তাহারপর চলিল। তবু দেখিতে পাই বিজয়াদিত্য অহিংসা ও মৈত্রীর পথেই জয়-যাত্রা চালাইয়াছেন। তাঁহার সামন্ত-রাজারা, তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া যখন বৃথা সৈন্য-সামন্তের কথা ভাবিতেছিলেন তখন বিজয়াদিত্য শুধু পরকে জয় করিলেন না, একেবারে প্রেমের বলে আত্মীয় বন্ধু করিয়া লইলেন। যাঁহারা হারিলেন তাঁহারা হার মানিলেন পশু শক্তির কাছে নহে। তাঁহারা স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন মৈত্রীর ও প্রেমের বাঁধনে। হারিয়াও ইহাতে অপমান নাই। জিতিলেও এইরূপ আনন্দ দুর্লভ হইত।

অসহযোগ আন্দোলনের পরে নরম গরম পন্থের তর্কের আর বিরাম ছিল না। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব হইতে কবির লেখাতে অহিংসা ও মৈত্রীর জয়গান দেখা যাইতেছে।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকেরও ধনঞ্জয় বৈরাগীকে একেবারে অহিংসা আন্দোলনের মহাগুরু বলিয়া দেখান যাইতে পারে। এই প্রায়শ্চিত্ত নাটক অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগেকার রচনা।

কবির ভাগ্যে যেমন চিরদিন হয়। তিনি তাঁর এইসব রচনার জন্য সর্বত্র লাঞ্ছিত হইয়াছেন অথচ এইসব আন্দোলনের আদি-গুরুত্বের গৌরব তিনি পান নাই।

তবে এই কথা সত্য বিজয়-যাত্রা করিতে হইলে অহিংসা ও মৈত্রীর পথই যথার্থ সাধনা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও দেখি জগন্মাতা জগদেশ্বরী সর্বভূতে, দয়া ও মৈত্রীরূপে সংস্থিতা।

শান্তিনিকেতনের কোনার্ক — শিল্পী—নন্দলাল বসু

করুণাময় দত্তগুপ্ত কৃতী পুরুষ, মুনসেফ থেকে ক্রমে ক্রমে জেলা জজ তার পর হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। ঈস্টারের বন্ধ, সকাল বেলা বাড়িতে খাস-কামরায় বসে তিন চা খাচ্ছেন আর খবরের কাগজ পড়ছেন এমন সময় একটি মেয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল।

ষোল-সতরো বছরের সুশ্রী মেয়ে, পরিপাটী সাজ। জস্টিস দত্তগুপ্ত তার দিকে তাকাতে সে বলল, আমার ঠাকুন্দাকে আপনি চেনেন, সলিসিটার্স চৌধুরী অ্যান্ড সন্সের প্রিয়নাথ চৌধুরী। বাবাকেও হয়তো চেনেন, সোমনাথ চৌধুরী। আমার নাম তিরি।

করুণাময় বললেন, ও, তুমি প্রিয়নাথবাবুর নাতনী. আমাদের সোমনাথের মেয়ে? ব'স ওই চেয়ারটায়। তা তোমার নাম তিরি হল কেন?

—কি জানেন, আমার মামা অঙ্কের প্রফেসার, আর আমি হচ্ছি তৃতীয় সন্তান, তাই মামা আমার নাম রেখেছিলেন তৃতীয়া। নামটা কটমটে, আমি ছেঁটে দিয়ে তিরি করেছি।

—বেশ বেশ। এখন কি চাই বল তো?

—আজ্ঞে, আমার ঠাকুমা বড় দুর্ভাবনায় পড়েছেন, একেবারে মুষড়ে গেছেন, ভাল করে খাচ্ছেন না, ঘুমুতে পারছেন না। দয়া করে আপনি তাঁকে বাঁচান।

—ব্যাপারটা কি? যদি বৈষয়িক কিছু হয় তবে তোমার বাবা আর ঠাকুন্দাই তো তার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

—বৈষয়িক নয়, হার্দিক।

—সে আবার কি?

—হার্টের ব্যাপার।

—তা হলে হার্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে দেখাও। আমি তো তাঁর কিছুই করতে পারব না।

—আপনি নিশ্চয় পারবেন সার। আপনি অনুমতি দিন, আজ সন্ধ্যেবেলা ঠাকুমাকে আপনার কাছে নিয়ে আসব।

—তা না হয় এনো। কিন্তু কি হয়েছে তা তো আগে আমার একটু জানা দরকার।

—ব্যাপারটা গোপনীয়, ঠাকুমাই আপনাকে জানাবেন। আপনি কিছু ভাববেন না সার, শুধু ঠাকুমাকে আশ্বাস দেবেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি কানে একটু কম শোনেন। আমি দরকার মতন আপনাকে প্রম্‌ট করব, ফিসফিস করে বাতলে দেব।

করুণাময় সহাস্যে বললেন, ও, ঠাকুমার ব্যবস্থা তুমি নিজেই করবে, আমি শুধু সাক্ষিগোপাল হয়ে থাকব?

—আজ্ঞে হাঁ। আমার কথা তো ঠাকুমা গ্রাহ্য করবেন না, আপনার মুখ থেকে শুনলে তাঁর বিশ্বাস হবে। আপনাকে দারুণ শ্রদ্ধা করেন কিনা। ঠাকুমা বলেন, হাইকোর্টের জজরা হচ্ছেন ধর্মের অবতার, হাইকোর্টের দৌলতেই ঠাকুন্দা আর বাবা করে খাচ্ছেন।

—বাঃ, ঠাকুমা তো বেশ বলেছেন! তোমার বাবা কি ঠাকুন্দা আসবেন না?

—না না না, তাঁরা এলে সব মাটি হবে। হাসবেন না সার, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ঠাকুমার দুশ্চিন্তা আমার জন্যে নয়, আমার কোনও স্বার্থ নেই।

—বেশ, আজ সন্ধ্যায় তাঁকে নিয়ে এসো।

সন্ধ্যার সময় তিরি তার ঠাকুমাকে নিয়ে করুণাময়ের বাড়িতে উপস্থিত হল। নমস্কার বিনিময়ের পর তিরি বলল, এই ইনি হচ্ছেন আমার ঠাকুমা শ্রীমতী কনকলতা চৌধুরানী, সলিসিটার প্রিয়নাথ চৌধুরীর স্ত্রী। আর ইনি হচ্ছেন মাননীয় মিস্টার জস্টিস করুণাময় দত্তগুপ্ত। ঠাকুমা, ইনট্রোডিউস করে দিলুম, এখন তুমি মনের কথা খোলসা করে বল।

কনকলতা ধমকের সুরে বললেন, আমি কেন বলতে যাব লা? বুড়ো মাগী, লজ্জা করে না বুঝি? তোকে এনেছি কি জন্যে? যা বলবার তুই বল।

তিরি বলল, বেশ, আমিই বলছি। শুনুন ইওর লর্ডশিপ—

করুণাময় বললেন, বাড়িতে লর্ডশিপ নয়।

—আচ্ছা, শুনুন সার। আমার ঠাকুন্দাকে তো দেখেছেন, খুব সুপুরুষ, যদিও পঁচাত্তর পেরিয়েছেন। আর আমার এই ঠাকুমাকেও দেখুন, বেশ সুন্দরী, নয়? যদিও সাতষট্টি বছর বয়সের দরুন একটু তুবড়ে গেছেন, পুরনো ঘটির মতন।

কনকলতা একটু কালা হলেও নিজের সম্বন্ধে কথা হলে বেশ শুনতে পান। বললেন, আরে গেল যা, ওসব কথা বলতে তোকে কে বলেছে?

তিরি বলল, এই সবই তো আসল কথা। তার পর শুনুন সার। পঞ্চান্ন বছর আগে, ঠাকুন্দার বয়স যখন কুড়ি, তখন প্রভাবতী ঘোষ নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ হয়। বারো-তেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে, ঠাকুন্দা তাকে একবার দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু আমার প্রঠাকুন্দা, অর্থাৎ ঠাকুন্দার বাবা ছিলেন একটি অর্থগৃধ্র—

করুণাময় বললেন, অর্থগৃধ্নু?

—আজ্ঞে না, অর্থগৃধ্র শকুনির মতন লোলুপ। তিনি পাঁচ হাজার টাকা বরপণ হেঁকে বসলেন। প্রভাবতীর বাবা ছিলেন গরিব স্কুলমাষ্টার, কোথায় পাবেন অত টাকা? সম্বন্ধ ভেস্তে গেল। ঠাকুন্দা মনের দুঃখে দিন কতক হেমচন্দ্র আওড়ালেন—ওরে দুষ্ট দেশাচার কি করিলি অভাগার। তার পর এই কনকলতা ঠাকুমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। তিনি ঠকেন নি, ছ হাজার টাকা বরপণ পেলেন, এক রূপসী হারিয়ে আর এক রূপসী ঘরে আনলেন।

করুণাময় প্রশ্ন করলেন, সেই আগেকার মেয়েটির কি হল?

—আমার সেই মাইট-হ্যাভ-বিন ঠাকুমা প্রভাবতীর? তিনি কুমারী হয়েই রইলেন, খুব লেখাপড়া শিখলেন, অনেক জায়গায় মাষ্টারি করলেন, আমেরিকায় গিয়ে ডক্টর অব এডুকেশন ডিগ্রী নিয়ে এলেন, শেষকালে পাতিয়ালা উইমিন কলেজের প্রিন্সিপালও হয়েছিলেন। সম্প্রতি রিটায়ার করে কলকাতায় এসেছেন। তার পর হঠাৎ একদিন সলিসিটার চৌধুরী অ্যান্ড সন্সের অফিসে উপস্থিত। কি সমাচার? না, আলিপুরে একটা ছোট বাড়ি কিনবেন, তারই দলিল আমার ঠাকুন্দাকে দেখাতে চান। ঠাকুন্দা তাঁর পরিচয় পেয়ে খুব খুশী—বুঝতেই পারছেন, পুরাতনী শিখা, ওল্ড ফ্লেম। তার পর প্রভাবতী আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন আসতে লাগলেন, আর ঠাকুমা ফোঁস করে জ্বলে উঠলেন, কলেরাপটাশ আর চিনিতে অ্যাসিড ঠেকালে যেমন হয়।

—সে আবার কি রকম? তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠাই তো শুনেছি।

—তার চাইতে ভীষণ। জানেন না সার? আমার মেজদা একদিন দেখিয়েছিল। কলেজ থেকে কলেরাপটাশ চুরি করে এনে তার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে ন্যাকড়ার পুঁটলিতে বেঁধে কি একটা অ্যাসিড ঠেকাল, অমনি ফোঁস করে জ্বলে উঠল।

—প্রভাবতী দেখতে কেমন?

—এখনও খুব রূপ।

কনকলতা চেঁচিয়ে বললেন, শাঁকচুন্নী বাবা, একবারে শাঁকচুন্নী!

করুণাময় হেসে বললেন, তবে আপনার ভাবনা কিসের?

—ও জজসায়েব, তা বুঝি জান না? ডাকিনী যোগিনী শাঁকচুন্নীদের বলে কত ছলা কলা, পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে দেয়। আর এই তিরির ঠাকুন্দাটিও বড্ড হাবাগোবা, শুধু কপালগুণেই টাকা রোজগার করে, নইলে বুদ্ধি কি আছে? ছাই, ছাই। তুমি বুঝিয়ে সুজিয়ে বুড়োকে ওই ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার কর বাবা।

তিরি ফিসফিস করে বলল, দেখুন, ঠাকুন্দার কিছু দোষ নেই, তিনি প্রভাবতীর সঙ্গে শুধু ভদ্র ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমার ঠাকুমাটি হচ্ছেন সেকেলে আর অত্যন্ত হিংসুটে। আপনি এঁকে বলুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।

করুণাময় বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তিরি বলল, সাত দিনের মধ্যেই।

করুণাময় বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সাত দিনের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে দেব।

তিরি বলল, ঠাকুমা, শুনলে তো? এখন বাড়ি চল, রাত্তিরে ভাল করে খেয়ো। কাল আবার আমি এঁর কাছে এসে খবর নেব। এখন তো আপনার কোর্ট বন্ধ, নয় সার? তা হলে কাল সকালে আবার দেখা করব। এখন উঠি।

পরদিন সকালে তিরি এলে করুণাময় বললেন, তুমি একটি সাংঘাতিক মেয়ে। তোমার কথায় ঠাকুমাকে তো আশ্বাস দিলাম, কিন্তু তার পর কি করব? কাল সারা রাত আমি ঘুমুতে পারি নি। বড় বড় দেওয়ানী মামলার রায় আমি অক্লেশে দিয়েছি, ক্রিমিন্যাল কেসে ফাঁসির হুকুম দিতেও আমার বাধে নি। কিন্তু এরকম তুচ্ছ বেয়াড়া

ব্যাপারে কখনও জড়িয়ে পড়ি নি। তোমার ঠাকুর্দা প্রিয়নাথ-বাবুকে আমি কি করে বলব—মশায়, আপনার অবুঝ গিন্নী বেচারীকে কষ্ট দেবেন না, প্রভাবতীকে হাঁকিয়ে দিন?

তিরি বলল, আপনাকে কিছুই করতে হবে না সার, শুধু সাক্ষী হয়ে থাকবেন। কাল আপনাকে একতরফের ইতিহাস বলেছি, আজ অন্য তরফের ব্যাপারটা শুনুন।

—অন্য তরফ আবার কে? তোমার ঠাকুমা নাকি?

—আজ্ঞে হাঁ। আমি বিস্তর রিসার্চ করে যা আবিষ্কার করেছি তাই বলছি শুনুন, পঞ্চান্ন বৎসর আগেকার ইতিহাস। ঠাকুর্দা প্রিয়নাথের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে ঠাকুমা কনকলতার একটি খুব ভাল সম্বন্ধ এসেছিল, বাগবাজারের হারু মিত্তিরের ছেলে গৌরগোপাল মিত্তির, এখন যিনি অল্ডারম্যান হয়েছেন। আমার ঠাকুর্দা সুপুরুষ বটে, কিন্তু গৌরগোপাল হচ্ছেন সুপার-সুপুরুষ, মূর্তিমান কন্দর্প। তাঁর বয়স যখন উনিশ-কুড়ি তখন ঠাকুমাকে একবার লুকিয়ে দেখেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বারো বছরের নোলক-পরা বোধোদয়-পড়া খুকীর প্রেমে পড়েছিলেন। তখন এই রকমই রেওয়াজ ছিল কিনা। তাঁর বাবা হারু মিত্তিরও মেয়েটিকে পছন্দ করলেন আর ছ হাজার টাকা পণে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হলেন। সব ঠিক, এমন সময় গৌরগোপালের আর এক সম্বন্ধ এল। বউবাজারের বিপিন দত্তর মেয়ে, একমাত্র সন্তান, অগাধ বিষয়, সব সেই মেয়ে পাবে। হারু মিত্তির বিগড়ে গেলেন। আমার প্রপিতামহ ছিলেন অর্থগৃধ্র, কিন্তু হারু মিত্তির একবারে দুকানকাটা চশমখোর চামার পয়সাপিশাচ। আমার ঠাকুমা কনকলতাকে তিনি নাকচ করে দিলেন, সম্পত্তির লোভে বিপিন দত্তর সেই বিশ্রী মেয়েটার সঙ্গে ছেলের বিয়ে স্থির করলেন। ছেলে গৌরগোপাল রামচন্দ্রের মতন সুবোধ, এখনকার তরুণদের মতন একগুঁয়ে নয়। কনকলতার বিরহে তিনিও দিন কতক হেমচন্দ্র আওড়ালেন—আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে। তার পর শুভদিনে ভেলভেটের ভাড়াটে ইজের-চাপকান পরে সঙ সেজে তক্তনামায় চড়ে আসেটিলীন জ্বালিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে সেই অগাধ বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী কুৎসিত মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেললেন। তার কিছুদিন পরেই ঠাকুমার সঙ্গে ঠাকুর্দার বিয়ে হল।

করুণাময় বললেন, খাসা ইতিহাস। এখন করতে চাও কি?

—আজ বিকেলে সেই গৌরগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করব, তারপর কর্তব্য স্থির করে আপনাকে জানাব। আজকের মতন উঠি সার।

গৌরগোপাল মিত্র বিকাল বেলা তাঁর প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘরে প্রকাণ্ড ফরাসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানছেন আর চৈতন্যভাগবত পড়ছেন, এমন সময় তিরি এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল।

গৌরগোপাল বললেন, তুমি কে দিদি? চিনতে পারছি না তো।

—আজ্ঞে, আমার নাম তির্রি।

—তির্রি কেন? টেক্কা কি বিবি হলেই তো মানাত।

—আমি মা-বাপের তৃতীয় সন্তান কিনা, তাই তির্রি নাম। আমার ঠাকুর্দার নাম শুনেছেন বোধ হয়—সলিসিটার প্রিয়নাথ চৌধুরী, আপনারই সমবয়সী হবেন।

—ও, তুমি প্রিয়নাথ চৌধুরীর নাতনী? তাঁর সঙ্গে মৌখিক আলাপ নেই, তবে বছর চার আগে একটা মকদ্দমায় তিনি আমার বিপক্ষের অ্যাটর্নি ছিলেন। খুব ঝানু লোক।

—সে মকদ্দমায় আপনি জিতেছিলেন?

—না দিদি, হেরে গিয়েছিলুম, লাখ দুই টাকা লোকসান হয়েছিল।

—তবেই তো মুশকিল। হেরে গিয়েছিলেন তার জন্যে প্রিয়নাথ চৌধুরীর নাতনীর ওপর তো আপনার রাগ হবার কথা।

—আরে না না, তোমার ওপর রাগ করে কার সাধ্য। এখন বল তো কি দরকার।

তির্রি মাথা নীচু করে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, আপনি হচ্ছেন আমার হতে-হতে-ফসকে-যাওয়া ঠাকুর্দা।

গৌরগোপাল বললেন, বুঝতে পারলুম না দিদি, খোলসা করে বল।

—পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা স্মরণ করুন দাদু। কনকলতা বলে একটি মেয়ে ছিল, তাকে মনে পড়ে?

—কনকলতা? সে আবার কে?

তির্রি বলল, সেকি দাদু, এর মধ্যেই মন থেকে মুছে ফেলেছেন? হায় রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়! বারো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, একবার দেখেই তাকে আপনি ভীষণ ভালবেসেছিলেন। তার সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধও স্থির হয়েছিল, কিন্তু শেষটায় আপনার বাবা সব ভেস্তে দিলেন। কিচ্ছু মনে পড়ছে না?

—হাঁ হাঁ, এখন মনে পড়েছে, নামটা কনকলতাই বটে। ওঃ, সে তো মান্ধাতার আমলের কথা, লর্ড এলগিন কি কর্জনের সময়। তা কনকলতার কি হয়েছে?

—তিনিই আমার ঠাকুমা। ঠাওর করে দেখুন তো, পঞ্চান্ন বছর আগে যাকে দেখেছিলেন সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার চেহারার কিছু মিল পান কিনা। আপনি যদি অত পিতৃভক্ত না হতেন, একটু জেদ করতেন, তবে সেই কনকলতার সঙ্গেই আপনার বিয়ে হত, আপনিই আমার ঠাকুর্দা হতেন।

—ওঃ, কি চমৎকার হত! আমার কপাল মন্দ তাই তোমার ঠাকুর্দা হতে পারি নি। কিন্তু এখনই বা হতে বাধা কি? আমার তিন তিনটে নাতি আছে, অবশ্য তোমার মতন সুন্দর নয়। তাদের একটাকে বিয়ে করে ফেল না? ডাকব তাদের?

—এখন থাক দাদু। আমি বি-এ পাশ করব, এম-এ পাস করব, বিলেত যাব, তারপর সংসারের চিন্তা। সেক্সপীয়ার পড়েছেন তো? আমি এখন ইন মেডেন মেডিটেশন ফ্যান্সি ফ্রী। ছ বছর পরে আপনার কোনও নাতি যদি আইবুড়ো থাকে তো আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

—জো হুকুম তির্রি দেবী চৌধুরানী। কি দরকারে এসেছ তা তো বললে না?

—সেই ছোট্ট কনকলতা মেয়েটি এখন কত বড়টি হয়েছে দেখতে আপনার ইচ্ছে হয় না দাদু?

—এত দিন তো তার কথা মনেই ছিল না, তবে আজ তোমাকে দেখে তোমার ঠাকুমাকেও দেখবার একটু ইচ্ছে হচ্ছে বটে। কি লেখাই হেম বাঁড়ুজ্যে লিখে গেছেন—ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায় তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে! কিন্তু তোমার ঠাকুমা তো আমাকে চিনবেন না। আমি তাঁকে লুকিয়ে দেখেছিলুম বটে, কিন্তু তিনি কখনও দেখেন নি।

—নাই বা দেখলেন। শুনুন দাদু—আসছে শনিবার আমার জন্মদিন, আপনাকে আমাদের বাড়ি আসতেই হবে, এখানকার ঠাকুমাকেও নিয়ে যাবেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চাই।

—দেখা তো হবে না দিদি। তিনি এখানে নেই। দু বছর হল স্বর্গে গেছেন। সেখানে তাঁর অনেক কাজ, ঘর দোর জিনিসপত্র সব পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখবেন, চাকরদের তো বিশ্বাস করেন না, হলই বা স্বর্গের চাকর। আমি সেখানে গিয়েই যাতে চটি জুতো, ফ্লানেল তেল, নাইবার গরম জল, সরু চালের ভাত, মাগুর মাছের ঝোল, চিনিপাতা দই, পান-ছেঁচা, আর তৈরী তামাক পাই তার ব্যবস্থা করে রাখবেন।

—সতী লক্ষ্মী স্বর্গে গিয়েও ধান ভানবেন! তবে কি আর হবে, আপনি একাই আসবেন। আমি কাল নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়ে দেব।

তির্রি প্রণাম করে বিদায় নিল, তার পর জস্টিস করুণাময় দত্তগুপ্ত আর ডক্টর প্রভাবতী ঘোষের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরল।

তির্রির বিস্তর বন্ধু, ইরা ধীরা মীরা ঝুনু বেণু রেণু উল্লোলা কল্লোলা হিল্লোলা প্রভৃতি একটি দঙ্গল। তির্রি তাদের বলেছে, জানিস, আমি ঠিক রাত বারোটায় জন্মেছিলুম, একবারে জিরো আওআর। কাজেই কোনটে জন্মদিন, আগেরটা কি পরেরটা, তা বলা যায় না। এখন থেকে দুটো জন্মদিন ধরব। আসছে শনিবার বিকেলে শুধু বুড়ো-বুড়ীরা চা খেতে আসবে। রবিবারে তোরা সবাই আসবি, হুল্লোড় করবি, গাণ্ডেপিণ্ডে গিলবি। সন্ধ্যের আগেই আসবি, বুঝেছিস? বন্ধুরা সমস্বরে জবাব দিয়েছে—আসিব আসিব সখী নিশ্চয় আসি-ই-ই-ব।

শনিবার বিকালে প্রিয়নাথ চৌধুরীর বাড়িতে জস্টিস করুণাময় দত্তগুপ্ত, অল্ডারম্যান গৌরগোপাল মিত্র, আর ডক্টর প্রভাবতী ঘোষ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন। বাইরের লোক

আর কেউ নেই। বাড়ির লোক আছেন—তিরির ঠাকুন্দা ঠাকুমা বাবা মা আর স্বয়ং তিরি।

মাননীয় অতিথিদের সংবর্ধনা, সকলের সঙ্গে পরিচয়, আর উপহারের জন্য প্রশংসা শেষ হলে তিরি করুণাময়কে চুপিচুপি বলল, এইবারে আপনার ভাষণটি বলুন সার।

করুণাময় বললেন, কল্যাণীয়া তিরির জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই যে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি, এটি একটি সামান্য পার্টি নয়। বিধাতার বিধানে যা ঘটে তা মাথা পেতে মেনে নেওয়া ছাড়া মানুষের গত্যন্তর নেই, কিন্তু কেউ কেউ ভবিতব্যকে অন্য রকমে কল্পনা করতে ভালবাসে। এই ধরুন— দশরথ যদি স্ত্রৈণ না হতেন, গোসাঘরে ঢুকে কৈকেয়ীকে একটি চড় লাগাতেন, তবে রামায়ণ অন্য রকমে লেখা হত। শান্তনু যদি বুড়ো বয়সে একটা মেছুনীর প্রেমে না পড়তেন, তবে ভীষ্মই কুরুরাজ হতেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও হয়তো হত না। অষ্টম এডোআর্ড যদি একগুঁয়ে না হতেন, প্রাইম মিনিস্টার আর আর্কবিশপদের ফরমাশ অনুসারে বিবাহ করতেন, তবে তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে হত না। আমাদের এই তিরি মেয়েটি বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করে না, কিন্তু তাঁর বিধানের সঙ্গে আরও কিছু জুড়ে দিয়ে আত্মীয়ের গণ্ডি বাড়াতে চায়। তিরির আসল ঠাকুন্দা আর ঠাকুমা তো বাড়িতেই আছেন, তার কল্পিত ঠাকুন্দা শ্রদ্ধেয় অল্ডারম্যান গৌরগোপালবাবু আর কল্পিত ঠাকুমা শ্রদ্ধেয়া ডক্টর প্রভাবতী ঘোষও দয়া করে এখানে এসেছেন। প্রিয়জনের এই সমাগমে তিরি যেমন ধন্য হয়েছে আমরাও তেমনি আনন্দলাভ করেছি।

কনকলতা তিরিকে জনান্তিকে বললেন, ওই বুড়ো আর বুড়ীটাকে এখানে আনলে কে রে?

তিরি বলল, গৌরগোপাল আর প্রভাবতী? আমি তো জানি না, জস্টিস দত্তগুপ্ত হয়তো বাবাকে বলে থাকবেন। ঠাকুমা, তোমার ওই ফসকে-যাওয়া বর গৌরগোপালবাবু কি সুন্দর দেখতে! আহা, ওঁর সঙ্গে তোমার যদি বিয়ে হত তা হলে বাবার রং আরও ফরসা হত, আর আমারও রূপ উথলে উঠত, একবারে ঢলঢল কাঁচা অঙ্গেরি লাবনি!

কনকলতা বললেন, দূর হ মুখপুড়ী, তোর মুখের বাঁধন কি একটুও নেই?

—কিন্তু ভাগ্যিস প্রভাবতীর সঙ্গে ঠাকুন্দার বিয়ে হয় নি, তা হলে আমার মুখটা চীনে প্যাটার্ন হত। ঠাকুমা, তোমারই জিত। পঞ্চান্ন বছর আগে ওই প্রভাবতীর একটা বর হাতছাড়া হয়েছিল, কিন্তু এত পাস করেও উনি এ পর্যন্ত আর একটা বর জোটাতে পারলেন না, অথচ তুমি এক মাসের মধ্যেই জুটিয়েছিলে—যদিও বিদ্যে বোধোদয় পর্যন্ত। তুমি কিন্তু ওই গৌরগোপালবাবুর দিকে অমন করে আড় চোখে তাকিও না বাপু, ঠাকুন্দা মনে করবেন কি?

কনকলতা রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কই আবার তাকাচ্ছি! কি বজ্জাত মেয়ে তুই! ও মাস্টার-দিদি প্রভা, এই তিরিটাকে বেত মেরে সিধে করতে পার না? জ্বালিয়ে মারল আমাকে।

প্রভাবতী বললেন, তিরি ঠাকুমাকে জ্বালিও না, এস আমার কাছে।

প্রভাবতী আর গৌরগোপাল পাশাপাশি বসেছিলেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাঁদের কাছে বসে পড়ে তিরি বলল, আর জ্বালাবার দরকার হবে না, ঠাকুমা ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। কিন্তু আসল কাজ যে এখনও বাকী রয়েছে। আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমি একটু স্বগতোক্তি করছি, যাকে বলে সলিলোকি।—প্রিয়নাথের সঙ্গে প্রভাবতীর বিয়ে হতে হতে হল না। আচ্ছা, তা না হয় না হল। গৌরগোপালের সঙ্গে কনকলতার বিয়েও হতে হতে হল না। তাও না হয় না হল। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধে শেষটায় প্রিয়নাথের সঙ্গে কনকলতার বিয়ে হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে চিরকুমারী

প্রভাবতী আর নবকুমার গৌরগোপালের কি করা উচিত? বিধাতার ইঙ্গিত কি?

প্রভাবতী বললেন, বিধাতার ইঙ্গিত—তোমাকে আচ্ছা করে বেত লাগানো দরকার।

গৌরগোপাল বললেন, আমার বাড়িতে পালিয়ে চল দিদি, কেউ বেত লাগাবে না।

তিরি বলল, হায় হায়, দেওয়ালের লেখা আপনাদের নজরে পড়ছে না? প্রজাপতির নির্বন্ধ বুঝতে পারছেন না? আপনাদের মনে কিছুমাত্র রোমান্স নেই, দুজনে মনে প্রাণে বুড়িয়ে গেছেন, বাহ্যাভ্যন্তরে শক্ত পাথর হয়ে গেছেন, একবারে পাকুড় স্টোন। ভাগ্যিস আপনাদের সঙ্গে আমার ঠাকুদ্দা-ঠাকুমার বিয়ে ভেস্তে গিয়েছিল, নয়তো আমার বুড়ো ঠাকুদ্দাকে বেত খেতে হত, আর বুড়ী ঠাকুমাকে বাঁদী হয়ে জন্ম জন্ম পান ছেঁচতে হত।

কনকলতা করুণাময়কে বললেন, হ্যাঁগা জজসায়েব, তিরি হাত নেড়ে ওদের কি বলছে?

—বোধ হয় ধমক দিচ্ছে।

—ছি ছি, মেয়েটার আক্কেল মোটে নেই, ভদ্রজন বাড়িতে এসেছে, তাদের ওপর তম্বি! ওর ঠাকুদ্দা আশকারা দিয়ে মাথাটি খেয়েছে। তুমি ওকে খুব করে বকুনি দিও বাবা, বাড়ির লোককে তো গ্রাহ্যি করে না।
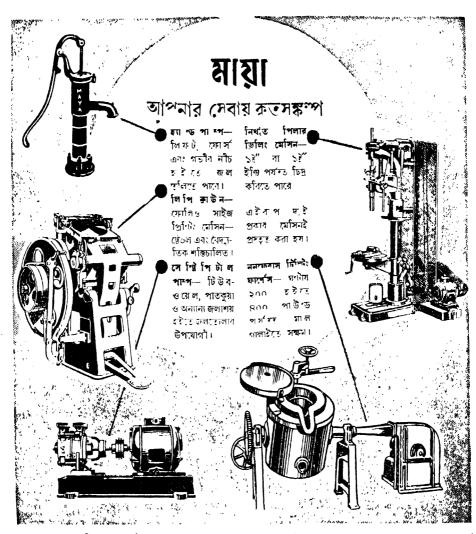
অবনীন্দ্রনাথ   গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত

(পরশুরাম লিখিত জাবালি অবলম্বনে)

প্রথম পর্ব

দিশা ॥ জল্পান্তি সুরয়ঃ সর্বে
সুরপুরে করেন জল্পনা
কত কি করেন কল্পনা
সুরগণ বলিভুজ।
ধুয়া ॥ গুজ্‌গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌ চলে আকাশে,
উস্‌খুস্‌ উস্‌খুস্‌ করে বাতাসে।

—দেব সভা—

(নারদ, বিশ্বকর্মা, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি)

নারদ ॥ বলি, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি,
সোম মঙ্গল, বুধ সবাই যে চুপ?
রবি দিচ্ছেন না ধূপ, সোমের মুখ চূণ,
মঙ্গল গনছেন অমঙ্গল, বুধের বুদ্ধি শূন,
বৃহস্পতি গুরুগম্ভীর, শুক্র দুখে মুখ বক্র
শনির শান নাই ভেবে খুন।
ও বিশ্বকর্মা, কেউ যে কথা কয় না—
ব্যাপার কি? স্বর্গের দ্বারে বিশ্বকদ্রু-গণ কর্কশ চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ মন্ডল ভেদ করছে না। ইন্দ্রের রন্ধনাগার হতে বিশ্বগন্ধা গন্ধায়িত ধূম নির্গত হচ্ছে না। বিশ্বকাগণের বলিক্রিয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। ব্যাপার কি জানো কিছু?

॥ গ্রহগণের গীত ॥

কি জানিবেন বিশ্বকর্মা, অগোচর শিব ব্রহ্মা।
অকস্মাৎ বজ্রপাত, উৎপাত কি হয় কি জানি।
হয় লয় নয় খন্ড প্রলয়,
নয় প্রণয় ঘটিত কান্ড মানি।

॥ নারদের গীত ॥

প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে ঝড় ঝাপটা চলে দিয়া
মনটা বলছে বহ্বারম্ভে হচ্ছে কোথাও লঘু ক্রিয়া।
নারদ ॥ কোনো ঋষি কারো শ্রাদ্ধ করছে
অনুমানি।

বিশ্ব॥ এমনিই তো বোধ হচ্ছে কোনো ঋষি বোধহয় দেবতাদের শ্রাদ্ধ করতে পণ্ডতপা হয়ে বসেছেন। কি বলেন দেবগুরু?

বৃহস্পতি॥ কো জানাতি।

(মাতলি, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, অপ্সরাগণ ও আর সকলের প্রবেশ)

নারদ॥ দেবেন্দ্র, একি এমন কাতর দেখি কেন?

॥ গীত ॥

সুররাজ আমায় বল হে, কেন আজ বিরস বদন?
কি কারণে হলে এমন?
কি জন্যে দুঃখ মনে, বিষণ্ণ কি কারণে
নীরধার দু নয়নে শুখাল চন্দ্রানন
ঘটিল কিবা অলক্ষণ।

॥ ইন্দ্রের গীত ॥

ভাঙলো কপাল এতকাল পরে, কব যাতনা কারে?
সকাল বিকাল প্রতিক্ষণে সদা হয় মনে—
সর্বনাশ আমার হবে সত্বরে।
সদা নৃত্য করে পঞ্চশত দক্ষিণ নয়ন
অন্ধকার যেন অনন্ত ভুবন করি নিরীক্ষণ।

ইন্দ্রাণী॥ কি অভাবে হল এমন ভাবান্তর
ভাবিয়ে না পাই কি জন্য কাতর
মনের বেদনা প্রকাশি বলনা
হয়ো না নিদয় অধিনীর পর।

নারদ॥ ওহে মাতলী, তুমি কিছু জানো তো বল, কি ল্যাঠা বাধলো কোথায়?

॥ ইন্দ্রাণীর গীত ॥

মর্তে ওখানে, হয়তো ওখানে
না জানি কে মন্তর জপেছে।
স্বর্গে এখানে অন্তর্যামী
ইন্দ্রদেবের আসন টলেছে।

নারদ॥ এই কথা? আমি আসছি একবার পৃথিবীটা ঘুরে দেখি কোথায় কি ঘটেছে।

॥ ইন্দ্রের গীত ॥

ঠাকুর তুমি যাচ্ছো কোথায়
একলা ফেলে আমায় হেথা।
একলা আমি থাকতে নারি
ভয়ে ডরে আঁতকে মরি।

নারদ॥ আমায় ছাড় না ছাড়, তুমি তো অন্তর্যামী, তায় সহস্র-লোচন—একবার দেখে নাও না ত্রিভুবনে কোথায় কি ভয়ের কারণ ঘটেছে। নিজের অন্তরের মধ্যেটায় হাতড়ে দেখ তো।

ইন্দ্র॥ সব গোলমাল ঠেকছে অন্তরে বাহিরে।

ইন্দ্রাণী॥ এ কোন দুষ্টা অপ্সরীর মায়ার কারখানা বোধ হচ্ছে।

নারদ॥ অপ্সরীর মায়ার লক্ষণ এ নয় ইন্দ্রাণী। একবার অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে আহ্বান কর—এ কোন নতুন ব্যাধির হাওয়া পৃথিবী থেকে এসে আক্রমণ করেছে।

(অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রবেশ)

অশ্বিনী॥ ও আর দেখতে হবে না—গায়ের বর্ণ পীত হয়েছে, চোখ বসে গেছে, নাড়িতে বায়ুর প্রকোপ বেশ দেখছি। এটা হিস্ট্রিয়া নামক যাবনিক রোগ। সোমপান আর অপ্সরাগণের নৃত্য-গীতাদি হচ্ছে ঔষধ।

ইন্দ্রাণী॥ তাই ডাকো—আমি চল্লেম। যেমন রোগী, বৈদ্যও জুটেছে তদনুরূপ। (প্রস্থান)

॥ ইন্দ্রের গীত ॥

যায় প্রাণ এখন আমি কি করি
এ যন্ত্রণা আর সহে না, মরি মরি।
হল অসহ্য, শয্যা কই শয়ন করি।
আতঙ্ক হতেছে মনে, কাঁপি অঙ্গ সঘনে
বাক্য না সরে বদনে
ভুবন অন্ধকার হেরি।

বৃহস্পতি॥ স্থিরো ভব স্থিরো ভব।

মাতলী॥ গুপ্তচরেরা চারিদিকে গেছে। যদি কোনো দিকে কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকে তো এখনি সংবাদ পাওয়া যাবে।

(হুজুগ ও গুজুবের প্রবেশ)

॥ গীত তুড়িজুড়ির ॥

জয় হোক দেবতার, দেবতার জয়জয়াকার,
দ্যুলোকের দুই দুই আফ্‌সার,
হুজুগদারি গুজুবকারি কারবার।
দুই কাজে দড়, দুই ভাই ছোট বড়
হুজুগ খোঁজেন গুজুব খোঁজেন
যেদিন পড়ে পালা যার।

হুজুগ॥ কাজটাতে এমন বিশেষ কিছু লভ্য নাই
ত্রিভুবন ঘোরাঘুরি পুরস্কার,
আর ধরা পড়ে কখন কখন খাওয়া মার।

মাতলি॥ নয় এঁরা যেমন তেমন আফ্‌সার—
হুজুগ গুজুব মিথ্যে সত্যি পুঁজিপাটার
বেনামদার খরিদ্দার।

ইন্দ্র॥ ভালো ভালো, কোথা হতে আসছ কও বিবরণ।

হুজুগ॥ অযোধ্যা হতে এলাম—রাম বনবাসের হুজুগ চলেছে, রাবণ বধের উয্যুগ হচ্ছে।

ইন্দ্র॥ সুখবর বটে।

গুজুব॥ গুজুবে শুনে এলেম, বালখিল্য মুনিগণের অত্যাচারে জাবালি ঋষি অযোধ্যার বাস পরিত্যাগ করেছেন এবং মাসাধিক কাল হল নানা জনপদ, গিরি, নদী, বনভূমি অতিক্রম করে অবশেষে হিমালয়ের সানুদেশে শতদ্রুতীরে সস্ত্রীক পর্বতবাসী কিরাতগণের পরিবৃত ভূখণ্ডে ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত আছেন।

ইন্দ্র॥ ঘোরতর তপস্যা, কেন কেন?

গুজুব॥ অভিসন্ধি এখনও প্রকাশ পায় নাই, তবে গুজুব যে রামচন্দ্রের বনবাস যাতে না হয় এবং রাবণ না বধ হয় সেই কারণে—

বৃহস্পতি॥ না, এ হতে পারে না, সম্ভবত ইন্দ্রত্ব লাভই।

ইন্দ্র॥ বোঝা গেছে। রামচন্দ্র থাকুন অযোধ্যায়, রাবণ থাকুন লঙ্কায়, ইন্দ্র থাকুন ঘাস কাটতে। জাবালিকে এ কার্যে নামিয়েছেন ঐ বালখিল্যগণ।

নারদ॥ আমি এমন সুপুত্র থাকতে পিতা একদল আপদ সৃষ্টি করে বসেছেন। ঋষি নয় তো এক একটি ঋষি, ব্যাঙাচি বল্লেও চলে।

ইন্দ্র॥ জাবালি তপস্যায় বসেছেন, বটে! মাতলি ভরত মুনিকে আমার আহ্বান জানাও। এইবার বোঝা গেছে ব্যাপার। (মাতলির প্রস্থান)

নারদ॥ রোগ ধরা পড়েছে যখন, তখন ভয় নেই।

(ভরত মুনির প্রবেশ)

ভরত॥ জয় হোক।

ইন্দ্র॥ দেখুন, আমরা অন্তর্যামী বটে, কিন্তু রাজকার্যে মনুষ্যের ন্যায় আমাদেরও অনেক সময় গুজুবের উপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়। জাবালি সম্প্রতি ঘোর তপস্যায় মন দিয়েছেন, সেটা ভঙ্গ করা কর্তব্য। উর্বশীকে মর্তলোকে—

ভরত॥ উর্বশী এখন কাব্যলোকে কল্পবাস করার কল্পনা করেছেন, মর্তলোকে আর অবতীর্ণ হতেই চান না।

ইন্দ্র॥ হুঁ তাঁর ভারি তেজ দেখছি।

নারদ॥ মর্তের কবিগুলো স্তুতিবাদে তার মস্তকটি ভক্ষণ করেছেন। এখন কিছুকাল তাকে বিরাম দাও।

ভরত॥ দিনকতক অমরাবতীতে আবদ্ধ থাকলে আপনিই সে মর্তলোকে যাবার জন্যে আব্দার ধরবে।

ইন্দ্র॥ তবে জাবালির জন্যে অন্য কোন অপ্সরাকে পাঠানো চাই।

ভরত॥ মেনকা তাঁর কন্যাকে দেখতে গেছেন। তিলোত্তমাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এখনো তিন মাস বাহির হতে দিতে নারাজ। অলম্বুষা পা মচকেচেন, নাচা অসম্ভব।

ইন্দ্র॥ খঞ্জা অপ্সরীতে কাজ হবে না, রম্ভা কোথায়?

ভরত॥ অষ্টাবক্র মুনি দেবগণের উপর বিমুখ হয়ে বক্র ভাবাপন্ন হয়েছেন, রম্ভা তাঁকে সিধে করতে গেছে।

ইন্দ্র॥ অনেকগুলো যে অপ্সরী ছিল, মরেছে নাকি,

ভরত॥ নাগদত্তা, হেমা, সোমা প্রভৃতি তিন শত অপ্সরাকে লঙ্কেশ্বর অপহরণ করেছেন, বাকি আছে কেবল মিশ্রকেশী ও ঘৃতাচী।

ইন্দ্র॥ কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। আঃ আমাকে না জানিয়ে অপ্সরাদের যত্র তত্র কেন পাঠানো হয়? মিশ্রকেশী, ঘৃতাচীর

বয়েস হয়েছে, তাদের দ্বারা কিছু হবে না।

নারদ॥ ওহে ইন্দ্র, সে চিন্তা নেই, জাবালিও যুবা নহেন। একটু গৃহিণী বাহিনী জাতীয়া অপ্সরাই তাঁকে ভাল রকম বশ করতে পারবে। পুরূরবা আর জাবালির মধ্যে তফাৎ ঢের।

ইন্দ্র॥ মিশ্রকেশীর চুল কিছু কিছু পেকেছে, সে থাক। ঘৃতাচীকে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক। তাকে একপ্রস্থ সূক্ষ্ম চীনাংশুক ও যথোপযুক্ত অলংকারাদি দেওয়া হোক। বায়ু, তোমাকে বিশেষ করে বলছি, মৃদুমন্দ বইবে। শশধর, তুমি মন্দাকিনীতে স্নাত হয়ে উজ্জ্বল বেশে দেখা দাও গিয়া। কন্দর্প, তোমার সেই অভ্ররচিত অঙ্গাবরণটা পরিধান করে যাও, দ্বিতীয়বার ভস্মের ভয় নেই। বসন্ত, তুমি সঙ্গে একশত কোকিল পিক, মধুকর পুষ্পাদি আর জনকতক নতুন অপ্সরী কিন্নরী নেবে—এ কাজে এখন থেকে তারা সুশিক্ষিতা হোক।

নারদ॥ দেখ, একশত কোকিল তো নেবেই, সেই সঙ্গে একশত বন্য কুক্কুট, রাজহংসাদি নিও, ঋষি বড়ো মাংসাসী।

ইন্দ্র॥ অবশ্য, অবশ্য, তাহাও লইবে। উপরন্তু দশ কুম্ভ ঘৃত, দশ স্থালী দধি, দশ দ্রোণী গুড় এবং অন্যান্য ভোজ্য-সম্ভার। যেমন করে হোক জাবালির ধ্যান ভঙ্গ করা চাই। সভা ভঙ্গ কর।

নারদ॥ ওহে ইন্দ্র, দধি, গুড়, ঘৃতাদির সঙ্গে ভরত ও আমি দুজনে যাই, কি বল?

ইন্দ্র॥ তথাস্তু, চল সকলে।

(প্রস্থান)

॥ দেব দুন্দুভি বাদ্য ও গীত ॥

শৌর্য বীর্য শৌর্য বীর্য গাম্ভীর্য আকর,
সংগ্রামে দুর্গম্য যিনি গুণের সাগর,
মহৈশ্বর্য দেবের পূজ্য দেব পুরন্দর।
বহুবিধ বেদবাদে বিপুলে বিম্বান,
অস্ত্রে শস্ত্রে মন্ত্রে তন্ত্রে সতত সন্ধান।
অবিরত বসু বসুন্ধরা বিতরণে
জিয়াইল যূথ যূথ যাজক জীবনে।
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দানেতে তৎপর
জয়তু জীবতু যাবচ্চন্দ্রদিবাকর।

ইতি প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

(মূল গায়েন)

দিশা॥ মেঘৈর্মেদুরমম্বরম বনভুবঃ শ্যামা-স্তমালদ্রুমৈনক্তম্
ভীরুরয়ম গৃহম্ প্রাপয়।
(দেবতাগণ ও অপ্সরীদের প্রবেশ)

॥ মূল গায়েন তুড়ি জুড়ির গীত ॥

ইন্দ্র রাজার ঘোড়া নামে,
নীল সাগরে ঢেউ না থামে।
রঙে রঙে ডাইনে বামে
উল্লসে চলে মহাবেগে কুলের পানে।
দিকে দিকে ঝরে জল ধারা
মেঘে মেঘে ওরা পেল ছাড়া।
করে এপার ওপার জল তোড়পাড়
চলে ঘন রোলে কল্লোলে
স্বর্গ হতে মর্তধামে।

বসন্ত॥ এ যে ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে এসে পড়া গেল। ইন্দ্র কি মেঘগণকে কিছু সমঝে দেননি?

নারদ॥ সমঝে দেবেন কি, এখানে রাবণ রাজার হুকুম চলে। হয়তো গরম লেগেছে, মেঘেদের হুকুম দিয়েছে, দাও বিষ্টি।

ঘৃতাচী॥ আমার বড় ভয় লাগছে, যদি রাবণ এসে ধরে নিয়ে যায়!

আমি একলাই জাবালির ধ্যান ভঙ্গ করতে যাবো, দরকার নেই কাউকে

মদন॥ দ্যায়লা দেখচেন ঘৃতাচী। ওহে বসন্ত এ বুড়ো হাবড়া অপ্সরী নিয়ে কাজ হবে না, চল ফিরি।

বসন্ত॥ আসতো উর্বশী, তিলোত্তমা, দেখতে দেখতে আলো হয়ে যেত চারিদিক!

ঘৃতাচী॥ আমি কি আসতে চেয়েছিলেম না—(রোদন)

নারদ॥ আহাঃ, কেন স্ত্রীলোকের সঙ্গে তোমরা লাগো। স্থির হও ঘৃতাচী, আমি বলছি জাবালি তোমাকে দেখে একেবারে ওর নাম কি—এ কারা আসে ব্যাঙের ছাতা মাথায়, চল আড়াল থেকে দেখি!

ঘৃতাচী॥ হয়তো রাবণের দূত।

বসন্ত॥ রাবণ রাবণ মনে জাগছে, তিনি ঘটক পাঠিয়েছেন, এল বলে পুষ্পক রথ তোমার জন্যে।

নারদ॥ যাত্রা মুখে ও নামটা না করলেই নয়।

মদন॥ হাত কেঁপে যায়; ও নামটা শুনলে, ধনুকে গুণ চড়াই কি প্রকারে? আঃ আসতো তিলোত্তমা তো—

বসন্ত॥ এক তিল অন্ধকার থাকতো না। মেঘ কেটে পূর্ণচন্দ্র দেখা দিত।

ঘৃতাচী॥ আমি চল্লেম, তোমাদের কাউকে আসতে হবে না, আমি একলাই জাবালির ধ্যান ভঙ্গ করতে যাবো, দরকার নেই কাউকে! আমার এই চমকির শাড়ি, ডাকের গহনা, এই নিয়ে চল্লেম, দেখাবো কেমন ঘৃতাচী আমি।

(প্রস্থান)

নারদ॥ ডাকের সাজ আর চমকি শাড়ি, তার উপর বাদলার কাজ করা অবগুণ্ঠন—ডাকিনী-সিদ্ধ যদি হন তো রক্ষে, না হলে এবারে জাবালি-পত্নী-হাতে ঘৃতাচীর দফা রফা হবে।

ভরত॥ আমরা এখন কি করি?

নারদ॥ করি কি? চল ওরই মতে চলে দেখা যাক জাবালির আশ্রমের দিকে।

(সকলের প্রস্থান)

॥ মূল গায়েনের গীত ॥

মাগো মা তোমার জামাই এসেছে (ধুয়া)
কচুপাতাটি মাথায় দিয়ে নাইতে নেমেছে।
তেল মাখতে তেল দিয়েছি, ঢেলে ফেলেছে
পা ধুইতে জল দিয়েছি, খেয়ে ফেলেছে
আক্ কাটতে কাটারি দিচি, নাকটি কেটেছে॥

(কচু পাতা মাথায় খর্বট, খল্লাট, খালিতের প্রবেশ)

খালিত॥ অহহঃ ভেবেছিনু বৃষ্টি হবে, ঠিক তাই হল।

খর্বট॥ আকাশটায় যেন ইক্ষু গুড়ের প্রলেপ পড়েছে।

খল্লাট॥ মেঘও গুড় গুড় বলছে।

খালিত॥ হাঁ দেখছ না, শিলগুলো গুড় বাতাসার মতো টপ্ টপ্ ছাতার উপর পড়েই চলেছে। তোমাদের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, মরতে এনেছো বুড়ো মানুষকে এই হিমালয়ের কাছে হাতির জঙ্গলে।

খর্বট॥ হস্তিমূর্খ জাবালি যদি কোথাও থাকে তো এই বনেই আশ্রম বেঁধে আছে।

খল্লাট॥ জাবালি আর জায়গা খুঁজে পেলেন না, এইখানে এসেছেন আশ্রম পাততে। বালির নামটি নেই, কেবল কাদা! ছোঃ এদেশেও লোক থাকে!

খালিত॥ আরে তার ইচ্ছে, সে পেতেছে ঘর, তোমার আমার কি প্রয়োজন ছিল তাকে উদ্‌বাস্তু করে আবার উৎখেদ করতে তেড়ে আসা এই পাহাড়তলীতে? ফিরে চল ভাই, খোঁচাখুঁচিতে আর কাজ

নাই—কেঁচো খুঁড়তে সাপ বার হলে রক্ষে নাই। সেবার পাঁচিল পার করে ছেড়েছে, এবার বাগে পেলে বাঘের মুখে নয় হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করবে!

খর্বট॥ ও কিসের গর্জন।

খালিত॥ মেঘের বোধ হচ্ছে।

খর্বট॥ বৃদ্ধ হয়ে তোমার ভীমরতি ধরেছে।

খল্লাট॥ চক্ষের মাথা খেয়ে বসেছো।

খালিত॥ কর্ণ তো আছে ভাই, হাতীর ডাক আর মেঘের ডাক তফাৎ বুঝি। বহুকাল পূর্বে হিমালয়ের এইদিকেই তপস্যা করবো ভেবে হাতীর খেদায় খন্দকের মধ্যে তিন রাত্রি বন্ধ ছিলেম। এ বয়সে এখানে আর বানপ্রস্থে এগতে সাহস হয় না। একর্দম মুনি তিষ্ঠেছেন এ দেশে; জাবালি কতদিন টেঁকেন দেখ। সরযুর সেই বেলে মাটির চরে ফিরতেই হবে তাঁকে।

খর্বট॥ চল না, দু'চার পা এগিয়ে দেখি।

খালিত॥ এগবে কি পিছোও পিছোও।

॥ সকলের গীত॥

আরে এগোও যে, আরে পিছোও যে
আরে এগোও হে, আরে পিছোও হে
ঐ দেখ আসে কে, নেমে পড়ো গর্তে
গা ঢাকা হও হে।

(সকলের নেপথ্যে গমন)

(জাবালি, হিন্দ্রালিনী ও কিরাতগণের প্রবেশ)

॥ কিরাতদের গীত॥

আরে উত্তরেতে মেঘ করেছে, চালান আসছে ফিরে
কাপাস তুলোর লেপ গড়েছে হিমাল পাহাড় ঘিরে।
ইন্দ্ররাজা পাগ্ বেঁধেছে ধুমোর ফালি ছিঁড়ে
পাহার বুড়ি ভাজতে আছে উড়কী ধানের চিঁড়ে।
আকাশ ডাকে হুড়্হুড়
আঁকে পাঁকে নলী গড়
হাওয়া বিছায় আমড়া পাতা কামরাঙা গাছ ঘিরে।

॥ জাবালির গীত॥

আরে ইলসে মাছ মাছের রাজা,
ও সে গভীর জলে হেলায় মাজা।
ভেটকি, চিতাল, পার্শে, রুই
শংকর, শাল, বয়াল, চুঁই
তলিয়ে চলে খেলিয়ে ল্যাজা।

॥ সকলে॥

ডিমে ভরা তেল সিঁদুরে
তপ্‌সে মাছের রাণীরে
করা চাই তেলে ভাজা।

জাবালি॥ কেউ চল জলে, কেউ যাও ক্ষেতে, কেউ কেউ বনে, কেউ গোঠে, যে যার স্থানে। আমি ছিপ ফেলবো এই দীঘিটের এই পারে, তোমরা যাও ওপারে।

রামা॥ ঐ যে বহৎ দীঘি সওয়া ক্রোশ পাক্কা,
ঘুরিয়া যাইতে হলে দু' ঘণ্টার ধাক্কা।

কানু॥ দীঘির ওপারে আছে বড় বড় গাছ
জেলের ছেলেরা চল, ধরি সেথা কুঁচো মাছ।

হিন্দ্রা॥ কানু, এক ঝাঁকা কুল পেড়ে এনো, কুল-আচার করতে হবে।

জাবালি॥ এখানেও কুলাচারের কথা ভাবছ, এই কিরাত-দেশে বসে?

হিন্দ্রা॥ তোমার যেমন আচার-বিচার নেই, মাছ, মাংস যা পাচ্ছো খাচ্চ।

জাবালি॥ জ্ঞাতি কুল সব বিসর্জন দিয়ে বসে আছি, আবার কুলাচার কি?

হিন্দ্রা॥ কুলের আচার, কুলাচার নয়, খাবার বেলা যে রোজ চেয়ে বসো।

জাবালি॥ তাই বল, ওটা চাই বই কি। চল, তুমি কুল পাড়ো বনে, আমি বসিগে ছিপ নিয়ে। মাছ ধরার দিন বহে যায়, চল।

(সকলের প্রস্থান)

(ঘৃতাচী সঙ্গে শর্করা ও করকচা অপ্সরা, নারদ, মদন, বসন্ত, ভরত প্রভৃতির প্রবেশ)

॥ মূলে গায়েন—গীত॥

কাটিল গ্রীষ্মকাল এল বরষা
আকাশ ছাইল মেঘ, আসি সহসা।
নীলগিরিনিভ মেঘ ঢেকে দিল দিক
উঠিল ভেকের রব, নীরবিল পিক।

॥ ঘৃতাচীর গীত॥

বহে পবন পুরুবিয়া
দেবদারু বন চুরুনীয়া
হিম কন্ কন্ সন্ সন্।

ভরত॥ রও, এখনই কেন? চল অন্তরালে। চূর্ণ কুন্তলাদি অলংকার ভূষণাদি লোধ্ররেণু, অলক্তক তিলকাদি ধারণ করে সেজে গুজে এসো!

॥ নারদের গীত॥

রং লেপিয়ে ঢং ফিরিয়ে
খুব জমকিয়ে সেজে নাও।
চেনা পরিচয়ে ধরা না পড়ো
এমনি তরে সাজ গে যাও।
রং ঢং দেখে ধরে না ফেলে
বয়েস ছাপাতে চেষ্টা পাও।

ঘৃতাচী॥ সাজ সাজ আনি চল
কালি দিয়ে টানি ভুরু-যুগল।
চোখের পাতায় এটাতে তেল ওটাতে কাজল।
অঙ্গদ বলয় কান কুণ্ডল,
নাকে চড়াই নাকছাবি নথ,
হাতে অঙ্গুরী মাণিক দু পল।
পরচুলা আঁটি অতি পরিপাটি
গুছিতে ঢাকি সিঁথের ফাঁক।

ভরত॥ দেখ, তিলক, তুলসী মালা একটু আধটু ভুলো না। ঋষির বয়েস হয়েছে কিনা।

(অপ্সরা ঘৃতাচীর নেপথ্যে গমন)

মদন॥ এখন আমাদের কি সাজ গোজ? এই বেশ কি চলবে?

নারদ॥ মন্দই বা কি—বোধ হচ্ছে যেন মদনলাল ধনুকধারী সিং। বাইরের ভিজে চটটা খুল্লেই হবে।

বসন্ত॥ আমার?

ভরত॥ তোমার সাজা চাই। কাগজের ফুলগুলো বার কর।

মদন॥ যে বৃষ্টি সব গলে যাবে যে! বরুণ দেব কি জল ঢালতে ক্ষান্ত হবেন না?

বসন্ত॥ রোসো রোসো, জল না হলে ফুল ফল এসব ফোটানো যায় কি করে? অপেক্ষা কর বর্ষা যাবে, আসবে শরৎ, তারপর হেমন্ত, শীত, বসন্ত। এখন সাজবো কি?

মদন॥ তবেই হয়েছে—আবার রতি-বিলাপ পালা শুরু হবে দেখছি। এতদিন বসে থাকতে হবে বনালয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে?

বসন্ত॥ রাজকার্য, তা বল্লে চলে কই তোমার!

শশধর॥ ভাবনা কি, তুমি তো অভ্রের ঠোঙার মধ্যে আছ—ভিজে মরছি আমরা।

নারদ॥ ও হে চন্দর উদয় হও হে
এ যে ঘোর করি এল মেঘ শ্যামাইয়া তরু
বাজিয়া উঠিল আর ভেকের ডমরু।

ভরত॥ করিয়া আইল মেঘ এ যে বিলক্ষণ
চিকুর হানিছে ঐ ভাল না লক্ষণ।

মদন॥ বিলক্ষণ নাকাল না করে ছাড়বে না।

চন্দ্র॥ এই বেলা চল, ওধারে গাছতলে আশ্রয় নিই।

ভরত॥ মাতলি ঘৃত, দধি, মোদকাদির ভাণ্ড কটা নিয়ে কি একেবারে জাবালির ওখানে গিয়ে উঠলো নাকি?

নারদ॥ চল চল দেখি গিয়া।

নেপথ্যে॥ ওহে নারদ শুনচো, এ ধারে দেখ। পার্বতীয় ইন্দুরের গাড়ায় পড়ে আমরা বিপন্ন হয়েছি—কাদা জলে ডুবে মরার জোগাড়—টেনে তোলো সে দাদা!

নারদ॥ কে, কে, জাবালি নাকি?

নেপথ্যে॥ না গো, দেখতে পাচ্ছ না? বালখিল্যগণ ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি—খালিত, খর্বট, খল্লাট প্রভৃতি তোমার ভ্রাতাগণ।

ভরত॥ অ্যাঁ, চল চল, তুলি একে একে। এ জায়গা তো ভাল নয়!

নারদ॥ আঁধারিয়া আছে বন-বাদাড়
আবুড় খাবুড় ভূমি, পগারে উগারে বাঁশ ঝাড়,
নানা খানা খন্দ, পথ করে বন্ধ,
দেখিলেই মনে হয় দেশটি উজাড়।

ভরত॥ চল তুলি গে বালখিল্যগণকে।

নারদ॥ তোমার ইচ্ছা হয় যাও, আমি যাচ্ছিনে—ওদের মতো পড়ে মরবো? শুনেছি এখানে কিরাতগণ লামা নামে একপ্রকার চামরশ্মশ্রু লোমশ শ্বেত ছাগ ধরার জন্য খন্দক কেটে পাতা লতা

চাপা দিয়ে রাখে। তারি একটার মধ্যে তলিয়ে গেছেন ভায়ারা।

(খর্বট, খালিত, খল্লাটের প্রবেশ)

খালিত॥ ব্রহ্মা তোমাকে মুনি না করে ঐ লামা-ছাগরূপে চরতে দিলে ভাল করতেন।

নারদ॥ তোমরা এলে কি করতে? আমরা না হয় এসেছি দেবকার্যে।

খর্বট॥ দেবকার্য করতে আমরাও এসেছি, জাবালিকে তাড়া করে!

খালিত॥ এই পাণ্ডববর্জিত দেশে জাবালি যে আশ্রম ফাঁদিবেন কে জানতো?

খল্লাট॥ লোকটার যদি কিছু কাণ্ডজ্ঞান থাকে!

নারদ॥ তা নাই থাক—সেই অযোধ্যা থেকে তাকে অনুসরণ করা এই দুর্গম দেশে, এ কেন? তোমাদেরই কাণ্ডজ্ঞানটা কেমন? বল, কেন এসেছ?

খর্বট॥ কৌতূহল আর প্রচণ্ড টান—

খালিত॥ পাপীকে উদ্ধার করার।

খল্লাট॥ অগ্নিশুদ্ধ করে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া।

॥ বালখিল্যদের গীত॥

তবুও তোর তরে কাঁদি
যতই কেন হোস না পাপী।
তবুও ভালবাসি নিরবধি।
দেব বাঞ্ছিত মানব জনম
পেয়ে না রাখলি ধরম।
আর কি পাবি এমন সুযোগ,
করবে কি আর মানুষ বিধি?

খালিত॥ কোথায় হে জাবালি, দেখা দাও।

নারদ॥ এ কি ছাগল, যে তোমার ডাকে আসবে? ছুটে চল আমাদের পিছে পিছে—বালক স্বভাব ছাড়!

খালিত॥ বলি আমরাই বালক, তোমরা তো বুদ্ধিমান—কই, ফাঁদ নিয়ে তো ঘুরছো, জাবালিকে দেখতে পাচ্ছো?

নারদ॥ না, তোমরা?

খালিত॥ দেখছি দিব্যি পরিষ্কার জল-জিয়ন্ত, মাছ গাঁথছে ছিপে। মেছো গন্ধ পাচ্ছো না?

ভরত॥ পাচ্ছি—যখনি উঠিছে জাগি বাতাস দখিনে আসিছে মাছের গন্ধ, মেছো তো দেখিনে?

খর্বট॥ মেছো কি আগডালে বসে আছে? উঁচুতে দেখছ কি, চোখ নামাও!

নারদ॥ কই, কই, এ তো বন আর গাছ-পালা—বল না কোথায়?

খর্বট॥ চোখ নামাও, উঁচু মাথা নীচু কর।

খল্লাট॥ আমাদের সমান হও—

খালিত॥ তবে যদি দেখা পাও।

দেবতারা॥ কত নীচু? কাদায় শুতে হবে নাকি?

খালিত॥ ঐ গর্তে নেমে তবে আমরা নজর করেছি।

নারদ॥ কুমতলব আছে তোমাদের, বুঝেছি। যাই ব্রহ্মলোকে ফিরে, দেখাবো তামাসা—আমার নাম নারদ!

খালিত॥ রাগতঃ হবেন না। কি পুরস্কার দেবেন বলেন, এখনি দেখিয়ে দিই।

দেবতারা॥ যা চাও। ঘৃতাচীকে চাও, তাই। শর্করা, করকচা, তিনজনে তিনটি নাও।

খর্বট॥ আমরা তপস্বী ঋষি ব্রাহ্মণ। জাবালিকে ধরে যমালয়ে নিয়ে যদি কুম্ভীপাকে নিক্ষেপ করে অগ্নিশুদ্ধি কর তো বল।

আকাশবাণী॥ তথাস্তু!

খর্বট॥ ঐ দেখা যাচ্ছে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জাবালি।

আমি কি কচি খুকী যে এই ছোট ছোট পুতুলের খেলাঘর পাতবো

নারদ॥ দেখি দেখি।

সকলে॥ তাই তো তাই তো।

(খর্বট প্রভৃতির প্রস্থান)

॥ সকলের গীত॥

তাই তো তাই তো তাই তো
ভুল নাই তো ভুল নাই তো
চল যাই তো চল যাই তো
ঘৃতাচী কোথায়, আসে নাই তো।

ভরত॥ সাজ আর হয় না। বিলম্বে নালম। চন্দর তুমি উদয় হও হে আড়াল থেকে।

॥ চাঁদের গীত॥

চাঁদ চাঁদ চাঁদ অর্ধ চাঁদ
হিঙ্গে বনের শশী
এই এক চাঁদ ঐ এক চাঁদ
চাঁদে মেশামিশি।

নারদ॥ এ কি হচ্ছে, ছেলে ভোলাতে এসেছ নাকি যে ছড়া কাটতে বসলে?

(ঘৃতাচীর প্রবেশ)

॥ গীত ॥

শরতের চাঁদ জোছনা পুরা
শোভিতেছে যেন চালকুমড়া
চষা ক্ষেতে যেন খাসা ফুটি
মাখানো দোবরা চিনির গুঁড়া।

ভরত॥ ছো, ছো ঘৃতাচী তুমি কি গীত গান সব ফলার করে বসে আছ? গান গাও ভাল করে, না হলে আমার মাথা হেঁট হবে।

॥ ঘৃতাচীর গীত॥

শরত চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরিল কুসুম গন্ধ।

নারদ॥ এটা তো মন্দ ঠেকছে না।

চন্দ্র॥ চল্লেম আমি, তোমরা কীর্তন শোনো।

ভরত॥ রও রও, ধর এইবার ভাল গান, না হলে অভিসম্পাত। ইন্দ্রসভার গান ধর না। এস হে চন্দ্র এইবার।

॥ ঘৃতাচীর গীত ॥

চন্দ্র ঝলকে চরণ নখর ছটায়
অম্বর তলে শোভেরে স্মিত সুধাকর
অপরূপ রূপ দিঠায়।
যত নক্ষত্রগণ পরিবেষ্টিত
কৌমুদি-শোভা বিলসিত হসিত বিহসিত
বিহরত ঝলকত চমকত বিভায়

নারদ॥ বস্, চন্দ্র উদয় হয়েছেন। এখন বসন্তের আবির্ভাব হোক—গাও।

॥ ঘৃতাচীর গজল ॥

কুল কাটাতে ফুল ফুটায়ে
দুলে দুলায়ে এস চলে
ফুল বনেতে বুলবুলি গায়
চুলবুলিয়া কুইলা বোলে।

ভরত॥ আরে রাখো রাখো চুলবুলানি, বলছি ফুল ফোটার গান গাও।

॥ ঘৃতাচীর গীত ॥

ফুল রইলাম গায় গায়
সে ফুল গেল দখিন বায়
ফুলে ধরলো কুঁড়ি মুকুতার ঝুরি।

বসন্ত॥ মন্দ নয়তো, বেশ মিষ্টি কথা-গুলি।

ভরত॥ বলছি খাস ইন্দ্রসভার গান ধরতে। গানে সুর চাই, কথা হবে জোরদার।

॥ ঘৃতাচীর গীত—বসন্ত বাহার ॥

আই বসন্ত আজব বাহার
খিলে জর্দ ফুল বওরণ কি তার
চুটকু কুসুম ফুলে লাগি সরষে
চম্পাকে বুখ, কলিয়ন কি বার
গারোয়া ভালে ওস্তাদ কি দোয়ারে
চলো অব বনবন মধুবন কিনারে।

বসন্ত॥ এইবার অগ্রসর হও।

মদন॥ আমি আড়ালে আছি।

বসন্ত॥ চলুক চলুক গান।

ভরত॥ ভয় খেও না।

নারদ॥ আমি আছি সহায়।

(প্রস্থান)

॥ ঘৃতাচীর গীত॥

বাজে ঝিমি ঝিমি কঙ্কণ কিঙ্কিনী
আলোতে আঁধারে চরণের ধ্বনি শুনি।
কুসুম সুবাস ভরে দিকে দিগন্তরে
যেন কোন মন্তরে অন্তর লয় জিনি।

ভরত॥ সাধু ঘৃতাচী, শেষ রক্ষা করা চাই।

ঘৃতাচী॥ গেয়ে চলো গো, নেচে চলো।

॥ মদন ও সখীদের গীত॥

ধরবো এবার বনের হরিণ
ভুলিয়ে এনে বাঁশীর গানে
আলেয়ার আলোয় ও তার
নয়ন ধাঁধি বিঁধবো বাণে।
বাতাসের আগে চলবে তার প্রাণ শিকারীর
বিঁধবো বুকের এপার ওপার
জবলে জবলে নয়ন বাণে।

(খর্বট, খল্লাট ও খালিতের প্রবেশ)

খর্বট প্রভৃতি॥ প্রিয়ে ঘৃতাচী, কি অপরূপ রূপরাশি লাবণী।
হরিণ হীন রজনীশ বদনী। কোকনদ নয়নী।
অপরূপ রূপ একি
বিম্বাধর মৃদু হাস্য
অমৃত যুত গীত ভাষ্য একি!

ঘৃতাচী॥ এ কি, এ কি, ছাগ দেখি না বাঘ দেখি
মন তোর বুদ্ধি এ কি
তুই সাপ-ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে
তলাস করতে এলি সেঁকি!

॥ সখীদের গীত॥

হায় কি দশা, এ কি তামাসা
কি হতে এ কি হল।
ও সে বনের হরিণ রইল দূরে
জালে কটা ব্যাং পড়ল।
উহু উহু উহু উহু এ কি হল।

(খর্বট প্রভৃতির প্রস্থান)

বসন্ত॥ আসছেন জাবালি। কুহু ধ্বনি, কুহু ধ্বনি। যত পারো নাচো। যা মনে আসে গেয়ে চলো।

॥ গীত॥

কুহু কুহু উহু উহু
আর কুইলা না ভাই ও
মুহু মুহু উঁহু উঁহু
বঁধু গেছেন বিদেশত
খৎ না লেখেন ছমাসত
বঁধুর লাগি মোর কলিজা
জবলি জবলি যাইবো
হু হুঃ হু হুঃ উহু উহু।

(জাবালির প্রবেশ)

জাবালি॥ এ কি অকালে বসন্তের খোঁচা খেয়ে শীতাতুর কোকিল ডাকলো, না কেউ কাঁদলো? এ কে অপরূপ দিব্যাঙ্গনা—কটিতলে বামকর, চিবুকে দক্ষিণ কর?

ভরত॥ মদন, বাণ কই?

মদন॥ আগেই ছেড়েছি, ঐ তিনটে খর্বট, খল্লাট, খালিতের বুকে পেঁছে গেছে।

বসন্ত॥ নাচো নাচো, কথার বাণে বিদ্ধ কর।

॥ ঘৃতাচীর নৃত্য গীত॥

ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন
কোমল মলয় সমীরে
মধুকর নিকর করাম্বিত কোকিল
কুজিত কুঞ্জ কুটীরে
ধীর সমীরে যমুনা তীরে।
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদীতে এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে যান,
করেন নাচ গান ধীরে ধীরে।

জাবালি॥ এই বসন্ত, এই বিষ্টি, এই ধান ভানতে শিবের গীত! অয়ি বরাননে, তুমি কে? কি নিমিত্তই বা এই দুর্গম জনশূন্য উপত্যকায় আসিয়াছ? তুমি নৃত্য সংবরণ কর। এই সৈকত ভূমি অতিশয় পিচ্ছিল ও উপল বিষম—যদি আছাড় খাও তবে তোমার ঐ কোমল অস্থি আস্ত থাকিবে না।

ঘৃতাচী॥ হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি ঘৃতাচী, স্বর্গাঙ্গনা। তোমাকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি। তুমি প্রসন্ন হও আমি দেব-দুর্লভ দ্রব্যসম্ভার তোমার জন্য আনিয়াছি—ঘৃত কুম্ভ, দধিস্থালী, গুড়্দ্রোণী—সকলি তোমার—আমিও তোমার, আমার যা কিছু আছে—না থাক!

॥ সখীগণের গীত॥

কি দিব কি দিব বধু মনে করি আমি
যে ধন তোমারে দেব সেই ধন আমার তুমি।

জাবালি॥ অয়ি কল্যাণি! আমি দীন হীন কৃতদার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার গৃহিণী বর্তমানা, অতএব তুমি ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়া যাও।

॥ ঘৃতাচীর গীত॥

তোরা সব ফিরে যা সখি যা ফিরে।
আমি যাব না, যেতে পারব না
আর ঘরেতে ফিরে।
আমার যত কিছু ধন কড়ি
বাগ বাগিচা পাকা বাড়ি
সকল ধনের অধিকারি
তিনজন সখি রহিলে।
হয়ে বিচক্ষণ করয়ে রক্ষণ
ঘরে আছে শুক সারী
তাদের অন্ন দিওরে।

জাবালি॥ ক্রন্দন করো না, শোনো। যদি তোমার নিতান্তই মুনি ঋষির উপর ঝোঁক হয়ে থাকে, তবে অযোধ্যায় গমন কর, তথায় খর্বট, খল্লাট, খালিতাদি মুনিগণ আছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা এবং যতগুলিকে ইচ্ছা হেলায় তুমি তর্জনী হেলনে নাচাইতে পারিবে।

(খর্বট খল্লাট খালিতের প্রবেশ)

সকলে॥ অযোধ্যায় কেন, চল এইখান থেকে একেবারে ইন্দ্রালয়ে গিয়ে শুভকর্ম সম্পাদন করা যাবে।

ঘৃতাচী॥ আমি কি কচি খুকী যে এই ছোট ছোট পুতুলের খেলাঘর পাতবো?

জাবালি॥ আরে, উচ্চাভিলাষ থাকে তো ভার্গব, দুর্বাসা, কৌশিক প্রভৃতি অনল-সংকাশ উগ্রতেজ মহর্ষিগণকে জব্দ করিয়া যশস্বিনী হও—আমাকে ক্ষমা দাও।

॥ ঘৃতাচীর গীত॥

আ লো ও সহচরী, আমি হবো দেশান্তরী
যাবো চলি একেশ্বরী।
জাবালি বল্লে কি না, পায়ে ধরি!
ছি ছি লাজে মরি।
মুখ আর তুলবোনা,
চোখ আর মেলবোনা,
দেশান্তরী, একেশ্বরী!

খর্বট॥ হে জাবালে, তোমার ঐ বিপুল দেহ কি বিধাতা শুষ্ক কাষ্ঠে নির্মাণ করিয়াছেন? প্রিয়া আমাদের ক্রন্দন করিতেছেন দেখিতেছ না?

ঘৃতাচী॥ তুমি দীন হীন, আমি তোমাকে কুবেরের ঐশ্বর্য আনিয়া দিব। তোমার ব্রাহ্মণীকে বারাণসী প্রেরণ কর, তিনি নিশ্চয়ই আমার ন্যায় স্থির-যৌবনা নহেন। দেখ, উর্বশী, মেনকা পর্যন্ত আমায় দেখে হিংসেয় জবলে মরে।

খালিত॥ এ একেবারে ঠিক।

খল্লাট॥ সইত্য সইত্য অভ্রান্ত সইত্য।

জাবালি॥ সুন্দরী কিছু মনে কোরো না, তুমি নিতান্ত খুকীটি নও। তোমার মুখের লোধ্রেণু ভেদ করে ও কি বলি-রেখা দেখা যাইতেছে? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার দন্তপংক্তিতে ও কিসের ফাঁক?

খালিত॥ হে মূর্খ, তুমি নিশ্চয়ই রাত্র্যন্ধ, তাই অমন কথা বলিতেছ।

সখী॥ পথশ্রমে সখীর লাবণ্য এখন সম্যক স্ফূর্তি পাইতেছে না।

ঘৃতাচী॥ সকাল হোক, দুধ, সর, ঘৃতাদি উর্বটন মাখি, স্নান করি উষ্ণ জলে, মুখে দিই হিমানি—

সখী॥ তখন দেখো, মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

(ঝাঁটা হাতে হিন্দ্রালিনীর প্রবেশ ঘৃতাচী ও সখিগণকে প্রহার)

হিন্দ্রা॥ দগ্ধাননে, নির্লজ্জে, ঘেঁচী, তোর তো আস্পর্ধা কম নয়। বোকা পেয়ে আমার স্বামীকে ভোলাতে এসেছ! পাঠাচ্ছি তোকে বারাণসী!

জাবালি॥ প্রিয়ে স্থিরোভব, ইনি স্বর্গাঙ্গনা ঘৃতাচী, ইন্দ্রের আদেশে এখানে আসিয়াছেন, ইঁহার অপরাধ নাই।

হিন্দ্রা॥ অজ্জউত্ত, তোমার কি প্রকার আক্কেল! এই উৎকপালি বিড়ালাক্ষী মায়াবিনীর সহিত বিজনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলে?

জাবালি॥ প্রিয়ে, প্রসন্না হও! বৎসে ঘৃতাচী তুমি শান্ত হও। তুমি আজ রাত্রে আমার কুটিরেই বিশ্রাম কর। সখিগণ ঘরে কিছু ব্যাঘ্রের চর্বি আছে, পৃষ্ঠদেশে মালিশ করগা, ব্যথার উপশম হবে। আজ রাত্রি দেবগণ দেবর্ষিগণ আমার আশ্রমে কাটিয়ে কল্য অমরাবতীতে গিয়া দেবরাজকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ এবং ঘৃত দধি গুড়াদির জন্য বহু ধন্যবাদ জানাবে।

ঘৃতাচী॥ দেবরাজ আমার মুখদর্শন করবে না। হা, এমন দুর্দশা কখনো হয়নি।

জাবালি॥ তোমার কোনো ভয় নাই—তুমি দেবেন্দ্রকে জানাবে ইন্দ্রত্বের উপর আমার কিছুমাত্র লোভ নাই। তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতে পারেন।

(সকলের প্রস্থান।)

খলিত॥ ঘৃতাচী, ও ঘৃতাচী!

খর্বট॥ যাও কোথায়?

খল্লাট॥ যাঃ চলে গেল। ওঃ চোখে এককালে ধাঁধা লাগিয়ে যেন বিদ্যুৎ চলে গেল। (প্রস্থান)

— ইতি দ্বিতীয় পর্ব —

— তৃতীয় পর্ব —

(মূল গায়েন)

নন্দন বনের একটা কোণে ঘোঁট উঠেছে
মোটা সোটা ঋষি একটা
পুরন্দরের পাট লুটেছে।

(দক্ষ, বৃহস্পতি, যম, জামদগ্নি প্রভৃতি, নারদ ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র॥ হে দেবর্ষে এখন কি করা! জাবালি ইন্দ্রত্ব চাহেন না জানিয়াও তো আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। জনরব শুনি যে ঐ দুর্দান্ত ঋষি সমস্ত দেবতাকেই উড়াইয়া দিতে চায়।

॥ গীত ॥

এ কি শুনি সর্বনাশ
কন্দর্পের দর্পনাশ।
বসন্তের অন্তকাল উপস্থিত হল
কলঙ্কে কলঙ্কে শশী হলেন নৈরাশ।

নারদ॥ পুরন্দর, তুমি চিন্তিত হয়ো না। বালখিল্যগণ আমাদের পক্ষে আছেন, এর একটা বিহিত আমি সত্বরেই করছি। একবার নৈমিষারণ্যে ঘুরে আসতে হল। ঋষি দিয়ে ঋষি ক্ষয় বুঝেছ?

ইন্দ্র॥ না বুঝলেম না তো!

নারদ॥ যেমন বিষে বিষক্ষয় করা গো!

বৃহস্পতি॥ মর্তলোকে রাজাদের মধ্যে শত্রুক্ষয়ের জন্য এরূপ ব্যবস্থা আছে বটে—কিন্তু—

ইন্দ্র॥ ওর আর কিন্তু নেই—এই বর্ষাকালে মনসা দেবীকে সদলে জাবালি আশ্রমে প্রেরণ করা যাক, কি বলেন, যমরাজ?

যম॥ আমি যদি ধর্মরাজ না হতেম তো ঐ উপদেশ দিতে পারতেম। ব্রহ্মশাপ ছাড়া এ ব্যবস্থা হতে পারে না।

এক সর্ষপ প্রমাণ সেবনে দিব্যজ্ঞান

ইন্দ্র॥ শাস্ত্রের অপেক্ষা আমি শস্ত্র-প্রয়োগে নিপুণ। বলেন তো এইখানে বসে বজ্র নিক্ষেপ করি।

ধর্ম॥ তারপর ব্রহ্মহত্যা থেকে বাঁচবে কি প্রকারে?

নারদ॥ অবিচার করা হবে না। আমি থাকতে পিতা রুষ্ট হলে রক্ষে নেই, আর দুই কর্তাও ক্ষেপবেন।

বৃহস্পতি॥ জনরবে নির্ভর করাও সমীচীন হবে না।

ধর্ম॥ রামচন্দ্র জাবালিকে নাস্তিক বলেছেন, সেইটে যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি, তবে ওকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, নচেৎ নয়।

নারদ॥ পিতা এই কথা আমায় বলেছেন। এই ত্রেতা যুগে পুণ্য ত্রিপাদ, এক পাদ পাপও দেখা দিয়েছে। ইহার হেতু কি তোমরা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি হে মুনিগণ?

জামদগ্নি॥ আশ্চর্য, ইহা আমরা কেহই ভাবিয়া দেখি নাই। আমার বিশ্বাস পাপাত্মা জাবালিই এর কারণ।

বৃহস্পতি॥ ঠিক ঠিক, আমরা এ তো অনেকদিন জানি।

জামদগ্নি॥ এই জাবালি ভ্রষ্টাচারী, উন্মার্গ-গামী, নাস্তিক! ইহার শাস্ত্র নাই, মার্গ নাই। রামচন্দ্রকে এই পাষণ্ডই সত্যধর্ম-চ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বাল-খিল্যগণকে এই দুরাত্মাই নির্যাতিত করিয়াছে।

ইন্দ্র॥ আমাকেও এই পাপিষ্ঠ হাস্যাস্পদ করিয়াছে।

দক্ষ॥ ইহাকে বধ না করিলে পুণ্যের নষ্টপাদ উদ্ধার হইবে না। আমি এক-বার জাবালিকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—সত্য করিয়া কহ তুমি নাস্তিক কিনা, তোমার মার্গ কি, শাস্ত্রই বা কি?

নারদ॥ তাতে তিনি কি বল্লেন?

দক্ষ॥ হে সুধিবৃন্দ, তিনি বল্লেন—আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি—আমার তুচ্ছ অভাব অভিযোগ জানাইয়া তাঁহাদের বিরত করি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন তাহারই বলে কোনপ্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত্র তত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য।

বৃহস্পতি॥ তুমি কি জবাব দিলে?

দক্ষ॥ আমি বল্লাম—তোমার কথার মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝিলাম না।

নারদ॥ তারপর, তারপর?

দক্ষ॥ জাবালি বল্লেন—হে ছাগমুণ্ড দক্ষ, তুমি বুঝিবার বৃথা চেষ্টা করিও না, আমি এখন চল্লেম, দেবগণ বিপ্রগণ তোমাদের জয় হোক।

ইন্দ্র॥ জামদগ্ন, কুঠারে কুঠারে এক-বিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছ, আর একবার এসো নাস্তিককে সংহার কর!

দক্ষ॥ থাম, থাম, ব্রাহ্মণের দেহে অস্ত্রা-ঘাত—ছি, ছি,। মনু কোথায়—তিনি কি ব্যবস্থা দেন?

(মনুর প্রবেশ)

মনু॥ হলাহল—তৎপরে, কুম্ভীপাক।

নারদ॥ আমি তো পূর্বেই বলেছি বিষস্য বিষমৌষধম্। কিন্তু হলাহল প্রয়োগ করতে যায় কে? বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে, তাই ভাবো।

ইন্দ্র॥ হলাহল হলাহলিগণকে আহ্বান কর।

(বিষলক্ষ্মীর প্রবেশ)

॥ গীত ॥

ইস্ বিষ আশিবিষ
তরল হলাহল
কালি নাগিনীর লালা গরল
হালা জ্বালাময়
সূচিকা ভরণ নরম গরম
মিছরি-ছুরি মিশিবরণ,
বিষয় বিষ চরম বিষ।
বিষ চৈনিক, বিষ জৈবিক
বিষ চিন্তামণি
বিষ মায়াখনি
পিপিলী বিষ, বৃশ্চিক বিষ
পাকা বিষ, কাঁচা বিষ
অম্ল বিষ, স্বর্ণ বিষ
বাতাসী বিষ, বাষ্পীয় বিষ, জলীয় বিষ
উনিশ বিষ উদ্ভিজ বিষ
বিশাই বিষ, বিষ ধরি বিষ
বিষের বিষ, বিষ হরি বিষ।

দেবতাগণ॥ হলাহল হলাহল—বিষ বিষ বিষ।

নারদ॥ থামো থামো, কোলাহল কোরোনা, বিষলক্ষ্মী কি বলেন শুনি।

বিষলক্ষ্মী॥ বিশুদ্ধ হলাহল হল চৈনিক হলাহল। মর্তলোকে যে দেশে লোকে পোস্ত ভাষা কয় ঠিক তার পূর্বদিকে চিন্তাম্বুং নামক উদ্যানে এক মন্ত্রউলি আছেন—তাঁর কাছে আছে।

ধন্বন্তরী॥ তার গুণ ক শুনি, এ তো নতুন খবর শুনছি।

বিষলক্ষ্মী॥ এক সর্ষপ প্রমাণ সেবনে দিব্যজ্ঞান। দুই সর্ষপে বুদ্ধিভ্রংশ, চতুর্মাত্রায় নরক ভোগ, অষ্ট মাত্রায় মোক্ষ লাভ।

ধন্বন্তরী॥ অনুপান, অনুপানটা কি?

বিষলক্ষ্মী॥ শ্বেত পাপড়া, ধনিয়া পলতা মিলিত দুই তোলা, দুগ্ধ আধ সের, শেষ আধ পোয়া ক্ষীর খাওয়া।

ইন্দ্র॥ অমৃতোপম। পাঠাও মন্ত্রউলিকে জাবালির নিকট অবিলম্বে। দেবর্ষি চলেন, কুম্ভীপাকের ব্যবস্থা করা যাক ধর্মরাজকে নিয়ে।

নারদ॥ তোমরা যাও, আমি ব্রহ্মলোকের দিকে যাচ্ছি—সেইখানে খবর কোরো।

(সকলের প্রস্তান)

(মন্ত্রউলি নিদ্রাউলির প্রবেশ)

॥ উভয়ের গীত ॥

মন্ত্রউলি মন্ত্রউলি এক শ্বাসে
উড়াইলাম বিষের গুলি।
উঠাইলাম বিষের বাও,
গও গহিনে নিদ্রা যাও।
নিদ্রা যাও মহানিদ্রা দুঃখ ভুলি,
পোখ্ পাখালি ঘুমায়ে যাক,
শৃগাল শৃগালী নীরবে থাক,
ফুলবনে ফণি মনসা থাক ফণা তুলি।

(জাবালি ও হিন্দ্রালিনীর প্রবেশ)

জাবালি॥ উপরে সূর্যের তাপ, নীচে মরু বালি
সর্ষে ফুল দেখিতেছে চক্ষুরে পুতলী।
প্রথম যৌবনে গৌড়ি মাধবী পৈষ্টি আসব, বাল্যকালে চুরি করে তালরস, এখনো চালাচ্ছি দ্রাক্ষারিষ্ট ভাণ্ড ভাণ্ড, এমন প্রচণ্ড নেশা তো অনুভব করিনি। তোমরা কে? কোন পথে, কোন দেশে যাচ্ছি আমরা?

॥ জাবালির গীত ॥

যে দেশে দিনেতে দিন
রাত্রে রাত্রি অন্ধকার মসী
যেখানে উৎকট আলো বিকট কালো
চোখ সবার
সেইখানে চলছি এবার রে নিকশী রূপসী।
অন্ধকারে শীতল হস্ত অস্ত তারার
স্পর্শ করে
আখা জ্বলে, খাক্ ওড়ে, বাতাস পোড়ে
দগ্ধ করে
নিদ্রা আসে স্বপন ধরে রে প্রেয়সী।

(জাবালির শয়ন)

(নিদ্রাপরী, নিশাপরীর প্রবেশ)

॥ গীত ॥

ঘুম যায় ঘুম যায় রে গাছ পাতারা
কুহু নিশার নিদ পাড়ে আকাশের তারা।
ঘুম ঘুম যায় ঘোরালো আলো
নীল নয়নে তারা দুটি কালো।
পিদুমের শিষ ঢোলে ফেলে ছায়া আলো।
থাকে থাকে বাতাস জাগে
থাকে থাকে ঘুমায় রে।

॥ জাবালির প্রলাপ ॥

গম্ভীর পাতাল! যথা কালরাত্রি করাল বদনা বিস্তারে একাধিপত্য। শবশয়ে অযুত ফণি ফণা দিবানিশি ফাটি রোষে। ঘোর নীল বিবর্ণ অনল শিখা সংঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশ ময়! তমো হস্ত এড়াইতে প্রাণ যথা কালের কবল। কোথা জল, কোথা স্থল, কোথা তল, কোথা দিগ্বিদিক, রসাতল, গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল।

॥ হিন্দ্রালিনীর খেদ ॥

হরিণ বনের ছায়, শিকারী তাহারে হায়
আচম্বিতে মারে শেলের ঘা।
কি শেল মারিলি ওরে কি বাণে বিঁধিলি তারে
বিনা দোষে নাশিলি আহা।

(সখীদের প্রবেশ)

॥ গীত ॥

মউলি শাকের শিকড় কেটে
কে খাওয়ালো শিলে বেটে?
ঘুম পাড়ানি ঘুমচি পাতা
তাই কি খেয়ে সকল গা'টা
এলিয়ে পলো রেতে রেতে?

॥ জাবালির প্রলাপ ॥

স্বাগতোসি হে চতুরানন, যথেষ্ট হয়েছে। প্রীত হয়েছেন, স্বস্থানে প্রস্থান করুন, বর দিয়ে আর আমাকে বিদ্রূপ করবেন না। আমার প্রার্থিতব্য কিছুই নাই। আমি স্বাবলম্বী যশঃবিমুখ তাপস, দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করে আছি। লোক সমাজে মন্ত্রপ্রচার আমার কর্ম নয়। সে ভ্রান্তি যেটুকু ছিল অপনীত হয়েছে।

॥ আকাশবাণী ॥

জাবালে! জাগ্রত হও, সংস্কারের নাগপাশ হতে মানব মনকে মুক্ত কর!

(জাবালির চৈতন্য লাভ)

জাবালি॥ তথাস্তু।

॥ মূল গায়েন—গীত ॥

বৃক্ষগণ হেলিল সুশীতল সমীরণে
পুষ্পগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে।
স্বপন কবি কাহিনী পলায় মুখ আবরি
জাগিল বিহঙ্গকুল ভাগিল বিভাবরী।

জাবালি॥ প্রিয়ে রাত্রি প্রভাত হল।

হিন্দ্রা॥ এই মাসে দীঘল দিন কুভু না ফুরায়
চউক আল মাইতে নিশা পরভাত হয়।

জাবালি॥ স্নিগ্ধ অতি এই কাল, নাহি কোন
গোলমাল নিস্তব্ধ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়।
ঝোপে ঝাপে অন্ধকার, নভস্থল পরিষ্কার
লতা পাতা হিমবিন্দুময়।
পরপারে যায় দেখা, যেন এক চিত্রলেখা
পশ্চিম দিগন্তে নত শীর
গাছে গাছে একাকার, মাঝে মাঝে রহে আর
দেবালয় প্রাসাদ কুটীর।
সরযূতীরের কুটীর মনে পড়ছে। চল ফিরে যাই।

(উভয়ের প্রস্তান)

(মূল গায়েন)

দিশা—পন্থ ধর রে বন্ধু চলি চলরে ঘরে!

॥ রামা কানুর গীত ॥

যাই যাই আসি আসি, পরব শেষ বনবাসী
বাতাসে আকাশে বাঁশী বিনতি জানায়,
যেন কে আপন জনা মিনতি মানায়।
বাঁশী কয়—পরব শেষ, যেতে হয় আপন দেশ
মন উদাসী কয় বাঁশী, যাই যাই, আসি আসি।

—পালা শেষ—

প্রসাধন

শিল্পী ঃ শ্রীনন্দলাল বসু

ব্লক ও মুদ্রণ—বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শ্রীরামকুমার কাজরিওয়ালের সৌজন্যে

আচার্য নন্দলাল বসু

মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে আচার্য নন্দলাল বসুকে 'পদ্ম-বিভূষণ পয়লা বর্গ' স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই ভারতের সকল শিল্পরসিকদের দৃষ্টি শিল্পীর চিত্রকলার উপর আকৃষ্ট হইবে। এই প্রবন্ধে তাঁহার চিত্ররীতির পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি, আশা করি এই সময়ে ইহা প্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। নব্য ভারতীয় চিত্রকলার উৎপত্তি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ হইতে উৎপত্তি হইলেও নন্দলালের কাজে ইহার একটি দ্বিতীয় পর্যায় লক্ষ্য করা যাইবে; সেজন্য তাঁহার এই নূতন টেণ্ডেন্সী বা গতি-প্রবণতার পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে কেহ কেহ নিও-রোমাণ্টিসিজম বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন, নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষা পাইলেও, তাঁহার কাজে রোমাণ্টিসিজমের পরিচয় পাওয়া যাইবে না, তিনি ইহা হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। শিল্পী গুস্তভ কুরবে (১৮১৯—১৮৭৭) ফ্রান্সের রোমাণ্টিসিজমের বিরুদ্ধে প্রথম প্রবল আওয়াজ তোলেন, তিনি নিজেকে বলেন রিয়ালিস্ট এবং বলেন 'ব্যাক টু নেচার।" কুরবে হইতে ফ্রান্সে রিয়ালিজম বা নেচারালিজম পরে ম্যানের "ইম্প্রেসনিজমের" উৎপত্তি হইয়াছে। নন্দলালের চিত্রেও তেমনি বাংলার রোমাণ্টিসিজমের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং তাঁহার কাজে ও চিন্তায় "ব্যাক টু নেচারের" ধ্বনি পাওয়া যাইবে, তবে নন্দলালের "ব্যাক টু নেচার" ইউরোপ হইতে আমদানী করা নহে, তাঁহার আদর্শবাদ আসিয়াছে চীন হইতে। চীনা চিত্রকলার উপর নন্দলালের গভীর শ্রদ্ধা। শিল্পীর ব্যাক টু নেচার পৌঁছিতে বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে, যদিও তাঁহার শিল্পের উৎস হিন্দু পুরাণ এবং ক্লাসিক্যাল আর্ট। নন্দলাল তাঁহার শিল্পে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন। প্রথম দিকে দেখা যায়, নন্দলাল কেবল পৌরাণিক চিত্র আঁকিতেছেন, পরবর্তীকালে আধুনিক কালের পারিপার্শ্বিক জীবনের চিত্র আঁকিলেও পৌরাণিক চিত্র একেবারে ছাড়িয়া দেন নাই, প্রথম যুগে যেমন তাঁহার বিখ্যাত পৌরাণিক চিত্র আছে, শেষের যুগেও তাঁহাকে প্রশংসনীয় পৌরাণিক চিত্র আঁকিতে দেখা যায়।

নন্দলালের শিক্ষা। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে খড়্গপুরে নন্দলালের জন্ম, তাঁহার পিতা

নন্দলালকৃত আলংকারিক চিত্র

ছিলেন সেখানকার দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার। কলিকাতায় কুড়ি বছর বয়সে ক্ষুদিরাম বোসের স্কুল (সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল) হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেনারেল অ্যাসেম্বলীতে এফ-এ ক্লাসে ভর্তি হন, সেখানে পরীক্ষায় ফেল করিয়া মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন, সেখানেও এফ-এ ফেল করেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের কমার্শিয়াল ক্লাসে ভর্তি হন, মিঃ চ্যাপম্যান ছিলেন তাঁহার প্রিন্সিপাল। ছয় মাস ছিলেন সেখানে, কিন্তু পড়াশুনা কিছুই করেন নাই, বইও কেনা হয় নাই; তখন ভর্তির ফি দিলেই কলেজে ভর্তি হওয়া যাইত। তিনি মাহিয়ানার টাকা দিয়া হ্যারিসন রোডের মোড়ে পুরাতন বইয়ের দোকান হইতে ছবির ম্যাগাজিন কিনিতেন।

বাল্যে নন্দলালের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল মূর্তিনির্মাতারূপে। খড়্গপুরে থাকিতে তিনি কুম্ভকারের কাজ দেখিয়া মৃন্ময়-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। চিত্রাঙ্কনের পূর্বে তাঁহার মূর্তিনির্মাণ শিক্ষা আরম্ভ হয়। কলিকাতায় আসিয়া স্কুলে পড়িবার সময় তিনি ড্রয়িং ক্লাসেই সর্বপ্রথম ছবি আঁকিবার উৎসাহ পান। কলেজে ভর্তি হইলে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে কবিতার বই পড়ানো হইত, তাহার পাতার দুই পাশে বর্ণনীয় বিষয়ের ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন। বাল্যে তাঁহার যে মাটির মূর্তি নির্মাণে আগ্রহ দেখা যায়—পরবর্তী শিল্পী জীবনে দেখি তাঁহার চিত্রে মূর্তির গুণ অথবা ভাস্কর্যসুলভ নৈপুণ্য (Sculpturesque quality), শুধু তাহাই নহে কিছু মাটির মূর্তিও গড়িয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভাস্কর্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়; তিনি যদি চিত্রকর না হইয়া ভাস্কর হইতেন, তাহাতেও বিশিষ্ট সফলতা লাভ করিতে পারিতেন।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্র "বুদ্ধ ও সুজাতা"

ও "বজ্রমুকুট" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া তিনি অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন; তখন অবনীন্দ্রনাথ গভর্নমেণ্ট স্কুল অফ আর্টের ভাইস প্রিন্সিপাল। নন্দলাল নিজের আঁকা খান কয়েক চিত্র লইয়া দেখা করেন; সঙ্গে ছিল রাফ্যালের ম্যাডোনার নকল, সস্ পেণ্টিং, গ্রীক মূর্তির নকল, স্টিল লাইফ পেণ্টিং ও কাদম্বরীর চিত্র। নন্দলাল আর্ট স্কুলে ভর্তি হইলেন। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন; হ্যাভেল নন্দলালের চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হন। ঈশ্বরীবাবুর ডিজাইনের ক্লাসে নন্দলাল ভর্তি হইয়াছিলেন।

ছাত্রজীবনে আঁকা নন্দলালের কয়েকটি চিত্র সুপরিচিতঃ সতী, শিব সতী, কর্ণ, তাণ্ডব নৃত্য, বেতাল পঞ্চবিংশতি, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় ইত্যাদি। মুঘল চিত্র সকল এখন যাদুঘরে টানানো থাকে; এগুলি আগে ডিজাইনের ঘরে টানান থাকিত। এই ছবির চার পাঁচখানা নকল করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে শিব সতী চিত্রের জন্য পাঁচ শত টাকা পুরস্কার পান; ঐ টাকায় তিনি মথুরা অবধি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে ভর্তি হইয়া, পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করার পর আর্ট স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

বিলাত হইতে লেডি হেরিংহাম আসিয়াছিলেন অজন্তার প্রতিলিপি লওয়ার জন্য। তাঁহাকে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যেরা সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন নন্দলাল, অসিতকুমার, মহীশূরের ভেঙ্কট আপ্পা এবং সমরেন্দ্র গুপ্ত। অজন্তার এই অভিযান বাংলার নয়াগোষ্ঠীর শিল্পীদের এক সুনির্দিষ্ট পন্থার এবং শক্তির নির্দেশ দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী স্থাপন করিলে, তাঁহার আহ্বানে তিনি কলাভবনের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে নন্দলালের কর্মধারার এবং জীবনের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। শিল্প জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে তাঁহার মানবতা ও আদর্শবাদ। তাঁহার ত্যাগ ও জীবনের সাধনাকে অবলম্বন করিয়া শিল্পের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থলিপ্সা তাঁহাকে সাধনা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই; বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিল্প সৃষ্টি করিয়া তিনি শিল্পকে খেলো করেন নাই। তাঁহার শিল্পে ভারতের শিল্প যুগের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইবে। নন্দলালের অসামান্য প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া বাংলার নানা জেলা হইতে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এমন কি সুদূর সীমান্ত প্রদেশ, সিংহল ও জাভা হইতেও ছাত্র আসিয়াছে।

সারা ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও নন্দলালের খ্যাতি ও বহু গুণগ্রাহী। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টরেট ও বিশ্বভারতী দেশিক (ডক্টরেট) উপাধি দান করিয়া এবং সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকে স্বর্ণপদক দান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

নন্দলাল যে, শুধু চিত্রকর্মেই প্রেরণা এবং নির্দেশ দিয়াছেন তাহা নহে, ভাস্কর্য, নানাবিধ কারুকর্ম, এবং বিশেষ করিয়া নাট্যসজ্জায় তাঁহার অপূর্ব কীর্তি থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের নাট্য ও নৃত্য নাট্য ভারতীয় মঞ্চে এক যুগান্তর এবং মনোহর সৌন্দর্য ও রুচি আনয়ন করিয়াছে, ইহার মঞ্চসজ্জা এবং পরিচ্ছদের সজ্জা নন্দলালের পরিকল্পনা হইতে আসিয়াছে।

ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতেই আলঙ্কারিক শিল্পে পরাকাষ্ঠা দেখা যায়; নন্দলাল সেই নষ্টপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আল্পনা অঙ্কনের নব জাগরণ আনিয়াছেন এবং নবরূপ দিয়াছেন। তাঁহার বহু চিত্রে কারু কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়; ডেকোরেটিভ আর্টে তাঁহার অপূর্ব দখল। তিনি একাধারে ক্র্যাফ্‌টস্‌ম্যান ও আর্টিস্ট।

তাঁহার সর্বপ্রকার ভারতীয় চিত্রকলার টেকনিকের পরিচয় কেবল থিওরেটিক্যাল বা অনুমানাত্মক নহে, প্রাচীন ফ্রেস্কো হইতে আরম্ভ করিয়া, মুঘল, রাজপুত, বাংলার পট পর্যন্ত সর্বপ্রকার চিত্র হাতে কলমে করিয়াছেন। ভারতে দুইপ্রকার ফ্রেস্কোর রীতি আছেঃ অজন্তার ও জয়পুরের ফ্রেস্কোর রীতি উভয়ই তিনি হাতে কলমে করিয়া দেখাইয়াছেন। ভারতীয় রীতির ন্যায় মিশরীয় ও আসিরীয় রীতিও তাঁহার চিত্র হইতে বাদ যায় নাই। কাগজ, কাপড়, সিল্ক, কাঠ, প্রাচীরে, সর্বপ্রকার বস্তুর উপর তিনি ছবি আঁকিয়াছেন। কোনো বস্তুই তাঁহার কাছে বাধাস্বরূপ উপস্থিত হয় না। জলরঙা ক্ষুদ্র মিনিয়েচার যেমন করিয়াছেন এগ্ টেম্পারায় অতি বৃহৎ প্রাচীর চিত্রও তেমন করিয়াছেন। সর্বপ্রকার কাজে দেখা যায়, তাঁহার রেখা ও আকৃতির (line and form) উপর দখল। সহজ সাবলীল গতিতে তাঁহার রেখার প্রকাশ। ওল্ড মাস্টার অজন্তা শিল্পীর নৈপুণ্য এবং চীন জাপানের ক্যালিগ্রাফির কৌশল তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। অবনীন্দ্র যুগের শিল্পীদের শুধু গুরু প্রবর্তিত ওয়াশের টেক্‌নিকের কাজ করিতে দেখা যায়, এবং সকলেই বিলাতী রং ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু নন্দলাল দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় শিল্পীর ন্যায় নিজের হাতে তৈরী দেশী রংয়ে টেম্পারা চিত্রের উপর অধিক জোর দিয়াছেন। তাঁহার টেম্পারা চিত্রে শুধু চারিটি রংয়ের ব্যবহার দেখা যায়; গেরি মাটী; এলা মাটী; ভুষা কালী; সবুজ পাথর (টেরাভার্ট)।

শান্তিনিকেতনে যোগ দেওয়ার পূর্বে তিনি প্রধানত পৌরাণিক চিত্র করিয়াছেন, কিন্তু শান্তিনিকেতন অবস্থানকালে পারি-

নৌকাবিলাস শিল্পী ঃ নন্দলাল বসু

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের স্টুডিওতে অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, আনন্দ কুমারস্বামী ও নন্দলাল বসু। স্কেচ্ : শ্রীনন্দলাল বসু

পার্শ্বিক জীবন এবং স্থানীয় দৃশ্য তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছে, এবং তিনি তাহা চিত্রে প্রকটিত করিয়াছেন। এসব চিত্র শুধু কল্পনাত্মক নহে, যেমন অবনীন্দ্র গোষ্ঠীর শিল্পীদের দেখা যায়, তাঁহারা শুধু মন হইতে ছবি আঁকিয়া থাকেন, তাহা অবাস্তব, প্রকৃতি হইতে সম্বন্ধ-বিচ্যুত। নন্দলাল প্রকৃতি হইতে অনুশীলন বা স্কেচ করিয়া থাকেন; শুধু মানুষ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহার স্কেচে ধরা পড়ে নাই; পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, নানা প্রকারের উদ্ভিদ, ফুল সব কিছুই যাহা তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে, তাহাই তিনি টুকিয়াছেন। এই সব ছোট ছোট ড্রয়িং (অধিকাংশই পোস্টকার্ডে করা) পেন্সিল ড্রয়িংই হউক, কালীকলমের কাজ হউক, শাদা কালোর কাজ হউক, খুবই সরস ও উপভোগ্য। অনুশীলনের বিষয়ের এরূপ ব্যাপকতা কেবল লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কাজের মধ্যে দেখা যায়, তিনিও কিছু বাদ দেন নাই, পোকা মাকড়ও স্কেচ করিয়াছেন। নন্দলালের প্রতিভা ও নৈপুণ্য যেমন বৃহত্তর কাজে, এসব ক্ষুদ্র কাজেও তাহা লক্ষণীয় এবং সমভাবে খ্যাতিসম্পন্ন।

নন্দলালের চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার শৈব চিত্র-সমূহ আলোচনা করিতে হয়; কারণ তাহা ভারতীয় শিল্পে এক অপূর্ব অবদান। ভারতীয় সাহিত্যে, গুপ্ত, পহ্লব, রাষ্ট্রকুট, চোল ভাস্কর্যে, এবং কাংড়াচিত্রে দেবাদিদেব শিবের মহিমার কীর্তন দেখা যায়; হিন্দু সাহিত্যে ও শিল্পে শিব প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, শিবের পরিকল্পনা, তাঁহার ধ্যান কবি ও শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। মহাকবি কালিদাস শিবের বন্দনা করিয়াছেন, "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।" নন্দলাল যেমন প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তেমন কালিদাসের কুমারসম্ভব তাঁহার কল্পনার খোরাক জোগাইয়াছে। তাঁহার শৈব চিত্রে প্রাচীন কলাকৌশলের গুরুত্ব যেমন ধরা পড়িয়াছে, তেমন ইহাতে বর্তমান আছে ভারতীয় আদর্শের এক আভিজাত্য এবং সম্ভ্রমতা। তিনি ভারতীয় শৈব চিত্রের ধারা সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা তাঁহার শৈব চিত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার শৈব চিত্র : শিবের তাণ্ডব নৃত্য, শিব ও মৃত সতী, উমার তপস্যা, শিবের বিষপান, উমার প্রত্যাখ্যান, ন যযৌ ন তস্থৌ, প্রেম ও মৃত্যু, অর্ধ নারীশ্বর, শিব ও উমা।

শৈব চিত্রের প্রসঙ্গে নন্দলালের দুর্গা

বসন্তোৎসব শিল্পী : নন্দলাল বসু মহাপ্রস্থানের পথ

চিত্রসমূহের আলোচনা হওয়া উচিত। তিনি দুর্গার বহু চিত্র আঁকিয়া বাংলার আরাধ্যা দেবীর এক নবরূপের উদ্ঘাটন করিয়াছেন; তাঁহার চিত্র শাস্ত্র ও ধ্যান-সম্মত। ইহাতে বিভিন্ন শৈলীর প্রচেষ্টা দেখা যায় ঃ তিনি গুপ্ত, পাল, তিব্বতীয় ড্রয়িং, বাংলার মৃণ্ময় শিল্প ও পটচিত্রের অনুধাবন করিয়াছেন। কলিকাতার আধুনিক বহু দুর্গামূর্তিতে যে নব পরিকল্পনা দেখা যায়, পরোক্ষভাবে তাহাতে যে নন্দলালের প্রভাব আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; নন্দলাল চিত্রকর হইয়াও ভাস্কর্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

পণ্ডিতপ্রবর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নন্দলালের শৈব চিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ "আদর্শ হিন্দু নন্দলাল 'শিব ও উমা'রূপী কল্পনার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। তিনি পূর্ববর্তী ভাস্কর ও চিত্রীদের ভাষার শিক্ষা লইয়া তাঁহাদের খোদিত মূর্তি অধ্যয়ন, পুরাণ পাঠ এবং শৈবত দর্শন হৃদয়ঙ্গম করিয়া 'শিব ও উমার' নিজস্ব কল্পনাকে এমনভাবে রূপায়িত করিয়াছেন যে, ঠিক সেই রকমটি বর্তমান কালের অন্য কোনো শিল্পীই পারে নাই। অননুকরণীয় কলাভঙ্গিমার সাহায্যে নন্দলাল তাঁহার স্বকীয় 'শিব ও উমার' কল্পজগৎ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন; ফলে আধুনিক শিল্পে 'শিব ও উমা'রূপী কল্পনার একটি নব্য উচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছে। এই শৈবত কল্পনার যে ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতা আছে তাহা এ দেশীয় নবীন শিল্পী ও ভাস্করগণকে উদ্বোধিত করিলে তাঁহাদের সৃষ্টির আদর্শ বহুগুণে উন্নীত হইবে সন্দেহ নাই। অন্যকে অনুপ্রাণিত করা যদি মহৎ শিল্পের গুণ হয়, তাহা হইলে শিল্পীশ্রেষ্ঠ নন্দলালের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে।"*

বৌদ্ধ বিষয়ক চিত্র কিছু আঁকিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই সুদীর্ঘ রেশমের উপর আঁকা গেরীমাটীর রেখা চিত্র "সংঘমিত্রা"। ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা বোধি-বৃক্ষের শাখা লইয়া যাইতেছেন। এ চিত্রের রেখার দক্ষতা অপূর্ব; আধুনিককালে এরূপ শক্তিশালী ও নির্ভীক রেখাচিত্র সম্ভব নহে; শুধু অজন্তার শিল্পী ও চীনা ওস্তাদ এই দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিতে নন্দলালের বিশেষ অধিকার ঃ উল্লেখযোগ্য, ছাগে আরোহণ করা অগ্নিদেবতার মূর্তি, ইহা তিব্বতীয় পতাকা চিত্র (টাংকা) স্মরণ করাইবে। অমৃত অপহরণকারী গরুড়ের মূর্তি ডেকোরেটিভ আর্টের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ইহার পরিকল্পনা তিনি যবদ্বীপের ভাস্কর্য বিষ্ণুর বাহন গড়ুর মূর্তি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক চিত্র তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করে নাই, এ বিষয়ের চিত্র তাঁহার আদিযুগের আঁকা "নৌকাবিলাস" উল্লেখযোগ্য, ইহাতে নন্দ-লালের বলিষ্ঠ ক্লাসিসিজম না থাকিলেও ইহা উপভোগ্য। পূর্বে বলিয়াছি নন্দলাল রোমাণ্টিসিজম দ্বারা উদ্বুদ্ধ নহেন, সেজন্য বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা গীতার শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অধিক প্রেরণা দিয়াছেন। এ বিষয়ে খান চার পাঁচ চিত্র আছে, সবটাতেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ মুহ্যমান অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।" একখানা চিত্র তাঁহার

* নিরীক্ষা, নন্দলাল সংখ্যা।

অত্যন্ত বলিষ্ঠতা ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য আকর্ষণীয়। শুধু দুই রংয়ের কাজ, ঘন রক্তবর্ণ ও ঘন কৃষ্ণ। ফিগারগুলি কাল সিলভয়েটে আঁকা; কাল রংয়ের কৃষ্ণ, অর্জুন, বলিষ্ঠ অশ্ব ও রথের পশ্চাদ্ভাগ শুধু সমতল রক্তবর্ণে রঞ্জিত, ইহা আসন্ন যুদ্ধের ভীষণতা সূচিত করিতেছে। এ বিষয়ে কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোনো চিত্রই নন্দলালের কাছাকাছি দিয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্যের কয়েকটি প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বোধ হয় শ্রেষ্ঠ হইল পুরী মন্দিরের গরুড়স্তম্ভের নীচে উপবিষ্ট আবেশ বিহ্বল শ্রীচৈতন্য। তাঁহার বস্ত্র শিথিল, দেহ যেন সংজ্ঞাহীন, মহাপ্রভুর তন্ময়ভাব। আরো তিনটি শ্রীচৈতন্যের চিত্র উল্লেখযোগ্যঃ সমুদ্রতীরে শ্রীচৈতন্যের কীর্তন, শ্রীচৈতন্যের জন্ম, নিমাই পণ্ডিতের টোল (রেখাচিত্র)। শ্রীচৈতন্যের জন্ম চিত্রে পুরীর পটের সৌন্দর্য ফিরাইয়া আনিয়াছেন, নিমাই পণ্ডিতের টোলের চিত্রের রেখা মাধুর্য-মণ্ডিত ও অননুকরণীয়।

কাঠের পাটায় আঁকা "বীণা বাদিনীর" টেম্পারা চিত্র নন্দলালের চিত্রের এক রত্নস্বরূপ। অজন্তার মাধুর্য ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে।

পঞ্চপাণ্ডবের স্বর্গারোহণের চিত্র শাদা কালোতে সুদীর্ঘ কাগজের উপর আঁকিয়াছেন; প্রথম দেখা যাইতেছে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী অগ্রসর হইতেছেন, পরে ক্রমে ক্রমে সকলের পতন হইতেছে, অবশেষে তপস্বী যুধিষ্ঠির সঙ্গী কুকুরকে সঙ্গে লইয়া একাকী তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের উপর দিয়া চলিয়াছেন। তুলি চালনার অদ্ভুত ক্ষমতা; শাদাকালোর ব্যঞ্জনা, তাহার gradation বা ক্রমপর্যায় আশ্চর্যজনক, ইহাতে চীনা দক্ষতা প্রকটিত হইয়াছে।

নন্দলালের অসংখ্য চিত্র, সকলের পরিচয় দেওয়া ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। তাঁহার আধুনিক চিত্রের ও মতবাদের কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিব। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি শান্তিনিকেতন অবস্থানকালে তাঁহার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইয়াছে; ক্লাসিসিস্ট নন্দলাল রিয়ালিস্ট বা ন্যেচারালিস্ট রূপে পরিবর্তিত হইয়াছেন। তাঁহার মতবাদ ও শিক্ষারও নূতনত্ব দেখা দেয়। টেকনিকের দিকেও বহু পরীক্ষণ চলিয়াছে। তাঁহার কোনো কোনো চিত্রে যে পোস্টইম্প্রেসনিজম-এর আমেজ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তিনি সেজান, ভ্যানগগ, গগ্যাঁ, মাটিসের চিত্র দেখিয়াছেন; তিনি যদিও চীনা টেকনিক দ্বারা অধিক প্রভাবান্বিত, কিন্তু পরোক্ষভাবে ঐ সকল শিল্পীর প্রভাবের আওতায় যে আসেন নাই, তাহা বলা যায়না।

তাঁহার ফিগার ড্রয়িং-এর মধ্যে প্রথম সাঁওতালদের চিত্রের কথা উল্লেখ করিতে হয়ঃ সাঁওতাল চিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল পেন্সিল ড্রয়িং "প্রত্যাবর্তন" নামক চিত্র। সাঁওতাল মজুর বহুদিন পরে বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে; তাহার পত্নী স্বামীদর্শনে অবাক হইয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে অ্যানাটমি ও ড্রয়িং-এর জ্ঞান প্রশংসনীয়। এই ড্রয়িংকে ক্লাসিক্যাল আর্টের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, নন্দলাল এখানে রিয়ালিস্ট।

পোস্টকার্ড চিত্রগুলিকে কার্টুন আখ্যা দেওয়া যায়; অল্প কথায় অল্প পরিসরের মধ্যে এরূপ রস বিতরণ করার চেষ্টা আর কোনো শিল্পীর মধ্যে দেখা যায় না, এসব ড্রয়িং-এর মধ্যে বেশ একটা humor আছে। স্কেচের বিষয়গুলির মধ্যে অত্যন্ত বৈচিত্র্য আছে।

শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তর তাঁহার স্থানচিত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; অরণ্যানী, বৃক্ষের সৌন্দর্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। পশু, পক্ষী উদ্ভিদ প্রভৃতি অংকনে বৈজ্ঞানিক বা ন্যেচারালিস্ট-এর মত অনুসন্ধিৎসা দেখা যায়।

আচার্য নন্দলাল একদিন আমাকে তাঁহার নবলব্ধ প্রকৃতিতত্ত্বের কথা বলিতে-ছিলেন। শান্তিনিকেতনের গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহর; তৃণশূন্য প্রান্তর খাঁ খাঁ করিতেছে। তাম্রবর্ণ কংকরের মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র সবুজ তালপাতার অংকুর রৌদ্রে মরকত মণির (এমারেল্ড) মত জ্বলিতেছে। তাহা দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, এই তালপাতা আঁকা কি কম কথা? এই ছবির মূল্য কি বুদ্ধ অথবা শিবের চিত্র অপেক্ষা কম হইবে? এই উক্তির সঙ্গে উনবিংশ

নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত পোর্ট্রেট

শতাব্দীর ফরাসী শিল্পী থিওডোর রুসোর (১৮২২—১৮৬৭) কথা একেবারে হুবহু মিলিয়া যাইবে। রুসো বার্বিজ' প্রদেশের ওকগাছ ও অরণ্যানী আঁকিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

"We are no longer in the age of olympians such as Raphael, Veronese, and Rubens......All particular, special majesty of a portrait of Louis XIV by Le Brun, Rigaud will be conquered by humanity of a tuft of grass clearly lit by a ray of sun."*

ভাবার্থ, আমরা এখন আর স্বর্গের অধিবাসী, রাফাএল, ভেরোনিজ এবং রুবেন্সের যুগে বাস করিনা......লেব্রাঁ, রিগড কর্তৃক অঙ্কিত চতুর্দশ লুইর সকল বৈশিষ্ট্য এবং মহিমা লুপ্ত করিয়া দিবে তুচ্ছ এক তৃণগুচ্ছ, যাহা সূর্যের একটি কিরণে সমুজ্জ্বল।

শিল্পশিক্ষার্থীর নিকট শিল্পাচার্যের চিঠি

প্রিয় নির্মল,

তোমার পত্র ও সেই সঙ্গে ধর্মাঙ্কুর বিহারের ফ্রেস্কোর পাঁচখানা ফটো পেলাম। তোমার কাজে যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা দেখে খুশী হলাম। তবে সাধারণ লোকের মনস্তুষ্টির ও হাততালির জন্য (pretty) ছবি কোরো না।

ভাল ছবি হওয়ার ত অন্ত নেই। তবে এবিষয়ে আমার যা জানা আছে লিখছি। আর্টের বিষয়ে ভাল ভাল বই পড়লে আরো জানতে পারবে।

এখানে বুদ্ধের ছবি করছ বলে বুদ্ধ-বিষয়ক কথাই বলছি। কিন্তু যে কোনো বিষয় ছবি করতে গেলে সে বিষয়ে সবরকম information ও তথ্য জানতে হবে। সদাই নেচারকে দু'চোখ ভ'রে দেখতে হবে ও ভাল লাগার চেষ্টা করতে হবে এবং ভাল ছবি (নাম করা) সর্বদাই দেখতে হবে।

বুদ্ধ-বিষয় ছবি করতে হলে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি সবসময় মনে রাখা দরকার—

১। বুদ্ধের জীবনী ভাল করে পড়তে হবে। বুদ্ধের শরীরের লক্ষণ, ভাব ও ভঙ্গির বিষয় নানা বুদ্ধভক্তের লেখা পুস্তক, আখ্যায়িকা, ভাল ভাল পুরাতন ও নূতন ভাল কবিদের লেখা যত পাবে পড়তে হবে।

২। বুদ্ধের ভাল মূর্তি ও ছবি যাতে তাঁর শরীরের ঠিক ঠিক লক্ষণ, ভাব ও ভঙ্গি যা ভাল সমঝদারদের মনঃপূত হয়েছে তা দেখা উচিত।

৩। বুদ্ধধর্মের মর্মকথা বুদ্ধভক্ত ও ভিক্ষুদের কাছ থেকে জেনে নেবে এবং নিজ জীবনে তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করতে হবে।

৪। সবচেয়ে বড় কথা বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রাখা। একথা সবসময়েই মনে রাখবে যে, শিল্পী ও তার করণীয় ছবি ও মূর্তি ও লেখা অভিন্ন। এর উপরই শিল্পীর সৃষ্টির তারতম্য রয়েছে।

৫। শিল্পীর মন ও স্বভাব পরিচ্ছন্ন আয়নার মত হবে। চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা ত বটেই, বিশেষ করে মাৎসর্যরূপ কলঙ্ক থাকবে না।

৬। শিল্পী নিজবিদ্যায় কৌশলী হবে, Perfect ও Sensitive যন্ত্রের মত।

৭। শিল্পী নম্র ও বিনয়ী হবে। তা না হলে অহংকার ও অপর শিল্পীর প্রতি দ্বেষ তার পথ রুদ্ধ করে নিধনের পথে নিয়ে যাবে—নম্র ও বিনয়ী ও শ্রদ্ধাবান হলে শিক্ষার ক্রমশ উৎকর্ষ হবে। যেমন নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল জমে আর উঁচু জায়গার জল গড়িয়ে যায়, জমি শুকনো ও উষর হয়ে যায়।

৮। শিল্পী প্রেমিক, অনুরাগী, ভক্ত ও নরম মনের হবে। তাতে আকার বস্তুর ভাব ও রূপের ছাপ গভীর ও স্পষ্ট হবে।

৯। শিল্পী তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হবে যাতে ভাল মন্দ বিচার, ছবির উপযোগী যথাযথ বস্তু ও ভাব বেছে নিতে পারে।

১০। শিল্পীর মন খুব Sensitive (দরদী) inquisitive (কৌতূহলী) হবে, এইটিই শিল্পীর প্রাথমিক গুণ।

১১। শিল্পী খুব দরদী রসিক হবে ও তার রসবোধ থাকা চাই। মোটকথা কাঠ-খোট্টা শুকনো হবে না। কবিত্বপূর্ণ মন হবে, imaginative হওয়া চাই।

১২। অর্থ ও নামের লোভে শিল্পী তার আভিজাত্য বিক্রয় করবে না। এ বড় কঠিন কথা। বিশ্বভারতী পত্রিকায় এ বিষয়ে আমার একটি লেখা বের হয়েছে সেটা দেখে নিও। এবিষয়ে বড় বড় শিল্পী ও লেখক-দের জীবনী পড়লে আরো বুঝতে পারবে। অবশ্য পেট চলা চাই, বেঁচে থাকা চাই। বেঁচে থাকার মত পর্যাপ্ত অর্থও চাই। তবে অর্থ সংগ্রহ করে বড় মানুষ হবার লোভ সংবরণ করতে হবে।

আশীর্বাদকঃ
নন্দলাল বসু

পুনঃ—

'পেটের দায়ে লক্ষ্মীকে উপাসনা করা আর লক্ষ্মীকে পাব বলে লক্ষ্মীর উপাসনা করায় অনেক তফাৎ।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীনির্মল দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

---

*Artists on Art from 14th century to 20th century edited by Robert Goldwater and Merco Treves.

শিয়ালদা স্টেশন। আসাম মেল ছাড়ছে। হৈ চৈ। হুস হাস। ধস্তাধস্তি। দৌড়ঝাঁপ। ভিড় কাটিয়ে জাঁদরেলি চালে চলেছে সাহেবী পোশাক-পরা চিন্মোহন। সামনে পিছনে বেয়ারা ও মুটে। সারি সারি ফার্স্ট ক্লাস কামরা, কোনোটার বাইরে আঁটা নেই তার নামের লেবেল। হাতের কাছে এক রেল-কর্মচারীকে পেয়ে রাশভারি গলায় বলে, "পুরকায়স্থ। ফার্স্ট। লোয়ার।"

"আসুন সার," বলে লোকটি তাকে সমীহ করে নিয়ে যায় গার্ডের কাছে। গার্ড খাতাপত্র খুলে খুঁজে বার করে তার নাম। তারপর সংগে করে নিয়ে যায় যেখানে এক পুলিসের উর্দি-পরা আরদালি দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

"এই আপনার বার্থ। কিন্তু এ যে দেখছি অকুপায়েড।"

আরদালী ঘোষণা করে, "এস আর পি, সৈদপুর।"

গার্ড তা শুনে তটস্থ হয়ে বলে ,'সর্বনাশ। বর্মণ সাহেব। আসুন, সার, আপনাকে আর একটা বার্থ দিই।"

চিন্মোহনের বয়স বাড়ছে। আর বছর দুই বাদে চল্লিশে পড়বে। ক্লান্তি বলে একটা কথা আছে। কঠিন হয়ে বলে, "আই ইনসিস্ট।"

তার বেয়ারা গার্ডের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, "সিভিল সার্জন, গৌহাটী।"

গার্ড পড়ে যায় উভয়সংকটে। আমতা আমতা করে বলে, "পার্বতীপুরে তো গাড়ী বদল করতে হবেই। এই কয়েক ঘণ্টা এক সংগে বসে থাকতে কি খুব কষ্ট হবে, সার?"

আরদালী ফিস ফিস করে বলে, "মেমসাহেব ভি হ্যায়।"

"দেন আই ডোণ্ট ইনসিস্ট," বলে চিন্মোহন এগিয়ে যাবার জন্যে পা তোলে। বেয়ারাও মুটেদের ইশারা করে।

এমন সময় ভিতর থেকে বাজখাঁই আওয়াজ আসে, "অর্ডারলি, সামান উতারো।" সংগে সংগে দেখা যায় ষণ্ডামার্ক এক পুলিস সাহেবকে।

"দুঃখিত।" ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "জানতুম না এটা রিজার্ভড।"

চিন্মোহন আপ্যায়ন করে বলে, "আপনাকে যেতে হবে না, দাদা। সংগে ভদ্রমহিলা রয়েছেন।"

"কুছ পরোয়া নেহি। গায়ে ইউনিফর্ম রয়েছে।"

চিন্মোহন লক্ষ্য করে যেমন তেমন কোটাল নয়, কুলীন কোটাল। আই পি। খাতির করে বলে, "মুলুকটা বাংলা। আপনারাই তার রয়াল বেংগল টাইগার। হতো যদি আসাম, আমিও আমার ইউনিফর্ম দেখাতে পারতুম।"

"ওঁকে ভিতরে নিয়ে এসো।" হুকুম করেন টাইগ্রেস।

চিন্মোহনকে অগত্যা উঠতে হলো সেই কামরায়। বসতে হলো তাঁদের পাশে। আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা জাত সাহেব মেম। তাঁরা অন্য দিকের বার্থে।

"আমরা তিনজন ভারতীয়।" শান্তি-জল ছিটিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা।

এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করলেন তাঁর স্বামী, "অথচ আমাদেরই সংখ্যা কম।"

"মর্মে মর্মে অনুভব করছি, দাদা।" জাঁকিয়ে বসে সিগরেট অফার করল চিন্মোহন। উভয়কেই। অবশ্য নিলেন না ভদ্রমহিলা।

ভাব হয়ে গেল। ততক্ষণে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে।

"আমার নাম বর্মণ। ইণ্ডিয়ান পুলিস।"

"পুরকায়স্থ। মেজর। আই এম এস।"

"আরে!" বলে বর্মণ হাতে হাত মেলালেন। এমন করে ঝাঁকালেন, যেন কত কালের চেনা।

"কে? চিন্মোহন?" ভদ্রমহিলা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। যেন চেনা চেনা ঠেকছে, অথচ স্বীকার করতে বাধছে।

"মাফ করবেন। মনে পড়ছে না।" চিন্মোহন তো হতভম্ব।

"মনে পড়বে কী করে! দেখলে কবে যে চিনবে! তোমার ছোট কাকিমা আমার বড়দি।"

"ওঃ মিলি!" চিন্মোহন বর্মণের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "মিলি বলছি কিছু মনে করছেন না তো? ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি মিলি, মিলি, মিলি। ভালো নাম কি কেউ বলেছে যে মনে থাকবে!"

"ভালো নামটাই আমি শুনে আসছি। ডাক-নামটা কি চিনু?"

"আঃ। ঠিক ধরেছেন।"

"আমার ভালো নাম জানতে চাইলে না? উর্মিলা।"

বর্মণ এতক্ষণ চুপ করে সিগরেট খাচ্ছিলেন। সিগারেট মুখে রেখে বললেন, "বাসবজিৎ।"

আলাপ জমে উঠল।

"আপনাকে আমার মাসি বলা উচিত। আর আপনাকে মেসো।"

"শুধু মিলি বললেই আমি খুশি হব, চিনু। আমি বয়সে ছোট, যদিও সম্পর্কে বড়।" মিলি খুলে বলল না, প্রায় বছর পাঁচেকের তফাৎ।

"আমাকে মেসো বললে আমি খুবই অপ্রস্তুত হব। লোকে ভাববে আমার বয়সের গাছপাথর নেই।" বাসব বলল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। "ভিক্টোরিয়া যে বছর মারা যান সেই বছর আমার জন্ম।"

"তা হলে আপনি উনবিংশ শতাব্দীর লোক নন।"

"সেই জন্যেই তো অনুরোধ আমাকে 'আপনি' বলে লজ্জা দিয়ো না।"

চিন্মোহন মিলির দিকে তাকাতেই সেও বলে উঠল, "আমাকেও।"

এই ট্রেনে আগেকার দিনে করিডোর থাকত। কী মজা! যখন ইচ্ছা বেল টিপলেই রেস্টোরাণ্ট কার থেকে খানসামা ছুটে আসত। সে করিডোরও নেই। সে বেলও নেই। আসাম মেলে চড়ে সুখ কী!

"চুয়াডাঙ্গায় চায়ের অর্ডার দিয়ে রাখা যাবে। পোড়াদায় চা।" বাসব বলল শুকনো গলায়।

"কেন? চা কি আমার থার্মোফ্লাস্কে নেই ভেবেছ?" মিলি বলল উজ্জ্বল হয়ে। শ্যামা মেয়ে। কিন্তু সর্বাঙ্গে আনন্দলহরী বাজছে। পূর্ণ যৌবনা।

"না, না, এই তো টিফিন খেয়ে বেরোলুম। এখন চা খেলে পোড়াদায় কী খাব? চিনুর সঙ্গে আলাপ হলো, সেলিব্রেট করতে হলে অর্ডার দিতে হয়। নাথিং লাইক এ রেস্টোরাণ্ট কার।"

চিন্মোহন কৃতার্থ হয়ে বলল, "ঐ থার্মোফ্লাস্কই আমার যথেষ্ট। যখন খুশি ঢেলে খাওয়া যাবে। কী বল, মিলি?"

"আসলে উনি চান রেলে চড়ার ষোলো আনা স্বাচ্ছন্দ্য। থার্মোফ্লাস্কে চা তো যে কোনো জায়গায় খাওয়া যায়।"

"ইউ আর রাইট। সেবার কণ্টিনেণ্টে গিয়ে যে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছি, এমন কি এই দেশেরই অন্যত্র যা পেয়েছি এ লাইনে তা কোথায়!" বাসব হা-হুতাশ করল।

এর পরে দেশে বিদেশের গল্প। চিন্মোহন সৈন্যদলের সঙ্গে বহু বছর থেকেছে। বহু স্থানে ঘুরেছে। সিভিল সার্জন আর ক'দিন!

"তার পরে! হোয়াটস্ হ্যাপ্নিং টু ইউ?" প্রশ্ন করল বাসব। তার চিরকেলে প্রশ্ন। যার সঙ্গে আলাপ হয় তাকে করে।

"ফিরে যাচ্ছি। খুব সম্ভব রাওলপিণ্ডি।"

"কেন? উজিরদের সঙ্গে বনছে না?"

"না। 'ভারতীয়' 'ভারতীয়' বলে চ্যাঁচালে কী হবে? মানুষ কোথায়?"

"সেই কথাটাই বলো দেখি ওই ভারতনারীকে। শুনলে তো? চিনু কী বলল?"

মিলি ও কথায় কান দিল না। দুবেলা ওই সব শুনে আসছে। 'হোয়াটস্ হ্যাপ্নিং টু ইউ?' সার্ভিসের লোকের মুখে ও ছাড়া কথা নেই।

"যুদ্ধ বাধবে নাকি? তোমার কি মনে হয়, চিনু?"

"আমি তো সেই আশায় আছি। এবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া চাই। নইলে আই এম এস হয়ে সার্থকতা কী? শিলং-এ প্র্যাকটিস করতে পারতুম। মা বাবা তাই চেয়েছিলেন। কোথায় বিয়ে দেবেন তাও ঠিক করে রেখেছিলেন। হা হা। চিনতেন না চিনুকে।"

"ও কী! বিয়ে হয়নি তোমার! আর কবে করবে!" বিমর্ষ হলো মিলি।

"এ জন্মে নয়। যুদ্ধে গেলে বাঁচব কি না কে জানে। মিছিমিছি একজনকে কাঁদিয়ে কী সুখ!" চিনু বলল নিঃস্পৃহ ভাবে।

"তা হিটলারের সঙ্গে লড়াই যখন, প্রাণে বাঁচা দায়। তোমার দূরদর্শিতার প্রশংসা করতে হয়।" বলে আর একটা সিগরেট ধরাল বাসব। তার আগে চিনুকে অফার করল।

"তোমরা আমাদের মেয়েদের কী যে ভাব! আমরা কি ভারতের বীরাঙ্গনা নই? ঐ যে রামায়ণে সুভদ্রার গল্প আছে—"

"মহাভারতে।" সংশোধন করল বাসব।

"আঃ। আমাকে বলতে দাও। কেবল ভুল ধরবে। বুঝলে, চিনু। রেঙ্গুনের মেয়ে। স্বদেশের কতটুকুই বা জানি! কে শেখাবে, বল! বিয়ের আগে তো এমন কি রাধাকৃষ্ণের লীলাও জানতুম না।"

"তবু ভারত বলতে অজ্ঞান!" কটাক্ষ করল বাসব।

"কিছু আসে যায় না।" চিনু অভয় দিল। "কথা হচ্ছে এই। আমাদের মেয়েরা বীরাঙ্গনাই বটে। আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যার সঙ্গে বিয়ে হবে সে যদি সরল মনে বিদায় দিতে না পারে, তা হলে তো আমার যুদ্ধে যাওয়া হয় না। না, হয়?"

মিলি চট করে এর জবাব দিতে পারল না। ভাবতে লাগল।

বাসব ততক্ষণে চিত্রপত্রিকা খুলে তার প্রিয় ব্যসন ক্রসওয়ার্ড নিয়ে অন্যমনা হয়েছে। কথাবার্তা এর পর থেকে চলল মিলিতে আর চিনুতে।

পোড়াদায় চা পান হলো। সান্তাহারেও তার জের চলল। আলাপ জমতে জমতে এমন হলো যে কারো মনে রইল না মাত্র কয়েক ঘণ্টার চেনা।

পার্বতীপুরে যখন ট্রেন থামল তখন হুড়মুড় করে এক পাল পুলিসের লোক এসে কামরায় ঢুকল। এরাই কুলী হয়ে মাল নামাল। এরা এক এক করে সেলাম ঠোকে আর বাসবের উচ্চতা এক এক ইঞ্চি করে বেড়ে যায়। সে চিনুর দিকে অনুকম্পাভরে তাকায় আর প্রাণের পুলক প্রাণপণে চাপে। তার সেলুন জোড়া হয়েছে সৈদপুরের শাটল ট্রেনের সঙ্গে। দেখুক চিনু।

প্ল্যাটফর্মে নেমে বাসব তার ইনস্পেক্টর সাব ইনস্পেক্টরদের মিছিল নিয়ে জি আর পি পরিদর্শনে চলল। যে ক'দিন ও ছিল না সেই ক'দিনে না জানি কী গণ্ডগোল বেধে গেছে। তিনটে দিনও কি ছুটি নেবার জো আছে! অধীনস্থরা জানত বর্মণের কোথায় দুর্বলতা। বলল, "ভীষণ ব্যাপার সার! আপনি না থাকলে দেখছি চোর ডাকাতরাও মাথা চাড়া দেয়। আপনি যে নেই এ খবরটা ওরাও রাখে।"

ওদিকে চিনুর বেয়ারা মুটে ডেকে নিয়ে এলো মিটার গেজের আসাম মেলের জন্যে। তা দেখে মিলি বলল, "তুমি কি সত্যি সত্যি যাচ্ছ নাকি? আমি বলি তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। একটা দিন কামাই করলে যদি তোমার চাকরি না যায় তা হলে জীবনে একটা দিন একটু আনন্দ করা যাবে। কাল আবার এখানে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে যাব তোমাকে।"

চিনু আর করে কী! দু'চার বার ওজর আপত্তি দেখিয়ে শেষে যা বলল তার তুলনা —ন্যাড়া, খাবি? হাত ধোব কোথায়? "তোমাদের কষ্ট হবে না তো?" বেয়ারাকে ইশারা করল মালপত্র সেলুনে তুলতে।

"তোমাকে না জানিয়ে একটা অপরাধ করে ফেলেছি।" মিলি বলল বাসবকে। "চিনু আমার কথায় এক দিনের জন্যে সৈদপুর যেতে রাজী হয়েছে।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। আমিও তোমাকে

আমন্ত্রণ করছি, চিনু।" বাসব এমনভাবে হাত পা ছড়িয়ে বসল যেন সেলুনটা তার পৈত্রিক সম্পত্তি। সেলুন দেখুক, বাংলো দেখুক, বাসবের রাজত্ব দেখুক চিনু। সেলামের বহরটাও দেখে যাক।

স্টেশন খালি করে পুলিসের লোক এসেছিল বাসবকে সেলুনে তুলে দিতে। তাদের একজন বলল, "আমরাই পারব, তবে সার স্বয়ং থাকলে আরো ভালো দেখায়।"

বাসব হুংকার ছেড়ে বলল, "নো পার্ট অফ মাই ডিউটি। এ সব মাশরুমের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা মিনিস্টারদের জানা উচিত যে আমি এদের রিসিভ করতে বাধ্য নই।"

গাড়ী ছেড়ে দেবার পর বাসব আফসোসের সুরে বলল, "জিভটা আমার বেয়াড়া। এই জিভটার জন্যে আমি অনেক ভুগেছি। আরো ভুগব। ঐ ছোট মিনিস্টার ফিরে গিয়ে বড় মিনিস্টারের কান ভারী করবে। পরের দিন টেলিগ্রাম আসবে, বরিশালের য়্যাডিশনাল এস পি।"

চিনু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "না, না, তেমন কিছু হবে না। উপরে গভর্নর রয়েছেন। তুমি একজন সিনিয়র আই পি।"

ও কথা কানে গেল না বাসবের। "খান বাহাদুরকে ডিনার দেবার জন্যে মিলিকে বলা বৃথা। কোনোদিনই ওসব করল না। নেহাৎ দু'চারজন সার্ভিসের বন্ধু ছাড়া আর কাউকেই ও ডাকবে না। আমারি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমাকে বলবে, নো পার্ট অফ মাই ডিউটি। এই যে পদোন্নতি দেখছ, চিনু, এর সমস্তটাই আমার যোগ্যতার দরুণ। এক রত্তিও খোসামোদের দরুণ নয়। আমার কাজের 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত আমার নখের ডগায়। কিন্তু এত করেও কি শান্তি আছে! কাল যদি পার্বতীপুরে সকাল সাড়ে ছ'টায় হাজিরা না দিই তবে চললুম আমি বরিশালে নৌকা চড়তে। রেল লাইন ও জেলায় নেই।"

মিলি বল, "বেশ তো, যাও না, হাজিরা দিয়ে এসো। আমি দেখব চিনুকে। আগে থেকেই খারাপটা ভেবে মন খারাপ করছ কেন?"

সৈদপুরে নেমে ওরা মোটরে করে বাংলায় গেল। তারপর যে যার ঘরে ঢুকল কাপড় ছাড়তে, গোসল করতে। শীতকাল। গরম জল তৈয়ার ছিল। বাথ টাবে গা মেলে দিয়ে চিনু ভাবতে লাগুল, কী আশ্চর্য এই দিনটা! মিলির সঙ্গে এ জীবনে দেখা হবে কে জানত এ কথা! চিনুর বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি।

ডিনারের ঘণ্টা বাজতেই কোনো মতে পোশাক পরে নিয়ে হাজির হলো চিনু। মিলি একা বসে আছে, বাসব অন্য ঘরে টেলিফোনে কথা বলছে। কাল সকালে পার্বতীপুরে রিফ্রেশমেণ্ট রুমে ও ব্রেকফাস্ট পার্টি দেবে মাহামান্য মন্ত্রীকে। যদিও তিনি সেচ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। পুলিস বিভাগের না।

"তুমি যাচ্ছ নাকি ব্রেকফাস্ট পার্টিতে?" জানতে চাইল চিনু।

"আমি!" জর্দলে উঠতে উঠতে হেসে উঠল মিলি। "উনি আমার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। মহিলা দু'পাঁচ জন থাকবেন বৈ কি। নইলে মন্ত্রীরা ক্ষুণ্ণ হন। যদিও তাঁদের বেগমদের বা রাণীদের পর্দার বাইরে আনবেন না। বড় বড় রেলওয়ে অফিসারদের মেমসাহেবরা গ্রেস করবেন। তাঁরাই এখানকার সর্ব ঘটে।"

তিক্ততায় মিলির মুখ বিরস হয়েছিল। চিনু বুঝতে পারছিল না কেন। সারা পথটা যে মেয়ে ফুর্তি করে এলো বাড়ি এসে সে কি তেতো ওষুধ খেলো?

অবশেষে বাসব এসে যোগ দিল। খানা আরম্ভ হলো।

"কাল ভোরেই স্পেশাল ছাড়বে। মিসেস টমসন, মিসেস ডিকসন, মিসেস হ্যারিসন এ'রাও যাবেন। বিশজন অতিথির জন্যে 'কভার' পাতা হবে। এখন মন্ত্রী রাজী হলে হয়। তাঁকে তো ধরতে পারা যাচ্ছে না। তিনি এখন রাজশাহীতে।" বাসব দুঃখ করল।

"তা হলে তোমার বরিশালে বদলি হলো না দেখছি। আমারও বাংলাদেশের সবটা দেখা হলো না।" দুঃখ করল মিলি।

"হবে, হবে। একদিন ডি আই জি হয়ে যাব হয়তো ওখানে। কিন্তু—"

"য়্যাডিশনাল এস পি! প্রাণ থাকতে নয়! তার চেয়ে যত বার খুশি মন্ত্রীপূজা করা যাবে। কিন্তু সামান্য ব্রেকফাস্টে কি দেবতারা তুষ্ট হবেন!" মিলি বলতে লাগল।

"আর ও'রা যখন প্রশ্ন করবেন, কই, মিসেস বর্মণকে তো দেখছিনে, তখন কী উত্তর দেবে তুমি? প্রত্যেক বারেই কি আমি অসুস্থ?"

বাসবের মন ভালো ছিল না, ডিনার শেষ হতেই মাফ চেয়ে শুতে চলে গেল। কাল তাকে রাত থাকতে উঠে দাড়ি কামাতে হবে। ইউনিফর্ম পরতে হবে। ফুল ইউনিফর্ম।

"তুমিও চললে নাকি। না, না। বসো। একটু আগুন পোহানো যাক।" বসবার ঘরে কয়লার আগুন জ্বলছিল। দেয়ালের অগ্নি-স্থলীতে। মিলি ও চিনু দু'জনে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে জমিয়ে বসল।

কফি এলো। কফির পেয়ালায় কফি ঢালা হলো। বিদায় নিয়ে চলে গেল চাকর-বাকর। নিঃঝুম হয়ে এলো চারদিক। গল্প করতে করতে রাত গভীর হলো। কারো দৃষ্টি নেই ঘড়ির দিকে। এমন কড়া কফি যে চোখ থেকে ঘুম ফেরার।

ছেলেবেলার গল্প। মিলিরা তখন রেঙ্গুনে আর চিনুরা শিলংএ। কেউ কাউকে দেখতে পায় না, অথচ মিলির সব খবর মিলির দিদির দৌলতে চিনুর নখদর্পণে। শুধু খবর নয়, ফোটো যে কত রকমের কত শত তার লেখাজোখা নেই। দিদির আলবামে আর টেবলে আর দেয়ালে দেয়ালে মিলির আনন্দ উজ্জ্বল মুখ। হাজারখানা ছবি. বিভিন্ন বয়সের। সাত আট থেকে আঠারো উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত। তার পরে ব্ল্যাক আউট। বিয়ের পর মিলি ফোটো পাঠায়নি। যদি পাঠিয়ে থাকে তবে চিনু জানে না।

অসাধারণ হাসিখুশি মেয়েটি। কখনো তার মুখে অহাসি অখুশি দেখা যায়নি। আর তেমনি ডার্নাপিটে দুরন্ত ঘরছাড়া বাহির বেড়ানো মেয়ে। এই সাঁতার কাটছে তো এই ঘোড়ায় চড়ছে। এই সাইকেল চালাচ্ছে তো এই টেনিস খেলছে। সব খেলায় চৌকশ। রাশি রাশি মেডাল পেয়েছে লাট বেলাটের হাত থেকে।

তা বলে সে লেখাপড়ায় মন্দ ছিল না। গানেও তার উৎসাহ ছিল। সেতারের হাত ছিল তার, আর ছিল স্কেচ করার শখ। দিদির কাছে পাঠানো স্কেচ চিনুও দেখে-ছিল। দেখে তারিফ করেছিল।

মিলি তার জীবনের বিচিত্র ঘটনাও রঙিয়ে রসিয়ে চিঠিতে লিখত। সেসব চিঠি এত মজার যে দিদি একা উপভোগ করতে চাইতেন না, চিনুকে পড়তে দিতেন। চিনু আমোদ পেত। বলত, "ছোট কাকিমা, তোমার বোনটি একটি য়্যালিস। য়্যালিস ইন বার্মা।"

সেই মিলির সঙ্গে এতকাল পরে দেখা। একশোটা স্মৃতি এক সঙ্গে জাগছিল। কোনোটা মিলির আট বছর বয়সের, চিনুর তেরো বছর বয়সের। ছাগলছানা কোলে নিয়ে তোলা ফোটো। কোনোটা মিলির বারো বৎসর বয়সের, চিনুর বয়স যখন সতেরো। প্যাগোডা দেখতে গিয়ে মিলি হারিয়ে গেছল। দারুণ য়্যাডভেঞ্চার। কোনোটা মিলির ষোলো বছর বয়সের, চিনুর বয়স তখন একুশ। এক বাঙালী মহিলা এসে আশ্রয়প্রার্থী হন। বলেন, মধ্যবিত্তের বাড়ি আগেও আশ্রয় নিয়েছি। তিনি নাকি কোন এক অভিজাত বংশের কন্যা, স্বদেশী করতে গিয়ে ফেরার হয়েছেন। মাসের পর মাস যায়, নড়তে চান না, শেষে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর আত্মীয়দের তল্লাস পাওয়া যায়। অভিজাত না, ফেরারী না, পলাতকা।

চিনুর মন সব কিছু সঞ্চয় করে রেখেছিল। কবেকার সব ঘটনা। কেই বা মনে রেখেছে সেসব! মিলির একে একে মনে পড়ছিল আর অবাক লাগছিল চিনুর স্মরণশক্তি দেখে।

আগুন যত বার নিবে আসছিল তত বার উস্কে দিচ্ছিল চিনু। আরো কয়লা ঢালছিল। আর ভাবছিল এত কথাও তার মনে ছিল। এতকাল মনে ছিল। একদিন আগেও তো এসব মনে পড়েনি। দেখা হোলো হঠাৎ। অমনি খুলে গেল অতীতের অর্গল।

উনিশ বছর বয়সে মিলির বিয়ে। তারপরে যেসব চিঠি আসে সেসব অন্য জাতের। ছোট কাকিমা চিনুকে দেখতে দেন না আর। এইভাবে একটা ছেদ পড়ে যায়। শেষের চিঠিখানা বিয়ের সম্বন্ধ হবার সময় লেখা। মিলির বিশেষ রুচি ছিল না। তার দিদিরও না। কিন্তু গুরুজনের মতে অনিশ্চিত রাজপুত্রের চেয়ে নিশ্চিত কোটালপুত্র ভালো।

বলতে বলতে এক মুহূর্তে অসতর্ক হয়েছিল চিনু। বলে বসল, "মিলি, তুমি কি জানতে না ছোট কাকিমার ইচ্ছা ছিল যে—"

মিলির মুখে যেন কেউ আবীর মাখিয়ে দিল। সে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

চিনু বার বার মাফ চাইতে থাকল, লজ্জায় তার মাথা কাটা যায়। ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই সে লাফিয়ে উঠল। "সর্বনাশ! পৌনে দুটো! গুড নাইট, মিলি।"

মিলি কাঁদছিল। কথা বলল না। শুধু একটা হাত তুলে রুমালের মতো নাড়ল।

পরের দিন ঘুম ভাঙতে প্রায় ন'টা বাজল চিন্ময়মোহনের। অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ভিজে বেড়ালটির মতো সে যখন ব্রেক-ফাস্ট টেবলে হাজির হলো, তখন শুনল সাহেব পার্বতীপুর চলে গেছেন, মেম-সাহেব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে এই একটু আগে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

কোনো মতে কিছু মুখে দিয়ে সে বসবার ঘরে গেল সময় কাটাতে। ম্যান্টেল-পীসে ও তার আশেপাশে মিলির ছেলের ফটো রাশি রাশি সাজানো। নানা বয়সের। দেয়ালে মিলির আঁকা স্কেচ। এক কোণে একটা সেতার। বাসবের শিকারের ট্রোফি ছিল একটা বাঘের মাথা ও বাঘছাল। দেখতে লাগল ঘুরেফিরে। আর ভাবতে লাগল কী সুখী এই তিনজনের ছোট একটি সংসার। জীবনের সার্থকতা এরাই পেয়েছে। পাক।

সিগরেটের পর সিগরেট খেয়ে চলেছে চিন্ময়মোহন। নিজের জন্যে তার আফসোস নেই। ছোট কাকিমার ইচ্ছা ছিল, তার নিজের ছিল কি না সন্দেহ। সে বিবাহ-বিমুখ ছিল বরাবর। তবু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, মিলি তার মনের মতো সঙ্গিনী ছিল। যাকে নিয়ে আজ খাইবার কাল পিণ্ডি পরশু কোয়েটা

তরশ্ন রানিখেত ঘ্নর্ণী হাওয়ার মতো ঘ্নরে বেড়ানো উড়ে বেড়ানো চলত।

"ওহ্! তুমি বসে বসে কড়িকাঠ গ্ননছ!" শ্ননে চমকে উঠল চিন্মোহন। যেন ধরা পড়ে গেছে চুরি করে ভাবতে ভাবতে। তার পিছনে মিলি। মিলির হাতে মরস্নমী ফ্নলের বিচিত্র তোড়া। চিন্মোহন দাঁড়িয়ে শ্নভ সম্ভাষণ করতেই সে ফ্নলের তোড়া বাড়িয়ে দিল। তারপর একটা চেয়ারে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল।

"তোমাকে জাগাইনি বেড টী খেতে। খ্নব ক্ষিদে পেয়েছিল নিশ্চয়।"

"না, তেমন কিছ্ন নয়। আমি ক্ষিদের চেয়ে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল্নম।"

"কেন, লজ্জার কী আছে! কাল তুমি যা বললে তা সত্যি। বড়দির ইচ্ছা ছিল, ছোট বোনের যে অনিচ্ছা ছিল তা নয়, কিন্তু একজন যদি প্রস্তাব না করে, আরেকজন যদি করে, তা হলে মেয়েরা এক্ষেত্রে নির্নপায়। তুমি এসেছ, ভালো হয়েছে। একটা ভুল বোঝার অবসান হলো। কিন্তু চিন্ন, আমার কী মনে হচ্ছে, জানো?"

চিন্ন লক্ষ করল মিলির চোখের কোলে অনিদ্রার ছাপ। বলল, "কতক্ষণ আগে উঠেছ?"

"কে? আমি? আমি তো কাল চোখ ব্নজতে পারিনি। সারা রাত সারা জীবনের ছবি দেখেছি। যেন সিনেমার অভিনয় চলছিল।"

"এত দ্নঃখিত হল্নম শ্ননে।"

"দ্নঃখের কী আছে! এক রাত ঘ্নম না হলে কেউ মারা যায় না। মরে অন্য কারণে। আমি যদি মরি তা হলে জেনো আমার উপায় ছিল না।"

লাফ দিয়ে উঠল চিন্ন। "ও কি সর্বনেশে কথা বলছ, মিলি!"

"বোস। আমার ভয়ডর কোনো দিন ছিল না। এখনো নেই। মরতে আমার একট্নও কষ্ট হবে না। যে কষ্ট পাচ্ছি তার তুলনায়।" মিলির কণ্ঠে হতাশা।

"ভালো ট্রীটমেণ্ট চাই। সৈদপ্নরে ডাক্তার কোথায় পাবে? কিন্তু ট্রাবলটা কী? জানতে পারি? প্রশ্নটা ডাক্তার হিসাবে করছি।" চিন্ন উদ্বিগ্ন স্নরে বলল।

"তা নয়। আমার যে সিকনেস তা শরীরের নয়, মনের। আই য়্যাম সিক য়্যাণ্ড টায়ার্ড অফ ইট অল।" মিলি ম্নম্নর্ষ্নর মতো এলিয়ে পড়েছিল।

কৌতূহল প্রকাশ করা শোভন হবে না বলে চিন্ন চুপ করে থাকল। ফ্নলের পাপড়ি ছিঁড়তে ব্যস্ত ছিল তার আঙ্নল।

"আমার কী মনে হচ্ছে, জানো?" মিলি আবার বলল সেই কথা। "মনে হচ্ছে আমার

ছোট বোনের যে অনিচ্ছা ছিল তা নয়...

জীবনের এই সন্ধিক্ষণে তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল, নইলে অমন অকস্মাৎ দেখা হতো না কাল। তিন মাস কলকাতায় থেকে কিছ্নই করতে পারল্নম না আমি, উনি আমাকে ধরে না নিয়ে এলে আরো তিন মাসেও কোনো স্নরাহা হতো না আমার।"

মিলি একট্ন একট্ন করে ভেঙে বলল তার দাম্পত্য জীবনের কাহিনী। এক সঙ্গে নয়। তবে লিখতে হচ্ছে এক সঙ্গে গ্নছিয়ে।

বিয়ের পর থেকে সে তার স্বামীর সঙ্গেই বাংলা দেশের মহকুমায় মহকুমায় জেলায় জেলায় ঘ্নরেছে। মাঝখানে কিছ্ন দিন ছ্নটি নিয়ে বাইরে বেড়িয়েছে দ্নজনে। এই যে চাকরি এতেও ঘোরাফেরার স্নযোগ প্রচুর। সেল্নন পাওয়া যায়। চাইলেই হলো।

কিন্তু বিয়ে যাকে করেছিল সে একদা মান্নষ ছিল। এখন আর তাকে মান্নষ বলা চলে না। ম্যান নয়, প্নলিসম্যান। তার জীবনের একমাত্র অভিলাষ সে প্নলিসের বড়কর্তা হবে। আই জি। কিংবা কমিশনার অফ প্নলিস। এর জন্যে তার সাধনার ত্রুটি নেই। প্রত্যেকটি এজাহার সে নিজে তদন্ত করবে, প্রত্যেকটি চোর ডাকাত সে নিজে পাকড়াও করবে, প্রত্যেকটি মামলা সে নিজে সাজাবে। মাসের মধ্যে বিশ দিন যে টহল দিয়ে ফিরবে। কখনো গোর্নর গাড়ীতে, কখনো ডিঙি নৌকায়, কখনো ঘোড়ার পিঠে, কখনো মান্নষের ঘাড়ে। এলাকার অন্ধিসন্ধি তার নখের ডগায়। থানার দারোগারা তার ভয়ে থরহর। বিনা নোটিশে কখন কোন দিকে উদয় হবে। বলবে, এই, তোমার গায়ে ইউনিফর্ম নেই কেন? ল্নঙ্গি পরে চাকরি করবে? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বদলি করবে, নয়তো সাসপেণ্ড। নিজে দৌড়াবে, দৌড় করিয়ে মারবে ব্নড়ো ব্নড়ো ইন্সপেক্টর-গ্নলোকে।

তিনখানা বই ওর নিত্যপাঠ্য। গীতা চণ্ডী পাঁজি নয়। 'ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোড, প্নলিস রেগ্নলেশন বেঙ্গল, সিভিল লিস্ট। ওর উপরে কে কে আছে, নিচে কে কে আছে, কবে কোথায় কোন পোস্টে নিয্নক্ত হয়েছে, ক'বছর ক'মাস ক'দিন চাকরিতে রয়েছে, কবে ছ্নটি পাওনা, কবে অবসর নিতে বাধ্য, কোন কোন পদ খালি হবে, কার কার দাবী বিচার-যোগ্য, কার কার রেকর্ড খারাপ এসব কেবল যে তার ম্নখস্থ তাই নয়, এর উপর ভিত্তি করে সে নিজের জন্যে একটা আকাশজোড়া কেল্লা গড়ে তুলেছে। অম্নকের জায়গায় অম্নক গেলে অম্নক হবে অম্নক, তার পর আমি হব অম্নক। আমাকে টপকে যদি অম্নক এগিয়ে যায় তা হলে আমি এ প্রাণ রাখব না। এত বড় অবিচার!

অথচ এমনি একটা অবিচার ঘটে গেল একবার য়্যাণ্ডারসনী আমলে। সাধারণ চোর ডাকাত ধরে নাম করলে কী হবে, সরকারের রাজত্ব যে চুরি যেতে বসেছে, চোর যে তেরো চোদ্দ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের থেকে শ্নর্ন করে সত্তর বাহাত্তর বয়সের ব্নড়োব্নড়ীরাও। সব বাঙালী হিন্দ্ন। ভুলেও একটা ম্নসলমান ধরেছ কি তোবা তোবা করে ছেড়ে দিতে হয়েছে। বাঘব মাছ ধরতে গিয়ে কাঁকড়া ধরেছিল। যদিও মাছের সংখ্যা তাতে কমেনি তব্ন সরকারকে বিব্রত করা তার পক্ষে স্নক্ষ্মব্নদ্ধির পরিচায়ক নয়। রিপোর্ট গেল যে বর্মণ আর সব বিষয়ে চৌকস হলে কী হবে, নট ভেরি ইনটে-লিজেণ্ট। রাদার কমিউনাল। সামলাও ঠেলা। প্নর্ববঙ্গ থেকে পত্রপাঠ বদলি উত্তর বঙ্গে। দিনাজপ্নর। তারপর গোটা কয়েক সন্ত্রাসবাদী দল ধরা পড়ায় তার স্নদিন এলো। তাকে দেওয়া হলো ভারতীয়-দের পক্ষে যা স্বপ্নাতীত। দার্জিলিং-এর এস পি পদ। অবশ্য সাময়িক।

সেখানে ক্লাবে ঢ্নকতে গিয়ে দেখল কেউ

তাকে পাত্তা দেয় না, তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন সে অনধিকার প্রবেশ করেছে। অভিমান করে ক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিল। ফলে সরকারী কাজের যে অংশটা ঘরোয়াভাবে ক্লাবে খানাপিনা করতে করতে নিষ্পন্ন হয় সেটার জন্যে ডি সি'র বাড়ী ছুটতে হয় এস পি'কে, এস পি'র বাড়ী ডি সি'কে। ডি সি'র এত সময় কোথায়, আর ডি সি যদি পাঁচবার আসেন এস পি কেন দশবার যাবে। আবার মান অভিমান। এবারও সরকার বিব্রত হলেন। রিপোর্ট গেল বর্মণ নোজ হিজ জব, কিন্তু হলে হবে কি, নট ভেরি ট্যাক্‌টফুল। রাদার রেস-কনসাস।

স্বর্গ হইতে বিদায়। ছেলেকে দার্জিলিং-এর সেণ্ট পলস স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে স্বামী স্ত্রী চলল রংপুর। বাসব সমস্ত ক্ষণ খুঁত খুঁত করতে থাকল। তার চাকরিতে একটা সেটব্যাক হয়ে গেল। চাকরির ইতিহাস বলে যে পুঁথিখানা ছিল সেখানা খুলে বার বার পড়ল। হায়, হায়, পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেল এত কালের তপস্যার পরে! আর কার কার জীবনে এমনটি হয়েছে তুলনা করে সান্ত্বনা খুঁজল। তখনো তার আশা ছিল তার পুরোনো আই জি বিলেত থেকে ফিরলে পরে এর একটা বিহিত হবে। আই জি তো ফিরলেন, সঙ্গে সঙ্গে বর্মণের কানে এলো সরকারী মহলের সিদ্ধান্ত নাকি এই যে বর্মণ দারোগা ভালো, কিন্তু তার রাজনৈতিক বা সামাজিক বাস্তববোধ নেই। বেচারা বুঝতে পারে না যে বিদেশী প্রভুদের স্বার্থকে আপনার স্বার্থ করতে না জানলে আর সব গুণ থাকা না থাকা সমান বৃথা। তা তুমি যত বড় কর্মঠ ও যোগ্য পুরুষ হও না কেন। সেই ইস্তক শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তববাদ চর্চা।

এদিকে মিলির ইহকাল পরকাল গেছে। বাংলা দেশের মফঃস্বলে কোথায় ঘোড়ায় চড়বে, সাঁতার কাটবে? বাসব অপদস্ত হবে বলে সে সাইকেলে চাপে না। যেখানে যেখানে ইউরোপীয় ক্লাব আছে সেখানে সেখানে টেনিস আছে, কিন্তু তারা ঠিক প্রাণ খুলে মেশে না। তাদের বিশ্বাস সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সকলেরই অল্পবিস্তর যোগ আছে, মিলিরও। নেই যে, একথা বুকে হাত দিয়ে বলা যায় কি? যখনি একটা সাহেব খুন হয় মিলি কি ব্যগ্র হয়ে ওঠে না খুনীকে বীর বলে বন্দনা করতে? আবার সেই বীর যখন ফাঁসির মঞ্চে ওঠে তখন মিলির কি খুন করতে ইচ্ছা যায় না যারা তাকে ধরেছে বা ধরতে সাহায্য করেছে তাদের সবাইকে? বাসবকেও?

ক্লাবে নাই বা গেল। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ভদ্রতা আতিথেয়তা এসব বাদ দিলে জীবনে কী থাকে! বিশেষ করে বাংলার মফঃস্বলে। কিন্তু একে একে বাদ দিতে হলো এসব। না দিলে দেশের কাছে অপরাধী মনে হতো। যারা আমাদের ভাইদের ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখছে দেউলিতে, বক্‌সায়, আন্দামানে পাঠাচ্ছে, ফাঁসি দিচ্ছে, তারা ডেকেছে বলে তাদের বাড়ী যেতে হবে, তাদের ডাকতে হবে নিজের বাড়ীতে? কখনো না। নাই বা হলো স্বামীর প্রমোশন। প্রমোশন চাও তো যোগ্যতার দ্বারা অর্জন করো। বিবেকের নির্দেশ অমান্য না করে ঈশ্বরের দয়ায় উন্নতি করো। খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকতে যাও কেন?

বদলির গোলমালে, স্বামীর সঙ্গে সফর করতে করতে সন্তান যদিও একটি তবু সেই একটিকে মানুষ করতে করতে মিলির নিজের যেটুকু প্রতিভা ছিল—প্রতিভা না বলে সাধনা বলা যাক—সেটুকুও অন্তর্ধান করেছে। সে আর না বাজায় সেতার, না আঁকে ছবি। এমন কি ভালো একখানা বই পড়তেও তার তেমন আগ্রহ নেই। পড়ে ডিটেকটিভ নভেল। দিন রাত খুনজখমের খবর শুনতে শুনতে পড়তে পড়তে তার এক রকম নেশা লেগে গেছে। বীরত্বের কাজ কিছু করতে পারল না জীবনে, তাই বিকৃত হলো তার বীরত্ব-তৃষা, সে অমৃত ছেড়ে হলাহল ধরল।

"এমন করে আর চলে না, চিনু। পালিয়ে না গেলে আমি বাঁচব না। কিন্তু কার সঙ্গে? তোমার সঙ্গে?" মিলি সত্যি সত্যি ওকথা মুখ ফুটে বলল।

বলল, "চিনু, লক্ষ্মীটি, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। আজকেই।"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না চিনু। সত্যি ও কথা শুনেছে? না অন্য কথা?

ত্রস্ত চকিত চাউনি দিয়ে চিনু একবার দেখে নিল মিলিকে। কী রোগ? ডাক্তারী শাস্ত্রের সঙ্গে লক্ষণ মিলছে কি না? মেণ্টাল কেস নয় তো?

"মরার চেয়ে পালানো ভালো, না পালানোর চেয়ে মরা ভালো, রাত দুটোর পর থেকে এই কেবল হানা দিচ্ছে মনে। একবার এটা, একবার ওটা। তুমি চলে গেলে দোটানা চলে যাবে। তখন আর পালানো নয়। মরা।" মিলি বলল বিভোর হয়ে। বলল যেন ঘুমের ঘোরে।

চিনুর বাকশক্তি লোপ পেয়েছিল। ভাবছিল মেণ্টাল কেস ছাড়া আর কী হতে পারে! এমন কী ঘটেছে যার জন্যে সুস্থ সবল পূর্ণযৌবনা অবস্থাপন্ন গৃহিণী ও জননী হয় মরবে নয় পালাবে? একি সত্য? একি মায়া?

মিলির প্রলাপ সমানে চলছিল। "তার চেয়ে আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। তোমার তো স্ত্রী নেই যে আপত্তি করবে। তবে, হাঁ, ইনি আপত্তি করবেন বটে। [illegible] করুন। আমি শুনব না। এখন তুমি একটু মনের জোর দেখালে হয়।"

মনের জোর দেখাবে কী। চিনু একেবারে জড়সড়। তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, বাসব তোমাকে মারধোর করে?"

"না, মারধোর করবেন কেন?"

"তবে কি," চিনু ইতস্তত করে জানতে চাইল, "আর কাউকে ভালোবাসে?"

"কই, না, তেমন কিছু তো শুনিনি।"

"মদ খায়? রেস খেলে? ধারকর্জে ডুবে আছে?"

"না, না। সেসব কথা ঠিক নয়। সামাজিকতার খাতিরে এক আধ পেগ খেতে হয়। ওটা আমার গা সওয়া হয়ে গেছে।"

"তা হলে?" চিনুর প্রশ্নের রসদ ফুরিয়ে এলো।

"তা হলে?" মিলি বিষণ্ন সুরে বলল, "আমি কেন পালাতে চাই? এই তো? চাই এইজন্যে যে যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল এ মানুষ সে মানুষ নয়। আমি পরপুরুষের সঙ্গে ঘর করছি বলে নিজের চোখে নিজে ছোট হয়ে যাচ্ছি। তিন মাস এখানে ছিলুম না। শান্তিতে ছিলুম। এবার আবার অশান্তি শুরু হলো। অশান্তিটা কোনখানে ধরতে পারছ না? পরপুরুষের সঙ্গে থাকায়।"

চিনু শুধু এইটুকু ঠাহর করতে পারল যে কেসটা মেণ্টাল নয়, মরাল। ডাক্তার তার কী করতে পারে! সে অনেকক্ষণ হতবাক থেকে তারপরে বলল, "আচ্ছা, ও যদি আবার সেই মানুষ হয়?"

"তার জন্যে চোদ্দ বছর অপেক্ষা করেছি। আর কত কাল করব। জীবনটা কি একজনের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছি! বিয়ে বলতে কি এই বোঝায় একজনের জন্যে আরেক জন তার নিজের জীবনের সব সুখ, সব সাধ, সবটুকু প্রতিভা, সমস্ত আয়ু উৎসর্গ করবে! জীবনধারণের ধারা যেখানে একজনের এক রকম, আরেকজনের আরেক রকম, সেখানে পৃথক জীবনই কি শ্রেয় নয়? না, চিনু, আমি আর অপেক্ষা করব না।"

"আচ্ছা, আমি ওকে বলব।"

"বলে কী ফল হবে, চিনু! জীবন বলতে আগে অনেক কিছু বোঝাত। এখন বোঝায় শুধু জীবিকা। তাও নয়। পদমর্যাদা। পদ যতই বাড়ছে ঘরের সঙ্গে বাইরের সঙ্গে বিচ্ছেদ ততই [illegible]। তবু থামবে না। লোকের সঙ্গে [illegible]মেশা কমে আসছে, কেউ আসে না, [illegible] আসে তাদের একটা না [illegible] [illegible]

আছে। তবু শিখবে না। এমন মানুষকে নিয়ে আমি করি কী! এর সঙ্গে বাস করা একান্ত নীরস। একটা দিনও কাটতে চায় না। চলে যদি যাই তো অমনি ফিরিয়ে আনার জন্যে সাধাসাধি। ফিরে যদি আসি তো অমনি ক্রসওয়ার্ড নিয়ে বসল, তোমার সঙ্গে দেখা না হলে শিয়ালদা থেকে পার্বতীপুর কথা কইবার সাথী পেতুম না। বাড়ী এলো তো ক্রিং ক্রিং। টেলিফোন। মন্ত্রীর জন্যে ব্রেকফাস্ট। খাওয়া শেষ হতে না হতে চলল ঘুমোতে। ভোর হতে না হতে চলল সৈদপুর।"

চিনু সহানুভূতি জানাল। বলল, "আচ্ছা, আমি ওকে বোঝাব।"

"মিসেস টমসনরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন আমি তাঁদের আয়ার স্বজাতি। কপালগুণে পুলিস সাহেবের বৌ হয়েছি। অথচ এ'রা না গেলে পার্টি জমবে না। অমন পার্টি দিতে যাও কেন? কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে? যদি য়্যাডিশনাল এস পি করে? করলে ক্ষতিটা কার? রাজ্যের, না তোমার? তোমার ক্ষতি হয় তো তুমি ছুটি নিয়ে সরে পড়। তা হবে না। ছুটি নিলে অন্য লোক প্রমোশন পাবে, আমি পাব না।"

চিনু বলল, "আচ্ছা, আমি ওকে ছুটি নিতে বাধ্য করব।"

"ছুটি নিলেই বা হবে কী! সমস্তক্ষণ ফিরে আসার জন্যে ছটফট করবে। তুমি ওকে চেন না, চিনু। ওর মন পড়ে থাকবে চাকরিতে, দেহ পড়ে থাকবে আমার কাছে। ওর চাকরি আমার সতীন। এ জীবনে আমার যে ক্ষতি হয়েছে তার পূরণ হবে না, চিনু, যদি না ও আমাকে ছাড়ে বা আমার সতীনকে ছাড়ে। চাকরি ছাড়লে ও বাঁচবে না, কাজেই আমাকেই ছেড়ে দিক, আমি বাঁচি। চিনু, তুমি এসেছ একটা সন্ধিক্ষণে।"

চিনু ভাবনায় পড়ল। বাসবের কাছে অমন প্রস্তাব করে কোন মুখে? বলল, "মিলি, চাকরি ছাড়তে হলে আরো আগে ছাড়া উচিত ছিল, যে বয়সে অন্য কোনো জীবিকায় প্রতিষ্ঠা সহজ। এখন যদি ছাড়ে ওর একূল ওকূল দুকূল যাবে। ও তো আমার মতো ব্যাচেলরও নয়, ডাক্তারও নয় যে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে পারবে। লোকটাকে কি তুমি মেরে ফেলতে চাও, মিলি? ওর দিকটাও ভেবে দেখো। সবুর করো, যতদিন না ওর পেনসন পাওনা হয়।"

"তা হলে আমাকেই মেরে ফেললে হয়। কবে ওর পেনসন পাওনা হবে, ততদিন যদি ও চাকরিতে পড়ে থাকে আর আমিও পড়ে থাকি ওর সঙ্গে তা হলে আমার প্রাণ বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। কেমন স্পিরিটেড মেয়ে ছিলুম আমি, জানতে তো সবই। সেই আমি এখন নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি। না, চিনু, এমন করে বেঁচে থাকা যায় না। আমাকে যদি বাঁচতে হয় তবে আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।"

চিনু বলল, "আচ্ছা, তুমি একটা মহিলা সমিতি কি বালিকা বিদ্যালয় নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারো না? এসব কাজও তো করবার মতো কাজ। দেশও চায়।"

"আহা, কী নতুন কথাই না শোনালে! মহিলা সমিতিও করেছি, বালিকা বিদ্যালয়ও করেছি। কিন্তু দেশের মেয়েদের মন পাইনি। ওদের ধারণা আমরা দেশের শত্রু, ইংরেজের চর। কী একটা গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মহিলা ও বালিকাদের হাত করছি। এদিকে মিসেস টমসন ডিকসন ওদিকে মিসেস উকিল মোক্তার। বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা! কার সঙ্গে মিশব! কার সঙ্গে মিলব! মিলে মিশে কাজ করতে প্রাণ ব্যাকুল। কিন্তু যেখানে এত সন্দেহ সেখানে মেলামেশা কি সম্ভব?"

চিনু আর কী বলতে পারে! বলে, "মিলি, তুমি ছিলে চির আনন্দময়ী। তোমাকে এমন নিরানন্দ দেখব আশা করিনি। কাল ঘুম হয়নি বলে আজ তোমার মন ভালো নেই। যাও, একটু বিশ্রাম করোগে। তোমাকে আমি আনন্দময়ী দেখে যেতে চাই। তুমি আনন্দ দিয়ে যাও, মিলি। দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়ে যাও, বিলিয়ে দিয়ে যাও আনন্দ। সে ক্ষমতা থেকে কেউ তোমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আজ তুমি সেতার বাজাবে, আমি শুনব। বিদায়ের পূর্বে মনের পটে মুদ্রিত করে নেব তোমার আনন্দময়ী মূর্তি।"

"ধন্যবাদ। সেতার বাজাতে ভুলে গেছি। কে শুনবে, কার জন্যে বাজাব? নিজের আনন্দের জন্যে যতদিন পারি বাজিয়েছি। তারপর ছেড়ে দিয়েছি।"

চিনু উঠবে ভাবছিল। মিলি তাকে উঠতে দিল না। বলল, "যাকে তুমি দেখবে আশা করেছিলে সেই আমি তোমাকে দেখা দেব, কিন্তু এখানে নয়, অন্য কোনোখানে। সেখানে আমাকে নিয়ে যাও, চিনু। এখানে আমি মরে যাচ্ছি, মরতে মরতে মরেই যাব একদিন।"

"ছি! ওসব কথা ভাবতে নেই। চিন্তাকে অন্যভাবে নিযুক্ত রাখ।"

"স্থান পরিবর্তন না হলে সেটা সম্ভব নয়।"

"বেশ তো, দার্জিলিং গিয়ে ছেলের সঙ্গে থাক।"

"ছেলে কতটুকু সময় আমার সঙ্গে থাকবে? তার জীবনে সে সঙ্গী খুঁজে নেবে অপরকে। আমি সঙ্গী পাব কোথায়?"

"তা'হলে কলকাতায় গিয়ে একটা কাজটাজ জুটিয়ে নাও।"

"চেষ্টা করিনি, ভাবছ? আমি কে সেকথা শোনার পর কেউ আমাকে চাকরি দেবে না। বলবে, আপনাকে দিলে অভাবীদের দেব কী!"

চিনু ভাবনায় পড়ল। না, এর কোনো সরল সমাধান নেই। মানিয়ে নিতে হবে স্বামীস্ত্রীকে। বাসবকে একটু নজর দিতে হবে ঘরের দিকে।

"কারা চাকরি দিতে রাজি, জানো?" মিলি বলতে লাগল। "যারা পুলিসের কাছ থেকে কোনো ফেভার চায়। তারা আমাকে দিয়ে আমার স্বামীকে বা আমাদের বন্ধু কোনো পুলিস অফিসারকে পাকড়াবে।"

শুনে এত বিশ্রী লাগল চিনুর। সে বলল, "কাজ নেই চাকরি করে। তুমি যাও, কিছুদিন ছোট কাকিমার সঙ্গে থাক। তোমার একটা চেঞ্জ দরকার।"

এ হলো ডাক্তারের রায়। তবে চিনু ভিতরে ভিতরে তৈরি হতে থাকল বাসবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। চেঞ্জের পরে আবার তো একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হবে। সমস্যাটা নৈতিক।

কথাবার্তা তখনকার মতো তোলা রইল। চিনু উঠল। মিলি একা বসে রইল। গভীর ভাবনায় মগ্ন। চিনুর কথা ওর কানে যায়নি বোধ হয়।

টিফিনের আগে বাসব এসে পৌঁছল। গটমট করে বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে চিনুকে লক্ষ্য করে বলল, "কেল্লা ফতে। মিনিস্টার লোকটা সিনিস্টার নয়। আমার সিগরেট ধরিয়ে দিল নিজের হাতে। বার বার 'সার' বলে সম্বোধন করল। যাবার সময় বলল, আপনার সৌজন্য আমার মনে থাকবে, সার। কখনো দরকার হলে আমাকে একবার টেলিফোন করতে ভুলবেন না। আমি আপনার পরম অনুগত ভৃত্য।"

চিনু তারিফ করে বলল, "তবে আর কী! এখন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে মিলির সঙ্গে একটু গল্প করতে পারো। কিন্তু সরকারী বিষয়ে না।"

"আর কোনো বিষয় কি আমার জানা

আছে ছাই!" বাসব মিলির খোঁজে বাড়ির ভিতর ঢুকল।

টিফিনের সময় মিলি খাবার ঘরে এলো না, মাথা ধরেছে বলে শুতে গেল। বাসব আর চিনু খেতে বসল। হেন তেন নানা রকম কথাবার্তার পর চিনু আস্তে আস্তে সুতো ছাড়ল। অতি সন্তর্পণে। পাছে বাসব রেগে যায়।

"তোমাকে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, বাসব। একবার তোমাকে শুইয়ে এগজামিন করতে চাই। হাঁ, ব্লাড প্রেসার তো বটেই। একটা থরো চেক আপ।"

"কেন? কেন, বলো তো?"

"ডাক্তারকে অমন প্রশ্ন করতে নেই। আই নো মাই জব।"

"কিন্তু হঠাৎ এ রকম একটা প্রস্তাব—"

"আহা, তোমাকে কি আমি বাধ্য করছি? আমাকে বিশ্বাস না হয় রেলওয়ের চীফ মেডিকেল অফিসারকে কল দিতে পারো।"

"তোমাকে অবিশ্বাস করছি, কেন ভাবছ? কিন্তু হঠাৎ এমন একটা—"

"আচ্ছা, খাওয়া শেষ করো। অতটা উত্তেজিত হতে হবে না। এগজামিন আজ না করে কাল করলেও চলবে। অবশ্য আমি থাকব না।"

বাসব দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেল। "না, না, আজকেই।"

গম্ভীরভাবে রক্তের চাপ ইত্যাদি পরীক্ষা করে চিনু বলল, "বাসব, আমি হলে এই মুহূর্তে ছুটির দরখাস্ত করে দিতুম পুরো আট মাস। চলে যেতুম ভিয়েনায় কি সুইট-জারলণ্ডে। মিলিকেও নিয়ে যেতুম সঙ্গে। খরচের কথা ভাবতুম না।"

বাসব যেন আকাশ থেকে পড়ল। প্রথমে তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। যখন সরল তখন বলল, "ডিগবি ছুটি নিচ্ছে সামনের মাসে। একটা ভেকেন্সী হবে। সেই চেনে যে আমি থাকব না তা কে বলতে পারে? এ সুযোগ যদি আমি হারাই তা হলে আমার নিচের লোক উপরে উঠে যাবে। তা যদি হয় তবে কে চায় বাঁচতে। বাঁচার জন্যে তো ছুটি নিয়ে ভিয়েনা যাওয়া। আমাকে একটু বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারো।"

"তা তুমি বিষ বড় কম খাচ্ছ না। তোমার ডায়েট বদলাতে হবে।"

"বলো কি হে। ডায়েট যদি বদলাই তবে খাব কী! খুলে বলছ না কেন, রোগটা কী? ডায়েবিটিস?"

"এখন বলব না। তুমি একখানা দরখাস্ত লিখে আমার হাতে দাও, আমি যাই চীফ মেডিকেল অফিসারের কাছে। দুজনে পরামর্শ করে গবর্ণমেণ্টে পাঠাই।"

"আচ্ছা, পনেরো দিন ছুটি নিলে হয় না? দার্জিলিং গেলে হয় না?"

খুলে বলছ না কেন, রোগটা কী?

"ক্ষেপেছ! চিকিৎসা জিনিসটা ছেলেখেলা নয়।"

"কিন্তু কিসের চিকিৎসা? বেশ তো ভালো বোধ করছিলুম আমি, এই একটু আগে পর্যন্ত। এখন দেখছি বুক ধড়ফড় করছে। ব্যাপারটা কী হে? হার্ট?"

"হার্টকে অবহেলা করা সুবুদ্ধি নয়।"

"আমার মনে হয় নার্ভ।"

"নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটতে দেওয়া অবিবেচনার কাজ।"

"তা হলে কী করতে বলো? দরখাস্ত? বরাট প্রমোশন পাবে, আমি সাক্ষী গোপাল হব? ওর রেকর্ড ভলো হবে, আমার খারাপ হবে?"

বরাটের বরাত। ইউরোপ থেকে ঘুরে এলে তুমিও একদিন বরাটের উপর টেক্কা দেবে। তা যদি না করো তো অক্কা পাবে।"

বাসব বিষম বিপদে পড়ল। একজন সিনিয়র আই এম এস ডাক্তার তাকে ছুটির দরখাস্ত করতে বলছে। নিশ্চয় যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু ওদিকে যে মোয়া গেল হাতছাড়া হয়ে। একবার রেকর্ড খারাপ হলে কি সহজে শোধরায়? কোন কোন পোস্টে অফিসিয়েট করেছে এ প্রশ্ন যেদিন উঠবে সেদিন বরাট উত্তর দেবে বুক ফুলিয়ে। আর বর্মণ?

বাসবকে দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে নেওয়া কি এক আধ ঘণ্টার কাজ? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল ওর মাথায় হাত বুলোতে, পিঠে হাত বুলোতে। জিভটা আবার দেখতে হলো। আবার স্টেথোস্কোপ বসাতে হলো বুকে। টোকা মারতে হলো নানা জায়গায়। নাড়ী দেখতে হলো। চোখের পাতা ওলটাতে হলো।

"মাই ডিয়ার চ্যাপ," চিনু বলল ইংরাজীতে, "তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। আপাতত আট মাসের জন্যে সুপারিশ করছি, পরে আরো কয়েক মাস বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। টেক দি ফার্স্ট বোট হোম।" শেষেরটুকু সাহেবিয়ানা।

বাসব এর পরে সত্যি সত্যি অসুস্থ বোধ করল। কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করল, "জ্বর নেই তো?"

"হুঁ। স্লাইট টেম্পারেচার। ও কিছু নয়। তুমি এখনি দরখাস্ত করো। আমি তোমার জন্যে লিখে দিতে পারি।"

"না, আমার স্টেনোকে দিয়ে লেখাব। কোই হ্যায়। স্টেনোবাবুকো খবর দো। আচ্ছা, আপাতত চার মাস। পরে বাড়িয়ে নেওয়া যাবে।"

"ইউরোপ গেলে চার মাসে কী হবে?"

"চার মাসের বেশী হলে এ পোস্টটা বেহাত হবে যে।"

"হলোই বা! এটা এমন কী একটা পোস্ট?"

"প্রাইজ পোস্ট। তবে কাজ দেখাবার মতো নয়।"

"তাই তো বলছি। এর জন্যে ইউরোপের প্রোগ্রাম সংক্ষেপ কোরো না। যাও, গিয়ে আনন্দ করো। মিলিও যাবে। মিলিও আনন্দ করবে। তোমরা দুজনে মিলে ভালোমন্দ খাবে, খোশগল্প করবে, নাচবে, খেলবে। ওকে বলবে ওর সেতারটা সঙ্গে নিয়ে যেতে। বাজিয়ে শোনাতে। শুনতে খাসা লাগবে তোমার ঐ বিদেশে। ওকে বলবে ছবি আঁকতে, তোমার ছবি, তোমার ব্যাকগ্রাউণ্ডের ছবি। তুমিও গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিয়ে শোনাবে ওকে। ক্যামেরা দিয়ে ওর স্ন্যাপশট তুলবে।"

বাসব তার স্টেনোকে লিখতে বলল ছুটির দরখাস্ত। সাত পাঁচ ভেবে বসিয়ে দিল মাসের ঘরে ছয়। ডাক্তারকে ঠকাল। কাগজটা সই করে দিয়ে চিনুর হাতে দিয়ে বলল, "আর এ নিয়ে খুঁচিয়ো না আমাকে। ইউরোপের পক্ষে ছ'মাস যথেষ্ট।"

চিনু আর পীড়াপীড়ি করল না। পাছে বাসব তার মত বদলায় সে কথা ভেবে

কাগজটা লুফে নিয়ে পকেটে পুরল। চীফ মেডিকেল অফিসারকে ফোন করে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ল মোটরে। বাসবকে টেনে নিয়ে চলল।

দুই ডাক্তারে মিলে, ছোটখাট একটা মেডিকেল বোর্ড করে সুপারিশ করল অন্তত মাস ছয়েক ছুটি, ভারতের বাইরে। সংগে সংগে পুলিসের লোক ছুটল কলকাতায় চিঠি দিতে। ডাকঘরে চিঠি দিলে দেরি হতে পারে।

চায়ের সময় মিলির সংগে দেখা। বাসব তখন মনের দুঃখে বিছানায়। চিনু সমস্ত খুলে বলল। "আমার ট্রেনের খুব বেশী দেরি নেই। মিলি, এবার তা হলে গোছগাছ করি। কাপড় ছাড়তে হবে আবার।"

"তুমি কি সত্যি যাচ্ছ আজ? আর একটা দিন থেকে গেলে হয় না?"

"তার কি কোনো দরকার আছে, মিলি?"

"আমাকেও তো গোছগাছ করতে হবে।"

"কেন বলো তো?"

"যাবার জন্যে।"

"তুমি যাবে কোথায়?"

"তুমি যেথায়।"

"সে কী। তুমি কি পাগল হলে।"

"তা তুমি যখন ওঁকে সার্টিফিকেট দিলে অসুখের আমাকে সার্টিফিকেট দাও পাগলামির। আর নিজে চিকিৎসার ভার নাও।"

চিনু এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সাত হাত গভীর জলে পড়ল। এই পাগলকে নিয়ে করে কী! বলল, "মিলি, তোমার বয়স উনিশ নয়। আমার নয় চব্বিশ। এ বয়সে রোমান্স করা মানায় না। তা ছাড়া তুমি আরেকজনের স্ত্রী। তার ছেলের মা।"

"কিন্তু ও যে সেই মানুষ নয়। আমি পর পুরুষের ঘর করছি।" মিলি বলল সম্পূর্ণ বেপরোয়া ভাবে।

"তা হলেও তোমার ছেলেমানুষী করা উচিত নয়। পরে যখন অনুতাপ করবে তখন ফিরে আসার পথ খোলা থাকবে না। তখন কী সর্বনাশ হবে, ভেবে দেখ।"

"ফিরে আসতে হবে কেন?"

"অনুতাপ করলে ফিরে আসতে হবে না?"

"অনুতাপ করি তো মরব, তবু ফিরব না।"

"ওটা পাগলের মতো কথা হলো। মিলি, ভেবেচিন্তে কাজ করো।"

"চিনু, ভাববার কী আছে! তোমার সংগে যে এমন ভাবে দেখা হলো এর কি কোনো তাৎপর্য নেই? এটা কি একেবারেই আকস্মিক।"

"তা ছাড়া আর কী! পথে ঘাটে অমন কত হয়।"

"হয়, কিন্তু ঠিক যখন মানুষ চারদিকে অন্ধকার দেখছে সেই সংকট ক্ষণে যদি অকস্মাৎ একটি আলোর রেখা চোখে পড়ে তা হলে তাকে অনুসরণ করাই মানুষের স্বভাব। তার ফল যদি খারাপ হয় তবে এর চেয়ে খারাপ হবে না।"

মিলিকে কোনোমতে তার সংকল্প থেকে টলানো গেল না। চিনু হাল ছেড়ে দিল। কিন্তু কী করে এটা সম্ভব! বাসব যদি রাজী না হয় তা হলে চুরি করে তো মিলিকে নিয়ে যেতে পারে না।

চিনু সে দিন যাওয়া স্থগিত রাখল। টেলিগ্রাম করতে হলো দ্বিতীয়বার। মিলির উপর ভার দিল বাসবের অনুমতি নিতে। কোন লজ্জায় সে নিজে ও কথা পাড়বে! এ ভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে জানলে সে কি পার্বতীপুরে 'ব্রেক জার্নি' করত। এখন এর কী যে পরিণাম, কল্পনা করতে তার রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছিল।

ওদিকে মিলি গিয়ে দেখল বাসব শুয়ে শুয়ে আফিসের ফাইল পড়ছে। রাশি রাশি ফাইল পাশের খাটে জড় হয়েছে। শোবার ঘরটাকেই আফিস ঘর করে তোলার চেষ্টা।

"তা হলে আমি শোব কোথায়?" শুধালো মিলি।

"কেন? চিনু আজ যাচ্ছে না? ও ঘরটা খালি হচ্ছে না?" শুধালো বাসব।

"না, চিনু আজকের দিনটা থেকে যাচ্ছে। কাল আমরা একসংগে যাব।"

বাসব অন্যমনস্ক ছিল, ঠিক ধরতে পারল না কথাটা। বলল, "হাঁ, এক সংগেই যাব আমরা ওকে পার্বতীপুরে তুলে দিতে।"

"না, আমরা মানে তুমি-আমি নয়। আমরা মানে চিনু-আমি।"

বাসব ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। এর অর্থ?

"বুঝতে পারলে না? চিনু আর আমি একসংগে যাচ্ছি গোহাটী। তুমি যদি ছুটি পাও তবে একাই বিলেত যেয়ো।"

হতভম্ব হয়ে বাসব বলল, "একাই!"

"কেন? একাই তো গেছলে পার্বতীপুর আজ ভোরে। ভয় নেই। ওদেশে তোমাকে সংগ দিতে অনেক মিসেস টমসন ডিকসন জুটবে। তুমি গোটাকয়েক পরিচয়পত্র জোগাড় করে নিয়ে যেয়ো। তোমার সুখী হওয়া উচিত যে, আমি থাকব না রসভংগ করতে।"

এতক্ষণে বাসবের হুঁশ হলো যে মিলি রাগ করেছে। উঠে বসে বলল, "মিলি, তোমার মনে কষ্ট হবে জানলে কি আমি ওদের নিয়ে যেতুম? আর তোমার ইচ্ছে ছিল জানলে কি আমি তোমায় নিয়ে যেতুম না?"

"আমার ইচ্ছা ছিল না যেতে। নো পার্ট অফ মাই ডিউটি। তোমার ইচ্ছা ছিল। পার্ট অফ ইওর ডিউটি। এখন কথা হচ্ছে এই। তোমার ডিউটি আর আমার ডিউটি যদি এক না হয়, যদি তাদের মধ্যে সংগতি না থাকে, সামঞ্জস্য না থাকে তা হলে তুমি আমি কেন একসংগে থাকি?"

বাসব অপ্রতিভ হয়ে বলল, "কেন এক সংগে থাকি?"

"হাঁ? কেন? বিয়ে হয়েছে বলে সারা-জীবন এক জোয়ালে জোতা থাকতে হবে? তুমি যেদিকে টানবে আমি টানের জোরে সেই দিকে যাব? ধরো, আমি যদি আরেকদিকে টানি? তুমি টানের জোরে আসবে সেদিকে? এই তো আমি কাল আসামের দিকে টানছি। দেখি তুমি আমার টানের জোর সামলাতে পারো কি না!"

বাসবের টনক নড়ল। সেই এত দিন টেনে এসেছে। এবার তাকে নাকে দড়ি দিয়ে টানা হবে।

"বেশ, তা হলে তাই হোক। চাকরিটা যাক। স্ত্রীর সংগে সংগে ফকিরের মতো ঘুরি। ছেলেটা ফুটপাথে বসে ভিক্ষা করুক।" বাসব কপালে হাত দিল।

"চাকরিটা গেলে তুমি সামনের মাসে ডেপুটি কমিশনার হবে কী করে! এই যে আজ এত তদ্বির করে এলে এটা কি আজ মাঠে মারা যাবে!"

"তদ্বির! আমি!" বাসব বিস্মিত হয়ে বলল, "আমি করব তদ্বির!"

"তবে অমন মরি কি পড়ি করে ছুটলে কেন? কী করতে? ওটা কি তোমার ডিউটি? যদি ডিউটি হয়ে থাকে, তবে তুমি চাকরিই করে যাও সারাজীবন। কেবল আমাকে ছাড়পত্র দাও। আমি চলে যাই যেদিকে দু'চোখ যায়। তোমার চেয়ে আমাকে কেউ ভালোবাসে না মনে করেছ? এই যে চিনু এ আমার ছেলেবেলার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খবর রাখে, বলছিল আমাকে কাল রাত্রে। কতকাল পরে দেখা, এই প্রথম দেখা, তবু সে যা জানে তা তুমিও জানো না, জানতে চাওনি, চাইবেও না কোনো দিন যদি তোমার সংগে আরো চোদ্দ বছর কাটাই। তুমি জানো চোরডাকাতের জীবনের খুঁটিনাটি খবর।"

বাসব অপ্রতিভ হয়ে বলল, "তুমি যদি না বলো আমি জানব কী করে?"

"আমি কি বলতে গেছি চিনুকে? কোনো দিন দেখেছি ওকে? ও আমাকে ভালোবাসে বলেই যেমন করে হোক জেনেছে। শুনলে বিশ্বাস করবে না ও আমাকে বিয়ে করতে

চেয়েছিল। এমন আহম্মক যে আমাকে জানায়নি। আমার সঙ্গে বিয়ে হয়নি বলে আর কাউকে বিয়েই করল না এ জীবনে।"

"য়্যাঁ!" বাসব অবাক হলো শুনে। যখন বাক্‌শক্তি ফিরল তখন বলল, "ওর একটা বিয়ে টিয়ে দাও। তুমি তো ওর বৌ হতে পারবে না।"

"কেন পারব না! তুমি আমাকে ছাড়পত্র দিলে আমি ওকে ওর অপেক্ষার পুরস্কার দেব। কাল যদি আমি ওর সঙ্গে পালিয়ে যাই তাহলে সেই অজুহাতে তুমি আমাকে ডাইভোর্স করবে। করবে কি না বলো।"

"য়্যাঁ!" আবার অবাক হলো বাসব। এবার বাক্‌শক্তি খুঁজে পেলো না।

"করবে। করবে। আমি জানি।" মিলি বলল ঈষৎ হেসে।

"ছাই জানো। হিন্দু আইনে ওসব থাকলে তো?" বাসব ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করবে। তোমার তো সর্বনাশ হবেই, আমারও প্রমোশন বন্ধ। সেটাও এক হিসাবে সর্বনাশ। পুরুষের জীবনে যদি উন্নতি না থাকল তবে কী থাকল! পুরুষ বাঁচে আর দশটা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর পাঞ্জা কষে। বরাট, আহমদ, নেলসন এরা একে একে মিছিলের মতো এগিয়ে যাবে আমাকে মাড়িয়ে, আমাকে পা দিয়ে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে। একটা জীবন্ত শবের মতো পড়ে থাকব আমি। বুকের উপর কালীর মতো নাচতে থাকবে তুমি। লজ্জা শরম সব খুইয়ে থাকবে। মুখখানা আরো এক পোঁচ কালো হয়ে থাকবে। চিনুর তত দিনে শখ মিটে গিয়ে থাকবে।"

এরপর দুজনের রীতিমতো ঝগড়া বেধে গেল।

ডিনারের সময় যখন তিনজনের দেখা হলো বাসব বলল, "চিনু, মিলিকে তুমি নিয়ে যেতে চাও, নিয়ে যাও।"

এবার অবাক হবার পালা চিনুর। "সে কী, বাসব! আমি কেন চাইব! আমি কেন নিয়ে যাব!"

"আহা! না হয় মিলিই চাইছে। মিলিই নিয়ে যাক তোমাকে গৌহাটী।"

"তাই বা কেন হবে! তুমি ওর স্বামী না?"

"আইনে তাই বলে বটে। কিন্তু আইনে আবার এ কথাও বলে যে আমি ওর গায়ে হাত দিতে পারব না দিলে পীনাল কোডের আমলে আসব। ওকে ধরে রাখতে পারব না, রাখলে পীনাল কোড। বার করে দিলে ও খোরপোষ দাবী করবে, তার মানে ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোড। হিন্দু আইনে ডিভোর্স নেই, কাজেই ও যা খুশি করতে পারে, আমি কেবল করতে পারি আর একটা কি একশোটা বিয়ে। তাতে ওর কী! আমারই মুশকিল! এ কালে একটার বেশী স্ত্রী পুষতে পারে ক'জন!"

চিনু সমবেদনা জানিয়ে বলল, "সত্যি, আইন আমাদের হাত পা বেঁধে রেখেছে। কিন্তু তুমি আইনের কথা ভাবছ কেন? হৃদয় বলেও একটা কিছু আছে। হৃদয়ের দিক থেকেও কি তুমি ওর স্বামী নও?"

"হৃদয়!" মিলি কণ্ঠক্ষেপ করে বলল, "হৃদয় জিনিসটা ও'র পক্ষে বাহুল্য!"

"হৃদয়!" বাসব চিন্তা করে বলল, "কী জানি কোনো দিন ভাবিনি। আমি পুলিসের কাজ করি। ও কাজে হৃদয় আর বিবেক এ দুটি থাকতে প্রমোশন নেই।"

"নাই বা হলো প্রমোশন! তোমার চাকরি তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না?"

"চাকরি কেড়ে নিচ্ছে না তা ঠিক। কিন্তু চাকরি করা অসম্ভব করে তুলছে। আমি না হয় প্রমোশন পেলুম না, আমার নিচের লোক তো পেলো। ডিঙিয়ে গেল তো আমাকে। হলো তো আমার উপরওয়ালা। যারা সুপারিসীডেড হয়েছে তাদের চেহারা দেখলে তোমার চোখে জল আসবে। যেন পিঁজরাপোলের গোরু। এই মিলিটার যদি একটু দয়ামায়া থাকত তার স্বামীটার জন্যে!" বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলল বাসব।

"এ কী নতুন রঙ্গ শুরু হলো!" মিলি বিচলিত হয়ে বলল, "তোমার কান্নাকাটি দেখে আমি অমনি গলে যাব! তেমন মেয়ে আমি নই। ঐ চিনু জানে কেমন ডানপিটে দুরন্ত মেয়ে ছিলুম। ডাকু মেয়ে।"

"থাক, মিলি। ওর অনেক দুঃখ।" চিনু বলল দরদীর মতো।

"মিলি বলছে আমি নাকি ওকে তোমার মতো ভালোবাসিনে।" বাসব বলল। "কিন্তু তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে তুমি যে ওর জন্যে তোমার জীবনের উন্নতি বিসর্জন দিতে এতটা আমি বিশ্বাস করব না, চিনু। আগে উন্নতি, তার পরে ভালোবাসা।"

চিনু কী বলতে যাচ্ছিল, তার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে মিলি বলল, "ব্যস। এই যখন তোমার শেষ কথা তখন আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই। তোমার ঘরে ফিরে এলে তো তুমি আমাকে নিয়ে ফাঁপরে পড়বে। আমি দিব্যি করছি, ফিরে আসব না।"

"কী! এত বড় কথা!" গর্জে উঠল বাসব। এই বার নিজ মূর্তি।

"মারবে নাকি! মারো।" তেমনি ঝাঁজিয়ে উঠল মিলি।

চিনু বসেছিল দুজনের মধ্যিখানে। হাঁ হাঁ করে দুই হাত দিয়ে দুজনাকে রুখল। খানসামা বেয়ারা সকলেই তটস্থ। কী যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে। ঝড়ের পূর্বাভাস। খুন কি আত্মহত্যা, কি আর কিছু।

"কোই হ্যায়!" বাসবের হাঁক, শুনে আরদালী ছুটে এসে সেলাম ঠুকল।

"কলম লে আও। কাগজ লে আও। লেফাফা লে আও। টিকট লে আও। জরুর।" বাসব হুকুম করল হুঙ্কার ছেড়ে।

কাগজ এলো। কলম এলো। খাম এলো। ডাকটিকিট এলো। তখন হাতের ইশারা করে চাকর বাকরদের সরিয়ে দিল বাসব। মিলির দিকে চেয়ে বলল, "কী লিখতে হবে, বলো। ছাড়পত্র?" তার চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে।

মিলির মুখ শুকিয়ে গেছে। সে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল।

চিনু বাসবের হাতটা ধরে বলল, "আরে, না, না। ক্ষেপেছ?"

"হাত ছাড়ো।" বলে হাত ছাড়িয়ে নিল বাসব। তার পরে কী যে লিখে গেল এক মনে। কাউকে দেখতে দিল না। পড়ে শোনাল না। খামে ভরে টিকিট সেঁটে উপরে লিখল, "চীফ সেক্রেটারী, গবর্ণমেণ্ট অফ বেঙ্গল।"

খামটাকে মিলির দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "এই নাও তোমার ছাড়পত্র। যাও, স্টেশনে গিয়ে আর এম এস'এ দিয়ে এসো। চিনু, তুমিও যেতে পারো ওর সঙ্গে।"

সামনে ভেরমুথ ছিল। চিনুকে অফার করে গলাটা ভিজিয়ে নিল বাসব।

মিলি তখনো বিমূঢ়ভাবে বসে। চিনু ঠিকানাটা লক্ষ্য করেছিল। জিজ্ঞাসুভাবে তাকালো। বাসবের মুখ তখন মড়ার মতো সাদা। তারই উপর অতি কষ্টে হাসির আমেজ ফুটিয়ে বাসব বলল ধরা গলায়, "ওহ্! চীফ সেক্রেটারীকে কেন লিখেছি, ভাবছ! ছাড়পত্র দিতে হলে আমরা শ্বশুর বংশকেই সংবাদ দিই। বলি, শ্রীমতী চাকুরি সুন্দরী দেবীকে ছাড়পত্র দিলুম। নিতে আজ্ঞা হয়।"

ইয়েতির কথা

ডক্টর কালীপদ বিশ্বাস

তুষার-মানব বা ইয়েতির কথা সকলেই শুনে থাকবেন। হিমালয় পর্বতমালার এই রহস্যময় প্রাণীটির সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় মাঝে মাঝে নানান রকমের কাহিনী প্রকাশিত হয়ে থাকে। ইয়েতির সঠিক পরিচয় জানতে যাঁরা আগ্রহশীল, এসব কাহিনী তাঁদের ভাল লাগবার কথা।

গত ১২ই মার্চ কলকাতার কোনও একটি দৈনিক পত্রিকায় এ সম্পর্কে যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছে, ইয়েতিদের বিচরণ-ক্ষেত্র হ'ল সিকিম আর তিব্বতের পূর্ব-উত্তর সীমান্ত অঞ্চল। বলতে দুঃখিত হচ্ছি, আজ পর্যন্ত আমি এই ইয়েতির দর্শন পাইনি। নাথু লা (১৪,৪০০ ফুট), কুপুপ (১৩,০০০ ফুট), জেলাপ লা (১৪,৩৯০) ইত্যাদি জায়গায় আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, কিন্তু—গোটা প্রাণীটির দর্শনলাভ তো দূরের কথা—তাদের পদচিহ্নও চোখে পড়েনি আমার।

চুম্বি উপত্যকার ঊর্ধ্বে 'তিব্বতের প্রবেশপথ' জেলাপ লা

জেলাপ লা থেকে চুমলহরি (২৩,৩৯০ ফুট) পর্বতশৃঙ্গটি দেখতে পাওয়া যায়। শৃঙ্গটিকে সবাই পবিত্র জ্ঞান করে থাকেন। স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছে "স্বর্গ-পাহাড়ের রানী"। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে যোসেফ হুকার মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, স্থানীয় উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণা করবার জন্য দীর্ঘদিন তিনি এখানে কাটিয়ে যান। তিব্বতের এটা প্রধান বাণিজ্য-পথ। জেলাপ লা দিয়ে প্রত্যহই ভারবাহী পশুদের আনাগোনা চলছে। চুম্বি উপত্যকা দিয়ে ব্যবসায়ীরা গিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেন।

কুপুপের রাস্তা যেখানে অতলস্পর্শী এক গিরি-গহ্বরের কাছে গিয়ে বাঁক নিয়েছে, সেখানে গিয়ে নীচের দিকে তাকালেই সুন্দর একটি হ্রদ চোখে পড়বে। নেমি ৎসো হ্রদ। অপরূপ এর সৌন্দর্য। হ্রদটি গভীর, জলের রঙ নীল। নাথং (১২,৩০০ ফুট) থেকে কুপুপের পথে আর একটি হ্রদ। এটির নাম বিদং। হ্রদটিকে সবাই পবিত্র জ্ঞান করে থাকেন। জল বরফ-জমাট। এর শেষ-প্রান্তে কুপুপের ডাক-বাংলো। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রায় বর্ণনাতীত। নাথু লা-র নীচে চাঙ্গুতেও এই রকমের বিরাট একটি হ্রদ রয়েছে। শুনেছিলাম পীতবর্ণ পবিত্র এক জোড়া হাঁস থাকে এখানে। ১৯৪৯ সালের মে মাসে আমার ছেলে শ্রীমান সঞ্জীব বিশ্বাস একটি হাঁসকে দেখতেও পেয়েছিলেন। কিংবদন্তী আছে, অনেকদিন আগে হ্রদের পূর্ব তীরে সমৃদ্ধ একটি গ্রাম ছিল। গ্রামের রাজা একদিন একটি হাঁসকে মেরে ফেললেন। পর্বত-দেবতা তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। সেই রাত্রেই এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে পাহাড় কেঁপে উঠল। ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গেই ধস নামতে লাগল চারদিকে। তারপর দেখতে-না-দেখতেই সমৃদ্ধ সেই গ্রামখানি হ্রদের মধ্যে গিয়ে ধসে পড়ল। তার আর কোনও চিহ্ন পর্যন্ত রইল না। এখনও এখানে নতুন কোনও মানুষ এলে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয় যে, হ্রদের জল যেন তিনি অপবিত্র না করেন। এখানে, আর এর নিম্নবর্তী অঞ্চলে ছোট ছোট প্রচুর গাছপালা রয়েছে,—রডোডেনড্রন, স্যালিক্স, জুনিপারাস, সিউ-ডোস্যাবিনা, বার্বারিয়া, কটোনিস্টার, আরিনারিয়া এবং আরও নানারকমের গাছ। প্রাইমুলাস, জেণ্টিয়ানস্, মেকোনপসিস, কারিড্যালিস, পোটেনটিলাস, পেডিক্যুলারিস, অকসিগ্র্যাফিস, স্যাকসিফ্র্যাগাস, ফ্রিটিল্যা-রিয়াস, ক্যাসিওপি এবং অন্যান্য আলপাইন উদ্ভিদের সন্ধানে ১২,০০০ ফুটের উপরকার অঞ্চলে রডোডেনড্রন আর আরিনারিয়ার ঝোপে আমরা বিস্তর ঘোরাঘুরি করেছি, কিন্তু কারো কাছেই তখন ইয়েতি বা তুষার-মানবের নাম শুনতে পাইনি।

লাচেনের উত্তরে মাইলখানেক এগোলেই জেমু উপত্যকার নিম্নাঞ্চলে গিয়ে পৌঁছনো যায়। এইখানেই চোখে পড়বে জেমু আর লাচেন চু (চু=নদী)। নদীর জল বরফ-ঠাণ্ডা। জেমু আর লাচেন হিমবাহ থেকে বেরিয়ে এসে প্রবল শব্দে এই দুটি নদী

চাঙ্গু হ্রদ (১২,৬০০ ফুট)

নীচের পাহাড়ে গিয়ে পড়ছে। এরই পশ্চিমে জেমু উপত্যকা। উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছবার রাস্তাটি খুব সংকীর্ণ। গোটা অঞ্চলটাই জলসিক্ত। এখানে-ওখানে রডোডেনড্রন, স্যালিক্স, বারবারিস, কীটভুক পিঙ্গুইকুলা আলপাইনা এবং অন্যান্য সাব-আলপাইন উদ্ভিদের ঝোপ-জঙ্গল। এর পর মাইল ছয়-সাত এগোলে যে সমতল সবুজ তৃণভূমি চোখে পড়বে, স্থানীয় লোকেরা তার নামই দিয়েছে "সবুজ হ্রদের উপত্যকা" (১৬,২০০ ফুট); এখানেও প্রচুর রডোডেনড্রন, জুনিপারাস, আরিনারিয়াস এবং অন্যান্য আলপাইন উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যাবে। পর্বতারোহী মাত্রেই "সবুজ হ্রদ"-এর নাম শুনেছেন। আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার একটি অপরূপ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

১৯২১ সালে প্রথম এভারেস্ট-অভিযাত্রী দল নাকি ২১,০০০ ফুট উঁচুতে উঠে মেটোকাংমি বা "তুষার অঞ্চলের রহস্যময় মানুষ"-এর পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযাত্রী দলের জনকয়েক কুলিও নাকি তুষার-মানব মি-গোর দর্শন লাভ করেছিল। ইয়ুক-সাম গ্রামের কাছে জোংরি আর গুইটা লা (লক গিরি-বর্ত্ম) যাবার পথে যে গভীর অরণ্যাঞ্চল

জেলাপ লা-র কাছে কুপুপ অঞ্চলে রডোডেনড্রন, আরিনারিয়া, কটোনিস্টার, জুনিপারাস এবং অন্যান্য আলপাইন উদ্ভিদের ঝোপজঙ্গল। তারই মাঝে-মাঝে তুষার জমে রয়েছে

রয়েছে, ভয়াবহ তুষার-মানব বা শুকপা'রা নাকি সেখানে অবাধে বিচরণ করে থাকে। অস্বাভাবিক রকমের ঢ্যাঙা আর উলঙ্গ একটি প্রাণীকে দেখে জনৈক ব্রিটিশ পর্বতারোহী একবার কী রকম হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন, অধ্যাপক রোয়েরিক তাঁর আলতাই-হিমালয় গ্রন্থে তার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রাণীটির চেহারা মানুষেরই মত। পাহাড়ের কিনারে সামনের দিকে ঝুঁকে' সে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই বিদ্যুৎবেগে কয়েকটি লাফ দিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দার্জিলিংয়ের জনৈক প্রাচীন অধিবাসীর কাছ থেকেও এ-সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। "মীস্টিক টিবেট অ্যান্ড দী হিমালয়"-এর প্রণেতা শ্রী কে ভঞ্জ তাঁর গ্রন্থে এই কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন। ব্যাপারটা এই :—

জেলাপ লা থেকে মাইল তিনেক দূরে চুম্বিথংয়ের কাছাকাছি অঞ্চলে তখন ডাক-বিভাগের কাজ চলছিল। সেই সময় হঠাৎ একদিন জন-বারো-চোদ্দ কুলী তাদের তাঁবু থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। অন্যান্য কুলি এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা প্রাণপণ খুঁজেও তাদের কোনও সন্ধান পায় না। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, নগ্ন পর্বতগাত্রের কিনারায় বিরাট কয়েকটি শিলাখণ্ডের আড়ালে অদ্ভুত একটি প্রাণী আত্মগোপন করে রয়েছে। আসলে সেটি নাকি একটি শুকপা। সৈন্যদল গিয়ে ঘিরে ফেলল তাকে, রাইফেল চালিয়ে তার প্রাণসংহার করল। মৃত প্রাণীটিকে প্রথমে
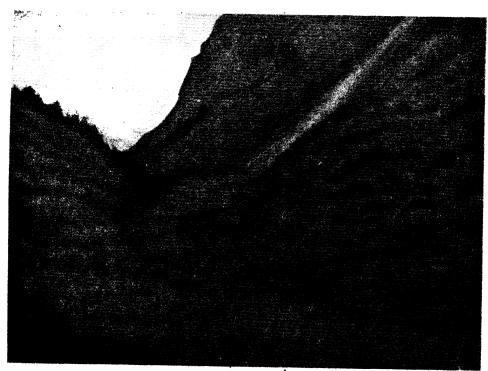
জেমু উপত্যকার কাছে রডোডেনড্রন, কটোনিস্টার, বারবারিস এবং অন্যান্য উদ্ভিদের ঝোপ। গাছগুলি এখানে আকারে খুব ছোট হয়

জেমু উপত্যকা (১১,০০০ ফুট)। বাঁ দিকে অ্যাবিস ওয়েবিয়ানা এবং সামনে রডোডেনড্রন, পাইরাস, লোনিসেরা, স্যালিক্স, ভাইবারনাম, রাইবস, বারবারিস ইত্যাদির ঝোপ দেখতে পা ওয়া যাচ্ছে

ডাক-বাংলোয় নিয়ে আসা হয়; তারপর সিকিমের তৎকালীন পলিটিক্যাল অফিসার স্যার চার্লস বেলের উদ্যোগে তাকে গ্যাংটক চালান দেওয়া হল। শোনা যায়, ব্রিটিশ মিউজিয়মে রাখবার জন্য মৃত প্রাণীটিকে নাকি শেষ পর্যন্ত লণ্ডনে প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রাণীটির চেহারা অবিকল মানুষেরই মত। দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ ফুট, গাত্র-ত্বক দু-তিন ইঞ্চি লম্বা রোমে আবৃত, পায়ের পাতা পেছন দিকে ঘোরানো। সত্যিই কখনও ব্রিটিশ মিউজিয়মে এ-রকম কোনও প্রাণীর মৃতদেহ জমা হয়েছিল কি না, সেখানকার কিউরেটরই তা বলতে পারেন। তিনিই বলতে পারেন, কথাটা সত্যি না কাল্পনিক।

হুকারের পর, ১৮৪৮-৪৯ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, বহু উদ্ভিদতত্ত্ব-বিদ্ পর্বতারোহী এবং শৌখিন পর্যটক পূর্ব সিকিমের কুপুপ জেলাপ লা ও নাথু লা এবং উত্তর সিকিমের থাঙ্গু ও ডোংখা লা (১৮১৩১ ফুট) অঞ্চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই কোথাও ইয়েতি বা তার রোম কি মাথার খুলি অথবা তার পদচিহ্নের কোনও উল্লেখ করেননি। অনেকের ধারণা, ইয়েতি হল মানুষেরই পূর্বপুরুষ। সিকিমের এই সব সুউচ্চ পর্বতাঞ্চলে দীর্ঘ-কাল আমাকে পর্যটন করতে হয়েছে, কিন্তু ইয়েতির কোনও চিহ্নও আমার চোখে

মার্মট (হুকারের বর্ণনা অনুসারে)

পড়েনি। স্থানীয় অধিবাসীরা ভদ্র, বিনয়ী। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের কুসংস্কারও বড় প্রবল। এদের এবং শেরপা ও কুলিদের কাছে অবশ্য নানান রকমের সব কাল্পনিক গল্প শুনতে পাওয়া যায়। শুধু ইয়েতির সম্পর্কেই নয়, সুউচ্চ পর্বতাঞ্চলের আরও অনেক রকমের প্রাণী, যথা পার্বত্য ভালুক, ছাগল (বুরেল—ওভিস মাহুরা), হরিণ, ইয়াক, কস্তুরী মৃগ, হাঁস, পায়রা, মার্মট ইত্যাদি সম্পর্কেও এ-রকমের বহু গল্প রয়েছে। আট হাজার ফুটের উপরে কোথাও আমি ইঁদুর দেখতে পাইনি।

পর্বতের উঁচু অথবা নিচু অঞ্চলে যে-সব ভালুক থাকে, বিশেষত বাদামি রঙের যে-সব ভালুক তুষারাবৃত অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, তাদের সম্পর্কে শেরপা আর কুলিদের মনে যে যথেষ্টই ভয় রয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দশ হাজার ফুটের চাইতে উঁচু জায়গায় বানর দেখতে পাওয়া যায় না। পূর্বে উল্লিখিত দৈনিক পত্রিকাটিতে প্রিন্স পিটারের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে ওরাং-ওটাং জাতীয় একটি প্রাণীর ছবি দেওয়া হয়েছে। ছবিটি হাতে-আঁকা। অনুমান করা হয় যে, ১২ হাজার ফুটের চাইতে উঁচু কুপ্‌পে আর তার কাছাকাছি অঞ্চলে এরা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায়। শ্যামের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ ব্রহ্মের অরণ্যাঞ্চলে এ-রকম অসংখ্য প্রাণী আমার চোখে পড়েছে। কারো গাত্রবর্ণ কালো, কারো বা বাদামি। কখনও দু পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটে, আবার কখনও বা চার পায়ে ভর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। গাছে গাছে লাফালাফি তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে তুমুল চিৎকার। সমস্ত বনভূমি তখন মুখর হয়ে ওঠে। পরস্পরের প্রতি এরা খুবই মমতা-শীল। সব সময়েই আমি এদের জোড়ায় জোড়ায়—স্ত্রী এবং পুরুষ—ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। উঁচু পাহাড়ের তুষারভূমি আর হিমাঞ্চলে কারো পক্ষেই দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বন্ধ্যা হিমঠাণ্ডা সেই আবহাওয়ায় গ্রীষ্মাঞ্চলের এই প্রাণীর অস্তিত্ব আদৌ সম্ভব কি না, সেটা যথেষ্টই সন্দেহের বিষয়।

প্রিন্স পিটার যে তীক্ষ্ণ চিৎকারের কথা লিখেছেন, আমার বান্ধবী মিসেস অ্যানি প্যারিও তা শুনতে পেয়েছিলেন। কালিম্পঙের বিখ্যাত হিমালয়ান হোটেলের তিনি স্বত্বাধিকারিণী। এখন কথা হল এই যে, সে-চিৎকার বাতাসেরও হতে পারে। উঁচু তুষারাঞ্চলে সারাক্ষণই বরফের ধস নামছে। সেই ধস এবং বিরাট বিরাট বরফের চাঙড়ের সংকীর্ণ ফাটল দিয়ে তীব্রবেগে হাওয়া বইবার সময় এ-রকম একটা তীক্ষ্ণ ধ্বনির সৃষ্টি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। একই সঙ্গে একটা গুরু-গুরু আওয়াজও শুনতে পাওয়া যায়। এ-সব অঞ্চলে, বিশেষ করে রাত্রির নিস্তব্ধতায়, অনেকেই তা শুনে থাকবেন। খুব উঁচু জায়গায় প্রত্যেকের মনেই কিছু না কিছু অবসাদের সৃষ্টি হয়, স্নায়ুও তখন খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বলমনা মানুষ যে তখন নানান রকমের সব ধ্বনি শুনতে পাবে, এটা খুবই নানান রকমের কাল্পনিক ছবি দেখবে, বিচিত্র সব ধ্বনি শুনতে পাবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। ইয়েতির দর্শন যাঁরা পেয়েছেন, দুঃখের বিষয় তাঁদের কেউই তার কোনও ফটো তুলে রাখতে পারেন নি। তা যদি পারতেন, এত সব বলবার কোনও প্রয়োজনই হত না। আসল কথা, এমন মনে করবার যথেষ্টই কারণ রয়েছে যে, বাস্তব কিছু তাঁরা দেখেননি, দৃষ্টিবিভ্রমের ফলে কী-দেখতে কী-দেখে তারপর কল্পনায় তাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। সামান্য জীব-বিজ্ঞানী আমরা; পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকায় ইয়েতির যে ছবি ছাপা হয়েছে, আমাদের ধারণা সেটা বর্তমান যুগের কোনও প্রাণী নয়; ছবি দেখে মনে হল, সেটা প্রাচীন যুগের ওরাং-ওটাং জাতীয় কোনও প্রাণীর পুনর্গঠিত অবয়ব।

এই রহস্যময় প্রাণীর মাথার খুলি, গায়ের রোম ইত্যাদি আবিষ্কার সম্পর্কে মাঝে মাঝে কৌতূহলোদ্দীপক সব খবর প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ-রোম বিশেষ কোনও প্রাণীর কি না, বিশেষজ্ঞরা তা বলতে পারেন নি। মোট কথা, এ-যাবৎ যে-সব খবর প্রকাশিত হয়েছে, তার থেকে এই রহস্যময় প্রাণীর প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটনের কোনও বৈজ্ঞানিক সূত্র পাওয়া যায় না।

খুব বেশী হৈ চৈ না করে তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই ভালো।

প্রসাদ শিখর

অনেক খুঁজে-পেতে বাড়ি বের করেছে। সে কি একটা গলির মধ্যে তেতলার ফ্ল্যাট। ঢুকতে যেমন মনে হয়েছিল উঠে এসে তত খারাপ লাগল না। বেশ ফাঁকা, নিরিবিলি। এমনি একটা ঠান্ডা-ঠান্ডা পরিবেশেই সুপ্রিয়কে মানাবে বুঝেছিল গুরুদাস।

তিন রুমের ফ্ল্যাট।

প্রথমে ঢুকেই বসবার ঘর। সুপ্রিয় আছে?

চাকর এসে বললে, বাবু পুজোর ঘরে আছেন। বসুন।

দু'ঘণ্টার উপর বসে আছে গুরুদাস। উঠে যায়নি। বিরক্ত হয়নি। বই-পত্রিকা এটা-ওটা নাড়াচাড়া করেছে। এক সময় চা ও জলখাবার দিয়ে গিয়েছিল চাকর তাই খেয়েছে। সিগারেট পুড়িয়েছে গোটাকতক। এমনি বসতেই হবে দরকার হলে এমনি একটা সমর্পণের ভঙ্গি গুরুদাসের। কাজটা জরুরি।

চাকর এসে বললে, বাবু জিগগেস করলেন আপনার নাম কি?

নাম বললে।

চাকর ফিরে এল। আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছেন।

ছোট একটা প্যাসেজ পেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকতে যেতেই সুপ্রিয় চেঁচিয়ে উঠল, জুতো খুলে এস।

জুতো খুলল গুরুদাস। খোলাই উচিত। যার যেমন শুচিতার রুচি তার মান রাখা দরকার।

পাশের ঘরই সুপ্রিয়র শোবার ঘর। শোবার ঘর না শুভ্রতার মন্দির। একটি যুগল-শয্যার খাট, সামনে একটা ডিভান। গোটা দুই গদিমোড়া টুল। একপাশে টেবিলের উপর সুপ্রিয়র স্ত্রীর একটি বড় বাঁধানো ফটো। একপাশে রুপোর সিঁদুরের কৌটো। ফোটোর ললাটে সিঁদুর পরানোর দাগ।

ওদিকের ঘরটা পুজোর ঘর। পুজোর ঘরই বটে। সবচেয়ে ভালো ঘর। পুব আর দক্ষিণ খোলা। ভালো ঘরটি নিজের শোবার জন্যে না রেখে দেবতার জন্যে রেখেছে এটা একটু অভিনব লাগল। তা সুপ্রিয়র অনেক কিছুই অভিনব।

পুজোর ঘরের চারদিকের দেয়াল পটে-চিত্রে বোঝাই। মাঝখানে মেঝের উপর একটি কম্বল পাতা। আসনে দৃঢ়ীভূত হয়ে জপসাধনই আমার পুজো।

কী হয় এতে?

আর কিছু নয়, সুখ হয়। বাঁধাবরাদ্দের উপর সকলেই একটু উপরি-পাওনা খোঁজে সেই উপরি-পাওনার সুখ।

ঈশ্বরকে পাবার মানে কি? কত লোকেই কত রকম প্রশ্ন করে। চাকরি পাওয়া বুঝি, বাড়ি পাওয়া বুঝি, বিষয় পাওয়া বুঝি—ঠিক ঠিক। ও সব তো আছেই, তার উপরে এই একটু সুর পাওয়া, স্পর্শ পাওয়া। সেই মা আছেন অনেক ছেলের সংসারে, অন্নজল পরিবেশন করছেন সবাইকে, কে আর মায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করে সচেতন? এরই মধ্যে এক ছেলে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল, মার মুখের কথা শুনল। একটু অতিরিক্ত কিছু আদায় করে নিল। সেই অতিরিক্তটুকুই ঈশ্বর।

কিন্তু যখন অন্নজল নেই?

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ঈশ্বরও নেই।

গুরুদাস এ সব তার্কিকের দলে নয়। সন্দেহ করে সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাও করে। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে সুপ্রিয় তার বন্ধু, আলাদা বিভাগে হলেও একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, উঁচু ধাপের অফিসর সুপ্রিয়—এবং সর্বোপরি, আজকে তো তর্কের কথা উঠতেই পারে না।

কি খবর? বিশুদ্ধ চিন্তায় মনে যে লাবণ্য আসে সেইটিই কান্তি হয়ে ফুটেছে সুপ্রিয়র দেহে-মুখে।

তুমি ক্ষণু, ক্ষণিকাকে চেন?

কে ক্ষণিকা?

আমার ভাগ্নী—

চোখ বুজল সুপ্রিয়। চিনতে পারল। সেই যার ডাকনাম টেঁপী?

হ্যাঁ, তার খবর শুনেছ?

না।

তার স্বামীটি মারা গেছে।

কদ্দিন?

এই বছর খানেক।

কিসে?

য়্যাকসিডেণ্টে—

কি জাতীয় দুর্ঘটনা বিশদ করে বলতে চাইছিল গুরুদাস, সুপ্রিয় বাধা দিল। বললে, বুঝেছি। অপঘাত।

তুমি তার স্পিরিট—আত্মা আনতে পারো?

আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

ভীষণ দমে গেল গুরুদাস। গলায় স্বর বেরুল কি বেরুলনাঃ কেন?

প্রেতলোকের বাসিন্দেরা বারেবারে একটা খবরই দিয়ে গেছে, ঈশ্বর আছেন, তাঁকে ডাকো তাঁকে ধরো। আমাদের ডেকে আমাদের ধরে লাভ নেই।

সে খবরের জন্যে প্রেতলোকে যেতে হবে কেন?

না, ওরা বলে, আমরা রাজধানীর কাছাকাছি আছি, তোমরা আছ অজ পাড়াগাঁয়ে। আমাদের থেকে খবর নাও, লাটসাহেব আছেন। আমরাই নির্ভরযোগ্য খবর দিতে পারি। আমাদের কেউ কেউ দেখেছে তাঁর মোটরগাড়ি তাঁর পাইকপেয়াদা। এই খবর পেয়ে এখন ওদিকে এগোও। তাই এখন সেই চেষ্টাই করছি। কিভাবে চেষ্টা করতে হবে তারও কিছু কিছু পাঠমালা পেঁৗছে দিয়েছে দয়া করে—তা ছাড়া—

তা ছাড়া—কান খাড়া করল গুরুদাস।

তা ছাড়া, যাকে ধরবার জন্যে এই প্রেতচর্চা, তিনিই কখন সখন দেখা দেন মূর্তি ধরে।

দেখা দেন? প্রায় লাফিয়ে উঠল গুরুদাস। কে তোমার স্ত্রী?

হ্যাঁ। শাশ্বতী।

কদ্দিন মারা গেছেন?

দেহ রেখেছেন। এই দু'বছর।

দেখা দেন, কথা হয় তাঁর সঙ্গে?

কথা হয় বৈকি। শুধু ছুঁতে দেন না। ছুঁতে চাইলেই নিষেধ করেন। কতদিন সিঁদুর দিতে গিয়েছি, সরে গিয়েছেন। ব্যাকুল হয়ে এগোতে গেলেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

কে জানে কাব্যকথা হয়তো। তবু দিনের বেলায়ই কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল গুরুদাসের। বললে, তুমি অনেক উঁচুয় উঠে গিয়েছ। কিন্তু মেয়েটার প্রতি যদি একটু কৃপা করো।

খুব কান্নাকাটি করছে? খুব কান্নাকাটি করলে আসতে চাইবেন। আত্মা।

না, এতদিনে সে ঝড়ের অবস্থাটা গেছে। তবু শোকের তো আর শেষ নেই। শেষ সময়ে কাছে ছিল না, একটা কথা বলে যেতে পারল না, শুনে যেতে পারল না—তারই জন্যে একটু আনতে চায় শুনতে চায়। যদি একটু সান্ত্বনা দিতে পারো—পরোপকার—

এই স্পিরিট আনার ব্যাপারটা তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি। ঠিক রেডিওর কাণ্ড। এক পারে একটা ট্রান্সমিটিং স্টেশন, আরেক পারে একটা রিসিভিং সেট। একটা পাঠাবার যন্ত্র, আরেকটা ধরবার। দুটোই নিখুঁত হওয়া চাই। যে আসবে তারও চাই ব্যাকুলতা আর যে আনবে তারও চাই তেমনি সুরবাঁধা দেহ। এপারের দেহ যদি শুধু কাঠ হয় ধ্বনি শোনা যাবে না, তেমনি ওপারের বিদেহ যদি উৎসুক না হন তা হলে অবস্থা হবে বাজনা আছে বাজিয়ে নেই। সুতরাং দুয়ের যোগ হলেই শুভযোগ। যদি কোথাও দেখ ফল হয়নি, জানবে যন্ত্রের গোলমাল। যন্ত্র যত জোরালো ততই নির্ভুল সাড়াশব্দ।

তা হলে তুমি একদিন বসো।

আমি বসলে হবে কেন? ক্ষণিকার স্বামী কি আমাকে চেনে? আমার কাছে আসতে তার আগ্রহ হবে কেন? ক্ষণিকাকে বসতে হবে।

বা, ক্ষণু তো বসবেই। কখন বসতে হবে বলো, কবে?

প্রথম একবার বসলেই কি পাওয়া যাবে? তার জন্যে আগে একটু কাঠখড় পোড়ানো চাই।

যথা?

একজন গাইড ধরতে হয়। যে আমাদের বৈঠকে পরিচিত এমন কেউ। সে আগে খুঁজে বের করবে কোন ঠিকানায় রয়েছে ক্ষণিকার স্বামী। কি নাম বললে?

শচীন্দ্রনাথ—

ওতেই হবে। খুঁজে পেলে তারিখ ও সময় ঠিক করে যাবে কখন তাকে আনতে পারবে পৃথিবীতে। সেই অনুসারে বসলে পাওয়া যাবে শচীন্দ্রকে। নচেৎ নয়।

এমন গাইড হবে কে?

ফ্রেণ্ডলি গাইড চাই। সে আমার স্ত্রীকে বলা যাবেখন। সে আনতে পারবে খুঁজে পেতে। তুমি আগে শচীন্দ্রের বিবরণগুলো আমাকে দিয়ে যাবে। কবে কোথায় জন্ম, কবে কোথায় মৃত্যু, বাপ-ঠাকুরদার নাম কি, বাড়ি কোথায়, কি কাজ করত, কত বয়স, যতদূর যা সম্ভব। এসব একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে এনে বলে দেব। তিনি খুঁজে দেখবেন। কখনো-কখনো বের করতে দেরি হয় কখনো বা পাওয়াই যায় না, আবার কখনো বা চট করে পেয়ে যায় হাতের কাছে। খুঁজে পেলে তিনি জানাবেন কবে কখন বসতে হবে।

যে সব বিবরণ দরকার আমি এখুনি দিয়ে যাচ্ছি।

লিখে দাও। সম্ভব হলে শচীন্দ্রের একটা ফটোও দিয়ে যেও। লোকটিকে দেখে যেতে পারলে আমার স্ত্রীর পক্ষে সুবিধে হবে।

তারপর দিনক্ষণ ঠিক হলে কি করতে হবে?

হ্যাঁ, আগে থেকেই বলে রাখি, একটি ঠাকুরঘর চাই বাড়িতে। আছে?

তা কোন না আছে?

নিশ্চয়ই নিচের তলার কোণের ঘরটিতে, সিঁড়ির নিচে, তাই না? হাসল সুপ্রিয়। যে তলাতেই থাক সে তলাতেই বসতে হবে।

আবার পূজোর ঘর লাগবে কেন?

বলা মুশকিল। কোথাও একটু শুচিতার পরিবেশ চায় হয়তো।

আর?

সেদিন বলে দেব। বিশেষ হ্যাঙ্গাম নেই। এস কদিন পর।

কদিন পরে খোঁজ নিতে এল গুরুদাস।

সব ঠিক আছে। শাশ্বতী দেখা পেয়েছে শচীন্দ্রের। আগামী বুধবার রাত নটার সময় আসবে।

আসবে?

তাইতো বলে গিয়েছে। বেশি ঘোরাঘুরি করতে হয়নি নাকি, সহজেই পেয়ে গেছে।

সত্যি? পাওয়া গেছে? ক্ষণিকার উৎসাহেরই যেন প্রতিধ্বনি করল গুরুদাস।

বসলেই বোঝা যাবে কতদূর কি হয়।

এখন কি করে বসতে হবে বলো।

কিছু নয়। একটা টেবিল জোগাড় করো। চারপেয়ে টেবিলেই চলবে। যে কোনো সাইজের যে কোনো ওজনের। বেশি বড় ও ভারি টেবিল নিলে বেশি শক্তিশালী রিসিভিং সেট দরকার। ওপারেও চাই বেশি স্পিরিটের

জনতা। নইলে নড়াবে কি করে? আর, না নড়লে স্থূলজ্ঞানে প্রমাণ হবে কি করে যে তারা এসেছে? সুতরাং ছোট দেখেই টেবিল নিও। কিছু ধূপকাঠি, গঙ্গাজল, লেখবার কাগজ—পেন্সিল—এই আর কি।

শুধু এই?

হ্যাঁ, দেখো, রাষ্ট্র করে যেন বেশি লোক জমায়েৎ কোরো না। কৌতূহলীকে প্রেতাত্মারা ভীষণ অপছন্দ করে, ভালোবাসে বিশ্বাসীদের। কৌতূহলীর ভিড়ে আসতে চায় না, বিশ্বাসীর দলে আরাম পায়। এ ঠিক আমার-তোমার মনোভাব। সেই আড্ডায় আমরা যেতে চাইনা যেখানে আমাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখে। সেই আড্ডায়ই আমরা যেতে চাই যেখানে আমরা সুস্বাগত। কোথায় বসবে?

ক্ষণু এখন বাপের বাড়িতে আছে সেইখানে। কিন্তু কে কে বসবে?

ক্ষণিকা আমি তুমি ও আরেকজন।

ওরে বাবা, আমি পারব না।

কেন, ভয় কি। নিজের হাতে দেখই না অনুভব করে ব্যাপার কি।

আচ্ছা, শুনতে পাই সবই নাকি অবচেতন মনের কাণ্ড?

বেশ তো, দেখই না পরীক্ষা করে। কতটুকু অবচেতন মন কতটুকুই বা অলৌকিক। কতটুকু বিজ্ঞান, কতটুকুইবা অবিজ্ঞেয়। তা ছাড়া মনের মত অলৌকিক আর কী আছে, তারই বা একটু হদিস নাও।

আর কিছু নির্দেশ আছে?

হ্যাঁ, তোমার ভাগ্নীকে বলবে সেদিন যেন উপোস করে থাকে। ঠিক নির্জলা নয় এই একটু লঘু আহার।

তা আর বলতে হবে না।

আর যেন খানিকক্ষণ হরিনাম করে। যতক্ষণ সম্ভব। বা যতক্ষণ ইচ্ছে।

আবার হরিনাম কেন?

এই একটা কিছু অনুরাগের ধ্বনি। ঈথরে একটু অনুকূল কম্পন। ভালো বেহালা বা বাঁশি বা শঙ্খধ্বনি করলেও হতে পারে। কিন্তু বলো তেমন করে ডাকতে পারলে হরিনামের মত প্রিয়নাম আর কী আছে?

বেশ, বলব।

এই শরীরটাকে একটু সুরে বেঁধে নেওয়া আর কি। একটা সূক্ষ্ম সুর ধরবে একটু তৈরি করে নেবে না যন্ত্রটাকে?

বরাদ্দ দিনে সুপ্রিয় গিয়ে দেখল আট-দশজনের ভিড়। সবাই বললে, আমরা বিশ্বাসী, সশ্রদ্ধ, কেউই কৌতূহলী নই।

চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় না। কিন্তু সবাই কনিষ্ঠ আত্মীয়, কাকে ছেড়ে কাকে বারণ করবে। বসুক দূরে-দূরে, দেখুক, বুঝুক—

সমস্ত কিছুকে আড়াল করেছে ক্ষণিকা নিজে। এককথায় বলা যেতে পারে, শোকশ্রী। দুঃখ একটা আশ্চর্য শক্তি। আয়ত চোখে নিস্পৃহ স্নেহ, মুখমণ্ডলে অসংকোচ ভক্তি। সমস্ত ভঙ্গিটিতে বিশ্বাসের নম্রতা। একেবারে যে নিরম্বু বিধবার সাজ পরে নি তাতে শান্তি পেল সুপ্রিয়। হাতে সোনার চুড়ি, ধোপভাঙা শাড়ির পাড়টি ঢালা সবুজ। ঠিকই করেছে। মৃত্যু বলে কিছু নেই। এ ঘর আর ওঘর। এখুনি প্রমাণ পাওয়া যাবে হয়তো।

বেশ বড় ঘর। জানলা-দরজা খোলা। আলো জ্বলছে। পুড়ছে ধূপকাঠি। চারপেয়ে টেবিল পড়েছে মাঝখানে। চারদিকে চারখানা চেয়ার। কাছে একটা টুলের উপর কাগজ-পেন্সিল। গুরুদাসকে জোর করে রাজি করানো হয়েছে, যদিও সে বলতে চেয়েছিল উপোস-টুপোস ধাতে সয়না আর হরিনামের বানান শিখিনি এ পর্যন্ত।

আর চতুর্থ, ক্ষণিকার ছোট ভাই বিজন।

সুপ্রিয় বললে, আমাদের দুজনের উপোসেই হবে, আমার আর ক্ষণিকার। তোমরা শুধু পাশে বসে একটু হাত রাখো টেবিলে। অর্কেস্ট্রার হালকা বাজনা তোমাদের দিচ্ছি। পাশের ঘরে বা প্যাসেজে যারা বসেছে তাদের উদ্দেশ করে বললে, চুপচাপ থাকুন। আর যদি ভয় পাবার কারণ ঘটে দয়া করে ভয় পাবেন না।

লঘু উপেক্ষায় হাসল একটু সকলে।

গুরুদাস বললে, টেবিলের উপর হাত রেখে শচীনের কথা চিন্তা করতে হবে তো?

মোটেই না। নেমন্তন্নের কার্ড আগেই পাঠানো হয়েছে। তারা তৈরি। এখন গাড়ি পাঠালেই হয়।

গাড়ি?

হ্যাঁ, ধ্বনির গাড়ি, ধ্বনির গাড়ি পৌঁছুলেই রওনা হবে। তবে একটা কথা বলে রাখি, ক্ষণিকাকে লক্ষ্য করল, যদি আসে কাঁদতে পাবে না।

না।

কান্না বলে কিছু নেই। অনন্ত জীবন, অনন্ত যাত্রা।

আর দেরি করে লাভ কি? ব্যস্ত হয়েছে ক্ষণিকা। আলোটা নিভিয়ে দেব?

বড় ভালো লাগল। বুঝি বা কিছু আছে আলো জ্বালা থাকলেও লোকে ভাববে। তবু ঘর অন্ধকার করবে না বলেই ঠিক করেছিল সুপ্রিয়। ক্ষণিকার এই প্রশ্নে সাহস পেল। যেন মমতার গভীর স্পর্শ বেজে উঠল কণ্ঠস্বরে। যেন যারা আসবে তারাই বলল। প্রথমটা বেশি আলো ভালো লাগে না। বহুদিন পরে নতুন পরিচয় একটি ধূসরতাই আশা করে হয়তো।

দাও। তার আগে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও সকলের গায়ে।

এ আবার কেন? বলে উঠল গুরুদাস।

সংস্কার। বাতাসের সঙ্গে গন্ধ যায় তেমনি আত্মার সঙ্গে সংস্কার।

আলো নিভিয়ে দিল। এপাশে ওপাশে দু-একটা না-জ্বললে নয় আলো জ্বলছে বাইরে। তবু যারা জমায়েৎ হয়েছিল জলের ছিটায় কেমন একটু শিউরে উঠল। থমথমে হয়ে উঠল বাড়ির ভিতরটা। বোমা-পড়ো-পড়ো কলকাতার আকাশের মত।

টেবিলের উপর আলগোছে হাত রেখে বোস। যদি মন শূন্য করতে না পারো সমুদ্র ভাবো—

গাড়ি ছাড়ল সুপ্রিয়। অর্থাৎ দরাজ গলায় নামকীর্তন শুরু করল।

সভ্য সমাজে বিন্দুমাত্র সংকোচ না রেখে কেউ গলা ছেড়ে নাম করতে পারে এ একেবারে ভাবনার বাইরে। একটা বিলিতি আফিসে সাহেব সেজে কাজ করে তার এ কি দুর্গতি। ভাবতে না ভাবতেই কাজ হল। হাতের নিচে টেবিলটা নড়ে উঠল। শুধু নড়ে উঠলনা, থরথর করে হাঁটতে লাগল, ঘুরতে লাগল, দুলতে লাগল নৌকার মত। গুরুদাসের মনে হল পা তুলে তার কোলের উপরেই উঠে আসে বুঝি!

ভূত, ভূত—লাফিয়ে উঠে আলো জেলে দিল গুরুদাস।

এক মুহূর্তে স্তব্ধ হল টেবিল। কিন্তু আবার গুরুদাস স্থির হয়ে বসে টেবিলে হাত রাখতেই টেবিল ফের নড়া শুরু করলে।

আলো থাক। বললে সুপ্রিয়। আলো বরং ভালোই করবে। বলে আবার হরিনামের ঢেউ তুললে।

তাকাল একবার ক্ষণিকার মুখের দিকে। চোখদুটি বোজা, মুখ যেন পাষাণ। যেন কোন গভীরের প্রতিলিপি!

যেমন ছন্দে নাম করে তেমনি ছন্দে

টেবিল নড়ে। টেনে-টেনে বললে বিলম্বিত, তাড়াতাড়ি বললে দ্রুত তাল।

সাবকনসাস মাইন্ড—চেঁচিয়ে উঠল গুরুদাস।

অমনি হাত তুলে নিল সুপ্রিয়। যে-মন রয়েছে আঙুলের আগায় সে-মনকে সরিয়ে নিল। আর হাত তুলে নিতেই টেবিল হাঁটতে লাগল নিজের থেকে, এঁকে-বেঁকে ঘুরতে-ঘুরতে এগুতে লাগল প্যাসেজের দিকে।

প্যাসেজের লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল! কিন্তু কথা রেখেছে, চেয়ার সরানোরই যা শব্দ করেছে হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ করেনি। অজ্ঞান হয়ে পড়েনি।

কতদূর গিয়ে থেমে পড়েছে টেবিল। সুপ্রিয় উঠে গিয়ে তাতে আবার হাত রেখে নামের সঞ্চার করে দিল। আবার টেবিল শুরু করল চলতে।

ওদিকে যাচ্ছে কেন?

জিগগেস করো তো ওদিকেই ঠাকুরঘর কিনা।

ঠিক। প্যাসেজের পারেই ঠাকুরঘর। কি আশ্চর্য, কে সেটিকে বন্ধ করে রেখেছে বাইরে থেকে তালা দিয়ে। টেবিল নিজে থেকে তাকে ধাক্কা মারছে। একবার দুবার—শিগগির খুলে দাও দরজা।

দরজা খুলে দিল। আবার তাকে ছুঁয়ে দিল সুপ্রিয়। টেবিল ছুটে উঠল গিয়ে সিংহাসনে। বাসনকোসন সব তছনছ করে দিল। প্রণামের ভঙ্গিতে পড়ল নত হয়ে।

দুবাহুর মধ্যে করে টেবিলকে তুলে নিয়ে এল আগের ঘরে। সুপ্রিয় বললে, ঠাকুর-প্রণাম হয়েছে, এখন শান্ত হও।

ডাক্তার, ডাক্তার—কে কোথায় শান্ত হবে! কে একজন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। জল, জল, পাখা—

আবার আসন ছাড়ল সুপ্রিয়। কাছে গিয়ে বললে, কোনো ভয় নেই। ডাক্তার ডাকতে হবে না। আমি এখুনি ঠিক করে দিচ্ছি। এ অবস্থায় কি করতে হবে, তা আমাকে শেখানো আছে। কেন যে সব ভিড় করতে আসে! বলে, বিশ্বাসী! বিশ্বাসী কখনো অজ্ঞান হয়? বলে সংজ্ঞাহীনের কানে কি মন্ত্র পড়ল সুপ্রিয়। মুহূর্তমধ্যে লোকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। বললে, না, কিছু না।

আবার এসে বসল চেয়ারে। বললে, আর জ্বালিয়ো না, এবার দুটো মনের কথা খুলে বলো। কাকে দিয়ে লেখাবে? আমি এক, গুরুদাস দুই, বিজন তিন, ক্ষণিকা চার। টেবিলে শব্দ করে জানাও।

ঠক ঠক ঠক ঠক।

পর পর চারবার টেবিলটা নিজের থেকে বেঁকে গিয়ে পায়া ঠুকে শব্দ করলে।

এতটুকু ঘাবড়াল না ক্ষণিকা। কাগজ পেন্সিল কুড়িয়ে নিল হাত বাড়িয়ে।

নিজের থেকে কিছু লিখো না। কেউ হাত ঘুরিয়ে লেখাতে চাইলেও বাধা দিও না।

তুমি কে? জিগগেস করলে ক্ষণিকা।

ক্ষণিকার হাতে লেখা হলঃ আমি।

আমি কে?

ক্ষণিকা আবার লিখলেঃ ও, গলার আওয়াজ তো তুমি শুনতে পাচ্ছ না। আমি—ইংরিজি-বাঙলায় বড় বড় হরফে ক্ষণিকা লিখলেঃ শচীন্দ্রনাথ—

তুমি যে সত্যি সেই, তা কি করে বুঝব?

নিজের হাতে লিখে যাচ্ছে ক্ষণিকাঃ আমার ম্যারেজ য়্যান্ড মর‍্যালস বইয়ের ফাঁকে তিরিশ টাকার তিনখানা নোট গোঁজা আছে। দেখ, পাবে।

সে বই তো তোমাদের বাড়িতে। কি করে দেখব?

না। সে বই তুমি তোমার সঙ্গে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছ পড়বার জন্যে। তোমার বাক্সেই সেটা আছে। দেখ খুলে।

বাক্স খোলা হল। পাওয়া গেল বই। বইয়ের পৃষ্ঠার ভাঁজে তিরিশ-তিরিশটা টাকা।

আরো অনেক সব প্রমাণ। চশমার খাপে সোনার বোতাম পড়ে আছে দেখ। ফাউন্টেন পেনের কালির বাক্সের মধ্যে ডাইং-ক্লিনিংএর রসিদ। কার কাছে কটা টাকা পাবে। কোন ব্যাঙ্কে পড়ে আছে কিছু তলানি। অনেক সব অন্তরঙ্গ কথা। কেমন আছে? কোথায় আছে? ওটা কোনরকম থাকা নাকি? কি করে? কি ভাবে? কেন চলে গেল অকালে?

আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো।

টেবিলটা নিজের থেকে লাফিয়ে উঠল দুবার। লেখা বেরুল ক্ষণিকার হাতেঃ এই দুর্লভ জীবন স্বেচ্ছাচারচিত দুর্ভিক্ষে নষ্ট ক'রো না। জীবনে-যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মত বয়ে যাও হু হু করে।

বেশ বলেছ। মুখে বলল ক্ষণিকা। কোথায় আমার শান্তি? আমার আশ্রয়!

স্পষ্ট লিখছে ক্ষণিকা নিজের হাতেঃ যে মহদাশয় এসেছেন তোমার ঘরে তাঁকে ধরো, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নাও, নাম নাও, মন্ত্র নাও—সেইখানেই তোমার পরা-গতি, পরা-সিদ্ধি—

পেন্সিলটা থামাল জোর করে। বললে, আমাকে দেখা দিতে পারো?

লেখা হলঃ পারি।

পারো?

হ্যাঁ, তবে এ বাড়িতে নয়।

কোথায়?

সুপ্রিয়বাবুর বাড়িতে। সেখানে প্রেতাত্মারা আসে। তাঁর স্ত্রী আসেন। পুণ্যস্থান। সেখানে দেখা দেওয়াই সহজ। দিন-ক্ষণ আমি বলে দেব স্বপ্নে—

ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্ষণিকা। বললে, না, না, এখানে এ বাড়িতে দেখা দেবে। আমার নির্জন ঘরে। নয়তো ছাদের উপর। মধ্যরাত্রে, শেষরাতে। স্বপ্নে নয়, স্বপ্নে দেখে শান্তি নেই। বাস্তব চোখে দেখতে চাই, ধরতে চাই—

হঠাৎ লেখা পড়লঃ আমরা এবার যাব। মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।

আর কারু কথা। সুপ্রিয় বললে, শাশ্বতীর।

এবার ছেড়ে দিন। পড়ল শেষ লেখা।

হাত ছেড়ে দিল। পুরো কথাটা শেষ হতে পারল না।

হাত তুলে নিতেই টেবিল আবার ছুটল ঠাকুরঘরের দিকে। ঠাকুর-প্রণাম করে যাবে। এবার ঘর খোলা, লোকজনের মন বিগলিত, সহজেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারল ভিতরে। নুয়ে পড়ে প্রণাম করল টেবিল।

গুরুদাস বললে, অপরিমেয় ব্যাপার।

ডিভানে বসে আছে শাশ্বতী।

আমি জানি আজ রাতে তুমি আসবে। দেখা দেবে। স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে কাল! পূজোর ঘর থেকে মাতালের মত বেরিয়ে এল সুপ্রিয়। গভীর ধ্যানের পর দেহে-মনে অপার্থিব মাদকতা আসে, পা টলে। দেয়াল ধরে ধরে এগুতে হয়।

ঘরে মৃদু নীল আলোটি জ্বলছে। চাঁদের আলোও মিশে গেছে নীল হয়ে।

এস, আজ দিনটি তো জানো, তোমাকে পরিয়ে দি সিঁদুর।

আর আর দিন নড়ে-চড়ে ওঠে। আজ স্থির হয়ে বসে রইল। ছোঁয়ার ভয়ে পালিয়ে যায়, আজ যেন ছায়ারই প্রাণ নেই।

রুপোর কৌটো খুলে আঙুলে করে সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দিল কপালে।

এ কি, স্পষ্ট ছোঁয়া যায় যে। কঠিন মাংসল কপাল। স্পষ্ট চুল, স্পষ্ট সিঁথি।

তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে ঝাঁজালো আলোটা জ্বালাল সুপ্রিয়।

চেঁচিয়ে উঠল নারীমূর্তিঃ এ কি, স্বপ্ন তো আমিও দেখেছিলাম। কিন্তু আমি তো শাশ্বতী নই, আমি ক্ষণিকা।

কেন এ রকম হল কে জানে! আচ্ছন্নের মত বলল সুপ্রিয়, তবে, চিরকালই, আজ যা ক্ষণিকা, কাল তা শাশ্বতী।

চোখ গেল

সুবোধ ঘোষ

শিলং-এর কুয়াশা খেয়ালী হলেও কেমন একটু অলস ও শান্ত। দেখে তবু বোঝা যায়, আর কতক্ষণ থাকবে, কোন্ দিকে চলে যাবে, কিংবা গলেই যাবে কি না।

কিন্ত সেই শিলং-এরই মিস্টার নাগের ভাগ্নী অপরাজিতা রায় যেন এক ছটফটে খেয়ালের কুয়াশা। গত পূজার সময় কলকাতার দিক থেকে শিলং-এ এল এবং এখনো শিলং-এই আছে। কিন্তু আর কতদিন যে থাকবে, কিংবা একেবারে থেকেই যাবে কি না, দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

থাকলেও, শেষ পর্যন্ত দু'জনের মধ্যে কার দিকে যে ঢলে পড়বে আর গলে যাবে এই

নবাগতা কুহেলিকা, তা'ও এখনো কিছুই অনুমান করতে পারা যাচ্ছে না।

বাজার-দোকানের কলমুখরতার প্রান্ত থেকে একটু দূরে, লাবান-এর নিভৃতে একটা গড়ানো জমির গায়ে ছবিঘরের মত সাজানো ছোট বাংলোটাই হলো মিস্টার নাগের বাড়ি। বাড়ির ফটকটা লতানে গোলাপের তোরণের মত। লতার মধ্যে থোকা থোকা সাদা গোলাপ হাসে, আর, যেন সেই লতানে গোলাপের হাসি নিজের মুখে তুলে নিয়ে অপরাজিতা রায় ঐ ফটকেরই কাছে দাঁড়িয়ে কিংশুককে স্বাগত আনন্দের ভঙ্গী নিবেদন করে সকালের দিকে, আর হিরন্ময়কে সন্ধ্যায়। হাসির কম-বেশি হয় না। তাই বুঝতে পারা যায় না, অপরাজিতার মন কোন্ দিকে, কার দিকে? খল্-খল্ ক'রে হেসে ওঠে সামনের বাড়ির ঐ জানালায় দাঁড়িয়ে অঙ্কের প্রফেসরের দুই মেয়ে, মীরা আর হীরা।

বোকা নয় অপরাজিতা, মীরা আর হীরার ঐ হাসির অর্থ বুঝতে পারে। ঐ হাসি যেন একটা মিস্টিমাখানো টিটকারির ঝঙ্কার। অঙ্কের প্রফেসরের দুই মেয়ের চোখেও যেন অঙ্ক আছে, এক পলকে দেখে নিয়েই হিসাব ক'রে বুঝে ফেলতে পারছে, এতদিন হয়ে গেল তবুও দুজনের কারও জন্যই অপরাজিতা রায় তার মুখের হাসির মাপে কম-বেশি করতে পারছে না। মীরা আর হীরা হয়তো মনে করছে যে, দু'জনকেই ভালবেসে ফেলেছে অপরাজিতা রায়।

সন্ধ্যাবেলায় ফটকে দাঁড়িয়ে বিদায় নেবার সময় হিরন্ময় বলে—আজ তাহ'লে আসি অপরা।

সকালবেলায় তেমনি ঐ ফটকেই দাঁড়িয়ে লতানে গোলাপের একটা পাতা পট্ ক'রে ছিঁড়ে নিয়ে কিংশুক বলে—আজকের মত বিদায় দাও জিতা।

সামনের বাড়ির জানালার কাছে খল্-খল্ ক'রে হেসে মুখ লুকিয়ে ফেলছে অঙ্কের প্রফেসরের দুই মেয়ে। মীরা আর হীরার কানেও বোধ হয় অঙ্ক আছে। শোনামাত্র হিসেব ক'রে বুঝে ফেলছে যে, অপরাজিতা যেন নিজেকে দু' টুকরো ক'রে ফেলেছে। একটা টুকরো হলো অপরা, আর একটা জিতা। ভালবাসাকে সমান দুই ভাগে ভাগ ক'রে দুই দাবীদারের হাতের কাছে তুলে দিয়েছে অপরাজিতা।

ভুল ধারণা করেছে মীরা আর হীরা। ঐ সব ধারণার কোনটাই সত্য নয়। অপরাজিতা রায় ভালবাসে শুধু নিজেকে।

হিরন্ময় আসে, কিংশুকও আসে, কিন্তু দু'জনের কাউকেই সত্যি ভালবেসে ফেলেনি অপরাজিতা। তবে নিজের মনের দিকে তাকিয়ে এই সত্য অস্বীকার করতে পারে না অপরাজিতা, তার ভালবাসার জীবনে এই দুজনেরই একজনকে আহ্বান করতে হবে।

গত তিন মাসের মধ্যে অন্তত বার দশেক তো হবে, মামিমাও বেশ স্পষ্ট ক'রে অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রেই ফেলেছেন—কি রে, তুই এখনো কিছু বলছিস না কেন?

হয় হিরন্ময় নয় কিংশুক, দু'জনের কোন একজনের নাম মামিমার কাছে মুখ খুলে বলে দিতে হবে এবং তার পর বোধহয় আর দশটা দিনও লাগবে না, তারই সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে অপরাজিতার।

সত্যিই, অপরাজিতার মনের মধ্যে একটা কুহেলিকাই যেন ছটফট করছে। হিরন্ময় আর কিংশুক, রূপে-গুণে দু'জনেই ভাল। কিন্তু দু'জনের দুই ভালত্বের মধ্যে মস্ত বড় একটা পার্থক্য আছে। তবু বুঝে উঠতে পারে না অপরাজিতার মন, কা'র ভালবাসা পেলে সুখী হবে তার জীবন। দুপুরের সূর্য আর শেষ রাতের চাঁদ, এই দু'য়ের মধ্যে কত পার্থক্য। কিন্তু এর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বললে কেউ যদি দোমনা হয়, আর ফাঁপরে পড়ে, তবে তা'কে দোষ দেওয়া যায় না।

কে জানে, মীরা-হীরা হয়তো অপরাজিতা রায়ের মনের গভীরে একটা লজ্জার কাঁটা ফুটিয়ে দেবার জনাই ওরকম খল্‌খল্ ক'রে হাসে, কিন্তু জানে না ওরা, অত নরম মাটির মন নয় অপরাজিতার। নরম পাথরের মন। ওদের ঐ টিটকারির ঝঙ্কারের মধ্যে অপরাজিতা রায় একটা হিংসুটে আক্ষেপের কাতরানিই শুনতে পায়। অপরাজিতা এখানে আসবার পর থেকে লাবান-এর অমন সুন্দর মীরা-হীরাও নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। এখন সব আলো নিয়ে ফুটে রয়েছে শুধু অপরাজিতা। মামা মিস্টার নাগকেই গাড়ির পিছনের সীটে বসিয়ে অপরাজিতা নিজে স্টিয়ারিং-এর চাকা ধরে বসে, আর এক-টানা গাড়ি ছুটিয়ে চলে যায় গল্‌ফের মাঠের দিকে। অনেক ঘুরে আর অনেক বেড়িয়ে যখন আবার বাড়ির দিকে গাড়ি ফেরায় অপরাজিতা, তখন দেখা যায়, অপরাজিতার ঝকঝকে মুখটা বেশ একটু ক্লান্ত হয়েছে, আর সেই মুখের উপর রুক্ষ ও ফাঁপানো চুলের এক একটা সাজানো স্তবক লুটোপুটি ক'রে ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও কী সুন্দর দেখায়। অপরাজিতা জানে, পথের দু' ধার থেকে অনেক চক্ষুর বিস্ময় ওরই মুখের দিকে তাকিয়ে উতলা হয়ে যাচ্ছে।

কা'কে ভালবাসতে হবে, ঠিক এই প্রশ্ন আজও দেখা দেয়নি অপরাজিতার মনে, কারণ অপরাজিতার কল্পনায় আর আকাঙ্ক্ষায় এই প্রশ্নটা জীবনের প্রথম প্রশ্ন নয়। তবে কি দ্বিতীয় প্রশ্ন? তা'ও নয়। যার ভালবাসা নিতে ভাল লাগবে, তাকেই ভালবাসতে পারা যাবে, অপরাজিতাও তাকেই ভালবাসবে, এই তো সহজ ও সরল সত্য।

কিন্তু হিরন্ময়, না কিংশুক? কার ভালবাসা পেতে ইচ্ছে করে অপরাজিতার? যেমন অপরাজিতার মনের ভিতরে, তেমনি বোধহয় মামা-মামির, মীরা-হীরার এবং লাবান-এর আরও দশজনের চোখে এই প্রশ্ন ঘনিয়ে আছে। অপরাজিতার মনটাও যেমন বেছে নিতে পারে না, তেমনি মীরা-হীরাও বুঝে উঠতে পারে না, কা'কে বিয়ে করবে অপরাজিতা?

লতানে গোলাপের তোরণের কাছে দাঁড়িয়ে আজও যে হাসিমুখ নিয়ে অপরাজিতা রায় অভ্যর্থনা জানায় হিরন্ময়কে কিংবা কিংশুককে, সে হাসি অপরাজিতার জীবনেরই একটি জিজ্ঞাসা। অপরাজিতার মনের কুহেলিকা প্রতি মুহূর্তে ছটফট ক'রে ভালবাসছে অপরাজিতাকেই। অপরাজিতা যেন জানতে চায়, তার এই পঁচিশ বছর বয়সের সুন্দর জীবন যে সমাদর ও সম্মানের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে পিয়াসী লতার ফুলের মত, সে সম্মান ও সমাদর পাওয়া যাবে কার ভালবাসায়? হিরন্ময়ের কিংবা কিংশুকের? শেষ রাতের চাঁদ, অথবা দুপুরের সূর্য, কা'র আলো পেলে সব চেয়ে বেশি সুন্দর হয়ে উঠবে অপরাজিতা?

বললে, হিরন্ময়কেই বলতে হয় শেষ রাতের চাঁদ আর, কিংশুককে দুপুরের সূর্য। হিরন্ময় বেশ শান্ত, আর কিংশুক বেশ একটু তীব্র। এরাও দুজনেই কলকাতার দিক থেকে এসেছে, এরা শিলং-এর কেউ নয়। তবে এরা দু'জনেই যে টাকার মানুষ, সে কথা সারা শিলং ক'দিনের মধ্যেই দেখে বুঝে নিয়েছে।

টাকার দিক দিয়ে বিচার করলে হিরন্ময় আর কিংশুকের মধ্যে এমন কিছু ছোট-বড় পার্থক্য করা যায় না। হিরন্ময়ের জুট আর কিংশুকের আয়রন, শেয়ারের পরিমাণের হিসাব নিলে কাউকে কারও চেয়ে কম মহৎ বলে মনে হবে না। মিস্টার নাগের কাছে সে-সব তথ্যের কিছুই অজানা নেই। বেহালাতে হিরন্ময়ের পাঁচটি বাড়ি আছে, আর কিংশুকের বাড়ি আছে দমদমে, ছোট-বড় মিলিয়ে মোট সাতটি। হিরন্ময় হলো এক ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, আর কিংশুক হলো এক ইনসিওরেন্সের। এই শিলং-এই নিজের নিজের টাকায় কেনা দুটি শৌখীন বাংলোর আশ্রয়ে থাকে দু'জনেই। হিরন্ময় একটু

নিকটে আর কিংশুক একটু দূরে। রিলবং-এ এক উঁচু টিলার উপর এক পাইনকুঞ্জের ছায়ার কাছে হিরন্ময়ের বাংলো, বাংলোর গায়ে কাচের কাজই বেশি। আর ডাওকি রোডের পাশে এক নিভৃতে, যেখানে দূরের বনের বুক থেকে ভেজা তেজপাতার সুগন্ধ বাতাসে ভেসে আসে, সেখানে কিংশুকের বাংলো, বাংলোর গায়ে কাঠের কাজই বেশি। গাড়ি আছে দু'জনেরই। হিরন্ময়ের এক সীডান, আর কিংশুকের এক টুরার।

হিরন্ময়ের চোখ দুটো ছাড়া মুখের আর সবই দেখতে সুন্দর। আর, কিংশুকের মুখের মধ্যে একমাত্র চোখ দুটি সুন্দর।

আর, এছাড়া আরও দুটি সত্য আছে, যে সত্য হলো দু'জনের জীবনেরই দুটি ভয়ানক খুঁত।

হিরন্ময়ের চোখ হলো পাথরের চোখ। আর কিংশুক হলো বিবাহিত, স্ত্রী আছে; যদিও স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। একজনের চোখের মধ্যে এক অন্ধকারের আঘাতের দাগ, আর একজনের মনের মধ্যে আর এক অন্ধকারের আঘাতের দাগ। এই দুই আঘাতের দাগকে জীবনেরই খুঁত এবং সমান কঠোর ও হিংস্র দুটি খুঁত বলে মনে হয়েছিল অপরাজিতার। অপরাজিতার মত মেয়ের আকাঙ্ক্ষার জগতে দু'জনেই অস্পৃশ্য।

প্রথম যেদিন জানতে পেরেছিল অপরাজিতা, কী দুঃসহ মনে হয়েছিল সেই দুই কঠোর সত্যকে। কিন্তু তারপর আর নয়। একজনের শান্ত পাথুরে চোখের মায়ার আবেদনে এবং আর একজনের তীব্র ভাসা-ভাসা চোখের জ্বালার আবেদনে বুঝতে পেরেছিল অপরাজিতা, এই খুঁত জীবনের খুঁত নয়, এই দুটি ভাল মানুষের জীবনের দুটি দুঃখ।

চোখে একটা ছায়া-ছায়া কাচের চশমা, ফ্রেমটা সোনার, হাসি-হাসি মুখ নিয়ে, আর বাদামী রঙের ছোট্ট একটা স্প্যানিয়েলের গলার শিকল একহাতে ধরে গাড়ি থেকে নেমে যখন তর্-তর্ করে হেঁটে আসে হিরন্ময়, তখন কার সাধ্য বুঝবে যে, ঐ মানুষটার চশমার ছায়া-ছায়া কাচের পিছনে নিরেট একটা অন্ধতা দুটি পাথরের চোখের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

আর কিংশুক। মীরা-হীরা কতবার নানা স্টাইলের সাজে ফুরফুরে পরীর মত রঙীন হয়ে এই ফটকেরই কাছে কিংশুকের চোখের উপর দিয়ে বেণী দুলিয়ে যাওয়া-আসা করেছে। কিন্তু দেখেছে অপরাজিতা, কোন দোলা লাগে না কিংশুকের মনে। ভুলেও মীরা-হীরার দিকে একবার তাকায় না কিংশুক। এই দুটি মানুষ দেখতে-শুনতে পৃথিবীর কোন নিখুঁত মানুষের চেয়ে কম নিখুঁত নয়।

মীরা-হীরার খল্-খল্ হাসিকে শুনতে গিয়ে এক এক সময় সত্যিই ভয় পায় অপরাজিতা, আর নিজেরই উপর বিরক্ত হয়। ঐ হাসি যেন টের পেয়েছে অপরাজিতার মনের সমস্যাটা কোথায়। এতদিন ধরে দেখে আর শুনেও অপরাজিতা বুঝে নিতে পারলো না, কার ভালবাসা ভাল লাগবে, এটাও যে অন্ধতারই মত একটা ফাঁপরে-পড়া আর দিশেহারা দুর্বলতা। মীরা-হীরার হাসি অপরাজিতার মনের ঠিক সেই দুর্বলতারই মধ্যে যেন কাঁটা ফুটিয়ে দেয়; অপরাজিতার মনের অহংকারে ব্যথাও লাগে। কিন্তু আর কতদিন? এইভাবেই থমকে থেকে থেকে যদি একদিন দেখা যায়, ঐ লতানে গোলাপের তোরণে সীডানও আসে না, টুরারও আসে না, তবে? তবে সেই দিন অঙ্কের প্রফেসরের দুই মেয়ের খল-খল হাসির বিদ্রূপাক্ত ঝংকার সহ্য করতে না পেরে বোধ হয় ছুটে যেতে হবে চেরাপুঞ্জির সেই মুশমাই প্রপাতের পাগলা জলের উচ্ছ্বাসের কাছে, যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে অপরাজিতার অপমানিত এই সুন্দর মুখের জ্বালা চিরকালের মত হারিয়ে যাবে।

ভয়ই পায় অপরাজিতা। মিররের সামনে দাঁড়িয়ে তার নিজেরই এত আদরের আর এত সুন্দর করে সাজানো রূপের প্রতিচ্ছায়ার দিকে মায়া-ভরা চোখ তুলে তাকিয়ে বুঝতে পারে অপরাজিতা, নিজেরই উপর খুব নিষ্ঠুর একটা অন্যায় সে নিজেই ক'রে ফেলেছে। কিন্তু আর নয়।

মামিমাও হঠাৎ এসে বললেন—কিরে, এখনো কিছু বলছিস না যে?

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আর বাঁকা ক'রে আঁকা ভুরুর উপর রুমাল ছুঁইয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে কি-যেন ভেবে নেয় অপরাজিতা। তারপরেই উত্তর দেয়—আজই বলবো।

শুনে খুশি হয়ে চলে গেলেন মামিমা, আর সেইক্ষণেই লতানে গোলাপের তোরণের কাছে কিংশুকের টুরারের হর্ন বাজে।

ড্রইং-রুমের ভিতরটা যেন স্টেজেরই উপর সাজানো একটা নাটুকে প্রয়োজনের সেট। একটা কৌচের উপর বসে থাকে কিংশুক, আর তার একেবারে চোখের নিকটের এক কৌচের উপর অপরাজিতা। কিংশুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অপরাজিতা, অদ্ভুত একটা মুখরতার আবেগ যেন কিছুক্ষণ নীরবে ছটফট করে অপরাজিতার রঙীন দুই ঠোঁটের সুন্দর সন্ধিরেখার আড়া[…] প্রতিজ্ঞার অপরাজিতা। —[…] চলে করতে চান কিং[…] দিন

হয়তো এই […] ছিল না বলেই এ[…] বড়-বড় ভাসা-ভাসা চোখ[…] ভালই লাগে। কিংশুক উত্তর দেয়—তোমাকে ভালবাসি, তাই। এই সহজ কথাটা জানবার জন্য প্রশ্ন করতে হয় না জিতা।

অপরাজিতা—ভালবাসেন কেন?

কিংশুক—সুখী হবো বলে।

অপরাজিতা—কেন সুখী হবেন?

অপরাজিতার প্রশ্নগুলি যেন ভয়ে-ভয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে কি খুঁজছে। হেসে ফেলে কিংশুক। উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে যায়, আর অপরাজিতার মুখের কাছে বড়-বড় ও ভাসা-ভাসা দুই চোখের পিপাসার জ্বালা ভাসিয়ে দিয়ে কিংশুক বলে—সত্যিই কি জান না জিতা? কেন তোমাকে ভালবেসে আর বিয়ে ক'রে সুখী হবো আমি?

অপরাজিতা—না, বুঝতে পারি না।

কিংশুক—তুমি সুন্দর ব'লে।

যেন অপরাজিতার জীবনেরই জয় ঘোষণা করে দিয়েছে কিংশুক। অপরাজিতার রূপের মহিমাকে বন্দনা করছে এক পূজারী। দেখতে পায় অপরাজিতা, তার সুন্দর মুখের ছবি কী স্পষ্ট হয়ে ভাসছে কিংশুকের বড়-বড় চোখের তারার বুকের উপর।

অপরাজিতার মুখের আর একটু নিকটে এগিয়ে আসে কিংশুকের চোখ। মুগ্ধ হয়েই দেখতে থাকে অপরাজিতা, সে চোখে সত্যিই দুপুরের সূর্যের তৃষ্ণা ছটফট করছে। আস্তে হাত তুলে সেই তৃষ্ণাকে যেন সমাদর করেই থামিয়ে রাখে অপরাজিতা, আস্তে মুখ সরিয়ে নেয়।

অপরাজিতার মুখের সেই লাজুক ভয়ের রক্তচ্ছটার দিকে তাকিয়ে কিংশুক হাসে। —থাক্, তাহ'লে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করলে তো জিতা?

অপরাজিতা বলে—বিশ্বাস করি কিংশুক বাবু।

অপরাজিতার কাছ থেকে বিশ্বাসের উপহার নিয়ে চলে যায় কিংশুক।

আসে সন্ধ্যা, কিন্তু অপরাজিতার মনের মধ্যে শুধু কিংশুক, আর কেউ নয়। ঐ কিংশুকই হবে অপরাজিতার জীবনের সাথী। লতানে গোলাপের তোরণের কাছে সেই পাথরের চোখের মানুষটার চকচকে সীডান আজ শেষবারের মত এসে শেষবারের মত চলে যাবে। শেষ কথা বলে সেই সীডানকে

নবাগতা কুহেবিদায় দিতে হবে, এই একটিমাত্র অনুমান কর্ব্য বাকি আছে। তাই কৌচের উপর বাজাসে থাকে অপরাজিতা।

থেকে সীডানের হর্ন বাজে। বাদামী রঙের গা ছোট্ট স্প্যানিয়েলের গলার শিকল এক হাতে ধরে তর্‌-তর্‌ করে হেঁটে হিরণ্ময় ড্রইং-রুমের ভিতরে এসে ঢোকে। হাসি-হাসি মুখ নিয়ে প্রশ্ন করে—অপরা আছ?

—আছি। বসুন।

কৌচের উপর বসে হিরণ্ময়। এইবার একটি কথা বলে শুধু ওকে উঠিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র।

প্রস্তুত হয়ে এবং সামান্য ও ছোট মাত্র একটি শেষ-কথা বলতে গিয়েও দেরি করে ফেললো অপরাজিতা। এবং, দেরি করে বলেই দেখতে পায়, চশমার ছায়া-ছায়া কাচের পিছনে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে দুটি প্রাণহীন পাথুরে চোখ।

—আপনি কোন্‌ আশা নিয়ে এখানে আসেন হিরণ্ময়বাবু?

এক কথা বলতে গিয়ে যেন মুখ ফসকে অন্য কথা বলে ফেললো অপরাজিতা।

হিরণ্ময় বলে—ঠিক আশা নিয়ে আসি না অপরা। আশা করবার সাহস আমার নেই।

অপরাজিতা—তবে কি দেখতে আসেন?

হেসে ফেলে হিরণ্ময়—দেখতে আসি না, দেখবোই বা কেমন করে?

চমকে ওঠে অপরাজিতার সুন্দর চোখ, যেন হঠাৎ একটা কাঁকরের কুচি ছুটে এসে চোখে লেগেছে।

অপরাজিতা—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি হিরণ্ময়বাবু, কিছু মনে করবেন না।

হিরণ্ময়—বলো।

অপরাজিতা—আমি আপনাকে কেন বিয়ে করবো? কি লাভ হবে আমার?

হিরণ্ময়—ঠিকই বলেছ অপরা, তোমার কোন লাভ হবে না, লাভ হবে আমার। কিন্তু...।

অপরাজিতা—কিন্তু কি?

হিরণ্ময়—আমি তোমার মুখ কোনদিন দেখতে পাব না, কিন্তু পৃথিবী তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবে আর দেখামাত্র বলবে যে, তুমি......।

অপরাজিতা—বলুন।

হিরণ্ময়—তুমি মহীয়সী।

মহীয়সী? কুহেলিকার দুই চক্ষু থেকে দুর্বার এক পিপাসার দ্যুতি যেন চমকে ওঠে। যেন এই ধ্বনি শোনার জন্য অপরাজিতার পঁচিশবছর বয়সের জীবনের অহংকার প্রতীক্ষায় ছিল। পৃথিবীরই চক্ষে পূজার মূর্তির মত স্তবে ও গানে বন্দিত হয়ে রয়েছে অপরাজিতা। চক্ষুহীন হিরণ্ময়ের মুখের ঐ ছোট্ট একটা কথার মধ্যে যেন সেই ছবি দেখতে পাচ্ছে আর মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে অপরাজিতা।

হিরণ্ময় কুণ্ঠিতভাবে বলে—আমার কথা বিশ্বাস করলে তো অপরা?

উঠে দাঁড়ায় অপরাজিতা, আর কুণ্ঠাহীন স্বরে ও স্পষ্ট করে একটি কথায় সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয়।—*আপনারই কথা বিশ্বাস করি হিরণ্ময়বাবু।*

ড্রইং-রুম ছেড়ে সোজা হেঁটে ভিতরের বারান্দায় গিয়ে থামে অপরাজিতা। মামিমা বলেন—কিছু বলছিস?

অপরাজিতা—হ্যাঁ।

মামিমা—কি?

অপরাজিতা—হিরণ্ময়বাবু।

বিয়ের অনুষ্ঠান তখনো শেষ হয়নি, অপরাজিতার প্রসন্ন মনটা যেন তখন থেকেই কান পেতে রয়েছে, এই পৃথিবীর কাছ থেকে একটি ধ্বনির অভিনন্দন শোনার জন্য। মনে হয় অপরাজিতার, চারদিকের এই এতগুলি ভদ্র ও ভদ্রার মুখে মুখে এখনি এক বিপুল গুঞ্জন জেগে উঠবে—এ কি করলো অপরাজিতার মত মেয়ে। এ মহত্ত্বের যে তুলনা হয় না।

শুনতে পায় অপরাজিতা, আসর ঘরের দরজার পর্দার ওধারে মামিমার কাছেই রাগ করে কথা বলছেন ক্যাণ্টনমেণ্টের মাসিমা—ছিছি, এ কি কাণ্ড করলো অপরাজিতা। জেনেশুনেও অন্ধ ভদ্রলোককে বিয়ে করলো।

ফরেস্ট অফিসারের স্ত্রী মন্দ্রণা তালুকদারও মামিমাকে কথা শোনাচ্ছেন—একজন অন্ধের হাতে এত সুন্দর মেয়েটাকে আপনারা ছেড়ে দিলেন?

অপরাজিতার কান যেন পুড়তে থাকে। কিন্তু ঘর-ভরা লোকের চোখের সামনে হিরণ্ময়ের হাতে হাত দিয়ে ফেলেছে অপরাজিতা। এক অন্ধের স্বামিত্ব স্বীকার ক'রে নিল অপরাজিতা এবং সেই স্বীকৃতি রেজিস্ট্রারের খাতায় স্পষ্ট ভাষায় উৎকীর্ণ হয়ে গেল।

খল্‌-খল্‌ হাসির স্বর। মীরা-হীরা হেসেছে। শুনতে পায় অপরাজিতা, মীরা বলছে হীরাকে—এইবার শুভদৃষ্টি হবে।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই কুয়াশামাখা লাবান-এর এই সন্ধ্যাটা যেন অপরাজিতার জীবনের সবচেয়ে বড় কল্পনা আকাঙ্ক্ষা ও গৌরবের দাবীগুলিকে বিচার করে রায় দিয়ে দিচ্ছে, তুমি মহীয়সী না ছাই, তুমি একটা বেকুব খামখেয়ালের কুয়াশা।

অপরাজিতার ফাঁপানো রুক্ষ চুলের ক্রীম-মাখানো স্তবকের মধ্যে সিঁথির রেখা খুঁজে পাওয়া যায় না, নেই-ই বোধ হয়। তবু ক্যাণ্টনমেণ্টের মাসিমা অপরাজিতার সেই ফাঁপানো চুলের স্তবকের মধ্যেই এলোমেলো করে হাত চালিয়ে এক জায়গায় সিঁদুরের ছোট একটা দাগ এঁকে দিলেন।

কিন্তু তারপর, মাত্র এই সন্ধ্যার পরের *সন্ধ্যাটা আসবার আগেই রিলবংএ হিরণ্ময়ের বাড়ির এক কক্ষের নিভৃতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে অপরাজিতা, এই দাগটাই জ্বলন্ত অঙ্গারের রেখার মত শুধু জ্বালাবার জন্যই* ছুঁয়ে রয়েছে অপরাজিতার অদৃষ্ট।

পৃথিবীর কথা থাক, শুধু রিলবং-এর এই বাড়িটা অপরাজিতাকে কত মহীয়সী করে তোলে, বোধ হয় এই একটি মাত্র প্রশ্ন অপরাজিতার মনের মধ্যে শেষ কৌতূহলের ক্ষীণ আলোকটাকে মিটিমিটি ক'রে জাগিয়ে রেখেছিল, তাই একই গাড়ির একই সীটে অন্ধ হিরণ্ময়ের পাশে বসে এই বাড়িতে এসেছে অপরাজিতা, নইলে আসতোই না।

কুয়াশা ছিল না, পাইনের বাতাসে হা-হুতাশও ছিল না, দিব্যি আকাশ-রাঙানো বিকাল-শেষের আলো বাংলোর কাচের উপর পড়েছে। চুপ ক'রে বারান্দার সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে থাকে অপরাজিতা।

আর, বারান্দারই এক চেয়ারের উপর বসে একটা উল্লাসের আবেগে প্রায় চিৎকার করেই ডাক দেয় হিরণ্ময়—কাছে এস অপরা।

অন্ধের হাতের নাগালের প্রায় কাছে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অপরাজিতা। শিউরে ওঠে অপরাজিতার চোখ। এলোমেলো করে দুটো হাত তুলে পাথরের চোখের মানুষটা যেন তার আশে-পাশের আর সমানের বাতাস হাতড়াচ্ছে। যেন একটা স্পর্শ শিকার করছে দুটো অন্ধ থাবা। বারান্দায় এত আলো, কিন্তু লোকটা যেন নিরেট একটা অন্ধকারকে আঁচড়াচ্ছে।

অপরাজিতা বলে—বলো, কি বলছিলে?

হিরণ্ময় কৃতার্থভাবে হাসে—কালকেই নার্সকে মাইনে-পত্র চুকিয়ে-দিয়ে একেবারে বিদায় করে দিয়েছি।

গলার স্বরের তীক্ষ্ণতা কোনমতে চেপে অপরাজিতা প্রশ্ন করে—কেন?

হিরণ্ময় হাসে—এবার থেকে শুধু তোমার হাতের ছোঁয়া, নার্সের হাতের ছোঁয়ার দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে।

—কি বললে? অপরাজিতার প্রশ্নে তীক্ষ্ণস্বরের ধিক্কার আর চাপা থাকে না। রিলবং-এর বাড়ি হিংস্র হাসি হেসে অপরাজিতাকে এক বিনে মাইনের চাকরানির জীবনের অঙ্গীকার ঘোষণা

করছে। এই লোকটারই মুখে অপরাজিতা প্রথম শুনেছিল সেই কথাটা, তুমি মহীয়সী। আরাধনা করে ডেকে নিয়ে এসে এক মুহূর্তের মধ্যে লোকটা প্রভু হয়ে উঠেছে, আর তার অন্ধ জীবনের ঘরে সেবার দাসী হবার জন্য অপরাজিতাকে কাছে ডাকছে।

হিরণ্ময় বলে—তোমার হাত কোথায় অপরা?

এক পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ায় অপরাজিতা। মাথাটাকে এপাশে-ওপাশে একবার দুলিয়ে প্রশ্ন করে হিরণ্ময়।—তুমি বসে আছ, না দাঁড়িয়ে আছ অপরা?

অপরাজিতা—কেন?

হিরণ্ময় হাসে—যদি দাঁড়িয়ে থাক, তবে আর দাঁড়িয়ে থেক না, বসো।

বসে না, দাঁড়িয়েই থাকে অপরাজিতা। আর বসলেই বা কি? ঐ মানুষ কি দেখতে পাবে, আর দেখে খুশি হবে, কিভাবে আর কোন ভঙ্গী নিয়ে বসে আছে অপরাজিতা? অপরাজিতার এই মূর্তি ওর চোখের সামনে ছটফট করলেও ওর চোখের নিরেট অন্ধকার একটুও কেঁপে উঠবে না।

হঠাৎ বলে ওঠে হিরণ্ময়—একটা কথা বলতে পারি অপরা, কিন্তু তুমি শুনলেও বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারবে না।

বিস্মিত হয় অপরাজিতা।—বিশ্বাস করার কথা ছেড়ে দাও, কথাটা বলতে পার।

হিরণ্ময়ের মুখটা যেন তার তিমিরময় জগতেরই একটা উৎকট গর্ব নিয়ে হাসছে। —তোমাকে চোখে দেখতে পাই না ব'লে আমার মনে এতটুকুও দুঃখ নেই অপরা।

যেন আর্শির বুকের উপর প্রচণ্ড এক মূর্খের হাতের ঢিল ছুটে এসে লেগেছে, অপরাজিতার বুকের ভিতরের সব কৌতূহলের প্রাণ ঝন্ ক'রে চূর্ণ হয়ে যায়। মনে হয়, তার ফাঁপানো চুলের স্তবকের মধ্যে লুকিয়ে কপালের কাছে একটা আগুনের দাগ জ্বলছে।

অপরাজিতার চোখে একটা অসহ্য ঘৃণার জ্বালা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ঠোঁটে দাঁত চেপে প্রশ্ন করে অপরাজিতা।— সত্যি বলছো?

হিরণ্ময় হাসে—একটুও মিথ্যে নয়।

অপরাজিতার একটা হাত হঠাৎ হিংস্র হয়ে রুমাল আঁকড়ে ধরে, আর পর মুহূর্তে মাথার ফাঁপানো চুলের স্তবকের আড়ালে লুকানো সেই লাল আগুনের দাগকে একটি কঠোর ঘষা দিয়ে মুছে ফেলে।

হিরণ্ময়ের স্তব্ধ পাথুরে চোখ শুধু তাকিয়ে থাকে, কিন্তু দেখে না। কথা বলে না হিরণ্ময়। অপরাজিতা এখন এখানে আত্ম-হত্যা করলেও পাথরের চোখ ঠিক ঐ রকম ক'রেই শুধু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতো।

সন্ধ্যা হয়; বারান্দায় আবছা অন্ধকারে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অপরাজিতা। পাইনের বাতাসের মর্মরের মধ্যে নিজেরই একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে অপরাজিতা আর মনে হয়, এ কি হলো? দুটো বেদনার্ত চক্ষুর দৃষ্টি তুলে নিজের জীবনটাকেই যেন দেখতে পায় অপরাজিতা, ডানাভাঙ্গা পাখির মত সব গৌরব হারিয়ে এক ব্যাধের দুটো পাথুরে চোখের সামনে পড়ে আছে সেই জীবন।

দপ্ করে আলো জ্বলে ওঠে বারান্দার; স্প্যানিয়েলের সঙ্গে হিরণ্ময় বারান্দার এধার থেকে ওধার তর-তর করে হেঁটে বেড়ায়।

দু চোখ ভরা ঘৃণা নিয়ে হিরণ্ময়ের চলন্ত চেহারাটার দিকে একবার তাকায় অপরাজিতা। পাথরের চোখের বুঝবার শক্তি নেই যে, এই বারান্দার বাতাসের মধ্যে অপরাজিতার স্নো-মাখা মুখটা সন্ধ্যা-কেতকীর মতো নতুন শোভায় ঢলঢল করছে। অপরাজিতার পাউডার-ছড়ানো গলা জড়িয়ে ঝিক ঝিক করে হাসছে ব্লাউজের জরি-বসানো বর্ডার, দুলছে শ্যাম্পেন-রং ভয়েলের শাড়ির আঁচল, সোনার সরু চেন-নেকলেসের লকেট হয়ে বুকের উপর পড়ে রয়েছে হীরা-বসানো ছোট একটি স্বস্তিকা, কিন্তু ঐ পাথরের চোখ মাঝে মাঝে তাকিয়ে অপরাজিতার এই সুন্দর ও সাজানো রূপের ছবির উপর শুধু অন্ধকার ঢালছে। ঐ মুখ থেকে জীবনে কখনো একথা শুনতে পাবে না অপরাজিতা, তুমি কত সুন্দর, আর এই সাজে তোমাকে মানিয়েছে কি সুন্দর।

যার মুখ থেকে একথা প্রথম শুনেছিল অপরাজিতা, আর একথা চিরকাল অপরাজিতার কানের কাছে বলতে পারতো যে, সেই মানুষটাই তার ভাসা-ভাসা চোখের জ্বালা নিয়ে এখন বোধ হয় চেরা পাহাড়ের মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে, আর ভাবছে, তারই জিতা তাকে এমন ক'রে এত অবিশ্বাসের বিষে ভরা একটা সাপিনীর মত পিছন থেকে ছোবল দিল কেন? যে চোখের তারার বুকে অপরাজিতা তার নিজেরই সুন্দর মুখের ছবি ভাসতে দেখেছে, আজ বুঝতে পারে, মস্ত বড় একটা ভুয়া ভাল-কথার ছলনায় পাগল হয়ে গিয়ে সেই চোখেরই উপর ধুলো ছুঁড়েছে অপরাজিতা। কিন্তু সেই ধুলো আজ কী ভয়ানক অভিশাপে তপ্ত হয়ে তার নিজেরই কপালের উপর এসে পড়েছে।

রিলবং-এর পাইনের মর্মর যতই সুর বদল করুক না কেন, অপরাজিতার প্রতিজ্ঞার সুর তাতে একটুও বদলায় না। শুধু চলে যাবার জন্যই এই বাড়িতে আর ক'টা দিন থাকা। ঐ পাথুরে চোখের মানুষটার ছোঁয়া বাঁচিয়ে খুব সাবধানে শুধু আল্‌গা হয়ে থাকতে হবে, তারপরেই মুক্তি। সেই মুক্তির প্রতিশ্রুতিকে দিনরাতের প্রতি মুহূর্ত মনে মনে এবং সারাদিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি চিঠি লিখে আহ্বান করছে অপরাজিতা। আর একবার সে আসুক, এসে দেখে যাক, তার জিতাই বেঁচে আছে, আর মরে গিয়েছে অপরা। এসে একবার শুনে যাক, কিংশুক, অপরাজিতা আজ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে সেই ভাসাভাসা চোখের প্রতি-শ্রুতিকেই, যে চোখে দুপুরের সূর্যের দীপ্তি জ্বল্-জ্বল করে। আসুক কিংশুক, এসে আর স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস ক'রে যাক, অপরাজিতাকে অবিশ্বাস করবার আর কোন কারণ নেই। অপরাজিতার ক্ষণিক মুখতার ভুল ক্ষমা ক'রে কিংশুক শুধু একবার এসে বলে দিয়ে যাক, অপরাজিতাকে আপন ক'রে নেবার জন্য সে আরও একটু প্রতীক্ষা স্বীকার ক'রে নিতে রাজি আছে। শুধু আর কয়েকটা মাস, কিংবা একটা বছর, যতদিন না আদালতের নির্দেশ অপরাজিতাকে রিলবং-এর এই অন্ধ ভবনের রাক্ষুসে আঁধিকারের বন্ধন থেকে ছিন্ন ক'রে দেয়।

রিলবং থেকে ডাওকি রোড, কতই বা দূর চিঠি যেতে দেরি হয় না, চিঠির উত্তর আসতেও দেরি হয় না। ব্যস্ত হয়ে আছে অপরাজিতার হাত, মত্ত হয়ে আছে অপরাজিতার মন।

পাথুরে চোখের হিরণ্ময় যখন ছোট স্প্যানিয়েলের সঙ্গে তরতর করে লনের উপর হেঁটে বেড়ায়, তখন অপরাজিতা তার ঘরের নিভৃত থেকে বের হয়ে এসে হিরণ্ময়েরই ঘরের ভিতরে ঢুকে টেবিলের উপর থেকে একটা পেন তুলে নিয়ে চলে যায়, আর লনেরই উপর পাতা চেয়ারে বসে চিঠি লেখে, সেই একই কথা।—তুমি একবার শুধু এস, ইতি তোমার জিতা।

চিঠি লেখা শেষ হলে অপরাজিতার এতক্ষণের নিঃশ্বাসের উদ্দামতাও শান্ত হয়। জামার বুকের ফাঁকে পেন গুঁজে দিয়ে অলস চোখে পাশেরই টবের হাস্নাহানার দিকে তাকিয়ে থাকে। নিকট দিয়েই হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে হিরণ্ময় একবার পাথুরে চোখ তুলে তাকায়, তার পর চলে যায়।

বেয়ারা এসে চিঠিটা নিয়ে চলে যাবার পর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় অপরাজিতা। হিরণ্ময়ের ঘরের টেবিলে

পেন রেখে দিয়ে আবার নিজের ঘরের ভিতর ঢুকে ছটফট করে। মিররের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনেরই শাস্তির রূপটা দেখতে পায়। গায়ে এলো-মেলো করে জড়ানো একটা বাজে শাড়ি, চিরুনির আঁচড় পড়েনি চুলে, কেমন বুনো-বুনো হয়ে গিয়েছে মাথাটা।

পাইনের বাতাস বড় বেশি উতলা হয়ে উঠলো সেই সন্ধ্যায়; ঝড়ো আবেগ মাঝে মাঝে গুমরে উঠছে সেই হুতাশভরা মর্মরের মধ্যে। কিন্তু অপরাজিতার কান যেন পাইনের সেই ঝড়ো গুমরানির মধ্যে গান শুনতে পাচ্ছে। চিঠির উত্তর দিয়েছে কিংশুক। আসছে কিংশুক। আর একটুও দেরী নেই। এই সন্ধ্যাতেই এইখানে এসে অপরাজিতার চোখের সামনে এসে দেখা দেবে কিংশুকের ভাসা-ভাসা চোখ। অপরাজিতার সুন্দরতার জয় যে মানুষের মুখে প্রথম ঘোষণা লাভ করেছে, তার চোখের সামনে সুন্দর হয়ে দেখা দিতে হলে যেমন ক'রে সাজা দরকার, তেমনি ক'রে সেজেছে অপরাজিতা।

রিলবং-এর এই অন্ধভবনে এসে এই ক'দিনের মধ্যে এই প্রথম হিরণ্ময়ের সঙ্গে নিজের থেকে যেচে কথা বললো অপরাজিতা। যদিও বলতে গিয়ে মনের ঘৃণা অনেক কষ্টে মনের মধ্যে চেপে রাখতে হয়। এই বাড়ির অন্ধ প্রভুত্ব এখনো আইনমত উদ্ধত হয়ে রয়েছে অপরাজিতার জীবনের উপর। নিয়মরক্ষার জন্যই একটা কথা বলে নিতে হয়; তাই বলে নিল অপরাজিতা।

অপরাজিতা বলে আজই বোধহয় এক ভদ্রলোক আসবেন এখানে।

হিরণ্ময়—কে?

অপরাজিতা—কিংশুকবাবু।

হিরণ্ময় একটু বিস্মিত হয়েও খুশি হয়।—কোন্ কিংশুকবাবু? সেই আয়রনের কিংশুক, ডাওহিল রোডে বাড়ি কিনেছে যে?

অপরাজিত—হ্যাঁ।

হিরণ্ময়—সে কি তোমাদের চেনা?

অপরাজিতা—হ্যাঁ।

হিরণ্ময়—সে কি শিলং-এই আছে?

অপরাজিতা—হ্যাঁ।

হিরণ্ময় হাসে—বিয়ের দিন লাবান-এর বাড়িতে আসতে পারেনি বলেই বোধহয় এখানে দেখা করতে আসছে।

উত্তর দেবার দরকার আছে ব'লে মনে করে না অপরাজিতা, তবুও হয়তো উত্তর একটা দিত, কিন্তু উত্তর দেবার সময় আর ছিল না। গেটের কাছে সেই টুরারের সাইরেন হর্ন বেজে উঠেছে হঠাৎ।

কিংশুক, সেই কিংশুকে ভাসা-ভাসা চোখ নিয়ে, জয়ী অভিযাত্রীর মতই ধীরে ধীরে হেঁটে তার জীবনের কামনার কাছে এসে দাঁড়ায়। সোজা এসে অপরাজিতার পাশেই দাঁড়িয়ে কিংশুক তার ভাসা-ভাসা চোখের জ্বালা আরও তীব্র ক'রে নিয়ে হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকায়। স্তব্ধ পাথরের চক্ষু শুধু তাকিয়ে থাকে।

হিরণ্ময় হাত তুলে নমস্কার জানায়, কিন্তু কিংশুক প্রতি-নমস্কারের সৌজন্য রক্ষার জন্য হাত তোলে না। হাত তুললেই বা কি, আর না তুললেই বা কি? পাথরের চোখে দেখতে পায় না।

হিরণ্ময় হাসে—যখন কষ্ট ক'রে এসেছেন, তখন এখানে বসে একটু চা খান আর গল্প করুন, তাড়াতাড়ি চলে যাবেন না।

কিংশুক ভ্রূকুটি ক'রে হাসে—কষ্ট ক'রে অবিশ্যি আসিনি, চা নিশ্চয় খাব, কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারলেই ভাল।

অন্ধভবনের সব প্রভুত্বের সৌজন্যকে যেন একটি আঘাতে মিথ্যা ক'রে দিয়ে অপরাজিতার মন নিজের দুঃসাহসের আবেগে বলে ওঠে।—এখানে নয় কিংশুক-বাবু, আমার ঘরে আসুন।

হেসে ওঠে হিরণ্ময়।—আমি বুঝতেই পারিনি কিংশুকবাবু, এখানে চেয়ার নেই।

অপরাজিতা বলে—অনেক চেয়ার রয়েছে এখানে। কিন্তু এখানে ঝড়ের ধুলো আছে।

ঝড়ের বাতাস আরও মত্ত হয়ে ঝনঝনিয়ে দেয় রিলবং-এর এই অন্ধভবনের শরীরের কাচগুলিকে। পাথরের চোখের সম্মুখ দিয়েই বারান্দার শেষ প্রান্ত পার হয়ে চলে যায় ভাসা-ভাসা চোখের কিংশুক আর তার জিতা। পাথরের চোখ নিয়ে বারান্দার উপর একা দাঁড়িয়ে হিরণ্ময় শিস দিয়ে ডাকতে থাকে, কোথায় ঘুমিয়ে রয়েছে সেই ছোট্ট স্প্যানিয়েল? কুকুরটা দয়া ক'রে না এলে এখান থেকে যে এক পা নড়তে পারছে না হিরণ্ময়! দিক ভুল ক'রে ফেলেছে পাথরের চোখের মানুষ।

একবার নয়, দু'বার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে কিংশুকের। এক ঘণ্টা নয়, দু'ঘণ্টারও বেশি গল্প করা হয়েছে। যা বলবার ছিল, তার সবই বলা হয়ে গিয়েছে। যা জানবার ছিল, তার সবই জানা হয়ে গিয়েছে। তবু কিংশুক বিদায় নিতে পারে না, আর অপরাজিতাও বিদায় দিতে পারে না।

অন্ধভবনেরই বুকের ভিতর একটা কক্ষের বাতাস যেন এখনই একটা চরম দুরন্ত মীমাংসা খুঁজেছে, যার পর আর কোন সন্দেহ থাকবে না যে, অপরাজিতার জীবনের উপর ঐ অন্ধভবনের গ্রাস মিথ্যা হয়ে গেল চিরকালের মত।

বাইরের ঝড়ের চেয়েও বোধ হয় বেশি পাগল হয়ে গিয়েছে অপরাজিতার মন, আর সেই মনকে এই নিভৃতে কাছে পেয়ে কিংশুকের ভাসা-ভাসা চোখের জ্বালা আরও তীব্র এবং আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ফুটে উঠতে থাকে।

আর প্রশ্ন করার কিছু নেই। এখন শুধু বিশ্বাস নিয়ে এই রাতের মত চলে যাওয়া। সেদিনের মতো বিশ্বাস নয়, অপরাজিতার কাছ থেকে একেবারে বুক ভরা বিপুল ও উচ্ছল একটি বিশ্বাস নেবার জন্য যেন একটা ক্ষুধা তবু অশান্ত হয়ে রয়েছে কিংশুকের চোখে।

কিংশুক হাসে—তবে এখনো কেন ঐ সোফাতে বসে আছ জিতা?

তখনি উঠে এসে কিংশুকের পাশে বসে অপরাজিতা। অপরাজিতার সুন্দর মুখের কথাকে একবার বিশ্বাস ক'রে ঠকেও যে-মানুষ আজ আবার সেই মুখের কথাকে বিশ্বাস করতে চাইছে, তাকে বিশ্বাস দেবার জন্যই যেন একটা তৃষ্ণা আকুল হয়ে উঠেছে অপরাজিতার চোখে।

অপরাজিতার মুখের বড় কাছে, সেই লাবান-এর বাড়ির ড্রইং রুমের সেই সকাল বেলার এক মায়াময় ছবির মত কিংশুকের ভাসা-ভাসা চোখের আবেদন এগিয়ে আসতে থাকে। মুখ সরিয়ে নেয় না উন্মুখ অপরাজিতা। কিন্তু হঠাৎ......।

চমকে ওঠে কিংশুকের চোখ, আর চমকে ওঠে অপরাজিতার কান। বারান্দায় পা ঘষে ঘষে আর থাম আঁচড়ে আঁচড়ে একটা শব্দ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে এই ঘরেরই দিকে।

কিংশুক বলে—হিরণ্ময়বাবু আসছেন।

অপরাজিতা বলে—আসছেন পাথরের চোখ।

আসুক, একটা নিরেট অন্ধকারের পাথর এখানে এসে দু'জনের চোখের সামনে বসে থাকলেই বা কি আসে যায়? কিংশুক আর অপরাজিতার জীবন্ত দুটি চোখের স্বপ্ন যদি এই সোফার কোলের উপরেই নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস মিলিয়ে এক হয়ে পড়ে থাকে, তবুও শান্ত পাথরের চক্ষু শুধু বসে বসে দেখবে, তার নিজেরই নিরেট অন্ধতাকে।

দরজার দিকে তাকিয়ে শাণিত ছুরিকারই মত উগ্র একটা দৃষ্টির ধিক্কার হেনে

অপরাজিতা বলে—আসুক। যতক্ষণ না চলে যায় ততক্ষণ আপনি এখানেই থাকবেন।

কিংশুক হাসে।—যদি না চলে যায়।

অপরাজিতার দুই চক্ষু হঠাৎ মাতাল পাগলের চোখের মত বিহ্বল হয়ে ওঠে। —তবেই বা বাধা কোথায়? পাথর দেখতে পায় না।

ঘরের ভিতর ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে একটা সোফার কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময় হেসে ফেলে—বলতে পার অপরা, আমি কেমন করে এখানে এলাম?

ঘরের অপর দিকের সোফায় কিংশুকের পাশে বসে অপরাজিতা গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়—আমি কি করে বলবো?

হিরণ্ময়—স্প্যানিয়েল এল না, নিশ্চয় কোথাও ঘুমিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তবুও তো ঠিক পথ বুঝে নিয়ে বারান্দার চারটে বাঁক পার হয়ে তোমার ঘরে পেঁৗছেছি।

অপরা—তা'তো দেখতেই পাচ্ছি।

সোফার উপর বসে হিরণ্ময়। তারপরেই ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে—কিংশুকবাবু কখন চলে গেলেন কিছু বুঝতেই পারলাম না।

ঝড়ের বাতাসে অবিরাম ঝন্-ঝন্ শব্দ করে ঘরের জানালার কাচ। উত্তর দেয় না অপরাজিতা। অপরাজিতারই মুখের কাছে কিংশুকের ভাসা-ভাসা চোখ নীরবে হাসে আর এগিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ......।

হঠাৎ হেসে ওঠে হিরণ্ময়। চমকে সরে যায় অপরাজিতার মুখ আর কিংশুকের চোখ। অপরাজিতার দুঃসাহসী দুই চোখের ভুরু মিথ্যা ভয়ের রাগে ক্ষুব্ধ হয়ে আরও কুটিল হয়ে ওঠে।

হিরণ্ময় বলে—ঝড়ের বাতাসে তোমার মাথার সুন্দর ক্রীমের গন্ধই আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে অপরা। এ যে আমার চেনা গন্ধ, বিয়ের দিন এই গন্ধই ছিল তোমার খোঁপাতে। ছিল কি না বলো?

উত্তর দেয় অপরাজিতা।—ছিল বৈকি।

হিরণ্ময় হাসে—আর একটা সত্য ধরে দেব?

উত্তর দেয় না অপরাজিতা।

হিরণ্ময় বলে—আজ তুমি সেই বিয়ের দিনেরই শাড়িটা পরেছ।

চমকে ওঠে অপরাজিতা।—কেমন ক'রে বুঝলে?

হিরণ্ময় নিজের কৃতিত্বের আনন্দেই যেন আটখানা হয়ে হাসতে থাকে।—তোমার শাড়ির আঁচলটা এখন উড়ে উড়ে যে সুন্দর ফিসফাস শব্দ ছড়াচ্ছে, সে শব্দ যে আমার চেনা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে হিরণ্ময়। তার পর কথা বলতে গিয়ে গলার স্বর যেন কেঁপে ওঠে—আরও একটা খবর বলতে পারি অপরা।

অপরাজিতা—বলো।

হিরণ্ময়—আমার পেন দিয়ে তুমি অন্তত একবার চিঠি লিখেছ।

দুরু দুরু করে অপরাজিতার চোখের দৃষ্টি। পকেট থেকে সাবধানে রুমাল বের করে নিয়ে আস্তে আস্তে কপালের ঘাম মোছে কিংশুক।

অপরাজিতা—কেমন ক'রে বুঝলে?

হিরণ্ময়—আমার পেনের গায়ে তোমার... বুকের গন্ধ পেয়েছি অপরা।

মাথা হেঁট ক'রে উদ্ধত চোখ দুটিকে হঠাৎ যেন লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে অপরাজিতা। মনে পড়েছে; পেনকে সেদিন মাত্র কিছুক্ষণের জন্য ব্লাউজের বুকের ফাঁকে স্থান দিয়েছিল অপরাজিতা।

হিরণ্ময় হাসে—ঠিক কি না?

অপরাজিতা—ঠিক।

হিরণ্ময়—কেন পেলাম বলো?

অপরাজিতা আস্তে আস্তে বলে—জানই তো, আর বুঝতেই তো পেরেছ, তবে মিছে আবার এসব প্রশ্ন কেন?

হিরণ্ময়—সত্যিই জানি, আর সবই বুঝতে পারি অপরা।

হাওয়ায় উড়ছে আঁচলটা। শক্ত ক'রে এক মুঠো দিয়ে আঁচলটা টেনে বুকের কাছেই ধরে রাখে অপরাজিতা, ভয়ানক ঢিপঢিপ করছে বুকের ভিতরটা।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর হিরণ্ময় বলে—তুমি কোথায় রয়েছ অপরা?

যেন হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ছটফট ক'রে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় অপরাজিতা।

হিরণ্ময়—তুমি কি করছো?

অপরাজিতার গলার স্বর শিউরে ওঠে—কিছু না।

হিরণ্ময় হাসে—তবে কথা বলো।

অপরাজিতা—আমি আর কি বলবো? তুমিই বলো, আমি শুনি।

হিরণ্ময় হাসে—তুমি জিজ্ঞাসা করো অপরা, নইলে শুধু নিজের থেকেই বলতে ভাল লাগছে না।

স্তব্ধ দুটি পাথরের চোখের দিকে অপরাজিতা তার দু'চোখের হঠাৎ বিস্ময় তুলে প্রশ্ন করে।—আমার দুঃখগুলি বুঝতে পার?

হিরণ্ময়—পারি অপরা।

অপরাজিতা—কবে বুঝলে?

হিরণ্ময়ের মুখটা করুণ হয়ে ওঠে।—এই বাড়িতেই প্রথম বিকালে।

অপরাজিতা দম বন্ধ করে।—কি বুঝেছিলে?

হিরণ্ময়—তোমার হাত হঠাৎ দুঃখে আছড়ে পড়েছিল তোমার কপালে।

ভয়ে শিউরে ওঠে অপরাজিতার সারা শরীর। হিরণ্ময়ের সোফার দিকে দু'পা এগিয়ে যেয়েই থমকে দাঁড়ায়। চেঁচিয়ে ওঠে অপরাজিতা—তুমি দেখতে পাও, তোমার পাথরের চোখ নিশ্চয়ই দেখতে পায়।

হিরণ্ময় বলে—আমার পাথরের চোখ সত্যিই দেখতে পায় না অপরা, আমি দেখতে পাই।

অপরাজিতা সত্যি ক'রে বলো, কি দেখতে পেয়েছিলে সেদিন।

হিরণ্ময়—ঐটুকুই দেখেছিলাম, তার চেয়ে বেশি দেখবার শক্তি নেই আমার।'

অপরাজিতা—কেমন ক'রে দেখলে?

হিরণ্ময় হাসে—তোমার হাতের চুড়ির শব্দই যে হঠাৎ একটা আঘাত খেয়ে ঠুং ক'রে বেজে উঠেছিল।

অপরাজিতা—তাতেই তুমি বুঝে ফেললে?

হিরণ্ময়—হ্যাঁ, তোমার একটুকু থেকেই যে আমি অনেক পেয়ে যাই, তুমি বুঝতেও পার না।

অপরাজিতা।—আর কোন দিন ধরে ফেলতে পেরেছিলে আমাকে?

হিরণ্ময়—কি বললে?

অপরাজিতা—বুঝতে পেরেছিলে আমার দুঃখকে?

হিরণ্ময় হাসে—বলবো?

অপরাজিতা হেসে ফেলে—বলই না।

হিরণ্ময়—এই বাড়িতেই এক সন্ধ্যা-বেলায় হাসনুহানা'র কাছে তুমি বসেছিলে, মনে পড়ে তো?

অপরাজিতা চোখের দৃষ্টি বাতাস-লাগা দীপশিখার মত ফুর ফুর করে—হ্যাঁ।

হিরণ্ময়—তোমার মন বড় অশান্ত হয়ে বড় কষ্ট দিচ্ছিল তোমাকে। তোমার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কাঁপা-কাঁপা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেই বুঝেছিলাম যে......।

অপরাজিতা রুমাল তুলে চোখের উপর চেপে ধরে বলে—উঃ, তুমি কী ভয়ংকর দেখতে পাও।

হিরণ্ময়ের দুই ঠোঁটের কাঁপুনিতে যেন সমব্যথিত মনেরই মায়া কাঁপতে থাকে।—নিজেকে বড় একলা বলে মনে হয়েছিল সেদিন, না অপরা?

হিরণ্ময়ের সোফারই কাঁধের উপর ভর ছেড়ে দিয়ে যেন এলিয়ে পড়তে চায় অপরাজিতার শরীরটা। দুটো পাথরের চোখের যাদু ক্ষণে ক্ষণে ভয় পাইয়ে, চমকিয়ে, হাসিয়ে, শিউরিয়ে আর অবাক করে দিয়ে অপরাজিতার স্নায়ু, শোনিত আর নিঃশ্বাসের উপর নিবিড় এক ক্লান্তি ঢেলে দিচ্ছে।

ছটফটে কুহেলিকা হাঁপাচ্ছে। আর ঘরের ওদিকের ঐ সোফার উপর একলা ব'সে রয়েছে যে চক্ষুষ্মান এক দুঃসাহস, তারই ভাসা-ভাসা চোখ দুটো স্থির হয়ে রয়েছে। নড়ে বসতে পারে না, জোরে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, যেন হঠাৎ এক অভিশাপের মন্ত্রের আঘাতে নিরেট হয়ে গিয়েছে কিংশুকের শরীর।

উঠতে পারে না কিংশুক, উঠে যাবার কথা নয়। শুধু চুপ ক'রে বসে থাকা, যতক্ষণ না জিতা আবার ঐ সোফার স্পর্শকে একটি ঘৃণার ঠেলা দিয়ে হাত তুলে নেয়, আর কিংশুকের এই সোফাতে এসে বসে। কিন্তু কি ভয়ঙ্কর শক্ত ক'রে ঐ সোফার কাঁধটাকে খিমচে ধরে রয়েছে জিতা। এক অন্ধের প্রলাপের বাঁশি শুনে হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে কাছে এগিয়ে গিয়েছে উন্মনা এক হরিণী। কিন্তু আর কতক্ষণ? ঐ বাঁশির মিথ্যা সুরের মিষ্টি এখুনি ফুরিয়ে যাবে, আর ছুটে সরে আসবে জিতা। জিতাকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু অন্ধের বাঁশির প্রলাপ যেন আরও অদ্ভুত হয়ে বেজে ওঠে। হিরণ্ময় বলে।—গাছ যেমন ক'রে ভোরের আলোর মুখ দেখে, আমিও তেমনি ক'রে তোমার মুখ দেখতে পাই।

চোখের উপর থেকে রুমাল তুলে নিয়ে অপরাজিতা চেঁচিয়ে ওঠে।—কী কুৎসিত আমার সেই মুখ!

হিরণ্ময়—কী সুন্দর সেই মুখ! তুমিও জান না অপরা, তোমার সে মুখ কত সুন্দর।

যেন ঝড়ের বাতাসেরই ধাক্কা লেগেছে, তাই সোফার পাশ থেকে ছিটকে এসে একেবারে হিরণ্ময়ের পাথুরে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় অপরাজিতা। পৃথিবীর মানুষ শুধু চোখ দিয়ে দেখে অপরাজিতাকে, আর এই লোকটা শব্দ দিয়ে, গন্ধ দিয়ে, আর ছোঁয়া দিয়ে দেখছে অপরাজিতার রূপ। প্রলাপ, প্রলাপ! হিরণ্ময়ের প্রলাপ আর সহ্য হয় না, হিরণ্ময়ের মুখ চেপে ধরবার জন্য হাত তোলে অপরাজিতা।

কিন্তু হাত নামিয়ে নেয় অপরাজিতা।

হিরণ্ময় হেসে ফেলে—হাত সরিয়ে নিলে কেন অপরা?

অপরাজিতার হাত থর-থর ক'রে কাঁপে। —উঃ, কি ভয়ানক তোমার চোখ।

হিরণ্ময়—বিয়ের সন্ধ্যায় নিশ্চয় এই পাউডারই তুমি হাতে মেখেছিলে অপরা।

কোন কথা বলে না অপরাজিতা। অপলক চোখে শুধু গভীর এক বিহ্বলতা থম থম করে। হিরণ্ময়ের ঐ পাথরের চোখ শেষ-রাতের চাঁদেরই মত মায়া ছড়িয়ে দিয়েছে কুয়াশার বুকে।

হিরণ্ময়—সেদিন তোমার হাতের গন্ধ আমারও হাতের মধ্যে পেয়েছিলাম, তুমি আমার হাতে হাত রেখেছিলে। কিন্তু তার পর আর সেই হাত কাছে পেলাম না।

অদ্ভুত এক হাসি করুণ হয়ে ছলছল ক'রে কাঁপে হিরণ্ময়ের মুখে।—আমার হাত এখন শুধু সিগারেটের গন্ধ মেখে একলা পড়ে আছে।

খপ্ করে একটা হাত এগিয়ে দিয়ে হিরণ্ময়ের হাত ধ'রে ফেলে অপরাজিতা—এই তো আমার সেই হাত।

—হ্যাঁ, সেই হাত। দুই মুঠো দিয়ে হিরণ্ময় অপরাজিতার সেই হাত জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টানে।

কিংশুকের চোখের দুপুরের সূর্য যেন এক অমা-বিভীষিকার ভয়ে হঠাৎ ডুবে গিয়েছে। এই ঘরে যেন শুধু ওরাই দু'জন আছে, ঐ এক জোড়া পাথরের চোখ আর বাঁকা-করে-আঁকা ভুরু নিয়ে এক জোড়া টলটলে কালো চোখ। মিষ্টি ছলনা মাখানো অবিশ্বাসের এক নিদারুণ যাদুকরী কিংশুকের দুই চক্ষুকে ধুলো-পড়া দিয়ে অন্ধ ক'রে দিতে চাইছে।

ওকি? কি ভেবেছে ওরা? এটা যেন ঘরই নয়, যেন গভীর বনের একটা নিরালা। বুনো জ্যোৎস্নায় পাগল হয়ে এক বুনো হরিণের মুখ তার হরিণীর মুখ খুঁজছে, কিন্তু বুঝতেই পারছে না যে একটা বাঘের চোখ নিকটেই বসে আছে।

বাঘের কানকেও বোধ হয় পাথর ক'রে দিতে চাইছে অপরাজিতা। হিরণ্ময়ের একটা হাত কপালের উপর তুলে নিয়ে চেপে রেখেছে অপরাজিতা। বড় বড় দুটো জলের ফোঁটা চিক্‌চিক্ করে দুলছে অপরাজিতার দুই চোখের দুই কোণে। চেঁচিয়ে উঠেছে অপরাজিতা।—চিরে দাগ ক'রে দাও আমার কপালে, একটা লাল দাগ। তোমার নখে ধার নেই কেন, ছিঃ।

একটা অন্ধের দুই বাহুর বন্ধনের মধ্যে চেপটে যেন এতটুকু হয়ে গিয়েছে লাবান-এর মিস্টার নাগের ভাগ্নী। লতানে গোলাপ কাঁটা হারিয়ে শুধু লতা হয়ে পড়ে আছে, অন্ধের বুকে একটুও বিঁধছে না।

হিরণ্ময়—তোমাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না বলে আমার এতটুকুও দুঃখ হচ্ছে না অপরা।

অপরাজিতা—হবেই না তো, তুমি যে চোখের দেখার চেয়ে তিন গুণ দেখা দেখে নিচ্ছ হিরণ!

হিরণ্ময় বলে।—জানি না কেমন তোমার শাড়ির রং, কেমন তোমার গলার হার আর কানের দুল। নিশ্চয়ই সুন্দর। কিন্তু আমার দেখার কাছে ওসবের কোন দরকার হয় না। আমি শুধু দেখি, তুমি সুন্দর।

পট্‌পট্ ক'রে কয়েকটা শব্দ হঠাৎ বেজে ওঠে, কেউ যেন তার রূপের খোসা ছিঁড়ে ফেলছে। হঠাৎ ঘরের মেজের উপর একটা রঙীন শাড়ি আর জামা যেন একটা ঝড়ের লাথি খেয়ে ছিটকে এসে পড়ে ঘরের মেঝের মাঝখানে। ঝম্ ক'রে মেজের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে সোনার একটা হার আর দুটো দুল।

ভাসা-ভাসা চোখের জ্বালার সম্মুখে যেন সুন্দর কতগুলি খোসা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে অপরাজিতা, আর নিজের একটা অনাবরণ আত্মার রূপ দেখছে হিরণ্ময়ের চোখের উপর চোখ রেখে। কী মহীয়সীর মত ভঙ্গী!

আর নয়, আর এক মুহূর্ত বসে থাকলে সত্যিই পাথর হয়ে যাবে কিংশুকের চোখ। রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে উঠে দাঁড়ায় কিংশুক। পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তারপর বোধ হয় ছুটেই চলে যায়। যেন একটা ভীরু দুঃসাহস হঠাৎ যন্ত্রণায় ডানা-ঝাপটানো পাখির মত শব্দ করে উড়ে চলে যায়।

হিরণ্ময় বলে—কিসের শব্দ? কেউ গেল?

অপরাজিতা—হ্যাঁ, চোখ গেল।

হিরণ্ময়—কি?

অপরাজিতা হাসে—একটা পাখির নাম।

নীল! নীল!
সবুজের ছোঁয়া কি না, তা বুঝিনা,
ফিকে গাঢ় হরেক রকম
কম বেশী নীল!
তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল
ক'টা গাঙ্‌ চিল।

ভাবি, বলি, সাগরের ইচ্ছে,
শাদা ফেনা থেকে যেন
শাঁখ-মাজা ডানা মেলে'
আকাশের তল্লাশ নিচ্ছে।

মিথ্যেই
মিল খোঁজা মন চায় উপমা।
নেই, নেই!
হৃদয় দুচোখ হয়ে, শুধু গেয়ে ওঠে,
সেই! সেই!

মাটি গাছ তীর সব একেবারে ফেলে দিয়ে আসা,
সুবিশাল ডানা মুড়ে
নোনা ঢেউএ আলগোছে ভাসা,
কূল-ছাড়া জল আর
মেঘ তারা হাওয়া নিয়ে থাকা,
সময়ের নীলে শুধু
উদ্দাম অবিরাম আলপনা আঁকা,
কি যেন কি যেন ঠিক
মন দিয়ে জানতে না জানতে
স্টীমার পৌঁছে যায়
আজকাল পরশুর প্রান্তে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

তোমাকে ভালোবেসে

জীবনানন্দ দাশ

আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল
এই জীবনের পদ্মপাতার জল;
তবুও এ জল কোথার থেকে এক নিমেষে এসে
কোথায় চ'লে যায়;
বুঝেছি আমি তোমাকে ভালোবেসে
রাত ফুরুলে পদ্মের পাতায়।

আমার মনে অনেক জন্ম ধ'রে ছিল ব্যথা
বুঝে তুমি এই জন্মে হয়েছ পদ্মপাতা;
হয়েছ তুমি রাতের শিশির—
শিশির ঝরার স্বর
সারাটি রাত পদ্মপাতার পর;
তবুও পদ্মপত্রে এ জল আটকে রাখা দায়।

নিত্য প্রেমের ইচ্ছা নিয়ে তবুও চঞ্চল
পদ্মপাতায় তোমার জলে মিশে গেলাম জল,
তোমার আলোয় আলো হ'লাম,
তোমার গুণে গুণ;
অনন্তকাল স্থায়ী প্রেমের আশ্বাসে করুণ
জীবন ক্ষণস্থায়ী তবু হায়।

এই জীবনের সত্য তবু পেয়েছি এক তিলঃ
পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল।
আকাশ নীল, পৃথিবী এই মিঠে,
রোদ ভেসেছে, ঢেঁকিতে পাড় পড়ে;
পদ্মপত্র জল নিয়ে তার—জল নিয়ে তার নড়ে;
পদ্মপত্রে জল ফুরিয়ে যায়।

একটি

নিশিকান্ত

সখি! তোমার অনেকবলা
অনেক কথার মালার মাঝে
একটি ক্ষণের একটি কথার
কুসুম আমার মনে আছে।
সেই কথাটি বলার কালে
তোমার দুটি কপোলে আর অধরে আর
তোমার ভালে
চিরন্তনের হর্ষশোণিত উচ্ছ্বসিয়া উঠেছিল,
চির-উষার স্তব্ধনীরব রক্তগোলাপ ফুটেছিল।

সখি! তোমার চোখের তারার
অনেক চেয়ে দেখার মাঝে
একনিমেষের একটি চাওয়ার
দৃষ্টি আমার মনে আছে।
সেই চাহনি চাওয়ার ক্ষণে
মর্ত্যরাতের আঁধার কালো কাজল আঁকা
ঐ নয়নে
মূর্ত হ'ল কালহারা কোন উদ্দীপনের স্বচ্ছ লিখা,
কোন অমরার ধ্রুবতারার নিদ্রাবিহীন নয়ন-শিখা।

সখি! তোমার নানাবেলার
নানারঙের রূপের মাঝে
একটি বেলার একটি রূপের
বর্ণ আমার মনে আছে।
যে বর্ণটির বিভায় জ্বলি'
সান্ধ্যতপনমগ্নআকাশ সৌর-সুরার
নেশায় ঢলি'
মর্ত্যকালের দিকসীমান্তে অসীমসোহাগ বিলিয়েছিল,
স্বর্ণ-স্বরূপ দিয়ে তোমায় আমার বুকে মিলিয়েছিল।

টুটুর জন্য

বুদ্ধদেব বসু

বলতে পারো সরস্বতীর মস্ত কেন সম্মান?
বিদ্যে যদি বলো তবে গণেশ কিছু কম যান?
সরস্বতী কী করেছেন? মহাভারত লেখেননি,
ভাব দেখে তো হচ্ছে মনে তর্ক করাও শেখেননি।
তিন ভুবনে গণেশ-দাদার নেই জুড়ি পাণ্ডিত্যে,
অথচ তাঁর বোনের দিকেই ভক্তি কেন চিত্তে?
সমস্ত রাত ভেবে ভেবে এই পেয়েছি উত্তর—
বিদ্যা যাকে বলি তারই আর একটি নাম সুন্দর।

পদধ্বনি

অজিত দত্ত

ঘোরানো সিঁড়ির যেন ধাপে ধাপে ক্রমে নেমে আসে
অস্পষ্ট অনুচ্চ এক পদধ্বনি নিশ্চিত মন্থর।
সংকুচিত হয়ে আসে ব্যবধান প্রত্যেক নিশ্বাসে,
অজ্ঞাত অস্তিত্ব কোনো প্রতিক্ষণে হয় অগ্রসর।
অযাচিত আগন্তুক, অনিবার্য অদৃশ্য অতিথি,
আসে না সে সূর্যসম অকস্মাৎ জ্যোতির বিকাশে,
খোঁজে না সে অভ্যর্থনা, জানে না সে বন্ধুতার রীতি,
অচিন্ত্য অদ্ভুত বার্তা বয়ে নিয়ে ক্রমশ সে আসে।

এখনো সময় আছে, এখনো নির্জন অবসর
শুধু বাকি আছে আর লিখে যাওয়া একখানি চিঠি,
এখানের খুঁটিনাটি ছোট, বড় সকল খবর
মনে-রাখা ভুলে-যাওয়া মনে-পড়া কথার প্রতিটি।
ক্রমান্বিত পদধ্বনি যতক্ষণ দুয়ারে না থামে
ততক্ষণে ঠিকানাটা লিখে দিতে পারি যেন খামে॥

মেঘস্বাতী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

তুমি কোন্ তারা জানলে আজকে প্রথম পৃথিবী-রাত্রি?
নাম কি তোমার, মনে হয় যেন জানতাম কোনোদিন।
ত্রিনয়নে কোনো জলৌকা চলে রথের চাকার মতো
সেদিন প্রথম প্রাণ।
ধরণীর প্রাণে প্রথম শিহর যেন দেহ-তরণীতে
দিতে হবে তার সব রোমাঞ্চ-স্বেদ।

তুমি সেই তারা আজ রাত্রিতে পেলে পৃথিবীর মেঘলা মেদিনী-চিত্র।
কী নামে তোমায় ডাকব জানে না মন।
চোখের দেখায় অনুভব করি আদি-ইতি লেখাগুলো
মেঘস্বাতীর তরুণ চক্ষুময়।
সব নাম যদি মুছে যায় আর সব রূপ যদি ভেঙে ভেঙে হয় ঢেউ
অনামিকা থাক্ একটি তারার জ্যোতির বিন্দু প্রাণ।
তবু তার গান রাত্রি জান্‌বে, জান্‌বে ধাত্রী মাটি,
জাগবে নারীর চান্দ্রমাসের আগুন-কণার নম্র গভীর গাত্র।

জানাকেই তুমি জানবে বলে ত কোটি বিন্দুর পথ
তোমার আলোর সিন্দুরে মেখে এলে।
এখানে মাটির সিন্দুর দ্যাখো তরুলতা-ফুলে মেখে,
অলক্তকের স্বক্-লিপ্সায়, চেলীতে, সীঁথিতে মোহমদিরতা মর,
তোমার পথের স্মৃতি আঁকা পাবে হৃদয়ের রাঙা পাত্রে।
না-ই বা তোমার নাম ধরে আজ ডাকলাম,
তুমি কি পারো না এতো পরিচয়ে বারেক আমায়
নাম ধরে ডেকে উঠতে?

মনে-মনে

দিনেশ দাস

তনিমা, তোমার বেদনা ও বিস্ময়
রাখো কি বিছায়ে গেরুয়া গঙ্গাজলে?
অথবা রেশমী ফিতের মতই সবুজ ঘাসের বনে
তোমার মনের গন্ধ কি জাগে ফুলফোটা জঙ্গলে?

আমরা দু'জনে ব'সে আছি পাশাপাশি
ভাদুরে গঙ্গা প্রাণীর মতই ছুটেছে ছন্নছাড়া,
তোমার মুখে কি হলুদ নদীর একফালি মেটে হাসি:
আমার বাহুতে আলগোছে ছোঁয় তোমার বাহুর ধারা।

তোমার বেদনা ফুলে' ফুলে' ওঠে যেন
ভরাগঙ্গার লকলকে জিভে রাশি রাশি ফেণা ভাঙে,
তার নীচে কত, কত জমে পলিমাটি—
জানবে না তুমি, কেই বা সে-কথা জানে?

আমরা এসেছি, অনেকে এসেছে আগে
কত স্বপ্নের ফুল ফুটে আছে কত রং, কত নাম:
জানতে না পাখি-পাখিনীর মত কেন প্রান্তরে আসা?
জানতাম সবই, তবুও কি আগে সবটুকু জানতাম?

তনিমা, তোমার বেদনা ও বিস্ময়
ছড়ানো রয়েছে এখানে সেখানে, জানবে না কোনোজন:
তোমার বেদনা পলিতে, মাটিতে প'ড়ে
সে-মাটি আমার মন॥

ওদের জীবন

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ওদের জীবনে আমি দেখেছি অনেক ফুল ফোটা,
দেখেছি অনেক কুঁড়ি ঝরে গেছে ফুটিবার আগে,
ঝরা ফুল মাটিতে ছড়ান;
কখনও আনন্দ হয় কখনও বিস্ময় মনে লাগে
সে রহস্য সমাধানে বৃথা আলেয়ার পিছু ছোটা
কল্পনায় পুতুল গড়ান।

ওদের জীবনে আমি দেখেছি উঠিতে ইন্দ্রধনু
সপ্তরঙে বিচিত্র সে সৌন্দর্যের কোথায় তুলনা?
স্থির জলে প্রতিবিম্ব তার
উলসি বিলসি চলে; মন বলে, ভুলোনা ভুলোনা,
বাতাস সহেনা গায়ে, শতখণ্ডে ভেঙে পড়ে তনু
মুছে দেয় সন্ধ্যার আঁধার।

ওদের জীবনে আমি দেখেছি বন্যার গতিবেগ
দুকুল ভাসায়ে তার উত্তাল তরঙ্গ ছুটে চলে।
তীরভূমি আবেগ-চঞ্চল;
জানিনা কি আলোড়ন অসহিষ্ণু হৃদয়ের তলে,
কি মোহে নামিয়া আসে স্ফীতবক্ষ আষাঢ়ের মেঘ
উজাড়িতে আপন সম্বল।

ওদের জীবনে আমি দেখেছি বসন্ত সমারোহ
পুষ্পমধু সঞ্চয়নে ভ্রমরের স্তুতি অবিরাম,
কুঞ্জবনে প্রভাতী বিলাপ
শুনিয়াছি কান পাতি; প্রেমাঞ্জন নয়নাভিরাম
দিবালোকে মুছে যায়—সত্য হয় মুহূর্তের মোহ
সত্য হয় বিরহ-সন্তাপ।

ঘুমচোখ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

তোমারে ভুলেছি, ভুলে—এড়িয়ে এড়িয়ে দূরে ছুটে পালিয়েছি।
নির্জনতা! এইবার ডাকো, ডেকে নাও—
দামাল শিশুকে টেনে বিলি কেটে, বুকে এনে—কাজল পরাও ঃ
ঘুম-ঘুম, ঘুমচোখ—সন্তান এখন মার আঁচল চেয়েছি।

সব ধুলো ঝেড়ে ফেলে, মুছে সব ঘাম আর কাদা ঃ
ভুলে যাবো সব রঙ—হলুদ, বেগুনী, নীল, সাদা,
বেলা হ'লো, হ'লো বেলা—খেলেছি ত' ঢের খেলা,
অনেক মাটির ঢেলা নিয়ে—
আর যে লাগে না ভালো, পারিনে চলতে আর কিছুতে মানিয়ে।

আঁধার, আঁধার গাঢ়, আঁধার আলোর আরো গূঢ় পারাবারে ঃ
প্রেম ও অপ্রেম সব—
সুখ-দুঃখ-হিংসা-কাম-কামনার পারে
নির্জনতা! কোথা তুমি! তুমি কোথা রয়েছ দাঁড়িয়ে—
এই সূর্য, রাত্রি, এই নেবুলা ও ছায়াপথ গেলে কি ছাড়িয়ে

দেখা হবে? দেখা হবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একা খুঁজে যেতে যেতে
যদি এসে পড়ে চোখে মরা তারাদের ছাই, লাগে হাই—তবে—
বৃহস্পতির দিশা ফুটবার আগে, রাগে রাহু ওঠে তেতে;
ব্রহ্ম-কমলের বনে পারবো কি পৌঁছুতে! পারবো কি, পারবো কি
—না হলে কি হবে!

নির্জনতা, তুমি শক্তি—আশা—শান্তি—পরমায়ু—
প্রাণ দাও প্রাণদা দু'হাতে।
নির্জন স্তনের থেকে সংজ্ঞাহারা গঙ্গাধারা ঝরাও, ঝরাও ঃ
পান করি—বড় তৃষ্ণা—যোজন পেরিয়ে যাবো তারপর পরিশেষ
তিমিরে তারাতে;
ঘুম-ঘুম, ঘুমচোখ। চোখের পাতার থেকে সব ছায়া-আড়াল সরাও।

এখন জীবনে যেন মেঘ করে, ছায়া পড়ে
—কোলাহল আসে শুধু ক্ষীণ হয়ে কমে
নির্জনতা সাড়া দাও, ক্ষীণতম ইশারাও
—কথাহীন কথা আছে অফুরন্ত জমে।

তরঙ্গ রাত্রি

উৎপলকুমার বসু

অভীপ্সার মহাপক্ষ মেলে
যে রজনী আসে তার নাম দিই ঝড়।
বিচিত্র আবেগে ওড়ে এ প্রাণের জীর্ণ কুটোখড়—
প্রেতছায়া বারংবার অঙ্কুশ হানে
আমার স্থবির বুকে বারবার বলে কানে কানে ঃ—
আমার হনন, হত্যা রাত্রির ঘন অন্ধকারে,
সব কিছু কিনে নিস প্রাণপ্রভ আলোক স্বীকারে।

দেয়াল

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চেনা আলোর বিন্দুগুলি
হারিয়ে গেল হঠাৎ—
এখন আমি অন্ধকারে, একা।
যতই রাত্রি দীর্ণ করি দারুণ আর্তরবে,
এই নীরন্ধ্র নিকষ কালোর কঠিন অবয়বে
যতই করি আঘাত,
মিলবে না আর, মিলবে না আর,
মিলবে না তার দেখা।

হারিয়ে গেল হঠাৎ আমার
আলোক-মাতা মন,—
নেই, এখানে নেই;
হারিয়ে গেল প্রথম-আলোর হঠাৎ-শিহরণ,—
নেই।
চার দেয়ালে বন্ধ হয়ে চার দেয়ালের গায়ে
যতই হানি আঘাত, মনের আর্ত আকাঙ্ক্ষায়
যতই মুক্তিলাভের চেষ্টা করি,
ততই কঠিন পরিহাসের রাত্রি নামে, আর
ততই ভয়ের উজান ঠেলে মরি।

চেনা আলোর বিন্দুগুলি
হারিয়ে গেল হঠাৎ—
এখন আমি অন্ধকারে, একা।
চারদিকে চার দেয়াল, চোখের দৃষ্টি নিভে আসে,
শিউরে উঠি অন্ধকারের কঠিন পরিহাসে,
এই নীরন্ধ্র অন্ধকারে যতই হানি আঘাত,
আসবে না আর, আসবে না কেউ,
মিলবে না তার দেখা।

ভাঙো আমার দেয়াল, আমার দেয়াল!

একটি ছুটির প্রতীক্ষায়

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

কোথায় রয়েছে যেন টানা
আকাশের অদৃশ্য সীমানা।
সাধ হয়, এই প্রাণ নিয়ে,
চলে যাই এ পথের সীমানা ছাড়িয়ে;
একান্তে একেলা শুধু হাঁটি
দেখে আসি গঙ্গার পুরাতন মাটি।
কিন্তু মনে হয়,
এ' আকাশ সে আকাশ নয়।

পথে ও বিপথে লোক করে গিস্‌গিস্
কম লোকে চলে শুধু আমাদের আফিস।
কম লোকে বেশি কাজ নেইত উপায়
এই সিচুয়েশনে কি ছুটি পাওয়া যায়।
ছ' বছর মেলেনিকো ছুটি
দু বেলা পুরনো পথে হাঁটি গুটিগুটি।
মনে পড়ে ছ' বছর আগের সময়
এ শহর সে শহর নয়!

সবই আছে আগের মতন
সেই জল, সেই মাটি আছে পুরাতন
এই স্রোত, এরই কাছে কাছে—
অলক্ষ্যে লুকানো কোথা আছে,
ছ' বছর আগেকার দিন;
কিংবা কোথা হয়ে গেছে লীন।

আজ কিছু নেই আর তার
আছে শুধু সময়ের অলঙ্ঘ্য পাথার।
একটি মানুষ শুধু—অদৃঢ় অস্পষ্ট ছিল মন
হারিয়েছে শুধু সেই জন।
অস্পষ্ট সে জন শুধু দিনে দিনে হয়ে অগ্রসর
মৃত্যুর আলোকপাতে ক্রমাগত হতেছে ভাস্বর।
এইবার দৃপ্তকণ্ঠে দপ্তরের দেবতার ঠাঁই
জানাবে সে, ছুটি তার চাই!

নতুন সকালে

আহম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্

আশ্বিনের নতুন সকালে
রৌদ্রমতী স্থির হয় কচি-পাতা ডালে,
বিলের সবুজে জাগে আউশের ঘ্রাণ
পাতিহাঁস কণ্ঠে পোষে গান।
ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে মাছরাঙা নীচে নেমে আসে
স্ফটিক শিশির জাগে প্রান্তরের ঘাসে।

ধানশিষে দুধ জমে, মনে জমে সুর
আলো-ছায়া মনে হয় আশ্বিনের সোনালী দুপুর।

প্রাঙ্গণে ফুলের টবে আকাশের অবারিত নীল
এক ফালি জানালায় আলো ঝিলমিল!
ঝিল্‌মিল এ আকাশ, ঝিল্‌মিল দিগন্তের তীর
আশ্বিনের হাওয়া লেগে কচি-পাতা ডালে শিরশির

এ আকাশ বেঁচে থাক, বেঁচে থাক আকাশের রং
বেঁচে থাক বুলবুল মনের সারং—
আর থাক কণ্ঠভরা সুর—
আশ্বিনের সোনালী দুপুর!!

মধ্যরাত্রে

অরুণকুমার সরকার

প্রেয়সী, তোমার যৌবন যেন বৈশাখী খরবায়ু
পুড়ে যাই আমি বৃক্ষ রিক্ত-পাতা।
দু'বাহু বাড়াও, প্রাণ দাও নব জলধারাসিঞ্চনে
বিদূরিত হোক ভয়ের ধূলোর গ্লানি।

প্রেয়সী, তোমার দুটি চোখ যেন মশালের আহ্বান
ছুটে যাই আমি পতঙ্গ ক্ষণজীবী।
অবগুণ্ঠনে প্রদীপ জ্বালাও মৃন্ময় মমতার
বিদূরিত হোক মৃত্যুভয়ের গ্লানি।

প্রেয়সী, তোমার এলোচুল যেন অর্বুদ হিজিবিজি
ব্যর্থ আমার চেতনার উদ্যম।
ধীরে কাছে এসো, বাঁধো কুন্তল দীঘিসুশীতল স্নেহে
বিদূরিত হোক আত্মক্ষয়ের গ্লানি।

প্রেয়সী, তোমার দুটি বাহু যেন সুদূরের দুটি পথ
মিলেছে আমার বহুদিনকার ঈপ্সিত প্রান্তরে।
দু'বাহু বাড়াও প্রেমের করুণ মধুর আলিঙ্গনে
বিদূরিত হোক একাকিত্বের গ্লানি।

অয়নান্ত

দেবদাস পাঠক

আর না, এবার তুমি অশান্ত ইচ্ছার পরিক্রমা
শেষ করো। ঘরে ফেরো। বৈশাখের দুরন্ত দুপুরে
বৈরাগী মনের বোঝা সাথে নিয়ে পথে ঘুরে ঘুরে
দেখেছ তো লাল মাটি, শালবন, গোলমোরের ডালে
সহস্র প্রাণের শিখা। আবার নির্জন সন্ধ্যাকালে
সমুদ্র সৈকতে একা রঙছুট হৃদয়কে নিয়ে
কখনও বসেছ তুমি পায়ে পায়ে বালি ভেঙে গিয়ে।
সমুদ্র দেয়নি শান্তি, তাই বুঝি তুমি বারে বারে
অশান্ত মনকে নিয়ে দিশেহারা ছুটেছ পাহাড়ে।
তবুও তো ফিরে এলে সেই রিক্ত মন সাথে নিয়ে।

আর না, এবার তুমি অশান্ত ইচ্ছার পরিক্রমা
শেষ করো। বৈরাগী মনের গৈরিক বসন খোলো।
দীর্ঘ প্রব্রজ্যার শেষে দিনান্তে কখন সন্ধ্যা হলো
দেখ চেয়ে: দুই চোখে প্রতীক্ষার ক্লান্ত দীপ জেলে
যে আছে দাঁড়িয়ে তার করুণ মিনতি পায়ে ঠেলে
কোনখানে যাবে তুমি, বল মন বল কোনখানে!
তোমার নিয়তি তার দুই চোখ মৃত্যুবাণ হানে;
এবার প্রব্রজ্যা শেষে শান্তির শিবিরে বুঝি এলে।

মাঝের লোক

অরুণ সরকার

আমি মাঝের লোক,
এধারে এক রঙের খেলা ওধারে এক রূপের মেলা
দোটানাতে ঘোরায় আমার চোখ।

পিছন পানে তাকিয়ে দেখি, শান্তি ঘেরা গ্রাম
পথের বাউল নিত্য শোনায় ভগবানের নাম,
মন্দাকিনী স্রোতের জলে
ময়ূর আঁকা নৌকা চলে,
আঙিনাতে লক্ষ্মী-বধূ প্রদীপ জেলে রাখে
জাম-কাঁঠালের বনে বনে দোয়েল শ্যামা ডাকে।

মানুষ আছে আলো-হাওয়ায় মাটির কাছাকাছি
চলা-ফেরায় বেশে ভূষায় নাইক বাছাবাছি,
ছোট বুকের ছোট আশায়
ঝগড়া ঝাঁটি ভালবাসায়
গণ্ডি-টানা জগৎ মাঝে খোলা আকাশ তলে
আলস-মাখা বিলাস ভরে জীবনধারা চলে।

আমি মাঝের লোক
পিছন পানে তাকিয়ে আমার
জুড়িয়ে আসে চোখ।
সুমুখ পানে তাকিয়ে দেখি বিপুল বসুন্ধরা
ভাবীকালের মানুষ সে কি সম্ভাবনা ভরা
বায়ুস্তরের তরঙ্গে সে
বার্তা পাঠায় দেশ বিদেশে
পরমাণুর শক্তি এসে ভৃত্য হয়ে খাটে,
অণুর চাপে চলছে গাড়ি, লাঙল চলে মাঠে।

কলের মানুষ কাজ করে যায়, প্রাণের মানুষ ভাবে,
চিন্তা তাহার কবে কোথায় নূতন গ্রহে যাবে,
কেবল চলা কেবল গতি
জ্বলছে শুধু জ্ঞানের জ্যোতি
নাইক থামা, নাইক যতি, ভয় ভাবনা হীন
চলছে মানুষ, চলছে শুধু এগিয়ে চলে দিন।

আমি মাঝের লোক
সুমুখ পানে তাকিয়ে আমার
ঠিকরে আসে চোখ।

প্রেমোত্তর প্রেম

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

যেখানে তুমি চলেছো তার উদার পথঘাট
কখনো তাকি অন্যমনা করেছে সহজেই
তোমাকে, তুমি জানো না কী-যে আলো-ঝরার ছাট
ভিজিয়ে ভীতু মেয়েকে যতো তোমাকে সে খোঁজেই।

কাজলা মেঘ খোঁজেনি সে কি মেঘের রং দিয়ে
ভিজিয়ে চুল বুলিয়ে তুলি ভুরুর বাঁকা কোণে
পথের ধারে কেয়ার সারি গন্ধ উপচিয়ে
আনে নি কোনো বিগত দিন তোমার আনমনে?

তোমার আনমনের বালুচরের শ্যাম-রেখা
ডেকেছে তাকি বলেছে—'এসো...' (বাহার-করা ফ্রেমে
জলের রঙে আঁকা সে ছবি, চকিত ক'রে দেখা—)
'পালিয়ে ঘর হে যাযাবর, বাঁধবে বাসা প্রেমে।'

চলতি প্রেমে শান্তি নেই চলার সুরে শুধু?
সেকথা মিছে। নেই কি ঢের অচেনা পথঘাট
নেই কি নব গৃহস্থালী, অদেখা মাঠ ধু-ধু
নতুন কতো মেলায় কেনাবেচার কতো হাট?
আগল-দেয়া বাসরে ব'সে ঘামানো মিছে মাথা
যাক না উড়ে চার দেয়াল, জানলা দোর বাতা......
বাসর ভেঙে আসর হোক; শোবার ছোটো খাট
প্রসার পাক; ছাড়িয়ে ঘর নিখিল হোক বঁধু।
একটুখানি বুঝেছি যেই দিয়েছি হাতে হাত
বাঁধে না নীড় যে প্রেম বড়ো মনকে করে মাঠ—
সেখানে জমে নিত্য নব আনাগোনার মধু।

ত্রিকালভামিনী

আনন্দ বাগচী

তোমাকেই ভেবে ভেবে বৃষ্টি পড়ে, রোদ্দুরের চিল
বিকেলের তীর খায়, রঙ করা মুখের মিছিল
রাত্রির নাটকে লিপ্ত, অন্ধকার-তালা খুলে দিন
তোমারই কল্পনা করে, মাটির সমুদ্রে তুমি লীন।

তুমি একই চিত্রকল্প হাসি আর কান্নার খসড়া,
আমি বার বার তাই তোমার যৌবনে দিই ধরা
তোমাকেই মনে রেখে দিন আর রাত্রির বিস্ময়,
যৌবন তোমারই নামে পৃথিবীর সব বিষ সয়।
মাটির কপালে আঁকে বসুধারা যন্ত্রণার টিপ
আয়োজন মত্তমন, তুমি তোল সন্ধ্যার প্রদীপ
বন তুলসীর ঘ্রাণ, শ্রাবণ রাত্রির পদাবলী
সবাকার নেত্রকোণে আলোকের অস্ফুট কাকলী।

এমন যন্ত্রণা দাও সময়ের অভিজ্ঞান হয়
চিরকাল, এই তীক্ষ্ণ আনন্দের লয়
এক সূক্ষ্ম সুরযানে আমাকে করুক পারাপার
অন্য লোকে, জানা থাক ধুলো কাদা মাটির সংসার।

তুমি নারী অন্ধকার, এ যৌবন তোমাকে দিলাম
চুপি চুপি। তুমি সেই যন্ত্রণায় লিখে দিও নাম।

মুক্তধারা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

তোমার মনের গভীর অরণ্যে
গোপন কথার অঞ্জলি আজ আনম্রঅঙ্কুর,
এখনো তার ইচ্ছা নামঞ্জুর—
জানাও তারেঃ 'তুই এবারে আলোর শরণ নে।'

আমার আলো তোমার ছায়াটিরে
রাখবে ঘিরে, পুষ্প যেমন সুদীপ্ত বিশ্বাসে
কোরকে তার শান্তি রাখে সযত্ন বিন্যাসেঃ
পাপড়িগুলি হাওয়ার ভারে যদি-বা যায় ছিঁড়ে,
অক্ষত সেই শান্তি হাসে সংহত উল্লাসে।

আজকে তোমার আজন্ম-বন্দীরা
মুক্তি পাবে, তাদের পথে তীর্থতোরণ খুলে
সূর্য হবে রক্তজবা তোমার সোনার চুলে—

তোমার কায়া আমার হাতে আনন্দমন্দিরা!

থার্মোমিটর দেখে, কাগজ-পত্র ঘেঁটে জানা যায়, লাল-দরিয়া এমন কিছু গরম জায়গা নয়। জেকবাবাদ পেশাওয়ার দূরে থাক্, যারা পাটনা-গয়ার গরমটা ভোগ করেছেন তাঁরা আব-হাওয়া দফতরে তৈরী লাল-দরিয়ার জন্ম-কুণ্ডলী দেখে বিচলিত তো হবেন-ই না, বরঞ্চ ঈষৎ মৃদু হাস্যও করবেন। আর উন্নাসিক পর্যটক হলে হয়ত প্রশ্ন করেই বসবেন, 'হাল্কা আলস্টারটার দরকার হবে না তো!'

অথচ প্রতিবারেই আমার মনে হয়েছে, লাল-দরিয়া আমাকে যেন পার্কসার্কাসের হোটেলে খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক-কাবাব ঝলসাচ্ছে। ভুল বললুম; মনে হয়েছে, যেন হাঁড়িতে ফেলে ঢাকনা লেই দিয়ে সেঁটে আমাকে 'দম্-পুখ্তের' রান্না বা 'পুটপক্ক' করেছে। ফুটবলীদের যে রকম 'বগি' টীম হয়, লাল-দরিয়া আমার 'বগি সী'।

সমস্ত দিনটা কাটাই জাহাজের বৈঠকখানায় হাঁপাতে হাঁপাতে আর বরফভর্তি গেলাসটা কপালে ঘাড়ে নাকে ঘষে ঘষে, আর রাতের তিনটে যামই কাটাই রকে অর্থাৎ ডেকে তারা গুণে গুণে। আমার বিশ্বাস ভগবান লাল-দরিয়া গড়েছেন চতুর্থ ভূতকে বাদ দিয়ে। ওর সমুদ্রে যদি কখনো হাওয়া বয় তবে নিশ্চয়ই 'কিম্-ভূত'ই বলতে হবে।

তাই সে রাত্রে ব্যাপারটা আমার কিম্ভূত বলেই মনে হল।

ডেক চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রা। এমন সময় কানে এল, সেই লাল-দরিয়ায়, দেশ থেকে বহুদূরের সেই সাত সমুদ্রের এক সমুদ্রে—সিলেটের বাঙাল ভাষা। স্বপ্নই হবে। জানতুম, সে জাহাজে আমি ছাড়া আর কোনো সিলেটি ছিল না। এ-রকম মরমিয়া সুরে মাঝ রাতে কে কাকে 'ভাই, হি কথা যদি তুলচস—' বলতে যায়? খেয়ালী-পোলাও চাখতে, আকাশ-কুসুম শুঁকতে, স্বপ্নের গান শুনতে কোনো খর্চা নেই;—তাই ভাবলুম চোখ বন্ধ করে স্বপনটা আরো কিছুক্ষণ ধরে দেখি।

কিন্তু ঐ তো স্বপ্নের একটিমাত্র দোষ। ঠিক যখন মনে হবে, বেশ জমে আসছে, ঠিক তখনই ঘুমটি যাবে ভেঙে। এ-স্থলেও সে আইনের ব্যত্যয় হল না— চোখ খুলে দেখি, সামনে—আমার দিকে পিছন ফিরে দুজন খালাসী চাপা গলায় কথা বলছে।

বেচারীরা! রাত বারোটার পর এদের অনুমতি আছে ডেকে আসবার। তাও দল বেঁধে নয়। বাকি দিনের অসহ্য গরম তাদের কাটাতে হয় জাহাজের পেটের ভিতরে।

সিলেট নোয়াখালির লোক যে পৃথিবীর সর্বত্রই জাহাজে খালাসির কাজ করে সে কথা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, তারা কাজ করে মাল জাহাজেই; এই ফরাসী যাত্রী জাহাজে রাত্রি দ্বিপ্রহরে, তাও আবার নওয়াখালি চাটগাঁয়ের নয়, একদম খাঁটি আমার আপন দেশ সিলেটের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তার সম্ভাবনা স্বপ্নেই বেশী, বাস্তবে কম।

এরা কথা বলছিল খুবই কম। যেটুকু শুনতে পেলুম, তার থেকে কিন্তু

এ-কথাটা স্পষ্ট বোঝা গেল, এদের একজন এই প্রথম জাহাজের 'কামে' ঢুকেছে এবং দেশের ঘর-বাড়ির জন্য তার মন বড্ড উতলা হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গী পুরনো লোক; নতুন বউকে যে রকম বাপের বাড়ির দাসী সান্ত্বনা দেয় এর কথার ধরন অনেকটা সেই রকমের।

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলুম। শেষটায় যখন দেখলুম ওরা উঠি উঠি করছে তখন আমি কোনো প্রকারের ভূমিকা না দিয়েই হঠাৎ অতি খাঁটি সিলেটিতে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের বাড়ি সিলেটের কোন গ্রামে?'

সিলেটের খালাসীরা দুনিয়ার তাবৎ দরিয়ায় মাছের মত কিলবিল করে এ সত্য সবাই জানে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বড় সত্য—সিলেটের ভদ্রসন্তান পারতপক্ষে কখনো বিদেশ যায় না। তাই লাল-দরিয়ার মাঝখানে সিলেটি শুনে আমার মনে হয়েছিল ওটা স্বপ্ন,—সেইখানে সিলেটি ভদ্রসন্তান দেখে ওদের মনে হল, আজ মহাপ্রলয় (কিয়ামতের দিন) উপস্থিত! শাস্ত্রে আছে, ঐ দিনই আমাদের সক্কলের দেখা হবে এক-ই জায়গায়। ভূত দেখলেও মানুষ অতখানি লাফ দেয় না। দুজন যেভাবে এক-ই তালে-লয়ে লাফ দিল তা দেখে মনে হ'ল ওরা যেন ঐ কর্মটি বহুদিন ধরে মোহড়া দিয়ে আসছে।

উভয় পক্ষ কথঞ্চিৎ শান্ত হওয়ার পর আমি কেস খুলে ওদের সামনে ধরলুম। দুজনেই একসঙ্গে কানে হাত দিয়ে জিভ কাটল। আমাকে তারা চেনে না বটে—আমি দেশ ছেড়েছি ছেলেবেলায়—তবে আমার কথা তারা শুনেছে, এবং আমার বাপ-ঠাকুর্দার পায়ের ধুলো তারা বিস্তর নিয়েছে, খুদাতালার বেহদ্ মেহেরবানী, আজ তারা আমার দর্শন পেল, আমার সামনে ওসব—তওবা, তওবা ইত্যাদি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার দেশের চাষারা ইয়োরোপীয় চাষার চেয়ে ঢের বেশী ভদ্র।

খালাসী জীবনের কষ্ট এবং আর পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথাও হল। দুঃখের কথাই পনরো আনা তিন পয়সা। বাকি এক পয়সা সুখ—অর্থাৎ মাইনেটা, সেই এক পয়সাই পঁচাত্তর টাকা। ঐ দিয়ে বাড়ি ঘর ছাড়াবে, জমি-জমা কিনবে।

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শুধালুম, 'আহারাদি?' রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে।

বললে, 'ঐ তো আসল দুঃখ হুজুর। আমি তো তবু পুরানো লোক। পাউরুটি আমার গলায় গিঁঠ বাঁধে না। কিন্তু এই ছেলেটার জান পান্তাভাতে পোঁতা। পান্তা ভাত! ভাতেরই নেই খোঁজ, ও চায় পান্তা ভাত! মূলে নেই ঘর, পুব দিয়ে তিন দোর। হুঃ!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি কথা! আমি তো শুনেছি, আর কিছু নাহোক তোমাদের ডাল-ভাত প্রচুর খেতে দেয়। জাহাজের কাম করে কেউ তো কখনো রোগা হয়ে দেশে ফেরেনি।'

বললে, 'ঠিকই শুনেছেন সায়েব। কিন্তু ব্যাপার হয়েছে কি, কোনো কোনো বন্দরে চাল এখন মাগ্‌গি। সারেঙ্গ আমাদের রুটি খাইয়ে চাল জমাচ্ছে ঐ সব বন্দরে লুকিয়ে চাল বিক্রী করবে বলে। সারেঙ্গ দেশের জাতভাই কি না, না হলে অন্ন মারার কৌশল জানবে কি করে?'

আমি বললুম 'নালিশ-ফরিয়াদ করোনি?'

বললে, 'কে বোঝে কার বুলি? এদের ভাষা কি জানি, 'ফ্রিঞ্চি' না কি, সারেঙই একটুখানি বলতে পারে। ইংরিজি হলেও না হয় আমাদের মুরুব্বিদের কেউ কেউ ওপর-ওলাদের জানাতে পারতেন। ঐ তো সারেঙ্গের কল! ধন্যি জাহাজ; ব্যাটারা শুনেছি কোলা ব্যাঙ ধরে ধরে খায়! সেলাম সায়েব, আজ উঠি। দেরী হয়ে গিয়েছে। আপনার কথা শুনে জানটা—'

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস।'

২

মাঝ রাতের স্বপ্ন আর শেষ রাতের ঘটনা মানুষ নাকি সহজেই ভুলে যায়। আমার আবার চমৎকার স্মৃতিশক্তি—সব কথাই ভুলে যাই। তাই ভাতের কেচ্ছা মনে পড়ল, দুপুরবেলা লঞ্চের সময় রাইস-কারি দেখে।

জাহাজটা ফরাসিস ফরাসিসে ভর্তি। আসলে এটা ইন্দো-চীন থেকে ফরাসী সেপাইলস্কর লাদাই করে ফ্রান্স যাবার মুখে পণ্ডিচেরীতে একটা ঢু মেরে যায়। প্যাসেঞ্জার মাত্রই পল্টনের লোক, আমরা গুটিকয়েক ভারতীয়ই উটকো মাল। খানা-টেবিলে আমার পাশে বসতো একটি ছোকরা সু-লিয়োৎনা—অর্থাৎ সাবঅলটার্ন। আমার নিতান্ত নিজস্ব মৌলিক ফরাসিসে তাকে রাত্রের ঘটনাটি গল্পচ্ছলে নিবেদন করলুম।

শুনে তো সে মহা উত্তেজিত! আমি অবাক! ছুরি কাঁটা টেবিলে রেখে, মিলিটারি গলায় ঝাঁঝ লাগিয়ে বলতে শুরু করলে, এ ভারি অন্যায়, অত্যন্ত অবিচার, ইনুই—অন-হার্ড-অব্‌—, ফাঁতাস্তিক—ফেনটাসটিক আরও কত কী!

আমি বললুম, 'রোসো, রোসো। অত গরম হচ্ছ কেন? এ অবিচার তো দুনিয়ার সর্বত্রই হচ্ছে, আকছারই হচ্ছে। এই যে তুমি ইন্দোচীন থেকে ফিরছো, সেখানে কি কোন ড্যানিয়েলগিরি করতে গিয়েছিলে, মো গার্সোঁ (বাছা)। ও সব কথা থাক, দুটি খাও।'

ছোকরাটির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল বলেই কথাটা বলবার সাহস হয়েছিল। বরঞ্চ ইংরেজকে এ-সব কথা বলবেন, ফরাসিকে বললে হাতাহাতি বোতল ফাটা-ফাটির সম্ভাবনাই বেশী।

চুপ মেরে একটু ভেবে বললে, 'হুঁঃ। কিন্তু এ স্থলে তো দোষী তোমারই জাত-ভাই ইণ্ডিয়ান সারেঙ্গ!'

আমি বিষম খেয়ে বললুম, 'ঐ যু-যা!'

পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ এখনো দেখলুম না যেখানে মানুষ সুযোগ পেলে দুপুর বেলা ঘুমোয় না। তবু যে কেন বাঙলীর ধারণা যে, সে-ই এ ধনের এক-মাত্র অধিকারী তা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। আপন আপন ডেক চেয়ারে শুয়ে, চোখে ফেটা মেরে আর পাঁচটি ফরাসিসের সঙ্গে কোরাসে ঐ কর্মটি সবে মাত্র সমাধান করেছি, এমন সময় উর্দি-পরা এক নৌ-অফিসার আমার সামনে এসে অতিশয় সৌজন্য সহকারে অবনতমস্তকে যেন প্রকাশ্যে আত্মচিন্তা করলেন; 'আমি কি মসিয়ো অমুকের সঙ্গে আলাপ করার আনন্দ লাভ করছি?'

আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, আরো অবনত মস্তকে বললুম; 'আদপেই না। এ শ্লাঘা সম্পূর্ণ আমার-ই।'

অফিসার বললেন, 'মসিয়ো ল্য কমাদাঁ—জাহাজের কাপ্তান সাহেব—মসিয়োকে—আমাকে—তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দাভিবাদন জানিয়ে প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যদি মসিয়োর উপস্থিতি পান, তবে উল্লসিত হবেন।'

পাপাত্মা আমি। ভয়ে আঁৎকে উঠলুম। আবার কি অপকর্ম করে ফেলেছি যে, মসিয়ো ল্য কমাদাঁ আমার জন্য হুলিয়া জারী করেছেন! শুকনো মুখে, ঢোক গিলে বললুম, 'সে-ই হবে আমার এ-জীবনের সব চেয়ে বড় সম্মান। আমি আপনার পথ প্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল।'

মসিয়ো ল্য কমাদাঁ যদিও যাত্রী-জাহাজের কাপ্তান, তবু দেখলুম তাঁর ঠোঁটের উপর ভাসছে আরেকখানি জাহাজ এবং সেটা সর্বপ্রকার বিনয় এবং স্তুতি-স্তোকবাক্যে টৈটম্বুর লাদাই। ভদ্রতার মানওয়ারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে মোদ্দা কথা যা বললেন, তার অর্থ আমার মত বহুভাষী পণ্ডিত ত্রিভুবনে আর হয় না, এমন কি প্যারিসেও হয় না।

এত বড় একটা মারাত্মক ভ্রমাত্মক তথ্য তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করবো করবো করছি, এমন সময় তাঁর কথার তোড় থেকেই বেরিয়ে গেল, তিনি তিন শ' তিরনব্বুই বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এই প্রথম একটি মহাপণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন, যিনি তাঁর খালাসীদের কিচির-মিচিরের একটা অর্থ বের করতে পারেন। যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তাহলে আমার মত আরো বহু লক্ষ পণ্ডিত সিলেট জেলায় আছেন। তারপর তিনি অনুরোধ করলেন, আমি যদি দয়া করে তাঁর খালাসীদের অসন্তুষ্টির কারণটি খোলসা করে বর্ণনা করি, তবে তিনি বড় উপকৃত হন। আমি তাই করলুম। তখন সেই খালাসীদের আর সারেঙের ডাক পড়লো। তারা কুরবানীর পাঁঠীর মত কাঁপতে কাঁপতে উপস্থিত হল।

কাপ্তান আর জজ ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী। সাক্ষীর বয়স কত, সেই আলোচনায় জজেরা হেসে খেলে সাতটি দিন কাটিয়ে দেন, কাপ্তানরা দেখলুম, তিন মিনিটেই ফাঁসীর হুকুম দিতে পারেন। মসিয়ো ল্য কমাদাঁ অতি শান্তকণ্ঠে এবং প্রাঞ্জল ফরাসিতে সারেঙকে বুঝিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে তিনি যদি আর কখনো এরকম কেলেঙ্কারির খবর পান, তবে তিনি একটি-মাত্র বাক্যব্যয় না করে সারেঙকে সমুদ্রের জলে ফেলে তার উপর জাহাজের প্রপেলারটি চালিয়ে দেবেন।

যাক। বাঁচা গেল। মরবে তো মরবে সারেঙটা!

পানির পীর বদর সায়েব। তাঁর কৃপায় রক্ষা পেয়ে 'বদর বদর' বলে কেবিনে ফিরলুম।

খানিকক্ষণ পরে চীনা কেবিন-বয় তার নিজস্ব ফরাসীতে বলে গেল, খালাসীরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে আজ যেন আমি মেহেরবানী করে কেবিনে বসে তাদের পাঠানো 'ডাল-ভাত' খাই।

গোয়ালন্দী জাহাজের মামুলী রাইস-কারি খেয়েই আপনারা আ-হা-হা করেন, সেই জাহাজের বাবুর্চিরা যখন কোর্মা-কালিয়া পাঠায়, তখন কি অবস্থা হয়? নাঃ, বলবো না। দু-একবার ভোজনের বর্ণনা করার ফলে শহরে আমার বদনাম রটে গিয়েছে আমি পেটুক এবং বিস্বানিন্দুক। আমি শুধু অন্যের রন্ধনের নিন্দা করতেই জানি। আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়েছে। তামা-তুলসী স্পর্শ করে এই শপথ করলুম—নাঃ, থাক, আপনার বাড়িতে আমার যা-[illegible] আমি একটা [illegible] দিলুম।

কাপ্তান সাহেব আমার কাছে 'চিরকৃতজ্ঞ' হয়ে আছেন। খালাসীরা তাই এখন নির্ভয়ে খাবার নিয়ে আমার কেবিনে আসে।

করে করে জাহাজের শেষ রাত্রি উপস্থিত হল। সে রাত্রে খালাসীদের তৈরী গ্যালা-ব্যানকুয়েট খেয়ে যখন বাঙ্কে এ-পাশ ও-পাশ করছি, এমন সময় খালাসীদের মুরুব্বিটি আমার পায়ের কাছটায় পাটাতনে বসে হাত-জোড় করে বললে, 'হুজুর, একটি নিবেদন আছে?'

মোগলাই খানা খেয়ে তখন তবিয়ৎ বেজায় খুশ। মোগলাই কণ্ঠেই ফরমান জারী করলুম, 'নির্ভয়ে কও।'

বললে, 'হুজুর ইটা পরগণার ঢেউপাশা গাঁয়ের নাম শুনেছেন?'

আমি বললুম, 'আলবৎ। মনু গাঙের পারে।'

বললে, 'আহা, হুজুর সব জানেন।'

মনে মনে বললুম, 'হায়, শুধু কাপ্তেন আর খালাসীরাই বুঝতে পারলো আমি কত বড় বিদ্যেসাগর! যারা বুঝতে পারলে আজ আমার পাওনাদারের ভয় ঘুচে যেত তারা বুঝলো না।

বললে, 'সেই গ্রামের করীম মুহম্মদের কথাই আপনাকে বলতে এসেছি, হুজুর। করীম ব্যাটা মহা পাষণ্ড, চোদ্দ বছর ধরে মার্সাঈ (মার্সলেস) বন্দরে পড়ে আছে। ওদিকে বুড়ি মা কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি কানা করে ফেলেছে, কত খবর পাঠিয়েছে। হা—কিছুতেই দেশে ফিরবে না। চিঠি-পত্রে কিছু হল না দেখে আমরা বন্দরে নেমে তার বাড়ি গিয়েছিলুম, তাকে বোঝাবার জন্য। বেটার বউ এক বেঙথেকী, এমন তাড়া লাগালে যে, আমরা পাঁচজন মন্দা-মানুষ প্রাণ বাঁচিয়ে পালাবার পথ পাইনে' তবে শুনেছি, মেয়ে-মানুষটা প্রথম প্রথম নাকি তার ভাতারের দেশের লোককে আদর-কদর করতো। যবে থেকে বুঝেছে, আমরা তাকে ভাণ্ডচি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার তালে আছি, সেই থেকে মারমুখো খাণ্ডার হয়ে আছে।'

আমি বললুম, 'তোমরা পাঁচজন লেঠেল যে কর্মটি করতে পারলে না, আমি সেইটে পারব? আমাকে কি গামা পায়লওয়ান ঠাউরেছো?'

বললে, 'না, হুজুর, আপনাকে কিছু বলবে না। আপনি সুট টাই পরে গেলে ভাববে আপনি এসেছেন অন্য কাজে। আমাদের লুঙি আর চেহারা দেখেই তো বেটি টের পেয়ে যায়, আমরা তার ভাতারের জাত-ভাই। আপনি হুজুর, মেহেরবানি করে না বলবেন না, আপনার যে কতখানি দয়ার শরীর সে কথা বেবাক খালাসী জানে বলেই আমাকে তারা পাঠিয়েছে। আপনার জন্যই তো আজ আমরা ভাত——'

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস, হয়েছে হয়েছে। কাপ্তান পাকড়ে নিয়ে শুধালো বলেই তো সব কথা বলতে হল। না হলে আমার দায় পড়েছিল।'

বললে, 'তওবা, তওবা। শুনলেও গুনা হয়। তা হুজুর, আপনি দয়া করে আর না বলবেন না। আমি বুড়ির হয়ে আপনার পায়ে ধরছি।'

বলে সত্য-সত্যই আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলো। আমি হা হা করো কি করো কি বলে পা দুটো ছাড়ালুম।

ওরা আমাকে যা কোর্মা-পোলাও খাইয়েছে তার বদলে এ কাজটুকু না করে দিলে অত্যন্ত নেমকহারামী হয়। ওদিকে আবার এক ফরাসিনী দজ্জাল। ঝাঁটা কিম্বা ভাঙা ছাতা নয়, পিস্তল হাতে নিয়ে তাড়া লাগানোই ওদের স্বভাব।

কোন মূর্খ বেরয় দেশ ভ্রমণে! কতনা বাহান্ন রকমের যতসব বিদকুটে, খুদার খামোখা গেরো।

৩

বন্দরে নেবে দেখি, পরদিন ভোরের আগে বার্লিন যাবার সোজা ট্রেন নেই। ফাঁকি দিয়ে গেরোটা কাটাবো তারও উপায় আর রইল না। দুজন খালাসী নেমেছিল সঙ্গে—ঢেউপাশার নাগরের বাড়ি দেখিয়ে দেবে বলে। তাদের পরনে লুঙ্গি, গায়ে রঙীন শার্ট, মাথায় খেজুর পাতার টুপি, পায়ে বুট, আর গলায় লাল কম্ফর্টার! ঐ কম্ফর্টারটি না থাকলে ওদের পোশাকি সজ্জাটি সম্পূর্ণ হয় না—বাঙালীর যে রকম রেশমী উড়ুনি।

দুই হুজুরে আমাকে 'হুজুর হুজুর' করতে করতে নিয়ে গেল বন্দরের এক সাবার্বে। সেখানে দূরের থেকে সন্তর্পণে ছোট্ট একটি ফুটফুটে বাড়ি দেখিয়ে দিয়েই তাঁরা হাওয়া হয়ে গেলেন। আমি প্রমাদ গুণতে গুণতে এগলুম। পানির পীর বদর সায়েবকে এখন আর স্মরণ করে কোনো লাভ নেই। তাই সোঁদরবনের ডাঙার বাঘের পীর গাজী সাহেবের নাম মনে মনে জপতে লাগলুম—যাচ্ছি তো বাঘিনীরই সঙ্গে মোলাকাত করতে।

বেশ জোরেই বোতাম টিপলুম—চোরের মায়ের বড় গলা।

কে বলে খাণ্ডার? দরজা খুলে একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের অতিশয় নিরীহ চেহারার গো-বেচারী যুবতী এসে আমার সামনে দাড়ালো। 'গো'-বেচারী বললুম তার কারণ আমাদের দেশটা গোরুর। আসলে কিন্তু

ওদের দেশের তুলনা দিয়ে বলতে হয়, মেরি হ্যাড্ এ লিটল্ ল্যাম্'-এর ভেড়াটি যেন মেরির রূপ নিয়ে এসে দাঁড়াল। ওদিকে আমি তৈরী ছিলুম পিস্তল, মেশিনগান, হ্যান্ড গ্রেনেডের জন্য। সামলে নিয়ে জাহাজে যে চোস্ত ফরাসিস আদব-কায়দার তালিম পেয়েছিলুম, তারই অনুকরণে, মাথা নিচু করে বললুম, "আমি কি মাদাম মা-ও-মের ('মুহম্মদের' ফরাসী উচ্চারণ) সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ লাভ করছি?' ইচ্ছে করেই কোন্ দিশী লোক সেটা উল্লেখ করলুম না। ফরাসীরা চীনা, ভারতীয় এবং আরবের মধ্যে তফাৎ করতে পারে না। আমরা যে রকম চীনা, জাপানী এবং বর্মী সবাইকে একই রূপে দেখি।

চেহারা দেখে বুঝলুম, মাদাম গুবলেট করে ফেলেছেন। বল্লেন, 'আঁদ্রে, (প্রবেশ করুন) মঁসিয়ো।' ভরসা পেয়ে বললুম, 'মঁসিয়ো মাওমের সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?'

'অবশ্য।'

ড্রইং-রুমে ঢুকে দেখি শেখ করীম মুহম্মদ উত্তম ফরাসী সুট পরে টেবিলের উপর রকমারি নক্সার কাপড়ের ছোট ছোট টুকরোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ফরাসীতেই বললুম, 'আমি মাদ্রাজ থেকে এসেছি, কাল বার্লিন চলে যাবো। ভাবলুম, আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই।' সে যে ভারতীয় এবং তার ঠিকানা জানলুম কি করে সেকথা ইচ্ছে করেই তুললুম না।

ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে অভ্যর্থনা জানালো।

আমি ইচ্ছে করেই মাদামের সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিলুম। মার্সেলেস যে কী সুন্দর বন্দর, কত রকম-বেরকমের রেস্তোরাঁ-হোটেল, কত জাত-বেজাতের লোক কত শত রকমের বেশভূষা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরো কত কি।

ইতিমধ্যে একটি ছেলে আর মেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

কী সুন্দর চেহারা। আমাদের করীম মুহম্মদ কিছু নটবরটি নন, তার বউও ফরাসী দেশের আর পাঁচটা মেয়ের মত কিন্তু বাচ্চা দুটির চেহারায় কি অপূর্ব লাবণ্য। কে বলবে এরা খাঁটি স্প্যানিস নয়? সে দেশের চিত্রকারদের অয়েল-পেন্টিঙে আমি এ-রকম দেব-শিশুর ছবি দেখেছি। ইচ্ছে করে, কোলে নিয়ে চুমো খাই। কিন্তু আশ্চর্য লাগলো, পূর্বেই বলেছি, বাপের চেহারা তো বাঙলা দেশের আর পাঁচজন হাল-চাষের শেখের যা হয় তা-ই, মায়ের চেহারাও সাধারণ ফরাসিনীর মত। তিন আর তিনে তা হলে সব সময় ছয় হয় না। দশও হতে পারে—ইন্‌ফিনিটি অর্থাৎ পরিপূর্ণতাও হতে পারে। প্রেমের ফল তাহলে অংকশাস্ত্রের আইন মানে না।

মাদাম ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি তোদের বাবার দেশের লোক।' ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমি আদর করতেই বলে উঠলো, 'ল্যাঁদ,—সে ত্যঁ প্যাই-ঈ ফাতাস্তিক, নেস্‌পা?—' অর্থাৎ 'ভারতবর্ষ ফেনটাসটিক দেশ, সে দেশের অনেক ছবি সে দেখেছে, তার ইচ্ছে সেখানে যায়, কিন্তু বাবা রাজি হয় না—তুমি, অঁকল (কাকা), আমাকে নিয়ে চল,' ঐ ধরনের আরো কত কী।

আমি আবার প্রমাদ গুণলুম। কথাটা যে দিকে মোড় নিচ্ছে তাতে না মাদাম পিস্তল বের করে।

অনুমান করতে কষ্ট হল না, আলোচনাটা মাদামের পক্ষেও অপ্রিয়। তিনি শুধালেন, 'মঁসিয়োর রুচি কিসে?—চা, কফি, শোকোলা (কোকো), কিম্বা—'

আমি বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ।'

তবু শেষটায় কফি বানাতে উঠে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে করীম মুহম্মদ উঠে দাঁড়িয়ে সিলেটি কায়দায় পা ছুঁয়ে সেলাম করতে গেল। বুঝলুম, ওর চোখ ঠিক ধরতে পেরেছে। আমি সিলেটিতেই বললুম, 'থাক থাক।'

যেভাবে তাকালো তার থেকে বুঝতে পারলুম, সে আমার পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছে না, সে পায়ের ধুলো নিচ্ছে তার দেশের মুরুব্বীদের যাঁর ভিতর রয়েছেন আমার পিতৃ-পিতামহও, সে তার মাথায় ঠেকাচ্ছে দেশের মাটির ধুলো, তার মায়ের পায়ের ধুলো। আমি তখন বারণ করবার কে? আমার কি দম্ভ! সে কি আমার পায়ের ধুলো নিচ্ছে!

শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করলে, 'হুজুর কোন্ হোটেলে উঠেছেন?' আমি নাম বললুম। স্টেশনের কাছেই।

আমি বললুম 'বসো।' সে আপত্তি জানালো না। তারপর দুজনই আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। কারো মুখে কোন কথা নেই।

এমন সময় মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তার গালে চুমো খেয়ে বললুম, 'মধু'।

বাপ হেসে বললে, 'এবারে জন্মদিনে ওকে যখন জিজ্ঞেস করলুম, সে কি সওগাত চায়, তখন চাইলে ইন্ডিয়ান বর। আমাদের দেশের মেয়েরা বিয়ের কথা পাড়লেই ঘেমে ওঠে।'

তার গলায় ঈষৎ অনুযোগের আভাস পেয়ে আমি বললুম, 'মনে মনে নিশ্চয়ই পুলকিত হয়। আর আসলে তো এসব বাড়ির, দেশের-দশের আবহাওয়ার কথা। এরা পেটের অসুখের কথা বলতে লজ্জা পায়, আমরা তো পাইনে।'

ইতিমধ্যে কফি এল। মাদাম বললেন, 'মেয়ের নাম সারা (Sara, ইংরিজিতে Sarah), ছেলের নাম রোমাঁ।' বাপ বললে, আসলে রহমান। বুঝলুম লোকটার বুদ্ধি আছে। 'সারা' নাম মুসলমান মেয়েদেরও হয়। আর 'রহমানের' উচ্চারণ ফরাসীতে মোটামুটি 'রোমাঁ'-ই।

বেচারী মাদাম। কফির সঙ্গে দিলে দুনিয়ার যত রকমের কেক্, পেস্ট্রি, গাতো, ব্রিয়োশ, ক্রোয়াসাঁ। বুঝলুম, পাড়ার দোকানের যাবতীয় চায়ের আনুষঙ্গিক ঝেঁটিয়ে কিনে আনিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, প্যাঁজের ফুলুরিও। মাদাম বললে, 'ম মারি—ইল লেজ এম। আমার স্বামী এগুলো ভালোবাসেন।'

ছেলেটা চেঁচিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মামি—আমিও মা।'

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'মোয়া ও সি, মনোঁক্‌ল্—আমিও চাচা।'

আমি আর সইতে পারলুম না। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সে সম্বন্ধে আমি সমস্তক্ষণ সচেতন ছিলুম। রোমাঁর ভারত যাওয়ার ইচ্ছে, সারার ভারতীয় বরের কামনা এসব আমায় যথেষ্ট কাবু করে এনেছিল; কিন্তু ফ্রান্সের সেরা সেরা মিষ্টির কাছে ফুলুরির প্রশংসা—এ কোন্ দেশের রক্ত চেঁচিয়ে উঠে আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিলে।

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'আজ তবে আসি। বার্লিনের টিকিট আমার এখনো কাটা হয় নি। সেটা শেষ না করে মনে শান্তি পাচ্ছিনে।'

সবাই চেঁচামেচি করতে লাগলো। ছেলেটা বললে, 'কিন্তু আপনি তো এখনো আমাদের এলবাম্ দেখেন নি।' বলেই কারো তোয়াক্কা না করে এলবাম এনে পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগলো। 'এই তো বাজান (বাবা+জান, সিলেটিতে বাজান), কী অদ্ভুত বেশে এদেশে নেবেছিলেন, এটার নাম লুঙ্গি, না বাজান? কিন্তু ভারী সুন্দর, আমায় একটা দেবে, অঁক্‌ল্—চাচা? বাবারটা আমার হয় না, (মাদাম বললেন 'চুপ', ছেলেটা বললে 'পার্দোঁ' অর্থাৎ বে-আদবি মাফ করো), এটা মা, বিয়ের আগে, ক্যাল্ এ জলি, কী সুন্দর—'

ওঃ!

গুষ্টিশুদ্ধ আমাকে ট্রাম টার্মিনালে পৌঁছে দিতে এল। পৃথিবীর সর্বত্রই সর্ব মহল্লা থেকে অন্তত একটা ট্রাম যায়—বিনা চেঞ্জে—স্টেশন অবধি। বিদেশীকে নেই

ট্রামে বসিয়ে দিলেই হল। মাদাম কিন্তু তবু পই পই করে কন্ডাক্‌টরকে বোঝালেন, আমাকে যেন ঠিক স্টেশনে নাবিয়ে দেওয়া হয়। 'মসিয়ো' এ(ত্‌) এন্রাজে'র, স্ট্রেঞ্জার, বিদেশী, (তারপর ফিস্‌ ফিস্‌ করে) ফরাসী বলতে পারেন না—'

মনে মনে বড় আরাম বোধ করলুম। যাক্‌, তবু একটি বুদ্ধিমতী পাওয়া গেল, যে আমার ফরাসী বিদ্যের চৌহদ্দী ধরতে পেরেছে।

মাদাম, কাচ্চাবাচ্চারা চে'চালে, 'ও রভোয়ার'।

করীম মুহম্মদ বললে, 'সেলাম সায়েব।'

৪

আহারাদির পর হোটেলের লাউঞ্জে বসে উপরে ঘুমুতে যাবো যাচ্ছি যাবো যাচ্ছি করছি এমন সময় করীম মুহম্মদ এসে উপস্থিত। পরনে লুঙি কম্‌ফর্টার!

ইয়োরোপের কোনো হোটেলে ঢুকে আপনি যদি লাউঞ্জে জুতো খুলতে আরম্ভ করেন, তবে ম্যানেজার পুলিস কিম্বা এম্‌বুলেনস্‌ ডাকবে। ভাববে, আপনি ক্ষেপে গেছেন। এতত্ত্বটি নিশ্চয়ই করীমের জানা; তাই তার সাহস দেখে অবাক মানলুম। বরঞ্চ আমি-ই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তাকে বারণ করলুম। কিন্তু তারপর বিপদ, সে চেয়ারে বসতে চায় না। বুঝতে পারলুম, পরিবারের বাইরে এসে সে ঢেউ-পাশার 'করীম্যা' হয়ে গিয়েছে। জুতো পরবে না, চেয়ারে বসবে না, কথায় কথায় কদম্‌বোস্‌—পদচুম্বন—করতে চায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'এ কি আপদ!'

লজ্জা পেয়ে বললে, 'হুজুরের বোধ হয় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে সকলের সামনে আমার সংগে কথা বলতে। তাহলে, দয়া করে, আপনার কামরায়—'

আমি উষ্মা প্রকাশ করে বললুম, 'আদপেই না।' এবং এ-অবস্থায় শ্রীহট্টের প্রত্যেক সুসন্তান যা বলে থাকে, সেটাও জুড়ে দিলুম—'আমি কি এঘরে 'মাগনা' বসেছি, না এদের জমিদারীর প্রজা। কিন্তু তুমি এ রকম করছো কেন? তুমি কি আমার কেনা গোলাম না কি? চলো উপরে।'

সেখানে মেঝেতে বসে এক গাল হেসে বললে, 'কেনা গোলাম না তো কি? আমার চাচাতো ভাই আছমত ছিল আপনাদের বাসার চাকর। এখনো আমি মাকে যখন টাকা পাঠাই সেটা যায় আপনার সাহেবের (পিতার) নামে। আমি আপনাদের বাসায় গিয়েছি, আপনার আম্মা আমাকে চীনির বাসনে খেতে দিতেন। আমি আপনাকে চিনি হুজুর।'

আমি শুধালুম, 'বউকে ফাঁকি দিয়ে এসেছ?'

বললে 'না, হুজুর। খেতে বসে রোমাঁর মা আমাকে আপনার সংগে দেখা করতে বললে। আপনাকে যে রাত্রে খেতে বলতে পারেনি তার জন্যে দুঃখ করলে। ও সত্যি বললে যে আপনাতে আমাতে বাড়িতে নিরিবিলি কথাবার্তা হবে না, তাই আপনাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেনি। আসবার সময় বললে, উনি যা বলেন তাই হবে।'

আমি শুধালুম,—'বউ না বললে তুমি আসতে না?'

কিছুমাত্র না ভেবে বললে, 'নিশ্চয়ই আসতুম। তবে ওকে খামকা কষ্ট দিতে চাইনে বলে না বলে আসতুম।' বলে লাজুক বাচ্চাটির মত ঘাড় ফেরালে। আমার বড় ভালো লাগলো।

আমি শুধালুম, 'আমি তোমাদের বাড়িতে কি বলতে গিয়েছিলুম তোমরা জানলে কি করে? আর আমি শুনেছি, তোমার বউ দেশের লোককে তাড়া লাগায়? আমাকে লাগালো না কেন?'

যেন একটু লজ্জা পেয়ে বললো, 'তা একটু-আধটু লাগায় বটে, হুজুর ওরা যে বলে বেড়ায় আমাকে রোমাঁর মা ভ্যাড়া বানিয়ে রেখেছে সে খবরটা ওর কানে পৌঁচেছে। তাই গেছে সে ভীষণ চটে। আসলে ও বড় শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, ঝগড়া-কাজিয়া কারে কয় আদপেই জানে না।

আর মানুষকে কি কখনো ভ্যাড়া বানানো যায়? কামরূপে না, কোনোখানেই না।

আপনি তা হ'লে সব কিছু শুনে বিবেচনা করুন, হুজুর।

সতরো বছর বয়সে আমি আর পাঁচজন খালাসীর সংগে নামি এই বন্দরে। কেন জানিনে, হুজুর, হঠাৎ পুলিস লাগালে তাড়া। যে যার জান নিয়ে যেদিকে পারে দিলে ছুট। আমি ছিটকে পড়লুম শহরের এক অজানা কোণে। জাহাজ আর খুঁজে পাইনে। শীতের রাতে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষটায় এক পোলের নিচে শুয়ে পড়লুম জিরবো বলে। যখন হুঁশ হল তখন দেখি আমি এক হাসপাতালে শুয়ে। জ্বরে সর্বাংগ পুড়ে যাচ্ছে—দেশে আমার ম্যালেরিয়া হত। তারপর ক'দিন কাটলো হুঁশে আর বেহুঁশে তার হিসেব আমি রাখতে পারিনি। মাঝে মাঝে আবছা আবছা দেখতে পেতুম, ডাক্তাররা কি সব বলাবলি করছে। সেরে উঠে পরে শুনেছি ওদের কেউই কখনো ম্যালেরিয়া রোগীর কড়া জ্বর দেখেনি বলে সবাই ভড়কে গিয়েছিল। আর জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে দেখতে পেতুম একটি নার্সকে। সে আমার জল খাইয়ে রুমাল দিয়ে ঠোঁটের দু'দিক মুছে দিত। একদিন শেষ রাতে কম্প দিয়ে এল আমার ভীষণ জ্বর। নার্স সব ক'খানা কম্বল চাপা দিয়ে যখন কম্প থামাতে পারলো না তখন নিজে আমাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল। দেশে মা যে রকম জড়িয়ে ধরতো ঠিক সেই রকম। তারপর আমি ফের বেহুঁশ।

কিন্তু এর পর যখন জ্বর ছাড়লো তখন আমি ভালো হতে লাগলুম। শুয়ে শুয়ে দেশের কথা, মায়ের কথা ভাবি আর ঐ নার্সটিকে দেখলেই আমার জানটা খুশীতে ভরে উঠতো। সে মাঝে মাঝে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতো আর ওদের ভাষায় প্রতিবারে একই কথা বলতো। আমি না বুঝেও বুঝলুম, বলছে, ভয় নেই, সেরে উঠবে।'

তারপর একদিন ছাড়া পেলুম। সংগে সংগে ছুটলুম বন্দরের দিকে। সেখানে এক জাত-ভাইয়ের সংগে। অন্য এক জাহাজের—আমাদের জাহাজ তো কবে ছেড়ে দিয়েছে।

সে সব কথা শুনে বললে, 'ভাগো, ভাগো, এখুনি ভাগো। তোমার নামে হুলিয়া জারী হয়েছে, তুমি জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছ। ধরতে পারলেই তোমাকে পুলিস জেলে দেবে।'

ক বছর? কে জানে। এক হতে পারে চোদ্দও হতে পারে। আইন কানুন হুজুর আমি তো কিছুই জানিনে।

কিন্তু যাই-ই বা কোথায়? যেদিকে তাকাই সে দিকেই দেখি পুলিস।

খানা-পিনার কথা তুলবো না, হুজুর, সে তখন মাথায় উঠে গিয়েছে। কিন্তু রাতটা কাটাই কোথায়?

শেষটায় শেষ অগতির গতির কথা মনে পড়ল।' হাসপাতাল ছাড়ার সময় সেই নার্সটি আমার সঙ্গে শেকহ্যান্ড করে দিয়েছিল একখানা চিরকুট। তখনো জানতুম না, তাতে কি লেখা। যাকে দেখাই সে-ই হাত দিয়ে বোঝায় আরো উত্তরদিকে যাও। শেষটায় একজন লোক আমাকে একটা বড় বাড়ির দেউড়ি দেখিয়ে চলে গেল।

সেখানে ঘণ্টাতিনেক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রোঁদের পুলিস আমাকে সওয়াল করতে লাগলো। হাসপাতালে দু'মাস ওদের বুলি শুনে শুনে যে-টুকু শিখেছিলুম তার থেকে আমেজ করতে পারলুম, ওর মনে সন্দ হয়েছে, আমি কি মতলবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি—আর হবেই না কেন? বুঝলুম, রাশিতে জেল আছেই। মনে মনে বললুম, কি আর করি, একটা আশ্রয় তো চাই। জেলই কবুল। চাচা মামু অনেকেই তো লাঠালাঠি করে গেছেন, আমি না হয় না করেই গেলুম।

এমন সময় সেই নার্সটি এসে হাজির। পুলিসকে কি একটা সামান্য কথা বলে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল তার ছোট্ট ফ্লাটে—পুলিস যেভাবে তাকে সেলাম করে রা টি না কেড়ে চলে গেল তার থাকে আন্দেশা করলুম, পাড়ার লোক ওকে মানে।

আমাকে খেতে দিল গরম দুধের সঙ্গে কাঁচা আণ্ডা ফেটে নিয়ে। বেহুঁশির ওক্তে কি খেয়েছি জানিনে, হুজুর, কিন্তু হুঁশের পর দাওয়াই হিসেবেও আমি শরাব খাইনি। তাই 'বরান্ডিটা' বাদ দিল।

'রাতে খেতে দিল রুটি আর মাংসের হাল্কা ঝোল। চারটি ভাতের জন্য আমার জান্ তখন কী আকুলি-বিকুলি করেছিল, আপনাকে কখনো সমঝাতে পারবো না, হুজুর।'

জাহাজের খালাসীদের স্মরণে আমি মনে মনে বললুম, 'সমঝাতে হবে না।' বাইরে বললুম, 'তারপর?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে বললে, 'সব কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে, সায়েব। আর কী-ই বা হবে বলে। ও আমাকে খাওয়ালে পরালে আশ্রয় দিলে—বিদেশে-বিভুঁইয়ে যেখানে আমার জেলে গিয়ে পাথর ভাঙবার কথা—এসব কথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে না বললে কি তার দাম কমে যাবে।'

দাম কমবে না বলেই বলছি হুজুর, সুজন নার্সের কাম করে—'

আমি শুধালুম, 'কি নাম বললে?'

একটু লজ্জা পেয়ে বললে, 'আমি ওকে সুজন বলে ডাকি—ওদের ভাষায় সুজান।'

বুঝলুম এটা ফরাসী SUZANNE এবং আরো বুঝলুম, যে-জাতের লোক আমাদের দেশের মরমিয়া ভাটিয়ালি রয়েছে তাদেরই একজনের পক্ষে নামের এটুকু পরিবর্তন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিছু কঠিন কর্ম নয়। অতখানি স্পর্শকাতরতা এবং কল্পনা-শক্তি এদের আছে।

আমি শুধালুম, 'তার পর কি বলছিলে?'

বললে, 'সুজন নার্সের কাম করে আমাকে যে এক বছর পুষেছিল তখন আমি তার বাড়ির কাজ করেছি। বেচারীকে নিজের রান্না নিজেই করতে হত—হাসপাতাল থেকে গতর খাটিয়ে ফিরে আসার পর। আমি পাক-রসুই করে রাখতুম। শেষ দিন পর্যন্ত সে আপত্তি করেছে, কিন্তু আমি কান দিনি।'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু তোমার পাড়ার পুলিস কোন গোলমাল করলে না?'

একটুখানি মাথা নিচু করে বললে, 'অন্য দেশের কথা জানিনে, হুজুর, কিন্তু এখানে মহব্বতের ব্যাপারে এরা কোন রকম বাগড়া দিতে চায় না। আর এরা জানতো যে ওর বাড়িতে ওঠার এক মাস পরে ওকে আমি বিয়ে করি।

কিন্তু হুজুর, আমার বড় শরম বোধ হত। এ যে ঘর-জামাই হয়ে থাকার চেয়েও খারাপ। কিন্তু করিই বা কি?

আল্লাই পথ দেখিয়ে দিলেন।

সুজন আমাকে ছুটি-ছাটার দিনে সিনেমা টিনেমায় নিয়ে যেত। একদিন নিয়ে গেল এক মস্ত বড় মেলাতে। সেখানে একটা ঘরে দেখি, নানা দেশের নানারকম তাঁত জড়ো করে লোকজনকে দেখানো হচ্ছে তাঁত-গুলো কি করে চালানো হয়, সেগুলো থেকে কি কি নক্সার কাপড় বেরোয়। তার-ই ভিতর একটা দেখতে পেলুম, অনেকটা আমাদের দেশেরই তাঁতের মত।

এমন সময় সেই নার্সটি এসে হাজির

আমার বাপ-ঠাকুর্দা জোলার কাজ করেছে, ফসল ফলিয়েছে, দরকার হলে লাঠিও চালিয়েছে।

অনেক ইতি-উতি কিন্তু কিন্তু করে সুজনকে জিজ্ঞেস করলুম, তাঁতের দাম কত? বুঝতে পারলো, ওতে আমার শখ হয়েছে। ভারি-খুশী হল, কারণ আমি কখনো কোনো জিনিস তার কাছ থেকে চাইনি। বললে, ওটা বিক্রির নয়, কিন্তু মিস্ত্রী দিয়ে আমাকে একটা গড়িয়ে দেবে।

ওদেশে ধুতি, শাড়ি, লুংগী গামছা কিনবে কে? আমি বানালুম, স্কার্ফ, কম্‌ফর্টার। দিশী নক্‌শায়। প্রথম নক্‌শার আধখানা ফুটতে না ফুটতেই সুজনের কী আনন্দ। স্কার্ফ তাঁত থেকে নামাবার পূর্বেই সে পাড়ার লোক জড়ো করে বসেছে আজগুবি এক নূতন জিনিস দেখাবে বলে। সবাই পই পই করে দেখলে, অনেক তারিফ করলে। সুজনের ডবল আনন্দ, তার স্বামী নিষ্কর্মা, ভবঘুরে নয়। একটা হুনুরী, গুণী লোক।

গোড়ার দিকে পাড়াতে, পরে এখানে সেখানে বিস্তর স্কার্ফ বিক্রি হল। বেশ দু' পয়সা আসতে লাগলো। তারপর এখানকার এক তাঁতীর কাছে দেখে এলুম কি করে রেশমের আর পশমের কাজ করতে হয়। শেষটায় সুজন নিয়ে এল আমার জন্য বহুৎ কেতাব, সেগুলোতে শুধু কাশ্মীরী নক্‌শা নয় আরো বহুৎ দেশের বহুৎ রকম-বেরকমের নক্‌শাও আছে। তখন যা পয়সা আসতে লাগলো তারপর আর সুজনের চাকরী না করলেও চলে। সেই কথা বলতে সে খুশীর সংগে রাজী হল। শুধু বললে, যদি কখনো দরকার হয় তবে আবার হাসপাতালে ফিরে যেতে পারবে। রোমাঁ তখন পেটে। সুজন সংসার সাজাবার জন্য তৈরী।

আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কেন বুড়ীর কথা পাড়ছিনে। বলছি, হুজুর, রাতও অনেক ঘনিয়ে এসেছে, আপনি আরাম করবেন।

আপনি বিশ্বাস করবেন না দু'পয়সা হতেই সুজন-ই বললে, 'তোমার মাকে কিছু পাঠাবে না?' আমি আগের থেকেই বন্দরে ইমানদার লোক খুঁজছিলুম। রোমাঁর মা-ই বললে ব্যাংক দিয়েও নাকি দেশে টাকা পাঠানো যায়।

মাসে মাসে বুড়ীকে টাকা পাঠাই। কখনো পঞ্চাশ, কখনো একশ'। ঢেউপাশাতে পঞ্চাশ টাকা অনেক টাকা। শুনি বুড়ী টাকা দিয়ে গাঁয়ের জন্য জুম্মা-ঘর বানিয়ে দিয়েছে। খেতে পরতে তো পারছেই।

টাকা দিয়ে অনেক কিছুই হয়, দেশে বলে, 'টাকার নাম জয়রাম, টাকা হৈলে সকল কাম'—কিন্তু, হুজুর, টাকা দিয়ে চোখের পানি বন্ধ করা যায় না। একথা আমি খুব ভালো করেই জানি। বুড়ীও বলে পাঠিয়েছে, টাকার তার দরকার নেই, আমি যেন দেশে ফিরে যাই।

আমার মাথায় বাজ পড়ল, সায়েব, যেদিন খবর নিয়ে শুনলুম, দেশে ফিরে যাওয়া মোটেই কঠিন নয় কিন্তু ফিরে আসা অসম্ভব। আমি এখন আমার মহল্লার মুরুব্বিদের একজন। থানার পুলিসের সংগেও আমার বহুৎ ভাব-সাব হয়েছে। আমার বাড়িতে প্রায়ই তারা দাওয়াৎ-ফাওয়াৎ খায়। তারা প্যারিস থেকে পাকা খবর আনিয়েছে, ফিরে আসা অসম্ভব। মুসাফির হয়ে কিম্বা খালাসী সেজে পালিয়ে এলেও প্যারিসের পুলিস এসে ধরে নিয়ে দেশে চালান দেবে। এমন কি তারা আমাকে বারণ করেছে আমি যেন ঐ নিয়ে বেশী নাড়া-চাড়া না করি। প্যারিসের পুলিস যদি জেনে যায় আমি বিনা পাসপোর্টে এদেশে আছি তা হলে তারা আমাকে মহল্লার পুলিসের কদর দেখাবে না। এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। আপনি কি বলেন, হুজুর?'

ডাহা মিথ্যা বলি কিপ্রকারে? আমার বিলক্ষণ জানা ছিল, ফ্রান্স চায় টুরিস্ট্‌ সে দেশে এসে আপন গাঁটের পয়সা খরচা করুক, কিন্তু তার বেকারির বাজারে কেউ এসে পয়সা কামাক এ অবস্থাটা সে যে করেই হোক রুকবে।

আমি চুপ করে রইলুম দেখে করীম মুহম্মদ মাথা নিচু করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে।

অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে বললে, 'রোমাঁর মা আমার মনের সব কথা জানে। দেশের লোক ভাঙচি দেয়, আমি ভেড়া বনে গিয়েছি এ-কথা বলে—এ সব শুনে সে তাদের পছন্দ করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে ভোরের ঘুম ভেঙে গেলে দেখি সেও জেগে আছে। তখন আমার কপালে হাত দিয়ে সে বলে, 'তোমার দেশে যদি যেত ইচ্ছে করে তবে যাও। আমি একাই বাচ্চা দুটোকে সামলাতে পারবো।' এ-সব আরম্ভ হল, ও নিজ মা হওয়ার পরের থেকে।

আজ আপনার কথা তুলে বললে, 'এ ভদ্রলোকের শরীরে দয়ামায়া আছে। আমার ছেলেমেয়েকে কত আদর করলেন।' আমি বললুম 'সুজন, তুই জানিসনে, আমাদের দেশের ভদ্রলোক আমাদের কত আপনজন। এই যে ভদ্রলোক এলেন এ'র সায়েব (পিতা) আমার বাবাকে 'পুতী'-ছেলে-বলে ডাকতেন। এদেশের ভদ্রলোক তো গরীবের সংগে কথা কয় না।' আপনি-ই বলুন, হুজুর।'

তার 'আপনজন'! ঐটুকুই বাকী ছিল।

'সুজনই আজ বললে, 'ও'র কাছে গিয়ে তুমি হুকুম নাও। উনি যা বলেন তাই হবে।' এইবার আপনি হুকুম দিন, হুজুর।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'তুমি আমায় মাপ করো।'

সে আমার পায়ে ধরে বললে, 'আপনার বাপ-দাদা আমার বাপ-দাদাকে বিপদে-আপদে সলা দিয়ে হুকুম করে বাঁচিয়েছেন। আজ আপনি আমায় হুকুম দিন।',

আমি নির্লজ্জের মত পূর্ব-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বললুম, 'তুমি আমায় মাপ করো।'

অনেক কান্নাকাটি করলো। আমি নীরব। শেষ রাত্রে আমার পায়ে চুমো খেল। আমি বাধা দিলুম না। বিদায় নিয়ে বেরবার সময় দোরের গোড়ায় তার বুক থেকে বেরল, 'ইয়া আল্লা!'

আধুনিক সাহিত্যে মানুষ

সুনীলচন্দ্র সরকার

এক হিসাবে সকল সময়ের সব সাহিত্যের একমাত্র বিষয় বলা যায় মানুষ। কারণ মানুষই তা লিখেছে, এবং মানুষের অভিজ্ঞতাই তার উপাদান। কিন্তু এটা হল লেখকের অন্তর্জগতের কথা। বাইরের দিকে চোখ ফেরালে সাহিত্যের দু'টি প্রেরণার উৎস, বা অভিজ্ঞা-অঞ্চল দেখি। পাহাড়ের উপর থেকে সমুদ্রের বিশালতা দেখতে দেখতে এক কাব্যমুহূর্তে কবি ভিক্টর হিউগো এই দুই রস-সমুদ্রের প্রত্যক্ষ রূপ দেখেছিলেন। শুনেছিলেন সমুদ্র-গর্জনের মতই আন্দোলিত হচ্ছে দু'টি বিশ্বব্যাপী সত্তা : Nature ও Humanity, প্রকৃতি ও মানুষ। এই যে মানুষ ছড়িয়ে আছে সমস্ত পৃথিবীতে, ভিন্ন হয়ে আছে অসংখ্য ব্যক্তিত্বে অথচ সম্পূর্ণ অংশীভূত হয়ে রয়েছে একই মহাজীবন সমুদ্রে, এই মানুষ বিশ্ব-সাহিত্যে, এবং আমাদের আধুনিক সাহিত্যে কতটা স্থান অধিকার করেছে তাই এ প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

বিশ্ব-সাহিত্যে প্রথম অর্ঘ্য পেয়েছে বোধ হয় প্রকৃতি। মিশরের Book of the Dead, ভারতের ঋগ্বেদ যদি প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে মেনে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে একপক্ষে রা, অসিরিস প্রভৃতি ও অন্যপক্ষে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, ঊষা প্রভৃতির স্তব বহু পরিমাণে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি ও রূপকে আশ্রয় করেই উৎসারিত হয়েছে। এর সংগেও মানুষী প্রতিমা মিশিয়ে যায়নি এমন নয়, কিন্তু তা গৌণ। কিন্তু মহাকাব্যের যুগ আশ্চর্যভাবে মানুষ-কেন্দ্রিক। দু' দশজন চিহ্নিত মানুষ মাত্র নয়, অসংখ্য মানুষ তাদের বৈচিত্র্য নিয়ে, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-জীবনের চঞ্চল আবহাওয়া নিয়ে এসে উঠল সাহিত্যের বিশাল যজ্ঞ-ভূমিতে। অনেকে হয় তো এই যুগকেই বিশ্ব-সাহিত্যের প্রথম অধ্যায় বলে মনে করেন। বাল্মীকি ব্যাসের পর তাঁদের মহত্ত্বের পরম বিস্ময়ে কতদিন এ ভারত-ভূমি স্তব্ধ হয়ে ছিল, কতদিন এদেশের সাহিত্যিকরা শুধু ঐ দু'জন প্রজাপতির সৃষ্ট জগতেই বিচরণ করতে বাধ্য হ'য়েছেন তার হিসাব পাওয়া যাবে ইতিহাস থেকে। যখন আমাদের কবিরা আবার স্বাধীন চেষ্টা শুরু করলেন, তখনো হয়েছে নাটক রচনা, কিন্তু তার রস হ'য়ে গেছে অন্তর্মুখী। জীবন্ত প্রত্যক্ষ মানুষ ক্রমশ সংখ্যায় এসেছে ক'মে, কিম্বা ঝাপসা হয়ে এসেছে একটা ভাবের নীহারিকায়। গ্রীসে বরং কিছুকাল চলেছে মানুষরস সাধনা। হোমারের পর গ্রীক ট্র্যাজেডিয়নরা মানুষের রসমূর্তিকে সজীব রেখেছেন, এমন কি গ্রীক কাব্য-সঞ্চয়ন গ্রন্থের (Greek Anthology) কবিরাও মানুষকে ভোলেন নি। ল্যাটিন কাব্যেও ব্যক্তি, মানুষ ও সমাজ-মানুষের রস-সংগ্রহে নিপুণতার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। অর্থাৎ গ্রীক হিউম্যানিস্‌ম্‌ যতদিন গ্রীস ও ইটালিতে জীবিত ছিল ততদিনই লেখকরা একথা স্বতঃসিদ্ধ বলেই জানতেন যে 'the proper study of mankind is man', কোনো Wordsworthকে তখন এই বাণী প্রচার করতে হয় নি। আবার অনেকদিন পরে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে রেনেসাঁসের যুগে এই মানবতাবাদই নূতন ক'রে জেগে উঠেছিল। তারপর অষ্টাদশ শতকে সামাজিক রীতি-নীতি নিয়ে কাব্য নাটক রস-রচনা এবং অবশেষে উপন্যাসের সূত্রপাত হল। রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসের দিনে মানুষ-বিগ্রহ প্রায় ডুবে যাবার মত হয়েও আবার স্বাধিকার ফিরে পেয়েছে ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থে, ব্রাউনিংএ, ঊনবিংশ শতকের অজস্র উপন্যাসে। নাটকের স্রোতে মন্দা পড়ে গিয়েছিল। আধুনিক যুগে আবার তার খানিকটা পুনরুজ্জীবন হয়েছে।

কিন্তু এত দীর্ঘকাল ধ'রে এত বিচিত্র সাহিত্য-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইয়োরোপেও যে গ্রীক্ সূচনার যোগ্য পরিণতি লাভ হয়েছে এমন বলা যায় না। বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীতে দেখবার চেষ্টা হয়েছে অনেক, কৌতূহল ও কল্পনার লীলাও হ'য়েছে যথেষ্ট। কিন্তু নির্মাণ যতটা হয়েছে, সৃষ্টি হ'য়েছে সেই তুলনায় ঢের কম। শাশ্বত মানব-রস ক্লাসিকাল যুগের পরে পাই প্রধানত কয়েকজন লোকোত্তর প্রতিভাশালী লেখকের লেখায়। কিন্তু ঐতিহ্য হিসাবে, সাহিত্য ব্যবসায়ের একটা ধারা হিসাবে এই মানবরূপায়ণ ক্রমেই ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। কিম্বা বলা যায় সাহিত্য থেকে এই ধারা স্খলিত হয়ে ক্রমে নেমেছে সাংবাদিকতায়, বা ঐ রকমেরই একটা কোনো নিম্নলোকে।

এর একটা কারণ লোক-সংস্কৃতির ক্রমিক পতন। হিউম্যানিস্‌ম্‌ যে বেদীতে মানুষকে তুলতে চেয়েছিল, প্রকৃতিবাদ, যুক্তিবাদ, এমন কি নতুন ধরনের মানবতা-বাদের দোহাই দিয়েই বিজ্ঞান তাকে সেই উচ্চভূমি থেকে একটু একটু করে সমতলে নামিয়েছে এবং এখনো নামাচ্ছে। intution বা Vision অর্থাৎ দ্যোতন বা দর্শন-এর দ্বারা যে মানুষের দেখা পাওয়া যেত, বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে তার সম্বন্ধে শুধু তথ্যভারই স্তূপীকৃত হয়ে উঠল। দ্বিতীয়ত লেখকদের মধ্যে সভ্যতার সমস্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে এল একটা introversion বা অন্তর্মুখতার তাগিদ। ভাবের বন্যায় ভেসে গেল প্রত্যক্ষ মানুষ, তার জীবন, তার সমাজ। মানবরসে ভাঁটা পড়ার জন্যেই নাটক রচনা হ'য়ে উঠল প্রায় অসম্ভব। শেক্‌স্‌পীয়রের পর থেকে আজ পর্যন্ত ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ লেখকদের ব্যর্থনাটকের সংখ্যা গুণলেই বোঝা যাবে তার সাহিত্যের এই দিকটা রয়ে গেছে কত দুর্বল।

ইয়োরোপীয় সাহিত্য—যা প্রধানত মানুষমুখী—তারই যখন এই অবস্থা তখন আমাদের দেশে এই দিক্‌টা যে কত অপরিপুষ্ট থেকে গেছে তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। অথচ পৃথিবীব্যাপী মানব-সমুদ্রে আজ ঝড় নেমেছে। তার

ঢেউ ছুটেছে দিক্ থেকে দিকে, দেশ জাতি শ্রেণীর ভেদ ভেঙে। মানুষের দিকে না চেয়ে আর উপায় নেই। আবার এসেছে মানুষ নিয়ে শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্যের জন্মমুহূর্ত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, তার কাব্যে গল্পে উপন্যাসে একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লেখক শিল্প সঙ্কেতের জন্যে দ্বারস্থ হয়েছেন পশ্চিমের। টেক্‌নিকের সাধনা করেছেন যত, ধ্যান তার তুলনায় অনেক কম। তা ছাড়া তাঁরা চোখ ফিরিয়ে আছেন আধুনিক ইয়োরোপ অ্যামেরিকা রাশিয়ার দিকে। তাঁদের বিশ্বসাহিত্য স্থানের দিকে অনেকটা ব্যাপ্ত হ'লেও কালের দিক্ দিয়ে একান্ত সঙ্কীর্ণ। সাহিত্য পাঠ সাহিত্যিককে সাহায্য করে, তার চোখ খোলায়, যদি সেই সাহিত্যের মধ্যে সত্যকার রস থাকে। রসাস্বাদনের দ্বারাই নূতন রস উদ্ভাবনের ক্ষমতা জন্মায়। কলাকৌশলের পাঠ নিলে শুধু শেখা বিদ্যার অনুসরণ ছাড়া আর কোনো মহত্তর সাহিত্যিক লাভেরই আশা নেই।

আমাদের এই অল্পদিনের সাহিত্যের অনেকগুলি দ্বারই এখনো খোলা হয় নি। যে ক'টি দ্বার খুলে দিয়ে গেছেন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—সে গুলি সবই সিংহদ্বার। যদিও কনিষ্ঠ সাহিত্য হিসাবে আমাদের সাহিত্যে অনেকগুলি ক্রমিকপর্যায় বাদ পড়ে গেছে, তবু বিশেষত বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ যে স্তরে মানুষ-সাহিত্যকে উত্তীর্ণ করেছেন, বা বলা যাক্ যে ভাবে তার পরিধি বিস্তার করেছেন, পশ্চিমে এখনো সে রকম কিছু হয় নি। অনেক প্রাথমিক ধাপ ডিঙিয়ে এঁরা একেবারে বিশ্বসাহিত্যে পুরোবর্তী হয়েছেন। এ একটা বিশেষ সৌভাগ্য নিশ্চয়। কিন্তু এ একটা বিপদেরও কথা বটে। যে সাহিত্যের নীচের দিকটা যথেষ্ট ব্যাপ্ত হয়নি, বিচিত্র ঐশ্বর্যময় হ'য়ে ওঠে নি, হঠাৎ দু একটা সৌধচূড়ায় তার কি প্রতিষ্ঠা লাভ হবে?

পৃথিবী-সাহিত্যে বিশেষত ক্লাসিকাল—অর্থাৎ গ্রীক ও ল্যাটিন কাব্যে—এ পর্যন্ত সার্থক মানব-রসের অনেকগুলি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। যাঁরা সাহিত্যের ইতিহাস পড়েন তাঁরা জানেন কেমন ক'রে এই ইঙ্গিতগুলিই বহু বৎসর বা যুগ পেরিয়ে বার বার প্রেরণা নিয়ে আসে নূতন সাহিত্যে, অতীতের সঙ্গে যুক্ত থেকেও কেমন ক'রে সেই ইঙ্গিত নূতন ফল প্রসব করে। রবীন্দ্রনাথ এই বিচিত্র ইঙ্গিত সম্বন্ধে কখনোই উদাসীন ছিলেন না। আজ আমরাই বা কেন বর্তমানকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবো, বর্তমানের চেয়ে অনেকগুণ সার্থক, গৌরবময় অতীত সাহিত্যযুগগুলি থেকে আমাদের শক্তি সংগ্রহ করবো না। প্রাচীন মহাকাব্যগুলি—রামায়ণ মহাভারত ইলিয়ড ওডিসি যে আজ একান্ত প্রাসঙ্গিক হ'য়ে উঠেছে। এরা আধুনিক বাঙালী লেখকদের কতদূর অনুপ্রাণিত করেছে? অথচ ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ আধুনিক লেখকরা বার বার অঞ্জলি পেতেছেন হোমরের রসধারায়, এবং কত বিভিন্নভাবে চরিত্রস্ফূর্তি লাভ করেছেন তার থেকে। ইয়েট্‌স্ ও জেম্‌স্ জয়েস্ দু'জনেই হোমরের কাছে বিশেষ ঋণী, কিন্তু এই ঋণের ফল প্রকাশ পেয়েছে কত ভিন্নভাবে।

এই মানবরসের সন্ধানে কেন আমরা গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবো না? ইয়োরোপ কয়েকশত বৎসর এই দুই সাহিত্যের চর্চা ক'রে, তার দ্বারা নিজের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধিবান্ ক'রে নিয়ে আজ যদি তাকে অবহেলাও করে তবু তার রক্তে মিশে গিয়েছে ঐ ঐতিহ্য। আমরা ইয়োরোপীয় সাহিত্যে যে সব আনন্দ বা তৃপ্তির সন্ধান পাই তার যে অংশটা যুগপরম্পরায় এসেছে ক্লাসিকাল সাহিত্য থেকে তার মূল্য যথেষ্ট। কেন সেই সব রস একেবারে মূল উৎসে সন্ধান করবো না। আর পরবর্তী কালেই যদি আসি তবে শেক্‌স্‌পীয়র ও গ্যেটে থাকতে আগে তাঁদের কাছে না গিয়ে অন্য কার কাছে হাত পাতবো?

মধুসূদনের চেষ্টা ছিল গ্রীক সাহিত্যের ঐশ্বর্য বাংলা কাব্যে আনা। একটা প্রেরণা ও শক্তি তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন, হোমরের মহাকাব্য থেকে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী কোনো সার্থকতা তিনি পেয়েছিলেন বলে দাবী করা যায় না। তবু মধুসূদন অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত এ বিষয়েও বাংলার প্রথম পথিকৃৎ। তার পর থেকেই এই সাহিত্য আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। ল্যাটিন ও রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী ও বিসর্জন শেক্‌স্‌পীরীয় গঠন-রীতিতে রচিত, কিন্তু তাঁর মালিনী সফোক্লিসের নাটকের ধাঁচে তৈরি। কর্ণকুন্তী গান্ধারীর আবেদন ইত্যাদি নাটিকায়ও গ্রীকপ্রভাব স্পষ্ট। ল্যাটিন কবি মার্স্যালের (Martial) কবিতার মেজাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার লঘুরসের কবিতাগুলির মেজাজের একটা বেশ আদল পাওয়া যায়। জার্মান কবি গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হ'য়েছে। কিন্তু আর কোনো বাঙালী লেখক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের যে দান সত্যিই মহার্ঘ তা চিনে নিয়ে নিজের কাজে লাগিয়েছেন বলে মনে পড়ছে না। অপেক্ষাকৃত কমদরের জিনিসই আমদানি বেশী। আমাদের বাল্মীকি ব্যাস কালিদাসকেও রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে নিজ পরিণতির সহায়ক ক'রে নিয়েছেন। সে রস-উৎসও সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে প্রায়লুপ্ত।

আজকাল কিছু কিছু আধুনিক ফরাসী জার্মান চীনা কবিতার অনুবাদ বাঙলায় দেখা যাচ্ছে, তার কিছু কিছু করছেন প্রতিষ্ঠিত কবিরা। তার একটা মূল্য ও প্রভাব আছেই। কিন্তু বেশীর ভাগ অনুবাদ শুধু নূতনত্বের চমকের জন্য, বিশেষত চীনে কবিতার অনুবাদ। এগুলি বিশেষ রসবোধের সাক্ষ্য দেয় না।

আজকের দিনে যে বাঙালী সাহিত্যিক মানবরস পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বা করবেন তাঁকে বিশ্বসাহিত্যের প্রাসঙ্গিক যুগাত্মা ও কীর্তির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত হতে হবে এবং সেই সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ দান বিশেষভাবে বুঝে নিতে হবে! বঙ্কিম ইয়োরোপীয় মানবতাবাদের এমন একটি বিশিষ্ট ফসল ফলিয়েছেন, যে সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। কাজেই ইয়োরোপও এখন এই কীর্তির কথা কিছুই জানে না।

মানবতাবাদের মূল ধারাটির লক্ষ্য ছিল সমস্ত মানুষ-জীবনকে একটা উন্নততর সাংস্কৃতিক ভূমিতে তুলে ধরা। এই সংস্কৃতির আদর্শের জন্যে এই মুভমেণ্ট মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল অতীত গৌরবের দিকে, গ্রীক-সভ্যতার দিকে। এর আর একটা লক্ষ্য ছিল অমর্ত্য জীবন বা পারলৌকিক সিদ্ধির থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সংস্কৃতিটিকে ঐহিক জীবনভোগের মধ্যেই স্থাপিত করা। ধর্মের জীবন-সীমা লঙ্ঘনের দাবী না মেনে জীবনকে তার নিজের মধ্য থেকেই সরস ও পূর্ণাঙ্গ করে তোলা। কাজেই বলা যায় ধর্মের সঙ্গে ও ভাবী-কালের দাবীর সঙ্গে এই হিউম্যানিসমের একটা বিরোধ প্রথম থেকেই রয়ে গেছে। বঙ্কিম ধর্মের দাবীর সঙ্গে উন্নত ও বিচিত্র জীবনভোগের দাবীর একটা সামঞ্জস্যসাধন করেছেন তাঁর সাহিত্যে। ভারত ও ইয়োরোপের ঐতিহ্যকে তিনি মিলিয়েছেন। কৃষ্ণচরিত্রই এই সমন্বয়ের পথে তাঁকে আলো দেখিয়েছে। তাঁর সমাধান শুধু বুদ্ধিগত ও যৌক্তিকই হয় নি, মানবরসের দ্বারা জীবন্ত হয়েছে। তবে তাঁর মানুষে ভবিষ্যৎমুখিতা স্পষ্ট নয়।

অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ যুগ-প্রবর্তক। তিনি মানবতাকে বিশেষ কোন সংস্কৃতি ও অভীপ্সার আলিঙ্গনমুক্ত করে তাকে বিশ্বমানবতায় পরিণত করেছেন। তিনি যে রস-সমুদ্র আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে মানুষের সার্বজনীন নিত্য ভূমিটির প্রথম দেখা মিলেছে। সব দেশের ও কালের মানুষই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব-রহস্য ও আশ্রয় তার মধ্যে খুঁজে নিতে পারে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যক্তি-মানুষের বিচিত্র মর্ম-সত্যকে দেখেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-মানবের স্বাধীন শাশ্বত ঋতম্ বা সত্যতার সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ঐ ব্যক্তিসত্তা ও বিশ্বসত্তা তাঁর চোখে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক—শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রী কাব্যে যাকে the numerous one বলে বর্ণনা করেছেন—তেমনভাবেই ফুটে উঠেছে। গ্যেটের মহৎ চেষ্টা যা আভাসে-ইঙ্গিতে মাত্র পেয়েছিল, তারই পূর্ণ উন্মোচন হয়েছে রবীন্দ্রনাথে।

এই পরম দর্শনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি দৃষ্টিভঙ্গীর স্থান করে নিয়েছেন। কখনো ফুটিয়েছেন চরিত্রের স্কেচ্, কখনো বা situation বা ঘটনাকে ঘিরে মানব-বেদনার উৎসরণ। তাঁর গল্পে উপন্যাসে, নাটকে এবং বিশেষ সূক্ষ্ম রসঘন ভাবে তাঁর পলাতকা, পুনশ্চ, শ্যামলী প্রভৃতি কাব্যে এই দুরকমের সাহিত্য-সৃষ্টিতে আশ্চর্য বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্যের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। শ্যামলী পুনশ্চ পর্যায়ের কাব্যে মানবসঙ্গীতের যে শুদ্ধশাণিত স্বরবিস্তার তিনি করেছেন তার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যে কোথাও নেই। চিরাচরিত সাহিত্য-পদ্ধতির এই অদ্ভুত নূতন জয়-পতাকাগুলি বাঙলা ভাষার অন্দরে আবদ্ধ থাকলে দুঃখের বিষয় হবে।

তা'ছাড়া ও'র পুনশ্চ থেকে আরম্ভ করে শেষের দিককার কাব্যে মানুষের একটি সার্বভৌম জীবনের রূপ ফুটে উঠেছে। এ মানুষ ও তার জীবন সর্বকালেরও বটে। পৃথিবী-গ্রহে মানুষ-জীবন যাপন করাটাই একটা মহাকাব্যের মহত্ত্ব নিয়ে ফুটে উঠেছে। হোমর মানুষের প্রাণশক্তিকে বন্দনা করে-ছিলেন। এই প্রাণ তার নিজের মধ্যেকার ও বাইরের অন্ধ শক্তি-সংঘাত সত্ত্বেও অপরাজিত—সেই তার গৌরব। রবীন্দ্রনাথ আরো কত পূর্ণ পরিণতভাবে এই প্রাণের দর্শন পেয়েছেন। অধ্যাত্ম-আলোর, নব-চেতনা বেদনার অনুপ্রবেশে এই প্রাণ অনেক বেশী ঐশ্বর্যবান।

মানবতাকে এমন এক স্তরে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ যেখানে অতীত ও ভবিষ্যতের, ধর্মের ও লৌকিক জীবনের, ব্যক্তির ও সমাজের সমস্ত বিরোধ নিরস্ত হয়েছে। পশ্চিমী মানবতাবাদ বার বার যে পরিণতির পথ হারিয়েছে, রবীন্দ্রনাথে তা আবিষ্কৃত হয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ করে যেতে পারেন নি, এমনও অনেক কিছু আছে এবং তিনি যা করেছেন, সেইসব ক্ষেত্রেও আর বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা নেই এমন নয়। আমাদের আধুনিক লেখকরা এর কোন কাজ কতটুকু করছেন। মানব-সাহিত্যে অন্তত বাঙলা সাহিত্যের পর্যায়ে এ পর্যন্ত তাঁরা কোন স্থায়ী ও সার্থক দান করতে পেরেছেন কি না।

পেরেছেন। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বোধ হয় তারা-শঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর ও বিভূতি বন্দ্যো-পাধ্যায়ের। সেই গ্রীক-যুগের pastoral বা গ্রামীণ কাব্যের ধারা কেমনভাবে নতুন বেশে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী ও অন্যান্য গ্রন্থে। কি শুদ্ধ, কি সরস আধুনিক রুচিসম্মতভাবে একটি way of life বা জীবনভঙ্গীর রস তিনি গ্রহণ ও পরিবেশন করেছেন। এক একটি way of lifeএর শিল্পরূপ গড়ে তোলার এখনও অনেক অবসর আছে। আরো অনেকে খনি ফ্যাক্টরী প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এই শিল্প-চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টা প্রশংসনীয়, কিন্তু তার ফল সাহিত্যে একটা স্থায়ী আসন পাবে কিনা বলা যায় না।

অন্নদাশঙ্কর শিক্ষিত সমাজের বাইরের দৃশ্যে ততটা নয়, অন্তর্লোকে একটা উদার অথচ বুদ্ধি-উজ্জ্বল কৌতূহল-দৃষ্টি ফেলেছেন। ব্যক্তিচরিত্র উদ্ঘাটনের চেয়ে সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত মানবজীবনের সূক্ষ্ম বেদনা, বিরোধ ও ironyগুলির দিকেই তাঁর লক্ষ্য বেশী। একটি সুস্থ সুপরিণত সমাজবোধই তাঁর বিশেষত্ব। কোন বিশেষ আন্দোলন বা মতবাদের একরোখা টানে তাঁর এই বোধের ভারসাম্য নষ্ট হয়নি। বরং বিদগ্ধজনোচিত wit ও humourএর সৌরভে তাঁর চেতনা হৃদ্যতা লাভ করেছে। তবে মৌলিকতার দিক থেকে দেখলে তাঁর সাধনার বেশ খানিকটা প্রশংসাই প্রাপ্য হয় তাঁর গুরু ও পথপ্রদর্শক প্রমথ চৌধুরীর।

তারাশঙ্কর শুধু একটি জীবনরীতি নয়, অনেকগুলি নিয়েই সাহিত্যিক পরীক্ষা করেছেন। গ্রন্থ-পরিকল্পনার সময় বিভিন্ন উপাদান বিন্যাসের ব্যাপারে একটা মাত্রাজ্ঞান শিল্পীমাত্রেরই পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই মাত্রাজ্ঞান হয়তো তারাশঙ্করের কিছুটা কম। কিন্তু এই খুঁতটুকু বাদ দিলে তাঁকে অনায়াসে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভা হিসাবে মেনে নেওয়া যায়। বাঙলা সাহিত্যের একটি অঞ্চলে তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে। এমন কি তাঁর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য পৃথিবীর ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও একটা মর্যাদার আসন তাঁর প্রাপ্য। অনেকগুলি চরিত্রকে নিয়ে একটি সজীব, সংহত ও পরিবর্তমান জীবন-প্যাটার্ন তৈরি করার ক্ষমতা একান্ত বিরল। বিশ্বসাহিত্যেও এ ক্ষমতার দৃষ্টান্ত কম মেলে। তারা-শঙ্করের হাঁসুলির বাঁকের উপকথায় এই দুর্লভ ক্ষমতার প্রকাশ দেখা গিয়েছে।

বাঙলার ছোট গল্প সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণার অকুণ্ঠ ঘোষণা সম্প্রতি একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরে প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর প্রভৃতি কয়েকজন ছোট গল্প-লেখকের কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। দুএকটি ছোট গল্প বেশ ভালো লিখেছেন এমন লেখকের সংখ্যাও অনেক। কাজেই বাঙলা ছোট গল্পের একটি ভালো সংকলন বিশ্বসাহিত্যে একটি সাময়িক মর্যাদা পাবার অধিকারী হতে পারে। কিন্তু সত্যকার নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী বা কোন স্থায়ীরস প্রবর্তনের গৌরব

আমাদের ক'জন ছোট গল্প লেখক করতে পারেন। এ বিষয়ে একটা অযথা সন্তোষ-বোধ আমাদের সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গলকর হবে না। বিশেষত পাঠকদের মধ্যে একটা রসবিবেক তৈরি হবার পথে এই পাইকারী হিসাবের আত্মস্তুতি একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

দেবতার প্রসাদের মত যথার্থ সাহিত্যরসের ছিটেফোঁটাও নিম্নতর রস-রচনার প্রাচুর্যের চেয়ে দামী ও প্রাসঙ্গিক। তাই থাকবে, তাই বিদেশী ও স্বদেশী সাহিত্যের মধ্যে সেতু রচনার কাজ করবে। আমি বরং আধুনিক বাংলা কাব্যে এই মানবরসের কিছু কিছু পরিবেশন দেখেছি যার একটা স্থায়ী মূল্য থেকে যাওয়া সম্ভব। জীবনানন্দের শেষের দিকের কাব্যে যুগজীবনের বিষাক্ত অভিজ্ঞতা যে রসমূর্তি গ্রহণ করেছে, তাঁর চোখে মানুষের যে বিপন্ন বঞ্চিত মূর্তি ফুটে উঠেছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র জনজীবনের মধ্য থেকেও হারানো ছড়ানো মানব-আত্মার যে অভ্যুদয় দেখেছেন; অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বনাগরিকের উদাস উদার অথচ তীক্ষ্ম সংবেদনশীল হৃদয়ের যেসব প্রতিবেদন ফুটিয়ে তুলেছেন; বিষ্ণু দের কাব্যে শুরু হয়েছে যে বিশাল জীবনের রসায়ন এবং অপেক্ষাকৃত সহজ ঘনিষ্ঠ সুরে সমাজমধ্যস্থ এক আধটি চরিত্র ও situation তিনি যে নিপুণ urbanity বা নাগরিক বিচক্ষণতার সঙ্গে উৎকীর্ণ করেছেন—এই সমস্তকেই আমি আধুনিক সাধনার মূল্যবান নিদর্শন বলে মনে করি।

লিরিক বা অন্তর্লীন সাহিত্যধারার যে ব্যাপক ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তার-পরে এখন অনেক কাল বাঙ্গলা সাহিত্যকে প্রধানত এই মানবরসের সাধনাই করতে হবে। বাঙ্গলা সাহিত্যের পরিণতির পথ এখন ঐ দিকেই। Sophocles সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'he saw life steadily and saw it whole'—'তিনি জীবনকে ধীর অব্যাহিতভাবে দেখেছেন এবং তার পূর্ণ রূপই দেখেছেন।' আমাদের সাহিত্যিকদের এখন সেই সাধনাই করতে হবে। কোনো মানুষের সমস্ত জীবনটিকে একটা বিদ্যুৎ-দৃষ্টির ফোকাসের মধ্যে এনে তার রস ও প্যাটার্নটি আবিষ্কার করা মানবসাহিত্যের একটা মূল্যবান দিক হয়ে ওঠা উচিত। গ্রীক কাব্যসংকলনে epitaphগুলিতে এই ধারার সূচনা হয়েছিল। মৃত্যুর তোরণের মধ্য দিয়ে এই epitaphএর কবিরা এক একটি জীবনের সমগ্র রূপটা অনুভব করবার চেষ্টা করেছেন। বাংলায় এই epitaph বা elegy জাতীয় কবিতা নেই বললেই হয়। এর থেকেই প্রমাণ হয় আমাদের ব্যক্তিগত জগৎ ও সাহিত্যজগতের মধ্যে এখনও একটা অনতিক্রমনীয় ফাঁক থেকে গেছে।

বাংলার অনেক আধুনিক লেখকের মধ্যেই একটা স্যাটায়ার-দক্ষতা দেখা যায়। এই প্রবণতাও তার ঠিক লক্ষ্য খুঁজে পায়নি বলে মনে হয়। স্যাটায়ার কেমন করে সরস হয়ে ওঠে; তার আদর্শও আছে গ্রীক ও ল্যাটিন কাব্যে। শুধু তিক্ততা আর বিদ্রূপই স্যাটায়ারের উপাদান নয়, শুধু আঘাত করাই তার উদ্দেশ্য নয়। স্যাটায়ারের মধ্য দিয়েও একটি সুসংস্কৃত বিচক্ষণ মনের জীবনদর্শন প্রকাশিত হতে পারে। তার উৎকর্ষের জন্যেও যথেষ্ট সাধনা, যথেষ্ট আত্মসংযম ও কলা-কৌশলের প্রয়োজন।

স্যাটায়ার ছাড়া অন্য ধরনের সমাজরসের কাব্যও অতি উপাদেয় হতে পারে। ল্যাটিন কবি হোরেস যখন তরুণ বন্ধুকে উচ্চাশা ত্যাগের উপদেশ দিতে থাকেন, কিম্বা আর একজনকে বুঝিয়ে দেন দাসীর প্রেমে পড়ায় কোনো লজ্জার কারণ নেই, তখন শুধু একটা সাংসারিক বিচক্ষণতা বা লঘুতা ছাড়া অন্য কিছু রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। সে একটি সুপরিণত সুসঙ্গত চিত্তের অকৃত্রিম স্ফূর্তির রস। আগেই এই প্রসঙ্গে ক্ষণিকার উল্লেখ করেছি। সেখানেও 'ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে' কি এক যাদু বলে উপদেশ হয়েও রসসিক্ত। অঞ্জনা গাঁয়ের রঞ্জনা মেয়েটির কবিতা এবং কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি লঘু ও ক্রীড়াচপল হ'য়েও কি অপূর্ব সরস হয়ে উঠেছে।

মার্স্যালের সামাজিক সমস্ত প্রতিক্রিয়া, তাঁর পছন্দ অপছন্দ, লোকচরিত্র বিচার, সামাজিক situationগুলির স্মিত অথচ সূক্ষ্ম বিবৃতি, তাঁর প্রশংসা ব্যঙ্গ সবই কেমন একটি আন্তরিকতার রসে সাহিত্য-মূল্যে লাভ করেছে। তাঁর কয়েকটি কবিতার বিষয় এইরকমঃ (১) তিনি Dr. Fellকে পছন্দ করেন না এই কথাই জানেন, কেন করেন না তা বলতে পারবেন না। (২) তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী অন্তরঙ্গতার দিক থেকে তাঁর কাছে সবচেয়ে দূরের লোক। (৩) তাঁর রচনা সম্বন্ধে অন্য লেখকদের মতামত তিনি গণনা করেন না। রাঁধুনী যারা ভোজে নিমন্ত্রিত তাদেরই মতামত চায়, অন্য রাঁধুনী-দের নয়। (৪) কুসীদজীবী Sextus এর প্রতিভা—বন্ধুলোক ধার চাইবার আগেই সে কৌশলে তার অক্ষমতা জানিয়ে রাখে। এই রকম বিষয়ের সঙ্গে মিশিয়ে আছে এক ক্রীতদাস যুবকের অকালমৃত্যুতে খেদ—তার মধ্যে এমন একটি সংযত আন্তরিক বেদনা ফুটেছে যা সুন্দর। আমাদের ব্যক্তিজীবনে, সামাজিকজীবনে এমন কত ঘটনা ঘটে, রস-মুহূর্তের আবির্ভাব হয় যা আমরা কাব্যের বিষয় বলে মনে করতেই পারি না। তার কারণ কাব্যের অনুমোদিত এলাকা সম্বন্ধে আমরা আধুনিক বিদেশী সাহিত্য থেকে একটা ভুল সংস্কার মেনে নিয়েছি।

প্রবন্ধ আর দীর্ঘ করা যায় না, নইলে ফরাসী কবি বোদলেয়ার, ম্যালার্মে, জার্মান কবি হাইনে, রিলকে প্রভৃতির অবদান এই প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক হত। এজরা পাউন্ড, এলিয়ট মানুষের চিরকালের জীবনব্যাপার থেকে ইচ্ছামত নজির নিয়ে নিজ নিজ বক্তব্যের প্রকাশকে শাণিত ও গভীর ব্যঞ্জনা-ময় করবার যে চেষ্টা করেছেন, তাও লক্ষণীয়। ছিন্ন কাহিনী কথোপকথন ঘটনা সাজিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এসবের চেয়ে অতিরিক্ত একটি বিশেষ ভাব। কিন্তু আমার মনে হয়, ইয়েটস্‌এর পরীক্ষা ও সিদ্ধির সম্মান উল্লেখ না করে এ প্রবন্ধ শেষ করা উচিত নয়। নিজের পরিচিত মানুষদের যুগসংকটের মধ্য দিয়ে যে ক্রমিক পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করেছেন, তার কয়েকটি কাব্যচিত্র তিনি এঁকেছেন। প্রত্যক্ষ বাস্তবজীবনের এত সুন্দর কাব্যায়ন আর কোনো কবি কখনো করেন নি। এই আলেখ্যগুলির মধ্যে সজীবতা সচলতার সঙ্গে প্রত্যক্ষের রস মিলেছে, আন্তরিকতম ব্যক্তিগত বেদনার সঙ্গে কাব্যের মহৎ ভাবাবেগ মিশেছে, সাংসারিক প্রতিক্রিয়া-গুলির অদ্ভুত উন্নয়ন হয়েছে আধ্যাত্মিক চেতনার দীপ্ত আকাশে।

সম্প্রতি আমাদের জাতীয় সমাজজীবনের ওপর দিয়ে যে সমুদ্রবিপ্লব বয়ে গেছে, তার ফলে চেনা মানুষদের স্বভাবে জীবনযাত্রায় মনোভঙ্গীতে কত আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে, চেনা ভাবভঙ্গীগুলির সুর কেমন করে বদলেছে, এসব কিছু কিছু প্রতিফলিত হয়েছে গল্পে উপন্যাসে। কিন্তু তার অনেকটাই যেন ফোটোগ্রাফি বা শ্রুতিলিপির স্তরে। এসবের সত্যকার সাহিত্যরূপ, কাব্য-রূপ আমরা কিছুই পাইনি। আমরা সমাজ ও মানব সম্বন্ধে কতকগুলো থিওরি বা আবছায়া অনুভূতির দ্বারা এখনো চালিত হচ্ছি। কিছু কিছু অস্পষ্ট নাম-না-জানা অভিজ্ঞতা যে আসেনি তা নয়, কিন্তু সেই ভাসমান নীহারিকাপুঞ্জ এখনো নক্ষত্র প্রসব করেনি।

চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ভবেশ দত্ত তাঁর চেম্বারে বসে বীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে একজন যুবক রোগীর চোখ পরীক্ষা করছিল। সিনিয়রের আদেশ নির্দেশের জন্যে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল ভবেশের তরুণ সহকারী সুরজিৎ সেন। খানিকবাদে রোগীর দিকে তাকিয়ে বরাভয়ের হাসি হাসল ভবেশ, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই মিঃ লাহিড়ী। তবে চশমা আপনাকে নিতেই হবে।'

রোগী ক্ষীণ আপত্তি করল, 'না নিলে চলবে না?'

ভবেশ স্মিত মুখে মাথা নাড়ল, তারপর সহকারীর দিকে তাকাতেই সে রোগীকে বলল, 'মিঃ লাহিড়ী, আপনি আমার সঙ্গে এঘরে আসুন।'

একজন রোগীর জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় দেওয়ার জো নেই ভবেশের। বাইরের বসবার ঘরে আরও পেশেণ্ট অপেক্ষা করছে। কেসগুলি দেখে আজ একটু তাড়াতাড়িই বেরুতে হবে। হার্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ নাগের বাড়িতে পার্টি আছে। তাঁর মেয়ের আজ জন্মদিন। সেই উপলক্ষে সস্ত্রীক ভবেশের নিমন্ত্রণ। সেজেগুজে ডলি হয়ত এতক্ষণ ছটফট শুরু করেছে।

অ্যাসিস্টাণ্টের দিকে তাকিয়ে ভবেশ বলল, 'সুরজিৎ প্রিন্সিপ্যাল সেনের রেকমেণ্ডশন নিয়ে যে ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে ডাকো এবার। আমি ওঁর ছাত্র ছিলাম। গুরুদক্ষিণা প্রতি বছরই কিছু কিছু দিতে হয়। তিনি যেসব পেশেণ্ট পাঠান, তা হয় অর্ধ মূল্যে না হয় বিনামূল্যে।'

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ভবেশ একটু হাসল, সে হাসি দাক্ষিণ্যের নয়।

সুরজিৎ বলল, 'স্যার, নলিনী দেবী নামে একজন মহিলা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। তিনি আমাকে এরই মধ্যে কয়েকবার অনুরোধ করেছেন, তাঁর কেসটা একটু আগে দেখে দেওয়ার জন্যে। তিনি অনেক দূর—সেই দমদম থেকে এসেছেন।'

ভবেশ এবার কৌতুকের ভঙ্গিতে বলল, 'খুব যে ওকালতি করছ, জানাশোনা আছে নাকি?'

সুরজিৎ লজ্জিত হয়ে বলল, 'না স্যার।'

'তবে আর কি, একটু বিশ্রাম করুন না বসে। দমদমের বাস রাত বারটা পর্যন্ত চলে। এখনতো সবে ছটা। কারো চিঠিপাঠি নিয়ে এসেছেন নাকি?'

সুরজিৎ বলল, 'সেকথা তো কিছু বলেন নি।'

ভবেশ বলল, 'তবে? তুমি এত সুপারিশ করছ কোন ভরসায়? দেখেশুনে কি মনে

হয়? ষোল টাকা ভিজিট দিতে পারবে না শেষে ধরাপড়া শুরু করবে?'

সুরজিৎ একথার কোন জবাব দিল না। সহকারীর কাছে এতখানি স্থূলতা প্রকাশ ক'রে নিজেই যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল ভবেশ। সুরজিতের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে পরিহাস তরল স্বরে বলল, 'আচ্ছা ডাকো, তোমার নলিনী দেবীকেই ডাকো।'

মিনিট খানেক বাদে নবাগতাকে সঙ্গে নিয়ে এল বেয়ারা। আর তাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ভবেশ ডাক্তার বলে উঠল, 'তুমি!'

তারপর সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা তুমি যাও সুরজিৎ। লাহিড়ীর কেসটা অ্যাটেন্ড করো গিয়ে। আমি এসে দেখছি।'

হাসি গোপন করে সুরজিৎ পাশের ঘরে চলে গেল।

তারপর একটু কাল চুপচাপ রইল দুজনে। একটু সময় নিল ভবেশ। ভারি রোগাটে হয়ে গেছে নলিনীর চেহারা। মুখে কিসের একটা রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। হিসেবমত বয়স তো এই প'য়ত্রিশ ছত্রিশ। কিন্তু দেখে মনে হয়, আরও বেশি। সেই রঙের জলুস রূপের ঔজ্জ্বল্য আর নেই নলিনীর। বেশ-বাসও খুব সাধারণ রকমের। কম দামী শাদা খোলের একখান তাঁতের শাড়ি পরনে, খয়েরী রঙের পাড়, আধখানা আঁচল মাথায় তুলে দিয়েছে। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখাটি বেশ পুরু আর স্পষ্ট। গলায় একগাছি সরু হার আছে। আর হাতে দুগাছি চুড়ি। এছাড়া আর কোন আভরণ নেই।

ভবেশ গম্ভীরভাবে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।'

ঠিক সামনাসামনি বসল না নলিনী, পাশের গদি আঁটা বেঞ্চটার এক কোণে গিয়ে বসল। তারপর একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকারে পড়ে এসেছি।'

ভবেশ বলল, 'তা জানি। আমার কাছে অদরকারে কেউ আসে না। তোমার চোখে অসুখ হয়েছে? কি ট্রাবল বলো।'

নলিনী একটু হাসল। 'তুমি নিজে নিশ্চয়ই মনে মনে জানো চোখের চিকিৎসার জন্যে তোমার কাছে আসিনি।'

ভবেশ বলল, 'ও। কিন্তু অন্য কোন রোগের চিকিৎসা তো আমি আজকাল আর করিনে। তাতে আমার নিজের প্র্যাকটিস সাফার করে। তাছাড়া সময়ও হয়না।'

নলিনী এবার চোখ তুলে ভবেশের দিকে তাকাল, তারপর একটু হেসে বলল, 'তোমার দামী সময় তাহলে আর নষ্ট করব না। আমার কথাটা বলি। গীতার সম্বন্ধ ঠিক করেছি।'

ভবেশ ভ্রূ-কুঁচকে বলল, 'গীতা! গীতা কে!'

এ প্রশ্নের জবাবে নলিনীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। চোখ নামিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল নলিনী।

ভবেশের এবার মনে পড়ে গেল। অদ্ভুত হাসি ফুটল তার মুখে।

'ও তোমার সেই মেয়ে? বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছ? বেশ বেশ, তা আমি কি করতে পারি বলো। টাকার দরকার বুঝি, কত টাকা দিতে হবে বলো।'

কোটের পকেট থেকে সেভিংস অ্যাকাউন্টের চেক বইটা বের করে ফেলল ভবেশ।

নলিনী মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমি টাকার জন্যে তোমার কাছে আসিনি।'

'তবে?'

নলিনী মৃদুস্বরে বলল, 'বিয়ের চিঠি এখনো ছাপতে দিইনি। তুমি যদি অনুমতি দাও, তোমার নামে চিঠিটা ছাপতে দিই।'

ভবেশ স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নলিনীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর আস্তে কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'তুমি নিজেই জানো নলিনী কি অসঙ্গত অসম্ভব প্রস্তাব তুমি করছ। অন্যের সন্তানের পিতৃত্ব যদি স্বীকারই করতাম, তাহলে উনিশ বছর আগেই তা করে ফেলতাম। তোমার বাবা-মা অনেক তখন চেষ্টা করে দেখেছিলেন। উৎপীড়ন অত্যাচারের কিছুই বাকি রাখেননি'।

'তাঁদের কথা আর কেন তুলছ। তাঁরা তো আর নেই।'

'কিন্তু তুমি তো আছ। তোমার তো কিছুই ভুলে যাওয়ার কথা নয়। তবু তুমি কোন সাহসে—'

নলিনী বলল, 'সাহসের জোরে আসিনি। ভেবেছিলাম মেয়েটার সুখশান্তির কথা ভেবে তোমার মনে যদি একটু দয়া হয়, তোমারও তো ছেলেমেয়ে হয়েছে।'

ভবেশ একটু হাসল, 'তা হয়েছে। কিন্তু এতো শুধু দয়ামায়ার কথা নয় নলিনী, এর সঙ্গে মানমর্যাদার প্রশ্নটাও জড়িয়ে রয়েছে যে। জানো তো এই কলকাতা শহরে আমাকে ডাক্তারি ব্যবসা করে খেতে হয়—।'

নলিনী বলল, 'তা জানি। আমারই ভুল হয়েছিল। অনর্থক তোমাকে বিরক্ত করে গেলাম। আমাকে ক্ষমা কোরো।'

মুহূর্তকাল দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। মনে হলো আশাভঙ্গে নলিনীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে।

ভবেশ বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও। তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও। কোথায় থাকো আজ-কাল?'

নলিনী বলল, 'তোমাদের বালীগঞ্জ থেকে অনেক দূরে।'

'তা হোক, রাস্তার নাম ঠিকানা বলো।' নলিনীর ঠিকানাটা পকেট ডায়েরিতে লিখে নিল ভবেশ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি কর আজকাল? মাস্টারী?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'দমদমেরই একটা স্কুলে।'

একটু চুপ করে থেকে ভবেশ ফের জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মেয়ের বিয়ে কবে?'

'দিন তারিখ এখনো ঠিক হয়নি। ভেবে-ছিলাম তো এই শ্রাবণ মাসের মধ্যেই, দেখি কি হয়।'

ভবেশ বলল, 'তাহলে তো এখনো দেরি আছে।'

'দেরি আর কই। সপ্তাহ দুই মাত্র বাকি। এখনোতো সবই পড়ে রয়েছে। আচ্ছা যাই তোমার রোগীরা নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে।'

ভবেশ বলল, 'রোগীদের ডাক্তার কি করছে তা বললে না।'

একথার কোন জবাব না দিয়ে নলিনী বেরিয়ে গেল।

নলিনী চলে যাওয়ার পর কি একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ভবেশ।

একবার ভাবল অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে দেয় তার মাথা ধরেছে। সব রোগীকে আজকের মত বিদায় করে দিক, কিন্তু তাকি ভবেশের মত একজন মর্যাদাবান ডাক্তারের পক্ষে শোভন হবে? তাই সে অশোভন কিছু করল না। যন্ত্রের মত কাজ করে গেল। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রোগী দেখল, সুরজিৎকে পরের দিনের কাজ সম্পর্কে যথারীতি উপদেশ নির্দেশ দিল, তারপর ধর্মতলার সেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে ছুটল বালীগঞ্জের দিকে। ড্রাইভ করতে গিয়ে মোটেই অন্যমনস্ক হয়ে অপটু হাতের পরিচয় দিল না ভবেশ। সুস্থ স্বাভাবিক-ভাবে অন্য দিনের মতই বাড়ি এসে পৌঁছল।

স্টেশন রোডের এই ছোট্ট শাদা দোতলা বাড়িটি ভবেশ সম্প্রতি তুলেছে। এ-বাড়িকে সাজিয়ে তুলবার ভার নিয়েছে ডলি নিজে। সামনে সারি সারি দেশী-বিদেশী ফুলের টব। জানলায় দরজায় রঙীন পর্দা। শোয়ার ঘরে শেডে ঢাকা নীলচে নরম আলো। বাড়িতো নয়, আর্টিস্টের আঁকা বাড়ির এক-খানি ছবি।

আর ছবির মতই সুন্দর ভবেশের স্ত্রী ডলি; বিলাত থেকে ফিরে এসে ভবেশ ওকে বছর দশেক হলো বিয়ে করেছে। স্বচ্ছল সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, বয়স এখন সাতাশ আঠাশ হবে। দুটি ছেলে হয়েছে। কিন্তু

ডলিকে দেখে কে বলবে তার বয়স কুড়ি পেরিয়েছে। তা ভবেশকে দেখেও তার আসল বয়েস বুঝবার জো নেই। পুষ্টিকর খাদ্যে, বাঁধা নিয়মকানুনে নিজের স্বাস্থ্যকে সে অটুট রেখেছে। না রাখলে কি চলে। নিজের চেহারা ডাক্তারের পেশার পক্ষে একটা বড় বিজ্ঞাপন। তেতাল্লিশ পেরিয়ে গেলেও ভবেশকে দেখলে মনে হয় না যে, তার বয়স তেত্রিশ বছরের ওপরে।

স্বামীকে দেখে ডলি একটু অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'আজও তোমার সেই সাড়ে আটটা। পাঁচ মিনিট আগে ফিরতে পারলে না বুঝি। ডাঃ নাগের মেয়ের জন্মদিনে যেতে হবে না! দেরি দেখে তিনি কি ভাবছেন বলতো।'

ভবেশ হেসে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। তিনি নিজেও তো ডাক্তার। তিনি জানেন আমাদের সময় আমাদের হাতে নয়, রোগীদের মুঠোয়।'

একবার অবশ্য ইচ্ছা হলো যে, ডলিকে বলে তাঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে। আজ আর সে নিমন্ত্রণে যাবে না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এই দুর্বলতাটা প্রকাশ করতে লজ্জা হলো ভবেশের। তাছাড়া একবার যদি বলে ফেলে, তার শরীর ভালো নেই, তাহলে কি আর রক্ষা আছে। ডলি হাজার প্রশ্ন তুলে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। আর শরীর ভালো না থাকার তো কোন কারণ নেই। কেন এমন একটা দৌর্বল্যের প্রশ্রয় দেবে ভবেশ?

তাই ভবেশ গাড়িতে চড়ে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণে গেল। সেখানকার সমশ্রেণী, সমবয়সী ও সমব্যবসায়ী বন্ধুদের সঙ্গে হাসি গল্প ঠাট্টা তামাসা করল, তারপর ফিরে এল বাড়িতে। না, আজকের চেম্বারের সেই ছোট একটু ঘটনায় ভবেশ ডাক্তারের মনে কি আচরণে কোন বৈলক্ষণ্যই ঘটেনি, যদি ঘটত তাহলে ডলি অন্তত সে কথা উল্লেখ না করে ছাড়ত না, স্বামীর চালচলন আচার আচরণ সম্বন্ধে তার দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ, ডলি ভবেশের ব্যারোমিটার। বিছানায় শুয়ে স্ত্রী যখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে তখন ভবেশেরও ঘুমিয়ে পড়া দরকার। কিন্তু বার বার ঘুমোবার চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারল না ভবেশ, উনিশ বছর আগেকার টুকরো টুকরো কতকগুলি ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

নলিনীর সঙ্গে আজ যদি বেশি রূঢ় ব্যবহার করে থাকে ভবেশ তা মোটেই অন্যায় হয়নি। তার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। উনিশ বছর আগে এই নলিনী ভবেশকে বড়ই প্রবঞ্চিত করেছিল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে মুখ দেখাবার আর জো ছিল না ভবেশের। তখনকার সেই প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তের কথা আজও ভবেশের সমস্ত মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

তাদের যশোহর শহরেরই প্রতিপত্তিশালী পসারওয়ালা উকিলের মেয়ে নলিনী, তার রূপের খ্যাতি শহর ভরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভবেশের বাবারও খ্যাতি প্রতিপত্তি নেহাৎ কম ছিল না। শহরে ছ'খানা বাড়ি, গাঁয়ে তালুকদারী, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে সম্মান ছিল অমূল্য দত্তের। ভবেশ তখন মেডিক্যাল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। শুধু যে কলেজেই তার খ্যাতি তা নয়, খেলার মাঠে, ক্লাবের বক্তৃতায় তার সমান নৈপুণ্য। তাই ভবেশের সঙ্গে যখন নলিনীর সম্বন্ধ এল সবাই বলল, এ একেবারে রাজজোটক, ভবেশের বাবা মেয়ে দেখে পছন্দ করে এলেন, এসে বললেন, এমন সুলক্ষণা মেয়ে তিনি কখনো দেখেন নি। শুধু রূপ নয় গুণ যোগ্যতাও যথেষ্ট। ধনীর মেয়ে হলে কি হবে রান্নাবান্না সেলাই সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সব কাজ সে জানে। লেখা-পড়া অবশ্য ঘরেই করেছে। ইংরেজী বাংলা যতটুকু শিখেছে একেবারে পাকা। হাতের অক্ষরগুলি একেবারে মুক্তোর মত। পণ-যৌতুকের যা ফর্দ পাওয়া গেছে তাতে অভিজাত পরিবারের মর্যাদা বজায় থাকবে।

ভবেশ অবশ্য মাথা নাড়ল, উঁহু সে পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে করবে না। বিয়ে যদি আদৌ করে, ডাক্তারী পাশ করে প্র্যাকটিস জমিয়ে তারপরে।

নলিনীর বাবা জিতেন বোস বললেন, 'বেশ তো বিয়ে না হয় ক বছর পরেই হবে মেয়ে দেখে ভবেশের পছন্দ হয় কিনা সেইটাই বড় কথা।'

কিন্তু নলিনীকে দেখে আসবার পর ভবেশের মত বদলাতে আর দেরি হলো না। বন্ধুমহলকে জানিয়ে দিল শুধু পাঠ্যাবস্থায় কেন যে কোন অবস্থায় এ মেয়েকে বিয়ে করা যায়।

ছেলের বাবা মেয়ের বাপ দুজনেই মুখ মুচকে হাসলেন। খুব ঘটা পটা আড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে বিয়ে হলো ভবেশের। শহরে প্রায় অর্ধেক লোক বিয়ের রাতে বউভাতে দু বাড়িতে পোলাও মাংস খেল।

ফুলশয্যার রাতে স্ত্রীকে আদর করে কাছে টেনে নিল ভবেশ, হেসে বলল, 'তুমি এত লাজুক কেন, মোটে কথাই বলছ না।' স্ত্রীর কাছ থেকে তবু কোন সাড়া না পেয়ে তার সুন্দর কোমল চিবুকটি তুলে ধরল ভবেশ। আর সঙ্গে সঙ্গে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল তার হাতে ঝরে পড়ল।

ভবেশ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'একি তুমি কাঁদছ! ছিঃ, আজকের দিনে কেউ কাঁদে নাকি। কি হয়েছে বলো, তোমাকে কেউ কিছু বলেছে?' নলিনী মৃদু স্বরে বলল, 'না।'

শুধু না আর না, আর শুধু কান্না। কিন্তু রূপবতীর কান্নারও রূপ আছে। যার চোখ সুন্দর তার চোখের জলও সুন্দর। ভবেশ ভাবল হয়ত বাবা মা ভাইবোনদের জন্যেই মন কেমন করছে নলিনীর। যদিও তার বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি সাত সমুদ্রের এপার ওপার না, নেহাতই এপাড়া থেকে ও-পাড়ায়; তবু আদুরে মেয়ের প্রথম প্রথম মন খারাপ হয়ে যাওয়াটা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। স্ত্রীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে বুকে টেনে নিল ভবেশ। চুমোয় চুমোয় মুখ ভরে দিল। একটু নোনতা স্বাদ লাগল অবশ্য। কিন্তু ভবেশ তা গ্রাহ্য করল না। সে কি জানে সেই কটুস্বাদ শুধু প্রথম রাত্রের না, তা জীবনের সমস্ত দিন রাত্রির।

ধরা পড়ল এক মাস পরে। অবশ্য তারও কিছুদিন আগে থেকে ভবেশদের অন্দর-মহলে মেয়েদের মধ্যে ফিসফিস শুরু হয়েছিল। কিন্তু মাসখানেক পরে কলঙ্কের কথাটি একেবারে সশব্দে উচ্চারিত হলো, দু মাসের অন্তসত্ত্বা অবস্থায় নলিনীর বিয়ে হয়েছে।

ভবেশের বাবা মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, এখনই ত্যাগ কর, এখনই ত্যাগ কর। ও আপদ দূর করে দাও বাড়ি থেকে। ভবেশ স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে বলল, 'তোমার চোখের জলের মানে এতদিন পরে বুঝলুম। কিন্তু এত কলঙ্ক, এত কালি কি ওই দু এক ফোঁটা জলে ধুয়ে যায়!'

নলিনীর চোখে এখন আর জল নেই। সে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকাল তারপর চোখ নামিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'না তা যায় না।'

ভবেশ বলল, 'তা যদি জানো তবে আমাকে এমন করে ঠকালে কেন?' একথার কোন জবাব না দিয়ে নলিনী অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর।'

'ক্ষমা! তোমার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই নলিনী। যাকে তুমি ভালোবেসেছিলে তাকেই কেন বিয়ে করলে না?'

নলিনী তেমনি মুখ নিচু করে বলল, 'আমি তো তাকে ভালোবাসিনি, সে জোর করে—'

এর পর নলিনী শুধু কাঁদতে লাগল। কাউকে আর কোন কথা সে বলল না, কি বলতে পারল না।

নলিনীর বাবা জিতেনবাবুকে খবর দেওয়া হলো, দোর এঁটে দুই বেয়াইয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। বাইরে থেকে মাঝে মাঝে তর্জন গর্জন শোনা গেল।

মনে হলো দুজনের মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলছে। কিন্তু সে যুদ্ধ তখনকার মত বাকযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে নলিনীর বাবা বেরিয়ে এলেন। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে চলে গেলেন মেয়েকে নিয়ে। যাওয়ার আগে নলিনী নাকি ভবেশের সঙ্গে আর একবার দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভবেশের বাবা-মা তাতে রাজী হননি। ভবেশের নিজেরও কোন আগ্রহ ছিল না। লজ্জায় ধিক্কারে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। তার মত চতুর আর বুদ্ধিমান ছেলেকে কেউ কোনদিন ঠকাতে পারেনি। বন্ধুর দল হাজার চেষ্টা ক'রেও তাকে কোন বছর এপ্রিল ফুল করতে পারেনি। আর সারা জীবনের মত তাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল পনের ষোল বছরের একটি মেয়ে। হাজার শাস্তি দিলেও কি এই প্রবঞ্চনা, প্রতারণার শোধ যায়।

বাড়ির ঝি চাকরের কল্যাণে কথাটা মোটেই চাপা রইল না। সারা শহর ভরে ছড়িয়ে পড়ল। ভবেশ যেখানেই যায় মনে হয় একটু আগে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, আধা-পরিচিত ভবেশ যার দিকেই তাকায় মনে হয়, সে মুখ টিপে হাসছে। ভবেশ অস্থির হয়ে উঠল। মানুষ জনের সঙ্গ সহ্য হয় না, নির্জনতাও অসহনীয়।

ওপক্ষ থেকে মিটমাটের নানারকম চেষ্টা হয়েছিল, প্রথমে ওরা খুব অনুনয় বিনয় করেছিল, যা হয়ে গেছে তারতো আর চারা নেই। একটি মেয়ের সর্বনাশ ক'রে লাভ কি। ভবেশ দয়া করুক, ক্ষমা করুক, সে মেনে নিক। কিন্তু ভবেশ তাতে রাজি হয়নি। তার বাবা-মা আরো অরাজি ছিলেন।

তারপর শুরু হ'ল শত্রুভাবে ভজনার পালা। জিতেন বোস শাসালেন তিনি মামলা করবেন। তাঁর মেয়ের নামে অযথা অপবাদ দেওয়ার জন্য ফৌজদারী করবেন, খোরপোষের নালিশ আনবেন। কিন্তু বন্ধুদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত রাজদ্বারে আর গেলেন না। নিজেই রাজার ভূমিকা নিলেন। দত্তদের বাড়ির ছেলেরা খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে বোসেদের বাড়ির লোকজনের হাতে মার খেল। আর একদিন বাজারের ধার দিয়ে ফেরার সময় বোসেদের বাড়ির ছেলেদের মাথায় ইঁট পড়ল। এমনি চলল মাস দু'তিন। তারপর একদিন সন্ধ্যার পর নদীর ধারের নির্জন পথ থেকে দুই ভোজপুরী দারোয়ান ভবেশকে পাঁজা কোলে করে তুলে নিয়ে তার শ্বশুর বাড়িতে হাজির করে দিল।

জিতেন বোস তাঁর অন্দর মহলের এক নির্জন ঘরে নিয়ে জামাইকে অনেক বোঝালেন। একবার পিঠে হাত বুলালেন, আর একবার সশব্দে টেবিল চাপড়ালেন। ভাবখানা এই, কথা না শুনলে সে চাপড় ভবেশের গালেও পড়তে পারে। শাশুড়ী, পিস শাশুড়ীরা করলেন গুণজ্ঞানের চেষ্টা। চায়ের সঙ্গে কি একটা শিকড় বাটা যেন খাইয়ে ছিলেন তাঁরা। বার দুই বমি ক'রে ভবেশ সেই বশীকরণের উদ্যোগকে নিষ্ফল ক'রে দিল। ভয় পেয়ে জিতেনবাবুই শেষ পর্যন্ত গাড়িতে ক'রে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন জামাইকে। সেই সময় এক টুকরো চিঠি হাতে এসে পৌঁছেছিল ভবেশের। 'ওঁদের কান্ড দেখে মরি। আমাকে ভুল বুঝো না। চিঠি লেখার ছলে স্পর্ধাকে ক্ষমা করো।'

কিন্তু শিকড় বাটা খেয়ে ভবেশের তখন মাথা গরম হয়ে গেছে। সে ভাবল এও আর এক ধরনের মন্ত্রতন্ত্র। বশীকরণের রকমফের। সে চিঠি ভবেশ টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিল।

তারপরও দুই পরিবারের মধ্যে বহুকাল ধরে শত্রুতা চলেছিল। কিন্তু তার সাক্ষী হিসাবে ভবেশ আর যশোহরে উপস্থিত ছিল না। এম বি পাশ ক'রে সে বিলাত চলে যায়। তাই স্পেশালিস্ট হয়ে যখন ফিরে এল, তখন শহরের অদল বদল হয়েছে। বোসেদের সেই দাপট আর নেই। জিতেনবাবু মারা যাওয়ার পর সম্পত্তি নিয়ে ছেলেদের মধ্যে দেওয়ানী ফৌজদারী বেঁধেছে। দাদাদের সংসারে নলিনীর স্থান হয়নি। কোলের মেয়ে নিয়ে সে কলকাতায় চলে গেছে জীবিকার সন্ধানে।

আর সাফল্যের গৌরবে ভবেশের সেই প্রবঞ্চিত হওয়ার ইতিবৃত্ত চাপা পড়ে গেছে। বাড়ি গাড়ি যশ অর্থ, সুন্দরী স্ত্রী, স্বাস্থ্যবান সন্তান সবই পেয়েছে ভবেশ। নিজের ক্ষমতায় অর্জন করেছে। জীবনে কোথাও কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, অতৃপ্তি নেই, আশ্চর্য তবু সারারাত ঘুম এল না ভবেশের। একখানি ম্লান মুখ তার বিনিদ্র চোখের সামনে কেবলি ভেসে বেড়াতে লাগল। আর বহুকাল আগের সেই একটি ফুলশয্যার রাত। শিশিরে ভেজা পদ্মের মত একখানি মুখ।

এতদিন পরে ভবেশের মনে হলো নলিনীর হয়ত তত অপরাধ ছিল না। কিন্তু বাবা-মা তখন মাথার ওপর। সে অবস্থায় ভবেশ কিই বা করতে পারত। এখনো নলিনী যা বলছে তা করবার সাধ্য অবশ্য ভবেশের নেই। আগে ছিলেন বাবা-মা এখন নিজের মান-মর্যাদা। যে সমাজে সে বাস করে, তার রীতিনীতি আচার-আচরণ তাকে মানতেই হবে। যাতে ডলির আর বিশু যীশুর মুখ নীচু হয়, এমন কাজ সে কিছুতে করতে পারে না।

এই উনিশ বছরের মধ্যে নলিনীর সঙ্গে আরো বার দুই ভবেশের দেখা হয়েছিল। বউবাজারে এক আত্মীয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল ভবেশ। গিয়ে দেখে নলিনী সেখানে এসেছে। শুধু চোখের দেখা। তারপর নলিনী বোধ হয় লজ্জা পেয়ে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। ভবেশও সরে পড়তে পারলে বাঁচে। কারণ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডলি তখন সঙ্গে আছে। দুজনের দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ডলির কাছে অবশ্য ভবেশ কিছুই গোপন করেনি। প্রথম জীবনের লজ্জাকর সেই ঘটনার কথা স্ত্রীকে সে বলেছিল। সেই সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিয়েছিল নিজের জীবন কাহিনী থেকে সে অধ্যায়টি ভবেশ একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলেছে।

ডলি জবাব দিয়েছিল, 'মুছে ফেলাই তো উচিত। তাছাড়া তুমি আর কি করতে পারতে।'

তারপর আরো একবার আকস্মিকভাবে কলেজ হাসপাতালের আউট ডোরে ভবেশের দেখা হয়েছিল নলিনীর সঙ্গে। ঠিক দেখা হওয়া নয়, নলিনী দূর থেকে তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। ভবেশ ডাঃ সান্যালের করিডরে দাঁড়িয়ে একটি পেশেণ্টের কেস নিয়ে আলোচনা করছিল। সান্যালই ভবেশকে ইশারা করে বলল, 'ওহে দত্ত, ভদ্রমহিলা বোধ হয় তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।'

চোখ ফেরাতেই ভবেশ দেখল, নলিনী দাঁড়িয়ে আছে। সান্যাল চলে যাওয়ার পর ভবেশ কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি এখানে।'

নলিনী বলল, 'থ্রোট ডিপার্টমেণ্টে এসেছিলাম।'

ভবেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার গলায়?'

নলিনী একটু হেসেছিল, 'আমার গলায় আবার কি হবে। আমার একটি ছাত্রীর টনসিলিটিস, অপারেশন কেস। তাকে ভর্তি করাতে এসেছিলাম।'

'ভর্তি হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

ভবেশ আর জিজ্ঞেস করেনি ই টি এন ছেড়ে আই ডিপার্টমেণ্টের এদিকে নলিনী কোন কাজে এসেছিল।

একটু বাদে নলিনীই নিজে থেকে বিদায় নিল। 'যাই এবার। ভালো আছো? ছেলে দু'টি ভালো তো?'

ভবেশ বলেছিল 'হ্যাঁ।'

কিন্তু কুশল প্রশ্নের বিনিময়ে আর কোন কুশল প্রশ্নের কথাই ভবেশের মনে হয়নি। জিজ্ঞেস করেনি কোথায় আছে, কি করছে

নলিনী। বরং ভবেশ যেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল পাছে এই দেখা সাক্ষাৎ আর কারো চোখে পড়ে যায়। পাছে কোন বন্ধুর কৌতূহল মেটাতে হয়। অনেক সহকর্মীরই তো যাতায়াত আছে ভবেশের বাড়িতে। পাছে তারা কেউ গিয়ে ডলির কাছে এই সাক্ষাৎকারের গল্প করে।

ভবেশের দুর্বলতার কথা নলিনী কি টের পেয়েছিল? কে জানে?

ভোরে উঠে ডলি বলল, 'ব্যাপার কি, তোমার কি কাল ভালো ক'রে ঘুম হয়নি। চোখ দুটো লালচে হয়েছে যে।'

ভবেশ অনিদ্রার কথাটা জোর ক'রে অস্বীকার ক'রে বলল, 'না, না কাল তো খুব ঘুমিয়েছি ডলি। এতো ঘুম শিগগির ঘুমোইনি।'

তারপর হাসপাতালের আউট ডোর ডিউটিতে বেরোবার আগে ছেলে দুটিকে ডেকে আদর করল ভবেশ। বড়টিকে গাল টিপে দিল। ছোটটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চুমো খেল কপালে। ভারি সুন্দর হয়েছে ওরা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, ফুটফুটে রঙ। রঙীন প্যাণ্ট আর হাফ সার্টে চমৎকার মানিয়েছে।

ডলি হেসে বলল, 'কি ব্যাপার আজ যে বাৎসল্যের বন্যা বইছে একেবারে। কি ভাগ্য ওদের। আজ ওরা কার মুখ দেখে উঠেছিল।'

ভবেশ হেসে বলল, 'যার সুন্দর মুখ দেখে রোজ ওঠে।'

হাসপাতালে চেম্বারে রোগীদের চিকিৎসায় আর বাড়িতে ফিরে স্নিগ্ধ পারিবারিক পরিবেশে স্ত্রীর সঙ্গে অবসর যাপনে সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে দিল ভবেশ। কিন্তু ঠিক আগের মত নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে কাটল না। দয়া ভিখারিণী একটি নারীর বিষাদ করুণ অস্পষ্ট একখানি মুখ ভবেশের মনের পটে বারবার ফুটে উঠতে লাগল।

নলিনীর মেয়ের বিয়ের দিন এগিয়ে এসেছে। তা আসুক। ভবেশ অমন অসঙ্গত প্রস্তাবে রাজী হ'তে পারে না। নিজের মান-সম্মানের কথা ভাবতে হবে, ভাবতে হবে পারিবারিক সুখ শান্তির কথা। অমন একটা অসমীচীন মিথ্যাচারে ভবেশ কি ক'রে রাজি হ'তে পারে? তা পারে না। তবে টাকা দিয়ে সাহায্য করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। আর সেই সাহায্যই সব চেয়ে বড় সাহায্য। মেয়ের বিয়েতে ভবেশের নামের চেয়ে তার টাকার দাম নিশ্চয়ই নলিনীর কাছে অনেক বেশি। নলিনী নিজেও হয়ত সে কথা জানে। শুধু লজ্জায় স্বীকার করতে পারেনি।

ভবেশ প্রথমে ভাবল, শ' পাঁচেক টাকার একটা চেক ডাকে পাঠিয়ে দেয় নলিনীকে। বহু দুঃস্থ আত্মীয় বন্ধুর কন্যা দায়ে, এমন দান খয়রাত ভবেশকে মাঝে মাঝে করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে টাকার অঙ্কটা একটু বেশি হয়ে যাবে। তা না হয় হলোই। বিয়ের আগে নলিনী যদি অমন একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে না আসত তাহলে তো সেই সমস্ত কিছুর অধিকারিণী হোত।

কিন্তু চেক কাটতে গিয়ে ভবেশের মনে হলো চেকটা ডাকে না পাঠিয়ে একেবারে ওর হাতে দিয়ে এলে কেমন হয়। নলিনী অবাক হবে, নলিনী খুশি হবে। ওর মুখে হাসি কোনদিন দেখেনি ভবেশ। ভারি সাধ হলো আজ একবার দেখবে। আশঙ্কায় ভয়ে চোখ ভরা জল নিয়ে যে মেয়ে বাসরঘরে এসেছিল, এই যৌবন-সীমান্তে তার মুখে এক ফোঁটা হাসি কেমন মানাবে ভাবতে চেষ্টা করল ভবেশ।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন ধর্মতলার চেম্বারে না গিয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীটের এক পরিচিত অভিজাত ড্রাগিস্টের দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে দোকানে ঢুকে সহকারী সুরজিৎকে ভবেশ ফোন ক'রে দিল। ভবেশ আজ জরুরী কাজে আটকা পড়েছে। তাই চেম্বারে যেতে পারবে না। সুরজিৎই যেন রোগীদের অ্যাটেণ্ড করে।

তারপর উত্তরমুখে ছুটে চলল ভবেশের স্টুডিবেকার। বহুদিন বাদে ছুটি নিয়েছে, ছুটি পেয়েছে শহরের কর্মব্যস্ত ভবেশ ডাক্তার। এমন অহেতুক নিরুদ্দেশ যাত্রার আনন্দ যেন তার ভাগ্যে শিগগির জোটেনি।

মোটরযানের পক্ষে সুগম নয় এমন অনেক আঁকা বাঁকা সঙ্কীর্ণ-সর্পিল পথ পেরিয়ে ভবেশের গাড়ি পুরোনো একটা এক-তলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

আশে পাশে শহরের চেয়ে গ্রামের পরিবেশই বেশি। রাস্তার ওপারে খানিকটা পোড়ো জমি। তার লাগা ছোট পানাপুকুরটিতে গুটি দুয়েক সাপলা জলের ওপর মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে। একটি ফুটেছে আর একটি ফোটেনি। আরো পশ্চিমে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটি নতন বাড়ি উঠছে। মজুরের দল কাজ করে চলেছে। আকাশে আজ মেঘ নেই। আছে রক্তিম গোধূলির রঙ।

গাড়ি থেকে নেমে একটু ইতস্তত ক'রে রুদ্ধ দরজার কড়া নাড়ল ভবেশ। সঙ্গে সঙ্গে দরজার খিল খুলে আঠার-উনিশ বছরের একটি মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। শ্যামবর্ণা, তন্বী সুঠাম চেহারা। নলিনীর মতই টানা নাক, কালো বড় বড় চোখ। সেই চোখ অভিজাত ভবেশ ডাক্তার বিস্মিত কৌতূহলের উদ্রেক করেছে। কি জিজ্ঞাসা করবে ওকে একটু যেন ভাবতে হলো ভবেশকে। সন্তানের বয়সী এই মেয়েটির সামনে নিজের পরিত্যক্তা স্ত্রীর নাম ধ'রে ডাকতে কেমন একটু লজ্জা বোধ করলে ভবেশ, তারপর সঙ্কোচের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল, 'নলিনী আছে।'

মেয়েটি স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, না। মা তো এখনো স্কুল থেকে ফেরেননি। আপনি আসুন ঘরে বসুন এসে। তাঁর ফিরতে বেশি দেরি হবে না।'

ভবেশ ভিতরে এসে ঢুকল। পরিপাটি ক'রে গুছানো ছোট্ট সুন্দর একখানি ঘর। পুরোন জীর্ণতার ওপর পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ পড়েছে। জানালায় নীলরঙের পর্দা। এমব্রয়ডারি করা সাদা ঢাকনিতে ঢাকা ছোট একটি টেবিল। তার ওপর কিছু দর্শন ইতিহাসের পাঠ্য বই। দু'খানি চেয়ার। একখানা সামনে একখানা পাশে। দেয়াল ঘেঁষে একটি তক্তাপোশ, মাথার কাছে বইয়ে ভরতি একটি শেলফ তার ওপর ছোট একটি সবুজ রঙের ফুলদানী, তাতে কয়েকটি চন্দ্রমল্লিকা।

প্রসন্নতায় মন ভরে উঠল ভবেশের। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নামই বুঝি গীতা?'

'হ্যাঁ।' মেয়েটি স্মিতমুখে জবাব দিল।

'আমার নাম ভবেশচন্দ্র দত্ত।'

'বাবা!'

অস্ফুটস্বরে কথাটি বলে নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠল মেয়েটি। তারপর অপলকে একটুকাল ভবেশের দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময় কৌতূহল, অভিযোগ অভিমানে মেশা সে এক অপরূপ দৃষ্টি, তারপর কি তার মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভবেশের জুতো ছুঁয়ে প্রণাম করল গীতা।

ভবেশ একটু যেন বিমূঢ় হ'য়ে রইল। তারপর আস্তে আলগোছে গীতার মাথায় হাত রেখে বলল, 'থাক থাক।'

নিজের ছেলেদের মুখে এ সম্বোধন তো ভবেশ রোজ শোনে। কিন্তু গীতার মুখের এই লজ্জিত অস্ফুট শব্দটি ভারি অশ্রুতপূর্ব মনে হলো ভবেশের। এক অনাস্বাদিত অনুভূতিতে তার মন ভরে উঠল। ভবেশ ভাবল এমন পরম মিথ্যা একটি সম্বোধন হঠাৎ এত বড় সত্য হয়ে উঠল কি ক'রে। কই গীতাকে দেখে, ওর মুখের ডাক শুনে তো মোটেই মনে হচ্ছে না তার সঙ্গে ভবেশের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই, বরং পরম আত্মীয় বলেই তো মনে হ'চ্ছে ওকে। তবে সত্যিকারের আত্মীয়তা মানুষের রক্তের মধ্যে নয়, আসল সম্পর্ক মানুষের ভাবের মধ্যে, অনুভবের মধ্যে!

'আপনি ঘামছেন। ঘরটা বড় গরম।' বলে

গীতা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতে শুরু করল।

ভবেশ এবার আর বাধা দিল না। মৃদু হেসে স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাল।

ডাক্তার হিসেবে এই বয়সী কত তরুণী মেয়ের সান্নিধ্যেই না এর আগে এসেছে ভবেশ। কিন্তু কই এমন বাৎসল্যের ভাব তো কাউকে দেখে এর আগে জাগেনি। মনে মনে কর্তব্য ঠিক করে ফেলল ভবেশ। নলিনীর সব প্রার্থনাই আজ সে পূরণ করবে। একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে তার মন এক পরম প্রসন্নতায় ভরে গেল। এই স্নিগ্ধ সেবা-নিপুণা লাবণ্যময়ী মেয়েটি পিতৃ পরিচয় পেয়ে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করুক, একটি ভদ্র পরিবারে মর্যাদাময়ী বধূর আসন পেয়ে ওর জীবন সার্থক হয়ে উঠুক। তার জন্যে যত অসুবিধে অশান্তি ভোগ করতে হয় ভবেশ করবে।

সামাজিক মান সম্মান তুচ্ছ করবার নয়। কিন্তু তার চেয়ে বড় মানুষের হৃদয়। নিজের মধ্যে এক পরম উদার হৃদয়বান পুরুষের অস্তিত্বের সাড়া পেয়ে ভবেশ গৌরব বোধ করল। তারপর খুঁটে খুঁটে মা আর মেয়ের জীবন সংগ্রামের অনেক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করল ভবেশ। বহু কষ্টে আর কৃচ্ছ্রতার মধ্যেই মেয়েকে মানুষ করেছে নলিনী। এখনো দুটো টুইশন ক'রে গীতাকে নিজের পড়ার খরচ চালাতে হয়। শুধু নলিনীর রোজগারে এ সব ব্যয়ের সঙ্কুলান হয় না। খানিক শুনে এবং অনেকখানি আন্দাজ ক'রে ভবেশের মন সহানুভূতিতে ভরে উঠল।

স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতার মধ্যে গীতাকে যদি বড় করে তুলত ভবেশ ডাঃ নাগের মেয়ে রুচিরা ওর কাছে দাঁড়াতে পারত নাকি। গীতার হাতে গলায় কোথাও কোন অলঙ্কার নেই। ধানী রঙের সাধারণ একখানি তাঁতের শাড়ি ঘুরিয়ে পরা। তাতেই কি চমৎকার মানিয়েছে। কি অপূর্ব সুন্দরই না দেখাচ্ছে এই নিরাভরণা মেয়েটিকে।

দোরের কাছে জুতোর শব্দ হলো। সিঁড়িতে পা রেখে নলিনী একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি!'

নলিনীর পরনে সেই খয়েরী পাড়ের সাদা খোলের শাড়ি, হাতে একটি পুরোন ছাতা, আর এক হাতে কতগুলি খাতা।

ভবেশ একটু হেসে বলল, 'ভাবতে পারনি যে খুঁজে বের করব? মেয়ের বিয়েটা চুপি চুপি একা একাই সেরে ফেলবে ভেবেছিলে বুঝি?'

একথার কোন জবাব না দিয়ে নলিনী মেয়ের দিকে তাকাল, 'গীতু, তুমি একবার ও ঘরে যাও তো মা। চা ক'রে নিয়ে এসো।'

আরক্ত হয়ে উঠল গীতার মুখ, মৃদু হাসি গোপন করতে করতে দ্রুতপায়ে সে পাশের ঘরে চলে গেল।

মৃদু হেসে প্রথম তারুণ্যের সেই মধুর লজ্জা উপভোগ করল ভবেশ। তারপর নলিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মেয়েকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিলে কেন। আমি কি কোন বেফাঁস কথা বলেছি?'

নলিনী বলল, 'না।'

'তবে?'

নলিনী বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার নিজের কিছু কথা আছে।'

ভবেশের সঙ্গে নলিনীর নিজের কথা! কি কথা বলবে নলিনী! এই উনিশ বছর ধরে যত কথা জমেছে তার কতটুকুই বা বলে প্রকাশ করতে পারবে?

ভবেশ নলিনীর দিকে তাকিয়ে মৃদু-স্বরে বলল, 'কি বলবে বল।'

নলিনী বলল, 'নির্মলকে আজ সবই বলে এলাম।'

ভবেশ বলল, 'নির্মল কে?'

নলিনী একটু হাসল, 'অমন করে তোমাকে ভ্রূকোঁচকাতে হবে না। নির্মল আমার ছেলের মত। গীতা যে কলেজে পড়ে সেখানকার লেকচারার। ওর সঙ্গেই গীতার সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে।'

ভবেশ বলল, 'তাই বল। আগে থেকেই ওদের মধ্যে জানা শোনা হয়েছিল নাকি!'

নলিনী বলল, 'তা হয়েছিল। মাইনে শ' খানেক টাকার বেশি পায় না। তবে প্রাইভেট টিউশনি করে, নোট লিখে কোন রকমে পুষিয়ে নেয়। বেশ ভালো চরিত্রবান ছেলে।' তারপর নলিনী একটু থেমে বলল, 'তোমার চেম্বার থেকে ফিরে এসে এই সাতদিন ধরে আমার ভাবনার আর সীমা ছিল না। মাথা ঠিক করে ক্লাস করতে পারতাম না। তাদের খাতা দেখতে পারতাম না, ঘরের কাজকর্মে পর্যন্ত ভুল হয়ে যেত। জীবন ভরে এত দুঃখ এত কষ্ট গেছে, কই আমার মন এমন অস্থির তো কোনদিন হয়নি।'

ভবেশ বলল, 'থামলে কেন নলিনী বল।'

নলিনী বলতে লাগল, 'কিন্তু অস্থির হলে তো চলবে না আমার। আমাকে যে কর্তব্য ঠিক করে ফেলতেই হবে। ওদের বিয়ের দিন যে এগিয়ে আসছে। একবার ভাবলাম গীতাকেই আগে বলি। ও সব খুলে বলবে নির্মলকে। কিন্তু পরে মনে হলো ও কি পারবে? আমার গীতুর তো কোন অপরাধ নেই। এমন একটা শক্ত কাজের ভার কেন ওর মাথার ওপর তুলে দেব? তাই নিজের লজ্জার কথা নিজের মুখেই বললাম। সব খুলে বললাম নির্মলকে।'

ভবেশ চমকে উঠে বলল, 'তুমি কি বলেছ নলিনী, কি বলেছ তাকে?'

নলিনী বলল, 'যা সত্যি তাই বলেছি। বললাম নির্মল, তোমরা এতদিন যা জানতে তা মিথ্যে, গীতা ডাঃ দত্তের মেয়ে নয়। ও আমার।'

ট্রেতে ক'রে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আসছিল গীতা। দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল, অস্ফুট স্বরে বলল, 'মা!'

নলিনী মেয়ের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল, 'এসো গীতু ঘরে এসো। সবাইকে চা দাও।'

কিন্তু গীতা দুজনের দিকে একবার ক'রে তাকিয়ে চায়ের ট্রেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ফের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবারো বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে গীতা। কিন্তু তখনকার লজ্জা আর এখনকার লজ্জায় তফাৎ অনেক।

ভবেশ আবেগভরা গলায় বলে উঠল, 'কেন এমন সর্বনাশ করলে নলিনী। আমি যে, আমি যে—।'

নলিনী বলল, 'আমি জানি তুমি কি জন্যে এসেছিলে। কিন্তু সত্য গোপন করে অল্প-বয়সে নিজের যে সর্বনাশ করেছি কোন লোভেই গীতার তেমন সর্বনাশ যেন না করি। নির্মল দু'একদিন সময় নিয়েছে। জানিনে মেয়ের ভাগ্যে কি আছে। কিন্তু যাই থাক, ওর ঘর-সংসারের ভিত চোরাবালি দিয়ে কোনদিন গেঁথে তুলতে দেব না।'

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে এল। কিন্তু কেউ উঠে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালবার প্রয়োজন বোধ করল না, ভবেশ বাইরের দিকে তাকাল। পুকুরের জলের সেই একজোড়া ফুল কোথায় মিলিয়ে গেছে। নারকেল গাছগুলির আড়ালে সেই অসম্পূর্ণ নতুন বাড়িটাকে এখন মনে হচ্ছে কদাকার একটা ভূতের মত।

আস্তে আস্তে উঠে পড়ল ভবেশ। বেরোতে বেরোতে বলল, 'যাই নলিনী।'

নলিনী যন্ত্রের মত আবৃত্তি করল, 'আর একদিন এসো।'

ভবেশ নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে উঠল। যদি কাজ কামাই করে সে ফের আর একদিন এদিকে আসেই, আর নলিনী বাড়িতে না থাকে গীতা কি আজকের মত ওর সামনে এসে দাঁড়াবে, পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে তারপর পাশে বসে হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকবে?

তা বোধ হয় কখনো আর করবে না। ওর মুখের পিতৃ সম্বোধন দ্বিতীয়বার ভবেশের আর শোনা হবে না।

পেত্নীর গল্প। গল্প বলতে যা বোঝেন তা নয়। চোখে-দেখা ঘটনা। ধর্ম-সাক্ষী, এক বিন্দু রঙ চড়াই নি। আর ঐ যেমন হয়ে থাকে—ভূতপেত্নী বলে শুরু, শেষ অবধি দেখা গেল দৃষ্টিবিভ্রম। কিম্বা পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে-আসা কোন পাগল। অথবা বজ্জাত মেয়েলোক। ওসব ফাঁকিজুকি নয় ধূমবতীর ব্যাপারটা। সাচ্চা জিনিস—পেত্নী তো শেষ অবধি পেত্নীই থেকে যাবে।

'পেত্নী' কথাটা কানে লাগছে। অথচ কি-ই বা বলি! তখন নতুন বয়স, রঙদার মন—আমি নাম দিয়েছিলাম ধূমবতী। ভারি রূপবতী—পেত্নী বললে যে চেহারা মনে আসে, তার ধারে-কাছেও নয়। যে সব জ্যান্ত মেয়ে দেখে ছেলেরা পলক না ফেলতে প্রেমে পড়ে—অনেক বেশি রূপসী তাদের চেয়ে। এমন কি লাবণ্যর চেয়েও। (দোহাই পাঠক, কথাটা আমার বাড়ির মধ্যে চাউর না হয়ে পড়ে!)

জন্ম থেকে শহরে বসবাস। কল টিপলে আলো, কল ঘোরালে জল। চাকরি নিয়ে সেই আমাকে বিরাটগড় যেতে হল। নাম শুনে ভেবেছিলাম বিরাট বিপুল কোন জায়গা। ছিল বটে তাই নীলকুঠির আমলে। ভাঙাচুরো দালানকোঠা, তার উপর বট-অশ্বত্থ ও হরেকরকম ঝোপজঙ্গল। সাপ আর বুনো শুয়োর মজাসে পাকা দালানে বসবাস করে। শীতকালে নাকি বড়-মিঞারাও (রাতের বেলা লিখছি—খোলাখুলি নাম করে কোন্ ফ্যাসাদে পড়ব!) বেড়াতে আসেন। এ হেন স্থানে এসে দুদিনে পালাই পালাই ডাক ছাড়ছি। ইচ্ছা করে, চাকরির পায়ে দণ্ডবৎ হয়ে শহরের ছেলে শহরে গিয়ে যথারীতি রাজাউজির নিধনকর্মে লেগে যাই।

কিন্তু মুরুব্বিরা নিষেধ করেন। খুঁটোর জোর নেই, কাকে ধরলে কি হয়—এই তত্ত্বে একেবারে আনাড়ি। তা সত্ত্বেও পরীক্ষায় বসলাম—এবং কি আশ্চর্য, টায়েটোয়ে পাশও হয়ে গেলাম। বাপ-ঠাকুর্দার পুণ্যবল না থাকলে এমন অঘটন ঘটে না। আরও বছর দেড়েক কেটে গেলে হঠাৎ সরকারি চিঠি, আমাকে সাবরেজিস্ট্রার করা হয়েছে বিরাটগড়ে। এ চাকরির নিয়ম—আজ এখানে কাল ওখানে, তামাম ঘাটের জল খাইয়ে নিয়ে বেড়ায়। মুরুব্বিরা তাই ভরসা দিলেন। থাকো বাপু চেপেচুপে। তদ্বিরতাগাদা লাগাও, তাড়াতাড়ি যাতে বদলি হতে পারো ভালো জায়গায়। ভালো অর্থে তাঁরা ভাবেন, যে জায়গায় দু-চার পয়সা উপরি আছে; আমি ভাবি, আছে যেখানে আড্ডা দেবার জুতে।

আছি তাই। হরিশ নামে তুখোড় একটি লোক পেয়েছি। সাবান কেচে রান্না সেরে জুতোয় বুরুশ ঘষে বাসন মেজে তারপর ধাঁ করে উর্দি-চাপরাস পরে নিয়ে গোঁফ চুমরে হরিশ আমার অফিসের চাপরাসী হয়ে যায়। বেলা দশটায় চাপরাসী সহ হাকিম গিয়ে এজলাসে ওঠেন। এই পাড়াগাঁয়ে সাব-রেজিস্ট্রারকে বলে 'হাকিম'—সকলে হুজুর হুজুর করে। শুনতে খাসা লাগে। চারটে অবধি তালেগোলে কেটে যায় এমনি।

সন্ধ্যার পর থানায় ডাক পড়ে প্রায়ই। হেরিকেন ও লাঠি-বন্দুক নিয়ে কনেস্টবল চলে আসে। ছোট দারোগার তাসের নেশা। কাজকর্মে বাইরে গেলেন তো আলাদা কথা—থানায় উপস্থিত থাকলে তাসে তাঁরা বসবেনই। অঞ্চলটার অধিপতিই হলেন ওরা—যার তার সঙ্গে মিশতে পারেন না। তাসখেলায় চারজন চাই—তা ছোটবাবু ছাড়া আছেনও বড় দারোগাবাবু, সরকারী ডাক্তার আর দশ-আনির নায়েব দয়ালহরি সেন। এঁদের একজন কেউ গরহাজির থাকলে আমার খোঁজ পড়ে যায়। ছাড়ান নেই কোন রকমে। খুনী আসামীকে গ্রেপ্তার করে হিড়হিড় করে থানায় নিয়ে যায়—প্রায় সেই গতিক। আমার ভাল লাগে না। নিরিবিলি একটু লেখা-পড়া করতে চাই। চুপি চুপি বলি—বয়সটা

খারাপ এবং চতুর্দিকে গাঙখাল ও সবুজ গাছপালা থাকায় কিঞ্চিৎ পদ্য লেখার বাতিকে পেয়েছিল ঐ সময়টা।

রেজেস্ট্রি অফিস পাকা-দালানে তারই কাছাকাছি খান-দুই দোচালা খোড়োঘর নিয়ে বাসা আমার। রাত ঝিমঝিম করে। তক্ষক ডাকে ঘরের আড়ায়। আর ফেউ ডাকে জঙ্গলে—তার মানে বড়-মিঞা কিম্বা ঐ জাতীয় বড়দের কেউ দর্শন দিয়েছেন। বাদুড়ের ঝাঁক দেবদারুবনে পাকা ফল খাচ্ছে—গাছের উপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সেই শব্দেও গা শিরশির করে। পদ ও প্রতিষ্ঠার গর্বে মানুষে মানুষে তফাৎ হয়ে থাকা একান্ত অনুচিত, এই মহাতত্ত্ব মনে পড়ে যায় তখন। হরিশকে ভিতরে ডেকে নিই। হাকিম ও চাপরাসীর প্রায় পাশাপাশি শয্যা। দশেধর্মে দেখে না এই যা—দেখতে পেলে ধন্য ধন্য করত।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি এক রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে হরিশ ডাকছে, উঠে পড়ুন হুজুর—বেড়ার ওধারে জলের তোড় শোনা যাচ্ছে। ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দাওয়ায় বেরিয়ে এলাম। তাই বটে! উঠানে স্রোত বয়ে চলেছে। বৃষ্টি চলছে দু-দিন ধরে—তা বলে এত জল?

এদিক-ওদিক তাকাই। সীমাহীন জল। মেঘ-ভাঙা ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় অদূরের অফিসবাড়িটা দ্বীপের মতো দেখাচ্ছে। দাওয়ায় বসে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। ভারি এক আফালি করল। হরিশ চুকচুক করে, ইস্—একেবারে ছাঁচতলায় গো! বড় কাতলা। কুঠির পুকুর ভেসে সব মাছ বেরিয়ে পড়েছে। খেপলা-জাল থাকলে এক্ষুণি এটাকে কায়দা করে ফেলতাম।

বান ডেকেছে। লটবহর কাঁধে নিয়ে এক হাঁটু জল ভেঙে অফিসের দালানে এসে উঠলাম। এসেছিলাম ভাগ্যিস। বানের তোড়ে সন্ধ্যা নাগাত আমার সেই কাঁচা বাসঘর ভেঙে পড়ল। চাল-খুঁটি-বেড়া এদিক সেদিক ভেসে চলল। ওখানে থাকলে আমাকেও ভাসতে হত।

দিন তিনেক পরে জল সরে গিয়ে ফের ডাঙা দেখা দিল। তখন ঘরের সমস্যা। সরকারি অফিসে চিরকাল বসবাস চলে না। আবার খোড়ো-ঘরে গিয়ে উঠতে আমার ঘোরতর আপত্তি। তাসের আড্ডার বন্ধুবর্গও চিন্তিত হয়েছেন। কিন্তু ভেবে কোন সুরাহা হবে—পাকা-কোঠা এই জায়গায় কে বানিয়ে রেখেছে আমার জন্য?

দশ-আনির নায়েব দয়ালহরি একটা খোঁজ দিলেন। কুঠিবাড়ি যেতে চান তো বলুন। নীলকরদের বাড়ি—ভেঙেচুরে পড়েছিল। দশ-আনির সেজোকর্তা সেই বাড়ি আগাগোড়া মেরামত করে দরজাজানলা পালটে ভদ্রলোকের বাসযোগ্য করলেন। ইচ্ছে ছিল, মাঝে মাঝে মহালে এসে ঐখানে থাকবেন। কিন্তু প্রথমবারেই ক'দিন থেকে চোঁচা দৌড় মারলেন। আর এ-মুখো হননি তারপর। ভূতের বাড়ি—প্রভুরা কিলবিল করছেন কুঠিবাড়ির অন্ধিসন্ধিতে। গল্প শুনে সরকারি ডাক্তার হেসে খুন। ভূত না ঘোড়ার ডিম মশাই। ডাক্তার হিসেবে আমার জানতে কিছু বাকি থাকে না। সেজোকর্তা বেএক্তিয়ার হয়ে থাকতেন—সে চোখে গরু-মানুষ পেত্নী-ভূতের তফাৎ বোধ থাকে না। আপনারাও যেমন!

দয়ালহরি আমার দিকে চেয়ে বলেন, তা সাহস থাকে তো বলুন। চাবি-ছোড়ান আমার কাছে—এক্ষুণি তালা খুলে দিচ্ছি। রঙিন মেজে ডিসটেমপার-করা দেয়াল সেজোকর্তার শখের আসবাবপত্তোর—যদ্দিন ইচ্ছে ভোগদখল করুন গে। কাছেই আমার বাসা—ছাড়া-বাড়ি দেখে মেয়েদের গা ছমছম করে। মানুষের আনাগোনা হলে তারা সোয়াস্তি পাবে।

বড় দারোগাও অভয় দেন, ঠিক আছে মশায়—ঐখানে উঠুন। লেখাপড়া শিখে কুসংস্কার থাকবে কেন? সারারাত্তির বরঞ্চ কনস্টেবল মোতায়েন করে দেবো ওখানে। বন্ধুলোক আপনি, সরকারি লোকও বটেন।

উঠলাম তো কুঠিবাড়ি। গোড়াতেই হরিশ জবাব দিল, কাজকর্ম সবই সে করবে, কিন্তু রাতে থাকবে না। সন্ধ্যাবেলা রান্নাবান্না সেরে চলে যাবে। যা গতিক, চাপাচাপি করতে গেলে চাপরাসীর চাকরিটাও ছেড়ে দেবে হয়তো।

যাকগে, বয়ে গেছে। দারোগাবাবু কথা রেখেছেন। রাত্রিবেলা এক কনস্টেবল সত্যিই পাহারা দিতে আসে। এক ঘুমের পরেও জানলা দিয়ে দেখেছি, বসে আছে লোকটা বারান্ডার উপর। মাস চারেক কেটে গেল। আরামেই আছি। সেজোকর্তা কি দেখেছিলেন জানি না—যাঁরাই হন, বাস উঠিয়ে সরে পড়েছেন। দয়ালহরি খুব দৃষ্টিমুখ দেন। ইদানীং কুঠিবাড়ির সামনে দিয়ে তাঁদের যাতায়াত। আমায় দেখলে বারান্ডায় উঠে আপ্যায়ন করেন, আছেন ভালো? বেশ বেশ—

স্ত্রীর নাম করে হরিশকে বলেন, বড় বউ কিজন্যে ডাকছে একবার তোকে। শিগ্গির শুনে আয়।

তার মানে রান্না-করা দু-একটা তরকারি কিম্বা পিঠাপায়স। হররোজ এই চলে। বিদেশি মানুষ একলা পড়ে থাকি—আর হরিশের যা রান্নার তরিবৎ! ক্ষিধের জ্বালায় সেই বস্তু গলাধঃকরণ করি। অভ্যাস না থাকলে কক্ষণো আপনারা তা পেটে রাখতে পারবেন না—নোংরা কান্ড করে বসবেন।

কুঠিবাড়ি আর দয়ালহরির বাসার মাঝে একখানা শুধু আউশ-ক্ষেত। বারান্ডায় দাঁড়িয়ে ওদের সব দেখা যায়।

আচ্ছা হরিশ, একটা মেয়ে দেখতে পাচ্ছি আজ ক'দিন—

অফিসে হরিশ চাপরাসী, কিন্তু অনেক দিন পাশাপাশি রাত কাটানোর দরুন বাড়িতে সময়বিশেষে সে সখাস্থানীয়।

উই যে ঢ্যাঙা এক হাড়গিলে ঘুরছে যেন—

হাড়গিলে কোথায় হুজুর—শহুরে মেয়ে, অতি শ্রীমন্ত।

গাঁয়ের তাবৎ খবর হরিশের নখদর্পণে। বলে, নায়েবের ভাগনী হল উনি। মা নেই—বাপের দ্বিতীয়পক্ষ। নানান গন্ডগোলে মামার বাড়ি এসে উঠেছে।

ফিক ফিক করে হেসে বলে, চালচলন অবিকল হুজুরের সঙ্গে মিলে যায়। পুকুরে নামবে না কিছুতে, ডুবে যাবার ভয়। তোলা-জলে চান করে। কে জল তুলে দেবে—তা দেখুন গে, সারা বেলা তো নিজেই জল বইছে কলস ভরে ভরে।

ঐ এক পরিচয়েই মেয়েটাকে আপন মনে হল। গ্রামের মধ্যে দু-জন আমরা স্বতন্ত্র নরনারী। ঘাটে গিয়ে গা ডুবিয়ে নাইতে পারিনে। অদৃষ্ট বশে জঙ্গুলে গ্রামে নির্বাসনে এসেছি, কিন্তু শহরের অভ্যাস নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। এখানকার একঘেয়ে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে আমি যেমন নিশ্বাস ছাড়ি, ঐ মেয়েটাও ছাড়ে তেমনি নিশ্চয়।

অথচ দেখিনি তাকে—আউশ-ক্ষেতের ওপারের একটুকু ছায়ামূর্তি ছাড়া। দশটায় অফিস চলে যাই—এক রবিবারে স্নানের জল বওয়া ব্যাপারটা চোখে দেখলাম। কত মেয়ে-বউ তো কুঠির পুকুরের জল নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এত দূর থেকে এক নজরেই মালুম হল, ঐ মেয়েটা আলাদা। কলসি কাঁখে ধরবার কায়দাও জানে না—অর্ধেক জল ছলকে পড়ে শাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে, সাবরেজিস্ট্রার হাকিম কুঠিবাড়ির বারান্ডায় দাঁড়িয়ে নজর হানছে। অন্য মেয়ে-বউ যেমন করে—কেউ আধ হাত ঘোমটা তুলে দেয়, কেউ বা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলতে চলতে হোঁচট খায়, কোন লজ্জাবতী মাঠ-পগার পেরিয়ে শজারুর মতো চোঁচা দৌড় মারে (শজারু বললাম এই জন্যে যে পায়ের তোড়া ঝুনঝুন করে দৌড়ানোর সময়)—আর এ মেয়ে সোজা একবার আমার দিকে তাকিয়ে যেমন যাচ্ছিল ধীরে ধীরে তেমনি চলে গেল।

অঘ্রানে খানাডোবায় পাট-পচানো জল কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে। যথারীতি কুইনাইন সেবন সত্ত্বেও হাড় কাঁপিয়ে একদিন জ্বর এলো। বিছানা ছেড়ে উঠবার তাগত নেই। রেজেস্ট্রি-অফিসের কাজ এক রকম বন্ধ—চাপরাসী হরিশকে তবু গিয়ে হাজরে দিতে হয়। দুপুরবেলাটা নিঃসঙ্গ লাগে। মা কবে মারা গেছেন, তাঁর কথা মনে আসে। শহরের বন্ধুবান্ধবদের কথা ভাবি। আর ভাবি দয়ালহরির ভাগনীটাকে। জ্বর কম থাকলে মাঝে মাঝে জানলায় বসি। যদি সে কুঠির পুকুরে জল নিতে যায়, কিম্বা দয়ালহরির স্ত্রী বার্লি রেঁধে পাঠিয়ে দেন তার হাত দিয়ে।

বার্লি নিয়ে নয়—শুধু হাতে সে এলো! মাথা কামড়াচ্ছিল, দু-আঙুলে রগ টিপে ধরে ছটফট করছিলাম। হঠাৎ দেখি, শিয়রের পাশে কখন এসে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মেমের মতো ফরসা চেহারা—আপনার আমার ঘরে এমনটা কদাচিৎ দেখা যায়। তাকিয়ে পড়তে জিজ্ঞাসা করল, বড্ড কষ্ট হচ্ছে?

না, না—বেশ তো আছি—

মিথ্যাও নয় জবাবটা। বলুন দিকি, কষ্ট থাকে অমন মেয়ে ঐভাবে সমবেদনা জানাবার পর? এতক্ষণের আর্তনাদ চক্ষের পলকে গানের মতন সুরেলা হয়ে উঠছে।

দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না—

চেয়ার দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু না বসে চকিতে বেরিয়ে চলে যায়, আজকে যাচ্ছি আমি। আবার আসব—কেমন?

দেখলাম, হরিশ এসে পড়েছে। তাই পালাল। কখন কি লাগে না লাগে—অফিস থেকে হরিশ সকাল সকাল এসেছে সেজন্য। মনিবের জন্য উদ্বেগটা কিছু কম হত যদি হতভাগার!

মাসখানেক ভোগান্তির পর জ্বরটা গেল। দুপুরের দিকে মেয়েটা রোজই আসে। কথাবার্তা বেশি নয়, মধুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু। এই গ্রাম্য অঞ্চলে সাধু-ফকিরেরা ঝাড়ফুক দিয়ে ব্যাধি সারান। সরকারি ডাক্তার যতই দেমাক করুন আমি জানি, দু-চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে মেয়েটাই আমার জ্বর সারিয়ে দিয়েছে।

জ্বর বন্ধ হবার পরে আর দেখা পাইনে। তখনো ঠাণ্ডা লাগানো বারণ—সন্ধ্যার পর দরজা-জানলা ভেজিয়ে ঘরে থাকতে হয়। এক কালে গানের চর্চা করতাম, গলার সুরের বিস্তর তারিফ পেয়েছি। দয়ালহরির বাড়ি থেকেই এক হারমোনিয়াম জুটিয়ে সঙ্গীত-সাধনায় লেগে গেলাম আবার। ডাক্তারের সব উপদেশ মেনে চলা যায় না—শেষটা দুয়োর-জানলাও খুলে দিয়েছি। কিন্তু গানে বনের পশু হয়তো বশ হয়, শহুরে মানুষ নৈব নৈব চ। ওরা বেশি কঠিন।

মরীয়া হয়ে এক চিঠি লিখলাম। সংক্ষিপ্ত সোজা কয়েকটা কথা। গান গেয়ে গেয়ে গলার নলি ছিঁড়ে গেল, তবু একবার দেখা পাই নে। অসুখের সময় রোজ আসতে—অসুখই তবে তো ভাল ছিল আমার পক্ষে। রোজ আমি দরজা খুলে ঠাণ্ডা লাগাই ভাগ্যবশে অসুখ করে যদি আবার।

হরিশ কি মনে করবে, তাকে দিয়ে হয় না। পথের এক রাখাল ছোঁড়াকে ডেকে নগদ চার পয়সা কবুল করলাম। নায়েব মশায়ের ক্ষেতে উই যে একজন বেগুন তুলছে, ওকে দিয়ে আয় তো কাগজখানা। কি বলে সেটা শুনে আসিস।

যেতাম, একথা বলা হল কেন তবে? এই ছোট ব্যাপার নিয়ে চিঠি লেখাও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আপনার পক্ষে।

নাম লিখেছে লাবণ্য। নাম পেয়ে গেলাম—এই বা কম কিসে? আছি চুপ-চাপ। স্রেফ বেকবুল গিয়ে বেগুন নিক্ষেপ হচ্ছিল—তবু অন্তত একটা দিনের নিশানা পাওয়া গেল? একটা দিন ছাড়া বাকি সমস্তই মায়া।

আবার চিঠি ক'দিন পরে।—না হয় গিয়েছি চার-পাঁচ দিন। বিদেশি মানুষ রোগে আইঢাই করছেন—কানে শুনে সবাই দেখতে যায়। ঘরের ভিতরে যাই নি তো! মামা-মামীর কানে এ সমস্ত না ওঠে—দোহাই আপনার!

চিঠি পড়ছি—চোখ তুলে দেখি, লেখিকাই
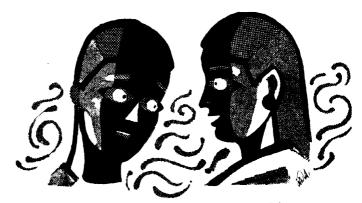
সাহস পেয়ে বলি—এত কঠিন আপনি ভাবতে পারিনি

ছোঁড়া এসে বলে, গোখরোসাপের মতো ফোঁস করে উঠল হুজুর। কোন দিন কোন-খানে যায় নি—মিছে কথা লিখেছেন নাকি আপনি। কাঁটাসুদ্ধ বেগুন ছুঁড়ে মারতে গেল। ভয়ে ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।

আরও এক আনা বকসিস দিয়ে তাকে বিদায় করলাম গোখরোসাপের মুখ থেকে বেঁচে এসেছে বলে। এসো নি তুমি—মিথ্যে কথা? বেশ, তাই মেনে নিলাম। আমারই চোখের ভুল, দিনের পর দিন চোখ ভুল দেখেছে। তোমার মুখে হেন বাক্য—কেউ নেই তবে আমার বিশ্বভুবনে। সেই ভালো! আমার কেউ নেই।

একটু আধটু অফিসে যাচ্ছি এখন, সকাল-সকাল ফিরে আসি। এসে দেখি, ঘরের মেজের উপর আঁটা খাম। জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

লিখেছে—রাগের বশে ছোঁড়াটাকে যা বলেছি পুরোপুরি ঠিক নয়। একশ-পাঁচ জ্বর শুনে গিয়েছিলাম একদিন। বাইরে থেকে এক নজর উঁকি দিয়ে আসি। রোজ

অদূরে কৃষ্ণপক্ষ ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। হাসছে মুচকি মুচকি।

জিজ্ঞাসা করলাম, এত খেলানো হচ্ছে কেন?

মজা করি।

সাহস পেয়ে বলি, এখন মোটে আসেন না। একা-একা বড্ড কষ্ট হয় আমার। এত কঠিন আপনি, ভাবতে পারি নি।

খিলখিল করে হাসে, আপনি-আপনি করেন—মনে হচ্ছে কত বড় দরের মানুষ যেন আমি!

অপরূপা ইতিমধ্যে এমন অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে—হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়ে গেলাম।

বেশ, তুমি বললে যদি আপদ চোকে তো তাই।

দিন কতক তার পরে ভারি মজা চলল। নিরিবিলি থাকলেই সে চলে আসে। নানান ছলছুতোয় আমিও হরিশকে বাইরে বাইরে রাখি। এমন হল, সন্ধ্যের পর সবে একটু প্যাঁ-পোঁ আওয়াজ উঠেছে—

দেখেছি গো, দেখতে পেয়েছি। আমার

চোখে লুকিয়ে থাকবে এত ক্ষমতা নেই তোমার লাবণ্য। এসো—খাটের উপর ভাল হয়ে বসে গান শোনো।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল আলাদা একজন কালো-রঙের, থুড়ি, একটুখানি চাপা-রঙের মেয়ে। আর ঝকমকে সেই লাবণ্য ফুড়ুৎ করে কোন ফাঁকে সরে পড়েছে। কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি, কে আপনি?

হকচকিয়ে যায় সে। কণ্ঠস্বর কাঁপছে, কথা আটকে আটকে যায়।

কেউ নই, কেউ নই। গান হচ্ছে শুনে একটু এসে দাঁড়িয়েছিলাম। ডাকলেন, তাই ভিতরে এসেছি। পথ ছাড়ুন, চলে যাচ্ছি।

সন্ধ্যাটা মনোরম হয়ে উঠেছিল, মাটি করে দিল। আচ্ছন্নের মতো মেয়েটা চলে যাচ্ছে—তবু মায়াদয়া হয় না, যাচ্ছেতাই গালমন্দ করছি। চরবৃত্তি করতে এসেছিলেন—পরিচয় দিয়ে যেতে হবে, কে আপনি? কে পাঠিয়েছে আপনাকে?

অদৃশ্য হয়ে গেল ঝুপসি-ঝুপসি গাছ-পালার আড়ালে। রাত্রিবেলা পিছনে ছুটে গিয়ে ধরব, এত সাহস নেই শহুরে ছেলের। যাই হোক, আর দেরি করা ঠিক নয়—বদনাম রটে যেতে কতক্ষণ? নিশ্চয় কারো নজরে পড়ে গেছে অন্ততপক্ষে যে মেয়েটা ঐ পালিয়ে গেল। যা থাকে কপালে—দয়ালহরির কাছে পরদিন কথা পেড়ে ফেললাম।—আপনার ভাগনীর সংগে যদি ইয়ে হয়—নিতান্ত অযোগ্য আমি, তবু যদি দয়া করে—

আপনি—তুমি বাবা পায়ে ঠাঁই দেবে লাবণ্যকে? যার মা নেই তার কিছুই নেই। অনেক কষ্ট পেয়েছে এই বয়সে। ও-মেয়ের যে এত ভাগ্য—

আনন্দে দয়ালহরি কেঁদে ফেললেন। কেল্লা ফতে—আবার কি! ক-দিন পরেই লাবণ্য তুমি একেবারে আমার। শোনো, শোনো—ও লাবণ্য, খবর রাখো?

দুষ্টুমি-ভরা চোখে চেয়ে সে বলে, মামী কিন্তু রেগে আগুন—কি করে জানল রে তোকে হতভাগা মেয়ে? যাতায়াত চলে বুঝি—প্রেম করে বেড়াস? একছুটে পালিয়ে এসেছি—ধরতে পারলে মামী দিত দেখিয়ে। কই, গানটান হবে না আজকে?

সত্যি হাঁপাচ্ছে। আর ঐ ভুবনমোহন হাসি। ক্ষেপে গেলাম যেন। ধরতে পারলে—মামী কেন, আমিও দিই দেখিয়ে মিথ্যে বলে খামোকা এই ভয় দেখানোর জন্য।

পালাচ্ছে, আমিও পিছনে ছুটি। ভয়-টয় গিয়ে অকস্মাৎ বিষম বীরপুরুষ হয়েছি। থমকে দাঁড়াল সে হঠাৎ একবার। খিলখিল হাসি। ধরুন দিকি কত ক্ষমতা। সে আর পারতে হয় না। ধরুন—ধরুন—

একেবারে কাছে গিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। শুধু হাত ফিরে এলো, কারো গায়ে ঠেকলো না তো! একটুকু সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারি স্ফূর্তি আমায় বেকুব বানিয়ে দিয়ে। জ্যোৎস্নার সংগে হাস্যধ্বনি মিশে চারিদিক তরঙ্গিত হচ্ছে। পাঁকাল মাছের মতন পিছলে পিছলে যাচ্ছে। তাই বা কোথায়—এত ছুটছি, তবু এতটুকুও স্পর্শ পাইনে।

আচ্ছা এইবারে—চু-উ-উ-উ—

পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা কপাটিখেলার যেমন দম ধরে ছোটে। নিঃসীম স্তব্ধতার মধ্যে ভ্রমরার একটানা গুঞ্জন।

খালি পায়ে মাটির ঢেলার ঠোক্কর লাগছে—তখন মালুম হল, আউশক্ষেতে চলে এসেছি। ধান কাটা শেষ হয়ে নতুন চাষ দিয়ে গেছে। জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে চারদিকে। ক্ষেতের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে সে ডাক দেয়, কই—পারলেন না তো!

ধরেছি—ধরলাম এইবারে বুঝি! উঁহু, ফসকে গেল, সামান্য একটুখানির জন্য। আলেয়া এমনি করে ভুলিয়ে নিয়ে যায় পথিককে—নিয়ে গিয়ে রক্ত শোষে।

রক্তে আগুন ধরে গেছে, ঠাণ্ডামাথায় ভাল-মন্দ ভাবি কখন? এসে পড়েছি দয়াল-হরির বাইরের উঠানে। আমি হেন হাকিম মানুষ রাত্রিবেলা এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছি—দেখতে পেলে লোকে ভাববে, নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তা সে যাই হোক, জিতেছি—জিতেছি—হাত ধরে ফেলেছি অবশেষে। সুকোমল হাতখানা ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলি, অসুখে কাবু হয়ে পড়েছি, কত কষ্ট আর আমায় দেবে লাবণ্য?

চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেন—বাড়ি এসে আবার মিষ্টি মিষ্টি বুলি! কি ভাবেন আমায়? খেলার পুতুল—যা ইচ্ছে করা যায় আমায় নিয়ে?

গর্জন করে উঠল সেই মেয়েটা চর সন্দেহে যাকে গালিগালাজ করেছিলাম। আর যার পিছন ধরে এতদূর চলে এলাম, চক্ষের পলকে সে জ্যোৎস্নার সংগে গলে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

দয়ালহরির ভাগ্নী লাবণ্য তবে তো এই। হাত ধরে লাবণ্যর মান ভাঙাতে আর একজন এখানে এনে পৌঁছে দিয়ে গেল। হাত ছাড়িয়ে নেবেই—আমি আরো শক্ত করে ধরি।

বিষম এক গোলমাল আছে এর ভিতরে। খুলে বলো, মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

কি জানে লাবণ্য, আর কি-ই বা বলবে! শহরের নিঃসংগ মানুষটার কষ্ট শুনে চুপি-সারে সে গিয়ে বাইরে দাঁড়াত। সে-ই আরো অবাক হয়ে গিয়েছে—মানুষটার পিছনে দুটো চোখ আছে নাকি? মুখ না ফিরিয়ে আমার খবর কেমন করে টের পায়? চিঠিতে লিখে পাঠায় আবার সেই কথা......

মামাকে দেখে লাবণ্য তাড়াতাড়ি সরে গেল, সমস্ত কথা শুনতে পেলাম না। যাকগে যাকগে, পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে। উল্লসিত চিৎকারে দয়ালহরি আহ্বান করলেন, এসেছ বাবাজী, এসো। থানায় বড়বাবু ছোটবাবুকে বললাম তোমার কথা। সবাই ধন্য-ধন্য করছেন। এমন দরাজ দিল পাপ-কলিযুগে কেউ কানে শোনে নি।

আর একটা দিন দেখেছিলাম তাকে। বিরাটগড় থেকে বদলি হয়েছি, পরের দিন চলে যাব। কুঠিবাড়িতে সেই আমাদের শেষ-রাত্রি। আমি আর লাবণ্য—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যেন এক আমরা। ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। জানলা দিয়ে পশ্চিম আকাশের চাঁদ দেখা যায়। জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে এসে পড়েছে। চাঁপাফুল ফুটেছে কোথায়, ফুলের গন্ধে ঘর আমোদ করছে।

খাটের বাজু ধরে আমাদের দু-জনের দিকে চেয়ে সে মুচকি মুচকি হাসছে। দেখা পেয়ে বড় আনন্দ হল।

এত সুখ তুমি এনে দিয়েছ, লাবণ্যকে তোমার জন্য পেলাম। যেখানেই থাকি, সারা জীবন তোমায় মনে করব।

হাসতে হাসতে সে বলে, বড় যে তুমি-তুমি করছ—কত বয়স আমার জানো?

অনেক ছোট নিশ্চয় আমায় চেয়ে—

অনেক বড়। কুঠিয়াল গ্রাণ্ট আমার বাবা। নয়নতারাকে ধরে আনা নিয়ে হরিশ মুখুজ্জের কাগজে খুব হৈ-চৈ হয়েছিল—সেই নয়নতারার গর্ভের মেয়ে আমি। কত বয়স তাহলে হিসাব করে দেখ।

বললাম, মেয়েরা বয়স কমায়—তোমার রুচি উল্টো। কিন্তু 'আপনি' বললে তুমিই তো হেসে উঠেছিলে আর একদিন।

হেসেছিলাম বুঝি! তাই হবে। মন খারাপ লাগে এক একসময়—ভালবাসার কথা শুনতে লোভ হয়, সাধ হয় মানুষের ছোঁয়া পেতে।

গভীর এক নিশ্বাস ফেলল। কণ্ঠ ছল-ছলিয়ে ওঠে। বলল, ধোঁয়ার কুণ্ডলী যে! তোমাদের চোখে ধোঁয়াটা রঙিন লাগে ভাগ্যিস! তোমার লাবণ্যর বকলমে ফাঁকি দিয়ে অনেক ভালবাসার কথা শুনে নিয়েছি। হি-হি-হি—

চলে গেল। হাসি ছাড়া কান্না দেখাবে না বুঝি—পাগলের মতন হাসতে হাসতে চলে গেল তাই।

পূজা মাঙ্গলিক
সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ। সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,—শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিপক্ষকে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, সন্তানকে সৎদৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,—আর প্রিয়পরিজনকে পূজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।
দানের আনন্দ একান্ত ভাবেই আপনার, আর আপনাকে সেবা করবার আনন্দ আমাদের।
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড।
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

রবীন্দ্রনাথ ও এশিয়ার পুনর্জন্ম

কালিদাস নাগ
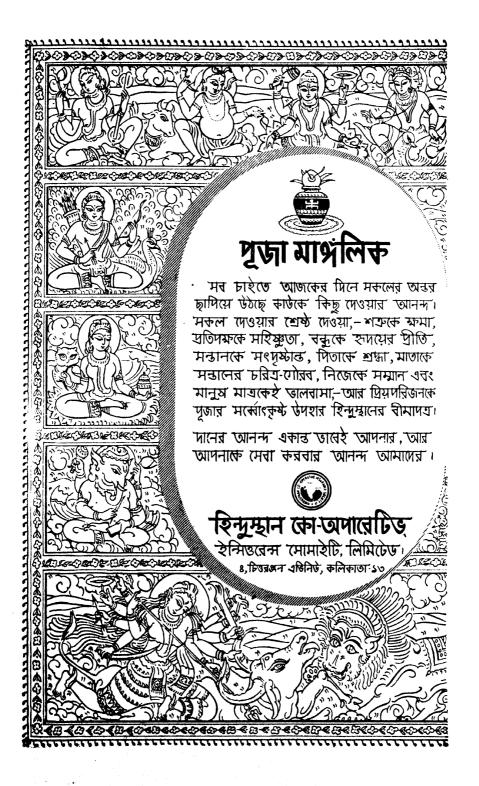
১৯২৪ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। পিকিং সাংহাই হাংফাউ নানকিং প্রভৃতি বড় বড় চীনা শহরে শহরে মানুষের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপের সুযোগ মিলেছিল এবং তখনই অনুভব করেছিলাম যে, তথাকথিত অসাধারণ নেতারা সাধারণ মানুষকে বশ করতে পারেন নি। এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল যখনই শহর থেকে বহু দূরে গ্রামের ভিতর নরনারীর সঙ্গে মিশেছি। তাদের ভাবনা-চিন্তা, অভাব-অভিযোগের সঙ্গে প্রাচীনপন্থী নেতাদের সংযোগ কমই ছিল। তাই সর্বত্র প্রগতিশীল নেতাদের কাছে গণ-সংযোগ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে (১৯১৪-১৯৪৬) এই গণসংযোগের বিকাশ অপূর্ব আকারে দেখা দিয়েছে যেমন ভারতে তেমন চীনে। এই দুই বিরাট জাতির সঙ্গে আজ মৈত্রীবন্ধন হচ্ছে। এশিয়ার নবজাগরণ বিশ্বের ইতিহাসে যেন এক নূতন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে, বিশেষভাবে পূর্ব এশিয়ায়।

১৯৫৪ সালের গোড়ায় আবার নিমন্ত্রণ এল যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপান থেকে। প্রায় ত্রিশ বছর পরে আবার ব্রহ্মদেশ, মালয়, দক্ষিণ-চীন হয়ে জাপানে এলাম। সেখানেও সাধারণ মানুষের 'মানুষ' হয়ে বেঁচে থাকবার কঠিনতম সমস্যা দেখা দিয়েছে, প্রতি পদে অনুভব করেছি। আর মনে পড়েছে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যে সতর্কবাণী জাপানীদের শুনিয়েছিলেন, সেটি উপেক্ষার ফলে কি ভীষণ শাস্তি জাপান পেয়েছে। জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে একে অন্যের উপর রাজাধিরাজ হয়ে বসবে—তার মধ্যে আবার শাদা ও কালো, খৃষ্টান ও অ-খৃষ্টান এমনি কত ভেদাভেদ ও কূটনীতির ঘাত-প্রতিঘাত ও তার বিষময় পরিণতি সবই ঋষি রবীন্দ্রনাথ দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং 'বলাকা' কাব্যে রূপদান করেছিলেন। ১৯১৬ সালে আবার ইংরাজী গদ্যে সেই গভীর তত্ত্ব তাঁর 'Nationalism' গ্রন্থে জুড়ে প্রথমবার জাপানে এসেছিলেন; কিন্তু বিজয়োন্মত্ত জাপান সেদিন তাঁর বাণী শোনেনি—ভারতের কবিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বিজিত জাপানের প্রবীণ নেতারা সেইজন্য আজ অনুশোচনা করছেন দেখে এলাম। সে যুগের জাপানে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ১৯১৬ ও ১৯২৪ সালে দেখেছিলেন, তাঁরা অনেকেই চাইছেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের যোগ দৃঢ়তর হোক। মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের

টাইকান শিষ্য ও লেখক

পর জাপানী কবি Yone Noguchi যখন চীনের প্রতি জাপানের আক্রমণের সাফাই গেয়েছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ যে জবাব দিয়েছিলেন সেটি পড়ে তাঁরই গান মনে পড়েছিল : 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি'। এবার টোকিওতে গিয়ে দেখলাম Noguchi গেছেন পরলোকে আর জাপানী সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন যেন ধুলায় লুটিয়েছে! আবার বলাকার সেই 'বিচার' কবিতাটি মনে পড়ে যায়—'মার্জনা তোমার গর্জমান বজ্রাগ্নি শিখায়'।

জাপানী নাট্যশাস্ত্রে একটা বড় বিভাগ 'মুখোশ পরে অভিনয়' (Mask play)! জাপানী শিল্পী মুখোশ গড়তে ও মুখোশ পরে অভিনয় করতে পাকা ওস্তাদ। এ অভিনয় শুধু রঙ্গমঞ্চে নয়, পথে-ঘাটে সাধারণ নর-নারীর মধ্যে এবার অনেক দেখলাম। প্রায় নব্বুই মিলিয়ন মানুষ যুদ্ধে সব খুইয়ে—তিনটি দ্বীপের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে আছে। তার পাহাড় জঙ্গল বাদ দিলে যেটুকু চাষের জমি থাকে তার উপর নির্ভর করে এত মানুষে বাঁচতেই পারে না। সেইটুকু জমির বুকে আবার 'অধিকর্তা' আমেরিকা আটশ'টি যুদ্ধকেন্দ্র (Military Base) অর্থাৎ জলসৈন্য, স্থলসৈন্য ও আকাশ বাহিনীদের 'ঘাঁটি' বিরাট আয়তনে গড়ে তুলেছে দেখতে পেলাম। এ ধরনের জুলুম কতকাল চলবে জানি না। সাধারণ জাপানী নর-নারী তাদের প্রতিবেশী বিরাট চীনের হাটে বাজারে ব্যবসা ক'রে বাঁচতে চায়; কিন্তু আমেরিকার নিষেধ সুস্পষ্ট। অথচ, জাপানকে তো বাঁচতে হবে? তাই আমেরিকার মারণাস্ত্রের (Munition) ব্যবসায়ে মজুরী ক'রে কত দিন বাঁচা যায়, আর ভেঙে পড়া ভিত কতটুকু গড়ে তোলা যায় সেটা জাপানীরা দেখছে। চার বার জাপান ঘুরেছি, কিন্তু জাপানী নর-নারীকে এত কম খেয়ে এত খাটতে আগে কখনো দেখিনি। অথচ নিঃশব্দে সমানে তারা কাজ ক'রে চলেছে। নাগাসাকি ও হিরোসিমার লক্ষ লক্ষ নরনারী বৃদ্ধ শিশুর রক্ত মাংস আণবিক বোমায় বাষ্পীভূত হয়ে গেছে। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; তবু আর একদল মানুষ খানিকটা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রেতাত্মাদের আর্তনাদ আকাশে বাতাসে যেন এখনো হঠাৎ শুনে শরীর শিউরে ওঠে। তার মধ্যেই আবার হোটেলে হোটেলে মার্কিন সৈনিকদের সঙ্গে ডলার-প্রার্থিনী তরুণীদের নৃত্য যেন আরও ভীষণ অসহ্য মনে হয়েছে। মার্কিন-মোঙ্গল বর্ণ সংকরের সমস্যা জাপানে উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছে। অবশ্য অনাথ-আশ্রম ও গীর্জার সংখ্যা মার্কিন মিশনের টাকায় খুবই বেড়ে চলেছে—এত বেড়েছে যে, সেকালের জাপানকে যেন খুঁজে পাই না। স্কুল-কলেজ কারখানার জাপানী তরুণীদের জাপানী পোশাকে প্রায় দেখাই যায় না। তাদের গায়ে মার্কিনী

সুদূরের পিয়াসী

ব্লক ও মুদ্রণ ঃ বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শিল্পী তার্তোহিকো সুগাত

জাপানী বাগানে শিল্পগোষ্ঠী

ঢংয়ের পোশাক, হাতে হাতে মার্কিনী বাই-বেল। যুদ্ধোত্তর জাপান, পরাজিত জাপানী সত্যিই কি বদলে যাবে?

হয়তো এ সব দুরূহ সমস্যা এড়াবার জন্যে জাপানের প্রবীণতম চিত্রশিল্পী ইকো-ইয়ামা টাইকান (Yokoyma Tikan) তাঁর টোকিও স্টুডিও ছেড়ে দিয়ে ফুজি (Fuji) পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। ১৯২৪ সালে ইনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর চিত্রশালায় যেভাবে সম্বর্ধনা করেছিলেন সব মনে আছে; জাপানের অপূর্ব পৌরাণিক নৃত্যকলা সেখানে তিনিই আমাদের প্রথমে দেখিয়ে-ছিলেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল আর আমাকে নিয়ে কত চিত্রশালায় কত শিল্পী-সাহিত্যিকের আখড়ায় টাইকান আমাদের নিয়ে গেছেন। জাপান ছেড়ে আসবার সময় প্রত্যেকে আত্মীয়ের মতো কত সুন্দর সুন্দর জিনিস উপহার দিয়েছেন। রবীন্দ্র-নাথ নদীর কবি—একথা আমার কাছে শুনে তাঁর একখানি অমর নদী-চিত্র (Scroll) পাটে পাটে খুলে আমাদের দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিলেন। সে ছবি আজও শান্তিনিকেতনে সুরক্ষিত হয়ে আছে। সেই মনীষী টাইকান আজকাল প্রায় ছবি আঁকেন না। শুধু তুষার ধবলা ফুজি-ইয়ামার দিকে চেয়ে চিরন্তন জাপানের পার্বতী-প্রতিমার ছন্দকে সাদা কালো রেখায় মাঝে মাঝে রূপ দেন। টাইকান তাঁর যৌবনকালে বাংলার স্বদেশী যুগে আশ্রয় নিয়েছিলেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র-নাথের বাড়িতে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির দেয়ালে সেকালে দেখেছি টাইকানের আঁকা রাসলীলা। রুশ-জাপানের যুদ্ধে বিজয়ী জাপান ভারত-স্বাধীনতার পূজারীদের কি-ভাবে মাতিয়েছিল তার অনেক প্রমাণ আমাদের পত্রিকাদিতে ছড়িয়ে আছে। টাইকানকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন প্রসিদ্ধ শিল্পরসিক Okakura; তিনি কলকাতায় বসে 'Ideals of the East' গ্রন্থখানি রচনা করেন এবং তার মধ্যে বেদান্ত-সূত্রের মতই লিখেছিলেন—Asia is One —এশিয়ার মানুষ আমরা এক। ভগ্নী নিবেদিতার মতই ওকাকুরাও বাংলার শিল্পিসঙ্ঘের সমজদার ও সহায়ক ছিলেন। নন্দলালের প্রসিদ্ধ 'সতী' চিত্রখানি জাপানে অপূর্ব বর্ণবিন্যাসে ছাপা হয়েছিল। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের—মৃত্যুকাল (১৯০২) পর্যন্ত—গভীর বন্ধুত্ব ছিল সে-কথা আমি উদ্বোধন পত্রিকায় (ভারত-শিল্পে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায়) লিখেছি। বাঙ্গালী গর্বের সঙ্গে মনে করবে যে, ষাট বছরেরও আগে স্বামী বিবেকানন্দ Parliament of Religionএ যোগ দেওয়ার পথে (১৮৯৩) জাপানে নেমেছিলেন এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে জাপানীর মৈত্রী-বন্ধনের সূত্রপাত করেছিলেন। শিল্পী গগনেন্দ্র-নাথ ঠাকুর প্রথমে জাপানী রীতিতে ছবি এঁকে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'র সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করেন। তখন থেকে দেখেছি নন্দলাল, মুকুল দে প্রভৃতি অনেকে জাপানী শিল্পি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে তুলেছেন। তার সচিত্র ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। তবু সেই যুগের বাঙ্গালী বলে এবার জাপানে গিয়েও জাপানী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের স্নেহ-পরশ পেয়ে ধন্য হয়েছি। একজন টাইকান শিষ্য শোনালেন যে, তাঁর গুরুজী আশী বছর পার করে একটি আত্মজীবনী লিখে ফেলেছেন এবং তার মধ্যে যেমন কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ছবি আছে তেমনি তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের কথা

ও বাঙলাদেশের আতিথ্যের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেই বইখানির বাঙলা অনুবাদ হওয়া উচিত। ফুজি (Fuji) পাহাড়ের কোলে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন ছিলেন Hakone হ্রদের কূলে; এবার সেখানেও তাঁর স্মৃতিচিহ্ন কিছু দেখে এলাম আর মনে পড়ল জাপানী তরুণীরা রেশমের রুমাল এনে কবির পদপ্রান্তে বসত—কবি ছোট্ট কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতা বাঙলা হরফে লিখে দিতেন—তারা ধন্য হ'ত। আজও ঘরে ঘরে সেইসব কবিতা-কণা সযত্নে রাখা আছে। ইংরেজী Fireflies বা বাঙলা "স্ফুলিঙ্গ" গ্রন্থে সেই সব কাব্য-রেণু ছড়ান আছে—

"সে লড়াই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই
যে যুদ্ধে ভাইকে মারে ভাই"

এতবড় ভবিষ্যৎ-বাণী চীন-জাপান যুদ্ধের আগেই করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯২৪ সালে কবিগুরুর সঙ্গে জাপানে নামবামাত্র যে মেয়েটি—শ্রীমতী টোমিকো ওয়াদা (Wada)—আমাদের হাত ধরে সারা জাপান দেখিয়েছিলেন তিনি আজ Dr. Tomi Kora M.P.—মনস্তাত্ত্বিক Dr. Korar সহধর্মিণী এবং জাপানী পার্লামেণ্টের সদস্যা; তাঁকে এবার জাপান রবীন্দ্র-পরিষদের (Nippon Tagore Society) সভানেত্রী করে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে এলাম যেমন ইন্দোনেশিয়ায় Jakarta নগরে, মালয়ের Singapore ও বর্মার Rangoon শহরেও Tagore Society গড়ে উঠেছে। তাঁদের ধারাবাহিক বিবরণী প্রকাশের ইচ্ছা রইল। এক যুগ হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারিয়েছি অথচ তাঁর অমর রচনা ও শিল্পাদির প্রচার ভারতের বাইরে হয়নি—এ আক্ষেপ বহুবার মনে জেগেছে। বিশেষ এবার Atomic-Hydrogen bomb বিধ্বস্ত জাপানে এসে। আমাদের মত দু'একজনের ক্ষুদ্র-শক্তিতে যতটুকু করা সম্ভব করেছি। কিন্তু আমাদের দিন ত শেষ হয়ে গেল। যে Nationalism গ্রন্থ জাপানী সেকালে বর্জন করেছিল, হয়ত আজ সেই বই নূতন চোখে তারা পড়বে—তাদের কাছে পাঠাতে হবে শিক্ষকদল যাঁরা রবীন্দ্র-ভাবধারার উপযুক্ত ভাষ্যকার। জাপানী PEN ক্লাবের সদস্যরা যেদিন আমায় সাদরে নিমন্ত্রণ করেন সেদিন Chuokoron পত্রিকার ভোজসভায় এ আলোচনা হল। বিচক্ষণ সাহিত্যিক Abi আবে-মহোদয় সুদীর্ঘ প্রবন্ধে সে আলোচনা করেছেন এবং যুদ্ধোত্তর জাপানের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক যোগের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন। তুমুল উৎসাহে এখন জাপানীরা মার্কিনী ইংরেজী ভাষা শিখতে লেগেছে তাই ভারতীয় সাহিত্যিক ও শিল্পীদের কাজ এই মিলনক্ষেত্রে কিছু সহজ হয়ে উঠবে। Asahi ও Mainichi প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা প্রত্যহ ১০।১২ কোটি কপি ছেপে বিলি করে সুতরাং এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম প্রচার-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে জাপান একথা নব্য ভারতের নেতা ও সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিই। কূটনৈতিক চক্রান্তে জাপান চীনের সঙ্গে ব্যর্থ-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও অর্থনৈতিক কারণে আবার যখন বিরাট চীনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে নামবে তখন ৬০ কোটি চৈনিকদের সঙ্গে প্রায় ১০ কোটি জাপানী নূতন এশিয়া গড়ে তুলতে লেগে যাবে—সে কথা কি ভুলতে পারে ৪০ কোটি ভারতবাসী?

ভারতের সচিত্র পত্রিকা ও বার্ষিকীতে (Annual) অনেক ভাল ছবি ছাপা হয় এবং জাপানে সেগুলি পৌঁছে দিলে জাপান-ভারতের মৈত্রী বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে উঠবে। ছবির ভাষায় ওস্তাদ চীনজাপানের মানুষ তাই রূপরেখার ইঙ্গিতে ভারত তাদের সঙ্গে আলাপ সহজেই করতে পারে। এবিষয়ে আলাপ হল এবার প্রধান শিল্পী-সাহিত্যিক Mushakoji-র সঙ্গে। তাঁর ৭০ বর্ষ পূর্তির আয়োজন চলছে এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মতন প্রথম শেষ বয়সে সাহিত্য রচনা থামিয়ে ছবি আঁকা শুরু করেন। Sendai বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁর চিত্র-প্রদর্শনীতে আমায় নিয়ে যান এবং তাঁর ফুলের ছবিগুলির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি দেখে শিল্পী তাঁর একখানি মূল্যবান ছবি আমাকে উপহার দিলেন। ধন্যবাদ দিতে তাঁর বাড়িতে গেলাম এবং অবাক হয়ে দেখি ইন্দো-পারসিক প্রাচীন চিত্রাদির সঙ্গে ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরবাড়ির একখানি স্কেচ্-বই যাতে অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবি রয়েছে। তাঁদের কোন জাপানী বন্ধুদের খাতায় দুই শিল্পী ভ্রাতা এঁকেছিলেন, সেই খাতা শিল্পী Mushakoji সযত্নে রেখেছেন।

জাপান ছাড়বার আগে শিল্পাচার্য টাই-কানের (Taikan) শিষ্য আমাকে নিয়ে গেলেন Osaka-র উপকণ্ঠে একটি স্টুডিওতে, এখানে শিক্ষা পেতে আসেন সুদক্ষ শিল্পীরা। সরু গলি পার হয়ে একটি কাঠের বাড়ী—নীচে থেকে বোঝা যায় না দোতালার একখানি ঘরে গড়ে তুলেছেন শিল্পের সাধনপীঠ। রূপদক্ষ Tatehiko Sugat অশীতিপর বৃদ্ধ কিন্ত রেখা ও রঙের যাদুকর। নীচু একটি চৌকি সামনে নিয়ে আঁকতে বসেন আর দুদিকে সরু মোটা কত রকমের তুলি। প্রত্যেক তুলির টানে এক এক নতুন ছবির ভাষা ফুটে ওঠে প্রাচীন-পন্থী এই ওস্তাদ শিল্পীর কাছে—এসব গল্প শুনে ভুলেই গিয়েছিলাম যে কিছু দূরেই গর্জে উঠছে ওসাকা শহরের দুরন্ত কারখানা—দিনরাত অবিশ্রাম কাজ চলছে আমেরিকার টাকার তাগিদে। হয়ত ডলারের চাপে জাপানের শিল্পী-প্রাণটা নষ্ট হয়ে যাবে; আবার পরীক্ষাটা কাটিয়ে উঠে প্রমাণ দেবে জাপানী সুন্দরের পূজারী। এই আশা শিল্পাচার্যের কাছে জানিয়ে এলাম। পরের দিন—ঠিক Kobe থেকে জাহাজে ভাস্‌বার আগে দেখি একটি কাগজের মোড়কে আমার নাম লেখা। খুলে দেখি তাতে হিকো তাঁর একটি অপূর্ব স্বপ্ন-চিত্র উপহার পাঠিয়েছেন। যাঁদিক একটি গাছ হাওয়ার ছন্দে দুলছে—তার নীচে বাঁশের কুঁড়ে ঘর, তার চালার নীচে বসে যেন এক শিল্পী চেয়ে আছেন এক বিরাট পর্বতশৃঙ্গের পানে আর সব ভরে আছে অসীম শূন্য—মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের অমর রাগিণী-চিত্র—

"আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী।"

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ সেকালে চালাঘরের দাওয়ায় বসে এমনি কত সুরের ছবি রচনা করে গেছেন। মুগ্ধ হয়ে আমরা সুরটা ধরতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার ছবিগুলি ধরতে পারে হয়ত চীনাজাপানী শিল্পী দল; সেকালে এসেছিলেন Kampo Arai টোকিও থেকে—আর রবি অস্তাচলে নামবার আগে এসেছিলেন JuPeon—তাঁকে শান্তিনিকেতনে আমি নিয়ে যাই—গুরুদেবের অপূর্ব আলেখ্য তিনি সেখানেই আঁকেন। দুই শিল্পীই আজ পরলোকে আর আমি—জাপানসাগর ও চীন-সমুদ্র পার হয়ে দেশে ফিরতে কেবলই তাঁদের কথা মনে পড়ছে—ভারতের সঙ্গে তাঁরা মিতালি করে গেছেন—তাদের উত্তর-সাধকরাও হয়ত প্রস্তুত হচ্ছেন আবার ভারতের দিকে আসতে যেমন ভারত থেকে ওদিকে গিয়েছিল কত শত সুন্দরের দূত! হয়ত এই কথাটাই চিরন্তন সত্য—দেশে দেশে সাধারণ মানুষের কোলাকুলি। আণবিক বোমার বিষবাষ্প—হয়ত দুঃস্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে মানুষের ইতিহাস থেকে—জয়ী হবে শাশ্বত সামগান—

"জয়ী প্রাণ চির-প্রাণ
জয়ী রে আনন্দ গান"

'ফাল্গুনী'র অন্ধ বাউল যে গান আমাদের শুনিয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা উপেক্ষা করে।

বড় ঘরের কথা

নিম্নোক্ত কাহিনীটি আমি শুনিতে পাইতাম কি না সন্দেহ যদি না সে-রাত্রে গ্রামের জমিদারবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ থাকিত। আমি গ্রামে নবাগত, কিন্তু জমিদার মহাশয় তাঁহার কন্যার বিবাহে গ্রাম-সুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, আমিও বাদ পড়ি নাই।

যিনি গল্প বলিলেন তাঁহার নাম ভুবন বিশ্বাস। রোগা চিমসে চেহারার বৃদ্ধ, নস্য লইয়া সজল চকিত চক্ষে এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং অসংলগ্ন দুই-চারিটা কথা বলিয়া চুপ করিয়া যান। পূর্বে তিনি পাশের কোনও এক জমিদারীর সরকার কিম্বা গোমস্তা ছিলেন। কয়েক বছর হইল অবসর লইয়াছেন। আমি গ্রামের বারোয়ারী গ্রন্থাগারের সমাবর্তন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি, দু'একদিন থাকিয়া চলিয়া যাইব। অন্যান্য গ্রামবাসীর মত ভুবনবাবুর সহিতও সামান্য পরিচয় হইয়াছিল।

জমিদার বাড়ীর বিস্তীর্ণ বারান্দায় নিমন্ত্রিতদের জন্য শতরঞ্চি পাতা হইয়াছিল। অতিথিদের মধ্যে একদল অন্দরের উঠানে খাইতে বসিয়াছেন। আমরা দ্বিতীয় ব্যাচ্ বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছি। চারিদিকে গ্যাস বাতি ও ডে-লাইট জ্বলিতেছে; লোকজনের ছুটাছুটি হাঁকডাক। মাঝে মাঝে শানাই তান ধরিতেছে। রাত্রি আন্দাজ ন'টা।

আমি এবং ভুবনবাবু বারান্দার এক কোণে বসিয়াছিলাম। এদিকটা একটু নিরিবিলি। ভুবনবাবু দুই একটা অসংলগ্ন কথা বলিতেছিলেন। এই সময় ফটকের সামনে একটি জুড়ি গাড়ী আসিয়া থামিল। ভুবনবাবু একবার গলা বাড়াইয়া দেখিয়া চট করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কারা এল?'

ভুবনবাবু ঘাড় ফিরাইলেন না, ঠোঁটের কোণ হইতে তেরছাভাবে বলিলেন,—'রামপুকুরের জমিদার আর তার মা।'

গৃহস্বামী ছুটিয়া আসিয়া নবাগতদের অভ্যর্থনা করিলেন। জুড়ি হইতে নামিলেন একটি বিধবা মহিলা এবং সিল্কের পাঞ্জাবী পরা এক যুবক। মহিলাটির বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ, এককালে রূপসী ছিলেন, রাশভারী চেহারা, মুখে আভিজাত্যের দৃঢ়তা পরিস্ফুট। পুত্রটি কিন্তু অন্য প্রকার। চেহারা এমন কিছু কুদর্শন নয় কিন্তু মুখে আভিজাত্যের ছাপ নাই। সাজ-পোশাকের

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মহার্ঘতা এবং মুখের উন্নাসিক ঔদ্ধত্য দিয়া সহজাত কৌলীন্যের অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা আছে, কিন্তু সে-চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই।

গৃহস্বামী মাননীয় অতিথিদের লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ভুবনবাবু এবার ফিরিয়া বসিলেন, দীর্ঘ এক টিপ্ নস্য লইয়া সজলচক্ষে এদিক ওদিক চাহিলেন, তারপর চাপা তিক্ত স্বরে বলিলেন,—'বড় ঘরের বড় কথা।'

এখানেই গল্পের সূত্রপাত। তারপর কয়েক কিস্তিতে ভাঙা ভাঙা ভাবে গল্পটি শুনিয়াছিলাম। ভুবনবাবু কয়েক বছর আগে পর্যন্ত রামপুকুর জমিদার বাড়ীতে সরকার ছিলেন; কি কারণে তাঁহার চাকরি যায় তাহা আমি জানিতে পারি নাই। তবে তিনি ভূতপূর্ব প্রভুগোষ্ঠীর উপর প্রসন্ন ছিলেন না তাহা তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গী হইতে অনুমান করিয়াছিলাম। কাহিনীর সব ঘটনা ভুবনবাবুর প্রত্যক্ষদৃষ্ট নয়, ময়না নাম্নী এক দাসীর কাছে তিনি অনেকখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তার উপর আমি খানিকটা রঙ চড়াইয়াছি। সুতরাং কাহিনীটি ষোল আনা নির্ভরযোগ্য মনে করিলে অন্যায় হইবে। রবীন্দ্রনাথের মানবীর মত ইহার অর্ধেক কল্পনা।

বর্তমান কালে বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর যে দুরবস্থা হইয়াছে, ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও ততটা হয় নাই। মারাত্মক রকম বদ্‌খেয়ালী না হইলে বেশ সম্ভ্রান্তভাবে চলিয়া যাইত, দোল দুর্গোৎসব বারো মাসে তেরো পার্বণ করিয়াও স্বচ্ছলতার অভাব ঘটিত না। রামপুকুরের জমিদার আদিত্যবাবু ছিলেন শুদ্ধ-সংযত চরিত্রের মানুষ, তাই জমিদারীটি মধ্যমাকৃতি হইলেও তিনি প্রজাদের উপর অযথা উৎপীড়ন না করিয়াও মর্যাদার সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিয়াছিলেন। ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিপত্নীক হন এবং একমাত্র কন্যা প্রভাবতীর মুখ চাহিয়া পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ লাভের ওজুহাতেও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই।

মাতার মৃত্যুকালে প্রভাবতীর বয়স ছিল নয় বছর। এ বয়সের মেয়েরা সাধারণত বেড়া-বিনুনি বাঁধিয়া খেলা ঘরে পুতুল খেলায় মত্ত থাকে; কিন্তু প্রভাবতীর চরিত্র এই বয়সেই ছেলেমানুষী বর্জন করিয়া দৃঢ়ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাকে লালন করিবার প্রয়োজন হয় নাই, সেই বরঞ্চ পরিবারস্থ সকলকে শাসন তাড়ন করিয়া বশীভূত করিয়াছিল। জমিদার পরিবারের অনিবার্য বিধবা পিসি-মাসিরা তাহাকে ভয়

করিয়া চলিতেন, ঝি-চাকর নির্বিচারে তাহার আদেশ পালন করিত।

আদিত্যবাবু সগর্ব স্নেহে ভাবিতেন, আমার একটা মেয়ে সাতটা ছেলের সমান। প্রভাবতীর ছেলেরাই হবে আমার বংশধর।

প্রভাবতীর বয়স যখন বারো বছর তখন আদিত্যবাবু তাহাকে জমিদারী সংক্রান্ত পরামর্শের আসরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখা গেল এদিকেও তাহার বুদ্ধির প্রাঞ্জলতা কাহারও অপেক্ষা কম নয়; নায়েব মোক্তার এই একফোঁটা মেয়ের বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। আদিত্যবাবুর মুখ স্নেহগর্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নায়েব মোহিনীবাবু গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন,—'মা আমাদের রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।'

তারপর হইতে যখনই বিষয় সংক্রান্ত সলা-পরামর্শের প্রয়োজন হইত, আদিত্যবাবু নায়েবকে বলিতেন,—'আমাকে আর কেন? প্রভাকে জিগ্যেস কর গিয়ে।'

নায়েব অন্দরমহলে প্রবেশ করিতেন, ডাক দিয়া বলিতেন,—'কোথায় গো মা লক্ষ্মী, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে যে।'

ঠাকুর ঘর হইতে হাসিমুখে বাড়াইয়া প্রভাবতী বলিত,—'কাকা! একটু বসতে হবে। ঠাকুরের প্রসাদ না পেয়ে যেতে পাবেন না।—ওরে ময়না, কাকার জন্যে আসন পেতে দে।'

ময়না প্রভাবতীর খাস চাকরানী, বয়স দুজনের প্রায় সমান। ময়না কার্পেটের আসন পাতিয়া দিত, নায়েব উপবেশন করিতেন। তারপর যথাসময় পূজা শেষ হইলে ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নবীনা প্রভুকন্যার সহিত মন্ত্রণা করিতে বসিতেন।

এইভাবে জমিদার পরিবারের বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক ক্রিয়া ঘড়ির কাঁটার মত চলিতে থাকিত।

প্রভাবতীর ষোল বছর বয়সে আদিত্যবাবু তাহার বিবাহ দিলেন। আগেই বিবাহ দিতেন, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইল। পাত্রের নাম নবগোপাল; গোলগাল সুশ্রী চেহারা। গরীবের ছেলে, তিন কুলে কেহ নাই; লেখাপড়ায় ভাল, বৃত্তি পাইয়া বি এ পাস করিয়াছে। আদিত্যবাবু ঘরজামাই করিবেন; সুতরাং নবগোপাল সব দিক দিয়া সুপাত্র।

মহা ধুমধামের সহিত বিবাহ হইল। নহবৎ বাজিল, ব্যান্ড বাজিল; সাতদিন ধরিয়া যাত্রা পাঁচালি কীর্তন চলিল, দীয়তাং ভুজ্যতাং হইল। না হইবেই বা কেন? জমিদারের একমাত্র কন্যা। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আদিত্যবাবু কোনও সাধই অপূর্ণ রাখিলেন না।

জামাই নবগোপাল শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল। নবগোপালের চেহারাটি যেমন মোলায়েম স্বভাবও তেমনি মৃদু স্নিগ্ধ, মুখের কথা মুখে মিলাইয়া যায়। আদিত্যবাবু বাড়ীর দ্বিতলের একটা মহল মেয়ে জামাইয়ের জন্য আলাদা করিয়া দিলেন। নিভৃত নিরঙ্কুশ পরিবেশের মধ্যে প্রভাবতী ও নবগোপালের দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইল।

দাম্পত্য জীবনের প্রভাত। শীত রাত্রির অবসানে নবারুণপ্রফুল্ল শিশির-বিচ্ছুরিত প্রভাত। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় শীতের রৌদ্র-ঝলমল প্রভাতে সূক্ষ্ম কুহেলিকা আসিয়া আকাশ ঝাপ্সা করিয়া দিয়াছে, সূর্যের প্রসন্নতা অশ্রুবাষ্পের অন্তরালে বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহের পর একমাস কাটিয়া গেল; ধীরে ধীরে

লক্ষ্মীর মত রূপ, সরস্বতীর মত গুণ।

আদিত্যবাবু এবং পরিবারস্থ সকলেই যেন অনুভব করিলেন, যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তেমনটি হয় নাই। কোথায় যেন খুঁত রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু কী খুঁত, কোথায় খুঁত? আদিত্যবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, অথচ কাহাকেও প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। গৃহিণী বাঁচিয়া থাকিলে প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইত না, কিন্তু মাতৃহীনা কন্যার মনের কথা জানা যায় কি করিয়া? প্রভাবতীর মুখ দেখিয়া কিছু অনুমান করা যায় না। সে আগের মতই সাংসারিক ও বৈষয়িক কাজকর্ম পরিদর্শন করে; পূজার ঘরের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন নিজের হাতে করে; বৃহৎ পরিবারের কোথায় কি ঘটিতেছে কিছুই তাহার চক্ষু এড়ায় না। তবু, আদিত্যবাবু যাহা দেখিতে পান না, পরিবারের অন্য কাহারও কাহারও চোখে তাহা চকিতের জন্য ধরা পড়িয়া যায়। প্রভাবতীর মনের চারিধারে যেন সূক্ষ্ম কুয়াশার জাল পড়িয়া গিয়াছে, যাহা পূর্বে অতিশয় স্পষ্ট ও নিঃসংশয় ছিল তাহা আবছায়া হইয়া গিয়াছে; সূর্যের চোখে চাল্‌শে পড়িয়াছে।

ওদিকে জামাই নবগোপালের জীবনের বাহ্য অংশ বেশ বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে সকাল বেলা দারোয়ানের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হয়, ফিরিয়া আসিয়া দপ্তরে শ্বশুরের কাছে বসে; বেলা হইলে নিজের মহলে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বৈকালে আবার বেড়াইতে বাহির হয়, ফিরিয়া শ্বশুরের কাছে বসে। শ্বশুর বুঝিতে পারেন ছেলেটি অতি শান্ত ও সুশীল। তাহার বুদ্ধির ধার হয়তো খুব বেশী নাই কিন্তু ধারতা আছে। জামাইয়ের আভ্যন্তরিক জীবনের চিত্র কিন্তু আদিত্যবাবু কল্পনা করিতে পারেন না। নিজের মেয়েকে তিনি চেনেন, জামাইকেও অল্প-বিস্তর চিনিয়াছেন, কিন্তু তবু মেয়ে-জামাইয়ের সম্মিলিত জীবন সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছেন না।

অনির্দিষ্ট উদ্বেগের মধ্যে ছয় মাস কাটিয়া গেল। তারপর একদিন আদিত্যবাবু নিভৃতে ময়নাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ময়না প্রভাবতীর দাসী ও নিত্য সহচরী। সে বালবিধবা, কিন্তু জীবনের ভিত্তিস্থানীয় গোপন সত্যগুলি তাহার অপরিচিত নয়।

আদিত্যবাবু ময়নাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, ময়নাও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উত্তর দিল। কিছুই পরিষ্কার হইল না, বরং আদিত্যবাবুর সংশয় আরও বাড়িয়া গেল।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ লইয়া নায়েব-মোক্তারের সহিত আলোচনা করা চলে না। আদিত্যবাবু মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল ডাক্তার সুরেন দাসের কথা। কলিকাতার বড় ডাক্তার, আদিত্যবাবুর বাল্যবন্ধু। যেমন হৃদয়বান তেমনি ঠোঁটকাটা। আদিত্যবাবু কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় গেলেন।

পরদিন রামপুকুরে নায়েবের কাছে টেলিগ্রাম আসিল—প্রভাবতী ও নবগোপালকে পাঠাইয়া দাও। প্রভাবতী ও নবগোপাল কলিকাতায় গেল।

ডাক্তার সুরেন দাস কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলেন। তারপর আদিত্যবাবুকে আড়ালে বলিলেন—'মেয়ের আবার বিয়ে দাও। এ বিয়ে বিয়েই নয়।'

পক্ষাঘাতগ্রস্ত মন লইয়া আদিত্যবাবু গৃহে ফিরিলেন। প্রভাবতী এবং নবগোপালও ফিরিল। প্রভাবতীর মনের কুয়াশা আর নাই, খর সূর্যালোক সমস্ত অস্পষ্টতা দূর করিয়া দিয়াছে।

দুই দিন আদিত্যবাবু কাহারও সহিত কথা বলিলেন না। কন্যার আবার বিবাহ দেওয়া দূরের কথা, মাতৃজারবৎ একথা কাহাকেও বলিবার নয়। মান সম্ভ্রম বংশ গৌরব সব ধূলিসাৎ হইয়াছে, মেয়েকে ঘিরিয়া যে নন্দনকানন রচনা করিয়াছিলেন তাহা ভস্মীভূত হইয়াছে সব থাকিতে তাঁহার কিছু নাই, তিনি সর্বস্বান্ত হইয়াছেন।

তৃতীয় দিন সকালবেলা আদিত্যবাবু চুপি চুপি প্রভাবতীর মহলে গেলেন। প্রভাবতী এই সময় পূজার ঘরে থাকে।

প্রভাবতীর মহলে চার পাঁচটি ঘর, তার মধ্যে দুটি শয়নকক্ষ, একটি বসিবার ঘর। নবগোপাল চেয়ারে বসিয়া মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিল, শ্বশুরকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আদিত্যবাবু জামাইয়ের মুখের পানে তাকাইতে পারিলেন না, লজ্জায় তাঁহার দৃষ্টি মাটি ছাড়িয়া উঠিল না। তিনি অবরুদ্ধ স্বরে বলিলেন,—'তুমি এমন কাজ কেন করলে?'

নবগোপাল উত্তর দিল না, নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

'এমন করে আমার সর্বনাশ করলে!'

এবারও নবগোপাল নিরুত্তর রহিল। পাশের ঘরে ময়না আসবাব ঝাড়ামোছা করিতেছিল, সে একবার দ্বার দিয়া উঁকি মারিল, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া গেল।

আদিত্যবাবুও আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া চলিলেন। কিছু বলিয়া লাভ কি? তিনি নিয়তির জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন, গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিলেও মুক্তি নাই। শত বৎসর পূর্বে তাঁহার প্রপিতামহের আমলে এরূপ ব্যাপার ঘটিলে তিনি হয়তো জামাইকে কাটিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিতেন। কিন্তু তাহাতেই বা কি লাভ হইত? কন্যার সুখ সৌভাগ্য বাড়িত না, বংশের মুখ উজ্জ্বল হইত না।

শ্বশুর প্রস্থান কবিবার পর নবগোপাল আবার উপবেশন করিল; ঘরের চারিদিকে একবার মন্থর দৃষ্টি ফিরাইল, তারপর মাসিক পত্রিকা তুলিয়া লইল।

দিন কাটিতে লাগিল, দিনের পর দিন। প্রভাবতীকে দেখিয়া অনুমান করা যায় না তাহার মনের মধ্যে কী হইতেছে। তাহার শান্ত সহাস্য দৃঢ়তার অন্তরালে হয়তো ব্যর্থ অভীপ্সার আগুন চাপা আছে, কিন্তু বাহিরে কেহ তাহা দেখিতে পায় না।

তারপর হঠাৎ একদিন আদিত্যবাবু মারা গেলেন। যেন অদৃষ্টের দুর্নিবার আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন। তাহার শরীর ভিতরে ভিতরে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, বাঁচিবার স্পৃহাও ছিল না। বুকে ঠাণ্ডা লাগাইয়া কয়েক দিনের জ্বরে তিনি ইহসংসার ত্যাগ করিলেন।

প্রভাবতী জমিদারীর সর্বেসর্বা অধিকারিণী হইল। কিন্তু এই সৌভাগ্যের জন্য সে লালায়িত ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর সে চার দিন শয্যা ছাড়িয়া উঠিল না। তারপর স্নান করিয়া সংযতভাবে পিতার চতুর্থী ক্রিয়া সম্পন্ন করিল।

জমিদার-সংসার পূর্বের মতই চলিতে লাগিল। গৃহে আদিত্যবাবুর স্থান শূন্য হইল বটে, কিন্তু সেজন্য কাজের কোনও ব্যাঘাত হইল না। নবগোপাল শ্বশুরের স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিল না, যেমন নির্লিপ্ত ছিল তেমনি রহিল। নায়েব প্রভাবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন।

তারপর যত দিন যাইতে লাগিল প্রভাবতীর স্বভাব তত পরিবর্তিত হইতে লাগিল। হঠাৎ কোনও পরিবর্তন ঘটিল না, ধীরে ধীরে অলক্ষিতে ঘটিল। আগে তাহার চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল, কর্কশতা ছিল না; কথায় শাসন ছিল, তাড়না ছিল না; দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য ছিল, ছিদ্রান্বেষিতা ছিল না। এখন ক্রমে ক্রমে তাহার স্বভাব তীক্ষ্ণ কণ্টকসমাকুল হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে শুচিবাই দেখা দিল। পরিচরবর্গ তাহাকে সম্ভ্রম করিত। এখন ভয় করিয়া চলিতে লাগিল।

তাহার দেহও অদৃশ্য রিপুর আক্রমণ হইতে অক্ষত রহিল না। বিবাহের সময় তাহার রূপ ছিল সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের মত, লাবণ্যের শিশিরে সারা অঙ্গ ঝলমল করিত। ক্রমে শিশির শুকাইয়া আসিল। সেই সঙ্গে একটা স্নায়বিক রোগ দেখা দিল, হঠাৎ কাজ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িত। আবার জ্ঞান হইলে যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে কাজে মন দিত। কেহ ডাক্তার ডাকার প্রস্তাব করিলে অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিত।

আদিত্যবাবুর মৃত্যুর পর দুই বছর কাটিয়া গেল। তপঃকৃশ দেহমন লইয়া প্রভাবতী উনিশ বছরে পদার্পণ করিল।

নবগোপালের জ্বর হইতেছিল। ম্যালেরিয়া জ্বর, আসিবার সময় শীত করিয়া হাত-পা কামড়াইত। স্থানীয় ডাক্তার কুইনিন দিতেছিলেন।

বিকাল বেলা নবগোপালের সাগু তৈরি হইল কি না দেখিবার জন্য প্রভাবতী রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল, ময়না আসিয়া খাটো গলায় বলিল, 'দিদিমণি জামাইবাবুর বোধহয় আবার জ্বর আসছে।'

প্রভাবতী থমকিয়া দাঁড়াইল,—'কি করে জানলি?'

ময়না সংকুচিত স্বরে বলিল,—'আমি ঘরে গিছলাম, দেখলাম শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, বড্ড হাত-পা কামড়াচ্ছে, একটু টিপে দিলে আরাম হয়।'

প্রভাবতী কিছুক্ষণ ময়নার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল,—'তা টিপে দিলি না কেন?'

ময়না লজ্জিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, প্রভাবতী তখন বলিল, 'আচ্ছা তুই সাবু নিয়ে আয়, আমি দেখছি।'

নবগোপাল নিজ শয়নকক্ষে একটা বিলাতী কম্বল গায়ে দিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া ছিল, প্রভাবতী খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। নবগোপাল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'আজ আবার জ্বর আসছে।'

প্রভাবতী নরম সুরে বলিল,—'হাত-পা কামড়াচ্ছে? আমি টিপে দেব?'

নবগোপাল ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া উঠিল, 'না, না, তুমি কেন? সদর থেকে একটা চাকরকে ডেকে পাঠালেই তো হয়।'

'তার দরকার নেই। আমি দিচ্ছি।'

প্রভাবতী খাটে উঠিয়া বসিয়া নবগোপালের গা-হাত টিপিয়া দিতে লাগিল। নবগোপাল আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর প্রভাবতী বলিল,—'ডাক্তারটা হয়েছে হতচ্ছাড়া। কম্বুলে ডাক্তার আর কত ভাল হবে। এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি তাকে। জ্বর সারাতে হয় সারাক নইলে বিদেয় হোক।'

ইতিমধ্যে নবগোপালের কাঁপুনি বাড়িয়াছিল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—'এখন ডাক্তার ডেকে কী হবে? জ্বরটা ছাড়ুক—' বলিয়া মাথার উপর কম্বল চাপা দিল।

প্রভাবতী উঠিয়া গিয়া নিজের ঘর হইতে আর একটা কম্বল আনিয়া নবগোপালের গায়ে চাপা দিল। বলিল,—'আসুক ডাক্তার, নিজের চোখে দেখুক। ম্যালেরিয়া সারাতে পারে না!' এই সময় ময়না সাগুর বাটি লইয়া প্রবেশ করিলে প্রভাবতী বলিল,—'ময়না সাগু রাখ। সদরে গিয়ে ডাক্তারকে

ডেকে আনতে বল। ডাক্তার এসে বসে থাকুক জ্বর ছাড়লে ওষুধ দিয়ে তবে যাবে।'

অতঃপর ধমক খাইয়া ডাক্তার এমন ঔষধ দিল যে, আর জ্বর আসিল না। নবগোপাল ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। গ্রাম্য ডাক্তার সাধারণত একটু হাতে রাখিয়া চিকিৎসা করে; এক দিনে জ্বর ছাড়িয়া গেলে জ্বরের লঘুতাই প্রমাণ হয়, ডাক্তারের কেরামতি প্রমাণ হয় না।

ইহার কয়েকদিন পরে সকাল বেলা প্রভাবতী নায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইল। নায়েব আসিয়া দেখিলেন প্রভাবতী নিজের শয়নঘরে মেঝেয় বসিয়া পান সাজিতেছে। প্রভাবতী নিজে বেশী পান খায় না, কিন্তু নবগোপাল পান দোক্তা খায়; ইহা তাহার একমাত্র ব্যসন। প্রভাবতী নিজের হাতে স্বামীর পান সাজে।

নায়েব প্রভাবতীর সম্মুখে আসনে বসিলেন। প্রভাবতী তাঁহার পানে চোখ না তুলিয়া বলিল,—'কাকা, ওঁর জন্যে একজন খাস-বেয়ারা রাখব ভাবছি। আপনি কি বলেন?'

নায়েব কিছুক্ষণ প্রভাবতীর নতনেত্র মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। এ বংশের সাবেক প্রথা, অন্দরের সকল কাজ, এমন কি পুরুষদের পরিচর্যা পর্যন্ত, ঝি-চাকরানী করিবে। আদিত্যবাবুরও খাস বেয়ারা ছিল না। নায়েব কথাটা মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়া বলিলেন,—'বেশ তো মা, তুমি যখন দরকার মনে করছ তখন রাখলেই হল। এ বংশে অবশ্য—'

'সে আমি জানি। কিন্তু দরকার হলে নিয়ম বদলাতে হয়।'

'তা তো বটেই। আমি লোক দেখছি।' একটু থামিয়া বলিলেন,—'একটা লোক ক'দিন থেকে চাকরির জন্যে ঘোরাঘুরি করছে—'

প্রভাবতী মুখ তুলিল,—'কি রকম লোক?'

নায়েব বলিলেন—'দেখে তো ভালই মনে হয়। ভদ্দর চেহারা, চালচলন ভাল। বলছিল কলকাতায় কোন্ ব্যারিস্টারের বাড়ীতে বেয়ারার কাজ করেছে।'

'তবে বোধহয় পারবে।'

'আপাতত ওকেই রেখে দেখা যাক। যদি না পারে তখন অন্য লোক দেখলেই হবে।' নায়েব উঠিলেন—'লোকটা এই সময় আসে। আজ থেকেই বাহাল করে নিই, কি বল?'

প্রভাবতী বলিল,—'তাকে একবার অন্দরে পাঠিয়ে দেবেন। আমি আগে একবার দেখতে চাই।'

'বেশ।' নায়েব চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ময়না ছুটিতে ছুটিতে ঘরে প্রবেশ করিল। 'দিদিমণি—' বলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া পিছন দিকে ইশারা করিল। তাহার চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা।

প্রভাবতী অপ্রসন্ন চোখ তুলিয়া দেখিল দ্বারের কাছে উমেদার ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, ছিটের ক্যামজ পরা ছিমছাম চেহারা। মুখে চোখে বুদ্ধির সংযম। সে নত হইয়া জোড় হাত কপালে ঠেকাইল।

প্রভাবতী তাহাকে এক নজর দেখিয়া পানের খিলি মুড়িতে মুড়িতে ধীর স্বরে বলিল,—'তোমার নাম কি?'

'আজ্ঞে মোহন।'

'কি কাজ করতে হবে শুনেছ?'

'আজ্ঞে নায়েব বাবু বলেছেন।'

'পারবে?'

'আজ্ঞে পারব।'

'বাবুকে তেল মাখানো, দরকার হলে হাত-পা টিপে দেওয়া, এসব করতে হবে।'

'আজ্ঞে করব।'

প্রভাবতী তখন ময়নাকে বলিল,—'ময়না, ওকে কোণের ঘরটা দেখিয়ে দে, ঐ ঘরে ও থাকবে। আর বাবুর কাছে নিয়ে যা।'

মহলের এক কোণে লম্বা বারান্দার অন্য প্রান্তে একটি ঘর অব্যবহৃত পড়িয়া ছিল, ময়না মোহনকে সঙ্গে লইয়া ঘর দেখাইয়া দিল, তারপর নবগোপালের ঘরে লইয়া গেল।

খাস বেয়ারা দেখিয়া নবগোপাল হাঁ-না কিছুই বলিল না। খুশি হইল কিনা তাহাও বোঝা গেলনা। কয়েক মিনিট পরে ময়না মোহনকে নবগোপালের ঘরে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলে প্রভাবতী বলিল,—'ময়না, বাকি পানগুলো সেজে ডাবায় ভরে রাখ, আমার স্নানের সময় হল।'

প্রভাবতীর শয়নকক্ষের লাগাও স্নানের ঘর, সে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। ময়না পান সাজিতে বসিল।

আজ ময়নার মন চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গুলিও অত্যন্ত সজাগ। পান সাজা শেষ করিয়া সে বাটা ভরিয়া নবগোপালের ঘরে রাখিয়া আসিল। দেখিল নূতন চাকর নবগোপালের মাথায় তেল মাখাইয়া দিতেছে।

প্রভাবতীর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে ঘরের এটা ওটা নাড়িয়া চাড়িয়া, আঁচল দিয়া আয়নাটা মুছিবার ছুতায় নিজের মুখ দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সারা দেহে যেন ছটফটানি ধরিয়াছে। তার-পর সে অনুভব করিল, স্নানের ঘর হইতে কোনও সাড়া শব্দ আসিতেছে না।

কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিত চক্ষে স্নানঘরের দ্বারের পানে চাহিয়া থাকিয়া ময়না সন্তর্পণে গিয়া দ্বার ঠেলিল। দেখিল প্রভাবতী অজ্ঞান হইয়া ভিজা মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাহার কাপড় চোপড়ের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় স্নান আরম্ভ করিবার পূর্বেই সে মূর্ছা গিয়াছে।

ময়না চেঁচামেচি করিল না, প্রভাবতীর পাশে ঝুঁকিয়া তাহার মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে প্রভাবতীর জ্ঞান হইল। সে উঠিয়া বসিয়া বস্ত্রাদি সম্বরণ করিতে করিতে বলিল,—'হয়েছে, তুই এবার নিজের কাজে যা। কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই।'

নূতন ভৃত্য মোহন যে অতিশয় কর্ম-নিপুণ লোক এবং সব দিক দিয়া বাঞ্ছনীয় তাহা প্রমাণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। সে অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলে ভদ্র-লোক বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু সে যত্নপূর্বক নিজেকে ভৃত্য পর্যায়ে আবদ্ধ করিয়া রাখে; খাটো করিয়া কাপড় পরে, মাথায় টেরি কাটে না। তাহার সবচেয়ে বড় গুণ সে অযথা কথা বলে না, মুখে প্রফুল্ল গাম্ভীর্য লইয়া আপন মনে কাজ করিয়া যায়। ময়না যখন গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত কথা বলিতে যায়, সে সংক্ষেপে উত্তর দেয়, মাখামাখির চেষ্টা করে না।

ময়নাকে লইয়াই গোলযোগ বাঁধিল।

ময়না মেয়েটা এমন কিছু ন্যাকা-বোকা নয়, তাহার পালিশ করা কালো শরীরে বেশ খানিকটা স্বচ্ছ সহজ বুদ্ধি ছিল। কিন্তু মোহন আসার পর হইতে তাহার বুদ্ধি-সুদ্ধি যেন জোয়ারের জলে ভাসিয়া গিয়া-ছিল। বিশেষত অবস্থাগতিকে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল, ইচ্ছা থাকিলেও সান্নিধ্য বর্জন করিবার উপায় ছিল না।

সকল দিকেই প্রভাবতীর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, ময়নার রসবিহ্বলতা তাহার চক্ষু এড়ায় নাই। একদিন সে ধমক দিয়া বলিল, —'হয়েছে কি তোর? অমন ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন? কাজকর্ম কিছু নেই?'

ময়না ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি প্রভাবতীর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

এইভাবে, মোহন নিযুক্ত হইবার পর মাসখানেক কাটিল। গ্রীষ্মকাল আসিল। আকাশে যেমন অলক্ষিতে বাষ্প সঞ্চিত হইয়া কালবৈশাখীর ভূমিকা রচনা করে, তেমনি জমিদার পরিবারের শত কর্ম-বহুলতার অন্তরালে ধীরে ধীরে উষ্ণতার স্বচ্ছ মেঘ সঞ্চিত হইতে লাগিল।

বৈশাখ মাসের শেষের দিকে এক সকালে প্রভাবতী দ্বিতলের জানালায় দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। রাত্রে গরমে ভাল ঘুম হয় নাই, উত্তপ্ত মুখের উপর সকাল বেলার স্নিগ্ধ বাতাস মন্দ লাগিতে-

ছিল না। কিন্তু এই স্নিগ্ধতা ক্রমে দ্বিপ্রহরের খর প্রদাহে পরিণত হইবে, এই শঙ্কা তাহার মনের সঙ্গে জড়াইয়া জড়াইয়া তাহার জীবনটাকেই দুর্বহ করিয়া তুলিতেছিল; মনে প্রশ্ন জাগিতেছিল, আরম্ভে এতটুকু সরসতা দিয়া ভগবান মানুষকে সারা জীবনের জন্য দুস্তর মরুভূমির শুষ্কতার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছেন কেন?

—'মা, কালীপুরের ভবনাথ চৌধুরী মশায় তাঁর ছোট ছেলেকে নেমন্তন্ন করতে পাঠিয়েছেন।'

প্রভাবতী দিবাস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, দেখিল নায়েব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

'কিসের নেমন্তন্ন?'

নায়েব বলিলেন,—'চৌধুরী মশায়ের প্রথম নাতির অন্নপ্রাশন, খুব ঘটা করছেন। বলে পাঠিয়েছেন, তোমাকে যেতেই হবে।'

প্রভাবতীর মুখখানা শাদা হইয়া গেল। চৌধুরী মশায় পাশের গ্রামের জমিদার, আদিত্যবাবুর সহিত বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। দেড় বছর আগে তিনি বড় ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন; এখন নাতির অন্নপ্রাশন।

প্রভাবতী রুদ্ধস্বরে বলিল,—'আমি যেতে পারব না কাকা।'

নায়েব বলিলেন,—'কিন্তু সেটা কি উচিত হবে মা। আগ্রহ করে নিজের ছেলেকে নেমন্তন্ন করতে পাঠিয়েছেন—যদি না যাও ক্ষুণ্ণ হবেন। লোক-লৌকিকতাও রাখা দরকার।'

প্রভাবতী জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, বলিল,—'বলে দেবেন আমার শরীর খারাপ, যেতে পারব না। আর, ছেলের জন্যে রুপোর ঝিনুক-বাটি পাঠাতে হবে তার ব্যবস্থা করুন।'

নায়েব মহাশয় কিছুক্ষণ ক্ষুব্ধ মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন।

জানালার বাহিরে বাতাস ক্রমে উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। প্রভাবতীর দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া উঠিল। সে আঁচলে চোখ মুছিয়া পালঙ্কে আসিয়া বসিল। ধরা-ধরা গলা পরিস্কার করিয়া ডাকিল,—'ময়না!'

ময়নার সাড়া না পাইয়া প্রভাবতী বিরক্ত বিস্ফারিত চক্ষে দ্বারের পানে চাহিল। ময়না সর্বদা কাছে কাছে থাকে, একবারের বেশী দুবার তাহাকে ডাকিতে হয় না। প্রভাবতী উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিল।

লম্বা বারান্দার অপর প্রান্তে মোহনের ঘর। ময়না দ্বারের চৌকাঠে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতরে চাহিয়া আছে।

প্রভাবতী নিঃশব্দ পদে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু ময়না জানিতে পারিল না। মোহন ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতিয়া নবগোপালের একখানা শান্তিপুরী ধুতি চুনট্ করিতেছে, ময়না তন্ময় সম্মোহিত হইয়া তাহাই দেখিতেছে।

এতক্ষণ প্রভাবতীর মনে যে অবরুদ্ধ বাষ্প তাল পাকাইতেছিল এই ছিদ্রপথে তাহা বাহির হইয়া আসিল। সে তীব্রস্বরে বলিল,—'ময়না! কি হচ্ছে তোমার এখানে? ডাকলে শুনতে পাও না!'

ময়না চমকিয়া প্রভাবতীকে দেখিয়া যেন কেঁচো হইয়া গেল—'দিদিমণি, তুমি ডেকেছিলে? আমি—আমি শুনতে পাইনি।'

দাঁতে দাঁত চাপিয়া প্রভাবতী বলিল,—

'সবাই জানে; বড় ঘরের বড় কথা'

'শুনতে পাওনি। এসো এদিকে একবার, ভাল করে শোনাচ্ছি।'

সে ফিরিয়া চলিল, ময়না শঙ্কিত শীর্ণ মুখে তার পিছনে চলিল। মোহন প্রভাবতীর স্বর শুনিয়া চকিতে মুখ তুলিয়াছিল, আবার ঘাড় হেঁট করিয়া কাজে মন দিল।

ময়নাকে লইয়া প্রভাবতী নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিল, প্রজ্বলিত চক্ষে চাহিয়া বলিল,—'ভেবেছিস কি তুই? সাপের পাঁচ-পা দেখেছিস?'

ময়না ক্রন্দনোন্মুখ ভয়ার্ত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভাবতী বলিল,—'ভেবেছিস আমার চোখ নেই, কিছু দেখতে পাই না! মোহনের সঙ্গে তোর কী? খুলে বল্ হতভাগী, নইলে ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝাড়ব।'

ময়না প্রভাবতীর পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—'আমি কোনও পাপ করিনি, দিদিমণি, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।'

প্রভাবতী পা সরাইয়া লইয়া বলিল,—'হয়েছে, আর ন্যাকামি করতে হবে না। আমি সব বুঝি। তোকেও ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব, ওকেও বিদেয় করব। আমার বাড়ীতে ওসব চলবে না।'

'আমার কোনও দোষ নেই দিদিমণি।'

'তোর দোষ নেই! সব দোষ তোর। তুই না বিধবা! তোর মাথা মুড়িয়ে গাঁ থেকে দূর করে দেব। নষ্টামির আর যায়গা পাস্‌নি'"

ভয়ে দিশাহারা হইয়া ময়না প্রভাবতীর পায়ে মাথা কুটিতে লাগিল,—'আমার দোষ নেই—আমার দোষ নেই—মা কালীর দিব্যি—বাবা তারকনাথের দিব্যি। আমি কিছু করিনি—ওই আমাকে ডেকেছে—'

'কি বললি—তোকে ডেকেছে?'

'হাাঁ, আজ রাত্তিরে ওর ঘরে যেতে বলেছে।'

প্রভাবতী ক্ষণেকের জন্য হতবাক্ হইয়া গেল, তারপর গর্জিয়া উঠিল,—'তাই বুঝি সকাল থেকে ওর দোরে ধর্না দিয়েছিস! হারামজাদি, তোকে আঁশ্ বঁটিতে কুট্‌ব আমি, কুটে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।'

ময়না মাথা কুটিতে কুটিতে বলিল,—'তাই কর দিদিমণি, তাই কর, আমার সব জ্বালা জুড়োক।'

প্রভাবতী কিছুক্ষণ অঙ্গারচক্ষু মেলিয়া ময়নার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর তাহার নড়া ধরিয়া তুলিয়া স্নানঘরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল,—'আজ সারাদিন সারারাত ঘরে বন্ধ থাকবি তুই, খেতে পাবি না। আর মোহনের ব্যবস্থাও আমি করছি।' ময়নাকে সে স্নানঘরে ঠেলিয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিল।

নিজের শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিয়া সে কয়েক মিনিট গুম হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণের জন্য তাহার সংজ্ঞা রহিল না।

জ্ঞান হইবার পরও প্রভাবতী শয্যায় পড়িয়া রহিল, উঠিল না। দ্বিপ্রহরে খাবার ডাক আসিলে সে বলিয়া পাঠাইল,—'আমার শরীর খারাপ, কিছু খাব না। ময়নাও খাবে না।'

নবগোপাল আহারাদি সম্পন্ন করিয়া প্রভাবতীর খাটের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, শান্তকণ্ঠে বলিল,—'শরীর খারাপ হয়েছে? ডাক্তারকে খবর পাঠাব?'

'দরকার নেই' বলিয়া প্রভাবতী পাশ ফিরিয়া শুইল।

নবগোপাল আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া লঘুপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহর ক্রমে পশ্চিমে গড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ অসহ্য গরম কাটিয়া শন্ শন্ বাতাস বহিল, আকাশের কোণ হইতে রাশি রাশি কালো মেঘ ছুটিয়া আসিয়া আকাশ দখল করিয়া বসিল। ঝম্ ঝম্ ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

প্রভাবতী উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিল। প্রবল বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ছাট্ তাহার

মুখ ভিজাইয়া দিল, বুকের কাপড় ভিজাইয়া দিল। সে ঊর্ধ্বে মেঘের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমে দিন শেষ হইয়া রাত্রি আসিল, ঝড়-বৃষ্টি থামিল। আকাশে বাতাসে স্নিগ্ধ শীতলতা, ধরণীর বুকে তৃষ্ণা নিবৃত্তির পরিপূর্ণ তৃপ্তি। প্রভাবতী আবার শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। শুষ্ক দহমান অন্তর লইয়া পড়িয়া রহিল। সৃষ্টির মধ্যে সেই যেন শুধু সৃষ্টিছাড়া।

দাসী ঘরে আলো দিতে আসিল। প্রভাবতী একবার চোখ খুলিয়া আবার চোখ বুজিল, বলিল,—'আলো দরকার নেই, নিয়ে যা।'

দ্বিপ্রহর রাত্রি। বাড়ীতে কোথাও আলো নাই, শব্দ নাই। নিশীথিনী যেন সর্বাঙ্গে শীতলতার চন্দন-প্রলেপ মাখিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

অন্ধকার ঘরে প্রভাবতী শয্যায় উঠিয়া বসিল; কিছুক্ষণ কান পাতিয়া রহিল। তারপর নিঃশব্দে উঠিয়া নবগোপালের ঘরে উঁকি মারিল। নবগোপালের ঘরে ক্ষীণ নৈশ দীপ জ্বলিতেছে। নবগোপাল শয্যায় নিদ্রামগ্ন। তাহার অল্প অল্প নাক ডাকিতেছে।

ফিরিয়া আসিয়া প্রভাবতী নিজের স্নান-ঘরের বন্ধ দ্বারে কান লাগাইয়া শুনিল। শব্দ নাই। তখন সে সন্তর্পণে বাহিরের দ্বার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইল। বারান্দার অপর প্রান্তে একটা ঘর। নিঃশব্দ পদে বারান্দা অতিক্রম করিয়া সে দ্বারের গায়ে হাত রাখিল। দ্বার ভেজানো ছিল, আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল।

প্রভাবতী দীপহীন কক্ষে প্রবেশ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রভাবতী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল, স্নানঘরের দ্বার খুলিয়া দেখিল ময়না মাটিতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে জাগাইয়া দিয়া সদয়কণ্ঠে বলিল,—'যা—এবার নীচে যা।'

ময়না চলিয়া গেলে প্রভাবতী স্নান করিল। তারপর পানের বাটা লইয়া পান সাজিতে বসিল।

নায়েব আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

'কাল না কি মা তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল?'

প্রভাবতী মুখ না তুলিয়া বলিল,—'কেন কিছু নয়, আজ ভাল আছি।—কাকা, ওই নতুন চাকরটাকে আজই বিদেয় করে দেবেন।'

নায়েব বলিলেন,—'কাকে—মোহনকে? কিন্তু কাজকর্ম তো ভালই করছে শুনেছি।'

প্রভাবতী বলিল,—'আমি ভেবে দেখলুম, অন্দর মহলে পুরুষ চাকর না রাখাই ভাল। ওকে পুরো মাসের মাইনে দিয়ে বিদেয় করে দেবেন। বলবেন যেন আমার জমিদারীর এলাকা ছেড়ে চলে যায়।'

কাহিনী শেষ করিয়া ভুবনবাবু এক টিপ্ নস্য লইলেন এবং চকিত সজল নেত্রে চারিদিকে চাহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, —'নবগোপাল কবে মারা গেল?'

ভুবনবাবু বলিলেন,—'এই তো বছর দুই আগে। লোকটা ভারি অমায়িক ছিল, ছেলেকে খুব আদর করত।'

প্রশ্ন করিলাম,—'আপনি ছাড়া একথা কে কে জানে?'

ভুবনবাবু বলিলেন,—'সবাই জানে আবার কেউ জানে না। বড় ঘরের বড় কথা।'
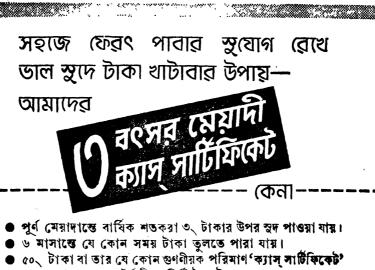
মাদলিন, এই সময়ে চিঠিটুকু সেরে নাও, এখন ওরা কেউ নেই।

চেষ্টা তো করছি মিসেস অর। কিন্তু যে রকম কাগজ আর লেখনী—

কেন, তোমার কাগজ তো মন্দ নয়, বাইবেলের শাদা পৃষ্ঠাটুকু তো ভালই।

কিন্তু লেখনী! কাঠি পুড়িয়ে কালো করে নেওয়া। কখনো অক্ষর পড়ে না, কখনো বা মুচ্‌ করে ভেঙে যায়। হাসিও পায়, কান্নাও আসে।

কি আর করবে? যেমন অবস্থা এর চেয়ে ভালো পাবে কোথায়? এতদিন যে ওরা মেরে ফেলেনি এই কি যথেষ্ট নয়?

মেরে ফেললে এর চেয়ে কি খারাপ হ'ত? তাছাড়া সে সময় তো যায়নি।

বোধ হয় গিয়েছে, কাল রাতে বোধ করি কামানের শব্দ শুনেছি।

বর্ষাকাল, মেঘের ডাক মিসেস অর।

কি যে বলো মাদলিন! এত বয়স হ'ল, মেঘের ডাক আর কামানের আওয়াজের তফাৎ বুঝবো না! নিশ্চয় জেনো ও কোম্পানীর কামান, আমাদের উদ্ধারের জন্য ফৌজ আসছে।

সেই আশা করতে করতেই তো তিন মাস গেল। আমার আর আশা করতে ভরসা হয় না।

তবে ভগবানের উপরে ভরসা করো।

তার চেয়ে চিঠিটুকু সেরে ফেলা যাক।

মাদলিন চিঠি লিখিতে লাগিল, মিসেস অর চুপ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মিসেস অর আবার মুখ খুলিল—বলিল, মাদলিন ফরাসী ভাষায় লিখো, ইংরেজিতে লিখলে সিপাহীদের হাতে পড়লে বুঝতে পারবে।

সিপাহীদের হাতে ছাড়া পাঠাবে কি উপায়ে।

সে কথা সত্যি; কিন্তু ওদের মধ্যেও তো ভালো লোক আছে, যেমন ঐ ওয়াজিদ আলি।

ওয়াজিদ আলির নাম শুনিয়া মাদলিন হাসিল।

কিছুক্ষণ পরেই আবার মিসেস অর বলিয়া উঠিল, লুকোও চিঠি লুকোও, ঐ শোনো পায়ের শব্দ।

মাদলিন কান পাতিয়া শুনিল, সত্যই পায়ের শব্দ, খড়ের গাদার তলে কাগজের টুকরাখানা ও পোড়া কাঠিটা সযত্নে রাখিয়া দিল।

ওয়াজিদ আলি প্রবেশ করিল। মিসেস অর এক গাল হাসিয়া বলিল—কি দারোগা সাহেব, শহরের খবর কি?

ওয়াজেদ আলি মাদলিনের দিকে তাকাইয়া মিসেস অরের প্রশ্নের উত্তর দিল—খবর ভালো। বোধ করি কোম্পানীর ফৌজ কাছাকাছি এসে পড়েছে, শহরের অনেকে দক্ষিণ দিকে কামানের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

কেমন মাদলিন আমি বলিনি।

ওয়াজেদ আলি, আমাদের এক টুকরো চিঠি কোম্পানীর ফৌজের হাতে পেঁছে দেবে?

আদেশ ও অনুরোধের মাঝামাঝি সুরে কথাগুলি বলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া মাদলিন হাসিল, তেমন হাসি ষোল বছরের নীচে ত্রিশ বছরের উপরে কোন সুন্দরী মেয়েতেও হাসিতে পারে না।

তাহার কাছে আসিয়া স্বর নীচু করিয়া ওয়াজেদ আলি বলিল, আপনার কোন্‌ কথা রাখিনি, জান কবুল করে রেখেছি, এখন সিপাহীরা আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

তোমার কোন বিপদ ঘটবে না তো ওয়াজেদ আলি?

আপনাদের বিপদ ঘটবার আগে নয়।

এবার রক্ষা পেলে তোমাকে ভুলবো না। এই বলিয়া দুজনে হাসিল।

মিসেস অর সে হাসি লক্ষ্য করিল। সে প্রাচীন হইয়া পড়িলেও এ হাসির অর্থ যে না বোঝে, তাহা নয়। বয়সকালে সে এইরকম হাসি কত হাসিয়াছে। ইংরেজ তরুণ-তরুণীর মধ্যে এই রকম হাসি বিনিময় হইতে সে দেখিয়াছে। কিন্তু একজন নেটিভের সঙ্গে এই রকম হাসি বিনিময়? অন্য সময় হইলে রাগে তাহার গা জ্বলিত। কিন্তু এখন হয়তো ঐ হাসির ক্ষীণ সূত্রেই তাহাদের জীবন ঝুলিয়া আছে। সে ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছে ওয়াজেদ আলির তাহাদের প্রতি দয়ার কারণ জীবে প্রেমও নয়, তাহার মতো প্রাচীনাকে রক্ষাও নয়, অন্য কিছু। তাহার মনটা কেমন বিকল হইয়া গেল, খড়ের আঁটির উপাধান মাথার নীচে টানিয়া লইয়া সে শুইয়া পড়িল। তাহার মন ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে চলিয়া গিয়াছে, লখ্‌নৌ শহর, কাইজারবাগের বন্দীশালা কোথায় মিলাইয়া গেল। ইংলণ্ড, কেণ্ট প্রদেশের ক্ষুদ্র এক গ্রাম, ঘাসে-ঢাকা মাঠের মধ্যে ফুল-ঝরা গাছের তলায় তরুণী পা ছড়াইয়া উপবিষ্ট, পাশে তরুণ যুবক অর।

যুবক বলিতেছে, আমারি আশা কি সফল হবে না কেটি?

তরুণী নীরবে হাসিল।

হাসির মতো এমন ভাষা থাকিতে মানুষে কতকগুলো বাজে কথা বলিতে যায় কেন?

২

তিনমাস আগে সিপাহী বিদ্রোহ বাধিয়া উঠিলে মাদলিন জ্যাকসন ও মিসেস অর

আরও সাতজন নরনারীর সঙ্গে যখন সীতাপুর ত্যাগ করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল ব্যাপারটা দু-এক সপ্তাহেই মিটিয়া যাইবে। অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে অনির্দিষ্ট পথ-যাত্রাকে তাহাদের একপ্রকার পিকনিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। বন্দিগড়ের রাজার আশ্রয় তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল। রাজা প্রথমে তাহাদের আদরযত্ন করিত; কিন্তু কোম্পানীর শাসন যতই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, তাহার ব্যবহারও কঠোর হইয়া উঠিল। অবশেষে একদিন রাজা জানাইল যে, এখানে আর তাহাদের থাকা নিরাপদ নয়, এক প্রতিবেশী রাজার রাজধানীতে যাত্রা করিতে হইবে। খান দুই গরুর গাড়িতে চাপিয়া সেই নয়জন ইংরেজ নরনারী যাত্রা করিল, সম্মুখে বন্দুকধারী দেড়শ সিপাই, একটা কামান, পিছনে বন্দুকধারী দেড়শ সিপাই, একটা কামান। সেই ক্ষুদ্র দলটি অচিরে বুঝিতে পারিল যে, তাহারা বন্দী। কিন্তু তাহাদের গন্তব্য স্থান কোথায়? অচিরে তাহাও প্রকাশ পাইল—লখনৌ শহর। লখনৌ তখন বিদ্রোহীদের আয়ত্ত এবং ঐ অঞ্চলে সিপাহীদের প্রধান আড্ডা। অবশেষে অশেষ কষ্ট ও অপমান সহ্য করিয়া মাস-খানেক পরে তাহারা লখনৌ শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল, আর কাইজারবাগের অন্ধকার এই ঘরটিতে বন্দী-জীবন আরম্ভ করিল। খড়ের গাদা শয্যা, সারাদিনে একমুঠো অন্নখাদ্য। এত কষ্ট, এত গ্লানি, এত অপমান, তবু কেহ মরিল না। মানুষের প্রাণ বড় কঠিন। দুঃস্বপ্নের মতো এসব মাদলিনের মনে পড়িয়া যায় তখন সে চোখ বুজিয়া, দু হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া থাকে। হঠাৎ পদশব্দে তাকাইয়া দেখিতে পায় রক্ষী ওয়াজেদ আলি তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। প্রথম প্রথম তাহার বিরক্তিবোধ হইত, এখন ভালোই লাগে। অভ্যাসে শয়তানকেও সহ্য হইয়া যায়, ওয়াজেদ আলি সুপুরুষ, যুবক আর দয়াশীল। মাদলিন প্রথমে মনে করিত এই রক্ষী যুবকের সঙ্গে একটু হাসিয়া কথা বলিতে ক্ষতি কি, তাহাতে সকলের বন্দীজীবন হয়তো একটু সুসহ হইবে; কিন্তু মন কি প্রয়োজনের অধীন? মন লইয়া খেলাইতে গেলে তাহার ছোবল কোথায় পড়িবে, কে বলিতে পারে? কিন্তু এসব তো পরের কথা, আগের কথা আগে।

৩

মাদলিন চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে, সঙ্কল্প করে যে দুঃখ দিনের বিভীষিকা স্মরণ করিবে না, কিন্তু সাধ্য কি! অবাঞ্ছিত মাছিটা যেমন ঘুরিয়া ফিরিয়া মুখের উপরে আসিয়া বসে, তেমনি দুঃসময়ের স্মৃতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনের মধ্যে উদিত হইতে থাকে।

মাদলিনের বাপ-মা থাকিত মীরাটে, সে সীতাপুরে মিসেস অরের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছিল, এমন সময়ে সিপাহীরা ক্ষেপিয়া ওঠে। হঠাৎ সীতাপুর পরিত্যাগ করিতে হইল, বাপ-মায়ের সংবাদ তারপরে আর সে পায় নাই।

বন্দিগড়ের রাজবাড়ি প্রকাণ্ড, চারদিকে তার প্রশস্ত পরিখা। গরুর গাড়িতে চড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা, সামনে পিছনে সশস্ত্র সিপাই, তাহাদের মুখে কি বিদ্বেষ! সেই সব মুখে সে নিজেদের বিরূপ ভাগ্য-লিপি পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে গ্রাম, কৌতূহলী জনতা, কোথাও বা উদাসীন, কোথাও বা হিংস্র। রাত্রিবেলায় সে ভয়ে ভয়ে থাকিত, কিন্তু না অন্তত সে বিপদটা ঘটে নাই। দূরে লখনৌ শহরের সৌধ-চূড়া। ক্রমে সেখানে আসিয়া তাহারা পৌঁছিল। তারপরে কাইজারবাগের বন্দীশালা, অন্ধকার, বৃহৎ দরজায় সশস্ত্র পাহারা। খড়ের গাদায় শুইয়া বসিয়া দিন আর কাটে না, একটানা, একঘেয়ে; অন্ধকার এবং অধিকতর অন্ধকারের দ্বারা বিশিষ্ট দিন-রাত্রির পালা। একদিন সকালে একদল সিপাহী আসিয়া তাহাদের সংগী ও যথার্থ রক্ষক পুরুষ ছয়জনকে হাত বাঁধিয়া লইয়া গেল। কোথায়? কেহ জানে না। কেন? জেনারেলের হুকুম। সিপাহী জেনারেলের। কিছুক্ষণ পরে একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের আওয়াজ। তবে কি? নিশ্চয়ই। কিন্তু সিপাহীরা যে বলিয়াছিল সাহেবদের ক্ষতি হইবে না! সিপাহীদের কথায় বিশ্বাস কি? বন্দীরা আর ফিরিল না। ওর পরে আর ফেরে কি উপায়ে? মাদলিনের বুকের মধ্যে নিশ্বাস ঠেলিয়া ওঠে। কিন্তু ঐ কচি মেয়ে সোফিটাকে বাঁচাইবার উপায় কি? ও যে খাদ্য বিনা মারা পড়িবে, শুকনো রুটি আর ভাত কি ওর সয়? তখনি আর একখানা মুখ ওর মনে পড়ে, সে মুখে বিদ্বেষ বা বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন নাই, বরঞ্চ যেন.........ওয়াজেদ আলির মুখ। লোকটা এক সময়ে নবাব সরকারে দারোগা ছিল, সিপাহীদের বিশ্বাসভাজন। মাদলিনের কেমন যেন বিশ্বাস হইয়াছিল এর উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়। বুড়ি মিসেস অর কতই না নিষেধ করিয়াছিল। বুড়ির চোখ কি তরুণীর চোখের মতো সব কিছু দেখিতে পায়? মাদলিন নিজেই প্রস্তাব করিয়াছিল, সোফিকে বাঁচানো যায় কিনা?

ওয়াজেদ আলি বলিয়াছিল, কেন এখানে থাকলে ক্ষতি কি?

আমাদের যদি মেরে ফেলে?

কে মারবে?

সিপাহীরা।

আমি নিজেও তো একজন সিপাহী।

পাণ্ডুর ঠোঁট দুখানিতে রাঙা একটি দাড়িম্বের বীজ বিকশিত করিয়া মাদলিন বলিল—দারোগা সাহেব, হুকুম হলে তুমিই মারবে।

এখন আর সে দারোগা সাহেব বলে না, নাম ধরিয়া ডাকে।

ওয়াজেদ আলি বলে, বেআইনী হুকুম মানবো কেন?

নইলে গর্দান যাবে যে!

একবার নোকরি গিয়েছে, এবারে না হয় গর্দান যাবে।

নোকরি গেল কেন?

সে অনেক কথা, আর একদিন বলবো।

ক্রমে এই দুই জনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। মিসেস অর ব্যাপারটা একেবারে বরদাস্ত

করিতে পারে না, বলে—মাদলিন এ কি রকম আচরণ? একজন 'বৃটিশার' হয়ে একজন নেটিভের সংগে মেলামেশা। ছিঃ!

মাদলিন বলে ওকে একটু খুশী রাখলে ক্ষতি কি? তা ছাড়া লোকটা তো মন্দ নয়।

সিপাহী আবার ভালো।

সব ইংরেজ কি ভালো?

আবার আর এক সময়ে গল্পের ছিন্নসূত্র জোড়া লাগে। লখনৌ-র নবাবদের কথা ওয়াজেদ আলির মুখে শোনে মাদলিন। শেষ নবাবের নাম ওয়াজেদ আলি শুনিবার পরে মাদলিন মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া তাহাকে নবাব সাহেব বলিয়া ডাকিত।

ওয়াজেদ আলি বলিত মেম সাহেবের মরজি হ'লে কী না সম্ভব হয়, একেবারে দারোগা সাহেব থেকে নবাব সাহেব।

ওয়াজেদ আলির কাছে সে নবাবের চিড়িয়াখানার কথা শুনিত, জন্তু জানোয়ারের লড়াইয়ের কথা শুনিত, নবাবদের অত্যাচার ও বদান্যতার কথা শুনিত, একজন ইংরেজ ক্ষৌরকার কিভাবে নবাবের দাক্ষিণহস্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছিল শুনিত, মাদলিনের বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না। পাশে বসিয়া মিসেস অরও শুনিত কিন্তু মাদলিন কখনো তাহার চোখে সমর্থন খুঁজিয়া পায় নাই।

ওয়াজেদ আলি রাজি হইল, বলিল, সেদিকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে এক দোস্তর বাড়িতে রেখে দেবো।

তারপরে।

কোম্পানীর ফৌজ এসে লখনৌ অধিকার করলে তাকে বের করলেই হবে।

আমাদের জয় সম্বন্ধে তোমার দেখছি কোন সন্দেহ নেই।

কারই বা সন্দেহ আছে? প্রতিদিন দলে দলে সিপাহী শহর ছেড়ে নিজ নিজ গ্রামে চলে যাচ্ছে।

কেন?

গুজব এই যে জেনারেল হ্যাভেলক কানপুরে এসে পৌঁছেছে।

বটে।

তারপরে একদিন সোফির মুখ হাত পা ভুষো মাখাইয়া কালো রঙ করিয়া ফেলা হয়। একজন মুসলমান স্ত্রীলোক সেদিকে কাপড়ে জড়াইয়া আরম্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে রওনা হইয়া যায়—মেয়ে মরিয়াছে কবর দিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

মিসেস অরের সন্দেহ কিছুতেই যায় না, বলে মেয়েটারও পুরুষগুলোর দশা হবে।

এখানে থাকলেও ক্রমে তাই হ'তো। কেন আমরা কি বেঁচে নেই?

ক'দিন আছি কে জানে।

কেন?

হয়তো পুরুষগুলোর দশা হবে। হোক এমন কি মন্দ।

মিসেস অর বদমেজাজী কিন্তু ভীরু নয়।

৪

হঠাৎ ওয়াজেদ আলি ছুটিয়া আসিয়া বলে মেম সাহেব চিঠিখানা দাও।

কেন?

মাদলিনের বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না

কেন আর কি? সুসংবাদ। কোম্পানীর ফৌজ আলমবাগে এসে পৌঁছেছে।

আলমবাগ কতদূরে?

কোম্পানীর ফৌজ ঠিক জানো তো?

সব ঠিক, এখন চিঠিখানা দাও বেহাত যেন না হয়।

মিসেস অরের সন্দেহ কিছুতেই যায় না।

ওয়াজেদ আলি সেই চিঠিখানা লইয়া প্রস্থান করে। মিসেস অর বলে—দেখো কার চিঠি কোথায় পৌঁছয়। মরে গেলেও সিপাইকে বিশ্বাস করতে নেই।

ভাঙা নৌকায় করে কেউ কি কখনো নদী পার হয় নি?

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ভারি বুট জুতার শব্দ ওঠে সংগে সংগে প্রবেশ করে কাপ্তেন মেনিল আর লেঃ বগ্‌ল সংগে একদল গুর্খা। ওয়াজেদ আলির পত্রবাহকের আলমবাগ পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই, মাঝপথে এদের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল।

মেনিল আর বগ্‌ল একযোগে বলিয়া ওঠে' গড্ সেভ দি কুইন্।' আশা করি সমস্ত কুশল।

ধন্যবাদ।

মেনিল শুধায় এলোকটা কে?

মাদলিন বলে, ওয়াজেদ আলি আমাদের রক্ষক, বড় ভালো লোক।

মেনিল ওয়াজেদ আলিকে বলে একখানা পাল্কী জোগাড় করে আনো।

পাল্কী পাওয়া যাবে কিন্তু বেহারা কোন প্রয়োজন নেই, আমাদের গুর্খা সৈন্যরা আছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওয়াজেদ আলি পাল্কী সংগ্রহ করিয়া আনে। মেনিলের নির্দেশে মাদলিন ও মিসেস অর পাল্কীতে চাপে। মেনিল গুর্খাদের নির্দেশ দেয় আলমবাগ, জেনারেল উট্রামের ক্যাম্প।

পাল্কীতে উঠিবার আগে মিসেস অর বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে ওয়াজেদ আলিকে দগ্ধ করিয়া দেয়, কুলে উঠিয়াছে এখন আর কৃতজ্ঞতার অভিনয় করিয়া কি ফল।

পাল্কীর ভিতর হইতে মাদলিন হাত বাড়াইয়া ওয়াজেদ আলির হাতখানা গ্রহণ করে, একটু চাপ দেয়, বিদায় বেদনাকে পরিহাসের তির্যক পথে চালনা করিয়া দিয়া বলে আবার কবে দেখা হবে নবাব সাহেব, কি দেখা করবে তো, অবশ্য দেখা ক'রো।

হাতের ঐ চাপটুকু মিসেস অরের নজর এড়ায় না, চাপা স্বরে বলে—শেম।

মার্চ অন্

পাল্কী রওনা হয়।

ওয়াজেদ আলি মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া থাকে, পাল্কীর দিকে তাকাইতেও ভুলিয়া যায়। সে দিকে তাকাইলে দেখিতে পাইত দুই জোড়া চোখ তাহার প্রতি নিবদ্ধ, এক জোড়া ঘৃণায় জ্বল-জ্বল, আর এক জোড়া বেদনায় ছল্-ছল্।

৫

লাঙলে জমি চষিলে যেমন নীচের মাটি উপরে উঠিয়া পড়ে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে উত্তর ভারতের অবস্থায় তেমনি সব ওলট পালট হইয়া গেল। বিদ্রোহের আগে যেমনটি সাজানো ছিল বিদ্রোহের পরে তাহার পরিবর্তন ঘটিল। মানুষ যে কে কোথায় গেল তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। দলত্যাগী সিপাহীরা অনেকে তরাই ও নেপালে চলিয়া গেল, অনেকে নিজের জেলা ছাড়িয়া অন্য নামে অন্য জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

গ্রামের চেয়ে শহরগুলিতেই বিপর্যয় বেশি ঘটিল। ইংরেজদের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল চারিদিকে নানা অসম্ভব স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। সিপাহী ও কোম্পানী দুই পক্ষই চরম বর্বরতা করিল। মানব চরিত্র সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু আশা পোষণ করেন তাঁহারা সে বিষয়ে যত কম আলোচনা করেন ততই মঙ্গল।

প্রচণ্ড কাল বৈশাখীর ঝড় থামিয়া গেলে গৃহস্থ যেমন বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র ও আত্মীয় স্বজনকে খুঁজিতে বাহির হয় উভয় পক্ষেরই সেই অবস্থা হইল। অনেকেরই সন্ধান মিলিল না, আবার অনেককে অভাবিত সব স্থান হইতে পাওয়া গেল।

ওয়াজেদ আলি মিস মার্দালিন জ্যাকসনকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। মার্দালিন বিদায় হইবার পরে ওয়াজেদ আলি তাহার আর কোন সংবাদ পায় নাই। ছায়া যেমন কখনো সঙ্গ ছাড়ে না, অন্ধকারে দেহের সঙ্গে মিশিয়া থাকে, আলোতে এদিকে ওদিকে সঞ্চরণ করে মার্দালিনের স্মৃতি দিনে রাত্রে তেমনি তাহার মনে লাগিয়াই রহিল। প্রথমে সে এই স্মৃতিকে গ্রাহ্য করিত না, পরে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইবার নয়। ওয়াজেদ আলি বুঝিল মানুষের চেয়ে তাহার স্মৃতি প্রবলতর; মানুষকে এড়াইয়া চলা যায়, কিন্তু তাহার স্মৃতিকে! মার্দালিনের প্রত্যেকটি কথাকে, ব্যবহারকে শত সহস্রবার সে এপিঠ-ওপিঠ করিয়া ঝাড়িয়া পিটিয়া দেখিয়াছে প্রত্যেকবার আশার আশ্বাসের প্রেমের নূতন নূতন শস্যকণা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার রোগখিন্ন, ভয়পাণ্ডুর মুখের সেই হাসি। সে হাসি যে ক্রমে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। আর সেই যে বিদায় কালে হাতের উপরে সে একটুখানি চাপ দিয়াছিল সেই স্থানে মুগ্ধ পুরুষ কতবারই না চুম্বন করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি জ্বালা কমিয়াছে? কিছু-মাত্র না। বরঞ্চ ঘৃতনিষিক্ত বহ্নির মতো তাহা অধিকতর তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, সেই বহ্নির দাহ তাহার সমগ্র শরীরের শিরা উপশিরায় সঞ্চালিত হইয়া গিয়া অনুক্ষণ রী-রী করিতে থাকে। তাহার আত্মীয় স্বজন তাহার ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া বলে যে ওয়াজেদ আলি বাউরা হইয়া গিয়াছে, ঘনিষ্ঠ দুই-চারজন দোস্ত যাহারা প্রকৃত ইতিহাস জানে তাহারা বলে মিসি বাবার শোকে ওয়াজেদ আলি মস্তানা হইয়া গিয়াছে। ওয়াজেদ আলি কিছুই বলে না, চুপ করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, বাহিরে কেবল বালুর স্তূপ, ভিতরে অনন্ত রসপ্রবাহ। অবশেষে একদিন রাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া মিস মার্দালিনের সন্ধানে সে বাহির হইয়া পড়িল।

৬

কাজটি সহজ নয়। প্রকাণ্ড দেশের মধ্যে মুষ্টিমেয় ইংরেজ নরনারীর কোথায় কে আছে কে বলিবে। তার উপরে মিস মার্দালিনের ঐ নামটি ছাড়া আর কোন পরিচয় তাহার জানা নাই। তা ছাড়া একজন নগণ্য নেটিভের পক্ষে ইংরেজ মহিলার সন্ধানে বিপদও আছে। তখনো জোর ধর-পাকড় চলিতেছে। সিপাহী পক্ষ ভুক্ত হইয়াও ওয়াজেদ আলি যে কিভাবে বাঁচিয়া গেল সে এক রহস্য। আবার মার্দালিনের সন্ধানে বাহির হইয়া অনেক স্থানে সরকারী লোকের হাতে সে ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরীহ বাউরা বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রকৃতিস্থ থাকিলে সে বুঝিতে পারিত কাজটি কত কঠিন। এক এক সময়ে তাহার মন ভাঙিয়া পড়িত, মনে হইত মার্দালিনকে খুঁজিয়া পাইবার সম্ভাবনা বুঝি নাই। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ পুরুষের কখনো মনে হইত না যে আরও একটা সম্ভাবনা থাকিতে পারে। যদিই বা তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ইংরাজ নরনারীর গৃহ তো কাইজারবাগের বন্দীশালা নয়। এ আশঙ্কা তাহার মনে একবারও উদিত হইত না, সে ভাবিত মিস মার্দালিন ঠিক তেমনিভাবে তাহাকে গ্রহণ করিবে বন্দীশালায় যেমন করিত। হাতের সেই স্থানটায় একবার চুম্বন করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে চলিতে আরম্ভ করিত। সুখ প্রকৃতিস্থের জন্য নয়, এ সংসারে অপ্রকৃতিস্থরাই কিঞ্চিৎ সুখী।

ওয়াজেদ আলি প্রথমে কানপুরে গেল, সে জানিত যে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ নরনারী কানপুরে চলিয়া গিয়াছে। কানপুরে আসিয়া সন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে লখনৌ শহর হইতে আনীত সমস্ত অসামরিক ইংরেজ নরনারী এলাহা-বাদে গিয়াছে, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। ওয়াজেদ আলি এলাহাবাদে আসিল। সেখানে চার পাঁচ মাস কাটাইল, হোটেলে ক্যান্টনমেণ্টে কত স্থানেই না সন্ধান লইল, কখনো কখনো দু' একজন ইংরেজ তরুণীকে দূর হইতে দেখিয়া মুহূর্তের জন্য চমকিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোথায় মার্দালিন! মরীচিকারও একটা অস্তিত্ব আছে. মার্দালিন বুঝি তাহার চেয়েও দুষ্প্রাপ্য।

সেখানে এক হোটেলে খানসামার কাজ সে লইয়াছিল, খাওয়া পরা চলিবে, আর মার্দালিনের সন্ধান যে ঐ সূত্রেই করিতে হইবে, তাহাও সে জানিত। সেখানে অন্য এক খানসামার কাছে গল্পে গল্পে শুনিল যে কানপুর হইতে ইংরেজ নরনারীর দল এলাহাবাদে তিন চার মাস থাকিয়া দেশের অবস্থা একটু শান্ত হইলে কলিকাতার দিকে যাত্রা করে। সেই দিন সন্ধ্যাতেই কলিকাতা-গামী ডাকের গাড়ীতে সে স্থান করিয়া লইল। মার্দালিনের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যে সে একটি সোনার আংটি তৈয়ারি করিয়া লইয়াছিল ডাক গাড়ীর মাশুল জোগাইতে সেটি বিক্রয় করিয়া ফেলিল। ওয়াজেদ আলি ভাবিল না হয় তাহার সন্ধান পাইবার জন্যই দিলাম, তাহাকেই দেওয়া হইল। প্রেমিকের বিচিত্র যুক্তি। যথাসময়ে সে কলিকাতায় পৌঁছিল।

৭

সেদিন শনিবার। কিছুকাল সাহেব সুবোর সন্ধানে থাকিয়া ওয়াজেদ আলি বুঝিয়াছে যুদ্ধকাল ছাড়া অন্য সময়ে

ইংরাজকে হয় তাড়িখানায় নয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে পাওয়া যায়। সে সরাসরি ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে চলিল। রেস কোর্সে পৌঁছিয়া সে দেখিল যে ঘোড়দৌড় শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জনতা তখনো অপসৃত হয় নাই। প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল বিশাল বপু জেনারেল উট্টাম খুব দর কষাকষি করিয়া এক জেলের কাছে তপসী মাছ কিনিতেছেন। লখনৌ শহরে সে উট্টামকে দেখিয়াছিল। তাঁহার আশেপাশে গুচ্ছে গুচ্ছে অনেক ইংরেজ নরনারী মুগ্ধ দৃষ্টিতে জেনারেল সাহেবের দর কষাকষি দেখিতেছিল। ওয়াজেদ আলির দৃষ্টি এক গুচ্ছ হইতে গুচ্ছান্তরে ফিরিতেছিল মাদলিনের সন্ধানে। এমন সময়ে হঠাৎ তাহার বনিয়াদের মূল অবধি কাঁপিয়া উঠিল —সে দেখিল অদূরে একটি গুচ্ছের মধ্যে মাদলিন। কাইজারবাগের বন্দীশালার সেই ত্রেসপান্ডুর ভীতিবিহ্বল তরুণী নয়, স্বাস্থ্য সৌভাগ্যে সমুজ্জ্বল কান্তিময়ী যুবতী। আর কেহ হইলে এ দুই যে এক বুঝিতে পারিত না। কিন্তু প্রেমের দৃষ্টির অসাধ্য কি? ওয়াজেদ আলির মনে হইল লক্ষ নরনারীর মধ্যেও প্রথম দৃষ্টিতেই মাদলিনকে সে চিনিতে পারিত। তারপরে তাহার মনে হইল এখন কর্তব্য কি? সরাসরি তাহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইবে। না, না, তাহা সম্ভব নয়। নিজের চেহারা ও পোশাকের দিকে তাকাইয়া সে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। এভাবে কেহ প্রেম-পাত্রীর কাছে যায় না। লখনৌ পরিত্যাগের পরে এই প্রথম সে নিজের দিকে দৃষ্টি দিল। কি হইয়াছে? মুখ শুষ্ক, চুল দাড়ি এলোমেলো, জামা ও পায়জামা ছিন্ন আর মলিন। সে স্থির করিল আজ গোপনে মাদলিনকে অনুসরণ করিয়া তাহার বাসস্থান দেখিয়া লইবে, আর আগামীকল্য সুপ্রভাতে সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রণয়নীর সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপিত করিবে, প্রেম-নিষ্ঠার চরম পুরস্কার দাবী করিবে। গোপনীয়তার দূরত্ব রক্ষা করিয়া সে মাদলিনকে অনুসরণ করিল এবং পার্ক স্ট্রীটের যে বাড়িটিতে সে প্রবেশ করিল তাহা মনে মনে টুকিয়া লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।

৮

দীর্ঘ ভ্রমণপথে ওয়াজেদ আলি একটি ছোট ব্যাগ কখনো হস্তচ্যুত করে নাই, করিবার কথা মনেও ভাবে নাই। শুভ লগ্নের জন্য ঐ ব্যাগটিতে কয়েকুটি কাপড় সঞ্চিত ছিল, একটি চুড়িদার পায়জামা, একটি পিরান, একটি রেশমের আচকান, শাদা কাপড়ের উপরে কাজ করা একটি লখনৌ টুপি, জরির ফুল তোলা এক জোড়া নাগরা জুতা, একটু আতর, আয়না আর চিরুনি। এই পোশাকে সাজিলে তাহাকে খুব সুন্দর দেখায়, কল্পনা নয়, স্বয়ং মাদলিন তাহাকে এইরূপ বলিয়াছিল। একদিন এই পোশাকে সজ্জিত হইয়া বন্দীশালায় ঢুকিলে মাদলিন দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া পরিহাস-মিশ্রিত উল্লাসে বলিয়াছিল কুর্নিশ নবাব সাহেব। ওয়াজেদ আলি মাদলিনের চোখে চকিতের জন্য সেই আর্তি লক্ষ্য করিয়াছিল সুপুরুষ দর্শনে সুন্দরী রমণীর মনে অজ্ঞাতসারে যে-ভাব উপজাত হইয়া থাকে। সেদিনের কথা সে কখনো ভুলিতে পারিবে কি? তাই মাদলিনের সন্ধানে বাহির হইবার সময়ে ঐ পোশাকটি সে সঙ্গে লইতে ভোলে নাই। একদিন ঐ পোশাক পরিবার অবকাশ আসিবে, আবার মাদলিনকে চমকিত করিয়া দিয়া সৌন্দর্যের অভিবাদন সে আদায় করিয়া লইবে—ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস, তাহার সংকল্প। সে ভাবিল আজ সেই শুভদিন সমাগত অথবা আগামীকল্য প্রভাতে সেই শুভদিন।

প্রতীক্ষার দীর্ঘ রাত্রি আর শেষ হয় না। অনেকক্ষণ সে পোশাকগুলি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সংস্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, চুল দাড়ি ছাঁটিয়া সুবিন্যস্ত করিয়াছে, এখন রাত্রি শেষ হইলে হয়। কিন্তু রাত্রি আর কিছুতেই নড়িতে চায় না। অবশেষে সে রাত্রিও শেষ হইল। পূর্বদিক একটুখানি ফিকা হইবামাত্র সে শয্যাত্যাগ করিয়া স্নান করিয়া লইল, পোশাক পরিল, চুল দাড়ি সুসংস্কৃত ও সুবিন্যস্ত করিল, একটুখানি আতর মাখিল, তারপরে আয়না হাতে করিয়া ভোরের আলোয় নিজেকে একবার দেখিয়া লইল। মাদলিনের সেদিনের বিস্মিত উল্লাসের স্মৃতি মনে পড়িয়া তাহার ওষ্ঠাধরে পৌরুষের গর্ব মিশ্রিত হাসির রেখা ফুটিল। জগতের সেই আলো-আঁধারির মুহূর্তে তাহার মনে হইল সুন্দরী মাদলিন যে সুপুরুষ ওয়াজেদ আলিকে ভালোবাসিবে তাহার চেয়ে সহজ ও সম্ভব আর কি হইতে পারে? স্বস্তির একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে সগর্বে পরম নিশ্চিন্তভাবে মাদলিনের আবাসের দিকে পার্ক স্ট্রীট ধরিয়া রওনা হইল।

বেশিদূর যাইতে হইল না, পার্কস্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত পৌঁছিতেই সে দেখিতে পাইল যে শুভ্র রেশম বস্ত্র পরিহিতা মাদলিন শারদীয়া ঊষার মতো প্রতি পদ সঞ্চারে লাবণ্যবিক্ষেপ করিতে করিতে ময়দানের দিকে চলিয়াছে। তাহার অরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া বিস্ময়ে উল্লাসে গর্বে ওয়াজেদ আলির মন ভরিয়া উঠিল, সে দ্রুতপদে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মাদলিন চলিয়া গেল। ওয়াজেদ বুঝিল এতদিন পরে দেখিয়া মাদলিন তাহাকে চিনিতে পারে নাই। মাদলিনের প্রত্যাবর্তনের আশায় সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মাদলিন যখন ফিরিল সে আর দ্বিধা না করিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং চোখে পরিচয়ের দ্যুতি প্রকাশ করিয়া অভিবাদন করিল। মাদলিন তাহার দিকে তাকাইল, কিন্তু তাহার চোখে পূর্ব পরিচয়ের কোন স্মৃতি চমক মারিয়া গেল না, বিস্ময় ও কৌতূহলের মাঝামাঝি সুরে সে শুধাইল কেয়া মাঙ্তা?

'কেয়া মাঙতা' এ প্রশ্নের কি উত্তর সম্ভব। কি উত্তর দিবে, আদৌ দিবে কি দিবে না ভাবিতে ভাবিতে মাদলিন অনেক দূরে চলিয়া গেল। ওয়াজেদ আলি মূঢ়ের মতো হতচৈতন্য অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। যখন সম্বিৎ তাহার কিছু ফিরিল কানে শুনিতে পাইল—ও মডু, সো লেট টুডে। উল্লসিত মাদলিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, বেটার লেট দ্যান নেভার।

কাম টু মাই প্লেস রব!
মাস্ট আই।
ইউ মাস্ট, ইউ নটি বয়।

পূর্ব মুহূর্তের ঘটনায় ওয়াজেদ আলির মন এমনি অসাড় হইয়া গিয়াছিল যে, দুঃখবোধ করিবার মতো শক্তিও তাহার রহিল না।

অদূরবর্তী একটি গাছের দিকে তাহার চোখ পড়িল, দেখিল তাহার তলায় অনেক-গুলি শালিখ জটলা করিয়া মারামারি ও কলরব করিতেছে, সেই দৃশ্য দেখিয়া সে এমন এক প্রকার কৌতুক অনুভব করিল যে, আর সব ভুলিয়া গিয়া সেই দিকেই অনন্যমনা হইয়া তাকাইয়া রহিল।

শিলচরের 'ধামাইল' ও 'বউ নাচ'

শান্তিদেব ঘোষ

বহুদিন থেকেই নানাপ্রকার নাচ দেখে বেড়াচ্ছি ভারতের নানা অঞ্চল ঘুরে, কিন্তু গ্রামসমাজে প্রচলিত বাংলা গানের সঙ্গে মেয়েদের কোন প্রাচীন পদ্ধতির নাচ দেখবার সুযোগ এতদিন আমার হয়নি। সে সুযোগ ঘটেছিল গত বছর। বর্তমানে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত শিলচর শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে ঐরূপ দুটি নাচ দেখে আমি যেমন আশ্চর্য হই তেমনি মুগ্ধও হয়েছিলাম। এতদিন শুনে আসছিলাম যে, বাংলার গ্রামে গ্রামে মেয়েদের নাচ এক সময় খুবই চল্‌তি ছিল, কিন্তু সে যে কী ধরনের নাচ তার পরিচয় পাবার সুযোগ আমার আগে হয়নি। ব্রতচারী আন্দোলনের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা 'গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় বাংলাদেশের গ্রামের কয়েক প্রকার নাচ শহরবাসী শিক্ষিতদের মধ্যে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু পুনরুদ্ধারের পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন সেগুলিকে নতুন সাজে সাজাতে। নতুন ভাবের গান রচনা করেছিলেন ও নতুন নতুন নৃত্যভঙ্গিও তাতে জুড়েছিলেন। একথা আমি বিশেষ করে বল্‌ছি ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত মেয়েদের নাচ ও গানগুলির কথা ভেবে।

যাই হোক, শিলচরে বাংলার গ্রামসমাজে একসময়ে অতিপ্রচলিত, অথচ অধুনা লুপ্ত-প্রায় মেয়েদের দুটি নাচ দেখে মনে হলো যে, বাঙলার মেয়েদের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে এমন কোন নাচ যদি থাকে ত এই দুটিই হ'ল তার খাঁটি নমুনা।

নাচ দুটি দেখালেন শিলচরের সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। বিদ্যালয়টি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে 'কামাখ্যাপদ ভট্টাচার্য' নামে একটি তরুণ যুবকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পর থেকে তাঁরই অপর ভ্রাতা ও ভগিনীরা এটিকে অক্লান্ত পরিশ্রমে চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে প্রাদেশিক সরকার বিদ্যালয়টিকে অর্থ সাহায্য করেন।

বিদ্যালয়টি যদিও অন্যান্য শহরের সংগীতবিদ্যালয়ের মত এযুগের গান-বাজনা ও মনিপুরী নাচ শেখাবার জন্যেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে বাংলার প্রাচীন সংগীত ও নৃত্যের প্রতি মমতার পরিচয় পাওয়া গেল। সেখানে গ্রামের প্রাচীন গান ও নাচের চর্চা হয়। গ্রামের নানাপ্রকার অপ্রচলিত গানও তারা সংগ্রহ করছেন। বিদ্যালয়ের সাহায্যে শহরের ছেলেমেয়েদের তা শেখাচ্ছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সকলেই শহরের স্কুল ও কলেজে পড়ে। তাদের মধ্যে এযুগের বাংলা গান, হিন্দি গান ও মনিপুরী বা Oriental নামে কথিত নাচের প্রতি ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। তাই প্রথমে যখন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঐ দুটি প্রাচীন নাচ শেখাবার কথা উঠলো, তখন দু-চারজন ছাড়া শহরের অনেকেই একাজে উৎসাহ দেখাননি। গত বছর যখন আসামে সর্বভারতীয় 'বুনিয়াদি' শিক্ষার বাৎসরিক সম্মিলন বসে, তখন এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আমন্ত্রণ করা

বউ নাচের বিভিন্ন ভঙ্গিমা। দুই হাতের পাতার নানা সংযত ভঙ্গিই এ নাচের বৈশিষ্ট্য

হয় শিলচর অঞ্চলের গ্রাম-প্রচলিত দেশী নাচ দেখাবার জন্যে। বিদ্যালয়ের পরিচালকরা কি নাচ সেখানে তাঁরা দেখাবেন তাই নিয়ে মহা ভাবনায় পড়েন। শিলচরের বৃহৎ মণিপুরী সমাজের মধ্যে মণিপুরী নাচ আছে। সে নাচ মণিপুরের দলই দেখাবে। তাই তাদের দিক থেকে একই নাচ দেখানোর অর্থ হয়না। অনেক ভেবেচিন্তে গ্রামের ঐ দুটি প্রাচীন নাচই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা সম্মিলনে দেখানো স্থির হল। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের অনেকেই তাঁদের ঐ পরিকল্পনাকে সমর্থন করতে পারেনি। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন শহরের ছেলেমেয়েরা এযুগে যাকে আধুনিক বলে, সেই রকমেরই কোন নাচ তৈরি ক'রে মেয়েদের শিখিয়ে নিলেই ভালো। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদ্যালয়ের পরিচালকেরা তাতে কান দেননি। সাহস করে শিলচরের ঐ প্রাচীন নাচ দুটিই মেয়েদের শিখিয়ে "বুনিয়াদি" শিক্ষা সম্মিলনে দেখালেন। সেখানে নাচ দুটি সমাদর পেল।

আমাকে যখন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের বিদ্যালয়ে একদিন গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নাচ ও গান দেখবার ও শোনবার জন্যে, তখন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বোধ হয় শিলচর অঞ্চলের মণিপুরীদের নাচ কিম্বা এযুগে শহরে প্রচলিত আধুনিক ভীল নৃত্য, শিকার নৃত্য বা সাপুড়ে নৃত্যজাতীয় কিছু দেখাবে। আলোচনা প্রসঙ্গে যখন ঐ অঞ্চলের প্রাচীন নাচ দুটির কথা উঠলো তখন আমি সেই দুটি দেখবার জন্যেই আগ্রহ প্রকাশ করি। পরিচালকরা আমার উৎসাহ দেখে উদ্যোগী হলেন, কিন্তু যে মেয়েরা নাচবে তাদের মধ্যে ঐ নাচ দেখাবার উৎসাহ কম বলেই মনে হল। তারা বোধহয় ভেবেছিল, গ্রামের ঐ নাচ দুটিতে তাদের নৃত্যনৈপুণ্যের সঠিক পরিচয় তারা প্রকাশ করতে পারবে না। ভাবল শান্তিনিকেতন-বাসী আমার কাছে ও নাচ দেখানো নিরর্থক। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তারা সেই নাচই নাচতে রাজী হল।

প্রথমে নাচল সঙ্গীতবিদ্যালয়ের ও শিলচর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী রেবা নাথ, গ্রামের একটি বালিকা বধূর সাজে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে, একলা। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা

গান ধরল "চাঁদবদনী ধনি নাচত দেখি," খাঁটি দেশী সুরে ও দেশী উচ্চারণে। গ্রাম্য ঢাকের ছন্দে ও তালে প্রথমে ঢিমালয়ে গানের সঙ্গে নাচটি শুরু হলো। বধূসাজে মেয়েটিও পা দুটি কাছাকাছি সমানভাবে রেখে, অল্প একটু হাঁটু মুড়ে, সামনে ঝুঁকে কেবল দুই হাতের পাতা নানাভঙ্গিতে দোলাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করলাম যে, মেয়েটি হাঁটু মুড়ে থাকলেও গানের ছন্দে ছন্দে ঈষৎ ওঠানামার একটা দোলা সর্বদাই চলছে তার দেহে। মেয়েটির পা দুটি কখনো মাটি ছেড়ে উঠছেনা। আগাগোড়াই মাটিতে পা ঘষে ঘষে, তার ডানদিক লক্ষ্য রেখেই চক্রাকারে ছন্দে ছন্দে সরে সরে

বউ নাচের পদচালনার বিভিন্ন ভঙ্গী

যাচ্ছে। এই নাচে পদচালনার বৈচিত্র্য খুব নেই। মাত্র তিনটি ভঙ্গি। সেই কটির ছবি দেওয়া হল। হাতের ভঙ্গির বৈচিত্র্য পায়ের চেয়ে কিছু বেশী কিন্তু খুবই সহজ। এত সহজ হয়েও গানের রসে, বাজনার ছন্দে ও বালিকার বধূজনোচিত ভয় ও সলজ্জভাবের মিশ্রণে নাচটি অত্যন্ত মধুর লেগেছিল।

এই নাচটিকে এ অঞ্চলে বলা হয়েছে "বউনাচ"। আমার পাশে শহরের প্রাচীন ব্যক্তি যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন বল্লেন ৫০।৬০ বছর আগেও তাঁদের গ্রামের বাড়িতে তাঁরা ঐ নাচ দেখেছেন। সে যুগে প্রথা ছিল যে, বিয়ের পর বাড়িতে নতুন বউ এলে একদিন বাড়ির বয়স্ক মহিলারা গানের সঙ্গে সঙ্গে তার নাচের পরীক্ষা নিতেন। গ্রামের ঢুলিকে ঐ উপলক্ষে ডাকা হত। বয়স্ক মহিলারা গান গাইতেন। সে যুগে নতুন বাড়িতে নতুন বউয়ের পক্ষে নাচ দেখানো যে কতখানি সংকোচের বিষয় ছিল সেকথা অনুমান করা কঠিন নয়। এ নাচ হাত ধরে কেউ কাউকে শেখায় না। বড়দের নাচ দেখতে দেখতে আপনা থেকেই মেয়েরা নাচগুলি আয়ত্ত করে। তাই গানের সঙ্গে নির্ভুল নাচ দেখাতে পারলে নতুন বাড়ির গুরুজনেরা যে সন্তুষ্ট হবেন, এই কথা মনে করে তারা নাচে উৎসাহিত হত। কথা-প্রসঙ্গে জানা গেল, আজও অশিক্ষিত নিম্নবর্ণের গ্রামবাসী মেয়েরা এ নাচ কোন কোন গ্রামে নাচে। তাদেরই একজনকে সংগ্রহ করে এই বিদ্যালয়ে মেয়েদের অনেক চেষ্টায় শেখানো হয়েছে। গানটির সঙ্গে নাচ আরম্ভে ঢিমালয়ে শুরু হলো। তাল ত্রিমাত্রিক ছন্দের। একটু একটু করে গানের লয় দ্রুত হতে লাগল, নাচও সেই লয়কে অনুসরণ করে চলল। শেষদিকের নাচটি দ্রুত ছন্দে খুবই জমে উঠল। নাচটি সম্পূর্ণ শেষ হতে সময় নিয়েছিল ১২ থেকে ১৫ মিনিটের মত।

সম্মিলিত ধামাইল নাচের একটি দৃশ্য

একটু বিশ্রামের পর ৬টি মেয়ে, বাঙ্গালী মেয়েদের মত মাথায় কাপড় দিয়ে শাড়ি পরে গোল হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গেই গান শুরু হল "যুগল মিলন হইল দেখ সখি শ্যামের বামে রাই দাঁড়াইল।" আগের গানটির মত এ গান এবং নাচও আরম্ভ হল ঢিমালয়ে, কিন্তু ধীরে ধীরে দ্রুত ছন্দে বাড়তে লাগল। এ নাচটির নাম "ধামাইল"। অনুমান করি গানগুলিকে ধামাইল গান বলা হয় বলেই বোধ হয় নাচগুলিও সেই নামেই পরিচিত। এই নাচটি গ্রামাঞ্চলের সমাজে জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত নানা উৎসব উপলক্ষে এবং বিশেষ বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। সূর্য-ব্রতের সময় সূর্যোদয়ের পূর্বেই হয় এই উৎসবের আরম্ভ। সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে থেকে নৃত্য সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান গাওয়া হয়, সূর্যাস্তের পর রাধা-কৃষ্ণের মিলনের গান গেয়ে এই উৎসবের সমাপ্তি হয়। সব উৎসব অনুষ্ঠানে এই নাচের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ের গানই কেবল গাওয়া হয়। এই ধামাইল নাচটি লুপ্তপ্রায় নয়। আজও শিলচরের গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায় দেখা যায়।

এই দলবদ্ধ নাচটি উপরোক্ত বউনাচের মত শান্ত প্রকৃতির নয়। তার তুলনায় অনেকটা জোরালো। পা তুলে মেয়েরা নাচল। পায়ের ভঙ্গির বৈচিত্র্য আগের চেয়ে কিছু বেশী। হাত তালিই হল এ নাচের একটি বিশেষত্ব। প্রত্যেক পুরো পদচালির সঙ্গে নানা ছন্দে একবার করতালি থেকে সাতবার পর্যন্ত করতালিতে শব্দ করে তারা নাচল।

পুরো এক পদচালিতে অধিকসংখ্যক করতালি সন্নিবেশ করা বিশেষ দক্ষতার পরিচয়। করতালি দিয়ে নাচবার সময় সামনে ঝুঁকে পড়ে। হাতের ভঙ্গিও বউনাচের চেয়ে বেশী। কখনো বাঁ হাত কোমরে দিয়ে কেবল ডান হাতে ভঙ্গি করে, কখনো দুহাত খুলে, কখনো কাপড়ের খুঁট একহাতে ধরে অন্য হাতে কোঁচড় থেকে যেন কিছু দিচ্ছে এই রকম ভঙ্গি করে নাচতে লাগল। বৃত্তাকারে ডানদিকে পাশাপাশি কিম্বা একজনের পিছনে অপরে থেকে, ঘুরতে লাগল। এ নাচটি শেষ হতে সময় লাগল প্রায় মিনিট পনরর মত।

ধামাইল নাচের অপর একটি ভঙ্গী

শিলচরে দেশী গানের সঙ্গে ঐ নাচের ভিতর দিয়ে আমাদের যুগ-যুগান্তরের বাঙ্গালী মেয়ে-বউদের নির্মল, বলিষ্ঠ ও আনন্দময় জীবনের একটি সত্যকার পরিচয় সেই দিনই প্রথম পেলাম।

ছায়াঘর

সন্তোষকুমার ঘোষ

ঠিক বেলা পাঁচটায় মোটরটা এসে সদরে দাঁড়ায়। হর্ন নেই, ধীরে ধীরে থামে বলে ব্রেক-কষা বা রাস্তায় চাকা-ঘষার শব্দ-টুকুও শোনা যায়। এক জোড়া জুতো সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে উঠে আসে, পুরু, কালো পর্দার বাইরে ভারি কিন্তু ভীরু গলা শোনা যায়ঃ 'আসতে পারি?'

সে-গলা প্রণতির চেনা। তাড়াতাড়ি সুব্রতর শিয়র থেকে উঠে দাঁড়ায়। চুলে চিরুনি বুলনোর দরকার নেই, মুখে গলায় হালকা পাউডার ছিটনোরও না, কেন না ঘর অন্ধকার, বেশবাস বিন্যস্ত থাকলেই হল।

মৃদু গলায় বলে, 'আসুন, ডাক্তার মৈত্র।'

বিকেলের মরা আলো ঘরের মধ্যে একবার ঝলসে উঠেই মিলিয়ে যায়। বোঝা যায় ডাক্তার ঘরে এসেছে। পর্দাটা যথাস্থানে ফিরে একটু একটু কাঁপতে থাকে। অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় বিছানা থেকে দুর্বল কিন্তু তীক্ষ্ণ একটি কণ্ঠ হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেঃ 'কে।'

ডাক্তার বলে, 'আমি।' পরিচিত ঘর, অন্ধকারেই সে তার নিজের আসনটি খুঁজে পায়। বিছানার পাশেই ছোট টেবিলে মেজার গ্লাস, শিশি, মালিশের কৌটো রাখা, তবু ঠোকর খেতে হয় না। আগের মতই ভারি কিন্তু ধীর গলায় ডাক্তার আবার বলে 'আমি। তুমি ঘুমোওনি সুব্রত?'

বিরক্তিসূচক একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে সুব্রত পাশ ফেরে, বোঝা যায়। বালিশে মুখ গুঁজে অস্থির ভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, 'না, না, না। ঘুম নেই। তুমি আবার কেন এলে ডাক্তার।'

এই প্রশ্নে ডাক্তার কি একটু চমকে যায়। কয়েকটি মুহূর্ত একটি টিক্‌টিক্-ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে সেকেণ্ডের জপমালা গোনে। তারপর কৈফিয়তের সুরে ডাক্তারকে বলতে শোনা যায়, 'তোমাকে দেখতে আসি সুব্রত।'

বালিশে মুখ ঢাকা, সুব্রত একটি খিল খিল হাসি চাপতে চেষ্টা করছে কিনা, স্পষ্ট বোঝা যায় না। শুধু তার পরিহাস-লঘু গলা শোনা যায়—'এই অন্ধকারে আমাকে কি দেখা যায় ডাক্তার।'

ডাক্তার বুঝি বলতে চেয়েছিল 'অন্ধকার তো তোমার ভালোর জন্যেই সুব্রত', কিন্তু কানের পাশে অস্বস্তিতে কয়েক গাছি চুড়ি রিণরিণ করে উঠতেই ডাক্তার থেমে গেল। এই অন্ধকারে প্রণতির উপস্থিতিটা অশরীরী অনুভূতিমাত্র ছিল, এতক্ষণে সেটা যেন শ্রুতিতে, অন্তত একটি ইন্দ্রিয়ের বোধে, ধরা দিয়েছে।

আবার সেই ঘড়ির টিক্‌টিক্ কিছুক্ষণ। এতক্ষণে অন্ধকারও যেন ফিকে হয়ে এসেছে, ছায়া-ছায়া একটি দেহ-রেখা দেখা যাচ্ছে বিছানায়, কুণ্ঠিত, সন্দিগ্ধ, লুপ্তপ্রায়। আপন মনেই মাথা নেড়ে নেড়ে সুব্রত ব'লে গেল, 'অন্ধকারে আমাকে দেখা যায় না। আয়াম্ কিং অব্ দি ডার্ক চেম্বার। তুমি 'রাজা' পড়েছ ডাক্তার।'

ডাক্তার পড়েনি। পড়লেও এ-প্রশ্নের জবাব দিত না।

অনেকক্ষণ কারও কোন কথা শোনা গেল না। ঘর শুধু অন্ধ নয়, বোবাও। একটি ঘড়ি, দুটি চুড়ি, আর সব চুপ। সেই চুড়ির দিকে চেয়ে ডাক্তার বললে, 'এই ওষুধগুলোই রিপীট হবে। প্রেসক্রপশনটা দিন, লোকের হাতে পাঠিয়ে দেব।'

বিছানার নীচে থেকে প্রণতি একটা কাগজ বার করে ডাক্তারের হাতে তুলে দিল। আঙুলে আঙুল ঠেকল। চমকে উঠল ডাক্তার। এতক্ষণ যাকে চোখে দেখতে পায়নি, তাকে স্পর্শ দিয়ে দেখল।

আর বসে থাকার অর্থ নেই। ডাক্তার তবু খানিকটা বসে থেকে থেকে শুধু মেজেয় জুতো ঘষল।

'তুমি একটু ঘুমোও সুব্রত। ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবে।' বিড়বিড় করে সুব্রত বলল, 'ম্যাকবেথ শ্যাল স্লীপ নো মোর। আর ভয়ের কথা কী বলছ। ভয় আমি পাইনে। কাউকে না, কিছুতে না। এই যে তুমি রোজ রোজ আসছ, তবু কি ভয় পেয়েছি ডাক্তার?' বলতে বলতে হেসে উঠল সুব্রত, মুখভঙ্গি অন্ধকারে দেখা গেল না, কিন্তু তীক্ষ্ণ কয়েকটি তীর ডাক্তারের মর্মভেদ করে যেন সমুখের দেয়ালে বিদ্ধ হল।

তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাইরে এল। এসেও কেন যে বিমূঢ় এক পল দাঁড়িয়ে রইল সে নিজেই জানেনা। সে কি ভেবেছিল যতক্ষণ কপাল আর ঘাড়ের ঘাম রুমালে মুছবে ততক্ষণ পর্দার ওপাশে খালি দুটি পা এসে দাঁড়াবে, দু'গাছি হালকা চুড়ি বেজে উঠবে, আর মৃদু একটি কণ্ঠ বলবে, 'আবার আসবেন?'

সিঁড়ি দিয়ে তরতর নেমে যায় ডাক্তার। মোটর-ইঞ্জিনটা স্পর্শমাত্র প্রাণ পেয়ে থরথর কাঁপে। মুখ বাড়িয়ে ডাক্তার একবার হয়ত উপরে, জানলার দিকে, তাকায়, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। ভুলটা টের পেতে কিছুমাত্র দেরি হয় না। জানালায় ফোকরও যে পুরু পর্দায় ঢাকা—আশ্চর্য, এই কথাটা তার মনে ছিল না?

সুব্রত অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এই নিষ্ঠুর সত্যটা প্রণতি প্রথম বিশ্বাস

করেনি, ওষুধের পর ওষুধ বদলেছে, ডাক্তারের পর ডাক্তার। দীর্ঘ আট বছর ধরে দিনের পর দিন নিজেকে শুধুই সান্ত্বনা দেবার কাহিনী।

আজও যখন হঠাৎ একদিন বিকেলে আকাশ মেঘে ছেয়ে আসে, রাস্তার শীর্ণ, উপোসী নিমগাছটার ন্যাড়া ডাল থেকে থেকে কাঁপে, একরাশ হু হু ধুলো সহসা এই সদাস্তিমিত ঘরে ঢুকে প'ড়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, ছায়া ঘনতর হয়, পাতা ছিঁড়ে গিয়ে ক্যালেণ্ডারটা পৃথিবীর বয়স নিমেষে দু'মাস বাড়িয়ে দেয়, প্রণতি জানালার পাট বন্ধ করবে কি, পর্দাটাকেও একপাশে সরিয়ে আনে, দু'টি শিকের ফাঁকে মুখখানি চেপে ধরে ফোঁটা ফোঁটা বর্ষার জল মাখে। ঝাপসা আকাশটা এখন কোন নিকূল নদীর মত, তার ওপারে চেয়ে থেকে থেকে আরও একটি দিনের কথা মনে পড়ে।

রেজেস্ট্রি অফিস থেকে ওরা নাম সই করে যেদিন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল সেদিনও এমনি ঝর্ঝর বৃষ্টি। প্রণতি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এবার?'

সুব্রত বলেছিল, 'চল আমাদের বাড়ি। বাবা মাকে সব বলি। তাঁরা নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করবেন।'

আশীর্বাদ তাঁরা করেন নি। ফের যখন ওরা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল তখনও টিপ টিপ থামেনি। প্রণতিকে আবার বলতে হল, 'এবার?'

'চলো তোমাকে বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে আসি।' ওদের বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত প্রণতিকে পেঁৗছে দিয়েছিল সুব্রত। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত টেনে নিয়ে বলেছিল, 'আজ আর ওপরে যাবনা। তুমি একটি মাস আমাকে সময় দাও, লক্ষ্মীটি।'

এক মাস নয়, সব ব্যবস্থা করতে সুব্রতের মাত্র কুড়ি দিন সময় লেগেছিল। ছোট কলেজে একশো পাঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি। ছোট্ট, দেড়খানা ঘরের বাসা, চল্লিশ টাকা ভাড়া। ওরা যেদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে এ-বাসায় উঠে এসেছিল, আশ্চর্য, সেদিনও সারা বিকেল জুড়ে একটানা একঘেয়ে বৃষ্টি। কয়েকটি বর্ষার সন্ধ্যার সঙ্গে প্রণতির জীবনের কয়েকটি ঘটনা এমন একাঙ্গ মিশে আছে!

অল্প আয়, ভাল চলত না। আপন লোকেরা সবাই পর হয়ে গিয়েছিলেন, কেউ কোন খোঁজ খবর নেননি। মাঝে মাঝে সুব্রতর কয়েকজন বন্ধু আসত, এককেটি সিঁদুর সন্ধ্যা চায়ের ধোঁয়া আর সিগারেটের ছাইয়ে ভরে দিয়ে চলে যেত।

তারপর তাদেরও আসা-যাওয়া কমে গেল। কেননা, আয় বাড়াতে সুব্রতকে তিনটে ট্যুইশনি নিতে হল। রাত জেগে লিখতে হত ছাত্রবন্ধু নোট। উদয়াস্ত, অস্তোদয় খাটুনি। প্রাণ রাখার প্রাণান্ত প্রয়াস। বিকিয়ে গেল অনেক সোনা সকাল, অভ্র দুপুর, রুপোলি বিকেল—সব ক'টি মুহূর্তে যেন এক দুশ্ছেদ্য লৌহরাত্রির দেয়ালে বন্দী।

একদিন দুপুরে দু'টো না বাজতে সুব্রত কলেজ থেকে ফিরে এল। প্রণতির মনে আছে সেদিন সিঁড়িতে অকাল পদধ্বনি শুনে সে অবাক হয়ে ছিল।—'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে তুমি? আজ কলেজে কম কাজ ছিল বুঝি। চল না একটু ঘুরে আসি। কতদিন আমি এই ঘরখানি ছেড়ে বেরোইনি বল তো।'

উত্তর না দিয়ে সুব্রত সটান বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। চোখ দু'টি ঢেকে বলেছিল, মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। একটু টিপে দেবে?

শুধু যন্ত্রণা নয়, জ্বর। সেই জ্বর একুশ দিন পর ছেড়েছিল। আবার কাজে যোগ দিল সুব্রত, কিন্তু আগেকার মত উৎসাহে নয়। ট্যুইশনি ছাড়তে হল দু'টো, নোট লেখাও। বলত, 'বেশি খাটতে পারিনে। পিঠে লাগে। চোখ জ্বালা করে।'

প্রণতি বলল, 'কাজ নেই খেটে। এই টাকাতেই আমি বেশ চালিয়ে নিতে পারব।'

সেই নীল-নির্মল শীতের বিকেলটির কথা প্রণতির মনে আছে। সুব্রত ঘরে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে ওকে ডাকল, 'শোন, শোন, শুনে যাও।'

তাড়াতাড়ি চায়ের কেৎলি ফেলে উঠে এল প্রণতি। শুনল বিরক্ত গলায় সুব্রত বলছে, 'জানালাটা বন্ধ করে রেখেছ কেন। কিছু পড়তে পারছি না।'

জানালা বন্ধ? অবাক হয়ে প্রণতি একবার খোলা জানালা একবার সুব্রতর চোখের দিকে চেয়ে রইল। প্রতিবাদ করতেও ভুলে গেল। অসহায়ের মত সুব্রত কেবলি থেকে থেকে মাথা নাড়ছে আর বলছে 'খুলে দাও, খুলে দাও। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'ভাল করে একবার চেয়ে দেখ তো।'

চোখ রগড়ে উঠে বসল সুব্রত, বলল, 'তাইতো। অথচ আমি ভেবেছিলাম ঠাণ্ডা কালো অন্ধকারে ঘরখানা ভরে গেছে? একটা অক্ষরও পড়তে পারছিলাম না। কিন্তু বৃষ্টি নেমেছে তুমি দেখতে পাওনি প্রণতি? জলের ঝাপ্টায় এখুনি ভেসে যাবে যে। বন্ধ করে দাও, বন্ধ করে দাও জানলা।'

জানালার সামনে গিয়ে প্রণতি বলল, কোথায় বৃষ্টি। এখনো আকাশে রোদ রয়েছে, তুমি দেখতে পাওনা?'

'রোদ?' করুণ, ভয়ার্ত চীৎকার করে সুব্রত বলল, 'এখনও রোদ আছে? অথচ আমি যে স্পষ্ট দেখছি প্রণতি, সব ঝাপসা হয়ে গেছে, ফোঁটা ফোঁটা জল চুঁইয়ে পড়ছে আকাশ থেকে।'

'দেখছ?'

সুব্রত নিজেকেই নিজে বিশ্বাস-না-করা গলায় বলল, 'দেখছি।'

প্রণতি আর কোন কথা না বলে, এতটুকু শব্দ না করে, জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ডাক্তার এল, ওষুধ। অন্য ডাক্তার, অন্য ওষুধ। কিন্তু সুব্রতর দৃষ্টিভ্রম ঘুচল না। অসুখটাই ধরতে পারলেন না কেউ। একজন ক্যালশিয়মের ঘাটতি ভেবে ইনজেকশনের পর ইনজেকশন দিলেন, আর ভিটামিনের অভাব মেটাতে পুষ্টিকর খাবারের ফর্দ; সেই ফর্দ হাতে করে প্রণতি কিছুক্ষণ পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, কলেজ থেকে দীর্ঘ ছুটি নিতে হয়েছে সুব্রতকে, শেষ ট্যুইশনিও গেছে।

একদিন শুধু প্রণতি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বাবা মাকে খবর দিই?'

নিমীলিত চোখ দুটির নীচে সুব্রতর চিবুকের পেশি কঠিনতর হয়েছিল। বলেছিল, 'না।'

সুব্রত অন্ধ হয়ে যাবে।

স্পেশালিস্ট ডাক্তার ফিসফিস করে এই নিষ্ঠুর নিয়তির কথা প্রণতিকে জানিয়েছিলেন। আশ্চর্য, তবু ভিজিটের টাকা তুলে দেবার সময় প্রণতির হাত কাঁপেনি।

স্পেশালিস্ট ভরসা দিয়েছিলেন, 'একেবারে হতাশ হবেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অপ্‌টিক্যাল নার্ভগুলো সব মরে গেছে বটে, তবে পরিপূর্ণ বিশ্রাম পেলে আবার সব ঠিক হতেও পারে। এ রোগের ডাক্তার হল সময়, আর ওষুধ হল রেস্ট অ্যাণ্ড পীস।'

দরজা জানালায় গাঢ় কালো ঢাকনা, সুব্রতর দৃষ্টি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে, আলোতে যন্ত্রণা বাড়ে।

এই ডাক্তার এসেছে আরও অনেক পরে। চাপা-ভয় ছায়া-ঘরে ক্ষয়িষ্ণুদৃষ্টি রোগীর শিয়রে ইতিমধ্যে প্রণতির একটির পর একটি দিন কেটে গেছে, মাসের পর মাস। সাহায্যকাস্ত বন্ধুরা ততদিনে ফিরে

বীরভূমের প্রান্তর (পেন্সিল স্কেচ) শ্রীনন্দলাল বসু

নোটিশে আসা-যাওয়া বন্ধ করেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। নোট প্রকাশকেরা মাঝে মাঝে যে টাকা পাঠায়, তাতে কোনমতে বাড়ি ভাড়া কুলোয়, হয়ত ঠিকে ঝির মাইনেও, তার বেশি কিছু না। চিকিৎসা বন্ধ, প্রণতির নিজস্ব গোপন সঞ্চয়ও খালি হয়ে এসেছিল।

এই ডাক্তার এসেছিল তারও পর। সেদিনও হর্ন দেয়নি, সরাসরি উপরে এসে দরজায় টোকা দিয়েছিল।

ঠিকে ঝিটার তখন কী কাজ বাইরে। পর্দা ঠেলে প্রণতিকেই বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। মিনিট খানেক কোন কথা বলেনি ডাক্তার। নির্নিমেষ নির্লজ্জ চোখে প্রণতিকে খুঁটিয়ে দেখেছিল।

সেই দৃষ্টি প্রণতি সহ্য করতে পারেনি। আগন্তুকের মুখের উপরই দরজা বন্ধ করে দেবে কিনা হয়ত একবার তাও ভেবেছে। এই তো ক' মাস মাত্র বাইরের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে নিরালোক ঘরখানায় অহরহ আশ্রয় নিয়েছে প্রণতি, এরই মধ্যে কি এমন পাণ্ডুরতা এসেছে তার কপোলে যে পুরুষের চোখে সে আব শায়া-শাড়ি-মোড়া রক্ত মাংসের মেয়ে নয়, ডিসেকশন টেবিলের নাবরণ একটা শরীর মাত্র?

'এটা কি সুব্রত রায়ের বাসা?' ডাক্তারের প্রশ্নে বিমূঢ়তা কেটেছে, কোনমতে 'হ্যাঁ আসুন' বলে এক রকম ছুটে প্রণতি ফের ঘরে গিয়ে লুকিয়েছে।

ডাক্তারও এসেছে পিছে পিছে।

'কে?' হঠাৎ ঘুম ভেঙে সুব্রত চেঁচিয়ে উঠেছিল। ওর বিছানার এক পাশে বসে ডাক্তার বলে, 'আমাকে চিনতে পারলে না সুব্রত? অথচ কলেজে একসঙ্গে কত দিন—'

সুব্রতর শীর্ণ মুখে একটু হাসির আভাস দেখা দেয়। ধীরে ধীরে বলে 'বোধ হয় চিনেছি। দেখতে তো ভাল পাই না। শুধু গলা শুনে বুঝতে চেষ্টা করি। তুমি বিলেত থেকে কবে ফিরলে অরুণ?'

ডাক্তার বলে, 'বেশি না, এই তো ক' মাস। তোমার খবর অনেক দিন খোঁজ করেও পাইনি। সেদিন একজন ঠিকানাটা দিলে। আজই আসবার ফুরসৎ পেলুম। তোমার কিছু হয়নি সুব্রত, আমার হাতে যখন পড়েছ তখন সেরে যাবে। আর ভয় নেই।'

আস্তে আস্তে সুব্রত বলল, 'না, আর ভয় নেই।'

সুব্রতকে অনেকক্ষণ ধরে ডাক্তার পরীক্ষা করেছিল। বহু দিন পরে আলো জ্বলেছিল সেই ঠাণ্ডা বন্ধ ঘরে। পরীক্ষা-শেষে

ডাক্তার বলেছিল, 'সুইচটা অফ করে দিন'। এখানে ভাল বুঝতে পারলাম না। ওকে একদিন আমার চেম্বারে নিয়ে যেতে হবে।'

দু' বন্ধুর গল্প সেদিন সহজে ফুরোয়নি। ডাক্তার উঠে দাঁড়াতেই সুব্রত বলেছিল, 'একটু ব'স, কত দিন পরে দেখা হল। একেবারে একা থাকি।'

একা থাকি। সুব্রতর কণ্ঠস্বরের হাহাকার-টুকু হয়ত ডাক্তারের অন্তর স্পর্শ করে থাকবে। অন্তত তখনই উঠতে পারেনি।

প্রণতি রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে জানালার সমুখে দাঁড়িয়েছে। শুনল সুব্রত জিজ্ঞাসা করছে, 'ডাক্তার, এখনও বিয়ে করনি?'

এই প্রশ্নের উত্তর শুনতে প্রণতিও কেন-যে আড়চোখে ফিরে চেয়েছিল, সে নিজেও জানে না।

'নু-নাঃ, কই আর করলুম।' অতি মৃদু নিরুত্তাপ গলায় ডাক্তার বললে। সেই নিস্পৃহতায় প্রণতি চমকে উঠেছিল। সুব্রত যদি জিজ্ঞাসা করত, 'আজ বিকেলে চা খাওনি?' —ডাক্তার তখনও হয়ত এই সুরেই বলত, 'নাঃ, কই আর খেলুম।'

'বিয়ে করলে না কেন।'

তরল গলায় ডাক্তার বলে উঠল, 'আই'ড্ হ্যাভ্ বীন এ ফুল ইফ আই ডিড্।' তবু প্রণতির মনে হ'ল, এই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীটা খাঁটি নয়, এই চমকটুকু ধার-করা।

সুব্রত তবু ছাড়ল না।

'তোমার সেই দূর-সম্পর্কের আত্মীয়াটির খবর কী ডাক্তার। তাকে বিয়ে করলে না কেন।'

স্পষ্টই বোঝা যায়, ডাক্তার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। প্রণতি ওকে রুমাল বার করে একবার কপাল একবার ঘাড় মুছতে দেখল।

'ও-কথা থাক, সুব্রত।'

বাইরে শেষ-বর্ষার ধারা, অল্প-অল্প হাওয়া। সুব্রত বলল, 'বলো না, বলো না ডাক্তার, একটু শুনি।' বাদলা আবহাওয়ায় পুরনো বয়ম খুলে যেন আচার খেতে ছেলে-মানুষি সাধ হয়েছে সুব্রতর, ডাক্তারের মানা শুনবে না। —'কোথায় যাবে এমন দিনে। আর একটু ব'স। কী হল সেই মেয়েটির।'

ভীত, কুণ্ঠিত চোখে এ-প্রসঙ্গে অনিচ্ছুক ডাক্তার বার বার ওর দিকে চেয়েছে, প্রণতি টের পেয়েছে। তারপর বহু প্রয়াসে ডাক্তার যেন একটা রূঢ় কথা বলবে বলে নিজেকে তৈরি করে নিল। 'এতদিনে নিশ্চয়ই সু-জননী, সু-গৃহিনী হয়েছে। টাকার অভাবে এক বছর আমি মেডিক্যাল ফাইন্যাল দিতে পারিনি। সে-বছরই সে মোটা মাইনের একজন সিনিয়র কেরানীকে বিয়ে করল। কেননা—' অত্যন্ত তিক্তস্বরে ডাক্তার বলল, 'কেননা, আমার সামনে তখন নিশ্চিত কোন কেরীয়র নেই। মেয়েরা শুধু সিকিওরিটি চায় সুব্রত, সেদিন ওকে আমি তা দিতে পারিনি।'

'শুধু সিকিওরিটি চায়?'

নিজের কথা বলে ফেলতে পেরে ডাক্তারের সংকোচ কেটে গেছে, ঈষৎ-উত্তেজিত কণ্ঠে তাকে বলতে শোনা গেল, 'হোআট্ এল্‌স্।' বলেই চকিতে জানালার দিকে তাকাল, সেখানে তখনও একটি নতমুখ মেয়ে, ডাক্তার হয়ত বুঝল কথাটি স্থানোচিত হল না, তাড়াতাড়ি যোগ করে দিলে, 'অন্তত সেই মেয়েটি চেয়েছিল।'

'সেই মেয়েই সব মেয়ে নয় ডাক্তার।'

অন্ধপ্রায় স্বামীর সঙ্গে থাকবে বলে এই প্রায়ান্ধ, আলো-নিঙড়ানো ঘরখানি যে বেছে নিয়েছে, সেই মেয়েটিকে ডাক্তার আরেকবার দেখে নিল। অতি ধীরে বলল, 'হয়ত নয়।'

তারপর সেদিন যত কথা বলেছে ডাক্তার, সব সুব্রতর সঙ্গেই, কিন্তু বার বার এদিকে ফিরে ফিরে চেয়েছে। দৃষ্টি যার লোপ পেতে বসেছে, তার সঙ্গে কথা বলার সুবিধা এই, অন্য দিকে চোখ ফেরালেও সে টের পায় না।

সেদিন অত সহজেই সুব্রত ডাক্তারকে রেহাই দেয়নি। একটু পরেই আবার বলল, 'পাশ করবার পরে তুমি হাউস সার্জন হয়ে একটি নার্সের প্রেমে পড়েছিলে, গুজব শুনেছিলুম। তাকে বিয়ে করলে না কেন।'

আবার সংকোচ বোধ করল ডাক্তার। তাড়াতাড়ি বলল, 'ওসব কথা থাক সুব্রত। সেই আমাকে বিয়ে করতে চায়নি। আমার সুপারিশ চেয়েছিল। মিশত কিছু সুবিধে পাওয়ার জন্যে, কেননা, ও তখনও টেম্পোরারি।' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ডাক্তার যোগ করল, 'অবশ্য এসব আমি অনেক দেরীতে বুঝতে পারি। বুঝে আর ভুল করিনি। সুপারিশ ওকে করেছিলুম, কিন্তু তিন মাস পরেই একটা গ্র্যান্ট নিয়ে বিলেত চলে গেলুম।'

এ-ঘরে আর দাঁড়িয়ে থাকা অশোভন, ওরা যখন লক্ষ্য করছে না সেই অবসরে প্রণতি পা টিপে টিপে পাশের আধখানা ঘরে গেল, যেটা কিছুদিন আগেও ছিল সুব্রতর লেখাপড়া করবার। গেল, কিন্তু একেবারে দূরে যেতে পারল না। দরজাটা একটু ফাঁকই রইল, তার ও-পাশে উৎসুক দু'টি কান।

'আর কোন মেয়ে তোমার জীবনে আসেনি?'

হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল ডাক্তার, এতক্ষণ কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মৃদু রেখেই কথা বলছিল, এবার বাঁধ ভাঙল। কাঁধ কুঞ্চন-প্রসারণের একটা ভঙ্গী করে বলল, 'লট্‌স। জাহাজেই একটি মধ্যবয়সী মেয়ের সংস্পর্শে এসেছিলুম, নাম বলব না, তিনি আবার ছোটখাটো একজন দেশনেত্রী। ইনি কী চেয়েছিলেন জানো? না, টাকা নয়, প্রতিষ্ঠা নয়, অকারণে ভদ্রমহিলাকে বদনাম দেব না, —তাঁর নজর ছিল শুধু আমার পেশিবহুল শরীরটার দিকে।'

বলে একটু বিরতি দিয়েছিল ডাক্তার, সেই অবসরে সুব্রত কথাটার কুৎসিত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে নির্বাক হয়ে গেল। কিন্তু ডাক্তারকে তখন নেশায় পেয়েছে, চোখ দু'টির পাতা দপ-দপ করছে। অতি দ্রুত কিন্তু চাপা গলায় বলে গেল, 'আরো ঢের এসেছে। বাট্ আই টেল য়ু, দে'র জস্ট এ লট্ অব ডাল্, ডলড্-আপ থিংস;—চীপ্, চীপ্, চীপ্।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সুব্রত, আর সেই অবিশ্বাসের ভঙ্গীটাই যেন সম্বিৎ ফিরিয়ে দিল ডাক্তারের, হঠাৎ-ক্ষুব্ধ মানুষটি আবার নিস্তেজ হয়ে পড়ল, লজ্জিত মুখে বারবার চাইল পাশের ঘরের দরজার দিকে, ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার আসি।'

'একটু চা খেয়ে যাবেন না?' প্রণতি বেরিয়ে এসেছে খুপরি থেকে।

শুকনো গলা, একটু ভিজিয়ে নিলে মন্দ হত না, ডাক্তার তবু বললে, 'না।'

মুখে মুখে দু চারটে উপদেশ ডাক্তার সেদিনই দিয়ে গিয়েছিল। রোগীকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। বেশি নড়া-চড়া বারণ। কোন রকম উত্তেজনা না। আর—

শেষ কথাটা খুব কাছাকাছি এসে, খুব চাপা গলায় ডাক্তার বলেছিল: 'এ্যান্ড য়ু মাস্ট হ্যাভ নো বেবীজ।'

লজ্জায়-কান-লাল প্রণতি তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গিয়েছিল। পর্দার বাইরে ডাক্তারের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেনি। পুরু ভুরুর নীচে চোখ দুটি এমন কেন ডাক্তারের, সবাইকে কেন অপারেশন টেবিলের রোগী ভাবে। বাইরে গিয়েও ডাক্তার এক-মুহূর্ত দরজার সমুখে কেন দাঁড়িয়েছিল কে জানে। সে কি ভেবেছিল আজকের প্রগল্‌ভতার জন্যে প্রণতির কাছে মার্জনা চেয়ে নেবে?'

তারপর থেকে প্রতিদিন রাস্তায় ওদের দরজার সামনে ডাক্তারের গাড়ি থেমেছে। ঠিক পাঁচটায় পরিচিত জুতোর শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে, দরজায় সন্তর্পণ টোকা দিয়ে বলে, 'আসতে পারি?'

ভিতর থেকেই প্রণতি সাড়া দেয়, আসুন।'

ডাক্তার বলে, 'কেমন আছ, সুব্রত।'

পাশ ফিরে তিক্ত গলায় সুব্রত বলে, 'ভাল, ভাল, ভাল।'

আশ্বাস দিয়ে ডাক্তার বলে, 'অত নার্ভাস হয়ে পড়েছ কেন। শীতকালটা আসুক। আমাদের হাসপাতালেই তোমার অপারেশন হবে। একেবারে সেরে যাবে দেখো।'

তারপর অনেকক্ষণ কোন কথা থাকে না। সুব্রতর কোন সাড়া নেই, মনে হয় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। অস্পষ্ট আলোয় একটি বুকের নিয়মিত ওঠা-পড়া দেখা যায়।

কখন এক সময় ডাক্তার উঠে পড়ে, বারান্দায় একটু-বা দাঁড়ায়। সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নামে।

ওদিকে ঘরের মধ্যে হঠাৎ সোজা হয়ে ব'সে সুব্রত জিজ্ঞাসা করে, 'ডাক্তার চলে গেল, প্রণতি?'

প্রণতি বলে, 'গেল। তুমি টের পেয়েছ?'

সুব্রত বলে, পেয়েছি। টের যে আমি সব পাই প্রণতি, সব দেখতে পাই। দেয়ালে পিঁপড়ে সারি বেঁধে চলে, তাও অনুভব করি।'

আন্দাজে আন্দাজে হাত বাড়িয়ে প্রণতির ঠোঁট দুটি ছুঁয়ে সুব্রত ফের বলে, 'দেখতে পাই শুনে হাসছ বুঝি? সত্যিই আমি দেখতে পাই, বোধ হয় তোমাদের চেয়ে, আর সকলের চেয়ে, একটু বেশিই পাই। চোখ দুটি দিয়ে যা দেখা যায় প্রণতি, সে নেহাৎ ওপর-ওপর দেখা। রেটিনা, লেন্স, ক্যামেরার কারসাজি, ফোটোগ্রাফির মত শস্তা। আমার এখনকার দেখা কিন্তু অনেক গভীর, স্পষ্ট। ছোঁয়ায় দেখি, শোনায় দেখি, গন্ধে দেখি, স্বাদে।'

বলতে বলতে সুব্রত যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল, কাঠ হয়ে গেল প্রণতি। এখুনি বুঝি সুব্রত ওকে বুকের ওপরে টেনে নেবে, অধীর আঙুলে কপালের চুল সরিয়ে, স্বেদবিন্দুর স্বাদ নিয়ে, কণ্ঠতটের ঘ্রাণ নিয়ে ওর নতুন ধরনের দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা দেবে।

থর-থর কাঁপতে থাকল প্রণতি, ভয়ে বুকের ভিতরটাও যেন হিম হয়ে গেল। অন্ধোপম মানুষটির আবেগও বুঝি অন্ধ, প্রণতি একবার ভাবল বাধা দেবে, পারল না, বাইরে শোঁ-শোঁ হাওয়ার রুদ্ধ মুষ্টি, জানালার পাল্লা থেকে থেকে কাঁপে, সব প্রতিরোধ বুঝি এখুনি লুটিয়ে পড়বে, বিজুরির ছুরিতে অন্ধকারের কলজে থেকে ফিনকি দিয়ে ম্লান-পিঙ্গল রক্ত সারা ঘরে ছড়িয়ে যাবে। বিবশ প্রণতি আতঙ্কে, সুখে, দু' হাতে চোখ ঢেকে দিলে।

সে-ঝড়ও থামল। শ্রান্ত সুব্রত ফের বালিশে মাথা রেখে ওর গালে তখনো-তপ্ত একটি হাত রাখল। আস্তে আস্তে বলল, 'ডাক্তারের কথা ভেবে ভয় পেয়েছ, না? ডাক্তারদের সব মানা মানতে নেই।'

মেঘ-শ্রাবণ, শিউলি-আশ্বিন কেটে গিয়ে হিম-অঘ্রাণ আসে। ঋতুরঙ্গের কোন ছাপ এই ছায়া-ঘরখানিতে পড়ে না। বড় জোর কোন দিন বৃষ্টির ফোঁটায় জানালার পর্দা ভিজে ওঠে, কোন দিন বা হালকা হাওয়ায় একটু কাঁপে, কোন দিন গাঢ় নীলে সোনালি একটু ছোঁয়া লাগে।

গেল। ঘরে আলো থাকলে দেখতে পেত প্রণতির মুখে এতটুকু রক্ত নেই। ওর হাতে রাখা হাতখানিতে কাঁটা দিয়েছে অনুভব করল, পাছে সেই হিম-আতঙ্ক তার দেহেও সঞ্চারিত হয়, সেই ভয়েই বুঝি ডাক্তার তাড়াতাড়ি হাতখানি ছেড়ে দিল।

আস্তে আস্তে পর্দা ঠেলে বাইরে এল ডাক্তার। সেই সিঁড়ি, আবার ধাপে ধাপে নামা, সদরে নিঃশব্দ সেই গাড়ি।

ডাক্তার চলে যাবার পর ঘড়ি-টিকটিক-প্রাণ ঘরখানিতে প্রথম সুব্রতর স্বর শোনা গেল।

'ডাক্তার কী বলছিল প্রণতি।'

প্রণতি কিছু বলল না, সুব্রত নিজেই

ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথাটা খাট থেকে সরে গিয়ে নীচে ঝুলছে

হর্ন না বাজিয়ে গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে আর দিনের পর দিন সিঁড়ি ভেঙে ডাক্তার একদিন যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, সাহস পায়। প্রেসক্রিপশনটা প্রণতির হাতে তুলে দিতে গিয়ে সেদিনও আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়, কিন্তু ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গেই হাত সরিয়ে নেয় না, মৃদু, অলক্ষ্য একটু চাপ দেয়।

সাড়া আসে না। পাবে সে আশাও সে করেনি। কী বলবে আগে কিছু ঠিক করে রেখেছিল, এখন এই মুহূর্তে সে-সব মনে পড়ল না, ভাঙা-ভাঙা গলায় কোনমতে বলল, 'একটু বাইরে আসবেন?'

এই ঘরে শুধু ছমছম ভয়, সব কিছু মৃত, নিরনুভূতি, এখানে কথা নেই, ডাক্তার তাই প্রণতিকে বাইরে ডেকেছে।

'বাইরে!'

ওই একটি শব্দে ডাক্তার উত্তর পেয়ে

ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, 'আমি জানি কী। তোমাকে বাইরে যেতে বলেছিল।'

দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর সুব্রত আবার বলল, 'গেলেই পারতে। কেন তুমি নিজেকে এভাবে শেষ করে দিচ্ছ প্রণতি। কেন এই কানা-ঘরে দিনরাত নিজেকে লুকিয়ে রেখেছ। আমার জন্যে? কিন্তু একটিবার আলোর মুখ দেখলে ক্ষতি কী।'

মাটির দিকে চোখ রেখে প্রণতি আস্তে আস্তে, শব্দগুলোকে জিভ দিয়ে প্রায় না ছুঁয়ে বলল, ভয় করে।'

ভয়, এত ভয়? নিঃশব্দ একটা হাসিতে সুব্রতর মুখের রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠল,— তুমি জান না, ভয়ের এই বাড়াবাড়িটাকেই আমার বেশি ভয়।

পরদিন, ডাক্তার আসেনি। বিকেল গড়িয়ে গড়িয়ে ডুবে গেল সন্ধ্যার দহে,

কিন্তু সদরে পরিচিত গাড়িটি দাঁড়াল না, দীর্ঘ দু' বছরের অভ্যাসে ছেদ পড়ল।

'প্রণতি।'

প্রণতি মুখ ফিরিয়ে বিছানার দিকে তাকাল।

'জানালার পাশে কী করছ। আজ সারা বিকেল একবারও তো আমার কাছে এসে বসলে না।'

সুব্রতর শিয়রে এসে বসল প্রণতি।

'মাথায় বড় যন্ত্রণা। একটু টিপে দেবে?'

শিরা-ওঠা কপালে কয়েকটি কোমল আঙুল ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হতে থাকল, রাত্রি বাড়ছে। রাস্তায় হঠাৎ হর্ন শুনে প্রণতির হাত পলকের জন্যে থেমেছিল। সুব্রত বলল, 'থামলে কেন। ডাক্তার নয়। ডাক্তারের গাড়ির তো হর্ন বাজে না।'

লজ্জায় প্রণতি মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইল।

তবু যতবার সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল, ততবার আড়ষ্ট হয়ে উঠল প্রণতি, আর কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকল, আজ যেন না আসে, আর যেন না আসে।

ওর মনের কথাটি পড়ে নিয়ে সুব্রত যেন বলল, তুমি যা ভাবছ তা নয়, ডাক্তারকে তুমি ভুল বুঝেছ। এ ঘর ছেড়ে বেরোও না, একটা রোগীর বিছানার সঙ্গে দিনরাত লেগে রয়েছে, তোমার শরীর-মনের পক্ষে এ ভাল নয়। ধৃতরাষ্ট্রের জন্যে গান্ধারী চোখে ঠুলি পরেছিলেন, এ নজীর পুরাণেই মানায়।'

একটু থামল সুব্রত। অনেক পরে আবার বলল, 'ডাক্তারকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। মেয়েদের কাছে এলেই সর্দি লেগে যাবার মত মন ওর নয়। অনেক মেয়ে ওর জীবনে এসেছে—কিন্তু কী আশ্চর্য জান, কোন মেয়েই ওর মনে ছাপ রাখতে পারেনি।

'কেউ না?' কখন আপনা থেকেই চুলে আঙুল বুলনো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, প্রণতি টের পায়নি। বলল, 'কেউ না?'

সুব্রত বলল,'না। ও যা খোঁজে, কোন মেয়ের মধ্যে তা পায়নি। দু'দিনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শোননি, সেদিন বলছিল, চীপ্, চীপ্, চীপ্? কিন্তু এত জোর দিয়ে মাথা টিপছ কেন প্রণতি। তুমি কি ক্ষেপে গেলে!'

তারপর একদিন সুব্রতর পৃথিবী থেকে আলো একেবারে মুছে গেল।

ভিয়েনা থেকে স্পেশালিস্ট এসেছিলেন। অপারেশনও হয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। হাসপাতাল থেকে ওরা গাড়ি করে সুব্রতকে ফের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল, ধরাধরি করে তুলে আনল সিঁড়ি বেয়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখল প্রণতি। ওরা চলে যেতে সুব্রত ইশারায় প্রণতিকে কাছে ডাকল। ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথাটা মড়ার খুলির মত, বিবর্ণ ঠোঁট দুটির ফাঁকে সাদা দাঁত-গুলো আরও বীভৎস। ঘর্ঘর ভাঙা গলায় সুব্রত বলল, 'হল না প্রণতি, শেষ বাজিও হেরে গেলুম।'

প্রণতির হাত দুটি নিয়ে মুখের উপরে রেখেছে সুব্রত, শুকনো কড়া কাপড়ের খস্‌খসে স্পর্শে প্রণতি আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মৃদু কণ্ঠে সুব্রত বলল, 'তোমাকে কখনও জানতে দিইনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার আশা ছিল আবার আলো দেখব। তোমাকে দেখব।'

আলো দেখব। তোমাকে দেখব। আহত একটি কণ্ঠ ছায়া-ঘরের দেয়াল থেকে দেয়ালে প্রতিহত হল। ধীর গাঢ় কণ্ঠে সুব্রত বলল, 'চোখ দুটো গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রুতি-ঘ্রাণ-স্পর্শ, আর বোধগুলোও গেল না কেন প্রণতি। তবে বুঝি বেঁচে থাকতে এত কষ্ট হত না।'

প্রণতি ভেবেছিল সান্ত্বনা দেবে, সুব্রতর কপালের ঘর্মাক্ত ভয়টুকু মুছে দিয়ে বলবে, 'চুপ কর, চুপ কর,' কিন্তু কথা ফুটল না, টের পেল ভরসার শেষ পাতাটিও খসে যেতে তার নিজের গায়েও কখন কাঁটা দিয়েছে; সেই ছায়াচ্ছন্ন ঘরের ঠান্ডা মেঝেয়, নির্বাক, রোমাঞ্চিত, বসে রইল। পট্টিবাঁধা মিছে চোখ দুটির নীচে ঠোঁট কাঁপছে—প্রণতি শুনতে পেল সুব্রত বিড়বিড় করে বলছে, কোন মানে নেই, এই নিরিন্দ্রিয় দেহে প্রাণটুকু পুষে রাখার কোন মানে নেই।

তারপর সেই দীর্ঘতম রাত্রিটি এল।

শেষ রাত্রে রুদ্ধ বিকৃত গলার আর্তনাদে প্রণতির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। জানালার পর্দা কখন সরে গিয়েছিল, হলদে এক টুকরো জ্যোৎস্নায় ঘর ভরে গেছে। সুব্রতর মুখে ফেনা, মড়ার খুলির মত ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথাটা খাট থেকে সরে গিয়ে নীচে ঝুলছে, তলপেট প্রচন্ড আক্ষেপে অস্থির, আলগা হাতের মুঠিতে চোখের মলমের শিশিটা। ঢাকনা খোলা। কাল এটাকে সরিয়ে রাখেনি প্রণতি?

অস্ফুট একটা চীৎকার করে প্রণতি নীচে নেমে এল, মোড়ের মুখেই পাড়ার এক ডাক্তারের বাসা, দরজায় ঘন ঘন ঘা দিল। ডাক্তারকে জাগিয়ে তুলতে সময় কম লাগল না। চোখে-মুখে জল দিয়ে সব সরঞ্জাম নিয়ে তিনি যখন হাজির হলেন, ততক্ষণ সুব্রতর মুখের ফেনা শুকিয়ে গেছে, তলপেট স্থির, মলমের কৌটোটা মুঠি থেকে খসে মেজেয় গড়াচ্ছে।

তারপর একটু একটু করে আলো ফুটল আকাশে, সকাল হতে না হতেই লোকজন এল, প্রতিবেশী, পুলিস, খবরের কাগজের রিপোর্টার। নোট বই খুলে ওরা প্রণতির জবানী নিলে।

আবার ওরা ধরাধরি করে সুব্রতকে নামালে নীচে। মর্গের গাড়িটা একবার গর্জন করে উঠেই রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রয়োজন নেই, তবু পর্দাগুলো টেনে দিল প্রণতি। খাটের পায়া ধরে নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

সদরে হর্নহীন গাড়িটা এসে দাঁড়ানোর আভাস পাওয়া গেল আরও অনেক পরে। সিঁড়ি বেয়ে এক জোড়া জুতো উপরে উঠে আসছে।

দেহ আড়ষ্ট, তবু কোন মতে থরথর পায়ে উঠে প্রণতি দরজায় খিল তুলে দিল।

কবাটে টোকা। মৃদু কণ্ঠ, 'দরজা খুলুন প্রণতি দেবী।' ডাক্তারের গলা। এসেছে।

আসবেই, প্রণতি জানত।

আবার করাঘাত। 'দরজা খুলুন।'

প্রণতি তবু উঠল না, আরও শক্ত করে খাটের পায়া চেপে ধরল। ডাকুক ডাক্তার, ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাক, প্রণতি ওকে কিছুতে আজ এ ঘরে আসতে দিতে পারবে না। এই বিছানায় আজ কোন নিশ্চক্ষু প্রহরী নেই, ডাক্তার ঢুকেই হয়ত নিষ্ঠুর হিংস্র হাতে পর্দাগুলো সরিয়ে দেবে, হয়ত-বা ছিঁড়ে ফেলবে, এতদিনের চুপ-চাপ অপেক্ষার শোধ নেবে। রক্তের মত গলগল স্রোতে ভেসে যাবে এই চোর-কুঠুরি। সেই আলোয় কাকে দেখবে ডাক্তার। ছমছম চির-গোধূলি ঘরে যার হাতে হাত ঠেকলে কেঁপে উঠত, দেখবে সেই রহস্যময়ী কোথাও নেই। অন্ধকার ঘুচলেই নার্সের মত, তার দূরসম্পর্কের সেই আত্মীয়ার মত, প্রায়-প্রৌঢ়া দেশনেত্রীর মত, নিতান্ত সাধারণ একটি মেয়েকে ডাক্তার দেখে ফেলবে,—যে দুর্বল সুখলোলুপ; ডাক্তারের মানা না-মানার লক্ষণ যার দেহে স্পষ্ট।

প্রণতি কিছুতে দরজা খুলতে পারবে না।

টিকেতে যেন আগুন ধরানো হয়েছে। রমলার সিঁথির সিঁদুরের দিকে তাকালে এমনই মনে হয়। গায়ের রং যেমন নিবিড় কালো, সিঁদুরের রং তেমনি আগুনে লাল।

টান-টান শরীর, গড়ন ছিপছিপে। চুল আঁট ক'রে বাঁধা। মসৃণ কপালের উপর গোলাকার একটা টিপ—মনে হয় অন্ধকারের গায়ে এক টুকরো ডুবন্ত সূর্য যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

এ সিঁদুর পায় কোথা থেকে রমলা? রমলা উত্তর দেয় না, হাসে। এমন নিখুঁত গোল হয় কী করে তার টিপ? রমলা বলে, হয়। চেষ্টা আর যত্ন থাকলেই হয়।

মুখে রমলা ঐ কথা বলে। কিন্তু মনে মনে বলে অন্য কথা। কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

যেমন ছিমছাম চেহারা রমলার, সংসারটাও তেমনি পরিপাটি। কোন্তে ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, ঝঞ্ঝাট নেই। নীচের ঘরে সকাল থেকে রাত্তির অবধি টাইপরাইটিং-মেশিনে খটখট্ আওয়াজ হয় একটানা, উপর থেকে রমলা সেই শব্দ শোনে আর নিজের মনেই টুকিটাকি কাজ-কর্ম করতে থাকে।

দুপুরে কয়েক মিনিটের জন্যে মোহিত উপরে উঠে আসে, মাথা নীচু করে বসে গভীরভাবে কি-সব কথা ভাবে, আর ভাত চিবোয়। মুখ ধুয়েই নেমে যায় নীচে। ফিরে আসে অনেক রাত্রে ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে, দুটো খেয়েই চট করে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যায়।

প্রত্যেক দিনের এইটেই রুটিন। এ রুটিনে একদিন এতটুকু নড়চড় নেই। কিছু বললে আবার তেতে ওঠে, বলে, জীবনে যদি শৃংখলা না থাকে, ডিসিপ্লিন না থাকে, টাইমের জ্ঞান না থাকে, তা হলে জীবনধারণের মানে?

ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে না রমলার, কিন্তু কিছু একটা জবাব দেবার জন্যে গলার ভিতরটা উসখুস করে। প্রতিধ্বনি করে মাত্র সে, বলে, মানে! কেবল অর্থ মানে নোটবই আর টাইপরাইটার—এইটেই বুঝি জীবন?

—যাক গে। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইনে। বলতে বলতে মোহিত সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে।

রমলা চলে আসে ঘরের মধ্যে। নিজের মনেই বলে, কেই-বা চায় ঝগড়া করতে! ঝগড়া করার যদি ইচ্ছে থাকত, তাহলে আগুন লেগে যেত বাড়িতে।

বাড়িতে আগুন নয়। আগুন লাগে তার সিঁথিতে। স্নান সেরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন লম্বা সিঁথির উপর সিঁদুরের দাগ দেয়, তখন যেন গনগনে হয়ে ওঠে একটা আগুনের রেখা।

বেশ দেখায়। কালো মানেই যে কদর্য, এ ধারণাটা একেবারে মিথ্যে করে দিয়েছে রমলা। তাই সে সিঁদুর পায় কোথা থেকে—এই সন্ধান জানতে চায় সকলে। কিন্তু সিঁদুর পরলেই তো সীমন্তিনী হওয়া যায় না; তা হতে হলে চাই একটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর সীমন্ত।

অহঙ্কার করলেও করতে পারে রমলা। কিন্তু তার সারা শরীরে লাবণ্যের অকৃপণ বন্যা যতই থাক্, অহঙ্কারের আঁচ তাতে নেই এতটুকু।

সাজে-পোশাকেও সে অতি সাধারণ। একটি রঙিন জামা গায়ে, একটি সাদা জমির শাড়ি পরনে, হাতে একগাছি ক'রে সরু শাঁখা ও রুলি। বেশ দেখায় তাকে। যদি সাজের ঘটা থাকত কোনো রকমের, তাহলেই তার রূপটা বুঝি মার খেয়ে যেত।

মোহিতের মেজাজ একটু চড়ে গেলেই সে বলে, বড় অহংকার, বড় অহংকার, বড় অহংকার। রূপ ধুয়ে জল খাও গে যাও।

—তার মানে?

—মানে নেই কিছু। মোহিত মাথা নীচু করে সিঁড়ির দিকে নজর রাখতে রাখতে নেমে যায়।

চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে যতটা, চোখের চশমার কাঁচ পুরু করা হয়েছে সেই অনুপাতে। সেই মোটা কাঁচের মধ্যে থেকে মোহিতের চোখ দুটো চেয়ে থাকে অস্বাভাবিক বড় হয়ে। এই চোখ দেখে এক এক সময় ভীষণ ভয় করে রমলার।

পাশের ঘরের হেমাঙ্গিনী বলে, আজ এত বিষণ্ণ কেন, ম্লান কেন?

রমলা বলে, ভাষাটা একটু সহজ করে কথা বল, ভাই। ডিক্সনারী মুখস্থ করে কথা বললেই হাসি পায়।

—বেশ তো। বেশ তো। বেশ তো। হাসি যদি পায়, তাহলেই আমার কাজ হয়ে গেল। বিষণ্ণও আর রইলে না, আর চট্ করে হয়ে গেলে, যা'কে বলে গিয়ে, অম্লান।

যেন মস্ত রসিকতা করা গিয়েছে, এমনি একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গিনী

বলে, কাজললতা আর সিঁদুর-কৌটো যেন মাখামাখি হয়ে গেছে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ভাই, তোমাকে।

রমলার কানে কথাগুলো ব্যঙ্গের মত বাজতে লাগল, সংক্ষেপে সে বলল, ভালো। নিজের প্রশংসা শুনলে কা'র না ভালো লাগে।

হেমাঙ্গিনী নিজের হাতের দিকে চেয়ে বলল, এখন আর কী দেখছ। রং ছিল কাঁচা সোনার মত। কিন্তু সে দিন গেছে। এখন গিল্টি সোনা হয়ে গেছি।

রমলা হাসল। হেমাঙ্গিনীর রং ফর্সা নয়, সাদা। কিন্তু হয়তো-বা একদিন সত্যিই ছিল ও সুন্দরী।

হেমাঙ্গিনী হাসল, বলল, রুপেয়া মানে টাকা ধার নেওয়া যায়, ঠিক ঐভাবে ধার পাওয়া যায় না আর একটা জিনিস?

রমলা বলল, কী?

—রূপ।

এর কোনো উত্তর হয় না। রমলা চুপ করে রইল।

হেমাঙ্গিনী বলল, আমাদের উনি আবার রূপের খুব ভক্ত। আর্টিস্ট কিনা। ছবি আঁকেন অসম্ভব ভালো। উনি বলেন, ভদ্রমহিলার স্বামীর বড় বরাত ভালো।

—কা'র কথা?

—তোমার গো তোমার। তোমার বর মোহিতবাবু খুব ভাগ্যবান পুরুষ।

রমলা একটু হাসল, বলল, আর তোমার উনির বরাত বুঝি মন্দ?

—ছি ছি ছি ছি। জিভ কাটল হেমাঙ্গিনী, বলল, বিশ্রী তুলনা তুলছ তুমি ভাই। ও'র তো ভালোই। উনি বলেন, তোমার বরের কপালও খুব সরেস।

কিন্তু ভালো কপাল হয়েছে মাত্র হালে, মোহিতের কপাল এত ভালো ছিল না আগে। এখন টাকা আসছে অনর্গল। নীচে থেকে উপরে ওঠার সময়ই তাই পায় না।

ঘর ও বাইরের কাজ করতে হয় রমলার একার। দোকান-পাট সবই করে সে। সারা রাস্তায় যেন আগুনের খই ছড়িয়ে চলে, এমনই তার চেহারার একটা জ্বলন্ত দীপ্তি।

কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন অন্দর-মহল থেকে মোহিত সারাদিনে একবারও বের হ'ত না।

মোহিতের চিরদিনের ধারণা, একমাত্র বাণিজ্যেই লক্ষ্মী বাস করেন। আর, অন্য সব রকমের কাজে লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্নও নাকি পড়ে না এতটুকু। তাই সে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু এ কাজের জন্যে যে পুঁজির দরকার—এ খেয়াল তার ছিল না। তাই বাণিজ্যে ঢুকে তাকে অনেক ঘা খেতে হল।

ছোটবেলা থেকেই মোহিতের মাথায় ব্যবসায়ের পোকা আছে। তখন তার বয়স মাত্র নয়, সেই সময় একবার সে যায় তার মামার বাড়ি—পলাশ গ্রামে। সেখানে সে দেখে মাচায়-মাচায় অজস্র লাউ ঝুলছে। এতে তার আনন্দ হ'ল এমন যে, সে ছুটে গিয়ে বসল মামীমার রান্নাঘরের চৌকাঠে, বলল, মামী, মামী, মামী, এক কাজ করলে হয় না?

—কি?

—রেলগাড়িতে চাপিয়ে এই লাউ নিয়ে গিয়ে কলকাতায় বেচলে কিন্তু মেলা টাকা পাওয়া যাবে।

মামীমা আশ্চর্য হলেন, এতটুকু ছেলের মাথায় এতটা বুদ্ধি দেখে সেই সঙ্গে আনন্দিতও হলেন সম্ভবত।

নয় বছর বয়সের ছেলের এই বুদ্ধি ক্রমশ পেকে উঠল। তেইশে পড়ল মোহিত।

এই সময় একটা ভুল করে বসল মোহিত-চন্দ্র। একটা অনর্থ কাণ্ড। সে মোহিত হয়ে গেল একদিন হঠাৎ। তার মামার শালার শ্যালিকার কন্যা রমলাকে দেখেই সে মুগ্ধ হয়ে গেল।

মোহিত ছেলে খারাপ না। বি-এ পাশ করেছে। শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং জানে। দেখতে শুনতেও মন্দ না। খারাপের মধ্যে চোখ দুটি। ছেলেবেলা থেকেই ওই ত্রুটিটা আছে। তাই এই বয়স থেকেই তার চোখে চশমা।

লেখাপড়া যখন জানে, তার উপর টেকনিক্যাল বিদ্যাও যখন একটু জানা আছে, তখন মাঝারী-গোছের চাকরি একটা পেয়ে যাবেই। এই ভরসায় মোহিতের মামার শালার শ্বশুরমশায় এই পাত্র হাতছাড়া করলেন না।

বিয়ের পর তারা গেল গিরিডি। বইতে পড়েছে উস্রি ঝরনার ধারে বসে নায়ক-নায়িকারা প্রেম করে, সেইজন্যে এই জায়গাটা বাছাই করে নিল মোহিত।

মোহিত জিজ্ঞাসা করল, ঝরনা তোমার কেমন লাগে?

রমলা হেসে উঠল, বলল, ভালো।

—এই আকাশটা, এই নিরিবিলিটা?

রমলা বলল, মন্দ কি?

কিন্তু যে কথাটা জিজ্ঞাসা করার জন্যে তার এত অবান্তর প্রশ্ন সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করা যাচ্ছে না। মোহিত রমলার দিকে একটু সরে বসে বলল, আর আমাকে?

—কি, তোমাকে কি?

—কেমন লাগে?

রমলা বলল, বিশ্রী।

উঠে বসল মোহিত, চশমা খুলে ঘাসের উপর রেখেছিল, চোখে দিয়ে নিল, বলল, তার মানে?

রমলা বলল, বিশ্রী মানে জান না? বিশ্রী মানে চমৎকার।

মোহিত টান হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের উপর, বলল, ভাগ্যিস মানে বলে দিলে! ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

—কিন্তু, কিন্তু, মোহিত কিন্তু-কিন্তু ভাবে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে যেদিন প্রথম দেখলে সেদিন তোমার কি মনে হয়েছিল?

রমলা বলল, মনে হয়েছিল, নিশ্চয় তুমি আমাকে বিয়ে করবে।

—কি করে মনে হল?

—তোমার হাব-ভাব দেখে। এমন-ভাবে চেয়ে ছিল! মনে হচ্ছিল খেয়েই ফেলবে বুঝি। চোখ দুটো যদি পুরো ভালো হত, তাহলে হয়তো ওই দৃষ্টি দিয়েই সাবাড় করে ফেলতে সেদিন।

—হুঁ। মোহিতের চিন্তার তল থেকে উঠে এল যেন একটি বুদ্‌বুদ। বলল, তোমার চোখের দৃষ্টি তো খুব তীক্ষ্ন।

—তীক্ষ্ন একে বলে না, এটাই স্বাভাবিক দৃষ্টি।

এখানে বসে অনেক প্রতিজ্ঞা আর প্রতিশ্রুতির পালা সাঙ্গ করে তারা যখন ফিরে এল, তখন সম্মুখে নতুন সমস্যা।

রমলা বলল, চাকরি খোঁজ।

—চাকরি? তেতে উঠল মোহিত, চাকরগিরি করে জীবন কাটাতে পারব না।

—তবে করবে কি?

—করব একটা কিছু। করব ব্যবসা। স্বাধীন কারবার!

রমলা এর মানে কতটা কি বুঝল বোঝা গেল না। কিন্তু এটা মোহিতের গোঁ। তার রকম সকম দেখে বোঝা গেল যে মোহিত যা করবে বলেছে তা সে করবেই।

রমলার বাবা আর কিছু দেখে বিয়ে দেন নি, দিয়েছেন কেবল ছেলে দেখে। আর কিছু দেখার অবশ্য কিছু ছিলও না। মোহিত যখন সাত বছরের তখন মারা গেছেন তার বাবা; যখন তেরো তখন মারা গেছেন মা। তার বড় দুটি বোন, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন আগে।

সুতরাং, সুতরাং আর কি? মোহিত একা এবং একক। চাকরিই করুক, আর ব্যবসাই করুক—সংসার চালাতে হবে তাকে একা। কারো সাহায্য বা সহায়তার কোনো বালাই নেই।

জীবন শুরু হল তাদের। টুথ-পাউডারের ক্যানভাসিং আরম্ভ করল মোহিত। দোকানে-দোকানে ঘুরে সেই দাঁতের মাজন চালাবার চেষ্টা করে শরীর কাহিল করল।

রমলা বলল, ভীষণ স্বাধীন ব্যবসা হচ্ছে যা-হোক। এ পাউডারের মালিক বুঝি তুমি?

মোহিত বলল, কদিন ধরে আমিও তাই ভাবছি। নামে মাইনে নয় বটে, কিন্তু কমিশনটাও তো মাইনেরই শামিল। এবার একটা নতুন প্ল্যান মাথায় এসেছে। ফুলেল তেল তৈরি করব—সেন্টেড হেয়ার অয়েল।

রমলা সাহস দিল। বলল, তেমন কিছু যদি ঘরে বসে করতে পার, তাহলে স্বাধীনতার একটা মানে আছে অবশ্য। বাড়িতে তৈরি করলে তো ভালোই। সঙ্গে আমিও তো আছি।

এইসব কথা এখন কেবলই মনে হয় রমলার। মনে হয় সেই উদ্রির কথা, মনে হয় সেই ফুলেল তেলের কথা। সারাদিন একা একা থেকে মনের মধ্যে একটা অসহ্য চাপা হাহাকার চীৎকার করতে থাকে। কিন্তু এ কথা বুঝিয়ে বলবে কখন এবং কাকে?

সব রকমের ব্যবসায় একে একে যখন মার খেতে লাগল মোহিত, যখন মন আর মেজাজ তার একেবারে বিদীর্ণ ও বিষণ্ণ হয়ে উঠত, তখন রমলা এসে বসত তার পাশে। বলত, ভয় কি, আমি আছি।

সে একদিন গেছে। তখন মোহিত ছিল কত অন্তরঙ্গ এবং কত আত্মীয়। অভাব ছিল অনটন ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে আনন্দও তার ছিল।

চারদিকে ঘা খেয়ে রিক্তপকেটে মোহিত যখন একেবারে অসহায়ের মত এসে বসত তার পাশে তখন এত মধুর লাগত রমলার, সে তা বুঝিয়ে বলতে পারে না। কিন্তু ওর ওই এক রোগ, ব্যবসার ঝোঁক ঢুকেছে মাথায়।

চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে মোহিতকে সে বলেছে, ভয় কি। পুরুষের এমনি দশ দশাই হয়ে থাকে। জান না, কথায় বলে, পুরুষ মানুষ কখনো হাতি কখনো মশা।

মুষড়ে থাকত যে মোহিত, এই কথা শুনে সে সোজা হয়ে বসত, আর মোটা কাঁচের চশমার ভিতর দিয়ে পুরু পুরু দুটো চোখে তাকাত রমলার দিকে।

রমলা হেসে বলত, অত বড় বড় চোখে অমন করে তাকাচ্ছ কি। আবার কি কাণ্ড বেধেছে জান?

—কি?

রমলা বলল, বলব বলব, ব্যস্ত কি।

মোহিত রমলার হাত চেপে ধরে বলল, কি হল আবার? বলই না।

রমলা বলল। মোহিত যেন একথা শুনে বিন্দুবিসর্গ খুশি হল না। ভয়ানক বিরক্ত হল রমলা, বলল, এত বড় একটা আনন্দের কথা নিয়ে তুমি আতঙ্কের মত আওয়াজ কর কেন?

আতঙ্কের শব্দ কেন তার গলা দিয়ে বের হল তা যে খুলে বলতে হবে রমলার

—ঝরনা তোমার কেমন লাগে?

কাছে, এইটেই বড় আশ্চর্য লাগল মোহিতের।

রমলা বলল, তাতে কি হয়েছে। আমরা যদি বাঁচি তাহলে তাকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারব।

কিন্তু কিন্তু কিন্তু, একা একা সারাঘর দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে আজ রমলা, কিন্তু কিছুতেই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি তারা। দুধের কথা দূরে থাক্, বার্লিজলই কি ঠিকমত দিতে পেরেছিল তাকে? নীচের ঘর থেকে টাইপরাইটিং-মেশিন থেকে খটখট শব্দ আসছে, যেন ঐভাবে হাতুড়ির আওয়াজ পড়ছে রমলার বুকের উপর।

হেমাঙ্গিনী হাসতে হাসতে এসে হাজির। এসেই বলল, ব্যাপার কি? ঝগড়া হয়েছে বুঝি কর্তার সঙ্গে? মুখখানা অমন গম্ভীর যে।

চোখ মুছে রমলা বলল, কিছু না।

—ইস। আঁৎকে উঠল হেমাঙ্গিনী; বলল, তোমার কপালময় যে ছড়িয়ে গেল আগুন। চোখ মুছতে গিয়ে যে কপালের টিপটা কেমন হয়ে গেল।

রমলা স্থির হয়ে বসে বলল, খবর কি?

হেমাঙ্গিনী বলল, পাঁচটা টাকা চাই, ভাই। উনি বললেন, আমার নাম করে গিয়ে বল—ঠিক দেবে।

ভুরু কুঁচকে রমলা বলল, তাঁর নাম না করলে বুঝি দিই নে?

—মাইরি দিদি, রাগ করো না। দাও বই-কি। সেদিন বারোটা টাকা তো দিয়েছ আমারই কথায়। সব এক সঙ্গে ফেরত দেব।

রমলা উঠল। আলমারির গায়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রিং থেকে চাবি খুঁজে দেখছে, আলমারির ডালার লম্বা আয়নায় ছায়া পড়েছে তার। হেমাঙ্গিনী বলে উঠল, অবিকল, দিদি, অবিকল। মাইরি, আশ্চর্য মিল কিন্তু।

ফিরে চেয়ে রমলা বলল, হল কি?

—একটা ছবি এঁকেছেন উনি। সবে শেষ করেছেন কাল। চান করে কাঁখে কলসি নিয়ে একটা মেয়ে ভিজে কাপড়ে ঘরে ফিরছে—আরশিতে তোমার ছায়া দেখে মনে হল, সে ছবি যেন তুমি।

উত্তর দিল না রমলা। হেমাঙ্গিনীর হাতে টাকা দিয়ে বলল, শরীরটা ভালো না।

হেমাঙ্গিনী হেসে উঠল, চোখে অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল, কী হল। সুখবর হলে কিন্তু মিষ্টি খাওয়াতে হবেই।

ভারি বিরক্ত লাগল রমলার। এসব রসিকতা তার ভালো লাগে না। ভালো লাগে না, বিরক্তও লাগে; কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন যেন অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চও বোধ হল আজ। কি রকম একটা আকাঙ্ক্ষায় লোলুপ হয়ে উঠল তার মন।

কিন্তু কি হবে এসব ইচ্ছে দিয়ে, আকাঙ্ক্ষা দিয়ে, তামাশা দিয়ে।

মোহিত উপরে এল। খেয়ে-দেয়ে নেমে চলে গেল। একটা কথাও হল না তাদের। কথা বলার সময় তার কই। তার কমার্শিয়াল ইস্কুল যে জাঁকিয়ে উঠেছে। বিজনেস করেসপণ্ডেন্স, শর্টহ্যাণ্ড, কমার্শিয়াল জিয়োগ্রাফি, টাইপরাইটিং—ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছাত্র আসছে। দম ফেলার সময় নেই। ঘরটা বড় না, তাই একসঙ্গে অনেকগুলি ছাত্র নিয়ে বসার অসুবিধে। ছোট ছোট গ্রুপে তাই ভাগ করে নিতে হয়েছে। মোহিত একাই এক-শ। একাই সে সব শেখায়।

রমলা বলল, একজন টিচার রাখ না। তাহলে একটু বিশ্রাম করতে পারবে—একটু ফাঁক পাবে।

—ধ্যেৎ। মাথা নীচু করে খেতে খেতে মোহিত বলল, আমি খেটে-খুটে গড়ে তুললাম, অন্যে এসে এখন ভাগ মেরে যাবে, তাই না?

রমলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। খাওয়া যখন শেষ হয়েছে, তখন সে বলল, অত টাকা খাবে কে? দুটি তো প্রাণী—আর যা ছিল তা তো কবে বিদেয় করে দেওয়া গেছে।

আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলল নাকি রমলা? সেই রকম যেন মনে হল মোহিতের। তার সেই দৈন্যের জীবনটাকে লক্ষ্য ক'রে যেন একটা তীক্ষ্ম বাণ মেরেছে রমলা। ক্ষীণ-দৃষ্টির এই চোখের উপরেও ভেসে উঠল স্পষ্ট রূপে সেই অতীত-দৃশ্যটা—ছোট মুঠির এক জোড়া হাত, আর কচি দাঁতের একটা আবছা হাসিও।

মোহিত অন্যদিনের মত চট ক'রে উঠে পড়ল না। খাওয়া হয়ে গেছে, তবু সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কেন, তা বুঝতে পারল না রমলা।

মোহিতকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে রমলা ধীরে ধীরে বলল, অত টাকায় আমাদের দরকার কি। তুমি একটু জিরোবার ব্যবস্থা কর।

উপরে একটি আর নীচে একটি—এই দুটি ঘর ভাড়া নিয়েছে তারা আজ বছর দশ হল। এখানে এসেই মোহিতের মাথায় এই ইস্কুল করার বুদ্ধি এল। আর, ইস্কুল করে দেখল ছাত্রও পাওয়া যাচ্ছে বেশ, তাদের আর্থিক জীবনে নতুন আলোর রেখাপাত হতে লাগল সেইদিন থেকে। কিন্তু জীবনের আর একটা দিকে গাঢ় অন্ধকার যে ঘনিয়ে এল, সে খবর রাখল না কেউ।

মোহিতকে অন্ধ বলে না রমলা। কিন্তু লোকটা বড় দীন, বড় গরিব ওর মন। এত অল্পেই কেমন তুষ্ট হয়ে আছে। মোহিতের চেহারা দেখলে তাই এক-এক সময় করুণা হয় রমলার। একটা কামরায় গুটি কয়েক ছাত্র নিয়ে বসে মশগুল হয়ে আছে লোকটা। ওর ধারণা, অবস্থা একেবারে ফিরিয়ে ফেলেছে ও। দুটি প্রাণীর একটা ছোট্ট সংসার—কোনো ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, বাড়তি একটা দায়িত্ব নেই; কোনো আত্মীয়-স্বজনের জন্যে কখনো কোনো লৌকিকতার বালাই নেই। এমন নির্ঝঞ্ঝাট জীবনটা আবার জীবন নাকি? মোহিতের এই বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে দেখে রমলার তাই হাসিই পায়।

হেমাঙ্গিনীর ধারণা আর মোহিতের ধারণায় একটা আশ্চর্য মিল দেখতে পায় রমলা। মোহিতের চোখে-মুখেও একটা তৃপ্তির জৌলুশ; যেন অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার সমুদ্র পার হয়ে সে এসে পৌঁছেছে একটা দিগ্বিজয়ের রাজ্যে, যেন মস্ত বড়লোক হয়ে গেছে সে।

রমলা কিছু বলে না। বলার কিছু নেইও অবশ্য। এতে মোহিতের প্রাণ যদি আহ্লাদে মাতোয়ারা হয়ে থাকে, থাক্ না। কিন্তু রমলার মনটা আলাদা জাতের—সে মন গরিব মন নয়, সে মন সহজে সন্তুষ্ট হতে রাজি না।

কুরুশ-কাঁটা নিয়ে বসে বসে রমলা একা-একা লেস বোনে। ঝালর-দার সায়া তৈরি করবে সে। বাবুয়ানির ধার ধারেনি কোনো দিন। কিন্তু কেন-যেন তার মনে নানারকম শখ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে আজকাল। নিজেকে একটু সাজাতে ইচ্ছে করে।

দুটি তো লোক। বাড়ির ভিতরের কাজই বা কতটুকু, বাইরের কাজই বা কতটুকু। হাটবাজার চুকে যায় অল্পসময়ের মধ্যেই, তারপর একা-একা এই ঘরটার মধ্যে তাকে কাটাতে হয় একটা বন্দীর জীবন। হাতের কাছে হেমাঙ্গিনী আছে, তাই রক্ষে। এক মেয়ে এই জীবনে সে এসে মাঝে-মাঝে এক-একটা ঘা দিয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্যে রমলার মন নানাসুরে একটু বেজে ওঠে।

মোহিত একটা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত হয়ে গেছে। ওকে ধাক্কা দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে রমলার লোকটার মধ্যে প্রাণ আছে কি না। অত মোটা কাঁচের চশমা চোখে দিয়েও লক্ষ্মীকে অত ছোট ক'রে দেখতে শিখল ও কোথা থেকে। এইটুকুতেই লোকটা নিজেকে লক্ষ্মীকান্ত বলে মনে ক'রে ধন্য হয়ে বসে আছে। লক্ষ্মীকে যদি পেতেই হয়, তাহলে বেশ ভাল ক'রে পাওয়ার চেষ্টা করলে হয় না?

কিন্তু কে বোঝাবে মোহিতকে।

রমলাও নিশ্চেষ্ট হয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে। কিন্তু সে যে একটা নিশ্চল পাথর হয়ে যায়নি, এই কথাটা জানান্ দেবার জন্যে এক-এক সময় উগ্র হয়ে ওঠে রমলা। কিন্তু নিজেকে শান্ত ক'রে সে স্থির হয়ে ব'সে থাকে। রমলার মন অত দীন নয়, অত দরিদ্র নয়; তুষ্ট যদি হতেই হয়, তবে এত সামান্যে সে সন্তুষ্ট হতে রাজি না।

হেমাঙ্গিনী আবার এসে উপস্থিত হল। তার যেন আজ খুব আনন্দ। বলল, জান দিদি? এবার আমরা বড়লোক হয়ে যাব। উনি বললেন, ও'র আঁকা ছবিটার দাম নাকি লাখ টাকা।

রমলা ভুরু দুটো কপালের উপর টেনে তুলে বলল, এত দাম? কে, কিনবে কে?

—ইশ। হেমাঙ্গিনী ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, কিনলেই হল। বেচতে যাচ্ছে কে। ও-ছবি উনি হাতছাড়া করছেন আর-কি।

হাসি পেল, কিন্তু হাসল না রমলা। হেমাঙ্গিনীকে সে সরল বলবে, না, আর-কিছু বলবে—ভেবে পেল না সে। বলল, বড়লোক হতে যেয়ো না। বড়লোক হওয়া ভালো না।

—তোমার আছে কি না অনেক, তাই কিছু বোঝ না তুমি। হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে বলল, জান না তো, কী কষ্টেই চলে আমাদের।

এর উপর আর কোনো কথা চলে না। আর কোনো আলোচনা করাও ঠিক না। কিন্তু এ কষ্ট তো ভালো কষ্ট। আলমারিতে টাকা বন্ধ করে রেখে রমলা যে কষ্ট ভোগ করছে তার কাছে এ যেন কিছু না। এর আগে সে হেমাঙ্গিনীর মতই কষ্ট ভোগ করেছে, কেবল তার মত কেন, তার চেয়েও বেশি। তার উপর পেয়েছে সে বাড়তি একটা দুঃখও। কিন্তু এখন যা ভোগ করছে, সে যে আরো তীব্র, মৃত্যুশোকের চেয়েও সে যে মারাত্মক—সে যে মৃত্যুযন্ত্রণা।

টাকার স্বাদ যে কত পাজি জিনিস তা সে হেমাঙ্গিনীকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল, কিন্তু মেয়েটা বুঝল না। এতে [illegible]

ঠিক থাকে না—এটা নিশ্চয় এখনো বোঝেনি হেমাঙ্গিনী।

হেমাঙ্গিনীর জন্যে দুঃখ হয়। বড় নির্বোধ সে। বড় সরল। তাই অকপটে সে কত সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে।

হরিশের হাসির আওয়াজ আসছে নীচ থেকে। সেই বাতাসে এদের মনের সব ধুলো যেন উড়ে গেল।

—এত প্রাণ খুলে জোর জোর রোজ রোজ হাসে, কে দিদি?

—ছাত্র।

—ভারি বজ্জাত ছাত্র তো। মাস্টারমশার সামনে গুরুর সামনে অমন গলা ছেড়ে হাসে কখনো?

ঠোঁট ওলটালো রমলা, বলল, কী জানি।

—আমাদের উনি এসব একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না। উনি হলে এমন ছাত্র কবে বিদেয় করে দিতেন।

—অমন মেজাজ দেখালে যে ইস্কুলই উঠে যাবে।

—যাক গে। হেমাঙ্গিনী বলল, ইস্কুল আগে, না, ইজ্জত আগে।

রমলা হেসে বলল, আগে ইস্কুল। সেসব তুমি বুঝবে না।

হেমাঙ্গিনীও হাসল, বলল, বুঝব আবার না। বোকা হতে পারি, কিন্তু আহাম্মক নই।

আর্টিস্ট করঞ্জাক্ষ ও শর্টহ্যান্ড-ছাত্র হরিশ দুজনের কথা নিয়ে নিত্য আলোচনা চলে এই দুই প্রতিবেশিনীর।

রমলা বলল, পয়সা না হলে মানই-বা কি, আর ইজ্জতই-বা কি। তোমার বরকে বলে দিয়ো ও-ছবিটা বেচে দিতে। লাখ টাকা না হোক পঞ্চাশটা টাকা তো আসবেই।

আঁৎকে উঠল যেন হেমাঙ্গিনী, বলল, বলো কী। সেদিনের বারো আর পরশুর পাঁচ—এই সতেরোটা টাকার জন্যে তুমি—

বাধা দিয়ে উঠল রমলা, বলল, রেগ না রেগ না। বেচতে তোমাকে হবে না।

হাট-বাজার দোকানপাট সবই করে রমলা। উপায় কি। স্বামী যার ঘরকুণো, তার এ ছাড়া গতি কি।

ওদিকে কৃষ্ণচূড়ার মাথায় মাথায় আগুনের দীপ জ্বলে ওঠে, আর তার নীচের পীচঢালা পথ ধরে চলে রমলা। একটা স্ফুলিঙ্গ। মাথায় তার আগুনের রেখা, কপালে অগ্নির টিপ। সাধ্বীর বিজ্ঞাপন যেন জ্বলতে থাকে গনগনে আগুনের মত।

হুশ করে গা ঘেঁষে বেরিয়ে যায় ট্যাক্সি, ট্রাম যায়, বাস যায়। সকলেই একবার চেয়ে দেখে এইদিকে। একে রূপ হয়তো কেউ বলে না, একে বলে একটি অপরূপ দৃশ্য। চমক-লাগানো চেহারাই বটে। যারা অল্প

ধরনের মানুষ, মনে জোর যাদের কম, তারা বলে—যেন মা-কালী।

কিন্তু কোনো কিছু কথা বলে না মোহিত। যে চোখে দেখে একদিন সে মোহিত হয়েছিল সে চোখ এখন আর তার নেই। সে মনও নেই, সে মেজাজও নেই। এখন সে উদাসীন একটা মাংসাপিণ্ড মাত্র।—রমলার এই অনুযোগ ক্রমশ স্তূপ হয়ে উঠছে।

হেমাঙ্গিনী এসে বলল, ফায়ার মানে কি ভাই?

—কেন?

—বলই না।

—হঠাৎ ও-কথা কোথায় পেলে।

হেমাঙ্গিনী বলল, উনি বলেন—তুমি নাকি একটা ফায়ার। মানে জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, তোমার কাছে জেনে নিতে।

রমলা বলল, কি-জানি। শুনিনি কখনো।

—কয়দিন থেকে তোমাকে কেমন যেন চাঙ্গা দেখছি। কেমন খুশি খুশি দেখছি। ভাব হয়েছে বুঝি নতুন করে?

রমলা বলল, নিশ্চয়। অত সুন্দর স্বামী যার তার খুশি না হবার আছে কি!

—আর কেমন জ্ঞানী কেমন গুণী কেমন ভারিক্কি। তার উপর, তার উপর কেমন রোজগার।

—তবে? খুশি আমি হব না, কি, হবে তুমি?

হঠাৎ ভারী গম্ভীর হয়ে গেল হেমাঙ্গিনী। সেই বা খুশি হবে না কেন। তার স্বামীর গুণই বা এমন কম কি।

দিন-রাত চালু একটা ব্যস্তসমস্ত কারখানার মত যে ইস্কুলে সারাদিন একটানা টাইপরাইটারের খটখট আওয়াজ বাজে, হঠাৎ সেখানটা হয়ে গেল স্তব্ধ। চোখের চশমাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে অপলক চোখে চেয়ে বসে আছে মোহিত। কিছু না দেখার জন্যে এখন আর তার চোখ বন্ধ করতে হয় না, চশমা খুলে রাখলেই চলে। একটানা একটা প্রকাণ্ড লম্বা ঘুম থেকে যেন জেগে উঠেছে আজ মোহিত। গত দশটা বছর তার কাছে কেমন একটা আবছা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।

হরিশের অনেক পয়সা। ট্যাক্সির কারবার আছে, শুরকি-কল আছে, বাড়ি আছে। তার উপর আছে চাল আর চটক। শর্টহ্যান্ড শিখতে এসেছিল নিজে নোট নেবার জন্যে নয়, নিজের আপিস চালাবার জন্যে।

টেবিলের উপর থেকে চশমা তুলে নিয়ে চোখে দিল মোহিত। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল উপরে। ফাঁকা ঘর। কিছু

নিয়ে যায়নি রমলা। চাবির তোড়াটাও বালিশের নীচে রেখে গেছে।

মোহিত ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

পাশের ফ্ল্যাটে একটা নারীকণ্ঠ শুনে সোজা হয়ে বসল মোহিত। কিন্তু তখনি গা ছেড়ে দিল। বেজায় ঘুম পাচ্ছে তার। সত্যি, একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। রমলা ঠিকই বলেছিল।

ও-ফ্ল্যাটে করঞ্জাক্ষ স্নান-সমাপন ছবিটা খবরের কাগজ দিয়ে জড়াতে জড়াতে বলল, এক-শ দু-শ কিংবা পঞ্চাশ না হোক, পাঁচ-দশ টাকা পাবই—বাজারে বেচে দেওয়াই ভালো।

হেমাঙ্গিনী ঠোঁট উল্টে বলল, তোমাদের মতলব বুঝিও নে ছাই। আজ যাকে বল লাখ টাকা, কালই তাকে বল পাঁচ-দশ।

করঞ্জাক্ষ বলল, সে কথা বুঝিয়ে বলতে গেলে লম্বা বক্তৃতা দিতে হবে। ফিরে আসি, বলব। তৈরি হয়ে থেকো কিন্তু।

হেমাঙ্গিনী বলল, আমি আছি।

জনসনের লণ্ডন ও আমার কলকাতা

ইন্দ্রজিৎ

দেশ পত্রিকার সাপ্তাহিক আসরে সম্প্রতি কলকাতা সম্বন্ধে আমি দুটি একটি প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। সে প্রবন্ধ যারা পড়েছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে কলকাতা সম্বন্ধে আমার মনে একটি ভয় মিশ্রিত ভক্তির ভাব লেগে আছে। ভক্তি থাকাই স্বাভাবিক। মাতৃঋণ কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যদিচ কলকাতায় আমার জন্ম নয় তথাপি অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালীর ন্যায় কলকাতার স্তন্যে আমি লালিত,—শিক্ষালাভ করেছি প্রধানত কলকাতায়। কলকাতা আমাকে লালন করেছে বটে, কিন্তু পালন করেনি অর্থাৎ জীবিকার্জনের ব্যবস্থা কলকাতায় হয়নি। জীবিকার অন্বেষণে কলকাতা যেদিন ছাড়তে হয়েছে সেই দিন থেকে পরিচয়ের বন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে। যে ছিল আপনজন ক্রমে সে পর হয়ে গেছে। বিশাল নগরীতে বাস করবার বিশেষ রকম কলাকৌশল আছে। ছাত্রাবস্থায় সেই কায়দা-কানুনগুলো আয়ত্ত করেছিলুম। বহুকালের অনভ্যাসে বিদ্যাহ্রাস হয়েছে। এখন হাওড়া কিম্বা শেয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামবামাত্র আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। বিশাল জনতার মধ্যে কোথাও একটা নির্মমতা আছে, সে কাউকে চেনে না। কলকাতায় আমার অগণিত আত্মীয়। অগণিত বন্ধু অথচ কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে কত-বার যে মনে হয়েছে এমন অনাত্মীয়, এমন নির্বান্ধব স্থান বোধকরি আর দ্বিতীয়টি নেই।

আমি যাঁকে গুরু বলে মানি সেই চার্লস ল্যাম লণ্ডনজাত, লণ্ডন লালিত এবং লণ্ডন পালিত মানুষ ছিলেন। তাঁর লণ্ডন প্রীতি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়ে তাঁর বহু রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর লণ্ডন সম্বন্ধে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তথাপি ল্যাম-এর একটি উক্তিতে মনে ধোঁকা লেগে যায়—the sweet security of streets—জনবহুল যানবহুল রাজপথে নিরাপদ গতির কথা আমি ভাবতেই পারিনে। লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, কলকাতার রাস্তার চাইতে আপদ-সংকুল স্থান আর কি হতে পারে আমি তো ভেবেই পাইনে। এই গেল ভয়ের কথা। অপরদিকে এও সত্য, সেই দুর্গম রাস্তা কোনো রকমে পার ক'রে দিয়ে কেউ যদি আমাকে একটি চায়ের দোকানে কিম্বা কফি হাউসে একবার বসিয়ে দিতে পারে তো আমার চাইতে কলকাতার বড় ভক্ত আর খুঁজে পাবেন না। মুহূর্তপূর্বে যে স্থান নির্বান্ধব মনে হয়েছিল তাই এখন বন্ধু সমাকুল মনে হবে। চায়ের দোকানে নিতান্ত অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিও মিত্রবংশীয়। ডক্টর জনসন বলেছিলেন, আমার এই ট্যাভার্ন চেয়ারই আমার সিংহাসন। চায়ের দোকানে একটি নিরাপদ আসন পেলে তাঁর মতো আমিও রাজ্যসুখ ত্যাগ করতে রাজি আছি।

চার্লস ল্যাম-এর মতো ডক্টর জনসনও অতিমাত্রায় লণ্ডন ভক্ত ছিলেন। বলেছিলেন One who is tired of London is tired of life অর্থাৎ কিনা লণ্ডনের স্বাদ যে হারিয়েছে সে জীবনের স্বাদ হারিয়েছে। কোনো শহর বা নগর সম্বন্ধে এত বড় সার্টিফিকেট কেউ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। কলকাতা সম্বন্ধে অতখানি বলতে কেউ রাজি কিনা আমি জানিনে। কলকাতা বিহনে জীবন বিস্বাদ হয়ে যাবে এতখানি বলতে আমি প্রস্তুত নই। এইটুকু অবশ্যই বলব যে একঘেয়ে জীবনে অরুচি ধরে গেলে স্বাদ বদলাবার জন্যে কলকাতায় যাওয়ার সার্থকতা আছে।

সেই লণ্ডনকে জনসন অত বড় সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, ভাবলে অবাক লাগে, সেই লণ্ডন শহর বহুদিন তাঁকে মাথা গুঁজবার স্থানটুকু দেয় নি। বাসস্থানের অভাবে লণ্ডনের রাস্তায় কিম্বা পার্কে তাঁকে রাত কাটাতে হয়েছে। মায়ামমতাহীন লণ্ডন একদা তাঁকে হেলাফেলা করেছে; সেই লণ্ডনকে উত্তরকালে তিনি নিজগুণে জয় করেছিলেন। লণ্ডন-সমাজের শিরোমণি হয়ে বসেছিলেন। জ্ঞানী গুণীরা তাঁকে ঘিরে বসেছেন, স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর মহা সমাদরে রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁকে লাঞ্চে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে লোকে কৃতার্থ, থিয়েটারে তাঁর আসন নির্দিষ্ট, চা কফির দোকানে তিনি সিংহাসনে আসীন। কোথায় জনসনের লণ্ডন আর কোথায় আমার কলকাতা। কলকাতার অগণ্য জনতার মধ্যে আমি নগণ্য। সেখানে কেউ আমাকে সূচ্যগ্রভূমি ছেড়ে দেয় না। লম্বা কিউ-র ল্যাজের ঝাপটা খেয়ে পালাতে হয়।

আপন বাহুবলে কিম্বা নিজগুণে যে জিনিস আয়ত্ত হয় তার অধিকার ভোগে যতখানি তৃপ্তি পাওয়া যায় এমন আর কিছুতে নয়। কোর্সিকাবাসী নেপোলিয়নের ফ্রান্স জয়, অস্ট্রিয়াবাসী হিটলারের জার্মেনী জয় আর অজ্ঞাতকুলশীল গ্রাম্য বালক জনসনের লণ্ডন জয় এক পর্যায়ের বলতে হবে। বোধকরি এই কারণেই জনসনের লণ্ডন প্রীতি এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। স্কটল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। জনসন যখন স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণে গিয়েছিলেন জনৈক স্কচ ভদ্রলোক তাঁদের মহামান্য অতিথিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন উক্ত দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁকে কতটা মুগ্ধ করেছে। জনসন তাঁর স্বভাবসুলভ শ্লেষাত্মক ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন, মশায়, সত্যি বলতে কি, দেখবার মতো বস্তু আছে একটি —ঐ চওড়া সড়কটা যেটা বেয়ে যে কোন স্কচম্যান লণ্ডন-স্বর্গে পৌঁছে যেতে পারে।

আমীর ওমরাও নন, উচ্চ রাজকর্মচারী নন, অত্যন্ত দরিদ্র একজন সাধারণ নাগরিক লণ্ডনের মতো একটি বিরাট নগরীর উপরে এতখানি প্রভুত্ব বিস্তার করেছেন এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। নিজেই গর্ব করে বলেছেন, এমন দিন যায় না যেদিন খবরের কাগজে কোন না কোন সূত্রে আমার উল্লেখ না থাকে। ডক্টর জনসন কোথায় ডিনার খেলেন, ডিনার টেবিলে কোন প্রসঙ্গে কি মন্তব্য করেছিলেন পরের দিন খবরের কাগজে ছাপা হ'ত এবং মুখে মুখে সেই কথা সারা লণ্ডনে ছড়িয়ে পড়ত। খবরের কাগজের তখন সবে জন্ম

হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে খবর সম্বন্ধে লোকের রুচি তখন অনেক বেশি মার্জিত ছিল। যা যথার্থই মূল্যবান তাকে মূল্য দিতে জানত। আজকাল খুন জখম, তহবিল তছরূপ, নারীহরণ, এইসবই খবরের কাগজের প্রধান উপজীব্য। তখনকার দিনে এসব ব্যাপার সমাজে আদৌ ঘটত না এমন নয় তবে এতটা বিস্তার লাভ করেনি, এ কথা নিশ্চিত। তা ছাড়া এই সব ব্যাপারকে সাধারণের দরবারে পরিবেশন যোগ্য বলে গণ্য করা হ'ত না।

লণ্ডনের সঙ্গে তাঁর নাম এমনি অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত যে তাঁর মৃত্যুর ১৭০ বৎসর পরে আজও টুরিস্ট ব্যবসার খাতিরে ইংরেজ বিদেশীদের আহ্বান করে বলে—Visit Johnson's London, বিদেশী টুরিস্টরা কি বলে জানিনে। আমি হ'লে বলতুম সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। জনসনহীন লণ্ডনের আজ কি আকর্ষণ? আধুনিক ইংরেজ কবি বিদ্রূপ করে বলেছেন—Oh! to be in England now that Winston's there আমি কবি হ'লে বলতুম,—Oh! for a day in London when Johnson was there.

যাই বলুন, লণ্ডনের কৃতিত্ব আছে, ও একনিষ্ঠ। কত রাজা কত উজীর গেল, কাউকেই সে আমল দেয়নি। বলে, আমি আর কাউকে জানি না, আমি শুধু জনসনকে জানি। জনসন আমার, আমি জনসনের। কিন্তু কলকাতা কার? ও কারোই নয়। রামমোহনের নয়, বিদ্যেসাগরের নয়, বিবেকানন্দের নয়, রবীন্দ্রনাথের নয়। কত জ্ঞানী কত গুণী, কত কর্মী কলকাতায় জীবনপাত করে গেলেন ও কাউকেই মনে প্রাণে বরণ করে নেয়নি। কারো নামেই নিজের পরিচয় দেয় না। লণ্ডনের মতো কারো সম্বন্ধেই বলে না—তোমার গরবে গরবিনী আমি। ও কোন একজনের নয়, ও জনতার।

লেখাটা প্রমীলা দেবীকে পড়ে শোনাচ্ছিলাম। উনি বাধা দিয়ে বললেন, তুমিও যেমন, লণ্ডন আর কলকাতা এক হতে যাবে কেন? লণ্ডন হ'ল মান্ধাতার আমলের সেকেলে মানুষ। আমাদের কলকাতা একেলে। ঠানদি আর নাতনির রকম-সকম কি এক হয়, না হলে ভালো লাগে? একনিষ্ঠতা ঠানদিকে যেমন মানায় নাতনিকে তেমন নয়। কলকাতা আধুনিকা। ও কারো কাছে ধরা দেয়নি, ভালোই করেছে। ওর কথা হল, আমি তারি যে আমারে যেমনি দেখে চিনতে পারে। তা প্রমীলা দেবী কথাটা মন্দ বলেননি। আমি এদিক থেকে ভেবেই দেখিনি; কিন্তু এটাও একটা দিক। আর এসব বিষয়ে মেয়েদের মতই শিরোধার্য।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে লণ্ডনের পশ্চাতে বহু শতাব্দীর ইতিহাস। কলকাতার ইতিহাস নেই, তেমনি আবার কৌলিন্যও নেই। ও এই সেদিনের অর্বাচীন। হিন্দু আমলের ফোঁটা তিলক নেই, নবাবী আমলের তকমা নেই। ইংরেজের আমলে ওর জন্ম। এত অল্প দিনে কৌলিন্য গড়ে উঠতে পারে না। কৌলিন্যবোধ যদি থাকত তো কুলিন কন্যাদের মতো অন্তত মরণকালেও কারো-না-কারো সঙ্গে মালা বদল করত। ওর তেমন মতিই নয়। ও নিজে যেমন অর্বাচীন, অর্বাচীনের প্রতিই তার আকর্ষণ। ছেলেছোকরাদের নিয়েই ও মেতে আছে। ওর বুদ্ধি কোনকালে পাকবে বলে মনে হয় না।

লণ্ডন আর কলকাতায় এই তফাৎ। লণ্ডন সাবালকের অর্থাৎ পরিণত বুদ্ধির শহর। তার কারণ লণ্ডন হচ্ছে ওদের ব্যবসার কেন্দ্র এবং শাসনকেন্দ্র। শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে লণ্ডনের তেমন প্রতিপত্তি নেই। নানা বিদ্যার নানা কেন্দ্র দেশময় বিস্তৃত; তোমার প্রয়োজন বুঝে যাও অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে কিম্বা শেফিল্ড ম্যাঞ্চেস্টার নয়তো গ্লাসগো এডিনবরায়। বেশির ভাগ মানুষ লণ্ডনের বাইরে শিক্ষিত। শিক্ষা সমাপ্ত করে, তবে জীবিকার অন্বেষণে ওদেশের লোক লণ্ডনে গিয়ে ভিড় করে। আর আমাদের শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র কলকাতা। বি এ, এম এ তো বটে; আইন পড়তে চান কলকাতায়, ডাক্তারি পড়তে চান কলকাতায়, ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে চান তাও কলকাতায়। কলকাতার বাইরে উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। গোটা বাংলা দেশের বিনিময়ে এক কলকাতা ফেঁপে উঠছে। তাতে কুফল ছাড়া সুফল কিছুই হয়নি। বাংলা দেশের চেহারাটি হয়েছে ম্যালেরিয়া রোগীর মতো পিলে-সর্বস্ব অর্থাৎ কলকাতা সর্বস্ব, হাত-পাগুলো কাঠি কাঠি। গায়ে মাংস লাগেনি কারণ মফস্বল অঞ্চল সব দিক থেকে বঞ্চিত—শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, সৌন্দর্য নেই, রুচি নেই। কলকাতা আমাদের একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র তো বটেই, উপরন্তু ব্যবসা এবং শাসন কেন্দ্রেও বটে। শহরটি ছাত্রপ্রধান বলে এর ব্যবসা বলুন, শাসন বলুন, উৎসব ব্যসন বলুন সবই ছাত্রদের নিয়ে। আমাদের শাসকবর্গ তো ছাত্র শাসন নিয়েই গলদঘর্ম। উৎসব ব্যসনের তো কথাই নেই। ছাত্র নইলে খেলাধুলো মিথ্যা, সিনেমা-হাউস ফাঁকা, রাজনৈতিক শোভাযাত্রা অচল। কলকাতার জীবন দ্বিখণ্ডিত। বয়স্করা জীবিকা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন,—বলতে গেলে জীবন্মৃত। আর ছেলেছোকরারা জীবনামৃত এমন গোগ্রাসে গিলছে যে সেটা এক রকম হ্যাংলাপনায় দাঁড়িয়েছে। এর কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। জীবিকা এবং জীবন এই দুই নিয়ে নগর নগরীর চরিত্র। এক দল জীবিকা নিয়ে থাকবে আরেক দল জীবনকে নিয়ে, তাতেই দ্বন্দ্ব সমস্যা দেখা দেয়। গোলদীঘির সঙ্গে লালদীঘির বড়বাজারের সঙ্গে বৌবাজারের ঠিক সামঞ্জস্য-বিধান হয়নি, এইজন্য কলকাতার সামাজিক জীবন বিধ্বস্ত। সেই সামঞ্জস্য যেদিন হবে সেদিন কলকাতা অনেকটা ধাতস্থ হবে।

কলকাতার মন মেজাজ এমনি বদলে গিয়েছে, আর যে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলতে পারি এমন ভরসা হয় না। জনসন যেমন লণ্ডন জয় করেছিলেন আমি তেমনি কলকাতাকে জয় করব এমন দুরাশা রাখিনে। ওখানকার জ্ঞানীগুণীরা আমাকে ঘিরে বসবেন এমন শুভ বুদ্ধি কি তাঁদের হবে? জনসনের মতো আমার বিদ্যেও নেই বুদ্ধিও নেই, শুধু তাঁর দুর্বুদ্ধিটুকু আছে। চোখা চোখা কথা বলে লোক ঘায়েল করতে উনি ওস্তাদ ছিলেন। সে বিদ্যেটা আমিও যৎকিঞ্চিৎ আয়ত্ত করেছি। জনসনীয় ভঙ্গিতে কলকাতার সম্বন্ধে অনেক কটূক্তি এই প্রবন্ধেই করেছি। কিন্তু কলকাতার রসজ্ঞান আছে। নিশ্চয় বুঝবে আমি ওকে ভালবাসি। যার সম্বন্ধে আমি উদাসীন তাকে গাল দিতেই বা যাবো কেন? আমার কলকাতাকে অপরে কেড়ে নিয়েছে এই ঈর্ষার বশেই কটূক্তি করেছি এতটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি কলকাতার আছে।

একদিক থেকে জনসনের চাইতে আমি বেশি ভাগ্যবান। জনসেন লণ্ডনকে তেমন করে পেয়েছিলেন বৃদ্ধ বয়সে, লণ্ডনও তখন বৃদ্ধ। আমি কলকাতাকে পেয়েছি আমার যৌবনে, তখন কলকাতারও ভরা যৌবন। ধূমায়িত চায়ের কাপে কলকাতার উষ্ণ স্পর্শ পেয়েছি, সে স্পর্শ লেগে আছে আমার অধরে। কলকাতাকে আর যদি ফিরে না পাই তাতেও দুঃখ নেই। যা পেয়েছি সেই ঢের তাতেই মন ভরে আছে। নাটোরের বনলতা সেন যা দিতে পারত না কলকাতা তাই দিয়েছে। কেমন করে ভুলব—আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল মির্জাপুরে ফ্যাবুরিট কেবিন।

মুষ্টিযোগ

সতীনাথ ভাদুড়ী

লাইন দিয়ে! লাইন দিয়ে! 'এক এক করে! এক এক করে!' হাঁক শোনা গেল উপেন্দ্র হোমিও ফার্মেসীর পাশের তামাক খাওয়ার-ঘর থেকে। যতবার একখান করে রুগী ভরা গাড়ি পোঁছবে, ততবার এই চীৎকার শোনা যাবে।

সম্মুখের মাঠে গরুর গাড়ি, মোষের গাড়ির ভিড় লেগেছে। দূর দূর থেকে রুগীরা এসেছে উপীন ডাক্তারকে দেখাতে। রোজই অগুণতি রুগী আসে—আজ আবার হাটবার।.........

......ছুটকো ছাটকা রুগী যায় বটে যুদ্ধফেরৎ অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জির কাছে। কিন্তু সাতঘাটের জল খাওয়ার পর যখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে, তখন আসতেই হয় উপীন ডাক্তারের কাছে। অন্য ডাক্তাররা রুগী হাতে রাখবার জন্য রোগ জীইয়ে রাখে; তেমন পাওনি আমাদের উপীন ডাক্তারকে! বিশ্বাস নিয়ে খেলে, ও'র এক ফোঁটা ওষুধেই রুগী চাঙ্গা হয়ে ওঠে; গোলমেলে রোগ হলে বড় জোর দরকার হয় তিন ফোঁটার। কিন্তু সত্যিকার বিশ্বাস চাই। ......

তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যে আশ-পাশের খানকয়েক গ্রাম জুড়ে বেশ একটা হোমিওপ্যাথির আবহাওয়া তয়ের করে ফেলেছেন। এরই ফলে অ্যালোপ্যাথ চ্যাটার্জি ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর মন কষাকষির অন্ত নেই।

ডিসপেনসারি ঘরের দেওয়ালে কাচের ফ্রেমে বাঁধানো দুইটি উপদেশবাণী। প্রথমটিতে সকলকে মনে করিয়ে দেওয়া যে 'বিশ্বাস না থাকিলে ঔষধে কোন ফল হয় না।' দ্বিতীয়টিতে তর্জনী সংকেত দিয়ে লেখা—"ঔষধ সেবনকালে তামাক খাওয়া এবং সিঁদুর ব্যবহার করা বারণ। মেটে সিঁদুর চলিতে পারে।"

হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের উপর বিশ্বাসে উপীন ডাক্তারের একটুও ভেজাল নেই বলে, অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে আসা রুগী দেখলেই তাঁর মেজাজ সপ্তমে চড়ে। তাঁর মনের এই দিকটির খবর গজাল চৌকিদারের সঠিক জানা ছিল না। সে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বিনা পয়সায় দেখাতে। চৌকিদারী বুদ্ধিতে ভেবেছিল যে চ্যাটার্জি ডাক্তারের নিন্দা মুখে নিয়ে ঢুকলে উপীন ডাক্তার খুশী হবেন। তাই সে আরম্ভ করে—"গিয়েছিলাম চ্যাটার্জি ডাক্তারের কাছে একে দেখাতে। তিনি বললেন—অনেক-গুলো ইনজেকশন দিতে হবে—অনেক খরচ—তার চেয়ে উপীন ডাক্তারের জল তুমি খাইয়ে দেখ।...... শোন একবার কথা! উপীন ডাক্তারের জল!......এই রকম খোঁচা-মারা কথাই বলে চ্যাটার্জি ডাক্তার।"

উপীন ডাক্তার লোক চরিয়ে খান। বুঝে গেলেন যে গজাল চৌকিদার ওষুধের দাম দেবে না।......ঘর ভরা রুগী। শুধু কি রুগী দেখা! ওষুধ দেওয়া, ওষুধের দাম নেওয়া, প্রত্যেককে একবার করে 'আজ তামাক খেয়োনা' বলা সব কাজ তাঁকে একা হাতে করতে হয়। এখন তাঁর নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। গজালকে ইশারায় চুপ করতে বলে তিনি হাঁক দিলেন—"ভন্তু! ওরে ভন্তা!"

"আজ্ঞে যাই!"

কড়া শাসন বাপের—ডাকের উত্তরে সব সময় আজ্ঞে বলবি! ভন্তু তাঁর একমাত্র ছেলের নাম। বছর আষ্টেক বয়স। বেশ চটপটে চালাকচতুর ভাব। ডাক শুনেই সে বুঝে গিয়েছে ব্যাপারটা। মেয়ে রুগীর পয়সা না দেবার লক্ষণ বুঝতে পারলে, তাকে উপীন ডাক্তার পাঠিয়ে দেন বাড়ির ভিতরে। এদের ওষুধ দেন ভন্তুর মা। হোমিওপ্যাথিক পরিবেশে থাকতে থাকতে তিনি নিজেও ওষুধ দিতে শিখেছেন। স্বামীর সঙ্গে হোমিওপ্যাথির গল্প করতে ভালবাসেন। সেকালের বিখ্যাত হোমিও-প্যাথ ডাক্তার ইউনানের অদ্ভুত চিকিৎসার কথা স্বামীর মুখে প্রত্যহ শুনলেও, তাঁর একঘেয়ে লাগে না। ইউনান সাহেব রোগীদের তামাক খেতে ও সিঁদুর ব্যবহার করতে বারণ করেছিলেন, একথা শুনবার পর থেকে ভন্তুর মা কর্তব্যবোধে মেটে সিঁদুর দেন সিঁথিতে। স্বামীকে মধ্যে মধ্যে তাড়া দেন, ডিসপেনসারির পাশেই বন্ধুদের জন্য একখান তামাক খাওয়ার ঘর করে দিয়েছেন ব'লে। উপীন ডাক্তার স্ত্রীকে বুঝোন যে এই ঘরে বিনা পয়সায় তামাকের ব্যবস্থা আছে বলেই অ্যালোপ্যাথি-বিরোধী দল হাতে থাকে;—ও পাট উঠিয়ে দিলে তো চ্যাটার্জিরই পোয়া বারো! ডিসপেনসারি ঘরে তামাকের ধোঁয়া না এলেই হ'ল!......এ যুক্তির জবাব না দিতে পেরে, ভন্তুর মা রাগে গজ গজ করেন।

ওষুধের ছোট বাক্সটি আলমারি থেকে বার করে ডাক্তারবাবু ছেলের হাতে দিলেন। গজালের বউ ভন্তুর সঙ্গে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

উপীন ডাক্তার রোগী দেখে চলেছেন। দেখা শেষ করে হোমিওপ্যাথির পরিবেশে

প্রত্যেককে বলছেন—তামাক খেয়োনা আজকে। পাশের তামাক খাওয়ার ঘর থেকে মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে—'এক এক করে।' "লাইন বেঁধে!' তাঁকে শুনিয়ে বলা। বিনা পয়সায় তামাকের দাম শোধ করছেন চ্যাটার্জিবিরোধী দলের পাণ্ডারা।

গজাল চৌকিদারের কথার জের হিসাবে উপস্থিত রুগীদের মধ্যে চ্যাটার্জি ডাক্তারের বিদ্যার দৌড় সম্বন্ধে নানারকম টীকা-টিপ্পনী চলতে লাগল। সর্বসম্মতিতে ঠিক হয়ে গেল যে, এক শুধু কাটাকুটি ছাড়া, অ্যালোপ্যাথি শাস্ত্রে আর কিছু নেই।

কিন্তু শেষ হয়েও, কথা শেষ হয় না। একজন দাড়িওয়ালা লোক বলে—"চ্যাটার্জি ডাক্তার বলছিলেন আমার কাছে যে জ্বরের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নেই। সেইজন্য হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের বাড়ির কারও কালাজ্বর হলে, তাকে অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে গিয়ে ধন্না দিয়ে পড়তে হয়। 'হোমিওপ্যাথ'এর ছেলের শক্ত ব্যামো হলেই দেখবে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করায়; ম্যালেরিয়া হ'লে লুকিয়ে অ্যালোপ্যাথি বড়ি খাওয়ায়।" আর থাকতে পারলেন না উপীন ডাক্তার।

" এত বছরতো এখানে হয়ে গেল! কেউ বলতে পারে যে একদিনের জন্যও অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেয়েছি, আমি বা আমার বাড়ির অন্য কেউ? কলকাতার হোমরা-চোমরা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা নিজেদের বাড়িতে কারও বাঁকা অসুখ হলেই, গিয়ে কেঁদে পড়ত, ডাক্তার ইউনানের কাছে, তাঁর ওই এক ফোঁটা ওষুধের জন্য! দেখেছি তো! কলকাতায় হাজার হাজার অ্যালোপ্যাথি পাস করা ডাক্তার, নিজের শাস্ত্র ভুল ব'লে ছেড়ে দিয়ে, আজকাল হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেয়! দেখেননি?"

প্রশ্নটি করা দয়াল সাহার দিকে তাকিয়ে। দোকানের মাল কিনতে দয়ালকে মাঝে মাঝে কলকাতা যেতে হয়। এ অঞ্চলে কলকাতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলে তাই তার খ্যাতি আছে। সে ঈষৎ হাসির মধ্যে দিয়ে উপীন ডাক্তারের কথায় সায় দেবার ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। দাঁতের ব্যথায় গালগলা ফুলে উঠেছে,—বেশী হাসতে গেলে লাগে।

যাক! সব খবর রাখে কলকাতার, এমন লোকও এখানে আছে তাহলে! চব্বিশ ঘণ্টা ভূতের বেগার খাটার মধ্যে এইটুকুই সান্ত্বনা উপীন ডাক্তারের!......

ডাক্তারবাবু যখনই দয়াল সাহার দিকে তাকিয়ে কলকাতার কথা বলেছেন, তখনই লাইন ভেঙে, অন্য রুগীদের চাইতে আগে দেখাবার দাবি স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে তার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্য রুগীরা ডাক্তারবাবুর দিকে তার এগিয়ে যাবার পথ করে দিল।

"ভাল করে খুলে ফেল কম্ফটারটা। গালের ঐ ফোলা জায়গাটাতে কি লাগিয়েছ? টিঞ্চার আইডিন?"

দয়াল সাহা ভাবেনি যে ডাক্তারবাবু আবার তার কম্ফটার খুলিয়ে ফোলা দেখবেন,—তিনি যে চিরকাল রোগের লক্ষণ শুনেই ওষুধ দেন!......একটু ঢোক গিলবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, সে উত্তর দেয়—"প্রলেপের কি যেন একটা ওষুধ—নাম জানি না—চ্যাটার্জি ডাক্তার দিয়েছিলেন পরশু—টনটনানি ব্যথা—কিছুই উপকার পাইনি—কাল সারারাত জেগে"......

"লাইন দিয়ে!" 'লাইন দিয়ে!" "এক এক করে!"

গম্ভীর হয়ে উঠেছে উপীন ডাক্তারের মুখ। এই দয়াল সাহার মত রুগীকেই তিনি লাইন ভেঙে আগে আসতে দিয়েছিলেন!

"তুমি সকলকে ডিঙিয়ে আগে এসেছ কেন দয়াল? যাও! নিজের জায়গায় যাও! যখন তোমার পালা আসবে তখন এস!"

একটি মৃদু গুঞ্জনের ঢেউ খেলে গেল, এই আদেশের সমর্থনে।

এর পর যখন দয়ালের পালা এল, তখনও ডাক্তারবাবুর রাগ পড়েনি।

"হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস না থাকলে কি ওষুধে ফল হয়!"

"বিশ্বাস না থাকলে কি আপনার কাছে ছুটে এসেছি! কি যে ভাবেন!"

"ভাবি ঠিকই! বাটপাড়দের ওষুধে যখন আর থই পাওনি, তখন এসেছ! এবার থেকে ভাবছি অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের ওখান থেকে ঘুরে আসা রুগীদের কাছ থেকে এক আনা করে বেশী নেবো, প্রতি দাগে। তোমাকে দিয়েই আরম্ভ করলাম দয়াল—এই এখন থেকেই!......এই নাও ওষুধ তিন দাগ। এ হচ্ছে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের বিষ নষ্ট করবার জন্য। ...... আজতো কিছু করবার উপায় রাখনি—কি করব বলো?......কালকে আসল রোগের ওষুধ দেবো।......তামাক খেয়োনা আজকে।"

দয়াল চলে গেল। ঘরের আবহাওয়া তখনও বেশ থমথমে। ডাক্তারবাবুর মুখ গম্ভীর দেখলে, রুগীরাও মুখ গম্ভীর করে থাকে। আস্তে আস্তে কথা বলতেও সাহস পায় না;—যা রাশভারী লোক উপীন ডাক্তার!

রুগী দেখবার বিরাম নেই।

প্রতীক্ষার একঘেয়েমি কাটানর জন্য একটি বুড়ো লোক বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করতেই ঘরের সকলেই হাঁ হাঁ করে ওঠে। ধরে মারে আর কি, তাকে। কোথাকার উজবুক লোকটা!

লোকটার জবাবে বোঝা গেল যে, সবাই তাকে যতটা বেকুফ ভাবছিল, ততটা সে নয়। ওষুধ খাওয়ার পর আজ আর তামাক খাওয়া চলবে না; তাই সে ভেবেছিল এখনই একটি বিড়ি খেয়ে নেওয়া যাক আরাম করে—ওষুধ খাওয়ার আগেই।

এ কথায় খেপে উঠল সকলে।

......"হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যে ঘরে থাকে সে ঘরে বিড়ি, তামাক, সিগারেট কিছু খেতে নেই, একথা কাছাকাছি গ্রামের ছোট ছেলেটা পর্যন্ত জানে! আর তুমি জান না! কোন্ গ্রামে বাড়ি? হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাতে আস, আর একটু খবর রাখ না? জাননা এখানে তামাক খাওয়ার ঘর আলাদা? দেখছ না, ডাক্তারবাবুর বন্ধুরা ঐ পাশের ঘরে বসে তামাক খাচ্ছেন!"......

এতক্ষণে উপীন ডাক্তারের মনের মেঘ কাটে। সত্যিই তা'হলে কাছাকাছি গ্রামের লোকেরা, বেশ হোমিওপ্যাথির ধরনে ভাবতে শিখে গিয়েছে! সার্থক হয়েছে তাঁর এতদিনকার নিষ্ঠা আর পরিশ্রম! প্রশান্তির স্মিতহাস্য ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। ওই সংক্রামক হাসিটিকে মুখে নিয়ে তিনি তাকালেন সকলের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে সকলে বুঝে গেল যে তিনি এইবার একটা কিছু হাসির কথা বলবেন। ......নিজের তৈরী সেই ছড়াটা বোধ হয়! ...হাসতে হবে এইবার!

সকলে নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসল।

তাদের হতাশ না করে উপীন ডাক্তার ছড়া কাটলেন—

"অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার,
নির্ঘাত বাটপাড়।
এর চেয়ে বেশী আর আমি কিছু বলতে চাই না।"

দমকা হাসির তোড়ে ঘরের থমথমে ভাব কেটে গেল এতক্ষণে। নিজেদের মধ্যে ইচ্ছামত গল্পগুজব করবার সাহস ফিরে পেয়েছে সকলে। এরপর আর সময় কাটতে দেরী লাগে না।......

শেষ রুগীটিকে তামাক খেতে বারণ করে ঘড়ির দিকে তাকালেন উপীন ডাক্তার। দেড়টা বেজে গিয়েছে। ......এই ফাঁকে খাওয়াদাওয়া সেরে না এলে, হয়তো বিকালের রুগীরা আসতে আরম্ভ করে দেবে এখনই! ......বাড়ি ঢুকবার আগে তামাক খাওয়ার ঘরে একবার হাজরি দিয়ে যাবার নিয়ম। হোমিওপ্যাথির একনিষ্ঠ সেবকদের সঙ্গে দুটো কথা না বলে যাওয়া ভাল দেখায় না।......

একটু একটু করে ধোঁয়া চালিয়ে দি
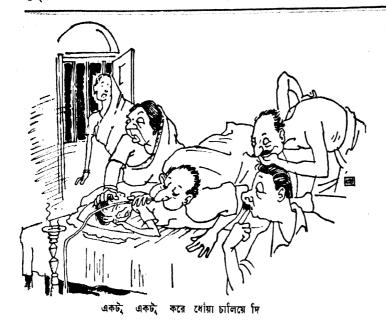
গিয়ে দেখেন একা পোদ্দারমশাই ঘাঁটি আগলাচ্ছেন। বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছেন। বাকি সকলে গিয়েছেন খেতে; ফিরে এই এলেন ব'লে! হুঁকোতে পোদ্দারমশায়ের জুত হয় না; নিজের গড়গড়াটি সেইজন্য তিনি সংগে করে নিয়ে আসেন।

গল্প আরম্ভ করলে চ্যাটার্জি ডাক্তারের কথা এসে পড়বেই পড়বে। তাঁর ভুল রোগনির্ণয়ের আধুনিকতম দৃষ্টান্তের সজীব বিবরণ সবে জমে এসেছে; এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে চীৎকার শোনা গেল ভন্তুর মায়ের!

"ওগো কি হ'ল দেখ! শীগগির দেখে যাও!"

সংগে সংগে চৌকিদারের হাঁকের মত চীৎকার আর একটি বামাকণ্ঠের!...... কি বলল বোঝা যায় না!......

ভীষণ একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়! এ চেঁচানির স্বরই যে আলাদা!......ভন্তু? সাপে কামড়েছে না হয় কুয়োয় পড়ে গিয়েছে!...... নিশ্চয়ই!

চেঁচামেচি হৈ-চৈ মুহূর্তের মধ্যে এতি ঘটে গেল!

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন তাঁরা। তাড়াতাড়িতে পোদ্দার মশাই গড়গড়াটি হাতে নিয়েই এসেছেন। বারান্দায় মাদুরের উপর ভন্তু শুয়ে রয়েছে, মায়ের কোলে মাথা দিয়ে। কাছে দাঁড়িয়ে গজালের বউ; চৌকিদারসুলভ চীৎকরটি ছিল এরই! ভন্তুর মায়ের চোখে জল—পাগলের মত কত কি জিজ্ঞাসা করছেন ভন্তুকে। ছেলে কোন কথা বলছে না। স্থির হয়ে শুয়ে চোখ পিটপিট করছিল। হঠাৎ চোখ বুজে এল তার!......নীরব......নিস্পন্দ!...

কি ব্যাপার?

গজালের বউ একগলা ঘোমটা টেনে পাশে সরে দাঁড়াল। ভন্তুর মায়ের তখন পোদ্দার মশাইকে দেখে ঘোমটা দেবার কথা মনে নেই। তিনি দেখিয়ে দিলেন সম্মুখের গেলাস, আর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ছোট বাক্সটি। ......অনেকগুলি শিশির ওষুধ, এক গেলাস জলের মধ্যে মিশিয়ে ভন্তু খেয়েছে;—ব'লল, খেতে নাকি তালশাঁসের জলের মত লাগে!......

"ক' শিশি?"

"দেখনা! তা কি আমি গনেছি!"

হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন ভন্তুর মা।

উপীন ডাক্তার হোমিওপ্যাথিক ওষুধের খালি শিশিগুলি গনলেন—ইপিকাক, চায়না, আর্নিকা, মার্কর, মার্কসল, নাক্সভোমিকা, ক্যালকেরিয়া কার্ব—সবগুলি নিঃশেষ করে খেয়েছে! সবগুলিই যে উঁচু 'ডাইলিউশন'এর ওষুধ ছিল!

"হ্যাঁরে ভন্তু, সব শিশিগুলোই কি ভরা ছিল? সাত শিশি ওষুধই কি তুই খেয়েছিস? কথা বলছিস না কেন—কথা বল! ......চোখ খুলে তাকা আমার দিকে।"

ভন্তুর সাড়াশব্দ নেই।

"তুমি আসবার আগে তবু চোখ খুলছিল। এখন কি হবে!"

ডাক্তার গিন্নীর এই কাতরোক্তিতে পোদ্দার মশাই আর স্থির থাকতে পারলেন না। হাতের গড়গড়াটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে তিনি এগিয়ে এলেন।

—"না ডাক্তার, তোমরা পারবে না। তোমার কাছে বলতে ভন্তুর ভয় করছে। দাঁড়াও আমি জিজ্ঞাসা করছি। আপনি একটু সরুন তো।"

ভন্তুর মা একটু সরে বসলেন।

পোদ্দার মশাই ভন্তুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বললেন—"ভয় পাস না ভন্তু! তোর মা-বাবা এখান থেকে উঠে গিয়েছেন। কেউ বকবে না। চোখ খুলবার দরকার নেই। শিশির ওষুধ তুই খাসনি—না? ডেয়ো পিঁপড়ের গায়ে ওষুধ ঢেলে দেখছিলি যে পিঁপড়ে মরে কিনা এতে, নারে? নিজের গায়ে লাগিয়েছিলি নারে? গায়ে লাগালে কেমন এসেন্সের মত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে নারে? কেউ বকবে না। বল! দেশালাই দিয়ে জ্বালিয়ে, ওষুধের ম্যাজিক করেছিলি নারে? ছোটবেলায় আমরাও ওরকম কত করেছি। ভয় কি—বল।".........

সব বিফল হল। ভন্তু কাঠের তক্তার মত পড়ে রয়েছে, শক্ত হয়ে।

ছেলের মা থাকতে পারলেন না।...

ছেলের জীবনমরণ নিয়ে কথা; আর এরা এখনও জেরা করেই চলেছে!... লজ্জাশরম ভুলে তাড়া দিয়ে উঠলেন স্বামীকে "আমি নিজে দেখেছি ওকে খেতে আর তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না? এখন বাজে কথা বলে সময় নষ্ট না করে, কিছু ব্যবস্থা কর—যাতে এইসব কড়া কড়া ওষুধের বিষ কাটে।"

"দাঁড়াও, আমি বরঞ্চ চ্যাটার্জি ডাক্তারকে ডেকে আনি।"

পোদ্দার মশায়ের এই কথা স্বামী-স্ত্রী কারও কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন চ্যাটার্জি ডাক্তারকে খবর দিতে।

বিপদের মুখে কোন বুদ্ধি যোগায় না।

গুটি গুটি লোক জমতে আরম্ভ করে ডিসপেনসারি ঘরে। চৌকিদার গিন্নীর চীৎকার বোধহয় এদের কানে গিয়েছিল। দরজার ওদিক থেকে নানারকম উপদেশ শোনা যেতে লাগল।......

'বমি করানো দরকার এখন।'

'নুন গুলে খাওয়ালে হয়না?'

'না হয় মাছের আঁশ?'

"চুলটুল কিছু দিয়ে গলার ভিতর সুড়সুড়ি দিলে কেমন হয়?"

"খাওয়ানো যাবে তো? দাঁতটাঁত লেগে গিয়েছে কিনা দেখে নিন, আগে একবার।"

"নেশা হয়নিতো? হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যে খাঁটি রেক্টিফায়েড স্পিরিট। অতটুকু ছেলে কখনও অতখানি রেক্টিফায়েড স্পিরিট সহ্য

করতে পারে? একবার চ্যাটার্জি ডাক্তারকে ডাকা দরকার।"

এই বিপদের মধ্যেও উপীন ডাক্তার বুঝে গেলেন যে শেষ বক্তাটি চ্যাটার্জি ডাক্তারের দলের লোক।........রেক্টিফায়েড স্পিরিটের জন্য চিন্তিত নন তিনি। আসল বিপদ এগুলো উঁচু ডাইলিউশন এর ওষুধের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে। এর কি সোজা ধক! আজ না হোক, কোন না কোন দিন অন্য একটা রোগ হয়ে ফুটে বেরবে।...........

আসন্ন বিপদের কথা ভেবে গজালের বউয়ের মুখ বিষাদে ভারি হয়ে উঠেছে। চোখের উপর এই জিনিস দেখবার জন্যই কি সে এখানে থেকে গিয়েছিল! ওষুধের দাম পুষিয়ে দেবার জন্য দুখান ঘুঁটে ঠুকে দিচ্ছিল ডাক্তারবাবুর বাড়ির—এরই মধ্যে এই কান্ড! দেখ দিকি, কিসে থেকে কি হ'ল! হে ভগবান! ডাক্তারবাবুর যে এই একটিমাত্র ছেলে।...... মাঝ থেকে সে-ই হ'ল নিমিত্তের ভাগী! তারই জন্যতো ওষুধের বাক্স আনা হয়েছিল বাইরে থেকে! ছেলেপিলের হাতে কখনও এই সব ধকওলা জিনিসের বাক্স দিতে আছে। খোকাবাবু খাওয়ার সময় শিশি-গুলিতে খুব অল্প অল্প ওষুধ ছিল,—এমনি করে দাও হে ভগবান!......

...ডাক্তারবাবু ছেলের নাড়ি দেখছেন! ছেলের মা তাঁর দিকে চেয়ে।......হে ভগবান, বাঁচিও ছেলেটাকে!......আহারে মাতো!......গজালের বউয়ের একটা কথা মনে পড়ে। ফিসফিস করে ঘোমটার মধ্যে থেকে ভন্তুর মাকে বলে—

"আমাকে যে খানিক আগেই সিঁদুর ব্যবহার করতে বারণ করলেন, ওষুধের ধক কেটে যাবে বলে, তা' সেই সিঁদুর খানিকটা খোকাবাবুর কপালে লাগিয়ে দিলে হয়না? তাহলে তো এই সব জোরালো ওষুধের ধক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মুখ্যু মানুষ, আমরা তো সব বুঝি না। ......

"ওমা তাইতো!"

ছুটে গেলেন ভন্তুর মা ঠাকুরঘরে। জলচৌকির নীচে প্রণাম করে উঠিয়ে নিলেন লক্ষ্মীর সিঁদুরকৌটোটি। এ হচ্ছে আসল সিঁদুর; লক্ষ্মীর কৌটোয় মেটেসিঁদুর রাখতে নেই; এখানে ছাড়া বাড়িতে নিজের ব্যবহারের জন্য যেটুকু আছে, সেটুকু মেটে-সিঁদুর। লক্ষ্মীর কৌটোর সমস্ত সিঁদুরটুকু তিনি এনে ঢেলে দিলেন ছেলের মাথায়।...ডবল গুণ এই ঠাকুর দেবতার সিঁদুরের! উপীন ডাক্তার প্রথমটায় বুঝতে পারেন নি। ভেবেছিলেন ভন্তুর মা বুঝি অমঙ্গল কাটানোর জন্য ঠাকুরদেবতার আশীর্বাদী সিঁদুর কপালে ছোঁয়াচ্ছেন ছেলের। ঠাকুরদেবতার দিক ছাড়া সিঁদুরের যে একটা ডাক্তারী দিক আছে, একথা খেয়াল হ'ল পরে—স্ত্রীর মুখচোখের ভাব দেখে। সংগে সংগে তাঁর নিজের মাথায় খেলে গেল, হোমিওপ্যাথি ওষুধের ধক কাটানোর, আরও জোরালো জিনিসের কথা। কি করে যেন সহধর্মিণীও বুঝতে পারলেন স্বামীর মনের ভাব। অথই সমুদ্রে কূল দেখতে পেয়েছেন দুজনে একই সংগে। ......একথা এতক্ষণ মনে পড়েনি কেন, তাই ভেবেই আশ্চর্য লাগে! এত জানা—তবুও!......

পোদ্দার মশায়ের গড়গড়াটি সম্মুখে মেঝের উপর রাখা ছিল। গড়গড়ার নলটা খুলে উপীন ডাক্তার সহধর্মিণীর হাতে দিলেন।

"ভাল করে ধর দুহাত দিয়ে নলটা ওর মুখের সম্মুখে। আমি তামাকে টান মেরে মেরে, নলের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে ধোঁয়া চালিয়ে দি এখান থেকে।"

পাড়ার রাঙাদিদিমা চেঁচামেচি শুনে দেখতে এসেছেন। বাড়িতে ঢুকে প্রক্রিয়াটি দেখে কি বুঝলেন তিনিই জানেন; বললেন—"তাতে কি হয়েছে! আমার সম্মুখে তামাক খেলে!"

গজালের বউ ঘোমটার মধ্যে থেকে জানিয়ে দিল যে, এ আসল তামাক খাওয়া নয়; এ হচ্ছে ওষুধের বিষ কাটানোর ওষুধ; সিঁদুরের মত।......

"তাই বলো!......তুমি নিজেই কাশছ যে উপীন! অভ্যাস নেই কিনা। ......একজন পাকা তামাক-টানিয়ে লোকের দরকার এখন! নল দিয়ে কি ধোঁয়া দেওয়া যায় অমন করে! ধোঁয়া যাচ্ছেনা মোটেই! হাঁ করিয়ে মুখের মধ্যে ধোঁয়া ঢোকাতে, তবে না! .....দাঁত বউ দেখতো দাঁত লেগে নেইতো ভন্তুর?......ও গজালের বউ খুঁটির মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? দ্যাখ দেখি খুঁজে পেতে একখানা চামচ পাস কিনা ওই বারান্দায়। দাঁত খোলাতে হবে।".........

দরজার বাইরে পোদ্দার মশায়ের কাশির সাড়া পাওয়া গেল।

"ডক্টর চ্যাটার্জি এসেছেন, পেট থেকে পাম্প করে ওষুধ বার করবার যন্ত্রপাতি নিয়ে। আমরা ঢুকছি।..."

হঠাৎ বিষম লাগল উপীন ডাক্তারের। নিশ্চয়ই তামাকের ধোঁয়া গলায় লেগে। অন্য কোন কারণে নয়।......

ভন্তু চোখ খুলেছে!......ওষুধের ফল ধরেছে তা'হলে! আনন্দের দীপ্তি লাগল, মা-বাবার চোখেমুখে।

পেট থেকে ওষুধ বার করবার যন্ত্রপাতি নিয়ে, চ্যাটার্জি ডাক্তার এসেছেন শুনে, ভন্তু ভয়ে চোখ খুলে ফেলেছিল। সে বুঝে গিয়েছে যে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলো খাওয়ার জন্য বাবা আজ আর মারধোর করবেন না তাকে।......বাবা ঠিক ধোঁয়া দিতে পারছেন না নলের মধ্যে দিয়ে।...কাশছেন। সে নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করেছিল একদিন!...

ডাক্তার চ্যাটার্জির কাটাকুটির ভয়ে, বাবার ভয় কাটিয়ে ভন্তু বলল—"নলটা গড়গড়ায় লাগিয়ে আমাকে দেন; আমি নিজে নিজে টানতে পারব। "......

কাশি থামিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন উপীন ডাক্তার।...আত্মসম্মান বজায় থাকবার তৃপ্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গর্ব।

চেঁচিয়ে বললেন—"অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারকে কে ডেকে আনতে বলেছিল! ডক্টর চ্যাটার্জিকে ভিতরে আনবার দরকার নেই, পোদ্দার মশাই। আমাদের ওষুধেই কাজ হয়েছে।...... যত সব!......

......হেঃ!"......

প্রবাল-বলয়

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের হৃদয়ে অনুভূতির একটা ক্ষেত্র আছে, যাকে সেই আমার দেখে-আসা নিস্তরঙ্গ নীল গভীর লেগুন বা সামুদ্রিক উপহ্রদটির সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে। কী নীল, কী স্তব্ধ, কী প্রশান্ত! ভিন্নমুখী চিন্তার স্রোতে ভিতরটা এলোমেলো, কিন্তু বাইরে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই! নীল-নীল হ্রদটিকে চারিদিক দিয়ে বলয়ের মতো বেষ্টন ক'রে আছে একটি বলয়াকার দ্বীপ,—অন্তরের অবচেতন স্তরে মধুর কামনাকে যেমন ঘিরে থাকে সচেতনতার নীতিনিষ্ঠ কঠিন প্রাচীর। প্রাচীরের বাইরে বাস্তব-জীবনের ঢেউ এসে বারংবার আছড়ে পড়ে, দুর্বোধ্য মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতে অস্থির! প্রবাল-স্তরের পর স্তর জ'মে স্বাভাবিক নিয়মেই গঠিত হ'য়েছে সেই বলয়াকৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপটি,—ভিতরে তার স্তব্ধ প্রশান্ত হ্রদ,—বাইরে অন্তহীন উধাও সমুদ্রের হাহাকার!

কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন নগণ্য ক্ষুদ্র দ্বীপটির কথা বলতে হ'লে মূল দ্বীপপুঞ্জটির কথা বলা উচিত সবার আগে। মূল দ্বীপগুলিকে ভারত মহাসাগরের মণি-মাণিক্য বলা হ'য়ে থাকে। যাঁরা মাছের ব্যবসা করবেন, নারকেলের ব্যবসা করবেন, অতিকায় কচ্ছপের খোল দিয়ে তৈরী নানারকম সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসা করবেন, তাদের পক্ষে এ দ্বীপগুলি অবশ্যই মহার্ঘ মণি-মানিক, কিন্তু জনৈক ভারতীয় ব্যবসায়ীর বিশিষ্ট কর্মচারী হ'য়েও আমার কাছে এ দ্বীপগুলি ভিন্ন এক রূপে দিন দিন প্রতিভাত হচ্ছে; যত কেটে যাচ্ছে দিন, ততই মনে হচ্ছে, মণিই যদি হয় ত এরা বিষধর হিংস্র সর্পকুলের মাথার মণি! এই অতি-প্রাকৃত রূপ যাদের চোখে পড়েছে, তাদের কাছে এদের সম্মোহনের কোনো তুলনা নেই!

একটা আদিম উদ্দাম হিংস্রতা যেন জেগে আছে এই দ্বীপগুলির ঘন-বিস্তৃত অরণ্যে অথবা পাহাড়-চূড়ায় অথবা বলয়াকার দ্বীপ দিয়ে বেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নীল হ্রদগুলির তীরে তীরে!

ছোট-বড়ো নয়-দশটি দ্বীপ নিয়ে এই আমিরান্টে বা আল্‌মিরান্তে দ্বীপপুঞ্জ। সভ্যতার সামান্য স্পর্শটুকুও ফেলে এসেছে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে মাহে-সিসিলিসে। সিসিলিস-সরকারেরই অধীন এই দ্বীপগুলি. র'য়েছে মাহে-সিসিলিসের দক্ষিণ-পশ্চিমে। কয়েকটিতে সম্প্রতি বসতি হয়েছে, তা-ও বিরল বসতি। অধিকাংশ দ্বীপগুলিতে মাঝে মাঝে নৌকা আসে সিসিলিস থেকে,-সেইটুকুই সভ্যতার স্পর্শ, সেইটুকুই সভ্য-জগতের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ!

আমি যে বলয়াকৃতি দ্বীপটির কথা বলতে ব'সেছি, তার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বৈচিত্র্য আছে। প্রথমত দ্বীপটি অতিশয় ক্ষুদ্র, মধ্যবর্তী হ্রদটি ততোধিক ক্ষুদ্র। সমুদ্রের তীর দিয়ে দিয়ে ঘুরে দ্বীপটিকে প্রদক্ষিণ করতে ঘণ্টাখানেকের বেশী লাগবে না! কিন্তু ওই ছোট্ট দ্বীপটিকে প্রকৃতি যা' দিয়েছেন, তা' অতুলনীয়! একদিকে বালুবেলার যেমন বিস্তৃতি আছে, যেমন আছে অসংখ্য নারিকেল-কুঞ্জ, অন্যদিকে তেমনি আছে লতাগুল্মে-ঘেরা শ্যামলিমার আভাস। যেদিকে লতা-পাতার বিস্তার, সেদিকে মাথা উঁচু ক'রে হ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট পাহাড়। এই পাহাড়টাই এ'দ্বীপের সব থেকে সৌন্দর্যের আকর এবং ভূতত্ত্ব-বিদ্‌দের কাছে একটা বিস্ময়ও বটে। প্রবালদ্বীপে এ ধরনের প্রস্তরের স্তূপ সাধারণত দেখা যায় না। আমার মনে হয়, ঐ প্রকাণ্ড পাথরটাই এই বলয়াকৃতি দ্বীপটির আদিতম সৃষ্টি। ডুবো পাহাড়ের হয়ত কোন চূড়া নৈসর্গিক বিপর্যয়ে একদিন অনন্ত সমুদ্রের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে-ছিল, তাকে ঘিরে ক্রমে ক্রমে জমলো প্রবালের দল, ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠ্‌ল এই দ্বীপ।

ত্রিকোণাকার প্রস্তরস্তূপটিকে লতাগুল্মে আজ ছেয়ে ফেলেছে, শুধু তীক্ষ্ম শিখর-দেশ মহেশের ধ্যানমগ্ন মুখখানির মতো নির্মল, জ্যোতির্ময়। আরও একটা জায়গায় এই উজ্জ্বল নির্মলতা বিরাজমান, যেখানে স্তূপটির পাদদেশের কাছে একটা প্রকাণ্ড শিলা নীল হ্রদটির উপরে ঝুঁকে প'ড়েছে, যেন দেখছে নিজের ছায়া যুগ-যুগান্তর ধ'রে। যখন আকাশে চাঁদ ওঠে,—যখন স্তূপটির চূড়ায় আর ঐ ঝুঁকে-পড়া নির্মল শিলাটির উপর হীরার মতো ঠিক্‌রে পড়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না,-যখন তারই প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে হ্রদ,—আর মৃদুমন্দ হাওয়ায় দুলতে থাকে অরণ্য,—তখন সব মিলিয়ে যে অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করে,—তা' বর্ণনা করা অসম্ভব। তখন মুহূর্তের জন্য ভুলে যাই আমার বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কথা, মুহূর্তের জন্যই মনে পড়ে,—আমি ভারতের এক মারাঠী ব্রাহ্মণ-পরিবারের ছেলে শৈব। আমাদের গ্রামের সেই ছোট্ট শিব মন্দিরটির কথা মনে পড়ে, মায়ের ঠাকুরঘরে সাজানো সেই মহাদেবের আবক্ষ-মূর্তিটির কথা মনে পড়ে। শিরে চন্দ্রকলা, গলায় জড়ানো বলয়ের মতো একটা সাপ,—মুখখানি কী অপরূপ শান্ত, স্নিগ্ধ

জানীয়! শিল্পকলার দিক থেকেও প্রণাম জানানো যায় মূর্তিটিকে!

আজও চারিদিক উদ্ভাসিত অবারিত জ্যোৎস্নায়। সমুদ্রও আজ শান্ত, সর্বত্র যেটা অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে এই নিশীথ রাত্রে। শুধু বলয়াকৃতি দ্বীপটি থেকে মাঝে মাঝে ডানা মেলে সমুদ্রের দিকে কিছুটা উড়ে আসছে দুটি-একটি শুভ্র সাগরপক্ষী, কেউ-কেউ ডেকেও উঠছে ভোর হয়েছে মনে করে, পরমুহূর্তেই যেন ভুল বুঝতে পেরে নীরব হয়ে যাচ্ছে, যারা সমুদ্রের দিকে উড়ে এসেছিল, তারাও ফিরে যাবে দ্বীপে।

আমার ছোট্ট মোটর-বোট্‌টি শুধু জলরেখা এঁকে এঁকে এগিয়ে চ'লেছে একঘেয়ে একটানা শব্দ ক'রে। আমার নিগ্রো সঙ্গী-দুটির একজন ইঞ্জিন নিয়ে ব্যস্ত—অপরজন আপন মনে গান ধরেছে উধাও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। ওর গানের সুরও একঘেয়ে—একটানা ইঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে মিশে-যাওয়া।

শেষ হ'য়ে গেছে আমার দশদিনের স্বেচ্ছাচারিতা,—দশদিনের ছুটি-নেওয়া সভ্যজগত থেকে,—ফিরে চলেছি মাইল তিন-চার দূরের আলফোঁসে দ্বীপে। আলফোঁসে দ্বীপে বসতি আছে,—ওখানেই ব্যবসায়-সূত্রে আমাকে আসতে হ'য়েছিল সিসিলিস থেকে মনিবের নির্দেশে। কাজ করেছি যথারীতি, শুধু এই দশটা দিনের হিসাব পারব না দিতে ব্যবসায়ীর কাছে। এই দশটা দিন শুধু আমারই হ'য়ে থাক,-যদি এর হিসাব সত্যিই দিতে হয় ত দেবো হৃদয়ের ব্যবসা যাঁরা করেন, তাঁদের কাছে,—আমদানী-রপ্তানির স্থূল ব্যবসায়ীর কাছে নয়!

কিন্তু লিসার কাছে এই দশটা দিনের কথা কতটুকু বলব? হাসিই এসে পড়ে ঠোঁটের কোণে,—বলার দরকারই বা কী? এ দশটা দিন ঐ বলয়াকৃতি নাম-না-জানা দ্বীপটিতে তাঁবুর মধ্যে কাটিয়েছি—আমার নিগ্রো সঙ্গী দু'টি দিনমানে বোট্‌ নিয়ে সমুদ্রে ঘোরাফেরা করছে মাছের আশায়, খাবার-দাবার চিঠিপত্র প্রভৃতি নিয়ে আসতে গেছে রোজ তিন-চার-মাইল দূরের আলফোঁসে দ্বীপ থেকে। চিঠিপত্র আমি একটাও খুলিনি এই দশদিন। শুধু লক্ষ্য করেছিলাম, দেশ থেকে চিঠি এসেছে একটা, মায়ের চিঠি। আর আছে মাত্র একটি নীল খাম, লিসার চিঠি।

এ চিঠিটাও খুলিনি। খুলব, সবই খুলব; একেবারে আলফোঁসেতে জাহাজে উঠে,—সিসিলিসে ফিরে যাবার পথে।

লিসাকে বিয়ে ক'রেছিলাম নিতান্ত খেয়ালের বশে প্রায় মাস ছয়েক আগে। জানি, খেয়ালের বশেই একদিন বিচ্ছেদ টেনে দেবো এই সম্পর্কে। খেয়ালের বশে লিসাও ছেড়ে যেতে পারে আমাকে যে-কোনো মুহূর্তে। সিসিলিসে বিয়ের স্বরূপই এই। মেয়ের সংখ্যাও যেমন বেশী, বিবাহ অথবা বিবাহ বিচ্ছেদও তেমনি ঘন ঘন,—সংখ্যায় প্রচুর। সাত-দিনের জন্যও টি'কতে পারে বিবাহ,—আবার সারা জীবনের জন্যও। হয়ত ঐ নীল খাম, ওটা বিবাহ বিচ্ছেদেরই বিজ্ঞপ্তি, কে বলতে পারে? এ' দেশে বিবাহ বা বিচ্ছেদ, কোনটাই কঠিন নয়। কঠিন বোধ হয় বলয়দ্বীপের নিস্তরঙ্গ নীল গভীর হ্রদটির মতো গভীরতম ভালোবাসার আনন্দে মগ্ন হ'য়ে যাওয়া!

লিসাদের দোষ নয়। আমি বোম্বাইয়ের মতো অট্টালিকা-ঘেরা মহানগরীতে মানুষ হ'য়েছি, আমি জানি,—দোষ কার, কোন্ অবস্থার! এই দ্বীপপুঞ্জে প্রকৃতির এই উদ্দাম অবারিত আদিমতার মধ্যেও মানুষ একটি কৃত্রিম সমাজ তৈরী ক'রে নিয়েছে, তৈরী ক'রেছে সিসিলিসে ভিক্টোরিয়ার মতো বন্দর,—সেই ক্লাব, সেই বল-নাচ, সেই পানীয়ের স্রোত! যদি সুয়েজখাল না খনন করা হ'তো, যদি ইয়োরোপকে আসতে হ'তো এশিয়ায় আফ্রিকার পাদদেশ ছুঁয়ে সেই আগেকার মতো,—তা'হলে সিসি-লিসের বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মূল্য বেড়ে যেতো প্রচুর, ভিক্টোরিয়াও বোম্বাইয়ের মতো পরিণত হতো বিরাট মহানগরীতে।

ভিক্টোরিয়া আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও দ্বীপ-পুঞ্জের প্রকৃতিদুলালদের বাঁধা হ'য়েছে যথারীতি সোলার হাল্‌কা টুপি আর টাইয়ের ফাঁস দিয়ে। বণিক আর পুরোহিত এসেছে একই সঙ্গে। সহজাত প্রাকৃতিক জীবনের উল্লাস থেকে যেন বিচ্ছিন্ন ক'রে এনে সভ্যতানামের এক কাল্পনিক অনু-শাসন দিয়ে বেঁধে রাখা হ'য়েছে মানুষ-গুলিকে। জীবনের সহজ স্রোতকে ব্যাহত ক'রে সেই স্রোতশক্তিকে কাজে লাগানো হ'য়েছে এক বাণিজ্যিক চক্রকে চলমান রাখতে। মোটর বোটে যেতে যেতে আমার বারবার আজ এই কথাগুলিই নাড়া দিচ্ছে মনকে। দশদিনের অজ্ঞাতবাসে থেকে আমি যা' দেখেছি, পেয়েছি, ভেবেছি,—তা আমার জীবনের ধারাকে বোধ হয় আমূল পরিবর্তনের স্রোতে এবার ভাসিয়ে দেবে! দু'বছরেরও বেশী বোধ হয় হয়ে গেল আমি দেশ ছেড়েছি,—একখানাও চিঠি দিইনি বাড়িতে,—অথচ, প্রতি মেল-এ আমার মায়ের চিঠি আসার বিরাম নেই!

জাঞ্জিবারে আমার এক জ্ঞাতিভাই থাকেন, চাকুরীর সন্ধানে ঘুরে ঘুরে অবশেষে তাঁর দ্বারস্থ হই,—তাঁরই চেষ্টায় ও সুপারিশে আমার এই সিসিলিস-দ্বীপের চাকরী।

কিন্তু যাক সে কথা। লিসার প্রতি কেমন ক'রে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়লাম অথবা ও-ই বা কখন আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল,—সে'সব না বললেও চলবে। নৈশ ক্লাববিহারিণী লাস্যময়ী সিসিলিসের সাধারণ মেয়েদের মতোই একটি মেয়ে ও। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ওর প্রাণপ্রাচুর্য। ওর থেকে সুন্দরী, ওর থেকে নৃত্য-গীত-পটীয়সী বহু মেয়ে আমি বোম্বাইয়ে দেখেছি, কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে দেখেছি, কিন্তু যেটা ওর সম্পদ,—সেটা হচ্ছে ওর চরিত্রের প্রাণচাঞ্চল্যের দিক,—মাদকতাময় একটা অদ্ভুত বন্যতার দিক।

সম্ভবত এটাই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল বেশী। ও যখন হ'য়ে ওঠে হাস্যে-লাস্যে উদ্দাম, খামখেয়ালীতে, গহন অরণ্যের মতোই রহস্যময়ী,—তখন আমার মধ্যেও দাপাদাপি করতে থাকে এক মুক্ত অরণ্যচারী!

আমাদের বিয়ের প্রথম রাত্রির কথাই বলছি। রাত অনেক হ'য়েছে তবু আমার বাংলোবাড়ির হলঘরে উল্লাসের বিরাম নেই,—অভ্যাগত বন্ধু-বান্ধবীদের সাহচর্যে নৃত্য-গীত পানীয়ের স্রোত ব'য়ে চলেছে! ওদের অলক্ষ্যে হঠাৎ এক সময় বাইরে এসে দাঁড়ালাম নির্জন অন্ধকার বারান্দাটার এক কোণে। আমার খেয়ালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আবার এটা-ই। মত্ততার উচ্চচূড়ে উঠে হঠাৎ-ই সবকিছুর উপর যতি টেনে দেওয়া। আমার মনটা তখন কেমন যেন গুমরে-গুমরে কাঁদতে থাকে,—যেন এই সুসজ্জিত টাই-পরা দেহের প্রাচীর ভেঙে মনটা উড়ে যেতে চায় ঐ অরণ্যের মধ্যে, পাহাড়ের পথে অথবা সমুদ্রের তীরে!

লিসা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাসির উচ্ছ্বাসে, নাচের শ্রমে, নেশার জড়তায় ওর দেহটা কাঁপছে, মুখখানায় ক্লান্তির ছায়া নামলেও উত্তেজনায় উত্তপ্ত। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কতো হুইস্কি তুমি খেতে পারো! আমি বেশ কিছুদূরে যেতে পারি, তুমি আমাকে ছাড়িয়ে যাও দেখি আজ?'

উত্তরে ওকে শান্ত করতে করতে হয়ত ভালবাসার কথাই কিছু বলে থাকব,—ও' হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল, 'ভালবাসাও একটা নেশা, তা' জানো? জোরালো হুইস্কিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে!'

বিয়ের প্রথম রাত্রি। সন্ধ্যায় থেমে গিয়ে মধ্যরাত্রে আবার বইছে সমুদ্রের হাওয়া, মনেরও একটা বিহ্বল অবস্থা। বলেছিলাম, 'ভালবাসা! এর আগে ভালবেসেছ কখনো কাউকে?'

হেসে উঠেছিল লিসা, যেন এক শিশুকে আদর করছে, এমনিভাবে আমার মুখখানা দুহাতে ধ'রে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'মিস্টার ইণ্ডিয়ান, তুমি কি জানো না, তুমি আমার তৃতীয় স্বামী?'

'জানি।'

'তবে?'

বললাম, 'জানবার পরই ত জিজ্ঞাসা করছি ভালবাসার কথা।'

লিসা আবার হেসে উঠ্ল, বলল, 'মদের নেশা কতক্ষণ থাকে?'

'তুমিই সেটা ভাল বলতে পারবে।'

হঠাৎ সেটা রূপান্তরিত হয়ে গেল কান্নায়, আমার বুকে মুখ রেখে লিসা বলল, 'মিস্টার ইণ্ডিয়ান, নেশায় চিরকাল আচ্ছন্ন থাকব, এমন কোনো জোরালো নেশার কথা বলতে পারো আমাকে? যা আজীবন টি'কে থাকবে, মুহূর্তের জন্যও কেটে যাবে না?'

'একথা আমাকেই জিজ্ঞাসা করলে শেষ পর্যন্ত বেছে বেছে?'

'হ্যাঁ। তোমাকেই। তুমি ভারতীয় যে।'

একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কি রকম?'

লিসা মৃদু ধীর কণ্ঠে বলল, 'শুনেছি ভারতের কথা। তোমাদের ভালবাসা না কি গভীর, তোমাদের ভালবাসার ধরনই না কি আলাদা!'

এইবার হাসবার পালা আমার, কিন্তু বিয়ের প্রথম রাত্রে বধূর কানে তরুণ বরের মধুগুঞ্জরণই ত কাম্য! প্রিয়াকে সান্নিধ্যের নিবিড়তায় নিয়ে চিরন্তন নরের বাণীই বললাম চিরন্তনী নারীকে! তারপর এক সময় ভেঙে গেল উৎসবের ভিড়, রাত্রি এগিয়ে গেল শেষের দিকে, তবু সে গুঞ্জনের বিরাম ছিল না! পশ্চিম আকাশে চাঁদের উপর দিয়ে স্বপ্নের মতো ভেসে যেতে লাগল লঘু মেঘের তরী, মধুর মুহূর্তগুলি কেটে যেতে লাগল অপূর্ব এক আবেশের মধ্য দিয়ে!

লিসা বলল, 'এই নেশায় তুমি আমাকে চিরজীবন ডুবিয়ে রেখো!'

বললাম, 'আমার পূর্ববর্তীদের কথা শুনেত চাই।'

হেসে বলল, 'আমাকে নেশা ধরায় আমার প্রথম স্বামী। বিরাট চেহারা ছিল তার, যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। ভালবাসার নেশা যে কী প্রচণ্ড, তা বুঝেছিলাম প্রথম কিছুদিন। কিন্তু আমি কেন পারব ছুটতে ওর সঙ্গে সমান তালে? ওর পানীয়ের মাত্রা ক্রমশই বাড়তে লাগল। ভয়াবহ রকম বেড়ে গেল এক সময়। বাধা দিতে গেলে বলত, তোমার দেহের পেয়ালায় দেবো শেষ চুমুক, মদের পেয়ালায় তারই প্রস্তুতি চলছে!'

'তারপর?'

লিসা হেসে বলল, 'কিন্তু আমার নেশা একদিন ছুটে গেল মিস্টার ইণ্ডিয়ান। বিচ্ছেদের ছুরি দিয়ে একদিন কেটে দিলাম সব সম্পর্ক।'

'কিন্তু, কোথায় গেল সে?'

ঠোঁট উল্টে বলল, 'জানি না।'

কে যেন একবার দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা ক'রে বলেছিলেন, সব নারীই সমান। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্তত তা বলে না। লিসার মধ্যে যে এক অদ্ভুত চুম্বক-শক্তি দেখেছিলাম, তা আমি আর কারুর মধ্যে পাইনি, একথা মুক্তকণ্ঠে বলব। যে-কথা আমাকে বলার নয়, এমন কথা ও' অতি সহজেই বলে ফেলত আমার কাছে, নারীর কাছে যে নিষ্ঠুরতা সচরাচর লোকে আশা করে না, সে' নিষ্ঠুরতাও প্রকাশ পেতো মাঝে মাঝে ওর আচরণে। কষ্ট পেতাম, দুঃখ পেতাম, তবুও ও' আমাকে টানত দুর্নিবার আকর্ষণে। একদিন জানতে চাইলাম ওর দ্বিতীয় স্বামীর কথা। তেমনিই হাসতে লাগল আমার কথা শুনে। স্থানীয় কোডোর সিগারেটে জোরে এক টান দিয়ে বলল, 'দেহের শক্তিতে ইনিও কম ন'ন। নামকরা কুস্তিগীর ছিল ওই দ্বীপের।'

'বিয়ে হলো কেমন ক'রে?'

'যেমন ক'রে হয় এখানে। বল্‌ল। আমিও রাজী হয়ে গেলাম।'

'কতদিন টি'কে ছিল এই বিয়ে?'

'বছর খানেকও নয়। এই ত সেদিনের কথা।'

বললাম, 'তারপরে?'

'তারপরে?' —হেসে উঠ্‌ল লিসা, বলল, 'তারপরে পাগল হয়ে গেল লোকটা।'

'কোথায় এখন সে?'

প্রথম স্বামীর বেলায় যেমন উত্তর দিয়েছিল, তেমনি ঠোঁট উল্টে এবারও বলল, 'জানি না।'

সরকারী দপ্তরে লিসা করত টাইপিস্টের কাজ। কোন কোন দিন ওর অফিসের পর চলে আসত আমার অফিসে, আমার কাজ থেকে জোর করে টেনে তুলত আমাকে, ঘুরতে বেরিয়ে পড়তাম একসঙ্গে। কোনদিন সন্ধ্যা কাটত গর্ডন স্কোয়ারে এক পাগল বেহালাবাদকের সুরের মূর্ছনা শুনে। কোনদিন বা লং পায়ার ধরে দুজনে হেঁটে চলতাম বহুদূর, কোনো জেটির কাছে হয়ত কোনদিন বসে থাকতাম চুপচাপ। ফেরবার পথে প্রিন্সেস হোটেলের বার ঘুরে বাড়ি আসতাম, দুজনেরই পা টল্‌ছে, কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যাচ্ছে!

এর পরে বাড়ির আসর ত আছেই। লিসা থেকেই হতো পানীয়ের শুরু। এক একদিন হঠাৎ বলে উঠত,—'না—না, তুমি অমন করে খেও না, তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি কিন্তু!'

অথচ, আসরের প্রারম্ভে ও-ই হাসতে হাসতে লীলায়িত ভঙ্গীতে হাতে তুলে দিত গ্লাস। শরীরে যখন জাগত আসুরিক মত্ততা, তখন আমার উদ্যত বাহু আর বিস্ফারিত রক্তিম চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ হু-হু করে কেঁদে উঠত, বোতলগুলি কেড়ে নিয়ে বলত, 'না—না, এ তুমি কী করছ! এ' তুমি কোথায় নেমে গেলে!'

আজ মোটর বোটে করে যেতে যেতে বুঝতে পারছি লিসার মনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে। আমার মধ্যে আমাকেও যেমন দেখতে চাইত, তেমনি চাইত আমার মধ্যে দুর্দান্ত কোনো একজনকে। সেই মত্ত দুর্দান্ত মানুষটি যখন আবির্ভূত হতো আমার মধ্যে, ওর চোখে মুখে জেগে উঠত একটা অদ্ভুত আত্মতৃপ্তির দীপ্তি!......কিন্তু কয়েক মুহূর্তের ক্ষুধা সেটা, তারপরেই ওর অন্তরটা হাহাকার করে উঠত আমার মধ্যে স্বাভাবিক আমিকে দেখবার জন্য! সমুদ্র যেমন হাহাকার করে তীরভূমির কাছে আদিতম প্রকৃতির গুণ্ঠন মোচনের জন্য! অদ্ভুত! বিচিত্র এই নারীমনের লীলা!

কিন্তু সত্যি বলছি, হাঁপিয়ে উঠতাম মাঝে মাঝে। যে জন্য বোম্বাই থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলাম দূরে, ঠিক সেই কারণে মনটা চাইত ভিক্টোরিয়া থেকেও দূরে সরে যেতে! কিন্তু ফেনায়িত রঙীন মদের মতো আমার সামনে দাঁড়িয়ে রহস্যময়ী লিসা, ওর সম্মোহনের শিকল কেটে ভেসে পড়বো বাইরের আকাশে, সে সাধ্য আমার কোথায়?

মায়ের আশীর্বাদের মতোই অবশেষে এলো একদিন মনিবের চিঠি। ব্যবসায়িক কাজে অবিলম্বে যেতে হবে আলফোঁসে দ্বীপে।

আলফোঁসে দ্বীপে এসে স্বাদ পেলাম মুক্তির। জনবিরল দ্বীপ, প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্য।

কাজ শেষ করতে কিছু সময় লাগল। দ্বীপের লোকগুলি সহজ, সরল, আতিথেয়তায় ওদের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু এখানেও নিয়ম আছে, একটা

সামাজিকতার সূক্ষ্ম বেড়াজাল আছে। এরও কি বাইরে যাওয়া যায় না?

কাজের ফাকে ফাকে চোখে পড়ত এই বলয়াকৃতি নাম-না-জানা ক্ষুদ্র দ্বীপটি। দ্বীপের ঐ প্রস্তর স্তূপটিই আমাকে আকৃষ্ট করত সব থেকে বেশী। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতাম, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে দ্বীপের মধ্যে। তাহ'লে নিশ্চয়ই বসতি আছে ওখানে। আছে লোকজন।

স্থানীয় লোকেরা বলল, 'ও দ্বীপে বসতি নেই। নারকেলের সময় অথবা পাখিদের ডিম কুড়োবার সময় আমরা এখান থেকে ওখানে গিয়ে কিছুদিনের জন্য আস্তানা গাড়ি, তারপর কাজ ফুরোলে চলে আসি। ওখানে কোনো মানুষ থাকে না।'

'কিন্তু, ধোঁয়া?'

ওরা বলল, 'এক দৈত্য বাস করে ঐ দ্বীপে। ধোঁয়ার কথা বলছেন? চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বালায় কচ্ছপের মাংস পুড়িয়ে খাবার জন্য।'

আশ্চর্য হয়েই বললাম, 'দৈত্যের কথা কী বলছেন?'

'দৈত্য ছাড়া আর কী বলব বলুন? মানুষ কি কখনো একা বাস করতে পারে ঐ নির্জন দ্বীপে, দিনের পর দিন!'

একটু থেমে ব্যাপারটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করে বললাম, 'তাহলে আসলে মানুষই। পুরাণ-কাহিনীর সেই অতিকায় কোনো ভয়ংকর জীব নয়!'

'তা অবশ্য নয়। আকারে-প্রকারে মানুষই বটে, কিন্তু অদ্ভুত মানুষ! পাহাড়ের গুহায় বাস করে। দূর থেকে মানুষ কেউ গেলে প্যাণ্ট পরে সামনে আসে, নইলে সাধারণভাবে কোনো আবরণই ওর দরকার হয় না।'

মনে মনে চমৎকৃত হয়েছিলাম, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠেছিলাম, 'বাঃ!'

শুভাকাঙ্ক্ষীরা বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু বলয়াকার দ্বীপটিতে যাওয়া আমার আটকাতে পারেনি কেউ। নিগ্রো সংগী দুটি বোট নিয়ে সারাদিন সমুদ্রে ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যায় ফিরে এসে সংগদান করেছে রাত্রে, আমার তাঁবুর সামনে বসে দিন কেটেছে সেই অদ্ভুত রহস্যময় লোকটার সংগেই।

প্রথম দর্শনেই তীক্ষ্ণ রাঙা চোখদুটি দিয়ে আমাকে বিশ্লেষণ করে নিয়েছিল সে, গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল, 'অসময়ে এ দ্বীপে মানুষ? এখন ত পাখিদের ডিম পাড়বার সময় নয়!'

আবরণের মধ্যে শুধু ছেঁড়া মোটা কাপড়ের একটা প্যাণ্ট, দীর্ঘ দৃঢ় চেহারা, তামাটে রঙ, জালুচে মাথায় চুল। একটু হেসে বলেছিলাম, 'তোমার কথা খুব শুনেছি। আলাপ করতে চাই তোমার সংগে।'

পাখিদের সচকিত করে হা—হা একটা প্রচণ্ড অট্টহাসির লহর তুলে দ্রুত পদক্ষেপেই আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল লোকটা।

পরদিন সকালে নিগ্রো সংগীরা বেরিয়ে গেছে সমুদ্রে, তাঁবুর সামনে হাল্‌কা চেয়ার আর টেবিলটা টেনে নিয়ে ব'সে আছি, লোকটি আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো কাছে। ঠিক তেমনি বিশ্লেষণের ভংগীতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল আমাকে, আমিও ওর মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে মিটি-মিটি হাসতে লাগলাম। পাতলা দু'টি ঠোঁটের ফাঁকে একটা শিস তুলে ভংগীভরে একেবারে টেবিল ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো, টেবিলে-রাখা বোতল আর গ্লাসের দিকে কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে একটু মুচ্‌কি হেসে লোকটি বলল,—'সকাল বেলাতেই আরম্ভ ক'রেছ?'

হাসলাম আমিও, বললাম,—'চল্‌বে নাকি?'

তেমনি হাসতে হাসতেই হাতে তুলে নিলো বোতলটা, লেবেলটা পড়তে পড়তে বলল,—'স্কচ্‌?'

পরক্ষণেই রেখে দিলো বোতল, বলল,—'ভিক্টোরিয়া থেকে আসছ নিশ্চয়ই?'

একটু ঝুঁকে আগ্রহের সুরে বললাম,—'কথা শুনে মনে হ'চ্ছে, আমরা একই পথের পথিক!'

'একই পথ!'—ব্যংগভরেই হো-হো ক'রে হেসে উঠল লোকটা। পায়চারী করতে করতে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল সে, হঠাৎ একটু দ্রুত পায়ে ফিরে এলো কাছে, টেবিলের সব সরঞ্জাম হাতে তুলে নিয়ে কাছেই ঝক্‌ঝকে বালির উপর ফেলল নারিকেলের ছায়ায়. তারপর হাত ধ'রে টানল আমাকে, বলল,—'ফেলে দাও তোমার টেবিল-চেয়ার, হাত-পা ছড়িয়ে সোনার মতো এই বালির গদির উপর গড়াও দেখি? এই নির্জন দ্বীপে এসেও টেবিল-চেয়ার!'

বললাম,—'ঠিক ব'লেছ।'

পাশাপাশি বালুবেলার উপর ব'সে কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। বলা বাহুল্য, লোকটা পানীয় স্পর্শও করল না, আপনমনে শিস দিতে দিতে সত্যি সত্যিই নরম বালির উপর শুয়ে পড়ল সে। বললাম,—'একটা কথা বলো ত' বন্ধু?'

'কি?'

'তুমি কোন্ দেশের মানুষ? ইয়োরোপের?'

লোকটা বলল,—'সৌরজগৎ ব'লে একটা কথা জানা আছে? সেই সৌরজগতে আছে পৃথিবী ব'লে একটা গ্রহ, আমি সেই গ্রহেরই মানুষ। এর বেশী যদি কিছু জিজ্ঞাসা করো ত' গুহার মানুষ ফিরে যাবে গুহায়, বাইরে এসে তোমাদের মুখও সে দর্শন করবে না!'

বললাম,—'আমি জানি তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার বন্ধুত্ব কামনা করতে এসে তোমার কিছুই জানতে চাইবো না,—এটাও অস্বাভাবিক।'

লোকটা উঠে বসল বলল,—'সত্যি ক'রে বলো ত', কেন এসেছ এই দ্বীপে? কোনো রাজনৈতিক কারণ?'

'মানবনৈতিক কারণ!'—বলে উঠ্‌লাম—'আলফোঁসে দ্বীপে তোমার কথা খুব শুনেছি। শুনে শুনে মনের অবস্থা এমন হ'লো যে, তোমার কাছে না এসে পারলাম না।'

একটু বাঁকা হাসল, বলল,—'বেশ।'

বললাম,—'যদি বলি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই সভ্যজগতে?'

অট্টহাসিতে আবার ফেটে পড়ল সে, বলল,—'একথা আরও দশজন দশবার দশ রকমে ব'লে গেছে। নতুন কিছু বলো।'

চুপ ক'রে রইলাম। সমুদ্র সেই একইভাবে বেলাভূমিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বেলা যত বাড়ছে, দ্বীপের মধ্যেকার হ্রদটি ততই গাঢ়, নীল হ'য়ে উঠছে। লোকটি বলল, ঘুরে ঘুরে দ্বীপের সব কিছু দেখ। তবে ঐ পাহাড়ের দিকে বেশীদূর যেও না। যদি যাও ত হাতে অস্ত্র নিও।'

'কেন?

'জন্তু-জানোয়ার-সরীসৃপ-কতো কী থাকতে পারে। ঐ অঞ্চলের সুবৃহৎ কূর্মকুল ত আছে।'

'জন্তু-জানোয়ার এলো কি ক'রে এই দ্বীপে?'

হেসে বলল,—'বহু পূর্বে এইসব দ্বীপে ছিল আরব জলদস্যুদের ঘাঁটি। তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তোমার হয়ত তেমন ধারণা নেই। জন্তুজানোয়ারের উল্লেখটা কথার কথা, কিন্তু নিগূঢ় কারণে সরীসৃপ-কুলের যে তারা আমদানী ক'রেছে এই সব দ্বীপে, ঐ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

সাগ্রহে বললাম, 'আমাকে বলো এ'সব কথা। আরব দস্যুর রহস্যময় জীবনযাত্রার কথা।' বাঁকা হেসে বলল, 'কাকে জিজ্ঞাসা করছ? আমি নিজে হয়ত ঐ দস্যুদেরই একজন।'

'কী রকম?'

'কে বলতে পারে? আরব জলদস্যু অথবা দুর্ধর্ষ স্প্যানিয়ার্ড,—কার রক্ত আমার

ধমনীতে টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটছে কে জানে! কতো বিচিত্র জাতির যে মিশ্রণ ঘটেছে এই সিসিলিস আরবি-পেলে-গোতে,—তার কি কোনো হিসাব আছে?' বলতে বলতে গাঢ় উত্তেজিত হয়ে উঠল ওর কণ্ঠস্বর, বলল,—'মাঝে মাঝে প্রবল উন্মত্ততা জাগে। মনে হয়, যারা মানুষের সহজ সবল জীবনধারাকে ব্যাহত ক'রে সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি করে জীবনকে জটিলতার নাগপাশে বেঁধে ফেলছে,—তাদের টুঁটি টিপে মেরে ফেলি,—অথবা হারপুনে ছুঁড়ে এ'ফোঁড়-ও'ফোঁড় করে দিই সেই সয়তানদের বুক।'

দিন ছয়-সাত এমনিভাবে কেটে গেল আমার দ্বীপে। শুক্লপক্ষ। ক্রমশই চাঁদ বড়ো হচ্ছে। রাত্রিগুলি কী মাদকতাময়ই যে হয়ে উঠছে দিন দিন! কিন্তু সন্ধ্যার পর ওকে আর পেতাম না। একদিন লেগুনে থেকে স্নান ক'রে উঠে ওকে বললাম,—'রাত্রে তোমাকে পাই না কেন?'

বলল,—'রাত্রে আমি আর একজনের।'

'আর একজনের! সে কে?'

হেসে বলল,—'একা নই ভাই, একা নই। আমার সংগী আছে।'

এতদিন এসব কথা শুনিনি কিন্তু। অথবা টেরও পাইনি অন্য কারুর অস্তিত্ব। বললাম,—'কি বলছ তুমি!'

বলল,—'তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে না সভ্যজগতে ফিরে যাবার কথা? উল্টে আমি তোমাকে বেঁধে রাখতে পারি এই দ্বীপে চিরজীবনের মতো। 'কিন্তু তা করব না। তুমি অবশ্যই ফিরে যাবে তোমার ঘরে।'

সমস্ত রাতটা কাটত আমার ওর প্রতীক্ষায়। মনে হ'তো, কখন ভোর হবে, কখন ও' আসবে। নিগ্রোরা চ'লে যাবার পর ও' এসে দেখা দিতো। কিন্তু কখনো অংশ নিতো না আমার পানীয়ের বা খাদ্যের। শত অনুরোধ সত্ত্বেও না। অথচ এই ভয়ঙ্কর লোকটির প্রতি আমার আকর্ষণ ক্রমশই প্রবল হ'য়ে উঠছে।

আরেকদিন বললাম, 'তোমার সংগীর কথা তুমি বললে না?'

হেসে বলল, 'এত আগ্রহ কেন?'

বললাম, 'কে জানে। অতি প্রাকৃত কোন কিছুর প্রতি মানুষের কেমন একটা অদ্ভুত ভয় আছে, তেমনি অদ্ভুত আগ্রহও আছে।'

দশদিনের দিন সকালে বলল, 'আজ পূর্ণচাঁদ উঠবে আকাশে। তৈরী থেকো বন্ধু, রাত্রে আসব তোমার কাছে, তোমার নিগ্রো সংগী দু'টি মদ খেয়ে নির্জীব হয়ে ঘুমিয়ে পড়বার পরে। তুমি আজ রাত্রে পানীয় স্পর্শ না ক'রে পারবে?'

বললাম,—'দেখি চেষ্টা ক'রে।'

আকার প্রকারে মানুষই বটে, কিন্তু অদ্ভুত মানুষ!

—'কিন্তু আজই তোমার শেষ রাত্রি এই দ্বীপে।'

'কেন!'

ফিসফিসিয়ে বলল,—'যা তুমি দেখবে, এর পরে থাকতে পারবে না এই দ্বীপে, কেউ পারেও না, তোমাকে যেতেই হবে।'

হেসে বললাম,—'দেশে অসাধারণ ডানপিটে ব'লে বিখ্যাত ছিলাম। কী এমন তুমি দেখাবে যে ভয় পেয়ে পালাতে হবে আমাকে?'

'ভয়?'—বাঁকা হেসে বলল,—'ভয় ছাড়াও ভয়ঙ্কর কিছু নেই কি?'

বললাম,—'দেখা যাক।'

হাতটা ধ'রে ফেলল, বলল,—'আমার প্রেয়সীকে দেখাবো তোমাকে আজ! ভালবাসার পাত্রী যে কতবড়ো নেশার পাত্রী হ'য়ে উঠতে পারে, তা' তুমি জানো?'

নিগ্রো দু'টি প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। লণ্ঠনের শিখাটি নিভিয়ে দিয়ে তাঁবুর বাইরে চুপচাপ ব'সে ছিলাম। পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্নায় চারিদিক উদ্ভাসিত। প্রতি মুহূর্তেই আশা করছি তার। দু'একবার ডেকে উঠেছে দু'-একটা সাগরপক্ষী, তীরভূমিতে ঊর্মিকল্লোল। আর দ্বীপের মধ্যে স্বপ্নের মতো মনে হ'চ্ছে ঐ স্থির গভীর নীল হ্রদটিকে। ঝুঁকেপড়া পাথরটির উপর চাঁদের আলো ঠিকরে প'ড়ে হ্রদের উপর এসে খেলা করছে।

পা-টিপে-পা-টিপেই এসেছিল সে, আমার হাতটা ধ'রে পা-টিপে-পা-টিপেই সে নিয়ে যেতে লাগল আমাকে হ্রদের দিকে। হ্রদের তীর ধ'রে ধ'রে যেতে লাগলাম আমরা। দু'টি মানুষ নয়, দু'টি ছায়া যেন এগিয়ে চলেছি সেই লতাগুল্মে-ঘেরা প্রস্তরস্তূপটির দিকে। ওর হাত ধ'রে উঠতে লাগলাম উঁচুতে। বেশী দূর নয়। ও' আমাকে একটা তরুণ বৃক্ষের কাছে দাঁড় করিয়ে দিলো। আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো কোমরে দু'হাত রেখে। বিস্ফারিত অস্বাভাবিক দু'টি চোখ, কী এক দুর্দমনীয় নেশার আবেশে কাঁপছে যেন ওর শরীর, টলছে যেন ওর পা। ফিসফিসিয়েই বলল,—'আর এগিয়োনা তুমি। বিপদ হ'তে পারে। যা দেখবার এখান থেকেই দেখ।'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি অবাক হ'য়ে। মদ ও স্পর্শ করতে চায়নি, অথচ নেশায় কাঁপছে সর্বশরীর, বলল,—'আমার প্রেয়সীকে দেখতে পাচ্ছ? ঐ দেখ জ্যোৎস্না-ঠিকরে-পড়া পাথরটার দিকে চেয়ে।'

দেখতে পেয়ে সত্যিই হিম হ'য়ে গেল যেন সর্বাংগ! লোকটি হো-হো ক'রে হাসতে হাসতে লাফিয়ে গিয়ে পড়ল পাথরটার উপর। সংগে সংগে কুণ্ডলী ত্যাগ ক'রে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালো বড়ো একটা সাপ। ভয়ংকর লোকটা মুখ এগিয়ে দিলো ওর মুখের কাছে,—ওর হাত বেয়ে ওর দেহটাকে বেষ্টন ক'রতে লাগল বিচিত্র সেই সাপ।

চাঁদের আলো এসে প'ড়েছে লোকটির মুখের উপর। প্রসন্ন প্রশান্ত মুখখানা আমার দিকে ফেরানো, বুকের উপর বলয়ের মতো ওকে ঘিরে আছে সাপটা।

পরক্ষণেই কী যে হলো, একটা ঝটাপটির মতো শব্দ,—সাপটাকে যেন দুর্দান্ত আক্রোশে দু'হাতের মুঠোর মধ্যে পিষে ফেলেছে সে, তারপরে সজোরে ছুঁড়ে আছড়ে ফেলল পাথরটার উপর। ফেলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো আমার দিকে। কেমন যেন আর্ত কণ্ঠস্বর, 'দেখেছ তুমি, সাপটাও আমাকে আর ছোবল মারতে চায় না, ওর মধ্যেও এসেছে স্নেহ আর ভালবাসা! ভালবাসা আর স্নেহ!'......

পাগলের মতো আবার ফিরে গেল সাপটার কাছে, ব্যাকুল হ'য়ে ডাকতে লাগল, 'লিসা—লিসা!'......

অকস্মাৎ হাঁক দিয়ে উঠল বোটের সামনে দাঁড়িয়ে আমার নিগ্রোসংগী। বোট্ ভিড়ছে তীরে। আলফোঁসে দ্বীপ।

বৌদ্ধ গুহা অজন্তা

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। উদাত্ত গম্ভীর বুদ্ধ মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে, পীত বসনাবৃত শত সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী প্রণত হয়ে পড়েছে স্তূপপাদমূলে। পারিপার্শ্বিকতা আমাকে গ্রহণ করেছে। এ সূর্যরশ্মি, মৃদু পবন, এখানের মধুর মৃত্তিকা গন্ধ আমার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে নবপ্রাণ সঞ্চারিত করছে। উত্তর ভারতে হিমালয় পাদদেশে রোহিণী-তীরে রক্ত মৃত্তিকা ভূষণ, সুপরিকল্পিত নগরী কপিলাবাস্তুর পথে নিজেকে আমি খুঁজে পেলাম। নগর পরিখা পেরিয়ে বিবিধ অলংকরণ খোদিত কাষ্ঠনির্মিত নগর-দ্বারে উৎসবমুখর নাগরিক-নাগরিকাদের সাথে নিজের উপস্থিতিও অনুভব করলাম।

পরিচ্ছন্ন জলসিক্ত রাজপথ, শ্যামল উদ্যান-বেষ্টিত দারুময় নাগরিকাবাস, ছায়া সুনিবিড় রাজোদ্যানের বৃক্ষতল, শ্রান্ত পথিকের ক্লান্তি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রাসাদতুল্য "বাওড়ী" বা ইঁদারার ভূ-গর্ভস্থিত কক্ষ, নাট্যশালা, বিপণিশ্রেণী, বিশাল সম্মিলন কক্ষ, নগর উপকণ্ঠে সুকর্ষিত ভূমি, তারপর সুস্থ, সবল, সুন্দর, ভদ্র, স্বাভাবিক, প্রাণোচ্ছল এ নাগরিকেরা যেন পরিশ্রম ও সু-বণ্টন দ্বারা অভাব-অনটন পেরিয়ে গেছে। তাই বোধ হয় এখানে এত আলো, এত রং, এত আনন্দ। তাই সম্ভব হয়েছিল সর্বকালের, সর্বলোকের বুদ্ধোত্তম গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। তাই কলালক্ষ্মী এখানে বরদারূপে আবির্ভূতা। তাঁর আশীর্বাদে সার্থক হয়েছে শিল্পী অথবা শিল্পীগোষ্ঠীর সমবেত চেষ্টায় সৃজিত এইসব মহৎসৃষ্টি।

অজন্তার গুহা মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি বারে বারে বাস্তবকে ভুলে যাচ্ছিলাম। বাঘগুহা আমাকে অভিভূত করেছিল, অজন্তা চমকিত করেছে। যতবারই মনে পড়েছে ঊনত্রিশটি বিভিন্ন গুহার বিরাট এই শিল্প নিদর্শনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা দূরে থাক, সাধারণভাবে দেখতে অন্তত ঊনত্রিশ দিন লাগবে, ততবারই চোখের উপর ভেসে উঠেছে আমার পকেটের অসহায়তা। এ দরিদ্রদেশে দরিদ্রতম শিল্পীদের শিল্পচর্চা যে কত হাস্যকর তা যেন আজ আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম। শুধু গুরুদেব ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের (ভি. সি.) আশীর্বাদ ও টেকনিসিয়ান স্টুডিয়োর সহকর্মীদের সহানুভূতি সহায় করে সুদূর ভারতের এই-সব শিল্পতীর্থগুলি দর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম, সর্বদাই নানা অসুবিধার বোঝা ঠেলে যেটুকু দেখতে পেয়েছি বা যেটুকু বুঝতে পেরেছি তা ভাল করে গুছিয়ে গ্রহণ করা আমার সামর্থের বাইরে। যত সংক্ষেপে যতটা বেশী পারি তাই আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি।

অজন্তা থেকে তিন মাইল দূরে গেস্ট-হাউসের নীরব কক্ষে স্থানীয় আর্কিওলজি বিভাগের কয়েকজন কর্মী তখন কলাকার হিসাবে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন, ক্রমে রহস্যময়ী সন্ধ্যার কাব্যময় পরিবেশ গল্পের গতিকে অজন্তা আবিস্কারের কাহিনীর দিকে নিয়ে এলো। ১৮১৯-২০ সালে মাদ্রাজ সেনাবাহিনী বোম্বাই-হায়দ্রাবাদ সীমান্তের একটি গ্রাম আক্রমণ করে। সৌভাগ্যবশত গ্রামবাসী সেই আক্রমণকে প্রতিহত করে, ফলে আক্রমণকারী মাদ্রাজ সেনাবাহিনী পেছিয়ে এসে তাপ্তীর এক শাখা নদীর কিনারায় অপেক্ষা করতে থাকে। রণক্লান্ত এক ইওরোপীয় তরুণ অফিসার একঘেঁয়েমি কাটাবার জন্য একদিন শিকারে বেরিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢোকে। ক্রমে শিকার অনুসরণ করে জঙ্গল পেরিয়ে এদিকের নদীর কিনারে এসে পড়ে, শিকার অনুসারীর নজর ওপারের ওই খাড়া পাহাড়ের উপর পড়তেই ১২০০শ বছর অজ্ঞাতবাসের পর আবিস্কৃত হয় এই জগৎ-দুর্লভ শিল্প ঐশ্বর্য। তারপর ১৮৪০ সালে আরেকজন ইওরোপীয় শিকারী ঐ এলাকাতে শিকারে আসেন এবং স্থানীয় এক রাখাল যুবকের সাহায্য নেন; রাখাল সাহেবকে বাঘের আবাসস্থল এই গুহার মধ্যে এনে হাজির করে। এই ইওরোপীয় ভদ্রলোকই প্রথম যিনি গুহার শিল্পনিদর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। অবশ্য ১৮৪৩ সালে লেখা জেমস্ ফারগুসনের এই বিষয়ক প্রবন্ধই বোধহয় প্রথম কার্যকরী আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়। ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা মাদ্রাজ সেনাবাহিনীর মেজর রবার্ট গিল্‌কে অজন্তা ভিত্তি চিত্রগুলির অনুলিপি করতে নিযুক্ত করেন। কয়েক বছরের চেষ্টায় মেজর গিল্ কিছু ছবির অনুলিপিও করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি প্রায় সবই ক্রিস্টাল প্যালেসে ১৮৬৬ সালে আগুনে পুড়ে যায়। তারপর ১৮৭২ সালে প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর জন গ্রিফিথ্‌সের পৌরোহিত্যে বোম্বে আর্ট স্কুলের ছাত্ররা দশ বছর ধরে আবার কিছু অনুলিপি করেন কিন্তু সেগুলি হ্যাভেল সাহেবের মতে অতীব প্রাণহীন। পরে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী অনুলিপি করেছেন স্থানীয় শিল্পী সৈয়দ আমেদ, তাঁর কাজও আমার প্রাণহীন মনে হয়েছে।

বাঘ বা অজন্তাতে যেসব ছবির মুদ্রিত অনুলিপি আছে গাইডদের কাছে এইসব অনুলিপিকারদের নাম জানতে চাইলে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই একজনের নামই জানা যায়; তিনি শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। এই গৌরবাত্মক অজ্ঞতার ফলে বহু জানা অজানা শিল্পীর ভুলত্রুটির দায়িত্ব শিল্পাচার্যের উপরেই বর্তায়। লেডি হারিংহামের অনুরোধ ১৯০৯—১১ সালে নন্দবাবু ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী অজন্তার ভিত্তি-চিত্রের অনুলিপি করেন। পরে নন্দবাবুর আঁকা যে কটি মুদ্রিত অনুলিপি আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাঁর পক্ষেই কিছুটা সম্ভব অজন্তা ও বাঘের মহাশিল্পীদের অনুসরণ করা।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় মাঝামাঝি পশ্চিম ঘেঁষা সমতল যেখানে পাহাড় রূপ ধারণ করে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রায়

অজন্তা গুহাশ্রেণী

৩০০ ফুট নীচে খান্দেশের কৃষ্ণকান্তো তুলোচষা মাটির বুক চেরা আঁকা-বাঁকা তাপ্তীর শাখানদের উপর, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কোন এক সুন্দর প্রভাতে হয়তো কোন ভিক্ষু সম্প্রদায় দাক্ষিণাভিমুখে চলতে চলতে সেখানে খানিক বিশ্রাম নিতে বসেছিলেন, তাপ্তীর সেই শাখা নদী, অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি সেই মনোরম উপত্যকা, শান্ত সমাহিত সে প্রকৃতি তাদের উৎসাহিত করেছিল স্থানোপযোগী জ্ঞান অর্জন ও বিবরণের কেন্দ্র স্থাপন চিন্তায়। তারপর পরিকল্পনা তৈরী হ'ল, চৈত্যবিহারের স্থান নির্ণয় হ'ল, স্তম্ভ, গবাক্ষের স্থান ও সংখ্যা নিরূপিত হ'ল, ক্রমে হাতুড়ি ছেনীর ঘা পড়ল, আদিম অগ্ন্যুৎপাতে নির্মিত কঠিন পাথর তার স্বরূপ বদলে সুরূপ ধারণ করল। হাজার স্থপতি শিল্পী প্রায় হাজার বছর ধরে সৃজন করে চলল ভারতের তথা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প কর্ম, এসে থামলে অসমাপ্ত ঊনত্রিশ নম্বর গুহায়। পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় ½ মাইল জোড়া এই মহান কীর্তি মানব ইতিহাসে একান্ত দুর্লভ।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়ের গায়ে এখনকার মজা নদীর প্রায় দুশো ফুট উঁচুতে একটির পর একটি গুহা খনন করা হয়েছে। খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ঐগুলি তৈরী।

কোটি কোটি মণ পাথর কাটা এই দানবীয় কীর্তি কি করে সম্ভব হ'লো তা বুঝতে পারিনি, কি করেই বা সম্ভব হ'লো এই বিরাট পাথরের স্তূপকে স্থানান্তরিত করা তাও ভেবে অবাক হলাম। গল্প শুনলাম যাঁরা একাজ করেছিলেন সেইসব মহান শিল্পসাধকেরা তাঁদের দুরূহ কাজকে সহজ-করার জন্য এক বিপরীত পথ বেছে নিয়েছিলেন, প্রচলিত ধারা অনুযায়ী ভিত থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বমুখী গঠনরীতি ব্যবহার না করে তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন উপর থেকে এবং দৈনন্দিন কাজের সুবিধার্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে যার পরবর্তী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার রাখতেন, ফলে যখন ক্রমে তাঁরা নীচের কাজে পৌঁছলেন তখন উপরের মূর্তি গঠন ও ভিত্তিচিত্র আঁকাতো শেষ হয়েই গেছে, সঙ্গে সঙ্গে পরিস্কার হয়ে গেছে ঐ খোদিত পাথরের স্তূপ। এই উপায় অবলম্বন করে তাঁরা আর একটি বিশেষ অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন, ভারা বেঁধে কষ্টকর ভঙ্গিতে খোদাই বা আঁকার ফলে অসুবিধা-জনিত আড়ষ্টতাকে জয় করে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল শিল্প কর্ম করতে পেরেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাশ্রয় করেছেন বিরাট জনশক্তি. তা ছাড়া "বুলডোজার" বা ডিনামাইট বিহীন সে যুগে এই অসম্ভব কীর্তি কল্পনার অতীত।

যদিও পূর্ব-পশ্চিমে অর্ধচন্দ্রাকারে খনন করার ফলে দিনের কোন না কোন সময় সূর্যালোক গুহাগুলির সুপ্তি ভাঙ্গায়, তবুও সামনের দিকে দু'একটা দরজা জানলা দিয়ে যেটুকু আলো ভেতরে পড়ে তা দ্বারা ছবি ও মূর্তিগুলির আভাস কোনক্রমে বোঝা গেলেও তার বেশী অনুভব করা একেবারেই অসম্ভব, বিশেষ করে পেছনের দিকে যেখানে আধো-অন্ধকার পাকা বাসিন্দা। স্থপতি ও শিল্পীরা কি করে এই অন্ধতা ঘুচিয়ে তাঁদের অমর স্বাক্ষর এখানে সৃষ্টি করেছিলেন তা আমার কাছে ধাঁধাঁ হয়ে আছে। মশাল জ্বালিয়ে এখানকার কাজ করা অসম্ভব, তার ধোঁয়া ছবির রং-এর ঔজ্জ্বল্য নষ্ট করবে, তবে হয়তো তৈল প্রদীপ জ্বালিয়ে কাজ করেছেন অথবা কিম্বদন্তী আছে যে পালিশ করা ধাতু ফলকের দর্পণে সূর্যরশ্মি প্রক্ষেপণ করে এখানে কাজ করা হয়েছে, কিন্তু পেছনের দিকে এমন সব কোণ আছে যেখানে ঐভাবে আলো নিয়ে যাওয়া খুবই মুশকিল, সুতরাং ওখানের শিল্পীরা শুধু মহা-শিল্পীই ছিলেন না তাঁদের দর্শনও ছিল প্রখর।

সপ্তদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের মতে বৌদ্ধশিল্প সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত,—দেব, যক্ষ, নাগ। দেব শিল্প-ধারা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধে প্রচলিত ছিল, এবং তারপর মহারাজ অশোকের সমকালে যক্ষ শিল্পধারার প্রচলন হয়। শেষে তৃতীয় খৃষ্টাব্দে প্রচলিত হয়েছিল নাগ শিল্পধারা, যার কিছু নিদর্শন কাশ্মীর ও মাদ্রাজে এখনও পাওয়া যায়। অজন্তার স্থাপত্য মূর্তি ও চিত্রণের ঢং অনুসরণে মোটামুটি দুটি ধারা অনুমান করা যায় হীনযান ও মহাযান যুগ। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী চৈত্য ও বিহারগুলিতে হীনযান যুগের অনাড়ম্বর চিত্রণ ও স্থাপত্য শৈলী এবং প্রাচীন কাষ্ঠনির্মিত গঠনপ্রণালীর অনুকরণ প্রচুর ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীকালে মহাযান মতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ চিত্র শৈলীর সুন্দর ব্যবহার করা হয়েছে এবং দারু স্থাপত্য অনুকরণ বর্জন এ যুগের বৈশিষ্ট্য।

গুহাগুলিকে সাধারণত এইভাবে ভাগ করা হয়ঃ—

হীনযান যুগ--(খৃষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দ)

চৈত্য নম্বর—৯, ১০

বিহার নম্বর—৮, ১২, ১৩

মহাযান যুগ—(৪৫০ থেকে ৬৪২ খৃষ্টাব্দ)

চৈত্য নম্বর—১৯, ২৬

বিহার নম্বর—১ থেকে ৭, ১১, ১৫ থেকে ১৮, ২০ থেকে ২৫, ২৮ ও ২৯

২৬ নং চৈত্যটি বোধ হয় অজন্তার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কৃত চৈত্য। এটি ৬৮'—লম্বা, ৩৬'—চওড়া এবং ৩১'— উঁচু। ১২' লম্বা সুন্দর অলঙ্কৃত ২৬টি স্তম্ভ আছে এতে, তার উপরে চারদিক ঘিরে পাড়ের মত বন্ধনী। এই পাড়টি নানা অংশে ভাগ করে নানা অলঙ্করণ খোদাই করা

হয়েছে, তার উপর অর্ধগোলাকার খিলান ঢংএর ছাদ, তাতে সমান দূরত্বে কাঠের বরগার মত পাথর খুদে পাষাণ পাঁজর তৈরী করা হয়েছে। ভিতরের স্তূপটি অপরূপ ভঙ্গিমায় বহু বুদ্ধমূর্তি খোদিত স্বাভাবিক লম্বাটে ঢংএর, তার উপর মণ্ডপ। এই চৈত্যের একটি বিশেষ ঐশ্বর্য, সম্পূর্ণ অক্ষত একটি ধ্যানগম্ভীর বুদ্ধমূর্তি অর্ধ-নিমীলিত পদ্ম-পলাশ-লোচন তাঁর দক্ষিণ হস্ত বরদা-মুদ্রাযুক্ত। এই গুহার সামনের দিকটি প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

বাঘের ৪নং গুহার মত অজন্তার ১নং বিহারটিও অপরূপ সুষমামণ্ডিত খোদাই ও চিত্রণে পরিপূর্ণ। বোধ হয় এখানে এইটিই মহাযান বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তি। বিহারটির প্রবেশদ্বার থেকে অন্তঃস্থল পর্যন্ত খোদিত মূর্তি, চিত্র ও অলংকরণ মনকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলে। রং, রেখা, ভঙ্গি, মণ্ডল, ষড়ংগ ইত্যাদির যথাযোগ্য ব্যবহার এক স্বর্গীয় ভাবাবেশে মাতিয়ে দেয়।

বাঘের সংগে অজন্তার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে, মূর্তি গঠনে ও চিত্রণে বেশ মিল আছে। এখানকার বিভিন্ন গুহার মূর্তিগুলিও যে একসময়ে যথাযোগ্য রঙে ও রেখায় মণ্ডিত ছিল তার অস্তিত্ব এখনও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। বাঘের মত এখানেও হিন্দু ও অনার্যদের বহু দেবদেবী মূর্তি আছে। এখানেও প্রবেশদ্বারের দুই পাশে নিপুণ হস্তখোদিত গংগা-যমুনা মূর্তি। কর্ষণজীবী-পূজ্য মেঘ বৃষ্টির দেবতা সপারিষদ সপ্ত-সর্পশীর্ষ নাগদেব ও ধন-দেবতা যক্ষের মূর্তি এখানে প্রচুর।

হীনযান যুগের বুদ্ধ প্রতীক পদ্ম, হস্তী, শ্রীপদ, জ্যোতিচ্ছটা এবং বোধিবৃক্ষ থেকে মহাযান যুগের পদ্মপাণি ধ্যানী-বুদ্ধ, সিংহাসনারূঢ় বুদ্ধ, ধর্মচক্র মুদ্রা, ধ্যান মুদ্রা, ভূমি-স্পর্শ মুদ্রা, বরদা মুদ্রা-যুক্ত বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব, মৈত্রেয় ইত্যাদি নানা ভঙ্গিতে নানা ভাবের যে অশেষ বুদ্ধমূর্তি এখানে আমি দেখেছি তার বর্ণনা ভাষায়ত্ত নয়।

আর্কিওলজি বিভাগ থেকে ভিত্তি চিত্রগুলি রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা প্রায় ১৯২০ সাল থেকেই চলছে এবং কিছুদিন আগে প্রফেসর লরেঞ্জো সেসোনি ও কাউন্ট ওরসিনি বলে দু'জন ইটালিও বিশেষজ্ঞ আনিয়ে এগুলির যথাসাধ্য ধ্বংসোদ্ধার করিয়েছেন। অনেকের মতে এর ফল ভাল হয়নি অনেক ক্ষেত্রে ছবিগুলি তাদের শিল্পগত পবিত্রতা হারিয়েছে।

২৯টি গুহার মধ্যে ১৬টি গুহায়

'মৃগ- দম্পতি'
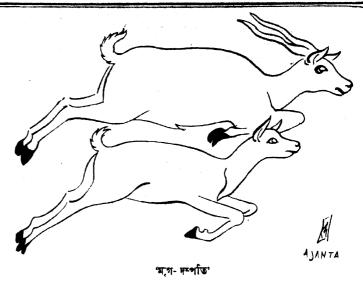
এখনও ভিত্তি চিত্রের ছিঁটেফোঁটা দেখা যায়, তবে ১, ২, ৯, ১০, ১৬ এবং ১৭ নম্বর, মোট এই ছটি গুহার ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছে। যদিও সেগুলি খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতকের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা আঁকা তবু তার মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে। ডাঃ ইয়াজদানি বলেছেন, "উত্তর শিল্প-ধারার প্রভাবমুক্ত দাক্ষিণাত্যের শিল্পিবৃন্দ খৃঃ পূঃ প্রথম সহস্রেই স্বকীয় শৈলীতে ছবি আঁকায় বেশ পটু ছিল।" তাঁর ঐ মতের নিদর্শন অজন্তার ৯নং এবং ১০নং চৈত্যে ব্যবহৃত ঢং দেখলে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। অজন্তা ভিত্তি-চিত্র আঁকায় যে সব মাল-মসলা ব্যবহার করা হয়েছে, তার বিশেষ বিবরণ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয় দেশ পত্রিকায় ১৯৫৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় লিখেছেন, তবুও আমি সংক্ষেপে কিছু বলছি। প্রথমত পাথরের দেয়ালের উপর উঁইমাটি, গোবর, তুষ, মেথির জল ইত্যাদির পচানো কাদার বজ্রলেপ অথবা সুরকি এবং আঁসযুক্ত কোন কিছুর বজ্রলেপ-এর আস্তরণ দিয়ে তারপর চুণকাম করে জমি ভিজে অবস্থায় আঁকা শেষ করতে হতো। এইসব ছবিতে যে সব রং ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রায় সবই স্থানীয় পাথর মাটি ও গাছগাছড়া থেকে সংগ্রহ করা যেমন হলদে মাটি থেকে হলুদ রং, লালমাটি বা পোড়া ইঁট থেকে লাল রং, সবুজ পাথর বা তাম্রক্ষার (অক্সাইড অব কপার) থকে সবুজ রং, তামার বাটিতে টক দই বা ঘোল রেখে তাম্রক্ষার তৈরী এখনো ওদিকের প্রাচীন শিল্পীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অভিজ্ঞ শিল্পরসিকদের মতে, অজন্তার দেয়াল চিত্রে ফ্রেস্কো এবং টেম্পারা, দুই ঢংই ব্যবহার করা হয়েছে।

কুমারস্বামীর মতে "এসব কাজ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা আঁকা হতে পারে, তবে প্রচলিত ধারা অনুসারে স্থায়ী শিল্পী, শিল্পীগোষ্ঠী অথবা চিত্রকর শ্রেণীর সাহায্য নেওয়ার সম্ভাবনাই এক্ষেত্রে বেশী। প্রাচীন ধারানুযায়ী চিত্রাংকন—উপযুক্ত দেওয়ালকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে সমানভাবে বিভিন্ন শিল্পীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার ফলে বহু শিল্পীর শিল্প কর্মের স্বাক্ষর অজন্তায় ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। কল্পনা করা যাক একদল বিচক্ষণ শিল্পী এখানে কাজ করছে, সহযোগিতা করছে তাঁদের ছাত্ররা। প্রথমেই রং প্রস্তুত করা হয়েছে, তারপর যথারীতি জল ও আঠা মিশিয়ে সেই রং নারকেলের মালায় পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মাটি লেপে চিত্রাংকনের জমিও (পরিকর্ম) প্রস্তুত হয়েছে এবং তাকে যথারীতি ধবলিত করাও শেষ হয়েছে। শিল্পীরা লেখনী অথবা বর্ণিকা (তুলি) দ্বারা প্রাথমিক আঁকা শেষ করেছেন, তারপর দ্বিতীয় আস্তরণ (ওয়াশ) দিলেন। প্রাথমিক রেখাগুলি আবছা হয়ে গেলো, এবার বিভিন্ন রংএর জন্য বিভিন্ন মাপের বহু বর্ণিকার দ্বারা রং লেপন করে শিল্পী চিত্রকে উন্মোলিত করছেন; এবার মূর্তি-গুলির প্রাথমিক কাজ শেষ করে পশ্চাদ-পটে রং দেওয়া শুরু হলো, তারপর প্রয়োজনীয় রংএর কাজ শেষ করে বর্তনার (বর্তুলতা) কাজে হাত দিলেন। দুই পাশে ছায়াপাতি রং দিয়ে বস্তুকে পশ্চাদপট থেকে মুক্ত করলেন এবং পুনরায় সীমা-রেখা এঁকে চিত্রকর্ম শেষ করলেন।" উঠে
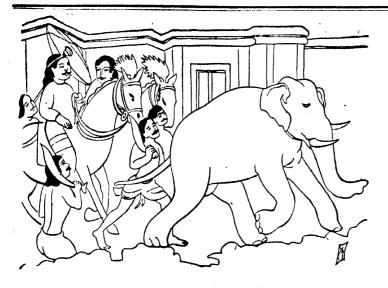
গজজাতক। গজরূপী বুদ্ধ রাজা কর্তৃক মুক্ত হয়ে সসম্মানে বনে ফিরে চলেছে

যাওয়া ছবি পরীক্ষা করলে লাল রংএ আঁকা প্রাথমিক রেখা এখনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায়।

রসোত্তীর্ণ শিল্পগুণে অজন্তা চিত্র সাধারণের চোখেও ভাল লাগে, তবে এর পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করতে হলে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে কার্যকরী জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। বর্ণ, বর্তুলতা, অলংকরণ, বস্তু সংস্থাপন ইত্যাদি ভাল লাগলেও রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ বা মূল অণ্টরসের যোগ্য পরিবেশন ইত্যাদি বুঝতে পারা সম্ভব হবে না, বিশেষ করে এর পরিপ্রেক্ষিত চিত্রণ ভাল নাও লাগতে পারে।

প্রাচীন ভারতীয় শৈলী পারিপার্শ্বিকতা অনুসরণকারী পরিপ্রেক্ষিত নির্ভরশীল নয়। তার পরিপ্রেক্ষিত ভাবানুসরণকারী, এই পরিপ্রেক্ষিত শিল্প-শাস্ত্রের প্রমাণানুগত। প্রমাণার্থে ভ্রমহীন জ্ঞান, দূরে বা নৈকট্যের চক্ষুগত জ্ঞানই প্রমাণ নয়, অনুভবগত আন্তরিক দিকও এর আছে। তাই অজন্তার পরিপ্রেক্ষিত চিত্রণ সাধারণ-গ্রাহ্য নয়।

এখানের ভিত্তিচিত্রে নায়ক-নায়িকা প্রথম নজরে বেমানান লাগবে। বিশেষ করে মহাপুরুষ চরিত্রগুলি পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিতানুযায়ী অস্বাভাবিক বড় করে আঁকা বলে মনে হবে, যদি না দর্শকের জানা থাকে ভারতীয় শিল্প শাস্ত্রানুযায়ী মূর্তি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, এদের আনুপাতিক মাপও নানা রকম, যেমন—প্রেতমূর্তি—সপ্ততাল, যক্ষ—অপ্সরা ইত্যাদি মূর্তি—নবতাল, নরমূর্তি—দশতাল, রুদ্র-মূর্তি দ্বাদশতাল, অসুর মূর্তি—ষোড়শতাল, বালামূর্তি—পঞ্চতাল, কুমারমূর্তি—ষটতাল, ইত্যাদি। মধ্যম অঙ্গুলির অগ্র থেকে করতলের সীমা পর্যন্তর সাধারণ নাম তাল, শিল্পশাস্ত্রে তাল মানে করোটি থেকে চিবুকের নীচে পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্য, তাই বোঝায়। জ্ঞানী পাশ্চাত্ত্য চিত্র সমালোচকদের মতে অজন্তার পরিপ্রেক্ষিত চিত্রণ স্বাভাবিক। যেমন একসেলজার্ল বলেছেন, "এমন কি মহাপুরুষ চরিত্রগুলিও ভূমিরেখা এবং শীর্ষরেখা অনুযায়ী সুন্দর, সুষ্ঠু পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত।"

অজন্তা শিল্পের যে বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে নজরে পড়লো, তা হচ্ছে এর গতিশীলতা। কি মূর্তি, কি চিত্র, এখানে সবই চলমান, সবই জীবন্ত, দেব-দেবী, মানব-মানবী, পশু-পক্ষী, উদ্ভিদ ও প্রাণী সবই এখানে নড়ে চড়ে। ২০নং গুহার হস্তি মূর্তিটি তার গতিবেগে দেহ সংলগ্ন আসন-ঘণ্টিকা ইত্যাদি পশ্চাতে বিক্ষিপ্ত করে ছুটে এগিয়ে চলেছে অথবা ১৭নং গুহার বিমানচারী গন্ধর্ব সকল, এ ছাড়া বিভিন্ন গুহার বিভিন্ন মূর্তি, যথা—মৃগ-দম্পতি বা গজ জাতকের চিত্রাবলী এরা সবাই স্ব স্ব বিশেষ ভঙ্গিতে গতিবান।

মূলত বৌদ্ধ জাতক ও বুদ্ধ জীবনীর ঘটনা নিয়েই অজন্তার শিল্প বিন্যাস। সর্বজন পরিচিত ছবি ১৭নং গুহার বুদ্ধ যশোধরা এবং রাহুল অথবা ১নং গুহার বুদ্ধ ও প্রলোভন বা অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি ইত্যাদি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীর ছবির চিত্রমালার শ্রেষ্ঠতমের অন্যতম। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি চিত্রটি খুব সম্ভব, বুদ্ধের সংসার ত্যাগের চিত্র। রাজকুমার সিদ্ধার্থের মহৎ ত্যাগকে আকার দিতে গিয়ে শিল্পী চরিত্রটিকে বিরাটরূপে কল্পনা করেছেন। পাশের অন্য চিত্রগুলি যেন এই মহানের অনুপাতে অনেক ছোট হয়ে পড়েছে। ত্রিভঙ্গঠামে স্থির এমূর্তির ডান হাতে ধরা নীলপদ্ম। জীবনের চরম সিদ্ধান্তের ক্ষণের যে ভাব শিল্পী তথাগতের মুখে দিতে সক্ষম হয়েছেন, তার বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। বুদ্ধ চরিত্র-কথা বলতে গিয়ে শিল্পী সমকালীন বহু ছবিই এ'কেছেন যা থেকে চক্ষুষ্মান দর্শক খুঁজে পায় সমসাময়িক সভ্যতার নিরিখ। চোখের উপর এবং মনের পটে ধরা দেয় সে যুগের কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, শ্রাবস্তি, কুশীনগর, উজ্জয়িনী ও তাদের নাগরিক নাগরিকারা। মহান এই নাট্যশালায় চলমান হয়ে উঠে চিত্ররূপী জীবন্ত নাটক যার নট-নটী কখন কুমার কখন ঋষি কখন বারাঙ্গনা কখন সতী স্বর্গ অথবা নরক।

বীর যোদ্ধাদের অস্ত্রাংকার বেজে ওঠে, আবার শুনি দেবভোগ্য সঙ্গীত। জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পারিপার্শ্বিকতায় চিত্রয়িত হয়েছে নর ও নারী, গভীর বনানি কখন তাঁদের পশ্চাদপট কখন সুরম্য উদ্যান। রাজ প্রাসাদে বা রাজপথে, শ্যামল শস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অথবা গগনচুম্বী নগরাজের পদতলে এ'দের অবস্থান। গগনচারী অপ্সরা গন্ধর্ব, দেবদেবী, সুখ দুঃখ, আনন্দ অশ্রু এবং হিংসা দ্বেষ কিছুই শিল্পীর অগোচর নয়। সুষ্ঠু সাবলীল মানব মানবীর সঙ্গে সঙ্গে একই স্বাচ্ছন্দে শিল্পী এ'কেছেন পশু-পক্ষী, প্রাণী, জলজ বা বনজ লতা-পুষ্প এবং প্রাণোচ্ছল বন্যতা।

কিছু ইতিহাসও চিত্রিত হয়েছে, যেমন ১নং বিহারের শীর্ষ দেশে রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর দরবারে পারস্যের রাজদূত, খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতকে পারস্য ও দক্ষিণ ভারতে যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ঘটেছিল এটি তারই চিত্রায়ন। সমসাময়িক পারস্যের ইতিহাস থেকে এ ঘটনার নজির খুঁজে বার করেছেন ডাঃ ইয়াজদানী।

ঐ বিহারের আরেকখানি ছবি বুদ্ধ ভ্রাতা নন্দর বিরহাতুরা পত্নীর, অশ্বঘোষ কৃত কাব্যের নায়িকা নন্দজায়ার এ কাহিনী বৌদ্ধ শিল্পীদের অতি প্রিয় ছিল। স্বামীর প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংবাদে দয়িতা বিরহে মুমূর্ষু নারীর এই শোকচিত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পে অদ্বিতীয়।

এই গল্প আমার স্ত্রী রেবাকে নিয়ে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। হ'ল আর একজনকে নিয়ে, বিশ্বাস করা যায় না এমন, অদ্ভুতভাবে। এক বর্ষার রাত্রে।

বলবেন, এমন হওয়া উচিত না। উচিত অনুচিতের তত্ত্ব আলোচনা করলে অবশ্য গল্প হয় না। উচিত তো না-ই আমার স্ত্রী রেবার কাহিনীও আপনাদের কানে তোলা। কিন্তু উপায় কি।

রেবাকে নিয়ে আরম্ভ করা যাক।

হ্যাঁ, এক গ্রীষ্মের ছুটিতে ও আমার কাছে এসেছিল। এই শেষ আসা। আমাদের বিয়ের পর এক বছরের মধ্যে অবশ্য আরো দু' তিনবার রেবা ছোট বড় ছুটিগুলো আমার কাছে এসে কাটিয়ে গেছে। যেমন পুজোর এক মাস, বড়দিনের সাত দিন, গুড-ফ্রাইডে—ইস্টার মনডে—পয়লা বৈশাখ—সংক্রান্তি ইত্যাদি মিলিয়ে ন'দিন। আর এক জায়গায় ওর চাকরি। স্কুলের টিচার। আমি আছি কলকাতায়। আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না বছরে দুবার তিনবার ওর কাছে ছুটে যাওয়া। চাকরিটাই এমন। বিয়ের সময় আঠারো দিনের ছুটি বলে কয়ে ওপরওয়ালার কাছ থেকে মঞ্জুর করিয়েছিলাম। বছর না পুরতে আবার ছুটি চাওয়া তো অসম্ভবই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও শীগগির আর ছুটি মিলতো কি না সন্দেহ। আফিসে এমন লোকও আছে যাদের তিন কি সাড়ে তিন বছর পার হয়ে গিয়েও ছুটি মিলছে না। হাবভাব দেখে মনে হয় তাদের ছুটির দরকার নেই। দরকার কি আর হয় না। হয়তো একবার—দু'বার—তিনবার আবেদন-নিবেদন ক'রে যখন বুঝেছে একটানা একমাস কি একুশ দিন কর্মচারীদের অদর্শন তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব প্রায় হৃদয়বিদারক ঘটনার মত তখন কর্মচারীরা ওপরওয়ালার কাছে ছুটি চাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অসুখ-বিসুখ? সে-কথা অবশ্য আলাদা। খুব বোশাদন রোগে ভুগে কি ঘন ঘন সর্দি-কাশি-পেটের অসুখে কামাই ক'রে কে কবে মার্চেণ্ট আফিসে চাকরি রাখতে পেরেছে আপনাদের অজানা নেই।

রেবা এসব বুঝতে পেরেছিল।

হ্যাঁ, আমার এবং আমার চাকরির অবস্থা।

শেষবার, অর্থাৎ সামারের ছুটিতে এসে মুখ কালো ক'রে ও বলছিল আর খুব শিগগির তার পক্ষে কলকাতায় আসা সম্ভব হবে না, পুজোতেও না, টুইশনি নিয়েছে। তা ছাড়া, সব চেয়ে বড় কথা বার বার আসা-যাওয়া ক'রে ক'মাসেই সে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। স্কুলের চাকরি। কত আর মাইনে দেয় কর্তারা। সুতরাং রেলভাড়া বাবদ যদি দু' চার মাস পর পর প'চিশ ত্রিশ টাকা বেরিয়ে যায় তবে তার ভাত খাওয়া হয় না। 'আর, তোমার পক্ষেও সম্ভব না শিগগির বেনারস যাওয়া। সুতরাং—'

সুতরাং একচালার নিচে থেকে এক হাঁড়ির ভাত খেয়ে দাম্পত্য-জীবন কাটানো শিকেয় তোলা রইল।

কি, আমি সাহসই পাইনি রেবাকে প্রস্তাব দেওয়ার যে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি এখানে থাক।

'আমার ট্রেনিং পাশ না করাটা কত বড় ভুল হয়েছে আজ বুঝতে পারছি।' রেবা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছিল। 'আমি কি জানতাম না বিয়ের পর এ-অবস্থা হবে। কিন্তু কাকু তো আর তা দেখেন নি, মন্ত্র পড়িয়ে কোনোমতে পার করিয়ে দেবার জন্যে চোখে ঘুম ছিল না। আর থাকবেই বা কী করে। আমি বাড়তি লোক, নিজের এতগুলো সন্তান, চাকরিও তেমন হাতিঘোড়া কিছু না। বাবা মরবার পর ও'র সংসারে আমাদের যেদিন ঠাঁই নিতে হয়েছিল সেদিনই জানতাম কত বড় অবিচার করা হ'ল আর একটা লোকের ওপর। তবু তো তিনি ধার-কর্জ ক'রে আমার পরীক্ষার ফিজ যোগাড় করলেন। না হলে বি-এ পাশ করাই আমার কপালে ঘটত না।'

এই অবধি এসে রেবা থেমেছিল।

'বেশ তো, তুমি না হয় ট্রেনিং-টা পাশ ক'রে নাও, আমি দেখি ইতিমধ্যে চেষ্টা-চরিত্র করে কলকাতার কোনো ইস্কুলে যদি তোমার একটা—'

এত বড় চোখ করেছিল স্ত্রী। হ্যাঁ, বিয়ের পর দ্বিতীয়বার বড়দিনের ছুটি কাটাতে যখন ও আসে।

'অদ্ভুত স্বার্থপর তুমি।' মনে হয়েছিল বুঝি সেদিনই সে বাক্স গুছিয়ে আবার বেনারস রওনা হয়। বলল, 'এতটা নিচ হতে আমি পারব না। চাকরি পেয়ে মাকে নিয়ে সেখানে আলাদা বাসা করেছি, কিন্তু তা বলে

কাকুর পরিবারের ভালমন্দ সুখদুঃখ জলে ভাসিয়ে দিয়ে আমি স্বামী-সঙ্গ করতে আজই এখানে ছুটে আসব মরে গেলেও তা পারব না, তারপর মা? মা-ও একটা সমস্যা। রোজ সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে না পারলে মরে যাবে—কলকাতায় এসে তার পক্ষে থাকা অসম্ভব বিয়ের রাত্রেই আমাকে কানে কানে বলছিল।'

আমি চুপ ছিলাম। কাকুর পরিবার। মা। বিশ্বেশ্বরের মন্দির। ট্রেনিং নেওয়া।

গুডফ্রাইডের ছুটিতে ও এল।

সেবার ক'লকাতার জলে ওর নিজের বদ্-হজম, গা-হাত-পা ব্যথা এবং এসব অস্বস্তির দরুন রাত্রে অনিদ্রা।

আমি বললাম, 'না হয় কালকের মেলেই তুমি ফিরে যাও, আরো তো ছুটির তিন-চার দিন আছে। সেখানে গিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে তারপর কাজকর্ম আরম্ভ করতে পারবে।'

তিন দিন না। ছুটির একদিন হাতে রেখে ও ফিরে গেছে।

তারপর গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে প্রথম দু'দিন ওর অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। এটা-ওটা কেনা কাটা করল—দোকানে দোকানে ঘুরে। ওর জুতো শাড়ি, বিধবা মা'র জন্যে কাপড়চোপড়, সেখানে ঘরের দরজা জানালার পর্দাগুলো ছিঁড়ে গেছল, তাই নতুন পর্দা কেনা হ'ল কুড়ি টাকার। একটা ইলেকট্রিক স্টোভ, বড় একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক, দু'টো চামড়ার সুটকেস এবং তিনটে মাঝারি সাইজের পাপোশ্। টুকিটাকি জিনিসও বিস্তর ছিল। সাবান তেল স্নো-ক্রিম পাউডার রাইটিং প্যাড জেলির শিশি মাখনের টিন এবং কিছু ওষুধপত্র। ওষুধ-গুলো ওর নিজের জন্য কি মা'র জন্য আমি প্রশ্ন করিনি। করব কি। সারাদিন ঘুরে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে ঘরে ফেরার পর এমন ক্লান্ত হয়ে ও বিছানায় এলিয়ে পড়েছিল যে কাছে গিয়ে কথা বলতে আমার সাহসে কুলোয়নি। হ্যাঁ, ক্লান্তি ওর চোখে-মুখে বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল। এবং পর-দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে বসে ও আসল কথাটা তুলল। খরচপত্র। দু' চার মাস পর পর এভাবে কলকাতায় স্বামীর কাছে আসতে হলে ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং আর শিগগির—

গ্রীষ্মের ছুটির তিনদিন আমার কাছে কাটিয়ে পঁচিশ দিন হাতে রেখে রেবা ফিরে গেল। সত্যি তার বিশ্রামের দরকার। স্কুল খুললে আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে মেয়েদের আকবর বাদশা আর তৈমুরলঙের জীবনী শেখাতে হবে।

আমার জুতো নেই, গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে, একটি মাত্র শার্ট বাড়িতে সাবান দিয়ে কেচে কোনোরকমে কাজ সারা হচ্ছিল বলে সেটার সাদা রং মজে গিয়ে মেটে হলদে রং ধরেছে। রেবা লক্ষ্য করছিল কি না জানি না। কিন্তু তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা না ঘামিয়ে বরং যতটা সম্ভব হাসিখুশি থেকে ওর জিনিস-পত্র বাঁধাছাঁদায় সাহায্য করলাম, ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এলাম, এবং গাড়িতে তুলে দিতে শেষ পর্যন্ত স্টেশনেও গেলাম।

'বাই—বাই।' হাত তুলে ইংরেজী কায়দায় ও বিদায় নিল। 'বাই—বাই।' আমি হাসি-মুখে মাথা নেড়ে প্রত্যাভিনন্দন জানালাম। সিটি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। রেবা আর আসেনি। আমার স্ত্রী।

এখন আসল গল্পে আসা যাক।

ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল ক'দিন ধরে। সর্দি-কাশিতে ভুগে আমি একাকার। দুদিন অফিস কামাই হয়ে তৃতীয় দিন চলছে। এমন সময় দুপুরবেলা হুড়মুড় করে এসে ঘরে ঢোকে সুবিনয়। আমার বন্ধু। মাথা ও কান বেয়ে টপ টপ জল ঝরছিল। গায়ের জামা খুলে ফেলে হাত বাড়িয়ে আমার ময়লা তোয়ালেটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে সে মাথা ও ঘাড় মুছল।

'কি ব্যাপার?'

'তোকে দেখতে এলাম।'

সুবিনয় আমার পাশে বসল।

এখানে বলে রাখি রেবাকে শেষ বারের মত বেনারস এক্সপ্রেসে তুলে দিয়ে এসে আদ্যোপান্ত সুবিনয়কে সব বলেছিলাম। নম্র-নিরীহ গোবেচারা মানুষ এবং ঘরের ইঁট কাঠকে যদি আমার বিশ্বাস করতে বাধত সুবিনয়কে কিছু বলতে আটকাত না। আজ অবশ্য আমি গলা বড় ক'রে স্বামী পরিত্যাগকারিণী রেবার কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছি। আমার খারাপ না লেগে বরং ভালই লাগছে। কিন্তু সেদিন?

আমার ভয় ছিল পাছে কেউ টের পায়।

স্ত্রী আমাকে পছন্দ করছে না, আমার সঙ্গে থাকতে তার আতঙ্ক, হ্যাঁ আতঙ্কই তো,—কাকু, মা, স্কুলের চাকরি এসব প্রশ্ন এদিকে উঠেছিল, কিন্তু তার আগে? সেই প্রথম যাত্রায় কলকাতা থেকে যাবার প্রস্তাব দিতে মেয়েটির (স্ত্রী বলতে আমার ঘৃণা হয় এখন) চোখের তারায় যে-আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল পুরুষ হয়ে আমি তা ধরতে পেরেছিলাম বৈ কি।

আর ধরতে পেরে আমি তা বিশ্বের কাছে লুকিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষ কয়দিন এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে। একটা জায়গা চায় সে একটি পাত্র খোঁজে। একজনের নিষ্ঠুর হওয়ার কাহিনী নিষ্ঠুরের মত কাউকে বলে তার পর তার কাছে সৎ-পরামর্শের জন্য হাত-পাততে না পারা পর্যন্ত সে শান্তি পায় না। সেই শান্তি আমি সুবিনয়কে দিয়ে পেয়েছিলাম। অবশ্য খুব যে একটা বড় রকমের পরামর্শ ও আমাকে দিতে পেরেছে তা নয়। ওয়েট্ এন্ড সী ব'লে আমায় সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া নিরীহ মানুষটার মাথায় আর বিশেষ কিছু আসেনি।

না ভুল বললাম, এসেছিল, এসেছে। ও যে সত্যি আমার বন্ধু আমার দুঃখে খুব বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছে সেটা সুবিনয় নিজে যতটা না বুঝেছিল আমি বুঝেছিলাম ঢের বেশি।

সুবিনয় আমার কপালে হাত রেখে জ্বর পরীক্ষা করল। আমি বললাম, 'জ্বর নেই, কাল একটু গা গরম হয়েছিল। আজ ভাল আছি।'

'তা তুই কি ঠিক করলি?'

কথার উত্তর না দিয়ে আমি অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ করে ছিলাম। সুবিনয় আবার প্রশ্ন করল, 'কি খেলি?'

অল্প হাসলাম। হেসে সুবিনয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললাম, 'একটু বার্লি জ্বাল দিয়ে খেয়েছি। স্টোভ ধরাতে গিয়ে আঙুলটাও পুড়িয়েছি।'

'বেশ করেছিস।'

আমার মুখের দিকে তাকাল না সে। ঘরের মেঝেয় একরাশ ছেঁড়া ন্যাকড়া, অনেকগুলো পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, স্পিরিটের শিশি ও হাতল ভাঙা একটা সসপ্যানের পাশে স্টোভটার দিকে চেয়ে থেকে সুবিনয় যেন কি চিন্তা করছিল।

'আজ শনিবার?'

'হ্যাঁ, অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা তোর কাছে চলে এলাম। আজও সকালবেলা তোর বৌদির সঙ্গে কথা হচ্ছিল।'

আমি চুপ করে আবার দেয়াল দেখছিলাম।

'তা হাত-পা পুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে ক'দিন চলবে, না হয় মেসে চলে যা।'

বললাম, 'তোমার ওয়েট্ এ্যান্ড সী উপদেশ মেনে নিয়ে এখানে পড়ে আছি আর কি। যদি আবার কোনোদিন সে আসে।' হাসলাম।

'নন্‌সেন্স।'

নিরীহ সুবিনয়ের চেহারা চাপা ক্রোধে থমথম করছিল দেখে হাসি বন্ধ করলাম।

'মেসে ফিরে যা, না হয় আমি যা বলছি তা কর্। এভাবে থেকে শরীরটাকে শেষ

করিস না।' সুবিনয়ও দেয়ালের দিকে চোখ রেখে কথা বলছিল।

বিয়ের পর রেবা যেবার প্রথম যাত্রা কলকাতায় আসে মেস ছেড়ে দিয়ে নেবুতলায় একুশ টাকা ভাড়ার ছোট একটা কামরায় বাসা বেঁধেছিলাম। সেই ঘরে আমি আজও পড়ে আছি। রেবা ফিরে আসবে বলে না, রেবার বার বার এসে ফিরে যাওয়ার পরও যখন দেখলাম ফুড্ আর লজ বাবদ মাস যেতে পঁয়তাল্লিশ টাকা মেসে না দিয়ে এখানে একুশ আর একটু কমসম খেয়ে এবং মাঝে মাঝে রাত্রে মুড়িটুড়ি চালিয়ে আমি পঁয়ত্রিশের মধ্যে মোটামুটি সারতে পারছি, তখন ভাবলাম (আপনি যদি স্বল্প বেতনভোগী কেরানি হন, আপনিও এই রাস্তা ধরবেন), আর মেসে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন কেন। তা ছাড়া, তা ছাড়া আরো কথা আছে। সেদিন বিয়ে করেছি অথচ আজ সাত মাসের মধ্যেও আমার নামে সবুজ বা সাদা একটাও খাম আসছে না মেসের লোকের চোখে সেটা বিসদৃশ ঠেকবে ভেবেও সেখানে ফিরে যেতে উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। বলবেন আফিসের ঠিকানায় বৌ চিঠি দেয় বলে ওদের বোঝাব। সেই রাস্তা বন্ধ ছিল কেন না মেসের তারাপদ রায় ও নগেন দত্ত নামে দুই ভদ্রলোকও আমার আফিসে চাকরি করে। এক ঘরে, হ্যাঁ, এক টেবিলে বসে আমরা লেজার লিখি। কাজেই বুঝতে পারছেন লোকের কাছে কি লুকোতে আমার লোকালয়ে থাকতে সাহস হচ্ছিল না। এই ঘরটাকে নির্জনবাসই বলা যায়। গোটা বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন টালি-ছাওয়া একতলা কামরা। আমার কাছে চিঠি আসে কি না আসে বাড়ির মালিক হার্ডওয়্যার মার্চেণ্ট ধনপতি নন্দী কি তার গোষ্ঠীর কেউ উঁকি দিয়ে দেখতে আসবে না। তা ছাড়া আমার জ্বর হল কি পেটের অসুখ, হাত পুড়িয়ে সাগু পাক করে খেলাম কি পা পুড়িয়ে চালে-ডালে একত্র সিদ্ধ করে খিচুড়ি, তা-ও তাদের জানতে মাথা ব্যথা নেই। দু'তিনবার বৌ এসে গেছে, এখন দু'তিন বছর কেন বাকি সারা জীবনেও যদি আর সে কাছে না আসে, বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বারানসীধামে স্বজনের কাছে পড়ে আছে আমার বলতে বাধা ছিল না। আমি ব্যাচেলার নই বিবাহিত, এটা যখন প্রমাণ হয়ে গেছে বাড়িওলার ঘর অধিকার করে থাকতে আর ভয় ছিল না। তা ছাড়া কেরানিরা সুযোগ পেলেই 'পরিবার' দেশে পাঠিয়ে দেয় লক্ষপতি ধনপতি নন্দীরা সেটা জানেন না আমি বিশ্বাস করতাম না।

ঘরে না থাকলে তো কথাই নেই; থাকলেও অধিকাংশ সময় আমি দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখি। আর তা ছাড়া মাত্র দুটো জানালার মধ্যে বলতে গেলে দেড়খানাই ঘরের ওপাশে ধনপতিবাবুর কয়েক শ' টন পুরোনো জং-ধরা লোহার টুকরো স্তূপ করে রাখা হয়েছিল বলে খোলা সম্ভব হত না। সুতরাং বাকি আধখানা দিয়ে বাইরের আলো বাতাস এবং মনুষ্যদৃষ্টি প্রবেশ করার তেমন সুযোগ ছিল না। কাজেই আমি অধিকতর নিশ্চিন্ত ছিলাম; নির্জনবাস বৈকি।

কিন্তু এখানে এভাবে হাত পা ছড়িয়ে একলা শুয়ে শুয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলব আর অনাহারে অর্ধাহারে থেকে শরীর নষ্ট করব দেখতে সুবিনয় প্রস্তুত না। এখানে আমাকে ওয়েট এণ্ড সী নীতি মেনে চলতে দিতে সে নারাজ। বিশেষ গত মঙ্গলবার আমাশয়ে ভুগে উঠে আবার এই বিষ্যুত বারেই সর্দিজ্বরে বিছানা নিয়েছি দেখে সুবিনয় আমার ওপর রীতিমত খেপে গেছে এবং অগত্যা যদি আমি মেসে ফিরে না যাই তো আজ এখুনি আমাকে তার সঙ্গে তার বাসায় চলে যেতে হবে। 'কালও তোর বৌদির সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে।'

দেয়ালে পেরেকের গায়ে রেবার ফেলে যাওয়া একটা রিবন ঝুলছিল। অনেকদিন এক জায়গায় একভাবে থেকে কালিঝুল ও ধুলো লেগে চকচকে ফিতেটার ধূসর রং ধরেছে। ওটাকে অবলম্বন করে এতবড় একটা মাকড়সার জাল তৈরী হয়েছে। একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে পরে বন্ধুর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'আমার লজ্জা করে।'

'তুমি স্ত্রীলোক।' সুবিনয় রীতিমত ধমক লাগাল, 'লজ্জা করে। আমার সঙ্গে থাকবি বন্ধুর বাসায় থাকবি এতে লজ্জাটা আসে কোথা থেকে আমায় বুঝিয়ে বলতে পারিস?'

গত পরশু সুবিনয় প্রথম আমাকে এ প্রস্তাব দেয়। এবং সেদিন যে-প্রশ্ন করেছিলাম আজ আবার সেই প্রশ্ন আমার চোখে ভেসে উঠল।

সুবিনয় আমার হাতে হাত রেখে বলল, 'অরুণাকে সেসব আমি কিছুই বলিনি। বিশ্বাস কর। তুই আমার বন্ধু। আমার কাছে তুই সব বলতে পারিস, কিন্তু তোদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক হয়ে আছে আমি মূর্খ না যে আমার স্ত্রীকে তা বলতে যাব।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'ধরেছি ওয়াইফ আসতে এখন কিছুকাল দেরি হবে সেখানে আর একটা পরীক্ষা পাশ দিতে তাঁকে থেকে যেতে' হচ্ছে, কাজেই সুধাংশু বাসা তুলে দেবে, এদিকে আবার মেসের খাওয়া তার সহ্য হয় না ডিসপেপসিয়ায় ভোগে।'

'তোর তো একখানা মোটে কামরা, কি করে হবে?'

'হ্যাঁ, একখানা বটে, ওটাকেই পার্টিশন লাগিয়ে দুটো করা হয়েছে। দু'তিন মাস আমার পিসতুতো ভাই বঙ্কিম তার স্ত্রী ও একটা বাচ্চা নিয়ে থেকে গেল কিনা। খুব সম্ভব বঙ্কিমের ক্যানসার হয়েছে। চিকিৎসা করাতে কলকাতায় এসেছিল।'

'তারা এখন কোথায়?'

'চলে গেছে। বঙ্কিম আসামের কোন্ একটা চাবাগানে চাকরি করে। খুব সম্ভব সেখানেই ফিরে গেছে। আর যাবে কোথায়। এ-রোগ তো সারবার নয়, মাঝখান থেকে এসে আমার কিছু—'

সুবিনয় থামল।

'টাকা পয়সা কিছু দেয়নি বুঝি?'

'কোথা থেকে দেবে, দিয়েছিল গোড়ার দিকে সামান্য, তারপর ডাক্তারে ওষুধে এমন খরচ হতে লাগল যে এদিকে দুটো লোকের ভাতের খরচ বাচ্চার দুধের খরচ বলতে গেলে সবই প্রায় আমাকে—'

'এসব কথা কিন্তু তুই আমায় কিছুই বলিসনি।'

'কি আর হ'ত বলে। দুটো মাস আমার যা গেছে, আর্থিক তো বটেই শারীরিক কষ্ট কি আর কম হয়েছে। আফিস বাজার তার ওপর বঙ্কিমের জন্যে রোজ ডাক্তারখানায় ছুটোছুটি, একলা হাতে সব ম্যানেজ করা কি চারটিখানি কথা।'

'তা তো বটেই।' সুবিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম সত্যি এই দু'মাসে সে বেশ একটু রোগা হয়ে গেছে। 'যাক, চলে গেছে ওরা তোর দিক থেকে ভালই হয়েছে।' আস্তে আস্তে বললাম, 'পরের উপকার করা কি আর কারো অনিচ্ছা, কিন্তু আমরা পারি কোথায়, আমাদের মতন অবস্থার লোকের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখাই যেখানে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, সত্যি কিনা?'

তৎক্ষণাৎ কথা বলল না সুবিনয়। রেবার ফেলে যাওয়া মলিন রিবনটা সে দেখছিল।

আমি হাত বাড়িয়ে শিয়রের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে জল খেলাম।

'লোকের উপকার ছেড়ে দিয়ে তুই আমার উপকার কর। বিছানাটা গুটিয়ে নে, সুটকেসটা গুছিয়ে রাখ, জলটা ধরুক, আমি একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে আসছি।'

আমি ফ্যালফ্যাল করে সুবিনয়ের মুখ দেখি।

'রিয়্যালি, মিথ্যা বলছি না, তুই গেলে, এক সঙ্গে আমার কাছে থাকলে আমার মস্ত উপকার হয়। কি চাকরি করি ক'টাকা

মাইনে পাই তোর অজানা নেই। তিন তিনটে বাচ্চা। এদিকে অগ্নিমূল্য হয়ে আছে, সব জিনিসপত্তর। বাড়ি ভাড়া আছে, তার ওপর অসুখবিসুখে—'

যেন কি বলতে চেয়েছিলাম, সুবিনয় আমার মুখের ওপর হাত রেখে বাধা দিলে।

'চলতি কথায় আমি যদি বলি আমার পেয়িং গেস্ট হয়ে তুই থাকবি তো তোর আপত্তি করা অন্যায়। আমারটা খাবি বলে তুই সেখানে যাচ্ছিস না। কেমন, হল?'

আমার আর কিছু বলার রইল না। দুই হাতে চোখ ঢেকে চুপ করে ভাবি। বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। আমি জানি আমি জানতাম সুবিনয় আমাকে ধনপতি নন্দীর এই অন্ধকার গহ্বর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে আজ বদ্ধপরিকর হয়ে এসেছে। তাই শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল। ওর সংসারে থাকা-খাওয়া বাবদ মাস অন্তে কিছু টাকা হাতে তুলে দিলে আর পাঁচটা খরচপত্রের দিক থেকে সুবিধা হবে চিন্তা করে যে সুবিনয় আমাকে নিয়ে যেতে আসেনি এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমার চেয়ে সুবিনয়কে কে-ই বা বেশি জানত। দূর সম্পর্কিত রুগ্ন পিসতুতো ভাই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই যে দু'মাস তার বাসায় থেকে খেয়ে চিকিৎসা করিয়ে গেল কই একদিনও তো সুবিনয়ের মুখ দিয়ে সেকথা বেরোয়নি। আসলে এই নির্জনবাস আশ্রয় করে রেবার চিন্তায় রুগ্ন হয়ে হয়ে আমি আয়ু ক্ষয় করছি, বন্ধু তো বটেই, আমার পরমাত্মীয় সুবিনয়ের তা সহ্য হচ্ছিল না। আমি জানি আমি জানতাম এই আস্তানার মোহ না ছাড়লে গোবেচারা নিরীহ সুবিনয় দরকার হলে নিষ্ঠুর হবে, বলপ্রয়োগ করবে আমাকে এখান থেকে নড়াতে। কিন্তু তা না করে আজ সে অন্য পন্থা অবলম্বন করল।

'তিনটে লোকের সঙ্গে একটা লোকের খাওয়া যেমন করে হোক চলে যায়, বিশেষ গায়ে লাগে না। আমি ঠিক করেছি, তুই যদি যাস তোর প্রথম মাসের টাকাটা দিয়ে তোর বৌদির একটা চশমা কিনে ফেলব। কবে চোখ দেখানো হয়ে আছে কিন্তু টাকার অভাবে আজ পর্যন্ত ওটা কেনা হচ্ছে না, কিছুতেই ম্যানেজ করা যাচ্ছে না।'

'থাক অত কথায় কাজ নেই।' রুষ্ট হতে গিয়েও হেসে উঠলাম। 'পেয়িং গেস্ট হয়ে তোর বাসায় থাকব। কিন্তু মনে রেখো ব্রাদার আমিও গরিব কেরানি। নিয়মমত যদি টাকা পয়সা দিতে না পারি, এক আধ মাস আটকে যায় বৌদি যেন শেষ পর্যন্ত আমায় মা আবার উপোস রাখতে আরম্ভ করেন।'

সুবিনয়ও হাসল।

'হুঁ, উপোস ঠিক রাখবে না। চালাক মেয়ে। দেনার কথা মনে করিয়ে দিতে থালায় ভাতের সঙ্গে একটুকরো কয়লা দেবে।'

আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম।

সুবিনয় বলল, 'চল, আর দেরি করে লাভ নেই, বৃষ্টিটা ধরল বুঝি এবার।'

দর্জিপাড়ায় এক গলির ভিতর সুবিনয়ের বাসা। তা বাসা যত ছোট হোক আর সাড়ে তিন হাত ও সাড়ে তিন হাত বন্দোবস্ত রেখে একটা টিনের পার্টিশন লাগিয়ে দুটো কামরা তৈরী করার চেষ্টা করতে গিয়ে সুবিনয় ঘরখানাকে যতই শ্বাসরোধী ও অন্ধকার করে তুলুক আমার তো মনে হয় ওখানে উঠে এক সন্ধ্যার মধ্যে শরীর মন ঝরঝরে হয়ে গেল।

সন্ধ্যার পরেও বৃষ্টি পড়ছিল।

এক ফাঁকে গিয়ে সুবিনয় বাজার করে নিয়ে আসে।

আমি ভাত খাব শুনে সুবিনয়ের বাজার করার প্রয়োজন হয়। বুঝলাম।

ওরা ধরে রেখেছিল শরীর খারাপ আমার, রাত্রে সাগু আর রুটি খাব।

অরুণা বলল, 'না হলে আমরা রাত্রে চা-মুড়ি দিয়ে কাজ সারতাম।' কথা শেষ করে বৌদি যখন সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল সুবিনয় তখন আমার সামনেই স্ত্রীকে ধমক দিল। 'এত কথা বলতে তোমায় কে ডেকেছে। যদি চা হয়ে থাকে চা করে নিয়ে এসো আগে।'

সুবিনয় রুষ্টভাবে কথাগুলি বলছিল বলে তার হাতে একটা চাপ দিলাম। হাত সরিয়ে নিয়ে সুবিনয় বলল, 'না, না, মেয়েদের বেশি কথা বলতে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। তুই জানিস না।'

আমার চোখে বন্ধুকে হঠাৎ অন্যরকম ঠেকল। কিন্তু, তখনই চিন্তা করে দেখলাম, না, আমারই ভুল। ইতিপূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে সুবিনয়কে দেখলেও রান্নাবান্না কি খাওয়া পরা নিয়ে দুজনের আলোচনা আর শুনিনি। আগে এত কাছাকাছি আসিনি এদের আমি, অন্তঃপুর।

'যাও, জল ফুটেছে। চট্ করে চা করে নিয়ে এসো। তোমার চায়ে কি একটু আদা দেবে হে সুধাংশু।' মন্থরভাবে সুবিনয় আমাকে প্রশ্ন করল। আমি মাথা নাড়লাম।

অরুণা আমাদের সামনে থেকে সরে যাওয়ার পর সুবিনয় বলল, 'স্ত্রীকে চাপে রাখতে হয়। আমি স্ত্রী-শাসনের পক্ষপাতী।'

আমি কথা বললাম না।

তাকিয়ে দেখছিলাম নতুন জায়গা। আমি পায়খানা সেরে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখি আমার বিছানার বাণ্ডিল খোলা হয়েছে। সুবিনয় কিছুই করছিল না। কেবল দাঁড়িয়ে থেকে কাজের তদারক করছিল। সুবিনয়ের বড় মেয়েটা বছর সাত আট বয়েস, মাকে সাহায্য করছিল। আমার লাল সুজনি বিছানো হল। ময়লা বালিশ। বস্তুত বাদলার জন্যে ধোয়ানো যাচ্ছিল না। তা ছাড়া ওয়াড়টা অনেকদিন থেকেই ময়লা হয়ে ছিল। অরুণা যখন সুজনির ওপর আমার বালিশ জোড়া বিছিয়ে পরে বালিশ দুটো আবার সরিয়ে নিচ্ছিল সুবিনয় তখন আচমকা ধমক দিয়ে উঠল।

'আবার সরাচ্ছো কেন।'

'ওয়াড় দুটো খুলে ফেলব।'

আমি লক্ষ্য করলাম কথা বলতে গিয়ে একবারও অরুণা স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিল না। রক্তাভ গাল।

পর পর দু'তিনটে ধমক খেয়ে অত্যন্ত অভিমান হয়েছে বুঝতে পেরে আমি চোখ ফিরিয়ে দরজার বাইরে প্যাসেজের একটা বালবের অন্তিমদশায় চলে যাওয়া ধুকধুকে লালচে রেখা দুটো মনোযোগ দিয়ে দেখি।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করে তারপর কাজ করবে। ওয়াড় যে খুলছ এখন, বালিশে পরাবে কি? এতকাল ছিল আজ রাতটা থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত না।'

অরুণা যত না লজ্জা পেল আমি লজ্জিত হলাম ঢের বেশি।

'আপনি ওটা আজ খুলবেন না।'

বলতে অরুণা এই সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকায়।

এবার লক্ষ্য করলাম রেবার চেয়ে সুন্দরী না হলেও অরুণা মন্দ না। মন্দ না বললে ছোট করে বলা হয়। হয়ত বেশি সুন্দরী। সত্যিকারের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার স্ত্রীলোক বলা যায়। শরীরে চলাফেরায় কথায়। বলতে কি অরুণা ম্যাট্রিকও পাশ করতে পারেনি, যদি না আগে কোনদিন সুবিনয় আমাকে জানিয়ে রাখত আজ আমি ভাবতাম এই মেয়ে ডবল এম এ। এত কাছাকাছি হয়ে আমি কোনদিন মুখ দেখিনি। ভাবছিলাম রাগারাগি হবে। পুনঃপুনঃ আঘাত করার ফলে চোখে জল আসবে। কিন্তু তা এল না।

অরুণা মুখ তুলে আশ্চর্য শান্তভাবে হাসল। 'স্ত্রীর ওপর উঠতে বসতে রাগারাগি করলে আজকাল স্ত্রীরা কি করে একবার ওকে বলে দিন তো ঠাকুরপো।'

'হ্যাঁ আত্মহত্যা করে, পালিয়ে যায়—কোর্টে যায় মামলা করতে ডাইভোর্সের। তুই বুঝিয়ে বলে দে না সুধাংশু। আমার কথায় তো এর বিশ্বাস নেই।'

আমি একদিকের দেয়ালে চোখ রাখলাম। পরে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম এক কথায় স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে সুবিনয় নীরব নতনেত্র হয়ে তার কাজের তদারক করছিল। 'পারিবারিক জীবনে তুই নিষ্ঠুর।' কেন জানি যতবার রূঢ়ভাবে স্ত্রীকে আদেশ-প্রত্যাদেশ করছিল বারবার সুবিনয়ের চোখে চোখ পড়তে আমার গলা বড় করে বলতে ইচ্ছা হয়েছিল। 'সংযত স্থিরবুদ্ধির মেয়ে বৌদি, তা না হলে তোকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ত।'

কিন্তু বললাম না।

মুর্খ রেবা আমার সেই মুখ হয়তো বাকি জীবনের জন্যে বন্ধ করে গেছে। ভেবে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললাম।

রান্নাবান্না হ'ল। খাওয়া-দাওয়া শেষ।

বৃষ্টিটা আবার চেপে এসেছিল।

এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে, হ্যাঁ বিশেষ করে আমার সঙ্গে থেকে 'কাকু' 'কাকু' করে বড় আর মেজ ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই সুবিনয়ের বাসাটা হঠাৎ নীরব হয়ে ছিল। বৃষ্টিতে আবার এখন মুখর হয়ে উঠল।

নতুন লোক আসাতে খাওয়ার পাট চুকবার পরও অতিরিক্ত দু'টা বাসনমাজা এবং এটা-ওটা ধোয়ামোছা সারতে বেশ রাত হয়ে গেল।

আমার বিছানার ওপর শুয়ে এতক্ষণ পর মোটামাটি সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হতে পেরে যেন সুবিনয় আবার সুবিনয় হয়ে গেল। অর্থাৎ আগের মত হাল্কা মনে রেবা সম্পর্কে আমাকে উপদেশ দিয়ে চলল। 'থাক্ এখন এখানে, ক'মাস। চিঠিপত্র যখন দেয় না তুইও দিবি না। কোথায় আছিস ঠিকানা জানাবি না। আসবে না মানে? আলবৎ আসবে। ওয়েট এন্ড সী। এক আধটা বাচ্চা পেটে আসুক। বিদ্যার দাপট, নিজে চাকরি করে তোর মতন কি কিছু বেশি রোজগার করতে পারার ভ্যানিটি চুরমার হ'য়ে যাবে। বুঝলি ওসব থাকে না। আফ্‌টার অল্ শী ইজ এ ওম্যান। তার যা ধর্ম তাই পালন করতে এসেছে সে পৃথিবীতে। যতক্ষণ না পাচ্ছে, যতক্ষণে না সেই সাধ পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ তুমি নিজের স্ত্রীর ক্যারেক্টার বিচার করতে পারছ না।'

আমি কথা বলছি না।

বৃষ্টিটা আবার থেমেছে। শেষ বর্ষার বৃষ্টি যায় আসে আসে যায়।

কেন কোথায় একটু টিনের ছাদ ছিল সুবিনয়ের বাসায়। বর্ষণ থামতে কোথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে একটা টপ্-টপ্ আওয়াজ হচ্ছিল।

'বুঝলি বিয়েটা কিছু না। ওটা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে একটা বন্ধনই নয়। পরিণয়ের আসল সুতো হ'ল সন্তান। একটা বেবি হোক তখন দেখবি।'

এবার সুবিনয় আর আস্তে কথা বলছিল না। আমার মনে হ'ল যেন ভিতরে চৌবাচ্চার ধারে অরুণা ধোয়ামাজার কাজ করছিল। কথাগুলি সে-ও শুনছে কি না চিন্তা করছিলাম।

'চুপ ক'রে আছিস কেন?' হেসে সুবিনয় আমার পেটে আঙুলের গুঁতো দিল। বললাম, 'শুনছি, তুই বলে যা।'

'সুতরাং টেক্ অ্যানাদার চান্স্। আবার আসুক। এর আগে চান্স নিয়েছিলি?'

আমার কান লাল হয়ে উঠল। কেননা, সুবিনয় আরো জোরে কথাটা বলল। যেন মনে হ'ল বাসন ধোয়া সেরে অরুণা ঘরে ফিরেছে। পার্টিশনের ওপারে চুড়ির শব্দটা কানে লাগল।

'হা ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিস কি, উত্তর দে।'

আমার গলা শুকিয়ে যায়। যেন তিন দিন পর ভাত পথ্য ক'রে হঠাৎ অসময়ে এমন পিপাসা পেল। চেপে গেলাম। কেননা তখন যদি আমি হেসেও জলের কথা বলতাম সুবিনয় আর্তনাদ ক'রে উঠত। আজ আপনাদের কাছে বলছি, সেদিন তখন আমাদের সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য-জীবনের সব কথা সুবিনয়ের কাছে প্রকাশ করার পরও একটা জিনিস গোপন করলাম। নিষ্ঠুরা রেবা মা হবার সুযোগ প্রতিবার কৌশলে এড়িয়ে গেছে যদি আমি বন্ধুকে বলতাম ঘরের সিলিং কাঁপিয়ে সে হেসে উঠত নয় তো রুদ্ধ কণ্ঠে আমার পৌরুষকে ধিক্কার দিয়ে বলত, 'ফুল্—তুই একটা গর্দভ। যা এখন ভেরেন্ডা ভাজগে—' ইত্যাদি।

আমি দু'বার ঘাড় নাড়লাম। অর্থাৎ আগেও চান্স নিয়েছি এবং ভবিষ্যতে কোন-দিন রেবা এলে ওকে মাতৃত্বের গৌরব দিতে চেষ্টা করব। আমার বুকের ভিতর হু হু করছিল।

যথার্থ উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সুবিনয় গলা খাটো করল এবার। মুখ দিয়ে একটা গজগজ শব্দ বের করে হেসে বলল, 'আমি ওভারলোডেড হয়ে গেছি যদিও। তিনটে। আর একটি আসছে। খরচটা বাড়ছে সত্য, কিন্তু এক জায়গায় সেটিসফেকশন আছে।'

সুবিনয়ের মুখের দিক তাকাই।

'তা তো বটেই, এতগুলি সন্তানের বাপ হয়েছিস।'

'কেবল কি তাই। তিনিও ভাল হাতে আটকা পড়েছেন। একবেলার জন্যে আর বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই।'

'কেন?' প্রশ্নটা ঠিক বুদ্ধিমানের মত হ'ল না টের পেলাম যদিও।

সুবিনয় বলল, 'কে এমন বড়লোক আত্মীয় আছে যে, এই দুর্দিনের বাজারে এতগুলি বাচ্চা সমেত গিয়ে উঠলে ভাল মনে তিন বেলা খেতে দেবে। কাকার পরিবার দেখতে বছরের পর বছর তোর স্ত্রী বেনারস পড়ে আছে। বাচ্চা-কাচ্চা হবার আগে আমার উনিও যেতেন সেওড়াফুলি এক মামীর সংসার দেখতে। সাত আট দিন সেখানে কাটিয়ে আসত অরুণা। এখন?' একটু থেমে সুবিনয় পরে শব্দ ক'রে হাসল। 'যদি বা কালেভদ্রে কোথাও থেকে নিমন্ত্রণ আসে এখন যাওয়া হয় না আর এক কারণে।' সুবিনয় টাকা বাজাবার মতন দুই আঙুলের বাড়ি মেরে বলল, 'এত পয়সা পাবেন কোথায় যে, আন্ডাবাচ্চা নিয়ে শ্রীমতী নায়ের করতে যাবেন। ট্রামবাসের খরচ আছে না? আমি বাবা স্রেফ বলে দিয়েছি, যাও যেতে পার। কিন্তু তারপর আর তিন দিন বাজার করা হবে না। কথাটি মনে রেখে বাড়ি থেকে পা বাড়িও।' কথা শেষ ক'রে সুবিনয় টেনে টেনে হাসল।

মৃদু হেসে বললাম, 'শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়েছেন বৌদি। একদিনের জন্যে আর চোখের আড়াল হবার উপায় নেই।'

যেন আত্মতৃপ্তিতে একটু সময় চোখ বুজে চুপ করে রইল সুবিনয়। তারপর ঘাড় তুলে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'তুই দেখে বুঝতে পারলি যে অরুণা আবার কন্‌সিভ করেছে?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'তা আর কি ক'রে বুঝবি। অভিজ্ঞতা নেই যখন। রংটা আরো ফর্সা হয়েছে লক্ষ্য করেছিস? এ সময় মেয়েরা দেখতে বেশি সুন্দর হয়। দাঁড়া, আর একবার ডাকছি, আর একবার দেখ।'

প্রচণ্ড শব্দ ক'রে জোরে বৃষ্টি নামল। কিন্তু সেই শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে চড়া সুরে সুবিনয় হাঁকল : 'অরুণা!'

'যাই।' ঠান্ডা মিষ্টি গলা পার্টিশনের ওপার থেকে ভেসে এল।

'তোমার কি আর ওদিক সারা হবে না সারারাত।' নীরস কণ্ঠস্বর এপারে সুবিনয়ের। 'সেই কখন খাওয়া হয়েছে, চৌবাচ্চার কাজ সারা হ'ল?'

'হয়েছে।'

'এখন কি হচ্ছে। খুটখাট শব্দ?'

'বাচ্চাদের মশারি খাটাচ্ছি। দড়ির একটা পেরেক উঠে গেছে। বাড়ি মেরে বসাচ্ছি।'

'কী অদ্ভুত মানুষ, ওটা তো বিকেলেই বলা উচিত ছিল আমাকে। রাত বারোটার সময় এখন—'

ওপারে কথা শোনা গেল না।

'মশারি খাটিয়ে এখানে একবার এসো।'

বিরক্তিটা দূর হতে সুবিনয়ের সময় লাগল একটু।

ওপাশে আর খটখট আওয়াজটা শুনলাম না।

'মনে হয় সারাক্ষণই তুই খিটিমিটি করিস বৌয়ের সঙ্গে।' আস্তে বললাম, 'এখন টের পাচ্ছি।'

'তাতে কি আমার সংসার ফুটিফাটা হয়ে গেছে। এখানে এসে এই এক সন্ধ্যের মধ্যে ফাটল কোথাও চোখে পড়ল নাকি তোর?'

'না না তা হবে কেন।' কি ইঙ্গিত করতে চাইছে বুঝতে পেরে লজ্জায় ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'তুই কেবল তাড়াহুড়োই করিস কোনো কাজে সাহায্য করিস না। বৌদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব ধীরেসুস্থে করছে বলেই দিন কে দিন এমন ফুল-বাগানের মত সুন্দর হচ্ছে সংসারটি তোমার। বাচ্চাগুলো ভাল থাকুক। দেখে আমার এত ভাল লাগছিল তখন থেকে।' কথাগুলি বেশ জোরে জোরে বললাম।

'না তেমন করে আর সাজাতে পারছি কই।' আত্মতৃপ্তিতে সুবিনয়ের চোখ আবার আধবোজা হয়ে এল। ওই শালার টাকা-পয়সার অভাবটাই মাঝে-মাঝে মাথা গরম করে দেয়। না হলে—না হলে।' চোখ দুটো সম্পূর্ণ বুজে যায় সুবিনয়ের এবং সে-অবস্থায় কিছুক্ষণ চুপ থেকে যেন কি একটু ভেবে পরে বলে, 'না হলে প্রথম থেকে—ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং অব যাকে বলে দাম্পত্য-জীবন—কনজুগ্যাল লাইফ, এ পর্যন্ত মন্দ কাটিয়ে আসিনি আমরা। আমার তো মনে হয় আমি এবং সে—দুজনেই সুখী।'

স্বামীর গালি খেয়েও বৌদির সন্ধ্যা থেকে হাসি হাসি করে রাখা মুখখানা আমাকে এখন তাই মনে করিয়ে দিলে।

যেন ঈষৎ অপদস্থ হয়ে চুপ ক'রে গেলাম।

মিটিমিটি হেসে সুবিনয় বলল, 'লিভার সতেজ রাখতে নিত্য একটু তেতো খেতে হয়, জলে কোনো জার্ম না থাকে তাই ওতে একটু ফিটকিরি মেশাতে হয়। সংসারের ডিসিপ্লিন রাখতে তাই বকাঝকারও দরকার। বুঝলি? গিন্নীকে যে-পুরুষ শাসন করে না আমি সেগুলোকে মেষ বলি। ওদের কপালে দুঃখ থাকে। হ্যাঁ, আদর করতে হবে বৈকি, কিন্তু তার একটা টাইম আছে, সেটা তিনি যখন গৃহস্থালীতে লাগেন তখন না। যখন তিনি অবসর, যখন শয্যাসঙ্গিনী হন তখন। 'তুই ম্যারেড্ ম্যান্ তোকে আর বোঝাব কি। কিন্তু বহু পুরুষ, মানে বিবাহিত লোক তা বোঝে না, —অর্থাৎ জানে না সংসার করতে হলে কিভাবে চলতে হয়। ফলে ভোগে।'

একটু চুপ থেকে সুবিনয় বলল, 'বল-ছিলাম বেতনের টাকা ফুরোলো মাসের শেষে মাথা গরম হয় অশান্তি পাই। কিন্তু যখন চারদিকে তাকাই তখন ভাবি ও কিছু না, মন গড়া দুঃখ। টাকার কাঁড়ির ওপর বসে থেকেও কত শ্রীমানের বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়, কি বলিস।'

আমি সুবিনয়ের চোখের দিকে না তাকিয়ে মাথা নাড়লাম।

'কাজেই ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দিই আর পটি লাগানো জুতো পায়ে থাকুক আমি সুখী, আমার সুখ দেখে অনেক টাকওয়ালা ঈর্ষা করেন। তুই চুপ করে আছিস সুধাংশু।'

বললাম, 'একশবার হাজারবার। কই, বৌদিকে ডাক না। আমি একটু জল খাব। তৃষ্ণা পেয়েছে।'

'কি হল, শুনছ?' এঘর থেকে সুবিনয় আবার হাঁকল। 'তোমার মশারী খাটানো হল? সুধাংশু জল খাবে।'

ওধারে কথা শোনা গেল না।

পুরো একটা মিনিট কাটলো।

'বেশ মজা তো!' অসহিষ্ণু হয়ে সুবিনয় আমার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'তুমি কোথায়, ঘরে?'

'না, বারান্দায়।' আর একটু ভিতর থেকে এবার উত্তর এলঃ 'বাবলু পেণ্টুলনে তখন কাদা ভরিয়েছে ধুয়ে দিচ্ছি, তা যেমন বাদলা, কাল শুকোবে কি।'

আমার চোখে চোখ রেখে সুবিনয় বলল, 'মেজ ছেলে আমার। তখন তো তুই দেখলি।'

ঘাড় নাড়লাম।

সুবিনয় আমার দিকে না তাকিয়ে আবার পার্টিশনের দিকে মুখ ফেরালো। 'তা বাবলুর পেণ্টলনে তো সেই কখন বিকেলে কাদা লেগেছিল। এতসব জিনিস-পত্র ধোয়াধুয়ি করে এলে এক ঘণ্টা চৌবাচ্চার পাশে বসে। তখন ওটার কথা মনে ছিল না, বড় যে মশারি খাটিয়ে শুতে এসে এখন ছেলের পেণ্টুলন নিয়ে বসে গেছ?'

উত্তর নেই কেবল ঝপ ঝপ শব্দ শোনা গেল। আর বন্ধুপত্নীর হাতের স্বল্প চুড়ির মৃদু রিনরিন্। পেণ্টুলন কাচা হচ্ছিল।

আরো একটা মিনিট কাটতে দিয়ে সুবিনয় আবার হাঁকে ঃ 'তোমার হ'ল?'

এবারও কথার উত্তর না দিয়ে বৌদি কি যেন একটা জোরে জোরে আছড়ায়। বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। তাই ওধারের সিমেণ্টের ওপর চটাস্ চটাস্ আওয়াজ এধারের সিমেণ্ট কাঁপিয়ে তুলল। যেন আর ধৈর্য রাখতে না পেরে সুবিনয় ছুটে যাচ্ছিল। আমি হাত চেপে ধরলাম। 'এত অস্থির কেন। আসবে এখুনি। একটা পেণ্টুলন ধুতে আর কত সময় লাগবে।'

আমার কথায় কান না দিয়ে ওপাশের শব্দ লক্ষ্য ক'রে সুবিনয় চিৎকার ক'রে বলল, 'আমি যদি আসি তো বাল্‌তির মধ্যে তোমার মুখ চেপে ধরব, ডাকছি, বড় যে সাড়া দিচ্ছ না।'

'ভালই হয় তবে, বিষ খেয়ে কি পালিয়ে গিয়ে তোমার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার আর দরকার পড়বে না আমার, বালতির সাবানগোলা জলের ভেতর একটু বেশি সময় মুখটা চেপে ধরে রেখো অতি সহজে কাজ সারা হবে।'

যেমন আশা করছিলাম। ঠাণ্ডা মিঠে গলায় অরুণা কথা বলে আর হাসে আর কাপড় কাচে ঝুপঝুপ। না, যেন কাচা হয়ে গেছে, এই বেলা বালতির জলে সেটা ধোয়া হচ্ছিল।

'তা আজ সেটি পারবে না, বাড়িতে ঠাকুরপো আছেন। আমায় খুন করছ টের পেলে পুলিস ডাকবেন।' যেন বারান্দা ছেড়ে অরুণা এখন ঘরে এসে ঢুকল।

স্ত্রীর উক্তি শুনে সুবিনয় আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছিল। কিন্তু আমি তা গ্রাহ্য না করে পার্টিশনের দিকে মুখ রেখে বললাম, 'ঠিক বলেছেন বৌদি। আমি এসেছি এখন সুবিনয় আর কিছু করতে পারবে না।'

'দেখুন, দেখে যান আপনার বন্ধু কেমন কুস্তেল। রাতদিন স্ত্রীর ওপর রাগারাগি তার বকাবকি। আপনি কালই রেবার কাছে চিঠি লিখে দিন।'

অট্টহাস্য করে এঘরের দেয়াল কাঁপিয়ে তুলল সুবিনয়। 'তাই দে, আজ রাতেই চিঠিটা লিখে রাখ সুধাংশু। আর লিখে দে তোর বৌ যখন আবার কলকাতায় আসবেন বেড়াতে একবার যেন দয়া করে তোর বন্ধু সুবিনয়বাবুর এত নম্বর মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে উঁকি দিয়ে দেখে যান। স্ত্রীলোক। একনজর দেখলেই বুঝবেন বিয়ের পরদিন থেকে যে চারাগাছটাকে তার

স্বামী উঠতে বসতে গামলা আর বালতির জলে চুবিয়ে মারছে ফল ফুল কুঁড়ি পাতায় বর্ষার ডুমুর গাছটি হয়ে উঠেছে।' কথা শেষ ক'রে বন্ধু টেনে টেনে হাসছিল।

নিজের সংসারের সুখ বর্ণনা তো বটেই তার সঙ্গে আমার লক্ষ্মীছাড়া সংসারের দিকে একটুখানি উপেক্ষার ইঙ্গিত ছিল টের পেয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

বন্ধুপত্নী এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে এল।

অরুণা হাসছিল। তার কান বেয়ে চুল বেয়ে জল পড়ছিল। বৃষ্টিতে বেশ ভেজা হয়েছে মাথা দেখে মনে হল।

নোলকের মত নাকের ডগায় একটা জলের ফোঁটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'জলটা মুছে ফেলুন।'

অরুণা বাঁ-হাত দিয়ে নাকের জল মুছে জলের গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে নীরবে হাসল। হাসির সঙ্গে একটি মেয়ে-মন ভীষণভাবে আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল।

গ্লাসটা আমার হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এবং আমার ওয়াড়হীন বালিশ দুটোর ওপর ওর সবে পাট ভাঙ্গা একখানা ধোয়া ধবধবে শাড়ি বিছিয়ে দিয়ে বলল, 'আর কিছু দরকার হবে ঠাকুরপো?'

বললাম, 'না। ভীষণ কষ্ট দিলুম হঠাৎ এসে উঠে। এত রাত হয়ে গেল কাজ শেষ হতে আপনার।'

'না মোটেই না একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন। আপনি না এলেও রোজ বারোটা বাজে। একলা হাত আমি সব দিক সামলাতে পারি না।'

'ও, তুমি তা-হলে বলছ আমি আফিস থেকে খেটেখুটে এসে তোমার ছেলেমেয়ের পেণ্টুলন সাফ করি, বেশ মজা।'

সুবিনয় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আব্দার দ্যাখ্ সুধাংশু। এমন দুঃখের জীবন হবে জানতে পারলে কোন্ শালা বিয়ে করত, তুই বল্।'

'বেশ তো রেবা-দি আসুন একবার। দেখে যাক কোন কাজটা অপূর্ণ থাকে শেষ পর্যন্ত। বড় যে অষ্ট প্রহর হৈ-রৈ করছ।' বলে অরুণা আমার দিকে তাকাল।

'রেবার আসবার দরকার কি সুধাংশু এখানে উপস্থিত আছে। সে নিজে দেখুক। কতটুকন বা সংসার কী বা থাকতে পারে কাজ যে একেবারে ওই নিয়ে মত্ত হয়ে আছ সারাক্ষণ। একটা লোক একলা হাতে একটা বড় দেশ ম্যানেজ করে, রাজ্য চালায়।'

আমি সুবিনয়ের যুক্তি শুনলাম না। একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ছেলেপুলের সংসারে কাজের ঝক্কি অনেক। মেয়েদের দারুণ কষ্ট হয়।'

'এ্যাঁ, তুই কত কষ্ট বুঝেছিস। যেন কত তোর অভিজ্ঞতা। আজ অবধি তো রেবা তোকে—'

কথাটা সুবিনয় শেষ করল না। হো-হো করে হাসল। আমার কান লাল হয়ে উঠল। বুঝতে পারার মতন বুদ্ধিমতী অরুণা। তার দুই কানও লাল হয়ে গেছে লক্ষ্য করলাম।

আমার চোখে ধরা পড়বে বলে ভয় পেয়ে আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে অরুণা হেসে উঠে তাড়াতাড়ি বলল, 'যারা রাতদিন স্ত্রীকে বকাবকি করে তারা কি প্রকৃতির পুরুষ জানেন নিশ্চয় ঠাকুরপো?'

অল্প হেসে বললাম, 'স্বার্থপর!'

অরুণা আড়চোখে সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে-সব পুরুষকে মেয়েরা ঘৃণা করে।'

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মত প্রবল হেসে ঘৃণাটা উড়িয়ে দিয়ে সুবিনয় স্ত্রীর শরীরের একটা বিশেষ অংশের ওপর চোখ রেখে বলল, 'কতটা ঘৃণা করি তার প্রমাণ দেখাতেই তো এসেছ মাঝ রাতে দুজন পুরুষের সামনে। তা সুধাংশু পাকা ছেলে। আমি বলার আগেই ও টের পেয়েছে যে আবার তুমি—' হি হি করে হাসল সুবিনয়। 'মেয়েরা পুরুষদের ঘৃণা করে!'

হাসতে হাসতে বারবার বলছিল সে। অরুণা ছুটে পালাল।

হ্যাঁ, সেই রাত্রেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছিল। যার ওপর আমার এ-গল্প দাঁড়িয়ে। ওরা চলে যেতে আমি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে বৃষ্টি খরতর হয়ে উঠছিল। নতুন জায়গা কাজেই শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম এল না। জেগে চুপ করে বৃষ্টির শব্দ শুনলাম। আর চিন্তা করলাম সুবিনয়ের কথা। বেচারা তখন এতটা প্রগলভ এতটা অসতর্ক হয়ে উঠেছিল বলে দোষ দিতে পারিনি তাকে। এতকাল আমি আমার হারানো স্ত্রীর গল্প বলে বলে আর উপদেশ চেয়ে চেয়ে বন্ধুকে হয়রান ক'রে তুলেছিলাম। আজ আমি তার অন্তঃপুরে এসে পা বাড়াতে সে তার একান্তভাবে পাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে রাগারাগি অথবা হাসাহাসি করে আমার কাছে নিজের দাম্পত্য-জীবনের অগাধ সুখ প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে স্বাভাবিক।

না করাটাই সুবিনয়ের পক্ষে অস্বাভাবিক ঠেকত। শুয়ে শুয়ে সুবিনয়ের আস্ফালন ও তার স্ত্রীর বারবার চমকে উঠে পর-মুহূর্তে স্বাভাবিক হেসে আক্রমণ প্রতিরোধ করার সুন্দর ছবিটা চিন্তা করতে লাগলুম। আপনাদের কাছে অস্বীকার করব না, কান পেতে রইলাম পার্টিশনের দিকে।

এক আধটা কথা শোনা যেতে পারে আর সেই কৌতূহল নিয়ে আমি যদি কান পেতে থাকি তো আমার সেই রুচিকে আপনারা ক্ষমা করবেন না জানি। কিন্তু আমার তখন মনের অবস্থা কি ছিল? খুব স্বাভাবিক যে আমি জেগে থেকে রেবার চরিত্রের সঙ্গে অরুণাকে মিলিয়ে দেখব দুই নারীর রূপ। রেবা তেমন ক'রে কোনদিন আমার সঙ্গে কথাই বলেনি। পাশের কামরায় বন্ধুপত্নী সুধাকণ্ঠী অরুণা, হ্যাঁ, বলতে গেলে রিক্সা থেকে নামার পর সেই বিকেল থেকে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। আমি খাওয়ার পরে একবার ছাড়া অরুণার হাতে আগে আরো পাঁচ সাত গ্লাস জল চেয়ে খেয়েছি। সুবিনয় বাজারে গেছে পর অরুণার সঙ্গে কত কোটি কথা বলেছি তার হিসাব দিতে পারব না।

রাত্রে অন্ধকারে বিছানায় ঢোকার পরও যদি সুবিনয় স্ত্রীকে ধমক দেয় তো তার উত্তরে অরুণা না জানি কেমন করে কথা বলবে শুনতে ছেলেমানুষের মত প্রায় পাগলের মত কান খাড়া রেখেছিলাম। কিন্তু বাইরে প্রবল প্রখর বারিপাতের শব্দ আর এই ছোট্ট বাসায় পাশের কামরায় সুবিনয়ের সংসারের ঘুমন্ত ছোটবড় মানুষগুলোর লম্বা লম্বা শ্বাস টানার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না। কান খাড়া রেখে বৃষ্টির শব্দকে উপেক্ষা করে আমি অতঃপর ওদের দুজনের, বন্ধু সুবিনয় ও তার স্ত্রী অরুণার শ্বাস-প্রশ্বাস বিচার করতে লাগলুম।

হয়তো সেই অবস্থায় আমার ঘুম এসেছিল।

এক সময় হঠাৎ চোখ মেলে টের পেলাম মাথাটা আর তুলে ধরা হাতের তেলোর ওপর রাখা নেই। বালিশে নেমে গেছে। মুখটাও পার্টিশনের দিকে ঘোরানো নেই। আমি যে-দেয়াল পিঠের দিকে রেখে শুয়ে ছিলাম সেই দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে এখন অন্ধকারে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছি। বাইরে বৃষ্টির গর্জন থেমেছে। টিনের ওপর বৃষ্টির ফোঁটার টপটপ শব্দটা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু থেমে থেমে, একটানা নয়, যেন যেখান থেকে জল পড়ছিল সেখানে জল কমে এসেছে। বৃষ্টিটা তাহলে বেশ কিছুক্ষণ ধরেছে অনুমান করলাম।

কিন্তু জলের শব্দ না অন্য কারণে আমি আবার কান পেতে থাকি। আমার মনে হ'ল একটা বেড়াল মিউ করে উঠে আবার থেমে আছে। আমার যেন মনে হ'ল বেড়ালটা আমার নাক ও মুখের উপর তার ঈষদুষ্ণ কোমল মোলায়েম শরীরটা বার দুই ঘষে দিয়ে এইমাত্র জানালার বাইরে লাফিয়ে গেছে। শিয়রের ওপর একটা ছোট্ট জানালা এখন চোখে পড়ছে। একটা পাল্লা খোলা। এদিকে একটা জানালা আছে আগে আমার চোখে পড়েনি। গরাদের ওপর এক চিলতে আলোর রেখা ধ্বকধ্বক করছে। দুই চোখ রগড়ে আরো একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে তারপর অবশ্য বুঝতে কষ্ট হ'ল না আলোর রেখা পাশের বাড়ির কোন ফাঁক কি ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসে সুবিনয়ের ঘরের জানালায় উ'কি দিয়েছে। কিন্তু আমি চিন্তা করছিলাম পাল্লাটা কি ক'রে খুলল। ভাদ্র মাসের পচা রাত। ঘরের ভিতর এমন গুমোট। পায়রার খুপরির মত সুবিনয়ের এই কামরায় একলা বিছানায় শুয়ে সেই জন্যই তখন আমার আরো ঘুম আসছিল না এবং মনে মনে আমি একটা জানালা কামনা করেছিলাম বৈকি। ছোট হলেও ওই ফাঁক দিয়ে একটু একটু হাওয়া আসছে টের পেলাম, হাওয়ায় বৃষ্টির গন্ধ ছিল। বেড়ালটা এই জানালা দিয়ে ঢুকেছিল এবং সম্ভবত আমার বিছানায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিল। আমি জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়েছে এখন বুঝতে কষ্ট হ'ল না। জানালায় হয়তো ছিটকিনি ছিল না। হয়তো এক আধটা দমকা বাতাস এসে থাকবে তাই একটা পাল্লা সরে গেছে। দ্বিতীয় পাল্লাটাও হাত বাড়িয়ে খুলে দেব কি না চিন্তা করছিলাম, হঠাৎ গরাদের সেই ফিনফিনে আলোর রেখাটা যেন একটা বড় আলো হয়ে দপ্ ক'রে আমার চোখের সামনে জ্বলে উঠল। খুব চমকে উঠলাম বৈকি। তারপর হাসলাম। 'বৌদি, এত রাত্রে!' বিছানায় উঠে বসে গলা বাড়িয়ে মুখটা আমি জানালার কাছে সরিয়ে নিই। সরে এসে গরাদের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে অরুণা দাঁড়ায়।

'আপনি ঘুমোননি?'

'না, তেমন ভাল ঘুম আসছে না।'

'নতুন জায়গা।' অরুণা ঠোঁট টিপে হাসল। 'আমি টের পেয়েছি, আপনি বিছানায় ছটফট করছিলেন।'

আপনাদের বলেছি এমন *বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভামণ্ডিত মোহিনী মুখ জীবনে আমি খুব বেশি দেখিনি। থুতনি ঠোঁট নাক কপাল ভুরু ঠোঁটের পিছনে সরু সাদা দাঁতের সারি চোয়ালের ধার লম্বা পালক ঘেরা চোখের বিদ্যুৎ মধ্য রাত্রে আমাকে, হ্যাঁ, রোমাঞ্চিত ক'রে তুলেছিল। আমি সময়ের অতিরিক্ত সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিষ্পন্দ হয়ে রইলাম। গায়ে ব্লাউজ ছিল না।

পরণে আধময়লা নরুন পাড় ধুতি। শাড়িটা তখন ভিজে গেছে বলে ছাড়া হয়েছে বুঝতে কষ্ট হল না। সুবিনয়ের কাপড় ওটা অনুমান করলাম।

হা করে অরুণার চোখে চোখ রেখে, এই মেধাবী মেয়ের কাছে আমি ভীষণভাবে ধরা না পড়ে যাই তাই চট্ ক'রে বললাম, 'না নতুন জায়গা বলে আমার বিশেষ তেমন অসুবিধা বোধ হয়নি। আমি বেশ ঘুমিয়ে ছিলাম এতক্ষণ, এইমাত্র তো জাগলাম। ক'টা বাজে?'

'একটা বেজে গেল একটু আগে।' অরুণা আস্তে ডান হাতাখানা গরাদের ওপর রাখল। শাদা কনুইটা আমার নাকের কাছে চলে এল প্রায়। অরুণার নিশ্বাস পতনের শব্দ শুনলাম।

বললাম, 'এত রাতে আপনি ওখানে? ওটা বুঝি আপনাদের ভিতরের বারান্দা?'

'হ্যাঁ, বাবলুর পেণ্টুলনটা ঘরে থাকলে কাল শুকোবে না বলে বাইরে দড়িতে রাখলাম। হাওয়ায় যদি কিছুটা শুকোয়।'

'আপনি তাহ'লে এতক্ষণ ঘুমোননি?'

'না, ওর ছেলেমানুষির সঙ্গে পাল্লা দিলে তো আমার সংসার চলে না। সবাই ঘুমোলে পর এখন একটু বাইরে এলাম। ভাল লাগছে হাওয়াটা।'

'অত্যন্ত খিটখিটে সুবিনয়।'

'সারাদিন খেটেখুটে আসে। চাকর বাকর নেই। বাইরের কাগজগুলো ওর নিজের হাতে করতে হয়। রাত্রের খাওয়া শেষ হ'ল কি, এটা করবে না, ওটা এখন না, শিগ্গীর আলো নেবাও। অর্থাৎ আমাকে ঘুমোতে দাও।'

'হ্যাঁ, সারাদিন পরিশ্রম ক'রে বাড়ি এসে সকাল সকা'ল ঘুমিয়ে পড়তে চায়। আমি লক্ষ্য করলাম। তাই সুবিনয়ের এত তাড়া আপনার পিছনে।' কথার শেষে একটু হাসলাম।

আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছিল পাছে না, বাড়িতে আমি রেবাকে এটা-ওটার জন্যে বকাবকি করি কিনা অরুণা প্রশ্ন করে। আমাদের মধ্যে যে এ ওকে ব'লে কাজ করানোর সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি সে কথা ও জানে না তো। কাজেই ভয় হচ্ছিল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ধরা না পড়ি আমি গুলি খাওয়া বাঘ।

স্ত্রীর ওপর হুকুম চালানোর আগেই ও আমাকে, আমার হাত-পা জখম করে দিয়ে চলে গেছে। সুবিনয়ের মত সন্ধ্যাবাতি লাগতে ঘুম-পাওয়া রাত আমার চোখের আগায় দোলে না। আমি নিশাচর।

চেহারা দেখে নারী ব্যর্থ পুরুষকে চিনতে পারে কি না ভয়ে ভয়ে অরুণার কালো অতল-গহ্বর চোখের মধ্যে আমি আর একবার ডুব দিলুম। ডুব দিলুম আর ভয়ে ভয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, সুবিনয়ের যদি আর একটু আয়-টায় বাড়ত একটা চাকর রাখার, নিদেন ঠিকে ঝি রাখার সংস্থান হত।'

আমার ঝি ছিল কিনা অরুণা প্রশ্ন করল না। বুদ্ধিমতী প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে গেল।

উ'কি দিয়ে ও আমার বিছানা দেখল।

'ছাড়পোকায় কাটে?'

'না।'

'আপনি আসবেন জেনে তক্তাপোশটায় দুপুরে খুব গরম জল ঢেলেছি। সব মরেছে তাহলে।'

'তাই মনে হচ্ছে।'

স্বল্প হেসে আমি বিচিত্র রূপিনী আর এক নারীকে দেখলাম। রেবার সঙ্গে একেবারে মিল নেই। রাগী স্বার্থপর স্নেহমমতাহীন রেবা। এটি মা। স্নেহ-শীলা জায়া।

এদিক থেকে তো বটেই, তা ছাড়া বিয়ের পর থেকে সুবিনয় স্ত্রীর সঙ্গে আছে এক জায়গায় এক বাড়িতে আজ আট বছরের বেশি এটা তার একান্ত বন্ধু হিসেবে আমার কানে মামুলি হয়ে গেলেও আজ হঠাৎ সব কিছু যেন চোখে নতুন ঠেকল। সতেরো নম্বরের অমুক লেনের বাড়ি সুবিনয়ের,—কথাটা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আজ এই গাঢ় বর্ষার রাত্রে সেই ঘরে আশ্রয় নিয়ে আমি একটা ভাঙ্গা জানালার চারখানা জং-ধরা লোহার শিকের ব্যবধান রেখে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব এটা আগে জানা ছিল না।

নতুন, ভয়ংকর নতুন লাগছিল অরুণাকে। সুসংবদ্ধ সাদা দাঁত দেখিয়ে আর একবার ও হাসল। শব্দ ছিল না হাসিতে। বাঁ-হাতে একটা হ্যারিকেন। ভিতরের চৌবাচ্চা বারান্দা কি পায়খানার জন্যে ইলেকট্রিক বাতির ব্যবস্থা নেই তাই তেলের ল্যাম্প। সন্ধ্যার পর ওদিকে যেতে হয়েছিল বলে আমাকে ওই আলো দু' একবার ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ জ্বলবার পরও চিমনিটার কোথাও এক আঁচড় কালি পড়েনি লক্ষ্য করলাম। যেমন এত কাজকর্ম করার পরও অরুণার হাত পা মুখ ঝকঝক করছিল।

আলো সমেত হাতটা কপালে তুলে

অরুণা চুল সরাল। তাই চোখ দুটো আরো চিকচিক করতে লাগল।

'ওই শুনুন আমাদের কর্তার নাক ডাকছে।' ক্ষীণ হাসল ও।

আমি মাথা নাড়লাম।

'ঘুমোলে সুবিনয়ের নাক ডাকে। কলেজে পড়ার সময় একবার সুবিনয়ের সংগে এক বিছানায় তাদের হস্টেলে রাত কাটাতে হয়েছিল বলে আমার জানা আছে।'

'বাবলুটার তো এখন থেকেই ঘুমোলে নাকে ডাকে। আরো বড় হলে সে যে কী গর্জন করবে ভেবে এখন থেকেই আমার মাথা গরম।'

'সুবিনয়ের মতন হয়েছে ছেলে।' আমি ক্ষীণ হাসলাম।

কিন্তু গৃহিণী তাতে বিশেষ সাড়া দিল না।

আমি বললাম. 'নাক-ডাকা ঘুম ভাল। ঘুম গাঢ় হলে তবে নাক ডাকে, ঘুমটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ।'

এবারও অরুণা চুপ ক'রে রইল।

বললাম. 'সুবিনয়ের বাড়িতে সুনিদ্রা হয় দেখে বাস্তবিক আমার এমন আনন্দ হচ্ছে। আমার বন্ধু ও।' বলে সতর্কভাবে বন্ধু পত্নীর চোখের দিকে তাকাই। 'স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে খাটবে কি করে।' কিন্তু এবারও চোখের কোনো ভাবান্তর আমি দেখতে পেলাম না। বরং আগের চেয়েও একটু বেশি গম্ভীর হয়ে অরুণা বলল, 'তবু তো আমার মনে হয় ওর ওজন ঠিক নেই। আর একটু ওজন না বাড়লে চট করে স্বাস্থ্য ভেংগে যাবে। চল্লিশের ধাক্কায় টিকবে না।'

সুবিনয়ের চল্লিশের কাছে বয়েস উঠেছে। আমার চেয়ে চার বছরের বড় সে। কথাটা হয়ত তার স্ত্রীর জানা আছে ভেবে বয়েস সম্পর্কে আমি কিছু বললাম না।

'এই শীতে ক'টা ক্যালশিয়াম ইনজেকশন না নিয়ে রাখলে আগামী বর্ষায় নির্ঘাৎ অসুখে পড়বে। কিন্তু টাকার অভাবে সেটি হচ্ছে না।'

আমি বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ শুনছিলাম।

যেন অরুণাও একটু সময় সেই শব্দ শুনতে ঘাড় ফেরাল। তারপর আমার দিকে মুখ ফেরাল।

'আমিই বলে-কয়ে ঘরখানাকে দু'ভাগ করিয়েছি। আত্মীয় আসে থাকবে। যখন না থাকে ভাড়া দিয়ে দাও। অতিরিক্ত ক'টা টাকা আসবে। সেটা দিয়ে তুমি বরং শরীরটাকে আরো ভাল করতে চেষ্টা

আমার জানলার পাশে আরো ঘন হয়ে দাঁড়ায়

কর, একটু ওষুধপত্র দুধ ডিম খাও। তা শুনতে কি চায়। একেবারে ছেলে-মানুষ।'

আমি অরুণার সংগে স্বল্প হাসলাম বটে। ঈর্ষায় আমার নাভিদেশ পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছিল। সেই জন্যেই এত কিল-চড় বকাবকি বালতির মধ্যে মুহুর্মুহু ঠেসে ধরে মেরে ফেলার ঘটা! এত আদর!

বললাম, 'হ্যাঁ, সেজন্যেই সুবিনয় আমাকে এখানে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে পাকড়াও ক'রে নিয়ে এল', ঠোঁটে একটা মোচড় দিয়ে বললাম, 'বলছিল তখন, এই টাকায়, মানে থাকা খাওয়া বাবদ পয়লা মাসে যে টাকাটা আমি সুবিনয়ের হাতে তুলে দেব তা দিয়ে সে আপনার চশমা কিনবে।'

'বলেছে নাকি আপনাকে একথা। ছি ছি কী মোটা বুদ্ধি লোকটার।'

বলে অরুণা আবার ঘাড় ফিরিয়ে ঝিরঝির বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে লাগল। ভিতরের একটুখানি উঠানে হ্যারিকেনের আলোয় বৃষ্টি পড়ছে দেখা যাচ্ছিল।

যেন ঘরের ভিতর কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁ করে উঠল। যেন নিশ্বাসের টানা ঘড়ঘড় শব্দ থামিয়ে সুবিনয় একবার জাগতে চেয়েছে। দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির চিরচিরে রেখাগুলি বেঁকে বারান্দায় এসে অরুণার কাপড়ের আঁচলটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু সে সব কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সুবিনয়ের স্ত্রী আমার জানালার পাশে আরো ঘন হয়ে দাঁড়ায়।

'আচ্ছা লোক! এ্যাঁ?' রিমঝিম বৃষ্টির শব্দের সংগে পাল্লা দিয়ে অরুণা গলাটাকে

মোলায়েম করে তুলল। 'শেষটায় আপনাকে আমার চশমার টাকার অভাব হয়েছে বলে এখানে ধরে নিয়ে এল, ছি ছি। আমার ভীষণ লজ্জা করছে।'

লজ্জার হাত থেকে বন্ধু পত্নীকে বাঁচাতে আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, 'না তাতে কি, আমরা বন্ধু। প্রয়োজনে এক সময় ছাত্রাবস্থায় এ ওকে টাকা দিয়েও তো সাহায্য করেছি।'

যেন কি একটু ভাবল অরুণা।

বৃষ্টির শব্দটা আবার হঠাৎ কমে যায়। শিশুটি আর কাঁদে না। সুবিনয়ের নাক পূর্ববৎ স্বাভাবিকভাবে ডাকতে থাকে।

'যাকগে, সেজন্যে আমিও খুব ভাবছি না। আপনি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বলেছে দুঃখ নেই। কিন্তু আমিও দেখে নেব এ-টাকা দিয়ে আমার চশমা আসে কি ওর দুধ। আপনি সাক্ষী থাকবেন ঠাকুরপো।'

'থাকব।' খুব কষ্টে অস্ফুট গলায় বলতে পারলাম। কেননা আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল স্বামী সোহাগিনী অরুণার সাদা কনুইটা আর একটু বেশি ঢুকে পড়েছিল আমার অন্ধকার ঘরে। যেন ঘরের অন্ধকারে একটা কোমল শ্বেতাভ কীলক গুঁজে দিয়ে আগের মত প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত হয়েও নিশ্বাস ফেলতে পারল।

'ওর বাল্যবন্ধু, কাজেই আমাদের ঘনিষ্ট আত্মীয়, তার চেয়েও বড় আপনি। আপনার ওপর যতটা দাবি খাটে আর কারোর ওপর খাটে না। কথাটা সন্ধ্যে-বেলা বলব ভেবেছিলাম, সুযোগ পাইনি। এখন ও ঘুমিয়েছে তাই বলতে এলাম। টাকা পয়সা সুবিধামত যা পারেন আপনি দেবেন তার জন্যে খুব যে একটা কড়াকড়ি নিয়ম থাকবে আমি তা চাই না। হ্যাঁ, নিয়মের মধ্যে একটা জিনিস আপনাকে মেনে চলতে হচ্ছে, দু' টাকা এক টাকা পাঁচ দশ কুড়ি—যখনই যা দিচ্ছেন সবটাই যেন আমার হাতে দেয়া হয়। না, ওর হাতে একটি পয়সা না, বুঝতে পাচ্ছেন?'

মাথা নাড়লাম। মনে মনে বললাম এই জন্যেই চোখে ঘুম নেই। কিন্তু সে কথা আর প্রকাশ করি কি করে?

চুপ করে রইলাম।

হ্যারিকেন ধরা বাঁ-হাতে আবার কপালের চুল সরাল। আমি বললাম, 'যান, এইবেলা ঘুমোন গে, আমার মনে থাকবে।'

আলস্যের একটা হাই ভেঙ্গে অরুণা কীলকের মত কনুইটা সোজা করে অন্ধকারে আমার মুখের সামনে ঝুলিয়ে দিলে।

'বৌদি বুঝি শিগগীর আসছেন না?'

'না।'

যতটা সম্ভব গলা সংযত রেখে বললাম, 'সামনে তার এগজামিন।'

'বাবা, কি করে যে পারে এ সব মেয়ে স্বামীকে ছেড়ে থাকতে',—অরুণা বৃষ্টির দিকে চোখ ফেরাল। কিন্তু বৃষ্টি তখন নেই। কেবল টিনে জল পড়ার টবটব শব্দ হচ্ছিল।

আমি চুপ। আমি চুপ ছিলাম, কেননা ঈর্ষার আগুনে আমার নাভিদেশ নিয়ে পড়ে না থেকে তখন মাথার ভিতর আগুনে জ্বালিয়ে তুলছিল। অধিক রাত্রি হওয়ার দরুন অনিদ্রায় চোখ জ্বালা করছিল, কপালের রগ দুটো দপ্‌দপ্‌ করছিল।

আর বাইরে সেই একঘেয়ে টবটব টবটব আওয়াজ। আমার স্নায়ুর মধ্যে সেই বিশ্রী শব্দটা প্রবেশ ক'রে শরীরটাকে ভয়ঙ্কর ক্লান্ত অবসন্ন ক'রে তুলল।

যেন আর একটা কি কথা বলতে অরুণা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। হাতের আলোটা নড়েচড়ে ওঠে। পিছনে দড়িতে ভিজা পেন্টুলনের ছায়াটা দোলে। কেবল ওর ডিমের মত ঈষৎ লম্বাটে মসৃণ মুখখানা স্থির। রাত্রির মত গভীর কালো চোখ জোড়ায় পলক পড়ছিল না। আমি, আমি সময়ের কিছু অতিরিক্ত সময় নিষ্পলক চোখে সন্তান সম্ভবা নারীর রূপ দেখলাম।

'যান', তিক্ত নীরস গলায় বললাম, 'রাত হয়েছে ঘুমোন গে। এক আধলাও আমি সুবিনয়কে দিচ্ছিনে। সব, হয়তো আমার রোজগারের পুরো টাকাটাই আপনার হাতে তুলে দেব।'

'পাগলের মত কথা বলছেন।' অরুণা অদ্ভুত চাপা গলায় খিল খিল হাসল। অন্ধকারে যে হাতটা আমার মুখের সামনে বুকের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিল সেটা আস্তে আন্দোলিত ক'রে বলল, 'সব আমায় দিয়ে দিলে রেবার জন্যে রাখবেন কি। পরে ও এসে আমার চুল ছিঁড়ে খাবে।'

'না, সে আর আসবে না।' কঠিন ক্রূর গলায় কথাটা কোনরকমে বলে শেষ ক'রে আমি হিংস্র উন্মত্ত পশুর মত ওর অনাবৃত সাদা বাহুটা সজোরে চেপে ধরলাম। যেন প্রতিশোধ নেবার আর কোনো উপায় ছিল না বলে আমাকে তা করতে হয়েছিল। আমার হৃদপিণ্ডের দুবদুব আওয়াজটাই কানে বাজছিল শুধু। আর কোনো শব্দ ছিল না। যেন টিনের ওপর জল পড়া থেমে গেছে তখন। ঢং ঢং করে পাশের বাড়ির দেয়াল ঘড়িতে দুটো বাজল। আর পার্টিশনের ওপারে সুবিনয়ের নাকের ঘড়ঘড় ধ্বনি।

আশ্চর্য! সময়ের অতিরিক্ত সময় অরুণা আমার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ওর নরম তুলতুলে হাতটা ধরে রাখতে দিয়ে সরিয়ে নেবার ন্যূনতম চেষ্টা না ক'রে ধীর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এ মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামা কাপড় করাতে হবে, ছি ছি কী ছিরি হয়েছে পোশাকের, এই নিয়ে তো ও আফিস কাছারি করছে!'

আমার বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে হাতটা নিচে গড়িয়ে পড়ল।

কবি সতীশচন্দ্র রায়

হরপ্রসাদ মিত্র

১৩০৮-৯ সালে রবীন্দ্রনাথের নব-পর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ এবং শৈলেশ-চন্দ্র মজুমদারের 'সমালোচনী' পত্রিকায় সতীশচন্দ্র রায়ের (১২৮৮-১৩১০) কয়েকটি লেখা ছাপা হয়েছিল। তারপর ১৩১৯ সালে শান্তিনিকেতন থেকে সতীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' নামে একখানি রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই রচনাবলী ছাপা হবার অনেককাল পরে ১৩৫৪ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যার 'বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা'য় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে লেখা সতীশচন্দ্রের একখানি চিঠি ছাপা হয়েছে। ১৩০৯ সালে শান্তিনিকেতন থেকে তিনি এই চিঠি লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ লালনে সেকালে তরুণ যে কয়েকজন সাহিত্যসাধক বাংলা সাহিত্যের লেখক এবং বিশ্বসাহিত্যের পাঠক হয়ে ওঠার সংকল্প নিয়েছিলেন, সতীশচন্দ্র ছিলেন সেই বহুশ্রমনিষ্ঠ, অল্পপ্রচারিত, প্রাণবন্তদের অগ্রণী। তাঁর অন্য দুই বন্ধুর নাম একালের পাঠকের কাছে বরং বেশি পরিচিত। সত্যেন্দ্রনাথ কবি হিসেবেই বেশি প্রসিদ্ধ,—তাঁর সাহিত্যচিন্তার অধ্যবসায়ভূয়িষ্ঠ গদ্য-প্রদেশের খবর একালের গল্প-উপন্যাস-রম্যগদ্য-পরিতৃপ্ত পাঠকের চেনা-মহলের বাইরে প্রতীক্ষা করছে। আর, অজিতকুমার চক্রবর্তী সৌভাগ্যবশত নিজের প্রবন্ধগুলি পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে বইয়ের পাত্রে তুলে রেখে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন; তাই গবেষক-আলোচক-অধ্যাপকদের উৎসাহে তাঁর নামটি বরং যথোচিত মহিমায় এখনো আমাদের বিদ্যোৎসাহী সভায় আলোচনায়-রচনায় মাঝে মাঝে উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু সতীশচন্দ্র মারা গেছেন মাত্র একুশ বছর বয়সে। মৃত্যুর বছরখানেক আগে সত্যেন্দ্র-নাথের কাছে তিনি লিখেছিলেনঃ—

আজকাল আমাদের সাহিত্যের prospect অতি শোচনীয়। আমি সাহিত্য proper-এর কথাই বলিতেছি। কারণ সাহিত্য আলোচনার জন্য যে পরিমাণ সাধুতা, চরিত্রবল, পরিশ্রম এবং মস্তিষ্কের উৎকর্ষের দরকার তা অনেক সাহিত্য যশোলিপ্সু যুবাপুরুষের নাই। আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, prophets দের পরেই সাহিত্য মানুষের জীবনে উন্নতির সহায়। prophets কিছু রোজ আসে না—interim-গুলি আমাদিগের সাহিত্যের democratic culture দিয়া ভরিয়া রাখিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধে' 'সতীশচন্দ্র রায়' নামে যে লেখাটি সংকলিত হয়েছে তাতে মৃত্যুর অল্পকাল আগে লেখা সতীশচন্দ্রের একখানি চিঠির অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সে লেখাটির মুখ্য বিষয় হলো তাজমহলের আবেদন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য। তবে, মমতাজের অকাল-মৃত্যুর সৌন্দর্য উপলব্ধি করে এই চিঠির সঙ্গে তিনি যে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাতে তাঁর অভিজ্ঞতার স্পন্দন তেমন কিছু চমৎকার হয়ে ওঠেনি। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'আগ্রাপ্রান্তরে' 'তাজমহল'—'বসোরার গোলাপ'—'চণ্ডালী', 'জামদগ্ন্য'—'পরীর জন্মকথা', 'দুয়ো-রানি'—'ছায়াগর্ভ-সম্ভূতং', 'শেলির প্রতি', 'প্রেমের স্বপ্ন' ইত্যাদি শিরোনামভূষিত অনুকরণপ্রধান কবিতাই অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু এইসব লেখার মধ্যেও মাঝে মাঝে তাঁর মৌলিক কল্পনার ঈষৎ স্ফুরণ দুর্লক্ষ্য নয়। এবং উপযুক্ত কবি মননের অভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর উপমা বা রূপকের স্বাদ যে নষ্ট হয়েছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের শোভার কথায় তিনি লিখে-ছিলেনঃ—

সতীশচন্দ্র রায়

> পশ্চিম দিগন্তে যেথা গভীর সিঁদুর
> যেন কোন উপন্যাস-রাজার মহাল-মালা
> ভাঙিয়া পড়িছে চুর চুর—

আবার, সুখমদে বিহ্বল কবিমানসে অপ্রত্যাশিত দুঃখের আবির্ভাব লক্ষ্য করে তাঁকে বলতে হয়েছেঃ—

> কোথা ছিল দুঃখ হায়! লুকায়ে ঘুঘুর মত—
> সুদূর মরম মাঝে?—সুখ সে কেমনে হত?

এই দুটি ছবি একই কবিতা থেকে (দুঃখ-দেবতার মূর্তি) তুলে দেওয়া হলো। প্রথমটি মনোরম, দ্বিতীয়টি অসংগত। প্রথমটিতে উপভোগের আনুকূল্য—দ্বিতীয়টিতে অনভ্যস্ত সাদৃশ্যের অন-স্বীকার্য বাধা। মনের গভীরে দুঃখ ঘুঘুর মতো লুকিয়ে আছে, এই উপমায় লুকিয়ে থাকাটুকু বড়ই কোমল হয়ে উঠেছে। অথচ, এক নিঃশ্বাসে কবি লিখেছেনঃ—

> হায় কি অশুভ খন!
> দেবতা কি দুরজন!
> দুরদৃষ্ট পড়িল ঝরিয়া
> নভতল ভস্মে আবরিয়া!

যে দুঃখে আকাশ ভস্মে ঢেকে যায়, সে দুঃখের উপমান ঘুঘু নয়। একথা সর্ব-জনবিদিত না হলেও রসিকের অগোচর নয়।

সতীশচন্দ্রের কবিতায় সে-যুগের রবীন্দ্র-প্রভাবময় অল্পক্ষম কবিদের মামুলি লক্ষণ-গুলিই সর্বত্র চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছাড়া সে সময়ে ভাওয়ালের গোবিন্দ-চন্দ্র দাস এবং কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়ও নবীন লেখকদের মনোহরণ করেছিলেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রিয়নাথ সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বরদাচরণ মিত্র, নবীনচন্দ্র দাস প্রভৃতি বহু কবি অনুবাদের কাজে নেমেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল—এঁরা উভয়েই ছিলেন

সেকালের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। সতীশচন্দ্রের কবিতায় এইসব ভিন্নমুখী সমকালীন কবির অল্পবিস্তর প্রভাব চোখে পড়ে। বিশেষত, শব্দের দিকেই তার অনুগ্রহের আতিশয্য ছিল। অপ্রচলিত, ধ্বন্যাত্মক, স্ব-উদ্ভাবিত—নানা অদ্ভুত শব্দ ছড়িয়ে আছে তাঁর মুষ্টিমেয় কবিতার ছত্রে ছত্রে। 'নিচয়' (নিশ্চয় অর্থে), 'ঋতুচার', 'নিদ্রাল' এবং আরো কয়েকটি শব্দ নিচের উদ্ধৃতগুলিতে দেখা যাচ্ছেঃ—

ক] সেই যে পক্ষীর দল, উড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে
মাঝে মাঝে ঋতুচারে যেথা এসে থাকে

খ] নীল জল, নীলাকাশ, দ্রাণ রৌদ্রভার,
গম্ভীর জেলের ছেলে, মৎস্যের শাকার!

গ] বহুদূর বালুচর—হস্ আসে ঢেউ,
হস্ কলকল্ পুনঃ চলি' যায় কেউ...

ঘ] দিনু ছুঁড়ি পত্রখানি। ওগো কবিগণ,
তোমরা বুঝিয়া লও কি এ জল্পন।
—'রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি'

ঙ] নিচয় পরীরা এসেছে খেলাতে
ফুল তুলে দেছে এ দোঁহার হাতে!

চ] ভাই বোন দুটি আঙিনার মাঝ
দুজনার চোখে একইতরো ভাজ,......
—পরীর জন্মকথা

ছ] নির্জন কান্তার পরে গৃহমুখী
যেথা মেষপাল
অলস নিদ্রাল
রুণু রুণু চলিয়াছে, মন্দালোকে,
থামি কভু ছুটি
শঙ্খ খুঁটি খুঁটি......
—(Browning-এর অনুবাদ)

অন্ত্যানুপ্রাসের খাতিরে শব্দের বহু বিচিত্র বিকৃতির দৃষ্টান্তও এইসব লেখায় বিরল নয়। অর্থাৎ, ছিদ্রান্বেষী সমালোচকের কাছে তো বটেই,—এমন কি প্রশ্রয়সমর্থ পাঠকের চোখেও সতীশচন্দ্রের কবিতা সুখ-পাঠ্য নয়। তবু, বর্তমান শতকের প্রথম দশকের উল্লেখযোগ্য বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁরও একটি বিশেষ কীর্তি আছে। তাঁর অকালমৃত্যু মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেনঃ—

এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ্য করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু জানি তাহার পাথেয় পরিপূর্ণ—সে দরিদ্রের মতো রিক্তহস্তে জীর্ণশক্তি লইয়া যায় নাই।

কেবল এইটুকুই নয়,—রবীন্দ্রনাথ আরো জানিয়েছেনঃ—

সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।

অকৃতার্থ মহত্ত্ব, অনুপম হৃদয়মাধুর্য, অকৃত্রিম কল্পনাশক্তি ইত্যাদি প্রশস্তিময় বহু কথা লিখে খেদ প্রকাশ করে তিনি জানিয়েছিলেনঃ—

......জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথার উপরেই আত্মপ্রমাণের ভার দিয়া গেল এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ শৈশবে,—নর্মাল স্কুলের ছাত্রাবস্থায়, প্রবীণ শ্রীকণ্ঠবাবুর হৃদ্যতায় যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি বাল্যকালে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর অসামান্য সাহিত্য-ভোগের সামর্থ্য দেখে তাঁরও ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে মন্তব্য আছেঃ—

তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি।

লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ সেন এবং তৎপরে আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-যৌবনের অনুরূপ সুহৃদ। তারপর, তাঁর আরো পরিণত বয়সে,—তিনি নিজে যখন কীর্তি ও খ্যাতির শিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সাহিত্য-সাধক তাঁর অন্তরের সেই একই প্রবেশ-তোরণে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই বিশেষ রুচিটির উল্লেখ আছে 'জীবনস্মৃতির' একাধিক পৃষ্ঠায়। প্রিয়নাথ সেনের প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছিলেনঃ—

তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়।

'কবির বিকল্প' নামে একটি কবিতায় 'আমি তব বাগানের ফুলতরু সখা' -এই ঘোষণার পরে শেষ স্তবকে সতীশচন্দ্র লিখেছেনঃ—

ওই যে মানবদল বিহঙ্গ সমান
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে আর করয়ে প্রয়াণ
মোর স্কন্ধে নিত্যগীত, শীতল পল্লব মাঝ
শিরে মোর প্রসারিত আনন্দ অলকা!
আমি তারি বাগানের ক্ষয়হীন কল্পতরু
আমি তব বাগানে ফুলতরু সখা!

দেশ-কাল-আচারের সংকীর্ণ সীমার শাসন তাঁর কবিমন কখনোই স্বীকার করেনি। দেশ-কালের পরিবর্তনের ভূমিকায় সাহিত্য বিচারের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত আধুনিক আন্দোলন অবশ্য সে যুগের বাঙালী সাহিত্য-পাঠকের মস্তিষ্কে অধিকার বিস্তার করেনি। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বিশেষ কোনো ঘটনারই চিহ্ন নেই তাঁর কবিতায়। তিনি বিশ্বের বিহঙ্গ সমান মানবদলের বিশ্বব্যাপী শোভাযাত্রা দেখেছিলেন,—কিংবা হয়তো তাই দেখতে চেয়েছিলেন। নিকটকালের সফেন, সশব্দ কোলাহল থেকে দূরে থেকে তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে তিনি যে-বিষাদের সুরটি শুনিয়ে গেছেন, সে হলো বয়ঃসন্ধির অস্ফুট অভাব-বোধ। সে অভাবের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই, সে ব্যাকুলতার কোনো নিশ্চিত লক্ষ্য নেই। 'সন্ধ্যার একটি সুর'—কবিতাটি এই লক্ষণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিশ্বময় সুন্দরের স্বীকৃতিই ছিল তাঁর

স্কেচ্

শ্রীনন্দলাল বসু

জীবিকা

পল্লীঅংগণে

অন্তরের আদর্শ। কিন্তু এ আদর্শ তাঁর লেখার মধ্যে উপযুক্ত আয়োজনে পুষ্পিত হবার আগেই মৃত্যু তাঁর পথ রোধ করে, সমস্ত সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। তবে, সেই আদর্শের যেটুকু সার্থকতা ফুটেছিল তাঁর অবারিত-স্বভাবের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ তারই প্রশস্তিসূত্রে লিখেছেন যে, আমাদের দেশে 'ব্রাউনিংয়ের ফ্যাশান বা ব্রাউনিংয়ের দল' প্রবর্তিত হবার আগেই ব্রাউনিং সতীশচন্দ্রকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করেছিল।

ব্রাউনিং পড়িতে যে অনুরাগের বল আবশ্যক হয়, তাহা বালক সতীশেরও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।

সতীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের কথা হাল আমলের মূল্যবান একটি প্রবন্ধে নিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে। 'বিশ্বভারতী পত্রিকার' (ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) 'কবি-তাপস সতীশচন্দ্র' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'চতুরঙ্গের' শচীশের সঙ্গে সতীশচন্দ্রের স্বভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে লিখেছেনঃ—

শচীশ চরিত্র বলা নিষ্প্রয়োজন, সতীশচন্দ্রের অবিকল প্রতিচ্ছবি অবশ্যই নয়; কিন্তু কবি-কল্পনার জারকরসে রসায়িত সতীশচন্দ্রের মানসমূর্তি অনেকাংশে হওয়া সে চরিত্রটির পক্ষে কি একেবারেই অসম্ভব। বলা প্রয়োজন, আমার এ জল্পনার অনেক পরে লক্ষ্য করেছিলাম যে 'চতুরঙ্গের' ইংরেজি অনুবাদ Broken Ties-এ রবীন্দ্রনাথ নিজেই শচীশকে বদলে 'সতীশ' করেছেন।

'গুরু শিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধ স্বীকার করে ছাত্ররা মনুষ্যত্বের সাধনা করবে, এই সংকল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন সে সময়ে সতীশচন্দ্র 'ধর্মব্রত স্বরূপে' অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। সংসারে বাধাবিপত্তি কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। কল্পনার সঙ্গে কর্মের কোনো বিরোধকেই চরম বাধা মনে করার দুর্বলতা ছিল না তাঁর সত্তায়। এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় লিখেছেনঃ—

সতীশ প্রতিদিনের ধূলিভস্মের অন্তরালে কর্মচেষ্টার সহস্র দীনতার মধ্যে শিবের শিব-মূর্তি দেখিতে পাইতেন, তাহার সেই তৃতীয় নেত্র ছিল।

১৩০৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে লেখা সতীশচন্দ্রের চিঠির যে অংশ বর্তমান আলোচনার প্রথম দিকে তুলে দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁর সেই তৃতীয় নেত্রের অভিব্যক্তি ফুটেছে। সাহিত্যের প্রকাশ্য, প্রতিষ্ঠিত ও বহু অনুশীলিত বাহনগুলির মধ্যে,—তিনি তাঁর স্বল্প আয়ুষ্কালের সীমানায় মাত্র দুটির চর্চায় অল্পকাল নিযুক্ত ছিলেন। মুষ্টিমেয় কবিতা এবং অল্পসংখ্যক প্রবন্ধ—এই হলো সাহিত্যকর্মী সতীশচন্দ্রের লিখিত কীর্তি। এই সংকীর্ণ রচনাক্ষেত্রের বাইরে টিঁকে আছে বন্ধুজনের কাছে লেখা তাঁর দুএকখানি চিঠির টুকরো। এ ছাড়া, আর বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না। রবীন্দ্র-নাথের প্রবন্ধটিই তাঁর মহত্ত্বের একমাত্র সাক্ষী—এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন যে সে মহত্ত্বের নাম 'অকৃতার্থ মহত্ত্ব'। আর, তাঁর মৃত্যুর পরে বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেনঃ—

আমাদের মনে ছিল সংকল্প অনেক
দুটি মন দৃপ্ত তেজীয়ান;
বৃথা হল আশা তরু-মূলে জলসেক,
অঙ্কুরে শুকায়ে গেল—সব অবসান।

এই শোকগীতিকার শেষ দিকে সতীশ-চন্দ্রের আর একটি পরিচয় আছেঃ—

বর্ষাদিনে গুরুগৃহে আমা দোঁহাকার
গুরু হ'ত মেঘের গর্জন;
তা ছাড়া কিছুই কানে পশিত না আর
ভেসে যেত উপদেশ-গম্ভীর বচন।

তারি সনে ভেসে যেত দূরে ভবিষ্যতে
কি কুহকে দোঁহাকার মন;
দেখিতাম সাম্য রাজ্য বিস্তৃত ভারতে
সমস্তে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।

উত্তরকালে, সত্যেন্দ্রনাথের 'হোমশিখা' (১৯০৭) বইখানির মধ্যে সংকলিত 'সাম্য-সাম' কবিতার উৎসকালের ইশারা পাওয়া যাচ্ছে এই উদ্ধৃতির শেষাংশে। নজরুল ইসলাম এই ঘটনার অনেক পরে ১৩৩২ সালের শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙলে' লিখেছিলেনঃ—

নেইক এখানে ধর্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরী-পুরুত মোল্লা-ভিক্ষু
এক গ্লাসে খায় জল।

সতীশচন্দ্র তাঁর তৃতীয় নেত্রের শক্তিতেই 'democratic culture'এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন শতাব্দীর সূচনা-সন্ধির বিশ্বমানবতা বোধ ও অধ্যাত্মবিশ্বাসের অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে। অথচ, সে উপলব্ধি তাঁর মনে সাহিত্যের গভীরতর, সূক্ষ্মতর আবেদনের পক্ষে বাধা হয়ে ওঠেনি। Browning-এর 'One Word More' কবিতাটি উপলক্ষ করে তিনি লিখেছিলেনঃ—

বাস্তবিক আমি যতদূর বুঝি, তাহাতে কবিতা, জীবনের প্রতিবিম্ব বই আর কিছু নহে।......

কবির কাজ কি? আমাদিগকে মহৎ করা—প্রতি পদার্থের মধ্যে রন্ধ্র করিয়া অসীমের আলোক আনিয়া দেওয়া।......... দৃঢ়হস্তে ঠিক আমার শরীর ধরিয়া যিনি বলিয়া দিতে পারেন, 'এই দেখ, ইহার মধ্যে স্বর্গের আলোক, এই দেখ ইহার মধ্যে স্বর্গের গন্ধ, তিনি সর্বাপেক্ষা বড় কবি। কবিতা এবং জীবন দৃঢ়রূপে মিলিত করিতে না পারিলে, সেই সিদ্ধির শেষ কথাটি বলা কাহারও সাধ্য হয়, আমি বিশ্বাস করি না।

আবার Paracelsus-এর আলোচনায় জীবনের সুখ-দুঃখ-নৈরাশ্য-ব্যর্থতা সমস্ত স্বীকার করেও Browning-এর সেই প্রসিদ্ধ উক্তির আনন্দ উপভোগ করে তিনি সানন্দে স্মরণ করেছেন—'Greet the Unseen with a cheer'।

সতীশচন্দ্রের ব্যক্তিস্বভাবের বিশিষ্ট প্রবণতার সংকেত নিহিত আছে তাঁর এই দুটি গদ্য-রচনায়। এই আনন্দবোধ সবল, সুদৃঢ়, সুপরিণত। জীবনের কঠোর বস্তু-সত্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তিনি বিশ্বপ্রেমের কথা বলেছিলেন, এরকম সংশয়ের কোনো কারণ নেই। এই লেখাটির শেষ দিকে তিনি মন্তব্য করেছেনঃ—

মানব জীবন ক্ষণিক অন্ধকার সত্ত্বেও যে যুক্তি-শৃঙ্খলা-সৌন্দর্যে পূর্ণ, বিশৃঙ্খল বাহ্য-ঘটনা বিদীর্ণ করিয়া কবি তাহাই দেখাইয়া দিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই দৃষ্টি-সামর্থ্যেরই ইশারা রেখে গেছেন 'শিবনেত্র'—কথাটির মধ্যে। 'শিব' হলো মঙ্গলের প্রতিশব্দ। সতীশচন্দ্র সেই মঙ্গলকে উপলব্ধি করে-ছিলেন মর্ত্যের প্রত্যক্ষ বাস্তবতার মধ্যে। Browning তাঁর আপন কবি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গুরুদেব'—আর নিজের বিষয়ে তাঁর ডায়রিতে তিনি লিখেছিলেন—'আমি essentially Indian—ভারতের রস আমার প্রাণে বসিয়াছে।' মানুষের কল্পনার রঞ্জন ব্যতিরেকেও সৃষ্টির যে গূঢ় সৌন্দর্য স্বাধীন সম্পূর্ণ এবং অনির্বাণ Browning-এর মানসশিষ্য সতীশচন্দ্র ছিলেন তারই উপাসক। মৃত্যুর অল্পকাল আগে,—সম্ভবত ১৩০৯ সালের ১৪ই বৈশাখ শান্তিনিকেতনের রুক্ষ প্রান্তরের রৌদ্রস্নাত গাছের দৃশ্য দেখে তাঁর কবি-মনে একদিন কল্পনার লীলা শুরু হয়েছিল। সেই লগ্নটি ধরা পড়েছে তাঁর ডায়রিতে। প্রকৃতির সেই উপহার সেদিন উপেক্ষিত হয়েছে। সেদিন বোধ হয় কুড়ি বছরের সেই অনুকরণনিষ্ঠ উদীয়মান বাঙালি কবির কবিতার খাতায় কোনো নতুন রচনা ভূমিষ্ঠ হয়নি। Browning-এর আবৃত্তিতেই তিনি আবিষ্ট ছিলেন,—আর ডায়রিতে লিখেছিলেনঃ—

"Scare away this mad ideal
Spare me thou the only real."

জল যে কত দামী জিনিস তা বুঝলাম মালাডে এসে। মালাডে দাদা থাকেন। এক বছর আগে তিনি কলকাতা থেকে বম্বে বদলী হয়ে এসেছিলেন। দাদার বম্বের সংসার দেখবার লোভ অনেকদিন ধরেই হয়েছিল, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তাই অফিস থেকে যেদিন আমার ছ' মাসের জন্য ডেপুটেশনে যাওয়ার প্রস্তাব এল, আমি এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম।

মালাড শহর-এলাকার বাইরে। সুতরাং শহরের সবরকম দাক্ষিণ্য এখানে নেই। জলাভাবটাই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। কল নেই। কুয়োর জল ফুটিয়ে খেতে হয়। কিন্তু মার্চ থেকে কুয়ো শুকোতে আরম্ভ করে, মে মাসে অধিকাংশই শুকিয়ে যায়। জল জল হাহাকার ওঠে চারদিকে। কুয়োর চারদিকে তখন সর্ব-ধর্ম ও সর্ব-শ্রেণীর ভিড় জমে। মেয়ে পুরুষ, ছেলে-বুড়োরা সবাই আসে। কুয়োর চারদিকে টিন, বালতি, কলসী আর ডেক্‌চির কিউ পড়ে যায়। তার কোন সময় অসময় নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন চলে জল তোলার পর্ব।

আমি এলাম মার্চ মাসে। তালুফাটানো গরম তখন বম্বেতে। এসেই বুঝলাম যে জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।

দাদার বাংলোর চারদিকে তিনচারটি দোতলা চত্তল। ব্যারাকের মত একটা ঘর আর একটা রান্নাঘর নিয়ে নীচে ওপরে কুড়িটি পরিবার থাকে। চত্তলগুলির একটি মাত্র কুয়ো—তা যখন শুকিয়ে যায়, তখন চত্তলের মেয়েরা দাদার কুয়োতে জল নিতে আসে। তাছাড়া বাংলোটার ঠিক পেছন দিকে ছোটমত একটা বস্তি আছে, তার বাসিন্দারা তো সারা বছরই জল নেয়। বাংলোতে এত ভিড় হওয়ার কারণ কুয়োটা মস্ত বড় এবং কখনো শুকোয় না।

রোজ সকালে বম্বে যাই, ঘণ্টা তিনকের জন্য একবার হেড অফিসে হাজিরা দিয়ে আবার দুটো তিনটে নাগাদ ফিরে আসি। কাজের চাপ নেই। এখানে কতকগুলো কাগজপত্র দাখিল করেছি, তা দেখিয়ে কতকগুলো রিপোর্ট ও প্ল্যান নিয়ে ফিরে যেতে হবে আমাকে। সুতরাং প্রচুর অবকাশ।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় আড় হয়ে বই বা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেই কুয়োর ধারটা দেখতে পাওয়া যায়। সব সময়েই দু'তিনজন মেয়ে পুরুষ কুয়োর ধারটাতে দাঁড়িয়ে আছে, জল তুলছে, গল্প করছে। রাতের বেলা যখন আমার ঘরে আলো জ্বলে আর মেহেদীর বেড়ার ছায়াতে কুয়োর ধারটা অন্ধকার হয়ে ওঠে, তখনো জল তোলার শব্দ পাই। মাঝে মাঝে শেষ রাতে যখন ঘুম ভেঙে যায়, তখনো দড়ি বালতি আর চুড়ির এক সম্মিলিত শব্দ কানে ভেসে আসে। জলের জন্য মানুষের যে তৃষ্ণা তাকে চব্বিশ ঘণ্টাই অনুভব করি।

তখন কি জানতাম যে, এই তৃষ্ণা লক্ষ্য করতে করতেই একদিন টের পাব যে, জীবনে আরো তৃষ্ণা আছে। জল, বাতাস আর আলোর জন্য যে তৃষ্ণা, তার চেয়েও তীব্র, তার চেয়েও শক্তিশালী এক তৃষ্ণা।

কিন্তু তার আগে দাদার ড্রাইভার বাসুদেবের কথা বলে নিই। বাসুদেব বিহারের লোক, বয়স সাতাশ আটাশ হবে। ছোটবেলাতেই বাপমাকে হারিয়ে সে সংসারে একা ভেসে পড়ে। তারপর নানা কাজ করে শেষে ড্রাইভার হয়ে সে দাদার সঙ্গে চলে এসেছে। লম্বা দোহারা গড়ন বাসুদেবের,

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে সে ভালবাসে। রূপ না থাকলেও রুক্ষ একটা শ্রী আছে তার।

বাড়ীর সবাই হাসাহাসি করে তার বাংলা বলার চেষ্টাতে। অনেক হাঁটাহাঁটি করে বাড়ী ফিরে এসে সে একদিন বলল, "হ'টে হ'টে থকে গেছি মা"—

বৌদি হাসিখুশী মানুষ, হেসে খুন হন বাসুদেবের কথায়। দাদা গম্ভীর মানুষ, হাসির কথাতেও হাসি পায় না তাঁর। কিন্তু একা হাসতে ভালো লাগে না বৌদির। ফলে আমাকে সব কথা শুনতে হয়, হাসতে হয়, দাদার গাম্ভীর্যের জন্য বেশী হেসে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়।

সেদিন রবিবার। দুপুরে সবে ঘুম এসেছে, এমন সময় বৌদি ঘরে এলেন, এসে আমার মাথা ধরে ঝাঁকুনি।

"এই—এই ঠাকুরপো"—

"না বৌদি, ঘুম পাচ্ছে"—

"আরে শোনই না—শোন"—

বাধ্য হয়ে তাকালাম। বৌদি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগলেন।

"হাসছ যে!"

"হাসছি কি আর সাধে ভাই—হিহিহি—ঐ বাসদেওটা"—

"আবার কি বাংলা কথা বলেছে?"

"বাংলা নয় ঠাকুরপো—বাসদেও এখন অন্য পাঠ পড়ছে—প্রেমের পাঠ"—

"কি?"

"হ্যাঁ—দেখ না, জানালা দিয়ে বাইরে দেখ"—

তাকালাম। কুয়োর ধারে তখন ভিড় নেই। আমগাছের ছায়াটা নিবিড় হয়ে পড়েছে কুয়োর ওপর। সেখানে একটি পেতলের কলসী কুয়োর পাড়ে রেখে একটি মেয়ে বাসুদেবের সংগে গল্প করছে।

মেয়েটিকে আগেও লক্ষ্য করেছি। পেছনকার বস্তিতে থাকে—মারাঠী ছুতোরের মেয়ে। নাম গংগা, বয়স কুড়ি একুশ হবে। ভোর সকালে, নিঝুম দুপুরে আর সন্ধ্যের ম্লান আলোতে ওরা দুই বোন জল নিতে আসে। দুই যমজ বোন। অবিকল এক রকম দেখতে ওরা, তবে গংগা একটু ছিপছিপে আর যমুনা একটু মোটা। গংগার মুখে চোখে একটা বিষণ্ণ ছায়া, যমুনা হাসিখুশী। গরীবের মেয়ে কিন্তু রুচি আছে ওদের, মারাঠী হিন্দী লিখতে পড়তেও জানে, শাড়ী পরার কায়দা থেকে চলাবলার ভংগীটিতে কোথায় যেন একটা শ্রী আছে ওদের। বৌদির সংগে এর আগে বারকয়েক কথা বলতে দেখেছি। বৌদি নিজেই একদিন তারিফ করেছিলেন ওদের। সেই দুজনের একজন। গংগা।

প্রশ্ন করলাম, "যমুনা কোথায় গেল?"

বৌদি বললেন, "যমুনা আগে কলসী ভরে জল নিয়ে গেছে। এখন থেকে এই তো হবে। যমুনা আসবে তো গংগা যাবে, আবার যমুনা যেতে না যেতেই গংগা ফিরে আসবে"—

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, "ওই বাসদেওটা'র মধ্যে কি দেখল মেয়েটা?"

বৌদি হাসলেন, "সে কি করে বলব ভাই? তবে কি এমন বড়লোক ওরা যে বাসদেওকে ছেড়ে তোমার মধ্যে কোন কিছু দেখবার মত স্পর্ধা হবে ওর?"

"ছিঃ বৌদি"—

"সত্যি কথা বলছি ভাই। তাছাড়া আমাদের ড্রাইভারের গুণটাই বা কি কম? আশী টাকা মাইনে পায়, দেখতে শুনতে ভালই, বাংলাও মন্দ বলে না"—

হেসে ফেললাম, "তোমার বৌদি খালি হাসি ঠাট্টা"—

বৌদিও হাসলেন, বললেন, কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা ঠাকুরপো। কৈ, এতদিন তো বুঝতে পারিনি"—

আমি বললাম, "ওইটে নাকি বোঝা যায় না বৌদি—পন্ডিতেরা বলেন যে, বীজের অঙ্কুরিত হওয়া যেমন, এ ব্যাপারটা ঠিক তাই। নিঃশব্দ অদৃশ্য। দর্শকদের চোখে যেমন হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে, তেমনি নায়ক নায়িকারাও তা হঠাৎই একদিন বুঝতে পারে"—

তাই বটে। প্রথম প্রথম প্রেমকে অনুভব করা যায় না। নিঃশব্দে, তিলে তিলে, অনুভূতির শিরা বেয়ে বেয়ে অদৃশ্য আখরে কথাটা লিখিত হতে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন সেই লেখা পড়া যায়, বোঝা যায়। তারপর তা উপচে পড়ে। যত সংযমই থাক না কেন, তাকে আর লুকোন যায় না। ত্রস্ত চোখের অনুসন্ধানী চাউনি, গ্রীবা বাঁকিয়ে ফিরে ফিরে চাওয়া, অকারণ হাসি, অসংলগ্ন কথা, সময়ে অসময়ে গুণগুণ করা, কথা বলতে বলতে আঁচলে গেরো বাঁধা আর খোলা, হাতের নাগালের মধ্যে কোন ফুল বা পাতাকে পেলে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলা আর মাঝে মাঝে বোকার মত কোন কাজ করা। সব কিছুর ভেতর দিয়ে একই কথার বারংবার ঘোষণা হয়—ভালবেসেছি।

বাসুদেবের মধ্যেও পরিবর্তন এল।

দাদাকে মাঝে মাঝে গাড়ী চড়তে গিয়ে ডাকতে হয়। সেই ডাক শুনে অন্যান্য চাকরেরা আবার হাঁক পাড়ে। তখন বাসুদেব ছুটে আসে, মাথা চুলকে অপরাধকে ঢাকার জন্য বলে, "ধোতি পেহেনছিলাম হুজুর"—

বৌদি মুচ্‌কি হাসেন।

বেশভূষাতেও বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় বাসুদেবের। সযত্নে টেরী কাটে সে, প্রায় রোজই পাটভাংগা ধুতি পরে। বৌদির কাছ থেকে ইস্ত্রিটা চেয়ে নিয়ে রোজই জামাকাপড় ইস্ত্রি করে। সন্ধ্যের পর বাসুদেবের গা থেকে সস্তা এসেন্সের গন্ধও মাঝে মাঝে টের পাওয়া যায়।

বৌদি হেসে বলেন, "হতভাগার কান্ড দেখেছ ঠাকুরপো"—

কিন্তু হতভাগা আরো অনেক কান্ড করতে লাগল। দুপুরবেলাটা বাসুদেব থাকে না, দাদাকে নিয়ে শহরে যায়, আর ফেরে সেই বিকেলে। মাঝখানেই এই ক' ঘণ্টার অনুপস্থিতিটা সে পুষিয়ে নিতে চায় সকালে আর সন্ধ্যাতে। সারাক্ষণ কুয়োর ধারে সে প্রহরীর মত বসে থাকে। যখন ভিড়টা কমে আসে, তখুনি আসে গংগা। কলসী রেখে কুয়োতে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ায়। সলজ্জ ভংগীতে মৃদুকণ্ঠে কথা বলে আর মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ত্রস্ত-চোখে দেখে নেয়।

কি কথা বলে ওরাই জানে। একটাও শুনতে পাই না আমরা, অনুমানও করতে পারি না। শুধু এইটুকুই বুঝি যে, কথার আর শেষ নেই। অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয়, তুচ্ছ আর সাধারণ কথাও ওদের কাছে উপভোগ্য আর অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বাসুদেবের ব্যাপার আমাদের ক্রমেই বিরক্ত করে তুলল। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় বাজার থেকে বাড়ী ফেরবার সময় বস্তীর পাশ দিয়ে বাংলোতে ফিরছিলাম। দেখলাম যে, গংগাদের বাড়ীর সামনে দাদার গাড়ীটা দাঁড়ানো আর বাড়ীটার বারান্দায় বসে বাসুদেব খুব গল্প জমিয়েছে দুই বোনের সংগে।

বাড়ীতে গিয়ে কথাটা বৌদিকে বললাম।

বাসুদেব ফিরতেই বৌদি কৈফিয়ৎ চাইলেন।

বাসুদেব মাথা চুলকে বলল, "উধার দিয়ে আইসছিলাম তো বিঠলদাসজী বুলাল—"

"বুলাল!" বৌদি ধমকে উঠলেন, "দেখ বাসদেও, আমরা কানা নই—"

বাসুদেব মাথা নীচু করে রইল।

"বেশী বাড়াবাড়ি ভালো নয় বুঝলে? বিঠলদাস বা তার মেয়ে, যার সংগে ইচ্ছে গল্প করগে কিন্তু আমাদের গাড়ী নিয়ে যেয়ো না ওদিকে—"

তারপরে বাসুদেব আর গাড়ী নিয়ে যায়নি। কিন্তু বৌদির ধমকে নেশা তার একটুও কমল না, বরং বেড়েই চলল।

দিন কাটতে লাগল। জলের জন্য মালাডে হাহাকার বেড়ে চলল। লোকেরা গল্প করতে করতে হিসেব করে পনেরোই জুনের কত দেরী, কবে আরব সাগর থেকে মৌসুমী মেঘের পুঞ্জ আকাশ ছেয়ে ফেলবে সবাই হিসেব করে আর কুয়োর ধারের ভিড় বাড়ে।

আজকাল গঙ্গা আর যমুনা একসঙ্গে আসে না। জল নিতে এসে একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে বাসুদেবের সঙ্গে একা গল্প করে গঙ্গা। তারপরে যারা আসে তাদের জল নেওয়া কখন হয়ে যায়। আবার নতুন লোক আসে। তবু গঙ্গা নড়ে না। শেষে বাসুদেবই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সেদিনও তেমনি গল্প চলছিল। হঠাৎ যমুনা এসে হাজির হল, এসে গঙ্গাকে বকতে শুরু করল। বাসুদেব কি একটা বলতে গেল কিন্তু যমুনা রুখে এল তার দিকে। গঙ্গা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বৌদি একটু বাদে এসে বললেন, "ঈর্ষা"—

বুঝলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, "কার কথা বলছ বৌদি?"

বৌদি মুখ বিকৃত করে বললেন, "ঐ ছুড়ীদের কথা বলছি—ঐ যমুনা মেয়েটা সব বুঝতে পেরেছে, অনবরত বাধা দেয় ও, গঙ্গাকে বকে, বাসদেওয়ের ওপর ওর ভয়ানক রাগ—"

"তার মানে যমুনাও কি—"

"তা কেন? কিন্তু কোন একজনকে ভালবেসেছে সেটাও তো অসহ্য মনে হতে পারে—"

হেসে বললাম, "এ যে রীতিমত উপন্যাস বৌদি—"

"আর বলো না ভাই—হতভাগা জ্বালিয়ে খেল। আমি তো ভয়ে ভয়ে আছি। তোমার দাদা জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না।"

পরদিন একটু নজর রাখলাম। বৌদির কথাই ঠিক। যমুনা বোনকে আগুলে আগুলে বেড়াচ্ছে। বাসুদেব কাছে এলেই তার চোখ জ্বলে ওঠে, মুখের ওপর যেন বিষ ছড়িয়ে পড়ে। কলসী কাঁখে চলে যেতে যেতে বিচিত্র ও বিষণ্ণ এক দৃষ্টি মেলে গঙ্গা বাসুদেবের দিকে তাকায়।

যমুনা তাড়া দিয়ে ওঠে "পেছন ফিরে কি দেখছিস্ অত, এ্যাঁ? বাড়ী তো সামনের দিকে।"

আমি বাইরের ঘরে শুই। ঘরের মেঝের ওপর বাসুদেব শুত। কিন্তু সেদিন লক্ষ্য করলাম যে বাসুদেব শোয়নি।

পর পর ক'দিন ধরেই তাই লক্ষ্য করলাম। শেষে কৌতূহল সামলাতে না পেরে রাঁধুনী বামুন পাঁড়েজীকে জিজ্ঞেস করলাম কথাটা। পাঁড়েজীর সঙ্গে বাসুদেবের বেশ ভাব।

পাঁড়েজী বলল, "এখানে শোবার জায়গা হয়না বলে বিঠল দাসের বাড়ীতে গিয়ে শোয় বাসুদেব—"

বৌদিকে বললাম কথাটা। বাসুদেবের তলব হল।

বাসুদেব বলল, "দাদাবাবু ঘরে শোন, আমার এখানে শুতে লাজ করে—"

বৌদি চটে গেলেন, "লজ্জা! বটে! তা ওখানে কি ঘরে শুতে দেয় তোমাকে?"

"জী না—বারান্দামে শুতি—"

"তা এ বাড়ীর বারান্দা কি দোষ করল? পাঁড়েজী রান্নাঘরের বারান্দায় শোয়, সেখানেও তো শুতে পারো। খবরদার, তোমার এসব বাড়াবাড়ি আমি সহ্য করব না বাসদেও, বাবুকে বলে দেব। আমি তোমাকে ও বাড়ী গিয়ে শুতে নিষেধ করছি, বুঝলে?"

"জী—"

বাসুদেব সেদিন আমাদের বারান্দাতেই শুল। বৌদির কথা অগ্রাহ্য করবে কোন সাহসে?

কিন্তু পাঁড়েজী এক ফাঁকে আমার কাছে আড়ালে বলে ফেলল, "আজ মাজী না বললেও, ও বাড়ীতে শুত দাদাবাবু—"

"কেন পাঁড়েজী?"

"ঐ যমুনা—ও নাকি কাল রাতে গঙ্গার সঙ্গে বাসুদেওকে বাত বলতে দেখেছে—দেখে বাসদেওকে ভয় দেখিয়েছে, বলেছে আজ থেকে শুতে গেলে বিঠলদাসকে নালিশ করবে—"

ব্যাপারটা বুঝলাম। বৌদির কথাই ঠিক। ঈর্ষা। মানব-হৃদয়ের কয়েকটা নির্দিষ্ট পথ আছে, কতকগুলি আইনকানুন আছে, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কয়েকটা নির্দিষ্ট লক্ষণ আছে যাকে জাতি, ধর্ম বর্ণ আর শ্রেণীর গণ্ডীতে দিয়েও বদলানো যায় না। সব মানুষই যে এক তা তখুনি টের পাওয়া যায়। আর এক বলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম আমি।

সেদিন রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বড় গরম। উঠে লাইট জেলে ফ্যানটা চালিয়ে দিলাম। তেষ্টা পেয়েছিল, এক গেলাস জল গড়িয়ে খেলাম, তারপর গেলাসটা ধুয়ে জলটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। বারান্দায় বাসুদেবের খালি বিছানা পড়ে আছে। বাসুদেব নেই।

প্রায় শেষরাতে ফিরে এল সে। ব্যাপারটা বোঝা এমন কঠিন নয়।

তবু হাতেনাতে ধরতে ইচ্ছে হল।

পরদিন জেগে রইলাম।

আমাদের বাড়ীর সব শব্দ রাত বারোটা নাগাদ থামল। ঘরের বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলাম।

কতক্ষণ কেটেছে মনে নেই। কুড়ি, পঁচিশ, চল্লিশ মিনিটও হতে পারে। বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাক ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কয়েকটা কুকুর ডাকল। কুকুরের ডাক ছাপিয়ে চৌকিদারের লাঠি-ঠুক্-ঠুক্ শোনা গেল। তারপরে একসময়ে বারান্দায় পায়ের শব্দ পেলাম। পা টিপে জানালার ধারে গিয়ে দেখলাম যে বাসুদেব বারান্দা থেকে নেমে গেল।

দরজা খুলে আমিও বাইরে বেরোলাম। নেশা চাপল। যে ভালবাসা মানুষকে পাগল করে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য করে সেই ভালবাসাকে চাক্ষুষ দেখতে ইচ্ছে হল।

বাগানটা পেরিয়ে পেছনকার ফটক খুলে বাসুদেব বস্তীর রাস্তাটা ধরল, তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হল।

আমিও এগোলাম।

বিঠলদাসের বাড়ীটা জীর্ণ। কাঠ আর টিনের দেয়াল, টালীর চালা। তার পেছনে কলাগাছের ঝাড়। সেখানেই বাসুদেবকে আবিষ্কার করলাম দূরে থেকে। সে একা দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একটা ছোট্ট ঢিল ফেলল সে একটা জানালার ওপর। জানালাটা খুলে গেল। অস্পষ্ট একটা মুখ।

মিনিটখানেক বাদে গঙ্গা বেরিয়ে এল। বাসুদেব তাকে বুকে টেনে নিল।

অস্পষ্টকণ্ঠে তারা কি বলতে শুরু করল তা বুঝলাম না। তবু সরতে পারলাম না।

হঠাৎ আর একটা নারীমূর্তিকে দেখতে পেলাম আমি। বাসুদেব আর গঙ্গা বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়াল। যমুনা!

যমুনার গলা দিয়ে যেন বিষ ঝরল, "ছি ছি ছি—তুই এত নীচে নেমেছিস্ দিদি!—" বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "চেঁচিয়ে পাড়া জড় করে তোমায় খুন করাতে পারি বাসুদেব, কিন্তু আজ তা করব না। এরপর আর কোন দিন তোমায় দেখতে পেলে তোমাকে—"

"ওখানে কেরে?" হঠাৎ বাড়ীর ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে এল। বাসুদেব চমকে উঠল।

গঙ্গা বলল, "যাও—পালাও বাসুদেব—"

বাসুদেবের আগে আমিই পালিয়ে

এলাম। বুঝলাম যে হয় বিঠলদাস না তো ছেলে দামোদর জেগে উঠেছে।

ঘরে বসে বুঝতে পারলাম যে বাসুদেব তার বিছানায় ফিরে এসেছে। আমি শুয়ে পড়লাম কিন্তু ঘুম আর আসতেই চায় না। বাসুদেবের কপালে এবার দুঃখ আছে।

বাইরে দেশলাই জ্বলল। বিড়ির গন্ধ ঘরে ভেসে এল। বুঝলাম বাসুদেবেরও ঘুম আসছে না।

বৌদিকে খবরটা জানালে বৌদি হয়ত খুশীই হতেন, কিন্তু তবু বাধল। চেপে গেলাম।

কিন্তু আমি চাপলেও বিঠলদাসেরা চাপবে কেন? বাইরের ঘরে আমরা যখন চা খেতে খেতে গল্প জমিয়েছি ঠিক সেই সময় দরজার গোড়ায় বিঠলদাস আর তার ছেলে দামোদর এসে হাজির হল।

"হুজুর"—

দাদা তাকালেন। আমি শঙ্কিত হলাম।

বিঠলদাস সব কথা খুলে বলল। দামোদর রাগে কাঁপছে মনে হল।

দাদার চোখ মুখ কুটিল হয়ে উঠল। বৌদিও কেমন যেন হয়ে গেলেন।

সব শুনে দাদা বললেন, "আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি বিঠলদাস—এর পরেও যদি বাসুদেব বাড়াবাড়ি করে তো আমি ওকে ছাড়িয়ে দেব। তখন তোমরা যা ইচ্ছে তাই করো"—

বিঠলদাস আর তার ছেলে চলে গেল।

দাদার ডাকে বাসুদেব এসে দরজার পাশে মাথা নীচু করে দাঁড়াল।

দাদা কট্‌মট্‌ করে তাকালেন তার দিকে। তারপরে তিনি যা বললেন তার সারাংশ হল এই যে, বাসুদেবকে তিনি ভবিষ্যতে আর ক্ষমা করবেন না। আর কোন অভিযোগ তাঁর কানে এলে তিনি তাকে চাবকিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেবেন।

ঘোষণা জানিয়ে দাদা ভেতরে চলে গেলেন। তাঁর অফিস যাবার বেলা হয়েছে।

বৌদি বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, "ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে বাসুদেব—এবার সাবধান হয়ো। আর বলিহারি যাই মেয়েটাকেও বাবা—আচ্ছা বদমাস তো!"

হঠাৎ বাসুদেব বৌদির পায়ের কাছে এসে বসে পড়ল, বসে কেঁদে ফেলল, "উ বাতটো বুলেন না মা—গঙ্গার মত ভালো লেড়কী খুব কম মিলে"—

বৌদি রাগতে গিয়েও রাগতে পারলেন না, আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। পরে গম্ভীর হয়ে বললেন, "বেশ, বুঝলাম যে ভালো মেয়ে, তা কি করবে তুমি? বিয়ে করবে?"

বাসুদেব মাথা নাড়ল, "আপনি বুলে ঠিক করে দেন না মা"—

"হুঃ—আমার ভারী দায় পড়েছে। ওসব পাগলামী ছাড়ো বাসুদেও, যাও তৈরী হওগে"—

তবু উঠল না বাসুদেব, বলল, "লোকিন হামি তো কুছু অন্যায় করি নাই মা—হামি ওকে পীয়ার করি"—

"থামো তো বাসুদেও, আর জ্বালিও না বাবা"—

বৌদি বাসুদেবের ভাষা শুনে হাসি না চাপতে পেরে সরে পড়লেন।

আমি বললাম, "তুমি কেমনধারা পুরুষ মানুষ হে বাসদেও, কাঁদছ কেন?"

বাসুদেব চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল, ধরা ধরা গলায় বলল, "কান্তে কি হামি মাংগি দাদাবাবু—লোকিন ফিরভি"—

কথা অসমাপ্ত রেখেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার কথা শুনে আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না।

সন্ধ্যেবেলায় বৌদি চা নিয়ে এলেন ঘরে।

বল্‌লাম, "খুব তো হেসেছিলে প্রথম প্রথম—এখন তোমাদের ড্রাইভারের কান্ড দেখলে তো"—

বৌদি একটা চেয়ারে বসে বললেন, "সত্যি, তখন অত ভাবিনি। এখন ভাবতে বিশ্রী লাগছে। যাই বল, গঙ্গা মেয়েটা কিন্তু বেশ ভদ্র—অথচ"—

আমি বললাম, "অথচ অবাক ব্যাপার এই যে, সেই ভদ্র মেয়েটিও ওর জন্য পাগল"—

"আমার বিশ্বাস হয় না"—

"শোন তাহলে"—

সেদিনকার রাতের ঘটনা বললাম আমি।

বৌদি অবাক হলেন, "সত্যি!"

মাথা নেড়ে বললাম, "কি জানো বৌদি, পণ্ডিতদের কথাই ঠিক—সুন্দরীরা পশুদেরই ভালবাসে"—

বৌদি একটা কড়া প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, এমনি সময়ে পাঁড়েজী দৌড়ে ঢুকল ঘরে।

"মাজী বাসদেওয়ের শির ফুঁড়ে দিইয়েসে ওরা—"

"কারা?"

বৌদির পেছন পেছন আমিও ছুটে বাইরে বেরোলাম। বারান্দাতে বাসুদেব গোঙাচ্ছে। পাশে দু তিনজন অপরিচিত লোক আর বাড়ির ঝি ও চাকর। কপালটা ফেটে রক্ত পড়ছে বাসুদেবের, হাত-পা ছড়ে গেছে। একটু একটু করে শুনে বোঝা গেল যে, বাসুদেব যখন বস্তীর রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিল তখন দামোদর দু তিনজন সঙ্গী নিয়ে তাকে ঘেরাও করেছিল।

পাঁড়েজী ফিসফিস করে বলল, "বাসদেওকে যখন ওরা পিটছিল তখন বিঠলদাসের বাড়িতেও কান্না শোনা যাচ্ছিল। বোধ হয় ঐ গঙ্গা কাঁদছিল—"

বৌদি খুব রাগ করলেন, বাসুদেবের ওপর "কেন? কেন গিয়েছিলে ঐ বস্তীর রাস্তায়? আর কোন রাস্তা নেই বেড়াবার?"

দাদা এসে সমস্ত শুনে বিঠলদাসদের ওপর চটে গেলেন। বটে, নিজেদের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে। সেই সঙ্গে বাসুদেবকেও আর এক দফা বকুনী দিতে ভুললেন না তিনি।

বৌদি গজগজ করতে করতে তুলো, টিংচার আইডিন আর ব্যান্ডেজ নিয়ে এলেন বললেন, "দাও তো ঠাকুরপো, এই হতভাগা রোমিওকে একটু ব্যান্ডেজ করে দাও। হতভাগার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি, এবার ওকে তাড়াতে হবে—"

হতভাগা বিনীত ভঙ্গীতে, মৃদু কণ্ঠে গোঙাচ্ছিল। বৌদির কথায় এতটুকুও বিচলিত হল না সে। তার চোখ তখন অন্য কিছু দেখছিল, আর তার কানে বোধ হয় একটি মেয়ের কান্নার শব্দ তখনো ভেসে ভেসে আসছিল। এমন একটি মেয়ে যে তাকে ভালবাসে, তার জন্য কাঁদে।

রাতে ভাবছিলাম।

বাসুদেবের মধ্যে কি খুঁজে পেল তারা? কিংবা এরই নাম বুঝি প্রেম?

কিছুতেই ঘুম এল না। বাসুদেবের কথা ভেবে নয়। সে চিন্তা থেকে নিজের চিন্তায় কখন সরে গিয়েছি তা খেয়াল ছিল না। না ঘুমোলেও রাতের অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে থাকলে যে বিচিত্র ঘুম-ঘুম একটা প্রলেপ দেহে মনে ছড়িয়ে থাকে তারই ফলে রাত কত গভীর হল তা বুঝতে পারিনি। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে উঠে বসলাম।

চুড়ীর শব্দ!

জানালার ধারে গিয়ে দেখলাম যে, বাসুদেবের বিছানার পাশে গঙ্গা এসে বসেছে, বাসুদেবের বুকের ওপর মাথা রেখে চাপা গলায় কাঁদছে।

বাসুদেব তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ফিসফিস করে বলল, "কেঁদো না ও ঘরে দাদাবাবু শুয়ে আছে—"

কান্নায় বুজে গেছে গঙ্গার গলা, তবু তার কথা বোঝা গেল, "আমি আমার জন্যই তোমার এত কষ্ট—"

বাসুদেব বলল, "তোমার জন্য কষ্ট পেয়েছি বলেই তো তোমার দাম বুঝতে পারছি—তোমার অনেক দাম গঙ্গা, তোমার জন্য প্রাণও দেওয়া যায়—"

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, "অথচ কি আমার দাম? অশিক্ষিত ড্রাইভার আমি, পৃথিবীতে কেউ কোথাও নেই।"

"আমি বা কি বাসুদেব? গরীব মারাঠী মেয়েদের অবস্থা তো তুমি জানো না। বুড়ী হয়ে যায়, তবু তাদের বিয়ে হয় না—সে যে কী জ্বালা—"

"গঙ্গা—"

"কি?"

"আমি ভেবে চিন্তেই দেখেছি।"

"কি?"

"তুমি আমাকে ভুলে যাও।"

"ভালবাসা আমার কাছে খেলা নয় বাসুদেব। আমি সমস্ত দুঃখের জন্য তৈরী।"

"কিন্তু আমি যে তৈরী নই গঙ্গা। না না তুমি যাও, আমাকে আর লোভ দেখিও না।"

"লোভ!" গঙ্গা বিদ্যুৎ বেগে উঠে দাঁড়াল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, "তাহলে চল্লাম—"

বাসুদেব জবাব দিল না। গঙ্গা পা বাড়াল। বাসুদেব নড়ল না। গঙ্গা চলতে লাগল, সিঁড়ির ধাপে পা রাখল।

হঠাৎ অস্ফুট ডাক বেরিয়ে এল বাসুদেবের গলা থেকে যেন তার আর্ত আত্মা ডেকে উঠল।

"গঙ্গা—"

থমকে দাঁড়াল মেয়েটা। বাসুদেব উঠে দাঁড়াল। গঙ্গা ঘুরল।

"গঙ্গা—"

দুজনে ছুটে এল পরস্পরের দিকে। যেন দুটো উন্মত্ত ঢেউ।

বাসুদেব বলল, "আমাকে মাপ কর, মাপ করো গঙ্গা। তুমি জানো না তোমার ওপর আমার কী লোভ, কী প্রচণ্ড লোভ। তোমায় চলে যেতে বলছি! কিন্তু তোমায় ছাড়া যে বাঁচতেও পারব না গঙ্গা—"

তারপর তাদের উন্মত্ত আবেগ দেখে লজ্জা পেয়ে নিজের বিছানায় সরে গেছি। সময় কেটেছে। শেষ রাতে চাঁদ উঠেছে, চাঁপা ফুলের গন্ধ পশ্চিমের বাতাসে ঘরের ভেতর ভেসে এসেছে। ঘুমিয়েছি।

অনেক বেলায় কড়া রোদের আঁচে আর বৌদির ডাকে যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন, দেখলাম যে টেবিলের ওপর ধূমায়িত চা। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ছিল। তাড়াতাড়ি চা নিয়ে চুমুক দিলাম। ওদিকে কুয়োর পাড়ে তখন ভিড়। জল কামীদের কলরব আর জল তোলার শব্দ। তৃষ্ণাকে জয় করবে বলে টলমল শীতল জলের জন্য তাদের সে কী প্রাণান্ত প্রয়াস!

আজকাল গঙ্গা আর জল নিতে আসে না। আসে যমুনা।

কিন্তু পর পর আরো দু রাত বাসুদেবের কাছে এল গঙ্গা। তারপর তৃতীয় রাত থেকে বন্ধ হল তার আসা।

কদিন বাদে পাঁড়েজী সেদিন বিকেলে এসে বলল, "এই বাসদেওটা একেবারে পাগলা হইয়ে গিয়েছে হুজুর—"

"কেন? কি হল?"

"ওরা আজ ঐ মেয়েটিকে দুসরা কোই জগাহ্ পঠায়ে দিয়েসে। লড়কীটার কোন আত্মীয় বাড়ি। খবরটা পাওয়ার পর থেকে বাসদেও খালি কাঁদছে—"

কি আর বলব। কাঁদুক। বাসুদেবের কপালে দুঃখ থাকলে খণ্ডাবে কে?

একটু বাদেই বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। কুয়োর ধারে, আমগাছটার তলায় অন্ধকারে বসে আছে আর কাঁদছে।

তার কান্না রাতেও শুনলাম। কিন্তু কি করব?

বৌদিকে বললাম কথাটা।

বৌদি বললেন, "গেছে? আপদ দূর হয়েছে। কাঁদুক কদিন, তারপর সব ভুলে যাবে।"

কিন্তু বাসুদেব যে ভুলবে তা মনে হল না। যতই দিন কাটতে লাগল ততই বাসুদেব গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল। তার পোশাক পরিচ্ছদ আর বেশভূষা মলিন হয়ে উঠল, চুল দাড়ি বড় হয়ে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর মত চেহারা হয়ে গেল তার। কথা বলে না সে, যন্ত্রের মত কাজ করে আর কুয়োর ধারে বসে থাকে।

যমুনা এখনো জল নিতে আসে, কিন্তু সে একা আসে না, তার মায়ের সঙ্গে আসে। বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে তাদের দু' চোখে আগুন জ্বলে আর তাকেই উদ্দেশ করে মারাঠী ভাষায় কি সব শাপশাপান্ত করে। কিন্তু বাসুদেব তাদের কথা শুনতে পায় না, তাদের দিকে তাকায়ও না।

দাদা মাঝে মাঝে ধমকান। বৌদি কত বোঝান। কিন্তু বাসুদেবের কোন পরিবর্তন হয়না। সে যেন এক দুশ্চর তপস্যা শুরু করেছে।

তার সেই তপস্যার বীজমন্ত্র শুনতে পাই আমি। অনেক রাতে।

কেঁদে কেঁদে আওড়ায় বাসুদেব। "গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা—"

মানুষের সুখ দুঃখের তোয়াক্কা করে না দিন রাতের চাকা। তাই দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল। সবার হিসেব করা শেষ হল। আরব সাগর থেকে জলভরা মেঘে একদিন আকাশ কালো হয়ে গেল। তারপর বৃষ্টি নামল। শুকনো মাটির ওপর জলের আলপনা দাগ কাটল। তৃষ্ণার্ত পৃথিবী নিঃশেষে লেহন করল সেই রসধারা।

কিন্তু কুয়োর ধারে ভিড় কমল কি? নিত্যকার তৃষ্ণার উনিশ বিশ হল মাত্র। আর কিছু নয়।

এরি মধ্যে একদিন পাঁড়েজী খবর দিল, "গঙ্গা লওটকে এসেছে দাদাবাবু—সেই আত্মীয় বাড়িতে নাকি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। ওরা অতিষ্ঠ হয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে।"

বাসুদেবকে লক্ষ্য করলাম। তার তপস্যা শেষ হয়েছে। হঠাৎ একদিন সে দাড়ি-গোঁফ নির্মূল করে ফেলল। এতদিন বোঝা যায় নি যে, কত রোগা হয়ে পড়েছে লোকটা। গঙ্গা এসেছে তবু কিন্তু তাকে খুশী মনে হল না। গুরুভার এক চিন্তা যেন সারাক্ষণ পাষাণ হয়ে তার ওপর চেপে আছে।

যমুনা এখনো জল নিতে আসে। যুবতী, সুশ্রী মেয়ে সে, কিন্তু পাকা বুড়ীর মত মাঝে মাঝে বাতাসের উদ্দেশে বলে, "কলেরা হয়ে মরবে, কুষ্ঠ হয়ে মরবে—শেয়াল কুকুরে কামড়ে কামড়ে খাবে"—

কার এমন পরিণামের কথা সে বলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু কে কি বলবে? কি হবে বলে?

বৌদি একদিন বললেন, "বাসুদেওটার জন্য চিন্তা হয় আজকাল। ঐ বিঠলদাসেরা এখনো আগুন হয়ে আছে। শুনেছি আবার নাকি মারধোরের আয়োজন করছে।"

আমি অবাক হলাম, "আবার কেন? ওব্যাপার তো চাপা পড়ে গেছে—গঙ্গা তো আসেও না।"

"আসবে কি? ওকে নাকি তালাবন্ধ করে রাখে"—

"বেচারী।"

বাসুদেব সন্ধ্যের পর কাজ না থাকলে মাঝে মাঝে বাইরে যায়। কোথায় যায় বুঝি না। মাঝে মাঝে রাতের বেলা খায়না সে। বৌদি কত বকেন, তবু ফল হয় না। মাঝে মাঝে পাঁড়েজী আর বাড়ীর ঝি'র সঙ্গে কি সব পরামর্শ করে সে। কিছু বুঝি না। বুঝবার জন্য চেষ্টাও করিনি। বাড়ীর ড্রাইভারের প্রেমের ব্যাপার নিয়ে এর বেশী কৌতূহল প্রকাশ করাটা বোকামীই হবে।

সেদিনটা রবিবারই হবে। দাদা বাড়ী ছিলেন। দু'তিনজন প্রতিবেশী এবং স্থানীয় দুজন বাঙালী ভদ্রলোক এসেছিলেন। তাঁরা গল্পগুজব করে সবে গেছেন এমন সময়ে বিঠলদাস আর তার ছেলে দামোদর এসে হাজির হল।

হাউমাউ করে কেঁদে পড়ল বিঠলদাস, বলল, "আমার গঙ্গা নিখোঁজ বাবুজী—কাল মাঝরাত থেকে"—

দাদা সব শুনলেন, বললেন, "তা আমি কি করব—পুলিসে খবর দাও"—

"আপনিই বিহিত করুন হুজুর—আপনার ড্রাইভার নিশ্চয়ই জানে।"

বাসুদেব এসে মাথা ঝাঁকল। পাঁড়েজী প্রভৃতি সবাই সাক্ষ্য দিল যে, বাসুদেব রাতে কোথাও যায়নি।

দাদা বিঠলদাসকে বললেন, "পুলিসে খবর দাওগে বিঠলদাস। আর দোষ তো তোমাদেরি—মেয়ে সামলাতে পারো না।"

বিঠলদাসেরা উত্তেজিত অবস্থায় চলে গেল। পুলিসেই খবর দেবে তারা। বিশ্রী ব্যাপার। আর এক দফা কড়া বকুনী খেল বাসুদেব। এখন যদি পুলিস এসে বাড়ীতে জেরা শুরু করে? তাহলে?

বৌদি বাসুদেবকে আড়ালে ডেকে বললেন, "সত্যি কথা বলেছো তো? হ্যাঁ বাসুদেও জানতে না কিছু?"

মাথা নীচু করে বাসুদেব মাথা নাড়ল, "না মা"—

দিন গেল রাত হল। তার পরের দিন।

বাসুদেবের শরীর খারাপ। দাদা একাই ড্রাইভ করে গেলেন অফিসে। আমার কাজ ছিল না বলে আমি আর বাড়ী থেকে বেরোলাম না, কোনান ডয়েলের একটা বই নিয়ে বসে গেলাম।

পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাসুদেব, পাঁড়েজী আর ঝি'র দিকে তাকিয়ে আজ একটু অবাক হলাম। কেমন যেন উত্তেজিত, চিন্তিত ও চঞ্চল মনে হচ্ছে ওদের। ব্যাপার কি? মাঝে মাঝে তিনজনে মিলে আবার কি সব জটলা করছে! কিন্তু পরক্ষণেই কোনান ডয়েল ব্যাপারটা ভুলিয়ে দিল। শেরলক্ হোম্সের কাণ্ডকারখানা পড়তে পড়তে এক সময়ে বিকেল হয়ে গেল। স্কুল থেকে বাচ্চারা কলরব করতে করতে ফিরে এল। বৌদি চা নিয়ে এলেন। বাইরে সূর্যের আলো ক্রমে ক্রমে রাঙা হয়ে মিলিয়ে এল। পরিচিত হর্নটা বাজিয়ে দাদার গাড়ী এসে বাড়ীতে ঢুকল। সন্ধ্যার অন্ধকারে চাঁপার গন্ধ বাতাসে তীব্র হয়ে ভাসল। আর আকাশের গায়ে চাঁদ নেই বলে তারারা আসর জাঁকিয়ে তুলল।

কিন্তু আরবসাগর থেকে যে একখানি কালো মেঘ ক্রমে সারা আকাশকে ছেয়ে ফেলার জন্য অন্ধকারে শ্বাপদের মত এগিয়ে আসছিল তা টের পাইনি। টের পেলাম অনেক পরে। রাত তখন সাড়ে এগারোটা মত হবে। হঠাৎ জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তারাদের আসর কখন ভেঙ্গে গেছে। ঘন কালো মসিলেখায় আকাশ অবলুপ্ত।

কয়েক মিনিট বাদেই আকাশ কাঁপিয়ে মেঘ ডাকল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। তারপর হুহু করে পূবের বাতাস এল আর বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। হাওয়ায় ঘরের ভেতর জলের ছাট আসতে লাগল। জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। তবু শীত শীত করতে লাগল। অথচ ঘরে কোন চাদর নেই গায়ে দেবার।

বৌদি তখনো জেগে ছিলেন। বসে বসে চিঠি লিখছিলেন। দাদা অফিসের ফাইল ঘাঁটছিলেন অন্য ঘরে।

ভেতরের করিডোরে দেখলাম পাঁড়েজী, বাসুদেব আর ঝি বসে গল্প করছে। এখনো চলছে ওদের ফিসফিস কথা!

"বৌদি, ভারী শীত করছে, একটি ব্যবস্থা করো"।

বৌদি মুখ তুললেন, 'ওঃ, তোমায় বুঝি চাদর দিইনি। চল দিচ্ছি, এখানে চট করে ঠাণ্ডা লেগে যায়, একটু সাবধান থাকাই ভাল।'

বৌদি বেরোলেন। করিডোর পার হয়ে সাজঘরে গেলেন। আমি করিডোরেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাসুদেব ওরা আমায় দেখে একটু নড়ে বসল। ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে দেখে আমি একটু বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

"কী অত কথা হচ্ছে হে তোমাদের? তোমরা শোবে না?"

বাসুদেব শুকনো গলায় বলল, "এখনো ভি নিন্দ্ আসছে না দাদাবাবু—"

হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ ভেসে এল সাজঘর থেকে।

"ঠাকুরপো—ঠাকুরপো—"

"কি হল বৌদি?"

ঘরের ভেতর ছুটে গেলাম, বৌদিও ছুটে বেরিয়ে আসছিলেন। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন তিনি, কাঁপছেন।

"বৌদি!"

ঘরের কোণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বৌদি বললেন, 'দেখতো, ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে—'

"সেকি!"

দরজার পাশেই ছাতাটা ঝুলছিল, সেইটি হাতে নিয়ে আমি কোণের দিকে এগোলাম। একটা ছোট টেবিলের ওপর লেপকাঁথা থাক করে সাজানো ছিল। তার পেছনটাতে। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, একটা চাদর ঝুলে পড়েছে কোণটায়, যেন কিছু ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ভালো করে তাকিয়ে বুঝলাম যে কেউ বসে আছে। চোর।

একটানে চাদরটা সরিয়ে ফেললাম।

বৌদি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, "গঙ্গা!"

গঙ্গা একবার ভয়ার্ত দৃষ্টি তুলে আমার দিকে তাকাল, তারপরেই দু'হাতে মুখ ঢাকল।

আর ঠিক সেই সময়েই বাসুদেব ছুটে এসে বৌদির পা জড়িয়ে কেঁদে উঠল।

"ওকে কিছু বলবেন না মা—ওর কোহিভি দোষ নাই—"

দাদার পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এল কাছে।

"কি হয়েছে?"

প্রশ্ন করেই ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

'একি।"

বৌদি কোন জবাব দিলেন না।

বাসুদেব হাতজোড় করে দাদার সামনে উঠে দাঁড়াল, "আপনি হামার অন্নদাতা বাপ হুজুর—ওকে কুছু কহিয়েন না, সারা দোষ হামার।"

"চোপরাও শুয়োর—" দাদা গর্জে উঠলেন, "রাস্কেল, তোর জন্য আমি কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়ব? হতভাগা বেইমান, এত বলেও তোকে ঠিক করতে পারলাম না।"

দু'চোখ বেয়ে তখন বাসুদেবের জল নেমেছে। দরজার ওদিকে পাঁড়েজী আর ঝিটা শঙ্কিত মুখে তাকিয়ে আছে।

"কবে থেকে আছে ওখানে?" দাদা প্রশ্ন করলেন।

বাসুদেব বলল, "কাল রাত থেকে।"

'তাহলে তুই সকালে মিছে কথা বলেছিলি! তোরা সবাই?"

পাঁড়েজী ও ঝি অপরাধীর মত সরে গেল সেখান থেকে।

দাদা আমার দিকে তাকালেন, "যাতো, পুলিসকে ডেকে নিয়ে আয়, এসব প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কোণ থেকে সেই অবনতমুখী গঙ্গা ছুটে এসে দাদার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, "দোহাই বাবুজী, আমাদের পুলিসে দেবেন না—"

দাদা বললেন, "নিশ্চয়ই দেব—"

বৌদি বললেন, "না—"

দাদা ঘুরে দাঁড়ালেন, "কি বলছ তুমি!"

বৌদি গঙ্গাকে তুলে দাঁড় করালেন, তারপর বললেন, "ওর দিকে তাকিয়ে দেখ।" আমরা তাকিয়ে দেখলাম। এতটুকুও বুঝতে কষ্ট হল না যে, গঙ্গা মা হতে চলেছে। বৌদি বললেন, "আমিও মেয়ে ছেলে, আমিও মা, তোমরা সবাই আজ ওকে কোন অপমান করলে আমি তা সইব না। ওদের ছেড়ে দিতে হবে।"

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে দাদা প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু পুলিস?"

"পুলিসের কাছে আমি জবাবদিহি দেব। বাসুদেব, তুমি তৈরি হয়ে নাও। ছি ছি ছি, একথা আমাকে বললে কি হতরে হতভাগা? ঐ ঘরের কোণে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বসে আছে মেয়েটা! ঠাকুরপো, তুমিই ওদের স্টেশনে ড্রাইভ করে নিয়ে যাও, নইলে হয়ত জ্যান্ত আর মালাড ছেড়ে বেরোতে পারবে না।"

দাদা নিরুত্তরে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেশ বোঝা গেল যে, তিনি বৌদির সিদ্ধান্তে মোটেই সায় দিতে পারলেন না।

বৌদির পায়ে লুটিয়ে পড়ে বাসুদেব বলল, "মাজী—আপনি হামার অপনা মাসে ভী কম নেহি।"

কথাটা এতটুকুও অতিরঞ্জিত মনে হল না। বৌদির সেই মহিমময়ী ও করুণাময়ী মূর্তি আমি আর জীবনে ভুলব না। সেই সঙ্গে বাসুদেবের অসহায় মুখ আর তার গর্ভবতী মারাঠী প্রেয়সীর শীর্ণ, পাণ্ডুর ও বিষণ্ণ মুখচ্ছবিও চিরকাল আমার মনে জমা হয়ে থাকবে।

বৌদি নিজের কয়েকটা শাড়ি আর ব্লাউজ গঙ্গাকে পোঁটলা বেঁধে দিলেন, তাকে যত্ন করে খাওয়ালেন। তারপরে বাসুদেবের মাইনে চুকিয়ে, তার হাতে আরো পঁচিশটা টাকা বেশী দিয়ে তাদের বিদায় দিলেন।

এতদিন বাসুদেব গাড়ী চালাত। আজ আমিই ওকে আর গঙ্গাকে গাড়ী চালিয়ে স্টেশনে নিয়ে গেলাম। তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। সারা মালাড দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে।

ট্রেনে চড়ে বাসুদেব ছলছল চোখে বলল, "গরীবদের ইয়াদ রাখবেন দাদাবাবু—"

ভারী সুন্দর ভঙ্গিতে গঙ্গা হাতজোড় করে নিঃশব্দে প্রণাম জানাল। ট্রেন ছেড়ে দিল।

পরদিন। আকাশ তখন পরিষ্কার, রৌদ্রোজ্জ্বল। বেশ গরম লাগছিল।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, কুয়োর পাড়ে তেমনি ভিড়। এত বৃষ্টিতেও মানুষের জলের তৃষ্ণা মেটেনি। সেই ভিড় দেখতে দেখতে হঠাৎ বাসুদেব আর গঙ্গার কথা মনে পড়ল। এখন তারা কোথায় কে জানে। কে জানে কোন শহরে গিয়ে তারা নীড় বাঁধবে, উদাসীন পৃথিবীর কাছে কতটুকু সহানুভূতি পাবে তারা। কে জানে ওদের কপালে কত দুঃখ আছে।

কুয়ো থেকে জল তুলছে একটি মেয়ে। তার চুড়ির ঠুনঠুন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। বালতিভরা টলমল তৃষ্ণার জল। জলের তৃষ্ণা। কিন্তু এই তৃষ্ণাই কি শেষ তৃষ্ণা? এর চেয়েও বড়, এর চেয়েও মর্মদাহী আরো তৃষ্ণা কি নেই? আর অন্তহীন এই অসংখ্য তৃষ্ণারই নাম কি জীবন?

অম্বর

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মান্ধাতা-তনয় অম্বরীশ, আর তাঁর নামেই নাকি এ-শহর—অম্বর। নাম-বিবর্তনের এ-লোকশ্রুতি কতখানি সত্য আর কতখানি কল্পনা তা আজ যাচাই করা সহজ নয়। আরও এক কিংবদন্তী আছে। অম্বর রাজ-কুল কছোয়া রাজপুত নামে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে, কছোয়া শব্দটি নাকি কুশের অপভ্রংশ। কুশ তথা রামচন্দ্রের মারফৎ কছোয়ারা অতএব খাঁটি সূর্যবংশী। দূর অতীতের প্রান্তে ইতিহাস যেখানে পথ হারিয়েছে পৌরাণিক উপাখ্যানের কুয়াশায়, এসব কাহিনীর জন্ম সেইখানে। অতএব, কিছু বিশ্বাস করবার আগে ঐতিহাসিক নজীর দাবী করা যাঁদের রীতি এবিষয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা মেটাতে পারি এমন হাতে-নাতে প্রমাণ আমি কিছু দাখিল করতে পারব না।

ইতিহাসের সেই প্রদোষকালে কছোয়াদের প্রথম দেখি বিহারের সাহাবাদ জেলার রোহতাসগড় পাহাড়ে। (তখন অবশ্য স্থান-বাচক এসব নামের একটিরও অস্তিত্ব ছিল না) অযোধ্যা থেকে তাঁদের সেখানে আসাটা একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। রোহতাসগড়ে কতদিন যে তাঁরা রাজত্ব করেছিলেন তারও কোনো সঠিক প্রমাণ নেই। শুধু, শোন-তীরবর্তী এই সমতল-শীর্ষ পাহাড়টির চূড়ায় বহু-পুরাতন এক দুর্গ-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যায়। তারপরে, কোন মহতী বিনষ্টি এড়াবার জন্যে তাঁরা এলেন নারওয়ার ও নিকটবর্তী গোয়ালিয়রে তার নির্ভুল ইতিহাস কে বলবে। মহাভারতে এ-অঞ্চল নিষাদ দেশ নামে বর্ণিত হয়েছে। ভবভূতির মালতী-মাধব নাটকের পটভূমিও এই দেশ। এখানে এঁদের আধিপত্যের অবসান উত্তর-ভারতে মুসলমানদের আবির্ভাবের সম-সাময়িক। একটি শাখা দুঃখ-সুখের মধ্যে নারওয়ারে টিকে ছিলেন আঠারো শতকের প্রায় শেষ অবধি; তারপরে সে-রাজ্য গ্রাস করলেন প্রবলপ্রতাপ সিন্ধিয়া। আর একটি শাখা—এবং এইটিই প্রধান—বহুদূর পশ্চিমে পালিয়ে এলেন রাজপুতনার ধোন্ধরে। ধোন্ধরে তখন শক্তিশালী মীনা আদিবাসী-দের বাস। তাদের পরাস্ত করে আগন্তুকেরা যে রাজধানীর পত্তন করলেন তাই আজকের অম্বর। ইতিহাসের ধূলি-মলিন পথে পথে যাযাবরবৃত্তির অবসান হল এতদিনে; পায়ের তলায় শক্ত মাটির আশ্রয় পেয়ে কছোয়া রাজপুতেরা নিশ্চিন্ত হলেন। কিছু বিলম্বে এল এ-রাজবংশের ফুল-ফোটানোর ফল ফলানোর উজ্জ্বল দিন-গুলি যা অনেক ক্ষেত্রে নিরুদ্বিগ্ন শান্তিরই সমার্থবাচক। পাজুন, ভগবান-দাস ও মানসিংহের মত অসামান্য রণকুশল সেনাপতি, মির্জা রাজা জয়সিংহের মত স্থাপত্য-ভাস্কর্যের রসজ্ঞ পৃষ্ঠপোষক এবং সওয়াই জয়সিংহের মত রাজনীতিজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী এ-রাজবংশেরই ফুল-ফল।

এই সোনার ফসলের দিনগুলি আজ হয়ত অম্বরের স্মৃতিকে দুঃস্বপ্নের মত পীড়িত করে। কছোয়াকুলের আধুনিক রাজধানী জয়পুর—অম্বর নয়। পুরনো রাজপীঠের গৌরব-আভরণগুলি একে একে খসে পড়ে ধূলায় মিলিয়েছে বহুদিন। শুধু এক আশ্চর্য প্রাসাদ, যা দিল্লী-আগ্রার মোগল-বৈভবকেও সহজেই লজ্জা দিতে পারে, আর গুটিকয় সুললিত মন্দির অবশিষ্ট আছে এখনও। কালের প্রহারে অবসন্ন অম্বর শঙ্কিত-যত্নে আজও এগুলিকে লালন করে আর দগ্ধ আকাশের নিচে স্তিমিতনেত্রে জাল বোনে অতীত-স্মৃতির। পশ্চিমের তপ্ত মরুভূমি থেকে হা হা করে ছুটে আসে দুরন্ত বাতাস; পরিত্যক্ত অম্বরের ভাঙ্গা পাঁজর ভেদ করে আওয়াজ ওঠে যেন চাপা কান্নার। কান পেতে শুনলে, বোবা নীরবতার বুক চিরে চিরে সে-হাহাকার বুঝি স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়।......

* * *

চিরদিন কিন্তু এরকম ছিল না। কছোয়া রাজপুতদের বাড়বাড়ন্তের দিনে অম্বরের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ত প্রায় হাল-আমলের কথা। তারও বহুপূর্বে, পৌরাণিক যুগে, মৎস্যদেশ নামে এ-অঞ্চল মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে। অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ, কীচক বধ প্রভৃতি ঘটনা নাকি কাছেপিঠেই কোথাও ঘটে থাকবে। অম্বর থেকে আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল দূরে, বৈরাট নামে যে লুপ্ত-নগরীটি সম্প্রতি মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করা হয়েছে তা' সম্ভবত পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের আশ্রয় বিরাট-পুরীরই ভগ্নাবশেষ। প্রত্নবিদেরা অন্তত এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে বৈরাটের সাবেক সভ্যতা হারাপ্পা বা মোহেন্‌জোদারোর থেকে কম প্রাচীন নয়। সম্রাট অশোকের আদেশে নির্মিত একটি বৌদ্ধ মঠ ও তাঁর একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বৈরাট সে-সময়েও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

তারপরে, মীনা আদিবাসীদের প্রতাপের যুগেও, ধোন্ধর রাজ্যের খ্যাতিপ্রতিপত্তি বড় কম ছিলনা যদিও সে-কালের খুঁটি-নাটি ঐতিহাসিক বিবরণ সহজলভ্য নয়। তৎপরবর্তীকালে, ভাসা ভাসা তথ্যের কুয়াশার মধ্যে যে নৃপতির নামটি বিশেষ

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তিনি কছোয়া কুলপতি পাজুন। পাজুন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের ভগিনীকে বিবাহ করেন ও ভারতবর্ষে প্রথম মুসলমান রাজ্যবিস্তারের বিরুধে রায় পিথোরার সমস্ত প্রচেষ্টার অন্তরঙ্গ সহায়ক ছিলেন। গজনীর আক্রমণের বিপক্ষে তিনি একাধিকবার অস্ত্রধারণ করেছিলেন ও একবার খাইবার গিরিবর্ত্মে সাহাবুদ্দিন ঘোরীর বাহিনীকে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন যে, অল্পসংখ্যক হতাবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে সাহাবুদ্দিন কোনোগতিকে গজনীতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। কনৌজ-কুমারী সংযুক্তা হরণের কাহিনী সর্বজন-বিদিত। পৃথ্বীরাজ যে অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র চিন্তা না করে এই অসমসাহসিকতায় ব্রতী হয়েছিলেন এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। কেননা, অনুসরণকারী কনৌজ-সৈন্যদের মহড়া নেবার ভার পাজুনের বিশ্বাসী তরবারির ওপর ন্যস্ত ছিল। জীবন দিয়ে সে-বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি রক্ষা করেছিলেন। অশ্বারোহী শত্রুসৈন্য তাঁর মৃতদেহ দলিত করে যখন পুনরায় অগ্রসর হল, সংযুক্তা-পৃথ্বীরাজ তখন বিপদ সীমানার বাইরে।

পাজুনের পরে অম্বরকুলের কৃতী নৃপতির নাম করতে হলে প্রায় পাঁচশো বছর পার হয়ে এসে আকবরের সমসাময়িক মহারাজা মানসিংহের সময়ে পৌঁছতে হয়। গোটা পাঠান আমলে কছোয়া রাজবংশে উল্লেখযোগ্য একটিও সৈনিক বা শাসকের উদ্ভব হয়নি, আবার মোগল আমলের শেষ দু'শো বছরে একই গোষ্ঠী থেকে মানসিংহ, মির্জা রাজা জয়সিংহ, সওয়াই জয়সিংহ প্রভৃতির মত বিরাট ব্যক্তিত্ব যে একের পর আর আবির্ভূত হয়েছেন, ইতিহাসের এ এক দুর্বোধ্য লীলা। তবু অম্বরকুলের এই অমিত বৈভব ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে যথোচিত সম্মানের দাবী করতে পারে কিনা সন্দেহ। এই অসামান্য রাজনীতিজ্ঞান, অপরাজেয় রণনিপুণতা একাদিক্রমে প্রায় দু'শো বছর মোগলের তাঁবেদারিতে নিঃশেষিত হয়েছে। এ যে কত বড় আপসোসের কথা তা বোঝাতে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ রকম কুশলী ব্যক্তির বেলাতেই এহেন কলঙ্ক যথেষ্ট মনস্তাপের কারণ হয়ে থাকে। অম্বরকুলের দুর্লভ প্রতিভার এই দাসত্বগ্লানি দূরপনেয়।

একথা অবশ্য এখন অলস কল্পনামাত্র যে মানসিংহের পিতামহ ভাড়মল বা পালক-পিতা ভগবানদাস যদি রাজপুত স্বার্থের বিরুধে মোগল পক্ষে যোগ না দিতেন তবে সমসাময়িক ভারত-ইতিহাসে
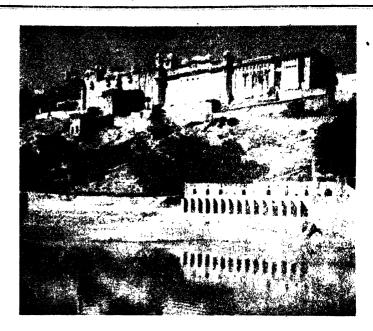
অম্বর প্রাসাদ

কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হওয়া সম্ভব ছিল কিনা। হয়ত হত, হয়ত হতনা। কিন্তু, আকবরের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পাকা-পোক্ত করবার কাজে মানসিংহের অসামান্য সমরপ্রতিভা নিয়োজিত না হয়ে যদি সে-প্রতিভা প্রতিপক্ষের ব্যবহারে আসবার সুযোগ পেত, তবে মোগল সাম্রাজ্যসৌধ যে কতখানি ঘাতসহ হত তা বিশেষ বিতর্কের বিষয়। রাণা প্রতাপের দৃঢ়তার সঙ্গে মানসিংহের সৈনাপত্য যুক্ত হলে, শুধু রাজস্থানে কেন সমস্ত মোগল-বিরোধী শিবিরে যে উদ্দীপনার স্রোত বইত তার প্লাবনী-শক্তির সামনে মোগল-বৈভবের পরিণাম কি হত তা সঠিক করে কে বলতে পারে।

সে যাই হোক, মোগলের দাসত্বগ্লানির কথা বাদ দিয়ে ধরলে, অম্বরকুলের এই ত্রয়ী যে সে যুগে নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক একজন দিকপাল ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। রাজস্থানের বীরত্বগাথা অবলম্বনে উপন্যাস নাটক বাঙলা ভাষায় অপ্রতুল নয় এবং সেগুলির মাধ্যমে মহারাজা মানসিংহের নাম সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে বিশেষ পরিচিত। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য, বিহার ও বাঙলা, পাঞ্জাব ও কাবুল—দিকে দিকে, দূর-দূরান্তরে মান-সিংহের অপরাজেয় বাহিনী মোগল শক্তির বিজয় বৈজয়ন্তী বহন করে নিয়ে গিয়েছে। বস্তুত, ভারত-ইতিহাসের যে কোনো যুগেই মানসিংহের মত অসামান্য প্রতিভাশালী সেনাপতি আর জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ। আকবরের দরবারে এহেন রণনায়কের অমিত সম্মান সহজেই অনুমেয়। কিংবদন্তী এই যে, প্রধান সেনাপতির অপ্রতিহত প্রতাপে স্বয়ং বাদশাহ আকবরও এতদূর বিচলিত হয়ে পড়েন যে একদা একত্র-ভোজনের সময় মানসিংহের জন্য গোপনে নির্দিষ্ট বিষপাত্রটি ভুলক্রমে নিজে নিঃশেষ করবার ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আকবরের মৃত্যু সম্বন্ধে এ-জনশ্রুতি অবশ্য ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। তবু, মোগল দরবারে কতদূর প্রতি-পত্তিশালী হলে ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে এমন কিংবদন্তী প্রচলিত হতে পারে এ তার এক নিরিখ।

মির্জা রাজা জয়সিংহের সমরখ্যাতি পিতার মত দিগন্তবিস্তৃত না হলেও, তিনিই একমাত্র মোগল সেনাপতি যিনি সম্মুখ-যুদ্ধে শিবাজীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেবের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে শিবাজীকে তিনি দিল্লীতে প্রেরণ করেন। কিন্তু কথা খেলাপ করে ঔরঙ্গজেব যখন তাঁকে বন্দী করলেন, তখন মির্জা রাজার রাজপুত সম্মানবোধে অতিশয় আঘাত লাগল। ফলের ঝুড়ির মধ্যে আত্ম-গোপন করে মোগল কারাগার থেকে শিবাজীর পলায়নের কাহিনী সুবিদিত। কিন্তু একথা তত সুবিদিত কিনা জানিনে যে, অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে এই দুরূহ কাজটি হাসিল করবার সমস্ত দায়িত্ব মির্জা

অম্বর প্রাসাদের প্রথম তোরণ

রাজা জয়সিংহের। পরাজিতের প্রতি, আশ্রিতের প্রতি দুর্ব্যবহার মোগলের পক্ষে অসম্ভব নয়—কিন্তু রাজপুত কখনও তা করে না—মোগলের বশ্যতা স্বীকার করলেও না। বিবেকের কাছে মির্জা রাজা দায়মুক্ত হলেন বটে, কিন্তু ঔরংগজেবের হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারলেন না। এই উন্নতচরিত্র রাজপুত নৃপতির গুপ্তহত্যা ঔরংগজেবের অতি-নিন্দনীয় চরিত্রকেও বুঝি কলঙ্কিত করে থাকবে।

আজকের পরিত্যক্ত অম্বরে যে আশ্চর্য প্রাসাদটি এখনও দর্শকের বিস্ময় উদ্রেক করে, সেটি মির্জা রাজা জয়-সিংহের বহুমুখী প্রতিভার আর একটি নিদর্শন। স্থাপত্যের বলিষ্ঠতায় ও ভাস্কর্যের নৈপুণ্যে দিল্লী আগ্রার অতুল বৈভবের সঙ্গে এ-প্রাসাদ অনায়াসেই পাল্লা দিতে পারে। বিশপ হেবার থেকে আরম্ভ করে অল্ডাস হাক্সলি অবধি বিদেশী পর্যটকদের জনে জনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এই অনুপম স্থাপত্য-কীর্তিটির, এর সুউচ্চ তোরণটির অভি-নবত্বের, এর দেওয়ান-ই-আমের কারুকার্যের, এর শীসমহলের টুকরো কাঁচের সজ্জার আর ডালিম বাগানের রঙের অজস্রতার। বস্তুত, এমন নিখুঁত সুন্দর একটি রাজ-প্রাসাদ উত্তর ভারতের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

মনীষার ক্ষেত্রে মহারাজা সওয়াই জয়-সিংহকে অম্বরকুলের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বললে ভুল বলা হবে না। প্রখর রাজনীতি জ্ঞান ও সমরকুশলতার সংগে গণিত ও নক্ষত্র বিজ্ঞানে যে অসামান্য ব্যুৎপত্তির তিনি অধিকারী ছিলেন, সে রকম দৃষ্টান্ত সমগ্র ভারত ইতিহাস বিরল। ঔরংগজেবের মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে, তিনি অম্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন ও ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এই তারিখগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্লথ-ভিত্তি মোগল সাম্রাজ্যসৌধ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে আরম্ভ করেছে এ সময়ে। দিল্লীর চারপাশে জাঠ, শিখ, মারাঠা প্রভৃতি শক্তিগুলি ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে। এই ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের ঠিক মাঝখানে থেকেও সওয়াই জয়সিংহ গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের মত দুরূহ বিদ্যায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবার যে অসামান্য অধ্যবসায় দেখিয়েছিলেন তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবার জন্য তিনি জয়পুর, দিল্লী, কাশী, মথুরা ও উজ্জয়িনীতে যে পাঁচটি মানমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন সেগুলিকে রাজস্থানের কাহিনীকার কর্ণেল জেমস টড "ভারত ইতিহাসের এক অন্ধকার যুগের দীপবর্তিকা" বলে বর্ণনা করেছেন। পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া গ্রন্থেও সওয়াই জয়সিংহের এই আশ্চর্য প্রতিভা অনুরূপ-ভাবে সমাদৃত হয়েছে।

তবু অম্বরের কাহিনী লিখতে বসে জয়সিংহের গণিতপ্রীতি কিছু খেদের সঙ্গেই স্মরণ করতে হয়। নগর নির্মাণের যে সব জ্যামিতিক পরিকল্পনায় তাঁর বিশ্বাস ছিল, বাস্তবিক ক্ষেত্রে সেগুলির প্রবর্তন করবার উদ্দেশ্যেই ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে অম্বরের আট মাইল দক্ষিণে তিনি জয়-পুর শহরের পত্তন করেন। প্রিয় জ্যামিতিক সিদ্ধান্তগুলি কাজে লাগিয়ে নতুন রাজ-ধানীকে তিনি নির্ভুলভাবে বিন্যস্ত করলেন সত্য, কিন্তু এতদিনের ঐতিহ্যের পুণ্যপীঠ অম্বর একেবারে দেউলে হয়ে গেল। লোকজন, রাজ্যপাট সব উঠে গেল জয়পুরে। অম্বরের কথা কেউ ভাবলে না। আজ ভারতবর্ষের আর পাঁচটা পুরা কীর্তির মধ্যে অম্বর একটি, এই শুধু তার পরিচয়। নতুন কালের নব নব আকর্ষণের বাইরে, বহু দূরে অম্বর আজ এক বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী মাত্র। আজকের পরিত্যক্ত অম্বরের মর্মোদ্ঘাটন করে রুডিয়ার্ড কিপলিঙের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। "স্বচ্ছ এক সরোবরের তিন দিক ঘিরে পাহাড়ের কোলে দূরে বিস্তৃত অম্বর শহর। প্রত্যুষের তরল অন্ধকারে আশা জাগে বেলা বাড়লে ঘুমন্ত অম্বর বুঝি জেগে উঠবে। কুয়াশায় ঢাকা শীতল উপত্যকায় সূর্যের আলো এসে পড়ে; পথিকের মনে এ-প্রতীতি বেদনার মত

বাজে—অম্বরের এ ঘুম কোনোদিন আর ভাঙবে না।"

* * *

পাহাড়ি রাস্তায় বাস এক জায়গায় মোড় ফিরতেই অকস্মাৎ এই ঘুমন্ত পুরীতে এসে প্রবেশ করলুম। এত অকস্মাৎ যে চিন্তা ভাবনা গুছিয়ে নিতে সময় লাগে। এ ত শুধু পিচঢালা সড়ক ধরে, মাঝ পথে কয়েকটি নিচু পাহাড় ডিঙিয়ে, জয়পুর থেকে অম্বরে এসে পৌঁছন নয়; এ যেন এক লহমায় আধুনিক সভ্যতা থেকে বিচ্যুত হয়ে চার পাঁচটা শতাব্দীর ওপারে এক জমকালো সামন্ততান্ত্রিক যুগে পৌঁছে গেলুম। ঢালু রাস্তায় ধীরে ধীরে বাস নামছে, বাঁহাতি জানলায় অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি সেই আশ্চর্য অম্বর প্রাসাদের দিকে, যার খ্যাতি একটা বাদশাহ জাহাঙ্গীরেরও ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। আঁকাবাঁকা সুরক্ষিত পথ শেষ হয়েছে বিশালকায় প্রবেশ-তোরণের সামনে; গ্রানিট ভিত্তিমূল থেকে প্রাসাদের দেওয়াল খাড়া উঠে গেছে বলিষ্ঠ ঋজুতায়। পুরনো—হাতির দাঁতের মত রঙ সে দেওয়ালের। অনাদরে শ্যাওলার ছোপ ধরেছে এখানে-সেখানে। পেছনে আশ্চর্য নীল আকাশ। আর সেই নীল হলুদের ভাঙা ভাঙা ছায়া পড়েছে নিচের তরঙ্গ-শিহরিত হ্রদে। চোখ ফেরান যায় না।

বাস এসে দাঁড়াল এক ফালি এক বাগানের সামনে। প্রাসাদে উঠবার পথ এই বাগানের মধ্য দিয়ে। শ্বেত পাথর বাঁধানো ফোয়ারা কয়েকটি, বাহারে ঝাউগাছ গুটি-কয় আর কিছু সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি। বাগান পার হয়ে নিচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে আঁকাবাঁকা প্রশস্ত পথ প্রবেশদ্বার অবধি প্রসারিত। এইখানে এই ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে নিচের উপত্যকায় বিগত-গৌরব অম্বর শহর নজরে পড়ে। অধিকাংশ বাড়িই ভেঙে পড়েছে, টুকরো টাকরা ছড়িয়ে রয়েছে এদিকে সেদিকে। শুধু এখনও অটুট আছে নগরের রক্ষা প্রাকার ধুলোয় লুটানো অম্বরের চারিদিকে পরিহাসের মত। ভারি পাথরের ফলা-কাটা দেওয়াল পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে, নেমেছে, দূরে মিলিয়ে গিয়েছে। আর বহু দূরে তামাটে প্রান্তরের শেষে ফিকে নীল রঙের পাহাড় তপ্ত দুপুরে রোদ্দুরে পোহায়। আগুনের হলকার মত থরথর করে কাঁপে শুকনো বাতাস।

ফটক পার হতেই বিস্তীর্ণ অঙ্গন। বাঁহাতি কিনারায় সিঁড়ি উঠে গেছে যশোরেশ্বরী কালীর মন্দিরে। এই সেই বিখ্যাত প্রতিমা যা বঙ্গ বিজয়ের পর রাজা মানসিংহ অম্বরে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। ভক্তজনের মতে এ-মূর্তির তুলনা ভারতবর্ষে বেশী নেই; এমন সুঠাম, এমন জীবন্ত। আর তারিফ করবার জিনিস আছে মন্দিরের অঙ্গনের চারপাশে শ্বেত-পাথরের জালির কাজ। মর্মরের উৎকৃষ্টতায় অথবা কারিগরির দক্ষতায় এ শিল্পসৃষ্টিগুলি আগ্রার ইতিমদদৌলা বা ফতেপুর সিক্রির শেখ সলিম চিশ্তির কবরের জাফরির কাজের সঙ্গে অনায়াসেই পাল্লা দিতে পারে। এতে আশ্চর্য হবার হয়ত কিছু নেই, কেননা একথা সুবিদিত যে, মোগল রাজধানীর স্থাপত্য-ভাস্কর্যে অম্বর-জয়পুরের শিল্পীদের দান অনেকখানি।

উগ্রা যশোরেশ্বরী সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, সাবেক আমলে দেবীর তুষ্টি কামনায় নাকি নিয়মিত নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল এখানে। রাজা মান বা মির্জা রাজার মত সুরুচিসম্পন্ন নৃপতিদের সময়েও এ-বর্বরতার কাহিনী অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। সওয়াই জয়সিংহ ত ছাগবলিও বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু দেবীর স্বপ্না-দেশে সে প্রথা নাকি আবার প্রবর্তিত হয়। বাঙলা দেশ থেকে যে পুরোহিতেরা প্রতিমার সঙ্গেই অম্বরে এসেছিলেন, বৈবাহিক সূত্রে কয়েক পুরুষে তাঁরা স্থানীয় রাজপুতকুলেরই অংশীভূত হয়ে পড়েছেন; বাঙালী বলে তাঁদের এখন আর সনাক্ত করা সহজ নয়। পুজা, আরতি, ভোগ-নিবেদনের চিরাচরিত রীতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি; বুঝি দেবীকেও একথা বোঝাবার নিষ্ফল প্রয়াস যে অম্বর শ্মশান হয়ে যায় নি এখনও।

যশোরেশ্বরী মন্দিরের পূর্বদিকে পাথর বাঁধানো বিস্তৃত চত্বরের একপাশে মির্জা রাজা জয়সিংহের অপূর্ব কীর্তি—দেওয়ান-ই-আম। পরিকল্পনায় মোগল, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে হিন্দু, এ-ইমারতটি কেন যে একদা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ঈর্ষার কারণ হয়েছিল কাছে এসে বুঝলুম। রঙিন-পাথরের নকশাকাটা মেঝে, সুনিপুণ কারুমণ্ডিত অগণিত স্তম্ভ আর খিলানের ঐশ্বর্য কিছু পল্লবিত করে দূত যখন মোগল-দরবারে এসে বর্ণনা করলে তখন দিল্লী-আগ্রার ওপর এই টেক্কা মারবার চেষ্টাকে বরদাস্ত করতে পারলেন না মহামান্য সম্রাট। একটা সামান্য সামন্ত-রাজ্যের স্পর্ধার সীমা থাকা দরকার। বিশদ খবর সংগ্রহের জন্য বিশ্বাসী অমাত্যেরা রওনা হয়ে গেলেন। আর, গোপনে, তাদেরও আগে ঘোড়া ছুটিয়ে বার হয়ে গেল মোগল-দরবারে নিযুক্ত অম্বরের গুপ্তচরেরা। অতি অল্প সময়ের মেয়াদে মির্জারাজা দেওয়ান-ই-আমের আগাগোড়া চুণের পুরু পলস্তারা দিয়ে ঢেকে ফেললেন। যথাসময়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীর এখবর শুনে নিশ্চিন্ত হলেন যে দিল্লী-আগ্রার সম্মান রক্ষা পেয়েছে, অম্বরের দেওয়ান-ই-আম সাদামাঠা চুণকাম-করা একটা দালান বই আর কিছু নয়।

গ্রানিট গিরিশীর্ষে অম্বর দুর্গ

মীরাবাঈয়ের মন্দিরঃ অম্বর
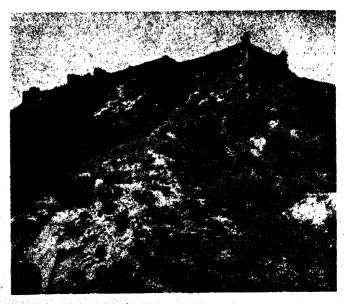
দেওয়ান-ই-আমের পাশেই অম্বর প্রাসাদের প্রবেশদ্বার সওয়াই-তোরণ। মানসিংহের সময় শুরু হয়ে এ-প্রাসাদ সম্পূর্ণ হয় সওয়াই জয়সিংহের আমলে। ফটকের বহুবর্ণ পাথর-বসানো রঙিন নকশা ও অতি সূক্ষ্ম জালির কাজকে অনেকে ভারতবর্ষে সর্ব-শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। আগ্রার ইতি-মদদৌলা বা সিকান্দরায় আকবরের কবরে এই 'পিয়েত্রা দুরা'র উৎকৃষ্ট নিদর্শন আছে সত্য, কিন্তু সওয়াই-তোরণের সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। আর, হিন্দু পারিবারিক স্থাপত্য-রীতির ক্ষেত্রে অম্বর প্রাসাদের তুলনা যে ভূভারতে বিরল একথা সর্বজন-স্বীকৃত। অনেক গলিঘুঁচি দালান পার হয়ে "যশ মন্দিরে" যখন পৌঁছলুম, মনে হল যেন সত্যিই এসে উত্তীর্ণ হলুম এক আলোর নিকেতনে। অল্ডাস হাক্সলি তাঁর জেসটিং পাইলেট গ্রন্থে এ-কক্ষটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। দেওয়ালে, থামে, ছাতে অসংখ্য টুকরো-কাঁচ বসানো; এক প্রতিবিম্ব ভেঙে ভেঙে শতখান হয়ে দেখা দেয়। সামনে, খোলা বারান্দার ধারে, বিস্তৃত ডালিম-বাগান। অনাদরে এখন শ্রীহীন, তবু টকটকে লাল ফুল ফুটেছে গাছে গাছে। পেছনে জাফরি-কাটা অলিন্দ; বাইরে তাকালে গা ছমছম করে। বহু নিচে, প্রাসাদের খাড়া দেওয়ালের গা ঘেঁষে সেই কালো তরঙ্গ-শিহরিত হ্রদ, তার ওপারে রুক্ষ উদ্ধত পাহাড়, আর পাহাড়ের পাশ দিয়ে যে ধু ধু প্রান্তর দেখা যায় তার শেষে ফিকে নীল দিগন্ত। এইখানে, এই সুসজ্জিত বিলাস প্রকোষ্ঠে, সৈনিকের স্বল্প অবকাশ উপভোগের জন্য কতবার ফিরে এসেছেন রাজা মানসিংহ। পরিপূর্ণ বিশ্রামের মধ্যে এই বাতায়নপথে দূরে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ক্ষণে ক্ষণে হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন তিনি। সহচরীরা উদ্বিগ্না হয়েছেন; বীরের তুষ্টি কামনায় অধীরা হয়েছেন। হায়, সবই বিফল হয়েছে। ওই নিদারুণ দিগন্ত হাতছানি দিয়ে পুনরায় তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছে কাবুলে, কান্দা-হারে, দাক্ষিণাত্যে, বাঙলায়।......

সমৃদ্ধির দিনে আজকের এই পরিত্যক্ত শহরের অঙ্গে মির্জা রাজা অথবা সওয়াই জয়সিংহ কিছু সাজ পরিয়েছেন, কিছু রঙ চড়িয়েছেন সত্য, কিন্তু অম্বরের সাবেক কাঠামোটা রাজা মানসিংহের। বিশ্রুত-কীর্তি এই রাজপুত নৃপতির আমলে এ-রাজধানীর খ্যাতি-প্রতিপত্তি যে-স্তর স্পর্শ করেছিল তেমন আর কোনো দিন করে নি। অম্বরে এসে রাজা মানের কথা সেজন্য যত মনে পড়ে এমন আর কারও কথা নয়। আর মন উধাও হয় প্রাসাদের অদূরে মীরা বাঈ-এর মন্দিরে এসে, যেটিকে অম্বরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি বলতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। অনাদৃতা চিতোর রাজকুলবধূ মীরাবাঈ যখন চিতোর পরিত্যাগ করে পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রা করেন তখন পথিমধ্যে অম্বরে নাকি বিশ্রাম করেছিলেন কিছুদিন। তাঁরই স্মৃতিরক্ষায় এ মন্দির পরে নির্মিত হয়েছিল। সন্তর্পণে বন্ধুর পথ অতিক্রম করে যখন কাছাকাছি এসে পৌঁছলুম তখনও এর সৌন্দর্য কল্পনা করতে পারিনি। হঠাৎ বাঁহাতি মোড় ফিরতেই এক আশ্চর্য সুন্দর তোরণের ভেতর দিয়ে পরিচ্ছন্ন মন্দিরটিকে দেখতে পেলুম। বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে সোনার আলপনা বুলিয়েছে দেবালয়ের গায়ে। প্রথম দৃষ্টিতে আমার মনে হল ভগবৎ প্রেমের একটি নিষ্কম্প দীপশিখা যেন ঊর্ধ্বে উৎসারিত হয়েছে; যেন পাষাণ-কায়ায় একটি সুললিত স্তব স্তব্ধ হয়ে রয়েছে ধূসর আকাশের পটভূমিতে।......কল-রব করে টিয়া উড়ে গেল এক ঝাঁক। দিন শেষের সমান্তরাল রোদ্দুর ডানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল তাদের। অম্বরের মৃত্যুনীল মন্থর আকাশে সবুজ-সোনালির একফালি প্রাণ-স্রোত চকিতের মত অনধিকার প্রবেশ করে পরক্ষণেই দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল।.........

* * *

অম্বর দেখা শেষ হল। বিমূঢ়ের মত জয়-পুর যাবার শেষ বাসে এসে বসলুম। সেই কাকচক্ষু জল হ্রদে প্রাসাদের ছায়া এখনও কাঁপছে। সন্ধ্যারতির করুণ ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে যশোরেশ্বরীর মন্দির থেকে। ধীরে ধীরে চড়াইয়ের পথে বাস উঠে এল। জীবনের এক অতি সুমধুর অভিজ্ঞতা যেন ফেলে রেখে গেলুম এই জনহীন উপত্যকায়।

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

যখনকার কথা বলছি আনারবাগ তখন নেটিভ স্টেট ইনামপুরের রাজধানী। নতুন বা পুরোনো কোন মানচিত্রেই অবশ্য এ নাম দুটো খুঁজে পাবেন না। কারণ, নিখাদ সত্যি ঘটনাটা বলবার মত দুঃসাহস আমার নেই এবং বলা হয়তো উচিতও নয়। ডাল্টনবাজারের ইতিহাস আমি যেভাবে মহুয়ামিলনের নামে চালিয়েছি, রুমা বাঈকে নিয়ে গল্প লিখতে হলেও সেই পন্থাই অনুসরণ করতে পারতাম। কিন্তু যে স্টেটেরই নাম দিই না কেন, কে বলতে পারে সেখানেই রুমা বাঈ ধরনের অন্য কোন চরিত্র আছে কিনা। গল্পকে নিছক গল্প হিসেবে স্বীকার করেন না, এমন পাঠকের অভাব নেই এবং সে কারণেই সম্প্রতি আমি একটু বিপদেও পড়েছিলাম।

রুমা বাঈ অবশ্য আজ আর বেঁচে নেই, থাকলেও এ গল্প পড়ে হয়তো খুশিই হতেন। কিন্তু উষ্মা প্রকাশ পেতো রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের ব্যবহারে।

আশ্চর্য এই যে, আনারবাগের পঞ্চান্ন বছরের আধ-পাগলা রাজা বাহাদুরের কাছে রুমা বাঈয়ের চরিত্রের কোন দিকটাই অজ্ঞাত ছিল না।

রাজা বাহাদুরের খাস আস্তাবলের হেড সহিসের সুন্দরী স্ত্রী জাহানারার সঙ্গে প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহের নাম জড়িয়ে গোপনে হাসাহাসি করতো অনেকে এবং পরপর নানা ঘটনার সূত্র জুড়ে কিউ ই ডি লিখে প্রমাণ করে দিতো যে রুমা বাঈ আসলে রাজা বাহাদুরের মেয়ে।

হলেও আপত্তি করবার কিছু ছিল না। রূপে এবং বলা বাহুল্য যৌবনে, রুমা বাঈ ছিল একেবারে ষোল আনা রাজকন্যে।

তখন পর্যন্ত আমি রুমা বাঈ নামটাই শুনেছি, স্বচক্ষে তাঁর দর্শন পাবার সৌভাগ্য হয়নি। কারণ, আমি ইনামপুর স্টেটের প্রজা ছিলাম না। আনারবাগের নতুন সুগার ফ্যাক্টরীতে চাকরী নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে।

এখন অবশ্য আমি ইনামপুর স্টেটের পাইক বরকন্দাজদের নাগালের বাইরে এবং রাজা বাহাদুরের প্রতাপও এখন শুধু তাঁর নামেই, তাঁর স্বেচ্ছাচারের আইন এখন ঠুঁটো হয়ে গেছে। তবু তাঁকে ভয় করার একটি কারণ আছে। যে হেভি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীটায় আমি এখন চাকরী করছি, তার রেসিডেন্ট ডিরেক্টর কালে সাহেব প্রতাপকিঙ্করের পিয়ারের দোস্ত এবং রাজা বাহাদুরের সুপারিশেই আমি এ চাকরীটা পেয়েছি।

সুপারিশ পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি লোকটা যে কে তা রাজা বাহাদুর স্বচক্ষে কোনদিন দেখেন নি। স্বচক্ষে তিনি কিছুই দেখতেন না। ফর্সা গোলগাল চেহারা, বাকাঁটা ভোজপুরী দারোয়ানের মত। আর এই শরীরের ওপর একরাশ মখমলের রাজবেশ, মখমলের ওপর সোনালী জড়ি, লাল নীল নানা দুর্মূল্য পাথর চুমকির মত বসানো। সিংহাসনে বসে মাথায় মুকুট পরে একটা ছবি তুলিয়েছিলেন প্রতাপকিঙ্কর, আর সেই ছবিটাই তিন রঙে ছাপা ক্যালেণ্ডার হয়ে আমাদের সকলের মেসে কোয়ার্টারে শোভা পেতো।

তাই রাজা বাহাদুরকে আমরা সকলেই চিনতাম। চিনতাম না রুমা বাঈকে।

সেদিন শুক্ল তিথির রাতে শরীরে জ্যোছনার মলমল জড়িয়ে কোথায় রোমান্সের পক্ষীরাজে উড়ে বেড়াবার কথা, তা নয় হঠাৎ কেমন যেন বেতো বুড়োর মত খিটখিটে হয়ে উঠেছিলাম। হয়তো চাকরীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েই।

একশো পঁচিশ টাকা মাইনেতে বহাল হয়ে গিয়েছিলাম আনারবাগের সুগার ফ্যাক্টরীতে, যে কারখানার স্বত্বাধিকারী ছিলেন স্বয়ং রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর। আর যেহেতু স্টেটের দেওয়ানজী মিস্টার রায় এবং চিনির কারখানার মাদ্রাজী ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামী এ দুজনের একজনেরও আশ্রিত লোক ছিলাম না, সেই জন্যেই হয়তো স্থায়ী ভাবেই আমাকে রাতের শীফটে ফেলে দিয়েছিলেন য়্যাসিস্টেন্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার করিম সাহেব।

ডাকে পাওয়া নিয়োগপত্রটি নিয়ে যেদিন প্রথম হাজির হলাম করিম সাহেবের কামরায়, সেদিনই টের পেয়েছিলাম, কপালে কি দুর্ভোগ আছে।

ফাইল ঘেঁটে আমার দরখাস্তটার ওপর চোখ বুলিয়ে কি যেন খুঁজে পেলেন না করিম সাহেব। অন্তত তাঁর মুখচোখ দেখে তাই মনে হয়েছিল।

আর সেইজন্যেই বোধহয় ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কার লোক তুমি?

প্রশ্নটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু বুঝতে না পারলে যে শুনতে পাই নি এমন একটা মুখভাব করে বেগ ইওর পার্ডেন বলতে হয় সে বিদ্যে রপ্ত ছিল।

করীম সাহেব উল্টে চটেই গেলেন। —কানে কম শোনো নাকি? কার লোক তাই জিগ্যেস করছি।

বললাম, আজ্ঞে তা তো জানি না, কাগজে কেমিস্ট চাই বিজ্ঞাপন দেখে এপ্লাই করেছিলাম।

—আই সী! অস্ফুটে বললেন করীম সাহেব, তারপর আমার নিয়োগপত্রের এক কোণে লাল কালিতে লিখলেন, রেকমেন-ডেড ফর নাইট শীফট। লিখে নীচে নাম সই করে বললেন, ঐ যে গলাবন্ধ কালো কোট পরে কেরাণীবাবু বসে আছেন, ওর কাছে যাও। গিয়েছিলাম, এবং যাওয়ার পর সেই যে নাইট শীফটের ইনচার্জের সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তারপর থেকে একদিনের জন্যেও দিনের শীফটে বদলি হতে পাই নি।

ফলে সারারাত ডিউটি দিয়ে এসে সারা দিন পড়ে পড়ে ঘুমোতাম, আনারবাগের লোকজনের সঙ্গে ভালো করে আলাপ করার সুযোগও পাই নি। তাই বোধহয় সেদিন ঘুরন্ত পিনিয়নটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটা অসহ্য বিতৃষ্ণা জমা হচ্ছিল মনের মধ্যে।

কারখানাটা ছিল বেশ খানিকটা উঁচু টিলার গায়ে। কিছুটা সমতল জমি কারখানার এলাকা পার হয়ে, তারপর ঢালু নেমে গেছে নীচের কুলিকামিনদের বস্তী অবধি।

একটা মোটা জলের পাইপ অতিকায় একটা অজগরের মত নেমে এসেছে ওপরের রিজারভয়ের থেকে, এসে ঢুকেছে কারখানার ভেতর। কুলিমজুরের হট্টগোল এড়িয়ে বাইরে এসে বসেছিলাম পাইপটার ওপর। বসে বসে দেখছিলাম আনারবাগের রূপ।

পূবের সীমান্তে যতদূর চোখ যায় শুধুই হিমাচলের আঁকাবাঁকা তরঙ্গ। যেন সুদীর্ঘ একখানি শ্যামল শাড়ী বিছানো আছে আকাশের গায়ে। আর জ্যোৎস্নার রোশনাই লেগে তুষারশুভ্র হিমচূড়ার রেখাটি যেন ফিকে রূপালী রঙের পাড়। কোন দৈত্যের কঙ্কালের মত চারপায়া উঁচু রিজার্ভয়েরের পিছনে ধোঁয়াটে আকাশের গায়ে বড়ো এক টিপ চাঁদ।

আনমনা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম সেদিকে।

মেশিন চলছে। কোরিয়ার থেকে আখের রাশি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ক্ষিদে মেটাচ্ছে রসলোভী যন্ত্রের।

অবিরত শোঁ শোঁ শব্দ, আর পিনিয়নের মূর্চ্ছনা। পিনিয়নের দাঁতে দুটি বিশাল হিংস্র চাকার মধ্যে রাশি রাশি আখ মাড়াই হচ্ছে, একদিকে জমা হচ্ছে ছোবরার রাশ, আর অন্যদিকে একটি উন্মুক্ত চোঙা বেয়ে ঢলে পড়ছে আখের রস।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একটি ছায়াশরীর এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

এতখানি দূর থেকে স্পষ্ট দেখা গেল না, কিন্তু লোকটি যেন এক আঁজলা রস তুলে পান করবার জন্যে ঝুঁকে পড়লো।

কুলিমজুরদের সঙ্গে কাজ করে করে মেজাজটাও হয়ে উঠেছিল রুক্ষ।

চিৎকার করে উঠলাম।—এই বেকুফ!

ছায়াশরীর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, শব্দ লক্ষ্য করে তাকালো আমার দিকে।

এগিয়ে যেতে যেতে রুক্ষস্বরেই বললাম। বললাম, কি করছিলে?

কিন্তু ততক্ষণে আমি আরো কাছে পোঁছে গেছি। চাঁদের আলোয় তার শরীরের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরুষ নয়।

বব্ করা নরম চুল, উলের আঁট ব্লাউজ, ট্রাউজারের কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

—বলছিলে কিছু? পরিস্কার উর্দুতে নারীকণ্ঠের শান্ত প্রশ্ন শুনলাম।

গলার স্বর আপনা থেকেই নরম হ'ল, বললাম, কি করছিলেন আপনি? এ রসে হাত দেয়া বেআইনী।

মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো। বে-আইনী? বলে চুপ করলে মেয়েটি। আমি কে জানো হে ছোকরা? আমি রুমা বাঈ।

রুমা বাঈ! সমস্ত শরীরে যেন শিহরণ খেলে গেল। আর পর মুহূর্তেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। অস্বস্তি, না ভয়?

আপনা থেকেই গলার স্বর শান্ত হল, যন্ত্রচালিতের মত তিনবার কুর্ণিশ করে তিন পা পিছিয়ে এলাম, সন্ধ্যের সময়, একদিন দেওয়ানজী মিস্টার রায় কারখানা দেখতে আসায় ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামী যেভাবে কুর্ণিশ করেছিলেন ঠিক সেইভাবে।

তারপর মাথা তুলে দেখলাম, রুমা বাঈ যেন কৌতুকের হাসি হাসছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, নতুন এসেছো, না? কোথাকার লোক তুমি?

—বেঙ্গল। ছোট্ট একটি কথা, তাও যেন জিভে জড়িয়ে গেল।

—তাই বলো। কিন্তু একটু ভদ্র হতে চেষ্টা করো। কারণ এটা বাংলা দেশ নয়, আর রুমা বাঈয়ের ইচ্ছাটাই এখানে আইন।

এত চেষ্টা করেও হাত দুটোকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখতে পারলাম না, হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, এ রস তো খেতে পারবেন না, এতে ধুলো বালি ময়লা মিশে আছে, একটু অপেক্ষা করেন তো ভালো টাটকা রস এনে দিচ্ছি। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছুটে গেলাম।

মিনিট দুই পরে কাঁচের গ্লাসে টাটকা এবং ছাঁকা পরিস্কার রস নিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন রুমা বাঈ উধাও। এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম প্যালেসের দিকে বেঁকেবেঁকে যে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে সেই রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে এক-খানা মোটরবাইক। আর মোটরবাইকের আরোহীর দেহরেখাটা যেন রুমা বাঈয়ের বলেই মনে হল।

সে রাত্রিতে আর কাজে মন বসলো না। একটি নাম কেবলই ঘুরে বেড়ালো কানের চারপাশে, বিভীষিকার মত। রুমা বাঈ! রুমা বাঈ!

কারখানার প্রতিটি কর্মীর কাছে কতবার শুনেছি এ নাম। কত গোপন রসিকতা, কত অবোধ্য রহস্য। ভয় আর ভালোবাসা। বিদ্যুতের মত যার আকর্ষণ। বিদ্যুতের মতই যার চোখে মৃত্যুর পরোয়ানা।

সমস্ত শরীরে জ্বরাতুর উত্তাপ আর মনে দুশ্চিন্তার পাথর নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম সে রাত্রে।

তারপর দুপুরে এক সময় ডাক পড়েছিল করীম সাহেবের কাছে।

ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

করীম সাহেব একরাশ কাগজপত্রের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে বসেছিলেন, মাথা না তুলেই বললেন, নাইট শীফটে তুমি ছাড়া আর কোন বাঙালী আছে?

বললাম, না স্যার।

—হুঁ।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন করীম সাহেব, মাথা তুললেন না। তারপর এক সময় হঠাৎ বললেন, তোমার সাহস তো কম নয়, ম্যানেজারের কাছে কমপ্লেন করেছো আমার নামে?

—কমপ্লেন করেছি? বিস্মিত হলাম।

—করোনি? নাইট শীফটে রেখেছি বলে দরখাস্ত করোনি তুমি?

—না স্যার।

—হুঁ। আচ্ছা যাও, কাল থেকে ডে শীফটে

কাজ করবে। করীম সাহেব এবারেও মাথা না তুলেই বললেন।

চলে আসছিলাম, হঠাৎ বললেন, মিস্টার কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে দেখা করো।

দুর্বোধ্য বিস্ময় আর আশঙ্কার অনুরণন বাজলো মনের কোণে। তবু ভয়ে ভয়ে গিয়ে দেখা করতে হ'ল ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে।

নমস্কার করে বললাম, ডেকেছেন আমাকে?

অনেকক্ষণ ধরে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মিস্টার কৃষ্ণস্বামী বললেন, দেওয়ানজী মিস্টার রায় তোমার রিলেটিভ? আগে বলোনি কেন?

বললাম, আজ্ঞে না, দেওয়ানজী আমাকে চেনেনও না।

কৃষ্ণস্বামী হাসলেন।—চেনে না? অথচ তোমাকে ডে সীফটে বদলি করবার জন্যে ফোন করেছিলেন আমাকে?

বললাম, বিশ্বাস করুন—

—রাতের শীফটে তো তুমিই একমাত্র বাঙালী?

বললাম, হ্যাঁ স্যার।

কৃষ্ণস্বামী কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা যাও। কাল থেকে ডে শীফটে।

চলে এলাম। কিন্তু যে খবর শুনে খুশি হয়ে ফিরে আসার কথা, সে খবর শুনেই কেমন যেন আতঙ্ক বোধ করলাম।

দেওয়ানজী মিস্টার রায়! তিনি বলেছেন আমাকে দিনের শীফটে বদলি করতে, কেন? আমাকে চিনলেনই বা কি করে? ভাবলাম, কে জানে, আমি যে বাঙালী সে-খবর হয়তো তাঁর কানে গেছে। তাই তিনি রাত্রির নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন আমাকে। কিংবা, কে জানে, দেওয়ানজীর সুপারিশে চাকরি পাওয়া বীরেন বক্সীই হয়তো সহকর্মীর জন্যে এ কাজটুকু করে দিয়েছে।

দিনের পাল্লায় আমি এবং বীরেন বক্সী ছাড়াও আরো পাঁচজন বাঙালী ছিল। তাই কাজের সঙ্গে আড্ডা আর গল্পগুজব যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গিয়েছিল। কৃষ্ণস্বামী এবং করীম সাহেব সাধারণত দপ্তরেই বসে থাকতেন, দু'এক মিনিটের জন্যে যদি বা আসতেন তো বাতাসের আগে সাবধানবাণী পৌঁছে যেত।

সেদিনও অমনি কানে কানে খবর এলো, রুমা বাঈ আসছে, রুমা বাঈ আসছে। সঙ্গে দেওয়ানজী।

মিনিট কয়েক পরে কৃষ্ণস্বামী এবং করীম সাহেবের সশ্রদ্ধ পথপ্রদর্শনকে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করতে করতে রুমা বাঈ এগিয়ে এলেন। মেশিন নয়, মানুষগুলোর দিকেই যেন তাঁর চোখ। কিন্তু ছিমছাম চেহারার

মেশিন নয়, মানুষগুলোর দিকেই যেন দৃষ্টি....
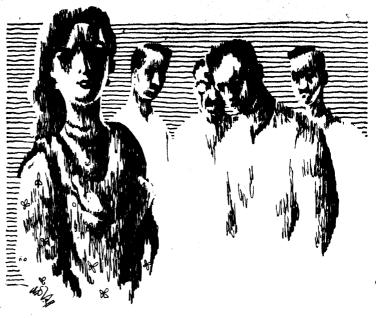
দেওয়ানজীর দৃষ্টি কাজের দিকে। আমরা দেখলাম শুধু রুমা বাঈকে।

সেদিন রাত্রিতে রুমা বাঈকে দেখেছিলাম, আর এ রূপে যেন ভিন্নজনের। দামী রেশমের শালোয়ার আর পাঞ্জাবীতে তাজা রক্তের বর্ণাভা, সলমা চুমকির ঝলমলানি আর গোলাপী ওড়নার প্রান্ত লুটিয়ে আছে যৌবনোদ্দীপ্ত বুকের উপর। চোখের নীচে সূক্ষ্ম সুর্মার শোভানি। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দুটি সুডোল হাত যেন গোলাপের পাপড়ি দিয়ে মাজা, যৌবনপুষ্ট জঙ্ঘায় অস্থির চঞ্চলতা।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়লো, কাছে এগিয়ে এলেন রুমা বাঈ। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বিজন আচার্যের দিকে দৃষ্টি ফিরলো তাঁর।

—এই ছোকরা, শোনো এদিকে।

বিজন এগিয়ে এলো, কুর্ণিশ করে সামনে দাঁড়ালো।

রুমা বাঈ জিগ্যেস করলেন, কি নাম তোমার?

নাম বললে বিজন।

—আচারিয়া? আচ্ছা যাও, কাজ করবে যাও। বলে অন্য একটা মেশিনের দিকে এগিয়ে গেলেন রুমা বাঈ।

আমাদের ফ্যাক্টরীর তৈরী এক মুঠো চিনি দেখালেন মিস্টার কৃষ্ণস্বামী।

সন্তুষ্ট হ'লেন না রুমা বাঈ।—এ তো স্রেফ ধুলো, এর চেয়ে বড়ো দানা হয় না?

জাভা, চিনির নম্বরওয়াটা কারখানায় তৈরী ব'লে দেখিয়ে দিলেন কৃষ্ণস্বামী। বললেন, দু'রকমই হয়।

দেখে সন্তুষ্ট হলেন রুমা বাঈ। ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন।

আর ওরা সদলবলে চলে যাওয়ার পর ঠাট্টা শুরু করলাম আমরা বিজনকে নিয়ে।

আমার চেয়ে বয়সে ছোটই ছিল বিজন। কিন্তু শুধু সেই জন্যেই নয়, বিজনের ওপর আমাদের সকলেরই কেমন একটা দুর্বলতা ছিল অন্য কারণে। রুমা বাঈকে দোষ দেয়া যায় না, যে কোন নারীমন বিজন আচার্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, আর সে চেহারার চুলে এবং চোখে কি এক অনুপম মাধুর্য। অথচ পোশাক পরিচ্ছদ নোংরা, সব সময়েই মেশিনের তেল আর কালি লেগে আছে। তার কারণ, বিজনের চাকরিটা ছিল অতি নগণ্য। মেশিন পরিষ্কার করা, দাঁতে দাঁতে মোবিল ঢালা। মাইনে ছিল পঞ্চান্ন টাকা, সে বাজারেও যা লোভনীয় ছিল বলেই বাংলাদেশ ছেড়ে এত দূরে আসতে হয়েছিল তাকে।

কিন্তু আমাদের প্রাদেশিক আভিজাত্যে ঘা লাগতো তার জন্যে। বিজনের চেয়েও তো কম কোয়ালিফায়েড লোক ছিল ইনামপুর স্টেটের সুগার ফ্যাক্টরীতে। অথচ বিজনের বেলাতেই কিনা এমন চাকরি?

সেই বিজনকে ডেকে কথা বলেছেন রুমা বাঈ, সুতরাং রসিকতা করতে ছাড়বো কেন আমরা।

বললাম, দেখিস ভাই, সেদিন রাত্তিরে খুব ফাঁড়া কেটে গেছে, বিপদে পড়লে বাঁচাস বিজন।

শুধু বক্সী হেসে বললে, সাবধান বিজন, রুমা বাঈ কিন্তু একটি আসল কেন-ক্রাশার। আখ হয়ে ঢুকলে—

নিষ্কাশিত-রস ছিবড়ের স্তূপটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হাসলো বক্সী।

রহমান, আয়ার, মিশ্র কেউই ঠাট্টা করতে কসুর করলে না।

কিন্তু ঠাট্টা যে সত্যি হতে পারে তা আমরা কেউ কল্পনাও করিনি।

আনারবাগের একটা দিকের নাম ছিল বাঙালীটোলা। স্টেটের বাঙালী চাকুরেরা সকলেই থাকতেন সেই পাড়ায়, একমাত্র দেওয়ানজী মিস্টার রায় ছাড়া। বাঙালী-টোলার কালী মন্দিরের পাশেই ছিল একটা মেস, আর সেই মেসে আমরা জন পঁচিশেক লোক থাকতাম। সুগার ফ্যাক্টরীর সাতজন, হেভি কেমিক্যালস্-এর কয়েকজন, আর্ট স্কুলের একজন শিক্ষক, মেয়েদের কলেজের একজন কেরানী এবং আরো যেন কে কে। বৃহস্পতিবারটা ছিল আমাদের ছুটির দিন।

সকালের চা আর ডাকযোগে আসা বাসি খবরের কাগজ নিয়ে বারান্দায় বসে আছি আমরা, হঠাৎ লাল রঙের টু সীটারখানা দেখা দিল।

শোঁ করে বাঁক নিয়ে একেবারে আমাদের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ালো গাড়িটা।

দেখলাম, স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন রুমা বাঈ।

মেসের দারোয়ানটা ছুটে গেল, ফিরে এলো তটস্থ হয়ে। আচারিয়া সাহেবকে ডাকছেন রুমা বাঈ।

হাঁটুতে হাঁটু ঠেকলো বিজনের, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দাঁড়াল বিজন। হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিলেন রুমা বাঈ, কি যেন বললেন বিজনকে, আর আমাদের চোখের সামনেই বিজনকে পাশে বসিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম সকলে। এমন ঘটনা যেন গল্পেই ঘটে। না, গল্পেও নয়। শুধু দুর্নামী রটনায়।

বক্সী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, লাজ লজ্জার বালাই নেই। একেবারে—

জানি না, বক্সী হয়তো এখনো আনার-বাগেই আছে, সুতরাং তার শেষ কথাটা না বলাই ভালো। কিন্তু মানুষ কথায় আর কতটুকু প্রকাশ করতে পারে, মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণাকে ভাষা দেবার মত বাহন হয়তো এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

রুমা বাঈ! যে নামটা এতদিন ছিল বিস্ময়ের, আশংকার, আতঙ্কের কণ্ঠে উচ্চারণ করবার মত, সেই নাম যেন ঘৃণার মন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। আর দুঃখ হল বিজনের জন্যে। ওর কি দোষ, কি করতে পারে ও বেচারী, এই অনাচারের রাজত্বে।

কিন্তু আমরা নিজেরাও বুঝতে পারিনি, কখন থেকে বিজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম আমরা।

প্রথম দিন বিজন ফিরে আসার পর জিগ্যেস করেছিলাম, কোথায় গিয়েছিলি, কেন ডেকে নিয়ে গেল?

শুনে হেসেছিল বিজন। —তোমরা যা ভাবছো তেমন কিছু নয়।

আমরা কিন্তু বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস না করারই কথা। দিনে দিনে পরিবর্তন লক্ষ্য করতাম বিজনের। পোশাক-পরিচ্ছদে সব সময়েই ফিটফাট হয়ে থাকতো বিজন। কোন-দিন নিজেই আসতেন রুমা বাঈ, কোন-দিন বা গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন।

প্যালেসের দর্জি শেখ সাহেব আসতো কোন কোনদিন, আর আমরা যেভাবে কুর্ণিশ করেছিলাম রুমা বাঈকে, সেইভাবেই বিজন আচার্যকে কুর্ণিশ করতো দর্জিটা।

দেখে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম আমরা। কিন্তু বিজনের সামনে হাসিঠাট্টা করতে সাহস হত না। বুঝতে পারিনি, আপনা থেকেই বিজনকে ভয় পেতে শুরু করেছি আমরা।

ইতিমধ্যে ধাপে ধাপে চাকরিতে উন্নতি হচ্ছিল বিজনের। মেশিন-ইন-চার্জ, ইনচার্জ থেকে সুপারভাইজার, সুপারভাইজার থেকে প্রোডাকশন ম্যানেজার। যিনি প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিলেন তাঁকে বদলি করে দেয়া হল হেভি কেমিক্যালসের ফ্যাক্টরীতে। আর আমি হলাম ব্লিচিং ডিপার্টমেণ্টের কেমিস্ট-ইন-চার্জ। মাইনে এক পয়সা বাড়লো না, বাড়লো কাজ।

সেই জন্যেই যত রাগ গিয়ে পড়লো বিজনের ওপর। যার জন্যে সহানুভূতি দেখাতাম, তাকেই ঈর্ষা করতে শুরু করলাম।

সহানুভূতি থেকে ঘৃণা, ঘৃণা থেকে ভয়, ভয় থেকে ঈর্ষা। আশ্চর্য, মানুষের মন!

কথাবার্তা একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। প্রয়োজনের সময়ে যে দু'চার কথা বলতাম তাও মেপেজুখে। যে অন্তরঙ্গতার সূত্রে
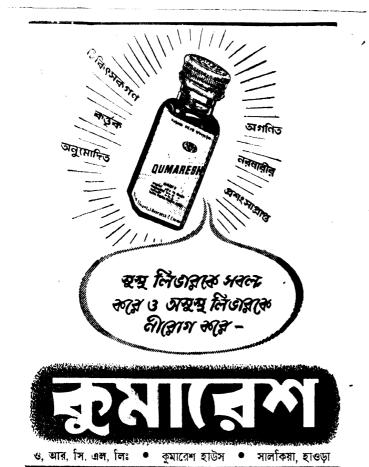
বাঁধা ছিলাম আমরা তা থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল বিজন!

মেস ছেড়ে অন্য একটা বাড়িতে উঠে গেল ও, আর আমরা একজোট হলাম ওর বিরুদ্ধে। আলোচনা করতাম, ষড়যন্ত্র করতাম কিভাবে জব্দ করা যায় বিজনকে।

নাইট শীফটের সকলেই ছিল আমার পরিচিত। তারা জানতো, প্রোডাকশন ম্যানেজার হওয়ার যোগ্যতা নেই বিজনের। তার না ছিল শিক্ষা, না অভিজ্ঞতা। তবু কেন সে সকলের মাথার ওপর চড়ে বসে থাকবে!

এ পি এম ছিলেন ধুরন্ধর লোক। বিজনের ওপর তিনিও ছিলেন অসন্তুষ্ট। তাই আমাদের কথা শুনে অসহযোগ শুরু করলেন তিনি। বিজনের আদেশটুকুই মানতেন, নিজের বিদ্যেবুদ্ধির সাজেশন দিয়ে এতটুকু উপকার করতেন না। ফলে, প্রোডাকশন কমতে লাগলো। এ ছাড়া, আজ এ মেশিন বন্ধ, কাল ওটা খারাপ। আর কেমিস্টের কারসাজিতে যা তৈরী হতে শুরু হ'ল কাশীর চিনিও তার তুলনায় উঁচুদরের।

দ্রুত উন্নতির তালে তালে চলতে পারলো না বিজন, মেজাজ হয়ে উঠলো রুক্ষ।

বিজনের ব্যবহারে কুলিমজুরদের মধ্যেও অসন্তোষের বীজ ছড়িয়ে পড়লো।

তবু টনক নড়লো না ম্যানেজারের। খোদ রুমা বাঈ যার সহায়, তাকে আমরা অপদস্থ করবো কি করে।

ওদের সন্ধ্যাভিসার জ্বালা ধরিয়ে দিতো আমাদের মনে। কোনদিন দেখতাম গুলাব মহলের ঝাউবাগানে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে বিজন আর রুমা বাঈ। কোনদিন বা পাহাড়ী ঝর্ণাটার ধারে জলে ভাসা পাথরে বসে গল্পগুজবে মত্ত।

আশ্চর্য চোখ ঝলসানো রূপ ছিল রুমা বাঈয়ের। আসমানী স্বচ্ছ শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে জ্বলতো তার যৌবনের উন্দামতা, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য।

একদিন দেখেছিলাম, সংকীর্ণ গিরিপথ বেয়ে ছুটে চলেছে এক জোড়া আরবী ঘোড়া। ফুটফুটে সাদা ঘোড়াটার পিঠে দৃপ্ত ভঙ্গীতে বসে আছেন রুমা বাঈ।

আরেকদিন দূরে থেকে দেখেছিলাম, সুইমিং কস্টিউম পরে স্নান করছেন রুমা বাঈ, ঝর্ণার জলে নেমে। সে কি হাসাহাসি, পরস্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে সাঁতার কেটে দূরে পালানো।

স্নান সেরে একটি শ্বেতাভ পাথরের ওপর এসে দাঁড়ালেন রুমা বাঈ। নারীর শরীর নয়, যেন জ্বলন্ত কামনা।

ধরা পড়ার ভয়ে দূরে থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন।

কিন্তু বিজন পালিয়ে আসতে পারে নি।

ও হয়তো সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল রুমা বাঈকে। তা না হ'লে মোতিকুমারীকে বিয়ে করতে রাজী হ'তো ও।

খবরটা এনেছিল বক্সী। —শুনেছো ব্যাপার? বিজনের সঙ্গে মোতিকুমারীর বিয়ে দিতে চায় রুমা বাঈ।

—মোতিকুমারী কে? প্রশ্ন করেছিলাম।

বক্সী বিস্মিত হয়েছিল। —সে কি? চেনো না তাকে? স্টেটের মেডিক্যাল অফিসারের মেয়ে। রোগা আর কালো সেই কুৎসিত চেহারার মেয়েটা, যে মেয়েদের ইস্কুলে টিচারী করে। দু'বেলা তো যায় এখান দিয়েই।

চিনতে পেরেছিলাম। যৌবন বয়সেও যে নারীদেহ কত কুৎসিত হতে পারে মোতিকুমারীকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

তাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, বিয়ে দিয়ে রুমা বাঈয়ের লাভ?

বক্সী হেসেছিল, উত্তর দেয়নি।

তারপর বলেছিল, রাজকন্যের খেয়াল। তোমাকে যে রাতের শীফ্ট থেকে দিনে বদলি করিয়েছিল, কেন? লাভ ছিল ওর?

—সে কি? রুমা বাঈ বদলি করিয়েছিল? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

বক্সী শুনে হাসলো।—জানতে না?

বললাম, কোন্ খবরটাই বা আমরা জানি। কিন্তু মোতিকুমারীর সঙ্গে যদি বিজনের বিয়ে হয় তা হ'লে খুশি হবো। কিংবা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে যদি খোঁড়া হয়।

বক্সীও হেসেছিল। —হবে, হবে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

যে কোন ভাবে বিজনের ক্ষতি করতে পারলে, বিজনকে অসুখী দেখতে পেলে তখন সত্যিই খুশি হয়ে উঠতাম। আমাদের সকলের কাছেই ও তখন চক্ষুশূল।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিজনও যে রুমা বাঈয়ের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, জানতাম না।

সন্দেহ হ'ল যেদিন শুনলাম চিনির কারখানা থেকে হেভি কেমিক্যালসে বদলি হয়েছে বিজন।

বক্সী বললে, শুনেছো খবর? পাঁচশো থেকে তিনশো টাকায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজনকে।

—সত্যি?

আজ স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু সেদিন সত্যিই খুশি হয়েছিলাম। আমাদের সমস্ত পরাজয়, সব গ্লানি যেন মুছে গেল এই একটি খবরে।

ঠিক যেমনভাবে ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে উঠেছিল, তেমনি ধাপে ধাপে নামতে শুরু করলো ও। আর আমরা সকলেই তার দুর্দশা দেখে আনন্দে আত্মহারা হ'লাম। কারণটাও অজানা রইলো না। রাজা প্রতাপ-কিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর তখন তিনখানা ডাকোটা বিমান কিনেছেন, আনার-বাগ থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করবার জন্যে। আর এই ডাকোটা বিমানের পাইলট হয়ে যে তিনজন নবাগতের আগমন হ'ল তাদের একজন হ'লো নিহাল। পাঞ্জাবী হিন্দু, অর্থাৎ দাড়িগোঁফ চাঁছা সুশ্রী চেহারা, যেমন সুশ্রী তেমনি স্মার্ট।

এই নিহালের সঙ্গে প্রায়ই আকাশ বিহারে যেতে শুরু করলেন রুমা বাঈ। শুনতে পেতাম রুমা বাঈ নিজেও নাকি প্লেন চালানো শিখছেন।

অসম্ভব মনে হ'ত না, কারণ রুমা বাঈয়ের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব ছিল না। ধুলিয়া বাবার আশ্রমের পাশ দিয়ে যে শীর্ণ খাড়াই পথটা পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে টুমুরিয়ার দিকে উঠে গেছে সেই দুর্গম পথ বেয়ে যেদিন ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখে-ছিলাম রুমা বাঈকে, তারপর থেকে ধারণা হয়েছিল, রুমা বাঈয়ের পক্ষে সবই সম্ভব।

বৈমানিক নিহালের সঙ্গে মাঝে মাঝে রুমা বাঈকে দেখতে পেতাম আংরেজ

বাজারে। কখনো বা ইম্পিরিয়েল ক্লাবের টেনিস লনে।

দেখে খুশি হ'তাম আমরা, খুশি হ'তাম এই ভেবে যে, নিহাল বিজন নয়।

বিজন যেদিন হেভি কেমিক্যাল্‌স্‌ থেকে সুগার ফ্যাক্টরীতে ফিরে এলো, কৌতুকের হাসি হেসে বললাম, দেখেছিস বক্সী, বাছাধনের মুখটি একেবারে চুণ!

বক্সী হেসেছিল। —দুদিনের জন্যে খুব নবাবী করে নিলো যা হোক্‌। ভাগ্যিস দেওয়ানজীর কানে তুলেছিলাম।

—তার মানে? বক্সী হেসে বলেছিল, রুমা বাঈ যদি কাউকে ভয় করে তো সে একমাত্র দেওয়ানজী।

যে বিজনকে একদিন সকলেই ভয় পেতো সে কোনকালেই হাতি ছিল না, দ্বিতীয়ত কাদায় পড়েছে। সুতরাং অন্য সকলেই আড়ালে টীকা টিপ্পনি কাটতে শুরু করলো। প্রথম প্রথম আড়ালে, তারপর কিছুটা শুনিয়ে শুনিয়েই।

একদিন আবার সেই মেসবাড়িতেই ফিরে এলো বিজন। আগের মতই মেলা-মেশা করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু স্বাভাবিক হতে পারলাম না আমরা। কোথায় যেন চিড় খেয়েছে, জোড়া লাগানো গেল না।

ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতাম। ঘৃণা নয়, কেমন যেন কৌতুক বোধ করতাম ওর কথা উঠলেই। ওর পরাজয় যেন আমাদেরই জয়তিলক।

তবু মনের মধ্যে যে ঔৎসুক্য গুমরে মরছিল তা চেপে রাখতে পারলাম না। একদিন বিজনকে একা পেয়ে জিগ্যেস করলাম, কেন এমন হ'ল বলতো বিজন?

বিষণ্ণ হাসি হাসলে ও। বললে, কি জানি। খানিক চুপ করে থেকে বললে, হয়তো মোতিকুমারীর জন্যে।

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

দুঃখের হাসি হেসে বিজন বললে, মানুষ যে কখন কাকে ঈর্ষা করে!

ঈর্ষা! যেন নিজের মনেরই প্রতিধ্বনি শুনলাম। সত্যিই তো, এই বিজনকেই একদিন ঈর্ষা করতে শুরু করেছিলাম আমরা। ঘৃণা করতাম? হ্যাঁ, ঘৃণা—কিন্তু সে তো ঐ ঈর্ষা থেকেই।

বিজন চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে, সেদিন এক চায়ের আসরে ডেকেছিল রুমা। অনেকে এসেছিল, তার সঙ্গে মেয়েদের ইস্কুলের মাস্টারনী মোতিকুমারী। দেখেছো তুমি তাকে?

—দেখেছি।

বিজন বললে, ওর চেয়ে কুৎসিত কোন মেয়ে চোখে পড়েছে তোমার? না, পড়েনি। তাই হয়তো কেউই ওর সঙ্গে কথা বলছিলো না। মেয়েপুরুষ আরো অনেকে ছিল সেদিন, সকলেই গল্পগুজব করছিল, হৈ হুল্লোড়ে মেতেছিল। আর মোতিকুমারী উপেক্ষিত হয়ে এক কোণে বসেছিল চুপ করে। অথচ রুমা বাঈয়ের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করারও সাহস ছিল না তার। দেখে মায়া হ'ল, গিয়ে ওর পাশের চেয়ারে বসলাম।

উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম, তারপর?

—তারপর মাঝেসাঝে দেখা হ'লে দু'একটা কথা বলতাম, হাসি ফুটতো ওর মুখে। ওর

হাসি দেখে আমিও যেন খুশি হ'তাম। সে-কথা বলতাম রুমাকে। শুনে রুমা একদিন বললে, তুমি ওকে বিয়ে করো।...কি জবাব দেবো এ-কথার। বললাম, অসম্ভব। শুনে যে চোখে তাকালো রুমা, সে-চোখ আমি কোনদিন দেখিনি।

—তারপর? যেন কোন রোমহর্ষক কাহিনী শুনছি এমনি উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করলাম।

বিজন বললে, তারপর? তারপর তো তোমরা জানো।

বললাম, রাজি হলি না কেন? রুমা বাঈয়ের খেয়াল, রাজি হ'লে হয়তো ভুলেও যেতো।

বিষণ্ণ দেখালো বিজনকে। বললে, রাজি হয়েছিলাম। ভয়ে নয়, সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলাম মোতিকুমারীকে। রুমার নির্যাতন যত বাড়তে লাগলো ততই যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম মোতিকুমারীর সঙ্গে। তারপর যেদিন বললাম, মোতিকুমারীকে আমি বিয়ে করছি, সেদিন—এই দেখো—

ব'লে জামাটা তুলে বিজন ওর পিঠটা দেখালে।

শিউরে উঠলাম। ফর্সা পিঠের ওপর গোটাকয়েক কালসিটের দাগ, যেন ক্রোধান্ধ কেউ চাবুকের পর চাবুক বসিয়েছে সেখানে।

বিস্মিত হয়ে তাকালাম, সে কি? কেন?

বিজন হাসলে। —আমি জানতাম, ঈর্ষায় জ্বলছে রুমা, কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। অথচ ওর সন্দেহ যে সত্যি, তার প্রমাণ না পেলে যেন শান্তি নেই ওর। কিন্তু, তোমাকে বলছি আমি, বিশ্বাস করো, রুমার চোখের সামনেই আমি মোতিকুমারীকে বিয়ে করবো। শেষের কথাগুলো এত দৃঢ়তার সঙ্গে বললে ও, যেন নিজের মনকেই বলছে।
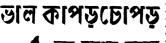
বিয়ে সত্যিই হ'ল একদিন। কিন্তু রুমা বাঈয়ের চোখের সামনে নয়। বাঙালীটোলার কালীবাড়িতে যখন বিজন আর মোতিকুমারী মন্ত্র উচ্চারণ করছে সেই সময় নিহালের সঙ্গে রুমা বাঈ আকাশবিহারে উঠেছেন। আর তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল সেই ডাকোটা বিমানখানায় আগুন লেগেছে। মুহূর্তের মধ্যে রাত্রির আকাশে বিদ্যুৎ জ্বালিয়ে প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে পড়লো প্লেনটা।

ভিড় ছুটলো আনারবাগের ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডটার দিকে। তখনও আগুনের শিখা দুলে দুলে উঠছে কালো আকাশের গায়ে। গুজব ফিরে এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

কিন্তু, না, পরের দিন সকালেই খবর পাওয়া গেল। মারা যান নি রুমা বাঈ, বাঁচবেন কি না তাও সন্দেহ। সমস্ত শরীর নাকি ঝলসে গেছে তাঁর, যদি বা প্রাণে বেঁচে যান তবু চিনতে পারবে না কেউ। হয়তো অন্ধ হয়ে যাবেন, হয়তো বা পঙ্গু হয়ে কাটাতে হবে সারা জীবন, আগুনে পোড়ানো কুৎসিত মাংসপিণ্ডের মত।

আমরা সবাই, যারা এতদিন ঘৃণা করে এসেছি, দুর্নাম রটিয়েছি রুমা বাঈয়ের, কেমন যেন ব্যথা অনুভব করলাম।

আনারবাগ শহরের উজ্জ্বলতম তারা যেন হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে, যে তারার আলো আমাদের মনেও রোমাঞ্চ জাগাতো, যে তারার আলোয় ধাঁধাঁ লাগতো আমাদের কল্পনাবিলাসী চোখে।

দিন কয়েক পরে বিজনকে কাছে ডেকে ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করলাম, শুনেছিস?

—শুনেছি।

বললাম, একবার দেখা করে আয় বিজন, মৃত্যুর আগে এটুকু সান্ত্বনা তাকে দিয়ে আয়। এই দুর্ঘটনাই প্রমাণ করলো বিজন, রুমা বাঈ তোকে ভালবাসতো।

অবিশ্বাসের হাসি হাসলে ও। বলছো যখন যাবো, তুমিও চলো।

প্যালেসের এক প্রান্তে সুব্যাপ্ত একটি ফুলের বাগানের মাঝখানে রাজা প্রতাপ-কিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের দানে গড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রুমা বাঈকে।

অনুমতি নিয়ে দেখা করতে গেলাম আমি আর বিজন।

একটি ফর্সা ধবধবে রোগশয্যায় সাদা চাদরের মত ম্লান হয়ে পড়েছিল রুমা বাঈয়ের অর্ধ অচেতন শরীর। ওষুধের একটা তীব্র দুর্গন্ধ চারিদিকের হাওয়ায়। আর রুমা বাঈয়ের সারা শরীর ব্যাণ্ডেজে মোড়া। সমস্ত মুখ ব্যাণ্ডেজে ঢাকা।

ধীরে ধীরে টুলটায় বসলো বিজন। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে রুমাকে স্পর্শ করতে গিয়ে হঠাৎ হাতটা ফিরিয়ে নিলো।

ডাকলে, রুমা!

ঠিক্ বোঝা গেল না, কি যেন অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এলো রুমা বাঈয়ের মুখ থেকে। একটু বোধহয় নড়লো ওর শরীরটা।

নার্স ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বিজনের নাম বললে।

রুমা বাঈ ফিস্ ফিস্ করে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ও আসে নি?

—কে? নার্স চাপা গলায় জিগ্যেস করলে।

—কে রুমা বাঈ?

—রায়, মিস্টার রায়। উত্তর এলো ধীর স্বরের।

—দেওয়ানজী? উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে বসলাম। বললাম, খবর দেবো, ডেকে পাঠাবো রুমা বাঈ?

মরণোন্মুখ একটি নারীর যে কোন শেষ ইচ্ছাকে তৃপ্ত করলে যেন আমিও তখন তৃপ্ত হই।

দীর্ঘশ্বাসের মত ব্যথার কণ্ঠে রুমা বাঈ বললেন, না, না, আমি জানি সে আসবে না।

—আসবে না? বিস্ময়ের স্বরে নার্স প্রতিপ্রশ্ন করলে।

হয়তো ব্যাণ্ডেজের বাঁধনে চাপা পড়ে গেল রুমা বাঈয়ের বিষণ্ণ ম্লান হাসি। —পাথর, পাথর সে, মানুষ নয়। এত ঈর্ষার আগুন জ্বালাতে চেয়েছি বিজন, তবু চোখ ফেরায়নি সে। হেরে গেলাম, হেরে গেলাম আমি।

কোন কথা বললাম না আমরা। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠে এলাম। আর রুমা বাঈয়ের সমস্ত দুর্নাম, সমস্ত হঠকারিতা আর দীপ্ত যৌবনের উদ্দামতায় ঢাকা পড়েছিল যে অতৃপ্ত ভালবাসা, যে ভালবাসা প্রকাশে ভীরু আর লজ্জায় দুর্বল, সেই ভালবাসার উজ্জ্বল শিখাটি হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মন বললে, রুমা বাঈও ভাল-বাসতে জানে।

এতখানি দুর্বলতা কি করে লুকিয়ে রেখেছিল রুমা বাঈ, এতখানি অতৃপ্ত বাসনার গায়ে অপবাদের শাল জড়িয়ে রেখে-ছিল কেন!

বিজনকে সে কথা জিগ্যেস করবার জন্যে ফিরে তাকালাম হঠাৎ। দেখলাম, বিজনের দুচোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে।

কান্না, কান্না। কিন্তু এ কান্নার খবর রাখলো না কেউ।

আনারবাগের দুর্নামী রটনা শুধুই মোতিকুমারীর বিয়ের সঙ্গে রুমা বাঈয়ের বিমান দুর্ঘটনার যোগাযোগ আবিষ্কার করেই তৃপ্ত হ'লো।

চরম চরিতার্থতা
শরতের নির্মল আকাশে
বৈরাগী মেঘ; বাতাসে
শেফালির স্নিগ্ধ নিমন্ত্রণ।
সোনায় পান্নায় বিজড়িত
দিগন্তে শরতের প্রসন্ন
মহিমা। রঙে রসে
মধুর এই যে উৎসব-
মুহূর্ত, হৃদয়ের আনন্দ-
গানেই এর চরম
চরিতার্থতা। তেমনি
রম্য রুচির চিরন্তন
বিলাস, রূপসাধনার
চরম চরিতার্থতা—
"লক্ষ্মীবিলাসে"।
লক্ষ্মীবিলাস তৈল
এম • এল • বসু য়্যাণ্ড কোং লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস : কলিকাতা-৯

ডনাল্ড কক্সিটর

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
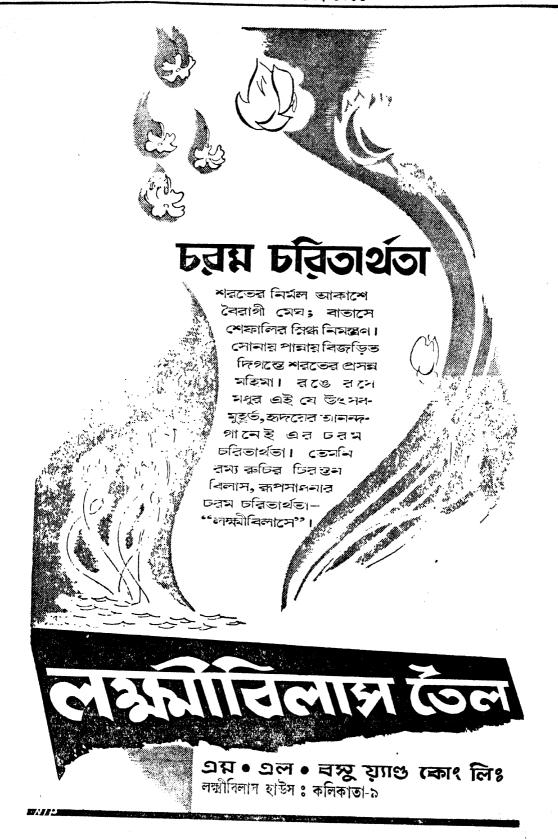
কক্সিটর পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে মিলবার্ন সাহেবের মারফতে। ছোট্ট পরিবার। মিস্টার হ্যারল্ড কক্সিটর, মিসেস এথেল কক্সিটর আর তাঁদের বছর দশেকের একমাত্র সন্তান, ডনাল্ড কক্সিটর।

হ্যারল্ড কক্সিটর কি একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রবৃত্ত ছিলেন। আমি বৈজ্ঞানিক নই, বিজ্ঞানের ধারও ধারিনে। সুতরাং ব্যাপারটা যে ঠিক কি তা আমি নিজেই ভালো বুঝতে পারিনি, অন্যকে বোঝানো তো দূরের কথা। শুনেছিলুম, অপারেশন করার আগে যেসব বস্তু দিয়ে রোগীকে অজ্ঞান করে নেওয়া হয়, সেগুলো নাকি রোগীর শরীরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত গ্লানি রেখে যায়। হ্যারল্ড কক্সিটর নাকি এমন এক যন্ত্র বের করার তালে আছেন যে, তাতে শুধু হাত লাগালেই মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়বে, শরীরের উপর তার কোনো রি-অ্যাকশন থাকবে না। এই নিয়ে তিনি বিস্তর খাটছেন-খুটছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটা তৈরি করে উঠতে পেরে-ছিলেন কিনা, সে-খবর আজ পর্যন্ত আমি পাইনি। ডাক্তাররা হয়তো তার সন্ধান দিতে পারবেন।

মিসেস কক্সিটর গৃহস্থালীর অবসরে ছবি আঁকেন। তাঁর আরো একটি মস্ত কাজ ছিল। পাড়ায় যতোগুলো হিতকারী প্রতিষ্ঠান ছিল, তার সবগুলোর সঙ্গেই মিসেস কক্সিটরের প্রাণের যোগ। টাকা তোলার জন্যে কোথাও থিয়েটর-কনসার্ট, কোথাও হাতের কাজের সেল্, কোথাও ভ্যারাইটি এন্টারটেন্-মেন্ট—এসবে মিসেস কক্সিটরের বিষম উৎসাহ, তাতে সর্বদাই এগিয়ে যান। এসব ব্যাপারে নতুন-নতুন মজা বের করার ফন্দিতে তাঁর মাথাটা বেশ খোলে। তাই সর্বত্র তাঁর ডাক পড়ত সর্বাগ্রে। মিসেস কক্সিটরও এসব ব্যাপারে কখনো না করতেন না।

ডনাল্ড কোন্ এক প্রেপ্যারেটরী স্কুলে পড়ত আর কি করে ভদ্রলোকদের অপ্রস্তুতে ফেলা যায়, তারই ফিকিরে ক্রমাগত ফিরত। সে মোটেই আমাদের গোপালের মতো শান্ত-শিষ্ট সুবোধ-সুশীল বালক নয়। দারুণ ছেলে এই ডনাল্ড কক্সিটর।

মিসেস কক্সিটরের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় শারন্স রেস্তরাঁয়। মিলবার্ন সাহেব সেখানে আমাদের লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছিলেন। মিস্টার কক্সিটর বোধ হয় তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে জড়িয়ে ছিলেন, তিনি আসতে পারেননি। শারন্সে সবই নিরামিষ ব্যাপার। শুনলুম, কক্সিটররা ঘোরতর নিরামিষাশী, ডিম পর্যন্ত ছোঁন না। বেশি মাংস খেলে মিলবার্ন সাহেবেরও বদহজম হয়। আর আমি ভারতবাসী বলে তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, ফলমূলই আমার প্রিয় খাদ্য।

টটনহ্যামকোর্ট রোড স্টেশনের উল্টো দিকে শারন্স রেস্তরাঁ। নিচের তলায় ফলফুলের তরিতরকারীর দোকান, ওপর-তলায় ডাইনিংহল্। সেখানে টোম্যাটোর সুপ, গাজরের কাটলেট, আলুর কোপ্তা, কড়াইশুঁটির ক্রোকে, রাঁধা কপির চাটনি, ভাতের পুডিং, এইসব নিয়ে মেনু। মেনু-অনুযায়ী আ-লা কার্ত লাঞ্চ হয়তো আমাদের পছন্দ হবে না ভেবে মিলবার্ন সাহেব তিনটে ফ্রুট-লাঞ্চের অর্ডার দিলেন। লাঞ্চ এল। একটা কাগজের ট্রের উপর সাজানো আপেল নাসপাতি কলা কমলা লেবু আঙুর বিলিতী বৈঁচি আর ফলসা, আর তারি সঙ্গে কিছু বাদাম আখরোট ও মনাক্কা। মুখ-বদলানোর পক্ষে মন্দ জিনিস নয়। গলা ভিজবার জন্যে এক-এক গ্লাস ফোর্ট। ফোর্ট যদিও চেহারায় ঠিক ক্ল্যারেটের মত দেখতে, কিন্তু এতে অ্যালকহল মোটেই নেই, নিতান্ত শুদ্ধ নিরামিষ পানীয়। নানা-রকমের ফল নিংড়ানো রসমাত্র।

খাওয়া চলল। দেখলুম, মিসেস কক্সিটর একবার কথা বলবার সুযোগ পেলে, সে-সুযোগ আর কিছুতেই ছাড়েন না। সাহিত্য আর্ট দর্শন ড্রামা, তিব্বতী লামা, থিয়সফি প্ল্যানচেটে ভূত নামানো কিছুই বাদ গেল না। সব বিষয়েই তাঁর সমান অনর্গল বক্তৃতা। বক্তৃতার বহর দেখে মিলবার্ন সাহেব আর আমি চুপ, এক-আধটা হুঁ না করেই কাজ সারছি। তার উপর মিসেস কক্সিটরের গলাটা একটু চড়ার দিকেই। আমাদের কথা তার তলায় ডুবে যেত। ঘর ভর্তি লোক। তারাও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাচ্ছে। সুতরাং মিসেস কক্সিটরের গলা আমাদের টেবিল ছাড়িয়ে বেশি দূর যেতে পারছিল না। নচেৎ সকলের দৃষ্টি আমাদের টেবিলের উপরেই পড়ত। বিলেত দেশেও যে এত-গুলো নিরামিষখেগো লোক আছে, তা এই প্রথম জানলুম।

খাওয়াশেষ হবার পর বাড়ি ফেরবার সময় মিসেস কক্সিটর আমায় জানিয়ে গেলেন, আমি মাঝে মাঝে ও'র ওখানে গেলে তিনি খুশিই হবেন। বিদেশি বলেই বোধ হয় তাঁর আমার উপর করুণার উদ্রেক হয়েছিল। ব্যাগের থেকে একটা কার্ড বের করে মিসেস কক্সিটর সেটা আমার হাতে দিলেন। দেখলুম, তাঁরা হল্যান্ড পার্কে বাস করেন। কোন্ বাস কোন্ টিউব ট্রেনে সহজে সেখানে যাওয়া যায় তার হদিশ দিয়ে মিসেস কক্সিটর আমার নাম ঠিকানা তাঁর নোট বই-এ টুকে নিলেন।

কক্‌সিটরদের ওখানে একদিন যাব-যাব করছি এমন সময় মিসেস কক্‌সিটরের কাছ থেকে চিঠি এল। ডিনারে নেমন্তন্ন। সে রাত্তিরটা বেশ পরিষ্কার ছিল। আমি হেঁটেই কক্‌সিটরদের বাড়ি চললুম। রাস্তা খুঁজে-পেতে পেঁছতে কিছু দেরি হয়ে গেল। কক্‌সিটরদের বাড়ির কাছ বরাবর গিয়ে দেখি, মিসেস কক্‌সিটর সদর দরজা খুলে দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাই-ছেন। তাঁর মনে বোধ হয় ভয় ঢুকেছিল। আমি বিদেশি মানুষ পথ ভুলে পথ হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কারুর জন্যে এতটা করা ইংরেজ-দের স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু মিসেস কক্‌সিটর একটু অন্য ধরনের মানুষ।

আমায় আসতে দেখে মিসেস কক্‌সিটর একেবারে রাস্তায় বের হয়ে এলেন। আমার হাত ধরে বললেন, এই যে আমাদের বাড়ি। চল, ভিতরে চল। হলএই মিস্টার কক্‌সিটর দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর পিছনে ডনাল্‌ড। মিসেস কক্‌সিটর তাঁর স্বামী পুত্রের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন। হ্যাটর‍্যাকে টুপি রেখে আমি তাঁদের পিছন পিছন অগ্রসর হলুম। দেখলুম, যেতে যেতে ডনাল্‌ড আমার আপাদমস্তক বার-বার আড়-চোখে লক্ষ্য করতে করতে চলেছে।

টেবিলে খানা দেবার পূর্বে ড্রয়িংরুমে বসে টুকি-টাকি গল্প চলছে, এমন সময় ডনাল্‌ড হঠাৎ আমাকে উদ্দেশ করে বললে—আপনি তো ভারতবর্ষের লোক মিস্টার চ্যাটার্জি?

আমি একটু আশ্চর্য হয়েই বললুম—হ্যাঁ আমি ওদেশেরই লোক বটে। আসলে বাংলা দেশে আমার জন্ম।

তখন ডনাল্‌ড বললে—আমি শুনেছি, ভারতবর্ষের লোকেরা জুতো মোজা পরেন না, খালি পায়ে হাঁটেন। ডনাল্‌ডের ভাব-খানা দেখে মনে হল, সে যেন ইঙ্গিত করছে আমি কেন তবে জুতো মোজা পরে এসেছি।

আমি বললুম—আমাদের দেশে আগে জুতো পরার বড় রেওয়াজ ছিল না। দরকার হলে লোকে খড়ম পরত। এখনো গ্রামাঞ্চলে প্রায় সবাই খালি পায়ে থাকে, শহরেও ঘরের ভিতর অনেকেই শুধু পায়ে চলাফেরা করে। আমি নিজে যখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ইস্কুলে পড়তুম তখন সেখানে খালি পায়েই থাকতুম। এখন শহরে থাকি কিনা, তাই জুতো মোজা পরি।

আগে অতটা নজর করিনি, এখন দেখলুম কক্‌সিটররা কেউ-ই মোজা পরেননি। তাঁদের পায়ের জুতোগুলো ফাঁক-ফাঁক করা স্ট্র্যাপে বাঁধা স্যান্ডালের মতো। কথায় কথায় শুনলুম তাঁদের ইচ্ছে, ঘরে অন্তত খালি পায়ে থাকবেন। কিন্তু ডাক্তারের মানার জন্যে সেটা করে উঠতে সাহস পান নি।

আমার কথা শুনে, ডনালড জবাব দিল—কোন রবীন্দ্রনাথ? পোয়েট রবীন্দ্রনাথ টেগোর? তিনি তো কালই অ্যামেরিকা থেকে লন্ডনে এসে পেঁছেছেন। সেই একই সঙ্গে এলেন, ম্যারী পিক্‌ফোর্ড। রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যে একটি লোকও যায়নি, কিন্তু ম্যারী পিক্‌ফোর্ডকে দেখবার জন্যে শহরের লোক ভেঙে পড়েছিল।

বড় ভয়ানক ছেলে তো এই ডনাল্‌ড। তার দেখছি, চার চোখ চার কান। সব দেখে সব শোনে সব কিছুর খবর রাখে!

মিসেস কক্‌সিটর একটু কটুস্বরে বললেন—ভেঙে পড়বেই তো। আমাদের দেশে সিনেমা স্টারদের কাছে কবিদের কিবা দর? পয়লা-নম্বরের সরেস কবি কবিতা লিখে সারা বছরে যা না উপার্জন করেন, এক একটা সিনেমা স্টার একদিনেই তার ঢের বেশি রোজগার করে। সুতরাং—

মিস্টার কক্‌সিটর এতক্ষণ একেবারে চুপ করে ছিলেন। এইবার মিসেস কক্‌সিটরের কথাটা লুফে নিয়ে তিনি বললেন—সুতরাং কবিদর্শনের চেয়ে তারকা দর্শনে ঢের বেশি পুণ্য এই কথাটাই তুমি বলতে চাও না কি।

কথাটা বেশি দূর আর এগোলো না। দাসী এসে খবর দিল, টেবিলে খানা দেওয়া হয়েছে।

আমরা এক-এক করে ডাইনিং রুমে ঢুকলুম। টেবিলে সুপ দেওয়া হয়েছে। সুপের পর যে জিনিসটা এল তার চেহারা দেখেই বুঝলুম, কক্‌সিটররা ঘোর নিরা-মিষাশী বটেন। জিনিসটা চেখে দেখে বুঝলুম, ওটা আধা কুমড়ো আধা লাউ-এর এক বিচিত্র ঘাঁট-বিশেষ। তারপর এল এক প্লেট কড়াইশুঁটিসিদ্ধ তার সঙ্গে ছোট-ছোট কাঁঠালবিচির মতো বিন্‌স-সিদ্ধ মেশানো। খেতে মন্দ নয়। শেষে পুডিং-এর বদলে কলার বড়া, যার ইংরিজি ভালো নাম বানানা ফ্রিটারস। চীজ্‌ও যে আমিষ, তা এখানে প্রথম শুনলুম। সেটা নাকি শুয়োরের নাড়িভুঁড়ি ছুঁইয়ে জমানো!

ডিনারটা আমার বোধ হয় তেমন পছন্দ-সই হল না মনে করে, মিসেস কক্‌সিটর নিরামিষ আহারের গুণগান করে মস্ত এক বক্তৃতা ফেঁদে ফেললেন। শেষে তার এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও বের করে ফেলে কি যে খানিক বকে গেলেন তা আমার ভালো করে বোধগম্য হল না। তবে মজার কথা এই শুনলুম যে, বিলেতেও নাকি হাজার হাজার নিছক নিরামিষাশী আছেন, যাঁরা জীবনে কখনো মাছ মাংস ডিম ছোঁন না। এক লন্ডন শহরেই পাঁচ ছটা ভেজিটেরিয়ন ক্লাব আছে। সেখানে নিত্য নূতন নিরামিষ রান্নার পরীক্ষা চলছে।

মিসেস কক্‌সিটরকে একটু প্রসন্ন করবার জন্যে আমি বললুম—শান্তিনিকেতন ইস্কুলে আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্যে নিরামিষ খাবারেরই ব্যবস্থা রেখে-ছিলেন। আমি একাদিক্রমে পাঁচ বছর পুরোপুরি নিরামিষাশী ছিলুম। ছুটিতে বাড়ি এসেও মাছ-মাংস ছুঁতুম না, কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করত।

মিসেস কক্‌সিটর পরম উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন—আপনাদের গুরুদেব ভারী জ্ঞানী মানুষ। পৃথিবীতে শরীর সুস্থ রেখে বেশি দিন বাঁচতে গেলে নিরামিষ
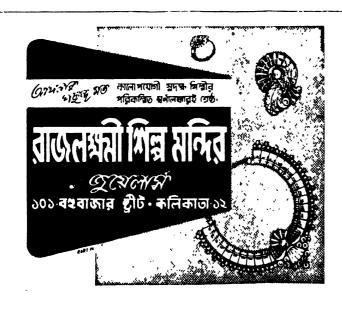
আহারই একমাত্র উপায়। উৎসাহের বহর দেখে আমি আর বলতে পারলুম না যে, পৃথিবীতে এমন লোকও অনেক আছেন যাঁরা মাছ মাংস খেয়েও সুস্থ শরীরে অনেক দিন বেঁচে আছেন।

বেশ চলছিল, এমন সময় ডনাল্ড-ছোকরা এক অবান্তর ফোড়ন কাটলো—আর দেখুন মিস্টার চ্যাটার্জি, টুপি পরাটা বড়ো খারাপ জিনিস। ওতে লোকে অকাল-পক্ক হয়। চুল তাড়াতাড়ি পাকে, টাকও পড়ে অনেক আগেই।

হ্যারল্ড কক্‌সিটর সেই যে একবার মুখ খুলেছিলেন তারপর একদম চুপ করে-ছিলেন। এবার তিনি আর একবার মুখ খুলে বললেন—আমাদের দেশের মেয়েরা দিনমানে হ্যাট পরলেও রাত্তিরে ইভনিং ড্রেসের সঙ্গে টুপি পরেন না। কিন্তু তাঁরা যদি রাতদিন খালি মাথায় থাকেন তাহলে তাদের মাথাটাও বাঁচে আবার তাঁদের স্বামী-দের টাকাটাও বাঁচে। আমাদের দেশের স্বামী বেচারীদের পরিবারের হ্যাটের দেনা চোকাতে চোকাতে প্রায় দেউলে হয়ে পড়তে হয়।

এই রকম নানা রহস্যালাপের মধ্যে খাওয়া শেষ হল। কক্‌সিটররা মদ্যপান করেন না, ধূমপানও করেন না। সুতরাং খাওয়া শেষ হতেই সকলে মিলে ড্রয়িংরুমে ফিরে আসা গেল। মিসেস কক্‌সিটর কোথা থেকে একটা পোর্টফোলিও বের করে এনে হাজির করলেন। তার থেকে বেরুলো তাঁর আঁকা কতকগুলো ওয়াটর কলরের ছবি, আর কতকগুলো পেন্সিল কি ব্রাউন ক্রেয়নে স্কেচ করা কতক পুরুষ আর মেয়ের মাথা। ছবিগুলোর আমিই যে প্রথম দর্শক, তা নয়। ছবিগুলোর অবস্থা দেখে মনে হল, যে কেউ মিসেস কক্‌সিটরের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সবাইকেই এই সব ছবি একবার-না-একবার দেখানো হয়েছে। ছবি-গুলো বিশেষ কিছু নয়। তবু মিসেস কক্‌-সিটরের আদরের জিনিস বলে একটু-আধটু তারিফ করতে হল। দেখলুম, হ্যারল্ড কক্‌সিটর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি যতক্ষণ ছবি দেখছি, তিনি ততক্ষণ ইভনিং নিউজ খবরের কাগজটা খুঁজে-খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। ডনাল্ডও তাই। সে দেয়ালের একটা টিকটিকিকে তাগ করে বসে আছে।

কথায় কথায় অনেক রাত্তির হয়ে গেল। ঘড়িতে সাড়ে এগারটা বাজে। ডনাল্ড শুতে চলে গেছে। হ্যারল্ড কক্‌সিটর মাঝে মাঝে গোপনে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাই তুলছেন। কিন্তু মিসেস কক্‌সিটরের কোনো ক্লান্তি নেই, তিনি সমানে কথা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি উঠি-উঠি করছি দেখে তিনি সস্নেহে জানালেন, লণ্ডনের কাছেই ব্রম্‌লে গ্রামে তাঁদের একটা কটেজ আছে। উইক্‌-এণ্ডে কাজ না থাকলে, তাঁরা সেখানেই গিয়ে থাকেন। আমি যদি আগামী শনিবার সেখানে দুদিনের জন্যে যাই তো তাঁরা খুবই খুশি হবেন। আমিও খুশি হয়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলুম।

ড্রয়িংরুম থেকে হল্‌-এ বেরিয়ে এসে দেখি, হ্যাট্‌র‍্যাকে আমার হ্যাট্‌ নেই। মিস্টার ও মিসেস কক্‌সিটর নির্বিকার। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন তাঁদের মতো পোরো না। বুঝলুম, এটা সেই দস্যি ছোঁড়া ডনাল্ডেরই কীর্তি।

শনিবার বিকেলে ব্রম্‌লের বাস্‌-এ চড়ে বসলুম। ব্রম্‌লে যাবার ট্রেনও পাওয়া যায়, কিন্তু মিসেস কক্‌সিটর বলে দিয়ে-ছিলেন, বাস্‌-এ গেলে বাস্‌ স্টপ থেকে তাঁর কটেজ একলাফেই পৌঁছানো যায়। মিসেস কক্‌সিটর কটেজ বলেছিলেন—বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, কথাটা তিনি নিতান্ত বিনয়বশত বলেননি। সত্যিই আমাদের দেশের মতো খোড়ো কুঁড়ে ঘর। তবে সেটা রাখা হয়েছে যাহোক-তাহোক করে নয়, অতি যত্ন সহকারে।

মিসেস কক্‌সিটর কটেজ বলেছিলেন—দেখলুম, কথাটা তিনি নিতান্ত বিনয়বশত বলেননি

আমিও হ্যাট ব্যবহার করি না; খালি মাথায় চলাফেরা করি। সুতরাং টুপি নিশ্চয়ই আনি নি। অত রাত্রে হ্যাট্‌ খোঁজার দায়ে ফেলে কক্‌সিটরদের অপ্রস্তুত করার ইচ্ছে হল না। আমি বিনা টুপিতেই বেরিয়ে পড়লুম। ভাগ্যিস সে রাত্তিরে বৃষ্টিবাদল ছিল না, ঠাণ্ডাও কম ছিল, তাই রক্ষে। নইলে, সর্দিকাশির ঠেলায় নিশ্চয়ই বিছানা নিতে হত।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে এসে দেখি, আমাদের ফ্ল্যাটের হল্‌-এর টেবিলে ব্রাউন পেপারে মোড়া এক পার্শেল পড়ে আছে। ফ্ল্যাটের কর্ত্রী মিসেস ফ্লেচর জানালেন, ডিস্‌ট্রিক্ট মেসেন্‌জার ওটা দিয়ে গেছে আমারই জন্যে। মোড়ক খুলে দেখি, আমার সেই টুপি, যেটা কাল রাত্তিরে কক্‌সিটরদের বাড়ি ছেড়ে এসেছিলুম। টুপির গায়ে আল-পিনে আঁটা একটা ছোট্ট কাগজে লেখা—ডোণ্ট ইয়ুজ হ্যাট্‌, অর্থাৎ কদাচ টুপি

ভিতরের সাজসজ্জা আসবাবপত্তর অবশ্য আমাদের দেশের চেয়ে ঢের ভালো, ঢের সুশ্রী।

এবার আর ভালো টুপি নিই নি। একটা ছিটের ক্লথ-ক্যাপ পরে গিয়েছিলুম। বাস থেকে নেমে সেটাকে মাথার থেকে নামিয়ে ওভারকোটের পকেটে পুরে ফেললুম। যথেষ্ট শীত পড়েছে। কিন্তু উপায় কি? ডনাল্ড নামে যে-ছেলেটি ওখানে বিরাজ করছেন টুপি দেখলেই তো তিনি হন্যে হয়ে উঠবেন, কিছুতেই তা বরদাস্ত করতে পারবেন না। ষাঁড়ের সামনে লাল ন্যাকড়া ধরে লাভ কি?

কটেজের দরজা খুলতেই মিসেস কক্‌-সিটর আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে ডেকে নিলেন। ডনাল্ড এসে শেক্‌হ্যাণ্ড করলে। একবার উঁকি মেরে দেখে নিল আমার মাথায় কিছু আছে কি না। তারপর একটু মুচকি হেসে কোথায় সরে পড়ল। হ্যারল্ড সাহেব কাজে

ব্যস্ত, তিনি আসতে পারেন নি। মিসেস কক্‌সিটর আমার ঘর দেখিয়ে দিলেন, বললেন, মফঃস্বলে তাঁরা সকাল-সকালই খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকিয়ে ফেলেন। ঘুমুতে যানও শিগ্‌গির করে আর ওঠেনও খুব ভোর-ভোর। লণ্ডনের জীবনযাত্রার একেবারে বিপরীত।

হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়িয়ে সুটটা একবার ব্রাশ করে নিয়ে ঘর থেকে বেরুতেই ডনাল্‌ড এসে জানালে, খাবার দেওয়া হয়েছে। দেখলুম, মিসেস কক্‌সিটরের লণ্ডনের বাড়ির চেয়ে গ্রামের বাড়িতে খাওয়াটা ঢের ভালো। কারণ, নানারকমের একরাশ ফল পাওয়া গেল। সবগুলোই কক্‌সিটরদের বাগানের গাছে ফলা। বেশ যত্ন নিয়ে ফলানো মনে হল। দেখতেও যেমন সুপুষ্ট, খেতেও তেমনি সুস্বাদু। খাওয়াটা বেশ জমলো।

ডিনারের শেষে কফি খেতে খেতে অনুভবে বুঝলুম, শীত বেড়েই চলেছে, যদিও এটা ঠিক শীতের সময় নয়। কিন্তু মেয়েদের মতো বিলিতী আবহাওয়ার মেজাজ বোঝা ভার। এই বৃষ্টি এই ঝক্‌ঝকে রোদ্দুর। এই পরিষ্কার এই অন্ধকার। এই শীত এই গরম। কি যে কখন, তার ঠিক নেই। তাই সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। মিসেস কক্‌সিটর ডনাল্‌ডকে উদ্দেশ করে বললেন,—তুমি একটু মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে গল্প কর। আমি ওঁর শোবার ঘরের ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করে আসি। রাত্তিরে আরো শীত পড়বে।

মিসেস কক্‌সিটর উঠে যেতে ডনাল্‌ড অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো বলে উঠল—শোবার ঘরে আগুন জ্বালানো আমি ভালো বলে মনে করি নে। বই-এ পড়েছি, ওতে শরীর খারাপ হয়। আর শুনেছি, শোবার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে অনেকে মারাও গেছে। খানিক পরে মিসেস কক্‌সিটর ফিরে এলেন। আমি সকলকে গুডনাইট করে শুতে গেলুম।

নতুন জায়গায় আমার প্রথম-প্রথম কিছুতেই ঘুম আসে না। বিলিতী বিছানায় শুয়ে মোটেই আরাম হয় না, এপাশ ওপাশ করার জো নেই। স্থির হয়ে একপাশে কুঁকড়িয়ে শুয়ে থাকতে হয়। পাশ ফিরলেই ছ্যাঁক করে শীত ধরে। চিৎ হয়ে অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে আছি, এমন সময় খুট্ করে দরজা খোলার শব্দ হল। আধখানা চোখ খুলে দেখি, একটা ছায়ামূর্তি আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকলো। প্রথমটা স্পষ্ট ধরা গেল না মূর্তিটা কার। ফায়ারপ্লেসের কাছে আসতে আগুনের আলোতে খুবই স্পষ্ট দেখা গেল, সেটি আর কেউ নন, স্বয়ং ডনাল্‌ড কক্‌সিটর।

এত রাত্রে ডনাল্‌ড কি উদ্দেশে যে আমার শোবার ঘরে প্রবেশ করল, তা ভেবে পেলুম না। একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে সে দেখে নিল, আমি মড়ার মতো স্থির হয়ে শুয়ে আছি। তারপর সে ফায়ারপ্লেসের সামনে হাঁটুগেড়ে বসে জ্বলন্ত কয়লাগুলোর উপর জলের ছিটে দিতে দিতে সমস্ত আগুন নিবিয়ে ফেললে। আবার একবার মিটমিট করে আমার দিকে তাকিয়ে পা-টিপে-টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডনাল্‌ডের নিশ্চয়ই ইচ্ছে ছিল আমাকে প্রাণে বাঁচানো, কিন্তু তার এই সদিচ্ছার ফলে আমার প্রাণ বেরুবার উপক্রম। ঘরের

আগন্ন নিবে যাওয়ার দর্ণ ঘরটা হয়ে উঠল যেন একটা রেফ্রিজেরেটর। দার্ণ শীত চামড়া ভেদ করে হাড় পর্যন্ত কন্-কনিয়ে তুলল। বিছানায় আর শন্য়ে থাকা গেল না। দন্খানা কম্বল আর তুলোর পাতলা আইডারডাউনে শানালো না। বিছানা ছেড়ে নেমে এসে আবার আন্ডারওয়্যার সন্ট মোজা চড়িয়ে তবে বিছানায় ঢন্কতে হল। ওভারকোটটা বাইরে হল্-এ টাঙানো ছিল, নইলে সেটাকেও গায়ে জড়িয়ে নিতে পারলে আরো ভালো হত। তবে ঘন্মের দফা সে-রাত্তিরের মতো একেবারে গয়া হয়ে গেল।

পরদিন সকালে ব্রেক্‌ফাস্ট টেবিলে আমার চোখমন্খের অবস্থা দেখে, মিসেস কক্‌সিটর জিজ্ঞেস করলেন -কাল রাত্তিরে বন্ঝি তোমার ভালো ঘন্ম হয় নি? তাঁর কথা শেষ না হতে হতেই ডনাল্‌ড বলে উঠল—হবে কি করে? ঘরের ভিতর নরককুণ্ডুর মতো আগন্ন জনলতে থাকলে কারন্র কি ঘন্ম হয়? আমি মনে-মনেই বললন্ম—ঐ শীতে নরককুণ্ডুর মতো না হোক হোমকুণ্ডুর মতো ধিকি-ধিকি একটন্ আগন্ন না জনললে ঘন্ম আসেই বা কি করে? ডনাল্‌ডের কথার প্রতিবাদ করতে গেলে কথা বেড়ে যাবে, তাই মন্খে আর কিছন্ প্রকাশ করলন্ম না।

ব্রেক্‌ফাস্ট খাওয়া শেষ হবার আগেই ডাক এসে গেল। রবিবারে শহরে চিঠি বিলি না হলেও মফঃস্বলে হয়। মিসেস কক্‌সিটর একটা চিঠি পড়ে খানিক মন্খ কাঁচুমাচু করে বললেন—তুমি কিছন্ মনে কোরো না চ্যাটার্জি, আমায় এক্ষন্ণি লণ্ডনে ফিরে যেতে হচ্ছে। বিশেষ এক জরন্রী কাজ পড়ে গেছে। ডনাল্‌ড তো রইল। সে তোমাকে দেখাশন্নো করবে। ডনাল্‌ড আমায় দেখাশন্নো করবে, তবেই হয়েছে। ঐ ডাকাতে ছেলের হাতে আমায় সমর্পণ করে মিসেস কক্‌সিটর কোথায় চললেন? —এটা অবশ্য আমার স্বগতোক্তি, ভদ্রতার খাতিরে ওটা মন্খ থেকে বেরন্লো না।

ডনাল্‌ড মন্রন্ব্বিয়ানার চালে বলল, অসন্বিধে হবে কেন? আমি থাকতে মিস্টার চ্যাটার্জির কোনোই অসন্বিধে হবে না। মিস্টার চ্যাটার্জি তো আর লণ্ডনে কোনো সান্‌ডে স্কুল দেখেননি। আজ আমি তাঁকে এখানকার সান্‌ডে স্কুল দেখিয়ে আনব। ডনাল্‌ড-এর সঙ্গে একত্র স্বর্গে যাওয়াটাও নিরাপদ নয়, কিন্তু উপায় কি? মিসেস কক্‌সিটর ছেলের কথা শন্নে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসিমন্খেই লণ্ডনের বাস ধরবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

লাঞ্চ পর্যন্ত কোনো অঘটন ঘটল না। সারা সকালটা ডনাল্‌ড একটা ভারি কেতাব মন্খে নিয়ে একমনে পড়ে যেতে লাগল। আমিও একটা ছবিওয়ালা সান্‌ডে পেপারে মনোনিবেশ করলন্ম। লাঞ্চের পর একটন্ বিশ্রাম করেই ডনাল্‌ড আমাকে সান্‌ডে স্কুল দেখাতে টেনে নিয়ে চলল।

আধ মাইলটাক্ রাস্তা চলবার পর ব্রমলে চার্চটা নজরে পড়ল। চার্চের গায়েই চার্চের অধ্যক্ষ পাদ্রী সাহেবের বাড়ি। বাড়ির একদিকে প্রকাণ্ড একটা টানা হল-ঘর। শন্নলন্ম, তাতেই সান্‌ডে স্কুল বসে। ডনাল্‌ডকে আসতে দেখে পাদ্রী সাহেব যে খন্ব খন্শি হয়ে উঠলেন, তা তাঁর মন্খ দেখে একেবারেই বোধ হল না। তবে আমায় বিদেশী দেখে তিনি খন্ব আপ্যায়িত করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

ঘরের মধ্যে সারি সারি বেঞ্চি পাতা। তাদের সামনে লম্বা লম্বা ডেস্কের মতো একটা করে টেবিল। বেঞ্চে বসে আছে ডনাল্ডের বয়িসী অনেকগন্লো ছেলেমেয়ে। রবিবার বলে তারা মন্খ হাত ধন্য়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছে। বেশ ফিটফাট কাপড়-চোপড় পরে এসেছে। পাদ্রী সাহেব এদের এখন্নি সদন্পদেশ দেবেন। উপদেশ শোনবার জন্যে তারা বেশ গম্ভীর মন্খে যে যার জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে। ডনাল্ড আর আমি সবশেষের পিছনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলন্ম।

পাদ্রী সাহেব উপদেশ দিতে উঠলেন। তাঁর সেদিনকার উপদেশের বিষয় চুরি করা মহাপাপ। তিনি হাতপা ছন্ড়ে মন্খ খিঁচিয়ে চুরি করা কেন যে পাপ সে-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিয়ে চললেন। বেশি দন্র অগ্রসর হবার আগেই দম নেবার জন্যে একটন্ থামতে হল। যেই থেমেছেন, অমনি ডনাল্‌ড সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বিনয়গদগদ স্বরে বলে উঠল, রেভারেণ্ড স্যার, আমায় দয়া করে মাফ করবেন স্যার। আপনার উপদেশ শন্নে একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে, সেটা আপনার কাছে নিবেদন করতে পারি কি?

পাদ্রী সাহেবের মন্খ আরো বিকৃত হল। তিনি স্পষ্ট কোনো জবাব না দিয়ে ঘাড়টা একটন্ কাত করলেন। প্রশ্ন করতে অনন্মতি পাওয়া গেল ধরে নিয়ে, ডনাল্‌ড গলা উঁচু করে বলল, রেভারেণ্ড স্যার, আপনি কি সত্যি বলতে চান, আপনি ছেলেবয়েসে কখনো মা-মাসী, খন্ড়ি-জেঠী কি দিদিমা-ঠাকুরমার ভাঁড়ার থেকে জ্যাম চুরি করে খাননি?

প্রশ্ন শন্নে ঘরসন্দ্ধ লোক হতভম্ব! পাদ্রী সাহেবের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল, কান দন্টো লাল টকটকে হয়ে উঠল, রগের শিরা দন্টো দপদপ করতে লাগল, মন্খচোখ থেকে এক ঝলক রক্ত ফেটে পড়ে-পড়ে। মন্ঠোসন্দ্ধন্ হাত শন্ন্যেই রয়ে গেল। মিনিট খানেক মন্খ দিয়ে কথা সরলো না। মনে হল মনে-মনে তিনি ডনাল্‌ডের প্রশ্নের এক জবর উত্তর খন্ঁজছেন। কিন্তু উত্তর আর দিতে হল না। ঘরসন্দ্ধন্ ছেলেমেয়ে একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল। সে-হাসি আর থামে না। তারা বোধ হয় এতক্ষণে ডনাল্‌ডের প্রশ্নের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করলে।

আমি দেখলন্ম, এক্ষেত্রে আর এখানে বসে থাকাটা কোনোমতেই বন্দ্ধির কাজ হবে না, পাদ্রী সাহেবের উপদেশ যতই শোনবার মতো হোক না কেন। আমার পিছনের দরজা ভেজানো ছিল। হ্যাণ্ডেল ঘন্রিয়ে নিঃশব্দে দরজা খন্লে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লন্ম। তখনো হাসির হররা চলেছে। কেউ আমাকে লক্ষ্য করলে না।

কিন্তু আর কক্‌সিটরদের কটেজে ফিরে গেলন্ম না। সোজা বাস্‌স্ট্যাণ্ডে উপস্থিত হলন্ম। লণ্ডনের বাস্ তখন ছাড়বার উদ্যোগ করছে। বাস্-এর পথে যতোগন্লো জায়গা পড়বে কন্‌ডাক্‌টর তাদের নাম একে একে তারস্বরে আউড়িয়ে যাচ্ছে। আমি কোনোদিকে না চেয়ে, কোনো দ্বিধা না ক'রে বাস্-এ চড়ে পড়লন্ম। আমার উইক-এণ্ড সন্টকেসটা কক্‌সিটরদের ওখানে পড়ে রইল। তা থাক, পরে একসময় সেটাকে আনিয়ে নিলে চলবে। এখন তো সটান লণ্ডন শহর।

বাস্ ছাড়বো-ছাড়বো। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, এক ছোঁড়া প্রাণপণ দৌড়তে দৌড়তে বাস্‌স্ট্যাণ্ডের দিকে আসছে। মাঝে-মাঝে এক হাত ঊর্ধ্বে তুলে বাস্‌কে থামবার ইঙ্গিত করছে। কাছে আসতে দেখা গেল, ছোঁড়া আর কেউ নন, আমাদেরই ডনাল্‌ড কক্‌সিটর। তার এক হাত খালি আর এক হাতে আমারই সন্টকেস। তড়াক করে বাস্-এ লাফিয়ে পড়ে আমারই পাশে এসে সে বসল। সন্টকেসটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে গম্ভীরমন্খে ডনাল্‌ড বলল,—মিস্টার চ্যাটার্জি, দয়া করে দন্খানা লণ্ডনের টিকিট কিনবেন।

আমি

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

আমার বসিবার ঘরে যখনই বাহির হইতে কোনও লোক আসে তখনই দেখিতে পাই আমার চারি বৎসরের কন্যাটি আসিয়া আশপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। মাঝে মাঝে সে আমাদের কথার প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমাদের রাশি রাশি কাজের এবং অকাজের কথা দ্বারা পাকে পাকে যে ব্যূহ রচনা করিতে থাকি তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবার ধৈর্য এবং সামর্থ্য তাহার শিশুমনের থাকে না; তাই কখনো সে তাহার 'ছবি ও ছড়া'র বইতে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করে, কখনও বা তাহার রান্নার সরঞ্জাম লইয়া ঘরের এককোণে স্থান করিয়া লয়, কখনও বা আমার পায়ের কাছে টেবিলের তলে তাহার পুতুলের সংসার জমাইয়া লয়। কিন্তু এটা লক্ষ্য করিয়াছি, যে-বাপদেশেই হোক না কেন, সে আমাদের আশেপাশেই থাকিতে চেষ্টা করে। লোকটি বা লোকগণ চলিয়া গেলে সে আমার একান্ত নিকটে আসিয়া আমার কানের চারি-পাশটাও যতটা সম্ভব তাহার ছোট্ট দুইখানি হাত দিয়া ঘিরিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিত, —'বাবা ওরা কি বলল?'

আমি বলিতাম,—'পড়ার কথা বলল।'

'পড়ার কথা কি বলল?'

আমি বলিতাম,— 'বলল, 'হাসি-খুসি' পড়তে তার খুব ভাল লাগে; তার 'ছবিও ছড়া'র বইটার সব ছড়াগুলি তার মুখস্থ হ'য়ে গেছে—এক নিঃশ্বাসে সব শুনিয়ে দিতে পারে; আর তার জানোয়ারদের একটা ছবির বই আছে, তার ভিতরের জলহস্তীটা এমনভাবে হা ক'রে আছে যে দেখলেই ভয় হয় ওর মুখের কাছে একবার হাত দিলে আর রক্ষে নেই, একেবারে হাউম ক'রে গিলে ফেলবে।'

এসব কথা শুনিয়া সে খুশী বটে—একটু একটু হাসেও—কিন্তু খুব যেন মন ওঠে না। আবার জিজ্ঞাসা করে,—'বাবা আর কি বলল?'

আমি বলিলাম,—'আর বলল কি, সেই ভদ্রলোকের একটি ছোট্ট মেয়ে আছে, সে মেয়েটি কক্‌খনো জামা গায় দিতে চায় না, চুল বাঁধতে চায় না, কক্‌খনো ঘরে থাকতে চায় না;—খালি গায়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলো-চুলে সারা দিনে পাড়া ঘুরে বেড়ায়'—

গল্পটির ইঙ্গিত সে বুঝিতে পারে,—সকৌতুকে বলে,—'তারপর—'

আমি বলিলাম,—'তারপর হ'ল কি, এক-দিন এই ভদ্রলোক তাঁর সেই মেয়েটিকে নিয়ে অযোধ্যায় বেড়াতে গেলেন'—

এই পর্যন্ত বলিতেই আমার মেয়ে আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'ও বুঝেছি, বুঝেছি'—

বস্তুত আমার মেয়েটিকে লইয়া আমিই কিছুদিন পূর্বে অযোধ্যা বেড়াইতে গিয়া-ছিলাম। সেখানে বাঁদরের উৎপাতের কথা পূর্বেই অনেক শুনিয়া গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বাঁদরেরা মিলিয়াই যে একজন যাত্রীকে একটি দূর তীর্থস্থান হইতে সত্যসত্যই দুইদিনের মধ্যে একেবারে উৎপাতের দ্বারা উৎখাত করিয়া দিতে পারে অযোধ্যা নিজে যাইবার পূর্ব পর্যন্ত এ-কথাটা এমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। অযোধ্যায় গিয়া আমি প্রথমেই আমার মেয়েকে বাঁদরের ভয় দেখাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম যে, সে যেন কলিকাতার ন্যায় এখানেও এলোচুলে ঘুরিয়া না বেড়ায়; কিন্তু সে আমার কথা অমান্য করিয়া একা একা খোলা ছাতে যাইতেই চারিদিক হইতে কতগুলি বাঁদর আসিয়া তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া ধরিয়া-ছিল এবং তন্মধ্যে একটিতে তাহার বগল হইতে জামাটি কাড়িয়া লইয়াছিল এবং অপরটিতে তাহার কাঁধে বসিয়া ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে কয়েকটি ঝাঁকি দিয়াছিল। অযোধ্যার সহিত তাহার এই পরাজয়, লজ্জা ও অপমানের স্মৃতি জড়িত আছে বলিয়া অযোধ্যার কথা আসিলেই সে আর অগ্রসর হইতে দেয় না—মুখ চাপিয়া ধরে।

কিন্তু প্রশ্ন এবং প্রশ্নোত্তর এইখানেই শেষ হইতে পারে না, আবার প্রশ্ন হয়—'বাবা, ওরা আর কি বলল?'

আমি আরও অনেক প্রসঙ্গের দ্বারা নানা টাল-বাহানা করিয়া শেষে বলি,—'ওরা বলল কি,—বাঃ, এই খুকু মেয়েটিত বড় ভাল!' শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একগাল হাসিয়া সে লজ্জায় মুখ লুকাইবার জন্য অন্য ঘরে দৌড়াইয়া পলাইয়া যায়।

জানিতাম, এই কথাটির জন্যই তাহার সকল আশপাশে ঘুরিয়া বেড়ান—তাহার প্রশ্নমালা। পিতা ও কন্যার এই অভিনয় অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছে।

একদিন বসিয়া বসিয়া এই কথাগুলিই ভাবিতেছিলাম এবং বেশ মজা দেখিতে-ছিলাম,—কি করিয়া চারি বৎসরের একটি কন্যার মনে ভরা রহিয়াছে শুধু আব্দার! এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময় এক বন্ধু আসিল। একসময়ে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম, আসা-যাওয়াও ছিল, এখন কালে-ভদ্রে দেখা-সাক্ষাৎ। বন্ধু আসিয়া প্রথমেই জানাইয়া দিল, অনেকদিন আমার সঙ্গে দেখা নাই,—দেখার জন্য অনেকদিন হইতেই তাহার প্রাণ কেমন করিতেছিল—কিন্তু শত ইচ্ছা থাকিলেও আসিবার উপায় কি! তাহার আপিসের কর্তা পকেটভরা মাইনে পাওয়া একটি নিরেট গোবেট—সুতরাং দশটা-পাঁচটার স্থলে দশটা-দশটা তাহার আপিস না করিলে আপিসের গণেশ মুহূর্তে উল্টাইবে। এবংবিধ ঘটনা বিপাকের মধ্যে আজ একান্তভাবেই সে মরিয়া হইয়া আমার কাছে চলিয়া আসিয়াছে—শুধু সন্দর্শন—বিশুদ্ধ বন্ধু-সন্দর্শন—আর কিছুই নয়।

তারপরে আরম্ভ হইল বর্তমান বাজারের অসঙ্গত চড়া দাম, শান্তিকামী নাগরিকগণের উপরে তাহার সাম্প্রতিক এবং সুদূরসম্ভাবী প্রভাব, সরকারি মহলের বিবিধ অসাধুতা—জওহরলালের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মোক্ষম মোক্ষম চালে ভুল, এম্‌-সি-সি'র খেলার ফল এবং বাঙলা সিনেমার বিষয়বস্তু এবং টেকনিক উভয়-ক্ষেত্রের ভয়াবহ ক্রমাধোগামিতার কথা।

এ-পর্যন্ত একরকম চলিতেছিল মন্দ না; কিন্তু তারপরেই আসিয়া পড়িল বাঙলা

সাময়িক-পত্রগুলির পরিচালক মণ্ডলীর স্বেচ্ছাচারিতার কথা—আর পুস্তক প্রকাশকগণের বইয়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে নির্বাচন-বুদ্ধির একান্ত অভাব এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রেও অর্থব্যবসায়ী দৃষ্টির অবাঞ্ছিত প্রাধান্যের কথা।

এ প্রসঙ্গগুলি আমাদের নিকট বড় পুরোনো হইয়া গিয়াছে—তাই উঠিতেই প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু লক্ষ্য করিলাম আমি তাহাদিগকে যত সযত্নে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছি বন্ধুবর ততই নানা প্রসঙ্গের অছিলায় ঠিক সেই প্রসঙ্গগুলি টানিয়া আনিবারই চেষ্টা করিতেছে।

সহসা মনে পড়িয়া গেল, তাইত,—কিছুদিন আগে যেন কোন্ পত্রিকায় আমার এই বন্ধুলিখিত একখানি গ্রন্থের সমালোচনা বা প্রশস্তি-লিপি পড়িয়াছিলাম,—তাহাতে ইহাও পড়িয়াছিলাম যে, গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সবই ইতঃপূর্বে একটি বিশেষ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু কি বিপদ—লজ্জার মাথা খাইয়া বন্ধুর নিকটে আজ আমি কেমন করিয়া এ-কথা বলি যে আমিই সেই মূর্খ—আমিই সেই পতিত নরাধম যে এমন যুগান্তকারী একখানি গ্রন্থকে এখনও সংগ্রহ করিয়া পড়ি নাই—এবং গ্রন্থখানির মধ্যে যে যথার্থই বচন-শলাকা দ্বারা খোঁচা মারিয়া চক্ষু উন্মীলিত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে সে বিষয়ে এখনও অবহিত হই নাই! প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা কাজ সারিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম,—'হ্যাঁ হে ভাই, বাজে কথায় যে আসল কথাই ভুলে যাচ্ছিলুম,—তোমার সেই বইটায় কিরকম সাড়া পাচ্ছ হে?'

শুনিয়াই বন্ধু এমন করিয়া একগাল হাসিয়া দিল যে দেখিয়া একমুহূর্তেই বুঝিতে আমার বাকি রহিল না, ঠিক এই কেন্দ্রবিন্দুটিতে আমাকে টানিয়া আনিবার জন্যই বন্ধু আমার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল এবং অন্তত অদ্যকার সন্ধ্যায় বন্ধুর শুভাগমনের শুধু মুখ্য নয়, একমাত্র কারণ ছিল ইহাই।

বন্ধু বলিল,—'কিরে তুই জানলি কি ক'রে বইয়ের কথা, পড়েছিস নাকি?'

দ্বিতীয়াংশের উত্তরটি সযত্নে চাপিয়া গিয়া প্রথম অংশকে অবলম্বন করিয়াই বলিলাম,—'ও বইয়ের কথা না জেনে উপায় আছে? বাজারে যে রীতিমতন হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।'

লজ্জিত হইবার ভান করিয়া বন্ধু বলিল, —'আরে যাঃ, তুই বাড়িয়ে বলছিস্।' বলিয়াই কিন্তু কোন্ কোন্ মনীষী বইখানি সম্বন্ধে কোথায় কি লিখিয়াছেন এবং ততোধিকভাবে লোকের কাছে কে কোথায় কি বলিয়াছেন তাহা প্রায় বিরাম-যতি শূন্যই অনর্গল মুখস্থ বলিতে লাগিল। তারপরে যে বন্ধুকে আর থামাইতেও পারি না, উঠাইতেও পারি না; কিন্তু দুইটাতেই যে আমার একেবারে আশু প্রয়োজন, কারণ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম আমার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় যে একটি সভার পুরোভাগে গিয়া বসিবার অঙ্গীকার রহিয়াছে। অতি দুঃখসহকারে কথাটা বন্ধুকে জানাইতে হইল এবং অতি অনিচ্ছাসহকারে তাহাকে উঠিয়া যাইতে হইল। বন্ধু চলিয়া গেলে আমার শুধু একটি কবিতার একটি লাইনই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে আসিতে লাগিল—

'মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত।'

যথাসময়ে সভার পুরোভাগে বসিয়া আছি, প্রধান অতিথির ভাষণ চলিতেছে; পুরা চল্লিশ মিনিট চলিয়াছে, তিনি যে সকল প্রসঙ্গ আজকার সভায় একান্তভাবেই উত্থাপিতব্য বলিয়া পূর্বাহ্নে আভাস দিয়া রাখিয়াছেন তাহা গুটাইয়া আনিতে আরও চল্লিশ মিনিটের কমে হইবে না হিসাব করিয়া একটু দীর্ঘকালস্থায়ী একটা আসন করিয়া বসিয়া রহিলাম। বিষয় মূলত বঙ্কিমচন্দ্র, কিন্তু বস্তুত বাঙ্গালী যাহা ছিল, যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে। এ-বিষয়ে বক্তা বহুপূর্ব হইতে কত সাবধান-বাণী, কত ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সব বাণী সময়মত গ্রহণ করিলে বাঙ্গালী জাতি আজ শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে নয়—জগতের মধ্যে কি হইতে পারিত,—আর সেই বাণীতে যথাসময়ে মনোনিবেশ না করার ফলে যে কি 'মহতী বিনষ্টি' অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই সত্যেরই আবৃত্তির পরে আবৃত্তি শুনিতে লাগিলাম—উদাত্ত-অনুদাত্ত—স্বরিত—প্লুত সব স্বরে। এই বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়ের নিকটে কি চিঠি দিয়াছিলেন, ব্রেজিলের টড্ সাহেবের নিকট এ-বিষয়ে একসময়ে তিনি কি মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে এ-বিষয়ে একদিন কি কড়া কথা শুনাইয়া

দিয়াছিলেন, বালক সুভাষকে একদিন কিভাবে তাঁহার হাতের বুড়ো আঙুল ধরিয়া মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিতে বলিয়াছিলেন, এসব কথাই তিনি বিস্তারিত জ্ঞাপন করিলেন। সেই এক বক্তৃতাই এতক্ষণ বসিয়া হইল এবং এমন অমোঘভাবে ফলপ্রসূ হইল যে সেই বক্তৃতার পরে সভাপতির ভাষণ শুনিবার জন্য কোনও শ্রোতাই আর অবশিষ্ট রহিল না। সভা-ভঙ্গ করিয়া বাড়িতে ফিরিতেছিলাম—পথে পথে শুধু ভাবিতেছিলাম, এ আমার হইল কি—? আমি যে দুনিয়ায় যাহা কিছু দেখি—যাহা কিছু শুনি সকলই সেই—

'মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত!'

কিছুদিন ধরিয়া নিজের মনের মধ্যে এই একটা নূতন আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলাম যে আমার জীবনে একটা মহৎ আবিষ্কার ঘটিয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্র যে বলিয়াছেন, 'মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে', এই কথাটি আমি ইদানীং যেমন করিয়া বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি এমন সুযোগ হয়ত আর অতি অল্প লোকেই পাইয়াছেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কিছুদিন এই লইয়াই ঈষৎ খোশ-মেজাজে আলোচনা করিতাম, মানুষের অবোধত্ব সম্বন্ধে সহৃদয়ের সহানুভূতি লইয়া হাসিতাম। প্রসঙ্গক্রমে এ জিনিসটিও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতাম যে মানুষের এই আদিম দুর্বলতার কথা সম্বন্ধে আমি এতখানি সচেতন বলিয়াই নিজের বিষয়ে আমি কঠোর আত্মসমীক্ষক। বড় বড় পুরুষ-সিংহেরও এবিষয়ে যে সহজাত দুর্বলতা তাহা তাঁহাদিগকে পরোক্ষে জনসমাজে কতখানি হাস্যাস্পদ করিয়া তোলে তাহা যে ভগবান্ চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, সেইখানেই ত নিজে বাঁচিয়া গিয়াছি।

কিন্তু মানুষের কি আর আত্মসুখে বাস করিবার উপায় আছে? একদিন হাতে পড়িল ত পড়িল একখানি 'চণ্ডীতত্ত্ব'। তাহার যে অংশটি আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িল তাহা আবার মহিষাসুর তত্ত্ব। মানুষের ভিতরকার 'আমি'-টিই নাকি হইতেছে এই মহিষাসুর। আমাদের ভিতরকার শক্তিরূপিণী দেবী তাঁহার বিবেক খড়্গ দ্বারা যতই তাহাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে চান, তত্ত্বদৃষ্টি-রূপ সূক্ষ্মাগ্র শূলের দ্বারা তাহাকে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া মারিতে চেষ্টা করুন না কেন, এ অসুর সহসা এত সহজে মরিবার নহে, সে নিরন্তর রূপ বদল করিয়া দেবীর দৃষ্টি এড়াইয়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চায়। শলাকার আঘাতে কঠোর বেদনানুভূতির সহিত জ্ঞাননেত্র আর একবার খুলিয়া গেল; চাহিয়া দেখিলাম, আর যাই কোথা,—চণ্ডীতত্ত্ব আমার সহিত চমৎকার মিলিয়া গিয়াছে। নিজের ভিতরকার সাধারণ অসুরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে গিয়া এতদিনে যে মহিষাসুর বনিয়া উঠিয়াছি! আত্মসমীক্ষণের ক্রমসূক্ষ্মাগ্র দুইটি শৃঙ্গ নাড়িয়া দেবীকে ভয় দেখাইতেছি বটে, আস্ফালনের লাঙুল তাড়নায় নিজে উল্লসিত হইয়া উঠিতেছি বটে—কিন্তু দেবীর চক্ষে বোধহয় এতদিনে ধরা পড়িয়া গিয়াছি। আমাকেও বোধহয় মানুষ পিছনে পিছনে হাসে।

মুশকিল হয় এইখানে, দুনিয়ার যত মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সবাই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, 'আমি'-টি হইলাম নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থির কেন্দ্রবিন্দু; সুতরাং আর সবাই-ই খালি ঘুরিতেছে, আমি শুধু অচল ধ্রুব। দুনিয়ার সকল লোক—তা তিনি জীবনের যে ক্ষেত্রেই যত বড় হোন না কেন—একটু না একটু ছিটগ্রস্ত—মাথার স্ক্রু বিধাতা পুরুষ ইচ্ছা করিয়া কিছু একটু ঢিলা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; কিন্তু সবকিছুই নিখুঁতভাবে ঠিকঠাক ফিটফাট রহিয়াছে শুধু আমার ক্ষেত্রে।

জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা যত যুক্তি-তর্ক প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে বিঘোষিত করুন না কেন যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে না, পৃথিবীই সূর্যের চারিপাশে দিনেরাত্রে সংবৎসরে ঘুরিয়া মরিতেছে, আমরা এখনও স্থির হইয়া বসিয়া আছি যে, সূর্যই ঘুরিয়া মরিতেছে, আমাদের পৃথিবী একেবারেই স্থির হইয়া আছে এবং তাহার ভিতরে আবার যে পর্যন্ত ট্রাম-বাস, রেল-স্টীমার, জাহাজ-উড়োজাহাজে না চড়িতেছি সে পর্যন্ত আমরা যে যাহার ঠায়-ঠিকানায় একেবারে নিশ্চল নির্বিকারভাবে আরাম কেদারায় পা ছড়াইয়া বসিয়া আছি। কিন্তু আমরা যে সকলেই নিরন্তর বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি তাহা আমাদিগকে কে জানাইয়া কে বুঝাইয়া দিবে? 'আমি'টি যে সদা ঘূর্ণায়মান তাহা বুঝিলে ত চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতিকে দিনেরাত্রে এমন করিয়া ঘূর্ণায়মান মনে করিতে পারিতাম না। সংসারে কে স্থির কে অস্থির ইহার মীমাংসা কে করিবে?

মনে আছে, আমাদের দেশে এক ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি সম্পূর্ণরূপেই 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'। আমরা জানিতাম তিনি একটু অপ্রকৃতিস্থ; আমরা তাই তাঁহাকে যতটা সম্ভব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু সাধ্য কি? গ্রামের পথে চলিতে ফিরিতে তিনি অতর্কিতে কোথা হইতে হঠাৎ রীতিমত গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই দুনিয়ার যত প্রকার সংবাদ এবং সমস্যা একটি একটি করিয়া তাহার উল্লেখ করিয়া নিজে তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকিতেন। এই-এই আলোচনা এবং মন্তব্য প্রসঙ্গে যত মানুষের নাম উল্লিখিত হইত সে মধু ধুপি হইতে মদনমোহন মালব্য যে বা যিনিই হোন তাহার সম্বন্ধেই সাবধান করিয়া সঙ্গোপনে বলিতেন,—'জান না, ও কিন্তু পাগল,—বদ্ধ পাগল!' একদিক হইতে তিনি ঠিকই বলিতেন। তিনি যদি একমাত্র প্রকৃতিস্থ মানুষের নমুনা হন (যে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্র কোনও সংশয় ছিল না এবং আমাদেরও নিজের নিজের সম্বন্ধে কাহারই কোনও দিন কোনও সংশয় নাই) তবে অপরে যাহা কিছু করে বা বলে তাহা ত সবই সেই বিবেচনায় বেঠিক—অতএব তাহারা পাগল নয় ত কি? কিন্তু হায়, দুনিয়ায় কে পাগল কে ঠিক একথা কে কাহাকে কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিবে? নানা হট্টগোলের মধ্যে 'আমি'-টিই কেন্দ্রবিন্দুতে অচঞ্চল এবং অবিনাশী হইয়া রহিল, বেচারা বাদ-বাকি সব কিছু নিরবধি কালে শুধু ঘুরিয়াই মরিতেছে।

সমরেশ বসু

যখন বেলা পড়ে আসত, সারাদিনের রোদ জ্বলা আকাশটায় ছড়াতো রং-এর তীব্র ছটা, জনহীন হয়ে আসত মাঠ ও বন, তখন মনে হ'ত রেল লাইনের উঁচু জমিটা আরও উঁচু হয়ে উঠেছে। যেন সারাদিন পরে নুয়ে পড়া মাথাটা আড়মোড়া ভেঙে তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। আর গাঢ় বর্ণের আকাশটা যেন নেমে আসত একটু একটু ক'রে। আকাশটাই ঘিরে থাকত উঁচু জমিটাকে।

তখন, দূর থেকে মনে হ'ত দু'টো অতিকায় দানব নেমে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ওই উঁচু জমিতে। [illegible] এ নির্জনতা ও নৈঃশব্দ্যের সুযোগে তারা নেমে এসেছে ধরাতলে। আকাশের অনেকখানি জুড়ে থাকত তাদের বিশাল দেহ। তাদের স্ফীত সুগঠিত মাংসপেশীর প্রতিটি সুস্পষ্ট রেখা ঢেউ দিয়ে উঠত আকাশের বুকে। তারপর, যখন তারা হঠাৎ খানিকটা সরে গিয়ে, ঝুঁকে পড়ে দাঁড়াত মুখোমুখি, এবং পরস্পরকে আচমকা আক্রমণ করে উঠত পড়ত, তখন শক্তি প্রয়োগে মাংসপেশীগুলি আরও উদ্দাম হয়ে উঠত। আকাশের বুকে ছিটকে যেত ধুলো মাটি। উঁচু জমিটা যেন থরথর ক'রে কাঁপত তাদের দেহ ও পায়ের চাপে। তখন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা ভয়ংকর দৃশ্যের অবতারণা হ'ত [illegible] এ জমিটার উপরে।

তারপর এ লড়াই চলতে চলতে, রং-এ রং-এ আকাশটা যখন কালো হয়ে আসে, জমি আর আকাশ হয়ে যায় একাকার, তখন তারা দুজনেই আকাশমাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে হারিয়ে যায়।

এমনি ঘটে রোজই। লড়িয়ে দু'জন দুই মস্ত মল্লবীর। লাখপতি আর ঘামারি। তারা দু'জনেই রেলওয়ে গেটম্যান।

মফঃস্বল শহর থেকে মাইল সাত আটেক দূরে, স্থানীয় স্টেশন থেকেও প্রায় দু' মাইল দূরে, মাঠের মাঝে এ ক্রসিং গেট। লাইনের পূর্বদিকের গ্রামটা কিছুটা কাছে। পশ্চিমের গ্রামটা একটা ঝাপসা কালো রেখায় মিশে থাকে আকাশের গায়ে। গেটের দু'দিকে দু'টো ঢালু সড়ক নেমে গেছে এ'কেবেঁকে, হারিয়ে গেছে মাঠ ও গ্রামের মধ্যে। চওড়া সড়ক। গরুর গাড়ির চাকার দাগে দু'পাশে গভীর রেখা পড়েছে। আর চারপাশে সবুজ ফসলের ক্ষেত।

ক্রসিং-এর দু'পাশে, ঢালু জমিতেই গেটম্যানদের ঘর। এমনভাবে ঘর দু'টো তৈরী হয়েছে, রেললাইনের উপর থেকেই লাফিয়ে ঘরের ছাদে চলে যাওয়া যায়। এপার থেকে ওপারের ঘর দেখা যায় না। ওপার থেকে এপারের না।

কাছাকাছি কোন বড় গাছপালা নেই। পাখীর জটলা বড় একটা শোনা যায় না। এখানে সারাদিন প্রজাপতি ফড়িং রঙিন পাখা মেলে অবাধে উড়ে বেড়ায়। ঝিঁ ঝিঁ'র গলা ফাটানো ডাক আরও ভারি করে তোলে নৈঃশব্দকে।

সারা দিনে লোকেরও যাতায়াত কম এই পথে। সকালে আর বিকালে দেখা যায় কিছু লোককে যেতে। হয়তো যায় কয়েকটা গরুর গাড়ি সারাদিনে। তাও গরুর গাড়িগুলোকে অধিকাংশ দিনই বেশ খানিকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কেননা, এই সীমান্তের যারা প্রহরী, লাখপতি আর ঘামারি, তাদের যতক্ষণ দয়া না হবে, ততক্ষণ সীমান্তদ্বার খোলার কোন উপায় নেই।

তারা অবশ্য লোক খারাপ নয়। কিন্তু এই নির্জন গ্রামের সীমানায়, চাকরি ছাড়া জীবনধারনের যে আর মাত্র একটি দিক তাদের আছে, তা' হল মল্লযুদ্ধ। সেজন্য দেহ তৈরী কাজটি তাদের সর্বাগ্রে। যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের তৈলমর্দনের সময়, কিংবা সকালের বুকডন বৈঠকের উত্তেজনায় চোখ লাল, মাথাটা অবসাদগ্রস্ত আর দেহের শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ পাগলা গতিতে থাকে ঝাঁকাতে, তখন পাচনবাড়ি হাতে কোন

গাড়োয়ানের 'খোলেন গো পবন-পো।' শব্দ তাদের কানেই ঢোকে না।

পবন-পো কথাটি খুব শ্রদ্ধা ও ভয়ের সঙ্গেই গাঁয়ের লোকে তাদের বলে। তারাও সাগ্রহে ও আত্মসন্তোষের সঙ্গে এই সম্মান গ্রহণ করে। কেননা, পবনপুত্র বলতে ভীম এবং হনুমানকেই নাকি বুঝিয়ে থাকে! লাখপতি আর ঘামারি, পরস্পরকে তারা ওই শক্তিমান বীর দুজনেরই অংশবিশেষ বলে মনে করে। আর, দুই বীরের-ই পূজারী তারা। বজরংবলী তাদের দেবতা। অর্থাৎ বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান।

কথাটা মিথ্যে নয়।

এই নির্জন পরিবেশে, লোকালয়ের বাইরে, দূর প্রান্তরে তারা দুই বন্ধু যেন গহন অরণ্যের দু'টি জীব। এখানে এই পরিবেশে তারা একাত্ম ও মুক্ত।

লাখপতি এখানে এসেছিল তার বিশ বছর বয়সে। ঘামারি তার চেয়ে বড় বছর দুয়েকের। আজ দশ বছর ধ'রে তারা একত্র রয়েছে। এই দশ বছরের মধ্যে তারা কখনো ফারাক হয়নি। এই দশ বছরের মধ্যে, পৃথিবীতে হয়েছে অনেক ওলটপালট। অনেক রাজ্য ভেঙেছে গড়েছে। অনেক মানুষ বেঁচেছে মরেছে। নদী ভিন্ন পথ ধরেছে, নতুন স্থলভূমি দেখা দিয়েছে, ঘটে গেছে ভৌগোলিক পরিবর্তন। এমন কি, ওই দূরের গ্রামগুলিতেও পরিবর্তন হয়েছে কিছু কিছু। কিন্তু এখানে কোন পরিবর্তন নেই। উদার আকাশের তলায়, এই নির্জন লেবেল ক্রসিং-এর দু'পাশে যেন পৃথিবীর কোন দুর্গম অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিকতা বিরাজিত।

পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে, সেটুকু লাখপতি আর ঘামারির দেহে ও রক্তে। দিনে দিনে তাদের দেহের রূপ বদলেছে। সঞ্চিত হয়েছে রক্ত, স্ফীত হয়েছে মাংসপেশী। এখন ক্রমে বাধাহীন হয়ে উঠেছে যেন তাদের রক্তপ্রবাহ। দেহের মধ্যে সে অস্থির, প্রতি মুহূর্তে একটা ভয়ংকর বন্যতা ফেটে পড়তে চাইছে। ক্রমশ অধ্যবসায়ে একদিন যা ছিল কোমল সুন্দর ও সুগঠিত, আজ তা বন্য পাহাড়ের মত খোঁচা খোঁচা পাথর। তাদের প্রেম, ভালবাসা, তাদের হাসি খুশী, আলাপ-আলোচনা সব এই দেহকে ঘিরে। এই দেহ ও পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বই মল্লযুদ্ধ। আর দিনে দিনে পরিবর্তন হয়েছে রেললাইনের তারের বেড়ার বাইরে তাদের মল্লভূমির প্রশস্ত স্থানটুকু। সেই মাটিটুকুকেও তারা দেহের মত ভালবাসে, দেহের মতই তার সেবা করে, তার প্রতিটি কণাকে তৈরী করে। এই মাটিতে তাদেরই গায়ের গন্ধ, তাদেরই ঘামে তাদেরই উত্তাপে শুকনো ও ঝুরঝুরে।

এবেলা ওবেলা, দিনে ও রাত্রে কয়েকবার ক'রে নিশান দেখানো, দেখানো নীল আলো, তাদের কাছে কোন কাজ-ই নয়। মাসে তারা একবার ক'রে সাত আট মাইল দূরের জংসন স্টেশনে যায় মাইনে আনতে। খোরাকি ও দরকারী বস্তু কিনে নিয়ে আসে তখনই। বাদবাকী দরকার দিনে একবার ক'রে গাঁয়ে গেলেই মিটে যায়। তাদের দু'জনের দু'টো গরু আছে। কিনতে হয়নি, দিয়েছে পুষতে না-পারা হা-ভাতে গাঁয়ের লোকেরা। গরু পুষতেও তাদের ভাবতে হয় না। লাইনের ধারে বেঁধে দিলেই জীব দু'টির পেট ভরে। রাত্রে কিছু জাব আর জল। তাইতেই দুধটা তাদের লাভ। সকালের দুধটা এসে একজন নিয়ে যায়। বিকালের দুধ তারা তাদের কুস্তির পর, জলের মত কাঁচা-ই পান করে। রাঁধে খায় এক সঙ্গে, থাকে সারাদিন এক সঙ্গে, রাত্রে শোয় আলাদা।

সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত, এই কাজগুলি সামান্য। কিন্তু, এই নির্জন পরিবেশে যা একদিন প্রয়োজনের জন্য তারা আরম্ভ করেছিল, আজ তা দারুণ নেশার মত জড়িয়ে ধরেছে রক্তের মধ্যে। অসামান্য হ'ল দেহ-চর্চা। রাত পোহালেই রক্তপ্রবাহে জাগে কলরোল। দেহের মধ্যে আছে তাদেরই অপরিচিত আর একটা খ্যাপা জীব। সময়ের একটু এদিক ওদিক হলে, প্রতিটি ধমনীতে সে পাগলের মত খোঁচাতে থাকে, ছুটোছুটি করে।

তখন আর চুপ ক'রে বসে থাকা যায় না। তখনই ল্যাঙট এ'টে, তুলসীমঞ্চের গর্তে সযত্নে রক্ষিত হনুমানের ছোট্ট মূর্তিটিকে নমস্কার ক'রে বুকডন বৈঠকে মেতে যায় তারা। বিকাল না হ'তেই আবার সেই। বজরংবলীর পূজো, তৈলমর্দন, ব্যায়াম ও মল্লযুদ্ধ।

মল্লযুদ্ধ শেষে দুধের মধ্যে বাটা সিদ্ধি মিশিয়ে খায়। খেয়ে গরিলার মত রক্তবর্ণ দু'টো চোখে স্নেহ ও সোহাগভরে দেখে শুধু নিজেদের দেহ। যেন তাদেরই পোষা দু'টি অতি স্নেহের জীব এই দেহ দু'টি।

এই সময়ে তাদের অতি ভয়ংকর দেখায়। মাথা আর ঘাড় তাদের সমান হয়ে উঠেছে। কোথাও যেন উঁচুনীচু নেই। কান দু'টোও আঘাতে আঘাতে দুমড়ে চেপটে যেন অনেকখানি মিশে গেছে। মল্লবীরদের নিয়ম তাই। কান পিটিয়ে পিটিয়ে একটা ড্যালা ডুমড়ি গোছের করে ফেলতে হয়। সেই কানে আবার অতি যত্নে পরানো আছে সোনার মাকড়ি। নাকগুলি চেপটে এ'কে-বেঁকে গেছে। চোখের কোল ও গালের মাংস শক্ত ও ফোলা। চোখ দু'টো ঢাকা পড়ে গিয়েছে কোটরে। ঘাড়ের মাংসপেশী যেন নিয়ত আক্রমণোদ্যত ভল্লুকের মত ঠেলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সামনের দিকে।

তারা বসে থাকে মুখোমুখি। আর তাদের মুখোমুখি হা করে চেয়ে থাকে মাঠ, বন, সর্পিল সড়ক আর আকাশ। তাদেরই ক্লান্তি ও অক্লান্তিতে বিরতি দিয়ে দিয়ে ডাকে ঝিঁঝিঁ।

তখন ঘামারি হয়তো বলে, 'আচ্ছা লাখুয়া, ভীমের চেহারাটা কিরকম ছিল বলতে পারিস?'

কথাটার মধ্যে কোন ঠাট্টার আভাস নেই। লাখপতি একটু ভেবে বলে, 'ঠিক বলতে পারছি না। তবে শুনেছি দৈত্যের মত।

তা' নইলে আর হিড়িম্বা রাক্ষসীকে মেরে ফেলেছিল?'

ঘামারি বলে, 'হুঁ, ঠিক।'

ভীম হনুমান, এদের নিয়ে প্রায়ই তারা এরকম আলোচনা করে। ইচ্ছে করে নয়। আপনি ওসব কথা তাদের মনে আসে।

কোন সময় হয়তো লাখপতি বলে, 'জানিস্ ঘামারি, আমার মনে হয় মহাবীর হনুমান আমাদের জরুরু দেখ্ভাল্ করে, আসে এখানে।'

অমনি ঘামারির ভাং নেশাচ্ছন্ন লাল চোখ দুটো ওঠে চকচকিয়ে। বলে, 'হ্যাঁরে, আমারও শালা ওরকম মনে হয়।'

বলতে বলতেই আপনি আপনি তাদের বিশাল দেহের মাংসপেশীগুলি নাচতে থাকে।

তখন ঘামারি বলে, 'আমার কি মনে হয় জানিস। এ রেল-লাইনের জমিটা আমি একলাই সিরিফ্ গর্দানের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারি। কেন বল তো?'

লাখপতি বলে, 'কি জানি মাইরী! আমারো শালা ও রকম মনে হয়। মনে হয়, দুনিয়াটা বেমালুম হালকা। ঘাড়ে করে নিতে পারি।'

সত্যি, দেহে তাদের এত শক্তির প্রাচুর্য যে, শুধু নেশা নয়, এমনি একটা অপরিসীম ক্ষমতা অনুভব করে তারা। এই প্রচণ্ড শক্তিটা এক সঙ্গে জমাট হয়ে যেন আগুনের মত ঠিকরে পড়ে তাদের চারটে চোখে। দেহ তাদের গৌরব, তাদের সব।

তখন হয়তো ঘামারি বলে, 'আয়, আর একবার লড়ি।'

লাখপতি বলে, 'সেই ভাল।'

কিন্তু আবেগবশত যেদিন লড়ে, সেদিন সময়ের কোন স্থিরতা থাকে না। অন্ধকারে শুধু দুপদাপ, হঠাৎ চাপা হুংকারের তীক্ষ্ন শব্দ, জন্তুর নিঃশ্বাসের ফোঁসফোঁসানি রাত্রিটাকে চমকে দেয়। বিমূঢ় অন্ধকার ও নক্ষত্রখচিত আকাশ চেয়ে থাকে হাঁ করে। আর অন্ধকারেও তাদের ঘর্মাক্ত শরীরে এমন একটা চমকানি দেখা যায় যেন, পাথরের ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে আগুনের ঝিলিক। কখনো শুধু মাথা ঠোকাঠুকি করে পরস্পর। তখন মন হয়, লেঠেলদের লাঠি ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

এই দৈহিক শক্তির খেলা-ই তাদের নেশা। তাদের মাতামাতিতে রাত্রিচর বাদুড়গুলিও দূরে দিয়ে উড়ে যায়, জানোয়ারগুলি ফারাক দিয়ে পাশ কাটায়। কারণ প্রকৃতির গড়া ভয়ঙ্করের মতই তাদের তখন দেখতে হয়।

এই দশ বছর কেউ তাদের কোথাও যেতে দেখেনি। গাঁয়ের লোক জানত তাদের কেউ নেই। তারাও সেরকমই জানত বোধ হয়। কেননা, তাদের মুখে কেউ কখনো অন্য কোন কথা শোনেনি। গাঁয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও কম। কেবল মাঝে মাঝে গাঁয়ের ছেলেরা আসে তাদের কুস্তি দেখতে। তাও ভয়ে ভয়ে। তাদের এই নীরস দেহ সাধনা মানুষের কাছ থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছে। নীল পুজোর দিন, গাঁয়ের মেয়েরাও আসে। আর সপ্তাহে একদিন, শুক্রবার কিছু ভিড় হয়। ওইদিন হাটবার। ক্রসিং পেরিয়ে যেতে হয় হাটে, সেইজন্যই ভিড়।

লোকে যেমন জানত, তাদের কেউ নেই, তারাও সেই রকম বিশ্বাস করত। কেননা, ঘামারির বউ মরে গেছে দেশে থাকতেই। তার আর কেউ নেই। তারপর থেকে সে এখানে আছে।

লাখপতিও পিতৃমাতৃহীন। ভাইবোনও নেই। ভগবান জানে, তার বাপ মা কি ভরসায় তার নাম রেখেছিল লাখপতি। পাঁচ বছর বয়সে তার বিয়ে দিয়ে দশ বছর বয়সে বাপ মা তাকে সংসারে একাকী করে রেখে গেছে। না ঘর, না ক্ষেতি জমি। ভাগ্যি ভাল, খুড়ো ছিল শিয়ালদহ লোকোর কুলি। সে বেঁচে থাকতেই জুটিয়ে দিয়েছিল কাজটা।

পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। নিয়ম হচ্ছে বর-কনে বড় হলে, যোয়ান হলে গাওনা হয়। ওইটিই আসল বিয়ে। তখন থেকে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ঘর করে। কিন্তু লাখপতির ভাগ্যে তা-ও ঘটে ওঠেনি। কি দিয়ে গাওনা হবে, বউ আসবে কোথায়।

তারপরে কাজ জুটেছে এই বাংলা দেশে। কেউ তাকে দেশে আজ অবধি ডাকেনি, সে-ও যায়নি। বউটাকে হয়তো আর কেউ ঘরে তুলেছে, কিংবা বাপ-মা বিক্রী করে দিয়েছে কাউকে। কিন্তু সেকথা দশ বছরে দশবারও তার মনে পড়েছে কি না সন্দেহ। এমন কি পাঁচ বছরের সেই স্মৃতির কণাও নেই তার মনে।

নারী সংক্রান্ত কথাবার্তা তাদের আলোচনায় খুব কম। ওদিক থেকে তারা অনেকটা নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। গাঁয়ের কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হওয়া ও মেশার অবসরও নেই তাদের।

তারা আছে তাদের কাজ, দেহচর্চা ও

মল্লযুদ্ধ নিয়ে। তারা শোনে শহরের মল্লযোদ্ধাদের কথা। তারা শহরে গেলে শহরের লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে।

তবু তাদের এই অসীম শক্তি ও বিশাল দেহটার মধ্যে কি যেন আটকা পড়ে আছে। যেন একটা খাঁচায় পোরা পাখি ছটফট করছে সব সময়েই মুক্তির জন্য। কিন্তু এই পরিবেশ ও দেহ ভেদ করে সে কখনোই বাইরে আসতে পারে না। এ যে কিসের বন্ধন, তারা জানে না। তবু, একটা দুর্বোধ্য আবেগ আসে তাদের মনে। তা-ও এতই ক্ষণস্থায়ী যে, আবার তারা মল্লভূমিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্লান্ত হলে পড়ে ঘুমিয়ে। ঘুম ভেঙেই গর্ব ও আনন্দভরে তাকায় পাহাড়ে বুকের দিকে, নাড়া দেয় মাংসপেশী। যেন পাথর কাঁপছে। তারপর আধঘুমন্ত, আড়-মাতালের মত কাজে হাত দেয়।

দেহ প্রধান। মস্তিষ্ক যেন কোন কুলুপ কাঠি দিয়ে আটকানো, অবসাদগ্রস্থ, নিষ্ক্রিয়। হৃদয়টাও কেমন যেন আবদ্ধ, অন্ধকার। এই তাদের জীবন।

এমনি অবস্থায় একদিন, হেমন্তের মাঝামাঝি এক দুপুরে গাঁয়ের ডাকঘরের পিয়ন এসে ডাকল, 'কই গো পবন-পো দাদারা।'

জবাব এল, 'এখুন দরজা নাই খোলা যাবে গো।'

পিয়নটাও অবাক হয়েছিল। চিঠি দেখে হাঁক দিল আবার, 'লাখপতি চামারিয়া কে আছেন গো আপনাদের মধ্যে?'

লাখপতি চামারিয়া? দুই মল্লবীর-ই উঠে এল দিবানিদ্রা ছেড়ে। তারাও ভারি অবাক।

লাখপতি বলল, 'কি হয়েছে?'

'আপনার নাম লাখপতি চামারিয়া?' এ গ্রাম্য বাঙালি পিয়ন চামারিয়া পদবীটা একটা বর্ণহিন্দুর পদবী ঠাউরেছে বোধ হয়।

লাখপতিঃ 'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

—'আপনার একটা চিঠি আছে।'

—'ইংলিশ চিঠি?'

—'না। হিন্দী।'

বোঝা গেল অফিসের নয়। লাখপতি আর ঘামারি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, মাটি কাঁপিয়ে গিয়ে চিঠিটা নিল। পড়বে কে? ঘামারি সামান্য পড়তে জানে। তবে দেহাতী অক্ষর। সৌভাগ্যের বিষয় চিঠিটা ধুলো-কাদামাখা দোমড়ানো হলেও দেহাতী ভাষায় লেখা।

পিয়ন বলল, 'ছ' মাস আগে চিঠিটা আপনাদের হেড অফিসে আসছে, এখানকার ঠিকেনা নাই কি না? তা কি বিত্তান্ত?'

দুজনেই তাড়াতাড়ি খাটিয়া পেতে বসল পড়তে। প্রথম অক্ষরটি পড়তে প্রায় পাঁচ মিনিট লাগল। পিওন বিদায় হল হতাশ হয়ে।

বিকালের দিকে চিঠি পড়া শেষ হলে তারা অবগত হল, চিঠিটা দিচ্ছে লাখপতির বিধবা খুড়ি। বক্তব্য, সে এবার মরবে। আশা করছে, এতদিনে লাখপতি গুছিয়ে নিয়েছে। সে যেন তার বউকে এবার নিয়ে যায়। বউ খুড়ির কাছেই আছে। তাই উপদেশ হচ্ছে, যৌয়ান আওরৎ, খর নদীর নৌকা। মাঝি হাল না ধরলে এবার তরী যাবে। অতএব আর দেরী নয়।

দুজনেই তারা তাদের এবড়ো-খেবড়ো মুখ দুটো আরও ভয়ংকর করে বসে রইল। জীবনে একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে। নিতান্ত আচমকা। হোক দেহের মধ্যে সীমিত, তবু জীবন তাদের ওখানেই পরিপূর্ণ। দেহের নানা স্থানে কতগুলি মাংসপেশী ফুলে উঠে অস্বস্তিতে থমকে রইল।

ঘামারি বলল, 'অওরৎ?'

লাখপতি বলল, 'এখানে?'

একটা ধিক্কার দেখা দিল তাদের চোখে। কিন্তু এদিকে বিকালের অস্থিরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তাদের রক্তধারায়। কথা অসমাপ্ত রেখে নেশার ডাকে সাড়া দিতে চলল তারা। দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নরম মল্লক্ষেত্রে।

তারপর রাত্রে যখন দুধ সিদ্ধি খেয়ে বসল দুজনে, তখন একই ভাবনা ঘিরে এল আবার তাদের মনে। দেহকে ঘিরে তাদের ঘোর স্বার্থপরতা, পৃথিবীর আর সর্বদিক থেকে এমনইভাবে বিমুখ করে রেখেছে চোখ ও মন। তাদের দেহ সাধনার যে পরম আনন্দ, তাতে এক নিরানন্দের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। এই দেহ থাকলে তার সুখ, পরমায়ু ও ভগবান। আওরৎ তো তাতে শুধু ক্ষয় ধরিয়ে দেবে।

অন্ধকারের মধ্যে পরস্পরকে একবার দেখল। তারপর স্থির হল, এটা নিশ্চয়ই মহাবীরের ইচ্ছা। সুতরাং আনতেই হবে। তবে লাখপতি তার এই দেহের ভাগ তাকে একটুও দেবে না। দুই বন্ধু এই স্থির করল। বউ থাকবে নিজের কাজ নিয়ে।

তারপর ছুটি নিয়ে লাখপতি দেশে গেল। নিয়ে এল বউ।

ছাব্বিশ বছরের এক মেয়ে, নাম তার উরাতীয়া। খুড়ি শাশুড়ীর ঘরে ক্রীতদাসীর মত খেটে খাওয়া মেয়ে। স্বাস্থ্য ও যৌবনে পূর্ণ তার সুগঠিত দেহ। বেশ আঁটো, সামান্য খাটো, রংটা আধা ফরসা। রূপসী বলা যায় কি না জানিনে। তার নিরাভরণ শরীরের পুষ্ট হাত-পায়ের গোছায় একটা বিহারী রুক্ষতা, কিন্তু চোখ দুটি ভরা কালো দীঘির মত ভাসা ভাসা অথচ গভীর। আর, হয় তো প্রথম স্বামী সাক্ষাতের গোপনলীলায় একটা দুর্বোধ্য হাসি তার গালের টোলে।

একটা হলদে শাড়ির ঘোমটা টেনে সে এল লাখপতির সঙ্গে, হাতে পুঁটলি ঝুলিয়ে। এল নির্জন মাঠের বুকে, লেবেল ক্রসিং-এর ঢালু জমির কোলে গেটম্যানের ঘরে। একদিন যাদের পদক্ষেপে ঘরটা কাঁপত, আজ আর একজনের পদসঞ্চারে সেই ঘর নিঃশব্দ, কিন্তু বিচিত্র শিহরণে, পুলকে ভরে উঠল। মল্লবীরের সাজানো-গোছানো গুমটি ঘরে আলো এল, হাওয়া বইল।

ঘামারি এসে দাঁড়াল। লাখপতি দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। বুকে বুক ঠেকল। কয়েকদিনের যন্ত্রণাকাতর চাপা পড়া রক্তধারায় জোয়ার এল আবার। তারপর দুই মল্লবীর চোখ দিয়ে চেটে চেটে দেখল দুজনকে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল দু'জোড়া চোখ।

লাখপতি বলল, 'চল্, একবার দেখা যাক।'

ঘামারি বলল, 'তুই দেখিস্ নি?'

লাখপতি বলল, 'ধুস্, শালা, মনেই হয়নি। চল্ এক সঙ্গে দেখি গে।'

ঘামারিঃ 'কি আর দেখব? অওরৎ অওরৎ।'

লাখপতিঃ তবু একবার—

দুজনে হাত ধ'রে ঘরে ঢুকল। উরাতীয়া বসে রয়েছে ঘোমটা টেনে। তারা দুজনে বসল অদূরের খাটিয়ায়। উরাতীয়াকে দেখে আর চোখাচোখি করে।

একটু পরে উরাতীয়া ঘোমটা তুলে খুব ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার কালো চোখে। দুজনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হ'তেই শান্ত অথচ মিঠে হাসি চমকে উঠল তার চোখে ও গালের টোলে। মাথাটি গেল নেমে। রুক্ষ খোঁপাটা ভেঙ্গে পড়ল ঘাড়ের পাশ দিয়ে।

হাসি দেখে অবাক বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল মল্লবীরেরা। আবার উরাতীয়ার চোখ উঠল, দূরে মেঘে যেন হালকা বিদ্যুৎ চমকালো মিঠে হাসির। বিশাল দেহ দুই বন্ধু আবার মুখ চাইল পরস্পরের।

তারপর হেসে উঠল। হাসতেই লাগল উচ্চরোলে। যেন এক রুদ্ধ ধারা হঠাৎ মুক্ত হয়ে অনর্গল বয়ে চলল অট্টরবে।

আর সেই অট্টরবের সঙ্গে এক বিচিত্র সুরে যোজনা করল নূপুর নিক্কনের মত চাপা গলার খিলখিল হাসি। থরথর করে কেঁপে উঠল উরাতীয়ার শরীর ও ভাঙ্গা খোঁপা।

এমনই অভাবনীয়, অচিন্তনীয় এই বিচিত্র হাসির রোল যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ক্লসিং গেটের এই চারপাশের সীমা, তার বনপালা সড়ক ও আকাশ থমকে রইল এক মুহূর্ত। পরমুহূর্তেই হেমন্তের অপরাহ্ন নেচে উঠল হাওয়ায়। ইতিহাসের যুগ ফিরে এল যেন সমস্ত পরিবেশটায়।

আজ এল মাঠের পাকা আমনের গন্ধ, গাভীর হাম্বা রব, মাঠের মানুষের হাঁকা-হাঁকি ডাকাডাকি। আর আশ্চর্য! এই কান পেটানো, নাক থ্যাবড়ানো, চাঁছা মাথা, এবড়ো খেবড়ো মুখ এই পাহাড়ে মানুষ দুটোকে দেখে একটু ভয় পেলে না গেঁয়ো উরাতীয়া। সে সমানতালে হেসে হাসিয়ে এক নতুন রং ছড়িয়ে দিল এখানে। তারপর খুলে ফেলল তার পুঁটলি।

কণ্ঠরোল থামল। কিন্তু যেন যুগ-যুগান্তের চাপা পড়া হাসি কাঁপতে লাগল মল্লবীরদের পেশীতে পেশীতে, হাসতে লাগল গর্তে-ঢোকানো চোখ। নিজেদের হাসিতে তারা নিজেরাই বিস্মিত। কৌতূহলিত হয়ে তারা দেখল আবার উরাতীয়াকে।

উরাতীয়া পুঁটলি খুলে বার করেছে বাঁকমল। পরেছে পায়ে। এইটুকু তার বাপের বাড়ির সম্বল। লুকিয়ে রেখেছিল খুড়িশাশুড়ির ঘরে এসে। আসল লোকের ঘরে এসে একদিন সে পরবে, এই ছিল সাধ। আজ তা পূর্ণ হল।

মল পায়ে দাঁড়াল উঠে সে। অসংকোচে ঘুরল সারাটি ঘর। আপন মনে হেসে হেসে দেখল চারদিক। রাবণের লঙ্কা পোড়ানো, গন্ধমাদন বহন, বুক চিরে দেখানো রাম-সীতা, এমনি ছ'সাত রকমের শুধু মহাবীর হনুমানের ছবি টাঙ্গানো আছে ঘরটায়।

তারপর বাইরে এসে দাঁড়াল উরাতীয়া। দুই মল্লবীর বন্ধুও উঁকি মেরে দেখতে লাগল এই অদ্ভুত ব্যাপার। উরাতীয়া গিয়ে দাঁড়াল তুলসীমঞ্চের কাছে। নীচু হয়ে দেখল মহাবীর হনুমানের মূর্তি। সেখানে গড় করল। মল্লক্ষেত্রের চারপাশে দুই বন্ধু লাগিয়েছিল বেল ও গাঁদার চারা। সৌন্দর্যের জন্য নয়। মল্লক্ষেত্রের পবিত্রতার জন্য। হনুমানজীর পূজোর জন্য। কয়েকটা গাঁদা ফুল ফুটেছে এর মধ্যেই।

উরাতীয়া টপাস্ করে ছিঁড়ল একটি ফুল। আড়চোখে দেখল দুই পুরুষকে। তারপর লাইন পেরিয়ে নেমে গেল ওপারে। গিয়ে খোঁপায় গুঁজে দিল ফুলটি।

দুই বন্ধু এগিয়ে উঁকি দিল। দেখল, উরাতীয়া ঘামারির ঘরটিও দেখছে ঘুরে ঘুরে। তার ঘোমটা গেছে খসে। বাইরে এসে দুজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জার বিচিত্র রাগে, হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আর একটা হাসির উচ্চরোল পড়ল ফেটে। কেন, তারা নিজেরাই তা জানে না। কেবলি হাসি আসছে, হাসি পাচ্ছে। প্রাণ চাইছে, ভাল লাগছে।

তারপর দেখা গেল, তাদের গায়ে আঁচলের হাওয়া দিয়ে উরাতীয়া দুলে দুলে চলে গেল পুবের সড়কের পাশে ছোট্ট পুকুরটিতে। স্নান করে এসে, কাপড় পরে খুঁজে পেতে বার করল দুধের বালতি। গাইয়ের বাঁট দেখে সে টের পেয়েছে, সময় হয়েছে দুইবার। মরদগুলোর সে খেয়াল নেই। কোনদিন ছিল না নাকি।

একটা নয়, ঘামারির গরুরও দুধ দুইল সে। দুয়ে অবাক-মুগ্ধ মল্লবীর পুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'উনুন কোথায়? আগুন দেব।'

দুই বন্ধু বিস্ময়ে চোখাচোখি করল। চোখে চোখেই তাদের কথা। পরস্পরের চোখের দিকে তাকালে তারা মনের ভাব বুঝতে পারে। মল্লক্ষেত্রে ওই শিক্ষাটি তারা আয়ত্ব করেছে। তাদের চোখ বোবা জানোয়ারের মত বলাবলি করছিল, 'এসব কি হচ্ছে? সত্যিই কি আমাদের জীবনে একটা নতুন কিছু ঘটতে বসেছে? একটা কোন সর্বনাশ কিংবা সুখের ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে?' তবু তাদের মস্ত বুক দুটিতে একটা খুশীর বন্যা পাক দিয়ে উঠছে।

ঘামারি বলল, 'তোর উনুনটা বার করে দে।'

লাখপতি, 'কেন? তোরটা কি হল? তোরটা-ই দে' বলেই আবার কি হল তাদের, তারা হেসে উঠল। এক নাম-না-জানা মদির রসে আকণ্ঠ ভরে উঠেছে তাদের। একটা মাতলামির ঘোর লেগেছে মনে।

শুধু তাদের মাঝে হাসি-উচ্ছল উরাতীয়ার গা বেয়ে যেন একটা মানুষিক মোহের ঝরণা পড়তে লাগল গড়িয়ে গড়িয়ে।

উনুন ধরল। ঘামারির ঘরে রান্না হত এতদিন দুজনের। এবার তিনজনের রান্না চাপল লাখপতির উঠোনে।

ঘামারি তেল আর ল্যাংগট নিয়ে এল। লাখপতির চাপা রক্তে লাগল ঢেউ। দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল মল্লক্ষেত্রে। এতদিন শুধু মল্লযুদ্ধের জন্য মল্লযুদ্ধ হয়েছে। এতদিন শুধু নানান কায়দা ও চাপা হুঙ্কার উঠেছে

ভয়ঙ্কর শক্তির ঘোরে। আর থমকে থেকেছে চারিদিকের পরিবেশ।

আজকের লড়াই উল্লসিত। আজ প্রাণ-খোলা উল্লাসের বাণ ডেকেছে মল্লক্ষেত্রে। রাম্না চাপিয়ে থেকে থেকে এসে দাঁড়াচ্ছে উরাতীয়া। কখনো বাঁকা হয়ে, সোজা দাঁড়িয়ে, ঘোমটা তুলে ও খুলে, চোখ বড় বড় করে, নয় তো খিলখিল হাসির বাজনা বাজিয়ে দেখছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অসংকোচে দিয়ে উঠছে হাততালি।

মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করছে, কার ক্ষমতা বেশী। আশ্চর্য! কেউ কাউকে আঁটিতে পারছে না। ঘামারিকে ফেলে লাখপতি তার ঘাড়ে মাটি ফেলছে আর হাঁকাচ্ছে রন্দা। তারপর বগলের তলায় হাত দিয়ে চেষ্টা করছে উল্টে ফেলতে। পারছে না। আবার পাল্টা লাখপতিকে নিয়ে চলল চেষ্টা। হল না।

তখন আবার হাসি। তিনজনের হাসি। এতদিন এই সন্ধ্যাবেলার উঁচু জমিটার উপরে, আকাশের কোলে দেখা যেত দুটি দানবের মূর্তি। আজ আর একটি বিচিত্র রূপের দ্যুতি মূর্তি ধরে দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝখানে। আজ তারাও যেন ধরছে মানুষের মূর্তি। মানুষিক স্বপ্নের ঘোর লেগেছে আজ এখানে।

তারপর দিন চলে গেল। একটা নতুন যুগের নব রূপায়ণের সূচনা ঘটল এখানে।

উরাতীয়া ছোট ঘরের মেয়ে ও বউ। ক্রীতদাসী ছিল খুড়িশাশুড়ির ঘরে। নিষিদ্ধ যৌবনবাসর থেকে নিয়ত হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তাকে। যেমন ডাকত আরও অনেককে। যেতও অনেকে। সে প্রতীক্ষা করেছিল একজনের জন্য।

এখানে এসে তার ছাব্বিশ বছরের পিপাসিত যৌবন প্লাবিত হল। সেই প্লাবনের ধারায় পলি পড়ল এখানকার মাটিতে, দুটি মল্লবীর মানুষের হৃদয়ে। সে একজনকে দিয়ে খুশী, পেয়ে খুশী আর একজনকে। লাখপতি তার ষোল আনা। জীবন ও যৌবনের দেবতা। ষোল আনার টায়টিকে হিসাবের পর যেটুকু মানুষকে করে নিঃশঙ্ক, বুকে আনে বল, তার সেটুকু হল ঘামারি। ঘামারি তার সহচর। তারা তার প্রেম ও প্রীতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ্য, সুখ ও দুঃখ।

দেবতা ও সহচর, দুই মল্লবীরের মনে সে বোধ ছিল না। অবোধ খুশীতে রচিত হয়েছে তাদের নতুন জীবন। তারা এতদিন শক্তি অনুভব করেছে মাংসপেশীতে। এবার হৃদয়ে হৃদয়ে। তাদের বিশাল শক্তিশালী শরীরের মধ্যে যে বন্দী বিহঙ্গটা এতদিন ছটফট করেছে, সে অকস্মাৎ মুক্ত হয়ে, ঝাঁপ দিয়ে স্নান করে নিল এক মুক্ত ফল্গুধারায়। জানত না, বন্দীর এ মুক্ত ফল্গুধারা হল উরাতীয়া।

এখন কুস্তির শেষে, যখন তারা দুজন দুধ সিদ্ধি খেয়ে হাওয়ায় বসে দোলে, তখন তাদের মাঝখানে এসে বসে উরাতীয়া। আগে তাদের মস্তিষ্ক থাকত অবসাদগ্রস্থ আর শরীরে বইত রক্ত। এখন মস্তিষ্কে একটা নতুন টঙ্কার অনুভূত হয়।

উরাতীয়া বলে ঘামারিকে, 'তা'পর, সেকথাটা বল। তোমার বউ কেমন করে মরল?'

মহাবীর, ভীম নয়, কুস্তি কায়দা নয়, বউয়ের কথা। ঘামারি বলল, 'কি আবার বলব।'

লাখপতি বলে, 'বল না। আমি তো কোনদিন শুনিনি?'

উরাতীয়া ব্যথা পায়, অবাক হয়। বলে, 'সচ্! ওমা এত বন্ধুত্ব আর এ কথাটা কোন-দিন বলা কওয়া হয়নি?'

অমনি ঠোঁট ফুলিয়ে, অভিমান ভরে বলে উরাতীয়া, 'যাও! তোমরা যেন কি!'

বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে তার। আর ওই কথা, ওই জলটুকু তাদের গলায় একটা বিস্মিত ব্যথা ও আনন্দের গোঙানি এনে দেয়। সত্যি, তারা অনেক কথা এতদিন বলেছে, হেসেছে। কিন্তু এমন বিচিত্র হাসি ব্যথা ও আনন্দ, এত অজানিত সুখ দুঃখ, হৃদয়ের ছোটখাটো অসামান্য বিষয়ের আদান-প্রদান হয়নি।

অনেক কথা, অনেক হাসি, এমনকি কোন কোন রাতে মোটা ও হেঁড়ে গলায় বেসুরো গান পর্যন্ত শোনা যায়;

ধোকে কে নিউ 'পর
ইমারৎ নহি বনতে॥

অর্থাৎ, মিথ্যার ভিতে সত্য দাঁড়ায় না। এ গানটা লাখপতি শুনেছিল কোনকালে মাইনে আনতে গিয়ে জংসন স্টেশনে। হনুমানের কীর্তি গাঁথা নয়, হিড়িম্বা বধের কাহিনী নয়, একেবারে অন্য কথা। তাও এতদিন পরে।

বেসুর ও হেঁড়ে গলার জন্যও তাদের তিনজনের হাসির অন্ত ছিল না। কখনো ঘামারি সব উদ্ভট হাসির গল্প করে। ছেলে-মানুষের মত উৎকট অঙ্গভঙ্গি করে নাচে। কোন্‌কালে দেখা এক সিনেমার নায়ক-নায়িকার অভিনয় করে দুজনে দেখায় উরাতীয়াকে।

উরাতীয়া হেসে বাঁচে না। বলে, ছি ছি! দূর দূর! তারপর আদুরে মেয়ের মত বলে, 'আবার দেখাও না?'

আর দুই মল্লবীর তাই করে। পবন-পোয়েরা যে এত সরল ও হাসিউচ্ছল, তা জানত না গাঁয়ের মানুষেরা। রাক্ষসের মূর্তির মধ্যে মানুষের দেখা পেয়ে, তারাও যাওয়া আসা করতে থাকে।

কিন্তু তাদের দশ বছরের ঘুণধরা রক্তে লুকিয়েছিল এক ভয়ঙ্কর বিষধর। লুকিয়েছিল নিতান্ত দেহসাধক, সংসার ও ভালোবাসা বিমুখ মল্লযোদ্ধাদের মনের অগোচরে। সুযোগ বুঝে সে কুণ্ডলীর পাক খুলতে লাগল।

এত সুখ কথা ও হাসি। এত বন্ধুত্ব। তবুও মল্লযোদ্ধাদের কোথায় চাপা ছিল আগুন, সে এবার থেকে থেকে জ্বলে জ্বলে উঠল আড় কটাক্ষে, শুধু চোখে চোখে। চোখে চোখে ভাব বিনিময়ে ছিল তারা দুরন্ত ও অভ্যস্ত। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

যে মুক্ত ফল্গুধারায় স্নান করে তারা দুদিন হেসে ছিল অনর্গল, সে হাসি আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওই মুক্ত ফল্গুধারাটা তাদের কাছে শুধু ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যৌবন ঝলকিত দেহ। মুক্ত আনন্দ, পাশব কামনার একটি যন্ত্র। দশ বছর ধরে তারা শুধু দেহের সেবা করেছে, দেহকে ভাল-বেসেছে। দেহাশ্রিত প্রবৃত্তি বার বার তাদের ওইদিকে অঙ্গুলি সংকেত করল। তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন কবে ছিঁড়ে গেছে টেরও পায়নি। যে ভয়ঙ্কর দৈহিক শক্তি তাদের মিলনের সূত্র ছিল, আজ তা পরস্পরকে আক্রমণে উদ্যত করল।

তারা মুখে কিছু বলল না। কিন্তু একজনের চোখে, 'খবরদার! এদিকে নয়।' আর একজনের, 'নয় কেন?'

কিন্তু তারা লড়ে রোজ। খায় এক সঙ্গে

গল্প করে। তবু যেন জমে না। হাসিটা যেন ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বেরোয় গলা দিয়ে।

অবাক হয় উরাতীয়া। সব না বুঝলেও এটা বোঝে, অদৃশ্যে কী যেন ঘটছে। ওরা হঠাৎ এমন হচ্ছে কেন? জিজ্ঞেস করলে ওরা দুজনেই বোকার মত হেসে ফেলে। আসর জমে উঠতে চায়। উঠতে পারে না।

সেই প্রাগৈতিহাসিকতা আরও নিষ্ঠুর রূপে যেন ফুটে উঠছে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে উরাতীয়া। বোঝে না। বোঝে না, কেবল আড়ালে নিঃশব্দে কেঁদে মরে। ওরা আমার দেবতা ও সহচর। ওরা দুদিন হাসল। কিন্তু আমি আসার আগেও কি ওরা এমনিই ছিল? মনে হয়নি তো? তবে?

ঘরের মধ্যে রাত্রে লাখপতির চেহারাটা বদলে যেতে লাগল। তার সোহাগ হয়ে উঠল নিষ্ঠুর। আদর হয়ে উঠল ভয়ংকর। অসহ্য আদরে সোহাগে উরাতীয়ার দেহটার উপরে একটা ভয়ংকর প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা যেন তার।

আর ঘামারি সেই সময়, অনেক রাত্রে ঢালু সড়কের পাশ থেকে উঠে আসে একটা ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মত। দাঁড়িয়ে দেখে লাখপতির বন্ধ ঘরটার দিকে। যন্ত্রণা কাতর জানোয়ারের মত বুক থেকে ফেটে পড়া শব্দটাকে চেপে ধরে কণ্ঠনালিতে। কান পাতে দেয়ালে।

কোন শব্দ নেই। মাঘের উত্তরে হাওয়া তার গায়ে ও দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে যায়।

শুকিয়ে উঠল উরাতীয়া। লাখপতিকে তার কিছু অদেয় ছিল না। ঘামারির একাকী জীবনের বেদনাই ছিল তার প্রীতি ও সৌহার্দ্যের গৌরব।

আড়ালে যদি সে জিজ্ঞেস করে লাখপতিকে, 'কি হয়েছে তোমাদের?' লাখপতি শুধু চেয়ে থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে উরাতীয়ার সর্বাঙ্গ, তারপর হঠাৎ খপ্ ক'রে উরাতীয়াকে ধরে ভয়ংকর আদরে দলা পাকিয়ে ফেলে। সে আদরে শুধু একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয় রক্তের মধ্যে।

ঘামারিও যেন তেমনি। জিজ্ঞেস করলে তেমনি করে চেয়ে থাকে। কিন্তু গায়ে হাত দেয় না। দিতে চায় যেন। উরাতীয়া ভয় পায়।

একই রকম দুজন। একই চাউনি ও চেহারা। কাছাকাছি থাকলেও এক এক সময় আলাদা করা যায় না ওদের। একই চালে ওরা দুজন চলেছে।

তবু ওরা লড়ে। শুধু লড়ে। তবে মহাবীরকে প্রণাম করে, হাত মেলায়, তারপর লড়ে। তবু ওদের চোখে চোখ মিশলেই, পাথরের ঘর্ষণে যেন আগুন ঠিকরোয়। লড়তে লড়তে ক্ষিপ্ততা দেখা দেয়, মুহুর্মুহু নতুন নতুন আক্রমণ চালিয়ে যায়।

উরাতীয়া যেন কেমন করে বুঝতে পারে, লড়াইটা অন্যপথ ধরছে। এই কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝেছে। সে বাধা দেয়, থামতে বলে।

ওরা থামে। ছেড়ে আসে মল্লক্ষেত্র। কিন্তু ওদের ভেতরে দুটো জানোয়ার ফুঁসতে থাকে। উরাতীয়াকে মাঝখানে রেখে অনেকক্ষণ ধরে তারা শান্ত হতে থাকে।

কিন্তু এ অবস্থাও আর রইল না। হঠাৎ লাখপতি একদিন ঘামারির উনুনটা লাথি মেরে ভেঙেগ ফেলল।

ঘামারি বলল, 'ভাঙ্গলি যে?'

ভয়ংকর আদরে দলা পাকিয়ে ফেলে

লাখপতি জবাব দিল, 'ওটা পুরনো হয়ে গেছে।'

ঘামারি খেতে এল না। লাখপতি বলল, 'খাবিনে?'

ঘামারি জবাব দিল, 'না। তোদের রান্না আর ভাল লাগে না। নিজে রাঁধবো।'

আশ্চর্য শান্ত তাদের কথাবার্তা। বিকালবেলা দুধ দুইতে গিয়ে উরাতীয়া দেখল ঘামারির গরু নেই। জিজ্ঞেস করল, 'গাই কোথায়?'

—'মাঠে।'

—'দুইতে হবে না?'

'না।' বলেই হঠাৎ ঘামারি দু'হাত বাড়িয়ে দিল উরাতীয়ার দিকে। এই প্রথম। উরাতীয়া দেখল, রাত্রের বন্ধ ঘরের ক্ষিপ্ত স্বামী লাখপতি যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে। এতদিন ছিল চাপা বেদনা ও অপমান। আজ তার চোখে দেখা দিল রাগ ও ঘৃণা। নিঃশব্দে পালিয়ে এল সে। নইলে ঝাঁপিয়ে পড়বে এখুনি।

তারপর এপার ওপার হল। দুটো সংসার হল। কেবল দেখা হয় মল্লক্ষেত্রে। এসে দেখে উরাতীয়া। বসে হাসে, কথা বলে কিন্তু একটা রুদ্ধশ্বাস গুমসোনি নিয়ে নেমে আসে আকাশটা।

লড়াইয়ের শেষে উরাতীয়া দেয় দুধ আর সিদ্ধি। ওরা খায়।

হয়তো লাখপতি বলে, 'হিড়িম্বাকে কি ভাবে মেরেছিল ভীম?'

ঘামারিঃ 'টুঁটি ছিঁড়ে।'

উরাতীয়া কেঁপে উঠে বলে, 'ওসব কথা থাক।' শঙ্কিত অথচ আদুরে গলায় বলে, 'গান গাও তোমরা একটু আমি শুনি।'

'গান!' বিদ্রূপের মত শোনায় যেন কথাটা। আর উরাতীয়ার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ে।

কিন্তু জগৎবিমুখ, দেহাশ্রিত এই মল্লযোদ্ধাদের বুকে জেগেছে যে অজগর, সে ফুঁসছে দিবানিশি।

মুক্ত ফল্গুধারা স্নান করেই শেষ হয়েছে। মুক্তিটাকে দেহের মত লুফে নিতে চাইছে তারা।

শীত গেছে। বসন্ত এসেছে। রাত এসেছে। ঢালু সড়কে ধুলো উড়ছে। গাছগুলি পাগল হয়েছে।

সেদিন শেষ গাড়িটা যায়নি তখনো। লড়াই শেষ করে বসেছে দুইজন। পরস্পরকে বারবার আক্রমণ করেছে তারা। এমন কি, আইনভঙ্গ করে আঘাত করেছে। যে জন্য ঘামারির কপালটা উঠেছে ফুলে আর লাখপতির ঠোঁটের কষে রক্ত।

উরাতীয়া নিয়ে এল দুধ সিদ্ধি। বুক ফেটে যাচ্ছে এই দুই বন্ধুর লড়াই দেখে। তারই জন্য ওরা আজ পরস্পরকে ঘৃণা করছে, লড়ছে। কিন্তু কেন, কেন? সে ওদের বুক ভরে নিয়েছে, ওরা কেন পারছে না। তবু সে হাসতে চাইল, আর চোখ ফেটে এল জল। 'ভগবান। ওরা মানুষ চেনে না, ভালবাসে না, হাসে না। আমি হাসতে হাসতে এলাম, ওরাও দুদিন হাসল। তারপরে এই যন্ত্রণা। সে কি শুধু আমি? তবে ক্রীতদাসী আমি ছিলাম ভাল।'

দুধের পাত্র এগিয়ে দিল সে লাখপতির দিকে। কিন্তু, চকিতে কি ঘটে গেল, গেলাসটা নিয়ে লাইনের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল লাখপতি। মুহূর্তে কিসের এক সঙ্কেত, দুই মল্লযোদ্ধাই চকিতে উঠে দাঁড়াল। পরস্পরকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দুজনেই, দু'দিক থেকে গিয়ে দাঁড়াল মল্লক্ষেত্রে।

উরাতীয়া ব্যাকুল গলায় বলল, 'আর না, আর লড়ো না।'

কিন্তু ততক্ষণে একটা আচমকা রদ্দা মেরে ঘামারিকে ছিটকে ফেলেছে লাখপতি। কিন্তু চকিতে ঘামারি লাফ দিয়ে উঠেছে। তারপর পরস্পর ঝুঁকে দুজন কয়েকবার নিঃশব্দে পাক খেল চারপাশে। অন্ধকারেও তাদের জ্বলন্ত চোখ দেখছিল পরস্পরকে।

উরাতীয়া ছুটে এল মল্লক্ষেত্রের মাঝখানে, 'পায়ে পড়ি, ওগো পায়ে পড়ি, থামো।'

কিন্তু তাকে এড়িয়ে বনবেড়ালের মত নিঃশব্দ উল্লম্ফনে ঘামারি লাখপতির পা দুটো ধরে, তাকে নিয়ে সশব্দে পড়ল মাটিতে। আর তাদের দেহের ধাক্কায় লাইনের তারের কাছে ছিটকে গেল উরাতীয়া। চীৎকার ক'রে উঠল, 'থামো!'

থামবে না। প্রাগৈতিহাসিক সেই জানোয়ার দুটো আজ ইতিহাসের যুগকে তরান্বিত করার জন্য নিজেদের বোধ হয় শেষ করবে। দেখা গেল, লাখপতির পা ধরে পাক দিচ্ছে ঘামারি. শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলতে চাইছে। কিন্তু লাখপতি আঁকড়ে ধরে আছে মাটি। পরমুহূর্তেই আবার দেখা গেল, দুজনেই জাপটা জাপটি করে গড়াগড়ি দিচ্ছে, হুংকার ছাড়ছে, পরস্পরের গলা টিপে ধরার চেষ্টা করছে। তারপর দেখা গেল, একজনকে চিৎ করে ফেলে গলা টিপে ধরেছে একজন, আর একজন দু'পায়ের মাঝখানে চেপে ধরেছে গর্দান। আর একটা ভয়ংকর গোঙ্গানি।

দূর থেকে একটা আলো এসে পড়েছে মল্লক্ষেত্রে। কিন্তু আমৃত্যু এই হিংস্র লড়াই। সেই আলোয় উরাতীয়া দেখল, পাথরে পাথরে ঘর্ষণ হচ্ছে। রক্ত ঝরছে পাথরের গায়ে।

আলোটা ক্রমে তীব্র হচ্ছে। শেষ গাড়িটা আসছে। উরাতীয়া মরিয়া হয়ে ওদের দুজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার নরম হাতে আঘাত করল, চীৎকার করে উঠল। 'থামো, থামো বলছি।'

কিন্তু তাদের পরস্পরের পেষণে শুধু তীব্র গোঙ্গানি। ছিটকে যাচ্ছে মাটি, খাদ হয়ে যাচ্ছে মল্লক্ষেত্র।

উরাতীয়া অস্থির অসহায়ভাবে উঠে দাঁড়াল। মরবে, হয় তো দুজনেই মরবে তার চোখের সামনে। শুনবে না, কিছুতেই শুনবে না।

এই ভয়ংকর দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে সে অপলক দীপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল দ্রুত এগিয়ে-আসা আলোর দিকে। অসহ্য ঘৃণায় অপমানে, বেদনায় ও অভিমানে অভিশাপ দিতে চাইল সে। দিতে গিয়ে আরো জোরে কেঁদে উঠল। আর একবার ওদের দিকে দেখে, চোখে হাত দিল। গাড়ির শব্দটা কানের কাছে বেজে উঠে মাটি কাঁপিয়ে তুলতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে লাইনের উপর।

তারপর একটা তীব্র চীৎকার, এঞ্জিনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ মাথাটা নিয়ে সে আবার ছিটকে পড়ল মল্লক্ষেত্রের সামনে। গাড়িটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল পেছনের রক্ত ক্রুদ্ধ চোখের মত লাল আলোটা।

হয় তো উরাতীয়ার মৃত্যু-চীৎকারটা তাদের পাশবিক মল্লযুদ্ধের চেয়েও তীব্র ও ভীষণ জোরে বেজে উঠেছিল। হঠাৎ মল্ল-যোদ্ধাদের দুজনেরই হাত শিথিল হয়ে এল। দুজনেই তারা ছেড়ে দিল পরস্পরকে দুজনেই উঠল, দুজনেই ফিরে তাকাল উরাতীয়ার শরীরটার দিকে। মুহূর্তে চমকে, দুজনেই টলতে টলতে এসে বসল উরাতীয়ার দুপাশে। তাদের মত ভয়ংকর মানুষরাও দারুণ আতংকে যেন শিউরে ডুকরে উঠল।

কে লাখপতি, কে ঘামারি, আর তাদের চেনা যায় না। তারা একরকম দেখতে, একই তাদের কণ্ঠস্বর। একজনেই দুজন।

একজন যেন দূর থেকে চাপা গলায় ডাকল, 'উরাতীয়া।'

অন্ধকারে চকচক করছে উরাতীয়ার সর্বাংগের রক্ত। সে নিঃশব্দ, নীরব। সে মারা গেছে।

আর একজন ডাকল, 'উরাতীয়া।'

কোন শব্দ নেই। তারা আবার দেখল পরস্পরকে, আবার উরাতীয়াকে। তারপর ভূমিকম্পের নাড়া খাওয়া পাথরের মত কেঁপে উঠল তাদের বিশাল শরীর দুটো। বোবা করুণ অসহায় জীবের মত কাঁপতে লাগল। আর রক্তের ও চোখের জলের নোনা স্বাদে ভরে উঠতে লাগল মুখ। তারা আবার ডাকতে চাইল, 'উরাতীয়া!' কিন্তু পারল না। শুধু বুকে বাজতে লাগল, উরাতীয়া! উরাতীয়া!

একদিন তারা দেহাশ্রিত বন্ধ জীবনবোধে আশ্রয় নিয়েছিল এখানে। তারপর মুক্তি এসেছিল, তারা হেসেছিল, গান করেছিল তাদের ঘাম ঝরেছিল একদিন। আজ রক্ত পড়ল, চোখের জলে ভিজল মাটি।

শুধু নিথর পড়ে রইল সেই মেয়ে উরাতীয়া। বুকে বাজল তার নাম। বাজতে লাগল, বাজতে থাকবে হয় তো চিরদিন, যতদিন না সে আবার এসে হাসবে, কথা বলবে। তেমনি বাজতে লাগল, আর দূরে দক্ষিণের পাগল হাওয়া হা হা করে ছুটে এল।

এ কটু বেশী তাড়াতাড়িই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন উত্তমাসুন্দরী। সুবিধেমতন পাওয়াও গেল, নিজেরও সহায়-সম্বলের তেমন জোর নেই যে, মেয়েকে বড় করবেন লেখাপড়া শিখিয়ে। বিধবা মানুষ, ভাসুরের আশ্রয়েই দিন কাটছে। তাই নানাদিক বিবেচনা ক'রে ঠিক ক'রে ফেললেন সম্বন্ধ।

মেয়েটা একটু পাগলা-পাগলা। বয়সের তুলনায় ছেলেমানুষও খুব। একটামাত্র মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী আদর দিয়েছিলেন প্রচুর। যা যখন চাই—তাই সই। এই ক'রে ক'রেই বোধহয় নষ্ট হ'য়েছে একটু। এ বাড়িতে এখন অন্তত তাই মত। ভাসুরের গাদা-খানেক ছেলেপুলে, তারা কেমন সময়মত খায়-দায়, ইসকুলে যায়, এর সে সব বালাই নেই। খাবে যখন খুশি তখন, অর্থাৎ সারাদিন পেলে তাই ভালো আর ইসকুলে তো যাবেই না। তেরো বছরের বলিষ্ঠ মেয়ে এই নিয়ে ক্লাস সেভেনে দু' দু'বার ফেল করলো। পড়ে না, শোনে না ফেল না ক'রে করবে কী? আর তাতে তার লজ্জাও নেই, দুঃখও নেই। বরং সুখীই। কেননা, জ্যাঠামশায় বলেছেন 'আর তোমার ইস্কুলে গিয়ে কাজ নেই। কানকাটা সেপাই হ'য়ে বাড়ি ব'সে ঘাস খাও।'

বিয়ে ঠিক হবার পরে তার আরো আনন্দ। একেবারে নিঃসংশয় হ'লো যে, আর পড়তে হবে না। বইগুলোকে চুপে চুপে ছিঁড়ে ফেললো চিলকুঠির ছাতে ব'সে। মনে মনে অনেক সুখের কল্পনা করতে লাগলো চুরি ক'রে আচার খেতে খেতে। তারপর নিচে নেমে কি ভেবে ঘুমন্ত জ্যাঠতুতো বোনের চুলের বেণীটা কচ্‌কচ্‌ ক'রে কাঁচি দিয়ে কেটে মার পাশে এসে চুপটি ক'রে শুয়ে রইলো।

পাত্রপক্ষ নিতান্তই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। ঢাকা শহর থেকে কয়েক স্টেশন দূরে কুর্মি-টোলায় থাকে। শ্বশুর ইস্টেশন মাস্টার আর শ্বশুরের ছেলে ইসকুল মাস্টার। বি-এ পাশ ক'রেই সত্তর টাকা মাইনেতে কয়েক মাস মাত্র মাস্টার হ'য়েছে সেখানে। আরো দুটো ভাই আছে, মা আছে, বুড়ি ঠাকুমা আছে। কোয়ার্টারটি সুন্দর। বাগান-ঘেরা ছোট্ট একতলা। একটু দূরে ঝিরিঝিরি তেঁতুলতলায় মস্ত ই'দারা। রেল-লাইনের বেড়ার ওপারে বাঁধি গাই। আবার কুকুরও আছে একটি। খাড়া খাড়া কান, থুকথুকে পোকা, তিরতিরে ল্যাজ এইটুকু একটা বাংলা কুকুর। সুনীল (অর্থাৎ পাত্র) আর তার ভাইয়েরা তাকে খুব ভালবাসে। নাম বাঘা। ঢালাও করা লাল সুরকির চাতালে তারচেয়েও লাল কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তার তলায় ছায়ায় বাঘা তার প্যাকাটির মত শরীর নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে দিনের বেলা আর রাত্তিরে পাহারা দেয়। মোটমাট ছিমছাম ছোট্ট সচ্ছল শান্তির সংসার।

উত্তমাসুন্দরী একদিন নিজে এসে সব দেখেশুনে গেলেন, খুশীও হ'লেন। দোষের মধ্যে শুধু এইটুকু, ছেলেটি যেমন রোগা তেমনি কালো। কিন্তু চোখ দু'টি ভারি সুন্দর। আর বড়ো লাজুক, বড়ো বিনীত। কে বলবে এই ছেলে আবার ছেলে ঠেঙায় ইসকুলে গিয়ে।

স্বামী যা রেখে গিয়েছিলেন, তার সবই তিনি খরচ করলেন এই বিয়েতে। ওদের বেশী দাবীদাওয়া ছিলো না, নগদ টাকায় ছেলের অমত, চাপাচাপি করায় বাপের অমত। মা সাতে নেই, পাঁচে নেই—তিনি কিছু বললেনই না। কেবল বুড়ি ঠাকুমা ক্যাটক্যাট্‌ ক'রে অনেক কিছু আদায় করলেন। তা বুড়িকে চুপ করাবার মত সবই দিলেন উত্তমাসুন্দরী। জোড়া পালঙ্ক দিলেন, লিখবার টেবিল দিলেন, চেয়ার দিলেন, আলনা দিলেন, জামাইকে ঘড়ি আর সোনার বোতাম দিলেন। মেয়ের গায়ে তিরিশ ভরি সোনা দিলেন। এত দেয়ার ঘটা দেখে রাগ করলেন ভাসুর, উত্তমাসুন্দরী নিঃশব্দে সেই রাগটুকু হজম করলেন। এই তো তার সব। ও ছাড়া আর কী আছে তার?

জিনিসপত্র দেখে, গয়নাগাটি, নতুন নতুন শাড়ি-ব্লাউজের বহরে সাবির আর মজার সীমা নেই। রাত্রিবেলা মার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'আর মাত্র দু'দিন বাকী। তারপর এ সব আমার, না মা?'

মার চোখে জল আসে। ভাঙা ভাঙা গলায় বলেন, 'তোমার না তো কার? সব আমার সোনার।'

কিন্তু তেরো বছরের পাগলাটে সাবি এটা বোঝেনি যে, মাকে ছাড়বার দিন ঘনিয়ে এসেছে। যা খুশি তাই করার পালা এবার ফুরোলো।

গোলমালটা বিয়ের রাত্রিতেই হ'লো একটু। সন্ধ্যায় লগ্ন ছিলো, আর সব নিরাপদেই হ'লো, কিন্তু অচেনা-অজানা কালো রংয়ের রোগা ছেলেটার সঙ্গে একা ঘরে শুতে সে কোনোমতেই রাজী নয়।

চুপেচুপে ডেকে নিয়ে উত্তমাসুন্দরী অনেক কিছু বুঝিয়ে পটিয়ে তবে ঘরে পাঠালেন। হয়তো প্রচুর পরিমাণে আচার আমসত্ত্বের লোভেই এমন সাংঘাতিক কার্যটি সমাধা করতে অবশেষে রাজী হ'য়েছিলো সে।

মধ্যরাত্রে কিন্তু ঠিক পালিয়ে এলো মার কাছে।

বাড়ির লোকেরা পরের দিন সকালে ফিস্‌ফাস্‌ করলো 'এ রকম একটা নির্বোধ মেয়েকে এতটুকু বয়সে বিয়ে দেওয়াই অন্যায় হ'য়েছে উত্তমার।' উত্তমাসুন্দরী ম্লানমুখে চুপ। এমন কীই বা ছোট। তেরো বছর পূর্ণ হ'য়ে প্রায় চোদ্দ হ'তে চললো, দেখতে-শুনতে মনে হয়, ষোলো।

জামায়ের মুখ যেন থমথমে দেখালো। কে জানে, কী করেছে, কী বলেছে। শঙ্কিত প্রাণে সারাক্ষণ মেয়েকে একথা-ওকথা-সেকথা দিয়ে কেবলি উত্তমাসুন্দরী বোঝালেন যে, এই রোগা কালো রংয়ের ছেলেটিই এখন তার সব। বাসি বিয়ের দিন অসুবিধে নেই, মার গলা জড়িয়েই রাত কাটলো আর মা সারা-রাত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সিদ্ধিদাতা গণেশ, মা লক্ষ্মী, মা কালী, তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মেয়ের সুমতির জন্য প্রার্থনা জানালেন। কাকস্য পরিবেদনা। পরের দিন দুপুরের গাড়িতে যাবার সময় একেবারে হুলস্থূল। কী কান্নাই যে কাঁদলো তার ঠিক নেই, না যাবার জন্য কী কাণ্ডই যে করলো তারও ঠিকানা নেই। যতই ছেলে-মানুষ ছেলেমানুষ থাকুক, যতই পাগলাটে হোক, সত্যি সত্যি নির্বোধ তো আর নয়। তাই এ রকম একটা অনর্থ করতে পারে বিয়ের ব্যাপারে সেটা উত্তমাসুন্দরীর মাথায়ই আসেনি, অগত্যা তিনি সঙ্গে গেলেন, কিন্তু এই কড়ারে যে, কুর্মিটোলা স্টেশনে তিনি নামবেন না, তার আগের স্টেশন তেজপুরে নেমে থাকবেন। সেখানে তাঁর বোন আছেন, তাঁর বাড়িতে থাকবেন, পরের দিন সকালে দু'জনে মিলে গিয়ে তাকে দেখে আসবেন। সাবি রাজী হ'লো তাইতেই। একদম মা ছেড়ে যাবার চাইতে এটা ভালো।

তেজপুর স্টেশনে অবিশ্যি আর এক পসলা কান্নাকাটির ধুম হ'লো। শ্বশুর-বাড়ির লোকেদের মুখে বিরক্তির রেখা কুঞ্চিত হ'তে দেখলেন উত্তমাসুন্দরী, ভয়ে বুক কাঁপলো তাঁর।

সুনীলদের বাড়ি এসে এতগুলো অচেনা লোকের মধ্যে কয়েকদিন লজ্জায় ভয়ে চুপ-চাপ থাকলো, সাবি। মার শেখানো মতো গুরুজনদের প্রণাম করলো, শান্ত হ'য়ে ব'সে থাকলো, সমবয়সী ছোট দেওরটি যখন ভাব জমাতে চেষ্টা করলো তখন খুশীও হ'লো একটু। সেই রোগা টিংটিঙে বাঘা কুকুরের গল্প হ'লো খানিক। কৃষ্ণচূড়া ফুল বিষয়ে কিছু জ্ঞানমূলক আলোচনা, ট্রেনগুলো যতবার হুসহুস ক'রে পাস করলো এই দেওরের সাহায্যেই জানালা দিয়ে দেখার সুযোগ ঘটলো। মোটমাট এই উৎকৃষ্ট ছেলেটির জন্যই বাড়িটা খুব অসহনীয় লাগলো না। কোনো এক রাত্রে সুনীল করুণ গলায় জিজ্ঞেস করলো—'আমাকে কি তোমার একটুও ভালো লাগে না?'

অনেক দূরে, খাটের ঐ প্রান্তে রোজের মতই দেয়ালে মিশে গিয়ে সাবি জবাব দিল,

'নুনা।'

'কেন?'

'তুমি দেখতে বিশ্রী।'

সুনীল ব্যথিত হ'য়ে চুপ করলো। একটু পরে আবার বললো, 'আমাদের বাড়ির কাউকেই কি তোমার ভালো লাগে না?'

'না।'

'সবাই বিশ্রী?'

'রঞ্জন ছাড়া।' একটু চুপ ক'রে থেকে, 'আর নেড়ি কুত্তাটার নাম বাঘা রেখেছ কেন? ওটার নাম ঘিয়েভাজা।'

সুনীল চুপ।

বাইশ বছরের অপাপবিদ্ধ মফঃস্বলের ছেলে, ভীরু ভীরু মনে, থরো থরো বুকে কত কিছুই ভেবেছিলো, সাবির সুন্দর মুখখানা দেখে কি মনে হয় সে এতো নিষ্ঠুর? এত নির্বোধ? হঠাৎ জিজ্ঞেস করে 'তোমার বয়স কত?'

'বারো, তেরো, চোদ্দ, পনেরো, ষোলো, সতেরো।'

'লেখাপড়া শিখেছ?'

'সেভেনে উঠে পাঁচ, ছ', সাত, আট, ন, দশবার ফেল করেছি। তোমার কী।'

'না আমার আর কী? রঞ্জনকে বুঝি এইজন্যেই খুব পছন্দ হয়েছে?'

'কেন সে-ও কি ফেল মারে?'

'সদা সর্বদাই।'

'তাই ভালো।'

একটু পরে সুনীল আবার বললো 'অত দূরে শুয়েছ কেন?'

'আমার ইচ্ছে।'

'তুমি ভূত দেখেছ?'

'ভূত!' কেরোসিনের লণ্ঠন কমানো ঘরের দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় চোখে তাকালো সাবি, 'কেন, ভূত আছে নাকি এখানে?'

'অনেক। শাকচুন্নি কন্দকাটা আর তিন ঠেঙি তো সর্বদাই ঐ জানালাটার কাছে ঘোরাফেরা করে।'

'এ্যাঁ'

'হ্যাঁ।'

স্প্রীংয়ের মত ছিটকে এসে সাবি সুনীলের বুকের কাছে মুখ লুকোলো, সুনীল তার পিঠের উপর সন্তর্পণে হাত রেখে বললো, 'এবার আর কিছু ভয় নেই আমার কাছে এলেই ভূতেরা পালিয়ে যায়।'

সাবির আর সাড়াশব্দ নেই।

পরের দিন সন্ধে হ'তেই ঘুর ঘুর করতে লাগলো শাশুড়ির পেছনে আর রাত্তিরে ঠিক গিয়ে তাঁর বিছানায় শুয়ে রইলো শ্বশুরের জোড়া বালিশে মাথা দিয়ে আরাম ক'রে। সবাই অবাক। রঞ্জন বললো, 'হ্যাঁ মা, বৌদি যে আজ আমাদের সঙ্গে শোবে।'

'আমাদের সঙ্গে শোবে কী? যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড। ও বৌ, বৌ—'

সাবি ঘুমিয়ে কাদা। কখন যে সে এসে শুয়েছে কে জানে। শাশুড়ি বিরক্ত হ'য়ে জোরে জোরে ঠেলা দিতেই সে উঠে বসলো চোখ মুছতে মুছতে। তারপরেই 'ওরে বাবারে ভূতরে' ব'লে আঁকড়ে ধরলো শাশুড়িকে।

'আমি ও ঘরে শোবো না, ও ঘরে ভূত আছে।'

'তোমার মুণ্ডু।' গজ্ গজ্ করলেন শাশুড়ি। শ্বশুর বললেন 'থাক না, শুয়েছে শুক না, ছেলেমানুষ মা ছেড়ে এসেছে—

'ছেলেমানুষ না হাতি—' লাগোয়া ঘর থেকে খেঁকিয়ে উঠলেন ঠাকুমা 'আঠারো বছরের ঝানু মেয়ে, ঢং দ্যাখোনা। হ'তো আমাদের কাল, ঠোনা মেরে গালের চামড়া ছিঁড়ে দিত। দাও, উঠিয়ে দাও। অসভ্য বৌ। বলা নেই, কওয়া নেই শ্বশুর শাশুড়ি রইলো কোথায় প'ড়ে সাততাড়াতাড়ি খেয়ে শুলো এসে। মা কি এইটুকু শিক্ষাও দিয়ে দেয়নি? ভদ্দরলোকের মেয়ের এ কি ব্যাভার।'

'থাক মা থাক' শ্বশুর আবার একটা দুর্বল চেষ্টা করলেন প্রতিবাদ করতে, 'রাত ক'রে আর ঝামেলা বাড়িয়োনা।'

শাশুড়িও যে একটু রাগ করেননি তাও নয়। এই কয়েকদিনের ব্যবহারে মোটেও সুখী হননি তিনি। বৌ যেন বৌ-ই নয় মোটে। যেন কেমনতরো। মাথার কাপড়তো আদ্দেক সময় থাকেই না। শরম ভরমের বালাই নেই। সারাদিন রোগা কুকুরটাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি, রঞ্জনের সঙ্গে হাতাহাতি, এর-মধ্যেই ক'বার দরজা খুলে লাইনের ধারে চলে গিয়েছে ট্রেন দেখতে। কড়াগলায় ধমক দিলেন তিনি, 'যাও, শোও গিয়ে। সারাদিন খেটেখুটে শুতে এলুম, আর যতো আপদ এসে জুটলো। যাও।' ধমক খেয়ে জলভরা চোখে আস্তে আস্তে উঠে গেল সাবি।

চুপচাপ নিজের ঘরে বসে সবই শুনছিলো সুনীল। তার ভূতের ভয়ের কৌশলটাই যে সাবিকে এই কষ্টটা দিল এটা ভেবে মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে গেল। সাবি আসতেই তার ফুটফুটে ফরশা নরম হাতখানা নিজের কালো রোগা হাতের মুঠোয় তুলে নিল 'আমার জন্যেই এই বকুনিটা খেলে তুমি। সত্যি বলছি ভূতটুত এঘরে কিচ্ছু নেই। আমি তোমাকে—' 'য্যাও' বলে এক ঝাপটা মেরে সুনীলকে চেয়ার থেকে উল্টে ফেলে গনগনিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো মেঝেতে। কান্নার বেগে তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। সুনীল নিজেকে সামলে উঠে বসলো কোনরকমে। ভারি রাগ হ'লো তার। হ'লোই বা বাইশ বছর বয়স, একটা ইসকুলের মাস্টার না সে? বি-এ পাশ করেছে না? একটা পজিশন আছে না? ফট্ ক'রে আলো নিবিয়ে অন্ধকার ক'রে দিল ঘর, তারপর জোরা খাটে উঠে শুলো আরাম ক'রে।

কিন্তু ঘুম এলোনা। কেন এলোনা কে জানে। অন্ধকারে তাকিয়ে তাকিয়ে কিসের অপেক্ষায় দুরু দুরু করতে লাগলো বুক। মফস্বলের বাড়ি, অন্ধকারও সাংঘাতিক অন্ধকার, চোখ চলেনা, মেঝেতে শুয়ে মেয়েটা করছে কী? এত অন্ধকারে সুনীলের নিজেরইতো ভয় করছে। ডাকবে নাকি উপরে উঠে শুতে? পরের মেয়ে, শেষে কি ঠাণ্ডা ফাণ্ডা লেগে মরবে? মরুক। আমার কী! ডাকতে গেলেই যেন সে আসবে। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলো বোধহয়, সহসা বুকের কাছে একটি উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের ওঠাপড়ায় চমকিত হ'ল সে। সব রাগ ভুলে গিয়ে সুনীলের একটা অদম্য ইচ্ছে হ'লো তার গায়ে একটু হাত ছোঁয়াতে কিন্তু ভয়ে কাঁটা হ'য়ে রইলো পাছে আবার রাগ ক'রে সে সরে যায়।

পরের দিন সকাল থেকে আর সাবির

পাত্তা নেই। সংগে সংগে নেড়ি কুকুরটাকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। চুপ। চুপ। চুপ। কী লজ্জা। কী লজ্জা। ঘরের বৌ চন্দ্র সূর্যের মুখ দেখবেনা সে নাকি বেরিয়ে গেল। ছি ছি ছি। লজ্জায়, ঘেন্নায় বাড়ি সুদ্ধ লোকের প্রায় গলায় দড়ি দেবার দশা। সুনীল বালিশের তলায় ছোট্ট এক টুকরো চিঠি পেলো, 'তোমরা বিশ্রি, তোমাদের বাড়ি বিশ্রি, আমি তাই চলে গেলাম। খবদ্দার আমাকে আনতে যেও না, তা হ'লে মা আবার জোর ক'রে পাঠিয়ে দেবেন। ইতি শ্রীমতী সাবিত্রী দত্ত।' দত্তটা তার বাপের বাড়ির পদবী। সুনীলদের পদবী রায়। তলায় আবার পুনশ্চ দিয়ে লেখা 'কিছু মনে কোরো না বাঘাটাকেও নিয়ে গেলাম।'

একবাক্যে সকলের এই সিদ্ধান্ত হলো যে আর যদি ওরা মেয়ে নিয়ে এসে কখনো দাঁড়ায় এই স্টেশনে ধুলো পায়েই তৎক্ষণাৎ বিদায় দেবে তাদের। জোচ্চোরি ক'রে পাগল ছাগল গছাবার আর জায়গা পায়নি ব্যাটারা। একটা বি, এ, পাশ ছেলে, তার ঘাড়ে এই ভূত। এক মাসের মধ্যে ছেলের বিয়ে দেব আমরা।

মুখ চুন ক'রে ইসকুলে গেল সুনীল। ইস্কুলে গিয়ে পড়াতে পারলো না। দিন-কয়েকের দেখা দস্যি মেয়েটার জন্যই তার মন কেমন করতে লাগলো।

এদিকে এক যমের অরুচি বাংলা কুত্তা কোলে ক'রে সাবি যখন এসে তাদের বাড়িতে পৌঁছোলো মা তো অবাক। জ্যাঠা জ্যাঠাইমা জ্যাঠাতো ভাইবোনেরা সব এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। কী ব্যাপার? বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একা একা কার সংগে এলি? কেন এলি?

সাবি চুপ।

'পালিয়ে চ'লে এসেছিস নাকি?'

সাবি চুপ।

'সব্বোনাশ করেছে তোর মেয়ে' জ্যাঠাইমা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'নে, সাধ ক'রে আরো হাবা মেয়ের বিয়ে দে।' জ্যাঠামশাই হুংকার ছাড়লেন, 'বেরো, বেরো শিগ্গির। নচ্ছার মেয়ে, পাজী মেয়ে, ভেবেছিস শ্বশুর বাড়ি থেকে চ'লে এলে এখানে সোনার থালায় ধানদুর্বা সাজিয়ে বরণ করবো। বেরো এক্ষুণি বেরো।' থাবড়া মেরে কোলের কুকুরটা ফেলে দিলেন, আর সেটা কেঁউ কেঁউ ক'রে উঠলো, 'ইশ। কোথা থেকে আবার একটা নর্দমার কুকুর এনে হাজির করেছো' উত্তমাসুন্দরী পাথর।

কী দুঃখের দশা নিয়েই তিনি এই ভবসংসারে এসেছিলেন। এই সাবিত্রীর আগে আরো তাঁর চারটি পুত্র সন্তান জন্মেছিলো। অদ্ভুত এক রোগ ছিলো তার। প্রত্যেকটি ছেলেই বিকৃত অংগ নিয়ে জন্মাতো, এক বছর দেড় বছরের হ'য়ে মারা যেত শেষে। কত ডাক্তার, কত কবিরাজ, কত সাধু, কত সন্যাসী—স্বামী চিকিৎসা করাতে আর বাকী রাখেননি কিন্তু এর কোন সঠিক কারণ ডাক্তাররা নির্দেশও করতে পারেননি, সারাতেও পারেননি। আবার যখন এই মেয়ে পেটে এলো, চেষ্টা করেছিলেন নষ্ট ক'রে ফেলতে, শেষ পর্যন্ত পারেননি। তারপর যখন একমাথা কালো চুল আর এক মুঠো জুঁই ফুলের মত চেহারা নিয়ে জন্মালো কী আনন্দ। এই সন্তানেরই নাকি তিনি অনিষ্ট কামনা করেছিলেন। ছি ছি। ভাবতেও শিহরিত হ'য়ে উঠেছেন।

মেয়ে নিয়ে বুক জুড়োলো বটে, কিন্তু তার ছ বছর না পুরতেই বিধবা হ'লেন। সেই থেকেতো চলেছে এর দুয়ার আর তার দুয়ার। বড় ভাইঝির কাছে ছিলেন বছর খানেক, হাতে টাকা ছিলো তখন, অসুবিধে ছিলোনা। তারপর নিয়ে এলেন বড়দা, রইলেন সেখানে পুরো তিন বছর। ছোট-ভাই থাকে নাগপুরে সেখানে বছর দেড়েক তারপর একেবারে রিক্ত হস্ত হ'য়ে ভাসুরের কাছে। কিছু গয়না আর লাইফ ইন্সিওরেন্সের হাজার টাকায় হাত দেননি। এতকাল, তাওতো শেষ হয়েছে এই মেয়ের বিয়েতে।

উত্তমাসুন্দরী কতক্ষণ থ' হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ছুটে এসে পাগলের মতো এলোপাতাড়ি কিল চড় ঘুষি চালালেন মেয়ের পিঠে। জ্যাঠামশাই প্রজ্বলিত চোখে চ'লে গেলেন, ভাইবোনেরা হ্যা হ্যা ক'রে হাসতে লাগলো, জ্যাঠাইমা রান্নাঘরে ঢুকলেন। কেবল কুকুরটাই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘেউ ঘেউ ক'রে প্রতিবাদ জানাতে লাগলো ক্রমাগত।

দুপুরে চোখের জলে ভেসে একখানা সুনীলকে আর একখানা সুনীলের মাকে চিঠি লিখলেন উত্তমাসুন্দরী। তার মেয়েকে যেন তাঁরা ক্ষমা করেন, বোকা নির্বোধ ব'লে ঠেলে না দেন। তিনি নিতান্ত নিঃসহায় বিধবা, অন্তত তাঁর উপর দয়া ক'রেও যেন এবারের মতো মার্জনা করেন। তাদের চিঠি পেলেই মেয়েকে দিয়ে আসবেন তিনি নিজে গিয়ে। কয়েকদিন পরে জবাব

এলো দুই ছত্র। সুনীলের মার কাছ থেকেও না, সুনীলের কাছ থেকেও না। লিখেছেন সুনীলের বাবা নিজে। দুঃখিত। এই বেরিয়ে যাওয়া বৌ আর আমরা ঘরে তুলতে পারবো না। কেননা ছেলে নিজেই বলেছে এই বৌ যদি আবার এবাড়িতে ঢোকে কখনো, তা হ'লে সে-ই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। তাছাড়া শিগ্‌গিরই আমরা মনোমত পছন্দমত আরেকটি পাত্রী স্থির করছি।

ব্যাস্। চুকলো। উত্তমাসুন্দরী ঘরে খিল দিয়ে দু'দিন কাঁদলেন, তিনদিন খেলেন না, ভাসুরের মুখ থমথমে হ'য়ে রইলো, জ্যাঠাইমা পাড়ায় ঘুরে জানিয়ে এলেন, এই ভবিষ্যতবাণী তিনি আগেই করেছিলেন। তারপর আবার কয়েকদিন পরে ঠিক হ'য়ে গেল সব। সবাই মেনে নিল সাবিকে। সে আগের মতোই স্বাধীন ইচ্ছেয় ঘুরতে ফিরতে লাগলো। এক মাস যেতে না যেতে সকলেই ভুলে গেল যে সাবির আবার একটা বিয়ে হ'য়েছিলো মাঝখানে। বরং ভালোই হ'লো। আইবুড়ো নামও ঘুচলো আবার মার বুক খালি ক'রেও গেলো না। কোথায় যেন একটা নিশ্চিন্ততাও অনুভব করলেন উত্তমাসুন্দরী।

কপালের সিঁদুর নাইবা থাকলো, ঘন ভ্রমরকৃষ্ণ আঙুরের মতো থোকা থোকা চুলের মাঝখানকার সরু সাদা সিঁথিতে লাল টুকটুকে রেখাটি কিন্তু জ্বলজ্বল করতে লাগলো সাবির। যত পাগলামিই করুক, স্নানটি ক'রে চুলটি আঁচড়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে চুপে চুপে ঠিক চিরুনির ডগায় সিঁদুর নিয়ে রোজ ঐ রেখাটি আঁকে সে। আর আঁকতে আঁকতে একখানা কালো আর লাজুক মুখ হঠাৎ ক'রে ভেসে ওঠে চোখে। বুকের ভেতরটা একটা নাম না জানা অনুভূতিতে কাঁপতে থাকে অনেকক্ষণ ধ'রে।

এমনিতেই বাড়ন্ত, বিয়ের জল গায়ে লেগে বোধ হয় আরো বেড়ে উঠলো কচি লাউ ডাঁটার মত। শরীর পুরন্ত হ'লো, রং টুকটুকে হ'লো। আর যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো নিজে থেকেই কমে গেল তার, দলের সর্দারনী হ'য়ে ফোঁপর দালালি আর ভালো লাগলো না। দস্যিপনা শিথিল হ'লো। ভাইবোনেরা ইসকুলে গেলে, জ্যাঠামশাই আপিসে গেলে, মা জ্যাঠাইমা দুপুরে ঘুমুলে সে একা একা এঘর ওঘর করে, চিলকুঠির ছাতে গিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকে। আবার কখনো কখনো ভীষণ লুকিয়ে, ভয়ঙ্কর চুপে চুপে, কোনো নিভৃত কোণে ব'সে দোয়াত কলম আর বিয়েতে পাওয়া নতুন চিঠির কাগজ নিয়ে কী যেন লেখে হিজিবিজি। টুক্ ক'রে একটা পাতা পড়ার শব্দ হ'লেও চমকে উঠে সেই লেখা পাতাটি ছিঁড়ে ফেলে।

এর মধ্যেই একদিন তেজপুরের মেশোমশাই হন্ত দন্ত হ'য়ে এসে খবর জানালেন 'আরে তোমরা করছো কী? মাস্টারবাবু যে তার ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন আবার। সব ঠিক। মেয়েও আমাদের চেনা।' বাড়িতে তাই নিয়ে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। জ্যাঠা বললেন, 'নালিশ করবো। ইয়ে নাকি। চালাকি পেয়েছে? খোরপোশ দিতে হবে না? জ্যেঠি বললেন, 'মেয়ে নিয়ে গিয়ে হাজির হও, দেখিনা কেমন না নিয়ে পারে।' উত্তমাসুন্দরী কেবল চোখের জল মুছতে
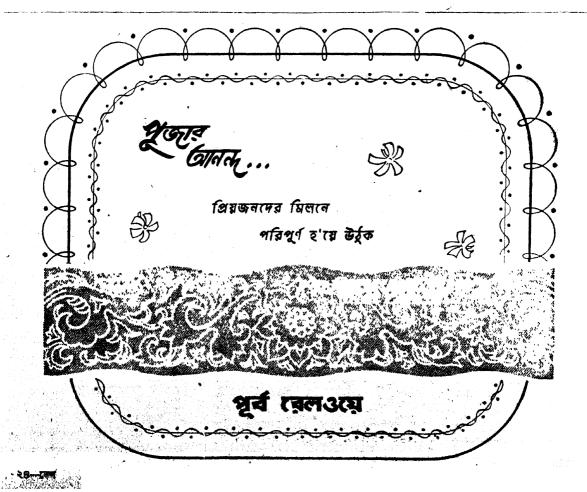
লাগলেন ঘন ঘন। শেষ পর্যন্ত কিছুই কার্যকরী হ'লো না, বাগাড়ম্বরই সার হ'লো।

স্নান ক'রে রোজের মতো সিঁথিতে সিঁদুররেখাটি আঁকতে গিয়ে আজ হাত কাঁপলো সাবির। আয়নায় তাকিয়ে দেখলো তার চোখভরা জল। কেমন একটা কষ্টে গলা বুক ভারি হ'য়ে উঠেছে।

সেদিন দুপুর নির্জন হ'লে হাতবাক্স থেকে একটা টাকা নিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়লো সে কোম্পানী বাগানের আঁকাবাঁকা পথ ধ'রে। আমবাগান ছাড়িয়ে, সরকার বাড়ির পেছন দিয়ে, মহিলা সমিতির কাঁচা ঘর ডিঙিয়ে সোজা বড় রাস্তায় এসে সে হাঁফ ছাড়লো। কতদিন বেরোয়না, আজ অনেকদিন পরে খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেশ লাগলো তার। বাঘাটা পেছন পেছন এসেছিলো, দু' চারবার ঢিল ছুঁড়তেই পালিয়ে গেল।

ভীষণ রোদ চড়েছে মাথার উপর। রাস্তাঘাটও নির্জন, নবাব বাড়ির কাছাকাছি বড় গাব গাছটার তলায় এসে একটু গা ছম্‌ছম্‌ করলো। ভয় ডর তার কুষ্ঠিতে নেই। আর এসব রাস্তাতো হাতের তেলো, কিন্তু ভূতের ভয়ে সে ভারি কাতর। ধীরে ধীরে রমনার রাস্তা বেয়ে পল্টন মাঠ ছাড়িয়ে লেবেল ক্রশের কাছে এসে রেল লাইন ধ'রে স্টেশনে এলো সে। রাতদিন গাড়ি যাচ্ছে তেজপুর, কুর্মিটোলা। পুরো এক ঘণ্টারও রাস্তা নয়, পঞ্চাশ মিনিট লাগে সবসুদ্ধ। ছ' আনার টিকিট। একখানা টিকিট কেটে থার্ডক্লাশ মেয়ে কামরায় চুপচাপ উঠে বসলো। আর উঠে বসা মাত্রই হুইসিল বাজলো, নিশান উড়লো আর ভালো ক'রে স্টার্ট দিতে না দিতেই হুস ক'রে এসে গেল কুর্মিটোলা।

স্টেসনের উল্টোদিকের দরজা খুলে নেমে, মাথায় একগলা ঘোমটা টেনে দিয়ে আরো দুটো লাইন পার হ'য়ে এপাশে এসে দাঁড়ালো সাবি। মাত্র পনেরো দিনের বসবাসের স্মৃতি। বেশ স্পষ্ট মনে আছে তার। ঐতো দূরে স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার, ঐতো ই'দারা, ঐতো কাপড় শুকোচ্ছে তাদের। ধুতিটা কার? আবার বুকটা কেঁপে উঠলো একটু।

কিন্তু ইস্কুল কোনদিকে তাতো জানেনা সাবি। গ্রাম দেশ, মাঠের আল বেয়ে বেয়ে এখন কোনদিকে যাবে সে? একটা গয়লানী থমকে দাঁড়ালো তার দিকে তাকিয়ে।

'আমাকে বিদ্যাপতি হাই ইস্কুলটা দেখিয়ে দিতে পার?' সাবি আবেদনটা তাকেই জানালো। গয়লানী ঘাড় নাড়লো তারপর বললো, 'তোমাকে যেন চেনা চেনা লাগছে গো?'

'আমাকে কোথেকে চিনবে? আমি হলাম গিয়ে বিদেশী।'

'বিদেশী? কোথায় থাক?'

'তেজপুরে। তা-ও আমার বাড়ি নয় দিদির বাড়ি।'

'ও, তেজপুর। তো এখানে ইস্কুলে যাচ্ছ কেন মেয়ে মানুষ?'

সাবি চিন্তা করলো একটু। তারপর বললো 'বড় বিপদে পড়েছি কিনা। আমার দিদির খুব অসুখ বেড়েছে। জামাইবাবু এখানকার ইস্কুল মাস্টার, খবর দিতে এসেছি। বাড়িতে আর কোনো পুরুষ নেই।'

'ও। তবেতো ভারি মুশকিল। এসো, পা চালাও। আমি ওদিকেই যাচ্ছি।'

বেশী দূর না। একটা মাঠ পেরিয়েই মস্ত চালাবাড়ি। দূর থেকেই গোলমাল কোলাহলে বোঝা গেল, হ্যাঁ ইস্কুলই বটে। গয়লানী চৌকিদারকে ডেকে দিয়ে চলে গেল নিজের পথে। সাবি চৌকিদারের হাতে দু' আনা পয়সা গুঁজে দিয়ে বললো 'শিগ্গির সুনীল মাস্টারকে একটা খবর দিয়ে দাওতো দারোয়ানবাবু, বলো যে বাড়িতে ভারি বিপদ।'

'আর হাপুনে তাহলে—'

'না না আমার কথা কিছু বলতে হবে না, শুধু তাকে একবার বার ক'রে নিয়ে এসো ক্লাশ থেকে।' আরো দু' আনা গুঁজে দিল হাতে। দু'আনাতেই যথেষ্ট গ'লে গিয়েছিলো চৌকিদার, তার উপরে দারোয়ানবাবু শুনেতো আত্মহারা আবার তার উপর আরো দু' আনা। এক দৌড়ে সে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলো তাকে। আর হন্তদন্ত হ'য়ে ঘাম মুছতে মুছতে সুনীল এসে সাবিকে দেখেতো একেবারে থ। সাবি চোখ নামিয়ে নিল। হঠাৎ কেমন জানি লজ্জা করলো একটু।

'তুমি! এখানে!' সুনীলের মুখ থেকে খ'সে পড়লো শব্দ দুটি।

'তা কী করবো?' অভিমানে ভারি হ'লো সাবির গলা, 'তোমরা তো আমাকে বাড়িতেই ঢুকতে দেবে না।'

'না করেছি কখনো?'

'হ্যাঁ।'

'কবে?'

'তোমার বাবাতো লিখেছেন আমি এলেই তুমি বিবাগী হ'য়ে চলে যাবে। কেন, আমি

কী করেছি?' দুপুরের রৌদ্র ঝলসিত সুন্দর একখানা মুখ, এই মুখখানা কতদিন কত সময়ে মনে পড়েছে সুনীলের। বুকের কাছে তার ভয়পাওয়া উষ্ণ নিঃশ্বাসটুকু অনুভব করতে করতে কত বুক কেঁপেছে। চুপচাপ তাকিয়ে রইলো সে। তারপর সহসা সচকিত হ'য়ে বললো, 'একটু দাঁড়াও আমি আসছি।'

ক্লাস ছুটি নিয়ে আবার মুহূর্তে ফিরে এলো সে। তারপর হাঁটিতে হাঁটিতে পোড়ো মন্দিরের ভাঙা বটগাছের নিভৃত ছায়ায় এনে বসালো সাবিকে। একেবারে নিভৃত নির্জন জায়গা, চারদিক তাকালে জন-মনিষ্যির চিহ্ন নেই, কেবল হলদে ফুল সরষে খেতের ঢেউ। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'মুখটা মোছ, কত ঘেমেছ। আবার ঢাকা থেকে পালিয়ে এসেছ বুঝি?'

'কেন আসবোনা?'

'কেন আসবে?'

'তুমি কেন বিয়ে করবে?'

'বিয়ে।' মুখটা শুকিয়ে গেল সুনীলের। একটুখন জবাব দিল না। তারপর বললো, 'তুমিতো আর আমাকে চাওনা। বিয়ে করি বা না করি।'

'নুনা।'

'কী না?'

'তুমি বিয়ে করবে না।'

'করলে ক্ষতি কী?'

'আমি ঢিল ছুঁড়বো।'

হেসে ফেললো সুনীল, 'কাকে?'

'ঐ তাকে।'

'তার কী দোষ?'

'আমি জানিনে যাও।' দু' হাতে মুখ ঢাকলো সাবি।

একটু পরে হাত সরিয়ে দিয়ে সুনীল বললো, 'একটা কথা শোন।'

'না।'

গাছের ওপাশে গিয়ে মুখ লুকালো

'এই সব অবাধ্যতা কর বলেইতো আমি বিয়ে করতে চাই।'

'করবো, করবো তো, একশোবার করবো। আমি তোমার কোনো কথা শুনবোনা।'

'শুনবে না?'

'না।'

'তা হ'লে বিয়ে করবো?'

'না।'

'বেশ কথা। নিজেও আসবেনা অন্যকেও আসতে দেবে না!'

'কেন দেব?'

'কেনই বা দেবে না?'

'তুমি—তুমিতো আমার।' ব'লেই ভয়ানক লজ্জা পেয়ে গাছের ও-পাশে গিয়ে মুখ লুকোলো। সুনীলের চোখেমুখে দুষ্টুমির হাসি ঝিলিক মেরে উঠলো।

বললো 'শিগ্গির এখানে এসো।'

'না'

'এসো বলছি।'

'না'

'আসবে না?'

'না'

'ঠিক আছে। আমি চললাম। বটতলার খবর সবাই জানে রাত্রি বা নিরব দুপুর তো দূরেস্থ কথা, দিনের যে কোনোসময়ে একা দাঁড়িয়ে থাকনা এর তলায়, সেই সিধু নাপিত ফাঁসি দিয়ে মরার পর থেকে—'

সড়াৎ ক'রে শুকনো পাতায় বুক-মাড়িয়ে একটা গিরগিটি চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাবি 'ওরে মারে বাবারে' বলে ছিটকে এসে জড়িয়ে ধরলো সুনীলকে। চারদিক তাকিয়ে সুনীল তৎক্ষণাৎ চট ক'রে সাবির বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরা কপালটিতে চুমু খেল একটি। লাল হ'য়ে সাবি বললো। 'ধ্যেৎ।'

সারা বেলা তারপর তারা কেমন ক'রে কাটালো, কোথায় কাটালো সে সব প্রশ্ন অবান্তর। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন দু'জনে লম্বা ছায়া ফেলে ভেতরের উঠোনে এসে দাঁড়ালো কুণ্ঠিত পায়ে তখন মা তুলসী তালায় প্রদীপ দিতে দিতে ছেলের কথাই ভাবছিলেন। এখনো কেন স্কুল থেকে ফিরলোনা সেটা ভেবেই উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন। কদিন থেকে তো বাড়িতে ছেলের সঙ্গে কম অশান্তি যাচ্ছে না বিয়ের ব্যাপার নিয়ে, নাকি তার জন্যেই রাগ ক'রে চ'লে গেল কোথায়! কতরকম ভাবতে ভাবতে যখন প্রণাম সেরে মুখ তুললেন আস্তে এসে লক্ষ্মী মেয়ের মতো কাছে দাঁড়ালো সাবি।

'কে।' ঝাপসা আলোয় তিনি চমকে উঠ্‌লেন।

সুনীল এগিয়ে এসে বললো 'ওকে নিয়ে এলাম মা।'

'নিয়ে এলি?'

'তোমরাতো একজন বৌ-ই চাইছিলে, তাই—'

'তাই নিজে যেচে, সেধে, গিয়ে ওকে নিয়ে এলি? একটা মান সম্মানও কি নেই তোর? নিজের না থাক, মা বাপের উপরও তো তোর একটা কর্তব্য—'

বড় বড় চোখ তুলে শাশুড়ির মুখের দিকে তাকালো সাবি—'নাতো, ওতো আমাকে আনেনি। আমিতো নিজে এসেছি। পালিয়ে এসেছি দুপুর বেলা।'

সুনীল চকিত হ'লো। সুনীলের মা তাজ্জব। সাবি ছোট মেয়ের মত শাশুড়ির হাত ধ'রে ফিক ক'রে হাসলো, 'ও ভীষণ মিথ্যুক মা। আরো কিন্তু অনেক মিথ্যে কথা বলবে ব'লে ঠিক ক'রে এসেছে।'

মা ছেলের দিকে তাকালেন, সুনীল নত দৃষ্টিতে চুপ।

হঠাৎ এতখানি জিব কাটলো সাবি 'এমা, তোমাকেতো নমস্কারই করিনি এতক্ষণ পর্যন্ত।' ধপ ক'রে শাশুড়ির পায়ে নরম হাতটা বুলিয়ে নিল একটু। শাশুড়ি কঠিন হ'য়ে পা সরিয়ে নিতে গিয়েও হঠাৎ হেসে ফেললেন তারপর ওর না-আঁচড়ানো মাথার এলোমেলো চুলের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন 'যা ঘরে যা। আর কোনদিন যদি পালাস তখন দেখিস।' নির্লজ্জের মতো অসংকোচে ঘরে যেতে যেতে সাবি বললো, 'কেবল একদিন গিয়ে তোমাদের ছিরে জাজাটাকে নিয়ে আসতে হবে।'

বাংলা মঞ্চের প্রথম শতাব্দী

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়

আগামী কয়েক বৎসরের ভিতরেই বাংলার রঙ্গমঞ্চ এক শতাব্দী পূর্ণ করবে। তখন বহু উৎসব, বহু সভার আয়োজন নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু আমরা কী বলব?

স্টার রঙ্গমঞ্চে বহু সাফল্যের সঙ্গে "শ্যামলী" যদি অভিনীত না হ'ত তাহ'লে আমাদের এই কথাই বলতে হ'ত যে, বাংলাদেশের গর্বের জিনিস রঙ্গমঞ্চ আজ বন্ধ হয়ে গেছে; অথচ শুনেছি আমাদের শৈশবেই স্টার, কোহিনূর, মিনার্ভা ও ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতি রজনী পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দর্শকবৃন্দকে আনন্দদান ক'রে কৃতার্থ হয়েছে। এমন বিপর্যয় তবে কেন ঘটল?

বাঙালীর পুনরভ্যুদয় হ'ল রাজা রামমোহনের সময় থেকে, অভিযান শুরু হ'ল সিপাহী বিদ্রোহের পর। বাঙালী তখন নিজেকে চিনতে শিখল, নিজস্ব সংস্কৃতি সম্বন্ধে সে জাগ্রত ও সচকিত হয়ে উঠল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৮৬০ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বাংলার যুগ বললে ভুল হবে না। এই কয়েক বৎসর হ'ল বাঙালীর রেনেসাঁর যুগ। এই যুগেই হয় বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি আর সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর চিন্তাধারা নানা দিকে নব নব রূপে তার শাখা বিস্তার করে অনুসন্ধিৎসু মনের দৃষ্টিপাত করেছিল। এই সময়েই জাতীয় জীবনে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন বাঙালী উপলব্ধি করল। সামনে বহু সমস্যা, দেশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। শিক্ষিতের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, কী করে এ জাতির নিদ্রা ভঙ্গ করা যায়? পত্তন হ'ল রঙ্গমঞ্চের সমস্যা সমাধানের উপায়। কৌলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ এই সব সমস্যার প্রতীকারের উদ্দেশে অভিনয় উপযোগী নাটক নিয়েই রঙ্গমঞ্চের যাত্রা শুরু হ'ল। সে যুগে গুণীর অভাব ছিল না। তাঁরা শুধু গুণী নন, গুণের পূজারীও ছিলেন। তাই তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চের স্থাপনা সম্ভব হ'ল। পাথুরে-ঘাটার রাজবাড়ি, পাইকপাড়ার রাজবাড়ি, এ'দের দান বাংলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এ সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, বাংলা নাটকের অভাবে তাঁরা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে অভিনয় করাতেন। তাঁদের উৎসাহের প্রাবল্যে বাংলা নাটকের অভাবও বেশীদিন রইল না। সামাজিক নাটকের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিমূলক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক ও মহাকাব্য (Epic) সগৌরবে তাদের স্ব স্ব স্থানে রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সে একদিন গিয়েছে। প্রসূতি যেমন তার নবজাত শিশুকে সূতিকাগৃহে সমস্ত হৃদয়ের স্নেহরসসুধা মাতৃস্তন-দুগ্ধ ঢেলে দিয়ে পুষ্ট ক'রে তোলেন ভবিষ্যতের কত আশার স্বপ্ন দেখতে দেখতে, তেমনি আমাদের দেশের মনীষীরা তাঁদের এই নবলব্ধ শিশুটিকে ভবিষ্যতের কল্পনা দিয়ে ঘিরে বহু যত্নে লালন করে তুলতে লাগলেন। মহাকবি মাইকেল লিখলেন "পদ্মাবতী" "শর্মিষ্ঠা" আরো কত নাটক; সঙ্গীতাংশ দিলেন মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন। ১৮৬০ শালের ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিকল্পনার এই হ'ল প্রথম সোপান। কিন্তু আজ একশ বছর হ'তে চলল আমাদের ন্যাশনাল থিয়েটার শুধু আমাদের স্বপ্নেই রয়ে গেল। সমসাময়িক আচার ব্যবহার নিয়ে তৎকালীন রঙ্গমঞ্চে প্রহসনের সৃষ্টি মাইকেলই প্রথম করেন। তখনকার সমাজের কাছ থেকে কত বাধাই না পেয়েছেন তিনি তাঁর প্রহসন নিয়ে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' মঞ্চস্থ করতেই পাইকপাড়ার রাজারা ভীত হয়ে ওঠেন।

অভিনয় তখন সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র কয়েকটি গুণী প্রগতিশীল শৌখীন ও সমজদার ধনীদের গৃহে এবং তাঁদের নিমন্ত্রিত বন্ধুদের ভিতরে। দশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। কিন্তু অভিনয়ের এমনি আকর্ষণ যে আস্তে আস্তে তা ছড়িয়ে পড়তে লাগল আর তা কোন বিশেষ গৃহকোণে আবদ্ধ রইল না। জনসাধারণের আগ্রহ মেটাবার জন্যে আবির্ভাব হ'ল সাধারণ প্রেক্ষাগৃহ বা পাবলিক থিয়েটার। বিশেষ একটি শ্রেণীর আশ্রয় থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে যে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল সেই বিদ্রোহই বাংলার রঙ্গমঞ্চের সর্বপ্রধান ঐতিহ্য। এই বিদ্রোহীদের অন্যতম ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। প্রাতঃস্মরণীয় এই দুই শিল্পীর নাম জানে না এমন বাঙালী নেই।

বাংলার রঙ্গমঞ্চকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম হ'ল গিরিশচন্দ্রের যুগ, দ্বিতীয় গিরিশোত্তর আর তারপর এল শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের যুগ।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ; তাঁকে সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে মাপতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তিনি ছিলেন একাধারে অসামান্য অভিনেতা ও নাটক রচয়িতা। এই দুয়ের সমন্বয় তাঁর মধ্যে যা ছিল তার দৃষ্টান্ত বিরল। কী সামাজিক, কী ঐতিহাসিক, কী ভক্তিমূলক অথবা নৃত্যগীতবহুল নাটক,

সর্বেতেই ছিল তাঁর লেখনীর অসামান্য পারদর্শিতা আর এ সমস্তের রূপও দিয়েছেন তিনি মঞ্চের উপর অভিনবরূপে। তিনি ছিলেন একাধারে প্রযোজক, পরিচালক, নট ও নাট্যকার। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে গিরিশচন্দ্রের যুগে রঙ্গমঞ্চ যে শীর্ষস্থান লাভ করতে পেরেছিল তার ইতিহাস সত্যিই বিস্ময়কর!

সেই যুগে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নাটকের অভাব হয়নি। সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এই সব কিছুর সঙ্গে বাংলার রঙ্গমঞ্চ এক অভিন্ন সূত্রে নিজেকে গেঁথে রেখেছিল এবং সেই যোগাযোগই বাঙালীর অন্তর স্পর্শ ক'রে এমন একটি তারে ঘা দিয়েছিল যার সুর আজও থেমে যায় নি। তখনকার দিনে আজকের মত ভোর না হ'তেই সকল সমাচার বাড়িতে বসেই সবাই শুনবার সুযোগ পেত না। 'নীলদর্পণের' অভিনয়ে গণ আন্দোলনের আভাস পেয়ে বাঙালীর প্রাণে আশার সাড়া জাগলো তার জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। বাঙালী জানল যে তার মূর্খ চাষী ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়। অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে মাথা তুলে দাঁড়াতে জানে। তখনকার যুগে 'নীলদর্পণের' অভিনয় জাতির জীবনে যে অনুপ্রেরণা এনেছিল তার গুরুত্ব আজকের দিনে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ভাবলে আশ্চর্য হই, ইংরেজ সরকার 'নীলদর্পণের' অভিনয় তৎক্ষণাৎ বন্ধ করেননি কেন? ইংরেজের তখন দেশ জয় করা হয়ে গেছে। শিক্ষিত সমাজের মন জয় করবার জন্য তখন তাঁরা বদ্ধপরিকর অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরণায় রঙ্গমঞ্চ তখন এই শিক্ষিত সমাজের মনের উপর এক গভীর রেখাপাত করেছে কাজেই সব দিক দিয়ে ভেবে চিন্তে সরকার বাহাদুর রঙ্গমঞ্চের মারফৎ এই বিদ্রোহের ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক সাধনাকে অবজ্ঞা করাই ছিল তখনকার দিনের ইংরাজ সরকারের রাজনীতি। বিদেশী রাষ্ট্রের এই অবজ্ঞার ফলে ভারতের কৃষ্টির কোন ক্ষতি ত হয়ইনি, উপরন্তু তাদের এই ঔদাসীন্যের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি তার নিজস্ব একটি রূপ খুঁজে পেয়েছিল। তবে ইংরেজ সরকারের পক্ষে বেশীদিন সহিষ্ণু হয়ে থাকা সম্ভব হয় নি। কিছুদিন পরই আরম্ভ হ'ল আইনের জুলুম। রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়ে যে জাতীয় জাগরণ সাড়া দিয়ে উঠেছিল তা বন্ধ করে দেবার জন্য নূতন নূতন আইনের সৃষ্টি হ'ল। যার নাগপাশ থেকে আমরা আজও স্বাধীন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারিনি এবং এই বন্ধনই রঙ্গমঞ্চের প্রগতির পথে মস্ত বাধা হয়েছে।

'নীলদর্পণের' সঙ্গে 'সধবার একাদশী' 'প্রফুল্ল', 'সরলা' প্রভৃতি নাটকের নাম উল্লেখ না করলে তখনকার বাংলা রঙ্গমঞ্চের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এইসব নাটকগুলি তখনকার দিনে সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত হয়। সাধারণ দর্শকের জন্য রচনা হ'ল 'বিল্বমঙ্গল', 'চৈতন্যলীলা,' 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি ভক্তিমূলক নাটক। তারপর

এল ঐতিহাসিক নাটক ভারতবর্ষের ইতিহাসের পুরাতন ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে আর এই ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দান ছিল অতুলনীয়। গিরিশোত্তর যুগেও এই তিন শ্রেণীর নাটকের মধ্যেই রঙ্গমঞ্চ মোটামুটিভাবে আবদ্ধ ছিল। এই সময়ে অমৃতলাল বসু প্রভৃতি লেখকের বহু ব্যঙ্গ কৌতুক নাটকও রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই যুগের বিশিষ্ট অভিনেতাদের মধ্যে অমৃতলাল বসু, অমৃত মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও গিরিশচন্দ্রের পুত্র দানীবাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। গিরিশ এবং গিরিশোত্তর যুগের অভিনয়োৎকর্ষের প্রধান বাধা ছিল অভিনেত্রী সংগ্রহ। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অভিনেত্রীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। কিন্তু তখনকার দিনে সামাজিক সংস্কার এমনি কঠোর ছিল যে, কোন ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মহিলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগ দেওয়া বাতুলের স্বপ্নপ্রায় ছিল এবং সে বাধা যে এখনও সম্পূর্ণভাবে উঠে গেছে তা বলা চলে না। তখনকার দিনে ভদ্রঘরের মেয়েদের ভিতরেও শিক্ষিতা মেয়ে কেউ ছিলেন না বললেই চলে। বিশেষ এক শ্রেণীর রমণীর ভিতর থেকেই অভিনেত্রী সংগৃহীত হ'ত এবং এ'দের সামাজিক জীবনের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও বিফলতা সম্বন্ধে সকলেই জানেন। তাই ভাবলে অবাক হ'তে হয়, এই আবহাওয়ার মধ্যে থেকে এসে কী করে বাঙালীর হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন তিনকড়ী, সুকুমারী, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণী, সুশীলা ও তারাসুন্দরী। এ কেবল সম্ভব হয়েছিল তাঁদের স্বাভাবিক অনুভূতি, প্রেরণা সাধনা ও কর্মে নিষ্ঠার ফলে। সমস্ত শিল্পানুরাগীদের কাছে তাঁরা আজ নমস্য!

এই অগ্রগামীদের অদম্য উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা ও মাদকতা রঙ্গমঞ্চকে এক জায়গায় নিয়ে এসে দাঁড় করালে। তারপরেই হয়ে গেল সব নিশ্চল; এল নৈরাশ্যবাদ ১৯১২ সাল থেকে। পিতা মাতা সন্তানকে যেমন বহু আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ করেন—তারপরে হয়ত একসময়ে বুঝতে পারেন আশানুরূপ ফল ত ফলল না! তেমনি বহু উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে যে রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হ'ল তা অন্যান্য সাহিত্য সঙ্গীত কলার সঙ্গে পা ফেলে অগ্রসর হ'তে পারল না—বহু পিছনে পড়ে রইল। জনসাধারণের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী তখন বহু প্রসারিত। ভারতবর্ষের সঙ্গে তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যোগ স্থাপিত হয়েছে। জাতি তখন নিজেদের বিশ্লেষণ করে দেখতে আরম্ভ করেছে। এই মাপকাঠিতে রঙ্গালয়ের বহু ত্রুটি তাঁদের চোখে ধরা পড়ল। সুধীজনেরা এইসব দোষত্রুটি সংশোধন করবার চেষ্টা না করে, নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখলেন; রঙ্গালয় বঞ্চিত হ'ল এ'দের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবও রঙ্গালয়ের উপর বিশেষ প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। যদিও এখানে উল্লেখযোগ্য 'বিধবা বিবাহ' নামে একটি নাটক কেশবচন্দ্রের বিশেষ উৎসাহেই মঞ্চস্থ হয় এবং তিনি শুধু উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বহু ভক্তেরা এতে অংশ গ্রহণ করেন। শিক্ষিত ও সুধী সমাজের মধ্যে থিয়েটার দেখার রেওয়াজ যখন উঠে গেল, তখন মাত্র কয়েকজন বিশেষ নাট্যানুরাগী ব্যক্তি বহু দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে রঙ্গালয়ের প্রদীপটি কোন রকমে টিমটিম করে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। কত দুঃখের ভিতরে যে তাঁরা অভিনয় করতেন আমরা তা ভাবতেও পারি না। দিনের বেলা অফিসের কাজ করে সারারাত অভিনয় করতেন—একদিনও অফিসের কামাই ছিল না বা বেঠিক সময়ে যেতেন না। সমস্ত রজনীব্যাপী অভিনয় না হলে তখনকার দিনের দর্শককে খুশী করা যেত না। তাই একই রজনীতে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটকের পরও আরো দুটি একটি নাটক অভিনীত হত। এই সময়ে নাটকের অবনতি হতে লাগল, রূপসজ্জারও বালাই ছিল না, স্টেজ টেকনিক ত ছিলই না। থিয়েটার চলা-না-চলা সম্পূর্ণ নির্ভর করত মহাজনের খামখেয়ালীর উপর। থিয়েটারের কর্ণধার যাঁরা ছিলেন তাঁদের সবচেয়ে প্রতিবন্ধকতা ছিল শক্তির অভাব, ভিত্তিমূলে প্রোথিত করার মত শক্তি তাঁদের ছিল না। বাস্তব থেকে তাঁরা দূরে থাকতেন। নাটক মনোনয়নে দূরদর্শিতার অভাব এবং দেশের নাড়ীর সঙ্গে যোগ না থাকার ফলে রঙ্গমঞ্চে বেদনা, আনন্দ, আশা আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে অসাধারণ ঘটনাবলী, জটিল ষড়যন্ত্রজাল, অক্ষম উদ্দেশ্যমূলকতা এবং কৃত্রিম মানবতার বেড়াজাল ছাড়া বছরের পর বছর তাঁরা আর কিছুই দিতে পারেন নি। নীতিবাগীশরা তখন থিয়েটার সম্বন্ধে যে অশ্লীল ইঙ্গিত করতেন তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল না যদিও গিরিশচন্দ্রের ও অমৃতলাল বসুর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলায় কেবল যে অভিনেতা অভিনেত্রীরা তটস্থ হয়ে থাকতেন তা নয়, দর্শকবৃন্দকেও অনুরূপ থাকতে হত। এইসব নানা কারণে দর্শকদের আগ্রহেও যে ভাঁটা পড়ে এসেছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এই সময়ে রঙ্গমঞ্চকে যাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও অপরেশচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। গীতিনাট্যে ক্ষীরোদবাবুর আলিবাবা, আজও দর্শকের মনে আনন্দের

তুফান তোলে। সাধনা বসু ও মধু বসুর আবদাল্লা মর্জিনার নাচের যখনই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছি তখনই প্রাচীনেরা দূরে নেপা-সুশীর কাছে এদের নাচ!" বলে মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ভিতরেও যেমন সূর্য-কিরণ লুকিয়ে থাকে তেমনি তখনকার স্কুল কলেজ ও শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন শখের থিয়েটারের দল। পূজা পার্বণে ও অন্যান্য সামাজিক উৎসব উপলক্ষে তাঁরা নিজেদের উৎসাহে নিজেদের চেষ্টায় স্টেজ বেঁধে অভিনয়ের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখলেন। বাংলার রঙ্গমঞ্চের ক্রমবিকাশে এঁদের দানও অগ্রগামীদের চেয়ে কিছু কম নয়। এঁরাই আবার বহু যত্নে বঙ্গরঙ্গ-মঞ্চকে পুনরুজ্জীবিত করে তুললেন। এই শখের থিয়েটার থেকে মর্যাদা নিয়ে আভিজাত্য নিয়ে শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে প্রকাশিত হলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছবি বিশ্বাস। এই শিল্পের কয়েকটি চিরন্তন নীতি বিস্মৃত না হয়ে তাঁরা নতুন পথের সন্ধান পেলেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টাতেই বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রগতি শুরু হয়। নাটুকে ঢঙে চলা ফেরা, কথাবার্তা ও ভঙ্গিমার পরিবর্তে পরিমার্জিত সংলাপ, সংক্ষিপ্ত ভাবময় বাস্তব জীবনে শ্রুত কথা-বার্তা, নাট্যালয়ের খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ লক্ষ্য এবং স্টেজ টেকনিক সম্বন্ধে সচেতন আধুনিক রঙ্গ-মঞ্চের যে পূর্ণতা ও বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে তার অনুপ্রেরণা সম্পূর্ণ শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের। এঁদের সঙ্গে আমরা শ্রদ্ধা-উন্নত চিত্তে স্মরণ করি, কৃষ্ণভামিনী, চারুশীলা, নীহারবালা, শ্রীমতী প্রভা, কঙ্কাবতী, শান্তি গুপ্তা ও সরযূবালাকে।

প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের বিকাশের সঙ্গে জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারায় এক অভিনব রঙ্গালয়ের সূচনা হয়। এই রঙ্গালয়ের মঞ্চ ছিল ঠাকুরবাড়ির পূজার দালান। অভিনেতারা সম্পূর্ণভাবে পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন এবং নাটক, সঙ্গীত ও সুর জোগাতেন সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুর পরিবার বহু বিষয়েই আমাদের পথ-পরিচায়ক ছিলেন। রঙ্গমঞ্চে শিক্ষিতা ভদ্রঘরের মেয়ের আবির্ভাব হল এঁদেরই রঙ্গমঞ্চে ৭০ বৎসর আগে। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভা নাট্যে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী বালিকা ও সরস্বতীর রূপ দেন আর লক্ষ্মীর ভূমিকায় নামেন ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী। মেয়েরা নৃত্যগীতে রূপ দেন 'মায়ার খেলায়'। মঞ্চের উপর মেয়েদের নৃত্য করানো নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বহু কটু কথা শুনতে হয়েছে। এর পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত 'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর', 'বিসর্জন', 'শারদোৎসব', 'অচলায়-তন', 'রাজা", 'নটীর পূজা' প্রভৃতি বহু নাটক আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা অভিনয় করেছেন এবং পরে সেগুলি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনীত হয়েছে তাঁদের ঠাকুর দালানে। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের হাতের স্পর্শ ইন্দ্র-জাল সৃষ্টি করেছে। আলোতে আলপনাতে রঙে রসে তাঁদের হাতের তৈরী মঞ্চসজ্জা ঝলমল করে উঠেছে, দর্শকদের নিয়ে গেছে কোন মায়াচ্ছন্ন লোকে। কবিকণ্ঠ আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর বর্ষামঙ্গলের 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে' —তাঁর বসন্তোৎসবে 'রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার যাবার আগে' আমাদের বুকের মাঝে ধ্বনিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা, অপূর্ব অভিনয় ও অনুপ্রেরণা, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের হাতে মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জা এবং দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে কবির গানের সুর রসপিয়াসী বাঙালীর মনে এনেছিল এক আনন্দের ঢেউ যার প্রভাব এসে পড়েছিল প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের উপর—নাট্যে নৃত্যে গীতে, অভিনয়ে।

রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের সঙ্গে কথনো যোগ দেননি। কিন্তু এ'দের উপর তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। তাঁর চিরকুমার সভা যখন প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নৃত্যে রূপসজ্জায় সাহায্য করেন এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে উৎসাহ ও আনন্দ দেন এবং নিজে এর রসোপভোগ করেন।

বাংলার রঙ্গালয়ের গৌরবোজ্জ্বল প্রদীপ আজ স্তিমিত হয়ে গেল কেন, এখন আমাদের সেই কথা ভাববার সময় এসেছে। প্রথমত ভালো নাটকের অভাবই হয়ত এর প্রধান কারণ। আমাদের সাহিত্য আজ ঐশ্বর্যভারে পরিপূর্ণ কিন্তু কোথায় নাট্যকার? এদিকে কারুর দৃষ্টি নেই কেন? যুগোপযোগী নাটক লেখা না হ'লে পুরাতন নাটক দর্শককে কী করে আকর্ষণ করবে? এই দারুণ অর্থ-সংকটের দিনে পরীক্ষামূলক নাটক করবার সাহসও কোন প্রযোজকের নেই। সুধীসমাজও নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। রঙ্গমঞ্চের এই অবনতির জন্যে চলচ্চিত্র জগতও অনেকটা দায়ী। অভিনেতা অভিনেত্রী চলচ্চিত্রের মারফতে রাতারাতি বিনাশ্রমে "তারকা" হয়ে অর্থ ও যশ দুই-ই অর্জন করেন। তাই আমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠা ও সাধনার একান্ত অভাব হয়ে পড়েছে; সেই সঙ্গে অভাব হয়েছে রঙ্গমঞ্চে ভালো অভিনেতা ও অভিনেত্রীর। কতখানি পরিশ্রম ও একাগ্রতা এবং কর্মনিষ্ঠা থাকলে ভালো অভিনেতা হওয়া যায় তা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস পড়লেই জানা যায়। আজকের দিনে কোথায় সে শিক্ষা, কোথায় সে নিষ্ঠা, কোথায় সে একাগ্রতা এবং কোথায় সেই আদর্শকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে বড় হ'বার চেষ্টা! থিয়েটারের ভেতরেও নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অভাব এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চিয়তা এই অবনতির জন্য দায়ী। এই সবের ভিতর থেকে সত্যিকারের শিল্পানুরাগী যাঁরা তাঁদের দরদী মন নিয়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য যদি সচেষ্ট না হ'ন তা হলে কী জবাব আমরা দেব আগামী কালের মানুষকে?

আই পি টি এ-র 'নবান্ন' দেখে আমাদের প্রাণে আশার সঞ্চার হয়েছিল, আবার বুঝি নতুন করে জেগে উঠল রঙ্গালয়, কিন্তু আই পি টি এ বহুরূপী সম্প্রদায় এ'রা কেউই যেন রঙ্গমঞ্চকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন না তার গৌরবের আসনে। এর কারণ কী? শিশিরবাবুর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি এ'রা কেবল আত্মবিকাশের চেষ্টা করেছেন, রঙ্গমঞ্চকে বাঁচাবার চেষ্টা করেননি। তাই আজ রঙ্গালয়ের এই অধঃপতন। ইদানিং আমরা দেখতে পাচ্ছি নাট্যকারও বিশেষ কোন একটি অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে লক্ষ্য করেই নাটক রচনা করেছেন। তাতে ব্যক্তিগত প্রতিভার বিকাশের সুযোগ ও সাফল্য হলেও রঙ্গালয়ের বিকাশ সম্ভব হয়নি। কোন ব্যক্তির প্রতিভা দেখেই তৃপ্ত হ'তে পারেন না, তাঁরা চান প্রত্যেকটি চরিত্রের সমাবেশে, গোষ্ঠীগতভাবে নাটকের উৎকর্ষ! এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে স্টার রঙ্গমঞ্চের প্রযোজক শ্রীসলিল মিত্র এবং পরিচালক শ্রীশিশির মল্লিক ও শ্রীযামিনী মিত্র টীম-ওয়ার্ক বা গোষ্ঠীগত কর্মের দ্বারা কীভাবে অতি সাধারণ নাটককেও সাফল্য-মণ্ডিত করতে পারেন তা প্রমাণ ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। এ'রা প্রেক্ষাগৃহের ভিতর ও তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে সুপরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও সুরুচিপূর্ণ করে দর্শকদের মনে এনেছেন তৃপ্তি! "রঙমহল" সম্প্রতি সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের মধ্যে তাঁদের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন, আশা করি আবার আমাদের মরা গাঙে বান ডেকে উঠবে।

আজকের দিনে বিদেশের শিল্পীদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদের শিল্পকে দেখবার জানবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। কিন্তু এ সব সুবিধা সত্ত্বেও আমরা কতটুকুই বা অগ্রসর হতে পারছি, তার জন্যে কতটুকুই বা চেষ্টা করছি। ন্যাশনাল থিয়েটার কেন শুধু স্বপ্নেই থেকে যাবে? রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া বিশেষ কোন একজনের দ্বারা এ কথনো সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে আমাদের স্বাধীন গবর্নমেণ্ট অত্যন্ত উদাসীন। তাঁরা যদি আজ এগিয়ে এসে হাল না ধরেন তাহ'লে বাঙালীর এত বড় গর্বের জিনিস চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হয়ে যাবে।

পিঙ্গলার প্রেম

বিমল কর
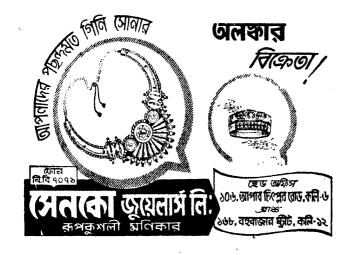
ভোরের ট্রেনে এসে পৌঁছল ওরা। তখনও ভাল করে ফরসা হয়নি আকাশ, স্টেশনের বাতিগুলো পর্যন্ত কুয়াশায় ভিজে ভিজে। ইঞ্জিন হল্টের ছাই-গাদায় ক'টি কাক সবে উড়ে এসেছে।

মাথায় গলায় মাফলার জড়িয়ে, র‍্যাপারে গা হাত মুড়ে এরা সারা রাত ঠায় বসে ছিল, এরা চারজন—ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের চার ছোকরা। ঠান্ডায় বসে বসে ঝিম মেরে গিয়েছিল সকলেই। ভোরের ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই জানালা দিয়ে ওদের মুখ চোখে পড়ল, কিরণশশীদের মুখ। সংগে সংগেই লাফ দিয়ে উঠল এরা। এসে গেছে, এসে গেছে। মংকি ক্যাপ, মাথায় ঢাকা মাফলার কি র‍্যাপার ঝপাঝপ মুখ থেকে সরিয়ে ফেলে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল চারজনে।

ভুবন চৌধুরী ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছে। তার মুখে চুরুট, গায়ে অলেস্টার। কিরণশশী জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে স্টেশন দেখছে। চোখে ঘুমের রেশ লেগে আছে তার, মাথার চুল একটু উস্কোখুস্কো, ঠোঁট দুটি এখনও ফিকে লাল।

ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের মানিক ভুবন চৌধুরীকে নমস্কার করে বললে, 'যাক্, এসে গেছেন। আমরা সারা রাত—!

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে ভুবন বললে, 'হ্যাঁ—দলবল নিয়ে আসা, সন্ধ্যের ট্রেন ধরতে পারলাম না।'

লবংগ ততক্ষণে নেমে এসেছে। জর্জেট শাড়ির ওপর শাল চাপিয়ে কাঁপছে আর হাসছে।

—ও ভুবনদা, এই নাকি মনোহরণপুর!

—তুমি আবার হরণ পেলে কোথায়—জায়গাটার নাম মনোহরপুর। ভুবন চৌধুরী বললে।

—তাই নাকি! লবংগ ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের ফটিকের দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে চোখ বড় করলে।

ফটিক মাথা নেড়ে আপ্যায়িত করার হাসি হাসল।

ট্রেন ছেড়ে দেবে। তাড়াতাড়ি, হুড়োহুড়ি করে জলপত্র নামাচ্ছিল আর দু' জন। মানিক ফটিক ছুটে গেল।

কিরণশশী নামল। সতীশ দত্ত আগেই নেমেছে। হেনা, রাণী, চাঁপা, পরীরাও নিচে নেমে শীতে কাঁপছে হি হি করে।

জরির চুমকি তোলা চটি-সমেত পা-টা একটু এগিয়ে ভুবনের নজর টানল সেদিকে কিরণশশী। বললে, 'পায়ে যে সাড় পাই না!

—বলেছিলুম তো মোজা পরে নাও!

—নিলেই হত। কিরণশশী বাঁ হাত দিয়ে খোঁপার হেয়ারপিনটা ঠিক করে নিতে নিতে স্টেশনের চারপাশে তাকাল। পরমুহূর্তেই ডান চোখের পাতা ক'বার কাঁপিয়ে বুজে নিল। বললে, 'ও লবংগ, দেখ্ তো—কয়লার গুঁড়ো পড়ল বুঝি চোখে!'

আঁচলের একটি কোণ সরু করে

পাকিয়ে কিরণশশীর চোখ থেকে কয়লার গ‍ুঁড়ো তুলতে তুলতে খিল খিল করে হাসল লবঙ্গ, 'পা দিতে না দিতেই মনোহরণপুর তোমার চোখ হরণ করল, কিরণদি!'

—মন তো আর হরণ করেনি! কিরণশশীও ঠোঁট উল্টিয়ে হাসি ছড়িয়ে দিল।

—ও লবঙ্গ, নবরঙ্গ চা খাবে নাকি? ওই যে টি-স্টল। সতীশ দত্ত ডাকছে।

ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিকের মানিক বললে, 'আপনাদের চা-টায়ের ব্যবস্থা করা আছে। আস্তানায় গেলেই দেখবেন সব রেডি। যদি বলেন, এখানেও এক দফা হয়ে যেতে পারে।'

—পারে যদি তবে কথায় কেন কাজে হোক, মশাই; শীতে আমি জমে গেলুম! সতীশ দত্ত সিগারেটে টান দিতে লাগল ঘন ঘন।

ফটিক ছুটল টি-স্টলে।

—আমাদের থাকবার জায়গাটা কতদূরে? প্রশ্ন করলে কিরণশশী।

—কাছেই।

—হেঁটে যেতে হবে তো!

—না, না—ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে স্টেশনের বাইরেই। কোন কষ্ট হবে না আপনাদের।

—ঘোড়ার গাড়িতে বাজনা নেই তো? লবঙ্গ আচমকা বললে। আর বলেই হেসে কুটি কুটি।

মানিক অবাক, একটু যেন কেমন অপ্রতিভ। বোকার মতন চেয়ে লবঙ্গর হাসি দেখতে লাগল।

—হাসির তুই কি পেলি—? কিরণশশীও ধমক দিলে।

—তুমি জানো না কিরণদি, সে যা হয়েছিল একবার! লালগোলা না কিষণ-গোলা কোথায় যেন একবার গিয়েছিলুম, বাপু। তাদেরও ঘোড়ার গাড়ি। আমাকে আর পুতুলকে ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে দিয়েছে। যাচ্ছি। ওমা, দেখি ভ্যাঁপোর পোঁ করে বাজনা বাজছে। কোথায়? না, মাথার ওপর ঘোড়ার গাড়ির ছাদে। আর রাস্তার যত লোক ভিড় করে আসছে। ছুটছে আমাদের পিছু পিছু। কি ব্যাপার, না—কলকাতার থিয়েটারের মেয়েদের দেখছে ওরা। লবঙ্গ কথা শেষ করে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসির দমক আটকাতে লাগল।

কিরণশশী হেসে মানিককে বললে, 'আপনারাও আমাদের বাজনা বাজিয়ে নিয়ে যাবেন না কি?'

—না, না—! মানিক মাথা নাড়ল।

বাজনা বাজিয়ে না নিয়ে গেলেও ভুবন চৌধুরীদের আদর-আপ্যায়নে, থাকা-খাওয়ায় কোন ত্রুটি রাখেনি মনোহরপুর ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ক্লাব। থাকবার জন্যে বাগান ঘেরা বাড়ি দিয়েছে। কুয়া থেকে জল তুলে দিতে, ফাই ফরমাস খাটতে চাকর দিয়েছে রেখে। মুখ ফুটে না চাইতেই চা, খাবার, পান, সিগারেট। স্নানের জন্যে গরম জল চেয়েছিল লবঙ্গ। চোখের পলকে তিন বালতি গরম জল তৈরি হয়ে গেল। খেতে বসে সরু চালের শাদা ধবধবে ভাত, টাটকা শাক-সব্জি, পুকুরের মাছ।

ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিকের সেক্রেটারী কুন্দ-ভূষণ ভুবন চৌধুরীর একটু আধটু পরিচিত। কলকাতা থেকে ওদের আনা-টানার ব্যবস্থা কুন্দই করেছে। কুন্দকে বললে ভুবন চৌধুরী পরিহাস করেই, 'এত তোয়াজ দেখে ভয় হচ্ছে, মশাই। শেষ পর্যন্ত মার ধোর দেবেন না তো?'

—আজ্ঞে না, তেমন কোন উদ্দেশ্য নেই। তবে দাদা, প্লে খারাপ হ'লে দু চারটে ইঁট কিন্তু স্টেজে পড়তে পারে! সহজভাবেই হেসে জবাব দিল কুন্দ।

কথাটা সহজ হলেও স্পষ্ট। যার অর্থ হচ্ছে, কলকাতা থেকে তোমাদের টাকা দিয়ে এনেছি। তোয়াজ করছি যথাসাধ্য। হেলা ফেলা করে পার্ট করলে চলবে না।

বলতে কি, ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক রেল ইনস্টিটিউটের দলকে টেক্কা দেবার জন্যেই এত করছে। ইনস্টিটিউটই প্রথমে কলকাতা থেকে ক'জন অভিনেতা অভিনেত্রী ভাড়া করে এনে মিলেমিশে দু রাত চুটিয়ে প্লে করেছে পুজোর সময়। অভিনয় যেমনই হোক্, ভিড় হয়েছিল খুব। সেই থেকে ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিকের রোখ চেপে আছে। ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিকের দলের সুনাম ছিল এদিক পানে। ইনস্টিটিউট কম্বাইন্ড-পারফরমেন্স করে সে সুনামের মুখে যেন দুয়ো দিয়ে দিলে। তখন থেকেই ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিকের তর্জন-গর্জন। আচ্ছা, দেখে নেব, আমরাই বা কম কিসে!

কুন্দর কলকাতায় যাওয়া-আসা আছে। তার ওপর সে হচ্ছে সেক্রেটারী। শপথ করেছিল কুন্দ, আচ্ছা আমিও দেখে নেবো। গোঁফ কামিয়ে হারাধনকে আর হেলেনের পার্টে নামাচ্ছি না। কলকাতার কিরণশশীকে আনবো। যেমন দেখতে আগুন, তেমনি প্লে।

কিরণশশী তিন দফায় দাম নেয়। এক

দফা তার রূপের জন্যে, দ্বিতীয় দফা তার অভিনয়ের জন্যে। আর তিন দফার কথাটা জানত থিয়েটার মহলের লোকেরা। কিরণ ভুবনময়। ভুবনকে বাদ দিয়ে কিরণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ভুবন চৌধুরী নামকরা অ্যাক্টর। কিরণ-ভুবনকে যদি আনতেই হয় মোটা টাকা খরচ করে তবে নাচ-গানের জন্যে লবঙ্গই বা বাদ যায় কেন! সখীর দলও থাক। লবঙ্গ আর সখীর দলের হেনা, চাঁপাকে দিয়ে স্ত্রী-ভূমিকার অন্যান্য পার্টগুলোও করিয়ে নেওয়া যাবে। এদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যোগ হল কমিক অ্যাক্টর সতীশ দত্ত।

বিস্তর পয়সা খরচ করেছে ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক কিরণশশীদের জন্যে, তোয়াজে ভিজিয়ে রেখেছে, রাখছে, রাখবেও তিন দিন—কিন্তু বাপু, স্টেজে নেমে হেলা-ফেলা করলে চলবে না। টাকা দিয়েছি—কাজ দেখাতে হবে। কুন্দভূষণের এই কথা।

—আমাদের ব্যাপারটা কি জানেন, ভুবন চৌধুরী পান চিবোতে চিবোতে বললে, 'লোকে নিয়ে যায়; যাই। নিজেদের টিম হলে কথা ছিল না। মফস্বলের সব অ্যাক্টর, সত্যি বলবো কি মশাই পার্ট ফার্ট করতে জানে না। তাদের সঙ্গে কো-অ্যাক্টিং! ও হয় না। কাজেই কোনরকমে কাজ চালিয়ে দি।'

—আমাদের ক্লাবের অ্যাক্টাররা কিন্তু অতো কাঁচা নয়, দাদা! কুন্দ চোখ পিটপিট করে বললে, 'অন্তত একজন আছে যে ভাল রকমই পাল্লা দেবে।'

—তাই নাকি? ভুবন অবজ্ঞার হাসি মিশিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলে, 'কোথায় সেই নটরাজ—দেখলাম না তো!'

—এখানে আসেনি এখনো। যথাসময়ে হাজির হবে আর কি!

সন্ধ্যের গোড়ায় মৃগাঙ্ক গ্রীনরুমে হাজির। রেল ইনস্টিটিউটের স্টেজ ভাড়া নিয়ে থিয়েটার হচ্ছে। সবই চেনা জানা মৃগাঙ্কর। সটান যথাস্থানে এসে ভাঙা চেয়ারে বসে পড়ল। তখন—সে ঘরে পুরুষরা মেক্‌আপ নিচ্ছে। চা, সিগারেট হাসি তামাসা।

—এসেছিস? মৃগাঙ্ককে দেখে কুন্দ-ভূষণ তার পিছু পিছু ছুটে এসেছে, 'কোথায় ছিলি সারাদিন?'

—হীরাপুরের বাঁধে মাছ ধরছিলাম।

—মাছ ধরছিলি, না বাড়িতে খিল বন্ধ করে বসে পার্ট মুখস্থ করছিলি?

—না, মাইরি না, কুন্দদা। বিশ্বাস করো, মাছ ধরছিলাম। অবশ্য মাছ ধরতে বসে পার্টের কথাই ভেবেছি সারাক্ষণ। মৃগাঙ্ক চারদিকে তাকিয়ে গলার স্বর খাটো করে বললো, 'কলকাতা থেকে ও'রা সবাই এসে গেছেন তো!'

—হ্যাঁ। কুন্দ তার গলার স্বর আরো খাটো করে মৃগাঙ্কর কানে মুখ নিয়ে বললে, 'ওই ভদ্রলোক ভুবন চৌধুরী। ওর কাছে তোর খুব সুনাম করেছি, মৃগে। আমার প্রেস্টিজ তোর হাতে। প্রাণ দিয়ে অ্যাক্টিং করবি, ভাই। আয়—ও'র সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দি।'

—বেশ তো, চলো। আমায় কিন্তু এক কাপ চা দিতে বলো, কুন্দদা—!

ভুবন চৌধুরীর কাছে এনে মৃগাঙ্কর সাথে আলাপ করিয়ে দিলে কুন্দ। বললে হেসে, 'আমাদের হিরো।'

ভুবন চৌধুরী স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল মৃগাঙ্ককে। চেহারাখানা নায়কের মতনই। সুঠাম অঙ্গ। রঙ ফর্সা। মুখখানি সুন্দর। ঈষৎ দীর্ঘ মুখের গড়ন, লম্বা নাক, চওড়া কপাল। উজ্জ্বল চোখ।

—বা, খাসা চেহারা! সপ্রশংস কণ্ঠে বললে ভুবন চৌধুরী।

মৃগাঙ্ক যেন লজ্জা পেল। একটু ইতস্তত করে বললো, 'চেহারায় কি হয়, গুণই বড়। আপনারা গুণী লোক।'

কথাটা কানে ভাল লাগল ভুবন চৌধুরীর। এমন বিনীত প্রশংসা, ঠিক এমন সুরেই আর কোথায় যেন শুনেছিল ভুবন চৌধুরী। কোথায় যেন, মনে করবার চেষ্টা করেই পরমুহূর্তে আবার অন্য কথায় মশগুল হয়ে গেল ও।

নাটকটা নিছক প্রেমের। বিরহ, ষড়যন্ত্র, মর্মান্তিক মৃত্যুর শোকে সিক্ত। জমাট কাহিনী। বরেন্দ্রী বিজয়ে এসেছে লক্ষণ সেন। পাল রাজার সভায় রাজনটী অহনা নামে গোপনে সেন রাজাদের গুপ্তচর বৃত্তি করছে সোমপ্রভা। এক শিল্পী অহনার রূপে মুগ্ধ। নাম তার ভাস্কর উপল। উপলের বন্ধু মেঘবর্ণ। মেঘবর্ণ পাল রাজকুলের এক মন্ত্রীপুত্র। মেঘবর্ণও ভালবাসে নটী অহনাকে। তাকে লাভ করতে চায়। কিন্তু অন্তরায় উপল। মেঘবর্ণ ষড়যন্ত্র করতে থাকে তলে তলে। হঠাৎ রাজাদেশ এল, ভাস্কর উপলকে পাল রাজ্য থেকে নির্বাসনের দণ্ড দিয়েছেন মহারাজ। অপরাধ, ভাস্কর নবনির্মিত মন্দিরগাত্রে রাজনটী অহনার প্রতিমূর্তি উৎকীর্ণ করেছে। দেব-দেবীর পরিবর্তে মানুষী মূর্তি, তাও নটীর! এ পাপ। কলুষিত হয়েছে মন্দির। নির্বাসিত করো শিল্পীকে।

রাজদণ্ড শিরোধার্য করে রাজ্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হল ভাস্কর।

নটী অহনাও প্রিয়র হাত ধরে পলাতক হ'তে চায়। পাল রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যাবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণপক্ষ রাত্রে পলাতক হল উভয়েই। মেঘবর্ণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে। শেষ পর্যন্ত সেই মন্দিরের কাছে এসে ধরা পড়ল ওরা। অসি যুদ্ধে আহত হল মেঘবর্ণ। কিন্তু মন্দির প্রবেশের মুখে মেঘবর্ণ আহত করলে উপলকে। অন্ধকার মন্দির অভ্যন্তর। গোপন সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে পালিয়ে যাবার শেষ চেষ্টা করে অহনা আর উপল। পারে না। প্রিয়ার বিষলিপ্ত অঙ্গ চুম্বন করে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে উপল। অহনাও প্রিয়তমের পথ অনুসরণ করে।

কিরণশশী পার্ট করছিল রাজনটী অহনার। মৃগাঙ্ক ভাস্কর উপলের, আর ভুবন চৌধুরী মেঘবর্ণর। লবঙ্গ অহনার সখী দেবস্মিতার।

জমাট বই। অভিনয়ের সুযোগ যথেষ্ট। কিরণশশীর নাম আছে পার্টটায়। তবু গোড়ায় গা দেয় নি কিরণশশী। ভুবন চৌধুরীও।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকেই কেমন যেন গোল বাধল। রাজনটী অহনার সঙ্গে ভাস্কর উপলের এই প্রথম প্রকাশ্য সাক্ষাৎ। নির্জন কানন। চরণে নূপুরের রিণিঝিনি বাজিয়ে চটুলা নটী পথ চলেছে। হঠাৎ গতি তার রুদ্ধ হল। সামনে অপরূপ এক তরুণ। গায়ে স্খলিত উত্তরীয়। পাষাণের মত প্রাণহীন, কিন্তু বিমুগ্ধ দুটি চোখ। সেই দুটি চোখ অপলক নয়নে দেখছে একটি পার্থিব সৌন্দর্যকে। সে সৌন্দর্য এক নারীর ক্ষৌমবাস, অঙ্গের লাবণ্য থেকে ঝরে পড়ছে। স্থির হয়ে আছে তার নয়ন রাজনটীর উদ্ধত কুচযুগে, কৃশ কটি, সঘন জঘনে।

কিরণশশী অবাক। ছেলেটা কি পার্ট ভুলে গেছে! নয়তো এতক্ষণ পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে কি দেখছে তাকে! ভাবল মনে মনে কিরণশশী, রূপ দেখে না মূর্ছা যায়!

ভাস্কর দেখছিল, সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মর মতন একটি আনন। চোখে যার ঘন অঞ্জন, সুডৌল গণ্ডে চন্দন রাগ। কটি চূর্ণ কুন্তল ললাটে।

অস্বস্তি বোধ করছিল কিরণশশী। গলার মালাটা বুকের কাছে বাঁ হাতের মুঠোয় দুমড়ে নিয়ে একটু বুঝি ভ্রূভঙ্গি করল।

'দেবী অহনা—!' অস্ফুট, সলজ্জ একটি বিস্ময় ধ্বনি শোনা গেল। এতক্ষণ পরে।

বইয়েতে আছে 'নটী'। মৃগাঙ্ক বললে 'দেবী'। আর শুধু বলা নয়, এমন সুরে বললে যেন মনে হল রূপভিক্ষু এক শিল্পী ওই একটি কথায় রূপ থেকে প্রাণে নেমে এল। প্রেমভিক্ষু হল এক নারীর। সেই আহ্বানে চমকে উঠল কিরণশশী। বুঝল—মূর্ছা নয়, মৃগাঙ্ক একটা ঘোর কাটিয়ে যেন স্তুতির অর্ঘ্য দিলে কিরণশশীকে। না, কিরণশশীকে নয়, অহনাকে। আর ও মৃগাঙ্ক নয়, অতীত ইতিহাসের এক প্রেমিক ভাস্কর।

উইংসের পাশে দাঁড়িয়েছিল ভুবন চৌধুরী। কিরণশশী স্টেজ থেকে বেরিয়ে আসতেই ভুবন ওর কাঁধে হাত দিল। নীচু গলায় বললে, 'তুমি হারলে, কিরণ!'

কিরণশশীও বুঝতে পেরেছিল। মফস্বলের এক শৌখিন ছোকরা অভিনেতার কাছে প্রথম মুখেই তার হার হয়েছে।

—গেল তো আর শেষ হয় নি! কেমন যেন তিক্ত সুর কিরণশশীর।

—আচ্ছা দেখি! ভুবন চৌধুরী হাসল।

মুখে তার মদের গন্ধ ধরা দিয়েছে এতক্ষণে।

দ্বিতীয় অংকের শেষ থেকে নাটক জমে গেল। হঠাৎ যেন তিন নটনটী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়ল। কে ভাল, কে কার চেয়ে ভাল অভিনয় করতে পারে, দেখাতে পারে। দর্শক-কুল হর্ষরোমাঞ্চিত, ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের উত্তেজনা ফেটে পড়ার মতন।

ভাস্কর উপলবেশী মৃগাঙ্ক কোথাও এতটুকু শিথিল অভিনয়ের সুযোগ দিচ্ছে না। ফলে কিরণশশীকে আর ভুবন চৌধুরীকে সদা সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কলকাতার নামকরা নটনটী তারা। বৃত্তিতে পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধে।

যতক্ষণ প্রেম ছিল, ততক্ষণ মৃগাঙ্ক মাতিয়ে রাখলো। আবেগে তার সুন্দর কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে গেছে। ফুট-লাইটের ঈষৎ নীলাভ আলোয় আশ্চর্য এক স্বপ্নময় জগতের ভাস্কর বলেই মনে হচ্ছিল তাকে, এক বিরহকাতর প্রাণ। কিরণশশীও কম যাচ্ছিল না। তার রূপ যেন একটু একটু করে প্রাণে এসে দানা বাঁধছিল—আর খুলে যাচ্ছিল প্রাণের রূপ। নটী নারীতে প্রকাশ পাচ্ছিল।

মন্দিরের দৃশ্যে অসি-যুদ্ধের সময় একটা কেমন ক্লান্তি নেমেছিল মৃগাঙ্কর। ভুবন চৌধুরী এখানে টেক্কা দিলে মৃগাঙ্ককে।

কিন্তু শেষ দৃশ্যে সবাই সুন্দর। মৃত্যু সামনে, প্রিয়াও হাতের নাগালে। আর কোন পথ নেই। জীবনের উপরই যবনিকা নেমে আসছে। তবে শেষ মুহূর্তে সেই সুখ নিয়ে যেতে দাও, তোমার স্পর্শের সুখ, তোমার অঙ্গের মধু, তোমার প্রাণের।

অহনার দুটি হাত টেনে নিলে উপল। চুম্বনের জন্যে ওষ্ঠের কাছে তুলে ধরল। চমকে উঠে হাত সরিয়ে নিতে যায় অহনা। সর্বাঙ্গে বিষলিপ্ত তার, গুপ্তচরীর বর্ম, নিষ্ঠুর হিংসা।

'সখি, যে অঙ্গের লাবণ্যে আমি সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছি, ষড় ঋতুর মনোহর ভুবন—সে অঙ্গ বিষ নয়, অমৃত।' ভাস্কর প্রিয়ার হাত দুটি টেনে নিয়ে ওষ্ঠে স্পর্শ করছে।

একটি ক্ষুধাতুর ওষ্ঠের চুম্বন। শব্দটুকুও যেন অনন্ত ক্ষুধা আর বেদনা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে কেঁপে কেঁপে উঠে মিলিয়ে গেল। এক মুহূর্তে বুঝি বিহ্বল, পরমুহূর্তে কিরণশশী মৃগাঙ্কর মুখ দু হাতে তুলে যেন গন্ধ নিল মৃত্যুর, মৃত্যুর শীতলতার। কিরণশশী নয়, কিরণশশী যেন এই মঞ্চের মায়ালোকে মরে গেছে। রাজনটী অহনা নিঃস্বতার বেদনায় স্তব্ধ, অচেতন। তারপর দু ফোঁটা চোখের জল। চাপা একটা কান্না গুমরে গুমরে উঠে শেষ ধাপে এসে হঠাৎ যেন ছাড়িয়ে পড়ল। 'প্রিয়তম, জীবনে অমৃত দিতে পারলাম না, বিষ দিলাম তোমায়। এ আমার নিয়তি।' কী করুণ, কী দুঃসহ।

ভুবন চৌধুরীও তার শেষ মুহূর্তের পৈশাচিক উল্লাস আর অন্তিম বেদনাটুকু সুন্দর করে ফুটিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কিরণশশীই যেন শেষ পর্যন্ত সকলকে ছাড়িয়ে গেল।

দর্শককুল চমৎকৃত। ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ধন্য মনে করল নিজেদের। কিরণশশী আর ভুবন চৌধুরীর ঘোড়ার গাড়িতে ফুলের সঙ্গে দামী মদের বোতল উঠিয়ে দিল।

যাবার সময় কুন্দভূষণ বললে ভুবন চৌধুরীকে, 'গ্র্যান্ড হয়েছে দাদা। ওয়ান্ডারফুল। এমন দেখি নি।'

কুন্দর পিঠ থাপড়ে ভুবন চৌধুরী হাসল, 'আপনাদের হিরো সত্যিই গুণী ছেলে। ওর হবে।'

মৃগাঙ্ক তখন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অলস

চোখে দেখছিল ঘোড়ার গাড়ির গদিতে যে বসে রয়েছে তাকে। ও আর অহনা নয়, এখন কিরণশশীই। কিরণশশীর গলায় সেই মালাটি তখনও দুলছে।

পরের দিন সকালে দেখা। কিরণশশী-দের বাড়িতে আসছিল মৃগাঙ্ক। বাগানের পথ দিয়ে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। পেয়ারা গাছের তলায় কিরণশশী আর লবঙ্গ দাঁড়িয়ে।

ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। হাসি হাসি মুখ। এমন চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওরা, যেন কথা বলার জন্যে ডাকছে মৃগাঙ্ককে।

একটু ইতস্তত করে কাছে গিয়ে দাঁড়াল মৃগাঙ্ক। বঙ্কিম চোখে কিরণশশী তাকে দেখল। আর তারপরই একটু গা এলিয়ে দিয়ে হাই তুলল।

—ধন্যি লোক মশায় আপনি, কথা বললে লবঙ্গ, 'পার্ট' করতে নেমে অন্য মানুষের গা হাতের দিকে জ্ঞান থাকে না! ইস্, কিরণদির হাতটা কি ভাবে কামড়ে দিয়েছেন—এখনো লাল টক্‌টক্ করছে।'

মৃগাঙ্ক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। অপ্রস্তুত সে।

—আ, লবঙ্গ—কী বলিস। কিরণশশী কৃত্রিম ধমক দেয়।

—আমি হাত কামড়েছি? মৃগাঙ্ক আমতা আমতা করে।

—না, না। ওই একটু—!

—একটু কি, দাও তো তোমার হাত! লবঙ্গ খপ্ করে কিরণশশীর হাত ধরে মৃগাঙ্কর চোখের ওপর বাড়িয়ে দিল, 'দেখুন তো, মশাই—!'

সত্যিই কিরণশশীর ডান হাতের উল্টো পিঠে এক জায়গায় লালচে হয়ে আছে। একটুক্ষণ তাকিয়েই মৃগাঙ্ক বুঝতে পারল। কালকের সেই শেষ দৃশ্যের চুম্বনের চিহ্ন। কিন্তু মৃগাঙ্ক তো দাঁত বসায় নি, ঠোঁট বসিয়েছিল। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে কী গভীর এবং তীব্র ভাবে মৃগাঙ্কর ওষ্ঠ শোষণ করেছিল কিরণশশীর হাত।

লজ্জায় মৃগাঙ্ক আরক্ত। মুখ নীচু করে থাকল ও।

—তুই বড় জ্বালাস, লবঙ্গ। কিরণশশী হাত সরিয়ে নিয়ে অবস্থাটা সহজ করবার চেষ্টা করলে।

—বেশ তো, জ্বালাই যখন, তখন তো তুমি জ্বলছই। আমি এবার যাই! ঠোঁট টিপে হাসে লবঙ্গ।

লবঙ্গ সত্যি সত্যিই চলে গেল।

একটু অপেক্ষা করে কিরণশশী দু পা এগিয়ে পেয়ারা গাছের ডালে গা হেলিয়ে দাঁড়াল।

—আপনার নাম তো মৃগাঙ্ক! কিরণশশী আলাপ শুরু করলে।

মাথা নাড়ল মৃগাঙ্ক।

—এখানেই থাকেন!

—হ্যাঁ।

—কি করেন?

—কিচ্ছু না। এবার মৃগাঙ্ক হাসল।

—শুধুই থিয়েটার করে বেড়ান! কিরণ-শশী একটু থেমে হেসে হেসে বললে।

—কোথায় আর, ওই মাঝে সাঝে কখনো!

পেয়ারা গাছের ক' হাত দূরে এক রাশ মরসুমী ফুল হাওয়ায় দুলছে। চকচক করছে শীতের রোদে। প্রজাপতি উড়ছে ফুলে ফুলে। সেই দিকে তাকিয়ে কিরণ-শশী যেন কি দেখল, খুঁজল, ভাববার চেষ্টা করল।

কিরণশশী হাঁটতে শুরু করলে। কালকের রাতে জরির ফিতে দিয়ে বাঁধা বিনুনীটা পিঠের ওপর খুলে রয়েছে। হাঁটার তালে তালে নড়ছে। সোনালী ডোরা কাটা সাপ যেন।

কুয়োতলার পাশেই পায়চারি করছে ভুবন চৌধুরী। কিরণশশী চোখ তুলে তাকাল। চোখাচোখি হল।

—আরে মৃগাঙ্ক যে, এসো ভাই। কন্‌গ্রাচুলেশান দিতে পারিনি কাল রাত্তিরে। কোথায় উধাও হয়ে গেলে হঠাৎ। এ্যাঁ—! ভুবন চৌধুরী হাত বাড়িয়ে মৃগাঙ্ককে কাছে টেনে নিল।

কিরণশশী দাঁড়াল না। মন্থর পায়ে এগিয়ে চলল। এমনি করেই কালকেও ও যেন মৃগাঙ্কর চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে।

সেদিন রাত্রে প্লে যেন আরও জমে উঠল। আজ কিরণশশী সেজেছে কপালকুণ্ডলা। পিঠময় এলো চুল ছড়ানো, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ফুলের বালা, পরনে ফিকে হলদে রঙের শাড়ি। কিরণশশীকে আশ্চর্য মানিয়েছে। চোখে তার টলমল করছে অরণ্যচারী হরিণীর রহস্য বিস্ময়।

পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ? মৃগাঙ্ক সত্যিই যেন পথ হারিয়েছিল। ডাক শুনে চমকে ওঠে। কে? কিরণশশী। না, কিরণ-শশী নয়, অন্য কেউ। অজানা, অচেনা। মৃগাঙ্ক নয়, নবকুমার বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকায়। ওর কাছে কি আশ্রয় আছে?

ভুবন চৌধুরী সেজেছে কাপালিক। ভয়ংকর, নিষ্ঠুর, বীভৎস। ধক্ ধক্ করে

জ্বলছে তার চোখ। লোকটা আজ আকণ্ঠ মদ খেয়েছে।

গ্রীনরুমের কাছে দু'জনে দেখা। মৃগাঙ্ক আর কিরণশশীতে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিরণশশী মুচকি হাসল।

—হাসছেন যে!

—এমনি। কপালকুণ্ডলার পোড়া কপালের কথা ভাবছি—! কিরণশশী এক দৃষ্টিতে মৃগাঙ্কর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে, গম্ভীর হল। পরমুহূর্তেই হেসে উঠে বললে, 'এমন নবকুমার জুটলে—' কথাটা শেষ না করেই কিরণশশী হঠাৎ থেমে গেল।

মৃগাঙ্ক কেমন একটু উষ্ণতা বোধ করলে। মুখ নামিয়ে নিল। একটু পরে মুখ তুলে কি একটা কথা যখন বলি বলি করছে—কিরণশশী তখন সরে গেছে।

শেষ দৃশ্যটায় মৃগাঙ্ক সকলকে মোহিত করে দিলে। শ্মশানে তারা দু'জন। অনন্ত বিচ্ছেদ ঘনিয়ে এসেছে। সব যেন বিষাদে ভারাক্রান্ত।

হাত ধরে ফেলেছে নবকুমার কপালকুণ্ডলার। কপালকুণ্ডলা, একবার বলো তুমি অবিশ্বাসিনী নও। সন্দিগ্ধ স্বামীর প্রশ্নই শুধু নয়, একটি গভীর ভালবাসা যেন শ্মশানভূমির নিস্তব্ধতায় কেঁদে উঠল।

কিরণশশী বহুবার এই কথাটি কানের কাছে শুনেছে—বহু মুখে, একবার বলো তুমি অবিশ্বাসিনী নও। কোনবারই এমনভাবে তার বুক কেঁপে ওঠেনি। আশ্চর্য, আজ কেন বুক কেঁপে যায়। কেন?

প্লে ভেঙেছে। ঘোড়ার গাড়িতে এসে উঠে বসল কিরণশশী। ভুবন চৌধুরীকে আজ অনেক আগেই পেঁছে দিয়ে আসতে হয়েছে কুন্দকে! আকণ্ঠ মদ খেয়ে লোকটা গড়াগড়ি যাচ্ছিল গ্রীনরুমের মেঝেতে।

কিরণশশীই মৃগাঙ্ককে তার গাড়িতে ডেকে নিয়েছে পেঁছে দিয়ে আসতে। লবঙ্গরা অন্য গাড়িতে।

শেষ রাতের ঠাণ্ডায় শীত ধরেছিল মৃগাঙ্কর। ঘোড়ার গাড়ির দরজা খানিকটা ফাঁক করা ছিল। কিরণশশী নিজের হাতে টেনে বন্ধ করে দিলে।

তারপর একটানা ঘোড়ার খুরের খট্ খট্। গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। ওরাও চুপ।

—চলুন আমাদের সঙ্গে কলকাতা! কিরণশশী বললে এক সময়।

—কলকাতা? মৃগাঙ্ক শব্দটা কেমনভাবে যেন পুনরাবৃত্তি করে।

—কলকাতাই আপনার জায়গা।

—সেখানে গিয়ে কি করবো!

—যা করতে জানেন, তাই করবেন। কিরণশশী সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল।

অন্ধকারে মৃগাঙ্কর মুখ দেখা গেল না। দেখা গেলে বোঝা যেত ওর মুখে বহুদিনের একটি লালিত স্বপ্ন যেন এই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

পরের দিন সারা সকাল, দুপুর মৃগাঙ্কর কেটে গেল কিরণশশীদের কাছে। ভুবন চৌধুরী বেলায় উঠে স্নানটান সেরে কুন্দভূষণের সঙ্গে মাছ ধরতে বেরিয়ে গেছে। ভুবন চৌধুরীর মাছ ধরার শখ যে হঠাৎ কেন হল—কিরণশশী ভেবে পেল না। সতীশ দত্তকে নিয়ে গেছে পাড়ার ছেলেরা। লবঙ্গ আজ হেনা, চাঁপাদের নাচ প্র্যাক্‌টিস করাচ্ছে। ও ঘরে নূপুরের ঝুম ঝুম আর মুখের বোল। মাঝে মাঝে লবঙ্গদের খিল খিল হাসি।

বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা দুটিতে। কিরণশশী আর মৃগাঙ্ক। গোলাপের কাঁটা কিরণশশীর আঙুলে ফুটেছিল। এক ফোঁটা রক্ত ঝরেছে। ক'টি রক্তগোলাপ তুলে ওর হাতে দিল মৃগাঙ্ক।

ঝিকমিক করছে রোদ গাছের পাতায়। প্রজাপতি উড়ছিল। বসছিল ফুলে ফুলে। কিরণশশী সেদিকে চেয়ে চেয়ে বললে এক সময়, 'কী সুন্দর প্রজাপতি!'

মৃগাঙ্ক প্রজাপতি ধরতে গেল। পারল না।

—ভীষণ চালাক ওরা। মুচকি হাসে কিরণশশী।

—হ্যাঁ, ধরা যায় না, উড়ে পালায়।

—কখনো কখনো ধরা পড়েও যায়, কিরণশশী ফুল-ধরা হাতটার উল্টো পিঠের একটু লাল আভা খুঁজতে খুঁজতে বলে, 'অবশ্য তেমন করে কেউ যদি ধরতে পারে!'

মৃগাঙ্কর ইচ্ছে হল, আর একবার চেষ্টা করে। পাছে বিফলমনোরথ হয়ে লজ্জায় পড়ে, তাই আর সাহস করল না।

খানিক পরে কিরণশশীই আবার কথা বললে, 'কাল আমরা এতক্ষণে ফিরে যাচ্ছি।'

—ট্রেন তো দুপুরে!

—ওই একই। সকালও যা, দুপুরেও তাই।

কিরণশশী বাগানের পথ ছেড়ে বাড়ির দিকে চলেছে।

—কেমন লাগল আমাদের মনোহরপুর? মৃগাঙ্ক হেসে প্রশ্ন করল।

—বেশ! কিরণশশী গোলাপের গন্ধ নিতে নিতে বললে, 'লবঙ্গ হলে বলত মনোহরণ-পুর।' বলে ঘাড় ফিরিয়ে হাসল। মনে পড়ল পরশু সকালে স্টেশনের কথা। লবঙ্গকে যা বলেছিল ও।

সেদিন রাতে কিরণশশী করছিল মায়ের পার্ট আর মৃগাঙ্ক হারানো ছেলের।

এই পার্টটি কিরণশশী খুব কম করেছে। ওর নিজেরই ভয় ছিল ভাল বুঝি হবে না। মৃগাঙ্কর সঙ্গে দাঁড়িয়ে পার্ট করতে সত্যিই এখন ভয় পায় কিরণশশী।

স্টেজে দেখা গেল, কেউ কম যায় না। মৃগাঙ্কও যত ভাল, কিরণশশীও ততটা।

শেষ দৃশ্যটা চমৎকার হয়েছিল। মৃগাঙ্কর সেই বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে দুহাতে জড়িয়ে 'মা' ডাক শুনে কিরণশশী যেন সত্যিই হারানো ছেলের মা হয়ে গেল। ব্যাকুল বাহুতে জড়িয়ে ধরেছে মৃগাঙ্ককে তখন। আর আনন্দে বেদনায় বিহ্বল হয়ে যেমন করে হাসি-কান্নায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল সেই স্টেজে, তার বুঝি তুলনা নেই।

সেদিনও রাত্রে ঘোড়ার গাড়িতে করে ফিরছিল ওরা দুজন। মুখোমুখি বসে। গাড়ির মধ্যে অন্ধকার। বাইরে ঘোড়ার খুরের খট্ খট্।

—তুমি-ই বলছি তোমাকে। কিরণশশী খুক্ করে একবার কেশে উঠল, 'শুনলাম তোমার বয়েস নাকি মাত্র বাইশ তেইশ।'

—কে বললে?

—কুন্দবাবু। কিরণশশী আর একবার কাশল, 'দেখলে কিন্তু তিরিশ টিরিশ মনে হয়। চমৎকার বাড়ন্ত তোমার শরীর স্বাস্থ্য।'

একটু চুপ।

—আমার বয়স কত বলতে পারো?

—না।

—তা তোমার প্রায় ডবলই হবে। সাঁইত্রিশ আটত্রিশ।

মৃগাঙ্ক অন্ধকারেই চোখ তুলে তাকাল।

—মনে হয় না এতো, না? কিরণশশী মৃগাঙ্ককে চুপ দেখে বললে।

—হ্যাঁ, সত্যিই মনে হয় না। নীচু গলায় জবাব দেয় মৃগাঙ্ক।

—মনে হবে কি করে! বয়েস আমাদের রাখতে হয়। বয়েস, গলা, রূপ—। যতদিন রাখা যায়, ততদিন।

—বয়েসে কি যায় আসে! বললে মৃগাঙ্ক।

আবার একটু চুপ। ধীরে ধীরে কিরণ-শশী মৃগাঙ্কর হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নেয়।

—ঠিক বলেছ, বয়েসে কি যায় আসে।

ঘোড়ার গাড়ির চাকায় শব্দ উঠছে। দূরে কোথায় যেন কুকুর কাঁদছে একটা। লবঙ্গদের গাড়িতে খিল খিল হাসি উঠেছে।

সব থেমে গেলে কিরণশশী সেই চুপের মধ্যে বললে, 'ওকে আমি বলেছি। রাজী হয়েছে ও। তোমায় কলকাতায় নিয়ে যাবো। যাবে তো?'

—না যাবার কি আছে?

—সে কি, কিছু নেই? মা, বাবা, বউ, ভাই বোন—!

—না; কেউ নেই আমার। মৃগাঙ্কর গলার স্বরটা একটু ভারি শোনায়।

—তবে তো ভালই। কিরণশশী বলে, 'আমরা ফিরে গিয়ে তোমার একটা ব্যবস্থা করে চিঠি লিখব।'

আবার চুপ। ঘোড়ার খুরের সেই খট্ খট্। অন্ধকার। আর শীত। দুটি হাতই শুধু উষ্ণ। আর উষ্ণমধুর কেমন এক গন্ধ। কিরণশশী মনে মনে ঘোড়ার খুরের খট্-খটের সঙ্গে জোড় বিজোড় মেলাচ্ছিল 'বয়সে কি যায় আসের'। যায়, না আসে। আসে, না যায়!

গাড়ি থামল। নামল ওরা। লবঙ্গরা বাগান দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাগান দিয়ে একটু বুঝি জড়োসড়ো হয়েই হাঁটছিল মৃগাঙ্ক।

—ওকি, এসো না! কিরণশশী ওর পাশ ঘেঁষে গিয়ে নিজের শালের অর্ধেকটা দিলে।

ক্ষীণ আপত্তি করেও মৃগাঙ্ক সেই শাল গায়ে রাখল। শেষ রাতের কৃশ চাঁদ আকাশে। ঘন কুয়াশায় চোখের গণ্ডিও সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। কেমন একটা শ্বেত-অন্ধকারের রঙ্গমঞ্চে ওরা হেঁটে চলেছে—ওরা দুজন।

কেউ ভাবেনি—আর একজনও থাকতে পারে এই মুহূর্তে। কিন্তু আর একজন

ছিল। ভুবন চৌধুরী। বাড়ির বারান্দায় অলেস্টার চাপিয়ে চুপ করে বসে ছিল।

পায়ের শব্দ পেয়ে জড়িত কণ্ঠে ভুবন চৌধুরী কি যেন বিড় বিড় করে বলে ওঠে। চকিতে কিরণশশীর শালের অংশটুকু গা থেকে ফেলে দিয়ে সরে দাঁড়ায় মৃগাঙ্ক।

—তুমি এখনো বাইরে বসে? কিরণশশী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ভুবন চৌধুরী টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ায়। নেশাটা এখন ওর মনে থিতিয়ে রয়েছে। দু' চার পা এগিয়ে কিরণশশীদের মুখোমুখি দাঁড়াল ও। জড়িত কণ্ঠে পরিহাস করে বলল, 'কিরণ, আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা।' টলে পড়তে গিয়ে টাল সামলে নিল। মৃগাঙ্ক ওকে ধরলে।

এবার হো হো করে হাসল ভুবন চৌধুরী, 'ব্রাদার, অদ্যাই শেষ রজনী।...... চমৎকার অভিনয় হয়েছে তোমাদের—গ্র্যান্ড! প্রিয়া, জায়া, জননী—তিন রাতে তিন রূপ —কিরণ তুমি অপূর্ব—ওয়ান্ডারফুল! চার্মিং!'

—কি হচ্ছে? এসো তো—! কিরণশশী ধমক দিল মাতাল ভুবন চৌধুরীকে।

ডান হাত বাড়িয়ে ওর বুক জড়িয়ে ধরল। তার দেহের ভারটা টেনে নিল নিজের দেহে। এগিয়ে চলল ঘরের দিকে।

মৃগাঙ্ক বললে, আমি যাই।

—কাল একবার এসো। কিরণশশীর মুখ দেখা গেল না।

(দুই)

মৃগাঙ্ক নিশ্চিত হতে পারে নি; ওর মনে সন্দেহ ছিল, সংশয়াকুল হয়েছিল যত দিন গেছে, দিন যাচ্ছিল—কিন্তু মাস চারেক পরে সত্যি সত্যিই আবার কিরণশশীর মুখ দেখতে পেল ও।

কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন ছিল হয়তো। কিরণশশী বললে মিষ্টি হেসে, 'নতুন বই নামাচ্ছি আমরা। তোমায় দিয়েছি রাজপুত্রের পার্ট—। প্রথম দিনেই বিখ্যাত হয়ে যাবে।'

পাশেই ছিল ভুবন চৌধুরী। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সরিয়ে রাখল কাপ। আশ্চর্য উজ্জ্বল হাসি তার মুখে। ভুবন বললে, 'এমন চান্স কেউ পায় না, ব্রাদার। অন্য থিয়েটারে ঢুকিয়ে দিলে তোমায় পাক্কা তিনটি বচ্ছর কোটালপুত্র সাজিয়ে রাখত।'

ওর কথায় ওরা হাসল। হাসি থামলে কিরণশশী বললে, 'কাল থেকে রিহার্সাল শুরু। দশ দিনের মধ্যে তৈরি করে নিতে হবে সব।—বুঝলে তো?'

ঘাড় নাড়ল মৃগাঙ্ক।

ভুবন চৌধুরী ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিল এতক্ষণ। এবার সোজা হয়ে বসে সিগারেট ধরাল।

'বইয়ের নাম, 'পিঙ্গলার প্রেম'। আমিই নাট্যকার।' একটি মুহূর্ত থামল ভুবন চৌধুরী, দেখল ওদের দুজনকে, আপন মনেই ঠোঁট বুজিয়ে হাসল একটু। বললে, 'অবাক হচ্ছো নাকি, ব্রাদার! তা তোমার আর দোষ কি, পাবলিকই ভুলে গেছে হয়তো। বছর কুড়ি আগে আমি যখন এদিকে আসি, নাট্যকার হয়েই এসেছিলাম, না-কি কিরণ। কিরণ সব জানে। খান দুয়েক বই লিখেছিলাম, ভাল চলল না; জমল না। নাট্যকার ভুবন চৌধুরী অ্যাক্টর ভুবন চৌধুরী হয়ে গেল। তাতেই যা নাম-যশ।' ভুবন চৌধুরী আবার থেমে, একটু চুপ করে হাসল, 'কী কান্ড! চেয়েছি নাট্যকার হতে, হলাম অ্যাক্টর!'

—এখন আবার নাট্যকার হবার শখ হয়েছে! বললে কিরণশশী ভঙ্গী করে, পানের কৌটো থেকে আতর দেওয়া পান নিতে নিতে। কৌটোটা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল ভুবনের দিকে।

একসঙ্গে দু-তিন খিলি পান মুখে ফেলে ভুবন চৌধুরী ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলে আবার।

—নাটকের একেবারে শেষটুকু এখনো আমার লেখা হয়নি—

—অথচ চার মাস ধরে নাট্যকার মশাই নাটক লিখছেন, সেই তোমাদের মনোহরপুর থেকে ফিরে আসার পরই। কিরণশশী ঠাট্টা করলে, 'আরও ক' মাস লাগত কে জানে! আমিই জোর করে রিহার্সালে নামিয়ে দিলাম। তাও যদি শেষ হয়!'

—শেষের একটাই তো দৃশ্য! আমার মনে ছকা আছে। আর একটু ভেবে লিখে ফেলবো। ভুবন চৌধুরী আবার সিগারেট ধরায়।

মৃগাঙ্ক ভুবন চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

'গল্পটা—' ভুবন চৌধুরী বলতে শুরু করে, 'গল্পটা শোনো। কিরণ, তুমিও।'

কিরণশশী কখনো-সখনো এই নাটকের দু-চারটে পাতা দেখেছে পাণ্ডুলিপির, কিন্তু গল্পটা শোনেনি। ভুবন চৌধুরী-ই বলেনি। তন্ময় হয়ে ছিল ও নিজের নাটকে। সিন্ধুর অতল তলে ডুবুরীর মতন।

'কোপলী নামে এক রাজ্য ছিল আদিকালে। সে রাজ্যের যিনি রাজা, বুড়ো বয়সে অপুত্রক অবস্থায় ভীষণ দুঃখকষ্ট মনে নিয়ে মারা যান—'। ভুবন চৌধুরী গল্প শুরু করলে, 'রাজার ছেলে ছিল না, কিন্তু একটি মেয়ে ছিল। নাম তার পিঙ্গলা। অপূর্ব সুন্দরী সে। বিলাস ব্যসনে, ছলাকলায় তার মতন পটু আর কেউ ছিল না। ওদিকে আবার পুরুষের মতন মৃগয়ায় যেত পিঙ্গলা। তার কোমল দেহ বর্ম আবৃত করে অশ্বারোহণে ঘন অরণ্যে ঘুরে বেড়াত। পিঙ্গলা বিবাহ করেনি। রাজা অনেক চেষ্টা করেছেন, অনুনয় করেছেন, রাজপুরুষরা পরামর্শ দিয়েছে, তবু পিঙ্গলা বিবাহে সম্মত হয়নি। ধীরে ধীরে একটা কথা ছড়িয়ে গিয়েছিল গোপনে গোপনে—পিঙ্গলা শুধু পশু মৃগয়াই করে না—তার অব্যর্থ শরে বহু সুপুরুষেরও অন্তর বিদ্ধ হয়েছে। তারা যে কারা, কেউ জানত না। অপুত্রক রাজা কন্যার এই অধর্ম ও স্বেচ্ছাচারিতা নীরবে সহ্য করতে করতে শেষে একদিন মারা গেলেন।' ভুবন চৌধুরী থামল।

কিরণশশী আর মৃগাঙ্ক কুতুহলী চোখে তাকিয়ে ভুবন চৌধুরীর মুখের দিকে।

আবার একটা সিগারেট ধরাল ভুবন চৌধুরী। চোখ বুজে একটুক্ষণ ভেবে নিল কি যেন। তারপর আরম্ভ করলে, 'এই গেল ফার্স্ট অ্যাক্ট। সেকেন্ড অ্যাক্টের শুরু—কোপলী রাজ্যের অধিশ্বরী এখন পিঙ্গলাই। একদিন মৃগয়ায় গিয়ে, অরণ্যের এক নদী-তীর থেকে অচেতন, মৃতপ্রায় এক যুবককে প্রাসাদে নিয়ে এল পিঙ্গলা। অমন রূপবান পুরুষ খুব কমই চোখে পড়ে। রাজবৈদ্য এলেন। সযত্নে পরীক্ষা করলেন যুবককে। ঔষধাদি দিলেন। বললেন, এই তরুণ কোন বিষাক্ত সাপের দংশনে বিষক্রিয়ায় মৃতপ্রায় হয়েছিল। ওর আত্মীয়স্বজন সম্ভবত তাকে মৃতজ্ঞানে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় যুবক আশ্চর্যভাবে পুনরায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে। অতি সুলক্ষণ পুরুষ।...... যুবকটি প্রাণ ফিরে পেল, কিন্তু অতীত কথা তার কিছুই মনে পড়ল না। কুল, শীল, বংশ নাম, দেশ—কোন কিছুই তার স্মৃতি-পথে ধরা দিল না। রাজ জ্যোতিষী এলেন। গণনা করলেন প্রচুর। অবশেষে বললেন, ইনি অবশ্যই অতি সুলক্ষণ পুরুষ, সদ্‌বংশজাত, সম্ভবত কোন রাজপুত্র।...রাজ-জ্যোতিষী তার বেশি কিছু বলতে পারলেন না।... পিঙ্গলা তার নতুন করে নামকরণ করলে, মৃত্যুঞ্জয়। আর নামকরণ করেই ও ক্ষান্ত হল না। ক্রমশই মৃত্যুঞ্জয়কে আকৃষ্ট করতে লাগল নিজের প্রতি। নিজেও আকৃষ্ট হল তার প্রতি।' ভুবন চৌধুরী আবার চুপ করলে।

—দ্বিতীয় অঙ্ক বুঝি এখানেই শেষ? মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করলে।

—হ্যাঁ, এখানেই। এরপর আর একটা অঙ্ক মাত্র আছে। তাতে তিনটি দৃশ্য। তার মধ্যে দুটি দৃশ্য লেখা হয়ে গেছে আমার। ভুবন চৌধুরী উঠে পড়ল। বললে, 'একটু বসো, আমি আসছি।'

ভুবন চৌধুরী চলে যেতে ওরা দুজন পরস্পরের দিকে তাকাল। মৃগাঙ্ক একটু পরে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

—তুমি হয়তো ভাবছিলে, তোমার কথা আমি ভুলেই গেছি, না? কিরণশশী নীচু গলায় প্রথমে বললে।

—তাই মনে হচ্ছিল। মৃগাঙ্ক কিরণশশীর হাতের দিকে চাইল। সেই লাল দাগটা কি বেশি দিন থাকা সম্ভব, ও ভাবল।

—তা বইকি! ভুলে যাওয়া অত সহজ! কিরণশশীর গলায় অভিমান।

মৃগাঙ্ক অভিমানটুকু বুঝতে পারলে। হাসল মধুর করে। বললে, 'আমি যা-ই ভাবি, আপনি তো আর সত্যি ভুলে যাননি।'

কিরণশশী উঠল। স্টেজে এইটেই তার সাজগোজ করবার, কাপড় ছাড়বার নিজস্ব ঘর। ওদিকের আয়নায় গিয়ে দাঁড়াল একটু। নিজের মুখ নিজেই দেখল। হাত দিয়ে কপালের চুলগুলো সরাল। গলার হারটা আঙুল দিয়ে নাড়া চাড়া করলে। তারপর ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে গলা বাড়ালো।

ফিরে এসে মৃগাঙ্কর মাথার কাছে বুক ছুঁইয়ে দাঁড়াল। কি একটা খড়কুটো বুঝি পড়েছিল মৃগাঙ্কর চুলে—সেটা ফেলে দিল।

—কোথায় এসে উঠেছ?

—কুন্দদার এক বন্ধুর মেসে।

—মেস—! অনেক লোক তো? ডাল-চচ্চড়ি খাওয়াচ্ছে?

—হ্যাঁ। মৃগাঙ্ক হাসল।

—ও মেস তুমি কালই ছেড়ে দিয়ে টাউন হোটেলে উঠবে! বুঝলে? একটা ঘর নেবে নিজের। আচ্ছা, আমি-ই বলে দেব মাধববাবুকে। টাউন হোটেলের ম্যানেজার উনি।

কিরণশশী আলগো হাতে মৃগাঙ্কর মাথার চুলে ইলিবিলি কেটে দিল।

—ভালভাবে না থাকলে শরীর রাখা যায় না। মেসের ছাই ভস্ম খেলে ও রূপ কি থাকবে নাকি তোমার? তখন—?

—আমার টাকা কই অতো?

—টা-কা! কিরণশশী আশ্চর্য চোখে তাকাল মৃগাঙ্কর দিকে। সেই চোখ ক্রমেই নরম, কোমল, কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন, বিষণ্ণ হয়ে এল। অস্পষ্ট—মৃদু অতি মৃদু সুরে বললে, 'তোমার টা-কা—'।

কিরণশশী আর কিছু বললে না মুখে। কিন্তু তার না-বলা মুখই যেন বাকি কথাটুকু বুঝিয়ে দিল : আমি কেন আছি তবে!

ভুবন চৌধুরী কোথায় যেন ছিল—এই সময় ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গন্ধ উঠল বাতাসে। কিরণশশী একটু সরে গেল।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই ভুবন চৌধুরী ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'থার্ড' অ্যাক্টের শুরুতেই আমি দেখাচ্ছি এক ভিলেনকে। এই ভিলেন হচ্ছে পিঙ্গলার রাজ-পরিষদের মন্ত্রী। লোকটা বিচক্ষণ, চতুর, কঠিন হৃদয়, নিষ্ঠুর। তার দুর্বলতা শুধু এক জায়গায়। আর তা হচ্ছে, পিঙ্গলার ওপর। পিঙ্গলার নিষ্কণ্টক জীবনের অনেকখানি কৃতিত্ব তার প্রাপ্য। এক সময়ে পিঙ্গলাও বুঝি তাকে ভালবাসত। কিন্তু...। কিন্তুটা বুঝতেই পারছো। মৃত্যুঞ্জয় আসার পর সে কিন্তু আরও দূরে সরে গেল। এদিকে পিঙ্গলা দিনে দিনে হৃদয় জয় করে নিল মৃত্যুঞ্জয়ের। শেষ পর্যন্ত পিঙ্গলা তার মনোভাব প্রকাশ করলে প্রকাশ্যেই—মৃত্যুঞ্জয়কে সে বিবাহ করবে। প্রথমেই বাধা দিল সেই মন্ত্রী। বললে, অজ্ঞাত কুলশীল পরিচয়হীন এক তরুণ, বয়সের পার্থক্য প্রচুর—এ বিবাহ হয় না। প্রজারা অসন্তুষ্ট হবে, বিদ্রোহ করবে। পিঙ্গলা হাসে। কোন বিপদের আশঙ্কাই তাকে সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। মৃত্যুঞ্জয় অপ্রাজ্ঞ—নিরীহ তরুণ। সে ভাবল, অন্তর্বিপ্লবে প্রয়োজন কি—ও পালিয়ে যাবে। পিঙ্গলা বুঝতে পারল। ওর চাতুরী বাড়ল আরও, আরও ছলা-কলা। সুরা, সঙ্গীত, বিলাস, ব্যসন মৃত্যুঞ্জয়কে লোভের নাগপাশ দিয়ে বেঁধে রাখল পিঙ্গলা। মৃত্যুঞ্জয় ভেসে যাচ্ছিল তার স্রোতে। মাঝে মাঝে তার ভয় হয়, কি যেন একটা আশঙ্কা জাগে, কিন্তু পরক্ষণেই পিঙ্গলার বরতনুর আশ্রয়ে সব ভুলে যায় ও। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়ে গেল বিবাহের দিন।' ভুবন চৌধুরী থামল একটু। তারপর হেসে বললে, 'বিবাহের দিনটাই নাটকের শেষ দৃশ্য। ওটাই লেখা হয় নি—মনে মনে ছকা আছে। লিখে ফেলবো শিগগির।'

—বিয়ে কি হবে না? কিরণশশী থমথমে গলায় শুধালো।

—কেন, বিয়ে না হলে কি তুমি পিঙ্গলার পার্ট করতে রাজী নও? ভুবন চৌধুরী অদ্ভুত একটা অট্টহাসি হাসল। যার শব্দ সেই ঘরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাতাসে বাতাসে কাঁপতে থাকল।

দশ দিনের রিহার্সাল—কিন্তু বাহাদুর বলতে হবে ভুবন চৌধুরীকে। আশ্চর্য কৃতিত্বে দশদিনেই শিখিয়ে পড়িয়ে নাটকটা ঝলমলিয়ে তুলল ও। কিরণশশী পিঙ্গলা। পিঙ্গলাই বটে। রূপে, রহস্যে, ছলনায়, নিষ্ঠুরতায়, প্রেমে কিরণশশী যেন পিঙ্গলাকে অতীতের কোন অন্ধকার থেকে তুলে এনে মঞ্চের পাদপ্রদীপে জীবন্ত করে তুলল। তেমনি মৃগাঙ্ক। অজ্ঞাত কুলশীল তরুণ, জীবনদাত্রীর প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, পিঙ্গলার প্রেম তাকে বসন্তের আশ্চর্য শিহরণ দিয়ে গেছে, উন্মনা সে। অথচ নিষ্ঠুর অতীতের সামান্য কটি অভিজ্ঞানের অভাবে এ সুখ তার করতলগত হয়েও হয় না। অন্তর্বিপ্লবকে ভয় পায় মৃত্যুঞ্জয়। সে বিপ্লব যদি জাগে, তবে? মৃত্যুঞ্জয় চায় না—তবু পিঙ্গলার উষ্ণ প্রলোভনের মায়ায়, সুরায়, নারীতে, আত্ম-বিস্মৃত হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে বন্দী, পরমুহূর্তে পিঙ্গলার বাহুলতায় সত্যই সে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে থাকে।

আজই প্রথম রজনীর অভিনয়। গ্রীন রুমের চঞ্চলতায়, কলরবে, আলোয়, মৃগাঙ্কর কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। ও কি পারবে আজ। কলকাতার স্টেজ। অসংখ্য দর্শক। এখানে মঞ্চ ঘুরে যাবে, কত রঙের আলো রামধনুর মতন নেমে আসবে—একটা ঐক্যতান গুঞ্জন করে উঠবে। ও কি পারবে? গলা দিয়ে স্বর বেরুবে কি কিরণশশীর সেই পিঙ্গলার রূপমূর্তির দিকে তাকিয়ে।

কিরণশশীও সেজেছে আজ। প্রতি নতুন দৃশ্যে তার নব নব বেশ। কখনো স্তোক-নম্রা, কখনো মৃগয়া বিহারিণী, কখনো লাস্যময়ী, ছলনাময়ী নারী; আবার কখনো মমতাময়ী নারী, প্রেমিকা, সুচতুরা রাজকন্যা।

যবনিকা উঠল। আবার নামলো।...

একটি অঙ্ক শেষ হলো।

ভালই হয়েছে। কথাটা অভিনয় করতে করতেই বোঝা গিয়েছিল দর্শকদের উচ্ছ্বাসের করতালি থেকে।

দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা উঠল। মৃগাঙ্ক। ভয় করছিল মৃগাঙ্কর। মনে হল, ওর হৃৎপিণ্ড বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু না, হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হল না। বরং কিসের একটি যাদুস্পর্শে যেন সত্যিই মৃত্যুঞ্জয় জেগে উঠল। চোখ মেলে দেখল, পিঙ্গলা। পিঙ্গলা, পিঙ্গলা, পিঙ্গলা।

দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা নেমে এল।

—মার্ভেলাস! ভুবন চৌধুরী ওর গলা জড়িয়ে ধরল। মুখে তার মদের গন্ধ, 'ফার্স্ট নাইটেই তুমি ফেমাস হয়ে গেলে, ব্রাদার। কিন্তু, শোনো, ওই শেষ দৃশ্যটা আমি বদলেছি। তোমার কথাবার্তা একেবারে শেষে তো কিছু ছিল না—কাজেই কিছু যাবে আসবে না। শুধু পোজটা বদলে যাবে তোমার। এই নাও—এই ক'টা কাগজ—শেষটুকু নতুন করে লিখেছি—দেখে নাও একলা দাঁড়িয়ে। যাই, কিরণকে আবার দেখিয়ে দি। ওর পার্টটাই বদলেছে—নিউ ডায়লগ।'

ভুবন চৌধুরী ছুটল কিরণশশীর সাজ-ঘরে।

মৃগাঙ্ক অবাক। লোকটা মাতাল ছিল—এবার পাগলা হয়ে গেল নাকি! শেষ মুহূর্তে শেষ দৃশ্য বদলাচ্ছে!

চমকে উঠেছে কিরণশশী ভুবন চৌধুরীর দৃশ্য-পাল্টানো কাগজের টুকরো কটা হাতে নিয়ে। প্রথমটায় ও কথাই বলতে পারল না। তারপর বললে, 'তুমি কি পাগল হলে নাকি?'

—পাগল হবো কেন! এই ঠিক। এই ঠিক নাটক। এমন ট্র্যাজিডি আর হয় না কিরণ। দিস্ ইজ্ নেমিসিস—নিষ্ঠুর নিয়তি!

'না, না, এ আমি পারবো না।' কিরণ কাগজ কটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ভুবন চৌধুরী হাসিমুখেই কাগজ ক'টা কুড়িয়ে নিয়ে কিরণের হাত ধরে।

—আমি নাট্যকার কিরণ। এই বই আমার জীবনের একটি কীর্তি। ভাল মন্দর আমি কি কিছু বুঝিনে?

—তা বলে এমন নিষ্ঠুর হবে তোমার নাটক, এমন অসম্ভব?

—কোনটা অসম্ভব কিরণ কি অসম্ভব? তুমি যদি ইংরিজী জানতে, শেক্সপীয়ারের একটা কথা শুনিয়ে দিতাম। সে কথা যাক। আমার পিঙ্গলার দুঃখটা তুমি বুঝছো না কেন?

—কিসের দুঃখ—! বিরক্ত হল কিরণশশী।

—দুঃখ নয়, বোকা!—তুমি অসম্ভব বোকা, কিরণ! ভেবে দেখো—পিঙ্গলা জীবনে বহু বঞ্চনার মৃগয়া করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়কে ভালবাসল। শত বাধা সত্ত্বেও সে ওর গলায় মালা দুলিয়ে বরণ করতে যাচ্ছে। ঠিক যে মুহূর্তে ধর্ম সাক্ষী করে গলায় বরমাল্য দিতে যাবে মৃত্যুঞ্জয়ের—ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বজ্র কঠিন আদেশ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সেই মন্ত্রী—এককালে যে তার সহচর ছিল। অনেক পরিশ্রমে গোপন অনুসন্ধানের পর সেই মন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচয় সূত্র জেনে এসেছে। সামনের ওই বরবেশী সূর্যকান্তি তরুণ পিঙ্গলার সন্তান। বহুকাল আগে বিলাসিনী পিঙ্গলা হৃদয়-মৃগয়ায় গিয়ে ওকে লাভ করেছিল—কিন্তু গ্রহণ করে নি—ফেলে দিয়ে এসেছিল।' ভুবন চৌধুরী পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বের করে খানিকটা মদ গলায় ঢেলে দিল।

কিরণশশী যেন পাথর। ভুবন চৌধুরী ওর চুল, চোখ, গালে নিবিড় সোহাগে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

—তুমি পিশাচ! কিরণশশী দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

—আমি নাট্যকার। ভুবন করুণ মুখে হাসল, 'কিন্তু তাতে কি—এই বইয়ে তুমি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এমন সুযোগ আর পাবে না কখনো!'

—সুযোগ?

—সুযোগ নয়। তোমার শেষ অভিনয়—সত্যকার অভিনয়।

—অভিনয়? কিরণশশী পুনরাবৃত্তি করে কথাটার।

—হ্যাঁ, অভিনয়। পারবে না ফুটোতে একটি নারীর সেই তিনটি রূপ—তার ভালবাসার সেই আশ্চর্য রহস্য। হলেই বা মৃত্যুঞ্জয় পিঙ্গলার পুত্র। কিন্তু নারী প্রেমের তিনটি-ই যে একরূপ—শুধু সাজ বদলে যায়—প্রিয়া হয় জায়া, জায়া হয় জননী। শেষ দৃশ্যে তোমার নির্বাক অভিনয়—শুধু এই তিন প্রেমের বেদনাকে একটি বেদনায়—

ম্যানেজার ঘরে মুখ বাড়াল এই সময়। তৃতীয় অঙ্ক শুরু হয়ে গেছে। ও চলে যেতে ভুবন পকেট থেকে বোতলটা বের করে কিরণশশীর হাতে দিল।

—অভিনয়, অভিনয়; তার জন্যে এতো। ওঠো। যদি শেষ দৃশ্য খারাপ হয় আমি কথা দিচ্ছি তোমায়, কাল বদলে দেব। যা ছিল আগে—তাই থাকবে।

কিরণশশীর স্নায়ু শিথিল হয়ে এসেছিল—একটু উত্তেজিত করে নিল।

সময়টা এসে গেছে। উইংসের পাশে কিরণশশী পিঙ্গলার বেশে অপেক্ষা করছে বরমাল্য হাতে—তার পাশে মন্ত্রীর বেশে ভুবন চৌধুরী।

কিরণশশী যেন কাঁপছিল। নিশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে। বুকটা ধ্বক ধ্বক করছে।

—অতো ভয় কেন তোমার—এত বছর ধরে অভিনয় করছো! ভুবন বললে চাপা গলায়।

—আমি পারবো না। সত্যিই পারবো না।

—পারবে, পারবে। না পারার কি আছে?

—কি করে তাকাবো আমি অমন কথা শোনার পর।

—যেমন করে তাকাতে হয়—তুমি-ই জানো।

আর দু মিনিট। স্টেজের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়—বরবেশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজপুরোহিত স্বস্তিবচন করছেন।

—আমি পারবো না গো, আমার বুক কাঁপছে।

—কাঁপুক; ভয়ে নয়—আনন্দে কাঁপছে তোমার বুক। ভুবন চৌধুরীর গলার সুরটা কেমন যেন বদলে যায়, হয়ত একটা হিংস্রতা আছে কিন্তু নরম সুরে ঢাকা—শাণিত ভঙ্গি আছে কিন্তু শোভনতা দিয়ে মোড়া। স্পষ্ট, মৃদু সুরে কিরণশশীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ও বললে, 'আমি জানি—আজ তোমার অভিনয় জীবনের সমস্ত অভিনয়কে ছাপিয়ে যাবে নয়নতারা। হ্যাঁ—ভাবো না সেই কথা, মনে কর না ঠিক এই সময়েই—সে দিনের কথা—যখন তোমার নাম ছিল নয়নতারা। ভদ্র কিন্তু মূর্খ দরিদ্র স্বামী ফেলে—কোলের এক বছরের ছেলেটিকে কোল থেকে সরিয়ে ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে পালিয়ে এলে। এতকাল পরে সেই ছেলেকেই না হয় ফিরে পেয়েছ...। ফিরে পেলে। তোমারই ছেলে ও। অই মৃগাঙ্ক, কিন্তু—তুমি জানো, তোমার মন, তোমার চোখ—মৃগাঙ্ককে—কথাটা আর শেষ করলে না ভুবন চৌধুরী। পিঙ্গলার মঞ্চপ্রবেশ-মুহূর্ত অপেক্ষা করছে।

—যাও—ভুবন আস্তে ওকে ঠেলে দিল।

কিছু বোঝবার, ভাববার, জানবার আগেই কিরণশশী দেখে ও শতচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে, উজ্জ্বল আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। সামনে মৃগাঙ্ক। মৃগাঙ্ক না মৃত্যুঞ্জয়।

ভুবন চৌধুরী উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্টেজের দিকে। কথা বলেছে নয়নতারা। না, কিরণশশী। না, না, কিরণশশীও নয়, পিঙ্গলা।

দু চোখ ভরে জল আসছিল ভুবন চৌধুরীর। সুন্দর নাটক লেখায় এত বেদনা আছে আজ জানল ও।

তখন বুঝি মাঝ রাত। মৃগাঙ্ক থাকতে

পারে নি। চলে এসেছে কিরণশশীর বাড়ি। ছটফট করছিল ওর মন। অতুলনীয় অভিনয় করেছিল কিরণশশী। কিন্তু তারপর, আশ্চর্য, কি যে হল তার, স্টেজের বাইরে এসে কারুর সঙ্গে কথা বললে না, কোথাও দাঁড়াল না, মৃগাঙ্ক সামনে গিয়েছিল তার দিকে ফিরেও তাকাল না—চলে গেল। ওরা বলছিল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ।

মৃগাঙ্ক ভুবন চৌধুরীকেও আর খুঁজে পায়নি। অনেক—অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল মৃগাঙ্ক। একাই বসেছিল গ্রীন রুমে। অসুস্থ—হঠাৎ কী এমন অসুস্থ হল কিরণশশী।

ছটফট করেছে মৃগাঙ্ক পুরো দু'ঘণ্টা। তারপর সটান কিরণশশীর বাড়ি।

কিরণশশীর বাড়িতে আসতে ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা। অন্ধকার বারান্দায়—বেতের চেয়ারে বসেছিল ভুবন।

—মৃগাঙ্ক! ভুবন চৌধুরী চমকে উঠল।

—উনি কোথায়, কি হয়েছে?

ভুবন চৌধুরী ভাবল একটুক্ষণ। তারপর বললে—'এসো'।

ভেজানো দরজা খুলে সুইচ টিপতেই আলোয় ভরে গেল ঘর। মৃগাঙ্ক ঘরের মধ্যে পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল। বিছানায় পড়ে আছে কিরণশশী— বেঁকিয়ে, এলিয়ে, অবশ অঙ্গ ছড়িয়ে-ছড়িয়ে। গায়ের ব্লাউজ খোলা, শাড়িটা সবই প্রায় তালগোল পাকিয়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে—পাশ বালিশ আর মাথার বালিশ এদিক ওদিক ছড়ানো—মদের বোতল আর কাচের পাত্র, ভাঙা প্লেট মেঝেয়। পিঙ্গলার সেই মালাখানি কার্পেটের ওপর পড়ে। মদের গন্ধ ভর ভর করছিল ঘরে।

ভুবন শাড়িটা দিয়ে কিরণশশীর গা ঢেকে দিল। ডাকল, 'কিরণ, দেখো কে এসেছে!'

কথাটা যেন কানেই যায় নি কিরণশশীর। দুবার ডাকার পর কোন রকমে মাথাটা উঁচু করে ও চাইল। চোখের পাতা আধবোজা। কি দেখল সে কে জানে। যেন মনোহরপুরের প্রথম রাত্রির অভিনয়ে রাজনটীর পার্ট করছে। মৃত্যুর সেই দৃশ্য। বিড় বিড় করে জড়ানো গলায় বললে, 'জীবনে অমৃত দিতে পারলাম না, বিষ দিলাম তোমায়। প্রিয়তম—এ আমার নিয়তি।' একটা হিক্কা উঠল। চোখ মুখ কুঞ্চিত করল কিরণশশী। তারপরই খিল খিল করে হেসে বালিশে লুটিয়ে পড়ল।

ভুবন কেমন অস্বস্তি বোধ করছে। মৃগাঙ্ক পাথর। একটু অপেক্ষা করে কিরণের গায়ে ঠেলা দিল ভুবন। ডাকলে, 'কিরণ—মৃগাঙ্ক এসেছে, মৃগাঙ্ক!'

বালিশে লুটোপুটি খেয়ে মাথাটা এবার আর একটু উঁচু করল কিরণশশী। চোখ চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলে। হঠাৎ কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, 'আমি অবিশ্বাসিনী নই—নবকুমার! আমি!' কান্নাটা হাসিতে জড়িয়ে গেল। মুখের মধ্যে হাত চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে আবার লুটিয়ে পড়ল কিরণশশী বিছানায়।

ভুবন ওর কপালে একটু জল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিল। মাথাটা কোলে তুলে বলল, 'কিরণ, কি হচ্ছে তোমার—মৃগাঙ্ক তোমায় দেখতে এসেছে!'

এবার কিরণশশী দু হাতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসল। চোখ তুলে তাকাল। মৃগাঙ্ককে দেখতে পেল কি না—কে জানে। ভাঙা গলায় বললে, 'খোকা, তুই ফিরে এসেছিস। খোকা—!'

কথা শেষ হবার আগেই সর্বাঙ্গ পাকিয়ে বমির ওয়াক তুলল কিরণশশী। খানিকটা বমি ছিটকে এসে পড়ল মৃগাঙ্কর পায়।

গা ঘিন ঘিন করছিল মৃগাঙ্কর। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক চাপা দিলে।

এই কুৎসিত পরিবেশ, ঘৃণ্য, নগ্ন আবহাওয়ায়—মৃগাঙ্করও বমি বমি লাগছিল। বীভৎস মনে হচ্ছিল কিরণশশীকে।

বাইরে বেরিয়ে এল মৃগাঙ্ক। রি রি করছে সারা গা, ঘিন ঘিন করছে। বমি আসছে তার নিজেরই।

নাক মুখ ঘৃণায় সিঁটকে থু করে খানিকটা থুতু ফেলল মৃগাঙ্ক। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'বেশ্যা!'

অন্ধকার বারান্দা দিয়ে নীচে নামতে লাগল মৃগাঙ্ক দ্রুত পায়ে।

করবীদি

গৌরকিশোর ঘোষ

লখনউতে নেমে শুনলাম কলকাতার গাড়ি তখনও আসেনি। খবর নিয়ে জানলাম, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেটা এসে পড়বে। বাংলার ডেলিগেটরা সব সেই গাড়িতেই আসছেন।

আমিনাবাদে ক্যাম্প, যেতে আসতে সময় যাবে; কাজেই আমি ঠিক করলাম, কলকাতার গাড়ি না আসা পর্যন্ত স্টেশনেই থাকব। আমি বিহারে থাকি, কাজেই বিহারের ডেলিগেট। একজন কমরেডকে বললাম, কমরেড, আমার জিনিসপত্র তোমার জিম্মায় রাখলাম। তোমরা ক্যাম্পে যাও। বাংলার কমরেডরা এলে আমি তাদের সঙ্গে যাব।

ফেব্রুয়ারী মাস। বেশ শীত। লখনউতে আমাদের পার্টির অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্স। ডিসেম্বরে হবার কথা, পেছিয়ে গেল দু' মাস।

গাড়ি আসবার সময় যত এগিয়ে আসে, আমার উত্তেজনা তত বাড়ে।

দিন্দা আর করবীদি আমাকে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হবে। দিন্দার বিস্ময় বোঝা যাবে না, তার মুখে কোনও ভাবাবেগের রেখাই বড় একটা ফুটতে চায় না। কিন্তু করবীদির? করবীদির কথা আলাদা। সমস্ত মুখে-চোখে তার খুশি উপছে পড়বে। এ আমি দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট।

গাড়ি এল। আরে বাবা! বাংলার ডেলিগেট এসেছেও প্রচুর। তিনটে কামরা বোঝাই। ফেস্টুনে, পতাকায় কামরাগুলো মুড়ে দিয়েছে। আর কি উৎসাহ তাঁদের। ঘন ঘন স্লোগান দিয়ে স্টেশন কাঁপিয়ে ছাড়ছে।

কামরা খালি করে সব প্ল্যাটফরমে নামল। জিনিসপত্র সামাল দিতে ব্যস্ত হল। বুক ঢিপ ঢিপ উত্তেজনা নিয়ে এগিয়ে চললাম পরিচিতের ভিড় ঠেলে।

ঐ যে দিন্দা। হঠাৎ নজরে পড়ল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দিন্দার হাত ধরে ঝাঁকানি দিলাম।

এই যে দিন্দা আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি, করবীদি কই?

আমাকে দেখে দিন্দা খুশি হয়েছিলেন। আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে বললেন, আসেনি।

করবীদি আসেনি? আমি অবাক হলাম। তবে কি করবীদি অসুস্থ?

দিন্দা বললেন, না।

করবীদি অসুস্থ নয়, অথচ কনফারেন্সে এল না, ব্যাপার কি?

মনে পড়ল সেদিনের কথা। দিন্দা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতা থেকে যেদিন করবীদির সঙ্গে ফিরলেন। জয়নগরের কনফারেন্সে যে চোট দিন্দা খেয়েছিলেন, তখন তার ঘা শুকিয়েছে কেবল, কিন্তু দুর্বলতা যায়নি। ছবিটা এখনও ভাসছে আমার চোখে। করবীদির উপর ভর দিয়ে দিন্দা নামলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরলাম।

ঘোড়ার গাড়ি করে তিনজনে যখন ফিরছিলাম, তখন ফিসফিস করে করবীদিই খবরটা দিলে। বলল, আমি দিন্দাকে বিয়ে করছি। লখনউতে অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্স. দিন্দার ইচ্ছে বিয়েটা তখনই হয়। সেদিন খুবই চমক লেগেছিল। তবু জয়নগরের ঘটনার পর তা সম্ভব বলেই মেনে নিয়েছিলাম। খুশিও হয়েছিলাম।

তবে এবার দিন্দা আমাকে যে চমক দিলেন, তার আর তুলনা হয় না।

টাঙ্গা করে দুজনে ডেলিগেট ক্যাম্পে রওনা দিলাম। যেতে যেতে দিন্দা বললেন, করবী পলিটিক্স ছেড়ে দিয়েছে।

সে কি! চমকে উঠলাম, কেন?

দিন্দা বললেন, বিয়ে করে ঘর-সংসার করছে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, ভুল বুঝেছিলাম করবীকে। কমরেড, ওকে চিনতে ভুল হয়েছিল আমার।

খপ্ খপ্ টাঙ্গার ঘোড়া ছুটেছে। ঝাঁকুনি লাগছে দুজনের।

এলোমেলো ভেসে ওঠা বহু ঘটনার সঙ্গে আমার আর একটি দিনের কথাও মনে

পড়ল। দিন্দা সেদিন করবীদির কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, কমরেড, তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম।

এই তো সেদিনের কথা। স্পষ্ট চোখে ভাসছে দৃশ্যটা। আমি পার্টি অফিসে বসে-ছিলাম। দিন্দা, করবীদি, মলয়, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ স্কোয়াডের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। সবাই অপ্রত্যাশিত উত্তেজিত। টাকা ভালই আদায় হয়েছে স্ট্রীট কর্ণার মিটিং-এ। মলয় তো গুনতেই বসে গেল।

এক টাকার নোট আটখানা, খুচরো সাঁয়ত্রিশ টাকা সাড়ে ছ' আনা আর একটা চুড়ি, ব্রোঞ্জের উপর সোনার পাত মোড়া চুড়ি।

খয়ে গেছে বহু ব্যবহারে, বুঝলি, কমরেড মলয় সেন চুড়িটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বলল, রিয়েল দাম হবে বড় জোর টাকা আড়েক। কিন্তু কমরেড বাজারের দাম, পণ্যমূল্যই এ চুড়ির আসল দাম নয়। এর পিছনে যে ত্যাগ, সেইটেই হ'ল আসল আর তার দাম কে কষবে। কি বলো করবীদি?

করবীদি সাফল্যের উত্তেজনায় তখন থর থর করে কাঁপছে। দুর্ভিক্ষ তহবিলে আজকের সংগ্রহ গত সব দিনের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। একদিনেই সংগ্রহ হয়েছে, চুড়ির বাজার মূল্যটা ধরেই, তিপ্পান্ন টাকা সাড়ে ছ আনা। এ অনেক। আমাদের শহর থেকে যে এত টাকা তোলা যাবে, তা ধারণা ছিল না। আর এর সবটুকু কৃতিত্ব করবীদির, করবীদির একার।

করবীদি মলয়ের কথার জবাব দিলেন না। বললেন, কমরেড্, এতো সবে শুরু। এখনো অনেক পথ বাকী। মনে রেখ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ তহবিলে আমাদের যা দেয়, তার কাছে পেঁছিতেও আমরা পারিনি।

পারব কমরেড, মলয় আবেগভরে বলে উঠল, এখন বিশ্বাস জন্মেছে, তোমাকে দেখে সাহস বেড়েছে, মনে হচ্ছে আমাদের 'কোটা' আমরা ছাড়িয়েই যাব।

মলয় আমাকে বলল, আজকের সভায় গেলিনে, বড্ড মিস্ করলি। করবীদির এ ধরনের বক্তৃতা আগে আর কখনো শুনিনি। করবীদি দুর্ভিক্ষপীড়িতদের যা একখানা বর্ণনা দিলে না, এত ভিভিড বোধ করি ফটো তুলেও দেওয়া যেত না, সেখানে সেই সভায় এমন একজনও কেউ ছিল না, যার চোখে জল না এসেছে। তারপর যখন করবীদি বললে, এদের বাঁচাবার দায়িত্ব আমাদের। আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন না লক্ষ লক্ষ শীর্ণ হাত আপনাদের দিকে প্রসারিত করে আপনাদেরই লক্ষ ভাই লক্ষ বোন বলছে, ম্যা'য় ভূখা হুঁ, ওগো আমাদের বাঁচাও, কি বলব ভাই চোখের সামনে যেন লক্ষ হতভাগ্যের সেই ক্ষুধাশীর্ণ অস্থিসার চেহারা ফুটে উঠল। তারপর করবীদির প্রাণঢালা আবেদন, আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, আপনাদের সবার ঘরে ঘরে। দিন, যথাসাধ্য দিন এই তহবিলে। বৃষ্টির মত পড়তে লাগল আনি, দুআনি, সিকি। করবীদি তাতেও ক্ষান্ত হ'ল না, এই, এই মাত্র এই। বন্ধুগণ এই কি আমাদের সব? সর্বস্ব?

বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। করবীদির এই দৃপ্ত আহ্বানে এগিয়ে এল এক দরিদ্র মধ্যবিত্তের মেয়ে। ক্লাস নাইনের ছাত্রী। বললে, তবু তো আমরা একবেলা খাচ্ছি। কি হবে এই অলঙ্কারে। নিন, এটাও নিন।
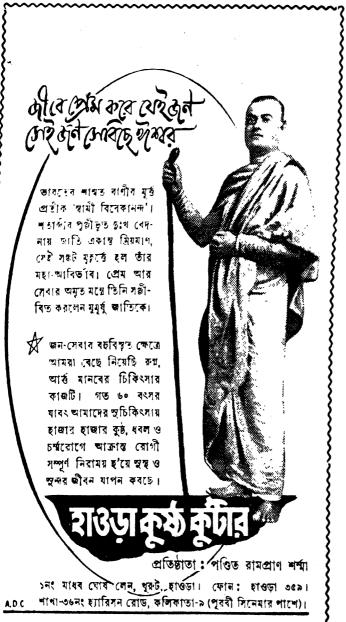
পরীক্ষার ফি দেব বলে রেখেছিলাম। কিন্তু আগে প্রাণ, পরীক্ষা পরে। বলেই মেয়েটি ছুঁড়ে ফেললে চুড়িগাছা। এই একটিমাত্র গহনাই সেই মেয়েটির সম্বল। তারপর শুরু হল আশ্চর্য কান্ড। যে বৃষ্টি বন্ধ হয়েছিল, দ্বিগুণ জোরে শুরু তার বর্ষণ। আস্ত আস্ত টাকা, আধুলি। এই দ্যাখ। মলয় উল্টে-পাল্টে দেখালে টাকাগুলো।

দিব্দা আহ্লাদে ডগমগ হয়ে উঠলেন। করবীদির একখানা হাত ধরে আবেগভরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, সাবাস কমরেড, তুমিই আমাদের মধ্যে প্রথম স্ট্যাখানো-ভাইট্। তোমার মতই হাজার হাজার স্ট্যাখানোভাইট্ আজ সোভিয়েটের ভিত গড়ে তুলছে। রাশিয়ায় হলে তুমি স্তালিন পুরস্কার পেতে।

দিব্দার কথা শুনে আমরাও খুশীতে ফুলে উঠলাম। একে একে করবীদির হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সাবাস দিলাম।

করবীদি তো গর্বে ফাট-ফাট। ওর মুখ চোখ দিয়ে যেন দীপ্তি বের হতে লাগল।

আমার উপর ছিল পার্টি পত্রিকায় রিপোর্ট পাঠাবার ভার। করবীদিকে আমাদের প্রথম স্ট্যাখানোভাইট বলে চালিয়ে দিলাম। লিখলাম, করবীদির আহ্বানে স্কুলের দরিদ্র ছাত্রীও একমাত্র অলঙ্কার খুলিয়া দিল। তার পরে এক কাহিনী জুড়ে দিলাম সেই ছাত্রীর। একমাত্র চুড়ি নিয়ে সে বাজারে এসেছিল, বন্ধক দিয়ে পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ তহবিলের সাহায্যের জন্য তাও দিয়ে দিল।

দিব্দা করবীদিকে বললেন, কমরেড, আমি ভুল স্বীকার করছি। তোমাকে আমি প্রকাশ্য রাজনীতিতে আসতে বাধা দিয়েছিলাম, সে ভুলের জন্য আমি লজ্জিত।

করবীদি হাসল। পরিতৃপ্তির হাসি। বলল, তাতে কি, ভুল তো মানুষেরই হয়। ভুল স্বীকার করবার সৎসাহস থাকে শুধু মার্কস্টদের। দিব্দা তুমি যে খাঁটি মার্কস্ট, তারই প্রমাণ দিলে। কিন্তু ভুল তো আমার কাছে করনি, করেছ শরৎদার কাছে। ভুলটা তার কাছেই স্বীকার কর না।

দিব্দা বলল, শরৎদা, শরৎদা মার্কসিজমের কি বোঝেন। বড্ড ইওটোপিয়ান।

করবীদির মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বলল, শরৎদাকে তুমি বুঝতে পারনি দিব্দা।

মনে পড়ল, করবীদি যেদিন প্রথম পার্টি অফিসে এল, সেদিনের কথা। দিব্দা সেটা সেদিন মোটেই পছন্দ করেন নি।

করবীদি যে আমাদের পার্টিতে বেশ কিছুদিন হ'ল যোগ দিয়েছে, তা আমরা জানতাম না। করবীদি পার্টিতে এসেছে প্রায় বছর দুয়েক।

দিব্দা বললেন, করবীদিকে পার্টি অফিসে এনে ভাল করলেন না শরৎদা।

দিব্দা বলেছিলেন, দুটো কারণে তিনি করবীদির প্রকাশ্যে আসা পছন্দ করেন নি। প্রথম, গোপনে রাখলেই করবীদিকে দিয়ে বেশী কাজ পাওয়া যেত। দিব্দার ইচ্ছে ছিল করবীদিকে দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করান। পরিচয় ভাঁড়িয়ে বিভিন্ন পার্টির চাঁইদের সঙ্গে দহরম-মহরম করে তাদের গুপ্ত খবরটি এনে দেওয়া—এই ধরনের কাজেই দিব্দা করবীদিকে লাগাতে চাইছিলেন। আরেকটা কারণও দিব্দা দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমাদের শহরটা বড় গোঁড়া। ছেলেমেয়েদের প্রকাশ্যে মেলামেশাটা লোকে ভাল চোখে দেখবে না। এই নিয়ে পার্টির বদনাম রটবে। ক্ষতি হতে পারে তাতে।

শরৎদা শান্তভাবে সব যুক্তি খন্ডন করেছিলেন। বলেছিলেন, দ্যাখ দিনু, পলিটিক্‌সকে হাত নোংরা করবার অস্ত্র ভাবছ কেন? আমাদের যে জীবন আজ অসম্পূর্ণ, অসামঞ্জস্যে ভরা, অসুন্দর, তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে, সামঞ্জস্য আনতে হবে, সেই জীবনকে সুন্দর করে তুলতে হবে। তাই না আমরা পলিটিক্‌সে নেমেছি। সেই পলিটিকস্ যদি নোংরা হাতে কর, তবে কি মহৎ উদ্দেশ্যে পেঁছতে পারবে ভেবেছ? কখনই না। ময়লা জলে কাপড় ধুলে তা কি সাফ হয় কখনও? ষড়যন্ত্র, গুপ্তবৃত্তি—ওসব হচ্ছে সুড়ঙ্গ, ও পথে আলো নেই, অন্ধকার। আমাদের কাজ অন্ধকার সরান, নিজেদেরকে অন্ধকারে জড়ান নয়। প্রচুর আলো পড়বে তবেই না জীবন সতেজ হবে, আর তেজোদ্দীপ্ত জীবনই পারে সব রকম বাধা-বন্ধ ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতে। জীবনের লক্ষণই হচ্ছে পরিপূর্ণ হওয়া। স্বাধীনতা তো সেই জন্যই দরকার। করবী নিজে যদি স্বাধীনতার আস্বাদ না পায়, আলোর পিপাসা যদি ওর তীব্র না হয়, তবে ও অন্যের স্বাধীনতা আনবার সংগ্রামে সাহায্য করবে কি করে? ওকে গোপনে রেখ না, অন্ধকারে রেখ না, ওকে আলোয় আন, প্রকাশ্য কর।

শরৎদার প্রত্যেকটি কথা আমার মনে গাঁথা আছে। সেদিন ও'র কথা শুনতে শুনতে দেখলাম করবীদি কেমন আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পরদিন খুব ভোরে করবীদি আমাদের বাসায় এসে হাজির। ঘুম ভাঙাল আমার। বলল, তুই আমার ভাই।

হাসলাম। করবীদি আমার এক দিদির

বন্ধু। একসঙ্গে পড়ত। বললাম, হঠাৎ এই খবরটা দিতে এত ভোরে ছুটে এসেছ। এতদিন পার্টির সঙ্গে আছ, সে-খবর তো একদিনও বলনি করবীদি।

করবীদিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। করবীদি যেন জ্বলছে। অত ভোরেই স্নান সেরে এসেছে। চুলের মৃদু গন্ধে আমার ঘরটা ভরে গেল। আর করবীদির উজ্জ্বল দীপ্তি আমার মনে যেন হাজার পাওয়ারের আলো ছড়িয়ে দিলে।

করবীদি বলল, এতদিন তো আর প্রকাশ্যে হাঁটবার অধিকার পাইনি। বলল, চলত ভাই একবার শরৎদাকে প্রণাম করে আসি। কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি। তুই জানিস নে, কাল আমার কি পরিবর্তন ঘটে গেছে। এতদিন যেন আমি পাতালপুরীর বাসিন্দা ছিলাম। দু'বছর পার্টিতে যোগ দিয়েছি, তোরা কেউ জানিস নে। দিন্দা জানে। আর এই দুটি বছর ধরে অন্ধকার পথে হেঁটেছি। দিন্দা বলেছিল, সেইটেই প্রয়োজন, আমার কর্তব্য। বিপ্লবীর কাছে আত্ম বলে কিছু নেই। আত্মত্যাগই ধর্ম। এই দু'বছর ধরে দিন্দাকে শুধু খবরই জুগিয়ে এসেছি। কি ভয়ে, কি উত্তেজনায় যে সময়টা কেটেছে কি বলব। জানতাম না তো স্বাধীনতার অর্থ বুক ফুলিয়ে সোজা পথে চলা। শরৎদা আমার বন্দীদশা ঘোচালে। চল গুরুপ্রণাম করে আসি।

মেয়েরা যতটা ভাবপ্রবণ হতে পারে করবীদিও তাই। ভাবের ফানুস একটি। তবু ভাল লাগল করবীদিকে। বোধহয় অন্তরঙ্গ হতে এসেছে বলেই।

বললুম, ব'স, এত তাড়াহুড়ো কেন? শরৎদা কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না। এসেছ এই ভোরে, চা খাও।

না না না। করবীদি অস্থির হয়ে উঠল। আগে, চল শরৎদার কাছে যাই। এসে চা খাব।

কেন, গুরু প্রণাম না করে বুঝি জল গ্রহণ করবে না। পুণ্যি হবে না?

করবীদি ঠাট্টা বুঝল। এক মুহূর্তে সব উৎসাহ নিবে গেল। গভীরভাবে আমার দিকে চাইল। আবার একটু খোঁচা দিলাম!

গোঁসাই বংশের মেয়ে তুমি। তোমার রক্তকণিকায় গুরুবাদ মেশান। আজ শরৎদার পাদোদক নিতে যাচ্ছ, পরে মার্কস্ নামের জপমালাও হয়ত নেবে একটা। খুব বিপ্লবী হয়েছ? মার্কস্‌বাদী হওয়া—

করবীদি হঠাৎ বলল, এসব কথা থাক। চল চা খাই।

তারপরও করবীদি কিছুক্ষণ ছিল। গল্পটল্প করবার পর উঠে পড়ল।

বলল, তুই তবে থাক, আমি বাড়ী যাই।

বললাম, সে কী, শরৎদার ওখানে যাবে না?

করবীদি হাসল। কিছু ব্যথা আর কিছু লজ্জা মেশা অপ্রস্তুত এক টুকরো হাসি।

বলল, না, যাব না।

বললাম, করবীদি, তুমি কি রাগ করলে?

করবীদি স্থির দৃষ্টিতে আমাকে চেয়ে দেখল। ম্লান মৃদু হাসল। বলল, না, রাগ করিনি। তবে দুঃখ পেয়েছি তোর কথায়। কারও উপর শ্রদ্ধা থাকা কি মার্কস্‌বাদীর কাছে অপরাধ?

বললাম, বিপ্লবীর কাছে ওসব খেলো সেন্টিমেন্টের কোন দাম নেই। ওসব হচ্ছে পাতি বুর্জোয়া ভাবালুতা।

করবীদি বলল, কি জানি। আমার এই উৎসাহ, এতো আমার জীবনের স্পন্দন। এটাকে তোর মনে হ'ল ভাবালুতা। তুই ঠাট্টা করলি। হয়ত শরৎদাও এটাকে তোর মত বিদ্রূপ করবে।

করবীদি একটু থামল। কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বলল না। আমার দিকে চাইল। ম্লান হাসি আরেকবার ফুটে উঠল ওর মুখে।

বলল, চললাম তাহলে।

দরজার পাশে আস্তাকুঁড়ে করবীদি কি যেন ছুঁড়ে ফেলে চলে গেল। দেখি এক ঠোঙ্গা ফুল। শিউলি।

মনে মনে হাসলাম। করবীদি গোঁসাই-বাড়ীর মেয়ে তুমি। গায়ে গুরুগিরির গন্ধ এখনও ভুরভুর করছে। ও গন্ধ খসাতে হবে।

॥ দুই ॥

সেদিনকার মিটিংএর যে রিপোর্টটা পাঠিয়েছিলাম আমাদের পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্রে, পরের সপ্তাহের কাগজে দেখলাম তা খুব ফলাও করে ছাপা হয়েছে। টাকার অঙ্কটা দিন্দা একটু বেশী করে দিয়ে-ছিলেন। আমাদের সেই মিটিংএ প্রায় চুয়ান্ন টাকা মত উঠেছিল, দিন্দা রিপোর্টে লিখলেন তিনশ। বললেন, অন্যান্য ইউনিটের কমরেডরা এতে উৎসাহ পাবে কাজে। এমনি করেই সুরু হবে টাকা তোলার সোস্যালিস্ট কম্পিটিশন।

পত্রিকা আফিস থেকে চিঠিও এসেছিল একটা, করবীদির একটা ভাল ফটো পাঠাতে। পরের সংখ্যায় যাতে ছাপান যায়।

করবীদির বাসায় সেটা আনতে গেলাম। গিয়ে দেখি, তুমুল তর্ক বেধে গেছে দিন্দা.

আর শরৎদাতে। করবীদি লজ্জিতভাবে বসে আছে। মলয় নখ খ‍ুঁটছে বসে বসে।

শরৎদা বললেন, মিথ্যা মিথ্যাই।

দিন্দা বললেন, মিথ্যে, কোনটে মিথ্যে? সেদিন চুড়িটা পড়েছিল, তাকি মিথ্যে? টাকা পয়সা যা সংগ্রহ হয়েছিল, সে সব কি মিথ্যে?

শরৎদা বললেন, কি মিথ্যে, কি সত্যি সব থেকে তুমিই তো ভাল জান দিন্দু। চুড়িটা সেদিন একটা মেয়ে খুলে দিয়েছিল, তা ঠিক। তবে সে চুড়ি সে দান করেনি। আবার তাকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে সেটা। আর তিনশ টাকা তো সেদিন ওঠেনি।

দিন্দা চুপ করে গেলেন। তারপর একটু-ক্ষণ বাদেই বলে উঠলেন, কিন্তু কোন খারাপ মতলবে তো তা করা হয়নি। সেদিন ঐ মেয়েটি চুড়িটা ওভাবে খুলে দিয়েছিল বলেই না, অতগুলো টাকা উঠে এল। আমি তো এতে করবীর কোন দোষ দেখিনে। বরং ওযে মেয়েটাকে তালিম দিয়ে ওভাবে কাজটা হাঁসিল করতে পেরেছে, তার জন্য ওকে আমি তারিফ দিই।

শরৎদা চমকে উঠলেন, কি বললে, করবী এটা করিয়েছে! করবী! তুমি!

শরৎদা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অবাক হয়ে করবীদির মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেন।

করবীদি লজ্জায় থতমত খেয়ে বলতে গেল, শরৎদা, কেন এটা করতে হয়েছে—

শরৎদা বাধা দিলেন। থাক, এক মিথ্যে ঢাকতে আর মিথ্যে শুনতে চাইনে। এ করে কার চোখে তোমরা ধুলো দিচ্ছ? এই তোমাদের রাজনীতির উপায়? ছিঃ।

শরৎদা যেন করবীদিকে চাবুক মারলেন। করবীদি মুখ নিচু করে বসে থাকল। শরৎদা উঠে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে করবীদি হঠাৎ খুব চটে উঠল। বলল, অত পিওর থাকতে গেলে আর পলিটিকস্ করা চলে না। রাম-কৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হওয়াই ভাল।

শরৎদা কেন জানিনে ঠিক সেই সময়েই ফিরে এলেন। ঘরে পা দিয়েই করবীদির মন্তব্য শুনলেন। একবার কি যেন বলতে গেলেন, কিন্তু না বলেই যেমন এসেছিলেন, তেমনি বেরিয়ে গেলেন। শরৎদা যে কথাটা শুনবেন, এটা করবীদি ধারণা করতে পারেনি। করবীদির মুখে আর কথা নেই। মুখখানা মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল।

দিন্দা বললেন, ভাল ভাল কথা আমরাও জানি। ভাল কথা বললেই ভাল পাওয়া যায় না। আলো চাই আলো চাই, আলোয় থাকব, অন্ধকারে হাঁটব না, এ কে না জানে? কিন্তু কালো সামিয়ানায় যে আলো ঢাকা, সে আলো পেতে কি সামিয়ানার ছাতে উঠব, না সামিয়ানার নিচে অন্ধকারে বসে তার গোড়ার বাঁধন কাটবার চেষ্টা করব।

করবীদি কিছু না বলে হঠাৎ উঠে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দিন্দা আর মলয় চোখে চোখে হেসে উঠল। সে হাসির অর্থ কি, জানি। দিন্দা ‘ইনার সার্কেলে’র মিটিং-এ একদিন বলেছিলেন, অনেকদিন আগে, করবীদি তখনও বাড়ি ছাড়েনি। আমি, মলয় আর দিন্দাই শুধু সে মিটিং-এ ছিলাম।

দিন্দা হেসে বললেন, করবীকে এমনিভাবে প্রকাশ্য পলিটিকসে শরৎদা কেন নামাতে চাইছেন, তা বুঝিনে আমি? ওসব চালাকি আমার জানা আছে। আমি বলে দিচ্ছি, দেখো, বাড়ীর থেকে ও মেয়ের উপর এবার প্রেসার আসবে। নানা রকম বুকনিতে ভুলিয়ে করবীকে আরো সামনে ঠেলে দেবে শরৎদা, করবী আরো স্বাধীনতা দেখাবে, তখন, ওদের যা বাড়ী, হাড় কনজারভেটিব, দেবে তখন তাড়িয়ে। মেয়ে বলে মানবে না গোঁসাইরা, ওদের ফ্যামিলিকে তো জানি! আর তারপর—অসহায়া বালা, এস পর মালা। বাস হ'য়ে গেল শরৎদার পলিটিকস্। করবীও সুট সুট করে ঘরকন্না করবে।

মলয় সব থেকে বেশী চটে গেল। অ্যাঁ, এই নাকি শরৎদার মতলব? করবীদিকে বাগাবার জন্যই এত সব কাণ্ড! বলল, মুখোস খুলে দেওয়া উচিত এই সব ব্ল্যাক-শিপদের। ভণ্ড, স্কাউণ্ড্রেল।

দিন্দা বললেন, মলয়, সময় না আসা পর্যন্ত কিছু কর না। অনেক ভেবে কাজ করতে হবে। করবীর তত দোষ নেই। ও তো সম্মোহিত। একে শরৎদার প্রভাব থেকে উদ্ধার করতে হবে। তারপর শরৎদার ব্যবস্থা। ওই করবীকে আমিই আনি এই পার্টিতে, ওকে এই পার্টিতেই থাকতে হবে।

সেই দিনই দিন্দার পরামর্শমত ঠিক হল, আমাদের একটা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ভাণ্ডার খুলতে হবে। শরৎদা প্রেসিডেন্ট
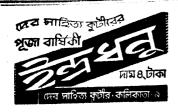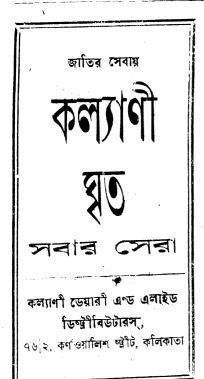
আর করবীদি সেক্রেটারী। সেটাও দিন্দার প্রস্তাব।

দিন্দা বললেন, আর এদের উপর নজর রাখবার জন্য একজনকে চাই, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। কাকে এই ভারটা দিই ভাবছি।

দিন্দা আমাদের মুখের দিকে চাইলেন। তারপর মলয়কে বললেন, মলয় এ ভার তোমাকে দিলাম। হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করবে।

মলয়ের চোখ হিংস্র উল্লাসে দপ করে জ্বলে উঠল। বলল, পার্টির জন্য সব পারি দিন্দা।

মিটিং থেকে বেরিয়েই দেখি বেশ নির্জন হয়ে গেছে। রাত প্রায় সাড়ে দশটা হবে। হাসপাতাল ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে আসতেই মলয় বললে, ঐ দ্যাখ শরৎদা। আবছা দেখা যাচ্ছে চেহারাটা। তবে হাঁটার ভঙ্গীটি দেখে শরৎদাকে বেশ চেনা যায়। অমন দুলে দুলে, সামনে ঝুঁকে এই শহরে একা শরৎদাই হাঁটেন।

চোখাচোখি হতেই শরৎদা আমাকে বললেন, ওহে কোথায় গিয়েছিলে, তোমার ওখান থেকেই আসছি।

জিগ্যেস করলাম, কেন?

আর বল কেন, করবী এসে হাজির রাত প্রায় আটটার সময়। ওকে ওর বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন।

বুকটা ধ্বক করে উঠল। দিন্দা কি হাত গুণতে জানে?

সত্যি? কথাটা বেরিয়ে যেতেই চমকে উঠলাম।

শরৎদা বললেন, হ্যাঁ। ওর বাবার কাছে গিয়েছিলাম। কথাই বললেন না। ভয়ানক গোঁড়া ওরা। ও তোমাদের ওখানেই উঠল আজ রাত্রের মত।

শরৎদা চলে যেতেই দিন্দা আর মলয় চোখে চোখে চেয়ে হাসল। অর্থপূর্ণ হাসি। দিন্দার দূরদৃষ্টি দেখে আমি থ। হঠাৎ মলয়ের চোখ ধক ধক করে জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, এসব চলবে না এখানে।

বাসায় ফিরে দেখি করবীদি দিব্যি মার সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে। হাসি ঠাট্টা গল্পে বাড়ি একেবারে জমজমাট। এত বড় একটা কাণ্ড যে ঘটে গেল তার জন্য করবীদির মুখে চোখে কোথাও এক ফোঁটা দুশ্চিন্তা নেই। যেন কিছুই হয়নি। যেন এইটেই করবীদির বাড়ী। হস্টেল থেকে পুজোর বন্ধে যেন ও এইমাত্র বাড়ী ফিরে এসেছে।

আমাকে দেখে হাসতে হাসতে উঠে এল। হাত ধরে এক ঝাঁকানি দিল।

তারপর করবীদি বলল, এতক্ষণে এলি। বাবা বাবা, ভাবলাম রাগে বুঝি আর ফিরবিই না। আমি সেই কখন এসে বসে আছি।

করবীদি আবার জ্বলছে। ওর চোখ জ্বলছে, ওর ঠোঁট নাক, চিবুক দিয়ে আভা বেরুচ্ছে, সেই সেদিন ভোরের মত। ওর ভেতরে যে প্রবল উদ্দীপনা জেগেছে, এ তারই আলো, যে প্রবল প্যাশন করবীদিকে চালিত করছে, এ তারই দীপ্তি। মনে হল করবীদির এ উচ্ছ্বাস ওর সহজাত, এ ওর উপচে-পড়া জীবনীশক্তি। তার সামনে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য আমার সংশয়, আমার সন্দেহ তলিয়ে গেল। খুশীতে মন ভরে উঠল। করবীদির হাতে জোরে এক ঝাঁকি দিলাম।

বললাম, ইনকিলাব।

করবীদি খিল খিল হেসে ধরতাই দিল, জিন্দাবাদ।

আর সঙ্গে সঙ্গে দিন্দার বিদ্রূপাত্মক ছড়াটা কানে বাজল। অসহায়া বালা, এস পর মালা। ভাবলাম, সত্যি দিন্দার আন্দাজ কত নির্ভুল। হয়ত গম্ভীর হয়ে থাকব।

করবীদির নজর পড়তেই বলে উঠল, কি রে, ভাবছিস কি?

বললাম, এর পরে কি হবে তাই ভাবছি।

করবীদি হাসল। বলল, স্বাধীন যে হয়েছি, স্বাধীন যে হতে পারি, তার প্রমাণ দেবার এই তো সময় এল। বাবা তার মেয়ের মনুষ্যত্বকে স্বীকার করতে চাইলেন না। যুক্তি মানলেন না। তাড়িয়ে দিলেন। তা বেশ কথা। সটান তোর এখানে চলে এলাম।

তারপর একটু ঠাট্টা করে বলল, ভয় নেই, তোর এখানে বেশী দিন থাকব না।

তা জানি, আর পারলাম না, গলায় ব্যঙ্গ বাসা বাঁধল, বললাম, থাকবে না তা জানি।

বলেই অপ্রস্তুত হলাম। করবীদিও বোধ হয় অবাক হল।

বলল, কি জানিস?

সামলে নিলাম। হেসে বললাম, সবাই যা জানে আমিও তাই জানি। কারো গলগ্রহ হয়ে থাকা তোমার চরিত্র নয়।

করবীদির মুখে আবার হাসি ফুটল। দিন পাঁচেক ছিল করবীদি আমাদের বাসায়। তারপর ওর মাসির বাসায় উঠে গেল।

॥ তিন ॥

মলয় যে সেদিন শরৎদাকে অমন অপমান করে বসবে, তা ভাবিনি। ওর রাগ একদিন প্রকাশ পাবে মনে মনে তা জানতাম। কিন্তু

তা এত শিগ্‌গির, আর এমন অভদ্রভাবে তা ভাবিনি।

করবীদি ক'দিন একেবারে চুপ মেরে আছে। রামকৃষ্ণ আশ্রমের তুলনা শরৎদাকে ও দিতে চায় নি। ওটা হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল ওর মুখ থেকে। আর শরৎদাও যে সে সময় আবার ফিরে আসবে তাও ও বুঝতে পারেনি। প্রথমটায় করবীদি খুব লজ্জায় পড়ল। পরে হল অনুশোচনা। শরৎদার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে, আমাকে দু তিন দিন বলল। কিন্তু যেতে পারল না। শরৎদার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহসই পেল না করবীদি। পার্টি অফিসে আসাই বন্ধ করে দিল করবীদি। সঙ্গে সঙ্গে সব উৎসাহ, সবার উৎসাহই যেন ঝিমিয়ে এল। মাস পাঁচেক তো করবীদি আমাদের সঙ্গে কাজ করছে এর মধ্যেই সকলের অজান্তে কেমন করে যে সব উদ্দীপনার কেন্দ্র হয়ে বসেছে তা বুঝতে পারিনি। দু তিন দিন আসেনি করবীদি, মনে হচ্ছে যেন কতকাল আসেনি।

দুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডারের কাজ প্রা বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। আমরা একবার চেষ্টা করলাম টাকা তুলতে করবীদিকে ছাড়াই। মিটিং করলাম, ঝোলা নিয়ে এগিয়ে গেলাম, চাঁদাই উঠল না তেমন।

মলয় বলল, করবীদি থাকলে দেখতিস পয়সার বৃষ্টি শুরু হত এতক্ষণে।

শরৎদার জন্যেই করবীদি আসছে না বলে মলয়ের ধারণা।

নিশ্চয়ই বারণ করে দিয়েছে, মলয় বলল। আর কি, নিজের কার্জটি তো হাসিল। এবার মালাটি পরিয়ে করবীদিকে ঘরে তুলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। কি মতলববাজ, বল দেখি।

এর মধ্যে একদিন শুনলাম, করবীদির বাবা দিন্দাকে ডেকেছিলেন। দিন্দা বললেন, করবী যদি বাড়ী ফিরে যায় তো ওর বাবা আমাদের ইউনিটকে মোটা টাকা চাঁদা দেবেন বলে স্বীকার করেছেন। সেই টাকায় এখান থেকে অনায়াসে একটা সাপ্তাহিক বের করা যেতে পারে। ডিস্ট্রিক্টটাও অর্গানাইজ করে ফেলা যাবে।

দিন্দা বললেন, করবীকে পলিটিকস্ ছাড়তে বলেন নি ওর বাবা। তবে ঝাণ্ডা ঘাড়ে করে ওর চোখের সামনে এই শহরে ওর মেয়ে ঘুরবে এটা উনি সহ্য করবেন না। রাস্তাঘাটে বক্তৃতা দেওয়াও উনি পছন্দ করেন না। আমরা যদি করবীকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারি, তাহলে তিনি নিয়মিত আমাদের বেশ মোটা চাঁদা দিতে পারেন।

ব্যাপারটা ভাল করে বিবেচনা করা দরকার। তাই একজিকিউটিভ মিটিং ডাকা হল। করবীদি সেদিনও এল না।

দিন্দা করবীদির বাবার প্রস্তাবটা বেশ গুছিয়ে মিটিং-এ তুললেন। করবীদির এই স্বার্থত্যাগটুকু পার্টির জন্য করা দরকার দিন্দা সেটা বুঝিয়ে দিলেন।

বললেন, এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি বিশেষ কিছু নেই। করবী একা যেটুকু কাজ করতে পারত, ওর বাবার টাকায় আমরা তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ করতে পারব। পার্টি তহবিলে বেশী টাকা দিতে পারব, করবী

বক্তৃতা দিয়ে যত লোককে বোঝাতে পারত, আমাদের জেলা অর্গান সাপ্তাহিক মারফৎ তার চেয়ে ঢের বেশী লোককে আমরা বোঝাতে পারব। আমার মনে হয় এমন অবস্থায় করবীর ফিরে যাওয়াই উচিত।

দিন্দা চুপ তো সবাই চুপ। মনে হল, বলি, করবীদি যদি আর আফিসে বসতে না পারে, তো ওখানে বসবার উৎসাহ আমাদেরও কমে যাবে যে। কিন্তু সে কথা বলতে বাধ বাধ ঠেকল।

অবাক করল মলয়। করবীদিকে না দেখলে সেই ছটফট করে বেশী। আর ও কিনা দিন্দার কথাতেই সায় দিল।

শুধু শরৎদা এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করলেন। বললেন, করবীকে ফিরে যাবার কথা বলতে আমরা পারিনে। সে নৈতিক অধিকার আমাদের নেই। আর কেনই বা ওকে ফিরতে বলব? ও একা যা কাজ করেছে এই শহরে, আমরা তার সিকিও করতে পারি নি। যে কাজগুলো করবীর স্বাধীনতার স্মারক, আমরা ওর বাবার প্ররোচনায় পড়ে সেগুলোই ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছি। ঝাণ্ডা ঘাড়ে করে কোন মেয়ে এই শহরে রাজনৈতিক প্রোসেশনে যোগ দিতে পারে, কার কল্পনায় এটা ছিল? করবী দেখিয়েছে তা সম্ভব। এই শহরে নারীদের মুক্তি আন্দোলন যদি কোন দিন সম্ভব হয়, সেদিনের মেয়েরা প্রেরণা পাবে আজকের এই করবীর কাছ থেকে। আমরা যদি নারী পুরুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, যদি প্রত্যেকের বাক-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, তবে পথে ঘাটে করবীর বক্তৃতা দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা করছি কেন?

দিন্দা ব্যঙ্গ করে বললেন, শরৎদার কথা শুনতে সব সময়ই ভাল লাগে। কিন্তু বিপ্লবীরা প্রয়োজন অনুসারে পন্থা বদলায়। শরীরের মাপে কোট বানায়। সেণ্টিমেণ্টের কথা বাদ দিন। ব্যাপারটা সাদা চোখে দেখুন। আমি পার্টির সভ্য। আমি আছি আর পার্টি আছে। দেখতে হবে আমাকে দিয়ে পার্টির ম্যাক্সিমাম বেনিফিট কিভাবে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, করবী ফিরে গেলেই বেশী লাভ পার্টি পাচ্ছে। তাই তাকে ফিরে যেতে হবে।

শরৎদা বললেন, এ সুবিধাবাদ। 'এ দিয়ে বিপ্লব করা যায় কিনা জানিনে, তবে এ দিয়ে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না।

মলয় বলল, শরৎদা কি বিপ্লব আর স্বাধীনতা আলাদা বলে চালাতে চান?

আমি কেন চালাতে চাইব? শরৎদা বললেন, ও দুটো গোড়াগুড়িই আলাদা। সেই কথাটা তো বলতে চাইছি। স্বাধীনতা উঁচু ডালের ফল নয়। কোন দূরস্থানে তা অপেক্ষা করে নেই কারো জন্য। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা স্বাধীন হচ্ছি একটু একটু করে, আবার স্বাধীনতা বিসর্জনও দিচ্ছি।

মলয়, বলল, তার মানে বলতে চান, আমরা স্বাধীন?

শরৎদা বললেন, পুরো নয়, তবে কিছুটাতো বটেই। মানুষের মধ্যে যে অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশই তো স্বাধীনতা। তার বিকাশ লাভের পথে যে সব বাধা, নানা ধরনের অন্তরায়—রাজনৈতিক অন্তরায়, অর্থনৈতিক অন্তরায়, আত্মিক অন্তরায়—তা দূর করাই তো স্বাধীনতার সংগ্রাম। বিপ্লব সেই সংগ্রামের অসংখ্য হাতিয়ারের মধ্যে একটা মাত্র।

তাহলে আপনি করবীকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করবেন না? দিন্দা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন।

শরৎদা বললেন, আমার তা করবার কোন অধিকার নেই।

মলয় হঠাৎ বলে বসল, তা থাকবে কেন? তাহলে যে মতলবটি হাসিল হবে না।

শরৎদা অবাক হয়ে গেলেন। তার মানে?

মানে বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না, মশাই। আপনার মতলব সবাই ধরে ফেলেছে। করবীদি ওর বাড়ীতে না গেলেই আপনার খুব সুবিধে। অসহায়া বালার গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়ে বরণ করে ঘরে তুলতে আর বাধা থাকবে না।

মলয় প্রবল হিংসায় থর থর করে কাঁপছে। প্রচণ্ড আক্রোশে ওর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। এই আকস্মিক অপমানে শরৎদার বাকরোধ হয়ে গেছে। দিব্দা চুপ করে বসে মলয়কে লক্ষ্য করছেন। কি জানি চোখের সামনে শরৎদার এ অপমান আমার সহ্য হ'ল না। আমি জানি শরৎদা কি, মলয় জানে না। কিন্তু দিব্দাও কি জানেন না, শরৎদাকে? মলয় কি বলতে যাচ্ছিল আবার। ওকে ঠেলে ঘর থেকে বের করে দিলাম।

শরৎদা, দিব্দা আর আমি বসে থাকলাম চুপ করে। কারো দিকে চাইনি, চাইতে পারিনি। ঘরের স্তব্ধতার আড়ালে আমরা লুকোতে চাইছিলাম। আমি ঢাকতে চাইছিলাম আমার লজ্জা আর শরৎদা বোধ হয় তার অপমান। দিব্দা শুধু স্থির দৃষ্টিতে শরৎদার দিকে চেয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, ঠিক কতক্ষণ পরে মনে নেই, হয়ত আধ ঘণ্টা, হয়ত দু'ঘণ্টা, শরৎদা যেন চেতনা ফিরে পেলেন। রক্তশূন্য মুখে এক ঝলক রক্ত এসে গেল। ধীরে সুস্থে চশমা মুছলেন শরৎদা, ধীরে সুস্থে উঠলেন। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। আমিও উঠছিলাম। দিব্দা বসতে বললেন, বসলাম।

বললাম, মলয় শরৎদার সঙ্গে অভদ্রের মত ব্যবহার করেছে।

দিব্দা বললেন, যত সব ছেলেমানুষি। দুদিন করবীর সঙ্গে ঘুরেছে কি, অমনি শরৎদার উপর জেলাসি হয়েছে।

ঠাট্টা করলেন, ইটার্ন্যাল লভ্ ট্রায়েংগেল। পার্টিটা থিয়েটারের স্টেজ হয়ে উঠল দেখছি।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে দিব্দা বললেন, কিন্তু এসব চলবে না। এই নাটক দেখবার জন্য পার্টির সৃষ্টি হয়নি। ডিসিপ্লিন, স্ট্রিকট্ ডিসিপ্লিন চাই।

শোন কমরেড, দিব্দা যেন নির্দেশ নিচ্ছেন কোন এক উঁচু আসন থেকে,

কে ক্ষমা চাইতে হবে। কাজটা খুব ায় করেছে তা বলছিনে, সেজন্য নয়, দাকে আমরা বর্তমান অবস্থায় ছাড়তে রিনে, শরৎদা গেলে করবীও যাবে।

কিন্তু দিন্দা, বললাম, মলয় যদি ক্ষমা চায়।

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে দিন্দা জবাব লেন, তাহলে, শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং নেতার তি অশোভন আচরণ, এই দুই অপরাধের ন্য তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। পার্টি ইজ্ পার্টি।

এই হ'ল পার্টি, ভাবলাম। অথচ একটু াগে পর্যন্তও আমার ধারণা ছিল, মলয় ন্দারই ডান হাত।

দিন্দা বললেন, আশা করি মলয়ের উপর তামার কোনো দুর্বলতা নেই।

না না, দিন্দার চাউনি দেখে শঙ্কিত লাম।

তবে, দিন্দা বললেন, যদি দরকার হয়, মলয়ের বহিষ্কার প্রস্তাবটা তোমাকে আনতে হবে। কি, পারবে তো?

নিশ্চয়ই, হাসি হাসি মুখ করে তৎক্ষণাৎ বললাম, কমরেড্, পার্টির জন্য সব পারি।

সেই মুহূর্তে একবার শুধু মনে পড়ল, মলয় আমার বন্ধু। ওকে আমিই পার্টিতে এনেছিলাম।

॥ চার ॥

করবীদিকে খবরটা দিতে গিয়েছিলাম। দিন্দা ঠিক করেছিলেন, শরৎদার বাসাতেই মিটিংটা হবে। আর করবীদি যাতে সেই সভায় হাজির থাকে সে চেষ্টা করতে দিন্দা আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন।

করবীদির বাসায় গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। করবীদির ঘরটাও অন্ধকার। উঁকি মেরে অবাক হলাম। করবীদি চেয়ারে বসে আছে, টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে। ঘরে ঢুকতেই মনে হ'ল, যেন চমকে উঠল। খুট করে আলো জেবলে আমাকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল করবীদি।

বলল, ও তুমি।

আমাকে তুমি বলাতে বিস্মিত হলাম।

করবীদির গলাটা ধরা ধরা, চোখ দুটো ফোলা ফোলা। বুঝলাম, কাঁদছিল। তবে কি করবীদি ব্যাপারটা জেনে গেছে।

খুব শীতল চোখে আমার দিকে চেয়ে করবীদি জিগ্যেস করল, কি ব্যাপার, তুমি আবার এসেছ কেন? আবার কি বলতে চাও, আর কি করতে চাও। তোমরা কি আমাকে একটুও রেহাই দেবে না।

কিছু একটা গভীরতর ঘটেছে। করবীদিকে অপ্রকৃতিস্থ ঠেকল। করবীদির এমন চেহারা, আমি এর আগে আর দেখিনি। যে মেয়ে সদা উচ্ছল, প্রাণের জোয়ারে আশপাশ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তার এ কি অবস্থা।

আজ করবীদিকে দেখে কে বলবে, বাড়ী থেকে প্রকাশ্যভাবে পার্টি করবার অপরাধে বিতাড়িত হবার পর, এই মেয়ে একদিন আমাদের সঙ্গে শোভাযাত্রায় বেরিয়েছিল। লুকিয়ে চুরিয়ে নয়, পিছনে পিছনে নয়, একেবারে সবার সামনে পতাকা ঘাড়ে করে, ধ্বনি করে করে। আরও অবাক করেছিল, ওদের পাড়ায় গিয়ে, চৌমাথায় দাঁড়িয়ে যখন বক্তৃতা দিল। লোক ভেঙে পড়ল চারদিকে। টিটকারি, বিদ্রূপ, চারধার থেকে অজস্র বর্ষিত হ'ল। কে যেন একটা ছোট্ট ঢিল করবীদির মাথায় ছুঁড়ে মারল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না করবীদি। কোন দিকে চাইল না। অবিচল বক্তৃতা দিয়ে গেল। আর আজ তাকে এ কী দেখছি। এতদিন করবীদিকে আমার একবারও কেন মেয়ে বলে মনে হয়নি, ভেবে আশ্চর্য লাগছে। আজ বিপর্যস্ত করবীদিকে দেখে মনে হ'ল, সে-ও মেয়ে। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে।

করবীদিকে আজ আর গ্রাহ্য করলাম না। ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। জিগ্যেস করলাম, করবীদি কি হয়েছে?

করবীদি আমার দিকে চাইল। আন্তরিকতার ছোঁয়ায় ওর চোখে জল নামল। কোনো কথা না বলে, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। উপুড় হয়ে বালিসে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

ফাঁকে ফাঁকে বলতে লাগল, কেন তোরা ওঁকে এ অপমান করলি। এতো মিথ্যে, একেবারে মিথ্যে। শরৎদা আমাকে বিয়ে যদি করতে চাইতেন, কে রুখতে পারত? আর আমি কি শরৎদার যুগ্যি? তাহলে কি শরৎদা বারবার আমাকে ফিরিয়ে দিতেন? জেল থেকে ফেরবার পর ওঁর শরীর বারবার ভেঙে পড়েছে, থাকেন তো একলা একখানা ঘর নিয়ে, ওঁর বাবা কতবার সাধা-

সাধি করেছেন, শরৎদা যাননি, নিজে হাতে নিজের সব কাজ করে গেছেন, সে কাজে সাহায্য করতে গেছি বাধা দিয়েছেন, সেবা করতে গেছি বিদ্রূপ করেছেন, লজ্জার মাথা খেয়ে আমিই প্রস্তাব দিয়েছি বিয়ের, বলেছেন, আবার যদি এ প্রস্তাব তুলেছি তো আমার মুখ দর্শন করবেন না। রাজনীতিটা যৌতুক বাধাবার জায়গা নয়। সেই লোককে তোরা এমনভাবে অপমান করলি?

বললাম, মলয়টা যে শেষ পর্যন্ত এই ব্যবহার করবে ভাবিনি।

করবীদি চট করে উঠে বসল বিছানার উপর। চোখ দুটো ধক করে জবলে উঠল।

বলল, মলয় নয়, এ ব্যবহার কার তা জানি, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এতে তোরও তো সায় ছিল? দিন্দা ছিল না সেখানে?

তীব্র জবলজবলে চোখে করবীদি আমার দিকে এমনভাবে চাইল যে, আমি কুঁকড়ে গেলাম।

ঘুরিয়ে জবাব দিলাম, আমি মলয়কে বের করে দিয়েছিলাম। তুমি শরৎদাকে জিগ্যেস কর।

করবীদি একটু কোমল হ'ল। বসল, কাউকে জিগ্যেস আর করতে হবে না। মলয় নিজেই সব জানিয়েছে। ঐ যে তার চিঠি। সে আর এখানে থাকবেই না।

সে কী, কোথায় গেল? আশ্চর্য হলাম।

করবীদি বলল, তা জানায়নি।

॥ পাঁচ ॥

তারপর থেকেই কেমন এক চাপা রেষারেষি শুরু হ'ল দিন্দা আর করবীদির মধ্যে। প্রথম প্রথম দিন কতক করবীদি গা এলিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিলাম বোধ হয় এবার বিদায় নেবে রাজনীতি থেকে। কিন্তু ভুল বুঝেছিলাম। করবীদি ফিরে এল, দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে। কিছুই তাকে দমাতে পারলে না। পার্টির প্রয়োজনে শরৎদাকে ওঠান হ'ল, প্রয়োজন ফুরালে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল। জীবন থেকেই সরে গেলেন শরৎদা। কিছুতেই যেন করবীদির আর কিছু এলোগেলো না। এ সব কোনো ঘটনাই যেন তার মনে রেখাপাত করল না। করবীদি জানতে পেরেছিল, পার্টি পলিটিক্‌স্ বুনো ঘোড়া, পিঠের উপর চেপে থাকতে পার যদি তবেই তোমার গতি। পিছলে পড়লে আর রক্ষা নেই। দিন্দার যেখানে জোর করবীদি সেইখানেই এবার হাত বাড়াল। করবীদি বুঝল, বিপ্লবী হলেই হবে না, পার্টিকে হাতের মুঠোয় রাখতে হবে।

দিন্দা, যিনি কাউকে পরোয়া করেননি, বিপ্লবের ভৈরবী সাধনায় যার গতি ছিল স্থির, আত্মবিশ্বাস ছিল দুর্জয়, লক্ষ্য করলাম, করবীদিকে ভয় করতে শুরু করেছেন। এতদিনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল বুঝি। তাও কে, না করবী। কিন্তু তুচ্ছ করবার মত, অবজ্ঞা করবার মত মেয়ে নয় করবী।

বুঝতে পারতাম এক প্রচ্ছন্ন অথচ তীব্র বিদ্বেষের আগুনে দুজনে জবলছে। দিন্দা আর করবীদি ঘৃণার অদৃশ্য ধারালো তরোয়াল হাতে যেন ছিদ্র খুঁজছে পরস্পরের, কুণ্ডলী করছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। দিন্দা আর করবীদি।

কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ ছিল না কারো মধ্যে। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে আমাদের পার্টি পলিসি বদলাল। 'গোপন কোটর' ছেড়ে বেরিয়ে আসবার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় কমিটি। হুকুম 'মাস্ কন্ট্যাকটের'। গণ-সংযোগ, এই হ'ল শ্লোগান।

আগের দিন পর্যন্ত দিন্দা বক্তৃতা দিয়েছেন, একশটা কাঠের টুকরোর চেয়ে একটা দেশলাই-এর কাঠির ক্ষমতা বেশী। সেই একটা কাঠিই পারে খাণ্ডব দাহন করতে।

দিন্দা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি পার্টির এত বড় পরিবর্তনের কথা। একটু আগেও যদি খবরটা পেতেন তো সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বদলে নিতে পারতেন। এর আগে, পার্টির পলিসি সে কয়বার বদলেছে, দিন্দারও বদল হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু এবার দিন্দার চোখ ছিল, করবীদির দিকে, আর করবীদির চোখ ছিল কমরেড ভুবন চাকলাদারের উপর। কমরেড ভুবন চাকলাদার মানেই পার্টি। কারণ তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। কলকাতা থেকে এসেছেন, লোকাল পার্টির সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য। নতুন থিসিস নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই দিন্দা পাশ কাটাতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু করবীদি ছাড়েনি। দিন্দাকে ধীরে ধীরে উস্কে উস্কে একেবারে আলোচনার মধ্যে ফেলে দিল। দিন্দা প্রাণপণে এই আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসতে যত চেষ্টা করেন, সময় নেবার ফিকিরে থাকেন, করবীদি তত তাঁকে ঠেলে দেয় সামনে। আর কমরেড চাকলাদার ততই তাঁকে রোমান্টিক, সেকেলে, ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়া বিপ্লবী বলে উপহাস করেন। আর করবীদির চোখে মুখে উল্লাসের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। দিন্দা একবার আমাদের সকলের দিকে আর একবার করবীদির দিকে তাকান, নিতান্ত অসহায়ভাবে তাকান। দিন্দার চোখে আত্ম-বিশ্বাসের সে তেজ আর নেই, তা অনেক অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে।

শেষে মিনমিন করে বলেন, আচ্ছা ভেবে দেখি।

করবীদি এইবার আমাদের সকলকে আহ্বান করে বলল, কমরেডস্, আজ যখন কাজ করবার সময় এসেছে, কর্মসূচীও তৈরী, তখন ভেবে দেখার নাম করে নিষ্ক্রিয় থাকাটা পার্টির নতুন থিসিস সমর্থন না করারই নামান্তর বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে সামনেই যখন পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন, তখন একটি দিন নিষ্ক্রিয় থাকাও কি ভয়ঙ্কর অপরাধ তা আশা করি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। যদিও জানি পার্টিকে যারা ভালবাসে, তাদের সকলের কাছেই এই নতুন থিসিস গ্রহণীয় হবে, তবু আমরা, আমাদের এই বিশিষ্ট কমরেডকে যিনি কলকাতা থেকে এসে আমাদের ধন্য করেছেন, দেখিয়ে দিতে চাই, আমাদের এই স্থানীয় ইউনিটটি ক্ষুদ্র হলেও পার্টির মহান আদর্শে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে কারোর পিছনে থাকবে না। যারা আমাদের নতুন আদর্শে বিশ্বাসী, মনে প্রাণে যারা এই আদর্শ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা হাত তুলুন।

ঘর ভর্তি সভ্যদের হাত উঠল। শুধু দিন্দা নিশ্চল। ঘর ভর্তি সভ্যের কণ্ঠে আওয়াজ উঠল, ইনক্লাব জিন্দাবাদ। শুধু দিন্দা নিশ্চুপ। চারবছর ধরে দিন্দার সঙ্গে আছি। তাঁর এতবড় পরাজয় আর হয়নি, দেখিনি, হতে পারে সে বিশ্বাস ছিল না। দিন্দা মুখ নীচু করে বসে থাকলেন, মুখ নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

করবীদির দিকে তাকিয়ে দেখি তার সর্বশরীর জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

॥ ছয় ॥

সেই করবীদিই আবার দিন্দার প্রেমে পড়ল। দিন্দাও। আশ্চর্য। মজিলপুরের সম্মেলনে যদি মারামারিটা না হত তবে এ ঘটনা ঘটত কিনা সন্দেহ।

তিন দিন ধরে অধিবেশন হল। এত লোক হবে ভাবিনি। অনেক ডেলিগেট এসেছিল। লীডাররা এসেছিলেন। আর শেষ দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনে এসেছিল চাষীরা। চব্বিশ পরগণার কমরেডদের সাবাস দিই সেই জন্য। কি সংগঠন! প্রায় পঁচিশ হাজার চাষী এসেছিল সেদিনকার সভায়।

তখন আগস্ট বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে দেশে। আমরা আগস্ট বিপ্লব সমর্থন করিনি। সেই সম্পর্কে কয়েকজন নেতা সভায় বক্তৃতা করেন। বলা বাহুল্য ওটাকে তুড়ে গালাগাল দেওয়া হয়।

মজিলপুরে আগস্ট আন্দোলনের সমর্থক ছিল প্রচুর। তারা তলে তলে

আমাদের সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এই প্রবল জনস্রোত সভায় আসতে দেখে তারা কিছু করতে ভরসা পায়নি।

সন্ধ্যের মুখে সভা ভেঙ্গে গেল। অধিকাংশ ডেলিগেট, নেতারা, মালপত্র একে একে স্টেশনে চলে গেল। আমরা দেরী করতে লাগলাম করবীদির জন্য। আমরা বাইশজন এসেছিলাম ডেলিগেট হয়ে। দিন্দাও ছিলেন। শেষ পর্যন্ত দিন্দা ওঁর ভুল স্বীকার করে নতুন থিসিস মেনে নেন। আর সম্মেলনের জন্য খেটেছিলেনও প্রচুর।

তবে করবীদি যা পরিশ্রম করল, তার তুলনা মেলা ভার। সম্মেলনে কিচেনের ভার ছিল করবীদির উপর। এমন সুন্দরভাবে করবীদি সব দিক সামাল দিল যে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। তাকে প্রাদেশিক কমিটির সদস্য করে নেওয়া হ'ল।

কিচেনের সব জিনিস স্থানীয় কমরেডদের হাতে বুঝিয়ে দিতে সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এল। বিদায় টিদায় নিয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়িয়েছি, আমরা প্রায় জনা পঞ্চাশেক এক দলে ছিলাম, আর হৈ হৈ করে মারপিঠ শুরু হয়ে গেল। মুহূর্তে কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল জানিনে। দেখি, অবিশ্রান্ত ইট-পাটকেল বর্ষণের মধ্যে আমরা জন ছয় সাত দাঁড়িয়ে আছি করবীদিকে ঘিরে।

অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। অচেনা জায়গা। মাঝে মাঝে পথের মোড় থেকে, ঝোপের আড়াল থেকে বাড়ীর কোণ থেকে টর্চের আলো এসে পড়ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইট ডাব পড়ছে আমাদের উপর। সেই ভয়াবহ তাণ্ডবের বর্ণনা হয় না। আমাদের সর্বশরীর থে'তলে গেল। মাথা, হাত, কপাল কারও না কারও ফাটলই। ভয় হচ্ছিল করবীদিকে নিয়ে। বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে করবীদি। এ অভিজ্ঞতা ওর ধারণার বাইরে ছিল। অন্ধকারের মধ্য থেকে হঠাৎ দিন্দা এগিয়ে এলেন। লক্ষ্য করিনি কখন যেন এগিয়ে গিয়েছিলেন। করবীদিকে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

বললেন, দাঁড়িয়ে লাভ নেই, এগিয়ে চল।

টর্চের আলো করবীদির উপর পড়তেই কে যেন চেঁচাল, ওরে, মেয়েমানুষ।

আরেকজন বললে, মার শালীকে। লুঠ কর।

দিন্দা চট করে করবীদিকে আড়াল করে দাঁড়াতেই একটা ডাব এসে তাঁর পিঠে পড়ল। কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে থাকলেন দিন্দা।

তারপর বললেন, এগোও, বাঁ দিকে মাঠ, তারপরেই রেল লাইন। ভয় নেই করবী। তুমি আমার হাত ধর।

সঙ্গে সঙ্গে একটা আধলা ইট দিন্দার কোমরে এসে পড়ল। দিন্দা যন্ত্রণা অব্যক্ত এক শব্দ করলেন। তারপর কোঁকিয়ে বলে উঠলেন, ভয় নেই করবী এগিয়ে চল।

আমরা মরিয়া হয়ে উঠলাম। লাহিড়ী বলল, দিন্দা, আমরা এখানটা সামলাচ্ছি, আপনারা এগিয়ে যান।

তারপর শুরু হ'ল, দু-পক্ষে ইট ছোঁড়াছুঁড়ি। দু-পক্ষেই ঘায়েল হল বেশ।

সব চেয়ে অবাক করল পুলিস। পুলিসের আড়াল থেকে ইট মেরে ওরা আমাদের ছাতু বানাবার জোগাড় করে তুলল, আর ওরা দিব্যি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

কি করে যে সেদিন স্টেশনে পৌঁচেছিলাম জানিনে। স্টেশনের আলোয় চেয়ে দেখি সর্বনাশ, জনা পঁচিশেক একেবারে রক্তে ভাসছে। সার সার পড়ে আছে প্লাটফর্মে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দিন্দার। তাঁর সর্বাঙ্গ থে'তলে গেছে। চাপ চাপ রক্ত সর্বদেহের এখানে ওখানে জমে আছে। চোখ বুজে নিশ্চল শুয়ে আছেন। ফেট্টি বাঁধা রক্তাক্ত মাথাটা করবীদির কোলের উপর। করবীদি নিষ্পলক চেয়ে আছে, দিন্দার দিকে।

ট্রেন এলে যত্ন করে একটা, সেকেণ্ড ক্লাসে তোলা হল দিন্দাকে। একজন ডাক্তার, করবীদি আর আমি উঠলাম। অযথা ভিড় বাড়তে আর দেওয়া হল না।

সারাপথ যে কিভাবে এসেছি, আমিই জানি। আমার নিজেরই গায়ে গতরে দারুণ ব্যথা। তবু সব ছাপিয়ে দিন্দার কথাই মনে পড়ছিল। দিন্দার বরাবরকার সঙ্গী একমাত্র আমিই আছি। মনে পড়ে বহুদিন আগে দিন্দাকে এমনি কাহিলভাবে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। যখন ওর টাইফয়েড হয়েছিল। তার মধ্যেও দিন্দা কাজের কথা ছাড়া কিছু বলেননি।

এইদিনও দেখলাম তাই। হঠাৎ একবার জ্ঞান হ'ল। জিগ্যেস করলেন, করবী, তুমি 'সেফ্'?

করবীদি বলল, হ্যাঁ। দিন্দা আবার চোখ বুজলেন।

করবীদি বলল, স্টেশনে পৌঁছেও এই কথা জিগ্যেস করছিল। সারাটা পথ কি মারই না খেয়েছেন, কিন্তু একটু উঃ কি আঃ কিছু করেনি।

॥ সাত ॥

ট্রেনে আসতে আসতেই করবীদি দিন্দার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন। আমি সেগুলি জানতাম না।

দিন্দা ওদের আত্মীয় হয় যেন কি

রকম। দিন্দাদের অবস্থাও এককালে খুব ভাল ছিল। কিন্তু ওর বাবা মারা যাবার সংগে সংগে সব যায়।

তখন দিন্দা দিনকতক ওদের বাড়ীতে থেকে পড়েছিল। সেই সময় করবীদির দিন্দাকে বড় ভাল লাগে। প্রথম প্রথম দিন্দা করবীদিকে আমল দিত না। নিস্পৃহ থাকত। কিন্তু দিন্দার মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। যার টানে করবীদি বারবার এগিয়ে এসেছে দিন্দার কাছে। হঠাৎ দিন্দা জেলে গেল। খালাস পেয়ে বছর দেড়েক বাদে ফিরেও এল। কিন্তু করবীদিদের বাড়ীতে আর উঠল না। উঠতে চাইলেও পারত না। সে দরজা দিন্দার কাছে জেল থেকেই বন্ধ হয়েছিল।

করবীদি বলল, দিন্দা যে জেল থেকে ফিরেছে তা জানতামও না। হঠাৎ কলেজের পথে একটা খাবারের দোকানের কাছে দিন্দার সংগে দেখা। বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে। কয়েদীদের মত। আমি কিছু না বলেই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। হয়ত কথাও বলতাম না। হঠাৎ নজরে পড়ল, এক ঠোঙ্গা মুড়ি কিনে দিন্দা গোগ্রাসে গিলছে। ঐ খাওয়ার রকম দেখেই দাঁড়িয়ে গেলাম। পারলাম না। মনে হল দিন্দা নিশ্চয়ই দিন দুয়েক খেতে পায়নি। এগিয়ে গিয়ে ডাক দিলাম।

দিন্দা করবীদিকে দেখে প্রথমটায় খুশী হয়নি। সাড়াও দেয়নি। একবার দেখেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে করবীদি সেদিন কলেজে গেল।

কিন্তু অবাক হলাম দিন দুয়েক বাদে, করবীদি বলল, বুঝলি, হঠাৎ কমনরুমে এক চিরকুট পাঠাল দিন্দা, দেখা করতে চায়। একবার ভাবলাম ফিরিয়ে দিই। কিন্তু পারলাম না, কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। সেদিন দেখা করলাম। টাকা চাইল কিছু, টাকা দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য, দিন্দা একটা টাকা কখনও নিজের জন্যে খরচা করেনি। যেমন অভুক্ত, অর্ধ-ভুক্তই কাটাতে লাগল। অথচ করবীদি দিন্দাকে নিয়মিত টাকা দিয়ে যেতে লাগল।

করবীদি বলল, মাসে একশ দেড়শ টাকাও দিয়েছি। কিন্তু দিন্দা যে কে সেই রয়ে গেল। দেখলেই মনে হ'ত যেন না খেয়ে আছে। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল থাক নাই বা জিগ্যেস করলাম, কি করে টাকা নিয়ে। কিন্তু পারলাম না। একদিন জিগ্যেস করতেই দিন্দা বললেন, হিসেব চাও? লজ্জা পেয়ে, থতমত খেয়ে বললাম, না না তা কেন? তারপর অনেক ঢোঁক টোক গিলে জিগ্যেস করলাম, খাওয়া দাওয়া করেন বলে মনে হয় না, তাই ওকথা জিগ্যেস করলাম।

দিন্দা বলেছিলেন, খাবার মত পয়সা রাখতে বিবেকে বাধে। আমার উপর পার্টি যে কটা টাকা তোলার ভার দিয়েছে তাই তুলতে পারিনে।

সেই প্রথম পার্টির কথা শুনলাম। তারপর তো ধীরে ধীরে পার্টির সভ্যাই হলাম। করবীদি বলে যেতে লাগল, এমন কোন খারাপ কাজ নেই, ক-বছর ধরে দিন্দা আমাকে দিয়ে যা না করিয়েছে। আশ্চর্য দিন্দার মনে কোন পাপবোধ নেই। খারাপ কাজ বলে কিছু নেই। পার্টির জন্য যা করা যায় তাই ভাল কাজ। কিন্তু আমার মন তো দিন্দার মত অত শক্ত সবল নয়। আমি ভয় পেতাম। আতঙ্ক হ'ত। দিনে দিনে অন্ধকার যেন গ্রাস করতে লাগল আমায়। পরিত্রাণ চাইতাম, পারতাম না। দিন্দার চৌম্বিক ব্যক্তিত্ব আমার অন্তরাত্মার বিদ্রোহকে গলা টিপে টিপে দমন করত। শেষ পর্যন্ত মুক্তির জন্যে, আলোর জন্যে, সদর পথে হাঁটার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠলাম। হয়ত পারতাম না। হয়ত চিরদিন অন্ধকারকেই আঁকড়ে থাকতে হ'ত। দিন্দাকে এড়াতে পারতাম না বলেই ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম, প্রবল ঘৃণা। সেই দিন্দার ছায়াতেই জীবন কেটে যেত। করবীদি একটু থেমে তারপর বলল, যদি না শরৎদাকে পেতাম।

করবী, দিন্দা ডাক দিলেন। ট্রেন হুইসল্ দিল। করবীদি চমকে চাইলেন দিন্দার দিকে।

করবী, তুমি সেফ্?

করবীদি অসীম মমতায় দিন্দার হাতখানা চেপে ধরে বললেন, হ্যাঁ।

যেন করবীদিকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সেই ভয়ে দিন্দা করবীদির হাত শক্ত করে ধরে থাকলেন।

দিন্দা বেশ জখম হয়েছিলেন। কলকাতায় হাসপাতালে ছিলেন দিনকুড়ি। করবীদিও ছিলেন। শুনলাম ওরা দুজনেই ফিরে এসে করবীদিদের বাড়িতে উঠবে। করবীদির বাবা নিজেই উদ্যোগ করে কলকাতায় গিয়ে ব্যবস্থাটা করে এসেছেন। দিন্দার কিছুদিন বিশ্রাম দরকার।

করবীদির চিঠি পেয়ে স্টেশনে গিয়েছিলাম ট্রেন থেকে দুজনে একসংগে নামলেন। দিন্দার কপালে সদ্য শুকানো ত্যারচা একটা কাটা দাগ। আমার মনে হ'ল জয়টিকা।

ঘোড়ার গাড়িতে ওদের সংগে আসতে আসতে বাড়ীর কাছে এসে যখন নামতে গেলাম তখন করবীদি আমার কানে ফিসফিস করে বলল, ডিসেম্বরে অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্স হবে লখ্নউতে, ওর ইচ্ছে বিয়েটা সেইখানেই হয়, শেষ অধিবেশনের পর। প্রথমটায় একটু অবাক অবাক লাগলেও সামলে নিলাম। শেষ পর্যন্ত করবীদি দিন্দাকেই বিয়ে করছে। আশ্চর্য বটে!

হেসে বললাম, এক কনফারেন্সের শেষে যার শুরু, আর কনফারেন্সের শেষ দিয়ে তা সারা করতে চাও।

করবীদি খিলখিল করে হেসে উঠল।

দিন্দা পার্টি আফিসে এসে বসবার শক্তি পেলেই আমাকে শহর ছেড়ে বেরুতে হল। পার্টির কাজ অসম্ভব বেড়ে গেছে। লোক দরকার প্রচুর। একটু পোক্ত হলেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্যত্র নতুন কেন্দ্র গঠনের কাছে।

এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে বিহারে এসে নভেম্বর মাস নাগাত ডেরা গাড়লাম। বছরখানেকের মত এখানে স্থিতি।

ডিসেম্বরে নয়, লখ্নউ সম্মেলন হ'ল ফেব্রুয়ারীতে।

দিন্দাও এসেছেন কিন্তু কোথায় করবীদি? আমি চুপ করে আছি। দিন্দা বললেন, বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্নর চিঠি পাঠিয়েছিল। সংগে একটা চিরকুট।

জিগ্যেস করলাম, কি লিখেছিল।

দিন্দা বললেন, পড়ে দেখিনি।

প্রায় ছ'বছর বাদে, কলকাতার এক বাসে, গত বছর করবীদির সংগে দেখা হয়েছিল। তখন ইস্ট রেঞ্জে ওরা বাসা করেছে।

সে বাসায় একদিন গিয়েছিলাম। করবীদির ঘরকন্নাও দেখেছিলাম। আর জিগ্যেস করেছিলাম, দিন্দাকে কেন বিয়ে করলে না।

করবীদি বলেছিল, দিন্দা ভাই মানুষ নয়, একটা রাজনৈতিক দলের প্রত্যঙ্গ। আমি মানুষ চেয়েছিলাম, যন্ত্রিক নয়, রক্ত মাংসের। আমি জীবন চেয়েছিলাম। পার্টি নয়। তোরা হয়ত হাসবি। একদিনকার বিপ্লবী মেয়ের মুখে আজকের এই কথা শুনে বিদ্রূপ করবি। কিন্তু পার্টিতে আমি ছিলাম বঁড়শি বেঁধা মাছ। পরিত্রাণের জন্য লেজের ঘাই মারতাম। তোরা ভাববি কি তেজ। রাজনীতি তো জীবন নয় ভাই, জীবনের একটা অংশ।

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা', কবির এই উক্তি সুজ্ঞাত। এই রঙ্গরসের একটি বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে ছন্দের খেলায়। তারই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করব এই প্রবন্ধে।

ছন্দ নিয়ে খেলা করবার প্রবৃত্তি কখন প্রথম দেখা দিয়েছে, তার সন্ধান করতে চেষ্টা করব না। ভারতচন্দ্রের রচনায় তার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। ভারতচন্দ্র ছিলেন পণ্ডিত এবং রসিক লোক। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তিনটি লাইনে—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলংকারসংগীতশাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ-আগমবেত্তা নাগরী পারসী।

এতগুলি বিদ্যার তিনি অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত বিদ্যার বোঝা চাপিয়ে তিনি সাহিত্যকে ভারাক্রান্ত করে তোলেননি। কারণ শুধু পাণ্ডিত্য নয়, রসবোধেরও তিনি অধিকারী ছিলেন। সে কথা তাঁর উক্তিতেই সুস্পষ্ট—

পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি॥
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ, না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

সংস্কৃত সাহিত্য তথা নাগরী ও পারসী বিদ্যার অধিকারী হয়েও লোকবোধ, প্রসাদগুণ ও রসালতার খাতিরে তিনি 'ভাষা'তেই অর্থাৎ বাংলাতেই কাব্য রচনা করেছেন। এই ভাষা কাব্যের আদর্শ কি ছিল, তাও তাঁর উক্তিতেই প্রকাশ পেয়েছে।—

ভারতের রচিতের অমৃতের ভার।
ভাষাগীত সুললিত অতুলিত সার॥

এই সুললিত ভাষাগীতে তিনি যে কাব্যরসামৃত পরিবেশন করেছিলেন, তার লক্ষ্য ছিল লোকসাধারণ। বাংলা 'ভাষা'র সঙ্গে তিনি যে কিছু কিছু যাবনী অর্থাৎ পারসী মিশাল দিয়েছিলেন, তার কারণ তৎকালে ওই পরিমাণ যাবনী লোকবোধ্য ছিল। শুধু যাবনী নয়, ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে বহু পরিমাণে সংস্কৃত শব্দও ব্যবহার করেছিলেন: কারণ ওই পরিমাণ সংস্কৃতও তৎকালীন লোকের পক্ষে 'বুঝিবারে ভারি' ছিল না।

বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত ও যাবনী মিশাল দিয়ে যে নূতন রকমের হাস্যরসও সৃষ্টি করা যায়, তা বোধ করি ভারতচন্দ্রই প্রথম অনুভব করেছিলেন। অনুপ্রাস-শ্লেষ-যমক অলঙ্কারের সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টির প্রথা প্রচলিত ছিল বহুকাল ধরেই। আর, শুধু ছন্দ প্রয়োগের দ্বারাই যে হাস্যরস সৃষ্টি করা যায়, তার নিদর্শন পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের রচনায়। বলা বাহুল্য, এই কাজে ভাষাপ্রয়োগের নৈপুণ্যও থাকা চাই। এসব ক্ষেত্রে ভাষার মিশ্রণ যে আরও কার্যকর হয়, তাও দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্র। অবশ্য অমিশ্র ভাষার ছন্দেও যে হাস্য সৃষ্টির সহায়তা হতে পারে, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে।
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমন্তিকে॥
—বিদ্যাসুন্দর, মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি

এটা সংস্কৃত তূনক ছন্দে এবং বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এখানে ভাষা ও ভাবে গাম্ভীর্য সুস্পষ্ট, হাস্যরসের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু এই তূনক ছন্দকেই বাংলা ভাষায় প্রয়োগ করা হয়েছে কৌতুক উৎপাদনের অভিপ্রায়ে।

যথা—

প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥...
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁপ ছিণ্ডিল।
পূষণের দূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল॥
বিপ্র সর্ব দেখি পর্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ লাথি কীল মারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে॥
—অন্নদামঙ্গল, দক্ষ যজ্ঞনাশ

বলা প্রয়োজন যে, এই অংশটিকে খাঁটি বাংলা রীতিতেও পড়া যায়। কিন্তু এভাবে পড়লে এর আসল মজাটুকুই পাওয়া যাবে না। সেটুকু রয়েছে এর সংস্কৃত উচ্চারণ ও ছন্দের মধ্যে। এখানে হসন্তচিহ্নহীন অকারান্ত বর্ণগুলিকে সংস্কৃত পদ্ধতিতে অকারান্ত রূপেই উচ্চারণ করতে হবে, দীর্ঘ-স্বরগুলির উচ্চারণও হবে দীর্ঘ। এভাবে উচ্চারণ করলেই এর অভিপ্রেত ছন্দ-রূপও প্রকাশ পাবে এবং আসল মজাটুকুও টের পাওয়া যাবে।

ভারতচন্দ্রের 'নাগরী' অর্থাৎ হিন্দী কবিতার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

গঙ্গ কহো গুণসিন্ধুমহীপতি নন্দন সুন্দর
কোঁ নহি আয়া।
জো সব ভেদ বুঝায় কহা জি ধোঁ নহি তঁহা
সমুঝায় শুনায়া॥
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধি ভুল গয়া
অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো অব ভণ্ড ভয়া কবিতাই ভটাইমে
দাগ চঢ়ায়া॥
—বিদ্যাসুন্দর, ভাটের প্রতি রাজার উক্তি

অন্য ধরনের হিন্দী রচনার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

শোন্ রে গোঁয়ার্ লোগ্
ছোড়্ দে উপাস্ রোগ্
মানহুঁ আনন্দ ভোগ্
ভৈ'ষ রাজ যোগ্মে।
আগ্মে লাগাও ঘীউ
কাহে কো জ্বলাও জীউ
এক রোজ প্যার পিউ
ভোগ্ এহি লোগ্মে॥
—চণ্ডীনাটক মহিষাসুরের উক্তি

এখানে হিন্দী ও বাংলা ভাষা ও ভঙ্গির মিশ্রণ উপভোগ্য। কিন্তু ছন্দটা বাংলা পদ্ধতির চৌপদী। ভারতচন্দ্র এই সামান্য মিশ্রণেই সন্তুষ্ট থাকেননি। সংস্কৃত, ফার্সি, বাংলা ও হিন্দীর মিশ্রণজাত এক অভিনব চতুরঙ্গ চৌপদীর দৃষ্টান্তও আছে তাঁর রচনায়। বলা বাহুল্য, এরও লক্ষ্য লোক-মনোরঞ্জন ও কৌতুকসৃষ্টি।—

যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি
দর জানে মন্ আয়ৎ খোসি।
আমার হৃদয়ে বসি
প্রেম্ কর্ খোস হোয়্কে।
ভূয়ো ভূয়ো রোরু দসি
ইয়াদৎ নমুদা যাঁ কোসি
আজ্ঞা কর মিলে বসি
ভারত ফকির খোয়্কে॥
—বিবিধ কবিতা

ভারতচন্দ্র ছিলেন বহুভাষাবিৎ ছন্দ-রসিক কবি। আধুনিক কালে সত্যেন্দ্রনাথও ছিলেন তাই; সুতরাং তিনিও কৌতুক সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ভারতচন্দ্রের অনুবর্তন করবেন, তা বিচিত্র নয়। দৃষ্টান্ত—

আমি তোরে ভালোবাসি, লো দ্যাখন-হাসি,
জাদু কিয়া মুঝে তুঁহি;
এখন চুমু দিতে গেলে চুমকুড়ি দিয়ে
কথং হসসি?—ব্রূহি।...
দ্যাখ ঘাট হয়ে থাকে মন কানটাকে—
লুতুর পেঠেই এম্;

শুধু কেঁদো না ফুঁপিয়ে কেটো না কুপিয়ে,
Thats' no fare game
দ্যাখ ভাষাপঞ্চকে গাঁথিলেন শ্লোকে
রায় গুণাকর ধীর;
আর তোমারে তুষিতে জবান্-পাঁচিশী
রচিল কলমগীর।...
তোমারে হাসাতে অশেষ ভাষাতে
বিশ্ব-Esparanto
করেছি রচনা, অয়ি সুলোচনা
মেছো আঁখি, হও শান্ত॥
—হসন্তিকা জবান-পাঁচিশী

আধুনিক কবির উপরে ভারতচন্দ্রের ছন্দোময় হাস্যরসের বিশেষ প্রভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ভারতচন্দ্র পত্তনিদার রামদেব নাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে 'নাগাষ্টক' নামে যে সংস্কৃত কবিতাটি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট লিখে পাঠান, বাঙালির ছন্দ রচনার ইতিহাসে তার উল্লেখ করবার প্রয়োজন আছে। এই কৌতুক-কবিতাটি সংস্কৃত শিখরিণী ছন্দে রচিত, কিন্তু তার কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও আছে। এখানে সবটা কবিতা উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। শুধু প্রথম ও পঞ্চম শ্লোক-দুটি উদ্ধৃত করছি।—

গতে রাজ্যে কার্যে॥ কুলবিহিতবীর্যে। পরিচিতে
ভবন্দেশে শেষে॥ সুরপুরবিশেষে। কথমপি।
স্থিতং মূলাযোড়ে॥ ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো॥ প্রসতি সারিরাগো।
হরি হরি॥ ১

মহারাজ ক্ষৌণীতিলককমলার্ক। ক্ষিতিমণে
দয়ালো ভূপাল॥ দ্বিজকুমুদ জাল। দ্বিজপতে।
কৃপাপারাবার॥ প্রচুরগুণ সার। শ্রুতিধর
সমস্তং মে নাগো॥ প্রসতি সারিরাগো।
হরি হরি॥ ৫

বলা বাহুল্য, হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরগুলির উচ্চারণ যথাবিহিত হওয়া চাই। নতুবা এই সংস্কৃত ছন্দটির সৌষ্ঠব বজায় থাকবে না। শিখরিণী ছন্দের প্রতি পংক্তিতে থাকে সতের অক্ষর এবং প্রতিপংক্তির ষষ্ঠ অক্ষরের পরে একটি যতি থাকা চাই। উদ্ধৃত অংশটুকুতে পঞ্চম পংক্তিতে যতির নিয়মটি লঙ্ঘিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্র এই রচনাটিতে অধিকাংশ স্থলেই ত্রয়োদশ অক্ষরের পরে একটি অতিরিক্ত যতি রেখেছেন এবং অনেক স্থলেই মিল দিয়ে যতিদুটিকে স্পষ্টতর করে তুলেছেন, যেমন—নাগো এবং রাগো। আবার কখনও কখনও প্রথম যতিবিভাগটির মধ্যেও একটি অতিরিক্ত মিল (যেমন—দেশে-শেষে, দয়াল-ভূপাল) দিয়ে ছন্দটিকে আরও মনোজ্ঞ করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সতের বছর বয়সে বিলাতে যান এবং সেখানে বৎসরাধিককাল (১৮৭৮-৮০) বাস করেন। সে সময়ে তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে এক পত্রে বিলাত-গামী নব্যবাঙালিদের সম্বন্ধে একটি কৌতুক কবিতা পাঠান। কবিতাটি নাগাষ্টকের মতোই শিখরিণী ছন্দে লেখা। কিন্তু তার ভাষা সংস্কৃত নয়, ইংরেজিমিশ্রিত বাংলা; আধুনিক কালের 'যাবনী' অর্থাৎ ইংরেজি-মিশাল থাকাতেই এর কৌতুকরস জমেছে আরও ভাল। কবিতাটি ছোট, মাত্র চার শ্লোক। সুতরাং সমস্তটাই উদ্ধৃত করে দিলাম।—

বিলাতে পালাতে॥ ছট ফট করে নব্য গউড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে॥ গৃহগ-বিহগ-প্রাণ দউড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে॥ গুরুজনবশে কিছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা॥ ধুতি-পিরহনে
মান হয় না।'

পিতা মাতা ভ্রাতা॥ নবশিশু অনাথা। হুট ক'রে,
বিরাজে জাহাজে॥ মসিমলিন কোর্তা। বুট প'রে।
সিগারে উদ্‌গারে॥ মুহু মুহু মহা ধূম-লহরী,
সুখস্বপ্নে আপ্নে॥ বড় চতুর মানে।
হরি হরি॥ ২

ফিমেলে ফী মেলে॥ অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে, উৎসাহে॥ মগন তিনি সাহেব গিরিতে।
বিহারে নীহারে॥ বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে॥ দুখিজন রহে জীবন ধরি॥ ৩

ফিরে এসে দেশে॥ গল-কলর বেশে। হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে, ॥ উলগতনু দেখে। বড় চটে।
মহা আড়ী সাড়ী॥ নিরখি, চুলদাড়ী। সব ছিঁড়ে;
দুটা লাথে ভাতে॥ ছরফট করে আসন-পিঁড়ে॥ ৪

বালক রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাত থেকে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' প্রকাশ করছিলেন ভারতী পত্রিকায়। এই কবিতাটিও তখন 'কোন মান্য বন্ধু'র রচিত বলে পঞ্চম পত্রের অন্তর্গত হয়ে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, "এ কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পড়তে পার, তা হলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে। অতএব নিতান্ত অক্ষম হলে বরঞ্চ একজন ভট্টাচার্যের কাছে পড়িয়ে নিও।" বলা প্রয়োজন যে, এটি যেভাবে ভারতীতে মুদ্রিত হয়েছিল তাতেও সংস্কৃত ছন্দ রক্ষিত হয়নি, যেমন—গৌড়ে, দৌড়ে, হুটু কোরে, বুটু পোরে। ছন্দের খাতিরে উপরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে দেওয়া গেল।

যা হক, একটু মিলিয়ে দেখলেই বোঝা
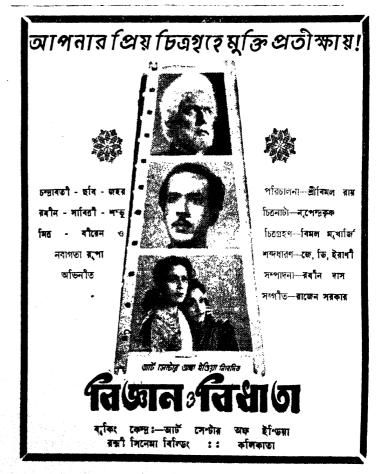
যাবে দ্বিজেন্দ্রনাথের এই কবিতাটি ভারতচন্দ্রের নাগাষ্টকের অনুসরণেই রচিত, যদিও এটির স্বকীয় বিশেষত্বও আছে। পংক্তির মধ্যে একটি অতিরিক্ত যতি স্থাপন এবং বিশেষ করে যতিতে যতিতে কিংবা প্রথম যতিবিভাগের মধ্যেই দুই শব্দে মিল দেওয়া (যেমন—বিলাতে-পালাতে, এসে-দেশে-বেশে). এই দুটি বিষয়ে নাগাষ্টকের সঙ্গে এটির সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। নাগাষ্টকের প্রত্যেক শ্লোকের শেষেই আছে 'হরি হরি'। দ্বিজেন্দ্রনাথও দ্বিতীয় শ্লোকের শেষেই ওই শব্দ-দুটি ব্যবহার করেছেন। নাগাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকের প্রথম লাইন এই—

পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরজিনী।

এই লাইনটির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'পিতা মাতা ভ্রাতা নবশিশু অনাথা' এই অংশটুকুর সাদৃশ্যও উপেক্ষণীয় নয়।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচিত ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে। এই পুস্তকে ভারতচন্দ্রের নাগাষ্টক কবিতাটিও প্রকাশিত হয়েছিল। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স পনেরো বছর। দ্বিজেন্দ্রনাথের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁর শিক্ষাগুণে দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্যে খুবই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। মনে হয় ওই সময়েই তিনি ভারতচন্দ্রের নাগাষ্টকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

নাগাষ্টকের রচনাকাল আনুমানিক ১৭৫০ সাল। আর, দ্বিজেন্দ্রনাথের উদ্ধৃত কৌতুক-কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৮৭৮-৭৯ সালে। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে ভারতচন্দ্রের প্রভাব শতাধিক বৎসর পরেও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় নি।

সংস্কৃত, বাংলা ও যাবনী মেশানো আর একটি কৌতুক কবিতার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এটি শুনেছি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর কাছে। তিনি নাকি এটি পেয়েছিলেন চন্দ্রমোহন বিদ্যারত্ন প্রণীত উদ্ভট চন্দ্রিকা গ্রন্থে। শ্লোকটি এই—

গঙ্গা পাজিস্বভাবা॥ তনুকুশকারিণী॥
পূতিগন্ধানুরাগা।
নস্যং মৌর্খ্যহরং। সত্যং চ গুড়ুকং॥
ক্ষুদ্রাঃ সহেরন্ চরস্।
সিদ্ধিনুর্দ্ধিবিবর্ধিনী খলু নৃণাং॥
খর্শান ভর্সাস্থলী।
আফিঙ্গারু মজা। ইয়ারখুশিদিল্॥
মদ্যং মজাদায়কম্॥

বলা বাহুল্য এটা সর্বতোভাবেই সংস্কৃত-ভঙ্গিতে পড়তে হবে। এই শ্লোকটির প্রথম লাইন রচিত স্রগ্ধরা ছন্দে, বাকি তিন লাইনের ছন্দ শার্দূলবিক্রীড়িত। সংস্কৃত ছন্দ বজায় রেখে এটিকে বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম। অনুবাদটি পড়তে হবে খাঁটি বাংলা ভঙ্গিতেই। তা হলেই এর মজাটুকু উপভোগ করা যাবে।—

গঙ্গায় পঞ্জর করায় ক্ষীণ, স্বভাবেও পাজি খুব,
বিশ্রী গন্ধেই করায় বশ।
পণ্ডিত নস্য টানেন, গুড়ুক সাধুসমাজ,
ক্ষুদ্রের দলেই চায় চরস॥
বুদ্ধির বৃদ্ধিসাধক—সুনাম কিনেছে ভাঙ,
খর্শান পেলেই ভর্সা পাই।
খুশদিল আর মজাদার আফিং ধর ইয়ার,
মদ্যের মজার অন্ত নাই॥

খর্শান মানে খৈনি। নেশার অন্য উপাদানগুলি সুপরিচিত। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলা মেশানো একটি কৌতুক শ্লোকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি সুকুমার সেন প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে। শ্লোকটি পাওয়া গিয়েছে একটি পুঁথিতে। রচনাকাল সম্ভবত ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদ। শ্লোকটি এই।—

তৈলাৎ খুস্কোঽপি সম্যক্।
ভালমতে ভিজে না-। কিং পুনর্হস্ত পাদৌ,
শ্বশ্রূর্যাতা গৃহে মে। খাতে কিছু বলে না-।
সর্বদা কয় রাঁদো-গা-।
লজ্জাশীলা ঃ পুমাং সো। যদি কিছু খাতে দেয়।
তত্র বৈরী মাগী-রা-,
ইত্থং বাসো গুরো মে। লুকি চুরি করিয়া।
প্রাণ বাঁচায় বৌছুড়ী-রা—॥

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম সং, পৃ ৪৬৬

শুধু সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা নয়, সংস্কৃত আর বাংলা উচ্চারণও এখানে মিশে গিয়েছে। শ্লোকটি স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত। সংস্কৃত অংশের উচ্চারণ সংস্কৃত রীতি-অনুযায়ী। বাংলা অংশ পড়তে হবে বাংলা ধরনেই, কেবল কয়েকটি জায়গায় সংস্কৃত ঢঙে দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে; সেগুলি চিহ্নিত করে দিলাম। বাংলার পল্লী বধূদের দুঃখের কাহিনীকেই কৌতুক রূপ দেওয়া হয়েছে এই স্রগ্ধরা ছন্দের শ্লোকটিতে। সংস্কৃতের মিশ্রণ বাদ দিয়ে অথচ ছন্দ বজায় রেখে এটিকে খাঁটি বাংলায় রূপান্তরিত করে দিলে এর কৌতুকরসটাই মারা পড়বে, বোধহয় পড়বে তার প্রচ্ছন্ন করুণ রসটি। যেমন—

তেল নেই গায় তার, মাথার চুল। ভাল মতে
ভিজে না,। হাতপা থাকবেই তো রুক্ষ,
দিনরাত রাঁধতেই হুকুম দেন। শ্বাশুড়ী ও
বড় জা, । দেন না অন্নই, কি দুঃখে!
লজ্জায় চুপচাপ পুরুষলোক। যদি কিছু খেতে
দেন, । বাদ সাধেই তায় নারীর দল,
বাংলার বৌ-সব বাঁচায় প্রাণ। লুকোচুরি করি,
আর। বুক ভিজায় তার চোখের জল॥

ছন্দের খেলায় যাবনী মিশাল দেওয়া দেবভাষার আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি দিলীপকুমারের উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থ থেকে।—

খোদাপাদারবিন্দদ্বয়ভজনপরঃ
পশ্চিমাস্যঃ পিতা মে
শ্রুত্বাল্লাল্লেতিবাণীং মুরশিদ নিকটে
মর্ত্যদেহং জহৌষ।
খাসীমুর্গীসুখানা কদু কিছু ভবিতা
মৎপিতুশ্চাল্‌সিখানাং
শেখঃ শ্রীনূরনামা গলধৃতবসনঃ
প্রেত্য সম্পাদনীয়া॥

• উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, সপ্তম উল্লাস, পৃ ৮৯

এখানেও স্রগ্ধরা ছন্দেরই খেলা। এই শ্লোকটিতে ভাষার কিছু ত্রুটি আছে। তবু এর মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। শ্রীনূর শেখ নামে জনৈক মুসলমান গলবস্ত্র হয়ে তাঁর পিতার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাচ্ছেন।—'আমার পিতা পশ্চিমমুখী খোদার পদারবিন্দ ভজন করতে করতে এবং আল্লা আল্লা বাণী শুনতে শুনতে মুরশিদাবাদের নিকটে মর্তদেহ ত্যাগ করেছেন। [অতএব তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে অনুগ্রহপূর্বক] আমার পিতার গৃহে গিয়ে কিছু কদু অর্থাৎ লাউ-যুক্ত খাসী ও মুর্গীর সুখাদ্য গ্রহণ করবেন। ইতি গললগ্নবাস শ্রীনূর শেখ।' চাল্‌সিখানা শব্দের অর্থ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে খানা কথাটিকে বাসস্থান বা গৃহ অর্থে গ্রহণ করলেই ভাষাগত সংগতি থাকে এবং অর্থও স্পষ্টতর হয়।

এবার ছন্দের খেলার আরও দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। দুটিই শুনেছি আমার প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্যের কাছে। এ দুটিও স্রগ্ধরা ছন্দেই রচিত।

গ্রামান্তরেহহং । ভাল বটে শিরিণী।
সত্যনারায়ণস্য
তত্রাতিহর্ষাৎ । আটখানি বাতাসা।
পাইলামাবশেষে।
তীব্রান্ধকারে । চোখে কিছু দেখি না।
ঘা গুঁতো খাই কপালে,
খেদান্বিতোহহং । ফিরে আসি বাড়িতে।
বৌ বলে হায়, 'বটে রে'॥

শ্লোকটিকে ছন্দ বাঁচিয়ে পড়বার একটা ...ষ কায়দা আছে। কেন না এটিতে ...কৃত ও বাংলা উচ্চারণের সমন্বয় ঘটেছে। ...্যেক লাইনের তিনটি অংশ। প্রথম অংশ ...স্কৃত, বাকি দুই অংশ বাংলা; কেবল ...ম লাইনের তৃতীয় অংশটিও সংস্কৃত। ...্যবর্তী বাংলা অংশটি স্বাভাবিক বাংলা ...ধতিতেই পড়তে হবে, কেবল 'আট' ...ব্দের ট-এর উচ্চারণ হবে অকারান্ত। ...য বাংলা অংশটিকে কিন্তু সংস্কৃত ...দ্ধতিতেই পড়তে হবে; কেবল 'পাইলাম ...ব্দের ই-কে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে, ...কন্তু 'খাই' শব্দের ই-র স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য ...য়। দুটি বাংলা অংশের এই দ্বিবিধ ...চ্চারণ এই শ্লোকটিতে মজা সৃষ্টির যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

দ্বিতীয় শ্লোকটির দুটিমাত্র লাইন মনে আছে। তাই উদ্ধৃত করছি।—

শুনছেন ন্যায়রত্ন দা-দা, আমি বড় ঠেকেছি,
আপনি হন গ্রামকর্তা;
দশ টা-কা-কর্জ করবো, কত করে দেব সুদ,
জানতে চাই সত্য বার্তা।

এরও ছন্দ স্রগ্ধরা। অর্থাৎ ছন্দ সংস্কৃত, কিন্তু ভাষা বাংলা। উচ্চারণও খাঁটি বাংলা, কেবল দাদা ও টাকা শব্দে আকারের উচ্চারণ সংস্কৃত অর্থাৎ দীর্ঘ। এখানে বিশেষভাবে বলবার কথা এই যে, এই শ্লোকটির অজ্ঞাত রচয়িতা অজ্ঞাতসারেই সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোরীতির আশ্রয় নিয়েছেন, অর্থাৎ তাঁকে বলতে হবে সত্যেন্দ্র-প্রবর্তিত ছন্দোরীতির অগ্রদূত। বস্তুত যে নীতি ধরে সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন সচেতনভাবে, বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত সেই নীতিটিকে উদ্ভট শ্লোক-রচয়িতারা নিজেদের অলক্ষ্যে অনুভব করেছিলেন বহুকাল পূর্বেই। সত্যেন্দ্রনাথ সেই পূর্বানুভূত নীতিটিকেই সচেতন স্বীকৃতি দিলেন, কিন্তু তাও নিজের অজ্ঞাতসারেই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে খেলার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত পেয়েছি চিরকুমার সভা নাটকের প্রথম দৃশ্যে। যথা—

কত কা-ল রবে-বল ভা-রত রে—
শুধু ডা-ল ভা-ত জল পথ্য করে।
দেশে অন্নজলের্ হল ঘোর্ অনটন-,
ধর হুইস্কি সোডা-আর মুর্গীমটন্।
যাও ঠা-কুর চৈতন চুট্‌কি নিয়া-,
এস দা-ড়ি নাড়ি-কলিমদ্দি মিঞা—॥

এটা তোটক ছন্দের আদর্শে রচিত, কেবল 'ভাত' শব্দে এ ছন্দের নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। হসন্তচিহ্নহীন অকারান্ত বর্ণগুলির উচ্চারণ অকারান্তই হবে। আর, হাইফেন চিহ্নহীন দীর্ঘস্বরগুলির উচ্চারণ হবে হ্রস্ব। এভাবে পড়লেই তোটক ছন্দের ভঙ্গি স্পষ্ট বোঝা যাবে। অকারান্ত ও দীর্ঘস্বরান্ত বর্ণের এই দ্বিবিধ উচ্চারণের যোগেই এর হাস্যরস ঠিকরে বেরোচ্ছে। প্রথম দুই লাইনে সংস্কৃত পদ্ধতি এবং তৃতীয় লাইনে সত্যেন্দ্রনাথের পদ্ধতি নিখুঁত-ভাবে অনুসৃত হয়েছে। বাকি তিন লাইনে এই দুই রীতির মিশ্রণ ঘটেছে অজ্ঞাত কবিদের উদ্ভট-শ্লোকের মত।

এবার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত মন্দাক্রান্তা ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণগমনে, কিন্তু পাথেয় নাস্তি,
পায়ে শিক্‌লী, মন উড়ু উড়ু,
একি দৈবের শাস্তি।
টঙ্কাদেবী, কর যদি কৃপা, না রহে কোন জ্বালা,
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না,
খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥

চার লাইনে সর্বত্রই সংস্কৃত উচ্চারণ বজায় রাখতে হবে। খাঁটি বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণই এখানে হাস্যরস সৃষ্টির আনুকূল্য করেছে।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী তাঁর যজুর্বেদ-সংহিতার বঙ্গানুবাদের (১৮৭৭) প্রারম্ভে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত যে 'অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' দিয়েছেন, সুকুমার সেন-কৃত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে তাও এস্থলে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এই শ্লোকটিতে তথ্যবিকৃতির সঙ্গে যে ঈষৎ কৌতুকরসের মিশ্রণ ঘটেছে তাই বিশেষভাবে উপভোগ্য।—

গৌড়ে, কাল্‌না-সুরধনিতটে ধাইগাঁ গ্রাম জানো,
সেই স্থানে নরগুরুকুলে রামকান্তো ছিলেনো।
পাটনা জেলা জজিয়তি-পদে মানাযুক্তো হলেনো,
তাঁরী পুত্রো বহু গুণ যুতো রামদাসো পিতানো॥
—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (১ম সং), পৃঃ ৪৭৫

হসন্তচিহ্নহীন অকারান্ত বর্ণ ও দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ ঠিক সংস্কৃত অনুসারী এবং 'ধাই' ও 'সেই' শব্দের ই-র পূর্ণ উচ্চারণ হওয়া চাই। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উচ্চারণই কৌতুকানুভূতির হেতু।

সত্যেন্দ্রনাথ খাঁটি বাংলা উচ্চারণ বজায় রেখে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করবার একটা নূতন রীতি উদ্ভাবন করেছিলেন। এই নূতন রীতির মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত তাঁর 'যক্ষের নিবেদন' (কুহু ও কেকা) কবিতাটি সুখ্যাত। এই নূতন রীতির মন্দাক্রান্তা ছন্দকেও কৌতুক-রচনার কাজে লাগিয়েছেন শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু। যথা—

মন্দাক্রান্তায় রচিল কালিদাস কাব্য মেঘদূত
চমৎকার,
বাংলায় তদ্রূপ লঘু গুরুবিভেদ নেই বলেই
শক্ত একটু।
যুক্তাক্ষর তাই যত পার চালাও আর দেদার
দাও হসন্ত,
ঠিক ঠিক জায়গায় বসালে পাবে এই তক্রে
কিঞ্চিৎ দুধের স্বাদ॥
—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ কার্তিক

একটা অনুষ্টুপ্ ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি দ্বিজেন্দ্রলালের কৌতুক-রচনা থেকে।—

আশ্চর্যরূপ রাজত্ব বাঙালীর বলে-সবে।
কেবল বক্তৃতা-জোরে করে রাজ্য চবৈ তুহি॥...
বাঙালী-মহিমা-কীর্তি-কলাপ-কাহিনী-যদি।
শুন মন দিয়া-বাবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
—আষাঢ়ে—কল্কিযজ্ঞ

এটাকে যদি সম্পূর্ণরূপেই অনুষ্টুপ ছন্দের ঢঙে সংস্কৃত উচ্চারণ পদ্ধতিতে আবৃত্তি করা যায়, তাহলেই এর মজাটুকু পুরোপুরি উপভোগ করা যাবে।

এবার সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তবর্গীয় ছন্দের দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েই প্রবন্ধ শেষ করছি। প্রথমটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের।—

ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পতি,
যমপ্রতাপ চ নাহিক মে।
ন চ নন্দনকানন স্বর্ণসুবাহন,
পদ্ম বিনিন্দিত পদযুগ মে॥
আছে সন্ধি-পদ রজরত্তি,
তাও পবিত্র কি জানিতনে।
চৌদ্দপুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি,
অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে॥
মেঘাচ্ছন্নে শনি-অপরাহ্নে যদি গুরু বাধা
না ঘটে মে।
কিংবা যদ্যপি [illegible] চুপিচুপি প্রেরিত না হই
পরধামে॥

এটা জয়দেবের 'চন্দনচর্চিত নীলকলেবর' ইত্যাদি রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত পদ্ধতিতেই পঠনীয়। কেবল 'তাও' শব্দের স্বাতন্ত্র্যহীন 'ও' এবং 'ঘটে' শব্দের এ-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব।

এবার দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা থেকে একটি পজ্ঝটিকা ছন্দের দৃষ্টান্ত দেখাই।—

অন্তত নাসা রক্ষার্থে সে
কানমলা হয় গিলিতে হেসে।...
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ,
যা কর সাহিব, নাড়িব পুচ্ছ।...
রহিও খুশি, ঘুষি আস্‌টা রাগে
মেরো নাকো কেবল নাকে।...
ও ঘুষি পড়িলে গণ্ডে জোরে
একেবারে মাথা ঘোরে॥
—আষাঢ়ে, কর্ণ-বিমর্দন কাহিনী

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, "এই লেখাটির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ন বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত ছন্দের সর্বত্র ঝকঝক করিতেছে।" কিন্তু এই হাস্য ও বিদ্রূপরস পুরোপুরি উপভোগ করতে হলে এই ছন্দটিকে ঠিকমত পড়া চাই, অর্থাৎ সর্বত্রই খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণ সম্পূর্ণ বজায় রাখা চাই।

পঙ্কজ দত্ত

কেমন ছবি দেখতে চাই?—দর্শক সাধারণের কেউ নিজেকেই এ প্রশ্ন করলে নিজেও এর কোন স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট উত্তর দিতে পারেন কি-না সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। আবার, লোকে কি চায়?—এ প্রশ্নেরও জবাব চিত্র-নির্মাতাদের কাছে আরও জটিল একটা ধাঁধা। বস্তুত দর্শক সাধারণ যেমন তাদের নিজেদের পছন্দ ও রুচি সম্পর্কে অবহিত থাকেন না, তেমনি ছবি যাঁরা তৈরী করেন তাঁরা আর সব কিছু জ্ঞানও আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলতে সক্ষম হলেও দর্শক কি পছন্দ করবে আর না করবে সে-রহস্য কিছুতেই ভেদ করে উঠতে পারছেন না এতাবৎকাল। ছবিতে গানের প্রাবল্যে লোকে যখন বিরক্ত ও তিক্ত হতে আরম্ভ করেছে ঠিক সেই সময়েই এলো "ঢুলি"; দেখা গেলো ছবিখানি দর্শক সাধারণ্যে অপ্রত্যাশিতরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হলো। এ-ছবিখানির ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই এসে উপস্থিত হলো "অন্নপূর্ণার মন্দির" যাতে একখানিও গান নেই, অথচ এ-ছবিও দর্শক-সমাজে অনুরূপ জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। দর্শক-সাধারণ একখানি ছবি ভালোবাসলো অধিক গান থাকার জন্যে, আর একখানি ছবি তাদের ভালো লাগলো গান না-থাকা সত্ত্বেও। এমন বিসদৃশ ক্ষেত্রে দর্শকাভিরুচির কিনারায় পৌঁছনো সম্ভব হয় কি করে!

দেখা গেল, কোন ছবির ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের একত্র সমাবেশ দর্শকসাধারণের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়; কিন্তু সেইসঙ্গে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব হলো না যেক্ষেত্রে ওরা দুজনে থাকা সত্ত্বেও সে-ছবি আশানুরূপ জনতা আকর্ষণে অপারগ হয়েছে। ভারতীয় চিত্র পরিচালকদের মধ্যে আজ বিমল রায় সর্বাধিক সম্মানিত এবং তাঁর ব্যক্তিগত খ্যাতি আন্তর্জাতিক। তাঁর ছবি শিল্প-কৃতিত্বের অভিনব বিকাশে সর্বজনীন শ্রদ্ধাও লাভ করে, কিন্তু ঠিক সেই তুলনায় তাঁর ছবি জনপ্রিয়তার চলতি মানদন্ড বক্স-অফিসেও সাফল্য লাভ না-করতে পারাটা ধাঁধার মতোই মনে হয়। নৌসাদের সঙ্গীত লোককে যখন সুরোন্মাদ করে তুললো; যখন কোন ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় নৌসাদের নামটি থাকাই দর্শক আকর্ষণে যাদুকরিশক্তিসম্পন্ন বলে প্রতীয়-মান হতে লাগলো, তখনও দেখা গিয়েছে যে নৌসাদ থাকা সত্ত্বেও ছবি জনপ্রিয়তার দিক থেকে অতিরিক্ত কিছু লাভ করতে

বাঙলার অমর সংগীতসাধক যদু ভট্টের কাহিনী, সান-রাইজ পিকচার্সের "যদু ভট্ট"তে বসন্ত চৌধুরী ও মঞ্জুলা মিত্র

পারেনি। "ডাঃ কোটনিশ" ছবিখানি টেকনিক্যাল দিক থেকে অপরূপ শোভা ফুটিয়ে লোককে এমনই মোহিত করে তোলে যে ছবিখানি কোন কোন স্থানে জনপ্রিয়তার রেকর্ড করতেও সক্ষম হয়। কিন্তু শান্তারামের পরবর্তী ছবিগুলি কলাকৌশলে তার চেয়ে উন্নততর কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হলেও জনপ্রিয়তার দিক থেকে সে পর্যায়ে উঠতে পারেনি।

বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ঠিক এমনিধারাই অভিরুচিভেদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোন এক ধরনের বিষয়বস্তু বক্স অফিসে সাফল্য অর্জন করলেই চিত্র-নির্মাতারা সেই ধরনের বিষয়বস্তুই দর্শকসাধারণের চলতি অভিরুচি বলে গণ্য করে নেন। কলকাতায় প্রদর্শিত বাঙলা ছবি বিষয়-বস্তু অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করে গত ছ বছরের হিসেবে দেখা যায় বর্তমানে সামাজিক ছবি তোলার দিকে ঝোঁক ক্রমশই কমতির দিকে। ঝোঁক বেড়েছে ভক্তিমূলক, পৌরাণিক ও সাজ-আড়ম্বরপূর্ণ রূপক বা ঐতিহাসিক ছবি তোলার দিকে। আজকাল সবচেয়ে বেশী ঝোঁক দেখা যাচ্ছে কমিক ছবির ওপরে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত ছ বছরে প্রদর্শিত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বাঙলা ছবির সংখ্যা এখানে উদ্ধৃত করা যায়ঃ

	সামাজিক	ভক্তিমূলক-পৌরাণিক	ঐতিহাসিক ও রূপক	রোমাঞ্চ ও অ্যাডভেঞ্চার	কৌতুকচিত্র	জীবনী
১৯৪৮ ...	৩৭	...	২	...	...	...
১৯৪৯ ...	৪৮	৩	২	১	২	১
১৯৫০ ...	৩৫	...	...	৯	...	৪
১৯৫১ ...	২৮	২	৪	৯	...	...
১৯৫২ ...	৩৫	৪	৭	৩	১	১
১৯৫৩ ...	২৮	৫	৫	২	৯	...

ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনী-চিত্র যেমন "মাইকেল মধুসূদন", "স্বামীজী" বা "বিদ্যাসাগর"-এর মতো ছবি তোলা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছে। এ-ধরনের ছবিগুলির একটা বিশেষ সম্মান ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ হয় এবং বক্স-অফিসের বিচারে জনপ্রিয়তার মানও উচ্চস্তরেই পৌঁছয়, কিন্তু জীবনী-চিত্র তোলায় এতো বিঘ্ন দেখা দেয় যে চিত্র-নির্মাতারা ও-পথে চলার কোন সহজ প্রেরণা পান না। কাজেই এই ধরনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে দর্শকসাধারণের অভিরুচির বিচার ও আলোচনা করা যায় না।

সামাজিক ছবি সংখ্যায় কমের দিকে যাওয়ার গতি অব্যাহত রেখেছে। এ-বছরে গোড়ার ছ মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির
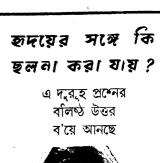
THE NEW THEATRES LIMITED
নিউ থিয়েটার্সের
শারদীয়া নিবেদন
বকুল
কাহিনী • মনোজ বসু
পরিচালনা • ভোলানাথ মিত্র
সঙ্গীত • প্রণব দে
চরিত্রে
অরুন্ধতী • উত্তম • শোভা
শ্রীমান বিভু • হরিমোহন
তুলসী প্রভৃতি
সমাপ্তির পথে
রাইকমল
কাহিনী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা • সুবোধ মিত্র
সঙ্গীত • পঙ্কজ মল্লিক
চরিত্রে
কাবেরী বোস • উত্তম
নীতিশ • চন্দ্রাবতী
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
গোধূলি
কাহিনী • নরেন্দ্র নাথ মিত্র
পরিচালনা • কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
একমাত্র পরিবেশক
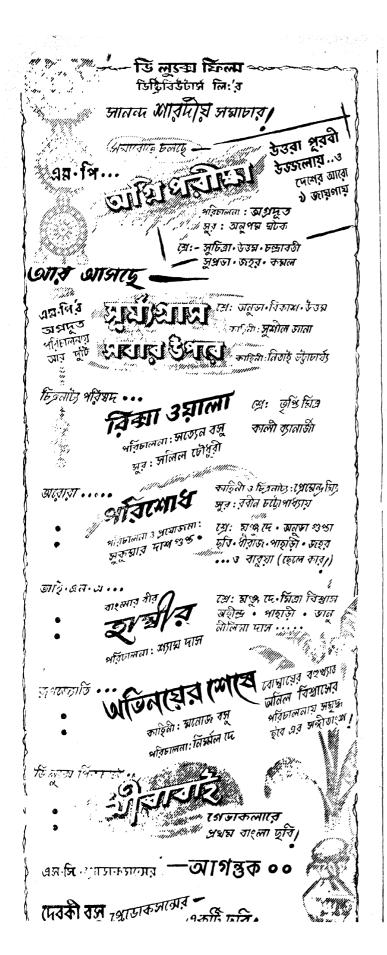
যে হিসেব পাওয়া যায় তাতেই দেখা যায় নিছক সামাজিক ছবি ১৫খানি এবং ভক্তিমূলক বা পৌরাণিক ৫খানি ; কৌতুক-চিত্র ৫খানি এবং অপরাধমূলক ২খানি। এ থেকে দেখা যাচ্ছে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক ছবি সংখ্যায় বাড়ছে অত্যন্ত দ্রুত। ১৯৫৩-তে সারা বছরে যতো পৌরাণিক ছবি হয়, ১৯৫৪-র ছ' মাসেই সে সংখ্যা পৌঁছে গেছে। ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি শ্রী এস এস ভাসানের মতে পৌরাণিক ও রূপক ছবি সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করছে সামাজিক-ছবি অনুমোদন বিষয়ে সেন্সর বোর্ডের অতি কড়াকড়ির জন্যে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, পৌরাণিক ছবি বেশী করে দেখানোর কারণ যে দর্শকসাধারণের কাছে তাদের আদর বেড়ে যাওয়া তার কিন্তু যুক্তি পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় এ-বছর প্রথম ছ মাসে যে পাঁচখানি পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক ছবি মুক্তিলাভ করেছে তাদের মধ্যে কোন একখানিও মুক্তিপ্রাপ্ত সামাজিক কোন ছবির মতো বক্স-অফিস সাফল্য লাভ করেনি। তেমনি আবার দেখা যায় কৌতুক-চিত্র গত বছর সারা বারো মাসে মুক্তিলাভ করে ৯খানি, আর সে জায়গায় এ-বছরের গোড়ার ছ-মাসেই ৫খানি মুক্তিলাভ করেছে। কৌতুক চিত্রের সংখ্যাও বাড়ছে বলেই যে ও-ধরনের ছবির চাহিদাও দর্শকসাধারণের মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করছে বক্স-অফিসে ঐ ছবিগুলির অসাফল্য দেখে তা মনে করা যায় না। সুতরাং ছবির বাজারে ভক্তিমূলক, পৌরাণিক বা কৌতুক চিত্র যে সংখ্যায় বাড়ছে তার অর্থ এই নয় যে, ওই ধরনের ছবির ওপরে দর্শক-সমাজের মোহ বাড়ছে ; ওর অর্থ হচ্ছে চিত্র-নির্মাতারাই ওই ধরনের ছবি তোলা বেশী নির্বিঘ্ন ও সামর্থসাপেক্ষ মনে করছেন বলে।

বস্তুত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় চিত্র-নির্মাতারা লোক-রুচি বলতে কিছু গ্রাহ্যের মধ্যে নিয়ে চলেন না, আসলে তাঁরা নিজেদেরই জ্ঞান বিদ্যা ও রুচি মতো একটা কিছু তৈরী করে সাধারণে ছেড়ে দেন। সেটা যদি লোকে গ্রহণ করে নেয় তো সেইটেই চিত্র-নির্মাতারা লোকরুচি বলে ধারণা করে নেন, আর যদি লোকগ্রাহ্য না

হয় তাহলে তারা লোকের রুচির ওপরে দোষারোপ করে ক্ষান্ত হন। চিত্র-নির্মাতারা যে লোকরুচি নির্ধারণ করার চেষ্টা আদতেই করেন না তা নয়, কিন্তু তাতেও তারা একটা নির্দিষ্ট নিরীখের সন্ধান করতে পারেন না। কোন নাটক বা উপন্যাস-গ্রন্থকে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে দেখে হয়তো একজন চিত্র-নির্মাতা সেই নাটক বা উপন্যাস অবলম্বন করে একখানি ছবি তৈরী করলেন। কিন্তু দেখা গেল সেই নাটক বা উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ জনসাধারণের অনুভূতিতে সামান্য আঁচড়টুকুও কাটতে অক্ষম হয়েছে। মঞ্চে কোন অভিনয় শিল্পী রাতের পর রাত অজস্র দর্শক আকর্ষণ করে যাচ্ছেন দেখে কোন চিত্র-নির্মাতা হয়তো তাঁকে তাঁর ছবিতে অবতরণ করালেন, কিংবা নিজের ব্যক্তিত্ব-চেতন সেই অভিনয়শিল্পী নিজেই হয়তো একখানা ছবি তৈরী করে সব নিজের মতো করে নিয়ে নেমে পড়লেন; কিন্তু দেখা গেল সে ছবি জনসাধারণের কাছে নিন্দিত হলো, শিল্পীও ধিকৃত হলেন।

অত্যন্ত উচ্চ মার্গের ছবির ওপরে চিত্র-নির্মাতা ও চিত্রব্যবসায়ীদের নিজেদেরই একটা আতংক আছে। শিল্প-কলার দিকে চমৎকার, কাহিনী ও বিষয়বস্তু মানুষকে চিন্তার খোরাক এনে দেয় এই ধরনের বিশেষণ কোন ছবির ভাগ্যে জুটলে সে ছবির বক্স-অফিসে শেয়াল-কুকুরের কান্না আরম্ভ হয়ে যায় বলে একটা প্রবচন আছে। পরোক্ষে এইভাবে ভালোজিনিস গ্রহণে দর্শকসাধারণের অক্ষমতা বা অনিচ্ছা বলেই অভিহিত করা হয়। একথাটা অবশ্য ঠিক যে ভারি ও গম্ভীর প্রকৃতির জিনিস নিয়ে মন ও মগজকে গুমোট করে তুলতে লোকে ভয় পায়। দেখা যায় কোন ছবি শিক্ষাব্রতী, কবি সাহিত্যিক, শিল্পী দার্শনিকদের কাছ থেকে অভিনন্দন লাভ করা মাত্রই জনসাধারণ সে ছবিকে একটা পবিত্র কিছু বলে ধরে নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে এড়িয়ে চলে যায়। পৃথিবীর সব দেশেই এই একই ধারা। কিন্তু কেন? জনসাধারণ বলতে যে মানুষের জোটকে বোঝায় তার মধ্যে উচ্চশিক্ষিত শিল্পমনা ও শিষ্টরুচি লোকও তো যথেষ্টই থাকে তবুও যা ভালোর আদর্শ বলে সমঝদারদের কাছে সুখ্যাত হয় জনসাধারণ তাকে পরিহার করে চলতে চায় কেন! অথচ নিচুদরের জিনিস যে জনসাধারণের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তাও দেখা যায় না। আদি-বৃত্তিতে আয়েসের স্পর্শ লাগিয়ে দিলেই লোকে খুশী হবে মনে করে এক শ্রেণীর চিত্র-নির্মাতা সেই রকম সব ছবি তৈরী করতে প্রবৃত্ত হন কিন্তু দর্শকসাধারণ নোংরা দেখলেই তার নিন্দা করেছে। নোংরা ছবি নিয়ে আলোচনা হয় বেশী, পাবলিসিটি পায় খুবই, কিন্তু বক্স-অফিসে তাদেরও জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে।

আবার দেখা যায়, লাস্যময় আদিরসাত্মক বিদেশী ছবির প্রতি একশ্রেণীর লোকের মোহ খুব। স্পষ্টত তীব্র যৌন-আবেদন-মূলক বিদেশী ছবির বহুলাংশে নগ্ন রূপ ও নীতিশিথিল ভংগী যথেষ্ট দর্শক আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই অনুকরণে যদি কোন দিশী ছবি তৈরী হয় তাহলে সে ছবি তো তেমন চলেই না অধিকন্তু সমগ্র চিত্রশিল্পেরই দুর্নাম এনে দেয়। সব জাতীয় ছবিরই নীতিপরিচ্ছন্নতা একান্ত কাম্য; ছবির উপাদান ভদ্র ও শিষ্ট-রুচি হওয়াটাই সকলে বাঞ্ছনীয় মনে করে, কিন্তু তবুও দেখা যায় দেশী ও বিদেশী ছবির বিচারে ভিন্ন ভিন্ন মন কাজ করে যায়। পৃথিবীর আর কোন দেশের জনসাধারণের মধ্যে দেশী ও বিদেশী ছবির বিচার ব্যাপারে এমন রুচিবৈষম্য আছে বলে জানা নেই।

দর্শক কখন কোন জিনিসের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, কোন্ একটা বিশেষ জিনিসের ওপরে দর্শকের মোহ কতকাল স্থায়ী হয়; একবার একটা কিছুর ওপর থেকে মোহ চলে গেলে আবার সে মোহ ফিরেও আসতে পারে কি-না, বা দর্শকের মোহ সৃষ্টি করে তোলা যায় কি-না সর্বদেশের চলচ্চিত্র-শিল্পের এইটেই আজ প্রধানতম ভাবনার বিষয়।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী । প্রাচীন চিত্র ।

অবতারত্রয়ার্চায়াং স্তোত্রমন্ত্রাস্তদাশ্রয়াঃ।
অষ্টাদশভুজা চৈষা পূজ্যা মহিষমর্দিনী॥ —শ্রীশ্রীচণ্ডী

মাতৃপূজা সমাগতা। কিন্তু কোথায় সব? আকুল দৃষ্টিতে তাকাইলাম। দিক্‌চক্রবাল জুড়িয়া নিবিড় ঘন দুস্তর তিমিরজালের বিস্তার। দুর্ভেদ্য, দুরপনেয় সেই আঁধারে ছায়া ছায়া প্রেতের কায়া। সেগুলি শ্মশানভূমিতে সঞ্চারী শবের মত ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠিতেছে মৃত্যুময় সেই ভৈরব প্রতিবেশে মাংসলুব্ধ শ্বাপদকুলের চীৎকার। সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। এ কি দেখিতেছি? নিরন্ধ্র সেই আঁধারে সহসা আলো ফুটিল। কোটি বিদ্যুতের উদ্দাম-দ্যুতিতে চোখের পলকে আকাশে-বাতাসে চমক খেলিল। হিরন্ময় সেই আলোকের ঝলকে ঝলকে পুলক-প্রবাহের সমারোহে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল অপূর্ব উজ্জ্বল এক দেবীমূর্তি। সিংহবাহিনী জননী। তাঁহার দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে বিদ্যাদায়িনী বাণী, সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং বলরূপী কার্তিকেয়। তবে আছেন তিনি, দুর্গতি-হারিণী দুর্গা, আমাদের যিনি মা! মায়ের মূর্তি যাহারা দেখিয়াছিল তাহারা ভুল করে নাই। সাধকের দৃষ্টি তবে সত্য। তাহাদের অনুভূতির মূলে প্রাণ-শক্তির যে স্ফুরণ তাহার লীলা সনাতন। এদেশের ঋষিবাক্য তবে মিথ্যা নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন, মা আসেন। অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটিলে তাঁহার আবির্ভাব হয়। দুষ্টের সংহার করিবার জন্য মা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সন্তান-স্নেহে উন্মাদিনী হইয়া ছুটিয়া আসেন দশভুজ ধারিণী জননী। তাঁহার ভ্রমণের বেগে ধরণী প্রকম্পিত হয়। আলুলায়িত কুন্তল-জালের উৎক্ষেপে বিক্ষেপে মেঘমালা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ভূধর টলে, সপ্ত সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ভূলোক-দ্যুলোক বিপুল বেদনায় আলোড়িত করিয়া দনুজ দলনীর লীলা আরম্ভ হয়। জনগণের কল্যাণের জন্য তিনি সংগ্রাম করেন। তাঁহার খড়্গের খেলায় সকল অশুভ নিরাকৃত হয়, নবসৃষ্টির চেতনা জাগে। বিপ্লবিনী জননীর সন্তানগণ মঙ্গল শঙ্খে সেই শুভ লগ্নে মাতৃপূজার উদ্বোধন করে। মহাভয়ে আজ আমরা অভিভূত, আমরা আজ একান্তই আর্ত, কবে অভয়া আমাদের মাকে আমরা নিজেদের জীবনে সেইভাবে সত্য করিয়া পাইব। আমাদের অষ্ট পাশের বিমোচন ঘটিবে, আমরা মানুষ হইব। বাংলার অন্তর-বাহির জুড়িয়া কবে জাগিবেন সনাতনী সেই অসুরনাশিনী ঈশানী? সকলের মাঝে এবং সকল কাজে মাকে পাইয়া সেদিন আমাদের মাতৃপূজা সার্থক হইবে।

দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থানরূপে তাঞ্জোরের নাম আজও উল্লেখ হয়ে থাকে। দশম শতাব্দী থেকে শুরু ক'রে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত চোল রাজাদের প্রচেষ্টায় তাঞ্জোরে নানাবিধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাজ হয়েছিল। তার প্রমাণস্বরূপ আজো দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ববিখ্যাত বৃহদেশ্বর মন্দির। তাঞ্জোরের চুয়াত্তরটি মন্দিরের নিখুঁত কারুকার্যে যে কয়খানি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য, তার ভিতর বৃহদেশ্বর মন্দির শীর্ষস্থানীয়। চোল রাজাদের প্রচেষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরের কাজ শুরু হয়। বৃহদেশ্বর মন্দিরের ভিতর কার্তিক-মন্দির তৈরী হয়েছিল, তারই গায়ে মহিষমর্দিনীর যে সব বিভিন্ন রূপ খোদাই করা আছে, তার দৃষ্টান্ত ফটোগ্রাফ। ফটো দুটি নীরোদ রায় কর্তৃক গৃহীত।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

[এই অপ্রকাশিত পত্রাবলী রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। কবির দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনীর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

কল্যাণীয়েষু

কলিকাতা

তুমি সেখানকার কলেজের নিয়মিত পড়াশুনায় নিযুক্ত হয়েছ শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। শিক্ষার বিষয় যেগুলি নির্বাচন করেছ সে ভালই হয়েছে। ভারতবর্ষের insect pest সম্বন্ধে যে সমস্ত বই এখানে পাওয়া যেতে পারে তা সন্ধান করে তোমাকে পাঠানো যাবে।

রথীকে পূর্বেই লিখেছি ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতি করতে হলে জলসেচন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা চাই সেটা তোমাদের মধ্যে কেউ একজন যেন শিক্ষা করে আসেন।

এ বৎসরে ত ভারতবর্ষে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ আসন্ন হয়ে এসেছে। শরতে যে বৃষ্টি নিতান্ত দরকার সেটা একেবারেই হল না—সেইজন্যে আমন ধান জ্বলে যাচ্ছে এবং রবি শস্যের চাষের ব্যাঘাত ঘটেছে। বাংলা দেশের অবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার মত তত বেশি নৈরাশ্যজনক নয়—কিন্তু তবু এখানেও আমাদের খুব ক্ষতি হয়েছে। উপরি উপরি কয়েক বছর শস্য না পাওয়াতে প্রজারা নিঃসম্বল হয়ে পড়েছে—গেল বছরে প্রজাদের অনেক টাকা ঘর থেকে দিয়ে রক্ষা করতে হয়েছে এবারেও তাই করতে হবে—এতে বাংলার জমিদারদের দুঃসময় উপস্থিত হবে। তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার অন্নগ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ ফিরে এসে এই হতভাগ্যদের অন্নগ্রাস কিছু পরিমাণেও যদি বাড়িয়ে দিতে পার তাহলে এই ক্ষতি পূরণ হয়ে মনে সান্ত্বনা পাব। মনে রেখো জমিদারদের টাকা চাষীর টাকা এবং এই চাষীরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহন করচে—এদের এই ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করবার দায় তোমাদের উপর রইল—নিজেদের সাংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটেই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে। আজকাল যে সমস্ত বিপ্লবের সূচনা দেখা যাচ্ছে তা নিয়ে তোমাদের ভাববার দরকার নেই কিন্তু অনাহার থেকে দেশের লোককে যথাসম্ভব বাঁচানোই তোমাদের জীবনের ব্রত হবে—এতে তোমাদের নিজেদের যদি ক্ষতি হয় তাও স্বীকার করতে হবে।

১৩১৬ সালের নববর্ষ আরম্ভ হয়েছে। ঈশ্বর করুন এই বর্ষে যেন নূতন জীবনে জন্মলাভ করি—পুরাতন জীবনের সমস্ত দীনতা দূর হয়ে যাক। পৃথিবীতে এতদিন যাকিছুকে নিজের বলে সঞ্চয় করেছি সমস্তই রিক্ত করে দিয়ে তাঁকে দিয়েই তিনি আমাকে পূর্ণ করে দিন। আমার সঙ্গে তোমাদের জীবনের সকল দিকের সম্বন্ধ—তোমরা বিচিত্র আশা নিয়ে নব যৌবনের প্রবল উৎসাহের মুখে জীবনকে ভাসিয়েছ আর আমি সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের এই আশীর্বাদমাত্র করতে পারি যে তোমাদের জীবনযাত্রা সার্থক হোক—সুখে ও দুঃখে সার্থক হোক।

পৃথিবীর এই বিচিত্র সফলতার ভিতর দিয়ে সেই চিরজীবনের একমাত্র সাফল্য যিনি, তাঁর মধ্যে তোমাদের অসমাপিত পবিত্র জীবনকে একদিন উৎসর্গ কর। তোমরা ধীর হও, বীর হও, সহিষ্ণু হও; সর্বপ্রকারেই মহৎ ও উদার হও। বিশ্বপ্রাণে যিনি সকলের বড়, কোনো সঙ্কীর্ণ সাময়িক উত্তেজনায় তাঁর চেয়ে কিছুকে কাউকেই যেন বড় স্থান না দাও! যাঁর কাছে দেশ নেই জাতি নেই যিনি সকল লোকের সকল কালের, তাঁর কাছে সমস্ত জীবনকে সম্পূর্ণ অবনত করে তাঁর কাছে বিশ্বমানব বিশ্বকল্যাণ বিশ্বমঙ্গলের দীক্ষা গ্রহণ কর—চিত্তকে কোনো সীমায় কিছুমাত্র সঙ্কীর্ণ না কর এই আমি একান্ত প্রার্থনা করি—তোমাদের সম্মুখে বহুতর নববর্ষ উন্নততর জীবনের শিখরে আরোহণের সোপান পরম্পরা হয়ে থাক—তোমাদের শক্তি কল্যাণের কোনো পথে গিয়ে নিরস্ত না হোক! ইতি ৩০শে চৈত্র ১৩১৫

আশীর্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শহরের লোকের সঙ্গে পুলিসের যে মারামারি হয়েছে সে সমস্ত খবর নিশ্চয়ই এতদিনে তোমাদের কাছে পুরোনো হয়ে গেছে। বন্দে মাতরম্ কাগজে এর বিস্তারিত বিবরণ সব পাবে। যাই হোক সে সব চুকে গেছে—এখন কলকাতায় কোথাও মীটিং নেই লাল পাগড়িওয়ালাদের লম্বা লাঠিও ঘুচে গেছে।

পরশু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মকদ্দমা চলছিল ইতিমধ্যে হার্নিয়ার ব্যামোয় অস্ত্র চিকিৎসা করবার জন্য তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতাল আশ্রয় করেছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হল—রাজা তাঁকে জেলে দিতে চেয়েছিল—তার চেয়ে উপর থেকে তিনি খালাস পেলেন।

তোমার দাদা উপেনের বিবাহ প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। ত্রৈলোক্য সান্যাল মশায়ের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির।

আজ এইমাত্র ত্রৈলোক্যবাবু আমার কাছে এসেছিলেন।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ১২ই কার্তিক ১৩১৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

কল্যাণীয়েষু

নগেন্দ্র, এখানে এবারকার প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সে আমাকে সভাপতির কাজে আহ্বান করেছিল সে খবর নিশ্চয় পেয়েছ। দেশের যে রকম অবস্থা হয়েছে তাতে কাজটা যে শান্তিরক্ষা করে সুসম্পন্ন হবে এমন আশা কেউ করেনি। এমন কি, আমাকে ভয় দেখিয়ে অনেকে অনেক রকম পত্রও লিখেছিল। নূতন দল পুরাতন দলের বিরুদ্ধে একেবারে কোমর বেঁধে প্রায় প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। তাই ঢাকা থেকে স্পেশল ষ্টীমারে পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরাল দলবল নিয়ে হাজির ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি দুই পক্ষকেই শান্ত ও সন্তুষ্ট করে আমার কাজ সেরে আসতে পেরেছি। এবারকার এই কন্‌ফারেন্স্ থেকে উপকার হবে বলে আশা করা যাচ্চে। বোধ হয় এই মেলেই বঙ্গদর্শনে আমার সভাপতির অভিভাষণটা দেখতে পাবে।

গ্রাম পল্লীকে organise করে তোলবার যে প্রস্তাব আমি আমার বক্তৃতায় করেছি সেটা আমি কাজে খাটাবার জন্যে পূর্বহতেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার জমিদারীর মধ্যে এই কাজের জন্যেই আমি ভূপেশকে লাগিয়ে দিয়েছি। আপাতত সে একটা পাড়াকে গড়ে তোলবার বিশেষ ভার নিয়েছে—দেখা যাক্ তোমাদের এই বরিশালের যুবকটির দ্বারা কতটা কাজ হয়। আরো দুটি ছেলেকে এই কাজে ভূপেশের সহকারীরূপে লাগাব বলে স্থির করেছি—তারা আর সপ্তাহখানেক পরে এসেই কাজে যোগ দেবে। যাকে cottage industries বলে অর্থাৎ ছোটখাট অনতিব্যয়সাধ্য কল নিয়ে গ্রামের লোক যে সমস্ত কাজ করতে পারে এখানকার পল্লীগ্রামে সেই সমস্ত চালানো উচিত বলে আমি স্থির করেছি। আমেরিকায় ভারতহিতৈষী যে একটি সভা হয়েছে এ সম্বন্ধে তাঁরা কি আমাদের কোনো পরামর্শ বা সাহায্য করতে পারেন. আমি যদি পারি তবে বোলপুর বিদ্যালয়ে টেক্‌নিকাল বিভাগ খুলে বিশেষভাবে এই সকল cottage industries এর উপযোগী শিক্ষার আয়োজন করতে ইচ্ছা করি। বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মপাল আমাকে কতকগুলি আমেরিকান যন্ত্র দেবেন বলেছেন এবং তাঁর ইচ্ছা এই যে বোলপুরের ঐ টেক্‌নিকাল বিভাগের নাম Indo American Industrial Institution রাখা হয়. তাহলে তিনি আমেরিকা থেকে সাহায্য জোগাড় করে দিতে পারবেন। সে কতদূর হবে জানিনে—কিন্তু এ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার খবর নেওয়া দরকার। তোমরা ঐ সভার কোনো সভ্যকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখে যদি সংবাদ নিতে পার তবে চেষ্টা কোরো।

আমি ত ইচ্ছা করচি শিলাইদহে চৈত্র মাসটা কাটিয়ে নূতন বৎসরে এখান থেকে যাব। তা যদি ঘটে ওঠে তবে তার মধ্যে এখানকার পল্লীর কাজটাকেও কতকটা পরিমাণে অগ্রসর করে দিয়ে যেতে পারব।

এখানে আমাদের সকলের শরীর বেশ ভালই আছে। তোমার পড়াশুনা বেশ ভাল চল্‌চে এবং শরীরের স্বাস্থ্য উন্নতিলাভ করচে শুনলে আমি খুব খুসি হব।

ঈশ্বর সর্বতোভাবে তোমার মঙ্গল বিধান করুন। ইতি ৫ই ফাল্গুন ১৩১৪

আশীর্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

নগেন্দ্র, অনেকদিন তোমার কোনো চিঠিপত্র না পেয়ে তোমার কি রকম চল্‌চে এবং তুমি কি করতে চাও তা বুঝতে পারছিলুম না। তোমার কি সঙ্কল্প তা খানিকটা জানতে পারলে আমিও তার জন্যে প্রস্তুত হতে পারি।

তুমি ভাল করে শিক্ষা সমাধা না করেই তাড়াতাড়ি চলে এস এ রকম ইচ্ছা আমার নয় সে আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি। আমাদের নিজের ইচ্ছা এবং সুবিধার দিকে তাকিয়ে তোমার জীবনকে খর্ব করা আমার একেবারেই অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। তোমার মার ব্যাকুলতা দেখে তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম এবং তাও সঙ্কোচে লিখেছিলুম, কারণ কোন্ কথা তুমি কি ভাবে গ্রহণ করবে তা নিশ্চয় জানিনে এবং আমার মনে এই আশঙ্কা রয়ে গেছে যে আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধের মধ্যে হয় ত একটি অপ্রসন্নতার

ব্যবধান তুমি রেখেছ। ঈশ্বরের প্রতি আমার সমস্ত ভার নিঃশেষে সমর্পণ করবার জন্যে আমার চিত্ত একান্ত উৎসুক হয়েছে সুতরাং আমার কোনো ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সুখদুঃখ ও প্রিয় অপ্রিয়তার জন্যে আমি চিন্তা করতেই ইচ্ছা করিনে। কিন্তু তোমাদের মঙ্গলের প্রতি উদাসীন থাকা আমার পক্ষে অসাধ্য এইজন্য তোমার চিত্ত প্রসন্নভাবে আমার প্রতি অনুকূল থাকে এ ইচ্ছা আমি ত্যাগ করতে পারিনে। কারণ, তোমার সেই ভাবটি না থাকলে তোমার প্রতি আমার মঙ্গল ইচ্ছাকে তুমি সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারবে না। যাই হোক্ এ সমস্ত বাদপ্রতিবাদের বিষয় নয় যিনি বিশ্বকে মঙ্গল সূত্রে ধারণ করে আছেন তিনিই যথাসময়ে সকলের সম্বন্ধকে মঙ্গলময় করে তুলবেন।

তুমি কোনো চাকরির বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করতে চাওনা এবং সামান্য কিছু জমি নিয়ে দেশের সাধারণ কৃষিজীবীদের সুখেদুঃখে যোগ দিতে ইচ্ছা কর এ কথা শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি। দেশের মঙ্গলসাধনই তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হোক্ ধন-সম্পদের মোহ তোমাদের মনে লেশমাত্র না থাক্ এই আমি আশীর্বাদ করি। সত্যভাবে গরীব হতে পারার মত সম্পদ জগতে আর কিছুই নেই। সেই পবিত্র সম্পদে তোমরা ভূষিত হয়ে জীবনকে ধন্য কর।

১৩১৬ সালের নববর্ষ আসন্ন হয়েছে। ঈশ্বর করুন এই বর্ষে যেন নূতন জীবনে জন্মলাভ করি—পুরাতন জীবনের সমস্ত জীর্ণতা দূর হয়ে যাক্। পৃথিবীতে এতদিন যা কিছুকে নিজের বলে অহঙ্কার করেছি সমস্তই রিক্ত করে দিয়ে তাঁকে দিয়েই তিনি আমাকে পূর্ণ করে দিন্। আমার সঙ্গে তোমাদের জীবনের অল্প দিনের সম্বন্ধ—তোমরা বিচিত্র আশা নিয়ে নবযৌবনের প্রবল বাতাসের মুখে জীবনকে ভাসিয়েছ আজ আমি সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের এই আশীর্বাদ মাত্র করতে পারি যে তোমাদের জীবনযাত্রা সার্থক হোক—সুখে ও দুঃখে সার্থক হোক্। পৃথিবীর বহু বিচিত্র সফলতার ভিতর দিয়ে সেই চিরজীবনের একমাত্র সাফল্য যিনি, তাঁর মধ্যে তোমাদের অস্খলিত পবিত্র জীবনকে একদিন উপনীত কর।

তোমরা বীর হও, ধীর হও, সহিষ্ণু হও, সর্বপ্রকারেই মহৎ ও উদার হও। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যিনি সকলের বড়, কোনো সঙ্কীর্ণ সাময়িক উত্তেজনায় তাঁর চেয়ে কিছুকেই কাউকেই যেন বড় স্থান না দাও! যাঁর কাছে দেশ নেই জাতি নেই যিনি সকল লোকের সকল কালের, তাঁর কাছে সমস্ত জীবনকে সম্পূর্ণ অবনত করে তাঁর কাছে বিশ্বক্ষমা বিশ্ব-করুণা বিশ্বমঙ্গলের ব্রতটি গ্রহণ কর—চিত্তকে কোনো সীমায় কিছুমাত্র সঙ্কীর্ণ না কর এই আমি একান্ত প্রার্থনা করি· তোমাদের সম্মুখে বহুতর নববর্ষ উন্নততর জীবনের শিখরে অধিরোহনের সোপান পরম্পরা হয়ে থাক্—তোমাদের শক্তি কল্যাণের কোনো মধ্যপথে গিয়ে নিরস্ত না হোক্! ইতি ৩১শে চৈত্র ১৩১৫

আশীর্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষালাভার্থ আমেরিকা-প্রবাসী কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে (১৮৮৯-১৯৫৪) লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই তিনখানি চিঠিতে, জীবনের এক পর্বে—স্বদেশী যুগে—তাঁর ধ্যানধারণার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

স্বদেশী আন্দোলন যখন রবীন্দ্রনাথের মতে দেশের সংগঠনকর্মে আত্মশক্তি প্রয়োগের শুভ পথে নিজেকে আবদ্ধ রাখল না, এক-পক্ষে 'বাংলাদেশের মনের জ্বালা......অগ্নি-মূর্তি' গ্রহণ ক'রে গুপ্ত বিপ্লবের আয়োজনে প্রবৃত্ত, অপর দিকে নেতৃবর্গ দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না ক'রে, দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচনে নিজের শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত না ক'রে কনগ্রেসসভার মঞ্চ জিতে নেবার চেষ্টাতেই অধিক উদ্যোগী, তখন তিনি আন্দোলন থেকে নিজেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, তাঁর নিজের সাধ্যে যতটুকু সম্ভব নিজ-জমিদারির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পল্লীসংস্কার চেষ্টা দ্বারা সেই অঞ্চলের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচনে ব্রতী হলেন, পুত্র ও পুত্রস্থানীয়দেরও এই ব্রতে পল্লীসংস্কার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বহুপূর্বের কথা। এতে সমগ্র দেশের একদিনে উন্নতি হবার আশা ছিল না, তবু এই মনে করে তিনি সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন যে, "তেত্রিশ কোটির কি করতে পারি, এ-প্রশ্ন যাঁরা করেন, তাঁরা সত্য কাজের পথকে রুদ্ধ করেন।... যারা আমাদের চারদিকে রয়েছে তাদের মধ্যে যদি সত্যকার আগুন জ্বালাতে পারি তবে সে আগুন আপনি আপনার শিখার পতাকাকে বহন করে চলবে......এ ক্ষুদ্র চেষ্টা দেশের সর্বত্র প্রসারিত হবে—শাখা থেকে প্রশাখায় বিস্তৃত হবে, বৃহৎ বনস্পতি হয়ে ছায়াদান করতে পারবে। ফলদান করতে পারবে।"

রাষ্ট্রীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে এলেও, রাষ্ট্রনেতার মধ্যে ঐকমত্য স্থাপিত হয়ে মতভেদ দূর হয়ে তাঁরা যাতে এক-যোগে দেশকর্মে ব্রতী হতে পারেন স্বদেশী-যুগ থেকে সুভাষচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বারংবার সে চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ অনলসভাবে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সুরাট কংগ্রেসের (১৯০৭) অঙ্গভঙ্গের পর চরমপন্থী ও মধ্যমপন্থী ভঙ্গ', প্রবাসী মাঘ, ১৩১৪; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০) উভয় দলকেই এই নিবেদন জানিয়েছিলেন যে, "কনগ্রেসকে সত্য করিয়া তুলিতে গেলে তাহা কনগ্রেসের মঞ্চে বসিয়াই করা যায় না। দেশের ভিতর সত্য কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে তবেই সমস্ত দেশের যোগে ঐ কনগ্রেস সত্য হইয়া উঠিবে—সেই দিকে চেষ্টা নিযুক্ত করিলে চেষ্টা সার্থক হইবে। কনগ্রেসকে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর দিয়া সত্য করিয়া তুলিব এই চেষ্টাই কোনো এক পন্থীর হউক। তাহাকে এ-বৎসর বা ও-বৎসর কোনো রকমে দখল করিয়া বসিব এ-চেষ্টা এমন মহৎ চেষ্টা নহে, যাহার জন্য দুই ভাইয়ে লড়াই করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের অভিনয় করা যাইতে পারে।"*

---

*সুরাটে কংগ্রেস ভেঙে যাবার কয়েক মাস পরে দুই দলে মিলন ঘটাবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র-নাথের গৃহে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়েছিল। দ্র হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'কংগ্রেস',

সুরাট-ব্যাপারের মাসাধিক কাল পরে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮**)। চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী দলের সংঘর্ষ এখানেও পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা,† সভার অধিবেশন যাতে সৌষ্ঠবের সঙ্গে সম্পন্ন হতে পারে এজন্য সম্মিলন কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে সভাপতিপদে আহ্বান করলেন, যিনি যুধ্যমান দুই দলেরই ঊর্ধ্বে। নিজেকে লোকনায়ক ব'লে গণ্য না করলেও¶, এই দুঃসময়ে, মনের ক্ষেত্রে পুনরায় বঙ্গ-ভঙ্গ যাতে ঘটতে না পারে, আত্মবিপ্লবের গতি যাতে রুদ্ধ হতে পারে তার চেষ্টা করবার জন্য তিনি এই অনুরোধ স্বীকার করলেন। বাংলা ভাষায় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির এই প্রথম অভিভাষণ; এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ দেশের স্থায়ী মঙ্গলের জন্য এমন সকল কর্মপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছিলেন যা দীর্ঘকাল পরে স্বাধীনতালাভের পর এখন স্বীকৃত ও ক্রমশ কার্যে পরিণত হতে চলেছে—তার মূল কথা পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চার, শিক্ষিতসমাজের সঙ্গে গণ-সমাজের যোগ।

বর্তমান প্রসঙ্গে কয়েকটি চিঠি পুরাতন সাময়িকপত্র থেকে উদ্ধৃত করা গেল যা এখনো গ্রন্থনিবদ্ধ হয়নি।—

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র

প্রাদেশিক কনফারেন্সে তোমার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। তুমি যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে এরূপ মনে করি না। তথাপি আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য কি একথা তুমি যেরূপ পরিষ্কার-রূপে দেখাইতে পারিবে, অন্য দ্বারা তাহা সেরূপ হইবে না।......লণ্ডন, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮

—প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৩

অবলা বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র।

......আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারির মধ্যে পল্লী-সংগঠকার্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েকজন পূর্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করবে। তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্ছে। আমাদের পল্লীর ভিতরে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন সুগভীর নিরুদ্যম যে, সে দেখলে স্বরাজ স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস ব'লে মনে হয়—ও-সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয়।...... আমি সভাস্থলের আহ্বানে আর সাড়া দিচ্ছিনে— কিন্তু সেইজন্যেই দেশের যেটা সকলের চেয়ে প্রয়োজন সেটা সাধনের জন্য আমার যেটুকু সাধ্য তা প্রয়োগ করতেই হবে। [এপ্রিল?, ১৯০৮]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

কনফারেন্সে আমাকে সভাপতির পদে আহ্বান করার সংবাদ পাইবামাত্র নানাপক্ষ হইতে গালিসংযুক্ত এত বেনামী পত্র পাইয়াছি যে, আমি যে কোন্ দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, কনফারেন্স মঞ্চে যখন মাথায় কেহ চৌকি ছুঁড়িয়া মারিবে তখন তাহাকে হাতজোড় করিয়া বলিব—বাবা তুমি কোন্ পক্ষের লোক আমাকে বলিয়া যাও—তাহা হইলে আমি যে কোন্ দলে আছি সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। চৌকি কেহ মারে নাই এবং দুই দলেই আমাকে বেতন চুকাইয়া দিয়াছেন, সুতরাং আজও নিষ্পত্তি হইল না।......১১ ফাল্গুন, ১৩১৪।

—বঙ্গবাণী, চৈত্র ১৩৩৩

[শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত]

** দ্র হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫২

† "সেবার পাবনায় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন। মডারেটরা তাহাতে কংগ্রেসের ক্লীড গ্রহণের চেষ্টা করিবেন জানিয়া ১৮ই [জানুয়ারি] তারিখে 'অমৃত-বাজার' কার্যালয়ে পরামর্শ-সভায় স্থির হয়, জাতীয় দলের লোকেরা পাবনায় যাইয়া কলিকাতা কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবগুলি যাহাতে গৃহীত হয়, তাহা করিবেন।"—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫১

¶ "আমি কোনো জন্মেই 'লীডার' বা জন-সঙ্ঘের চালক নহি—আমি ভাট মাত্র—যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গান গাহিতে পারি এবং যদি আদেশ দিবার কেহ থাকেন তাঁহার আদেশ পালন করিতেও প্রস্তুত আছি।...কিন্তু 'নেতা' হইবার দুরাশা আমার মনে নাই—যাঁহারা 'নেতা' বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি—ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। ইতি ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১২।" —রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত পত্র। বঙ্গবাণী, ফাল্গুন ১৩৩৩

শিল্পী: বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

তান্ত্রিক কবিতা

পরশুরাম

ভূপতি মুখুজ্যে এই আড্ডার নিয়মিত সদস্য নয়, মাঝে মাঝে আসে। সে কোন্নগরে থাকে কিন্তু কলকাতার সব খবর রাখে। আমুদে লোক, বয়স চল্লিশ হলেও ভাঁড়ামি করতে তার বাধে না।

আজ সন্ধ্যায় যতীশ মিত্রের আড্ডাঘরে ঢুকেই ভূপতি সেকেলে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার ভঙ্গীতে সুর করে হাত নেড়ে বলল,

শুন ন-গ-র-বা-আ-সি-গণ,
আশ্চর্য খবর মহা সেন্‌সে-শন।
শুন ন-গ-র—

বৃদ্ধ পিনাকী সর্বজ্ঞ এখানে রোজ চা খেতে আসেন। বললেন, ফাজলামি রাখ, যা বলবার সোজা ভাষায় বল।

ভূপতি আবার সুর করে বলল,

আমাদের কবি ধূর্জটিচরণ
ছিরু ঘোষকে করেছে গুরু বরণ,
মার্ক্সীয় বৈষ্ণব মঠে নিয়েছে শরণ,
সব সম্পত্তি নাকি করিবে অর্পণ।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, গাঁজা টেনে এসেছ নাকি? ছিরু ঘোষ লোকটা কে?

ভূপতি বলল, জানেন না? কমরেড শ্রীদাম ঘোষ, সম্প্রতি মঠস্বামী শ্রীদাম মহারাজ হয়েছেন।

—ওকে চিনি না, তবে তোমাদের কবি ধূর্জটিচরণকে বার কতক দেখেছি বটে, বছর দুই আগে যতীশের কাছে মাঝে মাঝে আসত। মার্ক্সীয় বৈষ্ণব মঠ আবার কি? জান নাকি যতীশ?

যতীশ মিত্র বলল, একটু আধটু জানি, কমরেড ছিরুর সঙ্গে এককালে আলাপ ছিল। আর ধূর্জটির সঙ্গে তো এক ক্লাসে পড়েছি, কিন্তু সে যে ছিরুর শিষ্য হয়েছে তা জানতুম না।

নামটা যেন সোনার পাথরবাটি, কাঁঠালের আমসত্ত্ব। মার্ক্সের শিষ্যরা তো ঘোর নাস্তিক, তারা আবার বৈষ্ণব হল কবে?

যতীশ বলল, কালক্রমে সবই বদলে যায়। ডবলু সি বনার্জির সময় কংগ্রেস যা ছিল এখনও কি তাই আছে? লেনিন আর ট্রট্‌স্কির পলিসি কি এখনও বজায় আছে? বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখবেন সর্বজ্ঞ মশাই। তান্ত্রিক ফাসিজ্‌ম, মার্কিন অদ্বৈতবাদ, ভারতীয় সর্বাস্তিবাদ—

উপেন দত্ত বলল, হেঁয়ালি রাখ যতীশ-দা, মার্ক্সীয় বৈষ্ণব মঠ ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে দাও।

যতীশ বলল, সব বৃত্তান্ত আমার জানা নেই যতটুকু জানি তাই বলছি। ছেলেবেলা থেকেই ছিরুর একটু কমরেডী মতিগতি ছিল। কলেজ ছাড়ার পর সে একজন উগ্র সাম্যবাদী হয়ে উঠল প্রতিপত্তিও খুব হল। শুনেছি শেষকালে সে ওদের দলের একজন কর্তা ব্যক্তি হয়েছিল। কিন্তু ছিরুর সঙ্গে পার্টির লোকদের মতের মিল হল না। তাদের গুরু রাশিয়া, কিন্তু ছিরু বলল, সব দেশে একই ব্যবস্থা চলতে পারে না। ভারতের লোক হচ্ছে ধর্মপ্রাণ, ধর্ম বাদ দিয়ে কোনও রাজনীতি এখানে দাঁড়াতেই পারে না। এই দেখ, বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে মা-দুর্গা বানিয়েছিলেন। আমাদের অগ্নিযুগে বিপ্লবীদের এক হাতে থাকত বোমা, আর এক হাতে গীতা। দেশবন্ধু কৃষ্ণপ্রেমী হয়ে পড়লেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তান্ত্রিক সাধনা করতেন। শ্রীঅরবিন্দ লাইফ ডিভাইন নিয়ে মেতে রইলেন। গান্ধীজি রঘুপতি রাঘবের নাম কীর্তন করতেন। গুরুজি গোলবালকরও রামভক্ত, যদিও তাঁর ভক্তি একটু দুসরী কিসিম কী। কমিউনিজ্‌ম এদেশে জু

অবলম্বন নেই। মহান স্তালিন, মহান মাও-সে-তুং বলে যতই চেঁচাও তাতে প্রাণ সাড়া দেবে না। ভক্তি চাই, অবতার চাই। সাম্যবাদকে ঢেলে সাজতে হবে। ছিরু ঘোষ বিগড়ে গেছে দেখে পার্টির কর্তারা তাকে দল থেকে দূর করে দিল। কিন্তু ছিরু দমবার পাত্র নয়, অনেক বড়লোক ভক্ত জুটিয়েছে, তাদের টাকায় মার্ক্সীয় বৈষ্ণব মঠ প্রতিষ্ঠা করে নিজে মঠাধীশ শ্রীদাম মহারাজ হয়েছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা তার পৃষ্ঠপোষক, শীঘ্রই সে অবতার হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের ধূর্জটি কবির তো কোনও দিন ধর্মে বা পলিটিক্সে মতি ছিল না, সে কি করে ছিরুর কবলে পড়ল বুঝতে পারছি না।

ভূপতি বলল, ছিরুর সব খবর আমি রাখি, ধূর্জটিরও নাড়ী নক্ষত্র জানি, সে দূর সম্পর্কে আমার শালা হয়। ছেলেবেলা থেকেই ধূর্জটি কবিতা লিখত, তার কবিখ্যাতি আছে, গোটাকতক বইও আছে। অনেক কবি যেমন করে থাকে সেই রকম ধূর্জটিও একটি মানসী প্রিয়া খাড়া করে তার উদ্দেশে কবিতা লিখত।

উপেন দত্ত বলল, এর মানে আমি মোটেই বুঝতে পারি না। আমাদের ছোট বড় বিবাহিত অবিবাহিত যত কবি আছেন তাঁদের অনেকে একটি মনগড়া মেয়ের উদ্দেশে কবিতা লেখেন। এতে তাঁদের কি লাভ হয়?

যতীশ বলল, শাস্ত্রে আছে, সাধকদের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা। কবিরা তেমনি প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য একটি পরমা প্রেয়সীর কল্পনা করেন। এ একরকম তান্ত্রিক নায়িকাসাধনা।

পিনাকী বললেন, বাজে কথা। একে বলে মনে মনে ব্যাভিচার। যাদের স্ত্রী নেই কিংবা স্ত্রী পছন্দ হয় না সেই সব কবিই মনগড়া নারীর সঙ্গে প্রেম করে।

উপেন বলল, সর্বজ্ঞ মশাই যা বললেন তা হয়তো ঠিক, যতীশ-দার কথাও ঠিক। কিন্তু কবিদের এইরকম প্রেমলীলার জন্যে তাদের স্ত্রীরা চটে না কেন? মেয়ে কবিও তো ঢের আছে, তারা তো মনগড়া প্রেমিকের উদ্দেশে কবিতা লেখে না।

যতীশ বলল, কেউ কেউ লেখে বইকি। তবে খুব কম, কারণ কায়মনোবাক্যে সতীধর্ম পালন করার সংস্কার এদেশের বেশীর ভাগ মেয়ের এখনও আছে। পুরুষদের সে বালাই নেই। কবিদের স্ত্রীরা মনে করে, ছাগলে কি না খায়, কবিরা কি না লেখে, তাতে দোষ ধরলে চলে না।

ভূপতি বলল, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে গণ্ডগোল বাধে, স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাত্রার ওলটপালট ঘটে, যেমন ধূর্জটিদের হয়েছে। ওদের সব খবরই আমি রাখি, বলছি শোন।—

ধূর্জটি যখন ছোট তখনই তার বাপ মা মারা যান, এক মামা তাকে নিজের কাছে রেখে পালন করেন। শিক্ষা শেষ করে ধূর্জটি তার মামার কারবারে যোগ দিল, দেদার কবিতাও লিখতে লাগল। তার পর তার বিয়ে হল। দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন লিখেছেন ধূর্জটির ঠিক সেই রকম মনে হল—ভাবলাম বাহা বাহা রে, কি রকম যে হয়ে গেলাম বলব তাহা কাহারে। এতদিন সে কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে কবিতা লিখত, এখন জীবন্ত প্রিয়ার ওপর লিখতে লাগল। বউএর শংকরী নামটা সেকেলে বলে ধূর্জটি বদলাতে চেয়েছিল, কিন্তু বউ রাজী হল না, বলল, ও আমার জেঠামশায়ের দেওয়া নাম, বদলানো চলবে না; তোমার নামটাই বা কি এমন মধুর? অগত্যা সেকেলে শংকরীকেই সম্বোধন করে ধূর্জটি লিখতে লাগল—নন্দনের উর্বশী, পাতালপুরীর রাজকন্যা, সাগর থেকে ওঠা ভিনস, আমার হৃদয় যা চায় তুমি ঠিক তাই গো, এই সব।

কিছু কাল এই রকমে চলল, তার পর ক্রমশ ধূর্জটির হুঁশ হল মানসী প্রিয়ার সঙ্গে তার বিবাহিত প্রিয়ার মিল নেই। শংকরী কাব্যরস বোঝে না, তার মনে রোমান্স নেই। বিয়ের সময় সে আত্মীয় আর বন্ধুদের কাছ থেকে বিস্তর সস্তা উপহার পেয়েছিল। তার উদ্দেশে লেখা ধূর্জটির কবিতাগুলোও যেন তার কাছে মামুলী উপহারের শামিল। সে সংসারের কাজ আর তার নবজাত খোকাকে নিয়েই ব্যস্ত। ধূর্জটি বেচারা আবার তার কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে চুটিয়ে কবিতা লিখতে লাগল আর শংকরী সাংসারিক কাজে ডুবে রইল।

তার পর হাঙ্গামা বাধাল বিশাখা। সে আমার খুড়তুতো শালী, অত্যন্ত ফন্দিবাজ মেয়ে, ধূর্জটির বউ শংকরীর সঙ্গে এক কলেজে পড়েছিল। তার স্বামী নরেশ এঞ্জিনিয়ার, আগে কাঁচরাপাড়ায় কাজ করত, তার পর বদলী হয়ে কলকাতায় এল, ধূর্জটির বাড়ির পাশেই বাসা করল। বিশাখাকে কাছে পেয়ে শংকরী খুব খুশী হল।

একদিন বিশাখা বলল, তোমার বর তো একজন বিখ্যাত কবি। আজকাল কবিতার বই কেউ কেনে না, কিন্তু ধূর্জটিবাবুর বই বেশ বিক্রী হয় শুনেছি। আচ্ছা, উনি কার উদ্দেশে অত প্রেমের কবিতা লেখেন? তোমার জন্যে নিশ্চয় নয়, তা হলে 'স্বপ্নে দেখা অচিন প্রিয়া' এই সব লিখতেন না।

শংকরী বলল, কারও উদ্দেশে লেখে না। কবিরা খেয়ালী লোক, মনগড়া একটা কিছু খাড়া করে তার উদ্দেশে লেখে।

—সত্যি বা মনগড়া যাই হক, তোমার রাগ হয় না?

—ও সব আমি গ্রাহ্য করি না।

—এ তোমার ভারী অন্যায়, এর পর পস্তাতে হবে। আর দেরি নয়, এখন থেকে স্টেপ নাও।

—কি করতে বল তুমি?

—একটা মনগড়া পুরুষের উদ্দেশে তুমিও কবিতা লিখতে শুরু কর।

—রাম বল। কবিতা লেখা আমার আসে না, আর লিখলেই বা ছাপবে কে?

—সে তুমি ভেবো না। 'নিস্যান্দিনী' পত্রিকা দেখেছ তো? তার সম্পাদক তরণী সেন আমার দেওর রমেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমার লেখা ছাপাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব। আর, কবিতা লেখা খুব সোজা, দেদার চুরি করবে, ওখান থেকে এক লাইন এখান থেকে এক লাইন নেবে, তার সঙ্গে নিজের কিছু জুড়ে দেবে। এখন গদ্য কবিতার যুগ, মিলের ঝঞ্ঝাট নেই, যা খুশি এলোমেলো করে সাজিয়ে দিলেই গদ্য কবিতা হয়ে যায়।

বিশাখার জেদের ফলে শংকরী রাজী হল। দুজনে মিলে একটা কবিতা খাড়া করল, বিশাখার দেওর রমেশ সেটা তরণী সেনের কাছে নিয়ে গেল।

তরণী বলল, আরে ছ্যা, একে কি কবিতা বলে! 'ওগো আমার বঁধু, তুমি ডুমুর ফুলের মধু!' এ রকম সেকেলে কাঁচা লেখা ছাপলে আমার পত্রিকা কেউ পড়বে না।

রমেশ তার বউদিদির সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরী হয়েই গিয়েছিল। বলল, আচ্ছা তরণী, তোমার পত্রিকার লাভ কত হয়?

—লাভ কোথায়, এখনও ঘর থেকে গচ্চা দিতে হয়।

—তবে বলি শোন। প্রতি মাসে আমি পাঁচ-ছটা কবিতা আনব, প্রত্যেকটি ছাপবার জন্যে পাঁচ টাকা হিসেবে দেব। তাতে পঁচিশ-তিরিশ টাকা পাবে। রাজী আছ?

তরণী সেন বলল, তা মন্দ কি, কাগজের খরচটা তো উঠবে। টাকা পেলে প্রতি সংখ্যায় দশটা কবিতা ছাপতে রাজী আছি। কিন্তু দেখো ভাই, নিতান্ত রাবিশ না হয়।

—আরে না না। শংকরী দেবীর নামে ছাপা হবে বটে কিন্তু বেশীর ভাগ আমার বউদিই লিখবেন। তাঁর হাত খুব পাকা।

নিস্যান্দিনী পত্রিকায় শংকরী দেবীর নামে কবিতা ছাপা হতে লাগল। তা দেখে ধূর্জটির মনে কিঞ্চিৎ কৌতুক আর করুণার উদয় হল। সে তার স্ত্রীকে বলল, বেশ তো, শখ যখন হয়েছে লিখতে থাক। এখন বড্ড কাঁচা, লিখতে লিখতে হাত পাকতে পারে। চাও তো আমি সংশোধন করে দিতে পারি। শংকরী বলল, না না, তোমার কিছু করতে হবে না, যা পারি আমিই লিখব। বদনাম হয় তো আমারই হবে, তোমার ক্ষতি হবে না।

শংকরী দেবীর কবিতা ক্রমশ কাঁচা থেকে পাকা, ঠাণ্ডা থেকে গরম, এবং গরম থেকে গরমতর হতে লাগল। পাঠকরা বলল, কি চমৎকার! একজন আধুনিক সমালোচক লিখলেন—এক অনাস্বাদিত-পূর্ব রসঘন কাব্যমধুরিমা, নারীর অন্তর্নিহিত ফল্গুধারার স্বত উৎসারিত উৎস, এর তুলনা নেই। নিস্যান্দিনী পত্রিকার কাটতি হু হু করে বেড়ে গেল। তরণী সেনকে রমেশ বলল, আর টাকা দিচ্ছি না, এখন থেকে তুমিই দেবে, প্রতি কবিতায় দশ টাকা। 'প্রগামিনী'র সম্পাদক অনুকূল চৌধুরী তাই দেবেন বলেছেন। তরণী বলল, আচ্ছা আচ্ছা, শংকরী দেবী টাকা না হয় নাই দেবেন। কিন্তু দক্ষিণা দেবার সামর্থ্য এখনও আমাদের হয় নি, আরও কিছু দিন সবুর করতে হবে।

উপেন দত্ত বলল, শংকরী দেবীর কবিতা পড়েছি বলে মনে হয় না। আপিসের যা খাটুনি, সাহিত্য চর্চার ফুরসতই নেই। এই আড্ডায় এসে পাঁচ জনের মুখে যা একটু শুনতে পাই। আচ্ছা যতীশ-দা, তোমার কাছে নিস্যান্দিনী নেই?

যতীশ বলল, আমি পয়সা দিয়ে রাবিশ কিনি না।

ভূপতি বলল, শংকরী দেবীর কবিতা শুনতে চাও? কিছু কিছু আমার মনে আছে, বলছি শোন। একটা হচ্ছে এই রকম—

আমি চিনি গো চিনি তোমারে,
তুমি থাক মহাপ্রাচীরের এপারে।
কি মিষ্টি তোমার আধো আধো বুলি,
রুশকে বল লুশ, দু টাকাকে তু লুপি।
ওগো লাল চীনের জঙ্গী জওআন,
তোমার নয়ন বাঁকা, বর্ণ স্বর্ণচাঁপা,
সিল্কমসৃণ শ্যাময় লেদার তোমার চামড়া,
ওই নির্লোম বুকে ঠাঁই চাই ঠাঁই চাই।

আর একটা বলি শোন—

ও বিদেশী পাখতুনিস্তানবাসী,
তাগড়া জাক্কাখেল, আমি তোমায় ভালবাসি।
নর্ডিক-নীল তোমার সুর্মা পরা চোখ,
সেমেটিক নাকের নীচে মোটা ছাঁটা গোঁফ।
তোমার লোমজঙ্গল বুকে টেনে নাও আমাকে,
ক্র্যাংক-শাফটের মতন দুই হাতে জাপটে ধর,
মড়মড়িয়ে ভেঙে দাও আমার পাঁজরা,
পিষে ফেল, পিষে ফেল।

এই সব কবিতা নিস্যান্দিনী পত্রিকায় দেদার ছাপা হতে লাগল। 'কাঙ্ক্ষার ঝংকার' নাম দিয়ে শংকরীর একটা কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হল, তিন মাসের মধ্যেই

তিনটে সংস্করণ ফুরিয়ে গেল। ধূর্জটি নিজের রচনা নিয়েই মেতে থাকত, তার বউ কি লিখছে, তা পড়ে লোকে কি বলছে, এ সব খবর রাখত না। একদিন তার এক সাহিত্যিক বন্ধু একখানা কাঙ্ক্ষার ঝংকার দেখিয়ে বলল, ওহে ধূর্জটি, এই শংকরী দেবী তোমারই গৃহিণী তো? ওঃ, ভদ্র মহিলা কি সব অদ্ভুত কবিতা লিখছেন, রেগুলার হট স্টফ। পড়ে তোমার মনে একটু ইয়ে হয় না? আমাদের সাইকোলজিস্ট প্রফেসার ভড় বলছিলেন, এ হচ্ছে উদ্দাম লিবিডো।

ধূর্জটির ভাবনা হল। স্ত্রীর কাছ থেকে তার কবিতার বই চেয়ে নিয়ে খুব মন দিয়ে পড়ল। তার মেজাজ বিগড়ে গেল। শংকরীকে বলল, এ সব কি ছাই ভস্ম লেখা হচ্ছে? লোকে যে ছি ছি করছে।

শংকরী বলল, করুক গে ছি ছি, খুব বিক্রি তো হচ্ছে। আরও একখানা বই ছাপবার জন্যে প্রেসে দিয়েছি।

মাথা নেড়ে ধূর্জটি বলল, ওসব চলবে না বলছি।

—বা রে মজা! তুমি লিখলে দোষ হয় না, আর আমার বেলা দোষ! 'ওগো সর্বনাশী, আমি ভালবাসি তোমার ঠোঁটের ওই মোনা-লিসা হাসি'—তুমি এই সব ছাই ভস্ম লেখ কেন?

—আমার সঙ্গে তোমার তুলনা! কাল্পনিক রমণীর ওপর কবিতা লিখলে পুরুষের দোষ হয় না, কিন্তু মেয়েদের সে রকম লেখা অতি গর্হিত।

—বেশ, তুমি কবিতা লেখা বন্ধ কর, তোমার সব বই পুড়িয়ে ফেল, আমিও তাই করব।

ধূর্জটি রেগে আগুন হয়ে বেরিয়ে গেল।

উপেন দত্ত বলল, যত নষ্টের গোড়া আপনার শালী বিশাখা। খামকা এই ঝগড়া বাধিয়ে তাঁর কি লাভ হল?

ভূপতি বলল, হুঁ, বিশাখার স্বামী নরেশও তাই বলেছে, খুব ধমকও দিয়েছে। তার পর শোন। শংকরীর কাছে সব কথা শুনে বিশাখা তার সখীর হয়ে লড়তে গেল। ধূর্জটিকে বলল, আপনার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি? ঘরে অমন সুন্দরী বউ থাকতে কোথাকার কে অচিন প্রিয়ার উদ্দেশে আপনি কবিতা লেখেন কোন্ আক্কেলে? তাতে শংকরীর রাগ হবে না? শোধ তোলবার জন্যে সেও যদি ওই রকম লেখে তাতে অন্যায়টা কি মশাই?

ধুর্জটি কেন, তা বলে চীনেম্যান আর কাবলী-ওলার উদ্দেশে প্রেমের কবিতা লিখবে?

—আচ্ছা আচ্ছা, এখন থেকে না হয় বাঙালী তরুণদের উদ্দেশেই লিখবে। কিন্তু তার চাইতে ভাল—আপনি আজ থেকে নিজের গিন্নীর নামে কবিতা লিখুন, যেমন প্রথম প্রথম লিখতেন। আর সেও আপনার নামে লিখুক। এক বাড়িতে যখন বাস করছেন, দুজনেই যখন কবি, তখন রেসিপ্রোসিটি না হলে চলবে কেন?

ধুর্জটি কিন্তু বুঝল না, তার মন অস্থির হয়ে উঠল। ভাল করে খায় না, ঘুময় না, আপিসের কাজেও মন দেয় না। এই অবস্থায় একদিন ছিরু ঘোষের সঙ্গে তার দেখা হল। ছিরু তখন মঠাধীশ মণ্ডলেশ্বর হাজার-আট-শ্রী হিজ হোলিনেস শ্রীদাম মহারাজ। দশ আঙুলে দশটা হীরের আংটি, বাসন্তী রঙের সিল্ক ভিন্ন পরে না। সে মিষ্টি মিষ্টি করে অনেক তত্ত্বকথা শোনাল, ধুর্জটি মুগ্ধ হল। ছিরু বলল, কোনও চিন্তা নেই, তোমার সমস্ত ক্ষোভ আমি দূর করে দেব, তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে যাতে পরমা শান্তি পাও তার ব্যবস্থা করব।

তার পর ছিরু ধুর্জটিকে যে লেকচারটি দিল তার সার মর্ম এই।—তোমাদের এই দাম্পত্যকলহ মার্কস-কথিত দ্বান্দ্বিক নিয়মেই হয়েছে। তুমি কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে কবিতা লেখ, তাতে তোমার স্ত্রী চটে উঠল—এ হল থিসিস। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তোমার স্ত্রী কাল্পনিক পুরুষের উদ্দেশে লিখতে লাগল, তুমি চটে উঠলে—এ হল অ্যান্টি-থিসিস। এখন দরকার সিন্থিসিস, তা হলেই সব মিটে যাবে। তোমরা দুজনে আমার মঠে চলে এস, নিত্য সৎকথা শোন, আর এই দুখানা বই দিচ্ছি, ভাল করে প'ড়ো—প্রেমসিন্ধুতরঙ্গভঙ্গিমা, এবং ডায়ালেকটিক্যাল বৈষ্ণবিজম। পড়লে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি আর শ্রীমার্কসে অচলা নিষ্ঠা হবে। তার পর ধুর্জটি আর তার স্ত্রী মার্কসীয় বৈষ্ণব মঠে চলে গেল।

যতীশ বলল, ধুর্জটি বোকা নয়, তবে কবিরা বড় সেণ্টিমেণ্টাল হয়, ভাবের ঝোঁকে অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার স্ত্রীও শুনেছি খুব চালাক মেয়ে। আমার বিশ্বাস ওরা বেশী দিন মঠে টিকতে পারবে না, শীঘ্রই অরুচি হয়ে যাবে।

ভূপতি মুখুজ্যে উঠে পড়ে বলল, তোমরা ব'স, আমি চললুম। কর্তাবাবুর খেয়াল হয়েছে কূর্ম-অবতার যাত্রা শুনবেন, তারই বায়না দিতে শিবপুর যেতে হবে। যে ছোকরা কূর্ম সাজে তার নাচ নাকি অতি অপূর্ব।

সাত দিন পরে ভূপতি আবার আড্ডায় উপস্থিত হয়ে হাত নেড়ে সুর করে বলল,

শুন ন-গ-র-বা-আ-সি-গণ,
বিচিত্র খবর চিত্তচমৎকরণ।
আমাদের মিসেস ধুর্জটিচরণ
ছিরু ঘোষকে করেছেন দংশন,
আর ধুর্জটি দিয়েছে বেদম পিটন।
স্বামী স্ত্রী করেছে স্বগৃহে গমন,
আর ছিরুর হাত হয়েছে সেপ্‌টিক ভীষণ,
আর-জি-করে হবে অ্যাম্পুটেশন।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, আঃ, ভাঁড়ামি রাখ, সমস্ত কথা খোলসা করে বল।

ভূপতি বলল, খোলসা করেই তো বললুম। আচ্ছা, ছন্দোবদ্ধ বাক্য যদি আপনাদের বোধগম্য না হয় তবে গদ্যতেই বলছি। ধুর্জটি আর তার স্ত্রী ফিরে এসেছে শুনে আজ সকালে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম। বিশ্রী ব্যাপার। মঠে যাবার দিন কতক পরে ছিরু মহারাজ ওদের বলল, এখানে স্বামী-স্ত্রীর একত্র থাকা নিষিদ্ধ, মেয়েরা আর পুরুষরা আলাদা আলাদা মহলে বাস করবে, নতুবা সাধনার বিঘ্ন হবে। শ্যামসুন্দরই একমাত্র পুরুষ, শ্রীরাধাই একমাত্র নারী। স্ত্রীপুরুষ সকলকেই রাধা-ভাবে ভাবিত হতে হবে, সেই হল আসল কমিউনিজম। তার পর একদিন শংকরীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ছিরু বলল, শ্যাম সে পুরুষোত্তম, পতি সে পুরুষাধম। আমার দেহেই শ্যামের অধিষ্ঠান হয়েছে। শ্রীরাধে, তুমি আমাকে ভজনা কর। হাত ধরে টানাটানি করতেই শংকরী চিৎকার করে উঠল, আর ছিরুর ডান হাতে এক ভীষণ কামড় বসিয়ে দিল। চিৎকার শুনে ধুর্জটি ছুটে এসে ছিরুকে বেদম কিল চড় লাথি লাগাল। মঠে মহা হইচই, ধুর্জটি আর তার স্ত্রী সোজা বাড়ি চলে গেল। তাদের মিটমাট হয়ে গেছে। শুনলুম ধুর্জটি কবিতা ছেড়ে দিয়ে সরল বীজগণিত রচনা করবে, আর শংকরী রবিবারের কাগজে নতুন রান্না লিখবে—কাঁকড়ার কচুরি, পেঁয়াজের পায়েস, এই সব।

যতীশ বলল, এই ব্যাপারের পর ছিরুর ভক্তরা বিগড়ে যায়নি?

—তা কেন যাবে, অবতারদের সবই তো লীলা-খেলা।

—ছিরুর হাত সত্যিই অ্যাম্পুটেট করবে নাকি?

—ডাক্তারের যদি কর্তব্যজ্ঞান থাকে তবে নিশ্চয়ই করবে।

এবার শুধু পুঁথির কথা না বলে কিছু মানবীয় অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই।

মনে পড়ছে ১৯১০ কি ১১ সন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মজলিসে আমরা কয়জন প্রায়ই একত্র হই। সেই মজলিসের অনেকেই এখন পরলোকে। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তী, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায় প্রভৃতি তখনকার দিনের তরুণ সাহিত্যিকদের দল, কবিগুরুর পাদমূলে প্রায়ই এসে সমবেত হতেন। এক-একদিন মজলিস একেবারে জমাট হয়ে উঠত। সেই রকম একটি দিনের কথা আজ মনে পড়ছে।

কবিগুরুর কাব্য নিয়েই প্রসঙ্গক্রমে তাঁর প্রখ্যাত একটি কবিতার কথা উঠল। কবিতাটির নাম বোধ হয় 'পতিতা'।

কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ,

> ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী
> চরণে তোমার নমস্কার
> লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা
> লও ফিরে তব পুরস্কার।

হাতের কাছে বইটি না থাকায় চারুবাবু তাঁর স্মৃতির থেকেই যা বললেন, তাই মেনে নিয়ে সেদিন আমাদের আলোচনা চলল।

কবিতার আখ্যান ভাগ হচ্ছে এই। রাজপুরুষেরা কুমার ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজধানীতে আনাতে চান। তাই তাঁরা কয়েকটি পতিতা বারাঙ্গনাকে উৎকোচ দিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে পাঠালেন। পতিতার দল বহু ছলা কলা নিয়ে গেল ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে। নিষ্কলুষ কুমার তাপস সেই নারীদের রূপ দেখে বুঝতে পারলেন না যে, এরা বারাঙ্গণা। বারাঙ্গণা জিনিসটাই তাঁর অপরিচিত। তিনি তাঁদের নয়নের দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে একজনকে বলেন,

> তোমার নয়নে দিব্যবিভা।

নিষ্কলুষ কুমার তপস্বীর এই স্বর্গীয় বাণী শুনে বারাঙ্গনাদের মধ্যে কারো কারো অন্তরের সুপ্ত দৈবভাব জেগে উঠবে। তাই একজন ক্ষোভে ও বেদনায় বিদ্ধ হয়ে রাজমন্ত্রীকে জানাচ্ছেন—

> ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী
> চরণে তোমার নমস্কার
> লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা
> লও ফিরে তব পুরস্কার।

কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে যে, কবিগুরুর হৃদয়ও এই বারাঙ্গনাদের প্রতি উদার সহৃদয়তার দরদে ভরপুর।

কেমন করে সেদিনকার আলোচনা প্রসঙ্গ পরম্পরায় এই কবিতাটিতে এসে পৌঁছল তা আজ আর মনে নেই।

স্বর্গীয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কবিগুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজপুরুষদের প্রতি সহৃদয়তা আপনার না থাকতে পারে কিন্তু পতিতাদের প্রতি এত দরদ আপনি কোথায় পেলেন? আপনার কি পতিতাদের জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোনো পরিচয় আছে?

কবিগুরু বললেন, আমাদের যোড়াসাঁকোর পাড়াটা এখন যদিও বারবণিতাদের দ্বারাই ভরপুর, চিৎপুর রাস্তাটা আজকাল আগাগোড়া তাদের দ্বারাই পূর্ণ, তবু পূর্বে এরূপ ছিল না। তখন ঐ পাড়াতে বিস্তর গৃহস্থ সজ্জন বাস করতেন। একদিন নিজ চক্ষে যা দেখেছি, তা কখনো ভুলব না।

একদিনের কথা আজো স্পষ্ট মনে আছে। একটি ছেলে হঠাৎ রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী চাপা পড়ল। অনেক পুণ্যার্থী নরনারী গঙ্গার দিকে চলেছেন। তাঁরা সেই ছেলেটির দিকে, খানিকক্ষণ দূর থেকে আহা উঁহু করে সটান নিজেদের গন্তব্য স্থলে চলে গেলেন। দোতলায় উপবিষ্ট একটি বারনারী ছেলেটিকে চাপা পড়তে দেখে একেবারে আপন মায়ের মতন আর্তনাদ করে ঝাঁপ দিয়ে অপরিচিত ঐ ছেলেটির উপর পড়লেন। আপনি বুকের উপরে ছেলেটিকে নিয়ে নিজের ঘরে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। দূর থেকেও তাঁর আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল। তারপর লোকমুখে শুনলাম নিজের গয়নাগাঁটি বিক্রী করে ছেলেটির জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করলেন। ছেলেটি তার কেউ নয়, অপরিচিত। তাঁর এই করুণার আদি উৎস কোথায়? নিশ্চয়ই জগজ্জননীর ভাব তার মধ্যে এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল। এই সুপ্তভাব বেদনার আঘাতে সেদিন হঠাৎ বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করল।

শুনেছি আমাদের মাঙ্গল্য দ্রব্যে বেশ্যার দুয়ারের মাটিও প্রয়োজনীয়।

আমি বল্লাম, মহানির্বাণতন্ত্রে মহাদেব পার্বতীকে বলছেন—

> তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা।

তার অর্থ হচ্ছে, জগতে নারীমাত্রেই তোমার স্বরূপ। শুধু স্থূল দৃষ্টিতে আমরা চোখে তা দেখতে পাই না। সাধারণ লোকেরা বুঝতে না পারলেও মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে তা ধরা না পড়ে যায় না।

সত্যেন দত্ত ও চারুবাবু দুজনেই বল্লেন, বারনারীদের এইরূপ মহত্ত্বের কথা আমরাও কোথাও কোথাও শুনেছি। আমাদের পাড়াতেও বারাঙ্গনা কোথাও কোথাও আছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তাদের খারাপ দিকটাই দেখতে পাই। বেশ্যাদের কথা উঠতেই তাদের বাড়ীর কথা উঠল। বেশ্যাবাড়ীর অভিজ্ঞতা ওদের কারোই ছিল না।

বন্ধু চারুবাবুকে আমি একদিন আমার একটি বেশ্যাবাড়ীর অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলাম। আমার সেকথা এখানে বলবার ইচ্ছা না থাকলেও বন্ধু চারুবাবু সেই খবরটি এখানে সেদিন ফাঁস করে দিলেন। তখন সবাই আমাকে ঘটনাটা বলবার জন্য ধরলেন। কাজেই বলতে হোল।

বসন্ত কাল গেছে। গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হয়েছে মাত্র। কাশীর গুদড়ী বাজারের কাছে, কোথায় পুতুল নাচের ও গানের একটা উৎসব জমেছে। বিকেলবেলা তা' ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখান হয়। তখন আমার বয়স বছর দশেক। দলের টানে পড়ে একদিন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে

আমিও দেখতে গেলাম। বিকেলবেলা। খুব আনন্দে রাজপুতানার ডিঙ্গল গান শুনেছি ও রাজস্থানী পুতুলনাচ দেখছি। এমন সময়ে দেখা গেল আকাশে কাল-বৈশাখীর ভীষণ আয়োজন। খুব বড় রকমের একটি ধুলোর ঝড় আসছে। সেই ঝড়কে সেখানে সকলে আঁধী বলত। আঁধীতে এত অন্ধকার হয় যে, সময় সময় সন্ধ্যের পূর্বেও মনে হয় যেন রাত্রি হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারও তার কাছে হার মানে। তখনই অবিলম্বে আশ্রয়ের দরকার হয়।

তখনই ভীত হয়ে আমাদের ছেলের দল বাড়ী রওনা হোল। শহর ঘুরে না গিয়ে বাঈজীদের পাড়ার মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ ধরলুম। সে পাড়াটার নাম ডালকী মন্ডী। আমাদের বড় ছেলেরা কেউ কেউ সে রাস্তা চেনেন বল্লেন।

এগিয়ে চলেছি প্রাণপণে। ডালকীমন্ডী প্রবেশ করতেই এমন অন্ধকার হোল যে, রাত্রির অন্ধকার তার কাছে কোথা লাগে। দোতলা তেতালার উপরে যেসব খাপড়ার টালী ঘর আছে, সেখান থেকে ক্রমাগত খাপড়া বর্ষণ হতে লাগল। অগত্যা একটা বারান্দার নীচে দাঁড়াতে হোল। উপর থেকে চাকররা এল সদর দরজা বন্ধ করতে চোর ডাকুর ভয়ে। ভীষণ অন্ধকার কিছু দেখা যায় না। আমাদের পায়ে পা ঠেকতেই তারা চীৎকার করে উঠল। উপর থেকে কয়েকটি সুন্দরী মেয়ে বাতি নিয়ে নেবে এলেন। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য। তখন সবাই দেখলেন আমরা বিপন্ন ছোট ছেলের দল। অন্ধকারে এতক্ষণ কেউ আমাদের দেখতে পান নি। এইমাত্র আমাদের দেখলেন। যদিও আমরা চোর ডাকাত নই, তবু চাকরেরা আমাদের বাইরে ঠেলে দিতে চায়। মেয়েরা বলেন কখনো না, এই ছেলে কয়টিকে উপরে নিয়ে চল। আমাদের নিয়ে উপরে চলে গেলেন।

আমাদের নিয়ে স্নানের ঘরে গিয়ে মাতৃজাতিসুলভ যত্নে হাত পা ধুইয়ে, মুছিয়ে, কাপড় ছাড়িয়ে ঘরে বসালেন। আমাদের বস্ত্রাদি সব ভিজে গিয়েছিল, তাই ওদের বিছানার চাদর দোলাই প্রভৃতি পরতে হোল। আমাদের কাপড়গুলো শুকোতে দেওয়া হোল। আমাদের গরম দুধ খাইয়ে কত যত্ন করে বসালেন। এ'রা যে বাঈজী অর্থাৎ বেশ্যা তা কি আমরা বুঝি।

ঐ বাড়ীতে ৩।৪টি মেয়েকে দেখলাম। তাঁরা সবাই নাকি বাঈজী অর্থাৎ ভালো গাইতে পারেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করলেন যে, চুপ করে বসে লাভ কি, এই বেলা তোমাদের কিছু গান শুনিয়ে দেওয়া যাক। একজন গান করলেন অপূর্ব দরদ দিয়ে। তার প্রথম পদটি হচ্ছে—'হারে যশোদা দুলাল।' অর্থাৎ গোষ্ঠ হতে ক্লান্ত হয়ে আগত শ্রীকৃষ্ণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন মা যশোদা। সেদিন ঘণ্টা দুই যে গান চলেছিল, সবই কানাইর প্রতি মা যশোদার বাৎসল্য রসে ভরপুর।

২।৩ ঘণ্টা কেটে গেল। অন্ধকার দূর হয়ে এল। ক্রমে চাঁদের আলো ফুটে উঠল। বাঈজীদের মধ্যে কেউ একজন বল্লেন, আজ রাত্রে এদের এখানেই রেখে দাও। কাল সকালে যাবে। অন্যরা বল্লেন, তা কখনো হয়? ভাবনার চোটে বাড়ীর সকলে যে মারা যাবেন।

তাঁদের ব্যবস্থামত তাঁদেরই গাড়ী দ্বার-দেশে এল। আমাদের গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে বিদায় কালে কত স্নেহ সম্ভাষণই করলেন। একজন বল্লেন, বাবা এদিকে তোমরা কখনো এলে আমাদের কাছে এসো। চিনতে পারবে তো? তখন অন্যেরা প্রতি-বাদ করে বল্লেন, না বাছা তোমরা কখনো এসো না। এ অতি অসৎ স্থান।

বলা বাহুল্য, আসবার সময়ে আমরা বস্ত্রাদি ছেড়ে নিজেদের কাপড়ই পরে এসেছিলাম। কাপড় শুকিয়েছিল।

এই ঘটনার বছর দুই পরে, কাশীর একজন মাননীয় রইসের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছি। সঙ্গে গুরুজন আছেন। বাঈজীদের গান ছিল। একজন বাঈজী তার মুজরা শেষ করে যখন বিদায় নিলেন তখন যিনি গাইতে এলেন, তাঁকে দেখলাম। সেই রাত্রের যত্নকারিণী বাঈজী-দের মধ্যেই একজন। তিনি গাইতে এসে প্রথম আমাদের দেখতে পাননি। সেদিনও যাঁরা আমাদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে রইসের বাড়ীতে গেছেন, তার মধ্যে একটি সেই আঁধীর রাত্রে আমাদের দলে ছিলেন।

ছেলেটি তাঁর অভিভাবকসহ সামনেই বসেছিলেন। বাঈজী তাঁকে দেখতে পেয়েই চিনতে পারলেন। তাঁর সামনে এসে হাসি-মুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে বাঈজী আপন মুজরা শুরু করলেন।

আমি দূরে ছিলাম, আমাকে দেখতে পাননি। তাই রক্ষে। কারণ যে ছেলেটিকে তিনি কুশল সম্ভাষণ করেছিলেন, সেই ছেলেটির অভিভাবক আপন ছেলেসহ অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তখনই সেখান থেকে উঠে গেলেন। তারপর তার ছেলেটির উপর এমন নিগ্রহ চলল যে, বাঈজী যে আমাকে দেখতে পাননি, এটা তখন পরম সৌভাগ্য বলে মনে হোল।

বাঈজীদের বাড়ী সম্বন্ধে আমার যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার এখানেই সমাপ্তি। তবে ভারতীয় সন্তদের সম্বন্ধে এবিষয়ে অনেক ভালো ভালো কাহিনী শুনেছি।

ভক্ত কবীরের বিষয়ে শোনা গেছে, সন্ত সাধকেরা মাঝে মাঝে সাধনার জন্য কোথাও কোথাও একত্রিত হতেন। সেই প্রসঙ্গে একটি গ্রামের কথা শুনেছি। সেই গ্রামটি ছিল অমী নদীর তীরে। গ্রামবাসীরা তাদের গ্রামের প্রত্যন্তবাসিনী এক পতিতাকে ঘর ছেড়ে উঠে যাবার জন্য ধরেন। মেয়েটি উঠতে গররাজি। সন্তদের ও বাইরের লোকের কাছে গ্রামের মান রাখতে গ্রামবাসীরা স্থির করলেন যে, তার ঘরে আগুন দিয়ে তাকে উৎখাত করবেন। কবির গ্রামবাসীদের নিরস্ত করে, নিজে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সেই নারীর প্রাঙ্গণে পরদিন ভোরবেলায় উপস্থিত।

নারীটি তখনও শয্যাত্যাগ করেনি। শয্যায় শুয়ে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখছিল, এক মহাপুরুষ তার দুয়ারে উপস্থিত। চমকে উঠে সে ভক্ত কবীরকে দেখে, তার ঘরে যা কিছু খাদ্য ছিল এনে উপস্থিত করল। কবীর বল্লেন, এইসব ভিক্ষা নিতে আমি আসি নাই। আমি এসেছি তোমার মোহাবরণটি নিয়ে যেতে। তোমার মধ্যে যে জগজ্জননীর দিব্যরূপ রয়েছে, তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তোমার কামনা কলুষিত আবরণ দিয়ে। সেই আবরণটি আজ ভিক্ষা চাইতে এসেছি। তা ছাড়া আর কিছুতে আমার ভিক্ষা পূর্ণ হবে না।

মেয়েটি চোখের জলে ভেসে গেল। কাঁদতে কাঁদতে সে কবীরকে বল্ল, বাবা এ কি সহজ কথা। এই মোহাবরণ যে আমার গায়ের চামড়া হয়ে রয়েছে। এই চর্মটি মোচন করতে গেলে যে বেদনা, তা কি সহ্য করা সহজ?

কবীর বল্লেন, মাগো সে ভিক্ষা না পেলে আমি আজ এখান থেকে নড়ব না।

দুজনেই নিস্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করছেন। কারো মুখে কথাটি নেই। অবশেষে সেই নারীকেই হার মানতে হোল। কবীর তাঁর পূর্ণ ভিক্ষা আদায় করলেন। যাবার সময়ে তৃপ্ত হয়ে বলে গেলেন, 'আজ আমি ভিক্ষায় এসে এক বিচিত্ররূপে জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করে গেলাম।' কবীরের সেই কথাই আজ চণ্ডী পাঠের সঙ্গে এই পূজার দিনে ঘরে ঘরে ধ্বনিত হচ্ছে।

সর্বরূপময়ী দেবী
সর্বদেবীময়ং জগৎ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক শেষ হয়ে আসছে তখন।

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ চলে গেছে; শিব চতুর্দশীর পর দিন মৌনী অমাবস্যা। পঞ্জিকায় নির্দেশ আছে মন্বন্তরা ও অক্ষয়-স্নান। এই রাত্রিতে গঙ্গাস্নান অক্ষয়পুণ্য। রাত্রি প্রভাতে শুক্লপক্ষের আরম্ভ মাধবপক্ষ, পূর্ণিমায় মাধবের রঙের খেলা, হোলি উৎসব, আবীরে রঙে কুমকুমে পৃথিবী রাঙা হয়ে যাবে, মাধবীলতার কোমল সবুজ শাখাগ্র-গুলির গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে হরিদ্রাভ কোমল-শুভ্র মর্ম মাধবীপুষ্প স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠবে। গৌরীপতির অর্চনার জন্য বসন্তের প্রারম্ভ থেকেই ফুটতে শুরু করেছিল যে রাঙা পলাশস্তবক সে পলাশের ফোটা শেষ হয়েছে শিবচতুর্দশীতে, তার ঝরার পালা শুরু আজ থেকে। রাঙা পলাশ শুকিয়ে রঙে পরিণত হবে, তারই কণা উড়িয়ে বাতাস খেলবে হোলি। সংকল্প করে যারা মাধবার্চনা করবে তারা এই অমাবস্যার রাত্রিতে স্নান করে, ঝরাপলাশ কুড়িয়ে বাড়ি আনবে, রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে তাই দিয়ে তৈরী করবে মাধবরঞ্জনের জন্য রাঙা রঙ। আবীর কুমকুম আসবে বাজার থেকে। অজয়ের ইলাম-বাজারের ঘাটে বড় বড় নৌকা এসে লাগবে। আবীর কুমকুম বেচে লা, আলতা, গালার খেলনা চুড়ি আর তুলো বোঝাই নিয়ে ফিরবে। জাফরান নিয়ে আসবে পাঞ্জাবের শেখ সওদাগরেরা, ইয়া ঢিলেঢালা পায়জামা হাঁটু-ঝুলে পাঞ্জাবী আস্তিন, তার উপরে হাতকাটা জরির কামদার ফতুয়া; জাফরানের সঙ্গে আনবে আতর; বড় বড় গদির মালিকেরা, জমিদারেরা আতর কিনবে; তাদের হোলিতে আবীরের সঙ্গে আতর না হলে চলে না।

আজকাল ইলামবাজারে যে ইংরেজ কোম্পানীর নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তখন সে কুঠীর পত্তনই হয় নি। বাংলা দেশে তখন নবাব সুজাউদ্দিন খাঁর আমল। নবাব মুরশিদ কুলি খাঁর আমলের টাকায় পাঁচ ছ'মণ চালের চলন তখনও সমানভাবে চলছে। বর্গীরা তখনও দেশে আসে নি। দেশে তখন অনাবৃষ্টিও ছিল না। যুদ্ধও না। বাঙলা দেশের ক্ষেতে তখন শস্যের সমারোহ; খামারে খামারে ধানের বাখার, ছোলা মসুরের বাখার, ভাঁড়ারে জালায় জালায় গুড় মজুদ। ঢাকায় মসলিন, মুরশিদাবাদ বিষ্ণুপুরে রেশম, গ্রামে গ্রামে আটপৌরে কাপড়ের তাঁত চলে ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। ফিরিঙ্গীরা এ দেশে এসেছে, বসেছে, কিন্তু তার ভিত পোক্ত হতে পারেনি। ওই তাঁতের কারবারে ইলামবাজারের তুলোর বাজার মস্ত বড় মোকাম। লেন দেন চলে হাজার হাজার টাকার। তার সঙ্গে আশ-পাশের চাষীদের ঘরের পলুর চাষের রেশমের কারবারও কিছু আছে। কিন্তু সবচেয়ে ইলামবাজারে বড় কারবার লাক্ষার। অজয়ের কুলের কুল গাছ আর পলাশগাছে লায়ের চাষ চলে। লা থেকে রঙ আলতা, গালা তৈরী হয়ে চালান যায় দিল্লী পর্যন্ত। এখানকার গালার কদর খুব। মুরশিদাবাদের দরবারে যে গালার উপর মোহর ছাপ দিয়ে গোপনীয় পত্র পাঠানো হয় সে গালা ইলামবাজারের। নবাব সুজাউদ্দিনের রঙমহল চেহেলসতুনে যে সব গালার আসবাব খেলনা আছে, বিলাস-ভবন ফররাবাগে যে বিরাট বড় অপরূপ গাছটি আছে, যার সবুজ পত্রপল্লবের বৃন্তে বৃন্তে লাল ফুল আর টোপা টোপা হলুদ ফল, তার উপর এক ঝাঁক কাল কুচকুচে মৌচুটকি পাখী সরষের আকারের রাঙা চোখ আর প্রবাল রঙের ঠোঁট নিয়ে বসে আছে, যার তারিফ নাকি দিল্লী দরবারের আমীরেরা এসেও করে গেছেন সে গাছটি ইলামবাজারের গালা দিয়ে এখানকার কারিগরেরাই তৈরী করেছে। বেগমেরা পুরনো ভেঙে নিত্যই যে নতুন গালার চুড়ি পরেন, জড়োয়া চুড়ির পাশেও যে চুড়ি জেল্লায় হার মানে না—সে চুড়ি ইলামবাজারের। মুরশিদাবাদের তওয়াইফ বাইজী কসবীদের হাতে যে এক-হাত করে গালার চুড়ি সেও তাই। ইলাম-বাজারের গালার চুড়ির রঙ সোনাদানা জহরতের সঙ্গে পাল্লা মারে। তার সঙ্গে তার গড়ন-রঙ-ঢঙের নিত্য পরিবর্তন। ওদিকে ইলামবাজারের কারিগরদের যেমন কারিগরির এলেম—তেমনি নিত্য নূতন ঢং আবিষ্কারের উপযুক্ত সাফা মগজ! নবাব বাদশাহের দরবারে খেলাতের ফর্দে বড় বড় বাড়ির কুটম্বিতার তত্বতল্লাসের দফার মধ্যে ইলামবাজারী গালার জিনিস কিছু না কিছু থাকেই। গালার তৈরী থালার উপর ফল ফুল আর খুচরো ফল—আম জাম কাঁঠাল এসবগুলি স্বচ্ছল গৃহস্থের ঘরে না-থাকলে মন খুঁতখুঁত করে। ইলামবাজারের বাজারে এর জন্যই বহু খরিদ্দারের আমদানী। অনেকে বলত ইলামবাজার নয়, এলেমবাজার।

অমাবস্যার ভোর বেলা। আকাশের পূর্বকোণে শুকতারা দপদপ করছে এখনও। অমাবস্যার অন্ধকার সবে ফিকে হতে শুরু করেছে, রাত্রির নিঝুম থমথমানি এখন কাটেনি; পাখীরা সবে একবার ডাক দিয়ে আবার ডাকি-ডাকি করছে; গালার কারখানার চুল্লীর ছাই কাড়া—অর্থাৎ পরিস্কার করা তখনও শুরু হয়নি। এই সময়ে আজ স্নান

গেছে। কাল থেকে মাধবার্চনা পক্ষ। আজ স্নান না করলে চলে? দোল পূর্ণিমা হোলি উৎসব।

বাংলা দেশে মহাপ্রভুর যে বৈষ্ণব ধর্ম মহাপ্লাবন এনেছিল—জীবনকে সাগর-সঙ্গমের মহাতীর্থে পৌঁছে দিয়েছিল, সে স্রোতোধারার মুখ তখন মজে এসেছে, ফলে দেশজুড়ে অবস্থা হয়েছে বিলের মত। মাছেরা যেমন এক্ষেত্রে সাগরসঙ্গমে পৌঁছুতে পারে না, সাগরের স্বাদ পায় না—বিলের জলতলেই পরিতুষ্ট থেকে চক্রাকারে পাক খেয়ে উছল মেরে অসীম অনন্তের সীমা ও অতলের তল পাওয়ার ভ্রান্ত আস্বাদে বিভোর থাকে —মানুষেরাও তেমনি আচার আচরণ পালনের মধ্যেই পরম-প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখে কল্পনা করে। বিলের জলে গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট ব্যঞ্জনের লবণের স্বাদেই যেমন বিলের মাছের সমুদ্র জলের আস্বাদ বলে ভ্রম হয়—মানুষেরও ঠিক সেই অবস্থা।

স্নান। স্নান। অক্ষয়স্নান। ইলাম-বাজারের প্রান্তদেশে অজয়; ক্রোশ তিনেক দূরে শ্রীমন জয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাট কেন্দুলী। কেন্দুলী পর্যন্ত অজয় গঙ্গা মহিমায় মহিমান্বিত; পৌষ সংক্রান্তিতে মকরবাহিনী উজান বেয়ে কাটোয়া থেকে কেন্দুলী ঘাট পর্যন্ত আসেন; এ পর্যন্ত অজয়-স্নানে গঙ্গাস্নানের পুণ্য হয়; দলে দলে স্নানার্থীরা স্নান-পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য জেগে উঠেছে সেদিন।

—ওদিকে নয়। এইদিকে। আরও খানিকটা নিচে যাই চল। লোক থৈ থৈ করছে ওদিকে। এদিকটা নিরিবিলি হবে। কি? দাঁড়ালি যে?

—হুঁ! অভিযোগের সুরে হুঁ বলে সুর টানলে মোহিনী। অভিযোগের সঙ্গে আবদার।-হুঁ—। ঘাটের বাজারে গালার চুড়ি পরব যে!

মা আর মেয়ে। কৃষ্ণদাসী আর গোবিন্দ-মোহিনী। সংক্ষেপে দাসী আর মোহিনী। ইলামবাজারের ন্যাড়ানেড়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বড় আখড়ার অধিকারিণী। কিন্তু লোকে চুপি চুপি বলে বৈষ্ণবী নটী। কথাটা পরিস্কার হল না। ছিল ওরা বৈষ্ণবী। মা কৃষ্ণদাসী তরুণ বয়সে নামের দলের সঙ্গে নাম গান গেয়ে বেড়াত; ক্রমে ইলামবাজারের ঐশ্বর্যের মোহে আজ নটী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে পুরো নটী নয়, নটীপাড়ায় বাস করে না, নটীর সাজে সাজে না, বৈষ্ণবীর মত তিলক কাটে চূড়াবেঁধে চুলও বাঁধে, বাজার এলাকার বাইরে আখড়াতেই বাস করে। সেখানে প্রভুর সেবাও আছে। তবে এ সমস্তের আড়ালে ওদের আর একটি রূপ আছে। সেটি নটীর রূপ। অনেককাল পর্যন্ত সেটি সাধারণ্যে অপ্রকাশ ছিল। কিন্তু কৃষ্ণদাসীর আখড়ার

পাকা কোঠা ঘর এবং পানের সঙ্গে মুরশিদা-বাদী জর্দা আর আতরের ঈষদ গন্ধ থেকে এ সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তাতে কৃষ্ণদাসীর কোন অনুশোচনা নাই, কিন্তু লজ্জা এখনও আছে। আরও তার সঙ্গে আছে শঙ্কা। অত্যন্ত সাবধানে থাকে সে। কোন গদি-ওয়ালা ধনীর বাড়ীতে যখন সে যায় তখন অত্যন্ত গোপনে যায়। যায় ডুলীতে, সঙ্গে লোক থাকে। বিরল পথে যাতায়াত করে। পথে লোকে ব্যঙ্গ করলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। বাজারের লোক দেশান্তরের আগন্তুক দুঃসাহসী সওদাগরদের পিছন ধরিয়ে দিলে বিপদ হবে। ওদের তো কোন বাধাবন্ধ নাই, এসে হাকবে—এ লম্বরদারনী!

তাদের সম্প্রদায়ের অনেককে এই অসাধানতার জন্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে বাজারে। তার উপর এই মেয়ে মোহিনী। মোহিনীকে কৃষ্ণদাসী অতি সন্তর্পণে গোপন সম্পদের মত রাখতে চায়। মেয়ে তো নয়, সাক্ষাৎ আগুনের শিখা। ঘরের দেওয়ালের আড়ালে কাচ ঘেরা লণ্ঠনের ভিতরের প্রদীপের মত ঢেকে রেখেছে তাই, ঘেরা না থাকলে এত পাখাওয়ালা পিঁপড়ে ফড়িং ছুটে এসে ওর উপর ঝাঁপ পড়বে যে তাতে হয় শিখাই নিভে যাবে নয়—অগ্নিকান্ড হবে। সেই কারণেই বাজার পার হয়ে ইলামবাজারের সদরঘাটে যাবে না কৃষ্ণদাসী; বাজারকে পিছনে রেখে মাঠ পার হয়ে শালবন কুলবনের ভিতর দিয়ে গাঁয়ের ঘাটে স্নান করবে। আর মেয়ে যাবে ঘাটের বাজারে চুড়ি পরতে!

কৃষ্ণদাসী বললে—না। একটু রূঢ়ভাবেই বললে।

ভালো করে চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মেয়ের চাদরটাও ঠিক করে দিলে। সবে মেয়েটার বয়স পনের। তার কুড়িবছর বয়সের সন্তান।

—চুড়ি আমি আনিয়ে দেব।

মৃদুস্বরে মেয়ে তেমনি অনুযোগের সুরেই বললে—আনিয়ে দেবে! পরের আনা জিনিসে বুঝি পছন্দ মত হয়? দোকানে কতরকম চুড়ি...

বাধা দিয়ে মা বললে—কত রকম চুড়ি! মরণ তোমার! দোকানে সবার সামনে লোক দেখিয়ে চুড়ি পরবি কি? আমাদের বুঝি তাই পরতে আছে?

—নেই তো, এত চুড়ি পরে তুমি ডুলি চেপে যাও কেন?

—যাই কেন? কচি খুকী নাকি তুই? সে যাই লুকিয়ে। আমরা বৈরেগী-বোষ্টুম, ন্যাড়ানেড়ি সম্প্রদায়। আমাদের অলঙ্কার না। আভরণ না। শুধু তেলক আর মালা। বড়জোর দরবেশী ফকীরকাটী ফটিকের মালা। দশকে দেখিয়ে গালার চুড়ি পরে 'ভাবন' করতে গেলে—পতিত করবে। চল,

করিস নে। ঝুঁঝাকি কেটে ফরসা হয়ে আসছে।

আকাশ সত্যই ফরসা হয়ে আসছে; গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। দিক চক্রবালের ওপার থেকে সূর্য দেবতার রথ ছুটে আসছে মুহূর্তে মুহূর্তে বহুযোজন পথ অতিক্রম করে। পাখীরা বাসায় বসে মুখ বাড়িয়ে কলরব করা শেষ করে দুটি চারটি করে বাইরে উড়তে শুরু করেছে। কাকেরা বেরিয়েছে সব চেয়ে আগে। প্যাঁচা এবং বাদুড়েরা বাসায় ফিরছে। খুবই কাছাকাছি মাথার উপর দিয়ে দ্রুত কুহু-কুহু-কুহু-কুহু ডাক ডেকে উড়ে গেল একটা কোকিল। কাকে তাড়া করেছে।

মোহিনী কাকটাকে গাল দিলে—মর মুখ-পোড়া হিংসুটে!

কৃষ্ণদাসী বললে—ওই অমনি করে তেড়ে ঠোকরাতে আসবে বাজারের যত নচ্ছারের দল। শিষ কাটবে। তখন মনটা থাকবে কোথায়!

বাজারের পথে সাধারণ নটীরা যখন সেজেগুজে বের হয় তখন বাজারের অবস্থাটা যে কি হয়! মা গো! শিষ, হাসি, অশ্লীল কথা যেন হাঁড়ি ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে গড়িয়ে বেড়ায় অবরুদ্ধ পচন রসের মত। ওই বিদেশীদের দু একজন দুঃসাহসী দাঁত মেলে পথ আগলে দাঁড়ায়, হাত ধরে টানে। সাধারণ নটী কসবীরা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে গুপ্ত প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তাই কি কৃষ্ণদাসীর সহ্য হয়?

তাদের পাট অর্থাৎ বিগ্রহের আশ্রমটি তো অখ্যাত সামান্য নয়। তার খ্যাতি অনেক। তারা অবশ্য সমাজে নগণ্য, বৈষ্ণব গোস্বামীদের চরণরেণু, জাত হারা ন্যাড়া-নেড়ী দলের বৈরাগী বৈষ্ণব। কিন্তু তবুও তার শ্বশুর প্রেমদাস বাবাজীর সাধক হিসেবে খ্যাতি ছিল। তাঁর ভাবাবেশ হত, তাঁর ভাবাবেশের সময় গোরাচাঁদের কাঁধের চাদর খসে পড়ত। বড় বড় গোস্বামীরা দেখতে আসতেন। তাঁরা বলতেন প্রভুর অঙ্গেও কম্পন জাগে তাই এমন হয়। কেউ বলতেন ওই চাদর দিয়ে প্রেমদাসের অঙ্গের ধুলা ঝেড়ে দিতে বলেন। কৃষ্ণদাসীর মহান্ত প্রেমদাস বাবাজীর নিজের ছেলে নয়; সুন্দর রূপ দেখে পোষ্য নিয়েছিলেন শেষ সেবাদাসীর গৃহস্থাশ্রমের ছেলেটিকে। নাম দিয়েছিলেন গোপাল দাস। পাটটিই বরাবরকার শিষ্য আর পোষ্যের পাট। এ পাটের সেবায়েৎ বাবাজীদের সেবাদাসী আছে, সন্তান নাই। সন্তান এই মোহিনী প্রথম হল গোপাল দাসের। তাতে সমাজে লজ্জা অবশ্য হয়েছে কিন্তু এ লজ্জা আর সে লজ্জায় অনেক প্রভেদ। ইলামবাজার এবং তার

মাথার মানুষ হল প্রেমদাসের আখড়ার সেবায়েৎ।

ইলামবাজারে বাজার যত জমে উঠল অজয়ের ঘাটে বন্দরের যত জাঁক বাড়ল ততই তো এখানকার তাদের সম্প্রদায়ের কলঙ্ক অপবাদ বাড়ল, তা মিথ্যেও নয়। বাইরে গ্রাম অঞ্চলে বৈষ্ণবদের বড় বড় পাটে তাদের সঙ্গে পতিতের মত ব্যবহার শুরু করেছে। এই তো ক্রোশ চারেক পথ জয়দেব কেন্দুলী, পৌষ সংক্রান্তিতে সেখানে গোটা দেশের বাউল দরবেশ ন্যাড়ানেড়ীর সমাগম হয়; মহোৎসব হয়; সেখানে ইলামবাজারে তাদের যাওয়া ভার হয়েছে। ইলামবাজারের বৈষ্ণবী শুনলে—তাদের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে, কেউ বা মুচকে হাসে, কেউ বা একটু সরেও বসে। এ অবস্থায় তাদের আখড়ার একটা প্রকাশ্য কেলেঙ্কারী হলে রক্ষা থাকবে না, পতিত করে একেবারে বাজারের ওই নটীগুলোর সামিল করে দেবে।

মেয়ের পিঠে ঠেলা দিয়ে কৃষ্ণদাসী হাঁটতে শুরু করলে। রাত্রির স্নান। আলো ফুটলে হবে না। এতেই অন্যায় হল। রাত আর নেই। পাখী ডেকেছে। পাখী ডাকলে আর রাত্রি থাকে না। 'ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা, খনা বলেন—সে হ'ল ঊষা।' ঊষা কাল রাতও নয় দিনও নয়। পাখী বাসা ছেড়ে বাতাসে পাখা মেললেই ঊষা শেষ, দিন শুরু হয়ে যায়। তবে দেশাচারে এটা চলে। —চল, চল, পা চালিয়ে চল বাছা। তা' বলে দেখে চলিস। দেখছিস না কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া, 'কয়ো' (কুয়াসা) জাগছে।

আকাশে সূর্যোদয়ে বিলম্ব ছিল। কুয়াসায় জাগছে ধীরে ধীরে। স্নান সেরে শুকনো কাপড় পরে মোহিনী পলাশ তলায় ঝরা ফুল কুড়াচ্ছিল। অজয়ের ওপারে শালবন। বিশাল শাল বন। অরণ্য। কৃষ্ণদাসী মোহিনীকে কোলে নিয়েই ওই অরণ্যের ভিতর দিয়ে শড়ক ধ'রে মদনমোহনের বিষ্ণুপুর হয়ে ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে জগন্নাথ দর্শন ক'রে এসেছে একবার। তখন মোহিনীর বাপ গোপাল দাস বেঁচে ছিল। দল বেঁধে গিয়েছিল তারা। এদিকে এ বন কেন্দুলীর ওপারের শ্যামরূপার গড় পার হয়ে চলে গিয়েছে পাহাড় মুলুকের দিকে। অ[illegible]য়ের তীরে অবশ্য জঙ্গলটা পাতলা। শা[illegible] গাছগুলি ছোট ছোট, আর ফাঁকা ফাঁকা। শালের সঙ্গে মহুয়া আর পলাশ।

মহুয়া ফুটেছে, মহুয়ার গন্ধ উঠছে। ভোরের হিমেল বাতাস গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে। বাতাস জোরে বইছে। পাকা মহুয়া ফুল টুপ টাপ করে ঝ'রে পড়ছে। তার সঙ্গে বনে পাতা ঝরছে। ঝর-ঝর-ঝর শব্দ উঠছে।

কৃষ্ণদাসী ভিজে গামছায় মহুয়া কুড়োচ্ছিল। তার অবশ্য রঙের বয়স যায়নি, হোলির দিন মোহিনী আর কি রঙ খেলবে—খেলবে সেই। কিন্তু রঙের বাহারের চেয়ে মহুয়ার রসের দিকে তার আকর্ষণ বেশী। আট দশটা মুখে ফেললে সারাটা দিন মাথায় রসের ঘোর লেগে থাকে। মোহিনীকে দুটো একটার বেশী খেতে দেয় না। আজও দেয় নি; সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছে জর্দা-মৌ-এ সব খাবার একটা বয়স আছে। বয়স হোক। খাবি। সে সব আচরণ আছে। হবে। তবে তো।

বলতে বলতে মুচকি হাসি আপনি মুখে ফুটে ওঠেছে তার।

এসব মোহিনী আবছা বোঝে। লজ্জা হয় সঙ্গে সঙ্গে। মুখ লাল হয়ে উঠেছে তার, বলেছে—কি বলিস যা-তা!

মুখ টিপে হেসে দাসী বলেছে যা-তা? দেখবি, তখন দেখবি! তোকে পুজো করবে লো! চন্দন মাখাবে সারা অঙ্গে। যা তা নয়। কিশোরী পুজো।

গুণগুণ ক'রে গান গেয়ে শুনিয়ে দিল মেয়েকে—উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী—।

একে সেকালের ন্যাড়া-নেড়ির দলের বষ্টুমী তায় গঞ্জবাজারের জলেবাতাসে আধানটী, তার উপর এই নির্জন নদীতট, তারও উপর মুখে তার মৌ ফুলের রসাল

স্বাদ, মনে মনে মৌতাতের একটি গোপন প্রত্যাশা; কাজেই কৃষ্ণদাসীর রসবিলাস উন্দাম হয়ে উঠল। 'কিশোরী ভজনের' কথার সঙ্গে জানিয়ে দিল যে, বাইরে যেমন নানান আচার ও ধর্মাচরণের পদ্ধতির সঙ্গে কোন একটি নিরীহ বৈষ্ণব মহান্তের সঙ্গে তার মাল্যবদল হবে, তেমনি ভিতরে কোঠা ঘরের উপরে আতর গোলাপ বসন-ভূষণের সমারোহের মধ্যে বাজারের কোন বিলাসী ধনী এসে তার সঙ্গে বাসর-সজ্জা পাতবে।

—দেখবি, ইলেমবাজারের যে আলতা এ চাকলায় কেউ চোখে দেখে না, যা যায় রাজারাজড়ার বাড়ী, সেই আলতা পরাবে তোর পায়ে।

তারপর আবার বললে—সেই ঠিক তার আগে, পরব দেখে তোকে অজয়ের সদর ঘাটে চান করতে নিয়ে যাব। সকাল বেলা—ভর্তি বাজারের সময়। তোকে দেখবে সব হাঁ ক'রে। তারপর লাগবে—নিলেমের ডাক। হুঁ-হুঁ!

অকস্মাৎ কাঁসর ঘণ্টা শাঁখ বেজে উঠল।

চমকে উঠল কৃষ্ণদাসী। খুব কাছেই কোথাও। ধ্বনিটা অতি নিকটের বলেই নয়, দেবমন্দিরের আরতির ধ্বনি বলেই চমকে উঠেছিল সে। বলে উঠল—মরণ! কোন সময়ে কোন তান!

মোহিনী কথা বললে না। মায়ের কথাগুলির মধ্যে একটি মারাত্মক মোহ ছিল। তার কিশোরী মন তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, শুনতে শুনতে অঙ্গ যেন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ফুল কুড়ানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার। এই ঘণ্টার শব্দে এবং মায়ের চমকে সে চমকে উঠল না, শুধু সজাগ হয়ে পলাশ ফুল কুড়িয়ে যেতে লাগল। প্রায় কোঁচড় ভর্তি হয়ে উঠেছে পলাশ ফুলে। একেবারে তলারগুলি থেকে চাপে এবং পেষণে রাঙা নির্যাস বের হয়ে আঁচলখানিতে ছোপ ধরিয়েছে।

কৃষ্ণদাসী মৌ কুড়ানো বন্ধ ক'রে সবিস্ময়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে।

সামনেই বনান্তরালে অজয় নদী বাঁক ঘুরেছে। সেই বাঁকের মাথায় একখানা বড় নৌকো। নৌকোর গলুইয়ে একটা ধ্বজা উড়ছে। ওই নৌকো থেকেই উঠছে আরতির কাঁসর ঘণ্টা শাঁখের শব্দ! মস্তবড় নৌকো।

কার নৌকো? মাঝি মাল্লার মাঝখানে জনকয়েক গেরুয়া পরা লোক? কোথাকার মহান্ত? জয়দেবের মহান্তের ঝাণ্ডা তো নয়! সে তো চেনে কৃষ্ণদাসী।

ঠিক এই সময়েই নৌকোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একজন সন্ন্যাসী। নৌকোখানা পালে চলছে এখন। জোর বাতাসে পালের টানে নৌকাখানা তরতর করে উজানে চলেছে। অজয়ের স্রোতও এখন মন্থর। দেখতে দেখতে নৌকাখানা তাদের সামনাসামনি এসে গেল। অজয়ের বালি এখন ওপারে, দক্ষিণ তটে। এপাশের কোল ঘেঁষেই চলেছে স্রোত। মা-মেয়ে দু জনেই সবিস্ময়ে পা-পা ক'রে এগিয়ে এল তটের ধারে।

অপরূপ সন্ন্যাসী। বৈষ্ণব। মুণ্ডিত মাথায় বেশ মোটা টিকি। টিকিটির গ্রন্থিটি ঠিক চূড়ার মত দেখাচ্ছে, তাতে সাদা ফুলের মালা জড়ানো। কপালে তিলক। বাহুতে তিলক। বুকে ছাপ। তার উপর তুলসীর মালা আর ফুলের মালা জড়াজড়ি করে দুলছে। দেহবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম কিন্তু তাতে অপরূপ একটি কান্তি আছে। আয়ত দুটি চোখ মুখশ্রীকে অপরূপ ক'রে তুলেছে। শান্ত প্রসন্ন মুখশ্রীতে একটি গম্ভীর উদাসীনতা থমথম করছে।

সন্ন্যাসী বেরিয়ে এসে সদ্যোদিত সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন।

কৃষ্ণদাসী অবাক হয়ে গেল। কে এল নবীন গোঁসাই? এ অঞ্চলের গোঁসাই মহান্ত সকলকেই তো সে চেনে! হোক না সে ন্যাড়া-নেড়ী বৈরাগী বৈষ্ণবী, ইলামবাজারের ন্যাড়া-নেড়ীদের বড় আখড়ার সে মা-জী। দুর্নাম থাকলেও পতিত নয় এখনও; মহোৎসবে, চব্বিশ প্রহরে, নবরাত্রিতে এখনও তাদের ডাক আসে —তাকে যেতে হয়; সে তো জানে চেনে। এ কে? এ তা' হ'লে কোন দূরান্তরের গোস্বামী মহান্ত নিজের মঠের ধ্বজা উড়িয়ে এসেছেন জয়দেব প্রভুর পাট পরিক্রমা করতে। তীর্থযাত্রী, গোস্বামী মহান্ত; প্রভাতটি আজ ভাল। দর্শন পুণ্য হয়ে গেল। নৌকাখানা পার হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণদাসী যাই হোক বৈষ্ণবের ঘরে তার জন্ম, বৈষ্ণবের আখড়ায় সে বাস করে, সে এ গোঁসাইকে দেখে প্রণাম করতে ভুললে না। সেই তটভূমিতেই নতজানু হয়ে বসে প্রণাম করে উঠে হাত জোড় ক'রে রইল। পরমুহূর্তে আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে যতখানি সে অবাক হল ততখানি সে বিরক্ত হল। মেয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে। পলক পড়ে না। কৃষ্ণদাসী তার হাত ধরে টানলে—মর-মর-মর! প্রণাম কর! প্রণাম কর।

মোহিনী চমকে উঠে তাড়াতাড়ি নতজানু হয়ে বসে মাথাটি লুটিয়ে দিলে।

—কি যে হাবা মেয়ে। প্রণাম করতে গিয়ে আঁচল ছেড়ে দিয়েছে। পলাশ ফুলগুলি ঝরঝর করে পড়ে গেছে মাটিতে ছড়িয়ে।

(দুই)

প্রথম খবর দিলে 'কয়ো বোরেগী'—'কয়ো' অর্থে কাক; কাককে এখানে 'কয়ো' বলে; বোধ করি বা 'কউয়া' শব্দের বঙ্গজ রূপ। 'ক'য়ো বোরেগী' নাম নয়, আসল নাম একটা আছে, কিন্তু সে লোকে ভুলে গেছে। বাউণ্ডুলে গাঁজাখোর ভিক্ষুক। কিন্তু ভিক্ষে সে গৃহস্থের দোরে-দোরে ঘুরে করে না, সে বেছে বেছে গিয়ে দাঁড়ায় এ অঞ্চলে যে বাড়ীতে যেদিন কোন একটা সমারোহ থাকে সেদিন সেই বাড়ীতে। সে শ্রাদ্ধই হোক আর গৃহ-শান্তিই হোক, অন্নপ্রাশন, বিবাহ বা ব্রত কি যা কিছু হোক। ভিক্ষার ঝুলি তার আছে, কিন্তু সেটা পূর্ণ করার চেয়ে পেট পূর্ণ ক'রে খেয়ে-দেয়েই সে অধিক তৃপ্ত। এ অঞ্চলে কোথায় কবে কোন সমারোহ সে সমাচার তার নখদর্পণে। সেই কারণে সে ভোর থাকতে উঠে বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে হয় হয়তো কোনদিন চার ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ; পথে যেখানে যত সমৃদ্ধ বাড়ী বা ঠাকুরবাড়ী আছে—সেখানে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে, জলপান খেয়ে, গাঁজায় দম দিয়ে আবার রওনা হয়। ঠাকুরবাড়ীই সে বেশী পছন্দ করে; কারণ সেখানে যা পায় তা মুড়ি-মুড়কি-পাটালী-গুড় জলপান নয়, সে পায় বাল্যভোগের বা প্রভাতীভোগের প্রসাদ; ছোলাভিজে, বাতাসা, একটু ছানা, একটুকরো আর কিছু, কোন কোন মন্দিরে দুখানা পুরীও মিলে যায়। এ গুণগুলির সঙ্গে এ অঞ্চলের লোকে কাকের গুণের সঙ্গে যথেষ্ট মিল দেখতে পায়। আরও একটি গুণ আছে—কাকের প্রকৃতি ও গুণের সঙ্গে যার মিল নাকি প্রায় আধ্যাত্মিক। কাকেরাই নাকি বার্তা নিয়ে আসে সকলের আগে। ওরা অযাচিতভাবে বার্তা বহন ক'রে এনে দিয়ে যায়। এটা নাকি কাকচরিত্র-পণ্ডিত যাঁরা তাঁদের মত। বাড়ীতে কাক এসে বসে কলকল ক'রে রব করলে বুঝতে হবে, বার্তা দিয়ে যাচ্ছে। আরও মিল আছে ক'য়ো বোরেগীর গায়ের রঙ কালো, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং পা দুখানি কাকের পাখার মতই অশ্রান্ত ও দ্রুত। লোকে দেড় প্রহরে যে পথটা হাঁটে ক'য়ো বোরেগী একপ্রহর না-যেতেই সে পথ চলে যায়। মধ্যে মধ্যে ক'য়ো কৃষ্ণদাসীর আখড়ায় এসে হাজির হয় এবং চেরা গলায় ডাকে—গৌর ব'লে ক'য়ো এসেছে মা-জী। এ'টো কাঁটা যা' আছে ছিটিয়ে দাও। জয় গৌর। নিতাইহে!

ওইটিই ওর সকলের দরজায় ভিক্ষার বুলি।

ওইদিনই সন্ধ্যার পূর্বে, ওই হাঁক হে'কে ক'য়ো এসে দাঁড়াল আখড়ার দরজায়। কৃষ্ণ-দাসীর কাছে তখন সংকেত এসেছে—বাজারের তুলোর গদীর মালিক রাধারমণ দাস সরকার মশায়ের ওখান থেকে। শুক্লা প্রতি-পদ থেকেই তাঁর মাধবার্চনার পূজন শুরু

হবে। সন্ধ্যার পরই ডুলি এবং লোক আসবে। কৃষ্ণদাসী একটু ব্যস্ত ছিল, দেহমার্জনা আছে, প্রসাধন আছে। দুধের সর এবং ময়দা মুখে মেখে ধুয়ে-মুছে, হলুদের সূক্ষ্ম চূর্ণ-বাঁধা মিহি কাপড়ের থুপলিটি মুখের উপর হাল্কাভাবে বুলিয়ে নিয়ে রসকলি তিলক আঁকতে হবে। চুল বাঁধা আছে। রাধারমণ দাস সরকার প্রৌঢ় বৈষ্ণব মানুষ, নটীর প্রসাধন বা সজ্জা তাঁর কাছে পলাণ্ডুর মতই অস্পৃশ্য অশুদ্ধ; বিশুদ্ধ বৈষ্ণবীর বেশ না-হলে তিনি দোরগোড়া থেকেই ফিরিয়ে দেবেন। বৈষ্ণবীর বেশই তাকে এমন করে করতে হবে, যাতে সুরমা-টিপ ওড়না-চুড়ি সমৃদ্ধ নটী বা ওয়াইফই বেশকে হার মানতে পারে। ব্যস্ততা সেই জন্য। কিন্তু ক'য়োর আহ্বান উপেক্ষা করা যায় না। কারণ ক'য়ো কাকের মত তাড়ালেও যায় না। তাড়া দিলে কাকেরা উড়ে গিয়ে সরে বসে—মুহূর্তে পরে আবার আসার মত—ফিরে আসবে সে এবং আবার হাঁকবে—গৌর ব'লে ক'য়ো আবার এসেছে মা-জী। জয় গৌর! নিতাই হে!

একখানি মালপোয়া এবং মালসাভোগের কিছু একখানি পাতায় সাজিয়ে আলগোছে তার হাতে দিয়ে দাসী বললে—আজ আমার তাড়া আছে ক'য়ো, তুই অন্য কোথাও বসে খেগে যা।

ক'য়ো পাতাখানা সামনে পেতে নিয়ে বললে—কোথায় যাব? যেতে যেতে চিলে ছোঁ মারবে। ও-বেটাদের হাতে ক'য়োরও রেহাই নাই। কোথাও যাবে বুঝি?

ক'য়ো নির্বিকারভাবে প্রশ্ন করলে। ওর প্রশ্নে শ্লেষ নাই ঘৃণাও নাই, ক'য়োর কুৎসা রটনার প্রবৃত্তিও নাই। ও শুধু শোনে—শুধু বলে। জেনে সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করে না, বলেও তা' কাউকে করাতে চায় না।

—কোথায় যাব? দাসী বললে—কত কাজ সে আর তুই বুঝবি কি? সেই ভোর থেকে—।

কথা ক'টা বলতে বলতেই চলে আসছিল কৃষ্ণদাসী, হঠাৎ মনে পড়ল ভোর বেলার সেই নৌকোখানার কথা। ক'য়ো তো নিশ্চয় জানবে। ঘুরে দাঁড়াল সে, বললে—হ্যাঁরে ক'য়ো—জয়দেবের ঘাটে আজ কোন গোঁসাই-মহান্ত এল রে? মস্ত বড় নৌকো। শিষ্য-সেবক, এই উঁচু ঝাণ্ডা। ঝাণ্ডাতে গড়ুর আঁকা। খুব ধুম ধাম! কে বল তো?

ক'য়ো আগেই মালপোতে কামড় মেরে-ছিল। বিচিত্র ক'য়ো, বিচিত্র তার খাওয়া। সে খেতে আরম্ভ করে উল্টো দিক থেকে। শাক থেকে নয়—মিষ্টি থেকে। এ'টোকাঁটার খাওয়া তো, আগাগোড়াটা একসঙ্গেই পায়। তাই ওইভাবে খেতে অসুবিধাও নেই। জিজ্ঞেস করলে বলে—হাবজ-গাবজ ঘাস-পাতা খেয়ে পেট ভরে গিয়ে শেষে যদি ভাল জিনিস খাবার [illegible]

চোখ বুজে। মালপোর কামড় মেরে চিবুতে চিবুতে সে ঘাড় নাড়তে লাগল—উঁ—হুঁ। উঁ হুঁ!

—উঁহু কি? আমি নিজে চোখে দেখেছি।

—হুঁ। সে জয়দেবে নয়।

—তবে কোথায়?

—কদমখণ্ডীর ঘাটের ওপারের ঘাটে।

—ওপারের ঘাটে? শ্যামরুপোর ঘাটে?

—হুঁ। রাজার ছেলে কালাপাহাড়। বলে রাধা মানি না। জয়পুরী বাবাজীদের চ্যালা নয়, চামুণ্ডো। ঠাকুর এনেছে শুধু শ্যাম। ওই শ্যামরুপোর ভাঙা গড়ের একপাশে মঠ বানাবে। বোষ্টুমী গেলে ঝাঁটা মারবে।

শ্যামরুপোর ভাঙা গড়ের একপাশে মঠ বানাবে! ভাঙা মঠ জঙ্গলে ভর্তি, বুনো-শুয়োর সাপ-খোপের আড়ৎ। মধ্যে মধ্যে বাঘ আসে। ভালুকের তো কথাই নেই। এই তো ভালুকের সময়। মৌ পেকেছে, মৌ খেতে আসবে! মৌ খেয়ে মাতাল হয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচবে। সেইখানে মঠ করবে!

জয়পুরী বাবাজীদের চ্যালা নয় চামুণ্ডো? রাজার ছেলে কালাপাহাড়? শুধু শ্যাম? রাধা নাই! কি আবোল তাবোল বকছে ক'য়ো? কিন্তু ক'য়ো তো বাজে খবর দেয় না!

ক'য়ো চোখ বুজে খেতে খেতেই বলে যায়।—মস্ত বড় ঘরের ছেলে। হয় বামুন নয় কায়স্থ। রাজা বাপের বেটা। খুব নাকি পণ্ডিতও বটে। কাশীতে পড়ত। তা' পরেতে সন্নেসী হয়ে যায়। বাপ ম'রে গেল, অনেক ধন; ভাইকে সব্বস্ব দিয়েছিল। এখন এই স্বকীয়াওলারা কাশীতে এসে জুটল তাদের সঙ্গে।—একটুকুন জল দেবা? গলাতে আঁটির মতন আটকায়—

চোখ খুললে ক'য়ো।

কৃষ্ণদাসী নাই সে চলে গেছে। ক'য়ো ডাকলে—মা-জী!

—মরণ! কি?

—জল!

—জল! বললাম ঘাটে খেগে যা। আমার এখন হাত-জোড়া।

—আমি দিচ্ছি মা। মোহিনী সাড়া দিলে। জলের ঘটি হাতে বেরিয়ে এল সে। দেবতার ঘরের দাওয়ায় বসে সে এতক্ষণ প্রদীপে তেলশলতে দিয়ে সন্ধ্যের আয়োজন করছিল।

—তা' বলে ছুঁস না যেন ক'য়োকে। যে আঁচলের ফে'চা তোর, উড়ছে-উড়ছে-উড়ছে। পতাকার মত ফৎ ফৎ করে উড়ছে। সামলাস আঁচল।

পনের বছরের কিশোরী মোহিনী এখনও হিলহিলে পাতলা। হাতের মুঠিতে কোমর ধরা যাওয়ার কথা শোনা যায়, কিশোরীর তা' নয়, তবে দেখলে তাই মনে হয়। কৃষ্ণদাসী তার বিপরীত; প'য়ত্রিশ বৎসরে তার দেহে ভরা গঙ্গার মত যৌবনের পরিপূর্ণতা; তেমনি স্বাস্থ্য! হয়তো বা মেদ খানিকটা জমতে শুরু করেছে। কৃষ্ণদাসীর কাপড় সে ভাল সামলাতে পারে না। আঁচলটাঁচল ঝলমলে হয়ে আশেপাশে ঝুলে পড়ে, মাটিতে লুটোয়, বাতাসে ওড়ে। কাপড়ের আঁচল সামলে নিয়েই সে ঘটি হাতে ক'য়োর সামনে এসে দাঁড়াল।

—জল নে ক'য়ো।

—মোহিনী! অঞ্জলি পাতলে ক'য়ো। খানিকটা খেয়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে ইশারা দিলে 'আর না'। তারপর আবার আরম্ভ করলে আহার। এবার নীরবে। কেষ্টদাসী নাই, কাকে বলবে! মালপোর শেষটুকু মুখে পুরে চোখ দুটি মুদ্রিত করলে। কিন্তু মোহিনী প্রশ্ন করলে—

—তারপর ক'য়ো?

—কি? অস্পষ্ট কথার সঙ্গে ভুরু দুটি চকিতে ওপরে উঠে নিচে নামল, ঘাড়টি ঈষৎ দুলল। অস্পষ্ট কথা ইশারায় স্পষ্ট ক'রে তোলে ক'য়ো। কথা তো তাকে খেতে খেতেই কইতে হয়।

—ওই যে সকালের গোঁসাইয়ের কথা! কোথাকার রাজার ছেলে?

—কে জানে? শুনলাম রাজার ছেলে।

—ঘরে পরিবার ছেলেপুলে আছে?

—তা আছে বই কি।......উ'হু......। নাই! ঘাড় নাড়লে ক'য়ো।—থাকলে ভাইকে রাজ্যি দেবে কেন? একটু চুপ ক'রে থেকে বললে —ছিল বোধ হয়, বোধ হয় মরে গিয়েছে সব।—আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—

—ভাইটা ভাল। মঠ করবার জন্য টাকা কড়ি অনেক দিয়েছে। সম্পত্তিও দেবে। শ্যামরূপোর গড়ের অংশ কিনেছে। বলেই যায় কয়ো।

জয়পুরী পণ্ডিতেরা নবদ্বীপে হার মেনে দস্তখত ক'রে রাধারাণীর জয় দিয়ে জয়পুর ফিরে গেল। কিন্তু বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়। এ ছেলে নাম কাটিয়ে—নিজেই মত বানিয়েছে।—বুয়েচ!

বলে গেল অনেক কথা। শুনে এসেছে কেঁদুলীর মহান্তের মঠে।

কদমখণ্ডীর ঘাটে নেমে—পুজো ভেট অবশ্য পাঠিয়েছে, কিন্তু নিজে দর্শন করতে যায়নি এই নবীন গোস্বামী। চূড়ার দিকে তাকিয়ে প্রণাম জানিয়ে শ্যামরূপোর গড়ের ঘন অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

কেন্দুলীর মহান্ত বলেছেন—অধার্মিক।

মহান্তের লোকজনেরা বলাবলি করেছে —লাগবে।

পাইকেরা লাঠী সোঁটায় ভাল করে তেল মাখিয়েছে।

হঠাৎ থেমে গেল কয়ো। তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। বললে—দাও আর খানিক জল দাও। বেশী দিয়ো না। মালসাভোগ প্যাটে গিয়ে জল পেয়ে গেঁজে উঠে ফাঁপবে। হু—আর না। এই ঠাঁইটাতে দাও। হাত বুলিয়ে নি। নইলে কাল এলে মা-জী ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে লাগবে—একেরে বাঘিনীর মতন।

মোহিনী বললে—তারপর ক'য়ো?

—আর জানি না। ক'য়ো পাতাটা মুড়ে হাতে নিয়ে চলে গেল। কয়োর খাওয়া শেষ হয়েছে, আর কথা সে বলবে না। এবার হাত মুখ ধুয়ে কোথাও বসে আবার গাঁজা খাবে। তারপর শুয়ে পড়বে। তবুও আজ সে বেরিয়ে যাবার সময় বললে— দরজা টরজা দাও বাপু! একলা থাকবে!

ক'য়ো জানে—ওপাশে খিড়কীর ডোবাটার চারিপাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও ডুলি নিয়ে বেহারারা বসে আছে। মা চলে যাবে। মোহিনী একরকম একলা থাকবে।

অবশ্য ভয় এ-কালে তেমন কিছু নাই। নবাব জাফর কুলীখাঁর শাসনের গুণে এদেশে এখন বাঘে বকরীতে এক ঘাটে জল খায়, বাজে কবুতরে এক গাছের ডালে ব'সে জিরোয়। কাটোয়ার নায়েব ফৌজদার কুড়ালিয়া মহম্মদ জানের দাপটে চোর ডাকাত শীতের সাপের মত মুদ নিয়েছে।

কৃষ্ণদাসী বিশদ বিবরণ পেলে দাস সরকার মশায়ের কাছে।

—ক'য়ো কি বললে আবোল তাবোল— মাথামুণ্ড বুঝলাম না। কিন্তু কি বিবরণ দাসজী? ওই যে আজ কে নতুন মহান্ত এসেছে তীর্থ করতে। মস্ত নৌকো। ক'য়ো বলে—রাজার ছেলে কালাপাহাড়। শ্যামরূপার গড়ের পাশে মঠ করবে। শুধু শ্যাম, রাধা নাই।

সুসজ্জিত ঘরে ব'সে কথা হচ্ছিল। সদ্য গঞ্জিকা সেবন শেষ ক'রে দাস সরকার মশায় ফুরসীর নলটি ধ'রেছেন, তাওয়া দেওয়া কল্কের মাথায় টিকে গনগন করছে— মৃদু মৃদু ধোঁয়াও বের হচ্ছে নলের মুখে, কিন্তু ঠিক তামাক ধ'রে ওঠার গন্ধটি বের হয় নি। তাওয়ার মাথায় তালপাতার হাওয়া দিতে দিতে প্রশ্ন করলে দাসী। আরক্ত চোখ মেলে সরকার বললেন—বোয়েচ কিনা,—জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহের আস্পর্ধার কথা শোন নি? রাধারাণী পরকীয়া বলে—। রাজা হ'লেই মাথা কেনে তো! আর তারই বা দোষ কি দিই বল? বোয়েচ কিনা;—ঔরংজীব বাদশা গোবিন্দজীর মন্দিরের চূড়া ভাঙলে, পাণ্ডারা ভয়ে গোবিন্দজীকে জয়পুরের মহারাজার বাড়ীতে তুলে দিলে। প্রভু নিজেই যখন আশ্রয় নিলেন—তখন সে বাতলাবে বইকি, বলবার আস্পদ্ধা হবে বই কি যে, ঠাকুর, ওসব গোপিনী টোপিনী নিয়ে তোমার রাস দোল ঝুলন করা হবে না।

কেষ্টদাসী জিজ্ঞাসা করলে—নবীন গোঁসাই কি রাজার ছেলে না কি?

—বোয়েচ কিনা;—হ্যাঁ তা বলতে পার। পক্ষ থাকলেই পক্ষী হয় না। পক্ষীর আরও লক্ষণ আছে। না-হলে ফড়িংকে পক্ষী বলতে হয়। এ গোঁসাইয়ের পক্ষী লক্ষণ সবই আছে তবে সবই আকারে ছোট। অর্থাৎ চড়ুইয়ের জাত। বাজপক্ষী নয়। জয়পুরের রাজপুত্তুর ভাবছ তা নয়। রাজা টাজা নয়। জমিদার, বড় জমিদার। চটক। বুঝলে যাকে বলে চড়ুই। বড় জোর শালিক বলতে পার। গাঙ শালিক। গাঙের ধারে বাড়ী—

সরকার কথা বলেন এইভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে। আর মধ্যে মধ্যে বলেন 'বোয়েচ কিনা'!

বোয়েচ কিনা:—বড় জমিদার, উপাধি রায় চৌধুরী। জাতিতে ব্রাহ্মণ; বহুপূর্বে ছিল পণ্ডিতের ঘর; পাঠান আমলে গৌড়ের সুলতানদের কোন সুলতানের সুনজরে পড়ে'। খেলাতের সঙ্গে মোটা ব্রহ্মত্রের সনদ পান। কিন্তু খাগেরু যে কলমে তালপাতার ওপর ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা যায়,—বোয়েচ কিনা দাসী,—জীবন জমীতে সোনার চাষ করা যায় তা দিয়ে আসল জমির একটি ঢেলাও ওল্টানো যায় না। কাজেই ব্রহ্মত্রের জমি খাজনা বিলি

ক'রে হন জোতদার। 'তারপর বোয়েচ কিনা'—জোতদার থেকে জমিদার। শিষ্য-সেবকদের পরলোকের কর্ণধার থেকে প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দেবশর্মা থেকে রায় চৌধুরী। শাস্ত্র পুরানের পুঁথিগুলি খেরোর কাপড়ে বাঁধা হয়ে—কালস্রোতের ঠেলায় ভাঙা কূলের মাটি চাপা পড়ল। তার জায়গায় কাপড়ের মোটা মোটা দপ্তরে থোকা জমাওয়াশীল বাকীর কাগজ বিন্ধ্যপর্বতের মত বাড়তে লাগল। পুঁথিগুলো যদি একেবারে ফেলে দিত তো হ'ত। ধুয়ে-মুছে যেত। বোয়েচ কিনা দাসী—তিত্‌লাউ খাওয়া যায় না—গেরস্ত বাড়ীতে ও লাউ হলে—তার ফল থেকে মূল পর্যন্ত ফেলে দেয়। কিন্তু বৈরাগীর আখড়ায় হ'লে—কি সন্ন্যাসীর আশ্রমে হ'লে তারা বিষ্ণুমায়ায় ফেলতে পারে না; নতুন ক'রে না-লাগালেও তিত্‌লাউ ক'টি পাকিয়ে শিকেয় টাঙিয়ে রেখে দেয়। সোনারূপোর জলপাত্রও—লাউয়ের খোলার কমণ্ডলুর মায়া ঘোচাতে পারে না। এও তাই আর কি! তাই থেকেই এ বংশে মধ্যে মাঝে দু চারজন পণ্ডিত জমিদার ফড়কে বেরিয়েছে। দেশে এদের অনেক নাম কেষ্টদাসী। তবে ভক্তি পথে পা বাড়ায় না, মেঠো পথের ধুলো কাদার উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা; জ্ঞানমার্গের পাকা সড়কে হাঁটার উপরেই বংশটার ঝোঁক। বোয়েচ কিনা—দু চারটে মহানাস্তিকও জন্মেছে। আবার জনকয়েক দুঁদে জমিদার, পাকা পোক্ত ভোগীও জন্মেছে। এই ছেলের বাপ ছিল তেমনি একজন ভোগী। বিয়ে ছিল দুটি। দুটিই ছিল দুয়োরাণী। সুয়োরাণী ছিল এক যবনী রক্ষিতা। এ ছাড়াও নিত্য নতুন বাঈজী বাঈয়ের অভাব ছিল না। আর একটি জিনিসের অভাব ছিল না, সেটি হ'ল বিষয়বুদ্ধির। অনেকদিনের পুরনো বংশ, ডালপালা অনেক, সবার মধ্যেই এই একই ধরন; এই সুযোগে ইনি অধিকাংশ শরিকের সম্পত্তি নানান কৌশলে কিনে—আসল গুঁড়ির মত মোটা হয়ে উঠলেন। শরিকেরা শেষ প্যাঁচ মারলে, যবনী রক্ষিতার অপরাধে পতিত করবার ভয় দেখালে। ইনি হাসলেন, এবং গুরু ডেকে তিলক ফোঁটা কেটে মালা প'রে নিজে বৈষ্ণব হলেন—সঙ্গে সঙ্গে ওই যবনীটিকে ভেক দিয়ে শুদ্ধ করে নিলেন।

—বোয়েচ কিনা—কেষ্ট দাসী! অল্পদামী জিনিস মেকী হয় কম। কি তার দাম যে মেকী হবে? মেকী হয় দামী জিনিস। আর যে জিনিসের যত মূল্য সে জিনিসের মেকী তত নিখুঁত। ধর্মের চেয়ে মূল্য আর কোন্ জিনিসের আছে বল? তাই এ সংসারে ধর্মের ভণ্ডামী আর আসল ধর্মাচরণ কষ্ট ক'রে করা তত কঠিন, বুঝেছ!

চাদরের খুঁটে চোখ মুছলেন সরকার।—এই ধর, আমরা যে গোপন ভজন করছি—এর অর্থ নিয়ে যত খুশী কুৎসা করা যায়। কিন্তু তিনি তো জানেন—। কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে কসরৎদক্ষ তরুণের শূন্যে লাফ মেরে ডিগবাজী খাওয়ার মত উপরের দিকে চোখ দুটি তুলে বিচিত্র কৌশলে উল্টে দিলেন।—বোয়েচ কিনা!

বোয়েচ;—এই ছেলেটি তাঁর বড় ছেলে। ছেলেটির মা গোঁড়া পণ্ডিত বংশের মেয়ে। —বোয়েচ কিনা;—একটা কথা বলতে ভুলেছি কেষ্টদাসী;—সেটা কি জান—সেটা হ'ল ওদের জাতের কথা। নিজেরা দেব-শর্মা থেকে রায় চৌধুরী হয়েছিল, পুঁথি-পেঁতে তাকে তুলে জমিদারী সেরেস্তার কাগজ নিয়ে পড়েছিল—এবং শামুকের খোলার নস্যের বদলে ফুরসীর নল, চটী এবং তালপাতার বদলে নাগরা এবং রেশমী ছত্র গ্রহণ করেছিল কিন্তু অন্দরমহলে মালক্ষ্মীদের জাত বদল হতে দেয়নি; তাঁরা ছিলেন খাঁটী ব্রাহ্মণী। মেয়ে দিত বড় লোকের বাড়ীতে কিন্তু মেয়ে আনত গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাড়ী থেকে। ওটা ছিল ওদের সেই প্রথম যিনি জমির সনদ পেয়ে জোতদার হয়েছিলেন—তাঁর আজ্ঞা। সেটা ওদের ভাঙবার জো ছিল না, ভাঙলে অভি-সম্পাতের ভয় ছিল। বোয়েচ কিনা;—বাজীকরেরা বলে শুনেছ তো; কার আজ্ঞে? না কামরূপের মা কামিক্ষের আজ্ঞে। এ তাই। এখন এ ছেলের মা ছিলেন—জাত বামুন যাকে বলে—সেই ঘরের মেয়ে। বোয়েচ কিনা—যখন বিয়ে হয় তখন তো জামাই ছেলেমানুষ, মেয়ের বাপ বুঝতে পারেন নি। যখন বুঝলেন—তখন মেয়েকে বললেন—আমার লোভের পাপে তুই লক্ষ্মীর মত জলে পড়ছিস মা। তবে আমার লোভ হলেও, তোর কপাল বড়। তার ওপরেই তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি চললাম। আর কখনও আসব না। তোর কপাল তোর ওই ছেলে।—বোয়েচ কিনা;—ওই ছেলেকে তিনি ইচ্ছে মত মানুষ করে-ছিলেন। বাধা দেবার কেউ ছিল না। কর্তা তখন ওই যবনীকে নিয়ে বিলাসের আমিরী ঢং পালটে বৈষ্ণবী ভজনের মুখোস পড়েছিল: বাঁয়া তবলার বদলে মৃদঙ্গ, ঘুঙুরের বদলে মন্দিরা বাজিয়ে গান-বাজনার আসর চলে। ঘরে কদাচিৎ আসেন। সে এসেও বড় গিন্নীর ওদিক বড় মাড়ান না; ও মেয়েকে বড় ভয় বা বড় ঘেন্না যা হোক একটা কিছু করেন। বোয়েচ কিনা—এইভাবে ছেলে বড় হ'ল; ঘোড়ায় চড়া শিখলে না, বন্দুক তলোয়ার ছুঁলে না, বাবরী করে চুল রাখলে না, শিখলে সংস্কৃত, কিছু ফার্সী, পুঁথি নিয়ে পড়ে রইল, [illegible]

তারপর একদিন বাপকে গিয়ে বললে—কাশী যাব, পড়তে।

বাপ বেশ ভাল ক'রে ছেলের আপাদ-মস্তক তাকিয়ে দেখে বললেন—কাশী।

—হ্যাঁ কাশী।

বাপ ভুরু কুঁচকে বললেন—তোমাদের দুই ভাইকে আমি মুর্শিদাবাদ পাঠাব ঠিক করেছি। দিন কতক দরবারে আমাদের মোক্তারের সঙ্গে যাবে আসবে। নবাব বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় হবে। রাজকার্য কাকে বলে শিখবে। চালচলন তরিবৎ-সহবৎ-কায়দাকানুনে দোরস্ত হবে। গান-বাজনা শিখবে। এ সময় কাশী? তোমার মা কি বড়ই ধরেছেন? তা সে তো আমাকে বললেই পারতেন।

ছেলে যেন নিবাতনিষ্কম্প পিদীম। বোয়েচ কি না কেষ্ট দাসী; ছেলে হাসলে না, কাশলে না, ভুরুও কোঁচকালে না, যেমন বলছিল তেমনি বলে গেল—মা যাবেন না। আমি যাব। পড়তে যাব। কাশীতে পড়ব ঠিক করেছি।

—পড়তে যাবে? কাশীতে পড়তে যাবে স্থির করেছ?

ছেলে, বোয়েচ না, বলে গেল—বেদান্ত পড়ব স্থির করেছি।

—বেদান্ত পড়ে তো পৈত্রিক জমিদারী চালানো যাবে না!

ছেলে বললে—শুনেছি অনেক আগে আমাদের পিতৃপুরুষের 'বেদান্তর টোল' ছিল।

বোয়েচ না কেষ্টদাসী—এবার বাপের চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ফুরসীর নলের অম্বুরি তামাকের ধোঁয়ায় বিষম খেলেন তিনি। কাশতে কাশতে বুকে হাত বুলিয়ে স্থির হয়ে বললেন—তুমি টোল খুলবে নাকি!

ছেলে বললে—টোল তো আমাদের আছে; সেটা তো উঠিয়ে দেননি কোনদিন; তবে আমরা অধ্যাপনা করি না, মাইনে করা বৃত্তি-ভোগী পণ্ডিতেরা অধ্যাপনা করেন।

—তুমি তাই করবে নাকি?

—না। সে এখনও স্থির করিনি। বেদান্ত পড়ে, এ বংশের এতকালের কুলধর্ম-ভ্রষ্টতার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য যা প্রয়োজন হবে তাই করব।

বাপ অনেকক্ষণ কথা কইতে পারলেন না। তারপর বললেন—তুমি হয়তো প্রহ্লাদ, কিন্তু আমি হিরণ্যকশিপু নই—আমাদের বংশও দৈত্যবংশ নয়। কৃষ্ণনাম করতে নিষেধ করব না। উৎসাহই দেব। যাও। কাশীই যাও। কিন্তু—। কিন্তু সেখানে থাকার ব্যবস্থাটা এ বংশের; না—যেমন ইচ্ছা তেমনি থেকো। বারণ করব না।

ফুরসীর নলে একটা সুখটান দিয়ে দাস-সরকার এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে নলটি কেষ্টদাসীর হাতে দিয়ে বললেন—মজেছে ভাল। নাও দেখ।

সলজ্জভাবে নলটি হাতে নিয়ে পাশে রেখে দাসী বললে—তারপর?

—তারপর? বোয়েচ না, এখন ধ্রুব তো তপস্যা করতে গেলেন কাশী। বোয়েচ না, এর বাবা বলেছিল আমি 'হিরণ্যকশিপু' নই। তা নয়। কিন্তু সুরুচি-মোহমুগ্ধ উত্তানপাদের সঙ্গে মিল পনের আনা। তাই ধ্রুব বলছি এঁকে।

ধ্রুব কাশী গেলেন। কিছুদিন পর মা মারা গেলেন।

বছর চারেক পর খোদ কর্তা।

শ্রাদ্ধশান্তির পর, সৎভাইকে সব ভার দিয়ে ফের চলে গেল কাশী। কি করবে এখনও স্থির করেনি। তবে জমিদারী নয় এটা ঠিক। বেদান্ত-পড়া হয়েছে, কিন্তু ধাতস্থ হননি। তার কিছুদিন পরই এই কাণ্ড। জয়পুরের মহারাজার ফতোয়া নিয়ে পণ্ডিতেরা এল কাশী।

জয়পুরে গেলেন গোবিন্দজী।

মহারানা দ্বিতীয় জয়সিং গোবিন্দজীর সেবার অধিকার পেয়ে বৈষ্ণব ধর্মের অভি-ভাবক হয়ে উঠলেন, বুয়েচ না! তিনি তখন পরমভাগবত। হুঁঃ! লোকটার অনেক গুণ আছে, অনেক কীর্তি করেছে, কিন্তু আস্পর্ধা দেখতো!

প্রৌঢ় দাস সরকারের মুখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল।

ক্রোধের কারণ আছে। মহারাজ জয়সিংহ যা ফতোয়া জারী করেছিলেন তাতে তাঁর এবং গোটা দেশটারই ধর্মজীবনে বিপর্যয় ঘটে যেত। গোটা দেশটাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল।

কীর্তিমান মহারাণা 'সওয়াই' জয়সিং। গণিতে জ্যোতিষে পণ্ডিত লোক। জয়পুরে দিল্লীতে মথুরায় উজ্জয়িনীতে কাশীতে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক। গোবিন্দজীকে

ধর্মের অবস্থার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। চিত্ত পীড়িত হ'ল। বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের পরকীয়া তত্ত্বের ব্যাখ্যায়, পূর্ণ চৈতন্যময় পুরুষের উপাসনায় এ কি বিকৃতি! এ যে ব্যভিচার!

পণ্ডিতদের নিয়ে তিনি বিচার করলেন। সমগ্র ভাগবতের প্রতিটি শ্লোক বিশ্লেষণ করে বিচার করে "পরকীয়া" মতকে খণ্ডন করে তিনি 'স্বকীয়া' মতের প্রতিষ্ঠা চাইলেন। বহুবল্লভকে শুধু শ্রীবল্লভ হিসেবে দেখতে চাইলেন। গোপীজনমনোহারীকে রাধাপ্রেমপরায়ণতার কলঙ্ক মুক্ত করবার সংকল্প করলেন। পরকীয়া রাধার স্থলে লক্ষ্মীকে দেখতে চাইলেন তাঁর পাশে। বহু সতর্ক বিচারের পর মত খাড়া হ'ল। মহাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব হলেন সে মতের ধারক। বৈষ্ণব ধর্মের সংস্কার হবে। প্রথমেই বিচার হল বঙ্গদেশীয়-মতাবলম্বী জয়পুরের পণ্ডিতদের সঙ্গে। তাঁরা হার মানলেন। বিচারপত্রে স্বকীয়া মত স্বীকৃতির স্বাক্ষর দিলেন। তারপর মহারাজা পণ্ডিত কৃষ্ণ-দেবকে পাঠালেন দিগ্বিজয়ে। মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সর্বাগ্রে জয় করতে হবে বঙ্গদেশ।

কলিতে বৈষ্ণবধর্মের মুরলী তার ছাপরের কেন্দ্র বৃন্দাবন ও যমুনাতট থেকে স্থান পরিবর্তন করে বঙ্গদেশে নবদ্বীপের গঙ্গাতটে গিয়ে নূতন সুরে বেজেছে। আজু কে গো মুরলী বাজায়? এ তো কভু নহে শ্যামরায়! সে গৌরতনু, বৃন্দাবন-চন্দ্রের নব ভাব-বিগ্রহ! সেই নবভাবেই বৈষ্ণব ধর্মে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে; নূতন গোমুখী—নবদ্বীপ; অথবা জহ্নু-মুনির আশ্রম। নূতন মহিমায় নির্গত হয়ে ভাবগঙ্গা প্লাবিত করে দিয়েছে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ। নবদ্বীপের শঙ্খ যদি এ স্রোতের আগে আগে না-বাজে, বাঙলা দেশ যদি এ মত স্বীকার না করে, তবে অপর সকল দেশ স্বীকার করা সত্ত্বেও এর অবস্থা হবে বঙ্গদেশের কীর্তিনাশার মত; নবদ্বীপের স্রোতই মহাপ্রভুর পুণ্যে ভাগীরথীর মহিমা বহন করবে।

মহারাজা জয়সিংহ আচার্য কৃষ্ণদেবকে সর্বপ্রথম পাঠালেন বাংলাদেশে। সঙ্গে রক্ষক সিপাহী দিলেন, সুবায় সুবায় সুবাদার নবাবদের কাছে, রাজার কাছে অনুরোধপত্র দিলেন, সাহায্য প্রার্থনা করলেন। "সঠিক ধর্মতত্ত্বের বিচার সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্ব-লোকের কাম্য এবং এ বিষয়ে সাহায্য করা সকল রাজারই কর্তব্য ও অপর সকল ধর্মেরও সহযোগিতা করা ধর্মেরই অঙ্গীভূত। ধর্মতত্ত্ব গুহায় নিহিত, সে গুহার পথ আবিষ্কার নির্ভুল দিগ্‌দর্শন, বিচার ভিন্ন 'বিনা তজবিজে' হয় না। ধর্মের

বেহেস্ত স্বর্গের ফটক বন্ধ হইয়া যায়, সেখানে মেকি সেলামী অচল; সুতরাং হিসাবনিকাশে সাহায্য করিয়া নিজের ও নিজের ধর্মের কল্যাণ অবশ্যই করিবেন।"

প্রয়াগে এসে বিচার হল। কৃষ্ণদেবের প্রতিভা জয়যুক্ত হল। পণ্ডিতেরা স্বকীয়া মতে স্বাক্ষর দিলেন। সেখান থেকে স্থলপথ ছেড়ে নৌকা নিয়ে গঙ্গার স্রোতপথে নবদ্বীপ যাত্রা করলেন। পথে কাশী। ভারতের সর্বমত সর্ববিদ্যার মহাকেন্দ্র। এখানেও বিচারসভা বসল। কাশীর গঙ্গার ঘাট—অতীত ভারতের সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যাপীঠ। এত বিচার, এত গবেষণা, এত দীক্ষা, এত উপলব্ধি, জ্ঞানে ধ্যানে এত আবিষ্কার পৃথিবীর আর বোধ করি কোথাও হয়নি। আচার্য কৃষ্ণদেব ঘাটে পূর্বাস্য হয়ে জাহ্নবীকে সম্মুখে রেখে আসন গ্রহণ করলেন, আশে পাশে বসল শিষ্যেরা, আর তাঁর দক্ষিণে বামে—উত্তর ও দক্ষিণ মুখে বসলেন কাশীর বৈষ্ণবাচার্যেরা—দৃষ্টির সম্মুখে অনন্ত পুণ্যস্রোতা সুরধুনী। বিরাট ঘাট জনসমাগমে পূর্ণ, কিন্তু স্তব্ধ। শুধু গঙ্গাস্রোতের কলকল শব্দ উঠছিল।

বিচারে আপন মতকে জয়যুক্ত করে আচার্য কৃষ্ণদেব বৈষ্ণবাচার্যদের স্বাক্ষর নিয়ে উঠে গঙ্গার ঘাটে নেমে জল মাথায় দিয়ে উঠছেন—এক নবীন শ্যামবর্ণ কান্তিমান যুবক তাঁর সম্মুখে হাতজোড় করে দাঁড়াল। মুণ্ডিত মস্তক, মধ্যস্থলে সুপুষ্ট শিখাগুচ্ছ, কপালে তিলক, বুকের উপর দুলছে তুলসীর মালা। বললে—আপনার সঙ্গে আমি বঙ্গদেশ বিজয়ে সঙ্গী হতে চাই।

আচার্য তার মুখের দিকে চেয়ে তার কান্তিতে মুগ্ধ হয়ে বললেন—এস। গ্রহণ করছি তোমাকে। দীক্ষা নাও আমার কাছে।

—শুধু দীক্ষা নয়, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চাই।

পুনরায় আর একদফা গঞ্জিকা সেবন করলেন সরকার মশায়। ভৃত্য প্রস্তুত করে দিয়ে গেল। কল্কেটি দাসীর উদ্দেশ্যে নামিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে দম ধরে বসে থেকে হুস করে দম ছেড়ে দিয়ে বললেন—ইনিই তিনি। বোয়েচ না কেষ্টদাসী—কৃষ্ণপ্রেমের দূতী—তুমি বোঝ ইনি কি? অবশ্য সবটা না বললে সম্যক বুঝবে না। ইনি আবার গুরুর চেয়েও এককাঠী সরেস। বংশ দণ্ডের কাণ্ড। জান তো জয়পুরী পণ্ডিতের এখানে এসে আচার্য রাধামোহনের কাছে মাথার পগ্গড় খসে পড়ল, মুক্তকচ্ছ হয়ে হাত জোড় করে হার মেনে পরকীয়া মতে দস্তখত দিয়ে চোঁচা [illegible]

জয়পুর; কিন্তু কণ্ঠিখানি জয়পুর থেকে ফিরে এলেন। উনি আবার নিজের মত বার করেছেন। পরকীয়া তো পরকীয়া, স্বকীয়াও নয়; কড়াকিয়া কাঠাকিয়া সেরকিয়া সব বরবাদ, ও ধারাপাতই বাদ। একের পর দুই নাই। শুধু শ্যাম। বোয়েচ না। জয়পুর থেকে মূর্তি গড়িয়ে এনেছে। শুনেছি। ভাইয়ের কাছে গিয়েছিল। ভাইটা ভাল। বিষয়ের বদলে মোটা টাকা দিয়েছে। শ্যামরুপোর গড়ের অংশ কিনেছে। সেইখানে মঠ ক'রে শুধু শ্যামের তপস্যা হবে। এই মাধবপক্ষে প্রতিষ্ঠা হবে। উনি হলেন তিনি। লগন চাঁদা। রাধা বাদ দিয়ে শ্যাম, রূপ বাদ দিয়ে রস, বোয়েচ দাসী—সে রস বানায় ময়রারা; ওটা বামুন নয়, সাধকও নয়, সন্ন্যেসীও নয়, ওটা ময়রা।

—কিন্তু! লাল চোখ মেলে দাসীর মুখের দিকে চাইলেন দাস সরকার।

—কি? হাসলে দাসী।

—তোমার এত খোঁজ? লক্ষণ তো ভাল নয় কেষ্টদাসী। কি বলে—তোমার বুকের মধ্যে প্রাণ ভোমরার যেন গুনগুনানি শুনছি সখি?

—এতও জানেন আপনি। কি গুনগুনানি?

হাতখানির আঙুলে মুদ্রা করে—দাসীর মুখের সামনে ধ'রে সরকার যথাসাধ্য সুরে গাইলেন

"সখি-রে—মুঞি কেন গেলুঁ
কালিন্দীর জলে।
কালিয়া নাগর চিত হরি নিল ছ—লে।
রূপের সাগরে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গে—ল॥"

দাসী চতুরা নায়িকা। সে কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদাস ভাবে বললে—তাই তো হয়। পুরুষেরা তাই চিরকাল বলে! অথচ—।

—অথচ কি?

—আমাদের এক কথা সরকার মশায়; আমাদের জীবন দিলে আর ফেরে না। ফাঁসী লাগে। সঙ্গে সঙ্গে সেও সুরে গান ধরে—

তোমারই চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসী।

দাস সরকারের চোখ দিয়ে জল পড়ে না কিন্তু পিট পিট করে। দাসী কয়েক কলি গাইতে গাইতেই সরকার ঘন ঘন চোখ মোছেন, এবং সেই ঘর্ষণে বাধ্য হয়ে জল আসে। এবং বারবার বলেন—রাধে-রাধে-রাধে! জয় রাধে জয় রাধে।

বাইরে মধ্যরাত্রির ঘোষণা করে শৃগালেরা। পেঁচা ডেকে ওঠে বাড়ীর পাশের আমকাঁঠালের বাগানের গাছের কোটরে। বন্দরের ঘাটে মদ্যপের স্খলিত কণ্ঠের গান ধ্বনিত
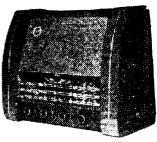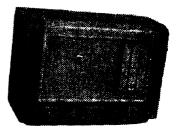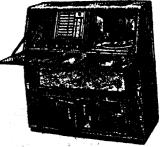
ফেউ ডাকছে। চিতাবাঘ বেরিয়েছে বোধ হয়।

দাসী বলে—রাত্রি অনেক হ'ল সরকার মশায়। মোহিনী একলা আছে।

হেসে সরকার বলেন—যা পাহারা দিয়েছি কেলে সর্দারকে, কোন ভাবনা নেই।

—তা নেই। তবু উসখুস করবে। ছেলে মানুষ।

—কত বয়স হ'ল মোহিনীর?

—এই পনের।

—তবে আর কি। গর্ভ ধ'রে ষোল করে ক্রিয়াটা করে ফেল। ছেলেটা বড় বেবগ্গা হয়ে উঠছে। ওকে আর রাখতে পারছি না। বোয়েচ না—কোন দিন কোন যবনী নটীর খপ্পরে পড়বে!

—না-না। এখনও—

—না নয়। আমি অনেক অর্থ দিয়েছি। দিয়েও যাচ্ছি। আমার ছেলের নজরের কথা যদি লোকে না-জানত কেষ্টদাসী, তা হলে এতদিন অনেক ধাক্কা তোমার দরজায় পড়ত। বোয়েচ না? এখন আমার ছেলে নটী পাড়ায় ইতর লোকের হাতে ধরা পড়লে বোয়েচ না, আমার মাথা হেঁট হবে। তা ছাড়া পাপ স্পর্শ করবে।

পুষ্পমাল্য, চন্দন, চুয়া, গুয়াপান ইত্যাদি উপকরণে সাজানো থালা খানি আসরের সামনে নামিয়ে দিলে কেষ্টদাসী। কুঞ্জভঙ্গের ইসারা এটি। বললে—নটীরাও তো কিছু প্রত্যাশা করে আপনার ছেলের কাছ থেকে! আমার মেয়ের মনটা এখনও বড় কাঁচা দাস মশায়। এ সব বললে বড় লজ্জা পায়। এখন কিছুদিন যাক।

বেশ শক্ত ভাবেই ঘাড় নাড়লে সে। আসল কথা দাসের ছেলেকে দেখে তার নিজেরই মন ওঠে না। কদাকার নয়, কিন্তু কেমন বর্বরের মত চেহারা। নিজেকে দিয়ে সে বোঝে! এই দন্তহীন ঘৃতপুষ্ট মেদবহুল লোমশ মানুষটা কি কুৎসিৎ!

(তিন)

কদমখণ্ডীর ঘাট কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব প্রভুর ঘাট, অজয়ের উত্তর তটে। দক্ষিণ তটে শ্যামারূপার গড়ের ঘাট। যখনকার কথা তখন দুর্ভেদ্য না হলেও অরণ্যে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। বহুকাল, অনেক কয়টি শতাব্দী-পূর্বের ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ।

এরই পাশেই নূতন গোস্বামী মাধবানন্দের নূতন মঠ স্থাপিত হয়েছে। মঠ এখনও হয় নি—একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে। গড়ের ধ্বংসাবশেষের একটি দিক, যে দিকটিতে বন অপেক্ষাকৃত কম ঘন, সেই দিকটিতে খান দশ বারো শীর্ণ শিশুশালের বেড়ায় মাটি ধরানো দেওয়ালের উপর খড়ের চাল ঘর তৈরী হয়েছে. একটি বিস্তীর্ণ এলাকার চারিপাশে শক্ত ঘের তৈরী হয়েছে। শুধু প্রবেশ পথের দুপাশে দুটি নূতন নির্মিত থাম, তাতেই এক জোড়া শক্ত দরজা। এ সব কিছুদিন আগে থেকেই হয়েছে। সরকার যে বলেছিল 'ভাইটা লোক ভাল,—হাঁকিয়ে দেয় নি, টাকাকড়ি দিয়েছে, মঠ বানাতে। এখানকার গড়ের অংশও কিনে দিয়েছে।' কথাটা সত্য। বন্দোবস্তটা আকস্মিক—তাই এমন মাটীর ঘর, শাল-গাছের বেড়া দিয়ে প্রারম্ভ করতে হয়েছে।

ন্যায়পরায়ণ বলে খ্যাত নবাব জাফর কুলী খাঁর মত নবাবের আমলে তাঁর নিজের সমাধিমন্দির ও মসজেদ তৈরীর সময় অনেক করভার বহন করতে হয়েছে অনেক মঠ-মন্দিরের কর্তৃপক্ষকে, অনেক অভিভাবকহীন মন্দির ভেঙে তার মালমসলা নিয়েছেন। বর্তমানে নবাব সুজাউদ্দিন খাঁ বিলাসী, তাঁর নতুন প্রমোদ ভবন ও উদ্যান ফররাবাগে অনেক নূতন নির্মাণ চলেছে। এই কারণেই তাঁদের পৈত্রিক ভূমির আশেপাশে মঠ তৈরীর সংকল্প তিনি ত্যাগ করেছিলেন। কে জানে কোন দূর ভবিষ্যতে কোন ধর্মদ্বেষী শাসক মন্দির ভেঙে দেবে! অনেক চিন্তা করে এই স্থানটির কথাই লিখেছিলেন—তাঁর ভাইকে। নির্জন আরণ্য পরিবেশের মধ্যে চলবে তাঁর জীবন সাধনা। কাশী থেকে ভাইকে লিখেছিলেন- "ওই শ্যামারূপার গড়ের পাশে আমাকে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দাও। আপাতত খড়ে বাঁশে কয়েকখানি ঘর। তারপর ধীরে ধীরে সব হইবে।" আচার্য কৃষ্ণদেব পরাজয় মেনে পরকীয়া মত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল। তিনি গড়ের করবার সংকল্প করেছিলেন। অনেক চিন্তা তিনি করেছেন। মনের মধ্যে ভেসে ওঠে—,

মহাপ্রভু নিজে রাধা ভাবে বিভোর হয়ে জগন্নাথদেবের রথের সামনে দাঁড়িয়ে দরবিগলিত ধারার মধ্যে গদগদ কণ্ঠে দেবতাকে বলছেন,—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব
চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মিলিত মালতী সুরভয়ঃ
প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র
সুরতব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবা রোধোসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।"

এর মর্ম মাধবানন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। পরকীয়া নায়িকার নায়ক-মিলনাগ্রহ এবং আবেগের কথা কে না জানে, অনুমান করতে পারে? আত্মসমর্পণের গভীরতা যে অতলস্পর্শী! সে যে অকূলে ঝাঁপ দেওয়া। কূল না হারালে অকূলে ঝাঁপ দেয় কি করে? স্বকীয়া থাকেন কূলের মধ্যে। তিনি জানেন। এ ভজনার মাধুর্য পঙ্কোদ্ভূত পঙ্কজের মত সর্বমালিন্য-মুক্ত, এ পুষ্পের মধুর আস্বাদ অমৃত তুল্য। তবু এ সবার জন্য নয়: সাধারণের নয়। এ অধিকার নিষ্কাম ভক্তের।

রূপ গোস্বামীর শ্লোকও তার মনে আছে। কিন্তু তবু সে তা গ্রহণ করতে পারে নি। সে সে কথাও জানে। লক্ষ্মী স্বামী প্রেমের ঐশ্বর্য-গৌরব-ভাবের অধিকারিণী হয়েও তৃপ্ত হন নি; মাধুর্যের আস্বাদনের জন্যই তিনিই পরকীয়া রাধা হয়েছিলেন। তবু না। তবু না। তবু না।

যা চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য তা সাধারণের জন্য নয়। সে তো দেখেছে তার বাপের জীবনের ধর্ম-সাধনার স্বরূপ। সারা দেশে পরকীয়া এবং কিশোরী ভজনের পরিণতি! এ ছাড়াও তার মন চৈতন্যময় পুরুষের পাশে আর কোন রূপকে কল্পনা করতে পারে না। নিত্য-চৈতন্যে-স্থিতিমান আনন্দ ধ্যানে মগ্ন—চিরসুন্দর পুরুষোত্তম, তিনি যে পূর্ণ, মাধুর্য ঐশ্বর্য সবই তাঁর মধ্যে। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মত। আজ কয়েক পুরুষের মোহাচ্ছন্নতায় সেই বিন্দুর ধ্যান বস্তুজগতে ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গেছে। স্থির জ্যোতির্বিন্দুকে হারিয়ে আলো-আঁধারির মোহে দিকভ্রান্তি ঘটেছে। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার জমেছে বংশকে ঘিরে। পরলোকে উর্ধ্বতন পুরুষেরা আলোক তৃষ্ণায় আকুল হয়ে তাকিয়ে আছেন উত্তর পুরুষের দিকে। সেই হারানো বংশ-

ধ্যান এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পুরুষের ধ্যান। সকল লীলার মধ্যে তিনিই লীলাময়। বৃন্দাবন থেকে প্রভাস পর্যন্ত তিনি একক; সকল কিছুকে মিথ্যার মত অলীকের মত বর্জন করে পিছনে রেখে সম্মুখে অগ্রসর হতে মুহূর্ত বিলম্ব ঘটে নি তাঁর। কুরুক্ষেত্রের রক্তপাতের এক বিন্দু তাঁর মনে স্পর্শ করে নি। প্রভাসের তটে বংশলোপের খেলা তিনি নিজেই রচনা ক'রে খেলা ক'রে গেছেন। তিনি পূর্ণ। তাঁর উপাসনা পূর্ণ এককের উপাসনা!

শুধু গোবিন্দ! শুধু শ্যাম। পূর্ণ পুরুষোত্তম। চৈতন্যের উৎস জ্যোতির্বিন্দু। গীতাতে তিনি স্বমুখে নির্দেশ দিয়ে গেছেন—মামেকং শরণং ব্রজ। দর্শন করবে সে তাঁর সেই বিশ্বরূপ—

"ত্বমাদি দেব পুরুষ পুরাণ"।—

ব্রহ্মচর্য তার প্রথম যোগ, দ্বিতীয় সন্ন্যাস, তৃতীয় ধ্যান। নারীকে দূরে রাখ। সেই ভাঙে ধ্যান—সেই ভাঙে সন্ন্যাস—সেই ভাঙে ব্রহ্মচর্য। বস্তুজগতের মোহ সে, চৈতন্যকে সে আচ্ছন্ন করে, জ্যোতিকে সে শিখাময় বহ্নি ক'রে তোলে ইন্ধনের মত।

সেদিন একাদশী। দোল পূর্ণিমার পূর্বে আমলকী একাদশী। প্রত্যূষে স্নান পূজা সেরে মাধবানন্দ স্বহস্তে আমলকী সংগ্রহের জন্য বের হয়েছিলেন। বেরিয়ে একটু এসেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এক অপরূপ শব্দ ঝংকারে বনস্থলী ভরে গেছে। যেন একটা বিরাট সেতার বাজছে—দুনের গতিতে—জোয়ারীর তারগুলি ঝংকার তুলছে। তার সংগে গন্ধ। নিশ্বাস ভরে গেছে তাঁর। চোখ জুড়িয়ে গেছে। কাঁচ সবুজের ঢেউ বইছে অরণ্যে—তার মধ্যে নানা বর্ণচ্ছটা। অরণ্যভূমিতে বসন্ত যেন পরিপূর্ণ প্রকাশে প্রকাশিত। বসন্তেরও আদি মধ্য অন্ত আছে—শৈশব যৌবন বার্ধক্য আছে। অরণ্যের তৃণাঙ্কুর থেকে শালশীর্ষের রক্তাভ কিশলয়-বৃন্তে, নবোদ্গত মঞ্জরীর মধ্যে বসন্ত যেন নবকিশোরের মূর্তি ধরে আসন পেতেছে। পাতায় পাতায়, ফুলে ফলে রূপ রস গন্ধের শব্দের সে যেন মহোৎসব। শব্দ সংগীত হয়ে উঠেছে, কত পাখীর কত গানে সে এক সংগীতের ঐকতান ঝংকৃত হচ্ছে; তার সংগে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি এবং ভ্রমরের অশ্রান্ত গুঞ্জন। সেতারের জোয়ারীর তারগুলির ঝংকারের মত। দুটো ভ্রমর তাঁর কানের পাশ দিয়ে একটানা ভোঁ—ও'—শব্দ করে পরস্পরকে তাড়া ক'রে উড়ে চলে গেল। ঠিক কানের পাশটিতে শব্দ অকস্মাৎ উচ্চ হয়ে উঠে—তাঁকে ঈষৎ চকিত করে তীরের মত সামনের দিকে চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাসলেন। মাথার উপর বিরাট মৌমাছির ঝাঁক। এখানে অজয় তীরের মাটির রং গৈরিক, গৈরিক বনতলের উপর টপ টপ করে মধু ঝ'রে পড়ছে; ঝরা পাতাগুলি আঠালো হয়ে উঠেছে, পায়ে আটকাচ্ছে। স্থানটায় অনেকগুলি বহড়ার গাছ। বহড়ার মঞ্জরী থেকে মধু ঝরছে। উগ্র মধুর গন্ধের মধ্যে মাদকতার আভাস। ঝরা পাতার উপর অসংখ্য মৃত পতঙ্গ; কয়েকটা ভ্রমরও পড়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে গলগলে ফুলের পত্রহীন গাছগুলি ফুলে ভরে গিয়েছে; জবা ফুলের মত আকার, গাঢ় উজ্জ্বল হলুদ রঙ, বনের শ্যাম-অংগে স্বর্ণভূষণের মত। ফুলগুলিকে ঘিরে এখানে মৌটুটকি পাখীরা নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে। কোথায় পত্রপল্লবের অন্তরালে কোকিল ডাকছে; মধ্যে মধ্যে কোথায় কোন গুল্মের অন্তরালে

তিতির ডেকে উঠছে। ক্রমোচ্চ স্বরগ্রামে একটানা ডেকে চলেছে—চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল! এবার আসছে শালফুলের গন্ধ। শাল বন শুরু হল। সরল দীর্ঘ-তনু শিশু বনস্পতির দল, তলায় অজস্র অসংখ্য চারা—তারই মধ্য থেকে উঠেছে কত লতা; গুল্গালতা, শতমূলি, অনন্তমূল, গুলঞ্চ আরও কত লতা। যে বনস্পতিকে ধরেছে তাকে পাকে পাকে পিষে ধরেছে, কান্ডের গায়ে সর্পিল বেষ্টনের চিহ্ন এ'কে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি—সহস্র বিস্তারের জাল রচনা ক'রে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে তার আলোকপথ রুন্ধ করে দিয়েছে। নারী। লতারাই এখানে নারী।

সামনেই একটা পথ। বনটার ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে অজয়ের ঘাটে। লোক চলছে। দল বে'ধে চলেছে। এক এক দলে পাঁচজন সাতজন। চলেছে ওপারে কেন্দুবিল্বে, অধিকাংশই তিলক ফোঁটা-কাটা বৈষ্ণব, কিন্তু গৃহস্থ এরা। মধ্যে মধ্যে দুজন—তিনজন বা চারজনের দলে বাউল বৈরাগী আর বৈষ্ণবী। মন বিমুখ হয়ে ওঠে মাধবানন্দের। অন্ধকূপের পঙ্কস্তরে পড়ে মানুষ যখন নেশার ঘোরে বা মস্তিষ্কের বিকৃতিতে পুষ্পশয্যার আনন্দ অনুভব করে, এবং ওই গাঢ় অন্ধকারকে জ্যোতির ভাস্বরতায় দৃষ্টি অবরুদ্ধ হল মনে করে পুলকিত হয় তখন চৈতন্যময় পুরুষেরও চেতনা বিলুপ্ত হয়—অন্ধ তামসী আদিম উল্লাসে অট্টহাস্য করে। এদের কেন্দ্র করে সেই তামসী জাগছে। একটা গাছের ছায়ায় ব'সে একটি এমনি দল গঞ্জিকা সেবনের আয়োজন করছে। মাধবানন্দ দিকটা পাশে ক'রে মোড় ধরলেন। তিমিরান্ধ অসহায় হতভাগ্যের দল। কৃমিকীট পঙ্কপল্বলের মধ্যে ভেসে বেড়ায় আর আকণ্ঠ পঙ্ক পান করে অমৃতাস্বাদনের তৃপ্তি অনুভব করে; এরা তাই। মধ্যে মধ্যে করুণা জেগে উঠতে চায়, কিন্তু করুণা করতে পারেন নি তিনি। করতে গেলেই তাঁর মায়ের কঠোর শীতল-দৃষ্টি চোখ দুটি তাঁর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে জেগে ওঠে। মনে হয় পরপার থেকে মা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন; —এই ভঙ্গিতেই তিনি তাকে তাঁর অবাঞ্ছিত কর্ম থেকে নিরস্ত করতেন। করুণা করতে পারেন নি তিনি। তবে—ঘৃণা—; না—ঘৃণাও তিনি করেন না।

হঠাৎ এসে পড়লেন একটা খোলা জায়গায়। একেবারে নদীতটে। নদীর গর্ভ খানিকটা দূরে, কিন্তু এখান থেকেই ক্রমনিম্ন তটভূমির আরম্ভ; তৃণভূমি—কাশ উলু শরের গোড়ায় গোড়ায় নতুন সবুজ পাতা বের হতে শুরু হয়েছে, কাঁচ সবুজ ঘাস কোমল লাবণ্যে ঝলমল করছে—তারই পাশে এক জায়গায় ক'টি লাল কাঞ্চনের গাছ; অষ্টাবক্রের মত আঁকাবাঁকা-ডাল খর্বাকৃতি গাছগুলি একেবারে পত্ররিক্ত—শুধু একেবারে মাথায় দুটি একটি ডালে রক্তাভ কাঞ্চন বর্ণ দুটি চারটি ক'রে ফুল, যেন মাথায় করে রেখেছে ফুলের অর্ঘ্য। অপরূপ শোভা হয়েছে। তারই কিছু দূরেই ক'টি আমলকী গাছ।

আমলকীর সঙ্গে কয়েকটি ফুল নিয়ে যাবেন। এমন সুন্দর ফুল, এ দেবতাকে না-দিয়ে মন ভরে না। কিন্তু ফুলগুলি অনেকটা উঁচুতে রয়েছে। গাছে না-উঠলে হবে না। ডালগুলি শীর্ণ। গাছের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। কেউ এসেছিল—নিচের ফুলগুলি পেড়ে নিয়ে গিয়েছে। নিচের কাশ ঘাসের মধ্যে একটি ফুল পড়েও রয়েছে। ফুলটি তুলে নিয়ে আবার তিনি ফেলে দিলেন। একটু অতিমৃদু সৌরভ তাঁর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল। কে কোন বিলাসী—কে জানে। থাক! আমলকীও পেড়েছে কেউ, সরু পাতা ডাল ভেঙে পড়ে আছে, আমলকীও ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। এবার ফুলটি তিনি তুলে নিলেন। বিলাসী নয়। যে আমলকী পেড়েছে—সেই ফুল পেড়েছে। এবং সে আমলকী-একাদশীও পালন করেছে নিঃসন্দেহে। ফুলটি হাতে এবং আমলকীগুলি উত্তরীয়ের আঁচলে বে'ধে নিয়ে নামলেন নদীগর্ভে। আজ কবিরাজ গোস্বামীর রাধাবিনোদকে ভেট দিয়ে আশ্রমে ফিরবেন। তাঁর দৃষ্টির তপস্যায় রাধা রাধাবিনোদের অঙ্গে লীন হয়ে যান। 'দিনমণিমণ্ডল। ভবখণ্ডন। মুণিজন মানস হংস। জয় জয় দেব হরে।'

"চন্দন-চর্চিত নীল-কলেবর
পীতবসন বনমালী
কেলিচলন্মণি কুণ্ডলমণ্ডিত
গণ্ডযুগস্মিতশালী
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনী
বিলসতি কেলিপরে।"

কবিরাজ গোস্বামী পদ্মাবতীরমণ জয়দেব সরস্বতী, তুমি নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলে তোমার সখি-সচিব-পত্নী পদ্মাবতীর রূপ-সাগরে, যৌবন-জলধিতে; তোমার কবিচিত্ত বিলাস-কলাকুতূহলে এমনি মগ্ন হয়ে গেল যে, চৈতন্যময় পুরুষোত্তমের আর কোন মহিমা দেখতে পেলে না? প্রভাসে সমুদ্রের কূলে নিমগাছের ছায়ার তলায় দ্বাপরের জীবচিত্ত-তিমির-হরণ জ্যোতির্ময় পুরুষটি যাদবহীন নির্বংশ দ্বারকাপুরীর দিকে তাকিয়ে যে নিরাসক্ত প্রসন্ন মুখে বসেছিলেন সে মুখশ্রী মহিমাও কি তোমাকে মুগ্ধ করে নাই? হায় কবি হায়! শুধু তুমিই বা কেন? মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পর তোমরা কবিরা যেদিন থেকে তপোবনের তপস্যাকে বহুমহিষী পরিবৃত রাজাদের রাজসভা আশ্রয় করিয়েছ সেদিন থেকেই তোমরা কবিচিত্তকে বিলাসকলা-তরঙ্গমুখর আদিরসের ঘাটে ডুব দিয়ে গলিয়ে দিলে। জীবন সমুদ্রের মহাগভীরে অনন্তের ধ্যান-মহিমার সন্ধান হারালে।

কেন্দুলীর মন্দিরে রাধাবিনোদজীকে দর্শন ক'রে ফিরছিলেন মাধবানন্দ। ওই কথাগুলি তাঁর মনের মধ্যে ফিরছিল। গলায় রাধাবিনোদজীর প্রসাদী মালা, সাদা টগর ফুলের মালাগাছির মধ্যে মধ্যে ওই কাঞ্চন ফুলের পরন; যেন শিলাফলকে সাদা রঙে লেখা ললিত কাব্যের একটি শ্লোকের এক একটি চরণের শেষে আলতার লাল কালিতে টানা এক একটি ছেদচিহ্ন। চমৎকার নিপুণ হাতের রচনা মালাগাছি; একেবারে মধ্যস্থলে কয়েকটি কাঞ্চনের একটি স্তবক।

মন্দিরে আজ অনেক যাত্রী সমাগম। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এবং এক শ্রেণীর বিলাসী গৃহস্থ বৈষ্ণবের ভিড় বেশী।

কয়ো বোরেগীও আজ হাজির এখানে। পূজা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে যে সব যাত্রী যাচ্ছে

তাদের সকলকেই উদ্দেশ ক'রে তার মুখস্থ ভিক্ষার বুলিটি উচ্চারণ করে চলেছে, সামনে একখানা গামছা পেতে রেখেছে।

—কয়ো, আমি কয়ো বোরেগী মা সকল—বাবা সকল—গোবিন্দের এ'টোকাটা ছিটিয়ে দিয়ে যাও।

অর্থাৎ প্রসাদ। চালের মুষ্টিভিক্ষা দুটো চারটে কড়ি, কখনও বা একটা আধটা কপর্দক আপনিই পড়ছে।

মাধবানন্দ হাসলেন কয়োকে দেখে। কয়োকে তিনি এর মধ্যেই চিনেছেন। কয়েকদিনই সে তাঁর আশ্রমে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে আসছে। প্রথম দিনের ওর কথাটি তাঁর বড় ভাল লেগেছিল। গিয়ে হে'কে বলেছিল—জয় গৌর নিতাই হে! শোনলাম বনের মাঝে প্রভুর পেসাদের পাতা পড়ছে। আমি বাবা কয়ো, কয়ো বোরেগী। মুঠো এ'টো কাঁটা ছড়িয়ে দিতে মন হোক গোঁসাইয়ের।

ওই 'মন হোক' কথাটা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

কয়ো তাঁর ওখানকার প্রসাদে সন্তুষ্ট হয়নি। তাঁর ওখানকার আশ্রমের ভোগ-রাগে বিলাসিতা নাই। দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করার পঞ্চামৃতের মধ্যেই দেব-ভোজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট। তারপর সকল ভোগই ব্রহ্মচারী তপস্বীর উপযোগী উপকরণ ও পদ্ধতিতে প্রস্তুত। হবিষান্নের ব্যবস্থা। এ সবই মাধবানন্দের নিজের কল্পনা।

আশ্রমের জন্য তাঁর ভাই দৈনিক দু মণ হিসেবে চালের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। এক মণ চাল বিক্রী ক'রে আসে রান্নার অন্য উপকরণ। তার মধ্যে ডাল নুন আর হলুদটাই প্রধান। ঘিয়ের কিছু সঞ্চয় থাকে। আশ্রমেই গরু কয়েকটি রাখা হয়েছে। ওই দুধ থেকেই আশ্রমের গব্যের প্রয়োজন মিটে যায়। তরিতরকারি হবিষান্নের উপযুক্ত; এখন বাইরে থেকে কেনা হচ্ছে, পরে আশ্রমেই উৎপন্ন হবে। ষোলজন শিষ্য আশ্রমে থাকে। তাদের অধিকাংশই মাধবানন্দের মনোমত জন। কয়েকজন তাঁর বংশের ছেলে জ্ঞাতিপুত্র। বংশের পাপমোক্ষণের প্রেরণা এবং প্রাচীন পণ্ডিত বংশের রক্ত দুই আছে তাদের। জনদুয়েক আছেন কাশীর লোক। তাঁরা তাঁর সতীর্থ নয়, তবে সতীর্থেরই পর্যায়ের। জনতিনেক আছেন—জয়পুরের। তাঁরাও কৃষ্ণদেবের শিষ্য। মনে তাদেরও প্রতিবাদ জেগে উঠেছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারেন নি। মাধবানন্দ মুখ ফুটে অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে অভিশাপের বা প্রত্যবায়ের ভয়কে তুচ্ছ করে গুরুর মুখের উপর প্রতিবাদ জানিয়ে চলে এলেন যখন—তখন তাঁরাও নীরবে তাঁর পিছন ধরে উঠে এসেছিলেন। জন-তিনেক আছে বিচিত্র মানুষ। তারা শিক্ষিত নয়, জ্ঞানী নয়, শুধু শুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী মানুষ। তারা চিন্তা করে না, করতে পারে না, কিন্তু অদ্ভুত জন্মগত প্রকৃতি বা শক্তি যে তত্ত্ব শুনবামাত্র বিশ্বাস ক'রে ধারণ করতে পারে, যার ফলে ধ্যানও করতে পারে অতি সহজে। এরা মোটা কাজ করে। গোসেবার কাজ, কৃষিক্ষেত্রের কাজ এরাই করে। সবচেয়ে বড় কাজ এদের সেবা। আশ্রমবাসীদের অসুখের সময় সেই পরিচয় সবচেয়ে বড় হয়ে ফুটে ওঠে। মাধবানন্দ নিজে মনে মনে প্রণাম করেন। কয়োকেও তিনি তার ওই বিচিত্র কথা শুনে বলে-ছিলেন—আশ্রমে থাক না। থাকবে তুমি?

চোখ বন্ধ করে খাচ্ছিল কয়ো, মুখেও এক মুখ ভাত আর কচুসিদ্ধ; সে নীরবে ঘাড় নেড়ে দিয়েছিল—না।

—কেন?

এবার ঘাড় নাড়ার সঙ্গে জিভ নাড়তে হয় না—এমন একটি উত্তর দিয়েছিল—উ'-হু। উ'-হু!

—কেন?

কোঁৎ করে গ্রাসটার খানিকটা গিলে বলে-ছিল—রামঃ। তোমাদের এখানে ঠাকুরের চরণ আছে বদন নাই। এখানে কে থাকবে?

—তার মানে?

—মানে—এটা গয়াক্ষেত্র, পিণ্ডির ব্যবস্থা। পিণ্ডি ঠাকুর পায়ে ছোঁয়, প্রেতে খায়। এখানে কয়ো থাকতে পারবে না।

উত্তরীয়ের খুঁট খুলে একটি কপর্দক কয়োকে দিয়ে তিনি চলে আসছিলেন। পথের দুধারে ফুল নিয়ে বসেছে ফুল-ব্যবসায়ীরা, আমলকী এনেছে কয়েকজন, এরা সকলেই ওই গড়জঙ্গলের ভিতরের ছোট ছোট গ্রামের মানুষ। ওপাশে বসেছে সমুজ্জ্বল পণ্যের হাট; গালার চুড়ি, গালার খেলনা, কুমকুম আবীরের ব্যবসায়ী, গন্ধদ্রব্যের কারবারী। আরও অনেক কিছুর দোকানীরা বসেছে কাপড়, মাদুর (সম্মুখে গ্রীষ্ম) বাসন প্রভৃতি নিয়ে। এই সবে দিনের প্রথম প্রহর: এখনও দলে দলে লোক আসছে, পণ্য আসছে, অজয়ের ঘাটে নৌকো এসে লাগছে, গাড়ী আসছে।

হঠাৎ পিছন থেকে চীৎকার শুনলেন মাধবানন্দ—কয়োর চেরাগলার চীৎকার—ঠাকুর! গোঁসাইজী! অ-গোঁসাইজী—!

ফিরে তাকালেন মাধবানন্দ।

কয়ো হাত নেড়ে তাকেই কিছু বলছে—গোঁসাইজী তোমার হোথা—

কয়ো কথা শেষ করবার আগেই একজন ঘোড়সওয়ার তাঁর সামনে দাঁড়াল। লোকটার অদ্ভুত বর্বর চেহারা। বয়স [illegible], বেশে-বাসে ধনীপুত্র বলেই মনে হয়। রক্তাভ গোল চোখ, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, কালো রঙ, লোকটা যেন বর্বরতার প্রতিমূর্তি। পান চিবুচ্ছে। লোকটা ব্রতও করে নি, দেবদর্শন করতেও আসে নি; এসেছে মেলা দেখতে, নারী সন্ধানে।

লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে কয়োর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে।

মাধবানন্দ একটু হাসলেন। ধনীর সন্ধান পেয়েছে 'কয়ো'। ওর অশ্ব-রজ্জুটি ধরে ওর পিছনে পিছনে মেলাময় ঘুরবে, বা কোন বৃক্ষতলে বে'ধে ঘোড়াটিকে পাহারা দেবে চোখ বুজে বসে। প্রাপ্তিটা ভালই হবে। এক ঠোঙা মণ্ডা বা কৃষ্ণপ্রসন্ন বা রাধারঞ্জন ফাউ মিলবে। আশ্চর্য! এরা ছানার মধ্যে হরিদ্রাভ ক্ষীরের পুর দিয়ে ঘিয়ে ভেজে উপরটা কৃষ্ণাভ করে নাম দিয়েছে কৃষ্ণপ্রসন্ন; অর্থাৎ কৃষ্ণের মত কালো মিষ্টান্ন কিন্তু ভিতরটা কৃষ্ণের রাধাময় অন্তরের মত হরিদ্রাভ। রাধারঞ্জন তার বিপরীত, উপরটা সাদা—অর্থাৎ ছানা রসে সিদ্ধ, কিন্তু ভিতরের পুরটা কৃষ্ণাভ। পরকীয়া রস—গাঢ়তম আদিরস—জীবনের আহার বিহারের উপকরণের উপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

নদীতে এসে নামলেন তিনি। তাঁর ছোট নৌকাখানা অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য।

তখন অজয় এমন শুকনো ছিল না, খানিকটা জায়গায় অন্তত একটা স্রোত ছিল, খুব গভীর না হলেও, নৌকা চলাচল করত। পারাপারেরও দরকার হত।

বেলা বেড়েছে। সূর্যের আলোতে উত্তাপ অনুভূত হচ্ছে। স্রোত পার হয়ে অজয়ের বালি অতিক্রম করে বনভূমে এসে ঢুকছেন। মঞ্জরী জাতীয় ফুলে—মধু বেশী এবং গুণে ও গন্ধে অপেক্ষাকৃত উগ্র। রৌদ্রোত্তাপে এরই মধ্যে মাধবীগন্ধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভ্রমরগুলি মাতাল হয়েছে; পরস্পরকে তাড়া দিয়ে তাদের ছুটোছুটির আর অন্ত নাই। বনতল আলো ছায়ার টুকরো টুকরো ছাপে ছাপে বিচিত্রিত হয়ে উঠেছে। গাছে চড়ে সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা মহুয়া সংগ্রহ করছে। কেউ কেউ কাঠ ভাঙছে। ছোট কয়েকটা ছেলে তিতির খরগোসের সন্ধানে তীরধনুক হাতে পা-টিপে টিপে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বনে কোথায় কে গাছ কাটছে। কুড়ুলের শব্দ বিচিত্র গতিতে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ছুটে গিয়ে দিকে দিকে পর পর প্রতিধ্বনি তুলে চলেছে। আরও একটু অগ্রসর হয়েই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। অদূরেই তাঁর আশ্রম। অতি মধুর নারী কণ্ঠের গান শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল, ধৃতকুণ্ডল, কলিত
ললিত বনমাল।
জয় জয় দেব হরে।

বারেকের জন্য থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তারপরই গতি দ্রুততর করলেন। দ্রুতপদে আশ্রমে এসে তাঁর আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। একটি যুবতী একটি কিশোরী দেবতার গৃহের সামনে বসে গান গাইছে। দেখে বুঝতে তাঁর বাকী রইল না যে এরা সেই ন্যাড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবী; বেশ-ভূষা দেখে আরও একটু সন্দেহ হয়। সাদা থান কাপড়ের মধ্যে থাকে যে পরিচ্ছন্ন বৈরাগ্য পরিধান পারিপাট্যে তা বিলাস মনে হচ্ছে। মেয়ে দুটি স্নান করেই এসেছে, চুলে কোন বিন্যাস নাই—এলানো চুল পিঠের উপর পড়ে আছে, কিন্তু অবিন্যস্ত চুলের মধ্যেও অভ্যস্ত বিন্যাসের শাসন ফুটে রয়েছে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। মুখে শুধু যৌবন ও স্বাস্থ্যের সহজ রূপের সৌন্দর্যই নেই—প্রসাধন মার্জনার ছটাও রয়েছে সেখানে। যুবতীটির চোখের কোণে দুটি কালো দাগের আভাস আরও কিছুকে যেন ব্যক্ত করছে।

আশ্রমের সকলে আপন আপন কর্মে মগ্ন। কয়েকজন পাঠে মগ্ন। দেবতার ঘরে দেবতার সম্মুখে আসনে বসে কেশবানন্দ ধ্যানে মগ্ন হয়ে রয়েছে। বাসুদেবানন্দ সদ্য ফিরে এসেছে, সে হাত পা ধুচ্ছে এবং গুনগুন করে স্তোত্র পাঠ করছে। শুধু গোপালানন্দ হৃষ্টপুষ্ট শ্যামাঙ্গী গাভী শ্যামলীর পিঠে হাতখানি রেখে চোখ বুঁজে বিভোর হয়ে গান শুনছে। কারণ গানের তালে তালে তার সর্বাঙ্গে দোলা লাগছে।

ঠাকুর ঘরের সামনে একখানি শালপাতার উপর কতকগুলি আমলকী একটি পাকা পেঁপে একছড়া পাকাকলা এবং সন্দারটির উপরে কয়েকটি লাল কাঞ্চন ফুল নামানো রয়েছে। এরাই এনে নামিয়ে দিয়েছে তা বুঝতে বাকী থাকে না।

মাধবানন্দ নীরবে দেবগৃহের দাওয়ায় উঠে গেলেন।

গান গাইছিল কৃষ্ণদাসী এবং মোহিনী। গাইছিল কৃষ্ণদাসী, মোহিনীর তরুণ স্বরখানি সবলগতি বাতাসের সঙ্গে বনের কচি শালের পল্লবান্দোলনের বেগের মত মিলে মিশে যাচ্ছিল। মাধবানন্দকে দেখে দুজনেরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মা-মেয়ে পরস্পরের দিকে বারেকের জন্য তাকিয়ে আবার তাকালে নবীন গোস্বামীর দিকে। অপরূপ নবীন গোস্বামী। শুধু রূপেই নয় আরও যেন কি আছে। হাপরের মধ্যে গলা সোনা আর হাপরের ফুঁয়ে গনগনে হয়ে জ্বলে ওঠা কয়লার ছটার মধ্যে তফাৎ আছে। এরূপে ওই গলানো সোনার মত একটি মহিমা আছে। ওঁকে দর্শন করতেই তারা এসেছে এখানে।

কৃষ্ণদাসী আর মোহিনী কেন্দুলী থেকে নবীন সন্ন্যাসীর মঠ দেখতে এসেছে। তাঁকে দেখতে এসেছে। কয়ো বোরেগী মেলায় ওই কথাটাই মাধবানন্দকে বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘোড়সওয়ার আসায় বলা হয়নি।

আমলকী একাদশীতে রাধাবিনোদজীকে দর্শন করতে তারা প্রতি বৎসরই আসে কিন্তু। অন্যবারের আসার সঙ্গে এবারের আসার একটা পার্থক্য আছে। এবার সকালে সকালে এসেছে। অন্যবার আসে পায়ে হেঁটে দলের সঙ্গে। এবার এসেছে দল বাদ দিয়ে নৌকায়, সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওই কয়োকে। রাধাবিনোদজীকে আমলকী ভেট দেওয়ার পুণ্য কামনার সঙ্গে ওই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখবার বাসনা কৃষ্ণদাসীকে উৎসাহে খানিকটা উতলা করে তুলেছিল। উৎসাহটা অনেকটা কোন গুপ্ত আগুনের অকস্মাৎ দপ করে জ্বলে ওঠার মত। হঠাৎ গত সন্ধ্যার সময় বাসনা জেগে উঠল; কেন্দুলী থেকে অজয় পার হয়ে নবীন গোঁসাইকে দেখে এলে হয় না? এ কয়েকদিন ধরেই অর্থাৎ সেই প্রতিপদের দিন থেকেই নবীন সন্ন্যাসী সম্পর্কে মনের মধ্যে অসীম
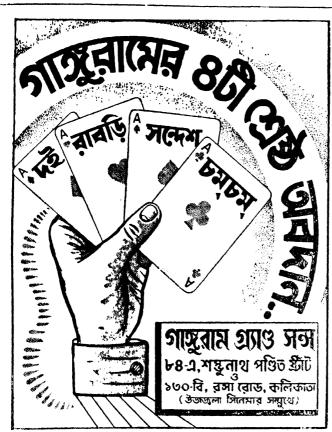
কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছে দাসীর মনে। নবীন গোঁসাইয়ের এমন রূপের সংগে তার অসাধারণ কাহিনী জড়িয়ে সে নিজেই মানুষটিকে দিনে দিনে এমনি মহামূল্য করে তুলেছে যে তাকে দর্শনের বাসনা আর সম্বরণ করা যায় না। মানুষটি যেন তেজোময় মণি। মাটির বুকের মণিতে ছটা আছে দীপ্তি আছে, এ মণিতে তার সংগে তেজ আছে। মণির সংগে তেজ; সে যে দিনমণির ভগ্নাংশ! ওই মণির তেজে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে উড়ে যাবার ব্যগ্র কামনায় তার মনোপতঙ্গের যেন পক্ষোদ্গম হয়েছে। মনে মনে মনের সংগে অনেক কথা বলে ক্লান্ত হয়েছে, মনের কথা বলবার মানুষ না-পেয়ে অবশেষে মেয়েকেই বলেছে। নিজের মনের বিস্ময় মেয়ের মনে সঞ্চারিত করেছে। একদিনে বলেনি, দিনে দিনে খানিকটা খানিকটা করে বলেছে। তার মনের রঙে সন্ন্যাসীর আসল রঙ আরও অনেক গাঢ় হয়েছে। তাই আরও গাঢ়তর করে মেয়ের মনে ছবি এ'কে দিয়েছে। দাস সরকার বলেছিল একগুণ সে তাকে দশগুণ করে তুলেছে। রমণ সরকার ওদের বাড়ী ঘরদোরের কথা বলে নি; দাসী মেয়েকে সাতমহলা বাড়ীর নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে; হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কিংখাবে মোড়া ষোল বেহারার পাল্কী, হাঙরমুখো নৌকো, পাইক বরকন্দাজের হিসেব নিকেশ পর্যন্ত। সবশেষে উদাস-ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বলেছে—

—সেই স—ব ছেড়ে চলে এসেছে নবীন গোঁসাই!

মোহিনী শুনে অবাক হয়েছে। দাসী নিজে বলতে বলতে বিস্ময়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে বসে নতুন করে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। হাতী ঘোড়া থাকার বিস্ময় তো সংসারে কম নয়, অনেক। রাজার ছেলে রথে যায়—পথে ভিড় জমে, কিন্তু এসব ছেড়ে আসার বিস্ময় যে তার চেয়ে অনেক বেশী। এর সীমা আছে, তার সীমা নেই। মোহিনী একদিন শুনতে শুনতে কে'দেছিল। আপনি চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল।

কাল সন্ধ্যা বেলায় দাসী হঠাৎ বলেছিল—মোহিনী, কাল কেন্দুলীতে প্রভুকে দর্শন করে অজয় পেরিয়ে শ্যামরূপো যাব।

আর বলে দিতে হয়নি। মোহিনীর মনে দাসীর মনের কথা প্রতিধ্বনি তুলেছিল সংগে সংগে। নবীন গোঁসাইয়ের মঠে? যাবি?

—হ্যাঁ।

দলের সংগে যাব না। বুঝলি! কয়োকে নিয়ে ভোর ভোর নৌকো করে যাব। চারটি করে রাধাবিনোদজীকে পুজো ভেট দিয়ে চলে যাব। দলবল নিয়ে গেলে হৈ চৈ হবে। ভাল করে দর্শন হবে না। দুটো কথা নিবেদন করতে পাব না। ভাল করে চরণ ছু'য়ে পেনাম করতেই দেবে না সবাই!

আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না মোহিনীর। রাত্রিতে তার ভাল ঘুম হয়নি। বুকের ভিতরটা একটা আশ্চর্য উদ্বেগে অস্থির হয়েছে, কে'পেছে। চরণ ছু'য়ে প্রণাম করবে, গোঁসাই মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করবেন—তখন কেমন হবে তার?

কৃষ্ণদাসীর মনে শেষের দিকে একটা শঙ্কা হয়েছিল। অজয় পার হয়ে বনে ঢুকে সে বার দুয়েক থমকে দাঁড়িয়েছিল। রাধা মানে না গোঁসাই। পরকীয়া মতের ওপর বিরাগ। যদি—। মোহিনী সংগে সংগে বলেছিল—দাঁড়ালি যে? চলনা কেন! কতবার বলি এত করে দুধ খাস না, আর ওই কল্কে। দিন-দিন মোটা হচ্ছিস।

মেয়ের উৎসাহে তার শঙ্কার অবসন্নতা কেটে গিয়েছে। শঙ্কাতে মানুষকে বড় দুর্বল করে দেয়! অভয়ের চেয়ে বল নাই।

অভিনব জলধর সুন্দর। ধৃতমন্দর।
শ্রীমুখ চন্দ্রচকোর॥ জয় জয় দেব হরে॥
তব চরণে প্রণতাবয়-।-মিতি ভাবয়। কুরু
কুশলং প্রণতেষু॥ জয় জয় দেব হরে॥
শ্রীজয়দেবকবেবিদং। কুরুতেমুদং। মঙ্গল-
মুজ্জ্বলগীতি॥ জয় জয় দেব হরে॥

গান শেষ করে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল দাসী ও মোহিনী।

নবীন গোঁসাই দেবতার ঘরে প্রবেশ করেছেন, তারা প্রত্যাশা করে তাকিয়ে রইল। তাঁকে দেখবে, প্রণাম করবে। দাসীর চিত্তে আবেগ জেগেছে, থর থর করছে সে আবেগে, সে বলবে—প্রভু, আমার মত পতিতের কি গতি হবে? আমাদের কি মুক্তি নাই? চোখের কোণে কোণে জল উ'কি মারছে।

মোহিনীর কোন বক্তব্য নাই, শুধু প্রণাম করবে—মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবে গোঁসাই, তার সারা অঙ্গ একবার থর থর করে কে'পে উঠবে।

বেরিয়ে এলেন আর একজন। মাধবা-নন্দের অন্য শিষ্য—বয়সে প্রৌঢ়। ইনিই দেবতার পুজো করে থাকেন। হাতে নির্মাল্য এবং দুটি আমলকী। আমলকী-একাদশীর বিশেষ প্রসাদ।

—নাও।

ওরা কথা বলতে পারলে না। নির্বাক হয়ে কলের পুতুলের মত হাত পেতে গ্রহণ করলে। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী চলে যাচ্ছিলেন। দাসী ডাকলে—প্রভু!

—কিছু বলছ?

—আমাদের এই ফুল—আমলকী আর ফল কটি!

প্রৌঢ় ঘরের ভিতরের দিকে তাকালেন। মাধবানন্দের দিকে তাকালেন। মাধবানন্দ কোন ইঙ্গিত দিলেন না, নিজেই বেরিয়ে এলেন। বললেন—নিবেদন করা হয়ে গেছে। নিয়ে যাও প্রসাদ!

দাসী আর্তনাদ করে উঠল প্রায়—আমাদের আনা ফুল ফল ঠাকুর ছোঁবেন না?

শান্ত গম্ভীর স্বরে মাধবানন্দ বললেন—দেবতার দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত। সব জায়গায় পড়ে, দেওয়ালের ঘেরে তো আটকায় না; ও'র ভোগ তো দৃষ্টিতে। দৃষ্টি নিশ্চয় পড়েছে তোমাদের নৈবেদ্যের উপর!

দাসী বললে—রাধাবিনোদের দরবারে, জগন্নাথ প্রভুর দরবারে কোথাও তো এমন নিয়ম নাই গোঁসাই? ওই তো, ওই তো তোমার গলায় রাধাবিনোদজীর প্রসাদী মালা, ও মালা তো আমার মেয়ের হাতের এই মোহিনীর হাতের গাঁথা। কই, সেখানে তো—।

তার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল; মাধবানন্দ গলা থেকে মালাগাছি খুলে ফেলছেন দেখে তার সমস্ত দেহমন যেন পঙ্গু হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই মেয়ের হাত ধরে সে টানলে—আয়! সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকিস না। মোহিনী!

মোহিনী নির্বোধের মত প্রশ্ন করলে—আমরা কি করলাম?

মাধবানন্দ মালাগাছি তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন—নাও। ধর। রাধাবিনোদের প্রসাদ।

মোহিনী হাত বাড়ালে, সে সব কথা ঠিক বুঝতে পারছে না। বুক দুরু দুরু করে ভয়ে কাঁপছে।

ওদিক থেকে দাসী সবলে তাকে আকর্ষণ করলে—না।

তারা চলে গেল।

মাধবানন্দ মালাগাছি দরজার চৌকাঠের মাথায় খোদাই হাতীর শুঁড়ের উপর ঝুলিয়ে দিলেন। কাল অজয়ের স্রোতে ভাসিয়ে দিবেন।

(চার)

দ্বাদশ রাশিতে সূর্য দ্বাদশ মাসে অবস্থান করেন, তাঁর সপ্তাশ্ববাহিত রথে বারো মাসে বারোটি রাশি পরিভ্রমণ ক'রে পৃথিবী পরিক্রমা শেষ করেন আর বিষ্ণুপ্রিয়া ধরিত্রী দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ যাত্রায় দ্বাদশ উপচারে পূজা করেন। বৈশাখে মেষ রাশিস্থ ভাস্করে প্রখরতম তাপের দিনে অগুরুচন্দনের লেপন প্রস্তুত করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ চর্চিত করে দেয়! প্রখর উত্তাপ! বড় ক্লেশ হবে। চৈতন্যময় পরমপুরুষ স্নিগ্ধ শান্ত হলেই সব স্নিগ্ধ শান্ত!

মাধবানন্দ দেব-অঙ্গ চন্দন চর্চিত করে দিলেন। তারপর একে একে আশ্রমের সকলেই চন্দন অর্ঘ্য দিলেন ভগবানের ভাব-বিগ্রহের চরণে। নিজের নিজের মস্তকে ললাটে এবং বুকে চন্দন প্রসাদের তিলক এঁকে নিলেন। এবং এর পর গোস্বামীরা একে একে বার হয়ে গেলেন।

এ মাসে অনেক কাজ, কাজ নয় ব্রত। বৈশাখ ব্রতেরই মাস। সবচেয়ে বড় কাজ এ মাসে জলদানের কাজ। অনেকগুলি জল-সত্রের ব্যবস্থা করেছেন মাধবানন্দ। এই সুদীর্ঘ বহুক্রোশব্যাপী অরণ্যের মধ্য দিয়ে বহুকালের সড়ক চলে গিয়েছে। এদিকে বর্ধমান থেকে, ওদিকে বহু দেশান্তর পার হয়ে চলে গিয়েছে, পঞ্চনদ পর্যন্ত। আবার রাণীগঞ্জের ওখানে দামোদর পার হয়ে, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পার হয়ে চলে গিয়েছে শ্রীক্ষেত্র। সুদীর্ঘ অরণ্যপথে ছায়া সুলভ, কিন্তু জল সুলভ নয়। মধ্যে মধ্যে অনেক ছোট ছোট নালা-নদী, এদিকে অজয়ে, ওদিকে দামোদরের সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু বনের মধ্যে তাদের খুঁজে বের করা শক্ত; দূর থেকে দেখা যায় না, চলার পথে বনের আড়াল থেকে হঠাৎ সামনে পড়ে; তার উপর গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়; দামোদর এবং অজয়ের নিজেদেরই অবস্থা ঐ সময় উপবাস-ক্লিষ্টের মত বিশীর্ণ; বালিয়াড়ির মত ধু-ধু করে। বৈশাখ দ্বিপ্রহরে গরম বাতাসে বালি ওড়ে। মধ্যে মধ্যে দু-চারটি অতি তৃষ্ণার্ত পথিকের নদীর বালির উপর পড়ে মৃত্যু হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। বিশেষ করে দামোদরের গর্ভে। দামোদরের এক-কূলবর্তী স্রোতের জলের আশায় তৃষ্ণার্ত পথিক বিশাল বালুময় বুকের উপর দিয়ে আসতে আসতে মাথার উপর সূর্যের এবং পায়ের তলায় বালির উত্তাপে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়। তার মৃত্যু হয়। কিছুক্ষণ মুখ ঘসড়ায় বালিতে, নাক মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়ে, তারপর শেষ হয়ে যায়। এদিকে অজয় অবশ্য এত-খানি নয়, এবং অজয়ের ওপার দিয়ে যে পথ, সে-পথ এমন অরণ্যসংকুলও নয় আর এ পথটির মত এমন গুরুত্বপূর্ণও নয়। পশ্চিমে নগরী অর্থাৎ রাজনগর থেকে উত্তরে রাজমহল পর্যন্ত পথের যোগাযোগ আছে বটে, কিন্তু খুব বেশী লোকজন হাঁটে না। তবে ওদিকে এক-একটা খাঁ-খাঁ করা মাঠ আছে। গ্রাম নাই, গাছ নাই, জলাশয় কদাচিৎ চোখে পড়ে। এমন প্রান্তরে পড়েও মানুষ তৃষ্ণায় মরে। এই দুই দিকেই জল-সত্র খুলেছে আশ্রম। স্থানীয় কর্মীরাই অবশ্য প্রধান, সেখানকার লোক নেওয়া হয়েছে। ছোলা, গুড়, জলের জালা, খরচপত্র সবই আশ্রমের, তত্ত্বাবধানও করেন আশ্রমের গোস্বামীরাই, কিন্তু সব করে স্থানীয় লোকে। প্রতি সত্রে জল সরবরাহের জন্য এক-একখানা গরুর গাড়ী করা হয়েছে। আরও কর্ম গ্রহণ করেছে আশ্রম, সন্ধ্যায় গোস্বামীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভাগবত-কথা শুনিয়ে আসেন। এই তো সাধন। সেবা এবং ভগবদগীতির পুণ্যে চৈতন্যময়ের পূজা।

মাধবানন্দ নিজে থাকবেন আশ্রমে। আশ্রমের উঠানের ঠিক মাঝখানে বড় নিম-গাছটার তলায় মাটি-বাঁধানো বেদীটির উপর বসে সমস্ত দিন ধ্যানে পাঠে মগ্ন থাকবেন; জলগ্রহণ করবেন সূর্যাস্তের পর।

আশ্রমের দরজার ওপার থেকে চেরাগলায় ধ্বনি উঠল—জয় গৌর নিত্যানন্দ! গোঁসাইজী, কয়ো এসে দাঁড়িয়েছে বাবা! প্রভুর পেসাদ এঁটো-কাঁটা ছিটিয়ে দাও। কুড়িয়ে খাই!

কাকের মত কলকল ক'রে কয়ো এসে দাঁড়াল দেবতার ঘরের সামনে। অনেক দিন কয়ো আসেনি এখানে। দেবতার প্রভাতী প্রসাদ হাতে নিয়ে সে এসে মাধবানন্দের সম্মুখে বসল। আশ্চর্য! কয়ো আজ 'প্রাপ্তি-মাত্রেণ ভক্ষয়েৎ' শাস্ত্রবাক্যটি লঙ্ঘন [illegible]

চুপ করে বসে রয়েছে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। মাধবানন্দ ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—একে দুটি কপর্দক দিয়ো কেশবানন্দ।

কয়ো বললে—জয় হোক গোঁসাইজীর! তা'—। কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে যেন পারছে না কয়ো।

মাধবানন্দ প্রশ্ন করলেন—আর কিছু বলছ?

—অপরাধটা কি বিষম হয়ে গিয়েছিল হতভাগীর প্রভু?

ভ্রু কুঞ্চিত করে মাধবানন্দ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুঝতে পারলেন না কিছু। তারপর বললেন—কি বলছ?

—আজ্ঞে প্রভু, কৃষ্ণদাসীর কথা বলছি।

—কৃষ্ণদাসী? সে কে?

—আজ্ঞে প্রভু, আমলকী একাদশীর দিন মা আর মেয়ে এসেছিল প্রভুর আশ্রমে। মা কৃষ্ণদাসী বেশ সুন্দর দেখতে, মোটা-সোটা দলমলে মেয়ে, আর মেয়ে মোহিনী ছেলেমানুষ পাতলা ঢলঢেল মুখ!

—হ্যাঁ। তারপর?

—প্রভু তার আনা আমলকী ফুল নেননি। তাই তারা রাগ করে আপনার হাত থেকে মালা না-নিয়েই চলে গিয়েছে। তবু প্রভু নিজের গলার মালা দিতে গিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। তারা তো ন্যাড়ানেড়ী দলের বৈষ্ণবী। আর তাতেও তো তারা খুব শুদ্ধ নয়!

কয়ো বললে—আমি বারণ করেছিলাম প্রভু। বলেছিলাম—মাজী ও গোঁসাইয়ের পাট আলাদা, সাধন আলাদা। ওখানে শুধু শ্যাম আছে, রাধা নেই। ওখানে যেয়ো না। কার জোরে ঢুকবে? যেয়ো না।

—কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আমি তো তার কোন অপরাধ নিই নি।

—আপনি সিদ্ধপুরুষ প্রভু! তাতেই ওর অপরাধ হয়েছে। দাসী পাগল হয়ে গিয়েছে। আজ দিন দুই একেবারে উন্মাদ!

—উন্মাদ?

—হ্যাঁ। আপনকার আশ্রম থেকে গিয়ে অবধি আপনাকে কটু বলত। তা পরেতে মনে মনে ফন্দী আঁটছিল, আপনাকে ইলাম-বাজারে পেলে অপমান করাবে। আমি তখুনি বলেছিলাম—মা-জী এসব মতলব ছাড়। তা শুনলে না। তার পরেই এই। সর্বপ্রথম রমণ সরকারের সঙ্গে দুর্দান্ত কলহ করলে। সে অনেক বিবরণ প্রভু। প্রভুর কোরোধ হতভাগীর সহ্য হবে কেন?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাধবানন্দ বললেন—আমি ক্রোধ করিনি, তুমি বিশ্বাস কর। এটা হয়তো তার কোন ব্যাধি। ঘটনাটা উপলক্ষ্য। ভাল করে চিকিৎসা করাতে বল'।

বলেই তিনি আসনে ধ্যানের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসলেন।

কয়ো ধীরে ধীরে উঠে এল। তার হাতের প্রসাদ হাতেই আছে।

কয়ো বললে—সে অনেক বিবরণ প্রভু। বিবরণ অনেকও বটে বিচিত্রও বটে। কৃষ্ণদাসী উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে।

সেদিন ওই মেয়ের হাত ধ'রে টেনে গোটা বনের পথটা যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। মোহিনী কাঁদ কাঁদ হয়ে বলেছিল—মা গো, এমন ক'রে টানিস নে। ছাড়। আমি পারছি না।

কৃষ্ণদাসী তার হাত ছেড়ে দিয়ে বলেছিল—মর তুই। থাক। আমি জানি না। বলেই সে হন হন ক'রে চলতে শুরু করেছিল। খানিকটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে মেয়েকে হেঁকেছিল—আয় বলছি! আয়!

অজয়ের ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্রামের জন্য নয়। মোহিনী প্রথমটা তাই ভেবেছিল। কিন্তু মুহূর্তে তার ভুল ভেঙে গেল; দাসী বনের দিকে অর্থাৎ আশ্রমের দিকে ফিরে কঠিন আক্রোশের সুরে বলে উঠেছিল—আমরা এত পাপী? আমরা অচ্ছুত? তোমার পুণ্যের এত অহংকার! তুমি রাজার ছেলে—তুমি পুণ্যাত্মা—! আর আমরা—!

মোহিনী ভয় পেয়ে গিয়েছিল। —মা!

কৃষ্ণদাসী এবার ঘাটের দিকে ফিরে বলেছিল—চল। বাড়ী চল। আমারও নাম কেষ্টদাসী!

অজয় পার হবার সময় নৌকার উপরেই অকস্মাৎ মোহিনীকে বলে উঠেছিল—কাঁচ খুকী?

মোহিনী বলেছিল—কি করলাম?

ঘাটে নেমে—তার হাত ধরে কঠিন সুরে বলেছিল দাসী—কেন হাত বাড়ালি মালা নিতে?

মন্দিরে পথে যেতে যেতে নিম্ন কঠিন সুরে বলেছিল—এই পুন্নিমেতে তোমাকে উচ্ছুগ্যু করব চল। আমি মনে করতাম—মেয়ে আমার হাবা গোবা! খুব চালাক তুমি!

মোহিনী ভয় পেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল—মা গো! এমন করে বলিস না! আমি কি করেছি?

কৃষ্ণদাসী মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বোধ করি লজ্জা পেয়েছিল—তার সম্বিত ফিরে এসেছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—কাঁদিস নে। জানিস তো রাগলে আমার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না।

সাহস পেয়ে মেয়ে বলেছিল—গাছতলায় একটু ব'স মা। একটু জিরিয়ে নি।
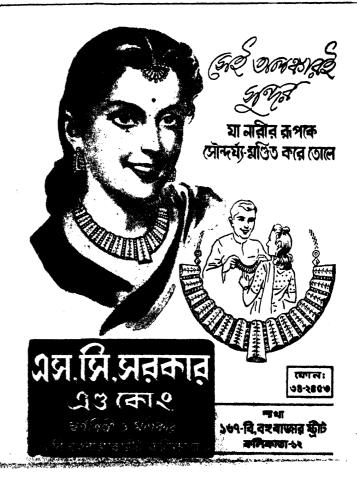
তারা তাই বসেছিল। মেয়ে বলেছিল—কেন তুই এত রাগ করলি মা? নবীন গোসাই কি বললে এমন?

হু-হু করে কেঁদে ফেললে কৃষ্ণদাসী। —কি না বললে মোহিনী? ওরে—আমাদের আমলকী ফুল ফল ছুঁলে না! আমরা অচ্ছ্যুৎ? এত পাপী আমরা?

মোহিনী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। এত দুঃখ এত ক্ষোভের সামান্য স্পর্শও তো তার মনে লাগছে না। তাদের ফুল ফল নেন নি কিন্তু নবীন গোসাই তো নিজের গলার মালা খুলে তার হাতেই দিতে হাত বাড়িয়েছিলেন। তার মন তাতেই যে প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। মায়ের দুঃখ সে আভাসে বুঝতে পারছে, কিন্তু মায়ের যে—। হঠাৎ মৃদুস্বরে সে বললে—তুই ডুলী চেপে রাত্রে আর বাইরে যাস নে মা।

মা দুটি হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল, কান্না তার তখনও ফুরোয় নি। সেই অবস্থাতেই মাথা নেড়ে রুদ্ধস্বরে বলেছিল —না—আর যাব না।

মোহিনী মাকে নাড়া দিয়ে সভয়ে ডেকেছিল—মা!

—কি? চমকে মুখ তুলেছিল কৃষ্ণদাসী।

—আসছে মা। ওই দেখ।

মন্দিরের দিক থেকে একজন ঘোড়সওয়ার আসছিল। রাধারমণ দাস সরকারের সেই বীভৎস-চরিত্র বর্বরদর্শন ছেলেটা। অ-ক্রুর নয় মূর্তিমান ক্রুর! বাপ নাম রেখেছে অক্রুর। বাজারে লোকে বলে ক্রুর! মোহিনীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। দাস-সরকারও ছেলের জন্য বিব্রত। ছেলে ইলামবাজারের নটীপাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। মধ্যে মধ্যে দু চারটে হাঙ্গামাও হয়। টাকা ঢেলে দাস-সরকার সব চাপা দেয়। তাই ছেলেকে দীক্ষা দিয়ে পরকীয়া-পথে—সাধনভজনের নামে—মোহিনীর সঙ্গে জুটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু দাসীর মন সায় দেয় না। ধনীর ছেলে হলে হবে কি? ওটা যে বর্বর-পাষণ্ড; বীভৎস প্রকৃতি অক্রুরের। ইলামবাজারের নটী যারা—তারা নামেই নটী; তারা শুধু দেহব্যবসায়িনী! অচ্ছুত জাতের মেয়ে! স্বভাবে-আচরণে-বেশে-ভূষায় হাস্যে লাস্যে এতটুকু মাধুর্য নাই, ওই বর্বরটার মতই তারা বীভৎস। তারা পর্যন্ত অক্রুরকে দেখলে ছুটে ঘরে ঢোকে, খিল দেয়। তার হাতে মোহিনীকে দিতে হবে বা দেবে মনে করলেও মনটা টনটন করে ওঠে। ফুলের মত মেয়ে মোহিনী। বড় সরল, বড় কোমল তার মোহিনী। অন্য দিকে অর্থের প্রলোভন এবং দাস-সরকারের ভয়। রাধারমণ সরকার কুটিল বিষয়ী; অনেক টাকা তার। সে তার সর্বনাশ করে দিতে পারে। নিশ্চয় পারে। তার এই নৈশ অভিসারের কাহিনী লোকের অজানা নয়; কিন্তু তা নিয়ে রটনা কেউ রটাতে পারে না—সে ওই দাসসরকারের জন্য। এ কয়েকদিনই দাস সরকার দাসীকে চাপ দিয়ে আসছে—'এই দোলপূর্ণিমাতেই—কর্মটা শেষ করা যাক।'

দাসী প্রথমটা জোর করেই না বলেছিল। তারপর হাত জোড় করেছে। দাস সরকার কিছুদিন সময় দিয়েছেন। বলেছেন—তা হলে ঝুলন পূর্ণিমায়। এর আর নড়চড় হবে না কিন্তু। দাস সরকার বললে কি হবে, অক্রুর সুযোগ পেলেই বীভৎস উল্লাসে ছুটে এসে জোটে। তীর্থস্থলে পর্বদিনে আসতেও তার বাধে না।

দাসীর চোখ দুটো হঠাৎ স্থির হয়ে গিয়েছিল। সে দৃষ্টি দেখে মোহিনী ভয় পেলে। সভয়ে ডাকলে—মা!

দাসী উত্তর দিলে না। সে যেন কোন ভাবনায় ডুবে যাচ্ছিল। কি ভাবনা সে মোহিনী জানত না, কিন্তু উদ্বেগে তার বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড মাথা কুটতে শুরু করেছিল।

ঘোড়ার রাশটা টেনে, ঘোড়াটা থামিয়ে—লাফ দিয়ে নেমে পড়েছিল অক্রুর। অক্রুরের বর্বর মুখাবয়বের মধ্যে শ্বাদন্ত দুটো বীভৎস, ও দুটো সর্বাগ্রে বের হয়ে পড়ে। হ্যা-হ্যা করে হেসে অক্রুর বলেছিল—বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার গামছা মাথায় দিয়ে; বনের মধ্যে গিয়েছিলে কোথা? আমি ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কয়ো বেটা বলে—কে জানে কোথা গেল! পা-চালালে পা-পা করে পিথিবী পেরিয়ে যায়; যুজিষ্টির সঙ্গেই চলে গেল; বলিরাজা পাতালে-রসাতলে। যার যেমন নেকন। আমি বসে আছি ভিখ মাগ্‌ছি। তারা গিয়েছে—নেকনে যেখানে নিয়ে গিয়েছে। আমি জানি না। তারপরে শুনলাম—একজন বললে—তোমার বাবার দাসী তো? —সে ওই বনে ঢুকেছে।

দাসী বলেছিল—হেথা নয় ছোট সরকার; হেথা কেলেঙ্কারীতে আমার মান যাবে জাত যাবে; সামনে রাধাবিনোদজী—আমার ধম্ম যাবে। তোমারও ফ্যাসাদ হবে, আমি মান জাত বাঁচাতে কাজীর দরবারের যাব।

অক্রুর হেসে বলেছিল—হম অক্রুর হ্যায় লেকেন দুনিয়া বোলতা হম ক্রুর হ্যায়—জবরদস্ত শূর হ্যায়—কাজীকে দরবার দূর হ্যায়। বহুত কাজী হম দেখা হ্যায়; জেব মে রুপেয়া হ্যায়; কাজী হাজী পাজী সবই ইসমে রাজী হ্যায়।

বলেই সে নিজের এ হেন কাব্যপ্রতিভায় উদ্দীপ্ত হয়ে হা-হা করে হেসে উঠেছিল।

দাসী সহজে ভয় পায় না। জীবনে সে অনেক দেখেছে। সে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল—আমি তোমাকে ডাকিনী বিদ্যেতে বাণ মেরে পেড়ে ফেলব ছোট-সরকার। আমার শ্বশুরের সিদ্ধ বিদ্যে হারায় নি, সে আমার কাছে আছে।

এবার ভয় পেয়েছিল অক্রুর। দাসী আবার বলেছিল—আখড়াতে আমার সঙ্গে দেখা করো। বাড়ীতে ঢুকো না। সকাল-বেলায় যাবে।

তারপর মেয়ের হাত ধরে বলেছিল—আয়। বাড়ী যাব।

পরের দিন।

আখড়াতে অক্রুরকে বলেছিল—শোন ছোট সরকার, খুলে সত্যি বলি শোন। মেয়েকে এতদিন তোমার মত মানুষের হাতে দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না। দিতামও না। কিন্তু আজ আমার মন পাল্টেছে। দেব, কিন্তু এক শর্তে।

—কত টাকা?

—টাকা নয়।

—বেশ, সম্পত্তি?

—না, তাও নয়।

—তবে?

—কেন্দুলীর ওপারে গড়জঙ্গলে—এক নতুন গোঁসাই এসেছে—

—হ্যাঁ। কোথাকার রাজার ছেলে।

—মহারাজার ছেলে হোক দেবতা হোক —ওকে যদি অপমান করতে পার—বাজারের নটী দিয়ে যদি অপমান করাতে পার—তা হলে—শুধু তা হলে তোমার হাতে মোহিনীকে দোব।

অক্রুর জীবনে কোন কাজেই হিসেব করে না, খতিয়েও বোঝে না, শুধু নির্বোধের মত কাজটাই ক'রে যায়; মন্দ কাজ হলে তার সঙ্গে জোটে তার বর্বর উল্লাস। বর্বর উল্লাসের সঙ্গেই সে বললে—আভি! আভি! আভি! আভি নটীর দল লেকে হম যায়েঙ্গা উসকা মঠমে।

—না। ইলেমবাজারের ওকে আসতেই

হবে—কোন-না-কোন কাজ পড়বেই। তখনই—এই বাজারে।

—বহুত আচ্ছা। তাই হোগা! বুক বাজাতে বাজাতে সে চলে গিয়েছিল। ওটাও একটা স্বভাব তার। বেশী খুশী হলেই বুকে তবলা বাজায়—তেটে-খেটে তেটে-খেটে—কত্তে গদি ঘিনি ধা!

মোহিনী আড়াল থেকে সব শুনেছিল। শুনে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কিন্তু মাকে কিছু বলতে সাহস হয় নি! সন্ধ্যায় কয়োকে পেয়ে তাকে বলেছিল—কয়ো তুমি নবীন গোঁসাইকে ইলেমবাজার আসতে বারণ ক'রে এসো। তোমার দুটি হাতে ধরছি।

কয়ো অভ্যাসমত চোখ বুজে মালপো চিবুচ্ছিল, মুখ ভর্তি ছিল—ঘাড় নেড়ে জানালে—যাবে!

ঠিক এই মুহূর্তেই খিড়কীর দরজায় দাসীর ক্রুদ্ধ চীৎকার শোনা গেল—না-না-না। আমি যাব না। আমি যাব না। কাল যাই নি। আজও যাব না। আর কখনও যাব না।

চমকে উঠেছিল দুজনে। দাস সরকারের ডুলি এসেছে। তার পেয়াদাকে বলছে দাসী। গতকালও ডুলি ফেরৎ দিয়েছিল শরীর খারাপ ব'লে। আজও দিচ্ছে। বলছে কালও যাবে না। কখনও যাবে না।

পরিদনও যায় নি। দোলের অগের দিন সেদিন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দাস-সরকার নিজে এলেন। দাসী তার দুটি পায়ে গড়িয়ে পড়েছিল—আমাকে ক্ষমা করুন সরকার মশাই। আমাকে রেহাই দিন। আমাকে রেহাই দিন।

—কি হ'ল তোমার?

—কিছু হয় নি।

—ভাল। কিন্তু এবার সংকল্প করে আরম্ভ করেছি, কাল শেষ। এবারের মত পর্ব শেষ হোক। তারপর আর যেয়ো না। সংকল্প ক'রে পর্ব শেষ না করলে যে প্রত্যবায় হবে।

—হোক। তাই হোক। আমাকে সর্পাঘাত হোক, আমার ব্যাধি হোক। আমি যাব না।

—যেতে তোমাকে হবে। আমার লোক তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে।

—তুলে নিয়ে যাবে? চলুক। তোমার ভজন আমি শেষ করে দিয়ে আসব ভজন ঘরে। আর—

বলেই সে ছুটে গিয়ে গৌরাঙ্গ মূর্তির পা দুটি জড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। বলেছিল—এই পা-ছাড়িয়ে নিয়ে যেয়ো আমাকে। দেখব!

দাস সরকার নীরবে উঠে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাসী সেই চতুর্দশীর সন্ধ্যা থেকে দোল পূর্ণিমার রাত্রি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত দেবতার চরণ ছেড়ে ওঠে নি।

যখন উঠল—তখন চোখ দুটো তার জবা ফুলের মত লাল।

মোহিনী শিউরে উঠেছিল মাকে দেখে। মা ভ্রূক্ষেপ করে নি। অজয়ে স্নান ক'রে এসে প্যাটরা খুঁজে শাশুড়ীর অর্থাৎ সিদ্ধবাউল প্রেমদাসের সেবাদাসীর অতি জীর্ণ গেরুয়া কাপড় খানা প'রে পুজোর ঘরে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল—মোহিনী! মোহিনী! আনত, জাঁতি খানা, ভাল খানা!

মোহিনীর হাত থেকে জাঁতি খানা নিয়ে নিজের চুলের প্রান্তভাগ তার হাতে দিয়ে বলেছিল—ধর, টেনে ধর। তারপর নিজে হাতে চুলের রাশি কেটে—নিজে হাতে সে গুলি খিড়কীর ডোবায় ফেলে দিয়ে এসেছিল।

—পাপ! পাপ! দে পাপ ঝেড়ে ফেলে! যা দূরে হ। ডোবায় ডুবে যা।

তারপর বসল পুজোয়।

বাজারে কানাঘুঁষো চলতে লাগল যে, কেষ্টদাসী সিদ্ধ হয়েছে। দাস সরকার একদিন খিড়কী থেকে উঁকি মেরে দেখে গেলেন। ছেলেকে ডেকে বারণ ক'রে দিলেন—ওপথ মাড়াস নে। অক্রুর নিজে একদিন একটা গাছে চড়ে দেখলে।

শুধু কয়ো আর মোহিনী বুঝলে—কৃষ্ণদাসী পাগল হয়েছে। রাত্রে দাসী বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত—মধ্যে মধ্যে হা-হা করে উঠত—কেন গেলাম। আমি কেন মরতে গিয়েছিলাম রে! আমি পাপী, কিন্তু আমার মেয়েতো পাপী নয় নবীন গোঁসাই! তুমি আগুন, গোঁসাই তুমি আগুন, ঘাসকেও দয়া নাই, পুড়িয়ে দিলে, ঘাসকেও ছাই ক'রে দিলে!

আজ কয়েকদিন সে বদ্ধ উন্মাদ।

(পাঁচ)

কি করবেন মাধবানন্দ? চৈতন্যের প্রকাশ-লীলায় এই রকমই ঘটে। মহাপ্রকৃতির নিয়মে চৈতন্যেরও বোধ হয় উদয়াস্ত আছে। চৈতন্যের প্রকাশলীলায় এটা স্পষ্ট। তিনি উদয় হন—প্রখর হন—ক্লান্ত হন—ঘুমিয়ে পড়েন, আবার জাগেন, আবার লীলা চলে, ফুল ফোটে—পাখী গায়—দেবমন্দিরে আরতি হয়—পূজা হয় হোম হয়, ধ্যান চলে; মানুষের বুকের মধ্যে দয়াময় জাগেন, প্রেমময় জাগেন, জ্ঞানময় যোগে বসেন, চৈতন্য সূর্যকে অর্ঘ দেন। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এলেন—দিন হল, পাপীর নাশ হল, পুণ্যাত্মার প্রতিষ্ঠা হল, তারপর আবার এল রাত্রি। চৈতন্য-সূর্য যেন অস্ত গেলেন। তখন সে কি অন্ধকার। আবার এলেন গৌতম বুদ্ধ—আবার দিন হল। আবার রাত্রি। তারপর শঙ্কর। তারপর চৈতন্য মহাপ্রভু! তাঁর তিরোধানে আবার অন্ধকার। দিন আর রাত্রি। অভ্যুদয় আর পতন। মহাপ্রকৃতির নিয়ম। ওঠে নামে, ওঠে নামে। উদয় হয় অস্ত যায়। অস্তের পর অন্ধকারের মধ্যে অসুরের, দস্যুর, খুনীর, পশুর, সরীসৃপের ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে, হিংসা জাগে, কাম জাগে শ্বাপদ-চীৎকার ওঠে। কত ব্যাধির বীজ জন্ম নেয়, কত পতঙ্গ জন্মায়, অন্ধকার বিলাসী পতঙ্গ। শ্যামা পোকার মত। সূর্যোদয়ে এরা গহ্বরে আশ্রয় নেয়, কিছু কিছু মরে।

কৃষ্ণদাসী রাত্রির অন্ধকারে ব্যাধির বীজের মত জন্মেছিল। তিনি অন্ধকারের মধ্যে সূর্যোদয়ের তপস্যায় হোমকুণ্ড জেলে বসে আছেন, তাতে শ্যামা পোকার মত কৃষ্ণদাসী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মরল; তিনি কি করবেন তাতে? তর্পণের সময় 'আব্রহ্ম স্তম্ভ' পর্যন্ত জগতকে জলগণ্ডুষ যখন তিনি দেবেন তখন তার মধ্য থেকে একটি জলকণা সে পাবে, দেবেন তাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে আত্মসম্বরণ করলেন মাধবানন্দ।

কৃষ্ণদাসী মরেছে।

সম্মুখে শ্রাবণ পূর্ণিমা; ভগবানের ঝুলন-যাত্রা। তার আয়োজন চলছে আশ্রমে। সেই

নিমগাছটির তলায় বসে আছেন মাধবানন্দ। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন; মধ্যে মধ্যে গুরু গুরু গম্ভীর গর্জন হচ্ছে। যূথবন্ধ দিক-হস্তীরা যেন আকাশ-ক্ষেত্র মথিত করে উল্লাস ক্রীড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে; মধ্যে মধ্যে বৃংহিত ধ্বনি করছে। ঘনশ্যাম হয়ে উঠেছে বিশাল অরণ্যভূম; সে শ্যামলতার আভা মেঘের ছায়ার সঙ্গে মিশে একটি প্রসন্ন কৃষ্ণশোভা বিস্তার করেছে বনতলে। কোন শাল শাখায় বসে ময়ূর ডাকছে। মধ্যে মধ্যে ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি নামছে, বিশাল অরণ্যে পত্রপল্লবে বৃষ্টিপাতের শব্দ উঠছে ঝর্, ঝর্ ঝর্ ঝর্, ঝর্ ঝর্। অজয়ের কল্লোল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে তার সঙ্গে। অজয়ে বন্যা এসেছে।

উন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণদাসী অজয়ে ডুবে ভেসে গিয়েছে। উন্মাদের খেয়াল! ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। ইদানীং উন্মাদ রোগের উপসর্গের বশে সে দিনে-রাত্রে বারবার স্নান করত। অজয়ে স্নানেরই ঝোঁক ছিল বেশী। সব সময়েই সঙ্গে থাকত দাসীর সেই কিশোরী মেয়েটি। মেয়েটিকে বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। দুবার দেখেছেন। আর একবার কয়ো তাকে নিয়ে এসেছিল—সে এসেছিল মায়ের অপরাধের জন্য দেবতার কাছে এবং তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে। মেয়েটি নির্দোষ এবং নিষ্কলঙ্ক। বড় সরল এবং ভীরুও বটে। দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটিকে দেখে বনভূমির সেই শ্যামলতাটির কথা মনে পড়েছিল, যেটি সদ্য সতেজ নমনীয় অগ্রভাগ বিস্তার করে শাল গাছটির গোড়ায় এসে তাকে জড়াবার জন্য মাথা তুলে দুলছে, দ্রুত বাড়তে চেষ্টা করছে। তিনি আশীর্বাদী দিয়ে আশীর্বাদ করে সান্ত্বনা বাক্যে তার মনে আশার সঞ্চার করে ফিরে পাঠিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন—ভাল করে চিকিৎসা করাও। রোগ হলে চিকিৎসা না হ'লে সারে না। ওষুদ সেও তো ভগবানের দান। রোগে ওষুদই হল তাঁর আশীর্বাদ। চিকিৎসা করাও ভাল হবে। বুঝেছ?

একটি ক্ষীণ স্মিত হাস্যরেখা তার মুখে মনে আশ্বাস পাওয়ার ইঙ্গিত ব্যক্ত করে ফুটে উঠেছিল।

ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর। তার চিন্তা কেন? মনের মধ্যে মায়ের শীতলদৃষ্টি—নির্নিমেষ চোখ দুটি ফুটে উঠেছে। নারায়ণ নারায়ণ।

তারপরই তিনি ডাকলেন—গোস্বামী কেশবানন্দ প্রভু!

—প্রভু!

—বসুন। কথা আছে। আমার মনে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কোন কথা না-বলে কেশবানন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আশ্রমে নারী সমাগম বাঞ্ছনীয় নয় বলেই আমি মনে করি। অথচ দেবতার দ্বার তো রুদ্ধ করতে পারি না!

—অন্যায় হবে। পূজারী গোস্বামী কেশবানন্দ প্রৌঢ়। তিনি নিঃসংশয় হয়ে কথাটা বললেন, কণ্ঠস্বরে তার আভাস ফুটে উঠল।

—সম্মুখে ঝুলনোৎসব। আশপাশ গ্রাম-গুলিতে আমরা ধর্মপ্রচার করি, সেখান থেকে গ্রামবাসীরা আসবে। মেয়েরাও আসবেন। আমি বলি—প্রভুর ঘরের ওপাশে একটি দরজা করা হোক। এবং সামনে যে বট-গাছটা আছে তার আশপাশে পরিষ্কার করা হোক। মেয়েরা ওই দিক থেকে দর্শন করবেন। এ ব্যবস্থা সাময়িক নয়; স্থায়ী করতে হবে।

—সুব্যবস্থা। আমার পূর্ণ মত আছে। সেই কথাই বলি কিশোরানন্দকে।

—হাঁ তাই বলুন।

চতুর্দশীর দিন। মাধবানন্দ কেন্দুবিল্ব থেকে ফিরলেন। ওখানকার মহান্ত স্মরণ করেছিলেন। স্মরণ করেছিলেন আলোচনা করবার জন্য। তাঁর এই নিজস্ব ধর্মমতের জন্য আলোচনা। মাধবানন্দ সবিনয়ে তাঁর মত তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি শুনেছেন। এবং বলেছেন এই শ্যামরূপার গড় দেউল যুগল বিগ্রহের পীঠ। কেন্দুলীর মন্দিরে যে রাধাবিনোদ জী রয়েছেন তাঁরই আদি অবস্থানভূমি। শ্রীমনজয়দেব গোস্বামী তাঁর রাধামাধবকে নিয়ে বৃন্দাবন গিয়ে-ছিলেন। শূন্য মন্দির ভেঙে গিয়েছিল, নূতন মন্দির গড়ে গড়জঙ্গলের ভগ্নস্তূপ থেকে রাধাবিনোদকে কেন্দুলীতে স্থাপন করা হয়েছে। যুগলের পীঠে শক্তিকে বাদ দিয়ে একক দেবতার উপাসনায় দেবতা ক্রুদ্ধ হবেন। পীঠের সাধনার ক্রমভঙ্গ হবে। কবিরাজ গোস্বামী জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভাবে-সুরে এ স্থানের আকাশবাতাস পূর্ণ। আপনি বিরোধী সুর তুলছেন।

মাধবানন্দ বিরোধের আভাস অনুভব করে-ছেন। তিনি অবশ্য বিরোধকে ভয় করেন না। বিরোধের শক্তি এবং বুদ্ধি দুই তাঁর রক্তের মধ্যে আছে; কিন্তু বিরোধ তিনি চান না। তিনি নিজেকে সংযত করে বলেছেন—কিন্তু আমারও যে শুদ্ধ চৈতন্যময়ের উপাসনা! উপায় কি?

এবার মোহন্ত বলেছেন—একটা উপায় আছে। এ মণ্ডলের মালিক রাধাবিনোদের শ্রীমতী রাধাকে পরিতুষ্ট করা। ওখানে আপনারা আপনাদের মতে উপাসনা করুন, একক থাকুন শ্যাম। উচ্চহাস্য করে বলেছেন—গিরিগোবর্ধন ধারণ করুন, রাখালদের সঙ্গে গোচারণ করুন, অকাসুর বকাসুর বধ করুন, দাবানলকে গ্রাস করুন, একক লীলা করুন, কিন্তু বৎসরে বৎসরে শ্রীমতীকে একটা কর দিন। আর প্রতি পর্বে ভেট। ব্রজবাসী মহান্ত হেসে বললেন—আপনার বাসুদেব—আমার রাধারাণী মহারাণীজীকে এক সনদ লিয়ে লিন। বস্ বখেড়া চুক যাক।

মুহূর্তের জন্য মাধবানন্দের মনে বিদ্রোহ জেগেছিল। কর, খাজনা? পরিশেষে অর্থমূল্য? হায় ধর্মের পরিণতি! কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত করেছেন। বলেছেন—ভেবে দেখি! বিবেচনার জন্য সময় দিন। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরলেন মাধবানন্দ। দ্বন্দ্বে তাঁর প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু একি? ধর্মের নামে এযে বণিকবৃত্তি! কাঞ্চন মূল্যে সব হয়? পতিতের পাতিত্য চলে যায়, সত্য এবং অসত্যের, ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে আপসও হয়। রাধাতত্ত্বের সত্যকে কাঞ্চন মূল্যে দিয়ে অস্বীকারই যদি করা যায় তবে কি মূল্য সে তত্ত্বের। না তত্ত্বের নয় তত্ত্ব-বাদীর। নিজেকে সংশোধন করলেন মাধবানন্দ।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। শুক্লপক্ষের প্রায় পূর্ণচন্দ্র; পূর্ণিমার পূর্বদিন তিথির উদয় হিসাবে ত্রয়োদশীর উদয়, কিন্তু লৌকিক গণনায় আজ চতুর্দশী। কয়েকদিন বর্ষণের পর গত রাত্রি থেকে বর্ষণ ক্ষান্ত হয়েছে। আজ দুপুর বেলা থেকে মেঘ কেটে আকাশ প্রায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এখানে ওখানে মেঘ রয়েছে, খানা-খানা মেঘ—তারা দ্রুত-গতিতে চলে যাচ্ছে উত্তর দিগন্তের দিকে। অরণ্যভূমের অপূর্ব শোভা হয়েছে। সুস্নাত ঘনশ্যাম অরণ্যশীর্ষে চাঁদের আলো পড়েছে, নিথর বনভূমি; কচিপাতার বর্ণলাবণ্যে জ্যোৎস্নার ছটা পড়ে ঝিকমিক করছে।

কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনার সঙ্গে আজ ঠিক মিলছে না। "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ।" অম্বর আজ মেঘ মেদুর নয়; বনভূমি সুশ্যাম, তমাল না-হোক শাল তরুর শ্যামলতা গাঢ়ই বটে। জ্যোৎস্নার আলোয় শ্যামআভা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আশ্রমে ফিরে উপাসনা সেরে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুম এল না। ওই চিন্তাই মনের মধ্যে ঘুরছে। চাঁদ প্রায় মধ্য আকাশের কাছে এসে উপস্থিত হল। [illegible]

মধ্যে বিশালায়তন মেঘের পুঞ্জ এসে চাঁদকে ঢেকে ছায়া ফেলছে, আধ আলো আধ অন্ধকারে প্রত্যুষের রূপ বলে বিভ্রান্তি হয়। সেই ভ্রান্তিতে মধ্যে মধ্যে পাখীরা কলরব করে ডেকে উঠছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে অবিশ্রান্ত। অরণ্যের ঝিল্লী রব না শুনে অনুমান করা যায় না; রব নয় এ যেন ঝঙ্কার। পৃথিবীর বুকের ভিতর থেকে যেন অবিরাম মন্ত্র গুঞ্জন উঠছে। গভীর অরণ্যে শ্বাপদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে।

অকস্মাৎ একটি বিদ্যুৎ খেলে গেল জ্যোৎস্নাকে চকিত এবং নিষ্প্রভ করে দিয়ে। দিগন্তে মেঘ জমেছে, উঠছে বোধ হয়। আবার বর্ষণ নামবে। গুরু গুরু ডাক উঠল। বনের পাতাগুলি বোধহয় কাঁপছে। ঠিক এই মুহূর্তটিতেই আশ্রমের প্রবেশ-দ্বারে একটা আঘাতের শব্দ উঠল। আবারও একটা শব্দ। তার সঙ্গে একটি আর্তস্বর। মানুষ! নারী কণ্ঠ!

মাধবানন্দ সচকিত হয়ে উঠে বসলেন। এবং পরমুহূর্তেই দ্রুতপদে এসে দুয়ার খুলে প্রশ্ন করলেন—কে? কি হয়েছে?

এখানটায় বন পাতলা। পশ্চিমদিগন্তে নতুন ওঠা মেঘের কৃষ্ণাভায় জ্যোৎস্না ঈষৎ ম্লান হয়েছে, সেই আলো পরিপূর্ণভাবে পড়েছে স্থানটায়। সেই আলোতে দেখলেন দুয়ারের চৌকাঠ ধরে হাঁপাচ্ছে একটি মেয়ে; এ যে সেই মেয়ে—সেই কিশোরীটা, সেই মোহিনী। বিচিত্র বেশবাসের অবস্থা, পরনে সূক্ষ্ম সৌখীন শাড়ী কিন্তু ভিজে তনু-দেহের সঙ্গে সেঁটে জড়িয়ে গিয়েছে। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। মাথার চুল থেকেও জল ঝরছে। অথচ কেশ বিন্যাসে প্রসাধনের চিহ্ন। ভয়ার্ত দৃষ্টি।

মুহূর্তে মোহিনী তাঁর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে পা দুটি জড়িয়ে ধ'রে বললে—আমাকে বাঁচান গোঁসাই, আমাকে বাঁচান!

মাধবানন্দ বুঝলেন—মাতৃহীনা হত-ভাগিনী বিপদাপন্ন হয়ে ছুটে এসেছে। কিন্তু ইলামবাজার থেকে এখানে—এই গভীর রাত্রে—কেমন ক'রে এল? অজয়ের বন্যা কমেছে কিন্তু প্রখর স্রোত অজয়ে। তারপর এই অরণ্যভূম! মনে মনে দেবতাকে স্মরণ ক'রে সস্নেহে তাকে বললেন—ওঠ! ওঠ! কি হয়েছে বল। ভয় কি?

তাঁর পায়ের উপরেই মুখখানা নড়ে উঠল —অর্থাৎ না—, সে উঠবে না। মুখে বললে —আমাকে বাঁচান। আমাকে বাঁচান!

এবার তার হাতে ধ'রে তাকে তুললেন। ব্রহ্মচারীর সঙ্কোচ তাঁর চিত্তকে চঞ্চল করছিল। সে বিরূপতার চাঞ্চল্য সম্বরণ করতে চেষ্টা করলেন; তবুও কোমল বাহুর স্পর্শে সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। সর্বাঙ্গ তার সিক্ত হয়ে গিয়েছিল, পরনের কাপড় এখনও ভিজে—কিন্তু মেয়েটির শরীরে এ কি উষ্ণতা! তার উষ্ণ ঘন নিশ্বাস হাতে লাগছে। তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে ছেড়ে দিলেন গোস্বামী।—কি হয়েছে বল?

মেয়েটি কাঁদছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না পড়েছে তার মুখের উপর। চোখে যেন কজ্জল রেখা। কপালে যেন একটি চন্দন টিপের চিহ্ন; ধুয়ে গিয়েও চিহ্ন রয়ে গেছে। নাকের রসকলিটিরও তাই। চোখের দৃষ্টি ভয়ার্ত—মুখখানি সকরুণ। কথা বলতে পারছে না সে।

মাধবানন্দ অধীর হলেন। অন্তরে মমতা বিগলিত তুষারের মত স্রোতবতী হয়ে উঠছে, অন্যদিকে তাঁর জীবনের অনুশাসন কঠোর হয়ে উঠছে। তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। আবার প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে বল? এখানে এত রাত্রে কেমন ক'রে এলে তুমি?

—অজয় পার হয়ে বনে বনে অজয়ের ধার ধার পালিয়ে এসেছি গোঁসাই। আমাকে আপনি বাঁচান।

অজয় পার হয়ে—বনে বনে পালিয়ে এসেছ? অজয় পার হলে কি ক'রে?

—কয়ো আমাকে পার ক'রে দিয়েছে পিঠে করে।

—পিঠে করে?

—ক'য়ো খুব ভাল সাঁতার জানে। জেলে-দের শোলার ভেলা পড়েছিল সেই শোলার আটি বুকে নিয়ে—আমাকে পিঠে নিয়ে পার ক'রে দিলে।

—সে কোথায়?

—সে এল না। আমাকে বললে—তুমি ওখানে যেয়ো না। কিন্তু আমি কোথায় যাব? আমি তোমার পায়ে শরণ নিতে ছুটে এসেছি গোঁসাই—আমাকে বাঁচাও।

—কি হয়েছে তোমার? কেন ছুটে এলে তুমি?

—সেই অক্রুর, গোঁসাই, সেই তুলোর গদীর মোটা সরকারের ছেলে—নটীপাড়া যার ভয়ে কাঁপে—। হু-হু করে কেঁদে উঠল মোহিনী।

দাসী নাই। উন্মাদিনী দাসীকে তপঃসিদ্ধা ধারণা ক'রে এতদিন অক্রুর মোহিনীর দিকে হাত বাড়াতে সাহস করে নি। দাসীর অপঘাত মৃত্যুর পর, আবার তার অবরুদ্ধ কামনা নির্ভয়ে তার পাশব গ্রাস বিস্তার করেছে। তাতে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তার বাপ—মোটা সরকার—রাধারমণ দাস। দু দিন আগে রাত্রিতে তাকে তারা বাড়ী থেকে অপহরণ ক'রে নিয়ে যায়। অক্রুর সেই দিনই তার পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু তাতে বাধা দিয়েছিল তার বাপ। পূর্ণিমাতে পরকীয়া মতে সাধন-দীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিল সে। আজ থেকে তার ক্রিয়া চলছিল। ওই কয়োর সঙ্গে মালাচন্দনের ব্যবস্থা করেছিল—কয়ো রাজী হয়েছিল। কিন্তু সে তাকে উদ্ধার করবার জন্য। কয়োকে তারা বিশ্বাসও করেছিল এই জন্য। আজ ছিল অধিবাস। তাই চোখে তার কাজল, কপালে চন্দনের ফোঁটা, পরনে এই সূক্ষ্ম শাড়ী। এ শাড়ী নাকি ঢাকার শাড়ী। আজ সন্ধ্যার পর কয়ো এক সুযোগের মুহূর্তে তার হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে সেই বাড়ী থেকে। ইলামবাজারের বন্দর ঘাটে মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছে সুপারি নারকেলের নৌকা; তাতেই এক ব্যাপারী এনেছে নবাব-আমীর-শাহী সরাপ। তাই আকণ্ঠ পান ক'রে অক্রুর বাজারে মারপিট ক'রে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সেই নিয়ে গোটা সরকার-বাড়ীতে হৈ চৈ শুরু হয়। পাইকেরা এমন কি মোহিনীর বাড়ীর পাহারাদারেরাও ছুটে যায়। ওই কয়ো, কয়োই তাদের হৈ চৈ তুলে পাঠিয়ে দেয়। তারপর সেই সুযোগে—।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মাধবানন্দ। আকাশে পশ্চিম দিগন্ত থেকে মেঘ ঘোর হয়ে ক্রমশ উপরে উঠছে। চাঁদের আলো গহন-রাত্রির মত ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে ক্রমশ। যেন একটা কুহেলি জাগছে। মোহিনীর মুখের অশ্রুধারা দুটির উপর চিক চিক করছে সেই আলো।

—তা তুমি আমার কাছে এলে কেন?

—আর কোথায় যাব? মা বলেছিল—

—কি বলেছিল?

—পাগল হয়েও বলত—অক্রুরের হাত থেকে বাঁচতে চাস তো নবীন গোঁসাইয়ের কাছে যাস।

—ভাল। কয়োকেই তুমি তা হলে বিবাহ কর। আমি পাশের গ্রামে তোমাদের বাড়ী-ঘর,—না, আমার পৈতৃক বাড়ী যেখানে সেখানে পাঠিয়ে দেব।

—না। আর্তস্বরে বলে উঠল—মোহিনী —না-না-গোঁসাই না।

—না? কেন?

—কয়োকে আমি—না-না-না।

সকরুণ হয়ে উঠল মাধবানন্দের দৃষ্টি; আহা; সুন্দরের এই সৃষ্টির মধ্যে কিশোরী বালিকা—। পরমুহূর্তে তিনি চমকে উঠলেন, মোহিনী আবার তাঁর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বলে উঠল—ওগো গোঁসাই, আমি তোমার সেবাদাসী হয়ে থাকব গো! তুমি আমার শ্যাম। তুমি আমার গৌর। তুমি আমার গোঁসাই। মা আমার বলে গিয়েছে, সেই প্রথম দিন থেকে মনে মনে গৌরের পায়ে মাথাকুটে বলেছি—আমি যেন তোমার সেবাদাসী হই!

থর থর করে কেঁপে উঠলেন মাধবানন্দ। শুধু তিনি নন, গোটা বনভূমি যেন কাঁপছে। বাতাস উঠেছে। ঝর-ঝর-ঝর-ঝর শব্দে উঠছে।

নিজকে সংযত করে মাধবানন্দ কঠিন স্বরে বললেন—ওঠ!

বিহ্বল মত উঠে দাঁড়াল মোহিনী। দু চোখে তার নূতন কিছু যেন দেখা যাচ্ছে। আয়ত চোখ দুটির পল্লব দুটি যেন কিসের ভারে ভারী হয়ে পড়েছে। তবু সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

মাধবানন্দ বললেন—না।

সদ্য-যৌবনা বৈষ্ণব-কন্যা মোহিনী, পরকীয়া সাধনের ব্যগ্র কামনা তার রক্তে, তার উপর নিদারুণ বিপদ ও আতঙ্কের উন্মত্ত সাহসে অতিক্রম করে অজয় পার হয়ে দীর্ঘ বনভূমি অতিক্রম করে একাকিনী এসেছে। তার রক্তের কণায় কণায় উত্তেজনা যেন ফেটে পড়ছে; তার আর লজ্জা নাই, বাধা বন্ধ নাই, প্রাণের কামনা উচ্চকণ্ঠে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। সে চীৎকার করে বলে উঠল—তোমাকে নইলে আমি বাঁচব না, ওগো গোঁসাই—আমি বাঁচব না।

সে চীৎকারে মাধবানন্দ চমকে উঠলেন। পল্লবান্দোলন-শব্দ-মুখর বনভূমির দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সে কণ্ঠস্বর!

মাধবানন্দ অতি রূঢ় স্বরে বললেন—না। এবার চমকে উঠল মোহিনী।

মাধবানন্দ ভিতরে প্রবেশ করে সশব্দে আশ্রমদ্বার রুদ্ধ ক'রে দিলেন।

গিয়ে বসলেন মন্দিরে—বিগ্রহের সম্মুখে, দ্বিভুজ বাসুদেব মূর্তি। ঘৃতদীপের শিখাটি উজ্জ্বল করে দিলেন। বিদ্যুৎচ্ছটায় গৃহাভ্যন্তর প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। শ্রীমুখের পরিপূর্ণ মহিমা বুঝি! মুহূর্ত পরে মেঘ গর্জন ছড়িয়ে পড়ল; নাকাড়ার মত বেজে উঠল। তারপরই প্রবল বেগে এল বর্ষণ, প্রবল বাতাসের একটা প্রবাহের সঙ্গে।

ঝর্-ঝর্, ঝর্ ঝর ঝর ঝর ঝর ঝর! যেন অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। যাক লুপ্ত হয়ে বস্তু-জগতময় পৃথিবী। হে চৈতন্যময় স্বত্তার ভাব-বিগ্রহ, তুমি বিগ্রহ-রূপের অবয়ব দীর্ণ করে জ্যোতিস্মান হয়ে ওঠ; মাধবানন্দের বস্তু-জগতময় দেহ-সত্তার সকল আকর্ষণ, সকল স্পন্দন স্তব্ধ করে দাও; চৈতন্য-মহিমাকে জাগ্রত কর!

কঠোর ধ্যানে তিনি মগ্ন হয়ে গেলেন।

(ছয়)

তিরিশ বৎসর পর।

অজয়তটে গড়জঙ্গলের পটভূমি নয়। গড়জঙ্গলের পটভূমিতে সে আশ্রমটি এখন মাটির স্তূপে পরিণত; তার উপর অজস্র শালচারা জন্মে এমন আচ্ছাদনে ঢেকে দিয়েছে যে তার মধ্যে সে আশ্রমের ইতিহাস একেবারে হারিয়ে গিয়েছে।

এবারের পটভূমি গঙ্গাতীর—উত্তরে পশ্চিমে পর্বতমালার সমাবেশ। চারিদিকে একটি নির্জন গাম্ভীর্য থমথম করছে। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতি এখানে নিত্য নবরূপে সাজে না। মুরশিদাবাদের ক্রোশ পনের উত্তর-পশ্চিমে, রাজমহলেরও ক্রোশ বিশেক দক্ষিণে, ভাগীরথী এবং পদ্মার মুক্তবেণী-সঙ্গমের অনতিদূরে ভাগীরথীর কূলে একটি আশ্রম। রাজমহল পাহাড় শ্রেণীর প্রত্যন্ত সীমায় বড় বড় স্তূপের মত ছোট একটি পাহাড়ের কোলে মাধবানন্দের আশ্রম।

ওই ঘটনার পরই মাধবানন্দ গড়জঙ্গলের আশ্রম ত্যাগ করে চলে এসেছেন। জয়দেবের মহান্ত মহারাজের করের দাবী তিনি মানতে পারেন নি। দ্বন্দ্ব করতেও প্রবৃত্তি হয় নি। এর উপর ইলামবাজারের রাধারমণ দাস সরকারের বর্বর পুত্রটি নানা রটনা শুরু করেছিল; রটনাকে তিনি গ্রাহ্য করেন নি কিন্তু ক্রমাগত পত্র লিখে প্রস্তাব পাঠাত মোহিনীকে তার হাতে সমর্পণ করলে সে প্রচুর অর্থ দেবে। মোহিনী কোথায় গেল কে জানে! তার জন্যে তাঁর কোন অনুতাপ নাই। আশ্রমের সেই মাটির ঘরগুলির চেয়ে তার স্বত্তার বড় আকর্ষণও নাই শক্তিও নাই। মাটির ঘরের মত; মাটির ঘর তার ছায়ায় নিরাপত্তায় মেঝের শীতলতায় মনকে যতটুকু মাটি ঘর হয়েও সে তার মেঝের মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে মানুষকে টানে। তেমনি করেই সে টেনেছিল। কিন্তু তিনি মানুষ, মাথা উঁচু করে চলেন তিনি; মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে মানুষ চলে তার জীবন ধর্মে—তাই তিনি চলে এসেছেন। মধ্যে মধ্যে তার মুখটা মনে পড়ে; ওই আশ্রমের তৃণাচ্ছাদিত অঙ্গনের মত। মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখেন। ঘুম ভেঙে যায়; উঠে বসে জপে বা ধ্যানে বসেন। নিজেকে প্রশ্ন করেন—অন্যায় করেছেন তিনি? নিজেই উত্তর দেন—না।

আশ্রমটি ছোট। বিগ্রহের জন্য এখানে একটি ছোট পাকা মন্দির, আশে পাশে অল্প কয়েকখানি ঘর। এরই মধ্যে মন্দিরের দাওয়ায় বসে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পিছনে পাহাড়, সামনে শ্যামল শস্য ক্ষেত্র চলে গেছে গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত। গঙ্গার জলধারা এখন দুকুল-প্লাবিনী, রঙ গৈরিক, আদি অন্তহীন দীর্ঘ বঙ্কিম রেখায় চলে গেছে। প্রৌঢ় মাধবানন্দ বসে বসে ভাবেন। কি ভাবেন সব সময় নিজেও যেন বুঝতে পারেন না। হারিয়ে যান। শুধু যেন অভিমানের মত, বেদনার মত কিছু অনুভব করেন, যা অন্তর আচ্ছন্ন করেছে মেঘাচ্ছন্নতার মত। প্রৌঢ় হয়েছেন—সম্মুখে আসছে জীবনের শেষ, তবু যা চেয়েছিলেন তা পেলেন না। তবু তপস্যা তিনি ছাড়েন নি। প্রৌঢ় কেশবানন্দ দেহ রেখেছেন, বাদ-বাকীদের তিনজন—ওই গোপালানন্দ, পরমানন্দ এবং প্রেমানন্দ ছাড়া অন্য সকলেই চলে গেছে। কিছু পেলে না বলে চলে গেছে।

তার জন্য মাধবানন্দের দুঃখ নাই। ক্ষোভও নাই। ভালই হয়েছে। চৈতন্যের তপস্যা, আধ্যাত্মিক সাধনা একারই বটে। তপস্যাও দল বেঁধে হয় না, সিদ্ধি পেলেও তা' শিষ্যদের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। ওতে মানুষের জীবন-স্বত্ব। তাও কি মেলে? মধ্যে মধ্যে তাঁর প্রশ্ন জাগে। লোকে বলে তিনি অনেক পেয়েছেন, তিনি হাসেন। ও পাওয়া একটু একটু ক'রে অনেক—অনেক অনেক করে সবটা পাওয়া হয় না। আলো জ্বললে যেমন একমুহূর্তে জ্বলে, ও-ও তেমনি, মানুষ একমুহূর্তে একসঙ্গে সবটা পায়। বাদবাকী যেটুকু সেটুকু তেল শলতে দিয়ে প্রদীপ সাজানোর ব্যাপার। আলোর আয়োজন বটে কিন্তু আলো নয়; আর আলো না-জ্বলা পর্যন্ত যে অন্ধকার সেই অন্ধকার! তারা অধীর হয়ে চলে গেছে। বেশ হয়েছে। শুধু—।

শুধু যদি তারা বস্তু-জগতের আকর্ষণে, হোমের আগুনকে পাকশালার প্রয়োজনে ব্যবহার না-করত! ঠিক রাখতে পারলে না নিজেদের। বস্তুময় জগতের ঘাত-সংঘাতের ঝাপটায় ঘূর্ণীপাকে জড়িয়ে পড়ল। ওই

তখন এ মাধ্যাকর্ষণ ঘাড়ে ধরে। ধাক্কা দিয়ে ঠেলে নিজের বুকে টানে। দেশটা ভূমিকম্পে কাঁপা মাটির মত কাঁপছে আজ বিশ বৎসর। নবাব সরফরাজ খাঁকে উচ্ছেদ করে আলীবর্দী নবাব হল। এই সামনে কয়েক ক্রোশ দূরে। ঘিরিয়ায় যুদ্ধ হয়েছিল। সেই কম্পনের শুরু। তারপর বর্গী হাঙ্গামা। গোটা দেশটাকে উৎখাত করে দিয়ে গেল। তারপর পলাশীর যুদ্ধ। মীরজাফরকে পুতুলের মত সামনে খাড়া করে ফিরিঙ্গী ইংরেজ মালিক হয়েছে দেশের। তারপর মীর কাশেম। মীর কাশেমের সঙ্গে আবার লেগেছে লড়াই। কাটোয়ায় লড়াই শুরু হয়েছে। কি হল কে জানে? এর সংঘাতে রাজা ফকীর হল, ফকীর আমীর হল, কত সংসার ছারখার হল তার আর লেখা-জোখা নাই। ভূমিকম্পে মাটি ফেটে কারও উঠান থেকে বের হল গুপ্ত-ধন, কেউ সবংশে বাড়ী ভেঙে চাপা পড়ল। এর সংঘাতে সাধন-জীবনও টলে গেছে। সন্ন্যাসীরা দল বেঁধেছে, তারা সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করছে। লুঠ তরাজ করে মঠে জমা করছে। দেশে তারাই হবে সর্বসর্বা। গঙ্গার ওপারে মালদহ পূর্ণিয়া ওদিকে রঙপুর পর্যন্ত তারা নিজেদের গড়ে তুলছে। অধিকাংশ শিষ্যই ওই দলে গিয়ে মিশেছে। তাঁর নিজের পিতৃবংশ এই বিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। সিরাজুদ্দৌলার সাহায্যকারী বলে—মীরজাফর তাদের সব সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে। ভাই মারা গেছে মীরণের অনুচরের হাতে। আঘাত তাঁকেও লেগেছে। মর্মান্তিক আঘাত। সে তিনি সম্বরণ করেছেন। তাঁর সাধনায় তাঁকে স্থির থাকতে হবে। গভীর বেদনা বুকে নিয়ে তিনি তিনি বসে আছেন। জয়দেব মনে পড়ে।

'দুরালোকঃ স্তোকস্তবকঃ নবাশোক লতিকা কাসারোপপবনপবনোপি ব্যথয়তি।' কিছুতেই আনন্দ নাই; 'অশোকের সদ্য ফোটা রাঙা স্তবক-শোভা মন অনুরঞ্জিত করতে পারে না, শীকরস্নিগ্ধ বাতাসেও সন্তাপ দূর করতে পারে না।' ঠিক তেমনি অবস্থা।

কামনার বস্তু কামনার ধন না পেলেই মানুষের বিশ্বসংসার এমনি বিস্বাদ হয়ে যায়। আসল কামনার ধনই হোক বস্তুই হোক ওই পরমানন্দ, পূর্ণতার স্বাদ। বস্তুজগতের ধর্মে বস্তুজগতময় দেহের মোহে সম্পদকে মনে ক'রে সেই বস্তু; নর নারীকে, নারী নরকে মনে করে সেই কামনার ধন। পায় যখন তখন হাসে, হারায় যখন তখন কাঁদে। তিনি চান নি, চাইবেন না।—'যেনাহং-নামৃতস্যাম তেনাহং কিমকুর্যাম?'

মেঘ ডেকে উঠল। শ্রাবণ মাস। বৃষ্টি নামবে। গোপালানন্দ দ্রুতপদে আসছে। আশ্চর্য মানুষ। সহজ মানুষ। ভজন গায়, শ্যামলী ধবলীর সেবা করে, মধ্যে মধ্যে কাঁদে; তাতেই মনে করে সব পাবে। শ্যামলী ধবলীকে ঘরে আনবার জন্য ছুটে আসছে। কিন্তু গোপালানন্দ বরাবর এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে, হাঁপাচ্ছে সে।

—কি গোপালানন্দজী?

—লড়াইয়ের খবর পেলেম মহারাজ; কাশেম আলি খাঁ নবাবকে ফৌজ তো হারিয়ে গেল কাটোয়ার লড়াইমে। তকী খাঁ মারা গেল।

—হেরে গেল?

—হাঁ। মকুসুদাবাদ তো ফিরিঙ্গী দখল করিয়ে লিলে। লড়াই হিঁয়া আসিয়ে গেল মহারাজ!

—হিঁয়া? ও—

—নবাব কাশেম আলির ফৌজ গঙ্গাজী পার হইয়ে ইধর আসছে। সব কোই বলছে—হিঁয়া—ওহি সুতীকে নালাকে হুঁয়া—খুঁট লিবে।

নেওয়াই সম্ভব। সুতীর নালা থেকে চড়কা বালিঘাটা পর্যন্ত ঘিরিয়ায় আলিবর্দী পল্টন সাজিয়ে নবাব সরফরাজের সঙ্গে লড়াই করেছিল। যুদ্ধের জন্য স্থানটা বেশ চিহ্নিত। কামান বসাবার জায়গা গুলো পর্যন্ত চিহ্নিত করা আছে। ওটা ভাল ঘাটী।

গোপালানন্দ বললে—দেহাতের লোকেরা প্যাটরা পুটলী নিয়ে ভাগছে। নবাবের ফৌজ গঙ্গা পার হইয়ে গেলো সকালে।

পালাচ্ছে গ্রামবাসীরা? পালাবেই তো। যুদ্ধ মানেই যে হত্যা-অগ্নিকাণ্ড-লুণ্ঠন-নারীধর্ষণ। হায় রে চৈতন্যধর্ম-ভ্রষ্ট মানুষ! হে চৈতন্যময়, মহাপ্রকৃতির কাছে তুমি এত দুর্বল! কেন? কেন? এমন হয় কেন? মাধ্যাকর্ষণ? মাথা-নেড়ে মাথা উঁচুকরা মানুষকে টেনে ফেলে ধুলো কাদা মাখিয়ে এত পরিতৃপ্তি রাক্ষসীর?

গোপালানন্দ বললে—সব বলছে কি জোর লড়াই হোবে। বহুত লুঠ হোবে। ইধরসে কাশেম আলির ফিরিঙ্গী জাঁদরেল মর্কার সমরু তেলেঙ্গা পল্টন লিয়ে আসছে। উধারসে আসছে আংরেজকে গোরা সিপাহী। উসকে সাথ—নবাবী ফৌজ। কুছু তো বাকী রাখবে না মহারাজ!

না, তা রাখবে না। যুদ্ধ-ব্যবসায়ী দুঃসাহসী বিদেশী, ওরা কোন ধর্মের ধার ধারে না। ওদের কি দোষ? মারাঠারা? তারা তো হিন্দু। ব্রাহ্মণ দেবতা বৈষ্ণব, নারী, শিশু কিছু বেছেছিল তারা? নারীর স্তন কেটেছে। শিশু হত্যা করে খেলা করেছে।

—হামি বলি কি, ভগবান প্রভুকে মুরত নিয়ে মহারাজ কাঁদরামে চলেন। শ্যামলী ধবলীকে নিয়ে হামি চলে যাই পাহাড়কে উধর। মঠকে চিজ বিজ কুছু কুছু ছোড় দিয়া যায়। উলোক আসবে তো শোচবে কি সব ভাগিয়েসে।

মঠের অনতিদূরে পিছনে ছোট পাহাড়টিতে একটি কন্দর অর্থাৎ গুহা আছে। নদীর

হাঙ্গামার সময় আত্মরক্ষার জন্য এই গুহাটিকে কেটে খুঁড়ে প্রশস্ত করে তুলেছে গোপালানন্দেরা। বাসোপযোগী করবার জন্য পাথর খোয়া চুন দিয়ে নিজেরাই পাকা মেঝে বানিয়েছে; বিগ্রহের জন্য বেদী গেঁথেছে, ফাটল গর্তগুলি বুজিয়ে চমৎকার একখানি ছোট কুঠরীতে পরিণত করেছে। দুটি দুয়ার করেছে। ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়, পাথর সুকৌশলে ঠেলে দিয়ে। স্থানীয় লোকেরাও বিশেষ কেউ জানে না এ গুহার সংবাদ।

গোপালানন্দ বললে—ওহি দেখেন।

উত্তর থেকে গঙ্গার কিনারা ধরে পল্টন চলেছে দক্ষিণ মুখে। কাশেম আলির পল্টন। উধুয়ানালার কেল্লা থেকে চলেছে ঘিরিয়া। গঙ্গা ধরে চলেছে বড় বড় নৌকা। রসদ বারুদ বোধ হয়।

—ইধর মহারাজ—ইধরে দেখেন।

উত্তরে পল্টনের পিছনে ছায়াপল্লব ঘেরা ছোট একটি গ্রাম জ্বলছে। পল্টনের লোকে জ্বালিয়ে দিয়েছে গ্রামখানা। তাড়াতাড়ি মঠের ধ্বজাটা নামিয়ে ফেললে গোপালানন্দ।

দিনের অবশিষ্ট বেলাটা ধরে ফৌজ চলল। ওদিকে পশ্চিম মুখে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে সারিসারি লোক। পালাচ্ছে। সন্ধ্যা হতেই গোপালানন্দ বিগ্রহ কাঁধে করে নিয়ে চলল গুহায়।

পরদিন। সন্ধ্যার মুখে।

ধ্যানে বসলেন মাধবানন্দ।

সারাটা দিনে কতবার যে তিনি পাহাড়টার চূড়োয় উঠে গুল্মের অন্তরালে দাঁড়িয়েছেন তার হিসেব নাই। গত রাত্রিতে সারারাত্রি মানুষ পালিয়েছে। এখন আর মানুষ দেখা যায় না।

খবর পেয়েছিলেন যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে ঘিরিয়ায়। সারাদিন যুদ্ধ চলছে। ঘিরিয়া এখান থেকে কয়েক ক্রোশ। কামানের শব্দ এখান থেকে শোনা যায় না, বারুদের গন্ধও পাওয়া যায় না, শুধু আশপাশ গ্রামগুলির অস্বাভাবিক স্তব্ধতা থেকে একটা আতঙ্ক-কর অবস্থার আভাস এসে মনে লাগছে। গ্রামগুলি প্রায় জনহীন হয়ে গেছে। গঙ্গার বুকে নৌকা চলাচল নাই—শ্রাবণ দিনের দ্বিপ্রহরটা খাঁ খাঁ করছে। শুধু আকাশ-জুড়ে কাকেরা অশ্রান্তভাবে উড়ছে। ভয়ার্ত কলরব করে ছুটছে। সন্ধ্যার মুখে ফৌজ দেখা গেল; ঘোড়সওয়ার ফৌজ উত্তর মুখে ছুটছে। বিশৃঙ্খল চলা। মধ্যে মধ্যে পয়দল সিপাহী। এরা পালাচ্ছে। উত্তর মুখে। তা হলে এরা কাশেম আলীর ফৌজ। ঘিরিয়ায় কাশেম আলী হেরেছে। চলছে উধুয়ানালার কেল্লায় আশ্রয় নিতে। কোলাহল কলরব উঠছে: কিন্তু তার মধ্যে উল্লাস নাই। কাদায় একটা গাড়ী—বোধহয় কামান পড়েছে, বয়েলগুলোকে নির্মম-ভাবে ঠ্যাঙাচ্ছে।

দেখতে না পেরে মাধবানন্দ গুহায় ঢুকে পাথর ঠেলে দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিলেন। এটা পিছনের মুখ, সম্মুখে উত্তর-পশ্চিম দিগন্ত, এ দিকটার ভূমি প্রকৃতি রুক্ষ অসমতল নানা জাতীয় গুল্মে আচ্ছাদিত, খানিকটা পার্বত্যও বটে; বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়িয়ে পড়ে আছে। এ দিকটা নিরাপদ; ওদিক থেকে দেখাও যায় না, তার উপর বর্সাতিহীন পরিত্যক্তও বটে। তাই এই দিকেই বের হন ইচ্ছে হলে। ভিতরে বেদীর উপর বিগ্রহের সামনে একটি প্রদীপ জ্বলছে। বেদীটি এমন একটি চোরকুঠারীর মত স্থানে যে, কোন গুহামুখ থেকেই সরাসরি দেখা যায় না। গুহার মধ্যে গুহার মত; একটা দেওয়ালকে খুঁড়ে খুঁড়ে বের করা হয়েছে। মাধবানন্দ এসে গুহার মধ্যে খানিকটা পায়চারী করলেন। আরও খানিকটা পশ্চিমে পাহাড়তলীতে একটা নালার ধারে গোপালা-নন্দেরা গরুগুলিকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ওখানে বড় বড় কয়েকটা গাছ আছে। তারই তলায় আশ্রয়টি নিরালা বটে। সহজে চোখ কারুর পড়বে না। বিকেল বেলা দুধ দুইয়ে দিয়ে গিয়েছে ওদের একজন। গুহার মধ্যে চিঁড়া আছে গুড় আছে, জল আছে। দু একটা পাকা পেঁপেও আছে। আশ্রমের উঠানের পেঁপে গাছগুলির যা ফল ছিল সব নিঃশেষে পেড়ে এনেছে গোপালানন্দ। গোপালানন্দই আশ্রমের গৃহিণী। পাকা হিসেব ওর। দেওয়ালের গায়ে খান দুয়েক অস্ত্র ঝুলছে। আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র না হলে চলে না।

চারিদিক বারকয়েক ঘুরে আসনে এসে বসে আচমন করে ধ্যানে মগ্ন হতে চাইলেন তিনি। ধ্যান! মনের মধ্যে বিগ্রহ মূর্তি ফোটে আবার মিলিয়ে যায়; যতবার ফোটে ততবার মূর্তির যেন নূতন রূপ হয়। চিন্তা করেন, তত্ত্ব চিন্তা। তাঁর নিজের উপলব্ধি মত তত্ত্ব। মধ্যে মধ্যে আনন্দের গভীরতায় মগ্ন হন—মনের মধ্যে আনন্দময় আবেগ জাগে, কখনও চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে; আবার চিন্তা জেগে ওঠে: এটা ওটা সেটা। প্রশ্ন জাগে—কই? কোথায়? কখনও কখনও সব ছেড়ে উঠে পড়তে ইচ্ছা করে। জোর করে সংযত করেন নিজেকে। বেশী করে কাঁদেন। মনে হয় জীবন আর বইতে পারছেন না। বিগ্রহ মূর্তিকে সবলে আঁকড়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করে—হয় তুমি বুকের মধ্যে স্থান নাও পূর্ণ কর; নয় শেষ করে দাও পালা। কখনও কখনও মনে হয়—হল বুঝি, পেলেন বুঝি, জ্বললো বুঝি আলো। তখন পরমোৎসাহে ধ্যান করে যান। কয়েকদিন ধরেই চলে, গভীর তপস্যা। তারপর প্রথমে আসে ক্লান্তি, তারপর—প্রশ্ন।

আজও ধ্যানে নিবিষ্ট হতে পারছেন না। গুহার মধ্যে বসেও ফৌজের কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন। ফৌজ চলছে, এখনও চলছে। ওদের দাঁড়াবার অবসর নাই পালাচ্ছে। আহত অশক্তরা পড়ে থাকবে। রাত্রে চীৎকার করবে। গ্রামবাসীদের হাতে মরবে। গ্রাম-বাসীরা ওদের মেরে প্রতিশোধ নেবে।

হঠাৎ যেন কানে এল মানুষের কণ্ঠস্বর। সতর্ক সজাগ হয়ে উঠলেন মাধবানন্দ। হ্যাঁ মানুষই। পূর্বদিকের গুহামুখে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কথা বলছে।

বিগ্রহকে প্রণাম করে প্রদীপটি একটি কুলুঙ্গীর মত গর্তে সরিয়ে দিলেন। গুহাটি প্রায় অন্ধকারই হয়ে গেল। উঠে দেওয়াল থেকে একখানা অস্ত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন গুহামুখের কাছে। মানুষ কথা কইছে।

—তুই ভাবিস নে। কয়ো বোরেগীর জান—বড় শক্ত! কয়ো সহজে মরবে না! কর্কশ ভাঙগলায় হাসছে যেন। চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। কয়ো বোরেগী! কয়ো বোরেগী!

—আর কোথায় যাবে? ওই মঠটায় তো থাকলেই হ'ত।—তরুণ কণ্ঠ! নারীকণ্ঠ! মাধবানন্দের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সমস্ত দেহে উত্তেজনা বয়ে যাচ্ছে। কে? কে?

—হ্যাঁ, ওই গঙ্গার ধারের পথের সামনে মঠ। যখন আবার ইংরেজ ফৌজ যাবে—তখন? ওরা খুঁজে দেখবে না ভাবিস? দেখছিস না, মঠে কেউ নাই। মঠের লোকও ওই ভয়ে পালিয়েছে।

—তোমার যে বড্ড লেগেছে!

—বড্ড নয়। বেটা তরোয়ালের খোঁচা একটা দিয়েছে। রক্ত খানিকটা পড়েছে। তা এক খোঁচায় কয়ো মরে না।

—গায়ে জ্বর!

—হোক। চল, এখন এই পাহাড়টার ওপারে কোথাও রাত্রিটা কাটাব। তারপর সকালে যা হয় করব।

—গাড়ী থেকে কেন তুমি গড়িয়ে এমন ক'রে নামলে? যা হয় হ'ত। যেতাম যেখানে সবাই যেত। হ'ত সবারই কপালে যা আছে।

—না। ওরা বিনেশ হ'তে চলেছে। আমি বেশ বুঝছি। আমার মন বললে। কয়োর মন, মিছে বলে না। হাসছে কয়ো।

—চল, ওঠ! কি কাঁদছিস বে?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মাধবানন্দ আর থাকতে পারলেন না। চিন্তাশক্তি হারিয়ে গেছে তাঁর। সমস্ত দেহ যেন কাঁপছে। বিস্ময়ের অবধি নাই। কয়ো আর মোহিনী? কোথা থেকে এল তারা? কয়ো আহত! মোহিনী কাঁদছে। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে ঠেলে পাশে পাথরখানা সরিয়ে দিলেন।

চীৎকার উঠল নারীকণ্ঠের—কে?

মাধবানন্দ অস্ত্র হাতেই বেরিয়ে এসে ডাকলেন—কয়ো? ইলামবাজারের কয়ো বোরেগী?

পরিপূর্ণ চন্দ্রালোক তখন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ওই তো কয়ো। শীর্ণ কৃষ্ণকায়—কিন্তু কোথায় যেন তফাৎ। বৃদ্ধ হয়েছে? না। পরিচ্ছদের তফাৎ। কিন্তু কয়ো তাতে সন্দেহ নাই। কয়োর চেহারা সেই চেহারা যা যৌবন বার্ধক্যে একরকমই থাকে।

কয়ো অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে।

মাধবানন্দ দেখছেন—মোহিনী কই? না মোহিনী তো নয়! এ যে বালক। কিশোর একটি। কিন্তু অবিকল সেই মুখ—সেই চোখ। সেই সব। সে ছিল গ্রাম্য—এর মুখে নগরের মার্জনা। বেশ-ভূষায় সভ্য জীবনের ছাপ; মহার্ঘ নয়—কিন্তু দরিদ্রের উপযুক্তও নয়। মাথায় বাবরী চুল, কানে বীরবৌলীর কর্ণভূষা, অনেকটা শেঠেদের মত। হৃদস্পন্দন তাঁর শান্ত হয়ে এল! এ মোহিনীর ছেলে। কিন্তু—?

—শ্যামরূপার নবীন গোঁসাই! আপনি?

—হ্যাঁ। তবে আর নবীন নই কয়ো! বুড়ো হয়েছি। কিন্তু তুই এখানে কোথায়? এটি কে?

চমকে উঠল কয়ো। বিহ্বল হয়ে গেল যেন। বিহ্বলভাবেই বললে—আজ্ঞে?

—এটি মোহিনীর ছেলে?

—হ্যাঁ। মোহিনীর ছেলে। বিহ্বল হয়েই সে উত্তর দিলে।

—মোহিনী? সে কোথায়?

—সে মরেছে গোঁসাই। আজ তিন বছর।

মরেছে মোহিনী। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মাধবানন্দ। তারপর বললেন—

—কিন্তু এখানে—কেমন ক'রে এলে তোমরা?

তাকালেন তিনি ছেলেটির দিকে। অবিকল সেই মুখ। সেই দৃষ্টি।

—সে অনেক কথা গোঁসাই! আমরা ছিলাম ওই ফৌজের দলে। কাশিম আলি নবাবের ফৌজের দলে। কাটোয়া থেকে হারতে হারতে আসছি ওদের সঙ্গে। ওই ওরই বাবার সঙ্গে। ওর বাবা আজ মরেছে ঘিরিয়ায়। আমাদিগে ভরে দিয়েছিল একখানা গরুর গাড়ীতে। অন্ধকারে পিছন দিয়ে গলিয়ে নেমে পড়লাম ওর হাত ধরে। পালাচ্ছি। ওর বাবা নাই কে দেখবে, কে রাখবে? বললাম—চল—পালাই। তুই গান করবি, আমি ডুবকী বাজাব, ভিখ মেগে খাব। বোষ্টোম বোরেগীর ভয় কি? তা পায়ে একটা খোঁচা খেয়েছি। আর একবার নামবার চেষ্টা করেছিলাম, তো এক বেটা তেলেঙ্গা খুঁচিয়ে দিলে তরোয়াল দিয়ে। নইলে এতক্ষণ অনেক দূর চলে যেতাম। রাতের মত একটুকুন ঠাঁই দিতে পার গোঁসাই?

—এস ভেতরে এস।

ছেলেটি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিশোরী মোহিনী যেন কিশোরের ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—তিরিশ বছর আগে, সেই ঝুলন পূর্ণিমার আগের দিন। গোঁসাই, মোহিনীকে পিঠে ক'রে অজয় পার হয়ে তাকে বলেছিলাম—চল মোহিনী, পালিয়ে যাই, হয় বর্ধমান—নয় রাণীগঞ্জ। ভিক্ষে করে খাব। তুই গান গাইলে ভিক্ষের অভাব হবে না। আমি তোর রক্ষক হয়ে থাকব। সে বলেছিল—না। কয়ো আমি তোকে বিয়ে করতে পারব না। আমি নবীন গোঁসাইয়ের কাছে যাব। তার পা জড়িয়ে ধরব। আমার মা বলেছে। তা দাসী বলেছিল, আমি জানি।

—গোঁসাই, লাজের মাথা খেয়ে বলেছিল—কয়ো—সেই চরণেই আমার ঠাঁই রে, সে ঠাঁই বিনে আমি বাঁচব না।

—আমি জানতাম গোঁসাই, তুমি ঠাঁই দেবে না। তাই আমি যাই নাই। বলেছিলাম—তবে তুই যা মোহিনী, আমি যাব না। কিন্তু থাকতে আমি পারি নি।

পিছনে পিছনে গিয়েছিলাম। তুমি দরজা বন্ধ ক'রে ঢুকে গেলে, মোহিনী—গোঁসাই গো! ব'লে ডুকরে কেঁদে ঠিক যেন ভেঙে পড়ে গেল। আমি কাছে যেতে পারলাম না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম—শালগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে, মনে হল আমিও যেন মানুষ জন্ম থেকে খারিজ হয়ে গাছ হয়ে গিয়েছি। পা যেন পুঁতে গিয়েছে মাটিতে, মুখ যেন বন্ধ হয়ে বোবা হয়ে গিয়েছি। তারপরে মোহিনী উঠল। ফিরে চলল যে পথে এসেছিল। আমিও পিছু পিছু চললাম। মাঝে মাঝে মোহিনী দাঁড়িয়েছিল—আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছিল—তবে আমি কোথা যাব,—গোঁসাই বলে দাও!

ঝম ঝম ক'রে বৃষ্টি নামল। গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকল। দিক দিগন্তর হারিয়ে গেল। আমি তখন গিয়ে তার হাত ধ'রে বললাম—মোহিনী গাছতলায় একটুকুক্ষণ দাঁড়া। বৃষ্টি থামুক।

কয়োর পায়ের ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিচ্ছিলেন মাধবানন্দ, কয়ো বলছিল। ক্ষতটা অনেকটা গভীর হয়েছে। অনেকটা রক্ত পড়েছে। কয়োর নিচের দিকের পোশাকটা রক্তে ভিজে গিয়েছে। ওদিকে স্থির স্তব্ধ কিশোর ছেলেটি একটি মাটির মূর্তির মত বসে রয়েছে, শুনছে। তার সামনে একটি দুধের পাত্র। খানিকটা দুধ তাকে খেতে দিয়েছেন মাধবানন্দ।

মাধবানন্দ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, ক্ষতস্থানের মুখের জমাট রক্ত সরে গিয়ে আবার প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হ'তে আরম্ভ হয়েছে। তিনি বললেন—চুপ কর কয়ো। তুই বেশী কথা বলিসনে।

কয়ো হাসল। বললে—দুধ খেয়ে জোর পেয়েছি। কয়োর জান কড়া জান গোঁসাই। কতকাল পর তোমার সঙ্গে দেখা। কথা বলে নি। পরান ছিল তাই দেখা হল। দেখা হ'ল, এখন পরাণ গেলেই বা ক্ষতি কি গোঁসাই। মোহিনী সব হারিয়েছিল গোঁসাই—হারায়নি তার মনের বাসনা। জান—সে তার মেয়েটাকে বষ্টুম ধম্মের ভজন শেখাত, গান শেখাত আর বলত—

—মেয়ে? চকিত হয়ে তাকালেন মাধবানন্দ ছেলেটির দিকে।—এ তো—

কয়ো বললে—এ ছেলে। এর আগে মেয়ে হয়েছিল তার। সে বলত—রাধা, তোকে নিয়ে আমি যাব—সেই নবীন গোঁসাইয়ের কাছে যাব। আমার জনম বৃথা গেল, জাত গেল—কুল গেল—তবু শ্যাম মিলল না, তোর জনম—

বাধা দিয়ে মাধবানন্দ বললেন—জাত গেল? কুল গেল? কেন?

—তুমি ফিরিয়ে দিলে গোঁসাই আমি তার হাত ধরলাম। আমি কয়ো—আমার পাথায় কি মোহিনী ঢাকা পড়ে? ত্রিভুবন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সেই জলের মধ্যে তবু বেরুলাম। বনের ভেতর দিয়ে সেই রাত্রে হেঁটে বাদশাহী শড়কে গিয়ে উঠলাম। ভয়ের তো পরিসীমা ছিল না। সেই ক্রুর সরকার, গোঁসাই, ক্রুর সরকার পেছনে। তারই মধ্যে জ্বর এল মোহিনীর। শড়কের পাশে ঝোপের মধ্যে তাকে নিয়ে বসে রইলাম। ভোরবেলা উটের গাড়ী যাচ্ছিল খান দুয়েক। পরাণের ডাহাতে, হাত জোড় করে বললাম—কোথা যাবে বাবা সকল? এক হতভাগিনীর বড় জ্বর, পথ চলতে পারছে না, পড়ে থাকলে ম'রে যাবে, যদি দয়া করে তাকে তুলে নাও গাড়ীতে তবে রাধারাণী দয়া করবেন। আমি হেঁটেই যাব। তারা যাচ্ছিল বাঈ নাচের দল। বর্ধমান থেকে ঝুলনে জমিদার বাড়ী গাওনা করতে যাচ্ছে। ওদের সবাই ঘেন্না করে, অচ্ছুৎ। কিন্তু ওরা লোক ভাল গোঁসাই। মতিবসানো নথ নাকে একজনা মাঝবয়সী বাঈ—সে মুখ বাড়িয়ে বললে, রাখো গাড়ী। তারপরে তুলে নিলে গাড়ীতে। মোহিনীকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বললে—এমন সুন্দর মেয়ে?

—তারপরে গোঁসাই মোহিনীর জ্বর এক মাস। কাঁটাখানা হয়ে গেল সে। তা ওই বাঈই তাকে নিজের বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছিল, বদ্যি দেখিয়েছিল, সেবাও করেছিল। মোহিনী জ্বরের ঘোরে ডাকত. [illegible]—এই যে আমি। সে আলাদা হয় না গোঁসাই। মোহিনীর নতুন জাত হ'ল। মোহিনীকে সে নাচ শেখালে, গান শেখালে। সে মোহিনী গোঁসাই—সত্যি মোহিনী। তখন একদিন গোঁসাই—

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—তখন মোহিনীর তো ভিন জাত। মোহিনীও আর এক মোহিনী। তার মুখ ফুটেছে, বাস ছুটেছে। একদিন আমাকে ডেকে বললে—কাল্লো, এ পথে পা দেবার আগে, তোর গলায় মালা দেব, তুই না বলিস না!

—না আমি বলি নাই। তারপর গোঁসাই বর্দ্ধমান থেকে মুরশিদাবাদ। সেইখানে এল এক নবাব সরকারের আমীন; নৌকোয় নৌকোয় খাজনা আদায় করে,—বেশ ধনী লোক। জাতে মুসলমান, কিন্তু ধম্মে বোষ্টোম। গোপন সাধন ভজন। তেলক ফোঁটা কাটে না কিন্তু ভেতরে ভেতরে বোষ্টম। আল্লাকে ডেকে নমাজ পড়ে। আবার হরিনাম ক'রে কাঁদে। নিরামিষ খায়; ঘুষ নেয় না; মধুর কথা ছাড়া কথা কয় না। মানুষটি বড় ভাল। একদিন এল, বললে—খেয়াল নয়, ঠুংরী নয়, গজল নয়, শুনেছি বাঈ কেত্তন গায় ভাল—কেত্তন শুনতে এসেছি। কেত্তন শুনে কাঁদলে। অনেক ইনাম দিয়ে চলে গেল। তারপর গোঁসাই. সেই নিয়ে গেল মোহিনীকে আপনার বাগিচা-বাড়িতে। বললে—তোমার জাত তোমার, আমার জাত আমার। তোমাকে নিয়ে আমার পরকীয়া সাধন। তুমি আমার রাধা।

কয়োর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছিল। রক্তক্ষয়ের দুর্বলতা তার নিজের অজ্ঞাতসারেই তাকে আক্রমণ করছে ধীরে ধীরে। মাধবানন্দও তন্ময় হয়ে শুনছেন; তিনিও বুঝতে পারছেন না। ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। স্বল্পালোকিত সেই গুহার স্তব্ধতার মধ্যে কোন কোণে ডাকছে কয়েকটা ঝিল্লী, একটা থামছে, অন্যটা ডাকছে; কখনও কখনও দুটো একসঙ্গে। তার মধ্যে শ্রান্ত স্বরে কথা বলে চলেছে বৃদ্ধ কয়ো। স্থির দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে শুনে চলেছেন সন্ন্যাসী। বিচিত্র অনুভূতি কিন্তু সে সবই যেন দিগন্তের মেঘের মত স্তব্ধ হয়ে আছে।

কয়ো বললে—মেয়ে যখন হল—তখন হাফিজ সাহেবের লজ্জার সীমা ছিল না। বলেছিল—পাপ আমার। তোমার নয় রাধা। এ পাপ এড়ানো যায় না। তাও তাঁরই লীলা। নইলে যে উদ্ধার হয়ে যায় সংসার। তা? একে খাঁটী রাধা ক'রে তৈরী কর। দেবতার পায়ে দিয়ে আসব।

—মেয়ে?

—মরে গিয়েছে। মরে গিয়েছে। মোহিনীর সঙ্গে মরে গিয়েছে। মরবার আগে তোমাকে দেখবার—

রইলেন তিনি। তারপর হঠাৎ বললেন—আশ্চর্য!

—কি গোঁসাই?

—তোরা এখানে এলি।

মোহিনীকে নিয়ে গিয়ে হাফিজ সাহেবের খুব উন্নতি হয়েছিল। যুদ্ধের আগে কাটোয়ায় ছিল হাফেজ সাহেব। কাটোয়ায় নবাবের হার হ'ল, ফৌজের সঙ্গে মুরশিদাবাদ এল—সঙ্গে আমরা ছিলাম। সেও ছাড়ত না, আমরাই বা যাব কোথা? সেখান থেকে ঘিরিয়া। ঘিরিয়ার পথে গঙ্গা পার হবার সময় ঝগড়া হল—একজন ফৌজী আমীরের সঙ্গে—ওই।

থেমে গেল কয়ো। কিছুক্ষণ পর বললে—আমাদের জন্যেই ঝগড়া। আমাদিগে জোর করে—। আবার থামল সে।

মাধবানন্দ স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, আপনার মধ্যে তিনি মগ্ন হয়ে গেছেন, সমস্ত পারিপার্শ্বিক নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি একা। না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও নাই—তাঁর জীবন আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিলুপ্ত করে দিয়ে নিজেকে প্রসারিত করে ধরেছে। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে অগ্নিবিন্দুর মত এখানে সেখানে জ্বলে উঠছে মোহিনী। তাঁর দেখা মোহিনী, না-দেখা মোহিনী, চেনা মোহিনী, অচেনা মোহিনী।

কয়ো বললে—সেই খুন করলে হাফিজ সাহেবকে। তখন লড়াই শুরু হয়েছে। তখন থেকে পালাবার চেষ্টা করছি। যুদ্ধে যদি হার না হত তাহলে পালাতে পারতাম না গোঁসাই। গোঁসাই!

মাধবানন্দ স্তব্ধ। উত্তর দিলেন না।

—একটু জল দেবে গোঁসাই? গোঁসাই!

মাথা তুললে সে, আধ আলো অন্ধকারের মধ্যে সেই নিস্তব্ধ স্থির-দৃষ্টি মূর্তি দেখে দেখে সে ভয় পেলে। গোঁসাইকে অনুমান করা যায় না। কাছে যাওয়া যায় না। তবু সে ডাকলে—গোঁসাই! সে স্বর কণ্ঠের মধ্যেই মিলিয়ে গেল তার। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে আর পারলে না—আকণ্ঠ তৃষ্ণা, মাথা বুক যেন কেমন করছে। দুর্নিবার তৃষ্ণায় খানিকটা বুক ছেঁচড়ে এগিয়ে টেনে নিলে দুধের পাত্রটা। নাই কিছু নাই।

হাতে ভর দিয়ে সে উঠল, কোথায় জল? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন টলছে, ঘুরছে! এ কি হল? আঃ—বলে একটা ক্ষীণ চীৎকার করে সে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

এবার চমকে উঠলেন মাধবানন্দ।—কয়ো!—

তিনি উঠে এসে তার গায়ে হাত দিলেন, বুকের উপর। তারপর হাত ধরে নাড়ী দেখলেন। নাই। মরে গেছে। প্রদীপটা নিয়ে এসে ধরলেন কয়োর উপর। স্থির সেখানটা লাল হয়ে গেছে, রক্তে ভেসে গেছে। প্রদীপটা পাশে রেখে তিনি আবার বসলেন। আবার মগ্ন হয়ে গেলেন। বুঝতে পারছেন না তিনি। কি হয়েছে তাঁর, কি হচ্ছে, অনুভব করতে পারছেন না। কোথায় কোন অলক্ষ্য স্থান হতে কিসের যেন একটা অনুভূতি বর্ষার মেঘের মত দেহ-মনের দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। বর্ষণ নাই—গুমোটে ভরে গেছে তাঁর জীবন-জগত। অচেতন হয়ে যাবেন তিনি?

হাত বাড়িয়ে প্রদীপটা তুলে নিলেন। উঠলেন। বিগ্রহের সামনে ধ্যানে বসবেন। চৈতন্য হারিয়ে যাচ্ছে—চৈতন্যময়ের ধ্যানে বসবেন। প্রদীপের শিখাটি বাড়িয়ে দিলেন।

পা বাড়িয়ে চমকে উঠলেন তিনি। সমস্ত দেহমনের উপর প্রসারিত স্থিরস্তব্ধ মেঘাচ্ছন্নতা বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হয়ে উঠল। উন্মত্ত চীৎকারে তিনি যেন নিজেই ফেটে গেলেন। দেহে মনে ঝড়ে-ঝাপটায়-বর্ষণে প্রলয় ভেঙে পড়ল।

আ—! একটা রব শুধু, চীৎকার শুধু!

মোহিনী! মোহিনী! ওই তো! ওই তো! বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

সামনে বিছানার উপর ঘুমন্ত একটি যুবতী, তার গায়ের পিরহানের আবরণ খসে পড়েছে, জামাটা গুটিয়ে গেছে; অতি-শুভ্র নবনীত তনু-লাবণ্য প্রদীপের আলোয় বর্ণে কোমলতায় ঝলমল করছে, স্পন্দিত হচ্ছে। পিরহানের নিচে বুকে বাঁধা ছিল একখানা ওড়নার ফালি, সেটা খসে গেছে; সেখানে মোহিনীর জীবন-বাসনা বিশ্বসংসারের সমস্ত মোহ বিস্তার করে দুটি পদ্ম কোরকের মত ফুটে রয়েছে।

মোহিনী। এ তো সেই মোহিনী! তাঁর জীবনের অসীম শূন্যতার মধ্যে যে মোহিনী অগ্নিবিন্দুর মত ফুটছিল, এতক্ষণ সে কি অগ্নিশিখা হয়ে নেমে জ্বলে উঠল!

থর থর করে কাঁপতে লাগলেন মাধবানন্দ। চোখে বিস্ফারিত একাগ্র দৃষ্টি, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে; বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড মাথা কুটছে। দেহের অভ্যন্তরে কোষে কোষে যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ চলছে। এক উন্মত্ত বাসনা বন্যার প্লাবনে বয়ে চলেছে অবিরাম অফুরন্ত স্রোতে। তিনি তার মধ্যে জলচর হিংস্র জীবের মত সেই স্রোতকেও আলোড়িত করে ভেসে চলেছেন। কি উন্মাদনা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোড়িত হচ্ছে এই মহাপ্লাবনে। সৃষ্টির জ্যোতি-বিন্দুগুলি ডুবে যাচ্ছে তার মধ্যে।

তিনি প্রদীপটা রেখে দিলেন তার শিয়রে। পরিপূর্ণ আলোটা যেন তার মুখে পড়ে। তারপর শ্বাপদের পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে দাঁড়ালেন।

এই তো মোহিনী! সেই মোহিনী!

দুই বাহুতে তার দুই হাত দৃঢ় মুঠিতে ধরলেন।

মেয়েটি জেগে উঠল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সে অস্ফুট চীৎকার করে উঠল।

—তুমি মোহিনী?

—না। আমি রাধা।

ছেড়ে দিলেন তাকে সন্ন্যাসী। রাধা! রাধা! স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্বল্প-ক্ষণ। তারপর আবার উন্মত্তের মত অধীর হয়ে উঠলেন। দেহে-মনে চীৎকার উঠছে। মিনতি নয়, আর্তনাদ নয়, বজ্র-গর্জনের মত চীৎকার। বিরূপাক্ষের চীৎকারের মত।

ধূমায়মান আগুন জ্বলে ওঠার মুহূর্তে যে গ্রাসে যে বিক্রমে জেগে ওঠে সেই বিক্রম তার, সেই গ্রাস তার। মাধবানন্দ আবার চীৎকার করে উঠলেন। আঃ—!

গুহার ভিতরে তার প্রতিধ্বনি জাগল, গর্জনে ভরে গেল গুহাটা, প্রদীপের শিখাটি পর্যন্ত প্রবল শব্দ-তরঙ্গে কেঁপে উঠল। আর্তনাদ করতে চাইলে রাধা, কিন্তু স্বর ফুটল না তার কণ্ঠে; ভয়ে সে থর থর ক'রে কাঁপছে। অনেক কষ্টে সে বললে—গোঁসাই, এমন করো না গোঁসাই। এতক্ষণে তার মনে পড়ল কয়োকে—সে ডাকলে—কয়ো! ওরে কয়ো!

গোঁসাই আবার এসে তার সামনে দাঁড়ালেন। জলকল্লোলের প্রচণ্ড অফুরন্ত প্রবাহে জীবনের সব বাঁধ তাঁর ভেঙে যাচ্ছে। না, এ যেন একটা বহ্নিস্রোত! সারা দেহটা প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। কি দুরন্ত ক্ষুধা তার!

আবার দুই হাত ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ জ্বলছে। হাত

ছেড়ে দিয়ে মুখখানি ধরলেন দুই হাতের মধ্যে। তার উষ্ণ নিশ্বাস লাগছে তাঁর মুখে। নিশ্বাস টেনে সে উষ্ণতা গ্রহণ করছে তাঁর ক্ষুধা। বহিঃক্ষুধা!—তুমি রাধা!

—হ্যাঁ।

উন্মত্তের মত মাধবানন্দ বললেন—তবে এস। এস। এক হাতে প্রদীপ নিয়ে অন্য হাতে তাকে ধরে টেনে বিগ্রহের সামনে এনে বললেন—দাঁড়াও, বেদীর উপর উঠে দাঁড়াও, ঠাকুরের পাশে দাঁড়াও।

সভয়ে মেয়েটি চীৎকার করে উঠল—না।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

—না—না—না। আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব। তার চেয়ে আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব গোঁসাই!

মাধবানন্দের হাত থেকে প্রদীপটা পড়ে ভেঙে গেল। নিভে গেল। নিরন্ধ্র অন্ধকারে গুহাটা ভরে গেল।

পরদিন সকালে গোপালানন্দ দুধ নিয়ে এসে দেখলে গুহার মুখ খোলা। গুহার মধ্যে কয়োর মৃতদেহ পড়ে আছে। গুহার মেঝেতে রক্তের দাগ। মাধবানন্দ নাই। বিস্ময় এবং উৎকণ্ঠার আর সীমা রইল না তার। বাইরে বেরিয়ে এসে সে ডাকলে—মহারাজ!

তার চীৎকার প্রান্তরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে মিলিয়ে গেল। একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুধু ফিরে এল গঙ্গার দিক থেকে। তবে কি মঠে গিয়েছেন? গুহায় মৃতদেহই বা এল কেমন করে? সহস্র প্রশ্ন। সহস্র প্রশ্ন তাকে বিচলিত করে তুললে। হঠাৎ মনে হল মঠে যাননি তো? সঙ্গে সঙ্গে মঠের দিকেই ছুটল সে। না। মঠেও নাই। মঠ শূন্য। ও দিকে বহু দূরে যেন ফৌজী বাজনা শোনা যাচ্ছে। ইংরেজের ফৌজ যাবে উধুয়ানালার দিকে। মহারাজ! গুরুজী! আবার চীৎকার করে ডাকলে সে। তারপর ছুটে গেল মঠের মন্দিরের দিকে। চূড়ার সঙ্গে বাঁধা শিকলটা ধরে উঠতে লাগল। মঠের চূড়ায় উঠে দেখবে সে। মঠের চূড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে আবার উচ্চ চীৎকারে ডাকলে। —গুরুজী! গুরু মহারা—জ। এদিক দেখলে—ওদিক দেখলে—পশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্বদিকে চোখ ফেরালে। এবার তার চোখে পড়ল, দূরে গঙ্গার কিনারার কাছাকাছি মাঠের মধ্যে একটা কি পড়ে রয়েছে। মানুষের মত। হ্যাঁ মানুষই। হয়তো কালকের ফৌজের পরিত্যক্ত কোন হতভাগ্য। তবু সে দেখবে। শিকল ধরে আবার ঝুলে পড়ল সে। নেমে এল। ছুটল।

মাধবানন্দই বটে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। গঙ্গা থেকে জল এনে মাথায়, মুখে জল দিয়ে তাঁর চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করলে। কিছুক্ষণ পর মাধবানন্দ উঠে বসলেন। রক্তবর্ণ চোখ। চোখের কোলে কালী পড়েছে। মাধবানন্দ যেন রোগশয্যা থেকে উঠেছেন। বিহ্বলের মত চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

—গুরুজী! গুরু মহারাজ!

—গোপালানন্দ?

—কি হইল মহারাজ? গুহামে আদমী মরে পড়িয়ে আছে—

—কাল রাত্রে গোপালানন্দ—

—মহারাজ!

—ওই আদমী রাধা নিয়ে এসেছিল—

—রাধা?

—হ্যাঁ গোপালানন্দ, রাধা। সাক্ষাৎ রাধা। গোপালানন্দ, সে রাধাকে আমি গঙ্গার জলে ফেলে দিলাম। তখন ঠাকুর আমাকে বললেন করলি কি? রাধা, রাধা, রাধাকে এনে আমার পাশে স্থাপন কর। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দ্রুতপদে চললেন গঙ্গার দিকে। রাধা, রাধাকে স্থাপন করতে হবে। রাধা। এইখানে, এইখানে—ফেলে দিয়েছি।

খাড়া পাড়ের নিচে গঙ্গার গৈরিক জল কুটিলাবর্তে আবর্তিত হচ্ছিল। একেবারে কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন মাধবানন্দ।—ওইখানে। ওইখানে!

গোপালানন্দ শঙ্কিত হয়ে চীৎকার করে উঠল—মহারাজ!

মাধবানন্দ চীৎকার করে ডাকলেন—রাধা! উন্মাদের প্রাণ ফাটানো সে ডাক। সেই প্রাণ ফাটানো ডাকের প্রতিধ্বনি ভরা গঙ্গার পরপারে শতধ্বনি হয়ে বেজে উঠল—এখানে ওখানে সেখানে—রাধা! রাধা! রাধা! রাধা! ওপার থেকে এপারে। প্রতিধ্বনির প্রতি-ধ্বনি! রাধা রাধা রাধা!

চীৎকার করে মাধবানন্দ সেই মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন।

একটা প্রচণ্ড শব্দ হল, আলোড়িত হল গঙ্গা বক্ষের ওই স্থানটি. জলধারা খানিকটা উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল শূন্যলোকে, তারপর আবার সব যথাযথ; পূর্ব প্রবাহ ফিরে এল গঙ্গার বুকে। কল কল কল কল অবিরাম একটানা শব্দ। অদৃশ্যলোকেও ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে গেল। একটি ভ্রষ্টতপ চৈতন্যের কালিমা অগ্নিশিখা জ্যোতির্লোকের উদ্দেশ্যে হাউইয়ের মত আকাশে উঠে নিভে পড়ে গেল পৃথিবীর বুকে এসে।
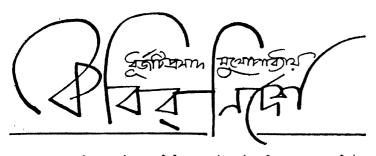
রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর জন্মতিথি উৎসবের বিপক্ষে ছিলেন; কিন্তু আমরা প্রতি বৎসরই উৎসব করছি। স্মৃতি-সভাতেও তাঁর মত ছিল না; তবুও আমরা সভা ডাকি, তাতে যোগদান করি এবং বক্তৃতা ও রবীন্দ্রসংগীত শুনি। আদেশভঙ্গের পাপ আমাদের হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমরা সে-পাপ মোচন করি নানা উপায়ে, প্রধানত ভাবের সাহায্যে। বাঙালীর দুর্দশা দেখে যখন মন বিষণ্ন, পশ্চিমী সভ্যতার দোর্দণ্ড প্রতাপে যখন ভীত, তখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্ম-সম্মান প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়। সেই বলে আমরা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করি, তাঁর কবিতা, গল্প ও সংগীতের মাধুর্যে বিগলিত হই, উচ্চকণ্ঠে এবং কখনও কখনও অশুদ্ধ বাঙলায়, তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করি। এই প্রকার উচ্ছ্বাস আমি বহুবার পড়েছি ও শুনেছি এবং কতদিন পড়ব আর শুনব, তাও জানি না। তাই আজ আমার মনে হচ্ছে তাঁর আদেশ-ইঙ্গিত মেনে চলাটাই বোধ হয় ভাল ছিল।

অবশ্য অনেকেই বাঙালীকে ভাবপ্রবণ জাতি বলেছেন। সংস্কৃতির দিক থেকে একথাটি সম্পূর্ণ ভুল; এবং জাতির চরিত্র বলে কোনও গুহ্য বস্তু নেই। এও শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথের রচনা যেকালে মূলত ভাব-প্রধান, তখন সমালোচনাও সমগোত্রের হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ-ধারণাটিও ভ্রান্ত। অবশ্য তিনি বুদ্ধি-সর্বস্ব ছিলেন না। মানুষের অযৌক্তিক অংশ ও ব্যবহারকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন অত্যন্ত। তাই বলে যে-ব্যক্তি আজীবন স্বেচ্ছায় শ্রেষ্ঠ মূল্যের চর্চা ও সমগ্র সৃজনী শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে এলেন, তাঁকে ভাবপ্রধান বলা মোটেই চলে না। বাঙলা ভাষার ক্রিয়ালঘিষ্ঠ অপূর্ণতাকে পূর্ণ করবার প্রয়াসে, হলন্ত শব্দও ব্যঞ্জনবর্ণপ্রধান যুক্তাক্ষরকে শাসিত ও নিয়মাধীন করবার ও সেই সঙ্গে ভাষাকে মুক্তি দেবার সাধনায়, তাঁকে কিছু কম সংযম করতে হয়নি। সম্ভবত তাতে শাসনের রুক্ষতা কিংবা প্রবীণ প্রথার নিয়মানুবর্তিতা ছিল না, তবু কি তাকে বাধাহীন, অনিয়ন্ত্রিত ভাবসর্বস্বতা বলা যায়? আমার মতে যায় না।

যাঁরা তাঁর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁরা প্রত্যেকেই আমার মতে সায় দেবেন। আর কিছু হোক্ না হোক্, ষাট-সত্তর বৎসর ধরে যিনি ভোর চারটায় শয্যা ত্যাগের পর উপনিষদের মন্ত্র জপ করে এলেন, তাঁর ধর্ম সত্যকারের ধর্ম, ধৃতি, জীবনের প্রতি অঙ্গকে ধারণ করে। এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উচ্ছ্বাসবিহীনই হওয়া উচিত নয় কি? অর্থাৎ, বুদ্ধি-বিচারই রবীন্দ্র রচনার উপযোগী পদ্ধতি, কারণ রবীন্দ্র-রচনায় ভাবজাত বিপ্লবী পরীক্ষার বহু নিদর্শন থাকলেও তার মর্মকথা ঐতিহ্যের সংযত অগ্রসৃতি, যে সম্পর্কে উচ্ছ্বাস, হা-হুতাশ, অতিরঞ্জন, একান্ত অচল, অবান্তর। তাহলে দাঁড়ায় এই, রবীন্দ্রনাথ আমাদের অভিমান নয়, তিনি কেবলমাত্র সম্মানের পাত্র নন, বর্তমান বাঙালী, ভারতবাসী, এশিয়াবাসী, এমন কি মানবের পরিমাণ, মানদণ্ড।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। বাঙালীর আজ কি অবস্থা বুঝুন। আমি থাকি বাঙলার বাইরে, তাই আমাদের অবস্থাটি একটু স্পষ্ট হয়েই দেখা দিচ্ছে আমার চোখে। বাঙালীর গর্ব ছিল সাহিত্য, সংগীত, চারুকলা এবং কল্পনার আশীর্বাদ যে-জন্য তার ন্যায়, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান ধন্য হয়েছিল। দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে একটি সত্য কথা বলার। আজ বাঙলার তার নিজের ক্ষেত্রেই কোনও

শিল্পী মুকুল দে কর্তৃক অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি

স্থান নেই, না আছে সাহিত্য, না আছে সঙ্গীত। বোধ হয় চিত্রকলায় এখনও আছে, তাও ক'জন বাঙালী ছবি কেনেন বা বোঝেন? অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাই। আজ যদি একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে পশ্চিম বাঙলা ধ্বংস পায়, তবে এ-দেশে ঐ রিলিফ-কেন্দ্র খোলা ছাড়া আর কিছু হবে না—সংস্কৃতির ক্ষতি হল বলে কেউ সত্যিকারের এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না। হয়ত মন্তব্যটি রূঢ় শোনাচ্ছে, কিন্তু নাচার। এর কারণ কি? অনেকে বলেন, কারণ পলিটিক্স, পলিটিক্যাল হিংসা। জানি না কতটা সত্য। অন্য প্রদেশ জেগেছে অতএব বাঙলার একাধিপত্য ত' যাবেই। হিংসা অবশ্য কিছু আছে; কিন্তু কিছু থাকলেই ত' লোকের চোখ টাটায়। কিন্তু হিংসার কিছুই যে নেই আজ, কিংবা যা আছে তা যৎসামান্য, যেটা দু'দিন পরে লোপ পাবে। অবস্থাটি অত্যন্ত শোচনীয় নিশ্চয়। সেজন্য কি অভিমান ভরে বসে থাকব, না হা-হুতাশ করব, না অন্য প্রাদেশিক সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করব? আমার মতে সদুপায় রবীন্দ্রনাথের রচনাতে আছে। অর্থাৎ, বাঙালীকে বাঁচতে হলে রবীন্দ্রনাথের পথে চলাই ভালো। বলা বাহুল্য, এই প্রকার যুক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষেরও ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট করা যায়, বিশ্বজনেরও। সর্বত্রই আজ দুর্দশা। বিশ্বের কথা আজ তুলব না, দেশের কথাই বলব।

রবীন্দ্র-নির্দিষ্ট দু' একটি পথের উল্লেখ করব আজ। প্রথমেই মনে ওঠে স্বাবলম্বন। কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, ভাষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, স্বাস্থ্য, সাজসজ্জা, গ্রহের উপকরণ, জাতীয় জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তিনি আপন-আপন চেষ্টাকেই নবজাগরণের মূলমন্ত্র বলেছেন। রাজনীতিতে তখন ভিক্ষাবৃত্তি চলছিল, তিনি সে-বৃত্তিকে ত্যাগ করতে বল্লেন এবং এই কারণেই, তাঁর সঙ্গে বালগঙ্গাধর তিলক এবং শ্রীঅরবিন্দ-প্রমুখ উগ্রপন্থীদের হৃদয়ের মিল হয়। তখনকার সরকার রবীন্দ্রনাথকে 'এক্সট্রিমিস্ট' ভাবতেন এবং তাঁর পিছনে গুপ্তচর রাখতেন। কিন্তু এই আত্মসন্ধান, আত্মসাধনা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নামান্তর ছিল না। সমবেত সামাজিক প্রয়াসই তাঁর উপায় ছিল। সমাজ অর্থে তিনি হিন্দু-মুসলমান বুঝতেন না, প্রথমত গ্রামের সমাজই তাঁর মতে স্ব-অধীনতার কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত ছিল। কিন্তু গ্রাম তখন দারিদ্র্যে ও রোগে মুমূর্ষু। তাঁর বিধান হল, সমবায় এবং কুটীরশিল্প। তাঁর কল্পিত সমবায় কেবল ক্রেডিট সোসাইটি নয়, একত্রে কনজ্যুমার্স ও প্রোডিউসার্স সোসাইটি। অধিকন্তু গ্রাম্য-সমবায়ের হাতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এমন কি আমোদ-প্রমোদেরও ভার থাকবে। আজকাল এই সর্বাঙ্গ-সমবায়কে 'Multi-purpose Society' বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে হয়ত বলতেন, "একে আমি চিনি। কিন্তু purpose-ই বা কেন, multi-ই বা কেন? Purpose তো জীবনেরই অভিব্যক্তি এবং জীবন তো সমগ্র, বহুর সমষ্টি নয়। অতএব এগিয়ে চল, কেবল ব্যাপারটা যান্ত্রিক করে তুলো না।" রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ উন্নতিকেই জাতীয় উন্নতির চরম অভিব্যক্তি ভাবতেন না। অবশ্য গ্রাম ছিল ভিত্তি, মূল, শিকড়। কিন্তু গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে তাঁর কোনও প্রকার অন্ধ মোহ ছিল না। গ্রামের কূপমণ্ডুকতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, নচেৎ ব্রহ্মচর্য আশ্রমকে বিশ্বভারতীতে পরিণত করতেন না।

আজ আমাদের জীবনে একটি ভীষণ শূন্যতা এসেছে। সেটা আমরা ভরে দিচ্ছি অনিশ্চিত ব্যর্থতা-বোধে। কোনো দেশে স্বাধীনতা পাওয়ার পর অত অল্পদিনের মধ্যে অমনতর ঘটনা ঘটেনি। শূন্যতা এসেছে নানা কারণে। প্রধান কারণ আমার মতে এই : আমাদের নিজেদের ভিত্তি নিতান্ত কাঁচা, শিথিল। জাতির ভিত্তি সর্বদাই জনসাধারণের সমবেত প্রয়াস। অন্য দেশে যাই হোক, ভারতবর্ষের জনগণ গ্রামবাসী, অর্থাৎ ভারতবাসীর জীবনধারা গ্রাম্য উপকরণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, ভাবধারাও তাই। ইংরেজ-আমলে এই উপকরণগুলি নষ্ট হয়েছে। তাই প্রতি মানুষটি যূথভ্রষ্ট, একলা, নিরালম্ব। তার অবলম্বন চাই। এতদিন ছিল এক নৈর্ব্যক্তিক শাসনপদ্ধতি। এখনও শাসন-পদ্ধতি চলছে, তবে সেটা স্বজাতি-চালিত বলে নৈর্ব্যক্তিক থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই সেটি হয় জওহরলাল, না হয় অন্য কোনো ব্যক্তির কার্যকলাপ হতে বাধা। অথচ পদ্ধতি না হলে চলে না। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কর্তব্যের তালিকা বেড়েছে, বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রপদ্ধতির সঙ্গে তাকে তাল ফেলে চলতে হচ্ছে। আমাদের শাসনপদ্ধতি হয়ে উঠল রাষ্ট্র। অথচ রাষ্ট্র চালাচ্ছেন আমাদেরই স্বজাতীয় ব্যক্তি-গোষ্ঠী। একধারে গ্রামের অসহায় বুভুক্ষু প্রতিটি মানুষ, অন্যধারে রাষ্ট্র ও তার পরিচালক। তাই এই প্রকাণ্ড শূন্যতা। মধ্যে কিছু নেই। তাই প্রতি নিরালম্ব ব্যক্তি অবলম্বনের ব্যক্তিসম্পর্ক-হীনতা লক্ষ্য করে হতাশ হয় এবং পরিচালকবৃন্দকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে। এই শূন্যতা আসত না, যদি গ্রাম্য-সমবায় আত্মনির্ভরশীল হত, যা রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই কামনা করেছিলেন। অতএব যদি রাষ্ট্রের প্রতি অশ্রদ্ধা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় আত্মবিলাস না হয়, যদি আমরা সত্যই দেশের কল্যাণ চাই, তবে রবীন্দ্রনাথের এই মূল কথাটি শোনবার এবং শুনে কাজ করবার সময় এসেছে। এখনও দেশ মরে যায়নি; তাকে বাঁচান যায়, সমবেত প্রয়াসের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ কেবল উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে তাঁর জমিদারীতে তিনি অসংখ্য সমবায় সমিতি, স্বাস্থ্য সমিতি, কুটীরশিল্প, সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন গ্রামবাসীদের নিজেদেরই উদ্যোগে।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নির্দেশ আরো মৌলিক, আরো ব্যাপক, আরো জাতীয় জীবনের ধারণক্ষম। অ-বাঙালীরা প্রধানত তাঁকে দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তার মহাকবিই ভেবে থাকেন। আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ তাঁর স্বদেশী গান, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাকে উচ্চ স্থান দিয়ে থাকি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই ধারণাটি অসম্পূর্ণ। আরেকটি কথা, যাঁরা তাঁর স্বদেশপ্রেমকে তাঁর প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ মনে করেন না, তাঁরা তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় মুহ্যমান হন। অবশ্য হবারই কথা। দু-একজন ছাড়া সর্বতোমুখীনতায় তাঁর সমকক্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। তবু সেইটাই তাঁর ধর্ম নয়। একই বহু হয়। সেই ঐক্য আমাদের স্বীকার করতে হবে। একই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ-ব্যাখ্যাকার, কবি, চিত্রকর, গল্প-নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধ-লেখক, এবং কর্মী। একই ব্যক্তি একাধারে দেশপ্রেমিক, দেশসেবক, এবং বিশ্ববোধে প্রবুদ্ধ। একই ব্যক্তি বিদেশের ও স্বদেশের গুণগ্রাহী। একই ব্যক্তি সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রবর্তক। একই ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের বিপক্ষে মাথা তোলেন আবার দেশবাসীকে কটুকথা শোনাতে কসুর করেন না।

একই মানুষ—এইটাই প্রধান কথা। অর্থাৎ তাঁর ধর্ম সর্বাঙ্গীণ, যেমন ফুলের, গাছের, ফলের, মানুষের আত্মার। ফুল যখন ফোটে, তখন একটির পর অন্য পাপ্‌ড়িটি খোলে না। অনেকেই ভোর বেলায় পদ্ম ফোটা দেখেছেন, কমল একই মুহূর্তে বিকসিত হয়। মানুষ যখন ধর্ম-পরিবর্তন করে, তখন আগে বেশভূষা বদলে, তারপর ধর্মপুস্তক অধ্যয়ন করে, তার পর কল্‌মা পড়ে কিংবা ব্যাপ্‌টাইজড হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বী হয় না। একই সঙ্গে সবটা বদলে যায়। তারপর তাকে আর চেনা যায় না। জাতীয় জীবনেও তাই : সেটি অর্গ্যানিকই বলুন আর স্পিরিচুয়ালই বলুন, তার পরিবর্তন সর্বাঙ্গীণ। অর্থাৎ, আগে তো ইংরেজ যাক, তার পর যা হয় দেখা যাবে। তার পর গান, ছবি, অভিনয়, সাহিত্য, চারুশিল্প এবং শিক্ষা—এই পদ্ধতিতে হয়ত ইংরেজ তাড়ানো যায়, কিন্তু তাড়াবার পর আর শ্বাস থাকে না, দম ফুরিয়ে যায়। ফলে আমাদের আজ দম ফুরিয়ে গেছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ফিলজফিতে এই মস্ত গলদ ছিল যে আমরা উন্নতিকে

একটি অবিচ্ছিন্ন সরল রেখায় যাত্রা ভেবেছিলাম এবং সেই মত কার্য করেছিলাম। মনে হয়েছিল, স্বাধীনতা একটা দূরের রেল-স্টেশন, যেখানে পেঁাছতে হলে দুটি সমান্তরাল লাইনের উপর গাড়িতে চড়ে, একটির পর অন্য একটি স্টেশন পার হতে হবে। অন্য পথে চললেই দুর্ঘটনা ঘটবে। এর মধ্যে পিউরিটান মনোভাব ছিল, কিছু কাজও হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিও হয়েছে ভীষণ। সমগ্রতাবোধ আমরা হারিয়েছি। সংস্কৃতির সংস্কারে আমরা পিছনে পড়ে গেলাম। তাই ছুটতে যাচ্ছে রাষ্ট্র; আর ব্যক্তিগতভাবে আমরা হাঁপিয়ে বসে আছি রাস্তার ধারে।

আজ সংস্কৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের প্রয়াস ও আমাদের প্রয়াসের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত বেশী। বাঙলা দেশের কথাই প্রধানত আমার মনে আসছে। অন্য দেশেও একই পরিস্থিতি। তবে কিনা বাঙলার গৌরব ছিল এককালে সংস্কৃতি সম্পর্কে। সে যাই হোক —উপায় কি? উপায় রবীন্দ্রনাথের বহুমুখীনতার মধ্যেই আছে। অর্থাৎ সমাজ-মনুষ্যত্বের ঐক্য। পলিটিক্‌স্ আর কালচারের খিচুড়িভোগে আমার রুচি নেই। তবে কে অস্বীকার করবে যে পলিটিক্‌স্ আর কালচার দুইই ঐ মানবিক সর্বাঙ্গীণতার বিবিধ রূপমাত্র। এইটাই আমার ধারণায় রবীন্দ্র-জীবনের মূল ধর্ম। তাকে গ্রহণ করবার সময় এসেছে। নচেৎ যা হচ্ছে তাই হতে থাকবে। তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের সাহিত্যের সংগীতের, চিন্তাধারার মানদণ্ড ভেঙেগ গিয়েছে, কারণ প্রতিটি পৃথক করে ভাবছি, জীবনের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন করারই দরুণ। এটা মোটেই স্বাধীন জাতির পক্ষে সম্মানের নয়।

বড় পরিসর ছেড়ে দিয়ে ছোট গণ্ডীতে আসা যাক। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ, আমার কাছে বুনিয়াদী শিক্ষার চেয়েও বেশী মূল্যবান। আমি তাও ছেড়ে দিচ্ছি। আমি মাত্র গবেষণার উল্লেখ করব, তাও একটি বিষয়ে, ইতিহাসে। কেউ কেউ আশ্চর্য হবেন কিনা জানি না, তবে একটু মনোযোগ দিয়ে তাঁর প্রবন্ধাদি পড়লে তাঁদেরও আমার মত বিশ্বাস হবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল এবং সে বক্তব্য মূল্যবান। অধিকন্তু তাঁর নির্দেশ আমাদের ঐতিহাসিকরা (মাত্র একজন ছাড়া) কেউই গ্রহণ করেন নি। তাঁরা খুবই ভালো কাজ করছেন, অনেক পুঁথি-নজীর-ফলক সংগ্রহ করেছেন, তাদের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের সাহায্যে অনেক তথ্য ও যৎসামান্য তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে তাঁরা ধরে দিয়েছেন। কিন্তু সত্য কথা বলুন তো, আপনারা এই সব বৈজ্ঞানিক ইতিহাস পড়ে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকথা, কি মূলধারা অবগত হয়েছেন কি? তার সাহায্যে ভারতীয় সভ্যতার কতটা পুনর্নির্মাণ সম্ভব হয়েছে? যৎসামান্য। আজ কোন্ ইতিহাসের পাঠ্য বই খুললে হতাশা ও গ্লানির অবসান হয়? কারণ নিশ্চয় ঐতিহাসিকের বিদ্যার অভাব নয়। কারণ ইতিহাসিক পদ্ধতির আংশিকতায়। বহু রচনায় বিজ্ঞানের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চিহ্ন আছে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়। কিন্তু পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি 'মেক্যানিস্টিক' ছিলেন না। তাই তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাস-ব্যাখ্যা অত গভীর ছিল। মাত্র আরণ্য সভ্যতা, forest civilisation', নাম দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি। অনেক দিন আগে চৈতন্য লাইব্রেরীতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলে যান আমাদের ইতিহাসের রূঢ়-সামগ্রী (raw materials) হ'ল জনগণের সংস্কার, আচার-ব্যবহার, পুরাণ, myths প্রভৃতি। 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অনেক বৎসর পূর্বে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার সূচনা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। সূচনাটি উদ্ধৃত হয়েছে অনেক জায়গায়। আমি তাই থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। "...বাঙলার প্রত্যেক জেলা যদি স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন এবং বাঙলার রাজবংশের পুরাতন দপ্তরে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, ঐতিহাসিক চিত্র তাহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই ঐ ত্রৈমাসিক পত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।" এই ধরনের কাজ কিছু হয়েছে ও হচ্ছে নিশ্চয়ই। যে-কাজ এখনও হয়নি সে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, "সমস্ত জনশ্রুতি,—লিখিত এবং অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা, এই পত্র-ভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। যাহা তথ্য হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাসরূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস।" এই শেষ মন্তব্যটি নিতান্ত মূল্যবান। মানবমন, বিশ্বাস, সত্য-মিথ্যা, তুচ্ছ-মহৎ জনশ্রুতির অর্থ হচ্ছে জনগণের মন, বিশ্বাস, শ্রুতি। অর্থাৎ রবীন্দ্রকল্পিত ইতিহাসের মালমশলা ethnology, কেবল archaeology, কিংবা state-record নয়। শিলালিপি, নজীরপত্র তো কোনো আদান-প্রদানের চরম অবস্থা, বোঝাপড়ার শেষ কথা। বিশ্বাস ও জনশ্রুতি হল চলিষ্ণু পদার্থ, সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত। কোনো এক নায়কের বা একটি শ্রেণীর এক-চেটিয়া ধন নয়। কেবল তাই নয়, এই সব বিশ্বাস অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং প্রায় সব মানুষই বুদ্ধির বহির্ভূত অনেক কর্মই করেন। সে-সব বাদ দিয়ে rational ইতিহাস লেখা হতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমান ও নির্বোধ মানুষ, অর্থাৎ জনগণের ইতিহাস লেখা যায় না। তার চেয়ে আরো বড় কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমরা আশা করিতেছি, ঐতিহাসিক চিত্র যে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহা বন্ধ্যা (অর্থাৎ un-productive) হইবে না। কেবল কৌতূহল পরিতৃপ্তিতেই তাহার অবসান নহে। তাহা দেশকে যাহা দান করিবে তাহার চতুর্গুণ প্রতিদান দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে। একটি বীজ রোপণ করিয়া তাহা হইতে সহস্র শস্য লাভ করিতে থাকিবে।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে ইতিহাস পূর্বোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলেই ফলপ্রসূ হবে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে—আমাদের ইতিহাস কৌতূহল পরিতৃপ্ত কেন, দেশাত্ম-পরিতৃপ্তিসাধন নিশ্চয় করেছে। কিন্তু সহস্র শস্য লাভ করেছে কি? এখানেও যে ঘাটতি, তা' একই কারণে। পদ্ধতির দোষে, জনগণকে বাদ দেওয়ার ফলে।

আমার বক্তব্য সামান্য ও সহজ। রবীন্দ্রনাথের স্মরণে কিংবা বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষ্যে উচ্ছ্বাস করায় অর্থ, তাঁর যথার্থ নির্দেশকে অগ্রাহ্য করা। তাঁর নির্দেশ একাধিক; আমি দুই তিনটির উল্লেখ করলাম। আরো অনেক আছে। এই যুগে, এই চিত্তবিক্ষোভে, এই হতাশায়, এই শূন্যতাবোধে সেই সব নির্দেশগুলি আমাদের সহায়ক হবে নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ কর্মনিষ্ঠার দিক্ ছিল। আত্ম-নির্ভরতার ওপর বিশ্বাস ছিল প্রগাঢ়, আর ছিল জনগণকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা। এক এক সময় তাই মনে হয়, এই আশ্চর্য-সহজ ক্ষমতার জন্যই তাঁর মানসিক সৃষ্টি সুচারুরূপে বিধৃত হতে পেরেছিল।

বজ্র আঁটুনি

আপনি কি সুদীর্ঘ পনেরো বছর বাদে ভারতে ফিরছেন? আপনাকে কি মাত্র পনেরো দিন পরে ভারত ছেড়ে যেতে হবে? কলকাতার জন্যে কি আপনার হাতে তিনটি দিনের বেশী সময় নেই? তার থেকে একটি দিন কি আপনি টেলিফোনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে নষ্ট করেছেন? আর ট্যাক্সি করতে গিয়ে মীটারের কারসাজিতে টাকাও কি বরবাদ হয়েছে আপনার? তবে কবে কেমন করে কোথায় আপনার বন্ধুজনের সঙ্গে আপনার দেখাশোনা হবে, কথাবার্তা হবে?

অমন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন কেন? কাল সকালের প্লেনেই দার্জিলিং চলে যান। বিকেলের দিকে চৌরাস্তায় গেলে দেখবেন তামাম কলকাতা শহর সেখানে উঠে এসেছে। অর্থাৎ কলকাতা বলতে যে সব ভাগ্যবানকে বোঝায়। টেলিফোন না করে, ট্যাক্সি না করে এক দিনেই আপনি পঞ্চাশ জন বন্ধু-বন্ধুনীর দর্শন পাবেন। অধিকন্তু এই বিশ্রী গরমটাও এড়াবেন। আপনার মনে হবে আপনি ইউরোপেই আছেন।

ঠিক এই জিনিসটি ঘটেছিল সুমন্ত হোমচৌধুরীর জীবনে। বেচারাকে বদলি করেছিল রোম থেকে টোকিও। ফরেন সার্ভিসে নাম দিয়ে পুরাতন স্বাধীনতা-কর্মীর এই দুর্ভোগ। মাত্র পনেরোটা দিন ভারতে কাটাবার মেয়াদ। তার থেকে দিল্লীতেই কয়েক দিন কাবার হলো নতুন রাজা উজিরদের সঙ্গে দহরম মহরম করে। কয়েক দিন গেল ময়মনসিংহে বুড়ো বাপ-মাকে দেখতে। তাঁরা পাকিস্তান থেকে নড়বেন না, মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন। এ ছাড়া দামোদর ভ্যালি ইত্যাদি কয়েকটা দৃশ্য না [illegible] আধুনিক ভারতের নাগরিকমাত্রের, না দেখলে বিদেশীদের প্রশ্নের উত্তরে বলবে কী!

চৌরাস্তায় যে দোকানগুলো আছে সুমন্ত তার একটাতে গিয়ে গাইড বুক ও মানচিত্র কিনল। বেরিয়ে এসে বেঞ্চিতে বসে পাতা ওল্টাচ্ছে এমন সময় তার কানে এলো, "এক্সকিউজ মী। আপনি কি হোমচৌধুরী?"

সুমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে বলল, "আমিই সেই। কিন্তু আপনাকে তো—"

অন্নদাশঙ্কর রায়

"চিনতে পারলেন না!" ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত ও আহত হয়ে বললেন, "তাহলে লক্ষ্য রাখুন। কে না চেনে আমাকে!"

সুমন্ত লক্ষ্য করল, যে যায় সে টুপি খুলে বা টুপিতে হাত ছুঁইয়ে অভিবাদন জানায় তার আলাপীকে। তাদেরই মুখে শুনল তাঁর নাম চ্যাটার্জি। তখন তার একটু একটু করে স্মরণ হলো। কোথায় তাঁর সঙ্গে পরিচয়। কবে। তার ভারী অদ্ভুত লাগছিল যে, দেশ স্বাধীন হলেও চাটুজ্যে সেই চ্যাটার্জি। ইংরেজ গেছে, তবু নামগুলি ইংরেজীতরো।

"রানা চ্যাটার্জি! ওয়েল, আই নেভার!" সুমন্ত তাঁর দুই হাত ধরে নাড়া দিল।

"তা হলে চিনতে পেরেছেন ঠিক। আমিই সেই পুরোনো পাপী। আঃ! পারীর সেই দিনগুলো এখনো মনে জ্বলজ্বল করে। আচ্ছা, ওই রাশিয়ান রেস্তোরাঁটা কি এখনো ওইখানেই আছে?"

"ওইখানেই আছে।"

"আর ওই ছুঁড়িগুলো?"

"ছুঁড়িগুলো বুড়ী হয়ে গেছে। তাদের জায়গায় নতুন ছুঁড়ি এসেছে।"

চ্যাটার্জি হা-হুতাশ করে বললেন, "দ্যাট রিমাইন্ডস্ মী। আমিও যে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আপনাকে দেখলে কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে, প্রায় চল্লিশ। আপনি এখনো যুবক। হবে না কেন! শীতের দেশে থাকলে যৌবন অনেক দিন থাকে। হাঁ, যৌবনের জন্যেও এক রকম রিফ্রিজেরেটর চাই। তা আপনি আজকাল কোথায়?"

সুমন্ত বলল, "রোম থেকে টোকিওর পথে। আপনাকে তো সবাই খাতির করে দেখছি। একটু তদ্বির করে দিন না আমার বদলিটা খারিজ করিয়ে। কৃতজ্ঞ হব।"

চ্যাটার্জি বললেন, "আসুন, আপনাকে আলাপ করিয়ে দিই।" এই বলে তাঁকে নিয়ে গেলেন উল্টো দিকের একখানি বেঞ্চিতে। সেখানে বসেছিলেন দুজন মহিলা।

"শ্রী হোমচৌধুরী। শ্রীযুক্তা চ্যাটার্জি। আর ইনি হলেন তাঁর বান্ধবী শ্রীযুক্তা গুপ্তা। দার্জিলিং-এই থাকেন।"

চারজনে বসে গল্প করা গেল। শ্রীযুক্তা চ্যাটার্জি জানতে চাইলেন পনেরো বছর পরে দেশে ফিরে নতুন কী দেখছেন। সুমন্ত বলল, "নতুনের মধ্যে এই দেখেছি বিলিতি পোশাক সকলেরই গায়ে। মেয়ে-দেরও। তবে মেয়েরা তার উপর একখানা শাড়ী জড়িয়ে 'ভারতীয়' এই বিভ্রম সৃষ্টি করেন। আর দেখছি মিস্টার ও মিসেস এ জমানায় জলচল নয়। তার বদলে শ্রী ও [illegible]।"

হাসাহাসি পড়ল। চ্যাটার্জি বললেন, "এই তো সেদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছে রাজভবনে যারা লাঞ্চে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রী ও শ্রীযুক্তা এইচ পি চ্যাটার্জি। আপনি রাজভবনে কল্‌ করেছেন? কর্তব্য।"

সুমন্তর মুখ শুকিয়ে গেল। প্রজাতন্ত্রী ভারতের রাজভবনে প্রাক্তন স্বাধীনতাকর্মী সুমন্ত হোমচৌধুরীর আসন যত সব নকল ইংরেজের সঙ্গে! আবার এই দুঃসহ গরমে কোটের গলা বন্ধ করে মেকী দেশীয়তা জাহির করতে হবে।

এমন সময় চ্যাটার্জি তড়াক করে লাফ দিয়ে বললেন, "আসুন, আসুন, আলাপ করিয়ে দিই। সার অশোকা রয়, সার বি পি সিং রয়, লেডী রানু মুখার্জি, হার হাইনেস দি মহারানী অফ জয়পুর। এ'রাও এসেছেন।"

আলাপ পর্বের পর স্বস্থানে ফিরে সুমন্ত বলল, "শুনেছিলুম স্বাধীন ভারত থেকে উপাধি উঠে গেছে। তা তো মনে হচ্ছে না। দিল্লীতেও দেখলুম উপাধির মান আছে।"

একটু পরে আর চ্যাটার্জিকে ধরে রাখা গেল না। তিনি তাঁর স্ত্রীকেও টেনে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সুমন্তকে বিরক্ত করলেন না। শ্রীযুক্তা গুপ্তাকেও না। ব্যাপার কী! স্বয়ং হিজ এক্সেলেন্সী পায়ে হে'টে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এবার রাজদর্শন।

সুমন্ত তার পার্শ্ববর্তিনীকে বলল, "কিছু মনে করবেন না। আপনাকে দেখে একজনকে আমার মনে পড়ছে। আপনি কি তার কেউ হন? নূপুর সেনের?"

পার্শ্ববর্তিনী মুচকি হাসলেন। "যদি বলি আমিই সেই?"

"তা হলে—তা হলে আমি সত্যি খুব খুশি হব।"

"বলব না। আমি তোমার উপর ভীষণ রাগ করেছি, সুমন।"

সুমন্ত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বলল, "এ কি কখনো হতে পারে যে, তুমি আর আমি এতক্ষণ এক সঙ্গে বসে থেকেও কেউ কাউকে চিনতে পারিনি!"

"আমি চিনতে পেরেছি গোড়া থেকেই। তুমিই চিনতে পারলে না।"

সুমন্ত বার বার মাফ চায় ও আফসোস জানায়। "নূপুর, তোমার সঙ্গে কথা না বলে আধ ঘণ্টা বাজে খরচ করেছি। এর ক্ষতিপূরণ হবে কি করে? কালকেই তো চলে যাচ্ছি। নূপুর, তোমাকে আমি ভুলে যাইনি। তোমার চেহারাও আমার মনে আছে। তবে কেন এ রকম হলো! বোধ হয় এইখানে তোমাকে প্রত্যাশা করিনি বলে।"

"আমিও কি তোমাকে প্রত্যাশা করেছিলুম এখানে? তবু দেখেই চিনেছি।"

সুমন্ত প্রস্তাব করল, "চল না একটু বেড়ানো যাক। আপত্তি আছে?"

নূপুর রাজী হলো। চৌরাস্তা তখন লোকে লোকারণ্য। পদে পদে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় নূপুরের। সুমন্ত যাদের দেখতে চেয়েছিল কলকাতায় তাদের কারো কারো সঙ্গে মুখোমুখি হয় তার। চলতে চলতে তারা চৌরাস্তা ছাড়িয়ে জলাপাহাড় রোড দিয়ে চলল। সেদিকটাতে ভিড় কম। চেনা মুখের অভাব।

সুমন্ত জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কর্তাকে দেখছিনে যে? তিনি কোথায়?"

নূপুর রাগ করে বলল, "তোমার চোখ সত্যি খারাপ। আমার কপাল দেখে বুঝতে পারনি যে তিনি পরলোকে?"

সুমন্ত শোক করে বলল, "আহা! কী হয়েছিল?"

নূপুর বলল, "ষাট বছর বয়স হয়েছিল। ব্লাডপ্রেসার।"

সুমন্ত সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিল, নূপুর বলল, "সাত বছর কেটে গেছে।"

তার পর সুমন্ত জানতে চাইল, "ছেলেমেয়েদের এখানে রেখে পড়াচ্ছ বুঝি?"

নূপুর বিষাদের সুরে বলল, "হয়ইনি।"

"হয়ইনি! আহা!" সুমন্ত সমবেদনা জানাল।

এর পর নূপুরের পালা। সে বলল, "বিয়ে করেছ নিশ্চয়। তিনি কোথায়?"

"তিনি ইহলোকে।" সুমন্ত গম্ভীরভাবে বলল।

"তার মানে?"

"তার মানে তিনি বেঁচে আছেন, কিন্তু —যাকগে, তোমার কি ওসব ভালো লাগবে শুনতে! সেও প্রায় সাত বছর হলো।"

নূপুর বুঝতে পারছিল না কী হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন করতে তার সংকোচ বোধ হচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে সুমন্তই অনাহূতভাবে বলল, "আমার কপাল দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে বুঝবে যে আমি ঘরপোড়া গরু। আমার ঘর পুড়ে গেছে। ঘরের লোকই ঘরে আগুন দিয়ে চলে গেল।"

নূপুর হায় হায় করে উঠছিল, সুমন্ত বলতে থাকল, "তামাশা দেখ, ওর যাতে কলঙ্ক না হয় তার জন্যে আমাকেই গায়ে পেতে নিতে হলো অপরাধের অপবাদ। পরিচিত মহলে মাথা হে'ট হয়ে গেল। স্ত্রীকে দোষী করলেও কি মাথা হে'ট হতো না! যাক, ও যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তাকে বিয়ে করেছে। সুখী হয়েছে। দুজন মানুষ অসুখী হওয়ার চেয়ে একজন সুখী হওয়া ভালো।"

সমবেদনায় নূপুরের চোখের পাতা ভিজল। সে বলল, "মেয়েদের আমি অত সহজে ক্ষমা করব না। বিশেষত সে যদি মা হয়ে থাকে।"

"হয়েছিল বৈকি। একটি মেয়ে। দুঃখ তো তারই জন্যে।"

"মেয়েটি এখন কার কাছে?"

"তার দিদিমার কাছে। তার জন্যেই অত দিন আমার ইউরোপে থাকা। নয়তো আমি স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে আসতুম। তার কাছাকাছি থাকব বলে রোমে আমাদের দূতাবাসে চাকরি নিই। কথা ছিল আমাকে বরাবর রোমেই রাখা হবে, বদলি করলে বড় জোর বেলগ্রেডে কি বেয়ার্নে। কী যে হলো, দিল আমাকে টোকিওতে ঠেলে।"

এমনি অনেক কথা। একটা চাপা দুঃখ ছাই ঢাকা আগুনের মতো ছিল। ছাই কেমন করে সরে গেল। নূপুর ভেবেছিল তার মতো দুঃখ কেউ কোথাও পায়নি। কিন্তু সুমন্তর দুঃখ কোনো অংশে কম নয়। বরং বেশী। সাথী মারা গেছে। দুঃখের কথা। কিন্তু সাথী ছেড়ে গিয়ে অপরের হয়েছে। এ যে আরো দুঃখের কথা। ছেলেমেয়ে হয়ইনি। দুঃখের কথা। কিন্তু মেয়েকে কাছে রাখার জো নেই, তার কাছাকাছি থাকাও হলো না। এ যে অসহনীয় দুঃখ! বেচারা সুমন্ত!

২

ওরা যখন চৌরাস্তায় আবার পা দিল তখন চ্যাটার্জি কোনখান থেকে ছুটে এলেন। বললেন, "কোথায় না খুঁজেছি আপনাদের! আপনারা তো বেশ! প্রথম আলাপেই এত দূর! হোমচৌধুরী, সেলাম ভাই আপনাকে। অনেক ঘুঘু দেখেছি, বয়স কালে নিজেও ছিলুম। কিন্তু আপনার কাছে কেউ নয়।"

সুমন্ত চেয়ে দেখল নূপুর লজ্জায় ম্রিয়মাণ। ওসব কথা পুরুষে পুরুষে সাজে। মেয়েদের সামনে কেন? চ্যাটার্জিকে চমকে দিয়ে বলল, "নূপুর যখন সেন ছিল, তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ। ও যদি আমাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ একদিন গুপ্ত না হতো তা হলে আমিও হয়তো

ইউরোপে চলে গিয়ে বনবাসী হতুম না। বলা যায় না, বরাতে থাকলে নূপুর ও আমি শ্রী ও শ্রীযুক্তা হোমচৌধুরী হলেও হতে পারতুম।"

তখন চ্যাটার্জি তাঁর গৃহিণীকে বললেন, "শুনলে তো? আমি আগেই অনুমান করেছিলুম যে ওরা পূর্বপরিচিত।"

"ওটা তো আমারই অনুমান। তুমি আত্মসাৎ করে বলছ তোমার।" গৃহিণী হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। তার পর নূপুরের হাত ধরে বললেন, "এতদিন পরে তোর মুখে একটু হাসি-হাসি ভাব ফুটল। সত্যি, তোকে খুব খুশি দেখাচ্ছে।"

চ্যাটার্জি প্রস্তাব করলেন, "চলুন, আমরা চারজনে মিলে মাউণ্ট এভারেস্টে যাই। ডিনার সেইখানে সারা যাবে। আমার নাম শুনলে ওরা তখনি টেবিল বুক করবে।"

তাঁর গৃহিণী বললেন, "কিন্তু তোমার যে আজ ক্লাবে কার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট।"

"ক্যানসেল করছি।" এই বলে চ্যাটার্জি টেলিফোন করতে ছুটলেন।

নূপুর বলল, "বসুধা ভাই, মাফ করিস আমাকে। আমার হস্টেল বন্ধ হয়ে যাবে। আমি লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আমি না থাকলে আমার মেয়েরা কী খাবে না খাবে কে দেখবে? সুমন্তকে ডিনারে নিয়ে যা। আমাকে বাদ দে।"

বসুধা ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু পীড়াপীড়ি করলেন না। স্কুলের কর্তাদের অনুমতি না নিয়ে নূপুর তো রাত করে হস্টেলে ফিরতে পারে না। সুমন্তকে বললেন, "ওর চাকরির এই এক দোষ। বাইরে বেশিক্ষণ থাকলে জবাবদিহি করতে হয় ঠিক বালিকাদের মতোই।"—

নূপুর চলে গেল। তখন সুমন্ত বলল, "আমি ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

এগিয়ে দিতে দিতে টাউন হল এলো, তার পর এলো ডাকঘর, তার পর রেল-স্টেশন। কার্ট রোডের উপর দিয়ে কিছুদূর হাঁটতে হলো। তার পর ছাড়াছাড়ি।

ইতিমধ্যে নূপুর বলেছিল সুমন্তকে, "তুমি দেখছি বানিয়ে বলতে ওস্তাদ। কই, আমাকে তো কোনো দিন বলনি যে আমি গুপ্ত হয়েছিলুম বলেই তুমি বনবাসী হয়েছিলে। কিংবা গুপ্ত না হলে আমার হোমচৌধুরী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।"

সুমন্ত বলেছিল, "তখন আমি সামান্য সাংবাদিক। আর গুপ্ত আমার দ্বিগুণ বয়সী ও দশগুণ যোগ্য অধ্যাপক। বি এ পাশ করে তুমি তাঁর কাছে এম এ পড়ছ। তুমি তাঁর প্রিয় শিষ্যা হতে হতে গৃহিণী ও সচিব হলে। আমি কি তোমাকে বাধা দিতে পারি! বিয়ের পরে কি তোমাকে বলতে পারি যে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম! যাক, ও-কথা ভেবে কী হবে! যা হবার তা হয়ে গেছে। ষোলো বছর পরে ও-কথা যাকে বলে তামাদি হয়ে গেছে।"

নূপুর বলেছিল, "হাঁ। কিন্তু এতদিন আমি ও-কথা জানতুম না। আমার কাছে ওটা নতুন কথা। আজ যদি তুমি ও-কথা মুখ ফুটে না বলতে তা হলে এ জন্মে জেনে যেতে পারতুম না যে, আমার হোমচৌধুরী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বা আমার জন্যে একটি ছেলে বনবাসী হলো। নামকরা কালো মেয়ে। কেউ ভালোবাসত না আমাকে। অন্তত আমার তা জানা ছিল না। জানলে কি আমি অত বড় একটা ভুল জেনেশুনে করি! তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, সুমন। তোমাকে দুঃখ দিয়েছি, নিজেও কি পাইনি!"

সুমন তা শুনে আবেগভরে বলেছিল, "তুমি আমাকে এমন কী দুঃখ দিলে যে ক্ষমা করার কথা উঠবে! দুঃখ দিল আমাকে আরেক জন। আমার মাথা হেঁট হলো। আমি মুখ দেখাতে পারছিনে। মিথ্যে কথা বলে বেড়াচ্ছি। মা বাবা জানতে চাইলেন বৌ কেমন আছে। বলতে হলো, ভালো আছে। ভালো আছে সে কথা ঠিক। কিন্তু যে ভালো আছে সে আমার বৌ নয়। আমার বাবা মা তার শ্বশুর শাশুড়ি নন।"

তখন নূপুর বলেছিল বিচলিত হয়ে, "তা তুমি আবার বিয়ে করলে না কেন? ও-দেশে কি মেয়ের দুর্ভিক্ষ!"

সুমন্ত বলেছিল, "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। সুন্দর মুখ অনেক দেখেছি। ভালোবাসাও হয়েছে। কিন্তু জীবনে দ্বিতীয়বার প্রস্তাব করতে পারিনি যে, আমাকে বিয়ে করো। দুদিন পরে আবার তো ইতিহাসের পুনরুক্তি হবে! কাজ কী বার বার উপহাস্য হয়ে! তার চেয়ে এই বেশ আছি।"

নূপুরকে এগিয়ে দিয়ে এসে সুমন্ত লক্ষ্য করল চ্যাটার্জি হাত পা ছুঁড়ে বিষম উত্তেজিত হয়ে কী যেন বকছেন আর তাঁর স্ত্রী তাঁকে শান্ত করছেন। সুমন্তর কানে এলো, "আমি দেখে নেব। চব্বিশ ঘণ্টা নোটিশ না পেলে টেবিল বুক করবে না! আস্পর্ধা!"

সুমন্ত বুঝতে পারল। বলল, "ভালোই হলো। আমি আপনাদের সঙ্গে নিরিবিলিতে বসে দুটো কথা কইতে চাই। ওসব হোটেলে নিরিবিলি কোথায়!"

"যা বলেছেন।" বসুধা দেবী কৃতার্থ হয়ে বললেন "এই চৌরাস্তাটাই এখনি উঠে যাবে ওসব হোটেলে। এই মুখগুলিকেই আরেক
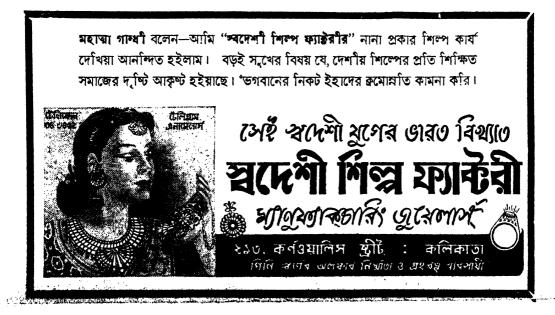
বার দেখবেন, নতুন কাউকে নয়। কী দরকার! তার চেয়ে এমন কোথাও যাওয়া যাক যেখানে প্রাণ খুলে তিনজনায় কথাবার্তা হবে।"

চ্যাটার্জি তখনো গজগজ করছিলেন। সুমন্ত বলল, "আপনারা আমার অতিথি। আসুন, চীন দেশে যাওয়া যাক। চীনা খাবার খাওয়া যাক।"

কাছেই একটা চীনা রেস্টোরাণ্ট ছিল তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এলো সুমন্ত। অনিচ্ছুক চ্যাটার্জিকে ধরে নিয়ে চলল সেখানে, তাঁর সদয় সহধর্মিণীর সৌজন্যে।

"কী অধঃপতন! কী অধঃপতন! যেই দেখবে সেই বলবে চ্যাটার্জি সাহেব এত নিচে নেমেছেন যে চীনারাই তাঁর অগতির গতি!" চ্যাটার্জির চেহারা অতি করুণ।

কিন্তু চীনারা যা আপ্যায়ন করল তা রাজোচিত। বিশেষ একটি দ্রব্য তাঁর কাছে প্রীতিকর ছিল। সে শুধু জোগাতে পারে চীনারাই। দেখতে দেখতে তিনি মেতে উঠলেন। 'আপনি' থেকে নামলেন 'তুমি'তে।

সুমন্ত জানতে চেয়েছিল নূপুরের ইতিহাস। চ্যাটার্জি আর তাঁর গৃহিণী যিনি যেটুকু জানতেন তিনি সেটুকু জানালেন। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বের করে নিল সুমন্ত। এক সঙ্গে সবটা নয়, অলক্ষিতে একটু একটু করে। আগেকার ঘটনা আগে নয়, পরেরটা আগে আগেরটা পরে। মনে মনে সম্পাদনা করলে বিবরণটা দাঁড়ায় এইরকম।

অধ্যাপকরা সাধারণত অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন। তা বলে অপ্রকাশ গুপ্তের মতো কেউ নন। পঞ্চাশোর্ধ্বে যখন বনে যেতে হয় তখন তাঁর মনে পড়ল যে বাণপ্রস্থের পূর্বে আশ্রমের নাম গার্হস্থ্য, সেটি তখনো বাকী। অমন একটা মারাত্মক ভুল ঘটে গেল, তিনি টের পেলেন না। আশ্চর্য! না? তা হলে বর্ণাশ্রম ধর্মের মহিমা রইল কোথায়! বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তখন বর্ণাশ্রমীদের রাজত্ব। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়। 'অন প্রিন্সিপ্‌ল' তাঁর বিবাহ করা উচিত।

অধ্যাপক তাঁর সে ভুল শুধরে নিলেন ছাত্রী নূপুরকে উপাধ্যায়ানী পদে উন্নীত করে। বয়সে ত্রিশ বছরের ছোট বড়। দুজনের দুই জেনারেশন। মনের দিক থেকে অনতিক্রম্য ব্যবধান। দেহের দিক থেকে একজনের উঠতি, অপর জনের পড়তি। চড়াই উতরাই। বিয়ের পর এক মাস যেতে না যেতে গুপ্ত উপলব্ধি করলেন যে এক ভুল শোধরাতে গিয়ে তিনি আরেক ভুল করে বসে আছেন। এ ভুল এমন ভুল যে এর সংশোধন না হলে তাঁর শরীর ভেঙে পড়বে। হয়তো যক্ষ্মা বা সেই রকম কিছু হবে। কোথায় বাণপ্রস্থ আর কোথায় টি বি স্যানাটোরিয়াম! তখন তো স্ত্রীর কপালে অকাল বৈধব্য, আর আগে থেকেই 'বাধ্যতা-মূলক' ব্রহ্মচর্য। তার চেয়ে ভালো, গুরুর কাছে গিয়ে মন্ত্র নেওয়া। স্বামী স্ত্রী দুজনেরই শপথ করা।

কোনো রকম পরামর্শ না করেই নূপুরকে তিনি সোজা নিয়ে গেলেন গুরুজীর আশ্রমে। নিজে মন্ত্র নিলেন, স্ত্রীকেও নেওয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে শপথ করা হয়ে গেল দুজনের যে, যত দিন প্রাণ তত দিন ব্রহ্মচর্য।

নূপুর কল্পনাই করেনি যে তাকে মন্ত্র নিতে হবে, শপথ করতে হবে। কিন্তু বিদ্রোহ করার সাহস তার ছিল না। তা ছাড়া সে ধন্য হয়েছিল অমন শিবের মতো স্বামী পেয়ে। কালো মেয়ে, কেউ বিয়ে করতে চায় না। বাপকে না জানি কত পণ দিতে হতো ও-মেয়েকে পার করতে। আর নয়তো সারা জীবন মাস্টারি করতে হতো বিয়ের আশা ছেড়ে। তার দেশমান্য স্বামীর কাছে সে পরম কৃতজ্ঞ। বিদ্রোহ করবে কী? মেনে নেবে। কপালে সুখ না থাকলে কেউ কখনো সুখী হয়? কপাল কপাল, সবটাই কপাল। অপ্রকাশ গুপ্তের মতো পতি পাওয়াও কপাল, তাঁর জীবদ্দশায় ব্রহ্মচারিণী হওয়াও কপাল।

কিন্তু মন যে মানে না। বি এ পাশ করা একেলে মেয়ের মন। আর মন যদি বা মানে প্রকৃতি মানে না। একটা কিছু ছল পেলেই স্বামীর শোবার ঘরে যায়, পায়ের তলায় বসে, পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। গুপ্ত খেঁকিয়ে ওঠেন। "থাক, থাক, গায়ে হাত দিতে হবে না। ডাইনী কোথাকার!" কোনো কোনো দিন বলেন, "দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী পলক পলক লহু চোষে।" এমনি কত রকম সন্ত বচন। নূপুরের ইচ্ছা করে গলায় দড়ি দিতে। কিন্তু সাহসে কুলায় না। বাপের বাড়ি চলে যেতে চায়। কর্তা যেতে দেবেন না। তাকে দেখাশুনা করবে কে!

সব চেয়ে অবিশ্বাস্য কথা ভদ্রলোকের ক্ষমতা না থাকলেও আকাঙ্ক্ষা ছিল। চুরি করে তিনি বাৎস্যায়ন পড়তেন। পড়াই সার। পরীক্ষা নিরীক্ষা অসার। নূপুর যেদিন আবিষ্কার করল যে বাৎস্যায়নের পুঁথি প্রাচীন ভারতের পদার্থবিজ্ঞান নয় সেদিন তার মোহভঙ্গ হলো। কিন্তু হলেই বা কী করতে পারে সে! তার হাত পা বাঁধা। তবে তার মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব এলো। গুপ্ত সেটা লক্ষ্য করলেন। তখন তিনি এক অভিনব চাল চাললেন।

তাঁর বাড়িখানা লিখে দিলেন নূপুরের নামে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিলেন—ভাড়া দিতে পারবে না, বন্ধক রাখতে পারবে না, য়্যাসাইন করতে পারবে না, দান করতে পারবে না, উইল করতে পারবে না, বিক্রী করতে পারবে না। যত দিন আয়ু তত দিন ঐ বাড়িতেই বসবাস করতে হবে। তার পরে ও বাড়ী গুরুজীর আশ্রমের।

সম্পত্তি যা ছিল তা তিনি ট্রাস্টীদের হাতে তুলে দিলেন। তার থেকে মাসোহারা পাবে নূপুর। সে মাসোহারা কলকাতার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু দার্জিলিং বা অন্য কোথাও যদি যায় তবে বাড়িভাড়া দিয়ে বিশেষ কিছু বাঁচবে না সুতরাং যাওয়া হবে না। যখের মতো আগলাতে হবে কলকাতার সেই বাড়ি। তার এক অংশে মেয়েদের জন্যে একটা ইনস্টিটিউট থাকবে। সেখানে এসে তারা শিখবে ভারতনারীর চারিত্র্য এবং ঐতিহ্য। শেখাবেন নূপুরের মতো আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন ব্রহ্মচারিণীগণ।

আপৎকালে কিছু থোক টাকার দরকার হতে পারে। তার জন্যে ট্রাস্টিদের অধিকার দেওয়া হলো। নূপুরের অসুখ বিসুখ হলে খরচপত্র যা হবে তা ট্রাস্টিরাই বহন করবেন। তা হলে একটি প্রাণীর আর কী ন্যায়সঙ্গত দাবী থাকতে পারে? কেনই বা সে আবার বিয়ে করতে চাইবে? চাইলেই বা তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে কেন? গুপ্ত নিজে যখন ব্রহ্মচারী নূপুর কেন তা হবে না? কেন হতে পারবে না? ছেলেদের জন্যে তিনি যে পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন তার ভূমিকার শেষ লাইনটি এই। "একজন যা পারে আরেকজন তা পারে।" এটি তাঁর বাণী।

অধ্যাপকের কোনো অধ্যাপক ছিলেন না। তাই তাঁকে কেউ বলতে ভরসা পাননি যে বৃদ্ধকে যা জীবনীশক্তি জোগায় তরুণী ভার্যাকে তা জীবন থেকে বঞ্চিত করে। তাঁর নিজের পক্ষে যা বাঁচবার শর্ত নূপুরের পক্ষে তা বন্ধ্যা হবার শর্ত। না বাঁচবার শর্ত।

দশটি বছর তার হাড় মাস জ্বালিয়ে গুপ্ত এক দিন সুপ্ত হলেন চিরনিদ্রায়। তিনি মনে করেছিলেন নব্বুই বছর বাঁচবেন, সেই-জন্যে নিয়মগুলো তাঁর দিন দিন কঠোর হচ্ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে দীর্ঘ পরমায়ুর তেমন কোনো সম্বন্ধ তাঁকে দিয়ে প্রমাণিত হলো না। নূপুরও মনে মনে বিশ্বাস করত যে ব্রহ্মচর্যের জয় হবেই। স্বামী নব্বুই কেন, একশো বছর বাঁচবেন। তাকে বিধবা হতে হবে না। সে স্বামীর পায়ে মাথা রেখে এয়োরাণী এয়োতি নিয়ে স্বর্গে যাবে। তার বিড়ম্বিত জীবনের এই হবে চরম সান্ত্বনা।

কিন্তু সেই তো গেল লোকটা ষাট বছর বয়সে, যে বয়সে অন্যান্য অধ্যাপক-দের পুত্রকন্যা হচ্ছে, পাকা চুল কাঁচছে, য়্যাভির্ডোভিট করে বয়সও কমছে। তবে কেন নূপুরকে মেরে রেখে গেল! কী তার লাভ হলো অন্য একটি প্রাণীকে জীয়ন্ত ব্যবচ্ছেদ করে! বিদ্রোহের ভাব প্রবল হলো এবার। কিন্তু নিরুপায়। দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে চাইলে বাড়িটি হারাবে, মাসোহারাটি বন্ধ হবে, থোক টাকা জুটবে না অসুখে বিসুখে। তার চেয়ে বড় কথা শপথ ভঙ্গ হবে। বজ্র আঁটুনি। অপ্রকাশ গুপ্ত তাঁর মৃত হস্ত দিয়ে বজ্র-মুষ্টিতে ধরে আছেন নূপুর গুপ্তর হাত। যেমন ধরেছিলেন বিবাহবাসরে।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। কয়েক বছর পরে গভর্নমেণ্ট ও-বাড়ি রেকুইজিশন করে। ভাড়া যা দেয় তা নিয়ে ট্রাস্টিদের সঙ্গে নূপুরের বিবাদ বাধে। নূপুর বলে, "আমাকে ও-টাকা দেওয়া হোক, আমি দার্জিলিং বা শিলং গিয়ে মনের মতো বাড়ি ভাড়া করে থাকি।" ও'রা বলেন, "আপনার মনের মতো হলে তো হবে না। কর্তার মনের মতো হওয়া চাই। তিনি যে চেয়ে-ছিলেন ভারতনারীর চারিত্র্য, আপনার মধ্যে ও আপনার মারফৎ একালের মেয়েদের মধ্যে। ইনস্টিটিউট হবে বাড়ির এক অংশে। দার্জিলিং বা শিলং তার অনুকূল নয়।"

এ ঝগড়া মিটল না। নূপুর রাগ করে দার্জিলিং চলে এলো, এখানে চাকরি নিল। বাড়িভাড়ার টাকা তো হারালোই, মাসোহারা মনি অর্ডার করে পাঠালে মনি অর্ডার ফেরৎ দিল। অসুখ বিসুখ হয়নি, হলে কী করত বলা যায় না। আপোসের চেষ্টা একাধিকবার হয়েছে। চ্যাটার্জি স্বয়ং করেছেন। নূপুর বলে, "স্বামীর ইচ্ছা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয় তা হলে আমি তাঁর স্ত্রী আমি যা বলব তাই হবে। বাইরের লোক ট্রাস্টি হয়েছে বলে তাদের ইচ্ছায় আমি চলব! পতিব্রতা মানে ট্রাস্টিব্রতা!"

নূপুর কিন্তু বিয়ে করতে নারাজ। শপথ ভঙ্গ করলে পাপ হবে।

৩

পরের দিন রবিবার। সকালে উঠে সুমন্ত চৌরাস্তায় গিয়ে জুটল। ভিড় নেই। ভিড় জমতে জমতে দশটা বাজে। তার আগেই সে নূপুরের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নিতে চায়। নূপুর বলেছিল সাড়ে আটটা নাগাদ আসবে। এলো ঠিক। দুজনে মিলে বেড়াতে গেল ম্যাল হয়ে বার্চ হিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে দৃষ্টি রেখে।

সুমন্ত বলল, "কাল চাটুজ্যেদের কাছে সমস্ত শুনেছি।"

নূপুর চমকে উঠে বলল, "তাই নাকি! কী শুনেছ!"

সুমন্ত খুলে বলল যা শুনেছিল। তারপর বলল, "আমি আশা করিনি যে, তোমাকে মুক্ত দেখব। দেখে আশান্বিত হয়েছিলুম। কিন্তু পরে যা শুনলুম তা আমাকে হতাশ করেছে। নূপুর, তোমাকে আমি বাধ্য করব না। তার চেয়ে নিজে সরে যাব। আজ বিকেলের প্লেনে আমি কলকাতা চললুম। পরশু টোকিও যাত্রা।"

নূপুর বলল বিমর্ষ হয়ে, "সত্য যখন করেছি তখন সত্যরক্ষা করতেই হবে। সত্যের দায় অস্বীকার করলে মহাপাতক হবে। তুমি আমি কেউ সুখী হব না, কারো কল্যাণ হবে না। আর যারা আসবে তাদের ঘোর অমঙ্গল হবে।"
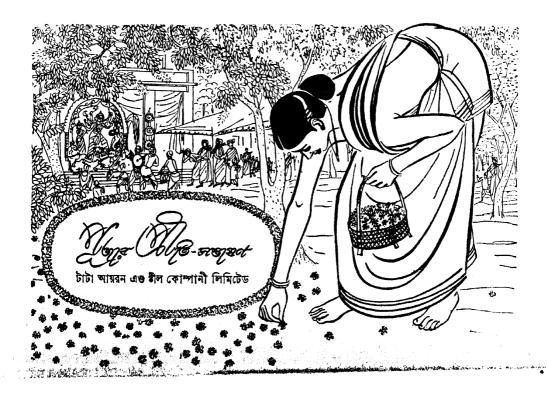
এর উপর কথা চলে না। সুমন্ত বলল, "বেশ, তা হলে আমি যাই। আবার কবে দেখা হবে তা সম্পূর্ণ তোমার হাতে। যেদিন আসতে লিখবে সেদিন আসব ছুটি নিয়ে। এসে তোমায় নিয়ে যাব। আমি ভুল বুঝেছিলুম। মুক্ত তুমি আইনের দিক থেকে। হৃদয়ের দিক থেকে। কিন্তু সংস্কারের দিক থেকে নও। সত্য যাকে তুমি বলছ তা একটি বৃদ্ধকে তাঁর তরুণী ভার্যার প্রাণঘাতী আকর্ষণ থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে কল্পিত। দশ বছর ধরে সেই কল্পিত সত্য তাঁকে বাঁচিয়েছে। এখন তিনি মৃত। মৃতকে বাঁচানোর প্রশ্ন ওঠে না। বরং আপনাকে বাঁচানোর প্রশ্ন ওঠে। আত্মরক্ষা কি একটা অপরাধ! আত্মার সঙ্গে সত্যরক্ষা কি একটা অন্যায়! তোমার অন্তরাত্মা কী বলে?"

সুমন্ত সেইদিন বিদায় নিয়ে চলে গেল। নূপুর তাকে আশা দিতে পারল না।

চাটুজ্যেরা জানতেন না যে, হোমচৌধুরী বিয়ের প্রস্তাব করেছিল, নূপুর রাজী হয়নি। তাঁরা আর সে প্রশ্নের অবতারণা করলেন না। তখনকার মতো যবনিকা পড়ল।

কয়েক মাস পরে বসুধা দেবী খবর পেলেন যে, নূপুরের শরীর ভালো নেই। দেখা করতে গেলেন। কী হয়েছে, জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর পেলেন মামুলি। ডাক্তারী শাস্ত্রে যা বলে। ট্রাস্টিদের কাছে থোক টাকার জন্যে চিঠি লেখার কথা তোলায় নূপুর চঞ্চল হয়ে উঠল। না, না, তা কিছুতেই নয়।

"তবে কি তুই বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবি?" তিনি মুখ ফুটে বললেন না যে, মারা যাবি। কিন্তু ইঙ্গিতটা স্পষ্ট।

"এ যাত্রা আমার বাঁচোয়া নেই, সুধা। এ রোগ চিকিৎসার অসাধ্য।"

"কেন? কেন? এমন রোগ ক'টা আছে যা চিকিৎসায় সারে না, থামে না? এখন থেকেই হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো কী হয়েছে?"

"আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা নেই, ভাই। কে আমাকে বাঁচাবে!"

বসুধা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "ছি! অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনতে নেই। তোকে বাঁচতেই হবে।"

সেদিন দুই সখীতে অনেক কথা হলো। মনের কথা। গোপন কথা। বোঝা গেল নূপুর প্রেমে পড়েছে। সুমন্তকে বিয়ে করতে পেলে বাঁচে। কিন্তু তার ভিতরের বাধা অলঙ্ঘ্য। সত্যরক্ষার দায়। শপথভঙ্গের ভয়। কে জানে কী অকল্যাণ হবে!

বসুধা বললেন, "তাই যদি হতো, কিছু কোথাও নেই, অকস্মাৎ রোম থেকে টোকিওতে বদলি হতো না সুমন্ত, এক দিনের জন্যে দার্জিলিঙ আসত না, দেখত না তোকে, শুনত না তোর ইতিহাস। এসব প্রজাপতির চক্রান্ত। ভগবানের ইচ্ছা। ওদিকে তারও তো বৌ থাকতে বৌ নেই। বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সে বৌ এখন পরকে বিয়ে করে পরস্ত্রী। বেচারা সুমন্ত! তুই যদি তার ভার না নিস্ আর কেউ না কেউ নেবে। তখন কি তোর ভালো লাগবে!"

মনের দুঃখ মনে চাপা ছিল বলে নূপুর এত কষ্ট পাচ্ছিল। সখীর কাছে অনাবৃত হওয়ায় হালকা বোধ করল। কিন্তু দোটানা তার কিছুতেই গেল না। এক দিকের টানে তার মুখে রং ধরল। নবারুণ রাগ। প্রেমে পড়লে, প্রেম পেলে যা হয়। অন্য দিকের টানে স্নায়বিক বিকার, মানসিক অবসাদ। যত রকম দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা। হাড়ে হাড়ে ভয়। কে জানে কী অকল্যাণ হবে. কী দুর্ঘটনা ঘটবে! তরুণী বধূর মতো রাঙা টুকটুকে তার চেহারা। কিন্তু শরীরের কল বিকল হয়ে এলো। কে কবে এমন দোটানায় পড়েছে!

বসুধা দেবী কী আব করবেন! তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। দেখা হলেই তিনি তাকে বোঝাতেন। বলতেন, "সময় আর জোয়ার কারো তরে সবুর করে না। বয়স একবার গড়িয়ে গেলে তখন হাজার মাথা খুঁড়লেও মা হওয়া যায় না। নারীকে প্রকৃতি যে মহাসুযোগ দিয়েছে নারী যদি তা বয়ে যেতে দেয়, তবে তার জীবন বৃথা। নূপুর, আর সাত আট বছর পরে তোকে অনুশোচনা করতে হবে।"

নূপুর বোঝে, কিন্তু তার প্রশ্ন হলো, "শপথ ভঙ্গ করলেও তো অনুশোচনা। কোন্‌টা বেশী, কোন্‌টা কম? এর উত্তর কে আমাকে দেয়?"

"এর উত্তর কেউ কাউকে দিতে পারে না। তোকেই দিতে হবে একদিন। ততদিনে হয়তো বড় দেরি হয়ে গেছে। সুমন্ত হয়তো আর কাউকে বিয়ে করে বসেছে। আর কারো প্রেমে পড়েছে।" বসুধা দেবীর এই হলো শেষ তাস।

আরো কথা ছিল। নূপুর ভেঙে বলত না। বাড়িটা একদিন না একদিন খালি পাওয়া

যাবে। গভর্নমেণ্ট ছেড়ে দেবে। সে রকম কথাবার্তা চলছে। ট্রাস্টিরাই চালাচ্ছেন। মাসোহারা মাসের পর মাস জমছে তাঁদের হাতে। একসঙ্গে পাওয়া যাবে হাজার দশেক টাকা। তা ছাড়া আপদে বিপদে ঐ যে থোক টাকার টোপ ঝুলছে ওটিও মাছকে লোভ দেখায়, ও লোভ এমন লোভ যে, থোক টাকার ভরসায় লোকে আপদে বিপদে পড়ে। অসুখ বিসুখেরও একপ্রকার চুম্বকশক্তি আছে। নূপুর তলে তলে গুপ্ত জালে জড়িয়ে পড়েছে। গুপ্ত মহাশয়ের জালে। সে জাল কাটাতে পারা তার সাধ্যের বাইরে। ততখানি মনের জোর তার নেই।

তার প্রয়োজন ছিল একটি ইচ্ছার ক্রিয়া। যে-ক্রিয়া একান্ত কঠিন। সে যদি তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে একটিবার বলতে পারত, "চাইনে আমার ধনসম্পদ", যদি বলতে পারত, "যাতে আমাকে অমৃত না করবে কী হবে তা নিয়ে", তা হলে সব সমস্যা জল হয়ে যেত। স্বাস্থ্য ফিরত। আয়ু বাড়ত। জীবনের স্বাদ মিলত। যখের মতো পরের ধন আগলাতে গিয়ে জীবন নষ্ট হতো না। বোঝে এ কথা নূপুর। বোঝে বলেই তো আরো ভোগে। তার ইচ্ছাশক্তি পক্ষাঘাতে অসাড়। সে অসহায়ের মতো চেয়ে আছে নিজের দিকে। হায়! কেউ কেন তাকে বাঁচায় না!

সুমন্তকেই আসতে হলো আবার উড়ে। এক মাসের ছুটি নিয়ে। দার্জিলিংয়েই বাসা নিতে হলো। এবার সে মনস্থির করে এসেছিল যে, নূপুরকে ওর ভাগ্যের হাতে একা ছেড়ে দিয়ে যাবে না। দরকার হলে নিজেই চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ওর কাছাকাছি থাকবে, আর কিছু করবে। জাপানের একটা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল। সব দেশে ওদের সংবাদপ্রেরক আছে। প্রকৃতপক্ষে ওটা আন্তর্জাতিক। ওটা কারো মুনাফার জন্যে নয়।

এই এক বছরে সুমন্তর যা পরিবর্তন হয়েছিল তা দৃঢ়তার দ্যোতক। তার প্রায় চল্লিশ বছরের জীবনে সে দু' দু'বার দাগা পেয়েছিল। একবার তো নূপুরের বিয়েতে। দ্বিতীয়বার তার পত্নীর সঙ্গে বিচ্ছেদে। এর ফলে তার বিশ্বাস ভেঙে গেছল। নারীর উপর বিশ্বাস। নিজের উপর বিশ্বাস। সে নিজে মানুষের মতো মানুষ হলে, পুরুষের মত পুরুষ হ'লে, এমন অপদস্থ বার বার হতো না। কিন্তু কোথায় তার নিজের দোষ তা সে বহুদিন আত্মপরীক্ষা করেও পায়নি। বরাতকেই দোষী করেছে। শিভ্যালরি বশত নারীকে দোষ দেয়নি। অথচ নারীর প্রতি আস্থা ফিরে পায়নি। আকস্মিক-ভাবে নূপুরকে পুনরাবিষ্কার করে তার ভাবান্তর ঘটে। জাপানে গিয়ে পুরো এক বছরকাল ভাবে। ভাবতে ভাবতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে জীবনটাকে ভাঙতে দেওয়া চলবে না, গড়তে হবে আবার। নারীর হাত না লাগলে গড়ে উঠবে না জীবন। নতুন কোনো নারী নয়, ওই পুরাতন নূপুর।

সুমন্ত লক্ষ্য করল যে, নূপুর ঠিক নারাজী নয়। নিমরাজী। এক বছরে এত দূর অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এর চেয়ে বেশী অগ্রসর হবে না, যদি না ওর যখের ধনের মায়া কাটে। মায়া যদি একটা রজ্জু হতো তা হলে খড়্গ দিয়ে তাকে ছিন্ন করা যেত। কিন্তু এ হলো অদৃশ্য বন্ধন। এর প্রতি লেশমাত্র মমতা থাকতে মুক্তি নেই। এ বন্ধন তো আছেই, এর উপর রয়েছে শপথভঙ্গের বিভীষিকা। কী জানি, কী অমঙ্গল হবে। ইহকালে ও পরকালে। এ বিভীষিকা থাকতে শান্তি নেই। বিবাহ করেও কি সুখ আছে!

তা হলেও সে হাল ছেড়ে দেবে না। নূপুরের দুরবস্থা তাতে বাড়বে। বজ্র আঁটুনি ওকে বাঁচতে দিচ্ছে না। সম্পত্তির মোহ মানুষকে ক'দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে! আর ঐ যে শপথভঙ্গ ঘটিত অন্তর্বিরোধ—প্রাণ চায়, সংস্কার না চায়—ও যে ওকে তিলে তিলে মারছে। বিবেকের ছদ্মবেশ পরে এসেছে সুলভ একটা সংস্কার। সেটাকে মারাত্মক করেছে ভারত নারীর চারিত্র্য এবং ঐতিহ্য বলে কথিত স্বামীকুলের সুবিধাবাদ। ঐহিক ও পারত্রিক স্বার্থ। বিড়ম্বিতা নারী বিড়ম্বনাকেই নোঙর মনে করে আঁকড়ে ধরে থাকবে, তলিয়ে যেতে যেতে। সুমন্ত তা হতে দেবে না। সাধ্যমতো প্রতিরোধ করবে।

প্রতিদিন তাদের দু'জনের দেখা হয়। একসঙ্গে বেড়ায় দু'জনে। কথাবার্তা ফুরয় না। চাটুজ্যেরা জানেন ও বোঝেন ওটা কথাবার্তা নয়, সংগ্রাম। হাসি তামাসা করেন না। দূরে দূরে থাকেন। নূপুরের সহযোগিনীরাও। মত আছে তাঁদের সকলেরই। কেউ এ বিয়েতে অন্যায় কিছু দেখেন না। কিন্তু মনঃস্থির করতে হবে নূপুরকেই।

"আমি যে কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছিনে, সুমন।"

"তা হলে আরো সময় নাও। আমি জাপান ফিরে যাই।"

"না। না। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।"

"আমিও কি পারব! তবু ছেড়ে থাকতেই হবে। নইলে কোনো দিন তুমি মনঃস্থির করতে পারবে না। কেবলি গড়িমসি করবে।"

"না। না। তুমি যেয়ো না। যেয়ো না আমাকে ছেড়ে।"

"তবে চলো আমার সঙ্গে।"

"না। না। আমার যে ভয় করে।"

৪

অবশেষে সত্যিসত্যি ওদের বিয়ে হয়ে গেল। সিভিল ম্যারেজ। চাটুজ্যেরা একটা রিসেপশন দিলেন বাছা বাছা কয়েকজন বন্ধু বন্ধুনীকে। তাঁরাই যেন বরকর্তা ও কন্যাকর্ত্রী। অনেক দিনের চাপা রসিকতা এক দিনে ফেটে পড়ল। নূপুরের সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া হলো। তা দেখে চ্যাটার্জি বললেন, "কিন্তু আমি ভাবছি ওর গালে সিঁদুর দিল কে? সুমন্ত নয় তো?"

বিয়ের রাত্রে সুমন্ত আশা করেছিল নূপুর সুখী হবে, সুখী করবে। কিন্তু শয্যায় গিয়ে দেখল নূপুর কাঁদছে। সে কী কান্না! আকুলি ব্যাকুলি হয়ে অঝোর চোখে কান্না। ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। যেন বুক ফেটে গেছে বা যাচ্ছে।

দেখেশুনে সুমন্তরও কান্না পায়। সেও চোখের জল ফেলে। এমনি করে কে জানে ক'ঘণ্টা কাটে। কান্নার ম্যারাথন রেস আর কি! বিলকুল নন্-স্টপ। যেমন দার্জিলিংয়ের বৃষ্টি। এ কি তিন দিনের আগে থামবে!

সুমন্ত বলল, "জানি তোমার অনুশোচনা হচ্ছে। যখের ধন গেছে, কিন্তু শপথভঙ্গ এখনো তো ঘটেনি। অত আকুল হয়ে কাঁদছ কেন? আমি এখনি খাট থেকে নেমে যাচ্ছি। কালকেই জাপানের পথে রওনা হব। তুমি চাও তো এ বিয়ে ভেঙে দিতে পারো। দোষ আমাকেই দিয়ো। অপবাদ মাথায় নিতে নিতে আমার মাথায় কড়া পড়ে গেছে। গণ্ডারের চামড়া। লাথি খেতে খেতে আমি ঘাগী হয়ে গেছি। তোমার মান যাতে থাকে তাই করো। বুঝিয়ে বললে ট্রাস্টিরা যখের ধন ফিরিয়ে দেবে।"

সুমন্ত নেমে যাচ্ছিল, নূপুর তার হাত ধরে বলল, "ওগো, যেয়ো না। তুমি যেয়ো না। তুমি গেলে আমি বাঁচব না। মরে যাব।"

তার ক্রন্দন হঠাৎ থেমে গেল। তার নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়তে থাকল। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ। কিন্তু অন্ধকারে চোখে পড়ল না সুমন্তর। কী যেন সে বলতে চায়। সঙ্কোচে বলতে পারছে না। চুপ করে রয়েছে।

সুমন্ত বলল, "নূপুর, আমি তোমার জীবন থেকে এক বার সরে গেছলুম। আবার সরে যাব। ভেবে দেখছি তোমার জীবনে আমার ঠাঁই নেই। আমি উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। আমাকে উড়ে যেতে দাও। কেঁদো না, লক্ষ্মীটি।"

নূপুর বলল, "আমি কি কাঁদছি? আমি তো কাঁদছিনে।"

"এই তো এতক্ষণ ধরে কাঁদছিলে। রাত বোধ হয় তিনটে বাজল। ঘুমোবে না? ঘুমোতে দেবে না?" সুমন্ত হাই তুলতে তুলতে বলল।

নূপুর সুমন্তর বুকে মুখ গুঁজে বলল, "না।"

"এ তো ভ্যালা বিপদ! কী যে করি তোমায় নিয়ে! কী যে তুমি চাও! কী যে তোমার মনের সাধ! দয়া করে বলবে কি একটি বার?"

নূপুর বলল না। তবে বুঝতে দিল যে মেঘের কোলে রোদ হেসেছে।

সুমন্ত তাকে একটু আদর করে বলল, "আমি জানি তুমি শপথভঙ্গ করবে না। আমিও তোমাকে বাধ্য করব না। এসো, তা হলে এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে আমরা একসঙ্গে থাকি। বন্ধুর মতো, বন্ধুনীর মতো। আমরা পরস্পরের সাথী।"

নূপুর সহসা বলে উঠল, "ওগো, তা নয়। ওগো, তা নয়।"

সুমন্ত উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল, "তবে কী? তবে কী! তবে কেন অত কাঁদছিলে?"

নূপুর তাকে দুইহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আধো আধো স্বরে বলল, "ওগো, তুমিও কি যোগী হবে?"

পুলকে ও বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে ক্ষণকাল নির্বাক থাকল সুমন্ত। আবিষ্কারকের মতো উল্লাসভরে বলল, "ওঃ এইজন্যে এত কান্না! যোগী! আমি হব যোগী!"

আবার কী মনে করে প্রিয়াকে আতঙ্কিত করে তুলল এই বলে, "হাঁ, হাঁ, যোগী হব আমি। যেমন তেমন যোগী নয়, মহাযোগী।"

তার পর নিজেই আতঙ্কিতার আতঙ্ক কুমারসম্ভবের মহাদেবের মতো।"

উত্তরে নর্মদা নদ এবং দক্ষিণে তাপ্তি নদী বেষ্টিত সাতপুরা পর্বতমালা মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক (নর্মদা-উৎস) হইতে পশ্চিমঘাট অবধি সুদূর প্রসারিত। সাতপুরা ও তাহার সমান্তরাল বিন্ধ্য-পর্বতমালা এবং মধ্যবর্তী নর্মদা-তাপ্তি অববাহিকা যেন ভারতবর্ষের দীর্ঘ হৃদরেখা রচনা করিয়াছে। পূর্ব-সাতপুরা অন্তর্গত পাচমারি ও মহাদেব পর্বতাঞ্চল ভারতীয় ভূতত্ত্বে 'উপর-গণ্ডোয়ানা' নামে পরিচিত। লাল ও হলুদ বর্ণের বালুপাথরের বিরাট খাড়াই পর্বতমালা বেষ্টিত এক মালভূমির উপর পাচমারি শৈলবাসটি (উচ্চতা ৩৫০০ ফিট) অবস্থিত। আমাদের সাতপুরা পর্যটন এই পাচমারি কেন্দ্র করিয়া।

হোসাঙ্গাবাদ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত মধ্যপ্রদেশ সরকারের এই গ্রীষ্মাবাসটির প্রাকৃতিক দৃশ্য ও আবহাওয়া অতি রমণীয়। ইহা তেমন জনবহুল নয় তবে গ্রীষ্মাবকাশে উপত্যকাবাসীরা এখানে আসিয়া সাময়িকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। পাচমারি পৌঁছাইবার দুইটি প্রশস্ত পথ আছেঃ একটি নাগপুর হইতে ছিন্দওয়ারা হইয়া, অপরটি জব্বলপুরের পশ্চিমবর্তী পিপারিয়া রেল স্টেশন হইতে। এই দুইটি পথ মাটকুলিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। মাটকুলি হইতে পাচমারি মাত্র ১৮ মাইল পথ এবং পিপারিয়া হইতে পাচমারির দূরত্ব মোট ৩২ মাইল মাত্র। এই দুইটি পথেই পরিবহনের ব্যবস্থা আছে।

পাচমারি শৈলাবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম এক বন্ধুগৃহে। নৃতত্ত্বে ও প্রত্নতত্ত্বে অনুশীলন করা বন্ধুটির বিশেষ শখ এবং তাঁহারই সহযোগিতায় পাচমারির নিকটবর্তী চিত্রিত গুহা ও প্রস্তরাশ্রয়গুলি দর্শন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সাতপুরা পর্যটনে আমার সহযাত্রী ছিলেন নৃতত্ত্বের একজন অধ্যাপক এবং ভূবিদ্যার একজন অধ্যাপক। আমরা চারজন পর্যটক মিলিয়া একটি ছোট রকমের অভিযান সৃষ্টি করিয়াছিলাম। বোম্বাই আর্ট স্কুলের একটি ছাত্রও আমাদের এই অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি পাচমারি পর্বতমালা সাতপুরার অন্তর্গত। এই পর্বতমালার অন্যতম এবং উচ্চতায় প্রধান—ধূপগড় পাহাড় (৪,৪২৯ ফিট) হইতে বিস্তীর্ণ নর্মদা উপত্যকা ও বিন্ধ্যপর্বতমালার মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে নীলগিরির মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে ধূপগড় একটি উচ্চতম শৃঙ্গ। সাতপুরার দ্বিতীয় উচ্চতম মহাদেব পর্বত (৪,৩৫৮ ফিট) ও তৎসংলগ্ন মহাদেব গুহা হিন্দুদের একটি তীর্থ। ধূপগড় ও মহাদেব পর্বত ব্যতীত চৌরাগড়, মরদেও, ল্যান্সডাউন প্রভৃতি উচ্চ পর্বত ও প্রবণ ভূমি হইতেও পূর্ব-সাতপুরার বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখা যায়। পাচমারির প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বিশেষত্ব—তাহার প্রবণভূমি, তাহার খাড়াই নগ্ন পর্বতগাত্র, তাহার বিচিত্র গুহা ও প্রস্তরাশ্রয়গুলি এবং পশুপক্ষীপূর্ণ ঘন অরণ্য—এক কথায় প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে ও দ্রষ্টব্য বিষয়বস্তুর সমারোহে সাতপুরার এই প্রবণভূমি শিকারী ও পর্যটকের ভূস্বর্গ।

পাচমারি নামটি সম্ভবতঃ পঞ্চমাটি বা

পাচমারি শৈলাবাস

পঞ্চপাণ্ডব গুহা
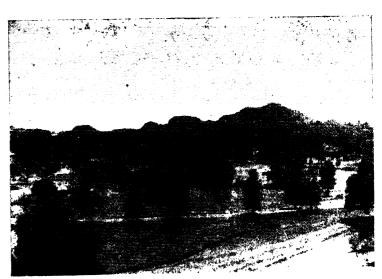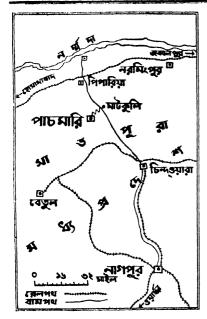
পঞ্চবাটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কথিত আছে, একদা পঞ্চপান্ডব তাঁহাদের নির্বাসন কালে ভ্রমণ করিতে করিতে এই পার্বত্য অঞ্চলে আসেন এবং পাঁচটি প্রস্তর গুহায় বসবাস করেন। পাচমারির নিকটেই এক জায়গায় এক সারি পাঁচটি গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই পান্ডবগুহা নামে খ্যাত। স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে পাচমারির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন ক্যাপ্টেন ফরসাইথ্ নামে একজন ইংরাজ, *যিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সাতপুরার অরণ্য অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করিতে যান। তখন পাচমারি মালভূমিটি এক কোর্কু জাইগীরদারের অধিকারে ছিল। মধ্যপ্রদেশের সাতপুরার এই পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চল গোন্দ্, কোর্কু প্রভৃতি আদিবাসীদের বাসভূমি।

ভরথীডিপ গুহা

পাচমারির বিরাট বেলেপাথর আয়সকনীয় ও অভ্রময় বলিয়া এখানকার পার্বত্য দৃশ্য নানা রঙে বৈচিত্র্যময়—বিশেষ করিয়া বৃষ্টির পর এই বিরাট বেলেপাথরগুলি লাল, হলুদ ও বাদামী প্রভৃতি রঙবেরঙে যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। যুগে যুগে শীতে উত্তাপে জলবৃষ্টিতে বেলেপাথরের এই সুন্দর পর্বতমালা ও প্রবণভূমি নানা বিচিত্র আকারে রূপায়িত হইয়াছে—কোথাও যেন জাফরী বা জালির সূক্ষ্ম কাজ, কোথাও যেন মৌচাকের আকার, কোথাও গোম্বুজ বা স্তম্ভের মত যেন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, কোথাও বিরাট ফাটল ও গহ্বর অথবা গুহাকন্দর, আবার কোথাও বিরাট খাড়াই ও খড্। বাস্তবিকই প্রকৃতির এই অদ্ভুত ভাস্কর্য পাচমারির পার্বত্য দৃশ্যকে বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর করিয়াছে। পাচমারির গিরিকন্দর-গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রস্তর-ফাটল বা প্রস্তরগ্রন্থি বাহিয়া বর্ষার জল বহু দূর নিম্নে গিয়া ফাটলগুলি প্রশস্ত করিয়া এই সকল গিরিকন্দর সৃষ্টি করিয়াছে। মহাদেব ও মরদেও গুহা, ছোট মহাদেব, জটাশঙ্কর, বুনিয়াবেরি, রিচ্‌গড়, ভরথীডিপ প্রভৃতি গুহা-কন্দরগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য এবং প্রত্যেকটি আপন বৈচিত্র্যে অদ্ভুত সুন্দর। কোন কোন গুহাভ্যন্তরে, যেমন জটাশঙ্কর গুহায়, বৃষ্টিজলের দ্বারা যেমন গুহাছাদ হইতে বিলম্বিত ক্ষুদ্র প্রস্তর-কণাকার সৃষ্ট হইয়াছে, তেমনি গুহামেঝেতে শিবের জটার মত প্রস্তরাকার সঞ্চিত হইয়াছে। কোন কোন গুহায় বা প্রস্তর-ফাটলে গভীর জলাশয় অথবা জলপ্রপাত সৃষ্ট হইয়াছে।

আমাদের দৈনন্দিন পর্যটনে এই প্রাকৃতিক গিরিকন্দর এবং প্রস্তরাশ্রয়গুলি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। আকর্ষণ শুধুমাত্র যে ইহাদের বিচিত্র অদ্ভুদাকার গড়ন গঠন তাহা নয়—আমাদের নিকট প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল ইহাদের চিত্রিত গাত্র—কত রকম ও রীতির চিত্রণ ও তক্ষণ তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া শক্ত। নানা ঘটনা, শিকার, যুদ্ধ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, নানা ঘরোয়া দৃশ্য, নানা রূপক, সঙ্কেতচিহ্ন ও কাল্পনিক আকৃতি প্রকৃতি গুহাগাত্রে বা প্রস্তরাশ্রিত পর্বতগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। বেশীরভাগ চিত্রে সাদা রঙ-এর সাহায্য লওয়া হইয়াছে, লাল ও পীতাভ শ্বেতবর্ণের এবং বহুবর্ণের নানা চিত্রণও দেখা যায়। কোন কোন গুহাগাত্রে একটি চিত্রণের উপর আর একটি চিত্রণ অধিশায়িত দেখা যায়—এইরূপ কয়েকটি চিত্রণের উপর চিত্রণের বিভিন্ন রঙগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তলার চিত্রণ লাল বা পীতাভ রঙ-এর এবং সেগুলি উপরের সাদা রঙ-এর চিত্রণের তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রাচীন।

ধুপগড়

আমরা যে কয়েকটি চিত্রিত গুহা ও প্রস্তরাশ্রয় দর্শন করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: উত্তরদিকে নিম্বুভোজ ও নিম্বুখড্, উত্তর-পূর্বে বুনিয়াবেরি গুহাবলী, উত্তর-পশ্চিমে জম্বুদ্বীপ, পশ্চিমে ভরথী ডিপ গুহাবলী, রোসা পর্বত ও রিচ্‌গড় এবং দক্ষিণে মহাদেব পর্বতগাত্র। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি সহজগম্য, কিন্তু কয়েকটি প্রায়-অনতিগম্য ও বিপদসঙ্কুল। আমাদের নিত্য পর্যটনে

প্রস্তরগাত্রে চিত্রণ (নিম্বুভোজ)

* ক্যাপ্টেন ফরসাইথ্ লিখিত HIGHLANDS OF CENTRAL INDIA দ্রষ্টব্য।

কয়েকটি গুহাকন্দর পৌঁছিতে পিচ্ছিল খাড়াই-এ উঠিতে বা খাদে নামিতে হইত, কিন্তু আমাদের এই পরিশ্রম ক্লান্তিকর ছিল না, বরঞ্চ রোমাঞ্চকর ও সার্থক ছিল। আমরা যেন নিত্যনতুন গুহাচিত্রণ আবিষ্কার করিতেছিলাম এবং তাহার আনন্দ ও বিস্ময় আমাদের পর্যটন সার্থক করিয়াছিল।

কয়েকটি গুহাগাত্রে শিকার ও যুদ্ধের চিত্রণগুলি অতি সুন্দর। যুদ্ধের দৃশ্য একদিকে যেমন ধনুকবান সহযোগে একদল, অপরদিকে ঢাল বল্লম কুঠারধারী আর এক দলের যুদ্ধবিগ্রহ চিত্রিত করা হইয়াছে। বর্শাবল্লমধারী অশ্বারোহী যোদ্ধার চিত্রও দেখা যায়। এই চিত্রণগুলি দেখিয়া মনে হয় যেন একদিকে আদিবাসীদল, অপরদিকে কোন উন্নত যোদ্ধার দল যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতেছে। কিংবদন্তী আছে যে, একদা আদিবাসী ভীলরা এই অঞ্চলে বসবাস করিত এবং যখন পান্ডবগণ এখানে আসেন, তখন ভীল ও পান্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং ভীলরা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। চিত্রগুলিতে এই দুই দল যে বিভিন্ন সংস্কৃতি বা সভ্যতাভুক্ত তাহা সুস্পষ্ট। পশ্চিম ইউরোপ বা দক্ষিণ আফ্রিকার গুহাচিত্রণের মত এগুলি যে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগের নয় তাহা ভাবিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। প্রথম, তীরধনুকের সহিত লোহ বা ধাতব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, দ্বিতীয় আধুনিক জীবজন্তুর চিত্র এবং সাজসজ্জা, দ্রব্যসম্ভার এবং নিত্যজীবনের চিত্রও আধুনিক ধরনের। এই চিত্রগুলি দর্শন করিয়া আমাদের ধারণা যে অধুনা বিগত কোন ঐতিহাসিক যুগে, কয়েকশত বৎসর পূর্বে কোন আদিবাসীরাই এই চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছে। কিন্তু সঠিক কোন্ কালের এই চিত্রগুলি তাহা বলা শক্ত। এই বিষয় পরে আলোচনা করিব।

শিকারের দৃশ্যগুলিও অতি নিখুঁতভাবে অঙ্কিত। যে সকল জীবজন্তু চিত্রিত তাহা আজও মধ্যদেশের অরণ্য অঞ্চলে দেখা যায়। পাচমারী ও নিকটবর্তী বনভূমিতে বন্য বৃষ, হরিণ, সম্বর, বন্য কুকুর, নেউল, সজারু, ব্যাঘ্র, চিতা, হায়না, ভল্লুক, বানর, খরগোস, ময়ূর প্রভৃতি জন্তু দেখা যায়। পাচমারির নানা গুহাগাত্রে যে সকল জীবজন্তু চিত্রিত হইয়াছে তন্মধ্যে বন্য বৃষ, হস্তী, ব্যাঘ্র, চিতা, হরিণ, বানর, ভল্লুক, খরগোস, সজারু, কুমীর, বন্য মোরগ ও ময়ূর উল্লেখযোগ্য। বুনিয়াবেরি গুহাগাত্রে ছোট বড় বানরের দল (সংখ্যায় ৪৫) চিত্রিত হইয়াছে। একটি দৃশ্যে বানর শিকারের একটি সুন্দর চিত্রণ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অন্যান্য শিকার চিত্রগুলির মধ্যে বন্য বৃষ, ব্যাঘ্র ও হরিণ শিকার বিশেষ দ্রষ্টব্য। মহাদেব পর্বতগুহো-

বুনিয়াবেরি গুহাগাত্রে চিত্রিত একটি বানর শিকারের দৃশ্য
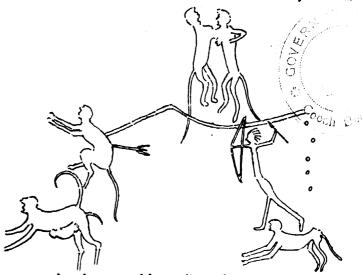
ডরথীডিপ গুহাগাত্রের একটি চিত্রণ

মহাদেব পর্বতগাত্রে অশ্বপৃষ্ঠে ব্যাঘ্র শিকারের চিত্র
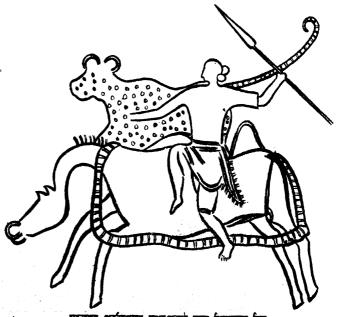
বুনিয়াবেরি পর্বতাশ্রয়ে চিত্রণ

গাত্রে অশ্বপৃষ্ঠে হইতে চিতাবাঘ শিকারের রঙিন (লাল) চিত্রটি অতি সুন্দর। প্রায় প্রতি চিত্রিত গুহায় নানা জীবজন্তুর চিত্রই বেশী দেখা যায়। মধু আহরণ ও ফল আহরণের কয়েকটি সুন্দর চিত্রণ দেখা যায়। নিম্বুভোজ গুহায় এবং আরো দুই একটি গুহাগাত্রে কাল্পনিক বা মায়িক মূর্তি বা বস্তুর চিত্রণ দেখা যায়, তন্মধ্যে যেমন নিম্বুখড় গুহাগাত্রে অশ্বমুণ্ডধারী অথবা শৃঙ্গধারী মনুষ্যাকৃতি উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি সুন্দর গোচারণের দৃশ্য চিত্রিত দেখা যায়। 'মাউণ্ট রোসা' গুহাগাত্রে গোচারণের একটি দৃশ্যে ব্যাবিলনীয় শিল্পে সুপরিচিত 'গীলগমেশ'এর অনুরূপ আকৃতি চিত্রিত দেখা যায়। এই সকল নানা ধরণের চিত্র বিচিত্রিত গুহা ও প্রস্তরাশ্রয়গুলি দেখিতে দেখিতে মনে হইত আমরা যেন কোন বিচ্ছিন্ন নতুন চিত্রজগতে প্রবেশ করিয়াছি।

জম্বুদ্বীপ পর্বতগাত্রে যুদ্ধের দৃশ্য

কর্নেল গর্ডন নামে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক পাচমারির এই গুহাচিত্রগুলি পরীক্ষাপূর্বক চিত্রণগুলির রং, রীতি ও বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া ক্রমপর্যায়ে চারিটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রণগুলি স্থূল ও প্রাচীন এবং তৃতীয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। মোটামুটি, লাল ও চতুর্থ শ্রেণীর চিত্রনগুলি পরিণত ও পীতাভ শ্বেতবর্ণের চিত্রণগুলি অধিকাংশ প্রাচীন এবং শ্বেতবর্ণের চিত্রণগুলি আধুনিক। গর্ডন সাহেবের মতে চিত্রণগুলির মোটামুটি বয়সকাল খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতক হইতে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত। সব চিত্রণগুলি একই কালের নয়। চিত্রণগুলি লক্ষ্য করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, যে লাল রং-এর চিত্রণগুলি প্রাচীনতম কিন্তু খুব বেশী হইলেও সম্ভবতঃ তাহারা সাত আটশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নয়। সাদা রং-এর চিত্রণগুলি মনে হয় আধুনিক এবং তিন-চারিশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নয়। ডরথিডিপ ও মহাদেব গুহাগাত্রে দুইটি শিলালিপি আছে, যেগুলির অক্ষর নাকি নাগরী অক্ষরের অনুরূপ এবং গর্ডন সাহেবের মতে ইহা সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতক খৃষ্টাব্দের। অবশ্য এই তারিখগুলি অধিকাংশই অনুমান মাত্র। বলা বাহুল্য, এই চিত্রণগুলির নিখুঁৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক এবং গুহাভ্যান্তরে গুহামেঝেগুলিও বৈজ্ঞানিকভাবে খনন করা প্রয়োজন। কারণ অনেক ক্ষেত্রে গুহামেঝের তলে প্রাচীন মানুষের বসবাসের নানা প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ব-সাতপুরার রমণীয় প্রবণভূমিতে লীলাপ্রকৃতি এই যে বিচিত্র বহুরূপ ধারণ করিয়াছে তাহা দেখিয়া পর্যটকমাত্রেই পরম বিস্মিত ও আনন্দিত হইবেন। যেমন ভূপৃষ্ঠে, তেমনি ভূনিম্নের রহস্যময় গিরিকন্দরে কারুকার্যখচিত প্রাকৃতিক কীর্তিকলাপ—কোথাও খাড়াই কোথাও খদ্, কোথাও আকস্মিক জলপ্রপাত, কোথাও অর্ধচন্দ্রাকারে ছাদ, কোথাও গোলাকার ফাটল বাহিয়া আলোর রেখা—গুহার পর গুহা—এক হইতে আর একটি এমনই—'ক্যাটাকোম্ব্'এর আকৃতি—দেখিয়া মনে হয় যেন কোন পাতালপুরীতে কোন্ রত্নের সন্ধানে আসিয়াছি। উপরের পৃথিবী হইতে নামিয়া নীচের পৃথিবীতেও লীলাপ্রকৃতির রহস্যদর্শনে পর্যটক সত্যই রোমাঞ্চিত হইবেন। উপরে নিম্নে প্রস্তরের এই বিচিত্র ভাস্কর্য এবং প্রস্তরগাত্রে প্রাচীন মানুষের লীলাকীর্তির চিত্রণ—এই দ্বিবিধ ঐশ্বর্য সাতপুরার এই প্রবণভূমিকে অনুপম ও অনন্য-

পর্বতগাত্রে আরেকটি যুদ্ধের দৃশ্য

সাধারণ করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, পর্যটন-সার্থক এই পটভূমি—এই সুন্দর পাচমারি শৈলাবাসটি উপেক্ষিত ও অবহেলিত এবং ইহার উন্নয়নে মধ্যপ্রদেশীয় সরকার ও তথা ভারতীয় পর্যটন-বিভাগ তেমন সচেষ্ট নয়। এখানে ভাল হোটেল বা বিশ্রাম-ভবনের অভাব এবং পরিবহন ব্যবস্থাও অনুন্নত। চিত্রিত গুহাগুলির সংরক্ষণ, নিরাপদ পথের দ্বারা বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানগুলির সংযোগ স্থাপন, পান্থশালা ও ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং পরিবহনের সুব্যবস্থা প্রভৃতি আধুনিক সংস্কার সাধন করিলে ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর শৈলাবাসে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই। পাচমারির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা অনেকেরই জানা নাই। প্রচারিত হইলে দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সরকারের আয়ও বৃদ্ধি পাইবে।

রোমান্স” জিনিসটা চিরকালের। তবে দেশ কাল ও পাত্র ভেদে তার ধরনটা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়।

আমার এই কাহিনী এমন এক প্রেমের কাহিনী, যে-কাহিনীর নায়িকার বয়স তেরো বৎসর। মেয়েটির নাম বিজয়িনী, ডাক নাম বিজু।

আট বৎসর বয়সেই বিজুর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল; বাবা ছিলেন সরকারী বড় চাকুরে, তাই তাঁকে দেশে দেশে বেড়াতে হত, বিজুও বাপের সঙ্গে নানা দেশ বেড়িয়েছে। শ্বশুরবাড়ি বাংলা দেশের এক পল্লীগ্রামে। বিয়ের চার বছর পরে সে একবার শ্বশুরবাড়ি এসেছে, আর এসেই সে তার স্বামীর প্রেমে পড়ে গিয়েছে।

স্বামীর সঙ্গে প্রেমে পড়া, এটা অবশ্য একটা নূতন কথা, কেন না বিয়ের মন্ত্রই হচ্ছে ‘যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম।’ সুতরাং হিন্দু বিবাহমন্ত্রই যখন প্রেমের গ্রন্থিবন্ধন তখন নূতন করে আবার প্রেমে পড়ার কথাই উঠতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল, কেন না বিয়ের পর বিজুর সঙ্গে তার স্বামী বিনয়ের খুব কমই দেখা হয়েছে, আবার যদি বা দেখা হয়েছে সে কথা বিজুর বিশেষ মনেই নেই।

পশ্চিমে থেকে থেকে বিজুর স্বভাবটা এমন হয়েছিল যে সে বাঙ্গালীর ঘরের বৌ হয়ে কি করে যে একগলা ঘোমটা টেনে একেবারে ভাল মানুষটি হ'য়ে থাকবে বিজুর মা সে কথা ভাবতেও পারতেন না। তাই যখন বিজুর শ্বশুরবাড়ি যাবার পর তিনি তাঁর বেয়ানের পত্রে জানলেন যে, ‘বিজু বড়ই সরল ও লক্ষ্মীমেয়ে’ তখন তাঁর মন অনেকটা হাল্কা হল। কিন্তু শাশুড়ী একথাও লিখেছেন “পশ্চিমে থেকে বাংলা দেশের আদব কায়দা কিছু শেখেনি সেজন্য ভাববেন না, দু'দিনেই সব শিখে নেবে।”

বিজুর শ্বশুর বাড়ি গ্রাম্য জমিদারের বাড়ি। শ্বশুর—জেলার বড় উকিল, কিন্তু ছেলেরা কেউই বিদ্বান নয়। বিজুর স্বামীর বয়স বাইশ বৎসর, কিন্তু সে এনট্রান্স পাশ করার পর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে গ্রামের ছেলেদের মোড়লগিরি করছে। চাষীদের সঙ্গে তার বিষম ভাব, এমন কি মাঠে গিয়ে মাঝে মাঝে লাঙ্গল চষেও দেয়। চাষীরা বলে, “ন বাবুর মত আর মানুষ হয় না, ও'কে তো দ্যাবতা বললেই হয়।” কিন্তু বাড়িতে তার উৎপাতে বৌ ঝিরা সব সময় তটস্থ থাকে, কোন সময় তার কি খেয়াল হয় কে জানে। তাই বিজয়িনী শ্বশুর বাড়ি এলে মেজবৌ একদিন বলেছিল, “এবার তো নবৌ আসছে, এবার তুমি জব্দ হবে, তার সঙ্গে এমন করে লাগতে পারবে না।” এখন এক পারিবারিক নাটক অভিনয়ের দৃশ্যের বর্ণনায় আসছি।

১২৫১ সাল। তখনকার দিনের একান্নবর্তী পরিবার। দরদালানে একসঙ্গে প্রায় চল্লিশ জন খেতে বসেছে, খুড়তুতো, জেঠতুতো, পিসতুতো ভাইয়েরা, ভাগনে এবং শ্যালকও আছে, গুরুজনদের মধ্যে আছেন ছোটকাকা ও পিসেমশাই। বধূরা এবং মেয়েরা পরিবেশন করছে, গৃহিণী আছেন রান্নাঘরে।

পরিবেশনে বিজুর খুবই উৎসাহ। মাছের থালায় দু' হাতই জোড়া, তাই মাঝে মাঝে তার ঘোমটা সরে যাচ্ছে। মেজো ননদ এসে মাঝে মাঝে ঘোমটা ঠিক করে দিচ্ছেন। গৃহিণীর আদেশ নবৌকে কিছু বলা চলবে না তবে সহবত অবশ্য শিখিয়ে দিতে হবে।

বিজুর স্বামী বিনয় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, “মেজদা, দেখ, বড় মুড়োটা দেখছি আমারই পাতে পড়েছে। তোমরা কখানা করে মাছ পেয়েছো দেখি, আমার পাতে দেখ বড় বড় পাঁচখানা মাছ।”

মেজদাদা বললেন, “বিনয় থাম দেখি। বড় মাছটা তুইই তো ধরেছিলি তবে মুড়োটা তোর পাতে পড়বে না কেন?”

বিনয় বললে, “পরিবেশন করছে কে, ও নবৌ বুঝি? ঘোমটা দিয়ে আছে বলে আগে চিনতে পারিনি. আমি বলি বুঝি মেজবৌদি। তবে তো আমার পাতে থালা শুদ্ধ মাছই পড়বে। মা, মা, ওকে কেন মাছ পরিবেশন করতে দিলে।”

মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে বললেন, “বিনু, আবার কি নষ্টামী জুড়েছিস? কেন ওকে ওরকম করিস? আমিই তো বলেছিলাম তোর পাতে বড় মুড়োটা দিতে। কাল আবার অভয়কে দেব। পুকুরে কি মাছের অভাব হয়েছে?”

বিজয়িনী আড়ষ্ট, থালা হাতে করে দাঁড়িয়ে। তার চোখের জলে ঘোমটা ভিজে গিয়েছে। শাশুড়ী এসে তার হাত থেকে থালাটি নিয়ে বললেন, “ছিঃ, কাঁদে না, যাও মা হাত মুখ ধুয়ে এসো।”

মুড়োটি বিনয় খায় নি, পাতেই পড়ে আছে। সেজবৌ ফুস্ ফুস্ করে বললে, “দেখলে তো ভাই, নঠাকুরপো মুড়োটা নবৌয়ের জন্যে পাতে রেখে গেল।”

কথাটা শাশুড়ীর কানে গেল, বললেন, “পাতে রেখেছে তাতে হয়েছে কি? যাও মা, বিনুর পাতে গিয়ে বোসো। স্বামীর পাতের মাছের মুড়ো খেলে স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি হয়, সেজপিসিমা বলেন, শোননি?”

দু ঘণ্টা পরে। বিজয়িনী ডাঁসা পেয়ারার

সন্ধানে পেয়ারা গাছের তলায় গিয়েছে। গিয়ে দেখল বিনয় গাছতলায় দাঁড়িয়ে।

বিনয়কে দেখে বিজুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কাছে গিয়ে বললে, "আমাকে গোটা কতক পেয়ারা পেড়ে দেবে?"

বিনয় বললে, "গোটা কতক? ও বাবা, আম্বা তো কম নয় দেখছি। বল না কেন, গাছে যতগুলো পেয়ারা আছে সবই পেড়ে দাও।"

বিজয়িনীঃ "সব পেড়ে দিতে বোলবো কেন? সবগুলো তো আর ডাঁসা পেয়ারা নয়?"

বিনয়ঃ "আচ্ছা পেয়ারা পেড়ে দেব। তার আগে বল্ দেখি ঘাটে তোদের চুপি চুপি কি পরামর্শ হচ্ছিল?"

বিজুর মুখ মলিন হয়ে গেল। সে বললে, "ছাড়, মার ঘরে যাব, মা ডেকেছেন পাকা চুল তুলে দিতে।"

কিন্তু বিনয় জোর করে তার হাত চেপে ধরল, বললে, "সেটি হচ্ছে না। কি পরামর্শ হচ্ছিল না বল্‌লে ছেড়ে দেব না। বল, শিগ্‌গির বল পরামর্শটি কি? বন-ভোজন হবে? ও না, বোধ হয় চাষীদের খেজুর গাছের রস চুরি করা হবে, তাই না?"

বিজু বললে. "রস চুরি করবো কেন, তুমি ভারি বাজে কথা বল। রোজ তো এক কলসী করে জিরেন রস চাষীরা দিয়ে যায়।"

"তা হলে কি হবে, কৃষ্ণযাত্রা? হ্যাঁ এই-বার ঠিক ধরেছি।"

বিজু বললে, "তাই বুঝি, বেহুলার ভাসান তো করা হবে। দেখোনি সেদিন। কি সুন্দর বেউলার ভাসান গান করেছিল মুসলমান-পাড়ার ছেলেরা?" বলতে বলতে চমকে উঠল, "ওমা! কি হবে? দিদিরা যে বারণ করেছিল বল্‌তে?"

সন্ধ্যার সময় কোন কাজ থাকে না। রান্নার পাট দিনে দিনেই চুকিয়ে রাখা হয়, কেবল সময় মত গরম ভাতটি নামিয়ে নেওয়া, আর সেও রাত্রি দশটা এগারোটায়। কাজেই সন্ধ্যাতে প্রায়ই কড়ি খেলার আসর বসে, দশ পঁচিশ, ছক্কা পাঞ্জা, বাঘবন্দী খেলা। তার মধ্যে দশ পঁচিশই প্রধান খেলা। দশ পঁচিশের ঘরে ঘরে যে চারটি করে কড়ি বসানো হয় তার জন্য কত রং বেরংয়ের কড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে, আবার দানের সাতটি কড়িও বাছাই করা বড় বড় কড়ি।

কিন্তু আজ আর কড়ি খেলা নয়, আজ হবে বেহুলার ভাসানের গান। দরদালানের উপরের বড় ঘরটা তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করাই থাকে, কেবল একবার ঘরটা ঝাট দিয়ে পরিষ্কার করবার জন্য খোলা হয়। দেয়ালে বড় বড় ছবি আছে সেগুলোও মাঝে মাঝে মুছে পরিষ্কার করা হয়। চাবিটা থাকে ভাঁড়ার ঘরের তাকের উপর। আজ সেই ঘরেই বেহুলার ভাসান করা হবে।

বেহুলার ভাসানে কান্নার পালা অনেক আছে, আবার তার মধ্যে সং এনে হাসির খোরাকও জোগান দেওয়া হয়। মাথায় পাগড়ী বাঁধা রামসিং জমাদারের সে কি ভঙ্গী, সে কি লাঠি ঘুরোনো, যেন বাতাসের সঙ্গে লড়াই করছে। আবার যেই শুনেছে একটা "ম্যা'ও" শব্দ, অমনি "ডাকু আয়া, ডাকু আয়া" বলে তার পালানোর ভঙ্গিমা দেখে দর্শকেরা হেসে কুটি কুটি হ'য়ে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। তখনকার দিনে লোকের আমোদ বোধের বিশেষ প্রবণতা ছিল।

বেহুলার নৌকায় 'গোদা' গিয়ে উঠেছিল, বেহুলা যখন স্বামীর দেহ নিয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন কলার ভেলায় করে; নৌকা নয়, কলার ভেলা। সেই 'গোদা'কে নিয়েও সং দেওয়া হ'ত। গোদা পায়ে তুলো আর পাট জড়িয়ে 'গোদ' তৈরী করেছে, আর থপ্ থপ্ ক'রে হাঁটতে হাঁটতে গোদা-পা তুলে তুলে তার তিন বৌকে শাসাচ্ছে, "মার্‌বো এই গোদা পায়ের লাথি"। আবার গানও করছে নেচে নেচে

"আমায়, "গোদা, গোদা" করিসনে গোদা বড় ভাগ্যিমান।
গোদার ডোলে গরু, শামুখে ধান।"

একটা ছোট বাছুরকে ধান রাখা ডোলের ভিতর ক'রে নিয়ে এসেছে, আবার একটা শামুখে ধান ভরে এনেছে। সেই শামুখটা সকলের সম্মুখে তুলে ধরে বলছে "দ্যাখ্ তোরা আমার কত ধান; গোলায় আর কত ধানই ধরবে, আমার শামুখের ধানে সম্বৎসর ওড়ন্ ফোড়ন্, অতিথ-পতিত, এসো জন বসো জন সব কুলান হয়ে যাবে।" আবার বেহুলার নৌকা ধরবার জন্যে মাটিতে উপুড় হয়ে সাঁতারের অভিনয়।

এই অভিনয়গুলিই বিশেষ করে দর্শক-দের মন আকর্ষণ করত, তাই মাঠে ঘাটে গান শোনা যেত—

"গোদা গোদা করিসনে গোদা বড় ভাগ্যিমান।"
আজ গোদা সেজেছে সেজো বৌ, পায়ে তুলো
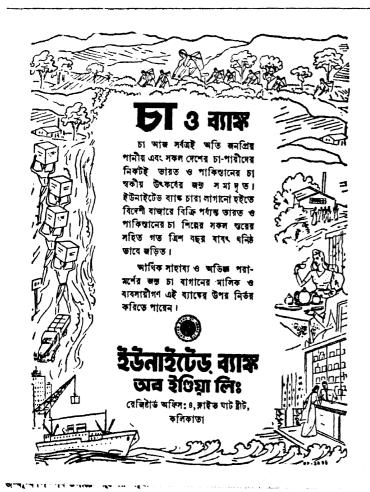
জমিয়ে গোদ করা হয়েছে, আবার শামুখে ধান ভরেও আনা হয়েছে কিন্তু ডোলটি খালি ডোল, বাচ্চুর তাতে নেই।

এদিকে রামসিং জমিদারবেশী মেজবৌ লাঠি ঘাড়ে পাঁয়তাড়া কসতে কসতে এমন এক লাফ দিয়েছে যে জানলার সার্সি ভেঙে চুরমার এবং ঠিক সেই সময়েই বিনয় ঘরের মধ্যে এসে হাজির।

অভিনয়কারিণীগণ এরপর যেভাবে লাঞ্ছিতা হলেন, তা বর্ণনা করা যায় না। দুজন দুজন করে চুলের বিনুনীতে বিনুনীতে বেঁধে এক এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিনয় বললে, "ঠিক এইভাবে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাক, তারপর ছুটি হবে।"

বিজু কোথায়? বিজুকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। সেই বিশ্বাসঘাতিনীই যে সমস্ত সন্ধান দিয়েছে তা বুঝতে কারও আর বাকি রইল না।

বেচারা বিজয়িনী! এই কাণ্ডর পর সে একেবারে একঘরে হল। তার সঙ্গে আর কেউই কথা বলে না সে সকলের পিছনে পিছনে বেড়ায়, কিন্তু কেউই তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

শাশুড়ি ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন, বললেন, "হল কি তোদের? বিজু অমন মুখ কালি করে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? রান্না ঘরের দুয়োর গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল, তোরা ওকে কাজে ডাকিস্‌নি বুঝি?"

সেজ মেয়ে বিমলা বললে, "না, ওকে আমরা আমাদের কোন কাজেই ডাকবো না। ও ভারী দুষ্টু, যে কথাটি হবে সেইটি গিয়ে ন-দার কানে তুলে দেবে। এদিকে দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি যেন উল্টে খেতে জানে না।"

বিজয়িনী কাঁদছিল, বললে, "মা, আমি তো ওর কাছেই যাইনি, আমি তো তোমার ঘরে আসছিলাম, তোমার পাকা চুল তুলতে, ও-যে জোর করে ধরে নিয়ে গেল।"

সেজ ননদ মুখ নাড়া দিয়া বললে, "নিয়ে গেল তো নিয়ে গেল, ওকে সব বলে দিতে গেলি কেন?"

বিজয়িনী অবিশ্রান্ত চোখের জল ফেলছিল, "আমি তো বলতে চাইনি, আমি তো বলতে চাইনি—ও-যে, ও-যে"—বলতে বলতে কান্নায় তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

আবার পরের দিন। মায়ের অনুরোধে বৌরা ও মেয়েরা অপরাধিণীকে ক্ষমা করেছে, সঙ্গে নিয়ে বাগানে গিয়েছে। বিজু একেবারে কৃতার্থ।

বাগানের মাঝখানে একটা ঝোপড়া তেঁতুল গাছ। বিজু মনের আনন্দে অনবরত বকে চলেছে, "জান ভাই, জান ভাই, উনি হাত গুনতে পারেন, তোমাকে সব বলে দেবেন সব ঠিক মিলে যাবে। এই যে গাছটা দেখছ, এটা কি গাছ বল দেখি?"

ননদ বিমলা বললে, "ওটা তো তেঁতুল গাছ, তুই কখনও বুঝি তেঁতুল গাছ দেখিসনি?"

বিজু বললে, "না ভাই, ওটা তেঁতুল গাছ নয়। উনি বলেছেন, ওটা এক রকমের তাল গাছ। দেখো, তালের সময় ও-গাছে তাল ধরবে।"

এই অদ্ভুত কথায় সকলে হেসে উঠল। কিন্তু বিজুর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলতে লাগল, "দেখো, তালের সময় ও-গাছে তাল ধরবে। উনি বলছিলেন যে, তোমরা গাছটাকে তেঁতুলগাছ মনে কর, কিন্তু আসলে ওটা তালগাছ। কি জন্যে যেন ওর পাতাগুলো তেঁতুলগাছের মত হয়ে গিয়েছে, উনি সে কথা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, আমি ভুলে গেছি।"

মেজ-জা ধমক দিয়ে উঠল, "থাম্‌ দেখি নেকি, অত 'উনি, উনি' করিস্‌নে। তোর 'উনি' সগ্‌গ থেকে নেমে এসেছেন। আমরা তো মানুষ নই, আমাদেব তো চোখ নেই!"

কিন্তু বিজয়িনীর দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ গাছে তাল ধরবেই। সে বললে, "আচ্ছা দেখো, তালের সময় গাছে তাল ধরে কিনা।"

বিজয়িনী যখনই বিনয়কে এড়িয়ে চলে, চতুর বিনয় তখনই বুঝতে পারে নিশ্চয় কিছু পরামর্শ চলছে। আর তখনই সে "বিজু, বিজু", ডাক ছাড়ে। সেই "বিজু বিজু" ডাক শুনলে বিজয়িনী আর দূরে থাকতে পারে না। বিনয়েরও আর বিজয়িনীর গোপন কথা বের করে নিতে কষ্ট হয় না।

তাই আজকাল গোপন-সভায় বিজয়িনীর আর প্রবেশের অধিকার নেই। বিজু যতই কাকুতি মিনতি করুক কেউ-ই তাকে দলে নেয় না, বলে, "বিজু তো! ন-ঠাকুরপো কাছে এলে ওর কি আর জ্ঞান থাকে?

দেখ না, যে দিকে ন-ঠাকুরপো, ওর নজরটি কেবল সেই দিকেই আছে।"

গ্রীষ্মের দুপুরে, বিনয় ঘরের মেঝেয় শীতলপাটি পেতে শুয়ে আছে। ছেলেদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এইবার মেয়েরা পাতে পাতে খেতে বসবে। বিজয়িনী কি একটা কাজে ঘরে এসেছিল, বিনয় ডাকল, "বিজু, বিজু, এদিকে আয় দেখি।"

বিজয়িনী এগিয়ে এসে বলল, "মা খেতে ডাকছেন, কি চাই তোমার?"

"খেতে ডাকছেন? বলিস কি? তোর যে চোখ লাল হয়েছে দেখছি, নিশ্চয় জ্বর হয়েছে। এদিকে আয় তো! ও বাবা! এ-যে বিষম জ্বর! শো, শো, শীগ্গির খাটের ওপর শুয়ে পড়। আমি লেপ এনে তোর গায়ে ঢাকা দিচ্ছি।"

সেই দারুণ গ্রীষ্মে বিজয়িনী লেপ গায়ে দিয়ে হাঁসফাঁস করছে। শাশুড়ি শুনলেন, "বৌর জ্বর এসেছে। ছেলের মুখে সংবাদ পেয়ে শাশুড়ি ঘরে এসে বধুর অবস্থা দেখলেন, বললেন, "দুখানা লেপ দেখছি গায়ে চাপিয়েছ, খুব কি শীত করছে?"

বিজয়িনী বললে, "না মা, ভয়ানক গরম হচ্ছে।"

শাশুড়ী ব্যাপারটি তখনই বুঝতে পারলেন, বললেন, "ওঠো, ভাত খেতে চল। বাছারে, একেবারে ঘেমে তিরখুন্তি। বিনু, হতভাগা ছেলে, আয় এদিকে, বৌটাকে খুন না করে বুঝি তোর শান্তি হবে না?"

বিনয় দুয়ারের কাছে মুখ বাড়িয়ে বললে, "ও গিয়ে বিছানায় লেপ মুড়ি দিল কেন, আমার কি দোষ? নিজের জ্বর হয়েছে কি না সেটুকু বুদ্ধি নেই?"

বিজয়িনী তবুও উঠতে রাজী হয় না, বলে, "উনি বলেছেন খুব জ্বর হয়েছে।"

শাশুড়ি রেগে উঠলেন, "বলুন উনি। জ্বর হয়েছে না ওর মাথা হয়েছে। আয় এদিকে, ওকে উঠতে বল্, আমি চলে যাচ্ছি।"

সেদিনের এই ঘটনায় বিজয়িনীকে অনেক ঠাট্টা সহ্য করতে হয়েছিল, কিন্তু উপহাসের কারণটি যে কি বিজয়িনী বুঝতে পারেনি।

ইতিমধ্যে একদিন চিঠি এল দুঃসংবাদ নিয়ে, বিজয়িনীর বাবা হঠাৎ মারা গিয়েছেন।

চিঠি পড়ে গৃহিণী স্তম্ভিত। তিনি তো জানেন বিজয়িনী তার বাবাকে কত-খানি ভালবাসে। সময় ও সুযোগ পেলেই সে সকলকেই বাবার গল্প শোনায়। বিশেষ করে শাশুড়ির যখন পাকাচুল তুলতে বসে তখন অনর্গল বকে যায়, কেননা সে বেশ বুঝতে পারে শাশুড়ি মনোযোগ দিয়েই তার কাহিনী শোনেন এবং শুনতে ভালবাসেন।

গৃহিণীর মনে পড়ছিল, সরলা বালিকার সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, সেই হাসিমাখা মুখের ভাব। বাবার কথা বলতে বলতে সে যেন আত্মহারা হয়ে যেত। অবশ্য বাপের বাড়ির সকল খুঁটিনাটি ঘটনাই সে বলতো। মার কথা, ভাইবোনদের কথা, ঝগড়ু সহিসের বৌয়ের কথা, এমন কি মেনি বেড়ালটার কথাও বাদ দিত না। কিন্তু বাবার কথা বলতে গেলেই তার মুখ সবচেয়ে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠত, গৃহিণী তা লক্ষ্য করে-ছেন বৈ কি!

আজ যখন বিজয়িনী শুনবে তার বাবা আর নেই, তখন তার কি অবস্থা হবে সে-কথা যেন মনে করাই যায় না।

গৃহিণী ছেলেকে ডেকে তার দুই হাত ধরে মিনতি করে বললেন, "লক্ষ্মী বাবা, রাত্রেই যেন মেয়েটাকে এই দারুণ খবর শোনাস্ নে।"

খাওয়া দাওয়ার পর যে যার ঘরে শুতে গেল। গৃহিণী উদ্বিগ্ন হয়ে বিজয়িনীর শোবার ঘরের দিকে কান পেতে থাকলেন।

বিজয়িনী স্বামীর কাছে আসলেই খুশী হয়ে উঠত, আর অনর্গল নানা কথা বলত। স্বামী সে কথায় কান দিচ্ছে কি না সে দিকে তার খেয়াল থাকত না। আজও ঘরে এসে আনন্দময়ী মহা আনন্দের দিনে কি কি ঘটেছে অর্থাৎ মেজদিদি, সেজদিদি ও ঠাকুরঝি যখন পুকুরঘাটে গিয়েছিল, তখন মেজদিদি কিভাবে পা পিছলে পড়ে গেল, সেজদিদি ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতরাবার সময় ঘড়াটা হঠাৎ কি করে ডুবে গেল, আবার সেজদিদি ডুব সাঁতার দিয়ে কি কৌশলে ঘড়াটি তুলল ইত্যাদি বর্ণনা দিতে দিতে নিজের মনেই মাঝে মাঝে হেসে অস্থির, তখন বিনয় হঠাৎ বলে উঠল, "হ্যা, খুব তো হাসিখুশী হচ্ছে, এদিকে কি চিঠি এসেছে জানো? তোমার বাবা মারা গিয়েছেন।"

"কি বললে?" বিজু চমকে উঠল, "বাবা মারা গিয়েছেন বলে চিঠি এসেছে? তোমার পায়ে পড়ি, কি হয়েছে বলো। আমার বাবা নেই? আমার বাবা?"

বিজুর গলা দিয়ে "বাবাগো!" শব্দের আর্তনাদ শুনেই গৃহিণী ছুটে এলেন।

দরজায় ঘা দিচ্ছিলেন তিনি, "দোর খোল্, শীগ্গির দোর খোল, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! বউটাকে তুই নিকেশ না করে ছাড়বিনে দেখছি।"

সেই আনন্দ-প্রতিমা কেমন যেন হয়ে গেল। তার মুখের দিকে যেন আর চাওয়াই যায় না। গৃহিণী কোন রকমে তাকে দিয়ে চতুর্থী করালেন, ভাবলেন বধূকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। মা-ও তো শোকাতুরা, মা মেয়েকে দেখে হয়তো কিছু শান্তি পাবেন, আর বিজুও মায়ের কোলে যেয়ে একটু জুড়োবে।

কিন্তু কাকে পাঠাবেন? বিজু বিষম জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ল, তার আর উঠবার শক্তি নেই।

জ্বরের ঘোরে অজ্ঞানের মত হয়ে থাকে, কিন্তু বিনয় কাছে আসলেই যেন বুঝতে পারে তখন চোখ খুলবার চেষ্টা করে।

গৃহিণী সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব-চিনি মানৎ করেছেন, বিজুর বাপের বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েছে।

বিনয় ছট্‌ফট করে বেড়ায়, বিজয়িনীর কাছে বেশীক্ষণ বসতে পারে না। বাড়ির সকলেই পালা করে রাত জাগে, সকলেরই মুখ মলিন, বাড়ির আনন্দের উৎস যেন একেবারে শুষ্ক হয়ে গিয়েছে।

গৃহিণী সব সময়ই বধূর ঘরে আছেন, তাঁর রান্নাবান্নায় আর মন নেই। মাঝে মাঝে বিনয়কে বলেন, "তুই গিয়ে ওর কাছে একটু বোস্, তাহলে হয়তো হুঁশ আসবে।"

হুঁশ এলো, কিন্তু একেবারে শেষ অবস্থায়। স্বামীর হাত দু হাতে জড়িয়ে ধরে বিজয়িনী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, "তুমি,—তুমি তো আমায় ভালবাসতে না!"

এইটিই তার শেষ কথা।

বিনয় যেন পাগলের মত হয়ে গেল। মার কোলে মুখ লুকিয়ে অস্ফুটে স্বরে কেবলই বলতে লাগল, "মা, মা, সে কিনা বলে গেল, আমি তাকে ভালবসতাম না!"

শান্ত সন্ধ্যা নেমে এসেছে আমেদাবাদ নগরের উপর ছম-ছমিয়ে। চিমনীর ধোঁয়ায় আর আলোর বন্যায় আকাশ হারিয়ে গেছে, শুক্ল দ্বাদশীর জ্যোৎস্নাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অদূরে বয়ে চলেছে মৃদুগতি শবরমতী।

যদি ওই লক্ষ লক্ষ গণেশী জনতার একটি মানুষেরও মনে হোতো, এই জ্যোৎস্নার কোনও নিগূঢ় ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দরকার, তবে সে বেরিয়ে পড়তো পথ ভুলে। সোজা চ'লে আসতো এখানে—এই এলিস ব্রীজের তলায়,—যেখানে একটি অতি মধুর জনশূন্য পথ শুধু এক ফালি চাঁদের ইশারায় অন্যমনস্ক পথিককে ডেকে নিয়ে যায়।

শুধু আমি নয়, এই এলিস ব্রীজের নীচে নেমে একদা ভারতবর্ষও পথ খুঁজে পেয়েছিল!

পথ অনেক দূর। অতিশয় জটিল, অত্যন্ত কুটিল। বহুদিন আগে বেরিয়ে পড়েছি পথে। দেখে এসেছি দিল্লী। পৃথিবরাজ আর জয়চাঁদের কলহ-কলঙ্কের দাগ মাড়িয়ে এসেছি। দাঁড়িয়ে দেখেছি গজনীর মামুদ নিয়ে গেছে অনেক ধনরত্ন। মহম্মদ ঘোরীর শৃংখল খুলে এসেছি। পা আমার ক্লান্ত হয়নি। আলাউদ্দীন থেকে আকবর, আকবর থেকে আওরঙ্গজেব,—অনেকবার আলো নিভেছে, অনেক আলো জ্বলেছে। কতবার দাঁড়িয়ে শুনেছি এখানে ওখানে নূপুরের নিক্কণ, তরবারির আস্ফালন, রক্ত নিয়ে হোলি খেলার আনন্দ-কোলাহল। কেঁদেছে সবচেয়ে তারা বেশী, যারা হেসেছে অনেক দিন। দেখে এলুম পদ্মিনীর চিতাভস্ম ভেসে গেল গাম্ভীর নদীর জলে, উপবাস ক'রে মরে গেল রাণাপ্রতাপ, শুনে এলুম মীরার কণ্ঠে হৃৎপিণ্ডের শির-ছেঁড়া ভজন। পুণায় দেখে এলুম শিবাজীকে, বাঘেলা বংশের কর্ণকে, বরঙ্গলের প্রতাপরুদ্রকে, দেবগিরির রামচন্দ্রকে। দেখেছি অনেক,—আজ তারা কেউ নেই।

কিন্তু পথে-পথে দেখে এসেছি শান্ত নম্র হাস্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু একজন—তিনি বৃদ্ধ পিতামহ, অসীম ক্ষমায় নিমীলিতনেত্র!

মদ্রদেশে মহীশূরে মধ্যভারতে—বিজয় পতাকা কতবার ঝড়ের হাওয়ায় ছিঁড়ে গেল, কত রুদ্রচণ্ডের অগ্নিমূর্তি পাণ্ডুর হয়ে গেল মৃত্যুর ছায়ায়। তারপরে এলো ভাস্কো-ডা-গামা আর ডুপ্লে, টাভার্নিয়ে আর পেল্‌সির্ট, হকিন্স আর স্যর টমাস রো। ওরা নতজানু হয়ে কুর্নিশ জানালো দিল্লীকে। ধীরে ধীরে লাল রংয়ের তুলি মাখালো ভারতের মানচিত্রে। ক্লাইভের শোষণ দেখলুম, হেস্টিংসের শাসনও দেখে এলুম। ওরা ক্ষমা পেয়ে গেছে পিতামহের।

হাঁটতে হাঁটতে এসেছি অনেক দূর। হাজার বছর ধরে হাঁটছি। যে উদ্যত অসি দেখেছিলুম লক্ষ্মীবাঈয়ের হাতে মৃত্যুর জয়টিকায়, আজাদ-হিন্দ্ তুলে নিয়েছিল সেই তরবারি,—মৃত্যুর আগে দেখে নিলুম তার ললাটে গৌরবের আভা। সে-আভা অমৃতলোকের।

এই এলিস ব্রীজের নীচে দিয়ে চলেছে শান্ত শবরমতী,—উপর দিয়ে ট্রেন, চ'লে যায় প্রভাসে আর দ্বারকায়। এখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখা যায় আমেদাবাদের সম্পদের সহস্র ধারা। ওরা পূজা করে গণেশের।

এই পুলের তলা দিয়ে যে-পথ, এ পথে ভারত এসেছে অনেকবার। কেমনা এ পথ সত্যের, এ পথ ব্রাত্যের। এখানে ঝড় থামে, মিথ্যা লুকোয়, লোভ পালায়, হিংসা লজ্জা পায়। চোখে জল নিয়ে ভারত যখন এসেছিল এই এক ফালি পথ দিয়ে—তখন তা'র পদক্ষেপ ছিল ধিক্কারে কুণ্ঠিত, অপমানে নতশির, উৎপীড়নে নিস্তেজ। কিন্তু এই পথের ধূলি থেকে সে তুলে নিয়েছিল মন্ত্রতিলক আপন ললাটে তাঁর দুর্গমযাত্রার পাথেয় হিসাবে। সে-দুর্দিনে সেই ছিল আশীর্বাদের মতো।

পায়ের শব্দ না হয়। এ পথের ঘুম না ভাঙে। সন্তর্পণে যাচ্ছিলুম।

খেজুর গাছের উপর দিয়ে উঠেছে চাঁদ, আর ওদিকে দ্বারকার ওপারে সূর্যাস্তের শেষ রক্তিমাভা তখনও চিকচিক করছে পশ্চিমের বৃক্ষজটলায়। এ পাশে আলো নেই শবরমতীতে; এক একটি নৌকা ভাসছে অন্ধকারের ছোট ছোট টুকরোর মতো। ধীরে ধীরে চলেছি। আশ্রম উপান্তে এখনও আলো জ্বলেনি। থমকে দাঁড়ালুম।

ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। কে যেন ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ঘট কাঁকালে নিয়ে শান্ত পদক্ষেপে উঠে গেল আশ্রমের অঙ্গনে। আশে পাশে গাছপালার ঝাপড়া, এখানে ওখানে একটানা ঝিল্লীর আওয়াজ। হেমন্তের সন্ধ্যা আপন ছায়াচ্ছন্নতায় যেন বাষ্পাকুল,—শবরমতীর তটে আর আশ্রমের আনাচে-কানাচে সেই হেমন্তের ধূমেল চোখ যেন ছলছলে।

ওংকার উঠছে যেন কোথায়! ঠাহর করা যায় না ঠিক কোন্‌খানে। হয়ত আশ্রমে, হয়ত ভারতে, নয়ত আমারই মনে। সহসা চোখ ছুটে গেল আশ্রমের বারান্দার একটি দরজায়,—কে একজন শান্ত মৃদু পদক্ষেপে হাতে নিয়ে এলো একটি প্রদীপ,—যেখানে রেখে প্রণাম করল, সেটি বোধ হয় তুলসীমঞ্চ।

প্রদীপটি জ্বলবে। মহাকাল এসে ফুৎকার দিলেও নিভবে না।

'হৃদয়-কুঞ্জ'—এককালে আশ্রমটির নাম দেওয়া হয়েছিল। বিশাল ভারতের এটি ছিল হৃৎকেন্দ্র, নামটি তাই মানিয়ে গেছে। কিন্তু এই 'হৃদয়কুঞ্জ' ছেড়ে চ'লে গেছে সেই অর্ধনগ্ন ফকির পঁচিশ বছর আগে ডাণ্ডি-অভিযানকালে, সে আর ফেরেনি! প্রতি সন্ধ্যার প্রদীপ আজও রয়েছে তাঁর পথ চেয়ে। কুঞ্জকুটীরের দ্বার আজও রয়েছে খোলা, নিত্যবিরহিনীর কণ্ঠে আজও ধ্বনিত হচ্ছে, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে!'

শান্ত শবরমতী বয়ে চলেছে অশ্রুমতীর মতো।

আশ্রম অঙ্গনে একটি বেদী আজও বাঁধানো। তা'র মূল থেকে উঠেছে বৃক্ষ। ওটাও বোধিদ্রুম। ওর নীচে ব'সে সিদ্ধিলাভ ক'রে সেই পরম ভিক্ষু বেরিয়ে পড়েছে বৃহৎ সংগ্রামের আহ্বানে। কিন্তু সেই ভিক্ষু আজও ফেরেনি। এমনি ক'রে একজন আড়াই হাজার বছর আগে ছেড়ে গিয়েছিল লুম্বিনী, আরেকজন দু'হাজার বছর আগে ছেড়ে এসেছিল বেথ্‌লেহেম্‌। কেউ ফেরেনি। ওরা অমনি ক'রে ছেড়ে চ'লে যায়; স্রষ্টা আপন সৃষ্টির ফাঁদ কেটে পালায়। জীবনশিল্পী আপন শিল্পকে অতিক্রম ক'রে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। পিছনের পৃথিবী ওদের জন্য চিরদিন কাঁদে। কাঁদে আর নৈবেদ্য বানায়।

লর্ড জেটল্যাণ্ডের অন্তিম আর্তনাদ শুনে চমকে উঠেছিলুম: তরবারির জোরে ভারত জয় করেছি, তরবারির জোরেই শাসন করব।

এই ভাষাতেই কথা বলেছিল, রেডিং, উইলিংডন, স্যামুয়েল হোর, লিন্‌লিথগো, আর ওয়াভেল। তাদের আজ কোনোমতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সংবাদপত্রে চার্চিলও বেঁচে নেই,—ওরা সবাই বেঁচে ম'রে রইলো। অর্ধনগ্ন ফকিরের প্রসন্ন ক্ষমা পেয়ে গেল মহম্মদ ঘোরী থেকে চার্চিল—সবাই।

আশ্রমটি যেন শান্ত পরিবেশের মধ্যে আত্মসমাহিত। সম্পদের ঔদ্ধত্যে আলোকিত আমেদাবাদ,—তারই পাশে এই ম্লানচ্ছায়াময় নিভৃত তপোবন। ওপাশে অহঙ্কার, এপাশে আত্মবিস্মৃতি। এখানে যেন অনন্তকালের একটি ভগ্নাংশ রুদ্ধশ্বাসে চুপ করে দেখছে কল্পান্তের নতুন ভারতকে,—যে ভারত ওই অর্ধনগ্ন ফকিরের বক্ষোরক্তে স্নান করে ক্ষতবিক্ষত দেহে আবার উঠে দাঁড়াতে চাইছে প্রায় হাজার বছর পরে।

নতুন ভারতের মহৎ ইতিহাস রচনার জন্য হয়ত লাল কালির দরকার হয়েছিল। কিন্তু তারজন্য পরম সত্যাশ্রয়ীর পুণ্যরক্ত দিয়েই কি লেখা হোল, সত্যমেব জয়তে!

নিঃশব্দে ক্লান্ত পায়ে ফিরে এলুম আবার এলিস ব্রীজের তলায়। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ নিবিড় জ্যোৎস্নায় জড়িয়ে এলো।—

"Father, forgive us."

এ-কূল ও-কূল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
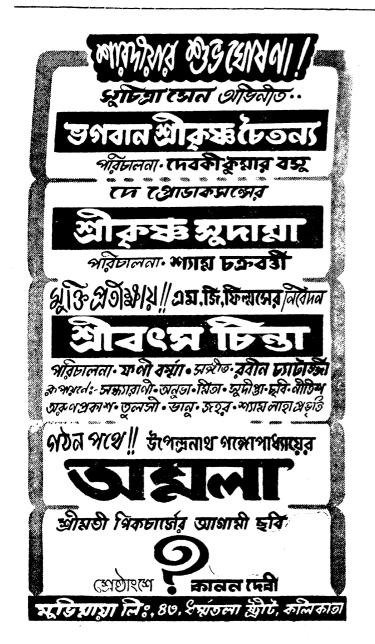
নির্মল আমাকে এই গল্পটি বলেছিল।

নির্মল জ্যোতিষী।—সেইরকম জ্যোতিষী, যার গণনার বেশির ভাগ কথাই মেলে না। দৈবাৎ যদি-বা দু'একটা মিলে যায়—তা' সে তার গণনার গুণে নয়, এম্‌নিই।

সেই নির্মল হঠাৎ দেখি একটা ঘর ভাড়া করে' বসলো। রাস্তার ধারেই ঘর। রাস্তাটা বড়ও নয়, ছোটও নয়। তবে কলকাতা শহরের রাস্তা: লোকজনের চলাচল খুব।

দোরের মাথায় প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড টাঙানো হ'লো। চারটে চার রকমের চেয়ার এলো। ভাঙা একটা তক্তাপোশের ওপর রঙিন একটা চাদর বিছিয়ে দেওয়া হ'লো।

জ্যোতির্বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ নির্মলকুমারের আস্তানা। দিনের বেলা ভাগ্য গণনা চলে, রাত্রে শয়ন এবং নিদ্রা। আহারের ব্যবস্থাটা শুধু বাইরের হোটেলে। ভেবেছিল স্বপাক আহারের ব্যবস্থাটা এইখানেই করে নেবে। কিন্তু করতে গিয়ে দেখে তার হাঙ্গামা অনেক। ঘরটার এদিকে ওদিকে কোথাও এতটুকু আড়াল নেই যেখানে বসে এই অতি প্রয়োজনীয় কর্মটি গোপনে সমাধা করে' নিতে পারে। কাজেই অপরের ভাগ্য গণনা যার পেশা, সে তার নিজের দুর্ভাগ্যটা অপরের কাছে জাহির করতে চাইলে না।

ভেবেছিলাম. নির্মলকে তার কারবার গুটিয়ে ফেলতে হবে। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, চলবে তো?

নির্মল বললে, হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী আর জ্যোতিষী—এই দুটো এইখানেই চলে ভালো। মানুষের পয়সা না থাকলে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করায়, আর সময় খারাপ হ'লে জ্যোতিষীর কাছে ছোটে।

কাজেই আমাদের দেশটাকে এই দুটো কারবারের পীঠস্থান বলা চলে।

হ'লোও তাই।

মাস চার-পাঁচ পরে, একদিন গিয়ে দেখি, নির্মল পরমানন্দে বসে বসে পান চিবোচ্ছে। চেহারাটা প্রায় জ্যোতিষী-জ্যোতিষী করে' এনেছে। মাথায় বাব্‌রি চুল রেখেছে, সোনা দিয়ে রুদ্রাক্ষের মালা তৈরি করিয়ে গলায় পরেছে। মাইনে দিয়ে একটা চাকর রেখেছে ফাই-ফরমাশ খাটবার জন্যে।

যেতেই এক গাল হেসে মহা সমাদর করে' নিয়ে গিয়ে বসালে।

চাকরটাকে ডাকলে, চৈতন্য!

তেরো-চোদ্দ বছরের একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো।

নির্মল বললে, চা নিয়ে আয়! পান নিয়ে আয়!

চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, চলছে কেমন?

নির্মল বললে, ভালো।

বললাম, অবস্থা যাদের খারাপ, তারাই তো আসে।

নির্মল বললে, না। কত রকমের কত মজার মজার লোক আসে এখানে। সেদিন একজন এসেছিল। অবস্থা তার মোটেই খারাপ নয়। শোন্ তবে—

এই বলে' সে বলতে আরম্ভ করলে :

লোকটির নাম সতীশ।

সকাল বেলা। চা-টা খেয়ে সবে বসেছি। লোকটি হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়লো আমার চেম্বারে। এই খানটায় বসলো। বসেই পেছন ফিরে ফিরে তাকায় আর থু থু করে থুতু ফেলে। সকাল বেলা। এ কার পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! বললাম, এ কি করছেন মশাই? থুতুতে যে ঘর ভরিয়ে দিলেন!

লোকটি বললে, দেবো না? না দিলে যাবে কেন? ভূত যে!

ভূত!—বললাম, ভূত কোথায় পেলেন?

বললে, পাব আবার কোথায় মশাই! সেই যে গঙ্গার ঘাটে পিছু নিলে, আজ পাঁচটি বছর পিছু ছাড়ছে না। আপনি গা বাঁধতে জানেন? যদি জানেন তো দিন বেঁধে!

বললাম, নিশ্চয় জানি। কিন্তু গা বাঁধার খরচ দেবে কে?

বললে, কত খরচ? আমি দেবো।

ভাবলাম কত বলি। দিতে তো পারবেই না জানি। ঝট্ করে' বলে ফেললাম, দশ টাকা।

আমার দিকে তাকিয়ে লোকটি তার মুখখানা এমনি করলে—যেন দশ টাকা তার কাছে কিছুই নয়।

বললে, টাকা কি আগেই দিতে হবে?

নিশ্চয়।

রঙিন একটা ডোরাকাটা হাফসার্ট ছিল গায়ে। তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে খান-পাঁচ ছয় দশ টাকার নোট বের করলে। তাই থেকে দশ টাকার একখানি নোট আমার হাতে দিয়ে বললে, দিন তাড়াতাড়ি গা'টা আমার বেঁধে দিন, নইলে আবার আসবে।

লোকটি যে এমন করে' টাকা বের করে' দেবে ভাবিনি।

নিতে কেমন যেন সংকোচবোধ করছিলাম। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। টাকাটা নিলাম। নিয়ে, দিলাম তার গা বেঁধে।

বিড় বিড় করে' কত রকমের কত মন্ত্র বললাম। একবার শোয়ালাম, একবার বসালাম, মাথা থেকে পা পর্যন্ত আল্‌তো-ভাবে হাত চালিয়ে কম করেও অন্তত বিশ-ত্রিশবার গায়ে মাথায় ফুঁ দিয়ে দিলাম।

যেমন তার ভূত, তেমনি আমার মন্ত্র।

বললাম, এবার কই আসুক্ দেখি! আর আসতে পারবে না।

—যদি আসে?

বললাম, তাহলে বত্রিশ বন্ধনে বেঁধে দিতে হবে। কিন্তু তার আগে আপনাকে বলতে হবে যিনি আসছেন তিনি কে, আর কেনই-বা আসছেন।

লোকটি বললে, তাহ'লে আগাগোড়া আপনাকে সব কথা শুনতে হয়।

বললাম. বলুন, শুনছি।

সতীশ বলেছিল :

বলেছিল, তার বীরভূম জেলায় বাড়ি। নাম সতীশ সরকার।

মস্ত বড়লোক বাপ, তার একমাত্র ছেলে সতীশ। দেশের ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন

পাশ করে' পড়তে এলো কলকাতায়। বাবার এক মস্ত বড়লোক বন্ধু থাকে শ্যামবাজারে। সতীশ তারই বাড়িতে থাকবে, খাবে আর কলেজে পড়বে—বাপ নিজে সঙ্গে এসে সেই ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন। দোতলায় আলাদা একখানা ঘর দেওয়া হলো সতীশকে। আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো ঘর। পাশেই বাথ-রুম। ব্যবস্থা চমৎকার। কিন্তু নিতান্ত অপরিচিত লোকজন, সঙ্গী নেই, সাথী নেই, বাড়িতে একগাদা মেয়ে, ছেলে যারা আছে, তারা নিতান্ত ছোট; সতীশের মন খুঁত-খুঁত করতে লাগলো। এর চেয়ে কলেজ-হোস্টেলে থাকলে সে ভাল থাকতো। টাকা এখানেও লাগবে, সেখানেও লাগতো। কথাটা কিন্তু সে তার বাবাকে মুখ ফুটে বলতে কিছুতেই পারলে না। অতি শৈশবে তার মা মারা গেছে। বাপকে সে ভয় করে বাঘের মত। ভাবলে, মুখে যা বলতে পারলে না, চিঠিতে লিখে তাই জানিয়ে দেবে তার বাবাকে।

দেখতে দেখতে দুটি বছর পার হয়ে গেল। আই-এ পাশ করে সতীশ বি-এ পড়তে লাগলো। তখনও কিন্তু কথাটা তার বাবাকে জানানো হলো না। বাড়ির সবার সঙ্গেই পরিচয় তখন তার হয়ে গেছে। পরিচয় হয়েছে, কিন্তু অনাত্মীয়ের সংকোচ তখনও ঘোচেনি।

সব কথা খুলে তার বাবাকে একখানা চিঠি সে লিখবে লিখবে করছে, এমন দিনে একটা বড় মজার ঘটনা ঘটে গেল।

সেদিন শনিবার। সতীশ সকাল-সকাল কলেজ থেকে ফিরেছে। ইংরেজী একটা কি ভাল সিনেমার ছবি চলছে, সেদিন তাই দেখতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে সে। এক পায়ে জুতো পরেছে, আর এক পায়ে তখনও পরেনি এমন সময় তার ঘরে ঢুকলো আঠারো উনিশ বছরের পরমা সুন্দরী এক তন্বী তরুণী। কখনও এ-বাড়িতে তাকে দেখেছে বলে' তার মনে হয় না। মেয়েটি এসেই প্রথমে হাত দুটি জোড় করে' কপালে ঠেকিয়ে বললে, নমস্কার। আমাকে চিনবেন না আপনি। নতুন এসেছি। এই বাড়িতে থেকে আমি কলেজে পড়বো। ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি বেথুনে। শুনলুম আপনার থার্ড ইয়ার। ফার্স্ট ইয়ারের বইগুলো আপনার আছে নিশ্চয়ই। একটিবার যদি দেখতে দেন তো দেখি যদি এক আধটা আমার কাজে লাগে। এক টানে এতগুলো কথা বলে গিয়ে হঠাৎ সে তার পায়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো; এ কি, আপনি কোথাও যাবার জন্যে তৈরি হয়েছেন নাকি?

সতীশ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সিনেমায় যাব।

মেয়েটি বললে তাহ'লে যান আমি তো এই বাড়িতেই আছি। ফিরে আসুন, এলেই দেখবো।

সতীশের হঠাৎ একবার মনে হ'লো—নাই-বা গেল সিনেমা দেখতে! তার পরেই কি ভেবে বললে, সেই ভালো। ফিরেই আসি।

এই বলে' সতীশ জুতোটা আবার পরে ফেললে।

দু'জনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

মেয়েটি বললে, একটু দাঁড়াবেন? এক মিনিট।

বেশ তো।—সতীশ দাঁড়িয়ে রইলো।

বাড়ির ভেতর থেকে ফিরে আসতে খুব বেশি দেরি হলো না মেয়েটার। ফিরে যখন এলো, দেখলে পায়ে একজোড়া স্যান্ডেল পরে এসেছে। বললে চলুন আমিও যাই আপনার সঙ্গে সিনেমা দেখতে।

আপনার আপত্তি নেই তো?

কোথাও এতটুকু সংকোচ বা জড়তা নেই মেয়েটির ব্যবহারে।

দুজনের অনেক কথা হলো সেদিন।

এই বাড়ির যিনি মালিক, তাঁর বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যে গ্রামে, সেই গ্রাম থেকে এসেছে মেয়েটি। নাম মিনতি। কায়স্থের মেয়ে। বাপ-মা, ভাই-বোন— কেউ কোথাও নেই তার। বাবা মারা যাবার পর লাইফ ইন্সিওরের তিন হাজার টাকা সে পেয়েছিল। তাই থেকে দু'হাজার টাকা খরচ করে সে পড়েছে। এখনও এক হাজার টাকা তার হাতে আছে।

গ্রামের মুরুব্বি-মাতব্বরেরা চেষ্টা করে-ছিলেন, তার একটি বিয়ে দিয়ে দেবার। কিন্তু বিয়ে সে করতে চায় নি। সে চেয়েছিল পড়তে।

তাইতেই তাঁরা চটে যান। আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—

মিনতি ম্লান একটু হেসে বললে, বুঝতেই পারছেন। আমি একা মেয়েছেলে কি করতে পারি বলুন।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, কি করলেন?

মিনতি বললে, সে সব অনেক কথা। শুনতে হলে আজ আর আমাদের সিনেমা দেখা হবে না। আজ থাক্, বলবো আর একদিন।

সতীশ বললে, আজই বলুন। সিনেমা দেখবো না।

সেদিন কিন্তু সে বললে না কিছুতেই। শুধু বললে, আপনি আমাকে আপনি বলবেন না, তুমি বলুন।

সিনেমা দেখে ফেরবার পথে সতীশ বললে, এই যে তুমি আমার সঙ্গে একা একা চলে এলে সিনেমা দেখতে, এই যে তোমাকে আমি তুমি বলছি, এর জন্যে লোকে যদি আমাদের নামে অপবাদ দেয়?

মিনতি বললে, সেটা যদি মিথ্যা হয়, তাকে ভয় পাবো কেন? আর যদি সত্য হয়, তখন তো আর সেটা অপবাদ থাকবে না! দেখুন, আমার মাত্র উনিশ বছর বয়স। এই উনিশ বছরে যে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি, অনেক মেয়ে সারা-জীবনেও তা পারে না। কাজেই কোনও মিথ্যাই আমাকে আজ আর বিচলিত করতে পারে না।

সতীশ বললে, যদি সত্যি হয়?

মিনতি একবার হাসলে। হাসলে তার সেই প্রাণমাতানো হাসি। হেসে বললে, আমার এই রূপই আমার সর্বনাশ করেছে।

মানুষকে একবার ভাবতে পর্যন্ত সময় দেয় না—সে কি করতে যাচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তার লোভ আর লালসা নিয়ে। কিন্তু আমি পোড়্খাওয়া মেয়ে সতীশবাবু, আমি অত সহজে ভুলবো না।

সতীশের মুখ সেদিন মিনতিই বন্ধ করে দিলে নিজের হাতে।

সে মুখ আবার খুলেছিল মিনতি নিজেই।

একই বাড়িতে থাকে। দু'জনেই কলেজে পড়ে। একসংগে খায়, একসংগে কলেজে যায়, একসংগে বেড়াতে বেরোয়, একসংগে বাড়ি ফিরে আসে।

বাড়িটা আবার এমনি যে, কে কার খবর রাখে!

দুজনের ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়তে থাকে। ঘনিষ্ঠতা শেষে এমন হয় যে, কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারে না। মান-অভিমানের পালা চলে।

সতীশ চিঠি লিখে মিনতির মান ভাঙায়। এক লাইন দুলাইন চিঠি শেষে এক পাতা দু'পাতাতেও শেষ হয় না। মুখে যা বলতে পারে না, চিঠিতে তাই লিখে জানায়।

একখানা চিঠি হাতে নিয়ে মিনতি সেদিন সতীশের ঘরে এসে ঢুকলো। বললে, প্রেমপত্র লিখতে আরম্ভ করলে? বলেই চিঠিখানা তার গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিলে।

সতীশ বললে, প্রেমপত্র কেন হবে?

মিনতি বললে, যা আমি দেখতে পারি না তাই! এই চিঠি যদি কেউ দেখে কি বলবে বলতে পারো? এ-বাড়ি থেকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দেবে যে! সতীশ বলল, বিদেয় করে দেয় তো তখন আমার বাড়ি আছে। মিনতি বললে, ওরে বাবা! তোমার বাড়ি? তোমার বাবা থাকতে? মরুকগে যাক্ আর ভাবতে পারি না বাবা, দাও আমার চিঠি দাও। এই বলে সতীশের লেখা চিঠিখানি নিয়ে মিনতি চলে গেল।

সতীশ বললে ও-চিঠি তুমি আবার নিয়ে যাচ্ছো কেন?

মিনতি চৌকাঠের বাইরে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ভাঁজ করা চিঠিখানি জামার নীচে বুকের তলায় রাখতে রাখতে বললে, আমার চিঠি আমি নেবো না তো কে নেবে?

বি-এ পাশ করলে সতীশ। আই-এ পাশ করলে মিনতি।

হঠাৎ সতীশের নামে এক টেলিগ্রাম এলো দেশ থেকে। তার বাবা টেলিগ্রাম করেছে—তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে।

বাবার শরীর অসুস্থ। ব্লাড প্রেসারের রুগী। অসুখ বাড়লো কিনা কে জানে।

সতীশ ভাবতে লাগলো। সন্ধ্যার ট্রেন।

মিনতি বললে, চল তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি। ছেলে বি-এ পাশ করেছে। গিয়ে দেখবে হয়ত বাবা একটি বৌ আনবার ব্যবস্থা করেছেন।

সতীশ বললে, তাহ'লে চল না আমার সংগে। বৌ নিয়েই যাই।

—সে সাহস কি তোমার আছে?

—নেই?

মিনতি বললে দেখে তো মনে হয় না।

সতীশ বললে, বেশ তাহলে তৈরি হয়ে থাকো।

মিনতি ম্লান একটু হাসলে। বললে, অদৃষ্ট আমার খুব মন্দ। শেষ পর্যন্ত কি হবে জানি না।

সতীশকে ট্রেনে চড়িয়ে দিয়ে মিনতি একাই ফিরে এলো শ্যামবাজারে।

সতীশ বাড়ি গিয়ে দেখে, মিনতি যা বলেছিল ঠিক তাই।

বাবার ব্লাড প্রেসারের অসুখটা ঘন ঘন জানাচ্ছে। ভয় হচ্ছে আর বেশিদিন তিনি বাঁচবেন না। তাই আগামী পঁচিশে ফালগুন সতীশের বিয়ের সব কিছু তিনি ঠিক করে ফেলেছেন।

সর্বনাশ! সতীশের বুকের ভিতরটা কেমন যেন করতে লাগলো। মিনতি যা বলেছিল ঠিক তাই।

কিন্তু বাবার মুখের ওপর জীবনে সে কোনোদিন কোনও কথা বলেনি। কথা বলবার মত সাহসও তার নেই। অথচ এ সময় কথা যদি সে না বলে, মিনতির এবং তার—দু'জনের দুটো জীবনই চিরদিনের মত ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সাহসে বুক বেঁধে এর প্রতিবাদ করবার জন্যে সতীশ গেল তার বাবার আছে।

সতীশকে দেখেই তার বাবা বললেন আর আমি বেশিদিন বাঁচবো না বাবা। এখন তোমায় বিয়ে দিয়ে তোমাকে সংসারী করে দিয়ে যেতে চাই। তোমাকে কিছু না জানিয়েই এইখানে আমি বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছি। জানি আমি যা করবো তার ওপর তুমি একটি কথাও বলবে না। তুমি আমার সেরকম ছেলে নও।

এই কথা বলেই বাবা একটু থামলেন। সতীশের বুকের ভিতরটা আরও বেশি ধক্ ধক্ করছে।

বাবা বললেন, কলকাতায় একখানি বাড়ি করবার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। কিন্তু সেটা এতদিন হয়ে ওঠেনি। যার জন্যে বন্ধুর বাড়িতে রেখে তোমাকে পড়াতে হলো। তুমি জানো না—পনেরো হাজার টাকায় কলকাতায় একখানি ছোট বাড়ি আমি বন্ধক রেখেছিলাম। যাঁর বাড়ি তিনি মারা গেছেন। তাঁর দুই ছেলে এলো আমার কাছে। এসে বললে, বাড়িটা ছাড়াবার ক্ষমতা আমাদের

নাই, বোনের বিয়ে দিতে হবে। কাজেই আপনি যদি হাজার পাঁচেক টাকা আমাদের দেন তো বাড়িটা আপনাকেই বেচে দিই। এই পাঁচ হাজার টাকা আমি তাদের দিলাম না। যে-মেয়ের বিয়ের জন্যে বাড়িখানা বিক্রি করতে চায়, সেই মেয়েটিকে দেখে এলাম। বেশ মেয়ে। এই মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ে ঠিক করে ফেললাম। বাড়িখানি তারা তোমার নামে লিখে রেজেস্ট্রি করে দিয়েছে। এই বাড়িতেই বিয়ে হবে। বিয়ের পরেও তোমরা এই বাড়িতেই থাকবে। পড়তে ইচ্ছে হয় পড়বে আর নয় তো তোমার যা খুশী—

চাকর এলো তেলের বাটি হাতে নিয়ে বাবাকে তেল মাখিয়ে স্নান করাবে।

বাবা বললেন, যাও।

সতীশের বলা কিছুই হ'লো না। চার দিন পরে পঁচিশে ফাল্গুন। সেদিন বর সেজে সে কলকাতায় যাবে বিয়ে করতে। মিনতি থাকবে কলকাতায়। কিছুই সে জানবে না। কিছুই সে শুনবে না।

তারপর?

কোন্ মুখে সতীশ গিয়ে দাঁড়াবে তার কাছে?

সতীশ মনে-মনে সঙ্কল্প করলে—বিবাহের পর কোনও সম্বন্ধই সে রাখবে না তার স্ত্রীর সঙ্গে।

দুর্বল এবং অক্ষমের একমাত্র সান্ত্বনা।

শুভদিনে এবং শুভ লগ্নে বিবাহ হয়ে গেল সতীশের।

বি-এ পাশ-করা যুবক সতীশ বিয়ে করে এলো শ্রীমতী সতীরাণীকে। মেয়েটির রং ফর্সা, দুর্বল এবং রুগ্না। তবু সবাই বলতে লাগলো, চমৎকার মানিয়েছে।

সতীশের বাবা কিন্তু সত্যই আনন্দিত হলেন।

বললেন, সতী আর সতীশ। নামের মিল কি রকম হয়েছে দ্যাখো।

ডাক্তার-কোবরেজ সবাই বলেছেন, তাঁর অসুখের চিকিৎসার প্রয়োজন। কলকাতার বাড়িখানি মেরামত করালেন মনের মত করে। তারপর ভাল একটি দিন দেখে ছেলে বৌ নিয়ে যাত্রা করলেন কলকাতায়।

নতুন বাড়িতে নতুন সংসার পাতলেন তিনি।

কিন্তু পঞ্জিকা দেখায় ভুলেই হোক, কিংবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, যাত্রাটা বোধ হয় শুভ হয়নি। নইলে বুড়ো বয়সে যে-সুখের আশায় তিনি এত কাণ্ড করলেন, সে সুখ তিনি পাচ্ছেন না কেন? ছেলে-বৌএর মুখে হাসি নেই, তাঁরও অসুখ তাড়াতাড়ি সারছে না; তার ওপর একদিন সকাল বেলা, বৌমা

প্রত্যহ যেমন আনে সেদিনও তেমনি তাঁর জন্য চা আনছিল, হঠাৎ তাঁর চোখের সমুখেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল। বড় বড় ডাক্তার এল্লো, নার্স এলো, বৌমা উঠে বসলো, আবার তেমনি উঠে হেঁটে বেড়াতেও লাগলো, কিন্তু ডাক্তার বললে, সাবধানে থাকতে হবে, হার্টের গোলমাল। রুগী ছিল একজন, হ'লো দু'জন।

সতীশের বাবা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারলেন না—কেন এমন হ'লো। কখনও ভাবেন, বাড়িটা অপয়া। কখনও ভাবেন, বৌটা অপয়া।

অথচ তখন আর শোধরাবার কোনও পথই অবশিষ্ট নেই।

একমাত্র যে-পথটি তাঁর জানা ছিল না, সে-পথের সন্ধান যে তিনি এত শীঘ্র পাবেন তা' তিনি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেননি। তিন মাস তখনও পার হয়নি, অকস্মাৎ একদিন সন্ধ্যায় তিনি বাথ-রুমে ঢুকলেন। ঢুকে আর সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন না। দেরি হচ্ছে দেখে চাকরটা দরজা খুলেই চীৎকার করে উঠলো। চীৎকার শুনে সতীশ এলো, সতী এলো। দেখলে, তিনি তাঁর সকল রকমের ভাবনাচিন্তা থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সতীশ কেঁদে আকুল হ'লো। সতীই তাকে সান্ত্বনা দিলে। মাথাটি তার নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে বললে, এ সময় বিচলিত হয়ো না। তোমাকেই সব করতে হবে।

মন্দ লাগছিল না। তবু সতীশ উঠে বসলো।

সতী বললে, আমাকে তোমার ভাল লাগে না—আমি জানি। কিন্তু কি করব বল, কোথায় ফেলবে? দাদাদের বোঝা হয়ে ছিলাম এতদিন, সেই বোঝার ভার তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তারা সরে পড়লো। কোথায় যে গেল একটা ঠিকানা পর্যন্ত দিলে না। অথচ আমি তাদের সহোদর বোন।

সতীশ উঠে যাচ্ছিল, সতী তাকে টেনে বসালো। বললে, 'আমার এই হার্টের ব্যারাম আজকের নয়—অনেক দিনের। আগে খুব ঘন ঘন হ'তো। বড়দা বলেছিল বিয়ে আমার দেবে না। ছোট বৌদি বেঁকে বসলো। বললে, আমার স্বামীর রোজগার নেই, আমি ঠাকুরঝিকে রাখতে পারবো না।

বড় বৌদি কিন্তু খুব ভালো। বললে, ছি ছোট-বৌ, ও-কথা বলতে আছে? ও যদি তোর মেয়ে হ'তো? তারপর বড় বৌদিই সবাইকে ডেকে বললে, মেয়েটা কানা নয়, খোঁড়া নয়, অথর্ব নয়, অকর্মণ্য নয়, ওরও সাধ আছে সাধ্য আছে, যেমন করে' পারো ওর বিয়ে দিয়ে দাও, যাদের বৌ হবে তারাই ওর অসুখ সারিয়ে নেবে। শেষ পর্যন্ত এই এজমালি বাড়ি বিক্রি করে আমার বিয়ে হ'লো। এক ঘাটের জঞ্জাল আর-এক ঘাটে এসে লাগলো।

সতীশের মনের অবস্থা খুব খারাপ। আজ শুধু মিনতির কথাই তার মনে হচ্ছে। পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে যেতে হবে সেই বাড়িতে। চিঠিখানা ডাকে পাঠিয়ে দিলেই হ'তো, কিন্তু মন তার কেন জানি না ছট্‌ফট্ করতে লাগলো মিনতির জন্যে। শুধুই মনে হতে লাগলো এতদিন সে পরাধীন ছিল, বাপের মৃত্যুর পর এখন সে স্বাধীন হয়ে গেছে।

সেদিন রবিবার। মিনতির নিশ্চয়ই কলেজের ছুটি। সতীশ ভাবলে দুপুর-বেলা যাবে শ্যামবাজারে। কিন্তু নাঃ, অত্যন্ত স্পষ্ট পরিষ্কার দিনের আলো, এ সময় গিয়ে মিনতির কাছে সে দাঁড়াতে পারবে না। অপরাধীর পক্ষে রাত্রিটাই ভালো। মিনতি যদি তাকে ক্ষমা নাও করে, আলোয়-আঁধারে মেশা রহস্যময়ী মিনতিকে সে প্রাণ ভরে দেখে আসবে।

কাচা গলায় দিয়ে সতীশ সেদিন সন্ধ্যায় গিয়ে দাঁড়ালো তার সেই বহু-দিনের পরিচিত বাড়ির অন্দরমহলে। দেখা হ'লো সকলের সঙ্গেই। সবার মুখেই সেই এক কথা!—বিয়ে তো সবাই করে, কিন্তু এমন কি সুন্দরী বৌ হ'লো যে তাকে পেয়ে সারা পৃথিবীটাকে ভুলে গেলে?

মুখচোরা সতীশ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু যার মুখ থেকে এই কথাটা শোনবার জন্যেই সে এসেছে, সে কোথায়?

শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে বলতেই হ'লো সতীশকে।—'মিনতিকে দেখছি না যে!'

কর্তার বড় মেয়ে—মিনতিকে যে এনেছিল এই বাড়িতে, সেই জবাব দিলে।—'সে হতভাগীর কথা আর বলিসনে ভাই। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি এখান থেকে।'

—কেন?

—একদিন তার বালিশের তলায় দেখি না এই এতগুলি প্রেমপত্র। পড়তে পড়তে রাত্রে বোধ হয় বালিশের তলায় রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর মনের ভুলে সেইখানে ফেলে রেখেই কলেজে চলে গেছে। বালিশের ওয়াড়গুলো ময়লা হয়েছিল, একহাত সাবান দিয়ে দিই ভেবে যেই বালিশটা উল্টেছি, বাস্, পড়বি তো পড় আমার হাতেই। বললাম, নাম ঠিকানা বল, এর সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দিই। তা সেই যে এক গোঁ ধরে বসে রইলো, নাম-ঠিকানা কিছুতেই বললে না।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, কারও নাম লেখা ছিল না চিঠিতে?

সে বললে, না। প্রত্যেকটি চিঠির শেষে লেখা ছিল—ইতি, তোমারই শ্রী।

সর্বনাশ! সতীশের মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল। চোখের সামনের আলোগুলো মনে হ'লো যেন দপ দপ করে নিবে যাচ্ছে!

এ যে তারই লেখা চিঠি।

সতীশ আর সেখানে দাঁড়ালো না। দাঁড়াতে পারলে না। তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো। পেছনে কে যে কি বললে তা' তার কানেও গেল না।

পিতৃশ্রাদ্ধ চুকে গেল নির্বিঘ্নে।

তার পরেই সতীশ একদিন গিয়ে দাঁড়ালো বেথুনের দরজায়। যেদিন গেল, সেইদিনই দেখা হলো মিনতির সঙ্গে।

কত ভাবনা ভেবেছিল সতীশ, কত ভয় হয়েছিল তার মনে। ভেবেছিল দেখা হলে মিনতি হয়ত কথাই বলবে না তার সঙ্গে, ভেবেছিল, মান-অভিমানের পালা চলবে কিছুদিন কিংবা হয়ত এই শেষ। বলবে, তুমি আর আমার কাছে এসো না, তোমার মুখ আমি আর দেখতে চাই না।

কিন্তু তার কিছুই হলো না। কলেজের ছুটির পর অন্য মেয়েদের পাশ কাটিয়ে একাই সে বেরিয়ে এলো বাগানের পথ ধরে। বহুদূর থেকে সতীশ তাকে চিনতে পেরেছিল। সেই তার মিনতি! সেই রহস্যময়ী তরুণী! সে যেন আরও সুন্দরী হয়েছে আগের চেয়ে। আরও উজ্জ্বল হয়েছে তার মুখশ্রী।

মিনতি মুখ তুলতেই সুমুখে দেখলে সতীশ দাঁড়িয়ে! ঠোঁটের ফাঁকে একটু-খানি হেসে বললে, এসেছো?

কিছুই যেন হয়নি তাদের মধ্যে!

চলতে চলতে বললে, জানি তুমি আসবে।

সতীশ চলছে মাথা হেঁট করে তার পাশে পাশে।

মিনতি বোধকরি তার ন্যাড়া মাথার দিকে তাকিয়েই বললে, বাবা কোথায় মারা গেলেন? দেশের বাড়িতে না কলকাতায়?

কলকাতায়।

বৌ কি করছে?

শুয়ে আছে।

শুয়ে কেন?

উঠে হেঁটে বেড়াতে পারছে না।

অসুখ? কখন থেকে?

বিয়ের আগে থেকে।

তাহ'লে ঠকেছ বল।

সতীশ জবাব দিলে না। মিনতি ডানদিকে রাস্তা ভাঙলে।

সতীশ বললে, এ দিকে?

মিনতি বললে, আমি শ্যামবাজারে থাকি না।

কিছুই যেন জানে না এমনিভাবে সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, ওখান থেকে চলে এসেছো? কেন?

এমনিই!—মিনতি বললে, এক জায়গায় বেশীদিন ভগবান আমাকে রাখেন না।

কোথায় থাকো

সেইখানেই তো যাচ্ছি। দেখবে চল না!

পরে দেখবো। হেদোয় একটু বসি। এমন করে চলতে চলতে কথা বলা যায় না।

চল।

দু'জনে বসলো গিয়ে হেদোর একটা গাছের ছায়ায়। সবুজ ঘাসের ওপর পা দুটি মুড়ে বাঁধানো একটি খাতা আর বইএর ওপর একটি হাত রেখে মিনতি বসলো সতীশের দিকে মুখ ফিরিয়ে। আর সতীশ বসলো নিতান্ত জড়সড়ো হয়ে মাথা হেঁট করে।

মিনতি বললে, ও. কি? অমন করে' বসলে কেন?

সতীশ তার মুখের পানে তাকালে না। বললে, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারো না মিনতি?

মিনতি হাসলে। হাসলে সেই রকম হাসি, যে-হাসি কান্নার চেয়েও করুণ। বললে, তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ! অপরাধ কি করেছো যে, ক্ষমা করবো?

সতীশ এইবার মুখ তুলে তাকালে। বললে, অপরাধ করিনি?

মিনতি বললে, না, ওটা তোমার স্বভাব। তুমি কি ইচ্ছে করলেই তোমার

স্বভাব বদলাতে পারো? তুমি বাড়ি যাবার সময়েই তো আমি বলেছিলাম।

সতীশ বললে, হ্যাঁ, যা বলেছিলে ঠিক তাই হ'লো।

মিনতি সে প্রসঙ্গটা যেন এড়িয়ে যেতে চাইলে। বললে, পড়াটা ছাড়লে কেন?

—তুমি কি আমার সব খবরই রাখো?

মিনতি বললে, সে সময় আমার নেই। এক ভদ্রলোকের দুটি নাতনীকে পড়াতে হয়, তার ওপর নিজের পড়া, পরের খবর রাখবার সময় আমার কোথায়?—পড়া ছেড়েছো, সারাটা দিন কাটাও কেমন করে?

সতীশ জবাব দিতে ইতস্তত করছিল। মিনতি বললে, ভাবছো কি বলবে? স্ত্রীর কথাটা বাদ দিয়েই বল। সে-কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে আমি বুঝতে পেরেছি।

সতীশ বললে, না লজ্জা নয়—তবে তার কথা কি আর বলবো। সে তো রুগী; ডাক্তার আসছে, ওষুধ খাচ্ছে, আর আমি দিনরাত ইংরেজী নভেল পড়ছি, ইংরেজী সিনেমার ছবি দেখছি। আর—আর—আর কি যে করবো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মিনতি বললে, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি—আর কিছুক্ষণ যদি বসি এখানে, তাহ'লে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কাজেই আজ আমাকে ছুটি দাও। আজ উঠি।

মিনতি উঠে দাঁড়ালো। সতীশও উঠলো।

হেদো থেকে বেরিয়ে একটা গলির ভেতর ঢুকে একটুখানি এগিয়ে গিয়ে পুরনো ধরনের প্রকাণ্ড একটা বাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে মিনতি বললে, এই বাড়ি।

সতীশ বললে, আজ দেখে গেলাম। আবার আসবো। কেউ কোনও আপত্তি করবে না তো?

না। বলে' মিনতি ফটক পেরিয়ে গেল।

ফটক পেরিয়েই আবার ফিরে দাঁড়ালো। ফিরে দাঁড়িয়ে একটুখানি হেসে বললে, আপত্তি করলেই-বা তোমাকে ঠেকাবো কি দিয়ে?

মিনতি দাঁড়ালো না। পেছন ফিরে একবার তাকিয়েও দেখলে না।

সতীশের একদিকে সতী, একদিকে মিনতি।

সতীকেও ফেলতে পারে না, মিনতিকেও ছাড়তে পারে না। এ কি দুর্বহ জীবন হলো সতীশের! কিই-বা এর পরিণাম, কোথায় এর শেষ?

রোজই তার দেখা হয় মিনতির সঙ্গে। কথাও হয় রোজ। শুধু সতীর কথাটা সতীশ [illegible] বলতে গিয়েও বলতে পারে না। কোথায় যেন আটকে যায়।

অথচ ওইটিই তার আসল কথা।

মিনতিই-বা কেমনধারা মেয়ে, সেই যে বলেছিল, লজ্জা যদি পাও, সতীর কথাটা বাদ দিয়ে ব'লো; সেইদিন থেকে ভুলেও সে একবার জিজ্ঞাসাও করে না—সতী কেমন আছে।

সতীকে বুঝতে পারে সতীশ, কিন্তু মিনতিকে বুঝতে পারে না। রহস্যময়ী মিনতি এখনও তার কাছে তেমনি রহস্য-ময়ীই রয়ে গেল।

সতীশ সেদিন আর থাকতে পারেনি। বলে ফেলেছিল মিনতিকে শুনিয়ে শুনিয়ে। —বৌটা মরেও না তো!

মিনতি বলেছিল, ছি! মানুষের মৃত্যু কামনা করতে নেই।

বলেছিল, নিজের হাতে যে-গাছ পুঁতেছো, তার ফলভোগ তো তোমাকেই করতে হবে।

সতীশ বলেছিল, অসহ্য হয়ে উঠেছে। আর আমি পারছি না মিনতি!

কান্নায় ভরে উঠেছিল তার কণ্ঠ।

এ যেন মিনতির কাছে তার মিনতি-কাতর প্রার্থনা! —তুমি আমাকে রক্ষা কর! তুমি আমাকে বাঁচাও!

কথাটা শুনে মিনতি এমন হাসি হেসে-ছিল যে, সতীশ আর একটি কথাও বলতে পারেনি।

একসঙ্গে বসে সিনেমার ছবি তারা অনেকদিন দেখেনি।

সতীশ বললে, শুনছি একখানা ভাল ছবি চলছে। কাল রবিবার। কাল যাবে?

মিনতি বললে, এসো। দেখবো চেষ্টা করে।

অনেক আশা নিয়ে সতীশ গেল মিনতির কাছে। কিন্তু গিয়েই শুনলে, মিনতি বেরিয়ে গেছে। একা নয়, বেরিয়ে গেছে সবাই মিলে। বাড়ির কর্তা, কর্তার দুই নাতনী আর মিনতি।

কোথায় গেছে কেউ কিছু বলতে পারলে না।

সতীশ একাই গেল সিনেমার ছবি দেখতে।

ছবির নাম—'PLACE IN THE SUN'. চমৎকার ছবি! তার জীবনের সঙ্গে অনেকখানি মিলে যায়। থিয়োডোর ড্রেসলারের 'অ্যান্ আমেরিকান্ ট্র্যাজিডি' বই থেকে নেওয়া গল্পাংশ। ছবি দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে শুধু এই আফশোশ তার হতে লাগলো—ইংরেজী বই সে এত পড়েছে, অথচ এই বইখানি এতদিন পড়েনি কেন?

আমেরিকার এক তরুণের দুর্ভাগ্যের কাহিনী। তারই মত একজন যুবক তার স্ত্রীর জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মরছে। এমন দিনে সে তার এক বন্ধুর বাড়ি গেল বেড়াতে। সেখানে এক তরুণীর সঙ্গে দেখা। মনে হলো এই মেয়েটিকে যদি সে তার জীবনসঙ্গিনী করতে পারতো, তাহলে তার জীবন হয়ে উঠতো মধুময়। তার যে স্ত্রী আছে, সে-কথা সে গোপন করে মেয়েটিকে বিয়ে করবার সব ব্যবস্থাই যখন ঠিক করে ফেলেছে, এমন দিনে সেই শহরেরই এক হোটেল থেকে এলো এক টেলিফোন! তার স্ত্রী এসে হাজির হয়েছে সেখানে।

সর্বনাশ!

তৎক্ষণাৎ মাথায় তার এক দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল।

মস্ত বড় একটি লেক আছে সেই শহরের প্রান্তে। সেখানে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়। তরুণ-তরুণীরা এখানে আসে নৌকো-বিহার করতে। সেও তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেল সেই লেকের ধারে, নৌকো ভাড়া করলে, তারপর নির্জনে কথা বলবার জন্যে সেই নিস্তরঙ্গ লেকের জলে দিলে নৌকো ভাসিয়ে। আকাশে চাঁদের আলো। বাতাসে বসন্তের আমেজ।

স্বামী শুরু করলে তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রমালাপের অভিনয়।

তার পর হঠাৎ এক সময় নৌকোটা দুলে উঠলো। দুলে উঠেই গেল উলটে। স্ত্রী সাঁতার জানতো না। নৌকোর তলায় চাপা পড়ে কোথায় তলিয়ে গেল—দেখবার কোনও প্রয়োজন ছিল না তার স্বামীর। সাঁতার কেটে সে তীরে উঠলো। তার পর কাজ হাসিল করে ফেলেছে ভেবে মনের আনন্দে মিললো গিয়ে তার প্রণয়িনীর সঙ্গে।

লোকটা নিতান্ত নির্বোধ। একবারও ভাবলে না—যে-লোকটা তাকে নৌকো ভাড়া দিয়েছিল, সে তার নৌকোর খোঁজ করবে।

তাই শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়ে গেল।

কিন্তু সতীশ এত নির্বোধ নয়।

নতুন একজন ডাক্তার এলেন সতীকে দেখতে।

সতীশ বললে, এতদিন ধরে এত চিকিৎসা হচ্ছে, এত ওষুধ খাচ্ছ, তবু তোমার রোগ সারছে না। ও ডাক্তারগুলো বোধ হয় টাকা পাবার লোভে পুষে রাখছে রোগটাকে। তাই আমি আজ অরুণবাবুকে ডেকে আনলাম। হার্ট স্পেশালিস্ট। বিলেত থেকে পাশ করে এসেছেন।

সতী বললে, কেন মিছিমিছি খরচ করছো টাকাগুলো। আমার এ রোগ সারবে না।

নিশ্চয় সারবে।

নতুন ডাক্তারবাবুও সেই কথা বললেন। বললেন, খুব বেশি ওষুধ খাইয়েছেন কি?

সতীশ বললে, যেখানে যত ওষুধ আছে—সব।

ডাক্তারবাবু বললেন, আজকালকার নিয়ম হচ্ছে খুব কম ওষুধ খাওয়ানো। সাত দিনের জন্যে অন্তত সব ওষুধ বন্ধ করে দিন। সাত দিন পরে আমি আবার আসবো, এসে ওষুধ দেবো একটা।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, একেবারে সব-কিছু বন্ধ থাকবে?

হ্যাঁ সব। —ডাক্তারবাবু বললেন, শুধু একবার করে গঙ্গার হাওয়া খাওয়ান। রোজ সন্ধ্যেবেলা একটা নৌকোয় করে গঙ্গার ওপর অন্তত ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসবেন।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

কথাটা সতীরও মনে ধরলো। খোলা হাওয়ায় সে বেশ ভালই থাকে।

পরের দিন নৌকোয় চড়ে গঙ্গায় বেড়াবে। যাবার জন্যে সতী তৈরি হলো সন্ধ্যের আগেই। রান্নার জিনিসপত্র বের করে দিলে ঠাকুরকে। ফিরতে যদি দেরি হয়। চাকরটাকে বললে, বাড়ি ছেড়ে যেন পালিয়ো না কোথাও আড্ডা মারতে। ঝিকে বললে, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত থেকো তুমি।

তার পর ভাল একটি জামা গায়ে দিয়ে, ভাল শাড়ি পরে সতীশের কাছে এসে বললে, চা খাওয়া হয়েছে তোমার? চল।

সতীশ ফিরে তাকালে। —বা রে! সাজলে তো সতীকে মন্দ দেখায় না! বললে, তুমি একেবারে সেজেগুজে তৈরি হয়ে গেছ?

সতী বললে, হ্যাঁ, গঙ্গা পর্যন্ত হেঁটে হেঁটেই যাব তোমার সঙ্গে।

সতীশ তার দিকে তাকিয়ে ছিল এক-দৃষ্টে। সতী বললে, কি দেখছো অমন করে?

সতীশের ভাবনার সূত্রটা যেন ছিঁড়ে গেল। বললে, নাঃ, কিছু না।

সতী আর একটু এগিয়ে এলো তার কাছে।

সতীশ বললে, সাজলে তোমাকে মন্দ দেখায় না।

ম্লান একটি হাসির রেখা ফুটে উঠলো সতীর ঠোঁটের ওপর। বললে, তাও ভালো যে ফিরে তাকালে এইদিকে!

সতীশ তার জামাটা গায়ে দিলে। জানলার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে, নাঃ, আজ আর যাওয়া হলো না। কাল যাব। আজ আমার একটা খুব জরুরী কাজ আছে, সেরে আসি।

সতীশ আর দাঁড়ালো না, সতীর দিকে একবার ফিরেও তাকালো না, সোজা চলে গেল তার জরুরী কাজের জায়গায়।

জায়গাটা আর কোথাও নয়। বেথুনের কাছে হেদো, হেদোর কাছে একটা গলি, গলির ভেতর রায়বাহাদুর নিকুঞ্জ ঘোষালের বাড়ির তেতলায় নির্জন একখানি ঘর। মিনতির আস্তানা।

মিনতিকে কথাটা বলবার জন্যে সতীশ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল।

বললে, সেদিন যদি যেতে আমার সঙ্গে সিনেমায়—ভারি মজা হতো।

মজাটা কি হতো, ইনিয়ে বিনিয়ে তাকে বললে সতীশ। বললে তাকে—ছবির গল্পটা।

তার পর তার এক বন্ধুকে ডাক্তার সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া।

তার পর ডাক্তারের অভিনয়!

এই বুঝি ধরা পড়ে! বলতে বলতে সতীশের সে কি হাসি!

হাসতে হাসতে মিনতির মুখের পানে যেই সে মুখ তুলে তাকিয়েছে; মুখের হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

মিনতি গম্ভীর মুখে অন্যদিকে চেয়ে আছে। কি যেন ভাবছে।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছো?

মিনতি বললে, পারবে তুমি এ-কাজ করতে?

সতীশ বললে, বুঝতে পেরেছো তাহলে?

মিনতি বললে, হুঁ।

সতীশ বললে, আচ্ছা দ্যাখোই না আমি কি করি! ভগবান সেদিন আমাকে যেন এই ছবিটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে!

মিনতি বললে, ভগবান তোমাকে খুব ভালবাসে দেখছি!

সতীশ বললে, কথাটা তোমার ভাল লাগছে না, আমি বুঝতে পারছি। মেয়ে-মানুষ তো! স্বভাবতই দুর্বল।

মিনতি বললে, তোমার চেয়েও?

সতীশ চুপ করে গেল।

মিনতি বললে, না না, তুমি এ-কাজ করো না। দ্যাখো না—কি হয়!

হবে আর ছাই! আমি আজ উঠলাম।

এই বলে সতীশ সেদিন তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল।

মিনতি তার পিছু পিছু সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত এলো। সতীশ যেন উন্মাদ হয়ে গেছে।

মিনতিকে পাবার জন্য উন্মাদ!

পরের দিন, সন্ধ্যায়। সতীকে সঙ্গে নিয়ে সতীশ গঙ্গার তীরে গিয়ে দাঁড়ালো। নৌকো ছিল একটিই। মাঝি এক বৃদ্ধ মুসলমান। এক ঘণ্টা ঘুরিয়ে আনবে। ভাড়া চেয়েছিল দু' টাকা। সতীশ দু' টাকা দিতেই রাজি। সতী বললে, না, দেড় টাকা।

মাঝি তাইতেই রাজি হলো।

নৌকো চললো। ধীরে-ধীরে। অত্যন্ত ধীরে-ধীরে।

সতীশ বললে, নৌকোটা জোরে জোরে চলে না বুঝি?

মাঝি বললে, ঠিক যাচ্ছে বাবুজী।

ফাঁকা নৌকো। ছই নেই।

সতীশ আর সতী—একজন বসেছিল এইদিকে, একজন ওইদিকেই দু'জন মুখো-মুখী। সতীশ ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

নৌকো মাঝ-দরিয়ায় এসে গেছে। সতীশ পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে মুখে দিলে। দিয়াশালাই জ্বালতে গিয়ে দেখলে, ক্রমাগত নিভে যাচ্ছে।

সতী বললে, যা হাওয়া!

সতীশ কিন্তু জানে, হাওয়া নয়, তার হাতদুটো কাঁপছে।

সতীশ এদিকে সরে এলো। সতীর পাশে এসে বসলো। বাঃ চমৎকার! সতীকে আড়াল করে দেশলাই জ্বালবে। একটা কাঠি জ্বাললে। নিবে গেল। আর-একটা এবারও তাই। আবার একটা। এবার জ্বলেছে।

সতীশ চোঁ চোঁ করে খুব জোরে জোরে সিগারেট টানছে। ভুলেই গেছে যে, সিগারেটের ধোঁয়া সতী সহ্য করতে পারে না।

একবার চেষ্টা করলে। পারলে না।

সতী খুক্ খুক্ করে কেশে উঠলো।

ও। —সতীশ সরে গেল নিজের জায়গায়।

মাঝি বললে, এবার ফেরাই বাবু।

সতীশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সতী তার আগেই বললে, হ্যাঁ, ফেরাও।

সেদিন কিছু হলো না। ফিরে এলো।

তাহলে কি মিনতি যা বলেছিল তাই সত্যি? পারবে না সে এ-কাজ করতে?

নিশ্চয়ই পারবে।

মিনতিকে দেখিয়ে দেবে সে দুর্বল নয়।

পরের দিন আবার।

আবার সেই গঙ্গা, সেই মাঝি, সেই নৌকো!

সতী আর সতীশ চলেছে মাঝ-দরিয়ায়।

আজও সিগারেট বের করলে সতীশ। আজও জ্বলছে না একটা কাঠিও। কিন্তু—

সতী বললে, আজ তো সেরকম হাওয়া নেই। তবু জ্বলছে না?

না। বলে সতীশ উঠে এলো সতীর পাশে।

দেশলাই জ্বলেছে। সিগারেট ধরেছে। ধোঁয়ার জন্য এবার তার নিজের জায়গায় চলে যাবার কথা। তবু যাচ্ছে না।

সতী কি ভেবে চট্ করে ফিরে তাকালে।

কি দেখলে সে?

নিজের অপকৌশল চাপা দেবার জন্যে যে-হাত দিয়ে সতীকে সে ঠেলে ফেলে দিতে গিয়েছিল, তার প্রসারিত সেই দুই হাত দিয়ে সতীর হাতদুটো চেপে ধরে বললে, হাওয়া পাচ্ছো?

সতীশের গলা কাঁপছে। হাতদুটো কাঁপছে। সে যেন ধরা-পড়া চোর। সতী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সতীশের দিকে।

সতীশ আর কোনও কথা বলতে পারছে না।

সিগারেটটা চোঁ চোঁ করে টেনেই চলেছে। ধোঁয়ায় সতীর মুখ ভরে গেল।

সতীর দু'চোখ জলে ভরে এলো। বললে, বুঝতে পেরেছি। এ-কথা আমাকে তুমি আগে বলনি কেন?

এই বলে সতী তাকে একটি প্রণাম করলে।

সতীশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে আর মুহূর্তের অবসর না দিয়ে নিজেই সে সশব্দে মাঝ-গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সতীশ চিৎকার করে উঠলো, সতী! সতী!

বুড়ো মাঝি হাতের বৈঠা ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপ দিলে জলে।

মাঝিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে ওদিক থেকে একটা নৌকো যেন তর্ তর্ করে ছুটে আসছে।

সতীশ দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে নৌকোর একটা পাটাতন চেপে ধরে থর্ থর্ করে কাঁপছে।

মুহূর্তের মধ্যে কি যে হয়ে গেল, কেমন করে সে তীরে এসে পৌঁছলো, কেমন করে আরও কয়েকটা নৌকো তাদের কাছে এসে গেছে—কিছুই তার স্মরণ নেই।

বুড়ো মাঝি একা নয়, আরও অনেকে চেষ্টা করেছে সতীকে উদ্ধার করবার, কিন্তু কেউ কিছু করতে পারেনি। স্রোতের টানে সতীকে কোথায় টেনে নিয়ে গেছে কে জানে। মৃতদেহ কোথায় গিয়ে ভেসে উঠবে, তাই-বা কে বলতে পারে!

সতীশ থানায় গেল। মাঝিদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

যা করবার সবই করলে।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে এলো একা।

ঠাকুর, চাকর, ঝি—সবাই জিজ্ঞাসা করলে, মা কোথায়?

সতীশ শুধু বললে, মা নেই।

সতীর ঘরে যে বিছানা তার পাতাই থাকতো, সতীশ তার ওপর গিয়ে বসলো। বালিশটা তুলতেই তার তলায় দেখলে কয়েকটা কাগজের টুকরো, একখানা বাংলা নভেল।

কাগজে কি যেন লেখা রয়েছে। সতীর হাতের লেখা।

অনেক কিছু সে লিখেছে আর কেটেছে। সম্ভবত তাকেই সে লিখে জানাতে চেয়েছে —একজায়গায় লিখেছে, তোমাকে বলতে পারছি না, তাই লিখে জানাচ্ছি। তুমি একটি বিয়ে কর।

সে-রাত্রে সতীশ আর মিনতির কাছে যেতে পারলে না। গেল তার পরের দিন। সকালেই গেল।

যাবা মাত্র বুড়ো রায়বাহাদুর তাকে বললেন, শোনো তো ভাই। এই ঘরে এসো।

সতীশ তাঁর ঘরে যেতেই তিনি দু'খানি খামের চিঠি দেখিয়ে বললেন, মিনতি পালিয়েছে। এই নাও তোমার চিঠি। কি লিখেছে পড়ে দেখো। খাম বন্ধ করে দিয়েছে। আমাকে লিখেছে, আমি যেমন এসেছিলাম, তেমনি চলে গেলাম। আমার খোঁজ করবেন না।

সতীশ ততক্ষণে তার নিজের চিঠিখানি খুলেছে।

মিনতি লিখেছে : তুমি যে দুর্বল নও, সেই কথাটা প্রমাণ করবার চমৎকার সুযোগ তুমি পেয়েছ। তুমি নিজেই বলেছো—মেয়েরা স্বভাবতই দুর্বল। তাই আজ আমি তোমার চেয়ে দুর্বল হয়েই রইলাম। চলে গেলাম চিরদিনের মত। আমার খোঁজ করবার বৃথা চেষ্টা করো না। আমাকে তুমি পাবে না।

সতীশ চিঠিখানি নিয়ে চলে এলো।

সেই থেকে সতীশ মিনতিকে খুঁজছে।

এদিকে ক্রমাগত মনে হচ্ছে, পেছনে সতীর কণ্ঠস্বর : এ-কথা আমাকে তুমি আগে বলনি কেন?

সুমুখে মিনতি, পেছনে সতী!

মানুষ সামলায় কেমন করে বলতে পারেন?

স্কেচ ॥ শ্রীনন্দলাল বসু

স্কেচ ॥ শ্রীনন্দলাল বসু

ফিলিপস্ এর সুপার এম রেডিও

সবে বেরিয়েছে

বিসিএ ৩৪৫ বি
৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড, ৫ ভাল্ভ্
চমৎকার স্বর, ব্যাটারী খরচে
সাশ্রয়—মূল্য : ২৯৫৲
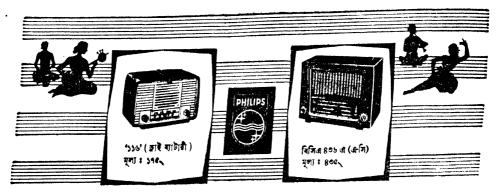
রেডিওতে ম্যাগনেটিক সরঞ্জামের ব্যবহার এটা ফিলিপ্স্ এর নূতন এক সৃষ্টি; এঁদের আধুনিক রেডিওগুলি "সুপার এম্" কৌশলে সমৃদ্ধ হ'য়ে রেডিও জগতে নূতন এক মাপ-কাঠির প্রবর্তন করেছে।

আনন্দ-মুখর দিনের খোরাক জোগাবে ফিলিপ্স্ এর নূতন এই 'সুপার এম্' রেডিও গোষ্ঠী। এ দিনের উপহার হিসাবে ফিলিপ্স্ এর রেডিওর কথা না ভেবে পারা যায় না।

আপনার গৃহের অফুরন্ত আনন্দের আধার

মূল্যের উপর স্থানীয় ট্যাক্স্ দেয় কোন রকম ডিস্কাউন্টের ব্যবস্থা নেই।

PSPH 137 A

কাস্টমসের হাঙ্গামা চুকিয়ে জাহাজ বোঝাই হওয়া গেল। মানুষ উঠে গেছে, পাট তোলা কিছু বাকি এখনো। ভর সন্ধ্যা, জেটির ভিড় নিঃশেষ হয়ে এলো। দুটো ক্রেন শুধু শ্রান্তিহীন নৈঃশব্দে গাঁটরির পর গাঁটরি জাহাজের খোলে নামাচ্ছে। শেষ নেই, সীমা নেই। ঝুপঝুপে বৃষ্টির ভিতর পাট নিড়চ্ছে, গাঁয়ে গাঁয়ে দেখেছি দুর্গন্ধ কালিবর্ণ এককোমর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পাট কাচছে। তারা এখন হয়তো জারির আসরে মশগুল, কিম্বা দাওয়ায় বসে ভুড়ুক-ভুড়ুক তামুক টানছে। কষ্টের ফসল এদিকে কিন্তু পাচার হয়ে যায় লবণ-সমুদ্রের পারে।

আবার একদল বিদায় দিতে এলেন। উঁচু সিঁড়ির মাথা থেকে সাড়ম্বরে এসো, এসো—হাঁক ছাড়ি। ডেকে তুলে এনে চায়ের হুকুম দিয়ে দিই। জাহাজ আপাতত আমার ঘরবাড়ি, এক বাড়ির মানুষ হলেও এঁরা এখন বাইরের লোক। ডাঙার উপরের বদ্ধ জীব, অতিশয় করুণার পাত্র। রকমারি পরীক্ষা ও বিচার-বিবেচনা অন্তে ডাক্তার জাহাজে উঠবার ছাড়পত্র দিয়েছেন। বলেকয়ে খাতিরউপরোধে নেমে গিয়ে এক পাক দু'পাক হয়তো ঘুরে আসতে পারি, কিন্তু সেটা আইনদস্তুর হবে না। রোগের জড় চতুর্দিকে ওৎ পেতে রয়েছে—ঘোরাঘুরির মধ্যে, ধরুন, বীজাণু কিঞ্চিৎ সঙ্গে বয়ে নিয়ে এলাম। তা হলে?

শেষ রাতে জাহাজ ছাড়বে, নোঙর ফেলে আছে। দূর সমুদ্রে যাবার আগে দিব্যি এক ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছে। ইঞ্জিনে ফোঁস-ফোঁস শব্দ—ঠিক যেমনটা ঘুমন্ত লোকে শ্বাসপ্রশ্বাস ছাড়ে।

লাউঞ্জে সদলবলে চা খেতে গিয়ে দৃষ্টি আর ফেরাতে পারিনে। খোদার দুনিয়া অতি বিচিত্র—তবু কিন্তু হেন আশ্চর্য সমাবেশ কদাচিৎ নজরে পড়ে। চারটি মেম সাহেব—আকারপ্রকার ও আয়তন হুবহু এক প্রকার। একই মাতৃগর্ভে এক সঙ্গে গলাগলি হয়ে না থাকলে এমন সম্ভবে না। চারজনে সেটিগুলো দখল করে বসে আছেন। জাহাজ ওদিকটায় কাত হয়ে গিয়ে কলকল করে তো জল উঠবার কথা। উঠছে না কেন ভাবতে গিয়ে মালুম হল, উল্টো দিকে ডাঙার সঙ্গে শক্তভাবে কাছি করা রয়েছে। এখন তো রক্ষা হয়েছে, কিন্তু নোঙর যখন উঠবে, অকূল সমুদ্রে জাহাজের উপর বস্তু চতুষ্টয় যখন ঘোরা-ঘুরি করবেন? বলতে পারেন, বড় বড় পাটের গাঁইটও তো যাচ্ছে। কিন্তু নির্জীব মালের বড় সুবিধা ভারসাম্যের হিসাবকিতাব করে যে জায়গায় রেখে দেবেন ঠিক সেই-খানে থাকছে। মেম সাহেবরা তো অমন ধারা চুপচাপ থাকবেন না?

আমাদের চা দিয়েছে, মোটা মেমদেরও দিল। তাঁরা চা ঢালছেন না—বিরক্ত কথাবার্তা, ব্যস্তসমস্ত দৃষ্টি। কই, আসছে না কেন এখনো? একজনে অধীর হয়ে কাঠের সিঁড়ির দিকে ধাওয়া করলেন। সর্বনাশ—কান্ড ঘটল এইবারে একখানা! সিঁড়ির নিচের দিকে দুজন মিস্ত্রি দেয়ালে বিদ্যুতের বাল্ব বসাচ্ছে। সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠল, মরে বুঝি হতভাগারা চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে!

না, বিলাতি জাহাজ—সিঁড়ি মজবুত কাঠে বানানো। মেম সাহেবরা ওদেরই দেশের তো—পূর্বাহ্নে সেইসব ভাবনা ভেবে রেখেছে। এমন-তেমন জাহাজ হলে এত ধকল সামলাতে পারত না। মেম সাহেব সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেলেন—এক ছোকরাকে বগলদাবায় নিয়ে পুনশ্চ নেমে এলেন ঐ পথে। আহ্লাদে আরও যেন ফুলে উঠেছেন। সিঁড়ি তবু ভাঙে না।

ছোকরাও ডগমগ। হাসতে হাসতে যেই না দেখা দিয়েছে, অপর তিনজনও টেবিল ছেড়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। গাঁয়ে দেখে-ছিলাম, কাছারির দরোয়ান খাজনার দায়ে ফড়িং কর্মকারকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যতই হাসুক, আমার কিন্তু সেই ফড়িঙের অবস্থাটা মনে আসছে। চারজনে চার দুনো আট হাতে ধরে আছে অক্টোপাসের কবলে পড়েও হাসতে পারে, ছোকরা বীর ব্যক্তি তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।

চা-পানের পর জাহাজময় ওরা টহল দিতে বেরুল। এ পাশে জেটি, আর ওদিকে দূরবিস্তীর্ণ কল্লোলিনী গঙ্গা। গঙ্গার কূলে দাউদাউ করে একটা চিতা জ্বলছে। তারার আবছা আলোয় ভারি এক আশ্চর্য ছবি দেখছি। এ যেন শহর কলকাতা নয়—সভ্যতা-সীমানার দূরবর্তী কোন এক নতুন জায়গা। পরিপূর্ণ স্বপ্ন-ভূমি—জীবন্ত মানুষের দৃষ্টির মধ্যে আসে না, অন্তত জাগ্রত চোখে তো নয়। চোখেই দেখে না আদপে, দেখতে হয় মন দিয়ে। আজকের যাত্রামুখে দূর ও নিকটে লোফালুফি চলছে—পরিচিত বান্ধবরা আসছেন যাচ্ছেন কাছাকাছি ঘুরছেন, ডাকছে সুদূর অপরিচয়ের সমুদ্র। এই দোলায়িত মনে বেদনা ও আনন্দের মেশা-মেশিতে চারিদিকে এমন নতুন রঙ ধরেছে।

চমক লাগল। হোস-পাইপে জল ছাড়বার মুখে যেমন আওয়াজ হয়, অবিকল তাই। দার্শনিক চিন্তা চুরমার হয়ে গেল—সর্ব-নাশ, চার মেমসাহেব একটি দুর্ভাগা ছোঁড়াকে আক্রমণ করেছেন। অর্থাৎ ওঁদের প্রথা মাফিক চুম্বন সেরে ষোল আনা বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন এবার। এই একটি কেবল নয়—আরও তিনজন অপেক্ষমান। পর পর বিদায় পর্ব চলবে, কেউ রেহাই দেবেন না। চুম্বন কি বলি—বাঘে হরিণছানার ঘাড় মটকে ধরে, ঠিক সেই গতিক। বাঘ না বলে হাতী বলতে পারলে বর্ণনা বেশি লাগসই হত। সে যাই হোক, চলে যাচ্ছেন—ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। চার মেম সাহেব নেমে গেলেন—জাহাজ মুক্তির উল্লাসে ইঞ্চি চারেক অন্তত জলের উপর ভেসে উঠেছে, মাপামাপি না করেও হলপ করে বলতে পারি। বাহাদুর বলি ছোঁড়াটাকে—এত কাণ্ডের পরেও রুমাল উড়াচ্ছে রেলিঙ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। এ লোকের পরিচয় না নিলে চলে না। ব্রাউন নাম, মোমবাসায় যাচ্ছে। আর অধিক আপাতত হল না। ফোঁত ফোঁত করছে, রুমালে চোখ ঘষে ঘষে রাঙা করে ফেলেছে। আছে পাঁচ নম্বর কেবিনে—আমাদের পাশেই। তাড়া নেই, কথাবার্তার অঢেল সময় পাওয়া যাবে।

আরও রাত হল। ঘাটের জাহাজ বলে অল্পসল্প আলো দিয়েছে, আঁধার কাটে নি। খালাসিরা নিঃশব্দে আনাগোনা করছে। ডিনারের প্রথম ঘণ্টা—বাচ্চা ছেলেপুলে খাবে এইবার। —যাই তবে? আমাদের এঁরা বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে জেটিতে নামলেন। চাঁদ দেখা দিয়েছে দালান-কোঠার ফাঁক দিয়ে। সামনের ফাঁকা জায়গাটায় ক্রেনের ছায়া। সারাদিন ধরে কত মানুষের আনাগোনা, কত হৈ-হল্লা—আর চাঁদের আলো, দেখুন দেখুন, জেটির উঠানে যেন আলপনা দিয়ে দিয়েছে। যাচ্ছেন ওঁরা দূরে অনেক

দূরে—ঠিক যেমন জন্মজন্মান্তরের কত আত্মীয়বন্ধু বিস্মৃতিতে বিলীন হয়ে গেছেন। কাঠের পাটাতনের উপর খটখট আওয়াজ তুলে অলস নৈষ্কর্মে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নিবন্ত চিতায় জল ঢেলে দিয়ে ওপারে শ্মশানবন্ধুরা ধীরে ধীরে ফিরে চলেছে। বাঁকের মুখে ক্রমে তারা আড়াল হয়ে গেল। গঙ্গার এ-কূল আর ঐ কূল দুই দৃশ্যের মধ্যে মিল আছে বিস্তর।

জাহাজে ডাক্তারবাবু আছেন। ও'দের দাপটে ডাঙার উপরে তো মরেও সুখ নেই। সমুদ্রে পালাচ্ছি, সেখানেও ও'রা। শুনলাম বাঙালী। যাই তবে তোয়াজ করে আসিগে।

ডাক্তার রোগী দেখতে বেরিয়ে গেছেন। যার যে কাজ। এই তো বিকালবেলা যাত্রীরা জাহাজে উঠল, এরই মধ্যে রোগে ধরেছে! কম্পাউণ্ডার লোকটা বেজার মুখে বলে, ডিনার খেয়েই বমি শুরু করে দিয়েছে। ঘাটের উপরে এই দরিয়ায় পড়ে তবে তো মশায়। বন্যা বইয়ে দেবে কিছু না, কিছু না—মুফতে অষুধপত্র মেলে, মনের সুখে তাই খেয়ে নিচ্ছে।

কেবিনে ফিরে এলাম। কেবিনবয় ভোলানাথ। বয়টির একগাছি দাড়িও কালো নেই —নৈমিষারণ্যের ঋষিদের মতন। নোয়াখালি জেলার লোক। জিজ্ঞাসা করলে পুরো নাম বলবে শেখ ভোলানাথ।

ভোলনাথ বলে, ডাক্তার তো এখানেই এসেছিলেন এইমাত্তোর।

কি আশ্চর্য, আমার কাছে কেন? ডিনার আমায় তো কাবু করতে পারে নি, সমস্তগুলো পদ অবহেলে উদরে ধারণ করে বেড়াচ্ছি। ঘর ভুল করলেন? বাতলে দাও দিকি ভোলানাথ, ডাক্তার সাহেবের চেহারা কেমনধারা, খোঁজ নিয়ে আসি।

জামাজুতো-পরা। জোরে জোরে চলেন। চড়ন্দার লালমুখো সাহেব হলেও ও'র কাছে খাতিরউপরোধ নেই।

এ মোক্ষম বর্ণনার পরে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল যেখানেই থাকুন নির্ঘাৎ ডাক্তারকে টেনে বের করব। সিঁড়ি দিয়ে নামছেনও বটে এক ব্যক্তি—ধুপধাপ পা ফেলছেন, পায়ে জুতো। এবং জামাও রয়েছে গায়ে—

ডাক্তার সাহেব আপনি?

নেহি, ধোবি—

লণ্ড্রি আছে জাহাজে। কয়েক ঘণ্টায় কাপড় কেচে দেয়, রোদ-বাতাসের মুখ চেয়ে থাকতে হয় না। ধোবি ডাক্তারের মতন ভালমানুষ নয়। কাপড় কেচে দিয়ে দাম লিখে রাখে—আট আনা থেকে পুরো টাকা। সবে জাহাজে চড়েছি, পাটভাঙা কাপড়চোপড়, ধোবি চাইনে—ডাক্তার খুঁজছি।

বের করলাম অবশেষে। ডেক-চেয়ারে টানটান হয়ে পড়ে আছেন। বয়স বেশি নয়, পাশ করেই জাহাজের চাকরি নিয়েছেন। সপ্তসাগরে আনাগোনা, যাত্রীদের ডেকে ডেকে আলাপ জমান। লিস্টে বাঙালি নাম পেয়েছেন—তবে আর কি! রোগীটাকে তিন রকম পুরিয়া একটা প্রলেপ ও দুটো মিকচারের ব্যবস্থা দিয়েই আমাদের কেবিনে চলে গিয়েছিলেন।

এবং মনে মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ-মেঘও জমেছে। বললেন, যাত্রীর মধ্যে আপনার নাম দেখলাম। এই নামের একজন কিন্তু—

শশব্যস্তে বলি, সে আমি নই। নামে নামে কতই মিল থাকে। এই ধরুন—ভূপৎ আছে সৌরাষ্ট্রের ডাকাত, আর ভূপতি মজুমদার এই সেদিন অবধি মিনিস্টার ছিলেন। দু-জনে তাই বলে এক হলেন নাকি? ভদ্রলোকের ছেলে, শখ করে অকূলে যাচ্ছি—নামের মিলে অমনি যা-তা ভাবতে বসেছেন!

লেখেন না আপনি?

তা লিখি, একেবারে লিখব না কেন? নিয়মিত জমাখরচ লিখে থাকি। এক বয়সে দু-দশখানা প্রেমপত্রও লিখেছি। বুকে হাতে বলুন তো, এ দুষ্কর্ম কে না করেছে! বেছে বেছে তবে আমারই উপর লেখক বদনাম হবে কেন?

তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ডাক্তার সাহেব পাশের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন. বসুন।—

এবং এ-গল্প সে-গল্পের পর,

ডিনারে কি কি খেয়ে এলেন বলুন—

বিদঘুটে ফরাসি নাম। অত বুঝি কারো মনে থাকে!

ডাক্তার সাহেব বুক ঠুকে বললেন, আমার আছে। নাম শুধু নয়, কোনটার ভিতর কি কি মশলা—সমস্ত আমার জানা। দায়ে পড়ে শিখতে হয়েছে। আমার মায়ের হুকুম।

মায়ের কথায় ডাক্তারের কণ্ঠ গভীর হয়ে উঠল, মা আমার বিধবা মানুষ—আচার-বিচারের বড্ড ধুম। হুকুম আছে আর যা-ই হোক, গরু-শুয়োরের তরকারি পাতে না পড়ে। মা'র কাছে আমি কথা দিয়ে এসেছি।

তারপর বললেন, শুনুন—একটা যুক্তি দিই আপনাকে। আমার খানা আগেভাগে
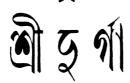
ঘরে দিয়ে আসে। আমি এসে বলে যাবো, কোন কোনটা চলবে। টেবিলে তদনুযায়ী অর্ডার দেবেন। এই যেমন আজকের বেগুনের তরকারিটা। খান নি তো? ঠকেছেন, বিষম ঠকেছেন। বড্ড উৎরেছে, জিভে এখনো স্বাদ জড়িয়ে আছে।

ঘাড় নেড়ে বলি, উৎরাবারই কথা! ভীলের পুর দেওয়া আছে কি না!

বলেন কি? তা কক্ষণো হতে পারে না। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন নাকি?

দরকার হয় নি, আপনি এসে বলল। আমার সঙ্গের ভদ্রলোকটি নিরামিষ খান। তাই বলতে এসেছিল, বেগুনেই তো প্রায় সব—সামান্য কয়েক টুকরো মাংস, তা-ও কত নরম জাতের জিনিষ। নিরামিষ পাতে এ তরকারি চলবে কি না?

ওয়াক-থুঃ, ওয়াক-থুঃ—বলছেন কি মশায়!

ঘাবড়ান কেন? মা-ঠাকরুনকে কথা দিয়ে এসেছেন, সেটা বজায় রয়েছে। পুরোপুরি তো গরু হল না—বাছুর মাত্র।

ডাক্তার বলেন, হারামজাদা বাটলারকে দেখে নেবো আমি। তবু রক্ষে, খাঁটি গঙ্গার উপর রয়েছি, দোষ তেমন অর্শাচ্ছে না। সাগরে পড়লে কড়াকড়ি করতে হবে।

প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে গেল। জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। জাহাজ চলছে ধীরে ধীরে।

পাড়ের চেহারা অবিরত বদলাচ্ছে। দেখছেন ঐ নারিকেল-খেজুরে ঘেরা ঘর-বাড়ি। তার পরেই এলো মসজিদ আমবাগান। গ্রাম ছাড়িয়ে এলাম তো ধানক্ষেত। ক্ষেত, ক্ষেত—ক্ষেতের আর অন্ত নেই। নৌকোর পর নৌকো চলেছে গদাই-লস্করি চালে। ভেসে চলেছে শেওলা। সূর্য উঠছে। রোদ পড়ে গাঙের ঘোলা জল রুপার পাতের মতো ঝিকমিক করছে। জন-কল্লোলিত শহর ছেড়ে এ আমি কোন জগতে এসে পড়লাম। শ' দুই-তিন হাত দূরেই ডাঙা। তবু কি অপার প্রশান্তি এই জায়গাটায়! জীবন-সংঘর্ষের খরতাপ এই জলটুকু পার হয়ে পৌঁছতে পারে নি—ডাঙার মধ্যেই আটকে রয়েছে। ঠান্ডা হাওয়া শরীর-মন জুড়িয়ে দিয়েছে, এতটুকু জ্বালার অবশেষ নেই।

ডেক মাজাঘষা করছে, রাগ হচ্ছে বিষম। তাড়া কিসের বাপু, গড়াও গিয়ে আরও খানিকক্ষণ। মানুষজন উঠে পড়ে হৈ-চৈ শুরু করে দিক, তখন যা করবার কোরো। ইঞ্জিনের ফিসফিসানি, জলের ক্ষীণ কলধ্বনি। দার্শনিক চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এমনি কত বিচিত্র পরিবেশ পার হয়ে জঙ্গম জীবন দিন অতিবাহন করে ছুটেছে। তারও লক্ষ্য এমনি কি সুনির্দিষ্ট? দুলছে জাহাজ এদিকে ওদিকে—জীবনেও এমনিধারা কত আন্দোলন!

কোঁকড়াচুল ফুটফুটে এক মেয়ে ঘটর ঘটর করে পেরাম্বুলেটার ঠেলতে ঠেলতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো। একটা বড় পুতুল পেরাম্বুলেটারে। পুতুলের লম্বা চুল দু-পাশে থোপা-থোপা হয়ে পড়েছে—ঠিক ঐ মালিকটির মতো।

হনি!

এই যে মা—

মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে মেয়েটা গাড়ি থামাল। সোনালি চোখের তারা মেলে আমার দিকে এক নজর চায়।

হনি তুমি? বেশ নাম, অতি চমৎকার নাম—

ফড়ফড় করে সে একগাদা জবাব দিয়ে দিল, হান নয়, আমার নাম হল হেলেন। এই আমার পুতুল। বাবা হংকঙে থাকে, মা আর আমি যাচ্ছি সেখানে।

মা এসে পড়লেন।

ব্রেকফাস্টে চলে এসো হনি।

এক হাতে মায়ের স্কার্ট জড়িয়ে ধরেছে, আর এক হাতে পেরাম্বুলেটার। মায়ের সঙ্গে বকবক করতে করতে হনি চলে গেল।

খুব চওড়া এখানটায়, একটা বড় খাল বেরিয়ে গেছে। বার কয়েক হঠাৎ সাইরেন বেজে নদীর মাঝ বরাবর জাহাজ থেমে দাঁড়াল। আবার নোঙর নামাচ্ছে। ভোলা মিঞা খুটখাট শব্দে কেবিনের কাছে আছে। ব্যাপার কি ভোলানাথ, দু-কদম এসেই তোমাদের জাহাজ হাঁপিয়ে পড়ল?

ভোলানাথ বর্তে গেছে। ডি-লাক্স ক্যাবিনের যাত্রী হয়েও এমন ডেকে ডেকে কথা বলছে। বলে, জায়গাটা হুজুর বড্ড খারাপ। এককালে ডাঙা ছিল, বান এসে সমস্ত গাঙে ঢুকিয়ে নিয়েছে। পানি তাই বড্ড কম, ভাঁটি সরে গিয়ে এখানে-ওখানে দেখুন মাটি বেরিয়ে গেছে। কখন কোথায় আটকে যাবে ঠিক নেই। জোয়ার যতক্ষণ না আসে থাকুন এইভাবে বসে। জোয়ার বাড়লে পাইলট এসে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

যতদূর নজর চলে, নিঃসীম চর মরু-ভূমির মতো খা-খা করছে। গাছ-পালা বাড়িঘরের চিহ্ন নেই। বাঁধের উপরে একটা শুধু নিষ্পত্র ন্যাড়াসেজির গাছ—নিঃসঙ্গ গাছের গোড়ায় ছলছল করে লক্ষ লক্ষ ঢেউ লুটোপুটি খাচ্ছে।

ভোলা মিঞা আঙুলে দেখায়, ক্ষীরি জেলেনীর ঘাট হল ঐখানটা—

ঘাট-টাট কই কিছু তো দেখিনে। মানুষ-জন নেই, তার ঘাট!

তবু হুজুর ডাক রয়েছে ঐ রকম। সেকালে মানুষ' ছিল, মস্ত এক পাড়া ছিল—

দেখেছ তুমি? জাহাজের চাকরি কদ্দিন হল ভোলানাথ?

লেখাজোখা আছে কি হুজুর? একেবারে বালক তখন। কাজ ছিল, জাহাজের যত পিতল ঘষে ঘষে চকচকে রাখা। কত দরিয়ায় ঘুরলাম হুজুর, ঘরদুয়োরে এখন মন টেঁকে না। দু-মাস দেশে গিয়ে আছি তো দরিয়া যেন হামলা ছেড়ে ডাকতে লাগে।

এই যেখানে নোঙর করে আছেন, এটা জেলেপাড়া। যেমন-তেমন পাড়া নয়, হাঁক পাড়লে একশ' মরদ বেরিয়ে আসবে। ভোলানাথ নিজে না দেখুক, স্বচক্ষে দেখা ছিল বুড়ো সারেং আবদুল আলির। বুড়ো ক'বছর আগে মাটি নিয়েছে, নইলে ডেকে এনে তার মুখ থেকে শুনিয়ে দিতাম হুজুর।

তা কি হয়েছে! আবদুল যখন নেই, তুমি বললে কিছু কমজোরি হবে না। তারই মুখে শুনেছ যখন।

কাজকর্ম নেই, ডাঙাব মতন আড্ডা-গুলতানিও হচ্ছে না। গল্পের গন্ধে ছেঁকে ধরলাম। কিন্তু এক্ষুণি বসে পড়লে তো চাকরি থাকবে না। খাতিরে নেহাৎ না বলতে পারে না, দু-এক কথায় সেরে দিয়ে সরে পড়ল। আমার অঢেল সময়—ভোলা মিঞার ছাড়া-ছাড়া গল্প জমে মিশে কেমন মূর্তি ধরে আসছে।

যেখানটায় রয়েছি—জল নয়, এটা খটখটে ডাঙা। বেশ, ধরে নিলাম তাই। খোড়োঘর গাদাগাদি হয়ে আছে—এর উঠান দিয়ে ওর ঘরে যাবার পথ, ওর কানাচে এর রান্নাঘর। তারই এক ঘর-উঠোন নিয়ে ডাগরডোগর বউটা—আমাদের ক্ষীরোদা জেলেনী। বিয়ে হয়েছিল কোন এক যুগের কথা—তখন বকেঝকে মার-পড়বে কোন ভরসায়? নৌকোয় না উঠে সে উঠোনের বাতাবিনেবু গাছের দোডালায় চড়ে বসল। শাড়ি দিয়ে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধল নিজেকে। দোডালা অবধিও জল উঠলে টানের চোটে যাতে ভেসে না পড়ে, জলের পাতালে ডুবে না যায়। হলও তাই। বাতাবিনেবু-গাছ উপড়ে গেল বন্যায়, গাছ ভেসে ভেসে চলে গেল অনেকখানি দূরে। ক্ষীরি মারা গেল। কাপড় দিয়ে গুতোন দিয়ে বরের ঘরে পাঠানো যেত না। ঢুকিয়ে দেওয়া হল জো-সো করে, দুয়োর বন্ধ করে বর শুয়েছে, একটু ঝিমুনি মতো এসেছে, নতুন বউ টিপি-টিপি খিল খুলে ফুড়ুৎ করে পাখির মতন বেরিয়ে যায়। ধর্ ধর্—কোথায়? হয়তো বা কলাবনে কাঁঠাল-ঝাড়ের ভিতর বসে পড়েছে। কিম্বা পোয়ালগাদার নিচে। কেউ খুঁজে পাবে না। তখন কাতর হয়ে ডাকাডাকি, ওরে ক্ষীরো চলে আয়। উড়ো-কালে মা-মনসাদের চলাফেরা—আর কেউ তোকে ঘরে যেতে বলছে না!

আর এখন সোমত্ত বউটার কাণ্ড দেখ। বাপের বাড়ি যাবে, তা-ও নানান অজুহাত। পাল-পার্বণে ক্রিয়াকর্মে ভাই এসে নিয়ে গেলে একটা দিন থেকেই অমনি যাই-যাই করে। ওরা বলে, বাপের বাড়ি জল-বিছুটি মারে ক্ষীরিকে। ক্ষীরি না-না—করে, কিন্তু চলে আসে ঠিকই একটা দিন দুটো দিনের ভিতর।

জাল-নৌকা নিয়ে মরদরা গাঙে বেরোয়, বিলে বেরোয়। বাইতে বাইতে অনেক দূর চলে যায়। ডিঙি ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। ছোট, আরও ছোট। বাঁকের আড়ালে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যায় অবশেষে।

শেষটা কি হল—পুরুষকে আর গাঙে যেতে দেবে না ক্ষীরি। তিলেক ছেড়ে থাকতে পারে না, ভয় করে। এ নিয়ে খুব হাসি-মস্করা পাড়ার মধ্যে। বউয়ের আঁচল-ধরা বলে পুরুষেরও নিন্দে রটে যাচ্ছে। আর যা বলে বলুক, কিন্তু জোয়ান মরদ মেয়েমানুষের গোলাম, এই গালা-গালি সহ্য করা যায় না।

পুজোর সময়টা—অষ্টমী-নবমী তিথি, বছরের সেরা গোন হল এই সময়টা। মাছ যেন মুকিয়ে থাকে জালের নিচে পড়বার জন্য। আর বাজারও ভাল। পাড়ার মধ্যে, তাই দেখ, সকলে বেরিয়ে গেছে—আছে শুধু মেয়েলোক আর বাচ্চাবুড়ো। তোমার আঁচল ধরে পায়রার মতন বকম-বকম করলে তো পেট ভরবে না ক্ষীরো। ঠাকুর-ভাসানের দিন আবার এক মোটা খরচ রয়েছে—

সন্ধ্যার মুখে ভারি মেঘ করে এলো। বাতাস নেই কোন দিকে, মেঘের ছায়ায় থমথম করছে স্থির নদীজল। ঐ যে কাঠের ভরা বাঁধা আছে—ভেবে নিন, ঐখানে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের ক্ষীরি। তাকিয়েছিল গাঙ আর গাঙপারের বিলের দিকে। অনেক দূরে জলের উপর যেন ক্ষীণ কয়েকটা কালো বিন্দু। ফিরে আসছে নৌকোগুলো আকাশের গতিক দেখে? সত্যি বটে তো—না, চোখের ভুল?

কড়কড় দেয়া ডেকে উঠল। উদ্দাম ঝোড়ো-হাওয়ার দাপাদাপি। ঘন কালো মেঘে বিদ্যুৎ এফোঁড়-ওফোঁড় করছে। অযুত কোটি সৈন্যের মতো ধেয়ে আসছে জলরাশি। ডাঙার উপরে আক্রোশ, আক্রোশ মানুষের উপর। নিঃসীম বিলের মাঝ-খানে জেলেডিঙিগুলো হাওয়ার দাপটে ছড়িয়ে পড়েছে—এখানে একটা ওখানে একটা, লক্ষ্যহীন ছুটাছুটি করছে। কল্পনা করুন, ছবিটার আন্দাজ নিয়ে নিন। ক্রুদ্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনার নামে আর্তনাদ করছে, ক্ষমা দাও দেবরাজ, মানুষের দোষ-গুণাহ মার্জনা করো। জবাবে হুঙ্কার আসে উপর থেকে, খলখল ঠাট্টার হাসি হাসে নিচের জলতলে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঝড়ের নদীতে যদি কখনো পড়ে থাকেন স্পষ্ট শুনতে পাবেন হাস্য-ধ্বনি, জলের এই কলরবের সঙ্গে তার কোন-রকম মিল নেই। স্ফূর্তিতে গলে গলে পড়ছে জলের নিচে কারা যেন। অধীর হয়েছে নতুন শিকারের আশায়। হয়তো বা ক্ষুধিত দৃষ্টি তুলে জলের উপরে দেখে নিচ্ছে এক-একবার। কত বাকি, কত বাকি আর এখনো! সবুর সইছে না তাদের।

আর ঐ কাঠের ভরার ঐ জায়গাটা সেকালের নদীতীর যদি হল, আমাদের ক্ষীরির চেহারাটাও ভাবুন ওখানে। আলুল চুল উড়ছে, পাগল হয়ে ছুটছে বউ বালুর উপর দিয়ে। কথা মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবু আকুল হয়ে চেঁচাচ্ছে, এসো গো, ফিরে এসো তুমি—

সে রাত্রে জেলেপাড়ায় একটা নৌকা ফিরে এলো না। পরের দিন এল কেউ কেউ। তারও পরে পাওয়া গেল ক'জনকে —পচে ফুলে ঢোল হয়ে বিকৃত বীভৎস মূর্তি ভেসে উঠল জলের উপরে। কিন্তু ক্ষীরি যাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকত, জল থেকে উঠল না সে কোন দিন।

একমাস দু-মাস করে কত দিন কেটে গেল। কি কাণ্ড, একদিন নদীর কূলে ছুটে ছুটে কত করে ডেকেছিল—এখন নদীর কাছে আসতে ক্ষীরির ভয় করে। নদী ডাকে। নদীর নিচে বিস্তর কণ্ঠের ধ্বনি—তার মধ্যে ক্ষীরির মানুষটিরও গলা। যাকে ছেড়ে এক লহমা থাকতে পারত না। জলের গম্ভীর বিচিত্র ডাক একাই কেবল শুনতে পায় বউটা। আরও অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখেছে। আর কেউ নয়—সে একলাই শুধু শোনে।

তারপরে একবার ভীষণ বান ডাকল। জল ধাওয়া করল ডাঙায়। পণ করেছে, ধরিত্রীর চিহ্নমাত্র থাকতে দেবে না, সমস্ত ভাসিয়ে নেবে। জল গজরাচ্ছে, হাজার হাজার ক্ষুধার্ত জানোয়ার খ্যা-খ্যা করে বেড়াচ্ছে যেন। পাড়াসুদ্ধ নৌকোয় উঠে পড়ল, ক্ষীরিকে তোলা গেল না কিছুতে। এত শত্রুতা জলের সঙ্গে, তার বুকে ভেসে

দেহ বাঁধা তো আছেই—আর পরমাশ্চর্য ব্যাপার, কঠিন মুঠোয় সে মাটি আঁকড়ে আছে। সে মাটি মুঠো খুললে ছাড়ানো যায় না। মরা মানুষের আঙুলে এমন জোর! মাটি ছাড়বে না, কিছুতে নয়। মনের সকল একাগ্রতা আঙুলের মুখে যেন মাটি আঁকড়ে ধরে আছে......

বোতামটা পরিয়ে দাও না—

মোহানার জল ও কাঠের ভরা থেকে মুক্তি জাহাজে ঘুরে এলো। জলের উপরে ডাঙা বানিয়ে দিব্যি যে গল্প জমে আসছিল, আবার তা জল হয়ে গেল। ছোট্ট মেয়েটা গলা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, জামার বোতাম পরিয়ে দিতে হবে। হনি নয়, সেই বয়সী আর একটি। পুতুলের সেই পেরাম্বুলেটার ঠেলে ঠেলে বেড়াচ্ছে।

বেবি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

ঘাড় দুলিয়ে মেয়েটা বলে, হ্যাঁ, আমি ঘুম পাড়িয়েছি। দেখ, কত ভালবাসে আমায়। আমার কাছে এসে কাঁদে না, কিচ্ছু না। ঠাণ্ডা হয়ে কেমন ঘুমিয়ে থাকে।

গাড়িটা তো হনিরই। তার সঙ্গে বড্ড ভাব বুঝি? পুরানো জানাশোনা?

তা পুরানো হয়ে গেল বই কি! কাল সন্ধ্যাবেলা খাবার টেবিলে ভাব হয়ে গেল। দুজনেই আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। তার বাবা হংকঙে থাকেন, আমার বাবা ত্রিয়েস্তে। হনিরা কলম্বোয় নেমে যাবে। আমরা বরাবর চললাম।

এক ফোঁটা মেয়েটার সমুদ্র যেন নখ-দর্পণে। বলে, উই যে পাইলট-লঞ্চ এসে গেল। জাহাজ ছাড়বে এবারে।

লঞ্চ জাহাজের গায়ে এসে ভিড়ল। তাড়া-হুড়ো লস্করদের মধ্যে। নোঙর উঠছে।

হনি এলো নাচতে নাচতে।

জেনের সঙ্গে তোমার বেবির কত ভাব হয়েছে, দেখ হনি। ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছে। বেবি ওকে বড্ড ভালবাসে, ওর কাছে কাঁদে না।

হনির ঝিকমিকে মুখ কালো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বলে, বেবি বলছ কাকে? এ তো ডল আমার—

জেন জেদ ধরল, না—বেবি।

আমার জিনিস—আমি জানি নে ডল কিম্বা বেবি? তুমি তাই শিখিয়ে দেবে?

এক ঝাঁকিতে জেনের হাত থেকে পুতুল সমেত গাড়ি নিয়ে হনি চলল। গড়গড় গড়গড় করে সারা ডেক ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। মাটির বাঁধন ছেড়ে দিয়ে চললাম। ক্ষীর জেলেনি নই, জলকে আমরা ডরাইনে। অকূল সমুদ্র কতদূর?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

খুঁজে দেখো, আছে. আছে,
নদী তেপান্তর কিম্বা পাহাড়ের কোলে কুন্তলিত,
তোমার সে শখের শহর।
ধুলো ওড়ে মাছি ঘোরে ভন্‌ভন্‌ বোলতা সোনালী
সুরে হেঁকে ফেরি করা সওদার গায়—
চিক ফেলা বারান্দায় তোতা হীরেমন দাঁড়ে,
অকস্মাৎ মুখ তুলে
চেয়ে দেখা সরু নীল আকাশের ফালি
ঝলমল গেরুবাজ পায়রার ঝাঁকে চমকানো!

সেখানে ছোটে না কেউ তবু,
হাঁকায় না, হারায় না জিলিপি গলিতে।
ছাদ যার নেই সেও
চকে এসে বাঁধানো চাতালে
মান্ধাতার অশথের পাতাঘন সবুজ মেঘের
হাওয়া খায় আর
শোনে কি না শোনে দূর ফিকে নহবৎ
মিহি জরি-কাজ যেন নগরের গুঞ্জনে জড়ানো।
সে শহরে ভিড় শুধু নয় ঘেঁষাঘেঁষি;
সেখানে জনতা যেন আপনারি বিচিত্র বিস্তৃতি।

খুঁজে দেখো. আছে. আছে
আধ আলো এঁদোগন্ধ পুরানো পুঁথিতে ঠাসা
কোনো এক বেচারী দোকানে.
কিম্বা পথে পড়া কোনো রোয়াকে ছড়ানো
কাঙালী বইএর ভিড়ে
বিস্মৃত সে লেখা
—শুধু শুধু সময়ের শূন্যে কার কবেকার
জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ের চিহ্ন এক ছিটে,
উড়ো এক ভীরু ক্ষীণ সম্ভাষের কাপাশের আঁশ।
নিরালা একাকী এক হৃদয়ের
খোঁজা যোঝা বোঝাপড়া সব
জীবনের পৃথিবীর সাথে,
কতদূরে ভেসে ভেসে চলে দুরাশায়
দিগন্তের দ্বিধা নিয়ে
স্নেহ-ভিক্ষু সমভিপ্রায়ীর।

খুঁজে দেখো, আছে. আছে,
নির্জনে কি কোন জনতায়,
সেই দুটি প্রতীক্ষার চোখ,
যে আকাশ সূর্যাতীত
তারই ছায়া-পড়া।
পৃথিবী এখনো ক্রূর
ইতিহাস সংকীর্ণ সর্পিল:
তবু নক্ষত্রেরা আর সমুদ্র সময়
দিতে চায় যে প্রত্যয়
সেই চোখে জানি মিথ্যা নয়।

মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে

জীবনানন্দ দাশ

মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে ;—
তবুও রয়েছে মহাসমরের তিমির
আমাদের আকাশ আলো সমাজ আত্মা আচ্ছন্ন করে।
প্রতিনিয়তই অনুভব করে নিতে হয় আলো : অন্ধকার
আকাশ : শূন্যতা, সমাজ : অঙ্গার,
জীবন : মৃত্যু, প্রেম : রক্তবর্ণা ;—জ্ঞান
এই সবের অপরিমেয় শববাহন শুধু, নিজেকেও
বহন করছে।

এসো রাত্রি, আলোর সহোদরা তুমি,
মুমূর্ষু আলোর ভীষণতাকে তোমার শান্তি নিঃশব্দতার
ভিতর গ্রহণ করবার জন্যে।
শোনো পৃথিবী, এই রাত্রির শীত, সফল বিসরণ ;—
এসো মৃত্যু, রাত্রির সহোদরা তুমি,
সময়ের এই অসৎ স্বাক্ষরিত অস্পষ্টতাকে নিঃশেষ
করবার জন্যে।
যে আদি আচ্ছন্নতার থেকে এসেছিল—
মিশে যাক্ সে অনাদির বাষ্পলোকে :
যে জীবন নয় সে মৃত্যুর নিস্তব্ধ অন্ধকারে
নির্মম পবিত্রতায় লীন হোক, নিত্য হোক, অনিমেষ
হয়ে উঠুক ;—
হে জীবন, এই সব ভীষণতা অনুভব করে
সূর্য নক্ষত্র কল্যাণে উৎসারিত জলস্ফুলিঙ্গ
হয়ে ওঠো তুমি ;
ওপরের সেতু হও,
সেতুলোকে মানব ;—
সাহস, আলোক, প্রেমপ্রতিভা, প্রাণ।

এবং লখিন্দর

বিষ্ণু দে

হৃদয়ে তোমাকে পেয়েছি, স্রোতস্বিনী !
তুমি থেকে থেকে উত্তাল হয়ে ছোটো,
কখনো জোয়ারে আকণ্ঠ বেয়ে ওঠো,
তোমার সে রূপ বেহুলার মতো চিনি।

তোমার উৎসে স্মৃতি করে যাওয়া-আসা,
মনে মনে চলি চঞ্চল অভিযানে,
সাহচর্যেই চলি, নয় অভিমানে,
আমার কথায় তোমারই তো পাওয়া ভাষা।

রক্তের স্রোতে জানি তুমি খরতোয়া,
ঊর্মিলে জলে পেতেছি আসন পিঁড়ি,
থৈথৈ করে আমার ঘাটের সিঁড়ি,
কখনো বা পলিচড়াই তোমার দোয়া।

তোমারই তো গান মহাজনী মাল্লার,
কখনো পান্সীমাঝি গায় ভাটিয়ালি,
কখনো মৌন ব্যস্তের পাল্লার,
কখনো বা শুধু তক্তাই ভাসে খালি।

কতো ডিঙি ভাঙো, যাও কতো বন্দর,
কতো কি যে আনো, দেখ কতো বিকিকিনি,
তোমার চলায় ভাসাও, স্রোতস্বিনী,
কাঠ খড় ফুল—এবং লখিন্দর॥
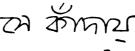
জগন্নাথ চক্রবর্তী

সে কাঁদায় তারপর একা বসে কাঁদে
নিজে সে বন্ধনে বাঁধা তাইতো সে আমারেও বাঁধে।
সন্ধ্যায় সমুদ্র-ঢেউ ফিরে যায় দূরে
তীর কাঁদে তারি নোনা সুরে
প্রভাতে অজস্র নীল নীলজল মাথা খোঁড়ে তীরে
ফিরে-যাওয়া ঢেউগুলি আসে ফিরে ফিরে

আফ্রিকা স্বাক্ষর

অমিয় চক্রবর্তী

সর্ব অক্ষরের সারি উঁচু নিচু কালো শাদা,
রক্তাম্বর মরুভাষা পাশে অন্তর্হিত
যে-সমুদ্রেণ নীলান্তের, সব ফিরে দেবো
নির্বাক অসংখ্য কাব্য। সীসে-ঢালা ছাপা
কোথায় ধরবে এ ভাষা আফ্রিকার প্রথম দিনের
যে-বাক্য ধরি বুকে? আরো স্তব্ধ কথা
সম্পূর্ণ অনাদি ধ্বনি নিরবধি অরণ্য স্পন্দিত
হয়ে জাগে কংগো তীর, সাগর সঙ্গীত,
কোথাও স্তিমিত রৌদ্র, চন্দ্রাঙ্ক সন্ধ্যায়।

দাহ ধরিত্রীর মূঢ় সৌর জল সংস্করণে
দক্ষিণ সাহারা প্রান্তে ওঠে ঘন এককতা
উচ্চারিত দ্রুমে আখে ম্যানিয়ক শিকড়ের ক্ষেতে,
দারুণ পতঙ্গ পাখা কুমিরে প্রাণের দামামায়
কাফ্রি মন্ত্র বিশ্বদৃষ্টিরূপী।
অন্য ভাষা, নেই॥

চলি সেই ত্রয়ী দ্বীপ ধারে
যেখানে পশ্চিমী ঋষি শুশ্রূষার ধ্যানের বিজ্ঞানে
শুনে ডাক বক্ষে যন্ত্রণার
প্রায় অর্ধশতাব্দীর যজ্ঞ জেবলেছেন, ব্রতী
জীবিতের প্রাণের শ্রদ্ধায়।

তীর্থ ল্যাম্বারেনে,
অ্যালবার্ট সোয়াইট্‌জর আজো প্রায়শ্চিত্তে নেমে
আশ্রমের নিত্য শ্রমে দুর্ভেদ্য আহত আফ্রিকায়
বাঁধেন ক্ষতের অভিশাপ;
বাণী সে যোগের॥

দাসব্যবসায়ী ঘাতী নানা দেশী
যুগের সঞ্চিত পাপে যুক্ত করে তীব্র বর্ণদ্বেষ;
লুব্ধ পররাষ্ট্র যত তার প্রশ্ন, প্রশ্নোত্তর
কাব্যোত্তীর্ণ বিপ্লবের ধর্মে রচে কল্যাণ সংগ্রামে
বিজয়ী মানবগাথা, ছন্দের অতীত॥

সত্তার আশ্চর্য শক্তি, মহাব্যাপ্তি ইতিহাসে
প্রকাশ পুঁথির অকুলান, রক্তে জেনে
নির্ভাষী ফিরিয়ে দিই; অনন্যা শুধুই
তীক্ষ্ণ তীব্র শান্ত কথা আত্মিক প্রত্যক্ষ ঝাঁকে ঝাঁকে,
ওড়ে নিত্য উদ্ভাবন, আফ্রিকা স্বাক্ষর
জাগ্রতের চির মাতৃভাষা॥

সেনেগাল, আফ্রিকা।
জুলাই ১৯৫৫

অজিত দত্ত

এই ঘর থেকে ওই প্রান্তরের পার
চোখের দৃষ্টির পথ এক লহমার।
তবু সে অনেক দূরে। কত দীর্ঘ দিন রাত্রি গেলে,
রিক্ত তপ্ত রৌদ্রে জ্বলা শুষ্ক দিনে বিবর্ণ বিকেলে,
দেহ মন টেনে টেনে নিয়ে দূর দিগন্তের কাছে—
প্রাপ্তির সম্পূর্ণে তৃপ্তি আছে।

হৃদয়েরে ছুঁয়ে যাওয়া, দূরে সরে যাওয়া প্রেমগুলি—
অসমাপ্ত ছবিটির পাশে রাখা কতগুলো তুলি—
একদিন জাগরণে, প্রেরণায় কেঁপে
ছবিটি সম্পূর্ণ করে দেবে জানি রঙের প্রলেপে।
যা আজ খণ্ডিত, রুদ্ধ, অতৃপ্ত, ঈপ্সিত, বহুদূর,
কোনোদিন তাই হবে পূর্ণতার তৃপ্তি ভরপুর।

তবুও সম্মুখে আজ প্রসারিত দীর্ঘ রাত্রিদিন
অবিশ্রান্ত প্রতীক্ষার প্রয়াসে মলিন।
দৃষ্টি দিয়ে, মর্মমাঝে, মুহূর্তেই যারে ছোঁয়া যায়,
তাহারে সম্পূর্ণ পেতে যেতে হবে দিগন্ত সীমায়।
যা আছে অন্তরে অন্তরালে
তার আবির্ভাব শুধু জীবনের রজনী পোহালে।

চন্দ্রের অর্ধেক আজো রয়ে গেল দূরে দুর্নিরীখে,
পাঠালো না আলো এই পৃথিবীর দিকে।
অর্ধেক প্রাপ্তির সেই অন্ধকার অতিক্রম করে
আহত বিক্ষত পায়ে প্রান্তরের সীমান্তের পরে
কোনোখানে কোনোদিন নিঃসঙ্গ চেতনা
বাঞ্ছিতেরে খুঁজে পাবে, অমৃতের পাবে এক কণা।

জ্যোৎস্না-কাতর

সুশীল রায়

জ্যোৎস্না-কাতর আমি। ক্লান্ত আমি। এ-রাতে এখন
অসহ্য আলোর বন্যা বিছানা ও বালিশের কোণ
প্লাবনে দিয়েছে ভরে। চোখ-ভরা ঘুমের মৌতাত
ভেঙে দিল এই রাতে ওই চাঁদ, এ কী উৎপাত?
ঘড়িতে বারোটা বাজে। চুরি করে এ-শান্তির স্বাদ
ভীষণ বিরক্ত করে চাঁদ।

তালের চূড়ায় আর বটের জটায় ছিল জমা
অন্ধকারে-রঙ-করা রাত্রিটার সুন্দর সুষমা;
এই ছোট ঘর, এর দেয়ালে সিলিঙে মেজেটাতে
ছিল সে সুন্দর শান্তি। অকস্মাৎ এ কী জ্যোৎস্নাতে
ভরে গেল সারা ঘর? কেন এই হঠাৎ প্লাবন
ভেঙে দিল ঘুম, মন কেন করে দিল উচাটন?

দুপুরে দেখেছি আজ অবিকল এমনি বিপদ—
শরতের পরিচ্ছন্ন মাজা-ঘষা নীলাকাশ, রোদ
সারা গায়ে মাখা তার; নীলে সুনির্মল সেই শোভা।
হঠাৎ সে নীল ভেঙে দেখা দিল সে-সদ্যবিধবা
—সাদা মেঘ, যেন থান-কাপড়ের প্রান্তে অঙ্গ ঢেকে
নীরব কান্নার চিহ্ন আকাশের গায়ে এঁকে এঁকে।
বিষাদের সে-ছায়ায় দীর্ণ হল নীল, করুণায়
জলহীন আকাশের চোখে বুঝি জল এসে যায়।

এই-যে নিবিড় রাত্রি, এই-যে নিটোল অন্ধকার
আকুল জ্যোৎস্নার ঘায়ে এ-শান্তিও হল ছারখার।
পুবের জানালা দিয়ে চুপিসাড়ে অন্ধকার ঘরে
চোরের মতন ঢোকে চাঁদ—এই রাত-দুপহরে।
সাদা চাদরের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় মিশে
মশারির ছাঁকনিতে ছাঁকা হয়ে বিছানা-বালিশে
পড়ে পরিষ্কার। এর অসহ্য এ শৌখিন মূর্তির
বিভায় ব্যাকুল করে, মন করে অস্থির অস্থির।
কিছুতেই শান্তি নেই, গনি তাই একাই প্রমাদ।
ভীষণ বিরক্ত করে চাঁদ।

উঠে বসি, ত্রস্তহাতে বন্ধ করি জানালার পাট,
তবু এ কী? অন্ধকার তবু, কই, হয় না জমাট।
স্নিগ্ধ শরতের কৃষ্ণাপঞ্চমীর কোণভাঙা চাঁদ
কেন ওঠে এই রাতে—এই রাত বারোটা-নাগাদ।

বাজপাখী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মেঘ কেটে গেছে আজ প্রসন্ন প্রভাতে
সূর্যালোকে উদ্ভাসিত সুনীল আকাশ
অন্ধকার জমেছিল যে দুর্যোগ রাতে
আজ তার চিহ্ন নাই; পুবালী বাতাস
বহে মৃদুমন্দ গতি, সুখস্পর্শে দুঃস্বপ্ন ভুলায়;
জীবন জাগিল তবু মৃত্যু যেন দাঁড়ায় শিয়রে
ভয়ে ত্রাসে কাঁপে প্রাণ যত্নেগড়া নিভৃত কুলায়
অবাধ দস্যুতা হেরি বিধাতাও লজ্জায় শিহরে।

সহসা বিদ্যুৎ বেগে বাজপাখী এল কোথা হতে
পক্ষীমাতা শাবকেরে বক্ষে ঢাকে, মেলি দুটি ডানা,
এখনো যে চঞ্চুপুটে আদার সে নেয় কোনোমতে
এ কী এ দুর্দৈব হায় শান্ত নীড়ে শত্রু দেয় হানা।

রক্তচক্ষু বাজপাখী রক্ত চিহ্ন উদ্গত নখরে
নেমে আসে চুপে চুপে ডানা মেলি শাবক সন্ধানে
আবিষ্ট চুম্বনে সিক্ত আকুলতা শিশুর অধরে
ভয়-বিহ্বলতা জাগে স্নেহাতুর মায়ের পরাণে।
ভয়ার্ত কাকলি ওঠে শান্তনীড়ে প্রভাত বেলায়
ছিনাইয়া লয়ে যায় বাজপাখী পক্ষীশাবকেরে
শোনিতে আপ্লুত দেহ পক্ষীমাতা পড়িয়া ধুলায়
নখাঘাতে ছিন্ন ডানা, ব্যর্থ দৃষ্টি হানে আকাশেরে।

জুলেখার মন

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

দক্ষিণ-দুয়ারে আসে স্নিগ্ধ-মৃদু মালতীর ঘ্রাণ,
সুন্দরী জুলেখা জাগে একা রাত্রি নৈঃশব্দ্যের বুকে
ঘুমের ঝরোকা তার খুলে দিয়ে চাঁদের আলোকে
সারা রাত কান পেতে শোনে দূর অরণ্যের গান;
যেখানে তারার ফুল গুচ্ছবন্ধ রয়েছে অম্লান,
দুধের মতন চাঁদ একাকীই জানালায় জ্বলে—
আকাশ-সমুদ্র থেকে সে-ও যেন মৃদু কথা বলে,
জুলেখা শুনেছে আজ সেই দূর চাঁদের আহ্বান।

জ্যোৎস্নায় ভরেছে বন, তারি ঢেউ লাগে বাতায়নে,
মনের অরণ্যে তার প্রেমের সোনালী ফুল ফোটে
কে যেন একাকী এসে বলে তাকে একান্ত অস্ফুটে—
অরণ্যের গন্ধ মেখে প্রেমিকের স্বপ্ন নিয়ে মনে
'প্রেমের অজস্র ফুল তুলে নেব আমরা দু'জন'
মালতীর সুরভিতে জেগে ওঠে জুলেখার মন।

হে হৃদয়, হাসো হাসো!

দিনেশ দাস

আজ অবেলায়
আমার মনের ভাঙা সিং-দরজায়,
কারা আসে চুপিসাড়ে
থেকে থেকে জোরে কড়া নাড়েঃ
এ যেন ছুটির পরে
দুষ্টু ছেলের দল ফিরে আসে ঘরে,
সদরের দোরে
বারে বারে কড়া নাড়ে জোরে।
কী করে এল যে তারা আমার অজানা জন্মদিনে
চল্লিশ বর্ষের দীর্ঘ পথ চিনে চিনে।

কালের মরচে ধরে ভাঙা দরজায়
জং-ধরা খিল খুলে যায়,
অচেনা, কতক চেনা, আধ-চেনা, প্রায়-চেনা, চেনা,
যুবক, বালক, শিশু নাম যার কেউ জানবে না,
তারা এসে হাত ধরে নিয়ে যায় টেনে
ঘর হতে লেনে,
লেন হতে কোনমতে
একেবারে খোলা রাজপথে।

এই সে বেকার রোড কেলভিন কুঞ্জের ধারেঃ
(এখন বেকার নয় রাতদিন গমগম কাজে-কারবারে।)
হেস্টিংস পার্ক-পথ, হর্টিকালচারে,
মনে পড়ে, কতদিন কত সমাদরে
কত যে ঘুরেছি একা, কখনো বাবার হাত ধরে
ছুটোছুটি লুটোপুটি এধারে-ওধারে।

আমার পুরনো দিনগুলো
চল্লিশ বছর ধরে পথে-পথে মেখে শুধু সময়ের ধুলো
অনেক ঘুরেছে এলোমেলোঃ
এইবার, কালের চাবুক খেয়ে কুকুরের মত
ঘরে ফিরে এল।

অঝোরে, অবাধে,
রুগ্ণ ছেলের মত দিনগুলি কাঁদে;
ফিরে ফিরে
পুরোনো হৃদয় ভেজে বৈকালী শিশিরে।
তবু দেখি দিগন্তের বাঁকা ঠোঁটে
অদ্ভুত গোলাপী হাসি ফোটে,
আঙুরের মত নামে থোলো-থোলো নীল অন্ধকার,
হে হৃদয়, হাসো হাসো হাসো একবার!

প্রকৃতির কবি

হরপ্রসাদ মিত্র

সে এক নিঝুম গ্রাম।
লাল মাটি, গাছের ছায়াতে—
কেবলি পাখির গান,
মাঠ জুড়ে আখের আবাদ।
দুপুরে গোযান, রাত্রে মাঝে-মাঝে নক্ষত্রের চলা!
বাকি সব অচঞ্চল—
ছুটিতে সে যাত্রী সেখানের!

মনেতে ছুটির বাঁশি,
ঘণ্টা বাজে সদরে-অন্দরে—
ভাদ্রের সেলেট-মেঘে রৌদ্র দেয় আসন্ন আশ্বিন।
গুমোট কাটলে সুখ;
গুটি কেটে চলে সে বেরিয়ে—
উধাও আখের ক্ষেতে দেবেই সে প্রজাপতি-প্রাণ!

ঠাণ্ডা, সবুজ, শান্ত লতা-পাতা চিকণ, নিবিড়—
শুয়ে বসে দেখে যাও,
যেতে দাও যা-কিছু যাবার।
কিন্তু সে রক্ষণশীল, মনে তার রক্ষার আকৃতি
আখের আবাদে বসে শুনেছে যে গঞ্জের গুঞ্জন!
তাই তার ফিরে-চলা—
তিন ক্রোশ দূরের স্টেশনে।

ট্রেন ছাড়ে।
ট্রেন চলে—
ভালোবাসা মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে।
চোখে কী অদ্ভুত জল!
ধোঁয়া লাগে। চলার আঘ্রাণ
থাকে মগ্ন চৈতন্যের গূঢ় তলে
নিসর্গপ্রীতিতে!

খাঁচায় ময়না পুষে, টবে শীর্ণ রজনীগন্ধাতে
প্রত্যহ সে জল ঢালে।
কলকাতায়—
এ-জন্মের দেনা।

মণীন্দ্র রায়

যে কথা সবাই ভাবি, কেন তা বলব না—
একই পরিচিত ছকে নানা ছলে করি আনাগোনা,
সে এক রহস্য, গ্লানিকর!

জানি যদিও অবশ্য
গহনার নৌকো চলে নিরাপদ একই ঘাটে ঘাটে,
কলুর বলদ ঘোরে ইচ্ছাহীন পথে,
তবুও জেলেরা দেখ মাছের সন্ধানে
উধাও নদীর মুখে লোনাজল আক্রমণ করে,
তবু অনভিজ্ঞ যুবা প্রেয়সীর কানে
নতুন ঐশ্বর্য দিয়ে প্রণয়ের ইমারৎ গড়ে।
এ জীবন প্রত্যহের প্রতিমুহূর্তের আবিষ্কার।

আমরা কেবলই হস্তলিপির খাতায়
চলি দাগা বুলিয়ে; কেবল
ভাঙাসাঁকো, পথে হাহাকার।
বরং নিজের কথা বলি।
হোক তা অস্পষ্ট, বেসরকারী।
মানুষের অভিমুখে প্রাণ যদি বাঁধা থাকে,
যেমন পাখির ডানা আপন শাখায়—
আকাশে কী ভয় আর
কী ভয় নিজেকে!

আমিও তোমারই কাছে ফিরে আসব
হে আমার রাজরাজেশ্বরী,
শুধু সামনে কাঁটাজমি, অন্তহীন আবর্তন, তাই
পথ গেছে বেঁকে॥
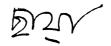
অরুণকুমার সরকার

অঙ্গে চন্দন-গন্ধ নাই থাক
নাই বা থাক ফুলধনু
রেখেছি তমালের গোপন ডালে
যুবতী শ্রীরাধার তনু।

তাই তো ভালোবাসা এখনো আছে
মুগ্ধ হয় চোখদুটি
হৃদয় ভোলেনি তো স্বভাব তার
রাতের বুকে চায় ছুটি।

হাজার উন্মাদ শব্দ শুধু
প্রেম করে না মানুষেরা
শব্দ হয় শুধু শব্দ শুনি
শব্দে শুধু ঘোরাফেরা।

যেখানে অস্থির শব্দ নেই
গোপন তমালের ডালে
নীরব রাত্রির ভালোবাসায়
নয়নতারা দীপ জ্বালে

তোমাকে মনে পড়ে কৃষ্ণচূড়া
জারুল তোমাকেও পড়ে
সুদূর বনপথ ঝাপসা যত
ছায়ারা নড়ে আর নড়ে।

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

জিয়রা না মানে।
বিষম বিষের জ্বালা
অমৃতের ফুল হয়ে ফুটে ওঠে গানে।
জওয়ানিয়া বীত চলি যায়—
এমন অকালে এক
ঠুনকো সুরের ছোঁওয়া লেগেছে হাওয়ায়।

পশ্চিম আকাশে,—
অস্তরাগে কার যেন বাদশাহী খসে পড়ে আছে।
রাঙা হয়ে ভূলুণ্ঠিত ফুলের বাসর—
নাজুখ্ দিলের খুনে গুলাবী আতর!

গান শোনো—বেহিসাবী ঢঙ:
ভৈরবী, পিলু বা তিলং!
হালকা সুরের মাঝে দেখ যার কায়া,
সে যে এক মরণের অনুরাগী ছায়া।
সে এক নবাব কবি, ব্যাঘ্ররূপ ত্যাগি
করুণ জরার দৈন্যে হয়েছে বিবাগী।
অপারগ নখ-দন্ত-হাত:
এখন সহে না আর ফুলের আঘাত।
রঙীন শিরাজী কই—ভুলে থাকা অক্ষমের জ্বালা—
শতখণ্ড হয়ে আছে পান্নার পিয়ালা।
পিয়ারীর শ্বেতশঙ্খ দুটি কর হতে—
জওয়ানির বাজুবন্ধ খুলে খুলে পড়ে শেষ রাতে।

হলদে পাতার শব্দ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিকেলের পাতা ঝরা, আর
আলো যে ঢেউ হল দিগন্তের দুরন্ত কান্নায়।
মন বলে কেউ যদি থেকে ছিল কোনো
বর্ষা শরৎ আর কখনো ফাল্গুনও
তাকে ছুঁয়ে নর্তকীর চটুল চরণে
এঁকেবেঁকে চলে গেছে—কেন, কী কারণে
হয়তো একান্তে বসে সে-কথা ভাববার
বিকেল হয়েছেঃ আজ পাতা ঝরাবার।

পাতা ঝরাবার স্বাদ শরীরের রোম কূপে কূপে
পাতা ঝরাবার স্বাদ বিচ্ছেদের প্রশান্ত নিশ্চুপে।
আকাশের নীল ক্ষেতে শাদা লাল বেগুনী মেঘেরা
উড়ে যায় হেসে যায় ভেসে যায় যেন পাতাঝরা।

নীল মনে ক্ষণে ক্ষণে বিদায়ের ভাষা আগেকার
ফিরে আসেঃ আলো ঢেউ ফিসফিসে শব্দ—
শুধু হলদে পাতার।
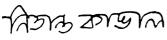
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নিতান্তই ক্লান্ত লোকটা। শুধু
ছোট্ট একটা ঘরের কাঙাল।
দক্ষিণের জানলা দিয়ে ধুধু
অফুরন্ত মাঠ দেখবে। আর
পশ্চিমের জানলা দিয়ে লাল
সূর্য-ডোবা সন্ধ্যার বাহার।
নিতান্তই ক্লান্ত লোকটা। শুধু
ছোট্ট একটা ঘরের কাঙাল।

নিতান্তই শান্ত লোকটা। তাই
মিষ্টি একটা মেয়ের কাঙাল।
যে তাকে খুনসুটি করে প্রায়ই
রাত জাগাবে। বলবে, "কোন্ দিশী
লোক তুমি তা বোঝা শক্ত। কাল
আনতে হবে আলতা এক শিশি।"
নিতান্তই শান্ত লোকটা। তাই
মিষ্টি একটা মেয়ের কাঙাল।

নিতান্তই ভ্রান্ত লোকটা। হায়,
অল্প-একটু সুখের কাঙাল।
রৌদ্রে, জলে, উদ্দাম হাওয়ায়
ঢের ঘুরেছে। বুঝল না এখনো,
ইচ্ছার আগুনে খেয়ে জ্বাল
একটু-সুখে তৃপ্তি নেই কোনো।
নিতান্তই ভ্রান্ত লোকটা। হায়,
অল্প-একটু সুখের কাঙাল।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ও গাঁয়ের লোক বলে সে এখনো পথের মাঝখানে।
তবে-যে শুনেছো তার পায়ের মঞ্জীর?
বৃষ্টি তার চরণের স্বরলিপি অবিকল জানে!

তুমি তবে পথে যাও, ঘুরে মরো, বিজুরী অথির,
মরমী পবন মৌন, আছে শুধু জলদস্যু হাওয়া,
এখনো তোমার কাজ পথে-পথে ঘুরে-ঘুরে যাওয়া।

অভিমান থেকে ক্ষোভে ক্ষোভ থেকে ক্ষমার নির্বাণে
যতো যাও, ফের তবু ক্ষুব্ধ এই শ্রাবণের লোভে
ক্ষমার নির্বাণ থেকে ফিরে যেতে হবেই বিক্ষোভে।

ও গাঁয়ের লোক বলে এসেছিলো তোর খোড়ো ঘরের খিলানে
—তুই ছিলি পথে—শুধু তারা তাকে সবাই দেখেছে,
তোকে ফিরে আস্‌তে দেখে সে গেছে, শহরে ফিরে গেছে।

এ গাঁয়ের ও গাঁয়ের লোক জমে তোমার দুদিকে।
সে কি তোকে ভুলে গেলো নগরের ভিড়ের উজানে?
বুকে ধরে রাখ্ এই মা'র মতো ডুংরি নদীকে।

মা'র চোখে সন্ধ্যা নামে, দূরে গেলো যে যার ডেরায়.
হাওয়া শান্ত হয়ে আসে, তারপর বৃষ্টি শেষ হলে
আমুয়া-গ্রামের পথে চ'লে

মুছে যায় সন্দেহের ভুল;
'সে তোরে ভোলেনি', এই শান্ত হাওয়া তোকে বলে যায়—
সাঁওতালি পথেও ওরে তুই তার বাংলার বাউল॥

প্রতিবেশী

দেবদাস পাঠক

আমি তো তারেই খুঁজি যে থাকে আমার খুব কাছে,
ডাকলেই সাড়া মেলে, কথা বলে এই তো সে আছে।
সে সব সময় আছে, খুব কাছে, রিনিঠিনি তার
চুড়ি বাজে, নানা কাজে ঘোরে ফেরে এধার ওধার।
আয়নায় ছায়া পড়ে, আলনায় এই দিল হাত,
ঝিরিঝিরি ছোট নদী কখন যে হবে সে প্রপাত
সে-কথা জানে না কেউ, আমি না, সে নিজেও না বুঝি,
সে আছে এখানে তবু ফিরে ফিরে আমি তারে খুঁজি।

সে তো এইখানে আছে, খুব কাছে, তবু ঘুরেফিরে
আমি তারে খুঁজি এই দুজনার এতটুকু নীড়ে।
আমি তার নাম জানি, কখনও বা হাতে হাত রাখি,
নিভৃত প্রহরে সেই চেনা নাম ধরে যদি ডাকি
চমকে সে মুখ তোলে, ঠোঁটে ভাসে অচেনার হাসি,
একি সেই একই মেয়ে যে-মেয়েকে আমি ভালবাসি!
মনে হয় চিনি নাই, কোনদিন চিনব না তাকে,
তবুও তারেই খুঁজি যে আমার খুব কাছে থাকে।

আশ্বিনে নদী ও নারী

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

আশ্বিনে রুপালী নদী সোনা হলো সোনালী আগুনে
পরীর অরূপ চোখে অপরূপ যৌবনের প্রেম
কী যে স্বপ্ন রেখে গেলো, কিছু নিয়ে ছড়িয়ে দিলেম
কিছু তার; অপরাহ্ন কেটে গেলো স্বপ্নজাল বুনে।

বিকেলের স্নান সেরে যে-যুবতী আসে বাতায়নে
তাকেও আশ্বিন জানে, সেও জানে মায়াবী শরৎ
সোনা ও রুপোর রঙে ভরে দেবে তারার জগৎ,
সে জানে আশ্বিন এলে দেখা হবে আবার দুজনে।

আশ্বিনে নদী ও নারী। কাকে রেখে কার স্বপ্ন আঁকি
বলো মন, বলো এই ছায়া-ছায়া রাত্রির দুপুরে
কার প্রজাপতি-চোখে পাখা মেলে যাই আমি উড়ে
কার বুকে মুখ রেখে আর সব ভুলে গিয়ে থাকি!

আশ্বিনে নদী ও নারী। মুগ্ধ মন সব ভুলে গিয়ে
তবু বলেঃ তাকে ডাকো যাকে তুমি এসেছো হারিয়ে॥

ডাকঘর

আনন্দ বাগচী

বইটা হঠাৎ খুলে বন্ধ করে দিল ভয়ে ভয়ে।

বিকেলের কাঁচঘরে চুপি চুপি উঁকি দিল চাঁদ
হয়ত আবার মেঘ জমবে নিষ্ঠুর অভিনয়েঃ
নিচু হয়ে নেমে এলো রঙ্-করা আকাশের ছাদ
রম্যব্যথাতুর তার আঁকাবাঁকা বালুর হৃদয়ে,
আর কিছু জানতে সে চায় না, চায় না অন্ধকার।

সেই নখদর্পণেও অন্ধকার-লেপা কার মুখ...

যখন তৃষিত হাতে ঘরের গহন বন্ধ দ্বার
খুঁজেছিল বইটার গভীর পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
রঙ্গনটী নদীটার মত জলমগ্ন দস্যু সুখ
সমস্ত সত্তায় তার ঢেউ দিল, তীক্ষ্ণ আলোছায়া-পর্দার
বিচিত্র লেখায়ঃ পাখি মুক্তি দেবে বুকের খাঁচাকে।

ডাক টিকিটের মত একখণ্ড অন্ধকার আঁটা
তার মুখে, শেষ হলো রুগ্ন ঘরের কাঁদাকাটা॥

সেইদিন কবে

অমলকান্তি ঘোষ

সেইদিন কবে আসবে যখন আমার মনের এই প্রান্তর
সূর্যবিহীন; বিহঙ্গমের চঞ্চল ছায়া শ্যাম-সুখী মাঠ
চির-শান্তর
বক্ষের পরে করবে না আর উচ্ছল নৃত্য।
এই মন রবে পূত-পবিত্র।......

যখন আমার কিছু ভয় নেই,
দুর্গ-দুয়ারে আসবে না কোন শত্রুর সেনা...

সেইদিন কবে আসবে বলো ত,
আর তোমাকেও খুঁজতে বেরিয়ে আমার সময়
হারিয়ে যাবে না।

পূজারিণী

শিল্পী ঃ শ্রীনন্দলাল বসু

ব্লক ও মুদ্রণ ঃ ন্যাশনাল অটোটাইপ কোং
শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প?
না, গল্পের মুখোশ?

দিলীপকুমার রায়

তপতী বললঃ "আর দেরি নয়—আজ একটু সময় পাওয়া গেছে—টেলিফোন বাজে নি সকাল সাতটা থেকে—"

হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে—"বেলা নটা। এমন অ[illegible] প্রথম ঘটল। আর দেরি [illegible] দেখে আসি ঝট করে [illegible] বিলডিং। নৈলে আর হয়ত—"

ক্রিং......ক্রিং......ক্রিং......

তপতী মুখ ভার ক'রে "যাঃ। আজও হ'ল না!" টেলিফোন ধ'রে: "হ্যালো! ......হ্যাঁ......কে? ......মিস ব্রাউন ...... নিচে লাউঞ্জে বসে? ......আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও উপরে।"

অসিত মুখ তুলে তাকায়।

তপতী বলেঃ "হ্যাঁ, বার্বারা। কাল বলছিল না যে, আর তিনচার দিনের মধ্যেই ওকে ইতালি রওনা হ'তে হবে? তাই হয়ত এসেছে।" বলেই ফিক করে হেসে: "আজও হল না স্টেট বিলডিঙের একশো-দুতলায় ওঠা।"

অসিত হেসে বলেঃ "তুমি যে এতে খুব দুঃখিত তা তো মনে হচ্ছে না।"

তপতী কিন্তু হাসল না এবার: "আহা, ও মেয়েটিকে আমার সত্যি বড় ভালো লেগেছে—তোমাকে শুধু যে দাদা ব'লে ডাকে তাই নয়—সত্যি গভীর শ্রদ্ধা করে।"

অসিত ফের হাসে: "আমাদের বাংলায় বলে 'ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি'। ভালো লেগেছে হয়ত আমাকে দাদা বলার জন্যে তত নয়—যত তোমাকে দিদি বলার জন্যে। একটু হার্ট-সার্চিং করলেই বা।"

তপতী রাগ করল এবার: "যা—ও। —ও কাল বলছিল—যাবার আগে তোমাকে আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়। ওকে সময় দাও না একটু—ও সত্যি জিজ্ঞাসু।"

অসিত তবু হাসবে: "ত্বাদৃং নো ভূয়া-ন্নচিকেতঃ প্রষ্টা—হে নচিকেতা—তোমার মতন জিজ্ঞাসু যেন আমাদের ভাগ্যে জোটে—বলেছিলেন সাক্ষাৎ যমদেব—আমি তো কোন ছার!"

রুং......রুং......রুং—বেজে ওঠে দোরের ঘণ্টা।

তপতী দৌড়ে গিয়ে দোর খুলে দেয়।

বার্বারার গলা জড়িয়ে ওদিকে থেকে সখীযুগলের পুনঃ প্রবেশ।

বার্বারা অসিতকে নত হ'য়ে ভারতীয় কেতায় নমস্কার করে: "না বলে কয়েই এসে পড়েছি, দাদা! তবে যদি সময় না থাকে আপনার—"সোজাসুজি দোর দেখিয়ে দিতে সংকোচ করবেন না এই অনুরোধ।"

অসিত হেসে বলল: "তোমাকে সেদিন বলছিলাম না আমাদের নচিকেতার গল্প, সে যমের কাছে গিয়েও অকুতোভয়ে কেবলই বলে—বলো আরো তত্ত্বকথা! শেষে যম যে যম তিনিও করলেন তাকে আশীর্বাদ, বললেনঃ বিদ্যুৎং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে—কিনা নচিকেতাকে পথের দিশা পাওয়া থেকে ঠেকাবে কে? —না না এ ঠাট্টা নয়—বোসো, বোসো। তুমি এসে কী ভালো যে করেছ —নৈলে আজ আর কেউ কি তোমার দিদিকে ঠেকাতে পারত—" বাইরের জানলা দিয়ে এম্পায়ার স্টেট বিলডিঙের অভ্রভেদী চূড়া দেখিয়ে—"ঐ শিখরে ওঠা থেকে? একটু কফি? —না না, গল্পের সঙ্গে কফির সঙ্গত না হলে চলে—বিশেষ এ বরফের দেশে? তপতী! ব্রহ্মবাদিনী! টেলিফোন করে দাও —আর এক পট কফি।"

* * *

বার্বারা কফিতে চুমুক দিয়ে বলল "কাল সারারাত ঘুমতে পারিনি দাদা! কেবলই ভেবেছি শ্যামঠাকুরের আর আনন্দগিরির কথা। কেবল একটা কথা মনে হচ্ছিল— —আপনাদের দেশে গুরুরা কি শুধু ছেলেদেরই দীক্ষা দেন, মেয়েদের নয়?"

তপতী টুকল: "বা রে বা! আমি তবে—"

বার্বারা লাল হ'য়ে উঠল: "আপনার কথা ছেড়ে দিন দিদি। দাদা তো বলবেন না আপনার ইতিহাস।"

অসিত তপতীর পানে তাকায়: "বলব না কি?"

তপতী এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়: "ক্ষমা!

অসিত বলেঃ "আহা আজ তোমার কথাই বলি না একটু—তপতী বাধা দিয়ে বলে "ফে—র?"

অসিত হেসে বলে: "আচ্ছা আচ্ছা সতী সতী-ই সই। হলই বা নামটা সেকেলে নাম্নীটি তো একেলেই বটেন।"

* * *

অসিত কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শুরু করে: "বাপ ওর নাম রাখতে চেয়েছিলেন অণিমা না মঞ্জিমা। কিন্তু ওর মা ধিক ধিক করে উঠলেনঃ "কী সব অলক্ষ্মী নাম—মাথা মুণ্ডু নেই। বলে ওর নাম রাখলেন—সতী। তোমাদের ভাষায় এ নামের প্রতিশব্দ নেই, তবে যদি চেস্ট পিওর আর ফেথফুল এই তিনটি শব্দ নিয়ে একটা তাল পাকাও তাহলে হয়ত একটু আভাষ পাবে—সতী বলতেই আমাদের মনে কী ভাব জাগে। মানে ঐ যে বললাম—একান্তই অনাধুনিক। কিন্তু ওকে যতই দেখতাম ততই মনে হত এ যেন ওর নাম নয়,—উপাধি। আর দিয়েছিলেন ওর মা না স্বয়ং বিধাতা। কারণ ও ছিল আশ্চর্য পবিত্র—ছেলেবেলা থেকেই। এত পবিত্র যে অনেকেই—বিশেষ করে মেয়েরা—ওকে ভুল বুঝত, ভাবত—ঢ—ঙ। তবে—" অসিতের মুখে তির্যক হাসি ফুটে ওঠে—"এ হল সেই সনাতন বিরোধ—চলে আসছে সৃষ্টির সূর্যোদয় থেকে —অসাধারণদের সঙ্গে সাধারণের গরমিল। ওকে খুব কাছ থেকে জেনে আমার একটা মস্ত লাভ হয়েছিল আরো এই জন্যে যে, গড়পড়তা মেয়েদেরও এই সূত্রে যেন একটু বেশি চিনতে পেরেছিলাম—কেন না দেখতে ভারি মজা লাগত যে তারা কী ফ্যাসাদেই না পড়েছে ওকে নিয়ে! ছেলেবেলায় গয়াতে একবার আমি একটি খাঁচায় কোকিল পুরে আমাদের বাংলোর সামনে একটি গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম—এমনি হঠাৎ শৌখিন খেয়াল হল—গাছ থেকে কোকিলের কুহুধ্বনি শুনলে মন্দ কি? কিন্তু হল সে ভারি মজা—দেখিকি, ওর খাঁচার চার-দিকে এ ডালে ও ডালে বসেছে কাকের

করে ওঠে 'কাকরা দারুণ উজিয়ে ওঠে—ধরে কা—কা—কা। ভাবটা—দেখতে আমাদের মতন অথচ এ কুহু কুহুর কুডাক ডাকে কেন সর্বনাশী?"

বার্বারা হেসে বলে ঃ "আপনি কি কাক-তত্ত্বেও বিশারদ না কি দাদা?"

তপতীও হাসে ঃ "দাদার কীর্তির কতটুকু বা জানো? —আর একটু কফি?"

বার্বারা বলেঃ "আর না, ধন্যবাদ। কেবল গল্পটা—"

অসিত বলে ঃ "হ্যাঁ বলি। প্রথম দিকটা বাদ দিয়ে যাই তপতী?"

তপতী বলেঃ "না, বলো গোড়া থেকেই—" বলেই বার্বারাকে—"তোমার সময় আছে তো?"

বার্বারা বলে হেসে ঃ "আমার আছে— কেবল আপনাদের—"

অসিত হেসে বলেঃ "আমাদের জপমন্ত্র— 'কালো হ্যয়ং নিরবধিঃ'—কি না We live in eternity অতএব হে জ্ঞানার্থিনী, অবহিত হও।"

অসিত কফিতে চুমুক দিয়ে শুরু করে; "সব দেশেই বলে অর্থের সঙ্গে পরমার্থের অহি-নকুল সম্বন্ধ। তোমাদের খৃস্টদেবও বলেছেন গুরু গম্ভীর স্বরে ঃ It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the Kingdom of Heaven" কাজেই একে ঠিক আচারগত বা সামাজিক সংস্কার বলে বাতিল করে দেওয়া যায় না—এ বিধান দিচ্ছেন তোমাদের পরম পিতার প্রিয়পুত্র যাঁর ভাবধারার উপর তোমরা আজো দাঁড়িয়ে। আমাদের দেশেও ঐ কথাঃ আমাদের কৃষ্ণ ঠাকুর বলছেন তার রাণী রুক্মিণী দেবীকেঃ যেন একটু মৃদু হেসে।

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
...তস্মাৎ প্রায়েন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি
সুমধ্যমে!

মানে, আমি বেচারি গরিব কি না, তাই গরিবরাই আমার আপন জন, ধনীরা প্রায় আমার দিকে ঘেঁষেন না।

"কিন্তু ঐ 'প্রায়' ক্রিয়াবিশেষণটি দিয়ে আমাদের দয়াল ঠাকুর একটু ফাঁক রেখে দিলেন ধনী বেচারীদের জন্যে। তাই আমাদের দেশেও পরম ভাগবতদের মধ্যে কালেভদ্রে এক আধটা জনক, অম্বরীষ, ঋষভ, যুধিষ্ঠির, রামানন্দ, প্রতাপরুদ্রের দেখা মেলে। নৈলে কি আর ধনীর ঘরে সতীর মতন মেয়ের আবির্ভাব হতে পারত? জনক অম্বরীষের বাল্যকাহিনী জানি না, তবে কল্পনা করতে পারি তাঁদের অভ্যুদয়ে বিজ্ঞ বয়স্কদের উৎকণ্ঠা। কিন্তু এ-ধরনের ব্যতিক্রম যখনি কেন না চোখে পড়ুক, চাক্ষুষ করি একটা জিনিসঃ বিধাতার দুষ্টুমি তোমরা যাকে বলো— round peg in a square hole: অর্থাৎ ধরো, সতী যদি হত গড়পড়তা ফ্যাশনেবল আধুনিকা তাহলে ওকে বলা যেত হ্যাঁ বাপের বেটি বটে। কিন্তু ও ঘরণীর ছাঁচে ঢালাই করেন এক জন্ম-বৈরাগীগণকে। ড্রামার উদ্ভব এইখানে— যেখানে যা সাজে না ঠিক সেইখানেই তার আবির্ভাব। কিন্তু এবার ভূমিকা রেখে প্রথমাঙ্কে নামি—তাহলেই বুঝবে কি কাণ্ড ঘটল এ হেন অঘটনে।"

* * *

অসিত কফিতে চুমুক দিয়ে শুরু করেঃ সতীর বাবার নাম রামপদ বাকচি। আসামে চায়ের ব্যবসা করে বিস্তর টাকা উপায় করেন। ভাগ্যবান পুরুষ—ধুলো-মুঠি ধরতেন, হ'ত সোনামুঠি। বিলেত ফেরত—থাকতেও জানতেন। চমৎকার বাগান বাড়ি সুইমিং পুল—তাছাড়া দান ধ্যানও ছিল কম নয়। এককথায়, দেশের দশের একজন—যাকে বলে।

"কিন্তু বিধাতা সব দিয়েও রাখলেন চাপা কিস্তিতে—দিলেন না সন্তান। স্ত্রী মহামায়া দেবীর বুক ছেয়ে কেবল বিষাদ আসত ঘনিয়ে। শেষটায় তিনি কাশী গিয়ে এক সন্ন্যাসীর কথায় ব্রত নিলেন—কঠোর ব্রত। রামপদবাবু হেসে বললেনঃ যত সব মিডীভাল—! কিন্তু অবাক কাণ্ড—বছর ঘুরতে না ঘুরতে কোল জুড়ে এল ঘর আলো করা মেয়ে—রূপ যেন ফেটে পড়ছে! রামপদবাবু ঘটা করে সারা শহরের মান্য-গণ্যদের ডেকে ডিনার দিলেন। ওদিকে মহামায়া দেবীও পিঠ পিঠ দশ হাজার কাঙালি ভোজন করিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রমে পাঠালেন বিশ হাজার টাকা প্রণামী। সন্ন্যাসী ঠাকুর আশীর্বাদ পাঠালেন। মহমায়া দেবী মেয়েকে নিয়ে গেলেন কাশী, বললেনঃ 'গুরুদেব, এর কুষ্ঠি করে দিতে হবে।' সন্ন্যাসী ঠাকুর ছিলেন কাশীর একজন নাম-করা জ্যোতিষী—যথাকালে কুষ্ঠি পেশ করলেন। মহামায়া দেবীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লঃ ধনপতির মেয়ে হবে কিনা সন্ন্যাসিনী! রামপদবাবু গর্জে উঠলেনঃ 'যা যাঃ—যত সব। মেয়ে আমার রাজরাণী হবে —আর তখন ঐ ইডিয়ট গণককারকে ডেকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে—' মহামায়া দেবী আতঙ্কে শিউরে উঠলেনঃ 'চুপ চুপ—মস্ত সাধু—তার প্রণামী পাঠালেন গুরুদেবকে সব কথা জানিয়েঃ 'হোম করুন গুরুদেব! স্বামীর আমার যেন অকল্যাণ না হয়—উনি মানুষ ভালো, কেবল সাহেবসুবোর সঙ্গে মিশেই যা মতিভ্রম'—ইত্যাদি।

"রামপদবাবু সাহেবি স্বভাবের আর স্ত্রী সেকেলে পতিব্রতা হলেও দুজনের মধ্যে ছিল গভীর ভালবাসা। রামবাবু সাধুসন্ন্যাসীকে দেখতে পারতেন না, পুজোপার্বণে বিশ্বাস করতেন না—এক কথায় যাকে বলে রগচটা র‍্যাশনালিস্ট—কিন্তু এমনিই বিচিত্র মানব-চরিত্র—সেকেলে পতিব্রতাকে শুধু ভালো-বাসাই নয়, করতেন শ্রদ্ধা, পারতপক্ষে তাঁর মনে কষ্ট দিতে চাইতেন না। তাই তাঁর জন্যে নিজের সুন্দর বাগানে—শোবার ঘরের পাশেই—একটি চমৎকার মন্দির তুলে দেন যেখানে মহামায়া দেবী ত্রিসন্ধ্যা যথাবিধি করতেন জপতপ, জানাতেন প্রার্থনা স্বামীর ছিল কিশোর কৃষ্ণের—শাদা মার্বেলের—এক হাত উঁচু—ওজনে বিলক্ষণ ভারি, নিজে হাতে তুলে রোজ ঝাড়পোঁচ করতে তাঁকে বেগ পেতে হ'ত বৈকি, তবু আর কাউকে ছুঁতে দিতেন না ঠাকুরকে।

"এ সবই রামপদবাবুর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রমাদ গণলেন যখন আদরিণী মেয়েও মার সঙ্গে মন্দিরে যাওয়া শুরু করল। শুধু মন্দিরে যাওয়া তো নয়—দেখতে দেখতে আট বছরে পা দিতে না দিতে মেয়ে মন্দিরে গিয়ে সমান ঠায় বসে শুনবে ঠাকুরের পুজো, দেখবে আরতি, মা-র সঙ্গে গুণ গুণ করে আওড়াবে সংস্কৃত মন্ত্র। ভাবনার কথা বৈকি!

'স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মত করে মেয়েকে পাঠালেন তিনি কলকাতায়—তাঁর ব্যারিস্টার ভাই কালীপদর কাছে। কালী-পদর ইতিমধ্যে হাইকোর্টে বেশ পসার হয়েছিল—আমাদের বাড়ির পাশেই ওর বাড়ি।,, আমার সঙ্গে তার বনিবনাও হয়ে-ছিল সহজেই—আরো কালীপদর স্ত্রী মোহিনী দেবীর গুণে। তিনি আমাকে ডাকতেন ঠাকুরপো—মানে স্বামীর ভাই— আমি তাঁকে ডাকতাম বৌদি বলে। সত্যি, বড় মিষ্টি মানুষ ছিলেন বৌদি। আর কী যে গল্প! তাঁর কাছেই শুনি সতী রামপদবাবুর ঘরে জন্মিয়ে কী বিভ্রাট বাধিয়ে দিয়েছিল— অজান্তে।

"সতী কালিপদর ওখানে যখন প্রথম আসে তখন সে সবে আট পেরিয়ে ন-য়ে পা দিয়েছে।,, দেখতে দেখতে সে আমার ভারি নেওটা হয়ে উঠল। কালিপদকে সে ডাকত কাকাবাবু, আমাকে—মামাবাবু।

"কী অপরূপ মেয়ে! শুধু কি দেখতে ফুটফুটে? —ওর প্রতি ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে সুষমা ঝরে পড়ত। গালে একটি কালো তিল—হাসলে তাকে কেন্দ্র করে যখন টোল ফুটে উঠত তখন এমন কোনো চোখ ছিল না যে বাহবা না দেবে বিধাতার কারিগরিকে। সবার উপর ওর রং—ঠিক যেন কাশ্মীরি মেয়ের—সাদা ও রাঙার জোড় মিলেছে। কিন্তু আরো একটু বলতে হবে। রূপ নিখুঁৎ হলেও মন ভরে না যদি না তাকে আভাময় করে তোল বুদ্ধি। ওর ছিল তীক্ষ্ণ মেধা। বাপের কাছ থেকে পাওয়া বুদ্ধি, মায়ের রূপ—দুয়ে মিলে ও অপরূপ হয়েই ফুটে উঠেছিল।

"যখন তখন ও আমার ঘরে এসে হানা দেবে। আমি হয়ত একমনে গান গাইছি —ও শুনবে চুপ করে বসে গান—কীর্তন— ভজন। কিন্তু ও যেন ডুবে যেত যখন আমি গাইতাম কৃষ্ণকীর্তন বা শ্যামাসঙ্গীত। আমি মাঝে মাঝে সত্যিই অবাক হয়ে যেতাম। জল্পনাকল্পনা করতাম—এমন তন্ময় হয়ে ও কী শোনে ও-সব ভাবের গানে?

"কিন্তু ক্রমশঃই আমার চোখ ফুটতে লাগল। না লেগে উপায়? এ মেয়ে তো সামান্যা নয়—যে আমার ঘরে নিঃশঙ্কে যখন তখন এসে এ-বই ও-বই টেনে নিয়ে চুপটি

নাটক নভেল গল্প রূপকথা তো নয়!—কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ভক্তমাল, চৈতন্যচরিত, রামকৃষ্ণকথামৃত—কখনো দেখি ওমা! বিষ্ণুপুরাণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, দেবীভাগবত নিয়ে মশগুল! ভাবি অবাক হয়ে—এসবে এইটুকু মেয়ে কী রস পায়? কী বোঝে? কিন্তু বুঝুক বা না বুঝুক রস যে ও কিছু অন্তত পেত—ওর মুখের চেহারা দেখলে সন্দেহ করার অবকাশ থাকত না।

"বছর দু তিনের মধ্যেই—তখন ওর বয়স এগার বার হবে—ও আমাকে প্রশ্ন করা শুরু করল—বিশেষ করে রামকৃষ্ণকথামৃত নিয়ে। 'আচ্ছা মামাবাবু, ঠাকুর মা কালীকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন—একথা তুমি বিশ্বাস করো?' 'অবিশ্বাস করছিস কেন?' —না না, অবিশ্বাস ঠিক নয়, তবে এ-ও তো হতে পারে যে, শ্রীম বানিয়ে বানিয়ে লিখেছেন। আমি দেখেছি অনেক পান্ডাপুরুত বানিয়ে বানিয়ে বলে—কিম্বা শোনা কথাকে এমনভাবে বলে যাতে অপরের মনে হয় যেন চোখে দেখা।'

"চমকে উঠি। ঠিক যে আমার ছেলেবেলাকার কথা! ওকে বললাম কোমলকণ্ঠেঃ 'তুই যা বলছিস তা ঠিক। তবে শ্রীম-কে আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি রে! তিনি রোজ টাটকা টাটকা লিখে রাখতেন ঠাকুরের কথা—সে-ডায়েরি আজো আছে। তাছাড়া শ্রীম ছিলেন সত্যবাদী—ভক্ত—মহাপুরুষ। মিথ্যা কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় নি কোনো দিনও। তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তো তোকে নিয়ে যেতাম তাঁর কাছে—তিনি কী খুশিই হতেন! কিন্তু তুই যে ভুল করে ফেললি ছাই দেরীতে জন্মিয়ে।

"ওকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল কলকাতায় এক ফ্যাশনেবল মেয়েদের স্কুলে। বলতে কি, ওর মনকে ওর অজান্তে ঘুরিয়ে নেবার জন্যেই রামপদবাবু ওকে কলকাতায় পাঠান—ঠাকুর দেবতার আবহাওয়ার ছোঁয়াচ কাটাতে চেয়ে। কিন্তু ওস্তাদের মার দেখ—হবি তো হ—ও এসে পড়ল এমন এক পাতানো মামাবাবুর কাছে—যার জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ওরই বয়সে। মাঝে মাঝে ভাবতাম এই বিচিত্র যোগাযোগের কথা আর মনে মনে হাসতাম লীলা বটে ঠাকুরের! কারণ ও যদি গোঁহাটিতেই থাকত, তবে ওর ধারালো মন পান্ডাপুরুতদের দেখে দেখে হয়ত ক্রমশ ধর্মের নামে অতিষ্ঠই হয়ে উঠত। কেন না সব বিশ্বাস করে ধরে নেও শোনা কথায় ভর করে—এই ধরনের বাণীতে ওর স্বাবলম্বী মন কোনো দিনই সাড়া দিতে পারত না। বাপের কাছ থেকে পেয়েছিল ও রোখালো বলিষ্ঠতা। না বুঝে কিছুই নেবে না। দারুণ এঁচড়ে-পাকা মেয়ে—মানে এ দিক দিয়ে—যাকে তোমরা বলো precocious.

"কিন্তু বিচিত্র এই যে অন্যদিকে ও ছিল ঠিক তেমনি অজ্ঞ। নরনারীর পরস্পরের প্রতি টান ও যে ওর কৈশোরে লক্ষ্য করেনি তা নয়—কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাবার ওর কোনো প্রবৃত্তিই ছিল না। স্কুলের মেয়েদের সঙ্গেও ও মিশত না—কারণ তারা যে-ধরনের হাসি গল্প ইয়ার্কি করত তাতে ওর স্বভাব-শুচি মন প্রতিহত হ'ত। হয়ত বা এরই প্রতিক্রিয়ায় ও ছুটে ছুটে আসত ওর মামাবাবুর ঘরে—যার কাছে ওর মন হাঁপ ছেড়ে বাঁচত।

"সময়ে সময়ে ও আশ্চর্য মন্তব্য করত নানা লোকের সম্বন্ধে। ভর কাকে বলে জানত না, যা মনে আসবে ব'লে ফেলবে। এই জন্যে স্কুলে ওর সুনাম ছিল না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। একদিন আমার কাছে এসে হঠাৎ বললঃ জানো মামাবাবু? মিস বোস না?—আমাদের হেডমিস্ট্রেস? মোটে ভালো লোক না।' আমি হেসে বললামঃ 'কী বাধালি রে আবার তার সঙ্গে?' ও বলল উত্তেজিত মুখে—গাল দুটি হয়ে উঠল আরো লালঃ 'আমার সঙ্গে কিছু বাধে নি—তিনি হাসাহাসি করছিলেন এক সুট-পরা ফোতো বাবুর সঙ্গে। বলছিলেন আমাদের দেশে কী যে সব কুসংস্কার নিয়ে আছে সবাই—ভগবান্ ভগবান্ ভগবান্!' আমি থাকতে পারলাম না, বললামঃ 'কুসংস্কার? ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বচক্ষে দেখেছিলেন—' মিস বোস তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেনঃ 'ননসেন্স! ভগবানকে চোখে দেখা যায় না কি?' আমি বললামঃ আপনি কী বলছেন মিস বোস? যারা চোখে দেখেছেন তাঁদের কথাই বড়—না যারা দেখতে পান নি তাঁদের কথাই বড়? মিস বোস ভুরু কুঁচকে বললেনঃ 'তুমি এ-সবের কী বোঝো পাকা মেয়ে যে অমন ইম্পার্টিনেন্ট সুরে কথা কইছ? তোমার বাবা আমাকে কী লিখেছেন জানো?—যে তোমাকে ভালো ক'রে ইংলিশ এডুকেশন দিতে—যাতে ক'রে তুমি সত্যি এন্‌লাইটেন্‌ড্ হ'য়ে উঠতে পারো। এসব সেকেলে মিডীভাল সুপার্স্টিশন এযুগে অচল টাকা। তাই বলি—তুমি এসব বাজে লিজেন্ড ছেড়ে সেন্সিব্‌ল্ হ'য়ে বাপ-মার ইচ্ছা মেনেই চলা শুরু করো যদি ভালো চাও।' এ-সময়ে ও পড়ছে ম্যাট্রিক ক্লাসে—বয়স তখন ওর চোদ্দ হবে। তখন ইংরিজি ও ভালো ক'রেই শিখেছে, কাজেই এসব বিলিতি বুকনির মর্ম ও বিলক্ষণ গ্রহণ করতে পারত।

"শুধু ইংরিজিই বা বলছি কেন—ইতিহাস, ভূগোল, কোনো কিছুতেই ও পেছিয়ে ছিল না। প্রতি পরীক্ষাতেই হ'ত ফার্স্ট—প্রাইজগুলো ছিল যেন ওর পোষা খরগোস। কাজেই মিস বোসদের দল ওকে নিয়ে যে বেশ একটু মুশকিলেই পড়েছিলেন একথা সহজেই কল্পনা করতে পারবে। কিন্তু আদিপর্ব থেকে এবার

উদ্যোগপর্বে আসি—নৈলে এ-মহাভারত আজ সারারাতেও শেষ হবে না।

"আমি মাঝে মাঝে গানের নিমন্ত্রণে বা বড় বড় ওস্তাদের খোঁজে আমাদের দেশের নানা শহরে ঢুঁ মেরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতাম—কখনো কখনো দু'তিন মাস বাদে। এই অদর্শনের ব্যবধানের দরুণ আরো চোখে পড়ত ওর দ্রুত বিকাশ। দেখতে দেখতে শুধু ওর মুখের ভাব বদলে যাওয়াই নয়—বালিকা থেকে কিশোরীর বয়ঃসন্ধিকালে যেমন হয়—ওর কথাবার্তার মধ্যেও ফুটে উঠল আশ্চর্য চিন্তাশীলতা —হয়ত আরো এই জন্যে যে ও একলা একলাই থাকত বেশির ভাগ সময়ে। না যাবে থিয়েটারে, সভাসমিতিতে, না যোগ দেবে পার্টি পিকনিক খেলা-ধুলোয়। স্কুল থেকে এসে ফের বই নিয়েই বসবে। ওর সখি একটিও ছিল না, সখা তো নয়ই। কালিপদর বাড়িতে যুবকের দল ওর আশ্চর্য রূপ দেখে ওর দিকে ঝুঁকবে তার জো কি? ও মেয়ে গন-গনে আগুন—একটু এগুতে না এগুতে ওর তাপে তারা পিছু হটত। মোহিনী বৌদি থেকে থেকে ওকে ধমকাতেন—কুনো ব'লে। ও বলতঃ 'কুনো মানে কী? এরা কেউ ভালো কথা বলে? গ্রেটাগার্বো আর মেরি পিকফোর্ড আর থিয়েটার, ম্যাচ্—এসব আমার ভালো লাগে না—কী করব?'

"ওর একমাত্র দরদী ছিলাম আমি। মামাবাবুকে ওর মনে ধরেছিল। মোহিনী বৌদি বলতেন মাঝে মাঝে হেসেঃ 'ও কি বলে জানো ঠাকুরপো? বলেঃ কলকাতায় মানুষের মতন মানুষ আছে ঐ একটি—আমার মামাবাবু। কী অগাধ পড়াশুনো অথচ কী বিশ্বাস!' আমি শুনে তো অবাক্। শুধু আমিই যে ওকে লক্ষ্য করছি তা নয়—ও মা! ও মেয়েও আমাকে যাচাই করছে—ওর মনের নিকষে! কিন্তু তবু ভাবি—বিশ্বাস বলতে কী বোঝায় সত্যিই কি জানে—ঐটুকু মেয়ে? হাজার প্রিকোশাস হোক, তবু বয়সে তো বালিকা এখনো—মানে চতুর্দশী। মোহিনী বৌদি থেকে থেকে ওর নামে নালিশ জানাতে আমার কাছে আসতেন। বলতেনঃ 'ওকে একটু বুঝিয়ে বলো ঠাকুরপো—এ কী কাণ্ড! ঐটুকু মেয়ে না খেলাধুলো, না গল্প-গুজব হাসিঠাট্টা থিয়েটার বায়স্কোপ—কেবল বই মুখে করে থাকা? এ কি ভালো? আমি মনে মনে হাসতাম আর বলতামঃ 'আর যদি জানতে বৌদি কী সব বাছা বই? ধর্মের বই—তত্ত্বকথা!' কিন্তু মুখে কিছু বলতাম না। শুধু থেকে থেকে মনে হ'ত বেচারি একলা মেয়ে কোথাও পায় না ব্যথার ব্যথী—কাজেই আসে আমার কাছে ছুটে ছুটে সাধুসন্তদের কথা শুনতে! ওকে যতটা পারি বাঁচাব আঘাত থেকে। কিন্তু হায়রে মানুষের শক্তি কতটুকু? কিন্তু সে-দুর্দৈবের কথা বলবার আগে আর একটা কথা ব'লে নিই।

"এই সময়ে ওর মনের আর একটা দিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। হল কি মোহিনী দেবীর ছিলেন এক গুরুদেব। তাঁকে দেখেই ও আগুন হ'য়ে উঠল। একদিন হঠাৎ আমার কাছে গুরুবাদের প্রসঙ্গ। এতদিন আমি এ-প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো আলোচনা করি নি ওর সঙ্গে—কারণ আমার মনে হয় নি ওর মনে এ-প্রশ্ন উঠেছে। তৃষ্ণা না পেলে জলের মর্ম বোঝা যায় না এ আমি জানতাম। কিন্তু হঠাৎ এই প্রসঙ্গে দেখতে পেলাম ও গুরুবাদ নিয়েও কিছু কম মাথা ঘামায় নি। আমি ওকে বললাম যে, সদ্গুরু পাওয়া জীবনের এক মহালাভ। ওর মুখ লাল হ'য়ে উঠল। আমাকে ও ভক্তি করত বটে, কিন্তু তাব'লে তর্ক করতেও কোনোদিন পেছপাও হ'ত না—সরলভাবে ব'লে ফেলত যা ওর মনে আসে। তর্কে হারলে বলত হেসে 'হার মেনেছি।' কিন্তু যতক্ষণ না কোনো কিছু ওর কাছে গ্রহণীয় মনে হবে ও কিছুতেই বরণ ক'রে নেবে না অন্ধভাবে। তাই আমাকে বলল রোখালো সুরেঃ 'এ কি কখনো হ'তে পারে মামাবাবু যে গুরুর খোসামোদ না করলে ভগবানের কাছে পৌঁছুন যাবে না? তাছাড়া গুরু ভগবান ও কেমন কথা? মানুষ হাজার বড় হোক কখনো ভগবান হ'তে পারে?' তারপর সে তর্ক আর তর্ক! কিছুতেই ও আমার কথায় সায় দেবে না যে, ভগবান্ গুরুকে পাঠাতে পারেন তাঁর সঙ্গে ঘটকালি করতে। বলল শেষেঃ 'যদি কোনোদিন দেখি তেমন কাউকে তবে সে আলাদা কথা। কিন্তু গুরুগিরি আমার একটুও ভালো লাগে না মামাবাবু!' বলতে বলতে ওর চোখ উঠল ছল ছল ক'রে, বললঃ 'মামাবাবু, আমাকে ভুল বুঝো না। খাঁটি সাধুসন্ত আমাদের অনেক কিছু দিতে পারেন এ আমার মন নেয়। কিন্তু যদুবাবু গুরু ঠাকুরটি হ'য়ে বললেন আমি মধু চেলাকে হুজুরালির কাছে হাজির ক'রে দেব—এ অহঙ্কারের কথা। ভগবান আমার মন টানেন কিন্তু তিনি সোজাসুজি না এসে এমন ঘোরালো পথে আসতেই বেশি ভালোবাসেন একথায় আমার মন সাড়া দেয় না, কী করব?'

"আমি কিছু বললাম না! ওকে আদর করে শুধু বললামঃ ঠাকুর রামকৃষ্ণের লেখা কী পড়ান? তিনি বলতেন না—যত মত তত পথ? তুই তোর মত নিয়েই ঘর কর্ না রে—স্বভাবেই থাক্ না। ভগবানকে ভালোবাসা হ'ল আসল কথা—আর সব তো কথার ফেনা। তাঁকে ভালোবাসতে পারলে তিনিই তোকে দেখিয়ে দেবেন, তোর পথে আলো ধরতে গুরুকে ডাক দিতে হবে কি না।' ও একটু ভেবে শান্ত হ'য়ে বললঃ 'এ বেশ কথা।' কী বুঝল ও-ই জানে।

"ভাবতে সত্যি আমার অবাক লাগতঃ কী অদ্ভুত মেয়ে! দেখতে 'সঞ্চারিণী লতা' কালিদাসের উপমা মনে পড়ে যেত—অপরূপ মোহিনী ললিতা সবই—অথচ মনটির মধ্যে মাখনের কোমলতার সঙ্গে জড়িয়ে ইস্পাতের কাঠিন্যঃ বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে! তোমাদের ভাষায়—প্যারাডক্স। নৈলে গুরুবাদের নামেই যার মুখের হাসি যায় নিভে, সে কি না প্রহ্লাদ ধ্রুব অম্বরীষের কাহিনী শুনতে না শুনতে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়! আমার মুখে এইসব ভক্তদের কাহিনী ও শুনত দিনের পর দিন। আমি ভাগবত থেকে সংস্কৃত শ্লোকগুলি প'ড়ে প'ড়ে বুঝিয়ে দিই আর সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে জল! সময়ে সময়ে বলবেঃ "উঃ! ঠাকুর তাঁর ভক্তদের কেন এমন ক'রে কষ্ট দেন মামাবাবু?' ব'লেই তৎক্ষণাৎঃ 'তবে বুঝি দুঃখ না পেলে ভক্তি জাগে না—এই না? কিন্তু না. তাই বা বলি কেমন ক'রে মামাবাবু? কাকাবাবুর বন্ধু মহিমবাবু না? তাঁর ছেলে মারা গেল, মেয়ে মারা গেল, স্ত্রী মারা গেল। কী কান্নাই না কাঁদলেন কাকাবাবুর কাছে এসে—এই সেদিন—এক বৎসরও হয় নি। ও মা! কাল শুনলাম তিনি হৈ হৈ করতে করতে পাটনায় গেছেন ফের বিয়ে করতে—ভাবতে পারো? বলতে বলতে বিতৃষ্ণায় ওর মুখ মেঘলা হ'য়ে আসে, বলেঃ 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে-ছিলেন একটি লাখ কথার এক কথা—উট কাঁটা ঘাস না খেয়ে পারে না—হাজার কেন না মুখ দিয়ে দরদর ক'রে রক্ত পড়ুক।' চমকে উঠলাম, মনে প'ড়ে গেল ওর কুষ্ঠির

কথা—এ-মেয়ে সংসারী হবে না। মুখে বললাম হেসেঃ 'কিন্তু সতী, তুই যাকে বলছিস কাঁটা ঘাস, উটের কাছে যদি মিষ্টি হয়?' ও পিট পিট জবাব দেয়ঃ 'মিষ্টি? কোনো কিছু মুখে দিলে যদি জিভ জ্বলে যায় তখনো কি সে মিষ্টিই থাকে? না মামাবাবু, বাবা মা যতই বলুন না কেন—বিয়ে আমি করছি নি।' ব'লেই একটু থেমেঃ 'আচ্ছা মামাবাবু, সকলকেই বিয়ে করতে হবে কেন? আর বিয়ে মানে কী—বলবে আমাকে খুলে?' বিপদে প'ড়ে এড়িয়ে গেলামঃ 'বর যখন আসবে তখন বুঝবে—এখন বললে যে-তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবি।' ও টপ ক'রে বললঃ 'তবে তুমি নিজে কেন বিয়ে করলে না?'

বার্বারা হেসে গড়িয়ে পড়েঃ "সোজা মেয়ে নয় দাদা! Live wire।"

অসিত বললঃ "সে আর ব'লে! কিন্তু এখনি হয়েছে কি-এ তো সবে কলির সন্ধ্যে। শোনোই আগে।"

* * *

আর এক পেয়ালা কফি ঢেলে নিয়ে অসিত ব'লে চলেঃ "পনের বছর বয়সেই ও ম্যাট্রিক পাস করল—মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট আর সব জড়িয়ে ফোর্থ।

"খবর যখন বেরুল তখনও গোহাটীতে ওর পিতৃগৃহে। ওকে আমিই প্রথম খবর দিই তার ক'রে। উত্তরে ও এক মস্ত চিঠি লিখল। তাতে প্রথম দিকে একটু নামমাত্র আনন্দ ক'রেই শুরু করল ফের সেই একই প্রশ্নাবলি নানা সুরেঃ ভগবানের কাছে পৌঁছতে হ'লে কী করতে হবে? যদি গুরু না করা যায় তবে কি পথ বিপথ হয়ে উঠবে? তা কখনো হ'তে পারে? ভগবানকে যে সত্যি চায় সে তাঁকে পাবে না কেন সোজাসুজি? শাস্ত্র? কিন্তু শাস্ত্রের সব কথাই তো মানা চলে না। একযুগে শাস্ত্র এক কথা বলেছে, পরের যুগে আর এক কথা—এ তো তোমার মুখেই শুনেছি মামাবাবু! আমার প্রশ্নঃ এযুগে কী করতে হবে ভগবানকে পেতে হ'লে? না প্রশ্নটা আরো তীক্ষ্ণঃ আমার মতন মন যে-মেয়ের—তাকে কী করতে হবে?

"আমি গুছিয়ে উত্তর লিখতে বসেছি এমন সময়ে এল দারুণ খবর—গৌহাটিতে ভূমিকম্প। খবরের কাগজে পড়লাম—এরকম ভূমিকম্প আসামেও না কি কখনো হয় নি—বহু লোক মারা গেছে, বহু বাড়ি প'ড়ে গেছে ইত্যাদি।

"সতীর কথা মনে হ'ল প্রথমেই—সে বেঁচে আছে তো! ছুটে গেলাম পাশের বাড়িতে—কালিপদ নিশ্চয় বলতে পারবে। পৌঁছতে না পৌঁছতে শুনলাম মেয়েদের কান্নার শব্দ। চাকরকে দিয়ে খবর পাঠালাম। বৌদি এলেন, কিন্তু কথা বলতে পারেন না। কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে সতীদের বাড়িতে সবাই মারা গেছে সতী ছাড়া—ওর বাবা মা আত্মীয়রা সব বাড়ি চাপা প'ড়ে মরেছে। তার এসেছে এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ সান্ন্যালের কাছে। তার বাড়িটা খানিকটা ধ্বসে পড়লেও দাঁড়িয়ে আছে—সতী ও আরো অনেকে সেখানেই আশ্রয় পেয়েছে।

"কালিপদ এল, বলল তার মাথার মধ্যে কেমন করছে। বলতে বলতে মাটিতে প'ড়ে গেল। ডাক্তার আনতে ছুটলাম। ডাক্তার এসে বললঃ "ভয় নেই, তবে পূর্ণ বিশ্রাম।" বৌদি আমাকে মিনতি ক'রে বললেনঃ 'ভাই এখন তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা—গিয়ে সতীকে নিয়ে এসো এক্ষণি।'

"আমি সতীকে তার ক'রে দিয়েই ছুটলাম শেয়ালদা স্টেশনে।

"ট্রেনে কী ভিড়! কান্নাকাটি করছে যে কত যাত্রী! কারুর বাপ মা মারা গেছে, কারুর স্ত্রীপুত্র, কারুর ভাই বোন—সে এক অবর্ণনীয় কাণ্ড! ট্রেনে জায়গা পাওয়াই ভার। অতি কষ্টে একটি কামরায় এক কোণে ঠাই পেলাম। মন বিষাদে কালো হ'য়ে গেল। তবু সর্বরক্ষে, সতী অন্ততঃ বেঁচে গেছে! ঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম করলাম।

"পান্ডুঘাটে পৌঁছে স্টীমারে ক'রে নদী পেরিয়ে গৌহাটি পৌঁছিয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। এর আগে ছোটখাটো ভূমিকম্প দেখেছি, কিন্তু নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের এ-রূপ কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। চারিদিকে গর্ত, জায়গায় জায়গায় মাটির নিচে থেকে কালো জল উঠে পুকুর মতন হ'য়ে গেছে, এখানে ওখানে ভিজে বালি, রাস্তাঘাটে গাড়ি চলা অসম্ভব, পুলগুলির একটিও স্বস্থানে নেই, চারিদিকেই ধসে পড়া বাড়ির স্তূপ, এক একটি বাড়ি দেখলে মনে হয়—যেন কোনো বিরাট দৈত্য মহাকায় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। দুধারে লোকলস্কর, উর্দিপরা পুলিস স্তূপ সরাচ্ছে আর টেনে টেনে বার করছে মরা গরুবাছুর, থেঁৎলে-যাওয়া মানুষ, আধমরা নারী, অঙ্গহীন শিশু...... সে চোখে না দেখলে ভাবাই যায় না। অথচ মাত্র দুদিন আগে এখানে ছিল সাজানো বাগান...এই সব ছেলেমেয়েরাই হাসতে হাসতে খেলা করেছিল, পথিক গান গেয়ে পথ চলেছিল নির্ভাবনায়, মায়ের কোলে শিশু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল—আনন্দের হাট ছিল এ সুন্দরী নগরী!

"ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ সান্ন্যাল চমৎকার যুবক! আমাকে সদরে ঠাই দিলেন। তাঁর বাড়িটি যে কী ক'রে বেঁচে গিয়েছিল কে বলবে! সতীর আমাকে জড়িয়ে সে কী কান্নাঃ 'বাবা নেই, মা নেই মামাবাবু! আমার কেউ নেই—তুমি ছাড়া।'

বার্বারা চোখ মোছেঃ "আহা!"

* * *

অসিত ব'লে চলেঃ "সতীকে নিয়ে সেইদিন কলকাতা রওনা হলাম। ট্রেনে ওর মুখে সব শুনলাম—সব কথা বলার সময়ও নেই দরকারও দেখি না। কেবল ওর একটি অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলব যার দরুণ ও বেঁচে গেল মরতে মরতে। ওর জবানিতেই বলি।

"সতী বললঃ 'পরশু মাঝ রাতে এক দারুণ স্বপন দেখে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নে দেখছি কি, চারদিক কাঁপছে—গুম্ গুম্ শব্দ—আর সঙ্গে সঙ্গে আশ-পাশে যেন একের-পর-এক সাজানো তাসের বাড়ি প'ড়ে যাচ্ছে। ঘুম ভাঙতেই বিপর্যয় ভয় আমাকে পেয়ে বসল। তুমি জানো মামাবাবু, আমি স্বভাবে ভীতু নই, কিন্তু মনে হ'ল ছুটে বেরিয়ে পড়ি—কেন জানি না। না, মনে পড়ছে—কী একটা স্বর যেন কানের কাছে বললঃ এক্ষুণি বাইরে চ'লে যাও—মাঠে—তবে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না সত্যি কোনো স্বর শুনে-ছিলাম, না আতংকের দরুণ মনের ভুল। পাশে মা ও বাবার ঘরে দুম্ দুম্ ক'রে ঘা দিয়ে বললাম: 'বাবা! মা গো! এক্ষুণি বেরিয়ে এসো! দেরি কোরো না।' মা চেঁচিয়ে বললেনঃ 'কী পাগলামি করছিস্? এই মাঘী শীতে মাঝ রাতে বাইরে যাব

কী?—শো গে যা।' শুনতে পেলাম ভিতরে পায়ের শব্দ, বোধ হয় বাবা উঠে জামা পরছেন দোর খুলবেন ব'লে। কিন্তু আমি আর সেখানে তিষ্ঠলাম না—বা তিষ্ঠতে পারলাম না বলাই ভালো—কে যেন আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিল বাইরে। বাইরে এসে আমাদের টেনিস-কোর্টে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে মাটির বুক ফেটে সে কী আর্তনাদ! সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আলোয় দেখি কি শুধু আমাদের বাড়ি নয়—সামনেই আমাদের মন্দিরটি দুলছে। আর দুলতে না দুলতে—গর্জন। আমি হতভম্ব হ'য়ে ঠায় চেয়ে রইলাম—দেখি পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। দেখতে দেখতে আমাদের বাড়ি ঘোর শব্দ ক'রে প'ড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে আর্তনাদ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, গরু বাছুরের হাম্বা......আরো সে কত রকম শব্দ।......

"আমি দাঁড়িয়ে আছি...মাথার মধ্যে কেমন যেন সব খালি হয়ে গেছে—ভাবতে পারছি না স্পষ্ট করে—এমন সময়ে দেখি হঠাৎ আমাদের গৃহমন্দিরটির চূড়া আমার পায়ের সামনে দড়াম ক'রে পড়ল—আমাদের গৃহ-বিগ্রহটিকে নিয়ে। আশ্চর্য এই যে বিগ্রহটির গায়ে আঁচড়ও লাগে নি—আশপাশের মখমলের পর্দা জড়িয়ে সে অক্ষত দেহেই ভূমিশয্যায় শুয়ে!
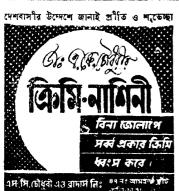
'বিগ্রহটিকে দেখে আমার সাড় এল। মনে হ'ল—হাসি পায় এখন ভাবতে—যেন ঠাকুর আমার কাছেই আশ্রয় চাইছেন। অদ্ভুত চিন্তা না? কিন্তু সত্যিই আমার মনে হ'ল এখন ঠাকুরের ভার একা আমারই। আমার কানে কানে কে যেন বলছিল : আমার দেখা-শোনা করবার আর কেউই রইল না রে, তুই ছাড়া। এ নিশ্চয়ই কল্পনা—জানি—কিন্তু কেন এ ধরনের কল্পনা জাগল আমার মনে, কে জানে? কারণ বিগ্রহটিকে আমার দেখতে ভালো লাগলেও কোনোদিনও মনে হয় নি যে জীবন্ত, কি আমার আপন জন। ভক্তি এসেছে সময়ে সময়ে ঠাকুরের মূর্তি দেখে—যেমন আর পাঁচজনের আসে তেমনি। অথচ তারপরই মনে হয়েছে : বিগ্রহ পূজো হয়ত ভালোই, কিন্তু ভগবানকে তো পাওয়া যাবে না এর মধ্যে দিয়ে। আর সব ছাড়িয়ে সেদিন রাতে কানে বেজে উঠল তোমার-গাওয়া একটি গান :

আমাদের এই দেহ প্রাণ মন
সুখ দুখ এই জীবন মরণ
এও বিধাতার পুতুল খেলা—
শুধু গড়া আর ভাঙিয়া ফেলা।
শুধু দুদিনের খেলা।"

* * *

বার্বারাই প্রথম কথা কইল, বলল : "আমার জীবনে মাত্র একবার ঘটেছে দাদা, এই ধরনের স্বপ্ন। আমার মার মোটর একটা ব্রিজ থেকে উল্টে প'ড়ে যায় নদীতে—ড্রাইভার ও তিনি উভয়েই মারা যান। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা মোটর উল্টে পড়ছে তার মধ্যে আমার মা। আমি সোমবার রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম সান-ফ্রান্সিসকোয়, মার মোটর উল্টোয় মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা শিকাগোতে। আমার এক বিদ্বান প্রফেসর বন্ধু ছিলেন, তিনি প্রফেটিক ড্রীম, টেলিপ্যাথি প্রভৃতি নিয়ে অনেক দিন ধ'রে চর্চা করেছেন, বইও লিখেছেন দুতিনখানা। আমি পড়লাম সেসব, কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যার বিশেষ কিছুই মর্ম গ্রহণ করতে পারি নি। অথচ আশ্চর্য এই যে, তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, এসব ঘটনার যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন নানান বড় বড় গালভরা শব্দের তাল পাকিয়ে—তাতে ক'রে অঘটনগুলি কেন ঘটল জলের মতন সাফ হয়ে গেছে!"

অসিত হাসল : "এ'রা বেশ থাকেন এই জাতীয় কথা দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে—আমার এক বিজ্ঞ ফরাসী বন্ধু আছেন তিনিও এই জাতীয় ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। তাঁর বিশ্বাস—যেখানে যাই কিছু ঘটুক না কেন মানুষ বুঝতে পারবেই পারবে বুদ্ধি দিয়ে। তাই যেখানে বুদ্ধি পড়ে অথই জলে সেখানে তাঁরা বলেন, এসব হয় বানানো, না হয় ভাববিলাসের কুয়াশা। কিন্তু নিশুত রাতে ঐ যে ভূমিকম্প হ'ল ও সতী বেঁচে গেল এ তো চোখে-দেখা সত্য? আচ্ছা। তারপর ওর বাবা, মা, তিন চারজন আত্মীয়, সাত-আটটা চাকর সবাই বাড়িচাপা প'ড়ে মারা গেল এ-ও তো ভাববিলাস নয়? আচ্ছা। অথচ সতী বেঁচে গেল কেন ভূমিকম্পের স্বপ্ন দেখে? বাইরে ওকে ঠেলে পাঠিয়ে দিল কে? আরো দেখ, যদি ধরো ও এ-স্বপ্ন আর দু মিনিট বাদেও দেখত তাহলে ঘুম ভাঙার আগেই ঘর চাপা প'ড়ে মরত তো—আর সবাইয়ের মতন? এখন, আমি জানি—ওকে বাঁচিয়ে দিল ভগবানের কৃপা। কেন ঘটল এ-অঘটন জানি না, তবে যাদের ধর্মে-প্রবণতা গভীর হয় তাদের তিনি এভাবে বাঁচান বা সাবধান করেন এ আমি একাধিকবার স্বচক্ষে দেখেছি। এমন কি, আমার মতন স্বভাবসংশয়ীর জীবনেও এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে একবার। হ'ল কি, দিল্লি থেকে আমেরিকা রওনা হব ব'লে ৬ই জানুয়ারি একটি প্লেনে আমার ও তপতীর জন্যে দুটি সীট রিজার্ভ করেছি এমন সময় ৪ঠা জানুয়ারি নিষেধ এল—যেও না এ-প্লেনে। নানা অসুবিধে সত্ত্বেও সে-প্লেন ছেড়ে ৮ই জানুয়ারি আমরা আর একটি প্লেনে রওনা হই। হংকং-এ পৌঁছে চা খাচ্ছি এমন সময় খবরের কাগজে পড়লাম আমাদের আগের প্লেনটি ব্যাংককে forced landing করতে বাধ্য হয়েছে—মানে মরতে মরতে বেঁচে গেছে প্লেনের আরোহীরা। আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন এক বৈদেহী স্বর। এখন, পাণ্ডিতেরা বলবেন—ধ্যেৎ! বৈদেহী আত্মা তোমাকে বাঁচাতেই বা কেন আসবে ধাওয়া ক'রে? কেন এল জানি না, তবে এসেছিল জানি। কিন্তু প্রমাণ করব কেমন ক'রে?"

তপতী বলল : "তাইতো আমি তোমাকে কেবল বলি দাদা, তোমার যা বলবার আছে বলে যাও. বুদ্ধিমন্তদের মধ্যেও তা সুবুদ্ধি থাকেন দুচারজন—তাঁদের উদ্দেশ ক'রেই বলো, সবজান্তাদের নিয়ে কেন মাথা বকানো? তাছাড়া তুমিই তো বলো গীতার একটি কথা যে প্রতি মানুষই চলে নিজের স্বভাবে। এই সব প্রাজ্ঞরা চলুন না নিজের বুদ্ধির নির্দেশে। কে জানে—এই-ভাবে চলতে চলতে হুমড়ি খেয়েই হয়ত তাঁরা একদিন বুঝতে শিখবেন—যাকে ব'লে ঠেকে শেখা—আর তখন বুঝবেন তাঁদের স্বভাবের অভাব কোথায়। তাই আমিও বলি—আমরা যা বিশ্বাস করি সেই অনুসারে চলি এসো—পণ্ডিতেরা থাকুন পাণ্ডিত্যের ব্যাখ্যানন্দে মজে।"

অসিত হেসে বলল : "তীরন্দাজি করেছ ভালো। মনে পড়ছে আমাদের কঠোপনিষদের একটি শ্লোক :

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ
পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানা পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব
নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

বার্বারার দিকে চেয়ে : "অর্থাৎ যম নচিকেতাকে বলছেন যে, যারা কিছু না জেনেও পাণ্ডিত্যের মোহে 'আমরা সব

জানি' এই অভিমানের নির্দেশে চলে, তারা অন্ধচালিত অন্ধের মতনই বারবার পড়ে আর ঘা খায়। তাই তোমার ও-কথা মিথ্যে নয় যে মানুষের পরম শেখা হল ঘা খেয়ে শেখা—বেশীর ভাগই ঠেকে শেখে, দেখে শেখে আর কজন বলো—বিশেষ ক'রে অঘটনের রাজ্যে? তবে বেলা হল, তর্ক ছেড়ে গল্পের রাজ্যে ফিরে আসি।"

* * *

অসিত বলল : "ট্রেনে অরুণ ম্যাজিস্ট্রেটের কৃপায় আমরা একটা কুপে পেয়ে গিয়েছিলাম। এতে কথাবার্তায় বড় সুবিধা হ'ল। আর সতী সে কত কথাই যে বলল! ওর যেখানে একটু কুণ্ঠা মতন ছিল এই বিপদে কেটে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মুখ গেল ওর খুলে। সব কথা বলার সময় নেই—তাছাড়া সব আমার মনেও নেই—কেবল একটি কথা না বললেই নয়। ও বলল : 'কিছুদিন থেকেই কেবলই মনে হচ্ছিল মামাবাবু যে আর না, এবার ঠাকুরকে বরণ করতেই হবে—কীভাবে তিনিই বুঝিয়ে দেবেন যদি শরণ নিই তাঁর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়ই আমি সব চেয়ে বল পেয়েছিলাম। তিনি বলতেন না—মাকে তিনি বলতেন মা আমি কিছুই জানি না বুঝি না তুই দেখিয়ে দে বুঝিয়ে দে—অমনি মা আমায় সব দেখিয়ে দিতেন—আমি জানতাম না বেদ গীতা পুরাণে কী আছে—মা আমায় সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্ত হলে হবে কি, মামাবাবু, বাবা মাকে আমি বড্ড ভালোবাসতাম—বিশেষ ক'রে বাবাকে। তিনি ক্রমাগতই বলতে লাগলেন বিয়ে না করলে তিনি মনে শান্তি পাবেন না—তাছাড়া বিয়ে না করা মানে কী? সন্ন্যাসিনী হওয়া তো। বাবা বললেন যেদিন আমি সন্ন্যাসিনী হব সেদিন তিনি আত্মহত্যা করবেনই করবেন। এই সময়ে গৌহাটিতে অরুণ সান্যাল এলেন ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে। এই প্রথম একটি যুবক দেখলাম যে, আমার দিকে ঝুঁকেও কাঙালপনা করল না। একবারও ও পীড়াপীড়ি করে নি আমাকে। কি জানি কেন, মানুষটিকে আমার ভালো লেগে গেল। ওকে আমি বললাম কাল রাতে আমার ঠাকুরের কথা। ও বলল আমার ধর্ম আমারই, ও এবিষয়ে কোনো কথাই কইবে না। তবে একথা বলল সঙ্গে সঙ্গে যে, প্রথম দিন থেকেই আমাকে ও ভালোবেসেছে ও কামনা করেছে। তাই যদি আমি ওকে একটা ট্রায়াল দিই তবে হয়ত আমাকে খুব পস্তাতে না হ'তেও পারে। ব'লে একটু হাসল। আমি ওর টোনে একটু আঘাত পেলেও বুঝলাম ওর ব্যথা আমার ব্যথা দিয়ে। তাই শেষ রাতে ওকে বললাম, আমাকে একটু সময় দাও। তখন ও বলল যে, আমার বাবার একটি চিঠি ওর কাছে আছে। তিনি ওকে লিখেছিলেন যে, যদি তিনি হঠাৎ মারা যান, যেন অরুণ আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। অরুণ তাঁকে কথা দেয়। এ চিঠিটি পড়তে পড়তে আমি কান্না [illegible] পড়লাম। যে-বাবা আমাকে এত ভালোবাসতেন তাঁর অন্তিম ইচ্ছার মর্যাদা আমাকে রাখতেই হবে—আমি করব বিবাহ।"

"কলকাতায় ওর কাকার ওখানেই বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়ের পর অরুণ ওকে নিয়ে গেল শিলঙে। সেখান থেকে ওর খবর অনেকদিন পাই নি। হঠাৎ বছর পাঁচেক বাদে ওর এক চিঠি। লিখল ওর একটি ছেলে হয়েছে, তার বয়স এখন চার বছর, কিন্তু ওর জন্মের পর থেকেই সতী বুঝতে পেরেছিল যে, বিবাহিত জীবনযাপন করা ওর পক্ষে অসম্ভব। ও লিখল বিয়ে বলতে কী বোঝায় ও সত্যিই জানত না। কিন্তু জানার সঙ্গে সঙ্গেই ও টের পেয়েছে যে এ-পথ ওর জন্যে নয়। অথচ কী করবে, কোথায় যাবে ও—জিজ্ঞাসা করল চিঠির শেষে। সব শেষে এক পুনশ্চ দিয়ে লিখল : 'সব কথাই তোমাকে খুলে লিখলাম মামাবাবু—না লিখে পারলাম না ব'লে। আমি আজ বড়ই বিপন্ন, অথচ কেউ নেই আমাকে পথ দেখাতে। সংকটও বিষম। আমার স্বামী সত্যিই ভদ্র ও দরদী, আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তাঁকেও আমি ভালোবাসি—তবে যেভাবে তিনি চান, সেভাবে নয়। সবার উপর এই যে এল শিশু, এর জন্যে তো আমি দায়ী। অথচ সংসারে আমি টিঁকতে পারছি না—কেবলই কানে বাজে আজকাল তোমার একটা গান :

তুমি আপনার হ'তে হও আপনার
যার কেহ নাই তুমি আছ তার...

এ অবস্থায় তুমি যদি আমাকে পথের নির্দেশ না দাও, আর কে দেবে বলো?"

অসিত বলল : "ও বিপন্ন হয়ে আমার কাছে উপদেশ চাওয়াতে আমি হ'য়ে পড়লাম যেন আরো বিপন্ন। সব কথা বলব না—শুধু এইটুকু বলি যে, ঠিক সে সময়ে আমিও পড়েছি এমনি উভয় সংকটে। গুরুদেবকে দুমেলে দেখে এসেছি, কিন্তু দুমেলের যোগাশ্রমে তিন চারশো শিষ্যের ভিড়ের মধ্যে পড়তে মন নারাজ। অথচ

গানেও পাই না শান্তি। এখানে ওখানে নানান্ সাধুর দেখা পাই—তাঁদের মুখে শুনি একই কথা—যে ভগবানকে পেতে হ'লে সব ছাড়তে হবে, দুনৌকায় পা দিয়ে চললে মুক্তি নৈব নৈব চ। ভেবেচিন্তে ওর প্রশ্ন খানিকটা এড়িয়েই ওকে লিখলাম যে, যে নিজেই পথ খুঁজছে সে আর একজনের পথের নির্দেশ দিতে পারে না। তাছাড়া বিবাহ ও শিশুর দায়িত্ব যে ঠিক কী বস্তু আমি কল্পনায় কিছু জানলেও সে-জানার উপর ভর ক'রে অপরের দিশারি হবার দায়িত্ব নিতে ভরসা পাই না। উত্তরে ফের এল এক মস্ত চিঠি। আমি তখন কাশীতে শ্যামঠাকুরের কাছে। ও লিখল আগাগোড়া শুধুই বিগ্রহের কথা। লিখল—যতই দিন যাচ্ছে এই বিগ্রহ ওকে টানছে। অথচ এ-টান কিসের ও বোঝে না, কেন বিগ্রহকে এমন ভালোবাসল তারও কোনো তল পায় না। সবচেয়ে মুশকিল এই যে, ওর কেবলই মনে হয় যে, এই পাষাণবিগ্রহ কিছু সর্বব্যাপী সর্বান্তর্যামী ভগবান্ নয়। তবে? উপায় কি? শেষটায় সে তো চিঠি নয়—কান্না—'তোমার কী মনে হয় আমাকে বলতেই হবে মামাবাবু! তুমি এভাবে সরে দাঁড়ালে আমি কার কাছে যাব বলো? আমার আর কে আছে যে ব্যথা দিয়ে আমার ব্যথা বুঝবে? আর যদি গুরু করা ছাড়া পথ না-ই থাকে, তবে কোথায় আমার গুরু মিলবে এটুকু অন্তত তোমাকে ব'লে দিতেই হবে।'

"শেষটায় ভেবেচিন্তে শ্যামঠাকুরকে সব কথা ব'লে দেখালাম এ-চিঠি। তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠল, তিনি বললেন : 'আমি কী বলব ভাই? কী জানি আমি? এ হ'ল বড় ঘরের শিক্ষিতা মেয়ের কথা—তাদের মনের রঙ-ঢঙ, মতি-গতি আমার অজানা। আমি শুধু জানি যে গুরু ইষ্ট-দেবের প্রতিনিধি হ'য়েই দেখা দেন—কেবল সময় হ'লে তবে। তাই শুধু এইটুকুই বলতে পারি নির্ভয়ে যে, ও যদি ওর ইষ্টকে ডাকার মতন ডাকতে পারে তবে তিনি গুরু মিলিয়ে দেবেনই দেবেন—মানে যদি গুরুবাদের পথ ওর স্বধর্ম হয়। কারণ গুরুদেবের শ্রীমুখে এও শুনেছি যে, সবাইকে ঠাকুর এক ছাঁচে ঢালাই করেন না, কেউ ইষ্টকে পায় গুরুর মাধ্যমে, কেউ বা সোজাসুজি। তবে একথা বলতে পারি ভাই—কারণ এ আমি ঠেকে শিখেছি যে, এই যে মনের বিমুখতা এ কিছু নয়। মানে আলোর বান ডাকতে না ডাকতে এ সব যুক্তিতর্কের জঞ্জাল যায় ভেসে। আমার স্পষ্ট মনে আছে প্রথম যেদিন গুরু-দেবের মুখে শুনলাম যে, আকাশবৃত্তি যে-সাধক নিয়েছে তার পক্ষে সঞ্চয় সাবধানতা বিধর্ম। শুনে ভাবো একবার, আনন্দ-গিরির মতন গুরুর কথায়ও মন আমার শিরপা তুলেছিল। হয়েছিল কি, আমি আকাশবৃত্তি নেওয়ার পরেও আমার স্ত্রী ও মেয়ের জন্যে দশ হাজার টাকার যে-একটা বীমা করেছিলাম তার টাকা পাঠাতাম মাস মাস। গুরুদেব বললেন এ হ'ল ভাবের ঘরে চুরি—পলিসির টাকা পাঠানো বন্ধ করতেই হবে। আমি মুখে কিছু বললাম না বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম—এ জুলুম, জবরদস্তি। গুরুদেব হেসে বললেন : একটা গল্প শোনো বাবা। এক যে ছিলেন মেমসাহেব। সবাই বলত : আহা হা, কী ভক্তিরে, কী বিশ্বাস! গির্জায় গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করে! মেমসাহেবের ছিল এক আট বছরের ছেলে। একদিন আকাশে খুব মেঘ করেছে ব'লে ছেলে বলল : আজ গির্জায় যাব না মা। মা বললেন হেসে : বিষ্টির ভয় করছিস? ওরে, আমি যে প্রার্থনা করেছি এইমাত্র—যেন ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে বিষ্টি না আসে। ঈশ্বর শুনেছেন সে প্রার্থনা—বিষ্টি আজ হবে না দেখিস যতক্ষণ না আমরা গির্জা থেকে ঘরে ফিরি। ছেলে বলল : তবে তোমার হাতে ছাতা কেন মা?' বলে হা হা করে হেসেঃ 'তখন আমার চৈতন্য হ'ল, গুরুদেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাক কান মলে তবে আপৎশান্তি। তাই বলছিলাম যে, আমাদের অজ্ঞান মনের গড়নই এমনি—সে ভাবে আজ যা ভাবছি ও যেভাবে ভাবছি তার আর মার নেই। কিন্তু যখন ঘরছাড়া বাঁশি ডাকে রে ভাই, তখন কী যে ওলটপালট হ'য়ে যায় চক্ষের নিমেষে!' বলে মাচকে হেসে : 'মনে পড়ে গ্রামে সে কী তোলপাড় যখন আমি বীমার টাকা পাঠানো বন্ধ করলাম—সবশুদ্ধ হাজার দুই টাকা পাঠানোর পরে। গ্রামের মোড়লরা হাঁ-হাঁ ক'রে এসে পড়লেন : করলে কী শ্যামলাল! এক বাড়ো শালিকের পাল্লায় পড়ে কি না দু হাজার টাকা খোয়ালে! কিন্তু এঁদের কী বলে বোঝাবে বলো যারা কল্পনাও করতে পারে না সাধক ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবের দিকে উধাও হয় কিসের টানে, কেন? মীরা-বাঈয়ের সেই যে গানটা, মনে নেই—ঘায়েলকী গতি ঘায়েল জানে ঔর না জানে কোই?'

"আমি সতীকে এসব কথাই লিখে দিলাম, শেষে পুনশ্চে জুড়ে দিলাম যে বাইরের লোকের উপদেশ বেশি না নেওয়াই ভালো—মহাভারতে বলেছে 'কালেন সর্বং বিহিতং বিধাত্রা'—বিধাতার বিধান ফলে সময় হলে তবেই। ঘোলা জলকে থিতিয়ে যেতে দিলে অনেক সময়েই সে তার স্বচ্ছতা ফিরে পায়।

"উত্তরে ও খানিকটা শান্ত হয়ে লিখল যে, ওর মন একথা নিয়েছে, আর ওর স্বামীর সঙ্গে খুব খোলাখুলি কথা হয়ে শেষে এই স্থির হয়েছে যে, এক বৎসর ও কোথাও গিয়ে একলা থাকবে—শুধু বিগ্রহ নিয়ে। ওর স্বামী অগত্যা সম্মতি দিয়েছেন, কেবল অনুরোধ করছেন যে, তাঁর ভাগিনীপতি, মা ও বোনের সঙ্গে রাওলপিণ্ডিতে গিয়ে থাকতে। এ এক বৎসর আমাকে কেউ বিরক্ত করবে না—এমন কি শিশু রজত থাকবে বাপের কাছেই—শিলঙে। সবশেষে ও লিখল : 'কিন্তু মামাবাবু, এক দিকে আমার শাশুড়ি-ননদ ঘোর সংসারী, অন্যদিকে আমার ডাক্তার নন্দাই ঘোর মডার্ন সায়েন্টিফিক মেটিরিয়ালিজম্ ছাড়া কিছুই মানেন না। কাজেই এঁদের সঙ্গে ঘর করতে হবে—ভাবতেও আমার বুক কেঁপে না উঠুক মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ-ছাড়া উপায়ই বা কী? আমার কাকা ও কাকিমার অবস্থাও যে তথৈবচ। অবিশ্যি হয়ত এ মন্দের ভালো যে, আমার কাকিমা গুরুবাদে বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি মামাবাবু, এঁরা—সবাই হয়ত নয়, কিন্তু বেশির ভাগ গুরুবাদীই—গুরু গুরু করে গদগদ হয়ে উঠলেও ভগবানের জন্যে গুরু এতটুকু ছাড়তে বললেই ডরিয়ে ওঠেন। কিন্তু যখন সংসারের দিকে চেয়ে দেখি তখন কি দেখতে পাই ত্যাগ না করে কেউ পাওয়ার মতন কিছু পেয়েছে? অথচ কাকিমার মতন উচ্ছ্বাসিনীরা—(বোধ হয় মেয়েদের মধ্যেই এঁদের দেখা বেশি মেলে, না?)—ভাবেন যে, সংসারকে প্রাণপণে আঁকড়ে থেকে শুধু গুরু গুরু করে গলদশ্রু হ'য়ে উঠলেই ভগবান সরাসর এসে দাঁড়াবেন—এই যে, এসেছি বৎসে।

"অবশ্য গুরুর মতন গুরু পেলে হয়ত অসম্ভবও সম্ভব হ'তে পারে—বলতে পারি না। কিন্তু সেদিকেও অথৈ জল। কোথায় তেমন গুরু। আমি পরচর্চা করতে ভালোবাসি না—তুমি জানো, কিন্তু শুধু মনের দুঃখ তোমাকে জানাতে চাই ব'লেই বলছি—কাকিমার এই গুরুদেবটি একদিন আমাকে কী বলেছিলেন শুনবে! তখন আমি কলকাতায়। কাকিমা হঠাৎ আমাকে এসে বললেন : তোর কী ভাগ্যি রে! গুরুদেব বলেছেন তুই বড় সুলক্ষণা মেয়ে, তোকে ডাকছেন আশীর্বাদ করতে। কী করি? গেলুম। তিনি আমাকে তাঁর নানান যোগবিভূতির কথা ব'লে শেষে

বললেন যে, তিনি ধ্যানে দেখেছেন আমি তাঁর শিষ্যা—তা আবার শুধু এ জন্মের নয় জন্মজন্মের—সোজা কথা নয়! আমি স্রেফ বলে দিলাম মুখের উপর যে তিনি দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু আমি যতক্ষণ না দেখছি ততক্ষণ কারুর শিষ্যা হ'তে পারব না। তিনি করুণার হাসি হেসে বললেন ঃ অন্ধ অজ্ঞানরা কি কিছু দেখতে পায় মা, যতক্ষণ না জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে গুরু তাদের চোখ ফুটিয়ে দেন? ব'লে গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ—জাতীয় একগংগা গালভরা সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে আমি ক্ষমা না চাইতেই আমাকে ক্ষমা করে ফেলে বললেন ঃ ত্রিকালদর্শী মুনিঋষিরা কি সাধে বলেছিলেন মা, যে গুরু বিনা ভগবান মিলতেই পারে না? আমি বললাম ঃ কেন? রমণ মহর্ষি? শুনে তিনি একটু হকচকিয়ে গেলেন, বললেন ঃ এখন থাক এসব আলোচনা, তুমি বুঝবে না—তোমার এখনো সময় হয়নি—দুঃখের আগুনে প'ড়ে চিত্ত-শুদ্ধি হলে তখন বুঝবে যেমন বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন রামকৃষ্ণকে। আমি পিঠ পিঠ উত্তর দিলাম ঃ গুরু কী বস্তু না বুঝতে পারি, কিন্তু এটুকু বুঝেছি ছেলেবেলায়ই যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ছিলেন মহাপুরুষ—যাঁদের কুড়ি হাজার বছরেও দু-একটির বেশি মেলে কি না সন্দেহ। হেসে মরি, মামাবাবু! কার সংগে কার তুলনা! যেন গুরুবাদের ময়ূরপুচ্ছ পরতে না পরতে দাঁড়কাক গুরু রামকৃষ্ণ ময়ূর বনে যায়! না মামাবাবু, গুরুবাদের ভড়ং ঢের শুনেছি—ক্ষ্যামা দাও। কিন্তু ঐ দেখ, কী ধান ভানতে শিবের গীত এসে গেল! বলছিলাম কি, ভেবেচিন্তে শেষটায় স্থির করলাম—বরং আমার শাশুড়ি, ননদ, নন্দাই-এর সংগেই থাকব—কেননা, কাকা-কাকিমার সংগে থাকলে এই গুরুটি গায়ে প'ড়ে এসে নানা ছাঁদে নিজের মহিমা প্রচার করবেন আর আমার মুখ বুজে শুনতেই হবে। কাজ কি ঝামেলায়? তাই আমার শাশুড়ি-ননন্দকে উনি লিখে দিলেন যে আমি সেখানে নিজের ব্যবস্থায়ই থাকব—আমার সংগে যাবে আমার চাকর, দাসী ও আমার মোটর ড্রাইভার। মোটর নিয়ে যাচ্ছি—কেননা, ইচ্ছা আছে একবার রাওলপিণ্ডি থেকে দুমেল গিয়ে স্বামী স্বয়মানন্দকে দর্শন করে আসব। কে জানে তাঁকে দেখলে হয়ত আমার গুরুবাদে অশ্রদ্ধা কাটবে। হ্যাঁ—বলি কি, তুমিও এসো না মামাবাবু, তোমার সংগেই যাই দুমেল। সত্যি, তোমার গান শুনতে কী যে ইচ্ছে করে! কতদিন তোমার গান শুনিনি বলো তো—দু বছর হ'তে চলল। তুমি রাওলপিণ্ডিতে আমার অতিথি হয়েই থাকবে—ও'রা কিছু বলবেন না, শুধু আমার স্বামীর মত আছে ব'লেই নয়, আমার একটা মস্ত সুবিধে আছে এই যে, আমার শাশুড়ি, ননদ, নন্দাই সবাই টাকাকে বড় খাতির করেন। আমি বড় মানুষের শিক্ষিতা মেয়ে, নিজের নামে ব্যাংকে টাকা রাখি—এতেই ও'রা ভড়কে গেছেন। আমার শাশুড়ি আমাকে সেদিন লিখেছেন যে, আমি রাওলপিণ্ডিতে যেভাবেই কেননা থাকতে চাই ও'রা কথাটি কইবেন না। এ ছাড়া আরো একটা ভরসার কথা এই যে, যোগাযোগটা ঘটেছে ভালো। হয়েছে কি, ও'রা চান আমি স্বামীর কাছে ফিরে যাই। আমার স্বামীও ও'দের সেদিন লিখে দিয়েছেন যেন ও'রা কেউ আমার সংগে আজে-বাজে তর্কাতর্কি না করেন—কেননা, আমি রোখালো মেয়ে, জোর ক'রে বা ভয় দেখিয়ে কেউ আমাকে দিয়ে কিছু করিয়ে বা বলিয়ে নিতে পারবে না। তাই তোমাকে ডাকছি—এসো অকুতোভয়ে।'

"দুমেল যাবার প্রসংগে আমার মন উঠল উজিয়ে। হয়ত এইভাবেই আমার বন্ধন কাটবে—আমি আশ্রমবাসী হবার সাহস পাব। ওকে আমি লিখলাম কাশী থেকে যে যদি ও রাওলপিণ্ডি যায়, তবে সেখানে একটু সুস্থির হয়ে বসে সব কথা খুলে আমাকে যেন জানায়—আমার অনেক দিন থেকে আর একবার দুমেল যাওয়ার ইচ্ছা আছে—ওর মোটরে বেশ আরামেই যাওয়া যাবে।

"এর উত্তর আসতে দেরি হ'ল। মাসখানেক পরে এল সতীর চিঠি কাশী ঘুরে। আমি তখন দিল্লীতে আমার এক মাসিমার ওখানে। এবার ছোট চিঠি। ও আমাকে ভরসা দিয়ে লিখল যে, রাওলপিণ্ডিতে ও বাংলোর এক ধারে থাকে—দু' তিনটে ঘর—একটা বিগ্রহের, একটা শোবার, একটা বসবার। ও বিগ্রহের ঘরেই শোয়। কাজেই একটা শোবার ঘর খালি আছে। আমি যেন পত্রপাঠ চ'লে আসি। উত্তরে ওকে আমার দিল্লীর ঠিকানা দিয়ে লিখলাম যে, আমি এখন দিল্লীতে, স্থির করেছি রাওলপিণ্ডি যাব। তবে বৃন্দাবন এত কাছে একবার অমলের সংগে কিছুদিন কাটিয়ে যেতে চাই। ওকে আমার বৃন্দাবনের ঠিকানা দিলাম—মানে, অমলের ঠিকানা।"

* * *

অসিত বলল ঃ "তিন বৎসর বাদে অমলের সংগে দেখা। ও পায়ের ধুলো নিতে এগিয়ে আসে। আমি ব্যস্ত হয়ে পেছিয়ে গিয়ে বললাম ঃ 'কী করো, কী করো? বয়সে ছোট হ'লে কী হয়—তুমি যে ভাই অনেক এগিয়ে গেছ।' ও হাসল, সে-হাসির মধ্যে যেন একটু বিষাদের ছোঁওয়া লেগে। বলল ঃ 'দাদা, সূর্যি-মামা থেকে ঢিবিটা যত দূরে গৌরীশংকর কি তার চেয়ে কাছে বলেন আপনি? তাই অমন কথা ব'লে আর লজ্জা দেবেন না।' আমি ওকে জড়িয়ে ধ'রে বললাম ঃ 'কেন মিথ্যে ধোকা দিচ্ছ ভাই, মুখে তোমার আলোর আভা—' ও বাধা দিয়ে বলল ঃ 'তাঁর কৃপার একটু ছিটেফোঁটা মিলেছে মানি, কিন্তু দাদা বলব সত্যি কথা?'

'কী?'

'দাদা! ঠাকুরের কৃপা পাওয়া সহজ, কিন্তু রাখা ভার। তিনি আমাকে আর দেখা দেন না।'

'সে কি! একেবারে অদৃশ্য?'

'না—অতটা নয়—আসেন কখনো কখনো স্বপ্নে—তবে—' বলতে বলতে ওর গলা ধ'রে এল।

'কী ব্যাপার অমল?'

'না, এমন কিছু নয়। তবে এখনো পথ অনেক বাকি দাদা, অভিমানের লেশ থাকলেও তো চলবে না। আমাকে পেয়ে বসেছিল এক বিচিত্র অভিমান—আমি তাঁর কৃপা পেয়েছি। অমনি তিনি অন্তর্ধান। জানেনই তো তাঁর মামুলি রীতি, গোপীদের কী হালটা করেছিলেন। আপনিই তো গান সেই মীরা ভজন ঃ চরণোঁমে পড়ী মৈ রোয়া করু, তুম শান্ত খড়ে মুসকায়া করো। আমরা কেঁদে মরি—তিনি হেসে কুটি কুটি'।

"তারপর বলল ও কত কথাই যে। শুনতে শুনতে চমকে উঠলাম বৈ কি! সাধে কি বলেছিলেন ঋষি—দুর্গম এ পথ ক্ষুরধারের মতন সংকীর্ণ! সে-সব বলবার সময় নেই—তবে ও যা বলল তার মোট কথাটা এই যে, ভগবানকে প্রতিমায় দেখা সাধনার শেষ নয়—মাত্র আরম্ভ। তাঁকে দেখতে হবে সর্বভূতে—'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। সেই বিশ্বাতীতকে যতক্ষণ না দেখছি কীট পতংগ থেকে মুনিঋষির মধ্যে ততক্ষণ ফিরে ফিরে জন্মাতে হবে। কিন্তু সে যাক্।

"ওকে বললাম সতীর কথা। শুনতে শুনতে ও কেবলই চোখ মোছে, বলে ঃ 'আচ্ছা দাদা! যান ওর কাছে ছুটে। ওকে বলুন—ভয় নেই। বলুন, যে একবার তাঁকে ভালোবাসতে পেরেছে—তার ভার তিনি না নিয়েই পারেন না।'

"আমি বললামঃ 'তা বটে অমল! কিন্তু ও যে গুরুকরণের নামেই হ'য়ে ওঠে উত্তপ্ত—গুরু নৈলে পথ দেখাবে কে?' অমল হাসলঃ 'ঠাকুর কাকে যে কোন্ পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে যান কেউ কি জানে দাদা? ও থাকুক না ওর স্বভাবে। কে বলতে পারে—ঠাকুর হয়ত ওকে বদ-গুরুর ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করতে চাইছেন ব'লেই ওর মনে বেঁধে দিয়েছেন গুরু-বিমুখতার রক্ষাকবচ? কারণ এ তো আপনি ভালো ক'রেই জানেন দাদা যে, ওর কথার মধ্যে অনেকখানিই সত্যি—ধরুন, এমন রূপবতী ধনবতী শিষ্যা না চাইবে কোন্ বদ্গুরু? লুফে নেবে তারা।' ব'লে একটু হেসে ঈষৎ সান্ত্বনার সুরে বলেঃ 'ওর কথায় তাই আপনি কিছু মনে করবেন না দাদা। গীতার কথা মনে নেই—যাকে আমরা দেখি আঁধার নিশা সেই নিশাই হ'ল জ্ঞানীর কাছে ধ্যানের উষা, আর যাকে আমরা বলি পুঁথিপড়া বইয়ের জ্ঞানালোক তত্ত্ববিদ্‌রা তাকে জানেন অজ্ঞানের অন্ধকার। নারদ যে নারদ তিনিও গুরু সনৎকুমারের কাছে এসে হায় হায় করেন নি কি যে, বহুশাস্ত্রবিৎ হ'য়েও তিনি র'য়ে গেলেন শুধু মন্ত্রবিৎ—আত্মবিৎ হতে পারেন নি? তাই আপনি সোজা যান ওর কাছে। আপনাকে ওর এখন সত্যিই দরকার।'

'যাব তো ভাবছি—কেবল—'

'না না, কেবল টেবল ছাড়ুন দাদা। ওর সরল শুদ্ধ মন ঠিকই ধরেছে যে, এখন ওর মন যে আলোর তৃষ্ণায় ব্যাকুল সে-আলো ও পাবে আপনার গানে।' ব'লে একটু হেসেঃ 'এমনি ক'রেই তো আমরা লক্ষ্যমুখে চলি দাদা, হাজারো পথে বিপথে রকমারি পাথেয় কুড়োতে কুড়োতে। তাছাড়া দাদা, সবই তো জানেন—আপনাকে আমি কী আর বলব বলুন? ধরুন না কেন, শ্যামঠাকুর গুরু পেলেন না চাইতে, আমি পেলাম স্বপ্নে—সতী হয়ত পাবে আর কোনো পথে।' ব'লে মুচকে হেসেঃ 'আমাদের বাঁকা ঠাকুরটির যে সবই ত্যাড়া দাদা! তাই না অমন যে অর্জুন—তিনিও কিনা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেনঃ আর উল্টোপাল্টা কথার পাঠ দিয়ে আমার বুদ্ধি ঘুলিয়ে দিও না ঠাকুর—বলো সোজাসুজি যা করলে ভালো হয়।'

"এসব কথা শুনে একটু ভরসা পেলাম। ঠিক করলাম যাব। লিখে দিলাম ওকে সেই মর্মে—অমলের কথা আগাগোড়া উদ্ধৃত করে। এর উত্তরে এল এক মস্ত চিঠি। অমলকে দেখালাম, বললামঃ ভাই তোমার মন ভগবান্—ঠিকই এঁচেছিলে। বেচারি মেয়ে বড়ই ব্যাকুল হয়েছে। না গিয়ে আর উপায় নেই এখন।'

"ও প্রথমে লিখেছিল ওর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা—কীভাবে ওর দিন কাটছে বিগ্রহকে নিয়ে। তার পরই কান্নার পালা। লিখলঃ 'তুমি অমলদার কাছে আনন্দে আছ নিশ্চয়ই—কিন্তু আমি যে আর সইতে পারছি নে মামাবাবু! আমার নন্দাই মন্দ লোক নন, কিন্তু আমার শাশুড়ি ননদ মুখভার করে থাকেন অষ্টপ্রহর। যতই কেন না বলি নিজের মতন থাকব—যাদের সঙ্গে ঘর করতে হয় তাদের সঙ্গে একদম বনিবনাও না হ'লে দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসে। কিন্তু এ-ও গৌণ। আমি সবচেয়ে বিপদে পড়েছি আমার একগুঁয়ে স্বভাবকে নিয়ে। নৈলে কি ঠাকুরকে ঠাকুর ব'লে মেনেও তাঁকে লক্ষ্য ক'রে এমন তাল ঠুকি? বলি—ঠাকুর, তোমার বিগ্রহকে ভালোবেসে ফেলেছি কেন জানি না, কিন্তু যতদিন না তার মধ্যে তোমাকে চাক্ষুষ করছি ততদিন মানব না যে তুমি শরণ দিতে চাও। মানব কেবল সেই দিনে—যদিও জানি না সেদিন আমার কখনো আসবে কি না—যেদিন তুমি সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলবে হাসিমুখে শুধু মমৈব ত্বং নয় তবৈবাহম্। সত্যি মামাবাবু, আমি যে এই দুই ভাবেই তাঁকে না চেয়ে পারি না—তুমিও আমার, আমিও তোমার। কিন্তু হ'লে হবে কি, তোমার চিঠিতে অমলদার মতন ভাগ্যবান্ ভক্তের আশ্বাস পেয়েও যে আমার মনের কালি একটুও ফিকে হ'তে চায় না, তার কী? সময়ে সময়ে মন অভিমানে কালো হ'য়ে আসে—বলি ঠাকুরকে উদ্দেশ ক'রেঃ 'যদি স্বাধীন বুদ্ধির অভিমান ছাড়তেই হবে ঠাকুর, তবে এমন মনের গড়ন আমাকে দিলে কেন যে অন্ধভাবে কিছুই মেনে নিতে পারে না? তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয়—যে-কথা অমলদা বলেছে—যে, আমার এ-সবই এখনকার আঁধার মনের কথা, আলোর বাণী যার রপ্ত হয় নি। তাই না এত শত মায়াযুক্তি আসে। কিন্তু মামাবাবু আমরা কি এসব যুক্তির মায়া, মোহেন টান কাটাতে পারি—যদি ঠাকুর না শক্তি দেন? এই দেখ না কেন, শিলঙে তো আমি ভেবেছিলাম যে, স্বামীপুত্র আমার কেউ নয়? কিন্তু এখানে এসে অবধি ওদের জন্যে প্রাণ কাঁদে। মামাবাবু, স্বামী আমাকে যে-ভাবে চান সেভাবে আমি আর সাড়া দিতে না পারলেও তাঁকে আমি শুধু যে শ্রদ্ধা করি তাই নয়—ভালোও বাসি। তাই কেবলই মনে হয়—কেন তাঁকে বিয়ে করতে গেলাম, কেন কষ্ট দিচ্ছি তাঁকে এমন ক'রে? সবচেয়ে কষ্ট হয় ভাবতে রজতের কথা। সে এখন শিশু, কিছুই জানে না। কিন্তু যখন বড় হবে—কী ভাববে তার মাকে যে তার প্রতি কর্তব্য না ক'রেই চ'লে গেল—কুন্তীকে কর্ণ যে-ভর্ৎসনা করেছিলেন মনে পড়ে আর ভয় ভয় করে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সুবুদ্ধির হাজারো যুক্তিঃ সংসার তো আর সত্যি মায়া নয়, দায়িত্ব তো নয় কল্পনাবিলাস। তাছাড়া, এক দুর্ভাবনা ছায়ার মতন পিছু নেয়, ছেড়েও ছাড়ে না—সংসার ছেড়ে যাব কোন্ চুলোয়? গুহাগহ্বরে বনে জঙ্গলে বাস—এ কি সত্যি ভাবা যায়—বিশেষ মেয়েদের পক্ষে—তুমিই বলো? অথচ তবু কেন ভালো লাগে না এ-সংসার? কেন নিরন্তর মনের মধ্যে ডাক শুনি—চ'লে আয়, চ'লে আয়, চ'লে আয়? তোমার গাওয়া সেই মহাসিন্ধুর গানটি মনে পড়েঃ

কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে?
ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে?
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে
পূর্ণইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে
আয় চ'লে আয় আমার পাশে।

কিন্তু সুধাসিন্ধু থেকে ছেঁকে তুলে এই ভূতের বেগার খাটার কাজে জুড়ে দিলেনই বা কিনি মামাবাবু? কেনই বা এত শত মমতা স্নেহ দায়িত্বের বন্ধন আমাদের আষ্টে পিষ্ঠে বাঁধলো, আর যাকে বলছি ভূতের বোঝা তাকে সাধ ক'রে বই-ই বা কেন ব'লো তো? পড়ি কেন দোটানায়ঃ মন বলে—এ কর্তব্য, প্রাণ বলে—সব ছাই, ছাই, ছাই! আমি কি একটা সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত কিছু মামাবাবু? সব থেকেও যে আজ আমার কিছুই নেই! কেন এমন হ'ল? স্বামী সংসার অর্থ গৃহসুখ—সবই তো আছে আমার—তবু কেন পারি না স্বামীর ঘর করতে? কেন ছেড়ে এলাম কোলের শিশুকে যার মুখ রোজ স্বপ্নে দেখি—কানে শুনি তার আধ আধ মা মা ডাক? এ কী লীলা ঠাকুরের—আমি তো বুঝি না—তুমি কি পারো বুঝিয়ে দিতে? কেউ কি পারে? আমি যে পথ দেখতে পাই না অন্ধকারে—কে আমাকে ব'লে দেবে? মাঝে মাঝে মন বিষাদে ছেয়ে যায়, ডাকি—ঠাকুর, ভালো যদি বাসলে, দূরে থেকে আর ছলনা কোরো না ললনাকে। গোপীদের করেছিলে সে এক—তাদের শক্তি ছিল এক কথায় সব ছাড়বার। কিন্তু আমি যে দুর্বল, ঠাকুর! এইভাবে ডাকতে ডাকতে সময়ে সময়ে চোখের জলে বুক ভেসে যায় মামাবাবু—কিন্তু তার পরেই আসে লজ্জা। স্বামী আমার নাম দিয়েছেন শক্ত মেয়ে। কিন্তু এর নাম কি শক্ত—যে কথায় কথায় চোখের জল ফেলে? সবচেয়ে লজ্জা এই যে, শিলঙ থেকে রোখ করে চলে এসেছিলাম

পারবই পারব ব'লে। কিন্তু এখানে এসে কী জানি কেন যত দিন যাচ্ছে, যত শুনছি ডাক—আয় আয় আয় রে চ'লে—ততই পিছুটানের শক্তিই যেন উঠছে ফুলে—অথচ দেখতে পাই না কেন কোনো অবলম্বন যাকে আশ্রয় করতে পারি? শুধু শুনিঃ

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে
কী সংগীত ভেসে আসে!
কে ডাকে কাতর প্রাণে মধুর তানে—
আয় চ'লে আয় আমার কাছে?

ঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে কাঁদি—কিন্তু তারপরই মনে হয়—এ-কী দুর্বলতা! ঠাকুর যে চান সব ছাড়বার কঠিন অর্ঘ—সেণ্টিমেণ্টাল চোখের জলের তরল নৈবেদ্য তিনি গ্রহণ করবেন কেন?

"কিন্তু আমার সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে কী বলব? আমি স্বামী গৃহ ছেলে সব ছাড়তে পারি যদি রোখ চেপে যায়—কিন্তু বিশ্বাসকে ছাড়ি কেমন করে যে, যাকে সত্য বলে না জেনেছি তাকে আগে থাকতে মেনে নেব না পুরোপুরি—অন্তত তার কাছে আত্মসমর্পণ করব না কিছুতেই? তুমি বলতে প্রায়ই—কোনো অভিমানই ধ্রুবতারার দিশা দেয় না—কেন না অভিমানের ধর্ম মরীচিকার দিকেই টানা। কিন্তু এ-কথাই বা আগে থাকতে মেনে নেব কী ক'রে বলো দেখি? অথচ হার মানতে আমার কী যে ইচ্ছে করে মামাবাবু! সত্যি বলছি—সময়ে সময়ে মনে হয় ঠাকুর যদি আমার সব কেড়ে নেন তবেই আমি ধন্য হই—সব সব স—ব—শুধু সংসারবন্ধন টাকাকড়ি গৃহসুখ নয়—আমার বুদ্ধি বিচার অভিমান—সমস্ত। কেবল তাঁর পায়ে আমার অশান্ত হৃদয়কে ঠাঁই দিন—তোমার গাওয়া গান ফের মনে পড়েঃ

আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে বাহু দিয়ে
নেও মা ঘিরে
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি মা
তোমার ঐ বুকের মাঝে

কিন্তু এ-প্রার্থনা কার? না, যে বলতে পারে মনেপ্রাণে

আর কেন মা ডাকছ আমায়?
এই যে এইছি তোমার কাছে।

কিন্তু আমি তো বলতে পারি না—আমি সব ছেড়ে তোমার পায়ে এসেছি ঠাকুর, আমাকে গ্রহণ করো। আমি যে আগেই ঠাঁই পেতে চাই। বিশ্বাস করতে সত্যিই চাই, কিন্তু কিছুই না দেখে নয়—তিনি যে আমাকে ভালোবাসেন একথা কানে শুনে যে আমার মন ভরে না মামাবাবু, চোখে দেখতে চাই তাঁর হাতছানি, প্রাণে পেতে চাই তাঁর স্নেহস্পর্শ। তোমারি একটি গান ফের মনে পড়ে—আহা কী সব গানই তুমি বেঁধেছ, মামাবাবু—শুনতে শুনতে কতবারই চমকে চমকে উঠেছি—এ কী! এ যে আমারি প্রাণের কথাঃ

শুনেছি বন্ধু, কত না কথা তোমার,
শুনেছি কাহারে বলে প্রেম অভিসার,
শুনেছি যে—মায়া কূলের ভরসা বাণী,
অকূলেই শুধু হয় মন-জানাজানি

গেয়ে শেষ দুটি চরণ গাইতে গাইতে তুমি কতদিনই না চোখের জল ফেলেছ আমার চোখের জলের সংগতে মামাবাবু!—

আজিকে শ্রবণ-ক্লান্ত হৃদয় মম,
নয়নের বর কবে দিবে প্রিয়তম
সকল আশার অতীত করুণা দানে
আঁখিরে সূর্যমুখী করি' তব পানে?'

কেবল আমাদের মন যে কী মামাবাবু! না দেখে কিছুই মেনে নেব না একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে—শুধু শোনা কথার এজাহার মেনে অদেখাকে মঞ্জুর করব না এ-শপথ করার সঙ্গে সঙ্গে—কে যেন বলে যে আগে কানে-শোনার এজাহারকে যে মঞ্জুর করে সে-ই পারে চোখে-দেখার কোঠায় উত্তীর্ণ হ'তে। কিন্তু কেমন ক'রে হয় এ অসম্ভব সম্ভব? ধরো না আমারি কথা—কোত্থেকে এক বিগ্রহ অনাথের মতনই এসে পড়ল আমার কোলে কোন্ এক ভূমিকম্পের পর —আর দেখতে দেখতে সে হয়ে উঠল আমার এত আপন? আপন অথচ নিষ্প্রাণ! এ দুইয়ের সংগতি কোথায় বলবে? অমলদা ধন্য—যে তার কাছে বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল দেখতে দেখতে—কিন্তু আমি একদিকে যেমন এ-বিগ্রহকে ভালোবেসেছি, অন্যদিকে একথাও তো অস্বীকার করতে পারি নি যে এ-বিগ্রহের মধ্যে ঠাকুরকে একটিবারও দেখি নি আজ অবধি? অথচ তবু এ কি অদ্ভুত নয় যে, চোখ যাকে অস্বীকার করছে পাষাণ ব'লে—মন তাকেই বরণ করল প্রিয়তম ব'লে? কেননা আর সবই আমার ভুল ধারণা হ'তে পারে, কেবল এখানে আমার কোনো ভুল কি আত্মবঞ্চনা নেই যে, আমি এ-বিগ্রহকে যেভাবে প্রাণ ঢেলে ভালোবেসেছি — সেভাবে জীবনে কাউকেই ভালোবাসি নি, আমার স্বামীকেও নয়, রজতকেও নয়, বাবা-মাকেও নয়—এমন কি তুমি যে তুমি—যে গুরু না হয়েও আমাকে সবপ্রথম চক্ষুদান করেছিলে সে তুমিও নও। তোমার গীতায় আছে একটি লাখ কথার এক কথা যে, সেই অচিন মানুষটিকে কেউ হয় দেখে আশ্চর্য, কেউ বা তার কথা বলতে হয় আশ্চর্য, কেউ বা শুনে আশ্চর্য—কিন্তু থতিয়ে, হায় রে হায়, হাজার দেখেশুনেও কেউ জানে না তার স্বরূপ। অথচ আমার মতন একটা নগণ্যের এ কী স্পর্ধা বলো তো—যে যাঁকে কেউ জানতে পারে না, তাঁকে আমি চাই শুধু কাছে পেতে না—বাজিয়ে নিতে? না মামাবাবু, যতই দিন যাচ্ছে, আমার মনে দীর্ঘনিশ্বাস উঠছে ঘনিয়ে যে, এরকম মনের গড়ন যাদের—ঠাকুর তাদের ছায়াও মাড়াবেন না। কী জানি কী আছে আমার অদৃষ্টে। আমি সামনে কী একটা যেন বিপদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি—অথচ তার হদিশ পেতে না পেতে সে যায় মিলিয়ে।

অসিত বলল: "হঠাৎ চিঠি এখানে শেষ—ও নাম সই করতেও ভুলে গিয়েছিল। 'বিপদের ছায়া', প'ড়েই আমি ভয় পেয়ে গেলাম—কে জানে ঝোঁকালো মেয়ে কী ক'রে বসে! অমলকে এ-চিঠি দেখালাম। সে বললঃ 'তুমি এক্ষনি যাও দাদা, আর দেরি কোরো না। ওকে নিয়ে সোজা পাড়ি দাও দুমেল আশ্রমে। হয়ত স্বয়মানন্দ স্বামীর কাছ থেকেই ও পাবে সেই আলোর আলো যার জন্যে ওর হৃদয় মাথা কুটছে ঠাকুরের পায়ে—কে বলতে পারে?'

"কথাটা আমার মনে লাগল। ভাবলাম—আর গড়িমসি করা কিছু নয়। ওকে তার ক'রে দিলামঃ 'আজই দিল্লি যাচ্ছি। সেখানে দুদিন থেকেই রাওলপিণ্ডি যাব। আমাকে মাসিমার ঠিকানায় তার কোরো।'

"দিল্লি পেঁছিলাম বিকেল বেলা। সন্ধ্যা বেলা সতীর টেলিগ্রাম এল মাসিমার ঠিকানায়ঃ 'চ'লে এসো এক্ষনি।'

"পরদিন সকালবেলা উঠে বিমানঘাটিতে ফোন করতে যাব রাওলপিণ্ডির প্লেনে একটি আসনের জন্যে, এমন সময় মাসিমা খবরের কাগজ হাতে এসে বললেনঃ 'সর্বনাশ! সতীকে তার করো।'

"কাগজে প'ড়ে শিউরে উঠলামঃ গত রাত থেকে মুসলমানরা ক্ষেপে উঠে—হিন্দুদের হত্যা করছে, বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, ইত্যাদি।

"বিমানঘাটিতে টেলিফোন করতে ওরা বলল, দিল্লি থেকে রাওলপিণ্ডিতে কোনো প্লেনই যাচ্ছে না। বাস্, আর কোনোই খবর পেলাম না।

"তৎক্ষণাৎ সতীকে জরুরি তার ক'রে দিয়ে আমার এক পদস্থ মুসলমান বন্ধুর কাছে গেলাম। তিনি আমতা আমতা ক'রে বললেনঃ খবর দারুণ বটে, তবে তাঁরা আশা করছেন দুচারদিনের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি বললামঃ 'আমার এক আত্মীয়া রাওলপিণ্ডিতে আছেন, আমি কোনোমতে সেখানে পৌঁছতে চাই।' তিনি মাথা নেড়ে বললেন ঃ 'দুতিন দিনের মধ্যে আপনি পাকিস্তানে ঢুকতে পারবেন ব'লে মনে হয় না। তবে—' ব'লে একটু ভেবে বললেন ঃ 'আপনি যদি কালকের দিনটা অপেক্ষা করেন তবে হয়ত টেলিফোন ক'রে খবর পেতেও পারি যদি আপনি আপনার আত্মীয়ার ঠিকানা আমাকে দেন।' আমি তাঁকে ঠিকানা দিয়ে ফিরে এলাম। সন্ধ্যাবেলা তাঁকে টেলিফোন করলাম, উত্তর এলো—এখনো কোনো খবরই আসেনি।

"সারারাত ঘুম হ'ল না। পরদিন সকালে উঠে কাগজে পড়লাম—বীভৎস কাণ্ড ঃ বহু হিন্দুকে মুসলমান গুণ্ডারা মেরে ফেলেছে, কত মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে...ইত্যাদি। মাত্র দুটি প্লেন রেফিউজি

নিয়ে দিল্লি রওনা হতে পেরেছে—কিন্তু তার পর থেকে প্লেন ট্রেন চলাচল সব বন্ধ—দুদিক থেকেই।

"এমন সময়ে অমলের এক চিঠি পেলামঃ 'দাদা, খবরের কাগজে সব পড়লাম। কিন্তু ভাববেন না—সতীর কোনো অমঙ্গলই হবে না, হ'তে পারে না। ঠাকুরকে যে অমন প্রাণ ঢেলে ভালোবেসেছে তার বিপদ হ'তে পারে—কিন্তু ভয় নেই। কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি—ঠাকুরের এ-শপথ চিরকালের। আর এ যদি সত্যি না হয়—তবে মিথ্যে পুজো, মিথ্যে মন্ত্র, মিথ্যে বেঁচে থাকা।"

"কিন্তু অমলের আশ্বাসেও আশ্বস্ত হ'তে পারলাম না। সমস্ত দিনটা অশান্তিতে কাটল। রাত্রে মাসিমা ও আমি রেডিও ধরেছি রাওয়ালপিন্ডির খবর পেতে—এমন সময়ে সতী এসে হাজির—সশরীরে! সঙ্গে এক সুদর্শন কাশ্মীরি ড্রাইভার। ওর পরনে শুধু একটি শাড়ি, চুল উস্কো খুস্কো, চোখের পাতা ফোলা, গায়ে একটিও গয়না নেই। অমন শোভনা মেয়ের যে একদিনে এ-রকম চেহারা হ'তে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

"ড্রাইভারকে বাইরের ঘরে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিয়ে মাসিমাতে আমাতে সতীকে নিয়ে পড়লাম। মাসিমার ওকে জড়িয়ে ধ'রে সে কী কান্না ঃ 'বড় বেঁচে গেছিস মা!' সতীর চোখে কিন্তু বাষ্পের আভাসও নেই। গুম্ হ'য়ে বসে রইল।

"তারপরে ওকে স্নান করিয়ে খাইয়ে মাসিমা আমার ঘরে এনে হাজির করলেন। তখন সব ইতিহাস শুনলাম। কিন্তু এ কী কাণ্ড! শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে সত্যি সন্দেহ হ'তে থাকে—আমি জেগে, না সব দুস্বপ্ন? কাগজে কয়েক বৎসর আগেই হিটলারের কাহিনী পড়েছিলাম অবশ্য—কিছুদিন আগে কলকাতায়ও ঘটেছে খুনোখুনি। কিন্তু কাগজে পড়া এক—আর যাকে স্নেহ করেছি তার মুখে শোনা আর।

অসিত বলল ঃ "সতী আমাকে আমার বৃন্দাবনের ঠিকানায় যে-চিঠি লিখেছিল মাত্র তিন দিন আগে—সে চিঠি লেখার পরেই ওর শাশুড়ি ওকে বলে এক মস্ত সাধুজি এইমাত্র সকালে হরিদ্বার থেকে এসে পেঁছেছেন। বেলা দশটায় ওখানকার গীতাপ্রচার সভায় গীতা সম্বন্ধে কিছু বলবেন। সতী জিজ্ঞাসা করল—একটু বিরস মুখেই—সাধুজির নামটি কী? ওর শাশুড়ি বললেন ঃ আনন্দগিরি।"

বার্বারা অস্ফুট কণ্ঠে বললঃ "আনন্দগিরি? শ্যামঠাকুরের গুরু?"

অসিত বলল ঃ "হ্যাঁ, তিনিই। শ্যামঠাকুরের কাছে শুনেছিলাম মাঝে মাঝে তিনি বেরিয়ে পড়তেন—গীতা প্রচার করতে। রাওয়ালপিন্ডির গীতা প্রচারের শাখা তাঁকে অনেকদিন থেকেই নিমন্ত্রণ করছিল, কিন্তু তিনি আসতে পারেন নি।"

বার্বারা বলল ঃ "তারপর?"

"সতী বললঃ 'আনন্দগিরির নাম শুনতেই আমি চমকে উঠলাম। কারণ তুমি আমাকে দুতিনটে চিঠিতে তাঁর কথা লিখেছিলে শ্যামঠাকুরের গুরু, মস্ত যোগী, মহাপুরুষ এইসব বলে। কাজেই আমার বিমুখতা কেটে যেতে দেরি হয় নি। আমি দশটার আগেই গীতাসভায় গিয়ে বসলাম। ঘর-ভরা লোক। সবাই উৎসুক। মস্ত নামকরা সাধু! আমার বুক উঠল দুরু দুরু ক'রে—কখন তিনি আসবেন!

"ঠিক দশটায় এক বালব্রহ্মচারী শিষ্যের সঙ্গে তিনি এসে হাজির হ'লেন সভায়। তাঁর উজ্জ্বল মুখ, মৃদু মৃদু হাসি ও কোমলকণ্ঠে অপূর্ব গীতার ব্যাখ্যা শুনতে না শুনতে আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন ক'রে উঠল মামাবাবু! মনে হ'ল যেন ঠাকুর তাঁকে পাঠিয়েছেন শুধু আমার জন্যেই। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে গুরুবাদের বিরুদ্ধে যত যুক্তিতর্ক জমায়েৎ হ'য়েছিল ভেসে গেল এক মুহূর্তে। মনে পড়ল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় উপমা—যুগ যুগ ধরে যে-অন্ধকার জমা হয়ে আছে অন্ধকূপে—একটি বাতি জ্বালতে না জ্বালতে পালিয়ে যায়—একটু একটু করে পালায় না। আমার মন অকুণ্ঠে ওঁকে বরণ ক'রে নিল।

বক্তৃতার পরে সোজা গিয়ে ওঁকে বললাম আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে—তবে নিরালায়। উনি স্নিগ্ধ হেসে ওঁর শিষ্যকে বললেন, 'মাকে পাশের ঘরে নিয়ে চলো, আমি আসছি।'

"একটু বাদে ঘরভরা প্রণামার্থীদের বিদায় দিয়ে তিনি এসে বসলেন আমার সামনে। বললেনঃ 'বোসো মা।' আমি চোখের জল আর সামলাতে পারলাম না—সোজা লুটিয়ে পড়লাম তাঁর পায়ে। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে মৃদু সুরে কিছুক্ষণ নারায়ণ নারায়ণ জপ করে বললেনঃ শান্ত হও মা। কোনো ভয় নেই। যে সত্যি চায় সে পায়ই পায়।

"আমার মনে কুণ্ঠা সঙ্কোচ ভয়ের আর লেশও রইল না। আমি উঠে, চোখ মুছে এক নিশ্বাসে বলে গেলাম যে, মনে এল—বাছবিচার না ক'রে। গোড়া থেকেই বললাম সব কথা—কিছুই বাদ না দিয়ে। তিনি খুব মন দিয়ে শুনলেন। আমার বলা শেষ হলে হেসে বললেনঃ তবে আর কি মা? আমি শুধালাম ঃ তবে আর কি মানে? তিনি বললেন ঃ মানে, বাধছে তোমার কোথায় ডাক যখন শুনেছ? আমি বললাম ঃ আমি যে বুঝতে পারছি না গুরুদেব—কী করতে হবে আমাকে? তিনি বললেন পিঠ পিঠ ঃ আর কিছুই না—শুধু ঝাঁপ দিতে হবে তীরে বসে ঢেউ গোনা ছেড়ে। আমি বিহ্বলকণ্ঠে বললামঃ ঝাঁপ? তিনি বললেন শান্ত হেসেঃ ভয় কি মা? এ-ঝাঁপে উঠবে না, শুধু ম'রে বাঁচবে। তাঁকে পেতে হ'লে চাই নবজন্ম। কিন্তু নবজন্ম হয় কখন? মরার পরে তো? তাই বরণ করতে হবে তোমাকে সাংসারিক হিসেব কিতেব, যুক্তিতর্ক, ভয় ভাবনার মরণ। আমি একটু চুপ করে থেকে বললামঃ কিন্তু কর্তব্য-দায়িত্ব? তিনি বললেনঃ ওসব শুধু তাদের জন্যে যারা তাঁর ডাক শোনে নি—যারা স্বভাবে সংসারী। তোমার স্বধর্ম তো সংসার নয় মা, তাই সংসারের ধর্ম তোমার পরধর্ম। আমি বললামঃ একথা আমি বহুবারই শুনেছি গুরুদেব, কিন্তু মন মানে না। কিম্বা হয়ত আমি কিছুই জানি না বলেই—তিনি বললেন বাধা দিয়েঃ যে তাঁর ডাক শুনেছে, তাঁকে ভালোবাসা কী বস্তু জেনেছে সে জানে না—আর জানে তারা যারা তাঁকে জানে নি—যাঁকে জানলে আর কিছু জানার থাকে না—নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ?

আমি বললাম ঃ কিন্তু গুরুদেব, ঠাকুরকে কি আমি সত্যি ভালো বেসেছি, না এসব মেয়েলি উচ্ছ্বাস—ফেনা? আমি দেখেছি কত মেয়েকে—তিনি ফের বাধা দিয়ে বললেনঃ শোনো মা বলি—তুমি কতদূর এগিয়েছ তুমি জেনেও জানতে পারছ না শুধু এই জন্যেই—এই কুতর্ক কুযুক্তির শাসানিই বুনছ আড়াল। তোমার ডাক এসেছে মা—একথা অবিশ্বাস কোরো না আর। ভয়ে ও আনন্দে আমার বুক কেঁপে উঠলঃ ডাক এসেছে? কী করতে হবে? তিনি বললেনঃ চলতে হবে দুরভিসারে। আমি ভয়ে ভয়ে বললামঃ কিন্তু গুরুদেব, পথ যে অজানা, চারদিক অন্ধকার। তাঁর মুখে ফুটে উঠল এক অপরূপ আবছা হাসি, সঙ্গে সঙ্গে গুণ গুণ ক'রে ধ'রে দিলেনঃ

ভীতক চিত ভুজগ হেরি' যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আঁধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণিমণি ঝাঁপ॥

এর মানে কি জানো মা? মানে এই যে, তাঁর বাঁশির ডাক শোনে যে রাধাহিয়া তাকে অচিন পথেই চলতে হয় অন্ধকারে গাঢাকা হয়ে। ভয় ভাবনা কাটে নি—কী হবে? তবু অভিসারে বুক দুরু দুরু করে—কোন্ দিকে যাবে—না বেরিয়ে পারে না। পথ যে চেনে না!—হঠাৎ সামনে ফণীর মাথায় মণি ধরে আলো পথ দেখাতে। অমনি ভয়ের রূপ বদলঃ যদি কেউ দেখে ফেলে—যেতে দেবে না যে! সঙ্গে সঙ্গে জাগে ব্যাকুলতা, আর সে কেমন ব্যাকুলতা বলো দেখি—ফণীর মণির আলো হাত দিয়ে ঢাকতে যাওয়া—যাতে করে অভিসারিকা নিজেকে অন্ধকারের আড়ালে রাখতে পারে? ভাবো সে কেমন আত্মহারা রাধা যাঁর বিষ-

ধরের ভয়ও ধুয়ে মুছে ভেসে গেল প্রিয়-মিলনের ব্যাকুলতায়! শ্যামের প্রেমে এমনি ব্যাকুল হয়ে অকূল বরণ করলে তবেই তিনি দেখা দেন রাধার আঁধার বুকে আলো হ'য়ে।'

"সতী বলল : 'তুমি জানো মামাবাবু, তোমার মুখে গোবিন্দ দাসের এ-কীর্তনটি শুনতে আমি কিরকম ভালোবাসতাম। কিন্তু কিছু মনে কোরো না, এ-গানটি তোমার মুখে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম এর ভাবরূপে, উপমার দীপ্তিতে। কিন্তু গুরুদেবের মুখে এ-গানটির মধ্যে শুনতে পেলাম কাব্যের উপমা নয়—বাঁশির ডাক। শুধু বৈষ্ণবের তরে বৈষ্ণবের গান—নর মানি। কিন্তু গুরুদেবের শ্রীমুখে এ-গানটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে, বৈষ্ণব পদাবলীর চরম বাণী ফুটে উঠতে পারে কেবল সাধকের কানে—কাব্যরসিকের কানে নয়। এ আমি যুক্তি দিয়ে বুঝিনি, হৃদয়ের আকাশে দেখতে পেলাম যেন মুহূর্তের বিদ্যুৎ ঝলকে। আর যেই দেখতে পেলাম সাধনার আলোর সঙ্গে কবিতার আলোর তফাৎ কোনখানে ও কেন—অমনি মনের মধ্যে সব গেল ওলট পালট হ'য়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মতনই উদ্বেল হ'য়ে উঠল—যেতে হবে যেতে হবে এই উচ্ছ্বাসে।

'কিন্তু তার পরেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সংশয়। বললাম : কিন্তু গুরুদেব, আমি তো শ্রীরাধা নই—বাঁশির ডাকও শুনি নি।

তিনি হেসে বললেন : শুনেছ বৈ কি মা—আর শুনেছ ঐ বিগ্রহকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই। এই ভালোবাসাই হ'ল বাঁশির ডাক—নৈলে যে বিগ্রহকে তোমার মন পাষাণ ব'লে জানছে তাকেই তোমার প্রাণ ভালো না বেসে পারল না কেন বলো? শোনো মা বলি, বিষকে বিষ ব'লে না জেনে খেলেও বিষের ক্রিয়া ঠেকানো যায় না তো? তেমনি তোমার এই বিগ্রহকে ভালোবাসা : একে বাঁশির ডাক ব'লে তুমি চিনতে না পারা সত্ত্বেও ওরই ভাবে তোমার বৈরাগ্য এলো—স্বামী ছেলে ধনসম্পত্তি সব ছেড়ে তুমি এলে নির্জনবাস করতে। কিন্তু এর পরে কী করতে হবে যখন তুমি ঠিক করতে পারলে না তখন ঠাকুর কী করলেন? না, আমাকে রাওলপিণ্ডি পাঠালেন শুধু এই কথাটি তোমাকে জানাতে যে তোমার সময় এসেছে সব ছাড়বার।

"সতীর মুখে আলো জ্বলে উঠল, বলল : 'মামাবাবু, কী বলব—এ শুধু যার হয়েছে সেই জানে—ব'লে বোঝানো যায় না। তোমার শ্যামঠাকুর জানতেন, কারণ তাঁর হয়েছিল এ-ভেসে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। কিন্তু এখনো যেন আমার বিশ্বাস হয় না মামাবাবু! আমি কি সেই সতী যে তোমার সঙ্গেও তর্ক করব—গুরুবাদ আবার কী? সত্যি, এর সমতল পাই না—এতদিনের তৈরি তর্ক বিচার সুবুদ্ধির কাঙাল—ভেসে গেল কি না মুহূর্তে! আর কার কথায়—না, এক অচেনা গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর যার সম্বন্ধে কিছুই জানি না! বলে ঈষৎ হেসে : জানো মামাবাবু, আমার বিজ্ঞ নন্দাইয়ের মুখে শুনতাম প্রায়ই যে, মিরাকলের যুগ গত! এখন হাসি একথা মনে হলে, অথচ তাঁকে দোষ দিইই বা কেমন করে? দুদিন আগেও যদি আমাকে কেউ বলত যে দুদিন বাদে আমারি হবে এই নাজেহাল অবস্থা—তাহলে কি আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম না? যে অবস্থার কথা এক সময় ভাবতেও ডরিয়ে উঠতাম—সে অবস্থা যখন এল তখন ভয় তো দূরের কথা, এক অসহ্য আনন্দে মন নেচে উঠল : আমার ডাক এসেছে সব ছাড়তে হবে, ছাড়তে হবে—আর ভয় নেই—হোক্ না লক্ষ্য সুদূর—পথের দিশা তো এসে গেছে—একটানা সোজা পথ—গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ—উদার, উদাস, নিঃসঙ্গ— কিন্তু আলোয় ভরা। ঝাপসা আর কিছুই নেই। বুকের মধ্যে আমার ডমরু উঠল বেজে।

'গুরুদেব আমার পানে খানিকটা একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন—আহা সে কী দৃষ্টি মামাবাবু! দৃষ্টি তো নয় যেন মূর্তিমতী করুণা। বললেন : আমি চললাম মা এবার

দেবতাত্মা হিমালয় (স্কেচ্) শিল্পী রামকিংকর

আমার কাজ শেষ হয়েছে। পরশুই আমি হরিদ্বারে পৌঁছব। দরকার হলেই চিঠি লিখো। কেবল একটি কথা : রাওলপিণ্ডিতে আর থেকো না। আজই ভোর রাত্রে ধ্যানে আমি পেয়েছি—কিন্তু সেসব এখন বলব না—এখনো তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না—মোট কথা, এখানে এক রাক্ষসী লীলা শুরু হবে। দারুণ হত্যাকাণ্ড। ঠিক কবে হবে সে দৃষ্টি ঠাকুর আমাকে দেন নি—কাল পরশুও হ'তে পারে—কিম্বা হয়ত তার আগেও হ'তে পারে—কিন্তু হবেই। তাই তোমরা যত শীঘ্র পারো এখান থেকে চ'লে যাও। কেবল একটি কথা—যাই কেন ঘটুক না, মনে রেখো এই কথাটি যে ঠাকুরের যে স্মরণ নিয়েছে তাঁকে যে সত্যি ভালোবাসতে পেরেছে কোনো রাক্ষস কি অসুরের সাধ্য নেই তাকে মারে।"

'তারপর?'

'আমি বললাম আমার নন্দাইকে গুরুদেবের ধ্যান দর্শনের কথা। তিনি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন : যত সব মিডীভাল! ঠাকুরের

কাছে ওয়ার্নিং. পেয়েছেন—রেড লাইট! ননসেন্স! এ বিংশ শতাব্দী। তাছাড়া এখানকার পুলিস কমিশনার আমার বন্ধু জানেন বৌঠান? কালই তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন—কিছুই না, যত সব এ্যালার্মিস্ট রিপোর্ট—বাজে গুজব। শহরের কোন কোণে একদল গুন্ডা একটু উপদ্রব শুরু করেছিল কাল সন্ধ্যাবেলা। দুটো লালাপাগড়ি পাঠাতেই তারা ঠান্ডা।

আমি কী বলব? চুপ ক'রে রইলাম। বিকেল বেলা এলো তোমার তার, আমি তোমার কথামত দিল্লিতে তোমাকে তার ক'রে দিলাম চলে এসো এক্ষনি।

কিন্তু পরদিন সকালে উঠতেই দেখি আমার নন্দাইয়ের মুখ চুন! বললেন ঃ শহরে না কি ভোর হ'তে না হ'তে গুন্ডারা শুরু করেছে তান্ডব—পুলিস নাকি কিছুই করছে না। বলতে না বলতে আয়েষা বলে আমাদের এক মুসলমান প্রতিবেশিনী এসে হাজির। ও আমাকে কেন জানি না ভালোবেসে ফেলেছিল। বলল ঃ এক্ষুনি পালান—একটা প্লেন ছাড়ছে উদ্বাস্তু হিন্দুদের নিয়ে—আপনাদের জায়গা হয়ত হলেও হতে পারে। আমার নন্দাই তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করলেন বিমান ঘাঁটিতে। ওরা বলল ঃ 'হ্যাঁ, সাংঘাতিক ব্যাপার—ভোর বেলাই গুন্ডারা অনেক হিন্দুর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, লুটতরাজও শুরু হয়েছে। আমাদের প্লেন ছাড়ছে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে।' আমার নন্দাই টেলিফানে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আমাদের মোটরে এক্ষুনি রওনা হচ্ছি।' ওরা বলল ঃ অমন কাজটি করবেন না, হিন্দু যাত্রীর মোটর ওরা ধরবেই ধরবে। আমাদের বাস পাঠাচ্ছি কয়েকটি হিন্দুকে তুলে আনতে, সেই বাসে চ'লে আসুন এক্ষনি—কিন্তু মালপত্র নিতে পারব না—এমন কি সুটকেস পর্যন্ত নয়—বহু লোক এসে পড়েছে ইতিমধ্যেই—তিল-ধারণের স্থান নেই—আপনাদের চারজনের কোনোমতে জায়গা হতে পারে, কিন্তু মাল-পত্র নয়। যদি দামী গহনাগাটি থাকে তবে একটা ছোট হাতবাক্স কি ব্রীফকেসে আনতে পারেন। আমার নন্দাই শুকনো মুখে বললেন আমাদের সব কথা।

'আমার ননদ তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁর যা কিছু গহনা ছিল একটি ছোট হ্যান্ডব্যাগে পুরলেন। এমন সময়ে আমার হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল ঠাকুরের কথা। মাথা ঘুরে উঠল। আয়েষা আমাকে ধরল, বলল ঃ ভয় নেই বহিন, বাস যখন আসছে। আমি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম ঃ ভয় নেই—কী বলছ? আমার ঠাকুর? আমার নন্দাই রুক্ষ কণ্ঠে বললেন ঃ ঠাকুর টাকুর ওরা নিতে দেবে না বৌঠান—তার উপর মার্বেল পাথরের ঐ ভারি বিগ্রহ। আমি আয়েষার বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম ঃ বিগ্রহ ছেড়ে আমি এক পা-ও নড়ব না। আমার শাশুড়ি চোখ কপালে তুলে বললেন পাগলামি কোরো না বৌমা! শীগগির দাও তোমার গয়নাটয়না যা কিছু আছে—দেরি কোরো না। আমি সোজা আমার ঘরে চ'লে গেলাম। ও'রা তিনজনে আমার পিছনে পিছনে ছুটে এলেন, আয়েষাও। আমি আমার শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম ঃ আপনারা যান মা—আমি যাব না যদি ওরা বিগ্রহ নিয়ে যেতে না দেয়।

তুমুল কান্ড! এদিকে তর্কাতর্কি করবারও সময় নেই—বাস এলো বলে। ওদিকে শহর থেকে একটা চাপা কল্লোল —গুম গুম গুম ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে—সমুদ্রের তীরে হাওয়া বাড়লে যেমন কল্লোল বেড়ে ওঠে। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে সব খালি। কোনো চিন্তাই যেন আমার নেই—সব ফাঁকা—একটা ঘোর মতন, অথচ ভয়ের নয়—আনন্দের। সে ব'লে বোঝাতে পারব না কী শান্তি! হঠাৎ সাড় এল আমার ননদের ঝঙ্কারে ঃ তবে মর গে যা বৌ! মুখ বুজে সব সয়েছি এতদিন শুধু দাদার মান রাখতে। নৈলে তোর মতন মেয়ের সঙ্গে কেউ ঘর করে না কি—যার ছায়া মাড়ানোও পাপ! বিগ্রহ বিগ্রহ—ব'লে ঠোঁট বেঁকিয়ে—ভক্তির বালাই নিয়ে মরি! স্বামী গেল, ঘর গেল, ছেলে গেল উচ্ছন্নে—রইলেন শুধু এক হাঁ-করা ঠাকুর! এর নাম যদি ধম্ম হয় তবে মুখে আগুন সে-ধম্মের। আমার নন্দাই বাধা দিয়ে বললেন ঃ আঃ কী করো? শুনুন বৌঠান—আমি বললাম—কেন মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন? আমার ঐ এককথা—বিগ্রহ রেখে আমি যাব না যাব না যাব না। আমার ননদ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন ঃ খু—ব ভালো আর এইই হবে ওর ঠিক সাজা। হবে না? স্বামীর মনে যে দুঃখু দেয় তার শাস্তি হবে না তো হবে কার শুনি? এখনো আকাশে চন্দ্র সূর্য উঠছে—আমার শাশুড়ি ওর মুখ চেপে ধরে বললেন ঃ কী করিস? থাম্। বৌমাকে ফেলে গেলে ছেলের কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে? শোনো বৌমা, লক্ষ্মী মা আমার অমন কোরো না—তৈরি হ'য়ে নাও এক্ষনি—তোমার গহনাগাটি যা আছে নিয়ে।

'এত দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি এল ঃ এত বড় বিপদেও এদের সবচেয়ে মাথাব্যথা আমাকে নিয়ে না, আমার গয়নাগাটি নিয়ে! আমি বললাম হেসে ঃ গয়নাগাটির দুর্ভাবনা আমার নেই বরং ওরা যদি বলে গয়নাগাটি রেখে সেই জায়গায় ঠাকুরকে নিয়ে যেতে দেবে তবে আমি যাব, নৈলে—যা হয় হবে—আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না—মরতে হয় মরব।

আয়েষা কাছে এসে আমার হাত ধরে মিনতির সুরে বলল ঃ কিন্তু বহিন, মরার বাড়াও বিপদ আছে। তোমাকে গুন্ডারা মারবে না। আমার মামার পাশের বাড়িতে একটি হিন্দু মেয়েকে গুন্ডারা আজই ভোরে লুটে নিয়ে গেছে—তোমাকেও নিয়ে যাবে—আর কেন, তা কি বলতে হবে?

'কেন জানি না আমার ভিতর থেকে যেন ফেটে পড়ল দম্‌কা হাসি, বললাম ঃ বেশ তো, নিক না লুটে। দেখা যাবে কার শক্তি বেশি—মারনেওয়ালা গুন্ডাদের, না রাখনেওয়ালা ঠাকুরের। ঠাকুর বলেছেন আমার ভক্তের দুর্গতি হ'তে পারে না। আজ দেখা যাবে তিনি শুধু কথা দিতেই মজবুৎ কি না। ব'লে হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলাম ঃ বেশ হয়েছে—চমৎকার! ঠাকুরও আমাকে পরখ করুন, আমিও তাঁকে পরখ করি। মন্দ কি? এস্পার কি উস্পার। আমার শাশুড়ি ভয় পেয়ে গেলেন, বললেন ঃ বৌমা! পাগল হ'য়ে গেলে না কি?

আমার ননদ এবার আমার শাশুড়ির হাত ধ'রে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেলেন বলতে বলতে ! কেন মিথ্যে ব'কে মরছ মা? যার মরণদশা ঘনায় তাকে বাঁচাবে কে? মরুক মরুক সর্বনাশী—আমাদের হাড় জুড়োক।

'এমনি সময়ে বাইরে বাসের হর্ন বেজে উঠল। আয়েষা আমাকে বলল ঃ বহিন, যদি নিতান্তই না যেতে চাও, তবে একটা বোরখা নিয়ে আসি—তাতে মুখ ঢেকে তুমি চলো আমাদের বাড়ি।

'আমি ওকে শান্ত কণ্ঠে বললাম ঃ না বহিন, তোমাদের বিপদ হবে—কাফেরকে ঠাঁই দিলে। তাছাড়া আমি রইলাম আমার ঠাকুরের পায়ে—সত্যি দেখতে চাই ঠাকুর নিষ্প্রাণ না জীবন্ত।

'ওদিক থেকে আমার ননদ হাঁকলেন ঃ আয়েষা! চললাম ভাই! আয়েষা বেরিয়ে গেল চোখ মুছতে মুছতে। আমি দোরে খিল দিলাম।

'কিন্তু তারপরই পড়লাম ভেঙে ঠাকুরের পায়ে—শুধু কান্না আর কান্না ঃ আমি কিছুই জানি না ঠাকুর, শুধু জানি তোমাকে—তুমি যদি অন্তর্যামী হও তবে তুমি জানো যে একথা সত্যি।

কেবল একটি মিনতি ঃ আমার প্রাণ যায় যাক কিন্তু মান যেন বজায় থাকে—গুন্ডারা যেন আমার গায়ে হাত দিতে না পারে।'

"সতী বলে চলল ঃ কতক্ষণ ঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে কেঁদেছিলাম মনে নেই—কেবল এইটুকু মনে আছে যে এক অপরূপ শান্তিতে আমার দেহমন জুড়িয়ে গেল। দেখা বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু দেখিনি, ঘিরে দাঁড়িয়ে। আমার কিন্তু তখন কোনো মতন এল যাকে বলে বোঝাতে পারব না মামাবাবু! শুধু এইটুকু বলি যে, মনে হ'ল যে কী একটা অনামী শক্তি আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। আমার কিন্তু তখন কোনো ঘোর বা ভাবটাবের অবস্থা নয়—খুবই সজাগ প্রতি ইন্দ্রিয় ঃ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি বাইরে হু হু করে কল্লোল বেড়ে উঠছে, চোখে দেখতে পাচ্ছি ওপারের রাস্তায় গুন্ডাদের ভিড়—একটু বাদেই চম্‌কে উঠলাম দেখে পাশের হিন্দু বাড়িতে আগুন জ্ব'লে উঠল দাউ দাউ ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে সে কী আর্তনাদ! ওদিকে চোখ পড়তেই দেখি—দু তিনটে গুন্ডায় মিলে এক যুবতী মেয়েকে টেনে তুলছে একটা মোটর-ট্রাকে, মেয়েটি আপ্রাণ চীৎকার করছে বাঁচাও বাঁচাও! কিন্তু তখন বাঁচাবে কে—যখন যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক—পুলিসও গুন্ডামিতে মেতে উঠেছে? এ ছাড়া আরো দুম্‌দাম্, হৈ-চৈ-এর শব্দ হাওয়ায় আসছে ভেসে,

প্রত্যেক ধ্বনিটি কানে আসছে, যা কিছু ঘটছে চোখে দেখছি অথচ আমি যেন কিছুতেই নেই—সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন! সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না মামাবাবু, কারণ আমি এখনো নিজেই জানি না কোত্থেকে আমার মনে এল এহেন অভয় যখন কানে শুনছি কান্নাকাটি, চোখে দেখছি পৈশাচিক কাণ্ড!

"খানিকবাদে শুনতে পেলাম আমাদের বাড়িতে হুড়মুড় ক'রে একদল লোকের ঢোকার শব্দ। কিন্তু তখনো আমার বুকের মধ্যে সেই ঠাণ্ডা অনুভূতি। এমনি সময়ে হঠাৎ আমার দোরে ধাক্কা। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম ঠাকুরের দিকে ঠায় চেয়ে। একটু বাদে ওরা দোরে ঘা দিতে লাগল। আমি সমানই নিরুত্তর। দেখতে দেখতে মড় মড় ক'রে দোর ভেঙে পড়ল—আর ঘরের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ঢুকল চার পাঁচজন—দুযমন চেহারার গুণ্ডা। একজন আমাকে দেখেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল : মিল গিয়া রে, মিল্ গিয়া—মহশাল্লা! তাদের মধ্যে দুজন আমার দিকে ছুটে আসতেই আমি বললাম : খবর্দার! আমাকে ছুঁও না—ব'লেই গলার মণিমালা হাতের বালা, চুড়ি, কানের দুল সব একের পর খুলে খুলে ওদের দিকে ছুড়ে ফেলে দিতে থাকলাম আর ওদের মধ্যে প'ড়ে গেল কাড়াকাড়ি। একজন এসে আমার আলমারির চাবি চাইল। আমি ঝনাৎ ক'রে মাটিতে চাবি ফেলে দিলাম। ওরা খুলে টাকাকড়ি শাল দোশালা গহনাপত্র যাকিছু ছিল সব নিল লুটে পুটে।

'আমার হঠাৎ চোখ পড়ল এদের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ লোকের 'পরে। গালপাট্টা দাড়ি, লম্বা, কঠিন ধারালো দুটি চোখ যেন জ্বলছে, কিন্তু খুব চমৎকার চেহারা। দেখেই বুঝলাম—কাশ্মীরী। ঠিক গোলাপ ফুলের মতন রঙ। প্রথম দিকে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, কিন্তু আমার পানে তার চোখ পড়তেই সে কেমন যেন থমকে গেল বাকি তিন-চারজন যখন লুটতরাজে ব্যস্ত তখন ও ঠায় আমার দিকে চেয়ে। ওর চিবুক দেখে মনে হ'ল রোখানো চিবুক। অথচ মুখের মধ্যে কেমন যেন একটা বিষাদের ছাপ। একটু অবাক লাগল ও ভাবে আমার দিকে চেয়ে কেন লুটতরাজ ছেড়ে? এমন সময়ে তাকে লক্ষ্য ক'রে একটি গুণ্ডা গ্রাম্য হিন্দিতে বলল : রুমৎ, এবার এই আওরৎকে নিয়ে যাই কী বলেন? ক্যা খবসুরৎ' কাজে লাগবে। লোকটি গম্ভীর কণ্ঠে বলল : না, ওকে নিয়ে আমাদের কী হবে? বলতেই সে গুণ্ডাটি অট্ট হেসে সহচরদের পানে তাকিয়ে বলল : তোদের বালিনি রহমতের মগজ মাখনে-ভরা? নৈলে এমন দরদ! চল্‌রে দোস্ত—একেও নিয়ে যাই—খাসা মাল—চুষতেও তাজা বেচলেও মজা! বলতে না বলতে তিনজন এল আমার দিকে এগিয়ে—চোখে পশুর লুব্ধ দৃষ্টি। আমি চেঁচিয়ে হিন্দিতে বললাম : তোমাদের ঘরে কি মা বোন মেয়ে নেই? বলতেই ওরা কেমন যেন থমকে গেল। এমনি সময়ে হঠাৎ সে লোকটি এগিয়ে এসে বলল : তোরা একটু বাইরে যা, আমিই একে নিয়ে যাচ্ছি বুঝিয়ে সুঝিয়ে। তোরা বরং দেখ অন্য সব ঘরে কিছু হাতিয়ে নেবার মতন আছে কি না। বলতেই ওরা খুশি হ'য়ে হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে গেল, কেবল ওদের মধ্যে একজন—

মুখে মদের গন্ধ—বলল ওর কান ঘেঁষে ওরে রহমৎ, একে আব্দুলের কাছে নিয়ে গেলে সে লুফে নেবে—বেশ মোটা বখশিশ মিলবে। এমন বিবি না চাইবে কোন্ বেকুফ?

'ওরা বেরিয়ে যেতেই লোকটি আমার কাছে এসে চাপা সুরে পরিষ্কার বাংলায় বলল : শীগগির আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসো। আমি কাশ্মীরীর মুখে বাংলা শুনে চমকে উঠতেই সে বলল : আমি পনের বৎসর ঢাকায় ছিলাম—কিন্তু সে সব হবে পরে, তুমি দেরি কোরো না আমার সঙ্গে জলদি বেরিয়ে এসো যদি বাঁচতে চাও। আমি বললাম : আমার ঠাকুরকে না নিয়ে আমি যাব না। সে চম্‌কে উঠে বিগ্রহের দিকে চেয়ে বলল : ও! ব'লে মুখ নিচু ক'রে একটু ভেবেই : আচ্ছা, তাহ'লে এক কাজ করো—ব'লেই আমার বিছানা থেকে বিছানার চারদরটা উঠিয়ে নিয়ে পকেট থেকে ছুরি বের করে দুটো জায়গায় বোরখার যেমন থাকে তেমনি ছোট ছিদ্র ক'রে আমাকে মুড়ে ফেলল : দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম : হ্যাঁ।' ও বিগ্রহটিকে নিজের শালে ঢেকে নিয়ে বলল : চলো এবার—তুরন্ত দেরি করলে হয়ত তোমাকে বাঁচাতে পারব না। তোমার কোনো ভয় নেই মা! আমাকে বিশ্বাস করো। আমার একটি মেয়ে ছিল—ঠিক তোমারি মতন সুন্দর। বলতে না বলতে ওর চোখে জল ভ'রে উঠল।

'ওর চোখে জল দেখে আর মুখে স্নিগ্ধ মা-ডাক শুনে আমার প্রাণ মন যেন জুড়িয়ে গেল। আমি ওর পিছন পিছন বাইরে এসে দাঁড়াতেই বাঁদিকে আমাদের গ্যারাজে ওর চোখ পড়ল, বলল : কার মোটর? আমি বললাম : আমার। ও একটু ভাবল, পরে বলল : কত তেল আছে জানো? আমি বললাম : জানি। আজকালের মধ্যে আমাদের কাশ্মীর রওনা হবার কথা ছিল, তাই কালই বিকেলে পেট্রোল ভরে নিয়েছিলাম ট্যাঙ্কে। এছাড়া গাড়ির মধ্যে চার টিন পেট্রোল মজুদ আছে। ওর মুখের মেঘ কেটে গেল, ব'লে উঠল : শুভানাল্লা! তাহ'লে আর ভয় নেই। কিন্তু তুমি কথাটি কোয়ো না—চুপ ক'রে ব'সে থেকো মোটরের এই কোণে বোরখা প'রে। এই নাও তোমার ঠাকুর, কেবল একে তোমার বোরখার নিচে ঢেকে রাখবে সারা পথ, বুঝলে? মনে রেখো, পথে কেউ একবার দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। ব'লেই মোটর বের ক'রে আনল, আমি ঢুকে বসতেই ও গেটের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল।

'কিন্তু রাস্তায় প'ড়ে বাঁদিকে মোড় দিতেই একদল গুণ্ডার শোরগোল। তৎক্ষণাৎ ও গাড়ি ঘুরিয়ে ডান দিকে চালানো একটা ছোট শড়কে। খানিক বাদে আবার একটা বড় রাস্তায় এসে পড়তেই শোনা গেল চেনা চীৎকার, হুঙ্কার...এখানে ওখানে কয়েকটা হিন্দুর বাড়ি জ্বলছে, দাঁড়িয়ে হিন্দু ছেলে মেয়ে শিশু বুড়ো বুড়ি। হঠাৎ সামনে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম : বিমান ঘাঁটির ছাপ মারা একটি বাস—তার চারধারে মুসলমান গুণ্ডা—দুতিনজন যাত্রী পথে শুয়ে, তাদের চারদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত। দু চারটে পুলিসও চোখে পড়ল কিন্তু তারা দাঁড়িয়ে হাসছে—বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না তারা কাদের দলে। ও ব্রেক কষতেই আমার চোখ পড়ল সামনে—অমনি আমার বুকের রক্ত যেন জল হ'য়ে গেল। দেখি কি, সেই ভিড়ের মধ্যে আমার নন্দাই দু হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে, আমার শাশুড়ি চিৎকার ক'রে কাঁদছেন—কেবল আমার ননদের কোনো চিহ্ন নেই। আমি ব'লে উঠলাম : আমার শাশুড়ি—ও ধমক দিল : চুপ। কথা কোয়ো না। ব'লেই মোটর পিছন দিকে হটিয়ে বাঁদিকে একটা গলিতে চালিয়ে দিল। গলিটা এত সরু যে ওদিক থেকে যদি একটা গাড়ি আসত তাহ'লেই সর্বনাশ, মোটর দাঁড় করাতেই হত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে এ গলিতে কোনো যানবাহনের চিহ্নও দেখা গেল না। আমি তখন ফের ব'লে উঠলাম : সর্দারজি, আমার শাশুড়িকে দেখলাম পথে দাঁড়িয়ে—বাসে ক'রে তিনি তাঁর মেয়ে ও জামাইয়ের সঙ্গে রওনা হয়েছিলেন প্লেন ধরতে—

'আমার কথা শেষ হবার আগেই ও বলল : কাল রাত্রেই আমরা ঠিক করেছিলাম যে একটি হিন্দুকেও পারতপক্ষে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেব না হিন্দুস্থানে—তাদের প্রতি মোটর বাস গাড়ি আটকাব—বলেই থেকে চাপা সুরে বলল : চুপ কথা কোয়ো না। দেখি : সামনেই দুতিনজন গুণ্ডা। রহমৎ বলল : ওরা যদি সন্দেহ করে যে তুমি হিন্দু মেয়ে বোরখা প'রে পালাচ্ছ তবে তোমাকে তো মারবেই, আমাকেও আস্ত রাখবে না—যে কাফেরকে বাঁচাতে যায়।

'বলতে না বলতে—যা ভয় করেছিলাম : দেখি গুণ্ডারা ছুটে আসছে। একজন বলল : রোকো। রহমৎ হট যা ব'লে গর্জে উঠেই আরো বেগে মোটর চালিয়ে দিল। ওরা সভয়ে লাফিয়ে দু পাশে প'ড়ে গেল সরু নর্দমায়। আমি মোটরের পিছনের জানলা দিয়ে দেখি কি—ওরা হৈ চৈ ক'রে লোক ডাকছে। কিন্তু ততক্ষণে আমরা ওদের নাগালের বাইরে।

'এতক্ষণ আতঙ্কে কান্নাও ভুলে গিয়ে-

ছিলাম—মোটরটা একটু দূরে গিয়ে একটা ফাঁকা বড় রাস্তায় পড়তেই বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। বিশেষ করে মনে হ'ল আমার ননদের কথা—যাকে দেখতে পাই নি। নিশ্চয় গুণ্ডারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে—সুন্দরী ও যুবতী দেখে। শাশুড়ি হয়ত প্রাণে বেঁচে ফিরতেও পারেন কিন্তু কী হবে আমার ননদের? রহমৎকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল: ওকে নিশ্চয় গুণ্ডারা কোথাও নিয়ে গিয়ে বেচবে। আমার মাথার বোরখা খ'সে পড়ে গেল। বললাম: বেচবে? ও কেমন এক রকম হাসি হেসে বলল: একথা শুনে চমকে উঠলে মা? আমার চোখের সামনে দেখেছি কত হিন্দু মেয়ের—বলেই ফের চুপ। সামনেই একটা বস্তি। আমি চোখ মুছে ব'সে ভাবতে লাগলাম—কত কী আথাল পাথাল! হঠাৎ একটা চিন্তায় চমকে উঠলাম: বিচিত্র বটে ঠাকুরের লীলা! —যারা ভেবেছিল প্রাণে বাঁচবে বিমান ঘাঁটির রক্ষণাবেক্ষণে—তারাই পড়ল মারা, আর যার আশ্রয় বলতে কেউ ছিল না—তার ভক্ষকই হ'ল রক্ষক!

"মাসিমা চোখ মুছে বললেন: 'সত্যি মা! আমরা'—

"আমি বললাম: 'তারপর?'

"সতী বলল: 'একটু পরেই এল সেই বস্তি। এবার আর অন্য পথ ছিল না—ঐ বস্তির মধ্যে দিয়ে ছাড়া, আশেপাশে কেবল খোলা মাঠ আর এখানে ওখানে ঘর। রহমৎ ফের মনে করিয়ে দিল যেন একটি কথাও না কই। বলতে না বলতে দেখি—অদূরে চারপাঁচটা গুণ্ডা! আমার খেয়ালই ছিল না যে আমার মুখে বোরখা নেই, রহমৎ তো আর পিছন দিকে তাকাবার ফুরসৎ পায়নি, তাই আমাকে সাবধান করে দিতেও পারেনি। ওরা বোধ হয় আমার সিঁথিতে সিঁদুর দেখেই উঠল হৈ হৈ করে: কাফের, কাফের—পকড়ো, পকড়ো! চমকে উঠে রহমৎ পিছনদিকে ঘাড় ফিরিয়েই চেঁচিয়ে উঠল: মা! বোরখা—বোরখা! আর বোরখা—ওরা তখন দেখে ফেলেছে!—ওদের মধ্যে দুজন হাত তুলে দাঁড়ালো আমাদের মোটরের সামনে: রোকো, রোকো! রহমৎ এই প্রথম ভুল ক'রে বসল—ব্রেক কষল। ওরা ছুটে আসতেই রহমৎ গর্জে উঠল: হঠ্ যা! কিন্তু কে শোনে তখন? একজন এসে ধরল রহমতের পাশের দরজার হাতল। সঙ্গে সঙ্গে ও বিদ্যুৎবেগে পাশের মোটা লাঠি তুলে নিয়ে তার মাথায় এক ঘা। সে যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে ছিটকে পড়ল এক তাল সুরকির উপর। হৈ হৈ করে আরো দুজন এল ধাওয়া ক'রে। রহমৎ আর দ্বিধা না ক'রে সোজা মোটর চালিয়ে দিল। একজন মাডগার্ডের ধাক্কায় ঠিকরে পড়ল বাঁ পাশে অন্যজন দুম করে পড়ে গেল মোটরের সামনে—সঙ্গে সঙ্গে মোটর উঠল লাফিয়ে তার দেহের উপর দিয়ে। অমনি চারদিকের বস্তি থেকে হাঁ হাঁ করতে করতে লোক এল ছুটে—কিন্তু ততক্ষণ আমাদের গাড়ি তিনশ গজ দূরে। আমি তাড়াতাড়ি বোরখা পরে পিছনের জানলা দিয়ে তাকাতেই দেখলাম দুটো দাড়িওয়ালা মুসলমান সাইক্লে চড়ছে। কিন্তু আমার নতুন বুইগ মোটর, রহমৎ অ্যাকসেলারেটার টিপল... কাঁটা নড়তে নড়তে পঞ্চাশ মাইলের নম্বরে এসে পৌঁছল, তার পর রাস্তা খোলা—কাঁটায় দেখলাম চলেছি ঘণ্টায় ষাট মাইল—সাইক্লের সাধ্য কি? মিনিটখানেক বাদেই পিছনদিকে আর কোনো আরোহীকে দেখতে পেলাম না।

"তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রহমৎ বলল: কী কাণ্ড বাধিয়ে দিলে মা! বোরখা খুলতে মানা করলাম এত—আমি হেসে বললাম: আমাদের কি বোরখা পরা অভ্যাস আছে? ও বলল: তা বটে। কিন্তু আর খুলো না মা, কেমন? বড় বেঁচে গিয়েছি। আমি লজ্জিত হয়ে বললাম: আর এমন ভুল হবে না।

"খানিক বাদে—প্রায় এক ঘণ্টা হবে—থামলাম এসে একটা চালাঘরের সামনে। ও বলল: আর ভয় নেই—এবার বোরখা খুলে ফেল, এখানে একটু জিরিয়ে যা হোক দুটো খেয়ে নাও। আমি বললাম: এখানে কেন? ও বলল: 'আমার বাড়ি। আমার প্রতিবেশীরা কেউ নেই সবাই গেছে শহরে লুঠতরাজ করতে। বলেই ম্লান হেসে: আমিও গিয়েছিলাম মাঈ। কেবল দেখ আল্লার কাণ্ড: কী করতে বেরিয়েছিলাম—কী ঘটে গেল চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে! এখানে কেউ নেই। আর যদি থাকেও—কুছ পরোয়া নেই—এ আমার এলাকা—দুর্দান্ত রহমৎ খাঁকে ওখানে সবাই ডরায়। কোনো ভয় নেই তোমার।

"এই ভয় নেই শুনেই আমি ভেঙে পড়লাম। ওর চালাঘরে নেমেই ওর চাটাইয়ের উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে কান্না আর কান্না। আমার না হয় ভয় নেই, কিন্তু আমার নন্দাইয়ের শাশুড়ির—বিশেষ ক'রে আমার ননদের? ক্রমাগতই মনে হয় ওর কথা—ওকে ওরা বেচবে, আর প্রাণ কেঁদে ওঠে। আহা আমার ননদের বয়স সবে বাইশ! তার উপরে সুন্দরী। ওর কী দশা হবে?

'রহমৎ আমার মাথার কাছে ব'সে আমার মাথায় কেবল হাত বুলোয় আর ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলে: মা...মা...মা! আর কীই বা বলবে সান্ত্বনা দিতে?

'খানিক পরে আমি নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসতেই ও কোণে উনুন থেকে গরম জল নামিয়ে চা করে আমার সামনে ধরল। পাশে একটা রেকাবিতে দুটো মোটা রুটি, গুড় আর একটি আপেল। বলল: 'কিছু খেয়ে নাও মা। দিল্লি পৌঁছতে রাত আটটা নটা হ'য়ে যাবে।

আমি বললাম: আমি কিছুই খেতে পারব না তুমি খেয়ে নাও। ও বলল: মা তুমি না খেলে আমি কেমন ক'রে খাই বলো? তুমি এখন তো শুধু আমার মা নও, আমার মেহমান যে!

'অগত্যা আমি এক পেয়ালা চা আর একটু রুটি ভেঙে মুখে দিয়েই বললাম: আর না। ও বলল: আর একটু খেয়ে নাও মাঈ—পথে আর দাঁড়ানো চলবে না সারা পাকিস্তানেই আগুন জ্বলে উঠেছে। দিন থাকতে লাহোর পেরুতে না পারলে তোমাকে হয়ত বাঁচাতে পারব না। আমি বললাম: লাহোর এখান থেকে কত দূর? ও বলল: এক শ মাইল হবে। ব'লে নিজের জেব থেকে একটা ঘড়ি বার ক'রে: এখন বেলা সাড়ে বারটা—আমরা চার ঘণ্টার পথ এসেছি। লাহোরে পৌঁছতে হয়ত তিনটে বাজবে। যদি কোনোমতে একবার লাহোর পেরুতে পারি তাহ'লে কেল্লা ফতে।

"আমি খেতে খেতে ওর জীবনকাহিনী শুনতে লাগলাম। ও বলল: মা! এ-অঞ্চলে আমার খুব নাম ডাক। দুর্দান্ত লোক আমি। হিন্দুকে দেখলেই মারব পণ নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে একদল গুণ্ডার দলপতি হয়ে কাল রাতে মতলব এঁটে-ছিলাম—ভোর থেকেই মারধর লুঠতরাজ শুরু করব। কেন এ-পণ নিয়েছিলাম শুনবে? জলন্ধরে হিন্দুরা আমার একমাত্র মেয়েকে খুন করেছে গত দাঙ্গায়। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছিলাম। রাওলপিণ্ডিতে আমরা আজ ভোরে উঠেই এক ধনী হিন্দুর বাড়ি লুঠ করেছি সবাই মিলে—যদিও যাঁর বাড়ি তাঁকে ধরতে পারিনি। কাল মাঝ রাত্রেই তিনি খবর পেয়ে মোটরে ক'রে পালিয়েছেন সপরিবারে। তাই আমি আরো রুখে উঠে চড়াও হই তোমাদের বাড়িতে। কিন্তু মা, হঠাৎ তোমার মুখের পানে চেয়েই চমকে উঠলাম। বলতে বলতে ওর চোখে জল, বলল: মা আমার দৌলৎও ছিল ঠিক তোমারি মতন মেয়ে—ফোটা ফুলটি। বয়সে তোমার চেয়ে হয়ত দু-এক বছর ছোটই হবে, কিন্তু তার রং একেবারে তোমার মত, ঠিক এমনিই আপেলের মতন লাল টুক টুক করত তার গাল দুটি—এমনি ডাগর কালো চোখ—আর সব চেয়ে আশ্চর্য—তার গালেও ঠিক কি এমনি একটি তিল ছিল। বলতে বলতে ওর দু গাল বয়ে দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে ব'লে চলল: ঠিক যখন ওরা তোমার গায়ে হাত তুলতে যাবে—তুমি বললে: তোমাদের ঘরে কি মা বৌ মেয়ে নেই? আমার বুকে কে যেন হাতুড়ি মারল। মনে হ'ল যেন আমার দৌলত আমাকে মনে করিয়ে দিল আমি কী ছিলাম কী হ'তে চলেছি! ...কিন্তু দেখ আল্লার খেল্: কোথেকে কী হয়! তোমাকে দেখতে না দেখতে আমার মধ্যে জেগে উঠল সেই রহমৎ খাঁ যে মানুষই ছিল মাঈ, শয়তান ছিল না। তারপরও মনের কোণে একটু কুণ্ঠামতন ছিল হয়ত। কারণ মনকে বোঝাচ্ছিলাম যে, এত নরম হচ্ছি কিসের লোভে? এমন সময় তোমার মুখে দেখতে পেলাম—কী যে দেখলাম জানি না

মা। কিন্তু চমকে গেলাম—যখন তুমি বললে তোমার ঠাকুরকে না নিয়ে তুমি নড়বে না। আমরা মুসলমান মা! কিন্তু আমি জোয়ান বয়সে বারো বৎসর ঢাকাতে ছিলাম—বাস চালাতাম। তাই হিন্দুরা প্রতিমা কী রকম ভালোবাসে জানতাম। বরাবরই আমার মনে হয়েছে এ সব বড় জোর পুতুলখেলা। কিন্তু যখন দেখলাম বাঁচবার সুযোগ পেয়েও তুমি সে-সুযোগ পায়ে ঠেললে ঐ পাথরের মূর্তির জন্যে তখন, কেন জানি না, আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন ক'রে উঠল। কিসে কী হয় কেউ কি জানে মা? আমি শক্ত মরদ—তার ওপরে আজ দুর্দান্ত গুণ্ডা। কিন্তু তোমার ঐ ছোট্ট একটি কথায় আমার বুকে জেগে উঠল দরদ—চোখে জল। মনে হ'ল—কী যে ঠিক মনে হ'ল বলতে পারব না—কিন্তু সব যেন ভেস্তে গেল ভাবতে যে, পুতুলকে মানুষ সত্যি এমন ভালোবাসতে পারে তাহ'লে? জানি না মাঈ, ঐ পুতুলের মধ্যে দিয়ে আল্লা কথা কন কি না—কিন্তু মনে হ'ল যে-মেয়ে ওকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতে পারে, সে ঠিক গড়পড়তা মেয়ে নয়। তাই আর কুণ্ঠা রইল না, ঠিক করলাম তোমাকে বাঁচাবই বাঁচাব যে ক'রে পারি। কিন্তু আর দেরি করা নয়—বেলাবেলি তোমাকে নিয়ে যদি লাহোর পেরুতে পারি তবেই না মরদের মরদ।

'আমার চোখে জল এল। আমি বললাম: রহমৎ খাঁ! তুমি আমার শুধু যে প্রাণ মান ইজ্জৎ বাঁচিয়েছ তাই নয়, তোমার কৃপাতেই আমি আমার ঠাকুরকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। এ-ঋণ শোধ হবার নয়। কিন্তু আমার জন্যে যখন এতোই করলে, তখন আর একটু করবে দয়া ক'রে? রাওলপিণ্ডিতে যখন ফিরে যাবে, একটু খোঁজ করবে—আমার শাশুড়ি-ননদের?

ও ম্লান হেসে মাথা নেড়ে বলল: মাঈ! রাওলপিণ্ডিতে আমি কি আর ফিরতে পারব? এতক্ষণে সেখানে সবাই জেনে গেছে রহমৎ খাঁ কাফেরকে বাঁচাতে মুসলমান মেরেছে—যার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছি সে হয়ত মরেই গিয়েছে। কাজেই আমি এখন ধরতে গেলে ফেরার। ওখানে আমার এক ভাইপো আছে, তাকে একবার লিখে দেখতে পারি—তবে মিথ্যে ভরসা দিয়ে কী হবে মাঈ—ওদের কেউ ফিরবে না। তোমার ননদ হয়ত বাঁচলেও বাঁচতে পারে—যদি সে খুব সুন্দরী হয়—কিন্তু সে-বাঁচা যে কেমন—বুঝতেই তো পারো। ব'লে ম্লান হেসে—মা! মানুষ যখন জাহান্নমে যায়, তখন সে কি আর মানুষ থাকে? আমি নিজেকে দিয়েই কি জানি না—মাথায় একবার খুন চেপে গেলে আমাদের কী চেহারা হয়? ব'লে ফের ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে: মা! আমি চোখের ওপর যা দেখেছি তারপর আর যেন বিশ্বাস হতে চায় না যে, গুণ্ডা যাদের বলি, তাদের সঙ্গে ভদ্রদের কোনো সত্যি তফাৎ আছে। মনে হয় বুঝি মানুষের মুখোশ পরে আমরা জানোয়ার আজো ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি—যেতে যেতে সে-মুখোশ খ'সে পড়লেই দেখতে পাই নিজ মূর্তি। কিন্তু যাক, এখন চলো। ব'লে দুটো কৌটোয় কিছু রুটি আর একটা ঘড়ায় জল ভরে নিয়ে মোটরে চড়ে বসল। তখন বেলা একটা হবে।

'পথে কী দেখব—গুণ্ডারা ফের রুকবে কি না, এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ফের ভুলে গেলাম তাঁর করুণা মামাবাবু, যিনি তাঁর যাদুতে ঘাতককে দাঁড় করালেন রক্ষক। কে জানে কী হবে ভাবতে ভাবতে ঠাকুরকে ডাকতেও ভুলে গেলাম—হয়ত তাই ফের এল আপদ এত অভাবনীয় পথ বেয়ে। হ'ল কি, রহমৎ খুব বেগে মোটর চালাচ্ছিল একটা শহরতলীতে—এক পুলিস রাস্তার মাঝখানে হাত তুলে হাঁকল রোকো। ও ভ্রূক্ষেপ না করে হট যাও—হেঁকেই অ্যাকসেলারেটর টিপল—পুলিসের পুলিসলীলা আর একটু হলেই সাঙ্গ হয়েছিল আর কি—যাকে বলে রগ-ঘেঁষে বেঁচে যাওয়া। যখন সে দেখল মোটর আরো বেগে ধাওয়া করেছে—তখন সে 'আরে বাপ্' ব'লে ঘোর চিৎকার করে লাফ দিতেই টক্কর খেয়ে পড়ে গেল—আমাদের গাড়ির মাডগার্ডে তার টুপি গেল আটকে। ঠারো ঠারো—ব'লে চিৎকার করতে করতে আর দুজন পুলিস ধাওয়া করল—আমি গাড়ি থেকে মুখ বার ক'রে দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে আরো তিন-চারজন পুলিস ছুটে এল বন্দুক হাতে। আমাদের মোটর নিশানা করে দুজন গুলি ছুড়ল—একটি হবি তো হ এসে বিঁধল সেই মাডগার্ডে ঝুলন্ত টুপিতে। রহমৎ হঠাৎ ডান দিকে একটা মোড় দেখে বেঁক নিল। অত বেগের মাথায় বেঁক নিতে গাড়ি কাৎ হয়ে পড়ে আর কি—কিন্তু যা হোক, টলতে টলতে টাল সামলে নিল। ও হাঁফ ছেড়ে বলল: উঃ. বড় বাঁচনই বেঁচে গেছি মা! এই মোড়টা এখানে নিতে না পারলে ওরা আরো গুলি ছুঁড়ত। আল্লা হো আকবর!

'আমি আল্লার নামে চমকে উঠলাম: এ-বিপদের মধ্যে আমি ক'বার স্মরণ করেছি তাঁকে যিনি বার বার এভাবে বাঁচিয়ে দিলেন? পাথরের ঠাকুরকে বুকে জড়িয়ে মনে মনে বললাম: 'ঠাকুর, অপরাধ নিও না—পারি না মনে রাখতে যে মারতেও তুমি রাখতেও তুমি।' অমনি—কী বলব মামাবাবু, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—আমি সত্যি যেন অনুভব করলাম ঠাকুর চলেছেন গাড়ির শুধু ভিতরে বসেই নয়, বাইরেও সমান ছুটে ঘণ্টায় ষাট মাইল—ঠিক দেহরক্ষীর
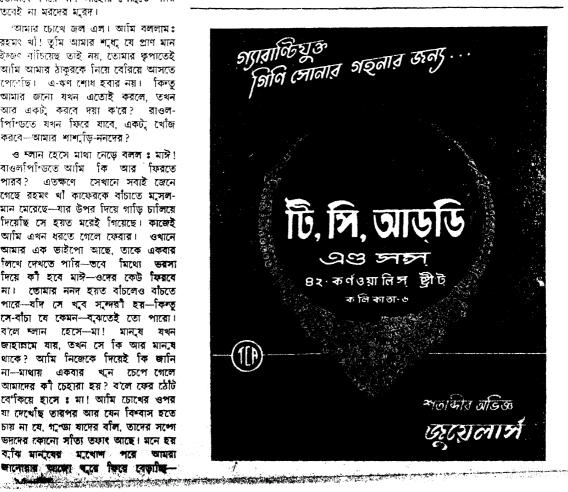
মতন! সে যে কী প্রত্যক্ষ অনুভূতি হাজার চেষ্টা করলেও বলে বোঝাতে পারব না।

"তারপর সময়ে সময়ে এখানে ওখানে সোজা পথ ছেড়ে ঘোরা সড়ক ধরে বিশেষ ক'রে পুলিসের থানা এড়িয়ে আমরা লাহোর পৌঁছলাম বিকেল তিনটেয়। রহমৎ এ অঞ্চলে বহুদিন মোটর ড্রাইভারের কাজে বাহাল ছিল বলেই এ সম্ভব হল—পথঘাট ছিল ওর নখদর্পণে। কিন্তু ভাবো একবার মামাবাবু, ও যদি মোটর-ড্রাইভার না হয়ে আর কিছু হ'ত, তবে আজ তোমার সতীর —উঃ কী যে আমার হ'ত ভাবতে পারো?' বলেই দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

ওর সে কী কান্না। মাসিমাও চোখে কাপড় দিলেন।

অসিত বলল ঃ "আমি কিছু বললাম না —কাঁদে কাঁদুক। ঠাকুরের সঙ্গে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে যে-শুভদৃষ্টি হয় তার দাম যে কত, খানিকটা তো জানতুম। আমি শুধু চোখ বুজে মাথায় দুহাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানালাম তাঁকে—যাঁকে সুখের দিনে আমরা ভুলে থাকলেও দুর্দিনে আঁকড়ে না ধ'রে পারি না। আমার মনে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি ছেয়ে গেল। সে যে কী অপরূপ ভাবাবেশ!...

"হঠাৎ চাপা কান্নার শব্দে চমকে উঠলাম। চোখ চেয়ে দেখি ঃ সতী মাটিতে শুয়ে—বিগ্রহটি রাখা হয়েছিল একটি চৌকির উপর, তার সামনেই। কেবল কাঁদছে আর আর মাথা কুটছে ঃ 'মাফ করো ঠাকুর যে তোমাকেও আমি অবিশ্বাস করেছিলাম নিষ্প্রাণ ভেবে।' মাসিমা আমার দিকে তাকালেন উদ্বিগ্ন হয়ে। আমি ইঙ্গিতে তাঁকে জানালাম কোনো কথা না কইতে।

"একটু পরে সতী শান্ত হয়ে উঠে বসতে মাসিমা ওকে ধরে নিয়ে গেলেন শোওয়ার ঘরে। তখন আমি রহমৎকে ডেকে আমার ঘরের সামনের বারান্দায় একটি খাট আনিয়ে নিজে হাতে বিছানা ক'রে দিলাম। ও আমাকে বাধা দিতে যায়। আমি বললাম ঃ 'ভাই, অপরের মেয়েকে ভালোবেসে যে শুধু নিজের মেয়ের শোক ভোলা নয়—নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারে তার আদর করতে পারেন এক ঠাকুর—আমাদের সাধ্য কতটুকু বলো? শুধু তোমাকে বলা যে ধন্য তুমি যার মধ্যে তিনি দিয়েছেন এমন ভালোবাসার শক্তি।'

"ওর শাণিত কঠিন দৃষ্টি চোখের জলে নরম হয়ে এল। ও আমার পা ছুঁতে মাথা হেঁট করতে যেতেই আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ও বলল ঃ 'করেন কি বাবুজি, আমি ছোট জাত, মুসলমান—আপনি—' আমি বাধা দিয়ে বললাম আর্দ্র কণ্ঠে ঃ 'ভাই, আমাদের ঠাকুরের একটি উপাধি—ভাবগ্রাহী, মানে—তিনি মানুষকে বিচার করেন তার ভাব দেখে। যারা তাঁকে সত্যি ভালোবাসেনি শুধু তারাই মানুষকে বিচার করে জাত দেখে।'

"ও একটু চুপ ক'রে থেকে বলল ঃ 'বাবুজি, আমার দৌলতকে যখন হিন্দু গুণ্ডোরা খুন করে তখন প্রতিহিংসার জ্বালায় আমি পণ নিয়েছিলাম—নরকেই যাব যেখানে আল্লা নেই শুনেছি। কিন্তু—' বলতে বলতে টপ্ টপ্ ক'রে দু' ফোঁটা চোখের জল ওর গালে গড়িয়ে পড়ল—'মাঈকে দেখে যেন আমার মনে ফিরে এল হারানো বিশ্বাস। আর একটা কথা বলব বাবুজি? বিশ্বাস করবেন কি না জানি না—কিন্তু সত্যি বলছি—যখন মা-আমার চেঁচিয়ে উঠল—ঠাকুরকে ছেড়ে যাব না—আমার কানে কানে কে যেন বলল ফিশ ফিশ ক'রে ঃ এই তোর ধর্ম মেয়ে, ধর্ম মা—এর সেবা করলেই ঘুচবে তোর দুঃখ। ......তাই......' বলে চোখ মুছেঃ মাকে কি আপনি আমার হয়ে একটু বলতে পারেন—আমাকে এ এক্তিয়ার দিতে? আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে বাবুজি মাথার মধ্যে দপ দপ করে সর্বদাই—ডাক্তার বলেছে রক্তের চাপ এত বেশি যে, যে কোনো মুহূর্তে সব শেষ হ'য়ে যেতে পারে। তাই আমার বিনতি—যে কটা দিন বাঁচি যেন মা-র সেবাতেই কাটে।

"আমি তৎক্ষণাৎ উঠে সতীকে গিয়ে বললাম। সতীর চোখ ছল ছল ক'রে উঠল। ও আমার সঙ্গে আমার ঘরে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল ঃ 'বেশ তো সর্দারজি, চলো আমার সঙ্গে হরিদ্বার। আমি যে কুটিরে থাকব সেখানে তোমারো ঠাঁই হবে। যাবে তো?' ও হেসে বললঃ 'মা? যে খেতে পায় না তাকে কি সাধতে হয় খেতে? কেবল একটা কথা—কিছু মনে কোরো না, শুনেছি তোমার গুরু হিন্দু সাধু—আমি ছোট জাতি মুসলমান—' আমি বাধা দিয়ে বললাম 'যদি তিনি সত্যি সাধু হন, তবে তাঁর জাত গেছে জেনো। আর যদি তাঁর জাতধর্ম-বিচার এখনো থাকে তবে তিনি পুরোপুরি সাধু নন। কিন্তু আজ আর নয়—বিশ্রাম করো। কাল সব ব্যবস্থা হবে ধীরে সুস্থে।

* * * * *

অসিত বললঃ পরদিন সকালবেলা সতী আমার কাছে এসে আমার হাতে একটি চিঠি দিল। বলল ঃ 'আমার স্বামীকে লিখেছি মামবাবু। তবে যদি তুমি বারণ করো তাহ'লে এ-চিঠি পাঠাব না।'

"ও লিখেছিল ঃ 'আমার জন্যে তুমি অনেক সয়েছ। আমিও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারলাম না—কিছুতেই। সংসারে থেকে সাধনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি সন্তান চেয়েছিলে—তাই আমার কর্তব্য আমি করেছি। কিন্তু এর বেশি যদি না পারি তবে তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না? আমি জানি তুমি মহৎ। তাই মনে হয় পারবে—যদিও আজ হয়ত তোমার মনে হ'তে পারে—মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক—যে আমি হৃদয়হীন, স্নেহহীন। যদি এভাবে আমাকে অপরাধী ক'রে তুমি মনে শান্তি পাও তবে আমি প্রতিবাদ করব না। কেবল আমার একটা অনুরোধ আছেঃ আমার নামে ব্যাংকে যে দুলক্ষ টাকা আছে সে টাকা আমি গুরুদেবের চরণে নিবেদন ক'রে দিতে চাই—এতে তুমি অমত কোরো না। করলে আমি দুঃখ পাব কিন্তু আমি নিরুপায়, কেননা নিঃস্ব আমাকে হ'তেই হবেঃ পিতৃ-ঋণ স্বামি-ঋণ আমি শোধ করেছি, এবার গুরুঋণ শোধের পালা। আমার কেবল আর একটা ঋণ আছে ঃ সন্তান ঋণ। গোহাটিতে আমার যা কিছু জমি জমা আছে বিক্রি করলে কম ক'রেও দুলক্ষ টাকা হবে। এসব রইল রজতের জন্যে।

আমার শেষ অনুরোধ—তুমি আবার বিবাহ কোরো। সত্যি বলছি, আমি তাতে কষ্ট তো পাবই না, বরং শান্তি পাব ভেবে—যে আর একজন তোমাকে সুখী করছে

পেরেছে যা আমি বহু চেষ্টা ক'রেও পারি নি। কেমন, লক্ষ্মীটি! আমাকে প্রসন্ন মনে অনুমতি দাও সন্ন্যাস নিতে। তোমাকে দুঃখ দিতে আমার মন সরে না। কিন্তু কী করব বলো? আমি যে আর পারছি না সইতে। তোমার কাছে আমি নানা দিক দিয়েই ঋণী—তাই তোমাকে দুঃখ দেব ভাবতেও বুকের মধ্যে খচ খচ করে। কিন্তু আমি যে আজ নিরুপায়। তুমি কি এ-বিদায়ের দিনে এইটুকুও বুঝবে না যে, ঠাকুর যাকে তাঁর পায়ে টেনে নেন তার তাঁর চরণ ছাড়া ঠাঁই থাকে না?'

"সতীর অনুরোধে আমিও অরুণকে লিখলাম—বিশেষ করে সতী কী ক'রে রক্ষা পেল সে খবর দিয়ে।

তিন চার দিন বাদে উত্তর এল। অরুণ আমাকে খুব শান্তভাবেই নিয়েছিল, লিখলঃ

"আমি তোমার বৈরাগ্য বুঝতে অক্ষম হ'লেও তোমার ব্যথা বুঝেছি নিজের ব্যথা দিয়ে। তাই ক্ষমা করবার প্রশ্নই উঠে না। ভগবান আছেন কি না আমি জানি না। আমার মা বোনের কোনো খবরই পাই নি—ভগবান তাঁদের দেখছেন কিনা বলতে পারি না। তবে এটুকু তোমাকে বলতে পারি যে, আমার মন আজ অশান্ত হওয়া সত্ত্বেও দৃষ্টি আমার ঝাপসা হয়নি—তোমাকে আগেও যেমন বিশ্বাস করতাম, আজও তেমনিই বিশ্বাস করি। তাই তুমি যদি আমাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে সত্যিই শান্তি পাও তবে আমি আমার নিজের মনঃকষ্টের জন্যে তোমাকে দায়িক করব না জেনো। কেবল একটা কথা তোমাকে ব'লে আমি হালকা হ'তে চাই। কথাটি এই যে তোমার কোনো কোনো বিমুখতাকে আমি বুঝতে পারতাম না বুঝতে চাইতাম না ব'লেই। আজ বুঝেছি—তোমার মতন মেয়ে বিবাহ করবার জন্যে তৈরি হয় নি। আমার ভুল হয়েছিল এইজন্যে যে, আমি গড়পড়তা মেয়েদের গজকাঠি দিয়ে মাপতে চাইতাম এমন মেয়েকে যে আর যাই হোক না কেন—গড়পড়তা নয়। আর আজ এটুকু বুঝবার কিনারায় এসেছি ব'লেই এটুকুও বুঝতে আমাকে বেগ পেতে হচ্ছে না যে তোমার উপর জোর খাটাতে গেলে আমাদের অশান্তি বাড়বে বৈ কমবে না। তাছাড়া তোমার মামাবাবুর চিঠিতে তোমার আশ্চর্য বেঁচে-যাওয়ার খবরে এও বুঝতে পেরেছি যে এরূপ ক্ষেত্রে তোমার মতন জন্মভক্তিমতীর মনে ভগবানের করুণায় বিশ্বাস আসা স্বাভাবিক। এর বেশি কিছু আমি বলব না আজ। কারণ যে-পথ তুমি নিয়েছ সে-পথ সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই আমার নেই, গুরুবাদ বলতে কী বোঝায় তাও আমি জানি না। আমি শুধু জানি একটা কথা ঃ যে, খাঁটি মানুষ যে-পথেই চলুক না কেন, পথ হারাতে পারে না।

কেবল তোমার একটা কথায় আমার মনে হাসি এল। তুমি আমাকে বিবাহ করতে বলতে পারলে! তবে মনে হ'ল—ভালোই হ'ল—শোধবোধ ঃ শুধু আমিই যে তোমাকে চিনতে পারি নি তাই নয়, তুমিও আমাকে আদৌ চিনতে পারো নি। নৈলে এমন কথা ভাবতে পারতে কি যে, তোমাকে ভালোবাসার পরেও আর কোনো মেয়েকে আমি ভালো-বাসতে পারি?

শেষে কেবল একটি কথা ঃ যদি কখনো তুমি ফিরতে চাও—যদি গুরু বা ভগবান সম্বন্ধে তোমার ধারণার পরিবর্তন হয় তখন হয়ত ফিরতে তোমার মন চাইবে কিন্তু সঙ্কোচে বাঁধবে তাই বলছি—যদি তুমি যা চাইছ তা না পাও—আমার গৃহদ্বার তোমার জন্যে খোলাই থাকবে—এমন কি যদি তুমি আমাকে আর কখনো স্বামীর অধিকার না দাও—তাহলেও। কারণ আর কিছুই নয়, শুধু এই যে, তোমাকে আমি সর্বান্তঃকরণে ভালোবেসেছি, আর ভালোবাসা যেখানে সত্য বিচার সেখানে নিরস্ত।"

* * * *

অসিত বললঃ "পরদিন সকাল বেলা আমরা তিনজন রওনা হলাম সতীর মোটরে। আনন্দগিরিকে সতী আগেই সমস্ত কথা লিখে জানিয়েছিল।

'হরিদ্বারে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল চারটে। চারদিকে সোনার আলোর বান ডেকে চলেছে। আনন্দগিরির কুটীরে পৌঁছতেই গঙ্গার শোভায় ও কুলুধ্বনিতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মনে হ'ল আকাশে বাতাসে যেন মধু ঝরছে...মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ......।

"দীপ্তানন সৌম্যমূর্তি শুভ্রশ্মশ্রু গেরুয়া পরা গুরুর পায়ে সতী লুটিয়ে পড়ল। তিনি ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। সতী মাথা তুলতে ওর চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বললেন ঃ কী মা লক্ষ্মী? বিগ্রহ নিষ্প্রাণ, না জীবন্ত?' সতী মাথা নীচু করে চোখ মুছল।

'তারপর আমি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই আনন্দগিরি বললেনঃ এসো বাবা!'

কথাবার্তা শুরু হ'ল। আনন্দ গিরি বললেন সতীকে ঃ ঠাকুরের মত পেয়েছি মা। আমার কুটীরের পাশেই গঙ্গাতীরে একটি ছোট বাড়ি বিক্রি আছে। আমি বাড়ি-ওয়ালাকে বলেছি—আমার মা লক্ষ্মী কিনবেন—আর নামও ঠিক করে রেখেছি আগে থেকে ঃ লক্ষ্মী আশ্রম। কেমন? ঠিক নাম হয় নি?'

'সব শেষে রহমৎ এগিয়ে আসতেই তিনি হাত বাড়িয়ে বললেনঃ আও ভাই, বৈঠো।'

"বাংলায়ই বললঃ আমি বাবাজিকে কালই রাত্রে বলছিলাম যে আমি মা-র কাছে থেকে শেষ জীবনটা তাঁর সেবায়ই কাটাতে চাই—যদি না আমি মুসলমান বলে সাধুজির আপত্তি থাকে।'

"আনন্দ গিরির মুখ কেমন যেন হয়ে গেল। ঠোঁটে হাসি, চোখে আলো! ওর চোখের দিকে খানিক এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন ঃ 'বোসো সর্দারজি।' ব'লে ওকে সাদরে নিজের পাশেই বসিয়ে ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একটি হাত সস্নেহে ওর কাঁধে রেখে বললেনঃ 'একটি গল্প বলি শোনো। আমাদের দেশে এক মস্ত গুরুজি ছিল—জ্ঞান ভক্তি প্রেম সন্তদের মধ্যেও যাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি ছোটজাতের মধ্যেই জন্মেছিলেন—জোলা। কিন্তু হ'লে হবে কি, ভগবান যাকে গ্রহণ করেন পণ্ডিতরা তাঁকে বর্জন করলেও মানুষ তাঁকে বরণ করবেই। দেশজোড়া হল তাঁর নাম। সবাই তাঁকে মনে করে আপনার। তিনি যখন মহাপ্রয়াণ করেন তখন তাঁর দেহ নিয়ে পড়ল কাড়াকাড়ি মুসলমানরা বলে ইনি আমাদের পীর, আমরা এঁকে গোর দেব, হিন্দুরা বলে ইনি আমাদের গুরু, আমরা এঁর সংকার করব। দুই দলে মহা দাঙ্গা হবার জোগাড়—এমনি সময়ে একটা ঝাপটা এসে শবদেহের ঢাকনি চাদরটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। দুই দলই অবাক—দেহ অদৃশ্য! তখন ওদের চৈতন্য হ'ল—কাকে নিয়ে করছিলাম দলাদলি যে সব দলেরি পারে চলে গেছে ভগবানের আপন হয়ে? বলতে বলতে আনন্দগিরির দীপ্ত চোখ দুটি বাষ্পাভাষে চিকিয়ে উঠল, তিনি গান ধরে দিলেন ভাবাবেশেঃ

খোদা জো মসজীদ বসতু হৈ—ঔর
মুলুক্ কেহিকেরা?
তীরথ মুরত রাম নিরাসী—বাহির করে
কো হেরা?
পুরব দেশমে হরিকা বাসা, পশ্চিম
অলহ মুকামা?
সুনো ভাই সাধু ঃ দিলমে খোজো—য়হী
করীমা রামা।
জেতে ঔরত মরদ উপানী—সো সব
রূপ তুমহারা।
কবীর বালক—অলহ রামকা—সো গুরু
পীর হমারা।

* * * *

বার্বারা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে ঃ "এর মানে?" অসিত গুন গুন করে গান ধরে দিলঃ

যদি খোদার নিবাস হয় শুধু মসজিদে,
তবে আর সব দেশ বলো কার?
যদি রাম শুধু তীর্থে ও প্রতিমায় রাজে,
তবে কে লবে ভবের সমাচার?
ঘর রহিম বাঁধেন শুধু পশ্চিমে—
পুরবেই শুধু ঝংকারে হরিনাম?
শোনো ভাই সাধু, কান পেতে অন্তরে—
ডাকে যেথা একই সুরে রহিম ও রাম।
প্রভু, যত নর, যত নারী—জনে জনে
চায় নাকি তোমারি মাধুরী সুগভীর?
জানে কবীর ঃ রহিম রাম উভয়েই
পিতা তার—যিনি গুরু তিনিই যে পীর!

বার্বারা উঠে দাঁড়ায়, ছোট্ট একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলে "আর আমরা পাঠাই মিশনারি আপনাদের দেশে—ধর্ম কাকে বলে বোঝাতে!"

ঋতুর মর্মবাণী
বর্ণ ও সঙ্গতির ঐশ্বর্যে,
কমনীয়তায় ও মধুরতায়
শরৎ মনে দোলা দেয় আর
আনন্দের সুরপুরীর দ্বার তার কাছে
হয়ে যায় উন্মুক্ত। ঋতুর এই মর্মবাণীকে
উপলব্ধি করতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে
লক্ষ্মীবিলাস-গন্ধসুষমায় অতুলনীয়
এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে
সর্বত্র সমাদৃত।
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
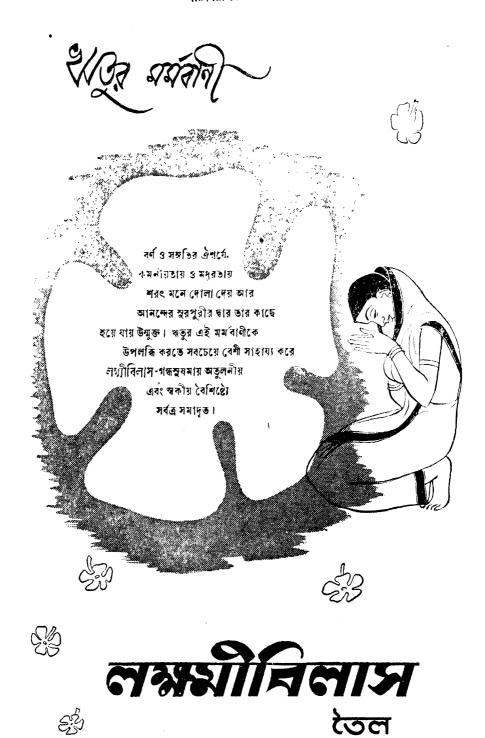
বিবাহ সম্পর্কে কিছু লিখতে যাওয়া বিড়ম্বনা বিশেষ। দুটি কারণঃ প্রথমত নয়া ভারতের আইন বেশ কড়া। নতুন আইনে বিবাহের রোমান্টিক দিক্‌টা কমে গিয়ে পোলিটিকাল ভাবটা চড়া হয়ে উঠেছে। এ যেন মধ্য যুগের 'ইন ভেস্‌টিচার ডিস্‌পিউট' যার আড়ম্বর-অনুষ্ঠান উবে গিয়ে পরিণত হ'ল ধর্মের ঘুষোঘুষিতে। এক দিকে সম্রাট, অপরদিকে খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ। কেউ

......তা হ'লে আপসে একটা মীমাংসা হয়ে যেতে পারে

কারুর কাছে মাথা নীচু করতে চাননি। রেষারেষির ফল শোচনীয় হয়েছিল, ইতিহাসে এই কথা বলে। বর্তমানে বর যদি নেয় আংটি আর কনের হাতে ওঠে 'স্টাফ্' বা লাঠি, তা হলে আপসে একটি মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিবাহটা এক কালে, এমন কি এখনও, রাজস্থানী প্যারেড হলেও আসলে এমন কিছু ঘটার ব্যাপার নয় যে তাই নিয়ে ঘটা করে লিখতে বসা চলে। তবে জীবনের একটা স্মরণীয় দিন বলে এর লোকপ্রসিদ্ধি আছে। অবশ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পৃথক হতে বাধ্য। কারুর কারুর মতে ওটি স্মরণীয়তম ঘটনা, কেউ বা বলবেন সব চেয়ে বিস্মরণীয়। আমার এক পুরানো অধ্যাপক-বন্ধু বলেন, জীবনে দুটি দুঃস্বপ্ন তাঁর হয়েছিল। একটি বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় থীসিস্ দাখিল করতে গিয়ে। আর একটি, যেদিন এক অশুভ লগ্নে কই মাছের কাঁটা গলায় আড় হয়ে বিঁধেছিল, এখনও নাকি যেটি থেকে-থেকে টনটনিয়ে ওঠে বা খচ্ খচ্ করে। মানে স্ত্রী।

তবু সমস্ত অসুবিধা বিভীষিকার কথা জেনেও সম্পূর্ণ সজ্ঞানে অনেক সরলপ্রাণ বিশ্বাসপরায়ণ মানুষ গঙ্গাযাত্রার বায়না ধরে শেষ মুহূর্তে। কারণ? ঐতিহ্যে আস্থা। মানুষের সারা জীবনটাই হচ্ছে এক আনুষ্ঠানিক পর্ব। ভূমিষ্ঠ হবার আগে থেকেই হয় অনুষ্ঠানের সূচনা, যথা পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন। আর জীবনান্তেও চলে সেই সংস্কারের পালা, যথা একোদিষ্ট সপিণ্ডীকরণ। যে কোনও দেশের যে কোনও ব্যক্তিকে অবশ্য আচার ও সংস্কারের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হয়। তবু হিন্দু সন্তানের মতন কাউকে নয়। তাই জার্মান পণ্ডিত একজন মন্তব্য করে গেছেন যে হিন্দুর জীবন জন্মের আগে থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত সংস্কারের বেড়াজালে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। আজকাল স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন সত্তার যুগেও কিছু কিছু সংস্কার যাবো-যাবো করে এখনও টিকে আছে নাম ভাঁড়িয়ে বর্ণচোরা হয়ে। যেমন বিবাহ। যতই সমাজ-বিজ্ঞান পড়ি, বুদ্ধি-বিচারের দোহাই দিই, পবিত্র বন্ধনকে সাময়িক সুবিধা-সখ্যের মুখোশ পরাই, বিবাহটা বিবাহই। অর্থাৎ সেই বিয়ে, যে বিয়ে না করানো পর্যন্ত আত্মীয়-বান্ধবের দল সুস্থ হতে পারেন না, যে বিয়ের দৃশ্য পাঁচিল ডিঙিয়ে, অন্তত ঝোলা বারান্দা থেকে বিপজ্জনক ভাবে ঝুঁকে পড়ে না দেখা পর্যন্ত প্রকৃতিস্থ বোধ করেন না। পুরানো ভালগ্যারিটি বলে নাক সিঁটকালেও বিবাহ হল পুরানো চালের মতন। একটু ভাপা গন্ধ, কিন্তু এখনও ব্যবহার আছে। মধ্যবিত্তের শূন্যপ্রায় হাঁড়িতে বা পেটে দুটি দানা এখনও দানা বেঁধে ফাঁপা প্রাচুর্যের সৃষ্টি করে।

বিবাহ আর সমাজ-নীতির বিবর্তন দেখাতে বসিনি, এটা ঠিক। তবু দার্শনিক ভঙ্গিমা না করেও বলতে হচ্ছে, জীবনকে যদি নাট্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলি যেন এক একটি খণ্ড দৃশ্য। এদের সমাবেশে জীবন-নাট্যের
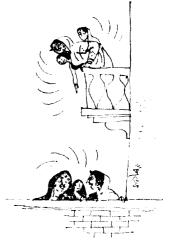
......অন্তত ঝোলা বারান্দার থেকে বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়ে......

বৈচিত্র্য, সমন্বয়েই সার্থক সমগ্রতা। এদের মধ্যে কয়েকটি আবার অপরিহার্য, না মেনে উপায় নেই। প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সমরোত্তরকাল পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত হয়ে এসেছে যে জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হল বিবাহ এবং পত্নীলাভ। সব প্রাচীন সংস্কারের পিছনেই থাকে ধর্মের অনুমোদন। বিবাহের বেলায়ও তাই। একটি আদিম অনুষ্ঠান বলেই এর সঙ্গে ধর্মভাব জড়িত। কালগুণে ধর্মের ছাপ যতই অস্পষ্ট হয়ে থাক, সামাজিক সংস্কার এবং লোকা-চারের গুরুত্ব কমে না, বোধ হয় কমবেও না। উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে লৌকিক আড়ম্বর

দিয়েই হোক্ অথবা অন্য কোনও সরল উপায়েই হোক্, একটু স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে রাখার ইচ্ছা ব্যক্তি-মনের স্বধর্ম।

দেয়ালপঞ্জীতে তিনশো' প'য়ষট্টি দিনের কালো হরফে নির্ভুল হিসেবের মধ্যে লাল অক্ষরের তারিখগুলোই মনে রাখার মতো। অতীতের ঘটনা হলো স্মৃতির সম্বল, অনাগত হলো উন্মুখর প্রত্যাশার সামগ্রী। বিবাহটাও তাই। গতানুগতিক জীবনে রঙীন তারিখের নিশানা। ফৌজদারী মামলার শেষ শুনানীর মতই এর সম্ভাবনা অফুরন্ত। তাই একে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই, মনে মনে কিংবা কাগজে-কলমে। হয় খরচের ফর্দ, নয় গদ্য কবিতা। মোট কথা, জীবনে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে থাকে যাদের আমাদের ন্যায্য মর্যাদা দিতে হয়। বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে একটি সুদুর্লভ ক্ষণের পলাতক অস্তিত্বটুকু স্থায়ী করতে চাই। ধরুন, যেদিন সেজে-গুজে দুরু দুরু বুক নিয়ে পাঠশালায় গিয়েছি, যে দিন মোড়ের দোকান থেকে প্রথম একটি কাঁচি মার্কা সিগরেট নিয়ে সরু গলিতে আত্ম-গোপন করেছি, কিংবা প্রথম যেদিন কাজে ঢুকেছি গুরুজনদের শুভকামনা আর পরশ্রীকাতরদের কটাক্ষ-দৃষ্টি নিয়ে অথবা যেদিন প্রথম কবিতা ফুটেছে চোখে কিংবা কলমে। সে দিনগুলি ভোলা যায় না। এবং ভোলা যায় না বলেই তাদের গন্ধ ও স্পর্শ-টুকু ধরে রাখি কথায়, ছবিতে। এটা হৃদয়-বৃত্তির বালাই, অম্লান স্মৃতির অনুষঙ্গ।

জন্ম মৃত্যু বিবাহ, এই তিনটেই নাকি দৈবজ্ঞের এলাকা। অথচ এবং সে-হেতু, জীবনের এ তিনটি পরম ও চরম মুহূর্ত। তার মধ্যে জন্মলগ্নটা জাতিস্মর না হলে কিছু মনে রাখার কথা নয়। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে অন্তিম চিন্তা অথবা মৃত্যুক্ষণের অদ্ভুত এলোমেলো ভাবনাগুলি ঠিক ধারণাতীত না হলেও কেউ যথার্থভাবে বলে বা লিখে রেখে যায় না। রইল শুধু বিয়ের দিন। তাই ঐ দিনটিকে কেন্দ্র করে যে সব চিন্তা জট পাকায়, যে সব অভিজ্ঞতার আভাস পাওয়া যায়, সেগুলি স্বপ্নবাসবদত্তার মতন অলৌকিক না হলেও বিচিত্র বৈকি! প্রথম পুলক ও বিস্ময়ের চমক এতই রোমাঞ্চকর যে তা নিয়ে স্মৃতির রোমন্থন চলে ডায়েরির পাতায় বা মনের খাতায়। কেননা, বিবাহ অর্থাৎ বিশেষভাবে 'বহন' করার হর্ষ-বিষাদময় ভারটুকু এতই প্রত্যক্ষ যে তাকে ইচ্ছামত বিস্মরণীর পারে পাঠানো যায় না। প্রৌঢ় বয়সেও যেমন পরীক্ষার দুঃস্বপ্ন ঘুমের মধ্যেও হৃদয়কে সচকিত করে তোলে, বৃদ্ধ বয়সেও তেমনি বিবাহের প্রথম রজনীর স্মৃতিতে মন আবেগে অথবা উদ্বেগে আকুল হয়ে ওঠে।

এখন এই বিয়ে ব্যাপারটি নিয়ে কেন এত জটলা হয়ে থাকে, লক্ষ কথা না হোক্, হাজার কথার চালাচালি হয়, সেটা খুব দুর্বোধ্য নয়। পাত্র-পাত্রীর মনের অবস্থা, আত্মীয়-স্বজনের চঞ্চলতা, উভয়পক্ষের অভি-ভাবকদের দুর্ভাবনা সহজেই অনুমেয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন চালু হলেও ভবিষ্যৎ দায়িত্বের গুরুত্ব কমছে না। দ্বিতীয় তৃতীয় অথবা চতুর্থবার দার পরিগ্রহ করতে গিয়েও ঝানু ইংরেজ ফরাসী আমেরিকান বর অত্যন্ত উচাটন হয়ে পড়ে, একথা বিদেশী উপন্যাস-পাঠকের অজানা নয়। কি দেশী, কি বিদেশী সাহিত্যে এই বিয়ের কথা ও দৃশ্য অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। এমন কি, বিবাহ-বার্ষিকীর দিনটি কোনক্রমে ভুলে গেলে নায়ক-নায়িকার মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্য হয়। বাইরে যতই কাজ থাকুক, গোপনে দাম্পত্য বিশ্বস্ততার হানি করেও ঐ দিনটিতে মাল্য ও উপহার নিয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি ঘরণীর মনস্তুষ্টি সাধনে যত্নবান হন। তাই মনে হয়, বিবাহের অর্থ আর উদ্দেশ্য আজকের দিনে অনেকটা বদলে গেলেও তার গুরুত্ব এবং প্রয়োজন বিশেষ কমেনি আর প্রজাপতির দৌত্যও থামেনি।

বিবাহের পিছনে রয়েছে এক ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য। ওকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক বিরাট সংস্কার। মিশর চীন ভারত ও গ্রীস, সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে বিবাহের অধিপতি দেবতার যথেষ্ট খাতির, কাম-স্তুতির আয়োজন। ওদিকে স্যামোয়া থেকে টাঙ্গানিকা, সকল অঞ্চলেরই বিবাহ-বিধি কৌম সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কোথাও বিয়ের অভাব নেই। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্ররা এক্সোগেমি এনডোগেমি লেভিরেট সরোরেট প্রভৃতি প্রথার কথা জানেন। এক পুরুষের বহু নারী আবার এক নারীর একাধিক পুরুষ গ্রহণের কথাও অবিদিত নয়। কিন্তু কেন এ সব প্রথার উদ্ভব হয়েছিল? নিশ্চয়ই অবস্থা ও প্রয়োজন-অনুসারে। আসল কথা এই, পুরুষ ও নারীর মিলন ও একত্র বসবাস সমাজে ও সংসারে স্বীকৃত। সেটার জন্য বিবাহের আয়োজন, সমাজের অনুমোদন, আইনের প্রচলন। অতএব যে জিনিসটাকে নিয়ে এতদিন ধরে এত প্রস্তুতি, সেটা যে মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে, এই তো স্বাভাবিক।

প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে বিবাহ-ব্যবস্থা ও উৎসব চলে আসছে। তাই সকল যুগের লোকই ভেবেছে এবং এখনও ভাবছে, আমিই প্রথম এ কাজ করলুম। শংকরাচার্য যাই বলুন, এই মোহটুকু না থাকলে কাব্য-

সৃষ্টি হয় না। বিবাহোন্মুখ যুবকের চোখে মায়াঞ্জন লাগে না, নবোঢ়ার মুখখানি সরমে রাঙাও হয় না। সকলেই বিয়ে করে এসেছে এ যাবৎ, কিন্তু আমাদের মতন নতুন কারুর নয়,—এই রকম একটা অহেতুক ছেলেমানুষি বিভ্রম জাগে বলেই পরবর্তী জীবনের জ্বালা কতটা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে, এটা ভাবনার বাইরে থাকে। বিয়ের সময়ে যে ফুল রোশনাই বাদ্য আর হট্টগোল হয়ে থাকে, সেটা আগামী দিনের গণ্ডগোলের পূর্বাভাস। এইজন্যই সাময়িক ঝামেলার মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী হাঙ্গামার বন্দোবস্ত কায়েম হয়ে যায়। প্রাচীন আর বর্তমানের মধ্যে যা কিছু তফাৎ, তা কেবল চাহিদায় আর দৃষ্টিভঙ্গীতে। লাওডামিয়ার কিংবা জানকীর, গুণবর্ধন অথবা ল্যান্সলটের যৌথ আদর্শের সঙ্গে মলয়কুমারের কিংবা ইয়াঙ্কি মুষ্টিযোদ্ধার দাম্পত্য প্রত্যাশার যেটুকু পার্থক্য, সেটা শুধু সময়ের ফের ও সমাজের পরিবেশ। নইলে যে বর, সে-ই বর, যে কনে সে-ই কনে। পূর্বরাগ-কল্পনায় আর ভ্রান্তি-বিলাসে বড় বেশি তারতম্য নেই। তাই প্রাক্-বিবাহিত জীবনে যৌবনস্নিগ্ধ মন সঞ্চয় করে চলে অনাগতার মনোমত রূপচিত্রণ, যেমনটি সাহিত্যে পাওয়া যায়, মামজেল্ মপ্যাঁর ডায়েরির পাতায়।

সনাতন প্রথায় সম্বন্ধ করে বিবাহ এবং চোখ বুঁজে ঢিল ছোঁড়া আর আধুনিক কালে কোর্টশিপ করে বিয়ে করার মধ্যে কেবল টেক্‌নিকেরই পরিবর্তন ঘটেছে। পুরাতন পদ্ধতিতে বর-বধূ শুভদৃষ্টির সময়ে সলজ্জ সঙ্কোচে তাকাতো। আধুনিক যুগে বর-কনের চোখ খোলাই থাকে এবং দৃষ্টিটাও দ্বিধাদুর্বল নয়। সে যাই হোক, নাটকীয়তার আকর্ষণ আর উপকরণগুলি মোটামুটি সেই একই আছে। আদিম যুগের জোর করে কেড়ে আনা স্ত্রীই হোক্, আর কৌম প্রথায় বহুপতি নারীই হোক্, কৌলীন্য প্রথায় পাইকারী দরে পাওয়া সহধর্মিণী হোক্ অথবা রেডিও-সিনেমার খাবি-খাওয়া গানে ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রার্থিতা প্রিয়াই হোক্, বিয়ে করে ঘরে না তোলা পর্যন্ত কেউ কিছু না—সবই মায়া। অবশ্য আগামী দিনের বিবাহিতা স্ত্রী দুধ-আলতায় পা ধুয়ে ঘরে গিয়ে টিঁকবেন, না কি তালাক দিয়ে সোজা মার্চ করে বেরিয়ে যাবেন, ভরসা করে কিছুই বলা যাচ্ছে না। আর একটি কথা। এক এক সময়ে মনে হয় তরুণ-তরুণীর স্বপ্নকামনা যদি সত্যিই হয়, তাহলে কি অবস্থাটা দাঁড়ায়? অর্থাৎ স্বামী অথবা স্ত্রী যেমনটি হলে মন খুশি হয় ভাবা গিয়েছিল,—হাব-ভাব, চাল-চলন যদি শেষ পর্যন্ত কল্পনা-মাফিকই উৎরে যায়, তাহলে সে-ই সে-ই স্বামী-স্ত্রী কি আর বাঁচতে চাইতেন? দিব্যদৃষ্টির ফলে

শুভদৃষ্টির সময় সলজ্জ সঙ্কোচে তাকাতো

যদি দেখা যেত বিবাহের পাঁচ বছর পরে কোনও দৃশ্য বা ঘটনা, তাহলে কি কোনও ভদ্রজন অথবা মহিলা চিরন্তন, মানে—যতদিন থাকে ততদিনকার, চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইতেন? মনে হয়, চাইতেন। পোকার স্বধর্মই হল আগুনে পুড়ে মরা। ভবিষ্যতের 'প্রোজেক্‌শ্যন' যতই বিভীষিকা হোক, অতীত স্মৃতির রোমান্টিক 'ফ্ল্যাশ ব্যাক'টুকু চিরকালই মনোরম। তৃতীয় নয়নে তুরীয় দৃষ্টি খুলে গেলেও আবার মোহাচ্ছন্ন হতে কতক্ষণ! এইজন্যই মোহমুদ্গর লেখা হলেও ধোঁকার টাটি মজার সংসার এখনও বজায় আছে।

আমাদের এক সাহিত্যিক তিক্ত-বাস্তব এক গল্পে লিখেছেন, মানুষ দুবার রাজা হয়। একবার, যখন সে চতুর্দোলায় চেপে বা ভাড়াটে গাড়ি করে বিয়ে করতে যায়। আর শেষবার, যখন পরের কাঁধে খাটিয়া চড়ে তাকে শ্মশান ঘাটে যেতে হয়। দুটোই জয়যাত্রা। একটি সজ্ঞানে, অপরটি অজ্ঞানে।

কেউবা ডবল ডিমের ওমলেট ওড়ায়

তফাৎ এই—প্রথমবার জোটে দুর্ভাবনা কিংবা দৈন্য। আর শেষ যাত্রায় ভস্মীভূত নিশ্চিন্ততা। কিন্তু শুভদিনে অলক্ষণের কথা থাক্। বরঞ্চ এই দিনটিতে পাত্র-পাত্রীর মনের অবস্থার কথাই চিন্তা করা যাক। পাঁচ-সাত দিন আগে থেকেই বিয়ে-বাড়ির গন্ধ জাগে, আবহাওয়া বদলে যায়। মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র সংসারে যতই স্থানাভাব অথবা অর্থাভাব ঘটুক, এ কয়দিন বাড়ি সরগরম থাকে হয়তো ধার-করা টাকারই গরমে। কারুর যেন ফুরসৎ নেই। বাজার করা, গয়না গড়ানো, ফুলশয্যার জিনিস কেনা, মেরাপ তেরপল লাগানো, অকারণ ব্যস্ত হওয়া, ঘর্মাক্ত কলেবর, ছেলে-মেয়েদের হৈ-চৈ, রমণীয় জটলা, কর্তা-ব্যক্তিদের অজস্র বকুনি—এক কথায় কায়িক ও মানসিক অপব্যয়ে মাথা যায় গুলিয়ে, শরীর যায় এলিয়ে। দু দণ্ড নিভৃতে বসে একটু সুমিষ্ট চিন্তার অবসরও মেলে না, একটা গোটা সিগরেট খাওয়ার মতন ধৈর্য বা অবকাশও থাকে না। তবু অনুকূল নির্জনতার অভাবেও ওরি মধ্যে পরিহাস-সম্পর্কীয়াদের সঙ্গে দু-চারটে রসিকতা ঝলসে ওঠে, বারান্দায় একটুখানি একলা দাঁড়ালে মনে জাগে লীলাকৌতুক।

মাত্র দু-এক দিনের ব্যবধানে একক জীবন দোসর হবে, একটি রুক্ষকপোল পুরুষের বা একটি পেলবমুখী নরম মেয়ের সাহচর্যে বাকি জীবন কাটাতে হবে একই ঘরে একই শয্যায়, সুখ-দুঃখের সেই জীবন মধুরাত মধুচ্ছন্দ হবে, না কি ছন্দোহীন পরুষ পদক্ষেপে তাল কেটে যাবে, এ সব জল্পনা ফাঁকে ফাঁকে মনকে একটু উদাস করে দেয় বৈকি! 'আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে'—ছেলেবেলায় শোনা সেই শ্রুতিমধুর ছড়াটি মনে পড়ে বার বার। তারপর সকাল হয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত বাকি সময়টুকু কিভাবে কাটে, সে সব কথা বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়। কেউ বা সারাদিন উপবাসে চিঁ-চিঁ করে, কেউ বা লুকিয়ে রেস্তরাঁয় ডবল ডিমের ওমলেট্ ওড়ায়। তবে ছেলের চেয়ে মেয়ের দেহমনেই ক্লান্তি আসে বেশি, এটা ঠিক। কারণ প্রগতি যতই হোক, মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চরতা, সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থকতার সন্ধান, কুমারী-হৃদয়ের ভীরু স্পন্দন বিস্ময়বিরল যুগেও কিছু কমেনি। আমার মনে হয়, ছেলেদের কল্পনা-বিলাস নিয়েই বেশি কথা বলা হয়েছে। মেয়েদের গোপন-লালিত স্বপ্নসাধ তেমন ভাষা পায়নি। হর্ষ ও বিষাদ, অজানা জীবনের ঈপ্সিত অনুরাগ আর পরাশ্রয়ী দুর্ভাবনা, অপরিচয় মিলনের সঙ্কোচ-সুখ এবং প্রিয়-জনদের বিচ্ছেদ-ব্যথা কিভাবে মেয়েদের মনকে শীর্ণ, উদাস ও আকুল করে তোলে

বিবাহলগ্নে, সে কথা শুধু মেয়েরাই ভালো-ভাবে বলতে পারেন। পুরুষের মন ও দৃষ্টি দিয়ে আমরা শুধু অনুমান করতে পারি।

পুরুষদের কি হয় বিবাহ-দিনে, তার কিছুটা দেখা ও জানা আছে। কেউ বা বলিষ্ঠচিত্তে হাসিমুখে শুভযাত্রা করেন, কেউ বা আতঙ্কে অবসাদে নির্জীব হয়ে পড়েন। এক বন্ধুকে দেখেছি মুখে বলছেন বিয়ের আগের দিন থেকে, 'এতে আর ভয়টা কি? সবাই বিয়ে করে থাকে, নতুন তো কিছুই নয়, মারাত্মক অপারেশনও নয়! তবে......উদ্বেগ, এই আর কি। শরীরটায় অস্বস্তি, পেটটাও কেমন যেন আপসেট...' বলেই দু-এক ডোজ প্যালসেটিলা খেয়ে রাখলেন। আর একজন আলাপী ভদ্রলোক ভোর বেলায় উঠে কাউকে কিছু না বলে চম্পট দিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় বিয়ে, এদিকে পাত্র নিখোঁজ। ডিটেকটিভগিরি করে তাঁর সন্ধান মিলল মগরা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে। বলা বাহুল্য, ঘোরতর অনিচ্ছা এবং হাত-পা ছোঁড়া সত্ত্বেও তাঁকে গলায় দড়ি দিয়ে বিকেল বেলার মধ্যেই কলকাতায় টেনে আনা হয় এবং যথালগ্নে হাঁড়িকাঠে চাপানো হয়। বিলাতী উপন্যাসে পড়েছি কত বাঘা বাঘা বর গির্জেয় ঢোকবার আগে নার্ভাস হয়ে হিমাঙ্গ হয়েছে। আবার যে দুঁদে জোচ্চোর লোক ঠকিয়ে খায়, সেও ভিজে বেড়ালটির মতন জাঁদরেল কনের পাশে পাশে রেজিস্ট্রী অফিসে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সই দিতে বাধ্য হয়। সবই হল মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। বিবাহমঙ্গল নিয়ে যত শাস্ত্র আর উপদেশ মধুরভাবে আওড়ান হোক না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিদারুণ উদ্বেগের সঞ্চার করে, যেন মূর্তিমান অমঙ্গল।

যার যেমন ধাত তার সেই রকম চিন্তা ও কাজ। কেউ বা হাসিমুখে বিয়ে করতে যায় কেউ বা ঠক ঠক করে কাঁপে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, কাপুরুষ মৃত্যুর আগে অনেকবারই মরে। কিন্তু সংকটের মুখো-মুখি এসে তারা আশ্চর্য স্থির হয়ে যায়। কথাটা সত্যি। আসরে গিয়ে একবার বসলে ভয়ের মাত্রাটা যায় কমে। তখন মনে হয়, আমিই তো অদ্যকার আরব-রজনীর অদ্বিতীয় নায়ক। আমাকে কেন্দ্র করেই তো এই উৎসব, এই কলহাসি আর গুঞ্জন, এত ফুল, আলো আর গানের আয়োজন। অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য বর-বেশী পুরুষ বাদশা বনে' যান, ভাবেন রঙ্গ-মঞ্চের পাদপীঠে যত আলো সবই তাঁর ওপর নিবদ্ধ। তাঁর ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাপূরণে সবাই ব্যগ্র, ক্ষীণতম তর্জনী-চালনায় দর্শকের দল উদ্‌গ্রীব ও নিস্তব্ধ। এই যে সাময়িক গুরুত্ব, এই যে ক্ষণবিলসিত রাজকীয় নাটকীয় মহিমা, এর মূল্য কম নয়। এই স্মৃতির জোরেই জীবনের জুড়ি-গাড়ি টালে-বেটালে চলতে থাকে। এরই অফুরন্ত মোহে ভারিক্কে গৃহিণী ছোটেন বরযাত্রার ঘটা দেখতে, বাসরে উঁকি দেন পূর্বকথা স্মরণ করে। বিবাহের ঐশ্বর্য যেটুকু তা এখানেই। একটি চরম লগ্নে এতদিনের জল্পনার সমাধি, সমস্ত সাধ-আহ্লাদের অবসান ঘটলেও এর রেশ দীর্ঘ-স্থায়ী। জীবনব্যাপী কালো ছায়া নামলেও কোনও মহিলাই বিয়ের বেনারসী অনাদরে ফেলে রাখেন না, কোনও পুরুষই ভোলেন না প্রথম রজনীর মদিরতা। পট্টবস্ত্রের প্রান্তলগ্না সলজ্জ কুণ্ডলী যে একান্ত নিজস্ব সামগ্রী আর উন্নতশির বলিষ্ঠ যুবা যে নিতান্তই অঞ্চলাশ্রিত সম্পত্তি, এই মনোভাবই বিবাহ-অনুষ্ঠানকে রাজসিক মর্যাদা এনে দেয়। দুটি প্রাণীকে ঘিরেই বিয়ে বাড়ির জৌলুস, সানাইয়ের মাধুর্য, চটুল লীলাবিভ্রম আর অঙ্গরাগ সুরভির মাদকতা।

বলা বাহুল্য, এই বিচিত্র বর্ণ উৎসবের ফুল্লশ্রীকে ধারণ করে আছে একটি কন্যার রমণীয় অস্তিত্ব। বহুজন-সমাগমে উদ্‌ভ্রান্ত বরের কাছে বিয়েবাড়ির দৃশ্য নয়নলোভন হয় কি না, বলা শক্ত। হয়তো বিরক্তি অসহিষ্ণুতা জাগে। শুধু যিনি বরণীয়া, যিনি এখনও অন্তরালবর্তিনী, তাঁরই অদৃশ্য নেপথ্য প্রেরণা মনে যেটুকু বল ও ধৈর্য সঞ্চার করে। সমস্ত আয়োজন অনুষ্ঠান সার্থক হতে চলেছে একটি মুহূর্তে, যখন নিচোল-রহস্যের মায়াবী অস্পষ্টতায় তিনি আত্মসমর্পণ করবেন। 'স্বামী'-'স্ত্রী' প্রভৃতি এতদিনের ব্যবহার মলিন শব্দগুলো যেন সহসা বাঙময় অর্থ ছাড়িয়ে নতুন ব্যঞ্জনায় দীপ্ত হয়ে ওঠে......

এতক্ষণ ধরে মিষ্ট-মধুর কথা শুনিয়েও মনটা কিন্তু আমার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, অনেক দিন হল বিয়ে হয়ে গেছে,—যেন আর কিছু প্রত্যাশা নেই, সব যাদু যেন ফুরিয়ে গেছে। আর একটি কারণ আছে এই বিষাদের, সেটি পকেট-সংক্রান্ত। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ—এই চার মাস ধরে এত বিয়ের নিমন্ত্রণ হয়েছে, যে তাদের অর্ধেকগুলিতে উপস্থিত হয়েও পুরো এক মাসের মাহিনা নিঃশেষ হয়ে গেছে! বিবাহের সম্বন্ধে একটি শেষ প্রশ্ন জানিয়ে শেষ করি। বর্ষার ধারার সঙ্গে অশ্রুধারা, শীতের প্রকোপের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের জর্জরতা, বৈশাখের খর তাপের সঙ্গে সাংসারিক রুক্ষতা, হেমন্তের আড়ষ্ট ভাবের সঙ্গে বিষাদের বারিবিন্দু, এই সব সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই কি শাস্ত্রকারেরা বিবাহের ঋতু নির্ণয় করেছিলেন? চৈত্র মাস কি দোষ করেছিল? বর্ষশেষের উদাস রিক্ততার মধ্যে কি অনাগত জীবনের বঞ্চনা ও বেদনা-বোধ চোখে পড়েনি তাঁদের?

ঘ্রাণ

সন্তোষকুমার ঘোষ

আনন্দ পর্বতের আড়ালে রোজই সূর্য অস্ত যায়, কিন্তু যাবার আগে নয়া রোতক রোডের এই বাংলোটিকে আদর করতে ভোলে না। লাল সিমেণ্ট-বাঁধানো বারান্দার উপর অনেকক্ষণ ধরে অলস, ক্লান্ত, মূর্ছিতপ্রায় পড়ে থাকে, দীর্ঘ বিলম্বিত বিদায়চুম্বনের মতো। তারপর রোদের ঠোঁট সরে, নিস্তেজ বারান্দাটিকে ঘিরে ছায়া নামে, থমথমে, গম্ভীর। লনের আঁচলে হিম হাওয়া চুপে চুপে চোখ মোছে। গেটের কাছে প্রৌঢ় প্রহরী ঝাউগাছটা এমনিতে কিছু টের পায় না; বয়সের ভারে, শকুনডানার অত্যাচারে সে বিব্রত। হাওয়া তার কানে ফিসফিস করে একটি সদ্যোবৈধব্যের খবর শোনায়, বিষন্ন ঝাউগাছটা তখন সহৃদয়ের মতো ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। আনন্দ পর্বতের পিছনের আকাশ তখনও আরক্ত, অনেক দূরের কোয়্যারি থেকে খোয়া ভাঙার আওয়াজ থেমেও থামে না। নয়ানজুলিতে নেমে-পড়া একটা লরী থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে, মজুরদের তাড়া দেয়, পাথরের টুকরো বোঝাই সারা হলেই সে লম্বা ছুট দেবে, কিষণগঞ্জ রেল ইস্টিশনের দিকে একটা নেই-কাজ শান্ত্রীর মতো ইঞ্জিন কোমরে কোমরে শিকল বাঁধা বন্দী ওয়াগনের সারিকে ক্রমাগত ধাক্কা দিতে দিতে হয়রান করে তোলে, তার পিস্টনের মুঠিতে জোর ঢের, থেকে থেকে ভাঙা গলায় অশ্লীল ক্রুদ্ধ একটা শপথ উচ্চারণ করে, পারলে বুঝি দুনিয়ার সব ওয়াগনকে চুলের মুঠো ধরে মাল টানার কাজে জুতে দিত।

পশ্চিমের বারান্দায় ডেক চেয়ার টেনে নিত্য যিনি এই দৃশ্য দেখেন তাঁর নাম কৌশল্যা উপাধ্যায়, রোতক রোডের বাংলোটির মালিক। ঝাউঝিরঝির বাতাসে সব শব্দ ঢাকা পড়ে না, কোয়্যারিতে খোয়া ভাঙার প্রতিধ্বনি তিনিও শুনতে পান, ছায়ামলিন লনের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, ওর শোকের কৃষ্ণচ্ছদ বুঝি আর ঘুচবে না। অথচ মনে মনে জানেন এও ঠিক নয়, হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ টিপলেই খুশির নির্লজ্জ হাসি বারান্দা ছাড়িয়ে লনে ছড়িয়ে পড়বে, বিয়োগের ব্যথা ভুলতে আর কতক্ষণ। এই স্তব্ধতার আয়ুও বেশি না। এখুনি একের পর এক মাল-বোঝাই লরি থরথর বেগে ছুটে যাবে, পীচ-ঢালা ধর্ষিত পথটার কপালে বিন্দু বিন্দু শ্রমচিহ্নের মতো ফুটে উঠবে আলোর মালা।

—মিসেস উপাধ্যায়?

কৌশল্যা সোজা হয়ে বসেন, ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী এসেছে। রোজই আসে, গেটের বাইরেই মোটর সাইকেলটাকে থামিয়ে ঠেলে নিয়ে আসে বলে কৌশল্যা টের পান না। সম্বোধনমাত্র চকিত হয়ে ওঠেন, এক হাতে আলো জ্বালেন, ডেক চেয়ারটা এগিয়ে দেন অন্য হাতে। —বসো চটর্জী।

চ্যাটার্জী বসে, কিন্তু বসেও উসখুস করে, সেটা কৌশল্যার চোখ এড়ায় না। শুভ্র সুন্দর মুখের কয়েকটি রেখা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু কাঠিন্যটুকুর খবর কণ্ঠও টের পায় না, সে অভ্যস্ত মধুর সুরে জিজ্ঞাসা করে, চা কি বারান্দাতেই দিতে বলব?

চ্যাটার্জী তাড়াতাড়ি বলে, কেন, চলুন ভেতরেই চলুন।

কৌশল্যা মনে মনে মজা পান, মুখেও কৌতুকের এক টুকরো হাসি খেলে যায়। —কেন, বারান্দা কি এতই ঠাণ্ডা? বেবি কিন্তু এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি।

স্মার্ট, সুপুরুষ ক্যাপ্টেন যেন জড়োসড়ো, এতটুকু হয়ে যায়, কোন মতে বলে, বেশ তো বেশ তো, না হয় কিছুক্ষণ বাইরেই বসা যাক। আপনি ঠিক জানেন মিসেস উপাধ্যায়, আপনার কোন অসুবিধে হবে না?

কৌশল্যা তাড়াতাড়ি বলেন, ও ডিয়ার, নো।

—এবার শীত দেরিতে পড়বে, কী বলেন।

কৌশল্যা জানেন, এ প্রসঙ্গের পরমায়ু পাঁচ মিনিট। ড্যালহৌসি সিমলা কসৌলির আবহ-তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা বেশিক্ষণ চলে না। তারপর ফের ফিরে আসতে হবে এই বারান্দাটিতে, যেখানে পেট স্পেনিয়েলটাকে কৌশল্যা উপাধ্যায় লম্বা লম্বা লোমে আঙুল বুলিয়ে আদর করছেন। তার পেডিগ্রী নিয়েও কিছুক্ষণ কথা হবে। জঙ্গী অফিসার হয়েও চ্যাটার্জি গৃহলালিত কুকুরের প্রতি বিমুখ, কিন্তু কৌশল্যার কাছে সেটা গোপন করতে গিয়ে ঘেমে উঠবে। আর, ততক্ষণ বুড়ো কালা ঝাউগাছটা যেন কতই শুনেছে এমন ভাবে হাওয়ার কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়বে, হেমন্তের আকাশ তারার ঘামাচি-কুটকুট নীল পিঠটা ঘসবে মেঘের ভিজে তোয়ালে দিয়ে, চ্যাটার্জি গেটে মচমচ শব্দ হলেই বেবি এসেছে ভেবে আড়চোখে তাকাবে —ডেকচেয়ারে ডুবে গিয়ে মজা দেখবেন কৌশল্যা। কড়াভাঁজ কোর্তার ফাঁকে ক্যাপ্টেনের রোমশ বুকটার সঙ্গে কোলে-লীন স্পেনিয়েলটার মিল পেয়ে মনে মনে হাসবেন।

—জানো ক্যাপ্টেন, আমার মেয়ে বেবি প্রথমে তোমার নামটা বুঝতে পারেনি। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ক্যাপ্টেন চ্যাটার আবার কেমন নাম মা? শেষের 'জী'টা ও ভেবেছিল বুঝি সম্ভ্রমের। বুঝিয়ে দিলুম, তোমার পুরো নামটাই চ্যাটার্জী।

নিজের খরচায় ঠাট্টা, তবু চ্যাটার্জীকে হাসতে হল। মোটা কব্জিতে বাঁধা ঘড়িতে সময় দেখল একবার, লুকিয়ে, কিন্তু বেবি এখনও ফিরছে না কেন জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না।

লনে ঘসঘস শব্দ, একটা সাইকেল থামল। একটি ছিপছিপে মেয়ে এসে দাঁড়াল বারান্দায়।

—বেবি, নটি মেয়ে, এতক্ষণে এলে? ক্যাপ্টেন সেই কখন থেকে বসে আছেন।

—সরি। অনেকক্ষণ বসে আছ? কিন্তু মা, তুমি তো ছিলে।

—আমি? কৌশল্যা লাজুক কিশোরীটির মতো হাসলেন, আই বোর্ড্ হিম নো ডাউট।

দু হাত তুলে নিখুঁত ভদ্রতার মুদ্রায় চ্যাটার্জী বললে, না মিসেস উপাধ্যায়, না।

—চলো এবার ভিতরে চলো বেবি ঠিক হাত বাড়িয়ে দিল না, তবু চ্যাটার্জী ওকে অনুসরণ করল। মিসেস উপাধ্যায় অর্ধপীত চায়ের পেয়ালাটার দিকে চেয়ে দেখলেন, ওটা শেষ করার সবুরও সয়নি, হ্যাংলা!—মনে মনে

ধমক দিলেন। চিমটি কাটলেন কুকুরটাকে, সে কেঁউ করে কোল থেকে নেমে পড়ল, এক দৌড়ে চলে গেল ভিতরে। বারান্দায় কৌশল্যা এখন একা। বাইরে চেয়ে দেখলেন, রুপেন জ্যোৎস্না এরই মধ্যে কুয়াশার রেশমী ফাঁস গলায় পরে মরবার উদ্যোগ করছে। সামনের উঁচুনীচু মাঠটা গড়াতে গড়াতে দূরের টিলার গায়ে ঠেকে গিয়ে থেমে গেছে। য়ুক্যালিপটাস গাছটা ঋজু শ্বেতাঙ্গের মতো, তার অস্পষ্ট ছায়া কিন্তু কালো; আঁকাবাঁকা, সাপের মতো হেলে হেলে ঘাস ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেছে। এতক্ষণে কৌশল্যা যেন অনুভব করলেন, এখানে ঠাণ্ডা, স্কার্ফ ভালো করে জড়ানো, তবু গায়ে কাঁটা দিল।

তিনিও কি ভিতরে যাবেন। কিন্তু ওরা তো তাঁকে ডাকল না। বেবি উঠল, চ্যাটার্জী তার পিছু নিল। শেষ-না-করা চায়ের পেয়ালাটার মতোই কৌশল্যা এখানে পড়ে রইলেন। সম্মুখের থামটাকে মনে মনে চ্যাটার্জী কল্পনা করে কৌশল্যা তাকে নিঃশব্দে টিটকিরি দিয়ে বললেন, ছি, চ্যাটার্জী, ছি। এই তোমার মিলিটারি এটিকেট। যেটুকু চা পেয়ালায় পড়ে ছিল সেটুকু লনে ঢেলে দিলেন।

ঘরে ঠক ঠক শব্দ। ওরা টেবিল টেনিস খেলছে। হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলেন কৌশল্যা। কেন তিনি এখানে পড়ে থাকবেন। অভিমান? ওরা ডাকেনি? কিন্তু এ বাড়ির মালিক কে। হিমের ছোঁয়ায় বা অন্য যে-কোন কারণে, একটা হাঁচি অনেকক্ষণ থেকে নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল, সেটাকে সামলে বোবা চটি পায়ে কৌশল্যা ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালেন। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে বেবির, অহংকারী মেয়েটার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। গম্ভীর গলায় কৌশল্যা বলে উঠলেন, র‍্যাকেটটা আমার হাতে দাও বেবি, তুমি হাঁপিয়ে পড়েছ। ঘাম মুছে ফেলল বেবি, সোজা হয়ে দাঁড়াল, আবদারের সুরে বলল, আরেকটু মা, আরেকটু। চ্যাটার্জী ভেরি ফাসট, ওর সঙ্গে খেলে তুমি দম পাবে না।

—র‍্যাকেটটা দাও। এবার এত জোরে বললেন কৌশল্যা যে বেবি ও'র চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। হাতে তুলে দিল র‍্যাকেট।

স্কার্ফটা ফেলে দিয়েছেন কৌশল্যা, কোমরে আঁচল বেঁধে ছুটছেন। এত জোর মনে, তবু কলিজাটা ধক ধক করে কেন, পা কেন চলতে চায় না। টেরিফিক চ্যাটার্জি'র র‍্যাকেটে ঘা খেয়ে একটা বল যেন দশটা হয়ে ফিরে আসে। দু'মিনিটেই রণে ভঙ্গ দিয়ে কৌশল্যা ধপ করে সোফায় বসলেন। শাদা দাঁতের পাটি বিস্তার করে বললেন, নাউ নাউ চ্যাটার্জি, তোমার শিভালরি নেই। মেয়েদের জিতিয়ে দিতে জানো না। ঘাড়ে গলায় রুমাল ঘসতে ঘসতে চ্যাটার্জী বলল, ফেয়ার ফিল্ড এ্যান্ড নো ফেভর।

ঘামে-গলা মুখখানা মেরামত করতে বেবি বুঝি আড়ালে গেছে, চ্যাটার্জীও সোফায় কৌশল্যার পাশে এসে বসেছে। পরিচারক শীতল পানীয় দিয়ে গেল। তখনও শ্রমের ক্লান্তি যায়নি, চুমুক দিতে দিতে কৌশল্যা মৃদুস্বরে গল্প শুরু করলেন। চমৎকার কাটল সন্ধ্যেটা। অনেক, অনেক ধন্যবাদ চ্যাটার্জী। উপাধ্যায় যখন মারা গেল, তুমি জানো না তখন সবাই আমাকে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকতে বলেছিল।

চ্যাটার্জী জানে। আজ নিয়ে অন্তত দশ বার এ কাহিনী শুনতে হয়েছে।

পানীয়ে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে কৌশল্যা বললেন, আমি যাইনি। রোতক রোডে ছোট এই বাংলোটি তৈরি করিয়ে নিয়েছি। দিল্লী আমি ছাড়তে পারব না, এর সঙ্গে আমার নাড়ির টান। উপাধ্যায়ের কত স্মৃতি এখানে জড়িয়ে আছে, এখানেই তার চাকরির উন্নতি, আণ্ডার সেক্রেটারি অবধি উঠেছিল। হঠাৎ ওপরের ডাক না এলে সেক্রেটারিও হত, হত না চ্যাটার্জি?

চ্যাটার্জী বলল, হত। রুমালে চোখ মুছলেন কৌশল্যা। কত পার্টি, কত বন্ধু, কী আনন্দে তখন দিনগুলো কেটে যেত তুমি জানো না চ্যাটার্জী। কত ইস্কুলের ফাউণ্ডার্স-ডে'তে প্রাইজ বিলোতে আমার ডাক পড়েছে। চ্যারিটি শো করে ওয়ার ফাণ্ডে চাঁদাই তুলে দিয়েছিলাম পাঁচ হাজার টাকা। সেসব দিন আর নেই, তবু গ্রামে ফিরে যাব? রুর‍্যাল আপলিফ্‌ট? টু বী বট্‌লড আপ ইন এ ভিলেজ হাট, জাস্‌ট ফ্যান্সি। তার চেয়েও একটা বড় দায়িত্ব আমার ছিল, সেটা সেদিন কেউ বোঝেনি—মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে।

—আপনার বড় মেয়েকে তো আপনি ভালো বিয়েই দিয়েছেন।

হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠলেন কৌশল্যা, ওষ্ঠাগত গ্লাসটাকে সরিয়ে রাখলেন, তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন ভালো বিয়ে? ইউ কল ইট এ ম্যাচ? না চ্যাটার্জী, না। একটা টিচিং শপের লেকচারারের চেয়ে দেবযানীর ভালো বর জুটত না আমি একথা মেনে নিতে পারি না। দেবযানী আমার অবাধ্য হয়ে নিজের সর্বনাশ করেছে, কোনদিন ও আমার ক্ষমা পাবে না।

অপ্রতিভ চ্যাটার্জী চুপ। বেবি তাড়াতাড়ি এগিয়ে কৌশল্যার মাথায় হাত রাখল। চুপ করো মা, চুপ করো। ওরা তো সুখেই আছে। মেহ্‌রাজী শিগ্‌গিরই ইউনিভার্সিটিতে কাজ পাবেন, দিদি বলছিল।

—তুই ওদের ওখানে যাস?

বেবি মাথা নীচু করে রইল।

তিক্তস্বরে কৌশল্যা বললেন, সুখ। পথের ধারে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে যে কুকুরগুলো শুয়ে থাকে, তারাও তবে সুখী বেবি। দেবযানী আমায় ঠকিয়েছে।

বিব্রত চ্যাটার্জি কখন বেবির দিকে চোখের ইশারা করে প্রথমত বিদায় না নিয়েই উঠে গেছে, কৌশল্যা টের পাননি। বাংলোটিকে থরথর কাঁপিয়ে পর পর দু'টি লরি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল, কৌশল্যা সম্বিত ফিরে পেলেন তখন। অবসন্ন গলায় বললেন, রাত হয়েছে, এবার খেতে চল বেবি।

মাথা নীচু করে টেবিলে বসেছে দু'জন। বেবি খাচ্ছে না, নখে চাপাটিগুলো খুঁটছে।

—তোমাকে একটি কথা বলব বেবি।

বেবি মাথা তুলল।

নৈর্ব্যক্তিক, যেন রায় পড়ছেন, এমন গলায় কৌশল্যা বলে গেলেন, তোমার ভাবভঙ্গিও কিছুদিন থেকে আমার ভালো ঠেকছে না। তুমি চ্যাটার্জিকে যেন বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছ। মাথা নীচু কোরো না বেবি, কৌশল্যা সহসা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, জবাব দাও?

মৃদু, অশ্রুতপ্রায় কণ্ঠে বেবি বলল, চ্যাটার্জিকে আমি কথা দিয়েছি।

—কথা দিয়েছ? কটু গলা কৌশল্যার, কয়েক মুহূর্ত নির্ণিমেষ চোখে চেয়ে রইলেন।—এরই মধ্যে? তর সইল না? বয়স যে তোমার এখনও আঠারো হয়নি, বেবি।

ধীর, কিন্তু দৃঢ় স্বরে বেবি বলল, তোমার হিসাব একেবারে ঠিক থাকে না মা, বাইশ পূর্ণ হয়ে গেছে।

—চুপ করো। খুব হিসাব শিখেছ বেবি; এতই যদি হিসাবি তুমি, তবে লুথরাকে কেন আমল দিলে না, সে তো আই এ এস; কিম্বা প্রকাশকে, সেও অল ইণ্ডিয়া রেডিওর একজন বড়ো অফিসার।

—চ্যাটার্জিও তো অফিসার, মা।

—আঃ, তর্ক, তর্ক কেবলই তর্ক। আমার কথা এই যে বেবি, এত তাড়াতাড়ি সব ঠিক করে ফেললে কেন। বাছাই করে তো নিতে পারতে। তোমাকে পিয়ানো কিনে দিয়েছি। গান আছে, পিকনিক, ঘোরাঘুরি, টেবিল টেনিস, এত শীগ্‌গির সব শেষ করে দিতে চাও কেন। এ কি তোমার ভালো লাগে না।

এক টুকরো ফ্যাকাশে আলো ছড়িয়ে গেল বেবির মুখে। আস্তে আস্তে বলল,—ছ' বছর ধরে টেবিল টেনিস খেলে খেলে দিদির কব্জি ব্যথা হয়ে গিয়েছিল মা, পুডিং তৈরি করে করে আঙুল পুড়ে গিয়েছিল তাই সে পালিয়ে বেঁচেছে।

—বেইমান। হাতে রুটির টুকরো না থাকলে কৌশল্যা বুঝি ঠাস করে চড় মেরে বসতেন মেয়েকে। রুদ্ধ শ্বাস, চোখে স্ফুলিঙ্গ ঝরছে, যেন শুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে

উচ্চারণ করলেন, কিছু শুনতে চাই না। কাল রবিবার, লুথরা সকালেই আসবে। আমাদের হিন্দনের পাড়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছে। তুমি তৈরি থেকো বেবি।

আনন্দ পর্বতের আড়ালে সূর্য অনেকক্ষণ ডুবে গেছে। পাথরভাঙা কোয়্যারি চুপ, রেল সাইডিংয়ের অত্যাচারী ইঞ্জিনটাও আজ নিখোঁজ। হিন্দনের তীর থেকে পরদিন কৌশল্যা যখন ফিরলেন তখন মন কানায় কানায় ভরা। দেহের কোষে কোষে অবসাদ, একরকম টলতে টলতে নামলেন গাড়ি থেকে। তারপর গেটের সমুখে দাঁড়িয়েই আরও এক দফা বিদায় দেওয়া, নেওয়া, খিলখিল হাসি; সর্বশেষ মডেলের গাড়িখানা যতক্ষণ না অদৃশ্য হল ততক্ষণ কৌশল্যা চেয়ে রইলেন।

বেবি দাঁড়ায়নি, বাড়ি ফিরেই সটান এসে শুয়ে পড়েছিল। কৌশল্যা আজ উদার হয়ে গেছেন, চাকর বেয়ারাদের দুটো করে টাকা দিয়ে বললেন, আজ রাত্রে আমরা খাব না, তোমরা সিনেমা দেখ গিয়ে। ঘরে এসে গরম জামাটা ছুঁড়ে ফেলে বললেন, বেবি, ঘুমিয়েছিস?

হুঁ কি উঁহু জাতীয় একটিমাত্র অব্যয় উচ্চারণ করে বেবি পাশ ফিরল।

—চমৎকার কাটল আজ সারা দিন না? গ্রামোফোনটা নিয়ে লুথরা ভালোই করেছিল। এত রেকর্ড, সব কি ওর?

বেবি বলল, জানি না।

—তুই তো ভয়ে ভয়ে চান করলি না। এখন মাথা ঘুরছে তো। ঘুরবে না। ও এত স্যানডুইচ আর ডিম নিয়ে গিয়েছিল কেন রে, আমরা কি রাক্ষস? হিহি করে হেসে উঠলেন কৌশল্যা, গলা অবধি একটা চাদর টেনে মেয়ের পাশের খাটিয়ায় শুয়ে পড়লেন। ওর যে বন্ধুটিকে সঙ্গে এনেছিল, সেহ্‌গাল না কী নাম যেন, সেও ভারী আমুদে, এয়ার ফোর্সে কাজ করে শুনলাম। আসছে রবিবার আমাদের আবার নিতে আসবে বলে গেল। এবার যাব গুরগাঁওয়ে, সোহ্‌নার হটস্প্রিংসে। একটা গাড়ি থাকা খুব সুবিধের, না?

সাড়া না পেয়ে কৌশল্যা হাই তুললেন, যেন স্বগত, যেন সিলিংটাকে শুনিয়ে বললেন, চ্যাটার্জির কিন্তু গাড়ি নেই। থাকার মধ্যে আছে ওই তো একটা ঝরঝরে মোটর সাইকেল, যেটুকু চলে তার দশগুণ গলাবাজি করে।

সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দিলেন কৌশল্যা, নরম মখমল অন্ধকারে ঘর ভরে গেল। বেবি শুনছে কিনা বিশ্বাস নেই, তবু বললেন, কাল বিকালে প্রকাশ আসবে, দিনের বেলা পিয়ানোতে একটু হাত লাগিয়ে [illegible]

হঠাৎ বিছানার উপর সোজা হয়ে বসল বেবি—এতক্ষণ তবে ঘুমোয়নি—ফাঁপানো, অগোছালো চুলের রাশি মুখটাকে যেন দশগুণ স্ফীত করেছে, তুমি কী চাও মা, ঠিক করে বলো দেখি? চ্যাটার্জিকে তবে আসতে মানা করে দিই?

কৌশল্যা সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারলেন না, অবাক চোখে চেয়ে রইলেন। বেবি আবার শুয়ে পড়ল। বুড়ো প্রহরী ঝাউ গাছটার পাতার আড়ালে বাসা খুঁজে মরছে কোন রাতপাখি, কৌশল্যা তার ডানার ঝটপট শুনলেন। তারপর শব্দ যখন থেমে গেল, তখন অতি ধীরে, একান্তই জনান্তিকে, তাঁর একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তাঁকে কেউ বোঝেনি, বেবিও না, বড় মেয়ে দেবযানীও না। চ্যাটার্জি আসবে না কেন, সেও চমৎকার ছেলে, আসবে বৈকি। কিন্তু সবাই আসবে। বোকা মেয়ে, তোর গায়ে দিদির হাওয়া লেগেছে, ঘুমন্ত বেবির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন। এই বয়সেই সব শেষ করে দিতে চাস। তোর মনে নেই বেবি, তোর বাবা যতদিন ছিল, আমাদের কোয়ার্টারে কত লোক আসত যেত। ব্রেকফাস্টে অতিথি, লাঞ্চে অতিথি, ডিনারেও। ডিনারের পর ব্রিজের টেবিল পড়ত। কত রাত পর্যন্ত গান, গল্প, হাসি। মিটার, চাওলা, ম্যালহোত্রা, এদের মনে নেই? একটি মৌচাক ঘিরে অবিরল গুঞ্জন।

তুঘলকাবাদের ধ্বংসস্তূপে স্বামীর সহকর্মী রাও একবার তাঁর হাত চেপে ধরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার গালে একটা চড় মেরেছিলেন কৌশল্যা। রাও রাগ করে নি, আরক্ত মুখে পালিয়েছিল। রাগ তিনিও করেননি। নিজে ঠিক থাকলেই হল। এই জীবনের উপর ধিক্কারও আসেনি। রাওকে পরদিনই চা খেতে ডেকেছিলেন।

উপাধ্যায় গেছে, সেই জীবন গেছে, কিন্তু নেশা যায়নি তো। কৌশল্যা আজও তার গন্ধটুকু নিয়ে দিল্লীতে পড়ে আছেন।

সারা দুপুর মেয়েকে চোখে চোখে রেখেছেন কৌশল্যা, তবু প্রকাশ যখন এল ঠিক তখনই বেবিকে দেখতে পেলেন না। মেয়েকে অভিশাপ দিলেন, প্রকাশকে আদর করে বসালেন ঘরে, বারবার উঠে বাইরে গেলেন, বেবি নেই। রাস্তার দিকে নজর রাখতে সুবিধা হবে ভেবে কৌশল্যা শেষে বললেন, আসুন মিঃ প্রকাশ, আপনাকে আমার বাগান দেখাই। আপনি তো ফুল ভালবাসেন, নয়? একটা 'ব্ল্যাক প্রিন্স' তুলে দিলেন বাটনহোলের জন্যে। জানেন, এগুলোর প্রোজেক্ট বেবির। রোজেজ আর মট ইন মাই লাইন। এই যে দেখছেন, [illegible] 'ফ্লেমিং সানসেট', সব ওর। আমি? আই টু হ্যাভ্ রেইজড সাম্। ক্রিসানথিমামগুলো আমার, হলিহক আমার, সুইট্-পী এখনও ভালো করে ফোটেনি, এও আমার। গেটে যে বুগাইভিলিয়া দেখছেন এর নাম বোয়া-দা-রোজ, আমার বাছাই। লাইক টু সী মোর? এদিকে আসুন। কারনেশান দেখুন, শাদা, লাল, হলদে, সব মিলিয়েছি। ডালিয়া চেনেন আপনি, ক্যালেন্ডুলা? বলুন তো কোনগুলো। এই কসমীয়াগুলো নিশ্চয় আমাদের খাবার টেবিলে দেখেছেন। বর্ষায় এলে আপনাকে গ্লোব আমারান্থ দেখাতে পারতুম। এগুলোর নাম আপনাকে বোধ হয় বলে দিতে হবে না, এগুলো পীটুনিয়া।

হঠাৎ কৌশল্যা আহত স্বরে বলে উঠলেন, মিঃ প্রকাশ আপনি কিছুই শুনছেন না।

অপ্রতিভ প্রকাশ প্রথমে প্রতিবাদ করল, পরে ভূয়সী মার্জনা চাইল। ঘরে ফিরে কৌশল্যা বললেন, আসুন আমরা একটা ছবির ম্যাগাজিন দেখি।

আদ্যোপান্ত দেখা হয়ে গেল, উইট এ্যান্ড হিউমারের কলম পড়ে দুজনে একসঙ্গে হাসলেন, কখনও কখনও হুলটা কোথায় না বুঝেও, এক সেট ধাঁধার সমাধান করা হয়ে গেল, বেবি এল না।

—মিঃ প্রকাশ, আপনাকে একটা গৎ বাজিয়ে শোনাই?

প্রকাশ শুনল, ধন্যবাদ দিল, শেষে একটা সৌজন্যসম্মত ছুতো করে সরে পড়ল।

বেবি ফিরে এল সন্ধ্যারও পরে। পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে চুপি চুপি শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কৌশল্যা কর্কশ গলায় ডাকলেন, বেবি, শোন। সারা বিকেল কোথায় ছিলে।

নিরুত্তর মেয়ে আসামীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। কৌশল্যা আবার চেঁচিয়ে বললেন, প্রকাশ এসেছিল, অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেছে জানো?

—মা তুমি তো ছিলে,—বেবি এতক্ষণে কথা বলল, একটুও বুঝি হাসতেও চেষ্টা করল, আমি জানি, আদর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি।

—না হয়নি, কিন্তু জেনে রাখ, প্রকাশ বসেওনি, খানিকক্ষণ উসখুস করে চলে গেল। বেবি, কৌশল্যা এগিয়ে এলেন, কণ্ঠস্বর সাধ্যমত কোমল করে বললেন, বেবি, ওরা কি আমার কাছে আসে। বুঝিস না কেন, তুই না থাকলে ওরা একদিনও কি আসত। একদিনও না।

একটু দম নিলেন কৌশল্যা তেমনি [illegible]

বলতো, তুই কোথায় গিয়েছিলি। চ্যাটার্জির কাছে, না?

মেয়ের মৌনকে কৌশল্যা ধরে নিলেন স্বীকৃতি, আবার যেন চোখে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বলল।—হ্যাঁ কিম্বা না বল।

—গিয়েছিলাম।

—বেশ। তবে তুমি নিজের মতে নিজের পথেই চলবে ঠিক করেছ?

বেবি জবাব দিল না। এক পলক ওর দিকে চেয়ে মনে মনে কী ভেবে নিলেন কৌশল্যা, বললেন, একবার ভেতরের ঘরে এসো বেবি, তোমাকে একটা খবর দেব। কোনদিন দিতে হবে না ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ আর না দিয়ে উপায় নেই।

দরজা জানালা ভালো করে এ'টে দিয়েছেন কৌশল্যা, চাকরদের কানে একটি কথাও যেন না যায়। ঘরে শুধু মৃদু একটি বেডসাইড রীডিং ল্যাম্প্ জ্বলছে। তাতে জ্যোতি কম, ছায়া বেশি।

অতি নীচু অতি নিভৃত ভঙ্গিতে কৌশল্যা বললেন, চ্যাটার্জিকে বিয়ে করবে ঠিক করেছ, কিন্তু তুমি কি জানো বেবি, ওর—ওর খারাপ অসুখ আছে। আর্মির লোক, ওদের কথা জানিস না তো। এখনও চিকিৎসা করছে।

—বাজে কথা, বেবি গর্জন করে উঠল।

—জানি তুই মানতে চাইবি না। কিন্তু বিশ্বাস কর, এর একটি কথাও বানানো নয়। ডাক্তারের প্রেসকৃপসনের নকল যদি দেখাতে পারি, তবে বিশ্বাস হবে?

ঘৃণা আর তিক্ততা মেশানো গলায় বেবি বলল, না, তাতেও হবে না। তোমার এত বুদ্ধি মা, কিন্তু হাতে বেশি অস্ত্র রাখনি কেন। দিদি যখন মেহরাজীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তখন ঠিক এই কথা বলেই তার মন ভাঙতে চেষ্টা করেছিলে মনে আছে? তোমার মনে নেই, আমার আছে। মা, এক অস্ত্রে বার বার কাজ হয় না।

—অন্ধ, স্বার্থপর। কৌশল্যা এর বেশি কিছু বলতে পারলেন না।

ক্ষীণ আলোটাও নিবিয়ে দিল বেবি, বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।—তোমার কিছু ভেবে কাজ নেই মা, এবার ঘুমোও তো। কাল চ্যাটার্জি আসবে। চাও তো তাকে আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করব।

জানালা খুলে দিতেই দমকা হাওয়া ঘরের কলিজা ফুসফুস ঠান্ডা নিঃশ্বাসে ভরে দিয়ে গেল। প্রহরী ঝাউ গাছ তাকে তাড়া দিল : সর্-সর্। রোতক রোডের আলোর মালা কে'পে কে'পে নিবু নিবু হয়ে এল। সেদিকে চেয়ে কৌশল্যা মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না।' শেষ অস্ত্র এখনও হাতে আছে। চ্যাটার্জিকে কী বলতে হবে তাও তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন।

আজ বিকাল থেকেই কৌশল্যা অস্থির পায়ে বাগানে পায়চারি করছেন। কোণের শিরীষ গাছের ডালে একটা মৌচাক হয়েছিল, সেটাকে আজ দুপুরে পাড়িয়ে এনেছেন। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। চাক নেই, তবু গুঞ্জন। ন্যাড়া ডালটার আশে পাশে কয়েকটা মৌমাছি এখনও গুনগুন করে ফিরছে। কৌশল্যা একটা ঢিল তুলে নিয়ে ছুঁড়লেন।

রেলসাইডিংয়ে ইঞ্জিনটা আজ রোগীর মত গলায় কাঁকিয়ে উঠল, একটা মোটরসাইকেলের ঘসঘস শুনতে পেলেন। চ্যাটার্জি আসছে।

এই জন্যেই বিকাল থেকে কৌশল্যা অপেক্ষা করে আছেন, চ্যাটার্জিকে এখানে ধরবেন বলে।

চ্যাটার্জি সোজা বারান্দায় উঠতে যাচ্ছিল, এগিয়ে এসে কৌশল্যা বললেন, ক্যাপ্টেন, একবার এদিকে একটু আসবেন?

ওকে নিয়ে গেলেন হেজের ধারে, কিন্তু প্রথমেই কিছু বলতে পারলেন না।

—ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি, আমি বেবির মুখে সব শুনেছি।

চ্যাটার্জি আরও কিছু শুনতে হবে ভেবেছিল, একটু অপেক্ষা করে আস্তে আস্তে বলল, আশা করি আপনি আমাকে অযোগ্য ভাবছেন না।

—অযোগ্য? একটা পাতা ছি'ড়ে নিয়ে কৌশল্যা বললেন, না। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি, আমার ভয় অন্য বিষয়ে।

ব্যগ্র চ্যাটার্জির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি ফেললেন কৌশল্যা, আরও একটা পাতা ছি'ড়ে নিলেন। ধীরে ধীরে বললেন, ফাঁকির ওপর তৈরি সৌধ স্থায়ী হয় না ক্যাপ্টেন। লুকোচুরির এক দিন না এক দিন ধরা পড়েই। সেদিন আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। পাতার রসে আঙুলে সবুজ রঙ ধরল, সেদিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কৌশল্যা যোগ করলেন, এ ভয়টা বিবাহিত জীবনে আরও বেশি। লুকোচুরিটা জানাজানি হয়ে গিয়ে অসুখ আরও বাড়িয়ে তোলে।

মূঢ় কণ্ঠে চ্যাটার্জি বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিসেস উপাধ্যায়।

অতি সংকুচিত ভঙ্গিতে কৌশল্যা বললেন, আপনাদের দুজনেরই বয়স অল্প, বেবিকে আপনি ভালো বেসেছেন। এ বিয়ে সুখের হত। আমি মা, তবু বেবির বিষয়ে আপনাকে একটা কথা জানিয়ে দিতে আমার বিবেক আমাকে বলছে। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি, বেবি একটু হালকা ধরনের মেয়ে দেখেছেন তো, ও জীবনে একবার ভুল করেছিল।

একাগ্রনেত্র চ্যাটার্জির দিকে আবার তাকালেন কৌশল্যা, বোধহয় শ্রোতার ঔৎসুক্য বাড়িয়ে দিতে চাইলেন।—আমার বড়ো মেয়ে দেবযানী যাকে বিয়ে করেছে সেই মেহরাকে বেবিই আগে ভালবেসেছিল। দোষ আমারই, ওকে ঠিক মত চালনা করতে পারিনি। মেহ্‌রার সংগে ও একবার ড্যালহৌসি পালিয়ে গিয়ে সাত দিন কাটিয়ে এসেছিল জানেন? পুরো সাতটি দিন।

আর পাতা ছে'ড়ার প্রয়োজন নেই, শেষ বিষটুকু ঢালা হয়ে গেছে। দষ্ট জীবটি ঢলে পড়ে কিনা দেখতে কৌশল্যা স্থির নয়নে তার দিকে চেয়ে আছেন। চ্যাটার্জি বিবর্ণ হয়ে যায়নি তো, এতটুকু নুয়ে পড়েনি। খাকি পাতলুনের পকেটে হাত দিয়ে আগের মতোই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে তার রেখাহীন মুখে কৌশল্যা একটুকরো হাসিও ফুটে উঠতে দেখলেন।—খবরটুকুর জন্যে অনেক ধন্যবাদ মিসেস উপাধ্যায়, কিন্তু বড় দেরিতে দিলেন। বেবিকে আমি বিয়ে করেছি।

—বিয়ে করেছ? ইঞ্জিনের মতো তীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে উঠলেন কৌশল্যা, হেজের গুচ্ছ ধরে নিজের শরীরের ভার সামলালেন।

—বিয়ে করেছি। চ্যাটার্জি পুনরাবৃত্তি করল।—কাল রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে নাম সই করে এসেছি। আপনার কাছে আগেই অনুমতি চেয়ে নেওয়া উচিত ছিল, নেওয়া হয়ে ওঠেনি। বেবি মানা করেছিল। সেজন্য হাজার বার মাপ চাইছি মিসেস উপাধ্যায়।

এগিয়ে গিয়ে মোটরসাইকেলটা তুলে নিল চ্যাটার্জি, গেটের দিকে যেতে যেতে বলল, সব বলে আপনি ভালোই করেছেন মা হয়েও লুকোননি, আমার অবাক লাগছে। তবে মিছে ভয় করবেন না, আমরা ফৌজী জওয়ান, এসব প্রেজুডিস নেই।

সাইকেলের পাদানিতে জুতো রেখে চ্যাটার্জি বলল, আরও একটা খবর আছে। আমি পুনায় বদলি হয়েছি। আগামী সপ্তাহেই যেতে হবে। বেবিকেও সংগে নিয়ে যেতে চাই।

মোটরসাইকেলের গর্জন ক্রমে-সরু-হয়ে-আসা রোতক রোডের শেষে মিলিয়ে গেছে। তখনও দাঁড়িয়ে আছেন কৌশল্যা। শিরীষের ডালটিকে ঘিরে মৌমাছির গুঞ্জন নেই। কোয়্যারি থেকে মাঝে মাঝে শুধু ঝুপঝুপ পাথর ধসে পড়ার আওয়াজ। চোখের পাতা দুটি ভারী, একি শিশির। দেবযানী গেছে, আগামী সপ্তাহে বেবিও যাবে। রোতক রোডের এই বাংলোটি একেবারে চুপ হয়ে যাবে, আর কেউ আসবে না। 'কেউ না', ফিসফিস করে কৌশল্যা যেন নিজেকে বললেন। জীবনের স্বাদ তো কবেই গেছে, উপাধ্যায় যেদিন গেছে, সেদিনই; গন্ধটুকু নিয়ে ছিলেন তাও গেল।

হঠাৎ হিংস্র হাতে দু'তিনটে ফুলের চারা উপড়ে নিলেন কৌশল্যা, ব্ল্যাক প্রিন্স্ আর এ্যাডমিরালের পাপড়ি ছি'ড়ে ছি'ড়ে ছড়িয়ে দিলেন।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ॥ ভবতোষ দত্ত ॥

নিপুণ গদ্যশিল্পী বলে বাংলা সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথের খ্যাতি। গদ্য রচনায় বলেন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা তাঁকে রসিক এবং সমালোচকরূপে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার আর একটি দিক আছে; সে দিকটি বাঙালী সাহিত্য-পাঠকের যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। সমালোচক প্রিয়নাথ সেন এবং মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—উভয়েই তাঁর গদ্যরচনার উল্লেখই বিশেষভাবে করেছেন। প্রিয়নাথ সেন বলেন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গত করলেও গদ্য-রচনাকেই অধিকতর সম্মান দিয়েছিলেন।

মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। জীবিতাবস্থায় তাঁর তিনখানি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল—একটি প্রবন্ধের আর দুটি কাব্যের। কাব্যগ্রন্থ দুটির নাম মাধবিকা ও শ্রাবণী। প্রথমটি বেরিয়েছিল ১৮৯৬ সালে এবং দ্বিতীয়টি ১৮৯৭ সালে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্য দুটির উল্লেখ থাকলেও নিঃসন্দিগ্ধ স্থান এখনও নির্দিষ্ট হয়নি। আধুনিক বাংলা ভাষার অসংখ্য পদ্যগ্রন্থের মধ্যে নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে এরা সমালোচকদের দৃষ্টির অগোচরে আত্মগোপন করে রয়েছে। একথা ঠিক কীটস তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে যে গভীরতা লাভ করেছিলেন, সেই গভীরতা বলেন্দ্রনাথের জীবনে আসেনি কিন্তু ছাব্বিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত কাব্যের মার্জিত পারিপাট্য এবং আবেগ আমাদের মুগ্ধ না ক'রে পারে না। এইজন্য এ'র কাব্যের বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করি।

বিশেষ ক'রে এইজন্য যে বলেন্দ্রনাথের সময়ে বাংলা কাব্য সাহিত্য, এতখানি ঐশ্বর্যবান্ হ'য়ে ওঠেনি। মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র বাংলায় মহাকাব্য রচনার যে প্রেরণা জাগিয়েছিলেন, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে-প্রেরণা নিঃশেষে ক্ষয়িত হোলো। অন্য ধারার কবিদের মধ্যে বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার বড়াল এ— দেবেন্দ্রনাথ সেন বাংলা কাব্যে স্থায়ী প্রভাব এ'কে দিয়ে গিয়েছেন। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' এবং 'সাধের আসন' প্রেমের কবিতার নূতন দ্বার উন্মোচন করেছে। অক্ষয়কুমার এবং দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন। অক্ষয়কুমারের তিনখানা কাব্যগ্রন্থ—প্রদীপ (১৮৮৪), কনকাঞ্জলি (১৮৮৫) এবং ভুল (১৮৮৭) আর দেবেন্দ্রনাথের ফুলবালা (১৮৮০), ঊর্মিলা কাব্য (১৮৮১) এবং নির্ঝরিণী (১৮৮১) বিহারীলালের প্রবর্তিত কাব্য-তটিনীকে করেছে খরস্রোতা। আর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বিহারী-লালের ভাব ও ভাষার সুস্পষ্ট অনুকরণ কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। কিন্তু অন্য দুজন কবি তখনই যে স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সেটি খুঁজে পেতে আরো কিছুকাল কেটে গিয়েছে। অবশ্য বলেন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

বলেন্দ্রনাথের পূর্বের এই যে সাহিত্যিক পরিমণ্ডল, এ ছিল গীতিকাব্যের। মহা-কাব্যের মুখর ঝটিকা দিগন্তে বিলীয়মান; গীতিকবিতার শান্তি ও স্নিগ্ধতা ক্রমেই নিবিড় হয়ে আসছে। এই কাব্যপরিমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণগুলি বিশদ করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে—পূর্বর্তীর দানকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নেবার জন্যই। বিহারীলাল উৎকৃষ্ট শিল্পী ছিলেন না; তবু কবিগুরু বলে তিনি স্মরণীয়। তাঁর

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিমর্যাদা তাঁর কাব্যরূপের উপর নির্ভর করে নেই বরং যে অভাবিত আত্মলীন ভাবনিষ্ঠার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, শিল্পী না হলেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য তাতেই হোলো লক্ষণীয়। মর্ত্যের মহত্ত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—বস্তুতে তিনি অনুভব করেছিলেন নির্বস্তুক অমৃতত্ব, অম্লান অজর সৌন্দর্যের নিত্যজাগ্রত বিকাশ। এর পর সৌন্দর্য হোলো সৌন্দর্যলক্ষ্মী, কবি-মানসী। বিশ্বের যে অঞ্জলি তিলোত্তমাকে করল পূর্ণ, অতঃপর কবি বিস্মৃত হলেন তাকে। বাহিরের বিশ্ব বসন্তের যৌবনস্বপ্নে বারবার গান গেয়ে উঠল, শ্রাবণের নয়নাশ্রুতে তার বিরহ হোলো সজল আর এদিকে পৃথিবীর মানব-সংসার প্রেম আর বেদনার আলিম্পনে হোলো বিচিত্র কিন্তু কবি আর তার দিকে ফিরে তাকালেন না। মানসীকে সম্বোধন করে স্তবমন্ত্র পড়লেন তিনি, বাস্তবকে আর মনে পড়ল না। এই বাস্তবকে ভোলেননি অক্ষয়কুমার। কিন্তু তার মানে তিনি যে একে স্বীকার করেছিলেন, তা' নয়। বিহারীলালের আত্মকেন্দ্রিকতা অক্ষয়কুমারের কবিমানসেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর কাব্যও অরূপার উদ্দেশ্যেই রচিত। তবে বিহারীলালের মতো আত্মহারা ছিলেন না তিনি। তাঁর কবিতায় প্রখর আত্মসচেতনতার ছায়া আর সেই সঙ্গে অরূপার জন্য বিরহ-বিলাপ। প্রকৃতির রূপরসগন্ধে তিনি কবিতার ডালা সাজাননি, পৃথিবীর রূপ-গৌরবে উল্লসিত হবার অবকাশ তাঁর ছিল না। তাঁর আদর্শ জীবনে কখনও ধরা দেয়নি; শেলীর মতো রূপে রূপে তাকে খুঁজে ফিরেছেন তিনি, কিন্তু তাঁর সন্ধান সফল হয়নি স্বাভাবিক কারণেই। আদর্শ আর বাস্তবের মিলন সম্ভব হয়েছে কবে। বিশেষ করে সে-আদর্শে যদি থাকে এমন প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য? বিহারীলালের চেয়ে তিনি ছিলেন সার্থকতর শিল্পী। তবু শেষ পর্যন্ত বিজয়ী বিহারীলালই। বাংলা কবিতার বিহারীলাল-প্রবর্তিত আদর্শ থেকে কেউ মুক্তি পান নি। সেই একই লিরিক আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। অবশ্য তাঁর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক প্রখরতা ছিল না। আপনার চিন্তা বা ধ্যান দিয়ে মানসী গড়বার সাধ তাঁর ছিল না। হৃদয়-ভারে তিনি বিবশ ছিলেন না, চিন্তার সূক্ষ্মতা তাঁর কল্পনাকে কুটিলগতি করেনি। এই পৃথিবীর দিকে তিনি মেলেছেন মুগ্ধ দৃষ্টি আর সেই চাওয়ায় প্রকৃতি হোলো সুন্দর। তৃণ-লতা-গুল্মে, শিশু-বৃদ্ধ-রমণীর সংসার, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের আকাশ, শ্যামলে সোনালীতে মেশানো এই প্রান্তর অশোকে কিংশুকে রঞ্জিত এই বসন্ত—দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতি যেন কলরব করে উঠল। দেবেন্দ্রনাথের কাব্য অরূপার জন্য নয়, অপরূপার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অক্ষয়কুমার এবং দেবেন্দ্রনাথের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মিলিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্য বলেন্দ্রনাথের কাব্যরচনার পূর্বে যা রচিত হয়েছিল, তা-ই আমাদের আলোচ্য। এই যুগে অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে চিত্রা পর্যন্ত বেরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতায় সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে সহজেই লক্ষ্য করা যেতে পারে। সেখানে একদিকে প্রকৃতি-পিপাসা আর একদিকে সূক্ষ্ম ভাবনিষ্ঠা রবীন্দ্র-কাব্যে পূর্ববর্তীর ধারাকে নিঃসংশয়িতরূপে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েও কখনই আসলে রূপতন্ময়তা এবং ভাব-তান্ত্রিকতার যুগ্ম বৈশিষ্ট্য থেকে স্খলিত হননি। সন্ধ্যাসঙ্গীতের যে পথহারা মানস-চেতনা প্রভাতসঙ্গীতে পথ খুঁজে পেয়েছে, অনতিবিলম্বেই সে রূপলোকে ব্যাপ্ত হোলো। কড়ি ও কোমল থেকে মানসী চিত্রা—সর্বত্রই অকুণ্ঠ রূপবিলাস। কিন্তু এই রূপ-পিপাসা ঠিক হেলেনীয় নয়; এতে আছে অতি সূক্ষ্ম চিন্তার লঘু স্পর্শ। কড়ি ও কোমলের 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'—এই আর্তধ্বনিতে কবিহৃদয়ের আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। জীবনের পথে বহির্গত পথিক-কবির এই আত্মচিন্তা একতারার তারে বারবার বেজেছে। এইজন্যই দেখতে পাই আনন্দ-স্নাত দৃশ্যগন্ধগান কবির মনোগত আদর্শে বারবার পরিবর্তন করেছে তার বস্তুধর্ম, পরিণত হয়েছে বাঁশীর সুরে, নিরবয়ব ভাবময়তায়।

রবীন্দ্রনাথের এই যুগের কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। মানসী এবং চিত্রাঙ্গদার প্রধান তত্ত্ব প্রেমের। এই প্রেমও বিদেহী প্রেম নয়, বরং দেহ-চেতনা এই প্রেমে বড়ো বেশি জাগ্রত। দেহকে আশ্রয় করেই প্রেমের বিকাশ। দেহের ক্ষুধা থেকেই ভালোবাসার দুর্নিবার আবেগ। সেইজন্য দেহসৌন্দর্যের বিস্ময়কর বর্ণনায় এই সময়ের রবীন্দ্র-কাব্য যৌবনতপ্ত। চিত্রাঙ্গদায় বিশেষ করে দেহ-রূপের সমস্যাটাই কবির চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে। এই কাব্যে কবি মিটিয়েছেন প্রেম ও রূপের দ্বন্দ্ব। এই মীমাংসায় দেহের সীমা নির্দিষ্ট হোলো; পরিপূর্ণ কল্যাণকে সে অতিক্রম করতে পারল না—

> ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
> তখন প্রকাশ পায় ফল।

বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছেই সাহিত্যিক শিক্ষানবীশী করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথের রচনা সংশোধন করে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের মতো পরমাত্মীয় কবির ছায়ায় বর্ধিত হয়ে বলেন্দ্র-নাথের কাব্যরচনায় আদর্শ যে রবীন্দ্র-নাথকেই অনুসরণ করবে, এটা স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। সুতরাং বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক গোত্র নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিচয়ই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনাও তো নির্জন সাধনা ছিল না। অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার ত্রিবেণীতেই বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার।

বলেন্দ্রনাথের কবিতাকে ঠিক প্রেমের কবিতা বলা চলে না। এ-কবিতা প্রেমের পরিণত হেমন্তের প্রতীক্ষায় আছে মাত্র। তরুণ মানসের রূপতৃষ্ণা, পৃথিবী এবং মানুষের বস্তুগত সৌন্দর্যের প্রতি উৎসুক আগ্রহ থেকে বলেন্দ্র-নাথের কবিতার জন্ম। এমন কি প্রকৃতির বর্ণনাও তাঁর কবিতার উপজীব্য হয়নি। নারী প্রকৃতির দেহলাবণ্য, বিশেষ করে জল এবং নারীর সখিত্ব বর্ণনাতে তাঁর বিশেষ আনন্দ। প্রাচীন সমালোচনায় এর নাম আদিরস। আদিরসই বলেন্দ্রনাথের কবিতার মূল প্রেরণা।

কিন্তু আদিরস বললেই বোধহয় যথার্থ সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হোলো না। গীতগোবিন্দ বা বিদ্যাসুন্দরের অনুরূপে কাব্যরস এখানে নেই। এ এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টি যার পেছনে রয়েছে কবির পিপাসু আনন্দিত চেতনা, যা দূরের থেকে দেখে কিন্তু সান্নিধ্যকে পরিহার করে। শুধু ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে নয়, দেখার বিশিষ্ট ভঙ্গিতেও বলেন্দ্রনাথ স্বয়ম্প্রভ। সে-দেখা চকিত, উৎকর্ণ। বসন্তকে ফিরে পেয়ে বনভূমি যেমন অসংযত বিকাশে আত্মহারা হয়, মানুষের জীবনেও মাধবীর আবির্ভাব তেমনি তার সব ভাবনাকেই দেয় ভুলিয়ে। দেখার আনন্দেই সে দেখে, শোনার আনন্দেই সে শোনে। কল্যাণ অকল্যাণের কোনো ভাবনাই আর তার থাকে না—

> পঞ্চ ঋতু থাক প্রিয়ে যাহে খুসী যার,
> মধুমাস থাক প্রিয়ে তোমার আমার।
> শুধু এই যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস
> অনুরাগ-রঙ্গে ভরা নিত্য নব আশ,
> এই তন্দ্রা, এই স্বপ্ন, এই নিশিশেষ,
> এই মনোমোহকর মদির আবেশ,
> শুধু এই মুকুলিত আম্রকুঞ্জবন,
> গন্ধভরা দিশাহারা প্রভাত পবন,
> শুধু এই পত্রে পত্রে মধুর মর্মর
> কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিত সঙ্গীত নির্ঝর
> এই স্বচ্ছ নীলাকাশ, কুলু কুলু নদী,
> এই বর্ণ, এই গন্ধ, গীতি নিরবধি
> এই প্রাণ এই প্রেম, এ পূর্ণ পুলক
> থাক যতক্ষণ থাকে দিনের আলোক।

এই যে প্রেমের পিপাসা, এতে উচ্চারিত হয়েছে অত্যন্ত আত্মগত একটি আকাঙ্ক্ষা। সে-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ কবি-ব্যক্তিরই, তার সঙ্গে সমাজ, জীবন বা জাগতিক বিধি-বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই। এই অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক স্বগতোক্তিতে প্রকৃতির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবিচিত্রতাগুলি কবির সেই

পিপাসারই প্রয়োজনে সার্থক হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে প্রেমের এই বিশিষ্ট কল্পনাভঙ্গি নিছক ব্যক্তিগত চেতনার রঙেই রঞ্জিত; একে আর নৈর্ব্যক্তিক বলা চলে না। বলেন্দ্রনাথের কবিতায় কবিব্যক্তির এই কোমল স্পর্শটুকু সর্বদাই অনুভবগম্য।

প্রাচীন কাব্যের আদিরস এবং রোমাণ্টিক কাব্যের প্রেমের কল্পনায় পার্থক্য এইখানেই। আধুনিক কাব্যের অত্যন্ত মন্ময় অনুভূতি প্রেমকে দ্রুত স্পন্দনে করেছে স্পন্দিত। সেকালের কাব্যের নরনারীর ব্যক্তিঅনুভূতি-হীন অনুরাগ বর্ণনায় এই উত্তাপটুকুরই অভাব। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। জ্ঞান দাসের কোনো কোনো পদ, চণ্ডীদাসের কোনো কবিতা সেইজন্যই বিস্মিত আনন্দে পাঠককে ভরে দেয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রেমের কবিতার নূতন ধরণ এনে দিলেন বিহারীলাল। মধ্যযুগের প্রথাবদ্ধ কাব্যরীতির অবসানে কবি-হৃদয়ের স্বাধীন এবং একান্ত আত্মগত প্রেমের বিরহ-বিলাসকে বিহারীলালই "সূর্যাস্ত-কালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকে" গেঁথে দিলেন। বিহারীলালের প্রেম হয়েছে পার্থিবকে আশ্রয় করেও অপার্থিব, বিদেহ। জন্মহীন, মৃত্যুহীন, দেহহীন প্রেমের কবি ছিলেন বিহারীলাল। এই দেহহীন প্রেমের রূপদক্ষ কবি রবীন্দ্রনাথ রূপকে অস্বীকার করে অরূপ প্রেমের লীলাকে কল্পনা করতে পারেননি। যদিও রূপকে অতিক্রম করে যাবার মতো ভাবুকতাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাই দেহের নিপুণ আলেখ্য নানা রঙে নানা ভঙ্গিমায় তিনি আঁকলেন, তবু তাঁর কবিসংস্কার শুচিতাপূর্ণ দূরত্বকে সর্বদাই রক্ষা করেছে। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলি স্মরণীয়—

> নিশিদিন কাঁদি সখি মিলনের তরে
> যে মিলন ক্ষুধাতুর মত্যুর মতন।

—এই উগ্র উন্মাদকণ্ঠ নিবিড় গুঞ্জনে শান্ত হয়ে এল—

> এ কী দুরাশার স্বপন, হায় গো ঈশ্বর—
> তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোনখানে!
> (পুনর্মিলন)

রোমাণ্টিক কাব্যে দেহ হয়েছে তৃষ্ণার বস্তু, তৃপ্তির নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কিংবা বিদ্যাপতির গানে দেহ বস্তু হিসাবেই সত্য, দেহকে নিয়ে কোনো সূক্ষ্ম কাল্পনিকতার অবকাশ নেই। তার কারণ অবিকৃত দেহ-সত্যই ছিল কাব্যের বিষয়। আধুনিক যুগে দেহ-সত্য কল্পনার আবরণে ঢাকা পড়েছে। অক্ষয় বড়াল এবং দেবেন সেনের কবিতাতেও দেহ-সম্বন্ধে রহস্যবোধ একটা গভীর জীবনসত্যের ইঙ্গিত দেয়। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যেও ভোগ-ব্যাকুলতা জ্বালাময় হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্র বা বিদ্যাপতির কাব্যের মত তা যেন তৃপ্তির সহজ আত্মস্থতায় সুস্থ নয়। সেকালের কবিরা হয়তো ভাবতে পারেন নি এই বাস্তব দেহটাই অসীম রহস্যে অধরা হয়ে থাকতে পারে। সেইজন্যই বোধহয় দেহ সম্বন্ধে তাঁদের উল্লেখ হোত নিতান্তই নগ্ন এবং যথাযথ। সেই দেহটাই আধুনিক কালে দূরান্তরিত হয়ে কল্পনার লীলাভূমি হয়েছে। দেহগঙ্গার তীরে বসে রূপের ঊর্মিমালা গুণতেই কবির আনন্দ এবং সেইজন্যই

> যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
> সলিল-মাঝে।

বলেন্দ্রনাথকেও উক্ত অর্থেই রূপশিল্পী বলতে চাই।

বলা যেতে পারে, বলেন্দ্রনাথের কাব্য-জগতের বিস্তার সঙ্কীর্ণ। সৌন্দর্যকে কবি নারীরূপের মধ্যেই সার্থক হতে দেখেছেন। প্রকৃতি বা জীবনের অন্য বৈচিত্র্যগুলি কবিকে আকর্ষণ করতে পারেনি। বয়ঃসন্ধিতে উপনীত রাধিকার মতো কবি আপন কল্পনায় আপনি মুগ্ধ। রাধিকার আত্মরতি এখানে কবির পিপাসার্ত হৃদয়ের তরুণ সৌন্দর্য-ক্ষুধার রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রিয়নাথ সেন বলেছিলেন, "বসন্ত ও বর্ষার বিভিন্ন শোভা ও বিচিত্র প্রভাবের মধ্যে কবির অন্তরের প্রেম আর অন্তরতমা সুন্দরী। "দিশে দিশে গীতে গন্ধে মুঞ্জরিত। বিরহে—মিলনে, অন্তরে—বাহিরে, শয়নগৃহে —নদীবক্ষে, প্রেমের সেই নিত্য-নব বসন্ত উৎসব—আর হৃদয়ের সেই বর্ষা-ঘন নিবিড় অনুরাগ। কিন্তু এ সুন্দরীর অবস্থান কোথায়—ইহার নাম কি? হৃদয়ের অন্তঃপুরে—কল্পনার দোলায় বাস এবং নাম মানসী। এক কথায় কবি তাঁহার হৃদয়-বাসিনীকে সকল সুন্দরীর সৌন্দর্যে—সকল বিলাস কলার শোভায় মণ্ডিত করিয়াছেন—একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের সমৃতি।" (প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি) এ মানসী বিহারীলালের সারদার সহোদরা নয়। পৃথিবীর আলো-হাওয়ার সংস্পর্শ-বর্জিত মানসী এ নয়। সুন্দরের তৃষ্ণাকে কবি বাস্তব নারীর চলনে বলনে বচনে কটাক্ষে মূর্তি দিয়েছেন। সুন্দরের এই পিপাসাই কবির বিশিষ্টতা।—

> সর্ব অঙ্গে ধ্বনি তব বাজিছে সুন্দরী,
> কঙ্কন মেখলা হার নূপুরে গুঞ্জরি
> নানা সুরে নিশিদিন; রতিপতি বুঝি
> কায়া ত্যজি তব অঙ্গে ফিরে কায়া খুঁজি
> চঞ্চল অধৈর্যভরে তারি পঞ্চ শর
> তব অঙ্গে অঙ্গে আজি হয়েছে মুখর
> মধুর নিক্কণে।

—উদ্ধৃত কবিতাংশটিতে পাঠকের স্বভাবতঃই মনে হবে সংস্কৃত কবিদের বর্ণনরীতির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মদন তার পঞ্চশরকে নারীর সৌন্দর্য-যোজনায় ব্যয় করেছে বলেই নারী এত সুন্দর। নারীরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে মদনের এই সকৌতুক অভিনয় সংস্কৃত কাব্যরীতিকে মনে করিয়ে দেবে। সুতরাং আলোচ্য অংশটি প্রথাকেই অনুসরণ করেছে বলে মনে হবে। উপরের কবিতার শেষের দুই পংক্তি—

> তরুণ অরুণ রাগে কঙ্কন কিঙ্কিনী
> ঝমঝমে তালে তালে বাজে রিনিরিনি।

এই অভূতপূর্ব কল্পনা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে কিংবা সংস্কৃত সাহিত্যেই বা কোথায় পাই। ধ্বনিকে বর্ণে রূপান্তরিত করা শুধু নয়, কবি আপনার হৃৎস্পন্দনে তাকে বাজতে শুনলেন—এই আশ্চর্য সংবেদনশীলতাতেই বলেন্দ্রনাথের প্রেম-কল্পনার বিশেষত্ব।

কবির এই স্পর্শকাতরতা আর একটি কবিতায় মধুর ছলনায় প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাটির নাম 'কলবেদনা'। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রে লিখেছিলেন—মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব। পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে—জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছল ছল জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে।" এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতাই রচনা করেছেন জল এবং নারীর অন্তর্লীন সহমর্মিতাকে কল্পনা করে। বিশেষ করে জলে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনে আত্মমুগ্ধ রূপসী চিত্রাঙ্গদার বিখ্যাত বর্ণনা এই সময়েরই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসে কয়েকটি বিখ্যাত দৃশ্যের এই একই বিষয়। বলেন্দ্রনাথের কাব্যেও একাধিকবার জল এবং নারীর নিবিড় অন্তরঙ্গতা বর্ণনীয় বিষয় হয়েছে। 'কলবেদনা' কবিতাটিতে কবির আকাঙ্ক্ষা জলের কলভাষণে ব্যক্ত—

> আমারে বাঁধিয়া লহ কটিতটে তব
> হে সুরসুন্দরি, চারু অঙ্গে অভিনব
> রহিব সুগন্ধ ওই বসনের মত
> তনখানি সযতনে সম্বরি সতত
> মোর স্বচ্ছ জলধারে.........

বলার কী প্রয়োজন আছে প্রথম পংক্তিতেই ধ্বনি এবং কল্পনার প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? সে কবিতার নাম 'বসুন্ধরা'। কিন্তু মানসসুন্দরীতে কবি মানসীকে ওই ভাষায় আহ্বান করেছেন, একই ভাষায় নিজেকে নিঃশেষে প্রিয়াদেহে বিলীন করতে দেবার মিনতি বাণী উচ্চারণ করেছেন—

> বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানসসুন্দরী
> দুটি রিক্তহস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
> কণ্ঠে জড়াইয়া দাও মৃণাল পরশ
> রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে
> কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছল ছল
> মুগ্ধ তনু মরি যায়, অন্তর কেবল
> অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
> এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।

বলেন্দ্রনাথের কবিতায় সরোবর 'প্রিয়তম ইব প্রার্থনা চাটুকারঃ' সে প্রিয়তম যে কবির প্রণয়-বাসনারই বিগ্রহ তাতে কী আর সন্দেহ আছে?

তবু বলেন্দ্রনাথের কবিতাকে ঠিক প্রেমের কবিতা বলতে চাইনে এইজন্য যে, প্রেমার্ত হৃদয়ের গাঢ় গভীরতা, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুভূতির তৃষিত হাহাকার এর মধ্যে নেই। যে বাগ্র ব্যাকুলতা প্রেমের ঝটিকাদীর্ণ রজনীতে অন্ধ হয়ে পথ হারায়ঃ জীবন-মৃত্যু, আকাশ-মৃত্তিকা তুচ্ছ হয়ে যায়—

My soul
Smothed itself out—a long-cramped scroll
Freshening and fluttering in the wind.

বলেন্দ্রনাথের কবিতায় আত্মহারা প্রেমের সেই উন্মাদনা নেই। তাঁর কবিতায় আছে সৌন্দর্যলোভী মুগ্ধ কবির ভ্রমর-গুঞ্জন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনের প্রেমের কবিতায় যে ভঙ্গিতে দেহবন্দনা করেছিলেন বলেন্দ্রনাথের কবিতাতে তার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলির সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের সনেটগুলি পাশাপাশি রেখে পড়া যেতে পারে। মানব-দেহের বিবিধ ভঙ্গিমার সৌন্দর্য-প্রতিভাস প্রিরাফায়লাইটদের মতো চিত্ররীতিতে বলেন্দ্রনাথ এঁকেছেন। শুধু রীতিতে নয়, দেহ-লাবণ্যের শাণিত বর্ণনাতেও প্রিরা-ফায়লাইটদের সঙ্গে তিনি তুলনীয়। ইংরেজ কবিদের দ্বারাই তিনি প্রভাবিত কিনা সেটা প্রত্যয়সহকারে বলা না গেলেও রবীন্দ্রনাথকে মাধ্যমস্বরূপ স্বীকার করে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাদের রীতি এবং প্রবণতার প্রভাবকে সম্ভবত অস্বীকার করা যাবে না। রোমান্টিকের নিরবয়ব তত্ত্ব বলেন্দ্রনাথের কাব্যে নেই। আবার পরবর্তীদের মতো সত্যাচরণের দুঃসাহসে ইন্দ্রিয়-হ্রদে অবগাহনও তাঁর কাব্যে নেই। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন ঈসথেট। একটা সীমা শিল্পী বলেই সর্বদা মেনে নিয়েছেন। সৌন্দর্য যতক্ষণ কল্পনায় রহস্যমণ্ডিত হয়ে শিল্পী-চেতনাকে লোভাতুর করল ততক্ষণই সেটা উপভোগ্য। তার অধিক অগ্রসর হবার আগ্রহ তাঁর ছিল না।

তাঁর উভয় কাব্য সম্পর্কেই কথাগুলি প্রযোজ্য। মাধবিকাতে যেমন শ্রাবণীতেও তেমনই। যখন বর্ষা এল, তখনও কী কবির হৃদয়ে রসের বর্ষণ নামেনি? গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটির মতো আকাশ মেঘে মেদুর হয়েছে, ধরণী স্বপন দেখছে বৃষ্টির। শ্রাবণী কাব্য আসন্ন বর্ষার কাব্য—

> মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়ে
> তুমি এস নেমে এস হৃদয়গুহায়
> অন্তরের মাঝে, অয়ি অন্তরবাসিনি।
> ঘনায়ে আসুক আরো তিমির-যামিনী
> তব চারিধারে, ঘন ঘন গরজনে
> পরিপূর্ণ হোক দশ দিশি, সন সনে
> বহুক পবন খরবেগে; তুমি রহ
> অহরহ পূর্ণ করি সকল বিরহ
> অন্তরমন্দির মাঝে; তব স্নেহহারে
> সজীব হইয়া উঠ নব মহিমায়
> পুরাণ বিরহ যত কুহু অভিসার
> ঝঞ্ঝাঘন গরজন শ্রাবণ-নিশার;
> মত্ত দাদুরীর রোলে স্নিগ্ধ কেকারবে
> তুমি যেন ভরি উঠ সর্ব অবয়বে।

—অন্তরবাসিনীকে কবি সম্পূর্ণরূপে পেয়েছেন, এ কথা বলতে পারি না। অধরাকে ধরবার, অপ্রাপ্যকে পাবার আগ্রহে কবির মন গুঞ্জন-রত—

> মুগ্ধ মন কোথা যেন করে অভিসার
> কোন্ বৃন্দাবনধামে কোন মধুদেশে
> কেতকী বেষ্টিত কোন্ নিকুঞ্জ উদ্দেশে
> কার লাগি;—সেই মোর হৃদয়ের রাণী
> দিশে দিশে গীতিগন্ধে তাহারে বাখানি।

এই বর্ষার সূর্যহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনেই রবীন্দ্রনাথের কল্পনাও যাত্রা করেছিল চির-বাঞ্ছিত তীর্থে—

> আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
> সেই দিবা অভিসার
> পাগলিনী রাধিকার,
> না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।

এই সুরে চিরন্তন রোমান্টিক দূরাভিসারেরই সুর—My love dwelt in a Northern Land. প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ঋতুর বিচিত্রতায় কবি তাঁর মানসীকে সহস্র দীপ্তিতে দীপ্তিময়ী হতে দেখেছেন। মাধবিকায় বসন্তের উন্মাদ কলোচ্ছ্বাসে সে প্রকাশিত, আবার শ্রাবণীর বর্ষণধারায় সে বর্ষাসুন্দরী। তার রূপ চিরনবীন। বিরহের করুণ বিষণ্ণতা তাঁর কাব্যে নেই। নূতনরূপে যাকে পাই নূতনতর রূপে তাকেই লাভ করবার আশা স্বভাবতই কবিকে কিঞ্চিৎ উন্মুখ করবেই। কবির রোমান্টিকতা এর বেশী অগ্রসর হয়নি। 'তৃপ্তির নরকে জ্বলি অতৃপ্তির খেদে'—এই দীর্ঘশ্বাস বলেন্দ্রনাথের কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেনি। বলেন্দ্রনাথের কবিতায় যে-সহাস্য রূপরচনা পাই তাতে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়তা কিংবা বার্থতা-বিলাস নেই। কবি স্বভাবত মুগ্ধ এবং সন্তুষ্ট। প্রাকৃতিক দৃশ্য, তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র ঘটনা, বিস্মরণশীল মুহূর্ত, পলায়নপর অনুভূতি—এরাই সনেটের আকারে এই কাব্যে এসেছে। সে দিক থেকে কবির জাগ্রত চেতনা বস্তুর বস্তুত্বে নিঃসন্দিগ্ধ থেকেও সামান্যকে অসামান্যরূপে দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। এর পেছনে কোনো গভীর কল্পনা নেই, কোনো তত্ত্ব বা আদর্শ নেই; চিত্র-রীতির বর্ণগাঢ় শিল্পকলা এর সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের চৈতালী কাব্যের কবিতা-গুলির সঙ্গে এর সাদৃশ্য মনে আসতে পারে—

> আবার বাঁধিনু তরী আর ঘাটে এসে
> ঝিকিমিকি বেলাটুকু উপনীত শেষে।
> কলস লইয়া কাঁখে গ্রামবধূজন
> গ্রামপথে হেলেদুলে করিছে গমন।
> দুইধারে শস্যক্ষেত্র লুটায় চরণে
> ফুলরেণু উড়ি আসি লাগিছে বদনে।
> তুলিয়া বসনখানি জানুর উপরে
> জলে নেমে আসে বধূ অবলীলাভরে;
> পূর্ণ করি শূন্য কুম্ভ তুলে লয় ধীরে
> চলে যেতে বার বার দেখে ফিরে ফিরে
> গৃহতটিনীর পানে সকরুণ চোখে—
> কি জানি আবার দেখা না হয় এলোকে
> তপোবন মৃগসম প্রকৃতির নীড়ে
> চিরজন্ম বর্ধিত সে এই নদীতীরে।

আমাদের সাহিত্যালোচনায় কবি এবং আর্টিস্টের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা হয় না। কাব্য এবং আর্ট আমাদের কাছে সমার্থক কিন্তু দুটোর অর্থ একই ধারা উচিত কিনা—এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। যিনি কাব্যের বহিরঙ্গ অর্থাৎ শব্দ এবং তার প্রসাধন-পারিপাট্য নিয়েই শুধু ব্যাপৃত থাকলেন—প্রেরণার অকৃত্রিম অনিবার্যতা যাঁর নেই, তাঁকে মৌলিক অর্থে কবি বলা যায় না। তিনি কলারসিক পদ্য-লেখক মাত্র। আবার যাঁর মধ্যে প্রেরণার স্বাভাবিক উৎসার আছে, কিন্তু সে-প্রেরণাকে শব্দের সুন্দর সজ্জায়—শুধু সুন্দর করবার জন্য নয়, যথাযথ মূর্তি দেবার জন্যই—ভূষিত করবার সতর্কতা নেই তাঁকে বলতে পারি ভাবুক। কবি তিনিই যিনি আবেগকে অমোঘ বাণীতে এককরূপে প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং হৃদয় এবং বুদ্ধির মিশ্র দানে কাব্যের সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ কবির ভাব আর ভাষায় কোনো ব্যবধান নেই—কবিতা আর কাব্যরূপ আলাদা নয়।

কলারসিক এবং কবি—এর মধ্যে আর একটি স্তর কল্পনা করা বোধহয় অপ্রয়োজনীয় নয়। নিছক চিত্রকাব্যের কথা নয়, প্রকাশ-সম্পদে সমৃদ্ধ, চিত্র-সৌন্দর্যে, বর্ণনানৈপুণ্যে, রূপলেখা মনোহর কাব্যও আছে। সে-কাব্য হয়তো আমাদের সবটুকু কামনা পূর্ণ করতে পারে না। জীবনের ঘূর্ণাবর্তে যিনি নামলেন না, বেদনার দারুণ অন্তর্দাহ যাঁর অস্তিত্বকে ভস্মীভূত করল না, কিংবা জীবনের দান যাঁর আত্মাকেও শান্ত করল না, মহাকবির অমরলোকে তাঁর হয়তো প্রতিষ্ঠা নেই, কিন্তু বস্তুর সৌন্দর্য তাঁর কবিত্ব-বাসনাকেও উদ্দীপিত করতে সক্ষম। জীবনকে তিনি দূর থেকে দেখেন এবং সে-দেখায় আছে কবির সকৌতুক চিন্তার চমক। এই সৃষ্টিও কবিতা—তবে সে-কবিতা ধ্যান-মহিমায় মহিমান্বিত নয়। জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত না থেকেও জীবনের সৌন্দর্যকে মাত্র উপভোগের সামগ্রীরূপে কাব্যে ধরে দেওয়াই আর্ট। যাঁরা 'আর্ট ফর আর্টস সেক'—এই মতবাদকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা

এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ'রা শ্রেষ্ঠ কবি নন, আবার সামান্য কলারসিক পদ্য-লেখকও নন। বলেন্দ্রনাথের কাব্যের আলোচিত বৈশিষ্ট্য থেকে তাঁকেও এই শ্রেণীর আর্টিস্ট বলেই গণ্য করা চলতে পারে।

প্রিয়নাথ সেন বলেছেন, "তিনি জন্মকবি—আজন্ম রচনারসিক (Stylist)।" বলেন্দ্রনাথের রচনারসিকতা শুধু গদ্যের ক্ষেত্রে নয়, কবিতার ক্ষেত্রেও সুপ্রকাশিত। বলেন্দ্রনাথের চিন্তা আমাদের যত-না আকর্ষণ করে তার চেয়ে বেশি আকর্ষণ করে তাঁর ভাষা-শিল্প। এই ভাষা শুধুই অর্থহীন শব্দযোজনা নয়, এ তার চেয়েও বেশি। সুন্দর রূপকে ফুটিয়ে তোলে এই ভাষা। এ-কথা বলা যেতে পারে, বলেন্দ্রনাথের গদ্যভাষা যদি তাতে সার্থক হয়ে থাকে, তবে তো আর কোনো প্রশ্ন থাকে না। সেটাই তো কাব্য। আমরা এটাকে ঠিক কাব্য না বলে বলব আর্ট। রবীন্দ্রনাথ নিজেই কাব্য এবং আর্টের পার্থক্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন, —'ফরাসি কবি গোটিয়ে রচিত "ম্যাড-মোয়াজেল ডে মোপ্যাঁ" পড়ে (বলা উচিত, আমি ইংরেজি অনুবাদ পড়েছিলুম) আমার মনে হয়েছিল, গ্রন্থটির রচনা যেমনই হ'ক তার মূলতত্ত্বটি জগতে যে-অংশকে সীমাবদ্ধ করেছে সেইটুকুর মধ্যে আমরা বাঁচতে পারি নে। গ্রন্থের মূলভাবটা হচ্ছে একজন যুবক হৃদয়কে দূরে রেখে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেশদেশান্তরে সৌন্দর্যের সন্ধানে ফিরছে। এইজন্য এই গ্রন্থের মধ্যে হৃদয় অধিকক্ষণ বাস করতে পারে না; রুদ্ধশ্বাস হয়ে তাড়াতাড়ি উপরে বেরিয়ে এসে যখন আমাদের প্রতিদিনের শ্যামল তৃণক্ষেত্র প্রতিদিনের সূর্যালোক প্রতিদিনের হাসিমুখগুলি দেখতে পাই তখনই বুঝতে পারি সৌন্দর্য এই তো আমাদের চারিদিকে, সৌন্দর্য এই তো আমাদের প্রতিদিনের ভালোবাসার মধ্যে। এই বিশ্বব্যাপী সত্যকে সংকীর্ণ করে আনাতে পূর্বোক্ত ফরাসী গ্রন্থে সাহিত্যশিল্পের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সাহিত্য-সত্যের স্বল্পতা হয়েছে বলা যেতে পারে।" (সাহিত্য, লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লিখিত পত্র)। সাহিত্যের সত্যকে উপলব্ধি করবার প্রণালী কবিতে কবিতে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তির সর্বশেষ বাক্যটি আমাদের বর্তমান আলোচনায় মূল্যবান। দেখা যায়, এক শ্রেণীর সাহিত্যিক-দের মধ্যে সৌন্দর্যচর্চা প্রাধান্য লাভ করেছিল, সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সে-সাহিত্য অপূর্ব হলেও কাব্যের মহৎ সত্য থেকে সে ছিল বঞ্চিত। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে এরও নিজস্বতা আছে। এ শুধু যন্ত্রবদ্ধ শিল্পকৃতি নয়, এ তারও অধিক। কল্পনা ও ব্যক্তিস্পর্শ একেও উচ্চতর কাব্য-পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ইংরেজি সাহিত্যে সুইনবার্ন টেনিসনের কাব্য কিংবা ফরাসী সাহিত্যের গোতিয়ে এবং জার্মান সাহিত্যের জুদারম্যানের উপন্যাস সৌন্দর্যচর্চায় উৎকৃষ্ট; বলেন্দ্রনাথের কবিত্বও রসসৃষ্টির সেই গোত্রেরই অন্তর্গত। তাঁর পূর্বগামী কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন সৌন্দর্য-রসিক কবি হলেও ভাষাকে তিনি শিল্প হিসাবে চর্চা করেননি এবং তার কাব্যে জীবন সম্বন্ধে গভীরতর উপলব্ধির বাণী বেজেছে।

কিন্তু বলেন্দ্রনাথের ভাষাশিল্পে এমন একটা অভিনবত্ব দেখা গিয়েছে, দেবেন্দ্রনাথেও যেটা সহজলক্ষ্য নয়। তার কারণ দেবেন্দ্রনাথ কাব্যভাষার ঐতিহ্যে একটি সুস্পষ্ট উত্তরাধিকারকে সযত্নে রক্ষা করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ যখন নিজস্ব শিল্পরীতির উদ্ভাবন করতে সমর্থ হলেন, তখন বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপটাই পরিবর্তিত হোল। রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কাব্যভাষা হচ্ছে ক্লাসিক গুণোপেত ভাষা। প্রত্যক্ষকে নিয়েই সে-ভাষার অর্থব্যাপ্তি। সাবয়ব বা concrete-কে প্রকাশ করতে সে-ভাষার যথাযোগ্যতা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্রের কবিকল্পনা ছিল প্রত্যক্ষতা-সচেতন। অবয়বহীন সূক্ষ্মতার জগৎ তখনও তৈরী হয়নি। তাই রবীন্দ্রপূর্ব কবিদের ভাষাশক্তি বস্তুমূলক কল্পনাতেই নিবদ্ধ। মধুসূদনের কাব্যের ভাষায় উপমা-উৎপ্রেক্ষার অজস্রতার মধ্যে ভাবমূলক রূপ-চিত্র দুর্লভ। হোমারের কাব্যে শেলীর প্রকাশ-রীতি নেই। প্রত্যক্ষকে তাঁরা প্রকাশ করেছেন প্রত্যক্ষের দ্বারাই। সূক্ষ্ম ভাবকে বস্তুতে আরোপিত করে শরীরী করে তোলা এবং বস্তুকে ভাবে আরোপিত করে অশরীরী করে তোলা—এই রোমাণ্টিক কারুকলা আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যভাষার লক্ষণ নয়। কবি হিসাবে বিহারীলালের অসাফল্যের কারণ এই-খানেই। তাঁর যুগবিরোধী আত্মকেন্দ্রিক কাব্যকল্পনার অনুরূপ ভাষা তিনি সেকালের ক্লাসিক ভাষাশিল্পের মধ্য থেকে সৃষ্টি করে তুলতে পারেন নি।

ভাষা ও ছন্দ কবিতায় বাল্মীকির এই উক্তি—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।

অর্থবদ্ধ ভাষাকে ভাবের আকাশে মুক্তি দেবার শক্তি প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথের সাধনায় পূরণ হয়েছে। তাঁর ব্যোমচারী মুক্তপক্ষ কবিকল্পনার যথার্থ বাহন তিনিই সৃষ্টি করেছেন—বিক্রমী অস্পষ্ট-মধুর। বাংলা কাব্যভাষার যুগান্তর সূচিত হোলো।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'কড়ি ও কোমলে'র যুগে রবীন্দ্রনাথ এই বিশিষ্ট ভঙ্গি ধীরে ধীরে আয়ত্তে নিয়ে আসছেন। 'মানসী'তে প্রায় সম্পূর্ণই আয়ত্তে। কিন্তু ঐ রীতি বাঙালী পাঠকের অভ্যস্ত হতে সময় লেগেছে। রবীন্দ্রনাথেরও আতিশয্য মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়ে যেত এবং তারই সুযোগ নিয়ে সুরেশ সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি আক্রমণ করেছিলেন—'পুলক নাচিছে গাছে গাছে'। সেই যুগে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃসঙ্গ কবি যিনি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা না রেখে রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করেছিলেন। এই প্রকাশরীতির জন্য রবীন্দ্রনাথ যেমন লাভ করেছিলেন উপহাস, বলেন্দ্রনাথও তেমনি পেয়েছেন উপেক্ষা।

তাঁর স্বল্প পরমায়ুতে কর্মক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত, কবিতা নিয়ে লিপ্ত থাকবার অবকাশ তাঁর বিশেষ ছিল না, তাই হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁর কারুকলার দুঃসাহসিক অভিনবত্ব বিস্মৃতিতে হোল অন্তর্হিত।

শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের কবিতায় বিশেষ প্রভাব পড়েছিল সংস্কৃত কাব্যের। পড়া বিচিত্র নয়। গদ্য প্রবন্ধ থেকেই বেশ বুঝতে পারা যায় সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের পরিচয় কত নিবিড় ছিল। সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা এবং রসগ্রাহিতায় তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজিতে যাকে diction বলে, বলেন্দ্রনাথের সেই বস্তুটি কালিদাস এবং বাণভট্টের থেকেই বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত। এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করা যেতে পারে এই সময় থেকে কিছুকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে কালিদাসের শব্দসম্পদ কী অকৃপণ দানে সাজিয়ে দিয়েছে। বিখ্যাত 'মেঘদূত' কবিতাটি মানসীর যুগে লেখা। কালিদাসের কাব্যের ধ্বনিবহুল চিত্রাত্মক শব্দখণ্ডগুলি ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে সহজেই আকর্ষণ করে নেয় এবং সারা জীবনেও তিনি এর মোহিনীশক্তি থেকে মুক্ত হননি। পরবর্তীকালে যদিও তাঁর ভাষায় চিত্রাত্মক গুণের চেয়ে মননধর্মী বিশ্লেষণ গুণই বরং প্রধান হয়ে উঠেছিল, তবু কালিদাসের শব্দই তার মূল কাঠামোরূপে ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। বলেন্দ্রনাথও যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য দ্বারাই প্রভাবিত ছিলেন উপরে উদ্ধৃত কবিতাংশ থেকে সেটা বুঝতে পারা যাবে। এইজন্যই শুধু ধ্বনি নয়, কাব্যের রং ও রেখার ঐশ্বর্য পাঠককে আকৃষ্ট করবেই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে তৈরী করে নিলেন সমিল প্রবহমান রূপে। মানসীর 'মেঘদূত' কবিতাটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের এ ছন্দে রচিত প্রথম কবিতা। * তারও পূর্বে আর কেউ লিখেছিলেন কিনা, সেটা ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি এই ছন্দকে পরিচিত এবং প্রচলিত করে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, অন্তত একজনকে দেখছি যিনি এই ছন্দে একাধিক দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। বলেন্দ্রনাথের 'অগ্নিহোত্র', 'কলবেদনা', 'দেহে', কবিতা তিনটি ছাড়াও অন্য কবিতাগুলিতেও তিনি এই ছন্দের নীতিটি অনুসরণ করেছেন। শব্দ ব্যবহারে ধ্বনিকে গৌরবান্বিত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মিলের একান্ত প্রয়োজন; বলেন্দ্রনাথের প্রয়োজনও সেইজন্যই। এই সমিল প্রবহমান ছন্দটির অনুসরণের জন্যও বাংলা সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথেরও স্থান নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

কিন্তু ভাষাশিল্পী হিসাবে বলেন্দ্রনাথের সাফল্য গভীরতর কারণে। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষার রোমানটিক কারুকলার উল্লেখ করেছি কিন্তু তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের ভঙ্গিগত পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার বৈশিষ্ট্য, সে রূপকাভিমুখী। বস্তু ভাবকে জাগিয়ে দেয়। বস্তু যেন ভিন্নতর এক ভাবসত্তার রূপক। রবীন্দ্রনাথকে এই দিক থেকে শেলীর সমধর্মী বলা যেতে পারে—

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন ছিদ্র হতে ছুটে আসে।
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর।

—বৈশাখের রুদ্র রূপটাই কবির অন্তরে কল্পনার দ্বার মুক্ত করেছে এবং বস্তুটা পরিণত হয়েছে সেই ভাবের রূপকে। বৈশাখ হয়েছে প্রমথনাথ আর ঘূর্ণি হাওয়া হয়েছে প্রমথবৃন্দ। বলেন্দ্রনাথে ঠিক এই ভঙ্গিটা নেই। তাঁর কাব্যে নিরবয়ব সাবয়ব হয়ে ওঠে—

সকল হৃদয়ভার কলসীতে ভরি'
লয়ে যাও গৃহমাঝে কক্ষতলে করি।

ঘাটের থেকে গৃহ প্রত্যাবর্তনের পথে জলের মতোই হৃদয়ভারে কলস পূর্ণ করে বধূ ঘরে ফিরে আসে—ভাষার এই নব উপমারীতিতে ভাবটা বস্তুর মতোই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। বলা নিষ্প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথেও এই রীতি আছে এবং এটা কীটসের প্রকাশরীতিরই এ[কটি] বৈশিষ্ট্য—

her heart was voluble
Paining with eloquence her bal[my] si[de;]
As though a tongueless nighting[ale] should sw[ell]
Her throat in vain, and die, hea[rt]-stifled in her d[ell.]

শুধু তাই নয়। অনুভূতি কল্পনার মা[ধ্যমে] কেমন ইন্দ্রিয়ান্তরিত হয়, তার দৃষ্টা[ন্ত] বলেন্দ্রনাথে আছে—

কক্ষমাঝে রিনি রিনি বাজে তব স্নেহ

কিংবা পূর্বোদ্ধৃত

তরুণ অরুণ রাগে কঙ্কণ কিঙ্কিনী
কক্ষমাঝে তালে তালে বাজে রিনিরিনি

ধ্বনির অনুভূতি বর্ণের অনুভূতি রূপান্তরিত হোলো। রবীন্দ্রনাথে এর খ[ুব] চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়

বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘ তান সুরে

রবীন্দ্রনাথের ভাষার শক্তি স্বাভাবিক কারণে বলেন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি। অর্থবদ্ধ শব্দে[র] উপর ভাবের আধিপত্যের জন্যই শব্দকে তার অর্থের অধিকার কিছুটা ত্যাগ করতে হয়েছে। প্রকাশের এই দুটি রীতির উদ্ভব আসলে অকৃত্রিম কবিকল্পনার উৎস থেকে। এবং এই রীতিটা সম্ভবত ইংরেজি রোমাণ্টিক সাহিত্য থেকে সঞ্চারিত হয়েছিল। সে যুগের বাঙালীর অনভ্যস্ত কানে একে মনে হয়েছিল অদ্ভুত। এই নিয়ে তাঁরা বিদ্রূপ করেছিলেন। অতএব এই প্রকাশরীতি বাংলা ভাষা প্রকৃতির অনুকূল কিনা—এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। প্রথম যুগে এর মধ্যে বিজাতীয়তার গন্ধ মনে হলেও আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা ভাষার আশ্চর্য অনুশীলনে একে স্বাভাবিক করে নিয়েছে। কিন্তু একে কী সম্পূর্ণ অপরিচিত বলা উচিত? জ্ঞানদাসের কবিতায়—

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল॥

এ রকম পংক্তি পূর্বকালের বাংলা সাহিত্যে সহজলভ্য না হলেও জ্ঞানদাসের প্রয়োগই এর অনিবার্যতার প্রমাণ। উক্ত পংক্তি দুটির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এর ভাবময়তা। এই ভাষা আসতেই পারত না, যদি-না কবি ভাবটাকেই ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হৃদয়ানুভূতিতে মাত্র অনুভব করতেন। সেই ভাবটাকেই প্রকাশ করবার অনিবার্য প্রয়োজনে এমনই এক ভাষা কুসুমের মত দল মেলল যা সে-কালের কোনো কবি ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন 'পঞ্চদশ বসন্তের একখানি মালা' কিংবা বলেন্দ্রনাথ যখন লেখেন—

যৌবন করিতে চাহে আপনারে ক্ষয়
ওই রূপাবলাতটে লাবণ্যসৈকতে

তখন মনে হয় এই ভাষা নূতন কিন্তু কৃত্রিম নয়, বাংলা ভাষা প্রকৃতির মধ্যেই এর সম্ভাবনা ছিল, অনুকূল হাওয়ায় আজ সে অঙ্কুর মেলেছে।

---

* প্রবোধচন্দ্র সেন: ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১০৮—৯

(১)
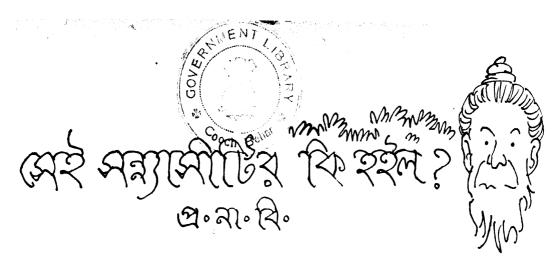
রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কোন্ অভিজ্ঞতার পরিণামে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত বালকেও জানে। রাজকীয় সুখ ও ঐশ্বর্যে লালিত পালিত যুবক রাজপুত্র নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া পর পর চারদিন চারটি দৃশ্য দেখিলেন, মৃতদেহ, রুগ্ণ, জরাগ্রস্ত ব্যক্তি ও একজন সন্ন্যাসী। প্রথম তিনটি দৃশ্য দেখিয়া বুঝিলেন যে, মানুষ যতই আরামে বিলাসে মগ্ন থাকুক না কেন, মৃত্যু, ব্যাধি ও জরা তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, ইহাদের আক্রমণ এড়াইবার কোন উপায় কোন দেহীর নাই। চতুর্থ দিনে তিনি দেখিলেন চীরাজিন ধারী এক প্রফুল্ল সন্ন্যাসী। তখন তাঁহার মনে হইল সন্ন্যাসের পথ গ্রহণ করিলে হয়তো বা জরা ও ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব, মৃত্যুর কবল অবশ্য অনপনেয়, কিন্তু যাহার বাসনার মূল ছিন্ন হইয়াছে, মৃত্যুতে তাহার আবার ভয় কি? তখন তিনি সংকল্প করিলেন যে, আর বিলম্ব নয়, সেই রাত্রেই সংসার পরিত্যাগ করিবেন ও দূরবর্তী কোন স্থানে গিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিবেন। এ পর্যন্ত সকলেরই পরিজ্ঞাত, পরে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কিভাবে তথাগত বুদ্ধরূপে জগতের অন্যতম ধর্মগুরুতে পরিণত হইলেন তাহাও কাহারো অবিদিত নহে।

আমি আজ অন্য বিষয় বলিতে বসিয়াছি, আর খুব সম্ভব সে বিষয়টি তত সুপরিজ্ঞাত নহে। সেই সন্ন্যাসীটিকে দেখিয়া রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মনে যে ভাব বিপর্যয় ঘটিল তাহা সকলে জানে বটে, কিন্তু রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে দেখিয়া সেই সন্ন্যাসীটির মনে কি ভাবোদয় ঘটিয়াছিল তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছে? যতদূর জানি বিষয়টি লইয়া কেহ চিন্তা করে নাই, এমন কি ইহাতে চিন্তনীয় যে কিছু থাকিতে পারে তাহাও কেহ ভাবিয়া দেখে নাই। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সন্দর্শনে সেই সন্ন্যাসীর চিন্তা বিপর্যয় ও তাহার পরবর্তী জীবন কাহিনীই আজ আমার আলোচ্যবস্তু।

(২)

সেই সন্ন্যাসীটি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া কপিলাবস্তু নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সেদিন প্রাতঃকালে ভিক্ষার্থ রাজপথে বাহির হইলেন। আগের তিন চারদিন তাঁহাকে বন-পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে, খাদ্য কিছু মেলে নাই, কাজেই ক্ষুধায় তাঁহার দেহ ক্লান্ত ও মন বিরক্ত হইয়াছিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা সন্ন্যাসীর দেহ মন যে বিকল করে গৃহীরা এ সত্য স্বীকার না করিলেও প্রকৃত সন্ন্যাসীগণ তাহা কখনো গোপন করে না। ভিক্ষায় বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন যে, সম্মুখে একটি আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা। নাগরিক-গণ সেই শোভাযাত্রা দেখিতে ব্যস্ত, কেহ সন্ন্যাসীকে বড় লক্ষ্য করিল না, লক্ষ্য না করিলে আর ভিক্ষা মিলিবে কি প্রকারে?

সন্ন্যাসী ভাবিলেন ভালই হইল, ঐ শোভা-যাত্রার দিকেই যাওয়া যাক, দু'চার মুষ্টি তণ্ডুল বা দু' চারিটি কার্ষাপণ পাওয়া অসম্ভব হইবে না। ইতিমধ্যে তূরী ভেরী জগঝম্প বাজাইয়া, রথ অশ্ব হস্তী পদাতিক সমাভিব্যাহারে শোভাযাত্রা কাছে আসিয়া পড়িল, তাঁহাকে আর বেশি অগ্রসর হইতে হইল না। সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন, সেই শোভাযাত্রার কেন্দ্রে একখানি সুবর্ণমণ্ডিত রথের উপরে সুখাসনে এক নধরকান্তি সুপুরুষ যুবক উপবিষ্ট। যুবতী কিংকরী-গণ কেহ চামর ঢুলাইতেছে, কেহ ময়ূরপাখার ব্যজন করিতেছে, কেহ তাম্বূল পানীয় অগ্রসর করিয়া দিতেছে; আর কয়েকজন সুবেশা সুন্দরী সেই রথের উপরেই তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। শোভাযাত্রার এক-জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্ন্যাসী জানিলেন যে, তিনি নগরের যুবরাজ। সন্ন্যাসী তখন রথের দিকে অগ্রসর হইলেন; সন্ন্যাসী দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসী রথের কাছে পৌঁছিয়া বলিলেন, যুবরাজ আপনার কল্যাণ হোক। সন্ন্যাসীকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দান করুন।

এখন ইতিপূর্বে যুবরাজ কখনো ভিক্ষা শব্দটি শোনেন নাই, কাজেই ব্যাপারটা কি জানিতেন না। তিনি সারথিকে শুধাইলেন লোকটি কি বলে? ভিক্ষার অর্থ কি?

এখন সারথির উপরে রাজার কড়া হুকুম ছিল যে, সংসারে দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটন আধিব্যাধি যে আছে, পথের বাহির হইয়া যুবরাজ তাহা যেন না জানিতে পারেন।

তাই সারথি বলিল, যুবরাজ, ভিক্ষা মানে দান। ঐ ব্যক্তি আপনাকে দান করিতে চায়।

যুবরাজ শুধাইলেন তবে ভাষাটা ও রূপ কেন?

সারথি বলিল, সন্ন্যাসীদের ভাষা স্বতন্ত্র।

ইত্যবসরে রাজপুরুষগণের ইঙ্গিতে শান্ত্রী মন্ত্রিগণ সন্ন্যাসীকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিল। জনতার কেহ কেহ বলিল, যাও, যাও, ঠাকুর আজকার আমোদটা মাটি ক'রো না। কেহ বলিল, সকাল বেলাতেই তোমার মুখ দেখলাম না জানি দিনটা কেমন যাবে!

সন্ন্যাসী পথের ধারে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন আর শোভাযাত্রা তূরী ভেরী জগঝম্প বাজাইয়া নগর পরিক্রমায় অগ্রসর হইল। এই ঘটনায় সন্ন্যাসী ভিক্ষা পাইলেন না বটে, তবু প্রচুর শিক্ষা পাইলেন।

উৎসবমত্ত নগরী সেদিন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিতে ভুলিয়া গেল। অভুক্ত সন্ন্যাসী সন্ধ্যা-বেলায় অবসন্ন দেহে নগরপ্রান্তের এক বৃক্ষ-তলে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন— হা ভগবান্ আমি কি মূর্খ। আজ বারো বছর, স্ত্রী পুত্র সংসার ও রাজত্ব ছাড়িয়া কোথায় ভগবান, ধর্ম কি, পরকাল কি, আত্মা আছে কিনা প্রভৃতি অবান্তর বিষয় চিন্তা করিয়া মাঠে ঘাটে বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া মরিতেছি। কোন দিন ভিক্ষা মুষ্টি জোটে কোনদিন বা জোটে না; কোনদিন আশ্রয় মানুষের গোয়াল, কোনদিন বা বৃক্ষতল; রৌদ্র বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম, মশক মক্ষিকা, শ্বাপদ দ্বিপদ, পরিশ্রম চিন্তা, ধ্যান ধারণা সমস্ত মিলিয়া স্বাস্থ্য ও যৌবন নাশ করিল, জীবনও শেষ হইবার মতো। অথচ কি ফলশ্রুতি? কিছুই না। ভগবান্ থাকিলে অবশ্যই এতদিনে দেখা মিলিত,

যাহা নাই তাহার দেখা মিলিবে কিরূপে? হায়, হায়, আমি কি মূর্খ।

তারপরে সন্ন্যাসী ভাবিতে লাগিলেন, আর ঐ রাজপুত্রটি কি আরামে আছে দধি দুগ্ধ নবনী প্রভৃতির সম্মিলিত সহযোগিতায় উহার দেহটি কি ললিত কোমল। মুখ হইতে কথা বাহির হইবার আগেই মানুষের যা কিছু কাম্য মিলিতেছে। দেখো দেখি মশা-মাছি নাই তবু ব্যজন চলিতেছে, চর্বনরত মুখ বিশ্রাম পাইবার আগেই নূতন তাম্বূল জুটিতেছে, আর রথের উপরে যাহার এত-গুলি সুন্দরী তরুণী গৃহে না জানি তাহার আরো কত! আহা, এই তো জীবন!

তারপরে তিনি ভাবিলেন হায় আমারও তো সব ছিল, সুন্দরী পত্নী রম্ভা, বালক পুত্র মাধব, কিঙ্কর, কিঙ্করী রথ, অশ্ব, মন্ত্রী, শান্ত্রী কিনা ছিল। আর আজ কিনা এই অবস্থা। শাস্ত্র, মুনি ঋষি ও আধুনিক অকালপক্কদের ধাপ্পায় পড়িয়া আজ হা ঘরে' হা ভাতে', হা পত্নীক, হা পুত্রক হইয়া হায় হায় করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি।

তারপরে ভাবিলেন, ভাগ্যে ঐ রাজপুত্রকে দেখিলাম, জানিলাম জীবন কি, বুঝিলাম কত বড় ভুল করিয়াছি, কিন্তু আর নয়।

তখন তিনি স্থির করিলেন যে, গতস্য শোচনা নাস্তি, যা হইবার হইয়া গিয়াছে এখনো জীবন পাত্রে কিছু রস থাকা অসম্ভব নয়, তলানিটুকুই অনেক সময়ে মধুরতর হয় শেষ চুমুকে তাহা পান করিয়া লইতে হইবে। পরদিন প্রাতঃকালেই চীরাজিন ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহীবেশ ধারণ করিবেন, তিনি সংকল্প করিলেন। এই সুখকর চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র তাঁহার চোখ ঘুমে ঢুলিয়া আসিল। তিনি চীর ও অজিন পাশে খুলিয়া রাখিয়া অনেকদিন পরে আরামে ঘুমাইলেন। সংসারের চিন্তাতেই এত সুখ। আহা সংসার কি মধুময়!

গভীর রাত্রে সেখানে এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল তাহার দেহে রাজবেশ। সম্মুখে অভাবিতভাবে চীর ও অজিন দেখিতে পাইয়া লোকটি সাগ্রহে তাহা তুলিয়া লইল। তারপরে রাজবেশ খুলিয়া সেখানে রাখিয়া নিজ দেহে চীরাজিন ধারণ করিল। লোকটি মনে মনে ভাবিল অদৃষ্ট অবশ্যই সন্ন্যাসের ইঙ্গিত করিতেছে নতুবা এমনভাবে সন্ন্যাসীর যোগ্য বসন জুটিয়া যাইবে কেন? লোকটি তখন ধীর পদে অরণ্যের দিকে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী জাগিয়া উঠিয়া বিস্মিত হইলেন এ কি চীরাজিন গেল কোথায়? তাহার স্থানে রাজবেশ আসিল কিরূপে? তখন তিনি বুঝিলেন ইহাই অদৃষ্টের ইঙ্গিত। বারো বৎসরব্যাপী সন্ন্যাসের অভিজ্ঞতায় সহজেই তিনি বুঝিলেন যে, সংসারে প্রত্যাবর্তনই তাঁহার কর্তব্য তাই সর্বজ্ঞ অদৃষ্ট মন্ত্রবলে চীরাজিন অপসারিত করিয়া তৎস্থলে রাজবেশ সন্নিবেশিত করিয়াছে। তাঁহার মৌলিক সংকল্পের সহিত অদৃষ্টের এইরূপ সহযোগিতা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন, আর সানন্দে রাজবেশ ধারণ করিয়া স্বীয় রাজ্যের দিকে দ্রুতপদে যাত্রা করিলেন।

(৩)

পূর্বোক্ত ঘটনার পরে আরও বারো বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

তারপর তিনি ভাবিলেন, হায়, আমারও তো সব ছিল

(৪)

সেই সন্ন্যাসীটি পূর্বনাম অভিজ্ঞান বর্ধন নামে এতদিন রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে একদা গভীর রাত্রে পুনরায় চীরাজিন অবলম্বন করিয়া তিনি গোপনে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। রাত্রিতেই তিনি অনেক যোজন পথ অতিক্রম করিলেন। পরদিন এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি পুষ্পিত শালবৃক্ষের তলে দিব্যকান্তি এক সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন। সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গের প্রত্যাশায় রাজা অভিজ্ঞান বর্ধন যাঁহাকে এখন পুনরায় সেই সন্ন্যাসী বলা চলিতে পারে তিনি অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কয়েকদণ্ড পরে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন সেই সন্ন্যাসী বর্তমান সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া বলিলেন, প্রভু আমাকে দীক্ষা দিন।

তখন বর্তমান সন্ন্যাসী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, বৎস, সন্ন্যাস বড় কঠিন, ও পথ সকলের জন্য নয়, কাজেই তুমি গৃহে ফিরে যাও।

ইহা শুনিয়া সেই সন্ন্যাসী বলিলেন, প্রভু, আপনার কথা সত্য। এক সময়ে আমি সন্ন্যাসী ছিলাম, কিন্তু পথটা যে পুষ্পাস্তীর্ণ নয় বুঝতে পেরে পুনরায় সংসারে ফিরে গেলাম। তখন বুঝলাম যে, সংসারের পথটাও দুর্গম।

তোমার কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু দু'য়ে তুলনা করলে বুঝবে সংসারটাই সহজসাধ্য।

দুয়ের তুলনা আমার চেয়ে বেশি কেউ করেনি, কাজেই আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন সংসারের পথ ক্ষুরধারের মত দুর্গম।

বিশ্বাস করা কঠিন। যাই হোক তোমার অভিজ্ঞতা শুনি, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি হ'তে পারে।

'সেই কথাই ভালো' বলিয়া সেই সন্ন্যাসী পূর্বনাম অভিজ্ঞান বর্ধন আরম্ভ করিলেন—

সন্ন্যাসী হয়ে বেশ সুখেই ছিলাম, মাঝে মাঝে অভুক্ত বা অনিদ্র থাকতে হতো সত্য, কিন্তু এখন বুঝছি সংসারধর্ম পালনের চেয়ে তা অনেক ভালো। তারপর এক দিনের এক আকস্মিক অভিজ্ঞতায় আমার সর্বনাশ হ'ল। চীরাজিন ত্যাগ ক'রে আমার রাজধানীতে ফিরে গেলাম।

তুমি কি রাজা ছিলে?

হাঁ' প্রভু, পূর্বজন্মের অনেক দুষ্কৃতি না থাকলে কেউ রাজা হয় না।

তাঁহার কথা শুনিয়া বর্তমান সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন, আচ্ছা বলো।

সেই সন্ন্যাসী পুনরায় আরম্ভ করিলেন—আমি ভেবেছিলাম আমি ফিরে যাওয়ামাত্র পত্নী, পুত্র, রাজপুরুষগণ ও প্রজাবৃন্দ সানন্দে আমাকে গ্রহণ করবে। কিন্তু কার্যত ঠিক তার বিপরীত ঘটল। বারো বছর আগে রাজধানী ছেড়ে ছিলাম। তার অল্প কয়েকদিন পরেই আমার সাধ্বী স্ত্রী পুনরায় বিয়ে করে ফেলেছিলেন। অবশ্য সে স্বামী মৃত হওয়ায় সমস্যা অনেকটা সরল হয়েছিল। যদিচ আমার বিশ্বাস লোকটা মরেনি, সাধ্বী স্ত্রীর বিড়ম্বনায় সন্ন্যাসী বেশে দেশান্তরী হয়েছে। সে যাই হোক, দুই স্বামীর সাধ্বী স্ত্রী তৃতীয়বার পতিগ্রহণের উদ্যোগ যখন করছেন তখন আমার অপ্রত্যাশিত অশুভ আবির্ভাব। প্রভু আপনি সন্ন্যাসী হলেও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কোন সাধ্বী পত্নীরই ভালো লাগতে পারে না। তিনি সরাসরি আমাকে অস্বীকার ক'রে বসলেন, বল্‌লেন, ও আমার স্বামী নয়, কোন প্রবঞ্চক হবে। বুঝুন ব্যাপার একবার। এতদিন সন্ন্যাসী অবস্থাতেও এই স্ত্রীর জন্যই আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

তার পরে?

ওদিকে আমার মন্ত্রীমশায় তার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ দেবার সংকল্প করেছে। সে জানে আর দুই বছর পরেই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যুবরাজ মাধব হবে রাজা, আর নিজে হবে রাজশ্বশুর, ক্ষেত্রবিশেষে রাজশ্বশুর মানেই রাজা। কাজেই মন্ত্রী আমাকে দেখে বলল, হাঁ, কতটা মহারাজার মতো দেখ্‌তে বটে, তবে লোকটা আমাদের মহারাজা নয়। ওদিকে আমার পুত্র মাধব, যাকে পাঁচ বছরের রেখে সংসার ত্যাগ

করেছিলাম এখন সে সতেরো বছরের উঠ্‌তি যুবক, সেই মাধব মনে মনে স্থির ক'রে রেখেছে মন্ত্রী সহায় না থাকলে সিংহাসনে বসা কঠিন হবে, কারণ স্নেহময়ী জননীর কাছে তৃতীয় পতি-উমেদার যাতায়াত শুরু করেছে। মাধব স্থির ক'রে ফেলেছে সিংহাসনে বসবামাত্র মন্ত্রী-কন্যাকে অর্থাৎ রাণীকে গুম্‌ খুন ক'রে পাঠশালার এক ভূতপূর্ব সহপাঠিনীকে বিবাহ করবে। এমন সময়ে আমার প্রত্যাবর্তন। সে বুঝলো তার যাবতীয় পরিকল্পনা অকালে শুকিয়ে গেল।

আর তোমার প্রজাবৃন্দের অসন্তোষের কি কারণ?

আমার স্ত্রী মন্ত্রীর দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে প্রজাদের স্বপক্ষে রাখবার আশায় যাবতীয় রাজকর মকুব ঘোষণা ক'রে বসে আছেন, হেনকালে প্রকৃত মালিকের প্রত্যাগমন প্রজাদের পক্ষে কখনোই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। তারা বিদ্রোহ করে আর কি!

সত্যই তোমার কঠিন পরীক্ষা গিয়েছে। এ অবস্থায় সিংহাসনে বস্‌লে কি ক'রে?

সে এক আশ্চর্য ঘটনা প্রভু। রাজপুরীর কোল সরোবরে আমার পোষা আর বড় প্রিয় একটি সারস পাখী ছিল। সেটা কি রকম ক'রে আমার আগমন জানতে পেরেছে, সেটা তখন এক অদ্ভুত কান্ড ক'রে বস্‌লো। রাজ প্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে ঠোঁটে ক'রে রাজমুকুট এনে আমার মাথায় পরিয়ে দিল।

বর্তমান সন্ন্যাসী বলিলেন, ঐ সারসটা পূর্বজন্মে তোমার পিতামহ ছিল।

সে কি প্রভু এটা যে সারসী।

তা হোক, জন্মান্তরে লিঙ্গান্তর ঘটা অসম্ভব নয়। আচ্ছা, তারপরে কি হ'ল বলো।

এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে সৈন্যদল হর্ষধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল, বলে উঠ্‌লে জয় মহারাজের জয়।

তাহলে বলো তোমার প্রতি সৈন্যদলের অনুরক্তি অটুট ছিল।

তা নয়, প্রভু, এতকাল রাজ্যে যুদ্ধ বা যুদ্ধ-সম্ভাবনা ছিল না, তাই সৈন্যদল ছিল অবহেলিত আর অপ্রাপ্তবেতন। এখন আমার অতর্কিত আগমনে, আমাতে মন্ত্রীতে রাণীতে যুবরাজে একটা যুদ্ধ-অশান্তি ঘটবার সম্ভাবনায় সৈন্যদল উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। তারা জানে যুদ্ধ আসন্ন হ'লে তবে বেতন পাওয়া যায়।

তারপর?

তারপর আর কি! তিমিঙ্গিল উপস্থিত হলে বিবদমান তিমিগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ঘটে। তখন রাণী, মন্ত্রী, যুবরাজ পরস্পর প্রতিযোগিতা ছেড়ে চিরমৈত্রীতে বদ্ধ হ'ল, আর আমাকে নাশ করবার ষড়যন্ত্র করলো।

যখন তারা দেখ্‌লো যে, সৈন্যদল আমার

প্রভু আমাকে দীক্ষা দিন

পক্ষে, তখন তারা এসে বল্‌ল, সবাই যে ঠিক এক কথা বল্‌ল, তা নয়, তবে ভাবটা অভিন্ন।

রাণী বল্‌ল, প্রাণাধিক, এতদিন অধীনীকে ভুলে কোথায় ছিলে?

আর অধিক সে বল্‌তে পারলো না, মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লো।

পুত্র বল্‌ল, পিতা আজ আবার আমি জীবন পেলাম।

মন্ত্রী বলল, মহারাজ, আপনি ফিরে এসেছেন, এবারে আমি স্বস্তিতে মরতে পারবো।

তারা সকলে একযোগে বলল, মহারাজ, আগামীকল্য নগর চত্বরে আপনার সম্বর্ধনা হবে, তাতে সবাই জানতে পারবে যে, আপনার শুভাগমন হয়েছে আর প্রজারাও চায় যে, একটা উৎসব হোক।

আমি বল্‌লাম ক্ষতি কি!

পরদিন সকলের সঙ্গে নগর চত্বরে উপস্থিত হয়ে দেখি সুসজ্জিত সভাস্থল, মাঝখানে আমার জন্য স্বর্ণ রৌপ্য খচিত আসন, চারিদিকে লোকারণ্য।

আমি আসনে বসতে যাবো, এমন সময়ে

সেটা তখন এক অদ্ভুত কান্ড করে বসলো
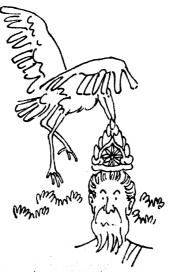
কোথা থেকে সেই সারসটি, আপনার কথা সত্য হলে আমার পূর্বজন্মের পিতামহ আমার প্রাণ রক্ষা করলো।

কি ভাবে?

সারস ঠোঁট দিয়ে একটানে আসনখানা সরিয়ে দিতেই প্রকাশ পেলো অতলস্পর্শ গহ্বর।

হঠাৎ সেই সন্ন্যাসী গর্জন করিয়া উঠিল —ওরে নরাধম, এই অভিসন্ধি ছিল।

না, না প্রভু আপনাকে নয়, এই কথাগুলো তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম।

তারপরে কি করেছিলে?

তখন রাণী, যুবরাজ ও মন্ত্রীকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়ে সমাধিস্থ করলাম। অপ্রত্যাশিত আনন্দদায়ক দৃশ্য দেখে সমবেত জনগণ গর্জন করে উঠল জয় মহারাজের জয়।

তারপরে?

তারপরে বারো বছর রাজত্ব করলাম।

তবে এখন রাজ্য পরিত্যাগের বাসনা কেন?

এতদিনে সেই সারসটি মারা গিয়েছে, আর অরক্ষিতভাবে সংসারে থাকবার সাহস বা ভরসা নেই।

এই পর্যন্ত বলিয়া সেই সন্ন্যাসী করজোড়ে সানুনয়ে বলিল, প্রভু সমস্ত অকপটে বললাম, এবার আপনি আমাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করুন।

তার আগে আমার সন্ন্যাসের পরীক্ষা শ্রবণ করো, পরে মনঃস্থির করো।

অতঃপর বর্তমান সন্ন্যাসী সন্ন্যাসজীবনের যাবতীয় দুঃখ বিবৃত করিলেন। স্ত্রী-পুত্র, পিতামাতা পরিত্যাগের দুঃখ, দেশে দেশে গুরুর অনুসন্ধান, ভণ্ড গুরুর সাক্ষাৎ, তপস্যার কঠোরতা প্রভৃতি কথা বলিলেন। তপস্যাকালে বিভীষিকা দর্শন, মার বা মদনের ছলাকলা প্রদর্শন, দেবগণের বরদানের জন্য আগমন; পিতামাতার ছদ্মবেশে কান্নাকাটি, এ সমস্তই তপস্যা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে। কত না বিপত্তি, প্রলোভন তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। ক্রমে তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় তাঁহার দেহ অস্থিচর্মসার হইল তাহাও কম দুঃখের নয়। অবশেষে একদিন তাঁহার বোধি জন্মিল, তিনি বুঝিলেন যে, তপস্যার কঠোরতা কিছু নয়, আবার বিলাসময় জীবনও কিছু নয়, এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথটাই জীবন সার্থকতার পথ। তখন তিনি এক পল্লী বালিকা প্রদত্ত পরমান্ন ভোজন করিয়া বোধিমার্গে অগ্রসর হইলেন।

এই কাহিনী বলিয়া বর্তমান সন্ন্যাসী মন্তব্য করিলেন, বৎস, সংসারের অবিচারে তুমি সংসার ত্যাগে উৎসুক, কিন্তু দেখো সন্ন্যাসের পথও বড় সুগম নয়।

তা নয় জানি কিন্তু একবার পরীক্ষা করতে ক্ষতি কি।

একবার তো পরীক্ষা করেছিলে, তবে আবার সংসারে ফিরলে কেন?

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সন্ন্যাসী-জীবনে এক রাজপুত্রের আরাম আয়াস দেখে হঠাৎ মতি পরিবর্তন ঘটল, সংসারাশ্রমে ফিরে গেলাম। আপনি হাসলেন কেন?

আমার জীবনেও অনুরূপ এক অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। এক সন্ন্যাসীর দিব্য প্রশান্ত মুখচ্ছবি দর্শনে আমি সংসার ত্যাগ করতে মনস্থ করি।

সন্ন্যাসী দর্শনে? কোথায় বলুন তো।

কপিলাবস্তু নগরে।

কপিলাবস্তু নগরে। তবে আমিই সেই সন্ন্যাসী।

আর আমিই সেই রাজপুত্র।

তুমিই সেই রাজপুত্র। হা ভগবান। বলিয়া সেই সন্ন্যাসী কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

তথাগত শুধাইলেন, বৎস, তোমার কি হল?

কি হল? কি হতে আর বাকি? নিতান্ত কাষায়ধারী না হলে গলা টিপে তোমাকে এতক্ষণ নিকেশ করে দিতাম।

তোমার অপ্রীতিকর কি এমন করেছি?

কি করতে বাকি রেখেছ। সেদিন কেন তুমি আমার চোখে পড়তে গেলে? তোমাকে না দেখলে আমি তো সংসারে ফিরতাম না। মনে মনে জানতাম স্ত্রী-পুত্র আমার অনুগত, আমার রাজধানী ও প্রজাবৃন্দ রাজভক্ত! এসব অবশ্য মিথ্যা মোহ, কিন্তু সত্য বাস্তবের অভাবে মিথ্যা মোহ নিয়েই তো আমার দিব্য চলে যাচ্ছিল।

মোহ যতই মনোরম হোক, তার ভঙ্গ কি বাঞ্ছনীয় নয়? কারণ মোহ সর্বদাই মোহ।

ওসব তোমার মতো সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রযোজ্য, আমার মতো সংসারীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

এই পর্যন্ত বলিয়া সেই সন্ন্যাসী আবার খেদ করিতে লাগিলেন—

হায়, ভগবান এ কি করলে? আমার সন্ন্যাসও নিলে, আবার সংসারও নিলে। এখন আমি দাঁড়াই কোথায়?

হঠাৎ তিনি বুদ্ধদেবের পায়ের উপরে পড়িয়া কাঁদিকে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, প্রভু, আমাকে দেখেই আপনি সংসার ত্যাগ করেছেন, বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন; আমার কাছে আপনি ঋণী: সেই ঋণশোধ করুন, আমাকে শান্তির পথ বলে' দিন।

বুদ্ধ বলিলেন, বৎস, শান্ত হও, আমার যথাসাধ্য করতে ত্রুটি করবো না। তুমি যাতে এক খন্ড জমি পাও তার ব্যবস্থা করে দেবো, তাতে তুমি শাকসব্জী, তরি-তরকারি উৎপন্ন করো। সে সব বিক্রী ক'রে যা পাও, তা দিয়ে জীবনযাপন করো, অবশ্যই মনে শান্তি পাবে।

[illegible]

হইল বলিলেন, রাজার ছেলে হয়ে সন্ন্যাসকামী হয়ে শেষে কিনা কৃষিকার্য করবো?

ক্ষতি কি? কোন্ রাজা, কোন্ সন্ন্যাসী এর বেশি করতে সমর্থ? এ যে সৃষ্টিকার্য।

বেশ, প্রভু, মনে যদি শান্তি পাই, তাই হবে।

তখন বুদ্ধদেব উক্ত সন্ন্যাসীকে লইয়া শ্রাবস্তী নগরে আসিলেন আর এক শ্রেষ্ঠীকে অনুরোধ করিয়া সন্ন্যাসী যাহাতে খানিকটা জমি পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রাবস্তী ত্যাগের সময়ে বুদ্ধ সন্ন্যাসীকে বলিলেন, এখানে তুমি কৃষি চর্চা করতে থাকো, আমি আবার যথাকালে ফিরবো। সন্ন্যাসী প্রণাম ক'রিল, বুদ্ধ আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

(৫)

আবার বারো বৎসর অতিবাহিত হইল। নানা দেশে ধর্মপ্রচার করিয়া বুদ্ধ শ্রাবস্তীপুরে ফিরিলেন। নগর প্রবেশের মুখে নগরোপকণ্ঠে সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে সুরম্য প্রাসাদ দেখিয়া তিনি এক শিষ্যকে শুধাইলেন—এ কোন্ শ্রেষ্ঠীর

শিষ্য বলিল, বারো বৎসর আগে যে সন্ন্যাসীকে আপনি এখানে একখন্ড চাষের জমি দিয়েছিলেন এসব তারই।

বলো কি। বুদ্ধ বিস্মিত হইলেন।

এমন সময়ে সেই ভূতপূর্ব সন্ন্যাসী, প্রভূতপূর্ব রাজা, বর্তমানে ভূস্বামী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ও তথাগতকে প্রণাম করিল।

বুদ্ধ বলিলেন, বৎস, একি করেছ?

সেই সন্ন্যাসী বর্তমানে ভূস্বামী বলিল, প্রভু এখন আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন? স্বভাবের নিয়মে দুই চার হয়েছে, চার চৌষট্টি হয়েছে—আপনার আশীর্বাদে প্রাপ্ত পাঁচ বিঘা জমি পঁচাত্তর হাজার বিঘায় পরিণত হয়েছে, এখনো বেড়েই চলেছে।

আশা করি আর বিবাহ করনি।

আজ্ঞে না, সেরূপ ভুল আর করবো না, তবে একেবারে উপবাসীও নেই, দ্বাদশটি উপপত্নী রেখেছি।

ঐ শিশুগুলি কার?

উপপত্নীদের দরুণ আমার।

কিন্তু মনে কি শান্তি পেয়েছ?

যে এত পেয়েছে তার আবার শান্তিতে কি প্রয়োজন?

কিন্তু মন কি বোঝে?

মন যাতে অবুঝ না হয় তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।

কি সেই ব্যবস্থা?

নিত্য নব উৎসব উত্তেজনা, নব নব সুখচর্চার দ্বারা বেচারা মনকে সর্বদা এমনি উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছি যে তার এক মুহূর্ত ফুরসৎ নেই, উন্মনা হবে কি করে? চিন্তাতেই অসুখের সূচনা, অবসরে চিন্তার সূচনা, আমার তিলমাত্র অবসর নেই। প্রভু এখন বেশ সুখেই আছি, অন্ততঃ অসুখী নই।

পুনরায় সংসারী যদি হবে তবে রাজ্য পরিত্যাগ করলে কেন?

তখন অবসর ছিল, তাই ভগবান, পরকাল, আত্মা, মুক্তি প্রভৃতি দুর্মোচ্য চিন্তাজাল ছিল। এখন তিলার্ধ চিন্তার অবসর না থাকায় ও সব ভূত কাছে ঘেঁষতে পারে না। প্রভু, অবসরকে হত্যা করবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিতাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি।

কিন্তু যখন মৃত্যুকাল আসন্ন হবে?

সেদিন সংসারের সবগুলো বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে নৃত্যে গীতে, খাদ্যে মদিরায়, বিদূষণায় বারাঙ্গনায় প্রলয়োল্লাস চলবে আমাকে ঘিরে প্রাসাদে—আর সেই মদিরাপিচ্ছিল পথ দিয়ে কখন্ শুট ক'রে চলে যাবো ওপারে জানতেও পারবো না।

তারপরে?

তারপরে আপনিও যতটুকু জানেন আমিও ততটুকু জানি। প্রভু, দুঃখ মুক্তির আশায় আপনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন—আর আমি করেছি ঐ উদ্দেশ্যে কর্মচক্র প্রবর্তন। আপনার ও আমার দুই সুখতত্ত্বই জগতে চলতে থাকবে। আপনার শিষ্যসংখ্যা কোটি কোটি হবে, কিন্তু আমার অচিহ্নিত শিষ্যসংখ্যাও নিতান্ত অল্প হবে না।

তখন বুদ্ধ বলিলেন, তোমাকে উপদেশ দেওয়ার আর কিছু নাই, আমি এবারে বিদায় হই।

বুদ্ধ রওনা হইবেন এমন সময়ে সেই সন্ন্যাসীর, বর্তমানে ভূস্বামীর দ্বাদশটি উপপত্নী আসিয়া বুদ্ধকে প্রণাম করিয়া বলিল, প্রভু, আমরা আপনার শরণ নিলাম, আমাদের আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।

বুদ্ধ ভূস্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিবলিলেন, তোমার সুখের উপকরণ যে চলল, এখন কি হবে?

উপপত্নী রাখবার ঐ তো সুবিধা, ও বস্তুর কখনো অপ্রতুলতা ঘটে না। বিশেষ ওদের বয়স হয়ে পড়ায় ওগুলোকে আমিই বিদায় করবো ভাবছিলাম।

বুদ্ধ ভূস্বামীর উপপত্নীসমূহ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ভূস্বামী অর্থাৎ ভূতপূর্ব সেই সন্ন্যাসী একজন অনুচরকে অবিলম্বে একপাত্র উৎকৃষ্ট মাধ্বী আনিতে আদেশ করিয়া সেই দিবস মধ্যেই দ্বাদশটি শূন্যস্থান যাহাতে পূর্ণ হয় সেইরূপ আদেশ করিলেন।

ইহাই হইল সেই সন্ন্যাসীটির প্রকৃত বৃত্তান্ত।

আন্দামান ও ওঙ্গে জাতি

নবেন্দু দত্তমজুমদার || অমিতা দত্তমজুমদার

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভারতবাসীর কাছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ "কালাপানি" অথবা কয়েদী উপনিবেশ বলিয়াই পরিচিত ছিল। হুগলী নদীর মোহনা হইতে ৬৯০ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের কোলে ভাসমান ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জটির এই কলঙ্কময় পরিচয় ভিন্ন আর কোনো পরিচয় তখনকার দিনে আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, সুপ্রাচীন যুগে সভ্যজগতের নিকট এই দ্বীপপুঞ্জ পরিচিত ছিল। চীনের, আরবের ও প্রাচীন গ্রীসের পৃথিবী ভ্রমণকারিগণের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই দ্বীপপুঞ্জের বর্ণনা পাওয়া যায়; কারণ সেকালে ভারত মহাসাগরের বক্ষে যে সকল বাণিজ্যপোত ঘুরিয়া বেড়াইত, এই দ্বীপপুঞ্জ সে সকলের মধ্যপথবর্তী ছিল।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থে এই দ্বীপপুঞ্জের নামের নানা রূপ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক ভ্রমণকারী ক্লডিয়াস টলেমির বিবরণে ইহার নাম আগমাটি। নবম শতাব্দীর আরব ভ্রমণকারীদের বিবরণে আমরা আরেকটি নাম পাইতেছি—অঙ্গমনোইন। চৈনিক বৌদ্ধশ্রমণ ই-চিঙ (খৃঃ ৬৭২), ইটালীর মার্কোপোলো (১২৮৬ খৃঃ) ফ্রায়রে অডোরিক (১৩২২) ও নিকোলো কোর্তি (১৪৩০) ইঁহারা সকলেই এই নামটিই ব্যবহার করিয়াছেন। মালয়বাসীদের সঙ্গে আন্দামানীয়দের সংস্রব বহু পুরাতন। তাহারা হণ্ডুমান নামে এই দ্বীপকে অভিহিত করে। ইহা রামায়ণের হনুমান নামের অপভ্রংশ, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। সামাজিক আচারাদি এবং ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রাদি বিষয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ানিবাসী আদিম জাতিগুলির সহিত এই দ্বীপবাসীদের অনেক মিল পাওয়া যায়।

বৃটিশ শাসনকালে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জলদস্যুদের উপদ্রব ও ভগ্নপোতের নাবিকদিগের উপর অত্যাচার নিবারণকল্পে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দ্বীপপুঞ্জে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিখ্যাত জরীপজারী আর্চিবল্ড ব্লেয়ারকে এখানে প্রেরণ করেন। ব্লেয়ার সাহেব ঐ উপনিবেশে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে কিছু কয়েদী লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিকূল জলবায়ুর জন্য ও অভিজ্ঞতার অভাবে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইল ও উপনিবেশ প্রায় পরিত্যক্তই হইল। সিপাহী বিদ্রোহের পরে পুনরায় এখানে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করা হইল। বন্দী বিদ্রোহিগণকে এই স্থানে দ্বীপান্তরে পাঠানো হইল। তখন হইতেই (১৮৫৮ খৃঃ) পোর্টব্লেয়ারে কয়েদী উপনিবেশ স্থাপিত হইল। ইহার পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে সমগ্র আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ শাসনের জন্য একজন চীফ কমিশনার নিযুক্ত হন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রবলভাবে আরম্ভ হইল। তখন বহু বীরযোদ্ধাকে এখানে যাবজ্জীবন কারাবাসের জন্য প্রেরণ করা হইতে লাগিল। "কালাপানি"র ইতিহাসের এই কালো অধ্যায়ের পরে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ একটি উজ্জ্বল পৃষ্ঠা আসিয়া পড়িল। এই সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ পোর্টব্লেয়ার অধিকার করিল। তখন অল্প কালের জন্য হইলেও স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা এখানকার আকাশে উড়িয়াছিল। অবশ্য তারপরে আবার বৃটিশ-অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর ১৯৪৭ সনে ক্ষমতা হস্তান্তরে সঙ্গে সঙ্গে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন ভারতের অংশীভূত হয়।

এখন সেখানে এক নূতন উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। এবার আর কয়েদী উপনিবেশ নহে; স্বাধীন ভারত সরকারের উদ্যমে সেখানে উদ্বাস্তু পুনর্বসতির পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে কার্যে পরিণত করা হইতেছে।

ওঙ্গে দম্পতি
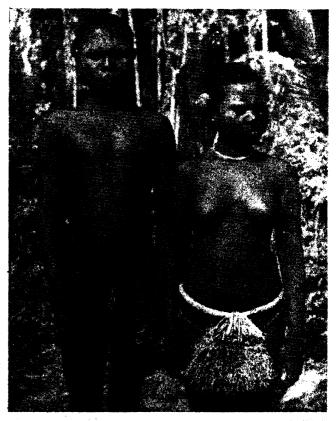
দুটি ওঙ্গে বালকের মুখের চিত্রণ

বহুসংখ্যক পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পরিবার সেখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন কেবল আন্দামানীয় আদিম জাতিসমূহই এখানকার অধিবাসী নহে। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের লোক এখানে বসতি স্থাপন করিতেছে।

উদ্বাস্তু পুনর্বসতির কাজের সংগে সংগে ভারত সরকার এখানে আরেকটি কর্ম-প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। এখানকার আদিম জাতীয় গণ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের অংগীভূত হইলেও জাতিগত ও কৃষ্টিগত-ভাবে ভারতীয়গণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অথচ ইহাদের সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি। সেইদিক হইতে নৃতাত্ত্বিকদিগের পক্ষে এই দ্বীপপুঞ্জ বিশেষ আকর্ষণের স্থান। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাবধি পাশ্চাত্য নৃতাত্ত্বিকদিগের কেহ কেহ এখানকার অধিবাসীদের লইয়া কিছু কিছু গবেষণা করিয়াছেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগ এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন ও কার্যে অবতীর্ণ হন। প্রাথমিক পরিদর্শনের পরে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এখানে ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের একটি শাখা স্থাপিত হয়। তাহার পর হইতে এখানে কয়েকজন নৃবৈজ্ঞানিক থাকিয়া কাজ করিতেছেন এবং প্রায় প্রতি বৎসরই বিভাগীয় গবেষকদল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একেক অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বাস করিয়া কয়েক মাস গভীর ও ব্যাপক গবেষণা কার্যে লিপ্ত থাকেন।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ২০৪টি দ্বীপের সমষ্টি। তাহার মধ্যে প্রধান—গ্রেট আন্দামান, লিটল আন্দামান ও সেণ্টিনেল। গ্রেট আন্দামান পাঁচটি দ্বীপের সমষ্টি—উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান, বারাটাং ও রাটল্যাণ্ড দ্বীপ। সমগ্র আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ উত্তরে-দক্ষিণে ২১৯ মাইল দীর্ঘ। দ্বীপপুঞ্জের শাসনকেন্দ্র পোর্টব্লেয়ার দক্ষিণ আন্দামানে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৭৮০ মাইল এবং মাদ্রাজ হইতে ৭৪০ মাইল। এখানেই কয়েদী উপনিবেশ ছিল। নৃতত্ত্ব বিভাগের আন্দামানস্থ শাখা কার্যালয়ও এখানেই। এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া নৃতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা করিয়া থাকেন। প্রধানত লিট্ল আন্দামানের ওঙ্গেদের মধ্যেই এখন গবেষণা কাজ চলিতেছে।

এখানকার আদিম অধিবাসিগণকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) জারাওয়া, (২) উত্তর সেণ্টিনেলবাসী, (৩) বৃহৎ আন্দামানীয় এবং (৪) ওঙ্গে। প্রথম দুইটি জাতির সহিত আমরা এখনো কোনো যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারি নাই। বিশেষত জারাওয়ারা বিদেশীদের সম্বন্ধে খুবই সন্দিগ্ধচিত্ত এবং অন্য কোনো জাতির সহিত সংস্রব রাখিতে একেবারেই পরাঙ্মুখ। তাহাদের বনাচ্ছাদিত পার্বত্য বাসভূমিতে কাহাকেও আসিতে দেখিলে আড়ালে লুকাইয়া তীর ছোঁড়া তাহাদের অভ্যাস।

তৃতীয় বৃহৎ আন্দামানীয় জাতি সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় যে, এই জাতি লুপ্তপ্রায়। পূর্বে এখানে ১২টি বিভিন্ন জাতি ছিল; কিন্তু সভ্যতার সংস্পর্শের দরুণ তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। বহিরাগতদের সহিতও যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, তাহা মুখাকৃতি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার ফলে নানাবিধ রোগ ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহারা সংখ্যায় কমিতে কমিতে মাত্র ত্রিশজনে পর্যবসিত হইয়াছে। এই ত্রিশ জনের মধ্যে পূর্বেকার ৪।৫টি জাতির লোক দেখা যায়। ইহাদিগকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে সকলকে একত্র করিয়া কোনো এক জায়গায় রাখিয়া তাহাদিগকে কোনো না কোনো অর্থকরী শিল্পকর্মে নিযুক্ত রাখা প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন মাঝে মাঝে সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া প্রয়োজনমত যথারীতি ইহাদিগের চিকিৎসা করানোও উচিত। ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করা সহজ। ইহাদের অনেকেই হিন্দী জানে; হিন্দীর মাধ্যমেই ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়।

লিট্ল আন্দামান দ্বীপের ওঙ্গেরাও এক সময়ে বিদেশীর প্রতি বিরূপভাবাপন্ন ছিল; কিন্তু এখন তাহাদের শত্রুভাব চলিয়া গিয়াছে। ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগের চেষ্টায় এখন ইহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে ও ইহাদের কৃষ্টির বিভিন্ন দিক লইয়া ব্যাপক গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য এই গবেষণা এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। প্রধানত ভাষার বাধাই ইহার কারণ। ভাষার দিকে এখন নৃতত্ত্ব বিভাগ হইতে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হইতেছে। ওঙ্গে ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান আরো বাড়িলে পরে উহাদের সমাজ ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে আমরা আরো দ্রুত জানিতে পারিব। এই প্রবন্ধে আমাদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাই লিখিতেছি।

ওঙ্গেদের বাসভূমি ঘনসন্নিবিষ্ট বিষুবীয় বনের ভিতরে। এখানে যেমন লতায় গ্রথিত বড় বড় চিরহরিৎ বৃক্ষের বন আছে, তেমনি আবার নানা প্রকার বিভিন্ন ঋতুর বৃক্ষও আছে। মাঝে মাঝে লতানো বাঁশঝাড়ও

(ক্রীপার ব্যাম্বো) বিরল নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমুদ্রোপকূলসুলভ নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ এখানে একেবারেই দেখা যায় না। আন্দামান দ্বীপগুলির উপকূলে ম্যানগ্রোভ ঝোপের ঘনসন্নিবেশ রহিয়াছে; বেত ও প্যাণ্ডানাস গাছও অনেক; এইগুলি অধিবাসীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এখানকার বনে বড় জন্তু বিশেষ কিছু নাই। বন্যবরাহ ও নানা প্রকার বিষধর সর্পই প্রধান। নানাপ্রকার পায়রা পাওয়া যায়; গ্রীন পিজিয়ান বা সবুজ পায়রা এবং ইম্পিরিয়াল পিজিয়ন তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জলচর জীব বহুপ্রকার, প্রধানত নানাপ্রকার সুদৃশ্য কড়ি ও শামুকশ্রেণীর জীব পাওয়া যায়। অশনযোগ্য ঝিনুক, কচ্ছপ, কাঁকড়া এবং নানাজাতীয় মাছ প্রচুর পাওয়া যায়।

দ্বীপগুলি প্রধানত গ্রীষ্মপ্রধান, শীতকাল নাই-ই। বর্ষা ঋতু ও শুষ্ক ঋতু—মোটামুটি ঋতু এই দুইটি। মৌসুমী বায়ুর প্রকোপে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ সুন্দর।

ওঙ্গেরা এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সমগ্র আদিবাসীরাই নেগ্রিটো জাতির অন্তর্গত। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ ও হ্রস্বকায়; গড় উচ্চতা ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি মাত্র। নাসিকা চওড়া ও চ্যাপটা, এবং ওষ্ঠাধর ভারী। ইহাদের শরীরে লোম ও মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু বিরল। মাথার চুল এত কুঞ্চিত যে, কোঁকড়াইয়া একেকটি ছোট ছোট গুচ্ছ হইয়া মাথায় প্রায় লাগিয়া থাকে ও অন্তর্বর্তী স্থান ফাঁক দেখায়। এইরূপ চুলকে নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় Pepper-Corn hair বলা হয়। হ্রস্বকায় হইলেও ইহাদের শরীর বেশ দৃঢ় ও সুসমঞ্জস।

ওঙ্গেদের ভিতর বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত নাই। দেহাচ্ছাদনের জন্য কম্বল বা পশুচর্মও ইহারা ব্যবহার করে না। পুরুষেরা অল্পদিন আগে পর্যন্ত নগ্নই থাকিত, এখন মাত্র ছোট ছোট একেক ফালি ন্যাকড়ার কৌপীন ব্যবহার করে। নৃতত্ত্ব-বিভাগ হইতেই এইগুলি বিতরণ করা হয়; সাধারণতঃ লাল সালুর টুকরাই ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকেরা কোমরে একটি প্যাণ্ডানাস পাতার ফালি বা লতাতন্তুর দড়ি বাঁধিয়া সরু সরু বেতসপত্রের তৈরী পাঁচ ছয় ইঞ্চি লম্বা ঘণ্টাকৃতি একটি গুচ্ছ সম্মুখভাগে ঝুলাইয়া রাখে। ইহা ব্যতীত দেহের অন্যান্য অংশে বল্কলের বা আর কোনো আবরণ ব্যবহার করে না। এই বেশে নিঃসঙ্কোচে তাহারা সর্বত্র চলাফেরা করে। দেহ আবরণহীন থাকিলেও অলঙ্করণহীন ইহারা রাখে না। লাল মাটি ও সাদা মাটির রঙে দেহে নানা বিচিত্র চিত্রাঙ্কনের প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। উৎসবাদিতে

ওঙ্গেদের সাম্প্রদায়িক বাসগৃহ

তো বটেই রমণীর প্রাত্যাহিক প্রসাধনেও নানাভাবে দেহকে বিচিত্রিত করিতে ইহারা বড়ই ভালবাসে। একে অন্যের দেহের বিচিত্র বর্ণসজ্জা করিয়া দেয়। লাল মাটি শূকরের চর্বির সঙ্গে মিশাইয়া এবং লালা দ্বারা ভিজাইয়া অঙ্গুলীর নিপুণ টানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অপরের দেহে সুন্দর পত্রলেখা রচনা করিতে একেকজন অতিশয় পটু।

ওঙ্গেরা চাষ করিতে বা আগুন জ্বালাইতে এখনো শেখে নাই; তবে আগুনের ব্যবহার ইহারা জানে। সেজন্য অগ্নিরক্ষা ইহাদের সমাজের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্তব্য। প্রজ্বলিত অগ্নি যাহাতে কিছুতেই না নেভে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইহাদের জীবিকার প্রধান উপায় শিকার, মাছ ধরা ও বন্য ফলমূল সংগ্রহ। শিকারের জন্তু প্রধানত বন্যশূকর, কচ্ছপ ও ডুগং নামক স্তন্যপায়ী জলজন্তু। নানা প্রকারের মাছ প্রচুর ও সহজলভ্য। বনজ খাদ্যের মধ্যে নানাপ্রকার ফল ও মূল তো আছেই, তদ্ভিন্ন বন্য মধুও প্রচুর পাওয়া যায় এবং ইহারা তাহা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে।

ওঙ্গেদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রধানত কাঠের, বাঁশের, হাড়ের ও শামুকের খোলের হয়। ইদানীং তাহারা লৌহফলকযুক্ত তীর, বর্শা ও হার্পুন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লৌহনিষ্কাষণ বা গলানোর পদ্ধতি ইহারা জানে না।

গাছের গুঁড়ি হইতে নির্মিত ওঙ্গেদের নৌকা

মৎস্য শিকার
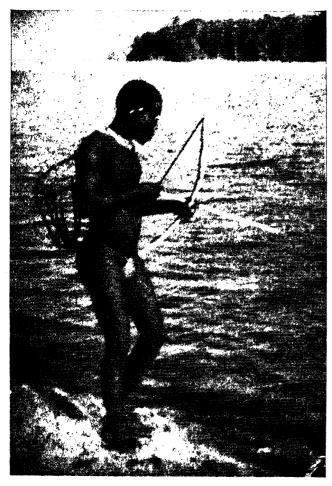
সমুদ্রে জলমগ্ন জাহাজ হইতে পাওয়া কুড়ানো লোহার টুকরা হইতে পাথরে ঘষিয়া তীরের বা বল্লমের ফলা প্রস্তুত করে। এই দ্বীপে অস্ত্র তৈয়ারী করিবার উপযুক্ত প্রস্তর পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ওংগেরা পাথরের অস্ত্র বা যন্ত্র একেবারেই প্রস্তুত করে না।

ইহারা যখন এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে যায় তখন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড বহন করিয়া লয় ও যথাস্থানে পেঁৗছিয়া আবার ভাল করিয়া আগুন জ্বালে। শিকারের মাংস অগ্নিসংযোগে রন্ধন করিয়া খাইতে ইহারা অভ্যস্ত। আজকাল সাধারণতঃ মাংস জলে সিদ্ধ করিয়াই রান্না করে। কিন্তু পূর্ব প্রথানুযায়ী এখনও অনেক সময়ে মাটিতে বড় একটি গর্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে কাঠের আগুন জ্বালিয়া তদুপরি কতকগুলি বড় বড় প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া দেয়। পাথরগুলি গরম হইলে তাহার উপর পাতা বিছাইয়া শূকরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া সাজাইয়া দেয়। তাহার উপরে আবার পাতা চাপা দিয়া সকলের উপরে মাটি চাপা দেওয়া হয়। ইহা চার-পাঁচ ঘণ্টা এইভাবে রাখিয়া দেওয়ার পর যখন মাংসগুলি বাহির করা হয়, তখন সেগুলি সুপক্ক হইয়া যায়। মৃৎপাত্রের ব্যবহার ইহাদের মধ্যে নাই। কাঠের বা বাঁশের চোঙ্গা বা বেতের ঝাঁপি দ্বারাই ইহাদের পাত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। আজকাল বাহিরের আমদানী ধাতুপাত্রও ব্যবহৃত হয়। অস্ত্রাদির কথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। আরেকটি শিল্প নৌকা নির্মাণ। ওংগেরা গাছের গোড়া কুঁদিয়া সরু লম্বা নৌকা (Canoe) প্রস্তুত করে। ক্যানোর এক পাশে হাত দুয়েক তফাতে ভারসাম্যের জন্য লম্বা কাষ্ঠখণ্ড সংযুক্ত থাকে (out-rigger)। এই নৌকা বাহিয়া মুক্ত সাগরে নির্ভয়ে পাড়ি দিয়া ইহারা মাছ ধরে। সমুদ্রে মাছ ধরার সময়ে তীর-ধনুক ব্যবহার করে। হারপুন দ্বারা সমুদ্রে কচ্ছপ শিকার করা হয়। খানাডোবায় মাছ ধরিতে মেয়েরা একরকম ছোট জাল ব্যবহার করে। লতা-তন্তুর বুনন বাঁশে গাঁথিয়া এই জাল তৈয়ারী হয়।

ইহাদের শ্রম বিভাগ মোটামুটি এই-রূপঃ—পুরুষেরা সমুদ্রে মাছ ধরে ও কচ্ছপ ধরে; বুনো শূকর শিকার করে; বনের মধু সংগ্রহ করে ও নৌকা তৈয়ারী করে। মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ করে; ছোট জলাতে জালের দ্বারা মাছ ধরে; জাল তৈয়ারী করে; ঝুড়ি বোনে; ও পরস্পরের দেহ চিত্রিত ও অনুরঞ্জিত করে।

জলবায়ুর প্রভাবের জন্য ইহাদের যেমন দেহাবরণের প্রয়োজন হয় না তেমনি গৃহেরও বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ওংগেরা স্বভাবত যাযাবর। আপন দ্বীপের ভিতরে ইহারা দলবদ্ধভাবে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ায়। সাধারণত দশ বারটি পরিবার থাকার উপযোগী এক একটি স্থায়ী সাম্প্রদায়িক গৃহ জঙ্গলের মধ্যে একেক স্থানে নির্মাণ করিয়া রাখে। এই গৃহ-গুলি গোলাকার হয় এবং ইহাদের চাল, বেতপাতার পাটি দিয়া ছাওয়া হয়। একেক পরিবারের জন্য এখানে একেকটি মাচা নির্দিষ্ট থাকে। এইসব গৃহে কিন্তু ইহারা বারোমাস বাস করে না। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আশে পাশে যখন যেখানে শিকার মেলে তখন সেদিকে চলিয়া যায়। মুক্ত আকাশের নীচেই দিবারাত্রি কাটায়। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে রাত্রিযাপন করিবার জন্য জঙ্গলের মধ্যে একটি পরিষ্কার প্রশস্ত স্থান বাছিয়া লয়। এখানেও একেক পরিবারের জন্য একেকটি মাচা নির্দিষ্ট থাকে; সেই মাচাতেই সমগ্র পরিবার ঘুমায় ও তাহাদের যৎসামান্য তৈজসাদি রাখে। কেবল বর্ষাকালে পূর্বো-ল্লিখিত সাম্প্রদায়িক গৃহগুলিতে ফিরিয়া আসে ও তাহার ভিতরে কয়েকটি পরিবার কোন প্রকারে মাথা-গুঁজিয়া থাকে।

স্ত্রীপুরুষ সকলেই সারাদিন খাদ্য-সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। রাত্রিতে মাঝে মাঝে নৃত্যের আসর জমায়। বহু-বিবাহ এখানে অপ্রচলিত; তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। সাধারণত সাম্প্রদায়িক গৃহের ভিতরে, কখনো বা বাহিরে সাময়িকভাবে নির্মিত কুটিরে আঁতুড়ঘর হয়। ফুল ও নাড়ী মাটিতে পুঁতিয়া ফেলাই নিয়ম। মৃত্যুর পরে মৃতদেহ গুটাইয়া জড়ো করিয়া বেত দিয়া পুঁটলীর মত করিয়া বাঁধিয়া মৃত-ব্যক্তির শুইবার মাচার তলায় প্রোথিত করা হয়। কিছুদিন পরে মৃতের নীচের চোয়ালের অস্থি তুলিয়া, পরিষ্কার করিয়া স্ত্রী বা অন্য নিকটতম কোনো আত্মীয়

উহা পদকের মত গলায় মাঝে মাঝে ঝুলাইয়া রাখে—এরূপ রীতি দেখা গিয়াছে।

সকল জাতির মত ওঙ্গেদেরও একটা ধর্মবিশ্বাস আছে নিশ্চয়, কিন্তু ভাষা-জ্ঞানের অভাবে এখন পর্যন্ত এবিষয়ে বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করা হয় নাই। তবে মৃতের চোয়ালাস্থি ধারনের রীতি হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে মৃত্যুর পরেও আত্মা অবশিষ্ট থাকে ও তখন সে আপনজনের কল্যাণ সাধন করিতে পারে এই ধারণা তাহাদের আছে। যে অল্পকাল তাহাদের মধ্যে কাটান হইয়াছে তাহা হইতে আর বেশী কিছু জানা যায় নাই।

সভ্যজগতের সহিত সংস্পর্শ ইহাদের অতি অল্পকাল যাবৎ। ইতিমধ্যেই ইহারা বিড়ী খাইতে শিখিয়াছে; তাছাড়া এক অভিনব উপায়ে ইহারা ধূমপান করে—কাঁকড়ার পায়ের নলের ভিতর শুষ্ক তামাক-পাতা পুরিয়া ধূমপান করিয়া থাকে। শুষ্ক তামাক পাতা ইহারা খুব ভালবাসে। চা পাতা সিদ্ধ করিয়া চা প্রস্তুত করিয়া পান করে। ধাতুর কর্মকার না থাকা সত্ত্বেও যৎসামান্যই ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াছে। দেশলাই, দা, রেতী ইত্যাদি খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে। বোঝা যায় যে বিজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ও আচারাদি গ্রহণ করিবার পটুতা ইহাদের যথেষ্ট আছে। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে অগ্রসর হইবার সময়ে আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। নচেৎ বৃহৎ আন্দামানীয় জাতিসমূহের ন্যায় সভ্যতার আকস্মিক সংঘাতে ইহারাও ধ্বংস হইয়া যাইবে।

বিনা লাইসেন্সে ও গোপনে নানা প্রকার মূল্যবান ঝিনুক, বিশেষতঃ trochus ও turbo, এবং ধূপ রপ্তানী করিবার চেষ্টায় একদল বিদেশী আনাগোনা করে। শুষ্ক তামাক পাতা ও আফিংয়ের লোভ দেখাইয়া তাহারা এইগুলি ওঙ্গেদের নিকট হইতে সংগ্রহ করে। ওঙ্গেদের নিজেদের মধ্যে কোনো মাদক দ্রব্যের প্রচলন নাই। যদি এই কুঅভ্যাস তাহারা একবার ধরে তবে ইহা অতি দ্রুত সংক্রামিত ও বর্ধিত হইবে, ও জাতিটিকে নষ্ট করিবে। গোড়াতেই এ সম্বন্ধে অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পৃথিবীর যে সকল জাতি সর্বাপেক্ষা আদিম অবস্থায় আছে ওঙ্গেরা তাহাদের অন্যতম। হঠাৎ সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন আকস্মিকভাবে বিপর্যস্ত হইয়া না যায় তাহা আমাদের দেখিতে হইবে; কারণ তাহা হইলে ইহাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি নষ্ট হইবে ও লোকক্ষয় হইবে। পক্ষান্তরে, ইহাদের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষার এবং অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি যাহাতে হয় সে চেষ্টাও নিশ্চয়ই করিতে হইবে। চিকিৎসক-রূপে যিনি ইহাদের মধ্যে থাকিবেন তাঁহার নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা ও সংস্কারমূলক কর্মোদ্যোগ আরম্ভ করিবার পূর্বে ইহাদের বর্তমান সামাজিক ধারা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। তার পরে তাহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া উহাদের উপযোগী পন্থা নির্ণয় করিয়া শিক্ষাপ্রচার ও অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবলমাত্র এইভাবে অগ্রসর হইলেই সুফল ফলিবে। অতি ধীরে ধীরে সভ্য-সমাজে প্রচলিত ধারা গ্রহণ করিলে যে পরিবর্তন তাহাদের সমাজে ও অর্থনৈতিক জীবনে আসিবে, তাহা তাহারা নিজেদের কৃষ্টির সহিত মিলাইয়া সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং তাহাতে তাহাদের সামাজিক জীবন অব্যাহত থাকিবে। এই-ভাবে নিজেদের স্বাস্থ্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া ভারত রাষ্ট্রের কর্মঠ ও শক্তিমান একটি অঙ্গরূপে ওঙ্গেরা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বৃত্তাকারে মেয়েদের সম্মিলিত নৃত্য

---

* তথ্যের জন্য দায়ী প্রথম লেখক, ভাষার জন্য দায়ী দ্বিতীয় লেখিকা।

রাতের আবেশ

সতীনাথ ভাদুড়ী

পথের ওধারের অশথ-তলায় একটা ঘুঘু কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।... প্রথম যখন তালেবররা এখানে আসে তখন ঐ গাছটাকে কত ভাল লেগেছিল। তাদের জন্য সরকার বাহাদুর নতুন গ্রাম বসিয়ে যখন ইঁদারা দেবার জায়গা খুঁজছিলেন, তখন তাঁরা এই অশথ গাছটার কাছাকাছি জায়গাই বেছেছিল। তাদের যাযাবর জীবনে নদীর ধারের অশথতলা পেলে, তারা আর কোন আশ্রয় স্থান চাইত না। পৌঁছেই প্রথমে গাছের ছোট ছোট ডাল-পালা কাটতে আরম্ভ করত, সঙ্গের ছাগল গরু, ভেড়াগুলোকে খাওয়ানর জন্য।... কিন্তু এখন আর সম্মুখের অশথ গাছটাকে সে রকম ভাল লাগে না।...

তালেবর বসেছে মাচার উপর; তার ছেলে গুজরাতী, আর গুজরাতীর-মা মাটিতে।

সুখ দুঃখের গল্প হচ্ছিল। পুরনো সুখের, আর আজকের দুঃখের কথা। যাযাবর জীবনের কষ্টের কথাটুকু এরা ভুলেও মনে আনে না। আগেকার ভালটুকুর সঙ্গে আজকের জীবনের খারাপটা তুলনা করে করে দেখে। একটা কিসের যেন অভাব বোধ অষ্টপ্রহর তাদের পীড়া দেয়। কোন জিনিসের অভাব তা' ঠিক বোঝা যায় না। তবে সে জিনিস যে আগেকার জীবনে ছিল, আর আজকের জীবনে নেই, এ সম্বন্ধে তাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। অস্বস্তিতে তাদের মন উদাস হয়ে থাকে; সময় সময় তেতোও হয়ে ওঠে। এই মৃদু মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের হাত থেকে সাময়িক শান্তি পাওয়া যায়, সেই সব গল্প করলে।

তালেবর বলে—"মাচার উপর বসলেই আমার মনে হয় যেন কোন হাটের মধ্যে বসে রয়েছি।"

"আমার হাটের কথা মনে পড়ে কুষ্ঠ-রোগী দেখলে।" মা বাবার কথার মধ্যে গুজরাতী কথা বলল না। সে জানে যে তাদের ব্যথা কত গভীর। অন্য দশজনের সঙ্গে লবটুলিয়ার লোকের মেলে না। হাট বলতে পৃথিবীসুদ্ধ সবাই ভাবে বেচাকেনার কথা, লোকের ভিড়ের কথা; কিন্তু নতুন টোলা লবটুলিয়ার লোকে হাটবারের হাটের কথা ভাবে না। যে সব দিনে জনশূন্য হাটের একচালা আর মাচাগুলো খাঁ খাঁ করে, সেই সব দিনের হাটের সঙ্গেই ছিল এদের সম্বন্ধ! বর্ষায় পথ চলার সময় যখন তারা মাথা গুঁজবার জায়গা খুঁজত, তখন তাদের দেখা হ'ত, ওই সব চালার স্থায়ী রাতের বাসিন্দা কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে। কুষ্ঠরোগী ভিখিরীরা বেশী থাকে সেই সব হাটগুলোতে, যেগুলো পাড়ার বাইরে। তালেবররাও সে যুগে খুঁজত গ্রামের বাইরের হাট। গাঁয়ের ভিতরের হাটে গেলে, হাটের মালিক আর পাড়ার লোকে অনর্থ বাধাত—চৌকিদার থানায় খবর দিত। তা' ছাড়া তখন অধিকাংশ সময়েই সঙ্গে সঙ্গে থাকত থানার পুলিস। সেগুলোই তাদের আস্তানা গাড়তে দিত না গ্রামের মধ্যে। গাঁয়ের বাইরে হাটের জায়গা ছাড়া আর ইঁদারা পাবে কোথায়; সব জায়গায় তো আর নদী নেই। তাই হাটের সঙ্গে তাদের স্মৃতি এমনভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো।

"মা, তুই তাহলে কুষ্ঠরোগী দেখতে খুব ভালবাসিস বল।"

"বাসিইতো। আর সব মানুষে আমাদের দেখে ভয় পেত, যেন কেটে খেয়ে ফেলে দেবো; কিন্তু কুষ্ঠ রোগী ভিখিরীরা কোনদিন ভয় পায়নি আমাদের দেখে।"

"আমার কি দেখলে হাটের কথা মনে পড়ে বাবুয়া?"

বাপ রসিকতা করে—"বেতো ঘোড়ার শুকনো লাদ দেখলে।"

"ধেৎ!"

মা জিজ্ঞাসা করে—"তুইও আবার পুরনো কথা মনে করিস না কি রে গুজরাতী? আমি তো ভাবতাম, হাট না দেখলে তোর আর হাটের কথা মনে পড়ে না। কি দেখে মনে পড়ে রে?"

"ওই হাঁড়িটা দেখে।"

তালেবর আর তার স্ত্রী দুজনেই একটু আশ্চর্য হয়ে তাকাল শিকেয় ঝোলানো কালিঝুলি মাখা মাটির হাঁড়িটির দিকে। ওই হাঁড়িটির মধ্যে গুজরাতীর-মায়ের পুরনো জীবনের পোশাক—খেরোর জীর্ণ ঘাগরাটি সযত্নে তোলা আছে; আর আছে একটা পুরনো ধুনুচি।

...সত্যিইতো! ঠিক সেই রকম লাগছে! এতদিন খেয়াল হয়নি। হাটের চালাগুলো থেকে ভিখিরীদের কালিঝুল-মাখা মাটির হাঁড়ি এমনি করেই ঝোলে।...কোন জিনিস দেখে যে লোকের কোন কথা মনে পড়ে!...

মায়ের মন হঠাৎ খুশী হয়ে ওঠে। লবটুলিয়ার বয়স্থ লোকদের ধারণা যে ছোটরা নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে—পুরনো জীবনের জন্য তাদের বুঝি মন খারাপ হয় না আর। না, তা'তো নয়। এ গাঁয়ের সবাই পিছনে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—ছেলেবুড়ো সবাই।

"গুজরাতীটারও দিল আছে দেখছি তাহ'লে। কি রকম মনে করে রেখেছে দেখ্, ছোঁড়াটা।"

"হাটের মধ্যেই ওর নাড়ী কাটা হ'ল; ও কি কখনও ভুলতে পারে হাটের কথা!"

"শোন্ গুজরাতী, তোর বাপের কথা একবার! নাড়ী কাটার সময়ের কথা কারও মনে থাকে নাকি?"

"আরে না না;" আমি কি তাই বলছি। কথাটার মানে আগে বোঝ। আমি বলছি অন্য কথা। জন্মটন্ম ওসব বাপ ঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া জিনিস; মনে না থাকলেও ভোলা যায় না। তা ছাড়া তোর আমার মনে না থাকলেও আমাদের মঘইয়া জাতের সকলের জন্মের কথা সরকার বাহাদুরের নিশ্চয় মনে আছে। সব যে পুলিসের খাতায় লেখা হত; জন্ম থেকে মরা পর্যন্ত। শুধু আমাদের মরাটা সে খাতায় আর লেখা হবে না!"

"তখন কি কেউ কোনদিন ভাবতে পেরেছিল যে আমাদেরও মাটির হাঁড়ি ব্যবহার করতে হবে একদিন!"

অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে এসেছে এই খেদোক্তি। লোকে কথায় বলে—'মঘইয়াদের দুই কাজ—দিনে পথচলা আর রাতে সিঁধ কাটা।' কোন জিনিসে অনাসক্তি না থাকলেও বাসন-কোসনের উপরই ছিল তাদের ঝোঁক বেশী। চৌকিদার, কার্নিস্টিবিল-সাহেব এরা সঙ্গে সঙ্গে থাকলে হবে কি; তারাও তো মানুষ—লোকের দুঃখ দরদ বুঝত; তা'রাই অতিরিক্ত বাসনগুলো বিক্রি করতে সাহায্য করত আধাআধি বখরায়। সে জীবনে কাঁসা পিতলের বাসনের অভাব হয়নি কোনদিন তাদের; কিন্তু আজ, সে ঝোঁক থাকলেও সামর্থ্যে কুলয় না। তাই মাটির বাসন এদের কাছে স্থায়ীভাবে ঘরবাঁধবার প্রতীক।

"গুজরাতীর মা, নামা দেখি একবার হাঁড়িটা।"

"না না। কি হবে ওসব দেখে।"

"কেন। দেখলে তোর সেই ঘাগরাটা ক্ষয়ে যাবে নাকি? গুজরাতী পাড়তো হাঁড়িটা।"

"না। দেখতে হবে না! মার খাবি বলছি গুজরাতী আমার কাছে।"

"আরে ধেৎ তেরি!" —ব'লে তালেবর হাঁড়িটাকে নামাতে গেল।...মেয়ে মানুষের কথায় কান দিতে গেলে, তাকে আর লবটুলিয়ার মোড়ল হয়ে বেঁচে থাকতে হ'ত না...

লাফিয়ে উঠে গুজরাতীর মা তার হাত ধরে। চেহারা বদলে গিয়েছে দুজনেরই মুহূর্তের মধ্যে। তালেবরের হাতের এক ঝটকায় তার স্ত্রী গিয়ে পড়ল মেঝের উপর। সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ি থেকে ছিটকে পড়ল পুরনো ধুনুচিটি, আর খেরোর ঘাগরাটি।

কথায় কথায় এদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। মারধর এদের নিত্যকার ব্যাপার। গুজরাতীর মাও হয়ত হাতের কাছে খড়ম, লাঠি, যা পেত তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত স্বামীর উপর।...কিন্তু ধুনুচিটা যে মেঝেতে পড়ে গিয়েছে।...

তালেবরও অপ্রস্তুতের এক শেষ। সে জানে ধুনুচিটা তার স্ত্রীর কত আদরের জিনিস। বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া। মারা যাবার সময় বাপ দিয়ে গিয়েছিল তার একমাত্র মেয়েকে। কয়েক পুরুষ থেকে এটা ছিল তাদের পরিবারে। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে, পূর্ব পুরুষদের কে যেন ধুনুচিটা একজন সন্ন্যাসীর কাছ থেকে পেয়েছিল। 'পাওয়া' মানে কি তা' তা'রা জানে। পাওয়া মানে নেওয়া—না বলে নেওয়া—রাতের অন্ধকারে সিঁধ কেটে নেওয়া কিংবা জোর করে কেড়ে নেওয়া—বাধা দিলে তাকে সাবাড় করে দিয়ে নেওয়া। বাপদাদারা এমনি করেই এ জিনিস পেয়ে থাকবে। নইলে সাধুসন্ন্যাসীর দায় পড়েছে কোন মঘইয়াকে যেচে জিনিস দিতে। দেখেছে তো সাধুবাবাদের। দুটো মিষ্টি কথা বলা দূরে থাক, তারা মঘইয়াদের কাছেও ঘেঁষে না। রাতের বেলা আরাম খোঁজে; তাই পথ চলতি সন্ধ্যা হলেই তারা ছোটে ভুঁড়িওলা গেরস্তদের বাড়ি। সেই জন্য সাধুসন্ন্যাসীদের, পথ চলার যুগে মঘাইয়ারা দু চক্ষে দেখতে পারত না কোনদিন। এই ধুনুচিটা বস্তায় ভরে সেইটা মাথায় দিয়ে তাদের সেই পূর্ব পুরুষ এক রাত্রে ঘুমচ্ছে এমন সময় তাকে গোখরো সাপে কামড়ায়। সাপের কামড়েও কিন্তু সে মরেনি, এই ধুনুচিটির গুণে। তাই ধুনুচিটাকে অন্য দশখানা বাসনের মত বিক্রি করে দেওয়া হ'ল না। তারপর থেকে পুরুষানুক্রমে তারা কেউ হাত ছাড়া করেনি এটাকে। পথচলতি কতবার কত দত্যি-দানো, আপদ-বিপদের হাত থেকে তারা বেঁচে গিয়েছে এর কল্যাণে। চিরকাল তারা শুনে এসেছে যে, এ ধুনুচি কাছে থাকলে ঘরে মন টেকে না; পথ চলতেই হয়।......কিন্তু কই? সে নিয়ম থাকল কই? সে-ই রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময় থেকে যে পথচলা শুরু হয়েছিল, তা সরকারের হুকুমে বন্ধ হয়ে গেল কি করে? কিন্তু সরকার বাহাদুরের নিয়ম মানুষে মেনে নেয়; জিনিসে নেয় না। তারা মেনে নিয়েছে, কিন্তু ধুনুচিটা নেয় নি। পথ চলার যুগে বর্ষায় পায়ে পাঁকুই হলে তারা এই ধুনুচিতে ধুনো গরম করে লাগিয়ে দিত; এক দিনে পাঁকুই সেরে যেত। এখানেও ক্ষেতের কাজ করে বর্ষায় পায়ে খুব হাজা হয়! যেবার তারা প্রথম এখানে আসে সেবার ধুনুচিতে ধুনো গরম করে লাগিয়ে-ছিল 'আঙুলের ফাঁকের হাজাতে।......এক দিন, দু' দিন, সাত দিন, দশ দিন—কিছুতেই কিছু হ'ল না! বুক চাপড়ে কপাল চাপড়ে মরে গুজরাতীর মা। বোঝা গেল যে, এক জায়গায় খুঁটির সঙ্গে বাঁধা পড়ে ধুনুচির ধক ফুরিয়ে গিয়েছে। সে পাঁকুই সারল সরকারী ডাক্তারের মলমে। [illegible] তা। সেখানে

সরকারী নিয়ম রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিয়মের চেয়ে বড়, সেখানে রোগ সারে সরকার বাহাদুরের দেওয়া ওষুধে। এ ধুনুচির দরকার ফুরিয়েছে, পথ চলার পালা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে। তুলে রেখেছিল তাই এটাকে গুজরাতীর মা। তার স্বামী ছেলে কারও এই অনাবশ্যক জিনিসটার কথা আর মনেও পড়েনি এতদিন।

অনেক দিন দেখেনি; স্বামী স্ত্রী ছেলে তিনজনেই হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ধুনুচিটিকে দেখছে। অদ্ভুত দেখতে। পিতল না তামা কিসের যেন। কলঙ্ক পড়ে সবুজ হয়ে গিয়েছে। নীচের দিকটা একজোড়া পায়ের পাতার মত; তারই সঙ্গে ধরবার হাতলটা আর ধুনো জ্বালাবার বাটিটা বসানো। কেউ একটাও কথা বলে না। গুজরাতীর মা সেটাকে সযত্নে কাপড় দিয়ে মুছে আবার রেখে দিল হাঁড়ির ভিতর।

এতক্ষণে তার সময় হ'ল ঘাগরাটাকে ঝেড়ে তুলবার। ক্ষার দিয়ে কেচে পাট করে তুলে রেখেছিল এটাকে। গুজরাতীর মায়ের চোখে অনুযোগের ব্যঞ্জনা—"দেখ্, কি করেছিস্ দেখ্।"

এই চাউনিই যুদ্ধবিরতির সূচনা। অল্পের উপর দিয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা; তাই তালেবর আর কথা কাটাকাটি করে না এ নিয়ে।

ঘাগরাটিকে দেখলেই গুজরাতীর মায়ের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। ঘরে যখন কেউ থাকে না তখন সে মধ্যে মধ্যে এটাকে বার করে করে দেখে। লবটুলিয়ায় আসবার পর থেকে তাদের ঘাগরা পরার পাট উঠে গিয়েছে; জেলার হাকিম বছরে একজোড়া করে শাড়ী দেয় তাদের প্রত্যেককে। সরকারী হাকিমরা সেই সময় এসে বলেছিল—ঘর বেঁধে থাকতে গেলে নাকি শাড়ী পরতে হয়; ঘাগরা পরলে নাকি আশপাশের গ্রামের লোকরা কোনদিন ভুলতে পারবে না যে লবটুলিয়ার লোকরা মঘইয়া।...তোরাতো ব'লে দিয়েই খালাস! শাড়ী পরে কি কোন কাজ করা যায় হাঁটতে গেলে পা জড়িয়ে আসে; অথচ কেমন যেন নেংটো নেংটো লাগে। আর যে জন্য পরা—আশপাশের গ্রামের লোক কি শাড়ী পরতে দেখলেই ভোলে তারা লবটুলিয়াকে বলে মঘইয়াটুলি। নামটা বলবার সময় নাক সিঁটকয়। ঘর বেঁধে যারা থাকে তাদের মন ওই বেড়া দেওয়া উঠনের মত এতটুকু!......

"মা, তোর সঙ্গে কথা বলতে তো ভয়ই করে। চটিসনা, একটা কথা বলছি। ঘাগরাটা একবার পরবি। দেখি কেমন দেখতে লাগে। ভুলে গিয়েছি।"

"মারব এক থাবড়া"।

"ওই দেখ। বলেছিলাম আগেই।"

"আগেই বলিস, আর পরেই বলিস, ও ঘাগরা আমি পরছি না। দাঁড়া ওটাকে তুলে রেখেদি।"

"জেদী, জেদী! তোর মা কি গুজরাতী কারও কথা শুনেছে কোনদিন যে আজ তোর কথা রাখবে?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, থাম! তোর আর রসান দিতে হবে না! —ঘাগরা অমনি পড়লেই হ'ল—কে না কে এসে পড়বে...!"

বাপ ছেলের দিকে চেয়ে হাসল—"টোল্লার কোন লোকটা বাড়িতে আছে আজ যে আসবে?"

"টোলার লোকরা না থাকুক। যার ভয়ে তা'রা সবাই পালিয়েছে, সে লোকটার কথা ভুলে যাচ্ছিস কেন? লবটুলিয়ায় আবার নতুন লোক আসবার কামাই আছে নাকি? লোকের পর লোক আসছেই, একদিনও বাদ নেই। এক মিনিট নিশ্চিন্দি নেই! অতিষ্ঠ করে দিল একেবারে! সব ক'টা এসে হাঁড়ির খবর চায়! ইচ্ছা করে যে এ সব ছেড়েছুড়ে পালাই, যে দিকে দুচোখ যায়!"

একথার প্রতিবাদ করতে পারে না তালেবর। সে নিজেও ভুক্তভোগী—লবটুলিয়ার সবাই। যবে থেকে তা'রা এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে, তবে থেকে শুরু হয়েছে সরকার বাহাদুরের লোকদের আনাগোনা। এ আপদগুলো দু রকমের। এক রকম—পেণ্টুলুন-পরা; সেগুলোকে ওরা বলে হাকিম। আর এক রকম—ধুতিপরা; সেগুলোকে ওরা বলে হাকিমের-চাকর। কেউ এসে বলে এমনি করে থুতু ফেলবে, কেউ এসে বলে এমনি করে ছাগলের নাদির পাহাড় করবে! সব বিষয়ে নাক গলাতে আসে তা'রা! ওই, দু রকমের লোকের ওপরই ওরা সমান বিরক্ত। তবে পেণ্টুলুন-পরা হাকিমগুলো টাকা, শাড়ী, ইঁদারা দেবার মালিক। তাই তাদের ওরা খাতির করে। তারা এলেই লবটুলিয়ার মেয়েরা হেসে বাঁকা চোখে ঝিলিক আর দেহরেখায় বিজুলী খেলায়; পুরুষেরা ঝুঁকে হুজুরকে সেলাম করে। কিন্তু ধুতিপরা হাকিমের চাকরগুলো যখন আসে তখন লবটুলিয়ার লোকে তাদের বিশেষ আমল দেয় না। 'যা বলবার আছে বলে যাও'—এমনি একটা নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আসলে এখানকার একঘেয়েমির গ্লানি তাদের ভবঘুরে মনের মধ্যে জমতে জমতে বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু রাগের পাত্র হিসাবে রক্তমাংসের লোক না পেলে তৃপ্তি হয় না। সরকার বাহাদুরকে তা'রা দেখেনি; তাই সব রাগ গিয়ে পড়ে, ওই হাকিম আর হাকিমের চাকরদের উপর। তা'রা পিছন ফিরলেই লবটুলিয়ার লোকে তাদের গালাগাল দেয় 'শ্বশুর' ব'লে।

আজকে যে শ্বশুরটার ভয়ে গাঁয়ের লোক পালিয়েছে সেটা 'হাকিম' না 'হাকিমের-চাকর' সেইটাই হ'চ্ছে কথা!

"যেটার আসবার কথা আছে সেটা পেণ্টলুন-পরা, না ধুতি-পরা?"

"তা আমি কি করে জানব।"

"ধুতিপরা হলে, সেটাকে দু ঘা দিলে কেমন হয়?"

"না না!"

"দেখছিস গুজরাতী, তোর বাবা ভয় পেয়ে গিয়েছে সেই গুরুমশাইকে মারবার পর থেকে।"

এখন যেখানে রাত্রে ছাগল গরু থাকে সেই চালাটাতে একজন হাকিমের-চাকর গুরুমশাই লবটুলিয়ার লোকদের প্রতি রাত্রে অ আ পড়াতে আসত। লোক ভাল ছিল না। জ্বালাতন হয়ে গিয়ে তালেবর তাকে এমন প্রহার দিয়েছিল যে সে আর এ মুখো হয়নি। সে আপদ বিদায় হয়েছিল বটে, কিন্তু সেবার জেলার হাকিম বড় ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছিল। জেলা হাকিম হালের-বলদ মরলে দেয়, বীজের ধান দেয়, শীতে কম্বল দেয়; তাকে চটাতে ভয় করে।

ভয়ের কথাটা মুখ ফুটে স্বীকার করতে বাধে। তালেবরের মনের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিয়েছে গুজরাতীর মা। ভীতু কথাটার চাইতে বড় দুর্নাম আর নেই মঘইয়াদের মধ্যে। পথ চলার যুগে এরা কোথাও আস্তানা গাড়লে এদের ভয়ে আশপাশের গ্রামের মায়েরা ছেলের গলার মাদুলিটি পর্যন্ত খুলে রাখত, মেয়েরা ক্ষেতখামারে যাওয়া বন্ধ করে দিত; শুয় নারে গুজরাতীর মা।" জাগত। রাত দুপুরেও গুজরাতীর মা আনাচকানাচ থেকে তালেবরগাষ্ঠ-কথা শুনেছে, ঘুম জড়ানো স্বরে মায়েরা দুষ্টু ছেলের কান্না থামাচ্ছে মঘইয়াদের কাছে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে।

স্ত্রীর কথায় তালেবরের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে বুক ঠুকে বলে—"এই তালেবর মঘইয়া আজ পর্যন্ত কাউকে ভয় পায়নি, বুঝেছিস। বন্দুকের গুলীকে পর্যন্ত ভয় পাইনি, জানিস!"

"সেই সোনাপুরের কথাটা বলছিস তো? সেই যে গেরস্তর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলি সে কি আজকের কথা—তখনও গুজরাতী জন্মায়নি। তখনতো আর বাঁধা-ঘরের মধ্যে থাকতিস না। সেদিন আর আজ! হেঃ! আজ বন্দুক দেখলে আর কাছার কাপড় থাকবে না!"

"দেখ গুজরাতীর মা অমন করে খোঁচামারা খোঁচামারা কথা বলবি না বুঝলি! থাবড়ে মুখ ভেঙ্গে দেবো! মরা তেলী—একশ আধুলি! যে তেলীটাকে ভাবছিস খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে, সেটার বাড়ি থেকেও দেখবি মরবার পর একশ' আধুলি বেরুবে। পেণ্টুলুন-পরা হাকিমরা আমার সঙ্গে 'আপনি' বলে কথা বলে—আর তোর মুখের কোন রাশ নেই?"

"তুই না বলে আপনি বলেছে হাকিম, তাতেই যে ফুলে হাপড় হয়ে গেলি! দেখিস, দেখিস, দেখিস,—আবার ফট করে ফেটে না যাস! তোকে আমাকে কি আর ওই হাকিমগুলো মানুষ মনে করে নাকি? মানুষ মনে করলে নতুন টেল্লো বসাবে কেন—পুরনো গাঁয়ের মধ্যে অন্য মানুষদের মধ্যেই থাকতে দিত। শুনিস না, উঠতে বসতে বলে আশপাশের গাঁয়ের মানুষদের

সত হতে? দেখিস না তাদের হুকুমের ঘটা? এমনি করে শাড়ি পরতে হবে, এমনি করে ইঁদারার পাড়ে জল ঢালতে হবে, সকালে বিকালে লোটা হাতে কোন মাঠে যেতে হবে তা' পর্যন্ত! গোবর-সোনার-হাকিমটা—ওই যে যেটা এসেই আরম্ভ করে 'গোবরই হচ্ছে সোনা'—সেইটা বলে কি না উননের ছাই ক্ষেতের মধ্যে না ফেললে পিটবে। এত বড় আস্পর্ধা! যাকে লোকে সত্যিকারের আপনি বলে তাকে আবার হুকুম করে নাকি? মুখে বলে ভাই—মনে ভাবে গাই! গরুরও অধম! বোঝাতো যায়! আপনি বলায় যে ফুলে কুপো হয়, সে যেন হাকিমের দেওয়া ইঁদারার পাড় জিভ দিয়ে চাটে। শাড়ী, কম্বল দিয়েছে বলে হক কথা বলব না, তেমন মেয়ে আমার বাপ জন্ম দেয়নি!"

"মেলা বকাস না! লম্বা লম্বা কথা! সে বাপের মেয়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাক না কেন, কে তা'কে আটকে রাখছে?"

"কথা, বলবার হ'লেই বলে!"

"মা তুই থামবি কিনা বল্ল! শোন আমার কথা। রাত্রে কিন্তু পড়তে হবে ঘাগরাটা। বাড়ির মধ্যে রাতে তো আর কেউ দেখতে আসছে না। এই নে বিড়ি।"

"আমার কথা কা'রও সয়না দেখি"—না বাপের, না বেটার। হাকিমের-চাকর যখন এসে গালাগাল দিয়ে গেল বীজের ধান খেয়ে ফেলেছিস বলে, তখন সে গালাগাল হাঁ করে গিললি তো? আমার কথা সইবে কেন! আচ্ছা আমি এই চুপ করলাম।"

সে বসল গম্ভীর হয়ে ছেলের দেওয়া সিদ্ধিপাতার বিড়ি টানতে। তিনজনেই নীরব কিছুক্ষণের জন্য। বাপ ছেলের দিকে চোখ টিপে ইশারা করে—দেখ না কি মজা করি।

ছেলে বোঝে যে বাপ এখনি আরম্ভ করবে বলতে, সরকার বাহাদুর বালিভরা জমি দিয়ে মঘইয়াদের কেমন করে ঠকিয়েছে। একথা শোনবার পর মায়ের সাধ্য নেই যে সে চুপ করে থাকে।......

কিন্তু সময় পাওয়া গেল না।

ঘু-ঘু—উ-উ-ঘু!.........

ডাক শোনা গেল ঘুঘু পাখির, বহু দূরে থেকে।

অশথতলার ঘুঘু পাখিটা থমকে দাঁড়ায়। এই অসময়ে সংগী ডাকছে কেন, এমন কাতর মিনতি জানিয়ে? গ্রীবা-ভঙ্গিতে ফুটে উঠছে বিস্ময়। শব্দ লক্ষ্য করে পাখিটা উড়ে গেল।

পাখিরা ভুল করে এ ডাক শুনে; কিন্তু লবটুলিয়ার লোকে করে না।

তিনজনেরই কান খাড়া হয়ে ওঠে।

"আসছে শ্বশুরটা!"......

ফাঁদ পেতে ঘুঘু পাখি ধরবার জন্য যাযাবর জীবনে তারা এ ডাক শিখেছিল। আজকাল এ ডাকের ওই এক মানে—সাবধান, অবাঞ্ছিত কেউ আসছে গ্রামে।...... গ্রামের লোকেই কেউ সতর্কবাণী পাঠাচ্ছে দূর থেকে।

পাশের গ্রামে কলেরা হয়েছে। কাল থেকেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, হাকিম আসবে লবটুলিয়ার লোকদের গায়ে কলেরার সূঁচ ফোটাতে। তালেবর গ্রামের মাথা; গ্রামে যে-ই আসুক তার বাড়িতেই আসবে। আজ চৌকিদার তাকেই খবর দিয়ে গিয়েছে। বলে গিয়েছে বাড়িতে থাকতে। তাই আজ গ্রাম সুদ্ধ সকলে ইনজেকশনের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও, তালেবররা যেতে পারেনি। গুজরাতী মাচার উপর উঠে দাঁড়াল—যদি দূর থেকে দেখা যায় কে আসছে।

"পেন্টুলুন পরা না কি?"

"হেঁটে না সাইকেলে?"

"দেখা যাচ্ছে না কিছুই।"

এই যে। এসে গেল লোকটা। সাইকেলে ধুতি পরা। হাকিমের চাকর। ছোকরা। এখনও মোচ কড়া হয়নি—একদম ছোকরা। ...ফুঃ!......

"আপনারই নাম তালেবরজী না? নমস্তে! চৌকিদারকে দিয়ে কাল খবর দিয়েছিলাম—পেয়েছিলেন তো?"

"হ্যাঁ।"

"আমি বেশিক্ষণ বসব না। আবার ফিরতে হবে ষোল মাইল সাইকেল করে। পাড়ার লোকজনদের তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠান!"

"পাড়ায় কেউ নেই। সব কাজে বেরিয়েছে।"

"আগে থেকে খবর পাঠিয়ে দিলাম—তবুও?"

"তার আর কি করব বলুন। ধরে তো আর রাখতে পারি না কাউকে।"

"ফিরবে কখন?"

"সে কথা কি আমায় কেউ বলে গিয়েছে?"

"তাহলে কতক্ষণ বসে থাকব?"

"বসে থাকতে হবে না।"

"তাহলে আপনাদের তিনজনকে দিয়ে দেবো?"

"না বলছি! আবার কেমন করে বলব?" গলার স্বর বেশ রুক্ষ।

লোকটা বোঝে। লবটুলিয়ার লোকদের মেজাজের বেশ দুর্নাম আছে সরকারী কর্মচারী মহলে। সে আর কথা না বাড়িয়ে সাইকেলে গিয়ে ওঠে। ওঠবার পর রাগ চাপতে না পেরে শাসিয়ে যায়—"আমি থানা হয়ে যাচ্ছি।"

আগুনে যেন ঘি পড়ল।

"বলুগে শ্বশুর, তোর বাপ দারোগাকে!"

গুজরাতী লোকটার দিকে দৌড়ে এগিয়ে যায়।

হাকিমের চাকরটা জোরে সাইকেল চালিয়ে প্রাণ নিয়ে বাঁচে।

এর পরও কি গুজরাতীর মায়ের গাম্ভীর্য টেকে!

"নে। এর পরও কি বলিস যে গুজরাতীর মা বাজে বক্‌বক্‌ করে?"

...সত্যিই এ সবের মধ্যে আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না! এখানে থাকলে লোকের মনে পচ্‌ ধরে। মানুষগুলোই যায় বদলে অন্যরকম হয়ে। একথা লবটুলিয়ার লোকে কত সময় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। একই জমিতে যারা বছরের পর বছর চাষবাস করে, একই উঠন যারা প্রত্যহ নিকয়, তাদের মন অন্যরকম হয়ে যেতে বাধ্য। লাড্ডু মঘইয়া এক রাত্রে তালেবরের ক্ষেতে মোষ চরিয়ে দিয়েছিল। পথ-চলবার যুগে কোন মঘইয়া তার ভাইবেরাদারের সূঁচটা পর্যন্ত নেয়নি, না বলে। কিন্তু আজ সে সব রীত বদলাচ্ছে। সরকারের খাতায় এতকাল ধরে মঘইয়াদের প্রত্যেকের নাড়িনক্ষত্র লেখা আছে; কোন মঘইয়া মেয়ে পুলিসের মার-ধর জুলুমে বলে ফেলেছে তার জাত বেরাদারের রাতের গতিবিধির খবর—এ কি কোথাও দেখাতে পারবে? কালে কালে কি হল! নিরসুরমা টাকার লোভে বলে দিল পাশের বাড়ির মদ চোলাই-এর কথাটা! ঘটিতে করে টাকা মাটিতে পুঁততে শিখবে আর দু'দিন পর!

আগের জীবনে এরা কোনদিন পয়সা জমানর কথা ভাবতে পারেনি। জমাতে গেলে সঙ্গের পুলিসটা কেড়ে নিত না? এই যে পুরনো কুকুর বাণ্টা, সম্মুখে বসে রয়েছে—এটার সুদ্ধ মনে পচ্‌ ধরছে—একবার ডাকল না—হাকিমের চাকরদের দেখে আর ডাকে না আজকাল!......

"শ্বশুরটা শাসিয়ে গেল থানায় যাচ্ছি বলে। যাক না। গিয়ে দেখুক! পুলিসরা যেন তোর বাপের চাকর! তোর কথা শুনে দারোগা সাহেব থামকা আমাদের পিছনে লাগতে গেল আর কি! আমাদের চেয়েও যেন বেশী পুলিস চিনিস! আমাদের আসিস দারোগা দেখাতে! ওরে, দারোগার-বাপ জেলার পুলিস সাহেব—তার সঙ্গে সুদ্ধ আমরা কারবার করেছি একদিন! মনে আছে না গুজরাতীর মা?"

"সে কথা কি আমি কোনদিন ভুলি। সে তো করেছিলাম, আমি। তুই তো তখন হাজতে।"

......অনেক কাল আগেকার ঘটনা। সে যুগে ওরা চুরিকে বলত 'রাতের রোজগার'। সন্দেহ করে তালেবরকে থানার হাজতে রেখেছে দারোগা সাহেব। সঙ্গের পুলিস কনস্টেবল গুজরাতীর মাকে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল—সাঁঝের পর দারোগা সাহেবের সঙ্গে একা দেখা করিস—সব ঠিক হয়ে যাবে।.........এ উপদেশে মঘইয়া মেয়েদের

দিতে হয় না—এসব তাদের জানা। সাঁঝের সময় চুল বেঁধে দারোগা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল থানায়। গিয়ে দেখে বিপরীত কান্ড—জেলার পুলিস সাহেব—লাল টকটকে সাহেব—থানার বারান্দায় চেয়ারে বসে। জিজ্ঞাসা করল—'কেয়া মাংটা?'

—সাহেব আমার মরদকে ছেড়ে দে। 'টুম লোগ বডমাস্ হ্যায়।' ...না, সাহেব।... সাহেব জিজ্ঞাসা করে, তারা চুরি ছাড়া আর কিছু জানে কিনা।......তা জানব না কেন সাহেব—কত জিনিস জানি—কত পাখির ডাক ডাকতে জানি; এমন শিয়ালের ডাক ডাকতে জানি যে, দূর থেকে বনের শিয়াল ছুটে আসবে।...তাই নাকি? দেখাও এখনি। দেখাতে পারলে তোমার মরদকে ছেড়ে দেবো।...শিয়ালের ডাক শুনে সাহেব খুব খুশী। দূর বনের শিয়ালরা এ ডাকে সাড়া দিতে সাহেব হেসে কুটিপাটি।...... দারোগাকে হুকুম দিয়ে দিল তালেবরকে হাজত থেকে ছেড়ে দিতে।......চলে আসবার আগে সেলাম করতেই সাহেব আবার বলল—টুম্ লোগ বডমাস্ হ্যায়।...

......সে সব কথা গুজরাতীর মায়ের মনে আছে।...

"পুলিসরা তো লোক খারাপ না। কত দারোগা কনস্টেবলকেই তো দেখলাম!"

"প্রথম প্রথম এখানে এসে পুলিস না থাকায় কেমন যেন খালি খালি লাগত নারে?"

"উখলি, সামাট, হাঁড়ি, ঘটির মত পুলিশগুলোও যেন আমাদের নিজেদের জিনিস হয়ে গিয়েছিল না রে?"

"সে সব যুগের কথা বাদ দে।"

......সত্যিই। রাতের-রোজগারের যুগের সঙ্গে আজকের তুলনাই হয় না। নিশাচর, রাতের শিকারীদের সঙ্গে তাদের ছিল আত্মীয়তার সম্বন্ধ। রাতদুপুরে ওয়াক পাখি ডাকে, সেকরা-পেঁচা ঠক্ ঠক্ করে শব্দ করে, সাপে ব্যাঙ ধরে, সজারু খরগোশে ক্ষেতের আনাজ খায়, জোনাকপোকা জ্বলে নেভে, শিয়ালের দল প্রহর গোনে; এরা সবাই ছিল মঘইয়াদের আপন জনের মত। ...আর এদের একাত্মতা ছিল, যারা পথ চলে তাদের সঙ্গে—রামলীলার দল, ইরাণীর দল, গাইয়ে-বাজিয়ে নৌটাঙ্কির দল, আরও কত দলের সঙ্গে।......

"বুঝলি গুজরাতীর মা, আজকাল রাতে মাঠে ঘাটে যাবার দরকার পড়লে, আর যেন দেখতেই পাই না আগেকার মত। খর খর শব্দ হলেই ভাবি, সাপ কি বুনো শুয়োরের কথা। কিন্তু জানোয়ার পোকা-মাকড়গুলোও বোধ হয় গন্ধতে বুঝে যায় কোন্‌টা পথ-চলার লোক, আর কোন্‌টা ঘর-বাঁধা লোক।"

"সে সব গন্ধই যেন পাই না আর। একই হাট, একই ছাপ্পর, একই গাছ,—কোন জিনিসের দিকে তাকাতে আর ইচ্ছা করে না আজকাল। তাকাই কিন্তু দেখি না!"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস শোনা গেল।

জমির উপর মোহ এখনও তাদের জন্মায় নি। ক্ষেতের আল নিয়ে মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হয়নি আজও। চাষবাসে তাদের মন বসে না। চাষের কাজ ফেলে অকারণে হাটে ঘুরে আসে, কিছু কিনবার না থাকলেও। হরখু পাঁচ-পা-ওলা গরুটাকে গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে। নিরসু মঘইয়া এক পয়সায় দশবার করে হরবোলার ডাক শোনায়।... কিছু আর থাকল না আগেকার মত!...

"চল, চলে যাই আমরা এখান থেকে।"

কতদিন তারা একথা ভেবেছে; কিন্তু যত জিনিস মন চায়, সব কি করা যায়! প্রবীণরা সাহস পায় না, ইচ্ছা থাকলেও। এখানে এসে অনেক কিছু তারা খুইয়েছে বটে; কিন্তু তার বদলে পেয়েছে খানিকটা নিরাপত্তা।......গুজরাতীর ছেলের নাড়ী আর অশথতলায় কাটতে হবে না।......

"সে আর আজ হয় নারে গুজরাতীর মা।"

কথার সঙ্কোচ-কাতর সুর গুজরাতীর মা ধরতে পারে। মেয়েমানুষের বাজে-কথা বলে তার প্রস্তাব উড়িয়ে দিচ্ছে না তালেবর। তালেবরের কথা দ্বিধালজ্জায় ভরা, চুরির কথা দারোগার কাছে কবুল করবার সময়ের মত। বড় জিনিস ফেলে, ছোট জিনিসের পিছনে ছুটবার লজ্জা।... সে জানে যে তার পূর্ব-পুরুষরা স্বর্গ থেকে তাকে অভিশাপ দিচ্ছেন—রাজা হরিশচন্দ্র পর্যন্ত। মরবার পর তাঁদের কাছে গিয়ে এর জবাবদিহি দিতে হবে। বাঁধা ঘরে থাকা, জমিতে লাঙল দেওয়া, সব যে তাদের বারণ। বাপ ঠাকুরদার মুখে শুনে এসেছে যে তারা আগে ছিল রাজা। একদিন রাজ্যপাটে লাথি মেরে তাদের পূর্বপুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্র বেছে নিয়েছিলেন, পথচলার জীবন। বলেছিলেন—আকাশের নীচে আর মাটির উপরের সব জায়গা, আজ থেকে হয়ে গেল আমার এলাকা। তাঁর বলা ছড়াটা আজও তারা গান গায়। সেই বড় আকাশ ছেড়ে, সে ছোট্ট সবটুলিয়ার, ছোট্ট আকাশ

পছন্দ করেছে; পায়ে চলবার পথকে আল দিয়ে ঘিরে চাষের জমি করে নিয়েছে। তার মনের এ হীনতার জন্য সে স্ত্রীর চোখে কত ছোট হয়ে গিয়েছে, তা' সে জানে। তবু—উপায় নেই!......

"কেন? হয় না কেন?"

"সরকারের হুকুম।"

"ওসব বোঝাস গিয়ে বাচ্চাদের—গুজরাতীদের। যে সরকার বালিভরা জমি দিয়ে ঠকাতে পারে, তার হুকুম হয়ে গেল রাজা হরিশ্চন্দ্রের হুকুমের চেয়েও বড়?"

"হ্যাঁরে, আজকাল তাই হয়ে গিয়েছে।"

"পায়ে চলার মাটিতে বেড়া দিয়ে ঘর তুলে দিয়েছে সরকার; তারই জন্য তুই সরকারের দিকে টেনে মিছে বলছিস! বুকে হাত দিয়ে বল, আমার কথা সত্যি কি না! আমরা যদি এখান থেকে চলে যাই রাতারাতি—অনেক—অনেক দূরে—তা হ'লে সরকার কি ধরে ফাঁসি দেবে আমাদের?"

"তা' আর হয় না।"

"আমরা যদি গিয়ে বলি—আবার আমাদের উপর আগেকার মত কনস্টেবল মোতায়েন কর, আবার সকলের নামে নামে পুলিসের টিকিট করে দাও, জমি ফিরিয়ে নাও—শুনবে না জেলা হাকিম?"

"না রে, আর হয় না সে সব।"

তালেবর তাকাতে পারছে না স্ত্রীর মুখের দিকে কুণ্ঠায়। তার ব্যক্ত, অব্যক্ত, অভিযোগ অনুযোগগুলো সব সত্যি; "তবু এমনিভাবে এখানেই থাকতে হবে। ভাবিস না গুজরাতীর মা পুরনো কথা। ভুলে যেতে চেষ্টা কর। যত ভাববি তত মন খারাপ হবে। আমি কি আর বুঝছি না তোর মনের দুঃখ—আমিও যে ভুক্তভোগী! প্রতি সকালে নতুন জায়গার নতুন গন্ধ না পেলে আমারই কি ভাল লাগে? হাকিমের কাছ থেকে হাত পেতে নেওয়া, আল ঘেরা বালির ঢিবিতে ছাগলনাদি দিয়ে ফসল নেওয়া, এ রোজগার কি আমারই ভাল লাগে? বাপঠাকুরদার মুখে কালি পড়ছে—এতে আমার কি লজ্জা করে না? একে কি রোজগার বলে! এ হচ্ছে থুতু চাটার সামিল। ইজ্জত দিয়ে পেট ভরানো। পরের এ'টো খাওয়া। রোজগার হচ্ছে রাতের রোজগার, গরাদ বে'কিয়ে তালা ভেঙে সি'ধকেটে রোজগার, নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে মরদের রোজগার। সে রোজগারের

ডাল-রুটি মিষ্টি, আর এখানকার খাওয়া হচ্ছে শুধু পেটের ফুটো বোজানো।...... বুঝি রে সব বুঝি! তোর চেয়ে বোধহয় বেশী করেই বুঝি—বয়সে বড়তো।...... কিন্তু তুই যা বলছিস সে আর হয় না। ছোট ছেলের মত অবুঝ হস না তুই গুজরাতীর মা। আমি নিজেই মরমে মরে আছি রে......আমি যে লবটুলিয়া গাঁয়ের মাথা!"......

বাণ্টা ঘরের একোণ ওকোণ শু'কতে শু'কতে, মাচার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। তালেবর চে'চায় "ভাগ! আর জায়গা পেলি না!"

গুজরাতীর মা কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে—"না না, তা' কেন হতে যাবে! ও মাচার উপরে বিছানো পুরনো তাঁবুটার গন্ধ শু'কছিল বোধহয়। চাউনি দেখছিস না। মানুষের চেয়েও জন্তু-জানোয়ার বোধহয় ভোলে দেরিতে।"

এই শতছিন্ন চটের তাঁবুটা, তাদের পথ-চলার জীবনের জিনিস। আজ অন্য কাজে লাগান হয়েছে। এ রকম আরও কত জিনিস আছে, যেগুলো তাদের পুরনো কথা মনে পড়ায় অষ্টপ্রহর। বেলা পড়ে এল। তিন-জনের কেউ এখান থেকে নড়েনি তখন থেকে। এরা প্রতীক্ষা করছে পাড়ার লোকদের ফিরে আসবার। প্রথমেই তারা আসবে এইখানে। জিজ্ঞাসা করবে, লেজগুটিয়ে পালাবার সময় সুচের-হাকিমের মুখখান কেমন হয়েছিল।......

বাণ্টা ডাকতে ডাকতে বাইরে ছুটে গেল। জন্তুজানোয়ারের ডাকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদাভেদও মঘইয়াদের জানা। কে আবার আসছে? ভরসন্ধ্যাবেলা নতুন লোক! সাঁঝের পর হাটুরের দল, বা ভিনগাঁয়ের গরুরগাড়ি পারতপক্ষে লবটুলিয়ার মধ্যে দিয়ে যায় না। এত ভয় করে লোকে মঘইয়াদের।......

গলার স্বর শোনা গেল জনকয়েক লোকের।... বেশ সজীব কথাবার্তা।...ক্রমেই কাছে আসছে।...

"একটু এগিয়ে দেখতো গুজরাতী।"

এল ঠিক মেলার যাত্রীদের মত দল বে'ধে। টোলার মেয়েরাও আছে।

দূর থেকে চে'চিয়ে গুজরাতী জানাল—"সাধুবাবা"।

আর একজন গুজরাতীর ভুল সংশোধন করে বলে—"না না, সাধুবাবা না—অঘোরী-বাবা।"

"সাধুবাবা!"

মুহূর্তের সংশয় ও দ্বিধা কেটে গেল টোলার লোকদের সংকোচহীন কথাবার্তার ধ্বনি কানে আসায়।

তালেবরের চেয়েও জোরে ছুটে এগিয়ে গেল গুজরাতীর মা।

......এইজন্যই সকালবেলা কাকটা ডেকে ডেকে বলছিল যে আজ এ বাড়িতে অতিথি আসবে। তখন সে কান দেয়নি; ভেবেছিল সু'চ ফোঁড়বার হাকিমের আসবার কথাই বুঝি বলছে। তা' তো নয়। এযে দেখি সত্যিকারের অতিথ।...সাধুবাবা! মঘইয়াদের বাড়িতে সাধুবাবার আসা এই প্রথম হলে কি হয়, ওরা যে কতকালকার জানা, কত-দিনকার চেনা। ওরাও যে পথচলার দলের লোক, মঘইয়াদেরই মত!......আজকাল ভাবলেও গায়ে আনন্দের শিহর লাগে!......

সঙ্গের লোকরা বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। সকলেরই কিছু না কিছু বলবার আছে এ সম্বন্ধে। সকলেই একসঙ্গে কথা বলছে, তাই বুঝতে একটু সময় লাগল। হাট থেকে ফিরছিল তারা। সাধুবাবা গিয়েছিল পাশের গ্রাম ডিহিপুরে আজ রাত্রে থাকবার জন্য। সে গ্রামে কলেরা; রোজ লোক মরছে। তার মধ্যে সাধুবাবাকে রাখে কি করে! কাছে পিঠের অন্য সব গাঁয়েও কলেরা। তাই তারা সাধুবাবাকে লবটুলিয়ায় এগিয়ে দিতে আসছিল। এরই মধ্যে তাদের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। দল পুরু হয়েছে লবটুলিয়ার কাছাকাছি এসে।··...

......অন্ধকারে সাধুবাবার মুখ দেখা যাচ্ছে না। সাধু সন্ন্যাসী, অতিথি হলে কি রকম ব্যবহার করতে হয় তাও জানা নেই। খাতির দেখাতে হয় দারোগা হাকিমকে। কিন্তু ঘরের অতিথি সন্ন্যাসী যে আপনার লোক!......জামা কাপড় কথাবার্তায় নাই বা মিল থাকল, আসল জায়গাতেই যে মিল। বুনোশুয়োর ভরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, কারায়েৎ সাপে ভরা আলের উপর দিয়ে, একেও যে হাঁটতে হয় দিনের পর দিন। আজ কোথায় আছে, কাল কোথায় থাকবে এরও যে ঠিক থাকে না। রোজ ভোরে নতুন জায়গায় ঘুম থেকে উঠে এও যে বুঝতে পারে না কোন দিক দিয়ে সূর্য উঠবে।......

"ও গুজরাতী, আলোটা জ্বাল আগে।"

আলো জ্বালায় এতক্ষণে সন্ন্যাসীর মুখ দেখা গেল। মাথায় জটা। লম্বা-চওড়া জোয়ান। পরনে লাল রঙের আলখাল্লা। আলখাল্লার রঙ দেখেই কেউ কেউ একে অঘোরীবাবা বলছে। হাতে সাপের মত আঁকাবাঁকা লাঠি; আর একহাতে কমণ্ডুল; পিঠে ঝোলা।

"দাঁড়িয়ে রইলি কেন সাধুবাবা। আয়। এই বিচালি কাটবার কাঠের কু'দোখানার উপর বস! হাত পা ধো! আমি জল ঢেলে দি—তুই পা ধো! খুব আরাম লাগছে নারে? সারাদিন চলবার পর পায়ে জল দিলে খুব আরাম লাগে, নারে? আর শীতকালে যদি পা ধোয়ার জন্য গরম জল পাওয়া যায়, তা হ'লে কেমন লাগে দেখেছিস কখনও?

দেখিসনি! সে আবার কি! এত ঘি-দুধ-খাওয়া-গেরস্তর বাড়ি যাস, তারা কোথাও গরম জল দেয়নি শীতকালে? গেরস্ত বাড়ির বাঁধা উনুনে জল গরম করতে সময় লাগে নাকি? যত ক্রোশ হেঁটেই আসিস না কেন, গরম জলে পা ধুলে সঙ্গে সঙ্গে শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে—ঠিক মদ খেলে যেমন হয়। কিন্তু সে শুধু শীতকালে। শীতকাল হলে আমিও গরম জল করে দিতাম।.........ও কি ছাই ধোয়া হচ্ছে! এইখানে......এইখানে......এই গোড়ালির কাছের কড়াটার উপর......রগড়ে......এই যেখানে জল ঢেলেছি......আরে ধেৎ!...” গুজরাতীর মা আর থাকতে পারল না, নিজে হাত না দিয়ে—“কি সাধুবাবাগিরি করিস। নিজের পাটা নিজে ধুতে শিখিসনি ভাল করে। এমনি......এমনি করে রগড়ে রগড়ে ধুতে হয়। তা নয় —সুড়সুড়ি দিচ্ছে যেন ফোড়ার উপর! ......কি ফেটেছে দেখতো তোর পা! তবু তো এখন শীতকাল না। এই তো সবে বর্ষার আরম্ভ। বর্ষাকালে তোর পাঁকুই হয়? হয় আবার না! কাকে বোঝাচ্ছিস। জল কাদায় হাঁটলে আবার পাঁকুই হয় না!......”

সন্ন্যাসীর গোড়ালির কড়াটার উপর পায়ের নিচের ফাটা খরখরে চামড়ার উপর হাত দিতে বেশ লাগছে গুজরাতীর মায়ের!......আবছা মনে পড়ে।......স্বপ্নের মত লাগে।......

যত মেয়ে পুরুষ এখানে দাঁড়িয়ে, কারও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না গুজরাতীর মায়ের আচরণ। সকলেই অনুভব করছে পথের পথিক সাধুবাবার সঙ্গে একাত্মতা। ......এ কি অতিথিকে খাতির করা? এ হচ্ছে মঘইয়াদের পূর্বপুরুষদের অতি সম্মান দেখানো, নিজেদের পূর্বজীবনের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া।

......এত স্বতঃস্ফূর্ত গুজরাতীর মায়ের আচরণ, এত সহজভাবে সে বলছে কথাগুলো যে কারও চোখে অস্বাভাবিক ঠেকছে না সেগুলো। বরঞ্চ তারা খুশী যে, অতিথি সেবার যেসব কাজ তাদের মাথায় খেলেনি, গুজরাতীর মায়ের সে সব ঠিক খেয়াল আছে, দেখে।......জানল কি করে এত সব গুজরাতীর মা!...... চিরকাল তারা দেখে এসেছে যে, সে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে বটে, সব সময় সব জিনিসে, কিন্তু তার বুদ্ধি খুব।......

সন্ন্যাসীও লোক চরিয়ে খান। এদের ক্ষুণ্ণ করতে চান না। যা মন চায় করুক। এর আগে কখনও মঘইয়াদের সংস্পর্শে আসেন নি—আজ এসেছেন বাধ্য হয়ে। এদের আদর আপ্যায়নের রীতিনীতি জানেন না। তবে এরা সাধুসন্ন্যাসীকে প্রণাম করে না দেখে, এদের ধাঁচ ধরনের একটা আন্দাজ করে নিয়েছেন। সন্ন্যাসী সুলভ গাম্ভীর্য যে এ পরিবেশে অর্থহীন, সে কথা বুঝতে তাঁর একটুও দেরী হয়নি।

“এই কাঠখানার উপর পা রাখ, সাধুবাবা। গুজরাতী তোর বাপের খড়ম-জোড়া আন্ না; এও কি বলে দিতে হবে। দেখিস্ সাধুবাবা, বাঁ পায়ের খড়মের বোলেটা নড়বড় করছে; সাবধানে হাঁটিবি। আয়।”

......সাধুবাবার সব কাজ গুজরাতীর মা নিজে করবে। পাড়ার মেয়েদের কাউকে কিছু করতে দেবে না।...... হাকিমের কাছ থেকে পাওয়া নিজের কম্বলখান মাচার উপর বিছাবার জন্য আনতেই, সন্ন্যাসী বাধা দিলেন—“না না আমার নিজের কম্বল আছে।” নিরসুর মা সবজান্তা ভাব দেখিয়ে বলে—“সাধুবাবারা কি কখনও অন্যর কম্বলে বসে!”

ঝুলি থেকে তিনি কম্বল বার করতেই তাঁর হাত থেকে সেখান ছিনিয়ে নেয় গুজরাতীর মা। মাচার উপর কম্বলখান বিছিয়ে দিতে দিতে বলে—“হাকিমের দেওয়া কম্বলে তোদের না বসাই ভাল।”

কথাটার সুর ধরতে না পেরে সন্ন্যাসী একটু অবাক হয়ে তাকালেন গুজরাতীর মায়ের দিকে।

“দাঁড়িয়ে রইলি কেন সাধুবাবা; মাচায় উঠে বস!” অতিথিকে সম্মান দেখানর একটা কথা এতক্ষণে মনে পড়েছে তালেবরের। কম্বলখানার উপর দুটো চাপড় মেরে সে বলে, “খাতিরের লোককে বসতে বলবার আগে কম্বলের ধুলো ঝেড়ে দিতে হয়, এটুকুও জানিস না গুজরাতীর মা?”

মেয়ে পুরুষ সকলের চোখ মুখেই ফুটে উঠল মৃদু ভর্ৎসনা—গুজরাতীর মাটা যেন কি! এটুকুও শেখেনি! খালি লম্বা লম্বা কথা!......

স্বামীর কথা তার কানেও গেল না বোধ হয়। গেলেও কোন জবাব দিত না।...... কি হবে কথা বলে; বুঝবে না ওরা। সাধুবাবা কি হাকিম দারোগা যে ওকে খাতির দেখাতে হবে, কম্বলের ধুলো ঝাড়বার মিছে চাপড় মেরে? ও হচ্ছে আপন জন; আপন জনের মত ওকে ভালবেসে আদর করতে হবে। সে সব কি এরা বোঝে!......

“তুই কি রকম অঘোরীবাবা রে? বাঘের ছাল নেই কেন? আমরা তো আগে জন্তুজানোয়ারের চামড়া পেতে শুতাম; শীতকালে তাঁবুর উপর দিয়ে দিতাম। সেই ছেঁড়া তাঁবুর উপরই তো তোর কম্বলখানা পাতা হ'ল এখন।”

সন্ন্যাসী একটু লজ্জিত হলেন।

“আমার জপতপের জন্য জানোয়ারের চামড়ার আসন দরকার হয় না। কম্বল দিয়েই কাজ চালিয়ে নিই।” সন্ন্যাসীর কথায় লাড্ডু মঘইয়ার মনে পড়ে জপতপের কথা।

“গুজরাতীর মা এত তো কথা বলছিস সাধুবাবার জপতপের কথাটা ভেবেছিস?”

বিজয়ীর দৃষ্টি লাড্ডুর। সকলের চেয়ে আগে তারই এ কথাটা মনে পড়েছে। অতিথি সৎকারে সে শুধু দর্শকমাত্র নয়, অন্য দশজনের মত। সাধুবাবা তালেবরের বাড়িতে এসে উঠলে কি হয়, সে গ্রাম-সুদ্ধ লোকের অতিথি।.........

তাই তো! এ এক নতুন সমস্যা! পূজোর ব্যবস্থা জিনিসটা কি রকম তা কারও জানা নেই।

সন্ন্যাসী মোটে গোঁড়া নন্। সব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।

বললেন—“জপতপের কোন ব্যবস্থার দরকার নেই। শেষ রাত্রে উঠে আমি জপে বসি। সেই সময়টাই ভাল সবচেয়ে—হৈ চৈ লোকজন একেবারে থাকে না।”

সকলের দুশ্চিন্তা কাটল। বয়স্থ বয়স্থারা একটু আড়ালে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কি সব যেন বলাবলি করে এল। বিনা চেঁচামেচিতে ঠিক হয়ে গেল, তালেবরের ঘরখানা আজ রাত্রের মত সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে সাধুবাবাকে। লোকজন থাকলে জপের ব্যাঘাত হয়। তাই তালেবররা আজ অন্য জায়গায় শোবে।

গ্রামের লোকরা বসেছে মাটিতে; সাধুবাবা মাচার উপরে। লবটুলিয়ার প্রত্যেকে একে একে পেঁৗছে গিয়েছে এখানে। যে সুঁচ-ফুঁড়বার হাকিমটার ভয়ে আজ সকলে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল তার কথা একবারও কেউ জিজ্ঞাসা করেনি কাউকে। মনে পড়েনি সে কথা এই নতুন অতিথিকে নিজেদের মধ্যে পাবার উদ্দীপনায়। সাধুবাবা ভারী সুন্দর গল্প করতে পারেন। তিনি কত নতুন নতুন খবর দিচ্ছেন পথের ধারের চেনা জায়গাগুলোর। সে সব জায়গা লবটুলিয়ার লোকে বেশ ভালভাবে জানে। তারা কত রকমের প্রশ্ন করছে। কামালপুর হাটের ইঁদারার পাড় এতদিনে বাঁধিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়? জালালগড়ের বেনেরা যে জন্তুজানোয়ারদের জল খাওয়ার জন্য চৌবাচ্চা করে দিয়েছিল, সেটা কি পরিষ্কার রাখে, না সেই আগেকার মতই ময়লা? নরকটিয়া নদীর উপর পুলটা তয়ের হয়ে গিয়েছে? সেইখানে একটা তালগাছের উপর অশথ গাছ আছে না? এই কুকুরটার মাটাকে

সেই গাছতলায় পোঁতা হয়েছিল। সেই সব পুরনো জীবনের কথা তাদের সম্মুখে এনে তুলে ধরছেন সাধুবাবা।...কি মিষ্টি যে লাগে, সেই সব পিছনে ফেলে আসা স্বর্গের কথা শুনতে!......আর কোন দিন তারা সে সব দেখতে পাবে না নিজের চোখে।......খুব ভাল লাগছে সাধুবাবার গল্প। এ গল্প যেন তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে না যায়!...একটা কথাও যেন কান এড়িয়ে না যায়! সবাই মাচার দিকে আরও ঘেঁষে বসে। সবাই—এক শুধু গুজরাতীর মা বাদে।

সে উঠনে রাঁধছে! সাধুবাবার গল্প একটু-আধটু তার কানে যে না যাচ্ছে তা নয়। কিন্তু নাই বা শোনা গেল সব কথা। তার মন ভরে উঠেছে; পুরনো জীবনটাই তার প্রাণের কাছে এসে গিয়েছে আজ, সাধুবাবার মধ্যে দিয়ে। যে জীবন সে প্রতি মুহূর্তে ফিরে পেতে চেয়েছে গত পাঁচ বছর ধরে, সেই জীবনেরই প্রতীক সাধুবাবা। নিজে থেকে এসে ধরা দিয়েছে সে জীবন, অপ্রত্যাশিতভাবে। সাধুবাবার ধুলোভরা কম্বলের গন্ধ, ফাটা পায়ের কর্কশ স্পর্শ, সাড়া জাগিয়েছে তার গভীরতম অন্তরে—ফিরিয়ে এনে দিয়েছে তার হারিয়ে যাওয়া জগতের স্বাদ। মনের সমস্ত একাগ্রতা ঢেলে দিয়ে সে রাঁধতে বসেছে, তার সাধুবাবার জন্য। নিজে রেঁধে খাওয়াবে তাকে, একথা ভাবতেই মন আনন্দে ভরে ওঠে।...খুব খিদে পেয়েছে বোধ হয় সাধুবাবার! সারাদিন বোধ হয় কিছু খায়নি! মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে!......

সে উনুনের আঁচ ঠেলে দেয়।

সাধুবাবাও গল্পর ফাঁকে ফাঁকে মাচার উপর থেকে উঠনের দিকে তাকাচ্ছেন। লক্ষ্য করছেন স্ত্রীলোকটির তন্ময়তা। মুখের একদিকে আলো পড়েছে—কালো পাথরে খোদাইকরা মূর্তির মত লাগছে মুখখানাকে এত দূর থেকে। এই রকমই তন্ময়তা নিয়ে স্ত্রীলোকটি তাঁর পা ধুইয়ে দিয়েছিল।......পথের গল্প ওকে শোনাতে পারলে আরও ভাল লাগত।...... একবার মেয়েটিও এদিকে মুখ ফেরাল—চোখাচোখি হল তাঁর সঙ্গে......স্পষ্ট দেখা যায় না—তবু মনে হল মেয়েটি মুচকে হেসে বলতে চাইল—এই যে আমার রান্না হয়ে এল; খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?

সে রাত্রে পাড়ার লোকে চেয়েছিল অনেক রাত্রি পর্যন্ত সাধুবাবার সঙ্গে গল্প করতে। কিন্তু গুজরাতীর মা তাড়া দিয়ে উঠেছিল। —"ও মানুষ সারারাত জেগে তোদের সঙ্গে গল্প করবে নাকি? সারাদিন পথ চলবার পর সারারাত জাগতে কেমন লাগে তা তোরা জানিস না? ভুলে গিয়েছিস নাকি এরই মধ্যে? আবার শেষ রাত্রে উঠে ওর জপতপ আছে। তারপর ভোরবেলায় তো চলেই যাবে। ওকে ঘুমতে দে এখন! যা! ভাগ! ঘর খালি করে দে!—তুই শুয়ে পড় সাধুবাবা; আমি আলোটা নিভিয়ে দিই।..."

তখন রাত কত ঠিক জানা নেই। সন্ন্যাসীর ঘুম ভাঙল। চমকে উঠেছেন। কে! বাড়ির বিড়ালটা নয়তো?......এতক্ষণে বুঝলেন ব্যাপারটা। ঘুমের ঘোরে একটু দেরী লেগেছে বুঝতে। কে একজন তার পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। প্রতিবার হাত নাড়বার সময় একটা খুট খুট শব্দ কানে আসছে। বোধ হয় গালার চুড়ির আওয়াজ! রাতের নিস্তব্ধতায় শব্দটা খুব জোরে জোরে হচ্ছে, মনে হয়।... গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। তবে কি......? আঙুলের পরশের সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস মাঝে মাঝে তাঁর পায়ে লাগছে। চুড়ি কিংবা কাঁকন না হয়ে যায় না। ....অন্য সাধুসন্ন্যাসীর মুখে উত্তরাখণ্ডের কোন কোন স্থানের সাধুসেবার অদ্ভুত রীতির গল্প কখন কখন শুনেছেন।...... এদের মধ্যে সে রকম কোন রীতি নেইতো সাধুসেবার?...... না না—তা' কেন হতে যাবে!...... কি জানি কেন, তাঁর মনে কোন সংশয় নেই যে এ গুজরাতীর মা। পা ধোয়াবার সময় তার চুড়িও এমনি করে গায়ে ঠেকছিল। সেইজনাই গালার চুড়ির কথাটা তাঁর সবচেয়ে আগে মনে এসেছে।...... পায়ের আঙুলের ফাঁকগুলোর মধ্যে বেশ করে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছে।...... সব চেয়ে ভয়ের কথা যদি স্ত্রীলোকটি বাড়ির লোকের অজানতে এসে থাকে। সেইটাই বেশী সম্ভব। প্রথম থেকেই স্ত্রীলোকটির হাবভাব ও আচরণ ঠিক অন্য মেয়েদের মত ছিল না।...... কিন্তু এতদূর তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। মঘইয়াদের সুনীতি দুর্নীতি সম্বন্ধে মূল্যবোধ, অন্যদের সঙ্গে মেলে না, এ খবরও তাঁর জানা।...... কি কুক্ষণেই যে এদের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন!... এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে হয় এখান থেকে!...... সত্যিকারের সাধক ভক্ত লোক নন তিনি। ঘুরে বেড়াতে তাঁর ভাল লাগে; দু মুঠো অন্ন আর মাথা গুঁজবার জায়গা জুটে যায়; আগের জীবনে একটা ছোট-খাটো গোলমালেও পড়েছিলেন; এই সব নানা কারণ মিলিয়ে তাঁর সন্ন্যাসী হওয়া।... সন্ন্যাসীর কঠোর জীবনে তিনি এত বড় বিপদে, এর আগে কখনও পড়েন নি। সন্ন্যাসীর বেশ থাকলে কি হয়—দুর্বল মানুষ তিনি, প্রাণের ভয় তাঁর প্রচুর।...... তাঁর নিজের গ্রামেই মঘইয়া চোররা একবার একটা মেয়ের হাত থেকে চুড়ি খুলতে না পেরে, তার হাত শুদ্ধ কেটে নিয়েছিল—বিনা দ্বিধায়!... এত হিংস্র জাত এরা!...... তাঁর বুকের স্পন্দনের শব্দ, চুড়ির শব্দকেও ছাপিয়ে উঠেছে।...... সারা গা ঘামে ভিজে উঠল।... স্ত্রীলোকটি অতি সন্তর্পণে মাচা থেকে নামল। সন্ন্যাসী চোখের পাতা খুলে দেখতে চেষ্টা করলেন সেদিকে। কিছু দেখা গেল না অন্ধকারে। শব্দ থেকে অনুমান করা যায় যে, মেয়েটি বেড়ার গা হাতড়াচ্ছে। আবার এসে বসল। পাখা করছে; তাহলে পাখা আনতে গিয়েছিল। গালার চুড়ির আওয়াজের সঙ্গে মিলেছে পাখা চালানর একটা মৃদু শব্দ। চোখ খুলে রাখলে হয়ত অন্ধকারে অভ্যস্থ হয়ে কিছু দেখতে পেতেন। কিন্তু ভয় হয়, যদি স্ত্রীলোকটা বুঝে ফেলে যে তিনি জেগে আছেন। কেন যেন তিনি অনুভব করছেন যে মেয়েটা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে ঠকানর জন্য, জেগে জেগে নাক ডাকালে কেমন হয়?...... হঠাৎ সরষের তেলের গন্ধ নাকে এল। মনে হল স্ত্রীলোকটি হাতের আঙুল তাঁর নাকের সম্মুখে রেখে কি যেন দেখছে। বোধ হয় তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে বুঝবার চেষ্টা করছে যে, তিনি জেগে আছেন কিনা। মঘইয়া মেয়ে পুরুষে এসব জিনিস ছোট-বেলা থেকে শেখে। মেয়েটা ঠিক বুঝে গিয়েছে যে তিনি জেগে। বুঝুক গে! এখন মটকা মেরে পড়ে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।...... কলেরার হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাঁর লবটুলিয়ায় আসা; কিন্তু এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া বুঝি কপালে নেই! পুরুষেরা জানতে পারলে বোধ হয় এই মুহূর্তে তাঁকে কেটে টুকরো টুকরো করে পুঁতে ফেলবে। ভয়ে গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। ভাবনা চিন্তাগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে—কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় না। এখানে আসাই ভুল হয়েছে! এরই নাম নিয়তি! ইষ্টগুরুর নাম স্মরণ করতেও একাগ্রতা আনতে পারছেন না; পারলে বোধ হয় মনে বল পেতেন।.........স্ত্রীলোকটি আর পায়ে তেল মালিশ করছে না। শুধু আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আঙুলের পরশ পায়ের পাতায়—পায়ের তলায়—ফাটা গোড়ালিতে—ফাটা খরখরে জায়গাটুকুর উপর আঙুলের ডগাগুলো একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে যেন খেলা করছে—সুড়সুড়ি দেবার মত—শুধু ওই জায়গাটুকুর উপর।—আনমনা হয়ে যায়নি তো? কিংবা হয়ত ঐ কর্কশ স্পর্শের অনুভূতিটুক উপভোগ করছে।—মেয়েটির গরম নিঃশ্বাস পায়ের উপর এসে লাগছে—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ফোঁপানির মত একটা শব্দ—বোধ হয় কাঁদছে।......

......ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা মিছে। প্রাণ বজায় রাখতে গেলে, আর এক মুহূর্তও

এখানে দেরী করা উচিত নয়।... একবার পাশ ফিরে আড়মোড়া ভেঙে তিনি একটু সময় দিলেন স্ত্রীলোকটিকে। মেয়েটি নড়ল না। পায়ের দিকে বসে রয়েছে। কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।... তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তাঁর লাঠি, কম্বল, ঝোলা নিয়ে তিনি বার হলেন ঘরের ঝাঁপ ঠেলে।...... যাক্ রক্ষা! বাইরে কাছাকাছি কেউ ওত পেতে নেই! গুরুদেব বাঁচিয়েছেন!... বাইরের খোলা বাতাসে এসে এতক্ষণকার মানসিক উত্তেজনা একটু কমেছে। তেল দিয়ে ঘষা গরম পায়ের তলায় ঠাণ্ডা শিশির ভেজা ঘাস—বেশ যেন একটু অন্যরকম অন্য রকম লাগে! আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন যে রাত্রি শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই। সন্ন্যাসী পা চালিয়ে চলতে আরম্ভ করেন।

বেশ কিছু দূরে এসেছেন। হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দে বুক কেঁপে উঠল।...... ছুটতে ছুটতে আসছে একজন।......কে?

চাপা গলায় জবাব এল—"আমি গুজরাতীর মা। জঙ্গলের পথ দিয়ে এলাম।" সন্ন্যাসী ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন।

"কেন?"

"আমি তোর সঙ্গে যাব।"

"আমার সঙ্গে!"

"হ্যাঁ"।

"পাগল নাকি তুই।"

"না, আমায় সাথে নিয়ে চল। অনেকক্ষণ ধরে তোর ঘুম থেকে উঠবার প্রতীক্ষা করছিলাম। আমার ভয় যে পাছে, উঠেই জপে বসিস। পুজো করতে করতে সকাল হয়ে গেলে, আমার আর যাওয়া হয় না। ঘুম থেকে উঠে তুই জপে বসলি না দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।...... আ মর! দ্যাখ্ কাণ্ড কুকুরটার। তুই আবার এলি কেন? ছিলি না তো ওখানে? যা! ভাগ!...... বুঝলি সাধুবাবা, আজ পুরনো ঘাগরা আর চোলিটা পরে এসেছি কিনা, তারই গন্ধে গন্ধে এসেছে। মনে আছে ওর সব। ভাবছে যে আগেকার ঘুরে বেড়ানর জীবন ওর আবার আরম্ভ হল বুঝি।"

এতক্ষণে সন্ন্যাসী ঠাহর করে দেখলেন যে গুজরাতীর মা শাড়ী ছেড়ে ঘাগরা পরেছে, মঘইয়া মেয়েদের মত। হাতে একটা পুঁটলি।

"বাড়ি যা"

"ঘর ছেড়ে এলাম, আবার যাব কেন?"

ঘাগরা পরে বাড়ির বার হতেই গুজরাতীর মা, তার অনেককাল আগেকার মন ফিরে পেয়েছে। মনের ভার কেটে গিয়েছে। নিজেকে খুব হাল্কা হাল্কা লাগছে। ছুটে যেতে পারে সে এখান থেকে ওখানে, দশ পনর বছর আগে যেমন পারত; একটা বেটা ছেলেকে চিমটি কেটে পালাতে পারে; ইঁদারার পাড়ের উপর উঠে এক পায়ে হাঁটতে পারে; নিজেদের দুষ্টু ভেড়াটার সঙ্গে কুস্তি লড়তে পারে; জন্তু জানোয়ারের ডাক ডেকে অন্যমনস্ক পথচারীকে হঠাৎ ভয় পাইয়ে দিতে পারে, তারপর হেসে মাটিতে লুটোপুটি খেতে পারে। এতদিন হাকিমের দেওয়া শাড়ী তার দেহ মনকে একেবারে আড়ষ্ট করে রেখেছিল। আজ পথের হাওয়া লেগেছে তাতে। পায়ের নীচের মাটিটা আজ অন্যরকম হয়ে গিয়েছে হঠাৎ। এর সঙ্গে কতকালের আত্মীয়তার সম্বন্ধ! আল দিয়ে ঘেরা ক্ষেতের মাটি, বেড়া দিয়ে ঘেরা উঠনের মাটি নিজের জিনিস হলেও আপন হয় না কোনদিন! সে সব জমি নিজের পাঁকের মধ্যে লোককে টানে। সেই মন ছোট করা ক্ষেতের আলগুলো, এখন হঠাৎ আবার পায়ে চলবার পথ হয়ে গিয়েছে। একটা সরু আলের উপর দিয়ে তারা চলেছে। সাপের ভয়ে লাঠি ঠক ঠক করতে করতে সন্ন্যাসী চলেছেন আস্তে আস্তে—নইলে অন্ধকারে পা পিছলে পড়ে যাবার ভয় আছে। এত আস্তে চলবার ধৈর্য আজ নেই গুজরাতীর মায়ের। হাওয়া বাতাসের এমন গন্ধ সে অনেককাল পায়নি। ক্ষেতে নেমে, সন্ন্যাসীকে পাশ কাটিয়ে, সে আবার গিয়ে উঠল আলের উপর। সাপখোপের ভয় নেই। স্বামী-পুত্র চেনা লোকজনের জন্য চোখের জল পড়েছে বটে, কিন্তু মনে একটুও দ্বিধা নেই। ......যারা লাঙল দিয়ে মাটির বুক ফাঁড়ে, তারা বুঝবে না......... পায়ের নীচের সব-মাটি পথ হয়ে-যাওয়ার আনন্দের সে যে কি স্বাদ, তা জানে শুধু এই সাধুবাবা!...

এতক্ষণে তারা আল থেকে নেমে গ্রামের বাইরের খোলা মাঠে পড়ল। এইখানে সন্ন্যাসী দাঁড়ালেন। কি করা উচিত এ ক্ষেত্রে, এই খেয়ালী মেয়েটির সঙ্গে কিভাবে কথা বলা উচিত, সে কথা এতক্ষণ ভেবে ঠিক করে নিয়েছেন তিনি।

"দাঁড়া এখানে! আমার কথা শোন। তুই বাড়ি ফিরে যা! পাগলামি করিস না।"

"পাগলামি, কি বলছিস সাধুবাবা!"

"পাগলামি বলব না ত কি? নিজের ঘর-দুয়োর ছেড়ে এমনি করে চলে যায় নাকি লোকে?"

"ও আমার কপাল! আমি ভাবছি যে তুই বুঝি আমার দুঃখের কথা বুঝেছিস! কি রকম সাধুবাবা তুই? ওই ঘর-দুয়োরের ভয়েই যে আমি চলে যেতে চাই।"

রাগে দুঃখে তার গলার স্বর ভারি হয়ে উঠেছে।

"তোর মনের দুঃখের কথা আমি কি করে জানব। বলে বুঝিয়ে দিবি, তবে তো বুঝব।"

গুজরাতীর মা কাঁদতে কাঁদতে বলে—

"তুইও যদি আমার ব্যথা না বুঝিস তবে কে বুঝবে।...এক ইঁদারার জল আমি আর রোজ রোজ খেতে পারছি না। একই অশথ গাছের উপর দিয়ে রোজ সূর্য উঠতে আর আমি দেখতে পারি না।...নতুন জায়গায় প্রত্যহ শোবার আগে অবাক হতে চাই, প্রত্যহ ঘুম ভেঙে

অবাক হতে চাই।...মাটির হাঁড়ি দেখলে আমার গায়ে জ্বলুনি ধরে......এক উনুনে রোজ রাঁধতে আমার কান্না পায়।...রাতে ঘুম ভেঙে বকের বাসায়-ভরা অশথ গাছের গন্ধ আমি কতকাল পাইনি।... এখানে কাল-কি-হবে বড্ডো জানা।...এ আমি সহ্য করতে পারছি না সাধুবাবা।... বাবরী চুল কেটে ফেলেছে এরা সকলে।"... অসংলগ্ন কথাগুলো। মানে ঠিক বোঝা যায় না। মনগড়া একটা মানে করে নিয়ে সন্ন্যাসী তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

"তোর ছেলে রয়েছে, স্বামী রয়েছে।..."

"সে কি তুই বলে বোঝাবি? তাদের কথা মনে করেইতো কলজের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। সারারাত চোখে জল এসেছে তাদের জন্য। গুজরাতীটা দেখতে চেয়েছিল, এই ঘাগরাটা পরে আমায় কেমন দেখায়। আমি যেখানেই থাকি, সে কথা কি কোন দিনও ভুলতে পারব! কিন্তু কি করি। এখানে যে দম বন্ধ হয়ে আসে!"

"আমি সন্ন্যাসী মানুষ; তোকে নিয়ে যাব কি করে?"

"কেন? তাতে কি হয়েছে? আমার ঘাগরা আর চোলির রঙ তোর আলখাল্লাটার মত নয় ব'লে, ভাবছিস? সে আমি ঠিক মিলিয়ে রং করে নেব।"

"না না সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে মেয়েমানুষ রাখতে নেই।"

"এ তুই কি বলছিস সাধুবাবা! কত মিয়া-বিবি সাধু দেখেছি।"

"না না। সে হয় না।"

"তুইও বলিস—সে হয় না? গুজরাতীর বাপও বলে—সে হয় না। সবাই বলে—সে হয় না! সে হয় না, ছাড়া কি আর কোন কথা নেই পৃথিবীতে? একা যেতে কি আমি ভয় পাই? তা নয়। একা পথ-চলা যে রাজা হরিশচন্দ্রের বারণ। তাই জন্যই না তোর এত খোশামোদ করছি সাধুবাবা!"

"সে হয় না রে, হয় না।"

"কোন উপায় নেই?"

"না।"

"তা হ'লে আমি কি করি?"

এ প্রশ্ন সাধুবাবাকে নয়, নিজেকে। গভীর হতাশায় ভরা। অন্তর নিংড়ে বেরিয়ে এসেছে কথাগুলো। আবার কি তাহলে তাকে, এতটুকু আকাশের নীচে, চোখ-পচানো অশথ গাছটার সম্মুখে বসে গোবর-সোনা হাকিমের বক্তৃতা শুনতে হবে? মরবার দিন পর্যন্ত ঢিবি করে ছাগলের নাদি পচাতে হবে?...

সে সন্ন্যাসীর পায়ের উপর মাথা কোটে। "অঘোরীবাবা ব'লে কি এতটুকুও মায়া-দয়া থাকতে নেই! না, করিস না সাধুবাবা! তোর কোন অসুবিধা আমি করব না। নিয়ে চল আমাকে এখান থেকে!"

...কি কাতর মিনতি! এমন অন্তর দিয়ে নিজের আত্মার মুক্তি বুঝি কোন সাধু-সন্ন্যাসীও কোন দিন চান নি! এ অনুরোধ রাখতে না পারার জন্য মনে অস্বস্তি লাগে সন্ন্যাসীর। কিন্তু সে সাহস নেই!...

কুকুরটা গ-র-র-র করে একটা অপছন্দ ও বিরক্তির আওয়াজ বার করল গলা থেকে। সন্ন্যাসী জোর করে পা ছাড়িয়ে নিলেন। তিনি আর দেরি করতে পারেন না; শুক-তারা দেখা যাচ্ছে পূব-আকাশে।...গাঁয়ের কে না কে আবার কোথা থেকে দেখে ফেলে হইচই বাধাবে!...

"চলে যাচ্ছিস সাধুবাবা? আচ্ছা আর এক দণ্ড দাঁড়া! ঘরে থাকলেও তো এত-ক্ষণ জপই করতিস। পথ চলবার তো সারাদিন সময় পাবি। তোর সড়ক কি আমি কেড়ে নিতে যাচ্ছি? একটুখানি না হয় আমার অনুরোধে দাঁড়ালি!"

"না না, ভোর হয়ে এল যে।"

তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

গুজরাতীর মা এগিয়ে এল সন্ন্যাসীর কাছে।—"একটু সবুর কর। এইটা নিয়ে যা।"

"কি আছে পুঁটলিতে?"

"একটা ধুনুচি। আর এক সাধুবাবার দেওয়া। ওটা কাছে থাকলে পথচলবার সময় মঙ্গল হয়; বাঁধা ঘরে মন টেকে না। এতে করে ধুনো গলিয়ে, পাঁকুই হলে পর দিস—একদিনে সেরে যাবে। এটা আমার আর কোন কাজে লাগবে না। তুই রাখিস কাছে।"

চলে যাবার সময় সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকটিকে ক্ষুন্ন করতে চান না। তিনি পুঁটলিটাকে নিজের ঝোলার মধ্যে ভরে নিয়ে পথের দিকে পা বাড়ালেন।

এখনও সাধুবাবা দূরে চলে যায়নি। মিষ্টি খাওয়ার পরও কিছুক্ষণ তার স্বাদ লেগে থাকে মুখে। কিছুক্ষণের জন্য, যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল, তার রেশ এখনও মুছে যায়নি মন থেকে একেবারে। সম্পূর্ণ মিলিয়ে-যাওয়া পর্যন্ত সময়টুকু সে নিজের মত করে, নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে চায়।...বহুকাল শিয়ালের ডাক ডাকা হয়নি, সেই যবে থেকে 'রাতের-রোজগার' বন্ধ হয়েছে মঘইয়াদের। আজকের পাওয়া পথ-চলার জীবনের ক্ষণিক স্বাদ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার আগে, তার ইচ্ছা হল একবার আগে-কার মত করে শিয়ালের ডাক ডাকতে। ঘাগরাটা আবার মাটির হাঁড়িতে তুলে রাখবার আগে, বড় আকাশের নীচে, এই ডাকের মধ্যে দিয়ে, সে পথচলার জীবনের শেষ অন্তরঙ্গ পরশ চায়।

ঘাগরাপরা মেয়েটির একদিকে, মাঠের মধ্যে দিয়ে পায়েচলার পথের অস্পষ্ট সাদাটে আঁকাবাঁকা রেখা; আর একদিকে আলদেওয়া ক্ষেত, নিস্তব্ধ গ্রাম। আকাশবাতাস কাঁপিয়ে শিয়ালের ডাকের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তরে।

বাণ্টার কান লেজ খাড়া হয়ে উঠল। সন্ন্যাসী থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকালেন। দেখে গুজরাতীর মায়ের মনে নতুন আশার ঝলক লাগে।

নানা দিক থেকে শিয়ালের ডাক শোনা গেল। বনের শিয়ালের ডাক। তারা ভুল করেছে। ঠকেছে।

এর পর শোনা গেল গ্রামের দিক থেকে শিয়ালের ডাক। লবটুলিয়ার লোকে ভুল করেনি। তারা সাড়া দিচ্ছে গুজরাতীর মায়ের ডাকের। নকল শিয়ালের ডাকের মধ্যে দিয়ে তারা জানাচ্ছে আসছি, আসছি, এই এলাম। তারপর গাঁয়ের দিক থেকে হইচই শোনা গেল।

সন্ন্যাসী বোধহয় ভাবলেন যে, তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্য স্ত্রীলোকটি গ্রামের লোক-ডাকল। তিনি প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করেন। গুজরাতীর মা আবার মুষড়ে পড়ে।

...না ফিরে এল না সাধুবাবা! পথচলার যুগে শিয়ালের ডাকে কাজ হয়েছিল, লাল টকটকে সাহেবের কাছে। কিন্তু নেংটিপরা সাধুবাবার আজ মন গলল না সে ডাকে! পথচলার যুগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালের ডাকের ধকও ফুরিয়ে গিয়েছে!... ভয় পেয়েছে সাধুবাবা।...আরে ছুটিস কেন? একেবারে ছোট্ট ছেলের মত! কিছু বোঝে না...আরে ওরা কি তোকে ধরতে আসছে? ওরা আসছে সাধুবাবার দর্শন করতে বিদায়ের আগে। বোকা কোথাকার! ...মায়া লাগে।...

পশ্চিমের দিগ্বলয়-ছোঁয়া মাঠের আঁকা-বকা পথে, সাধুবাবার আকৃতি ক্রমে ছোট হয়ে আসছে।...দূরে চলে যাচ্ছে।...অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল।

আল-দেওয়া-ক্ষেতে-ভরা গ্রামের দিককার মানুষগুলো কাছে এগিয়ে আসছে।...ক্রমে বড় হয়ে উঠছে।...কথা শোনা যাচ্ছে।...এই এসে পড়ল ব'লে!...

...যাক, সাধুবাবার শেষ দর্শন সে একাই পেয়েছে—লবটুলিয়ার অন্য কোন লোক না!...

এক রাত্রির আবেশ হঠাৎ কেটে গেল। একটা ঝাঁকানি খেয়ে মন ফিরে এল বেড়া-দিয়ে-ঘেরা উঠনের, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতায়। খেয়াল হল পরনের ঘাগরাটির কথা।...এর কি জবাব দেবে স্বামীপুত্রের কাছে? বলবে—'কাল যে বাপবেটায় দেখতে চেয়েছিলি ঘাগরা পরলে আমায় কেমন লাগে, তাই রাত থাকতে পরেছিলাম তোদের অবাক করে দেবার জন্য'।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা আর শুধু বণিক রইলো না, তারা দেশের শাসকও হ'লো। এর ফলে ভারতের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটল। এতদিন বণিক হিসেবে তারা পণ্যদ্রব্যের সন্ধান রেখেছে, দেশের মানুষের খোঁজ করেনি। একে তো খোঁজ করবার দরকার ছিল না; তার উপর একটা বাধাও ছিল। ভাষার বাধা। তখন সরকারী কাজকর্মের ভাষা ছিল ফার্সী, বিদেশী বণিকদেরও সেই ভাষা ব্যবহার করতে হতো। কিন্তু ফার্সী জনসাধারণের ভাষা ছিল না। সুতরাং দেশের লোক এবং তাদের সংস্কৃতির পরিচয় লাভের সুযোগ হয়নি।

ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে ইংরেজ তরুণরা কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে অর্থের লোভে ভারতে আসত। তারা লেখাপড়া জানত কম, স্বদেশে ভবিষ্যৎ ছিল না। ভাষার বাধা অতিক্রম করে নতুন দেশের সংস্কৃতির পরিচয় গ্রহণ করবার মতো যোগ্যতার অভাব ছিল তাদের মধ্যে। দেশ শাসনের দায়িত্ব লাভের পর শিক্ষা-দীক্ষায় যোগ্যতর লোকের প্রয়োজন হলো। একে একে শিক্ষিত ও প্রতিভাবান ইংরেজরা ভারতে আসতে আরম্ভ করলেন। নতুন দেশকে জানবার কৌতূহল তো তাঁদের ছিলই, তার উপর সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার জন্যও শাসিতের সঙ্গে পরিচয়টা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াল। মুষ্টিমেয় ইংরেজ এত বড় দেশ কৌশলের সঙ্গে অধিকার করেছে। কৌশল প্রয়োগের জন্য প্রতিপক্ষের রীতি-নীতি জানা দরকার।

ইংরেজ পণ্ডিতরা প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা শুরু করেছিলেন। ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে। এটা স্বাভাবিক ছিল। কারণ মুসলমান রাজত্বের প্রভাব তখনো দূর হয়নি। কিন্তু শীগ্‌গীরই শাসক সম্প্রদায় বুঝতে পারল ফার্সী ভাষা

স্যার চার্লস উইলকিন্স
১৭৪৯(আঃ)—১৮৩৬

ও মুসলমান আমলের ঐতিহ্য সত্যিকার ভারতকে জানতে সাহায্য করবে না। সংস্কৃত ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিখতে হবে।

ভারতীয় বিদ্যার চর্চা

১৭৭৬ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলে নিয়মিতভাবে ভারতীয় বিদ্যা চর্চার সূচনা হয়। হেস্টিংস স্থির করলেন যে ভারত শাসনের জন্য বৃটিশ আইন প্রয়োগ করা হবে না: ভারতীয়েরা তাদের প্রাচীন আইন অনুসারেই শাসিত হবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবার জন্য আইনের সংস্কৃত পুঁথিগুলির অনুবাদ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ইংরেজ বিচারকরা সংস্কৃত শেখেননি, জানতেন ফার্সী, সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা প্রথম সংস্কৃত পুঁথির ফার্সী অনুবাদ করলেন। ইংরেজীতে অনুবাদ করবার ক্ষমতা পণ্ডিতদের তখনো হয়নি। এমনি করেই এদেশে সংস্কৃত চর্চার শুরু হয়।

আইনের অনুবাদ থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কোম্পানীর কর্মচারী চার্লস উইলকিন্স নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত শিখে গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সুপারিশে কোম্পানী ১৭৮৫ সালে এই অনুবাদ প্রকাশ করলেন। ১৫৬ পৃষ্ঠার অনুবাদ পুস্তকটি বিদেশীদের নিকট এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের পরিচয় বহন করে আনল। এর এক বছর পূর্বে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন। 'শকুন্তলার' ইংরেজী অনুবাদ জোন্সের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে সংস্কৃতের ভাণ্ডারে শুধু ধর্মগ্রন্থ নেই, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যও আছে। সরকারী কাজ চালাবার জন্য প্রয়োজন হলো আধুনিক ভারতীয় ভাষা চর্চা করবার। খৃষ্টান পাদ্রীদের ধর্ম প্রচারের উপযোগী মাধ্যমও হলো চলিত ভাষা। নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁরা বিভিন্ন ভাষা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারতের ইতিহাস, ভাষা ও ধর্ম ইত্যাদি শিক্ষা দেবার জন্য দুটি কলেজ স্থাপিত হলো। একটি হেইলবারিতে, আরএকটি কলকাতার ফোর্ট উলিয়াম কলেজ। এর ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা নিয়মিত হলো এবং বিস্তৃতি লাভ করল।

পুঁথিপত্র সংগ্রহ

ওয়ারেন হেস্টিংসের ঘোষণার পর থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মধ্যে ভারতীয় বিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হলো। এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইংরেজদের মনে জাগল আবিষ্কারের কৌতূহল। পুঁথি, ছবি, ভাস্কর্য ইত্যাদি ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি ইংরেজ কর্মচারীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করতে লাগল। আমরা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না। বিনামূল্যে বিদেশীদের হাতে দুর্লভ নিদর্শনগুলি তুলে দিয়েছি। বিদ্যোৎসাহী ইংরেজরা
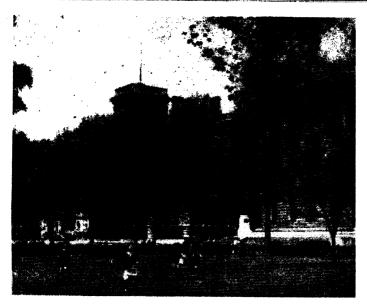
(ভূতপূর্ব) ইণ্ডিয়া আপিস ভবন। এখন কমনওয়েলথ রিলেশানস্ আপিস। বর্তমানে লাইব্রেরি এ বাড়িতে আছে

কর্মচারীরা সংগৃহীত পুঁথিপত্র এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষণের জন্য দিয়েছেন। যারা নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পুঁথি, ছবি, মূর্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করত, তারা এগুলো দেশে নিয়ে মূর্তি দিয়ে বাগান সাজাত এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কিউরিয়ো হিসেবে উপহার দিত বন্ধু-বান্ধবদের। প্রত্যেক জাহাজে অসংখ্য নিদর্শন ইংল্যাণ্ডে চলে যেত, তারপর সেগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ত যে সন্ধান রাখা সম্ভব হতো না। সাধারণ ইংরেজ পরিবারে এদের মূল্য ছিল না। কিছুদিন পরে জঞ্জাল মনে করে ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনগুলি ফেলে দেওয়া হতো। বাংলা দেশ থেকে সংগৃহীত একটি সচিত্র সংস্কৃত পুঁথির নমুনা এখানে দেওয়া হলো। 'ওরিয়েণ্টাল মিসেলেনি (১৭৯৮)' থেকে জানা যায় ১৭৯৩ সালে লেডি চেম্বার্স এটি সংগ্রহ করেছিলেন। বর্তমানে এই পুঁথির অস্তিত্ব সম্বন্ধে হদিস পাওয়া যায় না। এরূপ অসংখ্য পুঁথিপত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেকে অবশ্য সযত্নে রক্ষা করতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকত বলে ভারতীয় বিদ্যাচর্চায় এই সব পুঁথিপত্রের সাহায্য পাওয়া যেত না।

গ্রন্থাগারের সূচনা

সুখের বিষয় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভার এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৭৯৪ সালের ২৫শে মে তারিখের এক পাবলিক লেটারে তাঁরা বলেন:

"We understand it has been of late years a frequent practice among our servants, especially in Bengal, to make collections of Oriental Manuscripts, many of which have afterwards been brought into this country. By the accidents of time, and the exportation of many of the best manuscripts, a progressive diminution of the original stock, Hindustan may at length be much thinned of its literary stores without greatly enriching Europe. To prevent in part this injury to letters, we have thought that the Institution of a public Repository in this country for Oriental Writings would be useful, and that a thing professedly of this kind is still a bilaliothecal desideratum here..We think the India House might with particular propriety be the centre of an ample accumulation of that nature."

কেউ কেউ মনে করেন যে কোম্পানীর নিজস্ব ঐতিহাসিক রবার্ট অর্মের আগ্রহে ডিরেক্টর সভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। অর্ম ভারতের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির উপর তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। মেকলে বিদ্রূপ করে বলতেন, য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে কখানা ক্লাসিক বই একটি তাকের উপরে রাখা যায় তাদের মূল্য প্রাচ্যের সমগ্র সাহিত্য অপেক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু অর্ম তাঁর বন্ধুমহলে বলতেন যে ভারতের মৌলিক ও মূল্যবান পুঁথিগুলি বৃটেনে আনতে সম্পূর্ণ একটি বড় জাহাজের প্রয়োজন হবে।

কোম্পানী কর্মচারীদের পুঁথিপত্র এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক নিদর্শন হেড আপিসে জমা দেবার নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশের পশ্চাতে গ্রন্থাগার স্থাপনের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। শুধু ভারতীয় সভ্যতার চিহ্নগুলি এক স্থানে সংগ্রহ করে রাখা এবং দাতাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা ছিল উদ্দেশ্য। ডিরেক্টরবর্গ সুস্পষ্টরূপেই বলেছেন যে এই সংগ্রহশালাকে ব্যবহারের উপযোগী করবার জন্য তাঁরা একটি পয়সাও ব্যয় করবেন না।

চার্লস উইলকিন্স

কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল পুঁথিপত্রের গুদাম সৃষ্টি করা। স্যার চার্লস উইলকিন্সের ঐকান্তিক আগ্রহে গুদাম গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছিল। উইলকিন্সের উৎসাহ ছাড়া ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি স্থাপিত হতো কি না সন্দেহ।

উইলকিন্স সমারসেট জেলার অন্তর্গত ফ্রম-এ ১৭৪৯ অথবা ১৭৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কুড়ি বৎসর বয়সে চাকুরী নিয়ে তিনি বাংলা দেশে আসেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আয়ত্ত করে ফেললেন ফার্সী ও বাঙলা ভাষা। ১৭৭৮ সাল থেকে উইলকিন্স সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ করেন। মাত্র সাত বছর পরে তিনি গীতার ইংরেজী অনুবাদ সমাপ্ত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এর পর উইলকিন্স আরম্ভ করলেন মনুসংহিতার অনুবাদ। যখন এক-তৃতীয়াংশ অনুবাদ হয়েছে তখন স্যার উইলিয়াম জোন্স অনুবাদ সম্পূর্ণ করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। উইলকিন্স তাঁর হাতে পাণ্ডুলিপি তুলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। ১৭৯৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্সের নামে Institutes of Hindu Law প্রকাশিত হলো। এই ব্যাপারে উইলকিন্স নিজের নাম প্রচারে যে ঔদাসীন্য দেখিয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

উইলকিন্স সংস্কৃত চর্চার অন্যতম পথপ্রদর্শক। কিন্তু বাঙালীর নিকট তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাঙলা হরফের আবিষ্কর্তা হিসেবে। হ্যালহেড সাহেবের A Grammar of the Bengal Language (1778) প্রকাশ করবার সময় ব্যাকরণে উধৃত বাঙলা দৃষ্টান্তগুলি মুদ্রণের সমস্যা দেখা দেয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুরোধে উইলকিন্স বাঙলা হরফ প্রস্তুত করেন এবং তাঁর সহকর্মী পঞ্চানন কর্মকারকে কৌশলটি শিখিয়ে দেন। উইলকিন্স বাঙলা মুদ্রণের জনক একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

বাংলা দেশের আবহাওয়া উইলকিন্সের স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। [illegible]

এদেশে চাকুরী করবার পর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তাঁকে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হলো। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও তিনি সংস্কৃতের চর্চা নিয়ে ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে কতকগুলি অনুবাদ এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করবার পর ১৭৯৬ সালে আকস্মিকভাবে আগুন লেগে উইলকিন্সের বাড়ী, নগদ টাকা-কড়ি, বইপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উইলকিন্স বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়লেন; তাড়াতাড়ি একটা চাকুরী চাই। কোম্পানীর প্রস্তাবিত সংগ্রহশালার কথা শুনে তিনি তত্ত্বাবধায়কের পদের জন্য আবেদন করলেন। ভারতীয় বিদ্যায় তাঁর মতো পারদর্শী তখন বৃটেনে কেউ ছিল না। সুতরাং উইলকিন্সের বিশ্বাস ছিল এ কাজের তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

বোর্ড অব ডিরেক্টরস আবেদনপত্র পেয়ে তাঁকে লিখলেন যে, তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলে প্রস্তাবিত ওরিয়েণ্টাল রিপজিটারি বা ওরিয়েণ্টাল মিউজিয়াম কিভাবে তিনি গড়ে তুলবেন তার পরিকল্পনা পেশ করতে। উইলকিন্স ওরিয়েণ্টাল রিপজিটারি বা প্রাচ্য সংগ্রহশালার যে পরিকল্পনা পেশ করলেন তাতে মোটামুটি চারটি বিভাগ ছিল : (১) গ্রন্থাগার; (২) মিউজিয়াম; (৩) প্রকৃতিজাত ও (৪) শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী। প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পুঁথিপত্র, ম্যাপ, চার্ট, ছবি, মূর্তি, ঐতিহাসিক লিপি, মুদ্রা এবং যে সব দেশের সঙ্গে কোম্পানীর বাণিজ্য আছে সে-সব দেশের পণ্যদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহের ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল উইলকিন্সের। রাণীগঞ্জের কয়লা এবং বীরভূমের পোর্সিলিন মাটির নমুনা সংগ্রহের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

ডিরেক্টর সভা উইলকিন্সের পরিকল্পনা পেয়েও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না। উইলকিন্স কয়েক মাস অপেক্ষার পর নিরুপায় হয়ে তাঁর সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট সাহায্যের আবেদন করলেন। হেস্টিংস কলকাতা থেকে চিঠি দিলেন উইলকিন্সের আবেদন সমর্থন করে। বোর্ডের সভায় চিঠি পড়া হলো, কিন্তু কোনো কাজ হলো না। বোর্ডের সভাপতি হেনরি ডান্ডাস গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন; হেস্টিংসের উপরও তিনি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। এই দুটি কারণে প্রত্যেক বারই উইলকিন্সের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু উইলকিন্স হতাশ হবার পাত্র নন; এক বৎসর পরে তিনি আর একবার গ্রন্থাগারিকের পদ প্রার্থনা করে আবেদন করলেন। এবার তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। ইতিমধ্যে ডান্ডাস বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেছেন। সুতরাং বোর্ড অব
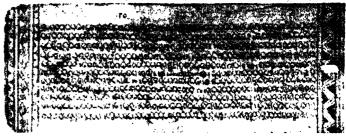
ওড়িয়া লিপিতে সংস্কৃত গীতগোবিন্দের সচিত্র পুঁথি

ডিরেক্টরস উইলকিন্সের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। ১৮০১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী উইলকিন্সকে বার্ষিক ২০০ পাউন্ড বেতনে কোম্পানীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয়। বর্তমান মূল্যমানে তাঁর মাসিক বেতন ছিল প্রায় দু'শ' বাইশ টাকা।

প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতি

উইলকিন্স যেদিন গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ আরম্ভ করলেন সেদিনই ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা হলো। লীডেন হল স্ট্রীটে ঈস্ট ইণ্ডিয়া হাউস কোম্পানীর হেড আপিস। সেই বাড়ীর একটি ঘরে উইলকিন্স বইপত্র সাজিয়ে বসলেন। গ্রন্থাগারে কোন পাঠকের প্রবেশাধিকার ছিল না। পুঁথিপত্র সংগ্রহের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। উইলকিন্সের বেতন ছাড়া গ্রন্থাগারের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করা হবে না—এই ছিল কোম্পানীর স্থির সিদ্ধান্ত। কর্মচারীরা বিজিত দেশ থেকে ছলে-বলে-কৌশলে মূল্যবান নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করে ইণ্ডিয়া হাউসে জমা দেবে, এই আশ্বাসে কোম্পানী লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়েছে। প্রথমে কোম্পানীর এই আশা পূর্ণ হয়নি।

লাইব্রেরির 'ডে বুক' বা দৈনিক দানের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, সর্বপ্রথম তিনটি হাতীর মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম যে সংস্কৃত পুঁথি লাইব্রেরিতে পাওয়া গেল সেটি শাহনামার সংস্কৃত অনুবাদ। ডিসেম্বর মাসে মেজর বীটসন দান করলেন The Original Manuscript Record of Tippoo Sultan's Dreams। টিপু তাঁর এই দিনলিপি অত্যন্ত গোপনে রাখতেন। তিনি যে দিনরাত্রি ইংরেজদের এদেশ থেকে কি করে তাড়ানো যায় সে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন এ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রথম বৎসরের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সংযোজন কোম্পানীর ঐতিহাসিক রবার্ট অর্মের সংগ্রহ। এই সংগ্রহে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত ভারত সম্পর্কে ১৯০টি পুস্তিকা ২৩১ খানি পুঁথি, এবং বহু ম্যাপ, স্কেচ, নকসা, ছবি, চিঠিপত্র ইত্যাদি আছে। মুসলমান রাজত্বের পতন এবং বৃটিশ রাজত্বের শুরু সম্বন্ধে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক মূল দলিল পাওয়া যাবে এই সংগ্রহে।

ভারত থেকে পুঁথিপত্রের আশানুরূপ সরবরাহ না পেয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ ১৮০৫ সালের ৫ই জুনের "বেঙ্গল ডেসপ্যাচে" এ ব্যাপারে বাংলা সরকারের উদ্যোগহীনতার অভিযোগ করেন। তাঁরা নির্দেশ দিলেন যে, এখন থেকে বাংলা সরকার এবং কর্মচারীদের বই পাণ্ডুলিপি ও শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ করবার জন্য তৎপর হতে হবে।

আসলে ইংরেজ কর্মচারীরা এবিষয়ে উদাসীন ছিল না। এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হওয়ার সংগৃহীত জিনিসপত্র সাধারণত এ দুটি প্রতিষ্ঠানেই দেওয়া হতো। যাই হোক, বাংলা সরকার কোম্পানীর নির্দেশ অনুসারে ১৮০৬ সালের ২৬শে জুন তারিখের কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কর্মচারীদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেন। এর পরে লাইব্রেরির পক্ষ থেকে কখনো বইপত্রের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করতে হয়নি।

সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজও বাড়তে লাগল। উইলকিন্সের একার পক্ষে সামলানো অসম্ভব। একে একে তাঁর অধীনে কেরানী নিযুক্ত হতে লাগল। এদিকে কোম্পানীর সংগ্রহশালার খ্যাতি বৃটেনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্র, গবেষক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছ থেকে এই সংগ্রহ ব্যবহারের জন্য ক্রমাগত আবেদন আসতে লাগল। জনসাধারণের এই দাবী বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হলো না। শেষ পর্যন্ত কোম্পানী সংগ্রহশালা ব্যবহার করতে অনুমতি দিলেন। গুদাম হিসেবে যে সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছিল, কোম্পানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তা গ্রন্থাগারে পরিণত হলো।

পুঁথিপত্র ছাড়া অন্যান্য জিনিসও অবিরাম ধারায় আসতে আরম্ভ করেছে। যেসব দেশে কোম্পানীর ব্যবসা আছে, সে-সব দেশ থেকে বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার আসতে লাগলঃ ঠগ দস্যু দলপতির মাথার খুলি, স্পিরিটে রাখা সাপ, ব্যাঙ, মাছ; বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, প্রস্তর মূর্তি, খনিজ, কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি। গ্রন্থাগারিকের পক্ষে একা দুদিক দেখা আর সম্ভব নয় বলে ১৮২০ সালে মিউজিয়াম বিভাগের জন্য একজন কিউরেটার নিযুক্ত করা হলো।

ইণ্ডিয়া আপিস

১৮৩৬ সালে উইলকিন্সের মৃত্যুর পর বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হোরেস হেমান উইলসন গ্রন্থাগারিক হয়ে আসেন। কয়েক বৎসর পরে মিউজিয়াম বিভাগটি লাইব্রেরি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হয়। তাঁর কার্যকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভারতে কোম্পানীর প্রভুত্বের অবসান। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করেন; সেই সঙ্গে কোম্পানীর অন্যান্য সম্পত্তির মতো গ্রন্থাগারটিও কোম্পানীর হাত থেকে খাস গবর্নমেণ্টের অধীনে চলে যায়। ভারত শাসনের দায়িত্ব পড়ে 'ইণ্ডিয়া আপিস' নামে একটি নতুন দপ্তরের উপর। এই নতুন বিভাগের জন্য বাড়ী চাই। লীডেন হল স্ট্রীটের ঈস্ট ইণ্ডিয়া হাউস দুটি কারণে অনুপযোগী বলে মনে হলো। প্রথমত পার্লামেণ্ট হাউস থেকে অনেক দূর, দ্বিতীয়তঃ স্থান সংকুলানের মতো বাড়ীটি যথেষ্ট বড় নয়। সুতরাং পার্লামেণ্ট, ডাউনিং স্ট্রীট এবং অন্যান্য সরকারী দপ্তরের নিকটবর্তী কিং চার্লস স্ট্রীটে সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা দিয়ে তিন বিঘা জমি কেনা হয়। বলা বাহুল্য, জমির দামটা ভারতের রাজস্ব থেকেই দেওয়া হয়েছে। বাড়ীর নকসা তৈরির ভার পড়ল বিখ্যাত স্থপতি স্যার গিলবার্ট স্কটের উপরে। কিন্তু এই নকসা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। এমন কি, পার্লামেণ্টেও এ নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইতালীয়ান স্থাপত্যের আদর্শে ইণ্ডিয়া আপিসের বাড়ীটি ১৮৬৭ সালে সমাপ্ত হয়। বাড়ীর উচ্চতা ৯৫ ফুট। যেসব ইংরেজ কর্মচারী ভারতে কাজ করেছে, বাড়ীর সর্বত্র তাদের মূর্তি ছড়িয়ে আছে। ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপনে যারা সাহায্য করেছে, সেইসব ভারতীয়ের মূর্তিও দেখা যাবে। বাড়ীর অলংকরণ করা হয়েছে ভারতের লতা-পাতা ও ফুল-ফলের নকসা দিয়ে। ইণ্ডিয়া আপিসের ঠিক উল্টো দিকেই সেণ্ট জেমস পার্ক।

এতদিন যা কোম্পানীর লাইব্রেরি বলে পরিচিত ছিল, নতুন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হবার পর তার নতুন নাম হলো 'ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি।' কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে, গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত করবার সময় অনেক মূল্যবান পুঁথিপত্র নাকি জঞ্জাল হিসেবে মন দরে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক উইলসনের পর ডাঃ ব্যালেন্টাইন, অধ্যাপক হল, ডাঃ রস্ট, অধ্যাপক টনি, ডাঃ টমাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত একে একে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এঁরা কেউ আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন না; কিন্তু প্রত্যেকেই ছিলেন প্রাচ্য বিদ্যায় বিশারদ। এঁদের ঐকান্তিক সাধনায় এবং বহু জ্ঞানান্বেষী সংগ্রাহকের সহায়তায় ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি অপূর্ব সম্পদের অধিকারী হতে পেরেছে।

ভারত স্বাধীন হবার পর ইণ্ডিয়া আপিসের দপ্তর বন্ধ হয়েছে। এখন সেখানে কমনওয়েলথ রিলেশানস-এর দপ্তর। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি এখনো সে বাড়ীতেই আছে, এবং যদিও ইণ্ডিয়া আপিস আর নেই, তবু গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক নামটি এপর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়নি।

গ্রন্থাগারের সম্পদ

গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ (১) মুদ্রিত পুস্তক; (২) পুঁথি; (৩) ছবি; (৪) ফটোগ্রাফ; (৫) বিবিধ।

মুদ্রিত পুস্তক—১৮৬৭ সালের 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হবার ফলে লাইব্রেরির মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহের ইতিহাসে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। এই আইন অনুসারে ভারতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি বই ও সাময়িক পত্রিকা বিনামূল্যে লাইব্রেরিতে আসতে আরম্ভ করে। ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত এই সুযোগ অব্যাহত ছিল। দীর্ঘ আশি বছর যাবৎ ভারতে মুদ্রিত পুস্তকের যে বিরাট সংগ্রহ গড়ে উঠেছে, বর্তমান ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চায় তার সাহায্য অপরিহার্য। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কোন ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক ক্রয় করা হবে—বহু দিন থেকে এই নীতি অনুসরণ করায় ভারতীয় বিদ্যা সম্পর্কিত সকল প্রয়োজনীয় পুস্তকই এখানে পাওয়া যাবে।

বর্তমানে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। ১৯৩৫—৩৬ সালে লাইব্রেরির কাজ সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল; সেই কমিটির রিপোর্ট থেকে কয়েকটি প্রধান ভাষায় পুস্তকের সংখ্যা দেওয়া হলোঃ

ক। প্রাচীন (Classical) ভাষাসমূহ—	
আরবী ও ফার্সী	১০,০০০
সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত	২২,০০০
তিব্বতী	১০০
চীনা	১,৮০০
জেন্দ ও পহ্লবী	২০০
খ। য়ুরোপীয় ভাষাসমূহ	৬০,০০০
গ। আধুনিক ভারতীয় ভাষা—	
আসামী	৭০০
বাঙলা	২৪,০০০
গুজরাটি	৯,৫০০
হিন্দী	১৯,৪০০
কানাড়ী	৩,১৬০
মালয়ালাম	১,০৫০
মারাঠী	৯,২০০
নেপালী	৩৭০
ওড়িয়া	৩,৯৫০
পাঞ্জাবী	৪,৯২৫
পুশতো	৩১৫
সাঁওতালী	১২৫
সিন্ধি	২,৫০০
তামিল	১৫,২৫০
তেলেগু	৯,৫০০
উর্দু	১৯,০০০

এ ছাড়া ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল প্রভৃতি দেশের ভাষায় লেখা পুস্তকও আছে। এই রিপোর্ট দাখিলের সময় গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ছিল দু' লক্ষ ত্রিশ হাজার। এর পর নির্ভরযোগ্য কোন বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। বর্তমানে য়ুরোপীয় ভাষায় রচিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার। এর মধ্যে পঞ্চাশ হাজারই ভারত সম্পর্কিত।

গ্রন্থাগারে শুধু 'মূল্যবান' পুস্তকগুলিই সংরক্ষণ করা হয়নি। আপাত দৃষ্টিতে যাদের মূল্য নেই মনে হবে তাদেরও সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। বাঙলা বইয়ের ক্যাটালগের পাতা ওল্টালেই এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে পাঠশালা এবং স্কুলের পাঠ্য বাঙলা বই

ও অর্থ পুস্তক লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণা করতে হলে একমাত্র ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি সাহায্য করতে পারবে।

পুথিঃ মোট সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০। এর মধ্যে অর্ধেক প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষার পুথি। এই হিসাবের মধ্যে তালপাতায়, ভূর্জপাতায় এবং কাগজে লিখিত সকল পাণ্ডুলিপি ধরা হয়েছে। শতকরা চল্লিশ ভাগ পুথি দান হিসেবে পাওয়া গেছে, ৯০০০ পুথি ভারত সরকার নানা উপায়ে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। অবশিষ্ট পুথি কেনা হয়েছে। দাতা অথবা সংগ্রহকারীর নাম হিসাবে পুথি বিভাগে প্রায় সত্তরটি পৃথক সংগ্রহ আছে। য়ুরোপীয় ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে প্রধানত ইংরেজ কর্মচারীদের চিঠিপত্র, দিনলিপি এবং ভারত সম্পর্কে অপ্রকাশিত রচনা পাওয়া যাবে। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গবেষণায় এসব মৌলিক উপাদান বিশেষ প্রয়োজনীয়। রবার্ট অর্মের সংগ্রহের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া ভারতের ভূতপূর্ব সার্ভেয়ার-জেনারেল ম্যাকেঞ্জির সংগ্রহ, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের পঞ্চাশ খণ্ডে বাঁধানো ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, ম্যাসন পেপারস, বুকানন হ্যামিল্টন পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ।

সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত পুথির সংখ্যা ৮,৬৯৬। কোলব্রুক সংগ্রহকে (২,৭৪৯) সংস্কৃত বিভাগের মেরুদণ্ড বলা যায়। এ ছাড়া স্যার উইলিয়াম জোন্স, হজ্‌সন, টেলর, উলকিন্স, বার্নেল, বুয়েলার, অফ্রেক্ট, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বরোদার গাইকোয়াড় প্রভৃতি সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তির সংগ্রহ লাইব্রেরির পুথি বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষরূপে উল্লেখ করতে হয় স্যার অরেল স্টেইন সংগ্রহের কথা। স্যার স্টেইনের পূর্ব তুর্কীস্থানে অভিযানের ফলে অনেক সংস্কৃত, খোটানী, তিব্বতী ও কুচিয়ান পুথি আবিষ্কৃত হয়। কতকগুলি সংস্কৃত পুথি খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে একদা মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এই সংগ্রহ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 'বাওয়ার ম্যানাস্ক্রিপ্ট' নামে পরিচিত আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে মূল্যবান পুথি এই অঞ্চলেই পাওয়া গিয়েছিল।

তিব্বতী পুথির সংখ্যা প্রায় এক হাজার, এ ছাড়া জাইলোগ্রাফ (কাঠের ব্লক থেকে মুদ্রিত গ্রন্থ)-এর সংখ্যা ৮০। হজসন, ডেনিসন রস এবং স্যার অরেল স্টেইন সংগ্রহ এবং ওয়াডেলের লাসা সংগ্রহ ও সেণ্ট পীটার্সবার্গ অ্যাকাডেমির দান এই বিভাগের মূল্যবান সংযোজন।

আরবী ও ফারসী পুথির ...

হাজারের উপর। টিপু সুলতান, আদিল্ শা ও দিল্লীর মোগল সম্রাটদের গ্রন্থাগার এই বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৮৭৬ সালে দিল্লী থেকে মোগল সম্রাটদের গ্রন্থাগার ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সংগ্রহে ১,৯৫০ আরবী, ১,৫৫০ ফার্সী এবং ১০০ উর্দু পুথি আছে।

আধুনিক ভারতীয় ভাষায় প্রায় ১,১০০ পুথি আছে। উর্দু পুথির সংখ্যা ২৬৯, একটি ভাষায় পুথির সর্বোচ্চ সংখ্যা এই। দ্বিতীয় স্থান মারাঠীর; ২৫১টি পুথি আছে মারাঠীতে। বাঙলা পুথির সংখ্যা মাত্র সাতাশ।

এ ছাড়া এশিয়ার অন্যান্য ভাষায় প্রায় ৩৫০ পুথি আছে। ১৯৫০ সালে মূল্যবান পুথিগুলি যাতে লুপ্ত হয়ে না যায় তার জন্য মাইক্রোফিল্‌ম গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ দু'হাজার পুথির মাইক্রোফিল্‌ম তুলেছেন।

ছবিঃ ছবির সংগ্রহ মোটামুটি দু' ভাগে বিভক্ত; ভারতের বিষয়বস্তু নিয়ে য়ুরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি। য়ুরোপীয় শিল্পীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের স্ত্রী-পুরুষের, প্রাকৃতিক দৃশ্যের এবং সমসাময়িক ঘটনার ছবি এঁকেছেন। হিন্দুদের দেব-দেবীর ছবিও এঁকেছেন অনেক। তৎকালীন ভারতের সামাজিক জীবনের পরিচয় এই শ্রেণীর ছবির মধ্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিশদ উল্লেখযোগ্য ভারতের গাছপালা ও জীবজন্তুর ২,৬৪৪খানি জল রঙের ছবি। লর্ড ওয়েলেসলি যখন ভারতের গবর্নর জেনারেল ছিলেন, তখন তাঁর নির্দেশে এগুলি আঁকা হয়েছিল।

ভারতীয় রীতিতে এদেশীয় শিল্পীদের

রিচার্ড জনসন ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের পোদ্দার। তিনি মোগল আমলের ঐতিহাসিক চিত্র, হিন্দু পুরানের কাহিনী নিয়ে আঁকা ছবি, রাগমালা ছবি, ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। এসব ছবির মোট সংখ্যা ১,৩০০। মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রকলার আলোচনা এই সংগ্রহ বাদ দিয়ে হতে পারে না। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি জনসন সংগ্রহ ক্রয় করেছেন। 'রূপম্' (ষষ্ঠ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯২১) এবং 'নিউ ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি' (৪র্থ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ১৯৪১)-তে 'জনসন সংগ্রহ' সম্বন্ধে দুটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক প্রবন্ধ দুটি থেকে অনেক তথ্য পাবেন।

এ ছাড়া হিন্দু ও মুসলমান পদ্ধতিতে আঁকা আরো অনেক ছবি লাইব্রেরির সংগ্রহে পাওয়া যাবে। আনুমানিক ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাজাহানের পুত্র দারাশুকো তাঁর পত্নী নাদিরা বেগমকে একটি ছবির অ্যালবাম উপহার দিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি এখানে রাখা হয়েছে। পুথি চিত্রিত করবার জন্য যে মিনিয়েচার ছবি আঁকা হতো লাইব্রেরিতে তাদের সংখ্যা দু' হাজারেরও বেশি।

ফটোগ্রাফঃ ভারতের জীবন, প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তি প্রভৃতির হাজার হাজার ফটোগ্রাফ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তি সম্বন্ধীয় ফেটোগ্রাফের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের উপর। ফটো ব্যতীত ২,৩০০ মূল্যবান নিগেটিভও আছে। ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করতে হলে এই ফটোগ্রাফের সংগ্রহ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বিবিধঃ বিবিধ দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি ও তাম্রলিপি, ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড, বয়ন শিল্পের নমুনা ইত্যাদি। ...

মার্কণ্ডেয় পুরাণের (সংস্কৃত) একটি পৃষ্ঠা
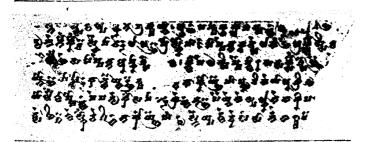
মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত কুচিয়ান (উপরে) ও খোটানী (নিচে) পুঁথি

সমীক্ষার প্রয়োজনে ভারতের প্রধান ভাষা ও উপভাষাগুলির গ্রামোফোন রেকর্ড করিয়াছিলেন। এই মূল্যবান রেকর্ডগুলি (২১০খানি) সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে টিপু সুলতানের বাঘের কথা উল্লেখ না করলে বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকবে। শ্রীরঙ্গপত্তম্ পতনের পর টিপুর প্রাসাদে এই আশ্চর্য কারিগরিসম্পন্ন বাঘটি পাওয়া গিয়েছিল। কোম্পানীর গ্রন্থাগারে বাঘটি আনা হয় ১৮০৮ সালের ২৯শে জুলাই। একটি বাঘ ভূতলশায়ী ইংরেজ সৈনিকের বুকের উপর বসে তার রক্তপানে উদ্যত হয়েছে, একটা হাতল ঘুরালেই বাঘের গর্জনের সঙ্গে মুমূর্ষু ইংরেজের ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা যেত। টিপু প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখতেন এবং প্রত্যহ নতুন করে সংকল্প করতেন যে তিনিও বাঘের মতো ইংরেজদের পরাজিত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন। দর্শকদের নিকট এই মূর্তিটি ছিল পরম বিস্ময়ের বস্তু। সব সময় লোকের ভিড় লেগেই থাকত। ইংরেজ জাতির পক্ষে অপমান জনক বলে সমালোচনা হওয়ার পরে মূর্তিটি 'ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে' স্থানান্তরিত করা হয়। ভিতরের যন্ত্রপাতি এখন খারাপ হয়ে গেছে, হাতল ঘোরালেও আর শব্দ শোনা যায় না।

ইণ্ডিয়া আপিসের রেকর্ড ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত হয় ১৮৮৪ সালে। কিন্তু ১৬০০ খৃষ্টাব্দ থেকে সকল রেকর্ড এখানে রাখা হয়েছে। বৃটিশ আমলের মৌলিক ঐতিহাসিক নজির এই রেকর্ডগুলি। পৃথক বিভাগ হলেও লাইব্রেরির সংগ্রহকে পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য এদের প্রয়োজন আছে।

গ্রন্থাগার পরিচালনা

বর্তমান ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির প্রশাসনিক কর্তা সেক্রেটারী অব্ স্টেট। [illegible] আপিসের ভারত ও পাকিস্থানের লণ্ডন হাই কমিশানের দপ্তরের কর্মী এবং ভারত ও পাকিস্থান সেনাবাহিনীর ভূতপূর্ব অফিসারবৃন্দ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পদাধিকারবলে পড়বার বিশেষ সুযোগ পান। অন্যান্য পাঠকদের অনুমতির জন্য সেক্রেটারী অব স্টেটের নিকট আবেদন করতে হয়। লাইব্রেরির পাঠাগারে পড়বার ব্যবস্থা আছে; তাছাড়া বাড়ীতেও বই নেওয়া যেতে পারে। শনিবার বেলা ১টা পর্যন্ত এবং অন্যান্য দিন লাইব্রেরি সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ। দূরবর্তী স্থানে ডাকে বইপত্র পাঠানো হয়। প্রয়োজন হলে লাইব্রেরির পুঁথিপত্রের মাইক্রোফিল্ম ও ফটোস্টাট কপি তুলে দেবার ব্যবস্থাও আছে। বেয়ারা ইত্যাদি ছাড়া লাইব্রেরির কর্মীর সংখ্যা ১৩। উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর অভাবে এখনো লাইব্রেরির সম্পদ সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচয় লিপিবন্ধ হয়নি। এপর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ খণ্ড ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছে; কতকগুলি এখন ছাপা হচ্ছে।

ভারতের দাবী

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারত বৃটিশ সরকারের অধীনে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন গ্রন্থাগারটিও হস্তান্তরিত হয়েছিল, তেমনি ভারত স্বাধীন হবার পর ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি আমরা পাবো, এমন আশা স্বাভাবিক। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু লাইব্রেরি নয়, ইণ্ডিয়া আপিসের রেকর্ড বিভাগের উপরও আমাদের অধিকার আছে। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি সম্বন্ধে এমন কোনো অভিমত প্রকাশ করেননি যা থেকে লাইব্রেরি হস্তান্তর করতে তাঁদের আপত্তি আছে বোঝা যেতে পারে। ভারত ও পাকিস্থান লাইব্রেরির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একমত হলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করবেন না, এতদিন এই আভাসই পাওয়া গেছে। ভারত ও পাকিস্থানের পারস্পরিক আলোচনা যখন একটি সিদ্ধান্তের পথে এগিয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ আট বছর পরে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে লর্ড হোম ঘোষণা করলেন যে, ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির উপর তাঁদেরই আইনগত অধিকার, সুতরাং লাইব্রেরি বৃটিশ সরকারের উত্তরাধিকারী হিসেবে ভারত পেতে পারে না। তিনি নজির দেখিয়েছেন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। ভারত শাসন আইনে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি বৃটিশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল একথা সত্য। কিন্তু এই ব্যবস্থাটা ছিল সাময়িক। নতুন আইনে সেক্রেটারি অব স্টেট-ইন-কাউন্সিল বাতিল হয়ে যায়। লাইব্রেরি ছিল সপারিষদ সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার অধীনে। সুতরাং লাইব্রেরি পরিচালনার দায়িত্ব বৃটিশ সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ভারত শাসন আইন পার্লামেণ্টে আলোচনার সময় স্যার স্যামুয়েল হোর ঘোষণা করেছিলেন যে, লাইব্রেরি যদিও বৃটিশ সরকারের পরিচালনাধীনে এসেছে তবু ভারত সরকারের প্রয়োজনেই এর গ্রন্থ সম্পদ ব্যবহৃত হবে। এবং আরও স্থির হয়েছিল যে, যদি কখনো লাইব্রেরি ভারত সরকারের হাতে দেবার সিদ্ধান্ত করা হয় তাহ'লে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সেজন্য কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা আইনের খসড়া প্রস্তুত করবার সময় সপারিষদ গভর্নর জেনারেল দাবী করেন যে, লাইব্রেরি ভারতেরই সম্পত্তি। বৃটিশ, ভারত এবং পাকিস্থান সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে লাইব্রেরির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের বৈঠকে যোগ দেওয়া তখন সম্ভব হয়নি; সুতরাং কমিটি কোন কাজই করতে পারেনি। তথাপি বৃটিশ প্রতিনিধি তাঁর নিজের অভিমত পেশ করে জানিয়েছেন যে, ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি লণ্ডনে রাখাই যুক্তিসঙ্গত। ভারত সরকার ইণ্ডিয়া আপিসের বাড়ী এবং লাইব্রেরির উপর তাঁদের দাবী প্রমাণ করবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। এই কমিটির সদস্য ছিলেন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন (ডাইরেক্টর অব আর্কাইভস্), ডাঃ এন, পি চক্রবর্তী (ডাইরেক্টর জেনারেল অব

র্কিওলজি) এবং আইন দপ্তরের কে, াই, ভাণ্ডারকর। এ'রা ভারতের দাবীর র্থনে ইতিহাস ও আইনের নজির খুঁজে য়েছেন।

আইনের নজির যদি লর্ড হোমের ব্যাখ্যা নুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধেও যায় তবু টাই চরম কথা নয়; শুধু ঐ কারণে রতের দাবী শিথিল হবে না। কারণ আমরা তখন পরাধীন ছিলাম; বৃটিশ রকার কখনো আইনের সাহায্যে, কখনো বা বে-আইনীভাবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের সম্মতি অসম্মতির কোনো মূল্য ছিল না। আইনের কথা বাদ দিলেও ভারতের দাবী আর্থিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইণ্ডিয়া আপিস ভবনটি সম্পূর্ণরূপে ভারতের অর্থে নির্মিত। মোট ব্যয় পড়েছিল প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা। ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ইণ্ডিয়া আপিস ভবন ও লাইব্রেরির সমুদয় ব্যয় ভারত বহন করেছে। রেকর্ড বিভাগ পরিচালনার জন্যও অর্থ এসেছে ভারতের রাজস্ব থেকে। প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশান অ্যাক্ট অনুযায়ী যেসব বই লাইব্রেরিতে পাঠানো হতো তাদের মাশুল পর্যন্ত ভারত দিয়েছে। স্যার অরেল স্টেন পুঁথিপত্র সংগ্রহের জন্য মধ্য এশিয়ায় যে অভিযানে বেরিয়েছিলেন তার জন্য অধিকাংশ অর্থ দেওয়া হয়েছে ভারতের রাজস্ব থেকে। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির জন্য যত বই কেনা হয়েছে তার প্রত্যেকটির দাম আমরা দিয়েছি; ইণ্ডিয়া আপিস ভবন নির্মাণ, সংস্কার, আসবাবপত্র, ঘর গরম রাখার জন্য কয়লার দাম, কর্মীদের বেতন প্রভৃতি সকল ব্যয় দিয়েছে ভারত। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরি পরিচালনার আংশিক ব্যয় ভারতের রাজস্ব থেকে দেওয়া হয়েছে। এতদিনের এত অর্থব্যয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এবং কোনপ্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়ে, লাইব্রেরিটি আত্মসাৎ করবার চেষ্টা বিস্ময়কর।

ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলির উপর আমাদের নৈতিক অধিকার আছে। এদের মূল্য আমাদের নিকটই সর্বাপেক্ষা বেশি। ভারতের লেখক ও প্রকাশকের দানে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশান অব বুকস অ্যাক্ট অনুযায়ী বইপত্র আদায় করে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থের জন্য লণ্ডনে পাঠিয়েছে, কিন্তু ভারতের বই ভারতে রাখবার ব্যবস্থা করেনি। প্রভুত্বের সুযোগ নিয়ে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শনগুলি ইংরেজরা সুকৌশলে, প্রায় বিনামূল্যে ইংলণ্ডে নিয়ে গেছে। আবার ইংরেজরা যা বিনামূল্যে আমাদের দেশ থেকে নিয়ে গেছে সেগুলি ভারতের টাকা দিয়ে চড়া দামে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির জন্য কেনা হয়েছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নজিরগুলি ছড়িয়ে আছে; তাদের উপর আজ আর আমাদের অধিকার নেই। একমাত্র ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি আমরা দাবী করতে পারি।

বৃটেনে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি ব্যতীত প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার জন্য রয়েছে বৃটিশ মিউজিয়াম, অক্সফোর্ডের বোড্‌লিয়ান লাইব্রেরি, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি, ইত্যাদি। প্রাচ্যে নবজাগরণের পর থেকে
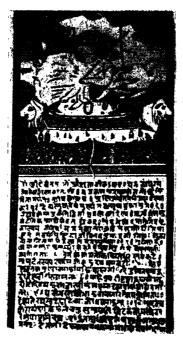
বাঙলা দেশ থেকে সংগৃহীত (১৭৯৩) সচিত্র সংস্কৃত পুঁথি

য়ুরোপে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার আগ্রহ অনেকটা কমে এসেছে। আজকাল প্রাচ্যের সমসাময়িক জীবন সম্বন্ধেই প্রতীচ্যের ঔৎসুক্য। পূর্বের মতো ভারত সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ সচরাচর য়ুরোপের পণ্ডিতদের কাছে থেকে পাওয়া যায় না। এতদিন বিদেশী পণ্ডিতরা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখন থেকে প্রামাণ্য আলোচনা করবেন ভারতের মনীষীরা; সুতরাং এই আলোচনার জন্য একান্ত আবশ্যকীয় নজিরগুলি ভারতে আনা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারের সার্থকতা তার সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারে। ইণ্ডিয়া আপিস [illegible] ব্যবহার কখনো হয়নি। লণ্ডনে তা হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র ভারতেই লাইব্রেরির বইপত্রের যথার্থ ব্যবহার হতে পারে। এখনো ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি সরকারী দপ্তর সংলগ্ন বিভাগীয় লাইব্রেরির মতো আছে। ১৯৫২-৫৩ সালের হিসেব থেকে দেখা যায় যে, গড়ে দৈনিক ১৫ জন পাঠক ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির পাঠাগারে পড়তে এসেছে। রবিবার ও ছুটির দিন বাদ দিয়েই এই হিসেব পাওয়া যায়। গড়ে বই ধার দেওয়া হয়েছে ১৪ খানা, তার মধ্যে ভারতীয় ভাষার বই গড়পড়তা ৮ খানা মাত্র। পরবর্তী বৎসরের হিসেবেও এই সংখ্যার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির সম্পদের তুলনায় এই সংখ্যা নগণ্য। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের সর্বশেষ হিসেব থেকে দেখা যাবে যে, পাঠকক্ষে গড়ে ৩২৫ জন পাঠক রোজ পড়াশোনা করতে আসে এবং বাড়িতে পড়বার জন্য দৈনিক প্রায় ১১০ খানা করে বই ধার দেওয়া হয়। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির মতো সম্পদশালী হ'লে জাতীয় গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যেত। ইণ্ডিয়া আপিস প্রকৃতপক্ষে দুর্লভ পুঁথিপত্র সংরক্ষণের গুদামঘর, এখনো সত্যিকার গ্রন্থাগার হতে পারে নি। এর ফলে ভারতীয় বিদ্যার চর্চা প্রতিদিন ব্যাহত হচ্ছে।

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির নজিরগুলি কাগজ, ভূর্জপত্র, তালপত্র, কাঠ, চামড়া, হাতীর দাঁত, পোড়ামাটি, সোনা, রূপা, তামা, পাথর প্রভৃতির উপর সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, খরোষ্ঠী, খোটানী, বাঙলা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির নিভৃত মঞ্চে অপেক্ষা করছে। এদের ভারতে আনতে পারলে বৃটিশ মিউজিয়ামের মতো জাতীয় সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করবার প্রচেষ্টা সফল হবে। এসব দুর্লভ অমূল্য নিদর্শন অন্য কোনো উপায়ে পাওয়া সম্ভব নয়। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির অভাবে যে ফাঁক থেকে যাবে তার ফলে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য চিরদিন বিদেশী সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে থাকতে হবে। ভারত গভর্নমেণ্ট লাইব্রেরি স্থানান্তরিত করবার জন্য যথাসাধ্য করছেন। ভারতের দাবীর পশ্চাতে নৈতিক সমর্থন আছে। সুতরাং ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি আমাদের হাতে আসবে বলে বিশ্বাস করি। তথাপি আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বড় প্রশ্ন যে, ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি কেন্দ্র [illegible]

বিরাম — শিল্পী রামকিংকর

চাষী — শিল্পী রামকিংকর

অ্যালবাম

বিমল কর
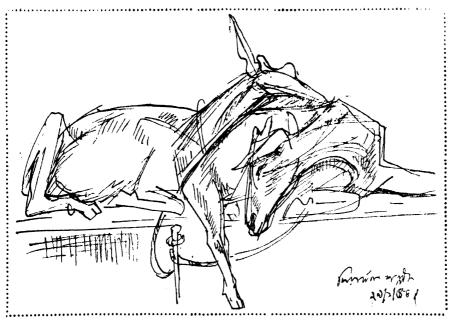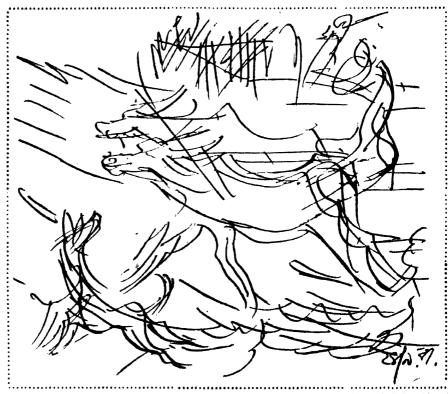
মল্লিকা তখনও দাঁড়িয়ে। ঠিক তেমনি-ভাবেই; আধখোলা আলমারির কাঁচের পাল্লার গায়। আলগা শাড়ির অল্প একটু মেঝে ছুঁয়েছে, খানিকটা লুটোচ্ছে পায়। আয়নায় ঝকঝক করছে আর-এক মল্লিকা।

মাঝে মাঝে এমনিই হয়। চলতে ফিরতে কথা বলতে হঠাৎ নিশ্বাস ফুরিয়ে নিথর হয়ে যায় মল্লিকা। তখন ও মানুষ নয়, যেন ছবি। ঠোঁট নড়ে না, চোখের পাতা পড়ে না; একটুও কাঁপুনি থাকে না কোথাও, না হাতে না পায়ে, বুকের ওঠানামাটুকুও আশ্চর্যভাবে মৃদু হয়ে আসে। বোঝা যায় না ফুসফুসে বাতাস আছে কি নেই।

আজও মল্লিকা ছবি হয়ে গিয়েছিল, বাইরে যখন ঝলসানো রোদ, ঘরে ফুলতোলা মোটা কাঁচের শার্সি আর পর্দা রোদ শুষে শুষে ছায়া এনেছে, তখন। আর তখন ঘড়ির কাঁটা দশের ঘর ধরো-ধরো করছে। মাথার ওপর মোলায়েম গতিতে বাতাস কেটে চলছে পাখাটা। দালান কি পাঁচিল থেকে কখনো কখনো কাক কি চড়ুই ডেকে উঠছে।

অন্য সময় হলে ছবিটা দেখত পুষ্প আরও অনেকক্ষণ। কিন্তু এখন আর সময় ছিল না।

রুমাল, কলম, মানিব্যাগ পকেটে ভরতে ভরতে পুষ্প বললে, 'কি, পেলে না?'

একটু চমকে গেল মল্লিকা। তন্ময়তা ভাঙল। নড়ে উঠল সামান্য। ঘাড় ঘোরাল। তাকাল স্বামীর দিকে। কথা বললে না, ডাগর দুটি চোখ তুলে ধরল, তুলে রাখল।

স্ত্রীর চোখে চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে বললে পুষ্প, 'ওই একটাই তো ছবি আমাদের বিয়ের সময়কার; ওটা হারিয়ে ফেললে!' গলায় ক্ষোভ ফুটে উঠেছিল পুষ্পর। একটু থেমে আবার, 'তোমার তো অ্যালবাম আছে। তার মধ্যে—!'

—অ্যালবামে রাখি নি। পুষ্পকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মল্লিকা বললে এতোক্ষণে। যদিও প্রশ্ন করলে না, তবু পুষ্প অবাক হচ্ছিল এবং বেদনাও অনুভব করছিল এই ভেবে যে, ওদের বিয়ের ছবিটা কি করে অ্যালবামে না রেখে পারল মল্লিকা।

স্বামীর ম্লান বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন হয়তো বোধ করলে মল্লিকা। বললে, 'ছবিটা কেউ দেখতে নিয়েছিল বোধ হয়, আর ফেরত দেয়নি।' মল্লিকার গলার সুর মিহি এবং শান্ত। এতো শান্ত যে একটা নিস্পৃহতা ফুটে উঠেছিল। প্রসঙ্গটা যেন এখানেই শেষ করতে চায় ও।

অথচ প্রসঙ্গটা ঠিক এখানে শেষ করার নয়। পুষ্প ভাবছিল, কি করা যায়? জব্বলপুর থেকে বড়দি বার বার চিঠি লিখছে। বিয়েতে আসতে পারেনি, বউ দেখেনি, বিয়ের সময় জোড়ে তোলা ফটোটা পাঠিয়ে দিতে।

অনুশোচনার একটা শব্দ জিবে টেনে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে পুষ্প, 'তা হলে এখন?'

—কি আর—! মল্লিকা স্বামীর ছেলে-মানুষিতে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে উঠেছে যেন, 'কলকাতা শহরের পথে ঘাটে স্টুডিয়ো। একটা ছবি তুলে তোমার দিদিকে পাঠিয়ে দিলেই হল।'

এরপর আর কি কথা থাকতে পারে। পুষ্পও কথা খুঁজে পেল না। স্ত্রীর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল। দশটার ঘর ছুঁয়ে ফেলেছে কাঁটা দুটো। দেরি হয়ে গেল অফিসের। অযথাই একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে কী বললে যেন পুষ্প। সম্ভবত বিদায় নিল।

ঘরে একলা হয়েও একা হতে পারল না মল্লিকা। আলমারির আয়না দেওয়া পাল্লাটায় আর-এক মল্লিকা ছিল। এবং সেই ঝকঝকে মল্লিকার চোখে চোখ উঠিয়ে এ মল্লিকা আবার যেন ছবি হয়ে ফুটে ওঠার চেষ্টা করলে। হাল্কা বাসন্তী রঙ শাড়িটা আগের মতই কোথাও আঁটোসাটো কোথাও আলগা হয়ে গা, পা, হাতের একটু আধটু অংশে ভাঁজ ফেলছিল। পিঠের ওপর ভিজে কালো চুল ছড়ানো। মিষ্টি একটা গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে। হাতের চুড়ি

আংটি ঝিকমিক করছে। সরু, শাদা ধবধবে গলায় মিহি-গড়ন হার, বুকের ওপর মিনে তোলা লকেট। আর ঈষৎ দীর্ঘ ধরনের মুখ, আয়নায় ভেসে রয়েছে। মাঝ সিঁথিতে সরু করে সিঁদুর ছোঁয়ান, কপালে ক'টি কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ নেমেছে। স্পষ্ট উঁচু নাক; পাতলা ঠোঁট, ধনুক গড়ন। টানা টানা চোখ নয়, তবু ডাগর, টলমলে আর শান্ত। এই চোখের সঙ্গে মল্লিকার ধারালো চিবুক ঠিক মিল খায় না। অথচ চোখ সয়ে গেছে বলে এখন আর খুঁতটুকুও ধরা পড়ার নয়।

সবই তেমনি ছিল, তবু মল্লিকা আর আগের মতন ছবি হয়ে ফুটে উঠতে পারছিল না। হাত, পা, মুখ, ঘাড় না নড়ালেও ওর চোখের মধ্যে একটা চঞ্চলতা ছটফট করছে। পাতা পড়ছে বার বার, দৃষ্টিটাও স্থির হয়ে নেই। আর বুকটা থেকে থেকে চাপা নিশ্বাসের ভারে দ্রুত কেঁপে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গটা তখন স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থামিয়ে দিতে চাইলেও থেমে যায়নি। মল্লিকার মনে এখনও ঘোরা ফেরা করছে। সত্যিই তো ফটোটা গেল কোথায়? মল্লিকা মনে করবার চেষ্টাও করছিল মাঝে মাঝে। অ্যালবামে রাখেনি। রাখার কথাও ভাবেনি কখনো, যদিও ফটোটা বিয়ের সময়কার এবং একটি বিশেষ সময়, স্মরণীয় মুহূর্ত ধরা থেকে গেছে সেই ছবিতে, তবুও না। মল্লিকার নিজের গোটা চারেক ছবি কিন্তু আছে বিয়ের সময়কার। হ্যাঁ, অ্যাল-বামেই, চকলেট রঙের পুরু খসখসে কাগজের ওপর। বধূ মল্লিকার টুকরো টুকরো চারটি রূপ, বিচ্ছিন্ন চারটি মুহূর্ত। একটি ছবি তুলেছি সেজদা, গায়ে হলুদের পর। এখনও যেন সেই ছবিতে একটি গুন গুন মিষ্টি দুপুরের কথা লেখা আছে, হলুদের দাগ।' আর একটা তুলেছিল প্রভাত, ওর খুড়তুতো ভাই, যখন লাল টুকটুকে বিয়ের চেলী পরে কপালে গালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে

কেমন যেন এক নেশায় থমথম হয়ে ও বসেছিল। তখনও সিঁথিতে সিঁদুরের রঙ ধরে নি। জোরাল আলোয় তোলা ছবি বলেই নয়, সেই গাঢ় সন্ধ্যায় মল্লিকা রক্ত গোলাপের মতই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ছিল তাই অতো সুন্দর হয়েছে ছবিটা। অন্য দুটি ফটোর একটি বিয়ের পরদিন স্নান শেষের পর। তখন মাঝ সিঁথির সিঁদুর আর অলংকার আর চওড়া পাড় শান্তিপুরী শাড়িতে চেহারাটাই কেমন যেন নতুন হয়ে গেছে। ছবিটা তুলেছিলেন জামাইবাবু। আর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আসল জিনিসটা তো আর কপালে জুটল না ভাই, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাব। শেষ ছবিটা অবশ্য শ্বশুরে বাড়িতে ফুলশয্যার দিন তোলা। এটাও তুলেছিল প্রভাত। সাজে সজ্জায় ঝলমল করছিল মল্লিকা তখন। চমৎকার দেখাচ্ছে ছবিতেও মল্লিকাকে।

অ্যালবামে ফটোগুলো আঁটা হয়ে যাবার পর পুষ্পও দেখেছিল। খুশী হয়েছিল খুব। আর ছবি দেখতে দেখতে বলেছিল, 'বা, সুন্দর হয়েছে। তা ওই তোমার-আমার এক সঙ্গে তোলান ছবিটাও এর সঙ্গে এ'টে রেখে দিয়ো।'

ঘাড় নেড়েছে মল্লিকা, হ্যাঁ, এ'টে রেখে দেবে। কিন্তু দেয়নি। কথাটা মনে পড়েছে কখনো কখনো। তবু এ'টে রাখেনি ছবিটা। হয়ে ওঠেনি।

আজ, এখন, মল্লিকা ভাববার চেষ্টা করছিল ছবিটা সত্যি কোথায় গেল! কেউ দেখতে নিয়েছে, পরে দিতে ভুলে গেছে। পুষ্পকে এ রকম একটা কৈফিয়ৎ অবশ্য দিয়েছে মল্লিকা। কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে, কেউ নেয়নি দেখতে। এবং তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মল্লিকা সে-ছবি তার ঘরে কোথাও পেল না। পায়নি। আশ্চর্য!

সকালের ক্ষোভটুকু ধুয়ে দিল মল্লিকা সন্ধে বেলায়। পুষ্পকে বললে, 'তৈরি হয়ে নাও, বেরুবো।'

—কোথায়?

—কেন, ভুলে গেলে। ফটো তুলতে যাব বলেছিলুম না।

—ও, হ্যাঁ। তা আজকেই—!

—কি এমন হাতি ঘোড়া কাজ যে আজ নয় কাল নয় করে ফেলে রাখতে হবে! যাবো তো স্টুডিয়োতে একটা; দশ বিশ পা-ও হাঁটতে হবে কি হবে না। মল্লিকা স্বামীর চায়ের কাপ, প্লেট মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিতে নিতে বললে।

—বেশ তো, চলো। একটু বেড়িয়ে আসাও যাবে। পুষ্প সিগারেট ধরাল।

মল্লিকা চলে গেল। ভালই লাগছিল পুষ্পর। অফিস থেকে ফিরে স্নান করেছে। চা-টাও খাওয়া শেষ হলো। ফাঁকা উঠোনে বেতের চেয়ারে বসে রয়েছে। জল-কালি অন্ধকার। ঝির ঝির হাওয়া বইছে থেকে থেকে। মাথা তুললেই তারা ঝিকমিক আকাশ।

কোথাও যদি কোনও ক্ষোভ পুষে রেখে থাকে পুষ্প, এরপর মল্লিকার কথার পর সব ধুয়ে যাওয়া উচিত। বলতে কি, তা গিয়েছে। আসলে স্ত্রীর ওপর যদি বা একটু অভিমান করেই থাকে পুষ্প সকালে অফিস যাবার সময়, পরে আস্তে আস্তে তা মিলিয়ে গেছে কখন। মল্লিকা এমন স্ত্রী—যার কাজকর্মে আচার আচরণে ত্রুটি ধরবে, তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি করবে বা দুঃখ পাবে পুষ্প তেমন স্বামী নয়। অত্যন্ত সহজ-ভাবেই দুটো কথা স্বীকার করে নিয়েছে পুষ্প মনে মনে। মল্লিকা সুন্দরী এবং মল্লিকা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তার রূপ, তার বিয়ের পাঁচ রকম যৌতুক নিয়ে মল্লিকা অনায়াসেই অন্য কারুর স্ত্রী হয়ে যেতে পারত। তা যে যায়নি, সেটা নেহাতই ভাগ্য। পুষ্পর ভাগ্য।

হ্যাঁ, পুষ্প তাই মনে করত, মনে করে এখনো। অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মতন মল্লিকা তার কাছে এসে গেছে। আশাতীত পুরস্কার পেয়েও মন খুঁত খুঁত করবে, এমন অবুঝ পুষ্প নয়। বরং এখানে তুলনায় তার অযোগ্যতার কথাটাই প্রথমে মনে পড়ে। সে লজ্জা তাকে ঘিরে রয়েছে। হীন-মন্যতার সংকোচও। কাজেই ছোট খাটো ত্রুটি যদি ঘটে, কোনও কারণে খুঁত লাগেও মনে তবু সামান্য সে সব বিষয় ভুলে যাবার চেষ্টা করে পুষ্প। ভুলে যায়ও।

তা ছাড়া ভালবাসা আছে। কেমন এক নিবিড় অনুরাগ। মোহ এবং আকর্ষণও। মল্লিকাকে এতোখানি ভালবাসার পর, তুচ্ছ খুঁটিনাটি কোনও গরমিল বা একটু আধটু দুঃখ কি অভিমান মনের মধ্যে ফেনাতে বসবে তাই কি সম্ভব পুষ্পর পক্ষে। না, সে সব অনায়াসেই সয়ে যেতে পারে পুষ্প, হাসি মুখেই ক্ষমা করতে পারে।

ছবি হারানোর ক্ষোভও কখন ভুলে গিয়েছিল পুষ্প। মল্লিকা নিজের থেকে না বললে ফটো তুলিয়ে আসার কথাই ওর মনে পড়ত না এখন দু চারদিন, যতদিন না আবার জব্বলপুর থেকে বড়দির তাগাদা আসে চিঠিতে।

পথে বেরিয়ে মনে পড়েছিল। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের কটা দোকানই ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল পুষ্প। মল্লিকা যেতে যেতে থমকে দাঁড়াচ্ছিল ফটো তোলার দোকানগুলোর সামনে।

পুষ্প বললে, 'এখানে নয়। আমার এক বন্ধুর স্টুডিয়ো আছে বিবেকানন্দ রোডে। পুরনো বন্ধু। তার দোকানেই চলো। ছবিটাও ভাল করে তুলে দেবে। তা ছাড়া দেখাও হবে, অনেককাল দেখা সাক্ষাৎ নেই।'

প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল পুষ্প। কবে দেখেছে এক-দরজার ক্ষুদে একটা দোকান, এখন দেখে মস্ত ঘরজুড়ে স্টুডিয়ো। দরজার পাশে পেতলের টবে পাতা গাছ, প্রকাণ্ড শো-কেস, আট দশখানা ফটো সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো। ফ্লোরেসেন্স বাতি জ্বলছে।

ভেতরে পা দিতেই দেখা হয়ে গেল সরোজের সঙ্গে। কাকে যেন কি বোঝাচ্ছিল। সোফায় চেয়ারে দু-চারজন খদ্দের বসে। পুষ্পরা ঢুকতে সরোজ তাকাল। মুখে ধপ্ করে একটা খুশীর হাসি ফুটে উঠলেও মল্লিকার দিকে তাকিয়ে কথা আসছিল না ঠোঁটে।

পুষ্পই কথা বললে প্রথমে। হাসলে; খুব একটা বড় চমক দিয়েছে যেন তেমন ধরন কৃতিত্বের হাসি।

—কিরে চিনতে পারিস?

—পারি না আবার! সরোজ পুষ্পর কাছে ক'পা এগিয়ে আসতে আসতে বলল। এবং কাছে এসে দাঁড়াল, 'তুই হঠাৎ!' সরোজ বন্ধুর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে মল্লিকার দিকে তাকাল।

—এলাম। তোরা ত আর খোঁজ খবর নিস না। পুষ্প হাসছিল, 'আলাপ করিয়ে দি। আমার স্ত্রী, মল্লিকা। আর ও, বলেছি আগেই, পুরনো বন্ধু, সরোজ।'

সরোজ নমস্কার করলে হেসে। সরু সরু আঙুল, ধবধবে নরম দুটি হাত জোড় করে কপালের কাছ পর্যন্ত আনলে মল্লিকা। ঠোঁটের পাশ বয়ে মিষ্টি একটা হাসি ছড়িয়ে গেল।

'কী ভাগ্য আমার!' সরোজ অপ্রতিভ হাসি হেসে বলছিল, 'আমার বন্ধুটির শেষ পর্যন্ত মনে পড়েছে আমাকে। নয়তো আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবার সুযোগই ঘটত না। আসুন, ওই পার্টি-শানটার পাশে একটা পায়রা-খোপ্ আছে আমার ওখানেই বসা যাবে।'

সরোজ সেই ধরনের মানুষ সহজেই যারা ঘনিষ্ট হয়ে যেতে পারে। পাঁচরকম কথা বলে, হেসে, অন্যকে হাসিয়ে প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতাটুকু কাটিয়ে দিতে পারে চট্ করে।

দশ মিনিটের মধ্যে এমন কাণ্ড করে বসল সরোজ যে মনে হলো মল্লিকার সঙ্গে ওর কম করেও দশটি মাসের চেনা-জানা। আর অনায়াসেই মল্লিকার সসঙ্কোচ গাম্ভীর্যটুকু খসিয়ে দিলে। মল্লিকা জানতেই পারল না, কখন পুষ্প-সরোজ দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গ আলাপ হাসি ঠাট্টার মধ্যে ও নিজেও মিশে গেছে।

কাজের কথাটা পাড়ল পুষ্প শেষ পর্যন্ত। —একটা ছবি তোকে তুলে দিতে হবে যে।

—কার, তোর না ও'র? সরোজ মল্লিকার দিকে চেয়ে মুচকি হাসে।

—দুজনেরই আমাদের, একসঙ্গে। পুষ্পও হাসল।

—জ্যলজ্যান্ত দুটো মানুষ থাকছিস এক-সঙ্গে তাতে হচ্ছে না, আবার ফটো? সরোজ আড়-চোখে-চোখে দেখল দুটিকে।

—সব সময় কি আর থাকছি একসঙ্গে। আমি যখন বাজার, অফিস কি আড্ডা মারতে তখন ত ও একা। আবার ও যখন বাপের বাড়ি যায় তখন আমি অ্যালোন্। পুষ্প হাসল। ওরাঁও। হাসি থামলে বললে পুষ্প, 'দিদিকে পাঠাতে হবে। মনে আছে তোর দিদিকে!'

—মনে থাকবে না আবার। কোথায় এখন দিদি?

—জব্বলপুর।

একটুখানি চুপ। সরোজ বললে শেষে, 'নে, তবে ওঠ্ পাশের ঘরে চল্।'

বেশ যত্ন করেই ফটোটা তুললে সরোজ। দুজনকে পাশাপাশি রেখে। তারপর মল্লিকার একা একটা। নিজের থেকেই আগ্রহ জানিয়ে। আর বললে মল্লিকাকে, ফটো তোলা শেষ হলে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে 'বা! ক্যামেরার সামনে একটুও জড়সড় হন না আপনি দেখছি। ভাল হবে ছবি।'

আরও সামান্যক্ষণ কথাবার্তা হল। যাবার সময় পকেটে হাত ঢুকোতে ঢুকোতে বললে পুষ্প, 'তা হলে পরশু সন্ধ্যে বেলা আমি আসছি ফটো নিতে। তা কতো লাগবে তোর?' মানিব্যাগটা বের করে ফেলেছে পুষ্প ততক্ষণে।

—কি টাকা? সরোজের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল নিমেষের জন্যে। পরক্ষণেই হাসি টেনে জবাব দিল, 'মাথা খারাপ নাকি তোর, এর জন্যে আবার টাকা কিসের?'

—না, না, সেকি; এটা তোর ব্যবসা—পুষ্প কিন্তু কিন্তু করছিল।

—ঠিক আছে, ধরনা এটা তোদের বিয়েতে আমার গিফ্ট্। সরোজ সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল পুষ্পকে, মল্লিকার দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, 'জানেন ত ও আমার বিয়েতে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করেনি।'

—জানি। মল্লিকা মাথা নেড়ে হাসল একটু, 'আগেও বলেছেন।'

—বলেছি নাকি। তা বলে থাকতে পারি। হয়তো আরও শ'খানেকবার বলবো চূড়ান্ত অভদ্রতা করেছে পুষ্প কিন্তু। সরোজ সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

—আমি কিন্তু আপনাকে আমাদের বাড়িতে আসতে নেমন্তন্ন করছি। মল্লিকা রুমাল দিয়ে কপাল মুছল, 'কবে আসছেন—?'

—যাবো।

—তবে তুই-ই পরশু আর না, সরোজ। পুষ্প উঠতে উঠতে বললে।

—হ্যাঁ, তাই ভাল। পরশুই আপনি আসুন নিশ্চয়ই। রান্নাবান্না করে রাখবো, যদি নষ্ট হয়, তবে—। মল্লিকাও হাসিঠোঁটে অন্তরঙ্গ সুরে বললে। ভ্রূভঙ্গি করলে একটু।

ফটো দুটো পকেটে করেই গেল সরোজ ঠিক দিনটিতে। সন্ধ্যে বেলা। দুটো ছবিই চমৎকার উঠেছিল। গুণী লোক সরোজ। চমৎকার না হয়ে উপায় কি। তবু নিজের হাতের গুণের কথা একবারও বললে না। বার বার মল্লিকার প্রশংসা করলে। ফাইন ফটোফেস্; ক্যামেরা কন্‌সাস্ নয় এক বিন্দুও। মনে হয় না ছবি তোলাচ্ছে মল্লিকা, মুখের সামনে ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। আশ্চর্য স্বাভাবিক সহজ এলোমেলো ভঙ্গি। যেন মনে হয় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, কিংবা একটা পাখি কী ফুল দেখছে। অথবা আনমনা হয়ে ভাবছে যেন কিছু, কোন কথা।

যাও-বা একটু দ্বিধা ছিল প্রশংসা শুনতে শুনতে তাও কেটে গেল। নিজের অ্যালবামের খাতা দুটো বের করে দিল মল্লিকা। বললে, দেখুন বসে বসে।

দেখল সরোজ। এবং পাশে বসে বসে পুষ্পও। একটি একটি করে পাতা উল্টে যাচ্ছিল সরোজ। ভাল মন্দ মন্তব্য করছিল। তবে যার ফটো তাকে নয়, যে তুলেছে তাকে। আর আশ্চর্য হচ্ছিল সরোজ, অদ্ভুত লাগছিল তার, দুটো অ্যালবাম খাতার প্রায় সবকটি পাতা জুড়ে শুধু মল্লিকার ছবি—একা মল্লিকার, আর কারুর নয়। ছেলে বয়সের মল্লিকা থেকে ফুলশয্যার মল্লিকা; পাঁচ বছর বয়স থেকে বাইশ বছরের মল্লিকা। ফ্রক পরা বিনুনি ঝুলনো মেয়ে পুতুল হাতে দাঁড়িয়ে, ফুলের টবের পাশে কোনোটা, কখনো স্কুল যাচ্ছে, কোনটা বা বালিশ বুকে কিশোরী মেয়ে গালে হাত দিয়ে মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে। এমনি সব। আরও অনেক। কিশোরী থেকে যুবতী। বটানিকসের বাগানে, গঙ্গার জেটিতে, রাঁচির কোন ঝরনার পাশে, ফুলের গা জড়িয়ে, পাতার ঝোপের মধ্যে, গাছের ছায়ায়। নিজের জীবনের টুকরো টুকরো ছবিগুলো আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে, একটি মেয়ের ইতিহাস যেন। এবং সম্পূর্ণ একার।

—তোর বউয়ের তো ফটো তোলানোর শখ বড়। বললে সরোজ।

—হ্যাঁ, ওই এক নেশা। পুষ্প কেমনতর এক হাসি হাসল।

মল্লিকা এল। অ্যালবাম দুটো তুলে নিয়ে শুধোলে, 'কেমন দেখলেন?'

—চমৎকার। শুধু আপনার ছবিই!

—আর কার থাকবে? মল্লিকা উজ্জ্বল চোখে তাকাল। গলার স্বরটা একটু ধারাল।

—তা ঠিক! সরোজের সন্দেহ হলো বেফাঁস কোন কিছু বুঝি বলে ফেলেছে। চালাক ছেলে, কথাটা ঘুরিয়ে নিতে একটুও কষ্ট হল না। বললে, 'নিজেকে নিজেই দেখা ভাল। যত বয়স বাড়বে ততই এই পিছু ফেলে আসা দিনগুলোর ছবি ভাল লাগবে, কত কথা মনে পড়বে।' সরোজ বেশ সহজ করে নিল অবস্থাটা।

মনে হলো খুশী হয়েছে মল্লিকা।

এরপর মল্লিকাকে খুশী করার জন্যে সরোজ একটা আকর্ষণ বোধ করবে আর মল্লিকা হঠাৎ প্রজাপতির মতন লঘু চপল বর্ণবহুল রূপটিকে খুলে মেলে ধরতে চাইবে দিনে দিনে, এটা ওরা কেউই ভাবে নি। না সরোজ, না পুষ্প। মল্লিকাও নয় বোধহয়।

এতোটা হাল্কা ছিল না মল্লিকা। ওর চলা ফেরায়, কথা বলায় সংযত একটা ভঙ্গি ছিল। কেমন একটা বেড়া ছিল কোথাও। জোরে কথা বলত কদাচিৎ, খিলখিল হাসি হাসতে হঠাৎ যদি শুনে থাকে কেউ। নয়ত একটু গম্ভীরই ছিল ও, সাজ পোশাকে শিষ্টতা ছিল। মেলামেশা ছিল না বড় একটা। একা একা নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে রেখেছিল মল্লিকা।

সরোজ আসার পর গত দুমাস ধরে একটু একটু করে, আস্তে আস্তে সব যেন মিলিয়ে আসছে। এখন মেলামেশা বেড়েছে। বেশ বেড়েছে। যদিও সেটা সরোজের সঙ্গে। আজকাল দিব্যি সামনা সামনি বসে ওরা গল্প করে। হাসিতে ঢেউ তুলে তুলে। কখনো রাগ, কখনো অভিমান। চপলতাও প্রকাশ করে ফেলে। ভাল করে সাজে, রঙ বদলে বদলে শাড়ি ব্লাউজ পরে, খোঁপার ছাঁদ বদলায়, কাজল দেয় চোখে, তিল আঁকে চিবুকে। তা ছাড়া আরও আছে। হৈ হুট্ করে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। পুষ্প থাকল, থাকল; না থাকল তো নয়। আজ আউটরাম ঘাট, সূর্য যখন ডুবছে তখন সেই পড়ন্ত বেলায় ছবি তোল একটা। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় জলে পা ডুবিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকলে সেই সময়ের ফটো। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে, ঘাসে শুয়ে।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা পুষ্পর চোখে একটু আধটু দিসদৃশ ঠেকলেও তেমন মারাত্মক বলে মনে হয় নি। পুষ্প ভেবেছিল এই হঠাৎ আতিশয্য এবং উন্মাদনা বেশি দিন থাকবে না মল্লিকার। সরোজও সৌজন্যতার টিলে রাশ সামলে নেবে। কাজেই চুপ করে থাকাই ভাল। তা ছাড়া কি বলবে মল্লিকাকে এ সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে; বললেও কি ভাববে ওরা পুষ্পকে। কাজেই পুষ্প চুপ করে ছিল। এবং চুপ করে আড়ালে থেকেই দেখছিল সব।

পরে পুষ্পর মনে হতে লাগল, ওরা—মল্লিকা আর সরোজ, তার স্ত্রী এবং তার বন্ধু পরস্পরের সঙ্গে যতটুকু শিষ্ট, সহজ, সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখলে শোভন হতো, বলার কিছু থাকত না, আপত্তি করার কথাই উঠতো না তার অনেক বেশি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং জটিল অবস্থা গড়ে তুলেছে। তুলছে। হ্যাঁ, সোজাসুজি স্পষ্টাস্পষ্টি না হলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইঙ্গিতে আভাসে কথাটা এরপর তুলতেই হলো পুষ্পকে। মৃদু, ক্ষীণ অভিযোগ জানাতে হলো।

আর মল্লিকার মনে হলো তার স্বামী অত্যন্ত ইতর একটা সন্দেহ মনে পুষছে। নানা রকম নোঙরামি, গোঁড়ামি। এ-রকম হয়। এসব লোকের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে সংকীর্ণতার অজস্র পোকা কিলবিল করে ঘোরে; তার আকাশটা আকাশ নয়, ঘরের ছাদ—যেখানে হাত-পা মেলার অবকাশ নেই, মন ছড়িয়ে দেবার মত স্থান কিংবা খাওয়াদাওয়া, ঘুম আর ঘর, কাছারির প্রাত্যহিক অভ্যাস ছাড়া আর কিছু, অন্য কিছু যা ভালো লাগাতে পারায়, ভালো লাগায়, স্বপ্ন, সুখ, খুশী আনন্দের জন্যে মনকে মিহি করে গুনগুনিয়ে রাখে।

—আমার নিজের একটা ভালো লাগা আছে। মল্লিকা বললে, গলার স্বরটা মৃদু হলেও কঠিন।

—আমি কি অস্বীকার করছি। পুষ্প শান্ত গলায় জবাব দিল, 'তোমার যা ভাল লাগে তুমি করো। কিন্তু দৃষ্টিকটু ঠেকে এমন কিছু না-ই বা করলে।'

—দৃষ্টিটা সকলের সমান নয়; চোখের দোষও থাকতে পারে কারুর। মল্লিকার ডাগর চোখে আগুনের হল্কা। ঠোঁটটাও কাঁপছিল।

—ওসব তর্ক করো না। পুষ্প অসহিষ্ণু, অধৈর্য হচ্ছিল ক্রমেই। গলার স্বর পালটে যাচ্ছিল। বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠেই বললে, 'সিনেমা-থিয়েটারের মেয়েদের মতন অর্ধেক গা খুলে ফটো তোলানোটা সুরুচির পরিচয় নয়।'

চমকে উঠল মল্লিকা। পা দুটো কেঁপে গেল একবার। কেমন একটা চূড়ান্ত উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ পাথরের মতন ভার লাগল। আর মনের মধ্যে ভাবনাচিন্তাগুলো হঠাৎ থেমে যাওয়া রেলগাড়ির মতন থমথম করে উঠল। একটুক্ষণ এইরকম। তারপর নির্বাক, নিস্পন্দ মল্লিকা ঝোড়ো বাতাস লাগা শীর্ণ গাছের মতন থরথরিয়ে উঠল। আর চোখের পলকে তার চেহারাটা খোপাটে হয়ে উঠল, চোখ-মুখ কথাবার্তায় অসহ্য ঝাঁঝ, বিশ্রী রকম ভঙ্গি।

—গা খুলেই আমি ছবি তোলাব—তোলাব। আমার গা আছে। যেমন তীক্ষ্ণ মল্লিকার গলার স্বর, তেমনি তীব্র তার দৃষ্টি।

—আছে বলেই একটা রাস্তার লোক দুবেলা এসে চোখে তাই চাটছে। পুষ্পর বেঁকা ঠোঁটে ধারাল ব্যঙ্গ। বলতে বলতে মুখটা ও অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল।

থতমত খেয়ে একটুর জন্যে চুপ করে পরক্ষণেই জবাব দিল মল্লিকা, 'তার চোখ তোমার মতন নয়।'

—তাই নাকি, সরোজের চোখে বুঝি ঠুলি পরানো আছে? পুষ্পর ধারাল হাসি মল্লিকার গা যেন ছুরি দিয়ে চিরে দিল।

ঘর ছেড়ে চলে গেল পুষ্প। তার আর সহ্য হচ্ছিল না।

মল্লিকা আস্তে আস্তে গিয়ে বিছানায় বসল। বসেই থাকল। বুকটা জ্বলছিল, টনটন করছিল কণ্ঠার কাছটা। বালিশ টেনে বুকে চেপে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল অবশেষে।

তারপর একটু একটু করে যখন ছোবল তোলা মনটা খানিক গুটিয়ে এল, নিস্তেজ হলো তখন একটা কথাই বেশি করে মনে পড়ছিল মল্লিকার এবং ও ভাবছিল। পুষ্প অবশ্য বিশ্বাস করেনি, বিদ্রূপ করেই বলেছে, সরোজের চোখে কি ঠুলি পরানো আছে? মল্লিকা কিন্তু জানে, ঠুলি পরানো না থাকলেও সরোজের চোখে অন্য জিনিস মাখানো আছে। কি বলবে তাকে মল্লিকা, কি নাম দিতে পারে? হ্যাঁ, এক রকম ভাবে বলা যায়, সে চোখ ক্যামেরার লেন্স। জায়গামতন যা শুধু আলো-ছায়াকে বিচিত্র আশ্চর্য রহস্যের যাদু মাখিয়ে ধরতে পারে। সরোজ তাই। মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি, নদী, সকাল-সন্ধ্যে, ফুল-পাতা, এ সবের মধ্যে যে আশ্চর্য রূপটি লুকিয়ে রয়েছে, ধরা দিয়েও আড়াল দেওয়া রহস্য, অন্যের চোখে যা পড়ে না পড়বে না, সরোজ টুক্ করে এক লহমায় সেইটিই তুলে নেবে। সে ক্ষমতা তার অসাধারণ; অনন্য-সাধারণ পটুত্ব। এর কম বা এর বাইরে কি আর-কিছু সরোজ? মল্লিকা ভেবে পায় না, ভাবতে চায় না। লোকটা তার কাছে মূল্যবান একটা ক্যামেরা ছাড়া আর কি! আর মল্লিকাকে, মল্লিকার জীবনের এই টলমল, কূলভরা যৌবনের নানা মুহূর্তকে সে শুধু ধরে দেবে কাগজে, সাদা-কালোয়, কদাচিত রঙেও। শুধু মন দিয়ে কতটুকু আর মল্লিকা ধরতে পারে, অসংখ্য মুহূর্তের কটিকেই বা! শুধু

সেজন্যেই সরোজ। এছাড়া, বলতে কি, ওই একটিমাত্র মানুষ, যে পাকা ডুবুরীর মতন ওর দেহ-মনের সমুদ্র থেকে আশ্চর্য আশ্চর্য রত্ন উদ্ধার করে আনতে পারে। মল্লিকা নিজেই জানে না যা, কল্পনাও করতে পারে না, সরোজ পলকে তাই ছোঁ মেরে তুলে ধরে। হ্যাঁ, ওই পারে, কাল-বৈশাখির ঝড় উঠলে হঠাৎ বেহালার এক মাঠে আলুথালু গাছপালা আর ডানা ঝাপ্টানো বক পাখির দল যখন হাওয়ার গতিতে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, তখন এলোচুলে কিলবিল করা কপাল-গলাকে একটু বেঁকাভাবে উঠিয়ে দিতে, আকাশ-মুখী চোখ করিয়ে আশ্চর্য একটি ছবি তুলে নিতে। যার প্রোফাইলে সেই আসন্ন ঝড়ও থমথম করে। সে মুখের চোখ দুটির পাতাও যেন বক পাখির চঞ্চল ডানার ব্যাকুলতাটুকু মেখে নিয়েছে। এমনি সব, কত কি। সেদিন যেমন দমদমের দিকে বেড়াতে গিয়ে এক ফাঁকা বাগানবাড়ির ঝিলের জলে সরোজ একটা ছবি তুলল। শালুক, পদ্ম ফুটেছিল জলে, পাতা খড়-কুটো ভাসছিল। সরোজ বললে, জলে নামো। একটা ডুব দিয়ে নাও। তারপর ওঠো, শুধু ভেজা মাথাটুকু ভাসিয়ে রাখো জলে। পড়ন্ত বেলার রোদ আছে, ছায়াও। আমি আর একটা জলজ কুসুমের ছবি তুলে নি। জলে নামল মল্লিকা। ছবি উঠল। দেখে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না। সত্যিই অপূর্ব সুন্দর একটি জলজ পুষ্প হয়ে ফুটে উঠেছে মল্লিকা। কী কোমল, মসৃণ আর স্নিগ্ধ সজল।

বলতে কি, মল্লিকাকে যে এমনি করে নিত্য নতুন রূপে আবিষ্কার করছে এবং সেই আবিষ্কারের ফলটুকু দিয়ে ধন্য করছে মল্লিকাকে, তৃপ্ত করছে, তাকে মল্লিকা আর কি ভাবতে পারে এক আলো বা এক যাদুকর ছাড়া। হ্যাঁ, তাই। কতো না অন্ধকার, অদৃশ্য গুহাশিল্পের মধ্যে খুঁজে খুঁজে সরোজ আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে দপ্ করে; উদ্ভাসিত হয়ে গেছে বিচিত্র কারুকর্ম মল্লিকার, মল্লিকার দেহবল্লরীর, অন্তরের অঢেল ঐশ্বর্য। যাদুকরের মতন ওই মানুষটি মল্লিকার চোখে মল্লিকারই চোখ, গলা, চুল, কপাল, স্তন, কটি, বাহুর কত না যাদুকে উন্মোচিত করে মুগ্ধ করে দিয়েছে তাকে। এবং মোহিত হয়েছে নিজেও।

রাস্তার লোক এসে তাই চাটছে—স্বামীর কথাটা মনে পড়ল আবার মল্লিকার। সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য ঘৃণায় মুখটা বিকৃত করে উঠল ও। ছি, ছি, কী ইতর পুষ্প। তার নিজের চোখে যেহেতু ভিখিরীর মত দীনতা, পশুর মতন বিশ্রী ক্ষুধা, যৌবনে যার ক্লান্তি নেই, জুড়ি নেই এবং যার চোখ শুধু ধবধবে মাংসর নরম মসৃণ স্পর্শটুকু নিয়ে রক্তের মধ্যে তপ্ত উন্মাদনায় ইন্দ্রিয় নিচয়কে শুধু টঙ্কার দিতে চায় সেই লোক অন্যকে বলে, বলেছে চাটছে, গা চাটছে মল্লিকার। আসলে গা চাটছে মল্লিকার কর্কশ জিব দিয়ে ওই লোকটা, যে তার, তার জীবনে হঠাৎ স্বামী হয়ে এসে পড়েছে।

মল্লিকার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল এবার। ভাবতে ভাবতে। তার কথা, সরোজের কথা এবং স্থূল রুচি, নিম্ন-দৃষ্টি, অতিসাধারণ এক স্বামীর কথা ভেবে। লোকটার নিজের চোখেই ঠুলি আঁটা এবং একটি কচ্ছপের মতন যে নিজের ভক্ষ্যবস্তু ছাড়া আর কিছু বোঝে না, বর্ণ, গন্ধ, রূপ, রঙ, স্বাদ নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে ক্ষমতাও নেই।

চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টি, তাকিয়ে তাকিয়ে পালঙ্কের কোণে ব্যাটম থেকে ঝোলান ছোট্ট বেড্সুইচটা দেখছিল মল্লিকা। আর অন্যমনস্কভাবে হাত তুলতে চাইছিল সুইচটা ধরবার জন্যে। অন্ধকারে একঘর আলো দপ্ করে জ্বালিয়ে দিতে পারে ওটাও।

স্বামীকে এরপর মল্লিকা ঘৃণাই করতে শুরু করেছিল। তার হাবভাবে দিন দিন অবহেলাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। যেন কিছুই আসে যায় না মল্লিকার, পুষ্প কি ভাবল আর না ভাবল, বলল কি না বলল। ও ওর মতনটি করে থাকবে, খুশি মত।

মল্লিকার উপেক্ষা পুষ্পর আরও অসহনীয় হয়ে উঠছিল। অভিযোগ বাড়ছিল। আর আগের মতন মুখ বুজে থাকতে পারত না পুষ্প। বলত, বলে ফেলত। কথা কাটাকাটি হ'ত স্বামী-স্ত্রীতে। কলহ, মন কষাকষি লেগেই ছিল। যেন ওদের মধ্যে কেউই আর অন্যকে সহ্য করতে পারছে না।

পুষ্প একদিন বললে, সরোজকে সে তার বাড়ি আসতে নিষেধ করে দেবে। জবাবে মল্লিকা জানাল, সরোজের দোকানের দরজাটা তো আর বন্ধ হয়ে যাবে না, আর মল্লিকা খোঁড়া হয়েও যায়নি।

আর একদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বড় রকমের এক ঝগড়া হয়ে গেল মল্লিকার এক ছবি নিয়ে। ড্রেসিং টেবিলের এক পাশে কোণাকুণি করে রেখেছিল ছবিটা মল্লিকা। চোখে পড়তেই ফ্রেমসমেত ছবিটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল পুষ্প।

—ওটা ফেলে দিলে যে বড়! মল্লিকা দপ্ করে জ্বলে উঠে কৈফিয়ৎ চাইল।

—বেশ করেছি। ভদ্রঘরের বউ তুমি, বেশভূষার একটা শ্রী থাকবে তোমার। কী ছবি ওটা—মাথায় নেই ঘোমটা, সিঁথির দাগটুকু পর্যন্ত না। চুড়ো করে চুল বেঁধে ফুল গুঁজেছো। গলায় মালা। দেখলে গা ঘিন ঘিন করে।

—করুক। আমার ছবি; আমি রাখবো মল্লিকা ছবি কুড়োতে যাচ্ছিল।

পথ আগলাল পুষ্প।

—না। ও-ছবি কিছুতেই তুমি রাখতে পাবে না। পুষ্প চিৎকার করে উঠল।

মল্লিকা তবু পথ করবার চেষ্টা করলে। পুষ্প কঠিন মুঠোয় হাত ধরে ফেলল মল্লিকার।

—ছাড়ো! থর থর করে কাঁপছিল মল্লিকা।

—না। এ ঘর তোমার একার নয়, আমারও। পুষ্পের সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছিল, 'ছবি যদি রাখতেই হয়, একা তোমার নয়, দু-জনের ছবিই রাখতে হবে। তোমার আমার দুজনের।'

মুঠো আলগা করলে পুষ্প। ভীষণ-ভাবে চমকে উঠে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে গেল মল্লিকা। চোখ তুলেই পরক্ষণে নামিয়ে নিলে। একটু পরে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেল।

ভুলল না পুষ্প কথাটা। বরং ভেবে দেখলে এটা একটা চমৎকার বিদ্রূপ হবে। সরোজ আর মল্লিকার চোখের সামনে বিষ কাঁটার মতন বিঁধে থাকবে তাদের যুগল-মূর্তি। পীড়া দেবে ওদের। মানসিক অস্বস্তি বোধ করবে দু'জনেই।

যতই ভাবছিল ততই একটা ইতর আনন্দ মনটাকে উত্তপ্ত করছিল। ক্ষুরধার কেমন এক প্রতিহিংসা ধিকিধিকি করে জ্বলছিল চোখে। আর পুষ্প ভাবছিল, যদিও নাটকীয় হল তবু পরিহাসটা চমৎকার। সরোজের স্টুডিওতে তোলা পুষ্প-মল্লিকার যুগল ছবিই এখন ওই নতুন প্রেমিক-যুগলের অনেক গোপন একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্তকে নিঃশব্দে বিদ্রূপে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দেবে।

কিন্তু আশ্চর্য ফটোটা এবারও পাওয়া গেল না। মল্লিকার কথায় বিশ্বাস না করে পুষ্প নিজেই সব জায়গা হাতড়াল। বাস্তবিকই ছবিটা নেই। কোথাও নেই। মল্লিকার অ্যালবামে এবারও তার জায়গা হয়নি।

পুরো একটা দিন নিজের মধ্যে জ্বলে-পুড়ে মরেছে পুষ্প এরপর। তারপর কোথাও যেন একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেয়ে হঠাৎ চুপ করে গেছে। আর আশ্চর্য এই যে, যতখানি দাঁত নখ বের করে হিংস্র উন্মত্ত হয়ে ও এগিয়ে এসেছিল মল্লিকার কাছাকাছি—সব অকস্মাৎ গুটিয়ে নিয়ে অদ্ভুত শান্ত এবং নিস্পৃহ হয়ে ও সরে গেল; দূরে সরে থাকল।

পুষ্প-মল্লিকার সংসারের আবহাওয়াটা শান্ত হয়ে এল আবার। অদ্ভুত ধরনের এক নিঝুম নিস্তব্ধতা। যেন একজনের অস্তিত্বটা শবের মতন পড়ে আছে, আর একজন ঘুমিয়ে, গাঢ় ঘুমে।

এক বৃষ্টির দিনে, বাইরে বারি ঝর ঝর, আকাশে শ্লেট রঙ, গাছপালা ভিজছে, কাক চড়ুইয়ের দল ভেজা পালক ঝাড়ছে, সন্ধ্যে নেমেছে—এমন সময় ও-বাড়ির শান্ত আবহাওয়া হঠাৎ দু-টুকরো করে কেউ যেন কেটে নিল। গাঢ় ঘুম থেকে চোখ মেলে মল্লিকা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। সেই আর্তনাদ, তীক্ষ্ম এবং করুণ গোঙানি, ভীত ব্যাকুল প্রশ্নগুলো ঘরের বাতাসে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। না, পুষ্প বাড়ি ছিল না। সরোজ ছিল। সামনেই। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছিল। কাঁধে স্ট্র্যাপে বাঁধা ক্যামেরাটা ঝুলছে। খাপ খোলা তলোয়ার নয়। খাপে বন্ধ। যাবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে ছিল সরোজ।

মল্লিকা তখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না পুরোপুরি। পাংশু মুখ, অসংবৃত বসন, জল উপচে পড়েছে চোখ বেয়ে। দৃষ্টি ঝাপসা। গলা কাঁপছিল, গা কাঁপছিল, নিশ্বাস দ্রুত।

—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! ভাঙা কান্না জড়ানো স্বর মল্লিকার।

—আগেই তোমার বুঝতে পারা উচিত ছিল। সরোজ অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

অসম্ভব চাপা সুরে কথা বলছিল সরোজ।

—পারিনি। মনেও হয় নি। অন্য কিছু ভেবেছিলুম। কিন্তু ও কথা থাক্। সত্যিই কি আর তুমি আসবে না?

—না।

—আমার ছবি?

—আমি পারবো না। সরোজের কথাটা রূঢ় ভাবে কানে বাজল। কিন্তু সরোজ সত্যিই আর তাকাতে পারছিল না মল্লিকার দিকে, মল্লিকার দেহের দিকে। একটা বিস্বাদ স্পর্শ যেন এক তাল ছায়া হয়ে পড়ে আছে ওই শরীরে। যাদুকরের চোখ সরোজের। ধরে ফেলেছে। জেনে ফেলেছে। ওর ক্যামেরার লেন্সটা ঘোলাটে হয়ে গেছে সেই মুহূর্তে। ছবি আর ধরা পড়বে না সরোজের ক্যামেরায়।

—চলি। সরোজ পা বাড়াল।

—আর ত আসবে না। মল্লিকা ককিয়ে কেঁদে উঠল।

—প্রয়োজন কি। সরোজ মুখটা নিচু করেই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। বাইরে তখনও ঝির ঝির বৃষ্টি, দমকা হাওয়া। তার কেমন এক নিঃশব্দ অনুভূতির স্পর্শ মাখানো।

বিছানায় উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল মল্লিকা। সারা গা সেই কান্না মেখে অসহায় ভাবে বালিশে, তোশকে চাদরে মিলিয়ে রইল। বাইরে বৃষ্টি ঝরে গেল, হাওয়া বয়ে গেল, সন্ধ্যে শেষ হয়ে রাত এল।

বাতি জেলে দিল না মল্লিকা ঘরের। অন্ধকারেই চুপ করে শুয়ে থাকল। সমস্ত কিছুই এখন তার অসহ্য লাগছে। এই ঘর বাড়ি, বালিশ, বিছানা, ঘড়ির টিকটিক। আর মল্লিকা বুকের মধ্যে তুষের আগুনে জ্বলছিল। সর্বস্ব তার বিকিয়ে গেছে। নিঃস্ব এবং রিক্ততার দুঃসহ ভার পাকে পাকে বেঁধে ফেলছে। মল্লিকা ভাবেনি, কল্পনাও করে নি—এ ভাবে সে ব্যর্থ হয়ে যাবে, যেতে পারে।

আরও কিছু সময় ভেবে ধীরে ধীরে উঠল মল্লিকা। প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে তাকে নিজেকে বাঁচাবার। বাইশ বছরের যৌবনকে পোকায় কেটে হতশ্রী বিবর্ণ করবে, কখনোই তা সহ্য করবে না মল্লিকা।

শরীরটা দ্রুত ভাঙতে বসেছিল। খাওয়া দাওয়া ঘুম গেল। উগ্র একটা রুক্ষতা ফুটল মুখে চোখে। গলার স্বর হলো কর্কশ। আর মল্লিকা থেকে থেকে হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠত। জ্ঞান হারাত। রাত্রে তন্দ্রার মাঝে উঠে বসে বিবশ বসনে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াত। আলো জ্বালত। আর দেখত নিজেকে। দেখে দুহাতে চোখ ঢেকে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠত।

খবর পেয়ে মা এলেন, জামাইবাবু, দাদা বৌদিরা। ডাক্তার দেখায় নি পুষ্প। কথাটা ও নিজের থেকেই বললে। ও'রা আঁতকে উঠলেন। পুষ্প জবাব দিল, মল্লিকা সেটা পছন্দ করতো না। তা ছাড়া—?

কি তা ছাড়া? ও'দের প্রশ্নের সাফ জবাব দিল পুষ্প, মেয়েকে আপনারা আপনাদের কাছেই নিয়ে যান। যা ভাল বুঝবেন করবেন। সেটাই ভাল হবে।

বাপের বাড়িতে এসে মল্লিকা আরও স্পষ্টাস্পষ্টি ধরা পড়ল। সকলের চোখে, সকালের কাছে।

ডাক্তার, ঔষুধ পত্র, টনিক, ডায়েট, কোনও কিছুরই ত্রুটি ঘটল না। তবু শেষ পর্যন্ত একটা বিশ্রী রকম অসুখে বাঁধিয়ে বসল

মল্লিকা। এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ করাতে হল। নিজের শক্তি ছিল না মল্লিকার।

দীর্ঘ দু মাস শুধু বিছানায় একভাবে শুয়েই সকাল সন্ধ্যে কেটে গেল। ভাল করে দেখবার ডাকবার মতন হুঁশই ছিল না মল্লিকার—প্রথম তিন চার সপ্তাহ। তারপর একটু একটু করে সূর্যের আলো চোখে পড়তে লাগল, খানিকটা আকাশ। জানালা দিয়ে কখনো মেঘ, কখনো পাখি, কখনো তারা দেখে দেখে মল্লিকার মনের কুয়াশা কেটে আসতে লাগল ধীরে ধীরে। একটি দুটি কথা ফুটল ঠোঁটে, দু এক ঝিলিক হাসি কখনো বা চুপিসারে গানের কলির গুনগুন।

সেদিন পুষ্প এসে মাথায় কাছটিতে বসে। দেখলে, মল্লিকার চুল একটি লম্বা বিনুনী করে বাঁধা। সিঁথিতে নতুন করে সিঁদুর ছোঁয়ান। মুখটায় বুঝি একটু পাউডার বুলিয়ে দিয়েছে বৌদিরা। চোখের কোণে কালিমা থাকলেও দৃষ্টিটা স্বচ্ছ, যদিও করুণ।

প্রথম একটা দুটো কথার পর খানিকটা চুপ ছিল দুজনেই। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে মল্লিকা শুধলো, 'আমি তো দেখতেই পাইনি। আমার কাছে রাখেই নি। তুমি দেখেছো?'

—দেখিছি। পুষ্প মুখ নিচু করে চোখের তারা তুলে মৃদু কণ্ঠে বললে।

—শুনলাম দিন বারো বেঁচেছিল। মল্লিকা পুষ্পর মুখের দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ বারো দিন।

আবার একটু চুপ।

—কেমন দেখতে হয়েছিল ছেলেটা? মল্লিকার গলায় আগ্রহ।

এবার স্ত্রীর মুখে একটুক্ষণ চোখ রেখে কেমন এক অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পুষ্প। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ও।

—আসছি। পুষ্প ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। হাতে অ্যালবামের খাতা।

খাতাখানা দেখেই চমকে উঠল মল্লিকা।

—ওটা এখানে—? অস্ফুট কণ্ঠে কি যেন বলতে গিয়েও পারল না মল্লিকা।

—তোমার ব্যবহারের জিনিষ সবই এ বাড়িতে। পুষ্প সামনে এসে দাঁড়াল।

আস্তে আস্তে পাতা উল্টে, শেষ পাতাটি খুলে পুষ্প অ্যালবামটি বাড়িয়ে ধরল।

মল্লিকা ভয়ে ভয়ে, বিহ্বল দৃষ্টিতে হাত বাড়িয়ে নিল অ্যালবামটা। আর তাকাল।

মাংসের গোলগাল একটি ছায়া অ্যালবামের একটি গোটা পাতা দখল করে পড়ে আছে।

মাংসপিণ্ড, হাত, পা আছে—মুখও। কিন্তু নিছক একটি মানবশিশুর আভাস, স্পষ্ট অবয়ব নয়।

মল্লিকা তবু মুখের একটা আদল খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিল। চোখের ভুরুতে, ঠোঁটে, নাকে। এবং মল্লিকার চোখে পুষ্পর মুখের একটু আদল যেন ধরা দিচ্ছিল।

কে তুলেছে ফটোটা, কবে, কত দিনে জিজ্ঞেস করবার জন্যে চোখ তুলে মল্লিকা দেখে পুষ্প নেই। কখন নিঃশব্দে চলে গেছে। ঘরে ও একা। একেবারেই একা।

অবাক চোখে এদিক ওদিক তাকাল মল্লিকা। কেউ নেই। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। অ্যালবামের ছবিটার ওপর আবার চোখ পড়ল। হাত রাখল মল্লিকা। হাত সরাল আবার। একটি পাতা উল্টে গেল। মল্লিকার ছবি, শেষ ছবি সরোজ যেটি তুলেছিল। আর একটা পাতা উল্টে ফেলল মল্লিকা, তারই ছবি, সরোজ তুলেছিল। একটি একটি করে পাতা উল্টে গেল মল্লিকা। নিজেকে, শুধু নিজেকেই দেখল নিজের ক'টি বছরকে, একান্ত নিজস্ব জীবনটিকে।

অন্য অ্যালবামটা কাছে নেই। দেখার দরকারও নেই। মল্লিকা জানে, তাতে কি আছে। একা—শুধু একা মল্লিকাই আছে। তার পাঁচ থেকে আঠারো কি কুড়ি বছরের নানারূপ, নিজেকে ধরে রাখার, দেখার সুযোগ। সময় যা কেড়ে নিতে পারেনি। বাকিটা এই অ্যালবামে।

শিথিল হাতে খাতাখানা রেখে দিল মল্লিকা। চোখ দিয়ে দেখার আর কিছুই নেই, মনেই কতো মুহূর্ত বেঁচে আছে এখনও। সেই পাঁচ থেকে এই বাইশ বছরের জীবন, হ্যাঁ, মল্লিকা এ জীবনকে ভালবেসেছিল। নিজেকে। শুধু নিজেকে। নিজের দেহ, রূপ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এবং নিজের আত্মাকেই যা শুধু তার অবয়বে পরিস্ফুট হতে পেরেছিল। আর কাউকে মল্লিকা দেখেনি, দেখতে ইচ্ছেও করেনি। শুধু নিজেকেই দেখেছে, দেখেছে আর মুগ্ধ হয়েছে, নিজের মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। এতকাল নিজেকে ভালবেসেই মল্লিকা সুখী ছিল, ভালবাসতে কাউকে ও চায়নি।

না, মল্লিকার জীবনে, তার পাশে আর কারুর স্থান হতে পারে না। অ্যালবামেও না। আমার গাছের ফুলে অধিকার সবটাই আমার, তোমার না। পুষ্পের ছবি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে মল্লিকা। ওর অ্যালবামে পুষ্পর জায়গাও নেই। হয়নি।

কিন্তু? মল্লিকা চমকে উঠল। চোখ নামাল। দুর্বল হাতটা বাড়িয়ে দিল আস্তে আস্তে। পাশেই পড়ে আছে অ্যালবামটা। হাত রাখল মল্লিকা, আস্তে আস্ত তালু ঘষল আলতো করে। কোথা থেকে কে এল, যদিও মল্লিকা চায়নি, তবু এল, জায়গা দখল করে নিল সেই অ্যালবামে, জুড়ে বসে থাকল। কী দুঃসাহস!

একেও ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দেবে নাকি মল্লিকা? দিতে পারে। কিন্তু অ্যালবামের পাতা থেকে সরিয়ে ফেললেই কি জীবন থেকে সরাতে আর পারবে মল্লিকা! আগেও চেয়েছে, পেরেছে কই! সে ঠিকই এল, জায়গা জুড়ে নিল।

এল যদি তবে থাকল না কেন? মল্লিকা আচমকা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করে চমকে উঠল। তারপর গুমরে গুমরে কাঁদল। কেন থাকল না, জায়গা ত ছেড়েই দিয়েছিল মল্লিকা শেষ পর্যন্ত। হেরে গিয়ে? হ্যাঁ, তাই, তাই, তাই।

তবু থাকল না। বরং এমন আদল রেখে গেল, এমন লোকের যাকে মল্লিকা চরম ঘৃণা করে এসেছে। মল্লিকার হঠাৎ মনে হল, পুষ্প যেন সেই ঘৃণা আর উপেক্ষা-অবহেলার শোধ নিল।

আর মল্লিকা, এখন অ্যালবামটি তুলে নিয়ে কান্না থরথর ঠোঁটে ছুঁইয়ে বুকে বেদনার ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে নিজেকে নিজেই বলছিল, বলতে যাচ্ছিল কি একটা কথা যেন, কিন্তু বলতে পারল না। হঠাৎ এতকাল পরে একটি আশ্চর্য ছবি—না ছবি নয় একটি মানবীর বেদনার হাহাকার হয়ে বিছানার ওপর এলিয়ে শুয়ে থাকল।

সেরাইকেলার ছোউ নৃত্য

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

টাটানগরের পরের স্টেশন সিনীতে নেমে বাসের অপেক্ষায় বসে আছি। ভোর রাত, সবে একটু দিনের আলো দেখা দিয়েছে। দূরে অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণী প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। প্রায় আটটায় বাস আসতেই সামনের আসনে উঠে বসলাম। সাত মাইল পথ, যাত্রা শুরু হলো। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছোউ নৃত্যের দেশ সেরাইকেলায় উপস্থিত হলাম। সেরাই কথাটা মনে হয় সরাইর অপভ্রংশ এবং কেলা যে কেল্লার নামান্তর তাও দু'একজনের মুখে শুনলাম।

ছোউ নৃত্যের উৎপত্তি ও বিবর্তন সংক্রান্ত ব্যাপারে উন্মুখী মন নিয়ে সেরাইকেলায় যাই এবং সেখানে বহু নৃত্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমার এই কথাই মনে হয়েছে যে, স্থানটি বিশেষভাবে নৃত্যের অনুকূল। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কোল, সাঁওতাল, ভূমিজ, উড়াম্, গোয়ালা, কুরমী, তাঁতি প্রভৃতি জাতির পৃথক পৃথক নৃত্য আছে। একই স্থানে এ ধরনের নৃত্যবৈচিত্র্য খুব কমই দেখা যায়। এই নৃত্যগুলি পল্লী প্রান্তরের সহজ আবেষ্টনীর মধ্যে গড়া এবং তাতে সহজ ছন্দের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ছোউ নৃত্যে তার ব্যতিক্রম সহজেই ধরা পড়ে তার দুরূহ ছন্দ, তাল ও পদক্ষেপে। অতএব স্থানীয় পল্লী নৃত্যের ঘনীভূত রূপ যে ছোউ নৃত্যে প্রকাশ পেয়েছে সে কথা বলা কঠিন। তবে পল্লী নৃত্যের স্পর্শ যে ছোউ নৃত্যে একেবারেই নাই সে কথাও জোর গলায় বলা যায় না।

ছোউ নৃত্যের সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে এ নৃত্যে গোষ্ঠীগত বা জাতিগত কোনও সংকীর্ণতা স্থান পায়নি। প্রত্যেকেই সমানভাবে এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। সমাজের অতি নিম্ন স্তরের লোকের সঙ্গে রাজপরিবারের সদস্যদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে এবং এ বিষয়ে তাঁদের মনে কোনও সংশয়ের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। কলানুরাগের এ ধরনের নিষ্কলুশ রূপ সত্যই গর্বের বিষয়।

ছোউ প্রধানত পুরুষ নৃত্য। স্ত্রী-চরিত্র পুরুষ কর্তৃক উপযুক্ত বেশভূষার সাহায্যে অভিনীত হয়। সেরাইকেলার রাজা এ পি সিং দেওর সহিত আলোচনায় জানতে পারলাম যে স্ত্রী-চরিত্র স্ত্রী দিয়ে অভিনীত হওয়ার পক্ষে চেষ্টা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তাঁর কোনও বিদ্বেষ নাই, কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ছোউ নৃত্যের কষ্টসাধ্য আঙ্গিক ও পদক্ষেপ স্ত্রীলোক দ্বারা সম্ভব নয়। রাজা সাহেবের নৃত্যপ্রীতি ছোউ নৃত্যকে বহুভাবে উদ্বুদ্ধ করে এসেছে এবং তাঁর উন্মুক্ত মনের সন্ধান পেয়ে বুঝতে পেরেছি সেরাইকেলার নৃত্য প্রেরণার জনক কে।

ছোউ কথাটার অর্থ মুখোশ এবং তা ছবি বা তদর্থযুক্ত শব্দ থেকে সম্ভবত গ্রহণ করা হয়েছে। মুখোশ যুক্ত নৃত্য হিসেবে ছোউর স্থান সর্বাগ্রে। উত্তর প্রদেশের রামলীলা এবং দার্জিলিংএর প্রেতনৃত্যেও মুখোশের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু সেসব মুখোশে ছোউর মতো উন্নত ও রুচিশীল নির্মাণ পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায় না। কথাকলিতেও মুখোশ আছে বটে, কিন্তু তা পুরোপুরি মুখোশ নয়। মুখমণ্ডলকে "মেক-আপ" সহযোগে মুখোশের মতো রূপ দেওয়া হয়। ছোউ নৃত্যের মুখোশ মাটি ও ন্যাকড়ার সাহায্যে প্রস্তুত এবং চরিত্রের পার্থক্য অনুযায়ী তাতে রং এবং অন্যান্য আভরণ সংযুক্ত করে মনোজ্ঞ করা হয়। ওজনে হাল্কা হলেও এ মুখোশে মুখমণ্ডলের প্রায় সবটা ঢাকা পড়ে এবং সেই কারণেই মনে হয় বেশিক্ষণ ধারণ করা সম্ভব নয়। নৃত্যও সেই কারণে স্বল্পক্ষণস্থায়ী হয়ে পড়ে। ভারতীয় নৃত্যের অন্যান্য শাখায় সময়ের যে ব্যাপ্তির সন্ধান পাওয়া যায় তা ছোউ নৃত্যে সম্ভব নয় এবং আমার মনে হয় তার জন্য মুখোশই দায়ী। অল্প সময়ের মধ্যে একক নৃত্যই হচ্ছে ছোউর ধারা। অবশ্য নৃত্যনাট্য শ্রেণীর অন্তর্গত একাধিক শিল্পী সহযোগে যে সব অনুষ্ঠান আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখি তা ছোউ নাচে যে একেবারেই নাই সে কথা বলা চলে না। শ্রীদুর্গা নৃত্যে একাধিক শিল্পীর আবির্ভাব এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। তবে একথা ঠিক যে ছোউ প্রধানত একক নৃত্য এবং তাতে পুরুষরাই এতাবৎকাল অংশ গ্রহণ করে আসছেন।

এই মুখোশের প্রয়োগ ছোউ নৃত্যে কবে প্রবর্তন করা হয় সে সম্বন্ধে সঠিক কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। রাজা সাহেবের মুখে শুনলাম যে ষোড়শ শতাব্দীতে সেরাইকেলা রাজ্যের ভিত পত্তন হয় এবং সেই সময় থেকেই মুখোশ ব্যবহারের সন্ধান পাওয়া যায়। সেরাইকেলার রাজপরিবার প্রথম থেকেই কলানুশীলনের প্রতি আকৃষ্ট এবং এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে প্রীতির অভাব কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। সত্য কথা বলতে কি, রাজ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

হলে ছোউ নৃত্যের বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। কারণ এ নৃত্যের আঙ্গিক ও উন্নত তালপ্রক্রিয়ার পশ্চাতে যে নিষ্ঠা ও অর্থকরী সহায়তার সম্পর্ক নিহিত রয়েছে তার অভাব হলে সমগ্রভাবে তা নৃত্য সম্প্রসারণে কতটা কার্যকরী হতো বলা যায় না।

রাজপৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধিত হলেও ঠিক কবে ছোউ নৃত্যের উদ্ভব হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খবর পাওয়া যায় না। অনেকের ধারণা শৈব মতের পরবর্তী যুগে ছোউ নৃত্যের প্রবর্তন হয়। শিব পূজার বিধি এ নৃত্য প্রচেষ্টার মধ্যে কিছুটা থাকার দরুণ এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নাচের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে শৈব মতের বাইরেও বহু নৃত্য পরিকল্পনা স্থান পেয়েছে। নাচের প্রধান বিষয়বস্তুগুলি হচ্ছে পরশুরাম, শ্রীরাম, মধুকৈটভ, হরপার্বতী, শ্রীদুর্গা, মহিষাসুর, চণ্ডী, কালী, চন্দ্রভাগা (সূর্যদেবের প্রণয়ী), দুর্যোধন, শ্রীকৃষ্ণ, কালীয়দমন, শিকারী, নাবিক, ময়ূর, সাগর, ফুল বসন্ত এবং আরও কিছু যার নাম সংগ্রহ করতে পারিনি।

এখানে বলা প্রয়োজন যে প্রত্যেক নাচে আলাদা আলাদা মুখোশ প্রয়োজন। চরিত্র অনুযায়ী প্রত্যেকটি মুখোশের চেহারা ভিন্ন এবং এ ধরনের কতো মুখোশ যে ব্যবহৃত হয় তা সঠিক নির্ধারণ করা কঠিন। উপরোক্ত নাচের নামগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পৌরাণিক ও কাল্পনিক বিষয়-বস্তুকে আশ্রয় করে নাচগুলি প্রসার লাভ করেছে। আমার মনে হয় পৌরাণিক গোষ্ঠীর নাচগুলি কাল্পনিক থেকে বেশি পুরাতন। মুখোশ তৈরীর মধ্যেও পুরাতন ও নূতন বিষয়বস্তুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বেশভূষা ও অলংকারের পারিপাট্য নূতন শ্রেণীর মুখোশে রক্ষিত হয় না। অধিকতর নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শেষোক্ত প্রকার মুখোশ তৈরী করা হয়। খবর নিয়ে জানতে পারলাম মুখোশ তৈরী সেরাইকেলার অতি প্রাচীন শিল্প। বংশ পরম্পরায় চলেছে এ শিল্প সৃষ্টির ধারা এবং সৃষ্টিকারদের মধ্যে বেশির ভাগই ব্রাহ্মণ। মৃৎশিল্পের অবদান নিয়ে নৃত্য পদ্ধতির বিকাশ আমার মনে হয় শুধু সেরাইকেলাতেই সম্ভব হয়েছে। রাজা সাহেবের মুখে শুনলাম, মুখোশ প্রথমে কাঠের প্রস্তুত হতো। তারপর সম্ভবত ওজন কমাবার জন্য বাঁশের ফালির ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে এবং তারও পরে লাউয়ের খোলার সাহায্যে মুখোশ তৈরী হতো। বর্তমনে মুখোশ তৈরী হয় কাগজ, ন্যাকড়া ও মাটির প্রলেপ দিয়ে এবং তা ওজনে যথেষ্ট হাল্কা। শিল্পীর যাতে দৃষ্টি বিভ্রম না ঘটে সেই জন্য প্রত্যেক মুখোশে চোখের মণির

ছোউ নৃত্যের সঙ্গে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র

ময়ূর নৃত্যে শুভেন্দ্রনারায়ণ

স্থানটিতে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ছিদ্র করা থাকে।

ছোউ নৃত্যকে অনেকে পল্লী নৃত্যের সমতুল্য মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বহু ঊর্ধ্বে ছোউ নৃত্যের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, পল্লী নৃত্যের সমমাত্রিক ছন্দ এবং একই দেহভঙ্গিমার পুনরাবৃত্তি ছোউ নৃত্যে পুরোপুরিভাবে স্থান পায়নি। নানা ছন্দ, নানা তাল, নানা ভঙ্গিমা ছোউ নৃত্যের প্রাণ। তালের ব্যাপারে ক্লাসিক্যাল সংগীতের পূর্ণ রূপায়ন ছোউ নৃত্যে দেখেছি। নাচের নাম ও তালের প্রয়োগ লক্ষ্য করলেই বিষয়টা সহজ হবে। যথাঃ—আরতি নাচ—সুরফাক তাল (দশ মাত্রা), হরপার্বতী নাচ—দাদরা তাল (ছয় মাত্রা), সবার বা শিকারী নাচ—চৌতাল (বারো মাত্রা), চন্দ্রভাগা নাচ—ত্রিতাল (১৬ মাত্রা), ফুল বসন্ত নাচ—ঝাঁপতাল (দশ মাত্রা), নাবিক নাচ—যৎ তাল (৭ মাত্রা বা ৮ মাত্রা), ভূপতিমনোরঞ্জন নাচ ধামার তাল (চোদ্দ মাত্রা)। শুধু এই নয়, ক্লাসিক্যাল সংগীতের আরও অনেক তালের প্রয়োগ ছোউ নৃত্যে লক্ষ্য করেছি এবং সেই জনাই ছোউ নৃত্যকে ক্লাসিক্যাল গোষ্ঠীর মধ্যে টেনে আনতে আমার একটুও আপত্তি নাই। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে নাচ আরম্ভ হয় যথেষ্ট ঢিমা লয়ে, তখন তালের বোল স্পষ্ট রাখা হয়। কিন্তু তারপর দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ে যখন দ্বিগুণ ও চৌগুণ গতিতে তাল বাঁধা হয় তখন পরন ও ছন্দপ্রধান কতকগুলি কর্তবের অবতারণা করা হয়। সে সব কর্তবের মধ্যে তবলা বা পাখোয়াজের বোলের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না; পাওয়া যায় স্থানীয় বাজনদারদের

খরখাই নদীতীরের শিবমন্দির। চৈত্র মাসে আনুষ্ঠানিক নৃত্যোৎসব এখানেই শুরু হয়

প্রস্তুত বোল যার ছন্দের মধ্যে নাচের ছন্দ নিহিত থাকে।

ছোউ নাচের মধ্যে দু' প্রকারের ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটির নাম ফরিখণ্ডা এবং এতে তরবারি হস্তে অঙ্গ সঞ্চালনই হচ্ছে প্রধান বিষয়। তালের গণ্ডীর মধ্যে এ ধরনের অঙ্গ অসঞ্চালন অতি দুরূহ ব্যাপার। আর একটি হচ্ছে বর্তমানের ছোউ নাচ যাতে ছন্দের মাধুর্য পুরোপুরি আকারে উপযুক্ত বেশভূষার সাহায্যে স্থান পায়।

ছোউ নাচে নূপুর ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু মুখমণ্ডল মুখোশ দ্বারা আবৃত থাকে বলে মুখভঙ্গিমা প্রকাশের কোনও অবকাশ নাই। এই অপূর্ণতা অতিক্রম করার জন্যই মনে হয় দেহভঙ্গিমা ও পদসঞ্চালনের মধ্যে বৈচিত্র্যের বিকাশ হয়েছে। সেরাইকেলার গুণী মহলের ধারণা এ সব দেহভঙ্গিমা ও পদসঞ্চালনের ধারা ভরত মুনিকৃত ভারত নাট্যেরই অনুরূপ। শিক্ষার্থী প্রথমে কতকগুলি প্রাথমিক ভঙ্গিমার সাহায্যে নৃত্য প্রচেষ্টা শুরু করে এবং সেগুলিকে "উপলয়" বলা হয়। এই উপলয়গুলি প্রধানত ভারত-নাট্যমের ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে কতকগুলি ভঙ্গিমা দেখেছি যা পল্লী নৃত্যের সমপ্রাকৃতিক বলা চলে। এই কারণে আমার মনে হয়, পল্লী নৃত্যের ও ক্লাসিক্যাল নৃত্যের আঙ্গিক ছোউ নৃত্যে এমনভাবে মিশে আছে যা সমগ্রভাবে এ নৃত্যকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথেই চালিত করেছে।

ছোউ নৃত্যে নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ বিধেয়—ধাংশা বা নাগারা, ঢোল, চর্চরী বা টোসা, মৃদঙ্গ (শুধু রঙ্গমঞ্চের অনুষ্ঠানে), মুহুরী বা সানাই, শিঙা, মদন-ভেরী, মন্দিরা, করতাল ও বাঁশী। বর্তমানে অবশ্য নানা প্রকারের আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অবিকৃত ধারার পরিপোষক নয়। নৃত্যের সঙ্গে গান করবার রীতি প্রচলিত নাই। নাচের বিষয়বস্তু অনুযায়ী রাগরাগিণী বাদ্যযন্ত্রে বাজে, যেমন ফুলবসন্ত নাচে বাহার। এই ধরনের রাগরাগিণীর প্রয়োগ ছোউ নাচের একটি বিশেষ আকর্ষণ এবং সেই কারণেই ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের পটভূমিকায় ছোউ নাচের বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, উপলয়গুলি আয়ত্ত করতে শিল্পীর ২ থেকে ৩ বৎসর লাগে। কিন্তু পুরোপুরি আকারের শিল্পী হতে হলে তাল ও ছন্দের উপর বিশেষ দখল থাকা দরকার। সময়ের বিচারে তা ৬ বা ৭ বৎসরের কমে সম্ভব নয়।

তাল আয়ত্তের ব্যাপারে পৌরাণিক বিষয়-বস্তুর বাইরে আর যেসব কাহিনী ছোউ নাচে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে স্থান পেয়েছে তার ছন্দ, গতি, ভঙ্গিমা নূতন নূতন পরিবেশের সন্ধান দিয়েছে। এগুলিকে প্রাকৃতিক-বর্ণনার পর্যায়ে ধরা যায়। যথা—ময়ূর, কুরঙ্গ, গরুড়, ভ্রমর, গৃধিনী ইত্যাদি। এইসব নাচে পশু-পক্ষীর চলনভঙ্গি উপযুক্ত আঙ্গিকের সাহায্যে পরিবেশন করা হয়। এই ধরনের দু'একটি নাচ দেখে আমার মনে হয়েছে যে, ছোউ একটি পরিবর্ধনশীল নৃত্যপদ্ধতি এবং তাতে নৃত্যশিক্ষকদের গভীর চিন্তার বিকাশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিরই সন্ধান দিয়েছে।

সেরাইকেলাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ছোউ নৃত্যের প্রয়োগ বহুকাল থেকেই প্রচলিত আছে। চৈত্র মাসের শেষ চার দিন এই নৃত্যানুষ্ঠানের প্রধান সময় এবং এইজন্য ছোউ নাচকে অনেকে চৈত্রপর্ব নামে অভিহিত করেন। উপরোক্ত সময়ের ১৩ দিন পূর্বে নৃত্যানুষ্ঠানের মহড়া শুরু হয়। এই সময়ে ভক্তবৃন্দ শহরের কেন্দ্রস্থিত শিব-মন্দির হতে নির্গত হয়ে খরখাই নদীতটে মাজনা ঘাটের পাশে অবস্থিত অন্য একটি শিবমন্দিরে যায় এবং স্নানান্তে পূর্বোক্ত মন্দিরে একটি পতাকা (নটরাজের প্রতীক) বহন করে আনে। সমস্ত পথটি বাদ্য ও সঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠে। তারপর ভক্ত-বৃন্দ যায় রাজপ্রাসাদে। চৈত্রের ২৫ তারিখ

রাজপ্রাসাদের একাংশ। সম্মুখের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছোউ নৃত্যের চৈত্রমাসিক অনুষ্ঠান হয়

রাজকুমার শুধেন্দ্রনারায়ণ সিং দেও

পর্যন্ত প্রতিদিন চলে এই অনুষ্ঠান। সেই রাতেই শুরু হয় আখড়া-মাড়া বা নৃত্য অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব। রাজপ্রাসাদের একটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে নটরাজের পতাকা প্রোথিত করে তারই সামনে চলে নৃত্যের প্রাথমিক অনুষ্ঠান। আখড়া-মাড়ার রাতে "যাত্রা-ঘটের" আবির্ভাবের সঙ্গে সত্যকারের নৃত্য অনুষ্ঠান শুরু হয়। মাজনা ঘাট থেকে জলপূর্ণ মাঙ্গলিক ঘট বা "যাত্রা ঘট" লাল পোশাক পরিহিত ভক্ত কর্তৃক রাজপ্রাসাদ ও তৎপরে শহরের মধ্যস্থিত শিবমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী চার দিন মঙ্গল ঘট পূর্বোক্ত শিবমন্দিরেই থাকে। যাত্রা ঘটের

ময়ূরনৃত্যে হীরেন্দ্র

আগমনের সঙ্গে সানাই, নাগরা, ঢোল অঙ্গ হিসেবেই পালিত হয়। যাত্রা ঘটের আগমনের পরে যে নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হয়, তাহাই ছোউ নৃত্য নামে পরিচিত। এই অনুষ্ঠানে উচ্চনীচের ভেদাভেদ নাই। সকলেই সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের নাম "বৃন্দাবনী"। প্রথমে বানরাকৃতি একটি মানুষ নাচতে নাচতে শহর পরিক্রমণ করে' রাজপ্রাসাদের নৃত্যভূমিতে আসে এবং তারপর সারারাত্রিব্যাপী চলে ছোউ নাচের আসর। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানের নাম "গরিয়াভর"। এই নৃত্যানুষ্ঠান কৃষ্ণ ও গোপিনীদের বিরহ-মিলনের সুমধুর বিষয়-বস্তু নিয়ে গঠিত। চতুর্থ ও শেষ রাত্রির অনুষ্ঠানের নাম "কালিকা ঘট" বা "কামনা ঘট"। মধ্য রাত্রির পরে আসে এই মাঙ্গলিক ঘট এবং তাতে "কামনা" বা আশার বারি সিঞ্চিত থাকে। অনুষ্ঠান শেষে ঘটটি শহরের মধ্যবর্তী শিবমন্দির প্রাঙ্গণে প্রোথিত করা হয় এবং এক বৎসর সেই অবস্থায় থাকার পর পরবর্তী বৎসরের অনুষ্ঠানের সময় তোলা হয়।

বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে নৃত্য ও সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার প্রয়োগ বিধিবন্ধ আছে এবং এ সকলের মাধ্যমেই ছোউ নাচের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির ভিত বহু পূর্বেই রচিত হয়েছে।

পূর্ববর্তীকালে নিম্নলিখিত প্রখ্যাত শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক ছোউ নাচের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। নারায়ণ দাস, বিদ্যাধর হুজ্জা, উপেন্দ্র বিসওয়াল, নন্দীঘোষ সাহু, দীনবন্ধু ব্রহ্ম, হরিহর সিং এবং রাজেন্দ্র পট্টনায়ক। রাজেন্দ্র পট্টনায়কের সুযোগ্য পুত্র বনবিহারী পট্টনায়ক বর্তমানে পূর্ববর্তী ধারা বহন করে আজও ছোউ নৃত্যকে অবিকৃত রেখেছেন। পট্টনায়ক বংশীয় প্রথম শিল্পী পীতাম্বর তিনপুরুষ পূর্বে উপেন্দ্র বিসওয়ালের সহ-যোগিতায় নৃত্যকেন্দ্র খোলেন। উপেন্দ্র পরে ময়ূরভঞ্জ দরবারে চলে যাওয়াতে তারই ছাত্র রাজেন্দ্রর (উপেন্দ্রর পুত্র) উপর নৃত্যকেন্দ্র পরিচালনার ভার পড়ে। আজ সে কেন্দ্রের অভিভাবক বনবিহারী পট্টনায়ক, কিন্তু নানা কারণে পূর্বেকার সংস্থা বজায় রেখে আজ তিনি কেন্দ্র পরিচালনা করতে অপারগ। রাজেন্দ্র পট্টনায়কই হচ্ছেন ছোউ নৃত্যের প্রকৃত জন্মদাতা এবং তাঁরই প্রভাবে আধুনিককালে ছোউ নাচের অনুরাগ সেরাইকেলার রাজপরিবারে প্রবেশ করে। ক্লাসিক্যাল রীতিতে গঠিত এই ছোউ নৃত্য-পদ্ধতি রাজপরিবারের সহানুভূতি অর্জন করে মহীয়ান হয়ে উঠে এবং তারই আভাস পাই কুমার শুভেন্দ্র, হীরেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র ও শুধেন্দ্র প্রমুখ রাজবংশীয় শিল্পীদের

ঋষ্যশৃঙ্গ নৃত্যে ব্রজেন্দ্র ও কেদার

প্রচেষ্টায়। রাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ সিং দেও সেরাইকেলার কৃষ্টির পশ্চাতে যে সকল ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা সংগ্রহ করে পুস্তক রচনা করেছেন একটি। তাতে ছোউ নাচ সম্বন্ধে অনেক তথ্য স্থান পেয়েছে। রাজপরিবারের চেষ্টায় ছোউ নৃত্য পাশ্চাত্যেও পরিবেশিত হয়েছে এবং সেখান-কার প্রশংসাবাদ পড়ে এই কথাই মনে হয় যে ভারতবাসীর কাছে এ নৃত্যের সমাদর বাড়ার প্রয়োজন আছে।

বর্তমানে বিজয়লক্ষ্মী কলাভবন নামে একটি নৃত্য প্রতিষ্ঠান সেরাইকেলাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার মাধ্যমে স্থানীয় সঙ্গীত ও নৃত্যে প্রগতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিকে পাটনাস্থিত বিহার সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক একাডেমীর সহিত গ্রথিত করা হয়েছে। এখানে শ্রীকেদার-নাথ কংশকার নামে এক নবীন যুবক শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। ইনি ১৯৩৮ সালে ছোউ নাচের বনবিহারী পট্ট-নায়ক প্রমুখ অন্যান্য শিল্পিবৃন্দের সহিত পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন।

শারদোৎসব
মহৎ কর্মের দ্বারা উৎসব সার্থক হয়, দানের
আনন্দ উৎসবকে স্মরণীয় করে তোলে। শত্রুকে
ক্ষমা ও প্রতিপক্ষের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন,
বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, সন্তানকে
সৎ দৃষ্টান্ত ও পিতাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন, মাতাকে
স্বীয় চরিত্রে কৃতার্থ করা ও নিজেকে সম্মান
দান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা উৎসবের
প্রধান অঙ্গ; আর প্রিয় পরিজনের হিতার্থে
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র শারদোৎসবের শ্রেষ্ঠ উপহার।
এই উপহার দানে আপনার আনন্দ,
আপনাকে সেবা করার আনন্দ আমাদের।
হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ।
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস • কলিকাতা-১৩

গোবিন্দবাবু ও মুকুন্দবাবু দুই ভাই একান্নবর্তী ছিলেন। উভয়ে মিলিয়া বহু সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। গোবিন্দবাবুর দুই ছেলে, খগেন ও নগেন। মুকুন্দবাবু নিঃসন্তান।

গোবিন্দবাবু যখন পরিণত বয়সে দেহ-রক্ষা করিলেন তখন খগেন ও নগেন সাবালক হইয়াছে, তাহারা সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইতে চাহিল। খগেন অত্যন্ত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক, সে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে চায়; নগেন ফূর্তিবাজ, সে ফূর্তি করিতে চায়। দু'জনেরই টাকা চাই, খুড়ার হাত-তোলায় থাকিতে তাহারা রাজি নয়।

মুকুন্দবাবু ধার্মিক ও ধীরবুদ্ধি লোক। তিনি ভাইপোদের, বিশেষত ফূর্তিবাজ নগেনকে মনে মনে ভাল বাসিতেন। তিনি তাহাদের সৎপথে থাকিবার উপদেশ দিলেন, তারপর চুল চিরিয়া ভাগ করিয়া দিলেন। কলহ মনান্তর কিছু হইতে পাইল না। খগেন ও নগেন নিজ নিজ অংশ লইয়া কলিকাতায় গেল। খগেন শেয়ার বাজারে ঢুকিল, নগেন পঞ্চমকার লইয়া পড়িল। এতদিন যাহারা এক সঙ্গে ওঠা-বসা করিয়াছে তাহারা তিন ভাগ হইয়া গেল।

কয়েক বছর কাটিল। খগেন একাগ্রমনে ব্যবসা করিতেছে, নগেন অনন্যমনে ফূর্তি করিতেছে। খুড়া মুকুন্দবাবু মাসে এক-খানি করিয়া চিঠি লিখিয়া ভাইপোদের তত্ত্ব-তল্লাস লন। খগেন মাঝে মাঝে আসিয়া খুড়ার সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। নগেন বড় একটা আসে না। নগেনের চেয়ে খগেনের বিষয়বুদ্ধি বেশী। কিন্তু তবু এমনই মানুষের মন যে, ধার্মিক মুকুন্দবাবু মনে মনে উচ্ছৃঙ্খল নগেনকে বেশী ভাল-বাসেন।

একদিন মুকুন্দবাবু বুঝিতে পারিলেন. তাঁহার সময় হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজ সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবস্থা দেখিয়া সকলের হৃদয়ঙ্গম হইল যে, মুকুন্দ-বাবু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বটে।

খগেন নিজের অফিসে কাজ করিতেছিল, খুড়ার এক পত্র পাইল। খামের মধ্যে এক-তা কাগজ, মুকুন্দবাবু স্বহস্তে লিখিয়াছেন—

আমি আজ ১৮ই জুলাই ১৯২১ তারিখে সুস্থ মনে স্বেচ্ছায় এই উইল করিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ আমার যাবতীয় সম্পত্তি পাইবে। শ্রীমুকুন্দলাল গাঙ্গুলী, বকলম খাস।

একই সময় কলিকাতার অন্য প্রান্তে নগেন খুড়ার নিকট হইতে একখানি চিঠি ও রেজিস্ট্রি-করা একটি প্যাকেট পাইল। নগেন তখন সবে ঘুম ভাঙিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আড়ামোড়া ভাঙিতেছিল, চিঠি পড়িয়া দেখিল—

কল্যাণবরেষু,

নগেন, আমার শরীর ভাল নয়, বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচিব না। মৃত্যুর পূর্বে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে এমন আশা করি না। তোমাকে দূর হইতেই আশীর্বাদ করিতেছি এবং সৎপথে চলিবার উপদেশ দিতেছি। আজ রেজিস্ট্রি ডাকে তোমার নামে একখানি শ্রীমৎ ভাগবদ্‌গীতা পাঠাইলাম, বইখানি যত্ন করিয়া পড়িও। মৃত্যুকালে আমি তোমাকে ইহাই দান করিয়া গেলাম।

ইতি আশীর্বাদক—তোমার কাকা শ্রীমুকুন্দ-লাল গাঙ্গুলী।

চিঠি পড়িয়া নগেন মুখ বিকৃত করিল।

চিঠি পড়িয়া নগেন মুখ বিকৃত করিল। বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ি বোধহয় দাদা পাইবে! আর আমার জন্য শ্রীমদ্‌ ভাগবদ্‌ গীতা। নগেন রেজিস্ট্রি প্যাকেটখানা তুলিয়া লইয়া ঘোর অভক্তিভরে নিরীক্ষণ করিল, তারপর টান মারিয়া ঘরের এক কোণে ফেলিয়া দিল।

ভৃত্য আসিয়া প্যাকেট তুলিয়া লইয়া বলিল,—'এটা কি বাবু?'

নগেন মুখ বাঁকাইয়া হাসিল,—'গীতা। নিয়ে যা—যত্ন করে পাড়স।—আর, বীয়ার নিয়ে আয়।'

মাস খানেক পরে মুকুন্দবাবু মারা গেলেন। খগেন যথারীতি তাঁহার শ্রাদ্ধ করিল এবং উইল প্রুভ করিয়া সম্পত্তি দখল করিয়া বসিল। নগেন কোনও প্রকার আপত্তি উপস্থিত করিল না। তাহার হাতে এখনও অনেক টাকা, খুড়ার অনুগ্রহ সে চায় না।

তারপর দশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। নগেন এখন নিঃস্ব। সম্পত্তি ফুরাইয়া গিয়াছে, বাড়ি বিক্রি হইয়াছে, এমন কি আসবাবপত্র লাটে উঠিয়াছে। বাড়ির নূতন মালিক নোটিশ দিয়াছে, আজ বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে।

নিরাভরণ বাড়ির মধ্যে নগেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কলসীর জল ঢালিতে ঢালিতে শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণার শেষ নাই। নগেন বুক-ফাটা তৃষ্ণায় ছট্‌-ফট্‌ করিয়া ফিরিতেছিল। মদ—এক গ্লাস মদ। আজ তাহার এমন অবস্থা যে এক গ্লাস মদ কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য নাই। কেহ একটা টাকা ধার দিবে না। যে-সব বন্ধু তাহার পয়সায় মদ খাইত তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু—এক গ্লাস মদ

না পাইলে তাহার তৃষ্ণা মিটিবে কি করিয়া! কাল কি হইবে তাহা তো কালকের কথা, আজ এক গ্লাস মদ পাওয়া যায় কোথায়? একটা টাকা--আট আনা পয়সা কি কোথাও পাওয়া যায় না?

অশান্ত চার্মচিকার মত ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ তাহার নজর পড়িল—ঘরের একটা উঁচু তাকের উপর কি যেন রহিয়াছে। নগেন হাত বাড়াইয়া সেটা তাক হইতে পাড়িল। ধূলিধূসর একটা বাদামী কাগজ-মোড়া প্যাকেট। কিসের প্যাকেট নগেন মনে করিতে পারিল না। ধুলো ঝাড়িয়া দেখিল রেজিস্ট্রি পার্শেল--খোলা হয় নাই—প্রেরকের নাম মুকুন্দলাল গাঙ্গুলী। তখন মনে পড়িয়া গেল--গীতা! মৃত্যুর পূর্বে কাকা পাঠাইয়াছিলেন।

গীতা...গীতা বিক্রয় করিলে কত পয়সা পাওয়া যায়! গীতা কি কেউ কেনে? হয়তো এমন লোকও পৃথিবীতে আছে যাহারা গীতা কিনিয়া পড়ে। নগেন মোড়ক খুলিয়া ফেলিল।

সোনার জলে নাম লেখা কাপড়ের বাঁধাই

"কিছু নেই, কিছু নেই।"

গীতা—এখনও বেশ ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। কত দাম কে জানে। নগেন প্রথম পাতাটা খুলিল—

একখানা ভাঁজ করা কাগজ রহিয়াছে। নগেন খুলিয়া পড়িল, তাহার খুড়ার হস্তাক্ষর—

আমি আজ ১৯শে জুলাই ১৯২১ তারিখে সুস্থ মনে স্বেচ্ছায় এই উইল করিতেছি। পূর্বে যে উইল করিয়াছিলাম তাহা অত্র দ্বারা নাকচ করা হইল। আমার মৃত্যুর পর আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র খগেন্দ্র-নাথ ও নগেন্দ্রনাথ আমার যাবতীয় সম্পত্তি ও টাকাকড়ি সমান ভাগে পাইবে। শ্রীমুকুন্দলাল গাঙ্গুলী, বকলম খাস।

পড়িতে পড়িতে নগেন তৃষ্ণা ভুলিয়া গেল। কাকার সম্পত্তির অর্ধেক, অর্থাৎ অন্তত লাখ খানেক টাকা। হায় হায়, এত দিন সে মোড়কটা খুলিয়া দেখে নাই কেন? যে উইলের জোরে দাদা সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়াছিল সে উইল কাকা নাকচ করিয়াছেন। এই উইলই বলবৎ। আর যাইবে কোথায়! দাদার গলা টিপিয়া সে নিজের ভাগ বাহির করিয়া লইবে।

গীতা মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া নগেন পাগলের মত ছুটিল। আগে সে উকিলের কাছে যাইবে, সেখান হইতে উকিলকে সঙ্গে লইয়া দাদার অফিসে যাইবে—

কিন্তু অতদূর যাইতে হইল না, দ্বারের কাছেই খগেনের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। খগেন হাঁটিয়া আসিয়াছে—তাহার মুখ শুষ্ক, চুল উস্ক-খুস্ক। বারো বছর পরে দুই ভাইয়ে সাক্ষাৎ।

খগেন ব্যগ্রস্বরে বলিল,—'নগেন, তোর কাছে এসেছি, বড্ড দরকার। কিছু টাকা ধার দিতে পারিস?'

'ধার—!' নগেন ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

খগেন বলিল, 'হ্যাঁ। আমার সব গেছে। বাড়ি বিক্রি করতে হয়েছে, গাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে—তবু ধার শোধ হয়নি। এখন দশ হাজার টাকা বার করতে না পারলে শেয়ার মার্কেট থেকে নাম কেটে দেবে।'

নগেন হঠাৎ খগেনের ঘাড় ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে লাগিল—'কিন্তু কাকার যে এত টাকা পেয়েছিলি তার কি হল? তার অর্ধেক ভাগ যে আমার! এই দ্যাখ্‌ উইল—' নগেন খগেনের নাকের কাছে উইল মেলিয়া ধরিল।

খগেন বলিল,—'কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। তবু পারবি না দিতে? দিবি না? দশ হাজার টাকা—'

এবার নগেন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—'দশ হাজার টাকা!—একটা জিনিস আছে—গীতা। আয় দাদা, গীতা বিক্রি করব। একটা টাকা পাওয়া যাবে না? তুই আট আনা নিস্‌, আমি আট আনা নেব। কেমন, হবে তো? হা হা হা—'

হাইকোর্টে ইস্টারে আমাদের দশ-দিন ছুটি। শান্তিনিকেতনে ছুটিটা কাটাব বলে যাচ্ছি। ভেদিয়ার পর দেখতে দেখতে বোলপুর এসে গেল। তখন বেলা পড়ে এসেছে। স্টেশনের চত্বর পেরিয়ে একটা রিকসা-সাইকল পাকড়ালুম। তারপর বাজারের রাস্তা পেরিয়ে, সরকারী বড়ো রাস্তা ধরে উত্তরমুখে শান্তিনিকেতন চললুম।

অর্ধেক রাস্তা যেতে বাঁদিকে ডাক-বাংলা। চেয়ে দেখি, তারই উল্টো দিকে, দূরে পূর্ব প্রান্তরের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক তাঁবু পড়েছে। তাঁবুর সামনে দুই ব্যক্তি সঙ সেজে মাথায় বিলিতি টপ্‌হ্যাট চড়িয়ে ড্রাম পিটছে। আর তারই সংগে তারস্বরে চিৎকার ছেড়ে কি যেন গড়গড় করে বলে যাচ্ছে। তাঁবুতে ঢোকবার গেটের ঠিক মাথায় লাল শালুর জমিতে রাঙতার সাদা সাদা অক্ষরে কি যেন লেখা। দূর থেকে লোক দুটোর কথাও একটুও বুঝলুম না, লেখাগুলোও একবর্ণ পড়ে উঠতে পারলুম না। সাইকলওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতে জানা গেল, ওখানে সার্কাস বসেছে। শুনলুম, বড়ো ভারী সার্কাস। হাতি আছে, ঘোড়া আছে, বাঘ আছে, একটা সিংহীও আছে। আর আছে, দুটো পরী-হুরী। তারা ভারী জবর খেল্ দেখায়।

সার্কাসের নামে আমি বরাবরই মেতে উঠি। বাল্যকালের সংস্কারবশত বোধ হয়। আমার ছেলেবয়েসে ক্রিস্‌মাসের সময় গড়ের মাঠে একমাস ধরে হারম্‌-স্টোনের সার্কাস, রয়াল সার্কাস বসত। তার একটা-না-একটাতে রোজই আমার যাওয়া চাই-ই চাই। তার জন্যে সে সময় বড়োদের কতই ধরাধরি করতে হত! ভেবে-চিন্তে কত রকমের ফন্দি বের করতে হত! সেসব কথা ভাবতে গেলে এখন হাসি পায়। শহরের অনেক রকমের সার্কাস আমার দেখা আছে। কিন্তু মফস্বলের সার্কাস এ পর্যন্ত দেখি নি। কৌতুকবোধ হতে লাগল। স্থির করে ফেললুম, সেই সন্ধ্যেতেই সার্কাস দেখতে আসব। রিক্স-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিলুম, কখন খেলা আরম্ভ হয়, ক'রকমের সিট্ আছে, কি তাদের দাম ইত্যাদি।

শান্তিনিকেতন গেলেই তখন আমি হিন্দার বাড়িতেই উঠি। লেকের ধারে বাগান-ঘেরা ছিমছাম বাড়ি। হিন্দা আমার খানিক আগেই এসে গেছেন। বাড়ি পোঁছে, জিনিসপত্তর কালু-ছোঁড়ার হাতে জিম্মা করে দিলুম। রিক্সওয়ালাকে গাড়ি রাখতে বলে দিলুম। তারপর হিন্দার সংগে এক পেয়ালা চা ও খানদুই কড়া-পাকের টোস্ট খেতে খেতে তাঁর কাছে মনের কথা ব্যক্ত করে ফেললুম। ধরে পড়লুম, হিন্দাও যেন আমার সংগে চলেন। কিন্তু হিন্দার তখন তুরীয় অবস্থা। তিনি কাগজ-কলম নিয়ে হু হু করে, একটার পর একটা কবিতা লিখে চলেছেন তো চলেইছেন। এসব হুন্দ ছেলেমানুষি কাণ্ডে যোগ দিতে তিনি একেবারেই নারাজ। আমি হিন্দাকে লক্ষ্য করে হৃদয়ের এ-কুল ও-কুল দুকুল ভেসে যায়—গানটির এক কলি শিষ দিতে দিতে রিক্সয় উঠে চেপে বসলুম।

সার্কাসক্ষেত্রে পোঁছে শালুর টুকরোয় লেখা অক্ষর পড়ে জানলুম, সেটা সার্কাসের নাম। ইংরিজি বাঙলা দু-ভাষাতেই লেখা। তবে সেটা আন্দাজে আন্দাজে বুঝতে হল। দি গ্রেট্ বীরভুম সার্কাস। কিন্তু 'দি'-এর 'এইচ' উঠে গিয়ে তার জায়গায় একটা অতিরিক্ত 'ই' বসেছে। গ্রেটের মধ্যিখানের 'এ' উঠে গেছে। বীরভূমকে জায়গার অভাবে সংক্ষেপে 'বীর' করা হয়েছে। সার্কাসের শেষের 'সি'-এর বদলে 'কে'। বাঙলা ভাষাতেও হ্রস্ব-দীর্ঘ ই-উ, কি ষত্ব-ণত্বের কোনো বিধানই মানা হয় নি। যাই হোক, নামে কি আসে যায়, যদি খেলা ভালো হয়।

দুটো ষণ্ডামার্ক জোয়ান মুখে চুণকালি মেখে কাফ্রি সেজে সবুজ রঙের সস্তা সিল্কের প্যান্টকোট এ'টে, বুকের উপর স্ট্র্যাপে বাঁধা বিলিতি ঢোলক দুটো কাঠি দিয়ে বাজাচ্ছে। আর চিৎকার করে স্লোগান আওড়াচ্ছে— আসুন, আসুন—দেখুন দেখুন। এমন মজাদার খেল্ আর দেখেন নি। না দেখলে আর দেখা হবে না।

তাঁবুটো সত্যি সত্যিই মস্ত বড়ো। তার লাগাও একপাশে একটা ছোট তাঁবুও দেখা যাচ্ছে। সেটা বোধ হল, আর্টিস্টদের (ইংরিজিতে শেষে একটা 'ই' আছে) গ্রীন-রুম। জন্তু-জানোয়ারদেরও বোধ হয় সেইখানেই থাকবার জায়গা। সেদিক থেকে একটা চিমসে দুর্গন্ধি ভেসে আসছে। তখন শান্তিনিকেতনে ইলেক্‌ট্রিক বসে গেছে। কোম্পানীর সংগে বোধ করি একটা থোক-থাক বন্দোবস্তে সার্কাসে বিজলি বাতি আনানো হয়েছে। চারপাশের ঘন অন্ধকার থেকে বেশ-খানিক আলোতে আসা যায়। বাতিগুলো দূর থেকে দেখতে মন্দ নয়; যেন আলোর মালা সাজিয়েছে।

টিকিট কিনে তাঁবুর ভিতর ঢুকলুম। রিক্সওয়ালাকেও একটা থার্ডক্লাস টিকিট কিনে দিলুম। বলে দিলুম, সে যেন খেলা ভাঙবার একটু আগেই বেরিয়ে রিক্স ঠিক রাখে। সামনেই রিং। খেলা দেখাবার জন্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে স্থান করে নেওয়া হয়েছে। তার তিনধার ঘিরে দাড়ির বেড়া। পিছনের তাঁবু থেকে খেল্‌দারদের আসা-যাওয়ার জন্যে ছোট একটা গেট্ আছে। রিং থেকে খানিক জায়গা ছেড়ে অর্ধবৃত্ত আকারে দর্শকদের বসবার স্থান। প্রথমে মাটিতে চাটাই পাতা থার্ডক্লাস সিট। তারই দুপাশে দুখানা করে চেয়ার পেতে ফার্স্ট-

ক্লাস আসন। চেয়ারগুলোর কোনোটার হাত ভাঙা, কোনোটার পিঠ ভাঙা, কোনোটার আবার পায়া ভাঙা—ইঁট দিয়ে ঠেকানো রয়েছে। তার পিছনে লম্বা লম্বা সরু সরু পিঠ-নেই বেঞ্চি পেতে সেকেন্ড ক্লাস।

আমি দেখে-শুনে ওরই মধ্যে একটু কম নড়বড়ে একটা চেয়ার দখল করে বসলুম। খেল্ শুরু হল। প্রথমে জিব্‌নাস্টিকের সেই মামুলী কসরত। বেশ খানিকক্ষণ ধরে চলল। লোকদের বিরক্তি ধরে যাচ্ছে, তবু থামে না। ঝাড়া আধ ঘণ্টার পর জ্যান্ত মানুষের বুকের উপর দিয়ে গোরুর গাড়ি চালানোর খেল্। চিৎ হয়ে শোয়া মানুষের বুকের উপর দিয়ে চার চারবার গোরুর গাড়ির চাকা এলো-গেল। তারপর মানুষটা মাটি ছেড়ে উঠে, গা-ঝাড়া দিয়ে সকলকে একটা নমস্কার করে স্বস্থানে ফিরে গেল।

এবার দর্শকদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। ভাবটা যেন ঐ আসছে—ঐ আসছে। চোখ মেলে চেয়ে দেখি, এক জোড়া কমবয়সি মেয়ে তাঁবুর ছোট গেট দিয়ে ঢুকে রিং-এর দিকে এগিয়ে আসছে। এরাই বোধ হয় রিক্‌সওয়ালার পরী-হুরী। দুটো মেয়েরই চেহারা ভদ্রস্থ। দেখে মনে হয়, একেবারে নিম্নশ্রেণীর মেয়ে নয়। হয়তো ম্যানেজারেরই কোনো আত্মীয় হবে। বিলিতি নর্তকীর ঢঙে মেয়ে দুটোর সবুজ সিল্কের জাঙিয়া পরা। বুকের উপর সবুজ স্তনাবরণ। মাথায় সবুজ মখমলের উপর জরির কাজকরা তাজ। তাজের উপর ময়ূরের পেখমঝরা পালকের চুড়ো।

রিং-এ এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের চেটো উল্‌টিয়ে দুটো আঙুল তাজে ঠেকিয়ে তারা মিলিটারি কায়দায় দর্শকদের অভিবাদন করলে। অমনি চারদিক থেকে অজস্র ক্ল্যাপ্। কিছুতেই আর থামে না। প্রায় দু-মিনিট ধরে হাততালি চলবার পর মেয়ে দুটোর জোড়া নাচ শুরু হল। নাচ মানে, অতি কদর্য অঙ্গভঙ্গি করে হাত-পা ছোঁড়া। মাঝে মাঝে বিলিতি ধরনের অক্ষম নকলে একটা করে পা মাথার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। তাই দেখে দর্শকদের কি ফুর্তি! খুশি যেন উথলে উঠছে! সঙ্গে সঙ্গে কান-ফাটানো হাততালি। গলা ছেড়ে বাহবা-বাহবা করে তারিফ দেওয়া। নাচ শেষ করে মেয়ে-দুটো এবার দিশি প্রথামতো হাতজোড় করে সকলকে নমস্কার করলে। তারপর হেলতে-দুলতে ঢোলকের তালে-তালে পা ফেলতে-ফেলতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর ক্লাউনের খেল্। ক্লাউনের খেল্ দেখতে আমার সব সময়ই বড়ো মজা লাগে। নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলুম। কিন্তু ক্লাউন আর তার ঘোড়া দেখে মন খিঁচড়িয়ে গেল। যেমনি রোগা হাড় জির জিরে ক্লাউন, তেমনি তার ঘিয়ে ভাজা ভাজা এক খুদে বর্মা পোনি! ক্লাউনের পোশাকও আবার তেমনি। গায়ে মান্ধাতার আমলের এক ল্যাজওয়ালা বিলিতি ইভনিং ড্রেস-সুট। ইস্ত্রির অভাবে কোঁচকানো-মচকানো। তার রঙ বোধ হয় এক সময়ে কালো ছিল, কিন্তু এখন তামাটে। প্যাণ্টুলুন গোড়ালি থেকে আধ হাত উঁচুতে উঠে আছে। তার তলা দিয়ে শতছিদ্র লাল মোজা দেখা যাচ্ছে। পায়ে বার্নিস-চটা পাম্পসু। কোটের তলায় সার্টের বদলে এক ময়লা গেঞ্জি। বো কলার ইত্যাদির বালাই নেই। গলা ঘিরে এক তেল-চিট্‌চিটে সাদা সিল্কের মাফলার। মুখ সাদা রঙ দিয়ে চুনকাম করা। মাঝে মাঝে গোলাপি রঙের ছাপকা-ছাপকা দাগ। মাথায় চুঙি-ধরনের ক্লাউনের ক্যাপ।

এক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে, আর এক হাতে এক চাবুক নিয়ে ক্লাউন সার্কাসের রিং-এ দেখা দিল। একটু মাথা নুইয়ে সকলের ভাগে পড়ে এমন একটা নমস্কার ঝাড়লে। মাথা তুলতেই ঠিক সামনা সামনি-বসা আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। লোকটার চোখে যেন একটু বিস্ময়। আমারো কেন মনে হল জানিনে যেন লোকটাকে চিনি-চিনি। কিন্তু একবার ওর আপাদ-মস্তক ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম। না, চিনতে পারলুম না। তাছাড়া ভাবলুম, আমার জানা কে আবার এখানে সার্কাস দেখাতে আসবে।

ক্লাউন তড়াক করে একলাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। তার লাল ছেঁড়া মোজা আর বার্নিশ-চটা জুতো পরা পা দুটো লম্বা হয়ে ঘোড়ার দুদিকে ঝুলতে লাগল। পা দুটো প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। প্যাণ্টুলুন তখন হাফ-প্যাণ্ট হয়ে হাঁটু অবধি উঠেছে। ক্লাউন চাবুক দিয়ে ঘোড়ার পিছনে আস্তে একটু ঘা দিলে। ঘা দিলে বলাটা ঠিক হল না, মনে হল যেন সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলে। এইবার খেল শুরু হবে। কিন্তু কি হল জানিনে, ঘোড়া আর কিছুতেই চলে না। ক্লাউন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ে ঘোড়ার মুখে-পিঠে হাত বুলিয়ে ঘোড়ার কাঁধের বালামচি আঙুল দিয়ে চিরে-চিরে আদর করে সুড়সুড়ি দিয়েও ঘোড়াকে আর এক পাও নড়াতে পারল না।

হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়ে গেল। দর্শকেরা চিৎকার করে উঠল ঃ খেল্ দেখান, খেল্ দেখান। বিষণ্ণ মুখে মাথা নুইয়ে, ঘোড়ার গলায় এক হাত জড়িয়ে ক্লাউন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। গোলমাল শুনে, স্বয়ং ম্যানেজারবাবু দৌড়িয়ে এলেন। পরনে তাঁর রাজপুত্তুরের পোশাক। চুড়িদার পায়জামা, সবুজ স্যাটিনের আচকান। শেষের কটা বোতাম খোলা। ম্যানেজারবাবুর জবরদস্ত ভুঁড়ির দরুণ সবকটা আটকানো যায়নি। মাথায় লাল টুকটুকে বাঁধা-পাগড়ি। পায়ে সবুজ জরির লপেটা। বোধ হল, খেলা শেষ হবার পর তাঁর স্পীচ দেবার কথা তাই আগের থেকেই তিনি সেজে গুজে ঠিক হয়ে আছেন।

আঙুলের ইঙ্গিতে সবাইকে চুপ করতে বলে, ম্যানেজারবাবু ক্লাউনের দিকে অগ্নি-দৃষ্টি হানলেন। ক্লাউন তখনো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। ঘোড়াও অচল অটল, নট্ নড়ন চড়ন, নট্ কিচ্ছু। ম্যানেজারবাবু উচ্চবাচ্য কিছু না করে ক্লাউনের হাত থেকে তার চাবুকটা কেড়ে নিয়ে, সপাৎ করে ঘোড়ার পিঠ চাবকে দিলেন। তারপর ঘোড়াকে সে কি এলোপাতাড়ি মার। দে মার তো দে মার। ঘোড়ার পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। তবুও ঘোড়া আর এক পাও নড়ল না।

দর্শকরা স্তব্ধ! আমি হতভম্ব! ক্লাউনের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরিয়ে বেরোচ্ছে। চক্ষের নিমেষে এক কাণ্ড ঘটে গেল। ম্যানেজারবাবু ঘোড়াকে আবার মারবার জন্যে যেমনি চাবুক তুলেছেন অমনি তাঁর হাত থেকে চাবুক ছিনিয়ে নিয়ে ক্লাউন ম্যানেজারবাবুর মুখচোখে পটাপট বেদম কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। ম্যানেজারের মাথার পাগড়ি উড়ে গিয়ে দর্শকদের মাঝখানে ছিটকে পড়ল। একজন সেটাকে লুফে নিল। ম্যানেজার তখন হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ক্লাউনকে মারবার জন্যে লাথি তুলেছেন। ঐ রোগা-পটকা ক্লাউন তাঁকে দু হাতে এমন এক ঝাঁকানি দিল যে, ম্যানেজারের দুপাটি জুতোই শূন্যে উঠে

হাওয়া হয়ে গেল। সাধের স্যাটিনের আচকান ছিঁড়ে চৌচির। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও পপাত ধরণীতলে। চারদিকে ভীষণ হাস্যরোল, বিষম হট্টগোল। তারই মাঝে ম্যানেজারের আর্তনাদ—পুলিস! পুলিস! কে একজন চিৎকার করে জানাল ঃ এরপর ম্যাজিক আছে, ম্যাজিক আছে। কে কার কথা শোনে? যা-ম্যাজিক দেখা গেল, তাই যথেষ্ট।

হঠাৎ ইলেকট্রিকের বাতিগুলো সব এক সঙ্গে নিবে গেল। বেগতিক দেখে, আমি হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে তাঁবুর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। আমার রিক্স-ওয়ালা চালাক ছোকরা। সে দেখি, আমার আগেই বেরিয়ে এসেছে। অন্ধকারে আমার অস্পষ্ট চেহারা দেখে হাঁকল ঃ বাবু এদিকে, এদিকে। আমি তার গলার স্বর লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে রিক্সয় চড়ে বসলুম। ছোকরা জোর জোর প্যাডেল মারতে লাগল। সাইকল বাঁই-বাঁই করে ছুটল। শেষে একেবারে বাড়ি এসে তবে থামল। আমি বেশ একটু ভারীগোছের বখসিস দিয়ে তাকে বিদায় করলুম। হিন্দা তখনো তাঁর নৈশ-ভ্রমণ শেষ করে ফেরেননি। কখন যে ফিরবেন তার ঠিক নেই। বেজায় খিদে পেয়ে গিয়েছিল। কালু ছোকরা আমায় আগে ভাগেই দুটি খাইয়ে দিল।

পরদিন সকালে চা-পর্ব শেষ করে হিন্দার উত্তরের বারান্ডায় দুজনে দুটো ডেকচেয়ার টেনে নিয়ে পাশাপাশি বসেছি। সামনের লেকে মাছরাঙা জলে ডুবে-ডুবে মাছ ধরছে। দূরে গাছপালা-ঘেরা ছোট্ট সাঁওতাল গ্রামটা ছবির মতো দেখাচ্ছে। ওদিকে নতুন ক্যানাল খোঁড়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। তারই দমাদম ঝপাঝপ শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। হিন্দার জমানো কবিতার খাতা বেরিয়েছে। তিনি একটার পর একটা তাই পড়ে যাচ্ছেন। আমি কিন্তু তাতে কিছুতেই মন বসাতে পারছি নে। কালকের সার্কাসের ব্যাপারটা কেবলি মাথায় ঘুরছে। ক্লাউনটাকে আগে কোথাও দেখেছি কি না, কিছুতেই মনে করে উঠতে পারছি না।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে, হিন্দা একটু অনুযোগের সুরেই বললেন ঃ কি অত মাথা-মুণ্ডু সব ভাবছ?

আমি বুঝলুম, কবিতাপাঠে বাধা পেয়ে হিন্দা বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। সার্কাসের সমস্ত কথা তাঁকে খুলে বললুম।

হিন্দা বললেন ঃ আরে মিথ্যে ওসব ভাবছ তুমি। তোমার পরিচিত কোনো কেউ ঐ লেংগি-পেংগি সার্কাসে কি দুঃখে আসবে? শোনো, বলে হিন্দা আবার কবিতা পাঠে মনোযোগ দিলেন। এবার আমিও হিন্দার কবিতা থেকে দুচারটে সুশ্রাব্য অথচ দুর্বোধ্য শব্দ চুনে চুনে হিন্দার সঙ্গে বিষম তর্ক বাধিয়ে [illegible]।

তর্ক বেশ জমে উঠেছে এমন সময় দেখি, এক কষ্টিপাথরের মতো কালো কুচকুচে লোক সামনে এসে হিন্দাকে একটা আর আমাকে একটা ঢিপ করে গড় করলে। আমতা-আমতা করে বললে: এখানে কৌঁসুলি-সাহেব থাকেন? ব্যারিস্টারি আমি করি বটে, কিন্তু এমন কিছু নামডাক নেই যে, এখানেও কেউ আমায় তেড়েফুঁড়ে ধাওয়া করে আসবে। হিন্দা আমায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন: এই সাহেব।

লোকটা আরো খানিক নিচু হয়ে আমাকে আর একটা প্রণাম করলে। বলল: হুজুর সাহেবকে একটু কষ্ট করে যেতে হবে।

আমি তো অবাক! জিজ্ঞেস করলুম: যেতে হবে? কেন? কোথায়?

লোকটি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললে: আজ্ঞে হুজুর সাহেব ঐ থানায়।

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে বললুম: থানায়? থানায় কেন?

শুনলুম: আজ্ঞে, থানাতেই তো সঙবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে।

এবার হিন্দা তাড়া দিয়ে উঠলেন: সঙবাবু? সঙবাবুটা কে আবার?

লোকটা থতমত খেয়ে কোনো রকমে গলা থেকে উগরে ফেলল: আজ্ঞে হুজুর সাহেব তো কাল রাত্তিরে তেনাকে সার্কাসে দেখেছেন। আমি এতক্ষণে বুঝলুম কালকের সেই ক্লাউনের কথা হচ্ছে।

বললুম: পুলিস এসে বুঝি তোমার সঙবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে? তা তুমি কে বট হে?

লোকটা আমার বীরভূমী ভাষার নকল দেখে দাঁত বের করে একটু হেসে বললে: হুজুর সাহেব আমি সার্কাসের চাকর বটি। কত্তাবাবুই তো পুলিস ডেকে সঙবাবুকে ধরিয়ে দিলেন। তা সঙবাবুর কি দোষ বলুন? তেনার ঘোড়াকে কত্তাবাবুই তো আগে মারলেন। সঙবাবুর ঘোড়া-অন্ত প্রাণ। তেনার লাগবে না?

আমি বললুম: হ্যাঁ তা লাগবেই তো।

দেখলুম লোকটা আমার কথায় খুশি হয়ে উঠেছে। লোকটা এবার দুপাটি দাঁতই বের করে বললে: বলুন তো হুজুর সাহেব আপনিই বলুন। লাগবে না?

আমি বললুম: তোমাদের কত্তাবাবুর কি হল?

লোকটা বিচিত্র মুখভঙ্গি করে বলল: আজ্ঞে তেনার গাল মুখচোখ সব ফুলে উঠেছে। তিনি এখন বিছানা নিয়েছেন। ঐ নাদুস-নুদুস গোলগাল ম্যানেজারের গালমুখচোখফোলা চেহারার দৃশ্য মনে করে আমি আর হাসি চাপতে পারলুম না। হো-হো করে হেসে উঠলুম।

লোকটা নেহাৎ অপ্রস্তুতে পড়ে আর কোনো কথা জোগাতে না পেরে শুধু বলল: আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

আমি জিজ্ঞেস করলুম: ঘোড়াটার কি হল জানো?

—হুজুর সাহেব ঘোড়াটা তো মরে গেল। তবে সঙবাবু বলেছিলেন ঘোড়ার আর জান নেই। কত্তাবাবু তিন টাকায় লাশটা ডোমদের ডেকে বেচে দিলেন। সঙবাবুর বিছানাপত্তর কাপড়চোপড় সামান্য যা-কিছু ছিল তাও সবই বেচে দিয়েছেন।

আমি লোকটার সঙ্গে যাবার জন্যে উঠলুম। হিন্দা ঠাট্টা করে বললেন: ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে চললে তো। হিন্দার কবিতা পড়ার তখনো অনেক বাকি। আমি বললুম: না হিন্দা আমরা যেদিন বার-এ কলড হই সেদিন আমাদের সিনিয়র বেঞ্চার আমাদের ডেকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে বিশেষ কোনো সৎ কারণ না থাকলে আমরা যেন বিচারপ্রার্থী কোনো শরণার্থীকে বিমুখ না করি।

আমার সুটকেসে একপ্রস্থ সাহেবী কোট-প্যান্টলুন টাই কলার সার্ট ইত্যাদি মজুত ছিল। আটপৌরে কাপড় ছেড়ে সেই সব চড়িয়ে নিলুম। দেয়ালের হুকে হিন্দার একটা সোলা হ্যাট ঝুলেছিল সেটাকে পেড়ে নিলুম। বাইরে এসে সার্কাসের চাকরটাকে বললুম: চল এবার যেখানে যেতে হবে।

আমার কোটপ্যান্টলুন-পরা চেহারা দেখে এবার লোকটা একেবারে আমার পায়ের ধুলো খানিক মাথায় তুলে নিলে। বললে: হুজুর সাহেবের জন্যে একটা র‍্যাকসা নিয়ে এসেছি চলুন।

এতক্ষণ দেখিনি। এখন দেখলুম দক্ষিণ দিকে টগর গাছের বেড়ার আড়ালে একটা রিকসা দাঁড়িয়ে। আমি এগিয়ে যেতে চালক বেরিয়ে এল। আরে! এ যে সেই কালকের চালাক ছোকরা। মুখে তার একটু মুচকে হাসি।

আমি তাকে লক্ষ্য করে বললুম: তোরই বুঝি এই সব কাণ্ড।

ছোকরা হেসে বললে: না হুজুর। ঐ কালুই তো বললে হুজুর নাকি কোলকাতার মস্ত বড়ো বালিস্তর-সাহেব।

আমি তাকে নির্দেশ দিলুম: চল্ আগে বিভূতি উকিলের বাড়ি চল। চিনিস তো?

ছোকরা একগাল হেসে বললে: খুব চিনি হুজুর। আসুন।

আমি সার্কাসের লোকটাকে আমার সঙ্গে রিকসায় চাপতে বললুম। কিন্তু সে জিভ কেটে বললে: সে কি হয় হুজুর-সাহেব? আপনি চলুন। আমি থানায় গিয়ে হুজুরের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব।

বোলপুরের অনেককেই আমি চিনি। আমার বড়োমামা দিপুবাবুর খাতিরে আমারো সেখানে খাতির। বড়োমামাকে বোলপুরের সবাই ভালোবাসত। একটু সমীহ করত। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি বোল-পুর ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মেম্বররা আদর করে তাঁকে মহারাজ বলে ডাকত।

বিভূতির বাড়ি পৌঁছে দেখি, তিনি সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে এক পেয়ালা চা নিয়ে আগেকার দিনের খবরের কাগজটা উলটিয়ে পালটিয়ে আর একবার ভালো করে পড়ে দেখার চেষ্টা করছেন। আমার আসতে দেখে কাগজ ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন: আরে চাটুয্যে-সাহেব যে। এই সাত সকালে কি মনে করে?

আমি বললুম: এই নটার সময় যদি তোমার সাত সকাল হয় তাহলে এই সাত-সকালেই তোমাকে আমার সঙ্গে একটু বেরতে হয়। বলে, আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া সব খুলে বললুম। শুনে বিভূতি আসছি বলে বাড়ির ভিতর থেকে একটা আধময়লা পাঞ্জাবীর উপর ফর্সা পাটকরা উড়নি কাঁধের উপর ফেলে বাইরে এল। তাঁকে রিকসে চড়িয়ে নিয়ে দুজনে থানায় চললুম।

থানায় উপস্থিত হয়ে দেখি হরিচরণ-দারোগা তখনো সে থানার চার্জে আছেন। বদলি হন নি। তিনি আমায় দেখে আত্মীয়তার সুরে আসুন চাটুয্যে সাহেব বসুন বসুন বলে আপ্যায়িত করে চেয়ারে

বসালেন। হরিচরণ-দারোগাকে সবকথা খুলে বললুম।

শুনে হরিচরণ বললেন ঃ তা' এখন কি করতে হবে বলুন। কাল রাত্তিরে হলে, সার্কাসের ম্যানেজারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে লোকটাকে ছেড়ে দিতে পারা যেত। কিন্তু এখন তো বিচারের জন্যে সিউড়ি চালান দিতে হয়।

আমি জানালুম ঃ বিভূতির নামে একটা ওকালতনামা লিখিয়ে নিতে হবে। আর ডিফেন্সের জন্যে আসামীর কাছ থেকে দু'চার কথা জেনে নেওয়া আবশ্যক।

হরিচরণ দারোগা আমাদের আসামীর কাছে নিয়ে গেলেন। আশ্চর্য তখনো তার পরনে সেই অদ্ভুত ইভিনিং ড্রেস-স্যুট গালে-মুখে রঙ। সারা রাত্তির না-ঘুমনোর দরুণ চোখমুখ আরো বসে গিয়ে চোয়াড়ে চেহারা হয়েছে। বিভূতি তো ঐ সঙের মতো চেহারা দেখে, হেসে কুটি-কুটি। কিছুতেই আর হাসি দমাতে পারে না।

আমি দারোগাকে বললুম ঃ সে কি মশায় আপনি এ'কে ঐসব কাপড় এখনো পরিয়ে রেখেছেন?

দারোগা হাত নেড়ে বললেন ঃ কি করি মশায়? ম্যানেজার বললে ও'র তো আর কিছু নেই? থাকবার মধ্যে এক ঘোড়া আছে। তাও শুনছি......

আমি ইশারায় দারোগাকে নিরস্ত হতে ইঙ্গিত করলুম। তিনি চালাক লোক। ইশারা বুঝে তখুনি থেমে গেলেন। বিভূতিকে ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেলুম। হরিচরণ আমাদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আমি ব্যাগ থেকে একটা নোট বের করে হরিচরণের হাতে দিয়ে বললুম ঃ কিছু কাপড়-চোপড় আসামীকে কিনে দিন। আর মুখের ঐ রঙ তোলাবার ব্যবস্থা এক্ষুণি করুন। নইলে বিভূতিকে দিয়ে আর কোনো কাজ করানো যাবে না। আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি। আপনি ততক্ষণ ওকালতনামাটা লিখিয়ে রাখবেন। দারোগার মুখ দেখে মনে হল, তিনি জানতে চাইছেন আমার অত মাথা-ব্যথা কেন। ভদ্রতার খাতিরে স্পষ্ট কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছেন না। আমি বললুম ঃ জানাশোনা লোক।

থানার বাইরে পা বাড়াতে দেখি, সার্কাসের সেই চাকর থানার বারান্দায় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে। তার মুখে নির্বাক প্রশ্ন ঃ সব ঠিক হয়ে গেল তো হুজুর? সঙবাবু ছাড়া পাবেন তো?

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম ঃ তুমি ফিরে যাও। ভাবনার কিছু নেই। সিউড়ি যেতে হবে। সব ঠিক আছে। লোকটা আবার দণ্ডবৎ হল।

বিভূতির বাড়ি গিয়ে এক পাত্র গরম চা খেয়ে নেওয়া গেল। বিভূতি কাজের লোক। অত হাসির মধ্যেও থানার ডায়েরী ঠিক দেখে নিয়েছেন। মামলা সম্বন্ধে খানিক পরামর্শ করে, বিভূতিকে কাল সকালের গাড়িতে আমার সঙ্গে সিউড়ি যাবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে উপদেশ দিয়ে আমি আবার থানায় ফিরে এলুম।

হরিচরণ দারোগা নেই। শুনলুম, কোথায় যেন কি একটা মামলার তদ্বিরে বেরিয়েছেন। হেড্-কনস্টেবল আমাকে খাতির করে ভিতরে নিয়ে গেল। সঙবাবু আর সঙ নেই। নতুন ধুতি আর হাত-কাটা সার্ট পরে, মুখ-হাত সাফ করে চুল আঁচড়িয়ে ভদ্রলোক বনেছে। আমি তার দিকে অনেকক্ষণ তাকাতে তাকাতে শেষে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলুম ঃ অক্ষয় নাকি? অক্ষয় মুখুজ্জে? লোকটা কোনো সাড়া-শব্দ করল না।

আমি তখন আবার বললুম ঃ আমি ভানু চাটুয্যে, আমায় চিনতে পারছ না?

অক্ষয় এতক্ষণে একবার মুখ খুললে। বললে ঃ কাল রাত্তিরেই চিনতে পেরেছি। তুমি তো বেশি বদলাওনি।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম ঃ তোমার এই হাল হল কি করে অক্ষয়? অক্ষয় চুপ করে রইল। কোনো জবাব দিল না।

একতরফা আর কতক্ষণ কথা চালানো যায়? আমি উঠে পড়ে বললুম ঃ এখন আসি অক্ষয়, ভয়ের কিছু নেই। আজ রাত্তিরেই তোমায় সিউড়ি নিয়ে যাবে। বিভূতি আর আমি কাল দুপুরের আগেই সেখানে পেঁাছে যাব। তারপর আমরা আছি। অক্ষয় হাঁ-না, ভালো-মন্দ কিছুই বলল না। আমি ঘর থেকে বেরোবার জন্যে দরজায় পা দিয়েছি, এমন সময় অক্ষয় পিছু ডেকে আমায় অনুরোধ করলে ঃ আমার ঘোড়াটার একটু খোঁজ নিও ভাই। আমি তাকে আর কিছু ভাঙলুম না। শুধু জানালুম, নেবো।

বাড়ি ফিরে এসে দেখি, হিন্দা নেই। বেড়াতে বেরিয়েছেন। আমি স্নানাদি সারতে গেলুম। চান সেরে বেরিয়ে আসতে দেখি, হিন্দা ফিরেছেন। তাঁর দৃষ্টি প্রশ্ন-ভরা। আমি তাঁকে চট্ করে স্নান করে নিতে বললুম।

খেতে খেতে হিন্দাকে অক্ষয় মুখুয্যের পূর্ব ইতিহাস খুলে বললুম—

—এক সময় আমাদের বাড়ি ছিল উত্তর কোলকাতায়। আমাদের পাশেই মুখুজ্জে-দের তিনমহলা ভদ্রাসন। অক্ষয়ের পূর্ব-পুরুষ মনোহর মুখুজ্জে লর্ড ক্লাইভের আমলে জিরেট-বলাগড়ের আদিবাস ছেড়ে, কোলকাতার পয়সার সন্ধানে আসেন। পয়সা কামিয়েছিলেন প্রচুর। তাঁর পরে, তাঁর বংশের চার-পাঁচ পুরুষ ব্যবসা করে, সওদাগরী হৌসে ব্যানিয়ানগিরি করে, কমিসারিয়টে চাকরি করে মুখুজ্জে বংশকে ফাঁপিয়ে তুলেছিলেন। অনেকে আবার পশ্চিমে রয়ে গিয়ে সেইখানেই বাসিন্দা হয়ে গেলেন।

—এই রকম চলেছিল অক্ষয়ের পিতামহ পর্যন্ত। অক্ষয়ের পিতামহ নীলকমল মুখুজ্জে কোনো কিছু বিষয়কর্ম না করে, পৈত্রিক বিষয় ওড়াবার কাজে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এত প্রচুর সম্পত্তি যে, ওড়াতে ওড়াতেও সবটা সাবাড় করে যেতে পারলেন না। খানিকটা অক্ষয়ের বাবা শ্রীকান্ত মুখুজ্জের ওড়াবার জন্যে রেখে গেলেন। তবে তাঁদের নিজেদের দশা ভাঙলেও, তাঁদের পোষ্য ভাগনে ও দৌহিত্র বংশের অবস্থা তাঁদেরই দৌলতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

—আমার জ্ঞান হতে যখন মুখুজ্জেদের দেখি, তখন তাঁদের আর অত জাঁকজমক জুলজলুষ নেই। সবই যেন রংছুট রংছুট। কোলকাতার বসতবাড়ি ছাড়া, অন্য সব বাড়ি একে একে গেছে। মফস্বলে জমিদারী কতক তখনো অবশিষ্ট আছে। এক টুকরো জমিদারী না থাকলে তখনকার দিনে কেউ কাউকে বনেদিঘরের বলে গ্রাহ্য করত না। অক্ষয়ের বাবা কাজকর্ম করে বিষয়ের উন্নতি করার চেষ্টা না করে, তান্ত্রিক-সাধনার জোরে সম্পত্তি বাড়াবার পন্থা অবলম্বন করলেন। ফলে জমিদারীর আয়তন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে চলল।

অথচ বাইরের হাঁকডাক কমল না। আয় কমলো বটে, কিন্তু ব্যয় ঠিক আগের মতোই রয়ে গেল। আমিও নিজে দেখেছি, অক্ষয়ের বাড়ি বেকার আত্মীয়স্বজনে, আশ্রিত অভ্যাগতে সর্বদাই সরগরম।

—অক্ষয়ের পিতামহ নীলকমলবাবুর ঘোড়ার ভারী শখ ছিল। অক্ষয়দের ভদ্রাসনের এক পাশেই প্রকাণ্ড এক আস্তাবল বাড়ি। শুনেছিলুম, এক সময় সেখানে নানা ধরনের গোটা কুড়ি-তিরিশ ঘোড়া সর্বদা মজুত থাকত। নীলকমল-বাবু ঘোড়া চিনতেনও যেমন, তাদের স্বভাব বুঝতেনও তেমনি। তাদের ভালোও বাসতেন খুব। প্রত্যেককে নিজের হাতে একবেলা দানা খাওয়াতেন। শোনা যায়, দু'বোতল ব্র্যান্ডি পার করে, স্বচ্ছন্দে জুড়ি হাঁকিয়ে গড়ের মাঠে গেছেন, এসেছেন। কোনোদিন কোনো অঘটন ঘটান নি। কিন্তু ভদ্রলোকের কি খেয়াল! অত গাড়িঘোড়া থাকা সত্ত্বেও রাত্তিরে কখনো ঘোড়ার গাড়ি চড়তেন না। পেরামবুলেটরের মতো ছোট্ট একটা দুচাকার কাঠের খেলাগাড়িতে দুটো বড়ো বড়ো রামছাগল জুতে মুসলমানী রক্ষিতার বাড়ি ছুটতেন। পরনে মুসল-মানী ধরনের জাবা-জোব্বা। মাথায় জরির টুপি। জুলফিতে গোঁফেতে আতর বুলিয়ে, আতরমাখানো তুলোর টুকরো কানে গুঁজতেন।

—আমি যখন দেখেছি, তখন অক্ষয়দের আস্তাবল প্রায় খালি। এক অংশ ভেঙেও পড়েছে। গোটা দুয়েক বোধ হয় ঘোড়া ছিল। অক্ষয় তার ঘোড়ার শখ পিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিল। ওইটুকু ছেলে, কিন্তু তখন থেকেই ঘোড়া বশ করতে ওস্তাদ। আর ঘোড়া বুঝত, চিনত এত যে, কুক-সাহেবদের বড়োবাবু দে-মশায়ও তাঁদের আড়গোড়ায় নতুন ঘোড়া এলেই তাকে একবার অক্ষয়দের বাড়ি এনে তার কাছে থেকে যাচিয়ে নিয়ে যেতেন।

—একবার আমাদের জুড়ির জন্যে এক-জোড়া তেজালো ঘোড়া কেনা হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই তাদের গাড়িতে জোতা যায় না। পা ছুঁড়ে, লাথি মেরে কেবলি গাড়ি ভাঙে। অক্ষয় বলে বসল, সেই ঘোড়া দুটোকে ব্রেক্ করবে। আমাদের বাড়ির অনেকটা অংশ জুড়ে তখন খালি জমি পড়েছিল। কর্তাদের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল যে, বংশবৃদ্ধি হলে সেইখানেই আবার নতুন ঘর উঠবে। অক্ষয় ঘোড়া দুটোকে সেই খালি জমিতে আনালে। তারা আসতেই তাদের কানে কানে মন্ত্রপড়ার মতো কি জানি কি বললে। তাদের ঘাড়ে, পিঠে এমন করে হাত বুলোলে যে, অমন ছটপটে ঘোড়া দুটো এক মুহূর্তে শান্তশিষ্ট জানোয়ার বনে গেল। একটাকে খুঁটি বেঁধে রেখে আর একটার পিঠে চড়ে সারা জমিটার উপর চর্কির মতো ঘুরতে লাগল। তারপর সেটাকে বেঁধে রেখে অন্যটাকে নিয়ে পড়লো। ঐরকম করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাতদিনের মধ্যে সে ঘোড়া দুটোকে ব্রেক্ করে ছেড়ে দিলে। আমাদের জুড়ি তারপর ভালোই চলল, আর কোনো গোলযোগ ঘটল না।

—অক্ষয়ের সঙ্গে আমার ভাব ক্রমশ খুবই জমে উঠল। দুজনে সমবয়িসি কিনা। সে প্রায়ই থেকে থেকে আমাদের বাড়ি আসত। অল্পবয়েসেই তার মা মারা গিয়েছিলেন। তার বাবা শ্রীকান্তবাবু আর বিবাহ না করে তান্ত্রিকমতে ভৈরবীসঙ্গ করতেন। ফুটফুটে ছেলে দেখে আমাদের বাড়ির গিন্নিবান্নিরা তাকে খুব আদর-যত্ন করতেন, প্রচুর খাওয়াতেন-দাওয়াতেন। অক্ষয়ের বাবা কি মনে করে জানি নে, তাঁদের কুলপ্রথা ভঙ্গ করে অক্ষয়কে আমার দেখাদেখি মিস্ ওয়াইটের মিসনরী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অক্ষয়ের পড়াশুনোয় কোনকালে খুব মনোযোগ ছিল না। খেলাধুলোয়ই বেশি ভালো-বাসত। দশ বছর পর্যন্ত সেই স্কুলে পড়ে আমি চলে গেলুম শান্তিনিকেতনে পড়তে, অক্ষয় ভর্তি হল হিন্দু স্কুলে।

—তারপর আমাদের বন্ধুত্বের পাকটা এলিয়ে গেল। আমি শান্তিনিকেতনের পাঠ শেষ করে পুরোপুরি কোলকাতায় বাস করতে আসার আগেই আমাদের যৌথ পরিবার ভিন্ন হয়ে গেলেন। কর্তারা সে-বাড়ি বিক্রি করে যে যাঁর নিজের রুচি-মতো কোলকাতার বিভিন্ন পাড়ায় বাড়ি তুলে ফেললেন। অক্ষয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

অক্ষয়ের সঙ্গে আবার দেখা হল প্রেসিডেন্সী কলেজে। কিন্তু কয়েক বছর কাছাকাছি না থাকায় কোথায় যেন কি রকম চিড় খেয়ে গেছে। অক্ষয়েরও কেমন যেন মনমরা মনমরা ভাব। হাসিখুশি নেই, আর নাকে-মুখে কথা নেই। সর্বদাই বিষণ্ন, গম্ভীর ভাব।

—দু'বছর কলেজে পড়ে, আই-এ পরীক্ষা না দিয়েই অক্ষয় হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল। একদিন তাদের পুরনো বাড়ি গিয়ে দেখি, সেটাকে মেরামত-সেরামত করে নিয়ে একপাল মাড়োয়ারী সেখানে বাস করছে। এরপর অক্ষয়কে আর কোথাও কখনো দেখতে পাই নি। এই আবার যা কাল রাত্তিরে।

হিন্দা চুপ করে আমার কথা শুনে গেলেন। স্বভাবতই তিনি অল্পভাষী। গল্প শেষ হতে শুধু একটু শব্দ করলেন, হুঁ।

পরদিন সকালে বিভূতিকে টেনে নিয়ে ছটার ট্রেনে সিউড়ি যাত্রা করলুম। ডাক বাংলায় জিনিসপত্তর রেখে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। ম্যাজিস্ট্রেট হিরণ মুখুজ্জে আমার বিশেষ জানাশোনা লোক। তিনি আমার কাছ থেকে অক্ষয়ের সম্বন্ধে সব কথা শুনে বললেন : তোমার ছুটির তো আরো কটা দিন বাকি আছে। আমি পরশুই কেসটা তোলবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমার উকিল তো সঙ্গেই আছেন। গভর্নমেণ্টের উকিলকে আজই নোটিশ জারি করিয়ে দিচ্ছি। এরপর কতদিনে মামলা শেষ করা না করা সে তোমার হাত।

বিভূতি ও আমি জেলে গিয়ে অক্ষয়কে বুঝিয়ে বললুম, সে যেন দোষ স্বীকার করে নিয়ে সরাসরি গিলটি প্লিড করে। তাহলে আর কথা বাড়বে না। একদিনেই মামলা খতম। পরশু দিনই অক্ষয়ের কেস ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উঠল। অক্ষয় আমাদের শেখানোমতো গিল্টি প্লিড করল। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ভালো হয়ে থাকতে একপ্রস্থ সদুপদেশ দিয়ে পঞ্চাশ টাকা ফাইন করলেন। অনাদায়ে দু মাস জেল। ফাইন আদায় হলে তার থেকে তিরিশ টাকা সার্কাসের ম্যানেজারকে দেবার হুকুম হল। টাকাটা আমি গোপনে পকেট থেকে বের করে দিয়ে বিভূতিকে সরকারী তহবিলে জমা করে দিতে বললুম। কিন্তু হিরণ মুখুজ্জের চোখ এড়ানো গেল না।

হিরণ মুখুজ্জে এজলাস ছেড়ে উঠে খাস কামরায় গেলেন। এক সঙ্গে বেশিক্ষণ বসে হিরণ কাজ করতে পারতেন না। ক্লান্তি দূর করবার জন্যে মাঝে মাঝে বিলিতি পানির চাড় দেবার প্রয়োজন হত। হিরণের আরদালি এসে আমাকে সেলাম করে দাঁড়াল। সাহেব আমাকে তাঁর খাস কামরায় তলব করেছেন।

আমি সেখানে যেতে হিরণ সামনে রাখা গেলাশে এক ঢোঁক চুমুক দিয়ে বললেন : টাকাটা শেষ পর্যন্ত তোমারই পকেট থেকে গেল হে চাটুয্যে? এ জানলে ফাইনটা আরো একটু কম করা যেতে পারত। তাতে আইনে কোনো দোষ হত না।

আমি হেসে বললুম : ঠিক আছে। ও পর্ব শেষ। ও নিয়ে আর ভেবো না। হিরণ আমাকে সেদিনটা অন্তত সিউড়িতে থেকে গিয়ে পরদিন শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতে বললেন। তাঁর বাড়িতে সেই রাত্তিরে বড়োগোছের খানাপিনা আছে। আমাকে তাতে যোগ দিতে বিশেষ করে অনুরোধ জানালেন।

আমি কিছুতেই রাজি হতে পারলুম না। হিন্দার কবিতা শোনার তখনো অনেক বাকি। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরার বাইরে এসে অক্ষয়কে কোথাও আর খুঁজে পেলুম না। সে তখন বোধ হয় তার ঘোড়া খুঁজে বের করতে ছুটেছে।

প্রাচীন ভারতের মহিলা চিত্রশিল্পী

শুভ্রা বসু

প্রাচীন ভারত শিল্প-সাধনার পীঠ-স্থান। সেকালের মঠ, মন্দির, স্তূপ, বিহার, মূর্তিমালা ও সাধারণ ব্যবহারের তৈজসপত্র—সবই আজ শিল্পকলা হিসেবে বিস্ময়ের বিষয়। এই বিস্ময় আরও বেড়ে ওঠে শিল্পীদের কথা মনে হলে। এত বড় বিরাট শিল্পের রাজ্য, কত কাল-জয়ী সৃষ্টি, কত না অভিনব রূপ-কল্পনা, কত গভীর ধ্যান ও উঁচু সাধনার ছাপ এদের সারা গায়ে। কিন্তু যাদের কল্পনায় এরা রূপায়িত, যাদের হাতের ছোঁয়া পেয়ে এরা প্রাণ-স্পন্দনে জেগে উঠেছিল তাঁরা কে? কি তাঁদের পরিচয়? এখানে ইতিহাস নিরুত্তর। প্রাচীন ভারতের শিল্পের ইতিহাসে স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। হয়ত কখনও কখনও কোন রাজা মহারাজার শিলালিপি, দানপত্র ও প্রাচীন কোন পুঁথির পাতায় দুই একজন শিল্পীর নামোল্লেখ দেখা যায়। মূর্তির পাদপীঠে শিল্পীর নাম খোদিত আছে—এমন মূর্তির সংখ্যাও খুবই কম। এছাড়া, সেকালের শিল্পীদের সম্বন্ধে কোন তথ্য বড় পাওয়া যায় না এবং ইতালীর নবযুগের শিল্পীদের জীবন-চরিতের মত ভারতের সুবর্ণযুগের শিল্পীদের জীবনী রচনার উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভাবনার বাইরে। মুঘল সম্রাট আকবরের সময়কার কয়েকজন শিল্পীর নাম 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লিখিত আছে বটে—কিন্তু তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত বা রচনাবলী সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত আলোচনা নেই। শিল্পীর নামাঙ্কিত মুঘল চিত্রের সংখ্যাও খুব কম। এর কারণ কি? সেকালের সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব শিল্প ও শিল্পীর কথা আলোচনা করলে এই মনে হয় যে, শিল্পীরা তখন তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে নিজেদের সত্তাকে বিলীন করে দিয়েই জীবনে সার্থকতার আস্বাদন করতেন। নিজেদের অস্তিত্বকে শিল্পের গায়ে নামাঙ্কিত করে স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজন তাঁদের ছিল না। একটি কারণ হ'ল—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁকে অন্য উপায়ে সংগ্রাম করতে হত না। রাজা, মহারাজা, শ্রেষ্ঠী, বণিক ও ভক্তের আনুকূল্যে ও সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের জীবনযাত্রার গতি সহজ ও সুন্দর হয়েই এগিয়ে চলত। দ্বিতীয় কারণ হ'ল—শিল্প রচনার কাজকে তাঁরা স্বধর্মের পবিত্র অনুষ্ঠান ও সাধনার বিষয় বলেই মনে করতেন। সুতরাং তাঁদের কখনই প্রয়োজন হয়নি মূর্তি বা চিত্রের গায়ে নাম খোদাই করবার অথবা অন্য কোন উপায়ে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে প্রচার করবার। যে দেশে ও যে সমাজে শিল্প ও শিল্পীর আদর্শ এত উঁচু ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—সেখানে শিল্পের জগতে নারীর অবদান সম্বন্ধে কৌতূহল মেটানো আরও অসম্ভব ব্যাপার। অথচ যেভাবে গোষ্ঠীগত, পুরুষানুক্রমিক ধারায় ও পারিবারিক ভিত্তিতে ভারতের শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল—সেখানে নারী-সমাজের দানও যে কিছু-না-কিছু ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া, গার্হস্থ্য জীবনের নানা শুভ অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণের ছোটখাট শিল্পকর্মের ধারা অনুশীলন করলে সহজেই বোঝা যায় যে, এর পেছনে বহুদিনের একটা ধারা-বাহিকতার প্রভাব রয়েছে। আজকের দিনে আলপনা ও অন্যান্য মণ্ডলশিল্পের নক্সা পুঁথিগত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীনারা পূর্ববর্তীদের কাজের রীতি চোখে দেখেই

[illegible]
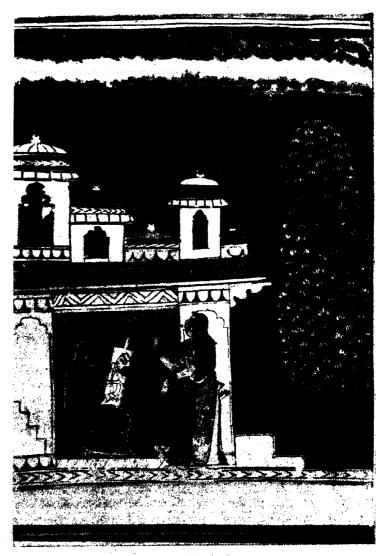
শিখেছিলেন এবং পুরুষানুক্রমিক ধারায় শিক্ষার ফলে যা সৃষ্টি হত—তার রূপ ছিল অনেক বেশী বলিষ্ঠ; গতি ছিল সহজ ও সচ্ছন্দ। শুধু আল্পনা নয়—নানা অভিনব রূপে কল্পনার মাটির পুতুল গড়া, ঘট, সড়া ও পিঁড়ি ইত্যাদি চিত্রণেও প্রাচীনারা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এরও পেছনে ছিল বংশানুক্রমিক ধারাবাহিক রীতির প্রভাব। উঁচু দরের শিল্প—যেমন ভাস্কর্য ও চিত্র রচনায় মেয়েরা কতটা অগ্রসর হয়েছিলেন তা স্পষ্ট অনুমান করা যায় না। কারণ, যে সব জায়গায় প্রাচীন শিল্পীর দুই একবার নামোল্লেখও আছে—সেখানে নারী শিল্পীর নামের কোন ইঙ্গিতও নেই। মুঘল যুগের শিল্পীদের লম্বা তালিকায়ও কোন নারীর নাম পাওয়া যায় না। অবশ্য মধ্যযুগের মুসলমান সম্রাটের দরবারের শিল্পীর তালিকায় কোন মহিলার নাম থাকবে এটা আশা করাও যায় না। কিন্তু ঐ যুগের মেয়েরা যে চিত্র চর্চা করতেন এবং ঐ বিষয়ে যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তার দুই একটি চাক্ষুষ প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে।

মুঘল আমলের অনেক আগেও এদেশে মেয়েরা যে উঁচুদরের সব শিল্প রচনা করতেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই যে সুনিপুণা হয়েছিলেন তার বহু ইঙ্গিত ও প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে অতি সুপ্রাচীন সব সাহিত্যের পাতায়। তাছাড়া, কয়েকটি প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নিদর্শনের মধ্যেও নারীর চিত্র চর্চার আভাস পাওয়া যায়। সাহিত্য ও শিল্প হ'ল সমাজের প্রতিচ্ছবি। সুতরাং সেইসব পুরানো দিনের সমাজে নারীরা শিল্পবিদ্যায় অতটা অগ্রসর না হ'লে কোন সাহিত্যিক বা শিল্পী তাঁর রচনায় উহার অবতারণা অবশ্যই করতেন না।

সাহিত্যের পাতায় নারী শিল্পীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত উষা ও অনিরুদ্ধের কাহিনীতে। বলিরাজার একশত পুত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বাণ। বাণের কন্যা উষা স্বপ্নযোগে প্রদ্যুম্ন তনয় অনিরুদ্ধের প্রতি হন আকৃষ্টা। স্বপ্নভঙ্গে বাণনন্দিনী হাহাকার ক'রে উঠতেই তাঁর প্রিয় সখী চিত্রলেখা এলেন এগিয়ে। তখন উষা সখীকে বললেন যে, তিনি স্বপ্নেতে শ্যামবর্ণ, কমললোচন, পীতবাস ও বৃহদ্বাহুযুক্ত এক পুরুষের প্রতি আসক্তা হয়েছেন। চিত্রলেখা তখন সখীর দুঃখ দূর করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একখানি পটে সুন্দর ক'রে চিত্র করলেন নানা দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ এবং মনুষ্য মূর্তিমালা। এছাড়া, সেই পটের মধ্যে বৃষ্ণিবংশ, শূর, বসুদেব, রাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের প্রতিকৃতিও এ'কে ছিলেন। প্রথমে প্রদ্যুম্নের চিত্র দেখে উষা একটু লজ্জিতা হয়েছিলেন—পরে অনিরুদ্ধকে দেখে অধোবদনা হয়ে 'এই সেই' বলে বিস্ময়ান্বিতা ও উৎফুল্লা হয়ে উঠলেন।

প্রাচীন ভারতের যশস্বী গ্রন্থকার শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনাকেও চিত্র চর্চায় রত দেখা যায় (২, ১)। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের উত্তর মেঘে (শ্লোক ২৪) যক্ষ যক্ষিনীর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে মেঘকে বলছেনঃ—

"হয়ত আমার কল্যাণে সে
পূজার্চনে ব্যস্ত প্রাতে,
কিম্বা আমার শীর্ণ এ রূপ
আঁকছে আপন কল্পনাতে।"

অনুবাদ—নরেন্দ্র দেব

পুষ্যভূতি বংশের রাজা শ্রীহর্ষের রচিত রত্নাবলী নাটকেও নারী শিল্পীর সুন্দর একটি বর্ণনা আছে। এই নাটকখানির দ্বিতীয় অঙ্কে দেখতে পাই নায়িকা সাগরিকা চিত্রফলক ও তুলি নিয়ে মহারাজার প্রতিকৃতি আঁকছেন। এমন সময়ে সখী সুসংগতা এসে পড়ায় সাগরিকা উড়ুনি দিয়ে পটখানি ঢেকে ফেললেন। সুসংগতা তখন জোড় করে ফলকখানি কেড়ে নিয়ে মহারাজার ছবির পাশে সাগরিকার ছবিও এ'কে দিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সাগরিকা ও সুসংগতা উভয়েই চিত্রবিদ্যায় নিপুণা ছিলেন। বাণভট্টের কাদম্বরী গ্রন্থে আছে যে, চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে কাদম্বরীর প্রথম দেখা হওয়ার পরে মহাশ্বেতার নির্দেশে তিনি (চন্দ্রাপীড়) যখন ক্রীড়া পর্বতের মণিমন্দিরে গেলেন—তখন কাদম্বরী তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য নানা গুণসম্পন্না একদল কন্যাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। ঐসব কন্যাদের মধ্যে কয়েকজন চিত্রবিদ্যায়ও খুব সুনিপুণা ছিলেন। আরও একখানি সংস্কৃত নাটকে নারী শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানি হ'ল ভবভূতি রচিত মালতীমাধব। প্রথম অঙ্কের, পঞ্চাশ শ্লোকে দেখতে পাই মালতী নিজের উৎকণ্ঠা দূর করবার জন্য মাধবের প্রতিকৃতি এ'কেছিলেন—আর সেই চিত্রখানি লবঙ্গিকা মন্দারিকার হাতে দিয়েছিলেন।

প্রাচীন যুগের সাহিত্যের পাশে পাশে শিল্পকলার মধ্যেও নারী শিল্পীর অস্তিত্বের দুই একটি চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাচীনত্বের দিকে মথুরা শৈলীর ভাস্কর্যে একটি দক্ষিণী মূর্তি বিশেষ করে উল্লেখ করার মত। মূর্তিখানির মাথাটি ভাঙ্গা; একখানি পা তুলে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হাতে ফলক ধরে ছবি আঁকছে। ভাস্কর্যে চিত্ররচনা রত নারীমূর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'ল ভুবনেশ্বরের নায়িকা মূর্তি। ছন্দোলীলায়িত দেহের উপরে মাথা নীচু করে ফলকে ছবি আঁকছে। নিছক ভাস্কর্য হিসেবেও এই মূর্তিখানি খুব মূল্যবান। কেহ কেহ এই মূর্তিখানাকে চিত্র চর্চা রত না বলে "পত্র লিখন" আখ্যাও দিয়েছেন।

নারী শিল্পীর সন্ধান করতে করতে প্রাচীন যুগ ছেড়ে মধ্যযুগে এলেও দুই চারটি সাহিত্যিক ও চাক্ষুষ প্রমাণের আলোচনা করা যেতে পারে এবং এই কয়টি প্রমাণও বেশ কৌতূহল উদ্রেক করে। খৃষ্টীয় ১১ শতকে ধারা নামক স্থানে পরমার বংশের রাজা ছিলেন ভোজ। রাজা ভোজের সভাকবি ধনপাল রচিত "তিলক মঞ্জুরী" কাব্যে নারী চিত্রশিল্পীর একটি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে। চক্রসেন বিদ্যাধরের কন্যা তিলকমঞ্জুরী বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে সর্বদা বিমর্ষভাবে থাকতেন। বিদ্যাধরের স্ত্রী মেয়ের অবস্থা দেখে তিলকমঞ্জুরীর চিত্রবিদ্যায় নিপুণা সখী চিত্রলেখাকে বললেন যে, তিলকমঞ্জুরী ছবি দেখতে খুব ভালবাসে (চিত্রদর্শনানুরাগিনী)। অতএব তাঁর উচিত আত্মীয় স্বজন ও সব রূপবান গুণবান রাজকুমারদের চিত্র এ'কে সখীকে দেখানো। তিনি আরও বললেন যে, প্রত্যেক রাজকুমারের ছবির পাশে তাঁদের নাম, ধাম ও গুণ গরিমার কথাও যেন লিখে দেয়া হয়।

আর একটি সুদক্ষা বালিকা শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় জৈনধর্মের একটি কাহিনীতে। সেখানে আছে যে, পুরানো কালে জিয়সত্তু নামে এক রাজা তাঁর প্রাসাদের একটি ঘরকে সুচিত্রিত ক'রে "চিত্রগৃহ" নাম দেবার পরিকল্পনা করেন। যে শিল্পীগোষ্ঠীর উপরে চিত্র রচনার ভার দেয়া হয়েছিল—তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন চিত্তনগয়া। এই শিল্পীর বালিকা কন্যা কনয়মঞ্জুরী প্রতিদিন পিতার খাবার নিয়ে এসে সেখানে অপেক্ষা করত। একদিন বালিকা পিতার তুলিকলম নিয়ে সেখানে বসে মেজের উপরে নানা বর্ণ সংযোগে একটি ময়ূরের পালক এ'কে রেখে গেল। এর পরে রাজা একদিন শিল্পীদের কাজ-কর্ম তদারক করতে এসে দেখেন ঘরের মেজেতে একটি সুন্দর ময়ূরের পালক পড়ে আছে। কৌতূহল বশত রাজা সেটিকে তুলতে গেলেন—কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও তোলা গেল না, বরং নখ গেল ভেঙ্গে। কারণ উহা তো আসল পালক নয়—কঠিন পাথরের মেজেতে আঁকা চিত্র মাত্র। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, সেকালে শুধু সাধারণ চিত্র রচনায়ই নয়—চিত্রে বাস্তববাদিতা প্রকাশেও মেয়েরা যথেষ্ট কৌশল ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

সাহিত্যের পাতা ছেড়ে দিয়ে এবারে

পুরানো চিত্রপটে লেখা শিল্প চর্চায় রত নারীর রূপ আলোচনা করা যাক। রাজস্থানী চিত্রের আদি যুগের রচনাবলীর মধ্যে রাগমালা চিত্রের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রমালায় আছে বিভিন্ন রাগ রাগিণীর চাক্ষুষ চিত্ররূপ। তার মধ্যে ধনশ্রী রাগিণীর যে রূপকল্পনা পাওয়া যায় তাতে ধনশ্রী নায়িকা বেশে নায়কের চিত্র রচনায় ব্যাপৃতা।

মুঘল যুগের শিল্পীদের নামের তালিকায় মহিলা শিল্পীর কোন উল্লেখ না থাকলেও দুই চারটি এমন চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, ঐ যুগে মেয়েরা অন্যান্য চারুকলার চর্চার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রবিদ্যারও যথেষ্ট অনুশীলন করেছিলেন। আকবর যুগের সুচিত্রিত "রসিক প্রিয়া" গ্রন্থের একটি চিত্রে দেখা যায়, নায়িকা একমনে বসে নায়কের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি রচনা করছেন আর পরিচারিকা সামনে রং-এর বাটি ধরে বসে আছেন। মুঘল যুগের আর একখানি চিত্রে হারেমের মধ্যে জনৈকা মহিলা শিল্পীর সামনে প্রতিকৃতি আঁকানোর জন্য এক অন্তঃপুরিকা স্থিরভাবে বসে 'সিটিং' দিচ্ছেন। মহিলা শিল্পীটি হাঁটুর উপরে ফলক রেখে অঙ্কনকার্যে নিবিষ্টা। তাঁর সামনে মেজেতে রয়েছে রং-এর বাটি ইত্যাদি। মুঘল হারেমে অনাত্মীয় পুরুষের যে প্রবেশ নিষেধ ছিল একথা ম্যানুচির রোজনামচায় বিশেভাবে উল্লিখিত হয়েছে। নারী শিল্পীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিকৃতি অঙ্কনের এই চিত্রটি দেখে মনে হয়—মুঘল পরিবারে ও তখনকার সম্ভ্রান্ত সমাজে মেয়েদের প্রতিকৃতি আঁকার জন্য মহিলা চিত্রশিল্পী নিযুক্ত করা হত। এর পরেই মুঘল চিত্রের বিশাল ভাণ্ডারে আর একটি নারীর অবদানের কথা মনে পড়ে। তিনি হলেন সাহিফা বাণু (Book Lady অর্থাৎ শিক্ষিতা মেয়ে)। ইনি মুঘল বংশের কোন বাদশার মেয়েও হ'তে পারেন অথবা ঐ যুগের কোন অভিজাত বংশের কন্যা হবেন। সাহিফা বানুর আঁকা যে ছবিখানি পাওয়া গিয়াছে উহা জাহাঙ্গীর যুগের রচনা—কিন্তু বিষয়টি হ'ল পারস্য সম্রাট শা-তামাস্পের প্রতিকৃতি। পারস্যের বাইজাদ শৈলীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর আগা মিরাক ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে শা তামাস্পের এই ধরনের একখানি প্রতিকৃতি আঁকেন। শের শার হাতে পরাস্ত হয়ে হুমায়ুন এই শা তামাস্পের আশ্রয়েই পারস্যে ছিলেন প্রায় বার বছর। হুমায়ুন সম্ভবত ভারতে ফিরে আসবার সময় বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ আগা মিরাকের অঙ্কিত চিত্রখানা নিয়ে আসেন। তারপরে হয়ত জাহাঙ্গীরের সময়ে সাহিফা বানু উহার এই মনোরম নতুন সংস্করণটি করেছিলেন। সম্রাটের

সাহিফা বাণু অঙ্কিত শা তামাস্পের প্রতিকৃতি

চেহারা, জামা পোশাক, মাথার পারসীক কুলা টুপি ও বসবার ভঙ্গী হুবহু নকল করা হ'লেও মুঘলাই রীতির অনেক নতুন জিনিস জুড়ে দেয়া হয়েছে। নতুনত্বের মধ্যে ছবির চারদিক ঘিরে 'হাঁসিয়া' বা বর্ডার প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবির মধ্যে চিত্রিত ছোট ছোট পাহাড় ও পৃষ্ঠপটের দৃশ্যটি নিছক মুঘল রীতির। সম্রাটের পেছনে যে গাছটি আছে—উহা পারসীক ও মুঘল—দুই রীতির চিত্রেই পাওয়া যায়। সরু বর্ডারের নীচে পারসীক অক্ষরে বেশ স্পষ্ট করেই সাহিফা বানুর নামটি লেখা রয়েছে। পুরানো প্রতিকৃতি নকল ক'রে আঁকা হ'লেও এই চিত্রখানি জাহাঙ্গীর যুগের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চিত্রের চেয়ে রচনারীতিতে কোন অংশে হীন নয়।

অতি সুপ্রাচীন কাল থেকে মুঘল যুগ পর্যন্ত সন্ধান ক'রে মহিলা শিল্পীর কথা 'যেটুকু জানা গেল—তা হিসেবে সামান্য হ'লেও খুব কৌতূহলের বিষয় সন্দেহ নেই। তবে এ বিষয়ে আরও আলোচনা ও অনুসন্ধান আবশ্যক এবং তাহ'লে হয়ত আরও অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে কলাশিল্পের ইতিহাসে প্রাচীন যুগের নারীর অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আমার একটি আত্মীয়া সবে জননী হয়েছেন। তাঁর জন্যে এক বোতল পোর্টের দরকার ছিল। তাঁর স্বামী আমার হাতে ষোলোটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, আমি তো কোথাও পাচ্ছি না। আপনার অনেক জানাশোনা আছে শুনতে পাই—দিন না জোগাড় করে।

জোগাড় করতে গিয়েই ভদ্রলোকের চালাকিটা ধরা পড়ল। যুদ্ধের তখন শেষ-মুখ—মৌর্য সাম্রাজ্যের স্বর্ণ যুগ নয়—চৌর্য সাম্রাজ্যের কালো যুগ চলছে। পোর্টের খবর দু-এক জায়গায় না পাওয়া গেল তা নয়, কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশের নিচে তারা কথা কয় না।

আত্মীয়াটির সঙ্গে সম্পর্কটা এমনি যে ওই ষোলোটা টাকা নিতেও বাধে। আরো ত্রিশটা টাকা চাইতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার ওপর দিনকাল এমনি যে হয়তো সন্দেহ করে বসবে আমিই ব্ল্যাক-মার্কেটিং করছি। অথচ প্রাইভেট কলেজের দীনতম লেকচারার আমি—ডি-এ জড়িয়ে দেড়শো টাকা মাইনে পাই। উদারতা দেখিয়ে নিজের টাকায় যদি পোর্টের বোতল একটা কিনেই ফেলি, তা হলে মাসের শেষ সাতদিন নির্ঘাৎ উপোস দিতে হবে।

অগত্যা কলেজী বন্ধু আদিত্য ডাক্তারের চেম্বারেই যেতে হল। আদিত্য ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ—ওর কাছে হয়তো একটা হদিশ মিলতেও পারে।

যাওয়ার আগে তিনবার আমি দ্বিধা করলাম। দু বছর আগে ওর মুখ দর্শন বন্ধ করে দিয়েছি। এককালে বন্ধুত্বটা ঘনিষ্ঠই ছিল, কিন্তু ওর স্ত্রী আত্মহত্যা করবার পর থেকে ওর নাম শুনলেই আমার ঘৃণা হয়। ওর স্ত্রী যখন গলায় শাড়ির ফাঁস পরিয়ে বীভৎসভাবে নিজের জীবনের সমাপ্তি ঘটায়, তখন আদিত্য একটা তৃতীয় শ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে ওয়াল্‌টেয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমার মাস্টারি বিবেক এত বড় অপরাধটাকে ক্ষমা করতে পারেনি।

কিন্তু গরজ বড় বালাই। যেতেই হল শেষ পর্যন্ত।

সারাটা দিনই অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘে অন্ধকার আকাশ। সন্ধ্যাটা বৃষ্টি আর এলোমেলো হাওয়ায় আরো বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। রসা রোডের এই ফাঁকা অঞ্চলটা আরো বেশি নির্জন হয়ে গিয়েছিল। ছাতাটা বন্ধ করে ওর চেম্বারে উঠতেই আমি থমকে গেলাম।

চেম্বারে মাত্র দুজন বসে মুখোমুখি গল্প করছিল। একজন আদিত্য, আর একজন সেই মেয়েটা। সেই দীপা মজুমদার—যাকে নিয়ে—

ইচ্ছে করল, তখনি নেমে যাই। কিন্তু সময় পাওয়া গেল না। আদিত্য ডাকল, একি সুকুমার যে! আরে, এসো—এসো—

একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে আছি—দীপা মজুমদারই উঠে পড়ল। নিজের বেঁটে ছাতাটা তুলে নিয়ে বললে, আজ আসি আদিত্য দা।

আদিত্য বললে, এসো।

দীপা বাইরের বৃষ্টিভেজা পথে বেরিয়ে গেল। আমি ওকে কতটা ঘৃণা করি সেটা জানে বলেই বোধ হয় আমাকে কোনো সম্ভাষণ করতেই সাহস পেল না। আমিও স্বস্তি বোধ করলাম।

আদিত্য হাসলঃ অমন করে দাঁড়িয়ে আছো কেন সুকুমার? এসো—বোসো—

ভাবলাম, আজ কয়েকটা স্পষ্ট কথাই বলব ওকে। মেয়েটাকে দেখে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে গিয়েছিল আমার। কী অদ্ভুত নির্লজ্জ আদিত্য! এত কাণ্ড—এত কেলেঙ্কারীর পরেও ও যে কী করে ওই মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে সে আমি কল্পনাও করতে পারলাম না।

বিচারকের মতো কঠিন মুখ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম আমি।

—অনেক দিন পরে এলে সুকুমার। ভালো আছো তো?—আদিত্য আমার দিকে সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে দিলে।

সিগারেট আমি স্পর্শও করলাম না। আকাশের মেঘের মতোই মুখের ওপর নিবিড় খানিকটা অন্ধকার ঘনিয়ে তুলে বললাম, হুঁ, ভালোই আছি।

—চা খাবে?

—না।

আদিত্য সিগারেট ঠুকতে লাগল টেবিলের ওপর। শান্ত গলায় বললে, অত চটেছ কেন? দীপাকে দেখে?

আমার এবার ধৈর্যচ্যুতি হল।

—তোমার লজ্জা করে না আদিত্য?

আদিত্যের মুখে এক টুকরো ম্লান হাসি রেখায়িত হলঃ করে। দীপাকে দেখলেই লজ্জায় মরে যাই আমি। আমাকে একটা অসহ্য গ্লানি থেকে বাঁচতে গিয়ে ও-যে কতবড় দাম দিয়েছে, সে-কথাটা ভেবে আজও আমি সান্ত্বনা পাই না সুকুমার।

—আদিত্য!—খুব সম্ভব একটা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ের চমক লাগল আমার গলায়।

বাইরে ঘন হয়ে বৃষ্টি নেমেছে। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সেদিকে একবার তাকালো ডাক্তার। আস্তে আস্তে বললে, এমনি বর্ষার দিনেই রবীন্দ্রনাথ তার গোপন কথাটি বলতে চেয়েছিলেন। ওটা নিছক রোমান্স নয় সুকুমার। সত্যিই এক-একটা সময় আসে যখন যে-কথাগুলো কাউকে বলা যায় না—সেই কথাগুলোই উজোড় করে বলতে ইচ্ছে করে। তোমরা শুধু একটা দিকই দেখেছ, আমাকে কোনো প্রশ্নই সেদিন করোনি। হয়তো প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষেও সম্ভব

হত না। আজ মনে হচ্ছে এ ভার যেন একা আর আমি বইতে পারছি না। কাউকে এর অংশ দিতে ইচ্ছে করছে। তোমার সময় আছে সুকুমার—বসতে পারো একটু?

তারপর আদিত্য ডাক্তার তার গল্প বলে গিয়েছিল।

আজ সাত বছর সে-গল্প আমি কাউকে বলিনি। এমন কি, এই সাত বছর ধরে নিজেকেই বার বার প্রশ্ন করেছি, এসব কি সত্যি? আদিত্য কি বানিয়ে বলেনি গল্পটা? নিউরোটিক স্ত্রীর ওপরে এই-ভাবেই একটা বীভৎস প্রতিশোধ নেয়নি সে?

তবু সম্পূর্ণ অবিশ্বাসও করতে পারিনি। হয়তো আসবার মুখে স্বাভাবিক কন্ট্-প্রাইসেই এক বোতল পোর্ট আমি পেয়ে-ছিলাম। সেই কৃতজ্ঞতাই হয়তো তার কারণ।

কিন্তু আজ যখন খবর পেলাম, বড় একটা বিলিতী ডিগ্রি নিতে গিয়ে ইয়োরোপে প্লেন-ক্র্যাশে মারা গেছে আদিত্য তখন এই কাহিনী প্রকাশ করবার একটা নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করছি। আর কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না—কিন্তু দীপা মজুমদারের দুটি কৃতজ্ঞ চোখের দৃষ্টি আমি অনুমান করতে পারছি। আর সেইটুকুই আমার পুরস্কার।

ডাক্তার যা বলেছিল, তা এই।—

তোমরা আমার স্ত্রী বীথিকে জানতে। জানতে, সে সুন্দরী, বিদুষী, গুণবতী। কিন্তু এটা জানতে না—সে কী ভয়ংকর নিউরোটিক।

দাম্পত্য-প্রেমের সে বীভৎস অভিশাপ বাইরে থেকে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। সাজানো ড্রয়িং-রুমে স্বামী-স্ত্রী যখন হাসিমুখে ভালো চা আর ভালো খাবার দিয়ে বন্ধুদের আপ্যায়ন করছে, কেউ অনু-রোধ জানালে স্ত্রী যখন অর্গ্যানে বসে মধু-কণ্ঠে গান শোনাচ্ছে, তখন স্বভাবতই মনে হতে পারে—এমন আইডিয়াল কম্বিনেশন বুঝি কখনো হয় না! সে স্ত্রী যদি আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে দু'কথা বলতে পারেন, নন্দলাল বসু আর যামিনী রায়ের আর্ট সম্বন্ধে দু' একটা মন্তব্য যদি জুড়ে দিতে জানেন—তা হলে তো আর প্রশ্নই থাকে না!

বন্ধুদের ঈর্ষাদগ্ধ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে শোনা যায়ঃ সত্যি—তুমি কী সুখী!

কী সুখী! তাই বটে। রাত্রে শোবার ঘরের নিভৃত নাটকটাকে কেউ তো দেখতে পায় না। স্নায়বিক ব্যাধিতে জর্জরিত স্ত্রী যখন সশব্দে একটা ফুলদানি আছাড় দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করেন, সাপের মতো হিংস্র গর্জন করে বলেন, তুমি একটা ইতর, একটা জানোয়ার—আর স্বামীর যখন দেওয়ালে মাথা ঠুকে নিজেই মাথাটা গুঁড়ো [illegible]

বীভৎস অধ্যায়টা লোকের দৃষ্টির আড়ালেই লুকিয়ে থাকে। কাউকে বলা যাবে না—কেউ বিশ্বাস করবে না! জুতোর পেরেক উঠে তীক্ষ্ণ দুঃসহ যন্ত্রণায় পায়ের তলা রক্তাক্ত হয়ে গেলেও যেমন মুখে হাসি টেনে মাটিতে বসে গল্প করতে হয়—ঠিক তেমনি ভাবেই এই মর্মান্তিক দাম্পত্য-লীলা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

তবু আমি সয়ে গিয়েছিলাম সুকুমার। একটা জিনিস বুঝেছিলাম, শান্তি আমি জীবনে কখনো পাবো না। প্রথম প্রথম কিসের একটা হিংস্র থাবা আমার হৃৎ-পিণ্ডকে আঁচড়ে চলত, মনে হত, এই আরণ্য জীবনবৃত্ত থেকে যেদিকে হোক ছুটে পালাই। কিন্তু অসহ্য রাত যেমন আছে, তার সঙ্গে তেমনি আছে অজস্র কাজে ভরা দিন। আস্তে আস্তে দিনের কাজকে রাতেও টেনে আনলাম—ডুবে গেলাম মেডিকেল সায়ান্সের পাতায়। একটা পা কাটা গেলে কিছুদিন বাদে ক্লাচ্-লাঠি অভ্যস্ত হয়ে যায়—আমারও তাই হল।

এইভাবেই চলছিল। মানুষ সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে সিনিক্ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত, পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসেই মাথার অর্ধেক চুল পেকে না যাওয়া পর্যন্ত হয়তো চলতও এইভাবেই। তারপর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর নামত একটা শ্রান্ত নির্বেদ। কিন্তু সে পর্যায়ে পৌঁছুবার আগেই পাশের ফ্ল্যাটে একঘর নতুন ভাড়াটে এল।

নবাগত এই প্রতিবেশীটির নাম নিশি-বাবু। শুনেছিলাম, রাধাবাজারের ওদিকে নাকি তাঁর কাগজের ব্যবসা আছে। ব্যবসা নিশ্চয় ফলাও ভাবেই চলছিল। কারণ যুদ্ধের কল্যাণে কাগজ তখন উধাও—হয় মিলিটারী ব্লু-প্রিন্ট্ হয়ে মহাশূন্যে উড়ছে আর নয়তো পোস্টারে-প্রোপ্যাগ্যান্ডায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চালাচ্ছে। সুতরাং নিশি-বাবু সকাল সাড়ে সাতটায় বেরুতেন আর রাতে সাড়ে বারোটায় ফিরতেন। কখনো কখনো ফিরতেনই না।

তাতে তাঁর স্ত্রীর অসুবিধে ছিল না। তিনি আমার ফ্ল্যাটে বীথির সঙ্গে গল্প করতে আসতেন।

এই ভদ্রমহিলার একটু বর্ণনা দরকার। এক ধরনের মেয়ে দেখেছ সুকুমার? কালো—বেশ কালো, অথচ দৃষ্টি পড়লে

তুমি সহজে সে-দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারবে না। উজ্জ্বল তরল চোখ—অথচ সে চোখে কী একটা বিষাক্ত প্রভাব আছে। সুন্দর শরীরে একটা পল্লবিত ছন্দ—আচমকা তোমার মনে হবে পায়ের কাছে ফণা তোলা একটা কেউটে সাপ দেখতে পাচ্ছ। মনে হচ্ছে তোমার এখুনি পালিয়ে যাওয়া দরকার, অথচ সেই তীক্ষ্ণ বিষাক্ত রূপের দিকে তাকিয়ে তুমি সরে যেতে পারছ না। রস-শাস্ত্রে নায়িকা-লক্ষণে সর্পিণীর উল্লেখ নেই কেন এ-কথা শুধু পণ্ডিতেরাই বলতে পারবেন।

আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সামান্যই।

—ডক্টর রায়, এ আপনার ভারী অন্যায় কিন্তু।

অন্যায়? প্রায় প্রথম পরিচয়েই এ ধরনের অভিযোগের জন্যে আমি তৈরি ছিলাম না।

--কী করেছি?

—সারা দিন তো বাইরে বাইরে ঘোরেন আপনি। বেচারী বীথির কী করে দিন কাটে —বলুন তো?

মুখে এসেছিল, আপনার স্বামীই বুঝি আপনার আঁচলের তলায় আশ্রিত হয়ে বসে আছেন? মনে এসেছিল, রাত্রের কয়েক ঘণ্টাই বীথি আমায় সহ্য করতে পারে না, আর চব্বিশ ঘণ্টা ওকে সঙ্গ দিতে গেলে ও হয়তো আমায় খুনই করে বসবে। কিন্তু মুখের কথা, মনের কথা—দুটোই আমি চেপে গেলাম। স্বাভাবিক সৌজন্যে জবাব দিলাম, ডাক্তার মানুষ--বুঝতেই পারেন অবস্থা। সময় কই আমার?

—সময় করে নেওয়া উচিত। বীথির কত খারাপ লাগে—সেকি বোঝেন না?

ধমক দিতেই ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু আমি বিনয়ের হাসি হাসলাম। অযাচিত উপদেশটাকে ভদ্রভাবেই মেনে নিতে হল। ব্যাস--ওই পর্যন্তই। তারপর থেকে ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ কোনোরকম বাক্যালাপ ঘটেনি। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে—হাসির বিনিময়ও ঘটেছে—ঠিক যতটুকু না হাসলে নয়। ভদ্রমহিলাকে আমার বিশেষ ভালো লাগেনি—উনিও যে আমাকে প্রীতির চোখে দেখছেন সে কথা মনে হয়নি কখনো। তাতে আমার কিছু আসে যায়নি। বীথির যদি ওঁকে ভালো লেগে থাকে—সেইটেই যথেষ্ট। বরং এইটেই ভেবেছি, আমার ওপর থেকে বীথির দৃষ্টিটা খানিক সরে গেলেই যেন স্বস্তি পাই আমি। ওর নিউরোসিসের জগতে আর একজন কেউ থাকুক। সঙ্গ দিক ওকে—ভুলিয়ে রাখুক।

আশ্চর্য, হলও তাই।

ভদ্রমহিলাকে বীথি ডাকত খুকুদি বলে। ওঁর আর কোনো নাম আছে কিনা জানতে চাইনি—জানবার কৌতূহলও আমার ছিল না। কিন্তু কৌতূহল বেড়ে উঠল তখন, যখন দেখলাম, বীথি একেবারে খুকুদি অন্ত প্রাণ হয়ে উঠেছে।

বীথি চরিত্রের দিক থেকে আত্মকেন্দ্রিক—রুচির দিক থেকে উন্নাসিক। খুকুদির সঙ্গে তার এই অন্তরঙ্গতা আমার কেমন বাড়াবাড়ি ঠেকল। শিক্ষা-দীক্ষার বিচারে খুকুদি বীথির চাইতে অনেক নিম্নস্তরের, কথাবার্তায় স্পষ্ট একটা অমার্জিত ভঙ্গি। বীথি গ্রাজুয়েট, খুকুদির লেখাপড়া কতদূর জানি না, তবে ওঁর স্বহস্তের একটা ছোট স্লিপ দেখেছিলাম একবার। তাতে তিন লাইনে চারটে বানান ভুল ছিল আর হাতের লেখা দেখে মনে হয়েছিল, ধোপার খাতার পরে উনি আর বেশিদূর এগোননি।

তবু দুজনের মধ্যে কী যে বন্ধুত্ব জমে উঠল সুকুমার, সে তোমায় আমি ভালো করে বোঝাতে পারব না।

দুপুর হলেই খুকুদি একটা পানের বাটা নিয়ে ওপরে এসে বসেন। পান খাওয়া চলে, গল্প চলে। বীথি আগে কালে-ভদ্রে দু একটা পান খেত, খুকুদির পাল্লায় পড়ে দেখলাম ওর দস্তুরমতো নেশা হয়ে গেছে।

একদিন বলেছিলাম, ওঁর পান খাও কেন? নিজে কিছু আনিয়ে নিলেই পারো?

বীথি বলেছিল, না—না। খুকুদির মতো পান কেউ সাজতে পারে না—কোনো পান-ওলাই না। ওঁর হাতের একটা আলাদা স্বাদ আছে।

স্বাদ থাকে তো থাক। আমার কিছু বলবার নেই। বরং একদিক থেকে জিনিসটা ভালোই হয়েছিল আমার পক্ষে। যত দিন যেতে লাগল, আমার ওপর থেকে বীথির খরদৃষ্টিটা সরে যেতে লাগল একটু একটু করে। বীথির মেজাজের চেহারাও বদলাতে শুরু করল। অনেকটা শান্ত, অনেকখানি আত্মমগ্ন এখন। কখনো কখনো আমার সঙ্গে গল্প করতেও চেষ্টা করে। সবই খুকুদির গল্প। খুকুদির বাড়ীর কোন আমড়া গাছে ভূত থাকত, ছেলেবেলায় খুকুদি কবে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিলেন—এইসব রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রায়ই শুনতে হত আমাকে। সেই চরিতামৃত শুনতে শুনতে ক্লান্তির ঘুম নেমে আসত আমার চোখে।

কখনো কখনো ভারী আশ্চর্য লাগত। সন্দেহ হত, বীথির চরিত্রে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। ও যেন খুকুদির প্রেমে পড়েছে—যেন খুকুদিকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। আমার ব্যক্তিগত সুখ সুবিধেগুলোর ওপর বীথির যে সতর্ক মনোযোগ থাকত, ক্রমশ সেটা যেন সরে যাচ্ছে দূরে।

প্রায়ই বীথি ও-পাশে ফ্ল্যাটে গিয়ে বসে থাকত। আগে খুকুদি আসত, কিন্তু এখন যাওয়ার গরজটা যেন বীথির পক্ষ থেকেই। রান্নার ব্যাপারে বীথি কোনোদিন চাকরকে বিশ্বাস করেনি—এখন ও-পাটটা সে ওদের হাতেই তুলে দিয়েছিল।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ব্যাপারে নিজের ওপরে নির্ভর করতে আমার ভালোই লাগে—ভোজন-বিলাসীও আমি নই। কাজেই এসবে আমার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে চকিত হয়ে উঠতেই হল।

ডাক্তারীতে পশার তখনো এমন বেশি জমে ওঠেনি যে মুঠোমুঠো নোট পড়ে থাকে ট্রাউজারের পকেটে। বরং যা পেতাম, তার সম্পর্কে আমাকে সজাগ থাকতে হত। খরচ করতে হত সাবধানী হিসেবের সঙ্গে। এই অবস্থায় একদিন ড্রয়ার খুলে দেখলাম, চল্লিশটা টাকা পাওয়া যাচ্ছে না।

বীথিকে ডাকলাম।

বীথির মুখে ভ্রুকুটি ঘনিয়ে এল: অত চ্যাঁচাচ্ছ কেন চল্লিশটা টাকার জন্যে? আছে আমার কাছে।

—তা হলে গোটা কুড়িক টাকা আমায় দাও। গরম জামাকাপড়গুলো ধুতে দিয়েছিলাম, নিয়ে আসতে হবে আজ।

বীথি একটু চুপ করে থেকে বললে, তা হলে দিন কয়েক পরেই এনো।

—কেন? দিয়েছ নাকি কাউকে?

বীথি জবাব দিল না।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি অনুমান করে ফেললাম: তোমার প্রাণের বন্ধু খুকুদিকে দাওনি তো?

প্রশ্নটা নিরীহ—অন্তত উত্তেজিত হওয়ার কিছুই ছিল না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিউরোসিসের একটা বন্য আভা জ্বলে উঠল বীথির চোখে।

--যদি দিয়েই থাকি, কী হয়েছে তাতে? অমন ছোটলোকের মতো করছ কেন সেজন্যে?

এ ধরনের কথায় আর ধৈর্যচ্যুতি হয় না আমার—দিনের পর দিন প্রায় অকারণ কটু-কাটব্য শুনতে শুনতে এসবে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি সংযম হারালাম না। বললাম, দিয়েছ কিনা সেইটেই শুধু জানতে চেয়েছি, ছোটলোকের মতো কিছুই করিনি।

—না, করোনি? —বীথি তিক্ত গলায় বললে, তোমাকে যেন আমি আর চিনি না! কী মতলব নিয়ে কী কথা যে তুমি বলো সে আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

আমি থেমে গেলাম। এর পরে আর একটা কথা বাড়ানোর অর্থই হল খানিক কল্পনাতীত বিভীষিকার সৃষ্টি করা। বীথি আর্তনাদ করবে, চাপা গলায় অবিশ্বাস্য ভাষায় অকথ্য গালাগালি করবে, আছাড় দিয়ে চুরমার করবে গোটা দুই কাচের গ্লাস। আর সেদিকে তাকিয়ে আমার মনে হবে: কী

থাকতে হবে—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর!

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি।

কিন্তু কেবল চল্লিশ টাকাই নয়। তারপরে প্রায়ই পনেরো-কুড়ি-ত্রিশ টাকার হিসেবে গরমিল হতে লাগল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কোথায় যাচ্ছে এ-টাকা, কে নিচ্ছে। টাকাগুলো যে কোনোদিনই শোধ হবে না, সে সোজা কথা বুঝতেও আমার বাকী ছিল না।

তবু আমি সহ্য করে চলেছিলাম। শুধু একদিন জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলামঃ নিশি-বাবু তো খুব ভালো ব্যবসা করেন শুনতে পাই, তবু তোমার খুকুদির এত টাকার দরকার হয় কেন?

—তা দিয়ে তোমার কোনো দরকার আছে? —ধারালো প্রশ্ন এল বীথির।

দরকার অনেক আছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা আমাকেই রোজগার করতে হয়, অনেক বিনিদ্র রাত্রির শ্রম, অনেক ক্লান্ত ক্ষুধার্ত দিনের জ্বালা ওই টাকাগুলোর সংগে জড়িয়ে থাকে। কাজেই ওদের সম্পর্কে প্রশ্ন করার নৈতিক অধিকার নিশ্চয়ই আছে আমার। কিন্তু বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে সে অধিকার আমি দাবি করতে পারলাম না।

কিন্তু একদিন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।

বীথির মামাতো বোনের বিয়ে। এ এক বিরক্তিকর সামাজিকতা। রক্ষা করতে খারাপ লাগে, আবার না করেও উপায় নেই।

বেরুবার মুখেই ঘটল ব্যাপারটা।

সাধারণত এসব লক্ষ্য করার অভ্যেস আমার নেই। কিন্তু সেদিন কী করে যে চোখে পড়ল সে আমি নিজেই জানি না।

বিশেষ একটা সখের হার ছিল বীথির। যে কোনো উৎসবে বেরুতে গেলে ওই হারটা সে পরতই। দামী জিনিস, অন্তত সাত-আটশো টাকার কাছাকাছি। আজ সে হারটা দেখা গেল না বীথির গলায়।

—তোমার ও হারটা পরলে না?

বীথি ভ্রূকুটি করলঃ পুরুষ মানুষের সব জিনিসে অত নজর কেন? বেরুচ্ছ, বেরোও।

কেন জানি না, হঠাৎ বিশ্রী একটা জেদ চাপল আমার। বললাম, না, সেই হারটাই তোমায় পরতে হবে।

বীথির চোখে-মুখে ঝড়ের পূর্বাভাস ঘনিয়ে এলঃ আমি পরব না।

—তার মানে? সে হারটাও তোমার খুকুদিকে দিয়ে রেখেছো নাকি?

প্রথম দিন যেমন মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আজও তেমনি ভাবেই ঠিকরে পড়ল কথাটা। কিন্তু ফল হল ভয়ংকর। একটা টেবিলের কোণা ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল বীথি।

হ্যাঁ, দিয়েছি। বেশ করেছি। আমার যা আছে সব দেব ওকে। আমার শাশুড়ী-র গয়না সব দিয়ে দেব। কী করতে পারো তুমি?

আমার মাথায় এবার চড়াৎ করে উঠল রক্তঃ অনেক কিছুই পারি। তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ বলেই আমি তোমার সে পাগলামি সমর্থন করব না। যাও—নিয়ে এসো হারটা।

—আনব না! —বীথি তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলঃ আনব না!

—তা হলে আমিই নিয়ে আসছি—বলে ঘুরে দাঁড়ালাম।

—খবর্দার—খবর্দার বলছি। —বীথির গলা থেকে বিকৃত আর্তনাদ বেরুলঃ এঘর থেকে এক পা যদি এগোও, আমি এই তেতলা থেকে সোজা বড় রাস্তায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। অসভ্য—ইতর—ছোটলোক—

তারপরের দৃশ্যটুকু আর বর্ণনা করে লাভ নেই সুকুমার। সেই কদর্য হিংস্রতা, সেই কটু গালাগালি—সে অধ্যায়টুকু প্রচ্ছন্ন থাকাই ভালো। টেবিল থেকে নতুন কেনা টাইমপীসটাকে এক আছাড়ে চুরমার করল বীথি—বেরুবার জন্যে যে সিল্কের শাড়ীটা পরেছিল, নখের আগায় সেটাকে ছিঁড়ল টুকরো টুকরো করে, একটা বন্দী বাঘের মতো দাপাদাপি করল কিছুক্ষণ, তারপর পাশের ঘরে গিয়ে দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু আমি তার মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ বীথির সমস্ত উন্মত্ততার মধ্যে আরো একটা কী যেন আগুনের চাবুকের মতো এসে আমায় আঘাত করল। চোখের তারা দুটো অস্বাভাবিক বিস্ফারিত। নাসারন্ধ্রের দু' পাশ ফুলে উঠেছে—মুখের রঙ বদলাচ্ছে ঘন ঘন। এ তো শুধু নিউরোসিস্ নয়!

হঠাৎ যেন কেউ প্রবল একটা ঘা দিয়ে আমার বন্ধ দৃষ্টি খুলে দিলে। আমার ডাক্তারী অনুভূতি মুহূর্তে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। মনে পড়ল—আরো মনে পড়ল, আজকাল প্রায়ই রাতে ভালো করে ঘুমোয় না বীথি। ওঠে—অন্ধকার ঘরে পায়চারী করে বেড়ায়। প্রশ্ন করলে জবাব দেয়, বিছানায় বড্ড পিঁপড়ে উঠেছে—ঘুমুতে পারি না।

অথচ, আলো জেবলে বিছানায় একটি পিঁপড়ের সন্ধানও আমি পাইনি।

এ-সব কিসের লক্ষণ? কিসের?

কিছুক্ষণ যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত কংক্রীটের মতো জমে গেল আমার। তার পরেই চোখে পড়ল টেবিলের ওপরে দুটো পান। খুকুদি'র পান। বেরুবার সময় খাবে বলে এনেছিল বীথি।

পান দুটো নিয়ে আমি তখনি চলে গেলাম ল্যাবরেটরীতে। তখন আমার পায়ের নিচে মাটি ছিল না, আকাশ ছিল না মাথার ওপর।

রেজাল্ট্ জানতে সময় লাগল না। একটু পরেই এল কেমিস্ট্।

—এ পান কোত্থেকে জোগাড় করলেন?

—কী আছে ওতে?—রুদ্ধ গলায় আমি প্রশ্ন করলাম।

কেমিস্ট্ জবাব দিলে, কোকেন।

জানতাম, আগেই বুঝেছিলাম। সোজা এসে খুকুদি'র ফ্ল্যাটের কড়া নাড়লাম।

খুকুদিই এসে সামনে দাঁড়ালো। ভাগ্যিস বীথি সেখানে ছিল না—সে তখনো নিজের ঘরেই খিল বন্ধ করে পড়ে আছে। খুকুদি এক মুহূর্তে আমার চোখের দিকে তাকালো। তরল চঞ্চল চোখ দুটোয় যেন বিষের ঢেউ দুলে গেল চকিতের জন্যে। তারপরেই মোহিনী হাসি হেসে বললে, ডক্টর রায়—আপনি? কী ভাগ্য আমার—আসুন—আসুন।

লোহার মতো শক্ত গলায় আমি বললাম, আপনার অভ্যর্থনা নেবার জন্য আমি আসিনি। আমি বলতে এসেছি, এ বাড়ি থেকে আপনি এক্ষুণি বেরিয়ে যাবেন।

—বেরিয়ে যাব?

—হ্যাঁ, বেরিয়ে যাবেন।

খুকুদি'র চোখে আবার নীল হিংসার ঢেউ খেলল। কিন্তু অবিশ্বাস্য সংযমের সংগে খুকুদি বললে, আপনি আমার স্বামীও নন—বাড়িওলাও নন যে হুকুম করলেই এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। রোদে রোদে ঘুরে বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছে আপনার। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটা আপনার ফ্ল্যাট্ নয়—পাশেরটা।

—কোন্ ফ্ল্যাট্ আমার সে আমি জানি। আপনার স্বামী হওয়ার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি, সে-কথাও আমার মনে আছে!—

—খুকুদি'র মুখে আমি বজ্রদৃষ্টি ফেললামঃ আমি বীথির স্বামী। আর এটাও আমার জানতে বাকী নেই যে, বীথিকে আপনি কোকেন ধরিয়েছেন। সেই সংগে একে একে কেড়ে নিচ্ছেন তার টাকা, গয়না, মনুষ্যত্ব—তার সব।

ফণা-তোলা নাগিনীর মতো দুলছিল খুকুদি, এবার যেন শিকড় পড়ল মাথায়। কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল সংগে সংগে। তবু হাল ছাড়ল না। পাংশু হাসি হেসে বললে, আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন ডক্টর রায়?

—চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না।—ইচ্ছে করল খুকুদির গলাটা আমি টিপে ধরিঃ আমি পাগল হতে পারি, কিন্তু পুলিস নয়। আপনার ফ্ল্যাট্ সার্চ করলে কোকেন পাওয়া যাবে কিনা, সেটা তারাই বিচার করবে।

খানিকক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল

দেখতে পাচ্ছিলাম। অদ্ভুতভাবে সেটা কাঁপছে, যেন মাথা-থ্যাঁতলানো একটা সাপ মোচড় খাচ্ছে অন্তিম যন্ত্রণায়। চাপা উত্তেজনায় খুকুদির ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়তে লাগল অনেকক্ষণ।

বললাম, আপনি যাবেন, না আমি পুলিসে খবর দেব?

খুকুদি বললে, পুলিসের দরকার নেই। আমি এমনি যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাব?

—সে কথা বলবার দায় আমার নয়। আপনার মামার বাড়ি, পিসের বাড়ি, জাহান্নাম—যেখানে হোক।

খুকুদির গলার শিরাটা শেষবার কেঁপে উঠল—দুই চোখে দেখা দিল হিংসার শেষ ফুলকি।

—পথ বাতলে দিয়েছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। এখুনি যেতে হবে?

—এখুনি।

—আমার স্বামীকে কী জবাব দেব?

—আপনিই জানেন।

—যাবার আগে একটা স্যুটকেস্ নিয়ে যেতে পারি?

—হ্যাঁ—আপনার কেকেন শখ। কিন্তু এখুনি নিয়ে আসুন। আমি আপনাকে রাস্তায় ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসব। আর মনে রাখবেন, এ বাড়িতে যদি আর কখনো পা দেন—অন্তত পাঁচ বছর জেল খাটবার জন্যে তৈরি হয়ে আসতে হবে আপনাকে।

খুকুদি দেরী করল না। দু' মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এল একটা চামড়ার স্যুটকেস্ নিয়ে।

রাস্তায় ট্যাক্সি আমিই ডাকলাম। গাড়িটা চলে যেতে খুকুদির চাপা গলার শাসানি ভেসে এল শেষবার: জেনে-শুনে আপনি আগুনে হাত দিলেন ডক্টর রায়। আমাকে আপনি চেনেন নি।

পরে চিনেছিলাম। জেনেছিলাম, খুকুদি নিশিবাবুর বিবাহিতা স্ত্রী নয়।

কিন্তু এ-সব কথা থাক সুকুমার। এই কুৎসিত অধ্যায়ের জের টানতে আর ভালো লাগছে না। শুধু পরের দিন অদ্ভুত কতকগুলো কাণ্ড করেছিল বীথি। একটা অসহ্য অব্যক্ত শারীরিক যন্ত্রণায় মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়েছিল, ঘামে ভিজে গিয়েছিল সর্বাঙ্গ, হাতে-পায়ে খিঁচুনি ধরেছিল। তারপর হঠাৎ উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর।

বাঘিনীর মতো আঁচড়ে আঁচড়ে মুখ রক্তাক্ত করে দিয়েছিল আমার। টেনে ছিঁড়ে নিয়েছিল এক গোছা মাথার চুল। আর ক্ষিপ্ত গোঙানির সঙ্গে বার বার বলেছিল, তুমিই খুকুদিকে তাড়িয়েছ বাড়ি থেকে—তুমিই।

একটা উপায় ছিল সুকুমার। বীথিকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া যেত। কে নিয়ে যাবে ওকে হাসপাতালে? কে এগোবে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর কাছে? অতএব 'ভায়োলেণ্ট মেথড'ই ভালো—প্রকৃতিই ওর ব্যাধিমোচন করুক।

তিনদিন ধরে ওর অসহ্য যন্ত্রণা দেখলাম আমি। দেখলাম ঘন-ঘন মূর্ছা। তারপর আর সহ্য হল না। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় মাদ্রাজ মেলে উঠে ওয়াল্‌টেয়ার চলে গেলাম।

আদিত্য একবার থেমে গিয়েছিল। একটা সিগারেট বের করেছিল টিন থেকে, কিন্তু ধরায়নি। আঙুলের ফাঁকে সেটাকে আটকে রেখে বলেছিল, এতক্ষণ দীপার কথা তোমায় বলিনি। এইবারে বলব। একেবারে শেষ দৃশ্যে ও এসেছে—অথচ সব চাইতে বিয়োগান্তক ভূমিকাটাই ওর।

মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত ও আমার সহপাঠিনী ছিল, তারপর পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। মেয়েটাকে আমার ভালো লেগেছিল, ওরও হয়তো আমাকে খারাপ লাগত না। কিন্তু আমরা প্রেমে পড়িনি—সে-কথা মনেও ওঠেনি কোনোদিন। অন্তত আমার দিক থেকে তো নিশ্চয়ই নয়।

সেই দীপার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওয়াল্‌টেয়ারে। বেড়াতে গিয়েছিল।

নিজের সমস্ত মানসিক বিক্ষোভকে ভোলবার জন্যে দিন কয়েক এক সঙ্গে বেড়িয়েছিলাম দুজনে। দীর্ঘ ছায়া কাঁপা নারকেল গাছের ছায়ায় বসে, সমুদ্রের কলধ্বনি শুনতে শুনতে হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম—ওকে বলেছিলাম আমার কাহিনী। আকাশে দেখা দিয়েছিল এক টুকরা শ্রান্ত চাঁদ—সমুদ্র বিষণ্ণ কান্নায় ঝিমিয়ে পড়ছিল—নারকেল পাতায় ঝির্ ঝির্ করে বাজছিল দীর্ঘশ্বাস—আর দীপার শান্ত চোখ মৌন-করুণায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

তারপরে টেলিগ্রাম এল। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করেছে বীথি।

কী জবাব দেব আমি কলকাতায় ফিরে? কী কৈফিয়ৎ দেব সমাজের কাছে? পোস্ট্-মর্টেমে কোকেন সিমটম বেরিয়ে আসবে—কোথায় লুটিয়ে যাবে বীথির সম্মান?

দীপা কি আমাকে আগেই ভালো-বেসেছিল? অথবা সেই মুহূর্তেই প্রথম ভালোবাসল আমাকে? আমাকে প্রশ্ন কোরো না সুকুমার। মেয়েদের চরিত্র বোঝবার চেষ্টা অনেকদিন আগেই আমি ছেড়ে দিয়েছি।

দীপা বললে, আমিও আপনার সঙ্গে কলকাতায় যাব আদিত্যবাবু। একটা ডাবল-বার্থ কুপে রিজার্ভ করুন।

—ডাবল বার্থ কুপে!

—তা ছাড়া উপায় কী আদিত্যবাবু? একমাত্র নিজের ওপর কলঙ্ক টেনেই আপনি স্ত্রীকে কলঙ্ক থেকে বাঁচাতে পারেন!

—আর আপনি?

—আমি আপনার বন্ধু।

ডাবল বার্থ কুপেই পাওয়া গেল। দুজনে দুদিকের জানালায় মুখ রেখে সারাটা রাত নিঃশব্দে কাটিয়ে কলকাতায় এলাম। বিশ্বাস করো সুকুমার—সে রাত্রে বীথির কথা আমার একবারও মনে হয়নি—একবারও নয়। শুধু দীপার অন্ধকার প্রোফাইলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেবেছি: ওকি আমাকে করুণা করছে—শুধুই করুণা?

আদিত্য আবার থেমেছিল।

—মেডিক্যাল কলেজে জানাশুনো ছিল, পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্টটা কাগজে আর বেরুল না। অবস্থা বুঝে পুলিসেও দয়া করল। তবে খুকুদিকে তারা আজও খুঁজছে—কোনোদিন পাবে কিনা জানি না। বিচিত্ররূপিনী খুকুদিকে অত সহজেই পাওয়া যায় না।

বীথির কলঙ্ক কেউ জানল না সুকুমার। কিন্তু চিহ্নিত হয়ে রইল দীপা। এখনও প্রাইভেট্ নার্স। পেশেণ্টের ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই যোগাযোগ হয় ওর সঙ্গে। বার বার ভেবেছি, ওকে জিজ্ঞাসা করব, ও আমায় ভালোবাসে কিনা। কিন্তু কী হবে জিজ্ঞাসা করে? আমিও ওকে ভালোবেসেছি কিনা—সে প্রশ্নের উত্তর তো আজও পাইনি!

আদিত্য শেষ করেছিল এখানেই।

ভেবেছিলাম, এ গল্প কাউকে বলব না। কোনো লাভ নেই—কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি নিজেই কি বিশ্বাস করতে পেরেছি? কিন্তু আজ যখন খবর এসেছে কণ্টিনেণ্টে একটা প্লেন-ক্র্যাশে মারা গেছে আদিত্য, তখন মনে হল অন্তত দীপা মজুমদারের জন্যেও এ কাহিনী আমি প্রকাশ করব।

যদি এ সত্যি হয়, তা হলে দীপার দুটো কৃতজ্ঞ চোখের দৃষ্টি আমি অনুভব করতে পারছি। আর যদি মিথ্যে হয়, তাতেই বা ক্ষতি কী! এ মিথ্যে দিয়ে দীপা বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল বীথির কলঙ্ক আর এক মিথ্যে দিয়ে না হয় আদিত্য দীপার কলঙ্ককেই আড়াল করে দিক।

জেন্টলম্যান

কথাটা মনে পড়ল সেদিন সকালে বাথরুমে। একটু অদ্ভুতভাবে।

হাতে আমার টুথব্রাশ, সামনে টুথপেস্টের টিউব। মাসের শেষ, তাই টিউব প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। যখন ভর্তি থাকে তখন আস্তে আমি ওটার লেজের দিকে চাপ দিই আর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ টুথপেস্ট। কম নয়, বেশী নয়। কিন্তু যে টিউব তার অন্তিম অবস্থায় পৌঁছেছে তার সাধ্য নেই অমন মিতাচারী হবার। তাই আমার ফুরিয়ে আসা টিউব সম্বন্ধে যখন আমার মনে সন্দেহ ছিল আধ ইঞ্চি পেস্টও তার অভ্যন্তরে আছে কিনা তখন স্বভাবতই আমি ওটার গলা টিপলুম জোরে—আর অমনি বেরিয়ে এলো প্রয়োজনাতিরিক্ত টুথপেস্ট, প্রায় দু ইঞ্চি। অপচয় হোলো।

কিন্তু আমার ততক্ষণে মাজনের কথা মনে ছিল না। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল অজিত ঘোষের মুখ। ওর দশা হয়েছে আমার ওই টুথপেস্ট টিউবটার মতো। সবই প্রায় ফুরিয়ে গেছে। বাকী যা আছে তা মাথায় এসে উঠেছে। ওর আর সাধ্য নেই হিসেবী হবার। মাথার দিকে একটু টিপলে বেরিয়ে আসে বেহিসেবী দু' ইঞ্চি।

*

অজিত ঘোষের টিউব যখন ভর্তি ছিল তখন আমি ওকে জানতুম না। আমি ছাড়া প্রায় সবাই জানতো। আজো কলকাতায় [illegible] প্রধান [illegible]—আফিসে, ক্লাবে—অল্পই আছেন যাঁদের সঙ্গে অজিত অন্তরঙ্গ নয়। ম্যাকিনলে কোম্পানির নাম্বার ওয়ান মিস্টার উইলিয়াম আর্চারকে অজিত বিল্ বলে ডাকে অনায়াসে। ওয়াল্টার হ্যারিসন কোম্পানির বড়ো সাহেব আর সবায়ের কাছে অ্যান্টনি ক্যাম্পেবল হতে পারে, অজিতের কাছে অনেক দিন থেকে সে টোনি বয় মাত্র। এর কারণ বোঝাও শক্ত নয়, কেননা অজিত ঘোষ প্রথম সারির একটি ম্যানেজিং এজেন্সির অফিসে প্রবেশ করেছিল এমন দিনে যখন ওই সব চাকরিতে অল্প ভারতীয়েরই প্রবেশাধিকার ছিল। সরকারী চাকরিতে আই সি এস বা আই পি যেমন একদিকে আর আজকালকার আই এ এস অপর দিকে, অজিতের সঙ্গে স্বরাজোত্তর নেতাজী সুভাষ স্ট্রিটের কালো সাহেবদের ব্যবধান ততখানি বা তার চেয়েও বেশী। অজিত শুধু য়ুরোপীয়ান কভেনান্টেড অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল না, তার নিয়োগ হয়েছিল বিলাতে, যার নাম বোধহয় হোম অ্যাপয়ন্টমেন্ট।

অজিতের অধিকার ছিল এই চাকরিতে। ওর পিতামহ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, ওর বাবা ছিলেন স্বল্পসংখ্যক ভারতীয় আই এম এস-দের অন্যতম। ওর নিজের শৈশব কেটেছে ইংল্যান্ডে কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর পাবলিক স্কুলে—ছুটি কাটতো সুইটজারল্যান্ডে বা দক্ষিণ ফ্রান্সে, পিতামহী ও পরে মায়ের সঙ্গে। [illegible]

পরে বদলি হয় প্রথম করাচী শাখায়, পরে বম্বেতে এবং সব শেষে কলকাতায়। এটা অজিতের কাছে শোনা নয়; যাঁরা জানেন বলেন, অজিত এতদিনে ওর কোম্পানির ডিরেক্টর হোতো নিশ্চয়ই। এখন ওর জায়গায় অন্য ভারতীয় আছেন।

এত কথা বলার প্রয়োজন ছিল এইটে বোঝাতে যে এত উপরে ছিল বলেই অজিতের পরবর্তী পতনে এত শব্দ হয়েছিল—আজো এ সম্বন্ধে গল্প শোনা যায় এ মহলে ও মহলে। এত উপর থেকে পড়েছে বলেই ওর নিজের আঘাত লেগেছিল এত বেশী।

*

বাইরে-থেকে অনেকের কাছেই অজিত-পতন আকস্মিক বলে মনে হয়েছিল। অত বড়ো বাড়ি একদিনে ধসে যায় না। নীচে থেকে তার ভিৎ ক্ষয়ে যাচ্ছিল অনেক দিন থেকেই, কিন্তু অজিতের বাইরের জীবনযাত্রায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন কেউ দেখতে পায়নি। রেসে অজিতকে দেখা গেছে আগেকার মতো। তফাৎ যদি কেউ লক্ষ্য করতো তবে শুধু দেখা যেতো যে অজিত আগের চাইতে একটু বেপরোয়া এবং দুটো রেসের মধ্যে সে বারে যেন একটু বেশী সময় কাটাচ্ছে। ক্যালকাটা ক্লাবে আগেও অজিতের নিত্য উপস্থিতির কথা সবাই জানতো। দুয়েকজন ছাড়া কেউই লক্ষ্য করেনি যে অজিত আগে কেউ ডাবল্ চাইলে তাকে বর্বর মনে করতো, এখন সে নিজেই ডাবল্ ছাড়া নেয় না। তারও কিছুদিন পরে বারম্যান জিজ্ঞাসা করেছিল : "আজ জিন্ কেন সাহেব?"

অজিত একটু থেমে জোরে হেসে উত্তর দিয়েছিল, "আজ সুবেসে জিন্ পিতা থা, হুইস্কি লিয়ে। ঔর এক।"

অজিতের সমৃদ্ধিতে এই সামান্য ফাটল তার প্রতি হাস্তেক্ত ক্লাবের বন্ধুরাও লক্ষ্য করেনি। সেখানে তার প্রতাপ যেমন ছিল তেমনি আছে। বন্ধুদের দৃষ্টি সন্ধ্যার [illegible] পরেই আড্ডায় না হলে তারা

দেখতো, অজিত বারোটার পরে কীরকম যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। একটা প্রচ্ছন্ন কিন্তু অপ্রতিরোধ্য অস্থিরতা ওকে যেন সজোরে দমিয়ে রাখতে সর্বক্ষণ চেষ্টা করতে হচ্ছে। কারো চোখে পড়েনি এ সব। তারা ভেবেছে, এমন হয় সবায়েরই। কেউ কোনো দিন বা কয়েক দিনের জন্য বেশী খায়, তারপর কম। অজিত যে মাসের পর মাস ওই অধিক পানের পর্যায়ে থেকে গেছে তা বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি তার প্রধান কারণ তার উদারতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ঠিক আগেকার মতো সে সই করেছিল বন্ধুদের জন্য। দেড়টা দুটোর সময় কেউ বাড়ি যাবার কথা বলতো, অজিত তাকে গায়ের জোরে ধরে রাখতো। অজিত যে সত্যি তার সঙ্গ চায় না, শুধু নিঃসঙ্গতাকে ভয় পায়, এটা সঙ্গীদের মনে না হলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না নিশ্চয়ই।

দিনের বেলায় অজিত অফিসের কাজ করতো। এই কাজের গুণাগুণে যদি কোনো তারতম্য ঘটে থাকে তা বাইরের লোকের জানার কথা নয়। দু'চারজন সহকর্মী লক্ষ্য করেছিল, অজিত বেশীর ভাগ দিন বাইরে লাঞ্চ খাচ্ছে। কেউ মন্তব্য করেনি কেননা এমন হওয়া একেবারে বিস্ময়কর নয়। অজিতকে কিছুটা এণ্টারটেইন করতেই হয়। দু'চারজন কেরানী লক্ষ্য করে থাকবে, অজিত লাঞ্চের পরে একটু বেশী মেজাজ গরম করে। বলা বাহুল্য, তাদের কারো সাহস ছিল না এ নিয়ে কথা বলবার। শুধু নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছে, ঘোষ সাহেব যেন আজকাল মাত্রা একটু চড়িয়ে দিয়েছে, দিনের বেলায়ও। প্রসঙ্গত বলে নেয়া থাক, অজিতের পতনের পরে কেরানীরা এই সময়কার ঘটনাগুলির উপর অনেক কল্পনার প্রলেপ দিয়ে অনেক রসাল কাহিনী রচনা করেছে। কেরানীদেরও দোষ দেয়া উচিত হবে না, তার বন্ধুরাও পরবর্তী কালে প্রচুর কাহিনী রচনা করে তার অনুপস্থিতিতে পরিবেশন করে পরিতৃপ্তি লাভ করেছে।

*

কিন্তু আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক। রেসে বেশী হেরেই হোক, বা স্টক এক্সচেঞ্জে বেশী লোকসান দিয়েই হোক, অজিতের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে উঠল। অফিসের কাজে মন বসাতে পারে না। বাইরে টাকা রোজগারের প্রাণান্তকর চেষ্টায় অজিত এমন কয়েকটা কাজ করতে বাধ্য হোলো যা কিছুদিন আগেও পাবলিক স্কুলের সন্তান অজিত ঘোষের পক্ষে একান্তই অভাবনীয় ছিল। এমনি সময় তার সর্বনাশ সম্পূর্ণ করবার জন্য তার স্ত্রী জয়া কলকাতা ছেড়ে চলে গেল দিল্লীতে তার বাবার কাছে। অজিতের দশা হোলো সেই নৌকার মতো যা থেকে মাঝি লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে গেছে পারের দিকে।

জয়াকে দোষ দেবার অধিকার আমার নেই। আমি তাকে কখনো দেখিওনি। আমি শুধু ঘটনার বর্ণনা করেছি নৌকার উপমা দিয়ে, মাঝিকে দোষ দিতে নয়। এর পরেই অজিত কয়েকদিন আর অফিসে গেল না। টেলিফোনে একবার খবর পর্যন্ত দিল না। অফিস থেকে যখন টেলিফোন এসেছিল তখন সে বাইরে। অফিসেও ইতিমধ্যেই খবর কিছু কিছু পৌঁছল বড়ো সাহেবের কানে। তিনি প্রথমে এসব গ্রাহ্য করেননি। অজিত তাঁর প্রিয়পাত্র। সাহেবের নেশা রাগ্‌বির আর রাগার খেলতে অজিত ছিল উৎসাহী ও পারদর্শী। কিন্তু ক্রমে সাহেব অধৈর্য হলেন। আরো খবর নিয়ে বিব্রত হলেন। এখন তিনি করবেন কী? বরাবর তিনি ভালো রিপোর্ট দিয়ে এসেছেন অজিত সম্বন্ধে। এখন কী করে ফিরিয়ে নেবেন সব কথা? অথচ কিছু ব্যবস্থা না করেও উপায় নেই। ক্রমে অজিতের দুর্নাম উপচে পড়বে কোম্পানির নামে। তার আগেই অজিতকে নিয়ে একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কী করে? এদিকে দেখাও নেই অজিতের।

এই দিনগুলির ইতিহাস একটু অস্পষ্ট। শুধু এই জানি যে কয়েকদিন পরে বড়ো সাহেব একটি চিঠি পান অজিতের। অজিত পদত্যাগ করেছে। পদত্যাগপত্রের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছেঃ সে এখন বিপদে পড়েছে। কিন্তু এই বিপদ নিয়ে সে

কোম্পানিকে বিব্রত করবে না, তার সাহেবকে তো নিশ্চয়ই নয়। তাই পদত্যাগ। তাড়াতাড়ি গৃহীত হলে বাধিত হবে। তাছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা একটু তাড়াতাড়ি পেলে সুবিধা হয়।

সাহেব যতটা দুঃখিত হলেন প্রায় ততটাই আশ্বস্ত হলেন। কোনো একটি ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট যেন কী বলতে গিয়েছিল অজিতের সম্বন্ধে। সাহেব ধমকে বললেন, "আই অ্যাম সরি ফর অজিত। বাট ডোন্ট্ ফরগেট, টু দি লাস্ট্ হি হ্যাজ্ প্লেড্ দি গেম্। ইন্ রিজাইনিং লাইক্ দিস্ হি হ্যাজ্ এগেন অ্যাক্টেড্ অ্যাজ্ এ জেণ্টল্ম্যান্। হি হ্যাজ্ ডান ইকস্যাক্টলি হোয়াট্ হিজ্ স্কুল উড্ হ্যাভ্ উইশড্।"

*

"জেণ্টলম্যান্",—এই কথাটা অজিতের সম্বন্ধে আমি যে কতবার শুনেছি, তার ইয়ত্তা নেই। এই পাবলিক স্কুলের তৈরী জেণ্টলম্যানের কথা আমি ইংরেজি উপন্যাসে প্রবন্ধে পড়েছি। অজিতের সঙ্গে দেখা হতে তাই আমার কৌতূহল স্বভাবতই জাগরিত হোলো। প্রত্যক্ষ পরিচয় হোক জেণ্টলম্যানের সঙ্গে। যদি কেউ বলে এটা আমার জন্মগত স্নবারির অন্যতর পরিচয়, তবে সে ভুল করবে। জেণ্টলম্যান কথাটা খাস বিলাতেই বিদ্রূপের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তাকে দেখা যায় প্রধানত কার্টুনে বা হাসির গল্পে। দ্বিতীয়ত, আমার সঙ্গে অজিতের দেখা হয় তখনই যখন তার জেণ্টলম্যানত্ব অন্তিমে এসে উঠেছে—সেই আমার টুথপেস্টের টিউবের মতো।

খাতে খাতে বলি। অজিত তখন ক্যালকাটা ক্লাবে পোস্টেড—বাকী কেউ বলে আড়াই হাজার, কেউ সাড়ে তিন। থ্রী হাণ্ড্রেড ক্লাবে তার প্রবেশ নিষেধ। প্রথম কারণ বাকী—হাজার ছয়েক। আর দ্বিতীয় কারণ, শেষ দিনে সে মত্তাবস্থায় মারামারি করেছিল। কোন রাণার সঙ্গে। অজিতের স্বাস্থ্য সহস্র রজনীর লক্ষ অমিতাচারেও ভেঙে পড়েনি; নাক ভেঙেছে রাণার। ক্লাবে ক্লাবে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সব ক্লাবের সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল অজিতের মুখের উপর। শুধু ক্লাবগুলির নয়, অনেক বন্ধুর বাড়িরও। অজিত তখন একা। সঙ্গী খোঁজে আপন বন্ধ শ্রেণীর বাইরে; সেখানে জেণ্টলম্যান নেই, ভদ্রলোক আছে।

কিন্তু ক্লাস ওয়ার থাক। অজিতের জেণ্টলম্যানত্বের পরিচয় আমি খুব স্পষ্টভাবে কখনো পাইনি, কিন্তু ওকে আমার খারাপ লাগতো না। ওর ব্যবহারে একটা স্বাভাবিক সৌজন্য ছিল। ও বিলাতী হোটেলে গিয়ে এমনভাবে অর্ডার দিতো যেন হোটেলের মালিকই অজিত ঘোষ। বেয়ারারা ওকে দেখেই বুঝতো ও সাহেবের জাত, আদেশ দিয়েই ওর অভ্যাস। বেয়ারারা পছন্দ করে এই জাতকে। এরা আট আনা বখ্‌শিস্ দিয়ে যে সেলাম পায় তা নবাগতদের জোটে না দ্বিগুণ বখ্‌শিস্ দিলেও। দ্বিতীয়রা বেশী বখ্‌শিস্ দিলে তারা ভাবে, নতুন কিনা, আমাদের কিনতে চায় টিপ্‌স্ দিয়ে, বোকা কোথাকার। অজিতের আরো গুণ ছিল। ও গল্প জানতো ভূরি ভূরি। ইংরেজিতে যাকে স্মার্ট গল্প বলে তার স্টক্ ছিল ওর বিরাট, ওর নির্ভুল উচ্চারণে সেই সমস্ত কাহিনী বলে ও হাসাতে পারতো সবাইকে। আমাকেও। মোদ্দা কথা আমি ওকে পছন্দ করতুম। পছন্দ করতুম এতদূর পর্যন্ত যে, ও যে দু'তিনবারে আমার কাছ থেকে প্রায় শ' দুয়েক টাকা ধার করেছে তা ধার দেবার সময় আমার আদৌ মনে হয়নি।

*

পরে জেনেছি, আমি অজিতের একমাত্র উত্তমর্ণ নই। মাসের পরে মাস চলে গেছে অজিত ধার তো শোধ দেয়ইনি, তার উল্লেখ মাত্র করেনি কোনো দিন। সমস্ত বিষয়টাই যেন অশ্লীল, ভালগার। টাকা-পয়সা নিয়ে আলোচনা করবে যাদের টাকা-পয়সা নেই, এই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা। জেণ্টলম্যান তার সঙ্গে পর্যন্ত টাকা রাখে না, কেননা তার সই গ্রাহ্য হয় সর্বত্র। অজিতের এই অবস্থা ঘুচে গেছে অনেক কাল, কিন্তু অভ্যাসটা যায়নি। এদিকে আমারও ওই শ' দুয়েক টাকার আসন্ন কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাই তাগাদা দিইনি। তবু ভালো লাগতো না। যার পকেটে পয়সা নেই, সে কেন রোজ রোজ অন্যের পয়সায় মদ খাবে? যার নিজের সাধ্য নেই অন্যের আতিথ্য ফিরিয়ে দেবার, সে কেন গ্রহণ করবে সকলের আতিথ্য?

ইতিমধ্যে একদিন কার কাছে যেন শুনলুম যে অজিত গত শনিবার রেসে গিয়েছিল এবং সেখানে তিনশো না অমনি কত টাকা হেরে এসেছে। এমন খবরে আমার খুশি হবার কথা নয়। আমি তাই অজিতের এক ভূতপূর্ব বন্ধুকে বললুম—বস্তুত সে-ই আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল অজিতের সঙ্গে—"অজিত আমার কাছ থেকে দুশো টাকা ধার করেছিল বেশ কয়েক মাস আগে। সেটা ফিরিয়ে না দিয়ে হি হ্যাজ্ নো বিজনেস্ টু গো অ্যাণ্ড্ লুজ্ মনি অ্যাট্ দি রেসেস্।"

বন্ধু বলল, "তোমার তো মাত্র দু'শো টাকা। আরো কতজনের কাছে ওর কত ধার তার ঠিকানা নেই। হয়তো হঠাৎ হাতে পেয়েছিল শ' তিনেক টাকা। সে ওর ধারের সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র। তাই নিশ্চয়ই ভেবেছে, রেসে গিয়ে ওই টাকাটা বাড়ানো যাক, অন্তত দু' চারজনের দেনা শোধ করে নতুন ধার নেবার পথ [illegible]।"

আমার তখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। আমি সোজা আমার টেলিফোনের কাছে গিয়ে অজিতকে ডাকলুম।

"হ্যালো।"

"ঘোষ হিয়ার।"

সেই গলা, যেন অজিত এখনো অমুক কোম্পানির সবচেয়ে সীনিয়র ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। আমার নাম আমি ঘোষণা করলুম।

অজিত বলল, "ওহো! যুগ যুগ ধরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তারপর, কী খবর? আজ সন্ধ্যায় কী করছ?"

সন্ধ্যায় অজিতের সঙ্গে সাক্ষাতের অর্থ আমার অজানা ছিল না। আমি তাই একটু ইতস্তত করে বললুম, "তা অনেক দিন দেখা হয়নি। কিন্তু, কিন্তু তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। আমার—"
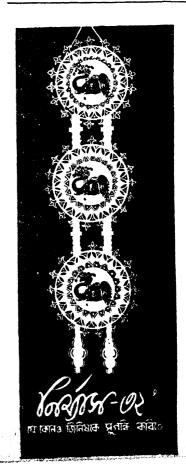
অজিত আমার কথা শেষ হতে দিল না। বলল, "আজ সন্ধ্যায় বাড়ি থাকবে? আমি চলে আসব, এই ধরো এইটিশ্, কী বলো?"

আমি একটু নিরাশ হলুম, কিন্তু সাধারণ সৌজন্য বিনিময়ের পরে সম্মতি জানিয়ে টেলিফোন রেখে দিলুম। মনে মনে স্থির করলুম, সন্ধ্যায় অজিত এলে সকল সংকোচ শিকায় তুলে টাকাটা দাবী করব। অজিতের বন্ধুর কাছে ফিরে এসে বললুম, "দি সেম ওল্ড অজিত! অ্যান্ড্ ভেরি ক্রাফটি টু! আমাকে কথাটা তুলতেও দিল না।" অজিতের বন্ধু বলল, "না, ও বুঝেছে তুমি ধারের কথাটা বলতে সংকোচ করছ। তোমার ওই এম্ব্যারাসমেণ্ট বাঁচাবার জন্যই তোমাকে বলতে দেয়নি। আজ সন্ধ্যায় এসে অন্তত কিছু টাকা তোমায় নিশ্চয়ই দিয়ে যাবে। ভুলো না, অজিত ইজ্ এ জেণ্টলম্যান্।"

জেণ্টলম্যান্! আমার বিরক্তি বাড়ল।

*

অজিত এলো সেই সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে। আমার একটু দেরী হয়েছিল ফিরতে। কিন্তু আমার বেয়ারার সঙ্গে অজিতের দোস্তি। আমি এসে দেখি বেয়ারা বাড়ি নেই, আমার বসবার ঘরে অজিত আরামে বসে আছে। মাথার উপরের পাখাটাই শুধু খোলেনি, কাছের আরেকটাও। মুখে সিগারেট; সামনে আমার সিগারেটের টিন খোলা, তাই বুঝতে কষ্ট হয় না কার সিগারেট পুড়ছে। বুঝে কষ্ট হয়।

আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে অজিত বলল, "আমি একটু পাঠিয়েছি তোমার বেয়ারাকে।" তারপর, বেশ কিছু সময় নিয়ে, সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে, যোগ করল, "তোমার ফ্রিজে দেখলুম একদম বরফ নেই। আমি বাবলুকে টেলিফোন করে দিয়েছি কিছু বরফ দিতে।"

অজিত এমন স্বাভাবিক স্বরে কথা বলছিল, এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে চলাফেরা করছিল যে, আমি তাকে প্রায় ঈর্ষা করলুম। আমি কেন এমন স্বাভাবিক হতে পারিনে? এতটুকু এদিক থেকে ওদিক হলে কেন আমার ভাবনার শেষ থাকে না? কোথাও একটা বিল দিতে দেরী হলে কেন ভেবে মরি? অথচ অজিতকে দেখো। তারই অন্যতম উত্তমর্ণের সঙ্গে কী অবিশ্বাস্য স্বাভাবিকতার সঙ্গে ব্যবহার করছে। আমারই বাড়িতে এসে এমনভাবে কথা বলছে যেন বাড়িটা আসলে ওরই। আমিই যেন আগন্তুক। শুধু তাই নয়, আমার সন্দেহ হোলো, আমিই ওর কাছ থেকে টাকা ধার করেছি না ও আমার কাছ থেকে? আমার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত সত্ত্বেও মুহূর্তের জন্য নিজের কাছে কবুল না করে পারলুম না—না, পাবলিক স্কুলের শিক্ষা সম্বন্ধে বর্তমান প্রগতিশীল মত যাই হোক না কেন,

সেখানে ওটা তোমার মনে চিরকালের মতো গেঁথে দেয়া হয় যে তুমি দুনিয়ার মালিক। তুমি কারো চেয়ে হীন নও, হেয় নও। প্রভুত্বে তোমার জন্মগত অধিকার। নেতৃত্বে তোমার দাবী প্রশ্নাতীত। আর সব মানুষ 'মেন', তুমি অফিসার। এই গুণ সওদাগরী অফিসে যেমন দেখা যাবে, তেমনি দেখা যাবে ক্লাবে, আবার ঠিক তেমনি দেখাতে হবে বার্মার জঙ্গলে বা ডুবন্ত জাহাজে।

এই ডুবন্ত জাহাজের সঙ্গে অজিতের তৎকালীন অবস্থার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য তার নিজেরও অজানা ছিল না নিশ্চয়ই। কিন্তু সে যে ক্যাপ্টেন তাতে কারো সন্দেহ করবার উপায় ছিল না। অজিতকে এমন "মাস্টার অব্ দি সিচুয়েশন" আমি অনেক দিন দেখিনি। আমার তাই টাকার সামান্য প্রশ্ন উত্থাপন করবার কথা মনেও এলো না। আমি প্রায় হেসে বললুম, "কী ব্যাপার, য়ু সীম টু বি ফুল্ অব্ বীনস্।"

"হোয়েন হ্যাভ্ আই নট্ বীন?" কথাটা বলে অজিতেরই মনে হোলো, একটু সংশোধন চাই। বলল, "মাঝে কয়েকটা মাস বাদে।" আবার অট্টহাস্যে যোগ করল, "কিন্তু সে সব শেষ হয়ে গেছে। অনেকদিন আমার কোনো পার্টি হয়নি। গত জন্মদিনে আমি কাউকে খাওয়াইনি। তুমি আমায় খাইয়েছিলে। আজ আবার একটা গ্র্যান্ড পার্টি হবে—যেমন এক সময় হোতো ক্যালকাটা ক্লাবে বা পুণী হান্ডেডে প্রায়। ওহো, তোমাকে তো বলাই হয়নি! দেবদান—দেবদান অব্ ছত্তিশগড়—তো হো—রাত তিনটের সময় আমি ওকে বাণ্ডিল তুলে নিয়ে বাড়ি পেঁাছে দিলুম। বর্ধমানকে জিগেস করো, আমার অন্য একটা ফেমাস্ পার্টিতে রুণুর কী অবস্থা হয়েছিল। রুণু অব্ সেরাইগাঁও।"

*

এগুলি অজিতের পক্ষে চাল নয়। সত্যি ওর অতীতের এমন সহস্র পার্টির স্মৃতি ওর মনে এখনো গাঁথা হয়ে আছে। এখন গায়ে একটা বুশ শার্ট, পরনে খাকি ট্রাউজার্স, কিন্তু জুতো পবানো হলেও চক্চকে। অনেকগুলি ভালো অভ্যাস ওর সুদিনের সঙ্গে বিদায় নেয়নি, দুর্দিনের উপহাস হয়ে বেঁচে আছে। আমি ওর স্মৃতিমন্থনে বাধা দিয়ে বললুম, "আজকের পার্টি মানে? কোথায়? কাকে কাকে বলেছ?"

"এইখানে। রাইট হিয়ার। আমার ফ্ল্যাটের চেহারা এখন এমন নয় যে, ভদ্র কাউকে ডাকতে পারি। তাই তোমার এখানে আসতে বলেছি—এখনি এসে পড়বে। হয়তো এখন যে লিফটটা উঠছে সেইটেতেই দু'চারজন আসছে।"

অবাক কাণ্ড। আমার বাড়িতে অজিতের পার্টি। একবার অনুমতি নেবার কথা ওর মনে হয়নি। ওই যে আগেই বলেছি, অজিত পাবলিক স্কুলের সন্তান। ও পৃথিবীর মালিক। আমি শুধু একবার বললুম, "একটু আগে বলতে হয়। কোনো ব্যবস্থা নেই, আয়োজন নেই।"

অজিত বলল, "আমি তোমার বেয়ারারের সঙ্গে সব ঠিক করে ফেলেছি। মায় খাবার পর্যন্ত।" ঘড়ি দেখে বলল, "সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। বাবলু শুড হ্যাভ বীন হিয়ার উইথ দি হুইস্কি বাই নাউ!"

অজিতের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবলু এলো; তার পিছনে লিফটম্যান আনল একটা পরিচিত আকার ও ছাপের কাঠের বাক্স। অজিত জিজ্ঞাসা করল, "সোডা কোথায়?"

"লীভ্ ইট টু মী, বস্। লিফটেই আছে।" বাবলুর ওই অভ্যাস। যে ওকে খাওয়াবে তাকেই বস্ বলবে। ও বাঙালী হলেও লাহোরে পড়েছে, তাই অনেকগুলি পাঞ্জাবী অভ্যাস ওর চরিত্রে এসে গেছে। কিন্তু অজিতকে অনেকদিন কেউ 'বস' বলেনি, বাবলুও না। অজিতের ভালো লাগল।

ধারের কথাটা আমার তখন ঠিক মনে ছিল না বোধ হয়, কিন্তু ভালো আমার লাগছিল না। কী দরকার ছিল এই পার্টির? তা ছাড়া অজিতের পার্টি সম্বন্ধে আমি যা জানতুম, তাতে অস্বস্তি বাড়ছিল বই কমছিল না। নিজের বাড়িতে ওরকম পার্টি হয়, ভাড়াটে ফ্ল্যাটে নয়। আমার ডানদিকের ফ্ল্যাটে থাকেন একটি ফিরিঙ্গি পরিবার, ভদ্রলোক ক্যাথলিক অ্যাসোসিয়েশনের উৎসাহী কর্মী। আমার বাঁ দিকের ফ্ল্যাটে থাকেন মদ্র এক বড়ো চাকুরে, রেলওয়ের বোধ হয়। তাঁর বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে যে শব্দ কানে আসে, তা আমোদের নয়, পুজোর ঘণ্টার। এ'রা সব কী বলবেন?

কিন্তু আমার কিছু করবার উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে অজিতের দশজন বন্ধু এসে হাজির হয়েছিলেন। ছয় বোতল হুইস্কি এসে গিয়েছিল। পর্যাপ্ত সোডা। যাঁরা জলের সঙ্গে খান, তাঁদের জন্য জল। বরফ। খাবার। একজন অতিথি ছিলেন সঙ্গীতে উৎসাহী। তিনি এসেই আমার রেডিওটা খুলে দিয়েছিলেন। আরেকজন অতিথি ছিলেন নিজে গায়ক। তিনি হিন্দী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ধরেছিলেন। কথারও কমতি ছিল না, বলা বাহুল্য। সব মিলিয়ে তাই হচ্ছিল, যা এমন পার্টিতে হয়ে থাকে।

*

অজিত নিজেকে অবহেলা না করে অভ্যাগতদের দেখাশোনা করছিল। কিন্তু কথা বলছিল না বেশী। পাঁচ বোতল যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন রাত প্রায় দুপুর। যারা যেতে চাইল অজিত তাদের বাধা দিল না। হাসতে হাসতে "গুড বাই" বলল। গৃহস্বামী হিসাবে আমি আমার কর্তব্য সম্পন্ন করলুম লিফট্ পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে এসে। একে একে সবাই গেলে বাকি রইল অজিত, তার এক বন্ধু (যার নামটা আমি ঠিক ধরতে পারিনি), আর আমি। আর সর্বশেষ বোতলের সিকি বা তারও কম। অজিত পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাতের উপর হাত রেখে বলল, "আই থিংক ইট হ্যাজ বীন এ ফাইন পার্টি, ডোণ্ট য়ু এগ্রী?"

আমি আন্তরিক সম্মতি জানালুম। অজিতের বন্ধুও। লোকটি দেখতে একটু বোকা বোকা। বেশী কথা বলে না।

এবার অজিত তার বন্ধুর দিকে চেয়ে বলল, "নাউ ফর এ স্পট অব বিজনেস্।"

আমার তখন ব্যবসায় সংক্রান্ত কথায় কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না। আমি তখন ক্লান্ত। তাই নীরব রইলুম। তা ছাড়া কথাটা আমাকেও বলা নয়।

অজিত বলল, "তার আগে একটা লাস্ট ড্রিংক হোক।"

আমি জানতুম, আপত্তি বৃথা। তাই গেলাস এগিয়ে দিলুম। অজিত তিনটে গ্লাসে সমানভাগে ভাগ করে শেষ হুইস্কি পরিবেশন করল। বলল, "নাউ ফর দি রিচুয়্যাল।"

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বলতে হবে না অনুষ্ঠানটা কী। অজিত একটা দেশলাই ধরিয়ে কাঠিটা শূন্য বোতলে ফেলে দিতেই হুস্ করে শব্দ হলো, জানা গেল ভিতরে খাঁটি জিনিস ছিল। পর পর ছ'টা বোতলের এই সশব্দ ময়না তদন্তে আমি আবার আমার নিষ্পাপ প্রতিবেশীদের কথা ভাবছিলুম। কিন্তু অনুষ্ঠানের যে একটা প্রতীকমর্ম ছিল, তা আমার জানবার কথা নয়।

সবশেষে অজিত আবার চেয়ারে বসল সোজা হয়ে, বলল, "নাউ ফর দি বিজনেস্।"

অজিতকে তখন দেখে আবার মনে হলো, সত্যি সে একদিন বড়ো বিলাতী অফিসে বিভাগীয় বড়ো সাহেব ছিল। চাকরি গেছে, কিন্তু আর সব কিছু বজায় আছে। সেই বিশাল চেহারা, সেই গম্ভীর স্বর, সেই ইংরেজি অ্যাকসেণ্ট।

*

"কানু, আমার বন্ধু বিশেষ অবশিষ্ট নেই।"

পানে মানুষ একটু ভাবপ্রবণ হয়। ভদ্রলোক বললেন, "বেশী আছে কি না জানিনে, তবে একজন নিশ্চয়ই আছে।"

"নেয়লী?"

"স্ত্রী।"

"ভেরি ওয়েল। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?"

"নিশ্চয়ই।" ভদ্রলোক ব্যবসায়ী। তাই সতর্কতার সঙ্গে একটু পরে যোগ করলেন, "নিশ্চয়ই, এনিথিং রীজনেবল্।"

"যদি বলি, কারো কারো কাছে অনুরোধটা পুরোপুরি রীজনেবল্ না-ও মনে হতে পারে?"

"লুক অজিত, য়ু নো, আমি পাঁচ পুরুষ বড়োলোক নই। আমি নিজে গত বিশ বাইশ বছরে কী করেছি, তা আন্দাজ করা তোমার পক্ষে নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। তারপর কিছু টাকা গেছে ব্যারাকপুরের বাড়িটায়। অতএব আমার সঙ্গতির মধ্যে যা সম্ভব—আমার যা যা কমিটমেণ্ট আছে—তা আমি নিশ্চয়ই করব।"

"ডোণ্ট গেট মি রং। আমার অনুরোধে তোমার আর্থিক ক্ষতি হবে না আশা করি।"

"না না, আমি তা ভাবিনি। আমি শুধু—"

অজিত হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, "আচ্ছা আমার স্বাস্থ্যটা কেমন আছে? এত অনিয়ম ও অমিতাচারের পরেও?" বলে অজিত একবার তার রাগবি-খেলা কব্জি ঘোরাল। বুকের ছাতি স্ফীত হলো। সত্যি ওর স্বাস্থ্যটা দেখবার মতো।

বন্ধু কানু তারিফ করে বলল, "চমৎকার স্বাস্থ্য। আমি বলব, এ ওয়ান্।"

"গুড্!"

অজিত এক চুমুকে তার গেলাস শেষ করে বলল, "এই চিঠিটা নাও। সীল করা আছে। এরই মধ্যে আমার অনুরোধ আছে; কিন্তু আরেকটা অনুরোধ আছে, কাল অফিসে যাবার আগে এটা খুলতে পারবে না।"

কানু হেসে বলল, "দ্যাটস ফানি! কাল কেন?"

অজিত রহস্যটা হাল্কা করে বলল, "শুধু এই জন্য যে, অফিসে যাবার আগে আমার অনুরোধ সম্বন্ধে কিছু তুমি করতে পারবে না।" হেসে যোগ করল, "আমি জানি, তোমার চেক্ বই তুমি বাড়িতে রাখো না।"

কানু এবার আর হাসল না। তার মনে সন্দেহ ছিল না—আমারও না—যে অজিত আরো একটা ধার চাইছে। অজিতের সম্বন্ধে এমন কথা ভাবাই কি স্বাভাবিক নয়? কানু বলল, "আচ্ছা, কথা দিলুম, কাল অফিসে যাবার আগে তোমার চিঠি খুলব না।"

এর কিছুক্ষণ পরেই কানু বিদায় নিল। আমি ক্লান্ত বলে ক্ষমা চাইলুম, লিফট্ পর্যন্ত গেলুম না। অজিত যেমন ছিল, তেমনি বসে রইল। আমি ভাবছিলুম, এবার উঠলে তো হয়। আমার কাল অফিস আছে।

*

অজিত বলল, "যদি কিছু মনে না করো, আই'ল হ্যাভ এনাদার ড্রিংক। হ্যাভ য়ু গট্ সাম হুইস্কি ইন দি হাউস?"

কিছু ছিল। অজিতের এমন আতিথেয়তার পরে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করব কী করে? কিন্তু আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। বললুম "তুমি নিজেই বের করে নাও, প্লীজ্, আমি উঠতে পারছি না।"

অজিত ধন্যবাদ দিয়ে উঠল। নিজের গেলাসে যা ঢালল তার নাম পাতিয়ালা পেগ্। আমি দেখেও দেখলুম না। অজিত বলল, "এবার তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

"বলো।"

"তোমাকে একটা পোস্ট-ডেটেড চেক্ দেবো, ফর দি ফুল অ্যামাউন্ট। আর তুমি আমায় এখন গোটা দুয়েক টাকা দেবে, ফর দি ট্যাক্সি। বাবলু আমার চেঞ্জটা ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেছে।"

আমি অফিসের ট্রাউজার্স পরেই বসেছিলাম। পকেট থেকে ক্লান্ত হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে আমি অজিতকে দিলুম।

অজিত একটা সীল-করা খাম আমার হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও। এটা অবশ্য চেক্ নয় ঠিক, বরং হুণ্ডি বলতে পারো। পরশু সকালে টাকাটা পাবে, কার কাছে ইত্যাদি সব লেখা আছে এর মধ্যে। তার আগে খুলো না কিন্তু।"

আমি বললুম, "দ্যাট'স অল্ রাইট।"

অজিত উঠলে আমি বললুম "গুড্ বাই।"

অজিত বলল, "গুড্ বাই।"

আমি লিফ্টের কাছে গিয়ে হঠাৎ কী মনে করে জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, এই কানু কে? একে আগে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।"

"না। তুমি বোধ হয় দেখনি।"

"কী করে? কোন্ অফিসে?"

"না, ও চাকুরে নয় তোমার মতো। ওর নিজের বড়ো ব্যবসা আছে, যদিও নামকরা নয়। ব্যবসা এক্সপোর্টের।"

আমি আর কিছু জানতে চাইলুম না। বললুম, "গুড নাইট।"

লিফটে নামতে নামতে অজিত বলল, "গুড বাই।"

*

এবার ফিরে আসা যাক আমার বাথরুমে। সেই যেখানে আমার টুথপেস্টের টিউবে চাপ দিয়ে অজিতের কথা মনে হয়েছিল।

পরপ্রভাতে আমার মাথা ধরেছিল। আমি স্নান সেরে অফিস গেলুম। তারও পরের দিন অজিতের চিঠি খুলে দেখলুমঃ

"আমার বন্ধু কানাই গুপ্তকে এই চিঠি দেখালে সে তোমাকে দুশো পঞ্চাশ টাকা দেবে। রসিদ দিতে হবে না। ঋণ এতদিন শোধ দিতে পারিনি বলে ক্ষমা চাইছি। আরো অনেকের কাছেই আমার এই রকমের ধার আছে, মোট প্রায় হাজার কুড়ি। মোটামুটি এই রকম অংকই কানাই দেবে বলে আশা করছি। আমার স্বাস্থ্য ভালো।

"আরেকটা অনুগ্রহ চাইব। তুমি টাকা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। আর কিছু জানতে চাইবে না। আমার কী হোলো তাও নয়, তাহলেই আমার জন্য বন্ধুত্বের পরিচয় দেবে। কানাই কেন টাকা দেবে তাও নয়, তাহলেই তোমার বন্ধুর অন্তিম উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো হবে।

"না। যাবার আগে তোমার কাছে সত্য গোপন করব না। কানাই এক্সপোর্টের ব্যবসা করে। কী রপ্তানি করে শুনলে তুমি শিউরে উঠবে, কিন্তু সেণ্টিমেণ্টাল হয়ো না। এর চেয়ে নৃশংস ব্যবসাও আছে, শুধু সেগুলোতে আড়াল আছে আর আমার বন্ধুর বেলায় তা নেই। সে মানুষ মারে না। মরা মানুষের শব চালান দেয় বিদেশের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য। আমি ব্যবস্থা করেছি কাল বিকালের মধ্যে আমার শব ওর কারখানায় যাবে। ওর এজেণ্ট আমার ফ্ল্যাটে আসবে ভোর চারটেয়, তাই তোমার পার্টি থেকে দুটোর আগে আমার বেরুতেই হবে।

"কানাইকে লেখা চিঠিতে দুটি শর্ত করেছি। এক, আমার সমস্ত দেনা ও শুধবে। তাতে ওর লাভের মার্জিন যদি একটু কম থাকে, তাহলেও। আমি জানি ও আমার কথা রাখবে, আমার মান রাখবে।

"দুই, আমি ওকে বলেছি আমার শরীর হার্ড কারেন্সীর বদলে ও আমেরিকায় পাঠাবে না। আমার আশা, ও আমার এ অনুরোধও রাখবে। আমার বাসনা ছিল দক্ষিণ ফ্রান্সে মরা। একটু সংশোধিত আকারে সে বাসনাও পূর্ণ হতে চললো।

"পৃথিবীকে আমি ভোগ করেছি। তাই এমন নিমকহারামি করব না যে বলব যেতে কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু খুব বেশী খেদ নেই। সান্ত্বনা, দুর্নাম নিয়ে বিদায় নিচ্ছি না। বলো, আমি ভদ্রলোক ছিলুম।"

এই গল্পে সে কথাটাই বলা রইল।

মৎস্যগন্ধা

শিল্পী : রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

রাত একটা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সব শেষ হয়ে গেছে। কেওড়াতলার শ্মশান থেকে ফিরে এসেছেন অজয়দার আত্মীয় বন্ধু গুণগ্রাহীর দল। যতদূর জানি তাঁর শবযাত্রায় বেশি ভিড় হয়নি। ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা তো বেশি লোকের সংগে তাঁর ছিল না। অমিশুক, অসামাজিক মানুষ। কারো সংগে আলাপ পরিচয় করতে জানতেন না, করলেও রাখতে জানতেন না। আরো এক কারণে বেশি কেউ যায়নি তাঁর শ্মশানে। অজয়দার মৃত্যু তো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, গৌরবের মৃত্যুও নয়। শিল্পী হিসাবে যে সামান্য সুনামটুকু তাঁর হয়েছিল, মৃত্যুতে তা তিনি মুছে দিয়ে গেছেন। আমার তো মনে হয় তাঁর বন্ধুর দল তাঁর জন্যে শোকসভা ডাকতে লজ্জা পাবে। তাঁর কথা কাগজে ছাপা হবে না। কারণ সে বড় কলঙ্কের কথা, অপমানের কথা। তাঁর বন্ধুরা ভাববেন সে কথা কাগজে না ওঠাই ভালো। তবু হয়ত দু'এক দিন বাদে দু'এক লাইনে বেরোবে তাঁর আত্মহত্যার খবর। আর দিল্লীতে বসে সে খবর তুমি পড়বে। বুঝতে পারছিনে পড়বার পর তোমার মনের অবস্থা কি হবে। তুমি কতটুকু দুঃখ পাবে, কতটুকুই বা স্বস্তি পাবে আমার পক্ষে তা অনুমান করা সহজ নয়।

কিন্তু তোমার মনের অবস্থার কথা আজ নাই বা ভাবলাম। এই মুহূর্তে তুমি আশা করি আরামে ঘুমাচ্ছ। কোন দুশ্চিন্তা দুঃস্বপ্ন তোমার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না। এক অভিশপ্ত রাত্রির প্রতিটি প্রহর জেগে কাটাতে হচ্ছে না, জ্বলে কাটাতে হচ্ছে না তোমাকে।

প্রথমে ডায়েরি নিয়ে বসেছিলাম। জানো তো মাঝে মাঝে ডায়েরি লেখার বাতিক আমার আছে। আজও তাই লিখছিলাম। কিন্তু দু'চার লাইন লেখার পর মনে হল দূর ছাই নিজের মনে বসে বসে কেন মিছে বক বক করব। তাতো প্রায় রোজই করি। তার চেয়ে তোমাকে চিঠি লিখি। কয়েকদিন আগের একটা চিঠির জবাব পাওনা আছে তোমার। চিঠির প্যাড নেই। ডায়েরির পাতায় সেই জবাব দিচ্ছি। তাই নিজের কাছে লেখা আর তোমার কাছে লেখা এক হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। জড়াক। তুমিও যা আমিও তাই। তুমি আর আমি অভিন্ন হৃদয়। মনে আছে সেই বিয়ের মন্ত্র?

তুমি আমার স্বামী। কতদিন বাদে আজ রাত জেগে জেগে তোমাকে চিঠি লিখছি। তবু তোমার আমার কথায় ভরা এ ঠিক আগেকার দিনের দাম্পত্যপত্র নয়। এতে আছে আরো একজনের কথা। একজন পর পুরুষের প্রসংগ। সে পুরুষ আজ মৃত। মৃতের সংগে নাকি মানুষের কোন বিরোধ নেই। মিথ্যে কথা। মৃত্যুর সংগে সংগে কি সব জ্বালা মেটে? সব দুঃখ সব অশান্তি সব সমস্যার শেষ হয়?

নিজের কথা লিখতে বসেছি। কিন্তু কোত্থেকে শুরু করি বলতো। প্রায় সব কথাই তো তোমার জানা। কিন্তু তুমি তার বেশিরভাগই ভুলে গেছ। অনেক কথারই মানে বোঝনি। আজ একখনা চিঠিতে যে তোমাকে সব কথা বোঝাতে পারব বিশ্বাস করাতে পারব আমার না আছে তেমন বিদ্যে-বুদ্ধির দৌড়, না তেমন মনের জোর। তাছাড়া সে চেষ্টা করেই বা লাভ কি। তার চেয়ে দেখি নিজে কতটুকু বুঝেছি, নিজে কতটুকু চিনেছি নিজেকে। অন্যের চোখ দিয়ে নিজের সেই আত্ম-পরিচয়কে যাচাই করে নিই। নিজের মন দিয়ে অন্যের চোখকে যাচাই করি।

তুমি যে আমাকে বিয়ে ক'রে সুখী হওনি এ কথা কিন্তু আমি মাস তিনেকের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম। মাসতিনেক কেন বোধ হয় দিন তিনেকের মধ্যে। বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু সে কথা প্রকাশ করতে সাহস পাইনি। বাইরের কারো কাছে না, তোমার কাছে না, নিজের কাছে স্বীকার করতে সবচেয়ে বেশি ভয় ছিল। ভয় আর লজ্জা। অথচ সবাই জানে তুমি আমাকে নিজে দেখে শুনে ভালোবেসে বিয়ে করেছ। আমাদের পরিবারে এ ধরনের বিয়ে এই প্রথম। এই নিয়ে আমার দাদা বউদি দিদি ভগ্নীপতি আর ছোট বোনদের মধ্যে কত ঠাট্টা তামাসাই না চলেছে। তোমাদের ভবানী-পুরের বাড়িতেও তাই। তখন কি জানতাম ব্যাপারটা আগাগোড়া এমন ঠাট্টাই হয়ে থাকবে?

মনে আছে সাত বছর আগের আমাদের সেই প্রথম পরিচয়ের কথা? পুরীর সমুদ্র আর সমুদ্র-তীরে সেই সূর্যোদয়। সেদিন সূর্যের সংগে তোমাকে অভিন্ন করে দেখেছিলাম। তুমি একা একা অন্যমনস্কভাবে বেড়াচ্ছিলে ছোড়দা দূর থেকে দেখেই তোমাকে চিনতে পারল। জোর পায়ে হেঁটে গিয়ে ধরল তোমাকে। আমি কি ছোড়দার সংগে হেঁটে পারি? কিন্তু তাই বলে পিছনে পড়ে থাকবার মত মেয়েও আমি নয়। প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে ধরলাম তোমাদের। ছোড়দা পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বন্ধু সুপ্রিয়, আর নীলা আমার বোন।' নমস্কার বিনিময় করে আমি তোমার দিকে একবার চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। তখনো আমি হাঁপাচ্ছিলাম। তুমি তা লক্ষ্য ক'রে ছোড়দাকে বললে, 'দিলীপ, তুমি বড় অন্যায় করেছ, দাদার কর্তব্য করনি।'

ছোড়দা অবাক হয়ে বলল 'কেন?'

তুমি বললে, আমাকে ওখান থেকে ডাকলেই পারতে। অনর্থক ওঁকে ছোটালে কেন। দেখতো কি কষ্ট হচ্ছে।'

আমি লজ্জায় মরে গেলাম। সেই লজ্জা ছোড়দা আরো বাড়িয়ে দিল হেসে বলল, 'তুমি আমাকে মিছামিছি নিন্দা করছ সুপ্রিয়। আমি তো নীলাকে অমন ক'রে ছুটতে বলিনি। ও নিজের গরজেই ছুটে এসেছে।'

শুনে তুমি মৃদু একটু হাসলে। আমি প্রতিবাদ ক'রে বললাম এত বাজে কথাও বলতে পার ছোড়দা। তুমি না বলে কয়ে চলে এলে আর আমি বুঝি একা একা দাঁড়িয়ে থাকব।'

ছোড়দা হেসে বলল, 'না থেকে বুদ্ধিমতীর কাজই করেছিস।'

অতি সাধারণ ঘটনা। তুমি বোধ হয়

ভুলেই গেছ। কিন্তু আমার কি রকম মনে রয়ে গেছে দেখ'। আজ ভাবি বুদ্ধিমতীর কাজ নয়, ভুলই করেছিলাম সেদিন। নির্লজ্জের মত আমিই তোমার পিছনে পিছনে ছুটে গিয়েছিলাম। তোমাকে ছুটে আসবার অবসর দিইনি। তার ফলে আমার ছোটা কোনদিন শেষ হয়নি। জীবন ভ'রে আমি যত ছুটেছি তুমি তত দূরে সরে গেছ।

সেদিন কিন্তু তুমি কাছে কাছে ছিলে, পাশে পাশে ছিলে। ছোড়দার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বার বার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলে। সে দৃষ্টির মুগ্ধতা বার বছরের মেয়েও বুঝতে পারে। আমি তখন আঠেরয় পড়েছি। আমার তো না বুঝতে পারার কথা নয়।

প্রথমদিন সরাসরি কথা আমাদের প্রায় হয়নি। ছোড়দার সঙ্গেই তুমি সব কথা বলছিলে। বেশিরভাগই তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের কথা। অফিস আর চাকরিবাকরির কথা। আমার তাতে কোন উৎসাহ থাকবার কথা নয়। তবু আমি উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম। একটি কথাও যেন বাদ না যায়। বুঝি বা না বুঝি তাতে কিছু এসে যায় না'। তোমার বলবার ভঙ্গি, তোমার গলার স্বর আমার কাছে যথেষ্ট। দাদা আর ছোড়দার আরো কত বন্ধুকে তো দেখেছি কিন্তু তোমার মত অত লম্বা অত ফর্সা আর কেউ নয়। অমন চমৎকার করে কথা বলতে কেউ পারে না। কিন্তু মেয়ে হয়ে আমি যে নির্লজ্জ লুব্ধের মত তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি পাছে তা তুমি দেখে ফেল পাছে ছোড়দার তা চোখে পড়ে সেই ভয়ে আমি বার বার নিচু হয়ে হয়ে সমুদ্রের ঝিনুক কুড়াচ্ছিলাম। যেন ঝিনুক কুড়োন ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই আর কোন লক্ষ্য নেই আমার। কিন্তু আর কোনদিকে দৃষ্টি না থাকলেও এটুকু দেখে নিচ্ছিলাম তুমি কথা বলতে বলতে কিভাবে থেমে যাচ্ছ। নীল সমুদ্র দেখার ছলে দেখে নিচ্ছ সমুদ্রতীরের তুচ্ছ এক ঝিনুক কুড়ানীকে।

রোদ উঠল। সময় হল ফেরবার। তুমি ঠিকানা দিলে তোমার চক্রতীর্থের হোটেলের, ছোড়দা দিল স্বর্গদ্বারের বাসার। যাওয়ার সময় তুমি আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আমরা শুধু এতক্ষণ ধরে মিথ্যে বকবক করে মরেছি। লাভ হল আপনার।'

বললাম 'কেন?'

তুমি বললে, 'আপনি আঁচলভরে রঙবেরঙের ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে চললেন আর আমরা ফিরছি খালি হাতে।'

বললাম, 'খালি হাতে ফিরবেন কেন, এগুলি নিননা।'

ছোড়দা বলল, 'নিয়ে নাও নিয় নাও সুপ্রিয়। আমরা কেউ ওর মত ঝিনুক কুড়াতে পারিনে। ভালো ভালো ঝিনুকগুলি যেন নীলার আঁচলে ওঠবার জন্যেই বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকে।'

তুমি পকেট থেকে সঙ্গে সঙ্গে রুমাল বের করলে, 'দিন।'

আমি আমার আঁচলের সব ঝিনুক তোমার রুমালে ঢেলে দিলাম।

তুমি বললে, 'একি সব দিয়ে দিলেন যে।'

হেসে বললাম, 'নিন না আমাদের আরো আছে। রোজই তো কুড়াই।'

তখন কি জানি অমন ক'রে দিতে নেই। একবার চাইলেই একেবারে উজাড় ক'রে দিতে নেই। তখন কি জানি সব দিলেই সব পাওয়া যায় না।

এবার বোধ হয় তোমার মনে পড়েছে। মনে পড়ছে একটা মাস কি আনন্দেই না আমাদের কেটেছিল। পুরী হয়ে উঠেছিল আনন্দপুরী। বাসায় আমার মা, ছোড়দা আর আমি। আর পুরীতে তুমি একা এসেছ বেড়াতে। নামকরা বড় হোটেলে পুরো একটা ঘর নিয়ে আছ।

দু'একদিন বাদে ছোড়দা বলল, 'একা একা কেন থাকবে এস দুই বন্ধু একজায়গায় থাকি।'

তুমি তাতে রাজী হলে না। তবু দিনের বেশির ভাগ সময় রাত্রিরও অনেকখানি আমাদের সঙ্গেই তোমার কাটতে লাগল। আমরা একসঙ্গে ভুবনেশ্বরে গেলাম কোনারকের সূর্যমন্দির দেখলাম। পথের মধ্যে একদিন বাস দুর্ঘটনায় সারাদিন আটকে রইলাম আর একদিন পড়লাম ঝড়ে। কিন্তু কোন বিপদই বিপদ নয় সব এ্যাডভেঞ্চার ফুলের মালা গাঁথবার জন্যে এগুলি সূচের ফোঁড় মাত্র। তুমি আমাদের বাসায় রইলে না। ইচ্ছা করেই কিছুটা ব্যবধান রাখলে। আমার সেই ফাঁকটুকু ভরে রইল তোমার চিন্তায় তোমার কথায়। তোমার হোটেল আর আমাদের বাসর মাঝখানের পথটুকু ভরে উঠল আমাদের পায়ের চিহ্নে।

পুরীতে যে অসম্ভবের আশা করেছিলাম কলকাতায় এসে তা যে এত তাড়াতাড়ি সার্থক হয়ে উঠবে সেকথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি বললে মিছে বলা হবে। ভেবেছিলাম বই কি। শুধু রাত্রির স্বপ্নে নয় দিবা স্বপ্নেও। ঘুঁটে কুড়ানী কি রাজরাণী হবার স্বপ্ন দেখে না?

দু'তিনবার এলে তুমি আমাদের সিমলা স্ট্রীটের বাসায়। আমার দাদা বউদির সঙ্গে আলাপ করলে। মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বললে ছোড়দার সঙ্গে দাবা খেললে। তোমার অমায়িকতা দেখে সবাই মুগ্ধ। তোমার মত বড়লোকের ছেলে তোমার মত বিদ্বান বুদ্ধিমান পুরুষকে এমন অনাড়ম্বর সরল আর বিনয়ী হ'তে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। তারপর বিয়ের প্রস্তাব করে তুমি তাঁদের আরো অবাক করে দিলে। একদিন ছাদের চিলাকোঠায় আমার হাতখানা তোমার মুঠির মধ্যে নিয়ে বললে 'তোমার কোন আপত্তি নেই তো নীলা?'

আপত্তি! এ যে আমার প্রত্যাশার অতীত। বললাম আমি কি তোমার যোগ্য? তুমি বললে 'অযোগ্য কিসে?'

বললাম, 'আমি তো দেখতে সুন্দরী নই।'

তুমি বললে, 'আমার চোখে সুন্দর' আমি বিয়ে করছি আমার নিজের চোখে দেখে। আর পাঁচজনের চোখ কি চশমা আমার ধার করবার ইচ্ছে নেই।' বললাম 'আমি তো তেমন লেখাপড়া জানিনে।'

তুমি বললে, আমি তো কোন স্কুলের হেডমিস্ট্রেসকে বিয়ে করছিনে। তছাড়া লেখা-পড়া জানাটাই সংসারে বড় জানা নয়।'

বললাম 'তবে?'

তুমি বললে 'ভালোবাসতে জানাটা তার চেয়েও বড়। সবচেয়ে বড়।'

আজ তুমি নিশ্চয়ই এ সব কথা ভুলে গেছ, আজ তুমি এমন কথা নিশ্চয়ই আর স্বীকার কর না। কিন্তু সেদিন করেছিলে। তুমি অতগুলি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছ, তোমার কত ধীশক্তি, স্মৃতিশক্তি। আমি মিথ্যেকথা বলছি এমন অপবাদ তুমি নিশ্চয়ই দেবে না। আমি সেদিনের শোনাকথাগুলিই তোমাকে আজ শোনালাম। কথাগুলি শুধু তো আমি মুখস্ত করে রাখিনি হৃদয়স্থও করেছিলাম যে।

আমাদের বাড়িতেও মৃদু আপত্তি উঠল। মা আর দাদা বউদি বললেন, 'অত বড়লোক। ওদের সঙ্গে কি আমরা তাল রেখে চলতে পারব?'

ছোড়দা বলল, 'আমরা তাল রাখব কেন? তাল রাখবে নীলা।'

বউদি হেসে বলল 'জগঝম্পের সঙ্গে মন্দিরার তাল। ছোড়দা রাগ করে বলল, 'তা হোক। বড়লোকের ঘর থেকে' মেয়ে আনার সময় হিসেব ক'রে আনতে হয়। কিন্তু তাদের ঘরে মেয়ে দেওয়ার বেলায় অত হিসেব না করলেও চলে।'

বউদির বাপেরবাড়ির অবস্থা আমাদের চেয়ে ঢের ভালো। আমাদের সংসারে এসে নিজের হাতে রান্নাবান্নার কাজ করতে হয় বলে তাঁর অসন্তুষ্টির শেষ ছিল না। এই নিয়ে ছোড়দা মাঝে মাঝে তাকে খোঁচা দিতে ছাড়ত না।

আমি জানি তোমাদের বাড়িতে শুধু আপত্তি নয়, বড় ঝড় উঠেছিল। তোমার বাবা মা দাদা বউদির কেউ এ বিয়েতে মত দেন নি। কি করে দেবেন। জাতে যদিও আমরাও বৈদ্য কিন্তু তোমাদের মত অভিজাত তো নই। আমার বাবা ছোট আদালতে ওকালতী করতেন আর তোমার বাবা হাইকোর্টের নামকরা এ্যাডভোকেট। আমরা পুরোন ভাড়াটে বাড়িতে থাকি আর তোমরা এক-ডালিয়া রোডে নিজেদের তেতলা বাড়ির অধিবাসী। তোমার তিন দাদার একজন বিলাত ফেরৎ ডাক্তার আর দুজন ইঞ্জিনীয়ার। ছোটভাইও মাইনিং-এর ভালো ছাত্র। আর আমার দুই দাদাই সাধারণ কেরানী। এক-জনের মাইনে কম, আর একজনের বেশী। তোমার বউদিদের মধ্যে একজন এম এ, এক-জন ডবল এম এ আর একজনের ডিগ্রীর কথা আজও জানিনে, তবে তিনি যে লণ্ডন প্রবাসিনী হল্যাণ্ডের মেয়ে তা জানি।

কিন্তু বিদেশীনীকে ঘরে আনতেও বোধ হয় তোমাদের বাড়িতে এত আপত্তি হয়নি যেমন হয়েছিল আমার মত স্বজাতীয়া, স্বদেশিনীর বেলায়।

কারণ শুধু আমাদের বাড়ির অবস্থাই তো নয়, আমার নিজের অবস্থাই বা কি। আমি বিদেয় ম্যাট্রিক পাশ আমার গায়ের রং শামলা। গুণের মধ্যে কেবল রাঁধতে বাড়তে জানি। আর বড়জোর দু' একখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত গুণগুণ করে গাই। তাঁরা আপত্তি না করবেন কেন।

কিন্তু তুমি সব আপত্তি অগ্রাহ্য করলে। সকলের অসম্মতি অনিচ্ছার বিরুধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে। উদ্ধতভাবে তোমার বাবাকে বললে, 'বেশ, সেজদা যেমন তার ডাচ স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হয়ে আছে আমিও তাই থাকব। তাতে তো তোমাদের প্রেস্টিজের হানি হবে না।'

ছেলে হিসেবে তুমিও তো কারো চেয়ে অযোগ্য নও ব্যাঙ্কিংএ তোমারও বিদেশী ডিগ্রী আছে। অল্প বয়সে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অফিসার গ্রেডে মোটা মাইনের চাকরি নিয়ে ঢুকেছ। তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে দাম না দেবে কে।

তোমার মা শেষে হার মেনে বললেন, দরকার নেই বাপু তোমার আলাদা বাড়িতে উঠে। তুমি বিয়ে করে এখানে এস। সে আর যাইহোক কানাও নয়, খোঁড়াও নয়, ভিন দেশের ভিন জাতের মেয়েও নয়। আমাদের বাঙ্গালী গেরস্থ ঘরেরই মেয়ে। আমি খুবই মানিয়ে নিতে পারব।'

তবু আমি আপত্তি করেছিলাম, 'তোমাদের বাড়ির সবাইরই যখন অমত—

তুমি জবাব দিয়েছিলে তাতে কিছু এসে যায় না। তোমার অমত আছে কিনা তাই বল। যদি থাকেও তাতেও আমি পিছিয়ে যাব ভেব না। তোমাকে আমি জোর করে হরণ করে নেব। আমি হেসে বললাম, 'আমাকে আর নতুন করে কি হরণ করবে। আমি তো হৃতা হয়েই আছি।'

বউ হয়ে ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম তোমাদের বাড়িতে। যেন এক দুরধিগম্য দুর্গে প্রবেশ করেছি। তোমার বাবা গম্ভীর মুখে আশীর্বাদ করে নিজের লাইব্রেরী ঘরে চলে গেলেন। তোমার বউদি আর বোনেরদল খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন আমার মধ্যে তুমি কী দেখতে পেয়েছ। তোমার মা শুধু সস্নেহে ডেকে বললেন, 'এসো মা।'

কিন্তু দুদিন পরেই দেখলাম আমি সত্যিই বেমানান হয়ে গেছি। আমি রেফ্রিজারেটরের ব্যবহার জানিনে তোমাদের বড় পিয়ানোটার কাছে যেতে আমার ভয় হয়; তোমাদের বাগানের বিদেশী ফুলগুলির নাম মনে

রাখতে পারিনে। একটা বলতে আর একটা নাম বলি। তাও উচ্চারণে ভুল হয়। আর সে কথা শুনে তোমাদের বাগানের দুজন মালী পর্যন্ত হাসাহাসি করে। ফুলের মত এত সুন্দর, এত তৃপ্তিকর তো কিছু নেই। কিন্তু তা আমার কাছে এক বিভীষিকার বস্তু হয়ে উঠল।

পদে পদে অপদস্থ হতে লাগলাম। আমি টেবিলে বসে খেতে জানিনে। টেবল ম্যানার্সে একেবারেই অজ্ঞ। খেতে খেতে কি করে গল্প করতে হয়, হাসতে হয়, হাসাতে হয়, সাহিত্য শিল্প রাজনীতির সঙ্গে পরচর্চাকে মিশিয়ে কি করে সুস্বাদু ককটেল তৈরী করতে হয় আমি কিছু জানিনে। আমার কথাবার্তা চাল-চলন আচার-আচরণ সারা বাড়িতে অফুরন্ত হাস্যরস জোগাতে লাগল। কেউ মুখে আঁচল দিয়ে হাসে, কেউ আড়ালে গিয়ে খিলখিল করে। শুনেছি তোমার বোন অনীতার সেই হাসি দেখেই উদাসীন নিস্পৃহ হার্টস্পেশালিস্ট দিব্যেন্দু সেন তার প্রেমে পড়েছিল।

সবাই হাসলেও তোমার মুখ দিনের পর দিন গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল। তা দেখে তোমার বউদি আর বোনেরা ভরসা দিয়ে বলল, 'ভেব না, ওকে আমরা ঘষেমেজে ঠিক করে নেব। তোমার নীলা হবে নীলকান্তমণি।'

কিন্তু সবাইকে এড়িয়ে আমি নিজের ঘরে আশ্রয় নিলাম। নিজেদের ঘরে। লক্ষ্য করতে লাগলাম সে ঘরে তোমার যাতায়াত কমতে লাগল। খুব বেশি রাত্রে ছাড়া তুমি সে ঘরে আস না। দিনের বেলায় আমাদের শোয়ার ঘরে ঢুকতে, আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে। সারাদিন অফিসে থাক, তারপর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দাও, গল্প কর। তারপর বিছানায় আসতে না আসতেই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়। একদিন আমি ধরে ফেললাম তা ঘুম নয়, ঘুমের ভান। অবশ্য অনেক আগেই বুঝেছিলাম। কিন্তু তোমাকে বুঝতে দিতে সাহস ছিল না। তবু সেদিন আর না বলে পারলাম না, একটু রাগ করেই বললাম, 'আমাকে পাশে নিয়ে শুতে তোমার যদি এতই ঘেন্না, আলাদা একখানা খাটের ব্যবস্থা করলেই হয়। ঘরের মধ্যে জায়গা তো কম নেই।'

তুমি এতটা নির্লজ্জতা, এতটা অবিনয় বোধ হয় আশা করনি। তোমার মুখের ভাব দেখেই তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু পরক্ষণেই রাগ আর বিরক্তিকে তুমি মধুর মিথ্যে, তবু মধুর হাসিতে ঢেকে দিয়ে বললে, 'ঘৃণা করব কেন নীলা। তুমি নিজেকে অত ছোট ভাব কেন। ছোট ভেবে ভেবে মানুষ নিজেকে ছোট করে।'

আমি তোমার বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে বললাম, 'আমি যে সত্যিই ছোট।'

তুমি সে কথার কোন প্রতিবাদ না করে বললে, 'তোমার বিরুদ্ধে অনেক নালিশ আছে।'

বললাম, 'কি নালিশ বল।'

তুমি বললে, 'তুমি বউদিদের সঙ্গে অনীতা অমিতাদের সঙ্গে মিশতে চাও না, তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চল, তাদের কারো কথা শোন না। এমন হলে তুমি শিখবে কি করে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেবে কি করে। আমার মা-ও তো লেখাপড়া বেশি জানেন না। কিন্তু কথায়-বার্তায় আদবকায়দায় যে কোন গ্র্যাজুয়েট মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারেন।'

আমি বললাম, 'ও'রা আমাকে মেজে-ঘষে ঝকঝকে করে তুলতে চান। কিন্তু মানুষ তো আর বাসন নয় যে, তাকে অমন করে মাজা যাবে।'

তুমি চটে উঠে বললে, 'উপমাটা তোমার মুখে ঠিকই মানিয়েছে। দুনিয়ায় বাসন মাজা ছাড়া তো আর কিছু জানো না। বাড়ির ঝি-চাকরদের সঙ্গে তোমার যত মেলামেশা, আত্মীয়তা। তোমার মনের কথা বলবার লোক কি এ বাড়িতে আর কেউ নেই?'

আমি জবাব দিলাম, 'যদি থাকবেই তাহ'লে ঝি-চারকদের সঙ্গে মিশতে যাব কেন।'

আমি চাইনি তোমার মুখে মুখে তর্ক করতে। আমি জানতাম আমার মত অশিক্ষিতা নির্গুণ মেয়ের পক্ষে তা সাজে না। কিন্তু আমি না চাইলে কি হবে, আমার ভিতর থেকে যত তিক্ততা, যত রুক্ষতা সব যেন ঠেলে বেরিয়ে আসত। আর তো কারো সঙ্গে তেমন কথা বলতাম না। তোমাকে সামনে পেলে তাই মুখরা হয়ে উঠতাম। তাতে তুমি আমাকে আরো অপছন্দ করতে লাগলে। তোমার ভালো-বাসায় যত ঘাটতি পড়ল আমার ভিতরের জ্বালাও তত বেড়ে চলল।

অকৃতজ্ঞ হব না। তুমি কর্তব্যের ত্রুটি করনি। তুমি আমার পড়াশুনোর ব্যবস্থা করলে। কলেজে পড়লে আই এ পরীক্ষা দিতে দু' বছর লাগে। এত বেশি বয়সে আমারও কলেজে যেতে সংকোচ। তাই বাড়িতেই পড়তে লাগলাম। রীণাদি, রিতাদি, অনীতা, অমিতা তোমার মুখের দিকে চেয়ে সবাই আমাকে পাশ করাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। কিন্তু কারোরই মুখ রাখতে পারলাম না। যে ইংরেজীর চর্চা তোমাদের বাড়িতে সবচেয়ে বেশি, সেই ইংরেজীতেই ফেল করে বসলাম।

এক বছরের মধ্যেই তোমার বাবা-মা মারা গেলেন। দাদারা চলে গেলেন ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে। সে সব বাড়ি তাঁদের নিজেদের রোজগারে নিজেদের পছন্দমত তৈরী। তোমার তখনও তত ক্ষমতা হয়নি। নিচের তলাটা ভাড়া দিয়ে ছোট ভাই সুশান্তের সঙ্গে তুমি এ বাড়িতেই রয়ে গেলে। তোমার কাছে গোপন করব না। আমি অনেকটা স্বস্তি পেলাম। এবার আর বাড়িতে ভিড় নেই। আমার সঙ্গে মিশলে, আমার সঙ্গে কথা বললে কারো কাছে তোমাকে উপহাসের পাত্র হ'তে হবে না। কিন্তু বৃথাই সে আশা করেছিলাম। আমার সেই জা আর ননদের দল নিজেরা চলে গেলে কি হবে তাদের মন্তব্য আর সমালোচনা যে তোমার মনের মধ্যে গেঁথে রেখে গেছে।

একদিন বিকেলে একতলার বিশুবাবুর বাচ্চা ছেলেটাকে আদর করছিলাম, তোমার চোখে পড়ায় তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে।
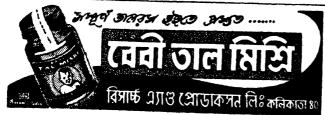
একটুকাল চেয়ে চেয়ে কি দেখলে, তারপর আমাকে কাছে ডেকে বললে, 'নীলা, শোন।'

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বিণ্টুকে তার মার কোলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিয়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

তুমি বললে, 'ছেলেপুলে তোমার খুব ভালো লাগে তাই না?'

আমি হেসে বললাম, 'কার না লাগে?'

তুমি কিন্তু হাসলে না। গম্ভীর মুখে বললে, 'তুমি কি এক্ষুণি ছেলেপুলে চাও?'

আমি মুখ নিচু করে বললাম, 'তুমি যখন চাও না, আমি কেন চাইব।'

তুমি বললে, 'না চাইনে। যতদিন মা হওয়ার যোগ্য না হতে পার, ততদিন তোমারও চাওয়া উচিত নয়।'

আমি এবার হেসে বললাম, 'তুমি বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করছ। আমি কি বলি- যে চাওয়া উচিত? আমি কি সত্যিই চেয়েছি?'

সেদিন রাত্রে তুমি আমাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলে, বললে, 'তুমি সত্যিই বুদ্ধিমতী নীলা, খুবই বুদ্ধিমতী।'

আমি হেসে বললাম, 'এ আর এমন বেশি বুদ্ধির কথা কি। বিয়ের দু-এক বছরের মধ্যে ছেলেপুলে হ'তে দিলে একেবারেই যে জড়িয়ে পড়তে হয়, কোন কাজকর্ম করবার শক্তি থাকে না, একথা নিতান্ত নির্বোধেও বোঝে।'

তুমি বললে, 'কাজকর্ম সত্যিই তুমি তাহলে কিছু করতে চাও নীলা?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে আর পরীক্ষাটরীক্ষা দিতে বল না। সেবার এক সাবজেক্টে গিয়েছিল, আবার পরীক্ষা দিলে সব সাবজেক্টে যাবে।'

তুমি বললে, 'আমারই ভুল হয়েছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কিছু হয় না। পড়াশুনো নয়, অন্য কিছু শেখ। টেকনিক্যাল কিছু শিখবে? সর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং, কি নার্সিং?'

আমি মাথা নেড়ে বলাম, 'ওসব আমাকে দিয়ে হবে না।'

তুমি বললে, 'তবে? গানবাজনার দিকে যাবে?'

আমি বললাম, 'গানের মত গলা কই। বাজনাও আমার আসে না।'

তুমি বললে, 'তাহলে?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'সেদিন হাসতে হাসতে সুশান্তর একটা কার্টুন এ'কেছিলাম। আমি ভাবলাম ও বুঝি রাগ করবে। ও কিন্তু উল্টো তারিফ করে বলল, ছোট বউদি তুমি আর্ট স্কুলে ভর্তি হও। তোমার এমব্রয়ডারির কাজ এত ভালো, তুমি এত ভালো আলপনা দিতে পার। তোমার ড্রয়িংও চমৎকার। যত মনভোলানো বানানো কথা।'

তুমি খুশি হয়ে বললে, 'ঠিক ঠিক। সত্যিই তো। অনেক আগেই তো আমার এটা চোখে পড়া উচিত ছিল। তোমার ওদিকে একটু ন্যাক আছে।'

হঠাৎ তুমি আমার হাতখানা তুলে নিলে। আমার হাতের আঙুলগুলির দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললে, চাঁপার রঙ না থাকলেও চাঁপার কলির গড়ন আছে। তোমার আঙুল আর্টিস্টের আঙুল।'

এত আদর তোমার কাছ থেকে অনেক দিন পাইনি। এত মিষ্টি কথা অনেক দিন শুনিনি তোমার মুখে। আমার চোখ ফেটে জল এল। বললাম, 'অমন ক'রে বল না। আমি অত ভালোবাসার যোগ্য নই।'

তুমি সেদিন প্রতিবাদ করলে না, আগেকার মত বললে না ভালোবাসার আবার যোগ্যতা অযোগ্যতা কি। বললে না প্রেম অযোগ্যকে যোগ্য করে, অপূর্ণকে পূর্ণতা দেয়। বেশ মনে আছে তুমি সেদিন অন্য কথা বলেছিলে। তুমি বলেছিলে 'যোগ্যতা নিয়ে কেউ জন্মায় না নীলা। যোগ্যতা প্রত্যেককে অর্জন করতে হয়, তার জন্যে সাধনা করতে হয়। প্রেমের কোন আলাদা মূল্য নেই। মানুষের মূল্যেই তার মূল্য। নিঃস্ব ভিখারীকে আমরা যা দিই তা প্রেম নয়, আবার ভিখারী হয়ে যা পাই, তাও প্রেম নয়, অনুকম্পা। আমি দেব কোত্থেকে যদি আমার দেওয়ার ভাণ্ডার না বাড়াতে পারি। তাই সংসারের চোখে, সমাজের চোখে নিজেকে যত মূল্যবান করতে পারব আমার প্রেম তত মূল্যবান হবে।'

এসব কথার অর্থ আমার কাছে মোটেই অস্পষ্ট ছিল না। তবু বললাম, 'সমাজের চোখে তুমি যথেষ্ট মূল্যবান। আর তোমার দামেই আমার দাম।'

তুমি জোর দিয়ে বললে, 'না, মোটেই তা নয়। অন্তত আমি সে কথা মানিনে। মেয়েরা শুধু স্বামীর স্ত্রী আর সন্তানের মা হবে আর কিছু হতে পারবে না, আর কিছু হতে চাইবে না এ আমি ভাবতেই পারিনে। তাকে আরো কিছু হ'তে হবে। এখনকার দিনে সে শুধু ঘরের নয়, সে বাইরেরও। স্বামীর নামে নয়, সন্তানের নামে নয় নিজের নামে তার নাম, নিজের দামে তার দাম। সব দিক থেকে সে হবে স্বাবলম্বিনী। তবেই তার ভালোবাসা মর্যাদা পাবে, অবলম্বন পাবে। রাহুভূত নিরাশ্রয় নিরবলম্ব প্রেমের কোন মানে নেই।'

তোমার কথাগুলিতে আমি যেমন উৎসাহ পেলাম, তেমনি নৈরাশ্যও বোধ করলাম। এ জন্মে আমার ভালোবাসা অর্থহীন হয়েই রইল। নিজের মূল্য বাড়িয়ে তাকে মূল্য দিতে পারলাম না। হাহাকার এল, আক্ষেপ এল মনে। একথা আগে বললে না কেন। তাহলে তো কিছুতেই বিয়ে করতে চাইতাম না। চিরকুমারী হয়ে থাকতাম। মনে মনে বেশ বুঝতে পারলাম পুরীর সমুদ্রপারে সেদিনের ঝিনুক কুড়ানীর কোন মূল্যই আর তোমার চোখে নেই। তুচ্ছ ছোট ছোট ঝিনুকগুলির মতই সে মূল্যহীন হয়ে

গেছে। হারিয়ে গেছে, চুরমার হয়ে ধুলোয় মিশে গেছে। ঝিনুকের রঙে যে মোহ তোমার চোখে লেগেছিল তা ধুয়ে যেতে একবছরের বেশি লাগেনি। এমন ভাগ্য হবে যদি জানত তাহলে আঁচলভরা ঝিনুক নিয়ে সেইদিনই সেই হত-ভাগিনী সমুদ্রে ঝাঁপ দিত। উঠে আসত না, ফিরে আসত না। সংসারে নিজের অযোগ্যতার কথা আমি নতুন করে অনুভব করলাম। এতো শুধু আমি আই, এ, ফেল করা নয়, সংসারের আরো বড় পরীক্ষায় আমি ফেল করেছি। আমার স্বামীর মনোনীতা হতে পারিনি, মনোরমা হ'তে পারিনি। কি ক'রে পারব। আমার যে কোন যোগ্যতাই নেই। রান্নাবান্না, ঘর-সংসারের কাজ ঝাড়াপোছা সাজানো গুছানো, আত্মীয়-স্বজনরে সেবা-যত্ন—এতকাল ধরে যা কিছু শিখেছি যা কিছু জেনেছি তার কোন দাম নেই। তাতে আমার মূল্যেও বাড়ে না, আমার প্রেমের মূল্যেও বাড়ে না।

ভর্তি হলাম সরকারী আর্ট কলেজে। তুমি নিজে সঙ্গে করে ভর্তি করে দিয়ে এলে। দেখলাম শুধু ছেলেরাই না, আমার মত অনেক মেয়েও এসেছে ছবি আঁকা শিখতে। তবে দু'একজন ছাড়া কেউ সিঁথিতে সিঁদুর পরে আসেনি। আমার মত এক পরীক্ষায় ফেল করে আর এক পরীক্ষার পড়া পড়তে আসেনি। তাদের মনে কত উৎসাহ, কত উদ্যম, কত আকাঙ্ক্ষা, কত স্বপ্ন। আর আমার মনে কেবল ভয় 'আমি কি পারব? আমি কি পারব?'

প্রথম প্রথম আমার শিল্প চর্চায় তোমার খুব উৎসাহ দেখা গেল। বইপত্র কিনে দিলে তুলি আর রঙ উজাড় করে আনলে। তারপর দক্ষিণ খোলা সবচেয়ে ভালো ঘরখানা ছেড়ে দিলে আমার স্টুডিওর জন্যে। জানলায় দরজায় রঙীন পর্দা ঝুলল, দেশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ ছবির প্রিণ্টগুলি দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙানো হ'ল দেয়ালে দেয়ালে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একটি সাধারণ ছাত্রীর জন্যে যে স্টুডিও তুমি সাজিয়ে দিলে কলকাতার খুব কম আর্টিস্টেরই তেমন স্টুডিও আছে।

কিন্তু ঘর তুমি শুধু সাজিয়েই দিলে সে ঘরে নিজে এলে না। সারাদিন তোমার অফিসের কাজে কাটে, সন্ধ্যার পর কাটে ক্লাবে বন্ধুদের সঙ্গে। সে দলে শুধু বন্ধুরাই নয়, বিদুষী বান্ধবীরাও দু'একজন থাকেন। তাঁদের সঙ্গে যদিও তোমার শুধু বন্ধুত্বেরই সম্পর্ক তবু আমি ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলে মরতাম। তোমাকেও কম জ্বালাতাম না। এসব নিয় তোমাকে অনেক কটু কথা বলেছি, ইতর ভাষায় ঝগড়া করেছি আজ সে জন্যে লজ্জা পাই ক্ষমা চাই তোমার কাছে।

তোমাকে আমি যত আঁকড়ে ধরতে চাইলাম, তুমি তত বিরক্ত হ'তে লাগলে, তোমার বিরূপতা তত বাড়তে লাগল। বাইরে থেকে আমি যত বাঁধতে চেষ্টা করলাম ভিতর থেকে তোমার বাঁধন তত আলগা হতে লাগল। আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। ছুটির দিন। তোমারও ছুটি আমারও ছুটি। কিন্তু তুমি কি একটা কাজের অছিলায় বেড়িয়ে গেলে। সারা দিনের মধ্যে আর ফিরলে না। আমার ইচ্ছা হ'তে লাগল তোমার সাজানো ওই স্টুডিওতে আগুন ধরিয়ে দিই, ভেঙেচুরে সব ছারখার করে ফেলি। কিন্তু কিছুই করলাম না। শুধু নিজেই জ্বলে পুড়ে খাক হ'তে লাগলাম।

তুমি এলে রাত এগারোটায়। কি উল্লাস কি উৎসাহ তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছ। চেষ্টা ক'রেও তুমি তা গোপন করতে পারলে না। কিন্তু আমার দিকে চেয়ে তুমি একটু যেন কুণ্ঠিত হলে, লজ্জিত হলে, দুঃখিত হলে। আমার কাছে এসে অনুতপ্ত সুরে বললে, 'নীলা, আমাকে ক্ষমা কোরো। সত্যি, তোমার আজ ভারি কষ্ট হয়েছে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তোমার তো সামনেই পরীক্ষা, তুমি বোধ হয় তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।'

আমি জ্বলে উঠে বললাম, 'থাক থাক তোমাকে আর মিথ্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। খবরদার কাছে এসো না, ছুঁয়ো না আমাকে।' কিন্তু তুমি যে নিষেধ মানলে না। আমাকে আদর করবার জন্যে এগিয়ে এলে। আমার মাথায়ও খুন চেপে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে তোমাকে ঠেলে ফেললাম। তুমি টাল সামলাতে না পেরে দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়লে।

চেঁচামেচি শুনে সুশান্ত ছুটে এল পাশের ঘর থেকে। ব্যাপারটা বুঝতে তার একমুহূর্তও দেরি হ'ল না। সে আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন তিরস্কারের সুরে বলল, 'ছি ঃ বউদি, মেয়েছেলে হয়ে তুমি এমন কাণ্ড করতে পার আমার ধারণা ছিল না। এর চেয়ে তোমরা আলাদা বাড়িতে, আলাদা হয়ে থাক না কেন। ছিঃ।'

তুমি সুশান্তকে বললে, 'তুই যা এখান থেকে।'

ব্যাপারটা সবাই জেনে গেল। ঝি চাকর, দারোয়ান ড্রাইভার কারো কাছেই কিছু গোপন রইল না। আমি লজ্জায় মরে রইলাম। ভাবলাম এর পরে কি ক'রে মুখ দেখাব। আরো অনেক রাত্রে তোমার কাছে গিয়ে বললাম, 'আমাকে ক্ষমা কর। দেখি কোথায় লেগেছে।'

তুমি পাশ ফিরে শুতে শুতে বললে। 'থাক। যেখানে লেগেছে সে জায়গা চোখে দেখা যায় না।'

সবই বুঝতে পারলাম। আঘাতটা শুধু তোমার মাথায় নয় পৌরুষে লেগেছে। কিন্তু এমন অদৃশ্য আঘাত তুমি কি হাজারবার আমার নারীত্বকে করনি? কিন্তু আমি সে তুলনার কথা তুললাম না। আমি বারবার ক্ষমা চাইলাম, তোমার পায়ের ওপর আমার ভিজে মুখ রাখলাম, তুমি পাশ ফিরলে, ফিরে তাকালে না।
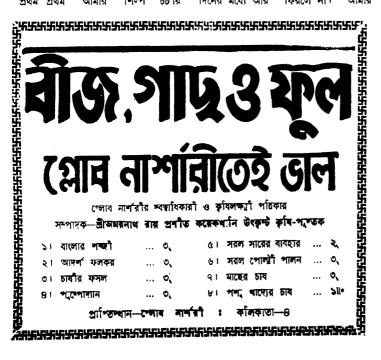
আলাদা ঘরে না গেলেও আলাদা খাটের ব্যবস্থা হল। আমাদের দুজনের সম্মতি রইল তাতে। একদিন শেষ রাতে ঘুম ভাঙিয়ে তুমি নিজে থেকেই সন্ধি করতে এলে, 'এসো নীলা উঠে এসো।'

আমি বললাম, 'না।'

তুমি বললে, 'না কেন।'

আমি বললাম, 'দিনের বেলায় তুমি একবার আমাকে ভুলেও ডেকে জিজ্ঞেস করো না। আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার লজ্জা, আমাকে ছুঁয়ে দেখতেও বোধ হয় তোমার ঘেন্না করে। রাত্রের অন্ধকারে সেই লজ্জা আর ঘেন্না তোমার ঢাকা পড়তে পারে, আমার ঢাকে না। তুমি যাও এখান থেকে।'

তুমি স্তব্ধ হয়ে সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলে। আমার আশঙ্কা হ'তে লাগল, তুমি এই অপমান কিছুতেই সহ্য করবে না। হিংস্র জন্তুর মত তুমি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে আমাকে। তোমার হাতের সেই শাস্তির জন্যে, মৃত্যুর জন্যে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু তুমি একটি শব্দ পর্যন্ত করলে না। আস্তে আস্তে চলে গেলে নিজের বিছানায়। আমার বহুবার ইচ্ছা করতে লাগল নিজেই উঠে যাই ছুটে যাই তোমার কাছে। কিন্তু কিসের একটা জেদ অতিকায় পেরেকের মত আমাকে খাটের সঙ্গে বিঁধে রাখল। মনে মনে ভাবলাম ঢের ছুটেছি, আর কত ছুটব।

বাইরের শোভনতা শালীনতার একটুও ত্রুটি হল না। স্বজন বন্ধুদের সামনে আমরা তেমনি হাসিমুখে বেরোলাম, তাদের চায়ে ডাকলাম, বিবাহ বার্ষিকীতে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালাম। এ অভিনয়ে তোমারও আনন্দ আমারও আনন্দ। আমরা যেন নিজেদের ঠকাচ্ছি না, শুধু পরকেই প্রবঞ্চিত করছি।

আমার ক্লাসের দুই বন্ধু উমা আর সুমিতা একদিন আমাদের বাড়িতে এল বেড়াতে। দামী দামী আসবাবপত্র দেখে সাজানো গুছানো বড় স্টুডিয়োটা দেখে অবাক হয়ে গেল তারা।

উমা বলল, ভাই নীলা তোমার মত ভাগ্যবতী আর কেউ নেই। সত্যি ভদ্রলোক তোমার কি যত্নই করেন।'

সুমিতা বলল, 'করবেন না? ও'দের যে প্রেমজ বিয়ে। সত্যি নীলাদি, তোমার মত এত বড় আর এত সুন্দর একটা স্টুডিও পেলে আমি রাতারাতি একজন বড় আর্টিস্ট হয়ে যেতে পারতাম।'

আমি বললাম, 'আর্টিস্ট হওয়ার আগেই যারা বড় স্টুডিও পায় তারা কিছুই হ'তে পারে না।'

সুমিতা বলল, 'ওরে বাবা, মানুষ না পেয়ে দুঃখ পায় আর তোমার এত পেয়েও আফসোস যায় না।'

তুমি বাড়ি ছিলে না। ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম সুশান্তর। প্রথম আলাপেই সুমিতা মুগ্ধ। আমি মনে মনে হাসলাম। এই মুগ্ধতার পরিণাম যে কি তা আমিই জানি। ভাবলাম আগে থেকেই সুমিতাকে সাবধান করে দেব। কেউ যেন প্রেমে বিশ্বাস না করে। কেউ যেন ভালোবাসার কাছ থেকে কিছু আশা না করে। কিন্তু বলি বলি করেও কিছু বলতে পারলাম না, কখনো সাক্ষাতে কখনো অসাক্ষাতে ওদের আলাপ পরিচয় এগিয়ে চলল। সে পরিচয় বিয়েতে গিয়ে মধুর সমাপ্তি পেয়েছে তা তুমি জানো। সুমিতার ভাগ্য যে আমার মত হয়নি, বড় স্টুডিও না পেলেও স্বামী-সন্তান নিয়ে ও যে সুখের সংসার পেতেছে তার জন্যে আমি ওকে ঈর্ষা করিনে। আমার মন অত ছোট নয়। তবে তুলনাটা মনে পড়ত বইকি।

অবশ্য ওদের শুভ পরিণয়ের আগেই তোমার আমার মধ্যে অশুভ সম্পর্ক আরো ঘোরালো হয়ে উঠল। তুমি দিল্লীতে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে বড় চাকরি পেলে। শুনতে পেলাম তোমার নিজের উদ্যম উদ্যোগের জন্যেই এমন হয়েছে। এতো শুভ সংবাদ। শুধু তদ্বির নয়, যোগ্যতা, কৃতিত্বও তোমার আছে বইকি। তোমার ভাষায় তোমার মূল্য অনেক বেড়ে গেল। তুমি বললে, "আর তো মাত্র গোটা তিনেক বছর তোমার বাকি। কোর্সটা কলকাতাতেই শেষ কর।'

আমি বললাম, 'শুরু যখন করেছি, নিশ্চয়ই শেষ করব।' তুমি বুঝি ভেবেছিলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাইব। হ্যাংলার মত ছুটব তোমার পিছনে পিছনে? সেই লজ্জাহীনা অতি লোভী ঝিনুক কুড়ানীর বহুদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে তা কি তুমি জানো না?

তুমি বললে, 'এখন একটু কষ্ট হলেও ভবিষ্যতে এতে তোমার ভালোই হবে। আমি অনেক ভেবে চিন্তেই তোমার জন্যে এ ব্যবস্থা করেছি। টাকার জন্যে ভেব না। যত টাকা লাগে আমি দেব। কলেজে যাওয়া ছাড়াও তুমি যদি আর কোন বড় আর্টিস্টের কাছে কাজ শিখতে চাও তারও ব্যবস্থা করতে পার। আর আমার মনে হয় তোমার কমার্শিয়াল আর্ট নেওয়াই উচিত ছিল। ফাইন আর্ট নিয়ে কি হবে? অর্থকরী দিকটাও তো দেখা উচিত।'

বললাম, 'ভেবে দেখি।'

তুমি চলে গেলে। দিন কয়েক
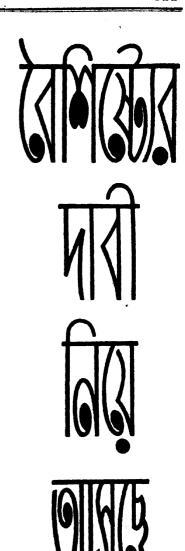
এসে রইলাম মা আর দাদাদের সংগে। এর আগেও মাঝে মাঝে গিয়ে থেকেছি। কিন্তু স্থির হয়ে থাকতে পারিনি। মনটা কেবলই ছটফট করেছে। কেন, সে কথা আজ আর নাইবা বললাম।

তোমার সংগে আমি জোর করে গেলাম না দেখে মা খুব রাগ করতে লাগলেন। বললেন, 'নিজের পায়ে তুই নিজে কুড়ুল মারলি। কার সাধ্য তোর ভালো করে। ঝগড়াঝাটি কি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হয় না? তাই বলে কি এমন করে একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকে?'

আমি বললাম, 'সেজন্যে নয় মা। ও'র যে নতুন চাকরি। তাছাড়া আমার যে কলেজ আছে।'

মা রাগ ক'রে বললেন, 'ছাই কলেজ। ও সব আঁকিবুকি করে কি হবে তোর। যত সব ছেলে মানুষি। আর সময় নষ্ট।'

মার কথার প্রতিবাদ করবার জন্যে আমি আরো মন দিলাম কাজে। পড়ে রইলাম নিজের রঙ তুলি নিয়ে। বিবর্ণ জীবনকে যদি রঙীন করে তুলতে না পারল শিল্প আছে কি জন্যে? জীবনের শূন্যতাকে ভরে তুলবার জন্যেই তো শিল্প। এ ছাড়া আর কি মূল্য আছে তার?
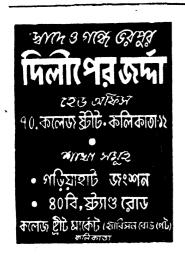
কিন্তু মাকে এড়ালেও ছোড়দাকে এড়াতে পারলাম না। যে চিলেকোঠার মধ্যে তুমি আমার হাত চেপে ধরেছিলে সেই ছোট ঘরেই এখন তার আস্তানা। নিচের ঘরগুলি দাদা বউদি আর তাদের ছেলেমেয়েরা দখল করেছে। ছোড়দা আমাকে একদিন কাছে ডেকে নিয়ে বলল, 'তোদের কি হয়েছে নীলা, আমাকে সত্যি ক'রে বলতো।'

হেসে বললাম, 'কি আবার হবে।'

ছোড়দা বলল, 'উঁহু, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। আমি যতদিন তোদের বাড়িতে গেছি, অস্বস্তি বোধ করেছি। কিসের যেন একটা দম আটকানো ভাব। সেই সুপ্রিয় আর নেই। যেন এক আলাদা মানুষ হয়ে গেছে। লুকোসনে, কি হয়েছে তোদের আমাকে বুঝিয়ে বল।'

আমি ধরা দিলাম না, তেমনি হাসতে লাগলাম, 'বললাম বোঝালেই কি তুমি বুঝবে ছোড়দা। এত বয়স হ'ল কিছুতেই বিয়ে থা করলে না। এ সব ব্যাপার আইবুড়োদের বোধগম্য নয়।'

তারপর একদিন ছোড়দার পীড়াপীড়িতে তার সংগে গেলাম একজিবিশন দেখতে। মিউজিয়ামের যে দিকটায় বছর বছর চিত্র-প্রদর্শনী হয় এ বছরও সেখানেই আয়োজন হয়েছিল। আর এই প্রদর্শনীতেই প্রথম পরিচয় হ'ল আর্টিস্ট অজয় চক্রবর্তীর সংগে। পুরীর সমুদ্রের মতই আমরা আর এক সমুদ্রের সামনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে-ছিলাম। সে সমুদ্র আরো বিক্ষুব্ধ আরো উত্তাল আরো বর্ণাঢ্য। অস্থির আর অশান্ত সেই ঝড়ের সমুদ্রের মধ্যে আমি যেন নিজের মনের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম। অদ্ভুত ভালো লাগতে লাগল আমার।

হঠাৎ একজনের গলার শব্দে আমি পিছন ফিরে তাকালাম। কালো মত রোগাটে এক ভদ্রলোক ছোড়দার সংগে কথা বলছেন। 'আরে দিলীপ যে। তুমি আবার ছবির ভক্ত হলে কবে। এ সব জায়গায় তো তোমাকে এর আগে দেখিনি।'

ছোড়দা বলল, 'আগে না দেখলেও যে এখন দেখবে না তার কোন মানে আছে নাকি? আমি নিজের ইচ্ছায় আসিনি হে, আমার এই বোনের পাল্লায় পড়ে আসতে হল। নীলাও তোমার পথের পথিক হতে যাচ্ছে। এতক্ষণ আমরা তো তোমার ছবিই দেখছিলাম। বেশ হয়েছে তোমার সমুদ্রের ঝড়।'

অজয়বাবু খুশি হয়ে বললেন, 'সত্যি? আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার ভালো লাগল?'

আমি বললাম 'খুব।'

তোমার সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। একবারও একটা ঢেউ এসে পা ভিজিয়ে দিল না। সত্যিকারের সমুদ্র হলে কি আর কথা ছিল? এতক্ষণে গ্রাস ক'রে ফেলত।'

অজয়বাবু হেসে বললেন, 'ওইটুকুই তো লাভ। এ সমুদ্র তোমাকে ডুবিয়ে মারে না। কিন্তু ডুবে মরবার অভিজ্ঞতাটুকু দিয়ে দেয়। মৃত্যুর স্বাদ নিয়েও তুমি বেঁচে থাকতে পার। আর সে মৃত্যু তোমার কাছ থেকে জীবনকে ছিনিয়ে নেয় না, জীবনকে মধুর করে।'

ছোড়দা বলল, 'দরকার নেই ভাই অত মাধুর্যের। তার চেয়ে একটু চা টা খাওয়াও তাই বরং ভালো। নীলার সংগে এই ঘণ্টা খানেক ধরে ঘুরে ঘুরে আমার পা দুটো আর নেই।'

অজয়বাবু হেসে বললেন, 'চল। চায়ের ব্যবস্থা বাইরে আছে।' তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কি মনে হয়?'

স্বীকার ক'রে বললাম, 'আমি আপনার কথাগুলি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'তার মানে কথাগুলি আপনার পছন্দ হয়নি।'

বললাম, 'যদি কিছু মনে না করেন, অনেকটা তাই। আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট, মৃত্যু যন্ত্রণার কি অভাব আছে যে সে অভিজ্ঞতা আমরা আর্টের কাছে নিতে যাব?' তিনি আমার দিকে বিস্মিত হয়ে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন, তাকিয়ে কি দেখলেন, তারপর বললেন, 'আচ্ছা এনিয়ে আর একদিন আলাপ করা যাবে।'

সেদিন রেস্টুরেন্টে আমরা বেশি সময় ছিলাম না। অজয়বাবু আর ছোড়দা দুজনেরই তাড়া ছিল।

ফেরার পথে বাসে যেতে যেতে ছোড়দা হঠাৎ বলল, 'ভালো হ'ল কি মন্দ হল কে জানে।'

আমি বললাম, 'কিসের ভালো-মন্দ ছোড়দা?'

ছোড়দা বলল, 'অপরের সংগে তোর আলাপ করিয়ে দিয়ে ভালো করলাম কি না কে জানে। আমার বন্ধুরা তো শেষ পর্যন্ত তোর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।'

আমি হেসে বললাম, 'তোমার ভয় নেই ছোড়দা। আমার সংগে কেউ আর শত্রুতা করে এঁটে উঠতে পারবে না।' মনে মনে ভাবলাম আমার ভিতরে বাইরে লোহার বর্ম আঁটা। পঞ্চবাণই হোক আর সপ্তবাণই হোক কোন বাণেরই সাধ্য নেই আমার মর্ম ভেদ করে।

তোমার চিঠিপত্র মাঝে মাঝে আসে। তাতে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব নেই। আমি যাতে স্বাধীন স্বাবলম্বিনী এমন কি যশস্বিনী হ'তে পারি তাই তোমার উদ্দেশ্য।

সে সব চিঠিতে তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথাও থাকে। কলকাতার মত দিল্লীতেও তোমার দক্ষতার পরিচয় সবাই পেতে শুরু করেছে। সহকর্মীদের মধ্যে তোমার খ্যাতি বাড়ছে, প্রতিপত্তি বাড়ছে, পদোন্নতির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তোমার। তুমি লিখতে, দরকার হলেই আমি যেন টাকা চেয়ে পাঠাই। যেন কোনরকম কার্পণ্য না করি। কার্পণ্য করব কেন। তুমি তো আমার নামে মোটা টাকার এ্যাকাউন্ট্ খুলে রেখে গেছ ব্যাংকে। মাসে মাসে আরো টাকা জমা দিচ্ছ সেখানে। বলতে গেলে মাইনের অর্ধেক টাকাই পাঠাচ্ছ। এদিক থেকে আমি সত্যিই তোমার অর্ধাংশভাগিনী। আমার আপত্তি করবারও কিছু নেই, অভিযোগ করবারও কিছু নেই। তবু তখন থেকেই তোমার টাকা ব্যয় করতে আমার সংকোচ হ'ত। যত পারি কম করে খরচ করতাম। তখন থেকেই মনে মনে আমার সংকল্প ছিল আমি দান নিচ্ছিনে, ঋণ নিচ্ছি। যেমন ক'রে পারি এ ঋণ আমি শোধ করব। তাতে যদি সারা জীবন লাগে লাগুক।

অজয়বাবুর সংগে আরো আলাপ হ'ল। প্রথম প্রথম এক্‌জিবিশনেই দেখা হত। তারপর একদিন তিনি তাঁর বাড়িতে ডাকলেন। প্রথম দিন ছোড়দাকে সংগে নিয়ে গেলাম বেড়াতে। শিল্পী হিসাবে তাঁর নাম আমাদের কানে পেঁৗছে ছিল। যদিও তাঁর অনেক ছবিই আমাদের চোখে ভালো লাগেনি। কারণ মানে বুঝিনি। শিল্পী হিসাবে তিনি ছিলেন বামপন্থী। রাজনৈতিক অর্থে বাম নয়। বরং বামপন্থী রাজনীতি-বিদরা তাঁকে বলবেন দক্ষিণ। আবার দক্ষিণীরাও পাত্তা দেবেন না। কারণ তাঁর রঙে আর রেখায় কোন দাক্ষিণ্য নেই, প্রসাদগুণও নেই। তাঁর সাধনা জীবনের প্রতিকূলে, সমাজের প্রতিকূলে, শিল্পের তরণী তিনি শান্ত স্বচ্ছ নদীর কূলে কূলে বেয়ে যাননি।

প্রথম প্রথম তাঁর এই বামাচার চোখের ওপর মনের ওপর অত্যাচার বলে মনে হত। কিন্তু আমার মনের তখনকার অবস্থায় তাঁর সেবারের ছবিগুলি আমাকে বিশেষভাবে টানল। দেখতে গেলাম কোথায় তিনি থাকেন সেখানকার পরিবেশ কি রকম, কেমন ক'রে সাজিয়েছেন তিনি তাঁর স্টুডিওকে।

তুমি বোধহয় ওদিকটায় কোনদিন যাওনি। বণ্ডেল রোড ছাড়িয়ে রেল লাইন পার হয়ে আরো পূর্বদিকে অনেকখানি হেঁটে গেলে বেদিয়াডাঙ্গা। আশে পাশে কতকগুলি বস্তি। তাঁর বাড়িটা ঠিক বস্তির মধ্যে না হলেও বস্তির মত। জীর্ণ একতলা পড়ো-পড়ো বাড়ি। খানতিনেক ঘর। সামনের ঘরটায় একটা ন্যাড়া তক্তপোষের ওপর উপুড় হয়ে বসে তিনি ছবি আঁকছিলেন। দরজার একটা পাল্লা খোলা। আমরা বিনা আমন্ত্রণেই ঘরে ঢুকলাম। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পরে তাঁর ধ্যান ভাঙল। মৃদু হেসে ছোড়দার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও তোমরা! এসো।'

ছবি-টবি সরিয়ে রেখে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা যে সত্যিই এত কষ্ট ক'রে আসবে আমি ভাবতে পারিনি।'

ছোড়দা বলল, 'আরো স্পষ্ট করে বলনা কেন আমরা যে আসি তা তুমি চাওনি।'

অজয়বাবু হার মেনে হাসতে লাগলেন। শেষে বললেন, 'গ্রীন-রুমের মধ্যে বাইরের দর্শকদের না নিয়ে আসাই ভালো।'

আমি বললাম, 'কিন্তু গ্রীনরুমটাই কি কম দর্শনীয়? আপনার স্টুডিও দেখতে এলাম।'

তিনি বললেন, 'তাহ'লে আপনাকে হতাশ হতে হবে। এই ঘরই আমার শোবার ঘর, বসবার ঘর—'

ছোড়দা পাদপূরণ করে বলল, 'এবং আঁকবার ঘর, থাকবার ঘর।'

তিনি হেসে বললেন. 'তুমি কি আজ-কালও কবিতা লেখ নাকি দিলীপ?'

ছোড়দা বলল, 'না আজকাল আর লিখিনে। মুখে মুখে বানাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর ওদিকের ঘরগুলিতে কারা থাকেন?'

তিনি বললেন, 'আমার বিধবা বোন আর চারটি ভাগ্নেভাগ্নী। চলুন তাদের সংগে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

আমি একটু বিব্রত হয়ে বললাম, 'এখন থাক না। ও'দের বিরক্ত ক'রে লাভ কি।'

'না না বিরক্ত আবার কিসের। ও লক্ষ্মী ও টুলু বুলু একটু চাটা করে দে এ'দের। কোথায় গেলি সব?'

বলতে বলতে তিনি পশ্চিম দিকের আর একটা দরজা ঠেলে ভিতরে চলে গেলেন।

আমি তাঁর ঘরের চারদিকে আর একবার তাকিয়ে দেখলাম। দেয়ালে কোথাও কোন ছবি নেই। একপাশে একটা সস্তা দামের ইজেল দাঁড় করানো রয়েছে। চারখানা ইঁটের ওপর একটা ভাঙা স্যুটকেশ। পরে জেনেছিলাম তাঁর অবিক্রীত ছবির রাশে সেটা বোঝাই হয়ে আছে।

একটু বাদে ফিতেপেড়ে সাদা-খোলের শাড়িপরা আমারই বয়সী একটি বিধবা মেয়ে ঘরে ঢুকলেন মৃদু হেসে নমস্কার জানিয়ে বললেন. 'চলুন, ভিতরে চলুন।'

সেদিন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা আর হল না। অজয়বাবুর বোন আর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। দাঙ্গায় মারা গেছেন লক্ষ্মীদির স্বামী। চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দাদার ঘাড়ে পড়েছেন। বড় মেয়ে টুলু ম্যাট্রিক পাশ করে কনভেণ্ট রোডের এক বিলাতী ওষুধের ফার্মে ঢুকেছে। রাত্রে কলেজে পড়ে। পনের ষোল বছরের একটি শান্ত কৃশাঙ্গী মেয়ে। ডেকে আলাপ করলাম। বেশ ভালো লাগল দেখতে। চোখ জুড়িয়ে গেল। মনে হল যেন নিজের সেই ফেলে আসা কৈশোরে ফিরে গেছি।

মোড়ের দোকানের তেলেভাজা সিঙাড়ার সঙ্গে অতি সস্তাদামের চা খেতে হল। কষ্ট হল খেতে। তোমাদের বাড়িতে থেকে ক'বছরের মধ্যে কবে যে অভ্যাস একেবারে ফিরে গেছে টেরও পাইনি। রাজাকে না পেলেও অশনে বসনে একেবারে রাজরানী হয়ে বসেছি। আর কয়েকটি ছেলেমেয়ে ছোট ছোট। ছেঁড়া প্যাণ্ট আর জীর্ণ ফ্রকে কোনরকমে নগ্নতা ঢেকেছে।

এতদিন ধারণা ছিল আমার মত দুঃখী বুঝি আর কেউ নেই। স্বামীর প্রেম না পাওয়ার মত বড় দুঃখ নেই পৃথিবীতে। এখন দেখলাম দুঃখের বিচিত্র রূপ বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র স্বাদ। সব দুঃখই বিস্বাদে ভরা।

এই পরিবারটির সঙ্গে আমি আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়লাম। যেন এক নতুন দুনিয়া আমি আবিষ্কার করেছি। একটি নয়, কয়েকটি। এক একটি হৃদয় তো নয়. এক একটি জগৎ। সে জগতে রসের শেষ নেই, রহস্যেরও শেষ নেই।

প্রথম প্রথম আমি কিছু খাবার, বইপত্র, কি খেলনা টেলনা নিয়ে গেলে ওরা ভারি আপত্তি করত। ভারি কুণ্ঠিত হত টুলু বুলু বল্টু পল্টুর দল। কিন্তু আমি বলতাম, 'মাসীর হাত থেকে নিতে তোমাদের লজ্জা কিসের। তোমরা যদি কিছু না নাও, আমি আর কোনদিন এখানে আসব না।' তখন তারা আমাকে ঘিরে ধরত, 'আমরা নেব, আমরা নেব। তুমি এস।'

অজয়বাবুর সঙ্গেও আত্মীয়তা হল। বাবু বাদ দিয়ে অজয়দা বলে ডাকতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, 'হঠাৎ অজয়দা কেন?'

আমি বললাম, 'আপনি একদিন তুমি বলেন, পরদিন ভুলে গিয়ে আবার আপনি শুরু করেন। আপনার মুখে তুমিটা যাতে স্থায়ী হয় সেইজন্যে।'

তিনি একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা।'

তারপর আমি ধরে বসলাম, 'আমাকে ছবি আঁকা শিখিয়ে দিন।'

তিনি বললেন, 'মাপ করো। জাতে বামুন হলেও গুরুপুরুতগিরি আমার আসে না। আমি নিজে কোনদিন স্কুল কলেজে ছবি আঁকা শিখিনি, ধরাবাঁধা গুরু বলে কাউকে বরণও করিনি। এদিক থেকে আমি যেমন অছাত্র, তেমনি অশিক্ষক।'

আমি বললাম, 'কিন্তু সবাই তো আর আপনার মত নয়।'

তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই নয়। তুমি তোমার মত। তুমি তোমার পথে চলবে। আমার কোন কিছু যদি তোমার ভালো লাগে তাহলে রঙ আপনিই লাগবে, রেখা আপনিই ফুটবে। তোমার চেষ্টা করে কিছু নিতে হবে না।'

আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, 'আপনার কাছে শিখতে চাই বলে আপনার নকল করতে চাই তা ভাববেন না।'

তিনি হেসে বললেন, 'তা কেন ভাবব। দীপ থেকে দীপ জ্বালিয়ে নিলে কি নকল করা হয়? চুরি করা হয়? তুমি দেশলাইর বাক্সটি চুরি করতে পার, সোনার প্রদীপটি চুরি করে নিতে পার, কিন্তু আগুনের গুণ এই, তা হাতে করে নেওয়া যায় না, ভিতরে ভরে নিয়ে যেতে হয়। আর তা যদি নিতে পার সে আগুন আমার আগুন নয় সে আগুন তোমার আগুন। তার জ্বালাও তোমার, তার আলোও তোমার।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ঋণ স্বীকারের কি কোন দরকার নেই?'

তিনি বললেন, 'স্বীকার করলেও হয় না করলেও হয়। ঋণ স্বীকারের একমাত্র পথ হল অঋণী হওয়া। শিল্পের সাধনা মানেই স্বকীয়তার সাধনা। সেই সাধনায় যতদিন সিদ্ধি না আসবে ততদিন ঋণ স্বীকার করলেও লোকে তোমাকে বাহাদুরী দেবে না, আর না করলে তো দুয়ো দেবেই। সাধারণ গৃহস্থকে ফাঁকি দিলেও গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়বে।'

বললাম, 'স্বকীয়তার মানে কি সম্পূর্ণ নতুন কিছু করা?' তিনি বললেন, 'সম্পূর্ণ নতুন মানে তো উদ্ভট কিছু। যাঁরা স্বকীয়তা সম্বন্ধে অতি সচেতন তাঁরা সেই উদ্ভট সাগরের উপকূলের মানুষ। দেখ নীলা, তুমি যে ভাষায় কথা বল সে ভাষা তোমার একার নয়, যে ভঙ্গীতে কথা বল তাও আর পাঁচজনের। ভাবের বেলায়ও সেই কথা। তবু তুমি যে আমার সামনে বসে বসে কথা বলছ তার মধ্যে শুধু তুমিই আছ আর কেউ নেই। আমার মনে হয় মৌলিকতাও তাই। সিন্ধুতে বিন্দুর মত সে মৌলিকতা আছে শুধু তোমার উপলব্ধির মধ্যে। তোমার মুখের বলার মধ্যে, আমার কানের শোনার মধ্যে। আর কোথাও নেই।'

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'ঋণের কথা বলছিলে। ঋণ তো আছেই। ঋণে শুধু আকণ্ঠ নয়, আপাদমস্তক ডুবে আছি। সে ঋণ আমার সূর্যের কাছে, পৃথিবীর কাছে, বাপের কাছে মায়ের কাছে আমার পূর্ববর্তী শিল্পীদের কাছে, সমকালীন শিল্পীদের কাছে, ঋষিদের কাছে, মনীষীদের কাছে প্রতিটি মানুষের কাছে। সে ঋণ কার কাছে নেই? তবু শিল্পের মধ্যে আমার অঋণী হবার অহংকার। তাতে আমার অনুভূতির রঙ, উপলব্ধির রেখা। তা আমার বাসনা বেদনার প্রতিরূপ।'

তোমার কাছে স্বীকার করছি এসব আলোচনা একদিনে হয়নি। আমাদের অনেক সকাল, অনেক দুপুর, অনেক সন্ধ্যা এসব শিল্পতত্ত্বে ভরে উঠেছে। আমি বসে বসে শুনেছি, কখনো সায় দিয়েছি, কখনো প্রতিবাদ করেছি। শোনার সময় নতুন মনে হলেও পরে ভেবে দেখেছি বিশেষ কিছু নতুন নয়। বরং বেশিরভাগই পুরোন। অনেক জায়গায় ভাষা পর্যন্ত ধার করা। তবু মনে হ'ত তাঁর বক্তব্যের ভিতর দিয়ে যে ব্যক্তিটি ফুটে বেরোচ্ছে, সে সম্পূর্ণ নতুন; জগতে যেন সে এই প্রথম ব্যক্ত হল, নিজেকে প্রথম ব্যক্ত করল।

আমাদের আলোচনার মাঝখানে লক্ষ্মীদি মাঝে মাঝে এসে ধমক দিতেন, 'অত যদি কথাই বল দাদা, তাহলে ছবি আঁকবে কখন? বক্তৃতা দেওয়াই যদি বড় কাজ মনে কর, একটা স্কুল-টিস্কুল খুলে মাস্টারি শুরু করে দাও।'

অজয়দা হেসে বলতেন, 'যত মাস্টারীই করি তোর মত হেডমিস্ট্রেস হতে পারব না। লক্ষ্মীর ধমকের বহর দেখেছ নীলা?'

ধমকটা শুধু যেন অজয়দাকেই নয়। র সংগে আরো কেউ জড়িয়ে থাকত। আমি লজ্জিত হয়ে উঠে পড়তাম। কিসের একটা অস্বস্তি যেন কাঁটার মত বিঁধত।

তারপর ধমকটা শুধু লক্ষ্মীদির মুখেই সীমাবদ্ধ রইল না—তোমার দাদা-বউদির দল, আমার দাদা-বউদি, এমন কি বউদির বউদিদিদের কানে গিয়েও খবরটা পেঁছিল, অজয়দার সংগে আমি বড় বেশি মেলামেশা করছি। ছোট-বড় প্রত্যেক ছবির একজি-বিশনে আমাদের একসংগে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে, দুজনকে একসংগে স্কেচ করতে দেখেছে কেউ কেউ মাঠে ময়দানে পার্কে গংগার ধারে। প্রথমে হাসি-পরিহাস, তারপর বন্ধুবান্ধবদের ঠোঁটে বাঁকা বিদ্রূপও চোখে পড়ল। এমন কি আমার আগেকার বন্ধু এবং এখনকার ছোটজা সুমিতাও ঠাট্টা করতে ছাড়ল না। খবরটা তোমার কানে দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না। আমি অপেক্ষায় রইলাম তুমি কি লেখ তাই দেখব। কিন্তু তুমি কিছুই লিখলে না। বরং জানালে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। বন্ধু নির্বাচনে, সংগী নির্বাচনেও আমার সেই স্বাধীনতা আছে।

একবার এসে তুমি কলকাতা থেকে ঘুরেও গেলে। আমি বললাম, 'অজয়দাকে একদিন ডাকি বাড়িতে। তাঁর সংগে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।' তুমি বললে, 'না থাক। আমার সময় হবে না।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'যাঁর নামের সংগে জড়িয়ে লোকে আমার এত দুর্নাম ছড়াচ্ছে, তাকে তুমি একবার চোখের দেখাও দেখবে না?'

তুমি বললে, 'কি হবে চোখের দেখা দেখে? তাঁর রূপগুণের বর্ণনা কানে যেটুকু শুনেছি তাই যথেষ্ট। প্রেমের দেবতা অন্ধ নয়, কানা। সে এক চোখ দিয়ে দেখে। এক চোখোমি না থাকলে প্রেম সম্ভব নয়। তুমি এক চোখে যা দেখেছ, আমি দু'চোখে তা দেখতে পারব না। তার চেয়ে চোখ বুজে থাকা ঢের ভালো।'

আমি এগিয়ে এসে তোমার হাত জড়িয়ে ধরলাম, ব্যাকুল হয়ে বললাম, 'তুমি তাহলে ওই সব কথা সত্যিই বিশ্বাস করেছ?'

তুমি নির্লিপ্ত ভাংগতে বললে, 'পুরো-পুরি করিনি। কিন্তু বিশ্বাস্য যদি কোন-দিন হয়ও, তাতেও দুঃখের কিছু থাকবে না। আমি তোমাকে শুধু যে জীবিকা বেছে নেওয়ার বেলায় স্বাধীনতা দিয়েছি তাই নয়, পছন্দমত সংগী তুমি খুঁজে নাও তাও চেয়েছি।'

তোমার কথাগুলি আমার বুকে সহস্র-মুখ বিষাক্ত তারের মত বিঁধল। গোড়া থেকেই তুমি তাহলে তাই চেয়েছ? শুরুতেই তোমার এই উদ্দেশ্য ছিল? আমি ভেবেছিলাম, তুমি ঈর্ষায়—অন্তত অপমানে জ্বলবে। তোমার স্ত্রী অন্যের অনুরক্ত হয়েছে, তাতে তোমার পৌরুষে ঘা লাগবে। কিন্তু কোন জ্বালার চিহ্ন দেখতে পেলাম না তোমার চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাষায়। শুধু আমি নিজে জ্বলতে লাগলাম, আমার বুকের ভিতরটা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল। আমার আর সন্দেহ রইল না, তুমি দিল্লীতে আর কোন মেয়েকে ভালোবাস। তার নাম আমি জানিনে, তার রূপ আমি দেখিনি। তবু সে আছে। আমার মনে হতে লাগল পৃথিবীর সব মেয়েকে তুমি ভালোবাস, শুধু আমাকে ছাড়া। পৃথিবীর সব মেয়ে আমার সতীন। আমার বুঝতে বাকি রইল না, তুমি নিজে মুক্তি চাও। তুমি চাও আমি আগে অন্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে তোমার মুক্তির পথ সহজ করে দিই। সেই মুহূর্তে আমি কি চেয়েছিলাম জানো? আমার হাতের তুলি ধারালো ছোরা হোক। সেই ছোরায় দুজনে একই সঙ্গে বিদ্ধ হয়ে মরি।

দুদিন বাদে তুমি দিল্লীতে ফিরে গেলে। তৃতীয় দিনে আমার পরীক্ষার ফল বেরোল। ফাইনালে আমি ভালোভাবে পাশ করেছি। অন্যবারের চেয়ে অনেক ভালো রেজাল্ট হয়েছে এবার। ওয়েস্টার্ন আর্টে সেকেন্ড হয়েছি আমি। তোমাকে খবরটা টেলিগ্রাম করে জানালাম। হাজার হোক তুমিই তো খরচ দিয়ে পড়িয়েছ। সঙ্গে সঙ্গে তুমি দীর্ঘ চিঠিতে অভিনন্দন জানালে। সে প্রেমপত্র নয়, মুক্তিপত্র। তুমি লিখলে, 'আমি এই চেয়েছিলাম নীলা। ভুল করেছি বুঝতে পেরে আমি সেই ভুলের জের টেনে চলিনি। প্রাণপণে ভুল শোধরাবার চেষ্টা করেছি। তোমাকে লেখা-পড়া শেখাতে চেয়েছি, যাতে স্বাধীনভাবে কিছু করতে পার তার চেষ্টা করেছি। আমি তোমাকে সংস্কার দিয়ে বাঁধিনি, আসক্তি দিয়ে বাঁধিনি। অবাঞ্ছিত সন্তান এনে তোমার চলবার পথে বাধা ঘটাইনি। তোমার সব দিক আমি খোলা রেখেছি। অবশ্য এখনো তোমার উপার্জনের ক্ষমতা হয়নি, এখনো তুমি আরো দু-একটা বিষয়ে মন স্থির করতে পারোনি। যতদিন তা না পার, আমি অপেক্ষা করব—আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, তোমাকে তৈরী হতে হবে। নিজের পথ, নিজের ঘর তোমাকে বেছে নিতে হবে।'

করে ছিঁড়ে ফেললাম। আজ ভাবছি দলিল হিসেবে রেখে দিলেও হ'ত। কিন্তু কি দরকার। তুমি তো আর তোমার চিঠি অস্বীকার করবে না। তাছাড়া ওকথা তো একবার নয়, কখনো ভাষায় কখনো ভঙ্গিতে এই কবছরে তুমি বহুবার বলেছ। তোমার সে চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি। আজ দিতে বসেছি।

রাত শেষ হয়ে এল। এবার শেষের ঘটনার কথা বলে আমার চিঠিও শেষ করি।

তোমার চিঠি পড়বার পর কদিন কেবল নিজের মধ্যে নিজে জ্বলে মরলাম, পুড়ে মরলাম। তারপর ভাবলাম তুমি যা বলছ তাই করব। আত্মনিবেদন করব দ্বিতীয় পুরুষের কাছে। তিনি যে আমার জন্যে উৎসুক, তিনি যে আমাকে চান তার সমস্ত শিল্প আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে, আমার তো তা বুঝতে বাকি নেই। সেই চাওয়া তাঁর চোখে দেখেছি, তাঁর মুখের ভাষায় শুনেছি, তুলির টানে আমার যেসব প্রতিকৃতি তিনি এঁকেছেন, তাতেও তাঁর বাসনা বহুবর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে আর ভাবনা কি। তবে আর দ্বিধা কেন! তবু ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারলাম না। আমি গেলাম না দেখে তিনি এলেন। তিনি এলেন তোমার সেই নিজের হাতে সাজানো স্টুডিওতে। নিজের হাতে সাজানো। কিন্তু ভাবছি সেই হাতে হৃদয়ের স্পর্শ কতটুকু ছিল। সুমিতা গেছে মনোহরপুকুর রোডে তার বাপের বাড়িতে। সুশান্ত বেরিয়েছে অফিসে। ঝি-চাকরেরা ঘুমোচ্ছে। সেই নিরালা নিস্তব্ধ দুপুরে অজয়দা এসে উপস্থিত হলেন। এর আগে কতদিন নিমন্ত্রণ করেছি তিনি আসেননি। বলেছি, 'আমার স্টুডিও আপনি ব্যবহার করুন না। ওটা তো পড়েই থাকে।'

তিনি হেসে বলেছেন, 'পরের স্টুডিওতে বসে আমি ঠিক কাজ করতে পারিনে।'

ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছি, 'অত পর পর কেন ভাবেন? আমি কি আপনার কাছ থেকে কিছুই নিইনি যে, আপনার নিতে অত সংকোচ?'

এতদিন আসেননি, কিন্তু সেদিন এলেন। সেদিন আর শিল্পতত্ত্ব নয়, শিল্পের আলোচনা নয়, এসে সরাসরি অভিযোগের সুরে, অভিমানের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি গেলে না কেন? তোমার পাশের খবর আমাকে অন্যের কাছ থেকে শুনতে হল।'

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'খবরটা কি এমনই শোনবার মত?'

তিনি বললেন, 'শোনবার মত ঠিকই। তবে হয়ত আমাকে শোনাবার মত নয়।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আপনি যে স্তরের

খবর আপনার কাছে কোন খবর নয়। আপনার কাছে পরীক্ষা দিলে হয়ত পাশের নম্বর পেতাম না।'

তিনি একটুকাল চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার স্বামীকে জানিয়েছ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'জবাব দিয়েছেন তিনি?'

'দিয়েছেন।'

'কি লিখেছেন? খুশি হয়েছেন নিশ্চয়ই?'

তোমার সেই চিঠির কথাগুলি আমার মনে পড়ে গেল। আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'সে কথা আপনাকে আর একদিন বলব।'

তিনি চুপ করে বসে রইলেন। বসে বসে দেখতে লাগলেন। স্টুডিও নয়, আমাকে। যার মধ্যে তুমি কিছুই দেখতে পাওনি, কিছুই দেখতে চাওনি। তবু আমি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। একটু বাদে আমি বললাম, 'যাই, আপনার জন্যে এক কাপ চা করে নিয়ে আসি।'

তিনি আপত্তি করে বললেন, 'না না, ওসব থাক।'

বললাম, 'তাহলে অন্য কিছু খাবেন?'

তিনি অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বললেন 'না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আমি আজ চলি।'

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি কবে যাবে?'

আমি বললাম, 'আপনি যেদিন বলবেন।'

তিনি বললেন, 'আমি বলব?' তারপর একটু ভেবে বললেন, 'তাহলে পরশু এসো। পরশু বিকেলে।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

তিনি বললেন, 'অবশ্য এসো। তোমার সব কথা শুনব, আমার সব কথা বলব।'

আমার মনে হল, বলবার আর শোনবার কিছু বাকি নেই। দুদিন ধরে কেবলই ভাবলাম, যাব কি যাব না, দেরি করতে করতে যখন গিয়ে হাজির হলাম, তখন আর বিকেল নেই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ওর ঘরের দিকে এগুতে লাগলাম। কিন্তু দোর পর্যন্ত গিয়ে আর যেতে পারলাম না। হঠাৎ আমার মনে হল, অন্ধকার ঘরে যে লোকটি ভূতের মত বসে আছে, সে আর যাই হোক, আমার ভবিষ্যৎ নয়। শুধু ভয় নয়, সংস্কার নয় এক অদ্ভুত বিতৃষ্ণা আমাকে পেয়ে বসল। আমার মনে হল আমি অজয়দার কথা ভালোবাসি, ছবি ভালো-বাসি কিন্তু আর কিছু আমি ও'র ভালো-বাসিনে। এই রূপস্রষ্টা কিন্তু রূপহীন মানুষটি আমার মনে কোন আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারেননি যে আগুনে আমি ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারি, ঝাঁপ দিয়ে মরতে পারি। সেই চরম মুহূর্তে সে কথা বুঝতে পেরে আমি বিমূঢ় হয়ে রইলাম। ছুটে পালিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বড্ডই দেরি হয়ে গেছে। ততক্ষণে তিনি এসে আমার হাত ধরে ফেলেছেন।

তিনি বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন, চল ঘরে চল।'

আমি বললাম, 'না। আমাকে ছেড়ে দিন।'

অন্ধকারে তিনি আমার মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাই আমার ঘৃণাকে ভাবলেন দ্বিধা, ভাবলেন লজ্জা।

তিনি বললেন, 'চল।'

ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন আমাকে।

বললাম, 'আলো জ্বালুন।'

তিনি বললেন, 'না। যে কথা এতদিন আলোর মধ্যে বলতে পারিনি, আজ অন্ধকারে তা বলব।'

আমি বললাম, 'আপনি বললেও আমি তা শুনতে পারব না।'

তিনি মরীয়া হয়ে বললেন, 'এতদিন তো শুনেছ, আমিও শুনেছি তোমার সব কথা। তুমি জীবনে যা পাওনি আমি জীবন ভরে তাই দেব। আমাদের দুজনের হৃদয় তাতে ভরে উঠবে। শূন্য হৃদয় নিয়ে কোন সাধনাই হয় না নীলা।

বলতে বলতে তিনি জোর করে আমাকে বুকে চেপে ধরলেন, চুমু খেলেন ঠোঁটে।

মনে আছে এমনি অবস্থায় তোমাকে একদিন ঠেলে দেয়ালের ওপর ফেলে দিয়েছিলাম? তাঁরও সেই গতি হল। আর সংগে সংগে আমার মুখ থেকে অতি কুৎসিত দুটি কথা বেরিয়ে পড়ল, 'লম্পট, বদমাস!'

সংগে সংগে পাশের ঘরে আলো জ্বলল, বারান্দায় আলো জ্বলল। লক্ষ্মীদিরা পাড়ায় এক বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আগে টুলু যে ফিরে এসে তার নিজের ঘরে ঢুকেছে তা আমরা কেউ লক্ষ্য করিনি, সেই শান্ত স্নিগ্ধ কিশোরী মেয়েটি আমাদের দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। শুধু চোখ নয় তার সর্বাংগ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে।

পরম ঘৃণায় টুলু বলল, 'কি হয়েছে?'

আমি বললাম, 'কি হয়েছে তোমার মামাকে জিজ্ঞেস কর।'

তারপর ছুটে চলে এলাম বাইরে।

সেই মুহূর্তে আমি যেন তোমার দুঃখ পুরোপুরি বুঝতে পারলাম। যাকে চাই তাকে না পাওয়ার চেয়ে যাকে চাইনে তাকে পাওয়ার বিড়ম্বনা কম নয়।

সেই দিনই রাত্রে ট্রেনের তলায় পড়ে অজয়দা মারা যান। তাঁর আত্মীয় বন্ধুরা একে দুর্ঘটনা বলে ঢাকতে চেষ্টা করলেও এ যে আত্মহত্যা পুলিস তা প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। প্রমাণ করতে পেরেওছে। আমার ঘরে তারা এসে হানা দিয়েছিল। জবানবন্দী নিয়ে গেছে আমার। জানিনে কতটুকু তার থেকে বুঝতে পেরেছে তারা।

কলংকে কেলেংকারিতে আমার আর মুখ দেখাবার জো রইল না। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে সে কথা ভাবছিনে। আমি ভাবছি একটি কলংক মলিন মৃত্যুর কথা। পৃথিবীতে কত মহৎ মৃত্যুর কথা শুনেছি পড়েছি। দেশের জন্যে আত্মদান, দশের জন্যে আত্মদান, আদর্শের জন্যে আত্মদানে মানুষের জীবন মহত্তর হয়েছে। কিন্তু এ মৃত্যু সে মৃত্যু নয়। সব দিক থেকে এ অপমৃত্যু। এ মৃত্যু অসামাজিক, অবৈধ, অশ্লীল। অজয়দা কেন এমন মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন? তোমার মত তিনিও তো কোন সংস্কার মানতেন না। তবু প্রচলিত পাপবোধের কাছে তিনি মাথা নোয়ালেন কেন? তিনি কাকে ভয় করলেন? কাকে দেখে লজ্জা পেলেন? আমাকে না তাঁর সেই শ্রদ্ধাবতী ভক্তিমতী কিশোরী ভাগ্নীটিকে?

অনেক কথাই আমার মনে হচ্ছে। কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছিনে। দরকার নেই উত্তরের। এক একবার মনে হচ্ছে কালকের ঘটনা উপলক্ষ। মৃত্যু কামনা তাঁর মনে অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। অনেকদিন তাঁকে বলতে শুনেছি, 'পছন্দ হল না নীলা, পছন্দ হল না।'

'কি পছন্দ হল না বলছেন?'

তিনি বলতেন, 'নিজেকেও না, নিজের সৃষ্টিটুকুও না। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন?'

তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার শিল্প আর জীবনকে আলাদাভাবে দেখতে চেয়েছিলাম। সম্পূর্ণ আলাদা করে ভোগ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হচ্ছে কই। সব যে একাকার হয়ে যাচ্ছে।'

তারপর একটু থেমে ফের বলেছিলেন, নিজের অনেক ছবি যেমন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছি, নিজেকেও তেমনি করে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে বাঁচতাম। নিজেকেও অমন করে ছিঁড়ে ফেলবার অধিকার আমার আছে। কারণ আমি তো আমার নিজেরই সৃষ্টি।'

তবু আজ সব অনাসৃষ্টির মূলে যে আমি একথা ভুলতে পারছিনে। আমার স্পর্শে বিষ আছে। সেই বিষের জ্বালায় তুমি দূরে সরে গেছ। আমার ঠোঁটের বিষ আরো অমোঘ। তাতে আর একজন আরো দূরে চলে গেল।

কিন্তু শুধু বিষ নয়, আমি অমৃতও দেখেছি। দেখেছি বেদিয়াডাঙ্গার সেই কটি ছেলেমেয়ের মধ্যে। দেখেছি সেই কিশোরী মেয়েটির মধ্যে। আমিও একদিন তার মত ছিলাম।

এখন নয়, আরো কিছুদিন বাদে আমি ফের যাব ওদের মধ্যে। জানি প্রথমে ওরা আমাকে সহ্য করতে পারবে না। ঘৃণা করবে, তাড়িয়ে দেবে। আমি তবু যাব। বার বার যাব। নিজে রোজগার করে যা পাব সব দেব ওদের। প্রথমে ওরা নিতে চাইবে না। তারপর আস্তে আস্তে নেবে। বলব, বলব কি জানো? বলব, 'তোমরা তোমাদের মামীর হাত থেকে নিচ্ছ, নিতে লজ্জা কি।'

সব লজ্জা, সব কলংক, সব পাপ, সব দায় আমি মাথায় করে রাখব।

ট্যাক্সিওয়ালা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বিধবা কি সধবা কি করে বুঝব বলুন।

সরু পাড় কি নিপাড় শাদা শাড়ি এখন অনেকেই পরেন। ওটা স্টাইল।

আর চুড়ি না রাখা।

সিঁদুর না পরা।

কি এমনভাবে সিঁদুরের টিপ চুলের অরণ্যে লুকিয়ে থাকবে যে কপালের সঙ্গে কপাল ঠেকালে যদি আপনার মালুম হয় আলপিনের ডগার আঁচড়টি। অনেক সময়ই হয় না।

তাছাড়া মুখখানা প্রায় সব সময়ই বাঁদিকের পার্টিশন তাক করে ধরে ছিল বলে মেয়েটির সিঁথি নজরেই পড়ছিল না।

চুড়ির বদলে বাঁ কব্জিতে ছোট ছেলেদের মোজার গার্ডারের মত কালো সরু ফিতায় বাঁধা ঘড়ি। ওর তলে রাখা হাতের সাদা ঈষৎ চ্যাপ্টা সরু কব্জির মাথায় তেঁতুল বিচির মত ঘড়িটা দেখতে দেখতে কেন জানি আমি মোটামুটি একটা বয়স আন্দাজ করে ফেললাম। ত্রিশ বত্রিশ? আটাশ হতে পারে।

কি আর একটু কম।

চব্বিশ। বাইশ?

বাইশ হলে খুব কম করে ধরা হত। [illegible] একদিকে বর্ষার কচি মালোর মত মসৃণ কোমল কব্জি আবার অন্যদিকে ওর পরু মাংসল ভারি পা দুটো বয়স সম্পর্কে মনে কেমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিল। তাই হয়। অনেক সময় কোনো মেয়ের চিবুক ও চোয়াল আপনাকে যে বয়সের ইঙ্গিত দেবে গলা বা ঘাড়ের দিকে চোখ রাখা মাত্র আপনার সেই অনুমান মিথ্যা মনে হবে। [illegible] যদি চব্বিশ বছর বয়স লেখা থাকে ঘাড়ের দিকে তাকানো মাত্র আপনার মনে হবে—না আরো বেশি, বত্রিশ।

এই ক্ষেত্রে আমি সে ধরনের একটা গোলমালে পড়েছিলাম। চেয়ারের তলা দিয়ে মেয়েটির চটি খোলা পায়ের যেখানটায় শাদা লেস পরানো শায়াটা উড়ু উড়ু করছিল (বস্তুত এত জোরে ও ফ্যান চালিয়ে দিয়েছিল যে হাওয়ায় তার কামরার ভিতর ঝড় বইছিল) দুবার আমি সে-জায়গাটা বেশ ভাল করেই দেখতে পেলাম। তামাটে বেশ শক্ত মতন মাংসের একটা ডেলা। অথচ সেই তুলনায় তার হাতটা অনেক বেশি শুভ্র কোমল কচি মনে হচ্ছিল।

সুতরাং হাত যে বয়স বলছিল পা বলছিল তার উল্টোটা। কিন্তু তাহলেও আমি পায়ের বয়সটা বাতিল করে দিলাম। কেননা ঝড়ো হাওয়ায় মুহুর্মুহু খোঁপা থেকে আঁচলটা যখন খসে খসে পড়ছিল ওর গলা ও ঘাড়ের সুন্দর কোমল বাঁক ও রেখাগুলি দেখে চব্বিশ পঁচিশের বেশি বয়স হবে না নিশ্চিন্ত হ'তে পারলাম।

আমার এতটা দেখার সুবিধা হত না।

আমি অনেকক্ষণ আগেই চা শেষ ক'রে চুপচাপ বসে ছিলাম। একজন কেউ ভিতরে পর্দা খাটানো কামরায় বসে খাচ্ছে হোটেলে (হোটেল-রেস্টুরেন্ট) পা দিয়েই অনুমান [illegible]। পর্দার ওপারে একজন আছে কি দুজন আছে প্রথমটায় অবশ্য ঠিক ধরতে পারিনি। এবং ধরতে না পারাটা কাজের কথা নয়,—কোনো বুদ্ধিমান যুবকই মেয়েটি একলা এসেছেন না সঙ্গে অন্য লোক আছে না জানা পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট থাকে না।

আমি চেয়ারটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে পর্দার দিকে চোখ রেখে এপারে বসে আর একটা কিছুর অর্ডার দিতে তৈরী হচ্ছে [illegible]।

পুরুষ খদ্দেরের গলার শব্দ শুনে কিনা ঈশ্বর জানে ও-ঘরের পাখা হঠাৎ বেগবতী হয়ে উঠল। তারপর তো পর্দা কতবার উঠল কতবার নড়ল কতবার দরজা থেকে তা সরে সরে গেল। ভিতরের হুকুম পেয়ে কিনা বোঝা গেল না যে-ছেলেটা আর একবার ভাত নিয়ে সেদিকে যাচ্ছিল পর্দাটা দলা পাকিয়ে পার্টিশনের মাথায় তুলে দিলে।

ভাতের পর দেখলাম আবার ডালের বাটি গেল, একদলা আলু সিদ্ধ।

ডিম মাংস কালিয়া কোর্মা দো-পেঁয়াজি ইলিশ-ভাতের গন্ধে চারদিক ম ম করছিল। চপ কটলেট গ্রীল মোগলাই পরটার অর্ডার পড়ছে অন্যদিকে। বেশ বড় রেস্টুরেন্ট।

কিন্তু সেই ডিশে ও কামরায় ডাল আর আলু ছাড়া অন্য কিছু প্রবেশ করল না লক্ষ্য ক'রে সচকিত হ'য়ে উঠলাম।

এটা অবশ্য কাজের কথা নয়।

অবস্থা ও রুচিভেদে এক-এক জন এক এক রকম খাওয়া পছন্দ করে। একটা আস্ত সিগারেট শেষ ক'রে আমি একটা চিংড়ি কাটলেট-এর অর্ডার দিলাম। সামনের কামরায় একটি মেয়ে খাচ্ছে আর সেদিকে হা ক'রে তাকিয়ে থেকে একটা চেয়ার দখল করে এমনি বসে থাকাটা অশোভন। কাজেই অতিরিক্ত খরচে নামা গেল।

ছেলেটাকে ডাকলাম।

যে উদ্দেশ্যে গলা বড় ক'রে আমি ছেলেটাকে ডাকছিলাম [illegible] হল। পর পর দুবার ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি এদিকে তাকায় ও আমাকে দেখে।

একটি মেয়ে সম্পর্কে আমি এতটা উৎসুক কেন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ভাবছেন লোকটা অভদ্র ইতর।

আসলে কিন্তু আমি তা না। আমি ট্যাক্সি চালাই। যারা ট্যাক্সি চালায় তারা সবসময়ই চোখ কান সজাগ রাখে। কে কখন ডাকে কার কখন হঠাৎ ট্যাক্সির দরকার হয় তার ঠিক আছে কিছু!

হ্যা, আমার প্রথমেই মনে হল যেন খাওয়া সেরেই মেয়েটি নিশ্চয় গাড়ি ঘোড়া কিছু একটা ডাকবে।

আপনারা ঠোঁট টিপে হাসছেন।

কিন্তু এটা তো সত্য যে নিত্য যাত্রী পারাপার করে কার কখন গাড়ির দরকার হবে রাস্তায় ঘাটে লোকের চোখ মুখ দেখলে আপনাদের চেয়ে আমি একটু আগে বুঝতে পারি?

হ্যাঁ, আট বছর আমি কলকাতা শহরে ট্যাক্সি চালাই। আমার নিজের গাড়ি।

গাড়ি কিনে আমি এই ব্যবসা করছি ঠিক তা না কিন্তু।

বরং গাড়ি চড়ে দিব্যি হাওয়া খাওয়া যাবে এই মতলবে গাড়ি কেনা হয়েছিল। হাম্বার। এক নম্বরের গাড়ি এটা, মশাই, আমার।

হ্যাঁ, ওতে চড়ে হাওয়া খাওয়ার মতলবটা আমার চেয়ে আমার বাবার বেশি ছিল।

কিন্তু কেনার এক বছর পরে বাবা মারা যান।

তার পরের বছর আমাদের দেশ ভাগ হয়। অর্থাৎ পাকিস্তানের ছোটখাট জমিদারীটা গেল।

ফতুর, আমি তখন ফতুর। জমানো টাকা কিছুই প্রায় ছিল না। জমিদারীতে ক' বছর ধরেই ঘুণ ধরেছিল।

আর কি, গাড়িখানা সম্বল ক'রে আমার স্ত্রী রমার হাত ধরে হিন্দুস্থান মানে কলকাতায় বড়মামার বাসায় এসে উঠলাম।

হুঁ, একডালিয়া রোডে।

গাড়িটা এবং বলতে সংকোচ নেই রমাও প্রায় নতুনই ছিল। গাড়ি কেনার ছ' মাস আগে তো আমি বিয়ে করেছিলাম।

যাক্‌গে, এখন জমিদারনন্দন চাকুরে মামার ঘাড়ে চেপে তার অন্ন ধ্বংস করবে, তা-ও একলা না সস্ত্রীক, অত্যন্ত নিন্দনীয়। বুঝলাম।

তাছাড়া মামা পারতেনও না।

বুদ্ধি করে বৌকে মামাশ্বশুরের জিম্মায় রেখে আমি গাড়িটা নিয়ে রাস্তায় বেরোলাম।

হুঁ, ট্যাক্সির লাইসেন্স নিয়ে (অবশ্য সরকারী চাকুরে আমার মামাই তদ্বির টদ্বির করিয়ে চট্‌ ক'রে লাইসেন্সটা বার করতে সাহায্য করলেন) বেশ দু' পয়সা কামাতে লাগলাম।

চাকরি, বিশেষ ক'রে অফিসের লেখা-পড়ার কাজের বিদ্যা মশাই আমার ছিল না বসে রাখছি—জমিদারের বাচ্চা, দুধের সর আর মাছের পেট খেয়ে প্রজাদের চোখ রাঙিয়ে জমিদারী চালাব এই স্বপ্ন নিয়েই বড় হয়েছিলাম। তা সে সুখ তো কপালে রইল না।

হুঁ, আমি ও আমার গাড়ি যখন দিবারাত্র কলকাতা শহর চষতে লাগলাম আর একজন কিছু দূরে একডালিয়া রোডে চুপ করে বসে রইল না। রমা।

পাকিস্তান থেকে সে-ও নতুন এসেছে তাজ্জব শহরে। গাড়িটা যদি একডালিয়া রোডের বাসায় এমনি পড়ে থাকত তো আমারা মামা বিকাশ রায়ের বড় মেয়ে টুনি (ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন) ওটাকে ব্যবহার করত। সে কি এক আধবার। দিনের মধ্যে বিশ বার। সে-বাড়ি উঠেই দু'এক দিনের মধ্যে আমি টের পেয়েছিলাম। নতুন কলেজী হাওয়া গায়ে লেগেছে টুনির। তার ওপর চেহারাখানাও মিষ্টি মতন। তায় আবার সবে লাগছিল ষোলটা বসন্তের হাওয়া। মশাই, ও কি আর ওর মধ্যে ছিল। টুনি বন্ধুদের সংগেই দেখা আর শেষ করে উঠতে পারছিল না।

অবশ্য বিকাশবাবু চেষ্টা করেছিলেন অনেক দিন থেকেই গাড়ি কিনতে। তা, সে কি আর চাকুরে লোকের পক্ষে চট্ ক'রে হয় মশাই, তা-ও এই গ্রেডে থেকে। কাজেই বুঝতে পারছেন টুনি গাড়িটা একবার বাড়ির মধ্যে পেয়ে প্রাণখুলে বেড়াতে শুরু করেছিল। ওটাকে আমার সঙ্গে না নিয়ে এলে কী অবস্থাটা হত?

গাড়ি রেহাই পেল, কিন্তু রমা রেহাই পায়নি। মফঃস্বল থেকে নতুন মেয়ে এসেছে। তা-ও একডালিয়া রোডের মত ফ্যাশানেবল পাড়ায়। তার ওপর রমার চেহারা ওপাড়ার অনেক মেয়ের চেয়েই ভাল,—আর এই তো সবে বিয়ে হয়েছে এখনো ইয়ে—

'বৌদি বৌদি।'

হ্যাঁ, বিকাশ রায়ের বড় ছেলে বেনু রায়। কী পাজি মশাই, যদি দেখতেন। এমনি মুখ দেখলে মনে হবে সাত চড়ে রা বেরোয় না। ভাজা মাছ উল্টে খেতে শেখেনি। আর এদিকে তলে তলে হাড়-বদমায়েস।

'বৌদি বৌদি।'

ঐ যে বললাম। টুনি করত আমার গাড়িটার সদ্ব্যবহার, আর বেনু হারাম-জাদা করতে লাগল আমার স্ত্রী রমাকে ব্যবহার। হ্যাঁ, ঐ যথার্থ শব্দ। বৌদি না হলে চা-খাওয়া হয় না, বাবুর বিছানা ঠিক থাকে না, বৌদি টেবিলের বই গুছিয়ে না রাখলে গোছানো হয় না, ধোবার কাপড় এলে সেগুলো সুটকেসে তুলতে ও দরকার মত একটা একটা করে বার করে দিতে বৌদি। ভাত খেয়ে উঠে বৌদির হাতের মুখশুদ্ধি মশলা মিষ্টি। বাথরুমে যেতে তোয়ালে সাবানের জন্যে বৌদির ডাক।

কেন হবে না মশাই।

রাতদিন দেখছিল সমর্থ সব মেয়ে।

সমর্থ মেয়েরা বেছে বেছে সমর্থ পুরুষকে পাকড়াও করছে। একত্র বেড়ানো একসঙ্গে সিনেমা দেখা।

আমি তো আগেও কোলকাতায় এসেছি। কিন্তু হালে, পাকিস্তান ছেড়ে এসে এবার রকম সকম দেখে বুদ্ধি লোপ। আর, একডালিয়া রোডের মত বাবুপাড়া। অবাধ মেলামেশার যেন বান ডাকছিল।

কিন্তু আমাদের সোনার চাঁদ বেনু সুবিধে করতে পারছিল না। বাপের অবস্থা তো আর দশটি ছেলের বাপের মতন না। বুঝতে পারছেন। রাজা জমিদারের মত অবস্থার ঘরের ছেলের সংখ্যা সেখানে অনেক।

আর লুটছিল সব তারাই।

গাড়ি আছে বাড়ি আছে হাতে দুটো তিনটে করে হীরে চুনীর আংটি সব ছেলে।

মশাই, কায়দা করে বাবা বনেদী পাড়ার বড়মানুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাড়া করা ফ্ল্যাটে থাকছিল বটে।

কিন্তু চারদিকের অবস্থা যে অন্য-রকম। ছেলে মেয়ে দুটোরই উপোস কাটছিল। টুনি পাচ্ছিল না একটা গাড়ি। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। আহা কী সব বন্ধু। হাতিবাগান না সিমলা স্ট্রীট থেকে একদিন একটা ছেলে গিয়েছিল ওবাড়ি। ছেঁড়া স্যান্ডেল, গায়ে কাঁধ-ছেঁড়া ময়লা পাঞ্জাবি। শুনলাম ওই নাকি টুনির লেটেস্ট। তা যেমন অবস্থার ঘরের মেয়ে এর চেয়ে ভাল ছেলে ও যোগাড় করতে পারত কি।

আর এদিকে ভুগছিলেন বেনুবাবু।

নতুন গোঁফ কামাচ্ছেন। কলেজে একটা পাশ দিয়েছেন। আদ্দি মলমলটা যে গায়ে না উঠছে তা নয়, পায়ে হরিণ চামড়ার চটি, বোতামের গর্তে একটা দুটো গোলাপ ফুলও মাঝে মাঝে গোঁজা হয় এবং মাথায় একটু আধটু গন্ধ তেল। কিন্তু ঐ। এর বেশি না। পকেটে পার্সে আর ক'টাকা নিয়ে চলাফেরা করতেন সাব-ডিপুটির ছেলে। এই বিত্ত নিয়ে ওখান-কার মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা! আমার তো মনে হয় কারো চুলের ডগাটি ও ছুঁতে পারেনি ওপাড়ায়।

তার শোধ তুলল সে রমার ওপর।

হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। আত্মীয়াও বটে মেয়ে তো বটেই। আঠারো বছর বয়সে সবে পা দিয়েছিল রমা। আর, বেনু ওকে পেলে কোথায়,—রাস্তায় ঘাটে না, বাড়িতে, ঘরে, একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে।

'বৌদি' বৌদি'।

মানে উপোসী বাঘ হরিণের সাক্ষাৎ পেল। কি, আমি খুব বেশি দোষ দিই না রমার। কি আর তেমন বুদ্ধিসুদ্ধি হবে ওই বয়সে, পাড়া গাঁয়ে থেকে লেখা-পড়া শিখে চোখমুখ ফুটবে তারও খুব একটা সুযোগ পায়নি। আদুরে বাপের মেয়ে মাঘমণ্ডল ব্রত করে আর দেয়ালির রাতে হাজার বাতি ও রংমশাল জ্বালিয়ে বড় হতে না হতে টুপ্ করে একদিন বিয়ে হয়ে গেল।

তা ছাড়াও একটা শয়তান যদি একটি মেয়ের মুখের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্বাস ফেলতে থাকে—

একডালিয়া রোডের বাড়ির শোবার ঘরে বাথরুমে, বাগানে, ছাদে আধখানা মাথা নষ্ট হয়েছিল রমার। বাকি আধখানা হল বাইরে, রেস্টুরেন্টে, হোটেলে এবং আর কোথায় কোথায় বেনু ওকে নিয়ে গিয়ে-ছিল জানি না। এদিকে আমাকে থাকতে হচ্ছিল বাইরে বাইরে গাড়ি নিয়ে রোজ-গারের ধান্দায়। টের পাইনি। কিন্তু যখন টের পেলাম তখন সব শেষ হয়ে গেছে। না, একটা সান্ত্বনা থাকত যদি বেনু ওকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোথাও ঘর-সংসার পাততো,—কিন্তু তা সে করেনি, করার ইচ্ছাও ছিল না। হয়তো এসব রেওয়াজ এই শহরে আজকাল উঠে গেছে। এক-ডালিয়া রোডের বাসায় যাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। দরকার ছিল না। রমাও সেখানে ছিল না জানতাম। নারকেলডাঙ্গার কাছাকাছি একটা টিনের শেড ভাড়া করে আমি আমার ট্যাক্সী নিয়ে থাকি। তখনই একদিন খবর পেয়েছিলাম রমা নাকি ধরমতলার কোন্ একটা বার-এ মদ খেয়ে এক রাত্রে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। বেনু রায়? না সঙ্গিনী নিয়ে শুঁড়িখানায় বসে ফুর্তি করার পয়সা তার ছিল না। হাত বদল হয়ে হয়েই রমা সেদিন কার কাছে গিয়ে পড়েছিল। তার পর বেশ কিছুদিন আর আমার স্ত্রী সম্পর্কে কেউ কোনো সংবাদ দেয়নি।

তারপর বছর তিন বাদে সংবাদ পেলাম দেরাদুন না কোথাকার হাসপাতালে আড়াই মাস একটা পচা ঘা নিয়ে শুয়ে থেকে তারপর রমা শেষ নিশ্বাস ফেলেছে।

শুনে আমিও শান্তির নিশ্বাস ফেললাম।

তারপর, তারপর আমি নারকেলডাঙ্গা থেকে উঠে এসে সার্কুলার রোড •

শেয়ালদার কাছাকাছি একটা জায়গায় একটা টালির শেড ভাড়া করে গাড়ি নিয়ে আছি, হ্যাঁ তেমনি ট্যাক্সিড্রাইভার। তবে রোজগার এখন বেড়েছে। বেড়েছে মানে বেশ বেড়েছে।

না, পূর্ব পরিচয় দিলাম এই জন্যে যে আমার ওপর দিয়ে, হ্যাঁ, ভাগ্যের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে।

আপনারা শুনলে হাসবেন।

হাসবেন এবং দুঃখও করবেন।

এবং এটা খুবই সত্য যে লোকে বলে যে, ঈশ্বর একদিকে কেড়ে নিলে আর একদিক দিয়ে দেয়।

স্ত্রী, জমিদারী গেছে। দেশ গেছে। কিন্তু, যেমন দিনকাল। খুব একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে যে আজ এই শহরে আমাকে থাকতে না হত তার বিশ্বাস ছিল কি। হ্যাঁ, আমি টাকাপয়সার কথাই বলছি। দিব্যি আছি। সুখই বলা যায়। আমি, দেখুন ইচ্ছা করলে, রোজ এক বোতল বিয়ার খেতে পারি। দুপুরবেলা আস্তানায় ফিরে গিয়ে সস্প্যানে করে আলুসিদ্ধ ভাত রান্না করে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শেয়ালদা কি ধরমতলার কোনো হোটেলে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা খরচ করে এখন মাংস ভাত চালাই। তবে একটু রয়েসয়ে খাওয়াদাওয়া করি আর মদটদও পারত পক্ষে অভ্যাসে আনতে চাই না। আমার পেটের ধাত ছোটবেলা থেকেই একটু খারাপ। লিভারের জোর কম।

তার সুবিধা হল এই যে, অপব্যয় না করার ফলে দুচার হাজার টাকা আমি যখন-তখন বার করে দিতে পারি। একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছি ব্যাঙ্কে। খাই খরচা বাদ দিয়ে যে টাকাটা বাঁচে ওখানেই ফেলে রাখি।

এতক্ষণ পর নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পারছেন আমি অত লোলুপ দৃষ্টিতে কেন বার বার মেয়েটিকে দেখছি। খাওয়া দেখছিলাম।

হ্যাঁ, কখন খাওয়া শেষ হবে আর বেরিয়ে এসে আমার গাড়িতে উঠবে। আরো ক'টা টাকা পাব। ড্রাইভাররা, বিশেষ যারা ট্যাক্সী চালায়, তাদের চিন্তাটা সাধারণত এখাতেই বয়। অন্তত প্রথম বইতে শুরু করে।—আর তা ছাড়াও আমি গোপন করব না, মেয়েটিকে যখন দেখছিলাম তখন তার হাত পা পিঠ কাঁধ চুল গায়ের রং এমন কি কোমরে কতটা মাংস নেই আর বুকে কতটা মাংস বেশি আছে দুচোখ দিয়ে জরীপ করলাম, দূর থেকে যতটা সম্ভব।

হাওয়ার দাপটে যখন খোঁপা থেকে আঁচলটা পিঠে নামল ও পরে পিঠ থেকে সরে গিয়ে আর একটা কাঁধের কাছে উড়ু উড়ু করে তখন আমি তার এ-কাঁধটা দেখতে পাই, বুকের এপাশের সুগোল মসৃণতা। তারপরেই অবশ্য ধারে সুস্থে একটা কাট্‌লেটের অর্ডার দিই। না হলে আর এই গরমে আমার কাট্‌লেট খাওয়ার ইচ্ছা—

কেননা এ-কাঁধের কাপড় সামলাতে এদিকে ও ঘাড় ফেরাতে আমার চোখের সঙ্গে ওর চোখ বেঁধে গেল। ঐ এক সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই বুঝে নিতে পারলাম গাড়ির দরকার হবে।

কাট্‌লেট শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরাই।

ব্যক্তিগতভাবে আমার যে খুব একটা লোভ হচ্ছিল বৌটিকে দেখে তা না।

তাছাড়া, নিজের স্ত্রী, রমার কাছে কামড় খাওয়ার পর স্ত্রীলোকদের আমি একটু এড়িয়েই চলি। বেশ আছি একলা আমার টিনের শেড্-এ। খাই-দাই স্ফূর্তি করি। তা না, জমিদারের ছেলে, দেশের অনেক বড়লোক বন্ধু পেয়ে গেছি এখন এই শহরে। হয়তো অনেকে আগে বড়লোক ছিল না, এখন হয়েছে, নিজেদের চেষ্টা বুদ্ধি ও ভাগ্যের জোরে। ব্যবসাকেন্দ্রে আমার আনাগোনা একটু বেশি। তাঁদের আমাকে একটু সহানুভূতি করাও বটে। তাঁরা ডাকছেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা ডাকছেন, আত্মীয় এবং বন্ধুরা দরকার হলেই আমার গাড়ি ভাড়া করেন। বালিগঞ্জ থেকে ভবানিপুর, ভবানিপুর থেকে গড়পাড়, গড়পাড় থেকে নতুন বাবুপাড়া লিন্‌টন স্ট্রীট, সেখান থেকে সোজা পার্ক স্ট্রীট এবং সেখান থেকে বেরিয়ে ড্যালোসী, কি চৌরঙ্গি কি ধরমতলা। পুরুষ,—আমি আপনাদের কাছে যখন কিছুই গোপন করব না তখন বলে রাখি পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই আমাকে বেশি ডাকে। তাই বলছিলাম, ভগবান আমার এক দিক নিয়েছেন আর এক দিক পূরণ করেছেন। এক এক সময় ভাবি, এক কালে জমিদার ছিলাম, আমার চেহারায়, চলায় বলায় তার পরিচয় এখনো একটু আধটু লেগে আছে বলে কি তারা আমার ট্যাক্সিতে চাপতে পছন্দ করেন! আমিও আমার চেহারা এবং পোশাক যতটা সম্ভব সুন্দর সুদৃশ্য রাখতে চেষ্টা করি এবং ফি মাসে গাড়িটার রং ফিরিয়ে ওটাকে তকতকে ঝকঝকে রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করি না। কেন তা করব না বলুন, আর দশটা ট্যাক্সিও যদি পর পর দাঁড়িয়ে থাকে, বালিগঞ্জের সেই সুন্দরী মেয়েটি, কি যেন নাম, উমা সেন হাত তুলে ঠিক আমাকে ডাকবে। লিনটন স্ট্রীটের সেই রূপসী বৌ, রুবি রায়, যদি কষ্ট করে একটু হেঁটে এসেও আমার গাড়ি ধরতে হয় তো তা করতে সে ভ্রূক্ষেপ করে না। রাস্তার আর পাঁচটা ট্যাক্সিওয়ালা বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে শুধু দেখে। গড়পাড়ের অসীমা চ্যাটার্জি, পদ্মপুকুরের তৃপ্ত চৌধুরী, মোহনবাগান স্ট্রীটের মালা রায়, পার্ক সার্কাসের চামেলী, শোভাবাজারের সীমন্তা এবং আরো একশ'টা মেয়ের বাড়ির নম্বর আমার মুখস্ত। বাড়ির নম্বর এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে (যদি কেউ অফিসে কাজ করে তো সেই অফিস এবং সেখান থেকে বেরিয়ে যেখানে যায়) যেখানে যাবে সেই ঠিকানা আমি জানি। মাফ্ করবেন, আপনি যদি স্ত্রী পুত্র কন্যার হাত ধরে লটবহর নিয়ে হঠাৎ শেয়ালদায় ট্রেন ধরতে কি কাঁকুড়গাছি কোনো আত্মীয়ের বাড়ি পৌঁছে দিতে আমায় ডাকেন আমি দু'হাত তুলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব। সময় নেই। আজ শনিবারের দুপুর, সোওয়া বারোটা বাজে, ঠিক একটায় ব্যাংকশাল স্ট্রীটের লাল অফিস-বাড়িটার সামনে আমাকে ট্যাক্সি

নিয়ে হাজির থাকতে হবে। সেই অফিসের রেখা সোমকে আমায় শেয়ালদার একটা হোটেলে পেঁৗছে দিতে হবে। আজ রোববার, উঃ তিনটে বেজে গেছে, এখনি আমাকে গাড়ি নিয়ে ছুটে যেতে হবে সাদার্ন এভিনু্য। ঝাউ গাছের আড়াল করা সেই আকাশী রঙের বাড়ির সপ্তমী বোসকে পেঁৗছে দিতে হবে সৈয়দ আমীর আলী এভিনু্যর একটা সুন্দর ফ্ল্যাট বাড়িতে। সোমবারের সকাল, সময় নেই, মধু বোস লেনের মায়া গাঙ্গুলি আমার ট্যাক্সিতে চেপে টালিগঞ্জে একটা বাড়িতে যাচ্ছে। সেখান থেকে আবার সন্ধ্যা সাতটায় সেই মায়াকে নিয়ে ধর্মতলায় যেতে হবে।

হ্যাঁ, সব ঠিক করা আছে। সময়, স্থান, লোক ও পথের দূরত্ব। ঘড়ির কাঁটা ধরে ধরে আমার সেসব জায়গায় উপস্থিত থাকতে হয়।

তাই বলছিলাম, হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যাবেন মনে মনে ঠিক করে যদি হঠাৎ আপনার বুড়ি দিদিমা একদিন হাওড়ার মেল ধরতে চাকর পাঠিয়ে আমার ট্যাক্সী ভাড়া করতে চান তো তিনি নিরাশ হবেন।

অবশ্য মিষ্টি বাক্য বলেই আমি আপনাদের চাকরকে ফিরিয়ে দেব আর আপনার দিদিমার জন্য মনে মনে কষ্টও করব, কিন্তু আপনারা শুনে হাসবেন আজ অবধি কোনো বর্ষীয়সীই আমার গাড়িতে চাপল না। তখন, তখন হয়তো, আমি আমার শাদা কালো হাম্বার নিয়ে লিনটন স্ট্রীটে যেতে তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খেয়ে তৈরী হতে আপনাদের পাড়ার রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়িটা থামিয়েছি। আর আপনার চাকরটাকে ফিরিয়ে দিয়ে দোকানে বসে চায়ের বাটি সামনে নিয়ে আমি একটি তরুণীকে দেখছি। বনানীকে। তার ফর্সা সুগঠিত দুটি বাহু, শক্ত মজবুত খোঁপা এবং ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ন উদ্ধত নাক। ট্যাক্সি নিয়ে যেতে দেরি হলে সেই নাকের ঘায়ে ও আমাকে কচুকাটা করে দিতে চাইবে। ছবিটা ভাবছিলাম। গোলাপী রং করা গোল প্যাটার্নের বাড়ির অসামান্যা সুন্দরী মেয়ে। কলেজে পড়ে। বনানী সেন।

এবং বনানীর মত সবাই দেখতে ভাল। হ্যাঁ, যারা আমার গাড়িতে চাপে। সব মেয়ে সব বৌ।

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে আমি যখন পাশে চুপ করে দাঁড়াই তখন তাদের চুল দেখি চোখের পালক দেখি ঘাড়ের বাঁক দেখি পিঠ দেখি কোমর। গাড়িতে উঠতে কি নামতে যদি কোনো মেয়ের শায়া শাড়ি একটু বেশি সরে বা উঠে যায় তো আমি পায়ের রং মাংসল ডিম এমন কি রোমকূপগুলি পর্যন্ত সতর্ক সূক্ষ্ম দৃষ্টি বুলিয়ে চট্ করে দেখে নিই। প্রশ্ন করবেন, কেন? অভ্যাস। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ওপর ওপর দেখা। নখ চুল আঙুল পালক মাংসে চামড়া ছাড়া আর কিছু দেখা আমার ইচ্ছাও নেই সময়ও হয় না।

মন?

তাই বলছিলাম, ওদের ওদিকটা আমি মাড়াই না। যদ্দুর সম্ভব চোখ বুজে থাকি, এড়িয়ে যাই। না হলে বনানী কেন আমার ট্যাক্সি যথাসময়ে ওর দরজায় হাজির না থাকলে রাগ করে, বালিগঞ্জের বৌটি মূর্চ্ছা যায়, টালিগঞ্জের মেয়েটি চোখে মুখে অন্ধকার দেখে, আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয় তার কিছু কিছুটা আমি জানি। কিন্তু জেনে করব কি। আমি যে আগেই আর একজনের কাছে ছোবল খেয়ে আছি।

চুপ থাকি। চোখ বুজে যাই। নিজের মিলিয়ে পয়সা আদায় ক'রে আর এক সেকেন্ড কোথাও দাঁড়াই না। আর এক পাড়ায় ক্ষেপ দিতে শহরের রৌদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বরং মনটন না দেখে আর দশজন ট্যাক্সিওয়ালার মত নিস্পৃহ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকাটাই নিরাপদ মনে করি। পৃথিবীতে বোধ করি একমাত্র ট্যাক্সিওয়ালারাই এত কাছে এসে এত নিরাসক্ত চোখে নারীর রূপ দেখে। তাই তাদের হা করে তাকিয়ে দেখাটাও বাড়ির 'জেনানারা' কোনোদিন আপত্তি করে না।

আমরা ট্যাক্সিওয়ালারাও সিগারেট মুখে গুঁজে সেই অগাধ রূপের ওঠা নামা দেখার নেশায় বুঁদ হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে যাই। এর বেশি কিছু আমাদের দরকার হয় না।

আর, তা ছাড়াও, আমি, ধরুন এখন যেমন, অভদ্রভাবে টেবিল থেকে চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বার বার খাবার প্লেট থেকে থুতনিটা তুলে বৌটির খাওয়া দেখছিলাম, এমন করার সুযোগ আপনারা সেখানে পেতেন না।

রেস্টুরেন্টওয়ালাই আপত্তি তুলে বলত, 'মশাই, বেরিয়ে যান। এটা ভদ্রলোকদের জায়গা। এমন ভাবে তাকানো—'

সেই স্বাধীনতা আমার ছিল।

সেই সুখ। আর, আপনাদের এখন বুঝতে নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে না, রোজ অন্তত দেড় ডজন মেয়ের রঙীন শাড়ি শায়া ব্লাউজ, অবিশ্বাস্য রকমের সব সুন্দর খোঁপা বেণী, চোখ, চোখের রং ও হাসি কান্না দেখে আমি নিজের স্ত্রী-বিচ্ছেদের দুঃখ একেবারে ভুলতে পেরে ট্যাক্সিওয়ালার জীবন কায়োমনে আঁকড়ে ধরে আছি। বেশ আছি।

হ্যাঁ, কি যেন বলতে যাচ্ছি,—খুঁটিয়ে বৌটিকে দেখছি। নিশ্চিন্ত মনে। তা ছাড়া এইমাত্র হঠাৎ একটা ভিড় হয়ে রেস্টুরেন্ট আবার পাতলা ফাঁকা হয়ে গেছে। কোলকাতা শহরের হোটেল রেস্টুরেন্টের দস্তুর যা। কোথা থেকে সব লোক ছুটে আসে আবার একসঙ্গে সব অদৃশ্য হয়ে যায়। একটিও থাকে না।

আমি দৃশ্যটা তাই উপভোগ করব ব'লে চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে বসি। খাওয়া দেখি। ছোট ছোট হা। শাদা মুখ শাদা ব্লাউস। শাদা পাড় ছাড়া কাপড়। একটা শ্বেতপাথরের পুতুলের মত লাগছিল। পুতুল খাচ্ছে।

তা ছাড়া ওর উল্টো দিকের দেয়ালের রংটা পাকা সবুজ। তার ওপর এই দিনের বেলায়ও মাথার ওপর বাতিশটা জ্বলছে। শরীরের একটা শাদা ছায়া পড়েছিল সামনে টেবিলের কাচে। শরীরটা

ছোট। নুয়ে খাওয়ার সময় ছায়াটা আরো ছোট হয়ে টেবিলে পোর্সেলিনের শাদা ডিশটার সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছিল এক এক বার।

এবার পায়ের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম শাড়ির আঁচলটা সরে গিয়ে শায়ার খানিকটা বেরিয়ে আছে। ঘোর লাল রং। এখন বুঝলাম হাতের মত পা দুটোও খুব ফর্সা। শায়ার লালচে আভা লেগে পায়ের মাংস বাদামি রং ধরে আছে। বয়সের রং না ওটা।

মানে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারলাম, হাত পা আঙুল গলা নাক ভুরু চুল চোখ সব নতুন। একেবারে টাট্‌কা, তাজা। যেন এইমাত্র বাক্স থেকে (বা ঘর থেকে যা-ই বলুন) বেরিয়ে রাস্তায় এসেছে। একলা রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছে।

এক গ্লাস জল দিতে ডাকলাম ছেলেটাকে।

জল খেয়ে মেরুদাঁড়া টান ক'রে সোজা হয়ে বসলাম।

মেয়েটিও সোজা হয়ে বসেছে। জল খাচ্ছে। ওপরের দিকে ওর থুতনি। আঁচলাটা আর খোঁপা বা ঘাড়ে লেগে নেই সরে গিয়ে বাঁ বগলের তলায় উড়ু উড়ু করছিল, ফলে সবটা পিঠ এখন দেখা যাচ্ছিল। আহা, কী পীঠ! যেন ঈশ্বর নিজের হাতে বাটালি চালিয়ে খোদাই করে সেই পিঠ তৈরী করেছে, তারপর ওতে রাঁদা চালিয়েছে।

মেয়েরা খুব পাতলা ব্লাউজ পরে। ব্লাউজের তলায় বডিজের ফিতে দুটো কড়া হয়ে চোখে পড়ে। যেন ওটা দেখানোর জন্যই ওপরের জামাটা। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখে খুশি হলাম। বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, টালা গড়পার এন্টালি পার্ক সার্কাস-এর এত মেয়েকে আমি রোজ বয়ে বেড়াই! এমন রেখে-ঢেকে জামা পরতে আর কাউকে দেখিনি। অথচ এতে যে তার পিঠের লাবণ্য মাংসের ছোট্ট নরম ঢেউ-গুলো বোঝা যাচ্ছিল না তা-ও না। শাদা স্ট্র্যাপ দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। এখন দেখলেই মনে হয় শরীরের কোথাও বুঝি অপারেশন হয়েছে। ওটা ব্যাণ্ডেজ। বাদুড়বাগানের শ্যামলী, সাদার্ন এভিন্যুর রেখা, লিনটন স্ট্রীটের বনানী, সুরাবর্দী এভিন্যুর শোভা সোম সব, সব এক। আমি, যদি কোন সময় কাপড় সত্বেও যায় ওদের পিঠের দিকে তাকাই না। চোখ ফিরিয়ে নিই। কিন্তু, গোপন করে লাভ নেই, আমার যেন ইচ্ছে হচ্ছিল এখন এখানে এই মেয়েটির পিঠটা একবার ছুঁয়ে দেখি।

অবশ্য আমাদের ট্যাক্সিওয়ালার জীবনে তার সুযোগ কম। পিঠ ধরব কি। জল করে ওদের সঙ্গে কথাই বলা যায় না। 'জোরুসে' 'জোরসে চালাও' 'আ গিরা' আর তারপর 'কত উঠল মিটারে?' ইত্যাদি একটা দুটো প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া ছাড়া জেনানাদের সঙ্গে ক'টা আর কথা হয়।

আর তারা এত ব্যস্ত থাকেন এক একজন।

আমরা ঠিকানায় পেঁছে দিয়েই খালাস। কেবল রাস্তার ক'মিনিটের সম্পর্ক।

কেবল সেদিন, আমার এখানে এই সাত বছরের জীবনে বকুলবাগান স্ট্রীটের একটি বৌয়ের হাত ধরেছিলাম। ভারি নরম হাত। বৌটি তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে ফুটবোর্ড থেকে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।

আর কোনদিন দেখিনি আমার ট্যাক্সিতে উঠতে। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি করেছিল।

এখন বৌটি স্বামীর বাড়ি থেকে ভর-দুপুরে পালিয়ে গিয়ে হাজরার মোড়ের একটা বাড়িতে একটি ছেলের সঙ্গে যে প্রেম করছিল আমি এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম।

হ্যাঁ, হর্ন শুনে যেভাবে ছেলেটিও একটা

ঘরের পর্দা ঠেলে ছুটে বেরিয়ে মেয়েটিকে ধরতে এসেছিল। পড়ে যেতো বলে তার আগেই আমি যদিও ওর হাতটা ধরে ফেলে নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিলাম।

না, বলছি এইজন্য যে, আমি সেখানে দাঁড়ানো সত্ত্বেও ছেলেটি বৌটির গলায় হাত রেখে যেসব কথা বলছিল।

কিন্তু তা শুনে তা বুঝে করব কি। আমি করবার কে। চোখ মুছে ফের মেয়েটি গাড়িতে উঠে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরিয়ে নিতে বলেছিল। ডবল ট্রিপ। দুটো বেশি পয়সা রোজগার হয়েছিল। ঐ পর্যন্ত।

আর দেখিনি ওকে।

অবশ্য এরকম ঘটনা আমি আঙুলের কড়ে গুণে আপনাদের শোনাতে চাই না। শোনাই না। আমরা সব দেখে বুঝে চুপ থেকে সিগারেট ধরিয়ে ফটক ছেড়ে চলে আসি। কথাটা উঠছে এইজন্যে যে, হাত ধরেছিলাম।

কিন্তু আমার হাত ধরায় কী এসে যায়। আমার দিকে আর ক'বার ও তাকিয়েছিল? যে হাত ধরেছিল ফেরার পথে তার মুখ ভেবেই সারা রাস্তা চোখে রুমাল চাপা দিয়ে বৌটি গাড়ির কোণায় মাথা রেখে নিঝুম পড়েছিল। কাজেই আমাদের ট্যাক্সি-ওয়ালাদের হৃদয় মন হাসি-কান্নার মধ্যে উঁকি না দিয়ে থাকাই লাভ।

কী, সেদিন, আমি যতক্ষণ না রিচি রোডের উমা চ্যাটার্জিকে তুলে চৌরঙ্গির হোটেলের একটা কামরায় পৌঁছে দিতে পারছিলাম ততক্ষণ, সারাটা বিকেল, উনিশ বছরের (কি কুড়ি একুশ বছর বয়স হবে বৌটির) একটি মেয়ের শরীরের তাপ, খাঁ খাঁ যৌবন, মাংসের মসৃণতার স্বাদ হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছি চিন্তায় বুঁদ হয়ে শিস দিয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়েছিলাম। মন খারাপ করব কেন।

হ্যাঁ, ট্যাক্সিওয়ালা, তার ওপর রমার সেই ঘটনায় হৃদয় নামক জিনিসটাকে গাড়ির চাকার তলায় থেঁতলে থেঁতলে এই শহরের পিচের রাস্তায় আমি যে সাত বছরে একেবারে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলাম তা সহজেই আপনারা অনুমান করতে পারছেন।

আর এক মেয়ে উমা।

কী চেহারা মশাই। আগুন।

এখনো কলেজে পড়ছে। এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চুরি করে রোজ হেঁটেলে সেই ভদ্রলোকের কাছে কেন যায় আমি কি জানি না, জানি, জেনে চুপ থাকি।

চুপ থাকার কারণ কাল আবার ট্যাক্সিটা যখন উমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ধীরে ধীরে চালিয়ে যাব ও হাত তুলে ডাকবে।

পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট সময় লাগিয়ে একটা নীল কি গোলাপী সিল্কে শরীর মুড়ে চোখে কাজলের পুরু প্রলেপ বুলিয়ে ও আমার ট্যাক্সিতে চাপবে। হু, সিনেমায় যাচ্ছে। আজ তিন মাস। সেই হোটেল। সেই সন্ধ্যার অন্ধকার কামরা। অথচ আর সব ঘর আলো।

ফুলের মত মেয়ে উমা।

কিন্তু হৃদয়বৃত্তি, ন্যায় অন্যায়ের চর্চায় মাথা ঘামালে আমার চলছিল কি। হোটেলে পৌঁছে দেওয়া মাত্র একটা দশটাকার নোট। মিটার খরচ পাঁচ আমার বখ্শিশ পাঁচ।

টাকাটা পকেটে পুরে লম্বা সেলাম জানিয়ে আর একবার উমার লম্বা ঘাড় মৌচাকের মত মস্ত খোঁপা ও সোনার বর্শার মত সুন্দর লম্বা হাত দুটো দেখে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছি। ওই দেখাটুকুনই আমার লাভ।

উপরি পাওনা।

এত কথা বলছি এই জন্যে যে, এখনো যে আমার ওই মেয়েটির পিঠ ছুঁয়ে দেখতে ভয়ানক ইচ্ছা হচ্ছিল সেটা নিতান্তই শাদা ইচ্ছা। হাই-এর সংগে ওঠে নামে। এই ইচ্ছাকে আমি কোনোদিনই কাজে পরিণত করব না; কোনো ট্যাক্সিওয়ালাই করে না। লোকের মার পুলিসের হ্যাংগামা মামলা মোকদ্দমা যা-হোক একটা কিছুর কথা ভেবে তারা ভীষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে সিগারেট টানে। সিগারেট টানে আর ঘড়ি দেখে। কখন সময় হবে। কখন সে এসে গাড়ি আলো ক'রে বসবে আর বলবে, 'চালাও।'

আমিও তার অপেক্ষা করছিলাম। খাওয়ার পর আরো একটা সিগারেট শেষ হয়েছে। পুরো পঁচিশ মিনিট এখানে খেয়ে বসে বিশ্রাম ক'রে কাটানো গেছে হিসাব করলাম।

'ওটা তোমার ট্যাক্সি?'

ঘাড় নাড়লাম।

আর অবাক হলাম বৌটিকে দেখে। হ্যাঁ, সুন্দর বলতে সুন্দর। সিঁদুরের রেখাটা অমন সরু করে না দিলে অত সরু চুলের সংগে মানাত না। আর এমন সুন্দর চোখ। লম্বা সরু পালক ঘেরা দুটো দীঘি। জল টলটল করছে, জীবন। ব্লাউজের হাতায় আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিতে বেরিয়ে আসা কচি সবুজ সোনালী আঙুর গুচ্ছ। শাড়ির পাড় আছে। সূক্ষ্ম জড়ির কাজ। দূরে থেকে বোঝা যায় না।

'বাঙ্গালী ট্যাক্সিওয়ালা আমার ভাল লাগে।' মেয়েটি বলল।

আমি চুপ করে হাসি।

লম্বা স্বর্ণচাঁপার মত দুটো আঙুল গলিয়ে বৌ বিলের টাকাটা কাউণ্টারের ওধারে পাঠায় আর এক হাত দিয়ে মনি-ব্যাগটা বুকের মধ্যে ব্লাউজের ভিতর রাখে। আমি ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিই। কেননা সেখানে দাঁড়িয়ে হা ক'রে চেয়ে থাকা অসভ্যতা।

'ভারি সুন্দর গাড়ি তো!'

গাড়িতে ওঠার সংগে সংগে মেয়েটি বলল। মনে মনে বললাম, তোমার মত সুন্দরী মেয়েরাই তো আমার গাড়ির সওয়ার। ওরা রোজ বেরোয়, বেড়ায়। তুমি, তোমায় তো আর কোনোদিন দেখিনি!

'এই ট্যাক্সিওয়ালা!'

ঘাড়টা ফেরাই।

'কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেস করছো না তো?'

আহা, কী দাঁত।

আমার তো মনে হয় ঐ দাঁত দিয়ে যদি সে কামড়াতে চায় তো রাস্তার সব পুরুষ দাঁড়িয়ে পড়বে, হাত বাড়িয়ে দেবে, গলা কি আঙুল। কেটে আলগা করে দিক।

আমি দেখছিলাম ওর গাল।

হ্যারিসন রোডের দিক থেকে রোদের লম্বা রেখা ওর গালে গলায় পড়ছিল। ওর পাতলা চামড়ার তলার রঙের লাল আভা দেখছিলাম। গলা বাড়িয়ে দিয়ে সে সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখছিল তখন। সামনে রেড সিগন্যাল। এগোবার উপায় নেই। তাই দুজনের কথা বলার সুযোগ হ'ল।

'লোয়ার সার্কুলার রোড বললেন না? ওই তো দক্ষিণ দিক।'

'হ্যাঁ, তারপর বাঁয়ে। মিডল রোড।'

'ও দশ মিনিটে নিয়ে যাব।'

'আবার সেখান থেকে আমাকে এই গাড়িতে ফিরতে হবে। চারটের মধ্যে মাণিকতলায় ফেরা চাই। হরিতকী বাগান লেন।'

'তা হবে খুব হবে, বিশ মিনিট লাগবে বড় জোড় নর্থে ফিরতে।'

ঘাড়টা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে আবার সুন্দর চোখজোড়া দেখলাম। দেখলাম, আর দরকার হলে কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা যে কত ভদ্র মার্জিত গলায় জেনানাদের সংগে কথা বলে প্রমাণ করতে আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'শেয়ালদার রিফুইজি হোটেলটায় খেতে ব'সে আপনি হঠাৎ যেভাবে গলা বাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকালেন তখনই বুঝে গেলাম আপনি গাড়ি খুঁজছেন। ট্যাক্সী চাই।'

একটু হাসলাম।

ওর একটু নিশ্বাস এসে আমার গলায় ও ঘাড়ে লাগল। ভাল লাগল। অবশ্য এগুলো আমাদের উপরি-পাওনা। গাড়ি একটু সামনের দিকে ঝাঁকুলেই মেয়েদের গায়ের গন্ধ এসে আমাদের গায়ে পিঠে লাগে। রাস্তা পরিষ্কার দেখে চট্ করে আমি তখন স্টার্ট নিয়েছি।

'চারটের মধ্যে ফিরতে পারলেই হ'ল। ওখানে আমার বেশি দেরি হবে না। যাচ্ছি তো একটা কথা বলতে।'

'কার সংগে?'

'মার সংগে।'

'ওখানে বুঝি আপনার মা থাকেন? মিডল রোড কত নম্বর?'

পাঁচএর পি কি সি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তা না পারলেও কার কাছে যাচ্ছে একবার একটা প্রশ্নের ঢিল মেরেই যে জেনে নিতে পারলাম জেনে সুখী হলাম। আমরা ট্যাক্সিওয়ালারা কার সংগে দেখা করতে যাচ্ছে

আগেই জেনে গেলে একটু বেশি খুশি মেজাজে গাড়ি চালাই তো।

'আর ওখানে বুঝি আপনার শ্বশুরবাড়ি মানে স্বামীর ঘর, হরিতকীবাগান লেন?

কথা না কয়ে থুতনি নেড়ে বৌ হাসল। রামধনুর মত বাঁকা ভুরু টান করে ফিসফিসে গলায় বলল, 'ওটা আমার স্বামীর ঠিকানা। তোমরা ট্যাক্সিওয়ালারা চট্ করে বুঝে ফেল।'

'তা কেন পারব না, আমরা কি এ-লাইনে নতুন নাকি। আপনাদের কে কোথায় থাকেন আসা-যাওয়া দিয়ে আমাদের বুঝতে হয়। অনেক সময় ঠিকানা ভুলে যাবার পরও আন্দাজের ওপর আমরা গাড়ি চালাই।'

হ্যাঁ, শেয়ালদা থেকেই ট্যাক্সি ধরব ঠিক করে ছিলাম। ভীষণ খিদে পেল ট্রেন থেকে নেমে। দুটো খেয়ে নিলাম। সারাদিন খাওয়া হয়নি। ইস্ কী রান্না।'

'বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল বুঝি?'

'হু, কাঁচড়াপাড়া। আমার ছোট ভাই আছে ওখানে। টি. বি।'

'আজকাল টি বি'র জালায় প্রাণ ঝালা-পালা। চারদিকে কেবল ওই।'

উত্তরে কি বলল ও বোঝা গেল না। কেননা একটু ফাঁকা পেয়ে গাড়ি জোরে চালিয়েছিলাম। তা ছাড়া এলোমেলো হাওয়া ছিল।

আর একটু পর। একটা বাঁক ঘুরেতে সামনে প্রকাণ্ড ভেড়ার পাল পড়ে গেল। রং করা ওদের গায়ের পশম। হাতে সময় আছে, তাড়াতাড়ি ছুটব বলে পথ পেতে খামকা কতগুলো হর্ন দিয়ে স্লটার হাউসের যাত্রীদের ব্যতিব্যস্ত করতে বাধল। বরং যতটা পারা যায় আস্তে, বেশ আস্তে গাড়ি চালিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাই।

'তোমার কি সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি ট্যাক্সিওয়ালা। তা হলে গাড়ি থামিয়ে এইবেলা সিগারেট ধরিয়ে নিতে পার।' বৌ তার হাতের ঘড়ি দেখল। 'হাতে সময় আছে।'

দাঁড়িয়ে পড়ি। স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। রাস্তায় চলতে এ ধরনের সহানুভূতিগুলি আমরা খুব পছন্দ করি।

সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আজ রাতটা তা হলে মার কাছেই থাকবেন। ও-বাড়ি?'

'ও মা, কি বলছি, তোমায় ট্যাক্সিওয়ালা? এই গাড়িতেই যে আমাকে মাণিকতলা ফিরে যেতে হবে। চারটের সময় আমাকে হরিতকী-বাগান লেনে নামিয়ে দিতেই হবে।'

কথাটা মনে ছিল না তাই লজ্জায় হাসলাম। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'আমার স্বামী খুব কড়া লোক। কোথাও একলা বেরোতে দেয় না। আজ ও একটু অফিসের কাজে বাইরে গেছে। বিকেলে ফেরার কথা। এই ফাঁকে ওদের দেখে নিচ্ছি। একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'অ বাবা, আপনি তা হলে ভীষণ লোকের পাল্লায় পড়েছেন। সারাক্ষণ বাড়িতে?'

'সারাক্ষণ।'

চোখ জোড়া ভীষণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল মেয়েটির।

'আমি যে কী সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছি তা যদি তোমরা বাইরের লোক একটু জানতে ট্যাক্সিওয়ালা, আমি কী ভীষণ লোকের ঘর করছি।'

নতুন করে স্টার্ট দেওয়াতে আমার গাড়ির ইঞ্জিন ধক্‌ধক্ করছিল। আমিও সেরকম একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম ভিতরে।

এই গাড়িতে চড়ে আমার এই ট্যাক্সির হাওয়া লাগিয়ে লাগিয়ে শহরের কত অসংখ্য মেয়ে আমোদফূর্তি লুটছে তা যদি তুমি জানতে বৌ, রোজ,—অবশ্য তারা তোমার চেয়ে অনেক বেশি চালাক ঢের বুদ্ধিমতী। কথাটা বললাম না

কেননা আমাদের ট্যাক্সিওয়ালাদের এসব ব্যাপারে নাক ঢোকাতে নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে সেই নরম বুক কতটা ওঠে নামে আড়চোখে সেটুকুন দেখে নিয়ে আমি নিজের কাজে মন দিই, জোরে দুই হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরি। ভেড়ার দল সরে গেছে। ফাঁকা রাস্তা।

'আপনি যখন জানা হয়ে রইলেন তখন মাঝে মধ্যে দুপুরে আধ ঘণ্টা আমায় ট্যাক্সিতে করে বেড়াতে বেরোতে পারেন। আপনার স্বামী অফিসে বসে মোটেই টের পাবেন না। কোন্ ফাঁকে কখন আপনাকে তুলে ঘুরিয়ে আবার কুলে জল আসবার আগে হরিতকীবাগান লেনে রেখে এসেছি। মিডল রোড যান ইচ্ছা পার্ক সার্কাস যান, সময় মত নিয়ে যাব, আবার ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বাড়ি ফিরিয়ে আনব।'

'আচ্ছা দেখা যাবে, সে দেখা যাবে।' বৌ বলল আর আমি আড়চোখে ওর লম্বা শ্বাসের সঙ্গে বুকটা কতটা কাঁপে তা চুরি করে লক্ষ্য করি।

কেননা কাল হয়তো ওকে আর দেখতেই পাব না, কোনোদিনই না।

'এবাড়ি?'

'না, আর একটু চলো।'

আমি বললাম, 'যদি মন খুব খারাপ লাগে তো আজ রাতটা মার বাড়ি থেকে যান। একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেই হল। মার অসুখ।'

'তোমরা যত সহজ মনে করো ট্যাক্সি-ওয়ালা তত সহজ না। ঘরের বৌয়ের বাইরে মানে স্বামীর ঘর ছাড়া আর কোথাও রাত কাটাতে হলে অনেক তথ্য প্রমাণ হাতে নিয়ে নামতে হয়। যে-লোক সাত জন্মে শ্বশুর-বাড়ি যায় না, সে ছুটে তক্ষুণি এসে দেখে যাবে কতটা অসুখ, কী রকম অসুখ শাশুড়ীর।'

'বুঝতে পেরেছি', আমি অল্প হেসে মাথা নেড়ে বললাম, 'আপনার শরীরটা আপনার স্বামীর কাছে একটা মদ বিশেষ, দামী নেশার মত। কিছুতেই আপনি না থাকলে ভাল লাগে না।'

অল্প হেসে বললাম আর দু'বার ঘন ঘন, ও দেখে ঠিক সে ভাবেই ওর গলার নরম পেশীর ওঠানামা দেখলাম।

সত্যি দামী শরীর বলে আমার এতটা লোভ হচ্ছিল মেয়েটির ওপর, কিন্তু কি করি উপায় কি, কতটা আর করতে পারে একটি যুবতী মেয়েকে একলা গাড়িতে নিয়ে যখন শহরের ট্যাক্সিওয়ালারা চলে। একটা বাড়ির নম্বর দেখে সরে আর একটা মোচড় দিয়ে এগোই। 'এ বাড়ি?'

'বেঁধে।'

হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিতে ও নামল। 'তুমি দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি কথা সেরে আসছি।'

আমি গলা বাড়িয়ে আবার ওর পায়ের মাংসের গোছা দেখলাম। কেন জানি আমার তখন গরম ফাউলকারীর কথা মনে পড়ে গেল।

মুখটা ফেরানো ছিল। চিবুকের ধারটা দেখে আপেলের টুকরোর কথা মনে পড়ল। আর টুসটুসে আঙুল!

আহা, পৃথিবীর সেরা আঙুর ভেবে সারারাত চুষে ছিবড়ে বার করে ফেললেও রস যাবে না, ভাবলাম।

কিন্তু ভেবে কি আর আমি গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিলাম। শতকরা নিরানব্বই জন ট্যাক্সিওয়ালার মত ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে গাড়িটাকে ব্যাক করে একটু ঘুরিয়ে একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে রাখলাম উল্টা দিকে মুখ করে।

হ্যাঁ, ওর শরীরের ওপর বেশি লোভ করেছিলাম ব'লে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে এই দাঁড়াল। দেখুন কী সব ঘটনা ঘটে আমাদের জীবনে! আমি তো ভাবছিলাম মা'র সঙ্গেই দেখা ক'রে ও বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। চোখে জল। নীল রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে!

কিন্তু তা না। শাদা কাঠের গেট-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক চিৎকার করছিল। হ্যাট্ কোট্ পরা। সাহেব মানুষ। যেন এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরছে কি এখন বাইরে যাবে।

তা অত সব চিন্তা করার সময় ছিল না। আমি কথা শুনছিলাম দু'জনের।

ট্যাক্সিওয়ালাদের দাঁড় করিয়ে আপনারা যেমন কথাবার্তা বলেন।

'এবাড়িতে আর কোনদিন তোমাকে দেখলে আমি ঠিক গুলী করব, চিত্রা।'

'আমার গ্রাসাচ্ছাদনের যতদিন না সুব্যবস্থা হয় তদ্দিন আমাকে আসতে হবে।'

'না চরিত্রহীন স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রে দিতে আমি বাধ্য নই।'

'বেশ তা হ'লে আমি কোর্টে যাব।'

'হ্যা, তাই যাও। আমি তাই চাই। একটা প্রস্টিটিউট এসে মোকদ্দমা করে মহীতোষ রায়ের কাছ থেকে খোরপোষ আদায় করবে। বেশতো তাই একবার চেষ্টা কর।'

বলে মহীতোষ রায়, সেই হ্যাট কোট পরা ভদ্রলোক সযত্নে কাঠের গেট্‌টায় একটা তালা পরিয়ে দিয়ে গট্ গট্ ক'রে ভিতরে চলে গেলেন।

চিত্রা ঘুরে এসে আমার গাড়ির কাছে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিতে ভিতরে ঢুকল। 'চালাও।'

এ সময়টা আমরা বিশেষ কথাবার্তা বলি না। কিন্তু তবু স্টার্ট দেওয়ার পর আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি নীল রুমাল দিয়ে চোখটা এখনো টিপে আছে কি না।

'এই ট্যাক্সিওয়ালা!'

খানিকটা অগ্রসর হবার পর, ও আমায় আস্তে ডাকল। ঘাড় ঘুরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। রুমাল সরে গেছে। চোখের কোণা শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে।

'তুমি তো দাঁড়িয়েছিলে কাছে, কথা-গুলো শুনলে?'

কথা বললাম না। সামনে এবার একপাল মোষ। রাস্তাটা কালো হয়ে গেছে।

'ও আমাকে গুলী ক'রে মারবে।'

যেন কিছুই হয়নি, এসব কথার কোনো দাম নেই, এরকম একটা ভান সময় সময় আমাদের করতে হয়। গাড়িটা একেবারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে অল্প হাসলামঃ 'ও কিছু না। আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। দু'দিনেই মিটে যাবে।'

বললাম, বলতে হয় আমদের এসব।

কিন্তু দেখলাম সেকথায় বৌটির কান নেই। এক দৃষ্টে রাস্তার ধারের একটা বাদাম গাছের গুঁড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে কি ভাবছে। জায়গাটাও নির্জন। মোষেরা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

'না মিটবে না, এ ঝগড়া মিটবার নয় তা সে-ও জানে আমিও জানি।' তেমনি বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্পষ্ট ধরা গলায় ও যেন নিজের মনে কথাগুলো বলল, তারপর হঠাৎ এক সময় মুখটা ফিরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকাল।

'ট্যাক্সিওয়ালা!'

'কি, বলুন।'

'ও আমায় ঘৃণা করে। কিন্তু আমিও যে ওকে ঘৃণা করি তা কি সে বোঝে না?'

আমি হাসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না। মেয়েটির গলার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত শব্দ হ'তে শুনলাম যে চমকে উঠলাম।

'গুলী করবে, সামান্য ক'টা টাকা চাইতে গেছি ব'লে তোমার সামনে, একজন ট্যাক্সিওয়ালার সামনে আমাকে অপমান করল, উঃ, কিন্তু, কিন্তু,—সে কি মনে করে—'

আমি হতভম্ব হয়ে ওর কাণ্ড দেখলাম।

'কোথায় গুলী করবে, এখানে, এই বুকে, এই বুকের মাংস ঝাঁজরা ক'রে দেবে মহীতোষ!' উপেক্ষার হাসি হেসে দ্রুত ব্যস্ত আঙুলে ব্লাউজের সব ক'টা হুক ও খুলে ফেলল: 'হ্যাঁ, তোমায় দেখাচ্ছি, তোমার সামনে অপমান করল কি না, তুমি দেখে রাখো, আমার এই বুক লক্ষ টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা রাখে কি না,—সামান্য ক'টা টাকা, সামান্য ক'টা—উঃ, এত অপমান!'

এ-ধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে আমার হয়নি। কিন্তু তা না হলেও বিমূঢ় বা বিব্রত হওয়ার পরিবর্তে শরীরটাকে শক্ত কঠিন ক'রে আমি ইঞ্জিনের দিকে ঘুরে বসার উপক্রম করতে ও আমার হাত চেপে ধরল। এবার বিব্রত হয়ে পড়লাম। ব্লাউজের মুখটা হা ক'রে আছে। নিশ্বাসের সঙ্গে দুটো পেশী শক্ত হয়ে উঠে আবার জেলীর মত নরম হয়ে যাচ্ছে।

এতৎসত্ত্বেও হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু ততক্ষণে ও আমার হাতের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। গরম জল টের পেলাম। কান্নার ঠমকে সেই সুন্দর র‍্যাঁদা করা পিঠ অনেকবার উঠল নামল।

কিন্তু তা দেখবার সময় বা ইচ্ছা কোনোটাই আমার ছিল না। তিক্ত গলায় বললাম, 'তা অত ঘৃণা যখন ওখানে গিয়েই বা কাজ ছিল কি—' বলছিলাম, কিন্তু এমন অস্পষ্টভাবে কথাটা মুখ থেকে বেরোল যে ও শুনল বলে মনে হ'ল না।

হেঁচ্‌কা টান মেরে হাতটা এবার ছাড়িয়ে নিয়ে মোটা গলায় বললাম, 'ভাল কথা, এখন আপনি কোথায় যাচ্ছেন কিছু বলছেন না তো, সেই হরিতকী বাগান লেনের ঠিকানায় কি ট্যাক্সী—'

আমার কথা শেষ হবার আগে ও চোখে নীল রুমাল গুঁজে মাথা নাড়ল। তারপর রুমাল সরিয়ে নিয়ে অল্প হেসে বলল, 'বেশ্যার আবার ঠিকানা কি, ট্যাক্সিওয়ালা।'

আপনারা ভাবছেন সেই মদির হাসি দেখে আমার বুকের ভিতরটা তির্‌ তির্‌ করে উঠবে, কিন্তু তা হয় না, তা আমরা হতে দিই না। তৎক্ষণাৎ ব্রেক্‌ কষে আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলাম। এবং মুখের ওপর সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, 'সঙ্গে পয়সাকড়ি কিছু আছে কি, ট্যাক্সীভাড়া দিতে পারবে?'

'না।'

'তবে এক্ষুনি নেমে পড়ো।' কর্কশ গলায় চিৎকার ক'রে উঠে আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে দিই। আর আমার মুখের দিকে তাকায়নি, ঘাড় নিচু ক'রে ও গাড়ি থেকে নেমে গেল। একবারও সেদিকে না তাকিয়ে আমি জোরে গাড়ি চালিয়ে সার্কুলার রোডে উঠে এলাম। তেল না, জল, তাই ট্রাউজারে হাতটা ঘষে তা মুছে ফেলতে অসুবিধা হ'ল না।
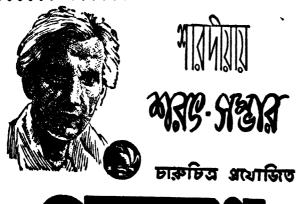
এক এক সময় আকাশের মূর্তিটা এমন হয়ে যায় যে, চোখ তুলে চাইতে ইচ্ছে করে না। কালি-ঝুলি মেঘে একশা!

তার ওপর যদি বৃষ্টি হয় টিপ টিপ করে সারাদিন তা হলে আর কথাই নেই! আকাশটাকে টেনে ছিঁড়ে নামিয়ে ফেললে রাগ যায় না!

সহযাত্রী বন্ধু কুমার বললে, অত চটলে কেন, অসময়ে বৃষ্টি ও আর কতক্ষণ!

যতক্ষণই হোক, জ্বালাতন! আকাশটার চেহারা দেখচো না? বৃষ্টির ছাট থেকে গা বাঁচাতে ট্রেনের কামরার জানালাটা তুলে দিয়ে বললুম।

কুমার বুঝি উপভোগ করে। জলের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে বললে, মন্দ কি, বেশ তো! বন্ধ করচো কেন?

কি করতে যে চোখের ডাক্তার হয়েছিল বুঝতে পারি না! নিজের চোখটাকে পর্যন্ত খেয়েচো! সব ভিজে গেল, এখন তোমার কথায় জানালা খুলে রাখি! অত যদি শখ গাড়ি থেকে নেমে ঐ মাঠে গিয়ে খানিকটা ভিজে এস? বাধ্য হয়ে বেঞ্চের এক ধারে সরে বসলুম। একরকম রাগ করে জানালাটা ফেলে দিলুম। আসুক ছাট!

কুমার নির্লজ্জের মত হাসতে লাগল। আচ্ছা পাগলকে ছোট লাইনে বেড়াতে নিয়ে এসেছি! কি কুক্ষণে ওকে পাড়াগাঁ সম্বন্ধে উৎসাহিত করেছিলুম! নাকে কানে খৎ, আর কখনো এইসব ভাব-বিলাসী শহুরে বন্ধুদের নিয়ে সোহাগ করি! উৎকট শখ!

একধার থেকে বৃষ্টির ছাট এসে কামরার অর্ধেকটা ভেসে গেল। ভিজে মোজা পরার মত অবস্থা। বিরক্ত হয়ে বললুম, কি হচ্ছে, বন্ধ করবে না, গাড়ি থেকে নেমে যাব?

কুমার তেমনি ছেলেমানুষের মত হাসতে লাগল।

চোরের ওপর রাগ করা বৃথা, উঠে জোর করে বৃষ্টির দিকে জানালাগুলো তুলে বন্ধ করে দিলুম। সব সময় ছেলেমানুষী ভাল লাগে না!

খানিকটা চুপচাপ আসার পর গাড়িটা এক জায়গায় এসে যেন অনেকক্ষণ থেমে রইল। বাইরে বৃষ্টিটা তেমনি অকৃপণ। আকাশ তেমনি কালি-মাখা!

সিগারেট ধরিয়ে কুমার বললে, যাই বল, মাঝে মাঝে এ একরকম অভিজ্ঞতা কিন্তু মন্দ নয়! ছোট রেলের ছোট্ট কামরায় সময়টা বেশ কেটে যাবে। অনেস্টলি বলচি আমার তো ভালই লাগছে।

মনে মনে বললুম, দেখা যাবে কতক্ষণ ভাল লাগে। একবার ট্রেনটা গন্তব্যে পৌঁছক, কাদা-হোড়ের মধ্যে দু'চারটে আছাড় হোক, তারপর—

মুখে বললুম, ভাল!

সত্যিকারের রাগটা আমার কার ওপর ভেবে পেলুম না। বন্ধু তো খুশী!

হঠাৎ আমাদের কামরায় ঘা পড়ল। মনে হলো, কে যেন বাইরে থেকে দরজাটা খোলবার জন্যে আনাড়ি হাতে টানাটানি করছে।

কুমার আমার দিকে চাইলে। মানে দরজাটা খুলে দেবে কিনা অনুমতি চাইছে। আমি কোন সাড়া করলুম না। আর কামরা নেই?

এদিকে বাইরে থেকে দরজা ধরে টানাটানি ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি এত বিরক্ত বুঝি জীবনে আর কখনো হইনি। সবাই মিলে আজ পিছনে লেগেছে!

বাধ্য হয়ে উঠে দরজাটা টেনে খুলে দিলুম। মুহূর্তে এক ঝলক বৃষ্টির সঙ্গে যে লোকটি ট্রেনের কামরায় উঠে এল সহযাত্রী হিসাবে নিশ্চয়ই সে আমার এতক্ষণ কাম্য ছিল না। বাইরে ঐ মেঘ-বৃষ্টির মত নিরানন্দ সে মূর্তিটি! এ লাইনের বিশেষ পরিচিত অন্ধ ভিখারী। আর এক আপদ!

উঠেছে, উঠেছে, তাও যদি বসে একধারে চুপ করে—তা নয় [illegible] তেলাপোকার মত কামরার মধ্যে ছটফট করছে! একবার এদিক একবার-ওদিক।

লাঠিটা বেতালা ঠুকছে।

ধমক দিয়ে বললুম, একধারে বস না চুপ করে! অমন ছটফট করচো কেন?

ততক্ষণে কুমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখলে না লোকটা অন্ধ!

তাতে কি? দিব্যি গাড়িতে উঠতে পারল আর বসতে পারবে না! তার মানে দেখাবো—

,কথাটা সম্পূর্ণ করতে দিলে না, কুমার লোকটিকে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি নাম তোমার?

লাঠিগাছটা কোলের মধ্যে রেখে অন্ধ ভাঙা গলায় বললে, নজর আলি! কৌতুক করে বললুম, বেশ নজর! ঘাড়ে পড়তে কেবল বাকি!

কুমার আমার কৌতুকে যোগ দিলে না। উৎসুক ভাবে অন্ধকে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাবে কর্তা?

অন্ধ জড়সড় ভাবে বললে, সুপ্পুর!

সেটা কোথায়? আলাপ করবার আর লোক পেলে না কুমার! আমি বললুম আমরা যেখানে নামবো, সেখান থেকে আর পাঁচ মাইল হেঁটে যেতে হয়।

এতদূর! যাবে কি করে? কুমার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

হাসিটা চাপতে পারলুম না, বললুম, যেমন করে এসেচে! কুমার বুঝি আমার কথায় কান দিলে না, সাগ্রহে অন্ধকে জিজ্ঞেস করলে, জল-কাদায় যেতে পারবে তুমি?

নজর আলী মাথা নাড়লে। মুখে অস্পষ্ট একরকম শব্দ করলে।

টিপ্পনী কেটে আমি বললুম, কি ভাব, ওরা কি তোমার আমার মত! ঠিক যাবে—

কুমার আশ্বস্ত হলো না, কেমন সন্দিগ্ধ ভাবে লোকটির দিকে ঠায় চেয়ে রইল।

আসতে-যেতে প্রায় দেখি বলে কোনদিন তেমন লক্ষ্য করে দেখিনি। ভিখারী তো ভিখারী! সামনা-সামনি আজ স্পষ্ট দেখলুম লোকটাকে:

মুখময় বসন্তের দাগ, দোলায় ছিপির

সৌন্দর্যে স্বকীয়তা
তনুশ্রীকে তরুণ কোমল ও প্রাণবন্ত রাখুন।
অঙ্গের স্বাভাবিক লাবণ্যসুষমাকে শ্রীমণ্ডিত করে
তুলুন। স্নিগ্ধস্পর্শী, শুভ্রকারী "'হেজলিন' স্নো"
রূপকে অপরূপ করে তোলে।
"'HAZELINE' SNOW"
(TRADE MARK)
"'হেজলিন' স্নো"
(ট্রেড মার্ক)
বারোজ ওয়েলকাম অ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড পোস্ট বক্স ২৯০, বোম্বাই
HAZELINE SNOW

নাকটা থেবড়া, ক্ষত-বিক্ষত, বেঁটে, কালো ড়ার মত চেহারা। মাথার বাবরি চুলে ন্টা নেকড়ার পট্টি বাঁধা। চোখ দুটো ভৎস, তারাগুলো কেমন কেমন!

অন্ধ না হলে নজর আলীকে ভয়ংকর ভাবা যায় হতো না। আর এ রকম দুর্যোগে ান মতেই ট্রেনের এই নির্জন কামরায় এক ঙ্গ ভ্রমণে আমি রাজী হতুম না।

চেয়ে চেয়ে কুমার জিজ্ঞেস করলে, চোখে খতে পাও না, এমন ভাবে চলা-ফেরা রতে তোমার অসুবিধে হয় না? যদি পড়ে-ড় যাও—

বৃথা দুর্ভাবনা! নজর আলী বললে, ভ্যেস হয়ে গেছেন বাবু!

কুমারের প্রশ্নে আমার হাসি পেল। বুঝতে ারলুম না, হঠাৎ এত মাথা ব্যথার কারণ ক?

খানিক চুপ করে থেকে কুমার জিজ্ঞেস করলে, একলা যাও আস, সঙ্গে কাউকে াও না কেন?

নজর আলী কোন উত্তর দিলে না সশব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

চকিতে মনে পড়ল কিছু দিন আগেও যেন নজর আলীর লাঠির প্রান্ত ধরে একটি কিশোরী মেয়েকে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছি, গাধা-বোটের মত। কাঠের পুতুলের মত মেয়েটা আগে-আগে এসে পথচারীর সামনে দাঁড়াত, আড়াআড়ি লাঠিটা ধরে নজর আলী পিছনে দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় ভিক্ষে করতো ঃ অন্ধকে এ্যাট্টা পয়সা দাও বাবা!

মাঝে মাঝে বড় ঘ্যান ঘ্যান করতো নজর আলী কানের পোকা বার করার মত। আবার অনেক সময় দৃষ্টিহীন চোখে পথের ধারে, রেল প্ল্যাটফরমে চুপটি করে দাঁড়িয়ে কি যেন লক্ষ্য করতো। কিশোরী মেয়েটা তখন লাঠি ছেড়ে একধারে বসে ভিক্ষালব্ধ আহার্যে মন দিত।

জিজ্ঞেস করলুম, তোমার সেই মেয়েটি কোথায়?

নজর আলী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, সে বাবু পাইলেচে!

কেন, তোমার মেয়ে নয়? সংবাদটা নতুন মনে হলো।

না বাবু! তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে নজর আলী বললে।

তা হলে কে? বরাবর তো তোমার সঙ্গেই ঘুরতে দেখেচি!

আমার মাসতাতো সম্মুন্দির বেটি! সম্বন্ধটা মনে মনে ঠিক করে নেয় নজর আলী।

তোমার ছেলে-পুলে নেই? হঠাৎ কুমার জিজ্ঞেস করলে।

নজর আলীর মুখটা কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠলো, বললে, সে শালার বেটারা নবাব-পুত্তুর! আমি মেঙে আনব আর ওনারা বসে বসে গিলবে! কামাটা মজজে টাার পাবে!

তোমার বিবি কিছু বলে না? কুমার জিজ্ঞেস করলে।

নজর আলী চুপ করে রইল। বিবি সম্বন্ধে অন্ধের বুঝি দুর্বলতা আছে। আমি চোখ টিপে হাসলুম।

কৌতুক করে কুমার বললে, বিবি তাহলে তোমায় দেখতে পারে না, কি বল!

হাতের মুঠোয় চোখ মুছে নজর আলী বললে, দেখা-দেখি কি বাবু! কানাকে কে আর দেখতে পারে? কথাটা সত্যি হলেও এ পরিবেশের সঙ্গে তেমন মর্মান্তিক বলে উপলব্ধি হয় না। আকাশ তেমনি ঘোলা, বৃষ্টি তেমনি অঝোর!

লোকে বলে অন্ধ-আতুরকে উপহাস করতে নেই। তবু উপহাস করে বললুম, এর ওপর বিবিও আছে! আমাদের চেয়েও কাজের লোক!

নজর আলী কাঁধফাটা ফতুয়ার পকেট হাতড়ে বুঝি একটা বিড়ি বার করলে। কুমার জিজ্ঞেস করলে, কি আগুন চাই?

এতক্ষণে অদ্ভুত এক ধরনের হাসি দেখা গেল নজর আলীর মুখে।

আমি হলে মুখটাই বেটার পুড়িয়ে দিতুম। কুমার সন্তর্পণে ওর বিড়ির মুখে আগুন দিয়ে দিলে। গা-টা আমার রিরি করে উঠলো। ভিখারীর আবার শখ দেখ না! আমার পয়সায় আমার মুখের ওপর নেশা করছে। স্পর্দ্ধা দেখ না!

মনে হলো, বেশ পরিতৃপ্তি সহকারে বিড়িটা টানছে নজর আলী। রাগে আমার গা জ্বালা করতে লাগল। বিড়ির আগুনে মুখটা যেন আরও বীভৎস দেখাল। বসন্তর দাগগুলো কি স্পষ্ট!

কুমার জিজ্ঞেস করলে, কদ্দিন বিয়ে করেচো?

খোশ মেজাজে নজর আলী বললে তা অনেকদিন বাবু!

বৌ দেখতে কেমন? সেই ছেলে-মানষী আবার কুমারের আরম্ভ হয়েছে। যার তার সঙ্গে যাতা আলাপ! কোথাকার একটা ভিখারী—

হঠাৎ নজর আলীর মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠলুম। বৌ-এর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কি যেন সংশয়ে পড়েছে মনের মধ্যে। কোমল-কঠিন-ভাব মিলে মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেছে।

আবার কুমার প্রশ্ন করলে, ছেলেপুলে ক'টি?

বিরক্ত হয়ে বললুম, তাতে তোমার কি! যত সব—

নজর আলী বললে, পাঁচ ছটা হবে শোরের পাল!

কুমার আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, ঠিক জান না, ক'টা? তোমার ছেলে-পুলে তো?

এতক্ষণ এইটেই আশঙ্কা করছিলুম,

নজর আলী রেগে আগুন হয়ে উঠলো, এই কি আপনাদের ভদ্দরলোকের মত কথা হলো! ছেলে তবে কার?

কুমারের মুখটা এতটুকু হয়ে গেল। ঠিক ঐ ভেবে সে প্রশ্নটা করেনি। একটা অন্ধ ভিখারীর পুত্রকন্যার সংখ্যা নিয়ে তার মাথা-ব্যথার কোন কারণ নেই। তবে কৌতূহলটা অশোভন, মুখের মত জবাবও পেয়েছে। ছিঃ ছিঃ!

শান্ত ক'রতে সহানুভূতির সুরে বললুম, বাবুর কথা বাদ দাও, তোমার চোখটা কি জন্ম থেকেই খারাপ আলি সাহেব?

আরো যেন ক্রুদ্ধ মনে হ'লো নজর আলীকে; চোখের কথায় মরা চোখ দুটো যেন ধক্ করে উঠলো।

চুপ করে ভাবছি, আচ্ছা ভিখারীর পাল্লায় পড়েছি, বেটা অকিঞ্চনের আবার আত্মসম্মান দেখ না! জানে না, এখনি ইচ্ছে ক'রলে ওকে ঘাড় ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে পারি। নেহাৎ—

নজর আলী বললে, চোখ আমার খুব ভাল ছিল বাবু, খুব সাফ্ সাফ্ দেখতে পেতুম—

চোখ নষ্ট হ'লো কি ক'রে? নির্লজ্জ কুমার আবার জিজ্ঞেস ক'রলে।

আড়মুড়ে নজর আলী বললে, দুঃখের কথা আর বলো কেন বাবু! বরাতে দুঃখু আছেন যাবে কোথায়! চক্ষু রত্ন মহারত্ন! শালার—

হঠাৎ কথাটা যেন মুখ থেকে ফস্‌কে গেছে, সারা দেহ নজর আলীর কেঁপে উঠলো, বেঞ্চি ছেড়ে লাঠিতে ভর দিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠলো।

কি ব্যাপার? উঠলে কেন?

নজর আলী বললে, এই ইস্টিশানেই নাববো বাবু!

অবাক হয়ে গেলুম নজর আলীর সময় জ্ঞান দেখে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ি কখন দিঘীরপাড় স্টেশন এসে গেছে! আমাদেরও এখানে নামতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমে চোখ তুলে চেয়ে দেখলুম, এখন আকাশের মুখ কিছুটা পরিষ্কার, কিন্তু পায়ের তলার মাটি ভয়ানক পিছল। তার ওপর সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শহুরে বন্ধুকে নিয়ে এতখানি পথ কি ক'রে যে পাড়ি দেব ভেবে পাই না। নিজের সম্বন্ধে কুমার আদৌ চিন্তিত নয়। তার যত ভাবনা এখন ঐ হতভাগা অন্ধ নজর আলীকে নিয়ে। আমাকে চার-পাঁচবার ওর কথা জিজ্ঞেস করেছে, লোকটা যাবে কি করে? ঐতো তোমাদের রাস্তা? অন্ধকার, কাদা—

লোক দিয়ে কুমারকে কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলুম। নজর আলীর জন্যে দুর্ভাবনার আমার অন্ত নেই!

তারপর বোধ হয় বছরখানেকই কেটে গেছে। স্ত্রীর চোখের জন্যে একদিন ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বন্ধুর চেম্বারে এসে হাজির হলুম। শুনেছিলুম, ইতিমধ্যে কুমার বিলাতী ডিগ্রী এবং দক্ষতার গুণে চোখের ডাক্তার হিসেবে বেশ পসার জমিয়েছে! চেম্বার ভর্তি লোক গম-গম করছে রাতদিন!

স্লিপ্ পেতেই বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ডেকে পাঠালে। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই অবাক হ'য়ে গেলুম, সামনে একটা চেয়ারে নজর আলী লাঠি আঁকড়ে স্থির হ'য়ে বসে আছে, কাঠের মূর্তি যেন।

আমি কিছু প্রশ্ন করবার আগেই কুমার বললে, ওর চোখটা আমি দেখছি। মনে হ'চ্ছে, ভাল করতে পারবো, ইট্ ইজ্ এ কেস অব্ পয়জনিং! যদি ভাল ক'রতে পারি—

নজর আলী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আল্লা আপনার ভাল করবে, খোদাতাল্লা আপনার বাড়বাড়ন্ত দেবে। চক্ষুটা আমার ভাল করে' দেন বাবু! চক্ষু বিহনে বড় কষ্ট!

বেটা ভিখারীর আব্‌দার দেখ না!

ঠিক এসে জুটেছে! মনে মনে আরো চটে গেলুম, নজর আলী আমাকে বাদ দিয়ে আমারই বন্ধুর করুণাপ্রার্থী হ'য়েছে।

কুমার সাহেব বললে, চেষ্টা তো করচি, দেখা যাক কদ্দুর কি হয়। তারপর আমাকে বললে, কি খবর, হঠাৎ কি মনে করে?

দোহাই, আর কিন্তু তোমাদের ওদিকে বেড়াতে যেতে পারবো না। মনে আছে?

মনে আর নেই, তার ফল তো ঐ মূর্তিমান! বন্ধুর কাছে যেন বিশেষ লজ্জায় পড়লুম।

তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিতে বল্লুম, আমার স্ত্রীর চোখটা—

কুমার ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো, তিনি এসেছেন নাকি!

না, মানে তোমার যদি সময় হয়, তা হ'লে একদিন আনবো মনে করচি—

কুমার তেমনি ব্যস্তবাগীশই আছে, বললে, এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয়, নিয়ে এস একদিন।

কৃতার্থ হ'য়ে বল্লুম, তোমার কবে সময় হবে?

হাতের মধ্যে একটা সিগারেট গুজে দিয়ে বললে, এনি ডে ইউ লাইক্।

সহজেই কার্যোদ্ধার হ'তে নজর আলীর প্রতি দৃষ্টি পড়লো। বল্লুম, কিরে নজর, কেমন আছিস?

গলার স্বরে এতক্ষণে নজর আলী আমার আগমনটা টের পেয়েছে। ডাক্তারবাবু আমার বন্ধু, কাজেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে সে বললে, খুব ভাল বাবু!... ডাক্তারবাবু আমার চোক ভাল করে দেবেন।

তোরই তো মজা দেখছি!

নজর আলী বুঝি নিজের মনে হাসতে লাগল। সত্যিকারের মজাটা তারই দেখতে গেলে—এত বড় চোখের ডাক্তার তার পরিচর্যা করছে বিনা পারিশ্রমিকে।

রহস্য করে বল্লুম, চোখ ভাল হ'লে ডাক্তারবাবুকে মুরগী টুরগী খাওয়াস্!

কুমার ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো, আরে না, না, ওসব মতলব করো না খবরদার!...বাবু তোমার দেশের লোক কিনা তাই ঠাট্টা করচেন!

নজর আলী বললে, না বাবু, ঠিক কথাই বলেচেন! আপনার মত গুণী লোকের মূল্য কি আমরা দিতে পারি! খাওয়াব।

নজর আলী কথাও শিখেছে মন যোগান!

স্ত্রীর চোখের জন্যে শেষ পর্যন্ত কুমার সাহেবের কাছে যাওয়াই হ'য়ে ওঠেনি। যে উপসর্গের কথা ভেবে চিন্তিত হ'য়েছিলুম সেটা কিছুই নয়—স্ত্রীর মাথাধরাটা তার চক্ষুপীড়ার কারণ নয়। কয়েকদিন কোন একটা হাতুড়ে চিকিৎসালয়ে যাতায়াত করতেই ভাল হ'য়ে গেল। তাছাড়া, সামান্য কারণে বন্ধুর অনুগ্রহ নিই বা কেন। মর্যাদা নাশের আশঙ্কায় স্ত্রীরই বিশেষ আপত্তি। বন্ধুরে বন্ধুর মত থাকাই উচিত! কুমারের এখন চৌষট্টি টাকা ফিজ্।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন দেশে যাবার পথে নজর আলীর সঙ্গে দেখা। দিব্যি চক্ষুষ্মান! নজর আমাকে দেখে হাত তুলে সেলাম ক'রে কুশল প্রশ্ন ক'রলে, বাবু ভাল আছেন?

ভাল! ব'লে ব্যস্ত হ'য়ে ট্রেনে উঠে পড়লুম।

ট্রেন তখনো ছাড়েনি, নজর এগিয়ে এসে বললে, ডাক্তারবাবু কেমন আছেন? ইদানিং কোন খবরই রাখি না, তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ভাল।

হাত তুলে বুঝি উদ্দেশ্যে নজর সেলাম জানালে।

ট্রেনের কামরা থেকে চেয়ে দেখলুম, নজর আলীর দৈহিক অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চেহারাটা সেরকম ষণ্ডামার্কা নেই, অনেক রোগা আর দুর্বল মনে হ'চ্ছে লোকটাকে। জানি না, কোটরগত চোখ দুটোয় ও কি জ্যোতি লাভ করেছে যার জন্যে দেহটা ওর অমন শুকিয়ে গেছে!

মনে হয়, ভিক্ষা করা ও ছেড়ে দিয়েছে। একটা মস্ত বড় অবলম্বন ও যেন হারিয়ে ফেলেছে দৃষ্টি ফিরে পেয়ে।

ট্রেনটা ছেড়ে না দিলে ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করতুম, এখন কাজকর্ম কি করছে। সংসারে ওকে নিয়ে সবাই কেমন সুখী হ'য়েছে। বিবির ভালবাসা, ছেলে-মেয়ের শ্রদ্ধা পেয়েছে তো?

এরপরও কয়েকবার দেখা হ'য়েছে নজর আলীর সঙ্গে ঐ দিঘীর পাড় স্টেশনে। হয় ও গাড়িতে উঠছে, না তো গাড়ি থেকে নামছে হন্তদন্ত হ'য়ে। চোখে এখন ভালই দেখতে পায় মনে হয়। কুমারের বাহাদুরী আছে। পথের একটা অন্ধ ভিখারীকে দৃষ্টি দান করেছে। ক'টা লোক পারে?

দেশ থেকে ফেরবার পথে একদিন নজর আমার গাড়িতেই উঠে পড়ল। আজ সে আর অন্ধ নয়, সুস্থ সাধারণ মানুষের মত এসে বেঞ্চির এক ধারে বসল।

জিজ্ঞেস করলুম, কি নজর, কোথায় চল্লে?

আলী বললে, কোলকাতায় যাব বাবু!

হঠাৎ কলকাতায় যাবে কেন? কিছু করা হয় নাকি?

আলী বললে, না বাবু। একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করবো।

কেন, চোখ দেখাবে নাকি? কিছু হ'লো?

না, চোখ আমার ভালই আছে। জেনার আলী সন্তুষ্ট নয় মনে হ'লো।

শারদীয় শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন
ন্যাশনাল কার্বন কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
EVEREADY
TRADE MARK
"এভারেডী" টর্চ ও ব্যাটারী
প্রস্তুতকারক

NCC 619

তা হ'লে? যেমন ডাক্তার, কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখিয়েছিল, এবার বুঝুক! নিশ্চয়ই কাজকর্মের জন্যে আলী তাকে বিরক্ত করে। চোখ হ'য়ে ভিক্ষে ক'রতে এখন লজ্জা করে বাবুর!

বল্‌লুম, বাবুকে আমার কথা বলো, বুঝলে।

আলী মাথা নাড়লে।

লোকটাকে কেমন বিমর্ষ, চিন্তিত মনে হ'লো। আরো যেন রোগা হ'য়ে গেছে এই ক'মাসে। সেই আমার নজর আলীর সঙ্গে শেষ দেখা। তারপর হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে ওর নাম দেখে চমকে উঠলুম। সুজাপুরের নজর আলী জোড়া খুনের আসামী হ'য়েছে। আমার ডাক্তার বন্ধুরও নাম আছে সাক্ষী হিসেবে।

যেটুকু খবর বেরিয়েছে তাতে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। এই সেদিনও যে লোকটা অন্ধ ছিল তার পক্ষে কাজটা অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। তার ওপর ব্যাপারটা নারী-ঘটিত, রহস্যজনক। খবরের কাগজওলারা আরো নিশ্চয়ই রঙ চড়িয়েছে! কয়েকদিন পরে দেশে গিয়ে দিঘীরপাড় স্টেশনে নেমে সুজাপুরের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে খুব একটা হৈ-চৈ শুনলুম না তবে নজর আলীর চোখ ফুটেই যে কাণ্ডটা হয়েছে সে আলোচনা শুনলুম। নজর আলী তার বৌকে খুন করেছে। সঙ্গে মনসুর রহমন ব'লে যে লোকটা খুন হ'য়েছে মৃত বকুলজান বিবির সঙ্গে সম্বন্ধটা নাকি তার বিশেষ সন্দেহজনক ছিল। মানুষ তা ব'লে চিরদিন অন্ধ থাকবে! যেন একটা মস্ত বড় অনাচার, স্বৈরাচারের শোধ নিয়েছে নজর আলী চক্ষুষ্মান হ'য়েই! খুব করেছে! বেশ করেছে!

দেশ থেকে ফিরে একদিন বন্ধুর চেম্বারে দেখা করলুম। রহস্যটা জানতেই হয়। কুমার নিশ্চয়ই সব জানে—নজরকে যখন সে চিকিৎসা ক'রে ভাল করেছিল!

আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই কুমার বললে, "তোমাদের নজরের কাণ্ড শুনেচো?"

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, তার জন্যে তুমিই তো দায়ী!

ডাক্তার বন্ধু হাসলে। বললে, "সত্যি, এমন জানলে কখনো ওকে দেখতুম না। এত কাণ্ড কে জানতো!

ঠিক জায়গাতেই এসেছি। বন্ধু আমার সবই জানেন। ঠিক লোককেই পুলিস সাক্ষী মেনেছে।

চেম্বারে সেদিন লোক-জন বিশেষ ছিল না, আর যে দু'একজন ছিল তাদের আসতে বলে' কুমার আমাকে নিয়ে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে চলে এল। ঘরটা গহ্বার মত। চোখের ডাক্তারের ডার্ক রুম, অন্ধকার কুপ্-কুপ্ ক'রছে।

ডাক্তারের মতলবখানা কি? কিছু ঠাহর করবার আগেই ঘরটা আলোয় ভরে গেল। ছোট্ট হ'লেও ঘরটা মন্দ নয়, নিরিবিলির মধ্যে বেশ ছিম-ছাম। দেখলুম, গোটা-দুই জানালা এদিক-ওদিক খুলে দিতেই ঘরময় আলো হ'য়েছে—অন্ধকূপ জ্যোতির্ময় হ'য়েছে!

একটা সিগারেট ধরিয়ে এবং আমাকে ধরাতে দিয়ে বন্ধু বললে, "অত ব্যাপার কি আমি জানি! সেই তোমাদের ওখানে বেড়াতে যাবার কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন শেয়ালদা স্টেশনে দেখি ভিখিরীটা এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে! দেখে কেমন মায়া হ'লো। হয়তো একদিন একসঙ্গে ট্রেন-ভ্রমণ করেছিলুম বলে এমনটা হ'লো। কাছে এসে সাড়া করলুম। আশ্চর্য, নজর আলী ঠিক আমার গলা চিনতে পারলে! তোমার সঙ্গে সেদিন আমি দিঘীরপাড় স্টেশনে নেমেছিলুম, ওর ঠিক স্মরণ আছে!

"সেদিন কি কৌতূহল হয়েছিল সামান্য একটা কানা ব্যক্তির জন্যে বলতে পারি না। স্বেচ্ছায় নিজের পরিচয় দিয়ে নজর আলীর চিকিৎসার সব ভারই নিয়েছিলুম। ওর জন্যে সেদিন যে মনোভাবের উদয় হ'য়েছিল আর কারো জন্যে তো তেমন হয় না। রাত দিন কত অন্ধই তো দেখছি চোখের ওপর!

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বল্‌লুম, কপালের গ্রহ! ওসব জঞ্জাল ঘাঁটিতে আছে!

বন্ধু বললে, "প্রথম প্রথম নতুন কেস ভেবে খুব উৎসাহ বোধ করেছিলুম...... যদি ভাল ক'রতে পারি দেখিই না চেষ্টা করে!

খানিক কি ভেবে বন্ধু বললে, "দু'দিন দেখার পর আমার কেমন সন্দেহ হ'লো, নজর আলীর চোখটা তীব্র বিষ ক্রিয়ায় খারাপ হ'য়েছে। অনেক জিজ্ঞেস পড়া করে খবরটা বার করি। বল্‌লুম, ডাক্তারের কাছে রোগ গোপন করলে ভাল হয় না।

হঠাৎ কোথা থেকে এলোমেলো খানিকটা বাতাস এসে একটা জানালার ছিটকেনা খুলে গেল। জানালার পাল্লাটা বন্ধ হ'য়ে গেল। ঘর আবছা অন্ধকার!

উঠে জানালাটা খুলে দিয়ে কুমার বললে, "বাল্য প্রেমের ব্যাপার! রেষারেষির ফলে বিষ খাওয়া-খাওয়ি! সব থেকে আশ্চর্য এই এপিসডে যাকে নজরের সন্দেহ সেই নাকি শেষ পর্যন্ত তারই সংসার ক'রছে। বকুল-জান বিবি। প্রেমের বিচিত্র গতি! অন্ধ হ'য়ে নাকি নজর আলী মনের শান্তিতে ছিল। বকুল খুব সেবা করতো।

শেষ করে' বল্‌লুম, তাহ'লে চিরকাল অন্ধ থাকলেই পারতো! এ পথ কেন আলো দেখবার! এখন ঠেলা বুঝবে—

ডাক্তার বন্ধু বললে, "ছেলেপেলের জন্যে নজর সেখ যায়! কেউ তার বাধ্য নয়, নিজের শরীরে আর তেমন শক্তি নেই। বকুলও নাকি ইদানীং তেমন দেখাশোনা করে না! আক্ষেপ অনেক। ভিক্ষে ক'রতে নাকি ভাল লাগে না!

ওর সব কথা এখন আমার মনে নেই, চোখ ফিরে পেলে নাকি নজর অনেক কিছু ক'রবে, ঘর সংসার ওর বয়ে যাচ্ছে!

"তখন কি জানি শেষ পর্যন্ত এই কীর্তি ও করবে। চোখটাই কাল হ'বে। এখন মনে হ'চ্ছে, আসলে যে সন্দেহটা ওর মনের মধ্যে বিশ-পঁচিশ বছর লুকোন ছিল সেটাই প্রকট হ'য়েছে। চোখের ওপর বিষ-ক্রিয়া শোধন করতে পারলেও মনের বিষ ক্রিয়ার শোধন করবার আমার ক্ষমতা কি?

বন্ধু খানিক চুপ করে' বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আচ্ছা মুশকিলে ফেলেছে নজর আলী! লোকের ভাল করাও বিপদ। কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে!

বন্ধু বললে, চোখ ভাল হ'য়ে কদিন ও আমার কাছে এসেছিল কৃতজ্ঞতা জানাতে! জিজ্ঞেস ক'রলে বলতো বেশ ভাল আছি কর্তা! কিন্তু লোকটাকে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হ'তো, মনে মনে ও খুশী হয়নি! একদিন ওকে ধরে করে' জিজ্ঞেস করলুম, কি নজর কেমন আছ? কেমন-কেমন যেন মনে হচ্ছে!

নজর স্বীকার ক'রলে—বললে, বাবু অন্ধ থাকাই ভাল। শান্তি নেই আলো দেখে! যত গোলমাল!

শান্তি বলতে ও কি বুঝেছিল জানি না। চোখ থাকলেই যে মনে শান্তি পাওয়া যাবে এমন কোন কথা নেই। সে নিশ্চয়তা বুঝি বিধাতা পুরুষও দিতে পারেন না কাউকে।

তবু আশ্বাস দিয়ে বললুম, "ঠিক আছে, ও কিছু নয়......সব সহ্য হ'য়ে যাবে...... চোখটা তোমার অনেকদিন বন্ধ ছিল তো!

তারপর অনেকদিন নজর আলী আর আসেনি। ভেবেছিলুম, মনোমত শান্তি ও পেয়েছে। সুখেই আছে!

"হঠাৎ একদিন মাঝেরহাটের ব্রীজটার ওপর দেখি, নজর আলী পাগলের মত দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থামিয়ে ওকে তুলে নিলুম—কুশল প্রশ্ন করলুম। নজর কোন উত্তর দিলে না। চেম্বারে এসে ওর দেহটা ভাল করে পরীক্ষা করলুম। না, কোন উপসর্গ জোটে নি।

"তুমি হয়তো ভাবছো, ওকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা আমার উচিত হয়নি। কি দরকার ছিল, দেখেছিলে দেখেছিলে ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কি জান, মনে মনে আমার অহঙ্কার ছিল নজর আলী আমারই সৃষ্ট জীব—আমারই কৃতিত্বের একটা জীবন্ত স্বাক্ষর। অন্ধের চোখ দিয়েছি আমি!

"তারপর কিছুদিন চুপ-চাপ। ভুলেই গিয়েছিলুম নজর আলীর কথা। ইতি-মধ্যে অনেক চক্ষু দান করেছি, অনেকে আমার গুণগান করছে। স্পেশালিস্ট বলে নাম বেরিয়েছে!

"একদিন কাজকর্ম চুকে যেতে চেম্বার ফাঁকা হয়ে গেল। এই ঘরে বসে আরাম করে সিগারেট টানছি, বেয়ারা এসে বললে, একটা লোক আপনাকে ডাকছে। সামনে ডেকে পাঠালুম। মূর্তিমান নজর আলী! কিন্তু একি চেহারা! একেবারে আধখানা হয়ে গেছে—পোড়া কাঠের মত চেহারা। মনে মনে ভারি বিরক্ত হ'লুম, লোকটা ভাবে কি! আমি কি ওর আত্মীয় না বন্ধু?

"আশ্চর্য, নজর কাঁদছে! জিজ্ঞেস করলুম, কি হ'য়েচে কাঁদচো কেন? নজর হাউ-হাউ করে উঠলো, বাবু চোখ দুটো আমার আবার খারাপ করে দেন! কেন আমার দৃষ্টি দিলেন? আমারে অন্ধ করে দেন কর্তা... আর সইতে পারি না।

হারান চোখ পেয়ে মানুষ সুখী নয়, সেই প্রথম শুনলুম! তারপর নজর আলীর চোখের দিকে চেয়ে চোখ আমার কপালে উঠলো—একি করেছে, চোখ দুটোকে প্রায় অন্ধ করে এনেছে! বাস্তবিক বলছি তোমাকে সেদিন খুবই রাগ হ'য়েছিল, ইচ্ছে হ'য়েছিল দিই ওর চোখ দুটো গেলে কানা করে'। বেটা ভিখিরী চোখের মর্ম কি বুঝবে! অপাত্রে দান এমনই হয়।

"নজর আর আসেনি, এলে আমার দোর আর খোলা পাবে না, সেদিন ও বুঝে গিয়েছিল।

হঠাৎ বন্ধু অন্যমনস্ক হ'য়ে কি যেন ভাবতে লাগল। আচ্ছা অন্ধের পাল্লায় বেচারী পড়েছে! এখন কোর্ট-পুলিস করতেই হায়রান! যত বাজে ঝামেলা!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, যাকগে, কি সাক্ষী তুমি দেবে ভেবেচো?

ডাক্তার বন্ধু বললে, কেন, এই তোমাকে যা বললুম।

সন্দিগ্ধ সুরে বললুম, লোকে বিশ্বাস করবে কি?

বন্ধু চটে উঠলো, লোকের বিশ্বাসের জন্যে সাক্ষী দিতে হ'বে! তুমিও তাই মনে কর নাকি? আশ্চর্য!

বন্ধুকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। ব্যাপারটা পরচর্চার মত। তবু ওঠবার সময় রহস্য করে বললুম, খুনটার মানে কিছু বুঝতে পারলে? সংসারে অশান্তির জন্যে নজর বকুলজান বিবির বুকে ছুরি মারতে পারে, কিন্তু এতদিন পরে বেচারা মনসুর রহমনের ওপর আক্রোশ কেন? হিসেব করে দেখলে এত-দিনে সে তো প্রায় গোরের দিকে পা বাড়িয়েছে! প্রেম-ট্রেম কিছু না, পাগলের কান্ড! তাই না?

ডাক্তার কুমার কোন কথা না বলে সোফা থেকে তড়াক করে উঠে পড়ল। খোলা জানালাগুলো বন্ধ করে দিল। সেই চোখ-দেখা ঘর আবার অন্ধকার নিরন্ধ্র, নিশ্ছিদ্র!

বিমূঢ় হ'য়ে কিছু বলবার আগেই কুমার ডাকলে, বেরিয়ে এস সোজা, ঘরটা বন্ধ করে দেব!

শিল্পী রামকিংকর

॥ শুভময় ঘোষ ॥

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

শিল্পী রামকিংকর সেই মাটির কাছের শিল্পী। তাঁর জন্ম বাঁকুড়া জেলার এক ছোট গ্রামে, ২৫শে মে, ১৯০৬ সালে। বাঁকুড়ার লোকশিল্পের ঐতিহ্য অনেকদিনের। ছোটবেলা থেকেই মাটির কাজ, ছবি এই সবে রামকিংকর আনন্দ পেয়েছেন। গ্রামের লোকজন তাঁর এই খেয়ালের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অনেকে সাহায্য করতেও এগিয়ে আসতেন। একজন হিতৈষী একবার রাফায়েলের ম্যাডোনার এক প্রিণ্ট এনে বল্লেন. "এটা কপি করে দাও তো। এতে তোমার লাভ হবে শিখতে পারবে।"

ইরা ভাকিলের মূর্তি

রাফায়েলের মাতৃরূপের নিছক কপি না করে রামকিংকর আঁকলেন সীতার ছবি, তাঁর কোলে লবকুশ। বলাবাহুল্য সেই হিতৈষী ভদ্রলোক এতে খুশি হলেন না। এইভাবে তাঁর শিল্পচর্চা চল্ল। গ্রামের থিয়েটারে বড় বড় চটের গায়ে বড় বড় টুলের ওপর চড়ে জুতোর বুরুশ দিয়ে বড় বড় আকাশ, বড় বড় গাছ, নানারকম দৃশ্য আঁকাও চলেছে। এতে রোজগারও হচ্ছে কিছু। আর আছে ফোটো এনলার্জমেণ্ট—যে এনলার্জমেণ্ট ভাল হয়নি, তাকে তুলি বুলিয়ে শুধরে দেওয়া, নতুন করে এঁকে দেওয়া। থিয়েটরের জন্য বড় বড় চটে, মোটা ব্রাশে বড় আকারের ছবি আঁকার ছোটবেলার এই অভ্যাস তাঁর পরবর্তী জীবনের ছবিতে হয়ত কিছু ছাপ ফেলে থাকতে পারে। এই বিষয়ে শিল্পসমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

১৯২১'র অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রে রামকিংকরের সঙ্গে অনিলবরণ রায়ের আলাপ হল। তিনি রামকিংকরের শিল্প-প্রকৃতির মর্ম বুঝলেন, বল্লেন, "ও সব চরকা টরকা তোমার নয়। তুমি অন্যভাবে কাজ কর।" রামকিংকরকে আন্দোলনের পোস্টার আঁকা ও লেখার কাজ দিলেন। হয়ত সেই সূত্রেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়। প্রবাসী সম্পাদকের সন্ধানী-মন সেদিনের ঐ বালক শিল্পীর মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিল। তাঁকে নিয়ে এলেন শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুর কাছে। সেটা তখন ১৯২৫ সাল।

রামকিংকর গরবীঘরের ছেলে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন তাঁকে কলাভবনে এনে দিলেন তখন তাঁর বয়স পনের বছর। নন্দলাল শুধু তাঁর শিক্ষার ভারই নিলেন না, যাতে শিখতে শিখতে কিছু উপার্জন করতে পারেন সেদিকেও দৃষ্টি রাখলেন। জগদানন্দ রায়ের বিজ্ঞানের বইগুলি তখন লেখা হচ্ছে। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত প্রভৃতি সে বইয়ের ছবি এঁকে দেন। নন্দলাল রামকিংকরকে জগদানন্দ রায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, "একেও কিছু কাজ দিন।" এইভাবেই চল্ল তাঁর খরচ। তখন খরচাও খুব কম। আলাদা মেস্‌এ একসঙ্গে খান, নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, হরিদাস মিত্র, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রভৃতি আরও কয়েকজন। খরচ পড়ে মাসে দশ টাকা। এইভাবেই তাঁর কলাভবনের শিক্ষা সমাপ্ত হল। এর ফল তাঁর শিল্পে কীভাবে প্রতিফলিত হল তা পরে আলোচনা করব। কলাভবনের পাঠ শেষ করে ছমাসের জন্য দিল্লীর মডার্ন স্কুলে চাকরি নিলেন। কিন্তু গিয়েই সে কাজ ভাল লাগল না। সময়টা কাটাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে বলে কয়ে স্কুলবাড়ির দেয়ালে খোদাই কাজের ভার নিলেন করলেন চূণ সুরকি দিয়ে সরস্বতীর রিলিফ। এক মাস ঐ কাজেই কাটিয়ে, আবার ফিরে এলেন কলাভবনে। দিল্লীর ঐ সরস্বতী রিলিফই তাঁর এই জাতের প্রথম কাজ।

কলাভবনে থেকে নন্দলালের কাজ দেখে তিনটে জিনিসের প্রতি রামকিংকরের মনের স্বাভাবিক প্রবণতা আরও বেড়ে যায়—শিল্পে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এবং রূপের ভাস্কর্যগুণ, ছন্দোময়তা ও রেখাময় গড়ন। শিল্পকথায় নন্দলাল বলেছেন, "ভারতীয়েরা বিষয়কে চারিদিক থেকে (ইন দি রাউণ্ড) দেখেছে।" নন্দলালের ছবি সম্বন্ধেও একথা সত্য। তিনি যদিও ভাস্কর নন,

ছন্দের খেলা

তবুও তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই ভাস্কর্য-গুণ বর্তমান। শুধু একটি বহিঃরেখা দিয়ে "সঙ্ঘমিত্রার সিংহলযাত্রা" ছবিতে সঙ্ঘমিত্রার বিরাট মূর্তি গঠন করেছেন। ছবিতে বস্তুর ভার, ঘনভাব এবং মূর্তি গড়ে তোলায় নন্দলালের যে আনন্দ তা রামকিংকরের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি সেই মানসিক প্রবণতা নিয়েই ছবি আঁকতে শুরু করলেন। জল রঙে, মাটির রঙে যে ছবি আঁকলেন, তাতেও এই গুণ ধরা পড়ল। শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এসে পৌঁছলেন মূর্তির জগতে, তেলরঙের ছবিতে।

মূর্তিগড়া ও তৈলচিত্রের সঙ্গে রামকিংকরের ছোটবেলা থেকেই পরিচয় ছিল। বাঁকুড়া থাকতেই তেলরঙে মিনিয়েচর এঁকেছেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন—"একবার কলকাতায় গেছি। এক রঙের দোকানে গিয়ে বল্লাম—অয়েল কালার, অয়েল কালার নাম শুনেছি, দোকানে আছে? সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো টিউব বের করে দিল।

জিজ্ঞেস করলাম—এ কেমন করে লাগায়?

দোকানী বল্ল—টিউব টিপে রঙ বের করবেন, তেল নেবেন, লাগাবেন—ব্যস্।

সেই দোকানীই আমার অয়েল পেন্টিং'র গুরু।" এই রং ও পাঠ নিয়ে দেশে ফিরলেন। এক সাইনবোর্ড-আঁকিয়ে এনামেল পেন্ট লাগিয়ে পট তৈরি করে দিল। কতগুলো মিনিয়েচর আঁকলেন। সেই স্বল্পজ্ঞান নিয়েই কলাভবনে এসে আবার বছর পাঁচেক পরে মূর্তি আর তৈলচিত্রের চর্চা শুরু করলেন। তাঁর করা প্রথম মূর্তি, বাসুদেব নামে এক দাক্ষিণী নৃত্যশিল্পীর প্রতিকৃতি। অবশ্য গ্রামের মাটির কাজগুলো ধরা হচ্ছে না। তেলরঙে তাঁর প্রথম ছবি "সোমাযোশী"। এইভাবে

প্রীতি পান্ডের মূর্তি

সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় মূর্তি ও তৈলচিত্রের সবরকম আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য শিখলেন। তবে ছোট ছোট মূর্তি ও ছবি তাঁকে তৃপ্তি দিল না। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে, নন্দলালের ছবিতে যে বিরাট রূপগঠন দেখেছিলেন, তার প্রতি তাঁর মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়েছিল। জীবনের যে প্রবল আবেগ নিজের মধ্যে এবং বিশ্বজগতে অনুভব করেছেন, তা স্টুডিওতে বসে ছোট ছোট গড়নে তৃপ্ত হল না। বাইরের প্রকৃতির মধ্যে মূর্তি গড়লেন। স্বাভাবিকের চেয়ে তা দেড়গুণ বা দ্বিগুণ বড় হল। শুধু আকারে বড় নয়, ঐ আবেগ প্রকাশ করার জন্য পালিশ করা সিমেন্ট নিলেন না। নিলেন কংক্রীট। মূর্তির গা মসৃণ না হয়ে হল কর্কশ, কিন্তু তার ফলে তার সজীবতা বাড়ল অনেক গুণ বেশি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কয়েকটি এব্স্ট্রাক্ট রূপগঠন ছাড়া মূর্তিতে মসৃণ সিমেন্টের ত্বক্ রামকিংকর খুবই কমই ব্যবহার করেছেন। এই আবেগ প্রকাশ করতে অধিকাংশ ছবিতেই সরাসরি রং লাগিয়েছেন, আগে পেন্সিলের কাঠামোটি না করে নিয়েই এবং ধরে ধরে করা অতি যত্নের সূক্ষ্ম কাজের বদলে কাটা-ছাঁটা ও বড় বড় ছোপে মোটা তুলির টানে ছবি এঁকেছেন। রঙের চতুর্দিকসমন্বিত ঘনত্ব, গভীরতা, স্পর্শবোধযুক্ত টেক্স্চার ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কাঠিন্য ও স্পর্শময় টেক্স্চার আনার জন্য তাঁর অনেক তৈলচিত্রে তেলরঙের সঙ্গে অন্য রঙও মিশিয়েছেন, তীক্ষ্ম রেখার বহিঃসীমা দিয়েছেন। একেক সময় ছবিকে পাথরকাটা মূর্তির গড়ন দিয়েছেন। এই সংখ্যার অন্যত্র (১৫৮ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত শুধু কালির আঁচড়ে আঁকা দুটি ছাগলের ছবি দ্রষ্টব্য। শুধু তৈলচিত্রেই নয়, জলরঙা ছবিতেও গাঢ় করে রং বুলিয়ে গভীরতা ও কাঠিন্য এনেছেন। অন্যত্র প্রকাশিত (এ বৎসরের শারদীয়া হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা) জলরঙে আঁকা ছবিটি এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যনীয়।

শিল্পকথায় নন্দলাল লিখেছেন, "এককালে বিশেষ করে দেবদেবীর ছবিই এঁকেছি। এখন কিন্তু দেবতার ছবি যেমন আঁকি সাধারণ জীবনের ছবিও এঁকে থাকি; উভয়েতেই সমান আনন্দ পেতে যত্ন করি। পূর্বে দেবত্ব দেবতার রূপেই দেখতাম, এখন দেখতে যত্ন করি—মানুষে, গাছে, পাহাড়ে।" শান্তিনিকেতনে এসেই নন্দলাল সাহিত্যের বিষয় থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পারিপার্শ্বিক জীবনের প্রতি আগ্রহশীল হন। রামকিংকরের ছবি, মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পকার্যে পারিপার্শ্বিক জীবনের শোভাযাত্রা রয়েছে। বিশেষ করে জীবনের নিচু মহলের মানুষের বেদনা ও

ভাস্কর্যে ইম্প্রেশনিজম্

প্রাচীন ভাস্কর্যের অনুকরণে দেওয়ালে রিলিফের কাজ

রবীন্দ্রনাথ
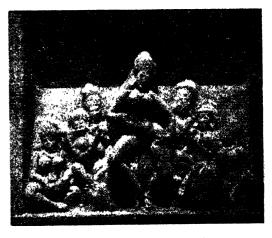
আনন্দ তাঁর শিল্পে প্রকাশিত। দিনশেষে কাজ থেকে ফিরছে ক্লান্ত সাঁওতাল-দম্পতী বা জীবিকার জন্য শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে নিয়ে চলেছে গ্রামের মেয়ে—তাঁর শিল্পে এদের জীবন ফুটে উঠেছে এবং এ ব্যাপারে কোনও ভাবালুতা নেই। শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যারা, তাদের জীবনসংগ্রামের রুক্ষতার ছাপ রয়েছে মোটা লাইনে, রঙের কালো কাঠিন্যে। ওদিকে আবার সকালবেলা কাপড় শুকোতে শুকোতে হাসতে হাসতে কাজে চলেছে মেয়েরা, একটি সাঁওতাল মেয়ের খোঁপায় শিমুলের রঙে মুগ্ধ সাঁওতাল ছেলে বা দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

সারা শরীরে কাজের আনন্দ ফুটিয়ে তুলে ধান ঝাড়ছে কৃষাণী—এও রয়েছে। "দুর্ভিক্ষ" "ক্ষুধা" প্রভৃতি রচনায় সমসাময়িক মন্বন্তরের ইতিহাস রয়েছে। দৃশ্যচিত্রের কথা ত বলা বাহুল্য। এ গেল পারিপার্শ্বিকের প্রতি এক ধরনের কৌতূহল। আরেক ধরনের মনোযোগ দেখা যায় তাঁর বাইরে রচিত মূর্তিগুলিতে। চারপাশের গাছপালা, বাড়িঘর, প্রকৃতির সঙ্গে সুষমাপন্ন একটি প্রাকৃতিক রূপ হিসেবেই তাদের গড়েছেন। পৌরাণিক বিষয় নিয়ে প্রথম জীবনে দু-একটি ছবি মাত্র এঁকেছেন। তার মধ্যে "দময়ন্তী" বিশেষ পরিচিত। শেষদিকে "কৃষ্ণের জন্ম" ছবিটি এঁকেছেন।*

রেখা ও ছন্দে নন্দলালের আনন্দ তাঁর এই সুযোগ্য শিষ্যেও বর্তমান। রেখার সজীব ব্যবহারে তাঁর সুন্দর অধিকারের প্রমাণ সব ছবিতেই পাওয়া যাবে, এই সংখ্যায় প্রকাশিত (১৫৮ পৃষ্ঠা) লাঙলটানা গরু দুটি ও কুকুরের স্কেচ্ দ্রষ্টব্য। যদিও রামকিংকর তাঁর গুরুর মত শুধু রেখার দ্বারা রূপগঠন কোনও বড় ছবিতে কখনও করেননি, তবুও প্রায় অধিকাংশ ছবিরই সমাপ্তি টেনেছেন রেখার বহিঃসীমা দিয়ে, তা সে যে পদ্ধতিতে বা যে রঙেই আঁকা হোক না কেন। তাঁর ছবিকে অনেক সময় আমরা ইম্প্রেসনিস্টিক বলে থাকি। কেন বলি জানি না। ইম্প্রেসনিস্টরা এমন বলিষ্ঠ, স্পষ্ট রেখার বহিঃসীমা ব্যবহার করতেন বলে শোনা যায় না। তাঁর আরেক ধরনের ছবি আছে, কালো জলরঙে রূপের বাইরের রেখাটি রচিত, ভেতরে ভেজা হলদে বা ঐ জাতীয় হাল্কা রঙের স্বল্প স্বচ্ছ ছাপ। তিনি নিজে বলেন, "যেখানে যত লাইন আছে সব আয়ত্ত করা উচিত। নেচার হচ্ছেন দেবশিল্পী। কতরকম সুন্দর সুন্দর লাইন সৃষ্টি করে চলেছেন। সে সব শিখে নিয়ে মনে রেখে পরে প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে হবে। লাইন সুন্দর হলে ছবি ভাল লাগবেই, মানে থাক আর না থাক।" মূর্তিতে রেখার এত স্পষ্টরূপ সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও তাঁর মূর্তিতে কয়েকটি মূলে স্বচ্ছন্দ রেখার সমষ্টি পাওয়া যায়। তাদের মাঝখানের ফাঁক ভরেছে বলয়িত, ঘনীভূত বস্তু দ্বারা। অবশ্য এব্সট্রাক্ট রূপগঠনে অনেকক্ষেত্রে সুস্পষ্ট রেখার বাহুল্য রয়েছে।

ছন্দ ও রেখার আনন্দ যে শিল্পী পেয়েছেন, তিনি কিছু পরিমাণে এব্স্ট্রাকসন ভালবাসেন। প্রাচ্যশিল্পের সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রথাগত শিল্পের এইখানেই পার্থক্য, একথা শিল্প আলোচকরা বলেন। নন্দলালও বলেছেন, "প্রাচ্যশিল্পের বিশেষত্ব হচ্ছে গতি, ভঙ্গী, ছন্দ ও ব্যঞ্জনা দিয়ে ভাবকে প্রকাশ করা; স্বাভাবিক দেহের খুঁটিনাটি গড়ন সেখানে গৌণ। একে বলা চলে ব্যঞ্জক। বিলাতী কায়দায় শারীর-

সাঁওতাল দম্পতী

স্থানের জ্ঞান পৃথক ক্লাসে পৃথকভাবে শেখবার ব্যবস্থা আছে। প্রাচ্যমতে অঙ্কন-কৌশল আলাদা করে শেখার প্রয়োজন নেই; কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কন কৌশল শেখা ভালো।" রামকিংকরও বলেন, "একাডেমিক শিক্ষায় ওরা দেখে দেখে এনাটমির চর্চা করে। ছবি আঁকে। ওরিয়েন্টাল বা মডার্ন আর্টে শিল্পীর নিজের কল্পনা বড় হয়ে উঠেছে। এনাটমির শেকলে বাঁধা চর্চার চেয়ে ছন্দের ওপর জোর পড়েছে বেশি। ওরিয়েন্টাল আর্টের ছন্দোপ্রধান রূপ দেখেই আধুনিক ইউরোপের শিল্পীরা এনাটমি ও রিয়ালিজমের বাড়াবাড়ি ত্যাগ করেছেন। মডার্ন আর্ট ত এইভাবেই জন্ম নিল—জাপানী ছবির প্রিন্ট দেখে। জাপানী ছবিতে একাডেমিক পার্সপেক্টিভ নেই অথচ বেশ দূরত্ব বোঝা যাচ্ছে—এসব দেখে ইউরোপের আর্টিস্টরা অবাক হয়ে গেলেন।

আমাকে অনেকে বলে, পশ্চিমের শিল্পীদের প্রভাবে আঁকি। কিন্তু আমার ধারা ত এদেশেরই ধারা। এদেশের শিল্প

---

* গত বছর শারদীয়া দেশ পত্রিকায় ছবিটি প্রকাশিত হয়। এই ছবিটি দেখে কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন এত ভীষণ কেন ছবিটি? তার উত্তরে রামকিংকর বলেন, "এতদিন এই ঘটনাটি দেখান হয়েছে অংশতঃ। অন্য শিল্পীরা এই ঘটনার একেকটা বিচ্ছিন্ন অংশ এঁকেছেন, কখনও শুধু কংশের রাগ, কখনও বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে, কখনও আর কিছু। ঘটনাটা টুকরো করে দেখিয়েছেন। আমি তা করতে চাইনি—পুরো ঘটনাটা একসঙ্গে ধরতে চেয়েছি। সবটা একসঙ্গে দেখলে এরকম বীভৎসই দেখায়, ঘটনাটাত সত্যিই ভীষণ।"

কখনও নকল করেনি। ছন্দ হল তার ভেতরের কথা। • পুজোর ঠাকুরের মূর্তির কথা যদি ছেড়ে দাও, আমাদের দেশের মূর্তির মোদ্দা কথা হচ্ছে স্ট্রাক্‌চার, ছন্দোময় রূপ গঠন। তবে বাইরের পরিবর্তন কিছু হবেই। আগে শিল্পের পেছনে ধর্মের পটভূমি ছিল। এখন তা নেই। এখনকার দুর্গাপ্রতিমা সিনেমা-স্টারের মত। ওরা বলে—দুর্গার চেহারাটা চাই অমুক স্টারের মত, সরস্বতীটা অমুকের। কার্তিক হবে হয়ত অশোক-কুমারের মত। আমি জিজ্ঞেস করি—অসুরেরটা কার মত হবে? এখনকার ধর্ম হল জীবন। জীবনকে দেখে তার থেকেই ছবির বিষয়, রূপ নিতে হবে।" নন্দলালও বলতেন, "কেবল পরম্পরা (ট্র্যাডিসন) থেকে নকল করে ছবি করলে তা একঘেয়ে হয়ে পড়ে।" রবীন্দ্রনাথকে যখন শিল্পী জিজ্ঞেস করেছিলেন আর্টের সাধনা কি, তিনি বলেছিলেন, "দেখো, তবেই দেখাতে পারবে। সৃষ্টির লীলা চারদিকেই আছে, এই সহজ সত্যটি যদি আর্টিস্ট আজও আবিষ্কার করতে না পেরে থাকে, পুরাণ কাহিনীর পুঁথির মধ্যে, প্রাচীন রাজপুতনার পটের মধ্যে যদি সে দেখার জিনিস খুঁজে বেড়ায়, তাহলে বুঝব কলা সরস্বতীর পদ্মাসন তার মনের মধ্যে বিকশিত হয় নি।" (যাত্রী)। রামকিংকরের মতে ট্র্যাডিসন হল সৃষ্টিক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্ন ধারা, কোন বিশেষ রীতির প্রাণহীন পুনরাবর্তন নয়। "মানব-সমাজ কালে কালে সামাজিক কাজ চলার প্রথা-প্রকরণাদি ভেঙে যেমন কালোপযোগী ক্রিয়া সমস্ত ধরে, আর্টের রাজত্বেও তেমনি প্রাচীন প্রথা-প্রকরণ কালে কালে সংস্কৃতি ও নবপ্রবর্তনের রীতি অবলম্বন করে, তা না হলে দেশের শিল্প কতকগুলো প্রকরণিক ভূতের উপদ্রব শুরু করে দেয়।" (অবনীন্দ্রনাথ-শিল্পায়ন)। শিল্পের এই প্রবহমানতা সম্বন্ধে রামকিংকর অতিমাত্রায় সচেতন বলেই তার ছবিতে আমরা "আধুনিকতা" দেখি। তিনি নিজে আধুনিক হবার কোনও চেষ্টা করেন নি। সে বিষয়ে তাঁর সচেতনতাও নেই। তিনি বলেন, "আমি 'আধুনিক' কিনা জানি না, আমি যা অনুভব করি তাই প্রকাশ করি।"

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের ছন্দ ও রেখা-প্রধান এব্‌স্ট্রাকসনের ধারাই রামকিংকরের ধারা। একথা রামকিংকর নিজেই একাধিক-বার বলেছেন। তবে প্রাচ্যশিল্প তখনও পুরোপুরি এব্‌স্ট্রাক্ট শিল্প সৃষ্টি

গুণ টানা

করে নি। এব্‌স্ট্রাক্ট আর্ট বলতে এখন আমরা যা বুঝি, তা বিশেষ করে এ যুগেরই।

আধুনিক ইউরোপের শিল্পীদের হাতেই এই নতুন শিল্প-অভিব্যক্তির সৃষ্টি। রাম-কিংকরের শিল্পে এই ধারার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তবে এই প্রভাব তাঁর মনের স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে। কারণ ভারতীয় শিল্পের বস্তুব্যতিরেকে যে শিল্পরীতি, তা তাঁর মনে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেছে। এর ফলে ইউরোপের নতুন শিল্পপদ্ধতিকে তিনি দেশের মাটির রঙে রসে নব প্রাণ দিতে পেরেছেন। এ বিষয়ে রামকিংকরের মত হল, "এটা একটা আলাদা ধারা, ওরিয়েণ্টাল নয়। ওরিয়েণ্টাল আর্ট কিছুটা রিপ্রেজেন-টেসন (প্রতিকৃতি) রাখতে চায়, একটা পরিচয়ের অবলম্বন। কিন্তু বস্তুর প্রতিকৃতি এব্‌স্ট্রাক্ট আর্টে একেবারে বাদ পড়েছে। রেখা, ডিজাইন প্রধান হয়েছে। স্ফিয়ার, সিলিণ্ডার, শোওয়া লাইন, খাড়া লাইন, বাঁকা রেখা বা তাদের ঊর্ধ্বগতি, নিম্নগতি—এই নিয়েই কাজ। কোন রূপের অনুকরণ না করে কেবল ভেতরের সুরটি এতে ধরা পড়বে। সংগীতও ত কপি করে না। বসন্ত রাগিণী গাইতে তবে ত গাইয়ে কোকিলের মত কু-কু করত। সুরটাকে নিয়ে একটা টাইপ ধরে দেওয়া তার কাজ। কোকিলের ডাক, পাপিয়ার ডাক, আলাদা করে কিছু নেই সব মিলে মিশে বসন্তের পরিবেশ রচনা, অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ করা। রাগিণীর এই-ভাবেই সৃষ্টি। এব্‌স্ট্রাক্ট আর্টও সেই রেখা ও ছন্দে-বাঁধা সংগীত। নানাভাবে এই ডিজাইন, সংগীত রচনা করতে করতে দেখতে হয় সুরটা ঠিক হল কিনা, রচনাটা সুন্দর হল কি না। আমাদের ক্লাসিক্যাল

গান একভাবে ইন্‌ফিনিটিকে ধরেছে, শুধু সুর দিয়ে, অনুভব দিয়ে। কথা দিয়ে নয়। গুরুদেবের গান আবার আরেকভাবে সেই ইন্‌ফিনিটিকেই ধরেছে। সেখানে সুরের সঙ্গে কথাও আছে, অর্থও আছে। ছবিতেও তাই--- কখনও বর্ণনা বা অর্থ দিয়ে ধরা হয়, কখনও হয় এবস্ট্রাক্ট আর্টের বর্ণনা বাদ দিয়ে শুধু রাগিণীর মত রূপ দিয়ে। আমরা ত শিল্পের শিক্ষার দিকটা ওড়াচ্ছি না। শিল্পের মূলমন্ত্রগুলি শিখতে ত হবেই। কিন্তু আজকের দিনে এই আর্টের প্রতিও প্রবণতা রয়েছে, লোকে আনন্দ পাচ্ছে---সেটা কেন স্বীকার করা হবে না? আমাদের প্রচলিত শিল্পধারা থেকে গুরুদেব প্রথম অন্য পথে গেলেন। অন্য অনেক বড় কবি ছবি এঁকেছেন--- কিন্তু তাঁদের ছবি অত্যন্ত একাডেমিক। কারণ গুরুদেবের মত দৃষ্টিশক্তি, অনুভূতির গাঢ়তা তাঁদের ছিল না। এই দুটি গুণ না থাকলে গুরুদেবও এব্‌স্ট্রাক্ট আর্টে ফেল করতেন। অন্য কবি হলে খুব কাব্যিকের ছবি আঁকতেন। এদেশের অনেক আঁকিয়ে তা করেছেন, আবার গুরুদেবেরই কবিতার লাইন ছবির তলে বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু গুরুদেব তা করলেন না। তাঁর ছবিতে রয়েছে বলিষ্ঠতা, ভাইটাল অবজারভেসন, ঘনভাব, ওয়ার্মথ্......আর তাছাড়া অর্থে বাঁধাপড়া মন হঠাৎ ছুটি পেতে চায়। সাধারণ মানুষও হঠাৎ কথা ছাড়া সুর ভেঁজে চলে--- তা করতে ভালবাসে। এব্‌স্ট্রাক্ট ছবিও তাই।"

ছন্দ ও রেখায় যে শিল্পীর আনন্দ রয়েছে, তাঁকে এব্‌স্ট্রাক্ট রূপ গঠনের দিকে কোন না কোন সময়ে যেতে হবেই। প্রথমে প্রতিকৃতির মাত্রা বা অর্থ বড় হয়ে থাকবে। তারপর রেখা ও ছন্দের প্রাধান্য বাড়তে বাড়তে বাইরের অর্থ বা পরিচয়ের অবয়বটি সামান্য থেকে সামান্যতম হয়ে আসবে। দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত নটরাজ মূর্তি এর নিদর্শন। নন্দলালের রেখাময় "মহিষ-দলনী দুর্গা" চিত্রও তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সমূয়েত ঋজুরেখার সমষ্টির দ্বারা এই ছবিতে তেজের মূর্তি গড়া হয়েছে। ছন্দ ও রেখার আনন্দে ক্রমশ এই অর্থের ভার কমে এসে এব্‌স্ট্রাক্ট রূপ কীভাবে গড়ে ওঠে, তা বোঝা যাবে, এর পরে নন্দলালের "ঢেউ" ছবিটি দেখলে। গাঢ় নীল জলের ঢেউয়ের ভঙ্গী এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ এক জায়গায় কৃষ্ণের মাথার ময়ূরপাখা হয়ে উঠেছে। ময়ূর-পাখা কোথাও আঁকা নেই, কেবল তার রঙ একটুখানি ছুঁইয়ে দেওয়া হয়েছে। রাম-কিংকরের "স্বস্তি"র মূর্তিরূপটিও স্মরণীয়।

ক্ষুধা

রামকিংকরের ছবি ও মূর্তি শুধু যে দর্শকদের আনন্দ দেয় তাই নয়, অনেক সময় তাঁদের মনে কিছু প্রশ্নও জাগিয়ে তোলে। সেইরকম দুটি প্রশ্নের উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করব।

প্রথম প্রশ্নটি হল---আপনার প্রকৃত পথ কোন্‌টি? আপনি কখনও এব্‌স্ট্রাক্ট, কখনও অন্য কিছু, কোন্‌টা আপনার পরিচয়? তিনি বলেন, "আমি ঠিক বলতে পারব না। যা ভাল লাগে, তাই করি। সব কিছুর ত অত ব্যাখ্যা চলে না। আর্ট জিনিসটা চিরদিনের ডিস্‌স্যাটিসফ্যাকসন, অহেতুকী। কোনও কিছু প্রপাগেট্‌ করবার কাজ তার নয়। কত কিছু রয়েছে পৃথিবীতে---গাছ, মানুষ, পাহাড়, শহর। একভাবেই না এঁকে, নানাভাবে আঁকলে ক্ষতি কী? রাশিয়ান আর্টে স্টেট্‌ আর স্ট্যালিন ছাড়া কথা নেই। তাই এব্‌স্ট্রাক্ট আর্টিস্টরা সব ছেড়ে চলে এসেছেন। কোন বাঁধাধরার মধ্যে থেকে আর্ট হয় না। কিন্তু তা বলে কি গান্ধীজীর ছবি করব না? করব, যদি চাই। কিন্তু গান্ধীজী আঁকলেই ফার্স্ট প্রাইজ, অন্য কিছু করলে মার খেতে হবে, তা ত চলতে পারে না। শিল্পী সব সময় পথে রয়েছে। সে চলেছে। কোথাও আটকে নেই।"

জীবনের যে প্রবল আবেগ রামকিংকর অনুভব করেন, তা তাঁর পাথরকাটা মূর্তিতে, কংক্রীটের রূক্ষ, দীর্ঘ ভাস্কর্যে ফুটেছে। ছবিতেও রেখার তীব্র আন্দোলনে, আপাতদৃষ্টিতে বেমানান রঙের পাশাপাশি যদৃচ্ছ ব্যবহারে, বিষয় নির্বাচনে, অনেকক্ষেত্রে গ্রাম্যশিল্প ও আদিম চিত্রের সরল-নিঃসঙ্কোচ অভিব্যক্তি ইত্যাদিতে খুব জোরের সঙ্গে সেই আবেগ প্রকাশিত। এখানেই তিনি তাঁর পূর্বসূরী ও সতীর্থদের থেকে স্বতন্ত্র।

লোকশিল্প ও আদিম শিল্পের সংস্কার-মুক্ত স্বতোৎসারিত ভাষা রামকিংকরের শিল্পকে স্বাভাবিক প্রাণশক্তি দিয়েছে। সেক্সপীয়রের মত তাঁর শিল্পেও "দি পপুলার ওয়ার্ডস্‌ হ্যাড দি ভিগার অব এ রিচ অ্যান্ড রোবাস্ট লাইফ।" অনেকের অনভ্যস্ত মন প্রশ্ন করে---এই উগ্রতার কী দরকার? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক রবীন্দ্রনাথের ভাষায়। "সৌন্দর্য-ভোগ মনকে জাগাবে এইটেই তার স্বধর্ম; তা না করে মনকে যখন সে ভোলাতে বসে, তখন সে আপনার জাত খোয়ায়, তখন সে হয়ে যায় নীচ। উচ্চ অঙ্গের আর্ট এই নীচতা থেকে বহুযত্নে আপনাকে বাঁচাতে চায়। লোভীর ভিড় তাড়াবার জন্যে সে অনেক সময় কঠোরকে দ্বারের কাছে বসিয়ে রাখে, এমন কি অনেক সময় কিছু বিশ্রী, কিছু বেসুর তার রচনার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কেননা, তার সাহস আছে। সে জানে, যে বিশিষ্টতা আর্টের প্রাণ, তার সঙ্গে গায়ে পড়ে মিষ্টি মিশোল করবার কোন দরকার নেই। উমার হৃদয় পাবার জন্য শিবকে কন্দর্প সাজতে হয় নি।" (যাত্রী)। রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন, "আদিকালের মানুষ তার অশিক্ষিত পটুত্বে বিরলরেখায় যে রকম সাদাসিধে ছবি আঁকত, ছবির সেই গোড়াকার ছাঁদের মধ্যে ফিরে না গেলে এই অবান্তরভারপীড়িত আর্টের উদ্ধার নেই। মানুষ বারবার শিশু হয়ে জন্মায় বলেই সত্যের সংস্কারবর্জিত সরল রূপের আদর্শ চিরন্তন হয়ে আছে; আর্টকেও তেমনি শিশুজন্ম নিয়ে অতি-অলঙ্কারের বন্ধনপাশ থেকে বারে বারে মুক্তি পেতে হবে।" (যাত্রী)।

রামকিংকর শিল্পের এই "সংস্কারবর্জিত সরল রূপের"ই সাধক। তাঁর পথ মুক্তির পথ। প্রাচীন ও আধুনিক দেশবিদেশের শিল্পরীতির সমন্বয় তিনি ঘটিয়েছেন। আশা করি, এই সম্মেলনের ফল তাঁর হাতে আরও বিচিত্র বিকাশে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।*

এই রচনাটির অনেক তথ্য রামকিংকরের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে সংগৃহীত। এবিষয়ে শিল্পী সুরেন দেও অনেক সাহায্য করেছেন। শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের "Outdoor Sculpture by Ramkinkar" লেখাটিও এই কারণে স্মরণীয়। প্রবন্ধে প্রকাশিত ফটোগুলি জিতেন্দ্রপ্রতাপের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

এক একজনের চেহারার মধ্যে এমন কিছু থাকে যার ফলে একবার দেখলেই মনে দাগ কাটে, ভোলা যায় না। অন্ধকারের মধ্যেও তাই চিনতে পারলাম।

রাত তখন ঘন হয়ে আসছে। পার্কে যারা সান্ধ্যভ্রমণের নামে চিনেবাদাম চিবোতে আসে তারা তখন ফিরতি মুখে। যুবকমন যাদের দেখে ঈর্ষা বা উল্লাস প্রকাশ করে সেই সব সুখী দম্পতিরাও তখন পরিবারের অনুপস্থিত আত্মীয়স্বজনদের সম্বন্ধে যাবতীয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব দ্বেষ উদ্গীরণ করে পুনরায় ধোঁয়াটে মন নিয়ে বাসায় ফিরে চলেছে। এ সময়টায় পার্কের ঘাসে কিংবা কাঠের বেঞ্চিতে লোকজন খুবই কম দেখা যায়।

বেঞ্চিটা দূর থেকে মনে হয়েছিল খালি আছে। কাছে আসতেই টের পেলাম, কে যেন বসে রয়েছে। পিঠ দেবার জায়গাটায় হাত রেখে এবং হাতের ওপরে মাথা রেখে যে বসেছিল, প্রথমটা মনে হয়েছিল সে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধীরে ধীরে তাই এক পাশে, একটু দূরত্ব রেখেই বসে পড়লাম। সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে লোকটা। আহা ঘুমোক! পাছে ঘুম ভেঙে যায় তার, এই ভয়ে, দেশলাই জ্বালবো কিনা সিগারেট ধরাবার জন্যে, ভাবছিলাম।

হঠাৎ চমকে উঠলাম।

মনে হল, ভদ্রলোক যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। কান পেতে শুনলাম। হ্যাঁ, কান্না। নিশ্বাসের শব্দেই কেমন যেন কান্নার আভাস।

চুপ করে বসে রইলাম। মুহূর্তের জন্যে মনে হল, উঠে পালাতে পারলেই যেন ভালো হয়। একবার আড়চোখে তাকালাম তাঁর দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে আমাকে একবার দেখে নিয়েই আবার হাতে মুখ গুঁজলেন ভদ্রলোক।

বলেছি না, এক একজনের চেহারার মধ্যে এমন কিছু থাকে, যে একবার দেখলেই মনে দাগ কাটে, অন্ধকারেও চিনতে অসুবিধে হয় না।

মুখ তুলে মুহূর্তের জন্যে তিনি তাকালেন আমার দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল সেদিনের দৃশ্যটা।

কেমন যেন রহস্য রহস্য ঠেকলো। প্রায় ছ-ফুট লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা, বয়সে প্রৌঢ়ই বলা চলে, মুখে বসন্তের দাগ থাকলেও সুশ্রী বলা যায় এমন ধরনের মুখশ্রী। কিন্তু এমন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ চেহারার মানুষ যে কাঁদতে পারে, বিশেষ করে পার্কের নির্জন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে, তা কোনদিন কল্পনাও করিনি। বরং প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল ওঁর মত সুখী মানুষ বুঝি ভূভারতে নেই।

দুপুরবেলায় আপিস থেকে বেরিয়েছি এক বন্ধুর সঙ্গে, কাছের ইস্কুলটায় বন্ধু-পুত্রের জন্যে একটা সীটের ব্যবস্থা করার চেষ্টায়। ইস্কুলে তখন বোধহয় টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে। হৈ হল্লা ছুটোছুটি করছে ছেলেগুলো সামনের রাস্তায়। হঠাৎ একখানা গাড়ি শব্দ করে এসে থামলো।

সঙ্গে সঙ্গে একদল বাচ্চা ছেলে ছুটে এলো গাড়িটার কাছে।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, স্টিয়ারিং ছেড়ে গাড়ি থেকে নামলেন ভদ্রলোক। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ, কিন্তু তার মধ্যে কোথায় যেন অফুরন্ত হাসি লুকিয়ে ছিল।

গাড়ি থেকে নেমেই পকেট থেকে রুমালটা বের করে কপাল মুছলেন তিনি, তারপর রুমালটা পাদানির ওপর বিছিয়ে বসে পড়লেন। একরাশ ছেলে তখন ঘিরে ধরেছে তাঁকে। তিনিও হাসতে হাসতে কি যেন বলছেন।

কাজ সেরে ইস্কুলের আপিসঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখনও তিনি গল্প করতে করতে বাঁ হাতের কৌটো থেকে টফি বের করে বিলি করছেন।

থামতে হল। কোলকাতা শহরে এমন দৃশ্য তো দেখা যায় না। পকেটের পয়সায় টফি কিনে এনে অপরের ছেলেকে খুশি করছেন—এ কেমন ধারার নির্বুদ্ধিতা।

ভদ্রলোক ততক্ষণে ম্যাজিক দেখাতে সুরু করেছেন। হাতের তাস উধাও করা, টফির টিনটা তখনই খালি, তখনই টাকায় ভর্তি, রুমালের রঙ লাল থেকে সবুজ, সবুজ থেকে সাদা—এমনি নানান কলাকৌশল দেখিয়ে একসময় উঠলেন তিনি।

যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন টিফিন-শেষের ঘণ্টা পড়তেই। কিন্তু ছেলের-দল তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ না গাড়িটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেদিন সত্যিই রহস্যজনক মনে হয়েছিল তাঁর ব্যবহার। মনে হয়েছিল মানুষ খুব বেশি সুখ এবং স্বচ্ছলতার মধ্যে বোধহয় স্বার্থশূন্য হয়ে অপরকেও খুশি করতে চায়।

তখন তো জানতাম না।

জানতাম না, সেই মানুষই কিনা অন্ধকারে পার্কের বেঞ্চিতে বসে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

অথচ কেন এই নিঃশব্দ কান্না তার হদিস খুঁজে পেলাম না।

তবু চুপচাপ বসে রইলাম। উঠে যেতেও মন চাইলো না।

খানিক পরেই মুখ তুলে সোজা হয়ে বসলেন ভদ্রলোক। সহজ হয়ে। আমার দিকে দু-একবার ফিরে তাকিয়ে বোধহয় বোঝবার চেষ্টা করলেন তাঁর গোপন কান্না আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিনা।

পার্কে বেড়াতে এসে কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়তো বসে থেকেছি কোন অপরিচিতের পাশে। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ করতে
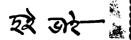
কথা বলতে ইচ্ছে হয়নি কোনদিন। এটা কোলকাতা শহর। একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসার অধিকার আছে, পাশের লোকের শান্তি ভংগ করে এক মনে পাগলের প্রলাপ বকে গেলেও আপত্তি করা যাবে না, কিন্তু অপরিচিত লোকটির সংগে কথা বলতে গেলেই তা অভদ্রতা!

পার্কটা তখন রীতিমত নির্জন হয়ে উঠেছে। সামনের গাছটার ডালে পাখা ঝটপট করছে কয়েকটা পাখি। আর পার্কের চারপাশের গ্যাসবাতিগুলোও কেমন যেন ম্লান বিষণ্ন। শুধু ঠান্ডা বাতাস আসছিল থেকে থেকে।

উঠবো কিনা ভাবছিলাম।

হঠাৎ ভদ্রলোক হাসলেন। —আশ্চর্য হয়েছেন, তাই না?

চমকে ফিরে তাকালাম।

বললাম, না না। আশ্চর্য হবো কেন?

উত্তর এলো, দোষ নেই আপনার। হঠাৎ পার্কে বসে বসে কাউকে কাঁদতে দেখলে আমিও হতাম।

সান্ত্বনা দেবার স্বরে বললাম, সকলের জীবনেই দুঃখ আছে।

হাসলেন ভদ্রলোক, অন্ধকারেও মনে হল, সে যেন হাসি নয়, কান্নারই নামান্তর। বললেন, ভগবান দুঃখ দিলে সহ্য করা যায়, কিন্তু......কথা শেষ হল না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।—আরেকদিন দেখা হবে।

একটা রহস্যের ছায়া যেন লম্বা লম্বা পা ফেলে অন্ধকার থেকে আলোর ভিড়ে মিশিয়ে গেল। মনের মধ্যে জেগে রইলো একটা দুর্বোধ্য প্রশ্ন। সে-প্রশ্নের উত্তর না জেনে শান্তি নেই যেন, স্বস্তি নেই। ভেবেছিলাম, আর বুঝি দেখা হবে না কোনদিন। জানতে পারবো না, কি এমন দুঃখ গুমরে মরে এই বলিষ্ঠ শরীরের গোপন মনে।

কে জানতো টফি বিলি করার অভ্যাস তাঁর নিত্যদিনের। কে জানতো আবার দেখা হবে!

বন্ধুর ছেলেটিকে সেদিন বৃন্দাবন মিস্ত্রিরের গলির ইস্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল।

গাড়িটা ফটকের সামনে এসে দাঁড়াতেই নমস্কার করে বললাম, কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?

ভদ্রলোক মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, মাপ করবেন, ঠিক মনে পড়ছে না।

বললাম, পার্কের বেঞ্চিতে আলাপ হয়েছিল......

দু-হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা মুঠো করে ধরলেন ভদ্রলোক। —আপনি? আপনি যে কি উপকার করেছেন আমার......

চুপ করে রইলাম। সেদিনও যারা ভিড় করে এলো, তাদের হাতে চাঁফ দেওয়া শেষ করে বললেন, আজ আমার কাজ আছে, আজ আর ম্যাজিক দেখানো হবে না। কাল দেখাবো, কেমন?

বলেই আমাকে টেনে তুললেন গাড়িতে।

সার্কুলার রোডের ওপর একখানা বিরাট বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে নামলাম। দরজা খোলাই ছিল। তোয়ালে কাঁধে বেয়ারাটা বসবার ঘর খুলে দিতে গেল।

ভদ্রলোক বললেন, না রতন, ওপরেই বসবো।

মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরের শোবার ঘরে উঠে এলাম তাঁর পিছনে পিছনে।

ঘরে ঢুকেই দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ছ-সাত বছরের ছোট্ট একটি ছেলে আর ন-দশ বছরের একটি মেয়ে। ভাইবোনে গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালজোড়া এত বড় অয়েল পেণ্টিংটা দেখেই কেমন সন্দেহ হল।

মনে হল, ছেলেমেয়ে দুটির মৃত্যুই হয়তো ভদ্রলোকের দুঃখের মূল। আর সেইজন্যেই হয়তো বৃন্দাবন মিস্তিরের গলিতে ছুটে যান প্রতিদিন। শিশুর ভিড়ে নিজের দুঃখ ভোলার চেষ্টা করেন হয়তো।

একটা চেয়ার টেনে বসতে বললেন।

বসলাম। তারপর দেয়ালের চারপাশে তাকিয়ে আরেকখানা ছবি খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না।

ভদ্রলোক হঠাৎ অয়েল পেণ্টিংটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, আমার ছেলে আর মেয়ে। আচ্ছা, এদের দেখেছেন কোথাও?

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, সে কি, হারিয়ে গেছে নাকি?

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

বললেন, না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আপনি যে কি উপকার করেছেন আমার!

অপ্রতিভ হয়ে বললাম, বার বার এ-কথা কেন বলছেন, কোন উপকার তো আমি করি নি।

—করেছেন। আপনি জানেন না, কি দুঃখের বোঝা বয়ে চলেছি আমি। আপনি সেদিন সান্ত্বনা না দিলে......

খানিক থেমে বললেন, সেদিন আমি আত্মহত্যা করতাম, আত্মহত্যার জন্যেই তৈরী করেছিলাম নিজেকে। সত্যি, এক-এক সময় মানুষ যে কত বোকা হয়ে যায়......

চুপ করে রইলাম। এ-কথার প্রসঙ্গে বলবার মত কথা খুঁজে পেলাম না।

দেরাজ থেকে একটা শিশি বের করলেন ভদ্রলোক। দেখিয়ে বললেন, আত্মহত্যাই করতাম, কিন্তু আপনার কথা শুনে জীবনের ওপর মায়া হ'ল, ভাবলাম...

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আয়নার টেবিলের দেরাজ খুলে একখানা অ্যালবাম নিয়ে এসে বসলেন।

—এই—আচ্ছা একে দেখেছেন কোথাও? দেখেননি কখনও?

অ্যালবামটা হাতে নিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম ছবিটার দিকে।

অপরূপ এক সুন্দরীর ফটোগ্রাফ। কোলে একটি ছোট্ট শিশু, আর হাঁটু জড়িয়ে ধরে আছে একটি ছোট্ট মেয়ে। এমন রূপময়ী মাতৃমূর্তি চোখে পড়ে নি

বলে দেওয়ার প্রয়োজন হ'ল না। বুঝলাম, ইনিই ভদ্রলোকের স্ত্রী।

অ্যালবামটা নিয়ে আবার পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, আমার স্ত্রীর ছবি, আমার ছেলে, মেয়ে।

ব'লে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভাবলাম, স্ত্রী হয়তো মারা গেছেন, তাই এমন হয়ে গেছেন উনি শোকে দুঃখে।

হঠাৎ মৃদু হাসি দেখা দিল ও'র মুখে। কান্নার মতই দেখাল হাসিটা।

বললেন, মেয়েদের মন...আপনি জানেন না, বারো বছর একসঙ্গে থেকেও কোনদিন বুঝতে পারিনি ও অসুখী ছিল। হঠাৎ একদিন বিকেলে কাজ থেকে ফিরে এলাম ক্লান্ত শরীর নিয়ে। আসবার সময় দু'খানা সিনেমার টিকিট কিনে এনেছিলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম, সমস্ত বাড়ি ফাঁকা। একটুকরো চিঠিও রেখে যায়নি সে। ভাবতে পারেন আপনি? বারো বছর ধরে যাকে ভালবেসে এসেছি, বারো বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও যার ভালবাসায় সন্দেহ করার কোন কিছু খুঁজে পাইনি, হঠাৎ এক সন্ধ্যায় ফিরে এসে যদি শোনেন সে চলে গেছে...

বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠল ভদ্রলোকের। ঘাম মোছার ভান করে রুমালে চোখ মুছলেন।

—প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তো বেড়াতে গেছে। কিংবা দোকানে কোন জিনিস কিনতে। চাকর দারোয়ান কেউ কিছু বলতে পারলো না। অপেক্ষা করে রইলাম সে রাত্রি। পরের দিন আত্মীয়স্বজন চেনা-জানা সকলের কাছে চিঠি লিখলাম। তারপর, তারপর ভয় হল, ভাবলাম......হ্যাঁ, পুলিশেও খবর দিলাম শেষকালে। হাসলেন ভদ্রলোক।

উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, খোঁজ পেলেন না?

—না। ছ' মাস পরে একখানা চিঠি পেলাম শুধু। তিন লাইনের চিঠি। লিখেছে, 'যাকে ভালবাসতাম, ভালবাসি তার সঙ্গেই চলে এসেছি। আমাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টায় নিজেকে কষ্ট দিও না।'

আহত বোধ করলাম। সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, সত্যি মেয়েদের মন......

হাসলেন ভদ্রলোক। বিষণ্ণ হাসি। বললেন, দুঃখ তার জন্যে নয়। স্ত্রীর দুঃখ আমি ভুলতে পেরেছি। কিন্তু আমার ছেলেমেয়ে দুটি...

দু' হাতের ওপর মাথা গুঁজে সশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ভদ্রলোক। আর সে কান্না দেখে আমার নিজের চোখও যেন ছলছল করে উঠল। বুকের ভেতর কেমন একটা দুঃসহ ব্যথা অনুভব

চুপ করে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় মাথা তুললেন ভদ্রলোক। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সেদিন কেন কেঁদেছিলাম জানেন? যে স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে গেছে তার দুঃখে নয়, ছেলেমেয়ের জন্যেও নয়...

—তবে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

বললেন, সেদিনই প্রথম খোঁজ পেয়েছিলাম ওদের। জানতে পেরেছিলাম, আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গেই চলে গেছে। খোঁজ পেয়েই ছুটতে ছুটতে গেলাম তার কাছে।

—তারপর?

—বললাম, আমি আর কিছু চাই না, শুধু ছেলেমেয়ে দুটিকে দাও। ওরা আমার সন্তান, আমি মানুষ করবো ওদের।

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললেন, যে স্ত্রীকে বারো বছর ধরে ভালবেসে এসেছি, যার ভালবাসায় কোনদিন সন্দেহ করিনি, তার চোখে সেদিন যে ঘৃণার দৃষ্টি দেখলাম, সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

ও ভাবলে, বুঝি ওকেই ফিরিয়ে আনতে চাই। তাই পাগলের মত চিৎকার করে উঠলো, বললে, 'আইনের জোরে নিয়ে যেতে চাও আমাকে? কিন্তু জেনে রাখো তা তুমি পারবে না। তার আগেই আত্মহত্যা করবো আমি, তবু তোমার কাছে ফিরে যেতে পারবো না।' হাসলাম তার কথা শুনে, ছেলেমেয়ে দুটিকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে গেলাম, তারা ভয়ে মায়ের আঁচল জড়িয়ে রইল, কিছুতেই আসতে চাইলো না। আপনিই বলুন, তারপরও আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হবে না?

উত্তর দিতে পারলাম না। কি উত্তর দেব এ-কথার! কি সান্ত্বনা দেব এ দীর্ঘশ্বাসের।

ভদ্রলোক হাসলেন, বোধ হয় আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করেই।

বললেন, আপনি যেচে সেদিন সান্ত্বনা না দিলে হয়তো আত্মহত্যাই করতাম। কিন্তু তারপরই মনে হল, এভাবে নিজেকে ধ্বংস করে লাভ নেই। প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি জেগে উঠলো মনে। ভাবলাম, ও যেমন আমার জীবন নষ্ট করেছে, ওকেও তেমনি

সুখী হতে দেবো না। সেদিন আমার স্ত্রীকে সামনে পেলে আমি খুন করতাম। এমন কি ছেলেমেয়ে দুটোকেও হয়তো...

বললাম, খুন করে বসলেও দোষ দিতাম না আপনার।

হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, কিন্তু তার আর প্রয়োজন হবে না।

—প্রয়োজন হবে না? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালেন। পরক্ষণেই হঠাৎ সচেতন হয়ে আমার দিকে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিলেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, বন্ধুদের পরামর্শে কোর্টে মামলা করলাম। বললাম, স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাই না, চাই শুধু আমার ছেলে আর মেয়ে দুটিকে। আইন আমার পক্ষে, ওরাও জানে আমার ছেলে আর মেয়েকে আমি ফিরে পাবো। তাই—

পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। একটুকরো কাগজ বের করলেন।

হাসতে হাসতে বললেন, সতী-সাধ্বী স্ত্রীর চিঠি। লিখেছে, ছেলেমেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবে না ও! লিখেছে, ওর সব দোষ ক্ষমা করে আমি যেন ওকেও ফিরিয়ে নিই। ব'লে হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললাম, মুহূর্তের ভুলের জন্যে তাঁর সমস্ত জীবনটা নষ্ট করবেন না। তাকে ফিরিয়ে আনুন আপনি।

ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, না, কক্ষণো না। তা হতে পারে না। ওকে আমি শাস্তি দিতে চাই, সমস্ত জীবন তার দুঃখময় করে তুলতে চাই আমি। আপনি জানেন না, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভোলা যায়, প্রেম ভালবাসা মুছে ফেলা যায় মন থেকে, কিন্তু সন্তান-স্নেহ যে কি, না হারালে বুঝবেন না। তাকে শিক্ষা দিতে চাই...

ব'লে স্থির হয়ে বসলেন ভদ্রলোক। তারপর স্ত্রীর চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন।

আর একটা নিঃশব্দ নিশ্চুপ অস্বস্তির মধ্যে বসে থাকতে হ'ল আমাকে। তারপর এক সময় বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আসবার সময় শুধু বললেন, আবার আসবেন।

বললাম, আসবো।

কিন্তু মনে মনে জানতাম, এ অস্বস্তিকর পরিবেশে স্বেচ্ছায় আর কোনদিনই আসবো না।

যাইও নি আর কোনদিন।

জানি না, তারপর কি ঘটেছে। জানি না, স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনেছেন কি না। কিন্তু এটুকু জানি, ছেলে আর মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না তাঁর স্ত্রী। এ অসহ্য অতৃপ্তির চেয়ে হয়তো বা আত্মহত্যাই বরণ করবেন।

যে যাই বলুক, যৌবনের ক্ষণিক মোহে পথ হারালেও যৌবনের ধর্ম হ'ল সন্তান-স্নেহ।

বহুবার ইচ্ছে হয়েছে এই বিচিত্র ভদ্রলোকটির জীবন নিয়ে গল্প লিখতে। সামান্য একটু কল্পনার রঙ মেশালে হয়তো ভালো গল্পও একটা লেখা যায়। কিন্তু অসত্যের কালিমা মাখিয়ে তাঁর চরিত্রকে বিকৃত করতে ইচ্ছে হয় না, সাহিত্যের খাতিরেও না।

চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ ধারা

পঙ্কজ দত্ত
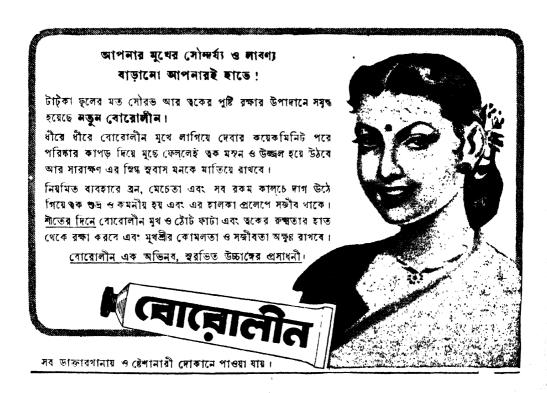
প্রথমনা মানুষের কাছে শেষ পর্যন্ত টেলিভিসনের আকর্ষণটা বড় হয়ে উঠতে পারল না। কোথায় ঘরের কোণে একা বা পরিবারের আর কয়েকজনের সঙ্গে বসে ছবি দেখা, আর কোথায় শত শত নতুন নতুন লোকের মধ্যে বসে ছবি দেখা—টেলিভিসন অনেক চেষ্টা করলে মানুষকে ঘরের সীমানায় বিরাম বিনোদনকে সহজতর করে তুলতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ও-চেষ্টা থেকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে এবং এখন এমন হয়েছে যে চলচ্চিত্রেরই ব্যাপক প্রচারে আজ টেলিভিসন হয়ে উঠেছে একটা মুখ্য মাধ্যম। নিরালা ও নিঃসঙ্গতাপ্রিয় যারা, অথবা প্রৌঢ় বয়সের যারা এমনিতেই সিনেমা আদি বাহ্যিক প্রমোদের ওপর অনুরাগ হারিয়ে ফেলেছে, শুধু তাদের কাছেই টেলিভিসনের মায়া খানিকটা সার্থক হয়ে আছে। এরা ছাড়া টেলিভিসনের স্থায়ী ও নিয়মিত ভক্ত বলতে খুব বেশী পাওয়া যায় না। টেলিভিসান রেডিওর মত বাড়িতে-বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মাঝে মাঝে বিশেষ কোন সূচীর ক্ষেত্রেই শুধু উৎসুক দর্শকের কৌতূহল চরিতার্থ করার কাজে লাগে। যেমন কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের রীলে যার প্রতিফলন সিনেমাতে পাবার কথা নয়, অথবা পেলেও দেরীতে পাওয়া যায়। টেলিভিসনের আবির্ভাবে ও প্রচলনে সিনেমার কদর চলে যাওয়ার ধারনা ততোটাই আজ অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে যতটা মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয়ে গিয়েছে রেডিওর উৎপত্তিতে সিনেমা, থিয়েটার এবং সংবাদপত্রের প্রসার ও প্রচার ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা। টেলিভিসন এখন উলটে সিনেমার প্রচারের বড় সহায়কই শুধু নয়, টেলিভিসনেরই সূচী ভর্তি করতে চলচ্চিত্রের বহুল ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে টেলিভিসন না থাকলেও এখানে তার উল্লেখের একটা তাৎপর্য আছে। আমরা ছবি তুলি আমাদের টাকায়, আমাদের দেশের শিল্প-সাহিত্য সঙ্গীতের উপাদান নিয়ে, আমাদের দেশের কলাকুশলী ও শিল্পী দিয়ে। কিন্তু ছবি তোলার যে সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি তার সবই আনাতে হয় ইওরোপ-আমেরিকা থেকে। এই সংস্রব আমাদের দেশের চলচ্চিত্রকে ইওরোপ-আমেরিকার চলচ্চিত্রের গতিপ্রগতির সূত্রে প্রভাবিত করে রেখে চলচ্চিত্রে কালের মুখে যা-কিছু বিবর্তন দেখা দেয়, তার আঁচটা স্বতঃই আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের গায়েও এসে লাগেই। কাজেই টেলিভিসন আসাতে ইওরোপ-আমেরিকার চলচ্চিত্র সেই প্রতিযোগিতাকে ঠেলে ফেলার জন্য যে সকল নতুন আকর্ষণ ও শক্তির উদ্ভাবন করেছে, আমাদের দেশের চলচ্চিত্রকেও ক্রমেই সেগুলি গ্রহণ করতে হচ্ছে। নতুন উদ্ভাবনের মধ্যে রয়েছে ছবি বহু বর্ণে রাঙানো, বড়ো ও চওড়া পর্দা এবং আপেক্ষিক শব্দ-তরঙ্গ। প্রতিটিই নানা রকমের আছে। টেকনিকলার, ডি'ল্যুক্স কলার, ক্রোমাটিকলার, ন্যাচুরালকলার প্রভৃতি কলার, গেভাকলার, ন্যাচুরাল কলার প্রভৃতি ছবি রঙ করার অনেক রকমের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে টেকনিকলার, ডি' ল্যুক্সকলার এবং গেভাকলারেরই প্রচলন বেশি। বহু ব্যয়সাধ্য হলেও আমাদের দেশে টেকনিকলারে খানতিনেক ছবি তৈরি হয়েছে এবং গেভাকলারেও তোলা হয়েছে খান ছয়েক ছবি।

অরোরা স্টুডিওতে নির্মিত অনুরূপা দেবী রচিত "মহানিশার"-র চরিত্র-চিত্রণে সন্ধ্যারাণী ও বিকাশ রায়

বর্তমানে ছবি রঙ করানোর ঝোঁকটা ক্রমশই বাড়ছে। চওড়া ও বড়ো পর্দা প্রায় সাতাশটি বিভিন্ন মাপের উদ্ভাবিত হয়, কিন্তু তার মধ্যে সিনেমাস্কোপ ও ভিস্টাভিশনই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। ভারতের বহু চিত্রগৃহ এই দুয়ের কোন-না-কোন মাপের পর্দা খাটিয়ে নিয়েছে, বিশেষ করে বিদেশী ছবির প্রদর্শন গৃহগুলির প্রায় সব কটিই এবং দিশী ছবির মহলেও ক্রমশই প্রচলন বাড়ছে। আর শব্দের ব্যাপারেও স্টিরিও-ফোনক পার্সপেক্টা জাতীয় পদ্ধতিও গুটিকয়েক বেরিয়েছে। এদিকটায় ভারতীয় চিত্রগৃহ বা স্টুডিও এখনও অবশ্য হাত দেয়নি, তবে যথেষ্ট আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়—বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনানো আর খরচ বৃদ্ধি, এই দুই অসুবিধার জন্যেই তার অবাধ প্রচলন আটকে রয়েছে।

কিন্তু একটু তলিয়ে বুঝতে গেলেই দেখা যায় যে, এসবই হচ্ছে বাহ্যিক প্রকরণ—ব্যবসাদারি চাল বললেও বলা যায়। ছবি দেখতে ভালো করতে হবে—দাও রঙ মাখিয়ে; ছবি দেখতে বড়ো হবে—দাও বড়ো চওড়া পর্দা বসিয়ে; ছবি শুনতে ভালো হবে, স্পষ্ট হবে—দাও আপেক্ষিক শব্দ-যোজনার ব্যবস্থা করে। কিন্তু এতে ছবির আত্মিক মূল্য কি বৃদ্ধি লাভ করতে পেরেছে? —ব্যবসাদারদের হাতে ছবির কারবার থাকলে তা হবেও না কোনদিনই। চলচ্চিত্র অদ্ভুত বলে নিছক কৌতূহল চরিতার্থতার পর্যায় অনেক আগেই পেরিয়ে আসা গিয়েছে। পর্দার গায়ে মানুষের ছায়া নড়েচড়ে চলে, কথা বলে, হাসে, কাঁদে, গায়—শুধু এই অকর্ষণেই ছবি দেখবার জন্য কারুরই আজ কৌতূহল জাগে না। ছবি আজ মানুষের জীবনের অঙ্গনে এসে আসন পেতে বসেছে, পৃথিবীর অগ্রগতির রথে অন্যতম সারথীর ভূমিকা আজ তার। এই নিয়েই বেঁধেছে দ্বন্দ্ব। ব্যবসাদাররা চলচ্চিত্রের সারথীর পদে অধিরোহণকে মোটেই ভালো চক্ষে দেখছেন না। চলচ্চিত্রকে তাঁরা আমোদ জোগাবার একটা ভাঁড়ের ভূমিকাতেই রেখে দিতে চান। তার জন্যে সরঞ্জাম ও সমারোহের যাকিছু, যতো পরিমাণে হোক ভরিয়ে দিতে কার্পণ্য করতে চান না। কিন্তু এমন একটা ফোর্স চলচ্চিত্রের অন্তস্থলে জমাট হয়ে উঠেছে, যা চলচ্চিত্রকে ব্যবসার আওতা থেকে দূরে হটিয়ে নিয়ে চলেছে।

ব্যবসার সামগ্রী হলেই কতকগুলো ধরা-বাঁধা ফরমুলার অধীন হয়ে পড়তে হয়ই। মনোমুগ্ধকর গান, নয়নাভিরাম নাচ, ললিত সৌন্দর্য, রোমাঞ্চকর ঘটনা, নাটকীয় পরিস্থিতি, জমকালো দৃশ্যপট, বিস্ময়কর কলাচাতুর্য, মনোজ্ঞ অভিনয় ইত্যাদি সব বাঁধাধরা কৃতিত্বে ছবিকে বিভূষিত করার দিকেই ব্যবসাদারের ঝোঁক, কারণ তাঁকে অর্থ উপার্জন করতে হবে; প্রচুর ব্যয় করে প্রচুর অর্থ চাই তাঁর। এ-নিয়ে কোন ঝুঁকি নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু টাকা উপার্জনের সুবিধে হবে বুঝতে পারলে হলিউড থেকে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে একটা বানরকে ছবিতে অভিনয় করানোর জন্যে নিয়ে আসতে দ্বিধা জাগবে না তাঁর মনে। অর্থ উপার্জনে সহায়তা পাওয়া যাবে বলে মনে হলে জলের নীচে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে চিত্র প্রদর্শনীক্ষেত্র নির্মাণ করে প্রেস-শো অনুষ্ঠিত করতেও পিছপাও নন তিনি। কতো রকমের উদ্ভট সব কাণ্ড ছবির ব্যবসাদাররা প্রয়োগ করে চলেছেন। কিন্তু এসবই হচ্ছে ছবিকে ব্যবসার আওতার মধ্যে ধরে রাখবারই চেষ্টা। তবে শেষ পর্যন্ত সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। ছবির সারথীর ভূমিকাই হচ্ছে কালের নির্দেশ। আজ পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়

সানরাইজ ফিল্মের "শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক"-এর প্রধান চরিত্রে বসন্ত চৌধুরী

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের চেয়ে বড়ো কিছু আর নেই। প্রপাগাণ্ডার জন্যে চলচ্চিত্রের চেয়ে শক্তিশালী বাহন আর কিছু নেই। পণ্যের বিজ্ঞাপনে চলচ্চিত্রের চেয়ে মনহরণকারী আর নেই। এইভাবে নানা রকমে চলচ্চিত্রের সার্থকতা নির্ণীত হতে হতে আজ এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে, যেখানে কারবার কেবল মানুষের হৃদয় ও আত্মা নিয়ে। ছবি এখন আর তামাসার জিনিস নয়; ছবি তার নিজের প্রকৃতির ও চরিত্রের সন্ধান করে নিয়েছে। তামসিক উপাচারের পদে আর তাকে ধরে রাখা যায় না।

চলচ্চিত্র একটা ইণ্ডাস্ট্রি হয়ে আর থাকতে পারছে না। ওকে নিয়ে ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে যাওয়াটাই ভুল। চলচ্চিত্রকে বলা হয় এমন একটি আর্ট, যার রূপায়নে থাকে বিভিন্ন বহু প্রতিভার সমন্বয়। কথা-কাহিনীর লেখক বা চিত্রনাট্যকার, প্রযোজক, পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী, শব্দ-সংযোজক, সুর-সংযোজক, শিল্পনির্দেশক সম্পাদক, রূপসজ্জাকর, অভিনয়শিল্পী ইত্যাদি। এটাকে বলা যায়, 'এসেমব্লি লাইনে' ফ্যাক্টরির উৎপাদন রীতি। এভাবের সৃষ্টি দিয়ে চোখকে ধাঁধিয়ে দেওয়া সম্ভব, হয়তো মনকেও আকৃষ্ট করে নেওয়া যায়, কিন্তু আত্মিক বিনোদনের কোন সম্পদই সঞ্জাত হতে পারে না এইভাবে। সিনেমা এখন আর বিলাসের দালানে সাজিয়ে রাখার জিনিস নয়। এই সত্যই চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ ধারার নির্দেশ এনে দিচ্ছে।

সংসারে গ্রন্থের যে আসন, চলচ্চিত্র তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে ক্রমশই। গ্রন্থ রচনা যেমন ইণ্ডাস্ট্রি নয়, হতে পারে না; অথবা ছবি আঁকা যেমন একটি শিল্প-প্রতিভার ব্যক্তিগত ধ্যান জ্ঞান ধারণার ফল, তেমনি হয়ে উঠছে চলচ্চিত্রও। বই লেখার সময় সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণাটাই যেমন আসল কথা, তেমনি চলচ্চিত্র সৃষ্টিটাও একজনের ব্যক্তিগত প্রেরণার গণ্ডির মধ্যে এসে পড়ছে। সেই ব্যক্তিটিই হলেন পরিচালক। ব্যবসায়িক তাগিদটা সে-প্রেরণার পিছনে কিন্তু আর রাখা চলবে না। সেই সঙ্গে ছবির কারবারের রীতি পদ্ধতিও বদলাতে বাধ্য। এখনকার মতো টাকা দাদন দিয়ে তারপর চাপ দিয়ে একখানা ছবি করিয়ে নেওয়ার রীতিটাই আর্ট সৃষ্টির প্রধানতম অন্তরায়। ছবির কারবার চালাতে দরকার পরিবেশক নয়, দরকার কনোসরদের। চারুকলার ক্ষেত্রে যেমন। ইণ্ডাস্ট্রি হয়ে রয়েছে বলেই চলচ্চিত্রকে বহুবিধ অসুবিধাকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হচ্ছে। অভিনয়ের কাজে লাগাবার জন্যে একদল লোককে ঐ পেশা নিয়ে থাকতে হচ্ছে। ওদের সংস্থানের জন্যে ছবির গল্প ও চরিত্র সেইমতো করে নিতে হচ্ছে। অথবা চরিত্র ও গল্পই যেমনই হোক, ওদেরই ভিতর থেকে অভিনয়ের জন্যে লোক বেছে নিতে হচ্ছে। তাই থেকে উদ্ভব হয়েছে 'তারকা-প্রথা'—সে এক সাংঘাতিক সমস্যা। তাছাড়া একই ব্যক্তিদেরই নানা ছবিতে দেখলে ছবির বৈশিষ্ট্যেরও হানি হতে বাধ্য। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে এই কথাটা মনে করলে যে, যখনই কোন যুগান্তকরী চিত্রসৃষ্টি হয়েছে, তার সব ক'টিরই ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিনয়ে অধিকাংশই আনকোরা নতুন লোককে। কারণ একই লোককে বার বার দেখলে তাঁর সম্পর্কে মনে একটা ধারণা গড়ে থাকবেই এবং যতোবারই তাঁকে অভিনয় করতে দেখা যাবে, প্রতিবারই তার ওপরে সঞ্চিত ধারণাটা তার সেই অভিনীত চরিত্রটির বিচারকে প্রভাবিত করবেই। এ অবস্থাটা মৌলিক চরিত্র উপস্থাপনের অন্তরায় বা চরিত্রের ওপর মৌলিকত্বের চেহারা ভালোভাবে অনুভব করাকে ব্যাহত করারই সম্ভাবনা। ছবি তৈরির অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কেও ঐ কথা। দল বেঁধে 'ইণ্ডাস্ট্রি' করে বহুর সমন্বয় ঘটিয়ে এসেম্ব্লি লাইনে চলচ্চিত্রের মতো আর্ট সৃষ্টি হয় না। আর ছবি এখন প্রকৃতই 'আর্ট' নাহলে চলচ্চিত্রের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না জন-সাধারণের কাছে।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা

মুক্তি প্রতিক্ষায়
এ. ভি. এম. প্রোডাকসন্স
চোরী চোরী
ভূমিকায়
নার্গিস • রাজ কাপুর
জনি ওয়কার • প্রাণ
ডেভিড • রাজ মেহরা
রাজা সুলোচনা •
সঙ্গীতে
শঙ্কর জয়কিষন
আগা জনি কাশ্মিরী
হজরত ও শৈলেন্দ্র
পরিচালনা
অনন্ত ঠাকুর
AVM
বসন্ত পিকচার্স
হাতিমতাই
পরিচালনা
হমি ওয়াদিয়া
পূর্ণ রঙ্গিন চিত্র
ভূমিকায়
সাকিলা • জয় রাজ
শেখ
প্রকাশ পিকচার্স
পাটরাণী
পরিচালনা
বিজয় ভট
সঙ্গীত
শঙ্কর ও জয়কিষন
ভূমিকায় :—
প্রদীপ কুমার • বৈজয়ন্তিমালা
ওম প্রকাশ • জীবন
পরিবেশক
বিলমোরিয়া এণ্ড লালজী
১১. এ এসপ্লানেড ইষ্ট. কলিকাতা. ফোঃ ২৩-২৫৭২

শ্রীশ্রীদুর্গা

(ওড়িশার প্রাচীন পট)

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।

ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে

—শ্রীশ্রীচণ্ডী

শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে

ব্লক ও মুদ্রণ ঃ বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শারদীয়া "দেশ" পত্রিকা

॥ মাতৃপূজা ॥

মা আসিতেছেন। জটাজূটসমাযুক্তা জননী। তাঁহার খড়্গ প্রভাব-নিকর-বিস্ফুরণের উগ্র আভায় আকাশমণ্ডল আলো হইয়া গিয়াছে। মায়ের শূলাগ্র-কান্তির ঝলকে দিকে দিকে বিদ্যুতের চমক ছুটিতেছে। তাঁহার পদসঞ্চারে পৃথিবী কাঁপিতেছে। পাহাড়-পর্বত টলিতেছে। সপ্তসিন্ধুর জল উচ্ছ্বসিত হইতেছে। সন্তান-স্নেহের অগ্নিময় আবর্তে প্রতপ্তা পীনোন্নতঘটস্তনী তিনি। তিনি উন্মাদিনী। মায়ের এই প্রমত্ত লীলা আমাদের চোখে পড়িতেছে কি? দেবতাগণ অগ্নিবর্ণা মায়ের ঐ মূর্তি দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা সমস্ত শক্তি নিঃশেষে দেবীর চরণে অর্ঘ দিয়াছিলেন। সন্তান-রক্তে অলক্তকচরণা দুর্গা দিকে দিকে শক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। বাংলার অন্তর আলো করিয়া একদিন জাগিয়াছিলেন বরদায়িনী এই জননী। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ঐ মায়ের মনোময় মূর্তিই প্রত্যক্ষ করেন। প্রত্যক্ষ সেই অনুভূতি চিন্ময়ত্বে গাঢ় হইয়া ঋষির চিত্তে মহামন্ত্রে স্ফূর্তি পায়। জাতি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষালাভ করে। সন্তান-ধর্ম বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ধর্ম মরণভয় হইতে জাতিকে উদ্ধার করিয়াছে। বলির উপর বলি পড়িয়াছে। দেশ স্বাধীনতা পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখ আমাদের কাটে নাই। সুতরাং সাধনা করিতে হইবে। ডাকিতে হইবে মাকে। দেখিতে হইবে দেবীর এই মূর্তি। ডুবিতে হইবে দুর্গতিহারিণী দুর্গার এই রূপে। মায়ের জ্বলাকরাল এবং অত্যুগ্র তাপকে অন্তরে মাখাইয়া বীরভাবে আমাদিগকে মাতৃ-পূজায় মাতিতে হইবে। তাঁহার সঙ্গে সমর-রঙ্গে ঝাঁপ দিতে হইবে। তবেই সন্তান-হৃদয়ে মহাশক্তি সঞ্চার করিয়া দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী জননী জাগিবেন। অভয়াকে পাইয়া আমাদের সকল ভয় ভাঙিবে। আমাদের মাতৃপূজা সার্থক হইবে।

॥ ১৩৬৩ ॥

আমাদের দেশে বহু মুসলমান কবি সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে অপূর্ব সব পদ রচনা করেছেন।

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ঘরে ঘরে কত আগমনী গান রচিত হয়েছে। এখনো মালদহ জেলার মুসলমান কবিদের রচিত গম্ভীরা কোলওয়াই প্রভৃতি গান শোনা যায়।

আমার মনে আছে দেবী দুর্গার বিসর্জন-দিনে চোখের জলের সঙ্গে অপূর্ব আনন্দ-রস মিশিয়ে সব গানের কথা। এই রকম গ্রাম্য গানও আছে।

> মণ্ডা মনোহরা
> ক্ষীরাপুলী রসকরা
> সবই তো বামন বেটা
> খায় গো মা
> তবে মইষটা কেন
> গড়াগড়ি যায় গো মা।

দেবী পূজায় ও দেবী বিসর্জনে মুসলমান রচিত অনেক পদও পাওয়া যেত। মনে পড়ে দেবী বিসর্জনের আর একটি পদ।

> তোমাকে দিয়ে বিসর্জন
> একলা ঘরে রইতে নারি।

সেই গানে কারো চোখের জল বাধা মানেনি।

এই দুর্গা পূজার উৎসবের প্রধান তিনটি অংগ—দুর্গা পূজার আগমনী গান; পূজার উৎসব, অনুষ্ঠান, গান বাজনা, খাওয়া-দাওয়া; দেবী বিসর্জন, দেবীর বিদায়-সঙ্গীত। দেবী পূজার আচার অনুষ্ঠান ছাড়া সব আমোদ-আহ্লাদে ও দেবীর বিদায় গানে কোথাও মুসলমান বন্ধুগণের যোগ দিতে বাধা নেই।

বাংলা দেশে দুর্গা পূজার উৎসবে যেমন মুসলমানেরা সামাজিক আনন্দে যোগ দিতেন তেমনই উত্তর ভারতে নানা স্থানে হিন্দুরাও মহরম ও ঈদ প্রভৃতি উৎসবে বহুদিন রীতিমত যোগ দিয়ে এসেছেন।

বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত পদাবলী যেমন দেখা যায়, তেমনই হিন্দুদের রচিত মুসলমান উৎসবের পদও দেখা যায়। অনেক মুসলমান কবি রচিত পদের পরিচয় এখন মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় ছাপা হয়েছে।

আমরা মালিক মহম্মদ জায়সী প্রভৃতি কবিগণের ঘরোয়া সব পদের পরিচয় পেয়েছি।

বাংলার বাউলদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বলে কোনো ভেদবুদ্ধি দেখিনা। আজ তাই একটি বিস্মৃত কবির আগমনী গানের পরিচয় দিতে চাই। তার স্থান ছিল পূর্ব-বঙ্গের ধনছত্র গ্রামের পাশে। কবির নাম গোলাম মোলা।

আগমনী গান বাঙালী জীবনের সুখ-দুঃখের এক অপূর্ব সম্পদ। এই আগমনী গানের রচয়িতাদের অনেকেরই জন্ম মুসলমান কুলে। তাঁদের অনেকের নামও আমরা জানিনা। কবি মীরমামুদ, কবি জাফর আলী, শেখ বুধাই, শাহ রসুল, গোলাম মোলা প্রভৃতি আগমনী গান রচয়িতার নামই বা কয়জন জানেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও তাঁদের আগমনী গান আমরা ভুলে গিয়েছি।

পূর্ববঙ্গের রাজা রাজবল্লভের বাড়ি কাশীতে এখনো আছে, পুষ্পদন্তেশ্বরে। রাস্তার অপরদিকে তাঁর দেওয়ান, জরসাবধসী রামানন্দ সরকারের বাড়ি। যতদূর মনে পড়ে, রামানন্দ সরকারের বংশজাত অতি বৃদ্ধ ভারত দেওয়ানজী ষাট সত্তর বৎসর পূর্বে কাশীবাস করতেন। প্রত্যেক পূজায় আগমনী উপলক্ষে তাঁদের মজলিসে বহু আগমনীর গান হ'ত। বয়স ছিল অল্প, তাই তখন তার মূল্য বুঝিনি! কাজেই সংগ্রহও করিনি।

অনেক পরে ঐ মজলিশের সদস্য ছকু ঠাকুর কালীমোহন মুখার্জি প্রভৃতির কাছে সামান্য কিছু আগমনী গান সংগ্রহ করি। রচয়িতা মুসলমান হলেও বাউল ছিলেন। তাঁদের বাউল গুরুদের নাম শেখ মদন, রসুল শাহ প্রভৃতি। গঙ্গারাম প্রভৃতি হিন্দু নামও এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। প্রসন্নতা ও সরলতা সেইসব গানের নিজস্ব সম্পদ।

কিছুদিন পূর্বে গোলাম মোলার একটি আগমনী গান আমার একটি পুরাতন খাতায় দেখতে পাই। সেই গানটি আমি আজ সকলের কাছে উপস্থিত করতে চাই।

এই গানটিই গোলাম মোলার পরিচয়। অধিবাসী ছিলেন। তাঁর রচনার মধ্যে মেউয়া, কালেম, হরইল, কোরা প্রভৃতি পাখীর নাম পাই। পূর্বের কবি গোবিন্দ-দাস ছাড়া আর কোনো লেখকের রচনায় এইসব পাখীর নাম পাই নাই।

আগমনী গানে আমার দেবীর জন্য ব্যাকুলতার সঙ্গে সঙ্গে তখনকার দিনের কন্যাবিচ্ছেদ-কাতরা দুঃখিনী মায়েদের একটি আন্তরিক পরিচয় পাই।

আগমনী

বিল ভরা থৈ থৈ গাঙ কূলে কূল।
সমলে শাপলা শালুক জলে তরে[১] পদ্মফুল ॥
কালেচা সরইল মেউয়া রইল ডাকে ডাহুক জোড়া।
ভেলে[২] বইসা মাউচ্ছা রাঙা বিলে ডাকে কোরা ॥
খেতের ঝোড়ে আইয়া কু কু চখা চখী চরে।
মনের দুঃখ চাপতে গিয়া পরান ফাইটা মরে ॥
নিশুইত রাতে কোরালের কুই পহরে পহরে।
গৌরী গৌরী কইরা আমার পরান মন পোড়ে ॥

গেছে কবে গৌরী আমার, আর তো দেখা নাই।
ক্ষুধায় তারে কে দেয় দানা; কেমনে আমি খাই ॥
শীতের কাঁথা পায়নি গৌরী পিন্ধনে তার তেনা।
সেই যে শুইয়া নয়ন ঝোরে ভিজ্যা যায় যে ডেনা॥
এমন যে কেশ আছিল মায়ের কে দেয় তারে তেল।
পাটের ফেউরাত যেনরে ওরে ভাবতে লাগে শেল ॥
দুঃখের কথা জিগায় তারে এমন তো কেউ নাই।
সবই মিলে, বাধার ব্যথিত বিচারাইল্যো না পাই॥
বৈশাখেতে হিজলের ফুলে ঝরে কেবল তারা
বর্ণ তারা।
গৌরীর লাইগা ঝরে আমার দুই নয়নের ধারা॥
জারঐল এখন ভরস ফুলে শেফাইল ঝরে গাছে।
বাউনা গোটা
ফুলের গন্ধে পূজা পূজা, কেমনে পরান বাঁচে ?॥
ভরা নদী আইজ কালে কাল, ভরা বিল আর খাল।
দুঃখে ভরা পরান আমার কেমনে দেই সামাল ॥

পালের রাশি লইয়া বসি নাইয়ারা গায় গান।
আসে নাকি গৌরী আমার, চইমকা উঠে প্রাণ॥
ঐ পাড়েতে কালা কাছাড় কেমনে কিনুম ন্যায়্যা।
গৌরীরে মোর আনে নাকি ঐ গাঙ বায়্যা ॥
মোলা গোলাম মোছে নয়ন কেবা দিব ডাও[৩]।
কোন বা নায়ে গৌরী আমার, বায় তো কতই নাও॥

---

১ স্থলে
২ মাছ ধরবার জালের জন্য বাঁশের কাঠামো
৩ আঁশ

চণ্ডীর শব্দ মূর্তি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
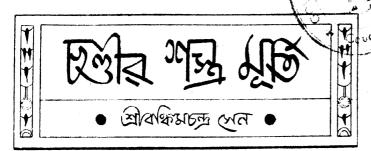
শ্রীশ্রীচণ্ডী এতদ্দেশে সপ্তশতী স্তব বলিয়া কীর্তিত হয়। চণ্ডী প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত ও উত্তম চরিত এই তিন অংশে বিভক্ত। মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী তিন চরিত্রের যথাক্রমে তিন জন দেবতা। প্রথম চরিতে মধুকৈটভ-বধে ব্রহ্মার স্তুতি, মধ্যম চরিতে মহিষাসুর-বধে শক্রাদির স্তুতি, দেবীসূক্ত সংবাদে 'নমস্তস্যৈ স্তুতি' এবং উত্তর চরিতে শুম্ভবধের অবসানে নারায়ণী স্তুতি—এই কয়েকটি স্তুতির অর্থানুভূতির উদ্দীপ্তিতে দেবীমাহাত্ম্য প্রকটিত।

চণ্ডমাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে, দেবগণের মধ্যে যেমন হরি, স্তবসমূহের মধ্যে সপ্তশতীর সেইরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য। হরি অখিলামরময়, ভাগবতের গজেন্দ্রমোক্ষ-লীলায় এই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। তিনি নিখিলাত্মা পুরুষ, এজন্য হরিতত্ত্বের অনুভূতিতে সর্বদেবতার প্রীতি সাধিত হয় এবং সরলভাবে পূর্ণতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। সপ্তশতী ভগবত্তত্ত্বের নিখিলাত্ম-ভাব অন্তরে জাগ্রত করে, তৎসাধকের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে সকল শাস্ত্রে একই দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে। স্বাধ্যায় বা শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্র অধীত হইলে শাস্ত্র-সমূহের অন্তর্গূঢ় ভাব মনকে আসিয়া স্পর্শ করে; তখন শাস্ত্র তত্ত্বের সার মন্ত্রে অভিব্যক্ত হয়। প্রত্যুত শব্দসমূহের বৈয়াকরণ বিচার সে অবস্থায় আর থাকে না। এলটি সংবেদন মনকে সাড়া দেয়। আত্মতত্ত্ব মনকে উজ্জীবিত করিতে থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন—এক আত্মাকেই জানো। কথার জাল হইতে মনকে মুক্ত কর। কারণ বহু শব্দের বিচার-বিবেচনায় তোমাদের মন বিভ্রান্ত হইবে। চণ্ডী এই হিসাবে শাস্ত্র নহে; প্রত্যুত মন্ত্র। চণ্ডীতে উপদেশ নাই, থাকিলেও তাহা গৌণ। চণ্ডীপাঠে ভগবৎ তত্ত্বের আত্মরসেরই উন্মেষ মনকে আসিয়া স্পর্শ করে। বৈখরী স্তর ছাড়িয়া মধ্যমা, মন্ত্র সম্পাদিত এবং তাহারও পরে পরা স্তরে মনকে উদ্দীপ্ত করে। এইভাবে ভগবৎ-বুদ্ধি লয় হইয়া আত্মার সংযোগসূত্র আমাদের পক্ষে সাধ্য হয়। অন্তরের দৃষ্টি খুলিতে খুলিতে অভীষ্টের সহিত চিত্ত তখন নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় মিলিতে চায়। এমন মিলনেই মায়ের লীলায় দোল, অন্য বোল তখন আর গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতে পারে না। সাধক মায়ের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। মন্ত্র সে অবস্থায় পরিণত হয় নামে এবং নামের মাধুর্য বীর্যে ডুবিলেই আমরা পূর্ণকাম হইতে পারি।

মাতৃসাধক গোবিন্দ রায় দেবী মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই সত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি গাহিয়াছিলেন—'দশভুজা রূপ দেখি ভেবেছ রূপের শেষ? কিন্তু তাহা নয়—'অন্তরে দেখিলে মায়ের অনন্ত বেশ উপলব্ধি করিবে। তখন তোমার জ্ঞানের বিচার বিলুপ্ত হইবে। মায়ের ভাবটি ধরিতে গেলে জ্ঞানের আলো ওঁকারে মিলাইয়া যাইবে। মনের সব সম্পর্কে বাজিবে প্রণব। ওঁকার মন্ত্র বীজ। সেই বীজে নিজবোধের অনুভূতি অন্তরে উদ্দীপ্ত হইলে নাম জাগে এবং সেই অবস্থায় সর্বত্র ইষ্ট-দেবতার স্ফূর্তি ঘটে। ফলত চণ্ডীর স্তবের গতি প্রণবের দিকে। দেবীমাহাত্ম্যের তিন চরিতে মনের তারে তারে জড়াইয়া ওঁকারেরই ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে এবং সেই অনাহত ধ্বনিতে আমাদের মন বুদ্ধি ডুবিয়া যায়; আমরা মাকে সর্বঘটে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাই। এই হিসাবে দেবীমাহাত্ম্যকে সাধনার দিক হইতে সিদ্ধোপায় বলা চলে। সাধ্য উপায়ের পথে সিদ্ধি কৃচ্ছ্রতাসাপেক্ষ, কিন্তু সিদ্ধোপায়ে সাক্ষাৎ-সম্পর্কেই অভীষ্ট লাভ ঘটে। মন্ত্রস্বরূপে দেবীমাহাত্ম্য আমাদের মনকে শুদ্ধ করিয়া বিশ্বজননীর সংরাধনা আমাদের পক্ষে সিদ্ধ করিয়া তোলে। এইভাবে যিনি বিশ্বজগৎপ্রসবিনী, সমস্ত জগতের যিনি হেতুভূতা সনাতনী, যিনি গুণাতীতা, ত্রিগুণা স্বরূপে আমরা বিকারশীল বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যেই তাঁহাকে জানিতে চিনিতে সমর্থ হই এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করি।

জড়া এই প্রকৃতি। এখানে আমরা যে আশ্রয় অবলম্বন করিতে যাই, তাহাই ভাঙিয়া পড়ে। যাহাকে আমরা আপনার বলিয়া স্বীকার করিতে উদ্যত হই, সে আমাকে বিকারের মধ্যে লইয়া যায়। কালসমুদ্রের মধ্যে আমরা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। ইহার কূল কোথায়? চারিদিকে আমাদের অন্ধকার। কোন বাতিই এই দুস্তর অন্ধকার হইতে আমাদের নিস্তার সাধন করিতে পারে না।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এমনই অসহায় অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে

আমরা প্রত্যেকেই এক একজন প্রজাপতি। আমরা সকলেই সৃষ্টি করিতেছি। সৃষ্টির বেদনা আমাদের সকলেরই অন্তরে রহিয়াছে এবং সৃষ্টির সেই অব্যক্ত বেদনার তাড়নায় আমরা জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া নিজেদিগকেই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু কতদিন অন্ধকারের পথে এই আনাগোনা, জন্ম-মরণের এই যাতনা? ইহার কি অবসান নাই? ব্রহ্মা সৃষ্টির চেতনার মধ্যে এই বেদনাই একান্তভাবে উপলব্ধি করিলেন। তিনি বুঝিলেন, আমি হারা-উদ্দেশে এই যে সৃষ্টির পথে চলিতেছি, এই সৃষ্টি পাপীয়সী। এই পথে আত্মাকে উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। নিবৃত্তি ইহাতে ঘটে না। অহংকৃত কর্মের এই যে বন্ধন, তাহার তীব্রতা নিতান্ত স্থূলতায় তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। কামনার দানবী মূর্তি তাঁহার দৃষ্টির পথে নগ্নতায় ধরা পড়িয়া গেল। তিনি দেখিলেন, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান—কামনার এই দুই আকারে তাঁহাকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। তাঁহার মনের মূলে স্থিতির কোন ভিত্তি মিলিতেছে না। বস্তুত দেহাভিমানকে আশ্রয় করিয়া মধুকৈটভ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। কালের দোলে দোলে মহাকালীর ধ্বংসলীলা তাঁহার দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইতেছে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীভগবান অর্জুনকে যেমন লোকক্ষয়কৃৎ রূপ দেখাইয়াছিলেন ব্রহ্মা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন সেই রূপ। কোথায় গিয়া তিনি লুকাইবেন? নিবিড় আঁধারে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি মহাকালীর চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। করজোড়ে বলিলেন, তুমি আমার মা, তুমি তোমার নিজের উদার প্রভাবে আমাকে রক্ষা কর। তিনি মায়ের পায়ে পড়িলেন। দেবীর কৃপা মিলিল। তিনি আসিলেন, বলিলেন, দেখো—আমি আছি তোমার আশ্রয়-স্বরূপে আমার নারায়ণী শক্তি তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। ব্রহ্মার মন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। মন্ত্রের প্রথম মহিমা খুলিল। "অনিত্যং অসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাং" গীতার এই বাণী চণ্ডীর মন্ত্রে মূর্তি লাভ করিল।

কিন্তু ইহাই তো সব কথা নয়। কারণ মন্ত্রের আত্মা তখনও মিলে নাই। মন্ত্র নাম হয় নাই। সব জুড়িয়া মা জাগেন নাই। সুতরাং অনুশীলনের পথে চিত্তকে অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত করিয়া মন্ত্রের অভিব্যক্তি ঘটিতে থাকিল। মনের মূলে সনাতন সত্য রহিয়াছে, ইহা বুঝা গেল বটে; কিন্তু মনকে সেখানে লাগাইতে গেলেই সে ছুটিয়া আসে! প্রবল ইন্দ্রিয়নিচয় মনকে আকর্ষণ করিয়া নীচে টানিয়া আনে। মনের জোর কই? মন স্বারাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে অসুরের দল। স্বাভাবিক শক্তিতে মনের উজ্জীবন এবং তাহার ফলে জীবের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে স্বরূপ ধর্মের উপলব্ধি এইরূপ অবস্থায় অসম্ভব। মনোবৃত্তির অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ মোহরূপ মহিষাসুরের প্রভাবে স্বর্গ হইতে নিরাকৃত হইয়াছেন। নন্দনকানন অসুরের অধিকারে, সুতরাং মায়ের পূজা সম্পন্ন হইবে কিভাবে? মাকে না পাইলে সন্তানের দৈন্য তো কোনদিনই দূর হইবে না! দেবীমাহাত্ম্যের মধ্যম চরিতে অসুরের স্থূল প্রভাব হইতে মনের মূলকে মুক্ত করিবার মন্ত্র-মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্র এই স্তরে মনের মূল হইতে অসুরের উপদ্রব স্তব্ধ করিয়া দেয় এবং সাধক প্রাণধর্মের উজ্জীবন উপলব্ধি করেন। জড়-জীবনের দৈন্য হইতে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ভোগের রাজ্যে মনোবৃত্তির একটি সঙ্গতি পান। বিশ্বপ্রকৃতিগত মরণের বিভীষিকা কাটিয়া গিয়া প্রীতির অনুভূতি এক্ষেত্রে সাধকের অন্তরে জাগে।

কিন্তু এই স্তরেও নিবৃত্তি নাই, কারণ সাধক এই ক্ষেত্রে যে সুখ উপলব্ধি করেন, তাহাও একান্ত সুখ নয়। তাহা উপহিত অর্থাৎ আকারে কিছু সূক্ষ্ম হইলেও তাহা স্বার্থের সহিতই সংশ্লিষ্ট। ব্রহ্মলোকের স্থায়িত্ব নাই; দেবলোকের সুখ তো নিতান্তই অনিত্য। আত্মাকে অব্যবহিত একাত্মবোধে উদ্দীপ্ত না করিতে পারিলে শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সেই অবস্থাতেও পরাভবের কারণ আসিয়া জুটে এবং মন্ত্রসাধনায় ব্যথিত পুরুষের পক্ষে এই আশঙ্কা জড় পার্থিব সুখের অপেক্ষাও ভয়ংকর আকারে দেখা দেয়; কারণ ইহা পরধর্ম। ফলত মন্ত্র-চৈতন্যের ফলে চিত্তে আত্ম-চৈতন্য উদ্ভিন্ন হইলে সাধক সকল বন্ধন ক্ষিপ্রবেগে খণ্ড খণ্ড করিয়া আগাইবার জন্য আকুল হইয়া পড়েন। অহংকার বা অভিমানের একটু টানও তখন শত শত শূলের আঘাতে মর্মমূলকে পীড়িত করিতে থাকে।

দেবী-মাহাত্ম্যের উত্তর চরিতে মন্ত্রানুভূতি সাধককে পরমা স্তরে লইয়া যায়। দেবতত্ত্বে বিবিধ লিঙ্গের ভেদাভিমানগত আসঙ্গ বা লিপ্সার আকর্ষণ তখন আর থাকে না। ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, নরসিংহী, কৌমারী দেবী বিভিন্ন দৈবশক্তির অখণ্ড এবং এক রসে রঙ্গময় অঙ্গ লইয়া সাধকের কাছে আসিয়া দাঁড়ান; হাসিয়া হাসিয়া সন্তানকে কোলে জড়াইয়া তিনি ঘোষিয়া মিলিয়া বলেন—একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। প্রকৃতপক্ষে দেবী এক, দেবী বাহু। একেরই বহুত্ব। ইহাই দেবী-মাহাত্ম্য—তিনি এক হইয়াও বহু হইয়াছেন, সর্বঘটে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মন্ত্র-মাহাত্ম্যের আত্মরসে চিত্ত ভরিয়া উঠিলে চরাচরে সর্বত্র মায়েরই মাধুর্য উপলব্ধি হয়, তখন মায়ের ব্যাপ্ত অনুভূতি জীবনে সত্য হয় এবং তাঁহার প্রণতিতে পরিস্ফূর্ত মনোধর্মে আমরা মায়ের ছেলে হই। তন্ত্রময়ী চণ্ডী মায়ের নাম আমাদের জীবনে সত্য করে। চণ্ডী মায়েরই মন্ত্রমূর্তি। ইহার অনুশীলন করিতে করিতে নামে মন্ত্রে অভেদ জ্ঞান হইলে ত্রিবৃত্তের বিস্তারক্রমে অম্মা, উমা পরে ও মা—অর্থাৎ যাহা কিছু সকলই মা, তখন যং যং হি দৃশ্যং খলু, দৈত্যা দুর্গা দুর্গা [illegible]

দুই সিংহ
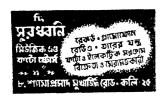
বেচারাম সরকার খুব ধনী লোক, যুদ্ধের সময় কনট্রাক্টরি করে প্রচুর রোজগার করেছেন। এখন তাঁর কারবার বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু তার জন্যে খেদও নেই। বেচারামের লোভ অসীম নয়, তিনি থামতে জানেন। যা জমিয়েছেন তাতেই তিনি তুষ্ট; বরং ব্যবসার ঝঞ্ঝাট আর পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এখন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

বেচারাম সুশিক্ষিত নন। তাঁর পত্নী সুবালা সেকেলে পাড়াগেঁয়ে মহিলা, একটু আধটু গল্পের বই পড়েন, তাও সব বুঝতে পারেন না। তাঁদের দুই সন্তান সুমন্ত আর সুমিত্রা কলেজে পড়ছে, তাদের রুচি আধুনিক, বাপ-মায়ের কথাবার্তা আর চালচলনে লজ্জা পায়। তারা স্পষ্টই বলে—বাবা কেবল টাকাই রোজগার করেছেন, শুধু পঞ্জাবী গুজরাটী মারোয়াড়ী আর বড়সায়েব ছোটসায়েবদের সঙ্গে মিশেছেন, কালচার কৃষ্টি সংস্কৃতি কাকে বলে জানেন না। আর মা তো কেবল সেকরা আর গহনা আর গোছা গোছা পান আর জরদা-সুরতি নিয়েই আছেন। বাবা, তুমি তোমার ওই সেকেলে ঝোলা গোঁফটা কামিয়ে ফেল, চুল ব্যাক-ব্রশ করতে শেখ। এখনও তো তেমন বুড়ো হও নি, একটু স্মার্ট হও। আর মা, তোমার দাঁতের দিকে তো চাওয়া যায় না, পান-দোক্তা খেয়ে আতা-বিচির মতন কালো করেছ। সব তুলে ফেলে নতুন দাঁত বাঁধাও। আর তো বাবার কাজের চাপ নেই, এখন তোমরা দুজনে চালচলন বদলাও, সভ্য সমাজে যাতে মিশতে পার তার চেষ্টা কর।

বেচারাম আর সুবালা অতি সুবোধ বাপ-মা। ছেলে-মেয়ের কথা শুনে হেসে বললেন, বেশ তো, এতদিন আমরা তোদের মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, এখন তোরাই আমাদের তালিম দিয়ে শুধরে নে।

বাপ-মাকে অভিজাত সভ্য সমাজের যোগ্য করবার জন্যে ছেলে-মেয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেল। বিখ্যাত ক্লাব 'সজ্জন সংগতি'র নাম আপনারা শুনে থাকবেন। তার সেক্রেটারি কপোত গুহ বার-অ্যাট-ল আর তাঁর স্ত্রী শিঞ্জিনী গুহর সঙ্গে সুমন্ত আর সুমিত্রার আলাপ আছে। দুজনে গুহ দম্পতিকে ধরে বসল তাঁরা যেন বেচারাম আর সুবালাকে পালিশ করবার ভার নেন। কপোত আর শিঞ্জিনী সানন্দে রাজী হলেন এবং বেচারামের বাড়িতে ঘন ঘন আসতে লাগলেন। কর্তার তালিমের ভার মিস্টার গুহ আর গিন্নীর ভার মিসিস গুহ নিলেন। বেচারাম কৃপণ নন, নিজেদের শিক্ষার জন্যে উপযুক্ত মাসিক দক্ষিণার প্রস্তাব করলেন। কপোত গুহ প্রথমে ভদ্রোচিত কুণ্ঠা প্রকাশ করে অবশেষে নিতে রাজী হলেন। ঘর সাজানো, খাবার ব্যবস্থা, পোশাক, গহনা, কথাবার্তার কায়দা, সব বিষয়েই সংস্কারের চেষ্টা হতে লাগল। বেচারাম গোঁফহীন হলেন, ব্যাক-ব্রশ করলেন, বাড়িতে ধুতির বদলে ইজার পরতে লাগলেন। কিন্তু সুবালা কিছুতেই পান-দোক্তা ছাড়লেন না, দাঁত বাঁধাতেও রাজী হলেন না। শিঞ্জিনী বার বার সতর্ক করে দিলেও সুবালার গ্রাম্য উচ্চারণ দূর হল না।

সম্প্রতি বিম্বিসার রোডে বেচারামবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি হয়েছে, তার প্ল্যান কপোত গুহই আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন। গৃহপ্রবেশ হয়ে যাবার কিছুদিন পরে সুমন্ত বলল, বাবা, এবারে বাড়িতে একটা পার্টি লাগাও। তোমার আত্মীয় কুটুম্ব বড়-সায়েব ছোট-সায়েব লোহাওয়ালা সিমেন্ট-ওয়ালা ওরা তো সেদিন চর্ব্য চুষ্য ভোজ খেয়ে গেছে, ওদের

ডাকবার দরকার নেই। পার্টিতে শুধু বাছা বাছা লোক নিমন্ত্রণ কর।

বেচারাম বললেন, আমার তো বাপু রাজা-রাজড়া আর বনেদী লোকের সঙ্গে আলাপ নেই, গায়ে পড়ে নিমন্ত্রণ করতেও পারি না। দু-একজন মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁদের বলতে পারি। গুহ সায়েব কি বলেন?

কপোত গুহ বললেন, অ্যারিস্টোক্র্যাটদের এখন নাই বা ডাকলেন, দিন কতক পরে তারা নিজেরাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ব্যস্ত হবে। আমি বলি কি, বাড়িতে নামজাদা হোমরাচোমরা সাহিত্যিকদের একটা সম্মিলন করুন, জাঁকালো টি-পার্টি। যদি দু-একটি সিংহ আনবার ব্যবস্থা হয় তবে সকলেই খুব আগ্রহের সঙ্গে আসবেন।

—বলেন কি মিস্টার গুহ, সিংহ কোথায় পাব?

—সিংহ বুঝলেন না? যাকে বলে লায়ন। অর্থাৎ খুব নামজাদা গুণী লোক, যাকে সবাই দেখতে চায়।

সুমন্ত বলল, লায়নের চাইতে লায়নেস আরও ভাল। যদি দু-একটি এক নম্বরের সিনেমা স্টার আনতে পারেন, এই ধরুন হ্লাদিনী মণ্ডল আর মরালী ব্যানার্জি—

কপোত গুহ মাথা নেড়ে বললেন, ঘরোয়া পার্টিতে ও রকম সিংহিনী আনা চলবে না, আমাদের সমাজ এখনও অতটা উদার হয় নি। তা ছাড়া সাহিত্যিকদের মধ্যে বুড়ো অনেক আছেন, তাঁরা একটু লাজুক, হয়তো অস্বস্তি বোধ করবেন। সাহিত্যিক সিংহিনী পাওয়া গেলে ভাল হত কিন্তু এখন তাঁরা দুর্লভ। কবে পার্টি দিতে চান?

সুমন্ত আর সুমিত্রা বলল, সরস্বতী পুজোর দিন পার্টি লাগান, বেশ হবে।

কপোত গুহ বললেন, উঁহু, সেদিন চলবে না, সাহিত্যিক সুধীদের নানা জায়গায় বাণীবন্দনায় যেতে হবে। দু-তিন দিন পরে করা যেতে পারে।

বেচারাম বললেন, বেশ, পঁচিশে জানুআরি হল রবিবার, সেই দিনই পার্টি দেওয়া যাক। কাকে কাকে ডাকবেন?

—শিঞ্জিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে ফর্দ করব। বেশী নয়, জন পঁচিশ-ত্রিশ হলেই বেশ হবে। এখন যাঁদের নাম মনে পড়ছে বলি শুনুন। বটেশ্বর সিকদার আর দামোদর নশকর গল্পসরস্বতী এঁরাই হলেন এখনকার লিটেরারি লায়ন, এই দুই সিংহকে আনতেই হবে।

সুমিত্রা বলল, ওঁদের দুজনের বনে না শুনেছি।

—তাতে ক্ষতি হবে না, এখানে পার্টিতে এসে তো ঝগড়া করতে পারবেন না। তার পর গিয়ে রাজলক্ষ্মী দেবী সাহিত্যাম্বা[illegible]কে বলতে হবে, উনি সিংহিনী না হলেও ব্যাঘ্রিনী বটেন। সেকেলে আর একেলে কবি গোটা চারেক হলেই চলবে, কবিদের আকর্ষণ গল্পওয়ালাদের চাইতে ঢের কম। প্রগামিনী পত্রিকার সম্পাদক অনুকূল চৌধুরী মশায়কে সভাপতি করা যাবে। আর কালাচাঁদ চোঙদারকে তো বলতেই হবে।

সুমন্ত প্রশ্ন করল, তিনি আবার কে?

—জান না? দুন্দুভি পত্রিকার সম্পাদক।

সুমিত্রা বলল, সেটা তো শুনেছি একটা বাজে পত্রিকা।

—মোটেই বাজে নয়, বিস্তর পাঠক। প্রতি সংখ্যায় বাছা বাছা নামজাদা লেখকদের গালাগাল দেওয়া হয়, লোকে খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে।

—পাঠকেরা রাগ করে না?

—রাগ করবে কেন। নামী লোকের নিন্দে সকলেরই ভাল লাগে। সেকালে যে সব পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করত, তাদের বিস্তর পাঠক জুটত। কবির ভক্তরাও পড়ে বলত, হে হে হে, কি মজার লিখেছে দেখ! তবে কালাচাঁদ চোঙদারের একটা প্রিনসিপ্‌ল আছে, ছোটখাটো লেখকদের গ্রাহ্য করে না, আর যে সব বড় বড় লেখক নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দেন তাঁদের ও রেহাই দেয়।

—বার্ষিক বৃত্তি কি রকম? ব্ল্যাকমেল নাকি?

—তা বলতে পার। শুনেছি দামোদর নশকর প্রতি বৎসর পুজোর সময় কালাচাঁদকে আড়াই শ টাকা দেন। উনি যে গল্পসরস্বতী উপাধি পেয়েছেন তা কালাচাঁদেরই চেষ্টায়। বটেশ্বর সিকদার একগুঁয়ে কঞ্জুস লোক, এক পয়সা দেন না, তাই দুন্দুভির প্রতি সংখ্যায় তাঁকে গালাগাল খেতে হয়। তবে কালাচাঁদ উপকারও করে। জন তিন-চার ছোকরা কতকগুলো অশ্লীল বই লিখেছিল, কিন্তু তেমন কাটতি হয় নি। তারা কালাচাঁদকে বলল, দয়া করে আপনার পত্রিকায় আমাদের ভাল করে গালাগাল দিন, আমাদের লেখা থেকে চয়েস প্যাসেজ কিছু কিছু তুলে দিন। বেশী দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই, পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, তাই নিন সার। কালাচাঁদ রাজী হল, তার ফলে সেই বইগুলোর কাটতি খুব বেড়ে গেল। তার পর গিয়ে দামামা পত্রিকার সম্পাদক গোরাচাঁদ সাঁপুইকেও বলতে হবে। সে ছোকরা ব্ল্যাকমেল নেয় না, তবে বড়লোক লেখকদের টাকা খেয়ে তাদের রাবিশ রচনার প্রশংসা ছাপে। তা ছাড়া প্রতি সংখ্যায় কালাচাঁদকে চুটিয়ে গাল দেয়। যাক ও সব কথা। আমি কালকেই ফর্দ করে ফেলব—কাদের ডাকতে হবে, কি খাওয়ানো হবে, বসবার কি রকম ব্যবস্থা হবে—সবই স্থির করে ফেলব।

নির্দিষ্ট দিনে প্রীতিসম্মিলন বা টি-পার্টির আয়োজন হল। বাড়ির সামনের মাঠে শামিয়ানা খাটানো হয়েছে, ছোট ছোট টেবিলের চার পাশে চেয়ার সাজিয়ে নিমন্ত্রিতদের চা খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। শামিয়ানার এক দিকে বেদীর উপর সভাপতি অনুকূল চৌধুরী, দুই সিংহ অর্থাৎ প্রধান অতিথি বটেশ্বর আর দামোদর, রাজলক্ষ্মী দেবী, এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লোক বসবেন। সভায় বক্তৃতা বিশেষ কিছু হবে না, শুধু বেচারাম অভ্যাগতদের স্বাগত জানাবেন, তার পর অনুকূল চৌধুরী গৃহস্বামীর কিঞ্চিৎ গুণকীর্তন করে তাঁর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেবেন। আশা আছে বটেশ্বর আর দামোদরও বেচারামের কৃতিত্ব আর বদান্যতা সম্বন্ধে কিছু বলবেন।

সভাপতি এবং দুই সিংহের জন্যে তিনটি ভাল চেয়ার আনা হয়েছে, একটি [illegible]

কাশ্মীরী আখরোট অর্থাৎ ওআলনট কাঠের। প্রথম চেয়ারটির পিছন দিকে একটু বেশী উঁচু আর নকশাদার সেজন্যে খুব জাঁকালো দেখায়। কপোত গুহ একই রকম তিনটি চেয়ার আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যোগাড় করতে পারেন নি। শামিয়ানার নেপথ্যে চড়কডাঙা স্ট্রিংব্যাণ্ডের তিনজন বেহালা-বাদক মোতায়েন আছে। তারা খুব আস্তে বাজাবে, যাতে অতিথিদের কথাবার্তার ব্যাঘাত না হয়।

নিমন্ত্রিত লোকেরা ক্রমে ক্রমে এসে পৌঁছুলেন। বেচারাম, তাঁর ছেলে-মেয়ে, এবং কপোত আর শিপ্রানী গুহ অতিথিদের সমাদর করে বসিয়ে দিলেন। বেচারাম-গৃহিণী সুবালা কিছুতেই এই দলের মধ্যে থাকতে রাজী হলেন না, তিনি রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে ফিসফিস করে একটু আলাপ করেই সরে পড়লেন এবং মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। প্রায় সকলের শেষে বটেশ্বর সিকদার আর দামোদর নশকর উপস্থিত হলেন। দৈবক্রমে এঁদের আগমন এক সঙ্গেই হল, প্রত্যেকের সঙ্গে গুটি কতক কমবয়সী খাস ভক্তও এল। বেচারাম আর কপোত সসম্ভ্রমে অভিনন্দন করে দুই মহামান্য সিংহকে শামিয়ানার ভিতরে নিয়ে গেলেন।

সভাপতি অনুকূল চৌধুরী আগেই এসেছিলেন। তিনি একটি কাশ্মীরী চেয়ারে বসলেন। বটেশ্বর বয়সে বড়, সেজন্য কপোত গুহ তাঁকে চন্দন কাঠের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। সুমিত্রা তাঁর গলায় একটি মোটা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিল। পাশের কাশ্মীরী চেয়ারটা দেখিয়ে কপোত গুহ দামোদরকে বললেন, বসতে আজ্ঞা হ'ক। দামোদর বসলেন না, মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কপোত গুহ আবার বললেন, দয়া করে বসুন সার। দামোদর ভ্রূকুটি করে উত্তর দিলেন, ও চেয়ারে আমি বসতে পারি না।

সভায় একটা গুঞ্জন উঠল। জন কতক অতিথি দুই সিংহের কাছে এগিয়ে এলেন। দুন্দুভি সম্পাদক কালাচাঁদ চোঙদার বলল, দামোদরবাবু এই দু নম্বর চেয়ারে কিছুতেই বসতে পারেন না, তাতে এঁর মর্যাদার হানি হবে, ইনিই এখনকার সাহিত্যসম্রাট। বটেশ্বরবাবুর প্রতি আমি কটাক্ষ করছি না, তবে আমরা চাই উনি ওই ভাল চেয়ারটি দামোদর বাবুর জন্যে ছেড়ে দিন।

দামামা-সম্পাদক গৌরচাঁদ সাঁপুই চেঁচিয়ে বলল, খবরদার বটেশ্বরবাবু, উঠবেন না, গট হয়ে বসে থাকুন। এখনকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট আপনিই।

কালাচাঁদ বলল, ননসেন্স। দামোদরবাবুর উপাধি আছে গল্পসরস্বতী, বটেশ্বরের কি আছে শুনি? ঘোড়ার ডিম।

গৌরচাঁদ বলল এই কথা? ওহে ভূপেশ ব্রজেন অবনী নমুদ্দিন ময়রাকেষ্ট, এগিয়ে এস তো। আমরা ছ জন ছোট-গাল্পিক, বড়-গাল্পিক, রম্য-লিখিয়ে, কবি, সম্পাদক আর সমালোচক—আমরা নিখিল বাঙালী সাহিত্যিকবর্গের প্রতিনিধিরূপে এই সভায় অধিকন্তু মুহূর্তে শ্রীযুক্ত বটেশ্বর [illegible] উপাধি দিলাম—অপ্রতিদ্বন্দ্বী গল্পমহীমণ্ডল-

[illegible]

করছি, আমার সঙ্গে যে লড়তে চায় সে মোজা তুলে নিক। সবতাতে আমি রাজী আছি—ঘুষি, গাঁট্টা, লাঠি, থান ইট, যা চাও।

মোজা তুলে নিতে কেউ এগিয়ে এল না। গৌরচাঁদ বলল, নুরু ভাই, জোরসে শাঁখ বাজা। নুরুদ্দিনের মুখ থেকে বিজয়সূচক কৃত্রিম শঙ্খধ্বনি নির্গত হল—পোঁ-ও-ও।

কালাচাঁদ চিৎকার করে বলল, বটেশ্বরবাবু, ভাল চান তো এখনই চেয়ার ভেকেট করুন। কি উঠবেন না? ও দামোদর বাবু, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, আপনার হকের আসন দখল করুন, এই চেয়ারটাতেই আপনি বসে পড়ুন।

দামোদর বললেন, ওতে বসবার জায়গা কই?

কালাচাঁদ আর তার দু জন বন্ধু দামোদরকে ধরে বটেশ্বরের কোলের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল—খবরদার উঠবেন না, আমরা আপনাকে ব্যাক করব। এই বুড়ো বটেশ্বর কতক্ষণ আপনার আড়াই-মনী বপু ধারণ করতে পারে দেখা যাক।

হট্টগোল আরম্ভ হল। রাজলক্ষ্মী সাহিত্যভাস্বতী বললেন, ছি ছি ছি, আপনাদের লজ্জা নেই, ছোট ছেলের মতন ঝগড়া করছেন! দু জনেই নেমে পড়ুন চেয়ার থেকে, আসুন আমরা সবাই চায়ের টেবিলে গিয়ে বসি।

কালাচাঁদ বলল, কারও কথা শুনবেন না দামোদর বাবু, গ্যাঁট হয়ে বটেশ্বরের কোলে বসে থাকুন।

গৌরচাঁদ বলল, ঠেলা মেরে দামোদরকে ফেলে দিন বটেশ্বর বাবু, চিমটি কাটুন, কাতুকুতু দিন।

সমাগত অতিথিদের এক দল বটেশ্বরের পক্ষে আর এক দল দামোদরের পক্ষে হল্লা করতে লাগল। অবশেষে মারামারির উপক্রম হল। অনুকূল চৌধুরী হাত জোড় করে দুই দলকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না।

কপোত গুহ চুপি চুপি বেচারামকে বললেন, গতিক ভাল নয়, পুলিসে খবর দেওয়া যাক, কি বলেন?

সুমন্ত বলল, উঁহু, বরং ফায়ার ব্রিগেডে টেলিফোন করি, হোজ পাইপ থেকে জলের তোড় গায়ে লাগলে দুই সিংগি আর সব কটা শেয়াল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সুমিত্রা বলল, ও সবের দরকার নেই, বিশ্রী একটা স্ক্যাণ্ডাল হবে। লড়াই থামাবার ব্যবস্থা আমি করছি। এই বলে সে সভা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির ফটকের বাইরে গেল।

বেচারাম সরকারের বাড়ির পাশে একটা খালি জমি আছে, পাড়ার জয় হিন্দ ক্লাবের ছেলেরা সেখানে পাণ্ডাল খাড়া করে খুব জাঁকিয়ে বাণীবন্দনা করেছে। তিন দিন আগে পুজো চুকে গেছে, কিন্তু ফুর্তির জের টানবার জন্যে এ পর্যন্ত বিসর্জন হয় নি, আজ সন্ধ্যায় তার আয়োজন হচ্ছে। পাণ্ডালের ভিতর থেকে দেবীমূর্তি বার করা হয়েছে। লাউড স্পীকারটা মাটিতে নামানো হয়েছে, কিন্তু বিজলীর তার খোলা হয় নি, এখনও একটানা রেকর্ড-সংগীত উদ্গিরণ করছে। সামনে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে। গুটিকতক ছেলে-মেয়ে [illegible] পরে তৈরী হয়ে আছে, আরা চলন্ত লরির

এই জয় হিন্দ ক্লাবের পুজোয় বেচারামবাবু মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছেন, অন্য রকমেও অনেক সাহায্য করেছেন, সেজন্যে তাঁর বাড়ির সবাইকে ক্লাবের ছেলেরা খুব খাতির করে। সেক্রেটারি প্রাণধন নাগের কাছে এসে সুমিত্রা বলল, দেখুন, বাড়িতে মহা বিপদ, আপনাদের সাহায্য চাচ্ছি—

ব্যস্ত হয়ে প্রাণধন বলল, কি করতে হবে হুকুম করুন, সব তাতে রেডি আছি, আমরা যথাসাধ্য করব, যাকে বলে আপ্রাণ।

সুমিত্রা সংক্ষেপে জানাল, তাদের বাড়ির পার্টিতে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে জনকতক গুণ্ডা মারামারির মতলবে আছে। দুই সিংহ অর্থাৎ প্রধান অতিথি একই চেয়ারে বসেছেন, তাঁদের রোখ চেপে গেছে কেউ চেয়ারের দখল ছাড়বেন না। ওঁদের সরিয়ে দেওয়া দরকার, নইলে বিশ্রী একটা কাণ্ড হবে।

প্রাণধন বলল, ঠিক আছে, আপনি ভাববেন না। আগে আপনার দুই সিংগির গতি করব, তার পর আমাদের বিসর্জন। মা সরস্বতী না হয় ঘণ্টাখানিক ওয়েট করবেন। ওরে ভূতো বেণী মটরা হেবো, জলদি আমার সঙ্গে আয়। নিরঞ্জন সিং, লরিতে স্টার্ট দাও, আমরা এখনই আসছি।

চারজন অনুচরের সঙ্গে তাড়াতাড়ি শামিয়ানায় ঢুকে প্রাণধন বলল, ও সিংগি মশাইরা, শুনেছেন? চেয়ার থেকে নেমে পড়ুন কাইন্ডলি, কেন লোক হাসাবেন?

কালাচাঁদ আর গৌরচাঁদ এক সঙ্গে বলল, খবরদার চেয়ার ছাড়বেন না।

প্রাণধন বলল, বটে? এই ভূতো বেণী মটরা হেবো, এগিয়ে আয় তুরন্ত। সিংগি মশাইরা, যদি নিতান্তই না নামেন তবে দুজনেই চেয়ারের হাতল বেশ শক্ত করে ধরে টাইট হয়ে বসুন।

নিমেষের মধ্যে প্রাণধনের দল দুই সিংহ সমেত চেয়ারটা তুলে বাইরে এনে লরিতে চাপিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও উঠে পড়ে বলল, চালাও নিরঞ্জন সিং, সিধা আলীপুর চিড়িয়াখানা। লাউড স্পীকারটা তখনও মাটিতে পড়ে গর্জন করছে—অত কাছাকাছি বঁধু থাকা কি ভালো-ও-ও।

জুএর সামনে এসে লরি থামল। বটেশ্বর আর দামোদরকে খালাস করে প্রাণধন করজোড়ে বলল, কিছু মনে করবেন না মশাইরা। শুনেছি আপনারা বিশ্ববিখ্যাত লোক, শুধু দু বেটা গুণ্ডার খপ্পরে পড়ে খেপে গিয়েছিলেন। সবই গেরোর ফের দাদা, কি করবেন বলুন। ঘাবড়াবেন না, আপনাদের ড্রাইভারদের বলা আছে, তারা আধ ঘণ্টার মধ্যে মোটর নিয়ে এসে পড়বে। ততক্ষণ আপনারা একটু গল্প-গুজব করুন, দুটো সুখ দুঃখের কথা ক'ন। আচ্ছা, আসি তবে, নমস্কার।

সিংহসমাগমের অতর্কিত পরিণাম দেখে প্রীতিসম্মিলনের সকলেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। কালাচাঁদ আর গৌরচাঁদ বেগতিক দেখে সদলে সরে পড়ল। অতিথিরাও অনেকে বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু আয়োজন একবারে পণ্ড হল বলা যায় না। অতিথিদের মধ্যে অনুকূল চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি চোদ্দ-পনের জন মাথাঠাণ্ডা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরা রয়ে গেলেন। সকলেই বেচারামবাবুকে আন্তরিক সমবেদনা জানালেন, বটেশ্বর-দামোদরের কেলেঙ্কারি আর কালাচাঁদ-গৌরচাঁদের গুণ্ডামির নিন্দা করলেন, বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য প্রকাশ করলেন, মাছের কচুরি, মাংসের চপ, চিঁড়ে ভাজা, কেক সন্দেশ চা প্রচুর খেলেন, তার পর গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন।

শিল্পী ঃ [illegible]

জল-পায়রা

প্রেমেন্দ্র মিত্র
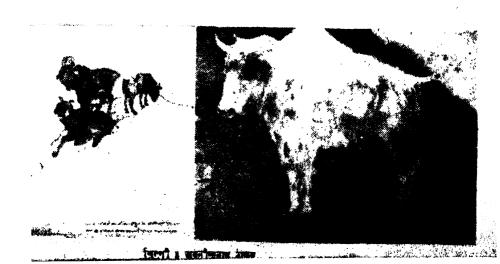
আফজল সাহেব একটু হাসলেন।

হাসিটা অবশ্য মুখে নয় তাঁর চোখেই টের পাওয়া যায় আজকাল। শরীরের একটা অংগের সংগে মুখের একটা দিক পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে আছে। পুরুষ্টু মাংসল গালের অন্যদিকেও কোন ভাবান্তরের ছাপ পড়ে না। পড়ে শুধু চোখে। যে চোখ আটাত্তর বছর ধরে সকৌতুকে নির্ভয়ে জীবনের অনেক কিছু দেখেছে, বুঝেছে ও হেসেছে।

বিরাট দশাসই পুরুষ, দামী মেহগনির সেকেলে কাজ করা প্রকান্ড খাটটা জুড়েই শুয়ে আছেন।

আর শুধু খাটটা কেন বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই সমস্ত ঘর মায় বাড়িটা এখনো তিনি যেন জুড়ে আছেন। ঘরে লোকজন আরো আছে কিন্তু তারা যেন ফালতু ফাউ। আফজল সাহেবের একটা ফুঁয়ে তারা যেন এখুনি উড়ে যেতে পারে।

আফজল সাহেব জীবনে অনেক কিছু অবলীলাক্রমে এমন উড়িয়ে দিয়েছেনও বহুবার। মানুষ জন, প্রতিপত্তি, সম্মান, ঐশ্বর্য।

কিন্তু সব কিছু আবার যেন প্রচন্ড চুম্বকের টানে তাঁর চারিধারে এসে জুটেছে।

টাকার পাহাড়ের প্রায় চূড়োয় উঠে আবার দেউলে হয়েছেন তিনবার, সাদিও তাই।

সে অতীতের কিছু চিহ্ন আছে, কিছু নেই।

আছে ওই শীর্ণ রুগ্ন নাতিটা। তাঁর তাজা টগবগে রক্ত এক পুরুষ বাদেই অমন ফিকে জোলো হয়ে যাবে কে জানত!

হতভাগা আবার অতি সৎ [illegible] চরিত্রবান। কি সব নাকি কেতাব লেখে। বাজারে খুব নাম।

বড় বড় হোমরা চোমরা [illegible] অনেকে তাঁর কাছে [illegible] আকবরের,—[illegible] লেখা [illegible]

বলেছে "ওই নাতির নামেই বেঁচে থাকবেন।"

আফজল সাহেব একবার নিজে পড়বার চেষ্টা করেছিলেন, হতভাগাটা কি লেখে?

হেসে তারপর আকবরকে বলেছিলেন,—"ইনিয়ে বিনিয়ে ওসব কেচ্ছা লিখে কি হবে। মরদ হ'লে ওসব লেখবার দরকার হয় না।"

শীর্ণ রুগ্ন ফ্যাকাশে আকবরের চেহারা, কিন্তু তার চোখেও সেই অদ্ভুত কৌতুকের হাসি, আরো বুঝি তীক্ষ্ম।

সে বইটা কেড়ে নিয়ে শুধু বলেছিল, "এ সব বাজে কেতাব পড়েন কেন! আখিরের কথা ভাবুন।"

অন্য সময় হলে আফজল সাহেব গাল দিয়ে ভূত ভাগাতেন, কিন্তু সেদিন কিছু পারেন নি।

এক আকবরের কাছেই এরকম হার তাঁকে মাঝে মাঝে মানতে হয়।

আজ যেমন হয়েছে।

ডাক্তার হকিম কবিরাজ কিছুদিন ধরে আফজল সাহেব কাছে ঘেঁসতে দেন না। কেউ কিছু বলতে গেলে কুৎসিত একটা গাল দিয়ে বলেন,—"দালালী কত পাও বলত! গাঁটকাটারা পকেট কাটলে তবু টের পাই না, আর এরা যে গাঁটও কাটে আবার দণ্ডেও মারে।"

মুখের পক্ষাঘাতের দরুণ কথাগুলো জড়ানো হলেও বোঝা যায়। অন্ততঃ ঝাঁঝটা ত বটেই।

তবু আজ আকবর নিজেই হকিম ডেকে এনেছে।

সেই হকিমের কথাতেই আফজল সাহেবের চোখের হাসি।

"কি খেতে ইচ্ছে করে আপনার?"—[illegible] জিজ্ঞাসা করেছে হকিম।

আফজল সাহেবের চোখের হাসি [illegible]

[illegible]

ভালো আছে তাই তুলে আফজল সাহেব কানে আঙুল দিলেন।

ঘরে আর যারা ছিল তারা প্রমাদ গণল। আকবর শুধু শান্ত গলায় বললে, "কানে উনি ভালই শুনতে পান।"

হকিম লজ্জিত কিন্তু আফজল সাহেবকে আজ আর চটতে দেখা গেল না।

জড়িয়ে জড়িয়ে যা বললেন, তার মানে বোঝা গেল এই যে এখনো তিনি সহজে মরছেন না, অনেকদিন দুনিয়াকে আরো জ্বালাবেন সুতরাং শেষ খাওয়ার এখনো অনেক বাকি!

শেষ খাওয়ার কথা মোটেই সে বলেনি, তাঁকে সারিয়ে আবার সে দুপায়ে খাড়া করে তুলবে, সেইজন্যেই সবরকম খোঁজখবর তাকে নিতে হচ্ছে, বোঝাতে গিয়ে হকিম গলদঘর্ম হয়ে উঠল।

আফজল সাহেবের চোখ তখনও হাসছে। জড়িয়ে জড়িয়ে আবার কি বললেন।

হকিম বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ভাবে আকবরের দিকে তাকাল।

আকবর বুঝিয়ে দিলে। আফজল সাহেব বলছেন,—"দু পায়ে খাড়া হয়ে কি হাতী ঘোড়া হবে। সাদি আর একটা করতে চাই যে! পারব?"

হকিম একটু হকচকিয়ে গেল। এ সব প্রশ্নের জবাব ত' তার মুখস্থ। কিন্তু ঠাট্টা কি না ঠিক ধরতে না পেরে আমতা আমতা করে বলবার চেষ্টা করলে,—"আজ্ঞে, তা কি বলে, আপনার বয়সেও......"

আকবরই তাকে উদ্ধার করলে। "আগে সারিয়ে তুলুন, তার পরে ত' সাদি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ যা বলেছেন।" হকিম নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচল, "সারিয়ে ত তুলবই। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম প্রথম, কি খেতেটেতে সাধ যায়।"

আফজল সাহেবের ঠোঁট নড়ল। হকিমেরও [illegible]...

অন্ধকারে। উঠে আসবে কিনা ভাবছে হঠাৎ কাছেই এক খাবলা অন্ধকার যেন ঝটপট শব্দে লাফিয়ে উঠে কিছু দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল।

কোন রকমে পাখীটা জখম হয়েছে নিশ্চয়। নইলে দুহাত যেতেই অমন মুখ থুবড়ে জলে পড়ত না। এতক্ষণে কোথায় উধাও হয়ে যেত।

কিন্তু আকাশের সীমানা যে ডানায় মাপে জখম হলেও তাকে ধরা সহজ নয়। পাক্কা আধটি ঘণ্টা অধরকে ক্ষ্যাপার মত তার পিছনে ছুটে সেই দাম আর বুনো ঘাসে ভর্তি জলায় নাকানি চোবানি খেতে হয়। হাত পা ছড়ে একাকার জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে সর্বাঙ্গ ভিজে সপসপে। পাখীটা বুঝি প্রাণ থাকতে ধরা দেবে না। অধরও ছাড়বার পাত্র নয়। বাদলাদিনের অন্ধকার এর মধ্যে গাঢ় হয়ে এসেছে। তবু ভয় ডর অধরের আর নেই।

সত্যিই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল পাখীটা। ধরা পড়ল আশ্চর্যভাবে। ভয়ে ক্লান্তিতে দিশাহারা হয়েই বোধহয়, অন্ধের মত পাখীটা পাখা লটপটিয়ে উড়ে এসে পড়ল একেবারে অধরের মুখের ওপরে।

অধরও তখন থেকে গেছে একেবারে। পাঁকের সঙ্গে মেশানো সেই একটা অদ্ভুত গন্ধ মাখা ভিজে পাখা দুটো তার মুখের ওপর সজোরে ঝটপট করে মনে হল যেন তার দমই বন্ধ করে দেবে। কটি মুহূর্ত ভয়ে দিশাহারা পাখীটার বুকের ধড়ফড়ানি যেন তার নিজের বুকের আওয়াজের সঙ্গে একাকার হয়ে তাকে বেহুঁশ করে দিলে। নিজের অজান্তেই হাত দুটো দিয়ে ধরে না ফেললে এবারও পাখীটা বোধহয় পালাত।

পাখীটাকে জাপ্টে দুহাতে ধরে মুখ থেকে ছিঁচড়ে ছাড়িয়ে অধর হাঁপাতে হাঁপাতে দাম ঠেলে পাড়ে উঠল। উত্তেজনায় ক্লান্তিতে তার পা তখন টলছে।

পাড়ের ওপরই কার সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগল। একটু। অধরের খেয়াল নেই কিছুর। তার সব কিছু সাড় ওই দুহাতে শক্ত করে ধরা পাখীটায়। পাখীটার বুকের ফাঁপুনি তার হাতের ভেতর দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে সমস্ত শরীরে। সেই একটা অদ্ভুত বুনো গন্ধ। না হাঁস মুরগীর নয়, আর কিছুর।

ধাক্কার পর খিলখিল করে হাসিতে অধরের হুঁস ফিরল।

"আচ্ছা বেহুঁস মানুষ ত! থালেই ফেলে দিচ্ছিলে যে।"

অধর থামল কিন্তু মুখে তার তবু কথা নেই।

সৈরভীই কাছে এসে বললে—

পাখীটা ঝটপট করে উঠতে চমকে উঠে বললে, "ওমা ওটা আবার কি!"

"বাদার পাখী। অনেক কষ্টে ধরেছি।" অধর এখনও হাঁপাচ্ছে। "কি পাখী দেখতে হবে চল।"

অধর পা বাড়াল, কিন্তু দু পা গিয়েই আবার চমকে দাঁড়াল।

"তুই এখন এখানে কোথা থেকে!"

আবার সেই খিল খিল করে হাসি। শরীরটা অধরের গায়ে যেন ঠেলে দিয়ে সৈরভী বললে,—"তোমার ঘরে খুঁজতে গেছলাম যে। ঘরে নেই দেখে এদিক পানে এলাম দেখতে।"

ভিজে পাখীটার আর সৈরভীর উষ্ণ স্পর্শ শরীরের মধ্যে যেন এক হয়ে মিলে যাচ্ছে। তবু অধর সভয়ে বললে, "এই রাতে আমায় ঘরে খুঁজতে এসেছিলি!"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, খুঁজতে ত আমিই আসি। তুমি ত আর বেটাছেলে নও, আমিই বাছা মেয়ে এবার।"

অধরকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বললে,—"ভয় নেই গো ভয় নেই। বিকেলে লাস্তাড় গেছে, সেই কাল ফিরবে।"

অধর কিছু না বলে আবার এগোল। মনটা গেছে কেমন খিঁচড়ে।

ঘরে পৌঁছে কুপির আলোয় পাখীটাকে দেখে ভয়-ডরের কথা কিন্তু আর তার মনে রইল না।

"জল-পায়রা। দেখেছিস সৈরভী! কেমন করে ডানাটা ভেঙে গেছে তাই আর পালাতে পারেনি।"

সৈরভী পাশের রান্নাঘরে গিয়ে আর একটা কুপি জ্বেলে কি নাড়াচাড়া করছে। সেখান থেকে বললে, "অত অগবাড়ন্ত হলে ডানা ভাঙবে না। উড়তে হাওয়া না দিতেই এত ছটফটানি কিসের। আমার মত কারুর টানে এসেছে বোধহয়।" আবার সৈরভীর হাসি।

"একটু সুতোটুতো দে সৈরভী, একটু ঘাসের চুণ দিয়ে ডানাটা বেঁধে দিই।"

"ও আবার দয়ার অবতার রে! থাক্, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। কাল সকালে কোথায় হজম হয়ে যাবে, উনি এখন ভাঙা ডানা জুড়চ্ছেন।"

অধর বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইল খানিক সৈরভীর দিকে। বাদার পাখী ধরা মানে যে

কি সে যেন ভুলেই গিয়েছিল। তবু একবার প্রতিবাদ করে উঠল,—"না, না, এ পাখী আমি মারতে দেব না।"

"না মারতে দেবে না! পাখী তোমার গুরুঠাকুর। দাঁড়াও আগে রাঁধি তারপর খেয়ে বোঝো।"—সৈরভী রান্নার জোগাড় করতেই আবার যাচ্ছিল, অধর একটু শক্ত হয়ে বললে, "না রাঁধতে টাধতে তোকে হবে না। তুই ঘরে যা।"

"ঘরে যাব!" সৈরভী ফোঁস করে ফিরে দাঁড়াল, "তাড়িয়ে দিচ্ছ!"

সৈরভীর এ মূর্তি দেখলে অধর কেমন বেদিশে হয়ে যায়, প্রচণ্ড একটা টানের সঙ্গে অদ্ভুত একটা ভয় মিশে হাতপাগুলো বশে থাকে না। আমতা আমতা করে কটা ঢোক গিলে বললে, "না, ভাবছিলাম কেউ যদি দেখে!"

"কে দেখবে! বললাম না, লাক্ষ্ডি গেছে। কাল ফিরবে।"

"কিন্তু আর কেউত আসতে পারে! হিরুই যদি আসে।"—অধর শেষ চেষ্টা করলে ভয়ে ভয়ে।

"না আসবে না। এমন সময় কারুর আসতে দায় পড়েছে! এই বেহায়া কালামুখীর মত কেউত আর অন্তর জ্বলুনীতে জ্বলছে না যে নিজে সেধে মুখ পোড়াতে আসবে!" সৈরভী মুখ ঝামটার সঙ্গে নিটোল শরীরের একটা মন তোলপাড় করা ঝাঁকানি দিয়ে ফিরে রান্নার চালার দিকে চলে গেল।

অধর নিরুপায়। সৈরভীকে জোর করে বাড়ি পাঠাবার তার সাধ্য নেই। মনও কি চায়! কিন্তু দামুর সেদিনের কথাগুলোও ভোলা যায় না যে। বলেছে, বাদায় জ্যান্ত পুঁতে রেখে দেবে!

তা দামু পারে। কাক পক্ষীটিও টের পাবে না এ ধু-ধু জলার দেশে। আর টের পেলেও মুখ ফুটে কিছু বলবে, কার এত বুকের পাটা।

সৈরভীর ওপর তার রাগ হয়। এই রাক্ষুসী টান তারই ওপর কেন? সে ছাড়তেও পারে না, ছেড়েও দিতে পারে না নিজেকে প্রাণখুলে। কতবার ভেবেছে পালিয়ে চলে যাবে কোথাও! কিন্তু যাবে কোথায়? জ্ঞান হওয়া থেকে এই বাদাই চেনে। তিনকুলে কেউ নেইও। আর যাবার কথা ভাবলেও বুকটায় কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।

এতক্ষণে একটা দড়ি দিয়ে পাখীটার পা দুটো অধর বেঁধে ফেলেছে। মেঝের ওপর ফেলতেই পাখীটা শুধু ডানা নেড়ে ছট-ফটিয়ে খানিকটা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলে গেল। কুপিটাই বুঝি উল্টে দেয়। অধর গিয়ে আবার পাখীটাকে ধরল। কিন্তু ধরবার আগে পলকা ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাবার কি চেষ্টা বেচারার! ঠোকরে একটু লাগে কিন্তু হাসিও পায়। কালো পুঁতির মত চোখ দুটো কুপির আলোতেই দেখা গেল। তাতে রাগ না ভয় না হুতোশ বোঝা যায় না কিন্তু মায়া হয় কেমন। আদেখলে মায়া অধর বোঝে। এমন কত পাখী কেটেছে। এটাকেও কাটতে হবে খানিক বাদে।

কিন্তু কাটা আর হল না।

উনুনে ধরিয়ে যোগাড়-যন্ত্র করে সৈরভী ঘরে এল। "কই! ঠুঁটো হয়ে এখনো বসে আছো? পাখীটা কাটবে কে, আমি?"

অধর জবাব দেবার আগেই সজোরে দরজাটা খুলে গেল। শুধু ভেজানই ছিল।

দামুই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর দুজনে দুদিকে কাঠ।

"হুঁঃ লাক্ষ্ডি গেছলাম বলে বড় সুবিধে হয়েছে, না?"

একটা চাপড় খেয়ে অধর মেঝেয় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দামু গিয়ে আবার ধরবার আগেই কোনক্রমে উঠে দরজা দিয়ে পড়ি কি মরি হয়ে বাইরে ছুট!

"শালা নেংটি ইঁদুরের বাচ্চা!"—দামু পেছু নেবার চেষ্টা করলে না। সৈরভীর দিকেই ফিরল এবার।

"চামচিকেটাকে যখন খুশি ধরব। তার আগে তোকেই এখানে শেষ করি।"

'করোনা!' ঘাড় বেঁকিয়ে শরীর টান করে সৈরভী বেপরোয়া।

দামু হাতটা ওঠাতে গিয়ে একটু থামল। শেষপর্যন্ত চড়টা অবশ্য বাদ গেল না।

সৈরভী ছিটকে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেলে। সেখান থেকে মাথার চুলের মুঠি ধরে টেনে আনছে এমন সময় পাখীটা ছটপটিয়ে উঠল মেঝেয়।

"ওটা কি!" চমকে দামু সৈরভীর চুল ছেড়ে দুপা পিছিয়ে গেল।

সৈরভীর এখনও সেই খিল খিল করে হাসি! "কি আমার বীরপুরুষ-রে। পাখীর আওয়াজে ভিরমি যায়!"

"পাখী! কি পাখী? কোত্থেকে?"

"কি পাখী দেখো না! অধর এই সাঁঝের বেলায় ধরেছে।"

দামু মেঝেতে উবুড় হয়ে বসে পাখীটা ধরল। "আরে জল-পায়রা যে! কোথায় পেল কোথায়!"

"এই ত খালের ধারে যুগদয়ে। ওইটেই বেঁধে দিতে এসেছিলাম।"

সৈরভীও বসল।

"রাঁধতে এসেছিলি!" দামু হাতটা তুলেও কিন্তু মারল না। হেঁচকা দিয়ে সৈরভীকে টেনে তুলে বললে,—'চ।'

"কেন এখানেই রাঁধি না? যোগাড় সব আছে।"

"হাঁ এখানেই রাঁধবি বই কি!"—দামু এক ঘা দিলে সৈরভীর মাথায়। "এ পাখী রাঁধতে দিচ্ছি! এ পাখী এখন নিয়ে গেলে দুনো দাম তা জানিস? লাক্ষ্ডি যেতে মুকুন্দর কাছে তাই শুনেই ত' ফিরে এলাম। শালা চামচিকেটা খুব পেয়ে গেছে ত! চুষুক এখন কলা!"

পাখী আফজল সাহেবের বাড়ি পৌঁছল। গফুর মিঞাই পৌঁছে দিলে খুশিতে ডগ-মগ হয়ে।

আকবর কোথায় বেরুচ্ছিল। সামনে পড়তে গফুর মিঞা রঙ-করা দাড়ির ফাঁকে এক গাল হেসে বললে,—"পেয়েছি হুজুর। সাত মুল্লুক চষে ফেলে পেয়েছি।"

ঠ্যাং দুটো ধরে গফুর পাখীটাকে ঝুলিয়ে ধরল সামনে। ভাঙা ডানা নেড়ে পাখীটা ছাড়া পাবার দুর্বল চেষ্টা একবার করে যেন হাল ছেড়ে দিলে।

[illegible]

হুজুর। আসমানের পাখী, শীতের মেহ্‌মান হতে আসে বাদায়।"

আকবর একটু হাসল। গফুর মিঞার ভেতরও কবিত্ব আছে।

"এমন সময়ে পাওয়া যায় না হুজুর!"—গফুর নিজের বাহাদুরিটা আর একটু জাহির করে পাখীর মাথাটা এক হাতে তুলে রল।

আকবর দেখতে পেল চোখ দুটো, নিষ্প্রভ কালো পাথরের কুচির মত। কিছুই সে চোখের ভাষায় নেই হয়ত। তবু পলকের জন্যে মনের ভুল হয় কেন?

গফুর সামান্য একটু বুঝি অসাবধান হয়েছিল। পাখীটা হঠাৎ পাখা ঝাপটে হাত ফসকে পড়ে গেল।

"যাবি কোথায়!" ডানা নেড়ে কেৎরে একটু না যেতেই গফুর পাকা হাতে খপ করে ধরে ফেলে বললে,—"পালাবার জো নেই হুজুর। ডানাই গেছে ভেঙে।"

"ভেঙে দাওনি ত!"

গফুর রীতিমত ক্ষুণ্ণ হল। "কি বলেন হুজুর! খাবার জিনিস খাই, যে চায় জোগাই। তা বলে অবোলা জানোয়ারের সংগে বেহুদা দুশমনি করব!" একটু থেমে আবার বললে, "আমার কিন্তু ভালো বখশিস চাই হুজুর।"

আকবর ভালোরকম বখশিসই দিলে, আর হুকুম দিলে পাখীটাকে তার ঘরেই রাখতে। কোন রকমে খোয়া গেলে আর পাবার নয় বলেই বোধহয়।

পাখী রান্না হবে কি না ওসমান জিজ্ঞাসা করতে এল বিকেলে।

"আগেই ত বলেছি, হবে না।" —আকবর একটু রেগেই উঠল।

ওসমান তবু চলে গেল না। দুবার মাথা চুলকে বললে, "আজ্ঞে সাহেব রাগ করছেন।"

"সে আমি বুঝব।"

ওসমান দ্বিধাগ্রস্তভাবে চলে গেল।

একটা ঝুড়িতে পাখীটা চাপা আছে। আকবর ঝুড়িটা গিয়ে তুলল। মাথাটা বুকের ভেতর গুঁজে পাখীটা ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। আকবর একটু ছুঁতেই ধড়ফড় করে উঠে পাখা ঝাপটে পালাবার চেষ্টা করলে। আকবর তাড়াতাড়ি চাপা দিলে ঝুড়িটা। তারপর লেখার টেবিলে গিয়ে বসল। লেখাটা এগুচ্ছে না। কেমন জট পাকিয়ে গেছে।

হঠাৎ ডাকনার শেষ ছিঁড়ে গিয়ে ডানার ঝটপটিতে চমকে উঠল।— না, এইন কোন সুদূর আকাশে নয়, ঝুড়ির ভেতরই পাখীটা ছটফট করছে।

কথা যেন আরো জড়িয়ে গেছে, আরো মৃদু, থেমে থেমে। কিন্তু চোখ এখনও উজ্জ্বল।

"কই, পাখী ত এসেছে! আমার কালিয়া কই?"

"হবে, কিন্তু দাওয়াই না খেলে কালিয়া হজম হবে কিসে? ব্যায়রাম যে বাড়ছে।"

"দাওয়াই খেলে আরো বাড়বে।"

"দাওয়াই আপনি খাবেন না কিছুতে!"

"না। কালিয়া বানানে বোলো।"—আফজল সাহেবের চোখে সেই হাসি।

"বেশ আপনি ডেকে হুকুম দিন, আমি পারব না।" —আকবর চলে যাবার চেষ্টা করে।

সক্ষম হাতটা নেড়ে তাকে থামিয়ে আফজল সাহেব বলেন,—"বুঝেছি পাখীটার ওপর লোভ হয়েছে। নিজেই খেতে চাও।"

"তাই যদি খাই।"

"মুরোদ আছে খাবার!"

হাতটা নেড়ে নাতিকে পাশে বসতে ইংগিত করেন আফজল সাহেব। তারপর আবার বলেন, "খাবার জন্যে সব কিছুই ত রেখেছিলাম। মুখে হাতটাও ত তুলতে পারলি না।"

আকবর উত্তর দেয় না।

হঠাৎ আফজল সাহেবের জড়ানো স্বর ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। —"বিয়ে-সাদি করবি, না সব দান-খয়রাত করে দিয়ে যাবো!"

"তাই যান।" —আকবর উঠে পড়ে।

"যাচ্ছ কোথায়!"

"কাজ আছে!"

"কাজ ত যত ঝুটো কেচ্ছা বানানো। গালে কে থাপ্পড় মেরে গেছে তারই শোধ কেচ্ছায়।" —আফজল সাহেব হাঁপাতে থাকেন এতগুলো কথা উত্তেজিতভাবে বলে।

আকবর প্রথমটা যেন পাথর হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

অত্যন্ত নিষ্ঠুর ঘা দিয়েছেন বুঝেই আফজল সাহেব আরো যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ডাক দেন, "দাঁড়াও।"

আকবর দাঁড়ায় না।

একটা ঘন দুর্ভেদ্য ধোঁয়ায় চোখের দৃষ্টি, মন সমস্ত যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে মনে হয় আফজল সাহেবের।

এই হয়ত শেষ। হোক্। আফজল সাহেব তৈরিই আছেন।

কিন্তু শেষ এখনও নয় দেখা যায়। ঘোরটা কাটতে অনেকক্ষণ লাগে অবশ্য। মাথাটা পরিষ্কার হবার পর প্রথম আফশোষ হয়। আকবরের সবচেয়ে দুর্বল সবচেয়ে গভীর ক্ষতের জায়গায় অন্যায় করে আঘাত দিয়েছেন।

কিসের! আকবরের বয়সে কতজন এসেছে গেছে, নামও ত মনে রাখেননি।

কিন্তু নাই আকবরকে বুঝুন, নিজের মাপ দিয়ে তাকে মাপার ভুল আর করবেন না।

বংশ থাকবে না! আফজল সাহেবের হাসি পায়। লোকে বলে তাই, নইলে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে কিছুই তাতে তাঁর আসে যায় না। দুনিয়া যিনি পয়দা করেছেন সে ভাবনা তাঁর।

সকালে আকবরকে আবার ডেকে পাঠালেন।

"সে আও সব ডাক্তার হাকিম। সব দাওয়াই একসংগে খাব।"

আকবর হাসল।

"আর ওই পাখীটা খেয়েছিস্?"

"না।"

"উড়িয়ে দিয়েছ বুঝি বেওকুফ মেহেরবান?"

"ডানা যে ভাঙা, উড়বে কি করে!" —আকবর আবার হাসল।

"বেশ, ডানা সারাও তারপর ছেড়ে দিও। আমার নজর দেওয়া পাখী যেন কারুর ভোগে না যায়।"

"জো হুকুম।" —মাথাটা নুইয়ে বললে আকবর।

ঘরে গিয়ে আকবর ঝুড়িটা তুলল। জলের একটা খুরি ছিল ভেতরে। উল্টে জলটা গড়িয়ে গেছে। খাওয়ার জন্যে দেওয়া ধান কটা চারিদিকে ছড়ানো। পাখীটা পড়ে আছে মেঝের ওপর। বুকের ভেতর মাথা গুঁজে নয়। গলাটা লম্বা করে মেঝের ওপর রেখে। পিঁপড়ে এসেছে এরই মধ্যে। পালকে লেগেছে। লেগেছে সেই কালো চকচকে পাথরের কুচির মত চোখে, যে চোখের ভাষায় কোনো মানেই বোধহয় হয় না।

॥ চরিত্র-বিচার ॥

সৈয়দ মুজতবা আলী

অংকশাস্ত্রে প্রশ্ন ওঠে না, এ বাবদে আপনার কিম্বা আমার অভিজ্ঞতা কি? রস নির্মাণে ঠিক তার উল্টো। সেখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র নির্মাণ করেন আর পাঠক আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটাকে অল্পবিস্তর যাচাই করে নেয়। কিন্তু যখন কোনো জাতির চরিত্র নিয়ে আলোচনা হয় তখন সেটাকে একদিক দিয়ে যেমন অংকশাস্ত্রের মত নৈর্ব্যক্তিক করা যায় না, ঠিক তেমনি সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার উপরও ছেড়ে দেওয়া যায় না। এবং তখন আবার এ প্রশ্নও ওঠে, যে-সব লোক এ আলোচনায় যোগ দিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা এ বাবদে কতখানি।

আমার অতি সামান্য আছে। তাই এই ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করতে হল। এবং অনুরোধ, নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই যদি মাত্রা পেরিয়ে যায় তবে যেন পাঠক অপরাধ না নেন। সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। 'বাঙালী চরিত্র' সম্বন্ধে যদি প্রামাণিক পুঁথিপ্রবন্ধ থাকতো তবে তারই উপর নির্ভর করে আলোচনা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারতো। তা নেই। বস্তুত আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় অন্য প্রদেশের লোক দ্বারা বাঙালী সম্বন্ধে অকৃপণ, অকারণ নিন্দাবাদ থেকে। যথা 'বাঙালী বড় দম্ভী', 'বাঙালী অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিশতে চায় না',—সহৃদয় মন্তব্য যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না, তা নয়—যেমন শুনবেন, 'বাঙালী মেয়ে ভালো চুল বাঁধতে জানে', কিম্বা 'ব্যবসাতে বাঙালীকে ঘায়েল করা (অর্থাৎ ঠকানো) অতি সরল।'

আমি [illegible] সব প্রদেশেই বাস করেছি। দিল্লীতেও প্রায় চার বৎসর ছিলুম। [illegible] কান খোলা রাখা না রাখলেও [illegible] অনেক খবর অনেক [illegible]

(১) সিন্ধী পাঞ্জাবী দেশহারা হয়ে দিশেহারা হয়নি। সিন্ধীরা বোম্বাই অঞ্চলে, পাঞ্জাবীরা দিল্লী অঞ্চলে আপন ব্যবসা-বাণিজ্য দিব্য গোছগাছ ছিমছাম করে নিয়েছে। বরঞ্চ অনেক স্থলে এদের সর্ববিধেই হয়েছে বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লীর কনট সার্কাস থেকে মুসলমান হোটেলওয়ালারা চলে যাওয়াতে সেখানে পাঞ্জাবীরা গাদা গাদা রেস্তোরাঁ খুলেছে। (ফলে খাস দিল্লীর মোগলাই রান্না সেখান থেকে লোপ পেয়েছে—এখন যা পাবেন সে বস্তু পাঞ্জাবী রান্না, লাহোর অঞ্চলের। দিল্লীর রান্নার কাছে সে রান্না অজ পাড়াগেঁয়ে)। এই পাঞ্জাবীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এদের কেউ কেউ পারমিট গিরমিট ব্যাপারে আমার কাছে দৈবেসৈবে সাহায্য নিতে এসেছে—কিন্তু কখনো হাত পাতেনি। এরা যা খাটছে এবং খেটেছে তা দেখে আমি সর্বান্তঃকরণে এদের কল্যাণ এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছি।

তাই অতিশয় সভয়ে শুধাই, পূব বাঙলার লোক পশ্চিম বাঙলায় এসে অনেক করেছে কিন্তু পাঞ্জাবী সিন্ধীরা যতখানি পেরেছে ততখানি কি তাদের দ্বারা হয়েছে? এ বড় বে-দরদ এবং বেয়াদব প্রশ্ন। পূর্ব-বঙ্গবাসীরা এ প্রশ্নে আমার উপর চটে গিয়ে অনেক কড়া কড়া উত্তর শুনিয়ে দেবেন। আমি নতশিরে সব উত্তর মেনে নিচ্ছি। এবং এস্থলে আগেভাগেই বলে রাখছি, আমি তাদের উকিল হয়েই এ-আলোচনা আরম্ভ করেছি, তাদেরই সাফাই গাইবার জন্য। একটু ধৈর্য ধরুন।

(২) চাকরী যেখানে ব্যক্তিবিশেষের কিম্বা ব্যবসা-বিশেষের চাকরী সেখানে সে চাকুরীর মূল্য চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু [illegible]

কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে অনেকগুলো বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। এ-সব পরিকল্পনা ফলবতী করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বর্তায়, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের উপর।

তাই প্রশ্ন, এইসব চাকরী পাচ্ছে ক'জন বাঙালী? পূর্বের তুলনায় এদের উপস্থিত বেশিরো কি? পূর্বের তুলনা বাদ দিলেও, প্রাদেশিক জন-সংখ্যার হিসেবে তারা তাদের ন্যায্য হকগত বেশিরো পাচ্ছে কি?

দিল্লীবাসী বাঙালীমাত্রই একবাক্যে তার-স্বরে বলবে, 'না, না, না!' পরশ্রীকাতর অবাঙালীও সে-ঐকতানে যোগ দেয়। মনে মনে হয়তো বলে 'ভালোই হয়েছে'।— তা সে-কথা থাক্।

কেন পায়নি তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেব না। দোষ বাঙালীর। সে কেন পারলে না, সেই সাফাই গাইবার জন্যই এ-আলোচনা। একটু ধৈর্য ধরুন।

(৩) অথচ দ্রষ্টব্য, দিল্লীর সাংস্কৃতিক মজলিসে বাঙালী এখনো তার আসন বজায় রাখতে পেরেছে। এই কিছুদিন পূর্বেই শম্ভু মিত্র দিল্লীতে যা ভেল্কিবাজি দেখালে সে কেরামতী সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। অল্পের ভিতর লিটল্ থিয়েটার চালায় চাটুয্যে। দিল্লীতে যাবতীয় চিত্র-ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয় বাঙালী উকীলবাবুর তাঁবেতে। গাওনা-বাজনাতে বাঙাল আলাউদ্দীন সায়েব—রবিশংকরের কথা নাই বা তুললুম। শিক্ষাদীক্ষায় মৌলানা আজাদ সায়েব। সাহিত্যে হুমায়ুন কবির।

ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায়ের তোলা 'পথের পাঁচালী' দিল্লী ছাড়িয়েও কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে গিয়েছে। নভেম্বরে বুদ্ধ-জয়ন্তী হওয়ার পূর্বেই হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে, 'কে করে তবে 'নটীর পূজা', কাকে ডাকা যায় 'চণ্ডালিকার' জন্য?'

অর্থাৎ বাঙালীর রসবোধ আছে, অর্থাৎ সে স্পর্শকাতর। তাই সে সেন্সিটিভ এবং অভিমানী।

আলীপুর বোমা মামলার সময় শমসুল হক্ (কিম্বা ইসলাম) নামক একজন ইন্সপেক্টর আসামীদের সঙ্গে পীরিত জমিয়ে ভিতরের কথা বের করে ফাঁস করে দেয়। বোমারুরা তাই তার উল্লেখ করে বলতো, 'হে শমসুল, তুমিই আমাদের শ্যাম, আর তুমিই আমাদের শূল।'

স্পর্শকাতরতাই বাঙালীর শ্যাম এবং ঐ স্পর্শকাতরতাই তার শূল। শুদ্ধমাত্র কিছু না দিয়ে স্টেজ সাজিয়ে নিয়ে দশটা বাঙালী তিন দিনের ভিতর যেরকম একটা নাট্য খাড়া করে দিতে পারে অন্য প্রদেশের লোক সেরকম পারে না। আবার যেখানে পাঁচটা সিন্ধী পারমিটের জন্য বড় সায়েবের দরজায় পঞ্চান্ন দিন ধন্না দেবে সেখানে বাঙালীর নাভিশ্বাস ওঠে পাঁচ মিনিটেই। সংসারে করে খেতে হলে ড্রিল ডিসি-প্লিনের দরকার। আর ওসব জিনিস পারে বুদ্ধিসুদ্ধিতে যারা কিঞ্চিৎ ভোঁতা, অনুভব-অনুভূতির বেলায় একটুখানি গণ্ডারের চামড়াধারী।

স্পর্শকাতরতা এবং ডিসিপ্লিন এ-দুটোর সমন্বয় হয় না? বোধ হয় না। লাতিন জাতটা স্পর্শকাতর· তাদের ভিতর ডিসি-প্লিনও কম। ইংরেজ সাহিত্য ছাড়া প্রায় আর সব রসের ক্ষেত্রে ভোঁতা—তাই তার ডিসিপ্লিনও ভালো।

এ আইনের ব্যত্যয় জর্মনিতে। চরম স্পর্শকাতর জাত মোক্ষম ডিসিপ্লিন মেনে নিলে কি মারাত্মক অবস্থা হতে পারে হিটলার তার সর্বোত্তম উদাহরণ। হালের জর্মনরা তাই বলে, 'অতখানি ডিসিপ্লিন ভালো নয়।' কিন্তু এ-কথা কাউকে বলতে শুনিনি, 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভালো নয়।'

কোনো জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়, সে তো আমরা জানি, কিন্তু আসল প্রশ্ন, লাইন টানবো কোথায়? জাতীয় জীবনে স্পর্শকাতরতা থাকবে কতখানি আর ডিসিপ্লিন কতখানি? কিম্বা শুধাই, উপস্থিত যে মেকদার বা প্রোপর্শন আছে সেটাতে বাড়াই কোন বস্তু—স্পর্শকাতরতা না ডিসিপ্লিন?

বিষপাথর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে গেল রমন ঘোষের চোখের সামনে। বসে পড়ল বেচারী। জুতো থেকে পা বের করে বুড়ো আঙুল ধরে খানিক ক্ষণ বসে থাকতে হল। পায়ের ব্যথাটা কমতেই অকস্মাৎ রাগ হয়ে উঠল পাথরটার উপর। এবং পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ রমন ঘোষ হাতের লাঠিটা দিয়ে পাথরটাকে খুঁচতে লাগল—এঁই! এঁই! এঁই! শা—! কিন্তু পাথরটা উঠল না। যেন কায়েমি স্বত্বে মোকররী মৌরসীদারের মত পোক্ত হয়ে নিজেকে গেড়ে রেখেছে এখানে। অবশ্য, সর্বদিক বিবেচনা করলে অন্যায়টা পাথরটার না, অন্যায় রমন ঘোষের সে কথা বলা শক্ত। মানুষের পায়ে-চলা পথের মধ্যে পাথরটা বসে ছিল না। একেবারে পাথরের নুড়ি ছড়ানো বীরভূমের লাল মাটির 'ডাঙা' অর্থাৎ তৃণহীন প্রান্তর। গরু ছাগল পর্যন্ত হাঁটে না। ঘাস জন্মায় না, যাবে কিসের জন্য? সাপ ব্যাঙও থাকে না, জলহীন লাল মাটি গ্রীষ্ম যত উত্তপ্ত হয়—শীতে তত ঠাণ্ডা হয়। খালি পায়ের দেশ—মানুষ হাঁটে না—নুড়িগুলো পায়ে বেঁধে; রমন ঘোষের মত ঠোক্কর খেতে হয়। যে যুগে দুনিয়া জুড়ে এক একটা এলাকা নিয়ে নানান 'স্তান' বা 'স্থান' গঠনের দাবী উঠেছে, সে যুগে নুড়িগুলোর ভাষা থাকলে অবশ্যম্ভাবী রূপে—এলাকার পা দেবার আগেই রমন ঘোষ শুনতে পেত—খবরদার এ আমাদের 'নুড়িস্তান'! হুঁচোট লেগে, রক্ত লেগে—কায়েম করেঙ্গে নুড়িস্তান! অন্যায়টা রমন ঘোষের। কিন্তু রমন ঘোষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েই প্রায়—দুর্গম হলেও—এই নুড়িস্তান দিয়ে চলেছিল। বারবার সে আপনমনেই বলছিল—'গলায় কলসী বেঁধে জলে ঝাঁপ দেব। ঘরে আগুন দিয়ে চলে যাব। করব কি? বেঁচে হবে কি? সব যাবে তাই [illegible] করে চোখ [illegible]

রমন ঘোষ আগেকার কালের মহাজন জোতদারদের জাতের অবশিষ্ট স্বল্প-সংখ্যকদের একজন। ফজলুল হক সাহেবের ঋণসালিশী বোর্ড প্রবর্তন থেকে শুরু করে জমিদারী জোতদারী মহাজনী সমৃদ্ধ সমাজের উপর যে প্রাগৈতিহাসিক আমলের হিমানী ঝড় ব'য়ে চলেছে, তাতে অতিকায় জন্তুর মত এদের সংখ্যা কমে আসছে; যারা আছে, তাদের মধ্যে রমন ঘোষ বিচক্ষণ বলেই বেঁচে আছে। কিন্তু এবার এসেছে প্রলয় ঝড়। জমিদারী উচ্ছেদ আইন তারপর এই জমির নতুন ব্যবস্থার খাম-খেয়ালী আইন। তিরিশ বিঘের বেশী আবাদী জমি থাকবে না কারুর। পতিত পুকুর নিয়ে পঁচাত্তর বিঘে। এর পর আর রমন ঘোষ বাঁচে না—বাঁচতে হয়? না ঘরে থাকতে হয়! আর যারা এই আইন করছে, তারা উচ্ছন্ন যাবে না? ভগবান এই সইবেন। বিচার করবেন না?

সারা জীবন ধরে রমন ঘোষ একটি একটি করে পয়সা জমিয়েছে। পয়সা থেকে টাকা, টাকা থেকে নোট—নোট থেকে হ্যাণ্ড-নোট—তা থেকে সুদে-আসলে তমসুদ। শেষের দিকে কট্ কবলা। অন্যদিকে থালা বাসন থেকে আরম্ভ করে সোনা-রুপোর গহনার মেয়াদী বন্ধকী কারবার। তার থেকে অঞ্চল জুড়ে জমি। পাঁচশো আটশ বিঘে আবাদী জমি। ভাগে, ঠিকে, কোর্ফায় বিলি। পৌষ মাসে খামার জুড়ে বাখার গোলা গড়ে ওঠে; পরিপূর্ণ ধান। সেই ধান বর্ষায় বাড়ি সুদে চাষীরা ভদ্রলোকেরা নিয়ে যায়। মা-লক্ষ্মী চেয়ে যান—দেড়া হয়ে শরীর সেরে ফিরে আসেন। সে সব গেল, সব গেল, সব গেল! এতে আর বাঁচতে হয়!

পৌষ মাস, রমন ঘোষ দু ক্রোশ দূরে গোয়ালপাড়ার এই জমির ধানের তাগাদায় গিয়েছিল। গোয়ালপাড়ার চাল্লিশ বিঘে জমি [illegible]

দিয়ে যায়, এবার কেউ উঁকি মারেনি। তাগাদা করবার জন্য হেফাজুদ্দি শেখ আছে। তারই বয়সী হেফাজুদ্দি; পায়ে বাত হয়েছে; তাগাদায় হেঁটে হেঁটে তার বাত সেরে গেল, কিন্তু ধান এল না। হেফাজুদ্দি বলে—'ইয়াদের গতিকগাতিক ভাল লয় ঘোষ। নিত্যিকালের মরণ নাই—তা কাল তাকাত বলে না ব্যাটারা। বলে দু-চার দিনেই যাব। বুঝ না—ই দু-চার দিন হতে হতে তুমিও কাবার আমিও কাবার।'

—'কাবার?' খিঁচিয়ে ওঠে রমন—'কাবার? আমি সব সাবাড় করে দিয়ে যাব তার আগে। হুঁ।'

সেই সাবাড় করবার জন্যই আজ নিজে বেরিয়েছিল ঘোষ। কাবারের সঙ্গে সাবাড় কথাটা বেশ মেলে বটে কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাবাড়ের অর্থটা কি, তা তার কাছেও পরিষ্কার নয়। হেফাজুদ্দি ক'দিন থেকে দশ মাইল দূরের একটা গাঁয়ে গিয়েছে। সেখানে নিজের একটা খামারই আছে ঘোষের। কিছু লোক সেখানে খামারে ধান তুলছে—সে ধানগুলি ঝাড়া হবে। হেফাজুদ্দি ছাড়া যাবার লোক নেই। স্ত্রী পুত্র কন্যা কেউ নেই, থাকবার মধ্যে এক বালবিধবা নিঃসন্তান বোন—আর দুই অপগণ্ড দৌহিত্র। কড়ি আর ঝড়ি। কড়িকে আতুড়ে কড়া দিয়ে দাইয়ের কাছ থেকে বা যমের কাছ থেকে নিতে হয়েছিল, তাই কড়ি। আর কাবারের সঙ্গে মিল রেখে অর্থহীন সাবাড়ের মত কড়ির ভাই ঝড়ি। ও হিসেবে দাড়ি হতে পারত, দড়ি হতে পারত, ঘড়ি হতে পারত, ড়ি-কারান্ত অনেক কিছু হতে পারত—কিন্তু ঝড়ি ছাড়া আর কিছু মনে পড়েনি। একমাত্র মেয়ের নাম রেখেছিল—লক্ষ্মী। আর ছেলেপুলে না হওয়ায় একটি গরীবের ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে ঘরে রেখেছিল। হারামজাদ, [illegible] বাচ্চা! ছোঁড়া কোথায়

কাটিয়ে রমন ঘোষের টাকা পোঁতা মেঝের উপর ভুলোয় তোষকে শুয়ে গরমে বেটা দিন কতকের মধ্যেই শুকনো লোম বন-বেড়াল—তারপর ক্রমে হল গুলবাঘ। যে বেটা বিড়ি খেত না—সে বেটা রমন ঘোষের জামাই হয়ে ধরলে সিগারেট—তার সঙ্গে মদ। রমন ঘোষ নামে রাধারমণ হলেও বাঁশী নিয়ে কারবার কোনদিন করে না—তার হাতের এই বংশদণ্ডটি—এটিকে সে চির-কাল বলে বংশ খেঁটে—এই নিয়েই তার কারবার—এই খেঁটে নিয়ে তাড়া করত জামাইকে—নিকালো। আভি। আভি! নেহি মাংতা হ্যায়! দিন কতক বেটা ভয় করেছিল—তারপর ফ্যাস ফ্যাস শুরু করে শেষ পর্যন্ত গর্জন করে বলেছিল—তুম নেহি মাংতা—নেহি মাংতা, আভি নিকালো গা। ঠিক হ্যায়; লেকেন হাম হামারা পরিবার বেটা মাংতা হ্যায়। দাও বাহার করকে। লেকেন হাম চলা যায়েগা। তুম শ্বশুর নেহি হ্যায়, তুম অসুর হ্যায়।

রমন ঘোষ হতবাক হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরের সঙ্গে অসুরের মত জামাইয়ের সঙ্গে মিল করে লাগসই জুতসই একটি কথাও সে তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খুঁজে পায় নি। শেষ পর্যন্ত লাঠি নিয়ে মারতে ছুটেছিল। একদিন মেরেও বসেছিল। এবং তার ফলে নেশা ছোটার পর জামাই, লক্ষ্মী এবং এক বছরের কাঁড়কে নিয়ে চলে গিয়েছিল। রমন বারবার বারণ করেছিল মেয়েকে—'যাবিনে খবরদার, যাবিনে লক্ষ্মী।' কিন্তু লক্ষ্মী শোনে নি। রমন বলেছিল—'তা হলে জন্মের মত যা।' তাই গেল। বছর চারেক পর ওই ঝাঁড়কে প্রসব করে—সূতিকা ধরিয়ে মাস কয়েক ভুগে খালাস পেলে। বেটার ছেলে মরবার একদিন আগে একটা খবর দিয়েছিল শুধু; তার আগে খুণাক্ষরেও জানায় নি। রমন ঘোষ যখন গেল, তখন প্রায় শেষ। ঘণ্টা দুয়েক পরই মারা গিয়েছিল লক্ষ্মী। হারামজাদ ছোট-লোকের বাচ্চা গুণের সাগর। শ্রাদ্ধশান্তিটা চুকবামাত্র একদা রাত্রে উধাও! চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল—"আমি সন্ন্যাসী হইলাম।" কাঁকলাসের মত চেহারা সাড়ে পাঁচ বছরের কাঁড় আর মাস কয়েকের কাঁটাসার ঝাঁড়কে নিয়ে অগত্যা স্বামী-স্ত্রীতে ফিরে এসেছিল রমন ঘোষ। একই এক বছরের মধ্যে মারা গেল রমনের স্ত্রী। আপদ গেল। মেয়ের জন্মে পাঁচ বছর ধরেই কাঁদত গুন-গুনিয়ে। মেয়ে মরতেই চেঁচিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে শয্যা নিলে—তারপর মরল। আপদ গেল। দিনরাত্রি ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান আর ভাল লাগছিল না। ছেলে দুটোকে তুলে নিলে মানদা—বিধবা বোন ডাগর্ডা শক্ত চেহারা, যেমনি গতর তেমনি মুখখানা। রমন ঘোষ গাল দিলে মানদা হাসে। রমন চিরদিনই মানদাকে গাল দিয়ে আসছে। সেই ছেলেবেলা থেকে। সেই সময় একদিন রমন মানদার হাসি দেখে বলে-ছিল—'গাল খেয়ে হাসি? তুই মর! তুই মর।'

মানদা বলেছিল—'তুমি একটি বিয়ে কর আমি দেখে মরি।'

—'বিয়ে করব?' কটমট করে তাকিয়ে ছিল রমন—'বিয়ে? বিয়ে করব?'

—'হ্যাঁ। এই ধন-সম্পত্তি—'

কথার মাঝখানে রমন বলেছিল—'তার চেয়ে রোগে ধরুক আমাকে। চিররোগী হয়ে পড়ে থাকি!'

—'মা-গো!' অবাক হয়ে গিয়েছিল মানদা। —'বিয়ের এত অপরাধ?'

—এর চেয়ে বেশী অপরাধ। রোগের চেয়ে অনেক বেশী। চিররোগে ধরলে সেও ছাড়ে না,' বিয়ে করলে বউ ছাড়ে না। রোগ ওষুধে বাগ মানে, বউ কিছুতেই বাগ মানে না। রোগের পথ্যি-ওষুধের দামের চেয়ে বউয়ের খোরাক পোশাকে বেশী খরচ। রোগ ছাড়লে আরাম হয়, বউ মরলে ছেলের জন্যে রেখে যায়; ছেলে মরলে নাতি থাকে। রোগে মরলে রোগ সঙ্গে যায়—বউ সঙ্গে মরে না—বউ থাকে, বিধবা হয়ে খাওয়ার তরিবৎ বাড়ে—মোটা হয়। বাড়ু মার বিয়ের মুখে। বিয়ে! বিয়ের ফল ওই দেখ—দুই কাঁকলাস। এক কাঁকলাস গায়ে লাগলে ছ মাসের বেশী বাঁচে না। এ দুই কাঁকলাস। কবে মরি তার ঠিক নাই। আবার বিয়ে!

নাতিরা সেই কাঁকলাস। চেহারা অবশ্য আর কাঁকলাসের মত নাই; পেট পুরে খেয়ে আর মানদার যত্নে হারামজাদের বেটো হারামজাদ দুটো মহিষবাহনের বেটা জোড়া অভিরাবণ হয়ে উঠেছে। বড়টা কাঁড়টা তো বীতিমত মণ্ডা এবং ষণ্ড দুই-ই হয়ে উঠেছে। হারামজাদ আবার 'ডন বৈঠকী' করে। হাতের গুলিগুলো লোহার গোলার মত শক্ত করে তুলেছে। বুকের ছাতি—সে ওই একখানি; মধ্যে মধ্যে মাপ করে; আটত্রিশ ইঞ্চি থেকে সাড়ে সাঁইত্রিশ ইঞ্চি হলে হারামজাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ডন বৈঠকী বাড়ায়। আর মানদা বাড়ায় দুধ, ছোলা রুটি, মাছ।

মানদা সর্বনাশীকে কিছু বলবার জো নেই; সর্বনাশী ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়ে এ বাড়িতে যখন আসে, তখন স্বামীর কিছু টাকা নিয়ে এসেছিল, আর ছিল গহনা। দুইয়ে জড়িয়ে তখনকার দিনের হাজার দেড়েক। তাই নিয়ে নিজের কারবার আছে সর্বনাশীর। বাজে কারবার; মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে এক বিন্দু নাই। বেছে বেছে লোকসানী খাতককে টাকা ধার দেয়। তাও না কিছু বন্ধক, না কোন লেখাপড়া। কার কোথায় অসুখে চিকিৎসা হয় না, মানদা গিয়ে টাকা দিয়ে আসবে। যা হয় সুদ দিয়ো; আমি তো বিধবা মানুষ। সুদ না পার আসলটা ডুবিয়ো না। কার মেয়ের বিয়ের টাকা হচ্ছে না। গিয়ে বলবে—এই নাও, ক্রমে ক্রমে দিয়ো। মেয়ের বিয়ে তো হোক। আশ্চর্য এ সত্ত্বেও টাকাটা ওর ডোবে নাই, রামনাম করে বাঁদরের ভাসানো পাথরের চাঁইয়ের মত জলের উপর ভেসেই রইল। শুধু রইল নয়—তার উপর ঘাস গজিয়ে ফসল ফলানো ক্ষেত হয়ে উঠল। এ ছাড়া মানদার কিছু জমিও আছে। তার ধানের আয়টাও বছর বছর আসে। ওই সবের আয় থেকে ছোঁড়া দুটোর ভাল-মন্দর ব্যবস্থা হয়। অবশ্য তাকেও দেয় মানদা। কি করবে রমন ঘোষ, অপচয় হতে দিতে তো পারে না, সে না খেলে পাড়াপড়শীকে বিলোবে সর্বনাশী। চারটে গাই; এক একটা দুধ দেয় চার সের। দুটো গাই দুধ দেয়; এ দুটো ছাড়াতে ছাড়াতে ও দুটোর বাচ্চা হয়। আটসের দুধ। না খেয়ে করে কি ঘোষ। আবার সর জমিয়ে ঘি করে। দুধে-ঘিয়ে ছোলায় রুটিতে কাঁকলাস দুটো ষাঁড় হয়ে উঠেছে। কাঁড়টা দিনরাত্রি গুল-পাকায় আর গোঁ গোঁ করে। রমন ঘোষের ভয় হয় কোনদিন না গুঁতিয়ে বসে।

ছোট ঝাঁড়টা আবার অন্য রকমের। ওটা ষাঁড় হলেও বসোয়া—মানে শিবের বাহন ষাঁড়ের জাত রঙচঙে কাপড় দিয়ে সাজিয়ে শিঙলে শিং বাঁধিয়ে পিঠে আর একটা পা-ওয়ালা যে ষাঁড়গুলোকে নিয়ে হাঘরে-গুলো ভিক্ষে করে বেড়ায় সেই জাত। বারো তের বছরের ঝাঁড় আজ এ ঠাকুর গড়ছে কাল ও ঠাকুর গড়ছে, গাছতলায় বসিয়ে পুজো করছে, টিন বাজাচ্ছে, শালুক ডাঁটি বলি দিচ্ছে। সন্ধ্যায় করতাল বাজিয়ে আবার হরিনাম করে। তবে ছোঁড়াটা পড়ে। মানদা ওকে নিমাই নিমাই করে এক খুদে গৌরাঙ্গ বানিয়ে তুলছে।

এই সংসারের অবস্থা; এতে রমন ঘোষের সাহায্যই বা কি হবে—সুবিধেই বা কোথায়। একমাত্র সে মরার পর চাল কলা তিল মধু মেখে তুলসীপাতা দিয়ে গয়াগঙ্গা বারাণসী বিষ্ণুপদে হরি বলে পিণ্ড দেওয়া ছাড়া ওদের কাছে কোন প্রত্যাশা রমন ঘোষের নাই।

না—থাক, রমন ঘোষ কারুর তোয়াক্কা করে না। সে কাউকে কিছু দিয়ে যাবে না। কিছু না। যা ওই জমি জেরাত থাকবে তাই পাবি পিণ্ড দিয়ে। আসল যা—নগদ সে ওই মাটিরতলায় পুতে রেখে যাবে। হাঁ।

এক একসময় মনে হয়—একদিন কাউকে কিছু না বলে ওই সব নগদ সম্বল তুলে কাছায় কোঁচায় ট্যাঁকে বেঁধে সরে পড়বে। যেখানে খুশী গিয়ে খুব করে কিছুদিন হেসে খেলে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু তা পারে না ভয় হয়। মনটাও খুঁত খুঁত করে।

যাক—যাক, মরুক—; ষণ্ড হয়ে বাঁচুক—গোঁর হয়ে বাঁচুক—তার কোন ক্ষতি নাই। রমন ঘোষ এখনও রমন ঘোষ। একাই একশো। প'য়ষট্টি বছর বয়সেও নধর দেহ, চকচকে চামড়া, মুখে খাঁজ পড়ে নাই। এখনও ব্রহ্মাণ্ড ঘেরে আসতে পারে। সেই মনের জোরেই সে গিয়েছিল আজ গোয়াল-পাড়া। কি ভেবেছে ব্যাটারা? ধান দিবে কি দিবে না? রমন ঘোষের চোখ দুটি গোল। সেই গোল চোখ প্যাকিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

তাও দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তারা তার পাকানো গোল চোখের সামনেই বলে দিয়েছে—লাঙল যার জমি তার!

সে বলার ভঙ্গি কি? রমন ঘোষের বুকের ভিতরটাও ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠেছে। সে—একজন চেঁচিয়ে বলেছে—লাঙল যার—

বাকী লোক সমস্বরে হরিবোল দেওয়ার মত সমস্বরে বলে উঠেছে—জমি তার!

তারপর আবার—রমন ঘোষ—

—বাড়ি যাও।

—ইনকিলাব—

—জিন্দাবাদ!

ভয়ে পালিয়ে এসেছে রমন ঘোষ। যাক বাবা ওই পর্যন্ত থাক। চীৎকার করেই ক্ষান্ত দে। গ্রাম থেকে বেরিয়ে খানিকটা এসে—বার কয়েক পিছনের দিকে তাকিয়ে কেউ আসছে না দেখে তার রাগ হতে আরম্ভ হল। গাল দিতে আরম্ভ করলে ঈশ্বর থেকে গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত। হারামজাদ জোতদার থেকে—কড়ি ঝড়ি মানদা পর্যন্ত। এবং বাড়ি গিয়েই এর বিহিতের জন্যে সদরে যাবার ব্যবস্থা করবে সংকল্প করে—এই ডাঙগায় ডাঙগায়—নুড়ি পাথরের খাজ্যের উপর দিয়েই হন হন করে চলেছিল। এক একজনের নামে তিন তিন নম্বর। বাকী ধানের জন্য এক নম্বর, জমি থেকে উচ্ছেদের জন্য নম্বর দুই আর ওই নাকের কাছে ইনকিলাব—জিন্দাবাদ বলে চেঁচিয়ে ভয় দেখানোর জন্যে ফৌজদারি নম্বর তিন।

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই এই পাথরটার ঠোক্কর লেগে বুড়ো আঙুলের মাথা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝন্ ঝন্ করে উঠে—চোখের সামনে পাথুরে ডাঙাটা পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল এবং মনশ্চক্ষের সামনে ধানপান ক্ষেতখামার সব পাক খেয়েই ক্ষান্ত হল না, মিলিয়ে যেতে লাগল অসীম শূন্যে। অসীম শূন্য—তিনটে শূন্য হয়ে—লাফাতে লাগল। অর্থাৎ তিন শূন্য।

যন্ত্রণাটা একটু সুস্থ হতেই যন্ত্রণা কমতেই নিদারুণ ক্রোধে লাঠি দিয়ে পাথরটাকে খুঁচতে লাগল। কিছুতেই ওঠে না পাথরটা। কিন্তু সেও রমন ঘোষ। পাথরটাকে খুঁড়ে তুলে তার উপর লাঠি দিয়ে [illegible]

বাবা! খচ করে গোড়ালিতে যেন ছুঁচ বিঁধে গেল! ওঃ।

ছুঁচ নয় কিন্তু ছুঁচের মাসতুত ভাই অনায়াসে বলা চলে। লোহার কাঁটা। একেবারে প্যাঁক করে বিঁধে গেছে। ডগায় ঠোক্কর খেয়ে গোড়ালিতে পেরেক উঠে গেছে। কড়ির পুরনো জুতো। কড়ি ফেলে দেয় রমন ঘোষ নিজের হাতেই পেরেক টেরেক ঠুকে নিয়ে পায়ে দেয়। ছিঁড়ে গেলে—কদরু জুতো সেলাইকে ডেকে বকেয়া সেলায়ের মত মোটা সেলাই করিয়ে নেয়। দরদস্তুর করে যা' হয় সেটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেয় রমন ঘোষ। ওই গুণটি রমনের আছে। যে যা পাবে সেটি সে তৎক্ষণাৎ দেবে। সে জমির খাজনা, ট্যাক্স থেকে শুরু করে জিনিসের দাম পর্যন্ত। কদরুকেও দেয়, তবে কড়ার থাকে তিন মাসের মধ্যে ওই জায়গাটাই খারাপ হলে বিনি পয়সায় মেরামত করে দিতে হবে। কদরুর কড়ার আছে সেলাইয়ের ঘষটে ফোস্কা উঠলে কি পা কাটলে সে জানে না। এ পেরেকটা কিন্তু কদরুর ঠোকা নয় নিজেরই ঠোকা। বেটা ঠেলে উঠেছে একেবারে সোজা হয়ে।

আবার একবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর ক্রোধটা ঘুরে এসে পড়ল ওই পাথরটার উপর। ওইটে। ওইটে। ওইটেই সব অনিষ্টের মূল। বেটা কায়েমি মোকরীর স্বত্ব; রাধে রাধে রাধে মোকরীর স্বত্ব হয় ওই বেটা পাথরের? বেটা ভাগ-জোতদার! বেটা তুচ্ছ ভাগ জোতদার মাথা ঠেলে খুঁটি গেড়ে বসবে তুমি। প্রতিশোধে বেটাকে উচ্ছেদ করেছে সে—এইবার ওর মুণ্ডপাত করবে। ওই বেটাকে দিয়েই ঠুকবে এই পেরেক হারামজাদকে। পাথরটাকে কুড়িয়ে নিলে রমন ঘোষ তারপর জুতোটাকে আর একটা পাথরের উপর রেখে কাঁটার উপর পাথরটা ঠুকতে লাগল। শা—! শা—! শা!

ওরে বাপরে! এ যে সর্বনেশে পাথর! ফর ফর করে আগুনের ফুলকি ছুটছে! আশ্চর্য। পেরেকে ঠুকবার সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডের জোগাড়। চারিদিকে আগুনের কনা ছুটছে। একি হনুমানের খসে পড়া লেজের গাঁট নাকি? অসুরের কাঁড়ি ছানে অসুরের পাথর হওয়া হাড় এখানে অনেক। তখন হনুমানের খসা লেজের টুকরো থাকবে তাতে আশ্চর্য কি?

পেরেকটা [illegible] পাথরটা হাতে নিয়ে বেশ করে দেখলে রমন ঘোষ। হুঁ—বেশ গোলগাল। পোয়াখানেক ওজন হবে। পেরেকের ঠোকায় একটু একটু দাগ হয়েছে চকচকে সাদা। ওপরটা লাল হয়ে আছে। শা—। তোমার অনেক গুণ। আসলে অনেক তোমার মর্ম। [illegible]

ঘোষ এখনও চকমকি ঠোকে।

কাড়িটা যত দেশলাই ফুরুচ্ছে ঘোষ তত আক্রোশের সঙ্গে চকমকি আঁকড়ে ধরছে। থাক তুমি থাক বেটা পাথর পকেটে থাক। উঁহু—জামাটা অনেক দিনের ছিঁড়ে যাবে। হাতেই থাক। চল—সারা জীবন তোমাকে ঠুকে আগুন বার করব। চল।

॥ দুই ॥

সর্বনেশে পাথর। আগুনে পাথর। পাথর থেকে আগুন লাগল।

বাড়ির এ'টোকাঁটা ঘুচোয় যে ঝিটা—সে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল—আগুন গো আগুন। লাগল গো লাগল।

রমন ঘোষ ঘরে বসে গোবিন্দকে ডাক-ছিল কাতরস্বরে—এই অকৃতজ্ঞ ধর্মহীন পৃথিবী থেকে পার করবার প্রার্থনা জানাচ্ছিল আর ভাগ জোতদারদের নামে নালিশের আর্জির খসড়া তৈরি করছিল। পার হবার আগে এস্পার ওস্পার করে যাবে একটা। হাইকোর্ট পর্যন্ত চল হারামজাদরা।

চীৎকার শুনে চমকে উঠল। আগুন! এই পৌষ মাসের শেষ—খামারে ঐরাবতের মত অতিকায় আপেটা ধান! আগুনে লাগলে—খই ছড়িয়ে গোটা গ্রাম ছেয়ে দেবে। আগুন! কোথা থেকে লাগল আগুন! কে লাগালে আগুন? কি করে লাগল আগুন?

স্খলিত কচ্ছ হয়ে কাপড়ের কসি গুঁজতে গুঁজতে বেরিয়ে এল ঘোষ। কোথায় আগুন?

মানদা বললে—নিভে গেছে সে। কিছু না, তুমি আপনার কাজ করগে!

—নিভে গেছে? তা হলে লেগেছিল। কি করে লাগল? কই কোথায় লেগেছিল? কোথায়? এই—এই হারামজাদী—কোথায় লেগেছিল? চেঁচালি যে?

ঝিটা বললে—খড় জেলে যজ্ঞি করছিল নিমু—

নিমু? মানদার কলির পেল্লাদ? খুদে গোঁর? যজ্ঞি? কিসের যজ্ঞি? নিজের মারণ যজ্ঞি? না মানদার চিতে? না—আমার ধ্বংস যজ্ঞি? সে কই সে কোথায়?

—পালিয়েছে বাবা। দপ করে খড় জ্বলেছে—আর আমি চেঁচিয়ে উঠেছি আর সে উঠে চোঁচা দৌড়। দিদি এসে জল ঢেলে দিলে একবালতি। নিভে গেল। একটা পাথর নিয়ে পুজো করছিল। পাথর বাবা সত্যি ঠাকুর। লণ্ঠন জেলে পাথরটি রেখে পুজো করছে—পাথর জ্বলছে বাবা। ওই দেখ!

সত্যই জ্বলছে।

ভিতর বাড়ি এবং বাইরের আমার বাড়ির মধ্যে খানিকটা [illegible] জায়গা। সেখানে একটা

সাধন পীঠ। হাজামজাদের পাঁচপুকুরের পঞ্চমুণ্ডির আসন। যত পুজো ওইখানে হয় ঝড়ির। সেখানেই লণ্ঠনের সামনে একটা গোলালো পাথর। সেটা জ্বলছে। ঠিক জ্বলছে। চারিপাশে তার ছটা ছড়িয়ে পড়েছে। আশ্চর্য এ কখনও দেখেনি রমন ঘোষ। তার মুখের কথা হারিয়ে গেল। সে যেন বোবা হয়ে গেছে। এ কি? এ পাথর কোথায় পেলে ঝড়ি? ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে পাথরটা তুলে নিলে রমন ঘোষ। আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দেখলে। চোখে এসে ছটা লাগছে! পাথরের ভিতরটায় যেন আলো জ্বলছে। আলো নয়—আলো লালচে, এ সাদা। সূর্যের আলোর মত সাদা। চোখ ধেঁধে যাচ্ছে!

পাথরটা সেই পাথরটা। হ্যাঁ সেইটাই। ঘোষ এনে রেখে দিয়েছিল তামাক টিকের সঙ্গে ঘরের কোণে; ঠাকুর-পাগলা ঝড়ি ওটার গোলালো আকার দেখে হয় শালগ্রাম নয় শিব যা হয় একটা কিছু হিসেবে পুজো করবে বলে ওটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে কামিনী গাছতলায় কখন স্থাপন করেছে।

জয় ভগবান, সর্ব্ব শক্তিমান! তুমি যা কর মঙ্গলের জন্য। তুমি যা কর মঙ্গলের জন্য। ভাগজোতদারদের দুর্মতি তুমি দিয়েছ না দিলে তারা ভাগ দেখে না রব তুলত না। ঘোষ যেত না গোয়ালপাড়া। ওরা ইনকিলাব বলে না-চেঁচালে রাগ হত না ঘোষের। রাগ না হলে ওই পাথুরে ডাঙগার উপর দিয়ে আনমনা হয়ে হাঁটত না। ওভাবে পথ না হাঁটলে হুঁচোট খেত না ঘোষ। হুঁচোট না খেলে পেরেক উঠত না জুতোতে, পেরেক না উঠলে ঘোষ লাঠি দিয়ে খুঁচে পাথরটা তুলত না। জয় ভগবান!

—ওটা কি দাদা? হীরে টীরে না কি? এমন জ্বলছে?

—হীরে, হীরে! টীরে নয়! বললে মুখ ভেঙে দোব! হীরে। হীরে। হীরে। প্রায় চীৎকার করে উঠল রমন ঘোষ।

—দেখি! দেখি!

ঝড়ি কখন এসে দাঁড়িয়েছে ঘোষের পিছনে। ঘোষ জানতে পারে নি। ঝড়ির গায়ের সিগারেটের গন্ধ নাকে আসা সত্ত্বেও জানতে পারে নি। ঝড়ির হাতখানা কাঁধের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসাতে খেয়াল হয়েছে নইলে বোধ করি কথার আওয়াজেও খেয়াল হত না। ঘোষ শক্ত করে হাতখানা নিয়েও প্রায় লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল।

—না। ওইখান থেকে দেখ। ওইখান থেকে!

—কেন [illegible] ?

—[illegible]

—তাইতো বেশতো ছটা বের হচ্ছে। ভিতরটায় যেন কি রয়েছে—?

—রয়েছে তো রয়েছে। তোদের কি? তোদের—।

হঠাৎ থেমে গেল রমন ঘোষ। কথা বলতে বলতেই মনে পড়ে গিয়েছে—হীরেতে কাচ কাটে। হীরেতে কাচ কাটে। ঘরে একখানা ছবি আছে। রাধাগোবিন্দের ছবি। তাতে কাচ আছে। হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে।

হন হন করে চলে এল ঘোষ। ঘরে এসে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। জানালা-গুলো শীতের দিনে আগে থেকেই বন্ধ ছিল। অনেক কষ্টে তক্তাটা টেনে ও দেওয়ালের ধার থেকে হড় হড় শব্দে টেনে এ দেওয়ালের ধারে এনে লাগিয়ে ছবিখানাকে নামালে। ঘোষের ইষ্ট দেবতার ছবি। যুগল-মূর্তির পায়ে কাচের উপর অনেক চন্দন। সব নখ দিয়ে চেঁচে ফেললে। তারপর কাচ-খানাকে খুলে ফেললে। ক্ষমা করো রাধাগোবিন্দ! হে রাধাশ্যাম। তোমার কাচ কেটে যদি পাথরটা হীরে হয় তা হলে কাচ নয় বাবা কাঞ্চন, সোনা সোনার সিংহাসন করে বসাব তোমাকে। ননী ছানার ভোগ দোব দু বেলা। জয় রাধাশ্যাম—কাটিস—কচ কচ করে কাচ কাটিস।

কর-র-শব্দে দাগ একটা টানলে ঘোষ। পাথরটার একটা খোঁচার মত অংশটা কাচটার উপর রেখে চেপে ধরে মারলে টান। কর-র শব্দ উঠল। হাঁ দাগ পড়েছে, কেটে বসে দাগ কেটেছে। এইবার দুই ধার ধরে চাপ দিলে ঘোষ। মট করে শব্দ হল—যেন ময়রাদের পাটার উপর ঢালা জমানো গুড়ের পাটালী খণ্ডার দাগ বরাবর ভেঙে দুখানা হয়ে গেল। চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল ঘোষের। কয়েক মিনিট স্তম্ভিতের মত বসে রইল সে।

হীরে। আলোয় ঝকমক করছে। আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ছে। কর কর শব্দ করে কাচে দাগ ফেলছে। মট করে দাগে ভেঙে যাচ্ছে কাচ।

হীরে! এ হীরে!

এরপর ছেলে মানুষ যেমন সাদা কাগজে কালির দাগ টানে তেমনি করে পাথরটা দিয়ে কাচখানার টুকরো দুটোকে নিয়ে দাগ টানতে লাগল।

কর-র! কর-র! কর-র! কর-র!

মট্! মট্! মট্! মট্!

চাপ দিয়ে ভাঙতে লাগল। পাটালীর মত! বরফির মত!

হীরে! হীরে! হীরে!

কত দাম হবে? ওজনে তোলা খানেক! [illegible] এক

[illegible]

চল্লিশ টাকা! উঁহু আশী এক শো টাকা! একশো টাকা! আলবাৎ এক শো টাকা।

"এক রতি হীরার দাম এক শো টাকা হইলে—এক পোয়া হীরার দাম কত হইবে?" ছিয়ানব্বুই রতিতে এক তোলা। আশী তোলায় সের। এক পোয়া সমান কুড়ি তোলা। তা হ'লে কুড়ি গণিত ছিয়ানব্বুই উনিশশো কুড়ি—দু' হাজার—দু' হাজার। দু হাজার গণিত এক শো। এক শো হাজারে এক লাখ—দু লাখ দু লাখ দুলাখ।

সংগে সংগে সে করর শব্দে ছোট ছোট টুকরো গুলোর উপরও দাগ টানছিল এবং মট মট করে ভাঙ্গছিল। এর মধ্যে ভাঙ্গা কাচে দুখান হাত কেটে তার রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। হীরে। দুলাখ। দুলাখ তার দাম। বেশীও হ'তে পারে। বিশ লাখও হতে পারে।

মাথা ঘুরছে ঘোষের। সে শুয়ে পড়ল। হীরে। দুলাখ। দশলাখ! বিশ লাখ।

—হীরে। হীরে বলেই মনে হচ্ছে।

বললেন পুরনো জমিদার বংশের বৃদ্ধ হেমন্তবাবু। রমন ঘোষদের গ্রামেরই জমিদার ছিলেন একদিন। এখন অবশ্য জমিদারীই উঠে গেছে। জমিদার নন। তবে গায়ের গন্ধ, মেজাজ এবং জমিদার বাচ্চার চোখ কোথায় যাবে? কুকুরে অন্ধকারেও চোর ঠাওর করতে পারে, বেড়ালে অন্ধকার ঘরে কোন কোণে ইঁদুর আছে জ্বল জ্বলে চোখে ঠিক দেখতে পায়, জমিদারবাচ্চা এক-দিনের জমিদার—হেমন্তবাবু পাথরখানা দেখে ঠিক বলে দিলেন। হীরে! হীরে বলেই মনে হচ্ছে।

খবরটা চারিদিকে রটে গেছে। ঘোষ পরের দিনই হেমন্তবাবুদের বাড়ির সে'করা বাগালকে ডেকে পাথরটা দেখিয়েছিল।

—দেখতো বাবা বাগাল!

বাগাল দেখে শুনে পাথটার মধ্যে আলোর ছটার ফলন দেখে কাচ কাটা দেখে বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিল। বলেছিল—তাই তো ঘোষ। তাজ্জব লাগছে। এ তো—

—কি এতো?

—দামী পাথর বলেই তো লাগছে।

—দামী পাথর? হীরে! হীরে! হীরে!

বাগালের কাছ থেকেই কথাটা বোধ হয় ছড়িয়েছে। এ আসছে পাথরখানা দেখি? ও আসছে—দেখান একবার ঘোষ মশায়!

হেমন্তবাবু ডেকে পাঠালেন—পাথরটা নিয়ে একবার আসবে।

কথাটা অমান্য করলে না ঘোষ। হেমন্ত-বাবু ঠিক বলে দেবে। ওদের আঙটিতে হীরের চলন অনেক দিন থেকে। বউদের নাকচাবিতে হীরে ভিন্ন অন্য পাথর ওদের দেখে ওদের চোখে হীরে পাইকারের চোখে [illegible] পাথর দেখে গরুর মত চেনা। দেখলেই ঠিক যেন বলে দেবে ঝুটো কি আসল।

হেমন্তবাবু ঠিক ধরলেন। হেসে বললেন —তোমার কপাল ঘোষ। ভাগ্যবান হে তুমি। জান এই তিন পাহাড়ী স্টেশন জানতো? রাজমহল যেতে তিন পাহাড়ীতে নামতে হয়। সেখানকার এক স্টেশন মাস্টার কত আর মাইনে ওদের হে? আঁ। কোন রকমে চলে আর কি। ফাকা জায়গায় স্টেশন চারিদিকে পাহাড় তো, তা বাতাস খুব। আর সেই বাতাসে টেবিলের উপর থেকে কাগজপত্র ফর ফর করে উড়ে যায়। উঠে গিয়ে ধরতে হয়। একদিন বিরক্ত হয়ে কতকগুলো পাথর কুড়িয়ে আনে। বুঝেছ। টেবিলের উপর কাগজ চাপা দেয়—ওড়ে না। এখন একদিন রাত্রে বুঝেছ না, এক মাড়োয়ারী সে গেছে তিন পাহাড়ী পাথরের কোয়েরী করবে—তারই জায়গা দেখতে। জায়গা দেখে ফিরবে। স্টেশনে এসেছে। রাত্রিকাল ট্রেনের খানিকটা দেরী আছে, কাজেই এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে স্টেশনে এসে ঢুকলে বাবুজী টেরেনকে কেতনা দেরী হ্যায়? রাত্রে স্টেশন মাস্টার একা বসে কাজ করছে।

মাস্টার কাজ করতে করতেই বললে দো ঘণ্টা।

—দো ঘণ্টা? তবতো হিঁয়া থোড়া বৈঠে হম। বলে বসল। বসে এটা ওটা দেখছে—কখনও গুনগুনিয়ে 'ঠুমকি চলত রামচন্দ' গাইছে, এমন সময় চোখ পড়ল পাথরটার উপর। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললে, বাবুজী এ পথল তুমি কোথা পেলে?

—কেন?

—পাথরটা আমাকে দেবে?

—তুমি কি করবে?

—কাম কুছ্ হোবে। লেকিন হম অপকো দাম থোড়া দেগা।

মাস্টার বাঙ্গালীর ছেলে—চালাক ছেলে, বললে দাম আমাকে আরও দুজনে বলে গেছে আমি দিই নি। তোমার দাম তুমি বল।

—পান শো।

হা-হা করে হেসে মাস্টার বললে—পাঁচ হাজারে দিই নি, তুমি বল পান শো। রাখ, ওটা দাও। বলে হাত থেকে নিয়ে সংগে সংগে স্টেশনের সিন্দুকে বন্ধ করলে। তার পর দিনই একেবারে কলকাতা। সেখানে জহরত-ওয়ালাদের দোকানে গিয়ে হাজির। তারা দেখেই তো লাফিয়ে উঠল। পাঁচটা দোকান ঘুরতেই দর উঠতে লাগল। শেষ পঞ্চাশ হাজারে বেচে দিয়ে মাস্টার চাকুরী ছেড়ে দিয়ে জমি জেরাত কিনে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস —বুঝলে না।

[illegible] তোমারও আবার সুখে-স্বচ্ছন্দে। টাকার [illegible] উপরেই তো রয়েছ। সেই খাটো কাপড় আর মাথায় তালপাতার ছাতা। সেই কড়াই বাটা আর ভাত। বউ মরে গেল, একটা বিয়েই করলে না হে! দিয়ে দাও পাথরটাকে আমাকে, কিছু টাকা নিয়ে দিয়ে দাও। আমি শেষ বয়সে একটু আরাম করেনি। খেল খেলে যাই। কলকাতায় বাড়ি কিনে গাড়ি করে নতুন বিয়ে না-করি একটা বাঈজী রেখে হোলি খেলে নিই। দেবে?

হাসতে লাগলেন হেমন্তবাবু।

লজ্জিত হয়ে ফিরে এল রমন ঘোষ। আসবার পথে খুক-খুক করে হাসছিল ঘোষ। বাবু এই বয়সে বললে, মুখ ফুটে বললে ওই কথাগুলো! কিন্তু বলেছে বেশ। খাসা!

বাড়ি করে, গাড়ি কিনে নতুন বিয়ে—

খি-খি-খি করে হেসে সারা হয়ে গেল ঘোষ!

বাড়ি ফিরতেই কড়ি জিজ্ঞাসা করলে, বাবু না কি পাথরটার দাম বলেছে লাখ টাকা?

ঘোষ চমকে উঠল। কটমট করে কড়ির দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, তাতে তোর কি? বলি তোর কিরে হারাম-জাদ?

কড়ি ভুরু কুঁচকে বললে, খবরদার বলছি। হারামজাদ হারামজাদ করো না বলছি।

—মারবি নাকি রে হারামজাদ?

—খুন করব। চিৎকার করে উঠল কড়ি। এবং গট গট করে উঠে গেল।

কড়ির এ-ধরনের শাসানি নতুন নয়, ঘোষ এর জবাবও দেয়—কুত্তার বাচ্চা দূর করে দোব। পথে বের করে দোব। কিন্তু আজ আর সে জবাব দিলে না। শুধু বললে, বটে! এবং ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে পাথরটি হাতে করে চুপ করে বসে রইল।

সন্ধ্যাবেলা মানদা ডাকলে, দাদা শুনছ?

উত্তর দিলে ঘোষ—কালা তো হইনি, কি বলছিস বল না কেন?

—ঘরে বসে আছ সেই তখন থেকে—

বেশ করছি। আমার খুশি আর বেরুব না। মরব। সবচেয়ে জোর আলোটা জেলে দিয়ে যা দেখি! কাচটা খুল ভাল করে ছাই দিয়ে মেজে দিবি।

আলোটা দিয়ে যেতেই আলোটা জোরালো করে জেলে দিয়ে পাথরটা সামনে রেখে আবার চুপ করে বসে রইল ঘোষ। জ্বল-জ্বলে ছটা যত রাত্রি হচ্ছে তত যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ওঃ আগুন বের হচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে, আগুন ধরে যাবে।

হীরে! হীরে! ঝলমল করে ছটা বের হচ্ছে।

ঘোষ নিজের বুকের উপর ধরলে পাথরটা। ওঃ ঠিক কৌস্তুভ মণি। বলি-হারি—বলিহারি। বলে লাখ টাকা দাম! দশ লাখ টাকা দাম। বিশ লাখ টাকা! ওই [illegible]

দেখেছে, তাতে কোথায়—এমন আলো-কোথায় বের হয়? আর এতটুকু টুকরো। তারই দাম বলে, আড়াই শো টাকা! আর এমন হীরে—! এমন ঝলমলে ছটা—আর এত বড় পাথর, এ থেকে এমন কত টুকরো বের হবে। একরাশি।

লাখ টাকা? দশ লাখ বিশ লাখ! শা—!

যাঃ বেটা হারামজাদা ভাগ জোতদারেরা, যাঃ, নেহি মাংতা হ্যায়। যাঃ, ও জমি তোরা নিয়ে নে। ঘোষের টাকা—সুদ অনেক দিন উঠে গিয়েছে। এবার তোরা খেগে যা। নেহি মাংতা হ্যায়! সব জোতদার, যেখানে যে আছে, দেবে তাদের ছেড়ে জমি। জয় জয়কার। জয় জয়কার পড়ে যাবে ঘোষের। বদান্য—মহানুভব—মহাত্মা টহাত্মা—বলে হৈচৈ করবে সব।

দশ লাখ না বিশ লাখ! না—দুয়ের মাঝামাঝি পনের লাখ। এই ঠিক পনের লাখ। পঞ্চদশ লক্ষ! ঠিক হ্যায়।

আচ্ছা আচ্ছা। এই তো আধুলিটা—এই আধুলির এই দিকটা দশ এই দিকটা বিশ; দাও ছুড়ে আধুলিটাকে দেখি কোন দিক ওঠে।

ঠং ক'রে পড়লো আধুলিটা। —এঃ দশ লাখ!

এ ছোড়াটা কিন্তু ঠিক হয় নি।—না হয় নি। উপরে উঠে ঠিক ঘোরে নি। ফের আর একবার। আবার আধুলিটা বুড়ো আঙুলের টোকা দিয়ে ছুড়ে দিলে। ইয়া! এবার বিশ লাখ।

আচ্ছা—আবার। ইয়া আবার বিশ লাখ। বিশ লাখ টাকা। যার বিশ লাখ টাকা সে ওই চাষের জমি নিয়ে করবে কী? নেহি মাংতা হ্যায়। বিশ লাখ। বিশ লক্ষ। বিংশতি লক্ষ। এক জায়গায় ঢাললে কত হয়?

আচ্ছা! এত টাকা নিয়ে সে করবে কী? কী করবে? কী করবে? ওই ঝাড় আর ঝাড়—দুটো হারামজাদের বেটা হারামজাদের জন্যে—?

উঁহু! উঁহু! উঁহু!—ওদের জন্যে যা আছে তাই অনেক! ভাগ জোতদারদের জমি ছেড়ে দিয়েও—বাড়িতে খাসে তার চার-খানা হালে আবাদী উৎকৃষ্ট জমি একশো-কুড়ি বিঘে। একশো কুড়ি বিঘেতে বছরে বিঘে পিছু আট মন ধান হলে ন শো ষাট মন ধান। দশ টাকা মন হিসেবে ন হাজার ছ শো টাকা। এ ছাড়া আখ, গম, আলু, কলাই, তিল হবে। সেও অনেক। বারো মাসে বারো হাজার টাকা, তার হাজা শুকো নাই। তা ছাড়া বন্ধকী কারবারে বিশ হাজার টাকা খাটছে। ওই হেমন্তবাবুর গহনা তার সিন্দুকে মধ্যে থাকে। এ ছাড়া পুকুর আছে, বাগান আছে।

ত্রিরিশ বিঘের বেশী আবাদী জমি রাখতে দেবে না? শা—। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। মন্ত্রী মশায়দের বুদ্ধির ফাঁক দিয়ে সুড়ুৎ করে টিকটিকির মত পার হয়ে গেলেই হবে। কাটাই যদি পড়ে তো পড়বে লেজটা, পড়ে নড়বে। কো-অপারেটিভ সোসাইটি ফেঁদে বসবে। ব্যাস। ভাগুগুলোয় লাগিয়ে দে তালের আঁটি; ছড়িয়ে দে কাঁটাল-বিচি, আমের আঁটি। ব্যাস ফলকর বনে যাবে! শা—!

চালিয়ে যেতে পারলে ওতেই রাজার হাল। না পারলে কিছুই থাকবে না বাবা! ব্যাস্ ব্যাস্, ওতেই হারামজাদার বেটা হারামজাদাদের ঢের দেওয়া হবে। এতেও যদি কেউ কিছু বলে, বলুক। গ্রাহ্য করে না রমন ঘোষ। কোন কালেই করেনি গ্রাহ্য কারুর কথা, আজও করবে না।

চলে যাবে সে। কোথায় যাবে? কোথায়? দিল্লী? বোম্বাই? কলকাতা? বিলাত? কোথায়?

বাড়ি করবে। সুন্দর বাড়ি। সামনে বাগান, বাড়িটি ছবির মত। দেখে এসেছে সে, কলকাতা গিয়েছিল গত বছর, তখন দেখে এসেছে। শা—। সুন্দর ঘর, সুন্দর দোর, সুন্দর মেঝে—সে আবার বাহার কত মেঝের, ফুটকি ফুটকি কালো সাদা দাগ-গুলো লাল-সবুজ-হলদে রঙের কাচের মত পালিশ করা মেঝে। ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান। গদি-আঁটা চেয়ার। বসলে বোক্ করে বসে যায়। আবার দোলে! বাড়ির সামনে সবুজ ঘাস-ওয়ালা খানিকটা বাগান। হরেক রঙের ফুল। দেবে সরষে বুনে। ফুল কে ফুল, ফসলকে ফসল। সরষে বাটা দিয়ে ইলশের ঝাল! আর আর—। শা—, মুরগী। মুরগীর সুরুয়া। খাবে মুরগী।

খাবে। কখনও খায়নি—কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট মাংস আর নাকি হয় না; এবার খাবে। এই যে টাকা, এ বয়সে এমন করে সে পেলে কেন? সাধ মেটাবার জন্য। খাবে মুরগী সাধ মিটিয়ে। হাঁ! নিশ্চয়! বিধাতা পুরুষ ফিস-ফিস ক'রে তার কানে কানে বলছেন সে শুনতে পাচ্ছে যে! বলছেন, "ওরে কষ্ট ক'রে টাকা জমিয়ে তো খেতে পারলিনে, ভোগ করলিনে; আচ্ছা এবার আমি ছপ্পড় ফেড়ে দিলাম; এবার ভোগ কর!" স্পষ্ট শুনেছে সে। হেমন্তবাবুর মুখ দিয়ে ও কথাগুলো বিধাতা পুরুষের। কানের কাছে অহরহ শুনেছে। আর সে অমান্য করবে না। ওঃ বুকের ভিতরে চাপাপড়া সাধগুলো কিল্‌বিল্‌ ক'রে বেরিয়ে পড়েছে। সারা শরীরটা যেন শিউরে শিউরে উঠছে।

খাবে মুরগীর মাংস, শুধু মুরগীর মাংস? আরও খাবে।

হুঁ! হুঁ! লাল পানি। বিলাতী মদ! রোজ মুরগীর মাংস আর বিলাতী মদ খাপ করে খেলে না কি পরমায়ু বাড়ে। গাল-গুলোয় রাঙা ছাপ ধরে। শা—না কি নব যৌবন হয়। আর চোখের সামনে নাকি ফুল ফোটে। তারপর?

হুঁ! হুঁ! তারপর নব যৌবন যখন হবে তখন—।

না—না। ওই হেমন্তবাবুর মত বাঈজী রাখতে পারবে না। না সেটা সে করবে না। একটি বেশ বয়স্থা মেয়ে দেখে—। মাথায় কলপ মাখালেই চুল কালো। বিলাতী মদে আর মুরগীতে নব যৌবন, গাল লাল। ব্যাস। বয়স্থা একটি মেয়ে, গরীবের মেয়ে, বেশ ভাল রাঁধতে পারে, বেশ মিষ্টি কথা, উল

বলতে পারে, বেশ একটু লেখাপড়া জানে এমন মেয়ে। রোজ সন্ধ্যেবেলা বায়স্কোপ দেখতে যাবে। রোজ!

হ্যাঁ—হ্যাঁ। একখানা মোটর গাড়ি কিনতে হবে। বেশ ছোটখাটো। দুজনে বসলে যেন গায়েগায়ে বেশ ঘেষাঘেঁষি হয়। মোটর গাড়িতে চ'ড়ে যাবে সিনেমা দেখতে।

আচ্ছা একটি ওই সব সিনেমার মেয়েকে বিয়ে করলে কী হয়? এখন তো সব এমন কত বিয়ে হচ্ছে! উঁ-হু। না না। ওদের ঠিক সামলাতে পারবে না। না না। তার চেয়ে এমনি মেয়ে, গরিবের মেয়ে ভাল: গান নাচ জানা মেয়ে বিয়ে করলেই হবে। ব্যাস, ব্যাস! ওই ঠিক।

—দাদা! অ দাদা শুনছ?

চমকে উঠল ঘোষ। তারপর চিৎকার করে উঠল দুরন্ত ক্রোধে, "কী, কী, কী? কী চাই তোমার রাক্ষুসী ডাইনী?"

—বলি রাত্রি যে অনেক হ'ল।

—তা হোক।

—ইষ্ট স্মরণ কর!

—করব না। ইষ্ট স্মরণ। ইষ্ট স্মরণ! চুলোয় যাক ইষ্ট স্মরণ। বিরক্ত করিস নে আমাকে।

—ওমা সে কী কথা গো। ক্ষেপে গেলে না কি?

—গিয়েছি বেশ করেছি।

—বেশ করেছ, করেছ। বেশ হয়েছে ক্ষেপেছ। ইষ্ট স্মরণ না হয় নাই করলে—খাবে না? খাবার তৈরী করে বসে আছি ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে!

—আগুনে গুঁজে দে। গরমও হবে। ছাইও হবে। বিরক্ত করিস নে—আমি খাব না।

—সে কি—

—খাব না—খাব না—খাব না! খাব না—খাব না।

চিৎকার করতে লাগল রমন ঘোষ; সে প্রায় উন্মাদের মত। ওঃ রেহাই তাকে পেতেই হবে—এই মানদার কবল থেকে—ওই কড়ি ঝড়ি দুই হারামজাদের হাত থেকে, এই হতভাগা সমাজ—এই ছোটলোকের গ্রাম থেকে উদ্ধার তাকে পেতেই হবে।

কলকাতার সুন্দর বাড়িতে—সুন্দর আসবাবের মধ্যে পরমানন্দে বাকী দিনকটা কাটিয়ে দেবে। ভোগ করবে। শা—চিৎকার ক'রে হাঁপানি ধ'রে গেল। ঘেমে উঠেছে রমন ঘোষ। আঃ—সর্বনাশী মানদা, এমন আচমকা ডাকে। চমকে উঠতে হয়, বুকের ভিতর ধড় ক'রে উঠল। রমন ঘোষ এসে বসল তক্তাপোশটার উপর।

এরকম শরীর যেদিন খারাপ করবে, সেদিন সিনেমায় যাবে না। সেদিন বাড়িতে বসে এক ডোজ বিলাতী মদ বেশী ক'রে খাবে। বলবে, দাও তো—

কি নাম হবে বউয়ের? লতিকা! হ্যাঁ লতিকা। —দাও তো লতিকা এক ডোজ।

লতিকা বলবে, সে কী? এই তো খেলে।

—শরীরটা খারাপ করছে। এই বুকের এইখানটা—। হ্যাঁ—দাও। আর একখানা গান কর। আর একটু নাচ। আজ আর সিনেমা থাক।

লতিকা গাইবে, চোখে চোখে রাখি হায়রে তবু তারে ধরা যায় না!

রমন ঘোষ এ গানটা শুনেছে। মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। রমন ঘোষ বোধ করি আত্ম-বিস্মৃত হয়েই দু হাত বাড়িয়ে সুরে ডেকে উঠল—আয় না?

—এস এস লতিকা এস! একটু বুকে হাত বুলিয়ে দাও। এইখানটা। এইখানটা। আঃ—আঃ—।

রমন ঘোষ সশব্দে তক্তাপোশ থেকে পড়ে গেল মেঝের উপর।

(তিন)

পরের দিন সকালেও রমন ঘোষ উঠল না দেখে মানদা ডাকলে কড়িকে। কড়ি ডেকে সাড়া না পেয়ে পাড়া গোল করে তুললে। দরজা জানালা সব বন্ধ। নিঃশব্দ নিঝুম ঘরের ভিতরটা। শুধু কেরোসিনের আলোর গ্যাসের গন্ধ বেরিয়ে আসছে কপাটের জোড়ের ফাঁক দিয়ে। কড়ি লাথি মেরে ভেঙে ফেললে দরজার খিলটা। সশব্দে দুপাশের দেওয়ালে আছাড় খেয়ে খুলে গেল দরজা। ভক্ ক'রে কেরোসিনের আলোর গ্যাস বেরিয়ে এল। ঘরের ভিতরের জ্বলন্ত আলোটাও মুহূর্তে দপ ক'রে নিভে গেল।

ঘরটার অবস্থা অন্ধকারের মধ্যে রমন ঘোষ মেঝের উপর পড়ে আছে। নিথর। দেহটা হিমশীতল। কঠিন হয়ে গেছে। হাতে তার পাথরটা।

মরে গেছে রমন ঘোষ।

* * * *

পাথরটা কড়ি রমনের শ্রাদ্ধের পর কলকাতায় নিয়ে গেল। ঐ টাকায় রমনের নামে হসপাতাল কি কিছু একটা হবে।

পাথরটা হীরে মণি মাণিক নয়। পেবেল। কাটলে পেবেল বের হবে। তার দাম আর কত? কাটাইয়ের জন্য তার চেয়ে বেশী টাকা লাগবে।

মানদা পাথরটা গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে, গঙ্গাস্নানে গিয়ে। [illegible]

বিচিত্রাঙ্গদা

ড্রামের শব্দ আবার মৃদু হয়ে দুরু দুরু করে। আর, ক্লেরিওনেটও যেন গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে বাজে—কেমন কাটা-কাটা সুর, চাপা-চাপা স্বর। গ্যালারির ভিড়ও শান্ত। হঠাৎ মরে গিয়েছে সব মুখরতা। অনেকের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়েছে। অনেকের বিস্ময় এরই মধ্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। দর্শকদের অপলক চোখ-গুলি তখন নিরুদ্দাম হয়ে সেই বিরাট তাঁবুর ভিতরেই উপরের শূন্যলোকের দিকে তাকিয়ে সুন্দর এক উন্দামতার খেলা দেখছে। ট্রাপিজের খেলা খেলছে মিস সুধালক্ষ্মী। একটার পর এক নতুন খেলা।

ঘাড় অনেকখানি কাত ক'রে আর মুখ বেশ খানিকটা তুলে নিয়ে দেখতে হয়। অনেক উপরের তাঁবুর সব চেয়ে উঁচু দুই খুঁটির মাথায় নীল আর লাল আলো জ্বলে। দুই আলোর মাঝখানের ব্যবধান জুড়ে জরির ঝালর লাগানো লম্বা একটি চাঁদোয়া। ঠিক তারই নীচে দুলছে দু'টি ট্রাপিজ—একটি এদিকে এবং আর-একটি ওদিকে। ট্রাপিজের রডে দুই পায়ের পাতা

সুবোধ ঘোষ

হুকের মত এঁটে দিয়ে, আর ছিপছিপে শরীরটাকে সাপের মত নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে দুলছে ডেকান গ্র্যান্ড সার্কাসের মিস সুধালক্ষ্মী।

সাদা সিল্কের টাইট দিয়ে সারা দেহটাই মোড়া। যেন অতি নিখুঁত আর বড় স্পষ্ট একটি মেয়েলী গড়ন নিয়ে দুলছে সাদা সিল্কের একটা স্তবক। কোমর ঘিরে সবুজ মখমলের খাটো জাঙিয়া। বুকটা এক টুকরো চওড়া মসলিন দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা, সেই বাঁধনের ফাঁসও যেন একটা রঙীন চিঁড়িতন, পিঠের কাছে কেঁপে কেঁপে দুলছে। মোটা চাবুকের মত শক্ত ক'রে বাঁধা বিনুনীটাও অনেক নীচের রিং-এর মাটিকে যেন ছলনা ক'রে বাতাস কেটে সোঁ সোঁ ক'রে দুলছে। বুকের মসলিনের উপর গাঁথা পর পর তিনটে মেডাল। মেডালের সারিও উলটে গিয়েছে, মাথা নীচু ক'রে দুলছে।

এলোমেলো নয়, বেশ সুন্দর ছন্দে বাঁধা সেই উন্দামতা, সেই ভয়াল কুহকের খেলা। দর্শকের চোখের শঙ্কাকে আনন্দে শিউরে দিয়ে, আবার কখনো বা চোখের আনন্দকে শঙ্কিত ক'রে দিয়ে দুলে দুলে ট্রাপিজের খেলা দেখাচ্ছে মিস সুধালক্ষ্মী। উপরের ঐ সুন্দর দোলানির দেহটা যদি হঠাৎ ভুলে ফসকে গিয়ে অনেক নীচে রিং-এর এই ভয়ানক শক্ত মাটির উপর পড়ে যায়? সুধালক্ষ্মী দোলে, সেই সঙ্গে গ্যালারির ভিড়ের আতঙ্কও দোলে।

কিন্তু কোন আতঙ্ক দোলে না, আর, একেবারে ধীর ও স্থির হয়ে চুপ ক'রে রিং-এর মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছে একজন। সে-ও সুধালক্ষ্মীর ঐ সুন্দর দোলানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর খেলা এখন থেমে রয়েছে। সুধালক্ষ্মী যখন খেলা থামিয়ে ট্রাপিজের বডের উপর বসে জিরোয়, তখন ওর খেলা শুরু হয়।

ওর খেলা হলো রিং-এর এই মাটির উপর ঘুরে ফিরে আর নেচে-কুঁদে যত উদ্ভট রগড়ের হুল্লোড় দুলিয়ে দেওয়া। বিদ্ঘুটে স্বর, কুতকুতে হাসি, ড্যাবড্যাবে চাউনি আর যত কটর-মটর বোল বুলি আর আওয়াজ। রং ঢং আর মস্করা।

লাপ্‌পাটি লিটিল! লাপাটি লিটিল! দর্শকদের দিকে তাকিয়ে রগড়ে বুলি ছাড়ে আর তিন-পেয়ে কুকুরের মত থমকে থমকে হাঁটে; রিং-এর মধ্যে ছোট একটা চক্কর দিয়ে সোজা টান হয়ে দাঁড়িয়েই গ্যালারিকে লক্ষ্য ক'রে বীরদর্পে একটা মিলিটারী স্যালুট ছাড়ে, তার পরেই ভাঙা কাঁসার বাসনের মত খ্যানখেনে স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে এই সার্কাসের জোকার দাসগুপ্ত—বাবা আমার নাম দিয়েছেন কার্নেল পোটাটো। ওরে আমার বাবা রে!

গ্যালারিতে হুল্লোড় ফেটে পড়ে। কার্নেল পোটাটো ইধার আও। এদিকে এস কার্নেল পোটাটো। কখনও এদিক থেকে, কখনো ওদিক থেকে তারস্বরের আহ্বান শোনা যায়।

চট্ ক'রে মাটির উপর হাত দুটোকে থাবার মত পেতে শরীরটাকে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে একটা ভল্ট খায় কার্নেল পোটাটো, হাতে ভর দিয়ে উলটো শরীরটাকে খাড়া রেখে তড়বড় করে দৌড়তে থাকে, আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পা-তালি বাজায়।

রিং-এর অনেক উপরে ঊর্ধ্বলোকের দুই রঙীন আলোর মাঝখানে ট্রাপিজের সুধা-লক্ষ্মী, আর নীচে মাটির উপর রিং-এর মাঝখানে জোকার দাসগুপ্ত। এই খেলাটা রোজই মোটামুটি মজা জমায় ভাল, এবং সেই জন্যই বোধ হয় আজও ভিড় টানছে ভাল, টিকিট বিক্রী মন্দ হয় না। নইলে কবেই তাঁবু গুটিয়ে এই শহর থেকে চলে যেত ডেকান গ্র্যান্ড।

দোলানি থামিয়ে ট্রাপিজের রডের উপর শান্তভাবে দাঁড়িয়েছে সুধালক্ষ্মী। আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে। আস্তে আস্তে টিপ [illegible] চকচকে

গ্যালারির দর্শকের মত জোকার দাস-গুপ্তও যেন মুগ্ধ হয়ে উপরের ঐ সুন্দর কুহকের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। জোকারও বোধ হয় ভুলেই গিয়েছে যে, এই মুহূর্তে ওকে ওর খেলার পাল্লা মাতিয়ে তুলতে হবে। শুধু আজ নয়, অনেকদিন থেকে এইরকমই একটা ভুল ক'রে আসছে জোকার দাসগুপ্ত। মনে থাকে না, নিয়মটা প্রায়ই ভুলে যায়, একটু দেরী করে ফেলে দাসগুপ্ত।

কিন্তু মনে করিয়ে দেবার লোক আছে। রিং-এর বেড়ার গা ঘেঁষে কাপড়-ঢাকা যে প্রকাণ্ড খাঁচা-গাড়িটা এখন নিঃশব্দে স্থির হয়ে রয়েছে, তারই এক পাশে টুলের উপর বসে চুরোট টানেন বাঘের ট্রেনার কালো-সাহেব জন রাজারাম। বাঘের মতই গম্ভীর গোঁপালো একটা মুখ। নিজের খেলা ভুলে গিয়ে হাঁ ক'রে সুধালক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে কি দেখছে জোকার? ভ্রকুটি করেন কালো সাহেব জন রাজারাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের ছিপছিপে বিজলি চাবুকটাও সেই আড়াল থেকে সপাং ক'রে শব্দ ক'রে ওঠে। সেই মুহূর্তে এক লাফ দিয়ে সরে যায়, আর তিনটে সামারসল্ট খায় দাসগুপ্ত। রিং-এর কিনারায় এসে কুতকুতে হাসি হেসে আর মাথার টুপি বুকে ছুঁইয়ে অতি বিনীত একটা ঢং ছাড়ে।—বাবানে মেরা নাম রখখা থা কার্নেল পোটাটো। আরে বাহ্‌রে মেরা বাপ!

কার্নেল পোটাটো! কার্নেল পোটাটো। গ্যালারির এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত হাঁক-ডাকের হুল্লোড় গড়াতে থাকে। আর, জোকার দাসগুপ্ত নিজেও যেন সেই হুল্লোড়ের সঙ্গে গড়াতে থাকে। ঢিলে-ঢালা আর ন্যাতপেতে একটা নিকার-বোকার, মাথায় লম্বা একটা ধুচুনি টুপি, খড়ি মাখা মুখ, চোখের চারদিকে গোল করে আঁকা বড় বড় দুটো লাল রং-এর চক্কর, কালো রং দিয়ে আঁকা এক জোড়া ভোঁতা গোঁফ; জোকারের সেই মূর্তি দেখলেই কোমরে যেন কাতুকুতু লাগে।

বড় স্মার্ট জোকার দাসগুপ্ত। গ্যালারির সামনের সারির কতগুলি বড় বড় পাঞ্জাবী পাগড়ির দিকে তাকিয়ে ভালুকের মত একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসেই জোকার দাসগুপ্ত হাঁক ছাড়ে—পিতা-জী মেরা নাম দিত্তী কার্নাইল পোটাটো।

তার পরেই আর এক লাফ, ক্ষেপা গরুর মত। কপালে তিলক আঁকা, কালো টুপি মাথায় আর সাদা চাদর গলায় পণ্ডিতের মত মূর্তি নিয়ে বসে আছে যারা, তাদের সামনে এসে [illegible]

তারপরেই আবার। থামে না, এক মুহূর্তও চিন্তা করে না। হাসিয়ে সারা গ্যালারির পেটে খিল ধরিয়ে দিয়ে জোকার দাসগুপ্ত তার সেই বিদ্ঘুটে রঙিণলা মূর্তি নিয়ে এক একটা ঢং ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘুরতে থাকে, আর, তার সেই প্রচণ্ড পরিচয় রটিয়ে দিতে থাকে।

—বাপ-নে ম-নে নাম আপী কারনেল পোটাটো! শুনেই চোখ বড় ক'রে তাকায়, তারপরেই হেসে ওঠে গ্যালারির স্পেশ্যাল সীটের কয়েকটা চিন্তামাখা মুখ, যাদের গায়ে লম্বা লম্বা ভাটিয়া কোট।

—ভগম্পন্ এনক্ নাম কারনেল পোটাটো কোড়ুত্তান। শুনেই শিউরে ওঠে, তারপর খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে হীরার নাকছাবি পরা একদল মেয়ের মুখ।

—শুড়া মশ্, শুড়া মশ্। অপ্লার মে নামশ্ বুধ্ কারনেল পোটাটো! শুনেই আঁৎকে ওঠে, তার পরেই মিচকে মিচকে হাসতে থাকে, আলখাল্লার উপর চামড়ার পোস্তিন গায়ে, নীল চোখে সুর্মা আঁকা, গোটা পাঁচেক লালচে মুখ।

—বাব্য হমর নাম কারনেল পোটাটো দেলাথনহি হো। হাতের তেলো টিপে টিপে মিথ্যে খৈনী খায় জোকার দাসগুপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে হি হি করে হেসে ওঠে আর টিকি চুলকোয় পিছনের বেঞ্চির একদল দর্শক। গায়ে ফতুয়া আর কাঁধে গামছা, লোকগুলি আহ্লাদে এর-ওর গায়ে ঢলে পড়ে।

আবার নীরব হয় গ্যালারি। কাটা-কাটা গম্ভীর সুরে ক্লেরিওনেট বাজে। গ্যালারির সব চোখ আবার উপর দিকে তাকিয়ে মগ্ন হয়ে গিয়েছে। আবার খেলা শুরু করেছে সুধালক্ষ্মী। রিংএর শক্ত মাটির উপর আবার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে জোকার দাসগুপ্ত।

এদিকের এই ট্রাপিজে দুলছে সুধা-লক্ষ্মী। সামনের ঐ ট্রাপিজটা শূন্য আসনের মত যেন একটু একলা হয়ে দূরে সরে রয়েছে। হঠাৎ খুব জোর একটা দোল খেয়ে সুধালক্ষ্মী তার ছিপছিপে শরীরটাকে একেবারে আলগা ক'রে যেন ঝড়ের পাখির মত বাতাসের বুকে ছেড়ে দেয়। ঝুপ ক'রে নীচে লুটিয়ে পড়তে গিয়েই টুপ ক'রে শূন্য ট্রাপিজের রড ধরে ফেলে সুধালক্ষ্মী। গ্যালারিতে হাততালির শব্দ চটপট ক'রে বাজতে থাকে।

ভাল খেলা। বেশ খেলা। তবু দর্শক-দের মনে একটা অভিযোগ আছে, এবং [illegible]

শুধু একজন, এই খেলা একটু ফাঁকির খেলা। গত বছরেও এই শহরে এসে খেলা দেখিয়ে গিয়েছে এই ডেকান গ্র্যাণ্ড। শহরের লোকের আজও মনে আছে, কী সুন্দর ট্রাপিজের খেলা দেখিয়েছিল সেই মিস মঞ্জরী আর চট্টোপাধ্যায়। আজ যদি থাকতো চট্টোপাধ্যায়, তবে সুধালক্ষ্মী আজ আর একলা পাখির মত ঝুপ ক'রে ঐ ট্রাপিজের শূন্য দাঁড়ে গিয়ে বসতো না। টুপ ক'রে একেবারে চট্টোপাধ্যায়ের কোলের উপর গিয়ে পড়তে হতো।

তার পর, শেষের দিকের সেই খেলাটা—লাস্ট গ্রিপ। কী চমৎকার! কোথায় গেল সেই ফুটফুটে চেহারার চট্টোপাধ্যায় আর কাজল-পরা সেই মিস মঞ্জরী? নিশ্চয়, ডেকান গ্র্যাণ্ড ওদের ভাল মাইনে দিতে পারেনি ব'লে ওরা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। বোধ হয় ওরা এখন গ্রেট হিপোড্রোমে আছে।

এতদিন ধরে অভিযোগটা তবু একটু শান্ত ছিল, কিন্তু আজ আর শান্ত থাকার কথা নয়। আজই সারা সকাল আর বিকেল জোরে ব্যাণ্ড বাজিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করেছে ডেকান গ্র্যাণ্ড, আজকের খেলায় সেই বিচিত্র লাস্ট গ্রিপ থাকবে। আজ আর সুধালক্ষ্মী একা ট্রাপিজে দুলবে না, তার জুড়িও থাকবে। কিন্তু কই? সুধালক্ষ্মীর জুড়ি কই? সত্যিই কি একটা ভাঁওতা দিল ডেকান গ্র্যাণ্ড? কোন্ সাহসে এমন ভাঁওতা দেয়?

ভাঁওতা নয়। ম্যানেজার চিপলুংকার তখন ছেঁড়া নেক-টাই'এ হাত বুলিয়ে হাসছিলেন। টেলিগ্রাম করা হয়েছিল, নতুন খেলোয়াড় এসে গিয়েছে। পৌঁছতে একটু দেরী হয়েছে, এই যা। কিন্তু কী ভাগ্য, প্রায় সময়মত পৌঁছে গিয়েছে।

চিতে বাঘের মত আঁটসাঁট চেহারা, ফিকে হলদে রং-এর টাইটের উপর কালো ডোরা, হঠাৎ এক নতুন খেলোয়াড় এসে রিং-এর মধ্যে ঢুকেই দর্শকদের দিকে একটা স্যালুট ছাড়ে, তার পরেই দড়ি ধরে কাঠবিড়ালীর মত মুহূর্তের মধ্যে উপরে উঠে গিয়ে শূন্য ট্রাপিজের রডের উপর দাঁড়ায়।

—চিনাপ্পা! চিনাপ্পা! গ্রেট হিপো-ড্রোমের সেই চিনাপ্পা! চিনতে পেরে গ্যালারির ভিড় আনন্দে হাততালি দেয়।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এতক্ষণ ধরে যার

চোখে কোন আতঙ্ক ছিল না, শুধু তারই চোখ দুটো হঠাৎ একটা ভয়ের শিহরণে খোঁচা লেগে শিউরে ওঠে। লাল রং-এ আঁকা দুটো গোল গোল চক্করের মধ্যে জোকারের সেই দুটি চোখের ড্যাবডেবে চাউনি যেন শ্রান্ত হয়ে মুদে আসতে থাকে।

ঐ ট্রাপিজে দাঁড়িয়ে আছে সুধালক্ষ্মীর খেলার জুড়ি। কোঁকড়া চুল, কালো রং, টিক-টিক করছে নাকটা, বেশ চেহারা। সুধালক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে মিটমিট ক'রে হাসছে চিনাপ্পা। এরই মধ্যে চিনাপ্পার চোখের তারার একটু রং ধরে গিয়েছে বলে মনে হয়। যেন মুগ্ধ হয়ে রয়েছে একটা হঠাৎ পাওয়া আশার উল্লাস। মুগ্ধ হবারই কথা। আয়নার মত চকচক করে দুটি টানা টানা চোখ, আর ঠোঁট দুটি যেন একটু ফুঁপিয়ে রয়েছে, টলটল করে সুডোল থুতনির ছাঁদ; তা ছাড়া কপালের উপর মালাবার চন্দনের ঐ টিপ। সুধালক্ষ্মীর ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ না হওয়াই তো আশ্চর্য। তবু তো, এখনও জানে না, বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে না চিনাপ্পা, শঙ্খ চাবুকের মত বাঁধা সুধালক্ষ্মীর ঐ বেণীতে মহীশুরে অগুরুর কী সুন্দর গন্ধ ফুরফুর করে।

চিনাপ্পা হাসছে, হাসুক। কিন্তু সুধালক্ষ্মী অমন ক'রে হাসে কেন? আজ এক বছর ধরে সুধালক্ষ্মীর ঐ সুন্দর মুখের কত রকমের হাসি দেখেছে দাসগুপ্ত, কিন্তু আজ এ কি-রকম উদ্দাম উল্লাসের হাসি? শিউরে উঠছে সুধালক্ষ্মীর ফোঁপানো ঠোঁট, আয়নার মত চকচকে চোখে বিদ্যুতের চমক খেলছে। এ কি হলো সুধালক্ষ্মীর? এক মুহূর্তে এক বছরের ইতিহাস ভুলে গেল?

মাত্র এক মাসের জন্য হিসাব লিখবার একটা চাকরী নিয়ে এই ডেকান গ্র্যান্ডের তাঁবুতে যেদিন এসেছিল দাসগুপ্ত, সেদিনের কথাগুলিও কি সুধালক্ষ্মী ভুলে যেতে পারে? হিসাব লেখার কাজ ছেড়ে দিয়ে খেলার কাজ ধরবার জন্য দাসগুপ্তের কানে কানে কে সেদিন অদ্ভুত উৎসাহের মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছিল?

—আপনাকে হিসাব লেখার কাজ মানায় না। বলতে বলতে একেবারে দাসগুপ্তের টেবিলের কাছে এসে সেদিন দাঁড়িয়েছিল সুধালক্ষ্মী। চমকে মুখ তুলে তাকিয়ে দাসগুপ্তও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। কে এই মেয়ে, যার ফোঁপানো দুটি ঠোঁট অদ্ভুত হাসি হাসছে?

প্রশ্ন না করতেই নিজের পরিচয় নিজেই বলতে থাকে সুধালক্ষ্মী—আমি সুধালক্ষ্মী, ট্রাপিজের খেলা দেখাই। মাইনে এক শো দশ টাকা।

দাসগুপ্ত হাসে—আমার মাইনে ত্রিশ টাকা।

সুধালক্ষ্মী—ত্রিশ টাকা মাইনে নিতে আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত।

দাসগুপ্ত—কেন? তার মানে?

সুধালক্ষ্মী—আপনার এই সুন্দর মজবুত চেহারা; ইচ্ছে করলেই, আর একটু চেষ্টা করলেই খেলা শিখে এক শো দশ টাকা পেতে পারেন।

চলে গেল সুধালক্ষ্মী, কিন্তু দাসগুপ্তের কানের কাছে যেন একটা গানের রেশ রেখে দিয়ে চলে গেল। আবার হিসেব লিখতে গিয়ে আনমনা হয়ে যায় দাসগুপ্ত। আশ্চর্য, এমন ভাল একটা শান্ত শিষ্ট কাজের আনন্দকেই যে বিস্বাদ ক'রে দিয়ে চলে গেল ঐ ফোঁপানো ঠোঁটের হাসি।

প্যারালাল বার ভালই রপ্ত করা আছে, হরাইজন্টালও কিছু কিছু। পরীক্ষার [illegible] কলেজের জিমন্যাসিয়ামের এখনও দাসগুপ্তের এই তরুণ শরীরের পেশীতে সঞ্চিত হয়ে আছে। একটু চেষ্টা করলে আরও ভাল খেলা শিখে ফেলতে পারে বৈকি দাসগুপ্ত। কিন্তু সে সুযোগ কই? আর এক মাস পরেই হিসাব লেখার এই চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সার্কাসের পুরনো কেরানী ছুটির পর ঠিক সময়েই ফিরে আসবে। তারপর? তারপর এই তাঁবুতে আর একটি দিনও থাকবার ভরসা কই?

একটু ভরসা পাওয়ার জন্য ছটফট করে মনটা। এই তাঁবু আর এই ত্রিশ টাকার চাকরিটাই যদি কোন জাদুবলে অন্তত এক বছরের মত বেঁচে থাকতে পারে, তবে...... দাসগুপ্তের জীবনের এই গোপন ধ্যানের মত চিন্তাগুলিই যেন হঠাৎ মহীশূর অগুরুর গন্ধে ভরে ওঠে। কী চমৎকার বেণী বাঁধে সুধালক্ষ্মী!

এক মাস পরে যেদিন শেষদিনের মত চাকরি ক'রে চলে যাবার কথা, সেদিনই সকালবেলা ম্যানেজার চিপলুংকার তাঁর ছেঁড়া নেকটাই-এ হাত বুলোতে বুলোতে দাসগুপ্তের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ান, সঙ্গে সুধালক্ষ্মী।

ম্যানেজার বলেন—সুধালক্ষ্মী বলছে, আপনি নাকি খেলা শিখতে চান।

চমকে উঠে বিড়বিড় করে দাসগুপ্ত—হ্যাঁ, ইচ্ছা ছিল বৈকি, কিন্তু......।

ম্যানেজারও মাথা চুলকে আমতা-আমতা করেন—হ্যাঁ, ঐ কিন্তুই হলো আসল কথা। আপনাকে মাইনে দিয়ে রাখবার উপায় কই? এদিকে সুধালক্ষ্মী এমন জোর করছে যে......।

বোধ হয় মুখের হাসি লুকিয়ে ফেলবার জন্য অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সুধালক্ষ্মী।

ম্যানেজার বলেন—একটা উপায় হতে পারে। জোকার ভোলাবাবু আর এক মাস পরে ছুটিতে বাড়ি যাবেন। আপনি যদি এই এক মাসের মধ্যে ভোলাবাবুর সাকরেদি ক'রে জোকারের কাজটা মোটামুটি শিখে নিতে পারেন, তবে......।

ম্যানেজার দেখতে পান না, কিন্তু দাসগুপ্ত দেখতে পায়, সুধালক্ষ্মী মাথা দুলিয়ে ইসারায় বলছে—রাজী হয়ে যান।

বিব্রতভাবে নেকটাই নাড়েন গোবেচারা ম্যানেজার চিপলুংকার—তবে আপনি সেকেণ্ড জোকার হয়ে এখানে অন্তত একটা বছর থাকতে পারবেন, মাইনে পাবেন পঞ্চাশ টাকা।

সুধালক্ষ্মী এইবার সামনে এগিয়ে এসে একেবারে হিতাকাঙ্ক্ষিণী অভিভাবিকার মত উপদেশের সুরে বলতে থাকে—আর অবসর সময়ে প্র্যাকটিস্ ক'রে ভাল ভাল খেলা- [illegible]

ম্যানেজার বিস্মিত হয়ে একবার সুধালক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকান। তারপরেই দাসগুপ্তের দিকে তাকিয়ে বলেন—ওঃ, তাহলে তো কথাই নেই দাসগুপ্ত। ইউ উইল বি ভেরি ভেরি হ্যাপি!

ভ্রূভঙ্গী করে সুধালক্ষ্মী। ফোঁপানো ঠোঁটের মিষ্টি হাসিটা যেন রাগ ক'রে আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে।—কি বললেন ম্যানেজার? তার মানে?

গোবেচারা চিপলুংকার এইবার বেশ চালাক হাসি হেসে জবাব দেন—তার মানে, দাশগুপ্ত অন্তত এক শো দশ টাকা মাইনে পাবে।

ম্যানেজার চলে যেতেই সুধালক্ষ্মী বলে—আপনি আমার ওপর রাগ করলেন না তো?

দাসগুপ্ত হাসে—একটুও না। কিন্তু আপনি কেন আমার জন্য ম্যানেজারের কাছে গিয়ে এত কাণ্ড করলেন?

—জানি না। গম্ভীর হয়, আস্তে আস্তে চলে যায় সুধালক্ষ্মী।

এই তো সেই সুধালক্ষ্মী। জোকার দাসগুপ্তের দুই চক্ষু যেন একটা জ্বালার ছোঁয়ায় ছটফট করে। কোথায় গেল সুধালক্ষ্মীর সেই গম্ভীর মুখ? আজও বুঝতে পারেনি কি সুধালক্ষ্মী, তাকে এই এক বছর ধরে ভালবেসে ধন্য হয়ে আছে যার জীবন, সে আজ নীচের এই রিং-এর শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে?

শুরু হয়েছে খেলা। কী উদ্দাম খেলা। এই ট্রাপিজ থেকে ঐ ট্রাপিজ, ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে সুধালক্ষ্মী আর চিনাম্মা। যেন এক ভয়ানক ধরা-ছোঁয়ার আবেগ শূন্যলোকে লুকোচুরি খেলছে। কেউ কাউকে কাছে পায় না। দুটি সুন্দর উল্কা যেন পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে আর আসছে।

তাই তো! সুধালক্ষ্মীকে এখনও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। ধরা দিচ্ছে না সুধালক্ষ্মী। জোকারের ড্যাবডেবে চোখ একটু শান্ত হতে আর খুশি হতে চেষ্টা করে।

এতদিনে ঐ ট্রাপিজে সুধালক্ষ্মীর জুড়ির আসনে দাসগুপ্তকেই আজ দেখতে পেত এই গ্যালারির ভিড়, যদি বুকের একটা অদ্ভুত ব্যথা এই তিন মাস ধরে দাসগুপ্তের চেষ্টার নেশাটাকেই দমিয়ে না দিত। ডাক্তার বলেছেন, এখন কয়েকটা মাস আর কোন শক্ত খেলা নয়, কোন শক্ত খেলার প্র্যাকটিসও নয়; হয় রেস্ট, নয় হাল্কা খেলা খেলে দিন কাটাতে হবে।

দাসগুপ্তের জীবনের স্বপ্নটাই যেন [illegible]

গুপ্তে, তাই বোধ হয় একটা নিষ্ঠুর হোঁচট খেতে হয়েছে। অল্প মাইনে, ডবল খাটুনি, আর দুর্বল খোরাক শরীরের উপর বেশ প্রতিশোধটাও নিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু একটা হোঁচট বৈ তো নয়? ডাক্তারের কথা শুনেও দাসগুপ্তের জীবনের স্বপ্ন একটুও দমে যায়নি। মাত্র তিনটা মাস, তার পরেই আবার দাসগুপ্তের এই মজবুত দেহের সব রক্ত স্নায়ু আর পেশী মরিয়া হয়ে ঐ ট্রাপিজের কাছে যাবার জন্য প্র্যাকটিস করবে। কি-ই বা আর বাকি আছে? ভল্টিং আর টামব্লিং বেশ দুরস্ত করা হয়েছে। বাকি শুধু টাইট-রোপ আর ল্যাডার। তারপর ঐ ট্রাপিজ, রপ্ত করতে দুটি মাসের বেশি লাগবে না। তারপর একশো দশ টাকার মাইনে, এবং তার চেয়ে বড় উপহার, ঐ রঙীন আলোর কাছে জরির চাঁদোয়ার নীচে শূন্যলোকের কুহক হয়ে সুধালক্ষ্মীর সঙ্গে লাস্ট গ্রিপ।

সেদিন হঠাৎ উদ্দাম হবে ক্লেরিওনেটের সুর। হঠাৎ মরিয়া হয়ে দুলে উঠবে দুদিকের দুই ট্রাপিজ। রড ছেড়ে দিয়ে দুদিক থেকে দুই মূর্তি বাতাসে শরীর ছুঁড়ে দেবে। ক্ষেপা ঢেউ-এর পাকের মত মস্ত একটি সামার সল্ট। তার পরেই বুকের কাছে বুক, মুখের কাছে মুখ। মালাবার চন্দনের টিপ দাসগুপ্তের একেবারে চোখের কাছে ভাসবে। দুই জোড়া বাহুর বাঁধনে জড়ানো একটি মিলনের মূর্তি যেন স্বর্গ থেকে জয়ী হয়ে, নীচের টান-করা ত্রিপালের ক্যাচের উপর ঝুপ করে নেমে পড়বে। সব পাওয়া, পরম পাওয়া পেয়ে যাবে দাসগুপ্তের এক বছরের আশার জীবন। খেলার সঙ্গিনীকে চিরজীবনের সঙ্গিনী ক'রে এক উৎসবের রাতে হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে যাবে দাসগুপ্ত।

এই এক বছরের মধ্যে দাসগুপ্তের চোখের কাছে ক'বারই বা এসেছে সুধালক্ষ্মী। সেই দু'বার, আর ডাক্তার যেদিন এল সেদিন একবার। কে জানে কেমন ক'রে আর কার কাছ থেকে খবর পেয়েছিল সুধালক্ষ্মী, বুকে একটা ব্যথা নিয়ে অফিস ঘরের পিছনে ছোট তাঁবুর ভিতরে একা শুয়ে আছে জোকার দাসগুপ্ত।

একেবারে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে দাসগুপ্তের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো সুধালক্ষ্মী। সুধালক্ষ্মীর মূর্তিটাই কেমন যেন, ভীত আর অনুতপ্ত উদভ্রান্তের মত খোলা বেণী, এক রাশ ঘন কালো চুল যেন ঢেউ তুলে কেঁপে রয়েছে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেও উপচে পড়বে, বেড় পাওয়া যাবে না। বড় বেশি গম্ভীর হয়ে গিয়েছে সেই ফোঁপানো ঠোঁট। শাড়িটাকে এলোমেলো করে যেন কোনমতে গায়ে জড়িয়ে [illegible]

করতেই হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে সুধালক্ষ্মী?

দাসগুপ্তের বুকের ব্যথা পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার চলে যাবার জন্য এগিয়ে যেতেই গলা কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সুধালক্ষ্মী—একটা আশা দিয়ে যান ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ঘাবড়ে গিয়ে সুধালক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকান।—হতাশার তো কোন কারণ নেই। এই ব্যথা সেরে যাবে।

ডাক্তার চলে যাবার পর আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাসগুপ্তের বিছানার কাছে দাঁড়িয়েছিল সুধালক্ষ্মী। দাসগুপ্তের মনের ভিতরে আকুল হয়ে ছটফট করে একটা প্রশ্ন। সত্যিই, ভালবাসে তো সুধালক্ষ্মী? না শুধু মিথ্যে একটা উপকার করবার জন্য ছুটে আসে? কিন্তু কি আশ্চর্য, এই মেয়ের মনটা যেন সীলমোহর করা। সেই মনের ভাষা শোনা যায় না।

দাসগুপ্ত বলে—আমার অসুখের কথা শুনে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন সুধা?

—জানি না। কথাটা বলেই বেশ একটু শান্তভাবে হন্ হন্ ক'রে হেঁটে চলে গেল সুধালক্ষ্মী।

হ্যাঁ, সাঁজমোহর কন্যা মনই বটে। কে জানে কি রহস্যের মন্ত্র লুকিয়ে আছে সেই মনের ভিতর।

থেমেছে খেলা। এই ট্রাপিজে সুধালক্ষ্মী, আর ঐ ট্রাপিজে চিনাপ্পা। আস্তে আস্তে হাঁপায়, দম ছাড়ে, আর রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

আবার ডিউটি ভুলে থমকে দাঁড়িয়ে আছে জোকার। সপাং ক'রে শব্দ ছাড়ে কালা-সাহেব জন রাজারামের বিজলী চাবুক।

—ওরে বাবা! ভাঙ্গা-গলায় কর্কশ ডাক ছেড়ে এক একটা লাফ দিয়ে রিং-এর চারদিকে ছুটতে থাকে জোকার। ভিরমি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে। নকল ভয়, নকল আতঙ্ক, আর নকল ক্লান্তির ঢং দেখায়। মিথ্যা হাঁপানি হাঁপায়। হাত দিয়ে পা টিপে আর পা দিয়ে হাত টিপে নিজেই নিজের সেবা করে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়। অ্যাঁও অ্যাঁও অ্যাঁও, মুখ বেঁকিয়ে ছিঁচ-কাঁদুনি কাঁদে। দু'চোখ থেকে ঝরঝর ক'রে জলের ফোয়ারা গড়িয়ে পড়তে থাকে।

গ্যালারির ভিড় চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। —নকল কান্না, নকলি আঁসু। ঐ যে কর্নেল পোটাটোর ড্যাবডেবে চোখের কোণে খুব সরু একটা টিউবের মুখ দেখা যায়।

নীরব হয় গ্যালারি। আবার শুরু হয়েছে খেলা। সুধালক্ষ্মী আর চিনাপ্পার মুখের হাসিতে যেন আগুনের রং-এর মত রক্তময় আভা। আর, নীচে রিং-এর মাঝখানে শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে [illegible] জোকারের বুকের পাঁজরে যেন কাঁ[illegible] করছে বাজনাটা। আর বুকেতে কিছু [illegible] সেই, উপরের রঙীন আলোর কাছে মত্ত হয়ে দুলছে দুই অভিসন্ধির কুহক। দাস-গুপ্তের স্বপ্নের ঘরে ডাকাত পড়েছে, পড়ুক। কিন্তু সুধালক্ষ্মীই যে হেসে হেসে দরজা খুলে দিল, সহ্য করা যায় না শুধু এই জন্যই দংশন।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে ক্লোরিওনেট। গ্যালারির ভিড় হাততালি দিয়ে বাতাস ফাটায়। দুই ট্রাপিজ দু'দিকে ছিটকে সরে গিয়েছে, আর জরির চাঁদোয়ার নীচে সেই রঙীন শূন্যলোকের মধ্যে ফুটে উঠেছে এক কঠোর হিংস্র আর নিষ্ঠুর লাস্ট গ্রিপ। সুধালক্ষ্মী আর চিনাপ্পা, দু'হাতে দু'জনের গলা জড়িয়ে ধরা একটা ক্লান্ত উন্মাদনার ছবি ধরাতলে লুটিয়ে পড়ার আগে আকাশে ভেসে উঠেছে।

—ওরে বাবা রে! জোকার দাসগুপ্তের ন্যাতপেতে নিকার-বোকারে যেন আগুন ধরে গিয়েছে। হাতে ভর দিয়ে প্রচণ্ড একটা ভল্ট খেতে গিয়েই রিং-এর শক্ত মাটির উপর মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে পড়ে যায় জোকার। গ্যালারিতে হো-হো হাসির হুল্লোড় ফেটে পড়ে।

পড়েই আছে জোকারের অসাড় শরীর। বেশ কিছুক্ষণ। এ আবার কর্নেল পোটাটোর কোন্ নতুন খেলা?—উঠো কর্নেল পোটাটো। ডাক দেয়, হাঁক ছাড়ে আর চিৎকার করে গ্যালারির ভিড়।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। লাপ্‌টি লিটিল, লাপ্‌টি লিটিল! বিড় বিড় করে জোকার। কুতকুতে হাসি হাসে, আর তিন-পায়ে কুকুরের মত ভঙ্গী ক'রে রিং-এর চারদিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরতে থাকে জোকার দাসগুপ্ত। নাক দিয়ে ঝরঝর ক'রে রক্ত গড়ায়। কপালের কাছেও একটা ক্ষত, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে।

—নকল রক্ত, নকলি খুন। গ্যালারির ভিড় হেসে হেসে চেঁচায়। কিন্তু কেয়াবাৎ হায়, বাহবা, কী অদ্ভুত কর্নেল পোটাটোর খেলা, কায়দাটা একেবারেই ধরতে পারা যাচ্ছে না।

ঘড় ঘড় শব্দ ক'রে বাঘের খাঁচা-গাড়িটা রিং-এর মাঝখানে চলে এসেছে। বিজলী চাবুক হাতে নিয়ে খাঁচার দরজা খুলে বাঘের মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছেন কালাসাহেব জন রাজারাম।

চমকে ওঠে গ্যালারির ভিড়। কর্নেল পোটাটোর সাহস তো কম নয়। হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে একটা দৌড় দিয়ে বাঘের খাঁচার ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। —ওরে বাবা! বাঘের শান্ত গম্ভীর ও উদাস মুখের কাছে মাথা দুলিয়ে নকল ভয়ের ঢং দেখায় জোকার দাসগুপ্ত।

গর্জন করে লাফিয়ে উঠেছে বাঘ। জন রাজারামের বিজলী চাবুকের [illegible] হঠাৎ জোকারের মুখের দিকে তাকিয়েই চাবুক তুলে চেঁচিয়ে ওঠেন কালাসাহেব জন রাজারাম। —আসলি খুন, এ যে আসলি খুন!

—সে কি? কি ব্যাপার? গ্যালারির মুখরতা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

সেই ভয়ানক গম্ভীর নীরবতাকে আবার চমকে দিয়ে হুংকার ছাড়েন কালা-সাহেব জন রাজারাম। —জানোয়ার বিগড় গিয়া। নাকে-মুখে খাঁটি রক্ত মেখে বাঘের মুখের কাছে আসে হতভাগা, ভাগো বেকুব জোকার।

একেবারে আতঙ্কহীন, কর্নেল পোটাটোর তার সেই কুতকুতে হাসি আর ড্যাবডেবে চাউনি নিয়ে আস্তে আস্তে সরে যায়।—লাপ্‌টি লিটিল, লাপ্‌টি লিটিল। হেলে দুলে ভঙ্গী করে রিং-এর চারদিকে ঘুরতে থাকে।

গ্যালারির ভিড় হাসে না। ক্লোরিওনেট বাজে না। অশান্ত অতৃপ্ত তৃষ্ণাতুর বাঘটাই শুধু গর্জন করে।

রিং-এর পাশের পর্দা ঠেলে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছে কে? চমকে ওঠে গ্যালারির নীরব বিস্ময়।

আর কেউ নয়। মিস সুধালক্ষ্মী। বেণী খুলে দিয়েছে, রঙীন একটা শাড়ি পরেছে, তবু ওকে চেনা যায়। বাঃ বেশ সুন্দর, ট্রাপিজের সুধালক্ষ্মীকে এখন যে ঠিক ঘরের লক্ষ্মীটিরই মত দেখাচ্ছে।

ও কি? আরও আশ্চর্য হয় গ্যালারির হাজার চোখ। জোকারের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন রাগে কটমট করছে সুধা-লক্ষ্মীর চোখ। রঙীন শাড়ির আঁচল মুঠো করে জোকারের কপালের ক্ষত চেপে ধরেছে সুধালক্ষ্মী। তার পরেই হাত ধরে এক টান দিয়ে রিং-এর ভিতর থেকে জোকারকে যেন জোর ক'রে নিয়ে চলে গেল সুধালক্ষ্মী।

ছেঁড়া নেকটাই-এ হাত বুলিয়ে ব্যস্ত-ভাবে ছুটে আসেন গোবেচারা ম্যানেজার চিপলুংকার।—কি হয়েছে? কি ব্যাপার সুধালক্ষ্মী?

সুধালক্ষ্মীর ফোঁপানো ঠোঁট মিষ্টি হাসি হাসে।—খেলা হলো খেলা। কিন্তু তাই দেখে কি ভয়ানক রাগ ক'রে পাগল হয়ে গিয়েছে আপনাদের জোকার।

—সত্যি নাকি? বড় বড় চোখ ক'রে দাসগুপ্তের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হন চিপলুংকার।

এইবার সুধালক্ষ্মীর চোখ দুটোই যেন হেসে ওঠে এবং হাসতে গিয়ে ছলছল করে। —আমাকে আজও বোধ হয় চিনতে পারেনি দাসগুপ্ত, নইলে বুঝতে পারতো যে [illegible] ... ।

সাঁওতাল রমণীর গহনা

বরুণ পালিত

ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরাই সভ্যজগতের কাছে বিশেষ পরিচিত। তাদের জীবনযাত্রাপ্রণালীর কতগুলো বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে আমাদের মনে ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। প্রকৃতির কোলে ওরা মানুষ, জীবনের প্রতি ওদের দৃষ্টিভঙ্গী সুস্থ ও সবল, এবং সহজ সরলভাবে জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া তাদের কাম্য। তাদের এই বৈশিষ্ট্যময় জীবনে সাঁওতাল রমণীদের প্রভাব অনস্বীকার্য। ঘরে বাইরে, হাটে-মাঠে মেয়েরা সব কাজে অগ্রণী এবং ফলে ওরা হয় সবল সুঠাম দেহের অধিকারিণী। অন্যান্য আদিবাসী মেয়েদের মত সাঁওতাল মেয়েরাও সাধারণ আটপৌরে মোটা কাপড় পরে, শহরে মেয়েদের মত তারা কোন রকম প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহার করে না। তবে সভ্যজগতের অন্য মেয়েদের মত সাঁওতাল মেয়েরাও গহনা পরতে ভালবাসে। সাঁওতালরা স্বভাবতই খুব গরীব, তাই সাঁওতাল মেয়েদের গহনাস্পৃহা রূপোর গহনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। গঠন পারিপাট্যে সেসব গহনা যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কর্মব্যস্ত জীবনে সব সময় গায়ে গহনা রাখা সাঁওতাল মেয়েদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সূর্যাস্তে ওরা ঘরে ফেরে এবং তাদের অবসর সময়টুকু আনন্দমুখরিত করে তোলে নাচে ও গানে। তখন দেখা যায় ওদের গায়ে নানা রকমের রূপোর [illegible]

কেয়ূরে কঙ্কণে

করে তৈরী হয় তাদের গহনা। আমাদের সমাজে যত রকমের গহনা আমরা দেখতে পাই তার সংগে তাদের গহনার কোন প্রকার-ভেদ আছে বলে মনে হয় না, তবে গঠন-বৈচিত্র্যে এসব গহনা সম্পূর্ণ আলাদা।

সাঁওতাল রমণীর সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় আমরা পাই তাদের কুটীরের দেওয়ালের আলিম্পনসজ্জায় আর পাই তাদের অংগাভরনে। প্রকৃতির কোলে তারা মানুষ, শহরের কৃত্রিমতা তাদের আজও কলুষিত করতে পারেন নি বলেই পোশাক-আশাকের আধিক্য বা চাকচিক্যে তাদের স্বাভাবিক দেহলাবণ্যকে তারা ঢেকে রাখে না। নিজের হাতে তাঁতে-বোনা লালপেড়ে একখানা সাদা শাড়িই তাদের অংগাবরন। টান করে তারা চুল বাঁধে, খোঁপায় গুঁজে দেয় লাল জবা ফুল অথবা রুপো দিয়ে তৈরি মোটা কাচের গয়না। কানের রুপোর ঝুমকো গালের কাছে ছুঁয়ে থাকে, কৃষ্ণ-কালো রাতের আকাশে যেন দ্বিতীয়ার চাঁদ। হাতের বাজুতে পুরু ও ভারী রুপোর গয়না যেন নিবিড় নীল অন্ধকারে বিদ্যুৎ-প্রবাহের খেলা। দুটি পায়ে রুপোর মল যৌবনোচ্ছল দেহলাবণ্যকে যেন আর ধরে রাখতে পারে না। তাদের মনের গড়ন আর দেহের গড়নের সংগে এই রুপোর গহনার গড়নেও স্বাভাবিক সৌন্দর্যের একটা সামঞ্জস্য আছে। একবারও মনে হয় না যে, গহনাই তাদের দেহ-সৌষ্ঠবকে ঢেকে দিচ্ছে বা দেহলাবণ্যের কাছে গহনা ম্লান হয়ে গেল।

সোনার গহনার প্রতি সাঁওতাল রমণীদের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। সোনার দামটাই তার একমাত্র কারণ নয়, শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যবোধ তার অন্যতম কারণ। ভ্রমরকৃষ্ণ কালো দেহে রুপোর গহনায় যে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে স্বর্ণালংকার সেখানে ম্লান হয়ে যায়। তাই রুপোর গহনার প্রতিই তাদের আগ্রহ এত বেশী।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে—প্রকৃতির কোলে যারা মানুষ এবং যাদের সৌন্দর্যের উপকরণ জোগাতে প্রকৃতি কার্পণ্য করেনি, তারা কেন গহনা পরে নিজেদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে কৃত্রিমতার ছাপ এনে দেয়? তবে কি এটা সভ্যজগতের সংস্পর্শে আসার কুফল? খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে সাঁওতাল মেয়েদের গহনা পরার রীতি বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত এবং আমাদের সমাজের মেয়েদের মত সাঁওতাল মেয়েদের গহনা-প্রীতিই তার একমাত্র কারণ।

রুপোর গহনা তাদের কালো দেহের রূপকে যেন আরও প্রস্ফুটিত করে তোলে।

সাধারণত সাঁওতাল মেয়েদের যেসব গহনা পরতে দেখা যায় তার গঠনভংগী, তার কারু-কার্য একই ছাঁচে ঢালা এবং প্রত্যেক সাঁওতাল পল্লীতেই একই ধরনের গহনা দেখা যায়। এসব গহনার গঠন নৈপুণ্য সত্যিই প্রশংসনীয় এবং রৌপাকার যে তাদেরই সম্প্রদায়ের লোক তা বলা বাহুল্য। সংশ্লিষ্ট ছবিগুলো থেকে সাঁওতাল সম্প্রদায়ে প্রচলিত গহনা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারনা করা যায়। এসব গহনা বিচার করে মনে হয় সাঁওতাল মেয়েরা সূক্ষ্ম চিক্কণ কারুকার্যে তত বিশ্বাসী নয়। সবল সুঠাম দেহের উপযোগী

লজ্জায় নীরব মঞ্জীর

প্রবাসীর পত্র ১৮৬৩-৬৪ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে

॥ ১ ॥

University Hall
Gordon Square,
London.
16th Nov. '63

ভাই বর্জিনি [১]

তুমি মনে করছো আমি তোমাকে বুঝি ভুলে গিয়েছি, কিন্তু এতদিন পত্র লিখি নাই বলিয়া যে তোমাকে ভুলে গিয়েছি তা নয়। তোমাকে আমি সর্বদাই মনে করি। তুমি শুনিয়াছ আমি আমার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি—আগামী জুলাই মাসে আর এক পরীক্ষা আছে, তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে গমন করিব। আমি বোম্বাই গেলে তুমি অবশ্য আমার সঙ্গে যাইবে। তারপর তোমাকে কি প্রকার অবস্থায় রাখিব, তোমার শিক্ষা কিরূপ ভাল হইবে—কোথায় থাকিলে ও কি প্রকার সংসর্গে থাকিলে উন্নতি লাভ করিবে, সে সকল বিষয় আমার সর্বদা মনে উদয় হয়, কিন্তু তাহার এখনো কিছু স্থির করিতে পারি না। আমাতে মনোতে [২] এ বিষয় লইয়া কত সময় কথা হয়। এ দেশের [সমাজের ?] সঙ্গে আমাদের দেশের যত বিষয়েই [ভিন্ন ?] তা থাকুক, এখানকার জনসমাজের যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু সুন্দর প্রশংসনীয়—স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল। আমাদের দেশে এরূপ সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে স্ত্রীলোকদের কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে স্ত্রীসৌভাগ্য এখনো অনেক দূরে। স্ত্রীলোক জীবন-উদ্যানের পুষ্প—তাহাদের বায়ু ও আলোক হইতে লইয়া কেবল ঘরের মধ্যে শীর্ণ ও বিশীর্ণ করিয়া রাখিলে কি মঙ্গলের সম্ভাবনা। এ দেশে সর্বদাই আমার এই প্রকার মনে হয়। আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে, কিন্তু তোমার আপনার উপরেই তাহার অনেক নির্ভর। ইংলণ্ডে এখন এতদিন থাকিয়া ইহা একপ্রকার বাড়ীর মত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের রীতিনীতির দোষগুণ পূর্বাপেক্ষা কত বলপূর্বক মনে আঘাত করে। কিন্তু সে বিষয়ে বিস্তার করিয়া লিখিবার বিশেষ ফল দেখি না। আমাদের দেশের আচারের বল অত্যন্ত অধিক—প্রত্যেকের নিজের শক্তি অতি অল্প। ইহাই আমাদের সকল দুর্দশার মূল। রোজ একমুষ্টি আহারে উদর পূরণ করা—তারপর ঘটা করিয়া বিবাহ করা—তারপর ছেলে-পিলে হলো তো আর কে গোলযোগ করে। বালিকা ভার্যা গৃহিণী হইলেন—আর তাহার কি করিবার অবশিষ্ট আছে? এইরূপেই ঘরকন্না লইয়া একরকম দিনটা চলে গেলেই হলো। স্ত্রীলোকদের সঙ্গীত শেখা বড় স্পর্ধার কর্ম ও অশেষ অনর্থের মূল—[illegible] তা বোধ হয় অনেকের আছে। আমি এখন সত্য সত্য মনে করিয়া পাই না আমাদের স্ত্রীলোকদের সময় কাটাইবার কি আছে! এখানকার কত লোকে আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু তাহার ভালরূপ উত্তরই দিতে পারি না। একটি বিষয় এখানকার লোকেরা ভাল জানে না—সে এই যে আমাদের স্ত্রীলোকেরা ১৩।১৪ বৎসরে মাতার স্নেহভার ও কর্তব্য লইয়া আক্রান্ত হয়—আর অন্য কিছু করিবার চিন্তা ও আবশ্যক থাকে না। আমি তোমাদের এতদিন পরে পত্র লিখিতেছি—কোথায় আনন্দের কথা হইবে, না দুঃখের কাহিনীতেই পত্র পূর্ণ হইল। আর কয়েক মাস পরেই ত আমাকে ফিরিয়া পাইবে। আগামী গ্রীষ্মে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই বা না হই—ইউরোপ হইতে বিদায় লইতে হইবে। এক বিষয়ে দুঃখ হয় যে ইউরোপের ক্রোড় হইতে এত শীঘ্র চলিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু বুদ্ধির প্ররোচনা হৃদয়ের ভাবের নিকটে কতক্ষণ দাঁড়াইবে। যখন তোমাদের দেখিবার ইচ্ছা হয়, ও দেশ ও বাড়ী মনে পড়ে, তখন আর সকল চিন্তা মনে স্থান পায় না। তুমি এখন না জানি কত বড় হইয়াছ। এখন তোমার শরীরে স্ফূর্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধি হইবার সময়। তোমার যৌবন-কুসুমের কলিকাবস্থা গিয়া তাহা এখন প্রস্ফুটিত হইতে চলিবে। তুমি এখন আপনিই আপনার রক্ষিত্রী—এবং তোমার আপনার মনের বলের উপর তোমার সুখদুঃখ নির্ভর। তুমি যাঁহার উপর অবলম্বন করিবার আশা কর, তিনি তোমা হইতে দূরে, তোমার আর কিছুদিন এখনো প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আমি বাড়ীর খবর অনেকদিন পাই নাই। সৌদামিনী সুকুমারী শরৎ স্বর্ণ বর্ণ [৩] কি করিতেছে। সৌদামিনীর লেন্ডু ও ইরাবতী [৪] কেমন আছে? বৌঠাকরুণ ও তাঁহার দ্বীপেন্দ্র [৫] কি করেন? সোম [৬] রবি কত বড় হইয়াছে? রবির পরে আমার আর এক ভ্রাতা হইয়াছে শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম কি হইয়াছে? মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন? দিদিমা কি এখনো আমাদের বাড়ীতে আছেন, না আর কোথাও? সকলকেই আমার প্রীতি ও ভালবাসা জানাইবে। আমি এখন লণ্ডনেই রহিয়াছি, হয়ত এ বৎসর সকল সময়ই থাকিতে হইবে। এখন বিদায় লই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

॥ ২ ॥

University Hall
Gordon Square,
London.
11th Jan. '64

ভাই জ্ঞানদা,

আমি বাবামহাশয়কে এক পত্র লিখিয়াছি, আমার ইচ্ছা যে তিনি তোমাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তুমি তাহাতে চিন্তিত হইবে না। আমি লিখিয়াছি যে আমাদের যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন তোমার বিবাহের বয়স হয় নাই—আমরা স্বাধীন পূর্বক বিবাহ করিতে পারি

---

[১] পল ও ভার্জিনিয়া ফরাসী গ্রন্থের কাহিনী এই সময়ে খুব লোকপ্রিয় ছিল। তাহা হইতে 'বর্জিনি'। কিছুকাল পরে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এই গ্রন্থের অনুবাদ "পোল ভার্জিনী" নামে অবোধবন্ধু পত্রে (১২৭৫ ১২৭৬) প্রকাশ করেন—রবীন্দ্রনাথ বাল্যে এই অনুবাদ পাঠের স্মৃতি "[illegible]" প্রবন্ধে ও জীবনস্মৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

[২] [illegible]

[৩] সত্যেন্দ্রনাথের ভগিনীগণ

[৪] সৌদামিনী দেবীর দুই কন্যা

[৫] দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র

[৬] [illegible]

নাই, আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভাই সত্য কি না? যদিও আমি তোমাকে এবিষয়ে কিছু মুখে বলি নাই, কিন্তু তুমি জান আমার ভাব কি। যে পর্যন্ত তুমি বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না। ইহা কি তোমার মনের ভাবের সঙ্গে মেলে না? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি তুমি তা জান—আমি বাবামহাশয়কে লিখিয়াছি যে যেমন উৎকৃষ্ট বীজ, ফলিবার জন্য উপযুক্ত সরস জমিকে প্রতীক্ষা করে, আমি তোমার জন্য সেইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। তোমার হৃদয়মন এখন অন্তঃপুরের প্রাচীর মধ্যে শুষ্কপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। তুমি ইংলণ্ডে আসিয়া আর এক নূতন ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে। তোমাকে আলিঙ্গন দিবার জন্য কত কত স্ত্রীলোক এখানে হস্ত প্রসারণ করিয়া আছে। তুমি এখানে আপনার বাড়ীর স্নেহের মধ্যেই থাকিবে। ইহা না জানিলে আমি বাবামহাশয়কে লিখিতে সাহস করিতাম না। তোমাকে আমি কতদিন দেখি নাই—ইংলণ্ডে দেখিতে পাইলে আমার মনের সকল আশা পূর্ণ হয়। তোমাকে একটা লেফাফার মধ্যে একটি পুষ্পময় পাতা প্রেরণ করিতেছি। তাহা তোমার প্রতি তাঁহার বন্ধুতার চিহ্ন স্বরূপ। তোমার এই স্ত্রীবন্ধুর নাম Miss Carpenter [৭]—আমার মনে নাই রামারঞ্জিকায় তুমি তাঁহার নাম পাইয়াছ কিনা? কিন্তু তিনি একজন অতি উদারস্বভাব পরোপকারব্রত উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোক। তিনি অবিবাহিতা কিন্তু কত কন্যার তিনি যথার্থ মাতা—তাঁহাদের নিজের পিতামাতা কেবল তাহাদের জন্মদাতা তুল্য। তুমি Miss Carpenter-এর বন্ধুতার চিহ্ন স্বীকার করিয়া আমার নিকট তাঁহাকে এক পত্র লিখো। হেমেন্দ্রের [৮] এর মধ্যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি হেমেন্দ্রের বধূর সঙ্গে তোমার বড় ভাব। জ্ঞানদা, তোমার জন্য আমি যে বাবামহাশয়কে লিখিয়াছি তাহাতে কি তুমি দুঃখিত হইবে? আমার তাহাতে কিছুই স্বার্থ-পরতা নাই, আমি কেবল তোমার হিতের জন্যই লিখিয়াছি। তোমার মনে কি লাগে না তোমাদের স্ত্রীলোকেরা এত অল্প বয়সে বিবাহ করে, যখন বিবাহ কি তাহারা জানে না ও আপনার মনের স্বাধীন-ভাবে বিবাহ করিতে পারে না। তোমার বিবাহ ত তোমার হয় নাই, তাহাকে কন্যাদান বলে, তোমার পিতা কেবল তোমাকে দান করিয়াছেন। আমরা যখন আপনারা স্বাধীনপূর্বক নূতন প্রেমের সহিত বিবাহ-বন্ধনে প্রবেশ করিতে পারিব, তখন কি সুখী হইব না? আমি এখন কেবল বাবা-মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি যাহাতে তোমার শিক্ষার জন্য তোমাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। আমি আরো দুই এক বৎসরের জন্য তোমার সুন্দর চক্ষুর অন্তরে থাকিব, এ বেদনা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি উন্নত হও, শিক্ষিত হও, তুমি ইংলণ্ডের সমাজের মধ্যে থাকিয়া তোমার স্ত্রীহৃদয়কে সহস্রগুণে বলবান কর, এ অপেক্ষা আমি আর অধিক কি দেখিতে চাই। তুমি আপনাকে যত উন্নত করিবে, তোমার দেশের ভগিনীগণের তোমার দৃষ্টান্তে ততই উপকার করিতে পারিবে। তোমার আসিবার যাহাতে সুবিধা হয়, বাবামহাশয় তাহা অবশ্য করিয়া দিতে পারিবেন। জ্যোতি [৯] যাহাতে তোমার সঙ্গী হইতে পারে তাহা আমি প্রস্তাব করিয়াছি। আমি অতি আগ্রহের সহিত তোমার ও বাবামহাশয়ের পত্র প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। লিখিতে বিলম্ব করিও না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

[৭] মেরী কার্পেন্টার
[৮] ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ
[৯] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৩ ॥

University Hall
Gordon Square,
London.
18th January '64

জ্ঞানদ

বাবামহাশয়কে তোমার ইংলণ্ডে আসিবার কথা লিখিয়াছি, বাবা-মহাশয় তাহাতে কি মত দিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক রহিয়াছি। তুমি নিজেই হয়ত কত কি মনে করিতেছ—আমি আবার ইংলণ্ডে কেমন করে যাব। আমার মনে আছে তুমি কেমন লজ্জাশীল ছিলে—তোমাকে কত বলিয়া একটু নতুন কাপড় কি জুতো বি মোজা পরিতে দিলে তুমি পরিতে চাহিতে না। আমার সামনে এতটুকু খেতেও লজ্জা করিতে। আমাদের স্ত্রীলোকের যা কিছু নিয়ম, যা কিছু আচার, যত লজ্জা, যত ভীরুতা, তুমি যেন তার মূর্তিমতী ছিলে। এখনো কি তোমার সবই সেইরূপ ভাব আছে? তুমি ইংলণ্ডে আসিলে তোমার আপনার যে কত উন্নতি হইবে তাহা তুমি আপনি জান না। তুমি হয়ত মনে করিবে এত গোলমালে আবার কে যায়—যেমন আছি বেস আছি। কিন্তু জানো না তোমার কত দেখিবার কত শিখিবার আছে তাহা যদি কখনো এখানে আসো তবেই বুঝিতে পারিবে। তুমি একবার ইংরাজি আরম্ভ করিয়াছিলে এতদিন যদি তাহা অভ্যাস করিতে তবে কেমন ভাল হইত। যাহা হউক আমার বোধ হয় তুমি দুই এক মাসের মধ্যে ইংরাজি অল্প বলিবার ও বুঝিবার মত শিখিয়া লইতে পারিবে। কিছুতেই চিন্তিত হইও না। যদি তুমি আসিবার মত ভাল সঙ্গী পাও, তবে তাহাদের সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করিবার ত্রুটি করিও না। স্টীমারে আসিতে তোমার কিছুই ভয় নাই। বাবামহাশয় যদি তোমার আসিবার বিষয় সম্মত হন, তবে এমন সময় বুঝিয়া অবশ্য প্রেরণ করিবেন যখন সমুদ্রে কিছুমাত্র ভয় নাই। তোমার সঙ্গে জ্যোতিকে পাঠান হয় এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছি। তাহা হইলে ভাল হইবে না? জ্যোতি তোমার বেস সঙ্গী হইবে সন্দেহ নাই। জ্যোতির হেমেন্দ্রের মত এর মধ্যে বিবাহ না হয় তবে বাঁচা যায়। তোমার যদি কাপড় পরিবর্তন করিতে হয় তাহাতে অসম্মত হইও না। সত্য সত্য বলিতে কি, আমাদের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ কাপড় পরে, তাহা না পরিলেও হয়। তাহা পরিয়া কোন ভদ্রসমাজে যাওয়া হইতে পারে না।[১০] ইস্টিমারে আসিতে গেলে তোমার আহারেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক। তাহা করিতেও অরুচি প্রকাশ করিও না। কেননা আমি জানি তোমাদের যে আহার, তাহার পরিবর্তে বাতাস খাইয়াও জীবন ধারণ করা যায়। সমুদ্রের উপর ক্ষুধার আধিক্য হইবে, সুতরাং পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করা বিধেয়। সকালে চা রুটি মাখন ও আর যাহা কিছু খাইতে চাও তাহা তোমাকে ঘরেই আনিয়া দিবে। ভোজনের সময় একটু মাংসের ঝোল কি কারি-ভাতও খাইতে অসম্মত হইও না। কেশববাবু[১১] একবার আমাদের সঙ্গে সিলোনে আসিয়া পথে কেবল ডালভাতে খাইয়া থাকিতেন—একটু মাংসের ঝোল তাঁহাকে খাওয়ান দুষ্কর হইত। তুমি তাঁহার মত করিয়া লুকাইয়া থাকিও না। সমুদ্রে আসিতে মধ্যে মধ্যে ভূমিতে নামিতে পাইবে। সিলোন হইতে আদেন পর্যন্ত জলের অধিক ভাগ—সুয়েজ হইতে আলেকসান্দ্রিয়া পর্যন্ত ভূমির ভাগ—তাহা রেলওয়েতে উত্তীর্ণ হইবে। সর্বশুদ্ধ পথে এক মাসের অধিক হইবে না। ফ্রান্সে পদনিক্ষেপ করিয়াই আমাকে দেখিতে পাইবে—আমরা তোমাকে সঙ্গে করিয়া ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে লইয়া আসিব। তুমি কিছুতেই চিন্তিত হইবে না—ইচ্ছা যেখানে সেখানে উপায় মিলিবে সন্দেহ নাই। প্রথম সকল কর্মই দুরূহ বোধ হয়, পরে যখন যথার্থই তাহা সাধন করিতে আরম্ভ করা যায়, তখন সকল সহজ হইয়া পড়ে। তুমি একবার ইংলণ্ডে পৌঁছিতে পারিলে সকল সুবিধা হইবে—তাহার কিছু চিন্তা নাই। আমি এখানে রহিয়াছি, তোমার ভয় কি? হেমেন্দ্র তোমার সঙ্গে আসিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু আমি যথার্থই দেখিতেছি হেমেন্দ্র তাহার স্ত্রীকে এখন ফেলিয়া রাখিয়া আসিতে পারেন না। তিনি যদি এখন বিবাহ করিলেন, তবে বিবাহের যে সকল কর্তব্য তাহাও তাঁহার সাধন করিতে হইবে। আমি থাকিতে থাকিতে তুমি এখানে আসিতে পারিলে আমি কি সুখী হইব! তাহা হইলে এ দেশে যাহাতে তোমার সুন্দররূপ রক্ষা ও শিক্ষা হয়, তাহার উপায় করিয়া যাইতে পারি। ইংলণ্ড এখন এক মাসের পথ বই নয়। তোমাদের যশোর হইতে আমাদের বাড়ী আসিতে তোমার কতদিন লাগিয়াছিল ভাবিয়া দেখ দেখি। তোমার খাওয়া দাওয়া ও কাপড় পরিবর্তন যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা কেবল সাহসপূর্বক করিবে। বাবামহাশয় যদি আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন, তবে তাহা সাধনের উপায়ের জন্য বড় ভাবিতে হইবে না। বাবামহাশয়ের কিরূপ মত হয়, ও তোমার কি ইচ্ছা আমাকে শীঘ্র লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর ভিতরে তোমার প্রতি বন্ধুত্ব স্নেহসূচক Miss Carpenter-এর উপহার পাঠালাম।

শ্রী স—

॥ ৪ ॥

University Hall
Gordon Square,
London.
18th February '64

ভাই জ্ঞানদ

আমার ইংলেণ্ড থাকিবার দিন চলিয়া যাইতেছে, আর বাড়ী যাইবার দিন সন্নিকট হইয়া আসিতেছে। তুমি আমাকে এখানে আসিয়া দেখিবে, কি আমি তোমাকে বাড়ী যাইয়া দেখিব? আমি বাবামহাশয়কে লিখিয়াছি যে, তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন, তাঁহার সম্মতি হইলে তুমি এখানে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে পার। এমন দূরই বা কি, এক মাসের পথ বই ত নয়। তুমি কত দূরে রহিয়াছ, কিন্তু তোমার সঙ্গে মনে মনে এখানকার কত লোকের আলাপ হইয়াছে। কত-লোক তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে, ও তোমার মঙ্গল তোমার উন্নতির ইচ্ছা করিতেছে। তুমি এখন পিঞ্জরের পাখীর মত বদ্ধ রহিয়াছ ও তোমার শরীর ও মনের স্ফূর্তি ও উন্নতির একটুকু স্থান নাই। তুমি এদেশে আইস, তোমার স্বাধীনতার প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইবে। আমি সেদিন এক চমৎকার স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছি, তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা ও হাসি হইতেছে—হঠাৎ আমাদের বাড়ীর ভিতরকার [illegible] নজর পড়িল। তাহা আর আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে আদেশ করিলাম— [illegible] [illegible] দেখিলাম

---

[১০] অবশেষে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর যোগেই 'ভদ্রসমাজে যাওয়া'র উপযোগী বেশ বাংলা দেশের শিক্ষিত নারীসমাজে প্রবর্তিত হয়। "বঙ্গ মহিলার সাধারণ প্রচলিত একখানি মাত্র শাড়ী পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের নিকট বাহির হওয়া যায় না।......বাঙ্গালী মেয়ের বেশের প্রতি অনেকদিন অবধিই পিতামহাশয়ের বিতৃষ্ণা এবং তাহার সংস্করণে একান্ত অভিলাষ ছিল।......পিতামহাশয় ছবি দেখিয়াছেন, আর আমাদের কাপড় ফরমাস করিয়াছেন, দরজি প্রতিদিনই তাঁহার কাছে হাজির, আর আমরাও। কিন্তু এত পরীক্ষাতেও তিনি আমাদের জন্য বেশ একটি পছন্দসই পোষাক ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেজবধূঠাকুরাণী বোম্বাই হইতে গুর্জর মহিলার অনুকরণে সুশোভন সুদর্শন পরিচ্ছদে আবৃতা হইয়া নূতন বেশে প্রত্যাগমন করিলেন তখনই তাঁহার ক্ষোভ মিটিল। [illegible] ও শালীনতায় সর্বাঙ্গীণ মিলনে, এ পরিচ্ছদ তিনি যেমনটি চাহিয়াছিলেন, ঠিক সেইরকম [illegible] হইয়া, বঙ্গবালাদিগের ঐকান্তিক একটি অভাবমোচনে তাঁহার চিরকালের বাসনা পূর্ণ করিল।" —[illegible]কুমারী দেবী, "আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার", ভারতী, [illegible] ১৩০৫।

[১১] [illegible]

তাহা এখনো ভাঙ্গা হয় নাই। ইহাতে কুপিত হইয়া কৈলাসকে আবার ডাকাইয়া বলিলাম তুমি যদি আমার কথা না শুন তবে বাবা-মহাশয়কে বলিয়া দেব—আর যে পর্যন্ত ও ঝরকা না ভাঙ্গিয়া ফেলিবে সে পর্যন্ত আমি এক গ্রাস অন্ন মুখে করিব না, এক বিন্দু জল পান করিব না। এই কথাগুলি এমন জোরে কুপিতভাবে বলিলাম যে আমার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, ও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাতেই তুমি বুঝিতে পার যে আমি তোমাদের জেলখানার যন্ত্রণা কত মনে করি। জ্ঞানদ, বাবামহাশয়ের যদি সম্মতি হয় যে তুমি এখানে আস, তবে কি তোমার তাহাতে কিছু আপত্তি আছে? তুমিই আপনিই আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছ যে তুমি আমাকে তোমার কাছে লইয়া চল। তোমায় কেবল কতক আচার রীতি পদ্ধতির পরিবর্তন স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমত তোমার কাপড় পরিবর্তন—তাহাতে তোমার কোন বাধা মনে করা উচিত হয় না। পায়ে মোজা ও পাদুকা পরিতে কি কোন কষ্ট বোধ কর? তারপর স্টীমারে আসিবার সময় তোমার আহারেও পরিবর্তন হইবে। কিন্তু এই সকল অল্প যাহা কিছু পরিবর্তন তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলে পৃথিবীতে এক পাও চলা যায় না। আমি যখন প্রথম স্টীমারে উঠিলাম তখন কত বিষয় নূতন দেখিলাম—কত নূতন রকমে আমাকে চলিতে হইল—অশন বসন শয়ন সকলি নূতন প্রকার। কিন্তু এই সকল নূতন প্রথা শিখিতে কতদিনেরই বা কর্ম—সহজেই শিক্ষা করা যায়। কেবল প্রথম একটু সাহস অবলম্বন করা। আমার মনে আছে আমি বাড়ী থাকিতে কত সামান্য বিষয়ের পরিবর্তনে তুমি কুণ্ঠিত হইতে। জ্ঞানদ, আমি এক্ষণি তোমাকে এখানে দেখিতে পাইলে কি খুসি হইব। আমি উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি বাবামহাশয় আমার প্রস্তাবে কি মত দেন। Miss Carpenter তোমাকে যে বন্ধুতাসূচক অভিজ্ঞান প্রেরণ করিয়াছেন তাহার উত্তর দিয়া আমাকে পাঠাইও। তোমার পিতার পত্র পাইয়াছি—তাঁহাকে আমার প্রণাম দিবে, আর বলিবে আমি শীঘ্র গিয়া হয়ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তুমি কি এখন ইংরাজি কিছু কিছু শিক্ষা করিয়া থাক। যদি কমলা দেবীর ভগিনী তোমার সঙ্গিনী হন তবে তাঁহার সঙ্গে ইংরাজি শিখিতে পারিবে ও অনেক বিষয়ে তাহাতে সুবিধা হইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

॥ ৫ ॥

University Hall
Gordon Square,
London W.C.
2nd July '64

ভাই বজিনি

তোমাকে আমি অনেক দিন হইতে পত্র লিখি নাই এবং তোমারও পত্র পাই নাই। এতদিন পরীক্ষার ভিড়ে ব্যস্ত ছিলাম—এখন সকল পরীক্ষা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন

হইয়াছি, আর কোন ভাবনা নাই। পরীক্ষার কিরূপ ফলাফল হইল তাহা এখনো জানিতে পারি নাই, শীঘ্র জানিয়া তোমাকে লিখিব। লিখিব কি, আমার পত্র আর আমি হয়ত একসঙ্গে গিয়াই তোমার নিকটে উপস্থিত হইব। এতদিন পরে ভরসা হইতেছে আবার তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা হইবে। আমি এক একবার মনে করি আমি ইউরোপের উন্নতির তরঙ্গের মধ্যে রহিয়াছি, তোমরা সেই একই সংকীর্ণ স্থানে এক কথা লইয়া রহিয়াছ। আমি একবার ভাবিয়াছিলাম তুমি যদি কোনরকম করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া এখানকার উন্নত সমাজের মধ্যে বাস করিতে পার তবে আমার এখানে যাহা কিছু শিক্ষা ও উন্নতি লাভ হইয়াছে তুমিও তাহার ভাগী হইতে পার। এই অভিপ্রায়ে তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার কোন উপায় করিয়া দেন বাবামহাশয়কে লিখিলাম, কিন্তু আমার সমুদয় যত্নই ব্যর্থ হইল। বাবামহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মানমর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি, অর্থাৎ তোমাকে চিরজীবনের মত চারি-প্রাচীরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখি। আমি ত তাই বুঝিতে পারি না বাবামহাশয়ের এই ইচ্ছা কেমন করিয়া রক্ষা করি। তোমাকে আমি কারাবন্ধ রাখিয়া কখনই সুখী থাকিতে পারিব না এবং তাহা হইলে তোমারও শরীর ও মন কখনই স্ফূর্তি লাভ করিতে পারিবে না। লোকেদের মনে এরূপ কেন হয় যে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেওয়া মহান অনর্থের মূল? আমার বিশ্বাস এই যে, স্ত্রীলোকদিগকে অজ্ঞান ও পরাধীন করিয়া রাখাই অশেষ অনর্থের মূল। স্ত্রীলোকেরা উন্নত ও স্বাধীন হইলে সমাজ যে কত উৎকৃষ্ট ভাব ধারণ করে, ইংলণ্ডে আসিয়া তাহার কতক বুঝা যায়। তুমি যদি ২৫ বৎসর অন্তঃপুরে যেমন আছ এইরূপে বাস কর আর যদি দুই বৎসর আসিয়া ইংলণ্ডে যাপন কর, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি ইংলণ্ডের দুই বৎসর অন্তঃপুরের ২৫ বৎসর অপেক্ষা বুদ্ধি মনের উন্নতিকর ও বিকাশকর দেখিতে পাইব। বাজিনি, আমার সর্বদাই মনে হয় যে আমাকে ছাড়িয়া তুমি এই দুই বৎসর কি করিয়া যাপন করিলে? এই দুই বৎসর কাল তোমার জীবনের মধ্যে না থাকারই সমান বিবেচনা হয়। যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, সে বিষয়ে ভাবিলে কি হইবে? আবার আমরা যখন মিলিত হইব তখন সকলি সুসার হইবে। বাবামহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন যে, প্রথমে বোম্বাই গিয়া তারপর ছুটি লইয়া কলিকাতায় আইলে ভাল হয়। কিন্তু আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম প্রথমে কলিকাতায় গিয়া তথা হইতে বোম্বাই যাওয়া শ্রেয়কর। বোম্বায়ে একবার গেলে সেখানে কখন বাড়ী আসিবার অবকাশ পাইব তাহা বলিবার যো নাই। আবার একবার কর্মে প্রবিষ্ট হইয়া কর্মভঙ্গ করিয়া অবকাশ লওয়া যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হইতেছে না। এইরূপ নানান্ ভাবিয়া প্রথমে কলিকাতায় যাইবার সংকল্প করিয়াছি। বৌঠাকুরণকে আমার প্রীতি ও প্রণাম জানাইবে। সৌদামিনী ও সুকুমারী আর স্বর্ণ শরৎকে আমার স্নেহ ও আশীর্বাদ দিবে। হেমেন্দ্র বীরেন্দ্র ও জ্যোতিকে আমার স্নেহ জানাইবে। এবার তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও পত্র লিখিলাম না, পরীক্ষার ফলাফল অবগত হইয়া আর সকলকে লিখিব। এই পত্র পাইয়া তুমি আমাকে যে পত্র লিখিবে তাহাতে যেন ব্রজমামা নিম্ন-লিখিত ঠিকানা লিখিয়া দেন—

S. N. Tagore, Aden, Passenger on board P. &. O. Com. or Mess. Imp. Steamer (To await arrival).

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

বাংলায় স্ত্রীস্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ ॥

শ্রীপুলিনবিহারী সেন ॥

বাংলাদেশে স্ত্রীজাতির উন্নতি ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের বিবরণে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ বিরল, কারণ আন্দোলন বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, তার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগ তেমন প্রত্যক্ষ ছিল না। কর্মজীবন বাংলার বাইরেই অতিক্রান্ত হয়েছিল বলে তার সুযোগও তাঁর পক্ষে সামান্যই ছিল; প্রথম আই সি এস রূপে তাঁকে নিয়ে অনেক কাল আমাদের দেশাত্মিকা তৃপ্তিবোধ করেছে। কিন্তু তাঁর চরিতকথা আলোচনা করলে মনে হয়, তিনি যদি সরকারী কর্মেই নিজেকে ব্যাপৃত না রেখে সার্বজনিক কর্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন, তাহলে তাঁর জীবন দ্বারা দেশ আরো লাভবান হতে পারত। উনবিংশ শতাব্দীর নারী-আন্দোলনে তাঁর দান প্রধানত তাঁর পরিবারের মধ্য দিয়েই দেশ লাভ করেছে; আমরা যদি এ কথা স্মরণ রাখি যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের প্রধান একটি কেন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্র-ভবন, বঙ্গনারীর আত্মবিকাশের উদ্‌যোগ এই পরিবারের কন্যা ও বধূদের দ্বারা এককালে অনেকখানি পরিপুষ্টি লাভ করেছে, তাহলে স্ত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র এই পরিবারের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁর প্রবর্তনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রভাব কেবল পরিবারের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি—তাঁর কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

সুখের বিষয়, সত্যেন্দ্রনাথের ভাইবোনদের জীবন-স্মৃতিতে, সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থি-রূপে বিলাতপ্রবাসকালে পত্নীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিতে, ও 'আমার বাল্য-কথা'য় এবং তাঁর স্ত্রী-কন্যার স্মৃতি-কথায় যে বিবরণ লিখিত আছে, তা একত্র করলে স্ত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজাবাহী সত্যেন্দ্রনাথের সুন্দর একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই সকল উপকরণ অবলম্বনে সেই বিচিত্র কাহিনী এখানে সঙ্কলন করা গেল।

১

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষার, অল্পাধিক আয়োজন, মেয়েদের মধ্যে বাংলা লেখাপড়ার চর্চা সর্বদাই ছিল. স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫?—১৯৩২) "আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার" প্রবন্ধে[১] তার বিবরণ দিয়েছেন—

"সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। সেকাল অর্থে এস্থলে আমি শুধু আমার শৈশবকাল গণ্য করিতেছি না—আমার পিতামাতার আমল হইতে আমার শৈশব পর্যন্ত এ সমস্ত কাল-খণ্ডটাই গণনায় আনিতেছি।...যখন আমার মাতৃদেবী পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। এই বহু পরিবারের কেহই মূর্খ ছিলেন না; বরঞ্চ ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরণীয়া ছিলেন।...আহার বিশ্রাম পূজা অর্চনার ন্যায় সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল।...আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতা-ঠাকুরাণী ত কাজকর্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্য-শ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাঠ ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। ...দিদিমা—মায়ের খুড়িমা[২]—তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির ত কথাই নাই; তন্ত্রপুরাণ সাংখ্য আর দর্শনাদির যত কঠিন অনুবাদই হউক না কেন, তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। ...নবীনার দল

১ প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬, পৃঃ ৩১৪-১৬

২ এই দিদিমারই কৃত্তিবাসের রামায়ণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পড়বার প্রসঙ্গ তাঁর জীবনস্মৃতিতে "শিক্ষারম্ভ" অধ্যায়ে বিবৃত।

বিলাতে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী

অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিনী ছিলেন।...মনে আছে, ঘাড়িতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারী ভরা পুতুল, খেলেনা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্দুকবন্দী পুস্তক-রাশিও থাকিত।"

অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার আয়োজন অবশ্য প্রথমে সামান্যই ছিল, বৈষ্ণব মেয়েরা অনেকে বাংলা ও সংস্কৃত জানতেন, তাঁদেরই উপর তাঁদের সাধ্যমত শিক্ষার ভার ছিল। মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭?—১৯২০) লিখেছেন৩—

"আমাদেরও প্রথম শিক্ষা একজন বৈষ্ণবীর নিকট হইতে। তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাম এবং কলাপাতে চিঠি লেখা অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পড়া পর্যন্ত আমাদের অগ্রসর হইয়াছিল।

"এমন সময় পিতৃদেব সিমলা পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া৪ আমাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মন দিলেন। কেশব-বাবুদের৫ অন্তঃপুরে মিশনরি মেয়েরা পড়াইতে আসিত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙালী খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন আমা-দিগকে পড়াইতেন এবং হপ্তায় একদিন মেম আসিয়া আমাদিগকে বাইবেল পড়াইয়া যাইতেন।"৬

কিন্তু এই ব্যবস্থা যথোচিত মনে না হওয়ায় কয়েক মাস পরে তা বন্ধ করে অন্য ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন—

"ধর্মের জন্য নহে,—কেবল স্ত্রীশিক্ষার জন্যই, আর একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিলেন।...আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার মেজদাদা মহাশয়েরও [সত্যেন্দ্র-নাথের] বিবাহ [১৮৫৯] হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিনজন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।"

মহর্ষি-পরিবারে নারীজাতির উন্নতি-কল্পে ক্রমশ যে সকল ব্যবস্থা স্বীকৃত হতে লাগল, তার প্রবর্তনের মূলে তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। স্বর্ণ-কুমারী দেবী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখছেন—

"আশৈশব ইনি [সত্যেন্দ্রনাথ] মহিলা-বন্ধু; স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষ-পাতী। বিলাত যাইবার পূর্বেই উক্ত বিষয়ের ঔচিত্য সম্বন্ধে সারগর্ভ সতেজ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইনি একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন।৭ পিতৃদেব অন্তঃপুরের মঙ্গলের জন্য যে সকল আচারবিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন, অধিকাংশই ইঁহার পরামর্শে, ইঁহার প্রবোচনায় সম্পাদিত। ইনি এ সকল কার্যে পিতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।৮ অন্তঃপুরের অবস্থা সংশোধনের জন্য মাতাকেও ইনি ক্রমাগত উত্তেজিত করিতেন।"

'আমার বাল্যকথা'য় সত্যেন্দ্রনাথ লিখে-ছেন—

"আমি ছেলেবেলা থেকে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি না কি?' আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার ভালো লাগিত না। আমার মনে হত, এই

৩ "পিতৃস্মৃতি", প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮।

৪ ১৮৫৮, ১৫ নভেম্বর। দ্র "সময়সূচী", মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ১৯২৭ সংস্করণ।

৫ কেশবচন্দ্র সেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে মহর্ষির বিশেষ যোগ ঘটেছে।

৬ বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে মহর্ষি কন্যা সৌদামিনীকে সেখানে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। "কলিকাতায় মেয়েদের জন্য যখন বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয় তখন ছাত্রী পাওয়া কঠিন হইল। তখন পিতৃদেব আমাকে এবং আমার খুড়তত ভগিনীকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। হরদেব চাটুর্য্যে মহাশয় আমার পিতার বড় অনুগত ছিলেন; তিনিও তাঁহার দুই মেয়েকে সেখানে নিযুক্ত করেন।"—সৌদামিনী দেবী, "পিতৃস্মৃতি"। "২৫ আষাঢ়, ১৭৭৩ শক [১৮৫১]...[illegible] বিদ্যালয়ে [illegible] দেখি এ [illegible] কি ফল হয়।"—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পত্র ৩০, [illegible]।

৭ "John Stuart Mill-এর গ্রন্থ আমার সাধের পাঠ্যপুস্তক ছিল; আর তাই পড়ে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নামে এক Pamphlet বের করেছিলুম।"—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আমার বাল্য-কথা ও বোম্বাই প্রবাস"।

৮ "বাবামহাশয় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে Conservative ছিলেন বলেই লোকের ধারণা, কিন্তু তখনকার কালের তুলনায় তাঁকে উন্নতি-শীলের মধ্যে গণ্য করাই উচিত। তাঁর জীবনের প্রথমদিকে তিনি যে-রকম সমাজসংস্কার করে-ছিলেন সে সময় আর কেহই সেরূপ করেছেন কিনা জানি না। তবে ক্রমশ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতকটা Conservative হয়ে পড়ে-ছিলেন; বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় সাবধানে পা ফেলে মাটী পরীক্ষা করে চলতে চাইতেন; কিন্তু আমার তখন নবীন বয়স—আমি ছিলুম ঘোর Radical।

"এই সকল বিষয়ে আমাদের পরস্পর যতই মতভেদ থাক না কেন তিনি আমার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করতেন না। আমিও আমার ইচ্ছামত চলতে দিতেন।"—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

"পিতৃদেব নিষেধ করিলে তাহা লঙ্ঘন করা আমাদের অসাধ্য হইত কিন্তু তিনি ইহাতে কোনো [illegible] নাই। তিনি [illegible] ছেলে-মেয়েরা [illegible] না তখন কোনো আচারের পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি [illegible] করিতেন না।"—সৌদামিনী দেবী, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়, মুসলমান রীতির অনুকরণ। আমাদের প্রাচীন হিন্দু আচার অন্যতর। এই অবরোধ প্রথা আমার অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হত। আমি গোপনে আমার এক বন্ধুকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য কত ফন্দী করতুম, এখন মনে হলে হাসি পায়।"৯

২

১৮৬২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থী হয়ে বিলেত যান, ১৮৬৪ সালে দেশে ফিরে আসেন। পরীক্ষার জন্য তাঁকে প্রভূত শ্রমস্বীকার করতে হয়েছিল বলা বাহুল্য, কিন্তু কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়াই এই সময় তাঁর একমাত্র ধ্যানধারণার বিষয় ছিল না। বিলাতপ্রবাসকালে স্ত্রী-স্বাধীনতার কল্পনা যে কেবল তাঁর দিনের অবসরকে আবিষ্ট করেছিল তা নয়, তাঁর রাত্রির স্বপ্নকেও অধিকার করেছিল, স্ত্রীকে লিখিত চিঠিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহে যে বালিকাবধূর (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ১৮৫২?-১৯৪১। বিবাহ ১৮৫৯) শিক্ষার সূচনা করে এসেছিলেন চিঠিপত্রের যোগে তাঁকে সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা, তাঁর আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য তাঁকে বিলাতে আনবার চেষ্টা, এ সব তো আছেই—এই সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লিখিত তাঁর যে চিঠিগুলি মুদ্রিত হল তাতে, তাঁর স্নেহব্যাকুল মনের একটি মধুর চিত্র পাওয়া যাবে—প্রায় শতবর্ষ পূর্বের এই চিত্র বাঙালীর পক্ষে তাঁর নানা কল্পনা অভিনব বলতেই বলতে হবে। স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যবস্থায় কৈশোর অবধি তাঁর গভীর উৎসাহ অনুকূল পরিবেশে আরো বর্ধিত হয়েছিল, দেশের অবস্থার সঙ্গে তুলনা স্বভাবতই তাঁর মনে সর্বদাই জাগরিত হত, 'আমার বাল্যকথায় সে কথা তিনি উল্লেখ করেছেন; বিশেষ করে, 'কত বিবাহিতা অবিবাহিতা রমণী সমাজের বিবিধ মঙ্গলব্রতে জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছেন', তা দেখে তিনি বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

এইরকম একজন ব্রতধারিণীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলপ্রসূ হয়েছিল, তিনি মিস মেরী কার্পেণ্টার (১৮০৭-১৮৭৭); জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লিখিত পত্রে এঁর কথাই সত্যেন্দ্রনাথ একাধিক বার উল্লেখ করেছেন। গত শতাব্দীর শেষভাগে, বর্তমান শতাব্দীর সূচনাতেও, মেরী কার্পেণ্টারের নাম এদেশে সুপরিচিত ছিল, বাঙলা ভাষায় তাঁর অন্তত

মেরী কার্পেণ্টার

দুখানি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১০; মেরী কার্পেণ্টার হল তাঁর স্মৃতি বহন করছে; কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত সমাজেও তাঁর নাম বহুশ্রুত নয় এই জন্য তাঁর সম্বন্ধে দু-একটি কথা বিবৃত হল—যাঁরা বিস্তারিত জানতে চান তাঁরা এসলিন কার্পেণ্টার প্রণীত জীবনী বা বাংলা পুস্তিকা দুটি পড়তে পারেন।

মেরী কার্পেণ্টার পরদুঃখকাতর ধর্ম-যাজক লেণ্ট কার্পেণ্টারের কন্যা, কৈশোর অবধি তিনি পিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা সার্বজনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। রামমোহন রায়ের বিলাত প্রবাসকালে (১৮৩১-৩৩) তাঁর সঙ্গে মেরী কার্পেণ্টার ও তাঁর পিতার বিশেষ যোগ হয়েছিল। রামমোহনের মৃত্যুতে মেরী কার্পেণ্টার একগুচ্ছ সনেট রচনা করে শ্রদ্ধানিবেদন করেন ১১—

Thy spirit is immortal; and
 thy name
Shall by thy countrymen be
 ever blest.
Even from the tomb thy words
 with power shall rise,
Shall touch their hearts, and bear
 them to the skies.

রামমোহনের সূত্রে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর যে অনুরাগের সূচনা তা ফলবান হয় বহু বৎসর পরে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বন্ধু মনোমোহন ঘোষের যোগে। এই ত্রিশ বৎসর কাল মেরী কার্পেণ্টার দরিদ্রের ও নারীর বন্ধুরূপে অনলস উদ্‌যোগের দ্বারা বিলাতের সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। রামমোহনের অনুগামী ও স্ত্রীস্বাধীনতা-প্রবর্তন-প্রয়াসী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বন্ধু মনোমোহন ঘোষ এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। "কুমারী কার্পেণ্টার ইহাদিগকে আদর সহকারে গ্রহণ করিয়া ইহাদের মুখে ভারতবর্ষের অবস্থা ও ভারতীয় ললনাদিগের শিক্ষার বিবরণ শুনেন। তাঁহার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষবাসী ছিলেন এজন্য প্রথম হইতেই ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল; এক্ষণে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার অপকৃষ্ট অবস্থা জানিয়া তিনি বিশেষ দুঃখিত হন।"১২ স্বদেশের রমণী ও দরিদ্রের জন্য যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন রামমোহনের দেশ ভারতবর্ষের রমণী ও দরিদ্রকুলের পক্ষ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে আহ্বান করেন—"তাঁহার সম্মুখে আবার একটী অভিনব কার্য-ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। ভারতবর্ষে যাইয়া ভারতবর্ষীয় নারীদিগকে সুশিক্ষিত করা তিনি আপনার জীবনের একটি প্রধান কর্তব্য কর্ম মনে করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ষাটি বৎসর হইয়াছিল। এবয়সে স্বদেশ ছাড়িয়া বহুদূর দেশে যাইতে লোকে অনেক অনিষ্টের আশঙ্কা করিতে পারে। কিন্তু পরহিতৈষিণী অবলার হৃদয়ে এরূপ কোন আশঙ্কা স্থান পাইল না।......ভারতবর্ষ তাঁহার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল; তিনি ভারতবর্ষে যাইতেই স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন।"১২ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগের

---

৯ "ওঁর [সত্যেন্দ্রনাথের] এক খুব বন্ধু ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। ওঁর ইচ্ছে যে আমাকে তিনি দেখেন। কিন্তু আমার ত বাইরে যাবার জো নেই, অন্য পুরুষেরও বাড়ির ভিতরে আসবার নিয়ম নেই। তাই ওঁরা দু-জনে পরামর্শ করে একদিন বেশী রাত্রে সমানতালে পা ফেলে বাড়ির ভিতরে এলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সমান তালে পা ফেলে তাঁকে বাইরে পার করে এলেন।"—জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী কর্তৃক তাঁর "জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবী" প্রবন্ধে মুদ্রিত, প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৫৮।

১০ রজনীকান্ত গুপ্ত, 'কুমারী কার্পেণ্টারের জীবন-চরিত', ১৮৮২। মেরী কার্পেণ্টার সিরিজ। জাতীয় ভারতসভার কলিকাতাস্থ বঙ্গ-শাখার কমিটির অনুরোধে লিখিত।

কুমুদিনী মিত্র [বসু], 'মেরী কার্পেণ্টার' ১৯০৬। শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুরোধে মুদ্রিত।

১১ Sophia Dobson Collet, **Life and Letters of Raja Rammohun Roy** পুস্তকে এগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

১২ রজনীকান্ত গুপ্ত, "কুমারী কার্পেণ্টারের জীবন-চরিত"।

ফলেই যে তাঁর ভারত-যাত্রা, একথা মেরী কার্পেণ্টার নিজেই উল্লেখ করে গিয়েছেন। ১৩

১৮৬৬ সালে তিনি ভারতবর্ষ যাত্রা করেন, তার পূর্বে তিনি রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থ The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy প্রকাশ করেন; এই গ্রন্থও সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির অনুরোধে লিখিত, মেরী কার্পেণ্টার সে কথা উল্লেখ করেছেন।১৪ ভারতযাত্রাকালে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের অভিন্নহৃদয় বন্ধু মনোমোহন ঘোষ। "বোম্বাই নগরে আসিবার কয়েকদিন পরে তিনি [মেরী কার্পেণ্টার] আহ্মেদাবাদ নগরে গমন করেন।"১৫ "এই সময়ে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ আহমদাবাদে সহকারী জজের কার্য করিতেছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার ইহার মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য তথায় যাত্রা করেন।"১২ "আহ্মেদাবাদ নগরেই তাঁহার ভারতীয় কার্যপ্রণালী স্থির হয়"১৫—অনুমান করা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা ও তাঁর পরামর্শক্রমেই। মেরী কার্পেণ্টার অতঃপর আরও তিনবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং দেশের নানা প্রান্তে ভ্রমণ করে, তৎকালে ভারতবর্ষে যাঁরা প্রগতির ধারক-বাহক ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে নানা সংস্কার ও উন্নতির সূত্রপাত করেন; অবশ্যই স্ত্রীশিক্ষা তার মধ্যে প্রধান। তাঁর উদ্যোগে জাতীয় উন্নতি বিধায়ক একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও তিনি ভারতবর্ষের নানা অভাব মোচনের জন্য আন্দোলন-আলোচনায় ব্রতী থাকেন, তার সুফলও হয়েছিল; এখানে তাঁর সব কীর্তির পরিচয় দেবার অবসর নেই। তাঁর পরলোকগমনের পর স্ত্রীশিক্ষা প্রচারকল্পে তাঁর অবিরত উদ্যোগের কথা এবং এ দেশের প্রগতিবাদীরা তাঁর কাছে যে প্রেরণালাভ করেছিলেন সে-কথা স্মরণ করে এ দেশে স্মৃতি-সভা হয়েছিল, মেরী কার্পেণ্টার হল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত; বাংলায় তাঁর জীবনী রচনার ব্যবস্থাও অনুরাগীবর্গ করেন—এই বীরাঙ্গনার১৬ ভারতকল্যাণব্রত স্বীকারের মূলে সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও যোগও স্মরণযোগ্য।

৩

বাইশ বৎসরের যুবক সত্যেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন, পরিবার থেকে দেশ থেকে 'অবরোধ প্রথা উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে; বিদেশপ্রবাসকালে তিনি তুলনা করবার সুযোগ পেয়েছেন "আমাদের স্ত্রীরা পর্দার আড়ালে কি খর্বীকৃত বদ্ধ জীবন যাপন করেন, উন্মুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সংকীর্ণ,

---

13. "Many had expressed their great surprise at her visit to this country, and at the warm sympathy that she showed for India; that sympathy had originated in the visit to England of Rajah Rammohun Roy, a most esteemable man, who endeavoured to lead his countrymen away from idols and supersitions. He was extremely anxious to benefit his fellow countrymen, and it was through his earnest efforts for them, that she turned her attention to this country......

"Subsequently, the visit of a Hindu gentleman, Mr. Satyendra Nath Tagore, of the Civil Service, impressed her still more with the desire, he having urged her to show sympathy to the women of India." —Mary Carpenter, "Addresses to the Hindoos Delivered in India", (Longmans. 1867), p. 48.

14. Recently, four young Hindoos have come to England to become acquainted with English men and women in their private and public work, and in their homes,—to study our laws and institutions, and thus to qualify themselves on their return to India to transplant there what they have found most deserving of imitation amongst us. They have desired to collect while in England all the records that remain of their illustrious countryman [Rammohun Roy], with a view to prepare a complete memoir of him on their return to India. It has seemed best however to them to publish separately all that can be learnt respecting the Rajah's last days, while on the scene of his labours. It is at their request that this volume has been prepared."

Mary Carpenter, 'The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy', 1866, preface, VIII.

উক্ত চারজন ভারতীয়ের নাম গ্রন্থের ২৫২ পৃষ্ঠার Appendix C-তে উল্লিখিত আছে—Satyendranath Tagore, Esq., now in the Indian Civil Service, Manomohon Ghose, Esq. now called to the English Bar, Woomes Chunder Bonnerjee, Esq., of the Middle Temple, Khetter Mohun Dutt, Esq. M.D., Professor of Bengalee in the London University.

মেরী কার্পেণ্টার সংক্রান্ত এই দুটি উদ্ধৃতিই "বাংলার নারী-জাগরণ" (১৩৫২, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ) গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে মেরী কার্পেণ্টারের যোগের কথা তাঁর গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন।

১৫ [illegible]

১৬ [illegible]

তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞানবৃত্তিক্রিয়া কিছুই স্ফূর্তি পায় না। বিলেত থেকে ফিরে এসে পর্দা উচ্ছেদ-স্পৃহা আরও জেগে উঠল।" ১৭

কিন্তু পরিবার ও দেশ তখনও তাঁর সংগে সমপদক্ষেপে চলতে প্রস্তুত হয়নি। স্বর্ণকুমারী দেবী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখছেন, "তখন অন্তঃপুরে অবরোধপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখনো মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইতে হইলে ঘেটাটোপমোড়া পাল্কীর সংগে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতান্ত অনুনয়-বিনয়ে মা গংগাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পাল্কী শুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে।" সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থান বোম্বাই, সামাজিক অবস্থা সেখানে বাংলা দেশের মত নয়: "স্ত্রী স্বাধীনতার দ্বার খোলবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত" মনে করে সত্যেন্দ্রনাথ আনন্দিত—জ্ঞানদা-নন্দিনীর জাহাজঘাটে যাওয়া নিয়ে এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হল। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখছেন, "স্ত্রীকে মেজদাদা লইয়া যাইতেছেন বোম্বাই সমুদ্রপার, কিন্তু তখনো অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহির্বাটীর প্রাংগণ পর্যন্ত হাঁটাইয়া গাড়ী চড়াইতে পারিলেন না। কুলবধূর পক্ষে ইহা এতই নূতন এতই লজ্জাজনক যে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। অগত্যা পাল্কী করিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল।"

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, "একজন ফ্রেঞ্চ মহিলা তাঁহার বহির্গমনের উপযোগী নূতন বেশ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।"

সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, "আমার সামনে যে পর্বতসমান বিঘ্নবাধা রয়েছে তা অতিক্রম করা কি কঠিন! যে প্রচণ্ড গড়ের মধ্যে আমাদের মেয়েরা আবদ্ধ, সে দুর্গ ভেদ করা কি দুরূহ ব্যাপার!" "অথচ আমার তা না করলেই নয়।" ১৭ সাংসারিক ক্ষেত্রে "ভালোমানুষ" লোক হলেও এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই প্রতিজ্ঞা প্রথমে তাঁর পরিবারে এবং ক্রমশঃ তাঁর পরিবার থেকে সমগ্র দেশে স্বর্ণফলপ্রসূ হয়েছে।

এই তো গেল ১৮৬৪ সালের কথা, ১৮৬৬ সালে যখন তিনি দেশে ফিরে এলেন "তখন আর কেহ বধূকে পাল্কী করিয়া গৃহে আসিতে বলিতে পারিলেন না। কিন্তু ঘরের বৌকে মেমের মত গাড়ী হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সে দিন বাড়ীতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত।" প্রবাসিনী বধূর তখন "অপরূপ বেশ, আচার নূতনতর"—সহজেই যে স্বীকৃত হতে পেরেছিলেন তা নয়—"বাড়ীতেও এ সময় ইঁহারা একরূপ একঘরে হইয়া রহিলেন। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা বধূঠাকুরাণীর সহিত অসংকোচে খাওয়াদাওয়া করিতে বা মিশিতে ভয় পাইতেন।"

এই যাত্রায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্নীকে গবর্মেণ্ট হাউসে গবর্ণর-জেনারেলের 'মজলিসে' নিয়ে যান। "ইতিপূর্বে কোন হিন্দু রমণীই গবর্ণমেণ্ট হাউসে যান নাই।"১৮ সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্য-কথায়' এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন—

"সে কি মহা ব্যাপার। শত শত ইংরাজ মহিলার মাঝখানে, আমার স্ত্রী সেখানে একটিমাত্র বঙ্গবালা—তখন প্রসন্নকুমার

১৭ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আমার বাল্যকথা..."

১৮ দ্র গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, জানুয়ারী ১৮৬৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁর 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর...' পুস্তকে উদ্ধৃত। এই গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে।

ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্যস্থলে দেখে রাগে, লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।" ১৭

অবশেষে "আমাদের বাড়িতে মেজদাদাই এ সমস্ত উল্টাইয়া দিলেন। আমরা যখন শেমিজ জামা জুতা মোজা পরিয়া গাড়ি চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম, তখন চারিদিক হইতে যে কিরূপ ধিক্কার উঠিয়াছিল, তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নহে।" ১৯

ক্রমশ কালপ্রভাবে, সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও তাঁর প্রভাবান্বিত আত্মীয়দের সহযোগে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হল।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রবল স্ত্রী-স্বাধীনতাপন্থী বলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখন স্বীকৃত, কিন্তু তাঁর প্রথম বই ('কিঞ্চিৎ জলযোগ', ১৮৭২) স্ত্রী-স্বাধীনতাকে পরিহাস করে রচিত—বইটি নিয়ে সেকালে বেশ আন্দোলনও হয়েছিল। কিন্তু "মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।"২০ 'কিঞ্চিৎ-জলযোগ' বইখানি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত হলেও ২১ ("ইহা সামান্য প্রশংসা নহে") জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "দুঃখিত ও অনুতপ্ত" হয়ে এ বইয়ের প্রচার বন্ধ করেন। "স্ত্রী-স্বাধীনতার শেষে আমি এত বড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, গঙ্গার ধারের কোন বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বরোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসিয়া দুইটি আরব ঘোড়ায় দুই-জনে পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া চাহিয়া, হতভম্ব হইয়া থাকিত।" ২০

সত্যেন্দ্রনাথের অপর এক ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পরিবারের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে উৎসাহী ছিলেন—সেইজন্য বিলাত থেকে সত্যেন্দ্রনাথ এঁকেই চিঠি লিখে জ্ঞানদানন্দিনীকে ইংরেজি শেখাবার ভার দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী

---

১৯ সৌদামিনী দেবী, "পিতৃস্মৃতি", প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮.

২০ "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি"

২১ দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, পরিশিষ্ট খণ্ড।

লিখছেন, "বাড়ির ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরকাল উৎসাহ ২২ এবং অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। বাড়ীর মেয়েদের ইংরাজী বাঙ্গালায় নিজে শিক্ষাদান করিতেন।" জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আত্মকথায় আছে—"বিয়ের পর সেজ দেবর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম, আর এক একবার ধমকে দিলে চমকে উঠতুম। আমার যা কিছু বাংলা শিক্ষা তা সেজ ঠাকুরপোর কাছে পড়ে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাংলা বই পড়াতেন, আমার খুব ভালো লাগত।" সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের পর হেমেন্দ্রনাথ আরো উৎসাহিত—"এক্ষণে সেজদাদা মহাশয় তাঁহার পত্নীকে ওস্তাদের নিকট গান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গান-বাজনা লেখাপড়া সর্ব-রকমে বেশ ভাল করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিল। দিদিরা পর্যন্ত ঘরে বসিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন।" এই হেমেন্দ্রনাথেরই কন্যা প্রতিভা, উত্তরকালে এ'রই উদ্‌যোগে স্থাপিত সংগীত সঙ্ঘ (প্রতিষ্ঠা ১৩১৮) ও সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীইন্দিরা দেবীর সহযোগে পরিচালিত আনন্দসংগীত পত্রিকা (প্র ১৩২০) দ্বারা বাংলা দেশে সংগীতের চর্চা প্রসারলাভ করেছে। এ'রই নামের সঙ্গে জড়িত রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভা, তারই প্রথম অভিনয়ে (১৮৮১) "প্রতিভা নাম্নী কন্যা প্রথমে বালিকা, পরে সরস্বতী মূর্তিতে অপূর্ব অভিনয় করিয়াছিলেন।"

(পুরনারিগণ কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে অভিনয়-প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহ স্মরণীয়—একজন্য যে তাঁদের ব্যঙ্গ-বাণ সহ্য করতে হয়নি, তা নয়। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী লিখছেন—"রাজা ও রাণী প্রথম যেবার হল মনে আছে তার পরদিনই বঙ্গবাসী কাগজে 'ঠাকুরবাড়ির নূতন ঠাট' নামে এক লেখা বেরল, তাতে প্রত্যেক ভূমিকায় অবতীর্ণ পাত্রের নাম পাশে পাশে দেওয়া আছে। তার অর্থ এই যে, কোন কোন নিষিদ্ধ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী সেজে-ছিলেন, সেইটে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া—যথা, ভাসুর ভ্রাতৃবধূ।" ২৩

এই অভিনয়ে দেবদত্ত সেজেছিলেন মেজোজ্যাঠামশায় [সত্যেন্দ্রনাথ] সুমিত্রা মেজোজ্যাঠামা [জ্ঞানদানন্দিনী], রাজা রবিকাকা......কুমার প্রমথ চৌধুরী, ইলা প্রিয়ম্বদা......")।২৪

এইখানে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বিলাত-যাত্রার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নেওয়া যেতে পারে। ছাত্রাবস্থায় বিলাত প্রবাসকালে স্ত্রী-স্বাধীনতার মঙ্গলপ্রভাব লক্ষ্য ক'রে পত্নীকে সেই আবেষ্টনে কিছুকাল রাখবার যে চেষ্টা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছিল, দীর্ঘকাল-পোষিত সেই বাসনা সত্যেন্দ্রনাথ পূর্ণ করতে পেরেছিলেন পনেরো বৎসর পরে; ঘটনাচক্রে নিজে সঙ্গী হতে পারলেন না, তাতে পশ্চাৎপদ বা উদ্বিগ্ন না হয়ে এক সহযাত্রী বন্ধুর ভরসায় দুই শিশুসন্তানসহ পত্নীকে দূরদেশে পাঠিয়ে দিলেন; পরে তাঁর অনুবর্তী হন (১৮৭৮)। আত্মীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর সেখানে তাঁদের নামিয়ে নিতে এসে নাকি বলেছিলেন, 'সত্যেন্দ্র এ কি করলেন? নিজে সঙ্গে এলেন না?' " ২৫

এই অবিরত উদযোগ সার্থক হয়েছিল তাঁর জীবনে, কৃতার্থ করেছিল তাঁর দেশকে; পরিবারের মধ্যে যে মঙ্গলচেষ্টার তিনি প্রবর্তন করেছিলেন, সমস্ত দেশের নারী-জাতি যার লক্ষ্য ছিল, তা তাঁর ভগিনী পত্নী কন্যা আত্মীয়াদের সূত্রে দেশময় বহু-পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তাঁর জীবিতকালেই; ১৯২৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভারতবর্ষের মহিলাসমাজকে দেশের বন্ধন-মুক্তির আন্দোলনেও স্বামী-পুত্রের সম-সুখ-দুঃখভাগী হতে দেখে গিয়েছেন; "আমার মনস্কামনা অনেকটা পূর্ণ হয়েছে" বলে তিনি তৃপ্তিলাভ করে যেতে পেরেছেন, যদিও দেশ এই পথিকৃৎকে বিস্মৃত হয়েছে।

২২ রবীন্দ্রনাথও এই উৎসাহের ফলভাগী হয়েছিলেন; দ্র "নানা বিদ্যার আয়োজন", জীবনস্মৃতি।

২৩ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, "বিলেতভাও", 'সমকালীন', আষাঢ়, ১৩৬০

২৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরোয়া, অধ্যায় ৯

২৫ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, "সত্যেন্দ্রস্মৃতি", বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২

সে-কালের পল্লীমানুষ

• সরলাবালা সরকার •

অর্ধেন্দু দত্ত

যশোহর জেলার এক গণ্ডগ্রামে একদল আধুনিক মেয়ে একবার পল্লীগ্রামের বৈচিত্র্য অনুভব করবার জন্য বেড়াতে গিয়েছিল। তার মধ্যে একটি মেয়ের সেখানে মামার বাড়ি। এককালে সে তল্লাটে সে-বাড়িটি খুব নাম করা বাড়িই ছিল। এখন অবশ্য কালের গতিতে আরও সব জায়গায় যেমন এখানেও তেমনি—বাড়িটি জরাজীর্ণ, অধিবাসীরাও তাই। অনেকেই বিদেশে ছিটকে পড়েছেন, যাঁরা আছেন তাঁরা কোন-রকমেই টিকে আছেন।

চৌধুরী বাড়ির সীমানা গ্রামের এমুড়ো থেকে সে মুড়ো পর্যন্ত। আলাদা আলাদা শরিকের আলাদা আলাদা বাড়ি; কারও দোতলা কোঠা বাড়ি কারও বা আটচালা আবার কারও বা দোচালা ঘর। কিন্তু সব বাড়িই এখন লক্ষ্মীশ্রীহীন, সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ।

গরীব যদিও সব কালেই গরীব, তবুও একালের গরীব আর সেকালের গরীবের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। রায়চৌধুরী বাড়ির ছোট তরফের কর্তা ছিলেন বড় গরীব, তাঁর হাতে এমন পয়সা ছিল না যে, ঘরামী ডেকে বর্ষার আগে ঘরের চাল মেরামত করিয়ে নেবেন, কিন্তু তাঁর ঘরের চালই সকলের আগে মেরামত হয়। ঘরামীরা দড়ি কাটারী হাতে নিয়ে চৌধুরী বাড়িতে ঢুকলেই অন্য অন্য শরিকের যাঁরা কর্তা, তাঁরা তাদের ডেকে বলতেন "ওহে, ছোট খুড়ো মশাইয়ের বাড়ির ঘর ক'খানই আগে সেরে দিয়ে এস, তারপর এদিকে আসবে।"

ছোট তরফের কোন নিজস্ব পুকুর ছিল না, হাটেও মাছ কিনবার মত সম্পাতি ছিল না, তাই যার পুকুরে যেদিন জাল ফেলা হত সে-বাড়ির কর্তা মাছ ধরার পর বড় রুই মাছের মুড়োটাই ছোট তরফের বাড়িতে পাঠাতেন, কেননা এখনও খুড়ো মশাইয়ের একটি মাছও পাতেনি; চিরকাল ওঁ'র মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খাওয়া অভ্যাস।

[illegible]

তো আর গরীব বড় মানুষের বাচবিচার করে না, তাই তাঁর গোয়ালে গরু নেই তবু তিনি আফিং খাওয়ার অভ্যাসটি ছাড়তে পারেন নি বলে সব শরিকের বাড়ি থেকেই তাদের গরু দোয়া হলে আগে তাঁর ঘরে কিছু দুধ পাঠানো হয়। ("আচ্ছা, খুড়ো মশাই আফিং খান, দুধ না হ'লে তাঁর চলবে কি করে?")

খুড়ো মশাইয়ের আরও একটি অভ্যাস ছিল, গাওয়া ঘি না হলে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পারেন না, তাই যেদিন যার বাড়িতেই সর বাটা হ'ত ঘি করবার জন্য, তারই বাড়ি থেকে অন্তত এক কটোরা ঘি যেত তাঁর বাড়ি।

এ-সব আগের দিনের কথা, এখন অবশ্য সেদিন নেই, এখন কার গোয়ালে কে ধোঁয়া দেবে? নিজের নিয়েই বাঁচছে না।

তবুও অতিথি পরিচর্যার রীতি আজও গ্রাম থেকে উঠে যায়নি। তাই রায়চৌধুরী বাড়ির এই আগন্তুকের প্রতি-বাড়িতেই নিমন্ত্রণ হচ্ছে।

খাওয়া দাওয়ার পর যখন বিশ্রামের সময় তখন বসত মেয়েদের মজলিস। গিন্নিবান্নি থেকে বৌ ঝি পর্যন্ত সকলেই সেই মজলিসের সভ্য। শহরের মেয়েরা পল্লীর সেকালের কাহিনী শুনবার জন্য উৎসুক, আবার পল্লীর বৃদ্ধারা সেই সব পুরানো দিনের কথার শ্রোতা পেয়ে আনন্দিত।

সুজাতা ইতিহাসের ছাত্রী, বি এ-তে সে ইতিহাসে অনার্স নিয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ঠাকুরমা, এই যে আপনাদের রায়চৌধুরী বংশ, এর কোন ইতিহাস আছে?"

"ইতিহাস" কথাটার অর্থ না বুঝলেও প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে বুড়া ঠাকুরানীর বিলম্ব হল না। তিনি বললেন, "রায়-চৌধুরীরা হল ধানি পিতাম্বরের বংশ। ধানি পিতাম্বরের কথা এ তল্লাটে কে না জানে? তিনি পঞ্চ গ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণ [illegible]

ধানের জাংগাল দিয়েছিলেন, যে যত পার ধান নেও। ছালা ছালা ধান নিয়ে গিয়েছিল পণ্ডিতেরা। সেই অবধি নাম হল ধানি পিতাম্বর। পণ্ডিতেরাই ঐ খেতাব দিয়ে-ছিল। এই যে যশোর জেলা, এ হল কুলীন কায়স্থের দেশ। বাগুটে, জঙ্গলেবেড়ে বিদ্যানন্দ কাটি এসব গ্রামের কায়স্থ হল বড় বড় কুলীন। তাইতো কুল-ক্রিয়া করবার জন্যে কলকাতা থেকেও বড় বড় ঘরের মানুষ আসে যশোর। রায়চৌধুরীরা কুলীন নয়, কিন্তু গোষ্ঠিপতি, কুলীনের সভার মধ্যেও ওরাই পায় মালা চন্দন।"

একজন প্রশ্ন করল, "হ্যাঁ ঠাকুরমা, "কুলক্রিয়া" ব্যাপারটা কি? কলকাতার বড় মানুষরা কুলক্রিয়া করতে যশোরেই বা আসে কেন?"

তখন ঘোষেদের বাড়ির কর্ত্রী বললেন, "কুলক্রিয়া" কাকে বলে দিদিরা, তাও তোমরা জান না, জানবেই বা কি করে? বিয়েই হল না এখনো, তার আবার কুলক্রিয়া। বলি শোন, কায়স্থের ভিতর নানা ঘর, কুলীন মৌলিক, বাহাত্তুরে মৌলিক, আবার আটঘরের মৌলিক। কুলীনদেরও নানান ঘর, মুখ্যি, জন্মমুখ্যি, শক্তী মুখ্যি, মবরুণ্গ, এই সব কত রকম আছে। ব্রাহ্মণদের হ'ল কন্যাগত কুল, আর কায়স্থের হল পুত্রগত কুল। সমান ঘরে কুলীনে মেয়ে দিতে না পারলে কুলীন ব্রাহ্মণের কুল থাকে না, তাই সেকালে একটা কুলীন পাত্র পেলে—তা সে বুড়োই হোক, আর ঘাটের মড়াই হোক—গাঁয়ে তাকে কেউ নিয়ে এলে সে গাঁয়ে যত কুলীনের মেয়ে

যাক্ সে বুড়িই হোক আর আঁতুড়ে দুধের মেয়েই হোক সবাইকে একসঙ্গে পাত্রস্থ করে দেত্তো। বুড়ি পিসির বিয়ে হয়নি সেই বুড়ি পিসি আর কচি ভাইঝি দুজনকেই একই পাত্রে পাত্রস্থ করে দিত সেকালের কুলীন বামুনেরা। একালে সে-সকল আর তেমন নেই। এই গেল বামুনের ঘরের কথা।

আর কায়স্থ ঘরের কথা আমি তো ভাল রকমই জানি। আমি হলাম, মুখ্য কুলীন কায়স্থের মেয়ে, চার বছর বয়সে আমার বিয়ে হলে ঘোষেদের বাড়ি এসেছি, আর এসেছি তো আকন্দের ডাল মুড়ি দিয়ে, বাবার আর নামটি নেই।"

বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি উঠল আধুনিকাদের মধ্যে। "চার বছরে বিয়ে? সেকি ঠাকুরমা? ঠাকুরদার বয়স তখন কত ছিল?"

"ওঁর বয়স ছিল তখন দশ বছর, কি যে রূপ— যেন ময়ূর ছাড়া কার্তিক। চার বছর শুনে তোরা অবাক হচ্ছিস? তিন বছর বয়স থেকেই তো কত ঘর থেকে আমার জন্যে সম্বন্ধ আসছিল। নিজের কুল থেকে বড় কুলীন ঘরের মেয়ে আনতে হবে তা না হলে কুলক্রিয়া হবে না। কুলক্রিয়া কি মুখের কথা? কুলীনের বড় ছেলের 'কুলক্রিয়া' করাতেই যে হবে, তা না হলে তাদের কুলই থাকবে না, তারা বংশজ হয়ে যাবে। আমার শ্বশুর ঠাকুরের চেয়ে আমার বাবার কুল উঁচু, বাবার মত সেরা কুলীন ও দিকে আর ছিল না, তাই শ্বশুর ঠাকুর সন্ধান পেয়েই ছেলে সঙ্গে নিয়েই রওনা হ'লেন। তিনি গল্প করেছেন, "যাত্রা সিদ্ধিকে স্মরণ করে রওনা দিলাম। মনে কেবল ভাবনা 'দেবে কি ওরা বিয়ে?' হয়তো আর কেউ এসে মেয়ের মাকেও এক গা গয়না দেবে বলে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। আমি তো খুব বেশী কুল মর্যাদা দিতে পারবো না, আমার ভাগ্যে কি ঐ কুললক্ষ্মী ঘরে আসবেন?"—শুনছিস তো নাতনিরা, মেয়ের কত মর্যাদা। শ্বশুর বলেন যে, "ছেলে নিয়ে গেলাম যে, ছেলে দেখে বেয়াই বেয়ানের জামাই করবার লোভ হবে, আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তাই ছেলে সঙ্গে নিয়েই বেয়াই বাড়ির অতিথি হলাম। ওকালতী করি যশোর সদরে, কি রকম প্যাঁচ দিতে হয়, জানা আছে তো, বললাম ছেলে নিয়ে তোমাদের শরণস্থ হয়েছি, মেয়ে আমার ঘরে দেবে এ-সত্যি যদি কর তবে অন্ন জল গ্রহণ করবো, না হ'লে না খেয়ে তোমাদের দোর গোড়ায় ধন্না দিয়েই পড়ে থাকব।"

সুজাতার বোন অজিতা, সে বলল, 'এ যে দেখছি রীতিমত সত্যাগ্রহ।'

ঘোষ গিন্নি বললেন, 'দিদিরা তোমরা গাঁয়ে এসেছো, গাঁয়ের সঙ্গে পরিচয় করবে। গাঁকে তুচ্ছ করো না। এই গাঁয়েই দেখছো ঐ মাঠ, যেখানে সারি সারি খেজুর গাছ, সেখানে যখন নীলের আমীন এসে দাগ দিয়ে গেল কি যে কাণ্ড হল সে দিনের কথা ভাবতে পার তোমরা? গাঁয়ের ছেলেরা সবাই সেদিন লাঠি ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়েছিল, তবুতো সে দাগ দেওয়া রুখতে পারেনি। হারে কপাল? কি নীলই এসেছিল এ দেশে, দেশের একেবারে ধনপ্রাণ নিকেশ করে তারপর সে আপদ বিদেয় হয়েছে।"

কলকাতাবাসীদের কলকাতা ফিরবার দিন এসে গেল। খুব ভোরেই রওনা হতে হবে। ঝিকরগাছিতে রেলওয়ে স্টেশন অনেকটা দূরে।

দুয়ারে দাঁড়িয়ে দু'খানা ছই দেওয়া গরুর গাড়ি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও খুব ভোরেই উঠেছে, ওদের অবশ্য রাত থাকতেই ওঠা অভ্যাস।

মিত্র বাড়ির, ঘোষবাড়ির, দত্তবাড়ির গিন্নিরাও এসে দাঁড়িয়েছেন রায়চৌধুরীদের বাড়ির দুয়ারের কাছে। ক'দিনেরই বা পরিচয় এই মেয়েদের সঙ্গে, তবু মনে হচ্ছে যেন তাদের কোন পরমাত্মীয়াই বুঝি বিদেশে যাচ্ছে।

খালি হাতে কেউ আসেন নি, সকলের হাতেই মুখে কলাপাতা বাঁধা মাটির 'পাতিল' আছে। রাতে বোধ হয় পিঠে-আটা কিছু তৈরি করেছেন সকলেই যে যার বাড়িতে। 'জামাইচিত্তহরণ' 'রসো-সরোবর-মাধুরী' 'চন্দ্রপুলি' 'চন্দ্রকান্তি' এইসব হল এদেশের পিঠের নাম।

রায়চৌধুরী বাড়ির গিন্নি, তাঁর ছেলের বৌ এবং নাতনী ও নাতবৌরা সকলেই এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ারের কাছে। কছিমুদ্দি বার বার তাড়া দিচ্ছে, "দিদি ঠাকরাণ, আর বিলম্ব করবেন না, দেরি হলি ট্রেন ধরতি পারবো না।"

চৌধুরী বাড়ির বুড়ো গিন্নি বললেন, "সবুর কর্, ঐ যে গুড়ের নাগরী দুটো আর চারটে মানকচু নিয়ে আসছে। চারটে নাগরীই দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু ওরা দিতে পারলো না, দিদিরা ঐ থিকেই সবাই ভাগ করি নিও।"

চৌধুরী বাড়ির ভাগনী যে, প্রণাম করল প্রথমে। আর সবাইও তার দেখাদেখি প্রণাম করল সমস্ত গুরুজনদের। ছেলে-মেয়েদের একটু একটু আদরও করলো।

রায়চৌধুরী গিন্নি বললেন—"রঞ্জন কই, সে এখনো এল না যে, দিদিদের ঠিকমত গাড়িতে তুলে দিতে হবে তো!"

ঠিকমত গাড়িতে তুলে দেওয়া শুনে সুজাতা মনে মনে হাসলো।

কুন্তলা বললে, "ঐ যে রঞ্জন দাদা আসছে। দেখি, হাতে কি তোমার? এক কলসী খেজুর রস? মাঠে গিয়েছিলে বুঝি, তাই এত দেরী? এস, এস, পা চালিয়ে এস।"

রঞ্জন লজ্জিতভাবে একটু হাসল, বললে "তোরা সেদিন জিরেন রসের কথা বলেছিলি, তাই গাছটা কাটিয়ে দু'দিন জিরেন দিয়েছিলাম, তারপর ভাঁড় বাঁধতে হল, তাই দেরী হয়ে গিয়েছে।"

কুন্তলা খিল খিল করে হেসে উঠল, 'ও হো,—তোরা রস খেতে চেয়েছিলি। অজিতা না রসের কথা বলেছিলি—!"

রায়চৌধুরী গিন্নি অজিতার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, মনে মনে ভাবলেন, "আহা, যদি হতো? মানাতো যেন রাধাকেষ্ট! মিত্তির বাড়ির মেয়ে, কুলীনের মেয়েই তো। তা কি আর হবে, কলকাতার মেয়ে, বড়লোকের মেয়ে।"

"দুর্গা! দুর্গা! যাত্রা সিদ্ধি!"

গাড়ি ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে। শোনা যাচ্ছে "হেট হেট, বাঁয়ে বাঁয়ে।"

রায়চৌধুরী গিন্নির হঠাৎ স্মরণ হল যে, পাঁচসের সোনামুগের ডালের পুঁটলিটা দিতে ভুল হয়ে গেছে।

কিন্তু তাঁর ভুল হলেও ডালটা ঠিকই পৌঁছে গেছে।

রায়চৌধুরী গিন্নী ঘরে গিয়ে দেখলেন যে, কাল রাত্রে যখন ডাল ভাজছিলেন তখন রঞ্জন একবার রান্না ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেছিল বটে, জিজ্ঞেসও করেছিল। তবে কি সেই পুঁটলিটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েছে, না নাতবৌদের মধ্যে কেউ?

বাংলার সমাজচিত্রের একটি দিক

॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ॥

আজকের দিনে বাংলার সমাজচিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে সমাজ নিতান্তই একমুখীন। সারা ভারতবর্ষে আমাদের কালচার তো 'বাবু-কালচার' নামে মধ্যে মধ্যে আখ্যাত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ আমাদের গ্রামাঞ্চলের জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জমি, আর শহরে জীবিকা চাকরি। এই হল বাঙালীর মোটামুটি চেহারা। প্রত্যেক সজীব সমাজে কত রকম ধরনের লোকই থাকে! ছোট ব্যবসায়ী, বড় ব্যবসায়ী, ছোট শিল্পী, সৈন্য, যোদ্ধা— আরও কত কি। আমাদের সমাজ এখন এ সব হতে বঞ্চিত। অথচ এমন এক সময় ছিল যে সময় বাংলার এই রকম বহুমুখীনতা ছিল যথেষ্ট। সে সময় বাংলায় যোদ্ধা ছিল, নৌসেনা ছিল, শিল্পী ছিল, বণিক ছিল, শ্রেষ্ঠী ছিল। তাদের বিচিত্র কর্ম-সমারোহে সমাজ প্রাণবন্ত থাকত। ইংরেজ সাম্রাজ্য যেমন একদিকে আমাদের অর্থনৈতিক ধ্বংস সাধন করেছে, অন্যদিকে এই আঘাতও কম প্রচণ্ড নয়। মোগল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় হবার সংগে সংগে এই ধরনের লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এখানে মোগল শাসকেরাও স্থানীয় যোদ্ধা নৌসেনা ইত্যাদির উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। বস্তুতঃ মোগল সৈন্যের সব চেয়ে বিশিষ্ট সেনাবল ছিল অশ্বারোহী সৈন্য—অন্যান্য সেনা, বিশেষতঃ নৌসেনা, তাদের তেমন ভাল ছিল না। সেইজন্য অন্যান্য সেনাবলের জন্য তাদেরও স্থানীয় সেনার উপরই নির্ভর করতে হত। আর যেসব পাঠান নেতা বা স্থানীয় বড় জমিদার বা ভূঁইয়া ঐ সব মোগল সেনাপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তাঁদের সেনাবল তো সমস্তই স্থানীয় লোক হতে সংগৃহীত। ভারতচন্দ্র, যিনি মোগল সেনাপতি এবং তাঁর অনুগ্রহপুষ্ট ভবানন্দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তিনিও লিখেছেন যে প্রতাপাদিত্য

নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

তখনকার ঢালীরা সত্য সত্যই ঢাল ধরত, ঢালী কেবলমাত্র এখনকার মত উপাধিতে পর্যবসিত হয় নি। তার সংগে গজসৈন্য ইত্যাদি তো ছিলই। বাংলার ইতিহাসে দেখা যায় প্রতাপাদিত্য কেদার রায় প্রভৃতির অধীনে যে সব নৌসেনা ছিল তাদের মধ্যে কিছু মগ আরাকানবাসী ও ফিরিংগি থাকলেও আসল সেনারা ছিল বাঙালী।

কিন্তু অত দূরে অতীতে যাবার প্রয়োজন নেই। যখন প্রবল প্রতাপ ইংরেজের বাহুবলের কাছে বাংলার নবাবের শক্তিও সংকুচিত তখনও বাংলায় অন্তত কয়েকঘর জমিদার ছিলেন যাঁরা অকুতোভয়ে ইংরেজ-সেনার সংগে যুদ্ধ করার স্পর্ধা রাখতেন। Long-এর The Social Condition of Bengal, নামক গ্রন্থ পড়লেও এর কিছু চিত্র পাওয়া যায়। ১৭৬০ সালে প্রথম খবর এলো (উক্ত পুস্তক, ২৩৮ পৃঃ) বর্ধমানের রাজা বিদ্রোহের চেষ্টা করছেন, তিনি পনের হাজার পাইক সংগ্রহ করছেন এবং বীরভূমের রাজার সংগে এই জন্য সন্ধি করেছেন। নবাব কাশিম আলি খাঁ নিজে তাঁকে দমন করতে না পেরে কোম্পানিতে নির্দেশ দিলেন বর্ধমানের রাজাকে দমন করতে। (ঐ, ২৪১ পৃঃ)। কোম্পানি তাঁকে কলকাতায় ডেকে পাঠালেন, কিন্তু রাজা এলেন না, আত্মগোপন করে রইলেন। (ঐ, ২৪৮ পৃঃ) বীরভূমের রাজাও নগর হতে পালিয়ে গেলেন। সুতরাং কোম্পানী সৈন্য পাঠালেন। ১৭৬১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর যুদ্ধ হল। মেজর হোয়াইট সেই যুদ্ধের যে বিবরণী কোম্পানীর কাছে পাঠালেন তাতে দেখা যায়, সে যুদ্ধ ছেলে খেলা হয় নি, বেশ রীতিমতই হয়েছিল। হোয়াইটের মতে তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত দশ হাজার লোক ছিল, তা ছাড়া অন্তত দশটি কামানও ছিল। বর্ধমানের রাজা অবশ্য শেষ পর্যন্ত হারলেন। কিন্তু এই হতেই বোঝা যায়, সেকালের বাঙালী সমাজ একালের মত ছিল না।

॥ ২ ॥

বাংলার এই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, ইংরেজ সাম্রাজ্যের আঘাত দুটি পথ ধরে প্রসারিত হয়েছিল। প্রথমটি হল অর্থনৈতিক। বাংলার যে সব শিল্প ছিল সে সবই জোর করে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। অপরটি হল আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে। সমস্ত জীবিকা ধ্বংস করে খোলা রাখা হল মাত্র দুটি পথ—চাকরি ও চাষ। সে চাষও আবার নিজের ইচ্ছা মত নয়। চাষ করতে হবে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে,—নীলের চাষ করতে হবে, কোম্পানীর ইনভেস্টমেণ্ট মেটাবার জন্য চাষ করতে হবে, তার জন্য দাদন নিতে হবে, দাবী না মেটাতে পারলে "শ্যামচাঁদের" অত্যাচার তো আছেই। 'নীল-দর্পণের' চিত্র কাউকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বস্তুতঃ এ দুটি দিকই অংগাংগী। একই ধারার দুটি দিক মাত্র।

বাংলায় সেই জন্য যেদিন নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন হল সেইদিনই এই দিকেও আঘাত শুরু হল। আজকাল সকলেই জানেন কর্নওয়ালিশী ভূমিব্যবস্থায় প্রজাদের চিরাচরিত স্বত্ব সমস্তই এক কলমের খোঁচায় উড়িয়ে দিয়ে জমিদারদের হাতে সমর্পণ করা হল। আর সেই সংগেই শুরু হল জমি কেড়ে নেবার অভিযান। যে সব শ্রেণী চাষ করত না, পুলিসের কাজ করত বা সৈন্যের কাজ করত, তারা নির্ভর করত তাদের জমির উপরে। তাদের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলত সেই জমির আয়ে, তারা করত অন্য কাজ। কোম্পানী রাজা হয়েই নিজের পুলিস করলেন, পাইকদের তাড়িয়ে দিলেন এবং সেই সংগে তাদের সমস্ত জমি কেড়ে নিলেন। এই আঘাত প্রথম আসে ১৭৯৩ সালের ১ম রেগুলেশানের ৮ম অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা হতে। তারপর লর্ড হেস্টিংস ১৮১২ সালে এই ব্যবস্থাকে তীব্রতর করে তোলেন, তার জের গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল। মোটামুটি বলা যায়, পঞ্চাশ বছর ধরে এই নিপীড়ন চালাতে চালাতে ক্রমে ক্রমে বাংলা জীবনরস নিষ্পেষিত করে দেওয়া হল, বাংলার সমাজ জীবনে আর কোনও বৈচিত্র্যও রইল না, প্রাণস্পন্দনও রইল না।

এই অত্যাচারের নির্মমতা এবং তার বিরুদ্ধে বাঙালীর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের তীব্রতা সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা নেই। অথচ আমরা বাংলার সংস্কৃতির আলোচনা করতে গিয়ে এই ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে যদি এখনকার 'বাবু-কালচার' ও গ্রাম্যসমাজ কেবল এই দুটি ধারা নিয়েই আলোচনা করি তাহলে সে আলোচনা প্রকৃত আলোচনাই হবে না। বস্তুত দীর্ঘ ইতিহাসের ব্যাপক পটভূমিকায় বাঙালী সংস্কৃতির আলোচনা করলে দেখা যাবে, মধ্যবিত্ত

সংস্কৃতির প্রাধান্য বাঙালীর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিতান্তই আধুনিক, সে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সমকালীন। তার অনেক কারণ ঘটেছিল। বাংলার সমাজবৈচিত্র্য গেল লুপ্ত হয়ে, লোকসংস্কৃতি ও লোকশিক্ষার ধারা হল অবরুদ্ধ, সমাজের অন্য কোনও অংশের মনের দরজা খুলবার সুযোগ হল না, পক্ষান্তরে মধ্যবিত্ত সমাজের একদিকে যেমন আর্থিক স্বাচ্ছল্য দেখা দিল প্রচুর, অন্যদিকে তেমনি তারা আস্বাদ পেল পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের। ফলে তারা উন্নতির উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে, তাদের ঘটেছে বিস্ময়কর বিকাশ,—যা ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথায়ও হয়নি, সম্ভবতঃ আর হবেও না। কিন্তু এই বিস্ময়কর বিকাশ সত্ত্বেও বলতেই হবে, এ বিকাশ একপেশে। যতদিন এর প্রসার এবং বিবর্তন ঘটছিল ততদিন এর অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে আমরা অন্যদিকে তাকাবার অবকাশ পাইনি। কিন্তু এখন যখনই সেই ধারাটি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছে তখন অন্যদিকের ধারাটিও বুঝতে হবে, তারা কি করে মরল তার ইতিহাস জানতে হবে, তাদের পুনরুজ্জীবন কিভাবে হতে পারে সে কথাও ভাবতে হবে।

পূর্বেই বলেছি, বাংলার এই সব বীর যোদ্ধারা সহজে মরেনি। বহু প্রতিরোধ করে, বহুবার অশান্তি ঘটিয়ে শেষে ক্রমে ক্রমে চেহারা বদলাতে বাধ্য হয়েছে। এই সময় পশ্চিম বাংলার প্রান্তসীমায় কত ঘন-ঘন অশান্তি ঘটেছে কেবলমাত্র তার তালিকা দেখলেই এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। কয়েকটি উল্লেখ করি—(১) ১৭৬৯-৭৪ সালে ধলভূম রাজার বিদ্রোহ; (২) ১৭৮৩ সালে রঙপুরে বিদ্রোহ; (৩) ১৭৮৯ সালে বিষ্ণুপুরে বিদ্রোহ; (৪) ১৭৯৯ সাল হতে চোয়াড়-বিদ্রোহ; (৫) ১৮১৭-১৮ সালে কটকে পাইক-বিদ্রোহ; (৬) ১৮৩১-৩২ সালে কোলদের বিদ্রোহ; (৭) ১৮৩২ সালে মানভূমের গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা; (৮) ১৮৩১ সালে বারাসতে বিদ্রোহ; (৯) ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ। তালিকা বস্তুত এর চেয়েও দীর্ঘ, মাত্র সামান্য কয়েকটি উল্লেখ করা হল। এই হতেই বোঝা যায় বারবার কি অশান্ত অস্থিরতায় এই সব শ্রেণী মাথা ঠুকে মরেছে, দুর্ভেদ্য দেওয়াল টলাতে পারেনি, কিন্তু তবু আঘাত করতে ছাড়েনি।

এই সব বিদ্রোহের মূলে কয়েকটি বড় কথা ছিল, স্থানীয় ও সাময়িক বিশিষ্টতা অনুসারে তার কিছু চেহারা-ভেদ থাকলেও তাদের মূল কাঠামোটা এক। সেইজন্য দু-একটির কথা একটু বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করি। চোয়াড় বিদ্রোহ অনেকদিন চলেছিল এবং ধলভূম, মেদিনীপুর এবং আশে-পাশের কয়েকটি জেলা তাতে কম্পিত হয়ে উঠেছিল। এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রাইস সাহেব যে ইতিবৃত্ত রচনা করেছিলেন তাতে এর বর্ণনা পাওয়া যায়।[১] সরকার তখন নতুন পুলিস করলেন, জমিদারদের হাত থেকে পুলিসী ব্যবস্থা কেড়ে নিলেন। ফলে পাইকদের বৃত্তি গেল। তারপর সরকার হুকুম করলেন, পাইকেরা যে সব জমি বৃত্তি হিসেবে ভোগ করত সেগুলি কেড়ে নেওয়া হোক্। এই কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হতেই বিদ্রোহের সূত্রপাত। সমস্যার বিরাটত্ব বোঝা যায় যখন স্মরণ করা যায় কেবল বর্ধমান রাজ হতেই ১৯০০০ পাইক বৃত্তিচ্যুত হয়েছিল। এই সব বৃত্তিচ্যুত সৈনিকেরা সুবোধ বালকের মত এক কথায় লাঙল ধরেনি। তারা বিদ্রোহের কঠিন পথই প্রথমে বেছে নিয়েছিল। যারা এই কেড়ে-নেওয়া জমির (Resumed lands) তহশিলদার হয়েছিল তারাই বার-বার আমন্ত্রিত ও নিহত হতে লাগল। সরকারের অন্য বিভাগ দোষ ফেলতে চাইলেন বোর্ড অফ্ রেভিনিউ-র উপর—কেন বোর্ড এই সব কথা না বুঝে জমি কেড়ে নেয়। কিন্তু দোষ তো বোর্ডের ছিল না, জমি কাড়া হচ্ছিল ১৭৯৩ সালের ১ম রেগুলেশনের ৮ম অনুচ্ছেদ অনুসারে। আর দায়িত্ব তো সমস্ত সরকারেরই। ভয়ে কোন কোন কালেক্টর পাইকান জমি ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাবও করলেন। মেদিনীপুর শহর বারবার বিপন্ন হয়ে উঠল। শেষে দীর্ঘকাল ধরে একদিকে সামরিক অভিযান চালিয়ে অন্যদিকে জমি সম্বন্ধে নানা প্রলোভন (যে প্রলোভনে চাষীরা প্রথম দিকে একেবারেই পড়েনি) দিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এই বিদ্রোহ শান্ত হয়। পাইকান জমি সম্বন্ধে ব্যবস্থা বদল করতে হয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের পিছনেও এই কথা, তবে তখন সাক্ষাৎ অত্যাচারী সরকার ছিল না, ছিল মহাজনেরা। বহুদিনের স্বাধীন ও নির্ভীক যোদ্ধা হচ্ছে ধলভূমের অধিবাসীরা। যখন পোড়হাটের রাজাকে কোম্পানীর অধীন করবার চেষ্টা হল এবং সেই সঙ্গে নবপ্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থা সেখানে চালাবার চেষ্টা হল অমনই ঘটল কোন বিদ্রোহ। ভূমিব্যবস্থা বদলাবার চেষ্টাই এর মূল কারণ। তারপরই মানভূমের ভূমিজ সম্প্রদায় করল বিদ্রোহ। তারই নাম গঙ্গা-নারায়ণ হাঙ্গামা। এ সম্বন্ধে Dent লিখেছেন :

> Dissatisfaction with the administration of Law of debtor and creditor appears to have been ripe at this time in Barabhum and the sale of ancestral holdings for debt was particularly objected to as something entirely opposed to the customs of the aboriginal tenantry.

এইখানেই বিদ্রোহের মূল কারণ নিহিত।

॥ ৩ ॥

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি গানের আসরেও একদিন শক্তির মদমত্ততার বুলিই তুলেছিল। যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই, সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকেই এই বুদ্ধির উদ্ভব। মঙ্গলকাব্যের অবসানে দেখা গেল পাঁচালী। সত্যপীরের পাঁচালী, শেক-শুভোদয়ার কাহিনী। এইভাবে চলতে চলতে আমরা হঠাৎ দেখি শিবায়ন কাব্য। (রামেশ্বর-কৃত)। তার মধ্যে দেখি, পার্বতী শিবকে বলছেন,

চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।

অনেক অনুনয়ে পার্বতী শিবকে চাষ-বাস করতে রাজী করালেন। শিব শূল ভেঙে লাঙল গড়ালেন, ইন্দ্রের নিকট চাষ-ভূমির পাট্টা নিলেন, কুবেরের কাছে বীজ-ধান কর্জ করলেন, ভীম 'হালুয়া'র (হেলে) সঙ্গে জমি চাষ করতে গেলেন। কাহিনীটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই যুগে লোকেও শূল ভেঙে লাঙল গড়াবার চেষ্টা আরম্ভ করতে বাধ্য হচ্ছিল—তারই প্রতিফলন এই কাহিনীতে। কিন্তু সে যুগে বাংলার সমাজের যে বৈচিত্র্য ও যে স্পন্দন, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, ইংরেজ সাম্রাজ্যের অভিঘাতে তা সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

এই সব কথা পুনরায় চিন্তা করবার প্রয়োজন ঘটেছে। তার কারণ, যে গোষ্ঠী ইংরাজোত্তর যুগে আমাদের সংস্কৃতির একমাত্র ধারক ও বাহক ছিলেন সেই গোষ্ঠী আজ ক্ষীয়মাণ। তার শক্তি শেষ হতে চলেছে। পক্ষান্তরে সমাজে নতুন নতুন শ্রেণী মাথা নাড়া দিতে শুরু করেছে, সেই সব শ্রেণীর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা সমাজ আর অস্বীকার করতে পারছে না। এককালে দেখা গিয়েছিল, সমাজের সকল স্তরেই সমাজস্পন্দন ছিল, সমাজে বৈচিত্র্য ছিল, আর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য ছিল। এই পরিবেশেই তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের মহৎ বিকাশ ঘটেছিল—বৈষ্ণব কাব্য হতে মঙ্গলকাব্য পর্যন্ত। আজ যদি আবার আমাদের সংস্কৃতিতে নব বিকাশের ধারা সৃষ্টি করতে হয়, তাহলে সমাজে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য এবং বহুমুখীনতা আনতে হবে, সংঘর্ষের বদলে সমন্বয় ঘটাতে হবে, নতুন নতুন শ্রেণীকে নব নব দিকে আত্মবিকাশের সুযোগ করতে দিতে হবে। আমাদের ঐতিহ্য সেইদিকেই ছিল। আজ সেই ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। প্রাচীনের পুনঃ সংস্থাপনে তা অবশ্যই হবে না, ইতিহাসের চাকাকে কখনই উলটে দেওয়া যায় না, কিন্তু এই ঐতিহ্য মনে রাখলে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টির সম্ভাবনা হতে পারে।

---

১ Burdwan District Handbook, Census 1951 দ্রষ্টব্য।

সবার ওপর

জীবনানন্দ দাশ

সবার ওপর তোমার আকাশপ্রতিম মুখে রয়েছে
সফল সকালের রোদ্র।
মনে হয়, সৃষ্টির অগ্নিমরালী পৃথিবীকে বঞ্চিত করে যদিও,
পৃথিবী মানুষকে,
যুদ্ধের অবিস্মরণীয় প্রতিভা ভাইকে আকর্ষণ করে যদিও
ভাইবোনকে নিঃশেষ ক'রে দেবার জন্যে,
রক্তনদীর ভিতর থেকে ফ'লে ওঠে শাদা মিনার,
মহৎ দার্শনিকের মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে জেগে ওঠে খুলির বাটি,
নির্বোধ প্রণয়ীদের নবান্নরসে উপচে ওঠে কিনারা তার,
মিষ্টি, মলিন, রুক্ষ ভূকম্পহীন অন্নোৎসবে, জেগে ওঠে বাসনা
কৃষ্ণার শাড়ি টেনে নেয়ার,
সাম্রাজ্য ভেঙে যায়,—
হেমন্তের মেঘের মত মিলিয়ে যায় সম্রাটদের চীৎকার;—
তবুও দুর্বার সৃষ্টির কুয়াশা সরিয়ে দেবার জন্যে তুমি
ডান হাত হলে তোমার;
একটি কালো তিলের নিখুঁত থেকে অপরিমেয় পদ্মের মত
হলে তুমি তোমার বাম হাত।
সৃষ্টি ও সমাজের বিকেলের অন্ধকারের ভিতর
সকাল বেলার প্রথম সূর্যশিশিরের মত সেই মুখ;
জানে না কোথায় ছায়া পড়েছে আমার জীবনে, তার জীবনে,
সমস্ত অমৃতযোগের অন্তরীক্ষে।

নির্বাণ

অজিত দত্ত

এখন আকাশ-মাটি ফুল-ফল মানুষের মন
সব মিশে একাকার হয়ে গেল। আমি আর তুমি,
আর দুঃখ সীমাহীন, আর আশা নেশার মতন
সমস্ত কল্পনা-ছাওয়া, স্বর্গ মর্ত আকাশ ও ভূমি
ছেয়ে গেল আলোস্রোতে সূচীভেদ্য আঁধারের মতো
চোখে আর দৃষ্টি নেই। হৃদয়ের সব আঁকে-বাঁকে,
সব সুখে সব দুঃখে, সমস্ত ভুবনে ওতপ্রোত
সমস্ত অতীতে আর ভবিষ্যতে ছড়ানো চাওয়াকে
একটি নিমেষে যেন মূর্ছায় নিস্তব্ধ ক'রে দিলে।
একেই কি প্রাপ্তি বলে? মুহূর্তের ধ্যানমগ্ন মনে
ত্রিলোক ত্রিকাল এসে হ'ল আত্মহারা? এ-নিখিলে
সতীর দেহের মতো ছড়ানো তোমাকে সচেতনে
পরিপূর্ণরূপে কি পেলাম?

কত হ্রস্ব এই স্বাদ!
কত লঘু এই ছোঁয়া। তবু সব চেয়ে তুমি জানো
আকাশ-পাতাল ভরা এ-বিশ্বের শূন্যতা অগাধ,
জানো কত বড় এই পাওয়া, কত বিশাল হারানো।
প্রথম বর্ষার মতো এই ছোট মুহূর্তের পরে
অফুরন্ত বেদনার ধারাস্রোতে হবে পুণ্যস্নান
আরো বহুদিন জানি। তবু পলে দণ্ডে বা প্রহরে
প্রচ্ছন্ন হবে না এই নিমেষের পরম নির্বাণ॥

শিশুর নিশ্চিতি চাই : বয়স্ক মননে

বিষ্ণু দে

শিশুর কর্মিষ্ঠ খেলা, মগ্ন তার খেলে,
সে খেলে আপনমনে নিবিষ্ট মননে,
খেলাঘরে, গড়ে ভাঙে, বলে প্রাজ্ঞ স্বরে:
খুকুমণি ভয় নেই, তবে রে রাক্ষস
অমনি হাসিস্ দেখি, আরে হল একি,
ভয় নেই খোকাবাবু, একঘায়ে কাবু
এই দেখ জুজুমানা।
[illegible]
[illegible]

বয়স জানান্ দেয়? শিশু তারপরে
নিশ্চিত শান্তিতে তার। সুস্থ আত্মবশ
আমরাও জানাই না কেন : খোকাবাবু,
খুকুমণি, ভয় নেই, শত জুজুমানা
জয় করে' দেব ফেলে ভেঙে অবহেলে,
রাক্ষস খোক্কস যতো সব অকাতরে
ছুঁড়ে দিয়ে হুঁড়ে দেব, এই দেখ চুর।
[illegible]
[illegible]॥

নবীনা

নিশিকান্ত

কি হ'ল আমার, কেমন করিয়া!
কি শুভলগনে কি জানি
কার অপূর্ব আবির্ভাবের সূচনার শিখা ধরিয়া
আমার আঁধার নিরাশার নিশা উঠিল রূপান্তরিয়া!
হে মূর্তিমতী ঊষাময়ী আশা, সুন্দরী নির্মলিনা,
মোর অন্তরে কোন্ অধরার অতল-সুষমা নিছানি'
শুভ্রতনুর মৃণালে এনেছ অরুণ-অধর-নলিনা?

এলে বরদার দানের পরশমণিকা,
পরশিলে এই কাঙালে!
এলে পাবনীর কুমারী লাবনী, নবীনা সন্দীপনিকা,
সঙ্কাশে তব দীপ্ত-আমার মলিন মনের কণিকা;
তব প্রশ্বাস-মলয়ে টুটিল আমার মুকুল-বন্ধ;
তুমি এসে মোর কত জন্মের সুপ্তির ঘোর ভাঙালে;
তোমার নয়ন-পাতের কিরণে নয়ন মেলিল অন্ধ।

গরল-সাগরে করেছ অমিয়-পারাবার,
এসেছ তরুণী-তরণী!
মুক্তধারার অকূলে ভাসালে টুটিয়া কূলের কারাগার।
এলে রূপবতী প্রেরণা-প্রগতি, ধ্রুব-নিয়তির তারা-হার-
গাঁথিলে আমার বসুন্ধরার শেফালি-ঝরার ঝর্ণায়;
পদতলে দিলে চির-শরতের স্বর্ণ-খচিত সরণী;
আমার সীমার স্বপনে রাখিলে অসীমা-অতসীবর্ণায়।

ডালাতে আমার পূজার কুসুম তুলিলে,
বাজাতে শিখালে শঙ্খ,
মর্মে আমার দেবী শারদার মন্দির-দ্বার খুলিলে,
উদ্বোধনের মন্ত্রসুধার ধ্বনি-তরঙ্গে দুলিলে—
দুলিলে আমার প্রতিক্ষণের প্রাণের প্রতিস্পন্দনে,
আমার তনুর শোণিতের ধারা করিলে নিষ্কলঙ্ক,
মোর নিশ্বাস নিলে নিবেদিত ধূপের অমল গন্ধে।

চলি তব সাথে, চলি অবিচল-চরণে,
যেথায় মর্ত-পন্থায়
মানবী-তনুতে ... মহাদেবী অভিনব অবতরণে,
চলে দুর্গত ... দুর্গা মরণশঙ্কা-হরণে;
যেথা দশভুজা শিবভুজা মুখে অনাহত-হাসি হাসিয়া
সমুদ্ভাসিয়া প্রতি ... প্রভাতে-নিশীথে-সন্ধ্যায়।

যৌবন শেষে

হুমায়ুন কবির

শেষ হল যৌবনের দিন।
অতৃপ্ত আকাঙ্খা যত, যত ছিল দুঃসহ দুরাশা
আজি হেমন্তের শ্রান্ত গোধূলির স্তিমিত আলোকে
বিষণ্ণ দিগন্তশেষে ম্রিয়মান ছায়ামূর্তিসম
বিলীন হইয়া আসে।

জীবনের বর্ষ ভরি ষড় ঋতু করিয়াছে কেলি।
কৈশোর বসন্তসম এসেছিল পুষ্পিত চেতনা;
স্বপ্নাতুর আঁখি ভরি
ধরণীর ধূলিজাল বর্ণে ছন্দে গন্ধে রূপে রসে
নিবিড় আনন্দময়।
কুহেলী বিলুপ্ত হল যৌবনের নিদাঘদহনে।
দুঃসহ বেদনা মেশা নিবিড় পুলক
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হানিয়াছে তীব্র উন্মাদনা
সহনের সীমারেখা অতিক্রম করি
অস্তিত্বের শেষ প্রান্তে চিত্ত যবে বিভ্রান্ত বিবশ
অকস্মাৎ নামিয়াছে' শ্রাবণের দুর্বার বর্ষণ
মিটাইতে অন্তর্দাহ

নিষ্ঠুর সৃষ্টির মাঝে কঠিনের পাষাণবন্ধনে
করুণার ফল্গুধারা গুপ্ত ছিল কোন সুপ্তি মাঝে?
স্নেহের প্রলেপসম অন্তরের যত তীব্র জ্বালা
মিটাল ইঙ্গিতে কার অবলীলাক্রমে?
জাগ্রত চেতনা স্তরে নিভে আসে দুঃখের দহন
অবচেতনায় তবু জেগে থাকে ছায়াসম ব্যথা
স্নেহমায়া প্রীতিমাঝে—বাজে শান্ত দীর্ঘছন্দা সুর
দীপ্তি আছে দাহ নাই শরতের জলহারা মেঘে,
বিদ্যুৎ ঝলসি উঠে, নাহি রুদ্র বজ্রের নির্ঘোষ।
জীবনের স্রোতধারা আপনার পরিপূর্ণতায়
অবসন্ন হয়ে খোঁজে সমাপ্তির কোথায় ইঙ্গিত।
শরতের কূলে কূলে উচ্ছলিত উদার আলোক
বাধাবন্ধ নাহি মানে।

আকাশের বাণী আনে হৃদয়ের গহন কন্দরে
শিথিল করিয়া দেয় আকাঙ্খার বেদনা বন্ধন।
বিদায় রাগিণী বাজে হেমন্তের আগমনী সাথে
বিসর্জন সুরে ভরা কি বিচিত্র আবাহন গান।
তারি প্রতিধ্বনি মম চিত্তে মম বাজিতেছে আজি
যৌবনের অবসানে শ্রান্তিভরা শান্তির সঙ্গীত।

সমর সেন

১
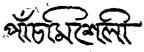
বাস্ থেকে দেখি বিরস গাছ,
কিন্তু কী সবুজ ঘাস!
ডিজেল্ তেলের পোড়াটে স্বাদ।
খালি মনে পড়ে তোমার ঠাণ্ডা হাত,
গুমোট গরমে পান্তা ভাত,
লঙ্কা, কাসুন্দী, পেঁয়াজ;
বারে বারে বেহাত্ হওয়া কি তোমার রেওয়াজ?

২

কারো কারো চোখে দেখি
আলোর কুহেলিকা,
ভুরুর রেখা
নদীর ওপারে বলাকা,
দেহ মদির কবিতা
খোঁয়ারির ভোরে লেখা।

৩

ফিকে জ্যোৎস্না ছড়ায়
ঘোলো, বাসি দুধের রং।
কাকেরা ফিরেছে বর্ষার গাছে
মেয়েটি ভিজে ফুটপাথে;
স্তন্যদার শিশু তার পাশে
হয়ত দুধের স্বপ্ন দেখে হাসে।
ট্রেনের না স্টীমারের গুমোট ডাকে
যশোদা-পৃথিবীর আবেশ কাটে।

এইটুকু আলোর বৃত্ত

অরুণ মিত্র

এইটুকু আলোর বৃত্ত
তার বাইরে উৎকণ্ঠা জমেছে
এইটুকু জায়গায় কেনাবেচা হাজার কথা
পেছনে স্তব্ধ হাওয়ার দেশ
নিঃশব্দ পাতাখসার শূন্য।

বীজধানের মাটি শিউরে শিউরে উঠেছিল
এখন নিথর
যারা তার গায়ে ভালোবেসে হাত রেখেছিল
তাদের রক্তে সেই স্পন্দন এখনও জড়িয়ে রয়েছে।

তারা এই সীমান্তে এসে ঘনিয়েছে।
এমনিভাবেই কি থাকবে তারা
প্রহরের পর প্রহর
যতক্ষণ না ঘাসের উপর শিশির জমে
পাখির ডানায় আকাশ কাঁপতে আরম্ভ করে?
নাকি তারা এমনিভাবে থাকবে
যতক্ষণ না ঝড় আসে
এক ফুঁয়ে সব একাকার হয়ে যায়?

দুটো সুডোল বাহু ধানের মঞ্জরীর মতো ঝলকে
নদীতীরের প্রকাণ্ড অবকাশ ভরিয়ে দিতে চেয়েছিল
সেই আবেগের ছবি কখন ভেসে গিয়েছে কালো জলে
মেয়েটা প্রেম নিয়ে তারপর বারে বারে এল
কেউ তার দিকে গভীর ক'রে তাকাল না।

দিনেশ দাস

একে একে আর সব নৌকোরা পেয়ে গেল
চোখের মতই বাঁকা নীল উপকূল।
আমার বিবর্ণ স্থির শীতের মাস্তুলঃ
মাস্তুলের মেরুদণ্ড বেয়ে নামে অঘ্রাণের অন্ধকার
পউষের হিম,
এ তো আর ক্ষ্যাপা ঝড় ডাকবে না আর কোনদিনঃ
ভাটার স্রোতের টানে বাবে একটানা,
দাঁড় আর হবে নাকো টানা।

সমুদ্র-পাখির ঝাঁক বিরামবিহীনঃ
কেউ আসে ভেলা হয়ে, কেউ ভাসে পাখা দু'টি তুলে,
কেউ ভুলে উড়ে বসে আমার মাস্তুলেঃ
সাধ যায়, সমুদ্র-সারস হয়ে উড়তাম যদি
সাদা পাকে মেখে সাদা লবণ-সমুদ্রি।

পউষের পাটাতন স্থবির, অবশ,
এ তো আর পাঁকে ভিজবে নাঃ

ফুল ফুটুক না ফুটুক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।
শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।
ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
—তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধরে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল—

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি।

তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে।
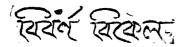
বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

জান্‌লার ধারে যখন দাঁড়াও আনমনা মন মেলে দিয়ে
অভ্যাস মতো বৈকালী মোহে : সোনালি ছিটিয়ে মুখে আভার
আগের দিনের বিস্ময় নিয়ে এ অপরাহ্ন তোমাকে আর
দ্যাখে না ; যখন অবেলার ঘুম সেরে নিয়ে
জান্‌লাটি খুলে তুমি যেই চাও সূর্যমগন পশ্চিমে ;
বিস্মিত চোখে এ অপরাহ্ন তোমাকে আর
স্বাগত করে না ; যেহেতু শরীরে ভরা জোয়ার
স্তিমিত, বিশেষ প্রতীত অধুনা......সময়-ধর্মে হ'লো ঢিমে!

তবু আজো তুমি ভাঙা-বেণী আর রেখা-বিদীর্ণ শাড়ি নিয়ে
শিথিল দুহাতে জানলার গ্রিলে ভর দিয়ে
কী যে চাও আর কাকে পাও দূর নিঃসীমে
সে তুমি কোথায়, যাকে খুঁজে ফেরো স্মৃতি-সমুদ্র পার?
কোন্‌ কিশোরীকে সাজিয়েছে প্রেম বিকেলের রং দিয়ে
তা দেখেই বুঝি এ অপরাহ্ন তোমাকে দ্যাখে না আর।

অরুণকুমার সরকার

বৃষ্টিভেজা শ্রাবণ রাতে ভাবনারা
পাড়াগাঁয়ের সন্ধ্যাদূরের পথ যেন
জটাজটিল লতায়পাতায় ফুরোয় না,
যদিও সেই মাঠ আর দীঘি ডাইনে বাঁ।

বিস্মরণে দীর্ঘ বছর বেঁচে আছি
প্রত্যহের ঠেলায় ঠেলায় পথ চলা।
তবুও আছে শীতল দীঘির প্রচ্ছায়া
চেনামুখের মৌনতরুর ভালোবাসা।

তুমি সে মুখ, তুমিই সে মুখ, তুমিই তো
তুমি আমার শ্রাবণ রাত্রি দুরন্ত।
তোমার চাওয়া আমার পাওয়ায় ফুরোয় না,
যদিও সেই মাঠ আর দীঘি ডাইনে বাঁ।
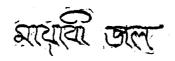
হরপ্রসাদ মিত্র

কালো জল,—

জল ছাই-ছাই, শাদা, আকাশ-নীল,—
ছায়াতে-আলোতে-জলেতে গভীর
আঁধে মিল!
আজকে শহরে ভিস্তির জলে
ভিজ্‌ছে খাটালে—
গরুটা, মোষটা, মানুষজন।

আজকে এছবি রেখেছি আর-এক
ছবির পাশে—
যেখানে শরৎ-আলোতে শান্ত নদীটি হাসে।
মিল্‌ বাঁধা হয় আকাশে-কাশে!
আমার মায়াবী জলকে রেখেছি স্বতন্তর—
দিনে-দিনে এই ঘট্‌ছে যদিও আথান্তর।

দিনে-দিনে ধুলো বাড়্‌ছে আমার
অশনে-বসনে, আশায়-ভাষায়
—কান্না বাড়ে,
প্রহরীরা এসে স্বপ্ন কাড়ে।
দিনে-দিনে আমি যন্ত্রের মতো কী মসৃণ।

উধাও-আমাতে সেতু বাঁধা হয়—
তবু, আমি সেই সেতুবিহীন!

কালো জল,
—জলে তারা-ফুল,—জলে ভাঙা চাঁদ,
জলে কতো-যে ঢেউ!

আজকে শহরে ভিস্তির জলে
ভেজে না হাওয়ার শুক্‌নো শ্বাস।
আজকে রেখেছি মায়াবী সে ছবি—
পালকের মতো হাল্‌কা কাশ।

জল দাও—জল ফটিক জল
কাগজের পটে চাতক-চোখেতে
মায়াবী জল!

দেহগুল্মের ফুল

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

মন আমার দেহগুল্মের ফুল
এক অস্থির-চেতনায় নিমজ্জন আন্দোলিত।
সারাদিন ঝড়ের কেন্দ্রে প্রস্ফুটিত ছিল
এখন কোমল বোঁটায় এলিয়ে আছে।
তার পাপড়িকে জড়িয়ে ধরেছে শ্যাওলা,
ফুলের মন যে একলা।

ঘুমন্ত একটি শিশুর বুকের ওঠানামা,
মা দেখছেন প্রদীপ তুলে শিশুকে
প্রকৃতি দেখছে আমাকে,
ফুলের ক্লান্তি কোমল-বোঁটায় এলানো,
সারাদিনের রুক্ষতা কেটে গিয়ে এখন
গভীর নীলাভ ঘুমের স্নিগ্ধ জলতলে
একটি রঙ-রাঙানো মাছ অথবা
প্রবালের মত [illegible] ঝলকে।

রাতশেষে মা যখন উঠে যাবেন,
যখন অন্ধকার ফিকে হবে নদীর পাড়ে
তখন পা টিপে' টিপে' ফুল
শ্যাওলা ছাড়িয়ে উঠবে আবার।
যখন শেষ হবে ললিত রাগের ঊষা,
শেষ হয়ে যাবে পাখির জাগরণের কাকলি,
সে ঝড়ের দিকে মুখ করে' বসবে।

তখন শুরু হবে ভৈরো,
মিলাতে না-মিলাতে আসবে আশাবরী
কিন্তু তার আশার রৌদ্র প্রতিদিনের মত
পৃথিবীর অপ্রণয়ে মেঘাবৃত হলে
অনিবার্য বেদনা ক্রমাগত
বিদ্যুতের প্রহার করবে পাপড়িকে।
যখন গুল্মের ফুল নিরুপায়ে
[illegible]

বন্ধুর জন্যে

মণীন্দ্র রায়

অনুগত বন্ধুর হাসিতে
কার না আনন্দ, কে না চায়
সাজানো দরবারে ব'সে রাজন্যের সুখে
চারণের গান? তবু পৃথিবী-যে হাতের উপরে
আমলকী নয় আজ, এ-অনুভূতিতে দেখি মনে
বর্ণশেখা শান্ত কাকাতুয়া
আচমকা কর্কশ ডাকে আকাশ-অরণ্য পূর্ণ করে!

দিও না, দিও না তবে সহজ আরাম
কাঁচের আধারে-রাখা লাল-নীল মাছের সংসারে।

আমি-যে দেখেছি সূর্যদেব
দিনান্তের সংঘর্ষের তামাটালা মুখে
নদীর কিনারে নামে কৃষকের দীপ্ত মহিমায়,
দেখেছি-যে সন্ধ্যার আকাশে
গাঁথামালা ছিঁড়ে ছিঁড়ে একঝাঁক হাঁস
নতুন আলপনা আঁকে চলন্ত পাখায়!

আমারো সমস্ত মন তাই
খোঁজে অন্য পটক্ষেপ—যেখানে নায়ক
প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে, তার আঘাতে আঘাতে
স্বপ্নের পাথর কেটে নিজেরই অনন্য মূর্তি গড়ে।

কোথা সে কিরাতবেশী অর্জুনের বন্ধু চরাচরে!

গোবিন্দ চক্রবর্তী

বেলা হ'য়ে গেছে যেন বড়
কত কি-যে আজেবাজে কাজে—
কোথায় করুণ সুর বাজে,
হৃদয় বেদনা-জরজর।

হে সংসার! দিয়েছ অনেক
ক্ষুধা, লোভ, বঞ্চনার আগুনের সেঁক—
এইবার এতটুকু সর;
উঠেছে রৌদ্র খরতর।

আমার যে বহু কাজ বাকি—
দূরাকাশে দুপুরের পাখি
স্থির হ'য়ে উড়ছে এখন।
বিকেলের বেশী আর দেরি কতক্ষণ!
একটু নিজের কাজে যাব—
গোছাব একাকী আপনারে,
একটু বা টুকিটাকি হিসাব মিলাব—
কতটুকু গিয়েছি ও-ধারে?

বোঝাপড়া হবেই ত' রাতে,
ঘুমে বুজে আসতেই চোখ—
তার আগে কিছু জমা হোক
যতটুকু না হবে হারাতে!

সময় ত' একদিন মোটে—
কতখানি তুমি তার চাও?
সংসার! এবার সরে যাও—
এখন আমার বনে সূর্যমুখী ফোটে।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

সব কিছু ঝরে যায়, সব কিছু মরে যায়, থাকে না কি কিছু?
হয়তো থাকে না কিছু, তবু আমি চলি এক
আকাশের তারকার পিছু।

দিনের উত্তাপ নেভে, থামে কথা, স্মৃতি ম্লান হয়,
ডাউন ট্রেনের ঘণ্টা বেজে ওঠে, ফুরায় সময়;
তবু তো মানে না মন, শূন্যহাতে মেলাশেষে
কে চায় ফিরিতে?

বন্দরে জাহাজঘাটে চোখ মুছে পুনর্বার দাঁড়াই সিঁড়িতে।
তীরের বন্ধুকে ঢেউ যুগ যুগ ধরে ভালবাসে
তাই সে অকূলে যায়, তবু কূলে ফিরে ফিরে আসে।

দুয়োরানী মা-কে

আশরাফ সিদ্দিকী

কেঁদোনা কেঁদোনা মাগো! ওই দেখো আকন্দের মূলে
এখনো কণ্টকে মোড়া। সন্ন্যাসী ত' বলেছে তোমাকে:
এ-কণ্টক ফুল হ'বে! এই নদী বইবে উজান!
দিকে দিকে লাল কমল নীল কমল তুলবে কৃপাণ!
একচক্ষু নৃপতির ক্রমে ক্রমে ভেঙে যাবে ভুল!

মোহমুক্ত আত্মশক্তি দেখো আজ আকন্দ শাখায়
কি ভীষণ শৌর্যে কাঁপে! তিষাম্পতি ভয়ে ম্রিয়মান!
সসাগরা বসুমতী ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে দূরে:
নীলাকাশ শ্বেত হ'লো; পায়ে পায়ে ঝড়ের বিষাণ!

সকাল থেকে সন্ধ্যা, থেকে রাত্রি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শুয়েছে অনেক রাত্রে, প্রায়-দুপুরে ঘুম ভাঙল তার।
সর্বাঙ্গে জড়তা, চাপা যন্ত্রণা কপালে। ঘুমঘোর
কাটেনি এখনো। কাল কোন্ সময়ে গানের আসর
ভেঙেছিল, কষ্ট করে কারা তাকে বাড়ির দরজায়
পৌঁছিয়ে দিয়েছে, কিছু মনে নেই। শূন্য পেয়ালার
দিকে সে তাকিয়ে আছে। এবং ভাবছে যে কোনোভাবে
দুপুরটা কাটবেই, মাঠে আড্ডা দিয়ে, কিংবা সিনেমায়।
তারপরে? তারপরে সন্ধ্যা। সন্ধ্যাটা সে কী করে কাটাবে'

দ্যাখো রে, লোকটাকে দ্যাখো। টালিগঞ্জে ট্রিপ্‌ল টোটের
বাজি জিতে আত্মহারা, ট্যাক্সির মিটারে নেই চোখ।
দু দিকে গাছপালা, মাঠ, চৌরঙ্গীর উজ্জ্বল আলোক
ছিটকে যায়। দৃষ্টি তার বিস্ফারিত। শার্টের হাতায়
মুখ ঢেকে সঙ্গীরা হাসে। লোকটা তবু নীরব। ঠোঁটের
প্রান্ত তার কাঁপছে। তার সন্ধ্যাটাও রুদ্ধশ্বাস ফটোফিনিশে
কেটেছে। এখন রাত্রি। রাত্রির আতঙ্ক পায়ে-পায়ে
নেমে আসছে চেতনার আদিগন্ত অন্ধকার তটে:

যা তোরা, চুপ করে ওই দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়া।
যে-লোকটা সমস্ত দিন হাটেমাঠে ডুগডুগি বাজিয়ে
ফিরে এল, অন্ধকারে সে তার নিঃসঙ্গ মন নিয়ে
কী করছে এখন, আমি দেখে আসি।

...আহা, অন্ধকারে
ফুটেছে আবছায়া শীর্ণ শান্ত ছবিখানি। কোনো সাড়া
নেই কোথাও, হাওয়া এসে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে যায়।
আহা, সে সমস্ত দিন ভয় পেয়েছে রাত্রিকে, এবারে
রাত্রি তাকে টেনে নেবে জ্যোৎস্নার প্রসন্ন জানালায়।

ক্ষণ-বসন্ত

মোহম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ

সুদূর অরণ্য থেকে ভেসে আসে সুরের ঝঙ্কার
বসন্ত-রাত্রির তীরে তনু-মন ভরে বেদনার,
ভুলেছি প্রকৃতি-প্রেম দীর্ঘদিন তার প্রতীক্ষায়
স্বপ্নাগতা মায়াবিনী ব্যথা দিয়ে গেছে বারবার—
একটি নিমেষে খুলে' হৃদয়ের অবরুদ্ধ দ্বার;
জানি না কেমন তার জ্যোৎস্নাসিক্ত শুভ্র অবয়ব
অথবা আরণ্য-ফুল, শুধু সেই দেহের বিভব
বিমুগ্ধ করেছে তবু স্বপ্নালোকে নয়ন আমার!

সে ক্ষণ-বসন্ত আজ পৃথিবীতে ফিরে' এলো একা-
এলো না কেবল সেই স্বপ্নে-দেখা পরিচিতা নারী;
জ্যোৎস্নায় কাতর মন ভুলে' গেছে অরণ্যের সুর
বহু যুগ-যুগান্তের ধ্যান-লীন প্রতীক্ষায় তারি—
যে একা মিলায়ে গেছে একদিন একাকী সুদূর
স্বপ্নের অরণ্য-তটে, মিশে' গেছে যেন শুভ্র রেখা।

চিহ্ন

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সারাটা পৃথিবী তুমি রেখে গেছো স্মৃতিচিহ্ন ক'রে।
আমি ভয়ে-ভয়ে থাকি, যদি কেউ ক'রে নেয় চুরি
রাত্রিদিন জেগে থাকি, দিতে যদি একটি অঙ্গুরী
যে-কোনো আঙুলে বেঁধে ঘুমোতাম আমি রাত্রি ভ'রে;

কাকচক্ষু তার জলে তার শীর্ণহীরার অক্ষরে
তুমি শুধু জেগে রইতে, তুমি আর তোমার মাধুরী
জেগে-জেগে কোনোদিন ফুরিয়ে যেতে না, ঘুমঘোরে
আমি সে-নদীর তীরে যেন এক মৌন রাজপুরী।

এখন পাহারা দিয়ে দেখি আমি প্রতি ঘাসে-ঘাসে
বিগত মাঘের মতো ভ্রমর বিশ্বাসী আছে কিনা,
এখন পাহারা দিই দূর থেকে, ভিতরে যাই না।

এ-সংহত হ্রদে সেই পদ্মের শিশুর ছায়া ভাসে,
এ-বিস্তৃত নীলিমায় সেই চন্দনার শিশু ওড়ে:
সমস্ত পৃথিবী তুমি রেখে গেছো স্মৃতিচিহ্ন ক'রে॥

উৎসবমুখর দিনগুলি
উৎসবমুখর এই দিনগুলি আমাদের মনে নতুন করে এই প্রেরণা যোগাক, যাতে আমরা আরও কর্মশক্তির উৎসাহ পাই, যাতে আমরা গড়ে তুলতে পারি সুসমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল
সোনার বাংলা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

জন্মান্ধ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

হাসি! হাসি!

কলতলায় চায়ের বাসন ধুতে-ধুতে মনে-মনে হাসল একটু মহুয়া।

পাশের বাড়ির মেয়েটিরও নাম হাসি না? কেউ বুঝি দেখা করতে এসেছে বাইরে থেকে। ডাকে কেমন একটু ব্যস্ততার রঙ না? ব্যস্ততার আড়ালে কেমন যেন একটু কাতরতারও আভাস আছে। মনে-মনে আবার হাসল মহুয়া।

মেয়েটা কি কানে শুনতে পায়না নাকি?

আর, হন্তদন্ত হয়ে অমন ডাকবারই বা কি দরকার। কড়া নাড়লেই তো হয়।

[illegible]
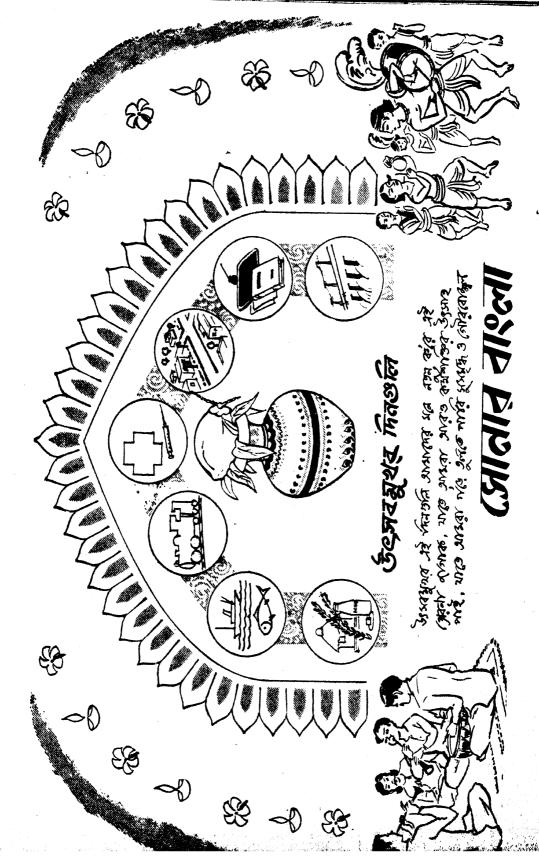
ঠুং ঠুং, কড়া নড়ে উঠল। বিদ্রূপে যেমন করে মুখ টিপে হাসে তেমনি করে মহুয়া হাসল আবার মনে-মনে। কিন্তু কড়া নেড়েও যেন লোকটার শান্তি নেই। আবার সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলার আওয়াজঃ হাসি! হাসি!

সত্যি, পাশের বাড়ির কড়ার আওয়াজ কি ঠুং ঠুং?

'বৌমা, বাইরে কে ডাকছে তোমাকে। শুনতে পাচ্ছ না?' উপর থেকে ডেকে উঠলেন স্বর্ণময়ী।

আমাকে ডাকছে? থতমত খেয়ে উঠে [illegible]

তারও চেয়ে বেশি কঠিনসম্বৃত হল। চোরের মত এগিয়ে গেল চুপিচুপি। আমাকে আবার কে ডাকে।

'এ কি! তুমি?' মহুয়ার মনে হল মুখের মধ্য থেকে জিভটা হঠাৎ উড়ে গেছে।

'একটা ইণ্টারভিয়ুতে এসেছি। চাকরির ইণ্টারভিয়ু।'

'এতদূরে?'

'এ আর কতটুকু! মানুষ আরো কত দূরে যায়।'

'উঠেছ কোথায়?'

'কোথায় আর উঠব? এখানে।' উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই ভিতরের উঠোনে ঢুকে পড়ল অমলেশ।

ভয়ে-ভয়ে উপরের দিকে তাকাল মহুয়া। দোতলার বারান্দা ফাঁকা।

একটু সাহস দেখাবার চেষ্টা করল। এমনভাবে একটু সরে দাঁড়াল যেন অমলেশ বাধা পায়। বললে, 'এখানে উঠবে কোথায়? এখানে তোমাকে কে চেনে?'

'তুমি চেন।'

স্বর্ণময়ী নিচেই নেমে এসেছেন। ভিতরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে জিগগেস করলেন, 'এ কে বৌমা?'

'সম্পর্কে আমার মাসতুতো দাদা। এখানে এক চাকরিতে ইণ্টারভিয়ুতে এসেছে।'

'বেশ তো, ভিতরে নিয়ে এস। এ অঞ্চলে কত কাল আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিনি—'

বুকটা হালকা হয়ে গেল। মহুয়া বললে, 'এখানেই উঠেছে।'

'বা, এখানেই তো উঠবে। আপনজন থাকতে যাবে কোথায়?'

'কাল রাত্রের ট্রেনে এসেছি।' ভিতরে আসতে আসতে অমলেশ বললে, 'কোথায় কোন মহল্লায় বাড়ি, অনেক খুঁজতে হবে তাই রাত্রে আর বেরোইনি। সারারাত স্টেশনেই ছিলাম। সকালে যে বেরিয়েছি বাক্স বিছানা স্টেশনেই পড়ে আছে। কি জানি যদি না পাই ঠিকানা। একে ট্রেনের ক্লান্তি, তায় সারারাত্রির অনিদ্রা—'

সত্যিই তো, আহা, তেমনিই তো মনে হচ্ছে। স্নেহচক্ষু দিয়ে একবার তাকালেন স্বর্ণময়ী। কেমন হাক্লান্ত ভেঙে-পড়া চেহারা। শুধু এক রাত্রি নয় যেন কত রাত্রি ঘুমোয়নি। স্নান করেনি। খায়নি পেট ভরে।

'ওপরে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। খাটে বিছানা পেতে দাও। বাথরুমে জল আছে কিনা দেখ।' আতিথেয়তায় প্রশস্ত হলেন স্বর্ণময়ী।

[illegible] নিয়ে এল, ঠেলে না ঠেলে,

সদ্য বিয়ের নতুন আসবাব দিয়ে ঠাসা। সে সব মুখস্তকরা মামুলি সাজপাট। নতুন পালিশের গন্ধ মাখা।

একবার চারদিক তাকাল অমলেশ। বললে, 'তোমার স্বামী কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'সেখানেই থাকে বুঝি?'

'চাকরি করে।'

'তুমি?'

'আমি পরে যাব।' মহুয়া চোখ নামিয়ে বললে।

'না, না, পরে নয়, একসঙ্গেই যেতে হবে।' কেমন অদ্ভুত করে হেসে উঠল অমলেশ। 'একসঙ্গেই যাবার কথা।'

একবারটি বসতেও বলল না মহুয়া, যেন এখুনি চলে যাবে এমনি আশা করছে। অমলেশ একটু পাইচারি করে দেয়ালের ছবিগুলি দেখতে লাগল। শুধু ছবি? দেখতে লাগল দেয়ালে আর কি লেখা আছে।

'তোমার ইণ্টারভিয়ু কবে?' মনের পাশ দিয়ে কথা একটা উড়ে যাচ্ছিল, মহুয়া লুফে নিলে।

'আজ।'

'আজ? আজ তো ছুটি।'

'ছুটি! তাই নাকি?' ঘাড় ফিরিয়ে হাসল অমলেশ। 'কে জানে আমার হয়তো বা ছুটির ইণ্টারভিয়ু।'

'ইণ্টারভিয়ু কোথায়?'

'কোথায় আবার! এই বাড়িতে।'

'এই বাড়িতে?'

'এই ঘরে।'

'কার সঙ্গে?'

'জানোনা কার সঙ্গে?' একটু যেন রুষে উঠল অমলেশ।

যেন সমস্তটাই একটা রসিকতা আর সেটা বেশ বুঝতে পেরেছে এমনি ভাব করে চিবুকে টোল ফেলে মহুয়া হেসে উঠল। বললে, 'কিন্তু ইণ্টারভিয়ুর আগে একটু সাজগোজ করবে না? কোনো জিনিসই সঙ্গে নিয়ে আসোনি, সামান্য একটা অ্যাটাচি কেসও নয়? শেভ করবে কি করে? স্নান করে পরবে কি? পরের চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াবে?'

'একটা, একটা শুধু জিনিস এনেছি।' পকেট হাতড়ে একটা পুরিয়া বের করল অমলেশ। 'এই নাও। নেবে?'

কোনো হীরে-পান্নার কণা হয়তো, অনায়াসে মহুয়া হাত বাড়াল। জিগগেস করল, 'কি?'

'বিষ।'

তক্ষুনি হাত গুটিয়ে নিল মহুয়া। একটা আর্তনাদ গলার কাছে এসে আটকে রইল। মনে হল হৃৎপিণ্ডটা যেন কে মুঠোর সাধ্য কি আর পায় নাগালের মধ্যে। মহুয়া কখন সরে গিয়েছে দরজার কাছে।

কিন্তু অমলেশও তো আজ মারমুখো। ছুটে দরজার কাছে গিয়ে মহুয়ার পথ আটকালো। পরদাটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বললে, 'কার সঙ্গে ইণ্টারভিয়ু জিগগেস করছিলে না? এবার বলি, মৃত্যুর সঙ্গে, পরমতম ছুটির সঙ্গে। কি, মনে নেই?'

চোখে-মুখে রাগের ঝলস আনবার চেষ্টা করে মহুয়া বললে, 'কী মনে থাকবে?'

'জানি থাকবে না। তাই তোমার চিঠিটা পকেটে করে নিয়ে এসেছি। যেটায় লিখেছ, আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না, আর কোথাও বিয়ে হলে আত্মহত্যা করবে।'

কি ভয়ানক বিশ্রী লাগছে শুনতে—মহুয়া মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'ও আমি লিখিনি।'

'লেখনি? এই দেখ সেই চিঠি।' সত্যি-সত্যি বুক-পকেট থেকে চিঠিটা বের করল অমলেশ। খাম খুলে চিঠি বের করে পড়ল জায়গাটা।

মহুয়ার ইচ্ছে হল ঝাঁপিয়ে পড়ে চিঠিটা কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু অমলেশও হুঁশিয়ার।

'লিখেছি তো লিখেছি। অমন অনেক কথাই লেখা হয় চিঠিতে। সব কথা ফলে না।'

'তা তো তোমার এই টাটকা সুখের পালিশ-করা আসবাব দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। নতুন শাড়ি নতুন গয়না নতুন বিছানা নতুন সিঁদুর—'

'এই তো জীবন।'

'এই তো জীবন নয়। জীবন অন্য রকমও ছিল। কথা তা নয়। কথা হচ্ছে তুমি যে কথা দিয়েছিলে তা তুমি রাখবে কিনা।'

'আমি আবার কি কথা দিয়েছিলাম!'

'এই যে পড়লাম। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, যদি আর কোথাও বিয়ে হয়—'

'আর তুমি?' চোখের পাতা দুটি একটু কাঁপল বুঝি মহুয়ার।

'আমি তো মরবই। আমি-তুমি দুজনে মরব। এক ঘরে এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে। তারই জন্যে খুঁজতে খুঁজতে এসেছি তোমার শ্বশুরবাড়ি। এই বিদেশে-বিভুঁয়ে। পকেটে বিষ নিয়ে।'

'তা তুমি মর। আমি মরব কেন?'

নিচে থেকে স্বর্ণময়ী ডেকে উঠলেন: 'তোমার দাদার জন্যে চা নিয়ে যাও বৌমা।'

আশ্চর্য, দরজা ছেড়ে দিল অমলেশ। চলে যেতে-যেতে চারপাশের দেয়াল-দরজা-জানলাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বললে, 'পাশেই বাথরুম আছে। হাতমুখ ধুয়ে নাও। স্নান প্রায় পালিয়ে গেল মহুয়া। নিচে গিয়ে ভাবতে বসল।

'ডিম আর টোস্ট করে দাও।' শাশুড়ি বললেন।

'টোস্ট নয়, কখানা লুচি ভেজে দিই। বেলা বেশি হয়নি। ভাত খেতে এখনো ঢের দেরি। হরবনসকে বলুন কিছু ভালো মিষ্টি নিয়ে আসুক।'

মহুয়া কিছু সময় চায়। ভেবে নিতে সময় চায়। শুধু উপস্থিত-বুদ্ধিতে যেন কুলোচ্ছে না। একটু গভীর করে চিন্তা করা দরকার। কি করে দশ দিক থেকেই ত্রাণ পাওয়া যায়। কি করে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে!

যা হঠকারী ছেলে, চরম কিছু একটা করে ফেলতে পারে। পকেটে কাগজের পুরিয়ায় বিষ থাকা বিচিত্র কি। টুথ-পাউডার বা শাদা নুন নিয়ে এসেছে এমন মনে হয় না। শুধু ফাঁকা ভয় দেখাবার জন্যে এত পথ এসেছে পাগলের মত এও যেন ধারণার বাইরে। নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটাবে।

এখন কি করা! শাশুড়িকে বলবে? শ্বশুরমশায়কে বলবে? পুলিশে খবর দেওয়াবে? আত্মহত্যার জন্যে তৈরি হওয়াও তো অপরাধ। খবর পেলে নিশ্চয়ই পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে যাবে। তাহলে একটা লোকের প্রাণ বাঁচে। শ্বশুরবাড়ির মান বাঁচে।

কিন্তু মহুয়ার? মহুয়ার নিজের মান বাঁচে না, লজ্জা বাঁচে না। ভিত সরে যায়। বনেদ টলে যায়।

তবে উপায়?

উপায় কোনো রকমে নিরস্ত করা। বিদেয় করে দেওয়া। কোনো ছুতোয় বাড়ির বাইরে ঠেলে পাঠানো।

সত্যি, যদি মরবিই, কলকাতায় মরলেই তো হত। গড়ের মাঠ ছিল, লেক ছিল, হাওড়ার পোল ছিল, তেরোতলা দালান ছিল। পকেটে বিষের পুরিয়া নিয়ে এতদূর কে আসে!

বিষের পুরিয়া না হাতি!

'তাড়াতাড়ি লুচি কখানা ভেজে ফেল বৌমা।' স্বর্ণময়ী তাড়া দিলেন: 'কেমন একটা উপোসী-উপোসী চেহারা। সারা রাস্তা ট্রেনে-স্টেশনে কিছু খেতে পায়নি বোধহয়।'

'এই হয়ে গেল মা।' চারদিককার ভয়ের মধ্যে শাশুড়ির এই আতিথেয় ভাবটিই যা একটু শান্তি। নইলে গোড়াগুড়ি থেকেই তিনি যদি সন্দেহচক্ষু ফেলতেন সে আবার একটা নতুন যন্ত্রণা হত।

সানুবক্তা লুচির থালা নিয়ে উপরে এল মহুয়া। এল ত্বরান্বিত লঘিমায়। নিজের

কিন্তু থালা নামিয়ে রাখতে হবে, চোখের সামনে অমলেশকে দেখল না বিভীষিকা দেখল!

'তোমার জন্যে চা এনেছি।'

মুখ তুলে তাকাল অমলেশ। বললে, 'তুমি খাও।'

'আমি খাব?' হাসল মহুয়া।

'অন্তত একখানা লুচি খাও—'

কি আশ্চর্য অনুরোধ। আবার হাসল। 'একখানা খেলে বাকি সব তুমি খাবে?'

'সব না হোক কিছু অন্তত তো খেতে হবেই।'

একটা লুচি মুখে তোলবার জন্যে গোল করতে লাগল মহুয়া।

'দাঁড়াও। একটুখানি দিয়ে দিই, একরতি।' পকেটে হাত ঢোকাল অমলেশ। 'এ কি, আমার সেই প্যাকেটটা গেল কোথায়? তোমাকে তখন যেটা দেখালাম। তুমি নিয়ে গিয়েছ?'

চকচকে চোখে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল মহুয়া।

'এই যে। এই খাটের উপরেই পড়ে আছে। রুমালটা তখন তুলতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছিল বোধহয়। কি ভীষণ!' অমলেশ প্যাকেটটা ফের পকেটে পুরল।

ছি ছি ছি! প্যাকেটটা হাতের কাছেই ছিল পরিত্যক্তের মত, এক-পলক চোখের কাছে। ছোঁ মেরে কুড়িয়ে নিতে পারত অনায়াসে। চিঠি সরাবার কথা ভাবছে, সবচেয়ে জরুরি ছিল প্যাকেটটা সরানো। সে সুযোগ পেয়েও সে হারালো। ছি ছি ছি।

'সামান্য একটুকুতেই কাজ হবে।' উঠে দাঁড়াল অমলেশ। 'দাঁড়াও তার আগে দরজাটা বন্ধ করি।'

'না, না, দরজা বন্ধ করতে পাবেনা।' যেন তিরস্কার করে উঠল মহুয়া। হাতের লুচিটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। তারপর, দুর্জন সঙ্গ ত্যাগ করা দরকার এমনি ভাবের থেকেই বললে, 'আমি চলে যাই।'

'চলে গেলে হবে কি করে? তোমাকে তোমার প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে। মরতে হবে।'

'আমি মরবার জন্যে বিয়ে করিনি।'

'তা জানি। স্বার্থপরের মত সুখী হবার জন্যে করেছ। দুনিয়ায় সবাই স্বার্থপর। আমারও তবে তাই হতে দোষ কি। বেশ, আমি তবে একলাই যাব।' খাটের উপর ফের গিয়ে বসল অমলেশ। 'শেষে যেন একথা বোলো না আমি তোমাকে সুযোগ করে দিইনি। কথা রাখিনি। প্রতিজ্ঞা মনে করিয়ে দিইনি। তোমাকে একলা ফেলে চলে গেলাম।'

দরজার কাছে মূর্তিমতী শিখার মত দাঁড়িয়ে রইল মহুয়া।

[illegible] এপারে নয় ওপারে।' বললে অমরেশ, 'তুমি চলে গেলে আমাকেই দরজাটা বন্ধ করতে হবে। যেন কেউ তক্ষুনি-তক্ষুনি বিরক্ত না করে, নিশ্চিন্তে দুদণ্ড ঘুমিয়ে নিতে পারি।'

'কিন্তু কেন, কেন তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্যে তুমি প্রাণ দেবে?' ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে এল মহুয়া।

'তুমি তো শুধু নিজেকে তুচ্ছ করোনি, আমাকেও তুচ্ছ করেছ। নিজের মুখ নিজে আর আমি দেখতে পারিনা।'

'আরো কত তুমি মেয়ে পাবে।'

'কে জানে পাব কিনা। পেলে মেয়েই পাব তোমাকে পাবনা।'

'তোমার কিই বা বয়স, এই মোটে ফিফথ ইয়ার এম-এসসি। কত বৃহৎ জীবন কত মহৎ সম্ভাবনা—'

'যেমন তোমার। এ সব কথা বলে লাভ নেই। ভালোবাসাকে বঞ্চিত করতে পারো কিন্তু সত্যকে পারোনা। যদি সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যা বলছি শোনো। দরজাটা বন্ধ করে দাও। তারপর আমার পাশে এসে শোও। চক্ষের পলকে সব শেষ হয়ে যাবে, সরে যাবে যবনিকা। একটা আরেক-রকম আশ্চর্য দেশে গিয়ে হাজির হব। তারপর আমাদের এখানে শেষ হয়ে যাবার পর আর সব কিভাবে শেষ হয় তা নিয়ে আমাদের আর চিন্তা নেই ভয় নেই লজ্জা নেই। এস, শোও—'

ঘৃণায় সমস্ত শরীর ছি ছি করে উঠল মহুয়ার। লুচির থালাটা হাতে করে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, 'যে আত্মহত্যা করে সে কাপুরুষ।'

'আর যে অন্যকে খুন করে?'

উত্তর দিল না মহুয়া। পাশের জানলা দিয়ে সব চা লুচি তরকারি একে একে মেপে-মেপে ফেলে দিল বাইরে। ভরা থালা শাশুড়ির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেনা।

'বলিনি, ভীষণ খিদে পেয়েছে বেচারির। কি করছে?' জিগগেস করলেন স্বর্ণময়ী।

'শুয়ে বিশ্রাম করছে।'

কতক্ষণ পরে ছোট দেওর নীলুকে পাঠাল উপরে। দেখে এস তো ভদ্রলোক কি করছেন! দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছেন নাকি?

ফিরে এল নীলু। বললে, বাথরুমে স্নানের জল পাঠিয়ে দিতে বললেন।

বুকের থেকে গুরুভার পাথর নেমে গেল। হরবনসকে পাঠিয়ে দিল জল দিয়ে। যখন স্নান করবে তখন নিশ্চয়ই চারটি খাবে। আর ভাত চারটি পেটে গেলে ঘুম কোন না নেমে আসবে। আর এই লম্বা ট্রেণ-ছোটার পর ঘুমও নিশ্চয়ই ছোটখাটো হবে না। তার গা ঢালা ঘুমের পর থাকবে কি এই পাগলামি?

[illegible] একটা [illegible] কিন্তু পরিবারে কিনা তার ঠিক কি। একটা রঙিন নাটুকেপনা।

ডাক পিওন চিঠি দিয়ে গেল। সোমনাথের চিঠি।

প্রসন্নবদান্য চিঠি। উৎসবের বর্ণিল ভাষায় স্বপ্নময়। আদরে সোহাগে আবেগে আবেশে প্রভূতদাক্ষিণ। এমন একটা চিঠি পাবার আজ যেন ভারি দরকার ছিল। যেন কত নির্ভর কত অভয়, কত শান্তি এমনি করে অনুভব করবার জন্যে চিঠিটা রেখে দিল বুকের মধ্যে।

নীলু এসে বললে, ভদ্রলোক স্নান করছে।

মুখ টিপে হাসল মহুয়া। স্নান করলে মাথাটা যদি একটু ঠাণ্ডা হয়। তারপর পেটে খানিকটা ভাত। তারপরে একটু ঘুম। তারপরে একটি নিটোল পলায়ন।

শ্বশুরমশায় খেতে বসে বললেন, 'একি তোমার দাদা কোথায়? তাকে ডাকো।'

সন্তর্পণে মহুয়া এল আবার উপরে।

দরজা খোলা। পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল বারান্দা থেকে। দেখল স্নান করে চোখ বোজা।

নড়ছে-চড়ছে? নিশ্বাস পড়ছে? নাকি গোঁ-গোঁ আওয়াজ হচ্ছে?

নড়ছে-চড়ছে।

পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকল মহুয়া। কাছে এসে দাঁড়াল। কাছে অথচ হাত বাড়িয়ে যাতে ধরতে না পারে। বললে, 'খাবে চলো নিচে। শ্বশুরমশায় বসে আছেন। তোমাকে ডাকছেন।'

চোখ খুলল না অমলেশ। বললে, 'নিচে যাব না। আমার ভাত এখানে নিয়ে এস। তোমারটাও নিয়ে এস। দুজনে এক সঙ্গে বসে খাব।'

'তুমি অতিথি। তোমাকে অভুক্ত রেখে শ্বশুরমশায় খেতে পাচ্ছেন না।'

'তুমিই যখন আমাকে অভুক্ত রেখে খেতে পেরেছ তখন সকলেই পারবে। শোনো—'

আর দাঁড়াল না মহুয়া। নিচে এসে শ্বশুরমশায়কে বললে, 'খানিকটা ঘুমিয়ে নিচ্ছে। বললে আরেকটু পরে খাবে। আপনি বুড়ো মানুষ ওর জন্যে বসে থাকবেন না।'

শ্বশুরমশায়ের খাওয়া হলে শাশুড়ি বললে, 'তুমি বরং ওর ভাতটা উপরে রেখে এস ঢাকা দিয়ে। যখন ইচ্ছে হয় খাবেখন।

কৃতজ্ঞতায় বুকটা ভরে গেল মহুয়ার। কি সুন্দর সংসার পেয়েছে সে। শ্বশুরশাশুড়ি কত উদার, কত স্বচ্ছচক্ষু। মহুয়ার প্রশংসায় দশমুখ। আর স্বামী? স্বামী তো আর একজন্মের নয়। অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু। কত জন্মের পথ হাঁটছে একসঙ্গে।

বাটি সাজানো ভাতের থালা নিয়ে উপরে এল মহুয়া। শ্বশুরমশায়কে তখন যা [illegible] করে, তাইই তো ঠিক,

ঘুমিয়ে পড়েছে। কাঠের টেবিলটার উপর রাখল ভাতের থালা। ঢাকনা চাপা দিয়ে।

তারপর?

পা টিপে-টিপে দাঁড়াল এসে খাটের গা ঘেঁষে।

বুকপকেট থেকে চিঠিটা উঁকি মারছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে একটানে তুলে নিলে কেমন হয়? কিন্তু তার চেয়ে ঐ পুরিয়াটা তুলে নিতে পারলেই বোধ হয় ভালো হত। ঘড়ির পকেট থেকেই যে কাগজের কোণটু উঁকি মারছে ঐটেই বোধ হয় সেই পুরিয়া। আলগোছে ওটা টেনে নিতে পারলেই তো চুকে যায়। মুলে কুড়ুল পড়ে।

আরো একটু কাছিয়ে এল মহুয়া। হাতের চুড়িবালাগুলি উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে নিঃশব্দ করল। হাত বাড়াল। হাতের তিনটি আঙুল একত্র করে উদ্যত করল।

আরেকটি নিশ্বাস মাত্র বাকি।

চোখ খুলল অমলেশ। বললে, 'কি নিতে চাও? চিঠিটা? একটা চিঠি সরিয়ে কি হবে? এক ঝুড়ি চিঠি তারিখওয়ারি করে সাজিয়ে রেখে এসেছি বাক্সে, দলিল হিসেবে। চিঠির ইতিতে, সেই সব তোমার ডাক, সখী, হাঁস, মউ, মধু, মহুয়া। তদন্ত করতে পুলিশের যাতে অসুবিধে না হয়। আর এইটে? এইটে বিষের পুরিয়া নয়, এটা পুলিশের কাছে লেখা চিঠি। আমার শেষ চিঠি। আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয় এই মামুলি মিথ্যে কথা লিখে যেতে পারব না। আমার মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী তা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে যাব।'

কালো মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে মহুয়া বললে, 'মোটেই আমি তার জন্যে ঝুঁকিনি, দেখছিলাম সত্যি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ কি না। যখন ঘুমোওনি তখন ওঠো। ভাত এনেছি খাবে এস।'

'ভাত এনেছ?' উঠে বসল অমলেশ। 'তোমারটা?'

'আমি নিচে বসে শাশুড়ির সঙ্গে খাব।'

'বেশ, যা এনেছ তা দুজনে মিলেই খাওয়া যাবে ভাগ করে। গোটা থালাটা নয় এক গ্রাস করে হলেই যথেষ্ট। ভাত ডালের সঙ্গে মিশিয়ে ছোট দুটো গরাস পাকিয়ে খেয়ে ফেলব দুজনে। কই কোথায় ভাত?' সহসা মহুয়ার বাঁ হাতটা চেপে ধরল অমলেশ।

আশ্চর্য, কি কৌশলে মহুয়া তক্ষুনি হাতটা ছাড়িয়ে নিল। আগে-আগে যেন জানতনা এ কৌশল। এ কায়দাটা হালে শিখেছে। সাধ্যি কি অনাত্মীয় পুরুষ তার গায়ে হাত দেয়। তার হাতে এখন বজ্রের মত লোহা, মাথায় শিখার মত সিঁদুর।

হাতের মুঠোর মধ্যে ধরেও ধরতে পারল না দেখে অমলেশের মুখ ব্যথায় ভরে গেল। বললে, 'জীবনে তোমাকে পাশে [illegible]

ছিলাম। আমাকে দেখে তোমার এতটুকু দয়া হয় না?'

'আমিই তো তোমার কাছে দয়া চাই। এক বিন্দু করুণা।' ভিক্ষুকের মত বললে মহুয়া।

'তুমি পরিবারের সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে গেছ, বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আজ, এখন, মরতে তোমার বাধা কি। এক মুহূর্তে নিশ্চিন্ত মৃত্যু। এক মুহূর্তে সে কোন দেশান্তরে চলে যাওয়া। নতুন অদ্ভুত, না জানি কোন আরেক রকম অনুভূতি। আরেক রকম আকাশ আরেক রকম জলস্থল।'

'আমার মর্ত জলস্থলই ভালো।'

'জানি তাই তুমি বলবে। তবে আর কি, আমি একলাই যাব। তুমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যাও।'

নিচু হয়ে হঠাৎ পায়ে পড়ল মহুয়া। কান্নালাগা ঝাপসা গলায় বললে, 'আমি তুচ্ছ আমি হীন আমাকে বাঁচাও। তুমি যদি নিজেকে বাঁচাও তা হলেই আমি বাঁচব। একটা ক্ষুদ্রপ্রাণ মেয়ের সাধ-করে-গড়া খেলাঘর ভেঙে দিয়ে তোমার লাভ কি। তুমি মহৎ, তুমি নিঃস্বার্থ—'

হতাশের মত খাটের উপর আবার শুয়ে পড়ল অমলেশ।

ভাতের থালার দিকে না গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল দেখে মহুয়ার আশা হল। বিষ খাওয়ার চেয়ে মড়ার মত পড়ে থাকাতেই যেন বেশি শান্তি।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল মহুয়া। শাশুড়িকে বললে, 'ওর দেখি দিব্যি জ্বর এসে গেছে। খাবে না।'

'খুব জ্বর?'

'মন্দ কি। কপালে হাত দিয়ে দেখলাম বেশ গরম।'

'আমি তখুনি চেহারা দেখে বুঝেছিলাম অসুস্থ। আহা, বেচারা, ইণ্টারভিয়ু কবে?'

'কাল। আজ তো ছুটি।'

শাশুড়ি-বৌয়ে খেয়ে নিল।

'ওকে একটু দেখো গিয়ে মাঝে মাঝে। যদি কিছু খেতে চায়—' স্বর্ণময়ী নিজের ঘরে গিয়ে দিবানিদ্রার আয়োজন করতে লাগলেন।

স্তব্ধ দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছে।

কি করছে না জানি।

ভেবেছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখবে, তা নয়, খাটের উপর বসে আছে। যেন বা উঁচু পাহাড়ের উপর বসে আছে। ঝাঁপ দিই কি না দিই এই দোদুল্যমান মুহূর্তের উপর।

'এ কি এখনো খাওনি?' অবাক হবার ভাব করল মহুয়া।

'আমার কি উদরের খিদে?'

'একটা তুচ্ছ মেয়ে তোমাকে আর কি দিতে পারে? নাও, খেয়ে নাও। আমার শ্বশুর-[illegible] কি [illegible]?'

'বেশিক্ষণ ভাবতে হবে না। এখন কটা বেজেছে?' খাট থেকে নামবার ভঙ্গি করল অমলেশ।

হঠাৎ কি হল কে জানে, মহুয়া ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। কি দুরন্ত সাহস মেয়ের। তার হৃৎপিণ্ড যে ধকধক করছে তা যেন অমলেশও স্পষ্ট শুনতে পেল দূরে থেকে।

উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বললে, 'মরবে?'

'মরব।' নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল মহুয়া। চাপা গলায় বললে, 'কিন্তু শোনো, শুধু আমি মরব। তুমি নয়। তুমি বাঁচবে।'

'আমি বাঁচব?'

'হ্যাঁ, তুমি বাঁচবে। তুমি পালাবে। বাঁচা মানেই কেবল পালানো। বর্তমান থেকে পালানো। পরিবেশ থেকে পালানো। তুমিও তেমনি পালিয়ে যাবে এ বাড়ি থেকে।'

'এ বাড়ির বাইরে এ মুহূর্তের বাইরে আর আমার জায়গা নেই।'

'আছে। অকারণে তুমি আমাকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছ যার জন্যে নিজের প্রাণকে মনে করেছ ধুলো। আসলে আমি তুচ্ছ আমি অসার আমি অপদার্থ। অন্তত আজ, এখন, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে তুচ্ছ করে দাও, অপদার্থ করে দাও। যাতে নিজেকে ঠিক মূল্য দিতে পারো। যাতে আমাকে ছুঁড়ে ফেলতে পারো ফলের ছিবড়ের মত, তরকারির খোসার মত। যাতে আমি এক নিমেষে তোমার কাছে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারি।'

চুলগুলি খসে গিয়েছে বুকে পিঠে, কি রকম অগোছালো চেহারা মহুয়ার।

অমলেশ চোখ বুজল।

'ও কি চোখ চাও, দেখ। আমাকে দেখ।' যেন কেঁদে উঠল মহুয়া।

'ক্ষমা করো। প্রেম অন্ধ, জন্মান্ধ। কী সে দেখে কে জানে। কিন্তু যা সে দেখে তাই সে দেখুক। এর বাইরে আর কিছু তার দেখবার নেই। তার চেয়ে খাবারের ঢাকাটা তোলো, চারটি ভাত খাই। ভাত অনেক বেশি মিষ্টি।'

'খাবে? এস। আমি মেখে দি।' যেন বিপদ কেটে গিয়েছে এমনি সর্বভোলা সুখে ভাতের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল মহুয়া। খাট ছেড়ে অমলেশও নেমে এল। ঢাকা তুলে ফেলে মহুয়া ভাতের সঙ্গে ডাল মাখল। নাও, আমি খাইয়ে দিই। গরাস পাকিয়ে তুলতে যাচ্ছে অমলেশের মুখের দিকে, অমলেশ পকেট থেকে কাগজের পুরিয়া বের করে খানিকটা গুঁড়ো তাতে ছড়িয়ে দিয়ে বললে, 'তুমি প্রথমে খাও। আমি পরে খাচ্ছি, নির্ঘাৎ খাচ্ছি।'

আর্তনাদ করে উঠল মহুয়া। এ কি, ঘরের দরজা যে বন্ধ।

অমলেশের হাতটা ঠেলে দিয়ে [illegible]

ছুটল দরজার দিকে। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল অমলেশ। কি অভ্রান্ত কৌশল শিখেছে মহুয়া, ব্যূহ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। চকিতত্তাড়িতের মত দরজা খুলে একেবারে বারান্দায়।

'কি, কি হল?' স্বর্ণময়ী ছুটে এলেন।

'লোকটা ভালো নয়। লোকটা গুণ্ডা। আমাকে খুন করতে চায়।'

স্থাণুর মত এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন স্বর্ণময়ী। শেষ সাহসে ভর করে এগুলেন দরজার দিকে। দরজা বন্ধ।

চাপা গলায় বললেন, 'দাঁড়াও, ও'কে তুলি। পুলিশে খবর পাঠাই।'

পুলিসে খবর না পাঠিয়ে উপায় ছিল না।

দরজা আর খোলে না ভিতর থেকে। বিকেল পেরিয়ে গেল, তবু না।

পুলিস এসে দরজা খুললে। মেঝের উপর মরে পড়ে আছে অমলেশ।

বাড়িটার চারদিকে যেন আগুন লেগে গেল। লোকে লোকারণ্য। লোকের আগুন। লজ্জার আগুন, অপমানের আগুন। আতঙ্কের ধূম্রকুণ্ডলী।

সকলের বুক ধড়ফড় করতে লাগল। মহুয়ার হাত-পা ঠাণ্ডা। চোখের সামনে দেখতে পেল একটা হাঁ-মেলা অন্ধকার। প্রকাণ্ড কালো শূন্য। সমস্ত ভবিষ্যৎ দিয়েও যেন সে শূন্য ভরাট হবার নয়।

'কি ভয়ংকর লোক বাবা। পকেটে বিষ নিয়ে এসেছিল।' নিজের ঘরে তার পাশে বসিয়ে মহুয়ার গায়ে পিঠে হাত বুলোচ্ছেন স্বর্ণময়ী। বললেন, 'আমার সোনার প্রতিমা বউ যে রক্ষা পেয়েছে, এই আমাদের ভাগ্যি।'

'বৌমা, এদিকে এস। দারোগাবাবুর কাছে জবানবন্দি করতে হবে।' শ্বশুর-মশায় মহুয়াকে ডাকলেন।

এতটুকু পা টলল না মহুয়ার। শোভন-সম্বৃত হয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়াল দারোগার সামনে। নিষ্কম্প বৈজ্ঞানিক গলায় বললে, 'হ্যাঁ, আমাকে ভালোবাসত, কলেজের ছেলে-ছোকরারা যেমন বাসে। মফস্বলের এক শহরে পাশাপাশি বাড়ি, যেমন হয়ে থাকে। চিঠি লেখালেখি হ'ত। পকেটে যে চিঠি পেয়েছেন, তা আমারই লেখা। অমনি এক-আধখানা নয়, ঝুড়ি ঝুড়ি লিখেছি। লোকটাকে ভালো লাগত বলে নয়, চিঠি লিখতে ভালো লাগত বলেই চিঠি লেখা। মনের কাঁচা রঙিন অবস্থার সঙ্গে প্রেমে পড়া। অল্পে সুখ নেই, আমাকে বিয়ে করতে চাইল। তৈরি ছেলে নয়, আমার বাবা-মা রাজি হলেন না। তাঁদের সেই অসম্মতিতে আমারও সমর্থন ছিল। আমাকে বললে অপেক্ষা করতে। কতদিন করতে হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমি মিলে গেল, বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দিলেন। সুখের রাজ্যে পা দিলুম। সেই থেকেই রাগ। সেই থেকেই আমাকে খুন করার মতলব। আমাকে মারতে না পেরে শেষে নিজে মরল।'

'কে আছে ওর জানেন?'

'ইস্কুলমাস্টার বাবা আছে শুনেছি। আর দাদারা আছে।'

স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন বিবৃতি। সত্যের সুর বাজানো। পুলিস বিশ্বাস করতে বেগ পেল না।

কি জঘন্যভাবে মৃতদেহটাকে নিয়ে গেল মর্গে। একটা কুকুর-বেড়ালের মত। ছোট ময়লাফেলা গাড়ির মধ্যে পুঁটলি পাকিয়ে। একটু ফুল নয়। চন্দন নয়। এক ফোঁটা চোখের জল নয়।

আত্মীয়স্বজন সবাই মহুয়ার তারিফ করলে। বিদুষী, কুশলী মেয়ে। আততায়ীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছে, পুলিসের হাত থেকে পরিবারকে।

টেলিগ্রাম গেল সোমনাথের কাছে। শিগগির চলে এস।

মহুয়ার অসুখ? আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা? স্টোভ? ছাদ? বাথরুম? বাবা-মার কিছু হলে নিশ্চয়ই বিস্তৃত করে লিখত। শুধু কাম্ শার্প যখন, তখন মহুয়ারই কোনো বিপদ।

মহুয়ার যেন কিছু না হয়। মহুয়াকে যেন ভালো দেখি। স্বাস্থ্যে সুখে লাস্যে লাবণ্যে উজ্জ্বল দেখি তার উপস্থিতি।

স্টেশনে পা দিয়েই নানা গুজব শুনতে পেল। কেউ বললে ছোরা, কেউ বিষ, কেউ এসিড বাল্‌ব। কিন্তু যাই বলো ধুরন্ধর মেয়ে। সব কিছু বাঁচিয়ে দিয়েছে। দিব্যি বেরিয়ে এসেছে পাশ কেটে। আর, যার মরণ যেখানে মাটি কেনা সেখানে। নইলে কোথাকার শ্রাদ্ধ কোথায় গড়ায়।

মেয়ের কিছু হয়নি?

একটি আঁচড়ও লাগেনি।

বাড়ি এসে ডাক দিল: 'মা, মহুয়া কোথায়?'

কি না জানি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হবে, মহুয়ার বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠল। পায়ের তলা থেকে শক্ত মাটি সরে যায় বুঝি। কিন্তু বিপদের সামনে ঘাবড়াবে না, এই তো তার প্রতিজ্ঞা। কেন, কি হয়েছে? কিছুই হয়নি। মোটরের নিচে পড়েও তো কত লোক মরে। কত লোক বা জনতার মধ্যে পড়ে আকস্মিক গুলিতে। আয়নায় একবার নিজের মুখ দেখল মহুয়া। ভয় বা মালিন্য অপরাধীর লজ্জা বা বিনয় লেশমাত্র আভাসটুকুও মুছে ফেলল। স্বাভাবিকতায় ঝলমল করে উঠল। তারো চেয়ে একটু বা বেশি। স্বামী এসেছে, তাকে পাওয়ার গৌরবে হয়ে উঠল যেন আনন্দের প্রতিমা। সিঁদুর অনেকেই পরে, কিন্তু ঝলক দিতে পারে ক'জন!'

হাসিভরা মুখে কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'কি ব্যাপার? কেমন আছ?' আপাদ-মস্তক তাকিয়ে জিগগেস করল সোমনাথ।

'নিটুট আছি। নিখুঁত আছি।' আহ্লাদের চাঁদের মত মুখ করে বললে মহুয়া।

'আর ঐ লোকটা? কে ঐ লোকটা?'

'বন্ধুতেই পাচ্ছ, ছেলেবেলার বয়-ফ্রেণ্ড যেমন থাকে, তেমনি।'

'যাকে বলে কাফ-লাভ, বাছুরে-পীরিত। হা হা হা।' গলা ছেড়ে হেসে উঠল সোমনাথ। 'তারপর কি করে সরল?'

'সরল মানে? ধরাতল থেকে বিদায় নিল। কি আস্পর্ধা, কোত্থেকে এসেছে সব খবর নিয়ে। আমাকে বিষ দিয়ে বললে, তুমি আগে খাও, তারপরে আমি খাব।'

'কাওয়ার্ড।'

'আমি বললাম, তুমি পীরের কাছে মামদোবাজি করতে এসেছ? আমি খাব কেন? আমার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব? একটা তুচ্ছ ছেলেমানসির জন্যে এত লোকসান? তোমার সখ হয়েছে তুমি খাও। তারপর আমার উপর জোর দেখাতে চাইল, গায়ের জোর—'

'লম্পট, দুশ্চরিত্র!' গর্জন করে উঠল সোমনাথ।

'আমার সঙ্গে চালাকি! একটা ঘুরনা মেরে ক্লিন্ বেরিয়ে এলাম।'

'দরজা বন্ধ করতে পারেনি তো?'

'সেই দিকে আমি খুব সজাগ ছিলাম। দরজার কাছে-কাছেই ছিলাম যাতে হঠাৎ না বন্ধ করতে পারে। আর বন্ধ করলেই বা কি, ধস্তাধস্তিতে পারত নাকি আমার সঙ্গে?' সুবলিত বাহুর একটা ঝংকার দিল মহুয়া।

'উঃ, কি বিপদ থেকেই না রক্ষা পেয়েছ।' প্রায় স্তবের মত সুরে বললে সোমনাথ। তারপর হঠাৎ কৌতূহল মিশিয়ে: 'পুলিশ কি বলছে?'

'সুইসাইড।'

বাবা-দাদাদের কাছেও খবর করেছে পুলিশ।

বাবা চিঠি লিখেছে মহুয়ার শ্বশুর-মশায়ের কাছে, ক্ষমা চেয়ে। কোনোই নীতি-শিক্ষা ধর্মশিক্ষা হয়নি। ছেলেবয়স থেকেই পথভ্রান্ত। তাই এই পরিণাম। আপনাদের সম্ভ্রান্ত পরিবার, আপনাদের বাড়িতে উঠে আপনাদেরকেই বিব্রত করল লাঞ্ছিত করল আমার এ দুঃখও দুর্বহ।

বড়দা নিজে এল সনাক্ত করতে। বিড়ম্বিত পরিবারকে সান্ত্বনা জানাতে। বলছে, 'একটা আস্ত মস্ত ইডিয়ট। কলেজে পড়লে কি হবে এক পিপে ধোঁয়া। খালি বাজে ইয়ারবন্ধুদের সঙ্গে মিশেছে, সিগরেট ফুঁকছে। নইলে কেউ মরে? মরবি তো এমনি একটা অভিনয় করার কি দরকার? মাসে-মাসে আমার টাকার শ্রাদ্ধ করেছে, তা দিয়ে দেখেছে কেবল সিনেমা নয়তো কিনেছে যত ছবিওলা পত্রিকা! শুধু-শুধু একটা নিরীহ ভদ্র পরিবারকে বিপন্ন করা। কোথায় লোকে পরের জন্যে জীবন দেয়, তা নয়, এ হচ্ছে পরের জীবনকে মাটি করার চেষ্টা।'

সোমনাথের মনের চেহারা আরো বৈজ্ঞানিক।

বিয়ের আগে বড় হচ্ছে আজকালকার মেয়েরা, এমনি এক-আধটা ঘটনা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। ইস্কুলের নিচু ক্লাশের মেয়েদেরও জিগ্‌গেস করো, তাদেরও এক বা একাধিক লাভার আছে। লাভার থাকাটাই ফ্যাশান। এতে দোষের কি। তাহলে ছেলেবেলা মাম্‌পস্‌ হওয়াও দোষের।

পর্বতের চূড়ার মতন তার স্বামী। এই ঢাক ফেলে মহুয়া একটা ট্যামটেমির সঙ্গে চলেছিল!

'চলো তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাই।'

মা-বাবা আর বাধা দিলেন না। স্বর্ণময়ী বললেন, 'তারই জন্যে তোকে এনেছি তার করে। এখানে লোকের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, কেবল বউ দেখতে বাড়িতে ভিড় করবে।'

'যেন ঝাঁসির রানি।' স্বামী-স্ত্রীতে দুজনেই হেসে উঠল।

'সব ব্যাপার তো বুঝবে না, নিন্দে করবে।'

'তাহলে তরকারি কুটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেললেও যেন নিন্দে করে।' স্বামী-স্ত্রীর আবার সম্মিলিত হাসি।

সেই থেকেই মহুয়া কেবল হাসে। কেবল হাসে। কথায়-অকথায় হাসে। এক মুহূর্ত তার স্তব্ধ থাকার, বিমনা থাকার, গম্ভীর থাকার উপায় নেই। সব সময়ে সে হাসে। সাজে-গোজে। উৎসবের মশাল জেলে বেড়ায়।

লোকে বলে, ব্যারাম।

মহুয়া বলে, হাসব না তো কি। আমার নামই সে হাসি।

কটা দিন এ-মেসে ও-মেসে কাটিয়ে সম্প্রতি একটা দু-কুঠুরি ফ্ল্যাট পেয়েছে সোমনাথ। আর তাতে সংসারের জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে মহুয়া।

সোমনাথের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়া হবার উপক্রম হয়। ঝগড়া জমতে দেয় না। চট করে হেসে ফেলে। স্বামীর সোনার থালে অভিমানের জাউ খাবার তার সাধ নেই।

জানলায় বসে না। অন্যমনস্ক হয় না। মুখভার করে থাকে না। জোরে নিশ্বাস ফেলে না। ঘুমোয় না অসময়ে। শতসহস্র কাজ করে।

বৃষ্টিতে ভেজে না। চাঁদ দেখে না। চুল আলগা বাঁধে না। উপন্যাস পড়ে না। পুরোনো বাক্সপত্তর ঘাঁটে না। স্বামীকে নিয়ে এখানে-ওখানে বেড়াতে যায়। যত রাজ্যের ফাংশান হচ্ছে শহরে তার টিকিট কেনে।

আর থেকে-থেকে বাড়িতে উৎসব করে।

একে নেমন্তন্ন ওকে নেমন্তন্ন। যাতে লোকের সামনে নিজের সাফল্য নিজের চরিতার্থতা জাহির করতে পারে। অন্যকে নিজের সুখটা দেখাতে না পারা পর্যন্ত সুখ নেই।

প্রথমে বিয়ের বার্ষিকীটা করল।

পরে সোমনাথের জন্মদিন।

নিজের জন্মদিনটাও করবে নাকি? দেখি ও'র মনে আছে কিনা। স্ত্রীর জন্মদিনের উদ্যোগ-আগ্রহ তো স্বামীর দিক থেকেই আসা উচিত।

কিন্তু উচিত ভেবে তো চুপ করে থাকা চলে না। আরেকটা উৎসবের সুযোগ হেলায় নষ্ট করি কেন? অভিমান করে লাভ কি। কটা স্বামীই বা স্ত্রীর জন্মদিন মনে করে রাখে।

স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে মহুয়া বললে, 'আজ আমার জন্মদিন, তোমার খেয়াল নেই?'

'আশ্চর্য, আমার কি ভুলো মন!' সোমনাথ আনন্দে সাড়া দিয়ে উঠল। 'কাকে-কাকে নিমন্ত্রণ করছ?'

'কাউকে না। শুধু তুমি আর আমি।'

'না, না, আপিসের বন্ধুদের বলি। তারা সস্ত্রীক আসুক। তাদের স্ত্রীরাও তো তোমার বন্ধু।'

আয়োজন হয়ে গেল।

হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ স্ফূর্তি।

ঝলমলে দামী শাড়ি দিয়েছে সোমনাথ। রাত্রে সেই শাড়ি পরে স্বামীর কোলে নিজেকে ঢেলে দিয়েছে মহুয়া। বললে, 'কি সুন্দর আমাকে দেখাচ্ছে বলো তো।'

মহুয়ার চুলের মধ্যে হাত বুলুতে-বুলুতে সোমনাথ বললে, 'কিন্তু আজ তো তোমার জন্মদিন নয়।'

'নয়?' এক ফুঁয়ে সমস্ত মুখ যেন নিবে গেল মহুয়ার। ঝটকা মেরে উঠে পড়ে বললে, 'সে কি, আজই তো একুশে ভাদ্র।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ তোমার জন্মদিন এগারোই। যেদিন—'

'যেদিন—' যেন আরেক জগৎ থেকে কথা বলছে মহুয়া।

'যেদিন অমলেশ তোমার কাছে এসে মরে। মনে নেই?'

'মরুক। সবই তো মরে গেছে। অতীতের সবই যদি মরে গেল জন্মদিনটাও কি মরবে না?' হোহো করে হেসে উঠল মহুয়া।

সোমনাথের মনে হল সবই মরে। দিন মরে রাত মরে রূপ মরে যৌবন মরে কাম মরে প্রেম মরে, কিন্তু কান্না মরে না।

মনুষ্যধর্ম

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মানুষের চরিত্রে এমন কতকগুলো বিরোধ আছে যে তার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর চেষ্টাও বিড়ম্বনা; এবং হয়তো উক্ত বিসংবাদের অনুগ্রহেই, কোপার্নিকাস্ যে-যুগে পৃথিবীর অহংকার ঘুচিয়ে, তাকে সূর্যের আজ্ঞাচক্রে আনলেন, ঠিক সেই সময়ে মনুষ্যধর্মের আকস্মিক স্ফূর্তি ছড়িয়ে পড়ল য়ুরোপের সর্বত্র। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনুপাতে মর্ত্যলোক অণো-রণীয়ান্, এ-কথা শুনেও, পশ্চিমের উজ্জীবিত মানুষ বেতসীবৃত্তির পরিচয় দিলে না, ধ্রুপদী সভ্যতার দৈবানুগত্যে ফিরে গেল না; মধ্য যুগের পারলৌকিক অভিনিবেশ ঝেড়ে ফেলে, সে টেরেন্স্-এর ভাষায় হঠাৎ বলে উঠল, "আমি মানুষ, মনুষ্যত্বের অপকর্ষও আমার অনাত্মীয় নয়।" এই বিশ্বাসের সার্থকতা কতখানি সাহস ও স্বার্থত্যাগের অপেক্ষা রাখে, তা যিনি বোঝেন, তাঁর কাছে পশ্চিমের পরবর্তী উন্নতি আর রহস্যময় ঠেকবে না। মনুষ্য-সংসারে মানুষই নিত্য, মনুষ্যসমাজে মানুষই সেব্য, মানুষিক মঙ্গলই মনুষ্যধর্মের একমাত্র লক্ষ্য—এই মহাসত্যে যে-জাতির শিল্প ও সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন, জীবন ও মরণ অনুপ্রাণিত তার অভ্যুত্থান স্বভাবতই অনিবার্য। কোনও লুপ্ত অমরার গুপ্ত আকর্ষণে সে-দিগ্বিজয় দিশা হারায়নি, সেই জন্যেই সারা জগৎ জেগেছিল তার শঙ্খনাদে; আকাশকুসুমে সে-জয়মাল্য গাঁথা হয়নি, তাই কৃপণ প্রকৃতিও তাকে ভেট পাঠিয়েছিল মুক্ত হস্তে; তার রাখীবন্ধনে পরমার্থ আর পুরুষার্থের চির বিবাদ মিটেছিল, কাজেই অজানার অভিসারে বেরিয়ে, বুদ্ধি বিপ্রলাপেও ভয় পায়নি।

দুর্ভাগ্যক্রমে অবিমিশ্র মিলিন অশেষ স্বর্গের মতোই শুধু কবিকল্পনা: জীবনে জন্ম-মৃত্যুর সীমাসন্ধি অনিশ্চিত; এবং শীতের পশ্চাতে বসন্ত যেমন আসে, বসন্তের পরে গ্রীষ্মসমাগম হয়তো ততোধিক ধ্রুব। বুঝি বা তাই নবজাত মনুষ্যধর্ম বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই ব্যক্তিবাদে বদলাল। বিশ্বমানব যদিও অতিবাস্তব তবু সে [illegible] দিয়ে যায় অসাধ্য। কিন্তু ব্যক্তি স্পর্শনীয়: তার ধাক্কায় পথে চলা বিপদ; তার সংসর্গ সংকল্প সত্ত্বেও এড়ানো দুষ্কর। উপরন্তু সে-কালটা ছিল বিশেষের অনুকূল। শূদ্র সেই সবে অন্ধকূপ ভেঙে বাইরে বেরিয়েছে; সমাজপতিদের অনুরূপ শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুযোগে সে তখনও বঞ্চিত। সুতরাং সে সম্ভবত তখনও বোঝেনি যে আলোর আশীর্বাদ গিরিশৃঙ্গেই সর্বাগ্রে পৌঁছালেও, পর্বতচূড়া নিরবধি অনুর্বর; সে-আলো চরিতার্থ সমভূমির সাফল্যে। কারণ যাই হোক, মানুষ সে-দিন তার অন্তরের বিশুদ্ধ শূন্যতায় ব্যক্তির পাদ-পীঠ-স্থাপনে বিলম্ব করেনি; এবং বোধ হয় সেই জন্যেই, ধর্মকে বিজ্ঞানের শিকল পরাতে চেয়ে, ব্রুনো প্রাণই হারালেন, স্বায়ত্তশাসনে নৈতিক নৈরাশ্যের অভিশাপ খণ্ডাতে পারলেন না। অবশ্য রোমান্টিসিজম-এর প্রথম প্রবক্তারা নিজেদের মধ্যে দ্বিপদ পশুর যথেচ্ছাচার দেখে যৎপরোনাস্তি লজ্জা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু উনিশ শতকের পুনরুজ্জীবিত খেয়ালীরা বিনয়ের প্রয়োজন সুদ্ধ মনে রাখেননি; এবং তাঁদের চরম প্রতিনিধি নীট্সে, নিত্যনৈমিত্তিক সংসারে অতিমানুষের আতিশয্য অচল জেনে, অবশেষে আশ্রয় নিলেন পাগলাগারদে।

ইতিহাসের সর্বত্র কার্যকারণের পরম্পরা থাক বা না থাক, তার সারল্য নিশ্চয়ই কাল্পনিক; এবং সেই জন্যে আমার বলতে বাধে যে ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ রিনেসেন্স্-প্রসূত ব্যক্তিবাদের অমোঘ পরিণাম। পক্ষান্তরে উক্ত কুরুক্ষেত্র সর্ব-নাশেরই উপক্রমণিকা; এবং ব্যক্তি ও তার সহোদর, সাম্রাজ্য, সমষ্টির সঙ্গে সসম্মান সন্ধি-স্থাপনের সুযোগ এ-বারেও হেলায় হারালে, আগামী প্রলয়ে উভয়ের বিলুপ্তি এক রকম অবশ্যম্ভাবী। তবে তার মানে এমন নয় যে জনসাধারণই কাণ্ডজ্ঞানের তথা শুভবুদ্ধির রক্ষাকর্তা; এবং মহত্ত্বের মর্যাদাহানি তো আমার অনভিপ্রেত বটেই, উপরন্তু এও আমি মুক্ত কণ্ঠে মানি যে সম্মিলিত, সমবেত মানুষ বামনের [illegible]

অপ্রত্যাখ্যেয়। কারণ দলভুক্তি ভাবুকের পক্ষে যত শক্ত, ভাবালুর পক্ষে তেমনই সহজ; এবং যেহেতু একদেশদর্শীর ঝোঁক বিচারের দিকে নয়, ব্যভিচারের দিকে, তাই তার মধ্যে আবেগ স্বভাবতই আবেশে বিকৃত। তাহলেও আমি জানি যে মহৎ মানুষও মানুষ, অমানুষ বা অতিমানুষ নয়; এবং আমার পাশে তাকে যতই গগনস্পর্শী দেখাক না কেন, তার মনুষ্যত্বও সীমাবদ্ধ, যার জন্যে মানবসমষ্টির প্রতিযোগে তার পরাজয় অনিবার্য। আসলে মহামানব বিশ্বমানবের প্রতিভূ; এবং তার সঙ্গে আগ্নেয়গিরির তুলনা চলে। তাকে প্রণালী করে, যে-দীপ্তি, যে-তেজ, যে-দাহ অতিভূমিতে ওঠে, সে-সমস্তই মানুষের অন্তর্ভৌম গৌরবের কণামাত্র; এবং সেই প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্যের বাহক যদিও আমাদের নমস্য, তার প্রতিনিধিত্বে যে-অমেয় মুক্তির প্রেরণা আছে, সে-উন্মাদনায় মাত্রাবোধের উচ্ছেদ যদিও প্রায় অপ্রতিকার্য, তথাচ এতাদৃশ দর্প কোনও মতেই পোষণীয় নয় যে মহামানব, এমনকি জগতের মহামানব-সমবায় বিশ্বমানবের চাইতে গরীয়ান্।

উপরের কথাগুলোয় যে-অর্থবিরোধের আভাস রয়েছে, তা হয়তো একটা উপমার সাহায্যে কাটবে। সৌর মণ্ডলে যেমন সূর্যের প্রাধান্য অনস্বীকার্য, মনুষ্যসমাজে তেমনই মহামানব নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সমগ্র সৌরমণ্ডলের অনুপাতে স্বতন্ত্র সূর্য যে-কারণে গৌণ, ঠিক সেই কারণে মানব-গোষ্ঠীর তুলনায় মহামানব নিকৃষ্ট। সৌর মণ্ডলকে সূর্যের চেয়ে বৃহৎ বলা সম্ভব, কেননা তাতে সূর্যের স্বকীয় গুরুত্ব বাদ পড়ে না, বরং আরও অনেক গ্রহাদির গুণাবলী তার অধিকারে আসে; এবং মানব-সমষ্টি মহামানবের বিয়োগে সংগঠিত নয়, মহামানব ও ক্ষুদ্র মানবের সমন্বয়ে উৎপন্ন। পক্ষান্তরে সৌর মণ্ডলের অধিপতি সূর্য ও তার তুচ্ছতম প্রজা উল্কার উপাদানে যে-মূলগত ঐক্য বর্তমান, তারই শাসনে তারা উভয়ে একটা বিশেষ আয়তনে, একটা বিশেষ আচরণে, একটা বিশেষ অয়নে চিরকাল আবদ্ধ; এবং মহামানুষ আর মামুলী মানুষ একই ধাতুতে নির্মিত একই প্রবর্তনায় চালিত, দুজনেরই শুরু জন্মে আর শেষ মৃত্যুতে। অবশ্য এক আর দুই—এই সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যবর্তী অফুরন্ত ভগ্নাংশক্রমের মতো, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে তারতম্যের ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই পরিধির ভিতরে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা শুধু অগণ্য, অনন্ত নয়; এবং বহুত্ববদ্ধ বৌদ্ধ তথা [illegible]

জ্যোতির্বিজ্ঞানের উক্ত আবিষ্কার কেবল অর্থালংকার হিসাবেই গ্রাহ্য নয়, অনুরূপ সামান্যীকরণ ব্যতীত সমাজবিজ্ঞানের প্রসার অভাবনীয়; এবং মনস্তত্ত্বে মন-গড়া মীমাংসার বাগাড়ম্বর কমাতে চাইলে, তাকেও জড়বিজ্ঞানের অনুগামী হতে হবে।

বলাই বাহুল্য বিজ্ঞানে আমার অজ্ঞানতা মাপতে গেলে, সুনেরুকেও মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না; এবং বোধ হয় সেই জন্যে ফরাসী রাসায়নিক স্তেফান লদ্যুক-এর অস্‌মোসিস্‌-সংক্রান্ত গবেষণার কথা শুনে আমি এত বাঙ্ময় হয়ে উঠেছি। কিন্তু বিভিন্ন দ্রাবণের ইচ্ছাকৃত সংমিশ্রণে যখন এ-রকম ছত্রক, তৃণ, বীজ, পুষ্প, পত্র, প্রবাল, শঙ্খ ইত্যাদির উৎপাদন সম্ভব যা দেখে, বিশেষজ্ঞেরও ভুল ঘটে, তখন প্রাণরহস্যের প্রস্তাবনায় প্রণবের প্রয়োজন নেই। জীববিজ্ঞানের সমস্তটা এখনও গণিতের সাংকেতিকে প্রকাশ্য নয় বটে, কিন্তু তার নিয়ম-লঙ্ঘনে মৃত্যুই অনিবার্য; এবং প্রমাণাভাবে জীব আর জড়ের সাজাত্য আজ যদিও পোষণীয় নয়, তবু জীবনের জাড্য ও পরবশতা পুনরুক্তির অপেক্ষা রাখে না। আসলে জীববিজ্ঞান জড়বিজ্ঞানের অপেক্ষা অধিক রোমহর্ষক নয়; এবং প্রথমাণু থেকে নীহারিকা পর্যন্ত জড়ের সকল আকার-প্রকার যেমন জড়বিজ্ঞানের অন্তর্গত, তেমনই এককোষী শষ্প থেকে বহুলাঙ্গ মানুষ পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেক পর্যায় জীববিজ্ঞানের আজ্ঞাবাহী। তবে প্রাধান্য জড়বিজ্ঞানেরই: কারণ জীবনের সূচনা জড়বিজ্ঞানের নিয়ম না মানুক, তার বৃদ্ধি ও স্থিতি সম্পূর্ণভাবে সেই নিয়মের অধীন: এবং অন্তত রসায়নবেত্তাদের বিচারে শুধু জীবনযাত্রাই অভিব্যক্তির সোপানমার্গে উদ্গত নয়, জড়জগতেও স্তরভেদের স্বাতন্ত্র্য স্বসমুখ অবৈকল্যের পৃষ্ঠপোষক। অবশ্য আধুনিক কণাদেরা আর এখানে থামতে প্রস্তুত নন; কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে শৃঙ্খলা আনার উদ্দেশ্যে বস্তুমাত্রকে যাঁরা দ্বিবিধ বৈদ্যুতিক শক্তির যোগ-বিয়োগে গড়তে চান, তাঁরাও জানেন যে বিকীরণব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারের অবকাশ নেই।

ফলত জড়ের প্রসঙ্গে বৈশেষিক মতই প্রযোজ্য; এবং অতীন্দ্রিয় পরমাণুর উত্তরঙ্গ রহস্যে গুণ যদিচ সংখ্যারই স্বত্ব আর স্বাতন্ত্র্য সমষ্টিরই ধর্ম, তবু অন্ধ নিয়তির অনিশ্চয়-বিধি সেখানেও সর্বেসর্বা। সুতরাং ব্যক্তিত্বে জড় তো জীবের প্রতিদ্বন্দ্বী বটেই, এমনকি জড় যেকালে প্রজননের দায়িত্ব-মুক্ত, তখন স্বয়ংসম্পূর্ণতাতেও সে জীবের ঊর্ধ্ববর্তী। অর্থাৎ ঈসপ-এর হিতোপদেশে জীবের ভক্তি অচলা : সে জানে ঐক্যই তার সে বিপরীত জাতির ঐকান্তিক সহযোগের *মুখাপেক্ষী নয়, তার পৃথক সত্তাও অদ্বৈত-সিদ্ধির ফল; এবং তার সাবয়ব দেহে যেমন ভেদবুদ্ধির নাম-গন্ধ নেই, তার মন তেমনই* ভূত-ভবিষ্যতের তীর্থসংগম। আমার বিশ্বাস এই নিগূঢ় সাযুজ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলেই, জীবজগৎ জড়জগৎকে হার মানিয়েছে। জড় সাধ্যপক্ষে তার স্বকীয়তা বাঁচিয়ে চলে। তৎসত্ত্বেও মাঝে মাঝে সংহতি ঘটে; কিন্তু সে-যোজনার প্রবর্তনা আন্তরিক নয়, তার হেতু দৈবদুর্বিপাক। তাই আবার বাহির থেকে যেই বিকল্পনের তাগিদ আসে, সে অমনই তার আপাতিক সম্বন্ধবন্ধন ঘুচিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে প্রাণের মিলন সাধিত হয় আস্রবণের আদান-প্রদানে, অস্‌মোসিস্‌-জাতীয় কোনও এক প্রক্রিয়ার আত্মবিনিময়ে। কাজেই বিচ্ছেদের বাহ্য আদেশে দুটি সংশ্লিষ্ট প্রাণকোষ তাদের সৌহৃদ্যসূত্র ছিঁড়তে পারে না, সহমরণ বরণ করে; এবং আশ-পাশের সঙ্গে এই রকম নিবিড় কুটুম্বিতা পাতাতে না পারলে, প্রাণপ্রবাহ গত পঞ্চাশ কোটি বছরে নিশ্চয়ই একাধিক বার হারিয়ে যেত।

তাহলেও প্রাণের প্ররোহ অলৌকিক নয়; এবং জীব যে বিশ্বজয়ী, এমন প্রত্যয়ে আমার জীবোচিত আত্মপ্রসাদই প্রকাশ পাচ্ছে। কারণ নিরপেক্ষ বিবেচকের কাছে জীবের পরাধীনতা তর্কাতীত; এবং ইষ্টসিদ্ধির জন্যে সে অন্য জীবেরই সাহায্য-প্রার্থী নয়, নিসর্গের লালন-ব্যতিরেকেও তার দিনপাত অসম্ভব। সাম্প্রতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে সৃজনের প্রাগুষায় সমস্ত আকাশ জড়ের যে-নির্ভার ও নিরন্তর ব্যাপ্তিতে আচ্ছন্ন ছিল, তারই স্বাভাবিক সঙ্কোচ আজ পুঞ্জরূপে প্রতিভাত। জীবনের বিকাশে এই প্রাথমিক জঙ্গমতাও ধরা পড়েনি; সে চিরকালই আলালের ঘরের দুলাল, পরোপকারী প্রতিবেশীর সৌজন্যকে আপন প্রভুত্বের নিশ্চিন্ত নিদর্শন বলে ভেবেছে। তাই কোটি কোটি বৎসর ধরে সার্বত্রিক সমুদ্র যতদিন নিঃস্রোত থেকেছে, ততদিন শুক্তির নিরাপদ সৌধে ট্রাইলোবাইট্‌-এর ঘুম ভাঙেনি। কিন্তু নিশ্চেষ্টা শেষ পর্যন্ত জড়জগতের অসহ্য লেগেছে : আস্তে আস্তে এখানে ওখানে দুটো একটা পাহাড় মথা তুলে দাঁড়িয়েছে, দুটো একটা নদী মহাসাগরে আলোড়ন জাগিয়েছে, এবং যুগের পর যুগ ধাক্কার উপর ধাক্কা খেয়ে, কম্বুজাতি অল্পে অল্পে বুঝেছে যে বাঁচার জন্যে অভেদ্য দেহ যথেষ্ট নয়, এমন শরীরের দরকার, যা স্রোতে নুইবে, অথচ মচকাবে না। এই ঠেকে শেখাই তার মেরুদণ্ড-আবিষ্কারের মূল কথা; এবং এর মধ্যে যিনি প্রাণীর স্বাধীনতা ও প্রাণের [illegible]

মধ্যে আপন অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়; *কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির উৎপীড়ন ভিন্ন সে কবে কোন্ স্বতঃপ্রণোদিত পরিণামবাদ স্বীকার* করেছে, তা অন্তত আমার জানা নেই।

অবশ্য উল্লিখিত পুরাবৃত্তের অন্য ব্যাখ্যাও সম্ভব; এবং আমাদের পিতামহেরা ভেবেছিলেন যে জীববিদ্যা একাধারে উদ্‌বর্তন ও বিবর্তনের সাক্ষ্য। কিন্তু মেরুদণ্ডের জন্মবৃত্তান্তে প্রগতির সন্ধান মিলুক বা না মিলুক, কৃকলাস জাতির উচ্ছেদে কেবল অবনতিই ফুটে ওঠে; এবং ভূগর্ভ খুঁজে, যেহেতু অনাগতের আভাস পাওয়া যায় না, অতীতের ধ্বংসাবশেষই চোখে পড়ে, তাই অন্তত ভূতত্ত্বের আলোচনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে যে অতিবৃদ্ধি প্রকৃতির অনভিপ্রেত; এবং অবর, ইতর, অপাংক্তেয়, অবজ্ঞেয়রাই ধরিত্রীর মাতৃস্নেহে অধিকারী। কারণ প্রাক্‌পুরাণিক অতিকায় জন্তুদের সম্বন্ধে যা স্মরণীয়, তা বোধহয় এই যে তারা প্রত্যেকে তাদের সময়ে উন্নতির চূড়ান্তে পৌঁছেছিল; কিন্তু বৈশিষ্ট্যের মোহ তাদের সেখানে থামতে দেয়নি, এবং সুনির্দিষ্ট গণ্ডি পেরোতে গিয়েই, তারা আজ শূন্যে মিশেছে। তাদের অগ্রজ অভ্রভেদী বনস্পতিদের ললাটলিপিতেও পাঠান্তর নেই : তারা এখন কয়লাখনির বাসিন্দা; অথচ যে-শৈবাল, যে-শিলাবল্ক ঝড়ে ভাঙে না, রৌদ্রে শুকায় না, জলে ধোয় না, জীবনের আরম্ভ থেকে অদ্যাবধি তারাই রয়েছে নির্বিকার। জীবাণুদের বেলাও এ-নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি; এবং টিরানোসরাস্‌-এর প্রস্তরিত কঙ্কালে ক্ষয়ের যে-বীজ মুদ্রাঙ্কিত, আধুনিক যক্ষ্মারোগীর অস্থিতেও সেই এখনও ঘুণ ধরায়। সুতরাং প্রগতিপূজা হয়তো মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর : প্রাগ্রসরনীতির প্ররোচনায় পূর্বগামীদের শোচনীয় পরিণাম ভুললে, মনুষ্যজাতিরও নাম-গন্ধ থাকবে না; এবং যেখানে জাতির আস্ফালন নিষিদ্ধ, সেখানে ব্যক্তির আতিশয্য টিঁকবে না : সে যদি ভালোয় ভালোয় না মানে, তবে প্রকৃতি তাকে মেরে মেরে শেখাবে যে আত্মম্ভরি জীবকোষের মতো অহংসর্বস্ব ব্যক্তিও নিজের অজ্ঞাতসারেই মুমূর্ষু।

ভূতবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগ থেকে খুশি-মতো দৃষ্টান্ত কুড়িয়ে আমি মানবস্বভাবের যে-ছবি আঁকতে বসেছি, তা নিশ্চয়ই অনেকের মনে ধরবে না; এবং তাঁরা প্রতিবাদে বলবেন যে, প্রাচীনেরা যেমন জড়জগতের উপরে মানুষী ভাব চাপিয়ে কল্পনার অপব্যবহার করেছিলেন, আমিও তেমনই মানুষকে অচেতনের পর্যায়ে নামিয়ে বিপরীত ভ্রান্তির প্রশ্রয় দিচ্ছি। অবশ্য মানুষ যে বুদ্ধিমান ও নির্বাচনক্ষম, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু শুধু সেজন্যে সে পশুর [illegible]

একাধিক মনোবিজ্ঞানীর মতে বুদ্ধি আর সংঘটিত স্নায়ুপ্রতিক্রিয়া তুল্যমূল্য; এবং নির্বাচনক্ষমতা যেকালে সহজাত প্রবৃত্তিরই রূপান্তর, তখন সে-শক্তি মনুষ্যেতর জীবেরও আয়ত্তে। আসলে নাড়ীমণ্ডলের আদিম উদ্ভাবকই মানুষকে বুদ্ধির পথ দেখিয়েছিল; এবং যে-জন্তু সর্বাগ্রে নিজের অন্ত্রকে অজীর্ণ রেখে, খাদ্যপরিপাকের কৌশল শিখেছিল, সেই আমাদের উদরপূর্তির উপায় যুগিয়েছে। নির্বাচনপদ্ধতির ইতিবৃত্ত আরও পুরাতন। সৃষ্টির প্রথম প্রাণী, প্যারামিসিয়ম্-নামক এককোষী কীটও বিপদ্প্রাজ্ঞ তথা ইষ্টান্বেষী ঃ সেও শত্রুর আক্রমণ থেকে পলায়, তথা আহার্যের দিকে এগোয়; এবং তার আণুবীক্ষণিক দেহ নাড়ীমস্তিষ্কহীন হলেও, প্রবৃত্তির প্রসাদে বঞ্চিত নয়। অতএব যদি ভাবা যায় যে আত্মরক্ষার প্রাক্তন সংস্কারই বিষাক্ত অ্যাপেনডিক্স-এর অস্ত্রচিকিৎসায় চিরাক্রিয়, তবে আমাদের অহমিকা তৃপ্তি না পাক, ন্যায়নিষ্ঠার অমর্যাদা ঘটে না; এবং সংস্কারে বিবেচনার মূলানুসন্ধান বিস্ময়বোধের অন্তরায় নয় বটে, কিন্তু জড়ের চেষ্টাসংক্ষেপ হয়তো আরও আশ্চর্যজনক।

প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধি বোধির অপভ্রংশ নয়; এবং প্রজ্ঞা উপজ্ঞা আর অভিজ্ঞার সংমিশ্রণ। অবশ্য এই অপূর্ব সমাবেশ সত্যই একটা অঘটনসংঘটন; এবং এরই জোরে মানুষ আজ পশুপতি। কারণ তার অগ্রজেরা এমন কোনও প্রণালীর খোঁজ পায়নি, যাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বাদেও জীবনযাত্রা সম্ভবপর। ফলে তাদের সংসার অপচয়ে ভরা; বংশকে বংশ, জাতিকে জাতি উজাড় হয়ে গেলে, তবেই এক গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা আর এক গোষ্ঠীর আয়ত্তে এসে পৌঁছাত। যোগ্যতাসঞ্চয়ের এই সর্বনাশা প্রতিযোগে মানুষ ঢুকল তার ভঙ্গুরতা নিয়ে; এবং পুরাতন প্রথায় প্রাণপাত করে, প্রকৃতির বরণমালা কুড়াবার সাধ যদি বা তার থেকে থাকে, সাধ্য আদৌ ছিল না। সুতরাং সে অল্প দিনে বুঝলে যে যারা বাঁচতে চায়, তাদের প্রয়োজন পরোক্ষ বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ সংকট তরে যাওয়ার বিদ্যা; এবং ভাষা যেকালে সেই যৌথ প্রযত্নের পরম পুরস্কার, তখন উক্ত আবিষ্কারও কোনও অনির্বচনীয় রহস্যের ধার ধারে না। অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তির দায়-মোচনের জন্যেই ভাষার উৎপত্তি এবং তার কর্তব্য প্রতিকূল পরিবেষ্টনকে সামবায়িক সাধনায় বশ মানানো। কিন্তু বাগ্যন্ত্রের অপপ্রয়োগ মনুষ্যসমাজে সুলভ; এবং অনাচারে পশুকে হারিয়ে, আমরা প্রায়ই ঐশী প্রেরণার দোহাই দিই। উদাহরণ হিসাবে স্মরণীয় মানুষের আষ্টপ্রহরিক রিরংসা; এবং জন্তুজগতে মানুষের নিকটাত্মীয় বানরই বোধহয় একমাত্র প্রাণী, যার মৈথুন ঋতুনিরপেক্ষ। তাহলেও আপ্তনেয়েরা সরস্বতীর বরপুত্র নয়; এবং তাই কামাখ্যার আনাচে কানাচে অনঙ্গের ক্লিন্ন আরাধনা সেরে, তারা সদরে পাশবশব্দকে যৌন ব্যভিচারের বিশেষণরূপে চালাতে পারে না।

সুখের বিষয়, ভাষা যেমন মানুষী আত্মপ্রবঞ্চনার প্রকরণবিশেষ, তেমনই বিশ্বসাহিত্যও তার অন্যতম অবদান; এবং আমার মত-খণ্ডনে সভ্যতাভিমানীরা সে-দিকেই তর্জনীনির্দেশ করবেন। কিন্তু গত তিনচার হাজার বছর ধরে সত্য শিব সুন্দরের মূর্তিনির্মাণে সে অনেক করকৌশল দেখিয়েছে বটে, তবু মানুষ হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই আজ পর্যন্ত দেহাত্মপ্রত্যয়ের দাস, এবং যদিচ মনোবিকলনের সিদ্ধান্ত এখনও তর্কসাপেক্ষ, তথাচ শিল্পরচনা চিরকাল অতৃপ্ত ক্ষুধার অবাস্তব অন্নই যুগিয়েছে। অর্থাৎ মানুষের অন্যান্য উদ্যোগের মতো সাহিত্যের মূলেও দৈন্যগ্রন্থি; এবং অনটন

যখন আর বাণিজ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদে মেটে না, তখনই আমরা কাব্যলক্ষ্মীর সিংহদ্বারে ধরনা দিই। ফলত আড্‌লার প্রমুখ মনোবেত্তাদের মতে অনবদ্য, তথা অবিকল, মানুষ কল্পলোকের জীব; এবং দৈনন্দিন পৃথিবীতে যারা জন্মায়, তাদের উপকরণে যেহেতু সকল গুণের সমন্বয় একেবারে অসম্ভব, তাই মানুষমাত্রেই তার প্রাক্তন স্বভাব উৎরিয়ে, আদর্শ সম্পূর্ণতার আশ্রয় চায়। কিন্তু সে-আদর্শ পরিণামবাদীর কৈবল্য নয়, বাঁচার জন্যে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে জীবগোষ্ঠীর যে-সদ্ভাবের প্রয়োজন, উক্ত আদর্শ তারই নামান্তর; এবং নির্দোষ ব্যক্তি সেই, যার সঙ্গে প্রতিবেশের সর্বাঙ্গীণ সঙ্গতি ঘটেছে। তাহলেও এমন লোক স্বভাবতই সর্ববিধ কর্মপ্রবর্তনায় বঞ্চিত; এবং সাহিত্যসৃষ্টিও একটা সজীব প্রক্রিয়া বলে, সে-সাধনায় সিদ্ধি কোনও না কোনও অসংস্থিতির মুখাপেক্ষী। অতএব একের সামঞ্জস্য-পদ্ধতিকে দশের গোচরে এনেই, সার্থক সাহিত্য সমাজের উপকার সাধে; এবং জৈবিক প্রতিষ্ঠার প্রকার-সন্ধানে বিমুখ হলে, এই বিষয়াসক্ত সংসার থেকে তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা যে বহু পূর্বেই উঠে যেত, তা নিঃসন্দেহ।

তবে আমরা মানতে বাধ্য যে ভাষা, তথা সাহিত্য, মানুষের অন্যান্য অঙ্গবিক্ষেপের মতো যদিও একটা স্থিতিস্থাপক ভঙ্গীমাত্র, তবু তার বর্তমান পরিণতি অত্যন্ত জটিল; এবং উদাহরণ, শাসন ও অভ্যাস—এই তিন দীক্ষাগুরুর পরামর্শে নবজাত শিশুর ক্ষুধিত ক্রন্দন যেমন দু দিনেই অন্ন-পরিবেষণের আজ্ঞায় রূপান্তরিত হয়, তেমনই কামনার তাড়নে আজ আর আমরা সঙ্গিনীহরণে বেরোই না, ঘরে বসে, প্রেমের কবিতা লিখি। কারণ অসাধ্যসাধনেই সভ্যতার সার্থকতা; এবং আমাদের চিৎপ্রকর্ষ যতই বাড়ছে, আমাদের সহজাত প্রতিক্রিয়া ততই কমে আসছে। ব্যাপার সম্প্রতি এত দূর গড়িয়েছে যে ইদানীং এমন মানুষ খুবই সুলভ, যার কার্যকলাপের কোনও নৈমিত্তিক ভিত্তি নেই, যে পুঁথিজাত ভাববিলাসে কাল কাটায়, যাকে জীবনের তাগিদ আর টলাতে পারে না, শুধু কথাই মাতিয়ে তোলে। কিন্তু মদনসখার সংস্পর্শে আমাদের আদি পুরুষের দেহে একদা যে-অবস্থা জাগত, এখনও সেই মদস্রাবই প্রণয়-নামে অভিহিত; এবং উক্ত গণ্ডনিঃস্রাব আপাতত আবহের কবল এড়িয়ে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির আয়ত্তে এসেছে বটে, তথাচ তার কারণই বদলেছে, ফল রয়েছে যথাপূর্ব—নূতন পটভূমিতে অভিনব অভিনেতারা নেমেছে, নাটক আছে নির্বিকার। এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলা চলে, যে আবেগের প্রকারভেদ নেই, পার্থক্য শুধু তার উৎসে ও উপলক্ষে; এবং সম্ভবত সেই জন্যে তাঁরা প্রেমাস্পদদের মধ্যে বাঁচেন না, প্রত্যেককে প্রতীক বিবেচনায় সনাতন প্রেমানুভূতির চিরাচরিত লক্ষণসঙ্গীতে বারংবার বাহ্যজ্ঞান হারান।

আসলে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, ভাবনা-বেদনা, আবেগ-উদ্বেগ—এ-সমস্তেরই সূত্রপাত দেহে; এবং সে-সত্য অনুব্যবসায়ীদেরও সুবিদিত। অন্ততঃপক্ষে উইলিয়ম্ জেমস-ই প্রথম দেখান যে প্রাণী যখন ভয়াবেগ অনুভব করে, তখন তার শরীরের অবস্থান্তর গৌণ নয়, মুখ্য; এবং আমাদের হাত-পা কুঁচকে যায়, নিঃশ্বাসের বেগ বাড়ে, হৃৎস্পন্দ দ্রুত তালে চলে বলেই, আমরা ভয় পাই, ভয়ানুভূতির ফলে ওই বিকারগুলো নজরে আসে না। অবশ্য এই রকম কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপরে দাঁড়িয়ে, সংবিৎকে উড়িয়ে দেওয়ার দুরাশা হাস্যকর; কিন্তু এ-বিষয়ে বোধহয় আর মতদ্বৈত নেই যে ক্ষুধার বশে মানুষের জিহ্বায় যেমন লালা ঝরে, তেমনই অন্য সকল উত্তেজনাতেও আমাদের বিভিন্ন গণ্ড রসায়িত হয়ে ওঠে। আলঙ্কারিক রস হয়তো ওই প্রাকৃত রসেরই প্রতিরূপ; এবং নালীহীন গণ্ডের রসসঞ্চারে আমাদের বাতবহা নাড়ীর কেন্দ্রগুলো না ভিজলে, বীরত্ব, স্নেহ, সৌন্দর্য, অধ্যাত্ম ইত্যাদির উপলব্ধি বুঝি বা অসম্ভব। অর্থাৎ মানবচৈতন্যকে দেহাতিরিক্ত ভাবা অনাবশ্যক; এবং আমার মতো চার্বাকপন্থীর কাছে চৈতন্যের সার্বভৌমত্ব ও অবিনশ্বরতা অন্য কোনও সিদ্ধান্তের সাহায্যে বোধগম্য নয়। যে-শাশ্বত সত্য, যে-সনাতন শুভ মানুষকে গত পাঁচ হাজার বৎসর ধরে মাতিয়েছে, মজিয়েছে, তা সম্ভবত এমন রসস্রাব, যা দেহীর পক্ষে মহত্তম মঙ্গলের কারণ; এবং সে অমর, কেননা অভ্যাসে মানুষের আঙ্গিক প্রতিক্রিয়ার নিরোধ যদিও সহজ, তবু পূর্বোক্ত গণ্ডনিঃসারের অবদমন অভাবনীয়। সুতরাং চৈতন্যের বেশ-ভূষাতেই পরিবর্তন ঘটে, তার স্বরূপে বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে না; এবং উল্লিখিত রস যেহেতু রসায়নের নিত্য নিয়মে বাঁধা, তাই তার ফলাফল সকল কালে ও সকল ক্ষেত্রে সমান আর মানবচৈতন্যের তুলামূল্য অপেক্ষাকৃত অক্ষয়।

এ-দিক থেকে দেখলে, কবিকে স্বর্গের চক্রান্ত ব'লে ভাবা শক্ত; এবং আমাদের মতো অসম্পূর্ণ মানুষ হয়েও, সে যেহেতু আমাদের তুলনায় অনেক বেশী আশুচেতন, তাই প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের অবিরত চেষ্টায় তার প্রণালীহীন গণ্ডগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফলে যতটুকু যা যে-রকমের অভ্যাঘাতে তার দেহে সরসতা আনে, তদপেক্ষা অধিক ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত আমাদের শরীরে হয়তো আন্দোলন জাগে না; এবং মহাকবি তিনিই, যিনি দুঃশাসন বস্তুমায়ের প্রচ্ছন্ন উদ্দীপনাশক্তিকে নিজের শরীরে ধরে, তাই দুর্বার উত্তেজনাকে অনুকূল ঘটনাচক্রের অনুগ্রহে পাঠকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে দেন। এ-ক্ষেত্রে ভাষাই ঘটনাবহ; এবং ভাষা যে শুধু ধ্বনি-রূপ উচ্চন্ত উদ্দীপকের আধার, তাই নয়, সভ্য মানুষের পক্ষে শব্দ আর বস্তু প্রায় অভেদাত্মা। সুতরাং কাব্যরচনার উপলক্ষে কোনও অলৌকিক প্রেরণা কবিকে পেয়ে বসে না। তিনি অভিধানে এমন শব্দরূপ, এমন ধ্বনিতরঙ্গ খোঁজেন, যা তাঁর মৌল উদ্বোধনের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহার্য; এবং কবিতা তখনই সার্থকতার পর্যায়ে পৌঁছায়, যখন অবশ্যম্ভাবী বাক্যবিন্যাসের সংঘাতে কবির শরীরে ঈপ্সিত আবেগের পুনরাবর্তন চলতে থাকে। কারণ আবেগের ঝোঁকে কথা কইবার সময়ে মানুষের বাগ্‌যন্ত্র কতকগুলো নির্দিষ্ট আদর্শ মানে; এবং ছন্দোবদ্ধ শব্দশৃঙ্খলার গুণে পাঠকের কণ্ঠ যেই সে-রূপকল্পের অনুকরণ করে, অমনই তার মানসপটে ফুটে ওঠে কবির ধ্যানতন্ময় চিত্রকল্প। এখানে মনে রাখা দরকার যে চেঁচিয়ে পড়ায় আর মনে মনে পড়ায় খুব বেশী তফাৎ নেই; এবং যাঁরা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাই শুনেছেন যে চিন্তাকালে আমরা শুধু মস্তিষ্ককে কাজে লাগাই না, সারা শরীরে আন্দোলন তুলি।

পূর্বেই জানিয়েছি যে উদ্দীপনায় যতই তারতম্য ঘটুক, তার দৈহিক প্রতিঘাত সার্বত্রিক ও সমান; এবং সেই জন্যে কবি ও পাঠক যদিও ভিন্নধর্মী, তবু তাদের আবেগ ও অনুভূত রস মোটামুটি এক। অন্যথায় কবিতা কেন চির পরিচয়ের বিস্ময় জাগায়, কাব্যপাঠের বেলা হর্ষ, বিষাদ, উৎসাহ ইত্যাদির উপলব্ধি কেন শারীরিক হয়ে ওঠে, রসাত্মক বাক্য কেন গদ্য ভাষ্যের তোয়াক্কা রাখে না—এ-সমস্ত সমস্যার সমাধান অসাধ্য; এবং শুনেছি বটে যে, যোগীর সমাধি অদ্বৈতের অনির্বচনীয় লীলাভূমি, কিন্তু সাধনার সে-স্তরে, শুধু আমার নয়, মহাকবিদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। কারণ ভাষা প্রতিবেশজয়ের পরমাস্ত্র; এবং মানুষের প্রতিবেশ যেকালে মুখ্যত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তখন অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অচিন্ত্যের দৌত্য ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এমনকি বিজ্ঞানের পারিভাষিকেও নিরুপাধিকের স্থান নেই; এবং হয়তো মর্ত্যসীমায় আবদ্ধ থাকতে সম্মত নয় ব'লেই, অর্বাচীন পদার্থবিদ্যা প্রাচীন পরাবিদ্যার মতো স্বতোবিরোধী। যে-মানুষ নিজের অন্ত্র-সম্বন্ধে অচেতন, তার কাছে চতুর্থ আয়তন খুব জোর উৎপ্রেক্ষামাত্র; এবং সমষ্টির পরিসংখ্যানে ব্যষ্টিগত গতিবিধির ব্যাখ্যা খুঁজলে, সান্তের অনন্ত ব্যাপ্তির মতো অসম্বন্ধ প্রলাপ অনিবার্য। অন্ততঃপক্ষে বর্তমান যুগ লজ্জভেদের মন্ত্র ভুলে গেছে; এবং নিষ্কর্ষের চূড়ান্তেও আমরা যেহেতু চক্ষু-কর্ণের দাস, তাই আমরা [illegible]

উদ্‌যাপন আমাদের অবগতি বাড়ায় না, অনর্থের প্রশ্রয় দেয়। অতএব আবেগ ও বাগ্‌যন্ত্রের প্রাগুক্ত আত্মীয়তা অবশ্য-স্বীকার্য; এবং এমন সিদ্ধান্ত থেকেও অব্যাহতি নেই যে মানুষের কান যে-নিয়মে একটা সুপরিমিত শব্দপর্যায়ের উপরে-নীচে বধির, মানুষের চোখ যে-নিয়মে একটা নির্দিষ্ট বর্ণস্তরের অধে-ঊর্ধ্বে অন্ধ, ঠিক তেমনই কোনও নিয়মেই মানুষের কণ্ঠ একটা নাতিবৃহৎ আবেগগণ্ডির বাইরে নিষ্ক্রিয়।

অর্থাৎ কবির প্রেরণা, সাধকের উপলব্ধি, দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টি মহৎ হোক বা না হোক, তাঁদের ভাষায় কেবল ততটুকুই বর্ণনীয়, যতটুকুর ভার তাঁদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সয়, অথবা যতখানির তাড়া না খেলে, তাঁদের বাগ্‌যন্ত্রের জড়তা কাটে না; এবং তর্কের খাতিরে যদি বা মানি যে এমন সিদ্ধপুরুষ এখনও বর্তমান, যাঁর দিব্যকর্ণ গ্রহ-নক্ষত্রের নূপুরনিক্বণে অহর্নিশি ঝঙ্কৃত, তবু সে-দুর্লভ অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যরচনার উপাদান যোগাবে—এ-ধারণা হাস্যকর। অবশ্য তারার নৃত্য হয়তো মদিরেক্ষণেরই উপভোগ্য; এবং যে-জাতিস্মর শ্রুতিবোধের গুণে পিথাগোরাস্ গোলকের স্বরগ্রাম আবিষ্কার করেছিলেন, বিবাদী সুরের সাম্প্রতিক অসঙ্গতি স্বতই তার পরিপন্থী। কিন্তু তুলনীয় অতিকথা আধুনিক সাহিত্যে বিরল নয়; এবং আজকালকার অধিকাংশ কবিই সাহিত্যের ব্যবহারিক ধর্মে আস্থা খুইয়ে, কাব্যের কাঁধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিপুল বোঝা চাপিয়েছেন। ফলে আমরা ভুলতে বসেছি যে সাহিত্যের কর্তব্য নেপথ্য অনুপ্রাণনার প্রকাশ্য প্রয়োজনায় লেখকের অনুভূতি-সম্বন্ধে পাঠকের চৈতন্যকে জাগিয়ে দেওয়া; এবং অলসস্বভাব চৈতন্য যেমন বিনা ধাক্কায় কাজে লাগতে রাজী নয়, তেমনই ধাক্কা যখন অবিরত চলে, তখন তার সাড়া পাওয়া অসম্ভব। কারণ দীর্ঘসূত্র উদ্দীপনাই অভ্যাসগঠনের অনুকূল; এবং কলিকাতার কলকোলাহলে যাঁদের কাল কেটেছে, তাঁরাই জানেন যে, রাজপথের অবিশ্রান্ত ঘর্ঘরে তাঁদের ঘুম ভাঙে না বটে, কিন্তু পাশের ঘরে অনুচ্চ আলাপ শোনা মাত্র তাঁরা চমকে ওঠেন। সুতরাং শিল্পসৃষ্টিতে আত্যন্তিক স্বকীয়তা পণ্ডশ্রম; এবং বৈচিত্র্যের অভাবে দর্শকের মনোযোগ যতই ঝিমিয়ে পড়ুক না কেন, যা আগা-গোড়া নূতন, তাতে শেষ পর্যন্ত সে হকচকিয়ে যায়।

উল্লিখিত সত্য অ্যারিস্টটল্-এরও সুবিদিত ছিল; এবং প্লেটো-পরিকল্পিত বিশুদ্ধ রূপে ব্যক্তির পরিচয় মেলে না বলে, তিনি যদিও গুরুর প্রতিবাদ করেছিলেন, তবু ব্যক্তির মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও সাধারণ্যের [illegible]

মধ্যেই সম্ভবপর; এবং জ্ঞান যেকালে সম্বন্ধেরই প্রকারান্তর, তখন ব্যক্তির বিশিষ্টাদ্বৈত অবগতির অতীত, তার ভিতরে যেটুকু সামান্য, আমরা শুধু সেইটুকু চিনি। এ-মতে বোধহয় অধিকাংশ মনস্তাত্ত্বিক সায় দেবেন : অন্তত অনুষঙ্গবাদীরা মানবেন যে অভূতপূর্বের অভ্যাঘাতে দেহাচার দুর্ঘট; সে-জন্যে পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার অনুমোদন অপরিহার্য। কারণ বাতবহা নাড়ীর মারফৎ বাহ্য উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছালে, মস্তিষ্ক সে-উত্তেজনাকে ভেঙে চুরে, প্রাক্তন প্রতিক্রিয়ার খোপে খোপে সাজিয়ে ফেলে; এবং মানুষ কর্মপ্রবর্তনার ততটাই নেয়, যতটা সেই ছকে ধরে। বাকীটা হয় উৎসন্নে যায়, নয় অবচেতন দূরদৃষ্টির যত্নে সুড়ঙ্গজাত হয়ে ভবিষ্যৎ অনুষঙ্গের গভীরতা বাড়ায়; এবং বুঝি বা তাই শ্রেষ্ঠ শিল্পসামগ্রীর বিশ্লেষণে প্রাচীন-অর্বাচীনের নিপুণ সংমিশ্রণ চোখে পড়ে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা একটা একাত্ম পরিবারের নামমাত্র; এবং সে-পরিবার এখনও সনাতন পদ্ধতি কাটিয়ে উঠতে না পেরে সাবেকী ভদ্রাসনকে সদর আর অন্দরে বেঁটে রেখেছে। এখানেও সদরে যা ঘটে, তা শাশ্বত, সহজ ও সার্বজনীন; এবং অন্দরবাসিনীরা যথারীতি পরান্নজীবী ও অসূর্যম্পশ্যা। সুতরাং প্রথম দিকটা আমাদের কর্মকৌশল শেখায়, ভিন্ন ভিন্ন আচরণের নিমিত্ত যোগায়, প্রবর্তনা-সমূহের প্রকারভেদ চেনায়; এবং দ্বিতীয় দিকটা আমাদের ভাব জাগায়, ছবি আঁকায়, স্মৃতির আহার-বিহারের ব্যবস্থা করে।

ভাষা-রূপে পরিবর্তিত প্রবর্তনাতেও ওই দ্বৈধ বিদ্যমান; এবং প্রবীণ আলংকারিকেরা শব্দের স্বভাবে লক্ষণা, ব্যঞ্জনা, অভিধা প্রভৃতির শ্রেণীবিভাগ এনে সম্ভবত ওই পার্থক্যেরই খবর দিয়েছেন। উদাহরণত নীল-বিশেষণটি বিবেচ্য; এবং তার যে-অর্থ সাধারণগোচর, তা এই যে নীল রঙের বস্তু লাল বা অন্য বর্ণের বস্তু নয়। কিন্তু নীলের অন্তরঙ্গ ভাবচ্ছবি বচনাতীত : চণ্ডীদাস তাতে হয়তো দেখতেন নীল সাড়ীর আড়ালে রজকিনীর তপ্তকাঞ্চন কান্তি; স্বয়ং রামীর কাছে রংটা নিশ্চয়ই তার জাতিব্যবসায়ের মর্যাদা পেত; এবং আমার প্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাঁধাই যেহেতু নীল ছিল, তাই আমি ওই বর্ণে আমার স্বর্গীয় গুরুমহাশয়ের জবাকুসুমসঙ্কাশ ভ্রূকুটি প্রত্যক্ষ করি। বলা বাহুল্য, এক নীল-শব্দের দ্বারা অত রকম তাৎপর্য প্রকাশ্য নয়; এবং কোনও বৈষ্ণব কবি যদি ভাষার বহিরাশ্রয়িতা ঘুচিয়ে, শুধু নীল-শব্দের পুনরুক্তিতে ইষ্টসন্দর্শনের মহানন্দ

লোকসমক্ষে ফোটাতে চান, তবে তাঁর সাধ মিটবে না, মুদ্রাদোষেই লোক হাসাবে। কারণ বিস্রম্ভালাপ অন্দরেই সাজে; এবং প্রিয়-সম্বোধন যখন সদরে শুনি, তখন চপল শ্রোতার বাচালতা থামানো যাক বা না যাক, রসিক জনের বিরক্তি রোখা যায় না। অবশ্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অবরোধপ্রথার উচ্ছেদ অনিবার্য; এবং এক বিশ্ববিদ্যালয়ে প'ড়ে, এক বক্তৃতাসভায় জ'মে, এক বাজারের ভেজাল সওদায় স্বাস্থ্য হারিয়ে, আমরা সকলে হয়তো একই ভাবনা ভাবি। সম্ভবত সেই জন্যে ব্রাহ্মসমাজের ব্রাত্যেরাও সম্প্রতি গোঁড়া হিন্দুয়ানির ধ্বজা ওড়াচ্ছেন; এবং বাঙালী মুসলমানেরা আকাশকুসুম কুড়াতে বেরিয়েছেন আরব মরুর কণ্টকিত অভাবে। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য একেবারে মিথ্যা না হলে, আমরা মানতে বাধ্য যে সংসারের নাটমঞ্চে তাঞ্জবব্যাপার অচল; এবং অভিজ্ঞতা ও ভাষার প্রকৃতি যতই বদলাক না কেন, সদরের বাসিন্দারা বাটনা বাটতে বসবে না, অবগুণ্ঠিতারাই পুরুষালিতে হাত পাকাবে।

পক্ষান্তরে নিরঙ্কুশে যদিও এন্ট্রোপি-র নিয়ম খাটে, এবং কালক্রমে যদিও অভিজ্ঞতার অভিজাত কুলপ্রথায় জনতার স্থূলে হস্তাবলেপ লাগে, তবু উপলব্ধি-মাত্রেই সাধারণ্যে আসে না, কেবল সেই অনুভূতি বিশ্বমানবের আদর পায়, যা সার্বজনীন স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী। কারণ পাভলোভ্ পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়েছেন যে খাদ্য-পরিবেষণের সঙ্গে কুকুরকে প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সুর শোনালে, এক দিন, খাদ্য বাদ দিয়েও, সেই সুরের সাহায্যে তার জিভে লালা ঝরানো সম্ভব; এবং জৈব প্রয়োজনের বিচারে মানুষ যেহেতু কুকুরের সমকক্ষ, তাই তার বেলাতেও উদ্বোধক-পরিবর্তনের প্রকারান্তর নেই। অর্থাৎ শিক্ষার সোপান-মার্গ নিশ্চিত ও নির্বিকার দেহপ্রতিক্রিয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং অবিরাম অভ্যাসে প্রাণিবিশেষের পরিচিত উদ্দীপনা বদলিয়ে, তার জায়গায় প্রায় যে-কোনও নূতন উত্তেজনার উপস্থাপন সুসাধ্য বটে, কিন্তু সে-ব্যাপারেও তার সহজ পরাবর্তই কর্মকর্তা। সুতরাং সংগীতের প্রতি কুকুর বা মানুষের অনুরাগ আসলে স্বভাবগত নয়; নানা আওয়াজের মধ্যে তারা রাগ-রাগিণীর ঠাট তখনই চিনতে শেখে, যখন তা ছাড়া তাদের জীবনযাপন দুষ্কর। ধরা যাক আমি পাহাড় চড়তে চড়তে পা পিছলে চলেছি নাস্তির দিকে; হঠাৎ একটা খোঁচে অবলম্বন জুটে গেল; এবং সেটাকে আঁকড়ে যেখানে ঝুলে রয়েছি, তার নীচে খাত, আর খাতে মৃত্যু। এ-অবস্থায় মৃত্যুভয় সামঞ্জস্যসিদ্ধির মুখ্য প্রবর্তনা; এবং সেই জন্যে, এখন ধারালো পাথরে আঙুল কেটে দুখানা হবার জোগাড় জেনেও আমার বাহুপেশী নড়বে না, দেহ-যন্ত্র স্বজ্ঞাগুণে বুঝবে যে বর্তমানে জ্বালার প্রতিকার খোঁজা ভারসাম্য রক্ষার অন্তরায়, উপস্থিত ক্ষেত্রে ঝুলে থাকাই স্থিতিস্থাপকতার অদ্বিতীয় উপায়। বাঁচার গরজে আহত পেশীর অনিকাম প্রসার-সংকোচ যেমন নিরুদ্ধ, তেমনই নিষিদ্ধ স্বগত ভাষার অতিবাস্তব যথেচ্ছাচার; এবং কুমীররূপী জীবনের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে যে-কবি কালস্রোতে ভেলা ভাসাবেন, অপঘাত থেকে তাঁর নিস্তার নেই।

আমি জানি যে ইতিপূর্বে দু-চারজন লেখক সমসাময়িকদের অবজ্ঞা কুড়িয়েও পশ্চাদ্‌গামীদের অর্ঘ্য পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের বেলাও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি; এবং জীবদ্দশায় ডান্, ব্লেক, কীট্‌স প্রভৃতির অমর্যাদা তাঁদের অক্ষমতার পরিচয় দেয় না, প্রমাণ করে তৎকালীন সমাজের দুর্গতি। অর্থাৎ তাঁরা মহা-কবি; মানুষের চিরন্তন অভীপ্সা থেকেই তাঁদের কাব্যপ্রেরণা উৎসারিত; এবং যে-যুগে তাঁদের জন্ম, তার কৃত্রিম আবহে প্রত্যক্ষ প্রেরণার অবকাশ ছিল না বলেই, তদানীন্তন পাঠকবর্গের অনুকম্পা তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি, সে-কালের শুচিবায়ুর মধ্যে তাঁদের কালাতীত সরলতা স্বভাবতই অনুপকারী লেগেছিল। আসলে হয়তো সভ্যতাই প্রাকৃত কাব্যের পরিপন্থী; এবং এমন কবির অভ্যুদয় সম্ভবত এখনও অবারিত, কাব্যে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের বিজ্ঞাপন যাঁর বিবেকে বাধে, যিনি আত্ম-রতির মোহ কাটিয়ে তথা ম্যাথ্যু আর্নল্ড-এর উপদেশ মেনে সাহিত্যকে দেখেন যুগ-চৈতন্যের নিকষ হিসাবে। তাহলেও তাঁরই সমূহ বিপদ; এবং নিরাসক্ত আত্মসমর্পণে এগিয়ে তিনিই বুঝিবা মর্মে মর্মে বোঝেন যে মানুষের অনুসন্ধিৎসা আজ যেকালে অরূপ রতনের লোভে রূপসাগরে ডুবুরি নামিয়েছে, তখন ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ ভাষা সুবিধা নয়, বরঞ্চ বাধা। কারণ দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, রঞ্জনরশ্মি, ছায়াচিত্র ইত্যাদির অনুগ্রহে চৈতন্য সম্প্রতি অলক্ষ্যে দিশাহারা; এবং সে-বিমূর্ত লোকে অলংকারশাস্ত্র আচরণীয় বটে, কিন্তু যেখানে জ্যামিতির প্রবেশ সুদ্ধ নিষিদ্ধ, সেখানে এমনকি ব্যাকরণও যেন কার্ডিও-গ্রাম-এর দিনে সহস্রমারী কবিরাজের অতিজীবিত নাড়ীজ্ঞান। [illegible]

কবিদের আত্মশ্লাঘা জটিল রচনার মাত্রা-ছেদে বাড়ে, কমে; এবং উগ্র বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার ব্যতীত শুধু পাঠকের মনোহরণ অসম্ভব নয়, শিক্ষার ব্যাপ্তিতে ও কৃষ্টির বাহুল্যে সেও ইদানীং সাহিত্যিকের মতোই অসামান্য।

আগে পরমার্থের বার্তাবহ বলে, সুখে দুঃখে কবিদের ডাক পড়ত; কিন্তু তার সান্ত্বনাবাণীতে বারংবার এত ছিদ্র বেরিয়েছে যে বিপদে-আপদে আজ আমরা বিজ্ঞানের মন্দিরেই পূজো মানি। একদিন সভা-সমিতির অবসরবিনোদে কবিরাই দলপতি ছিলেন; কিন্তু এখন তেমন আসর হয় উঠে গেছে, নয় তার অধিকারী রাষ্ট্রনেতা আর ব্যায়ামবীর। অগত্যা কাব্য আজ খামখেয়ালী; কবির স্বকীয়তা এখন শিশুসুলভ স্বেচ্ছাচারের ভেক পরেছে; ব্যক্তিস্বরূপ হারিয়ে সে সম্প্রতি আঁকড়ে ধরেছে হিংস্র ব্যক্তিবাদকে। অতএব আবার মনে করার সময় এসেছে যে, সকল পারদর্শিতার পিছনে যে-রকম প্রাক্তন সংস্কারই উহ্য থাক না কেন, সেই অধিসংক্রান্তি সেই "অ্যাটাভিজম", সেই সহজ ঝোঁক মোটেই অলৌকিক নয়; অথবা তাতে যদি দৈবের প্রসাদ দেখি, তবে নিপুণ ফুটবল-খেলোয়াড়ও অধরার প্রিয়পাত্ররূপে গণ্য; এবং লেখক-পাঠকের সংবাদে মরমী আদান-প্রদানের রহস্যারোপ সম্ভব হলে, সাহিত্য-পদবাচ্য আত্মপ্রকাশ নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন—যেই তৃতীয় নয়ন খুলে চাইবে, পাঠক অমনই বুঝবে লেখকের হৃদয় কোন্ উপলব্ধিতে উদ্বেল। আসলে সাহিত্যসৃষ্টি, তথা সাহিত্যসম্ভোগ অনুকূল আবেষ্টনের গুণ; এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষের প্রতিবেশ যেহেতু অল্প-বিস্তর ভিন্ন, তাই কেউ লেখে কাব্য, কেউ মাতে গণিতশাস্ত্রে, কারও জিহ্বা গো-নামে রসিয়ে ওঠে, কেউ ভাবে গাভী ভগবতী। উপরন্তু ব্যক্তির মতো যুগের পরিমণ্ডলও পরিবর্তনশীল; এবং সেই জন্যে অষ্টাদশ শতকের কবিতা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছড়ার মতো শোনায়, শেক্সপীয়র-এর প্রহসন পড়ে পরীক্ষার্থীর কান্না আসে, "সং অফ্ সলোমন্"-এর আধ্যাত্মিক রূপক আধুনিকদের কামানলে ঢালে ঘৃতাহুতি।

তথাচ এমন অনুমান বোধ হয় একেবারে অমূলক নয় যে মানুষের অধিকাংশ ভাবনা-বেদনায় শিক্ষা, সমাজ ও সময়ের স্বাক্ষর যদিও সুস্পষ্ট, তবু তার দেহের কতকগুলো প্রতিক্রিয়া অনাদ্যন্ত, কতক-গুলো প্রবৃত্তি দুর্দমনীয়, কতকগুলো অভিজ্ঞতা মজ্জাগত; এবং যে-কবি সেই সনাতন ধর্মের প্রচারক, তাঁর স্থান হয়তো [illegible] কেন্দ্রে যেখানে সর্বব্যাপী

আমার বিশ্বাস এই নৈরাত্ম্যনীতিতেই বিশ্ব-সাহিত্যের ঐকাসূত্র অনুসন্ধানীয়; এবং উক্ত সর্বসম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলেই, সকল জাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে প্রসঙ্গ, পদ্ধতি ও আবেদনের এতটা সৌসাদৃশ্য সম্ভবপর। কিন্তু কাব্য তথা মহত্ত্বের বিশ্লেষণে যাঁরা হেতুবাদের শরণ নিতে অনিচ্ছুক, তাঁদের মতে বুদ্ধ বা কালিদাস প্রয়োগাগারে উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত মহাপুরুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কৌতূহল কেবল নিরর্থ নয়, উপহাস্যও; এবং যখন এ-মনোভাবের অলি-গলিতে প্রবেশ করার মতো পথজ্ঞান আমার নেই, তখন আমি মানতে বাধ্য যে, ভূতবিদ্যার সাহায্যে হিমালয় গড়া না গেলেও, গিরিরাজের উদ্ভব-সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই প্রামাণসহ। তবে এটা ঠিক যে জড়ের বিষয়ে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি যত ব্যাপক, পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসৌকর্য-বশত জীবন-প্রসঙ্গে আমরা ততটা নিশ্চিত নই; এবং তৎসত্ত্বেও গবেষণালব্ধ উপায়ে আজ যেহেতু প্রাণীর লিঙ্গ বদলানো যায়, প্রণয়াসক্তির মতো নিত্য প্রবৃত্তি প্রতিলোমের আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠে, দ্রাবণজাত লতা-পাতা আসল ডাল-পালাকে লজ্জা দেয়, তাই এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে জীববিদ্যাতেও আমাদের ব্যুৎপত্তি প্রত্যহ বাড়ছে।

অন্ততঃপক্ষে আমাদের প্রাণসংক্রান্ত অনুমান যতই অসম্পূর্ণ হোক, কোথাও অযৌক্তিক নয়; এবং এ-জাতীয় প্রকল্পের পিছনে যে মনোভাব বিদ্যমান, পদার্থ-বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য আপাতত তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য জীব-বিদ্যার নিঃসংশয় বিভাগে জন্তু আর উদ্ভিদই অবগতির প্রধান অবলম্বন; এবং মানুষের মেধা বা মনীষা সম্ভবত অতি-জান্তব। কিন্তু এও মর্ত্যেরই মহিমা; এবং এর সমস্ত অন্ধি-সন্ধি এখনও আমাদের নখদর্পণে আসেনি বলে, একে যদি লোকোত্তর লাগে, তবে না মেনে নিস্তার নেই যে বাণের চাল-চলনও অলৌকিক। আসলে চাকা গড়িয়ে যায় স্বভাবগুণে, আর মানুষ মনস্বী ঘটনা-গতিকে; এবং ঘটনাগতিকের সংজ্ঞা বেশ একটু আবছা রকমের বটে, তবু তার প্রতিকারে লীলাবাদের অবতারণা জিজ্ঞাসার আত্মহত্যা। কারণ সত্তার শ্রীবৃদ্ধি আর অনির্বচনীয়ের জন্মাধিকার প্রায় সমার্থ-বাচক; এবং রূপহীন ভাবনা ভাবনা নয়, ভাবনার ভানমাত্র। পক্ষান্তরে সংস্কৃতির বিকাশ মহাপুরুষেরই চেষ্টা-প্রসূত; এবং সেইজন্যে উপসংহারে এ-কথার পুনরাবৃত্তি অত্যাবশ্যক যে, প্রাতঃস্মরণীয়দের মর্যাদা-লাঘব বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ আমার বক্তব্য এই যে, তাঁদের সঙ্গে মনুষ্যজন্মের ধিক্কারে আমি কবে নিজেকে হারিয়ে ফেলতুম; এবং হয়তো উক্ত সাদৃশ্যের দোষেই মহাত্মারাও আমার বিচারে পরমাত্মার সমকক্ষ নন, বিধান-বিকল দেহী। অর্থাৎ ব্যক্তির মহত্ত্ব সংসার-সীমার বাইরে দুর্নিরীক্ষ্য; এবং শিলাময় তটের ধাক্কাতেই প্রচেতার পরাক্রম যেমন আমাদের চোখে পড়ে, তেমনই আমরা মহাপ্রাণ ওথেলো-কে তখনই চিনি, যখন বুঝি তার অধঃপাতের হেতু কত অকিঞ্চিৎকর।

বিহার ভূমিকম্প প্রচারপুস্তিকার সাহায্যের জন্য প্রচ্ছদপট

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

[শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে]

সরবতি বাঈ

বিমল মিত্র

সুচেতা চট্টোপাধ্যায় সুচরিতাসু—

তোমার চিঠি পেলাম। তোমাকে নিয়ে গল্প লিখতে বলে আমাকে ভারি বিপদে ফেলেছ! আমি ফরমায়েসি গল্প কিছু লিখেছি বটে, কিন্তু এ তো জুতো নয় যে যতবার ফরমায়েস করবে ততবারই বানিয়ে দেব। আর তোমার ঠিকানাও দাওনি চিঠিতে। খামের ওপর পোস্ট অফিসের ছাপ খুঁজে ঠিকানা বার করতে গিয়ে দেখলাম, লেখা রয়েছে—শিবপুরে।

শিবপুরে! শিবপুর কি এখানে! তবু ঠিকানা মিলিয়ে তোমার সন্ধান করতে বেরোব তা মনে কোর না যেন। যে-টুকু তুমি লিখেছ তাতেই আমি বুঝে নিয়েছি। বুঝেছি নিতান্ত অসহায় হয়েই আমায় চিঠি লিখেছ। যদি আমি কিছু সাহায্য করতে পারি। আমার দ্বারা তোমার কতটুকু সাহায্য হবে জানি না।

কিন্তু তোমার চিঠি পড়তে পড়তে আমার একটা লাভ হয়ে গেল। বহুদিন আগের আর একজনের কাহিনী মনে পড়লো। সে সরবতি বাঈ নয়, বনলতা। বনলতার কাহিনী।

বনলতা আমার নিজের কেউ নয়। তোমার মতই একদিন তার ছাব্বিশ বছর বয়েসে এক ভীষণ সমস্যার উদয় হয়েছিল। সত্যিই ছাব্বিশ বছর বয়েসের সমস্যার বুঝি তুলনা নেই। তুমি লিখেছ যে-ছেলেটি তোমাকে ভালবাসে তার বয়েস তোমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। অর্থাৎ তেইশ! ছাব্বিশ বছরের জ্বালা তেইশ কী করে বুঝবে বলো।

ছাব্বিশ বছরের বনলতা একদিন বলেছিল—আপনার তো আস্পর্ধা কম নয়!

তেইশ বছরের সুধাময় বলেছিল—পেখম্ দেখে আমরা ময়ূর চিনতে পারি কিনা—

বনলতা বলেছিল—তাহলে এবার আরো ভালো করে চিনুন—

বলে কথা নেই বার্তা নেই পায়ের চটিটা খুলে সুধাময়ের গালে সপাং সপাং করে বসিয়ে দিয়েছে। বনলতার জুতোর শুক-তলাটা সুধাময়ের গালে গিয়ে পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

ততক্ষণে মেডিকেল কলেজের নার্স ডাক্তার ছাত্র ছাত্রী সবাই দৌড়ে এসেছে। ভিড় জমে গেছে কলেজের অপারেশন থিয়েটারের সামনে। মেথর, জমাদার, হাউস সার্জেন, কেউই বাদ নেই। কী হলো! কেন মারলে? কেন জুতো মারতে গেল হাউস্ ফিজিশিয়ানকে! সামান্য একজন নার্সের এই কান্ড! কী হয়েছে মেট্রন! হৈ, চৈ—ধুন্ধুমারকান্ড একেবারে।

বনলতা তখন রাগে ফুলছে। পারলে যেন আরো দু'ঘা মেরে দিত হাউস-ফিজিশিয়ানের গালে। এক ঘায়ে যেন ঠিক শায়েস্তা হলো না।

মেট্রন জিজ্ঞেস করলে—কী হলো মিস রায়?

বনলতা বললে—

কিন্তু সে কথা এখন থাক! ছাব্বিশ বছরের সে জ্বালা আর কেউ না বুঝুক তুমি হয়ত বুঝবে। তুমিই বুঝবে বনলতা রায়ের সেই অপমান। তেইশ বছরের ছেলে সুধাময় সেদিন অন্যায় করেছিল কি করেনি, তা-ও তুমি বুঝতে পারবে! কিন্তু সে-কথা পরে বলবো!

তুমি লিখেছ—তেইশ বছরের একটি ছেলে তোমাকে নিয়ে ঘর-বাঁধতে চায়। তা হলোই বা তোমার চেয়ে তিন বছরের ছোট, ঘর-বাঁধতে কি বয়েস লাগে! ঘর তো যে-কোনও বয়েসেই বাঁধা চলে। বিশেষ করে তেইশ বছরে ভালো করেই চলে। তেইশ বছর ক্লান্তি জানে না। তেইশ বছর ঘুম জানে না। তেইশ বছরের যে অক্লান্ত ক্ষমতা। তেইশ বছর কি সামান্য জিনিস!

তবে গোড়া থেকে বলি শোন। অনেক দিন আগে একবার ওখা পোর্টে গিয়েছিলাম। রাজপুতানা পেরিয়ে ভারতবর্ষের একেবারে শেষ প্রান্তে। মেহ্‌শানা, আমেদাবাদ, জাম-নগর। মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান পোরেন্দর অতিক্রম করে একেবারে ভারত মহা-সমুদ্রের ধারে। যেখানে দাঁড়ালে ভারত সমুদ্রের ওপারে আফ্রিকার চালানী নৌকোগুলোকে দেখা যায়। দেখা যায় পালতোলা নৌকোর সার। যেখান থেকে বাণিজ্য করতে যায় এপারের মাঝি-মাল্লারা। আর ওপারে সওদা বেচে অন্য কোনও সওদা কিনে নিয়ে আসে এখানে বেচতে। এই তাদের ব্যবসা! সমুদ্রের ধারে ধারে জেলে-মালোদের বাস। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে।

পান্ডা ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছিল—তীর্থস্থান বলেই বাবু-মহাজনেরা এখানে আসে হুজুর —নইলে সবই তো ওই মাঝি-মাল্লা কেবল—

জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোমাদের এখানে বাঙালী কেউ নেই?

বাঙালী! ঈশ্বরীপ্রসাদ মনে করতে চেষ্টা করলে। বললে—একজন বাঙালী এখানে ছিল হুজুর, এখানকার বাতি-ঘরে কাজ করতো, তিনি তো বদলি হয়ে গেছেন তিন বছর আগে—আর একজন—

বলতে গিয়েই যেন মনে পড়ে গেল। বললে—আর একজন এখনও আছে হুজুর—

বললাম—কে?

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—তা সেও এখান থেকে তেত্রিশ মাইল দূরে—এক ডাক্তার—

বাঙালী ডাক্তার ডাক্তারী করতে এসেছে হাজার-হাজার মাইল দূরে এই অজ গ্রামের মধ্যে! মাঝি-মাল্লারা পয়সা দিতে পারে!

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—আপনাকে আমি নিয়ে যেতে পারি সেখানে, মস্ত হাসপাতাল করে দিয়েছে ডাক্তার-মা—একটা পয়সা নেয় না হুজুর—

জিজ্ঞেস করলাম—নাম কী?

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—বনলতা মিত্র...... লোকে ডাক্তার-মা বলে ডাকে—

বনলতা মিত্র! বহু দিন বহু বছর অতিক্রম করে মেডিকেল কলেজের একটা ঘটনার কথা হঠাৎ মনে পড়লো। তার নামও বনলতা রায়। এমন নাম সচরাচর সব মেয়ের থাকে না।

জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম দেখতে বলো তো?

আমি যে-বনলতাকে দেখেছিলাম তার তখন তোমার মতই ছাব্বিশ বছর বয়স হবে। সে-ও কি আজকের কথা! তখন আমার কত আর বয়েস। মেডিকেল কলেজে প্রত্যেক দিন যেতাম সন্ধ্যেবেলা। টুকু মাসিমা গলস্টোন অপারেশন করতে হাসপাতালে শুয়ে থাকতো। আমি বাড়ি থেকে টিফিন কেরিয়ার নিয়ে খাবার দিয়ে আসতাম। সেখানেই প্রথম বনলতা দেবীকে দেখি। নার্সের পোষাক পরা। হাতে থারমোমিটার নিয়ে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী নিরীহ চেহারা। ছাব্বিশ বছর বয়েস হলে কী হবে, মাসিমা বলতো—ভারি যত্ন করে রোগীদের জানিস্—

ঈশ্বরীপ্রসাদ বলতে লাগলো—ওখানকার মাঝি-মাল্লাদের বড় পারা-রোগ আছে কিনা—সেই পারা-রোগের হাসপাতাল করে দিয়েছে ডাক্তার-মা। এক পয়সা খরচ-পত্তোর লাগে না—সেবা-যত্ন হয় ভালো—ডাক্তার-মা ভারি যত্ন করে রোগীদের—

মনে আছে যখন সব দেখা হয়ে গেল, রুক্মিণীর মন্দির, দ্বারকার মন্দির, ওখা-বন্দর, আর কিছু দেখতে বাকি নেই, তখন গরুর গাড়ি ভাড়া করে একদিন গিয়েছিলাম ডাক্তার-মার হাসপাতাল দেখতে। ওখা-বন্দর থেকে স্থলপথে তেত্রিশ মাইল ভেতরে। রাস্তা খারাপ। মটর যেতে পারে না। গরুর-গাড়ির ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাওয়া—আমি আর পান্ডা ঈশ্বরীপ্রসাদ। ঈশ্বরীপ্রসাদ সারা রাস্তা গল্প করতে করতে চলেছে।

বনলতা দেবীকে নিয়ে গল্প অবশ্য হয় না। বনলতা দেবীর জীবনে আরম্ভও যা শেষও তাই। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল বনলতা দেবীর জীবনের প্রশ্নের মত তার উত্তরও বড় সরল। সোজা সমতল ভূমির মত সরল। চড়াই যদিই বা থাকে, সেটা শুধু শুরুতে, শেষে আর কিছু নেই। আর প্রশ্ন যেমনই হোক উত্তর যার কঠিন নয় তাকে নিয়ে গল্প লেখা তো বিড়ম্বনা!

সেদিনও যথারীতি কাঁটায় কাঁটায় চারটে বাজতে হাসপাতালে গেছি। সেই চারপাশের সার-সার রোগীদের বিছানা, কাতর চাউনি।

হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই টুকু মাসিমা বললে—আজকে এখানে এক কান্ড হয়ে গেছে জানিস?

হাসপাতালে জীবনের তিনটি বৃহৎ ঘটনার মধ্যে অন্তত দুটি নিত্যনৈমিত্ত ঘটে থাকে। জন্ম আর মৃত্যু এখানে চিরাচরিত। তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাকে কান্ড বলেও কেউ ভাবে না।

বললাম—কী কান্ড!

টুকু মাসীমা বললে—আমাদের এখানকার নার্স এক ডাক্তারকে জুতো মেরেছে!

—কোন নার্সটা?

—ওই যে! ওই......

বনলতা দেবীকে সেদিন দেখেছিলাম। মাথায় স্কার্ফ আঁটা। হাতে একটা জ্বরের চার্ট। অমন মেয়ে যে একজন পুরুষকে জুতো মারতে পারে, দেখে তা মনে হলো না। সবাই তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে বলে যেন মনে হলো।

—আর সেই ডাক্তার?

ডাক্তার সুধাময়কে আমি দেখিনি। কিন্তু হাসপাতালের এ-কোণে ও-কোণে সব জায়গায় কেবল ওই একই আলোচনা। গুজুর-গুজুর ফুস-ফাস সব কথা। যেন আলোচনার একটা বিষয় পাওয়া গেছে।

টুকু মাসিমা আরো প্রায় এক মাস ও হাসপাতালে ছিল। পরে সব শুনেছি। জানতে আর কারো বাকি ছিল না। ডাক্তার হাউস-সার্জেন, মেট্রন, সুপারিন্টেন্ডেন্ট সব্বাই।

সুধাময় সেদিন সেই কথাই বলেছিল বনলতা দেবীকে।

বলেছিল—আমার আর কারো কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই—আপনি আমার খুব ক্ষতি করলেন।

বনলতা বলেছিল—আর আমারই কি মুখ দেখাবার উপায় আছে ভেবেছেন!

সুধাময় বলেছিল—আপনি মেয়েমানুষ; আপনার ঘর থেকে না বেরুলেও চলে; কিন্তু আমার?

ছকু খানশামা লেন-এর একটা পাঁচ-ঘর-ওয়ালা বাড়ির একখানা ঘর নিয়ে থাকতো তখন বনলতা। সেইখানেই রান্না খাওয়া সেরে দরজায় চাবি দিয়ে ডিউটিতে যেতো। আবার ফিরতো ছোট এটাচি কেসটা নিয়ে। হাসপাতালের কারো জানা ছিল না এ ঠিকানা। কোনওদিন গল্প করতেও বনলতা কাউকে নিয়ে আসেনি এ-বাড়িতে। কিন্তু এ-বাড়ির ঠিকানা সুধাময় কেমন করে যে জোগাড় করলো কে জানে।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিতেই সুধাময়কে দেখে বনলতা কেমন অবাক হয়ে গেলো। খানিকক্ষণ যেন মুখ দিয়ে কথাও বেরোল না তার।

সকাল বেলা যাদের ঝগড়া হয়ে গেছে, দুদিন পরে তারাই কী করে যে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে পারে, তা লোক-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকলে কেউ আর অবাক হবে না।

পরস্পরের ক্ষমা চাওয়ার পালা যখন শেষ হলো, তখন সুধাময়ই প্রথমে কথা বললে—। বললে—আমি তাহলে উঠি এখন—

বলে উঠতেই যাচ্ছিল। বনলতা বললে—একটা কাজ করতে পারবেন আমার?

সুধাময় ঘুরে দাঁড়াল। যেন অবাক হলো। বললে—কাজ! কী কাজ বলুন?

বনলতা বললে—আমার এ-মাসের কুড়ি দিনের মাইনে পাওনা আছে—ওটা এনে দিতে পারবেন?

—কেন, আপনি নিজেও তো আনতে পারেন!

বনলতা বললে—আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি!

তারপর একটু থেমে বললে—যে-ঘটনা ঘটলো তাতে আর ওখানে আমার চাকরি করা চলে না।

সুধাময়ের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। একটু সম্বিত ফিরে পেয়ে বললে—কিন্তু আমিও যে ছেড়ে দিয়েছি! আর তো যাই না কলেজে—

এবার বিস্ময়ের পালা বনলতার, কিন্তু একটু পরেই বললে—আপনার ভাবনা কি, আপনি ডাক্তারি পাশ করে গেছেন, অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে চলে যেতে পারবেন—

সুধাময় বললে—সেই জন্যেই তো ক্ষমা চাইতে এসেছি—

বনলতা বলেছিল—না, ক্ষমা আপনার চাইবার দরকার ছিল না, অপরাধ তো আমারও কম ছিল না—সকাল থেকে মেজাজটা আমার ভালো ছিল না। তারপর দুম্ দাম বাড়ি-ভাড়া

বাকি পড়ে গেছে...আপনি ঠিক আমাদের অবস্থা বুঝতে পারবেন না—

সুধাময় আবার একটু বসলো। বললে—আপনিও ঠিক আমার অবস্থা বুঝবেন না—সেই ঘটনার পর থেকে আর বাড়ি ফিরিনি জানেন—

বনলতা বললে—তাহলে দু'দিন কোথায় ছিলেন?

সুধাময় বললে—এই রাস্তায় পার্কে... খবরের কাগজে খবরটা বেরোবার পর কোনও বন্ধুর বাড়িতে যেতেও লজ্জা করছে...

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আচ্ছা উঠি এখন—

বনলতা বললে—কোথায় যাবেন?

সুধাময় বললে—জানি না, বাড়িতে তো যেতে পারবো না, হোস্টেলেও না,—

—তাহলে?

সুধাময় বললে—ডাক্তারি পাশ করেছি, একেবারে উপোষ করবো না জানি, কিন্তু টাকাও আমার হাতে নেই যে ট্রেণে উঠে চড়ে বসি বা কোথাও চলে যাই—টাকা থাকলে কোথাও চলে যেতুম আজই—

সুধাময় এবার উঠে সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছিল। বনলতা চুপ করে চেয়ে দেখল তার দিকে। তারপর যখন সুধাময় সিঁড়ি দিয়ে একেবারে নেমে গেছে নিচে, তখন ডাকলে—সুধাময়বাবু, শুনুন—

সুধাময় ওপর দিকে চাইলে। বললে—আমাকে ডাকছেন?

বলতে বলতে ওপরে এসে দাঁড়াল আবার। বনলতা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—একটা কথা রাখবেন আমার—

—কী?

তাড়াতাড়ি হাতের একগাছি চুড়ি খুলে নিয়ে বনলতা সুধাময়ের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে—এটা গিল্টী নয়, খাঁটি সোনার, আপনার বোধহয় উপকার হতে পারে—

সুধাময় সত্যিই অবাক হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোল না তার।

বনলতা বললে—আপনার বয়েস কম,—নিতে আপত্তি করবেন না—

সুধাময় বললে—এর চেয়ে আর একবার জুতো মারুন না—এখানে তো কেউ নেই, আমি তা-ও সহ্য করবো—

বনলতা এবার চোখ নামালো। বললে—আমারও যে খুব ভালো অবস্থা তা নয়, কিন্তু...

সুধাময় বললে—তা হলে খেসারত দিচ্ছেন বুঝি?

বনলতা বললে—ধরুন না কেন তাই! আমি হয়ত খুঁজে পেতে অন্য কোথাও একটা চাকরি জোগাড় করে নেব—কিন্তু আপনার এই বয়েস, এখনও যে অনেক বাকি—

সুধাময় বললে—তা হোক, তবুও আপনি ফিরিয়ে নিন—

বলে চুড়ি-গাছা বনলতার হাতের মুঠোয় গছিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বনলতা খপ্‌ করে হাতটা ধরে ফেলেছে। বললে—আপনার দুটি হাত ধরে বলছি, নিন—

সুধাময় অবাক হয়ে বনলতার মুখের দিকে স্পষ্ট করে চাইলে। মুখখানা এতবার দেখেছে, কিন্তু মেয়েটির মুখে যেন অন্য ভাষা অন্য অর্থ দেখতে পেলে আজ প্রথম। সুধাময় আর হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে না। বললে—আপনি নিতে বলছেন?

বনলতা বললে—আমি আপনার চেয়ে বয়েসে বড়—আমার কথা শুনতে হয়—

সুধাময় বললে—কিন্তু আপনারও তো দুমাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি?

বনলতা বললে—আমি মেয়েমানুষ, আমরা পুরুষের চেয়ে বেশি সহ্য করতে পারি—

বলে নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

তুমি মেয়েমানুষ। তুমি হয়ত বনলতার এই আচরণ বুঝতে পারবে। তারপর ঘরে ঢুকে বনলতা বিছানায় মুখ গুঁজে কেঁদে-ছিল কিনা তা কেউ জানে না।

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—তা নাহারগড়ে এক বাঙালী ডাক্তার যখন এল—তার আগে অসুখ হলে লোকে জলপড়া খেত, মানত্‌ করতো ঠাকুর দেবতাকে—আর যাদের পয়সা ছিল, তারা দেখাতো বৈদ্যকে—রাজার বৈদ্য, তার নজরই লাগতো পনেরো টাকা, দাওয়াইএর দাম আলাদা—

ঈশ্বরীপ্রসাদ বলতে লাগলো—নাহারগড় ছোট সহর হলে কী হবে, নাহারগড়ের রাজা খানদানী রাজা। রাজার তিন রাণী। ফি রাণীর তেরটা ঝি। ছত্রিশটা পর্দায়েত, আর লোক-লস্কর, খোজা, রাজকুমার, লালজীসাহেব সব আছে।

আজমীর স্টেশনে একদিন ভোরবেলা এক ছোকরা ডাক্তার এসে ট্রেণ থেকে নামলো। সঙ্গে না আছে সুটকেশ, না আছে বিছানা। দেখে মনে হয় তেইশ চব্বিশ বছর বয়েস।

যখন আজমীরে ছিলাম, তখন খানিকটা কাহিনী সদানন্দবাবুর কাছেও শুনেছিলাম।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—মশাই, এই যে

রাজপুতানা, দেখছেন, যার কোথাও জায়গা নেই এইখানে তার ঠিক জায়গা মিলবে!

বাঙালী-মিষ্টির দোকান করেছেন সদানন্দবাবু। বাঙালী কেউ আজমীরে এলে ওখানে আসতেই হবে। বাঙলা দেশ ছাড়িয়ে এত দূরে ছানার খাবার, দুটো বাঙলা কথা, মাছের ঝোল-ভাত ওইখানেই পাবেন। বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর, চিতোর চারধারে। মাঝখানে এই আজমীর।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—নাহারগড়ের রাজবাড়িতে বিয়ে—সন্দেশ রসগোল্লার অর্ডার হয়েছে আমার ওপর—আরও হুকুম হয়েছে মেজরাণীকে রসগোল্লা তৈরি শিখিয়ে দিতে হবে— গিয়ে দেখি রাজবদ্যি ওখানকার বাঙালী। ছোকরা বয়েস—দেখেই চিনতে পারলুম—বললাম—আপনি এখানে?

অনেকদিন আগের কথা। এক ছোকরা মানুষ স্টেশনে নেমে সোজা আমার কাছে এসে হাজির। আমি তখন ভিয়েন করতে যাচ্ছি। আমাকে জিজ্ঞেস করলে—এখানে ধর্মশালা আছে কোথাও স্যার?

জিজ্ঞেস করলাম—কোত্থেকে আসছেন।

বললে—কলকাত্তা থেকে—

—সঙ্গে আর কে কে আছে?

বুঝলাম একলা যখন এসেছে তখন তীর্থযাত্রী-টাত্রী কেউ নয়।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কী করেন—

বললে—আমি ডাক্তার!

ডাক্তার শুনেই যেন অবাক হয়ে গেলাম। ডাক্তারি করতে বাঙলা দেশ ছেড়ে এখানে কেন? নিশ্চয়ই কোথাও গোলমাল আছে! জিজ্ঞেস করলাম—সঙ্গে টাকা-কড়ি কিছু আছে?

বললে—আছে।

বুঝলাম মিথ্যে কথা। কাছে টাকা থাকলে মুখের অন্যরকম চেহারা হতো। বাড়ির কারো গয়না চুরি করে এনেছে হয়ত। এ-রকম কত ছেলেই তো এসেছে। আমিও একদিন মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এই মরুভূমির দেশে পালিয়ে এসেছিলাম। আমারই মতন কেউ হবে বোধহয়। হাতে তখন ছানার বারকোষটা, সেটা পাশের ঘরে গিয়ে রেখে আসতে হবে। বললাম—তুমি একটু বোস, আমি আসছি—

বলে খানিক পরেই ফিরে এসেছি দোকানে। কতই বা দেরি হয়েছে! এই দু'মিনিট কি তিন-মিনিট! এসে দেখি ভোঁ-ভাঁ! কেউ কোথাও নেই। বোধহয় আমার জিজ্ঞেস করবার ধরন দেখে সন্দেহ হয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে এদিক-ওদিক দেখলাম। ওই যেখানে এখন সিন্ধিদের দোকানগুলো হয়েছে, ওখানে তখন ফাঁকা ছিল সব। সামনে রেলের লাইনগুলো দেখা যেত। ওদিকে একবার পালিয়ে গেলে আর পাত্তা পাওয়া মুশ্কিল। শেষে আর তার পাত্তা পাইনি।

তা নাহারগড়ে গিয়ে আবার সেই ছোকরার সাক্ষাৎ পেলাম মশাই। রাজা দলজিৎ সিং-এর খাস রাজবদ্যি! উঠতে বসতে ডাক পড়ে রাজবদ্যির!

বললাম—চিনতে পারেন?

কিন্তু তাকেই মশাই আর চেনবার উপায় নেই তখন। নারাহগড় স্টেট্ আপনার কেউ-কেটা নয়। শহর ছোট হলে কী হবে নাহারগড়ের রাজা খানদানী রাজা, রাজার তিন রাণী। তিন রাণীর তেরটা করে ঝি, ছত্রিশটা পর্দায়েত্ আর লোক-লস্কর, খোজা, রাজকুমার, লালজীসাহেব, লালজী-বাঈ—সব আছে। সেই রাজার নেক-নজরে পড়া সোজা কথা নাকি!

চোখে-মুখে কথা সদানন্দবাবুর। বলেন—লোকে বলে বাঙালীর ছেলে ঘর-কুনো—তা দেখে আসুন রাজপুতানা ঘুরে, যত স্টেটের দেওয়ান, নায়েব, ডাক্তার ল-য়্যাডভাইসার সব তো বাঙালী! আর নাহারগড়ে আগে রাজবদ্যি ছিল এক বেহারী, কারো অসুখ হলে দিত হরতুকির বড়ি, ডাক্তার মিত্তির যাবার পর থেকে আর বদ্যির বড়ি কেউ খেতে চায় না—

জিজ্ঞেস করলাম—তা রাজাকে পটালে কী করে ডাক্তার?

ডাক্তার বললে—মেজরাণী উর্মিদা-বাঈএর অসুখ হয়েছে, রাজবদ্যি দেখছে, মোটে সারে না—মরো-মরো অবস্থা, আর আমি তখন আজমীর থেকে টো-টো করে ঘুরতে বেরিয়েছি, বেরিয়ে নাহারগড়ে আছি। রাজবাড়ির পাইক-বরন্দাজ দোকানে আসে, সিনেমায় ছায়াবাজি দেখে, পথে ঘাটে দেখি। তাদের কাছে কথাটা শুনে বললাম—আমি সারিয়ে দিতে পারি উর্মিদা-বাঈজীকে!

কিন্তু দেখবো কী করে। রাজার অন্দর-মহলে ঢুকি কী করে। রাজার পাঞ্জা চাই। অন্ততঃ দিলখুশা সিংএর পাঞ্জা চাই। দিলখুশা সিং হলো অন্দরমহলের খোজা! সারা অন্দর মহলের একমাত্র প্রহরী। সর্বত্র তার গতিবিধি। রানী-সাহেবা থেকে সুরু করে বড়রাণী লালজীবাঈ, বাঁদী, নোকরাণী পর্যন্ত কারোর অন্দর-মহলের বাইরে আসতে গেলে দিলখুশা সিং-এর পাঞ্জা চাই!

বললাম—তা হলে কী হবে?

তারা বললেন—আপনি রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন—

রাজপ্রাসাদের পশ্চিমে বিরাট লেক্-এর পাড়ে রেসিডেন্ট সাহেবের বাঙলা। একদিন ভোর বেলা তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। দেখা কি হয়। দেখা কি করতে চায়। বেঙ্গল থেকে আসছে শুনেই তখনকার সাহেবরা ভাবতো টেররিস্ট। রেসিডেন্ট অসবর্ণ সাহেব বার কয়েক দেখলে আমার দিকে। মেডিকেল ডিগ্রীটা হাতে নিয়ে পড়লে কতবার। তাতেও কি সন্দেহ যায়! জিজ্ঞেস করলে—এখানে তুমি কী করতে এসেছ বাবু?

বললাম—মেজরাণী উর্মিদা-বাঈএর অসুখের খবর শুনে এসেছি—যদি সারাতে পারি, যদি রাজার নেক-নজরে পড়ে ভাগ্য ফেরাতে পারি, তাই—

তা লিখে দিলে রেসিডেন্ট সাহেব একটা চিঠি রাজার নামে!

রাজা-সাহেবের সঙ্গেও দেখা হওয়া সোজা ব্যাপার নয়। রাজা তো রাজা! রাজা দলজিৎ সিং বাহাদুর। পারিষদ আমলা কর্মচারীরা বলে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী তাঁর রাজ্য। মোগল সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে সম্রাট আকবরের কাছে বীরত্বের জন্যে বাহবা পেয়েছিলেন নাহারগড়ের পূর্বপুরুষ রাজা চিক্মৎ সিং বাহাদুর। পুরুষানুক্রমে এখন সে-বীরত্বের খেতাব পেয়েছেন রাজা দলজিৎ সিং। কিন্তু আর কিছু বীরত্ব দেখাবার এখন আর দরকার হয় না। দরকার হলে শুধু রেসিডেন্ট সাহেবকে নিয়ে কিম্বা বড়লাট বাহাদুরকে নিয়ে শিকার করতে যান। আমলা-কর্মচারীরা ঢাক পিটিয়ে বিট্ দিয়ে বাঘ-ভাল্লুক তাড়িয়ে নিয়ে আসে রাইফেল-এর আওতার ভেতরে আর তিনি হাতীর পিঠের হাওদায় চড়ে ফায়ার করেন। তা মেজরাণীর অসুখে তিনিও মনমরা হয়ে ছিলেন। তারপর রেসিডেন্ট অসবর্ণ সাহেবের চিঠি পেয়ে আর দ্বিধা করলেন না। পাঞ্জা পাশ করে দিয়ে আমলাদের হুকুমনামা দিয়ে দিলেন। রোগী দেখে ডাক্তার বেরিয়ে আসবে তারপর সে-পাঞ্জা কেড়ে নেওয়া হবে। যতদিন না রোগ সারে ততদিন!

যথারীতি পাঞ্জা দেখাতে হলো অন্দর-মহলের গেটে! খোজা দিলখুশা সিং পাঞ্জা পরীক্ষা করে নিয়ে গেল মেজরানীর মহলে। মহলের পর মহল অতিক্রম করে, কত সুড়ঙ্গ, কত গলি, কত বিচিত্র ঘাগরা ওড়না সুরমা-আঁকা চোখের অপাঙ্গ দৃষ্টি পেরিয়ে তবে আসতে হয়। ঝালর ঘেরা মশারির ভেতর মেজরাণী উর্মিদা-বাঈএর ঘর। মশারীর আড়ালে উর্মিদাবাঈ শুয়ে ছিলেন। দিলখুশা সিং-এর কথায় ওপাশ থেকে বাঁদী মশারীর বাইরে মেজরাণীর হাতটা বাড়িয়ে দিলে। পরীক্ষা হলো অসুখ। জিজ্ঞাসাবাদ হলো। কী খাচ্ছেন না-খাচ্ছেন সব প্রশ্ন। সব প্রশ্নের উত্তর হলো ওপার থেকে বাঁদীর মারফৎ।

এই রকম তিনদিন। তিনবার যাওয়া-আসা করতে হলো ডাক্তারকে। ওষুধও চলছে। আজমীর থেকে ওষুধ আনিয়ে

খেতে দিলে। দিলখুশা সিংকে ভালো করে বুঝিয়ে বললে। তারপর রাজার পাঞ্জা দেখিয়ে রাজকোষ থেকে টাকা নিতে হলো।

কিন্তু এতেও তখন অত তাজ্জব কিছু হয়নি।

হলো হঠাৎ। রাজার কাছে খবর গেল নতুন বাঙালী ডাক্তার সাহেব মেজরানীকে ভাল করে দিয়েছে। এবার তলব হলো রাজার আম দরবারে।

সদানন্দবাবু বললেন—একেই বলে ভাগ্য মশাই—হয়ত মায়ের একগাছা সোনার চুড়ি চুরি করে নিয়ে এসেছিল—শেষে হয়ে গেল রাজবদ্যি! পুরোন রাজবদ্যির খেলাত গেল। শুধু জায়গীরটা রইল। নতুন ডাক্তার তিন হাজারী জায়গীর পেলে, —রাজা রাজড়ার ব্যাপার, কখন কার ভাগ্যে ফুলের মালা আর কার ভাগ্যে জুতোর মালা জোটে কে বলতে পারে!

জিজ্ঞেস করলাম—তা ডাক্তারি পাশ করেছেন আপনি, আপনার চাকরির ভাবনা কী? বাঙলা দেশে একটা জোটাতে পারেন নি এতদিন?

ডাক্তার বললে—বাঙলা দেশে মুখ দেখাবার অবস্থা ছিল না আর, তা নইলে এখানে আসি—

জিজ্ঞেস করলাম—কেন, কী হয়েছিল?

ডাক্তার চুপ করে গেল। রাজাসাহেব বিরাট প্রাসাদ করে দিয়েছে ডাক্তারের জন্যে। সামনে বাগান। আর শুধু তো রাজত্বই নয়, রাজকন্যাও—

—কী রকম?

সদানন্দবাবু বললেন—তবে শুনুন—

সে-এক ইতিহাস বটে! আমাদের চোখে তো বটেই। নাহারগড়ের ইতিহাসেও। নাহারগড়ের রাজা ভারি বিলাসী মানুষ। কাজ-কর্ম তো নেই মশাই, কেবল বিলাস। নইলে রসগোল্লা তৈরি করতে গিয়ে আমি মাঝখান থেকে পাঁচটা হীরের আংটি, একটা গরদের জোড় আর সাতশো টাকা ইনাম নিয়ে এলাম! রাজবাড়ির আমলা-মহকুমা-দরবারের লোক খেয়ে একেবারে বাহোবা-বাহোবা করতে লাগলো! এমন মেঠাই খায়নি কখনও—বড়রাণী নিজে তাঁর হাতের পান্নার আংটি দিয়ে তারিফ করে পাঠালেন! অথচ রসগোল্লা তৈরি করতে ছাই শিখেছে, রসগোল্লা তৈরি কি অত সহজ মশাই, তাহলে তো সবাই পারতো......তা শেষে রাজা-সাহেবের পেয়ারের লোক হয়ে উঠলো ডাক্তার। রোগ কারো হোক আর না হোক, ডাকো ডাক্তার সাহেবকে! দুপুরবেলা গরমে ঘুম আসছে না, ডাকো ডাক্তার সাহেবকে! অন্দরে [illegible] বানিয়েছে, ডাকো ডাক্তার সাহেবকে! এমনি যখন-তখন ডাক! [illegible]

রাজার হুকুমে হুজুরে হাজির হওয়াই তো রাজবদ্যির আসল কাজ!

তবু যখন সময় থাকে হাতে, যখন একলা ঘরে মরুভূমির গরমের রাত্রে ডাক্তার শুয়ে থাকে আর ঘুম আসে না তখন মনে পড়ে আর একজনের কথা। আসবার দিন জোর করে হাতে গুঁজে দিয়েছিল একগাছা সোনার চুড়ি।

সুধাময় বলেছিল—ঋণ শোধ করে দেব একদিন, সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া আজ আর আমার কিছু বলবার মুখ নেই—জানো—

বনলতা বলেছিল—একে ঋণ না-ই বা বললে—ধরো না কেন, তোমাকে দিলাম আমি ওটা—

সুধাময় খুব হেসেছিল সেদিন কথাটা শুনে।

বনলতা বলেছিল—অত হাসছো যে?

সুধাময় বলেছিল—আমাকে জুতো মারার ব্যাপারটা তুমি এখনও ভুলতে পারোনি দেখছি—আমি কিন্তু ভুলেই গেছি—

বনলতা কিন্তু হাসেনি। বলেছিল—যারা এত সহজে সব ভুলে যায়, তাদের নিয়ে কিন্তু ভয়ের কথা!

সুধাময় তখন বনলতার হাতটা ধরেছিল নিজের হাত দিয়ে। বললে—আমাকে নিয়ে কিন্তু তোমার অত ভয় করবার দরকার নেই—অপমানটাই সহজে ভুলি, তাবলে ভালবাসাও ভুলবো এমন পাষণ্ড নই আমি—

বনলতা বলেছিল—চিঠি দেবার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে কি?

পাশের বাড়ির মেয়েরা বলতো—আজ তোমার ডিউটি নেই বনলতাদি?

একটি দিনের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে যেন পৃথিবীতে। একদিন আগেও যে-ছিল নেহাৎই পর, হাওড়া স্টেশনে সেই সুধাময়ের গাড়িটা ছেড়ে দেবার পর কেমন যেন ফাঁকা লাগলো সমস্ত কিছু। অথচ সুধাময় তার কে-না-কে? একই হাসপাতালের একজন ছাব্বিশ বছর বয়েসের নার্স আর একজন সদ্য পাশ করা ডাক্তার। চেহারাতেও কত ছোট দেখায়!

বনলতা শুধু বলেছিল—আমার জন্যেই তোমার আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে যেতে হলো—

সুধাময় বললে—আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে আমার লাভ হলো কি লোকসান হলো তা এখনো বলার সময় আসেনি—

বনলতা বলেছিল—সে-সময় আর কি আসবে?

সুধাময় বলেছিল—না এলে তোমার জুতো মারাও যেমন মিথ্যে হবে, তেমনি তোমার চুড়ি দেওয়াও মিথ্যে হবে, আমার [illegible]

দিয়েছিল। লিখেছিল—রাজপুতানার মরুভূমির দেশে এসে এখনও ওয়েসিসের সন্ধান পাইনি। রাস্তায়-রাস্তায় চানা-ভাজা খাই আর কুয়োর জল ভরসা। তোমার চুড়ি-গাছা আজো খরচ করতে ভয় হয়, ওটা কাছে রেখে দিই সব সময়, তুমি যে আছো তার উপলব্ধিতে সান্ত্বনা পাই—

চিঠিটার কোথাও বনলতাকে যেতে বলার অনুরোধ নেই। বার-বার চিঠিটা পড়লে বনলতা। তারপর চিঠিটা আঁচলে বেঁধে রেখেই উনুনে ভাত চড়িয়ে দিলে। ছাব্বিশ বছর বয়েস তো, সত্যি কথাটা লিখতে আত্ম-অহমিকায় বাধলো। চাকরি জোটেনি তবু লিখলে—নতুন একটা হাসপাতালে চাকরি নিয়েছি, কলকাতা থেকে দূরে, সময়মত উত্তর না-পেলে কিছু মনে কোর না—

দুপুরবেলা ভাত খেয়ে উঠে মেঝেতেই গড়িয়ে পড়লো বনলতা। সুধাময় তো দেখতে আসছে না।

কিন্তু রাজপুতানা কলকাতা নয়। নাহারগড়ও কলকাতা নয়।

আর ডাক্তার সুধাময়ের বয়েসও তেইশ। সে কী করে বুঝবে ছাব্বিশের ব্যথা। সকাল থেকে উঠে প্রথম কাজ সাজ-গোজ

করা। দরবারে গিয়ে রাজা দলজিৎ সিং বাহাদুরকে কুর্নিশ করে বসে থাকতে হয়। তারপর দরবার শেষ হতেই বাড়ি এসে খেয়ে নিয়ে দৌড়তে হয় রাজ-প্রাসাদের তয়খানাতে। দিবানিদ্রার পর রাজা-সাহেব তখন দাবা খেলতে বসেন। আগে অন্য সংগী ছিল, এখন ডাক্তার। এককালে রাজ-মন্ত্রীজী, দেওয়ানজী, রাণীজী, পর্দায়েৎজী, পাশোয়ানজী সবাই সংগ নিয়েছে দাবা খেলায়। এখন হয়েছে ডাক্তার।

রাজা-সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন—দাবা খেলা আসে ডাক্তার?

মহারাজার সামনে না বলতে নেই। বললে—জানি হুজুর—

এককালে দাবা খেলেছে সুধাময়। তখন ছিল আড্ডার নেশা। এখন চাকরি বাঁচাতে দাবা খেলতে হয়। এই দাবা খেলতে খেলতেই একদিন সুধাময়ের জীবনে চরম আত্মোপলব্ধি এল। আবার আত্মবিভ্রমও এল বলা চলে। এই দাবা খেলতে না বসলে বনলতার জীবনেও এই দুর্দৈব আসতো না। আর গল্প-লেখক হিসেবে আমিও সরবতি বাঈ-এর কাহিনী জানতে পারতুম না।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—আমি গিয়েছিলাম রসগোল্লা বানাতে, আর শুনে এলুম সরবতি বাঈ-এর গল্প—

রাজ-অন্দরমহলের ব্যাপার। কখনও তো দেখিনি। না-দেখলে তা বোঝবার সাধ্য নেই কারো। গোলাপী ওড়না আর অসূর্যম্পশ্যাদের চকিত চাউনির ভিড়। এখানে সুড়ংগ, ওখানে কটাক্ষ। নানা তোষামোদ আর হাহাকারের ভিড় ঘাগরা আর সুরমা কাজলের রহস্য। বাইরের জগতের বিশ্ব-পৃথিবীর খবর এখানে পৌঁছয় না। এখানেই জন্ম আর এখানেই মৃত্যু হয়েছে এমন নারীর ইতিহাসই এখানে বেশি। শেঠ আর বেনেদের ঠাকুরাণীরা আসে উৎসব-পার্বণে, দোল-যাত্রায়। কেউ ফিরে যায়, কেউ রাজা-সাহেবের নজরে পড়ে গিয়ে আর ফিরতে পারে না। কারো কারো উচ্চাকাঙ্ক্ষা তালকটোরার বন্দীশালায় ধূলিসাৎ হয়। রাজার নজরে একবার পড়ে গেলে জীবনের কোনও সাধ আর অপূর্ণ থাকবার নয়। তার জন্যে কত সাধ্য-সাধনা। খোসামোদ করতে হয় মহারাণীকে, মাজী-সাহেবাকে, পর্দায়েৎ, পাশোয়ানজীকে আর সকলের চেয়ে বেশি খোসামোদ করতে হয় একমাত্র প্রহরী খোজা দিলখুশা সিং-কে। কিন্তু সরবতি বাঈ তাদের মধ্যে একজন হলেও—ঠিক তাদের মত নয়।

খেলায় রাজা-সাহেবই বেশিবার হারেন। হারলেই তো খেলে আনন্দ। ভারি উৎসাহ রাজা-সাহেবের।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন — সেকালের বিগ্রহ ছিল, এখনকার রাজাদের আছে কী মশাই! শুধু কোথায় সুন্দরী মেয়ে আছে নিয়ে এস, কার সুন্দরী বউ আছে ধরে আনো। এমনি করে অসংখ্য মেয়ে-মানুষে ভরে গেছে অন্দর-মহল। সেখানে একমাত্র পুরুষ হলো রাজা-সাহেব। তা সব সময়েই কি আর সে-সব ভালো লাগে! মাঝে মাঝে তাই শিকার-টিকার করেন, দাবা-টাবা খেলেন। তা নাহারগড়ের রাজার আবার বয়েসটাও কম। তিন রাণী, সেই রাণীর বয়েসও আবার রাজার বয়েসের চেয়ে বেশি! মহারাজার বয়েস যখন বারো, বড় রাণীর বয়েস তখন কুড়ি, মেজ রাণীর বয়েস তখন ষোলো, ছোট রাণী তখনও আসেই নি। আবার প্রত্যেক রানীর সংগে বাপের বাড়ি থেকে যৌতুক-পাওয়া তেরটা-চোদ্দটা করে ঝি, তাদেরও এইরকম জোয়ান বয়েস। তা ছাড়া আছে রাণীদের সখীরা, আছে বাইরের উপহার পাওয়া মেয়ে, কেউ এসেছে ইচ্ছে করে, কাউকে আনা হয়েছে ভুলিয়ে ভালিয়ে। রাত্রে গান-বাজনার উৎসবে তাদের কাউকে চোখে লেগে গেল তো তার বরাত খুললো। কাউকে আবার ষড়যন্ত্র করে গুম্ করে ফেলা হলো তালকটোরার ঘরে। সারা-জীবন আর রাজা-সাহেবের নজরে না পড়তে পারে। তা সুন্দরী মেয়েদের ভাগ্যে বিড়ম্বনাই বেশি কি না। আমি যে অন্দর-মহলে ঢুকলাম, মেজ-রাণীকে রসগোল্লা তৈরি করতে শেখালুম, কাউকে এক-পলকের জন্যে দেখতেও পাইনি, খোজা-সাহেবের আইন এমনি কড়া!

কিন্তু ডাক্তারের ব্যাপার আলাদা! রাজ-বদ্যি তায়, রাজা-সাহেবের পেয়ারের লোক!

ডাক্তার বলে—হুজুর, গজ বন্দী হলো আপনার!

রাজা-সাহেব বলেন—তোমার মন্ত্রীর কী দশা করি দেখ ডাক্তার—

প্রাসাদের তয়খানা একেবারে মাটির নিচের তৈরি। গরমের দিনে ভারি আরাম সেখানে। ভেতরের অন্দর-মহল থেকে সুড়ংগ পথে আসা-যাওয়ার রাস্তা আছে। দরকার হলে রাজা-সাহেব হাততালি দেন আর সংগে সংগে হুকুম তামিল হয়। ঘাগরাপরা দাসী বাঁদী আসে। জল দরকার হলে জল, সরবৎ দরকার হলে সরবৎ, যা চাই সব।

রাজা-সাহেব আমলাদের বলেন—ডাক্তারের মাথা খুব সাফ্—

শুধু মাথা নয়, ডাক্তারের সবই ভালো। ডাক্তার কাছে এলেই হাসি বেরোয় মুখে। যে-কাজ কেউ আদায় করতে পারছে না, ডাক্তারকে বললেই তামিল হয়ে যাবে। ডাক্তারের কথায় 'না'-বলবার সাধ্য মহারাজার নেই! সম্মানে উঁচু-নিচু হলেও বয়েসটা বাঙালীর বুদ্ধি! বুঝলেন, সেই কোন দূরে বাঙলা দেশ থেকে খালি হাতে এসে একেবারে সর্বস্ব দখল করে নিলে। সাধে কি আর মশাই সবাই চটে গেছে আমাদের ওপর?

বললাম—তারপর কী হলো বলুন?

সদানন্দবাবু বললেন—তারপরেই তো সরবতিবাঈ এল। দুপুর থেকে খেলা চলেছে। পর-পর দুবার হার হয়েছে রাজা-সাহেবের, এবারও হারবার মত অবস্থা। কিস্তী মাৎ হবো-হবো! ডাক্তারের কাছে পারবার উপায় নেই। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো!

ভীষণ গরমের দিন। হলেই বা তয়খানা। পাকা চোত্ মাস। বাইরে তো লু চলে। আকাশের তলায় আই-ঢাই করে প্রাণ। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে চিঁ চিঁ করে। ডাক্তারের জল তেষ্টা পেয়ে গেল!

ডাক্তারের ও-সব আরক-মোদক কিছুই চলে না। বললে—এক গ্লাস জল চাই—জল!

রাজা-সাহেব হাততালি দিলেন। সে-হাততালির মানে যারা বোঝে তারা বোঝে! হাত-তালির ইংগিত পেতেই পেছনের সুড়ংগের পথ দিয়ে বেরিয়ে এল সরবতি বাঈ!

খেলা ফেলে ডাক্তার চেয়ে রইল সেই দিকে। গোলাপী বুটিদার ঘাগরা, বুকে সোনালী এক-চিলতে কাঁচুলি আর পাতলা ফিনফিনে জাফরাণী জরিদার ওড়না। গায়ে আর কোথাও কিছু নেই। মাথায় সোনার ঘড়া। দুহাতে ঘড়াটা আলতো করে ধরে ঘরে এসে দাঁড়ালো। হেঁটে এল না সরবতি-বাঈ, যেন ভেসে এল। ডাক্তার জল খেয়ে আবার দাবার চাল দিলে। কিন্তু আর যেন জমলো না।

রাজা-সাহেবও অবাক হয়ে গেছেন। সেই প্রথম হার হলো ডাক্তারের।

ওঠবার সময় রাজা-সাহেব মাথায় পাগড়ি পরে বললেন—তোমায় আমি একটা উপহার দেব ডাক্তার।

—উপহার?

রাজা-সাহেব বললেন—তুমি তো বিয়ে করোনি?

ডাক্তার বললে— না—

—তবে এবার তুমি বিয়ে করো!

ডাক্তার অবাক হয়ে গেছে। বললে—কাকে?

—সরবতিকে তোমার হাতে দেব—

ভাবুন একবার! ইতিহাসে এমন ঘটনা কেউ কখনো শোনেনি, দেখেনি। মোগল-সরকারের আমলে অবশ্য বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সে তো রাজনীতি। লালজী-সাহেব, বাঈজীলালজীদের কারো কারো এমন [illegible]

কোনও মেয়ের ভাগ্যে এমন ঘটনার কথা ইতিহাসে নেই। সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কোন বাঈজালজীর বিয়েতেও এত ঘটা হয় না। বায়না চলে গেল এখানে-সেখানে। জুতোওয়ালা জুতো তৈরি করতে বসলো। মেঠাইওয়ালা মেঠাই বানাতে লাগলো। এখান-ওখান থেকে কুটুম্বরা আসবে। এলাহি কাণ্ড। রসগোল্লা বানাবার ফরমাজ হলো আমার ওপর! কিন্তু যাদের নিয়ে কাণ্ড, যাদের বিয়ে তাদের বুক দুর-দুর করে কাঁপছে।

দিলখুশা সিং পিঠ চাপড়ে দিলে সরবতি বাঈএর। যা, বে'চে গেলি বেটি! তোর দেমাগ্ খুশ্ হবে এবার!

আর ডাক্তার! ডাক্তার সুধাময়। কলকাতার মেডিকেল কলেজের এম-বি ডাক্তার তারও আবার ভয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুম আসে না ডাক্তারের চোখে। অনেক মাইল দূরে একটি মেয়ে এই রাত্রে হাসপাতালে ডিউটি করতে করতে হয়ত একবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই তার—কোথাও নেই আশ্রয়। একগাছি সোনার চুড়ি দিয়ে একজন নিরুদ্দেশ যাত্রীকে একদিন সাহায্য করেছিল। তারপর হয়ত আবার অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে মেতে আছে।

চিঠি লেখে বনলতা। লেখে—চাকরিতে মোটে সময় পাই না। সময়-মত চিঠি না দিতে পারলে ভেবো না, নতুন দেশ, দুধ খাবে আর ও-দেশে তো খাঁটি ঘি পাওয়া যায়—তার ব্যবস্থা কোর, এখানে ইলিশমাছ উঠেছে, তোমার জন্যে মন কেমন করে—

ছাব্বিশ বছর বয়েসের দৌর্বল্য থাকে বনলতার চিঠিতেও। যেন উপদেশ দেয়, যেন উ'চুতে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে চাওয়া। ঠিক সমানে-সমানে নয়।

সুধাময়ের চিঠিও আসে। লেখে—তোমার সোনার চুড়িটা আর বেচবার দরকার হবে না, তবু কাছে রাখি, মনে হয় তুমি কাছাকাছি আছো, একেবারে হৃদয়ের কাছাকাছি—

বার-বার চিঠিগুলো পড়ে বনলতা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে। রান্না করবার ফাঁকে ফাঁকে পড়ে। কই, কোথাও তো যেতে লেখেনি তাকে। হয়ত এখনও ভালো করে গুছিয়ে বসেনি সুধাময়। ভালো করে ঘর সাজাতে হবে, ভালো করে ব্যবস্থা করতে হবে। বনলতাকে তো যেমন-তেমন করে রাখা যায় না। যেখানে-সেখানে! নিজে মুখ ফুটে কি বলা যায়—আমি যাচ্ছি! যেতে তো কই লেখে না! কেমন করে কই লেখে—তুমি চলে এসো বনলতা, আমি তোমার জন্যে ঘর সাজিয়ে বসে আছি। ছাড়ো তোমার চাকরি, আমি তো আছি। চাকরি তোমার, আমি আর [illegible]

এ-হাসপাতাল থেকে ও-হাসপাতাল। কোথাও গিয়ে বনে না বনলতার।

একটু অসুবিধে হলেই বলে—দেখুন, আপনাদের মতো নয় আমার, আমার চাকরি না করলেও চলে—

সরলাদি বলে—হ্যাঁ বনলতাদি, তুমি নাকি এক ডাক্তারকে জুতো মেরেছিলে?

চমকে ওঠে বনলতা। কে বললে?

এখানে হাওড়াতেও তাহলে কথাটা প্রচার হয়ে গেছে। বলে—তোমার সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বোলো দিও, দরকার হলে তাঁকেও জুতো মারতে বাধবে না আমার—

সরলাদি বলে—কাজ কি ভাই ও-সব ভেবে, চাকরি করতে যখন এসেছি, চাকরি না করে কি চলবে আমাদের? এই তো আমাদের কপাল—

বনলতা বলে—তোমাকে তাহলে সত্যি কথাই বলি সরলাদি—চাকরি আমি করবো না বেশিদিন।

সরলাদি যেন অবাক হয়। বিশ্বাস

করে না।—বলে—চাকরি না করে কী করে চালাবে বনলতাদি?

বনলতা বলে—কলকাতা ছেড়ে চলে যাবো!

—কোথায়!

বনলতা বলে—যেখানে হোক—আমরা কাজ জানি, কাজ জানলে খাবার জায়গার অভাব—

সরলাদি বলে—আমাকেও সংগে নিও বনলতাদি, আমারও আর ভাল লাগে না, খবর-কাগজ খুলে তাই কেবল চাকরি-খালির বিজ্ঞাপনগুলো দেখি—

বনলতা বলে—যাবে আমার সংগে—সে কিন্তু অনেক দূরে—

—অনেক দূরে! কোথায় শুনি?

—নাহারগড়।

সরলাদি বলে—নাহারগড় আবার কোথায় ছাই, নাম শুনিনি তো! সে-কোথায়?

—রাজপুতানায়!

সরবতিবাঈ বলেছিল—বাঙলা দেশ, সে কোথায়?

সুধাময় বলেছিল—সে অনেক দূরে।

অনেক দূরত্বটা আন্দাজ করতে গিয়ে সরবতি বাঈ-এর চোখ দুটোও বড় বড় হয়ে আসে। অনেক দূরের মানুষকে যেন ভয় হয়। সরবতি বাঈএর চোখে যেন কেবল ভয়ের ছায়া। রাজসাহেব কোনও ত্রুটি রাখেননি। আজমীর, বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর থেকে আত্মীয় কুটুম্বরা এসেছে। অন্দর মহলে এসে ঢুকেছে। রাজপুরোহিত এসে মন্ত্র পড়িয়ে বিয়ে দিয়েছে। ও বিয়ে যখন, তখন বাঙালী-মতেই হোক আর রাজপুত-মতেই হোক—হলেই হলো!

বিয়ে ফুলশয্যা বৌভাত সবই রাজোচিত। রাজা-সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন একবার —তোমার আত্মীয়-স্বজন কাউকে নেমন্তন্ন করতে হবে না?

কিন্তু আছে কে যে নিমন্ত্রণ করবে। বিয়ে যারা দেবার লোক তারা সবাই আছে সুধাময়ের কিন্তু সম্পর্ক যখন রাখেনি কেউ তখন আর দরকার কী। আর রাজা-সাহেব একাই তো এক শো। একা রাজা-সাহেব সহায় থাকলে আর কারো সাহায্য চায় কে!

সরবতি বাঈ ফুলশয্যার রাত্রেই বলেছিল —আমাকে ছুঁয়ো না—

হয়ত প্রথম লজ্জার ভান! কিন্তু রাজ-অন্দর মহলে মানুষ, যৌবন নিয়ে যত রকম বেসাতি আছে সব তো তার নখ-দর্পণে থাকা উচিত। চোখের সামনেই তো দেখেছে যৌবন কী করে বিশ্বজয় করে। সামান্য চাষার গরীব মেয়ে কী করে একদিন মহারাণীর চেয়েও উঁচু পদ পেয়ে যায়।

ছোট বেলায় বাবা একদিন বলেছিলেন—এবার চাকরিতে ঢুকে পড়ো আর আমি তোমায় পড়াতে পারবো না—

করেছে। বললে—কেরাণীগিরি আমি করবো না—

রেগে গিয়েছিলেন বাবা। বলেছিলেন—তা হলে তোমার যা ইচ্ছে করো—আমার আর পড়াবার ক্ষমতা নেই—

কাকাদের কাছে গিয়েও দরবার করতে হয়েছিল—। তাঁরা বলেছিলেন—ডাক্তারি পড়া তো চারটিখানি কথা নয়—শুধু টাকা হলেই তো চলবে না, মাথাও চাই—

বাবা অবশ্য তার ডাক্তারী পাশ করা দেখতে পাননি। মা-ও না। দেখেছিলেন কাকাবাবু। কিন্তু তারপরেই তো লজ্জায় কলঙ্কে দেশ ছেড়ে পালাতে হলো। বাঙলা দেশের সংগে তার আর সম্পর্কই রইল না। ক্ষীণ একটু সম্পর্ক রইল যার সংগে, সে বনলতা। কিন্তু বনলতাকে এ-খবরটাই বা জানানো যায় কেমন করে! রবিবার দিন সকালবেলাই একটা চিঠি এসেছিল বনলতার। লিখেছে—চাকরিতে বড় ব্যস্ত থাকতে হয়—মোটে সময় পাই না—ভাবছি অন্য হাসপাতালে চাকরি নেব, এখানে মেট্রন সুবিধের লোক নয়—

থাক। বনলতা তার চাকরি নিয়েই ব্যস্ত থাক!

আর সুধাময় এখানেই থাকুক! সরবতিয়া বাঈ আছে, রাজা-সাহেব আছেন, ভয় কী তার!

সুধাময় জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কী ভয় করছে?

কোনও উত্তর দেয়নি সরবতিবাঈ! গোলাপী বুটিদার ঘাগরা, এক চিলতে কাঁচুলী আর জাফরাণী রঙের পাতলা ওড়নার আড়ালে নিজেকে যেন সুদূরে করে রেখেছিল। যেন স্পর্শ করলে জাত যাবে তার।

কিন্তু সত্যিই শেষ পর্যন্ত জাত যায়নি সরবতিবাঈ-এর।

বলেছিল—তুমি আমাকে সাদী করলে কেন বাবুজী?

সুধাময় জিজ্ঞেস করেছিল—কেন, তুমি কি সুখী হও নি?

তখন রাজা-সাহেব মারা গেছেন। তিন রাণী বিধবা হয়েছে। ভোল বদলে গেছে রাজ্যের। ডাক্তারের আগেকার প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে গেছে। শুধু আছে জায়গীরী। তিন হাজারী থেকে পঞ্চাশ হাজারী করে গিয়েছিলেন রাজা-সাহেব, তাই আছে। সরবতিয়ার তখন শোচনীয় অবস্থা। তাকে আর স্পর্শ করা যায় না। ইনজেকশনের পর ইনজেকশন দেয় সুধাময়। রাতদিন তার ঘুম নেই। বড় বড় বই আনায় সুধাময়। ডাক্তারী শাস্ত্রে এত ওষুধ আছে, এ-রোগের চিকিৎসা হবে না, এ-রোগ আরোগ্য হবে না, তা কি হতে পারে! আস্তে আস্তে ঘায়ের ওপর মলম লাগিয়ে দেয় সুধাময়। সরবতিয়া বাঈ-এর মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে দিতে হয়। যন্ত্রণায় ছটফট করে সরবতি বাঈ!

সরবতি বাঈ কাতর চোখে জিজ্ঞেস করে, —আমাকে তুমি কেন সাদী করেছিলে বাবুজী?

কিন্তু তখন আর কার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে সুধাময়। যার কাছে চাইবার তিনি আর তখন নেই। রাজা-সাহেব তখন লালজী-সাহেবদের ষড়যন্ত্রে খুন হয়ে গেছেন। তাঁর প্রেতাত্মা তখন অন্তঃপুরের মহলে-মহলে, ভালকটোরার কুটুরীতে সুড়ঙ্গের অলিতে-গলিতে, অলিন্দে-অলিন্দে আর মাজীসাহেব, মহারাণী, পর্দায়েৎ পাশোয়ান-জীদের কক্ষে কক্ষে নিঃশব্দ হাহাকার করে বেড়ায়।

ফুলশয্যার রাত্রে নির্জন ঘরে সরবতি বাঈ-এর সেই উন্মত্ত রূপ আবার ঝড় ওঠালো। সুধাময় আবার সেই দিকে চেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। সেই দাবা খেলার সময় যেমনভাবে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল বাইরে মরুভূমির রাত্রি যেন যাদুমন্ত্রে মদির হয়ে উঠেছে। রাজার আদেশে এ ঘরে আজ সমারোহের সীমা নেই। আতর গোলাপজল, ফুল, পানীয়—কিছুরই অভাব রাখেননি তিনি। অন্তঃপুরের মহিলারা উৎসবের শেষ সমবেত গানটি গেয়ে বিদায় নিয়েছে। বাইরে উৎসবের বাকি অংশ এখনও চলছে, কানে ভেসে আসছে সে-সুর।

সরবতি বাঈ চীৎকার করে উঠলো—পায়ে পড়ি বাবুজী, আমাকে ছুঁয়ো না—

—কেন?

বিয়ের ইতিহাসে নববধূর এ-আচরণ কখনও শোনা যায়নি। অন্ততঃ সুধাময় কখনও শোনেনি। তবু সে রাত্রি তেমনি করেই কেটে গেল। দুজনেই জেগে। একজন পালঙ্কের ওপর, আর একজন পালঙ্কের নিচে। রাত্রের ফুল সকাল হলেই শুকিয়ে এল। আতর গোলাপজলের তীব্র সুগন্ধও কখন মরুভূমির শুখনো হাওয়ায় মিলিয়ে এল। ভোর হবার সংগে সংগে সরবতি বাঈ সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল আর বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সুধাময়।

আজ থেকে কত বছর আগেকার এ-সব ঘটনা। এ-সব ঘটনা, এ-সব শোনা কাহিনী মনে পড়তো না, যদি না তোমার চিঠি পেতাম। এ সেই বনলতারই কাহিনী। সরবতিবাঈ এ-কাহিনীর কিছু না। তবু বনলতার কাহিনী বলতে গেলে সরবতি-বাঈ-এর কাহিনী না বললে চলবে না।

বনলতা তোমারই মত একদিন ছিল ছাব্বিশ বছরের মেয়ে। তোমারই মত চাকরি করতো সে। আর তোমারই মত মুখ ফুটে মনের কথাটা বলতে লজ্জা পেতো। তোমারই মত [illegible]

বড় হওয়ার জ্বালা তো আছেই। তাই তো বলি সেই জ্বালা ঢাকবার জন্যে লজ্জা আরো খারাপ।

সরলাদি বলতো—কার সোয়েটার বুনছো বনলতাদি?

সুধাময়ের নামটা করতে যেন লজ্জা করতো বনলতার। বলতো—কেউ না কেউ আসবেই, তখন তাকেই দেব—

সরলাদি বলতো—কেউ এলে এখনই আসতো—আমাদের বয়েস তো হু হু করে বেড়ে চলেছে ভাই—

এক-একদিন সরলাদি বলতো—রাজ-পুতানায় যাবে বলেছিলে, যাবে না?

বনলতা বলে—দূর, ও তোমাকে এমনি বলেছিলাম—

তবু তন্ন তন্ন করে সুধাময়ের চিঠিগুলো পড়েও কোথাও তাকে আহ্বানের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। চিঠির কোথাও একটুকু হা-হুতাশ নেই। একলা থাকবার হা-হুতাশ! কোথাও কোনও ইঙ্গিতও নেই তার। লেখে—চাকরি করতে গেলে ও-সব একটু সহ্য করতেই হয়, সহ্য করবে মুখ বুজে। তোমার সেই সোনার চুড়িটা এখনও কাছে রেখে দিয়েছি। ওটা তোমায় ফেরৎ পাঠাবো না—। ওটা কাছে রেখে দিয়ে শান্তি পাই—মনে হয় তুমি আমার কাছাকাছি আছো—

তারপর?

তারপরেও পড়ে দেখে বনলতা। কোথাও তো এ-কথা লেখা নেই—'তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসো, চাকরি করবার দরকার নেই তোমার—'। এ-কথা স্পষ্ট করে কেন লেখে না সুধাময়।

রাতের নির্জনে আবার দেখা হয় সরবতি বাঈ-এর সঙ্গে। একদিনেই যেন চেহারা করুণ হয়ে উঠেছে। রাজার প্রাসাদের অন্তঃপুর ছেড়ে সুধাময়ের বাড়িতে এসে উঠেছে সরবতি বাঈ! রাজা-সাহেব দুজনের একটা বিরাট অয়েল-পেণ্টিং করে দিয়েছেন। সেটা দেয়ালে টাঙানো হয়েছে। চমৎকার মানিয়েছে সরবতি বাঈকে। তবু সুধাময়ের মনে হলো সরবতি বাঈ যেন ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে থাকে ইচ্ছে করে।

হাত বাড়াতেই সরবতিবাঈ সরে গেল। বললে—আমাকে ছুঁয়ো না তুমি বাবুজী!

নিজের স্ত্রীকে ছুঁতে পারবে না সুধাময়, এ-কেমন অনুরোধ!

সরবতি বাঈ বললে—না, আমার অসুখ আছে।

অসুখ! দাঁড়াই এক-পা পেছিয়ে এল সুধাময়! অসুখ যদি সরবতি বাঈ-এর তো সেও তো. ডাক্তার। কী অসুখ! কেমন অসুখ! সব অসুখের ওষুধ আছে। অসুখ সারিয়ে দেবে সুধাময়। অসুখের [illegible]

সরবতি বাঈ বললে—আমাকে ছুঁলে তোমারও অসুখ হবে বাবুজী!

সুধাময় এবার সোজা হয়ে প্রশ্ন করলে—কী অসুখ?

সরবতি বাঈ বললে—ওরা সবাই তোমাকে জব্দ করবার জন্যে তোমাদের দাবা খেলার আসরে আমাকে পাঠিয়েছিল—তোমার ওপর ওদের খুব রাগ—

সুধাময় জিজ্ঞেস করলে—রাগ কেন?

সরবতি বাঈ বললে—রাজা-সাহেব যে তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল বাবুজী!

—তা আমাকে জব্দ করবে কী করে শুনি?

সরবতি বাঈ বললে—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে—তোমার জীবন বরবাদ্ করে দিয়ে?

সুধাময় বললে—তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমার জীবন বরবাদ হবে কেন?

সরবতি বাঈ বললে—হ্যাঁ, বাবুজী, আমার জীবনও বরবাদ হয়ে গিয়েছে—

সব শুনে অবাক হয়ে গেল সুধাময়। সরবতি বাঈ বললে—আমার মত আরো অনেক মেয়ে আছে বাবুজী, কাউকে জব্দ করতে গেলে তাদের দিয়ে মন ভুলিয়ে জওয়ানী বরবাদ করে দেওয়া যায়,—

—আর তারা?

সরবতি বাঈ বললে—তারা ওখানেই একদিন যন্ত্রণায় ছটফট্ করে কুষ্ঠ হয়ে মারা যায়—

সুধাময় বললে—রাজা-সাহেব জানেন এ-সব, কথা?

সরবতি বাঈ বললে—হুজুর সব ব্যাপার জানেন, শুধু আমার ব্যাপারটা জানেন না, এ খোজা দিলখুশা সিং-এর মতলব, লালজী সাহেবের চক্রান্ত আর বড় রাণী চন্দ্রাবতুজীর পরামর্শ—

এ-সব অনেকদিন পরের কথা। পরদিন সকালেই সুধাময় দরবারে গিয়ে রাজা-সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চাইলে। আমলারা বললে—রাজা-সাহেব তো আজ দরবার করবেন না হুজুর—

—কেন?

—সে তাঁর খুশী!

কিন্তু পরদিনও রাজা-সাহেব এলেন না। কিন্তু খবরটা তার পরদিন বেরুল। রেসিডেণ্ট্ সাহেব এলেন, তদারক চললো কিছুদিন। অনেক জল গড়িয়ে গেল আরাবল্লীর গিরি-খাত দিয়ে, অনেক মোহর, অনেক টাকা, অনেক ইনাম সুড়ঙ্গের অন্ধকার গলিতে গিয়ে আত্মগোপন করলো। সারা-রাজ্যময় তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল সেদিন। কত গুজবের সৃষ্টি হলো, কত কাহিনী। কেউ বলে—এ লালজী সাহেবের কাজ।

কেউ বলে—রাণী চন্দ্রাবতুজীর [illegible]

কেউ বলে—দিলখুশা সিং-এর হাত আছে—

রেসিডেণ্টের রিপোর্ট গেল দিল্লীতে—নাহারগড়ের রুলিং প্রিন্স্ হার্ট ফেল করে মারা গেছেন।

সরবতি বাঈ বললে—আমার জন্যে কেন তক্‌লীফ করছেন বাবুজী,—

বেশি কথা বলে না সরবতি বাঈ। শুধু বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট দুটো শুধু এক-একবার কাঁপে। বলে—ও-সাদী আমাদের সাদী নয় বাবুজী! আমাকে ভুলে যান্ আপনি—

সুধাময় বই খুলে তখন পড়ছে। দিন-রাত বই পড়ে আর জিজ্ঞেস করে। বলে—তোমার ভুখ্ আছে?

আবার কখনও পড়তে পড়তে কী একটা সন্দেহ হয়। বলে—আমার কাছে লজ্জা কোর না, আমি ডাক্তার যা যা জিজ্ঞেস করি বলো তো...

অদ্ভুত জীবন। এত অদ্ভুত জীবনের পরিচয় সুধাময় তার ডাক্তারী বইতেও কখনও পড়েনি। কোথাকার সব বাছাই করা মেয়ে। কাউকে কিনে আনা, কাউকে চুরি করে আনা। গ্রামের সব মেয়ে। হয়ত জল তুলতে এসেছিল কুয়োর ধারে তারপর আর কেউ তার সন্ধান পায়নি। একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে অকারণে। তারপর এসে তাদের তুলে দিয়েছে দিলখুশা সিং-

এর হাতে। তারপর যারা বেশি সুন্দরী, তাদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে রোগের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে শরীরে। যখন কাউকে জব্দ করতে হবে, কারুর জীবন বরবাদ করে দিতে হবে, তাকে উপহার দেওয়া হয় এক-রাত্রির জন্যে। তারপর রোগের বীজাণু শরীরের কোষে কোষে রক্তকনিকায় মিশে গিয়ে বিষাক্ত করে দেয় সমস্ত। তারপর যন্ত্রণা। কঠোর যন্ত্রণায় জীবনের অবসান হয় এক-রাত্রির বিভ্রমে।
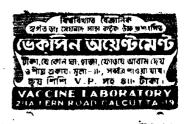
সরবতি বাঈ বলে—আমাকে তুমি কেন সাদী করলে বাবুজী?

অনেক দিন আগের কথা!

একদিন রাত্রে হঠাৎ অন্দর-মহলের দরজা খুলে গেল। খবর গেল দিলখুশো সিং-এর কাছে। একদিন মোগল আমলে এখানে যুদ্ধ-বিগ্রহের দিনে সশস্ত্র পাহারা বসেছে। মহারাজা যুদ্ধে গেছেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। খবর এসেছে পরাজয়ের। মোগল-সৈন্য দলে দলে ছুটে আসছে নাহারগড় লক্ষ্য করে। সড়কী, ঢাল, তরোয়াল, ঘোড়া, উট নিয়ে তৈরি হয়ে আছে এখানকার প্রহরীরা। ভেতরে অন্তঃপুরে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। খোজা-প্রহরীরা কান পেতে আছে। মোগল সৈন্য অন্তঃপুরে ঢোকবার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। আগুনের কুণ্ড তৈরি হবে, একে-একে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে মাজী-সাহেব, বড়রাণী, মেজরাণী, ছোটরাণী, সখী, পর্দায়েৎ, পাশোয়ানজী, দাসী, বাঁদী, কেউ আর বাকি নেই। এক-এক করে আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে। মোগল-সৈন্য যেন দেহ স্পর্শ না-করতে পারে। সবাই জহর-ব্রত করবে! কিন্তু সেদিন আর এখন নেই!

তবু আজো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। দিলখুশো সিং নিজেই এসেছে মশাল নিয়ে।

বললে—মুখটা দেখি—?

মুখটা দেখে খোজা দিলখুশো সিং-ও অবাক হয়ে গেল। এত কম বয়েসের মেয়ে আর এত রূপ!

দিলখুশো সিং-এর হাতে ছেড়ে দিয়ে লোক দুটো আবার অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ইস্পাতের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে। তারপর মহলের পর মহল পেরিয়ে চললো দিলখুশো সিং আর ছোট একটি মেয়ে। শেষে এসে পৌঁছুলে একটা ঘরে। দিলখুশো সিং-এর ঘর। ঘরের কোণ থেকে বেরোল একটা লাল কাপড়ে বাঁধা খাতা। খাতার পাতাগুলো খুলতে খুলতে বললে—নাম কি তোমার ছোকরি?

ছোকরি বললে—মোহর বাঈ—

নামটা লিখে নিলে দিলখুশো সিং। তার পর নিয়ে গেল বড়রানীর কাছে। ঘরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বড়রাণী তখন আল-বোলায় তামাক খাচ্ছিলেন। আফিং-এর নেশাও করা ছিল। পাশে কয়েকজন সখী বাঁদী সেবা করছে। সামনে পানের বাটা।

দিলখুশো সিং-এর অবাধ গতি। ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে—চন্দাবতজী—

চন্দ্রাবতজী চন্দ্রাবৎ বংশের মেয়ে। বললেন—কে?

দিলখুশো সিং সামনে গিয়ে মোহরকে এগিয়ে দিলে। বললে—সেলাম কর—

—কে এ?

—নতুন এসেছে আজ। নাম—মোহর বাঈ—

বড়রাণী ভালো করে চোখ তুলে চাইলেন। সখীরাও দেখলে, বাঁদীরাও দেখলে ভালো করে। দেখে হেসে গড়িয়ে পড়লো তারা। বললে—ওমা, একেবারে ঠাণ্ডি সরবতের মত চেহারা যে—

সব দেখে শুনে মোহর বাঈ আরো তাজ্জব হয়ে গেছে। এ-কোথায় এল সে। রাজার বাড়ি দেখাবে বলে তারা বাপকে দু'শ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এল। বললে—মেয়ে তোমার সুখে থাকবে শেঠজী—খেয়ে পরে বাঁচবে, তারপর রাজা-সাহেবের নজরে যদি একবার পড়ে যায় তখন আর পায় কে! তারপর গরুর গাড়ি চড়ে এখানে এনে কোথায় পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল তারা। এ যেন পরীদের দেশে এসে পড়েছে সে।

হঠাৎ বড়রাণীর গলার শব্দে তার যেন জ্ঞান ফিরে এল।

বড়রানী বললেন—ঠাণ্ডি সরবতের মতন চেহারা—ওর নাম থাক সরবতি বাঈ—

সেই থেকে নাম হলো সরবতি বাঈ।

সরবতি বাঈ অন্তঃপুরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এ-মহল থেকে সে-মহল। দোলের দিনে ফাগ মাখে, বিয়ে-সাদীতে মেঠাই খায়। দেওয়ালীতে নতুন জামা পরে। যাত্রা-ছায়া-বাজী এলে দেখে। গান শোনে। অভিনয় দেখে। পুজো-পার্বণে যোগ দেয়। আর সবাইকার মতই একজন।

তারপর একদিন বয়েস হলো। দিলখুশো সিং বলে—সরবতিয়াজী, অত দুষ্টুমি করে না, এখন তোমার বয়েস হয়েছে—

বয়েস সত্যিই হলো একদিন। সেই বয়েস হওয়াই কাল হলো তার। পায়ে জরির জুতো উঠলো। বুকে কাঁচুলি উঠলো, মাথায় ওড়না উড়লো। চুলের বেণী ঝুললো, পায়ে মল, কানে ঝুমকো, গলায় হার—সব। এ-সব রাজবাড়ির নিয়ম। এ-নিয়ম চলে আসছে অনাদি কাল থেকে। এখন যারা পর্দায়েৎ হয়েছে—তারাও এক-কালে এমনি করে এসেছে। পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে এসেছে। তাদের কাছে পুরুষ একমাত্র রাজা-সাহেব। আর কোনও পুরুষ নেই। এ-জগতে একজন পুরুষ আর সব নারী। ওই পুরুষটির মনোরঞ্জনের জন্যেই এই অসংখ্য নারীর জীবন-যৌবন-মান-সম্ভ্রম সমস্ত কিছু।

কিন্তু হঠাৎ এক দুর্দৈব ঘটলো সরবতি বাঈ-এর জীবনে।

হোলির উৎসব হচ্ছে। চারিদিকে ঝাড়-লণ্ঠন, ফুল, পাতা, লাড্ডু, মেঠাই-এর ছড়া-ছড়ি। নতুন কাপড়, জামা, জুতো, ওড়না, ঘাগরার আমদানী হয়েছে। সবাই আসতে শুরু করেছে। দূরে দূরে খানদানী ঘরে নেমন্তন্ন গেছে। তাদের ঝি-ঝিউড়ি, বউ, বহিন সব এসেছে। কিন্তু সবাই সরবতি বাঈ-এর দিকে চেয়েই চমকে যায়—! এত রূপ! এত রূপও হয়! যেন সকলকে হারিয়ে দেবে আজ। রাজা-সাহেবের সামনে আজ সবাইকে হার মানতে হবে। সকলের পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়না, সাজা-গোজা সব ব্যর্থ। এক সরবতি বাঈ আজ সকলকে কানা করে দেবে।

সবাই বলে—ও কে বহিন?

—ও সরবতি বাঈ—

সর্বনাশ! রাজা-সাহেবের চোখে পড়তে দেওয়া উচিত হবে না এমন রূপকে। এমন রূপসীকে আড়ালে না সরালে আজ সকলকে কানা করে দেবে! দিলখুশো সিংকে চুপি চুপি ডেকে পাঠালেন বড়রানী চন্দ্রাবতজী! তারপর কি কথা হলো কেউ জানে না। কেউ শোনেনি সে-কথা। শুধু, যখন উৎসব হলো তখন আর সরবতি বাঈকে কেউ আর দেখতে পেলে না সেদিন। সরবতি বাঈ তখন তালকাটোরার বন্দীশালার অন্ধকারে চুপ করে বসে আছে।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। উৎসবে সরবতি বাঈ-এর অধিকার নেই বটে। কিন্তু অধিকার আছে অন্য কাজে। আরো গুরুতর কাজ! রাজ্যের ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের কাজে তাকে ব্যবহার করা হবে। এমন রাখতে হয়। যখন রাজার শত্রুতা করছে কেউ, ষড়যন্ত্র করছে রাজ্যের বিরুদ্ধে, তাকে খাতির আপ্যায়ন করে এনে বসিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে আরক খাইয়ে অসাড় করে ওই সব রূপসী নারীদের এগিয়ে দেওয়া হয়। এই-ই তাদের কাজ। জীবন বরবাদ করে দেওয়া হয় শত্রুদের। তাদের ধ্বংস করা হয় এইভাবেই।

শুধু কি সরবতি বাঈ! ও-মহলে ওই কাজের জন্যে আছে মতিয়া বাঈ, আখতারি বাঈ, গোলাপী বাঈ। বেশিদিন বাঁচে না তারা। তবু জীইয়ে রাখতে হয়। খেতে পরতে দিতে হয়। ভালো-ভালো সাজ-পোশাক দিতে হয়। তারপর অনেক রাত্রে একদিন দিলখুশো সিং মশাল নিয়ে এসে দরজার চাবি খোলে আর আধা-অন্ধকারে ঘরে টুপ করে ঢুকে পড়ে একটা বিকলাঙ্গ মূর্তি! এসে জড়িয়ে ধরে সাপের মত। তারপর রাত্রির রোমাঞ্চ কাটতে পাঁচ কি সাত দণ্ড লাগে মাত্র। দিলখুশো সিং আবার তাকে বার করে নিয়ে যায়। তারপর আবার। তারপর দিনও আবার। আলো

করে রক্তের অণু-পরামাণুতে মিশে যাক বীজাণু। ভালো করে অস্থি-মাংস-মজ্জায় শেকড় গাড়ুক। কোথাও কোনও ফাঁক না থাকে!

মতিয়া বাঈ, আখতারি বাঈ, গোলাপী বাঈ সকলেরই জীবনে এমনি ঘটেছে। সরবতি বাঈ-এর জীবনেও ঘটলো।

বড়গাজীর শেঠ খানদানী লোক। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার অনেক মতলব। রতন-গড়ের নবাবের কাছে গিয়ে নাহারগড়ের রাজা-সাহেবের কুৎসা করে। জমিদারীর প্রজাদের ওপর হামলা করে। গরু-ঘোড়া-উটের পাল চুরি করে নিয়ে যায়। এর মূলে ছিল বড়গাজীর শেঠ। তাকেই জব্দ করতে হবে। রেসিডেণ্ট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করে আপীল-আদালত যা-কিছু সে তো হবেই, কিন্তু শেঠজীকে জব্দ করা দরকার। একদিন ডেকে আনা হলো খাতির করে। খাওয়ানো হলো পেট ভরে। আরক এল। বাঈজী এল। আর রাত্রি গভীর হলে এল গোলাপী বাঈ। গোলাপী বাঈ-এর সংগে এক বিছানায় রাত কাটালো শেঠজী! আর শেঠজীর অস্থি-মাংস-মজ্জায় গোলাপী বাঈ-এর সমস্ত কামনা প্রতিশোধ হয়ে প্রতিহিংসা হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে গেল। তারপর চার কি পাঁচ বছর! রাজা-সাহেবের সব শত্রু নিপাত হয়েছে এমনি করে।

সরবতিবাঈ শুধু কাতর চোখে চায় আর ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—আমাকে তুমি সাদী করলে কেন বাবুজী, আমরা সাদীর জন্যে নয় যে—.

এবার কিন্তু অন্য ঘটনা। রাজা-সাহেবও জানে না। এ দিলখুশা সিং বড়রানী আর লালজী সাহেবের কাণ্ড! তিনি হাজারী থেকে পঞ্চাশ হাজারী জায়গীর পেয়ে গেল বাঙালী ডাক্তার চালাকী করে। রাজা-সাহেব ডাক্তার-সাহেবের কথায় ওঠেন বসেন। তাকে জব্দ করতে হবে। রোজ দাবা খেলতে বসে, তক্তখানায়। যখন জলের জন্যে রাজা-সাহেব হাততালি দিবেন জল নিয়ে যাবে সরবতি বাঈ!

সকাল থেকে দিলখুশা সিং অনেক পোশাক-আশাক দিয়ে গেছে। কুঙ্কুম, বাসতেল, ফুল, সোনার বলেওড়া, পেঁছা-কঙ্কম, কপালের টিপ। ভালো করে সাজো, ভালো করে ঘষে মেজে মোহিনী মূর্তি ধরো, খেলার মোহ ভাঙাও—। আপত্তি করলে চলবে না, রাজ্যের ভালো-মন্দের জন্যে সব স্বার্থত্যাগ করতে হবে। কাঁদলে চলবে না!

তারপর মোহিনী মূর্তিতে সাজিয়ে তক্তখানার পাশের ঘরে রেখে এল সরবতি বাঈকে।

দিলখুশা সিং বললে—রাজা-সাহেব তিনবার হাততালি দিলেই বুঝবি জল [illegible] হাততালি দিলে আরক,

রাজা-সাহেব হাততালি দিলেন তিনবার।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—পরে আর এক-বার গিয়েছিলাম মশাই নাহারগড়ে। সেবারও ওই রসগোল্লার বায়না, সরবতি বাঈ-এর বিয়ের সময় রসগোল্লা খেয়ে খুব ভালো লেগেছিল, আবার তাই হুকুম হয়েছে।

তা গেলাম, তখন দলজিৎ সিং মারা গেছে, খোজা দিলখুশা সিং আর বড়রানী চন্দ্রাবতজীর রাজত্ব। বড় কুমার-সাহেব গদীতে বসেছে। ডাক্তারের আর সে-খাতির নেই। ডাক্তার তখন এক কাণ্ড করে বসেছে।

বললাম—কী কাণ্ড!

সদানন্দবাবু বললেন—ভীষণ কাণ্ড। সারা-জীবনেও মশাই এমন কাণ্ড কেউ শোনেনি।

জিজ্ঞেস করলাম—আর বনলতা?

—কে বনলতা! সদানন্দবাবু চিনতে পারলেন না।

বললেন—দেখলাম বটে একজন মহিলাকে—

—কী রকম চেহারা?

চেহারা বনলতা রায়ের এমন কিছু ভালো নয়। পাঁচ-পাঁচি একরকম। লোকে বলতো—মুখের গড়নে কী যেন একটা আছে! ওই জন্যেই একদিন সুধাময় বোধ হয় একটা রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারেনি। তার মূল্যও সেদিন দিয়েছে সে। সারা জীবন ধরেই সে মূল্য দিতে হয়েছে তাকে। আর সে-মূল্য কি কম মর্মান্তিক।

সরবতি বাঈ যেদিন মারা গেল সেদিন সুধাময় নদীর ধার থেকে সোজা নিজের ঘরে এসে বসলো। সেই যে ঘরে ঢুকলো জীবনে সে-ঘর থেকে বেরোয়নি আর। কখন সকাল হয়েছে, কখন সন্ধ্যে হয়েছে, কখন রাত হয়েছে, কখন সারা নাহারগড় ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে খবর রাখতো না। কেউ কেউ দেখেছে। রাস্তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখা গেছে, ডাক্তার ঘরের ভেতর বসে-বসে কী সব লিখছে। পাতার পর পাতা। লোকের রোগ হয়েছে, ডাক্তারের কাছে এসেছে রোগের ওষুধ নিতে।

জিজ্ঞেস করেছে—ডাগ্‌দার সাব্‌ হ্যায়?

চাকর এসে বলেছে—না, সাহেব ডাক্তারী করে না আর—

অনেক রাত্রে বই পড়তে পড়তে পাতার ওপর চোখ দুটোকে স্থির করে দেয়। যেন ধ্যানে বসেছে সুধাময়। সরবতি বাঈ মারা গেছে যন্ত্রণায়। ডাক্তারের ওষুধ তাকে বাঁচাতে পারেনি। ডাক্তারী বিদ্যে কোনও কাজে লাগেনি। পৃথিবীর কোনও ওষুধ তাকে সারাতে পারেনি। এক-একদিন সরবতি বাঈ-এর পাশে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে শুধু দেখেছে তাকে। জিজ্ঞেস করেছে—আজ কেমন আছো?

সরবতি বাঈ শুধু চোখ দিয়ে কথা বলেছে। কথা বলবার শক্তি ছিল না শেষ পর্যন্ত। যেন বলতে চেয়েছে—আমাকে কেন সাদী করলে বাবুজী!

সুধাময় বললে—আর একটা ইনজেকশন্ দিচ্ছি—এটা নিয়ে কেমন থাকো দেখি—

একটার পর একটা ওষুধ এনেছে কলকাতা থেকে, বোম্বাই থেকে আর খাইয়েছে সরবতি বাঈকে। বই-এর পর বই কিনেছে আর পড়েছে। এ-বুঝি মধুজ্ঞানের জগতের এক আজব রোগ। এ রোগের কথা কেউ লেখেনি আগে। সরবতি বাঈ-এর সমস্ত শরীর আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করলো। তারপর কথা বন্ধ হলো, তারপর চোখ অন্ধ হলো। সে-যন্ত্রণা আর চোখ দিয়ে দেখা যায় না। তবু সরবতি বাঈ-এর সারা দেহখানা নিজের দুহাতে তুলে ধরে তাকে ধুইয়ে দিতে হয়, পরিষ্কার করে দিতে হয়। সমস্ত গায়ে দুর্গন্ধ। এত যে সুন্দরী, এরই সৌন্দর্য দেখে একদিন সুধাময় অবাক হয়ে গিয়েছিল, এখন আর সে-কথা ভাবা যায় না। কয়েক মাস বেশ ভালো ছিল, আবার রোগ হলো, আবার ভালো হলো, তারপর আবার সেই।

সমস্ত বাড়িটা সেদিন যেন থম্‌ থম্‌ করছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ। পশ্চিম দিকের খেজুর গাছের পাতায় শুধু শুকনো বাতাসের খস্‌ খস্‌ শব্দ আসছে একটু। একটা পাখি নিঃশব্দে উড়ে যেতে যেতে বুঝি হঠাৎ ডানা ঝাপ্‌টিয়ে দিক্‌-পরিবর্তন করলো। সরবতি বাঈ যে-ঘরটায় শুয়ে থাকতো সেটা আজ ফাঁকা। তবু সেইদিকে চেয়ে সুধাময়ের মনে হলো, কেউ যেন কাঁদছে। সরবতি বাঈ-এর কান্নার শব্দ। ঠিক সেই রকম গলা। বলছে—কেন আমাকে সাদী করলে বাবুজী! অস্ফুট স্বর যেন আস্তে আস্তে আবার অনেক দূরে মিলিয়ে গেল। সমস্ত নাহারগড় যেন স্থির হয়ে আছে। নতুন রেসিডেন্ট্ এসেছে লেকের ধারে বাঙলোতে। নতুন সাহেব। রাজপ্রাসাদ থেকে নতুন করে দামী ভেট্ গেছে সাহেবের কাছে। রাজা-সাহেবও নতুন, রেসিডেন্ট্‌ও নতুন। তবু বড়রাণী আছে, খোজা দিলখুশ্‌শা সিং আছে। রাজপ্রাসাদের সমস্ত চক্রান্ত সাহেবের চোখ থেকে আড়ালে রাখতে হবে। সরবতি বাঈ গেছে, মোতিয়া বাঈ, আখতারি বাঈ, গোলাপী বাঈও হয়ত গেছে। তাদের জায়গায় আবার হয়ত এসেছে অন্য কোনও বাঈ। সরবতি বাঈ-এর ঘরে অন্য কোনও মেয়ে এসে আবার হয়ত বন্দী হয়েছে। আবার যদি রাজা-সাহেবকে কেউ হাত করে ফেলে আবার সরবতি বাঈ সেজে সোনার ঘড়ায় জল নিয়ে হাজির হবে তয়খানাতে! তা হলে মুক্তি কোথায়! সরবতি বাঈ, আখতারি বাঈ, গোলাপী বাঈদের মুক্তি কোথায়?

ডাক্তারী বই পড়তে পড়তে হঠাৎ সুধাময় উঠলো। ক'দিন ধরে দাড়ি কামানো হয়নি। টিম্‌ টিম্‌ করে আলো জ্বলছে ঘরে, সমস্ত মুখটা বিভৎস হয়ে উঠলো আয়নার ছবিতে। হঠাৎ যেন সরবতি বাঈ অলক্ষ্যে কথা বলে উঠলো—আমাকে তুমি কেন সাদী করলে বাবুজী?

এই কেন'র উত্তর দেওয়া হলো না সুধাময়ের। সরবতি বাঈ-এর সমস্ত শরীর পঙ্গু হয়ে গেছে তখন। কথা বলতে পারে না। লোক চিনতে পারে না। চোখ মুখ নাক কান সব বিকৃত হয়ে গেছে। সেই রূপ কোথায় গেল। কোথায় গেল সরবতি বাঈ! অন্ধকার রাতগুলোতে সরবতি বাঈ-এর বিকৃত রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শুধু দেয়ালের অয়েল-পেন্টিংখানা নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে।

সেদিন সকাল বেলাই ডাক্তার মাধোলালকে ডেকেছে।

বললে—আজ থেকে যে আসবে, বলবি আমার সংগে দেখা হবে না—

মাধোলাল বললে—যদি রাজা-সাহেব এত্তেলা দেয়?

সুধাময় বললে—তবু না—

—যদি রাণীসাহেবা এত্তেলা পাঠায়?

—তবু না—

—যদি...

কেউ না, কেউ না। কেউ নেই সুধাময়ের। সরবতি বাঈ ছাড়া ইহলোকে পরলোকে কেউ তার নেই।

তেত্রিশ মাইল রাস্তা। গরুর গাড়ি ঝাঁকুনি দিতে দিতে চলেছে। রাত থাকতে বেরিয়েছি। বাবলা কাঁটার ঝোপ-ঝাপ পেরিয়ে মেটে রাস্তা ধরে চলা। ছায়া-ছায়া দিন। ভারত মহাসাগরের ধারে ধারে নুনে জমাট বাঁধা খাল-বিল। রোদ লেগে চিক্ চিক্ করছে। পাণ্ডা ঈশ্বরীপ্রসাদ গল্প বলে চলেছে শুধু।

এ-ও আজ থেকে কতদিন আগের কথা। সব স্পষ্ট মনে নেই।

আজ তোমার চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে আবার সব মনে করবার চেষ্টা করছি। আজমীরের সদানন্দবাবুর কাছে সুধাময় ডাক্তারের সবটা শোনা হয়নি। সদানন্দবাবু সবটা জানতেনও না। রসগোল্লার বায়না পেয়ে নাহারগড়ে গিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে যেমন-যেমন দেখেছিলেন তেমনি বলেছিলেন আমাকে। প্রথমটা শুনি টুন্ডু ঘাসিমার কাছে কলকাতায়। তারপর আজমীরে। বার বার ভাগে ভাগে গল্প শুনে একটা আধা-সম্পূর্ণ কাহিনী পেয়েছিলাম। আর আজ শুনছি শেষটা। বনলতা রায় কেমন করে বনলতা মিত্র হলো সেই গল্প।

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—পয়সা তো ডাক্তার-মা নেয় না—ডাক্তার-মা'র হাসপাতালে কারো পয়সা লাগে না—

অথচ পয়সার একদিন কী অভাবই ছিল বনলতার।

সরলাদি বলেছিল—সব কেমন-কাটা হলো বনলতাদি?

বনলতা বললে—আর পয়সা নেই ভাই—

সরলাদি বলেছিল—গিয়ে চিঠি দিও কিন্তু—

কিন্তু সরলাদি চলে যেতেই মনে পড়ে গেল। সুধাময়ের জন্যে কাগজ বিলিয়েছে। ডাইরেক্টারের আমলের [illegible]

পড়ে। ট্রেনভাড়া বাদ দিয়ে হাতে আর কিছু নেই। হঠাৎ মনে পড়লো একটা কথা। আবার দোকানে যেতে হলো। বললে—সি'দুর দিন তো এক প্যাকেট—ভালো সি'দুর—

দোকানী একবার বনলতার সি'থির দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর প্যাকেটটা দিয়ে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। দাম নিতে গিয়ে বনলতার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখলে কিছুক্ষণ! বনলতা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলে। তার মুখ চোখও কি সি'দুরের মত লাল হয়ে গেছে। জানতে পেরেছে নাকি সবাই!

মুখের কথার প্রতীক্ষায় নির্ভর করে আর বনলতার দেরি করা চলে না তখন। তখন ছাব্বিশ ছত্রিশে গিয়ে পে'ৗছেছে। রাত্রে ডিউটি করতে গিয়ে ঘুম এসে পড়ে। সারাদিন ঘুমে ঢোলে চোখ। আর শুধু কি চোখ! মনেও বুঝি ক্লান্তি নেমেছে। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সমস্ত দেহ। তবু কোথায় যেন বিরাট অসম্পূর্ণতা। নিঃসহায়, নিরবলম্ব অপার শূন্যতা। বনলতা ট্রেনে উঠে বার বার ভাবতে চেষ্টা করলে—কোনও অন্যায় সে করতে যাচ্ছে না। তার বয়েস ছত্রিশ আর সুধাময়ের তেত্রিশ। আজকের এই তেত্রিশ মাইল পথের মতই দীর্ঘ। ছায়া আছে কিন্তু প্রখর রোদের তেজে কি কখনও ছায়ার আশ্রয় খোঁজেনি সুধাময়! কখনও ছায়া নিবিড় আশ্রয়ের সন্ধানে আকুল হয়নি! তবে কেন সে চিঠি লেখা ছেড়ে দিলে। বনলতার একটা চিঠিরও জবাব সে দেয় না কেন!

মাধোলাল প্রথমে বাঙালী মেয়ে দেখে আপত্তি করেছিল—। বলেছিল—দেখা হবে না—

বনলতা বলেছিল—দেখা হবে না কেন?

—ডাগদারবাবুর হুকুম—

বনলতা বলেছিল—তুমি বলো, আমি দেখা করবোই, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি—কলকাতা থেকে—

মাধোলাল বলেছিল—ডাগদার সাহেব কারো সঙ্গে দেখা করেন না হুজুর,—শুধু ওষুধ খান—আর লেখেন—

—কী লেখেন?

মাধোলাল বলেছিল—লিখে লিখে খাতা ভর্তি করেন, খাতায় বোঝাই হয়ে গেছে ঘর—

[illegible]প্রণয়ের সঙ্গে যেদিন ডাক্তার-মা'র হাসপাতালে গিয়েছিলাম, সেদিন বনলতা মিত্র আমাকে দেখিয়েছিলেন সে-সব খাতা। বনলতা মিত্রকেও সেদিন বহু বছর পরে প্রথম দেখেছিলাম। সমস্ত চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। [illegible] নজর। রোগীরা সবাই বনলতাকে ডাক্তার-মা বলে ডাকে। দূরে সমুদ্রের জল চিক্ চিক্ করছে। বনলতার বসবার ঘর থেকে বাইরের সে-দৃশ্যটার সঙ্গে ডাক্তার-মা'র চেহারারও কোথায় যেন সাদৃশ্য ছিল। যেন তেমনি বিরাট, তেমনি প্রশান্ত, তেমনি প্রশস্ত।

বনলতা দেবী বললেন—ডাক্তার মিত্র ওই সব খাতায় নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন প্রথম দিনটি থেকে, সমস্ত খুঁটি-নাটি, অনেক খাতা কপি করিয়ে পাঠিয়েছি জার্মানীতে, তা থেকে নতুন তথ্য আবিষ্কার হবে বলে তাঁরা চিঠি লিখেছেন—এই দেখুন সে-চিঠি—

আমাদের জলখাবার এল। দেখলাম, বনলতার জীবনে যেন এতদিনে স্থৈর্য এসেছে। যেন এতদিন এই সত্য-সাধনা, এই পরিপূর্ণতার দিকেই তিনি একাগ্রচিত্তে এক লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। প্রথম যৌবনের সেই প্রমত্ততার কোনও লক্ষণ আর নেই সেখানে। যেদিন প্রথম নাহারগড়ে এসেছিলেন সেদিনও চিত্ত তাঁর স্থির ছিল না।

সুধাময় বলেছিল—কেন তুমি এলে বনলতা?

বনলতা বলেছিল—আমি যে বড় দেরি করে ফেলেছি—আর অপেক্ষা করতে পারছি না—কবে তুমি আমাকে আসতে বলবে তার প্রতীক্ষা যে আমার অসহ্য হয়ে উঠলো—

—কিন্তু আমি যে...

বনলতা বলেছিল—আমি তোমার কোনও কথা শুনবো না, আমি কলকাতা থেকে একেবারে সি'দুর কিনে এনেছি—

বলে সুধাময় আপত্তি করবার আগেই তার হাতটা চেপে ধরলে বনলতা।

সুধাময় একবার বলতে গেল—আমাকে ছুঁয়োনা বনলতা—

কিন্তু তার আগেই বনলতা সুধাময়ের হাত দিয়ে তার নিজের সাদা সিঁথিতে জোর করে সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর সুধাময়ের পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ছুঁইয়ে বলেছে—তোমাকে দিয়ে জোর করে নিজের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে নেওয়াতেও আর আমার লজ্জা নেই—লজ্জা করবার সময়ও নেই—

সুধাময়ের হাতের আঙুল তখন একটু খসতে শুরু করেছে। সারা গায়ে ঘা বেরিয়ে পুঁজ বেরোচ্ছে। তখন চোখেও আর ভালো দেখতে পায় না। দুদিন বাদে হয়ত কানেও আর শুনতে পাবে না। তবু সুধাময়ের চোখের কোণে যেন একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো। বললে—তুমি এত দেরি করে কেন এলে বনলতা?

বনলতা সুধাময়ের হাত দুটো ধরে বললে—তা হোক, আরো দেরি করিনি—সেই আমার ভাগ্য—

সুধাময় বললে—কিন্তু ওই তুচ্ছ সিঁদুরটুকু ছাড়া যে আর কোনও সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার থাকবে না—

—কে বললে থাকবে না?

সুধাময় বললে—সত্যিই থাকবে না, থাকলে আমার সমস্ত তপস্যা মিথ্যে হয়ে যাবে যে—সরবতিবাঈ যেমন করে যত কষ্ট পেয়ে মরেছে, সেই সমস্ত কষ্টটুকু আমি নিজে পেয়ে মরতে চাই—আর আমার এই লেখাগুলো যদি পারো, বিলেতে কিম্বা জার্মানীতে কোথাও পাঠিয়ে দিও, তারা হয়ত সরবতি বাঈদের আবার বাঁচাতে পারবে—

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—তারপর সেই পঞ্চাশ হাজারী জায়গীর বেচে দিয়ে ডাক্তার-মা এইখানে এসে হাসপাতাল করলেন—যত পারা-রোগী আসে সবাইকে নিজে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করেছেন বিনা-খরচে, ডাক্তার আছে—নিজের তো ও-বিদ্যে জানাই ছিল—যেমন করে ডাক্তার সুধাময়কে সেবা করেছেন তাঁর মরার শেষ দিনটি পর্যন্ত, তেমনি করেই এখানকার রোগীদের সেবা করেন, বাঙলা দেশের কথা ভুলেই গেছেন, এইটেই দেশ হয়ে গেছে এখন ডাক্তার-মার—

ঈশ্বরীপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কিন্তু সরবতি বাঈ-এর রোগ ডাক্তারের হলো কী করে?

ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছিল—ডাক্তার যে ইচ্ছে করে ইন্‌জেকশন নিয়েছিল নিজের শরীরে—

—কীসের ইনজেকশন?

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—ওই পারা-রোগের!

জানি না, তোমাকে আজ যে চিঠি লিখছি এতে তোমার জীবনের পরিণতির কিছু আভাষ পাবে কিনা। কিন্তু একটা কথা আমি নিজেই বুঝতে পারি না আজো। আজো এতদিন পরে মনে আছে সেদিনকার সেই ওয়াপোর্ট থেকে বাবলাকাটার মোটে রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়িতে চড়ে চলতে চলতে আর ঈশ্বরীপ্রসাদের গল্প শুনতে শুনতে নিজের মনকেও আমি এই প্রশ্নই করে ছিলাম।

সুধাময় কেন নিজের শরীরে সিফিলিসের ইনজেকশন নিয়েছিল?

সে কি পৃথিবী থেকে সিফিলিস দূর করবার সাধনায়, না সরবতি বাঈ-এর সমস্ত যন্ত্রণা নিজের শরীরে তুলে নিয়ে সুস্থ সুন্দর সরবতি বাঈকেই পাবার জন্যে। যাকগে, আমার এ-গল্প যে কাকে নিয়ে তাও আমি ঠিক বলতে পারবো না আজ। কে এর নায়িকা? সরবতি বাঈ না বনলতা দেবী! সাধারণ পাঠক যা খুশী ভাবুক—তোমারও কি সে সম্বন্ধে কোনও সংশয় আছে?

এ-গল্প এখানে শেষ হয়ে গেলেই ভালো হোত হয়ত। কিন্তু সে-গল্প আমার-গল্প হতো না। তাই যখন চলে আসছি বনলতা দেবি বললেন—আর একটা জিনিস দেখাতে বাকি আছে আপনাদের—দেখবেন আসুন—

আমাকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন বনলতা দেবী। ঈশ্বরীপ্রসাদ তখন সমুদ্রের ধারে হাত-মুখ ধুতে গেছে। এ-ঘরটা আরো প্রশস্ত। আরো সাজানো। নানা জিনিস সযত্নে সাজানো।

বনলতা দেবী বললেন—এই দেখুন, এখানে ডাক্তার মিত্রের সব জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যে-জুতো ব্যবহার করতেন, যে-কাপড়, যে-জামা ব্যবহার করতেন—সমস্ত! তাঁর যাবতীয় জিনিস। তাঁর চিরুণী, তাঁর চশমা, তাঁর বাঁধানো দাঁতটি পর্যন্ত—

—আর ওই দেখুন—ডাক্তার মিত্রের ছবি!

চেয়ে দেখলাম দেয়ালের গায়ে বিরাট একটা অয়েল পেণ্টিং। সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো। একপাশে ডাক্তার সুধাময়, মাথায় পাগড়ি পরা। বরের পোশাক। আর তার পাশেই সরবতিবাঈ-এর ছবি। জাফরানি ওড়না, গোলাপী ঘাগরা। রাজপুতদের বধূবেশ। যে ছবিখানার কথা শুনেছি সদানন্দবাবুর কাছে। নাহারগড়ের রাজা-সাহেব যে-ছবি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন তাদের বিয়ের দিন।

আমি সেই দিকে চেয়ে দেখছিলাম এক মনে।

বনলতা দেবী বললেন—আমাকে চিনতে পারছেন?

কেমন অবাক হয়ে গেলাম।

বনলতা বললেন—ডাক্তার মিত্রের পাশে—ও তো আমিই—

বললাম—আপনাকে তো চেনা যায় না?

বনলতা বললেন—তখন তো বয়েস কম ছিল, সে-বয়েসে আমায় দেখতেও খুব ভালো ছিল, অনেক ফর্সা ছিলাম, রাজা-সাহেবের ভারি সাধ আমি রাজপুত মেয়েদের পোষাক পরে ছবি তুলি, রাজা-সাহেবই দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন কি না—

একবার মনে হলো জিজ্ঞেস করি—সরবতি বাঈকে আপনি চেনেন?

কিন্তু আমার মুখ-চোখের ভাব দেখে বোধ হয় তাঁর সন্দেহ হলো। বললেন—আর তাছাড়া দুজনেরই বয়েস তখন কম ছিল যে—

বললাম—কত?

বনলতা দেবী বললেন—ওঁর তখন [illegible] ছাব্বিশ আর আমার [illegible]—

আজ থেকে ন'শো বছর পর

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

A. Dutta

আজ থেকে ন'শো বছর পরে আপনাদের দশাটা কি হবে, এখন থেকে একটু ভাবতে বলছি। নিশ্চয় জানবেন, আপনাদের মিছেমিছি ভয় দেখাতে যাচ্ছিনে। যে কথাগুলি বলব তার ভিত্তি হল পরিসংখ্যান। পরিসংখ্যান কথাটা বুঝলেন তো! যাকে বলে স্ট্যাটিস্টিক্স। আর তো গোল নেই। আমার বক্তব্য পরিসংখ্যান দিয়ে বলব। এটা বিজ্ঞান, অতএব আপনারা উড়িয়ে দিতে পারেন না।

ভবিষ্যতের কথা ভাববার আগে একবার অতীতের দিকে তাকান। পৃথিবীতে মানবের সংখ্যা কিরকম হারে বেড়ে গিয়েছে দেখুন।—

খৃষ্টপূর্বাব্দ	পৃথিবীর লোকসংখ্যা
৮০০০	অর্ধ কোটি
৫০০০	২ „
১০০০	১০ „
খৃষ্টাব্দ	
১	২০ „
১৬৫০	৫৪ „
১৭৫০	৭৩ „
১৮৫০	১১৭ „
১৯০০	১৬০ „
১৯৫০	২৪০ „
১৯৫৫	২৫৫ „

আপনি কি বলবেন জানি। বলবেন, সমস্তই গাঁজা। পৃথিবীতে লোকগণনা শুরু হয়েছে তো এই হাল আমলে। খৃষ্ট-জন্মের আট হাজার, পাঁচ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে কত লোক বাস করত তা কে গুণেছে, আর কেই বা তার হিসেব রেখেছে। দেখুন, এসব তথ্য ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে, আর বের করেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। আপনাকে মেনে নিতেই হবে।

আচ্ছা, সকল দেশে, সকল সময় লোক-সংখ্যা কি একই হারে বেড়ে চলেছে। না, তা নয়। দু'একটা উদাহরণ দি। গোটা শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও ওএলসের জনসংখ্যা ৯০ লক্ষ থেকে বেড়ে গিয়ে ৩.৪ কোটিতে [illegible]

লোকসংখ্যা যদি ওই হারে বাড়ত, তাহলে ১৯০০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হত ৬০০ কোটি। জাপানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি, আর ফরাসী দেশে সবচেয়ে কম।

পৃথিবীর এত লোককে খাওয়াচ্ছে কে? আর কে খাওয়াবে, মাতা বসুন্ধরা। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যত শস্য ফলে তা কি সমস্ত পৃথিবীর লোকের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে নয়। হরে দরে হাঁটুজল ব'লে নদী পার হতে গেলে মাঝ দরিয়ায় ডুবতে হয়। বাংলাদেশের কতক লোক বাড়ি বাড়ি ঘুরে একটু ফ্যানও না পেয়ে যখন অনশনে রাস্তায় পড়ে মরছিল, তখন অত্যধিক গমের ফলন হওয়ায় ক্যানেডা প্রচুর গম পুড়িয়ে ফেলেছিল। পৃথিবীর বর্তমান ২৫৫ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৩০ কোটি লোক সচ্ছলে জীবনযাপন করে, বাকি ২২৫ কোটি কষ্টে দিন কাটায়। সবচেয়ে গরিব দেশ বারটি—ইন্দোনেশিয়া, চীন, দক্ষিণ-কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, আবিসিনিয়া, লাইবেরিয়া, ইকুয়েডর, হাইতি, সউদি আরব, য়িমেন, ফিলিপাইন। আফগানিস্থান, ভারতবর্ষ, সিংহল, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশ এদের একটু উপরে, খুব বেশি নয়। ১৯৫১ সাল থেকে ভারতে খাদ্যাভাব আরও বেড়ে গিয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিসংখ্যান থেকে আরও, দেখা যায় যে, ১৯৫৩ সালে আয়রল্যান্ড ছিল সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট, আর ভারত সবচেয়ে ক্ষুধার্ত। পাকিস্থান সহ ভারতের জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ, কিন্তু এই দুই দেশে শস্যের ফলন পৃথিবীর উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ মাত্র। গ্রেট ব্রিটেনের অবস্থাও সেই রকম। তবে সে তার প্রয়োজনীয় খাদ্যের শতকরা ৬৫ ভাগ বাইরে থেকে আমদানি করে, তার দেশে জন্মায় মাত্র ৩৫ ভাগ। আমাদের দেশে সেই রকম করলেই হয়। ব্রিটেন ধনী, আমরা গরিব, একথা মনে রাখতে হবে। [illegible]

অনাবাদী জমিতে আবাদ কর, জমিতে সার দাও ইত্যাদি।

কিছুদিন আগে একটা প্রদর্শনীতে গিয়েছিলুম। কৃষি বিভাগের একটা স্টল, পাশে বনসংরক্ষণ বিভাগের।

প্রথম বিভাগের একজন কর্মী তারস্বরে চীৎকার করছেন,—ভারত স্বাধীন হয়েছে, তার এখন বাইরে থেকে খাদ্য আনা চলে না, খাদ্য সম্বন্ধে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে, অতএব, ভাইসব, যেখানে যত জমি বনজঙ্গলে ভরে উঠেছে সব সাফ কর, জাপানী পদ্ধতিতে ধানচাষ কর। তিনি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। আর একজন, ওই বিভাগেরই, উঠলেন। তিনি আরম্ভ করলেন,—বন্ধুগণ, অবিভক্ত ভারতের প্রধান সম্পদ ছিল পাট; এতো ভালো পাট আর এতো বেশি পাট আর কোনো দেশে জন্মাত না; কিন্তু দুঃখের বিষয় পাকিস্থান হওয়ায় পাটচাষের বেশির ভাগ জমি সেই দেশেই গিয়ে পড়েছে; এখন আপনারা যে যেখানে পারেন পাটের চাষ করুন, দেশের সমৃদ্ধি বাড়ান।

এখান থেকে বনসংরক্ষণ বিভাগে গেলুম। —মহাশয়রা, বিজ্ঞানের একটা তথ্য আপনারা মনে রাখবেন। কোনো দেশে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে যদি বন না থাকে তবে সে দেশে বৃষ্টিপাত কমে যায়, ফসল ভাল হয় না। আমাদের দেশে বনের পরিমাণ বেশ হ্রাস পেয়েছে, অতএব আপনারা বন-মহোৎসব পালন করুন, মেয়েরা নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে এসে গাছের চারা আপনাদের হাতে দিক, আপনারা সেগুলি পুঁতে পুঁতে যান।

আমিও এইরকম একটি উৎসবে সভাপতিত্ব করে কয়েকটি লিচুর চারা পুঁতেছিলুম; পরের বছর সন্ধান নিয়ে জানলুম, সেগুলি সব ছাগলে মুড়িয়ে খেয়ে গিয়েছে। ছাগলকে আর জিজ্ঞেস করলুম না, কেন যে ছাগল মুড়োল। জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয় উত্তর পেতুম, গৃহস্বামিনী কেন ভাত দেন না। ভাত তিনি পাবেন কোথায় যে দেবেন!

বাজে কথা যাক। আবাদী জমির পরিমাণ না বাড়িয়েও ফসল বাড়ানো যায়। সার লাগাও। সিন্দ্রীর মতো আর কয়েকটা কারখানা সরকার গড়ুক, আর ভাবনা থাকবে না। কিন্তু এতেও হবে না। এটা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, কৃত্রিম রাসায়নিক সারের সঙ্গে বেশ কিছু প্রকৃতিজ সার না দিলে জমির উর্বরাশক্তি বাড়ে না। এই প্রকৃতিজ সার অপরিমেয় নয়, অন্যদিকে রাসায়নিক সার খুব যে সস্তা তা নয়। [illegible]

বাড়ানো যেতে পারে। ক্রমবর্ধমান মানবের চাহিদা এতে কিছুতেই মিটবে না। ফসল বাড়ে A. P.-তে আর জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয় G. P.-তে। বড়ই ভাবনার কথা হল।

এইবার গোড়ার কথাটায় আসা যাক। একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ্ বিষয়টা অন্য দিক থেকে বিচার করে, আঁকজোখ করে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তাতে আমাদের পিলে চমকে গিয়েছে। তিনি বেশ জোরের সংগে বলছেন যে, আজ থেকে নশো বছর পরে পৃথিবীতে মানুষের শুধু দাঁড়াবার জায়গা থাকবে। ঠেলা সামলান। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুতে যাবেন, উপায় নেই, পর পর লোক দাঁড়িয়ে, যেদিকে তাকান এই-ভাবে লোকের পর লোক। দূর ছাই, ঘুম থেকে উঠে কি বলছি, শোবার জায়গায়ই পাননি, ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু অতদিন অপেক্ষা করতে হবে না, তার অনেক আগেই একটা ব্যবস্থা আপনা-দের করতেই হবে।

অনেক সুসভ্য দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহুদিন থেকে ভাবছেন, কি উপায় অবলম্বন করলে জনসংখ্যা হুস্‌হুস করে বেড়ে না যায়। মহাত্মা গান্ধী সংযমের কথা বলে গিয়েছেন। কিন্তু মুনি-ঋষিদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীবাসী সংযমের পরিচয় দেয়নি। পাশ্চাত্তের অনেক সুসভ্য দেশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, কিছুটা ফলও পেয়েছে। ফ্রান্স এই পথে চলেই জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার খুবই কমিয়ে ফেলেছে। আয়রল্যান্ডে আগে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত, আজ যে সে-দেশ খাদ্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ, তার কারণ ওই একই উপায়ে সে-লোকসংখ্যা বেশি বাড়তে দেয়নি। আমাদের জাতীয় সরকার তার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশবাসীকে এই পথে নিয়ে যাবে স্থির করেছে। এর জন্যে বহু কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, অচিরেই দেখবেন, পার্কে পার্কে বক্তৃতা হচ্ছে, প্রচারক ব্যবস্থাপত্র বাতলে দিয়ে যাচ্ছে।

আমি বলে রাখছি, এতে কিছু হবে না। এসব চলে যেখানকার লোক অর্ধশিক্ষিত। তাছাড়া এমন অতি-

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় G. P.-তে
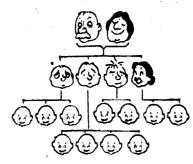
শিক্ষিত দেশও আছে, যারা চায় জনসংখ্যা খুব বেড়ে যাক, যেমন চীন, রাশিয়া প্রভৃতি সাম্যবাদী দেশসমূহ। রাশিয়া তো স্থির করে ফেলেছে, তার বর্তমান লোক-সংখ্যাকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কুড়ি কোটি থেকে ত্রিশ কোটিতে পৌঁছে দেবে। পৃথিবীর বহু দেশ অর্ধশিক্ষিত, আমাদের দেশেই তো বারো আনা লোক নামসই অবধি করতে জানে না। সুতরাং সরকার-নির্দিষ্ট পথে তারা চলবে না। তাছাড়া অনেকগুলি কথা তারা ভাবছে। Family Planning যদি আগে চালু থাকত, তবে হয়ত অতিদরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন সন্তান হত না, আর যত বড়ো ধনী যে হোন না কেন, নিশ্চয় সাতটির বেশি সন্তান হওয়া বিধিবহির্ভূত রইত; অথচ তারা দেখেছে, পিতার চতুর্দশতম পুত্রের প্রতিভা সমগ্র জগৎকে বিভাসিত করেছে। জনসংখ্যা নিয়মিত করে ফ্রান্স খাদ্যের সচ্ছলতা এনেছে, এটা ঠিক, কিন্তু লাভো-অসিয়র, পাস্তুর সে দেশে আর জন্মাচ্ছে কই? জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে মানুষের যোগ্যতাও কি বাড়ে না। এই সব কথা তাদের মনে আসছে।

আপনারা কেউ কেউ হয়ত ভাবছেন, অদূরে মঙ্গল গ্রহে যাবার পথ খুলে যাবে, সেখানে গিয়ে দিব্যি আরামে বসবাস করা যাবে। মনেও ঠাঁই দেবেন না। ভিড় বাড়াবার জন্যে তারা আপনাদের ঢুকতে দেবে কেন?

তা হলে কি করা! উপায় আছে বৈকি, আর উপায় না ভেবে শুধু ভয় দেখাবার জন্যে আমি আপনাদের কাছে হাজির হইনি। পথ অত্যন্ত সোজা; যে-পথ ধরে পৃথিবী এতদিন চলে এসেছে, অবিকল সেই পথ। আমার যুক্তি গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং নির্ভুল।

ধরুন, ক হল জন্মহার, খ মৃত্যুহার। তা হলে ক বিয়োগ খ হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। খ-এর অপেক্ষা ক-র বৃদ্ধি দ্রুত; অতএব জনসংখ্যা হুস্‌হুস করে বাড়ছে। কিন্তু আপনাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, আপনারা শুধু ক-র দিকেই তাকাচ্ছেন, কেবলই ভাবছেন, কি করে ক না বেশি বাড়তে পায়, তা হলে ক-খ-এর বিয়োগ ফল, অর্থাৎ জনসংখ্যা বেশি বাড়বে না। আপনারা অনেক রকম কৌশলের কথা চিন্তা করেছেন, কিন্তু কিছুতেই ব্যাপারটাকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারছেন না। আমি বলি কি, ছেড়ে দিন ক-এর কথা, খ-তে মন দিন। ক বাড়ছে বাড়ুক, দ্রুত হারে বাড়ছে, বাড়তে দিন, সংগে সংগে খ-কে সেই হারে বাড়িয়ে যান। তা হলে দাঁড়াল কি? দাঁড়াল—

ক — খ = নিত্য।

অর্থাৎ জনসংখ্যা এখন যা আছে, ভবিষ্যতে তাই থাকবে। এইবার grow more food। আয়রল্যান্ডের মতো প্রতিগৃহে সচ্ছলতা আসবে।

ফাটুক কতকগুলি হাইড্রোজেন বোমা
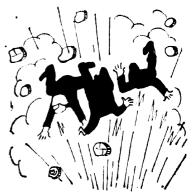
আপনি হয়ত একটু ভেবে চিন্তে জিজ্ঞেস করবেন, খ বাড়ানো মানে হল তো জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলা। আমি অস্বীকার করছি না। তবে আপনাকে নিজ হাতে কিছু করতে বলছি না। প্রকৃতি এতদিন সে কাজ করে এসেছে, এখনও সে করে যাবে, আপনি দূরে দাঁড়িয়ে তার কার্য-কলাপ দেখে যান, শুধু বাধা দিতে যাবেন না।

এই তো সুয়েজ খাল নিয়ে ব্যাপারটা বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, কি দরকার হয়েছে আপনাদের [illegible]

ক—খ হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে

স্কেচ ॥ শ্রীনন্দলাল বসু
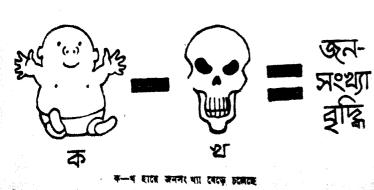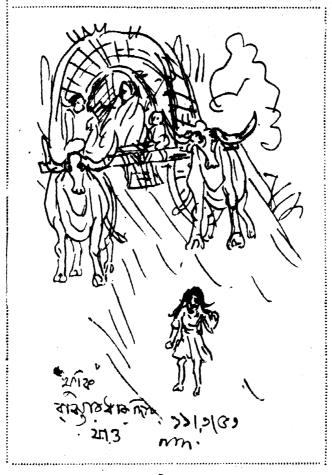
'শান্তি শান্তি' করে হৈ-চৈ করা। লেগে যা' বলে সকলে নখে নখে ঘষতে থাকুন, আরম্ভ হোক তৃতীয় মহাযুদ্ধ, ফাটুক কতকগুলি হাইড্রোজেন বোমা, ভাবা তো পুল করে ফেলেছে, কয়েকটা বোমা যদি তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারে, কাজে লাগুক, পৃথিবীর বারো আনা লোক খতম হয়ে যাক। বিচলিত হবেন না, শ্রীকৃষ্ণ তো গীতায় বলেছেন—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

যদি মারা যান, স্বর্গে যাবেন, আর যদি ওই চার আনার মধ্যে পৃথিবীতে থাকেন, পেট পুরে খাবেন। দেখুন আপনি তো স্বার্থপর নন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যেদিন প্রকাশিত হল, তার পরদিন থেকে আপনি তো চার পয়সার পুঁই-ডাঁটা চার আনা দিয়ে কিনে চলেছেন। হ্যানিম্যান [illegible] ভাগ বেড়ে যাবে। পৃথিবীতে মহাযুদ্ধ শয়াবর ঘটে এসেছে, আজও ঘটতে দিন।

আপনার আর একটা কর্তব্য আছে, সেটাও পরিষ্কার করে জানাই। ক, খ-র বিয়োগ ফল, অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যা যে বাড়ছে, সেটা শুধু ক বাড়ছে বলেই নয়, অধুনা খ বেশ কমে চলেছে। এটা কমাচ্ছে আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা। কালাজ্বর, এখন আর নেই বললেই হয়, উপেন ব্রহ্মচারীর ইউরিয়া স্টিবেমাইন তা রোধ করল। বাংলা দেশ ম্যালেরিয়ার উজাড় হয়ে যাচ্ছিল, ডি-ডি-টি বাধা দিল, ক্যামোকুইন সারাল। পেনিসিলিন, ক্লোরো-মাইসিটিনের দল নিউমোনিয়া টাইফয়েডকে কোণঠাসা করল। স্ট্রেপ্টোমাইসিন পা-স-এর তোড়াতে যক্ষ্মাও বাগ মেনেছে। অবশ্য ক্যান্সার ক্রমাগত একটু একটু বাড়ছে, আর তারা এখনও আয়ত্তের মধ্যে আসেনি। কিন্তু রোগের উপর, আর [illegible] এই কর্মটি করছে, তাকে বাতিল করে দিন। বন্ধ করে দিন অ্যালোপ্যাথিক কলেজগুলি। বিজ্ঞানের জয়ঘোষণা যদি করতেই হয় তো অ্যাটম বোমা করুক, পাস্তুর-লিস্টার-কক-ফ্লেমিংদের কথা বলবেন না। মানুষকে চিকিৎসা শাস্ত্র দান করে মহাদেব পার্বতীর কাছে কি রকম মুখঝামটা খেয়েছিলেন, স্মরণ করুন। পার্বতী বললেন,—রোগে যদি না মরে, তবে লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে মানুষ যে না-খেতে পেয়ে মরবে।

তবে সুসভ্য দেশে একটা চিকিৎসা-পদ্ধতি তো চালু রাখতে হয়। বেশ, থাকুক হোমিও-প্যাথি। ওর মস্ত গুণ, মৃত্যুপথযাত্রীকে ও কোনরকম বাধা দেয় না।

ক-র কথা ভাববেন না, সে যত ইচ্ছা বাড়ুক। কিন্তু তার চেয়ে বেশি করে বাড়তে দিন খ-কে। মহাযুদ্ধ, মহামারী, ভূমিকম্প, প্লাবন—মহাকালের এই সব দুর্যোগকে স্বাগত জানান। বহ্নিশিখায় [illegible] একবার

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা আপনাদের কাছে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন,* সে প্রবন্ধের আলোচনা, পনেরো মিনিটের মধ্যে করা অসম্ভব। যে প্রবন্ধ পড়তে লাগে এক ঘণ্টা তা' লিখতে লাগে অন্তত দশ ঘণ্টা। এবং তা লিপিবদ্ধ করবার পূর্বে বক্তব্য কথা মনে গুছিয়ে নিতেও কিছু সময় লাগে।

সুতরাং এ জাতীয় প্রবন্ধের দু'কথায় সম্যক আলোচনা করা যায় না, সমালোচনাও করা যায় না।

শৈলেন্দ্রবাবু বলেছেন যে, সাহিত্য শব্দ তিনি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে ডারউইন-এর Origin of species, মিল-এর Utilitarianism রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতিও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ দর্শন, বিজ্ঞান, অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্রও কখনো কখনো সাহিত্য পদ-বাচ্য হয়। আমারও বিশ্বাস তাই। তাঁর এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে সাহিত্য এ সকলের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। ফলে তাঁর প্রবন্ধে তিনি নানারূপ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও আলংকারিক সমস্যার বিচার করেছেন। প্রবন্ধ লিখতে গেলেই আমরা এ সকল সমস্যার অবতারণা করতে বাধ্য। অর্থাৎ আমরা চাই আর না চাই, আমাদের প্রবন্ধের অন্তরে কিছু না কিছু দর্শন, বিজ্ঞান থাকতে বাধ্য। অমুকের লেখা আমার ভালো লাগে অথবা লাগে না, এমন কথা বলায় সে লেখা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। বলা হয় শুধু বক্তার অহৈতুকী প্রীতি অথবা বিরক্তির কথা। কিন্তু কেন ভালো লাগে অথবা কেন ভালো লাগে না, তা' বলতে গেলেই আমাদের নানারূপ যুক্তির আশ্রয় নিতে হয়। এবং সে সব যুক্তি আমরা যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করি, তার নাম হয় দার্শনিক সত্য, নয়, বৈজ্ঞানিক সত্য। শৈলেন্দ্রবাবুও সে কারণ নানা সমস্যা তুলেছেন, যার হাতে হাতে মীমাংসা করা অসম্ভব। কারণ উক্ত সমস্যাগুলির প্রতিটিই মনকে নাড়া দিয়ে নানারূপ চিন্তার উদ্রেক করে। সুতরাং এ সব সমস্যার, আগে মনে আলোচনা না করে মুখে আলোচনা করতে সাহস হয় না।

(২)

আমার ধারণা যে তাঁর প্রধান বক্তব্য এই "আর্ট ফর আর্ট" কথাটা নিরর্থক। শুধু তাই নয়, উক্ত বুলির দোহাই দিয়ে অনেকে আর্টের উপাদানকে অবজ্ঞা করেন।

আমার ধারণা শৈলেন্দ্রবাবু যে তর্ক তুলেছেন, সে হচ্ছে আর্টের ফর্ম এবং কনটেন্ট-এর মূল্য নিয়ে ইউরোপের মামুলি তর্ক।

যখন একদল লোক ফর্ম-এর উপর বেশি ঝোঁক দেন, তখন আর একদল লোক কনটেন্ট-এর উপর বেশি ঝোঁক দিতে বাধ্য। সুতরাং সে অবস্থায় কনটেন্ট-পক্ষীয়দের সঙ্গে ফর্ম-পক্ষীয়দের বিবাদ উপস্থিত হয়।

আমার বিশ্বাস, ফর্ম ও কনটেন্ট নিরপেক্ষ নয়। আর্ট বস্তুটি কি তা আমরা ঠিক বলতে না পারি, একথা ভরসা করে বলা যায়, সেই সাহিত্য, সেই চিত্র, সেই সঙ্গীত আর্ট পদবাচ্য যার অঙ্গে এবং অন্তরে ফর্ম এবং কনটেন্ট মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে। সেরূপ স্থলে ফর্মকে কন-টেন্ট-এর মূর্তিও বলতে পারি, আর কনটেন্টকেও ফর্ম-এর আধার মাত্র বলতে পারি। এরূপ কথা বলায় ও সুরের নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তার বেশি আর কিছু বলা হয় না। কারণ উপাদানের [illegible]

হয়, এমন কথা বললে তা যে সত্য নয়, তার হাজার প্রমাণ দেওয়া যায়। আমরা একতাল মাটি নিয়ে শিবও গড়তে পারি, বানরও গড়তে পারি; কারণ উভয় মূর্তিরই উপাদান এক।

আমার বিশ্বাস আর্ট ফর আর্ট যখন আর্টের একমাত্র মূলমন্ত্র হয়, তখন কথাটা সত্য, কিন্তু উক্ত মন্ত্রকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রাহ্য করলেই তা হয়ে পড়ে অসত্য। যেমন জড়জগতের সত্যগুলি বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে পুরো সত্য, কিন্তু সেগুলি মানব জীবনের মূল সত্য হিসেবে গ্রাহ্য করলেই আমরা ভুল করি। তবে এই কারণে Science যে immoral নয়, তা প্রমাণ করতে ইউরোপের একটি বড় বৈজ্ঞানিক Henri Poincare-কে অনেক বাগ্‌বিস্তার করতে হয়েছে।

(৩)

ফর্ম এবং কনটেন্ট-এর মধ্যে কোন্‌টি ছোট, কোন্‌টি বড়, সে তর্ক তখনই ওঠে যখন কোনও সাহিত্য, সামাজিক লোকের নীতিজ্ঞান অথবা রুচিজ্ঞানকে আঘাত করে। তখন সামাজিক মনের এই বিরুদ্ধতার উত্তরে আর্ট ফর আর্ট-এর দোহাই দেওয়া চলে না।

চলে না যে তার প্রমাণ, লোকে তখন সুন্দরের দোহাই না দিয়ে সত্যের দোহাই দেয়। ভাষান্তরে কোন সাহিত্যকে অশিব বলা মাত্র প্রতিপক্ষ আর্ট-এর দোহাই না দিয়ে বিজ্ঞানের দোহাই দেয়।

এতে এইমাত্র প্রমাণ হয় সত্য শিবসুন্দরের ভিতর একটা যোগাযোগ আছে। এর কারণ ও তিনটির কোনরূপ বাহ্য সত্তা নেই, তিনটিই মানুষের মনের জিনিস আর মানুষের মন মূলত এক।

এখন প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, অনেকে সুরুচির সঙ্গে সুনীতি গুলিয়ে ফেলেন। ও উভয় যে এক নয় তা যাঁর [illegible]মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় আছে, তিনিই জানেন।

---

* আটাশ বছর পূর্বে রামমোহন লাইব্রেরীতে 'সাহিত্যে আধুনিকতা' সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভা বসে। সেখানে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যের রুচি ও নীতির কিছু তীব্র সমালোচনা করেন। সভায় ডাঃ কালিদাস নাগ, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। তাঁর সেদিনকার ভাষণ বর্তমানে দুর্লভ এবং তার আবেদন আজও অম্লান বিবেচনা করে এখন উদ্ধার করা হল। এই ভাষণ [illegible] মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে [illegible]

সুনীতি প্রধানত জীবনের কথা, সুরুচি সাহিত্যের।

নীতি জিনিসটা একমাত্র স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ-ঘটিত নয়, তার এলাকা সমস্ত ব্যবহারিক জীবন। কিন্তু সুরুচি কথাটার অর্থ অত ব্যাপক নয়। রুচি কথাটার অর্থ অনেকের কাছে একমাত্র মানুষের যৌন-সম্পর্কের Expression-গত। এমন লেখাও আছে, যা নীতিপূর্ণ অথচ ঘোর অশ্লীল, অপর পক্ষে এমন লেখাও আছে যা শ্লীল অথচ যার নীতি ভয়াবহ।

সাহিত্যে শ্লীলতার কথা বহু পুরাতন এবং যুগভেদে দেশভেদে ও-কথার অর্থও বিভিন্ন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে—অশ্লীলতা একটি ভাষার দোষ মাত্র, ভাবের নয়।

অপরপক্ষে ফরাসী সাহিত্য ফরাসী জাতির কাছে কুরুচিপূর্ণ বলে মনে হয় না, কিন্তু ইংরেজদের মতে তা অশ্লীল। আনাতোল ফ্রাঁস-এর লেখার ইংরেজী অনুবাদ আছে; কিন্তু তার প্রতি কথা যে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হয়েছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অথচ ফরাসীরা সাহিত্য সম্বন্ধে নিজেদের সুরুচির বড়াই করেন। এ বিষয়ে তাঁদের taste নাকি অতি সুকুমার।

(৪)

আমি পূর্বে বলেছি যে, নীতির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কাম মানুষের একমাত্র রিপু নয়। সুতরাং নীতিবীরকে অন্যান্য রিপুর উপরও জয়ী হতে হয়। সাহিত্যে কুরুচি আমরা ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতির নির্লজ্জ প্রকাশেও দেখাতে পারি। যে লেখায় এ সকল মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, সে সব রচনাও পাঠকের মনে জুগুপ্সার উদ্রেক করে। সম্ভবত ফরাসী জাত এই শ্রেণীর কুরুচিকেই জঘন্য মনে করে। কারণ এ সকল রিপুর দৌরাত্ম্যও অসামাজিক।

যদিচ দেশভেদে কালভেদে সমাজের রুচির ভেদ ঘটে, তবুও এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে প্রতি দেশে প্রতিযুগে প্রতি সমাজের একটি বিশেষ সামাজিক রুচি থাকে এবং যে সাহিত্য সেই সামাজিক রুচিভ্রষ্ট, সেই সাহিত্যের অন্তরে যদি কোন অসাধারণ সৌন্দর্য কিংবা মহত্ব না থাকে, তা হলে তা হীন বলেই গণ্য হবে।

আমাদের এ কথা মনে রাখা উচিত যে সাহিত্য সৃষ্টিরও কতকগুলি limitation আছে। গোড়ার কথা অর্থাৎ ভাষার কথাই ধরা যাক্।

আমরা যে শ্রেণীর লেখক হইনে কেন আমরা সকলেই ব্যাকরণের বাঁধা নিয়ম অনুসারে লিখতে বাধ্য।

আমাদের মধ্যে যিনি যতই ইংরাজী ভাবের ভাবুক হন না কেন, আমাদের কারুর I is লেখবার অধিকার নেই। ও-কথা লিখে Intensity of feeling-এর দোহাই দিলে আমরা হাস্যাস্পদ হব।

সামাজিক ভাষার মত সামাজিক রুচিও আমরা নিরাপদে লঙ্ঘন করতে পারিনে। যদি না আমাদের প্রতিভার এতাদৃশ ঐশ্বর্য থাকে যে কলমের এক ঘায়ে আমরা নব-রুচির সৃষ্টি করতে পারি। এ-হেন প্রতিভার সাক্ষাৎ কদাচিৎ দু' একজনের মধ্যে মেলে।

সুতরাং আমাদের মত সাধারণ সাহিত্যিকদের পক্ষে এ বিষয়ে সংযম অভ্যাস করাই ভালো। কারণ সংযমের ভিতরেও শক্তির বিকাশ হয়। উভয় কূলের বন্ধনের মধ্যেও নদী খরস্রোতে প্রবাহিত হয়।

(৫)

তবে একটা কথা বলা আবশ্যক। যদি সত্য সত্যই তরুণ সাহিত্যের রুচির সঙ্গে সামাজিক রুচির বিরোধ ঘটে থাকে, ত তার মূলের সন্ধান করতে হবে আমাদের সামাজিক মনে। আমাদের নতুন শিক্ষা এবং নতুন অবস্থার ফলে যে আমাদের মনের অনেক বদল হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষের মন অয়েল ক্লথ নয় যে আমাদের মনের উপর দিয়ে নব-শিক্ষালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সব জলের মত গড়িয়ে যাবে, তার ফলে আমাদের মন একটুও ভিজবে না। ফলে সে সকল আচার-রীতির সঙ্গে অনেকের মানসিক সংঘর্ষ হতে বাধ্য। মনোজগতে revolution ও reaction দুয়ের মূলেই সামাজিক মনে নিহিত। কারণ উভয়েই বর্তমানের প্রতি অসন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং নীতি ও রুচির যদি নতুন ধারণা আর সম্ভবত বিরুদ্ধ ধারণা আমাদের হয়ে থাকে, ত তার কারণ খুঁজতে হবে সামাজিক মনে। অবশ্য নব সাহিত্য বহু লোকে সৃষ্টি করছেন। আর যদি এই হয় যে, দুটি একটি লেখাই অনভ্যস্ত রুচির পরিচয় দিচ্ছে, তা হলে তার জন্য সাহিত্যকেও দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তা হলে একথা বলতে বাধ্য হব যে, সমাজ ও সাহিত্য যেখানে ছিল সেখানেই আছে, তাদের একটুও নড়চড় হয়নি। আর এক কথা—সাহিত্যের রকমফেরে যে সমাজের হাত বদল হবে এ আশাও আমি করিনে, এ ভয়ও আমি পাইনে। কেননা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব সমাজের উপর অতি সামান্য। তা যদি না হত ত সুনীতিপূর্ণ সাহিত্য পড়ে পড়ে সামাজিক লোক সব এতদিনে দেবতা হয়ে উঠত। পৃথিবীতে নীতিশিক্ষার কেতাব কিছু কম নয়, আর আমরা অন্তত বাল্যকালে সকলেই তা পড়তে বাধ্য হই। 'সদা সত্য কথা কহিও' এ কথা কে না শুনেছেন? অথচ উক্ত শিক্ষার বলে দুনিয়ার লোক যে সত্যবাদী হয়ে ওঠেনি, ব্যবহারিক জীবনে তার নিত্য পরিচয় পাওয়া যায়। সৎ-সাহিত্যের প্রভাব যখন এত কম, তখন অসৎ-সাহিত্যের শক্তি কি প্রলয়ংকরী হবার কথা?

জীবনটা শুধু মুখের কথা নয়।

(৬)

সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের কি সম্বন্ধ, বন্ধু সে-প্রশ্নও তুলেছেন। বলা বাহুল্য সে একটা মহা দার্শনিক প্রশ্ন এবং দু কথায় এর উত্তর দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়, আমার পক্ষে ত নয়ই। তবে সত্য কোন ক্ষেত্রে সরস হয়ে ওঠে সে সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে,—যে সত্য আমরা নিজে আবিষ্কার করি এবং সেই সঙ্গে আমাদের অন্তরাত্মা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে—সেই ব্যক্তিগত সত্যই সাহিত্যের উপাদান। কারণ সে ক্ষেত্রে কোন বাহ্য সত্যই মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে সেই সত্যের উপলব্ধির ফলে ব্যক্তি-বিশেষের অন্তরাত্মার অপূর্ব অনুভূতি।

আজকের এ সভায় আমরা ফ্রয়েড-দর্শনের নাম বহুবার শুনেছি। উক্ত দর্শনের অথবা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলি সাহিত্যের উপাদান হতে পারে না, হতে পারে শুধু Psycho-analysis-এর উপাদান, যদি না কোন ব্যক্তি বিশেষ ফ্রয়েড আবিষ্কৃত কোনও সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করে থাকেন এবং তার ফলে তাঁর অন্তরাত্মা বিচলিত হয়ে থাকে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ফ্রয়েড যাকে Edipus Complex বলেন সে Complex-এর নাম তিনি গ্রীক নাটক থেকে সংগ্রহ করেছেন। উক্ত নাট্যকার ফ্রয়েড পড়েন নি, কারণ তিনি ফ্রয়েডের জন্মের অন্তত দু হাজার বছর আগে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এবং শুনতে পাই যে, উক্ত নাটক কাব্য হিসেবে একখানি মহা নাটক। এ-ট্রাজেডি বিশ্বমানবের এত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, কারণ উক্ত নাটকের দর্শক ও পাঠকরা ওর প্রসাদে pity and terror অনুভব করেন। বলা বাহুল্য যে, নাট্যকার যদি উক্ত ঘটনায় নিজে pity এবং terror অনুভব না করতেন, তা হলে ও মনোভাব তিনি অপরের মনে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন না। ধরুন, অপর কোন ব্যক্তি একই ব্যাপারকে যদি মজার বিষয় মনে করতেন এবং তিনি যদি বড় সাহিত্যিক হতেন, তাহলে উক্ত ঘটনা অবলম্বন করে হয়ত অপূর্ব প্রহসন রচনা করতে পারতেন।

বাইরের সত্য যে সাহিত্যের উপাদান নয়, তার একমাত্র কারণ সাহিত্যে লোকে বাহ্য সত্য প্রকাশ করে না—করে শুধু মানুষের অন্তরের সত্য। সেই কারণেই বৈজ্ঞানিক সত্য যতক্ষণ Universal থাকে concrete না হয়, ততক্ষণ তা সাহিত্যের উপাদান হতে পারে না। এই সূত্রে আপনাদের কাছে আর একটি কথা নিবেদন করতে চাই। শৈলেন্দ্রবাবু রিয়ালিজম্ এবং তাঁর গুরু এমিল জোলার উল্লেখ করেছেন। জোলা যদি যথার্থ সাহিত্য রচনা করে থাকেন, তাহলে তাঁর রচিত সাহিত্য সমাজের রিপোর্ট নয়—পুলিশ রিপোর্টও নয়, বৈজ্ঞানিক রিপোর্টও নয়। সাহিত্যিক ও রিপোর্টার সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতের লোক। ফ্রান্সের আধুনিক সমালোচকদের লেখায় পড়েছি যে, জোলা রিয়ালিজম্-এর সঙ্গে ফরাসী সমাজের রিয়ালিটির কোনই সম্বন্ধ ছিল না—যে সমাজের তিনি বর্ণনা করেছেন, তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কারও কল্পনায় পৃথিবী স্বর্গ হয়ে ওঠে, কারও কল্পনায় নরক। জোলার কল্পনা নারকীয়। তাঁর রচিত সাহিত্যও এক রকম রোমাণ্টিক সাহিত্য, অর্থাৎ তা-ও পূর্ণমাত্রায় সাবজেকটিভ্, একথা যদি সত্য হয় ত এই প্রমাণ হয় যে, বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সাহিত্যিক রিয়ালিজম্-এর কোনও সম্বন্ধ নেই।

যখন জোলার কথা পাড়া গিয়েছে, তখন তাঁর বিষয়ে আর একটি সমালোচকের মত উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। বিচিত্রায় পড়লুম যে, রোমাঁ রলাঁ শ্রীমান্ অন্নদাশঙ্কর রায় নামক জনৈক বাঙালী যুবককে বলেছেন যে, জোলার নভেল অতি উঁচুদরের সাহিত্য। এখন রোমাঁ রলাঁর নাম সকলেই শুনেছেন, আর তিনি যে দুর্নীতি ও কুরুচির পক্ষপাতী, একথা তাঁর অতিবড় শত্রু বলবেন না। অপরপক্ষে জোলার নভেল যে কদর্যতায় পরিপূর্ণ এবং তিনি যে প্রধানত বীভৎস রসেরই রসিক, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। তবে রোমাঁ রলাঁ তাঁকে অত বড় সার্টিফিকেট দিলেন কেন? এর কারণ স্পষ্ট, রোমাঁ রলাঁ নিজে লোকহিতৈষী এবং তাঁর ধারণা যে, লোকহিতব্রতেই জোলা লেখনী ধারণ করেছিলেন। ফলে রোমাঁ রলাঁর মতে জোলার কদর্যতা তাঁর মহৎ কার্য সাধনের একটা উপায় মাত্র। End justifies means—এও হচ্ছে ইউরোপের ধর্মযাজকদের একটি সনাতন মত। আমাদের দেশের আলংকারিকরাও বলেছেন যে, লোকের মনে বৈরাগ্য উদ্রেক করার জন্যই বীভৎস রসের অবতারণা করা সংগত। ক্ষেমেন্দ্র ও রোমাঁ রলাঁ উভয়েই পরম ধার্মিক, একজন ঘোর বৌদ্ধ, অপরটি ঘোর humanitarian। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, লোকের নীতি-বুদ্ধি [illegible]

সুরুচির কোনও তোয়াক্কা রাখে না—বরং সুরুচিকেই দুর্নীতি মনে করে। সাহিত্যের হিসেব কিন্তু স্বতন্ত্র। এইসব কারণে আমাদের সমালোচনায় সাহিত্য রচয়িতাদের যে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি আছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ নই। কারণ আলংকারিকদিগের বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে কেউ সাহিত্য রচনা করতে পারেন নি। কোন বাহ্য নিয়মের দ্বারা সাহিত্য শাসিত হতে পারে না, কারণ যে যথার্থ সাহিত্যিক, সে নিজের মনের দ্বারাই শাসিত। —সাহিত্যের ছোট-বড়র প্রভেদ হয় শুধু সাহিত্যিকদের মনের ছোট-বড়র প্রভেদে।

কিন্তু আর এক হিসেবে এরূপ আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে। শৈলেন্দ্রবাবু বলেছেন যে, সাহিত্য সমালোচনা করতে গেলে আমরা যে-সকল কথার ব্যবহার করি, যথা রসসৃষ্টি ইত্যাদি, সে-সকল কথার অর্থ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারনা নেই। একথা সম্পূর্ণ সত্য। আর এ সকল কথার অর্থ স্পষ্টতর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের অর্থের বিষয় আলোচনা করা। এইরূপ আলোচনার ফলে আমাদের বুদ্ধি পরিষ্কার হবে এবং এ সকল শব্দের অন্তরে বহু লোকের অনুভূতির ও চিন্তার পলি পড়বে। কথা একই থাকবে, কিন্তু তার মর্ম প্রস্ফুটিত হবে।

বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে emotion যে জাগানো যায়, এ-কথায় আমি বিশ্বাস করিনে, কারণ intelligence এবং emotion যে পরস্পরের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত মনোবৃত্তি, এরূপ আমার ধারনা নয়—আর intelligence-এর যে মস্তিষ্কে ও emotion-এর হৃদয়ে এবং will-এর মেরুদণ্ডে বসতি, এহেন রূপকথায় বিশ্বাস করা অসম্ভব। সুতরাং বুদ্ধির চর্চা করলে যে আমাদের জাতির হৃদ্‌রোগ হবে, এ-ভয় আমি পাইনে। সাহিত্যের চর্চা যখন বাঙালী করবেই—তখন সাহিত্যের রূপগুণের আলোচনাও করতে হবে। এবং এ-আলোচনা যত বেশি হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। আশা করি, এ-আলোচনাও সুনীতি ও সুরুচিভ্রষ্ট হবে না। আর বলা বাহুল্য, সমালোচনারও সুনীতি ও সুরুচি দুই-ই আছে।

সারা পথ কষ্ট। রাতে ঘুমুতে দিল না। স্টেশনে স্টেশনে ডেকে তুলে মালা দিচ্ছে, চন্দন লেপছে কপালে। পুণায় নামলাম, তখন আর মানুষ বলে মালুম হবে না। নাক-চোখ-মুখ নেই, গা-গতর কিছু নেই—ভারী ভারী ফুলের বাণ্ডিলের তলায় দুটো করে পা বেরিয়ে আছে। শিবাজি মন্দিরে লোক ভেঙে পড়ছে। বেদির উপর তুলে দিয়ে বলে, বলুন কিছু এবার—।

গোয়ায় গিয়ে পৌঁছুলে নিদারুণ ঠেঙাবে, গুলীও করতে পারে, এই মাত্র শুনেছিলাম। পথের এত সব হ্যাঙ্গামের কথা বলেনি তো কেউ। বললে বোধহয় পিছিয়ে যেতাম। দোহাই পাড়ি ঃ দেখুন—মারাঠির যা বিদ্যে, কথাবার্তা বুঝতে পারি খানিক খানিক। রাষ্ট্রভাষা গোয়ালা-কয়লা-ওয়ালার সঙ্গে হয়তো চালানো যায়, বক্তৃতায় চলবে না। তবু মাপ হল না ঃ তা কি হয়েছে বাংলাতেই ছাড়ুন। জবালা-মরী হলে হল, মানুষজন বুঝে নেবে।

পুণা থেকে বেলগাঁও। খাতির যতই করুক, টিকিট কাটতে হল নিজ নিজ পয়সায়। গোড়া থেকে সেই কথা। বারো ঘণ্টার পথ। রাত্রি একটায় স্টেশনে নেমে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি, বৃষ্টি! সৃষ্টি-সংসার ভাসিয়ে দিল আজকে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি—অলক্ষ্য অন্ধকার থেকে সাড়া এলো, চলে আসুন—

নিঃশব্দে চলেছি তাদের পিছু পিছু। চারিদিক নিষুপ্ত, একটানা জলস্রোত। এক ভাঙা বাড়িতে গিয়ে উঠলাম, অনেক লোক আগে থাকতে এসে আছে। বলে, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিন। সময় নেই—

আধ মগ চা আর গোণাগুণতি একখানা করে রুটি। গরম চা হড়হড় করে গলায় ঢেলে চাঙ্গা হয়ে নিলাম। ট্রাক দাঁড়িয়ে রাস্তার উপর। সত্তরটি প্রাণী মোটমাট। কিন্তু পায়ে হেঁটে যখন যাওয়া যাবে না, এবং ট্রাকও একটা বই দুটো নেই—সত্তর না হয়ে সাত শ' হলেও ওরই মধ্যে উঠে পড়তে হবে। কোন কায়দায় উঠবেন, সে আপনার ভাবনা।

আঁকাবাঁকা পথ পাহাড়ের গা বেয়ে। এই

চলে গেলাম—অনেকক্ষণ পরে দেখছি, সেই পথটাই হাত কয়েক নিচে। টানেলের ভিতর ঢুকে পড়লাম একবার। বৃষ্টিটা মাঝে বন্ধ হয়েছিল, আবার নামল। বৃষ্টি অন্ধকার আর মানুষের গাদাগাদি—পথের মজাটা উপভোগ হচ্ছে না। বহাল তবিয়তে আর একবার আসব এদিকে। যদি অবশ্য সশরীরে ফিরে আসতে পারি সালাজার মশায়ের অতিথি-শালা থেকে।

চল্লিশ মাইল এসে আনমোর কাস্টমস্। টাকাপয়সা কাপড়চোপড় জমা দিয়ে দিন; নাম-ঠিকানা লিখুন। ফিরতি মুখে যাবতীয় মালপত্র বুঝে নিয়ে যাবেন। না ফেরেন তো দেশের ঠিকানায় ফেরত পাঠাবে। আপনার ভালমন্দ যা-ই হোক, মালের এক তিল মার যাবে না।

মালকোঁচা এঁটে নিলাম। গায়ে কামিজ, গামছা বাঁধা কোমর বেড় দিয়ে। পুরোপুরি রণসজ্জা। আরও পাঁচ মাইল ভারতের এলাকা। পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সদর পথে কড়া পাহারা—গাইড হয়ে এসেছে তাই ক'জন—সুলুকসন্ধান বুঝে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

সাপের মতন প্রায় বুকে হেঁটে চলেছি। সীমান্তে এসে দাঁড়ালাম, তখন ফরশা হয়ে গেছে। জায়গাটাও একেবারে ফাঁকা মাঠ। মাঠের ওপারে জঙ্গল। পশ্চিমঘাট পর্বত-মালা দিগন্ত ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। গাইডেরা ত্রস্ত হয়ে বলে, গুলী করবে—শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো। সত্তর জন আমরা চক্ষের পলকে মাঠের জলকাদার সঙ্গে লেপটে গেলাম। গাইডেরাও শুয়েছে একজন শুধু হামা-গুড়ি দিয়ে জঙ্গলের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুয়ে শুয়ে মৃদুকণ্ঠে বচসা চলেছে, পতাকা কে নেবে কাঁধে? গুলী করবে নিশ্চয় সেই মানুষকে তাক করে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী সব অঞ্চলই আজকে পাশাপাশি—প্রথম বুলেট বুকে নেবে কোন অঞ্চলের কোন ভাগ্যবান? মারাঠিরা কর্ম-কর্তা আমাদের উপর কেমনধারা টান সেই স্বদেশী যুগ ধরে। বললেন, সর্বকাজে, বাঙালী চিরকাল আগুয়ান—তোমরাই নেবে পতাকা। কে নেবে, মানুষ ঠিক করো। লড়াইয়ের ফেরতা মোহন সিং ও সোনো-পন্থ অপ্পে চিরলে এখনো দেড়-দু'গণ্ডা গুর্খা বেরুবে—পতাকার দাবিতে ঝগড়া বাধিয়েছে তারা। আর হল না—ঝিঁঝি ডাকতে লাগল বনান্তরাল থেকে। ঝিঁঝি নয়—যে লোকটা আগে চলে গেছে, তার সংকেত। সময় হয়েছে, যাত্রা এবারে। সাঁ করে এক ছুটে মাঠ পেরিয়ে বনে ঢুকে পড়ুন।

বাস্, এসে গেছি গোয়ার ভিতর। পাহারাদার মশায়েরা রাজপথে ওদিকে ফাঁকা পাহারা দিচ্ছেন। ঘুরুন তাঁরা পাহারা দিয়ে দিয়ে। বনজঙ্গল পার হয়ে আবার জনপদে বেরুব, পুরো মিছিল তখন সাজানো হবে। পথ কতখানি রে বাপু—চলেছি, চলেছি, চলার আর শেষ নেই। দেবরাজও কি দিন বুঝে নামলেন? বৃষ্টি ছাড়ছে না, ভিজে জবজবে হয়ে গেছি। জঙ্গল ঘন হয়ে পথ এঁটে যায় একসময়। গাইডদের কুড়াল আছে, গাছপালা কেটে পথ করে দিচ্ছে। ঐ কাটবার সময়টা অবকাশ আমাদের—এক-আধ মিনিট যা দাঁড়াতে পাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছাড়ছি।

ও বাবা, ওরে বাবা গো—

সাড়ে ছ' ফুট জোয়ানপুরুষ লড়াইয়ের সৈনিক মোহন সিং তিড়িং করে হাত তিনেক পিছনে লাফিয়ে পড়ল। নানান জন্তু-জানোয়ার—বাঘ দেখল নাকি? কুড়াল উঁচিয়ে গাইডেরা ছুটে এসেছেঃ কই, কোথায়?

আঙুল তুলে মোহন সিং গাছের ডাল দেখাল। বাঘ তো গাছে চড়ে বেড়ায় না, হতভম্ব হয়ে তারা ইতি-উতি চায়।

—কোন দিকে?

—দেখ না তাকিয়ে।

কাঁপছে দস্তুরমতো। জলে ভিজে শীত লেগেছে বলেই কি? বলে, ঐ—ঐ—। ডালে নয়, পাতার উপর।

পাতায় পাতায় ছিনেজোঁক। এদিকে ওদিকে সর্বত্র।

—জোঁক দেখে অমন চেঁচালে?

মোহন সিং খিঁচিয়ে ওঠে, বাঘ হলে ডরাবো কেন? এত মানুষ একসঙ্গে, বাঘে আমাদের কি করবে?

তা বটে! পর্তুগীজ-বুলেটের, আশার্ব রেলভাড়া করে কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে আসছি। বাঘকে আমরা থোড়াই কেয়ার করি। জোঁক সর্বনেশে বস্তু। চোবাগোপ্তা আক্রমণ—টেরও পাবেন না, কোনসময় এসে ধরেছে। রক্ত খেয়ে সাবাড় করল—সুড়সুড়ি দিচ্ছে তখন কে যেন, আরাম লাগছে। এ শত্রুর কাছে সামাল হবেন কি করে? চলাচল বন্ধ করে সর্বাঙ্গ নিরিখ করছি, জোঁক লেগে আছে কিনা। পিঠের জামা তুলে এ ওকে বলছি, দেখ তো—দেখ তো—

বুড়ো মানুষ সীতারামিয়া—একটা দাঁত নেই, একগাছি চুল কাঁচা নেই। কথা বলতে গেলে কামারের হাপরের মতন ফকফক করে হাওয়া বেরিয়ে আসে। জোঁকের গোল-মালের মধ্যে ফাঁক বুঝে তিনি ধপাস করে বসে পড়লেন।

—এক ঢোক জল খাওয়াও ভাই।

—এখন জল চাচ্ছেন, তারপরে মিঠাই, মেওয়া, রাত্তির হলে আকাশের চাঁদ। পিছনে ঝরনা রেখে এলাম, জলের কথা তখন বলতে কি হল?

—ঝরনা লাগছে কিসে? খানা-ডোবার কত জল! বুড়োমানুষটা পিপাসার জল চাচ্ছে, অমন করতে নেই—

—বুড়োমানুষ তো ঘরে শুয়ে থাকলেই হয়। এসব কাজে আসা কেন?

—আজ বুড়োমানুষ ভায়া। সত্যাগ্রহ এই-টুকু বয়স থেকে করছি। গান্ধিজীর সেই চম্পারণ থেকে। কোনও জায়গায় বাদ নেই। এখন তো ও-পাট উঠেই যাচ্ছে। হয়তো বা এই শেষ। অমন করে বলে না, ছিঃ!

একজনের ঘটি চেয়ে নিয়ে আমি জল এনে দিলাম। জল খেয়ে সীতারামিয়ার মেজাজ চড়ল।

—চিরকাল বুড়ো ছিলাম না, বুঝলে? সত্যাগ্রহ ক'টা দেখেছ? এ আবার সত্যা-গ্রহ নাকি? পুঁচকে একফোঁটা পর্তুগাল, ম্যাপে যার নিশানাই মেলেনা। খোদ বৃটিশের সঙ্গে আমরা সত্যাগ্রহ করতাম। রাবণ রাজা সূর্যকে তাঁবেদার করে খাটাত, আর ঐ বৃটিশ-রাজা। সে রাজ্যে সূর্যের অস্ত যাবার এক্তিয়ার ছিল না।

কিন্তু সীতারামিয়ার চেয়েও বেশি মুশকিল চৌধুরীকে নিয়ে। দলপতি তিনি। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে হাঁটু ফুলে ঢোল হয়েছে, কিন্তু এলাকার ভিতর এসে পড়ে এক লহমা থেমে থাকবার যো নেই। কেমন করে খবর বেরিয়ে যাবে—পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। অথবা চুপিসারে নিয়ে পুরবে জেলে। মানুষজন জানবে না, দাগ কাটবে না কারো মনে।

দাঁড়ানো চলবে না অতএব। চলো, এগিয়ে চলো। মরে গেলে শবদেহ নিয়ে তখনো এগুবে। মোহন সিং তড়াক করে চৌধুরীকে কাঁধে তুলে ফেলল।

—কি হচ্ছে, আঁ? এই যাচ্ছেতাই পথে নিজেরাই পারো না, এর উপর আমায় বইবে? খানিকটা কাতর হয়ে পড়েছি বলে নেতার কথা মানবে না তোমরা?

মোহন সিং বধির কালা আপাতত। ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে। মাইলটাক গিয়ে চৌধুরী আর্তনাদ করে ওঠেন, নামাও, নামাও—। কি হল হঠাৎ, মর্মান্তিক যন্ত্রণা উঠেছে হয়তো দেহে। ভড়কে গিয়ে মোহন সিং যেমন নামিয়েছে, চৌধুরী এক গাছের গুঁড়ি এঁটে ধরে দাঁড়ালেন। গাছশুদ্ধ না উপড়ে তাঁকে নড়াতে পারবে না। রাগ করে বলেন, কি খেলা হচ্ছে বলো তো আমায় নিয়ে? কাঁধ সুড়সুড় করে তো বুড়ো-মানুষ সীতারামিয়া মশায়কে নিয়ে নাও—

সীতারামিয়া ঠিক পিছনে। তাঁকে নিয়ে আবার কথা ওঠায় ক্ষেপে উঠলেনঃ বুড়ো বুড়ো কোরো না বলছি। এ বুড়ো তোমাদের সকলকে শেষ করে তবে মরবে।

সকলের আগে তিনি চলে এলেন। এর পরে আর হাঁটা নয়, দৌড়চ্ছেন আগে আগে।

পাহাড় আর জঙ্গলের অন্ত নেই। ঘনতর হচ্ছে ক্রমশ। পথ ভুল হয়নি তো? আমার অবস্থা অতি সঙ্গিন। সকাল থেকে মাথা ছিঁড়ে পড়ছে—আর পারি না, টলে পড়ছ

না যাই। সীতারামিয়া ও চৌধুরীর গতিক দেখে ভয়ে ভয়ে কাউকে বলিনি। মোহন সিং সন্দেহ করেছে, কটোমটো তাকাচ্ছে। ফাঁকা কাঁধে অসুবিধা হচ্ছে বোধ হয় তার। শনির দৃষ্টির আড়ালে সরে যাই তাড়াতাড়ি। একেবারে সকলের পিছনে।

এক গাইডের মুখ-ভরা বিপুল গোঁফ-দাড়ি। ঐ দাড়ির জঙ্গল দেখে কে দণ্ডকারণ্য বলেছিল—লোকটাও সেই থেকে দণ্ডক-ভাই। তার সঙ্গে গল্প জমিয়েছি, তারও কাছে কিছু ভাঙিনি। যেন গল্পের দরুনই পিছিয়ে পড়ছি আমরা।

—গ্রাম কতদূরে দণ্ডক-ভাই?

—আধ মাইল।

অধীর কণ্ঠে বলি, ঐ এক কথাই তো কখন থেকে বলছ।

দণ্ডক-ভাই গম্ভীর হয়ে বলে, দু-কথার মানুষ নই আমি।

আরও ঘণ্টা দুয়েক কায়ক্লেশে চলবার পরেও সেই আধ মাইল। পিছিয়ে পড়েছি, পাহাড়ের বাঁকে আগের মানুষদের অনেকক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। ধুঁকতে ধুঁকতে এক পাথরের উপর বসে পড়লাম।

—জিরিয়ে নিই একটু। আর পারছি না।

কপালে হাত ছুঁইয়ে দণ্ডক-ভাই শিউরে উঠেঃ জ্বর ধাঁ ধাঁ করছে। এতক্ষণ পেরেছ কি করে সেই তো অবাক লাগে।

ব্যাকুল হয়ে বলি, কি হবে তা হলে?

দণ্ডক অভয় দেয়, জিরিয়ে নাও না। কুছ পরোয়া নেই। ওরা পাকদণ্ডী ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। চড়াই ধরে সোজাসুজি আমি নিয়ে তুলব।

তবে তাই। আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকো তুমি। ওদের দলে ভিড়ো না।

দণ্ডক ঘাড় নাড়লঃ বেশ তো! কিন্তু ওদের জানিয়ে আসা তো দরকার। তোমায় না দেখতে পেয়ে ফিরে আসে যদি! পৌঁছুতে তবে দেরি পড়ে যাবে। এক ছুটে আমি বলে আসছি।

হনহন করে চলল। পিছন থেকে বলে দিই, দেরি কোরো না ভাই। যাবে আর ফিরে আসবে।

মুখ ফিরিয়ে সে বলল, আধ ঘণ্টা। উঁহু, অতও নয়। বসে থাকো তুমি।

আধ মাইলের পিছন ছুটেছি সকাল থেকে, আবার এই আধ ঘণ্টার ফেরে পড়লাম। সন্ধ্যা হয়ে আসে, তখন আর বসে থাকতে পারি না। ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছি, দণ্ডক, দণ্ডক-ভাই—। কাকস্য পরিবেদনা। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ডাক ঘুরে বেড়ায়। সর-সর করে মস্ত এক সাপ সরে গেল পথের পাশ দিয়ে। কপালক্রমে এটি ভদ্রস্বভাবের, নির্গোলে তাই সরে গেল। ফোঁস করে ফণা তুলতেও পারত। তখন খেয়াল হল, [illegible] ঠিক হচ্ছে না আর [illegible] বাসিন্দা ও'রা, সারাদিন ঝিমিয়ে থাকেন, স্ফূর্তি-ফার্তির সময় এবারে। সুমুখ-আঁধারি রাত, তার উপর ঘনপত্র গাছের ছায়া—অন্ধকার নিবিড় হল দেখতে দেখতে। গাছে উঠে পড়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। জ্বরে হাঁসফাঁস করছি, পুরোপুরি চেতনা আছে তা-ও মনে হয় না। তবু কিন্তু বুদ্ধি এসে গেল—কোমরের গামছাখানা পরে ধুতি দিয়ে সর্ব দেহ আষ্টেপিষ্টে বাঁধলাম ডালের সঙ্গে। আরও জ্বর বেড়ে একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেলেও ভূঁয়ে না পড়ি।

সে রাত্রে পশ্চিমঘাটের পর্বত-সানুতে উৎসব পড়ে গেল। দিনের ঘুম ভেঙে অরণ্য জেগে উঠেছে। হাওয়া দিয়েছে, পাতায় লতায় ফিসফিসানি আওয়াজ। কল কল করে জল নামছে কোথায়। জন্তু-জানোয়ার ছুটোছুটি করছে ছায়ান্ধকারে—বনের অন্ধিসন্ধিতে ভারি মজার লুকো-চুরি খেলা। শহুরে মানুষ—আপনাদের এ-বস্তু আন্দাজে আসবে না। রাত্রিচর পাখি আকাশের গায়ে কালো কালো রেখা টেনে ছুটোছুটি করছে, বুনো ফলের লোভে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অদূরের কোন গাছে। সারা বনের সমস্ত ডালপালা ভরে জোনাকিরা আলো সাজিয়েছে। কত জানোয়ারের কত রকম ডাক—কচি গলার কান্নার মতন, খল-খল করে হেসে ওঠার মতন। বাঘের হামলা এক একবার তাড়া দিয়ে সব থামিয়ে দিচ্ছে। জ্বরটা আরও বেড়েছে, আধেক ঘুম আধেক জাগরণে চারিদিক বিচিত্র লাগছে। ভয়ও হচ্ছে। বনভূমের নতুন মানুষ আমি বাসিন্দাদের কারো নজরে না পড়ি, অতিথিকে উৎসবে টেনে নামিয়ে না নেয়।

ভোরের আলোয় আবার সব নিঃশব্দ। রঙ্গালয়ে পট পড়ে গেছে। কে বলবে, অত কাণ্ড চলেছিল রাত্রে! গাছ থেকে নেমে এসেছি। চারিদিক এখন মরা। জ্যান্ত মানুষ খুঁজে বেড়াই—কোথায় জনপদ, কোথায় মানুষ! বন্ধু হও, শত্রু হও—মানুষ কেউ যদি থাকো কথা বলে ওঠো। দণ্ডক সেই ছুতো করে ভেগে পড়ল। দোষ দিইনে—একটা দিনের চেনা রোগি নিয়ে পড়ে থাকতে যাবে কেন? অরণ্যে চিৎকার করে বেড়াই, কে আছ গো, কে আছ?

জ্বর থাকার দরুন খিদেটা নেই। তেষ্টা আছে, ঝর্ণাও তেমনি পায়ে পায়ে। ঝর্ণায় নেমে আঁজলা ভরে ভরে জল খাই। বিকালের দিকে এমন সুবিধাটাও গেল। কড়া উপোসের ঠেলায় জ্বর কাবু হয়ে আসছে: এবং তারই উপসর্গ, চনমন করছে পেট। কি খাই, কি খাই? লতায় লতায় লাল টুকটুকে ফল ফলে আছে এক রকম। একটা ছিঁড়ে মুখে [illegible]—[illegible]

ভাবছি, কুইনাইন জ্বরের অষুধ—মুখে দিয়েছি তো গিলেই ফেলি, জ্বর যেটুকু আছে ছেড়ে যাবে। ফল খোঁজাখুঁজিই চলল তারপরে। আমের কাছাকাছি এক ফল—আঁটি খুব মোটা, কিন্তু মিষ্টি। কোঁচড় ভরে সেই ফল পেড়ে নিচ্ছি—

মহিষ যেন একটা! গ্রাম তবে নিকটেই। দড়ি ছিঁড়ে মহিষ এসে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। উঠি কি পড়ি ছুটেছি সেদিকে। একটা নয়, পিছনে আরও আছে। বিস্তর মহিষ, সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল সবগুলো। সে নজর ভাল ঠেকে না—হিংস্র, ভয়ংকর। কী সর্বনাশ, বুনো মহিষের দল। একটা বড় গাছের গুঁড়ি ঠেশ দিয়ে দেখছিলাম, ফনফন করে উঠে পড়লাম। এই কাজটা খুব ভাল পারি। যতক্ষণ নিচে ছিলাম, মহিষগুলো তাকিয়ে ছিল স্থির চোখে। গাছে উঠেছি দেখে তীরের বেগে ছুটে এলো। লতা-পাতা ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে, মাটি উঠছে খুরের ঘায়ে। এসে করল কি—গাছে ঘা মারছে শিং দিয়ে। এদিক দিয়ে মারছে, ওদিক দিয়ে মারছে। এই প্রকাণ্ড গাছ কাঁপছে থর থর করে। আর আমি জোঁকের মতন লেপটে আছি ডালপাতার ভিতরে। আছি কি নেই বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ হাঁকডাক ও লড়ালড়ি করে মহিষেরও বোধ করি সেই সন্দেহ হয়—গাছে নেই, ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে। অন্ধকার হল, ধীরে ধীরে বনান্তরালে চলে গেল দুশমনগুলো। নির্জন বনে আরও একটি রাত্রি আমার। কোঁচড়ের সেই ফল খাচ্ছি আর আঁটি ফেলছি ছুঁড়ে ছুঁড়ে…

গাছের চূড়া থেকেই দেখে নিয়েছি সরু এক জলধারা। নদী পেয়ে গেছি, এ নদী ছাড়ব না কিছুতে। উত্তাল স্রোতে জল চলেছে, কিনারে কিনারে চলেছি। নদী নিশ্চয় নেমে গেছে জনপদে—যেখানে গ্রাম আছে, মানুষ আছে। পায়ে চলার পথ একটু যেন? বর্ষার শ্যামল ঘাসের উপরে পায়ের দাগ—কোন মানুষ হেঁটে চলে গিয়েছে। ঈশ্বর, চিহ্নটুকু না হারায় যেন কোন রকমে! খানিকটা গিয়ে পদচিহ্ন নদীর জলে নেমে গেল। অতএব পার হয়ে গেছে সেই মানুষ। পাহাড়ে-নদী জল অল্প। পাথরের চাঁই মাঝে মাঝে মাথা জাগিয়ে আছে। সেই পাথরে পা রেখে রেখে—বুঝে দেখুন আমার অবস্থা, পেটে ভাত নেই, জ্বরে পিশেছে দু-দিন ধরে—পাথরে পা রেখে রেখে নদী পার হচ্ছি। একবার টাল সামলানো গেল না, জলে পড়ে গেলাম। উপুড় হয়ে পড়েছি। আর যাবে কোথায়—করাল স্রোত নুড়ির মতন গড়িয়ে নিয়ে চলল। মিনিট দুয়েকে মাইল খানেক [illegible]

করছি, হাত বাড়াচ্ছি এটা-ওটা ধরবার জন্য। ধরে ফেললাম গোড়া-আলগা এক গাছের শিকড়। শিকড় ধরে ঝুলে খেয়ে ডাঙায় উঠলাম। বিষম কষ্ট হয়েছে, কষ্টের চোটে গড়িয়ে পড়ি সেইখানে।

তারপরে সামলে নিয়ে চোখ মেলে দেখি, নারকেলের ছোবড়া। নারকেল হলে ভাবতেন জলে ভেসে এসেছে। ছোবড়া মানুষের হাতে ছাড়ানো, মানুষ আছে তবে কাছাকাছি। আমার অবস্থা, ঐ ছোবড়া হাতে নিয়ে এক পাক নেচে নেবার মতন। সোনার তাল পেলে মানুষে অমন করে না।

আর কয়েক পা গিয়ে—সৌভাগ্যের অন্ত নেই—পোড়া কয়লা। রান্নাবান্না করে গেছে, ছেঁড়া কলাপাতা পড়ে আছে। কাঁঠালগাছ দেখা গেল, বিস্তর কাঁঠাল ফলেছে। তারপর ক্ষেতখামার—পুরুষ-মেয়ে চাষবাস করছে। আহা রে, মানুষ দেখে চোখ জুড়াল। বেড়া-ঘেরা বাগ-বাগিচা— নারকেল-বাগান, কাঁঠালগাছ, কলাবাগান। তার পিছনে খেড়ো ঘর— পূর্ব বাংলায় কলাবাগানের মধ্যে ঠিক যেমনধারা ঘর দেখতে পান।

এক বাড়ি ঢুকে পড়লাম। ভর দুপুরে, তা বুঝবার জো নেই—আকাশ থমথম করছে মেঘে। মেয়ে-পুরুষ কাউকে দেখছি নে—ঐ যা দেখলাম, ক্ষেতে গিয়েছে বোধহয়। শুধু বাচ্চার দঙ্গল। ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে। কাকে কি বলি, কে আমার কথা বুঝবে? তা খাবার না জুটল, কোলে তুলে ধরি তো একটা-দুটোকে। হল না—দড়দাড় করে সব পালাল।

বৃষ্টি এলো। ফুল-লতাপাতায় ফটক সাজিয়েছে এক বাড়ি। আটচালা মতন টিনের ঘর—মানুষজন গুলতানি করছে—বৃষ্টি বাঁচাতে তাদের দাওয়ায় উঠে পড়লাম। পুরুষ আছে, মেয়ে আছে। সঙ্কুচিত হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছি, ক'জনে এগিয়ে এলো।

কে তুমি?

চুপ করে আছি। মোম দিয়ে গোঁফ-মাজা—উনিই বাড়ির কর্তা বলে ঠেকেছে—গর্জন করে উঠলেন, সত্যাগ্রহী নাকি তুমি? ঠিক করে বলো।

চাট্টি খেতে দেবেন আমাকে—

বেরোও, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাও বলছি—

দাঁড়িয়ে ছিলাম, বসে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে। সত্যাগ্রহের মহড়া দিয়ে নিই অভদ্র লোকটার কাছে।

যাবে না?

বৃষ্টি ধরুক—

ধরুক না ধরুক, যেতেই হবে তোমাকে।

মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে ছাঁচতলায়, জল গড়িয়ে নয়নজুলিতে জমছে, ঝিলিক দিচ্ছে আকাশে—মুগ্ধ হয়ে আমি এই সব স্বভাবের শোভা নিরীক্ষণ করছি।

শুনতে পাচ্ছ না?

কিন্তু কোন অজুহাত মানল না। ঘাড় ধাক্কা দিল লোকটা। ক্লান্ত রোগা শরীর—উঠানে গড়িয়ে পড়ে গেলাম বৃষ্টি জলের মধ্যে। এর পরেও রেহাই নেই—দাওয়ার ধারে এসে হুংকার দিচ্ছে, ছুতো ধরে পড়ে থাকলে হবে না। ওঠ—উঠে পড়, বলছি।

মরি, সে-ও ভাল—এই ছ্যাঁচড়া জায়গায় তিলার্ধ আর নয়। টলতে টলতে বেরুলাম। শরীরের সঙ্গে মনও দুর্বল হয়ে গেছে। চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো। হায় রে, এই মানুষ এরা সব! বদনাম শুনি পর্তুগীজ পুলিশ ও সৈন্যের সম্পর্কে। সে প্রভুদের সঙ্গে কখন মোলাকাত হবে জানিনে। কিন্তু এদের কাণ্ড দেখে রি-রি করে জ্বলছে সর্বাঙ্গে। বেরিয়ে পড়েছি, তবু ছাড়ে না। ঐখান থেকে চেঁচাচ্ছে, গুণে গুণে পা ফেলছিস—চলে যেতে মন সরে না বুঝি?

কড়া সুরে জবাব দিই: সরতে চাইছে না পা দুটো। দু-দিন খাইনি, অসুখ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের জানানো মিছে। বরঞ্চ জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে থাকব, তোমাদের মতন মানুষের কাছে নয়—

আবার চোপরা করে—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

দুই বীরপুরুষ সেই বৃষ্টি-জলের মধ্যে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল। হাতে লাঠি। লাঠি উঁচিয়ে বলে, এত জায়গা থাকতে এখানে মরতে এসেছে। গ্রাম-ছাড়া করে দিয়ে আসব তোকে।

রাগে রাগে পা ফেলছিলাম—অতঃপর প্রাণের আতঙ্কে দস্তুরমতো ছুটতে আরম্ভ করেছি। ঐ লাঠির এক ঘা যদি বসিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে খতম। হাঁক দিয়ে ওঠে, কানা গরুর ভিন্ন গোঠ। ওদিকে কোথায় রে, ডাইনে—

অতএব ডাইনে ঘুরি। সুঁড়িপথ। পিছন পিছন ওরা তাড়া করে আসছে। আড়ালে এসেই দু-জনে কিন্তু হাতের লাঠি ফেলে দিল। দু-দিক দিয়ে এসে কাঁধের নিচেটায় ধরেছে। খানাখন্দ জলে ভরতি, ব্যাং ডাকছে—এই রেঃ, দেয় বুঝি দুই মরদ জলসই করে!

কিন্তু না, লাঠি ফেলে তারা আর এক মানুষ। আমার কাঁধের নিচে হাত বেড় দিয়ে দেহভার তারাই বয়ে চলেছে। বলে, ও-বাড়ির মেয়ের বিয়ে। অনেক লোক জমেছে, তার মধ্যে কে ভালমানুষ, কে পুলিশের চর ঠিকঠিকানা নেই। সত্যাগ্রহীর কথা শুনলে [illegible]

বড্ড অত্যাচার হল তোমার উপরে। কপালের ওখানটা ছড়ে গিয়েছে বুঝি—আহা-হা!

অবাক হয়ে গেছি। মারমুখী মানুষের মুখে পলকের মধ্যে এমন সহানুভূতি বেরোয়! যাচ্ছি আর মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছি একটু করে। বৃষ্টিটা বন্ধ হয়েছে, এই বড় রক্ষা। বললাম, তোমাদের গ্রামটা বড্ড বড় তো? কতক্ষণে যে শেষ হবে!

—বড় তো বটেই, দেড়শ' ঘর বসতি। তা তোমার কি ভাবনা? না পেরে ওঠো, এর পর পাঁজাকোলা করে নেবো!

পথের পাশে গাছতলায় ষণ্ডাগুণ্ডা একজন যেন ওৎ পেতে ছিল।

—সত্যাগ্রহীকে গ্রামের বের করে দিচ্ছ তোমরা?

আমার লোক দুটো থতমত খেয়ে যায়ঃ অবস্থা জানো তো তুমি! তার উপরে ওটা হল বিয়ে-বাড়ি—

ষণ্ডা লোকটা আমার দিকে চেয়ে বলে, যাওয়া হবে না মশায়। সবাই গরু-ভেড়া নয় ওদের মতো। সত্যাগ্রহী ঠাঁই পায়নি শুনলে দশখানা গ্রাম থুতু দেবে আমাদের।

রোষদৃষ্টি হেনে তাদের বলে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পালাও—বিদেয় হও শিগগির। যা করতে হয় আমি করব। পুলিশ এলে বলে দিও, ভীমরাও আটকেছে।

আমার হাত মোক্ষম এঁটে ধরে ভীমরাও কটমট চোখে তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ এক আচ্ছা ব্যাপার! আমি যেন একটা বল বা ঐ গোছের কিছু—আমায় নিয়ে লোফালুফি চলছে। তারা অনেক দূর চলে গেল, ভীমরাও তখন বলে, রাতটুকু তো জিরিয়ে নাও, কাল তারপরে ভেবেচিন্তে দেখা যাবে। কোন জায়গায় থাকবে, দেখতে দিচ্ছিনে ওদের। কাউকে বিশ্বাস নেই। তবে রাজ-অট্টালিকা হবে না, সেটা মশায় আগেভাগে বলে দিলাম। সত্যাগ্রহ করতে এসেছ, জায়গার খুঁতখুঁতানি হবে কেন?

যেন আমি ইতিমধ্যে দরবার করে রেখেছি রাজ-অট্টালিকার জন্য। কিন্তু ঐ মেজাজের উপর কথা বলতে যাবে কে? লোক দুটো চলে গেছে, ভীমরাও তখনো চুপচাপ। একবার তাড়া দিয়ে ওঠে, এমনি তো হেঁটে চলবার মুরোদ নেই, অত দাঁড়াবার তেজ আসে কোথা থেকে? গাছের শিকড় রয়েছে, ওর উপর বসে পড়লে কি গতর ক্ষয়ে যায়?

ভয়ে ভয়ে সেই পথের ধারে বসে পড়তে হল। ভীমরাও সহসা কোমল হয়ে বলে, ঘোর না হলে যাওয়া যাচ্ছে না ভাই। কে কোথায় দেখে ফেলবে। বোসো আর একটু। পথ বেশি নয়। দু-চার পা এখান থেকে। হাঁটতে পারবে তো?

ঘাড় নেড়ে বলি, খুব—খুব—

পারবে বই কি! এত বড় [illegible]
[illegible]

তো হাঁকিয়ে দিচ্ছে, সেই সময় লোক-দেখানো সোহাগটা দেখলে না?

নিয়ে তুলল এক গোয়ালঘরে। বাড়ি নয়, খামার—ফসল তোলে এ জায়গায়। মালিক বোধ হয় জানেও না কিছু—গোয়ালে গরু তুলে জাবনা দিয়ে রাতের কাজ সেরে বাড়ি চলে গেছে। ভীমরাও এদিক ওদিক তাকিয়ে সন্তর্পণে ঝাঁপের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। পিছনে আমি। অন্ধকারে চোখ জ্বলে যেন তার—আমি কিছু দেখছি না, ওরই মধ্যে একটা কোণে নিয়ে গিয়ে বলে, ভালো কপাল তোমার। এতখানি শুকনো ফাঁকা জায়গা। বোসো, আরাম করে বসে পড়ো—

বসিয়ে দিয়েই বেরুচ্ছে। আস্তে আস্তে বলি, একটু যদি জল পাওয়া যায়—

ভীমরাও থমকে দাঁড়াল : রাত্তিরটা জল খেয়ে কাটাবে? চটে আছ গাঁয়ের উপরে—জল খেয়ে পড়ে থাকবে, অন্নগ্রহণ হবে না। এত বড় দুর্বাসা মুনি, তবে এসব কাজে কেন এসেছ শুনি?

এবং মিনিট দশেকের ভিতরে থালায় করে ভাত ডাল আর কি-একটু তরকারি নিয়ে এলো। আলো নেই, এসব হাত ঠেকিয়ে বুঝে নিচ্ছি। বলে, অন্ধকারে খেতে হবে। কেরোসিনের যা দর, এমনিই তো কত মানুষ আলো জ্বালে না। কোন লাটসাহেব হে তুমি, একটা রাত আঁধারে কাটাতে পারো না?

ভাগ্যিস অন্ধকার। আমার সেই অবস্থা তাই দেখতে পেল না। দেখলে নির্ঘাৎ হেসে ফেলত। অথবা কান্না আসত। ভাত এমন বস্তু, আগে কখনো ভাবতে পারিনি। কিন্তু হলে কি হবে—দু-গ্রাস পেটে না পড়তে নাড়িভুঁড়ি অবধি পাক দিয়ে উঠল। যেটুকু ভিতর গেছে, তার দশ গুণ অন্তত হড়হড় করে উগরে দিলাম। বিশ্বভুবন বনবন করে পাক খেতে লাগল। তারপরে আর কিছু জানি নে……

চেতনা ফিরলে দেখি, একা ভীমরাও নয় আর একটা মেয়ে জুটেছে। অন্ধকারে চেহারা দেখতে পাইনা, ঝিনঝিন গয়না বাজিয়ে সেঁক দিচ্ছে আমার হাতে পায়ে। গোয়ালের সাঁজালের আগুন ভীমরাও হাতপাখার বাতাস দিয়ে দিব্য গনগনে করে তুলেছে। এত সেঁকছে, শীত যায় না তবু : সর্বদেহে কাঁপুনি। লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই, ভয়ও হচ্ছে। উঠে বসতে যাই।

—সেরে গেছি আমি। আর দরকার নেই। তোমরা চলে যাও।

ভীমরাও বলে, যাবো তোমার হুকুমে নাকি? উঠো না বলছি, ভাল হবে না। উঃ, কম জ্বালান জ্বালিয়েছ! ওই ননীর দেহ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোও কোন আক্কেলে?

সুর নামিয়ে মেয়েটাকে বলে, দুধটা [illegible]

জবাব না দিয়ে মেয়েটা দুধের বাটি আগুনের উপর ধরল। চুড়ি-পরা নিটোল হাতের একটুকু। আসল রং ঠিক জানিনে, আগুনের আঁচে গৌরবরণ দেখাচ্ছে।

ভীমরাও বলে, দুধ খেয়ে নাও—চাঙ্গা হবে। জায়গাটা নোংরা করে ফেলেছ, দুখানা বেঞ্চি জুড়ে খাট বানিয়ে দিচ্ছি। আমি বেটা কাঁধে বয়ে এনে দেবো, উনি শুয়ে শুয়ে পা দোলাবেন—

বেঞ্চি আনতে ভীমরাও কোন দিকে চলে গেল। মেয়েটি এবার কথা বলে ওঠে। সহজ হিন্দি—আর কী মিষ্টি গলা! বলে, সত্যাগ্রহী, দুধটুকু খাও। আশীর্বাদ করো আমায়। তুমি রাগ করে থাকলে সুখশান্তি হবে না আমার জীবনে।

চমক লাগে, এমন কথা বলছে কেন? বলছে, বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল, সেই থেকে খোঁজ করছি তোমার। চুরি করে এসেছি মাপ চাইবার জন্য, বাড়ির কেউ জানে না। আমার এমন দিনে সত্যাগ্রহী তুমি রাগ করে থেকো না।

বিয়ের কনে এই? কোন গতিকে একটু আলো এসে পড়ত এই গোয়ালঘরে—করুণাময়ীকে দেখে নিতাম। কেমন চেহারা জানিনে। কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের ফোঁটা? বিয়ের কনে কেমন সাজ করে এদের দেশে? গয়না তো বাজছে, কোন কোন গয়না পরে এসেছ ওগো কন্যে?

একটু পরে বেঞ্চি ঘাড়ে ভীমরাও এসে পড়ল। বলে, দুধ খাওয়ানো হয়ে গেছে। ব্বাঃ ব্বাঃ! এবারে বাড়ি যাও তুমি, বেশিক্ষণ এখন বাইরে থাকে না। দুধ নিয়ে এসে খুব ভাল কাজ করেছ, বুদ্ধির কাজ করেছ—

খাইয়ে দাইয়ে ওরা চলে গেছে। একলা আমি, আর গরুগুলো। মশা হয়েছে—গরু পা দাপাচ্ছে, আমিও এপাশ-ওপাশ করছি মশার কামড়ে। স্বপ্নের মতো লাগে—নরম হাতে কতক্ষণ ধরে মেয়েটা সেঁক দিল, আর শিশুর মতন মাথাটা তুলে ধরে দুধ খাইয়ে গেল।

অনেক রাত্রি। ভারী বুটের আওয়াজে চোখ মেললাম, ঘুমের ভাব কেটে গেল। বুটজুতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোয়ালঘরের কানাচে। পুলিশ টের পেয়ে গেছে। দরমার বেড়ার এখানে ওখানে ফাঁক—টর্চ ফেলছে সেখান থেকে। টর্চের আলো মুখের উপর পড়ছে। আমার ঘুম ভাঙে না কিছুতে, মরে ঘুমুচ্ছি। দুমদাম লাথি পড়ছে দরজার ঝাঁপে। ঝাঁপ ছিঁড়ে পড়ে গেল। খুঁটি বেয়ে টকাটক উঠে পড়ে চালের বাতা খুঁজছে—কি খুঁজছে বলুন তো? বোমা-রিভলবার সেরেসুরে রেখেছি কিনা। আর জনচারেক ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমায়। বন্দুক তাক করা। পণ্ডগোল, কুঝেছি কি দেহের চার [illegible]

উল্টো দিকে। সেদিক দিয়ে আরম্ভ আর একজন। কী ভয়ানক ঘুম বুঝুন, ঘুম আমার কিছুতে ভাঙছে না। শেষটা চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করিয়ে চোখের পাতা জোর করে খুলে দিল। না জেগে আর উপায় কি?

কে তুমি?

আমি সত্যাগ্রহী—

এদিক দিয়ে ঠাঁই করে এক চড়, তো ওদিকে মুখ ঘুরে যায়। ওদিককার চড়ে মুখ আবার সিধে হয়। শেষটা আর নিয়ম নেই—এলোপাথাড়ি মারছে কিল-চড়-ঘুসি।

—কত জনে এসেছ তোমরা, তারা সব কোথায়? আবার চোখ বুজেছি আমি; ঘুম ধরেছে, শুনতে পাচ্ছি না। হাতে কুলোয় না তখন—লাঠি বের করল। বাঁশের ও রবারের ছোট ছোট লাঠি। শেষটা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল অন্য এক জায়গায়।

রাতে ভাল ঠাহর হয়নি—সকালবেলা দেখতে পাচ্ছি সেই গোয়ালের মতন ঘোড়া-ঘর নয়, পাকা দালান। দালান পাকাই বটে—তবে এ দালান যখন বানিয়েছিল, অনুমান করি, পর্তুগীজরা তখনো এসে জোটেনি। আজকে উজ্জ্বল রোদ, কিন্তু কালকের

বৃষ্টির জল টপটপ করে চুইয়ে পড়ছে ছাত থেকে। বৈশাখ মাসে পুণ্যার্থীরা তুলসীগাছে ঝারি বসান, আমার সর্বাঙ্গে তেমনিধারা জলের ঝারি ঝরছে। ন'টা নাগাত দরজার তালা খুলে ডাকল, বাইরে এসো সত্যাগ্রহী—

ফাঁড়িতে নিয়ে এসেছে। সাইনবোর্ডে পাচ্ছি, বিচুলি জায়গাটার নাম। অফিসের বড় বারান্দায় পুলিশেরা বসে। সেখানে নিয়ে দাঁড় করাল।

—কি ঠিক করলে, বলবে সব কথা? দেখ, চুপ করে থেকে পার পাবে না। মুখ দিয়ে কথা না বেরোয় তো জিভ ছিঁড়ে বের করব। যা জানো, বলে যাও।

—হুঁ।

—সত্যাগ্রহী বর্ডারে নিশ্চয় অনেক দেখে এলে?

—হুঁ।

উৎসাহভরে একজনে খাতা বের করে নিল।

—কত হবে? আন্দাজেই বলো না হে। কোন্ পথে আসছে তারা? কুচকাওয়াজ হচ্ছে শুনলাম ওদিকে—সত্যি?

—হুঁ।

আরও চলল কিছুক্ষণ। শেষটা খাতা ছুঁড়ে দিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরে—এক কথা কাঁহাতক বলি, বিরক্ত হচ্ছেন আপনারা। দিন পাঁচ-ছয় কেটে গেল। সেলে আটক থাকি, সকালবেলা বারান্ডায় নিয়ে নিয়মিত ডলাই-মলাই করে। দিনে রাতে দু-খানা পাউরুটি ও দুই গ্লাস জল বরাদ্দ। বেরুতে দেবে না। ঘরের মধ্যেই নোংরা হচ্ছে, তা বলে উপায় নেই।

এক বুড়ো পুলিশের উপর তদারকের ভার। লোকটি খৃষ্টান, কথাবার্তায় টের পেয়ে গেলাম।

—গোয়া ইণ্ডিয়ার মধ্যে ঢুকে গেলে তো গির্জা ভাঙবে তোমরা। পৈতে পরিয়ে আমাদের পুজোয় বসিয়ে দেবে।

—ইণ্ডিয়ায় লাখো লাখো গির্জা। গিয়ে দেখগে যাও। আর বিশ পুরুষ ধরে যাদের পৈতে, তারাই সব এখন পৈতে ফেলে দিচ্ছে।

একদিন লোকটা জিজ্ঞাসা করে, ভাইবোন ক'টি তোমরা?

—একলা।

—বিয়ে করেছ?

—না।

—মা-বাপ বর্তমান আছেন?

—মা ছোট্ট বয়সে মারা যান। বাবা আছেন, —বয়স হয়েছে, নড়তে চড়তে পারেন না।

—আচ্ছা পাষণ্ড তো বুড়ো! ছেড়ে দিলে কোন্ প্রাণে?

—না বলে চলে এসেছি।

—আসবে বই কি! এমনি ধনুর্ধর ছেলে তোমরা আজকাল। এত যে সাজা পাচ্ছ, বাপের মনে কষ্ট দিয়েছ তারই ফল। বেশ হচ্ছে, আমি বড্ড খুশি।

চটেমটে চলে গেল। কিন্তু মজা হল তারপর। আস্ত পাউরুটি এখন কেটে কেটে এনে দেয়। এক গাদা, খেয়ে শেষ করা যায় না।

তাই একদিন বললাম, ক'টা রুটি কাটো?

একটা। তাই তো হুকুম হয়েছে, বেশি দিয়ে কোন্ ফ্যাসাদে পড়ব। শকুনের চোখ ঘুরছে চারদিকে।

একটা রুটির এতগুলো টুকরা?

—রুটিটা বড় ছিল। একখানা করেই দিতে বলেছে, কি ওজনের হবে বলে দেয়নি তো?

ঠাহর করলাম রুটির টুকরোয় চিনি ছড়ানো। মাখনের মতো কি একটু লাগানো, এমনও সন্দেহ হয়। আর একদিন জানলার গরাদে দিয়ে কাগজে জড়ানো খানিকটা ভাজি এসে পড়ল।

ছয়দিনের দিন যথারীতি সেই বারান্ডায় দাঁড় করিয়েছে। আজকে বেশি জমজমাট। বারান্ডা ভরে গেছে। লালচে-মুখ পর্তুগীজ আছে, কটকটে কালো নিগ্রো আছে—গোয়ার দেশী লোকেরা তো আছেই। একটা নতুন লোক—সাজপোশাকে অফিসার মনে হয়—কোমল সুরে শুভার্থীর মতন বলে, এত কষ্ট করে লাভটা কি হবে বলতে পারো? গোয়া ভারতে গেলে নেহরু আর সাঙ্গোপাঙ্গদের মজা। তোমাদের নামও কেউ জানতে পারবে না।

ঘাড় নেড়ে সায় দিই, আমার নাম আবার জানতে যাবে কে?

—বোঝ তবে। খবরাখবর বলো দিকি সমস্ত। টাকা পাবে, আমোদ-স্ফূর্তি পাবে। এমন স্ফূর্তি যা তোমাদের ধারণায় আসে না। যে রকমটা চাও। বন্ধু হলে আমরা বড্ড খাতির করি।

—বটেই তো!

পুলকিত পর্তুগীজ অফিসার আমার দিকে ও সকলের দিকে চেয়ে হাঁক ছাড়ল, বলো সবাই সালাজার জিন্দাবাদ!

সবাই তাই বললো। আমার ক্ষীণ কণ্ঠ কেবল ভিন্নরকম—ভারত জিন্দাবাদ!

অফিসারের ফরশা মুখ কালো হয়ে গেছে। পাশের একজন বলে, এই শয়তানিই চলছে এদ্দিন ধরে। একখানা কাঠ স্যর, মানুষ নয়। শুকনো কাঠ আমরা পাহারা দিয়ে মরছি। কিম্বা হয়তো কোন মন্তোর জানে। আমাদের হাত ব্যথা হয়ে যায়, ওর গায়ে লাগে না।

আমি তখন বলি, কেন এঁদের হাতের কষ্ট দেওয়া? পাঞ্জিমে পাঠিয়ে দিন, বিচার হোক।

অফিসার বলে, অদ্দুর যেতে হবে না। বিচার আজ এখানেই। বিচারের জন্যে এসেছি—

বলিদানের আগে যেমন পাঁঠা পাছড়ায়, জনকয়েক তেমনি করে ধরল আমায়। চকচকে ক্ষুর বের করল। গলায় বসিয়ে দিয়ে জবাই করবে? আপনারা ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু কেমন রোখ চেপে গেছে—আমি তখন জীবনে বীতস্পৃহ একেবারে। ইচ্ছে করেই তো মরতে এসেছি।

না, গলা কাটল না। থরথর করে ক্ষুর অর্ধেকখানি কামিয়ে ফেলল। মাথার এখানে ওখানে খোঁচা খোঁচা চুল তুলে নিচ্ছে। হাসছে সকলে হো-হো করে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে। বলে, চুল তুলে নিলাম—তা রাগ কোরো না, কালো রং মিলিয়ে দিচ্ছি আবার—

আলকাতরা ঢালল মাথার সেই সব জায়গায়। দেখছে মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—শিল্পবস্তু মানুষে যেমন করে দেখে। বলে, খাসা দেখাচ্ছে—চমৎকার! এবারে কান দুটো। কান দুটো নিয়ে ছেড়ে দেবো তোমায়।

ক্ষুর ধরে সত্যি সত্যি কানে পোঁচ দিতে যায়। দু-হাতে কান চেপে ধরে মাথা ঘোরাচ্ছি এদিকে-ওদিকেঃ গলা কেটে ফেল আমার। সেই ভালো। কান ছুঁতে দেবো না।

অফিসার লোকটা সদয় হয়ে তখন বলে, যাকগে, যাকগে। দুটো কানের দরকার নেই, একটাতেই হবে। একটা নিয়ে নাও, আর একটা ওর থাক। কাটা-কানটা ইণ্ডিয়ায় পাঠাবো—এর পরে যারা আসছে, বুঝে সমঝে আসে যেন।

বিষম হুটোপাটি। গায়ে আমার অসুরের বল এসেছে। মানুষগুলোকে ঘা-গুঁতো দিয়ে ছিটকে নেমে পড়লাম। তখন মরীয়া। মারুক কাটুক, তার আগে শুনিয়ে যাই যে জন্য এত কষ্ট করে এত পথ এসেছি। পতাকা নেই আমার সঙ্গে—মুখে মুখে চেঁচাচ্ছি, ভারত জিন্দাবাদ! ছুটে বেড়াচ্ছি চেঁচিয়ে চেঁচিয়েঃ ভারতের জয় হোক—তোমাদের আমাদের সকলের ভারত—

—ধর্ ধর্—

কতক্ষণ পারব, ঝাপটে ধরেছে আবার। অফিসার বজ্রকণ্ঠে হুকুম দেয়, পায়ের তলা চিরে দাও। হেঁটে হেঁটে জন্মে আর সত্যাগ্রহে না আসতে পারে!

* * *

সত্যাগ্রহী শিরিষ-কাগজ ঘষছিলেন আলমারিতে। পালিশ হবে। কাগজ রেখে পা তুলে ধরলেন দৃষ্টির সামনে। বললেন, পা দেখাচ্ছি—কিছু মনে করবেন না। নয়তো ভাবতেন, বেটা গালগল্প চালিয়ে যাচ্ছে। পুঁজ হয়েছিল, সেই অবস্থায় সীমান্তে এনে একরকম ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দিল এপার-মুখো।

ঘা শুকিয়ে গেছে, তবু গা ঘিনঘিন করে ওঠে। পায়ের তলায় লম্বালম্বি আড়াআড়ি অগুন্তি সরলরেখায় জাল বুনে গিয়েছে।

সত্যাগ্রহী বলেন, হাঁটতে পারি না। জুতো পায়ে হাঁটতে গেলেও টনটন করে। তাই এই বসা কাজ ধরেছি। কাজটা ভালো। খাটুনির কিছু নয়, দিন গেলে [illegible] টাকার [illegible] দিকে [illegible]

গুটিপোকা

সতীনাথ ভাদুড়ী

ওয়াক পাখী ডাকে—ওয়াক্! ওয়াক্!

দুটো রাখাল ছেলে বলাবলি করে—"ঠিক যেন বমির ওয়াক তুলছে, নারে?"

"ঠিক যেন আঁতুড়ঘরে ছেলে কাঁদছে নারে?"

বুড়ো নিরাপদবাবুর মত কাজের লোকদের, এ ডাক কানেও যায় না। পাখির ডাক শোনা তাঁর কর্তব্যের ফিরিস্তির মধ্যে পড়ে না যে।

বারোয়ারিতলার তেঁতুলগাছে ওয়াক পাখির ডাকের কিন্তু বিরাম নেই। কেউ শুনুক, আর না-ই শুনুক, দাড়িওলা-মহাত্মাজী তো শুনবেনই। মালিকের দোকানে তেল-নুন ওজন করবার সময়েও, সে কান খাড়া করে থাকে শোনবার জন্য। মিষ্টি মিষ্টি ভিজে ভিজে লাগে; কষ আমলকি খাওয়ার পর মুখ একরকম মিষ্টি মিষ্টি রসরস হয়ে ওঠে না? সেই রকম। রসে-ভরা ভরাট গলা যেন মুখে মিঠে খিলি দিয়ে কথা বলছে। তার মধ্যে আবার একটু কাঁপুনি মেশানো: ছেলেপিলেদের হুইসেল-বাঁশির মধ্যে একটা ছিপির টুকরো থাকলে আওয়াজটা যে রকম কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ে, সেই রকম। রাতের বেলায় বিছানায় শুয়ে এ ডাক কানে এলে আজও উদাস মনটা কেঁদে কেঁদে ওঠে—ঘুম আসতে চায় না কিছুতেই।

মাথায় ছোট ঝুঁটি, পাঁশুটে রঙের ডানা, নীলাভসবুজ পা আর ঠোঁট, বকের মত দেহের গড়ন,—ওয়াক পাখিগুলোর। অনেকে এর মাংস খায়। বছর বিশেক আগে বারোয়ারিতলায়, এই পাখি মারা নিয়ে হ'ল এক কাণ্ড। সরকারী কাছারির নতুন বাড়ি তৈয়েরের জন্য, বাইরে থেকে যে কন্ট্রাক্টরর এসেছিল, তাদের কুলি খাটানোর কাজ দেখত গেরুয়াপরা একটি লোক। ওয়াক পাখির বাসায়-ভরা তেঁতুল গাছটার নিচে সে লোকটা পড়ে রইল তিন দিন না খেয়ে দেয়ে; বারোয়ারিতলায় বন্দুক দিয়ে পাখি মারলে, সে না খেয়ে প্রাণত্যাগ করবে ওইখানেই। এ নিয়ে মহা হইচই। বারোয়ারি কমিটির মিটিং পর্যন্ত হ'ল। সেই থেকে শুধু যে ওয়াকপাখি মারা বন্ধ হ'ল তা' নয়, লোকটার নাম হয়ে গেল দাড়িওলা-মহাত্মাজী। এত বড় নাম ধরে ডাকা যায় না সব সময়। প্রবীণ প্রবীণারা তাই ডাকেন মহাত্মা ব'লে; আর অন্য সবাই ডাকে দাড়িওলাদা' ব'লে।

দুর্নাম নিয়ে সেই কণ্ট্র্যাক্টরকে এখান থেকে চলে যেতে হয়। কাঠের ফ্রেম খুলতেই নতুন জমানো সিমেণ্ট-কংক্রিটের ছাত ধসে পড়ে, দুজন লোকও মারা যায়। দাড়িওলা-মহাত্মা সেই সময় থেকে এখানেই রয়ে গিয়েছে। পাখির ডাক আঁকড়ে পড়ে আছে। ওয়াক পাখি ডাকে।

দাড়িওলা মহাত্মা মনে মনে জাল বোনে। আর জাল বোনে গুটিপোকারা, সমাজসেবী নিরাপদবাবুর রেশমঘরে। নিজের দেহটাকে উলটে-পালটে ঘুরপাক খাইয়ে খাইয়ে মুখের লালা দিয়ে মিহি রেশমের জাল বোনে।

বুড়ো নিরাপদবাবু সেগুলোকে গরম জলে সিদ্ধ করেন পাছে আবার গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে না যায়।

লোকদের দৃষ্টান্ত দিয়ে শেখানর জন্য তিনি বহু জিনিস করেছেন সারা জীবন ধরে। এখন গুটিপোকার চাষ নিয়েই মেতে আছেন।

হালখাতার দিন সন্ধ্যায় গুটিপোকা সিদ্ধ করতে করতে তাঁর দেরি হয়ে গিয়েছিল। মালিক দোকানে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের মত বড়লোকদের কৃপাতেই তো দোকান চলে;—শুধু বড়লোক নয়—মহৎ পরোপকারী লোক। সব সম্ভ্রান্ত খদ্দেররা এর আগে দোকানে পায়ের ধুলো দিয়ে গিয়েছেন—এক শুধু তিনিই বাকি। এই যে তাঁর গাড়ি এসে থামল! কিছুক্ষণ গুটিপোকার গল্প করে, বেশ কিছু মোটা টাকা দোকানে জমা দিয়ে, তিনি লাঠি ঠুক-ঠুক করতে করতে আবার গিয়ে গাড়িতে উঠলেন—সময় নেই তাঁর মোটে—বহু জায়গায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে। তিনিও গেলেন, মালিকও উঠলেন বাড়ি যাবার জন্য।

"মহাত্মা, তুমি তাহ'লে ঘণ্টাখানেক পরে দোকান বন্ধ করে এস। লুচি মিষ্টি অনেক বেঁচে গেল দেখছি।"

"না, ওগুলো বাঁচবে না—খরচ হবে।"

"ও তোমার চেলা শাগরেদদের দল এখনও কি!"

মালিক হেসে চলে গেলেন।

দল বোধহয় কাছেই কোথাও অপেক্ষা করছিল। দাড়িওলা-মহাত্মাজীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে তা'রা এসে হাজির হ'ল দোকানে। বয়সনির্বিশেষে সব ছেলেই দাড়িওলাদা'র বন্ধু। স্কুলের ছেলেরা তার কাছ থেকে সিগারেট কেনে, তার ঠিকানায় কলকাতা থেকে নভেল আনায়। আর একটু বেশি বয়সের যুবকরা দাড়িওলাদা'র মাইনের অর্ধেক জোর করে নিয়ে নেয় ক্লাবের জন্য। এরা সেই বড়দের দল।

"বুড়ো কি বলল দাড়িওলাদা?"

"অতবড় একজন লোক। তাঁকে 'বললেন' বলতে পার না?"

"বুদ্ধ কি বলিলেন? রেশমকীটের কাহিনী নয় কি?"

হাসির শব্দে দাড়িওলাদা'র জবাবটা শোনা গেল না।

"ভো ভো শমশ্রুল অগ্রজ! আপনার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করুন।"

"আমি বলছিলাম যে একজন বিরাশি বছরের বুড়ো ভদ্দর লোক যদি তোমায় দুটো বাক্যে উপদেশই দেন, তা' শুনলে কি তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে?"

"আচ্ছা দাড়িওলাদা, তুমি সব সময় ওই বুড়োর দিকে টেনে কথা বলো কেন বল তো?"

লুচি মিষ্টি পরিবেশন করতে করতে সে জবাব দেয়,—"কারও দিকে টেনে কথা বলি না। পাড়ার লোকের জন্য ভদ্দরলোক কী না করেন। যার যখন যে দরকার, সবাই ছোটে নিরাপদবাবুর কাছে। কোন দিন না বলতে শুনেছ ভদ্দরলোককে? লোকের বিপদে-আপদে সব সময়....."

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সে। হঠাৎ নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। সকলের চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল একবার। সব সময় সে সতর্ক হয়ে থাকে। তবু কেন সে ব'লে ফেলল এ কথা। বিপদ-আপদের কথাটা তোলা ঠিক হয়নি। কথার মোড় ঘোরাবার জন্য জিজ্ঞাসা করে—'তোমাকে আর দুখান লুচি দিই? আরে লজ্জা কি! নাও, নাও। তুমিই বা বাদ থাকো কেন? এস।

কিন্তু সামলানো গেল না।

"বুদ্ধের ওই যে বিপদ-আপদে গিয়ে দাঁড়াবার কথাটা বললে না, ওরই জন্য তো আমরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ি। আমার বাড়ি হ'লে আমি বুড়োকে ব'লে দিতাম পরিষ্কার —বিয়েতে এস, পইতাতে এস, ভোজে কাজে এসে দাঁড়াও, বাড়িতে ডাকাত পড়লে এস, আগুন লাগলে/এস, বাড়ির ঝগড়া মিটোতে এস, কিন্তু দোহাই তোমার, বাড়িতে কারও অসুখ করলে দেখতে এস না!"

"যা বলেছিস!"

"একটা কথা অনেকদিন আমার মনে হয়েছে, বুঝলি। নিজের ছেলের অসুখ করলে নিরাপদবাবু কি সে ঘরে ঢোকেন?"

প্রচুর হাসি-তামাশার মধ্যে এই সমস্যার উপর ভোট নেওয়া হ'ল, দীর্ঘ আলোচনার পর। সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয়ে গেল যে, যেহেতু নিজের বাড়িতে অপয়ার ধক থাকে না, যেহেতু যার নামে হাঁড়ি ফাটে তার বাড়িতেও রান্না হয়, যেহেতু মাছ ধরতে যাবার সময় যার মুখ দেখলে খালি হাতে ফিরতে হয় সেও প্রত্যহ মাছ খায়, সেই জন্য এই সভার মতে নিরাপদবাবু নিজের ছেলের অসুখ করলেও রুগীর ঘরে ঢোকেন।

—সিগারেট আছে—যার যা ইচ্ছা—পান জরদা, সিগারেট তিনটেও নিতে পার ইচ্ছা করলে।"

দাড়িওলা-মহাত্মার এই শেষ চেষ্টাও বৃথা হ'ল। বরঞ্চ ফল হ'ল উলটো। সকলে চেপে ধরল দাড়িওলাদা'কে—এ বিষয়ে তার মতটা জানবার জন্য।

"লোকের পিছনে লাগতে তোমরা এতও ভালবাস!"

"পিছনে আবার লাগলাম কোথায়। তোমার মতটা কি তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"আমি কিছু বলব না। বছরের প্রথম দিন পরনিন্দা করলে, সারা বছরটা এই কাজেই কাটবে।"

"ও বোঝা গেল! তুমি আমাদের স্বীকৃত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে? তা তো হবেই।"

এ রসিকতার অর্থ এখানকার সবাই জানে। হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে। দাড়িওলাদা' নিজের কাঁচুমাচু মুখখানায় জোর করে হাসি আনবার চেষ্টা করছে। রসিকতাটা তাকে নিয়ে; তার মনের সবচেয়ে স্পর্শ-কাতর জায়গাটাকে নিয়ে। অন্যলোকে এ কথাটা তার মুখের উপর খোলাখুলি বলে না; কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সে শিষ্টাচারের নিয়ম মানবে কেন; তাঁকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে ছাড়বে কেন। যত অন্তরঙ্গ তত বেশি নিষ্ঠুর।

"দাড়িওলাদা', দু' বছর হয়ে গেল, এখনও তোমার মালিকের দোকানটাকে ফেল মারাতে পারলে না—এ কিরকম হ'ল! তোমার নাম খারাপ হয়ে যাবে দেখছি এইবার।"

এতক্ষণে আক্রমণটা এসেছে। এইটারই তার ভয়। এখানকার লোকের মনে একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা আছে যে, সে যার চাকরি করে, তার ব্যবসাই ফেল্ করে। এ ধরনের কথার প্রতিবাদ করলে আরও কথা বাড়ে, চটলে লোকে আরও বেশি করে ক্ষেপায়—এসব সে জানে। এসব [illegible] কৌশলে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়; কথা উঠবার সম্ভাবনা দেখলে গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হয়, না হয় কাজের ছুতো দেখিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে হয়; তাও যদি সম্ভব না হয়—তবে সাবধান, চোখে যেন জল না আসে, মনের ব্যথা যেন চোখমুখে প্রকাশ না পায়, চেষ্টা করবে মৃদু হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে রাখতে। বিশ বছরের অভ্যাসে এসব তার আয়ত্ত হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা দুর্নাম নয়; এ তার জীবিকা নিয়ে টানাটানি। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়, সতর্ক হয়ে থাকতে হয়। প্রাণের দায়ে সে সাধ্যমত এখানকার সকলকে খুশি রাখবার চেষ্টা করে; বুড়োদের খবরের কাগজ পড়ে শোনায়; মেয়েদের ফাইফরমাশ খাটে; ছেলেদের তো কথাই নাই। আঘাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় কত ভাবে যে সে নিজেকে ছোট করছে নিজের কাছে [illegible] তার ঠিক নাই।

চেষ্টা। দিনদিনই সংকুচিত মনটাকে আরও বেশি করে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে হয়। তার পেটের মৃদু ব্যথাটার চাইতেও এ ব্যথার অস্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি। কিরকির করে বিঁধছে সব সময়। এর হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া। বোঝে সব; কিন্তু পারে না। উপায় যে নেই!

তবু এক-এক সময় মেজাজ ঠিক রাখতে পারা যায় না।

"লোকের সুনাম করতেও তোমরা; দুর্নাম করতেও তোমরা! দশচক্রে ভগবান ভূত। লোককে অপয়া করতেও তোমরা, পয়মন্ত করতেও তোমরা!"

এতক্ষণ বেলেখেলা চলছিল; এইবার আসর সত্যিকারের জমে উঠল।

"আচ্ছা, আমি বলছি। এক-এক করে গুনে যা। পয়লা নম্বর—নতুন কাছারির কণ্ট্র্যাক্টর।"

"কণ্ট্র্যাক্টরবাবু সিমেণ্ট চুরি করায় ছাত ধসে পড়ল। আর আমি হলাম অলক্ষুণে?"

"দুই নম্বর—বেচুবাবুর মনোহারির দোকান।"

"টাকা ঢালবে না দোকানে। আমি বলে-বলে হয়রান। কানেও তোলে না। যা থোক, তাই নেই। খদ্দের আসবে কেন? দোকান উঠে গেল কি আমি অপয়া ব'লে?"

"তিন নম্বর ছকুবাবু আর গদাইবাবুর দেওয়া দোকান।"

"দুজনের মধ্যে যে যখন দোকানে বসে সে-ই তখন টাকা হাতায়। দুজনেই মালিক; কা'কে ঠেকাবে! ছকুবাবু কলকাতায় গেল বউ আনতে—বলল, দোকানের মাল কিনতে যাচ্ছি। শুধু নিজের রাহা আর খাইখরচ নয় —ট্যাক্সিতে করে মুর্গিহাটা থেকে মাল কেনবার পর্যন্ত বিল করল দোকানের উপর। এ ব্যবসা যদি ফেল্ না মারে, তবে ফেল্ মারবে কোন্ ব্যবসা?"

"চার নম্বর—শ্রীনাথবাবুর খবরের কাগজ বিলি করবার কাজ।"

"হায় রে আমার কপাল! কলকাতার কাগজের অফিস থেকে তাগাদার পর তাগাদা আসে। ভদ্দরলোক নির্বিকার! কিছুতেই টাকা পাঠাবে না। মাঝে মাঝে দু দশ টাকা ঠেকিয়ে দেয়। এমনি করে আর কতদিন চলে? কলকাতার কাগজওয়ালারা তো আর দানছত্র খুলে বসে নি। তারা কাগজ পাঠান বন্ধ করল। এর মধ্যে, আমি অমঙ্গুলে কি না সে কথা ওঠে কি করে?"

পাঁচ নম্বর—হেমবাবুর মনিহারীর দোকান।"

"আরে, বড়রাস্তার উপর না হ'লে কি মনিহারী দোকান চলে? নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় দোকান খুলে [illegible]!"

"ছ' নম্বর—[illegible]

"এই তো হাবলা এখানে রয়েছে—বলুক! তিন বন্ধুর টাকায় দোকান—সবাই নিজের নিজের মত চাকরিবাকরি করে। দোকানে যা বিক্রি হয় সবাই মনে করে লাভ! চপ-কাটলেট খেয়েই দোকানটাকে উড়িয়ে দিল। কত সাবধান করে দিলাম—কে কার কথায় কান দেয়! ব্যবসা ফেল্ মারল কেন। না, দাড়ি-ওলাদা' অপয়া। বলো, তোমরাই বলো!"

"হাতযশ কি সকলের থাকে, দাড়িওলাদা।"

"সাত নম্বর—..."

"ব'লে যাও, ব'লে যাও।"

আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা ঝিমিয়ে এসেছে।

"আট নম্বর—..."

"পেয়েছ, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো দাড়ি-ওলাদা'কে; ব'লে নাও।"

"ন' নম্বর—..."

"যে মরেই রয়েছে, তা'কে মেরে আর লাভটা কি তোমাদের।"

নামের ফর্দ এক জায়গায় শেষ হতে বাধ্য, তাই শেষ হ'ল।

"আচ্ছা দাড়িওলাদা, যে কারণেই ব্যবসা-গুলো ফেল্ করুক, এটা তো স্বীকার কর যে, তুমি যার চাকরি নিয়েছ, সে-ই গণেশ উলটেছে?"

"অন্যভাবে দেখ না কেন জিনিসটাকে। বলো না কেন যে ফেল্ মারবার মত ব্যবসা-গুলোতেই আমার চাকরি জুটেছে বারবার। ভাল জায়গায় জোটেনি।"

"তাই বা হয় কেন? ভুলে একবারও কি চলবার মত ব্যবসাতে তোমার চাকরি জুটল না?"

"আমার কপাল!"—সত্যিই এ প্রশ্নের জবাব নেই তার কাছে। কেন এমন হয়? ভালভাবে, স্থায়িভাবে চলবার মত ব্যবসাতে কেন সে ঢুকতে পারে না? তর্কের মধ্যে এইখানে পৌঁছবার পর, আর পায়ের নিচে শক্ত মাটি পাওয়া যায় না। সে জানে যে, অপবাদটা মিথ্যা; কিন্তু তার বলবার মুখ নেই। নিরস্ত্র সে। শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন গতি নেই তার। এখানে থাকবার দাম এই অপযশটুকু। এখানে থাকতে গেলে দিতেই হবে। সে হো-হো করে হেসে ওঠে। সে হাসি আর থামতে চায় না। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল। জেরায় কোণঠাসা হ'লে এই রকমই করতে হয়। নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রূপে প্রাণ খুলে যোগ দিতে হয়, দলের সঙ্গে সঙ্গে। দেখাতে হয় যে, রসিকতাটা তুমিও তাদেরই মত উপভোগ করছ। তা'রা যদি দু' পা যায়, তুমি আরও এক-পা বেশি এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে বলো—"যাদের নামে হাঁড়ি ফাটে, তাদের হচ্ছে 'জেনারেল প্র্যাকটিস'। আমরা হলাম স্পেশ্যালিস্ট। আমি [illegible] [illegible]

পেনাল্টি শট-এ স্পেশ্যালিস্ট—ওর নাম নিলে কিছুতেই গোল হবে না।"......

হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে আসে সকলের। দাড়িওলাদাটা এমন এমন কথা বলে!...... একেবারে হাসিয়ে হাসিয়ে মারে! ..এই জন্যই সকলের ওকে এত ভাল লাগে।

"একবার বোলো, দাড়িওলা মহাত্মাজীকা জয়!"

"ওঠ! ওঠ সকলে! এইবার দোকান বন্ধ করতে হবে।"

...এরা বোঝে না, তার দিক থেকে জিনিসটাকে কখনও ভেবে দেখে না, হাসি-ঠাট্টা করে। এইরকম নির্দোষ হাসি-ঠাট্টা থেকেই হয় অপয়া দুর্নামটার আরম্ভ। তখন বোঝা যায় না—পরে কবে থেকে যেন উল্কির দাগের মত গায়ে আঁকা হয়ে যায়। ও দাগ ওঠে না। একবার অপয়া তো চিরকাল অপয়া। কেন তার এমন হ'ল? এখানে আসবার আগে পর্যন্ত তো তা'র এ অখ্যাতি ছিল না। ছেলেবেলায় সে নিজেও হয়ত কত লোকের পিছনে লেগেছে, তাই বুঝি ভগবান তা'কে শাস্তি দিচ্ছেন!......হয়ত সময়টাই খারাপ পড়েছে তার—গ্রহনক্ষত্র কত কিছু আছে তো! সেইটা কেটে গেলেই আবার ভাল সময় আসে। প্রতিবারই তো সে ভাবে যে এইবার বুঝি তার দুঃসময়টা কেটে গেল। কিন্তু কাটে কই! বিশ বছর হয়ে গেল!.....এই জায়গাটাই তার সইছে না বোধ হয়!......হয় না এরকম? এক-এক জনের এক-এক জিনিস সয় না? সেই রকমই কিছু হবে নিশ্চয়।......কিন্তু পুরনো-কথা-মনে-পড়ানো বর্ষারাতের ওয়াকপাখির ডাক, বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে আর কোথায় পাবে? গঞ্জের বাজার ছাড়বার পর কয়েক বছরের ভবঘুরে জীবনে কত জায়গা তো ঘুরে দেখেছে!...এমন মনে-পড়ানি জায়গা যে আর নেই ভূভারতে! নিজের দেশের গঞ্জের বাজারে ফিরে যাবার পথ যে তার বন্ধ!......

মালিকের বাড়িতেও আজ হাসখাতার খাওয়াদাওয়ার জের চলেছে। দু' চারটি অন্তরঙ্গ পরিবারের মেয়েরা নিমন্ত্রণ খেতে এসেছেন। দাড়িওলা মহাত্মা যখন বাড়ি পৌঁছল তখন তাঁরা খেতে বসেছেন। সব বাড়ির মেয়েদের সঙ্গেই তার জানাশোনা। গেরুয়া কাপড় পরে, মাছমাংস খায় না, যখন যে কাজ বলো হাসিমুখে করে দেয়, এর কথা ওর কাছে বলে না, কারও নিন্দা কুৎসার মধ্যে থাকে না,—তাই পাড়ার গিন্নীবান্নীরা সকলেই তাকে ভালবাসেন, তাকে বিশ্বাস পান; তার কাছে সংসারের সুখদুঃখের গল্প করেন; তাকে দিয়ে লুকিয়ে গয়না গড়ান। সব বাড়িতেই তার অবারিত দ্বার। অদ্ভুত একটা সম্বন্ধ সে পাতিয়ে নিয়েছে এখানকার সব বাড়ির সঙ্গে, এই বিশ বছরের মধ্যে। [illegible]

করেছে এর আগে;...তার উপর গেরুয়া কাপড়ের পাসপোর্ট। সে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েদের খাওয়ার কাছে। অন্য কোন তার বয়সী পুরুষমানুষের মেয়েদের খাওয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস হ'ত না।

বেচুবাবুর স্ত্রী হেসে বললেন—"এতক্ষণে ছুটি হ'ল মহাত্মার। তোর খাওয়া হ'ল না, আর আমরা খেয়ে নিলাম।"

বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হয়েছেন। বাড়ির ছেলে, রাঁধুনি বামুন, আর সন্ন্যাসী ঠাকুর,—তিন মেলালে যা হয়, তাই হচ্ছে দাড়িওলা-মহাত্মার সম্পর্ক এই সব পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে।

"তাতে কি হয়েছে।"

"হবে আবার কি; তোর জন্য মিষ্টিটিষ্টি কিছু আর আমরা রাখব না।"

"আমাদের মালিকানীকে মিষ্টিতে ফেল্ করানো অত সোজা নয়, বুঝেছেন। ও মালিকানী! শুনেছেন! এদিকে। এই পাতে আর দুটো মিষ্টি দিয়ে যান।...তা' বললে কি চলে? একটা নিতেই হবে।"

"মালিকানী আবার কি কথা? মা বলতে পারিস না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনারাই বুঝিয়ে বলুন তো দিদি, মহাত্মাকে। কি বিশ্রী শুনতে মালিকানী কথাটা। আমি তো ওকে ব'লে ব'লে হার মেনে গিয়েছি।"

"মালিকানী কথাটাই ভাল। ওতে নিজের নিজের জায়গাটা সব সময় মনে থাকে দুজনেরই। যার যে জায়গা, বুঝলেন।"

হাসছে মহাত্মা।

"শোন কথা! এ কথার কোন মানে হয়!"

এই এক উত্তর মহাত্মার। বাঁধা উত্তর। বেচুবাবুর স্ত্রীর জানা। পাড়ার যার-যার বাড়িতে কাজ করেছে, সে সব বাড়ির গিন্নীদের জানা। সবাইকে সে একদিন মালিকানী বলেছে। সবাই সে সময় মালিকানী কথাটাতে আপত্তি করেছেন। কিন্তু সব সময় ওই এক উত্তর।......নিজের নিজের জায়গা ঠিক থাকে।......জায়গার আবার ঠিক-বেঠিক কী? কী ভাবে, কী বলে, কী করে, তা' ওই জানে! মা বলতে না পারিস মাসি, পিসি, খুড়ি, জেঠিও তো বলা যায়!...

সবাই যে যার নিজের নিজের মত মানে করে নেন। কেউ ভাবেন, মা ব'লে বুঝি কোথাও ঠকেছে; দুঃখ পেয়েছে বোধহয়। কারও-বা ধারণা যে, সে মায়ের মর্যাদা যাকে-তাকে দিতে চায় না। কারও বা সন্দেহ যে, বয়সে বেমানান ব'লেই হয়তো তাকে মা বলতে চায়নি। কিংবা হয়ত নিজের মাকে নিয়েই মনের ব্যথা ওর—কখনও বাড়ি যায় না—কারও কাছে নিজের দেশের কথা বলে নি কখনও—জিজ্ঞাসা করলেও বলে না।... পুরনো মালিকানীদের মধ্যে বেচুবাবুর স্ত্রীই [illegible]

বাড়িতেই সে সব চেয়ে বেশিদিন কাজ করেছে কি না। তাঁর ধারণা যে, মহাত্মার মতে মা সম্বন্ধটা স্থায়ী; মালিকানী সম্বন্ধটা সাময়িক; যেদিন ইচ্ছা ছিঁড়ে ফেলা যায়।...কতবার তাকে চাকরির জায়গা বদলাতে হয়, অতবার কি মা বদলানো যায়?

...বলে ঠিকই। মা যদি—তবে বাবসা ফেল মারবার পরও বাড়িতে ছেলের মত রেখে খেতে দিলেন না কেন? মানুষটা একটু অদ্ভুত কি না...অন্য কারও সঙ্গে মেলে না। এত মেলামেশা সকলের সঙ্গে, অথচ যেন আলগোছে মেশে!—নির্লিপ্ত গোছের। এত হাসিখুশি, তবু যেন কোথায় ওর বাথা!...... বহুকাল আগে একদিন ব'লেছিল যে, ওর ছোটবেলাতেই মা-বাবা দুজনেই স্বর্গে যান।

...অন্য নিমন্ত্রিতরা চলে যাবার পরও বেচুবাবুর স্ত্রী কিছুক্ষণ থেকে গেলেন, মহাত্মার খাওয়ার কাছে বসবার জন্য। অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে, এই সব ছোট-ছোট না-চাইতে-পাওয়াগুলোকে, বড় ভয়-ভয় করে মহাত্মার।

খাওয়াদাওয়ার সম্বন্ধে সে খুব সাবধান। কিন্তু সে রাত্রে বেচুবাবুর স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে খাওয়াটা বেশি হয়ে গিয়েছিল। শেষ রাত্রি থেকেই পেটের মৃদু বাথাটা বাড়ে। আবার বেশি বাড়াবাড়ি না হয়, সেবারকার মত! সে-ই তার ভয়। সকালে দোকান খুলে সে বেঞ্চিখানার ওপর শুয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর একটু খারাপ মেজাজ নিয়ে উঠে, দোকানের কাজকর্ম আরম্ভ করে। সারারাত ঘুম হয়নি; শরীরে জুত পাচ্ছে না; মালিক দোকানে এলে এখন একটু সাহায্য হ'ত। কিন্তু মালিক যে ওঠেন বেলা করে। দোকানে আসতে আসতে তাঁর প্রায় ন'টা বাজে। বয়স হচ্ছে তো। পেন্সন নেবার পর 'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড'-এর টাকা দিয়ে এই মুদিখানার দোকান খুলেছেন। কাচ্চাবাচ্চা অনেক; তাই এই দোকান দেওয়া।

একজন খদ্দেরের জন্য আধ সের নুন ওজন করতে করতে হঠাৎ তার হাত কেঁপে উঠল—"দাড়িওলাদা'! দাড়িওলাদা'! চল শিগগিরই, মা ডাকছে!" খোকন ছুটতে ছুটতে আসছে—মালিকের ছোট ছেলে খোকন।... জোর তাগিদ দিয়ে মালিকানী অনেক সময়ই ডেকে পাঠান। গরম গরম মুড়ি খাওয়াবার জন্যও জোর তাগিদ, লক্ষ্মীর ব্রতকথা শোনাবার জন্যও জোর তাগিদ, আবার পাঁচিলে চড়ে শিম পেড়ে দেবার জন্যও জোর তাগিদ। কিন্তু এর সুর অন্য—একেবারে অন্য রকম! ছ্যাঁৎ করে গিয়ে মনে লাগে; একটা আতঙ্ক ও অস্বাচ্ছন্দ্যের শিহর সারা দেহে খেলে যায়। কেন ডাকছে সে আন্দাজ করে নিয়েছে। ব্যাঙ আর পিঁপড়েরা যেমন করে আসন্ন ঝড়বৃষ্টির কথা জানতে পারে, তেমনি করে সে জানতে পেরেছে। অন্যদিন হলে সে জিজ্ঞাসা করত [illegible]

এখন সে চুপ করে থাকে—যতটুকু দেরি করা যায়—ছেলেটা আপনা থেকেই বলবে। ছেলেটা বয়সে অত ছোট না হ'লে, প্রথম নিশ্বাসেই আসল খবরটা দিয়ে দিত! তা'র কথা যেন কানেই যায়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে, মহাত্মা খদ্দেরকে বলে—"আধ সের নুন। এই এস।"

"দেরি করছ কেন দাড়িওলাদা? মা যে এখনই যেতে বলেছে!"

"যে খদ্দের দোকানে এসে পড়েছে, তাকে বিদায় করব, তবে তো যাব!"

অতটুকু ছেলে খদ্দেরের প্রতি দোকানদারের কর্তব্যের কিই-বা বোঝে। তাড়া খেয়ে সে চুপ করে গেল।

"তুই একটু তাহ'লে দোকানে ব'স খোকন! কোন খদ্দের এলে বলবি যে দাড়িওলাদা' এই এল ব'লে।"

"না না মা দোকান একেবারে বন্ধ করে যেতে বলেছে। মা'র বড় ভয় ভয় করছে।..."

বুকের স্পন্দন থেমে গেল খোকনের এর পরের কথাটা শোনবার জন্য।

"......পায়খানা থেকে এসেই, বাবার যে অসুখ করেছে।"

ধীরেসুস্থে দোকান বন্ধ করলে কি হয়, তালা দেবার সময় তার হাত কাঁপছে।

পাশের দোকানদার জিজ্ঞাসা করে "এমন অসময়ে যে?"

মালিকানীর ডাক পড়েছে।"—ঠোঁটের কোণে একটু হাসি।

তাকে পিছনে ফেলে খোকন ছুটে চলে গেল। সে হাঁটছে আস্তে আস্তে। মনের আলোড়ন চেপে একটা অবিচলিত শান্ত ভাব দেখাতে চায়, বাইরের নিষ্করুণ পৃথিবীকে।

দাড়িওলাদা' বাড়ি পেঁছে দেখে, ডাক্তার তার আগেই এসে গিয়েছেন। পাড়ার দুচার জন লোকও রয়েছেন। মেঝের উপর মাদুরে মালিক শুয়ে, বুকে বাথা, শরীর কেমন করছে, কথা বলতে পারছেন না—খুব গরম লাগছে। মালিকানী পাখার বাতাস করছেন। নড়াচড়া বারণ, তাই তক্তাপোশে পর্যন্ত উঠিয়ে শোয়ান হয়নি। শক্ত অসুখ। মানসিক উদ্বেগ ঢাকবার চেষ্টা কারও নেই। ডাক্তারবাবু বড় ডাক্তারকে ডাকতে বললেন; একা নিজের উপর দায়িত্ব রাখতে ভরসা পান না।...অক্সিজেন দেবার যন্ত্রটা এনে রাখা ভাল, এখানকার একমাত্র যন্ত্রটা খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে; মধুগঞ্জ হাসপাতালেরটা আনিয়ে নেন এখনই লোক পাঠিয়ে।... একজন যাও চট করে কারও কাছ থেকে মোটরগাড়ি চেয়ে নিয়ে। দেরী কর না!... উনুনে এক হাঁড়ি গরম জল চড়িয়ে রাখ!... বড় ছেলেকে একখান টেলিগ্রাম করে দাও!... এতগুলি কাচ্চাবাচ্চা ভদ্রলোকের! একটা ছেলেও এখনও মানুষ হয়নি! মেয়ের বিয়ে বাকি!

ডাক্তার, বদ্যি, লোকজন—মুহূর্তের মধ্যে [illegible]

বাড়িটাতে। সদর দরজার বাইরে জনকয়েকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বড় ডাক্তারবাবুকে। তাঁর অভিমতটা জানতে চায়।

...রুগীর জ্ঞান আছে; ভাল লক্ষণ; হার্টের অসুখ; একদিন এই রকম কাটলে, তবে আশার কথা।...যত সময় কাটে, তত বিপদ কমে এ সব রোগে।...

দাড়িওলা মহাত্মা বড় ডাক্তারের পিছন থেকে ব'লে ওঠে—"মালিককে কত বারণ করি বেশী করে খেতে। ব্লাড-প্রেসারের রুগী উনি, কাল রাতেও আধ সের মাংস খেয়েছেন। অল্প বয়সে যা সহ্য হয়, এ বয়সে কি তা' হয়!"

এ তার আত্মরক্ষার অস্ত্র; এখন থেকে বলে রেখেদিল; ভবিষ্যতে কাজে লাগতেও পারে। শ্রোতাদের সকলের মুখচোখ সে লক্ষ্য করছে।...সকলে রুগীর কথাই ভাবছে—তার কথাটা এখনও কারও খেয়াল হয়নি। কিন্তু সে আর কতক্ষণ!...কত লোক তো সেরে ওঠে এই ব্যারামের হাত থেকে! সে খবরের কাগজে পড়েছে কয়েকজন নামজাদা লোকের কথা, যাঁরা এই অসুখের ধাক্কা সামলে উঠে আবার নিজেদের কাজকর্ম করছেন।...হে ভগবান, আমার মালিককে বাঁচিয়ে দাও! আমার পাপখণ্ডন কি এখনও হয়নি!...

"শরীরটা বেশী খারাপ লাগছে? বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেবো? তবে? কি বলছ? কা'কে খুঁজছো? মহাত্মাকে? মহাত্মাকে একবার ডেকে দেবো? ও মহাত্মা, কোথায় গেলি—শীগগির শোন—তোকে ডাকছেন।"

...মালিক ডাকছেন! সে ঘরের ভিতর ঢুকল তাড়াতাড়ি। মালিকানী উঠে রুগীর পাশে তার বসবার জায়গা করে দিলেন। চোখের ভ্রূকুটিতে ছোট ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে দিলেন যে, কথাবার্তা ব'লে রুগীর বিশ্রামের ব্যাঘাত করবার সময় এখন নয়। মালিকের অসহায় চাউনি করুণ মিনতিতে ভরা। কি যেন বলতে চান। কি যেন অনুরোধ করতে চান!

কি বুঝল, না বুঝল সে-ই জানে। মহাত্মা আশ্বাস দিয়ে বলে—"সে সব কথা আপনি ভাবছেন কেন? দিনকয়েক বিশ্রাম করলেই আপনি ভাল হয়ে উঠবেন। আমি তো রয়েইছি।"

তবু যেন একটু আশ্বস্ত হলেন মালিক। একটু স্বস্তি, একটু কৃতজ্ঞতা—মহাত্মার কথার উপর যে নির্ভর করা যায়।...

এইটুকুই তার তৃপ্তি। সবাই তাকে বিশ্বাস করে। করেনি এক শুধু নিজের দেশের গঞ্জবাজারের সেই আড়তদার, যার গোলায় সে জীবনে প্রথম চাকরি নিয়েছিল। ...মালিক তারই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন। ঘর নিস্তব্ধ; [illegible]

বাইরে একটা মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল। কে যেন কি জিজ্ঞাসা করছে আস্তে আস্তে। "আমি ছিলাম গুটিপোকার ঘরে। হেমের ছেলে গাড়ি চাইতে গিয়েছিল, মধুগঞ্জ হাসপাতালে যাবার জন্য। তার কাছেই শুনলাম খবরটা।"...গাড়ি চাইবার আর লোক পেল না!

...আসছেন! কান খাড়া হয়ে উঠেছে সকলের।...ঠকঠক করে লাঠির শব্দ!... মুহূর্তের মধ্যে বুঝে গিয়েছে সকলে। অবাঞ্ছিত শব্দটা এগিয়ে আসছে।...উঠনে... সিঁড়িতে...বারান্দায়। ছাইএর মত শাদা হয়ে গিয়েছে মালিকানীর মুখ।...কোন রকমে কি শব্দটাকে আটকানো যায় না দরজার বাইরে! ডাক্তারবাবু, মহাত্মা, কেউই কি পথ আটকে দাঁড়াতে পারে না! মালিকানী মাথার কাপড় টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কেঁপে উঠেছে দাড়িওলা মহাত্মার বুক। রুগীর চোখও আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, ডাক্তারবাবু পর্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়লেন; মালিকানীর দৃষ্টির অনুরোধ বুঝতে পারলে কি হয়; নিরাপদবাবুকে বারণ করবার সাহস এ শহরের স্থায়ী বাসিন্দে কারও নেই।...মহাত্মা এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে।...আটকাবে নাকি তাঁকে দরজার বাইরে?...হাজার হ'লেও ও বাইরের লোক—ও পারে বৃদ্ধের পথ আটকে দাঁড়াতে। ...চোখাচোখি হ'ল দুজনের।

নিরাপদবাবুকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল মহাত্মা। তার মুখের হতাশা ও বিরক্তির ব্যঞ্জনাটুকু বৃদ্ধের নজর এড়াল না। তিনি যে অবাঞ্ছিত এখানে তা' তিনি জানেন। কত সময় তাঁর নিজের সম্বন্ধে কত টীকাটিপ্পনী তাঁর কানে আসে। সে সব গায়ে মাখলে চলে না। পাড়ার কারও অসুখ-বিসুখে তিনি কি কখনও না গিয়ে পারেন? যে যা ইচ্ছা বলুক, তাঁকে তাঁর কর্তব্য করে যেতেই হবে—যতকাল বাঁচবেন! এত বড় জীবনে, দশের জন্য তিনি কত কাজ করেছেন; কিন্তু ভয় বা স্বার্থে কর্তব্যপথ থেকে বিচলিত তিনি কখনও হ'ননি।... শিখুক, দেখে শিখুক ছেলে-ছোকরারা! আজকালকার ছেলেরা—বলে বড় বড় কথা— অচেনা মানুষের জন্য চোখের জল ফেলে— কিন্তু পাশের বাড়ির লোকটা না খেতে পেয়ে মরল কিনা সে খবর রাখে না!... উপদেশে কাজ হয় না; তাই তিনি নিজের আচরণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চান, তাদের সম্মুখে। দেখে শিখুক!...

"ঠিক কি এসে জুটবে! গন্ধ পায়! তর্কে তর্কে থাকে!"...এই নাবলা কথাগুলো এসে বিঁধছে।...অকৃতজ্ঞের দল!...কত সময় ভেবেছেন যে, আর যাবেন না কারও বাড়িতে এ সব সময়ে।...কিন্তু না' করলে কি চলে!...

মনের কুণ্ঠা ঢেকে, তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন রোগীর মুখের দিকে।

দাড়িওলা মহাত্মা সেই যে বেরিয়ে এল, আর রোগীর ঘরে ঢোকেনি। মালিকের বাঁচবার আশাটুকু তার মন থেকে উবে গিয়েছে, নিরাপদবাবু এখানে আসবার মুহূর্তে। কোন আশা নেই; আর কতক্ষণ টিকবেন, সেই হচ্ছে এখন কথা!...নিজের পেটের ব্যথাটাও যেন এতক্ষণে তাঁকে বাগে পেয়ে নতুন করে চেপে ধরল।...সকলে জিজ্ঞাসা করছে তাঁকে রোগীর আধুনিকতম খবর। দায়সারাভাবে সে উত্তর দিচ্ছে সকলের প্রশ্নের—অনিশ্চিত, অস্পষ্ট জবাব। যতটুকু স্থগিত করা যায়! কিন্তু সে আর কতটুকু!

...সবাই ওত পেতে রয়েছে শিকার করবার জন্য!

...প্রতি ক্ষেত্রেই তার বিভিন্ন মালিকের ব্যবসাটা না চলবার একটা করে ন্যায্য কারণ ছিল; কিন্তু লোকে তাকেই করেছিল নিমিত্তের ভাগী। এ দোকানটাও উঠে যাবে মালিকের মৃত্যুতে; তার অপয়া দুর্নামটা আবার আর একটা নতুন বার্নিশের পালিশ পাবে; তার অপযশের ভিত আরও একটু মজবুত হবে লোকের চোখে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথাটা ভেবেই তার ভয়। আর যদি সে চাকরি না পায়! অপয়া ব'লে আর যদি কেউ তাঁকে কাজ না দেয়! তার নিয়মিত বাঁধা দুর্ভাগ্যের পর, সে প্রতিবার নূতন চাকরি পেয়ে এসেছে। কিন্তু এবার যদি না পায়! তার দুর্নামটার বনিয়াদ যে আগের চেয়েও মজবুত হ'ল এবার; তাই ভয় এত বেশী! যে চাকরি দেবে, সে কি কথাটা না ভেবে পারে!...শেষকালে কি তাকে এখানে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে খেতে হবে? এর হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় এখান থেকে চলে যাওয়া—এখান থেকে বহুদূরে— যেখানকার লোকে তার অপয়া দুর্নামটার কথা জানে না। সে পরিশ্রম করতে ভয় পায় না; বহু রকমের কাজ জানে; কাজ সে জুটিয়ে নিতে পারবে যেখানে যাবে সেখানে। কিন্তু মন যে চায় না এখান থেকে চ'লে যেতে!

মহাত্মা বাইরের বারান্দায়, মেঝের উপর শুয়ে পড়ে। উপুড় হয়ে শুলে পেটের ব্যথাটা কম থাকে। এই অসহায় পরিবারের এত বড় বিপদের কথাটা, তার আর মনেও আসছে না এখন। নিরাপদবাবু কখন চলে গিয়েছেন তা' সে খেয়ালও করেনি।

মালিক মারা গেলেন বিকালের দিকে। নিরাপদবাবু আবার এলেন। হেঁটে এসেছেন —শোকের বাড়িতে তিনি কখনও গাড়িতে আসেন না।...বাড়ির লোকের কান্নাকাটি কানে আসছে।...এই অঘটনের জন্য তারা নিশ্চয় তাঁরই দোষ দিচ্ছে।......তিনি মনেকরে পর [illegible] [illegible] [illegible] কথা

এখানকার লোকে ভুলে যায়; কিন্তু যারা মারা যায় তাদের কথাই মনে করে রাখে; সেইগুলোকেই অপবাদের নজির হিসাবে দেখায় সময়ে অসময়ে! অবিচার না?... এই বাড়ির লোকদের শোকদুঃখের জন্য কি সত্যই তিনি দায়ী?...উপস্থিত লোকেরা তাঁকে বলছে না কিছু, কিন্তু তাদের রুদ্ধ আক্রোশ তিনি অনুভব করতে পারছেন, কারও দিকে না তাকিয়েও। ঘরে ঢুকতেই, মালিকানী কান্নার মধ্যেই চীৎকার করে উঠলেন—"যমদূতটা আবার এসেছে রে!"

......মিশে যেতে ইচ্ছা হয় মাটিতে। তবু তাঁকে বিচলিত হ'লে চলবে না! শেষবারের মত একবার মৃতের মুখখানি দেখতেই হবে। তারপর আরও কত কাজ! আগে শ্মশানে যেতেন; আজকাল আর যান না। তবে শব-দেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা নিজে দাঁড়িয়ে করান।

এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর কেবলই মহাত্মার কথা মনে পড়ছে।...একই অভিশাপ তাঁদের দুজনের উপরই।......

"মহাত্মাকে দেখছি না?...শরীর খারাপ? ...কি হয়েছে?...এই তো ওবেলাও দেখলাম ঘোরাঘুরি করছে।......তোমার আবার কি হ'ল মহাত্মা?"

"একটা কলিক ব্যথা আমার মাঝে মাঝে হয়। ও কিছু নয়।"

"তোমার আর শ্মশানঘাটে গিয়ে কাজ নেই। ভেবো না। শুয়ে থাক। হাঁ, হাঁ, কোন ভাবনা চিন্তা ক'র না!"

নিরাপদবাবুর কথার আন্তরিকতাটুকু সে ধরতে পারে। মুখে যা বললেন তার চেয়েও যেন বেশি বলতে চান, এইরকম একটা ভাব তাঁর কথার মধ্যে স্পষ্ট ছিল। ঠিক কি বলতে চাচ্ছিলেন বোঝা গেল না।

'বল হরি হরিবোল' দিয়ে শব শ্মশানে নিয়ে গেল। মহাত্মার চোখের জল বাধা মানছে না। বড় ভাললোক ছিলেন এ মালিক। তার সব মালিকরাই লোক ভাল; সকলেই তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে। এক শুধু সে বিষনজরে পড়েছিল গঞ্জবাজারের সেই আড়তদারের।......এখনও ওয়াকপাখির ডাক কানে আসছে।......সব লোকজন চলে যাবার পরও নিরাপদবাবু রয়েছেন, বাকি কাজগুলো তদারক করতে।...শ্মশান থেকে ফিরে আসবার পর লোকদের মিষ্টিমুখ করাতে হবে—অগ্নিস্পর্শ করাতে হবে—কিছু নিম-পাতারও দরকার—সব ব্যবস্থা তিনি নিখুঁত-ভাবে আগে থেকে করে রাখতে চান। গাড়িতে তিনি যাবেন না আজ, তাই বৃদ্ধকে নিয়ে যাবার জন্য বাড়ির চাকর এসেছে একটা প্রকাণ্ড আলো নিয়ে।

আর কোন লোক নেই এখন। এই সুযোগ-টুকুই তিনি খুঁজছিলেন এতক্ষণ থেকে। চাকরের হাত থেকে বড় আলোটা নিয়ে তিনি বাইরের বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"এদিকটা যে একেবারে অন্ধকার। ওরা ফিরে এসে এইখানেই তো দাঁড়াবে প্রথম। এখানে আলোটা থাক, কি বলো মহাত্মা? থাক্, থাক্, উঠলে কেন? এখন কি রকম বোধ করছ?"

একটা নিবিড় একাত্মতা তিনি বোধ করছেন মহাত্মার সঙ্গে।...আজ তাঁকে খোলাখুলি যমদূত বলেছে একজন, এই বাড়িতেই! ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না, অপয়া দুর্নামের ব্যথা কেমন করে অষ্টপ্রহর মনের মধ্যে কিরকির করে বেঁধে।...তিনি মহাত্মার মনের ব্যথার নাগাল পান।...বুড়ো হয়েছেন, কতদিন আর বাঁচবেন! কিন্তু মহাত্মাকে যে এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে। ...ওর দুর্নাম কাটাবার একটা উপায় আছে —ওকে যদি আর কারও চাকরি না নিতে হয়! সেইজন্য তিনি একটা ব্যবস্থা করতে চান।...এ শুধু একজন লোককে সাহায্য করা নয়—একটা আদর্শকে সাহায্য করা—অমঙ্গলের বাহক হিসাবে যাদের উপর অযথা অপবাদ, তাদের খ্যাতি ফিরিয়ে আনবার জন্য তাঁর সাধ্যমত এই সামান্য চেষ্টা। সমাজের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এ একরকমের প্রতিবাদ আন্দোলন। এই অবিচারের প্রতিবাদ জানানোর জন্যই তিনি শত বাধা সত্ত্বেও মরণাপন্ন রোগীদের দেখতে যান—মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে। কিন্তু তিনি জানেন—এর পিছনে কতখানি ব্যক্তিত্ব, কতখানি মনের জোরের দরকার হয়। তিনি যা পারেন, তা' কি সবাই পারে? মহাত্মাকেই দেখ না—ভয়ে আধমরা হয়ে রয়েছে কালকের কথা ভেবে।......

স্বভাব এমন হয়ে গিয়েছে যে, অপয়া দুর্নাম সংক্রান্ত কোন কথা, কারও কাছে বলতে লজ্জা-লজ্জা করে—মহাত্মার মত আপনজনের কাছে পর্যন্ত। তার উপর চাকরটা আবার একটু দূরেই দাঁড়িয়ে!

গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন—"তুমি এবার একটা নিজের ব্যবসা আরম্ভ কর। যা লাগে আমি দেবো।"

এর চেয়ে সংক্ষেপে বলা যেত না। এর চেয়ে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলবার দরকারও ছিল না।

ভুল শুনল না তো! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ভরসা পায় না মহাত্মা প্রথমটায়।...ব্যথার ব্যথী নিরাপদবাবুর সহানুভূতিতে ভরা মুখখানির উপর আলো পড়েছে।...ভিক্ষা দিচ্ছেন না। বন্ধু বন্ধুকে দিচ্ছে। শুকনো কর্তব্যনিষ্ঠার চেয়েও অনেক গভীর জিনিস ফুটে উঠেছে দরদী লোকটির চোখের লেখায়।......

......এতদিনে বুঝি তার শাপমোচন হ'ল! ...নিজের শরীর খারাপ; মালিকের মৃতদেহ এখনই শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; তার উপর এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব; একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। আর একটু ভাববার সময় পেলে ভাল হ'ত!...কিন্তু তার নিজের ব্যবসাও যদি ফেল্ করে! ভয়-ভয় করে! তাহ'লেও কি লোকে সেটাকে তার অপয়া দুর্নামের নজির হিসাবে ব্যবহার করবে নাকি? না শুধু অকেজো বলবে? ...ঠিক বলা যায় না।...

নিজের ব্যবসা কখন চালায়নি-চিরকাল অন্যের ব্যবসাতে কাজ করে এসেছে—ঠিক বিশ্বাস পায় না নিজের উপর।' এর চেয়ে, উঠে-যেতে-পারে না এইরকম একটা ব্যবসাতে, কোন ভাল ব্যবসায়ীর অধীনে সে যদি এখানে একটা চাকরি পায়, তাহ'লেই সব দিক দিয়ে সুবিধা। চাকরিও থাকে, দুর্নামও কাটে।...

"আপনার ছেলে তো অত বড় কন্ট্র্যাক্টার। তাঁর ব্যবসাতে যদি একটা চাকরি......"

কথাটাকে শেষ করতে দিলেন না নিরাপদবাবু।

"না না, সে হয় না!"

হঠাৎ তিনি আলোটাতে পাম্প দিতে বসলেন।

"আপনার টাকার আমার দরকার নাই।"

দুজনের বলা-কথার পিছনের না-বলা কথাগুলো, দুজনেই স্পষ্ট বুঝেছে।

নিরাপদবাবু গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত মহাত্মা সেইখানে বসে বসে কত কি ভাবল।...নিরাপদবাবুকে আর কি দোষ দেবে, তার নিজেরই যে নিজের উপর কত সময় সন্দেহ হয়!...কত দিক থেকে, কত রকম করে সে নিজের সমস্যাটাকে ভেবে দেখে। যত ভাবে তত মাথা গরম হয়ে ওঠে, পরিবেশের উপর একটা বন্ধ আক্রোশে। ...যে লোকটাকে মালিকানী যমদূত ভাবেন, সে পর্যন্ত তাকে চাকরি দিতে ভরসা পায় না।...ঘেন্না ধরে যায় নিজের উপর! লোকে যখন তাকে এড়িয়ে চলতে চায়, তখন তার লাভ কি বেঁচে থেকে? বিনা অপরাধে চব্বিশ ঘণ্টা চোরের মত থাকার কোন অর্থ হয় না। এই হীন হয়ে থাকা, সকলের ঠাট্টার বিষয় হয়ে থাকা, অন্যের কৃপার উপর নির্ভর করে থাকা, লোকের আপদ হয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে সে আর খুঁজে পাচ্ছে না। নিরাপদবাবুর প্রত্যাখানটাই তার মনে লাগছে সব চেয়ে বেশি করে।

সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছে।...তার আনা অমঙ্গলের ধকল আর কাউকে সইতে হবে না!......

গোয়ালঘর থেকে গরু বাঁধবার দড়িটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। নিশিতে-পাওয়া লোকের মত সে চলেছে অন্ধকার পথে। ঠিক কোথায় যাচ্ছে ভেবে বার হয়নি। কিন্তু জলকে কি ব'লে দিতে হয়, কোন দিকটা নিচু? নিরাপদবাবু তার সঙ্গে আজ কথা [illegible] নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে মন থেকে। কেবল একটাই চিন্তা।......

বারোয়ারিতলার তেঁতুলগাছে ওঠবার সময় ঘষড়ানি লেগে বুকের চামড়া ছিঁড়ে গেল, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই; পাখির ডাক আর ডানা-ঝটফটানির শব্দ তার কানেও ঢুকছে না; গায়ে ভিজে ভিজে কি যেন পড়ছে মাঝে মাঝে, সেদিকে তার খেয়াল নেই। অন্ধকারে ঠিকমত ডাল বাছা শক্ত। হাতের কাছের একটা ডালে সে শক্ত করে দড়ির ফাঁসটা বাঁধে। আগে কি ছিল তা' সে ভুলেছে; পরে কি আছে তার জন্য কোন চিন্তা নেই; জানা ও অজানার মধ্যের চুল-চেরা জোড়ের দাগের উপর সে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ নিরাপদবাবুর কথা মনে পড়ল। কী আন্তরিক দরদে ভরা চাউনি! তাঁর চাউনির মধ্যে দিয়ে আজ যেটুকুনি সে পেয়েছে, সে জিনিস গত কুড়ি বছরের মধ্যে সে আর কারও কাছে পায়নি। জানা লোকের মধ্যে আর কেউ, তার দিক থেকে সমস্যাটাকে এমন-ভাবে ভাবেনি। তিনি যা করাতে চেয়েছিলেন, তা' আজ পর্যন্ত আর কেউ করতে চায়নি তার জন্য।......'যখনই ওই বুড়ো যমদূতটা বাইরের বারান্দায় ব্যথায় কাতর মহাত্মাকে দেখতে গিয়েছে, তখনই আমরা বুঝে গিয়েছি যে মহাত্মার সময় ঘনিয়ে এসেছে'—কাল যদি লোকে বলে এ কথা!...কে তাদের বোঝাতে যাবে যে রোগে ভুগে মরা, আর আত্মহত্যায় মরা, এক জিনিস নয়! সকলে ওৎ পেতে থাকে। তার আত্মহত্যাটাকে নিরাপদবাবুর অপয়া-দুর্নামের একটা অতিরিক্ত প্রমাণ ব'লে লুফে নেবে লোকে। যে অন্যায় অবিচারটা সহ্য করতে না পেরে, সে আজ মরতে চলেছে, সেইটাই প্রশ্রয় পাবে, যদি সে মরবার লোভ না ছাড়ে!......

দম-আটকানো সুড়ঙ্গপথের ফাটলের মধ্যে দিয়ে একটু যেন আকাশের আলো দেখতে পাওয়া গেল।

সে গাছ থেকে নেমে, শহরের বাইরে যাবার পথ ধরে। মৃত্যুর কাছাকাছি আসবার মুহূর্তে, সে এখানকার জগৎটা থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেই মরা জগৎটার দিকে ফিরে তাকাবার তাগিদ আর নেই। ওয়াক-পাখিরা বৃথাই ডেকে ডেকে সারা হ'ল, তা'কে অপয়ার মায়াগণ্ডির মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনবার জন্য।

* * *

দিনকয়েক পরে ওয়াকপাখির ডিম পাড়তে গিয়ে দুটো রাখাল ছেলে তেঁতুল-ডালে ঝোলান এই দড়ির ফাঁসটাকে দেখে। দেখে ধরতে পারেনি, এটা কি জিনিস।

"ওটা পাখির দোলনা। দেখছিস না বাচ্চা পাখিটা গিয়ে বসল।"

"দোলনা না ছাই! আরও দাঁড়া হাঁ করে ওর নিচে! বেশ হয়েছে! ওটা পাখিদের [illegible]"

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে নবজাগৃতি ঘটেছিল তার প্রভাব দেশের অন্দর-মহলকেও কি প্রবল নাড়া দিয়েছিল তা জানা যায় জ্ঞানদানন্দিনীর জীবন পরিচয়ে। শুধু ঠাকুরবাড়ির বধূ বলেই নয়, নারীজাগরণের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবেও জ্ঞানদানন্দিনী আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া। তিনি যে-দিন প্রথম ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে গেলেন, সেদিন বাংলার অন্তঃপুরের অচলায়তন ভেঙে খোলা আলো-বাতাস বইয়ে দেওয়া হল। কুঁচি দিয়ে বা হাবল্ করে শাড়ি পরার যে পদ্ধতি আজ বাংলার মেয়েমহলে বহুল প্রচলিত, যা অবাঙালীরাও বাংলার কাছ থেকে আজ গ্রহণ করেছে তার প্রথম প্রবর্তক ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। বম্বাই প্রবাসকালে গুজরাটি ও মারাঠী মেয়েদের শাড়ি পরার পদ্ধতি থেকেই বাংলা দেশের জন্যে এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন তিনি করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ছিল। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বহু রচনা আছে যা পুস্তকাকারে আজও প্রকাশিত হয়নি। মারাঠী থেকে অনূদিত 'ভাউ সাহেবের বখর' যখন ধারাবাহিক ভারতীতে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন সাহিত্য অনুরাগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর কাছ থেকে আমরা 'টাক ডুমা ডুম ডুম' ও 'সাত ভাই চম্পা' নামক দুখানি সুলিখিত শিশু পাঠ্য-পুস্তক লাভ করেছি।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ১৮৮৫ সালে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন—

"বালকদের পাঠ্য একটি কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুধুমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার অংশ গ্রহণ করিতে বলেন।"

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে জ্ঞানদানন্দিনীর জন্ম হয়। ১৮৫৯ সনে আট বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৩৪৮ সালের ১৫ই আশ্বিন ৯০ বৎসর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আত্মস্মৃতি-মূলক শৈশব জীবনের এই অপ্রকাশিত রচনাটি [illegible]

যশোর নগরধাম প্রতাপ আদিত্য নাম— সেই যশোর নগরধামের অধিকারভুক্ত নরেন্দ্রপুরগ্রাম আমার জন্মস্থান। শুনেছি নরেন্দ্র রায় বলে এক প্রবল প্রতাপ লোক ছিলেন, তাঁর নামে এই গ্রামের নামকরণ হয়। বংশের পরিচয় বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। সেই সুদূর বালিকা-কালের ঝাপসা স্মৃতিপটে সনতারিখশূন্য অগ্রপশ্চাৎ সীমাবিহীন যে দু'চারটা জিনিস অঙ্কিত আছে, তাই বলছি।

শুনেছি আমার ঠাকুরদাদারা কৃষ্ণনগর অঞ্চলের লোক ছিলেন। তাঁরা নাকি কুলীন ব্রাহ্মণ ফুলের মুখুটি ছিলেন। মায়ের মুখে শুনেছিলুম যে, তাঁর শ্বশুরের নামের সংগে মেলে বলে তিনি 'নীল' আর 'কম্বল' এই দুটো কথা উচ্চারণ করেন না, তাই বুঝেছিলুম যে তাঁর নাম ছিল নীলকমল মুখোপাধ্যায়। আমার বাবামশায় আট বৎসর বয়সকালে, কি কারণে জানিনে, তাঁর বাপের উপর রাগ ও অভিমান করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। লক্ষ্যহীনভাবে পথে চলতে চলতে তিনি যশোরের দক্ষিণ-দিহি গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সেই গ্রামে সে সময় রায়বংশের একটি বড় ও সংগতিপন্ন পরিবার বাস করতেন। ঘটনা-ক্রমে বাবামশায় সেই পরিবারের কর্তাব্যক্তির সামনে এসে পড়েন। তিনি দিব্যি একটি সুন্দর ছেলে দেখে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে কাছে ডেকে নামধাম ও সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বাবামশায় তাঁর নামধাম ও বংশপরিচয় যা দিলেন তাতে রায়মহাশয় যেন বেশ সন্তুষ্ট হলেন। আর বল্লেন,— তুমি ছেলেমানুষ, একলা কোথায় ঘুরে বেড়াবে। আজ থেকে আমার এখানে থাকো। পরের ঘটনা থেকে মনে হয় যে প্রথম থেকেই রায়মশায়ের মনে ছেলেটিকে বাড়িতে রাখবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। বাবামশায় সম্মত হওয়ায় রায়মশায় তাঁকে যত্নের সহিত লালন পালন করতে লাগলেন। তখনকার মতে তাঁর বিয়ের সময় হলে রায়মশায় বাবামশায়কে তাঁর নবম বর্ষীয়া কন্যা নিস্তারিণী দেবীর সংগে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে রাখলেন। আমার ঠাকুরদাদা তাঁর ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে [illegible]

হবার পরে তিনি খবর পেলেন যে তাঁর ছেলে দক্ষিণ দিহির কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে আছেন। খোঁজ পেয়ে যখন তিনি দক্ষিণ দিহিতে এসে শুনলেন যে পিরালী ঘরের মেয়ের সংগে তাঁর ছেলের বিয়ে হয়েছে, তখন তিনি রাগে দুঃখে একেবারে যেন ভেঙে পড়লেন আর পৈতে ছিঁড়ে সাপ দিলেন যে, অভয়াচরণ নির্বংশ হোক। বাবামশায়ের নাম ছিল অভয়াচরণ মুখো-

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

পাধ্যায়। বছর কতক পরে বাবামশায়ের মনে ঘরজামাই থাকতে ভারি একটা বিতৃষ্ণা জন্মালো। তখন তিনি কোনরকমে লুকিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়বার নানান উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন দুপুরে রাত্রে স্ত্রীকে জাগিয়ে, তাঁর হাত ধরে দক্ষিণ দিহি থেকে নরেন্দ্রপুর গ্রামে চলে এলেন। শ্বশুরের অনেক চেষ্টাতেও আর শ্বশুরবাড়ি ফিরলেন না। নরেন্দ্রপুরে কোন একটা কাছারিতে তিন চার টাকা মাইনের একটা চাকরী করতে লাগলেন। মায়ের কাছে শুনেছি সেই সময়টা তাঁর বড়ই কষ্টে গিয়েছে। একে তো বাপের বাড়ি ছেড়ে আসার দুঃখ, তার উপর তখন তিনি ঘরসংসারের কাজকর্ম কিছুই জানতেন না। পাড়ার কোনো কোনো গৃহিণী তাঁর দুঃখ [illegible]

জ্বালানি কাঠ পর্যন্ত তাঁকে বনজঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে আনতে হ'ত। কাঁটা খোঁচায় হাত ছড়ে গেলেও কাঁদতে কাঁদতে ডাল ভেঙ্গে এনে উনুন ধরাতে হ'ত। কতক দিন এরকম দুঃখে কষ্টে কাটবার পর কলকাতার এক খুব ধনী জমিদার মহিলা কোন সূত্রে বাবামশায়ের সব খবর শুনতে পেয়ে তাঁকে কলকাতায় এনে একটা বেশি আয়ের কাজে নিযুক্ত করে, নিজের বাড়িতে যত্নে রাখেন। তিনি বরাবর কলকাতায় থাকতেন, কেবল পুজোর সময় একমাস বাড়ি আসতেন। সেই সময় আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম। মা আমায় যখন তখন বলতেন যে, তুমি আমার গর্ভে এসে অবধি আমার দারিদ্র্য দুঃখের শেষ হয়েছে।

সেই মহিলাটি বাবামশায়কে দাদা বলে ডাকতেন। আমি জন্মাবার পর যখন আমার অন্নপ্রাশনের সময় তখন আমার এই ধনী পিসিমা আমার অন্নপ্রাশনের সমস্ত গয়না কাপড় ও খরচপত্র পাঠিয়ে দেন শুনেছি। আর কোন সময় নরেন্দ্রপুরের কাছাকাছি গ্রামে খুব চুরি ডাকাতি হচ্ছে শুনে পিসিমা আমাদের বাড়ি পাহাড়ার জন্যে নিজের খরচে দুজন পাঠান দরওয়ান রাখিয়ে দিয়েছিলেম। তারা আমাকে সকালে বিকালে কোলে করে নিয়ে বেড়াত সেটা এখনও মনে আছে। আমার যখন আড়াই বছর বয়স, তখন পিসিমার বিশেষ অনুরোধে বাবামশায় মাকে ও আমাকে তাঁর ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা কিছুদিন পুজোর সময় সেখানে গিয়ে ছিলুম। সেই অনভ্যস্ত প্রকাণ্ড বাড়ি জাঁকজমক ও মেলাই চাকর দাসীর মাঝখানে মা যেন সর্বদাই ভীত সংকুচিত হয়ে থাকতেন। বাড়ির কর্ত্রী পিতার ঘরজামাই মেয়ে ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কলিকাতার অট্টালিকার ও জমিদারীর অধিকারিণী হন। তিনি অসাধারণ দানশীলা ছিলেন। পুজোর সময় জমিদারীর আমলা ও বাড়ির চাকর দাসীদের নতুন কাপড় বিতরণ করবার সময় তিনি মাকে সেই ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে বসালেন। মা দেখলেন যে, একটা বড়ঘরের মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত নববস্ত্রে পরিপূর্ণ। একে একে ছোট বড় সমস্ত কর্মচারী ও চাকরদাসী আসতে লাগল আর তিনি তাদের নতুন কাপড় দিতে লাগলেন। মায়ের মনে হল যে সে যেন এক অফুরন বিরাট দান ব্যাপার। শুনেছি ঐ সময় নাকি আমার এই পিসিমা আমার ভাবী শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে আমাকে দেখাতে নিয়ে যান, আর তাঁর এক ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বলেন। এত জাঁকজমক গোলমালের মধ্যে আর বেশিদিন থাকতে মায়ের ভাল লাগছিল না। তাই বাবামশায় আমাদের নরেন্দ্রপুরের বাড়িতে এনে রেখে গেলেন।

আমরা প্রথমে যে বাড়িতে ছিলুম, সে বাড়ির কথা আমার বিশেষ কিছু মনে পড়ে না। তারপর যে এক জায়গায় থাকতে গেলুম সেই বাড়ির ঘরদোর আমার কিছু কিছু মনে আছে। আলাদা আলাদা এক-একখানা ঘর, একটা দক্ষিণের, একটা পশ্চিমের, আর একটা উত্তরের; সেইটাই সব থেকে বড়। এই তিনঘরের সামনে একটা বড় উঠোন। দক্ষিণের ঘরের একটু পিছনদিকে রান্নাঘর, তার সামনে আর একটা উঠোন। সমস্ত ঘরগুলির চারিপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণের ও উত্তরের ঘরের মাঝের পাঁচিলে সদর দরজা ছিল। দরজার বাইরে উত্তরদিকে একটা বড় ঘর ছিল আর দক্ষিণদিকে দরওয়ানদের থাকবার একটা ঘর ছিল। তার পরেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা ফুলবাগান ছিল। বাগানের প্রতি বাবামশায়ের অসাধারণ অনুরাগ ছিল। সেই ফুলবাগানে তিনি অনেকরকম দুর্লভ ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন। পশ্চিমের দিকে অনেকটা জমি ছিল। তাতে একটা পুকুর কাটিয়েছিলেন, তার এক পাড়ে একটি বড় কলাবাগান, আর অপর তিন পাড়ে নানা গাছ লাগান ছিল। সেই পুকুরের জলেই আমাদের স্নান পান রান্না সব কাজ চলত। একবার বাবামশায়ের গুরুমশায় এসে কথায় কথায় বলেছিলেন যে, সব দানের চেয়ে বিদ্যাদান বড়। তাই থেকে বাবামশায়ের মনে হল যে পাঁচিলের বাইরে উত্তরের বড় ঘরটায় একটা পাঠশালা বসাবেন। তার জন্য একজন গুরুমহাশয় রাখা হ'ল। আর শীঘ্রই অনেক পোড়ো এসে জুটল। পাঠশালা রীতিমত চলতে লাগল। তখন বাবামশায়ের মনে হ'ল যে, বাড়িতেই যখন পাঠশালা হ'ল, গুরুমশায়ও রাখা হল, তখন আমার মেয়েটাকেও পাঠশালায় পড়তে দিই, ছোট মেয়ে তাতে বোধ হয় কোন দোষ হবে না। সে সময় ওদেশে মেয়েদের লেখাপড়া বড় নিন্দনীয় ছিল না। আমি একদিন রাত্রে হঠাৎ উঠে মাথা তুলে জেগে দেখি যে, মা যেন কি লিখছেন আর পড়ছেন। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি সেগুলো ঢেকে ফেললেন পাছে আমি ছেলেমানুষ কাউকে বলে ফেলি। আমাদের এক প্রতিবেশিনী আত্মীয় লেখাপড়া জানতেন, লোক নিন্দার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে হিসেব কিতেব চিঠিপত্র লিখতেন। তবু কি রকম করে টের পেয়ে লেখাপড়া করেন বলে পাড়ার লোকে তাঁর নিন্দা করত। পাঠশালা সম্বন্ধে আমার যা কিছু জ্ঞান, তা এই পাঠশালা থেকেই হয়েছিল। যদিও তখন আমার চার পাঁচ বছরের বেশি বয়স হবে না। বাবামশায় যখন আমাকে এই পাঠশালায় নিয়ে গেলেন, তখন আমি লজ্জায় ভয়ে জড়সড় হয়ে মুখ হেঁট করে বসে রইলাম মনে আছে। মনে হ'ল চারিদিকে অপরিচিত পুরুষ মানুষ। অবশ্য আমার তুলনায় তাদের বয়েস কিছু বেশি ছিল বলেই বোধহয় তাদের দিকে তাকাতেও পারলুম না। প্রথমে তালপাতায় যতটা চওড়া পাতা তত বড় আক্ষর আমাকে লিখতে দিল। তারপর সে লেখা অভ্যাস হলে কিছু কম চওড়া আট ভাঁজের কাগজে লিখতে দিলে। আরো হাত পাকলে শেষে ষোল ভাঁজের কাগজে লেখালে, সেই হ'ল চূড়ান্ত। মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে নেই বলে আমাকে কেউ কিছু বলত না। কিন্তু ছেলেদের উপর মারধর হ'ত, সেটা বুঝতে পারতাম। যে ছেলে লেখাপড়ার দিকে চোখ না রেখে এদিক ওদিক তাকাত তাকে কি রকম শাস্তি দেওয়া হত আমার একটু একটু মনে আছে। সে যত বড় হাঁ করতে পারে সেই হাঁয়ের মাপে একটা ছোট কঞ্চি কেটে তার নীচের ও উপরের দাঁতের মাঝে বসিয়ে দেওয়া হ'ত, কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকতে হ'ত। কোন পোড়ো গরহাজির হলে তাকে ধরে আনবার জন্যে গুরুমশায় জনকতক পোড়োকে পাঠাতেন। তারা যখন তাকে ধরে আনত তখন কি একটা ছড়া বলতে বলতে আসত, তার এক লাইন মনে আছে—"গুরুমশায়, গুরুমশায় তোমার পোড়ো হাজির।" হাজির হলে পরে তার শাস্তি হত। দু রকম শাস্তির কথা মনে আছে। উঁচুতে টাঙান একটা আড়া বাঁশের সঙ্গে তার দু' হাত বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে বেত মারা হ'ত এই একটা, আর একটা হচ্ছে বিছুটি গাছ কেটে এনে মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হ'ত, তার উপরে তাকে খালি গায়ে গড়াতে বলা হ'ত। মা বাপেরা গুরুমশায়ের কাছে ছেলে দিয়ে যাবার সময় নাকি বলত—দেখবেন, যেন নাক চোখ কান বজায় থাকে। কত দিন যে আমি পাঠশালায় পড়েছিলাম মনে নেই তবে বোধ হয় ষোল ভাঁজে লেখা পর্যন্ত শেষ হয়।

আমাদের পাড়ায় আমার সমবয়সী ছেলে মানুষ কেউ ছিল না। আমারও বাইরের লোকের বাড়ি যেতে ভাল লাগত না। বাড়ির লোক ছাড়া অপর কারো কাছে বড় সংকুচিত ও লজ্জিত হয়ে পড়তুম। আমি একটা ঘরের কোণে বসে নিজের খেলনা নিয়ে খেলতে খুব ভালবাসতুম। সকালবেলায় উঠে সাজি হাতে করে আমাদের ফুলবাগানে পুজোর ফুল তুলতে যেতে আমার বড় ভাল লাগত। ক্রমে যখন পুষ্পপাত্রে পুজোর ফুল দূর্বো বিল্বপত্র কি রকম করে সাজাতে হয়, কেমন করে শিব গড়তে হয়, এই সব শিখলুম, তখন আমার মা আইমাও যেমন খুশী হলেন আমারও তেমনি আনন্দ হ'ল। আমাদের বাড়িতে মা, আইমা (আমার মায়ের পিসি) আর

পিসিমা এ'রা থাকতেন। পিসিমা কখনো আমাদের বাড়ি, কখনো তাঁর শ্বশুরে বাড়ি জগন্নাথপুরে থাকতেন। বাবামশায় কলকাতা থাকতেন, কেবল পুজোর সময় একবার করে বাড়ি আসতেন। আইমার শ্বশুরে বাড়ি ছিল মজুমদার পাড়ায়, বোধ হয় আমাদের বাড়ি থেকে আধ ক্রোশটাক্ দূরে। আইমা প্রায়ই আমাকে কোলে করে নিয়ে মজুমদার পাড়ায় যেতেন। পথে পাছে আমার ক্ষিধে পায় বলে, একটা বাটিতে দুধ ভাত মেখে সেটা গামছায় বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতেন। মজুমদারেরা এক বড় গুষ্টি ছিলেন। তাঁদের আলাদা আলাদা বাড়ি, সব কাছাকাছি ছিল, তার মধ্যে বড়র বাড়িতে দুর্গোৎসব হ'ত। সেইখানেই সেই ছেলেবেলায় আমি দুর্গাপুজো দেখেছি। বলির সময় মজুমদার বাড়ির সব ছেলেরা খুব আহ্লাদের সংগে চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখত, আর বলি হয়ে যাবার পর নাচতে নাচতে পাঁঠার মুণ্ড মাথায় করে নিয়ে গিয়ে দুর্গা প্রতিমার পায়ের কাছে রেখে দিত। আমার কিন্তু আনন্দ হওয়া দূরে থাক বলির পাঁঠা আর হাড়কাট দেখলে বড় ভয় ও দুঃখ হ'ত। বলির আগে আমি দূরে সরে গিয়ে চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে কেবল বলতুম, "হে মা দুর্গা, আমার উপর রাগ কর না।" বলিও দেখতে পারতুম না, অথচ মা দুর্গা সেজন্যে রাগ করবেন বলে মনে মনে খুবই ভয় পেতুম। একটা লম্বা ঘরে পুজোর ভোগ রাঁধা হ'ত, সেখানে চক্রবর্তী বাড়ির মেয়েরা সকাল সকাল স্নান করে এসে রান্না করতেন। আমাদের দেশে সে সময় টাকা দিয়ে রাঁধবার বামুন পাওয়া যেত না। তাই পুজো বা কোন ক্রিয়াকর্মে রাঁধবার লোক দরকার হলে চক্রবর্তী বাড়ির মেয়েদের অনুরোধ করে ডেকে আনা হ'ত, তারপর কাজ কর্ম হয়ে গেলে তাঁদের উপহারের মত কাপড়-চোপড় দেওয়া হ'ত।

নরেন্দ্রপুরের কাছাকাছি দক্ষিণডিহি চেংগটে জগন্নাথপুর প্রভৃতি গ্রামে আমাদের এক এক ঘর আত্মীয় ছিলেন। এই সব জায়গায় আমি আইমার সংগে বেড়াতে যেতাম, তিনি আমাকে খানিক কোলে করে খানিক হাঁটিয়ে নিয়ে যেতেন। কোন আত্মীয়ের অনুরোধে হয়ত দু-চার দিন তাঁদের বাড়ি থেকেও আসতুম। সব জায়গাতেই প্রচুর আদর যত্ন পেতুম। এই রকম বেড়ান আমার খুব ভাল লাগত। যখন বাড়ি থাকতুম একা একা খেলনা নিয়ে খেলা করা ছাড়া আমার আর এক আমোদ ছিল ধান খেতে পায়রা ধরা।" আমাদের [illegible]

থাকত। তারই সামনের উঠোনে একটা লম্বা দড়ির এক মুখে ফাঁস দিয়ে তার মধ্যে ধান ছড়িয়ে রাখতুম, আর তার আর এক মুখ ধরে আমি ঘরের দরজায় বসে থাকতুম। যেই একটা পায়রা ধান খেতে আসত অমনি আস্তে আস্তে দড়িটা ধরে টানতুম; ক্রমে ফাঁসটা ছোট হয়ে হয়ে তার পায়ে গিরের মত আটকে যেত, তখন তাকে ধরে নিয়ে এসে পুষতুম। কিন্তু অনেক সময় পায়রা ধান খেতে আসতে দেরী করত কিম্বা মোটেই আসত না তখন আমি মনে মনে খালি মা কালির কাছে বার বার মানত করতুম। "হে মা কালি, একটা পায়রা ধান খেতে আসুক; হে মা কালি তোমায়
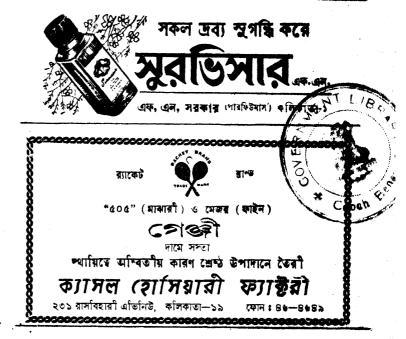
জোড়া পাঁঠা আর এক বোতল মদ দেব, একটা পায়রা ধান খেতে আসুক।" এই রকম মানত করা আর সুবচনীর পুজো দেওয়া, মকদ্দমা হার-জিতের সময় চার-দিকে শুনতে পেতুম। মকদ্দমা হার-জিত এ সব যে কি ব্যাপার তা কিছুই জানতুম না। কেবল কথাগুলোই জানতুম। তাই আমারও যখন কিছু পাবার ইচ্ছে হ'ত, তখন ঐ জোড়া পাঁঠা আর মদ মা-কালীর কাছে মানতুম। আমাদের বাড়ির কাছেই এক কালী মন্দির ছিল। কারো মানসিক পূর্ণ হলে, কারো আরোগ্যলাভ বা মকদ্দমায় জিত এই রকম কোন কারণ ঘটলে তাঁরা সেখানে পাঁঠা পাঠিয়ে দিতেন ও মদ দিয়ে যেতেন। এই রকম কোন উপলক্ষ্যে দেখেছি পাড়ার কতকগুলি বৃদ্ধা নিজেরা মদ ও শুদ্ধি পাঁচ রকমের ভাজা নিয়ে কালী মন্দিরের ভিতর যেতেন। আইমাকে ডাকলে তিনি আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাঁরা মদ ও সব রকম ভাজা পুরুত ঠাকুরের কাছে দিতেন, আর নিজেরা কালী ঠাকুরের সামনে বসতেন। মা-কালীর হাতে ছোট একট পাতলা পিতলের বাটি থাকত, পুরুত ঠাকুর প্রথমে সেই পাত্রটিতে মদ ঢেলে দিতেন। তারপর কুমারী কন্যা বলে সকলের আগে আমার হাতে ঐ রকম একটা ছোট বাটিতে মদ দিতেন, আর পাত্রটি আমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলে, প্রথম আঙ্গুলে ও কড়ে আঙ্গুলের উপর ঠিক করে বসিয়ে দিতেন। মাঝের আঙ্গুল দুটো মুড়ে রাখতে হত। পরে পুরুত ঠাকুর নিজে এক পাত্র নিতেন ও আর সকলের হাতে এক একটি পাত্র দিতেন তারাও ঐভাবে ধরতেন আর ডান হাত দিয়ে মদের সঙ্গে সঙ্গে ভাজা খেতেন। যে বৃদ্ধাদের দাঁত নেই তাঁদের জন্য ভাজা গুঁড়ো করা থাকত। কালী মন্দিরের আর একটা অনুষ্ঠান দেখে-ছিলাম মনে আছে। আমার মা বোধহয় কারো ব্যামোর সময় মানত করেছিলেন যে আরোগ্য লাভ হলে কালীর সামনে হাতে ধুনো পোড়াবেন আর বুক চিরে রুধির দেবেন। যেদিন এই ক্রিয়া হবে সেদিন মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে কালীমন্দিরে গিয়ে-ছিলেন। পুরুতের কথামত মা কালী প্রতিমার সামনে আসন হয়ে বসলেন। বুক চিরে রুধির দেওয়ার ব্যাপারটা আমি অত নজর করে দেখিনি, তেমন মনে নেই। দেখলাম আমার মায়ের দুই হাতের তেলোয় আর মাথার তেলোয় তিনটে বিড়ে রেখে তার উপর পুরুত ঠাকুর তিনটা আগুনভরা মালসা রাখলেন। মা স্থির ও আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন আর পুরুত সেই আগুনের উপর ধুনো দিতে লাগলেন। আমি প্রথমে কিছুক্ষণ ভীত চকিত হয়ে দেখতে লাগলুম। তারপর এমন কান্না জুড়ে দিলুম যে কেউ আমাকে থামাতে পারল না। তখন পুরুত ঠাকুর বাধ্য হয়ে বোধহয় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তিনটে মালসা নাবিয়ে নিলেন। আমিও মায়ের কোলে গিয়ে খুশি হয়ে গেলুম।

একবার পাড়ার এক সধবা গৃহিণী আমাকে কুমারী পুজো করেছিলেন। তিনি আমাকে স্নান করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে, একখানা জলচৌকীতে বসিয়ে দিলেন। তার পরে ফুল চন্দন এইসব নিয়ে কি পুজোর মত করলেন তা আমার বিশেষ কিছু মনে নেই। বড় বয়সে আমার এই কুমারী পুজোর কথা একজন খৃস্টান ভদ্রলোকের কাছে গল্প করেছিলুম। তিনি শুনে বেশ খুশী হয়ে বল্লেন এই দেখ, আমাদের দেশেও [illegible] করে।

আমি খুবই আদরের মেয়ে ছিলুম। আমিই যেন এই ক্ষুদ্র সংসারটির কেন্দ্রস্থল ছিলুম। আমার জন্যই সংসারের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা হত। আমার ভালমন্দ সুখ স্বাচ্ছন্দ নিয়েই সকলে ব্যস্ত থাকতেন। পিসিমা সকালে উঠে বাসি কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে আমার প্রথম খাবার ভাত রাঁধতে যেতেন, তাকে যশোরে "আনালে" ভাত বলত,—বোধহয় স্নান না করে রাঁধা হত বলে। আমাদের দেশ থেকে গঙ্গা দূরে বলে এক বোতল গঙ্গাজল রান্নাঘরে টাঙ্গানো থাকত। তাড়া-তাড়ি ছেলেপিলের খাবার বা রোগীর পথ্য রাঁধতে হলে স্নান না করে সেইটে স্পর্শ করা হত, অর্থাৎ একটু গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দেওয়া হত। একবার আমি অনেকদিন পালাজ্বরে ভুগেছিলুম। সে সময়ে আমাকে যে জিনিস খেতে দেওয়া হত, বাড়ির আর সকলে কেবল সেই জিনিসই খেতেন। আর কোন খাবার জিনিস সে সময়ে বাড়িতে আনা হত না, পাছে দেখে আমার লোভ হয়, বা না খেতে পেলে মনে কষ্ট হয়। এখনকার স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে চারিদিকে যা শুনি ও পড়ি, আমার মনে হয় ছেলেবেলায় অনেকটা সেই রকম নিয়মই আমাদের খাওয়া দাওয়া হত। পুকুরে ধরা টাটকা মাছ, কখন কচ্ছপের মাংস, কচ্ছপের ডিম; ঘরের গরুর দুধ, গুলেল দিয়ে কেউ মাঝে মাঝে জলের পাখি বা অন্য কিছু শিকার করে আনলে তার মাংস, নিজের বা কোন বাড়ির বলির মাংসও প্রায়ই হত, হরিণের মাংস কেউ আনলে বাবামশায় খুব খুশি হতেন। আমার বাপের বাড়ি ভক্ত শাক্ত পরিবার। হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস ছাড়া আর সব মাংসই সেখানে খাওয়া হত। সকালে প্রথমে উঠেই ত ঐ আনালে ভাত খেতুম, দুপুর-বেলা ভাতের সঙ্গে কতক রকম শাক-তরকারি, টাটকা মাছের ঝোল, কচ্ছপের ডিমের বড়া কিম্বা কচ্ছপের মাংসের ঝোল। বিকেলে ঘরের সর বসানো দুধ গরম গরম মুড়কি দিয়ে জলখাবার হত। এই খাওয়াটাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগত। রাত্রে মাছের ঝোল ভাত, কোন কোনদিন পাঁঠার ঝোল। আমার যখন কর্ণবেধ হয়, আমি বড় কাঁদছিলুম। লোকে আমাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলে যে হয়ে গেলেই সর বসানো দুধে গরম মুড়কি খেতে পাব। তখন আমি চুপ করে কান বিঁধতে রাজি হলুম। কাপড়ের মধ্যে একখানা সাড়ি পরতুম, আর শীতকালে একটা দোলাই মাথার উপর দিয়ে ঘাড়ের কাছে গিঁঠ বেঁধে দেওয়া হত। নতুন কাপড় পরবার আগে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে, কাপড়ের একদিক থেকে একটা সুতো বের করে নিয়ে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে "কাটা নাও" "খোঁচা নাও" "আগুন নাও" এইরকম বলে বলে কাপড়ের [illegible]

তবে কাপড় পরতে হয়। আর যখন দুধে দাঁত পড়তে আরম্ভ হল, তখন দাঁতটি হাতে করে নিয়ে একটা ইঁদুরের গর্ত খুঁজে "ইঁদুর, পড়া দাঁত তুমি নাও, তোমার দাঁত আমাকে দাও" বলে সেই গর্তে ফেলে দিতে হত। এই কথাটা বিশেষ করে আমার মনে আছে এইজন্যে যে, বিয়ের পরে যখন বাকি দুধের দাঁতগুলি পড়ত, তখন কলকাতার সেই পাকা ইট চুনের বাড়িতে দাঁত ফেলতে ইঁদুরের গর্ত কোথায় খুঁজব তা ভেবে পেতুম না। এখন সর্বদা শুনতে পাই যে, খোলা বাতাসে থাকা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে একটা বড় দরকারী জিনিস। আমি বাপের বাড়িতে যে রকম ঘরে থাকতুম তাতে দিনরাত খোলা বাতাসেই থাকা হত। বাড়ির নিচের ভাগটা সমস্ত মাটি দিয়েই করা হত, এতটা উঁচু করা হত যে চার পাঁচটা ধাপ উঠে তবে মেঝেতে পৌঁছনো যেত। আমাদের উত্তরের ঘরটা সব চেয়ে বড় আর সবচেয়ে উঁচু ছিল, আরও বেশি ধাপ উঠে তাতে যেতে হত। প্রত্যেক ঘরের সামনে সমান লম্বা একটা বারান্দা ছিল, আর ঘরের চারিদিকটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেই বেড়ার বাঁশ কিছুদিন ভিজিয়ে রেখে, লম্বাদিকে চিরে দুখানা করে সেই এক এক ভাগকে দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে সরু জালির মত করা হত। সেই জালি কাজের বেড়ার ভিতর দিয়ে আলো হাওয়া যথেষ্ট প্রবেশ করতে পারত, আবশ্যকমত জানলা দরজাও রাখা হত। কাঠের কপাটের উপর নানারকম ফুল পাতার তোলা কাজ নিজের নিজের রুচি অনুসারে করা হত। ঘরের উপরে বেশ পরিষ্কার কাটাছাঁটা খড়ের চাল থাকত। বারান্দার মেঝে রোজ সকালে গোবর মাটী জল গুলে লেপন করা হত, সমস্ত উঠোনটা গোবর মাটির ছড়া দিয়ে ঝাঁট দেওয়া বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হত। কোন জায়গায় আবর্জনা জমা করে রাখা গৃহিণীর পক্ষে বড় লজ্জার বিষয় ছিল।

আমার ছেলেবেলায় কতকগুলি জিনিসে খুব আমোদ হত। তার মধ্যে হরির লুট ছিল সবচেয়ে স্মরণীয় অনুষ্ঠান। নিজেদের বা অন্য কারো বাড়ি অসুখ বিসুখ, বিপদ আপদ হলেই হরির লুট মানা হত। যেখানেই হোক্ না কেন, পাড়ার সকলেই তাতে যোগ দিত। দেবতা অধিষ্ঠিত কোন বট অশ্বত্থ বা বড় পুরনো গাছতলায়ই প্রায় হরির লুট দেওয়া হত। পাড়ার সকলের সঙ্গে আইমা আমাকেও কোলে করে নিয়ে সেই জায়গায় যেতেন। বাতাসা ছড়ানো আরম্ভ হলে তিনি আমাকে কুড়োবার জন্যে কোল থেকে নামিয়ে দিতেন। মস্ত লম্বা হাত পা-ওয়ালা লোকে সব হুটোপুটি করে [illegible]

হাত পা তার ভিতরে প্রায় কিছুই কুড়োতে পারত না। কুড়োবার খানিক চেষ্টা করে শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে আইমার কাছে এসে দাঁড়াতুম, তিনি কোলে করে আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। আর সেদিনকার কর্তা বা কর্ত্রী আমার কান্না দেখে আবার কিছু বাতাসা আনিয়ে আমার সামনে ছড়িয়ে দিতেন। তাঁদের কথায় সেই বাতাসা নিতুম বটে কিন্তু আগে সকলের সঙ্গে কুড়োতে পারিনি সে দুঃখটা মন থেকে যেত না। এক এক দিন পাড়ার মেয়েরা সব পরামর্শ করে ঠিক করতেন 'জাগরণ' করবেন, পূর্ণিমার রাত্রেই প্রায় করা হত। মেয়েদের সব ঘরকন্নার কাজ খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে পুরুষেরা সব শুতে গেলে, যেবার যে বাড়িতে জাগরণ হবে সেখানকার পরিষ্কার উঠোনে মাদুর পাতা হত। গ্রামে সব মেয়েরা পান হাতে করে এসে জুটতেন, তারপরে মাদুরে বসে নানারকম কথাবার্তা হাসি গল্প এইসব হ'ত। যিনি গাইতে পারেন গাইতেন। আমাদের দেশে ক্ষুদে নাচ বলে একরকম নাচ আছে, তাও কেউ কেউ নেচে দেখাতেন। এইরকমে খুব হাসি আমোদে অনেক রাত কেটে যেত। আমার জাগবার খুব ইচ্ছে থাকলেও খানিক বাদে ঘুমিয়ে পড়তুম। নষ্টচন্দ্রের রাত্রে খুব মজা হত। পাড়াপড়শীর বাড়ি থেকে সেদিন ফল তরকারি প্রভৃতি কিছু একটা চুরি করে আনতেই হবে, এমন করে যাতে ধরা না পড়ে। নিজের বাগানের চোরকে ধরা, আর পরের বাগান থেকে ধরা না পড়ে কিছু চুরি করে আনা এই নিয়ে খুব ছুটোছুটি হুটোপুটি হাসাহাসি পড়ে যেত। আমাকে নষ্টচন্দ্র দেখতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল, কারণ দেখলে কলঙ্ক হয়। নিষিদ্ধ জিনিসের যেমন ফল হয়ে থাকে, সেইদিকে ঝোঁকটা বেশী বাড়ে, তেমনি আমারও নষ্টচন্দ্র দেখবার জন্যে খুব একটা ছটফটানি হ'ত, এদিকে আবার কলঙ্কের ভয়ও খুব হত। যদিও 'কলঙ্ক' কথাটা ছাড়া তার মর্মার্থ কি তা জানতাম না, বুঝতাম না। এক একবার চোখ বুজে আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা চোখ একটুখানি খুলে অল্প দেখে নিয়ে তখনই ভয়ে ভয়ে মুখ নীচু করতুম।

আমাদের বাড়ির কাছাকাছি নানা রকম জাতের লোকেরা বাস করত, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেতর জাত, মুসলমান প্রভৃতি। আমার এখন মনে হয় তাদের সকলের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ও কথাবার্তায় বেশ একটা সহজ স্বাভাবিক আত্মীয়তার ভাব দেখতে পেতুম। সকলের সঙ্গেই যেন সকলের একটা কিছু পাতানো সম্পর্ক থাকত। মা [illegible]

সেখানে বয়স অনুসারে কায়েত ঠাকরুণ, মুখুজ্যে মেয়ে বা ঘোষ মশায় এই রকম কিছু বলা হত। এরকম সম্বোধন কেমন বেমালুম বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে মিশে যায়, যেমন ফুলের সঙ্গে ফুল গাঁথা। আর আর 'মিস্টার', 'মিসেস্', 'মিস' এই সব শব্দগুলি শুনলে মনে হয় যেন ফুলের গাঁথুনীর ভিতর মাঝখান থেকে কঠোর খন্‌খনে ঝন্‌ঝনে ধাতুর টুকরো এসে পড়ল। মুসলমান ও হিন্দু পাড়াপড়শীর ভিতরেও ঐ রকম সম্পর্ক পাতানো থাকত। আমার মনে আছে একটি মুসলমান মেয়ে আমার আইমাকে মা বলেছিল। আইমা তাকে মেয়ে বলতেন আর তার স্বামীকে জামাই বলতেন, ও জামাইষষ্ঠীর সময় তাকে রীতিমত জামাইষষ্ঠী দিতেন। ঘরসংসারের কাজকর্ম সারা হয়ে গেলে বিকেলবেলা সকলে পরস্পরের বাড়ি যাওয়া-আসা করত। মুসলমান চাষীরা সূর্যোদয়ের আগে মিষ্টি খেজুর রস এনে আমাদের খেতে দিত, আর রাত্রি নটা দশটায় সব চেয়ে মিষ্টি যে জিরেন রস তাই আনত, আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে খাওয়ানো হত। বাপের বাড়ি ছেড়ে অবধি সেরকম রস আর কখনো খাইনি। খুব সুগন্ধ নতুন খেজুর গুড়ও তারাই এনে দিত; তেমন গুড়ও আর কখনো পাইনি। পুকুরধারের বড় কলাবাগানে মা একজন গরিব ক্যাওরার মেয়েকে থাকতে জায়গা দিয়েছিলেন, সে সেখানে ঘর বেঁধেছিল। সে আমাদের উঠোনের ছড়া ঝাঁট-এর কাজটা করত, ওঁরা তাকে খেতে দিতেন। তার একটু পয়সা রোজকার করবার দরকার হলে সে মাকে এসে বলত—মা ঠাকরুণ, একখানা ভাল কাপড় আর কিছু গয়না যদি আমাকে দেন তো আমি সাজগোজ করে দুচার বাড়িতে গিয়ে ক্ষুদে-নাচন নেচে কিছু পয়সা যোগাড় করে আনতে পারি। মা তাকে একখানা ভাল সাড়ি ও কিছু গয়না দিতেন, সেইগুলো নিয়ে সে নাচ সেরে আবার দু-একদিনের মধ্যে ফিরিয়ে দিত, মা তার উপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘরে তুলতেন। মুসলমান পাড়াপড়শীরাও মা বাবামশায়ের কাছে এসে এমন সহজভাবে আপনার জায়গা বুঝে নিয়ে সেখানে বসত ও গল্প করত যাতে কোন পক্ষের কোন দ্বিধা বোধ বা মনমালিন্যের কারণ কিছুমাত্র দেখত না। তাদের বাগানের কোনো নতুন ফল বা তরকারি হলে তারা কত আহ্লাদের সহিত আমাদের এনে দিত। মা বাবামশায়রাও নিজের ঘরের তৈরী বা বাগানের কোন জিনিস কত [illegible]

বোবার বাঁশী

১

পথের পাশে ফালতু বাঁশের টুকরো। ক্ষেতে যাওয়ার পথে চাষী দেখে চ'লে গেল, না ক্ষেত খামারের কাজে লাগবে না।

বধূ চলছিল জলে, একবার দাঁড়ালো, তারপরেই কলসী দুলিয়ে গেল চ'লে, না, এ তার লাউমাচায় চ'লবে না।

গুরুমশাই চ'লেছেন পাঠশালায়, একবার হাতে তুলে দেখলেন বাঁশের টুকরোখানাকে, ফেলে দিলেন, বুঝলেন তাঁর দণ্ডের যোগ্য মজবুত নয়।

ছেলেরা চলেছে মাঠে খেলবে ব'লে, বাঁশখানাকে দেখে সকলে হাতে নিয়ে লোফালুফি করল, তারপরে দিল ছুঁড়ে ফেলে, নারে না, বড্ড হাল্কা।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। গাঁয়ের বোবা চ'লেছে আপন মনে, চোখে প'ড়লো তার বাঁশের টুকরোটা, কুড়িয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো, চোখ উঠল আনন্দে জ্বলে'—বা চমৎকার বাঁশী হবে।

মাঝরাতে বাজে বোবার বাঁশী, অটল নিশুতি ওঠে কে'পে কে'পে, ঘরে ঘরে ঘুম ভেঙে যায়। কোন্ অস্পষ্ট ব্যথায় সবাই এপাশ ওপাশ করে, বুঝতে পারে, পারে না, এই মধুর সুরের সঙ্গে তার কোন মধুর বার্তা জড়িত। চাষী ভাবে তার ক্ষেতে নেমেছে সোনার ফসলের মেঘ, গুরুমশাই ভাবেন পোড়োরা হয়েছে উজীর কোটাল, বধূ ভাবে স্বামী ফিরে এসেছে বিদেশ থেকে, ছেলেরা ভাবে খেলুড়ীর দলে এসেছে এক সর্দার খেলুড়ী, যাকে কিছুতেই যায় না ধরা, যার পরনে পীত বস্ত্র, যার মাথায় শিখিপুচ্ছের চূড়া, যে মন নিয়েছে সবার কেড়ে। যে ভাবনার কোন কূল নেই সেই সমুদ্রে সবার মন অতর্কিতে পাল তুলে বেরিয়ে পড়ে। সবাই ভাবে এ কেমন হ'ল!

বোবার বাঁশী বাচালকে দিয়েছে স্বপ্নের ভাষা।

খেলার উৎস

২

পাহাড়তলীর গ্রাম। পাহাড় থেকে ঝরনা ঝরে, মেয়েরা কলসী ভ'রে নিয়ে যায় তার প্রথম অঞ্জলি, তরল মুক্তার মতো নির্মল পানীয়। ঝরনার ধারা মিলেছে এসে হ্রদে, এক কূল থেকে আর এক কূল পর্যন্ত বিস্তৃত তরল পান্নার নিস্তব্ধ চাদর। গ্রামের স্নান পানের জন্য প্রদত্ত গিরিদেবের পরম প্রসাদ।

রাতের বেলায় ভূমিকম্প হোল পাহাড়ে, সব গেল ওলট পালট হ'য়ে। ঝরনার ধারা গেলো বন্ধ হ'য়ে। বাঁধভাঙা হ্রদের জল পাগলের অট্টহাসির মতো খলখল্ ক'রে ছুটে বেরিয়ে গেল। শব্দে লোক জেগে উঠে দেখলে সব শূন্য, ঝরনার খাত শুষ্ক, হ্রদের রিক্ত গহ্বর অক্ষিহীন চক্ষুকোটরের মতো আকাশের দিকে নীরবে তাকিয়ে। কোথাও একবিন্দু জল নেই। তৃষ্ণার সর্বনাশ।

জল খুঁজতে লোকে দিকে দিকে বেরিয়ে প'ড়ল, গেল চৌপাড়িতে, গেল তিনমাথা পাহাড়ের তলায়, গেলো জোড়া-হাতী অরণ্যের মধ্যে। ক্ষেতে চাষী নেই, পথে পথিক নেই, বিপণিতে বণিক নেই, পাঠশালায় গুরুমশায় নেই, সব গেছে জল খুঁজতে। শিশুদের আজ শাসনবিহীন মুক্তি।

তারা খেলছিল উত্তর দিক্কার শূন্য মাঠে। এখানে ওখানে পাথরের চাঙড় আছে প'ড়ে! সেগুলো নিয়ে ঠেলাঠেলি প্রধান খেলা। ঐ যে বড় চাঙড়! ওখানাকে সরাতে হবে। দু'চার জনের কাজ নয়, খুব ভারি। তখন সকলে মিলে সেটাকে ঠেলতে থাকে, হে'ইয়ো জোয়ান, হে'ইয়ো।

সবাই হঠাৎ চ'মকে ওঠে, এ কিসের শব্দ? আর একটু ভাই, আর একটু। পাথর স'রতেই বেরিয়ে পড়ে গুপ্ত ঝরনার বিমল উৎস। শিশু ঝরনা যোগ দেয় শিশুদের খেলায়।

সন্ধ্যা বেলায় গাঁয়ের লোক ফিরে আসে, না, কোথাও জল মিলল না। কিন্তু সবাই চ'মকে ওঠে, একি জলের শব্দ কেন? যখন জল খুঁজে ম'রেছে দূরে দূরান্তে, তখন জল ছিল গাঁয়ের মধ্যেই, সেটা কিনা আবিষ্কার করলো আবার শিশুরা। দেখেও কেউ বিশ্বাস ক'রতে চায় না। তবু জল তাতে আর সন্দেহ নেই। সবাই অঞ্জলি [illegible] এসে [illegible]

প্রমথনাথ বিশী

সন্তোষকুমার ঘোষ

[এত চরিত্র থাকতে গড়পাহাড়ের মনসিজ রায়কে কেন বেছে নিলুম সে কৈফিয়ত নিজেকেই দিতে পারিনি। চরিত্রটি অসামান্য, কিন্তু আমি তাঁকে সামান্যই চিনি। একবার কিছুক্ষণের জন্যে কাছে থেকে দেখেছি মাত্র। তখন তিনি কীর্তির চূড়ায়, বহুর মুখে তাঁর জয়ধ্বনি। সেই গোলে তখন হরিবোল দিতে পারিনি। মনে হয়েছিল কোথাও ফাঁকি আছে। সরে এসেছি। আজ সেই [illegible]

কতদিন পাহাড় দেখিনি! অজানার দিকে যাত্রাজনিত দুরুদুরু ভয়, তবু মন খুশীতে একবার নেচে উঠেছিল। আর, সঙ্গে সঙ্গে সব যেন বদলে গেল। চেয়ে দেখি, আগেকার ইসটিশনে সহযাত্রীরা প্রায় সবাই নেমে গেছে, বাকী পথটুকু অন্তত এই কামরাটাতে আমি একা। এখান থেকে ঘন বনের এলাকা। রোদ্রের মুগা চাদর কে যেন ত্রস্তে গুটিয়ে নিয়েছে। একচক্ষু হরিণের মতো দিশাহারা ইঞ্জিন অরণ্যগর্ভে পথ খুঁজে মরে।

খানিকক্ষণের জন্যে চোখ বুঁজে থাকব। একবার তাকিয়ে দেখি বনের সীমা কখন শেষ হয়ে গেছে, তেপান্তরের মাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমাদের গাড়ি। বেলাশেষের আলোয় শীর্ণলেখা ত্রিপূর্ণি চোখে পড়ল। এই রেলপথের ওখানেই শেষ। তারপর খেয়াঘাট, নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হবে ওপারে, যেখানে সুব্রত, এখানে আমার চেনা একমাত্র মানুষটি, অপেক্ষা করবে বলেছে।

পাথরকুচি-ছাওয়া প্লাটফরম, টিপটিপ বর্ষা মাথায় নিয়ে নামতেই হুহু হাওয়া একবার আমার পা থেকে চুলের ডগা অবধি কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। সামনে ইঞ্জিনের পথ জুড়ে রক্তাক্ত নিষেধঃ 'ডেড্ এন্ড'। নদীর বনঝাউঝাপসা অববাহিকার ঠিক পরেই বোবা-হাবসি পাহারাদার পাহাড়, একটার পিছনে আরেকটা, স্থির অন্ধ, সারিসারি। এদিক ওদিক ভালো করে চেয়ে দেখলুম, আমি ছাড়া দ্বিতীয় যাত্রী নেই। পশমের জামাপরা একটা লোক পথ আগলে দাঁড়িয়ে-ছিল, তার মুখে কথা নেই, চোখ অপলক, আমার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিল। টিকিটচেকার। পিজবোর্ডের টুকরোটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলুম।

সুব্রত ওপারেই ছিল। কদমছাঁট চুল, পরনে শার্ট, পরিচয় না দিলে তাকে হয়ত [illegible]

[এক]

প্রথমবার যখন গড়পাহাড়ের মাটিতে পা দিই তখন সন্ধ্যা, দিকচোখে নেশার রক্তিম ঘোর। এবার গিয়েছিলাম সকালে। প্রথমবারের কথা আগে বলি।

তখন আষাঢ়ের শেষ, অসমতল মাটির বুক চুইয়ে গেরুয়াপেতে ছোটবড় ধারা। দূরে-কাছে এই-চুপ-এই-চঞ্চল মেঘ, হালকা-রোঁয়া, ধোঁয়াধোঁয়া, মন্তথুরে। থেকে থেকে হাওয়ায় ছুঁহিন তীর। চক্রবালরেখা কঠিন অয়োবলয়ের মতো।

খুব পুরনো কথা নয়, তবু মনে হয়, কত কাল কেটে গেছে। স্মৃতিফলকের লেখা ফিকে। যেন জন্মান্তর।

ইঞ্জিনের পরের কামরায় উঠেছিলুম। রোদ্রের মুগাচাদরে কয়লার কালির ছিটে লাগছে। জানালায় কান পাতলে একটি আগুনের কলিজার ধসধস শোনা যায়। তাকিয়ে দেখেছি সব কিছু যেন ভয়-পাওয়া, পিছন-ছুট, শুধু আমাদের মূঢ় একরোখা রেলগাড়িটার গতি সামনের দিকে। অনেক [illegible]

হাত বাড়িয়ে আমাকে তুলে নিল। বললুম, এ কী চেহারা করেছ।

কেন, খারাপ কী।

বললুম, না খারাপ নয়, তবে আলাদা। আর্ট ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসে লম্বালম্বা চুল রেখেছিলে, ঢিলেঢালা জামা, কোনটারই বোতাম নেই কিম্বা খোলা; ধুতি মাটিতে লুটোতে—

সুব্রত বলল, আর?

ভালো করে ওর দিকে আরেক নজর চেয়ে নিয়ে বললুম, আর বোধহয় এর চেয়ে কিছু রোগা ছিলে।

—অর্থাৎ আগের চেয়ে শরীরটা ঢের মজবুত হয়েছে, এটাই তোমার ভালো লাগছে না, কেমন? শিশির, তুমি ঠিক এক রকম রয়ে গেছ, ঘুনধরা বোহেমিয়ানার খাঁচায় মনময়নাকে এখনও ছোলাছাতু দিচ্ছ। এটা বোঝনা, একমাত্র সবল শরীরই সবল মনের আধার হতে পারে? আগে ভালো করে খেতুম না, চলতে গেলে সামনের দিকে নুয়ে পড়তুম, মিনিট কুড়ি কাজের পরেই বসে বসে হাঁপাতে হত, থেকে থেকে যক্ষ্মারোগীর মত কাশতুম, সেই বুঝি ভালো ছিল? এখন একটানা ছ'সাত ঘণ্টা কাজের পর শুধু এক পেয়ালা গরম দুধ খেয়ে নি। আবার কাজে লাগি।

ওর কব্জি থেকে কনুই, আর জানু থেকে জুতো অবধি রোমশ শরীরটা একেবারে খালি, জলের ছাটে হাওয়ার ছুঁচে ভ্রূক্ষেপ নেই, সেদিকে একবার চাইতে গায়ে যেন কাঁটা দিল, কোথাও যেন শিল্পীটিকে পেলামনা, না ওর পোশাকে, না ভাববিহ্বল চোখে। কিম্বা, কে জানে, হয়ত আমারই সংস্কার-গ্রস্ত মনের ভ্রম। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

বাস চলতে শুরু করেছিল। দুধারের মাঠ হলদে রঙের কী এক ফসলে ভরে গেছে। শিষে শিষে ফড়িং, তাদের রঙও বুঝি হলদে, মাঝে মাঝে ফড়ফড় করে যখন ওড়ে তখনই শুধু আলাদা করে চেনা যায়।

একবার জিজ্ঞাসা করলুম, সেই কবে এসেছ, তখন থেকে এখানেই পড়ে আছ। তোমার ছবি আঁকা আজও শেষ হলনা সুব্রত। একটা বড় অয়েল করবার ফরমাস নিয়েই তো এসেছিলে না? সেটা শেষ হয়নি?

- কবে শেষ হয়েছে, কিন্তু নতুন ধরেছি যে।

—নতুন ছবি?

—হাঁ, ও'রই আলাদা আলাদা স্টাডি।

একবার বিস্ময় প্রকাশ না করে পারিনি। সেই থেকে এক ছবি আঁকছ, প্রৌঢ়, খামখেয়ালী একটা মানুষের? সুব্রত, এখানে বেশি দিন থাকলে তুমি মরে যাবে কিম্বা পাগল হবে। তুমি আমার সংগে ফিরে চল।

সুব্রত নির্লিপ্ত একটা মুখভঙ্গি করে বাইরের দিকে তাকাল। অর্থাৎ উত্তর দেবারও প্রয়োজন নেই আমার প্রস্তাব এমন হাস্যকর। অনেক পরে নিজে থেকেই ভিতরের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, মনসিজ রায়কে তুমি দেখনি তাই বলছ। শিশির, এমন একটা সবজেকট পেলে তাকে আঁকার জন্যে যে কোন আর্টিস্ট একটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। চিবুক আর চোয়ালের এমন গড়ন তুমি দেখনি। আর নাক। তার বাইরের ছাঁচটা কোনমতে হয়ত তুলে নিতে পারি, কিন্তু রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিজলীর যে স্ফুরণ, আমার তুলির সাধ্য কী তাকে যথাযথ আঁকে। ঘনরোম ভ্রূ, প্রশস্ত, প্রসন্ন ললাট—

—দিনরাত ওই রূপ ধ্যান করছ বুঝি?

হয়ত আমার ভঙ্গিতে একটু ব্যঙ্গ লেগে থাকবে, সুব্রত আহত চোখে তাকাল। এখানে এভাবে কথা বলছ শিশির, পাহাড়গড়ে গিয়ে কিন্তু চপলতা দেখিও না।

—কেন, তোমাদের ইস্কাবনের রাজাকে ভয়ের কিছু আছে নাকি।

সুব্রত এবার যেন রাগ করল, আরও একটু তফাতে সরে বসে বলল, জানিনে। শুধু ভয় আর ভরসা যাদের ব্যবহারিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রাণিবিজ্ঞানে তাদের স্থান কি খুব উঁচুতে শিশির? ভয় বা ভরসার কথা নয়। দেখব মানুষটি কেমন। যদি দেখি বড়, অন্তত আমাদের অনেকের চেয়ে উপরে, তবে তাঁর কাছে মাথা নোয়ানোর সংবুদ্ধি যেন থাকে।

আমার পরিহাস করার প্রবৃত্তি নিমেষে উবে গিয়েছিল। জানালার বাইরে চেয়ে চেয়ে ভেবেছি আরও কতদূরে আছে গড়পাহাড়। ঝাঁকুনির তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছে। মাটি এখানে বন্ধুর, কতকটা কুমোরের টালখাওয়া চাকের মতো। দুয়েকবার কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ার দশা হল, সুব্রতই ধরে ফেলে আমাকে বাঁচালো। হয়ত অপটুতা দিয়ে ওর সহানুভূতিও আকর্ষণ করে থাকব, কেননা ঈষৎ পরেই ওকে কোমল গলায় বলতে শুনলুম, আর বেশি নয়, ওই দেখ।

ওর আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে দেখলুম, এখনও কিছু দূরে সবচেয়ে উঁচু টিলাটির উপরে সুডৌল একটি শ্বেত ঘট। ঘট নয়, গড়। কিন্তু কাছে যাবার আগে বুঝিনি। ওখানে এই বাস উঠবে? সুব্রত বলেছিল, না ও পথটা এখনও তৈরি হয়নি আগে তো এই রাস্তাটুকুও ছিল না। ত্রিপুর্ণির ঘাট থেকে পঁচিশ মাইল পাকা রাস্তা তৈরি করিয়েছেন পাহাড়গড়ের মালিক মনসিজ চৌধুরী। বাস সার্ভিসও চালু করেছেন তিনি।

ঘটটি স্ফীত হতে হতে একটি প্রাকারের রূপ নিল, আমরা যখন টিলাটার নীচে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সূর্য একেবারে ডুবে গেছে।

সুব্রত আমাকে হুঁশিয়ার না করে দিলেও পারত। গড়পাহাড়ের দেউড়ি পেরোলে পা অসাড় এবং জিহ্বা আপনা থেকেই জড় হয়ে যায়। কোন প্রকার চপলতা সেখানে অসম্ভব। ঠাণ্ডা পাথরে বাঁধানো মেঝে, শ্রেণীবদ্ধ প্রহরীর মতো দীর্ঘ থামগুলি শুধু মূক নয় পঙ্গুও, একঠায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘতর ছায়ার ফিতে ফেলে মেঝের পরিসর মাপে। একান্তে নিজের কাছে বলা অস্ফুট বাণীটিও দেয়ালে দেয়ালে প্রতিহত হয়ে শত গুণ মুখর হয়ে নিজের কানে ফিরে আসে। এতটুকুও ধুলো কোথাও নেই, একটি ভাঙা ডালের কুটো কি ঝরাপাতা নেই আনাচে কানাচে, অনাবশ্যক সব কিছু নির্মম ভাবে ছাঁটাই হয়ে গেছে, সর্বত্র কর্মপটুতার নির্ভুল ছাপ।

দুপাশের ঘরগুলির প্রত্যেকটিই যথেষ্ট আলোকিত, অন্তত যেতে যেতে তাই মনে হয়েছিল, হাওয়ার গতিবিধিও অবাধ। বারান্দাগুলি কয়েকটি দ্বিধাহীন সরল রেখার মতো মহলের পর মহল পার হয়ে গেছে।

এই পরিবেশের পক্ষে গড়পাহাড়ের পরিকল্পনা এবং বিন্যাস আশ্চর্য রকমের নতুন। অনুভব করেছিলাম এবং সুব্রতকে বলতেও দ্বিধা করিনি।

—সবটাই মনসিজ রায় ভেঙে নতুন করে গড়েছেন যে। আগে তো এরকম ছিল না। আজ থেকে কয়েক বছর আগেও গড়পাহাড়কে দেখাত সেকালের কাহিনীতে পড়া রহস্যময় যক্ষপুরীর মতো। মেঝে তখনও পাথরে বাঁধানো ছিল, কিন্তু পিছল, দেয়াল ছিল ভিজে স্যাঁতসেঁতে, এই সাতমহলা ইমারতের কলিজায় ফুসফুসে ছিল চাপচাপ ভয়, কত শতকের পোষা কালোবিড়াল অন্ধকার, রকমারি ঝাড়লণ্ঠনের ছটায় বাহার যত, তত আলো ছিল না। সব কিছু আমূল সংস্কার করেছেন মনসিজ। এখনও সব কাজ শেষ হয়নি। দেখবে? এদিকে এস।

সুব্রত আমাকে টেনে নিয়ে গেল একদিকে, সেটা বোধহয় এই বিপুল প্রাসাদের পিছন দিক, ধ্বংসস্তূপে পরিকীর্ণ। এখানে ভাঙার কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু গড়া শুরু হয়নি। এই মহলটাতে আগে গানবাজনার জলসা বসত। মনসিজ বললেন, বাজে জিনিসের এখানে স্থান নেই। গোটা মহলটা একেবারে গুঁড়িয়ে দিলেন।

—আর গানবাজনা হবে না? বিমূঢ় আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। হবে বইকি, হবে। ওখানে সমবায় সমিতির অফিস হবে। সংস্কারের এই বিরাট প্রয়াসটাই একটা সমবেত সংগীত, মনসিজ বলেন।

—একজনের শেখানো সুরে। হঠাৎ চটুল গলায় বলে উঠলুম। কানু ছাড়া গীত নেই। মনসিজ ছাড়া এই বৃন্দাবনে কি পুরুষও নেই? আর সব মোহিত গোপিনী?

আরও কত কী বলতুম ঠিক নেই। হঠাৎ চেয়ে দেখি সুব্রতর মুখ পাংশু হয়ে গেছে।

কত দিন গেল, তবু আজও লিখতে বসে দেখছি বিরাট গড়পাহাড় মনের প্রাঙ্গণে তার

দীর্ঘ ছায়া ফেলে দাঁড়াল। চুপ করে কিছুক্ষণ শ্রাবণের আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে তার থমথমে আবহাওয়ার কিছুটা যেন অনুভবে পাই; কথার পর কথা সাজিয়ে তার স্তব্ধ গম্ভীর রূপের আভাসটুকুও আঁকা যায় না।

প্রথম মনে পড়ছে মৃণালিনীকে। আমাকে নিয়ে সুব্রত খাবার ঘরে গেল, উনি আলোর নীচে বসে কী একটা বুনছিলেন। নিঃশব্দে ঢুকে আসন নিয়েছিলুম, আমাদের দেখতে পাননি। কিন্তু প্রায় তখনই দেয়ালঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় কী ইসারা হল, একটি অশ্রুত গানে নিয়মিত তাল দেবার মতো বাজতে লাগল, এক, দুই, তিন...আট অবধি। মৃণালিনী মাথা তুললেন, আমাদের দেখলেন, হয়ত ঈষৎ হাসলেন। সুব্রত আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে কী বলেছিল মনে নেই, মাথা সামান্য হেলিয়ে দুজনই দুজনকে নমস্কার করে থাকব। তার পরও দু' তিন মিনিট কেটে গেল, কোন কথা হয়নি, টেবিলের শুভ্রচ্ছদে সুব্রত আঙুল দিয়ে একটা ছবি এঁকে গেল, আমি হাত বাড়িয়ে একটি ফুল তুলে তার ঘ্রাণ নিলুম, মৃণালিনী কী করলেন মাথা তুলে দেখিনি। দেয়ালঘড়ির কাঁটা সরে গিয়ে আবার ঘস করে যেন একটা সংকেত হল, আটটা পাঁচ। মৃণালিনী উঠে দাঁড়ালেন, সুব্রতর সঙ্গে চোখেচোখে দুর্বোধ্য ভাষায় কী কথা হল, ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে ওঁকে বেরিয়ে যেতে দেখলুম। সামনা-সামনি ভালো করে দেখতে ভরসা হয়নি, পিছন থেকে, যতক্ষণ না একেবারে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ ওঁর দেহভঙ্গি দেখলুম। না, মদালস কুঞ্জর নয়, চকিত হরিণী নয়, না-ধীর-না-দ্রুত সেই গতির কোন ধ্রুপদী তুলনা নেই। একটা বিজলীজ্বালার শীর্ণ দীর্ঘ সরল-রেখা বলতে পারি, কিন্তু তাও ঠিক হবেনা।

—ওঁর কোন দিন দেরী হয়না। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় আসেন।

সুব্রতর কথায় চমক ভাঙল। বললুম কে?

—মনসিজ রায়।

ওঁকে ডাকতেই মৃণালিনী উঠে গেছেন, বুঝতে পারলুম।

ঠিক তিন মিনিটের মাথায় মৃণালিনী ফিরে এলেন। পরিবেশক ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল, তাকে খাবার আনতে বললেন।—উনি আসবেননা? সুব্রত জিজ্ঞাসা করে থাকবে।

—না। শরীর ভালো নেই বললেন।

—ডাক্তারকে কি—

—বললেন, তেমন কিছু নয়, দরকার হবেনা।

খাবার টেবিলে সেদিন কথা যা তা ওইটুকু। আমার সঙ্গে মৃণালিনীর সোজা-সুজি বাক্যালাপ হয়নি। তবু মুখে গ্রাস [illegible] আড়চোখে চেয়ে দেখেছি, তিনিও আমাকে লক্ষ্য করছেন। স্থির-পল্লব দৃষ্টি, মনে হয়েছে বড় বেশি শীতল, বড় অপলক। ঘোমটা নেই, সিঁথিতে রঙ নেই, শাড়িটাতেও যৎসামান্য; সরু একগাছি করে চুড়ি বাদ দিলে ফর্সা রোগা হাত দু'টিও খালি। মৃণালিনীর বয়স কত অনুমান করতে পারিনি। দেহতটে কবে একদিন যৌবন আছড়ে পড়েছিল তার দু' একটি ঢেউ সুশালীন বেশবাসের ভাঁজে ভাঁজে আজও ধরা পড়ে আছে, যাবষাব করেও একেবারে মিলিয়ে যায়নি; আধখোলা একটি কঠিন ঝিনুক ওষ্ঠপুটে বেঁকে আছে।

খাওয়াশেষে মুখ ধুতে ধুতে সুব্রতকে ফিসফিস করে বলেছিলাম, এঁকে তো—

—বারে, পরিচয় করিয়ে দিলাম যে, তখন খেয়াল করে শোননি? ইনি মনসিজ রায়ের ভাগনী। কিন্তু এ পরিচয় শুধু লৌকিক। এখানকার মেয়েদের নিয়ে একটা কল্যাণসংঘ উনিই গড়ে তুলেছেন।

তবু জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর?

—বিয়ে হয়েছে কিনা জানতে চাইছ? হয়নি শুধু এইটুকু জেনে রাখ। প্রশ্ন ক'রনা, কেন। উত্তর দিতে পারবনা।

মনসিজ রায়ের সঙ্গে সেদিন রাত্রে দেখা হয়নি, তবু তাঁকে আমি দেখেছিলাম। দূরে থেকে। সেই ঘটনাটুকু বলে প্রথম দিনের বিবরণ শেষ করি।

সুব্রতর সঙ্গে এক ঘরেই আমার বিছানা হয়েছিল। শিয়রে কাঁচের পাত্রে রাখা ঠাণ্ডা জল, উপরে মৃদু ঘূর্ণিত বিজলী পাখা, এক কোনে টোপর-পরা টেবিল ল্যাম্প। আরামের উপকরণ সবই ছিল। তবু সহজে ঘুম আসেনি। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে টেবিল আলোটাকে কানা করে দিলাম, কালো-পশম অন্ধকারের নরম রোঁয়া শরীর আর চেতনা জড়িয়ে ধরল, তখনও ঘুম এলনা। জানালার বাইরে চেয়ে দেখেছি, নর্তনবিড় মেঘের ঘেরাটোপে ধরা পড়ে ক্ষয়ক্ষীণ চাঁদ ছটফট একটা মৌমাছির মতো কেবলই এদিক ওদিক পথ খুঁজছে। কয়েক ফোঁটা ঝিরঝির বৃষ্টি এরই মধ্যে হয়ে গেল। কনকনে ভিজে হাওয়া ঠেকাতে গলা অবধি একটা চাদরে ঢেকে নিলুম।

আর ঠিক তখনই হাড়কাঁপানো গলায় একটা কুকুরের তীব্র চিৎকার কানে এল।

পাশের বিছানা থেকে মুখ বাড়িয়ে সুব্রতকে বলতে শুনলাম, উনি ছাদে এসেছেন। কুকুরটা ওঁকে দেখতে না পেরে কাঁদছে।

—পোষা কুকুর?

—হ্যাঁ, একেবারে বাঘা জাতের। ওঁর নিশরাতের সঙ্গী।

[illegible]

আমরা যেখানে আছি সেটাই সবচেয়ে উঁচু তলা, তবু এর উপরেও একটু আছে। দূর থেকে মনে হয় গম্বুজ, আসলে কিন্তু ওটাও একটা ঘর, ওখানে মনসিজ রায় থাকেন। ঘোরানো, রুদ্ধশ্বাস, ঢাকা সিঁড়ি পেরিয়ে পৌঁছতে হয়। ঘরের সামনে বাঁধানো একটু খোলা জায়গা, ওটাই ছাদ, সেখানে আবছা আলোতে একটি ছায়া-মূর্তিকে বুকের উপর আড়াআড়ি হাত রেখে পায়চারি করতে দেখেছি। বলে দিতে হয়নি। দেখেই চিনেছি ইনিই মনসিজ রায়। গড়পাহাড়ে ঢুকতেই অতিকায় দৈত্যবৎ একটি ব্রোঞ্জমূর্তি চোখে পড়েছিল। দৈর্ঘ্যে সেটা আশেপাশের সব কিছু ছাড়িয়ে গেছে। তার পর এই প্রাসাদের ঘরে ঘরে, অলিন্দে, এঁর নানা আকারের প্রতিকৃতি দেখেছি। আর কেউ নয়, আর কারুর নয়, সব মনসিজ রায়ের। বিপুল ব্যক্তিত্বের পক্ষপুট মেলে গরুড়ের মতো গড়পাহাড়কে ঢেকে আছেন।

এত ছবি, শুধু একটা মানুষের। আশ্চর্য নয়, সুব্রত সেই কবে থেকে একই ছবি আঁকছে, আজও শেষ হলনা। একই মুখ, নানা বেশে, নানা পরিবেশে। সেই ভ্রূভঙ্গি, কঠিন মুখপেশী : দৃপ্ত, অটল, প্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল।

সুব্রত পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, শুনেছিলাম ওঁর অসুখ—

—বোধ হয়, ঘুম হয়নি তাই উঠে এসেছেন। এমন সময় রোজ এমনিও একবার ওঠেন। একা ওই মিনারের পাশে দাঁড়ান। এখান থেকে যতটুকু দেখা যায় সব ওঁর স্বপ্ন আর স্বেদে তৈরি। চুপে চুপে দেখেন।

ছায়ামূর্তি তখনও ছাতের আলিসায় কনুইয়ে চিবুক রেখে দাঁড়িয়ে। ঠিক তখনই মূক অভিনয়ের দৃশ্যটুকু প্রত্যক্ষ করলুম। একটা নেকড়ের মতো কুকুর কোথা থেকে এসে ছাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার ছাইরঙ রোম অন্ধকারের ছায়াছায়া আঁশের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে, কিন্তু মসৃণ, নীরন্ধ্র নীরবতার পটে তার তপ্ত হাপরের মতো লকলকে শ্বাস আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। দুটি থাবা তুলে সে ছায়ামূর্তির জানু জড়িয়ে ধরল, একবার মনে হল বুঝি কটি ছাড়িয়ে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে কণ্ঠাশ্লিষ্টও হবে কিন্তু তার আগেই মনসিজ তাকে ধমক দিয়ে নামিয়ে দিয়েছেন।

—ভিতরে যাও এখুনি, যা-ও?

সঙ্গে সঙ্গে সেই নেকড়ে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। পাথরের মেঝের মুখে আঁচড় কেটে হয়ত প্রতিবাদ জানাল, পর মুহূর্তেই তাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলুম।

সুব্রতও দেখছিল। আমার দিকে চেয়ে

ধীরেধীরে বলল, ওই একটি জীব, ও'কে প্রাণ দিয়েও আগলে আছে, কতবার বাঁচিয়েছে হিসাব নেই। একবার তো একজন ও'র শোবার ঘরে ছোরা হাতে—

—ছোরা হাতে? সবিস্ময়ে বলেছিলাম, ও'রও তবে শত্রু—

—আছে বইকি। এত বড় মানুষ, এত করেছেন এখানকার সবারের জন্যে, ও'র শত্রু থাকবেনা? কতবার তো ও'র খাবারে বিষ মেশানোর চেষ্টা ধরা পড়ে গেছে।

বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু কুকুরটার কথা কী বলছিলে?

—ও হাঁ, টাইগার। ওকেও খুব ভালবাসেন মনসিজ। বোধহয় আর কেউ নেই যে ও'র এত কাছে নিঃসঙ্কোচে যায়, যেতে পারে, কোলে উঠতে পারে। ও'র বাঁ গালে একটা দাগ আছে, দেখো। সেটা বাঘারই নখের আঁচড়। এই একটি জীবের সঙ্গে ও'র সত্যিকার সখ্য। যাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন।

—কেন, ও'র ভগিনী?

—ভগিনী? ও, মৃণালিনীর কথা বলছ। আপন ভগিনীতো নয়। না, ও'র এত কাছে যাবার অধিকার মৃণালিনীরও নেই।

শুধু দূরে থেকে নয়, মনসিজ রায়কে কাছে থেকেও দেখেছি। সুব্রত পরদিন সকালে আমার নাম করে চিরকুট পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঠিক ন'টার সময় উর্দিপরা বেহারা সেলাম করে দাঁড়াল। মনসিজ স্মরণ করেছেন।

সেই ঘোরানো সিঁড়ি আর ফুরোয়না। ধাপ গুনে গুনে উঠতে শুরু করেছিলাম, কপালে এক ফোঁটা দু' ফোঁটা করে ঘাম জমল, মুছে একবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি থেই হারিয়ে গেছে। উপর দিকে চাইলাম তখনও অনেক ধাপ বাকী।

মানুষের কল্যাণ চান মনসিজ, কিন্তু মানুষকে তাঁর ভরসা নেই। তাই অনেক দূরে, অনেক উপরে, একেবারে যেন আকাশে নীড় বেঁধেছেন।

—আসুন, ইস্কাবনের রাজাকে দেখতে এসেছেন?

চমকে চেয়ে দেখি কখন পৌঁছে গেছি, মাঝখানে পিছল মসৃণ মেঝে, মাত্র কয়েক ফুট দূরে মনসিজ রায়। নমস্কার করতেও ভুলে গেছি। আমাকে দেখেই টাইগার অকারণ ঘেউ ঘেউ করে থাবা তুলে দাঁড়াল, চেনে বাধা, সুতরাং এগোতে পারলনা, কড়াগলা ধমক খেয়ে মাটিতেই লুটিয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তেই দেয়ালে দেয়ালে গমগমে একটি কণ্ঠস্বর প্রতিহত হল: ইস্কাবনের রাজাকে দেখার লোভ সামলাতে পারলেননা বুঝি?

হাতে কাগজকাটা একটা প্লাস্টিকের ছুরি, সেইটে নিয়ে মনসিজ আলতো হাতে খেলছেন, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। কী করে আপনার দেওয়া নামটা আমার কানে এল ভেবে অবাক হয়েছেন? আমি সব যে জানতে পাই। যাই বলুন, নামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে মনসিজ করমর্দন করলেন, মুখে তখনও সেই চতুর, একটু-বা দুর্বোধ্য হাসি, বুকের ছাতি তো নয় যেন কবাট, ঝাঁকুনি খেয়ে টের পেলাম কী অসীম শক্তি পাঁচ আঙুলের মুঠিতে, আবার এও টের পেলাম সেই আঙুলের ডগা যেন থরথর করে কাঁপছেও। বেশিক্ষণ চোখে চোখে চাইতে পারিনি, তীব্র, মর্মদর্শী দৃষ্টি, তবুও এক নিমেষেই বুঝেছিলাম সে চোখেরও পলক পড়ে।

—আপনি সুব্রতর বন্ধু, দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। কাগজকাটা ছুরিটা দিয়ে টেবিলে টোকা দিতে দিতে মনসিজ বললেন, আপনার কথা আমি শুনেছি। আরও শুনেছি,—সহসা মুখ তুলে আমার চোখে চোখ রেখে মনসিজ বলে গেলেন,—আপনি ঐতিহাসিক। তথ্যসংগ্রহের জন্যে বেরিয়েছেন। আপনার তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতিটা কী।

উত্তরের আশায় আমার চোখে চোখ রেখেই মনসিজ চুপ করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব আমার মুখে জোগাল না। খানিক পরে আমতা আমতা করে বলতে চেষ্টা করলুম, পদ্ধতি, পদ্ধতি আবার কী। পড়া। দেখা। সত্যই তথ্য।

—সত্যই তথ্য? আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে মনসিজ তীব্র গলায় হেসে উঠেছিলেন মনে আছে।—এ-সব গালভরা কথা বলে সরলমতি ছাত্রদের ভোলাবেন।—সত্যের উপরেও আরেকটা কথা আছে, হিত। দৃষ্টবস্তুকেই আপনি সত্যজ্ঞান করেন, ধরে নিয়েছি। এ-নিয়ে তর্ক করব না। কিন্তু তা হলেও উদ্দেশ্য উপায় ইত্যাদি বহু গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা বাকী থেকে যায়। যা হয়, যা হয়েছে, তা আমরা সবাই জানি, মানুষের বাঁচামরার সমস্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি ক্ষীণ, শুধু সেই তথ্য দিয়ে পুঁথির পাতা বোঝাই করে কোন লাভ নেই। কী হওয়া উচিত, আমার কাছে এই কথাটা অনেক বেশি মূল্যবান। আমার সারাজীবন এই নিয়েই মাথা ঘামিয়েছি এবং আমার ধারনা, ঘটনার বিবরণী রচনার চেয়ে মানুষের অনেক বেশি কাজে লেগেছি।

সত্যি বলতে কি, মনসিজ কী বোঝাতে চান আমি ভালো বুঝতে পারছিলুম না। কাগজকাটা প্লাস্টিক ছুরিটা শক্ত মুঠোয় ধরা, চোখ দুটি কী এক আবেগে জ্বলছে, একবার মনে হয়েছিল মনসিজ প্রলাপ বকছেন। নইলে তাঁর কথার বিনীত জবাব দেওয়া আমার অসাধ্য ছিল না। বলতে পারতুম, ভাবী হিতের সঙ্গে অতীতের কথারও অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে। গতের বিফলতা আর সাফল্যের নুড়ি ঠুকে ঠুকেই মানুষ আগামীকালের পথের দিকে এগোয়।

সেই কঠিন চাউনি অবশ্য মনসিজের মুখ থেকে আপনা থেকেই মুছে গিয়েছিল, ফুটেছিল মৃদু মৃদু হাসি। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, আপনারা জ্ঞানী, শুধু জানতে চান। আমি বৃথা কিছু জানি না, জানতে চাই না, আমি শুধু করি। কাজ করি। আমাদের তফাতটা কোথায় বুঝতে পেরেছেন।

কেবল কথা নয়, মনসিজ দেখিয়েও দিয়েছিলেন। ডেকে নিয়েছিলেন জানালার ধারে।

—আমার কাজের প্রমাণ চান? দেখুন। গরাদের বাইরে বলিষ্ঠ হাতের কব্জি অবধি বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন।

দেখেছিলাম। সবুজে সোনায় ছলছল খেত, যতদূর চোখ যায় ততদূর প্রসারিত ত্রিপূর্ণি নদী এখান থেকে ফিকে নীল ফিতের মতো।

—ওই নদীকে আমি বেঁধেছি। পরিপূর্ণ গলায় মনসিজকে বলতে শুনলুম।

আগে প্রতি বর্ষায় ত্রিপূর্ণি কূল ছাপিয়ে যেত। তার বানের টানে কত মোষ, গরু, মানুষ, হাঁ মানুষও, ভেসে গেছে হিসাব নেই, জলধারার কুলকুল ধ্বনি ছাপিয়ে গৃহহারার কান্না টিলায় টিলায় প্রতিধ্বনিত হত। সেই অশ্রুনোনা নদী আজ চাষীর মুখে হাসি ফুটিয়েছে ছোট ছোট নালা বয়ে, এসেছে খেতের আল অবধি।

প্রথম যখন গড়পাহাড় আমার হাতে আসে তখন কী ছিল জানেন। পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় উঁচু নীচু রুক্ষ পতিত জমি। পাথর, কাঁকর আর বালি। এক ছটাক দু ছটাক জায়গা নিয়ে যারা চাষ করেছে তাদের জমিতে কোন স্বত্ব নেই। লাঙলের ফলায় ধার নেই। রুগ্ন পশুদের কাঁধের কাছে কী দগদগে ঘা, আপনি দেখেননি। সেই ছোট ছোট জমির আল আমি ভেঙে দিয়ে সমান করেছি, এসেছে ট্রাক্টর।

বাধা আসেনি? এসেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থের বেড়াগুলিকে নির্মম হাতে গুঁড়িয়ে দিতে হয়েছে। মনসিজ হার মানেন নি। উপায়ের চেয়ে লক্ষ্যকে তিনি বরাবরই বড় বলে জানেন। জ্ঞাতিদের সরিয়ে দিতে হয়েছে। তারা একদল চাষীকে নিয়ে ঘোঁট পাকিয়ে তুলতে চাইছিল। সেখানেই শেষ নয়। তারপর একদিন দুর্যোগের রাতে ত্রিপূর্ণির জলে বিরোধী দলের কুড়িজন চাষীকে—

—ডুবিয়ে মেরেছিলেন? অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিলাম মনে আছে।

নীরেখ মুখে শস্যহিল্লোলিত খেতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি তর্জনী ঘুরিয়ে মনসিজ বলেছিলেন, উপায় কী। কুড়িটি প্রাণের বিনিময়ে দু হাজার প্রাণ কী আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে দেখুন। সেই

দুর্যোগের কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির দুর্ঘটনার কথা আজ কেউ মনেও রাখেনি।

বুক ভরে মনসিজ নিশ্বাস নিলেন, পরম প্রশান্তি দু চোখ ছাপিয়ে ললাটে কপোলে ছড়িয়ে গেল, চিবুকের কঠিন ভঙ্গিটিকেও যেন নরম করে আনল।—এই সব নয়। আজ থেকে দশ বছর আগে এখানে এলে কী দেখতেন জানেন? পুরনো আমলের দুর্গের মতো দেখতে একটা বাড়ি, তার আনাচে কানাচে আগাছা ছেয়ে গেছে, দেয়াল চিড় খেয়েছে অশথশিকড়ের গুপ্তচৌর্যে। এর চেহারা আমূল বদলে দিয়েছি আমি। জ্ঞাতিরা এখানেও বাধা দিতে চেয়েছে। প্রথমে ঐতিহ্য, পরে বাজে খরচের ধুয়ো তুলেছে। কান দিইনি। সব ভেঙে নতুন করে গড়েছি। নড়বড়ে খিলান আর স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের নীচে অন্ধকার টিকটিকি চামচিকে ইঁদুর আরশোলা আর সাপের সঙ্গে অনেক মিথ্যা মোহ আর সংস্কার চিরকালের মত চাপা পড়ে গেছে। জ্ঞাতিরা সরে গেছে ক্ষতি-পূরণ নিয়ে, দাবিদাওয়া ছেড়ে দিয়ে। নীচের তলায় ধসধস আওয়াজ শুনছেন, প্রকাণ্ড একটা হৃৎপিণ্ড চলার শব্দের মতন? ওটা নতুন গড়পাহাড়ের প্রাণ। ওখানে বিজলী ডায়নামো বসিয়েছি আমি। পুরনোর কবরে নতুন কালকে ডেকে এনেছি। আজ আমার কারখানায় তাঁত চলে, চাল ছাঁটাই হয়—একটা জীবনের পক্ষে যতটুকু সম্ভব সবই করেছি। দৃঢ়তা দিয়ে, কঠোর হয়ে, ইচ্ছা, শুধু প্রবল একটি ইচ্ছা দিয়ে অসাধ্যসাধন করেছি।

শ্রান্ত মনসিজ মুহূর্তের জন্যে চুপ করে-ছিলেন। কয়েকটা চড়ুই কোথা থেকে উড়ে এসে তাঁর ভুক্তাবশেষ রুটির টুকরো খুঁটে খুঁটে খেতে শুরু করেছিল। চেনবাঁধা বাঘা কুকুরটা গর্জন করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, ধমক দিয়ে মনসিজ তাকে নিরস্ত করলেন।

—তবু অনেক বাকী থেকে গেছে। ইসারা করে মনসিজ আমাকে ডেকে আনলেন সামনের খোলা ছাতটিতে, প্রাঙ্গণের একটা ইঁটের পাঁচিলঘেরা জমি দেখিয়ে বললেন, ওই দেখুন আমার মঠ।

—আপনার মঠ?

—আমার। মনসিজের গাঢ় কণ্ঠ আপনা থেকেই নীচে নেমে এল,—আমার অবর্তমানে কী হবে সে কথাও কিছু ভেবেছি বই কি। এ-মঠ শুধু লোকদেখানো একটা মিনার হবে না। এখানে বিজ্ঞানচর্চার ল্যাবরেটরি হবে। আমার একটা অপূর্ণ সাধ মৃত্যুর পরে পূর্ণ হবে।

আমার চোখে অবিশ্বাসের ছায়া মনসিজ দেখতে পেয়েছিলেন কিনা জানি না, হয়ত মনের কথা পড়ে নিয়ে বললেন, আপনি ভাবছেন আমার মৃত্যুর পর এ-সব কিছুই থাকবে না? থাকবে, নির্মলবাবু, আমি বলছি থাকবে। আপনি কি ভাবেন আমি এত বছর ধরে শুধু ইঁটের ওপর ইঁট আর পাথরের ওপর পাথরই সাজিয়ে গেছি। তা নয়, আমি মনের মতো করে কয়েকটা মানুষও তৈরি করে গেছি যে। আমার স্বপ্ন, আমার কামনা সঞ্চারিত করে দিয়ে গেছি তাদের মনে।

—সেই মন যদি—

সম্পূর্ণ হতে দেননি, আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মনসিজ বলেছেন, সেই মন যদি বিকল হয় বলছেন? যদি অন্য পথে চলে? তা চলবে না। আমার পথেই চলবে, ভয়ে।

—ভয়ে?

গভীর প্রত্যয়ে মনসিজ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, ভয়ে। কল্পিত ঈশ্বরকে মানুষ ভয় পায় না? পাপ-পুণ্যের ভয়ে এতবড় সমাজটার বাঁধুনি ঠিক থাকে দেখেন না? অদৃশ্য, অনির্দেশ্য ভয়ের শক্তি বড় বিচিত্র। আমার প্রতিকৃতি ছড়িয়ে দিয়েছি গড়-পাহাড়ের ঘরে ঘরে। আপনার বন্ধু যা এঁকে-ছেন, আঁকছেন। সেই ছবিকে ওরা ভয় করে, পূজো করে। ওই ছবি আমার ইচ্ছার প্রতীক। আমার মৃত্যুর পর সেই ইচ্ছাই নিয়তির মতো অমোঘ হয়ে অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওদের ঠিক পথে চালাবে।

যুক্তি নয়, এটা বিশ্বাসের কথা, অতএব প্রতিবাদ করিনি। নমস্কার করে চলে এসেছি। চেনবাঁধাগলা টাইগারকে নিয়ে মনসিজ আমাকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে-ছিলেন। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে নামতে সেদিন প্রভুভক্ত সন্দিগ্ধ কুকুরের অনু-সারী ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনেছি।

সেদিনই বিকালে গড়পাহাড় ছেড়ে আসি, মনসিজের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। প্রাচীরের সীমা ছাড়িয়ে এসেও অনেক দূর থেকে অতিকায় একটি রোঞ্জমূর্তি চোখে পড়েছে। বারবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছি। অতিমানব মনসিজের কঠোর ইচ্ছার প্রতীক।

আর দেখেছি মৃণালিনীকে। চলে আসার সময়ে তিনি বাইরে বারান্দায় রেলিঙে কনুই রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। কৃশ, দীর্ঘাঙ্গী। মরা দিনের আলোয় কি তাঁর পীতাভ মুখে ঈষৎ রক্তচ্ছটা দেখেছি। কী জানি।

ত্রিপূর্ণির ঘাট অবধি সুব্রত আমাকে তুলে দিতে এসেছিল। বিদায়ের কিছু আগে বলেছিল, তুমিও চলে এস, সুব্রত। এই নদীর জল কানায় কানায় ভরে উঠেছে। ঢেউয়ে ছোট ছোট ছায়া ফেলে কত পাখি ঘরে ফিরছে। একটু পরেই আধখানা চাঁদ বিগলিত অভ্রকণার মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে পড়বে। কতদিন তুমি এ-সব ছবি আঁকনি বলতো। একটি দর্পী প্রৌঢ়ের রেখা-কর্কশ মুখ সম্বল করে কত দিন একটি শিল্পীর কাটে।

সুব্রত উত্তর দেয়নি। প্রদোষের আলোয় ওর নিষ্প্রভ মুখের দিকে চেয়ে আরেকটা কথা চকিতে মনে এসেছে। বলেছি, তবে কি ভুল করেছি, প্রৌঢ় মুখটি নয়, তুমি কি মৃণালিনীর মায়া কাটিয়ে আসতে পারছ না।

হঠাৎ সুব্রত আমার দু হাত টেনে নিয়ে জোরে চাপ দিয়েছে।—তুমি জান না। মৃণালিনী কারুর নয়। কারুর জন্যে নয়। ঠিক ওর মামার ছাঁচে তৈরি। ওর গলা আর গালের হাড় কী উঁচু দেখনি? আকৃতি বা প্রকৃতিতে দুর্বলতা নামক ধাতুটির ছিটে-ফোঁটাও কখনও লাগেনি।

—কাউকে কোন দিন ভালবাসেনি?

—আমরা তো জানি না। একবার ঘটা করে খাঁচা এনে একটা টিয়ে পুষেছিল। দিনরাত তাকে নিয়ে থাকত, ছোলাছাতু খাওয়াত, বুলি শুনত। একদিন সকালে দেখা গেল, খাঁচার দরজা খোলা, ভিতরে জলের বাটি ওলটানো, টিয়েটা ঘাড় গুঁজে মরে পড়ে আছে।

—মরে পড়ে আছে? অস্ফুট গলায় চেঁচিয়ে উঠেছি। সুব্রত, পাখিটাকে মনসিজ নিজে মারেননি তো?

—জানি না। সুব্রত অন্য দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

কঠিন গলায় বললাম, সুব্রত, নিজের সঙ্গে প্রতারণা কর না। মৃণালিনীকে কোন দিন তোমার মনের কথা বলনি?

অতি ধীরে, অপরাধ স্বীকার করার মতো গলায় সুব্রত বলেছে, বলেছিলাম। রাগ করেনি, ওর মুখ ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গেছে। টিয়াটার মৃত্যুর দু মাস পরের ঘটনা। গড়পাহাড় গড়ে তোলার কত কাজ, মৃদু গলায় বলেছে। পরে আমিও ভেবে দেখেছি, হয়ত ওর কথাই ঠিক। শিশির, সব মেয়ে হয়ত প্রসাধন, প্রসব আর শয্যার জন্যে নয়।

পরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম সদ্যোজাত চাঁদের পিণ্ডটাকে কালো একখণ্ড মেঘ ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে। বিদ্রূপের সুরে বলেছি, এ-সবই মনসিজ রায়ের শেখানো বুলি, সুব্রত।

সুব্রত উত্তর দেয়নি। ততক্ষণ খেয়া ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে।

[দুই]

গড়পাহাড়ে আরও একবার গিয়েছিলাম। মনসিজ রায়ের মৃত্যুর পর।

মৃণালিনী তার করেছিল, সুব্রতর খুব অসুখ। আপনি আসুন।

মাঘের শেষ। ত্রিপূর্ণির ঘাটে খেয়ার দরকার নেই, পাথরের নুড়িতে পা রেখে রেখে অনায়াসে পার হওয়া গেল। সঙ্গে একটা ছোট এটাচিমাত্র। ওপারে গিয়ে দেখি চিকচিক রোদ, নরম, নরমনরম। গড়পাহাড়ের আকাশও তবে হাসে। প্রাসাদের শ্বেতস্বচ্ছ চূড়াটি যেন সোনার টোপর। গাছগুলো শুধু পত্রশ্রীহীন।

দেউড়ি পেরোতেই বিশাল ভীমকায় ব্রোঞ্জ-

দ্বীর্ঘ সেদিনের মতোই স্পর্ধিত। পদপ্রান্তে দেখলাম টাইগার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে। শীতে ধুঁকছে। চেন বাঁধা নেই তবু তাড়া করে এলনা। আমার পায়ের সাড়ায় মাথা তুলল, বাতাসে কী যেন শুঁকল, ফের ঘাড় কাত করে ঘুমিয়ে পড়ল। পাশ কাটিয়ে সদর দরজায় এসে দাঁড়ালাম।

দরজা খুলে যেতেই দেখলুম মৃণালিনী। পায়ে বোবা চটি, গায়ে পশমের চাদর। শাঁখার মতো শাদা হাতের পাতা দু'টি শুধু বাইরে। হাসলেন। তাঁর শাদা দাঁতের পাঁতি পূর্বে দেখিনি, এবার দেখলুম। বললেন, আসুন।

তেমনি তকতকে মেঝে, কোথাও দাগটুকু লেগে নেই। হলঘরের সব কটি জানালাই খোলা। সকালের রোদ কাচের সার্সিতে ঠিকরে রামধনু রঙ নিয়েছে। সেই সঙ্গে কনকনে ভিজে হাওয়াও চোখেমুখে লাগছিল, লাগুক। সেই ভয়-ভয় চাপা গুমোট তো নেই।

না, মনসিজের আশা মিথ্যে হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরও গড়পাহাড় ধ্বসে পড়েনি। সেই কেতার ছাপ সর্বত্র। সবই নিয়মে চলেছে।

দেয়ালগুলো ফাঁকা ফাঁকা। কেমন যেন নিরাভরণ, নিরাবরণ, বড় বেশি শাদা। ওখানে কি সেবারে আর কিছু ছিল?

সুব্রতর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে মৃণালিনী চলে গিয়েছিলেন। জানালা খোলা নেই, এ ঘরটা এখনও কেমন নিবু-নিবু, অন্ধকার।

কবাট খোলার শব্দে সুব্রত মাথা তুলল। হেসে বলল, এস। এখানে ব'স। শিয়রের কাছে রাখা একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল।

বললাম, গড়পাহাড়ে আবার যে কখনও আসব, ভাবিনি। কিন্তু তোমার এ কী চেহারা হয়েছে সুব্রত। এই তো সেদিন দেখে গেলাম, বোধ হয় তিন বছরও হয়নি। সুস্থ, সবল দেখেছিলাম এরই মধ্যে এত বুড়ো হয়ে পড়েছ?

বিরল, পাকধরা, কিন্তু দীর্ঘ চুলের ভিতর দিয়ে অলস আঙুল চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে সুব্রত বলল বুড়ো? তা একটু হয়েছি বোধ হয়। বাইরে থেকে সব তো বোঝা যায় না, আমার ভিতরটা আরও বুড়িয়ে গেছে।

রোগে? ওর একখানা হাত টেনে নিলাম। রোগে যদি হয় সুব্রত, তোমাকে আমি এখান থেকে নিয়ে যাব, সারিয়ে তুলব। দেখবে আবার—

—দেখব মরা গাঙে বানের মত আবার আমার ভাঙা গাল ভরে উঠেছে, চোখের কোলের কালি ধুয়ে গেছে, না? কিন্তু আমার ভিতরের যৌবনও কি আবার ফিরে পাব। তা হয় না, বালিশে রেখেই ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সুব্রত। তা হয় না। যা খুইয়েছি তা আর ফিরে পাব না।

সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতর আঁকা ছবির কথা মনে পড়ল, মনসিজ রায়ের নানা ভঙ্গির প্রতিকৃতি। এবার কোন দেয়ালে তার একটিও দেখিনি। সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বিছানা থেকে মাথা একটুখানি তুলে সে বলেছিল, ছবি? আছে বৈকি। উপরে।

—উপরে?

—হাঁ, যে ঘরে মনসিজ থাকতেন সেটা এখন মিউজিয়ম হয়েছে জাননা? মনসিজ মিউজিয়ম।

—মিউজিয়ম? সেখানে কে যায়?

—যায় কেউ কেউ, যার ইচ্ছে হয়। চোখ বুঁজে বালিশে মাথা রেখে সুব্রত অবহেলার সুরে বলল, আমি তো যাই না।

'আমি তো যাই না', সুব্রত আবার বলল, ধীরে ধীরে, প্রতিটি অক্ষর জিভ দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। আমি যাই না। আমার সব মোহ ঘুচে গেছে। কিন্তু শিশির বড় দেরীতে। জীবনের, যৌবনের অনেকগুলো বছর এখানে অপচয় করার পরে।

বলতে বলতে সুব্রত কেমন উত্তেজিত হল, হঠাৎ উঠে বসল, মাথার বালিশ দুটো টেনে আনল কোলে। বিহ্বল রক্তিম দু'টি চোখ আমার দিকে রেখে বলল, তুমি জাননা, লোকটা খাঁটি ছিল না। জুয়াচোর, আমাদের সবাইকে ঠকিয়েছে।

বুঝতে পেরেও মূঢ়ের মতো প্রশ্ন করলুম, কে জুয়াচোর সুব্রত, কার কথা বলছ। মনসিজ?

—মনসিজ রায়। শ্রান্ত হয়ে সুব্রত আবার শুয়ে পড়েছে, পাতা দু'টি করতলে ঢেকে উচ্চারণ করল, মনসিজ রায়। ওর মৃত্যুর পর ওর চিঠি বেরিয়ে পড়েছে, ওর স্বরূপ জানতে আজ কারও বাকী নেই। লোকটা একেবারে মুখোস পরে ছিল। তুমি শুনে কি অবাক হবে, যাকে পরম আদর্শবাদী বলে, ত্যাগী বলে, নিপুণ সংগঠক বলে আমরা পুজো করতেও বাকী রাখিনি, সে বিকৃতমনা, পরস্বাপহারী বই কিছুই নয়? জ্ঞাতিদের ঠকিয়েছে, তাড়িয়েছে, এমন কি গুপ্ত-হত্যাতেও পেছপা হয়নি; যা কিছু করেছে, শুধু নিজের পুঁজি বাড়াবে বলে? চাষীদের জমির স্বত্ব দিলুম বলে ঝড় জল রোদে পশুর মতো খাটিয়েছে, অথচ আজ জানা গেছে সে সব দলিলের দাম আইনের চোখে কানাকড়িও নয়, আসল মালিকী স্বত্ব আছে ওর নিজের জিম্মায়?

—আগে কেউ টের পায়নি? কেউ জানত না?

—জানত দু'একজন, যারা পুরনো আমলের। কাউকে ঘুষে বশ করেছিল, অনেকেই তখন মুখ খুলতে পারেনি ভয়ে। আজ ওর কীর্তি জানতে কারুর বাকী নেই। মৃণালিনীও জানে। চোখ দু'টি আবার খুলেছে সুব্রত, মণি থেকে শুকনো আবীরের মতো রোষ ঝরছে, বলেছে, মৃণালিনীও জানে। এতটা যদি শুনলে, তবে শেষ ভয়ংকর কথাটাও শুনে রাখ মৃণালিনীকে লোকটা চিরকুমারী করে রেখেছিল নিজের জন্যে। ওর রক্তিতার প্রয়োজন মেটাতে।

হাতুড়ির ঘায়ে রক্তস্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিছানায় ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—কিন্তু মৃণালিনী তো শুনেছি ওর—

—হাঁ, আত্মীয়া। স্নেহের সম্পর্ক। কিন্তু যে শয়তান, তার কাছে আবার সম্পর্ক। পাখিটা মরে যেতেই মৃণালিনী কিছু বুঝেছিল। আতংকে মুখ ফুটে কিছু বলেনি। আমার সঙ্গে মৃণালিনী দাঁড়িয়ে যদি দুটো কথা বলেছে, অমনি লোকটার মুখে ক্রুর হাসি ফুটে উঠতে দেখেছি।

বালিশে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুব্রত, বোধ হয় দম নিল। অনেক পরে ওকে ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে শুনলুম, এখন শুনছি জ্ঞাতিরা ক্ষতিপূরণ পাবে। কিন্তু আমি? এক দিন ছবি আঁকতুম। নাম হয়েছিল। আজ চোখ থেকে রঙ গেছে, তুলিতে ধুলো পড়েছে, শিশির, বলতে পার, আমার ক্ষতি এ জীবনে পূরণ হবে কী দিয়ে। মিউজিয়মে-রাখা ছবিগুলো শুনছি ওরা পুড়িয়েও দেবে, হয়ত দেওয়াই উচিত, কিন্তু তাতে নতুন ছবি তো তৈরি হবেনা।

পর দিন সকালেই গড়পাহাড় ছেড়ে এসেছি। তখনও সূর্য ওঠেনি, কিম্বা উঠলেও কুয়াসায় ঢাকা ছিল। চুপে চুপে নেমে এসেছি সিঁড়ি বেয়ে। ধোঁয়াটে আলোয় কিছু ভালো করে চোখে পড়ে না, এখানে ওখানে জুতো ঠেকে ঠোক্কর খেতে হল। তবু সদর দরজায় পৌঁছনোর পথ টের পেয়েছি ঠিক। এই তো সেই মনসিজ রায়ের পিত্তলমূর্তি। আর এ-পাশে, হাত বাড়িয়ে ছুঁতে গিয়েও পারলাম না, শ্যাওলাধরা ইঁট-গুলো যেন পিছলে গেল। এ-পাশে মনসিজ রায়ের অসমাপ্ত সেই মঠের ভিত, যেখানে বিজ্ঞান চর্চার ল্যাবরেটরি গড়ে উঠবে, তিনি এক দিন বলেছিলেন। এখন শুধু ইঁট আর আগাছার স্তূপে মনসিজের কীর্তিরই মত।

এ-মঠ কোনদিন তৈরি হবেনা। সবাই যাকে আজ নির্বিবেক বলে জানে সেই মৃত মানুষটিকে স্মরণ করে কী জানি কেন, বিচিত্র একটু করুণা অনুভব করলাম।

দেউড়ি অবধি গিয়েছি, পিছন থেকে একটানা একঘেয়ে গোঙানির মতো একটা আওয়াজ কানে এল। বাঁধা কুকুর টাইগার ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। আবছায়াতে কোথায় লুকিয়ে ছিল আগে দেখতে পাইনি। কুয়াসার স্তর থেকে স্তরে তার আর্তস্বর তরংগায়িত হয়ে উঠছে। মনসিজ রায়ের জন্যে কাঁদছে তার একমাত্র বন্ধু!

ভয় দিয়ে যাদের জয় করেছিলেন, তারা সবাই সরে গেছে। বাঁধা পড়ে আছে একমাত্র সেই, যাকে মনসিজ ভালবাসা দিয়েছিলেন।

রাজা

শওকত ওসমান

চৌদ্দগ্রাম ছাড়িয়ে জেলা-বোর্ডের দক্ষিণমুখী সড়ক আবার পূব-দিকে বাঁক নিয়েছে।

এইখানে আমাদের কাহিনী শুরু করা যাক্।

চারিদিকে তাকালে কোন জমকালো জনপদ তোমার চোখে পড়বে না। আচোট রুক্ষ জমির সমতলে ডট-চিহ্নের মত কৃষকের ইতঃক্ষিপ্ত কুটির, উঠান আর দু-একটা গাছপালা শুধু ছড়ানো। চতুর্দিকে প্রকৃতির হৃদয়হীনতার মধ্যে ঐটুকু শ্যামল-মমতা। পূব-আকাশের গা-ঘেঁষা পার্বত্য ত্রিপুরার পাহাড় আধ ক্রোশটাক দূরে। এমন দিনেও সেখানে রঙের কোন দাম চড়া নয়। কিন্তু তুমি চোখ মেলে দেখতে পারবে না। প্রচণ্ড খরার ঝলকে সূর্যমুখী ফুলের চোখ পর্যন্ত এখানে বুজে আসতে বাধ্য। সরু সরু আলের রেখা, ঢেউ-তোলা উঁচুনীচু ঢিবি-সংকুল জমি, তালগাছ—তারপর পাতলা পাহাড়ী বনের চত্বর তরু-জনতার সঙ্গে ধাপে ধাপে উঠে গেছে আকাশের দিকে ক্রমশ বামনতা-মুক্ত, ক্রমশ ঘন ও পুরু। তার পূব-দিকে একটা ছোট মসজিদ, দুটো মুখ-থুবড়ানো আমের গাছ।

মোকামী যে-কেউ তোমাকে তর্জনী-সংকেতে বলবে, ওইখানে পূর্ববঙ্গ শেষ হোয়ে গেছে, তারপর হিন্দুস্তানের সীমানা শুরু।

সড়কের সঙ্গে সরু-সরু আল-পথের যোগাযোগ বহু দিক থেকে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা জুম্মার দিন ঐ পথেই মসজিদে যায়।

আমাদের কাহিনীর সঙ্গে আপাতত ধর্মনিষ্ঠার কোন যোগাযোগ নেই।

পশ্চিম দিকের আল-পথ ছেড়ে ওরা দু-জন সড়কে উঠল। আশপাশে আর কোন প্রাণী দেখা যাচ্ছে না। দু-জনের মধ্যে একজন বৃদ্ধা। ষাটের বেশী বয়স। এক-খানা থামী কাপড়, কুর্তা পরনে। ছেঁড়া ওড়না চাদরের মত বুকে জড়ানো। ওর মাথার চুলে কালো রঙের সন্ধান নেহায়েৎ পণ্ডশ্রম। কালো রঙ একমাত্র মাথার উপর ছাতাখানা।

ছাতা! তারও বিশেষ-বাখান দরকার। চতুর্দিকের শিকগুলো মরা ব্যাঙের ছড়ানো হাত-পার মত। মাঝখানে কাপড় আছে সামান্য কয়েক ফালি, জোড়াতালির পৌনঃ-পুনিকতায় সমৃদ্ধ। বাঁটের মুণ্ডু নেই। তবু ছাতা! শুধু সূর্যের তাপ নিবারক নয়, আব্রু বাঁচায়, পর্দাহীনতার গোনাহ্

(পাপ) ও ফলস্ব দোজখের আগুন থেকেও মুক্তি দেয়। সেইজন্যেই ত করিমা বিবি ওটা সঙ্গে এনেছে। বেগানা মরদের সম্মুখে পড়লে চোখ-মুখ অন্তত আড়াল করে রাখা যায়। যেন, লজ্জা-শীলতার উৎস ঐ দুই জায়গায় সীমাবদ্ধ।

সঙ্গী সাজেদ বুড়ির নাতি। নয়-দশ বয়স। সে পরেছে ঢাকাই তাঁতের লুঙ্গী। গা উলঙ্গ, কুচকুচে, শীর্ণ, দরদর ঘামে ছয়লাব।

একই ছাতার তলায় দু-জন। কোন রকমে মাথা বাঁচে। পথ চলতে একটু এদিক-ওদিক হোলে নাতি ছত্র-ধারিণীর কর্তব্য সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি ছাড়ে। অসহ্য তাপের ঠেলায় দাদী দু-এক মিনিট স্বার্থপর সাজে। হিস্যা- বাঁটোয়ারার রীতি এতক্ষণ এইভাবে চলে আসছে।

সাজেদের বগলে সের দুই ওজনের একটা তেজী মোরগ। রামধনুর সমস্ত রঙ ঐ ডানার প্রতিবেশী। তার উপর সূর্যের আলো। সমস্ত রঙ তাই লুকোচুরি খেলায় মত্ত। মোরগের মাথার মুকুটখানা পর্যন্ত নয়ন-হরণ। অতি ঘন লাল। করাতের দাঁতের মত খাঁজকাটা—উপরে ঘর্মবিন্দুর মণিমুক্তা। মুকুটের এই শোভা দেখলে রাণী এলিজাবেথ কুক্কুট-স্বামীর উমেদার হোত বৈকি! মোরগের পা-দুখানা নিভাজ হলুদ। নখের ধূসরতা তার সঙ্গে সমান টেক্কা দিয়েছে।

সড়কের মাঝখান পীচে ঢাকা। দু-পাশে সাদাটে পথ। সূর্যের খরা এত প্রচণ্ড, তার ঝলকে প্রাণীর চোখও রেহাই পায় না। সাজেদের বগলে চোখ বুঁজে মোরগটা ঝিমিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে চোখের পাপনি খোলে, কিন্তু কয়েক লহমা মাত্র। তবু মনে হয়, মোরগটা নিশ্চিন্ত আরামের পানা-ডোবায় যেন ডুবে আছে। বালকের বগল-দাবানির ভেতর অনেক মায়া, অনেক মমতা।

রওয়ানা হওয়ার আগে দাদীর সঙ্গে নাতির বেশ এক পশলা মন-টানাটানি চলেছিল।

—রাতা কনডে লাইবা, দাদী? নাতি সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল তখন।

—তর ফুফুর ঘরৎ লইয়া যামু। (তোর পিসি বা ফুফুর ঘরে নিয়ে যাবো)

—ন, লইতা দিতাম নঅ। আঁর রাতা এ্যাডে লইবা ক্যান?

অন্যান্য মুরগী-হাঁস প্রতিবেশীদের জিম্মায় রেখে করিমা বিবি মেয়ের বাড়ী যাচ্ছে। হঠাৎ এই মোরগটা নিয়ে যাওয়ার কি সার্থকতা? সে-প্রশ্ন বালকের মনে অত্যাত কিছু নয়।

—অকস্মাৎ রাতা, হের লাইগ্যা এ্যাডে নেওয়ার মন চায় না।

—হব বুঝেছি, দাদী। হ্যাডে জবাই করবা। হের তরে লইয়া যাওনের চাও।

সাজেদ বেশ বেঁকে বসেছিল।

—খালি হাথৎ মেহমান (অতিথি) যাওন বালা (ভালো) না। মানুষে কইব কি?

দাদী বোকার মত জবাব দিয়েছিল।

—হাগোরে দিয়া আইবা? হে করতা দিতাম নঅ। সাজেদ তা করতে দেবে না।

ফলে মানাভিমান। বালক চোখের গোস্বা ও পানি। শেষে সিদ্ধান্ত হয় : সাজেদ মোরগটা সঙ্গে নিয়ে যাক্। পরে আসার সময় আবার ফিরিয়ে আনবে।

বৃদ্ধার মনে অবিশ্যি অন্য অভিসন্ধি ছিল। আপাতত ঐ আপোসই যথেষ্ট।

দু-সের ভারি মোরগ। পথ-হাঁটার ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে ওজন আরো বাড়ে! সাজেদ কিন্তু মোরগ হাত-ছাড়া করে না। ঘামে তাতে তার প্রাণ ধুকপুক করে। তাই দাদীর সামান্য কথায় ভীষণ চটে ওঠে সে।

—আঁরে দ্যাও, রাতা আঁরে দ্যাও। তোঁয়ার খুব তকলিফ হইয়ে।

—নআ। দিতাম নআ।

আরো সস্নেহে সাজেদ মোরগ বুকে চেপে ধরে। দুই-সনী বন্ধুত্ব উভয়ের।

জানোয়ারও আরামে চোখ বোঁজে। দাদী বলপূর্বক কেড়ে নিতে গেলে ডানা ঝেড়ে পায়ের নখ উঁচিয়ে এমন গররাজি-ভাব দেখায় মোরগটা যে, বৃদ্ধার আর সাহস হয় না। নাতির প্রতিবাদ, মোরগের ওজর-আপত্তি। থাক্ ওর কাছে। তবু বৃদ্ধার কষ্ট হয়। মা-বাপ-খাওয়া অনাথ ছেলেটা খামখা এত দুর্ভোগ সইছে!

তাতা মাটি। কাঁচ পায়ে ছ্যাঁকা লাগে। এমন-ই পথ।

—দাদী, আর হাঁটিতা মন লয় না। ওই খেজুর গাছের নীচদি একডু বইস্যো।

সাজেদ অনুরোধ করে। দাদী কিন্তু আরো জোর-কদমের পক্ষপাতী। জলদি কইরা চল বাই। বস্তু দেরী হইয়ে। ফুফুর ঘরৎ পোঁছিনে দুফুর না ফারায়।

তপ্ত মাটির তেজ করিমা বিবির পায়ের তলায় বেশী জুৎ পায় না। নীচের এবড়ো-খেবড়ো মাংস কোন্ কালে ফেটে-ফেটে কড়া শক্ত হয়ে গেছে। জীবন-সংগ্রামের হাজারো রকম যন্ত্রণা কশাঘাত তাড়না মেহনত-দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার ঘর্ম-পিচ্ছিল পথে জখমের মত জমা হোয়েছে, মুষড়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে। তার দাগ মিলিয়ে যায়নি। পায়ের তলা-ই মানুষের জীবনেতিহাসের পাতা। করিমা বিবি তাই দ্রুত হাঁটে, নাতির বার-বার আবেদনে সাড়া দেয় না। খেজুর গাছ কবে পার হোয়ে গেছে তারা।

এক ফালি মেঘে সূর্যের মুখ ঢাকা পড়ল। ছায়ায় রৌদ্রের তাপ কমে। কিন্তু চাঁটি আরো জোরে শুরু হয়, মেঘটুকু সরে-যাওয়া মাত্র।

সাজেদ এবার প্রায় কাঁদ-কাঁদ-স্বরে ডাকে : দাদী, একডু বইস্যোন। আঁই আর ফারতাম নঅ।

ছাতায় নাতির মাথা ঢেকে দাদী তার ঘামে-ভেজা মুখের দিকে তাকায়। করুণার তর্জানি খানিকটা থাকলেও বিরক্তির ঝাঁঝই বেশী। প্রথমে সে জবাব দেয় না।

আবার নাতির কাতর অনুরোধ।

দাদী কিন্তু চটে ওঠে : গা'য় তাকত নাই। বা'ত খাস্ না?

—হ খাই। শরম করে না। পেট ভইরা বা'ৎ দিছ কোনদিন?

কথা অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। আরো ক্ষোভে দাদী তেতে ওঠে প্রথমে, তারপর শুরু হয় খেদোক্তি : হেই কবে পুৎ মরছে। নিজে না খাইয়া তরে দিছি। তুই কস্ বা'ৎ দিই না?

করিমা বিবির এমন উষ্মা অস্বাভাবিক। ক্লান্তি, রৌদ্রের দুঃসহ জ্বালা, দুশ্চিন্তার হানা—সব মিলে বৃদ্ধার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। এই নাতিকে অবলম্বন করেই ত সে বেঁচে আছে, নচেৎ কবে মরে যেতো।

দুজনে হাঁটছে। কিন্তু একদম নিঃশব্দ। মোরগটা ঝিমিয়ে রয়েছে চোখ বুঁজে। সেদিকে সাজেদের খেয়াল আছে পুরো-মাত্রা। কয়েক মণ যেন ভারি হোয়ে উঠেছে মোরগটা। সাজেদ বগলান্তর করে প্রাণী-বন্ধুকে। মোরগটা তখন কঁকিয়ে ওঠে। করিমা বিবির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের চিন্তায় সে বুঁদ।

নাতি হঠাৎ চরম-পত্র বিলি করল : বসবা কি না কও?

সাজেদ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাতা মাটি আর সহ্য হয় না।

দাদী এবার নিরুপায়। মেজাজ নরম।

—দাদা-বা'ই আর একডু। ঐ বটগাছর ছায়াদি বইস্যুম।

সত্যি বিঘে দুই দূরে সড়কের পাশেই একটা ঝাঁকড়া বটগাছ দেখা যাচ্ছিল।

নাতি সেদিকে চোখ ফিরিয়ে আশ্বস্ত। করিমা বিবি আঁচল দিয়ে দুইজনের মধ্যবর্তী এতক্ষণকার অসোয়াস্তিকর ব্যবধান ঘাম-মোছার সময় মুছে নিল নিঃশব্দে।

বটগাছের তলায় রোদ্দুর-না-সেঁধোনো ঠাণ্ডা ঘন ছায়া। সাজেদ দাদীর কাছে মোরগ গচ্ছিত রেখে সটান শুয়ে পড়ল। উত্তপ্ত বাতাসও এখানে ঝাঁঝ হারিয়ে শুকনো পাতার বনে মর্মর তোলে। ক্লান্ত পথিকের স্বর্গ-মর্তের কত কাছাকাছি! অনন্তকাল এইখানে শুতে পারলেই খুশী হোতো সাজেদ।

আষাঢ়-গগনের সড়কে সূর্য দিশাহারা। করিমা বিবির চোখের পাতা সহজে বুজে আসতে চায়। কিন্তু দশ মিনিট যায় না, সে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাগিদ। বা'ই, উইঠ্যা পড়, মিয়া-বা'ই।

অনুনয় মমতা-বিগলিত।

সাজেদ শুয়ে-শুয়ে দাদীর দিকে তাকায়। আর অবাধ্যতা দেখায় না সে। করিমা বিবির রেখা-কুটিল মুখ ও চোখের তলায় আরো মুখ আছে—হাজার হাজার সুন্দরী জননীর চোখ-মুখের সমাহার। সাজেদ কি ভাবে যে আবেদন উপেক্ষা করবে?

উঠে পড়ল সে।

দাদী ক্লান্ত হাসি-মুখে ছাতা ধরল নাতির মাথায়। মোরগ এবার সাজেদের বগলে।

সূর্য-তেজ আবার ডিগ্রি-ডিগ্রি চড়ছে।

কয়েক বিঘা জমি পার হোয়ে এলো তারা। কেউ কোন কথা বলে না। পথের শাসনে দুইজনে মৌন। বেচারা মোরগটা একবার ক-ক-ক্ শব্দ পর্যন্ত করে না। মাঝে মাঝে সড়কের ধুলোবালি উড়িয়ে মোটর যায় শুধু অটোবালের রোলার ঠেলে-ঠেলে।

দাদী জোরে হাঁটতে অনুরোধ করে। কিন্তু সাজেদ যোগান দিতে পারে না। পায়ের তলায় ফোসকা পড়ার উপক্রম। দাদীর আবেদন মিনতি অনুরোধ ছ্যাকার মতই লাগে তার কাছে। সে তাই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে, যেন কথা মুখ থেকে বেরোনোর পথ না পায়। কথা সে বলবে না।

এবার সড়ক ছেড়ে মেঠো পথে নামল তারা। কিছুদূর হেঁটে নাতি আবেদন ছোড়ে: দাদি, আবার বসা লাগে। পায়ে বড় দুখ্ পাইছি।

সূর্যের আকাশ-জরীপ দেখে করিমা বিবি টের পায়, দুপুর হোয়ে গেছে।

আর দেরি করা চলে না। নাতির কাছে সে পাল্টা আবেদন পাঠায়: আর থোড়া রাস্তা। হেই, পৌঁছাইলাম বইলা।

—আর ফারতাম নআ।

—ক্যান?

—ঐ গাছের তলাৎ বইসব্যা চলো।

—ন, বাই।

করিমা বিবির মেজাজে এতটুকু তিরিক্ষি ভাব নেই।

মেঠো রাস্তা। হাহা-গ্রাসী আচোট জমির জঙ্গল চারিদিকে। কোথাও কোথাও বাখারির বেড়-ঘেরা এক-আধ ফালি জমি আছে মাত্র।

নাতির ক্লান্ত মুখ দেখে করিমা বিবির কষ্ট হয়। কিন্তু দেরি আর করা চলে না। এখনও দেড় মাইল পথ বাকী। দুপুর হয়ে গেছে। নাতির আবেদন তাই ব্যর্থ।

সোজা জানিয়ে দেয় সে, আর কোথাও বিশ্রাম সম্ভব নয়।

মোরগটা পর্যন্ত এতক্ষণে বেঁকে বসেছে। কুটুম্বিতার জন্য সে কারো বাড়ী যেতে নারাজ। হঠাৎ পা খিঁচিয়ে জানান দিল, তারও স্বাধীনতা আছে।

সাজেদ মোরগটা সামলাতে যায়। কিন্তু হঠাৎ ক-ক-রব সহযোগে পা-খিঁচুনীর এমন মহড়া চলল যে, এমন তেজী জানোয়ার সাজেদের মত ক্লান্ত বালকের পক্ষে ধরে রাখা অসম্ভব।

কুক্কুট-প্রবর বগল-ছাড়া, এক লাফে মাটির উপর পড়ে সোজা দৌড় দিল।

—ধইর‍্যা—ধইর‍্যা—ফ্যালা—ধইর‍্যা—। হন্ত-দন্ত দৌড়ায় করিমা বিবি আর চীৎকার করে। সাজেদ অনেক আগেই পেছন-পেছন দৌড় শুরু করেছে। কিন্তু মোরগ নাগালের বাইরে। আর ধরা দিতে নারাজ। অন্যদিন সাজেদ একটু তি-তি-রবে ডাক দিলে যে হাজির হয়, আজ কোন শব্দই তার কানে গেল না!

দাদী ও নাতি দুইজনে খেদাখেদি শুরু করলে।

একজন তাড়িয়ে আনে, অপরজন ধরার চেষ্টা পায়। কিন্তু চর্বিদার মোরগের সঙ্গে পাঁকাটি-শরীর মনিবেরা পারবে কেন? কয়েক বিঘা জমিন-দৌড় বৃথায় গেল।

সাজেদ শেষে হয়রান হোয়ে বলে: দাদি, রোদ্রে গরমে 'হালার মাথা খারাব হইছে। ছাড়ান দেন।

—ছাড়ান দিব! কি কস্?

—তয় আপনে দ্যাহেন। তবে আপনি দেখুন!

সন্দিগ্ধ-চোখ মোরগটা তখন দশ বারো গজ দূরে মনিবের মতই বিশ্রাম নিচ্ছিল।

করিমা বিবি হাল ছাড়ে না। কয়েক কাঠা জায়গার মধ্যে মানুষ ও পশুর লুকো-চুরি খেলা শুরু হয়। বৃদ্ধা পেরেসানির শেষ সীমানায় তখন। হাজার হোক, প্রাণ-ধর্মের তফাত আছে, কিন্তু বয়স?

দাদীর ধর্না এবার নাতির কাছে: মিয়া-বা'ই, লগে আয়, বা'ই! দুইজনে দোহ রাস্তাডারে।

—ফারুম না।

—সোদর বা'ই!

দাদীর কাতর আহ্বানে বালক নিরুপায়। শেষ পর্যন্ত সাড়া দিতে হয়।

আবার খেদাখেদি।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল।

মোরগটা শেষে বেদম তাড়া খেয়ে একটা বেড়া-ঘেরা হলদে ফুলে ছাওয়া ঝিঙে ক্ষেতের ভেতর ঢুকল।

এবার দাদী-নাতি দুই জনে নিরুপায়, চেয়ে থাকে। কারো ক্ষেতের ভিতর ঢুকে ত আর খেদাখেদি চলে না। মরুভূমির মধ্যে গতরের কত মেহনতে না মানুষ ঐ ফসলটুকু তুলেছে।

কাঠা তিন জমি দূরে তিন-চার ঘর গেরস্থর চাল দেখা গেল। বাস্তুর সীমানায় কয়েকটা আমের গাছ। ঐ বাড়ীর কারো ক্ষেত তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বৃদ্ধার মাথায় ফন্দী খেলে যায়। সে বললে: বা'ই, তুই খাড়াইয়া রাস্তাডার দিকে চাইয়া র'। আই আইতাছি।

—জলদি আইস্যোন। কন্ডে যান?

—এক মুড়া চাউল আনি। এইবার 'সেন' ধরা পইড়ব।

—জলদি আইস্যোন।

—হু।

করিমা বিবির মাথা বোঁ বোঁ ঘুরছে। তবু স্থির থাকতে হয়।

বাড়ীর সীমানায় পৌঁছানোর আগেই করিমা বিবি দেখতে পায়, আম গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে একজন বর্ষীয়সী মহিলা এই দিকে চেয়ে আছে। উদ্ধার-পর্বের সূচনায় আলো দেখা গেল।

করিমা বিবিকে দেখে মেয়েটি কৌতুহলী, আরো এগিয়ে আসে।

তার মুখোমুখি হওয়া মাত্র করিমা বিবি অন্যান্য জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই প্রথমে বলে: ভৈন্ (বোন), এক মুডি চাওল দ্যান্ না, বড় ঠ্যাকায় পড়ছি।

—কোন্‌খন আইলা?

—চৌদ্দগ্রাম।* একডু জল্‌দি করেন, ভৈন্‌। করিমা বিবির স্বরে ভয়ানক ব্যগ্রতা।

—চাওল চাও?

—হ।

—মাফ করেন।

—এক মুড়ি। স্রেফ এক মুড়ি। আধ মুড়ি অইলে চইলব।

—কইছি, মাফ করো। আল্লা যারে যে হালতে রাইখ্‌ছে হেই জানে।

—এক মুড়ি চাওল দিতা ফারেন না, ভৈন?

—মাফ করেন। মরদ জোওানগো কাজকাম নাই। পুবের পাহাড়ে কাম-কামাই হইত, হে গ্যাছে গ্যা। হে ত হিন্দুস্তান এলাকা। গাঁয়ে মুনিষ খাড়াইবো কেডা? হগ্‌গলে গরীব।

করিমা বিবি না-ছোড় বান্দা, আরো ব্যগ্রতা-ব্যাকুলতা দেখায়।

এক মুড়া দেন, ভৈন্‌। বড় উব্‌কার অয়।

—মাফ করেন, কইছি না? রাইতে রাইতে 'জান্‌' হাথৎ পুবের পাহাড়ৎ তবু জোওান পোলারা যায়, নইলে খামু কি? কোনদিন কে গুলী খাইয়া আসে—হে-রা পাহাড়ৎ গেলে মুখে দানা-পানি সান্ধায় না। একদিন দেরি অইলে কাইন্দা খুন হই। কি দিন যে—

বষীয়ানের খেদোক্তি শোনার ধৈর্য নেই করিমা বিবির। শেষে মেজাজ রুখতে পারে না। চড়া কণ্ঠস্বর বাইরের উত্তাপ আরো দু-ডিগ্রি বাড়িয়ে দেয়ঃ এমন চশম-খোর, কিপ্‌টা মানুষের লগে আইলাম, এক মুড়া চাওল দিতা চায় না—এত কইতাছি—।

বষীয়ান এই আস্পর্ধায় প্রথমে খুব বিস্মিত হয়, পরে মুখে বিষ উগ্‌রে তোলেঃ মুখ সামাইলা কথা কস্‌। ভিক্ষা চাইতা আইস্‌ছস্‌, ফের ছিনালের লাহান চুপা করস? মুখ ভাঙ্গাইয়া দিমু না?

—ভিক্ষা। ভিক্ষা চাইলো কেডা? এত দুঃখ-মুসিবৎ গ্যাছেগ্যা, কারো লগে ভিক্ষা চাই নাই, আইজ ভিক্ষা চাইমু? আঁই মানুষ না?

করিমা বিবি ভিক্ষা চাইবে? কেন সে কি মানুষ নয়?

বর্ষীয়ান সহজে রেহাই দেয় না। তারও জিজ্ঞাসা আছে।

—তয় চাওল চাস্‌ ক্যা?

—এক মুড়া চাওল। আঁর রাতা ছুইটা গ্যাছে গ্যা ওই ক্ষেতের ভিতর। মাইয়ার বাড়ী যাই, লগে রাতা লইছিলাম। হেডা ছুড়ে গ্যাছে গ্যা।

বষীয়ান বিস্ময়-অনুতাপ-লজ্জায় চোখ উপরে তুলে নিজের গালে দুই দিকে মৃদু থাপ্পড় দেওয়ার পর আফ্‌সোস-দ্যোতক চুক্‌চুক্‌ শব্দ করে। করিমা বিবিকে সে ভিখারী মনে করেছিল। ঘামে, রৌদ্রে, ক্লান্তির রগ্‌ড়ানিতে চেহারার যা ছিরি, ভিখারী ঠাউরানো ত অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বষীয়ান কিন্তু ভুল-সমঝোতার ক্ষতি-পূরণ দিল সাড়ে ষোল আনা। সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ছুটে গেল, ফিরে এলো দশ বারো জন কুঁচো ছেলেপিলে সঙ্গে।

—চাওল আনুছেন? করিমা বিবি শশব্যস্ত আবার জিজ্ঞেস করে।

—চাওলে কাম নাই। এক মুড়া চাওল খামাখা নষ্ট কইরা ফায়দা কি? হা, এই চাওলের লাইগ্যা দ্যাশ-ময়—

বষীয়ান কথা শেষ করে না, তার অন্যান্য কাজ তখন খুব তোড়ের সঙ্গে চলে। বাহিনীদের সে হুকুম দিলঃ এই পোলাবান, ভৈনের রাতাডা ছুইটা গ্যাছে গ্যা। অহনই ধইরা আনস ত দেহি। মারস না য্যান।

বাহিনীর সঙ্গে বষীয়ান মহিলা করিমা বিবিকে যেতে দিল না। গাছের ছায়ায় বসিয়ে রেখে আবার বাড়ী থেকে ঠাণ্ডা পানী ও সামান্য গুড় নিয়ে এলো।

এবার করিমা বিবি সোয়াস্তি পায়।

তারপর দুই জীবনান্তগামিনীর আলাপ-চারিতা চলে। ফাশ্‌ফুটের (পাশপোর্ট) কথা, চাওলের কথা ইত্যাদি সংসারের সুখ-দুঃখের কাহিনী।

কিন্তু করিমা বিবি আলাপে আন্তরিকতা দেখাতে পারে না। ছেলেদের হল্লা আর রাতার দিকে তার মন পড়ে আছে।

ক্ষেতের চারপাশে তখন হৈ হৈ রব। প্রায় পনর মিনিট কেটে গেল। দুপুর কবে ঢলে গেছে। আর ঘণ্টা দেড়েক পরেই ত বৈকালের রাজগী-কাল।

ছেলেরা শেষে ফিরে এলো। সঙ্গে সাজেদ। বষীয়ানের একজন নাতি আসামী করিমা বিবির হাতে সোপর্দ করল। কম খেদাখেদি করতে হয়নি ওদের।

ঠাণ্ডা জল, গুড়, আলাপিতা-অনুকূল আমের ছায়া কিন্তু করিমা বিবির গোস্বা ঠাণ্ডা করতে পারে নি।

তার হাতে মোরগটা দেওয়া-মাত্র সে গলা মুচড়ে মারল এক পট্‌কান—রীতিমত সজোর আছাড়। আর মুখে গালাগাল ঃ শয়তান, বজ্জাৎ জানোয়ার, কম দুক্কু দিছস—।

ছেলেরা এতক্ষণ খেদাখেদি করেছে, তার উপর সমস্ত রৌদ্র গেছে মাথার উপর দিয়ে, এক ফোঁটা জল পায়নি—প্রাণীর প্রাণ, তবু প্রাণ ত বটে! মোরগটা মাটির উপর পড়েই পা খেঁচে-খেঁচে গলা টানতে লাগল। মানুষ হোলে বলা চলত 'জানু'-কান্দানী 'শ্বাস' উঠছে।

উপস্থিত সকলে হতভম্ব। এমনকি করিমা বিবি নিজেও।

সাজেদ তখন কান্না শুরু করে দিয়েছে মোরগের কাছে ধুলোয় পড়েঃ আঁআর রাতা মইরা গ্যালো—মইরা গ্যালো—।

করিমা বিবি দু-মিনিট গুম বসে থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে অভিনয়ের মহড়া শুরু করে। সে বষীয়ানের দুই হাত চেপে ধরে বলেঃ জল্‌দি কইরা একডা ছুরি আনেন—একডা ছুরি—

—ছুরি ত নাই।

—একড়া বট্‌কী—(বঁটি)—বট্‌কী—একডা—করিমা বিবির মুখে শুধু ঐ এক রব।

বষীয়ান দৌড় মেরে ঘর থেকে সত্যিই একটা বঁটি নিয়ে এলো।

করিমা বিবি তখন পাগলের মত ছেলেদের অনুরোধ করেঃ জবাই কইরা দাও—জল্‌দি জবাই কইরা দাও

—আঁরা মোল্লাও না, মুন্সী-সাবও না। সত্যিই ত, কুঁচো ছেলেরা না মোল্লা, না মৌলবী-সাহেব। হাসির হররা চলে তখন ওদের দলে।

মোরগটার চোখ ঢুলে পড়ছে, তখনও হলুদ-হলুদ পা নড়ছে। গলা থেকে বেরুচ্ছে প্রাণঘাতী ঘড়ঘড় শব্দ।

সাজেদ চীৎকার করেঃ জবাই করতা দিমু না। জবাই করতা দিমু না।

করিমা বিবি আর মোল্লার অপেক্ষা করে না, নিজেই মোরগের গলায় বঁটি বসিয়ে দিল।

কুঁচো চ্যাংড়ারা তখন হাসে আর চীৎকার

'পাগলা ঘোড়া খেপেছে'—

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পেড়ে বলে : বিস্‌মিল্লা কন্‌— বিস্‌মিল্লা কন্‌।

বিস্‌মিল্লাহ!

কত রঙ মোরগের পাখ্‌নায়।

সমস্ত রঙ কিন্তু রক্তের লালিমার কাছে নিষ্প্রভ হোয়ে গেল। শ্বাসনালী থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোয়।

জবাই-মোরগটার মত সাজেদও ধুলোয় পড়ে ছটফট করে। তার কান্না আর থামে না।

বর্ষীয়ান মহিলা সত্যিই দয়াময়ী। সাজেদের জন্য সে আবার কিছু গুড় ও জল নিয়ে এসে তাকে মাটি থেকে তুল্‌ল ও সস্নেহে হাত মুখ মুছিয়ে দিল। তারপর সান্ত্বনার পালা।

এখানে মোরগের মত সবাই আবার স্তব্ধ হোয়ে যায়। কি যেন নিমেষে ঘটে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দুইজনে আবার উঠে পড়ল। করিমা বিবি বর্ষীয়ানের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বলে : তৈল, রাতাডা লইয়া যাই। আইজ্যার পোলা-মাইয়েরা খাইবো। [illegible] খাইয়েতে জবাই করাছি, হালাল হইবো পোলাবানগোর লাইগ্যা—

—বুড়াগোর লাইগ্যাও হইবো—

ঠোঁট-কাটা একটা ছেলে হঠাৎ মন্তব্য করে বসল। বর্ষীয়ান কোন মন্তব্য করে না। দুই বৃদ্ধা সমবয়সী, তাই স্বতই সহানুভূতি জাগে।

জীবনের শেষ চৌহদ্দির কাছাকাছি। তবু দিনকে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে নিতে হয় আয়ুর সঙ্গে।

করিমা বিবির এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে জবাই-করা মোরগটা। দুই ডানা ধরেছে; কাটা কল্লাটা ঝুলেছে উল্টে। ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত ঝরছে তখনও। নীল চোখ দুটো তখনও যেন চেয়ে রয়েছে।

ম্রিয়মান সাজেদ দাদীর পেছন-পেছন হাটে। বিমবৎ সহগমন।

নেশাগ্রস্ত জনের মত করিমা বিবি হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে বলে : এত দেরি অইলো। আইজ আর খাত পাইবা না যুহুর ঘরৎ।

—ক্যান?

—অহ্যার (আহমদের)-ও দিন চলে না। [illegible] বন্ধ। দুফুরের খাওনের আগে গেলে যেন কিছু থাইকত।

—হের তরে, আঁরে থাকি তাড়াতাড়ি করতা কইছিলা?

করিমা বিবি নিরুত্তর। অকরুণ লজ্জার মুখোমুখি তবু বেশীক্ষণ চুপ্‌চাপ থাক্‌তে পারে না।

—হেরাও আমাগো লাহান, বাই। রাতাডা লইছিলাম, কোন মিঁয়া-বাড়ীৎ বেইচ্যা দু-তিন ট্যাহা পাইবো, তয় আমাগো দু-দিন খাওয়াইতা হেরার কোন তক্‌লিফ অইব না। দুইদিন মাইয়ার মুখডা দেইখ্যা আসন যাইবো। বদ্‌ নসীব—কি অইলো, দ্যাহো।

মোরগের কথা, এইক্ষণে অন্তত, সাজেদের আর মনে থাকে না। দাদীর অগাধ ক্ষোভের স্পর্শে তারও মন সিক্ত হোয়ে ওঠে।

—চলেন, তয়, বাড়ি ফিইরা যাই।

—ন, বাই। কাল বিয়ানে চইলা আমুনে, থাকুম না। ওই দ্যাহো—ওই যে খেজুরের গাছ—তোমার [illegible] বাড়ি—[illegible] দিয়া। [illegible]

পথ চলতে-চলতে [illegible] জবাব দিল সাজেদ,—হু, দ্যাখছি।

"ফুলমণি ও করুণা'র মতো একটি মৌলিক গ্রন্থ যে বাঙলা সাহিত্যের সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি তা সত্যি বিস্ময়কর। আলোচনা দূরের কথা, বাঙলা ভাষা এবং বাঙলা উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এ বইটির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। অথচ নাম না জানবার কারণ নেই; কারণ লঙের তালিকায় 'ফুলমণি ও করুণার' উল্লেখ করা হয়েছে।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ বইটি নানা কারণে বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে: 'ফুলমণি ও করুণা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে; লেখিকা শ্রীমতী মুলেন্স। মিশনারী সাহেবরা এর অনেক আগে থেকেই বাঙলা ভাষার চর্চা করে আসছিলেন। কিন্তু কোনো য়ুরোপীয় মহিলার এমন সুন্দর প্রাঞ্জল বাঙলা রচনার দৃষ্টান্ত আর আছে বলে জানি না। শুধু ভাষার দিক থেকে নয়, বিষয়বস্তুর মৌলিকতার জন্যও 'ফুলমণি ও করুণা'র দান উল্লেখযোগ্য। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালকে' বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা হয়ে থাকে। এর ছয় বৎসর পূর্বে 'ফুলমণি ও করুণা' প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকে আধুনিক উপন্যাসের কতকগুলি গুণ সুস্পষ্ট। প্যারীচাঁদ মিত্রের গৌরব ক্ষুণ্ণ না করেও বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাসে শ্রীমতী মুলেন্সকে অন্যতম পথিকৃতের সম্মান দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম বাস্তব কাহিনী

"ফুলমণি ও করুণা" বাঙলা সাহিত্যের প্রথম বাস্তববাদী কাহিনী। এ কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা পল্লীগ্রামের স্বল্পবিত্ত অধিবাসী। পুরুষরা বেয়ারা, খানসামা, মজুর, ছুতার মিস্ত্রি ইত্যাদির কাজ করে; মেয়েরা করে আয়ার চাকরি; অথবা গোরুর দুধ বিক্রি করে, কিংবা পাড়ার কোনো বাড়ীতে ঠিকা কাজ করে কিছু পয়সা পায়। সর্বসাকুল্যে একটি পরিবারের মাসিক আয় আট দশ টাকার বেশি নয়। লেখিকা এই জীবনের সুখ দুঃখ, আচার ব্যবহার, খাদ্য, পোশাক, চরিত্রের দোষ ও গুণ ইত্যাদি সবকিছু লেখিকার হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কাহিনীর পরিবেশ বর্ণনা এমন সূক্ষ্ম ও বাস্তব যে একজন সমালোচক ডিফোর রচনারীতির সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' ও 'কলিকাতা কমলালয়' এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' সমসাময়িক নাগরিক সমাজের ছবি আছে। কিন্তু ব্যঙ্গ চিত্র আঁকা লেখকদের উদ্দেশ্য ছিল বলে সর্বত্র বাস্তবানুগত্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কোথাও কোথাও পরিবর্তন কিংবা অতিরঞ্জন প্রয়োজন হয়েছে। 'ফুলমণি ও করুণার' লেখিকা দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার রূপ যেভাবে দেখেছেন তাকেই যথাযথরূপে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন।

বইটি বিশেষ করে মেয়েদের জন্য লেখা। সুতরাং স্ত্রী চরিত্রগুলি স্বভাবতঃই প্রাধান্য লাভ করেছে। পুরুষরা সকলেই রয়েছে নেপথ্যে। মেয়েদের ঘরকন্না, তাদের কুসংস্কার, বৃথা তর্কবিতর্ক, ছলচাতুরী ইত্যাদির নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা। দীর্ঘকাল যাবৎ সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ না করলে এরূপ বাস্তবানুসারী বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

মেয়েদের কাহিনী বলেই কয়েকটি শিশুর চরিত্র অতি সহজে এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে শিশুদের এরূপ স্থান ইতিপূর্বে কোথাও ছিল বলে জানি না। এর পরেও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত কথাসাহিত্যের জগৎ থেকে শিশুরা নির্বাসিত ছিল বলা যায়। ফুলমণি ও করুণার ছেলেমেয়েরা তাদের হাসি, খেলা ও গল্প দিয়ে একটি নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছে। সাধু ও সত্যবতী মেম সাহেবের কাছ থেকে পয়সা পেয়ে আনন্দে সকলকে দেখিয়ে বেড়ায়। পূর্বে কখনো এরা আতর দেখেনি; মেম সাহেব একটু আতর মাখিয়ে দেওয়ার দুজনেই বিস্মিত হয়ে গেল এর আশ্চর্য

করে। কিন্তু ছেলেমানুষ বলে তাকে ঠকতে হয়। সাহেবদের বাড়ী মোট পৌঁছে দিলে তিন পয়সা দেবার কথা; কিন্তু কাজ শেষ হলে সাহেবের খানসামা একটিমাত্র পয়সা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। লেখিকা নবীনকে নিজের বাড়ীতে কাজ করবার জন্য নিয়ে এসেছেন। নবীন চাকরি করে দুটো পয়সা পেলে করুণার দুঃখ একটু লাঘব হবে। নতুন চাকরি পেয়ে নবীনের মনোভাব কেমন হয়েছে তা লেখিকার ভাষায় পড়ুন: "যখন দরজী চাপকান বানাইবার কারণ নবীনের গায়ের মাপ লইতে লাগিল, তখন আমি তাহার অহংকার দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না; কেননা সে দীনহীন বালক এক ছেঁড়া নেকড়া ব্যতিরেকে আর কোন বস্ত্র কখন পরে নাই, অতএব সে দরজীর হাতে সরু কাপড় এবং লাল সালু দেখিয়া বোধ করিল যে ইহা পরিয়া আমি একেবারে বাবু হইব।"

"ফুলমণি ও করুণা"র সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর সহজ, সাবলীল ভাষা। এ ভাষা গল্প বলবার পক্ষে বিশেষরূপে উপযোগী। শ্রীমতী মুলেন্স আরবী, ফারসী ও গ্রাম্য শব্দ সযত্নে বাদ দিয়েছেন। একশ' চার বছর পরেও কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। পরিষদ সংস্করণ "আলালের ঘরের দুলালে" পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী দুরূহ শব্দের সটীক তালিকা যোগ করা হয়েছে। লেখিকার সংলাপের ভাষা খুব সুন্দর। মনে হয় পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথন যেন সত্যি শুনতে পাচ্ছি। যতি চিহ্নের সুষ্ঠু ব্যবহার একালের মানদণ্ডেও বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। এমন যথাযথ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী লেখকদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

অল্প কয়েকটি কথায় এক একটি ছবি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন লেখিকা। দুটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে দেওয়া হলো:

নবীন "গৃহের ভিতরে দৌড়াইয়া আইল। তাহার বর্ণ অতিশয় কাল, এবং ধূলা ও কাদাতে খেলা করিয়া আসিয়াছিল, এই জন্য তাহাকে আরও মলিন বোধ হইল। সে প্রায় উলঙ্গ, কেবল তাহার কোমরে একখানি ছেঁড়া কানি বাঁধা ছিল।"

ফুলমণির স্বামীর চরিত্র কয়েকটি লাইনে ফুটে ওঠে: "তাহার মস্তকে দুই একটি পক্ক কেশ দেখা গেল, এবং তাহার মুখ অতিশয় দয়াশীল বোধ হইল। পূর্বে আমি তাহাকে দেখি নাই, তথাচ দেখিবামাত্র তাহার প্রতি আমার মনে সম্ভ্রম জন্মিল।"

পরে আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতী মুলেন্সের ভাষার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের [illegible] তুলনীয়। একদিকে [illegible] ও [illegible] [illegible]

THE HISTORY

OF

PHULMANI AND KARUNA;

A BOOK FOR

NATIVE CHRISTIAN WOMEN.

ফুলমণি ও করুণার

বিবরণ,

স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত।

CALCUTTA.

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY, BY J. BAPTIST, AT BISHOP'S COLLEGE PRESS.

[illegible] 1852. [illegible]
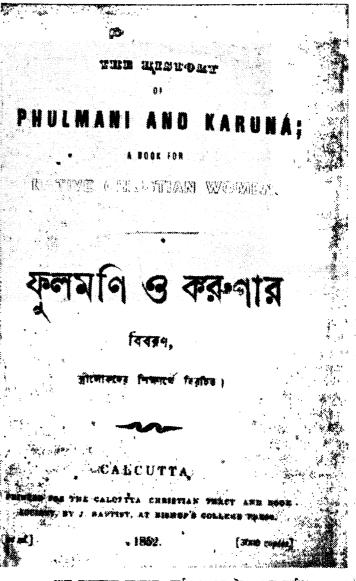
প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র; লেখিকার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ভাষাদর্শের মধ্যে এরূপ ভাষার অস্তিত্ব কৌতূহলোদ্দীপক। রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' ভাষা সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করেছিল শ্রীমতী মুলেন্সের ভাষারীতির মধ্যে তার সমর্থন পাওয়া যাবে।

উপেক্ষার কারণ

একমাত্র মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সে যুগে গল্প রচনার রেওয়াজ ছিল না। 'নববাবুবিলাস' ও 'আলালের ঘরের দুলালের' লেখকদের সামনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। 'ফুলমণি ও করুণা'ও এর ব্যতিক্রম নয়। শ্রীমতী মুলেন্স পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

"It is a book specially intended for Native Christian women. I have endeavoured to show in it the practical influence of Christianity on the various details of domestic life, such as the forming of marriage connections, behaviour to husbands, moral training of children and the duty of women, specially to the poor, to the sick, and to the heathen. ....The above subjects are worked into the little story, fictitious on the whole, but founded upon facts; for many of the incidents related in it

have come under my notice, and others I have heard from Missionaries' wives in the country."

সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও "ফুলমণি ও করুণা" যে উপেক্ষিত হয়েছে তার কারণ লেখিকার উদ্দেশ্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে। "ফুলমণি ও করুণার" পাত্রপাত্রীরা বাঙালী খৃস্টান; কাহিনীর মধ্যে অনেকবার বাইবেলের গল্প ও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে; সর্বোপরি, বইটি প্রকাশ করেছেন ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান ট্রাক্ট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটি। সুতরাং "ফুলমণি ও করুণা" যে মিশনারীদের খৃস্টধর্ম প্রচারেরই একটি অংশ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সে সময় বুদ্ধিজীবী হিন্দুরা মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করতেন। তাই ক্রিশ্চিয়ান ট্রাক্ট সোসাইটির ছাপমারা 'ফুলমণি ও করুণা' তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। চোখে পড়লেও উপেক্ষা করা হয়েছে। সমসাময়িক সমালোচকরা নীরব থাকলে পরবর্তীকালের সাহিত্য-রসিকরাও উদাসীন থাকেন।

"ফুলমণি ও করুণা" ৩০৬ পৃষ্ঠার সুমুদ্রিত ও বহুচিত্রশোভিত গ্রন্থ। প্রকাশক যে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন তা বোঝা যায়। ক্রিশ্চিয়ান ট্রাক্ট সোসাইটি শত শত পুঁথিপত্র প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্য থেকে এ বইটি লঙ্ সাহেব তাঁর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। খৃস্টান প্রচার সাহিত্যের মধ্যে এ বইটি যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল তা নিম্নলিখিত মন্তব্য থেকে জানা যাবে :

"History of Phulmani and Karuna—a book adapted especially to Native Christian women, written by Mrs. Mullens. 3000 copies printed. It is written in very plain and easy language, and is adorned with many engravings; and it may be regarded as one of the most popular Christian books ever yet published in India in the vernacular. Applications have been received from the Societies at Madras and Agra for permission to translate and publish it there."—*The Twenty-third Report of the Calcutta Christian Tract and Book Society, pages 14-15.*

লেখিকার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত "ফুলমণি ও করুণা" বারোটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল।

কাহিনী

ফুলমণি, করুণা, প্যারী ও রাণী এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র। এদের জীবনের কতকগুলি ঘটনা পৃথকভাবে বলেছেন লেখিকা। বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ দৃঢ়সংবদ্ধ নয়, সুতরাং উপন্যাসে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়নি। উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্যও হয়তো লেখিকার ছিল না। এদের জীবন লেখিকা যেভাবে দেখেছেন তিনি নিজের জবানিতে তারই ছবি এঁকেছেন। সুন্দর খণ্ড চিত্রগুলিতে উপন্যাস অপেক্ষা রম্যরচনার সুর বেশি পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে লেখিকার ব্যক্তিত্বের মাধুর্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

লেখিকা এখানে নিজেকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পত্নী বলে পরিচয় দিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে যেখানে আছেন সেখানে ইংরেজদের মধ্যে ধর্মভীরু লোক বড় কেউ নেই। স্থানীয় পাদ্রি বললেন যে, একটু দূরের বাঙালী খৃস্টানদের গ্রামে অনেক সৎ লোকের সন্ধান পাওয়া যাবে। লেখিকা তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আগ্রহান্বিত হলেন।

"কএক বৎসর হইল আমি বঙ্গদেশের মফঃশ্বলে নদীতীরবর্তী এক নগরে বাস করিতাম। সেই নগরের নাম এই স্থানে লিখিবার আবশ্যক নাই। তথা হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে এ-দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান লোকদের এক গ্রাম আছে; ঐ গ্রামস্থ ভ্রাতা ও ভগিনীদের সহিত আমার যে সুখজনক আলাপ এবং ধর্ম্মের বিষয়ে কথোপকথন হইত, তাহা আমি অদ্যাবধি স্মরণে রাখিয়া স্বর্গস্থ পিতার ধন্যবাদ করিয়া থাকি;......দৈবাৎ আমার স্বামিকে কোন ডাকাইতের দলের বিষয় তত্ত্ব করিবার কারণে গৃহত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে যাইতে হইল, তাহাতে সন্ধ্যাকালে আমার মনে বড় ঔদাস্য হইলে খ্রীষ্টিয়ান গ্রামে গিয়া তথাকার লোকদের সহিত পরিচয় ও কথোপকথন করিতে মনে স্থির করিলাম। আমার বাটী হইতে উক্ত গ্রাম প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে; কিন্তু সেদিন বড় উত্তম এবং শীতল বায়ু বহিতেছিল, এই কারণ আমি গাড়ীতে না চড়িয়া একজন চাপরাসিকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে চলিলাম।"

গ্রামে ঢুকে খৃস্টান অধিবাসীদের বাড়িগুলি অপরিচ্ছন্ন দেখে লেখিকার মন বড় খারাপ হয়ে গেল। কিছু দূরে এসে একটি পরিচ্ছন্ন বাড়ি দেখতে পেলেন। বাড়ির বাহিরে শেকল দিয়ে বাঁধা একটি টিয়া-পাখিকে একদল কাক অত্যন্ত জ্বালাতন করছিল। মেমসাহেব পাখিটি রক্ষা করবার জন্য শেকল খুলে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন। "আমার আগমনের শব্দ শুনিয়া একজন অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক বাহিরে আইল। তাহার মাথার চুল সুন্দররূপে বাঁধা ও তাহার পরিধেয় শাড়ি অতিশয় পরিষ্কার ছিল।

"আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওগো এটা কি তোমার পাখী? কএকসকল উহাকে বড় দুঃখ দিতেছিল, এজন্য আমি ইহাকে বাটীর ভিতরে আনিয়াছি। স্ত্রীলোক উত্তর করিল, বিবি সাহেব, আপনকার বড় অনুগ্রহ। এ আমার পাখী বটে, আমার পুত্র ভুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া গিয়াছে। ইহা বলিয়া সে পক্ষীর সকল এলোমেলো পালকগুলিতে হাত বুলাইয়া সমান করিল এবং বোধ হইল যে, পক্ষী তাহার কর্ত্রীকে ভালরূপে চিনিত; কারণ সে তাহাকে না কামড়াইয়া তাহার বস্ত্রের মধ্যে লুকাইতে চেষ্টা করিল।"

এই স্ত্রীলোকই ফুলমণি। সে মেমসাহেবকে বসবার আসন এনে দিল। লেখিকার চোখ দিয়ে ফুলমণির বাড়ি দেখুন :

"তাহার চতুর্দিগের বেড়া নূতন দরমা ও নূতন বাঁশ দিয়া বাঁধা ছিল, এবং তদুপরি একটি সুন্দর ঝিঙা লতা উঠিয়াছিল। উঠানের এক পার্শ্বে গোরুর একখানি ঘর দেখা গেল, তাহার মধ্যে একটি গাভি ও বৎস ধীরে ধীরে জাওনা খাইতেছে। গোশালার ছাতের উপরে অনেক পাকা লাউ দেখিলাম। উঠানের অন্য দিগে পাকশালা ছিল এবং তাহার দ্বার খোলা থাকাতে আমি দেখিতে পাইলাম তন্মধ্যে তিন চারিটি সুমার্জ্জিত থালা ও ঘটি এবং কএকখান পরিষ্কার পাথরও রাশীকৃত আছে। উঠান সুন্দররূপে পরিষ্কৃত ছিল, তাহাতে যেমন প্রায় সকল ঘরে রীতি আছে তেমন কোন কোণে জঞ্জালের রাশি দেখিতে পাইলাম না; সকল সমান পরিষ্কার ছিল। দাবার সম্মুখে ঘরের ছাঁচির নীচে দশ বারটি চারাগাছ গামলাতে সাজান দেখিলাম; তাহার মধ্যে তিন চারিটি ঔষধের গাছ ছিল, অন্য সকল গ্যাঁদা, তুলসী, গন্ধরাজ ইত্যাদি। একটি অতি সুন্দর চীন গোলাপের চারাও ছিল, তাহাতে কুঁড়ি ও ফুল ধরিয়াছিল।"

ফুলমণির বাড়ির ছবিটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ফুলমণির সংসার আদর্শ খৃস্টান পরিবার হিসাবে দেখানো হয়েছে। ফুলমণির স্বামী প্রেমচাঁদ সাত টাকা বেতনে স্থানীয় পাদ্রী সাহেবের নিকট চরকরার কাজ করে। ফুলমণি দুধ বিক্রি দ্বারা এবং সেলাইয়ের কাজ করে আরো কিছু পায়। এতেই তাদের সংসার চলে যায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মিতব্যয়ী, ধর্মভীরু এবং পরোপকারী। প্রতিবেশীর আপদে-বিপদে সর্বদা এগিয়ে আসে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি প্রখর দৃষ্টি। আলস্যকে ঘৃণা করে। ছেলে-মেয়েদের মিশনারী স্কুলে দিয়েছে। সাধু ও সত্যবতীর শিশুসুলভ কৌতূহল ও ঔৎসুক্য আছে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। তবে সাধু ও সত্যবতীর মুখে বাইবেলের কথা শুনে প্যাকামো বলে মনে হয়।

ফুলমণির বড় মেয়ে সুন্দরী স্কুলের পড়া শেষ করে শ্বশুরে গেছে, আমার প্রকৃতি

নিয়ে। প্রেমচাঁদ অনেকদিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে থাকবার ফলে ওষুধপত্রের জন্য কিছু দেনা হয়ে গেল। এই দেনা শোধ করবার জন্য সুন্দরী চাকরি নিয়েছে। প্রতিবেশী মধু সুন্দরীকে বিয়ে করে দেনা শোধ করবার প্রস্তাব জানাল। কিন্তু মধু মাতাল বলে ফুলমণি এ প্রস্তাবে সম্মত হলো না। তার ফলে মধুর মুখরা মা সুন্দরীর নামে দুর্নাম রটাতে লাগল। বলল, চরিত্রের স্খলন ঢাকবার জন্যই ওকে শহরে পাঠানো হচ্ছে।

কয়েক মাস পরে ছুটি নিয়ে সুন্দরী বাড়ি আসবার পর লেখিকার সঙ্গে তার দেখা হলো। সুন্দরীর জন্য এবার শিক্ষিত, উপার্জনশীল এবং চরিত্রবান বর স্থির করা হয়েছে। কিন্তু সুন্দরী এ বিয়েতে সম্মত হলো না; কারণ সে মনে মনে অন্য এক-জনকে বরণ করেছে। মিথ্যা সংকোচের বশবর্তী হয়ে সে যে মনের কথা গোপন করেনি এইজন্য লেখিকা সন্তুষ্ট হয়েছেন। "আমি কহিলাম, না ফুলমণি, বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরা যে একেবারে ইংরাজ বিবির ন্যায় হয় আমার তো এমত বাঞ্ছা নাই; কেননা তাহারা পুরুষদের সহিত হিতজনক আলাপ করিতে চাহিলে একপ্রকার লজ্জার আবশ্যক আছে, কিন্তু সেই লজ্জা ঘোমটা দ্বারা নয়, বরং মনের শুদ্ধতা দ্বারা প্রকাশ পায়। যে স্ত্রীর এমত লজ্জা থাকে, সে কখন কোন পুরুষের সাক্ষাতে অপবিত্র বাক্য ও মন্দ কৌতুকের কথা কহিবে না। এই প্রকারে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সহিত স্বচ্ছন্দে আলাপ করিয়া নির্দোষী থাকিতে পারে।"

ফুলমণি যেমন আদর্শ কর্ত্রী, সুন্দরী তেমনি আদর্শ খৃস্টান কুমারী। ছোট ভাই-বোনদের সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করে, সংসারের ভার লাঘব করবার জন্য বিদেশে চাকরি গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি; আর সবচেয়ে সুন্দর তার প্রেমের দ্বিধাহীন স্বীকৃতি। সুন্দরী যে আদর্শ চরিত্রের মেয়ে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রানি ও সুন্দরী এক সঙ্গে একই স্কুলে পড়ত। মধু সুন্দরীকে বিয়ে করতে না পেরে রানিকে বিয়ে করেছে। মধু মাতাল ও লম্পট। তার হাতে রানির লাঞ্ছনার সীমা রইলো না। কিছুদিনের মধ্যে মধু নিজেই কলেরায় মারা গেল। লেখিকা মধুর মৃত্যুর সময়কার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। পাড়ার লোক এসে ভিড় করেছে; নানা মন্তব্য, নানা ওষুধ ও বিভিন্ন চিকিৎসা। কেউ কেউ মন্তব্য করল মেম-সাহেব থাকার আড়ম্বর কিছু করা গেল না। অল্প কথায় [illegible] চরিত্রটি যেন [illegible]।

[illegible]

আবার রানির খোঁজ করতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন রানি প্রসব বেদনায় ব্যাকুল।

"তাহার শাশুড়ী আমাকে দেখিয়া বলিল, বউ এক দিন এক রাত্রি এইরূপ অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতেছে, তথাপি যে খালাস হয় এমত কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না।

"রাণির স্বামির মৃত্যুর সময়ে যেরূপ গোলমাল হইয়াছিল, এখনও স্ত্রীলোকেরা সেইরূপ গোলমাল পুনর্বার করিতেছে; বিশেষতঃ দশ বার জন্য মেয়্যা আসিয়া রাণির চারিদিগে দাঁড়াইতেছিল। যদি একজন কথা কহে তবে অন্য জন আর একটা কথা কহে; একজন তাহাকে বসিয়া থাকিতে কহে, আর একজন বলে, না না, তুমি হাঁটিয়া বেড়াও; এবং তৃতীয় জন কোন অজ্ঞান বুড়ির ঔষধ আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দেয়। এই সকল বৃথা উপায় দ্বারা ছেল্যা শীঘ্র না জন্মিয়া বরং অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল, তাহাতে রাণির যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি হইল। ...রাণি দুই তিন মাস পূর্বে আপন শাশুড়ীর সাক্ষাতে এমত কথা বলিয়াছিল, যে গত রাত্রিতে একটা পেচা কিংবা ভূতল পক্ষী ডাকিতে ডাকিতে আমার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। এই কথা এখন তাহার শাশুড়ীর মনে পড়াতে সে বলিতে লাগিল, যদি এমত হয়, তবে সে পক্ষী ফিরিয়া না আইলে পোয়াতি প্রসব হইতে পারিবে না। এ কথাতে অন্য সকল স্ত্রীলোকেরা স্বীকার করিল, কেবল একজন বুড়ি ইহাতে সম্মতা না হইয়া বলিল, আমার বোধ হয় পেঁচাতে কোন ক্ষতি হয় না, কেন না একবার আমি পাঁচ সাত জন স্ত্রীলোকের সহিত উঠানে বসিয়াছিলাম, এমত সময়ে একটা পেচা আমাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল; তখন আমার ছোট ভগিনীর প্রায় নয় মাস গর্ভ ছিল, এই জন্যে তাহার নিমিত্তে আমরা সকলে বড় ভাবিত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোন ক্ষতি না হইয়া অল্পদিন পরে সে এক ঘণ্টা মাত্র দুঃখ পাইয়া এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল।

"ইহা শুনিয়া আর একজন স্ত্রীলোক বলিল, ও কথা আমি কখন বিশ্বাস করিব না। সকল লোকেরা জানে যে ঐ পক্ষী ফিরিয়া না আইলে পোয়াতি প্রসব হয় না; হয়তো সে ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তোমরা তাহাতে মনোযোগ করিলা না।

"প্রথম বক্তা উত্তর করিল, না গো, না, কখনো ফিরিয়া আইসে নাই; আমাদের কি চক্ষুঃ ছিল না? এবং দিনের বেলা দুই প্রহরের সময়ে ছেল্যা হইল, তখন কি পেচা থাকে? কিন্তু রাণির কি হইয়াছে, তাহা আমি সুন্দররূপে বলিতে পারি। অল্প দিন হইল সে পলাইয়া কালীপুরের কোন বুড়ির ঘরে ছিল, ঐ বুড়ি কোন মন্ত্র দ্বারা তাহাকে নিশ্চিন্তা করাইয়া তাহার গহনা [illegible]

[illegible]

অবশ্য জাগিয়া উঠিত। অতএব আমার বোধ হয় সে ব্যক্তি ডাইনী, এবং রাণি যেন প্রসব হইতে না পারে, এই জন্যে সে তাহার প্রতি কোন কিছু করিয়া থাকিবে। পূর্বে কথা হইতে একথা আশ্চর্য হওয়াতে সকল স্ত্রীলোকেরা একত্র হইয়া বলিতে লাগিল, হাঁ ২, ইহা হইয়া থাকিবে বটে।

"মধুর মাতা বার ২ বলিতেছিল, হায়! আমার পুত্রের ছেল্যাকে আমি কখন কোলে করিব? কিন্তু তাহার বউর কি গতি হয়, তাহাতে সে কিছুমাত্র ভাবিতা হইল না; শেষে প্রতিবাসীদের কথা দ্বারা সে বোধ করিল, যদ্যপি আমি বউর তত্ত্ব না করি, তবে ছেল্যা শুদ্ধ নষ্ট হইবে। এইজন্য সে ডাইনীর বিষয় শুনিয়া কহিল, তবে আমি একজন মানুষকে কালীপুরে পাঠাইয়া দিই, সে ঐ বুড়ির পায়ে পড়িয়া প্রার্থনা করুক, যেন আমার বউর গর্ভের বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়।

"এই কথাতে রাণি কাতর হইয়া আমার প্রতি ফিরিয়া বলিল, ও মেম সাহেব, আপনি কি আমার এবিষয়ের কোন ঔষধ জানেন না? কালীপুর এখান হইতে দুই দিবসের পথ; অতএব সেথা হইতে মানুষ ফিরিয়া না আসিতে ২ আমি মারা পড়িব। ও মেম সাহেব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা-দিগকে বলুন, যেন ইহারা আমাকে আর জলপড়া ও তৈলপড়া না দেয়, কারণ তাহাতে আমার বমি হইতেছে, আর খাইতে পারিব না।"

লেখিকার পরিচর্যার ফলে রাণি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল। "রাণি প্রসব হইলে পর সকলে আমাকে অতিশয় প্রশংসা করত আশীর্বাদ করিতে লাগিল এবং রাণীর শাশুড়ী আপন পুত্রের ছোট কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার পিতাকে স্মরণ করত ক্রন্দন করিতে লাগিল।"

পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত মেয়েরা একটি বিষয় নিয়ে কিরূপ জটলা করে উপরে উদ্ধৃত অংশটুকু তার চমৎকার উদাহরণ। এই ঘটনার পর রাণীকে অনেকদিন আমরা আর গল্পের মধ্যে দেখতে পাই না। রাণীর দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা জানা গেল কাহিনী সমাপ্ত হবার একটু আগে।

এই কাহিনীর আর একটি স্ত্রী-চরিত্র প্যারী। স্বামী সন্তানবতী এই হিন্দু রমণী এক সাহেবের বাড়ী আয়ার চাকরি করতে এসে খৃস্টানুরক্ত হয়ে পড়ে। স্বামীর পরিবার ত্যাগ করে সে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। এখন সে বৃদ্ধা, চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করে ফুলমণিদের গ্রামে বাস করতে এসেছে। বৃদ্ধ বয়সে নিঃসঙ্গ জীবনে তার ছেলেমেয়ে-দের কথা মনে পড়ে। ছেলেমেয়েরা তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নেবার জন্য যে আকুল আবেদন জানিয়েছিল এখনো তার প্রতিধ্বনি কানে [illegible] "আমাদের [illegible] চল মা! চল!"

ধর্মপরায়ণ প্যারীর মৃত্যু কাহিনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে।

করুণা

লেখিকার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি করুণার চরিত্র। করুণার চরিত্র স্থিতিশীল নয়, নিপুণভাবে তার ক্রমবিকাশ এবং পরিণতি দেখানো হয়েছে। করুণার কথা বলতে গিয়ে লেখিকা তাঁর উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়েছেন, জেগে উঠেছে তাঁর শিল্পী সত্তা। করুণা ফুলমণির প্রতিচরিত্র। ফুলমণি আদর্শ খৃস্টান রমণী; করুণা খৃস্টান হয়েও সেই ধর্মের নীতি অনুসারে জীবন যাপন করে না। সে অলস, কর্তব্যবিমুখ, কলহ-প্রিয়া এবং মিথ্যাবাদী। তথাপি লেখিকার সহানুভূতি করুণার উপরেই দেখা যায়। বাঙলা উপন্যাসের আদিযুগে করুণা একটি অনন্যসাধারণ নারী চরিত্র।

লেখিকা ফুলমণির বাড়ী বসে কথা বলছেন এমন সময় সশব্দে কপাট খুলে করুণা প্রবেশ করল। "তাহার কাপড় বড় ময়লা এবং চুল বাঁধা না থাকাতে মস্তকের চতুর্দিগে পড়িয়াছিল। সে আমার মুখপানে কিঞ্চিৎকাল অসভ্যরূপে তাকাইয়া ফুলমণির প্রতি ফুসফাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি কে? ফুলমণি বলিল, ইনি নূতন মেজিস্ট্রেট সাহেবের বিবি।"

সশব্দে কপাট খোলা, অসংযত বেশবাস এবং অসভ্যরূপে তাকাইয়া থাকার মধ্যে করুণার স্বভাব ফুটে উঠেছে। এত অল্প কথায় এমন সুন্দর বর্ণনা দেওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয়।

করুণা তার আসবার কারণ বলল: "চড়চড়ি রন্ধন করিবার নিমিত্তে কিছু তৈল তোমার নিকটে চাহিতে আসিয়াছি, ঘরে একটিও পয়সা নাই, আমার পুত্র এখনি কতকগুলিন চুনা মাছ ধরিয়া আনিয়া দিল, সেইগুলিন এই বেলার মত রন্ধন করিব। আমার স্বামিকে তো জান; সে আমাকে কিছু খরচ দেয় না, তথাপি খাইতে না পাইলে সমস্ত রাত্রি তিরস্কার করিতে থাকে।"

করুণা ইচ্ছা করলে কিছু পয়সা উপার্জন করতে পারে। কিন্তু সে অলস, তাই কোনো কাজ করতে চায় না। না হলে সেদিনই রমানাথ উপদেশক তার পীড়িতা স্ত্রীর কাছে বসলে ছয় পয়সা দেবে বলেছিল। কিন্তু করুণার তা পছন্দ হয়নি। সে রাণীর শ্বশুর বাড়ী থেকে পলায়ন ও প্রত্যাবর্তনের মুখরোচক কাহিনী নিয়ে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে জটলা করে সময় কাটিয়েছে।

লেখিকা একদিন ফুলমণির পুত্র ও কন্যা সাধু এবং সত্যবতীকে একটি করে সিকি দিয়ে গেলেন। বিকেলের মধ্যেই এ সংবাদ পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। পরদিন সকালে মেম সাহেবের বাঙলোয় গিয়ে উপস্থিত হলো করুণা। সে বড় দুঃখী, তাই সাহায্যপ্রার্থী। স্বামী লম্পট ও মাতাল; ছুতার মিস্ত্রির কর্মে নিপুণ, কাজ করলে স্বচ্ছন্দে দৈনিক চার আনা উপার্জন করতে পারে। তথাপি কাজ করবে না। এইজন্য করুণার এত দুর্দশা। পয়সা নেই, শাড়ী নেই।

লেখিকা করুণার অলস প্রকৃতির কথা শুনেছেন। প্রতিবেশীদের তার সম্বন্ধে ভালো ধারণা নেই। সে গির্জায় পর্যন্ত যায় না। শুধু শুধু পয়সা দিলে করুণা আরো অলস হবে। ধোপার নিকট করুণার একখানি শাড়ী আছে। নগদ পয়সা না দিলে ধোপা কাপড় দেবে না। লেখিকা করুণাকে একটি পয়সা দিয়ে বললেন, কাপড় এনে গির্জায় যেও।

করুণা আবার বলল, ছেলের বড় অসুখ। তাকে পথ্য দেবার মতো পয়সা নেই। আর কিছু দিন।

এবারও মেম সাহেব নগদ পয়সা না দিয়ে রুটি, মিস্রি ও সাগু দিয়ে দিলেন। করুণা নগদ পয়সা পেলে সুখী হতো।

পরদিন লেখিকা করুণার বাড়ী এলেন তার অবস্থা দেখতে। রান্নাঘরের চাল ভেঙে পড়ায় বড় ঘরের দাওয়ায় বসে করুণা রান্না করছিল। উঠান অপরিষ্কার, সমগ্র বাড়ী ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। তাঁকে দেখেই করুণার নেড়ি কুকুরটা চীৎকার শুরু করেছে, কথা বলে কার সাধ্য। করুণা অনেক কষ্টে কুকুর শান্ত করল। মেম সাহেব চেয়ে দেখলেন করুণা ময়লা শাড়ী পরেই আছে, ধোপা বাড়ী থেকে কাপড় আনেনি। সেই পয়সা দিয়ে পান তামাক খেয়েছে। করুণা বলল, "কাপড়ের দুই এক দিন বিলম্ব হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমরা তামাক না খাইলে মারা পড়ি। ...আমরা দুঃখি লোক, পেটে খাইতে পাই না; তাহাতে ধর্মকর্ম কি প্রকারে করিব?"

পীড়িত ছেলে কই? করুণা বলল, আজ একটু ভালো আছে, খেলতে গেছে। মিথ্যা কথা। ঠিক তখনই নবীন ছুটে বাড়ীতে ঢুকল। তার দেহে রোগের চিহ্নও নেই। নবীনের কাছ থেকেই শোনা গেল করুণা রুটি মিস্রি দু'পয়সায় এক প্রতিবেশীকে বিক্রি করে সেই পয়সা দিয়ে তামাক কিনে এনেছে। তামাকের ঘোর নেশা। রাত্রিতে ছেলেকে বার বার ডেকে তুলে তামাক সাজিয়ে দিতে বলে। নিজে শুয়ে থাকে। এত অলস।

মেম সাহেব প্রস্তাব করলেন, তোমাকে সেলাইয়ের কাজ দেব, সে কাজ করলে কিছু উপার্জন হবে। করুণা সন্তুষ্ট নয়; বলল, "আপনি ধনবান লোক, দীনহীনকে একটা টাকা অমনি ফেলিয়া দিলে আপনকার কিছু ক্ষতি হইবে না।"

সংসারের সকল কাজ করে সেলাইয়ের সময় নেই। সেলাই না করলেও করুণা মারা পড়বে না, ভগবানই চালিয়ে নেবেন।

কয়েক দিন পরে করুণাদের বাড়ী গিয়ে লেখিকা দেখলেন সিঁড়ির উপরে বসে করুণা কাঁদছে এবং মাথার ক্ষত থেকে তার গাল বেয়ে রক্ত পড়ছে। স্বামী মেরেছে। তাঁকে দেখে করুণা বলতে লাগল, "বিবেচনা করুন আমি অতি দুর্ভাগা, আমি কোথা হইতে সুন্দর ঘর ও পরিষ্কার বস্ত্র পাইতে পারি? ও মেম সাহেব, যদি ঘরের মধ্যে মিষ্টবাক্য বলে, তবে দুই দিন অনাহারে থাকিলেও থাকা যায়; কিন্তু এইরূপ নিত্য ঝকরা মারামারি ইত্যাদি আমি আর সহ্য করিতে পারি না। হায়! আমার মৃত্যু হইলে ভাল হয়।"

মেমসাহেব প্রশ্ন করলেন, স্বামী কেন মেরেছে?

"করুণা উত্তর করিল, মেমসাহেব বলি শুনুন। আজি আমি তাবৎ দিন কিছু খাইতে না পাইয়া তিনটা বেলার সময়ে ফুলমণির নিকটে দুইটি পয়সা চাহিয়া আনিলাম; পরে তদ্দারা কতকগুলিন ছোট ছোট মাছ কিনিয়া রাত্রিতে ইহা রান্ধিব এমত মনে করিয়া সেই মাছ কুটিয়া ধুইয়া রাখিতেছি, এমন সময়ে আমার স্বামী আর দুইজন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঘরে আইল। তাহারা সকলে কিঞ্চিৎ মত্ত ছিল, তাহাতে আমার স্বামী বড় রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওগো, ভাত তৈয়ার আছে কি না? আমি উত্তর দিলাম, চারিটার সময় ভাত হয়? মাতাল হইয়া কি বলিতেছ, তুমি তাহা জান না; আর তুমি কে, যে তুমি ভাত চাহিতে আসিয়াছ? খরচের নিমিত্ত কি তুমি পয়সা দিয়াছিলা? সে এই কথা শুনিয়া কোটা মাছের চুপড়িকে মাছসুদ্ধ লাথি মারিয়া নর্দমাতে ফেলিয়া কহিল, হুই এমত কথা বলিস? আমি যদি পয়সা না দিই, তবে এই মাছ কি প্রকারে আপনার জন্য যোগাইয়া রাখিয়াছিলি?"

এই বলে সঙ্গীদের নিয়ে করুণার স্বামী চলে গেল। যাবার সময় করুণাকে মেরে গেছে। মেমসাহেব করুণাকে বুঝিয়ে বললেন, মাতালকে তিরস্কার করে কোনো লাভ নেই; বরং তাতে ফল উল্টো হয়। মাতাল হলে তো লোকের জ্ঞান থাকে না। বরং তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে ফল হবার আশা আছে। স্বামীকে যখন ত্যাগ করা যাবে না তখন ধৈর্য ধরে তার চরিত্রের পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে।

করুণার বড় ছেলে বংশী বাবার মতোই দুশ্চরিত্র। মাত্র পনেরো-ষোলো বছরেই এই অবস্থা। তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু সে বড় ছেলে; ওর জন্মের পরে পাঁচ বছর আর কোনো সন্তানাদি হয়নি। সুতরাং বংশীর উপর করুণার আকর্ষণ বেশি। মেমসাহেব ছোট ছেলে নবীনকে খানসামার কাজে নিযুক্ত করবেন স্থির করলেন। তাহলে করুণার দুঃখ হয়তো একটু লঘু হবে। করুণার মনেরও একটু পরিবর্তন হয়েছে। করুণা নিজেই সেলাইয়ের কাজ [illegible] মেমসাহেবের

কাছে। স্বামী ও ছেলের উপর নির্ভর করে কিছু হবে না।

পরদিন করুণা নবীনকে মেমসাহেবের বাঙলোয় পৌঁছে দিতে এলো। এতটুকু ছোট ছেলেকে চাকরি করবার জন্য অচেনা পরিবেশে রেখে যেতে খুব দুঃখ হচ্ছিল। তবু উপায় নেই। করুণা নবীনকে রেখে বিদায় নেবার সময় কাতর কণ্ঠে বলল, মেমসাহেব, ও আর আমার ছেলে নয়, এখন থেকে আপনার ছেলে হলো।

কয়েকদিন পরে বংশীর শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হয়েছে খবর পাওয়া গেল। রাত্রিতে আর এক জন সঙ্গীর সহিত সে গিয়েছিল মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি চুরি করতে। গৃহস্বামীর তাড়া খেয়ে অন্ধকার রাত্রিতে গভীর পুকুরের জলে পড়ে ডুবে মরেছে। করুণা পুত্রশোকে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠল।

লেখিকা অসুস্থ হওয়ায় অনেক দিন করুণার সংবাদ নিতে পারেন নি। প্রায় দেড় মাস পরে এসে দেখলেন করুণার দেহ শীর্ণ, মন বিমর্ষ এবং সংসারের অবস্থা পূর্বের চেয়েও খারাপ। স্বামীর স্বভাব পরিবর্তন হয়নি। তিনি যখন করুণার সঙ্গে কথা বলছেন তখনই গ্রামের চৌকিদার মাতাল স্বামীকে ধরে নিয়ে এলো। মেম সাহেব বললেন, ওকে ভালো করে শুইয়ে দাও।

করুণা তাড়াতাড়ি মাদুর পেতে যত্ন করে স্বামীকে শুইয়ে দিল। মাতাল স্বামী করুণার কাছ থেকে কখনো এমন যত্ন পায়নি। নেশায় তার চেতনা স্তিমিত, চোখ বন্ধ। সে ভাবল কোনো বারবণিতা অর্থের লোভে তার যত্ন করছে। "করুণার এমত নূতন ব্যবহার দেখিয়া তাহার মাতাল স্বামী তাহাকে কিছু মাত্র চিনতে না পারিয়া বিছানাতে শুইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল, এ বেটী বড় ভাল মানুষ, ইহার ঘরে বরাবর আসিব।"

মেম সাহেব করুণার হাতে দুটি টাকা দিয়ে বললেন, তুমি স্বামীর যত্ন কোরো; মাতালকে গালমন্দ করে লাভ নেই।

পরে লেখিকা সংবাদ নিতে এসে করুণার মুখে শুনলেন সেদিনের বিবরণ। করুণা বলল, যখন জ্ঞান হলো তখন নবীনের বাপকে বললাম, চান করে এসো, আসতে আসতে আমার রান্না হয়ে যাবে।

—আমার জন্য এত করছ কেন? ফুসলিয়ে পয়সা নিতে চাও?

কঠোর কথা মুখে এলো; কিন্তু আপনার উপদেশ মনে করে চুপ করে রইলাম। "পরে সে পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আইলে আমি একটা মাদুর দাবায় বিছাইয়া তাহাকে ইলিস মাছের ব্যঞ্জন ও ভাল অম্ল ও ভাত আনিয়া দিলাম।"

সে বড় আশ্চর্য হলো। কেন এ-সব? বললাম, আর কোনো কারণ নেই, শুধু তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই। হেসে বলল, আমার বড় ভাগ্য। "পরে কোমর হইতে গেঁজিয়া বাহির করিয়া সে তাহা আমার সম্মুখে ফেলিয়া হাসিয়া কহিল, যাহা হউক করুণা, আজি তুমি ভুলাইয়া আমার পয়সাগুলিন লইলা; অতএব যাহা উহাতে থাকে বাহির করিয়া লও। গেঁজিয়াতে কেবল চারিটি পয়সা ছিল, তথাপি তাহা লইয়া নবীনের বাপকে বলিলাম, তোমার নিকটে এই যে চারিটি পয়সা পাইলাম, ইহাতে আমার বিস্তর বোধ হইল।"

স্বামীর নিকট হতে জীবনে সে কিছু পায়নি। সুতরাং এই চারটি পয়সাই তার কাছে অনেক মনে হলো।

এর পর থেকে ধীরে ধীরে স্বামীর পরিবর্তন হতে লাগল। মদ খাওয়া ছেড়ে সে কাজকর্মে মন দিল। করুণা স্বামীকে ফিরে পেল। এতদিন তার জীবন ছিল শূন্য; তাই সংসারের কাজে মন ছিল না; ধর্মের কথা ভাবেনি। স্বামীকে পেয়ে তার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠল। ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলো; গির্জায় যেতে আরম্ভ করল। এখানেই করুণার জীবনের পরিণতি।

লেখিকা

"ফুলমণি ও করুণার" লেখিকা যে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন মহিলা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একশ' বছরেরও পূর্বে বিদেশী সমাজের কথা বিদেশী ভাবায় এমন সুন্দর করে বলা কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। "ফুলমণি ও করুণার" চরিত্রগুলির উপর লেখিকার গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। খৃস্টধর্ম কাহিনী ও চরিত্রগুলি আচ্ছন্ন করতে পারেনি। চরিত্র-চিত্রণে লেখিকা কোথাও কোথাও যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা সেই যুগের তুলনায় বিশেষ প্রশংসনীয়।

লেখিকার পিতা ফ্রাঁসোয়া লাক্রোয়া ফরাসী সুইজারল্যান্ডের এক গ্রামে ১৭৯৯ খৃস্টাব্দের ১০ই মে জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি কাকার বাড়ী থেকে লেখাপড়া শেখেন। শিক্ষা সমাপ্ত করবার জন্য তাঁকে হল্যান্ড যেতে হয়। সেখানে তখন পৌত্তলিকদের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য নেদারল্যান্ডস্ মিশনারী সোসাইটি গঠিত
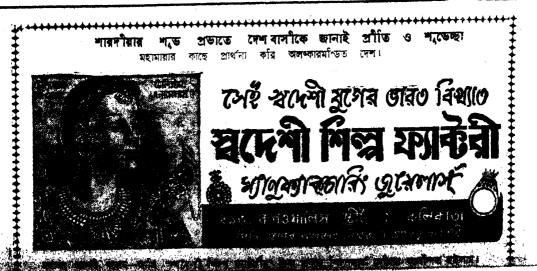
...সমিতির তখনো এমন লোক- ...না যে নিজেরাই বিদেশে প্রচার চালাবেন। তাই তাঁরা লণ্ডন মিশনারী সোসাইটিকে কিছু কিছু লোক ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। লাক্রোয়া মিশনারী দলে নাম লেখালেন, এবং লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির কর্মী হিসেবে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ চিনসুরা পদার্পণ করলেন।

"ফুলমণি ও করুণার" লেখিকা হান্না ক্যাথেরিন লাক্রোয়া ১৮২৬ খৃস্টাব্দের ১লা জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় তখন য়ুরোপীয় মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুবিধা ছিল না। সুতরাং হান্না বাড়ীতেই শিক্ষা লাভ করেছেন। বাড়ীতে বাঙালী ভৃত্য ছিল; তাদের কাছ থেকে বাঙলা শেখার সুযোগ হয়েছে। বাঙলায় কথা বলতে পারতেন অনর্গল; বাঙলা বই পড়াও শিখেছেন। ভবানীপুরে মিশনের নতুন কেন্দ্র খোলার পর বাঙালী বালিকাদের জন্য সেখানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলো। হান্না সেই স্কুলে প্রত্যহ একটি করে ক্লাশ নিতেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো। অনর্গল বাঙলা বলতে পারতেন বলেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে পড়াতে দিয়েছিলেন।

১৮৪১ খৃস্টাব্দে পিতা-মাতার সঙ্গে হান্না ইংলণ্ড যান। লণ্ডনে মিসেস র‍্যামজে নামক এক ভদ্রমহিলার তত্ত্বাবধানে ১৮ মাস শিক্ষালাভ করেন। তারপর সুইজারল্যাণ্ড ঘুরে কলকাতা ফিরে এলেন।

১৮৪৫ খৃস্টাব্দের ১৯শে জুন মিঃ জে মুলেন্সের সঙ্গে হান্নার বিবাহ হয়। স্বামী বাবার মতোই মিশনের কর্মী ছিলেন। সুতরাং তাঁদের কর্ম ও আদর্শের সুন্দর সামঞ্জস্য ঘটল। হান্না মেয়েদের স্কুল পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করলেন। সন্তানদের দেখা শোনা ছাড়া অন্য সব সময় তাঁর মাথায় ঘুরত স্কুলের কথা। মিশন স্কুল হলেও তিনি ছাত্রীদের দেশীয় প্রথায় জীবন যাপনে উৎসাহ দিতেন।

১৮৫৮ খৃস্টাব্দে মিঃ মুলেন্সকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইংলণ্ড যেতে হয়। হান্নাকেও যেতে হলো। কিন্তু লণ্ডনে থেকেও তাঁর সর্বদা মনে পড়ত বাঙলা দেশের কথা। তিন বৎসর পরে (১৮৬১) তিনি আবার কলকাতা এসে স্ত্রী-শিক্ষার কেন্দ্রগুলির ভার গ্রহণ করলেন।

১৮৫২ সালে "ফুলমণি ও করুণা" প্রকাশিত হবার পর লেখিকা হিসেবে হান্না খৃস্টান মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর বাবা কিন্তু বই প্রকাশ করা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, মিশনারীদের প্রচারের লোভ থাকা উচিত নয়। কিন্তু হান্নার মনের ঝোঁক সাহিত্যের উপর। তখনকার দিনের নামকরা সকল ইংরেজ সাহিত্যিকের রচনা তো নিয়মিত পড়তেনই, তাছাড়া বাঙলা সাহিত্যের কোনো ভালো বই পড়তেও তিনি বাকি রাখেননি। হান্না উপলব্ধি করলেন যে তাঁর যাদের মধ্যে কাজ করতে হয় সেই বাঙালী মেয়েদের হৃদয় স্পর্শ করা যেতে পারে একমাত্র সহজ ও মনোজ্ঞ করে লেখা বাঙলা বইয়ের সাহায্যে। কলকাতা ফিরে এসে তিনি নতুন বাঙলা রচনায় হাত দিলেন। বাবার মৃত্যু হয়েছে: বই ছাপালে এখন আর তাঁর অসন্তোষভাজন হতে হবে না।

নতুন বাঙলা বইটি ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই শেষ করতে হবে—এই তাঁর সংকল্প। তাই প্রত্যহ নিয়ম করে লিখতে আরম্ভ করেছেন। ২০শে নবেম্বর (১৮৬১), বুধবার, প্রাতরাশের পর থেকে এগারোটা পর্যন্ত লিখে স্কুলে গেলেন একটা ক্লাশ নিতে। এক ঘণ্টা পরে ফিরে এসে আবার লিখতে বসলেন; মিনিট কুড়ি লেখার পর কে একজন এলো। তার সঙ্গে নতুন বাঙলা বইয়ের গল্পের প্লটটা আলোচনা করতে করতে হঠাৎ পেটে তীব্র বেদনা অনুভব করলেন। উত্তরোত্তর ব্যথা বাড়তে লাগল। ডাক্তারের ওষুধে বিন্দুমাত্র ফল হলো না। ২১শে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে হান্না পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পরে পরীক্ষা করে জানা গেল যে অন্ত্রের একটা ধমনী ছিঁড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এই বিদেশী মহিলা বাঙলা লিখতে লিখতে মৃত্যু বরণ করলেন। ভাবতেও শ্রদ্ধা হয়। তাঁর অসম্পূর্ণ বইটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

যতদূর জানতে পেরেছি শ্রীমতী মুলেন্স নিম্নলিখিত পুঁথিপত্রগুলি রচনা করেছিলেন:

(১) ফুলমণি ও করুণা;

২। The Missionary on the Ganges, or what is Christianity? (ইংরেজী ও বাঙলা সংস্করণ)

৩। Miss Tucker কৃত "Daybreak in Britain"-এর বাঙলা অনুবাদ।

৪। Travels of a Bible (বাঙলা)

(৫) স্বামীর সঙ্গে পিতার জীবনীর "হোম লাইফ" অধ্যায়টি।

প্রথম, দ্বিতীয় (ইংরেজী সংস্করণ) ও পঞ্চম রচনাগুলি দেখবার সুযোগ হয়েছে। অন্যগুলি দেখতে পাইনি।

সিঁড়ি

সুশীল রায়

অবিনাশ থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কিছু বললেন?"

অবিনাশের মুখের দিকে তাকায় পুলকেশ, বলে, "হাঁ। বললাম। তবে তোকে না।"

তবে কাকে কি বললেন তার বাবু? বুঝতে পারে না অবিনাশ। সে গিয়ে ঢোকে রান্নাঘরে। ডাল-সোমবারা দেয়।

হাঁচতে থাকে পুলকেশ পাকড়াশি। হাঁচতে হাঁচতে বলতে থাকে, "কী আরম্ভ করলি রে, অবিনাশ?"

কড়াইয়ের মধ্যে ডালের ভগবগানি শব্দে পুলকেশের গলা চাপা পড়ে যায়। অবিনাশ কোনো উত্তর দেয় না।

মন্দ লাগছে না এ-রকমের জীবনটা। রোমাঞ্চ আছে, কিন্তু কোনো রোমান্স নেই। এত কাছে, তবু মনে হয় দুস্তর এক পাহাড়ের ব্যবধান।

মাত্র দুটি ঘর পুলকেশের। দু-ঘরের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই, গলির গায়ের সিঁড়িটা ছাড়া। একটু বেখাপ্পা ধরনেরই ব্যবস্থা। নীচের ঘর থেকে উপরের ঘরে পুলকেশকে যেতে হলে প্যাসেজে নেমে কয়েক পা হেঁটে গলির দরজা ভেদ ক'রে সিঁড়ি ধরতে হয়।

পাশাপাশি দুটি ঘর অনেক খুঁজেছে পুলকেশ। পায়নি। পেলেও পছন্দ হয়নি। তাই অগত্যা এই খাপছাড়া ব্যবস্থার দুটি ঘর নিতে হয়েছে।

একা মানুষ, একটা ঘর হলেই চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু তবু একটা ঘরে তার কুলায় না।

বউ নেই বটে। কিন্তু আছে বই। অজস্র বই। প্রথম প্রথম পড়ার ঝোঁক ছিল, সেই ঝোঁকে বই কিনত, বা জোগাড় করত। এখন পড়ার ঝোঁক [illegible]

কিন্তু বইয়ের বাতিক কাটেনি। প্রত্যহ দু-একটা ক'রে পুরনো বা নতুন বই জোগাড় করা চাই-ই। বাতিক কাটেনি, বরঞ্চ বেড়েছে।

উপরের ঘরটা বইয়ে ঠাসা। নীচের ঘরেও সিলিঙ পর্যন্ত কাঠের ফ্রেম উঠেছে ঠেলে এবং সেই ফ্রেম বেয়ে বেয়ে বই।

বইয়ের প্রাচীরের মধ্যে দিন যাপন করে পুলকেশ পাকড়াশি। একঘেয়ে ঠেকত, কিন্তু একঘেয়েমিটা কাটানোর জন্যেই এখনো বই কিনতে হয় প্রায় প্রত্যহ।

উপরের ঘরে সে যায় মাঝে মাঝে। বইয়ের ধুলো ঝাড়তে, কিংবা উই ধরল কি না দেখতে।

একটি চাকর আছে। অবিনাশ। রান্না করা, বাসন মাজা, বাজার করা যাবতীয় কাজ করে সে-ই। রান্নার ব্যবস্থাও নীচে। তিনকোণা উঠোন, তার গায়েই চৌবাচ্চা আর রান্নাঘর।

"একা মানুষের পক্ষে খাসা ব্যবস্থা।" পুলকেশ যখন খুব ফাঁকা ফাঁকা বোধ করে ঠিক তখনি তার মুখ দিয়ে এই [illegible]

পুলকেশের বন্ধুভাগ্য ভালো। অনেক বন্ধু। সকলেই বিবাহিত। সকলেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে-দুঃখে দিন কাটিয়ে চলেছে।

এই বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ হচ্ছে জনার্দন। পাঁচটি পুত্রের পিতা সে।

প্রত্যেক রবিবার সকালে জনার্দনের বাসায় আসা পুলকেশের বাঁধা। এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। পুলকেশ জনার্দনকে রসিকতা ক'রে ডাকে সত্যবান।

ফার্ন প্লেসে জনার্দনের বাসা। ডোভার লেন থেকে বেশি দূরে না। পুলকেশ একডালিয়া রোড ধরে সোজা চলে আসে টেম্পোরারি পার্ক পর্যন্ত, সেখান থেকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ক্রস ক'রে ফার্ন রোড হয়ে চলে আসে জনার্দনের ডেরায়।

কড়া নাড়ে পুলকেশ, ডাকে, "কই হে, সত্যবান। বাড়ি আছ?"

দরজা খুলে দাঁড়ায় সাবিত্রী, বলে, "আসুন। আজ যেন একটু দেরি হয়ে গেল?"

[illegible] পুলকেশ বলল, "[illegible]

একটু হল। ঠিক ন'টায় আসি। আজ নটা সাত হল।"

"তাই উনি বলছিলেন, আজ বুঝি এলেন না।"

পুলকেশ বলল, "আপনার উনি গেলেন কোথায়?"

"আসছেন।"

চৌকির উপর খবরের কাগজ ছড়ানো। সাবিত্রী কাগজগুলো কুড়িয়ে গোছ করে নিয়ে ভিতরে চলে যাচ্ছিল।

পুলকেশ বাধা দিল, "ও কি, কাগজ নিয়ে পালাচ্ছেন কেন? এমন মধুর সানডে, মুখরোচক খবরাখবর কত থাকে আজ। দেখি বসে বসে।"

"খবরের কাগজ তো পড়বেন কলা। দু-বন্ধুতে মিলে এখন রাজা-উজির মারতে বসবেন। বসুন। এক্ষুনি দিয়ে যাচ্ছি কাগজ।"

পুলকেশ বলল, "থাক্‌গে। কাগজ চাইনে। সত্যবানকে দিয়ে যান তো একটু জলদি ক'রে।"

বলতে বলতেই জনার্দন এসে হাজির। বলল, "এসেছ?"

"এসেছি। কিন্তু তুমি নাকি আমার আশা আজ ছেড়ে দিয়েছিলে?"

"দিয়েছিলাম। ঘড়ির কাঁটা দেখে চল তুমি। সময় মেপে মেপে। আজ কটা মিনিট বাজে ব্যয় হয়ে গেল তো?"

"গেল!"

জনার্দন বলল, "যাক্‌ গে। কী হবে তোমার সময় পুষে রেখে। আইবুড়ো জীবনটা টেনে চলা মানেই সময়কে হত্যা করা—বাজে ব্যয় করার চেয়েও নিষ্ঠুর কাজ।"

পুলকেশ বলল, "কে শিখিয়ে দিল ভায়া এ-কথা? এ তো তোমার ভাষা নয়।"

হেসে ফেলল জনার্দন।

সাবিত্রী এসে দাঁড়াল, মুখে তার হাসি, চোখে কৌতুক।

জনার্দন বলল, "চেয়ে দ্যাখ পুলকেশ। পাঁচটি ছেলের মা ইনি। তবু দ্যাখ স্বাস্থ্য, দ্যাখ ফুর্তি। বয়স যেন দিন দিন ও'র কমছে। আর তুই, আজ পর্যন্ত একটি স্ত্রীরও হাসব্যান্ড হতে পারলি নে, তবু দিন দিন বুড়িয়ে যাচ্ছিস, আর গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিস। এভাবে কদ্দিন চলবি?"

পুলকেশ সাবিত্রীর দিকে চেয়ে বলল, "সত্যবানকে তো সত্য কথা বলতে বেশ শিখিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে নমস্কার। একে এক্ষুনি দাঁড়ে বসিয়ে দিন বৌদি। আমি হলপ করছি কাকাতুয়াকে ও হার মানাবে।"

সাবিত্রী হেসে উঠল। কিন্তু কেন হাসল তা পুলকেশও বুঝি বুঝতে পারল না, বলল, "হাসি না বৌদি। সিরিয়াসলি বলছি। কিন্তু কই, কাগজ রেখে এলেন কোথায়। না পড়ি, একটু ছবি-টবি দেখি—কত ছবি আজ কাগজে ছড়ানো।"

"আনছি।" সাবিত্রী একটু দাঁড়াল, বলল, "আপনার বাসায় কটা ঘর?"

"জানেন তো।"

"দুটো ঘর। একটা আমাকে দিতে হবে। তার জন্যে ভাড়া দেব।"

পুলকেশ ঘুরে বসল জনার্দনের দিকে, বলল, "কি হে সত্যবান, রাগারাগি হল নাকি? ডাইভোর্সও হয়ে গেল নাকি?"

জনার্দন বলল, "কি জানি! ও'র কি মতলব।"

সাবিত্রী বলল, "দুটো ঘর আপনার লাগে না। অযথা ঘরটা আটক করে রাখবেন কেন?"

"কেন। আমার বই।"

"বই যেমন আছে তেমনি থাকবে। ভাবনা নেই। কিন্তু রাজি হতে হবে আপনাকে।"

জনার্দন মুচকে মুচকে হাসতে লাগল। কোনো মন্তব্য করল না সে।

সাবিত্রী ভিতরে চলে গেল। এবং তক্ষুনি ফিরে এল খবরের কাগজ হাতে নিয়ে। পাতা খুলে বের করল একটা সংবাদ, ঠিক সংবাদ নয়—একটা বিজ্ঞাপন। সেটা মেলে ধরল পুলকেশের সামনে।

মন দিয়ে, একবার দুবার তিনবার পড়ল পুলকেশ। যেন মানে বুঝতে পারল না। সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকাল, জনার্দনেরও।

জনার্দন বলল, "বুঝলাম না। সকাল বেলা থেকে ওই বিজ্ঞাপনটা নিয়ে তোলপাড়। ঠিক নটায় তুমি আস। উৎকণ্ঠভাবে তোমার জন্যে ব'সে। ন'টা পার হয়ে গেল দেখে হতাশা। তারপর তো দেখছি এই উল্লাস।"

সাবিত্রী বলল, "এই মেয়েটি পেয়িং গেস্ট থাকতে চায়।"

"কোথায়?"

"আপনার বাসায়।"

"মেয়েটি কে?"

"কী ক'রে বলব? বিজ্ঞাপনটার একটা জবাব দিলেই জানা যাবে। দেখুন-না প'ড়ে—পূর্ববঙ্গীয়া সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছাত্রী, কলিকাতায় ভদ্রপরিবারে পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকিতে চান। ছাত্রীটি আগামী বৎসর এম এ দিবেন। প্রয়োজন হইলে তিনি বাড়ির মেয়েদের পড়াইতে প্রস্তুত। বক্স নম্বর ৯৬—"

আর্তনাদ করে উঠল যেন পুলকেশ, বলল, "ভদ্রপরিবার দূরের কথা। আমার পরিবার কোথায়?"

সাবিত্রী বলল, "চুপ করুন। পরিবারেরই খোঁজ করা হচ্ছে। আমি আজ চিঠি দিয়ে দিচ্ছি।"

পুলকেশ উঠে দাঁড়াল, বলল, "দারুণ কনস্‌পিরেসি। সত্যবান, এই চক্রান্তের তুমি হলে চাঁই। আমি পালাই ভাই।"

"পালিয়ে বেশি দূর যেতে হবে না।" সাবিত্রী বলল, "আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু। ভয় কি? আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কও থাকবে না। সে থাকবে উপরের ঘরে। অবিনাশই রাঁধবে দুজনেরটা। উপরের খাবার উপরে দিয়ে আসবে।"

পুলকেশ একটু থামল, বলল, "বাথরুম?"

"দোতলায় ইরা থাকে, তাদের ব'লে আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব। আপনার ভাবতে হবে না।"

জনার্দনের দিকে তাকাল পুলকেশ, বলল, "ব্যাপার কী হে। কথা বল। বাধা দাও। বৌদি যে ক্ষেপে গেছেন।"

জনার্দন বলল, "আমার সাধ্য নেই। উনি যা বলবেন, সে-কথা মানতে আমি বাধ্য।"

ভিতর থেকে আওয়াজ এল, "মা মা মা।"

পুলকেশ বলল, "আপনাকে ডাকছে কে?"

সাবিত্রী সহাস্যে বলল, "আমার বড় পুত্র।"

চমকে উঠল যেন পুলকেশ, বলল, "তার মানে?"

সাবিত্রী বলল, "কাকাতুয়া।"

হেসে উঠল পুলকেশ। জনার্দনও যোগ দিল সে হাসিতে।

ভিতরের বারান্দায় দাঁড়ে বসে এতক্ষণ ঝিমুচ্ছিল কাকাতুয়াটা। বাইরের ঘরে এদের কলকল কথা শুনে তার ঘুম ভেঙে গেছে।

পুলকেশ জনার্দনের দিকে চেয়ে বলল, "তোমার জন্যে আর একটা দাঁড় আমি কিনে দিয়ে যাব।"

সাবিত্রী বলল, "দেবেন। তার আগে আমাকেও কথা দিয়ে যান। আমি জবাব দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু।"

"আমি পালাই।" বলেই দরজা ফাঁক ক'রে চট করে রাস্তায় নেমে গেল পুলকেশ।

পুলকেশ চলে গেলে জনার্দন বলল, "বয়স হয়ে গেছে, তাই মেয়েদের ভয় পায়।"

"মেয়েদের ভয় পাওয়া ভাল।" সাবিত্রী বলে উঠল, "তোমাদের মত এত নির্ভীক হওয়াও ভাল না। গ্রাহ্যই কর না মোটে।"

ও-প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে জনার্দন বলল, "সামাজিক বিপ্লবই বলতে হবে। মেয়েরাও পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে চায়। মেয়েরাও খুব নির্ভীক হয়ে উঠেছে, তাই না?"

একথার উত্তর দিল না সাবিত্রী। একটু থেমে বলল, "দাঁড়াও-না। তোমার বন্ধুকে কাবু আমি করবই। ভীষ্মকে ভস্ম করে দেব।"

"কিন্তু মেয়েটা ও-ভাবে থাকতে রাজি হবে?"

"দেখা যাক।"

মন্দ লাগছে না তো এ-রকমের জীবনটা। রোমাঞ্চ আছে, কিন্তু কোনো রোমান্স নেই।

"অবিনাশ।"

"বাবু!"

অবিনাশের দিকে না তাকিয়ে পুলকেশ জিজ্ঞাসা করে, "উপরে চা দিয়ে এসেছিস?"

"হাঁ।"

একটু থামে পুলকেশ, কোঁচা দিয়ে বইয়ের মলাট মুছতে মুছতে যেন অন্যমনস্ক হয়ে কি কথা বলতে কি বলে ফেলছে এইভাবে বলে, "কী করছে দিদিমণি?"

"পড়ছে।"

রাগ হয় অবিনাশের উপর। এমন কাটাকাটা রসকষহীন উত্তর দিতে সে শিখেছে কোথায়। একটা কথার উত্তর দিতে হলে পুরো একটা সেণ্টেন্স দিয়ে উত্তর যে দিতে হয় এই সামান্য নিয়মটা এখন ওকে শেখাতে বসবে এমন মনও নেই এমন মেজাজও নেই পুলকেশের। বলে, "ভাগ্।"

ভেগে যায় অবিনাশ। বেশি দূরে না। তার দৌড় যে পর্যন্ত। রান্নাঘরে।

উপরের ঘরে যাতায়াতের রাস্তা একটু ঘুরপথে বটে, কিন্তু উপরের ঘরটা নীচের ঘরের ঠিক উপরেই।

শব্দ হয় উপরের ঘরে। পায়ের শব্দ। সমস্ত শরীর অস্থির-অস্থির ঠেকতে থাকে পুলকেশের। চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে আছে সে তার চৌকিতে, ওই শব্দ শুনে তার মনে হচ্ছে তার বুকের উপরে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে যেন একটি গুরুভার জীব।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে পুলকেশ, ডাকে, "অবিনাশ। অবিনাশ."

রান্নাঘরেই অবিনাশের থাকার ব্যবস্থা। সেখান থেকে সে বাবুর গলা শুনে প্রায় ছুটে আসে, বলে, "বাবু।"

"বাবু বাবু কোরো না, অবিনাশ। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। উপরে কিসের শব্দ হচ্ছে দেখে এস।"

হতভম্ব হয়ে যায় অবিনাশ। বাবুর মেজাজ হঠাৎ এমন গরম হয়ে গেল কেন, [illegible]

এসে গলিতে নেমে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি ধ'রে উপরে উঠে এসে কড়া নাড়ে।

দরজা খুলে দাঁড়ায় নীলিমা সেন। "কি রে, কি ব্যাপার?"

মাথা নীচু ক'রে দাঁড়ায় অবিনাশ, বলে, "উপরে কিসের শব্দ, বাবু জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"শব্দ? শব্দ কোথায়? আচ্ছা, গিয়ে বল ওটা পায়ের শব্দ। আমি চলাফেরা করছিলাম।"

অবিনাশ নেমে এসে পুলকেশকে খবরটা দিতেই পুলকেশ তেতে উঠল, বলল, "ইডিয়ট। এই কথা জিজ্ঞাসা করতে তোকে কে বলেছে? ভাগ্।"

ভেগে গেল অবিনাশ।

অবিনাশের আর ভালো লাগছে না। এবার তার ইচ্ছে—সত্যিই সে ভাগবে। একেবারে কিছু না জানিয়ে।

নীলিমা সেন আছে বেশ মজায়। যে ভদ্রলোকের সে পেয়িং গেস্ট তাঁর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, দেখাসাক্ষাৎ নেই, কিন্তু তার যত সম্পর্ক দোতলার পাশের ফ্ল্যাটের তিন বোনের সঙ্গে—ইরা, ধীরা আর নীরা।

ইরা বলল, "আপনার হোস্টের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করুন।"

হেসে উঠল ধীরা, বলল, "অজ্ঞান হয়ে যাবেন তা হলে ভদ্রলোক।"

"তার মানে?" নীলিমা ওদের মুখের দিকে তাকাল।

নীরাও হাসছিল, বলল, "ভীষণ নার্ভাস লোক। আমরা তিন বোন তো হতকুৎসিত দেখতে, আমাদের দেখে কোনো পুরুষ এতটুকু বিগলিত হয় না, নার্ভাস হওয়া দূরের কথা। কিন্তু গলিতে হঠাৎ যদি কোনো দিন মুখোমুখি হয়েছি ওঁর, ওরে সর্বনাশ! দেয়ালের সঙ্গে আঠা হয়ে লেগে যান ভদ্রলোক—রাস্তা ছেড়ে দেন আর-কি।"

একটু থেমে নীরা বলল, "আপনার মত এমন রূপসী আর বিদুষী মেয়ে ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, দিব্যি ক'রে বলতে পারি উনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন।"

টিপ্পনি কাটল ধীরা, বলল, "অর্থাৎ জ্ঞানহারা।"

ইরা কথা বলছিল না, এবার মুখ খুলল সে, বলল, "ঠিক বলেছিস তোরা। বিয়ে-না-হওয়া মেয়েদের বয়স হয়ে গেলে তারা হয় স্টেডি, আর বিয়ে-না-হওয়া পুরুষদের বয়স হয়ে গেলে তারা হয় শেকি। আমাদের তিন বোনকে দেখে নিশ্চয় এতদিনে বুঝেছেন যে, আমাদের নার্ভ খুব স্টেডি?"

হাসতে আরম্ভ করল নীলিমা সেন। ওদের [illegible]

বয়স হয়েছে ওদের অনেক। ঠিক কত, তা বলতে পারা যাবে না বটে, কিন্তু চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে গেছে। দেখতে ভালো না বলেই হয়তো বিয়ে হয়নি।

নীলিমা সেন বলল, "কোনো ঝুঁকি নিয়ে দরকার নেই। ভদ্রলোকের সঙ্গে করতে গিয়ে বিভ্রাট বাধিয়ে লাভ কী। আলাপ-পরিচয় না করলেও চলবে। ভদ্রতা আপনাদের বন্ধু আছেন, তিনি যা করবার করবেন।"

"কে? সাবিত্রী? ওকে চেনেন না, ওর কিন্তু মতলব বড় খারাপ। থাকে সাদাসিধে। পেটে পেটে জিলিপির প্যাঁচ। নিশ্চয় আপনিও টের পেয়েছেন ইতিমধ্যে।"

ইঙ্গিতটা বুঝল নীলিমা। কিন্তু না-বোঝার ভান করে সে দাঁড়িয়ে রইল।

এই ভাবে দিন বয়ে চলেছে। দিন যতই বয়ে চলেছে পুলকেশের কাছে দিন যেন ততই দুর্বহ হয়ে উঠছে। এ-রকম একটা দম-আটকানো অসম্ভব অবস্থার মধ্যে সে টিকতে পারবে না।

সকালে ঘুম ভাঙার পর বিছানায় শুয়ে শুয়েই পুলকেশ এইসব কথা ভাবছে। কাল রাত্রে তার ঘুমের ভীষণ ব্যাঘাত ঘটেছে। অনবরতই তার মনে হয়েছে উপরে কিসের শব্দ; আবার কান পেতেও কোনো রকমের শব্দ শুনতে না পেয়ে মনে হয়েছে—হঠাৎ সব এমন স্তব্ধ হয়ে গেল কেন। এক মর্মান্তিক দুশ্চিন্তায় তার রাত্রি কেটেছে।

অবিনাশ এসে দাঁড়াল পাশে।

"কি চাই?"

"দিদিমণি দিলেন।" বলে অবিনাশ কতকগুলো কাগজ দিল পুলকেশের হাতে।

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে সেগুলো নিয়েই পুলকেশ বলল, "কি এসব?"

অবিনাশ বলল, "টাকা।"

"টাকা? টাকা কিসের?" উঠে বসল পুলকেশ, "যা, এক্ষুনি ফিরিয়ে দিয়ে আয়।"

কথাটা বলেই পুলকেশ একটু কি যেন ভাবল, বলল, "দাঁড়া। আমিই যাচ্ছি।"

হাতমুখ ধুলো না পুলকেশ, কাপড়টা পরল না গুছিয়ে, জামাটা গায়ে চাপিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

সোজা সে চলে এল ফার্ন প্লেসে, একেবারে সাবিত্রীর সামনে এসে দাঁড়াল, বলল, "রক্ষে করুন। এই নিন টাকা। এই নিন চাবি। আমি চললাম।"

"রোসো। রোসো। রোসো।" প্রায় ছুটে এল জনার্দন, বলল, "হল কি? পৌঁছে গেছি, সে শেষ করবে না? আজকে [illegible] কি দরকার?"

আজ আর সত্যবান না। আজ তার আসল নাম ধরেই কথা বলল পুলকেশ, বলল, "না জনার্দন। আমাকে এ-ধরনের অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলা তোমাদের ঠিক হয়নি। তোমাদের কাছে যা খেলা আমার কাছে তা ইয়ে।"

সাবিত্রী হাসতে লাগল, বলল, "টাকা নিতে যদি ইজ্জতে বেধে থাকে, নেবেন না। পেয়িং গেস্ট হিসেবে না রেখে ওকে গেস্ট ক'রে নিন।"

"না। ওসব রসিকতা ভালো লাগছে না। হয় আমি যাই, না হয় ও যাক।"

সাবিত্রী বলল, "অসহায় মেয়েটা যাবে কোথায় শুনি।"

"আমি জানিনে।" বলেই পুলকেশ চলে যাচ্ছিল।

বাধা দিল জনার্দন, "উত্তেজিত হোয়ো না পুলক। যা হোক, একটা ব্যবস্থা করা হবে।"

সাবিত্রী বলল, "টাকাটা রাখুন আপনার কাছে। আমি গিয়ে ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আসব।"

পুলকেশ চলে গেল। উস্কোখুস্কো চুল এবড়ো দাড়ি নিয়ে পাগলাটে পাগলাটে পা ফেলতে ফেলতে সে ফিরে চলল তার ডেরায়—ডোভার লেনে।

প্যাসেজের মুখেই মস্ত বাধা পেল পুলকেশ। যথাসম্ভব দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিল সে।

মেয়েটা একটু দাঁড়িয়ে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, "পেয়েছেন?"

মুখ তুলে তাকাল পুলকেশ। কে এ, ঠিক চিনতে পারছে না তো সে। অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করল, "কে?"

নীলিমা। মেয়েটা বলল, "অবিনাশের হাত দিয়ে পাঠিয়েছি সকালে। আমাকে চিনতে পারেননি নিশ্চয়। আমার নাম নীলিমা সেন। আপনার পেয়িং গেস্ট।"

হাত জোড় ক'রে নমস্কার করতে গিয়ে পুলকেশের হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে নোট পড়ে গেল।

কুড়িয়ে দিতে গেল নীলিমা, বাধা না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পুলকেশ। নোট-কয়টা তুলে পুলকেশের হাতে দিতে গেল সে। এবার বাধা দিল পুলকেশ, বলল, "থাক। সাবিত্রী দেবীর সঙ্গে কথা বলবেন।"

নিদারুণ বিব্রত অপ্রতিভ আর অপ্রস্তুত হয়ে গেল নীলিমা, দেখল, সে যা পাঠিয়েছিল সেই কয়টি টাকাই সে কুড়িয়ে তুলেছে। তার মনে হল, বুঝি কম হয়ে গেছে। বলল, "আমার সঙ্গে সাবিত্রী দেবীর যে কথা হয় তাতে কিন্তু এই অ্যামাউন্টই ঠিক হয়েছিল।"

পুলকেশের উস্কো চুলগুলো এই কথা শোনামাত্র আরো যেন এলোমেলো আর কণ্টকিত হয়ে উঠল বলে মনে হল তার। পালিয়ে গেল পুলকেশ।

পুরো একটি মাস কেটে গিয়েছে। দিন গুনে গুনে সে-হিসাব করে নি পুলকেশ, কিন্তু আজকের এই লেন-দেনের ঘটনাটা তাকে মনে করিয়ে দিল যে, একটা মাস কাটল।

ঘরে এসে আয়নায় মুখ দেখতে লাগল সে। ইশ, এই রকম একটা বীভৎস চেহারা নিয়ে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে হল তাকে। কী যে মনে করল মেয়েটা, তার ঠিক নেই। এ সব-কিছুর জন্যে দায়ী হচ্ছে জনার্দন ও সাবিত্রী। তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই আর রাখবে না পুলকেশ। অন্তরঙ্গ! অন্তরঙ্গ বলে বুঝি এই রকম অন্তর্ঘাতী কাজ করতে হয়?

কী লজ্জা! কী সংকোচ! বলে কিনা, এই রকম অ্যামাউন্টের কথাই ছিল। পুলকেশকে কি সে একটা শাইলক মনে করল নাকি!

কিন্তু ভালো হয়েছে এক দিক থেকে। টাকাটা যথাস্থানে পৌঁছে তো গেছে। এবার, আবার নেওয়া কি না-দেওয়া নির্ভর করবে পুলকেশের নিজের উপর।

পুলকেশ ডাকল, "অবিনাশ।"

অবিনাশ এসে দাঁড়ালে বলল, "দিদিমণি যদি আবার কিছু দিতে চায়, নিবি নে। বুঝলি?"

কি বুঝল অবিনাশ তা অবিনাশই জানে, তবু সে ঘাড় কাৎ ক'রে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দাড়ি কামাতে বসল পুলকেশ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম হতে হবে তাকে। কী রকম একটা ভাল্লুকের মত চেহারা নিয়ে আজ ভদ্রমহিলার সামনে পড়ে গিয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা পুলকেশ সারাদিনের কাজকর্ম সেরে একটু ক্লান্ত হয়েই বসে আছে তার ঘরে, তার মনের দুশ্চিন্তার মত তার সম্মুখে রাখা চায়ের বাটি থেকে ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে।

কয়েকটা পায়ের শব্দ বাজছে উপরের ছাদে। এক জোড়া পা চলাচল করলে এত শব্দ হতে পারে না। দুশ্চিন্তা যেন আরো দ্বিগুণ হয়ে উঠল পুলকেশের। তার পেয়িং গেস্টের আবার কোনো গেস্ট এল নাকি?

কিছুক্ষণ পরে পুলকেশকে চমকে দিয়ে ঘরে ঢুকল কে এ?

ব্যস্ত হয়ে পুলকেশ চৌকি থেকে প্রায় লাফিয়ে নেমে এল।

"আহা হা। বড় হতাশ হলেন। নীলিমা না, আমি।" সাবিত্রী হাসতে লাগল।

"আসুন। আসুন। বসুন। কি খবর বলুন।" একটা মোড়া এগিয়ে দিল পুলকেশ।

সাবিত্রী মুচকে হাসল, বলল, "আর বসব না। পালাই। নিজেরা নিজেরা তো রফা করে নিয়েছেন। আমাকে আর এর মধ্যে জড়ানো কেন?"

সুইচ টিপে দিয়ে পুলকেশ বলল, "বুঝলাম না।"

"আমরাই কি কিছু বুঝলাম? সকালে অত মেজাজ দেখে হন্তদন্ত হয়ে এসে শুনি সব মিটমাট হয়ে গেছে।"

"হেঁয়ালি রেখে কি হয়েছে বলুন।"

মোড়া একটু টেনে নিয়ে বসল সাবিত্রী, বলল, "শুনলাম, টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছেন, অনেক কথা হয়েছে আপনাদের দুজনের, গলিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"

"কে বলেছে?"

"উপর থেকে এইমাত্র নেমে এলাম।"

উত্তেজিত হয়ে উঠল পুলকেশ, বলল, "এই-সব বলল বুঝি? এত বড় লায়ার—"

আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিল পুলকেশ, জিভ সংযত করে নিল, বলল, "কিন্তু ঘটনাটা একেবারে অ্যাক্সিডেন্ট।"

সাবিত্রীর সঙ্গে নীলিমার যা-যা কথা হয়েছে, সব পুলকেশকে সে জানাল। পুলকেশ টাকা নিতে রাজি না, তার প্রেস্টিজে লাগে; পেয়িং গেস্ট না হয়ে কেবল গেস্ট হিসেবে রাখলেও রাখতে পারে; কিন্তু তাতে প্রেস্টিজে লাগে নীলিমার। এক অচেনা অজানা অপরিচিত লোকের গলগ্রহ হয়ে থাকবে কেন সে? এ-বাড়িতে মেয়েও নেই যে, বাড়ির মেয়েদের পড়িয়ে সে থাকতে পারে। এ-ক্ষেত্রে সাবিত্রী পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, এ-মাসের টাকা আর দিতে হবে না। এবার থেকে নতুন জায়গা খুঁজতে হবে নীলিমাকে, যে-কদিন জায়গার ব্যবস্থা না হয় পুলকেশকে বলে-কয়ে সে কদিন এখানেই থাকার ব্যবস্থা সাবিত্রী করে দেবে অবশ্য। হয় পুলকেশ যাক নয় নীলিমা যাক—এই রকম নাকি পুলকেশের ইচ্ছে। এ-কথাও সাবিত্রী জানিয়ে এসেছে নীলিমাকে।

বিবরণ শুনে পুলকেশ বলল, "করেছেন কি?"

"অন্যায় করি নি।"

"অন্যায় না হতে পারে, কিন্তু ভদ্রতা—"

"খুব হয়েছে।" সাবিত্রী বলল, "সকাল-বেলা এই ভদ্রতার জ্ঞান ছিল কোথায়?"

"সত্যিই এইসব বলেছেন?" পুলকেশ জিজ্ঞাসা করল।

"সত্যি না তো কী? আপনাকে এসে বানিয়ে ব'লে আমার লাভ কী? একটা মেয়ের উপকার করতে গিয়ে যা শিক্ষা হবার খুব হয়েছে, তার উপর আবার কথা বানাব?"

সাবিত্রী উঠে দাঁড়াল। বাধা দিল পুলকেশ, বলল, "চা হয়ে এল কিন্তু।"

"দরকার নেই। আপনার কথায় ফেরবার সময় হয়ে এল। ফিরে আমাকে না দেখলে বাড়ি মাথায় করবেন।"

"ইশ! এত ভাব বুঝি?" একটু রসিকতা করার চেষ্টা করল পুলকেশ।

"হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। এমনি ভাবই রাখতে হয়। ঘরে তো জেনানা নেই, বুঝবেন কি? আমি চলি। উপরে চা পাঠিয়ে দিন। কলেজ করে হয়রান হয়ে এসে বসে আছে।"

আর দাঁড়াল না সাবিত্রী। বড় বড় পা ফেলে চলে গেল।

লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেল পুলকেশ। সাবিত্রী দেবীর পেটে জিলিপির এমন প্যাঁচ কে জানত। মেয়েটাকে চট করে একটা আলটিমেটাম দিয়ে চলে গেল। এ-যেন ভাড়াটে উচ্ছেদের নোটিশ।

রান্নাঘরের দরজায় এসে উঁকি দিল পুলকেশ, বলল, "এতক্ষণেও চা হল না অবিনাশ। ক্লাস ক'রে তোর দিদিমণি এসে গেছে সেই কখন। যা শিগগির, চা-খাবার দিয়ে আয়।"

অবিনাশ খাবার নিয়ে উপরের ঘরে চলে গেল। পুলকেশ তার নিজের ঘরে বসে বসে পায়ের শব্দ শুনে শুনে অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগল অবিনাশের দিদিমণি এখন কি করছেন।

দিন কাটছে বড় অশান্তিতে আর উদ্বেগে। কিছুদিন আগেও যে রোমাঞ্চটা ছিল, এই উদ্বেগে তা উধাও হয়ে গিয়েছে। কী মন্ত্র যে দিয়ে গেছে সাবিত্রী, ঠিক নেই। একেবারে লজ্জাকর গ্লানিকর অপমানকর। হয় পুলকেশ থাকবে, নয় ও। এমন কথা কখনো কোনো মানুষকে কেউ বলে! চক্ষু-লজ্জা বলেও তো কথা আছে!

উদ্বেগে তাই দিন কাটে পুলকেশের। বিনা নোটিশে হঠাৎ হয়তো একদিন বলবেন ঐ ভদ্রমহিলা, "আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম। এবার চলি।"

কষ্টের কথা যদি বলেন তিনি, তবে তা সত্যি। কষ্টভোগ পুলকেশকে করতে হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু কিসের কষ্ট, তা আবার বুঝিয়ে বলা আরো কষ্ট। কিন্তু তার পরের চলে যাওয়ার কথাটাই বড় সাংঘাতিক। যেন রাখতে না পেরে অতিষ্ঠ হয়ে তাড়িয়ে দিল পুলকেশ।

সাবিত্রী দেবী মানুষটা বড় সুবিধের নয়। জনার্দন কী ক'রে যে এতদিন ধরে ওঁকে টলারেট করছে তা জনার্দনই জানে!

বিদায় নেবার জন্যে কখন যে নীলিমা সেন এসে হাজির হবে তার দরজায়— এ এক সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা হয়েছে পুলকেশের। বিদায় নিয়ে চলে যাওয়াটা গুরুতর ব্যাপার কিছু নয়, একদিন যাবেনই। কিন্তু এ-ভাবে [illegible]

তা ভাবতে বসলেই পুলকেশের মাথা গরম হয়ে ওঠে।

যাক গে। আর ভাববে না পুলকেশ। দুশ্চিন্তাকে আর প্রশ্রয় দিতে সে নারাজ।

দিন-কয়েক এইভাবে কাটার পর অতিষ্ঠ হয়ে উঠল পুলকেশ। চীৎকার ক'রে ডাকল সে অবিনাশকে।

অবিনাশ এসে দাঁড়াবামাত্র রুদ্ধশ্বাসে সে বলে ফেলল, "উপরে যা। দিদিমণিকে বল, আমি আসছি। আমার বইগুলো একবার দেখে আসব।"

অবিনাশও রওনা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল পুলকেশ।

সিঁড়ি ভেঙে সে সরাসরি ঢুকতে গেল ঘরে। দরজার কাছে ধাক্কা খেল অবিনাশের সঙ্গে। বেচারা খবরটা দিয়েই বেরিয়ে আসছিল।

সচকিত হয়ে উঠল নীলিমা সেন, বলল, "আপনার বই সব ঠিক আছে, কোনো কিছুতে আমি হাত দিই নি।"

আজ পুলকেশ যেন নির্ভীক, যেন এক যোদ্ধার সাহস নিয়ে সে এসেছে এখানে, লজ্জলজ্জা লোকলজ্জা আত্মসংকোচ কিছুই তার নেই।

পুলকেশ বলল, "আপনি চলে যাচ্ছেন শুনলাম।"

"কে বলল?"

"শুনেছি। একটা মিথ্যা ধারণা নিয়ে চলে গেলে অন্যায় করবেন।"

"কি ধারণা? কিসের ধারণা?" ব্যাকুল-ভাবে প্রশ্ন করতে লাগল নীলিমা, "এ-কথা উঠল কিসে বুঝতে পারছি নে।"

কথা হারিয়ে গেল পুলকেশের, একথার পর কী কথা বলতে হবে খুঁজতে লাগল সে। বলে ফেলল, "ফর গড্‌স্ সেক চলে যাবেন না।"

বলেই তরতর ক'রে নেমে চলে গেল পুলকেশ।

ইরা ধীরা নীরা ওপাশ থেকে হুটপাট ক'রে এসে ঢুকল ঘরে, বলল, "ব্যাপার কি, ব্যাপার কি? কে এসেছিল?"

"মিস্টার পাকড়াশি।"

চমকে গেল তিন বোন, বলল, "কেন?"

"বই খুঁজতে।"

কথাটা শুনতে যেন ভুল হল এমনি ভান ক'রে হাত দিয়ে কান আড়াল ক'রে বলল, "কি? কি খুঁজতে?"

"বই।"

"আও আরো। আমরা ভাবলাম হয়ে।"

নীরা বলল, "কি যেন বলে গেলেন [illegible]

হয়ে থাকতে চান বুঝি? তার প্রস্তাব পেশ ক'রে গেলেন বুঝি?"

নীলিমা গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল। এদের কথায় সে বিব্রত হচ্ছে। কিন্তু পুলকেশ তাকে হঠাৎ অমন ভগবানের দোহাই দিয়ে গেল কেন—সে চিন্তাও বিভোর করছে তাকে।

তিন বোন তক্ষুনি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বলতে বলতে গেল—"জবর খবর। সাবিত্রী-দিকে খবর দিতে হয় এক্ষুনি।"

দুই কান গরম হয়ে উঠতে লাগল নীলিমার। চৌকির উপর বসে দুই হাতের বেড়ে দু-হাঁটু ধ'রে সিলিঙের দিকে চেয়ে সে ভাবতে বসল আকাশ-পাতাল।

নীচের ঘরে বসে গলদঘর্ম হচ্ছে পুলকেশ পাকড়াশি। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কী কথা বেরিয়ে গেল! আশ্চর্য!

আনোয়ারীবাঈ ঘরে ঢুকতেই মনোহর প্রসাদ উঠে দাঁড়াল। হাত কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন করল তারপর নিজের মেহেদীপাতার রংয়ে ছোপানো দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল।

আনোয়ারীবাঈ কার্পেটের ওপর বসলেন। মনোহরপ্রসাদের মুখোমুখি। আজকাল বেশীক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। কোমর টন টন করে। বাতের মরশুম শুরু হয়েছে। ভরা শীতকালে আর উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবে না। মাঝে মাঝে আনোয়ারী বাঈয়ের খুবই আশ্চর্য লাগে। মনেই হয় না, বছর বারো আগে হাঁটু মুড়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গেয়েছেন। রাত ভোর হয়ে গিয়েছে ঠুংরী আর গজলে। এখন একটা দুটো গান গাইতে গেলেই হাঁপ ধরে।

—কি ব্যাপার ভাইসায়েব, ভোর ভোর? আনোয়ারীবাঈ চুল-সরু খাঁজ ফেললেন কপালে। এত ভোরে ঘুম ভাঙানোতে মেজাজ খুশ নয় মোটেই।

—একটা জরুরী খবর ছিল, মনোহর প্রসাদ দাড়ি ছেড়ে হাঁটুতে হাত বোলাতে আরম্ভ করল। মুখে একটু হাসি হাসি ভাব।

আগের দিনে ঠিক এমনিভাবেই মনোহর প্রসাদ খবর আনতো। ছিপছিপে ফরশা চেহারা, হাতের ছোঁয়ায় তবলা যেন কথা বলত। মুজরো নিয়ে বাইরে যাবার সময় আনোয়ারীবাঈ সব সময়ে মনোহরপ্রসাদকে সঙ্গে নিতেন। কোন ঝামেলা নেই, বদ অভ্যাস নয়। ঘাড় হেঁট করে নিজের কাজ করে যেত। আনোয়ারীবাঈয়ের শুধু তবলচীই ছিল না মনোহরপ্রসাদ, এধার ওধার থেকে খবরের টুকরোও সেই সংগ্রহ করত।

—আজ রায়-বেরিলির খান-সায়েব এসেছেন। এখানে থাকবেন হপ্তা খানেক। খান সায়েব ঠুংরীর বড় ভক্ত, দেখি একবার যোগাযোগ করে। কাল পরশু আপনার কোন বায়না নেই তো কোথাও?

মনোহরপ্রসাদ জিজ্ঞাসুদৃষ্টি মেলে চাইত আনোয়ারীবাঈয়ের দিকে।

—না বায়না আর কোথায়, আনোয়ারীবাঈ ঘাড় নাড়তেন, বায়না থাকলে আর তুমি জানতে পারতে না?

তা ঠিক। মনোহরপ্রসাদও ঘাড় নেড়েছে। এমনি নানা খবর।

—আজ রাতে মীর্জা হোসেন আসবেন গান শুনতে। সন্ধ্যার ঝোঁকে মনোহরপ্রসাদ সংবাদ আনল।

—আজ রাতে? সর্বনাশ! বিস্ময়ে আনোয়ারীবাঈ চোখ কপালের মাঝবরাবর তুলেছেন, আজ যে ডাক্তার জনার্দন সুকুল আসবেন, তিনদিন আগে খবর পাঠিয়েছিলেন?

ও ঠিক আছে, নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিয়েছে মনোহরপ্রসাদ, আমি তাঁকে বারণ করে এসেছি। বলেছি আপনার তবিয়ৎ খারাপ। দিন সাতেক পরে আসর বসবে।

—কিন্তু কাজটা কি ঠিক হল ভাই সায়েব। আনোয়ারীবাঈ আমতা আমতা করেছেন।

মীর্জা হোসেন কাল সকালে হায়দ্রাবাদ ফিরে যাচ্ছেন। [illegible]

এ মুখো হবেন না। আর সুকুল সায়েব তো ঘরের লোক।

আনোয়ারীবাঈ রাজী। কোনদিন মনোহর প্রসাদের কথার ওপর কথা বলেন নি। এটুকু জানতেন, মনোহরপ্রসাদ যা করবে আনোয়ারীবাঈয়ের ভালোর জনাই। নিজের দিকে চাইবে না, গায়েও মাখবে না দুঃখ কষ্ট। সুকুল সায়েবের চেয়ে মীর্জা হোসেন পয়সা কম ঢালবে বলে নয়, হোসেন সায়েব গানের অনেক বেশী সমঝদার। ঠিক জায়গায় তারিফ করতে জানেন, বুঝতে পারেন গলার সূক্ষ্ম কাজের কেরামতি। সুকুল সায়েবের এ সবের বালাই নেই। গান শুরু হতেই তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়েন। ঠিক গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে ঘাড় নেড়ে বলেন, কেয়াবাত! কেয়াবাত! বড় মিঠে গলা বাইজীর। ভারি মিঠে।

আজ নিশ্চয় এ সব কথা বলতে মনোহর প্রসাদ আসে নি। গান ছেড়ে দিয়েছেন আনোয়ারীবাঈ। মনোহরপ্রসাদও আর তবলা ছোঁয় না। গান বাজনার সম্পর্ক নেই, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক ঘোচে নি। সময় পেলেই মনোহরপ্রসাদ ঘুরে যায় একবার। পা মুড়ে বসে ফেলে আসা সুখ-দুঃখের গল্প চলে। জমানা বিলকুল বদলে গেছে, সে সম্বন্ধে আক্ষেপ।

আনোয়ারীবাঈ বিস্মিত হলেন, হেসে বললেন, আর জরুরী খবরে দরকার কি ভাইসায়েব। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এবার যা কিছু জরুরী খবর আসবে একেবারে ওপার থেকে।

মনোহরপ্রসাদ এ কথার কোন উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে কার্পেটের একটা ফুল খুঁটতে খুঁটতে আস্তে বলল, মোতি এসেছে শহরে।

মনোহরপ্রসাদের কথার টুকরো কানে যেতেই আনোয়ারীবাঈ টান হয়ে বসলেন। একটা হাত রাখলেন কানের পাশে। মনোহর প্রসাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, কে এসেছে? কে এসেছে শহরে?

মনোহরপ্রসাদ মাথা তুলল, গলাও চড়াল একটু, মোতি এসেছে, মোতি। খবরের কাগজে বেরিয়েছে মেজর বর্মা লক্ষ্ণৌতে বদলি হয়েছেন।

বুঝতে বেশ একটু অসুবিধা হল আনোয়ারীবাঈয়ের। অস্পষ্ট কতকগুলো হিজিবিজি রেখা। অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন। বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলেন কিছুক্ষণ, মোতি, মোতিবাঈ, মোতিবাঈ এসেছে শহরে।

দু একদিনের কথা নয়। দেড় যুগেরও বেশী তখন কত বয়স মোতির। বড় জোর পাঁচ কি ছয়। দু পাশে বেনী দোলানো, রঙীন শালোয়ার পাজামা পরা ফুটফুটে মেয়ে। ছুটে ছুটে বেড়াতো এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি। দুনিয়ার লোকের সঙ্গে দোস্তি। চেয়ে চেয়ে আনোয়ারীবাঈয়ের আশ আর মিটতো না। কোনদিন যে মনের মানুষের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল আনোয়ারীবাঈ, পাতানো নয়, সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী, পরের যুগের গজল-ঠুংরী-খেয়ালের সুরে বাঁধা জীবন নয়, পা ফেলা নয় তবলার বোলের তালে পা মিলিয়ে, মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখে ঘেরা জীবন, সামাজিকতার গণ্ডীর মধ্যে সাবধানে পা ফেলে চলা, মোতি আনোয়ারীবাঈয়ের সেই ফেলে আসা জীবনেরই চিহ্ন।

শুধু মাঝে মাঝে আনোয়ারীবাঈ চমকে উঠতেন। আগুন জ্বলে উঠত মাথায়। যখন দু একজন গানের ওস্তাদ, আশপাশের দু একজন রহিস আদমি মোতিকে আদর করতে করতে বলত, আর কেন আনোয়ারী, এবার মেয়েকে গান বাজনা শেখাতে আরম্ভ কর। এখন থেকে শুরু করলে তবে বয়সকালে মার মতন মিঠে গলা পাবে, নাম রাখবে লক্ষ্ণৌর।

মুখে আনোয়ারীবাঈ কিছু বলেন নি, কিন্তু মনে মনে শিউরে উঠেছেন। মানুষজন সব সরে যেতে, বাড়ি খালি হয়ে যেতে মোতিকে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদেছেন। মোতির ঠোঁটে, গালে চুমু খেতে খেতে বলেছেন, না, তোকে আমি কিছুতেই এ পথে নামতে দেবো না। কিছুতেই না।

মনের ইচ্ছাটা আড়ালে ডেকে মনোহর প্রসাদকে বলেওছিলেন অনেকবার।

—মোতিকে আমি সরিয়ে দিতে চাই এখান থেকে। নাচ গান হৈ হল্লা এসব যেন ওর জীবনে কোনদিন না আসে।

মনোহরপ্রসাদ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো। এ আবার কি কথা। আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়ে গান বাজনা শিখবে না তো বেনারস গিয়ে মালা জপবে বসে বসে? তীর্থধর্ম শুরু করবে উঠতি বয়সে?

তীর্থধর্ম করবে কেন এ বয়সে? সংসার করবে। মনের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ঘর পাতবে।

নিজের ফেলে আসা সাজানো সংসারের কথা ভেবেই আনোয়ারীবাঈ উদ্গত নিশ্বাস চাপলেন।

ঘর সংসার করবে মেয়ে। তা বেশ, কিন্তু জেনে শুনে চকের আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়েকে কে এগিয়ে আসবে বিয়ে করতে। ওড়না ফেলে কে মাথায় ঘোমটা দেওয়াবে। দু একজন কাঁচা বয়সের কাঁচিডানা মেলে সবে উড়তে শেখা ছোকরা হয়তো রাজী হতেও পারে। বিয়ের ভড়ং করে নিয়ে গিয়ে ফুর্তি করবে কদিন। তারপর শখ মিটলে কিংবা বাপের দেওয়া মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেলে ফেলে পালাবে মোতিকে। তখন!

কাজটা যে সোজা নয়, তা আনোয়ারীবাঈ ভালই জানেন। আর জানেন বলেই মনোহর প্রসাদকে ডেকেছেন শলা-পরামর্শ করতে।

একটা উপায় আছে। আনোয়ারীবাঈ এগিয়ে এসে একটা হাত রাখলেন মনোহর পসাদের হাতের ওপর।

কি উপায়? মনোহরপ্রসাদ নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল।

বার কয়েক ঢোক গিললেন আনোয়ারী-বাঈ। কপালে জমে ওঠা ঘামের বিন্দু সুরভিত রুমাল দিয়ে মুছে নিলেন, তার-পর বললেন, এমন করা যায় না ভাইসায়েব, আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়ে নয় মোতি। ছেলে-বেলায় মা-বাপ হারা কোন অনাথা মেয়ে। তিন কুলে দেখবার কেউ নেই। কোন ভদ্র-লোক যার ছেলেপিলের সাধ অথচ ভগবান কিছু পাঠান নি কোলে, তেমন কেউ মোতিকে নিতে পারে না? নিজের মেয়ের মতন মানুষ করতে পারে না?

সর্বনাশ, বিলিয়ে দেবেন মেয়েকে! কিন্তু মেয়েকে ছেড়ে আনোয়ারীবাঈ বাঁচবেন কি করে?

—আনোয়ারীবাঈ বাঁচতে চায় না। মেয়েকে বাঁচাতে চায়! আনোয়ারীবাঈয়ের গলা ধরাধরা।

মনোহরপ্রসাদ বোঝাতে চেষ্টা করল। ব্যাপারটা আনোয়ারীবাঈ ভাল করে ভেবে দেখুন। হঠাৎ উচ্ছ্বাসের ঘোরে এমন একটা কাজ করলে আফসোসের অন্ত থাকবে না। শেষ জীবনে যখন পঙ্গুত্বের অভিশাপ নামবে, দেহ জরাগ্রস্ত হবে, হাজার চেষ্টাতেও গলায় মিঠেসুর ফুটবে না, তখন এই মেয়েকে আশ্রয় করেই তো বাঁচতে হবে। এরই রোজগারে দিন কাটাতে হবে। আর কি অবলম্বন থাকবে?

অবলম্বন? আনোয়ারীবাঈ হাসলেন। করুণ হাসি। মনোহরপ্রসাদের দিকে চেয়ে বললেন, শেষ জীবনে মেয়ের চেয়ে আরো বড় কিছু অবলম্বনের খোঁজ করব ভাই সায়েব। সারাটা জীবন তো ছিনিমিনি খেললাম নিজেকে নিয়ে, তখন মালেকের কথা ভাববো। তাঁর হাতেই ছেড়ে দেবো নিজেকে।

এর ওপর আর কথা চলে না। তবু মনোহরপ্রসাদ একবার শেষ চেষ্টা করল, কিন্তু মোতি থাকতে পারবে আপনাকে ছেড়ে?

আনোয়ারীবাঈ আবার হাসলেন, মানুষের পরমায়ুর কথা কেউ বলতে পারে?, হঠাৎ যদি মারাই যায় আনোয়ারীবাঈ, তাহলেও তো আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে মোতিকে। হাজার কাঁদলেও আমাকে ফিরে পাবে না। না, ভাইসায়েব, আনোয়ারীবাঈ গলায় সুর নরম করলেন, ভেজা ভেজা স্বর, একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে। মোতিকে আমি এ নরকে বাড়তে দেবো না। ওকে কোথায়ও সরিয়ে দিতেই হবে। তুলে দিতে হবে কোন ভদ্র মানুষের হাতে।

মনোহরপ্রসাদ ঘাড় নেড়েছিল বটে, কিন্তু কোন সুবিধা করতে পারে নি।

আনোয়ারীবাঈ ভোলেন নি কথাটা। গান-বাজনার শেষে ক্লান্ত দু'টি চোখ তুলে সেই এক মিনতি জানিয়েছিলেন মনোহর প্রসাদকে। আর দেরী নয়, মেয়ে বড় হচ্ছে। বুঝতে শিখছে। যা কিছু করতে হয়, এই বেলা। গাছ একটু বড় হয়ে গেলেই তাকে ওপড়ানো মুশকিল। মাটির গভীরে চলে যায় শিকড়, ডালপালা বিস্তৃত হয় দিকে দিকে, তখন টানাটানি করতে গেলে ক্ষতিই হয়। লক্ষ্ণৌতে সে রকম কেউ না থাকে, মনোহরপ্রসাদ আশপাশে ঘুরে দেখুক। ঘোরবার সব খরচ আনোয়ারীবাঈ দেবেন, কিন্তু আর দেরী নয়।

বরাত ভালো মনোহরপ্রসাদের। এদিক ওদিক ঘুরতে হয়নি। কাছে পিঠেই খোঁজ পাওয়া গেল। সুন্দরবাগে নতুন এক ভদ্রলোক এসেছেন, স্ত্রীকে নিয়ে। যে বাড়িতে উঠেছেন, সেই বাড়িওয়ালা মনোহর প্রসাদের দোস্ত। কথায় কথায় ব্যাপারটা তার কাছ থেকেই জানা গেল।

ভদ্রলোক সরকারের বড় চাকরে। সারা ভারতবর্ষে চাকরির অন্ন ছড়ানো। ঘুরে ঘুরে সেই অন্ন খুঁটে তুলতে হয়। বছর তিনেক পর পর বদলি হন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা। পয়সাকড়ি, ইমানইজ্জত সব আছে, কেবল সুখ নেই। বছর চারেকের ফুটফুটে একটি মেয়ে ছিল, আজমগড়ে দুদিনের জ্বরে মেয়েটি শেষ। চিকিৎসার সুযোগও পাওয়া গেল না। সেই থেকে ভদ্রলোকের স্ত্রী অনবরত কাঁদেন আর বুক চাপড়ান। অভিশাপ দেন ভগবানকে। ভদ্রলোক এসব কিছু করেন না। অফিসের সময়টুকু ছাড়া চুপচাপ ঘরে বসে [illegible] দরজা জানলা বন্ধ করে।

মনোহরপ্রসাদ আসমানের চাঁদ পেল হাতের মুঠোয়। তকলিফ ক'রে আসমানে চড়তে হ'ল না, চাঁদ নিজেই যেন নেমে এসে ধরা দিল।

দোস্তের মারফৎ আলাপ হল। প্রথম প্রথম দু-একটা সান্ত্বনার মোলায়েম কথা, মিঠে মিঠে উপদেশ, দুনিয়ায় কিছুই স্থায়ী নয় সে সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা। তারপর আস্তে আস্তে কথাটা পাড়লো। খুব সাবধানে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মনোহর প্রসাদের দিকে তারপর ধীরগলায় বললেন, কিন্তু যাদের মেয়ে তারা ছাড়বে কেন?

ছাড়বে কেন! মনোহরপ্রসাদ কপালে হাত চাপড়ালেন, বাপ গেছে অনেকদিন, মা যে অবস্থায় আছে, দুবেলা দুখানা রুটিও দিতে পাচ্ছে না মেয়েকে। কোনদিন দেখবো মা আর মেয়ে দুজনেই খতম হয়ে গেছে। নয়তো, মা কি আর সহজে ছাড়তে চায় মেয়েকে।

ভদ্রলোক উঠে ভিতরে গেলেন, বোধহয় পরামর্শ করলেন স্ত্রীর সংগে, তারপর বাইরে এসে বললেন, একবার দেখাতে পারেন মেয়েটাকে।

—বহুৎ খুব, বলেন তো কালই নিয়ে আসতে পারি?

বেশ। তাই নিয়ে আসবেন।

সোজা মনোহরপ্রসাদ আনোয়ারী-বাঈয়ের সংগে দেখা করল। সব ঘটনা জানাল। পরের দিন সকালে মোতিকে নিয়ে যাবে তাও বলল।

মনোহরপ্রসাদ ভেবেছিল, সব ঠিকঠাক হলে আনোয়ারীবাঈ বোধহয় রাজী হবেন না। প্রাণ ধরে ছাড়তে পারবেন না মেয়েকে। কিন্তু আনোয়ারীবাঈ একটুও আপত্তি করলেন না। সামান্য বাধাও নয়। কেবল বললেন, লোক বেশ ভালো তো ভাইসায়েব? মোতির কোন কষ্ট হবে না?

—নিজের পেটের মেয়ে হারিয়েছে, এখন যাকে নেবে, তাকে নিজের মেয়ের মতনই মানুষ করবে। আর তাছাড়া লোক খুব ভদ্র। খানদানী ঘরের ছেলে, শুনেলাম লেখাপড়াও খুব জানে।

আনোয়ারীবাঈ আর কিছু বললেন না, কিন্তু পরের দিন মনোহরপ্রসাদ মোতিকে নিতে গিয়েই অবাক। দামী শালোয়ার, দোপাট্টা পায়জামায় ঝলমল করছে মেয়ে। গলায় মুক্তার মালা, কানে পান্নার দুল। পায়ে ভেলভেটের নাগরা।

সর্বনাশ, এই বুঝি অভাব অনটনে দিন কাটানো মেয়ের পোশাকের বহর!

কথাটা মনোহর প্রসাদ বললো আনোয়ারী-বাঈকে।

—এত সব দামী জামা গয়না পরিয়েছেন কেন? গরিবের মেয়ে এই কথাই তো জানানো হয়েছে।

তবে? এই এতক্ষণ পরে একটু যেন ছলছলিয়ে এল আনোয়ারীবাঈয়ের চোখ। ভিজে ভিজে গলা।

—সব খুলে ফেলব?

মনোহরপ্রসাদ ভাবল দু এক মিনিট তারপর বলল, শালোয়ার পাজামা না হয় থাক, গয়নাগুলো খুলে নিতে হবে।

আনোয়ারীবাঈ এক এক ক'রে সব খুলে নিলেন। মেয়েকে সারারাত ধরে বুঝিয়েছেন। নতুন জায়গায় গিয়ে বেফাঁস যেন কিছু না বলে ফেলে, কান্নাকাটি না করে। বাইরে যাবেন আনোয়ারীবাঈ। তীর্থ ধর্ম করতে। সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের যেতে নেই। ফিরে এসে মোতিকে তিনি নিয়ে আসবেন।

—কার কাছে যাবো মা। মোতি অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করেছে।

—তোমার কাকা কাকীর কাছে। দেখবে কত যত্ন করবে, ভালবাসবে, জিনিস কিনে দেবে।

মোতি আর কথা বলে নি। এখানে মায়ের সংগে তার সম্পর্ক কম। মাঝে মাঝে আনোয়ারীবাঈ শহরে যান মুজরো নিয়ে। খুব দূরে কোথাও নয়, ধারে কাছেই। কানপুর, বেরিলি, ফয়জাবাদ। সেই সময় মোতি থাকে বুড়ি ঝির কাছে। এখানে থাকলেও আনোয়ারীবাঈ ধারে কাছে ঘেঁষতে দেন না মেয়েকে। গান বাজনার আসরে এসে কাজ নেই। সারেংগীর সুরে আর তবলার বোলে শুধু সুর নয়, বিষও আছে। একবার নেশা ধরলে আর রক্ষা নেই।

মোতিকে নিয়ে যাবার সময় ধারে কাছে আনোয়ারীবাঈকে দেখা গেল না। এদিক-ওদিক চেয়েও মনোহরপ্রসাদ তাঁর খোঁজ পেলেন না।

ভদ্রলোকের নাম ব্রজবিলাস শকসেনা। আদি নিবাস মজঃফরপুর। বিলেতে ছিলেন বছর চারেক। স্ত্রী পর্দানসীন নন, কেবল আনকোরা শোক পেয়ে বাইরে বেরোনো বন্ধ করেছেন। মোতিকে দেখে ব্রজবিলাসবাবুর স্ত্রী পর্দা ঠেলে সদরে চলে এলেন। দুহাতে মোতিকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে ভেঙে পড়লেন কান্নায়। ব্রজবিলাসবাবু কাঁদলেন না বটে, কিন্তু তাঁর মুখ চোখের ভাবে মনে হ'ল, মেয়ের শোকটা আবার নতুন করে যেন দেখা দিল।

মোতিকে তাঁরা ছাড়লেন না। কথা হ'ল মনোহরপ্রসাদ বিকেলে এসে মোতিকে নিয়ে যাবে আবার পরের দিন সকালে মোতির জামাকাপড় বিছানাপত্র যা আছে সবশুদ্ধ নিয়ে আসবে। সেই সংগে মোতিকেও।

যাবার মুখে ব্রজবিলাসবাবু মনোহর প্রসাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

—একটা কথা ছিল।

—বলুন।

—কিছু টাকা, ওর মাকে দিতে চাই। যদি আপনি নিয়ে যান সংগে করে। মনোহর প্রসাদ দুহাত যোড় করল। বিনীত গলায় বলল, কসুর মাফ করবেন। টাকা দিতে ওর মা হয়তো রাজী হবেন না। তাহলে মেয়েকে বিক্রি করার সামিলই হবে। মেয়েকে মানুষ ক'রে তুলুন আপনারা, তাতেই উনি খুশী হবেন।

তারপর থেকে মেয়ের সংগে আর আনোয়ারীবাঈয়ের দেখা হয়নি। দেখা হয়নি বটে, তবে খোঁজ খবর পেয়েছেন মনোহর প্রসাদের মারফৎ। বছর তিনেক পরেই ব্রজবিলাস বদলি হলেন মীরাট, সেখান থেকে দেরাদুন ছুঁয়ে গেলেন আগ্রা। সব জায়গা থেকেই চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখে-ছিলেন মনোহরপ্রসাদের সংগে। চিঠিতে

বেশীর ভাগই মোতির কথা। মোতির মা যে বাইজী ছিলেন, সেকথা মোতির কাছ থেকেই তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কোন আক্ষেপ নেই। পিছন দিকে চাইতে আর তাঁরা রাজী নন। পুনর্জন্ম হয়েছে মোতির। আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়ে নয় মোতি, এখন সে মোতিকুমারী শকসেনা, ব্রজবিলাস শকসেনা, সিনিয়র অফিসরের একমাত্র মেয়ে।

তারপর বছর কয়েক কোন খবর নেই। পুরোনো ঠিকানায় চিঠি দিয়েও মনোহর প্রসাদ কোন উত্তর পাননি। হঠাৎ চিঠি এল মজঃফরপুর থেকে। লিখেছেন মায়াবতী শকসেনা, ব্রজবিলাসের বিধবা স্ত্রী। সামনের মাসে মোতির বিয়ে, আর্মি অফিসর মোহনচাঁদ বর্মার সংগে। তাঁর স্বামী হঠাৎই মারা গেছেন। অফিসের টেবিলে হার্টফেল ক'রে। এই বিয়েতে মনোহর প্রসাদ অনুগ্রহ করে যদি পায়ের ধুলো দেন তো সবাই কৃতার্থ বোধ করবে।

মনোহরপ্রসাদ যেতে পারেনি, কিন্তু আনোয়ারীবাঈকে পড়িয়ে শুনিয়েছিলো সে চিঠি। তখন আনোয়ারীবাঈয়ের অবস্থা পড়তির মুখে। রোগে ধরেছে। লোকের আসা-যাওয়া অনেক কম। প্রায় খালিই পড়ে থাকে জলসাঘর। বাড়িভাড়াও কিছু কিছু বাকি পড়েছে। ভাবছেন সরে গিয়েও কোথাও আরো ছোট বাড়ি ভাড়া করবেন। চকের আরো ভিতরের দিকে।

সেদিন বাক্স হাতড়ে একটা মুক্তার মালা বের করেছিলেন আনোয়ারীবাঈ। ঝুটো নয়, খাঁটি মুক্তা। বোম্বাইয়ের আমীর মকবুল আলির উপহার। খুব বড়ো বড়ো জায়গায় যেতে আসতে আনোয়ারীবাঈ গলায় দিতেন। মোতির বিয়েতে সেটাই পাঠিয়ে দিলেন।

বিয়েতে মনোহরপ্রসাদ যায় নি, কিন্তু দিন পাঁচেক পরে বিয়ের বিস্তারিত বিবরণ পড়েছিল খবরের কাগজের পাতায়। খুব ধুমধাম। দু হাজারের ওপর মাননীয় অতিথি। জাঁদরেল সব অভ্যাগতের লিস্ট। সে খবরও মনোহরপ্রসাদ আনোয়ারীবাঈকে শুনিয়েছিলো। আজকাল কি যে হয়েছে আনোয়ারীবাঈয়ের। বোধহয় বয়স হয়েছে বলেই, একটুতেই জল জমা হয় চোখের কোণে। দুটো ঠোঁট থরথরিয়ে কাঁপে, আর ঠিক বুকের বাঁ পাশে অসহ্য যন্ত্রণা। নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়।

বিড় বিড় করে বললেন আনোয়ারীবাঈ, একবার মোতিকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে। দূর থেকে একটু দেখে আসা।

মনোহরপ্রসাদ এ কথার কোন উত্তর দেয়নি। অবশ্য মায়াবতী শকসেনাকে চিঠি-পত্র লিখে মোতির সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো করা যায়, কিন্তু মেয়ে লক্ষ্মী হয়েছে, ভালো ঘরে, ভালো বরে পড়েছে, এইতো যথেষ্ট। চোখে দেখতে যাওয়া মানেই তো মায়া বাড়ানো। আরো কষ্ট পাওয়া।

মনোহরপ্রসাদ লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছিল।

তারপর কয়েক বছর আর কোন খোঁজ-খবর নেই। কোন চিঠিপত্রও দেননি মায়াবতী শকসেনা।

মাঝে মাঝে দেখা হলেই আনোয়ারীবাঈ বলেছেন, আর কটা দিনই বা বাঁচব, যাবার আগে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করছে মোতিকে।

মনোহরপ্রসাদ আমল দেয়নি। বলা যায় না মেয়েমানুষের মন। এমনিতে আনোয়ারীবাঈ খুব শক্ত, বাইরে কাঠিন্যের দুর্ভেদ্য আবরণ, কিন্তু চোখের সামনে নিজের মেয়েকে দেখতে পেলে, সে নির্মোক হয়তো খসে পড়বে। কেঁদে ফেলবেন আনোয়ারীবাঈ। অযথা একটা গোলমালের সৃষ্টি। আর্মি অফিসর মোহনচাঁদ বিরক্ত হবেন। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়াও বিচিত্র নয়।

হঠাৎ সকালে খবরের কাগজটা ওল্টাতে ওল্টাতে মনোহরপ্রসাদের চোখে পড়ে গেল। বার বার পড়ল খবরটা, কাগজটা চোখের কাছ বরাবর নিয়ে, তারপরই খবরটা নিয়ে গেল আনোয়ারীবাঈয়ের কাছে।

মেজর মোহনচাঁদ বর্মা জলন্ধর থেকে বদলী হয়েছেন লক্ষ্ণৌ। সামনের সোমবার থেকে নতুন জায়গার কার্যভার গ্রহণ করবেন।

আনোয়ারীবাঈ এগিয়ে এসে একেবারে মনোহরপ্রসাদের দুটো হাত জড়িয়ে ধরলেন।

—আমি মোতিকে দেখবো। চুপচাপ দেখে চলে আসব। ওর বাড়ির রাস্তায় বসে থাকব, ও বাইরে বেরোবার সময় একবার শুধু চোখের দেখা দেখব। ভাইসায়েব, এটুকু উপকার আমার করতেই হবে। আমি বুঝতে পারছি, আর আমি বেশিদিন নেই।

কথা শেষ হবার সংগে সংগে আনোয়ারীবাঈ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

—আচ্ছা দেখি। মনোহরপ্রসাদ হাত ছাড়িয়ে বাইরে চলে এল।

বাইরে চলে এল বটে, কিন্তু কথাটা ভুলল না। বিকেলের দিকে টাঙ্গায় চড়ে হাজির হ'ল বাদশাবাগে। বেশি ঘুরতে হল না। রাস্তার ওপরেই খাসা ঝকঝকে দুতলা। বোগেনভিলার গেট, নিচু পাঁচিল আইভি-জড়ান। রাস্তা থেকেই পুরো লন নজরে আসে। বাহারে গাছের ছিটে দেওয়া মখমল-নরম লন।

এগিয়ে গিয়ে তকমা-আঁটা দরোয়ানের সংগেও মনোহরপ্রসাদ আলাপ জমিয়ে ফেলল। মেহমান আদমি, ঘুরে ঘুরে দেখছে সারা শহর। চমৎকার বাড়ি। যেমন বাড়ি তেমনি বাগান। ভাগ্যবান মালিকটি কে?

—মালিক আত্তাজি সায়েব, দরোয়ানের ভাগ্যে এমন শ্রোতা সচরাচর জোটে না, টুলে বসে আয়েস করে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল, উপস্থিত ভাড়া নিয়েছেন মেজর বর্মা। নতুন এসেছেন এখানে। সামনের রবিবার খানাপিনা আছে। শহরের জাঁদরেল লোকদের আমন্ত্রণ। এখানকার সমাজে পরিচিত হ'তে চান মেজর সায়েব।

—বটে, মনোহরপ্রসাদ কল্পিত বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল, খানাপিনা হবে কোথায়? কার্লটন হোটেলে?

—উঁহু, হোটেলে কেন, সায়েব এই লনে বন্দোবস্ত করতে বলেছেন। বাইরের লনই ত ভাল।

দরোয়ান বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়ল।

—তাতো নিশ্চয়। সংগে সংগে সায় দিল মনোহরপ্রসাদ, তারপর একটু থেমে বলল, বিবিজী নেই বাড়িতে, না সায়েব একা।

—হ্যাঁ, বিবিজী আছেন বই কি। জিনিস কিনতে হজরৎগঞ্জ গেছেন। বিবিজীই তো সব। তিনিই ঘোরান, সায়েব ঘোরেন।

দরোয়ানের গলা পরিহাস-তরল। মনোহর-প্রসাদ আর কথা বাড়াল না। ধন্যবাদ জানিয়ে টাঙ্গায় এসে উঠল।

ওই কথাই ঠিক হল। সন্ধ্যার ঝোঁকে মনোহরপ্রসাদ টাঙ্গা নিয়ে আসবে। আনোয়ারীবাঈ সংগে যাবেন। নিচু পাঁচিল, রাস্তা থেকে দেখার কোন অসুবিধা নেই। আর তেমন হলে বেড়ার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেই চলবে। দরোয়ানের সংগে আলাপ হয়েছে, ভিতরে না ঢুকতে দিতে পারে, বেড়ার বাইরে দাঁড়ালে আপত্তি করবে না। খানাপিনার ব্যাপার যখন, লনে আলোর বন্দোবস্ত নিশ্চয় থাকবে। আনোয়ারীবাঈ-এর দেখতে কোন অসুবিধা হবে না। ঠিক চিনতে পারবেন আত্মজাকে। চোখ ভরেই শুধু নয়, মন ভরেও দেখতে পাবেন।

টাঙ্গায় উঠেই আনোয়ারীবাঈ অস্বস্তি বোধ করলেন। বুকের বাঁ দিকে তীব্র ব্যথা। টনটন করে উঠল চোখের দুটো পাতা।

—কি হলো, কষ্ট হচ্ছে? মনোহরপ্রসাদ আনোয়ারীবাঈয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

না, ঘাড় নাড়লেন আনোয়ারীবাঈ, কোন কষ্ট হচ্ছে না। কেবল বুকের ভিতর অসহ্য দাপাদাপি। এত বছর পরে মেয়েকে দেখতে পাবেন, যে মেয়েকে দু হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন পঙ্কিল পরিবেশ থেকে, বাইজীর ঘৃণ্য জীবন থেকে উন্নীত করেছেন গৃহস্থ-বধূর পর্যায়ে। তাই বুঝি হৃদয় অধৈর্য হয়ে পড়ছে, অপেক্ষা করতে মন চাইছে না।

টাঙ্গা যখন গিয়ে পৌঁছল তখন অতিথি-অভ্যাগতেরা সবাই এসে গিয়েছেন। জোর বাতির নিচে [illegible] রঙীন পোশাকের বাহার। এতদূর থেকেও [illegible] উগ্র গন্ধ পাওয়া

গেল, খাঁদির সুবাস। কিছু কিছু লোককে মনোহরপ্রসাদ চিনতে পারলো, শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবার। আমিনাবাদের রিটায়ার্ড জজ কেশরী সুকুল থেকে শুরু করে নবাবের বংশধর আমিনউদ্দিন। সেরা ব্যবসায়ী মিস্টার মোতিস পাশাপাশি ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার হেনরী উড। তাদের সঙ্গে রয়েছেন আত্মীয়া আর বান্ধবীর দল। কলরবে জায়গাটা সরগরম। মাঝখানে মেজর বর্মাকে দেখা গেল। ঘুরে ঘুরে তদারক করছেন, মাঝে মাঝে চোখ ফেরাচ্ছেন বাড়ির দিকে বোধ হয় স্ত্রীর আসার প্রত্যাশায়।

দরোয়ানই বলল, মেমসায়েব এখনও নামেন নি, বোধ হয় সাজছেন।

আনোয়ারীবাঈ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন গাড়ি-বারান্দার দিকে। ঐখান দিয়েই তো মোতি আসবে। আনোয়ারবাঈয়ের আত্মজা, তাঁরই রক্ত-মাংসে গড়ে তোলা স্বতন্ত্র সত্তা।

হঠাৎ আলোড়ন উঠল অতিথিদের মধ্যে। সবাই দাঁড়িয়ে উঠলেন। মেজর বর্মা এগিয়ে এলেন দু-এক পা।

পাতলা ফিনফিনে ব্লাউজ—কটি উন্মোচিনী, হালকা সবুজ রংয়ের আরো পাতলা শাড়ি। অন্তর্বাস দিনের আলোর মতন স্পষ্ট। আঁকা ভ্রু, ঠোঁটে কৃত্রিম লালিমা, দু-গালে রুজের রক্তিম আমেজ, সুর্মাটানা দুটি চোখকে আয়ত করার দুর্লভ্য প্রচেষ্টা, চুড়ো বাঁধা কটা চুলের রাশ।

চেয়ে চেয়ে দেখলেন আনোয়ারীবাঈ। সেদিনের সে মেয়েটার সামান্যতম পরিচয়ও নেই মিসেস বর্মার মধ্যে। শান্ত সুন্দর মেয়েটা কি মন্ত্রে রূপান্তরিত হল আজকের এই উৎকট বিলাসিনীতে। যে পোশাক পরে আনোয়ারীবাঈ। নিভৃতে বিশেষ কোন অতিথির সামনে আসতেও লজ্জা পেতেন, কি ক'রে মোতি হাজার অতিথির মাঝখানে এসে দাঁড়াল সেই পোশাকে!

মিসেস বর্মাকে নিয়ে যেন লোফালুফি শুরু হ'ল। অপূর্ব ভঙ্গীতে মোতি এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে সরে সরে যেতে লাগলো। কোথাও কোন পুরুষের চটুল উক্তিতে নিচু হয়ে তার গালে আলতো করাঘাত ক'রে বলল, Naughty boy, আবার কোথাও কোন পুরুষের বাটনহোল থেকে গোলাপ তুলে নিয়ে নিজের কবরীতে গাঁথলো। কারো টেবিলে বসে হেসে গড়িয়ে পড়ল অতিথির গায়ের ওপর, লিপস্টিক-রক্তিম ঠোঁট দুটো ফাঁক করে মোহিনী হাসি উপহার দিয়ে আবার সরে গেল অন্য টেবিলে।

মনোহরপ্রসাদের টনক নড়লো আচমকা মনিবন্ধে টান পড়তে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আনোয়ারীবাঈ কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। থর থর ক'রে কাঁপছে গোটা শরীর।

টাংগা অপেক্ষা করছিল, আর দেরী করল না মনোহরপ্রসাদ। সাবধানে আনোয়ারী-বাঈকে ধরে গাড়িতে নিয়ে এল। কি ভাগ্যিস, জোর ব্যাণ্ড শুরু হয়েছে লনে, আনোয়ারীবাঈয়ের উচ্ছ্বসিত কান্নার আওয়াজ কারো কানে যায় নি।

—কি হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ লাগছে? মনোহরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করলো।

এতদিন পরে নিজের মেয়েকে চোখের সামনে দেখলে কষ্ট হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। এই জন্য আনতে চায় নি আনোয়ারীবাঈকে।

—না, না, শরীর আমার খুব ভাল আছে। কিন্তু কি হ'ল ভাইসায়েব। বাইজীর মেয়ে বাইজীই হ'য়ে রইলো! ছেলেবেলা থেকে কাছ ছাড়া করেও রক্তের দোষ ছাড়াতে পারলাম না। পোশাক-আশাক, রং-ঢং, চালচলন এ সবে চকের রাস্তায় দাঁড়ানো বাইজীদেরও যে হার মানালো। এ কি হ'লো ভাইসাব, এ আমার কি হ'ল।

দু-হাতে মুখ ঢেকে আনোয়ারীবাঈ আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিকথা

অহীন্দ্র চৌধুরী

নাট্যাভিনয়ে আমি সচেষ্ট হই ১৯১০ সাল থেকে। পেশাদার নাট্যালয়ে যোগদান করি ১৯২৩ সালে। বাঙলার নাট্যশালার সঙ্গে আমার সেই প্রথম যোগাযোগ এবং সেই আগেকার দিনের নাট্যযুগের কথা মনে পড়লে অনেক কিছুই স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। সেদিনের সে সব কথা সমালোচকদের কাছে হয়তো আমার নাট্যবৃত্তি সঞ্চরণের প্রথম লক্ষণ বলে মনে হবে। কিন্তু অতীতের ঘটনার সঙ্গে মানুষের এমন একটা ভাবালুতা জড়িয়ে থাকে, এমন একটা হৃদয়স্পর্শিতা বিজড়িত থাকে যা বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই প্রারম্ভেই সমালোচক ও পাঠকদের কাছে তার জন্যে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি, আর আমার এই স্মৃতিকথা যদি তাদের সামান্যও খুশী করতে পারে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। গোড়াতেই বাঙলা নাট্যশালার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে আরম্ভ করলে আগের আমলটা বুঝতে সুবিধে হবে।

কলকাতায় প্রথম নাট্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ সালে। তার উদ্যোগী ছিলেন রুশদেশবাসী মিঃ হেরেসিম লেবেডেফ। ইনি ভাষাবিদ গোলকনাথ দাসের সাহচর্যে এবং একদল স্ত্রী ও পুরুষ শিল্পীর সহযোগিতায় এই মঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। কয়েকটি মাত্র নাটক অভিনয়ের পর বছর ঘুরতেই নাট্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়।

এর পর ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত বাঙলার নাট্যাভিনয় কলেজ নাট্য সমিতির, শখের ক্লাব, বড়োলোকের বাগানবাড়ী ইত্যাদী শৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। প্রথম সাধারণ নাট্যালয়ের উদ্বোধন হয় ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর। দ্বিতীয় নাট্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৮৭৩ সালে এবং তৃতীয়টিও হয় ঐ বছরই ৩১শে ডিসেম্বর। এর পর, চতুর্থ নাট্যালয়টির উদ্বোধন হয় ১৮৭৫ সালে। সেই থেকে বাঙলায় নাট্যালয় অপ্রতিহতভাবে চলে আসছে।

১৮৭২ সালে সেই প্রথম নাট্যালয়ের উদ্বোধন থেকে আজ পর্যন্ত এই [illegible] [illegible] যায়। প্রথম নাট্যালয়ের যেদিন উদ্বোধন হয়, আর ১৮৭৫ সালে যেদিন চতুর্থ নাট্যালয়টি গড়ে ওঠে এই চার বছরকে প্রস্তুতি কাল বলে ধরে নেওয়া যায়। ১৮৭৬ সাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ছিল রোমান্টিক ও পৌরাণিক নাটকের যুগ। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক উপন্যাসের নাট্য রূপ, মাইকেলের পৌরাণিক নাটক, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির পৌরাণিক নাটকের ওপরেই তখন ঝোঁক ছিল। পৌরাণিক নাটক অর্থে ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকের বেশী চলন ছিল, মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' জাতীয় নাটকগুলি পৌরাণিক হলেও জনপ্রিয় হতো না। 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' ইত্যাদি সামাজিক নাটকেও তেমন জনসমাগম হতো না। তার কারণ তৎকালে মেয়েরা বেশী পছন্দ করতেন ভক্তি-মূলক পৌরাণিক বিষয়বস্তু। কৃষ্ণ-রাধা রাম-সীতা প্রভৃতির কাহিনী খুব জনপ্রিয় হতো। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল প্রভৃতির নাটক ফুরিয়ে গেলে কবি মনোমোহন বসুর নাটক জনপ্রিয় হয়। সাধারণ নাট্যালয় প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকে কলকাতা ও ঢাকায় মনোমোহন বসুর গীতবহুল পৌরাণিক নাটক হতো। নাটকে বহু গান ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। একবার বাঙলা থিয়েটারের সাম্বৎসরিক উৎসবে তৎকালের 'আধুনিক' নাট্যকার মাইকেল প্রমুখদের উদ্দেশ করে তিনি নাটকে গানের অংশ কম রাখার জন্য অনুযোগ তোলেন এবং গীতাভিনয় রচনার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু তখনকার নব্য দর্শকরা গান তত পছন্দ করতেন না, অবশ্য মেয়েরা পছন্দ করতেন।

সামাজিক নাটক বলতে তখন হতো ব্যঙ্গ কৌতুক নিয়ে প্রহসন। বিয়োগান্ত প্রথম

সামাজিক নাটক হয় ষ্টারে, ১৮৮৮ সালে 'সরলা'। তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস-খানির নাট্যরূপ দান করেন অমৃতলাল বসু। তখন নাট্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল ব্যঙ্গ কৌতুক মিলনান্তক ছাড়া বিয়োগান্ত সামাজিক নাটক কেউ পয়সা দিয়ে দেখতে আসবে না। তখনকার চারটি থিয়েটারের কেউই সাহস পাননি। অমৃতলাল এমারেল্ড থিয়েটারে 'সরলা' মঞ্চস্থ করার সংকল্প করেন অনেকটা পরীক্ষা-মূলকভাবে এবং অত্যন্ত সংশয়ের সঙ্গে। কিন্তু নাটকখানি উদ্বোধিত হবার পর সংশয়ও দূরে হলো, পরীক্ষাও সফল হলো। সেই প্রথম লোকে পয়সা খরচ করে কাঁদতে এলো। এতোকাল রাধা-কৃষ্ণ'র কাহিনী দেখে কেঁদে এসেছে কিন্তু সাধারণ মানব মানবীর জন্য কান্না সেটা অভাবনীয় ছিল। 'সরলা' নাটকে বহু অর্থ পাওয়া গিয়েছিল। এর পর গিরিশচন্দ্র এসে ষ্টারে যোগদান করায় তাকে সামাজিক নাটক লেখার জন্য অনুরোধ করা হয়। ষ্টারে সকলেই তখন গিরিশচন্দ্রের শিষ্য। তাদের সম্মিলিত আগ্রহে ও অনুরোধে গিরিশচন্দ্র লিখলেন 'প্রফুল্ল'।

দেশে তখন মদ্যপান নিবারণী আন্দোলন প্রবল। তখনকার দিনের গুরুজনস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মদ্যপান প্রচলিত ছিল। এমনও দেখেছি, পিতা ও পুত্র দুজনে দুবগলে মদের বোতল নিয়ে গলা জড়াজড়ি করে শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে একজন পড়লেন রাস্তার এপাশের নর্দমায়, আর একজন ওপাশে; একজন এদিকে যাবার জন্য চেঁচান তো অপরজন বলেন ওদিকে। তারপর কিছুকাল পরে সেই পিতার মৃত্যু হলো, তার ছ মাসের মধ্যে বিরাট বাড়ী সম্পত্তি সব কোথায় উড়িয়ে দিয়ে সেই ছেলে পথে এসে ভিক্ষা করতে আরম্ভ করলে। দিনে ভিক্ষা করে, আর রাত কাটায় বন্ধ দোকানের খোলা পাল্লার ওপর শুয়ে। শেষে এমন হলো যে ভিক্ষেও লোকে আর দেয় না এবং নেমতন্নবাড়ীর সামনের আঁস্তাকুড় ঘেঁটে উচ্ছিষ্ট খেয়ে শেষে একদিন রাস্তায় মরে পড়ে রইলো। এতো চাক্ষুষ ব্যাপার। সন্ধ্যের পর বাড়ীতে বাড়ীতে গুরুজনরা মদ্য পান করে যা অবর্ণনীয় কাণ্ড করতেন তাই দেখে লজ্জায় ছেলেদের বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়াতে হতো। অল্পসংগতির মদ্যপায়ী লোকের পারিবারিক দুরবস্থা হতো চরম। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও খুব কমই ছিলেন যারা মদ্য পান করতেন না। নামকরা সব বিদ্বান লোক, তাদের কাছে মদ্যপান যেন একটা ফ্যাশনই ছিল। গিরিশচন্দ্র নিজে মদ্যপ ছিলেন, পরমহংস-দেবের সংস্পর্শে এসে তার পরিবর্তন আসে তবে মদ্যপান বর্জন করতে তার আরো অনেক দিন লেগেছিল। সমাজের এই দুরবস্থার প্রতি মানুষের চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্যই গিরিশচন্দ্র 'প্রফুল্ল'তে যোগেশ চরিত্রের অবতারণা করেন। আইনজীবী রমেশের মতো চরিত্রও সেকালে দুর্লভ ছিল না। অনেক আইনজীবীর কীর্তিকলাপ দেখেছি যাঁরা আজ প্রাতঃস্মরণীয়, তাদের নাম করা যাবে না, কিন্তু যেভাবে তারা ধনসম্পত্তি করেছেন তা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। তখন অনেক আইনজীবী বেতন দিয়ে দালাল ও গুণ্ডা পুষতেন যাদের কাজ ছিল পরের বাড়ীর বউ-ঝিকে বের করে নিয়ে এসে

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

তাদের মক্কেলদের তোষণ করার জন্য বাগানবাড়ীতে সন্ধ্যায় সুরার আসরে হাজির করে দেওয়া। এটা বেশী হতো বাগবাজার ও ভবানীপুর অঞ্চলে, তখন অবশ্য এ দু অঞ্চল ছিল শহরতলীর মতো।

'প্রফুল্ল' প্রথম মঞ্চস্থ হয় ষ্টারে ১৮৮৯ সালে। যোগেশের ভূমিকায় অবতরণ করেন অমৃতলাল মিত্র—গিরিশচন্দ্র এই ভূমিকায় অভিনয় করেন আরো ছ বছর পরে ক্ল্যাসিক থিয়েটারে। 'প্রফুল্ল' প্রথম অভিনীত হবার পর ১৮৮৯ সালের ২১শে মে ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নাটকখানির প্রশংসা করা হয়। কোন নাটক নিয়ে দৈনিক-পত্রে সম্পাদকীয় বের হওয়া আজ তো ভাবাই যায় না। শুধু তাই নয়, পরের মাসে ঐ কাগজেই নাটকখানির এতো দীর্ঘ এক সমালোচনা লেখা হয় যে, একদিনে তা ছাপানো কুলিয়ে উঠতে না পারায় দুদিন ধরে, ৮ই ও ৯ই জুন, ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশ করা হয়। ইংরেজের কাগজেই শুধু নয়, দেশীয় কোন দৈনিকেও কোন নাটকের এমন সম্বর্ধনা দেখা যায়নি।

'প্রফুল্ল' নাটকে আমি অভিনয় করেছি কিন্তু বরাবরই রমেশের চরিত্রে। যোগেশ যা গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে দেখেছি এবং আজও এমন জ্বলজ্বল করে তা চোখের সামনে ভেসে রয়েছে যে ঐ ভূমিকায় অভিনয় করার সাহস পাইনি কোনদিন। দানীবাবু যে সকল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তার অনেকগুলিতে আমি অবতরণ করেছি। সে সময়ে তিনকড়িবাবু অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর অভিনীত 'কর্ণ' চরিত্রে আমিও অভিনয় করেছি, প্রশংসাও পেয়েছি। কিন্তু যোগেশ করবার সাহস হয়নি কোনদিন। একজন অভিনেতা মঞ্চের ওপরে এসে শুধু দাঁড়িয়ে থেকেই যে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে কি অদ্ভুত আবেগ-প্রবাহ বইয়ে দিতে পারেন তা গিরিশচন্দ্রের 'যোগেশ' না দেখলে, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

বড়ো বড়ো অভিনেতারা তখন ছোট ছোট টাইপ পার্ট করতে বেশী ভালোবাসতেন। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দু, মুস্তাফী প্রভৃতি ছোট ছোট টাইপ চরিত্রেই বেশী নামতেন। ছোট ছোট চরিত্রগুলির ওপর তৎকালে বিশেষভাবে দৃষ্টিও দেওয়া হতো। গিরিশচন্দ্র এক 'কপালকুণ্ডলা'তেই সাতটি বিভিন্ন টাইপ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। টাইপ চরিত্রে মঞ্চ তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। আর তখন-কার অভিনেতাদের নিষ্ঠা ও অনুরাগও থাকতো খুব বেশী। এইসূত্রে মনে পড়ে ঘনশ্যামবাবুর কথা। 'চন্দ্রশেখর'-এ তিনি বিশ্বাসের ভূমিকায় অভিনয় করতেন গোড়া থেকেই। কালে বয়েস হয়ে যেতে তিনি অভিনয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। হঠাৎ একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন পোস্টার পড়েছে 'চন্দ্রশেখর' অভিনয়ের। আর কোন দিকে তাকানো নয়, সটান গিয়ে হাজির হলেন ষ্টার থিয়েটারে এবং কাউকে কোনকিছু বলার অবকাশ না দিয়ে সোজা বসে গেলেন মেক-আপ করতে। থিয়েটারের অন্যান্যেরা ঘনশ্যামবাবুর ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দেখে হন্ত-দন্ত হয়ে হাজির হলেন ম্যানেজার অমরেন্দ্র দত্তের কাছে। ঘনশ্যামবাবু কারুর কথায় কর্ণপাত করলেন না অগত্যা অমরেন্দ্রবাবু ডেকে পাঠালেন ঘনশ্যামবাবুকে। অমরেন্দ্র-বাবু একটু কায়দা করে জানালেন যে হঠাৎ 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় ঠিক হওয়ায় তারা তাঁকে খবর দিতে পারেননি, আর তাই অন্য একজনকে ওই পার্টের জন্য ঠিক করা হয়েছে, এমনকি পোস্টারেও তার নাম দেওয়া হয়েছে। ঘনশ্যামবাবু তা বোঝবার নন, খবর তাকে না দিতে পারা গিয়েছে না হোক, তিনি যখন পোস্টারে 'চন্দ্রশেখর' হবে জেনেছেন তখন তিনি [illegible] কি [illegible]

পারেন। অমরেন্দ্রবাবু ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এসে যখন পড়েছেন ভালোই হয়েছে, আশীর্বাদ জানিয়ে তিনি বাড়ী যান, তাঁর যা প্রাপ্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ঘনশ্যামবাবু তাও বোঝেন না। তাঁর সেই এক যুক্তি, তিনি যখন জীবিত রয়েছেন তখন বিশ্বাসের ভূমিকায় তার কেউ কি করে অভিনয় করতে পারে! ম্যানেজারবাবুর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন, বিশ্বাসের ভূমিকায় আর কেউ যেন না নামে। শেষে কোনভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পেরে সে রাত্রে ঘনশ্যামবাবুকেই বিশ্বাসের ভূমিকা করতে দেওয়া হলো।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এলো ঐতিহাসিক নাটকের যুগ। ১৯০৩ সালে হয় 'প্রতাপাদিত্য'। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক তখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। স্বদেশী যুগ আরম্ভ হতে বিদেশীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভারতীয় বীরদের কাহিনী নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকে। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে তৈরী নাটক আগে চলেনি, কিন্তু এ সময়ে সেগুলি পুনর্মঞ্চস্থ হতে লাগলো। রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গ বিজেতা'ও ফিরে এলো। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নতুন ঐতিহাসিক নাটক লিখতে লাগলেন। ঐতিহাসিক নাটকে প্রকৃত যুগান্তর নিয়ে এলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে লোকের দৃষ্টিভঙ্গীই বদলে দিলেন তিনি। তাঁর নাটকের চারণ গান যুগ প্রবর্তন করে। বিলেতে থাকাকালে দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানকার নাটকের উন্নত ধারা লক্ষ্য করেন এবং দেশে ফিরে তিনি তাঁর নাটকে তা প্রয়োগ করেন। তাঁর বিশিষ্ট দান হচ্ছে চারণদের গানগুলি। অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে সেই সব গান। 'মেবার পতন'এর গানের সুর আজও চলছে, এ থেকেই বোঝা যায় সেকালে গানগুলি কি পরিমান জনপ্রিয় হয়েছিল। দানীবাবুর অভিনয়গুণে 'দুর্গাদাস' নাটকখানি এতো জনপ্রিয় হয়েছিল যে তখন মনে হতো যে 'দুর্গাদাস' না দেখলে যেন নাটক দেখাই বাকি থেকে যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক হয় 'সাজাহান', প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯০৮ সালে। দেশাত্মবোধক নাটকের যুগ চলে অবশ্য ১৯১২ সাল পর্যন্ত এবং ঐ বছর গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর এবং ১৯১৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের তিরোধানে কোন চমকপ্রদ দেশাত্মবোধক নাটক আর পাওয়া যায়নি।

ঐতিহাসিক নাটকের যুগ স্থায়ী হয় ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। এই কালে রঙচঙে পোশাক সমন্বিত কোন নাটক হলেই ঐতিহাসিক বলে আখ্যাত করা হতো। ১৯১৮-১৯ সাল পর্যন্তও আমরা [illegible] ঐতিহাসিক নাটক বলে [illegible]

নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র

ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত বলেও চালানো হতো, এমনিই ছিল ঐতিহাসিক নাটকের ওপর মোহ। 'বন্দিনী' নাটকখানিকে আমরা 'ঐতিহাসিক' বলে প্রচার করেছিলুম বলে মনে পড়ে না, কিন্তু পত্রিকার সমালোচনায় ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করা হয়। আর্ট থিয়েটারের পত্তনের পর ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, প্রহসন প্রভৃতি সব রকমের নাটক অভিনীত হয়।

বাল্যকালের কথা মনে পড়ে যখন
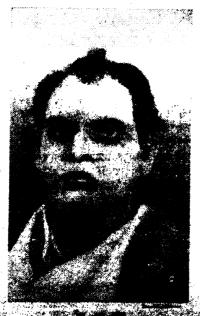
থিয়েটার দেখাটা জীবনের একটা বড়োরকমের ঘটনা বলে পরিগণিত হতো। নিষ্ঠাবানেরা তৎকালে ছেলেদের বিডন স্ট্রীটের থিয়েটারের ধার ঘেঁষতে দিতেন না। ওখানে বেশীর-ভাগই যেসব নাটক অভিনীত হতো তার মধ্যে ফাজলামী থাকতো বেশী। অবশ্য সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম, সাজাহান, বলিদান, মেবারপতন প্রভৃতি বহু উচ্চাঙ্গ নাটকও অভিনীত হয়েছে। নিষ্ঠাবানরা পছন্দ করতেন হাতীবাগানের থিয়েটার। আর্ট থিয়েটারের উদ্দেশ্যই ছিল সুন্দর কলাসম্মত ও রুচিপূর্ণভাবে নাটক প্রয়োগ করা। ছেলেবেলায় দেখেছি ক্ল্যাসিক, কোহিনুর প্রভৃতি নাট্যালয়ে সূচীর শেষের দিকে প্রহসন বা গীতিনাট্য আরম্ভ হলেই বহুলোক উঠে চলে যেতো। তখন এককালে দুটি বা তিনটি নাটক অভিনীত হতো। কেন এককালে একাধিক নাটক অভিনয় করতে হতো কুঞ্জলাল চক্রবর্তীর কাছ থেকে তার কারণ জানতে পারি। খুব অমায়িক মিশুকে ও গল্পে লোক ছিলেন কুঞ্জলাল। কারণটি তিনি যা জানান তা হচ্ছে, সকাল পর্যন্ত অভিনয় না হলে রাতের অন্ধকারে তখনকার দিনে মেয়েছেলে নিয়ে বাড়ী ফেরার অসুবিধে ছিল। দর্শকদের অনেকে আসতেন কাশীপুর, বরানগর, টালা, বেলেঘাটা, খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। রাত দুটো তিনটেয় অভিনয় ভাঙলে ঠিকেগাড়ীর গাড়োয়ানের ওপর ভরসা করে বাড়ী ফেরা নিরাপদ ছিল না। তখন থিয়েটারে আসতে গা ভর্তি গয়না পরা মেয়েদের রীতি ছিল। এমন ঘটনাও হয়েছে যে গাড়োয়ানের সঙ্গে সড় করে মাঝরাস্তায় বাবুদের জখম করে গুন্ডারা মেয়েদের গয়না লুট করে নিয়ে গিয়েছে। কর্পোরেশনের তখন আইন রাত একটার বেশী থিয়েটার চলতে দেওয়া হবে না। তাই নিয়ে অনেক লেখালেখি ও দরবার হয়, কিন্তু তখনকার সাহেব-চেয়ারম্যান নেটিভদের অসুবিধে বুঝতে চাইলেন না। কিন্তু তবুও অভিনয় ভোর পর্যন্ত চালাতেই হতো এবং আইন ভঙ্গের জন্য নিত্য জরিমানা দেওয়া বরাদ্দ করে রাখা হতো।

বড়ো বড়ো নাম করা শিল্পীরা সব নাটকে নামতেনও না বা রাত ভোর থাকতেনও না। গোড়ার পঞ্চাঙ্ক নাটকে অভিনয় করেই বাড়ী চলে যেতেন, পরের প্রহসনগুলি করতো ছেলে ছোকরার দল। সমস্ত পরিচালনার ভার থাকতো প্রম্পটারের হাতে। পরদিন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এসে লগবুক দেখতেন কখন অভিনয় শেষ হয়েছে জানবার জন্য, এবং আইন ছাপিয়ে যতো ঘণ্টা বেশী হয়েছে সেটা হিসেব করে জরিমানা দিয়ে আসতেন। কোনদিন হয়তো তারা দেখতেন অভিনয় [illegible] রাত সাড়ে তিনটেয়, তখনই ভাবতে [illegible]

টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। আগে যেখানে হয়তো ছিল গোড়ায় একখানি পঞ্চাঙ্ক এবং শেষে এক বা দুখানি প্রহসন, সময় পুরোবার জন্য হয়তো তার মাঝে একখানি তৃতীয়াঙ্ক যোগ করে দেওয়া হলো পরের অভিনয় দিনে। অভিনেতাদের অনেকেই তখন অফিসে কাজ করতেন; সকাল পর্যন্ত অভিনয় করে তারপর অফিস করার অসুবিধে হতো তাদের। তাই নাটক নম্বরে চাপালে কি হবে, প্রম্পটারকে হাত করে কেটেকুটে ছোট করে এমনভাবে অভিনয় করতেন তাঁরা যে ভাঙতে আগের মতোই সেই রাত তিনটে সাড়ে তিনটে। অংশ বাদ দেওয়ার জন্য শেষ রাতের ঝিমিয়ে পড়া দর্শকের গোলমাল করার আর তেমন এনার্জি থাকতো না। পরদিন কর্তৃপক্ষ লগবুক থেকে অতো রাত্তির থাকতেই অভিনয় ভেঙেছে দেখে আরও একখানি নাটক বা প্রহসন হয়তো নম্বরে যোগ করে দিতেন। এইভাবে একটি সূচীতে দুখানি পঞ্চাঙ্ক ও দুখানি প্রহসন হতেও দেখা যেতো। অনেক সময়ে অভিনয় ভাঙতো সকাল সাতটায়।

পালপার্বণে তখন ছেলেমেয়ে নিয়ে সমগ্র পরিবার যেতো থিয়েটার দেখতে। এখন সে সব ভাসাভাসাভাবে মনে পড়ে। আমার তখন অল্প বয়স, স্কুলে পড়ি। কি একটা পর্ব উপলক্ষ্যে বাড়ীর লোকের সঙ্গে আমিও যাই ক্ল্যাসিক থিয়েটারে যোগেশের চরিত্রে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' দেখতে। সে বয়সের সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। কতকগুলি দুঃখজনক দৃশ্য আজও আমার দৃষ্টিতে ভেসে রয়েছে, আলছা ছাপ নয়, নটগুরুর কতক জায়গায় অভিব্যক্তির খুটিনাটিও মনে রয়েছে। নাটকখানির আর কোন চরিত্রের অভিনয় অতো গভীরভাবে মনে গেঁথে নেই। অন্যান্য থিয়েটারেও আরো অনেকেরই অভিনয় দেখেছি। তার মধ্যে ১৯০৮ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের অভিনয় আমাকে এতো অনুপ্রাণিত করে তোলে যে, আমার যখন সতের বছর বয়েস এক শৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের হয়ে আমি নিজেই সাজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করতে উদ্বুদ্ধ হই। তারপর বাঙলা দেশের নানা স্থানে এবং পরে পেশাদার মঞ্চে যোগদান করেও ১৯২৪ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত, ঐ চরিত্রটিতে অভিনয় করেছি। এই ত্রিশ বছর ধরে দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, বিহার, আসাম এবং বাঙলার জেলায় জেলায় এই চরিত্রটির অভিনয় দেখাতে প্রায় আঠার শত বার আমাকে 'সাজাহান' নাটকে অবতরণ করতে হয়েছে। ১৯১০ সালে কচিৎ-কদাচিৎ দর্শক মাত্র থেকে একজন উদীয়মান অভিনেতা হবার চেষ্টা করতে থাকি। ভবানীপুরে তখন [illegible]

বাছা বাছা নাটক আমরা মহলা দিতে থাকি। আমার তখনকার সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চট্টোপাধ্যায় প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও পরবর্তীকালের চিত্র-পরিচালক প্রফুল্ল ঘোষ। আমাদের নাটক মহলা দেওয়াই সার ছিল, কারণ মঞ্চস্থ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমাদের ছিল না অগত্যা সভ্যদের সামনে মহলা দেওয়া নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হতো।

তখনকার দিনে আমরা ছেলে-ছোকরারা মিনার্ভার ভক্ত ছিলুম, বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বা দানীবাবু অভিনীত নাটকগুলি আর রিহার্স্যালও দিতুম সেই সব

রসরাজ অমৃতলাল বসু

নাটকই, যেমন সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, রাণা-প্রতাপ ইত্যাদি। কখনও কোন কাপ্তেন জুটে গেলে অনেকের হাত-খরচের পয়সা জমিয়েও নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা কখনো কখনো হতো। পাল-পার্বণে বা বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে কোন শুভ কাজ উপলক্ষ্যে থিয়েটার দেওয়া হতো। নিজেরাই বাঁশ বেঁধে স্টেজ খাটাতুম। খরচের মধ্যে ছিল কার্ড ছাপানো, সিন ড্রেস ভাড়া, চা, পান ইত্যাদি, তাতে টাকা আগী হলেই চলে যেতো। সাধারণ রঙ্গালয় ভাড়া প্রায় পাওয়াই যেতোনা, মাঝে মাঝে মনোমোহন থিয়েটার অবশ্য ভাড়া দিত, কিন্তু খরচে কুলিয়ে ওঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রয়েল ক্লাব থেকে ভবানীপুরের পুরানো ক্লাব বান্ধব সমাজে যোগদান করি। ওখানে তখন ছিলেন [illegible]

রায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন বসু প্রভৃতি যাঁরা উত্তরকালে অভিনয় জগতে নাম করেন। বান্ধব সমাজে যাত্রা ও থিয়েটার দুই-ই করেছি। একবার ধর্মতলার কোরিন্থিয়ান থিয়েটার ভাড়া নিয়ে "সরলা" ও অতুলচন্দ্র মিত্রের নৃত্যগীতবহুল "তুফান" অভিনয় করি। তারও বছর খানেক পরে আমরা মনোমোহন স্টেজ ভাড়া নিয়ে "ভীষ্ম" অভিনয় করি, যাত্রাতে এ পালাটির নাম ছিল "বসুমিত্র"। সংস্কৃত নাটক ও যাত্রা সম্পর্কে ভালো করে জানবার জন্য ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশোনারও সময় করে নিতুম এরই ফাঁকে ফাঁকে। তিন-চার বছর বান্ধব সমাজে যুক্ত ছিলুম এবং তার মধ্যে বার ষাটেক অভিনয় করতে নেমেছি। যাত্রার মধ্যেও আমরা নতুন কিছু করার চেষ্টা করেছি। সাধারণত যাত্রার আসর বসতো কোন বড়োবাড়ির উঠানের মাঝখানে বা কোন মন্দির প্রাঙ্গণে। সাজঘর থেকে আসরে যাবার তখন পথ থাকতো মাত্র একদিকে একটি। "অভিমন্যুবধ" পালার সময় আমরা আর একটি পথের ব্যবস্থা করি। এ অভিনয় হয় ভবানীপুরে গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। দৃশ্য শেষে দ্বিতীয় পথ দিয়ে অভিনেতাদের নিষ্ক্রমণের ব্যবস্থা দ্বারা অভিনয়ের গতিবেগ বাড়ানোর সুবিধে হলো, বিশেষ করে চতুর্থ-পঞ্চম-অঙ্কে যুদ্ধাদি দৃশ্যের ক্ষেত্রে। তাছাড়া পোশাকাদি বিষয়ে আমরা বইপত্তর ঘেঁটে যথাসম্ভব নতুন ধরনের কিছু করারও চেষ্টা করতুম।

১৯২০ সালের শেষে প্রফুল্ল ঘোষ উদ্যোগী হলেন সিনেমার ছবি তোলায়, আমিও তার সঙ্গে যোগদান করি। তখন ম্যাডান কোম্পানী ছাড়া ছবি তুলতো না বিশেষ কেউ। ইণ্ডো-বৃটিশ ও অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন তখন নতুন হচ্ছে। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে "সোল অফ এ স্লেভ" তোলা আরম্ভ হলো বরাকরে, এখন যেখানে মাইথন বাঁধ তারই কাছে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে। মন্দিরের পাশে ছিল ছোট একটি নদী, তার ওপর একটা ঝোলানো সেতু, ঐখানেই আমাদের ছবির কাজ। আমাদের ক্যাম্প ছিল সালানপুরে। সেখান থেকে ট্রলিতে চেপে রেল লাইন ধরে আসতে হতো। রেলের কর্মীরা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। তখন রেলওয়ে ইনস্টিটিউটগুলি হয়নি, আমরাই মাঝে মাঝে স্টেশনে স্টেশনে অভিনয় করে আসতুম, আর সেইজন্যেই তাদের কাছে আমরা খাতির পেলুম। ছবির গল্প আমারই লেখা, পরিচালনার জন্য ছিলেন হেম মুখোপাধ্যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দায়িত্বও আমাকেই সম্পন্ন করতে হয়। ১৯২২ সালে কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে (বর্তমান শ্রী [illegible]

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

এরপর আবার আমি মঞ্চাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হই।

নাট্যালয়ের অবস্থা তখন সঙ্গীন। সাধারণ নাট্যালয় তখন স্টার, মিনার্ভা, মনোমোহন আর এখন যেখানে বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিস ঐখানে ছিল বেঙ্গল থিয়েটার। অমরেন্দ্র দত্ত মারা যাবার পর স্টার মঞ্চ সাধারণ পার্টিকে ভাড়া দেওয়া হতে লাগলো। অনঙ্গ হালদার, গিরি মল্লিক, অপরেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাড়া নিতেন। মনমোহন পাঁড়ে মিনার্ভা ছেড়ে কোহিনুর নিয়ে মনমোহন থিয়েটার খুললেন। মিনার্ভার লেসি ছিলেন মহেন্দ্রনাথ মিত্র, তাঁর কাছ থেকে থিয়েটারটি নিলেন তাঁরই ভাই উপেন্দ্রকুমার মিত্র। এখানে ম্যানেজার হলেন অপরেশবাবু। নাট্যালয় কটি তেমন চলছিল না। নতুন নাট্যকার নেই, নতুন কোন শিল্পীও আসে না। নামকরাদের মধ্যে মাত্র ছিলেন অমৃতলাল বসু, পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ, দানীবাবু আর তারাসুন্দরী। ওরই মধ্যে আবার মিনার্ভা ও মনমোহনে তখন প্রতিযোগিতা লেগেই থাকতো, তবে শিল্পি-গোষ্ঠিতে দানীবাবু থাকায় মনমোহনই ওরই মধ্যে একটু ভাল চলছিল। ম্যাডান কোম্পানী এ সময়ে কর্ণওয়ালিশ সিনেমাকে থিয়েটারে পরিণত করেন। কিছুদিন পরে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এখানে যোগদান করে ক্ষীরোদ প্রসাদের "আলমগীর" মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু যে কারণেই হোক এদের সঙ্গে থাকতে অস্বস্তি বোধ করায় তিনি থিয়েটার ছেড়ে দেন। ম্যাডান নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে নিয়ে থিয়েটার চালাতে লাগলেন এবং পরে বেঙ্গলী থিয়েটারকে নিয়ে গেলেন এলফ্রেড মঞ্চে (বর্তমান দীপক সিনেমা)। কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার আবার সিনেমা হলো। এ সময়ে ম্যাডান কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারের পাশে ক্রাউন সিনেমা (বর্তমান উত্তরা) তৈরী করেন। এই ক্রাউন সিনেমাতেই প্রথম বিলিতি ঘূর্ণায়মান মঞ্চ খাটানো হয়। কিন্তু ওখানে নাট্যাভিনয় না হওয়ায় মঞ্চটি কোন কাজে আসেনি। একটু যা কাজে লাগানো হয়েছিল "মিসররাণী" ছবিখানি তোলার সময়। এই-খানেই প্রথম আমাদের দেশে ছবি তোলার জন্য 'আর্টিফিশাল' লাইটের ব্যবহার হয়। পরে মঞ্চটি নষ্ট হয়ে যায়।

১৯২২ সালে হয় উত্তরবঙ্গে ভীষণ প্লাবন। আর্তদের সাহায্যের জন্য ভবানী-পুরের রসা থিয়েটারে (বর্তমান পূর্ণ থিয়েটার) এক সাহায্যাভিনয়ের আয়োজন হলো। উদ্যোক্তা ছিলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূপেনবাবু ছিলেন স্টার থিয়েটারের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। সংকটের সময়ে তিনি স্টারকে ওভার-ড্রাফটও ঠিক করে দিতেন। অভিনয় হবে ঠিক হলো "চন্দ্রগুপ্ত"। তখনকার শৌখীন সম্প্রদায়ের নাম-করা শিল্পীদের অনেকেই অভিনয়ে নামলেন। শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গে আমিও অবতরণ করি সেলুকাসের ভূমিকায়। প্রবোধচন্দ্র গুহ এই অভিনয়ের জন্য স্টার থিয়েটার থেকে সিনসিনারি এনে দেন। তিনি তখন স্টারের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও

অর্ধেন্দু মুস্তফী

অমরেন্দ্র দত্ত

কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। কর্মী হিসেবে কাজ করতেন, টাকা পয়সা জোগাড় করে আনতেন এবং কখনো লাভ হলে তবে কিছু লভ্যাংশ পেতেন, নয়তো কোন বেতন তিনি নিতেন না। সে সময়ে এক 'অযোধ্যার বেগম'-এই যা কিছু লাভ হয়েছিল, তাছাড়া লাভ হতো না, কাজেই প্রবোধবাবুও কিছু পাচ্ছিলেন না। "চন্দ্রগুপ্ত"র অভাবনীয় সাফল্য ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করলো। তারা ভাবতে লাগলেন এই রকম দল নিয়ে স্টারে অভিনয় করতে পারলে ভালো হয়। ভূপেনবাবু তাঁর প্রস্তাব পেশ করলেন ভবানীপুর গ্রুপের কাছে। তিনকড়িবাবু, নরেশবাবু ও ইন্দুবাবু রাজী হয়ে গেলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে কোন কারণে অবনিবনা হলো। আমার কিন্তু তখন সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ে যোগদান করতে কেমন ভাল লাগছিল না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নাট্যালয়ে গিয়ে বক্সে বসে অভিনয় দেখতে দেখতে অভিনয় করার ইচ্ছে হতো, সে সময়ে ঠিকই করে ফেলতুম নাট্যালয়ে যোগ-দান করবো। আবার বাড়ি ফিরলেই মন বেঁকে দাঁড়াতো। মেয়েদের নিয়ে অভিনয় করতে হবে সেও যেমন সঙ্কোচ ছিল, তেমনি থিয়েটারের ভিতরের আবহাওয়ার কথা মনে করেও পিছিয়ে যেতুম।

নাট্যালয়ে সেকালে মদ্যপান অবারিত ছিল। তাছাড়া বড়ো অভিনেতারা চলে যাবার পর গ্রীনরুমে যে কাণ্ড হতো তা নরকের সামিল। থিয়েটার দেখার জন্য বড়োলোকেরা এলেও মদের ফোয়ারা ছুটতো। সেকালে রাজারাজড়ারা এবং বড়লোক জমিদাররা থিয়েটারের বক্স স্থায়ীভাবে নিয়ে রাখতেন। তারা নিজেরা বা তাদের কার্ড নিয়ে কেউ এলে তবেই বসতে পেতো, না হলে বক্স

থাকতো চাবিতালা দেওয়া। বড়লোকরা এলে তাদের জন্যে বারান্দায় লম্বা টেবিল পড়ে যেতো, আর সাহেবী হোটেল থেকে খানসামা আনিয়ে তাদের বিলিতি মদ পরিবেশন করা হতো। মদ যে অভিনেতাদের কি পরিমান কান্ডজ্ঞানবির্বর্জিত করে তুলতো তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

বিডন স্ট্রীটের এক থিয়েটারে তখন "দুর্গেশ নন্দিনী" হচ্ছে। জগৎসিংহের ভূমিকায় যিনি নামবেন তিনি যথাসময়ে সাজপোশাক পরে তৈরী হয়ে রইলেন। হঠাৎ কি খেয়াল হতে 'এই আসছি' বলেই তিনি পোশাকের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং সটান হাজির হলেন পাশের বস্তীতে চোরাই মদের আড্ডায়। এদিকে অভিনয় আরম্ভ হবার সময় হলো, কিন্তু কোথায় জগৎসিংহ! অগত্যা কর্তৃপক্ষ অপর এক ডুপ্লিকেট অভিনেতাকে পোশাক পরে নামিয়ে দিলেন। খানিকক্ষণ অভিনয় করার পর এ অভিনেতাও প্রথম জগৎসিংহ কোথায় গেলেন বলে তাকে খুঁজে নিয়ে আসার নাম করে বেরিয়ে গেলেন। দুজনের কারুরই ফেরবার নাম নেই, কি করা যায়—কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তৃতীয় একজনকে পোশাক পরিয়ে বাকি অংশ অভিনয়ের জন্য নামিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর শোনা গেল, দুজনকে খুঁজে আনার নাম করে তৃতীয় জগৎসিংহও উধাও। তিন তিনজন জগৎসিংহ সেদিন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে ফিরলেন।

এইসব কান্ড ভেবেই সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদানে মনের পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছিলুম না। কিন্তু ভূপেনবাবু নাছোড়বান্দা। ইন্দু আমার পাশের বাড়িতেই থাকতেন, তাকেই নিয়োজিত করা হলো আমাকে পাকড়াও করতে, তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হতে লাগলো। শেষে আর পারা গেল না, একশত টাকা মাস মাহিনায় সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দিলুম। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন। উত্তরকালের স্বনামধন্যা কৃষ্ণভামিনী ও নীহারবালা তখন এখানে উদীয়মানাদের দলে। সে সময়ে মাসিক বেতনের লেভেল ছিল তিন সাড়ে তিনশ টাকা। আর্ট থিয়েটারে সাড়ে চারশো পর্যন্তও বেতন দেওয়া হতো। অবশ্য দানীবাবু পেতেন তার চেয়ে তিনচার গুণ বেশী।

পৃথিবীর সর্বত্র তখন আর্টের আন্দোলন। ভারতে সে আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছে এবং নাট্যালয়েও তার প্রভাব দেখা দেয়। কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের জনকয়েক মিলিত হয়ে গঠন করলেন আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড। এর ডিরেক্টরদের মধ্যে রইলেন পূর্বোল্লিখিত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সেন (সলিসিটর) নির্মলচন্দ্র চন্দ্র (সলিসিটর) কুমারকৃষ্ণ মিত্র ও হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স)। এ দলের অধিনায়ক হলেন প্রবীণ নাট্যকার ও অভিনেতা ম্যানেজার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁরই লেখা নাটক "কর্ণার্জুন" নিয়ে এই দলের অভিযান আরম্ভ হলো ১৪ই জুলাই ১৯২৩ সালে। আমি তাতে অর্জুনের ভূমিকায় অবতরণ করি।

আর্ট থিয়েটার আমার কাছে স্বর্ণলংকা সদৃশ হলো। এমেচার দলে অভিনয় করার সময় থেকেই আর্টকে অভিনয়ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার ঝোঁক ছিল, কিন্তু তখন আর্থিক সংগতির অভাবে বিশেষ কিছু করে ওঠা যায়নি। আর্ট থিয়েটারে

দানীবাবু

সে সুযোগ পাওয়া গেল। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা দৃঢ় তো ছিলই, অধিকন্তু ডিরেক্টররাও ছিলেন শিল্পভাবাপন্ন ও প্রগতিশীল। আমার চেয়ে কজন সিনিয়র ব্যক্তি ছিলেন, এখানে তাই নাট্য প্রয়োগ ব্যাপারে আমার ওপরে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার এসে পড়েনি, শুধু অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করারই ভার ছিল। কিন্তু আমার তখন উৎসাহের অন্ত ছিল না, তাই নিতান্ত অযাচিতভাবেই নাট্য প্রয়োগ ব্যাপারে আমার সারা সময় ও শ্রম ব্যয় করতে লাগলুম। ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজারের থিয়েটারে সকাল ৮-৯টার মধ্যেই হাজির হয়ে পড়তুম এবং বাড়ি ফিরতুম অর্ধেক রাতে, কখনও কখনও তারও পরে। অনান্য অভিনেতা সন্ধ্যে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত থেকে শুধু রিহার্স্যালেই যোগ দিতেন। প্রয়োগকর্তা প্রবোধচন্দ্র গুহ আমার মতো নাট্যপ্রয়োগ বিষয়ে কিছু জানেশোনে এমন একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্মী পেয়ে আমাকে গ্রহণ করে নিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নাট্য প্রয়োগের যাবতীয় কাজই আমার হাতে ছেড়ে দিলেন, কেবলমাত্র অফিসের দায়িত্বটুকু ছাড়া। সমগ্র সিনসিনারি ও সাজপোশাকের প্রয়োগ আগেকার মঞ্চাধ্যক্ষদের চোখ খুলে দিলে। দৃশ্যসজ্জা তৈরী হলো প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের অনুসরণে এবং পোশাকের ডিজাইন করা হলো অজন্তার ফ্রেস্কো দেখে। অর্থাৎ একেবারে আনকোরা অবস্থা থেকে কাজ আরম্ভ হলো। পোশাকের জন্য নানারকমের কাপড়, জরি পুঁতি সব বাজার থেকে কিনতে হলো। সে সব কাপড়-চোপড় রঙ করেও নিতে হলো নিজেদেরই হাতে। এ সব করতুম সাধারণত আমি আর প্রবোধবাবু মিলে, আর গয়নাপত্তরের ব্যাপারে সাহায্য নেওয়া হতো অভিনেত্রী ও ব্যালে মেয়েদের কাছ থেকে। সেটিং ব্যাপারে ট্রিকের কাজ ছিল এবং ঠিক মতো তা যাতে হয়, সেজন্য বহুবার রিহার্শ্যালেরও দরকার। কিন্তু সেজন্য অভিনয়ের রিহার্শ্যাল মধ্যরাত্রে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ট্রিক রিহার্শ্যালের জন্যে সময় জুটতো না। কাজেই উদ্বোধন দিনের একপক্ষ আগে থেকে পরীক্ষামূলক ব্যাপারগুলো ঠিকঠাক করে রাখার জন্যে প্রতিদিন মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত কাজ করতে হতো। তারপর নাটক যখন খোলা হলো, দেখা গেলো ট্রিকগুলোর প্রভাব দর্শকের ওপরে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পড়েছে। পর্দা ওঠা থেকে শেষ যবনিকাপাত পর্যন্ত সব ঘড়ির কাঁটার মতো চললো। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রাবলী এবং নৃত্য রচনাগুলির উপস্থাপন এমন সময়তাল রেখে সম্পন্ন হলো যা আগেকার মঞ্চাধ্যক্ষদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। "কর্ণার্জুন"এর নাচগুলি পরিকল্পনা করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গানে সুর দিয়েছিলেন জ্ঞানকীনাথ বসু। সে সময়ে আবহসঙ্গীতে সি লোবোর ব্যান্ড পার্টির বাজনা হতো।

আগে ছিল ড্রপ-সিন, যা উঠতো আর নামতো। আমরাই প্রথম ঐ "কর্ণার্জুন" অভিনয়ের সময়েই পাশের দিকে সরে সরে যাওয়া এবং দুপাশ থেকে এসে দৃশ্য বন্ধ করার ভেলভেট-ট্যবলো পর্দার প্রচলন করি। অভিনয় ব্যাপারেও সেই প্রথম হলো বাই-একটিংয়ের প্রবর্তন। আগে কোন চরিত্র কিছু বলতে বা অভিব্যক্ত করতে থাকলে তার আশপাশের অন্যান্য চরিত্রের আর কিছু করবার থাকতো না, শুধু দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া। এবার থেকে আমরা সংলাপের ভাব ও পরিবেশ অনুযায়ী সঙ্গের চরিত্রগুলির ওপরে তার প্রতিক্রিয়া অভিব্যক্ত করে তোলা আরম্ভ করলুম। এতে ফল হলো, কোন

সময়ে দীর্ঘ সংলাপ হলেও অভিনয় মুষড়ে পড়তে পেতো না। "কর্ণার্জুন" ছিল পঞ্চমাঙ্ক নাটক, অভিনয় হতো প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে, কিন্তু তখনকার লোকের কাছে তা একঘেয়ে লাগতো না। এখন নাটকখানি কাটছাঁট করে সাড়ে তিন ঘণ্টায় আনা হয়েছে। দু' আড়াই ঘণ্টার সিনেমা দেখায় তখনকার দর্শক অভ্যস্ত হয়ে পড়েনি বলেই বোধহয় সেকালে পাঁচ-ছ ঘণ্টা ধরে একখানি নাটক, বা সারারাত ধরে কয়েকখানি নাটক দেখতে দর্শকের ধৈর্য থাকতো। মনে আছে "গোরা" অভিনীত হয়েছিল ছ' ঘণ্টা ধরে এবং রবীন্দ্রনাথ সারাক্ষণ বসে দেখেছিলেন। সেকালের হিসেবে "কর্ণার্জুন" অত্যন্ত ব্যয়বহুল নাট্যপ্রয়োগ হয়েছিল। এর পরের বছর, ১৯২৪-এর ডিসেম্বর মাসে হয় "বন্দিনী"; সে নাটকখানি প্রয়োগ করতে খরচ হয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা—তখনকার দিনে সেইটেই অত্যন্ত "হেভী" খরচ। "বন্দিনী" হয়েছিল ইতালীয় অপেরা "আইডা" অবলম্বনে এবং নাট্যরূপ দান করেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

"কর্ণার্জুন" এমন অভূতপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয় যে, নাটক দর্শকদের তখন গন্তব্য হয়ে উঠলো একটি মাত্র নাট্যালয়, স্টার থিয়েটার। কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে ম্যাডানের বাঙলা নাট্য পরিবেশন প্রচেষ্টা স্তব্ধ হয়ে গেল। দানীবাবুর অধিনায়কত্বে মনোমোহন থিয়েটার কোন রকমে চলছিল, তাও গেল বন্ধ হয়ে। আর মিনার্ভা তো আগেই ১৯২২ সালেই আগুন লেগে ভস্মসাৎ হয়ে গিয়েছে। মিনার্ভা কিন্তু দল ভেঙে দেননি। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মিত্র পুরো দলটি নিয়ে, ১৯২৫ সালে আবার নতুন করে—মিনার্ভা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত মফঃস্বলে অভিনয় দেখিয়ে দল বাঁচিয়ে রাখেন। মাঝে মাঝে এলফ্রেড থিয়েটার ভাড়া নিয়েও অভিনয় করেন। মিনার্ভার নতুন বাড়ির উদ্বোধন হয় "আত্মদর্শন" নিয়ে। "কর্ণার্জুন" একাদিক্রমে দু'শ আশী রজনী অভিনীত হয়।

আর্ট থিয়েটারে "কর্ণার্জুন"-এর সাফল্য আর একটি বড়ো কাজ করে, সেটি হচ্ছে শিশিরকুমারকে "সীতা" মঞ্চস্থ করায় অনুপ্রাণিত করে তোলা। কর্নওয়ালিশ ছেড়ে শিশিরকুমার তার দল নিয়ে এলফ্রেডে এসে নৃত্যগীতবহুল "বসন্তলীলা" অভিনয় করছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র দের (অন্ধগায়ক) গান এতেই প্রথম শোনা যায়। শিশিরকুমার আগে ইডেন গার্ডেনের মেলায় দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" অভিনয় করেন, কিন্তু সে-নাটকখানির স্বত্ব আর্ট থিয়েটার ক্রয় করে নেওয়ায় শিশিরকুমার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে দিয়ে নতুন করে [illegible]

মনোমোহন থিয়েটারে ৬ই আগস্ট ১৯২৪ সালে। আর্ট থিয়েটারের ধারায় জমকালোভাবে প্রযুক্ত "সীতা" অনেককাল মঞ্চস্থ হয়।

শনি ও রবিবারের প্রদর্শনীতে "কর্ণার্জুন" চলতে থাকায় সপ্তাহের মাঝের প্রদর্শনীর জন্যে নতুন কোন নাটক না পাওয়া পর্যন্ত পর্যন্ত আমরা রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্ত" পুনর্মঞ্চস্থের ব্যবস্থা করি। ১৯২৪ সালের নববর্ষের দিন আমরা উদ্বোধন করি "ইরাণের রাণী"—অস্কার ওয়াইল্ডের "ডাচেস অফ পাডুয়া" অবলম্বনে অপরেশচন্দ্রের লেখা নাটক। এর ঘটনাকাল ছিল ইরাণের সেই অগ্নি-উপাসনার আমল।

এ নাটকখানিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় ছাড়া প্রয়োগেরও সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিই, অবশ্য প্রবোধচন্দ্র গুহের সহায়তাও ছিল। আসবাবপত্র সিন সিনারি দ্রাক্ষাকুঞ্জ খুবই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তৈরী করা হয়। এতে আমি বিরতিকালীন আবহসঙ্গীত প্রবর্তন করি। কুড়িজন নিয়ে সেই অর্কেস্ট্রা গঠন করা হয়। এর-পরে "বন্দিনী"তেও আমরা এর পুনরাবৃত্তি করি। এবার মঞ্চসজ্জা আরো জমকালো করে তোলা হয়। প্রাচীন মিশর হচ্ছে ঘটনাস্থল এবং প্রযোজক হিসেবে মিশরের পরিবেশ নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলারও আমি সুযোগ পাই।

আমার এর পরের প্রচেষ্টা হলো ১৯২৭ সালে "চাঁদ সদাগর"। নাট্যকার মন্মথ রায় তখন নবাগত। সে সময়ে আর্ট থিয়েটার স্টার ও মনোমোহন দুটি নাট্যালয়েরই লেসি। এইবারেই কর্তৃপক্ষ আমাকে সহকারী-পরিচালক নিযুক্ত করে দেন এবং পরিচালক হন অপরেশচন্দ্র।

বাঙলা নাট্যালয়ে আর্টের আন্দোলন স্থায়ী হয় ১৯৩২ সাল পর্যন্ত, কিন্তু তার

আগেই ১৯৩০ সালে আমি আর্ট থিয়েটার ছেড়ে মিনার্ভাতে বেশী মাইনে, বোনাস ইত্যাদির চুক্তিতে ম্যানেজার-অভিনেতারূপে যোগদান করি। আগেও কয়েকবার আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু আদালত থেকে ইনজাংকশন দেওয়ায় যাওয়া হয়নি। ওখানে যাবার পর ১৯৩২ সালে পৃথিবীব্যাপী অর্থ সংকটের আঁচ নাট্যালয়েও এসে লাগলো। বাজারের অবস্থা শোচনীয়, তবুও শহরের থিয়েটার চারটি কোনক্রমে বেঁচে রইলো। এই অবস্থা চললো ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। এ সময়ে নতুন নতুন নানারকমের নাটক নিয়ে পরীক্ষা চলতে থাকে। যে-নাটকখানি খুব সাফল্য-মণ্ডিত হতো, সেটি বড়জোর ষাট বা সত্তর রজনী পর্যন্ত চলতো।

১৯৩৬ সালের পর নাট্যালয় আবার জমে উঠতে থাকে। একটা নতুন-জোয়ারের আভাস দেখা দিল। ১৯৩৩ সালে আসে শকট-মঞ্চ ও ঘূর্ণায়মান-মঞ্চ। প্রথমটি হয় প্রবোধচন্দ্র গুহ কর্তৃক নব-প্রতিষ্ঠিত নাট্য-নিকেতন মঞ্চে (পরে শ্রীরংগম এবং বর্তমান বিশ্বরূপা), আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি প্রবর্তিত হয় রঙমহল থিয়েটারে, এটিও তখন সবেমাত্র গঠিত হয়েছে। আমি তখন মিনার্ভায়, প্রবোধচন্দ্র আমাকে তাঁর নাট্যালয়ে প্রযোজক-অভিনেতারূপে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমি যোগদান করি "মা" অভিনয়ের সময়। প্রবোধবাবু আড়ালে সরে গিয়ে তাঁর সুযোগ্য পুত্রের সহায়তায় কার্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

শকট-মঞ্চ নাট্যাভিনয়ে বিশেষ সুবিধে এনে দেয়। স্বনামধন্য নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "জননী" নাটকখানি প্রথম শকট-মঞ্চে পরিবেশিত হয়। পরে ১৯৩৯ সালে নাট্য-নিকেতনে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রবর্তন হয়। ঐ দু প্রকার মঞ্চের পার্থক্য হচ্ছে, শকট-মঞ্চ রেলের মত লাইনে ঠেলে দিয়ে দৃশ্য সরিয়ে দেওয়া হয়, আর ঘূর্ণায়মান-মঞ্চে চাকার সাহায্যে ঘুরিয়ে দৃশ্য পরিবর্তন করা হয়। শচীন্দ্র সেনগুপ্তের "তটিনীর বিচার"এ ঘূর্ণায়মান-মঞ্চ সহযোগে নাট্য প্রযোজনায় একটা যুগান্তর নিয়ে আসা হলো। ঘূর্ণায়মান-মঞ্চের সহায়তা পাওয়ায় শচীনবাবু তখন নতুন ধরনের মনস্তত্ত্বমূলক নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। তার আগে ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করে তিনি নাম করেন। "তটিনীর বিচার"এ মিঃ ডোসের চরিত্রে অভিনয় করা ছাড়া চরিত্রগুলির গতিবিধি ও দৃশ্যাবলীর পরিবর্তন অনু-সারে [illegible] চক্রটির সময় ঠিক রাখায়ও ভার নিই। এরপর আসে

তারাসুন্দরী

শচীনবাবুর "সংগ্রাম ও শান্তি" ও "নার্সিং হোম" এবং মহেন্দ্র গুপ্তের "কঙ্কাবতীর ঘাট"। সব কয়খানিই ঘূর্ণায়মান-মঞ্চের উপযোগী করে রচিত হয়। এইভাবে চলে আসে ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালের শেষ পর্যন্ত। তারপরে এলো জাপানী বোমার ভয়, শহর প্রায় খালি করে কলকাতার লোক সরে পড়তে লাগলো। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো ১৯৪৩ সালে। যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলেছে। লোকের হাতে তখন পয়সা অঢেল। কি দেখছে না দেখছে তা বিবেচনা করার মন ছিল না তাদের। এ সময়ে কতকগুলি আর্টহীন নাটক পরিবেশিত হয়, কিন্তু

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তাও লোকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে বেশ পয়সা পাইয়ে দেয়। এইভাবে এলো ১৯৪৭ সাল।

স্বাধীনতা লাভের পর এবং পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমন হওয়ার পর অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পীদের সমন্বয়ে আগেকার নামকরা নাটকগুলির অভিনয়ের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যায়। পূর্ববঙ্গের লোকে এতোকাল যাদের নামই শুনে এসেছেন, সেইসব জনপ্রিয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের যতোজনকে এক নাটকে ধরানো সম্ভব তাই দেখবার জন্য মেতে উঠলেন। তাই তখন চললো কিছুকাল ধরে সম্মিলিত-অভিনয়, যাতে অতি নগণ্য চরিত্রেও অবতরণ করতে লাগলেন নামকরা শিল্পীবৃন্দ। ১৯৪১ থেকেই ধরতে গেলে এই সম্মিলিত-অভিনয় দেখা দেয় এবং উদ্বাস্তুদের আগমনে তা বহু হয়ে হয়ে ১৯৫২ সালে ভাটা পড়ে যায়। তারপরই দেখা দিয়েছে নতুন নাটকের জন্য ঝোঁক। ১৯৫৩ সাল থেকে নাট্যালয়ের ইমারতি উন্নতি বিধানের চেষ্টায় মনোনিবেশ করা হয়েছে। স্টার থিয়েটার নাট্যগৃহের যথেষ্ট সংস্কার সাধন করে নিরুপমা দেবীর উপন্যাস অবলম্বনে "শ্যামলী" নাটকখানি প্রায় পাঁচশত রজনী অভিনয় করে নাট্য-জগতে এক কীর্তি স্থাপন করেছে। এদের দেখে রঙমহলের নতুন কর্তৃপক্ষও গৃহ সংস্কার করে তাদের দ্বিতীয় নাটক নীহাররঞ্জন গুপ্তের "উল্কা" নিয়ে সাড়ে চারশত রজনী অভিনয় অতিক্রম করে চলেছেন। শ্রীরংগম নতুন স্বত্বাধিকারীর হাতে নতুন চেহারায় "বিশ্বরূপা" নামে সম্প্রতি তারাশংকরের "আরোগ্য নিকেতন" নিয়ে দ্বারোদ্ঘাটন করেছে। মিনার্ভাও নতুন নাটক "এরাও মানুষ" নিয়ে চলেছে দুশত রজনী অভিনয় উদ্‌যাপনের দিকে এগিয়ে। এইসংগে রয়েছে শৌখীন দলের নাট্যাভিনয়ে প্রবল উদ্যম, বছরে বছরে নাট্যোৎসব, থিয়েটার সেন্টারের একাঙ্ক-নাটক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি যার ফলে অভূতপূর্ব উৎসাহ প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একটা কথা এই সূত্রে স্মরণযোগ্য যে গত শতাব্দীতে নটগুরু গিরিশচন্দ্র যে নাট্যধারা প্রবাহিত করে দেন আজও সেই ধারাই চলেছে। নাট্যরচনাই হোক আর অভিনয়েই হোক সর্বক্ষেত্রেই গিরিশ-প্রভাব, তা কারুর পক্ষেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

এসব পশ্চিমবঙ্গের নাট্যালয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই সূচনা। পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টও প্রতিষ্ঠা করেছেন নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত একাডেমি। জাতীয় নাট্যালয় গঠিত [illegible]

গিরগিটি - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সস্তা টিনের ঘর হলেও বাড়টা তার ভাল লাগে। লোকজন একরকম নেই বললেই চলে। মোটে আর এক ঘর ভাড়াটে। তা-ও ঠিক পাশাপাশি ঘর না। উঠোন পার হয়ে বাঁ দিকের ভাঙ্গা ঝির-ঝিরে একটা দেওয়াল ঘেঁসে ডুমুর আর পেঁপে জঙ্গলের আড়াল করা কিছু এক-জায়গায় একটা [illegible]

সমান কথা। সারাদিনের মধ্যে এক আধবার যদি কাশির শব্দ কি যন্ত্রপাতি চালাবার টুংটাং আওয়াজ কানে আসে,—আসে না। ডুমুর গাছ পেঁপে জঙ্গল ভাঙ্গা নড়বড়ে পাঁচিল সামনে নিয়ে ঘেঁটুফুল ডোরার ছাপ-ধরা পুরোনো টিনের দরজার আড়ালে বসে [illegible]

মায়ার ঘরে উঁকি দেয় তো দেখতে পাবে দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা বড় আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ও নিজেকে দেখছে। দেখছে আর যেন আনন্দের আতিশয্যে মৃদু শিস দেওয়ার মতন একটা গানের সুর জিহ্বা ও ঠোঁটের মাথায় জড়িয়ে রেখে রেখে তারপর একসময় নিজের নিশ্বাসের সঙ্গে বার করে সেটা ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে। গায়ের জামায় [illegible]

বোতাম নেই, আঁচলটা ঢিলে হয়ে মাটিতে লুটোয়, খোঁপার বাঁধন খুলে দেওয়াতে ঘাড়ে পিঠে কোমর অবধি একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝারো গড়ন। রং খুব ফর্সা না। কিন্তু মুখখানা সুন্দর। অন্তত মায়ার নিজের কাছে নিজের ছোট্ট পাতলা কপাল আর দু'ধারে একটু বেঁকে যাওয়া না-সরু-না-মোটা ভুরু ও ডগার দিকে ঈষৎ ছড়িয়ে পড়া নাক ও কালো পালক ঘেরা চোখের লালচে মতন বা বলা যায় বাদামী রঙের চকচকে মণি দু'টো অসম্ভব ভাল লাগে। হ্যাঁ আর ওর কচি পেয়ারার মতন ছোট্ট সুগোল মসৃণ একখানা থুতনি। নিজের কাছে তো বটেই প্রণবের কাছেও এই চোখ এই নাক এই ভুরু গাল কপাল এবং বিশেষ করে শক্ত পালিশ গোল ছোট্ট থুতনিটা যে কত প্রিয় তা মায়া এই দু'বছরে বেশ বুঝে নিয়েছে। বাপ্, আদর করতে সকলের আগে প্রণব এই থুতনি ধরে নাড়া দেবে টিপবে রগড়াবে নয়তো থুতনির ওপর নিজের নাক কি গালটা চেপে ধরে ঘসবে। খসখসে গালের ঘসায় মায়ার থুতনির ছাল উঠে যায় যেন। কিন্তু তা কি আর কোনোদিন গেছে। দু'বছর আগে কুমারী বয়সে যেমন ছিল আজও সেই থুতনি নিটোল অক্ষত হয়ে নিজের জায়গায় চুপ ক'রে বসে আছে। যেন এর ক্ষয় নেই বৃদ্ধি নেই জরা নেই। কচি পেয়ারা। তুলনাটা মনে করে মায়া হাসল। অথচ দু'দুটো বর্ষায় না জানি কত সহস্র গাছের পেঁয়ারা বড় হ'ল পাকল কি পাকবার আগেই পোকা কি বাদুড়ের কামড়ে নষ্ট হয়ে নিচে ঝরে পড়ল। আনন্দের আতিশয্যে মায়া বাঁ হাতের দু'টো আঙুলে দিয়ে নিজের সুন্দর থুতনিটা একবার স্পর্শ করল। তারপর আরশীর কাছ থেকে সরে এসে এধারের দেওয়ালের র‍্যাকেটে কুঁচিয়ে রাখা খয়েরী পাড় বুঁটিদার শাড়ি আটপৌরে একটা ব্লাউস ও শুকনো তোয়ালেটা টেনে নামাল। সাবানের কেস্ ও দাঁতন নিতে ভুলল না। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে তখনি কি ও কুয়োতলায় গেল? না। এ-বাড়ির সুবিধা এই। কানে শুনতে খারাপ লাগে যে কল নেই। কিন্তু তাতে কি। দু'জন তো ওরা মানুষ। অফিসে যাবার আগে রাস্তার কল থেকে প্রণব দু'বালতি জল ধরে নিয়ে আসে। তাতেই তাদের রান্না আর খাওয়া কুলিয়ে যায়। বিকেলে এক আধ বালতি আনতে হয়। তা-ও রোজ না। কোনো কোনো দিন। এদিকে স্নান হাত-মুখ ধোওয়া বাসনকোসন ধোওয়া কাপড় কাচাকাচি সব, সব পাতকুয়োর জলে। কত সুবিধে। সারাদিন বালতি ডুবিয়ে ডুবিয়ে যত খুশি জল টেনে তোল কেউ কিছু বলবার নেই। তা ছাড়া ঘড়ি ধরা সময় নিয়ে কলে জল এলো কি চলে যাচ্ছে বলে যে তাড়াহুড়ো ক'রে কাজ সারতে হয় না এটাই মায়ার সবচেয়ে ভাল লাগে। প্রচুর সময় নিয়ে আলসেমীর নৌকোয় গা ভাসিয়ে দিয়ে এক এক সময় এক একটা কাজে হাত লাগালেই হ'ল। আর বড় কথা ভিড় বলতে কিছু নেই এখানে। মায়া ছাড়া আর কারোর কুয়োতলায় কাজ আছে বলেও মনে হয় না। প্রণব সেই সাত সকালে দু'বালতি জল মাথায় ঢেলে খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যায়। ফেরে বিকেল পাঁচটায়। আর কে? ওপাশের ঘরের বুড়ো? লোকটাকে মায়া কোনোদিন কুয়োতলায় দেখল না। ও আসলে স্নান করে কিনা খায় কিনা মায়ার সে সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। খায় নিশ্চয়ই। না হলে আর বেঁচে আছে কি করে। কিন্তু রান্না করে কি? তা হলে তো অন্তত এক আধ বালতি কুয়ো থেকে কি কল থেকে হোক,— আর রান্না না করলেও এমনি তো জল খেতে হয়—সেইটাই বা কোথা থেকে আসে। রাত ন'টায় আর একবার রাস্তার কলে জল আসে। যদি তখন? কিন্তু তা-ও মায়ার চোখে পড়েনি। অবশ্য মাঝে-মাঝে রাত বারোটায়ও জল আসে। তখন কি? তা অবশ্য মায়া বলতে পারে না। বা রাস্তার কল থেকে এত রাত্রে জল ধরে তার ঘরের সামনে দিয়ে কেউ যাচ্ছে কি না দুপুর রাত অবধি জেগে বসে থেকে লক্ষ্য করার মায়ার ইচ্ছা ধৈর্য কোনোটাই নেই। বড় কথা এখানে এ-বাড়ির উঠোন যেমনি ফাঁকা তেমনি কুয়োতলাটাও সারাক্ষণ ফাঁকা থাকে বলে মায়ার যখন ইচ্ছা তখন যতটা খুশি সময় নিয়ে কাজ করার সুবিধা আছে। এই চেয়েছিল ও এমনটি সে চাইছে। শাড়ি শায়া ব্লাউস এক হাতে আর এক হাতে দাঁতন সাবানের বাক্স নিয়ে ও উঠোনের ডান পাশের নিম গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। এখন বর্ষা ঋতু। পাতা ও ফলে ফলে গাছটা বোঝাই হয়ে আছে। দুটো একটা নিম ফল পাকছে। একটা দু'টো মাটিতে পড়ছে। আর পাকা নিম ফলের লোভে রাজ্যের বুলবুলি উড়ে এসে কিচিরমিচির করছে উড়ছে ছুটোছুটি করছে ডাল থেকে ডালে। মায়া ওর সুন্দর থুতনি তুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে পাখিদের নিমফল খাওয়া দেখল। নির্জন কুয়োতলার মতন নিমগাছটাও এ-বাড়ির একটা সম্পদ, অন্তত মায়ার কাছে, ভাবে ও। অবশ্য বাড়িওয়ালা বরদাসুন্দর বটব্যাল কল্পনা করছে, এপাশের নিমগাছ ওপাশের ডুমুর আর পেঁপের জঙ্গল সাফ করে ফাঁকা উঠোনের সবটা জুড়ে বড় দোতলা পাকা দালান তুলবে। টিনের ঘর রাখবে না। কিন্তু সেটা কবে হবে আজকালই হচ্ছে কিনা শোনা যায় নি। অবশ্য তাই নিয়ে মায়া কি তার স্বামী প্রণব মাথা ঘামায় না। টিনের ঘর ভেঙে দিলে সস্তা ঘর খুঁজতে তারা কোনদিকে যাবে, না কি এখানেই দোতলার পাকা ঘরে একটু 'সুবিধামতন' ভাড়া হলে থেকে যাবে তা-ও তারা কিছু ঠিক করেনি। বরং সেসব না ভেবে মায়া সবুজ চকচকে চিকরিকাটা নিমপাতাগুলোর নাচানাচি দেখতে লাগল। আকাশের থমথমে মেঘলা ভাব কেটে গিয়ে একটু সময়ের জন্যে রোদ উঠতে পাতাগুলো যেন হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। গাছের গুঁড়ি ঘেসে একটাল ইঁট কবে থেকে পড়ে আছে। মখমলের মতন পুরু নরম সবুজ শ্যাওলার একটা আস্তরণ সবগুলো ইঁটকে যেন জমিয়ে এক ক'রে দিয়েছে। আগুনে রঙের দুটো ফড়িং সবুজ ইঁটের পাঁজা ঘিরে নাচানাচি করছে। ওপাশের ডুমুরের ডালে এতবড় একটা গিরগিটি স্থিরচোখে তাকিয়ে ফড়িং দুটোকে দেখছে। যেন কোথাও একবার একটু শান্ত হয়ে ওরা বসলে সে লাফিয়ে পড়ে ওদের ঘাড় কামড়ে ধরবে। করুণ চোখে ফড়িং দুটোকে আর একবার দেখে মায়া আস্তে আস্তে কুয়োতলার দিকে চলল।

কুয়োতলার এখানে ওখানে লম্বা ঘাস গজিয়েছে। জায়গাটা সিমেণ্ট করা নেই। গোড়ার দিকে মায়ার অসুবিধা হ'ত। জল কাদা আর আগাছার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে দড়ি বাঁধা বালতি নামিয়ে কুয়ো থেকে জল টেনে তুলতে ওর এমন গা ঘিনঘিন করত। কিন্তু আশ্চর্য, ক'দিনে এটা সয়ে গেছে। প্রণব খান ছয়েক পুরোনো ইঁট বিছিয়ে দেওয়ার পর থেকে মায়া আর কোনো অসুবিধাই বোধ করে না। বরং কুয়োতলার এই মাটি, লম্বা ঘাস, ঘাসের ফাঁকের চিকচিকে জল কাদা আর অগুণতি কিলবিলে মশার বাচ্চা দেখতে ওর এখন ভাল লাগে। যেন এগুলো না থাকলে খারাপ লাগত। বিয়ের পর থেকে এতকাল ওরা শহরের মাঝখানে যে বাড়িতে ছিল সেখানে সিমেণ্ট করা শক্ত ঠনঠনে কলতলার বাঁধানো চৌবাচ্চার পাশে ব'সে একদঙ্গল মেয়েছেলের কাপড় কাচাকাচি কলরব আর তাড়াহুড়োর চাপে পড়ে মায়ার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। মাটি আকাশ গাছপালার গন্ধ ছিল না। ছিল দেওয়াল আর দেওয়াল, আর কটকটে ফিনাইলের গন্ধ আর সস্তা সাবান হেয়ার-অয়েলের মিঠে পচা গন্ধে ভরা বন্ধ বাতাসের গুমোট। কলতলায় যতক্ষণ থাকত মায়ার গা-বমি করত। এখানে খোলা হাওয়া আর ঘাসের শিসের দোলানি আর নিমগাছ থেকে ভেসে আসা পাকা নিমফলের গন্ধ আর বুলবুলির কিচিরমিচিরের এক আশ্চর্য নির্জন জগতে হাত পা ছড়িয়ে বসে মায়া যতক্ষণ খুশি প্রণবের কিনে দেওয়া ভাল সাবানটা মাখতে পারে,—যে-ভাবে খুশি। বাপস, আগের বাড়িতে ইচ্ছামতন খোলা গা হয়ে

বলে মায়া একদিন সাবান মাখতে পারেনি। হ্যাঁ, মেয়েরাই,—একটি মেয়ের গায়ের কাপড় সরে গেলে কি খুলে ফেললে এমন সন্দিগ্ধ কুটিল চোখে তাকায়? আর চোখ টেপাটেপি ঠোঁট টেপাটেপি। এখানে সেসব বালাই নেই। মায়া এক টানে গায়ের ব্লাউসটা খুলে ফেলল। কাঁচুলি ও সায়ার বাঁধন আলগা করে দিতে সরসর করে সেগুলো আপনা থেকে খসে পড়ল। পা দিয়ে এক পাশে ও-দুটো ঠেলে সরিয়ে রাখল ও। এমনি জল দিয়ে কেচে দেবার ইচ্ছা। এখন শুধু পেঁয়াজের খোসার মতন পাতলা শাড়িটা ওর গায়ে পতপত করছিল। এলোমেলো হাওয়া। হাওয়ার ঝাপটায় শাড়িটা একসময় গায়ের চামড়ার সংগে লেপ্টে যেতে হাড় ও মাংসের স্থূল সূক্ষ্ম বাঁকা ও আধ-বাঁকা রেখাগুলো একসংগে জেগে উঠল। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি! গায়ে জল ঢালার আগে রোজ ও কিছুক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থেকে শাড়ির পতপত ও হাওয়ার শিরশিরানিটা অনুভব করে। যেন প্রত্যেকটা রোমকূপের মধ্যে হাওয়া ঢুকে গলা বুক পিঠ পেট কোমর তলপেট উরু হাটু হাটুর নিচে পায়ের মাংসল ডিম দুটোকে সতেজ স্নিগ্ধ ক'রে দেয়। আঁচলটা আর গায়ে রাখে না ও। কোমরে জড়ায়। তারপর কুয়োপাড়ের উঁচু সিমেণ্টের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে কোমর থেকে থুতনি পর্যন্ত সবটা শরীর সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিচের অন্ধকার জলের দিকে তাকায়। জলের আয়নায় নতুন ক'রে সে নিজেকে দেখে। যেন চিনতে পারা যায় না এ-মায়া সেই মায়া এই কপাল সেই কপাল, এই থুতনি সেই থুতনি, এ-বুক সেই বুক। কি, ঘরের আরশীতে এইমাত্র সে যা দেখে এসেছে—। যা সুন্দর শক্ত জমাট আর এখানে জলের অন্ধকারে তা কেমন বিশ্রী হয়ে পড়েছে। এ-অবস্থা দেখে মায়া প্রথমটায় চমকে ওঠে, ভয় পায়। তারপর অবশ্য কারণটা বুঝতে পেরে নিজের মনে ও হাসে। সামনের দিকে অতটা ঝুঁকে থাকলে নিজের ঐ চেহারা দাঁড়াবেই। সুতরাং ভয় মিছে। আসলে ওর—চট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের ওপর চোখ রেখে সে নিশ্চিন্ত হয়। তেমনি মিটোল মসৃণ জোড়া ফলের স্বপ্ন হয়ে কার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা সারাক্ষণ? কি দেখছে? মায়া আবার নিজের মনে একটুখানি হাসল। আবার জোরে হাওয়া বইছিল আর ওর সারা শরীর শিরশির করছিল এমন সময় হঠাৎ ও চমকে উঠল। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কে হেঁটে এল না। ব্যস্ত হয়ে আঁচলের খুঁটটা কোমর থেকে টেনে খুলে তাই দিয়ে ও কোনরকমে বুক ঢেকে তারপর ঘাড় ফেরাল। ঘাড় ফিরিয়ে মানুষটার চেহারা দেখে আবার নিশ্চিন্ত হল। ওর পাওয়ার কিছু না। একটা হাঁড়ি হাতে করে ভুবন সরকার অদূরে পেয়ারা চারাটার গুঁড়ি ঘেঁষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন জল নিতে এসে কুয়োতলায় স্ত্রীলোক দেখে বুড়ো লজ্জা পেয়ে আর পা বাড়াচ্ছে না। মায়া কিন্তু ততটা লজ্জাবোধ করল না। কোনোদিনই করে না। পাকাটির মত সরু জিরজিরে হাত-পা, শুকনো খটখটে ক'খানা পাঁজর, শনের মত পাকা একমাথা লম্বা রুক্ষ চুল ও হলদে ফ্যাকাশে চোখ জোড়া নিয়ে কালেভদ্রে যদি কখনও লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়ায় কি পাশ কেটে চলে যায়, মায়ার মনেই হয় না একটা মানুষ, একজন পুরুষ। ঠিক বুড়ো হয়েছে বলে না, ওর ক্ষীণ হাত-পা নিষ্প্রাণ চাউনি, মন্থর চলার মধ্যে এমন একটা কিছু মিশে আছে যে, মায়ার কখনও কখনও ওকে দেখলে ডুমুরতলার ওধারের পুরোনো ভাংগা পাঁচিলটা কি পেঁপে-জংগলের পাশের মৃত নিষ্প্রাণ সহস্র ক্ষতচিহ্নযুক্ত মাদার গাছটার চেহারা মনে পড়ে। এর বেশি না। অথচ এ-ও যে বরদাসুন্দর বটব্যালের সাড়ে বারো টাকা ভাড়ার টিনের ঘরের ভুবন সরকার নামধেয় একজন মান্যগণ্য বাসিন্দা এবং একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী মায়া ভুলে যায়।

একপাশে একটু সরে দাঁড়িয়ে মায়া অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ভুবন জল নিতে অগ্রসর হচ্ছে না। যেন সাহস পাচ্ছে না।

'নিন, আপনি জল নিয়ে যান।' মায়া ডাকল।

মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল ভুবন। ডাক শুনে চোখ তুলল।

'আপনি চান সেরে নিন। আমার পরে হলেও চলবে।' কথা বলল না লোকটা। যেন পোকায় খাওয়া একটা শুকনো ডুমুরপাতা খসখস শব্দ করে উঠল।

'আমার চান সারতে দেরি হবে।' কথাটা বুড়োকে বুঝিয়ে বলা দরকার, না হলে বুঝবে না টের পেয়ে মায়া রাগ না করে বরং শব্দ করে হাসল। 'আপনাকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার চান করা চলবে কি?'

হাঁ করে তাকিয়ে ভুবন তার একমাত্র প্রতিবেশিনীর হাসি দেখছিল। না কি কচি সবুজ ঝিরঝিরকাটা নিমপাতার গায়ে বর্ষা-দুপুরের রোদের ঝিলিক দেখছে বুড়ো, ভাবল মায়া। তার ঠোঁটে চোখে শাড়ী তখন মেঘ-ভাংগা এক আঁজলা হলুদ রোদ ঝিলমিল করছিল।

পেয়ারা পাতার ছায়ায় দাঁড়িয়ে শুকনো কাঠের মত মানুষটা যেন আরো কালো হয়ে উঠল।

'না, আপনার চান সারা হোক। আমি ঘুরে আসছি, হাতের একটু কাজও বাকি আছে বটে।' বলে বুড়ো আর দাঁড়ায় না, সরে যায়। কষ্ট লাগে মায়ার। হয়তো এভাবে বলা ঠিক হয়নি। যদি দাঁড়িয়ে থাকত ওখানে তো দোষ ছিল কি। তা ছাড়া জল নিতে ও বড় একটা আসে কই। নিশ্চয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল এখন। গায়ে জল ঢালার আগে বুকের আঁচলটা আবার কোমরে জড়াতে জড়াতে মায়া ভাবে। এ-বাড়ির ভাংগা পাঁচিল মরা গাছ কি ছাতা-পড়া পুরোনো ইঁটের পাঁজার সংগে যে-লোকটার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে মায়া পরিতৃপ্ত ছিল আজ তাকে হঠাৎ আলাদা করে দেখতে যাওয়া কি তার পায়ের শব্দে গা ঢেকে ফেলার মধ্যে কি একটা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেল না? মায়ার বুকের মধ্যে কেমন খচ খচ করতে লাগল। এক টুকরো অনুশোচনা গলার কাছে আটকে থেকে যেন জায়গাটা জ্বালা জ্বালা করে উঠল। স্নান করার আনন্দ তেমন ক'রে ও অনুভব করতে পারল কই। সাবান-গোলা জল দুধের ধারা হয়ে ওর উষ্ণ কোমল ঝকঝকে চামড়ার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। একলা মায়া ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ তা দেখছে বলে আজ আর সে মনে করতে পারল না। অথচ ওরা রোজ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে, হ্যাঁ, সহস্র পাতার চোখ মেলে এবাড়ির নিমগাছ, রোদ কি জল ঠেকাতে বড় বড় ছাতা মাথায় ওধারের পেঁপে গাছগুলো, এপাশের কচি পেয়ারা গাছটা, ওদিকের পাঁচিলের মাথায় কাকগুলো পর্যন্ত, ইঁটের পাঁজা ছেড়ে লাল ফড়িং দুটো উড়ে এসে ঘুরে ঘুরে মায়ার ভিজে চুল দেখে নাভি দেখে স্তন দেখে জঙ্ঘা দেখে। কচি কলাপাতার বোঁটার মত ওর পিঠের ঋজু মসৃণ সুন্দর শিরদাঁড়া ঘেঁসে একটা মশা হুল ফুটিয়ে দিয়ে এতটা রক্ত খেয়ে পেট মোটা করে একসময় উঠে গেল। যেন মায়া টের পেল না। ভাল করে তোয়ালে দিয়ে গা রগড়াতে আজ তার হাত উঠছিল না। ভাবছিল ও মানুষটাকে এখানে দাঁড়াতে নিষেধ করা আর ডুমুরের মরা ডালটাকে এদিকে উঁকি দিতে বারণ করা এক কথা। যেন সেই অভিমানে ফড়িং দুটো এল না, পাঁচিলের মাথায় কাকগুলো নেই, পেঁপে গাছগুলো ছাতার আড়ালে মুখ ঢেকেছে, নিমগাছটা বুলবুলিদের ফল খাওয়াতে ব্যস্ত। মায়ার স্নান দেখতে কারো উৎসাহ নেই। ওদের একজনকে সরে দাঁড়াতে বলায় বাকি সবাই রাগ করেছে দুঃখ পেয়েছে। অথচ এদের চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরা খুলে দেওয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে পাঁচ নালতির জায়গায় পনেরো নালতি জল ঢেলেছে ও. প্রণবের কিনে দেওয়া সাবানটাকে বার বার ঘসে ফ্যাদলে ক্ষয় করে এনেছে।

বুড়ো একটা আঘাত বুককে নিয়ে কোনো-রকমে ও স্নান শেষ করল। ভাল করে মাথা মোছা হল না তোয়ালে বা কাপড়ের জল নিংড়ানো হ'ল না। মন্থর ভারি পায়ে কুয়োতলা ছেড়ে ও ঘরে ফিরে এল। তখনি আবার তার আরশীর সামনে দাঁড়াবার কথা। কিন্তু তা সে করল না। ভেজা কাপড়গুলো মেলে না দিয়ে দলা করে সেভাবেই দরজার পাল্লার ওপর রেখে দিল। টস্‌টস্‌ করে জল ঝরছিল সেগুলো থেকে। মায়া এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে তা দেখল কিন্তু সে-সম্পর্কে ও কিছু ভাবছে বলে চোখ দেখে মনে হল না। চৌকাঠ পার হয়ে আস্তে আস্তে ও আবার উঠোনে নামল। আবার এক সেকেন্ড কি ভাবল, তারপর ওপাশের ডুমুর জঙ্গল ও ভাঙ্গা পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে ডেকে বলল, 'আমার হয়ে গেছে আপনি যান।'

কেউ সাড়া দিল না। টিনের ডেরা থেকে বেরোলো না কেউ। মায়া আর একটু সময় অপেক্ষা করল। একটা শালিক ওর পায়ের শব্দে উঠোনের ঘাস ছেড়ে উড়ে পেয়ারার ডালে গিয়ে বসল। এক পা এক পা করে মায়া ডুমুরতলার দিকে এগোয়।

টিনের চাল প্রায় মাথায় ঠেকে। ভিতরে ঢুকল না ও। চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে এক-বার উঁকি দিয়ে দেখল। অবাক হ'ল না, বরং মায়ার দুঃখ হ'ল। মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতের কাছে মাটিতে দুটো একটা যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। কোনোটা জং ধরা। কোনোটার হাতল নেই, কি মাথা ভেঙ্গে গেছে। ওধারে দুটো গোল মতন কি যেন পড়ে আছে। ইলেক্‌ট্রিকের কলকব্জা কিছু হবে মায়া অনুমান করল। পাশেই আর একটা জিনিস দেখে মায়া চিনল। টেবিল-ফ্যান্‌। দুটো ব্লেডই ভেঙ্গে গেছে, একটা আছে। ওটা ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ না হয়ে যায় না। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সব দেখা শেষ করে মায়া আবার বুড়োর মুখটা দেখতে লাগল। দুটো চোখ গর্তে ঢুকে পড়েছে। কপালের চামড়া ঠেলে পাকানো দড়ির মতন একটা মোটা শিরা বেরিয়ে আছে। কাঠের টুকরোর মতন দুটো চোয়াল। নাকটা উঁচু, গাল কপাল শুকিয়ে যাওয়ার দরুন আরো বেশি উঁচু দেখাচ্ছে। গলায় বুকে ক'খানা শুকনো হাড় ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। শিয়রের কাছে শূন্য এল্যুমিনিয়মের ডেকচিটা পড়ে আছে। দেখে মায়ার দুচোখ আবার ছলছল করে উঠল। একটু সময় ইতস্তত করে তারপর ও আস্তে ডাকল, 'ঘুমিয়ে পড়লেন কি? ঘুমোচ্ছেন?'

'হুঁ হুঁ কে?' বুড়ো চমকে উঠে চোখ মেলে দরজার দিকে তাকাল তারপর ব্যস্ত হয়ে পা দুটো গুটিয়ে সোজা হয়ে বসল। হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে অল্প হাসল, হাই তুলল একটা। 'ভাবলাম আপনার চানটা হোক হাতের কাজটা সেরে ফেলি, আর এর মধ্যে কিনা চোখটা লেগে গেল।'

'আমার হয়ে গেছে, যান।' বলল মায়া, বলে চলে আসত চৌকাঠ ছেড়ে, কিন্তু পারল না, দাঁড়িয়ে রইল। এই প্রথম ওর মুখোমুখি দাঁড়ানো। শুকনো মরা গাছ দেখে যেমন ভয় বা লজ্জা পাওয়ার প্রশ্ন মনে জাগে না এখানেও তাই। শূন্য হাঁড়িটা তুলে নিয়ে মায়ার সামনে দাঁড়িয়ে ভুবন ওর চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে যেন কি বলি বলি করছে। মায়া মাটির দিকে চোখ নামিয়ে প্রশ্ন করল, 'এইবেলা বুঝি রান্না-বান্না হবে?' কোণার দিকে একটা উনুন ও কিছু ভাঙ্গা বাঁশ কাঠের টুকরো মায়ার চোখে পড়েছে।

'হুঁ, দিদি, ইচ্ছা ছিল সেরকম, তা শরীরটা যেন এখন আর নড়াতে ভাল লাগছে না।' বলে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল ভুবন, চুপ করে রইল একবার, তার-পর আস্তে আস্তে বলল, 'বেলা এখন কটা ঠিক বাজবে দিদি?'

'বারোটা হবে।' মায়া মাটি থেকে চোখ তুলল। 'অনেক বেলা হয়েছে।' যেন মানুষটার চোখের রং এখন আর তেমন ফ্যাকাশে না থেকে একটু চকচকে হয়েছে দেখে মায়া ঘাড় ফিরিয়ে বাইরে ডুমুর পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের রোদ পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হল। শুকনো পাতার খসখস শব্দের মত নিশ্বাসের আর একটা শব্দ কানে এল ওর।

'আহা, কত ভাল লোকের সংসর্গে আছি আমি।' যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছিল বুড়ো। 'দিদি আমার কষ্ট করে খবর দিতে এল কুয়োতলা অবসর হয়েছে, তুমি যাও।'

মায়া কথা বলল না। চোখের একটা প্রসন্ন ভাব নিয়ে বুড়োর হাতের শূন্য হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। যেন বুড়ো আবার একটা কি বলি বলি করছিল। টের পেয়েও মায়া চোখ তুলল না। দুটো লাল ফড়িং-এর একটা ইঁটের পাঁজা ছেড়ে এখানে উড়ে এসে ওর হাঁটুর কাছে ঘুরঘুর করছে দেখে মায়া অবাক হয় খুশি হয়।

'ইচ্ছে করেছে অনেকদিন, সাহস হয়নি কথা বলতে, কিন্তু দিদিমণি যে এত ভাল মানুষ আমি কি জানতাম।' ভাঙ্গা অসমান নোংরা দাঁত বার করে ভুবন অল্প শব্দ করে হাসল। 'কেমন ভালোলোকের সংসর্গে বাস করছি আমি। আহা!'

'বুড়ো মানুষ আমার সঙ্গে কথা বলবেন তাতে—' বাকিটা বলল না মায়া সুন্দর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে তা বুঝিয়ে দিল।

'বুঝতে পেরেছি বুঝতে পারি।' ভুবন খুশী হয়ে মাথা নাড়ল। 'সকল লোক কি আর সমান। সংসারে সব মানুষ একরকম হলে সৃষ্টি অচল হত।'

মায়া নীরব। ফড়িংটা এখন তার কানের কাছে খোঁপার পাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছিল।

'সকল লোক সমান না।' ভুবন আবার বলল, 'সেদিন রাস্তার কলে এই হাঁড়ি দিয়ে জল ধরতে গিয়ে কি কম নাকাল হতে হয়েছিল, দিদি, বড় বেশি অপমান হয়ে ফিরে এসেছিলাম।'

'কে অপমান করল?' মায়া বুড়োর চোখের দিকে তাকায়।

'দিদির বয়সী একটা মেয়ে, বৌ, কার বৌ জানি না, রাস্তার ওধারের একটা টালির ঘরে যেন থাকে।' বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তার বয়সের একটি বৌ বুড়োকে অপমান করেছে শুনে মায়ার দুঃখ এবং কৌতূহল হল। 'কি বললে বৌটা, কি বলছিল আপনাকে?'

'আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে ওকে দেখছি। ওকে দেখতে আমার কলের কাছে দাঁড়ানো। জল ধরতে যাওয়াটা কিছু না, ছুতো।'

'ছি ছি ছি।' মায়া সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল। 'এমন একটা বুড়ো মানুষকে এভাবে বলতে কি ওর—'

বাকিটুকু বলল না মায়া। কিন্তু তার চোখের বেদনা ভুবনকে অভিভূত করল। 'সব মানুষ সমান না সকল চোখ এক না।' একটা ভারি নিশ্বাস ফেলে ভুবন মৌচাকের মতন মস্ত কালো খোঁপা ঘিরে লাল ফড়িং-এর নাচানাচি দেখল। গাল ঘুরিয়ে মায়া আবার একটু সময় পেয়ারা পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়া আষাঢ় আকাশের হলদে আলো দেখছিল।

'অনেক বেলা হ'ল, এইবেলা রান্নাবান্না আরম্ভ করুন।' ঘাড় ফিরিয়ে কথাটা বলতে গিয়ে মায়া চুপ ক'রে গেল। ফ্যাকাশে মরা চোখ দুটোতে যেন অন্যরকম রং লেগে আবার চকচক করছে। ডান হাতের হাঁড়িটা বাঁ হাতে চালান দিয়ে ভুবন আস্তে আস্তে ঠোঁট নাড়ছে, যেন কি বলতে গিয়ে ইতস্তত করছে।

আর দাঁড়াল না, চৌকাঠ ছেড়ে মায়া উঠোনে নামল।

শুকনো ডুমুর পাতার খসখস শব্দ শুনে আর একবার ও ঘাড় না ফিরিয়ে পারে না। না, ভুল দেখেছে সে, মরা মাছের চোখ নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

রুক্ষ জীর্ণ অস্থিসার একটি মানুষ। মৃত পত্রহীন মাদার গাছটার চেহারা মনে পড়ল মায়ার।

'আমায় কিছু বলছেন?'

'না,' ভুবন মাথা নাড়ল। 'বলিনি কিছু। দিদিকে দেখে ভাবছিলাম। দিদিকে দেখলে আমার কেবলই ওই ডালিম চারাটার কথা মনে পড়ে।'

'কোথায় ডালিম চারা, কোন্‌দিকে!' যেন খুব বেশি চমকে উঠল মায়া। আঙুল দিয়ে ভুবন উঠোনের একটা পাশ দেখিয়ে দিতে মায়া সেদিকে তাকায়। অনেকদিন আগেই ওটা তার চোখে পড়েছে। কিন্তু এখন যেন নতুন ক'রে ও ডালিমচারাটা দেখতে পেল। চারা বলা চলে না, ঠিক। গাছ। লম্বা ঋজু একটি মেয়ের সুন্দর দুটো বাহুলতার মতন সুগোল মসৃণ দুটো কাণ্ড আকাশের দিকে একটুখানি উঠে তারপর থেমে গেছে। তারপর কচি কচি ডাল। যেন অনেকগুলো আঙুল। আঙুলে ছেয়ে নতুন লালচে সবুজ পাতার ঝিলি-মিলি। হাওয়ায় দুলছে নড়ছে। যেন আঙুল নেড়ে নেড়ে মেয়েটি নিজের এলো-মেলো চুলে বিলি কাটছে আর খিলখিল হাসছে। আর একটুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মায়া। আধফোটা একটা কলি সিঁদুরের রেখা হয়ে পাতার মাঝখান থেকে উঁকি দিয়ে আবার তখনি লুকিয়ে যাচ্ছে। আর একটু মনোযোগ দিয়ে দেখল মায়া। একবার দেখল। দুবার দেখল। বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ছিল না। সুগোল সুঠাম আশ্চর্য সবুজ দুটো ফল। পাতার আড়াল সরিয়ে সন্তর্পণে দুবার দেখিয়ে তারপর যেন লুকিয়ে ফেলল মেয়েটি আর খিলখিল হাসল। ছোট্ট একটা নিশ্বাস পড়ল মায়ার।

'চারা না, গাছ।' ঘাড় ঘুরিয়ে ও ভুবনের মুখের দিকে তাকায়। ভুবন মাথা নাড়ল।

'নতুন গাছ। যৌবন লেগেছে গায়ে।'

মরা মাছের মত চোখদুটো আবার চক-চক করছে কিনা দেখতে মায়া আর মুখ ফেরায় না। যেন কি ভাবছিল ও। ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে ফিরে এল।

কি, অপরের চোখে সে নিজেকে দেখছে? কে সেই পর? কেউ না। মানুষ না পুরুষ না। সংসারে একমাত্র পুরুষ প্রণব। তার স্বামী। যার মুখে রাত-দিন তার রূপ যৌবন শরীরের অঢেল লাবণ্যের প্রশংসা শুনে শুনে মায়া এখন ক্লান্ত হয় বিরক্ত হয়। আর কোনো পুরুষের চোখে মুখে সে তার বাইশ বছরের যৌবনের স্তুতি দেখল-না শুনল না। যদি দেখত শুনত তবে কি সে খুশী হত? মায়া ঠিক [illegible]

চেয়ে চেয়ে দেখে, ভাঙা পাঁচিল মরা গাছ কাক শালিক বুলবুলির ঝাঁক যখন তখন মায়ার হাত দেখছে পা দেখছে হাঁটু দেখছে পিঠ কোমর ভুরু চোখ চুল নখ সব। রাগ করে না ও, বরং খুশি হয়। যদি ওরা এমনভাবে ওর দিকে তাকিয়ে না থাকত তো তার মনে হ'ত না সে বেঁচে আছে। সুতরাং—

দুপুরে খাওয়ার পরে চোখে আজ ঘুম আসেনি। শুতে গিয়ে শোয়া হ'ল না। এক আশ্চর্য নেশায় মন শরীর আচ্ছন্ন হয়ে রইল। সত্যি তো। মরা মাদার গাছ কি নোনাধরা পাঁচিলটা যদি হঠাৎ মুখ ফুটে ব'লে ওঠে, 'চমৎকার! কত সুন্দর তুমি', অথবা 'তোমাকে দেখে বর্ষার রজনীগন্ধা কি বৈশাখের চাঁপার কথা মনে পড়ে আমাদের,' তো সে কি খুব অবাক হবে? হয়নি। এখনও হ'ল না। বরং নূপুর বাজার মতন উত্তেজনায় আনন্দে তার রক্তের মধ্যে মিষ্টি রিমঝিম একটা শব্দ হচ্ছিল। সেই কখন থেকে। শোয়া ছেড়ে এক সময় ও উঠল। আস্তে দরজার দুটো পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে উঠোনের দিকের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিল। তারপর এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। ঠিক মাঝ জায়গায় দাঁড়ালেই দেওয়ালের আরশীতে ও পায়ের নখ থেকে সিঁথির ডগা পর্যন্ত সব দেখতে পায়। না, আরশী মুখ ক'রে দাঁড়ালেও সব দেখা যায় কি। সব বাঁধন খুলে পা দিয়ে একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিলে ও। আর সেই মুহূর্তে আয়নার দিকে তাকিয়ে ও স্থির স্তব্ধ হ'য়ে গেল। যেন রক্তের বাজনাটাও কিছুক্ষণের জন্য থেমে রইল। না, নিজের এই মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি, এভাবে! ডালিম গাছ। পাতা ফুল ফল কাণ্ড শাখায় শাখায় ছড়িয়ে পড়া যৌবনের সতেজ প্রগলভ লাবণ্য। পুলকের বিদ্যুৎ-শিহরণ তার মেরুদাঁড়ায় খেলা ক'রে গেল, টের পেল মায়া। আর রক্তের বাজনাটা যেন প্রচণ্ড শব্দ ক'রে তখন বেজে উঠল ঝম্ ঝম্ ঝম্। ঘরের চালে শব্দ হচ্ছিল, বাইরে, গাছের পাতায়, পাঁচিলের গায়ে, কুয়োতলায়, ডুমুর জঙ্গলে। আকাশ ভেঙে জোরে বৃষ্টি নামল, আর আয়নার সামনে নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে কোটি-বার ও নিজেকে দেখল।

অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল এটা। একদিন দুদিন তিনদিন। এবং সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস ও লক্ষ্য করল। অবশ্য তাতে প্রথম দিন ও ভয়ই পেয়েছিল, দ্বিতীয় দিন আর ভয়টা রইল না, মনটা একটু খারাপ লাগল। কিন্তু, অবাক হ'ল মায়া, তৃতীয় দিন [illegible]

রেটের গন্ধ অফিসের গল্প বা মায়া রাঁধতে বসেছে আর পাশে ব'সে স্বামী তার গলায় কি পিঠের ঘামাচি খুঁটছে কি বিড়বিড় করে বাজারের হিসাব বলছে ইত্যাদি সব কেমন যেন মায়ার কাছে পুরোনো, বড় বেশি এক ঘেয়ে ঠেকতে লাগল। যেন জন্মাবধি সে এসব দেখছে শুনছে। যেন শুনে শুনে দেখে দেখে এখন তার হাঁপিয়ে ওঠার সময় এল। এমন কি রাতটাও। আদর চুমু আবেগ উচ্ছ্বাস কোনো কিছুর মধ্যেই আর ও দিশেহারা হয়ে যেতে পারছিল না। যেন কতকাল ধ'রে চলছে। যেন এসব কাজ এখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকলে ভাল হয়। বিছানার গন্ধ প্রণবের গায়ের গন্ধ চটচটে ঘাম আর গরম নিশ্বাসের হল্কা থেকে রেহাই পেতে সত্যি ও এক সময় উঠে পড়ে। 'এর মধ্যেই তোমার জল তেষ্টা পেয়ে গেল!' ঠাট্টার সুরে প্রণব বিড়বিড় করে। কিন্তু মায়া উত্তর দেয় না। গম্ভীর থাকে। সবটা আবহাওয়া তার কাছে অশ্লীল কুৎসিত ঠেকে। বিছানার অন্ধকারে আধশোয়া স্বামীকে কুৎসিত মনে হয়। বেশ বাস ছেড়ে নিজেকে কুৎসিত মনে হয়। অথচ—অন্ধকার জানালায় একলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ও ভাবে।

প্রশ্নের জবাব দেয়নি ভুবন। ঘাড় গুঁজে মাছ কুটছিল। জলপচা শাদাটে ক'টা পেট-ফোলা ট্যাংরা মাছ। একটা ভোঁতা কাটারির বুকে পুঁছিয়ে পুঁছিয়ে পেট আলগা ক'রে মাছের কালচে তামাটে রঙের নাড়ি-ভুঁড়ি বার করতে করতে ভুবন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যেন লোকটার নিশ্বাসের ঝাপটায় মাছির ঝাঁক ভন ভন ক'রে ওঠে। কিছু তার নাকের সামনে কিছু ঘাড়ের কাছে পিঠের খাঁজে উড়ে বেড়ায়।

'আপনার বুঝি বঁটি নেই?'

ভুবন শুধু মাথা নাড়ল কথা বলল না বা চোখ তুলে চৌকাঠের দিকে তাকাল না।

মায়া একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

'বঁটি থাকলে সুবিধে হ'ত। ছোট মাছ কাটারি দিয়ে কুটতে কষ্ট।' ব'লে মায়া ঘাড় ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। আজকের দুপুরের চেহারাটা অন্যরকম। বৃষ্টিও পড়ছে আবার রোদও উঠেছে। সিল্কের মত শাদা নরম মেঘে মোড়া আকাশ থেকে কে যেন একটা রূপালি জাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। রূপার সুতোর মতন শাদা ফিন-ফিনে বৃষ্টির ছাট এসে থেকে থেকে মায়ার পায়ের কাছে মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে। মাটি ঘাস গাছের পাতা ভাল ক'রে ভিজতে না ভিজতে আবার দেখা যায় ঝকঝকে রোদের হাসি। [illegible]

ভুবনের দিকে তাকাল। এবার ও খুশি হ'ল। ফ্যাকাশে হলদে চোখ জোড়া মেলে মানুষটা হা ক'রে তাকে দেখছে। মায়া বাঁ পা নামিয়ে ডান পা-টা চৌকাঠের ওপর রাখল।

'তা কারখানার কাজ কি ক'রে গেল বললেন না তো?'

শুকনো মরা পোকায় খাওয়া গাছের বাকলের মতন বুড়োর ঠোঁটের চামড়া ঈষৎ বিস্ফারিত হ'ল। বোঝা গেল হাসতে চেষ্টা করছে। বাঁ হাতের পিঠটা কপালে ঠেকিয়ে আবার হা ক'রে সে মায়ার মুখের দিকে তাকায়। অর্থাৎ অদৃষ্টে নেই তাই চাকরি গেছে। বুঝতে পেরে মায়া একটু সময় চুপ ক'রে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'যাক, হাতের কাজটা যখন শেখা আছে কোনোরকমে চলে যাচ্ছে—যাবে। ঘরে ব'সে টুকিটাকি সারাইয়ের কাজ করছেন মন্দ কি।'

কিন্তু চোখ দেখে মনে হ'ল না ভুবন তা ভাবছে। কি ভাবছে চিন্তা না ক'রে মায়া আবার উঠোনের দিকে মুখ ফেরাল। ভিমরুলের চাকের মতন প্রকাণ্ড খোঁপার পরিবর্তে অল্প বয়সের একটি মেয়ের মতন চেরা বেণী আজ ও ঘাড়ের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। হাওয়ায় দু'টো বেণী নড়ছিল। স্কুলে পড়ার সময় বেণী করত ও। বৌ হবার পর আজ এই প্রথম। আর এই বেণী তৈরী করার সময় অনেকদিন পর এক ধরনের বনজ লতার কথা বার বার মনে পড়ছিল তার। প্রণব এভাবে চুল বাঁধা পছন্দ করবে না এটাও মায়া চিন্তা করেছে এবং স্বামী বাড়ি ফেরার আগেই ওটা ভাঙতে হবে ভেবে তার বুকের মধ্যে বেশ একটু টনটন করছিল। খসখস শব্দটা শুনে মায়া চমকে ঘাড় ফেরাল। ভুবন এবার দাঁত বার ক'রে রীতিমত হাসছে।

'কি হ'ল? মাছ কোটা তো শেষ হয়েছে, এবার রান্না চাপান।'

'তা চাপাব, এক সময় চাপালেই হ'ল।' হাত নেড়ে মাছের গায়ের মাছি তাড়ায় ভুবন। 'রান্না আর খাওয়ার কথা এখন বড় একটা ভাবি না, দিদি, কেমন যেন ইচ্ছাই করে না হি-হি। একটা কাজ ছিল শেয়ালদার। বুঝিয়ে দিয়ে ফেরার সময় এই তো আজ আট দিন পর দু'টো মরা ট্যাংরা আনলাম। রান্নাই বা আর রোজ হয় কোথা.—'

মায়া চুপ ক'রে রইল।

হাওয়াটা একটু বেশি জোরে বইছিল ব'লে পিঠের বেণী দু'টো একজোড়া সাপের মতন পরস্পর জাপ্‌টা জাপটি ক'রে আবার কোমরের দু'দিকে সরে গিয়ে হিলহিল করছিল। যেন সাপের খেলা দেখতে বুড়ো চোখ বাঁকা করে ঘাড় কাত করে মায়ার পিঠের দিকে চেয়ে থাকে। ঘোলা জলের ওপর রোদ পড়লে যেমন একটা চিকচিকে শাদাটে আভা জাগে বুড়োর চোখে আজ আবার সেই রং দেখল মায়া। কিছু বলল না ও, বরং ক্ষুদে প্রজাপতিটা এইবেলা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, উড়ে উড়ে এসে ওর গলায় বুকে বসতে চেষ্টা করছে দেখে মায়া সেটাকে একসময় খপ্ করে মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলে পরে ওটাকে উঠোনের দিকে ছুঁড়ে দিতে ঘুরে দাঁড়ায়। এবার ভুবন তার সবটা পিঠ ও কোমর দেখতে পাবে মায়া অনুমান করছিল। বাচ্চা প্রজা-পতিটা বাইরে ঘাসের ওপর ছিটকে পড়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ মরার মতন শুয়ে থেকে পরে একসময় নড়ে চড়ে উঠে দিব্যি উড়তে উড়তে পেয়ারা গাছের দিকে চলে গেল। মায়া খুক্ ক'রে হাসল। ভুবনও হাসল। মায়া ঘুরে দাঁড়াল।

"মরেনি। ভাবলাম হাতের চাপে চট্‌কে শেষ হয়ে গেছে।"

'কেন মরবে?' ভুবন ঘাড় নাড়ল। 'নরম মুঠো। এই চাপে কি আর ও মরে!'

মুখ ফিরিয়ে মায়া শাদা প্রজাপতিটাকে আর দেখতে পেল না। পেয়ারা পাতার ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

'ভারি সুন্দর ছিল, এই এতটুকুন!'

ভুবন ঘাড় নাড়ল। ফাটা শুকনো রোদ পোড়া গাছের বাকলের মতন পুরু ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আরো সুন্দর লাগছিল দিদির থুঁতনির চারপাশে, যখন ও ঘুরঘুর করছিল। মাছ! মাছ কুটব কি ছাই। আমি তখন থেকে কেবল ভাবছি কোন্ ফুলের সঙ্গে কোন্ ফলের সঙ্গে এই থুঁতনির তুলনা চলে। মচ্‌কা ফুল—না না না, করবী ফুলের তলার দিকটা, ছোট্ট বাটির মতন গোল হয়ে বোঁটার সঙ্গে যেটুকু লেগে থাকে,—অবিকল সে রকম। দিদির থুঁতনি দেখলে তাই মনে পড়ে। মিছা বলছি? আর একবার যখন আরশীতে মুখ দেখবেন কথাটা সত্য কিনা বুঝবেন।'

মেরু দাঁড়ায় একটা শিহরণ অনুভব করত মায়া, কিন্তু তা করতে গিয়েও সে ওটা আর টের গেল না। তাই আগের চেয়েও শান্ত স্থির চোখে ও ভুবনের মুখের দিকে তাকাল। একজন পুরুষের মুখে ও রূপের প্রশংসা শুনছে কি? না না, যা-ও একটু হাসির রোদ লেগে ঘোলাটে চোখ দুটো চিকচিক করছিল এখন আবার মরা মাছের চোখের মতন ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে হয়ে আছে। কাঠের টুকরোর মতন শুকনো হাটুর সঙ্গে দুটো হাত ঠেকানো। বরং ক্ষীণ একটা বেদনার ঢেউ বুকের মধ্যে অনুভব করল মায়া। অল্প হেসে বলল, 'তা দেখব আরশীতে, দেখা যাবে সত্যি আমার থুঁতনি অত সুন্দর কিনা। আপনি এইবেলা উঠুন। আসুন। আমি জল তুলে দিই আপনি মাছটা ধুয়ে ফেলুন। অনেক বেলা হ'ল।'

দু'জনের পায়ের শব্দে গিরগিটিটা ওধারের পাঁচিলের মাথা থেকে লাফিয়ে ডুমুর জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। মায়া থমকে দাঁড়ায়। পিছন থেকে ভুবন বলল, 'তা আমি না হয় এতকাল কোণার দিকের ভাঙ্গা ঘর নিয়ে ছিলাম, এখন উঠোনের এধারে নতুন ঘর তুলেছে কর্টব্যাল। আর ঘর তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাড়াটেও পেল, এখন তো জঙ্গলটঙ্গলগুলো একটু সাফ করে ফেলা উচিত ওর, কিন্তু, শালা কি এদিকে একবার উঁকি দিতে আসে? মাসকাবার হলে ভাড়া গুণতে হাজির হবার বেলায় ঠিক আছে।'

'না খুব বেশি জঙ্গল কি।' মায়া বলল, 'আমার কিন্তু এই গাছটাছগুলো বেশ ভালই লাগছে। সস্তার মধ্যে বাড়িটা চমৎকার।'

একটা নিশ্বাস ফেলল ভুবন।

'আমার ইচ্ছা করছে এই আগাছাগুলো তুলে ফেলে এধারটায় কিছু ফুলের গাছ করি।'

মায়া কথা বলল না।

'তা এবছর আর হয় না।' পিছন থেকে ভুবন পরে বলল, 'আরো আগে পুঁতলে তবে ঠিক হ'ত। এখন বীজ পুঁতলে শালার জলেই সব পচে ভূত হয়ে যাবে গাছ বেরোবে না। আর গাছ বড় হতে হতে শীত এসে যাবে। শীতে আর দো'পাটি তেমন ফোটে কই। উঁহু।'

'হ্যাঁ, সুন্দর।' ঘাড় ফিরিয়ে মায়া বলল, 'দো'পাটি ফুল আমি খুব পছন্দ করি। ছোটবেলায় দেখতাম আমাদের স্কুলের বাগানে,—এমনদিনে গাছগুলো শাদা হয়ে থাকত।'

'শাদা লাল গোলাপী অনেক রঙের হয়।' ভুবন আস্তে আস্তে বলল, 'আমার ইচ্ছা লাল দো'পাটি করার। লাল ফুল দিদির বেণীতে মানাবে ভাল।'

মায়া হঠাৎ আবার কথা বলতে পারল না। ভুবনও চুপ করে রইল। কিন্তু কুয়োতলায় গিয়ে সে মুখ খুলল। মায়া জল ঢালছে আর দু'হাতে রগড়ে মাছের গায়ের ছাই ময়লা সাফ করতে করতে কি ভেবে সে বলল, 'ছোটবেলার কথা ইস্কুলে পড়ার দিন-গুলোর কথা দিদির খুব বুঝি মনে পড়ে?'

প্রথমটায় উত্তর দিল না মায়া, তারপর এক সময় আস্তে আস্তে বলল, 'মনে পড়লেই আর কি করা যায়। দেখতে দেখতে বড় হলাম, স্কুল ছাড়লাম, তারপর বিয়ে হয়ে গেল।' একটু থেমে পরে বলল, 'হাজারবার মনে পড়লে কি ইচ্ছা করলেও এখন আর সেদিন ফিরে পাব না।' নিজের মনে কথাটা বলে শেষ করে বিষণ্ণ চোখ দুটো ও আকাশের দিকে তুলে ধরল। রোদের আভা মুছে গিয়ে কালো বড় বড় মেঘের আনাগোনা আরম্ভ হল এবার। মাছ ধোয়া শেষ করে ভুবন
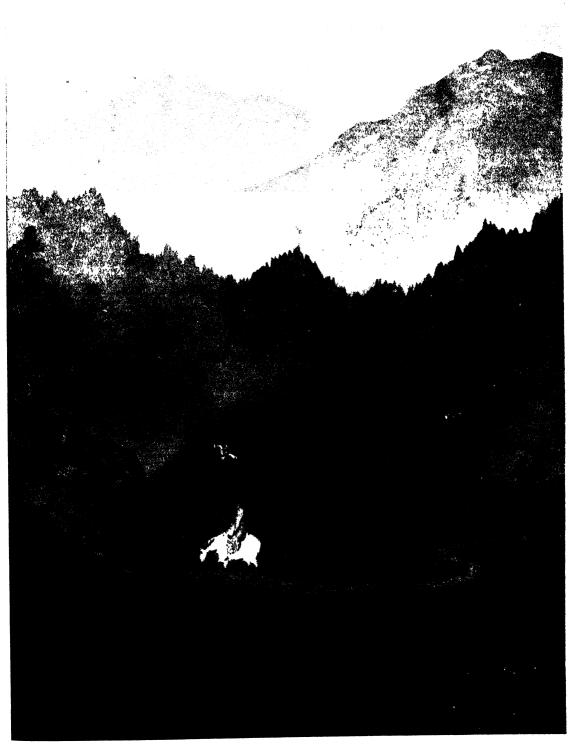
নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী

শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্লক ও মুদ্রণ : বেংগল অটোটাইপ কোং

রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

সেগুলো রং-চটা ফটো লোহার থালাটায় তুলে রেখে লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'আর জল ঢালতে হবে না?' মায়া চোখ নামাল।

'না, আমার হয়ে গেছে।' ঘাড় তুলে ফ্যাকাশে চোখে ভুবন ওর আপাদমস্তক দেখে। কুয়োর বাঁধানো কার্নিশের ওপর একটা পা, এক পা নীচে ইঁটের ওপর রেখে মায়া হাতের শূন্য বালতিটা একটু একটু আন্দোলিত করছিল বলে ওর বুক কোমর ঊরু মন্থর ঢেউয়ের মতন থেকে থেকে দুলছে কাঁপছে।

'মন, দিদি। ছোটবেলার মনটা যদি আমরা কোনোরকমে ধরে রাখতে পারি তো বুড়িয়ে গিয়েও মাঝেসাঝে সে-দিনের নাগাল পাই। মিছে বলছি?'

আকাশে চোখ তুলল মায়া। চমকে ওঠার মতন কাউকে দেখছে না ও, কি কারো কথা শুনছে না। নিমগাছটা বুলবুলিদের ফল খাওয়াতে খাওয়াতে সারা দুপুরই এই বুলি আওড়ায়। উঠোনের চড়ুইগুলো, ওধারের ফড়িং দুটো, ডুমুর জঙ্গলের ছায়ায় ঝিঁঝিঁর দল সারাক্ষণই কি ডেকে ডেকে মায়াকে একথা শোনাচ্ছে না। আর, এটা ও বেশ বুঝতে পারে ওদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এবাড়ির শ্যাওলা ধরা ইঁটের পাঁজা, নড়বড়ে ভাঙ্গা দেওয়াল, হয়তো মৃতপ্রায় হলুদ রঙের পেঁপে গাছটাও ফিসফিসে গলায় কেবল এই বলছে। এখন?

শান্ত সহানুভূতির চোখে মায়া ভুবনকে আবার দেখল।

'যান, এইবেলা গিয়ে উনুনটা ধরিয়ে ফেলুন—অনেক বেলা হ'ল।'

ভুবন স্থির। নির্বাক।

একটা বেণী ঘাড় ডিঙ্গিয়ে ওর বুকের ওপর লুটোয়। চোখ বাঁকা করে মায়া তাই দেখে। এমন সময় হঠাৎ এক আঁজলা রোদ ওর বুকের সামনে দিয়ে থুতনি ঘেঁসে উড়ে গেল। এক ঝাঁক প্রজাপতি। উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ। হাতের তেলোর মত বড় এক একটা। ওরা ডালিম গাছটা লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে। যেন দিশাহারা হয়ে হাতের বালতিটা ঠক্ করে একদিকে ছুঁড়ে ফেলল মায়া। ছুটল। পেয়ারা গাছের ডালে আঁচল বেঁধে গেল, নিচের দিকেও কি একটা কাঁটায় শাড়ির পাড় আটকে ওর মোরগফুল আঁকা শায়া বেরিয়ে পড়েছে। কোনোমতে সামলে নিয়ে আবার এগোয়। ধরল একটাকে। বাঁ হাতের লম্বা সরু দুটো আঙুলের মাঝখানে আলতো করে একটা পাখা চেপে ধরে ও কুয়োতলায় ফিরে এল। ডান হাতের মুঠোয় আঁচলটা। বুকের ওপর চেপে রেখেছে কোনোরকমে। শ্বাসপ্রশ্বাসে জায়গাটা কাঁপছে।

এই প্রথম ভুবন শব্দ ক'রে হাসল। যেন জং ধরা খসখসে গলায় নতুন ধাতুর ধার শোনা গেল।

মায়া মুখ কালো ক'রে ফেলল।

প্রজাপতিটাও হাত থেকে উড়ে গেল।

আঁচলটা অতিরিক্ত দ্রুততার সঙ্গে বুকে জড়ালো গলায় তুলল ও এবং অন্য দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু কতক্ষণ?

এদিকে আবার ওকে তাকাতেই হয়।

তাকিয়ে অবশ্য নিশ্চিন্ত হয়। কাঠ। মরা কাঠ চুপ ক'রে ব'সে আছে। দুটো হাত শুকনো নিষ্পত্র গাছের ডাল। জীর্ণ বাকল। ভিতরের শাঁস পুড়ে গেছে। অঙ্গার দেখা যায়।

'উঠে ঘরে যান। সেই কখন তো মাছ ধোয়া হ'ল। খাওয়া দাওয়া করবেন না!'

'আমি হা ক'রে তাকিয়ে দেখছিলাম।'

'খুব বড় প্রজাপতি! এত বড় প্রজাপতি এখানে এসে আর আমি দেখিনি।' মায়া বলল।

'আমি প্রজাপতি দেখছিলাম না।'

মায়া বুড়োর চোখের মধ্যে তাকায়।

ঘোলা ফ্যাকাশে চোখ স্থিরভাবে ধ'রে রেখে ভুবন হাসে। 'দিদির ছুটে যাওয়া দেখছিলাম। আহা রাজহংসীর গতিভঙ্গি। কথাটা মিছে বলছি? আয়নায় দেখবেন। ঘাড় ঘুরিয়ে যদি সম্ভব হয়। আমি এমন সুন্দর ছাঁদের পিঠ কোমর আর কারো দেখিনি।'

'দেখব আয়নায়, রোজই তো দেখছি।' বুকের সুর বার করতে গিয়ে ও কোমল গলায় হাসল। 'এই বেলা উঠুন, চলুন আমি উনুন ধরিয়ে দিই। আষাঢ়ের বেলা তা-ও হেলতে শুরু করেছে।' মায়া নুয়ে হাত বাড়িয়ে মাছের থালাটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'কত ভাললোকের সংসর্গে আছি আমি।' পিছনে চলতে চলতে ভুবন বলল। 'দিদির মন কত নরম!'

ডুমুরতলার নিচু চালার ভিতরে ঢুকল দুজন আর সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামল। কয়লার ব্যবহার নেই বুঝতে কষ্ট হয় না। কবে যেন কয়লা আনা হয়েছিল। দু' চার খণ্ড এক কোণায় পড়ে আছে। তার ওপর উঁইয়ের ঢিবি মাথা জাগিয়েছে।

ভুবন বলল, 'মাঝে মধ্যে রান্নাবান্না যে না করি দিদি তা না, ওই ওধারের পুরোনো বেড়ার বাঁশ কাঠ কিছু কিছু ভেঙ্গে এনে কাজ চালাই আর কি।' একটু থেমে পরে বলল, 'তা কাঁচা ঘর বটব্যাল এমনিও রাখবে না। আস্তে আস্তে সবটাই পাকা ক'রে ফেলবে। তখন আমাকেও উঠতে হবে বৈকি।'

'পরিবার সংসার কোনোদিনই ছিল না নাকি?' উনুন সাজিয়ে আগুন দিতে তৈরি হবার আগে মায়া একবার ঘাড় সোজা করল। তার গলার বুকের উদ্ধত গোলাপীর সুন্দর ভঙ্গি দেখতে ভুবন ফ্যাকাশে চোখে আবার রং আনতে চেষ্টা করছে টের পেয়ে মায়া ঘাম মুছবার অছিলায় আঁচলটা নামিয়ে কোলের ওপর জড়ো করল। তারপর একটা পোকা বা মাকড়ের দিকে স্থির সতর্ক দৃষ্টি রেখে টিকটিকি যেমন চুপচাপ ব'সে থাকে কতক্ষণ ও সেভাবে বসে রইল। কেনই বা থাকবে না। কুয়োতলায় যখন ও স্নান করে খোলা গায়ে সাবান মাখে পাশের মুমূর্ষু মাদার গাছটা পিটপিট চোখে তাকিয়ে থেকে থেকে পরে হঠাৎ এক সময় যখন ওর সঙ্গে কথা বলে শব্দ ক'রে নিশ্বাস ফেলে তখন কি ও অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সতর্ক সন্দিগ্ধ চকিত হয়ে ওঠে না! ধারালো দৃষ্টি হেনে গাছটাকে পরীক্ষা করার পর মায়া নিশ্চিন্ত হয়। চমক ত্রাস জয় ক'রে আবার স্বাভাবিক গলায় গানের গুনগুনি তুলে বুকে পিঠে সাবান ঘসে। এখনও তাই হ'ল। বাদলা দুপুরের পচা ভ্যাপসা গরম তার ওপর ভুবনের পুরোনো ছোট্ট আবর্জনায় ঠাসা ঘরের অস্বস্তিকর গুমোটে ঘেমে ও স্নান ক'রে উঠছিল। কপালে গলায় ঘাম। গলার নীচে বুকে স্তনের পাশে পাশে মুক্তাবিন্দু হয়ে মুহুমুহু ঘাম জমছে আর পর মুহূর্তে তারা ভেঙ্গে গলে ঝরে পড়ছে। সবল সুস্থ হাতে আঁচল ঘসে ঘসে মায়া ঘাম মুছল। ভুবনের দিক থেকে চোখ সরাল না। যেন শরীরটাকে আরও একটু স্বস্তি দিতে শাড়ি শায়া গুটিয়ে হাঁটুর খানিক নিচে পর্যন্ত তুলে ধরল। তারপর আশ্চর্য ঠাণ্ডা নরম গলায় প্রশ্ন করল: 'লঙ্কা পেঁয়াজ ঘরে আছে? পচা মাছ রসুন ছাড়া চলবে না কিন্তু।'

'দেখি, হয়তো আছে।' যেন অত্যন্ত অনিচ্ছায় নধর সুডৌল পায়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ভুবন ঘরের এদিক ওদিক দেখে। 'রসুন থাকতে পারে, পেঁয়াজ যেন ফুরিয়ে গেছে।'

'নিয়ে আসুন, আমি উনুন ধরিয়ে দিলাম।'

ভুবন লঙ্কা পেঁয়াজ খুঁজতে উঠে গেল।

কিন্তু ফিরে এসে দেখল উনুন ধরেনি, কেবল গলগল ক'রে ধোঁয়া উঠছে। আর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এক জোড়া চোখ ছুরির ফলার মতন চকচকে ঝকঝকে হয়ে গেছে।

শুকনো পাতার খসখস শব্দ হ'ল।

'দিদির চোখের দিকে তাকাতে ভয় করে।'

'কেন, কিসের ভয়।' মায়া নরম গলায় হাসল।

'বাঘিনী বনের মধ্যে শিকার খুঁজছে, সে রকম দৃষ্টি, সেই চোখ।' খসখসে গলায় ভুবন হাসে। 'মিছে বলছি না কিন্তু।'

মায়া কথা বলল না।

বৃষ্টিটা আরো জোরে চেপে এল।

কিন্তু জলের আওয়াজ ছাপিয়ে বাইরে

অদ্ভুত একটা ডাক শোনা গেল। যেন ঘরের পিছনে অসহ্য উল্লাসে একটা হুতুম পাখি গলা ছেড়ে ডাকছে।

আর সেই মুহূর্তে দপ্ ক'রে উনুনে আগুন জ্বলে উঠল।

ভুবন খুশী। কালো চোখের মধ্যে আগুনের নাচ দেখতে পেয়ে মুখটা মুখের কাছে সরিয়ে আনল। 'দিদির চোখ জোড়া আরো সুন্দর আরো ভয়ানক লাগছে এখন।'

'কি রকম, কিসের মতন শুনি?' গর্বে নাসারন্ধ্র স্ফুরিত করল মায়া।

'যেন বাঘিনী শিকার ধরেছে। খুশীর রক্তে দু' চোখ লাল।' খসখস ক'রে ভুবন হাসে।

মায়া কথা বলে না। কি ভাবে। তারপর আগুনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আপনার ঘরে আরশী আছে?'

ভুবন মাথা নাড়ল। 'ছিল। ভেঙেগ গেছে।'

'তবে আর কি।' যেন তাচ্ছিল্যের শীত-লতা দিয়ে মায়া চোখের আগুন নিভিয়ে দিল।

'নিন, পেঁয়াজটা ছাড়িয়ে ফেলুন। বসে থাকলে রান্না নামবে কি। শিলনোড়া থাকলে দিন চট্ ক'রে লঙ্কা দুটো বেটে নিই। হলুদ কোথায়?'

মরা মাছের ফ্যাকাশে চোখ তুলে ভুবন ঘরের এদিক ওদিক দেখে। তারপর অনিচ্ছা-সত্ত্বে উঠে যায়। কাঠ। মরা গাছ চোখের সামনে হাঁটছে। বিদ্যুৎ শিহরণ মেরুদাঁড়ার অর্ধেক পর্যন্ত এসে মিলিয়ে গেল টের পেয়ে মায়ার কান্না পায়। বাঁ-হাতের কনিষ্ঠা ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুপ ক'রে ভাবে।

অফিস থেকে প্রণব সকাল সকাল ফেরে। ফজলি আম নিয়ে এল, এক ডিবে পাউ-ডার কিনে আনল।

মায়া দেখে হাসল। তা বিকেলে ও সেজেছিল ভাল। সুন্দর খোঁপায় এতবড় একটা নীল অপরাজিতা গোঁজা। সিঁদুরের ফোঁটাটা টকটক করছে সিঁথিমূলে। অপরাজিতা রঙের ব্লাউস। ব্লাউসের সঙ্গে মিলিয়ে হাল্কা কমলা রং শাড়ি। ঠোঁটে রং আছে কি না প্রণব বুঝতে পারল না। তোয়ালের কোণায় আলতা লাগিয়ে ঠোঁট ঘসা হতে পারে। প্রণব অনুমান করল। তার ঘরে লিপস্টিক নেই।

'নাও, এইবার পাউডারটা মেখে ফেল। পাউডার তো ফুরিয়ে ছিল।'

'বাবা। অফিস থেকে তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়েছ কি! আমার সুন্দর মুখের কথা ভেবে? বিকেলে কতক্ষণে পাউডার মেখে [illegible] বসে!'

'তো, তুমি কি মনে কর। তোমার কি মনে হয় না সারাক্ষণই আমি একটি মুখের কথা ভাবি? অফিসে যেতে, অফিসে বসে, অফিস থেকে বেরিয়ে?'

'বাড়াবাড়ি। তুমি যে আমার কথা মনে কর না তা আমি কখনো মনে করি না। বরং দুঃখ, একটু বেশি মনে রাখো বলে। একটু কম ক'রে যদি রাখতে আমি সুখী হতাম। আমার জীবন সুখের হ'ত।' মায়া একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলল।

আর ঘাটানো ঠিক হবে না ভেবে প্রণব চুপ ক'রে গেল। কাপড়চোপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধোয়। পাউডার ও আম সরিয়ে রেখে মায়া চা করতে বসে।

ফুরফুরে একটা হাওয়া বইছিল।

বাদলা দুপুরের পর রোদ লাগা বিকেল বড় চমৎকার। ভালয় ভালয় চা খাওয়াটিও হ'ল। এক সঙ্গে বসে। মুখোমুখি হয়ে ব'সে গল্প করল দু'জন।

একটা হলদে প্রজাপতি দু'জনের মুখের সামনে ওড়াউড়ি করল। সেই দুপুরের ডালিম ডালে বসা প্রজাপতি। দেখে তখনকার ছবিটা মনে হ'তে মায়া চুপ ক'রে রইল।

'কতবড় পতঙ্গ!' একবার ইচ্ছা করছিল তার প্রণবকে বলে। বলেঃ 'সুন্দর আরো কত জিনিস পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে এক-বার চোখ মেলে দেখো।' কিন্তু একটা জরুরী কথা এসে যাওয়াতে মায়ার আর তা বলা হয় না। ইচ্ছা করেই চুপ ক'রে রইল। তারপর অবশ্য ও কাজের কথায় মুখ খুললঃ 'তা তোমার যখন বন্ধু তখন ওটা ক'রে ফেল না। একটু কমিয়ে টমিয়ে দেবে খরচ। এ-বয়সে প্রিমিয়াম চালাবার সাহস যদি না পাও তবে আর কবে পাবে, আর হবে কি।'

প্রণব চুপ ক'রে মায়ার মুখ দেখে কথা শোনে।

'আমি তোমায় এটুকুন বলতে পারি। তিন হাজার টকার ইন্সিওর করেও এই আয়ে আমরা সুন্দর চালিয়ে যেতে পারব। দু'টি তো মুখ। তুমি আর আমি। কিছু কষ্ট হবে না প্রিমিয়ম চালাতে।' মায়া চুপ করল।

প্রণব স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল। মায়া মুখ ফিরিয়ে অন্য-দিকে তাকায়। মনের ভাব বুঝতে পেরেছে আশঙ্কা ক'রে প্রণব চুপ ক'রে রইল। খরচ চলতে পরবে কি পরবে ন। ভবিষ্যতে এই সংসারে তিনটি মুখ হবে কি চিরকাল তারা এমনি দু'জন থাকবে। পলিসির চাঁদা চালাতে অসুবিধাটা কি ইত্যাদি আলোচনা আপাতত চাপা দিতে প্রণব হঠাৎ শব্দ করে হসল।

চমকে উঠল মায়া।

'খুব খুশী দেখাচ্ছে!'

'একটা মজার গল্প তোমাকে বলা হয়নি। আজ শুনলাম।'

প্রণব ঝুঁকে গলাটা বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু গল্প শুনতে স্ত্রীর খুব আগ্রহ নেই চোখের রং দেখে সে টের পেয়ে আবার গম্ভীর হয়। সোজা হয়ে বসে।

'উঠি, উনুনে আঁচ দিতে হয়।' হাই তুলে মায়া বাইরে উঠোনে গাছের মাথায় সোনার পাতের মতন রোদের শেষ ঝিকিমিকি দেখে। প্রজাপতিটা উড়ে বেরিয়ে গেছে। কোনদিকে গেছে মায়ার চোখে পড়ছিল না। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে এক জোড়া বুলবুলি প্রাণপণে যত পারছিল ঠুকরে ঠুকরে নিম ফল খেয়ে নিচ্ছিল। পাখার ঝাপটায় পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির জল ফোঁটা ফোঁটা হয়ে নিচে ঝরছিল। ডুমুর জঙ্গলের দিকে চোখ গেল মায়ার। এবাড়িতে ওখান থেকে অন্ধকার নামে, সন্ধ্যা শুরু হয়। এর মধ্যেই দুটো জোনাকি এসে জুটেছে ওধারে। একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল মায়া।

'গল্পটা শুনবে?' ভয়ে ভয়ে প্রণব প্রশ্ন করল।

'কার গল্প কিসের গল্প!' মায়া ঘাড় ফেরালো না।

'অফিসে সুকুমার আমাকে বলল, সুকুমার ভক্ত।'

মায়া নীরব।

'সুকুমারদের পাড়ায় ঘটনাটা ঘটেছে।'

কিন্তু ওপক্ষের কোনোরকম উৎসাহ নেই লক্ষ্য করে প্রণব আবার দমে যায়। চুপ করে থাকে। মায়া উঠে দাঁড়ায়। 'চাল —উনুনে—'

যেন শেষ উদ্যম নিয়ে প্রণব বেশ বড় গলায় হাসল ঃ 'গল্পটি শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে, তুমি বিশ্বাসই করবে না যে—'

'আহা বলো না, এতক্ষণে তো বলা হয়ে যেতো।' বিরক্ত কণ্ঠস্বর। যেন গল্পটা অগত্যা শুনতেই হবে, না হলে আর একজন ভীষণ অসন্তুষ্ট হবে চোখমুখের এমন ভাব প্রকাশ করে মায়া ধপ করে বেতের চেয়ারটায় বসে পড়ল। 'কি গল্প শুনি?'

'সুকুমারদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক তার বাড়ির ঝিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। পরশুর ঘটনা। এদিকে বাড়িতে কান্নাকাটি। বেশ বড় বড় দু'তিনটি ছেলে মেয়ে। স্ত্রী, হ্যাঁ, ভদ্রলোকের স্ত্রীও যে অসুন্দরী এমন না। দিব্যি দেখতে শুনতে মহিলা। সুকুমার দেখেছে। কাল চার পাঁচবার নাকি ফিট্ হয়েছে। মহিলার দাদা এ জি অফিসের বড় চাকুরে। খবর শুনে ছুটে এসে কাল তিনি থানায় খবরও দিয়েছেন—কিন্তু তাতে কি আর—হা-হা।' শব্দ করে প্রণব হাসল। 'সুকুমারদের পাড়ায় সে এক বিশ্রী হৈ-চৈ—'

কিন্তু স্ত্রীর ভুরু দেখতে দেখতে প্রণবের হাসি মিলিয়ে গেল।

বড় তাড়াতাড়ি সে গম্ভীর হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল সে নির্লজ্জের মত হেসেছে।

'কি রুচি তোমার, কী বিশ্রী স্বভাব!' মায়া চেয়ার ছেড়ে উঠল। 'এই গল্প শোনাতে তুমি পাগল হয়ে ছুটে এসেছ ঘরে।' একবার থামল, উঠোনের ঘাসের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল একটুক্ষণ, তারপর প্রণবের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল মায়া।

'তুমি কি জান না যে এসব গল্প আমি কোনোদিনই ভালবাসি না। তোমায় কি আমি একদিন বলিনি যে এসব কুৎসিত ঘটনা ইচ্ছা হয় তুমি গিয়ে আর কাউকে শোনাবে। আর কাউকে যতক্ষণ খুশি বসে থেকে রসিয়ে ফেনিয়ে বলে শেষ করে তবে ঘরে ফিরবে। আমাকে না, আমার কাছে এসব—' রাগে মায়া কাঁপছিল। 'ছিছি,—কোন্ ভদ্রলোক বাড়ির ঝির সঙ্গে পালালো, কোন্ লোক অফিসের টাইপিস্ট মেয়ে দেখে ভুলেছে, কোন্ ছেলে বাসে-দেখা মেয়ের কাছে প্রেমপত্র লিখল এসব ছাড়া কি পৃথিবীতে আর গল্প নেই, ঘটনা ঘটে না? আমি অন্য রুচির মানুষ। আমি কক্ষনো এসব কুৎসিত বাজে ছাই-ভস্ম কথাবার্তা ভালবাসি না, শুনি না। যদি ভাল কথা সুন্দর কথা অফিসের বন্ধুদের কাছে শোন বাড়ি এসে বলো, সারারাত বসে কান পেতে শুনব, শুনতে রাজী, বুঝলে।'

'হিতে বিপরীত হ'ল।' একলা চুপ করে অন্ধকার ঘনিয়ে আসা বারান্দায় বসে প্রণব ভাবল। স্ত্রীর অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য এই গল্প না করে অন্য কোনো প্রসঙ্গ তোলা উচিত ছিল। কি প্রসঙ্গ, এমন কোন্ বিষয় আছে যে, শুনলে মায়া খুশি হত। প্রণব তার দুবছরের বিবাহিত জীবনকে আর একবার সূক্ষ্মভাবে জরীপ করল। করে কিছু দেখতে না পেয়ে পেয়ারাতলার অন্ধকারের দিকে চেয়ে ছিল। অন্ধকারে একটা বিড়াল ঘুরঘুর করছিল। প্রকাণ্ড ধুমসী বিড়াল। ছাই রঙের। ধোঁয়া রঙের। যেন এই জন্যই দৃশ্যটা আরো খারাপ লাগছিল। তাকাতে ইচ্ছা করছিল না প্রণবের। অস্পষ্ট এলোমেলো চঞ্চল ঘোলাটে। বোঝা যায় না কোন্‌টা বিড়াল কোন্‌টা অন্ধকার। গুলিয়ে যায়। যেন এই ধরনের বিবাহিত জীবন তার। পুরুষের কাছে নারী এর চেয়ে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন হয়ে ধরা দেয় না। দেবে না! এক থাবলা অন্ধকার। হঠাৎ নড়েচড়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে তারপর আবার চলন্ত বৃত্তে শিকারী মুখের গহ্বরে [illegible] চোখের নিমেষে জমে অন্ধকার হয়ে যায়। পেয়ারাতলার চাপচাপ অন্ধকারের [illegible]। নিরন্তর [illegible]

রহস্যের অতল অন্ধকারে মিলিয়ে দিতে, নিশ্বাস ফেলার শব্দটি না করে সংসারের সাত কাজে নিজেকে ঢেলে দিতে মায়ার জুড়ি আর কেউ আছে কিনা চিন্তা করে প্রণব যেমন ক্রুদ্ধ হ'ল তেমনি হতাশ হল। হতাশই বেশি হল। যা স্বাভাবিক। সুখী না, বিয়ে করে এই জীবনে কেউ সুখী না। বন্ধুরাও বলে বটে। কেন সুখী না, কি দিয়ে সুখী না তার চুলচেরা হিসাব অবশ্য আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। প্রণব তার নিজের সম্পর্কে একটা প্রামাণ্য হিসাব কারো কাছে তুলে ধরতে পেরেছে কি। পারল না। পারে না বলেই বুকের মধ্যে এক টুকরো কান্না নিয়ে মাটির অন্ধকার থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়। একটি মোটে তারা সেখানে। কিন্তু তা হলেও ঘোলাটে অন্ধকারের চেয়ে সূচের আগার মতন সূক্ষ্ম উজ্জ্বল এক বিন্দু আলোর মধ্যে অনেক বেশি শান্তি অনেক আশা লুকিয়ে থাকে। রাত বাড়লে আলোর ফুটকি বাড়ে আশার ইসারা আকাশে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে। কোন্ এক বন্ধু তাকে পরামর্শও দিয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে খিটি-মিটি বাধলে, কথায় কাজে না বনলে চুপ-চাপ বসে রাত্রির অপেক্ষা করবে। আর এক মুঠ অন্ধকার তোমার চারপাশে নামুক আরো কিছু তারা মাথার ওপর ঝিকিমিকি করুক। তারপর। তাই চুপচাপ একলা অন্ধকারে মশার কামড় সহ্য করে বসে থেকে প্রণব গাঢ় গূঢ় রাত্রির অপেক্ষা করে। এটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার।

মায়া?

প্রণবের মত বাজে ভাবনাচিন্তা তার কোনোদিনই নেই।

আজও করল না।

বরং ততক্ষণ ক্ষিপ্র সুন্দর হাতে ও নতুন করে ঘর ঝাঁট দিল। বিছানা পাতল। আলো জ্বালাল। আরো যা কিছু শোবার ঘরের টুকিটাকি কাজ শেষ করে শেষবারের মতন দেয়ালের আয়নার মুখখানা একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে চলল। শোবার ঘরের পিছনে ছোট্ট চালা।

কিন্তু সেখানে পা দিয়ে তখনি তার আলো জ্বালাতে ইচ্ছা হল না। অন্ধকার চালার নীচে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ও বাইরের দৃশ্যটা দেখে। কাদের বাড়ির একটা লিচু চারা, একটা নারকেল গাছ ওধারে। তারপর আকাশ। আকাশের কিনারে শাদা এক গোছ আলোর ইসারা জেগেছে। তার অর্ধ চাঁদ উঠছে। এখনি উঠবে। একটা অদ্ভুত সময়। কৃষ্ণির ভিজে হাওয়া মায়ার চোখেমুখে লাগল।

আর ঠিক তখন ও শুনতে পেল কোন-দিকে গাছের পাতার আড়ালে একটা পাখি যেন ঠোঁট [illegible]। হয়তো [illegible] পাখির [illegible]

মায়ার রোমাঞ্চ হ'ল। ইচ্ছা করে ও খোঁপাটা খুলে ফেলল। ঘাড়ের কাছে বেনীটা একটু সময় সাপের মত প্যাঁচ খেয়ে লেগে থেকে তারপর হঠাৎ লাফিয়ে পিঠ বেয়ে কোমরের ওপর এসে ঝুলতে লাগল।

একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় মায়া। একটু ঝুঁকে ঈষৎ বাঁকা হয়ে। আঁচলটা আর ঘাড়ে লেগে থাকে না লুটিয়ে নিচে পড়ে।

বস্তুত তখন মায়ার সৌন্দর্য যে দেখেছে সে বলবে!

কিন্তু কে দেখবে।

কেউ দেখবার নেই বলে ভিজে হাওয়ার মতন একটা ভারি নিশ্বাস তার বুক ঠেলে গলার কাছে উঠে এসে যন্ত্রণা করতে থাকে। কিন্তু অল্পক্ষণ। খুব অল্প সময়ই প্রণবের জন্য ও দুঃখ করে। কেননা মায়া জানে এখানে এখন চাঁদ ওঠার দৃশ্য দেখতে প্রণবকে ডেকে আনলেও সে তা দেখতে পাবে না। পারে না। সেই চোখ নেই। পাখির ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকানোর শব্দ? সেই কান নেই। কেন নেই, তার কি নেই স্বামীর ভাবতে মায়া আজ বড় একটা গ্রাহ্য করে না। ভুলে থাকে। একটু একটু করে দু' বছরের অভ্যাসের পর এখন, আজ, নিজেকে ও বেশ সবল শক্ত মনে করছিল। আর এই জন্যই প্রণব কাছে ছিল না বলে তার এত ভাল লাগছিল।

ডুমুর জঙ্গলের মধ্যে গিরগিটিটা হঠাৎ কর্কশ শব্দে ডেকে উঠল। মায়ার বুকটা কাঁপল। একবার। পরমুহূর্তে ও সহজ স্বাভাবিক হয়ে বরং মনের স্ফূর্তিটাকে একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে হাত বাড়িয়ে খপ্ করে উড়ন্ত জোনাকিটাকে ধরে ফেলল। জোনাকি ছুঁলে কি হয় ছেলেবেলায় শোনা কথাটা মনে হতে ও ঠোঁট টিপে হাসল। এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে, রাতে বিছানায় সেটি করার ভয় অবশ্য নেই ভেবে মায়া নিচের ঠোঁটটা ঈষৎ বিস্ফারিত করে যেন প্রায় শব্দ করে আর একবার হাসল, তার-পর পোকাটাকে দেখতে লাগল। হাতের মুঠ খুলে আবার বন্ধ করল ও। আবার খুলল। খুঁটিতে আর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে পা ছড়িয়ে বসল। ইঁট দিয়ে এক চিলতে বাঁধানো জায়গা। পা ঝুলিয়ে বসলে নিচের ঘাসে পায়ের গোড়ালি ঠেকে। মায়ার এটা ভাল লাগে। সাপের আস্তানা হবে ভয় দেখিয়ে প্রণব সব ঘাস কেটে-ছেঁটে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলতে চেয়েছিল,—মায়া দেয়নি। সাফ করতে হয় সাপের ভয় থাকে সামনের দিকের উঠোন পরিষ্কার কর। এটা নয়। রান্নাঘরের পিছনের এই ছোট্ট ঘাস জমি। [illegible] জগতের সম্পূর্ণরূপে মায়ার। তার নিজস্ব [illegible]। [illegible]

কি হাত বোলানো ও বরদাস্ত করে না। বলতে কি, ঘাসের মাথায় পা ঠেকলে পায়ের তলা যখন খসখস করে মায়ার খুব ভাল লাগে। চোখ বুজে ও এই খসখসটা অনুভব করে। যেন হাল্কা পাতলা মেয়েলি পা পেয়ে ঘাসের শিসগুলো ইচ্ছামতন সুড়-সুড়ি দিতে থাকে। না, প্রণব একদিন ছোট্ট একটা পালক (সম্ভবত পায়রার) দিয়ে তার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়েছিল, বেশ কিছুদিন আগে, কিন্তু মায়ার তা ভাল লাগেনি। বরং তার রাগ পেয়েছিল। মুখে বলেনি যদিও কিছু। কিন্তু চোখ-মুখেরও এমন ভাব করেছিল যে, তারপর আর একদিনও প্রণব এ ধরনের রসিকতা করতে সাহস পায়নি। কেন ভাল লাগেনি কেন খারাপ লাগল তা নিয়ে মায়া মাথা ঘামায় না। শুধু ঘটনাটা তার মনে আছে। এখানে এখন ঘাসের শিসে পা ঠেকিয়ে সেদিনের কথা ভেবে ও হাসল। বস্তুত প্রণবের অধিকাংশ কাজই কেন ভাল লাগে না একদিন ঠাণ্ডামেজাজে বসে ভেবে দেখবে মায়া ঠিক করে রেখেছিল, কিন্তু বসা আর হয় না, যেন সময়ই পাচ্ছে না ও। বস্তুত যে জিনিস ভাবতে গেলে মন প্রফুল্ল না হয়ে বিষণ্ণ অবসাদগ্রস্ত হয় তাকে নিয়ে বসতে তার জন্য কিছুক্ষণ সময় নষ্ট করতে যেন প্রকৃতিই তাকে দিচ্ছে না। প্রণবকে নিয়ে ও যে কী মুশকিলে পড়েছে তা যদি ঈশ্বর জানত!

চমকে উঠল মায়া। হাতের মুঠ আলগা করে আলোর পোকাটাকে দেখতে না পেয়ে ও অবাক হল, হতাশ হল। একটু ভাবতে গেছে আর তখনি এমন সুন্দর জিনিসটা হারিয়ে ফেলল! এদিক ওদিক তাকাল ও, হাতের পিঠ দেখল, পা পায়ের নিচের ঘাস —কোথাও নেই। তা ছাড়া উড়ে যেতেও তো পারে না। যা-ই ভাবুক, যতক্ষণই ভাবুক মায়া চোখ বুজে ছিল না। উড়ে যাবার সময় পোকাটাকে ও দেখতে পেত। না, আছে! এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে দুষ্টু এসে বসবে মায়ার স্বপ্নের বাইরে। কখন এল? চোখ ফেরাতে পারছিল না মায়া। ভিজে হাওয়ার স্পর্শ পেতে এখানে এসেই ও ব্লাউসের বোতাম খুলে দিয়েছিল। প্রণব না থাকলে খালি-গা হয়েই বসত। (গায়ে জামা না-রাখা প্রণব পছন্দ করে না। দিনের-বেলা এমনকি রাত্রেও। দরজায় খিল না দেওয়া পর্যন্ত, আলো নিভিয়ে বিছানায় না ঢোকা পর্যন্ত মায়া বুক পিঠ ঢেকে রাখবে—হ্যাঁ, দাবী ছাড়া একে আর কি আখ্যা দেবে মায়া, স্বামীর দাবী? ভাবতে মায়ার বিশ্রী হাসি পায়, করুণা করে ও লোকটাকে মনে মনে। থাক সেসব।) এখন ও স্বপ্নাচ্ছন্নের মত নিজের বুকের দিকে চেয়ে রইল। সদ্য ঢালু জায়গাটুকুতে একটা সবুজ মুক্তার গা থেকে ঠিকরে পড়া হাল্কা সবুজ আলোয় তার বুক এখন সত্যিকারের কাঁচা ফলের মতন দেখাচ্ছে। বিদ্যুৎ শিহরণ খেলা করে গেল মেরুদাঁড়ায়। মায়া অনুভব করল নিজের বুক দেখে এত বেশি মুগ্ধ অভিভূত ও আর কোনোদিন হয়নি। আর একদিনও না। ওকি? উড়ে যাচ্ছে! উড়ে গেল? হা করে চেয়ে রইল মায়া। হাত উঠল না। হাত বাড়িয়ে আবার ওটাকে ধরবার তিলমাত্র চেষ্টাও করল না ও। বরং চরম তৃপ্তির পর দারুণ আলস্য ও অবসাদ নিয়ে মানুষ যে চোখে কোনো একটা কিছুর চলে যাওয়া দেখে ঠিক সেভাবে ও চুপচাপ ডুমুরতলার অন্ধকারের দিকে আলোর পোকার উড়ে যাওয়া দেখল। কতক্ষণ এমনি স্থির হয়ে একভাবে বসে কাটাল মায়ার খেয়াল ছিল না। যখন খেয়াল হল দেখল গাছের পাতা চুঁইয়ে জল পড়ার মতন বর্ষা-রাত্রির নীল ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না তার নরম শরীরের ওপর একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে। আলস্য ভঙ্গের হাই তুলে ও উঠে দাঁড়াল। ওধারে পেঁপে গাছের কাণ্ড আর নোনাধরা দেয়ালের মাঝখানে একটুকুরো মাকড়সার জালে কখন জানি দু'এক ফোঁটা বৃষ্টির জল লেগে ছিল, জ্যোৎস্না পড়ে এখন চিকচিক করছে অল্প হাওয়ায় থেকে থেকে কাঁপছে। না, উত্তরদিকে শাদা একটা ডেলা ছাড়া আকাশে আর কোথাও এক ফোঁটা মেঘ নেই। ঘাড় উঁচিয়ে মায়া সবটা আকাশ দেখতে চেষ্টা করল, তার নিজের ঘরের চালের জন্য বাকিটুকু দেখা গেল না যদিও। তা হলেও মায়ার মনে হল আজ রাত্রে আর বৃষ্টি হবে না। কী যে ভাল লাগছিল ওর। যেন শরতের রাত ভেবে একটা টিয়া পাখি কিচমিচ শব্দ করতে করতে রান্নাঘরের চাল ঘেঁসে একদিকে উড়ে গেল। কোনো আতাগাছে গিয়ে বসবে হয়তো, মায়া ভাবল, না কি কামরাঙ্গা গাছে?

হ্যাঁ, হঠাৎ ভীষণ খারাপ লাগল তার কথাটা মনে হতে। এখন উনুন ধরাতে হবে। যদি উনুন না ধরায় ও যদি রান্না না করে, আজ, একটা রাত কি চলে না। খুব চলে। কেন চলবে না। অন্তত মায়ার কোনো অসুবিধা হয় না। আম আছে। প্রণব ফজলি আম এনেছে। একটা আস্ত আম যদি খায় ও তো ভাতের দরকার হয় না। তাই খেয়ে দিব্যি শুয়ে পড়তে পারে। কিন্তু প্রণব পারবে কি? ভাত না হলে? প্রস্তাবটা দেবে ভেবে মায়া ইতস্তত করতে লাগল। এক পা অগ্রসর হয়ে আবার দাঁড়াল ও। প্রণব কি ঘুমিয়ে পড়েছে? কেন জানি কেবলই মনে হচ্ছিল তার বারান্দার চেয়ারে বসে প্রণব ঘুমোচ্ছে।

বরদাসুন্দর বটব্যালের [illegible] (ধরুন না [illegible]) এক [illegible] [illegible]

[illegible]

বিস্তারিত বর্ণনা করতে গেলে গল্প দীর্ঘ হয়ে যাবে। কেবল এইটুকু বললে চলবে যে, মায়াকে রান্না করতে হ'ল। প্রণব চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েনি। পায়চারি করছিল সিগারেট টানছিল। চিন্তামগ্ন। কিছু ভাবছে বুঝতে পেরে মায়া কাছে ঘেঁসেনি।

আয়োজন সামান্য। ভাত আর ইলিশ-মাছের ঝোল। চট্‌ করে রান্না হয়ে গেল। দুজনে খেতে বসে কথা হ'ল না।

যেন দুজনেই ভাবছিল এখন কেউ কাউকে ঘাঁটাবে না। ভালয় ভালয় খাওয়াদাওয়াটা শেষ হোক।

খাওয়া সেরে লবঙ্গ মুখে দিয়ে প্রণব পিঠটা এলিয়ে দিয়ে বিছানায় বসল।

এঁটো বাসন জড়ো করে রেখে হাত ধুয়ে মুখ মুছে মায়া ঘরে এল।

প্রণব হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনের আলো চাড়িয়ে দিল।

মায়া চিরুনী হাতে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

শোবার আগে চুল আঁচড়ানো তার চির-দিনের অভ্যাস। মায়া পান খেয়েছে। ইলিশমাছ খেয়ে মুখে আঁশটে গন্ধ লাগছে ব'লে পান খেয়েছে। এমনি অভ্যাস নেই। প্রণব পান খায় না। কাকে দিয়ে মায়া পানের খিলিটা কিনিয়ে এনেছে প্রণব জিজ্ঞেস করল না। কেবল লাল টুকটুকে এক জোড়া ঠোঁটের দিকে সে চেয়ে রইল।

'ব্লাউসটা খুলে ফেল না হয়, খুব ঘামছ।'

মায়া শব্দ করল না বা প্রণবের দিকে তাকাল না।

সিলিংএর দিকে চোখ রেখে প্রণব চুপ করে রইল।

চিরুনী চালাবার সময় মায়ার হাতের চুড়ির রিণঠিণ শব্দ হয়। মায়ার হাত মাথা চুলের ছায়া এই এত বড় হয়ে দেয়াল ও সিলিং পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ছায়ার দীর্ঘ ঢেউ হয়ে চুলটা উঠছে নামছে দুলছে। আর সেই ঢেউ-এর বুকে চিরুনীর ছায়াটা একটা ছোট্ট নৌকো হয়ে নেচে নেচে চলেছে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে প্রণব দৃশ্যটা দেখল। একটা পোকা ঘরে ঢুকেই আলোর কাছে ছুটে এসে হারিকেনের চিমনির গায়ে ঠোক্কর খেয়ে নিচে ছিটকে পড়ল। মেঝের আবছা অন্ধকারে পোকাটাকে আর দেখা গেল না।

'আলো নিভিয়ে দেব?' মায়া ঘুরে দাঁড়ায়।

'তোমার হয়ে গেছে?' উৎসাহের চোখে প্রণব স্ত্রীর মুখ দেখল ও পিঠ টান করে সোজা হয়ে বসল।

'হওয়া আর কি।' তেমন ভাল করে কথার উত্তর দিল না মায়া। চিরুনী রেখে দিয়ে চুলে প্যাঁচ তুলে কোনোরকমে একটা এলো খোঁপা করে রাখল।

'আলো নিভিয়ে দিই?' মায়া আবার বলল।

'যা খামছ জামাটা খুলেই ফেল।' প্রণব উবুং ঝুঁকে বসল।

মায়া আলোটা দেখতে লাগল।

প্রণব ইচ্ছা ক'রে সামান্য হাসল।

মায়া নীরব।

হামাগুড়ি দিয়ে প্রণব বিছানার লাগোয়া জানালার পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে বসল।

মায়া মুখ তুলছিল না।

ভুরু পর্যন্ত হারিকেনের আলো লেগেছিল ওর। কপালটা অন্ধকার ছিল বলে অসংখ্য কুঞ্চন প্রণব দেখতে পেল না তাই সাহস করে গলাটা একটু ভিজিয়ে মোলায়েম সুরে বলল, 'না না আমি তো বলছি, তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। আর আমি আমার স্ত্রীকে দেখছি। অন্য কাউকে না।'

স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া ক্ষীণ হাসল। হাসির মধ্যেও দু'টো চোখ জ্বলছিল। প্রণব ঢোক গিলল।

'না না রিয়্যালি বলছি। আমি যে অন্যায় কিছু করছি না; আমি যে, আমিও যে তোমার মতন বাইরের এত লোকের এত সব কীর্তি কত বেশি অপছন্দ করি এটা তোমার কাছে প্রমাণ দিতে তোমাকেই দেখতে চাই। এর চেয়ে পবিত্র কাজ আমার পক্ষে আর কি আছে তুমিই তার রায় দাও।'

একটা টিকটিকি ঘরের চালে ডেকে উঠল।

একটা ভীষণ আপত্তি আঙুলের মাথায় ঝুলিয়ে রেখে মায়া ব্লাউসের বোতামে হাত দিল।

প্রণব একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'আমার চেয়ে ভাল রুচি যে আর কারোর নেই তুমি কি আজ দু'বছর, বিয়ের রাত থেকে কালকের রাত পর্যন্ত টের পাওনি? রিয়্যালি আমি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি সুকুমারদের পাড়ার সেই ভদ্রলোকদের ক্লাসের লোককে। ছি ছি ছি, শেষপর্যন্ত ঝি! আমার উচিত হয়নি জঘন্য খবরটা এনে তোমার কানে তোলা।'

'যাক, আর বেশি বকতে হবে না।' 'এইবার আলো নিভিয়ে দিই। শুতে দাও।'

একটু সময়ের জন্য প্রণব নিশ্বাস ফেলল 'কেন?'

'লজ্জা করে, ভাল লাগে না।'

প্রণব একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ত্যাগ করল।

'লজ্জা করে।' একটু থেমে পরে সে বলল, 'বলো ভাল লাগে না, আমাকে তোমার ভাল লাগে না তাই এরকম করছ।'

'কিরকম?'

প্রণব কথা বলল না।

'দু' বছর আমাকে দেখে কি তৃপ্ত হওনি?' [illegible]

'হইনি' [illegible]

এবার ফেটে পড়ল। 'তৃপ্তি পাই না শান্তি পাই না বলে এখন বাতির আলোয় তোমার রূপ দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিছুটা ক্ষতিপূরণ হোক।'

'ও সেইজন্যেই ক্ষোভ।' মায়া আঁচলটা তুলে বুকের ওপর জড়ো করল। একটু পায়চারি করল। দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে আয়নার সামনে একবার দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে প্রণবের সামনে ফিরে এল।

'সেই চিন্তা সেই ধ্যান তোমার। এইজন্যেই ঘরে আলো রেখে নিজেকে আমি দেখাতে চাই না।' মায়া খুব আস্তে বলল না। তাতে অবশ্য ক্ষতি হ'ল না। বেশ কিছুক্ষণ আগেই সুন্দর ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আকাশ মেঘে মেঘে কালো অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। এখন ঝমঝম ক'রে বর্ষণ শুরু হ'ল। যেন হুতুম পাখিটা অসময়ে দু'বার ডেকে উঠল।

আলো নিভিয়ে মশারির ধারগুলো টেনে দিতে দিতে মায়া বলতে লাগল, 'সেই পাপ চোখের সামনে নিজেকে খুলে ধরতে লজ্জা করে বৈকি। ভালও লাগে না।'

'বেশ তো, যাকে ভাল লাগে তাকে দেখাও তার সামনে সব খুলে মেলে দাঁড়িও।' প্রণব দেয়াল ঘেঁসে বিছানার একপাশে শুয়ে রইল। 'আমি আর দেখতে চাইব না।'

'কে দেখছে, কাকে দেখাচ্ছি যদি জানতে তো তোমার মন একটু উন্নত হ'ত। রোজ রাত্রে আমার জন্যে তুমি এমন হ্যাংলামো করতে না।'

'অ, তা হ'লে কেউ দেখছে,' শ্লেষের সুর বার করল প্রণব। 'তা হলে বলো এমন কেউ আছে যাকে সব দেখিয়ে সব দিয়ে তৃপ্তি পাও, আমাকে না?'

'হ্যাঁ, আমার রূপ আমি আকাশকে দেখাই, বাতাস এসে আমার গায়ের গন্ধ শোঁকে, গাছ, গাছের পাতা, শালিক বুলবুলিরা আমার যৌবন দেখে। কোনো মানুষ না, পুরুষকে দেখাই না। তোমাকে দেখে দেখে পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, অন্তত আমার।'

'কখন দেখাও,' যেন একটু হাসতেই চেষ্টা করল প্রণব। 'আকাশের নিচে কোথায় ব'সে সব খুলে দাও আমাকে বলতে পার?'

'ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো।' মায়া শুয়েছিল। রাগ করে উঠে বসল। 'নিশ্চয়ই আমাকে একসময় স্নান করতে হয়, কাপড় বদলাতে হয়। ইতর অভদ্র কোথাকার!'

কিছুক্ষণ আর কথা শোনা গেল না প্রণবের। যখন শোনা গেল মনে হ'ল ঘুমে কথাগুলো গাঢ় ভারি হয়ে গেছে। অভিমানেও হতে পারে, মায়া ভাবল।

'তাই তো বলি তোমার মতিগতি বোঝা ভার। তাইতো বন্ধুরা বলে নারী-চরিত্র। আর এদিকে সারাক্ষণ আমি ভেবে ভেবে মরি। পাউডার ফুরোতে না ফুরোতে পাউডার নিয়ে এলাম। ফজলি আমের চালান এসেছে এক টাকার আম কিনে আনলাম।'

'সস্তা জিনিস দিয়ে সস্তা জিনিস আদায় করো। আমার কাছে পাবে না। তেরো বছরের খুকির কাছে গিয়ে এই কান্না কেঁদো—পাবে। আমি আর তোমার কান্নায় গলে যেতে রাজী নই যত খুশি চোখের জল ফেলো।'

সত্যিই প্রণব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। যেন বালিস ভিজে যাচ্ছে।

একটা বিশ্রী গুমোটে মায়ার মাথা ধরছিল। অন্ধকারেই আন্দাজ করে মশারীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে তার ভাল লাগল। কান খাড়া করে শুনল। হঠাৎ আবার বৃষ্টিটা থেমে গেছে। টের পাচ্ছিল ও। আস্তে আস্তে বিছানার দিকের। না, উল্টোদিকের জানালায় সরে গিয়ে দু'টো পাল্লা খুলতে বাইরের [illegible] দেখে অবাক হয়ে [illegible]

ফুটে জ্যোৎস্না? 'মেঘের পর রোদ্দুর মতন।' মায়া মনে মনে বলল। 'রাত্রেও চাঁদের আলো আর বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা চলছে।' যেন কোনদিকে কদমফুল ফুটেছে। ভিজে হাওয়ায় টাটকা গন্ধ ভেসে আসছিল।

এক পা এক পা ক'রে ও আর একবার বিছানার কাছে সরে এল। নাক ডাকছে, কাঁদতে কাঁদতে এইবেলা প্রণব ঘুমিয়েছে। কান খাড়া ক'রে রাখল ও একটু সময়। আর ঠিক তখন মায়া শুনল বাইরে পাতার ঝোপে একটা পাখি ডানা ঝাড়ছে। এক-সঙ্গে অনেকগুলো জলের ফোঁটা ঝরে পৃথিবী আবার চুপচাপ। নিঝুম।

চিকরিকাটা আলপনায় ভুবনের পৈঠা ভরে গেছে। ডুমুর পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পড়ে পড়ে এই কাণ্ডটি হয়েছে। এক সঙ্গে এত আলো-ছায়ার ঝিলিমিলি দেখে মায়ার চোখের পলক পড়ছিল না। আর তাকেও অপরূপ দেখাচ্ছে। অজস্র জ্যোৎস্না ও ছায়া বুকে মুখে মেখে খুঁটি ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে মায়া বসে আছে। একদৃষ্টে ভুবন তাকিয়ে দেখল।

'নিন, ধরুন।'

'ছি, এতগুলো ফুল নিয়ে এলেন— মালা! দো'পাটির মালা। কোথায় পেলেন?'

'বৌবাজার।' খলখসে গলায় ভুবন উত্তর [illegible] ভটা সারিয়ে পার্টিকে বুঝিয়ে [illegible] যেতে হ'ল কি না। বাজারের ভিতর [illegible] ফিরছিলাম হঠাৎ চোখে পড়ে গেল।'

মায়া কথা বলল না।

'নিন, পরুন মালাটা, খোঁপায় আটকে দিন। একবার চেয়ে দেখি কেমন লাগে।'

'এলো খোঁপা।' ভুবনের হাত থেকে মালাটা তুলে নিয়ে মায়া ক্ষীণ গলায় হাসল। 'ভাল দেখাবে কি।'

'সবরকম খোঁপাতেই ভাল দেখাবে। দিদির এই চুলে দো'পাটি গুঁজলেই হ'ল।'

'শাদা ফুল।'

'রাত্রে খুলবে ভাল। রাতের চুলে শাদা মানায়।'

খোঁপায় মালা জড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে মায়া বাইরের উঠোন দেখে। জলে জ্যোৎস্নায় গাছের পাতাগুলো চিকচিক করছে। হাওয়ায় নড়ছে। পেয়ারা পাতা থেকে টুপ-টাপ রুপালি জল ঝরছে।

'সেই দুপুর থেকেই মগজে দো'পাটি ফুল ঘুরছিল। কপাল ভাল পেয়ে গেলাম, দিদিকে সাজাতে পারলাম।'

মুখ ফিরিয়ে মায়া শব্দ না করে হাসল। কি একটু চিন্তা ক'রে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'সাজাবার, সাজ দেখবার এত শখ। তাই তো জিজ্ঞেস করছিলাম, পরিবার সংসার কি কোনোদিনই নেই, ছিল না?'

শুকনো পাতার খসখস শব্দ হয় ভুবনের গলায়।

'ছিল দিদি, তা সেসব ইচ্ছা করে বলিনি, কি হবে বলে।'

'তা, শুনি?'

'একবার না তিনবার। তিন তিনটে পরিবার ঘরে আনলাম, একটাও থাকেনি।' ভুবন চুপ করল।

'কোথায় ওরা?'

'প্রথমটা মরেছে কলেরায়, দ্বিতীয়টা মরল ছেলে বিয়োবার সময়, হুঁ, মরা ছেলে বেরিয়েছিল। আর শেষেরটা পালাল আমাদের কারখানার এক ছোকরার সঙ্গে। তা-ও তো ক'বছর হয়ে গেল।'

কথা শুনে মায়া চমকে উঠল না, মরা কাঠের জীর্ণ কাঠামোটার দিক থেকে বিস্ময়ে ও চোখ ফেরাতে পারছিল না। কিন্তু কথা তখনও শেষ হয়নি, একটু থেমে ভুবন বলে, 'এখন আবার আমাদের উল্টা-ডাঙার শশী বায়না ধরেছে। আজ ছ'মাস ধরে ঝোলাঝুলি করছে। হুঁ, একটা মেয়ে আছে ওর হাতে। বিধবা ভাগ্নীর মেয়ে। সোমথ মেয়ে কাঁধে নিয়ে মাগি ভারি বিপদে পড়েছে, তাই শশী ঘুরঘুর করছে।'

জলতরঙ্গের মিষ্টি বাজনার মতন মায়ার নরম হাসির ধ্বনিতে চারদিকের আলো-ছায়া কাঁপে। আবার কোনদিকে পাতার আড়ালে পাখি ডানা ঝাপটায়। হাসি থামতে মায়া বলল, 'বলেন কি, এই বয়সে আবার! আপনি সাহস পান?'

'পাই না, সাহস পাচ্ছি না ব'লে তো শশীকে কথা দেওয়া হচ্ছে না।'

'না, না, পারবেন না। সাহস করবেন না।' ব্যস্ত হয়ে মায়া বলল, 'শশীকে বলে দিন এই বয়সে আর ওসব হয় না।'

'তা বুঝি, তা কি আর বুঝি না দিদি।' মুখের কাছে মুখ সরিয়ে এনে আবেগে ভুবন হিসহিস করে উঠল। 'কিন্তু পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।'

পাথরের মতন স্থির শক্ত হয়ে গেল মায়া। এক মুহূর্ত। তারপর অনায়াস সহজ ভঙ্গিতে মরা গাছের জীর্ণ ডালের বেড় থেকে নিজেকে মুক্ত করল, ক'রে সোজা হয়ে বসল। ফ্যাকাশে ঘোলা চোখে কতটা রক্তের জোয়ার এসেছিল আবছা অন্ধকারে বুঝতে না পেরে কেমন একটু অসহায়বোধ করল ও। তা হলেও সেই ভাবটা কাটাতে ওর দেরি হয় না, আস্তে আস্তে বলল, 'শশীকে বারণ ক'রে দিন, বুঝলেন, শশীকে ব'লে দিন যে এ বয়সে আর—'

'বলব, আমি মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছি, শশীকে শেষ কথাটা বলে দেওয়াই ভাল।'

হঠাৎ আর কথা বলে না মায়া। ঘাড় ফিরিয়ে উঠোন দেখে। যেন নিজের ঘরের দিকে চোখ যেতে কি ভাবে।

'কি, কর্তাবাবু কি জেগেছেন, এইবেলা জাগবেন?' ভুবন গলা বাড়িয়ে দেয়। মায়া নিঃশব্দে মাথা নাড়ল, থুথু ফেলল, যেন থুথু ফেলতেই উঠোনের দিকে মুখ বাড়িয়েছিল ও। তারপর ঘুরে বসে শান্ত মোলায়েম গলায় বলল, 'এই জংলা ছিটের শায়াটা আমাকে কেমন মানিয়েছে বলছেন না তো, কেমন দেখাচ্ছে?'

খসখসে গলায় ভুবন হাসল।

'বলব, বলছি, ওটা পরনে দেখে তখন থেকেই তুলনাটা আমার মনের মধ্যে কেবল নড়াচড়া করছে। চিতাবাঘিনী, বনের চিতার মতন চমৎকার সরু ছিমছাম মাজাঘসা কোমর দিদির।'

'তাই নাকি, ঘরে গিয়ে আয়নায় দেখব তুলনাটা ঠিক হ'ল কিনা।'

'কেন, আবার আয়না কেন, আমার চোখকে কি দিদির বিশ্বাস হয় না?' যেন এই প্রথম ভুবনের গলায় দুঃখের আওয়াজ বেরোলো। 'বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রসের বাল্ব জেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মত ঝকঝকে ক'রে রেখেছি ছানি পড়তে দিইনি, দিদির কি এখনো বুঝতে বাকি।'

যেন এই প্রথম মায়া ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠেছিল, এই প্রথম তার কান্না পেল, কিন্তু কোনোটাই ও হ'তে দিলে না। ভয় কান্না দুটোকেই জয় করার আশ্চর্য ক্ষমতা নিজের মধ্যে অনুভব করল ও। তাই উষ্ণ কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়ে অবলীলাক্রমে ও হাসল। 'বিশ্বাস করি, তা না হ'লে কি আর দুপুর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই আয়নার সামনে দাঁড়াই, নিজেকে দেখি, বলুন?'

॥ ডায়েরির পাতা ॥

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১।৫।৫৬

এ ক'দিন লিখতেও পারিনি, পড়তেও পারিনি। কেবল আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের স্নেহ, যত্ন, ভালোবাসাই ভোগ করেছি। হাওয়াই জাহাজে বসে লিখছি, চারপাশে বিদেশী। অতএব লজ্জা নেই স্বীকার করতে যে আমি যত পেয়েছি তার একাংশও দিতে পারিনি। এ জগৎটা নেহাৎ মন্দ নয়। মধ্যে মধ্যে ভাবতাম যে আমাদের যুগের লোকেরাই বন্ধুত্ব করতে জানে। তা নয়, এ যুগের ছেলেরাও বন্ধু হ'তে পারে। ভারতবর্ষে বোধ হয় ব্যক্তিগত সম্বন্ধের জোর একটু বেশী। অন্য দেশেও আছে অবশ্য। কিন্তু এতখানি কি? সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ঐ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধেই ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়ায়। ই এম ফর্স্টার সার কথা বলেছেন। স্বাধীনতার মস্ত লাভ বন্ধুত্বের অবাধতা। পরাধীনতায় বন্ধুত্ব খোলে না।

* * *

ক্যাপ্টেন পাশে বসে গল্প করলেন। কলকাতার কালবোশেখীকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না; অর্থাৎ ভয় করেন। একটা চওড়া ও ঘনকালো মেঘকে পাশ কাটাতে গিয়ে অনেক দূরে বেঁকে যেতে হচ্ছে। আমার সন্দেহ হয় যে, আজকাল কালবোশেখী কি আশ্বিনের ঝড়ের প্রকোপ কমে গেছে। অথচ পুজোর ছুটিতে গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ পার হওয়া এককালে বিপজ্জনক বলেই গণ্য হোতো। গঙ্গার মাঝিরাও মেঘ বুঝে নৌকো ছাড়ত, বোশেখ মাসের বিকেলে। শুনলাম এই মেঘখণ্ডের ঘনতা প্রায় দেড়শ' মাইল, অর্থাৎ আধঘণ্টা ধাক্কা খাবো।

* * *

দুজন অল্পবয়সী মা চারটি বাচ্চা নিয়ে নাজেহাল হচ্ছে। একটি শিশুকে দোলায় দোলাতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। আরেকটিকে বেতের বাক্সতে ঢোকাবার চেষ্টা চলছে। ভীষণ দুষ্টু, কিছুতেই শোবে না। এত বেশী সাজসরঞ্জাম, এত বেশী সুজন, এত ... আমাদের কপালে জোটেনি। এত ... [illegible]

একটা ছিটের জামা, আর বড় জোর ছোট্ট পায়জামা। ব্যস, এইত' ছিল। আর মানুষ হয়েছি ঝি-চাকরদের হাতে। ধুলো মাটি কাদা জল ঘেঁটেছি, বুড়ো ঝি কি দিদ্দা ঝেড়ে দিয়েছে। আর খেয়েছি বাগানের আম লিচু গোলাপ জাম, সকালে বিকেলে এক জামবাটি কি ফুল কাঁসার গেলাসে দুধ, সকালে ভাত আর রাতে ফুলকো লুচি। পরেছি পুজোর সময় রঙীন রেশমী জামা আর ফরাসডাঙার কি শান্তিপুরের ধুতি, তাও বড় হ'লে। বছরে জোর দুজোড়া চীনে বাড়ির জুতো। আর পরীক্ষায় ভালো করলে 'স্যান্ডফোর্ড অ্যান্ড মার্টন' কিংবা স্মাইলসের সেলফ-হেলপ উপহার। পুজোর ছুটিতে দেশে যাওয়া, কালীপুজোর বাজি আর পাকাটি পুড়িয়ে ফিরে আসা, এসেই ম্যালেরিয়া আর তিন বোতল ডি, গুপ্ত। মা বাপের স্নেহ যে পাইনি তা নয়। ১০৬ ডিগ্রী জ্বরে বেহুঁশ, চোখ খুলে দেখি মা মাথায় বরফ দিচ্ছে, আর বাবা ওষুধ ঢালছেন। আবার মারও খেয়েছি রীতিমত।

কাল সত্যেন (বোস) বলছিল, সেও—মা'র সে এক ছেলে—তার মা'র কাছে পিটুনি খেয়েছে। এ-যুগে মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুদের হাল অনেক ভালো। তবে একটু যেন আদিখ্যেতা মনে হয়, একটু যেন বাড়াবাড়ি। জানি না, হয়ত এই ঠিক। তবে মধ্যে মধ্যে, দিনে দুতিনবারের বেশী নয়, একটু চড়-চাপড় দেওয়া ভালো। ওটা অবশ্য ভাগাভাগি করে নিতে হয়, এবেলা মা ওবেলা বাবা। নয়ত বাচ্চারা একটু একদেশদর্শী হয়ে পড়ে। শিশুরা অত্যন্ত বুদ্ধি সহকারে মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া জাগিয়ে দেয়—অন্তত দিতে পারে। আজকালকার আমেরিকান কিশোর-কিশোরীর, এমন কি শিশুর, বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে ব্যবহার দেখে স্বাধীনতার সীমা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে পড়ছি। ইংরেজ বাচ্চারা দুষ্টু, কিন্তু পাজি অসভ্য নয়।

আমাদের ... [illegible]

ব্যবহার উঠে গেছে—বিদেশীরা বোতলে পুরে না পাঠালে আমাদের নতুন জননীদের মনঃপূত হয় না। ধনতন্ত্রের গুপ্তচর হতে মা লক্ষ্মীদের কোনো লজ্জা নেই। এ-ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখেছি, একটা নয় দশ বিশটা। প্রবীণ ডাক্তার বলে গেলেন বাচ্চাকে চুণের জল খাওয়াতে। মা'র বিশ্বাস হোলো না, বত্রিশ টাকা ফী দিয়ে সদ্য বিলেত-ফেরৎ শিশুরোগের বিশেষজ্ঞকে ডাকা হোলো। এক মাস ধরে রোগ আর যায় না। পরে সারল বটে, কিন্তু কিসে কেউ জানলে না। বিশেষজ্ঞদের নিন্দা করছি না, কিন্তু সাধারণত তাঁদের অভিজ্ঞতা তাঁদেরই মা ঠাকুমাদের চেয়ে কম। অমৃত বোস কি সাধে 'খাস দখল' লেখেন!

* * *

না, বাচ্চাগুলো ঘুমিয়েছে। বাঁচা গেল। একবার আমাকে এক সহযাত্রিণীর শিশুর কান্না থামাতে ইতার্সি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তাকে কোলে নিয়ে পায়চারি করতে হয়েছিল। ছেলে মানুষ মা অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন আর বাচ্চাটা চিল-চেঁচানি চেঁচাচ্ছিল। সেই থেকেই এই কমপ্লেক্সটা হয়েছে। বোধ হয় তারও আগে, ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে, ভারত সমুদ্রের বক্ষে—আদর করে একটা বাচ্চাকে মিছরী আর এলাচ দানা দিই বার দুই-তিন। সেই থেকে পাঁচ ছ'দিন জোঁকের মতন ব্যাটা গায়ে জুড়ে রইল। শিশুদের ডিসিপ্লিন চাই বৈ কি!

* * *

কোরিয়া থেকে এক আহত সৈনিক ইংলণ্ডে ফিরছে। কি অদ্ভুত বয়! শিরদাঁড়া ভেঙেছে। একবারও উ—আঁ শুনলাম না। শ্রদ্ধা আসে, কিন্তু কিসের জন্য, কার জন্য ছোকরাটির এই সর্বনাশ হোলো ভাবলে মেজাজও ধরে। আমার মাথায় একটি ব্যাপার ঢোকে না—কেউ যুদ্ধে মরতে চায় না আজকাল, এমন কি পয়সার জন্য নয়, চাকরীর জন্য নয়। পরলাভ-ত' কনট্র্যাকটারদের, আর চাকরী ... সিভিলিয়ানদেরই। সেপাইদের ... বোলেরাও চায় না—গুর্খাদেরও নয়। কেউ চায় না, তবু যুদ্ধ হয়, মানুষ মরে! আর সব যুদ্ধই ধর্মযুদ্ধ, মহাভারত থেকে আজ পর্যন্ত! রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ... আমাদের ... উদ্ধাকাঙ্খিত ... আমি অত্যন্ত অভিমানে হয়েছি। ... দুই-এ ... থাকে না।

অত্যন্ত আধুনিক আর রুচিসম্পন্ন। দমদমা এর তুলনায় আঁস্তাকুড়। ফরাসী আর আমেরিকানী প্রভাবের সুচারু সমন্বয়। কত জাত, কত ধর্মই এই লেবাননে আছে। বুরখা পরা বিস্তর তীর্থযাত্রী দালানে অপেক্ষা করছে। এই শহরে একঘণ্টার মধ্যে বরফ আর সমুদ্র! সকালে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

সাইপ্রাস পার হলাম—এবার এথেন্সএর ওপর দিয়ে যাবো। পরিষ্কার আকাশ, নিশ্চয় স্পষ্ট দেখতে পাব। রোম দেখেছি, এথেন্স দেখা হয়নি। অত্যন্ত লোভ হয় দেখবার। এত বরফের চূড়ো কোত্থেকে এল? ডোডেকানীজ, সাইক্লেডীস পার হলাম। এইবার পিলোপনীস। নামগুলো শুনলে মন চমকে ওঠে। ছেলে বয়স থেকে গ্রীক পুরাণ আর ইতিহাস পড়ে আসছি, তাই গায়ে কাঁটা দেয়। একবার মাত্র কাশী দেখে বিহ্বল হয়েছিলাম, পরে অত্যন্ত জঘন্য লেগেছিল। সেই বিহ্বলতার স্মৃতি আছে 'আবর্তে'। নালন্দা-রাজগীর দেখেও মন উধাও হয়ে যায়। কী আশ্চর্য! গত বৎসর সারনাথ দেখে খারাপ লাগল রীতিমত। ভ্রাম্যমানের জন্য বন্দোবস্ত করলে ঐ দশাই হয়! বুদ্ধজয়ন্তী কেমন হবে কে জানে।

আলো আর আকাশের ষড়যন্ত্রে এই পূর্ব ভূমধ্যসাগরের সভ্যতা। ভূমির বিশালতা এখানে অপ্রয়োজনীয়। প্রকাণ্ড দেশের ল্যাঠা বিস্তর। ভৌগোলিক প্রতিবেশকে অমান্য করা যায় না। অবশ্য গ্রীস রয়েছে, পেরিক্লীস নেই, তবু সভ্যতার আদিতে ও উত্থানে প্রতিবেশের জয়-জয়কার। সুন্দর নীল আলো—আসমানী রঙ। বাঙলা ভাষা রঙ সম্বন্ধে দরিদ্র। অথচ বাঙলাদেশের আকাশে বাতাসে গাছ পাতায় ফলে-ফুলে রঙ নেই কে বলবে! রবীন্দ্রনাথ কত রঙের নাম দিয়েছিলেন জানতে ইচ্ছে হয়!

পিলপনেসাস্, এথেন্স্ পার হলাম। কিছুই দেখা গেল না। ছেলে বয়সে শুনেতাম হেরোডোটাস আজগুবি গল্পই লেখেন, এবং ঐতিহাসিক হলেন থুকিডাইডিস্। এখন শোনা যাচ্ছে উল্টো। পেরিক্লীসের বক্তৃতা আগাগোড়া কাল্পনিক, তাঁর এথেন্সও তাই। তবু এথেন্স যা, তা-ই—যেমন কাশী। তুলনা ঠিক হোলো না—কাশীর সঙ্গে রোমেরই তুলনা চলে। ভারতের এথেন্স কি? উজ্জয়িনী? কিন্তু উজ্জয়িনী চিন্তারাজ্যের রাজধানী ছিল না, দরবার ছিল। হয়ত নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা। কিন্তু কোন্‌টা ভারতীয় চিন্তার ধারা বদলেছে, যেমন এথেন্স করেছিল য়ুরোপের বেলা? বাঙলার নবদ্বীপ? সেখানে আর্ট কোথায় রাজনীতির আলোচনা কোথায়? বোধ হয়, ভারতীয় চিন্তা অত্যন্ত ডিসেণ্ট্রালাইজড, বহু কেন্দ্রিক। বনে উপবনে, ঋষিদের আশ্রমে অনেক প্রাথমিক প্রশ্ন উঠত নিশ্চয়ই। এখনকার আশ্রমে পুজোই হয় শুনেছি। ভারতের যেখান থেকেই চিন্তাধারা নিঃসৃত হোক্ না কেন, একবার না একবার মিশবে কাশীতে (বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়)। এথেন্স, রোম, প্যারিস, ভিয়েনা—ঠিক এই ধবনের উৎস কি ভারতে আছে? আমাদের চিন্তার পরম্পরা যেন দেশ-কাল-পাত্র বিবর্জিত। অথচ অবতারের দেশ, অথচ আর্যভূমি পুণ্যভূমি! বোধ হয়, আমাদের চিন্তার বিষয় ও পদ্ধতিই এজন্য দায়ী। এক হিসাবে য়ুরোপ আমাদের চেয়ে ঐতিহ্যে আবদ্ধ। কেবল ইংলণ্ড নয়, প্রত্যেক ক্যাথলিক দেশেই তাই।

১১।৫।৫৬

জুরিখ আগেও দেখেছি বাইরে-বাইরে। এবার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে। বৃষ্টি নিয়ে নামলাম। ডাঃ ফেলড্‌ম্যান গোড়া থেকেই বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন, অতএব সোজা হাসপাতালে চলে এলাম। হাসপাতালটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ। দশ বারো তলা উঁচু—ঘরটি চমৎকার: নীচে ফুলের বাগান, আর ঠিক চোখের সামনে হ্রদ ও শহর। একটু ছবি-ছবি ভাব যেন, তা হোক। প্রথমে একটু চমকে গেলাম—এটা হোটেল না হাসপাতাল। শুনলাম, যখন সমগ্র য়ুরোপ যুদ্ধে ব্যস্ত তখন এরা মানুষ বাঁচাবার জন্য কোটি টাকার হাসপাতাল তৈরী করলে। একজন জার্মান ডাক্তার বল্লেন, এটি য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। জানিনা শ্রেষ্ঠ কি না, তবে কল্পনাতীত পরিচ্ছন্নতা। দক্ষতার পরিচয় এখনও পাইনি। রাত্রে একজন পরীক্ষা করলেন—নতুন কথা কিছু শুনলাম না। কী আশ্চর্য! শরীর মোটেই ক্লান্ত হয়নি।

য়ুরোপের সব ভালো, কিন্তু পাশ বালিস নেই। ওদের বিছানাও আমার পছন্দ নয়—একেবারে 'প্রোক্রাস্টীয়ান বেড'। বিছানায় যদি না চরে বেড়াতে পাই, যদি না ধামসাতে পাই, তবে সেটা বিছানাই নয়। ওদের দেহটাই আড়ষ্ট—হাঁটু মুড়ে, উবু হয়ে যারা বসতে পারে না, তাদের শোয়া ঐরকম হবে না ত' কি হবে! বিছানার চারদিকে কল-কব্জা, ওপরে, নীচে, ঘরের সর্বত্র। নিশ্চয়ই খুব আরাম, অপারেশনের পরে বুঝব নিশ্চয়। লোকে বলে কলকব্জা হলে যারা খেটে খায়, তাদের, বিশেষত গৃহিণীদের, অবসর মিলবে। তা ত দেখছি না, গুচ্ছেরখানেক উঁচুনীচু স্তরের নার্স, ঝি, সকাল থেকে খেটেই যাচ্ছে। অবশ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অত্যন্ত। কিন্তু অত লোক-লস্কর নিয়ে কি আমাদের দেশে ঝাড়-পোঁছ করা যেত না? লেবার ইন্‌টেন্সিভ আর ক্যাপিটেল ইন্‌টেন্সিভ-এর

পার্থক্য বস্তুত কম। প্রথমটির পরিশ্রম সোজাসুজি, দ্বিতীয়টির পরিশ্রম বাঁকা-চোরা, আগুপিছু, পরাশ্রিত—যে-পর মানুষ নয়, বস্তু। এবং তারই রকম-ফের। যতদিন যন্ত্রপাতি ছিল, ততদিন মানুষ আর শ্রম একই ছিল। কারণ যন্ত্রপাতি হোলো অংগপ্রত্যংগেরই বিস্তার। কল-কব্জা এই আঙ্গিকতাকে কেটে জোড়া দেবার চেষ্টা করছে। ফলে এদের হাত-পা নাড়া সব যেন কলের পুতুলের মতন,—নাচ নয়ত হাত পা ছোঁড়া—সাধারণ নাচ অবশ্য। দশ বারো বছর কঠিন শিক্ষার পরও ব্যালের নর্তকীরা হাটু, আংগুল, ঘাড়, ভুরু আমাদের নর্তকীদের মতন অত সাবলীল-ভাবে নাড়তে পারে না। পাশ-বালিসের চলন থাকলে অন্য ব্যাপারই হোত। একটা কত ছোট্ট ব্যাপারে পশ্চিমী সভ্যতার 'রাইগর মর্টিস' ধরা পড়ে।

১৩।৫।৫৬

কাল দেহ নিয়ে এত রকম পরীক্ষা চলল, এত মরফিন ঢোকানো হল যে সারাদিন মাথা তুলতে পারলাম না। এই হাসপাতালের এক পাদরি এলেন, তিনি প্রোটেসট্যান্ট। পাদরির পোশাক নয়, স্ট্রাইপড্ ট্রাউজারস্ আর কালো কোট। লাল মুখ, গোঁফের ভেতর দিয়ে জার্মান কথাই বেরুল। প্রশ্ন করলেন, আমি কি থিওলজির প্রোফেসর? আমি বল্লাম, 'না, ঘোর মেটিরিয়ালিস্ট বিষয়ের—অর্থশাস্ত্রের।' বল্লেন, 'এখানে সকলে আশা নিয়ে আসে—সকলের মুখেই আশা।' ভাবলাম এই রে! আরম্ভ হোলো বুঝি! 'নিশ্চয়ই, বিজ্ঞানের দৌলতেই এত আশা।' 'আপনার……' শেষ হবার আগেই বল্লাম, 'আমি হিন্দু, ব্রাহ্মণ।' অর্থাৎ আমাদের ধর্মে ঐ আশা-ফাশার বালাই নেই; যা হবার তাই হবে। ভদ্রলোক 'পরে কথা-বার্তা হবে' বলে আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

এই বোধহয় সজ্ঞানে প্রথম বেলা পাঁচটায় চা খেলাম। বাড়িতে, এমন কি বন্ধুর বাড়িতে হলেও, অনর্থ করতুম। আগামী দশ পনের দিন ঐ চলবে সম্ভবত। গলাই থাকবে না, ত খাওয়া।

সন্ধ্যায় শ্রীরঙ্গনাথন্ তাঁর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দেখা করতে এলেন। ছেলেটি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অরগে-নাইজেশন পড়া শেষ করছে। শ্রী রঙ্গনাথন আমাদের সেই প্রখ্যাত লাইব্রেরিয়ান। দেশ-বিদেশে তাঁর বহু সুখ্যাতি শুনেছি। ভদ্রলোক বিষয়টির নতুন অর্থ বোঝালেন—ছেলেটিও দৃষ্টান্ত দিতে লাগল। কিন্তু ভদ্রমহিলার ইচ্ছা নয় যে আমরা অত কথা [illegible]

পাশের গ্রামে আসছেন—ততদিনে আশা করছি উঠে বসতে পারব। শুনেছি, কথা ফুটতে মাসকয়েক লাগবে। দেখা যাক্। মুখ চাপবার মতন লোক ত' দেখিনি, এবার যদি রোগে পারে! মাথাটা পরিষ্কার থাকলেই কথা ফুটবে। সেখানে এখনও ত' কোনো দুর্বলতা দেখছি না। সেই ৬টার সময় উঠে স্নান টান করে টেবিলে বসেছি কাজ করতে। কাল রাতেও খানিকটা পড়তে পারলাম।

* * *

সকাল থেকেই গির্জের ঘণ্টা আর ব্যান্ড শুনেছি। জুরিখের ঘণ্টাগুলো শ্রুতিকটু। এরাই না 'কাক'-রুক তৈরী করেছিল? সবই যেন জাবড়া-জাবড়া—জেনেভা অন্য রকমের। এখানে টিউটনিক ছাপটা একটু বেশি। সেরে উঠলে আইন্স্টাইন যেখানে পড়াতেন, লেনিন-বাকুনিন যেখানে থাকতেন, পাগলা আর্টের যেখানে জন্ম হয়েছিল, আর ইয়ুং-এর অনুষ্ঠানটি দেখব। আমার শহর দেখার অর্থ, কিংবা দৌড় ঐ পর্যন্ত।

ডাক্তার রুয়েডি এসে বলে গেলেন, এ ঘরটা ডাক্তারদের কাছ থেকে অনেক দূরে। তাই দশ পনের দিন তাঁদের কাছাকাছি তিন তলায় থাকতে হবে। দিনে ত্রিশ-চল্লিশ ফ্রাঙ্ক সস্তাও হবে। পরে একই ঘরে দুজন থাকতে হবে। ঐখানেই বিপদ! বাড়িতেও অন্তত তিরিশ বছর একলা এক ঘরে কাটিয়েছি। সে ঘরটা থেকে হ্রদ আর পাহাড় দেখতে পাব না—তবে বাগানের ওপরেই। বাগানটি সত্যই অপূর্ব। রঙ বেরঙের ফুল—টিউলিপে ভরা। আরো কত ফুলের নামই জানি না—জানতে হবে। সুধীনের (সুধীন দত্ত) পরামর্শে 'মোহানা' এনেছি, কিছু বাড়াতে হবে। তার মতে 'অন্তঃশীলা'কে ছোট করা, 'আবর্ত'কে না ছোঁয়া আর 'মোহানা'কে একটু বাড়িয়ে এক ভল্যুমে তিনখানি ছাপানো উচিত। ইচ্ছা ছিল তাই, চেষ্টাও করলাম 'অন্তঃশীলা'কে নিয়ে। কিন্তু বাগে আনতে পারলাম না। সুধীন নিজের লেখা ভেঙে সাজে। এমন কি, সংশোধন কি নতুন রচনা অনেক সময় বোঝা যায় না। আমি অতদূর যেতে রাজী নই। এ-যেন অতীতকে গুঁড়িয়ে বর্তমানের চাকে [illegible]। সুধীন [illegible] ক্লিনিকে থেকেছে, তাই জানে কি একঘেয়ে লাগে।

* * *

ক্লিনিকের [illegible] হচ্ছো। রাস ব্যান্ডের [illegible] করতে পারিনি। [illegible]

মাপকাঠি হচ্ছে সমাজে স্ত্রী-জাতির স্থান। আমি বলি হাসপাতাল। দেশে এমন হাস-পাতাল দেখেছি, যার ঘরের সামনে খোলা নর্দমা, তাও জল সরে না। য়ুরোপের তিন চারটে জিনিস দেখলে হিংসে হয়,—মিউ-জিয়ম, জাহাজ,—মানোয়ারী আর হাওয়াই; আর হাসপাতাল।

এক বান্ধবী ফুল নিয়ে সকালে এলেন দেখা করতে। সারলে তিনি শহর ঘুরিয়ে আনবেন। একেবারেই একলা মনে হচ্ছে না। ছেলেবেলায় বাবার এক বন্ধু তাঁর কাছে আমার সুখ্যাতি করছিলেন। বাবা, উত্তর দেন, "তা জানি না। তবে, he has a genius for friendship and some friends are geniuses." সত্যি, আমার বন্ধুভাগ্য খুবই ভালো।

* * *

দুপুরে চিরজীবন এক-আধঘণ্টা ঘুমোবার অভ্যাস। কাজ পড়লেও খানিকটা সময় করে নিই। আজ পারলাম না শুতে। রোদ্দুর ফুটে ফুটে করছে, বাগানে ফুলের মেলা বসেছে, কত যে পাখি ডাকছে—এই দশতলা থেকে শুনতে পাই। লিফ্‌টে করে নীচে গেলাম—বাগানে আধঘণ্টা বসলাম। শত শত স্ত্রী-পুরুষ রবিবারের দুপুরে অসুস্থ আত্মীয়দের দেখতে এসেছে ফুলের তোড়া নিয়ে। একটা বাচ্চা আর ফিরতে চায় না, তার বাবা আদর করে ভুলিয়ে নিয়ে গেল। মা'র বোধহয় খুব অসুখ……

'কম্পাউণ্ডারবাবু, কম্পাউণ্ডারবাবু!' গলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের চেম্বারের ভিতর থেকে টেবিল চাপড়াবার শব্দ শোনা গেল। ডিসপেনসারির কাউণ্টারের পিছনে ছোট টুলটির ওপর বসে থাকতে থাকতে একটু অন্যমনস্ক হয়েই পড়েছিল তারাপদ কম্পাউণ্ডার। হঠাৎ ডাক্তারের চেঁচামেচিতে চমকে নড়েচড়ে উঠে তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়ে বলল 'আজ্ঞে!'

ভিতর থেকে ডাক্তার অরুণাভ মুখুয্যে বলল, 'আর আজ্ঞে! তিন তিনবার ডাকবার পর আপনার চৈতন্য হল। আপনাকে নিয়ে আর পারা গেলনা মশাই। নিন, প্রেসক্রিপসনখানা নিয়ে চটপট মিকশ্চার আর পাউডারটা করে ফেলুন তো। সোমেনের আবার অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। ও দেরি করতে পারবেনা।'

সোমেন সেন এই ছোট শহরের ব্রাঞ্চ ব্যাংকের একাউণ্টাণ্ট অরুণাভের বন্ধু। তার সামনে অরুণ একটু বেশি হাঁক-ডাক করে। তাতে বন্ধুকেও খাতির করা হয় আবার নিজেরও একটু প্রতিষ্ঠা বাড়ে। তারাপদের বুঝতে কিছু বাকি নেই। উঠে গিয়ে প্রেসক্রিপসনখানা নিঃশব্দে নিয়ে আসে কম্পাউণ্ডার, আলমারি খুলে শিশি-গুলি বার করে ওষুধ তৈরিতে মন দেয়। সোমেনের পাঁচ বছরের ছেলে [illegible] কদিন ধরে সর্দিজ্বর চলছে। অরুণাভ গিয়ে এর মধ্যে দুদিন দেখে এসেছে। একাউণ্টাণ্ট আজ নিজেই এসেছে, ছেলের জন্যে ওষুধ নিতে।

মিকশ্চার তৈরি করতে করতে দুই বন্ধুর আলাপ কানে গেল তারাপদের। না, ছেলের অসুখের জন্যে এখন আর কোন উদ্বেগ জানাচ্ছেনা সোমেন। তারাপদকে নিয়েই তাদের আলোচনা হচ্ছে।

'তোমার কম্পাউণ্ডারটির কি হয়েছে হে অরুণাভ? রাস্তা দিয়ে যখনই যাই দেখি টুলের ওপর ঝিম ধরে বসে আছে। কেমন একটা উদাস উদাস ভাব। কারো দিকে কোন লক্ষ্য নেই।'

অরুণাভ বলল 'আর বোলোনা। ব্রংকো-নিউমনিয়ায় বেচারার স্ত্রী মারা গেছে বছর খানেক হল। তারপর থেকে ওইরকম ভূতান্তারিত অবস্থা। ডাকলে সাড়া মেলেনা, একটা মিকশ্চার তৈরি করতে পাঁচ মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টা লাগিয়ে দেয়। কাজকর্ম চালানোই মুশকিল হয়ে পড়ে। নেহাৎ বাবার আমলের পুরোন লোক। টাকাপয়সা নিয়ে কোন তঞ্চক করেনা। তাই—'

সোমেন একটু হেসে বলল 'তা এক কাজ করনা ভাই। দেখেশুনে তোমার কম্পাউণ্ডারের ফের একটা বিয়ে দিয়ে দাও।'

অরুণাভও হাসল, 'যা বলেছ বিয়ে দেওয়ার মত বয়সটাই বটে।'

'বয়স কত হল?'

'তা পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। কিন্তু চুল পেকে দাঁত পড়ে চেহারার যা দশা হয়েছে তাতে ষাট বললেও চালিয়ে দেওয়া যায়।'

[illegible] এই [illegible] করে আইফ [illegible] [illegible]। [illegible] এখনো কিন্তু তা হয়। মাঝে মাঝে কাগজে পড়ি এসব খবর। কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় না। এদেশটা কেঁদে কেঁদেই শেষ হল। জীবন নিয়ে কোনদিন মজা করতে জানল না। লোকটির আর আছে কে কে?'

'কেউ না। আপন বলতে কেউ নেই ত্রিসংসারে।'

'তবে তো আরো ভালো। লাইন একেবারে ক্লিয়ার। দেখে শুনে তুমি তাহলে তোমার কম্পাউণ্ডারের এবার একটা বিয়ে দিয়ে দাও। সার্ভিসও ভালো পাবে। তোমার একটা কীর্তিও থেকে যাবে। শত হলেও তুমিই তো এখন অভিভাবক।'

'যা বলেছ।'

ডাক্তার আর বন্ধু দুজনেই ফের হেসে উঠল। মৃদুগলায় স্ক্রীনের আড়ালে দুই বন্ধুর নির্দোষ রসালাপ চললেও কম্পাউণ্ডারের সবই কানে গেল। ভ্রু দুটি কুঞ্চিত, মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল তারাপদের। ওষুধ তৈরি করতে করতে হাতখানা একটুকালের জন্যে নিশ্চল হয়ে রইল।

বন্ধুর চেম্বার থেকে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে সোমেন এবার বেরিয়ে কাউণ্টারের কাছে এসে একটু তাড়া দিয়ে বলল, 'কই মশাই আমার ওষুধটা হোলো?'

কম্পাউণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'আজ্ঞে হাঁ, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এই নিন।'

দাগকাটা মিকশ্চারের শিশি আর পাউডারটা সোমেনের হাতে তুলে দিল কম্পাউণ্ডার।

সোমেন বলল, 'থ্যাংকস। লিখে রাখবেন আমার একাউণ্টে।' তারপর হাত ঘড়ির দিকে একটু চোখ বুলিয়ে তাড়াতাড়ি ডিসপেনসারি থেকে বেরিয়ে গেল। ওর অফিসের বেলা হয়ে গেছে।

কম্পাউন্ডার আবার শক্ত হয়ে তার টুলটিতে বসল। কাঁচা-পাকা চুলে ভরতি মাথাটা হঠাৎ জোরে নাড়তে নাড়তে নিজের মনেই বলে উঠল না না না। ওরা যা বলে সব মিথ্যে। এখন আর আমার কোন দুঃখ নেই। আমি সব ভুলে গেছি। এক বছর পরেও মরা বউয়ের কথা কেউ মনে করে রাখে নাকি? আমিও সব ঝেড়ে মুছে ফেলেছি। তবু লোকে আমাকে মিথ্যে বদনাম দেবে। অকেজো হয়েছি বলে আড়ালে বসে নিন্দে করবে। দিনরাত খেটে মরলেও গরীবের যশ নেই।'

স্টেথস্কোপ গলায় সাদা স্যুট পরা তরুণবয়সী সুদর্শন ডাক্তার ব্যাগ হাতে এবার চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল। কম্পাউণ্ডারের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে স্মিতমুখে বলল 'মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে অমন বিড়বিড় ক'রে কি বলছিলেন?'

কম্পাউণ্ডার লজ্জিত হয়ে একটু আগের বিসদৃশ আচরণটাকে জোর গলায় অস্বীকার করে বলল 'কই না তো, কিছু বলিনিতো।'

অরুণাভ গম্ভীরভাবে উপদেশ দিল 'অমন করে মাথা নাড়বেননা। আর অতবড় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রেখেছেন কেন? ভারি বিশ্রী দেখায়। জামাটারই বা কি হাল করে রেখেছেন। বোতাম নেই। কাঁধের কাছে খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। ছি ছি ছি। লোকে আমাকে কি ভাববে বলুনতো। মনে করবে মাইনেপত্র কিছু দিইনে। তাই এই দশা। আজই আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নতুন একটা জামা কিনে নেবেন। আর নাপিত ডেকে ছোট করে ছাঁটিয়ে নেবেন চুল।'

লম্বা চুলগুলি হাতের মুঠোয় করে কম্পাউন্ডার বলল, 'এইতো এক মাস আগেও ফটিক পরামাণিককে দিয়ে চুল ছাঁটিয়ে এসেছি ডাক্তারবাবু। শালার চুলও যেন ইয়ার্কি পেয়েছে। সেও আমাকে দশজনের কাছে নাকাল করতে চায়।'

অরুণাভ বলল, 'থাক থাক আর মুখ খারাপ করবেন না। আপনি তিন মাসের মধ্যে পরামাণিকের কাছে যাননি তা আমি জানি। যেখানে পাবলিককে নিয়ে আমাদের কারবার। তাদের দশজনের মনস্তুষ্টি না করতে পারলে আমাদের রুজি-রোজগার বন্ধ। আমি তো সব সময় ডিসপেনসারিতে থাকিনে। আপনিই জানেন। অনেক [illegible]

গোষ্ঠের লোক কম্পাউন্ডার সেজে বসে আছে তাহলে অচেনা অজানা কোন লোক কি সাহস করে এদিকে ঘেঁষবে?'

তারাপদ অপ্রসন্ন মুখে চুপ করে রইল। অরুণাভ আবার বলল, 'অথচ শহরে দিনের পর দিন লোক বাড়ছে। এই আমার পশারের সময়। আমার ট্রিটমেণ্ট খারাপ একথা কেউ বলতে পারবে না। কলকাতার বড় বড় ডাক্তাররাও আমার প্রেসক্রিপসনে কলম ছোঁয়াতে পারেনি। দয়া করে আপনি একটু বুঝে সামলে চলুন। কাছারি পাড়ার শীতাংশু ডাক্তার কেমন একটি ছোকরা কম্পাউন্ডার রেখেছে দেখেছেন তো? ছেলেটি কেমন স্মার্ট কি রকম টিপটপ থাকে। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের কি ভাবে রিসিভ করে একবার দেখে আসবেন গিয়ে।'

তারাপদ ঘাড় নেড়ে বলল, 'আসব। টিপটপ আমিও থাকতে জানি। আপনি ভাববেননা।'

ঘড়ি দেখে ডাক্তার বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলল, 'আমি হেডমিস্ট্রেসের বাসায় যাচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসব। পেশেণ্ট এলে তাদের ভালোভাবে রিসিভ করবেন। তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করবেন আগে যেমন করতেন।' তারপর একটু থেকে নরম গলায় বলল, 'আপনার কষ্টের কথা বুঝি কম্পাউণ্ডারবাবু। কিন্তু উপায় কি বলুন। তা ছাড়া দুনিয়া ছেড়ে সবাইকেইতো চলে যেতে হবে। দুদিন আগে আর পরে। কত রোগ কত মৃত্যু চোখের ওপর তো নিত্য দেখছেন। আপনি ওসব ভাবনা ছেড়ে দিন।'

হঠাৎ তারাপদ কম্পাউন্ডার হাতজোড় করে কাতর স্বরে বলে উঠল, 'দিব্যি করে বলছি ডাক্তারবাবু আমি সব ভাবনাই ছেড়ে দিয়েছি। আমার মনে আর কোন দুঃখ নেই। দয়া ক'রে আপনি ওসব কথা আর বলবেন না। আমি তাতে বড় লজ্জা পাই।'

'আচ্ছা আচ্ছা।'

অরুণাভ একটু হেসে এবার সত্যিই বেরিয়ে পড়ল।

লজ্জা ছাড়া কি। পুরুষ মানুষের পক্ষে বউয়ের জন্যে বেশিদিন শোক করার মত অগৌরবের কাজ আর দুটি নেই। স্ত্রী মারা যাওয়ায় পর দু'একদিন দু' এক ফোঁটা চোখের জল ফেললেই যথেষ্ট। তাও গোপনে গোপনে ফেলতে হয়। লোকে দেখে ফেললে লজ্জার আর শেষ থাকে না। বাপ মা, ভাই কি ছেলেমেয়ে মারা গেলে যেমন চেঁচিয়ে কাঁদা যায় স্ত্রী মারা গেলে তেমন পারা যায় না। যত দুঃখই হোক চারুবালা চলে যাওয়ার পর সংসার যত শূন্যই মনে হোক সে বোধ তারাপদের আছে। কাণ্ডজ্ঞান সে কোন মুহূর্তেই হারিয়ে ফেলেনি। স্ত্রীর জন্যে তার চোখে জল দেখেছে, তাকে হাউমাউ করে কাঁদতে দেখেছে বলুক তো কেউ। নিজেকে লোকের কাছে অপদস্থ করবে তেমন পাত্রই তারাপদ কম্পাউন্ডার নয়। একা এক ঘরে মশারির মধ্যে সে গুমরে মরেছে, বালিশ

বুকে চেপে দুঃসহ যন্ত্রণায় ছটফট করেছে, তবু বাইরের কাকপক্ষীকে সে নিজের দুর্বলতার কথা জানতে দেয়নি। অ... আজ কিনা ডাক্তারবাবু তাকে খোঁটা দিলেন স্ত্রীর শোকে তারাপদ কম্পাউন্ডার কাজের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। একেবারে অপদার্থ হয়ে গেছে। পাগল বাউন্ডুলের সামিল হয়েছে। ছি ছি ছি। আজ বলে নয়। ডাক্তারবাবু প্রায়ই এর ওর কাছে তার বিরুদ্ধে এরকম নালিশ করেন। উদাসীন অমনোযোগী বলে অপবাদ দেন। আসলে বুড়ো কম্পাউন্ডারের কাজ তাঁর আর পছন্দ হয়না। চালাক চতুর ছোকরা কম্পাউন্ডার রাখবার তাঁর ইচ্ছা হয়েছে। যে সমবয়সী বন্ধুর মত ঠাট্টা ইয়ার্কি করবে দু'চারটে রসের কথা বলতে পারবে তেমন একজন লোক চায় ডাক্তার। কিন্তু তারাপদের মত এত কাজ কি আর কাউকে দিয়ে হবে? সকাল থেকে রাত বারটা পর্যন্ত এমন গাধা খাটুনি কি আর কেউ খাটতে পারবে? জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, তারাপদ না করে কি। ঘর ঝাঁট দেয়, টেবিল আলমারি পরিষ্কার করে, হিসেব লেখে, রোগীদের কাছ থেকে বাকিবকেয়া আদায় করতে যায়; মিকশ্চার মলম, মালিশ, পাউডার ড্রেসিং, ইনজেকসন এসব তো আছেই। কিন্তু এত করেও ফল পাওয়া যায় না, আবার কেউ কিছু না করেও সব পায়।

বউ মারা গেছে বলে তারাপদ নাকি অকেজো হয়ে পড়েছে। কথা শোন! হঠাৎ মৃতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল কম্পাউন্ডার। সে বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে যেমন করত, অবিকল সেইরকম। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, 'হারামজাদী, কী করেছিস চেয়ে দেখ। নিজেও মরেছিস আমাকেও মেরে রেখে গেছিস। তোর জন্যেই এই গাল-মন্দ আমাকে শুনতে হয়। আমি নাকি কাজ করিনে, আমি নাকি ফকির দরবেশের মত ঘুরে বেড়াই।'

জামা কাপড় আগের মত ধোপদুরস্ত ফিটফাট রাখতে পারে না কম্পাউন্ডার। এ কথা সে স্বীকার করে। কি করে রাখবে। সে কি এসব কোনদিন শিখেছে যে করবে। এসব তো চারুবালা নিজেই করত। নিজের হাতে সাবান দিয়ে জামা কাপড় কেচে ইস্ত্রি করে দিত। বলত 'ধোপাবাড়ি দিলে জামা-কাপড় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। টেঁকে কম, তার চেয়ে নিজের হাতে কেচে নেওয়া ভালো, না হয় একটু কম বাবু দেখাবে। এমনিতেই যা একখানা খাপসুরৎ চেহারা। তাতে উনিশ বিশ হলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'

মুখ টিপে টিপে হাসত চারুবালা। কিন্তু উনিশ বিশ সত্যিই হ'ত না। ওর হাতের কাজ চমৎকার ছিল। স্টেশনের লাগা অত নামজাদা স্বরাজ লন্ড্রীর কাজকেও হার মানাত। শুধু কি জামা কাপড়! তারাপদের জুতোও নিজের হাতে পালিশ করত চারুবালা। সে নিজের হাতে এসব করতে গেলে চারুর মন উঠত না। খোঁটা দিয়ে বলত, 'কম্পাউন্ডারি করা আর এসব করা এক কথা নয়। ঘর সংসারের কাজ অনেক শক্ত। রোগীর সেবার চেয়ে সুস্থ মানুষের সেবা করায় অনেক বিদ্যেবুদ্ধি দরকার।'

মাঝে মাঝে আদর করে এই সেদিন পর্যন্ত চারুবালা তারাপদের জামার বোতাম লাগিয়ে দিয়েছে, কোঁচা দিয়েছে কুঁচিয়ে।

তারাপদ লজ্জিত হয়ে বলত, 'কি যে কর। কেউ দেখে টেখে ফেলবে।'

চারুবালা বলত, 'আহা, বাড়িতে কত আত্মীয়কুটুম্ব তোমার, বয়স্থা কত ছেলে মেয়ে নাতিনাতনি। তারা সব আড়ি পেতে আছে।'

সত্যি সারা বাড়িতে আর কেউ ছিল না। ছোট্ট উঠানের উত্তর প্রান্তে একখানি মাত্র ঘর। ডানদিকে আর একখানা রান্নার চালা। উঠানের ওপর একটি পেয়ারা গাছ। আর ঘরের পিছনে নারকেল গাছ গুটি তিনেক। চারদিকে বাঁখারির বেড়া ঘেরা শহরের এক প্রান্তে আট টাকা ভাড়ার এই বাড়িখানা এখনো রেখে দিয়েছে তারাপদ। বাড়ি-ওয়ালার ইচ্ছা বাড়িখানা তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আরো বেশি টাকায় ভাড়া দেয়। কিন্তু তারাপদ তাতে রাজী হয়নি। ডাক্তারবাবু অনেকদিন বলেছেন, 'আপনি তো আজকাল এসে এই ডিসপেনসারিতেও থাকতে পারেন। আলাদা বাড়ি ভাড়া টেনে আর লাভ কি।'

কিন্তু তারাপদ এখনো ছেড়ে দেয়নি বাড়ি। কাজকর্ম শেষ করে দিনে দুবার —দুপুরে আর রাতদুপুরে সে এই বাড়িতে আসে। নিজেই রান্নাবাড়া করে খায়। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন তাঁদের বাড়িতে খেতে। জাতে ব্রাহ্মণ। কোন অসুবিধে ছিল না। কিন্তু তারাপদের মন ঠিক চাইল না। তারচেয়ে বাড়িই ভালো। সেখানকার হাওয়ায় এখনো তার গন্ধ, প্রতিটি আসবাব-পত্রে, বাসনকোসনে তারই স্মৃতি, তারই হাতের ছোঁয়া যেন এখনো লেগে আছে। তার শখ করে কেনা অল্প দামি সব জিনিস-পত্রে এখনো ঘর বোঝাই হয়ে আছে তারাপদের। ভারি মমতা ছিল তার জিনিসে। জিনিস তো নয় যেন এক একটি ছেলেমেয়ে। একটুও অনাদর সইতে পারত না। ও বাড়ি কি তারাপদের ছাড়বার জো আছে?
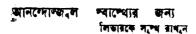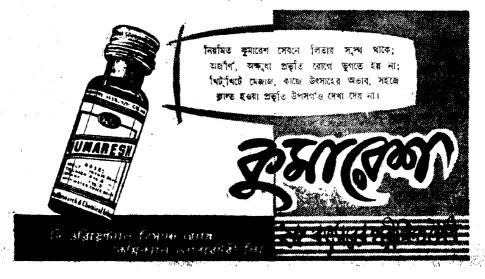
'কম্পাউণ্ডারবাবু!'

আবার চমকে উঠল কম্পাউণ্ডার। না, এবার আর ডাক্তারের ধমক নয়, রোগীরা এসেছে।

'আসুন দত্তমশাই। ডাক্তারবাবু এক্ষুনি এসে পড়বেন।'

যত্ন করে তাঁকে চেয়ারে বসতে দিল তারাপদ। প্রেসক্রিপসন দেখে বলল, 'ওষুধটা আবার রিপিট করতে লিখেছেন। এক্ষুনি করে দিচ্ছি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।'

তারপর মাস্টার দর্জি, মুহুরী, হাতে কপালে উল্কি আঁকা হিন্দুস্থানী গয়লানি অনেকেই এসে ভীড় করল ডিসপেনসারির দরজায়। তাদের রোগব্যাধির কথা শুনতে শুনতে, নানা রঙের নানা গন্ধের ওষুধ তৈরি করতে করতে মৃতা স্ত্রীর কথা ভুলে গেল কম্পাউণ্ডার। ভুলে গিয়ে বাঁচল।

অরুণাভ ফিরে এসে তাকে ব্যস্ত দেখে খুশি হল। ভাবল ধমকে কাজ হয়েছে।

কিন্তু তারাপদ কম্পাউণ্ডারের ভাগ্যই আজ মন্দ। একটু বাদে খাকির পোষাক পরা ডাকপিওন এসে হাজির হল। ডাক্তারবাবুর নামে দুখানা চিঠি। একখানা মেডিক্যাল জার্নালের। সঙ্গে আশ্চর্য কম্পাউণ্ডারেরও চিঠি রেখে গেল একখানা। তারাপদই হাত বাড়িয়ে রাখল চিঠিগুলি। অরুণাভের চিঠিগুলি তাকে এগিয়ে দিয়ে নিজের চিঠি-খানার দিকে একটু বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। কে লিখল তাকে এই এনভেলপের চিঠি।

এনভেলপ কিন্তু মুখ আঁটা নয়, মুখ খোলা। যে পাঠিয়েছে সে পুরো দু'আনা পয়সা ব্যয় করেনি। তিন পয়সার টিকেটে কাজ সেরেছে। বুকপোস্টের চিঠি। এসে না পৌঁছালেও পারত। তবু বছরে দু' এক-খানার বেশি চিঠি তারাপদের নিজের নামে আসে না। চিঠির দাম তার কাছে অনেক, চিঠির মধ্যে অনেক রহস্য। ভিতর থেকে কাগজখানা টেনে বার করল তারাপদ। হলদে রঙের কাগজে ছাপা চিঠি। তারাপদের ছোট শ্যালক বিনয় তালুকদারের ছেলের শুভ অন্নপ্রাশন। এই প্রথম ছেলে। বিনয়ের দাদা বিজন নিমন্ত্রণ করেছে। সবান্ধবে যেতে লিখেছে। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করবার কথাও আছে চিঠিতে।

ডাক্তার কি কাজে বাইরে এসে দেখে ফেলল চিঠিটা। বলল, 'কি ব্যাপার। অত মন দিয়ে কার চিঠি পড়ছেন!'

তারাপদ একমুখ হেসে বলল, 'আমারই চিঠি। শ্বশুরবাড়ি থেকে লিখেছে।'

অরুণাভ বলল, 'ভালো, ভালো। বউ গেলেও শ্বশুরবাড়ি [illegible]। আমরা তো এখনো [illegible] [illegible]

তারাপদর শ্বশুর শাশুড়ী এখন আর কেউ বেঁচে নেই। শ্যালক শ্যালিকারা আছে। ছোট দুই শালীর এখনো বিয়ে হয়নি। আর দুজনের ভালো ঘরেই বিয়ে হয়েছে। তারপর নিমন্ত্রণের কথাটা জানাল তারাপদ। তারিখ মিলিয়ে দেখল আজকেই অন্নপ্রাশন। ভাগ্যে চিঠিটা পাওয়া গেছে।

অরুণাভ হেসে বলল, 'চিঠিটা ছাড়তে ও'রা একটু হিসেবের ভুল করে ফেলেছেন। একদিন পরে ছাড়লেই ঠিক হ'ত।'

বক্রোক্তিটা ভালো করে বুঝতে পারল না তারাপদ। বলল, 'ডাক্তারবাবু, আজকের দিনটা আমাকে ছুটি দিতে হবে। তিনটের গাড়িতে কলকাতায় যাব। আবার রাত দশটার গাড়িতে ফিরে আসব।'

অরুণাভ বলল, 'সে কি কম্পাউণ্ডারবাবু! যেতেই হবে আপনাকে? অমন একখানি উড়ো চিঠি পেয়েই কুটুম্ববাড়িতে ছুটবেন?'

তারাপদ কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল, 'তাদের সময় নেই, লোকজন কম। দিনও বোধহয় হঠাৎ ঠিক হয়েছে।'

অরুণাভ প্রসন্নভাবে বলল, 'কিন্তু এদিকে যে অনেক কাজকর্ম বাকি পড়ে আছে। আর্জেন্ট কেস আছে কয়েকটা।'

তারাপদ বলল, 'আমি রাত্রে এসে সব সেরে রাখব। কোন প্রেসক্রিপসন ফেলে রাখব না। রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত কাজ করব। মরশুমের সময় এর আগেও তো কত করেছি।'

অনেক অনুরোধ উপরোধের পর শেষ-পর্যন্ত অরুণাভ ছুটি দিতে রাজী হল। ভাবল আসুক ঘুরে। তাতে যদি মনটা একটু বদলায়, মনে খানিকটা ফুর্তি টুর্তি আসে তো সকলের পক্ষেই ভালো হবে। ছুটি মঞ্জুর করবার পর অরুণাভ বলল, 'দেরি করবেন না যেন। আজ রাত্রে দশটার মধ্যেই ফিরে আসবেন।'

ডিসপেন্সারি থেকে আজ একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ল তারাপদ। বাজারের ধারে বটতলায় বসে ফটিক পরামাণিক মাথার পর মাথা সাফ করছে। তারাপদ নিজের মাথা নামিয়ে দিল তার কাছে। সত্যি এ বেশে কুটুম্ববাড়ির উৎসব অনুষ্ঠানে যাওয়া চলে না। মনে পড়ল মাথার চুল বড় হলে চারুবালাও বড় উত্যক্ত করত। তারাপদ বলত, 'নিজের যে কোমর অবধি ঢেউ খেলানো চুল তাতে কোন দোষ নেই। আমার চুল এক ইঞ্চি কি আধ ইঞ্চি বাড়লেই বড় মাথা ব্যথা।'

চারুবালা [illegible] বলত, 'সব ব্যাপারেই আমার সঙ্গে তুলনা করতে আসা চাই।'

ক্ষৌরী হয়ে বাসায় গেল তারাপদ। [illegible]

থেকেই রান্নাটা তারাপদ একটু একটু শিখে নিয়েছিল।

আজ কি হয়েছে তারাপদের। উঠতে বসতে কেবলই তার কথা মনে পড়ছে। আর বুকটার মধ্যে কেমন করে উঠছে থেকে থেকে। রক্ষা যে মানুষ আর একজনের মনের কথা সব বুঝতে পারে না। ডাক্তারের বুক পরীক্ষার যন্ত্রেও সব তোলপাড় ধরা পড়ে না।

খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করেই যাত্রার জন্যে তৈরি হল তারাপদ। বাক্স খুলে ধুতি পাঞ্জাবি বার করল। এখনো আস্ত আছে দু'একখানা।

ছোট একটি কাঁচের আলমারিতে নানাধরনের খেলনা সাজানো মাটির আর চিনেমাটির নানারকমের পুতুল, কাচের বাড়ি, তুলোর হাতি—কলকাতা থেকে কত কী ই যে সে কিনে এনে সাজিয়ে রেখেছে তার ঠিক নেই। যাদের জন্যে আনা তারা কেউ আসেনি। কত তাবিচ কবচ, ডাক্তার কবিরাজ কিছুতেই কিছু হল না। এই একরাশ নির্জীব পুতুল না রেখে যদি একটি জীবন্ত পুতুল, যদি খানিকটা রক্তমাংসের মধ্যে একটু প্রাণকণা রেখে যেত চারুবালা তাহলেও অনেকখানি সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর একান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা হয়নি। মাঝে মাঝে পাড়া প্রতিবেশীর বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিজের কাছে এনে রাখত চারু। তাদের খেলনা দিত, খাবার দিত, পুজোর সময় জামা প্যান্ট কিনে দিত দু'একজনকে। এতটা বাড়াবাড়ি তারাপদর সহ্য হ'ত না। এই নিয়ে ঝগড়া হত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। পরের ছেলেমেয়েদের জন্যে কতদিন যে চারু না খেয়ে থেকেছে তার ঠিক নেই। সে যখন বেঁচে ছিল পেয়ারা গাছ আর নারকেল গাছগুলিতে সব সময় পাড়ার কোন না কোন দুষ্টু ছেলে এসে ফলপাতা ছিঁড়ে ডাল ভেঙে একাকার করত। তারাপদ তাদের বাঁদর হনুমান বলে গাল দিত তেড়ে মারতেও যেত কখনো কখনো। চারুবালা মারা যাওয়ার পর কোন একটি ছেলেও আর আসে না। ডাকলেও কেউ সাড়া দেয় না। দূরে দূরে পালিয়ে যায়। অথচ তারাপদের আজকাল ইচ্ছে করে এদের কেউ কেউ আসুক। চারুবালার কথা ওদের মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছা করে তারাপদের, জানতে ইচ্ছা করে ওরা কে তাকে কতটুকু মনে রেখেছে। কিন্তু কেউ সে কথা বলবার জন্যে আসে না। কেউ চারুবালার কথা তার মুখ থেকে শোনবার জন্যে আসে না। মাঝে মাঝে বুকটা বড় খালি খালি মনে হয় তারাপদের। কেমন যেন খাঁ খাঁ করতে থাকে। তখন ইচ্ছা হয় কাউকে জড়িয়ে ধরে। শুধু একজনকে না, গোটা সংসারকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরতে ইচ্ছা করে তারাপদের। কিন্তু ইচ্ছাটা মনের মধ্যেই ওঠে মনের মধ্যেই মরে। তারাপদ কারো কাছেই যেতে পারে না। একজনের সঙ্গে আর একজনের ব্যবধান যেন সাতসমুদ্র তের নদীর। সেই দুস্তর সাগর পার হবার বিদ্যা তার জানা নেই। সারাজীবনে শুধু একজন তার কাছে এসেছিল। সে ওই চারুবালা। কি মধুর, কি আশ্চর্য এই কাছাকাছি আসা। একেক সময় ভেবে অবাক হয়ে যায় তারাপদ। নাক-মুখ, হাত-পা ওয়ালা সম্পূর্ণ আলাদা একটা মানুষ আর একজন মানুষের সঙ্গে এমন এক হয়ে মিশে যায় কি করে। এর চেয়ে বড় রহস্য, বড় অসাধ্য সাধন যেন আর নেই। দুটো আলাদা আলাদা শরীর। তাদের আরাম-বিরাম ক্ষুধা তৃষ্ণা, জ্বালা যন্ত্রণা সবই তো আলাদা। তবু যেন আলাদা নয়। মাঝখানের এই ফাঁকটুকু, দুজনের ভিন্ন ভিন্ন এই আকার এ যেন শুধু বাইরের লোকের দেখবার ভুল। আসলে তারা এক। আসলে তারা দুজন নয়, আধায় আধায় মিলিয়ে একজন। সংসারে তেমন কেউ আর এলনা তারাপদর কাছে।

গাড়ির সময় হয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে তারাপদ। অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ। বাচ্চা ছেলের জন্যে কিছু একটা নিয়ে যেতে হয়। অবশ্য কলকাতায় গিয়েও কিনে নেওয়ার সময় থাকবে। কিন্তু হঠাৎ তারাপদের মনে হয় চারুবালার ভাইয়ের ছেলেকে তার নিজের হাতের জিনিস দেওয়াই ভালো। হোক একটু পুরোন, তবু তো তার আপন পিসীর হাতের জিনিস। পুরোন একখানা খবরের কাগজের পাতায় জড়িয়ে লাল বড় হাতীটার সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট ছোট পুতুল সঙ্গে নিল তারাপদ। নেওয়ার আগে মনটা আবার একটু খচ করে উঠল। আলমারির একটা তাক প্রায় খালি হয়ে গেছে। তা যাক। এতো ছেলেদের খেলবারই জিনিস। চারুবালার সম্পত্তি তার আপন ভাইপোই পাচ্ছে। এতে তার আত্মা খুশিই হবে। কত খেলনা কিনে কিনে পরের ছেলেকে বিলিয়েছে চারু।

খুচরো পয়সা ফুরিয়ে গেছে। বাক্স থেকে দশ টাকার নোট বার করে তারাপদ পকেটে গুঁজল।

শহরের দক্ষিণে স্টেশন। তারাপদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। উল্টো দিকে। তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্যে একখানা সাইকেল রিক্সা ভাড়া করল তারাপদ। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর এই প্রথম সে গাড়িতে উঠল। এর আগে শহরের এই সব রাস্তা দিয়ে কতদিন স্টেশন পর্যন্ত এক সঙ্গে রিক্সায় গেছে দুজনে। আজ সেই রিক্সার আধখানা একেবারে খালি।

ট্রেনে উঠেও স্ত্রীর কথাটাই বারবার মনে পড়তে লাগল তারাপদের। বছরে দু' একবার স্ত্রীকে নিয়ে সে কলকাতায় যেত। ভাইদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করত চারুবালা। দু'একদিন হয়তো থাকত। কোন বার থাকতও না। স্বামীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। কালীঘাটে পুজো দেওয়া, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, সিনেমা দেখা, সংসারের জন্যে টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনা, কলকাতায় এসে ব্যস্ততার অবধি থাকতনা চারুবালার। তারাপদকেও অস্থির করে তুলত। এই নিয়ে কত বকাবকি ঝগড়াঝাটিই না হয়েছে। কলকাতায় এলে চারুর বয়স যেন অর্ধেক হয়ে যেত। অল্পবয়সী মেয়ের মত তার ছটফটানির আর শেষ থাকত না। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে তারা মাঝে মাঝে পরামর্শ করত একবার পশ্চিমে যাবে। ছেলেপুলে যখন কিছু হলইনা তারা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবে। দেশ দেখবে মন্দির আর ঠাকুর দেবতা দেখে মনের সাধ মেটাবে।

কিন্তু তার জন্যে অনেক টাকা দরকার। সংসার খরচ চালিয়ে অত টাকা তারাপদ কম্পাউণ্ডারের হাতে কোনদিনই জমতনা। তাই পশ্চিমে না গিয়ে পুব মুখে কলকাতার দিকেই তারা রওনা হয়ে পড়ত। তারাপদ বলত 'যতই বল, কলকাতার মত শহর আর কোথাও পাবে না। দিল্লী বল আগ্রা বল এর কাছে, কিছু নয়। জীবন ভরে দেখলেও এ শহর ফুরোয় না। হাওড়া স্টেশনে নেমে তারাপদ দেখল সন্ধ্যা উৎরে গেছে। গাড়িটা অনেকক্ষণ লেট ছিল। নইলে কিছু আগেই এসে পৌঁছতে পারত। একটু লজ্জিত হল তারাপদ। আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ি। একেবারে গিয়েই খেতে বসাটা কি ভালো দেখায়। খেটেখুটে না দিতে পারলে নিজেরই কেমন যেন সংকোচ লাগে।

এত ভীড়ের মধ্যে পকেটের টাকাটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে তারাপদ দ্রুতপায়ে প্লাটফর্মের বাইরে চলে এল। তারপর ঠেলাঠেলি করে উঠে বসল ট্রামে।

আগে বাসা ছিল উল্টোডিঙ্গিতে। এখন গ্রে স্ট্রীটে নতুন বাড়ি ভাড়া করেছে বিজন তালুকদার। নম্বর মিলিয়ে সেই বাড়িতে এসে হাজির হল তারাপদ। এতবার এসেছে কলকাতায় তবু রাত্রি বেলায় এই শহরে এলে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। কেমন যেন একটা গোলকধাঁধার মত লাগে। চেনা রাস্তা চেনা বাড়ি সব যেন অচেনার মত মনে হয়, দিক ঠিক রাখতে পারে না। এখানে এলে ভারি ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়, বোকা বোকা হয়ে যায় তারাপদ। চারুবালা তার ভাবভঙ্গি দেখে বলত, 'কোনদিনই না জানি কবে। লোকে [illegible]

দোতলায় চারখানা ঘরের একটি ফ্লাট ভাড়া নিয়েছে দুভাই। অনেক পোষ্য, ছেলেমেয়ে আর লোকজন। নইলে কুলোবে কেন।

রাস্তা থেকেই উৎসবের রাত্রি বলে চেনা গেল। অনেকগুলি আলো জ্বলছে। রঙীন কাপড় দিয়ে গেট সাজানো হয়েছে। মাথার ওপর পুঁতি দিয়ে লেখা রয়েছে 'স্বাগতম্'। বাড়ির সামনে কয়েকখানি গাড়ি দাঁড়ানো। দুটি বাড়ির ফাঁকে যে সরু একটি কানাগলির মত আছে তাতে সারি সারি চেয়ার সাজানো। বহু অপরিচিত লোক সেখানে বসে গল্প করছে। কিছু কিছু চেনা লোককেও তারাপদ দেখতে পেল। চারুর দূর সম্পর্কের এক কাকা। দুজন পিসতুতো ভাই। কিন্তু তারাপদকে কেউ তারা চিনতে পারল বলে মনে হলনা। অন্তত কাছে তাকে ডাকলনা কেউ।

একটুবাদে বিজনকে দেখা গেল। সে আরও মোটা হয়েছে। বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে। তার চেয়ে দ্বিগুণ মোটা লম্বা চওড়া এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওপর থেকে নিচে নামছে। কে যেন ফিস ফিস করে বলল, 'অফিসের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ লাহিড়ী।'

তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবার পর হঠাৎ তারাপদের দিকে চোখ পড়ল বিজনের। একটু হেসে বলল, 'এই যে এসেছেন।'

তারপদ বললল, 'হ্যাঁ এলাম, গাড়িটা বড় লেট ছিল। তাই—' তাকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে বিজন বলল, 'ছেলে দেখেছেন? যান ছেলে দেখে আসুন। ও পণ্টু এঁকে ওপরে নিয়ে যাও। ছেলে দেখা হয়ে গেলে একেবারে ছাদে নিয়ে যাবে। যারা দূর থেকে এসেছে তাদের এবার বসিয়ে দাও। নইলে সময়েও কুলোতে পারবেনা, জায়গাতেও কুলোতে পারবেনা। দেখনা এরই মধ্যে দাঁড়াবার স্থান আর নেই। কী যে তোমাদের ম্যানেজমেণ্ট—।'

ম্যানেজমেণ্টের নিন্দা করায় পণ্টু বড় অপ্রসন্ন হল। তারাপদের ঘাড়ে প্রায় হাত দিয়ে বলল, 'আসুন, ওইতো সবাই ওপরে যাচ্ছেন। যেতে পারেন না ও'দের সঙ্গে!'

একজন নিমন্ত্রিতের সঙ্গে তারাপদ গিয়ে একখানি ঘরের সামনে দাঁড়াল। ঘরের মাঝখানে নতুন পাটির ওপর প্রৌঢ়া মত গয়না-গাটি পরা মোটাসোটা একজন মহিলা ফুটফুটে একটি সুন্দর ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। ছোট একটি [illegible]

বলল, 'আহা সুন্দর ছেলেইতো হয়েছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।'

কিন্তু ছেলেটি মাঝে মাঝে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠছে। এই আড়ম্বর অনুষ্ঠান তার যেন আর ভালো লাগছেনা। তা দেখে মহিলাটি শিশুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটু আদর করে বললেন, 'কি সোনা, অমন করছ কেন। তোমাকে যে সবাই দেখতে এসেছেন।' তারপর পাশে বসা চশমাপরা বেণীদোলানো উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখ রুচি এর পরে যদি গরম লেগে ছেলের একটা কিছু হয় তাহলে আর রক্ষে থাকবেনা বাছা। তোমাদের দেখাদেখিই মোটে শেষ হচ্ছে না। সেই যে সকাল থেকে চলেছে। এই ভীড় আর গরমে বুড়ো মানুষেরই শরীর খারাপ হয়ে যায়। আর তো—। ও'দের হাত থেকে তুমি জিনিসগুলি নিয়ে নাও। এখানে আর ভীড় বাড়িওনা।'

সঙ্গে সঙ্গে তরুণী মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের হাত থেকে দামি দামি উপহারের জিনিসগুলি নিতে লাগল। দু' একটি কথাও বলল কারো কারো সঙ্গে।

'কি খবর আলোকদা? বউদি এলেননা যে?'

'রীণাদি', ভালো আছ তো? এতক্ষণে তোমার সময় হল। বাব্বা!'

ভীড়ের মধ্যে তারাপদ উল্লসিত হয়ে উঠল। মেয়েটি আর কেউ নয়, চারুর সবচেয়ে ছোট বোন রুচি। মুখের আদলে মিল আছে। ওর এক ফোটা সম্ভাষণ পাওয়ার জন্যে তারাপদের মন উদগ্রীব হয়ে উঠল। কিন্তু রুচি নীরবে তার হাত থেকে ময়লা কাগজে জড়ানো পুতুলের পুঁটলিটা তুলে নিল। সে তারাপদকে চিনতেই পারলনা, নাকি ইচ্ছা করেই চিনলনা তা ভালো করে বুঝতে না বুঝতেই আর একজনের পালা এসে গেল। তারাপদ ভেবেছিল বলে 'এ তোমার বড়দির হাতের জিনিস। তার বড় সাধ ছিল—।'

কিন্তু তার মুখ থেকে কোন কথা বেরোতে না বেরোতেই তাকে ঠেলে আর এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন।

তারপর ভীড়ের ঠেলাঠেলিতে তারাপদ উঠে এল ছাদে। সামিয়ানার নিচে সারা ছাদ জুড়ে পাত পড়েছে। কতক বসেছে কতক এখনো বসেনি। সেই পণ্টু আর দু'তিনটি লোক ব্যস্ত ভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে।

হঠাৎ পণ্টু তার দিকে চেয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন। বসে পড়ুন।'

তারাপদ লজ্জিতভাবে বলল, 'আমি পরে বসব।'

পণ্টু লুচির ঝাঁকা হাতে বিরক্ত হয়ে বলল, 'আবার পরে কেন। জায়গা যখন রয়েছে বসে পড়াইতো ভালো।'

তারাপদ মৃদু স্বরে হেসে বলল, 'মানে আমি এবাড়ির জামাই কিনা—।'

সোনার চশমা পরা, কবজীতে ঘড়ি বাঁধা গলায় একটি সাদা রুমাল জড়ানো পরিবেশক পণ্টু তারাপদের দিকে একপলক তাকিয়ে দেখে মুখ টিপে হাসল, 'আরে মশাই জামাইই হোন, আর শ্যালকই হোন, খেতেতো দুটি হবেই। বসুননা।' তার কথার ভঙ্গিতে আশেপাশের আরো অনেকে হেসে উঠল।

লজ্জায় মরে গেল তারাপদ। ছি ছি ছি ওই অবিশ্বাস্য কথাটা সে উচ্চারণ করতে গেল কোন আক্কেলে। তার চেহারা দেখে, পোশাক পরিচ্ছদ দেখে সে যে এমন সম্পন্ন পরিবারের জামাই তা যদি কেউ সহজে স্বীকার করতে না চায় তাকে দোষ দেওয়া যায় না। ওই অপরিচিত যুবকটির কোন দোষ নেই। যারা পরিচিত তারাই কি তাকে ভালো করে চিনতে চেয়েছে? তার

জামাইদের মধ্যে একজন ডাক্তার আর একজন ইঞ্জিনিয়ার। ভীড়ের মধ্যে তাদেরও তো দেখতে পেয়েছে তারাপদ। কিন্তু তারা দেখেনি। শ্বশুর মশাই যখন তার সংগে সম্বন্ধ করেছিলেন তখন তিনি বস্তীতে থাকতেন। তাঁর শেষ জীবনে গত যুদ্ধের বাজারে ছেলেরা ব্যবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। ভাইদের ভাবভঙ্গি দেখে চারুও ইদানীং বড় একটা এদিকে ঘেঁষত না। শুধু এক বছর নয়, আরো অনেক কাল আগে থেকে সে এদের কাছে মরার সামিল হয়ে গিয়েছিল। তবু শ্বশুর শাশুড়ী থাকলে এতটা অনাদর হয়ত হত না। চারু বেঁচে থাকলে এমন বাইরে বাইরে ঘুরতে হতনা তাকে। এখানে আসাই তার ঠিক হয়নি। এখানে ঢুকবার গেটপাশ সে হারিয়ে ফেলেছে।

'কি মশাই বসবেন না! একখানা জায়গা ওদিকে খালি আছে। পাতাটা নষ্ট করে লাভ কি। বসে যান না দয়া করে।'

পঞ্চুর আর এক সংগী ঘুরে এসে ফের অনুরোধ করল তারাপদকে।

ততক্ষণে লুচির পরে পোলাও আর মাংস এসে গেছে। তার সুগন্ধ নাকে গেল তারাপদের। পেটে ক্ষিদেটা চন চন ক'রে উঠল। সজল হ'ল শুকনো জিভটা।

কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে তারাপদ নিজের মনে বলল, 'না।'

তারপর ছেলেটির দিকে চেয়ে সে হাত জোড় করল, 'মাফ করবেন, আমার আবার অম্বলের দোষ আছে কিনা। তাই—।'

'সে কথা আগে বলতে হয়।'

ছেলেটি আর সময় নষ্ট না করে তরকারির বালতি হাতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

আরো দু' এক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল তারাপদ। অলক্ষ্যে ভীড়ের সংগে মিশে বেরিয়ে এল 'স্বাগতম্' লেখা সেই আলোর মালায় সাজানো তোরণ দিয়ে।

পথে নেমে তারাপদ ট্রামে উঠল না, বাসে উঠল না, হেঁটে চলল অন্যমনস্কভাবে।

অবশ্য এমন ক'রে পালিয়ে না এলেও পারত তারাপদ। পরিচয় দিলেই কেউ কেউ হয়ত ডেকেও বসাত। কিন্তু এই আনন্দ উৎসবের বাড়িতে চারুবালার নামটা কেউ তুলত কিনা সন্দেহ। অথচ স্ত্রীর বাপের বাড়িতে তার নাম কারো কারো মুখে শুনবে, তার সম্বন্ধে দু' একটি কথা কারো কাছে বলবার সুযোগ পাবে, এই আশা নিয়ে এসেছিল তারাপদ। কিন্তু না, চারু-বালার কোন চিহ্নই এখানে আর নেই। সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর প্রথম যেবার তারাপদ এখানে আসে তখন চারুর ছোট বোনেরা কেঁদেছিল, ভাইরা চোখের জল ফেলেছিল, তারপর সব শুকিয়ে গেছে। একটা বছর কি কম সময় দুনিয়ায়। পরিচিত আত্মীয় বন্ধু প্রায় সকলের কাছেই তারাপদ স্ত্রীর মৃত্যুর কাহিনী কিছু না কিছু বলেছে। এখন একেবারে পুরোন হয়ে গেছে ব্যাপারটা। কেউ আর আজকাল ওসব কথা শুনতে চায় না। অন্য প্রসংগ এনে কৌশলে এড়িয়ে যায়। আর তা বুঝতে পেরে তারা-পদ লজ্জিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার নিজের কাছে তো একটা বছর এমন কিছুই নয়। তার নিজের কাছে তো চারুবালা অমন ক'রে ফুরিয়ে যায়নি। তাদের তো আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না, তারা যে পরস্পরের সব ছিল। তারাপদের মনে হল সংসারে নতুন ক'রে আপনজন পাওয়া, বিশেষ ক'রে এই পড়তি বয়সে ভারি কঠিন। কিন্তু স্ত্রীর কথা

দাম্পত্য জীবনের দু' চারটে সুখ দুঃখের কথা বলা যায়, তেমন অল্প স্বল্প একজন অন্তরঙ্গ মানুষ পাওয়াও কম কঠিন নয়। বিশেষ ক'রে আলাপ জমাতে ভারি অপটু তারাপদ। বন্ধুত্ব করতে, বন্ধুত্ব রক্ষা করতে সে একেবারেই জানে না।

হাঁটতে হাঁটতে তারাপদের মনে হল, শোকার্ত হৃদয় নিয়ে এ বাড়িতে তার না আসাই ভালো ছিল। এর চেয়ে চারুকে নিয়ে কলকাতার যে সব জায়গায় আগে আগে বেরিয়েছে সেই ইডেন গার্ডেন আর গঙ্গার ঘাটে গেলে বরং কাজ হত। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখেছে, সে সব জায়গাতেও গিয়েও মন টে'কে না। আরো খারাপ লাগে, আরো নিঃসঙ্গ আর দুর্বহ মনে হয় জীবন।

'ঈস্, একেবারে গা ঘে'ষে চলেছে। যেন দেখতেই পাচ্ছে না?'

হঠাৎ মেয়েলি গলার সাড়া পেয়ে থমকে দাঁড়াল তারাপদ। এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে সে পথ চলছিল। রাস্তার লোকজন সম্বন্ধে কোন খেয়ালই তার ছিল না। চৌরঙ্গী রোডের বাঁ দিকের সরু ফুটপাথ দিয়ে এগিয়ে চলেছিল দক্ষিণমুখে। ভেবেছিল, হে'টেই যাবে স্টেশন পর্যন্ত। গাড়ির এখনো ঢের দেরি। তারাপদ থেমে দাঁড়াতে মেয়েটি এবার সাহস ক'রে মৃদু স্বরে বলল, 'আসুন।'

হঠাৎ অন্ধকার সরু গলির মুখ থেকে এই আমন্ত্রণ। আশ্চর্য, তার মত অভাগা অনাহূত রবাহূত লোককেও ডাকবার মানুষ পৃথিবীতে এখনো আছে?

তারাপদ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আমাকে বলছেন?'

মেয়েটি মুখ টিপে হাসল, 'তবে আর কাকে? আসুন না, ভেতরে।'

অল্প বয়স। আঁট সাঁট করে শাড়ি পরা। চোখে সুর্মা, পিঠের ওপর লম্বমান বেণী। মুখে মধুর মনোমোহিনী হাসি।

বুকের মধ্যে তোলপাড় ক'রে উঠল তারাপদের। আর একবার ইশারা করতেই সে ওর পিছনে পিছনে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে এখন আর তার কিছু বাকি নেই। তবু ফিরে যাওয়ারও যেন শক্তি নেই আর। আচ্ছন্নের মত তারাপদ এগিয়ে চলল।

আরো খানিকটা ভিতরে গিয়ে মেয়েটি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। কিন্তু তারাপদ কোন কথা বলে না দেখে নিজেই হেসে বলল, 'পাঁচ টাকা রেট।'

তারাপদ এতেও কোন আপত্তি না করায় মেয়েটি খুশি হয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

গলির মধ্যে এদিকে ওদিকে আরো দু-তিনটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। [illegible]

উঠল, 'মল্লিকার জুটে গেল। ভারি ধড়িবাজ মেয়ে।'

আঁচলের চাবি দিয়ে ঘরের তালা খুলল মেয়েটি। সুইচ টিপে আলো জ্বালল ঘরে। গোটা দুই ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ। একটা কাপড় রাখার আলনা। ঝকঝকে করে মাজা একরাশ বাসন। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীমূর্তি। একধারে তক্তপোশে পরিষ্কার বিছানা পাতা। আঙুল দিয়ে সেটি দেখিয়ে আবার একটু হাসল মেয়েটি। তারপর তারাপদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'বোসো না।'

আপনি থেকে তুমিতে আসতে তার এক মিনিটের বেশি সময় লাগল না।

কিন্তু ততক্ষণে তারাপদর সম্বিৎ ফিরে এসেছে। সে কাতর আর্তনাদের সুরে বলল, 'না না না।'

মল্লিকা সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর একটু বিস্মিত, একটু রুষ্ট স্বরে বলল, 'না মানে?'
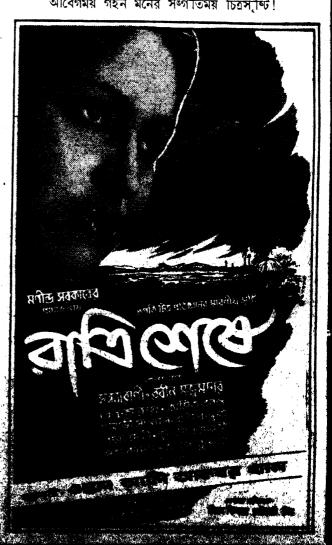
তারাপদ বলল, 'আমাকে মাফ করো। আমি ভুল করেছি। আমাকে যেতে দাও।'

'ভুল করেছ! যেতে দেব!'

ভেজানো দরজায় এবার শক্ত ক'রে খিল এ'টে দিয়ে এল মল্লিকা। ফিরে এসে আবার দাঁড়াল সামনে। তারপর কুৎসিত মুখভঙ্গি ক'রে কাঁসার মত খনখনে গলায় বলল, 'ভুল করেছ! ড্যাকরা মুখপোড়া মিনষে! এখানে এসে ঢং হচ্ছে। টাকা নেই বুঝি সঙ্গে?'

তারাপদ এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গলির মোড়ে আধো আলো আধো ছায়ার রহস্য কুহেলীতে যাকে মনে হয়েছিল বিশ বাইশ বছরের তরুণী, তার বয়স যে চল্লিশের কম নয় তাতে তারাপদের কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। মুখ ভরা মেচেতার দাগ, তোবড়ানো গাল, কোঁচকানো চামড়া। পাউডারের পুরু প্রলেপেও সব কুশ্রীতা ঢাকা পড়েনি। লিপস্টিক মাখা ঠোঁটের ফাঁকে পানের রসে কালো, বিবর্ণ, ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে। তারাপদের মনে হল, এমন অসুন্দর একখানা মুখ সে আর জীবনে দেখেনি।

মল্লিকা বলল, 'ঢং দেখ মিনষের। সং-এর মত দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হাঁ করে দেখছ কি। এ মুখ দেখতে দর্শনী লাগে। টাকা দিয়ে তারপরে দেখ। বার কর টাকা। আছে সঙ্গে? নাকি মুফতে ফুর্তি লোটবার মতলব?'

তারাপদ বলল, 'টাকা আছে।'

রেলের টিকিট কেনার পর টাকা খানেকের খুচরো সিকি আধুলি পকেটে রেখে বাকি টাকাটা সে কোঁচার খু'টে বে'ধে নিয়েছিল। এর আগে পকেটমারের হাতে তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। ভুলেও এখন আর সে বেশি টাকা পকেটে রাখে না। মল্লিকার কথায় তারাপদ কোঁচার খু'ট খুলে পাঁচ টাকার নোটখানা বার ক'রে দিল।

এবার ফের খুশি হয়ে হাসল মল্লিকা। বলল, 'পথে এসো চাঁদ। কি রকম ঝানু আর সেয়ানা তাই দেখ। কোঁচার খু'টে বে'ধে এনেছে টাকা। কারো কারো কাছ থেকেও খুলে নিতে হয়। টাকাই যখন আছে তবে অমন করছিলে কেন? বোসো।'

এবার বেশ একটু খাতিরের সঙ্গেই মল্লিকা অনুরোধ করল।

তারাপদ বলল, 'না না, আমাকে ছেড়ে দাও, এমন মহাপাপ আমি জীবনে করিনি, এমন মতিভ্রম কোনদিন হয়নি আমার। ছি ছি ছি, চারুর কাছে আমি এমন করে বিশ্বাসঘাতী হলাম!'

মল্লিকা মুখ টিপে হেসে বলল, 'চারু কে? তোমার পরিবার বুঝি?'

তারাপদ বলল, 'হ্যাঁ।'

মল্লিকা বলল, 'মাগী খুব জাঁদরেল মনে হচ্ছে। নইলে এখানে এসেও তুমি তার ভয়ে কাঁপো? এই শহরেই আছে নাকি?'

তারাপদ ঘাড় নেড়ে বলল, 'না।'

'তবে কোথায় থাকে?'

তারাপদ বলল, 'সে আর নেই। আজ এক বছর হ'ল স্বর্গে চলে গেছে। আর আমি—'

মল্লিকা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও মারা গেছে। তাই বল। তাহলে তো সব ল্যাঠা চুকেই গেছে। তাহলে আর তোমার অত ভয় কিসের?'

তারাপদ কাঁদ কাঁদভাবে বলল, 'ভয়? সে যে আমার কী ছিল, সে যে আমার বুকের কতখানি জায়গা জুড়ে আছে তা তুমি বুঝতে পারবে না।'

বলতে বলতে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে তক্তপোশের ধারে বসে পড়ল তারাপদ। তার আর দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি নেই। বসে দু' হাতের তালুতে মুখ ঢেকে সে এবার ফু'পিয়ে কে'দে উঠল। শুধু স্ত্রীর শোক নয় পৃথিবীর যত অবজ্ঞা, অবিচার, লাঞ্ছনা সে জীবন ভরে সহ্য করেছে সব তার এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল।

মল্লিকা এই আধবুড়ো গে'য়ো লোকটির দিকে চুপ করে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তার তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল, মানুষটি মাতাল নয়। হয়ত মাথাটা একটু—। কত রকমের, কত ভাবের লোকই আসে এখানে। কত জাতের, কত ধাতের মানুষই না মল্লিকা এ জীবনে দেখল।

তারাপদ দু' হাতের তালুতে মুখ লুকিয়ে অস্ফুট স্বরে কে'দে চলেছে। কি ভেবে মল্লিকা সেই পোষাকী শাড়িতেই তার পাশে এসে বসল। তারপর আলগোছে তারাপদের পিঠে হাতখানা রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'কে'দো না। ঘরের মানুষ চলে গেলে ওইরকমই লাগে। আমি সেই গোলকডাঙার বাড়িতে তাকে নিয়ে ক'দিনই বা ঘরসংসার করেছি, আর তখন কী-ই বা বয়স ছিল আমার। বারো তেরোর বেশি নয়। তবু এখনো তার কথাটা ভাবলে মন উদাস হয়ে যায়।'

তারাপদ হঠাৎ মুখ তুলল। মল্লিকার দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে বলল, 'তোমারও স্বামী ছিল নাকি?'

মল্লিকা বলল, 'ছিল বইকি। পুরো দুটি বছর ঘর করেছি। তা মিথ্যে বলব না। আদর সোহাগ খুবই করতে জানত। তোমরা কতদিন সংসার করেছিলে?'

তারাপদ বলল, 'প'চিশ বছর। আদর সোহাগের কথা বলছ? সে যা আমার সেবা যত্ন ক'রে গেছে—'

তারপর একটু একটু ক'রে তারাপদ তার প'চিশ বছরের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের ইতিহাস বলে যেতে লাগল। কত তুচ্ছাতি-তুচ্ছ ঘটনা, ঝগড়া বিবাদ, মান অভিমানের কাহিনী। কাঁটা নেই, ক্ষত নেই, যৌথ জীবনের কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণার কথা কিছু যেন এখন আর মনেও পড়ে না। মৃত্যু সব মধুময় ক'রে রেখে গেছে।

মল্লিকা কেবল শুনেই গেল না, ফাঁকে ফাঁকে সেও দু' চার কথা বলতে লাগল। তার দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্ব বেশি নয়। কিন্তু তারাপদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার অনেকখানি মিল আছে।

এপাশের ওপাশের ঘর থেকে বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজ, মাতালের কান্না, হৈ চৈ হাসি আর হুল্লোড়ের মিশ্রিত শব্দ ভেসে আসতে লাগল। কিন্তু তারাপদ আর মল্লিকা তা যেন গ্রাহ্যও করল না।

অনেক রাত্রে বাড়ীওয়ালী এসে দোরে ঘা দিল, 'ওলো ও মল্লিকা, কি হল তোর? ঘুম খুনে হয়ে রইলি নাকি?'

কিন্তু তারাপদের একটানা কথায় [illegible]

[illegible]
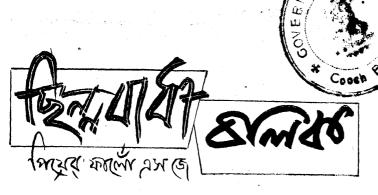
তাঁর সুচিন্তিত **'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ-পরিচয়'** প্রবন্ধে 'প্রমথ চৌধুরী বহুদিন আগে এই মন্তব্য করেছিলেন যে,

> "যা ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর যা বুদ্ধির অগম্য, ফরাসি সাহিত্যে তার বড় একটা সন্ধান পাওয়া যায় না।...ফরাসি জাতির দেহে কিংবা মনে কোনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই এবং তাঁরা কস্মিনকালেও তাঁদের মগ্নচৈতন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেননি। এই কারণে ফরাসি কবিতা ইংরেজি কবিতার তুলনায় আবেগহীন ও কল্পনার ঐশ্বর্যে বঞ্চিত, সে কবিতা মানবমনের গভীরতম দেশ স্পর্শ করে না।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে অতীন্দ্রিয়-বাদী আর্তুর র‍্যাঁবো এবং অন্যান্য সিম্বলিস্ট ও সুররিয়ালিস্ট (অতীন্দ্রিয়বাদী) কবি যদি ফরাসী সাহিত্য-জগতে আবির্ভূত না হতেন, তা হলে কথাটি মোটামুটিভাবে সত্য হতেও পারত। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠতম কবি জাঁ রাসিন-এর কথা বাদ দিলে তবে ফরাসী ক্লাসিক কাব্য যুক্তিবাদ ও মানব-বাদের সংকীর্ণ গন্ডি বড়-একটা অতিক্রম করতে পারে নি; ফরাসী রোমান্টিকদের ভাবঘন অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের সাধনা যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন, তবু তাঁদের সেই 'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়' হয়তো ছিল না। কিন্তু প্রতীকী ও অতীন্দ্রিয়বাদী ফরাসী কবিদের সম্বন্ধে কথাটি আদৌ সত্য নয়। ভেরলেন, মালার্মে, র‍্যাঁবো, লাফর্গ, আপলিনেয়র, সুপেরভিয়েল, এলুয়ার প্রভৃতি কবির কাব্যসৃষ্টি ও প্রেরণা সেই 'ইন্দ্রিয়ের অগোচর বা বুদ্ধির অগম্য' বিশ্ব-রহস্যের উদ্ঘাটনপ্রয়াস থেকেই উৎসারিত। এঁদের কাব্য সংগীতধর্মী; ভাষা এখানে বুদ্ধি বা যুক্তির কোন ধরাবাধা নিয়ম মানে না। স্বপ্নাবিষ্ট কবি যেন সাধারণ সংলাপের বাগ্ধারা ও রীতি ত্যাগ করে ওস্তাদী আলাপের রাগদ্যোতক ভাবাভঙ্গী অবলম্বন করেন। প্রকাশনার অপেক্ষা ব্যঞ্জনাই এখানে সর্বপ্রধান।

এই প্রবন্ধে [illegible] র‍্যাঁবোর [illegible]

অনস্বীকার্য। প্রতীকী কাব্যধারার অন্যতম প্রবর্তয়িতা ভেরলেনের উপর বালক-কবি র‍্যাঁবোর প্রভাব তো একদিন গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল; মহাকবি পল ক্লোদেল র‍্যাঁবোর অগ্নিময় ভাষার স্পর্শে কিরূপ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, সেই কথা কারও অজানা নেই। র‍্যাঁবোর অপেক্ষা মহৎ অনেক কবি ফ্রান্সে আবির্ভূত হয়েছেন। রাসিনের সঙ্গে কিংবা ভিইয়োঁ, বোদলের, ভালেরি, ক্লোদেলের সঙ্গে, এমন কি, মালার্মে বা ভেরলেনের সঙ্গে র‍্যাঁবোকে তুলনা করা যায় না; উগো প্রভৃতি রোমান্টিক কবিরাও নানা দিক থেকে র‍্যাঁবোর তুলনায় মহত্তর কাব্য সৃষ্টি করেছেন। তা সত্ত্বেও এই 'মায়াবী' বালক এমন কয়েকটি কবিতা ও কবিত্বময় গদ্য-রচনা রেখে গিয়েছেন, যা ভাবের উন্মত্ত তীব্রতায় ছন্দের অনবদ্য স্বরসংগতিতে ও প্রতীকী ভাষার রহস্য-ব্যঞ্জনায় বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে প্রায় অদ্বিতীয়।

১। কবিমানসের অভিব্যক্তি

আর্তুর র‍্যাঁবোর জীবনী যাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁরা অনেকে বাস্তব ও অবাস্তব, সত্য ও কল্পনা মিলিয়ে মিশিয়ে এক অদ্ভুত রূপকথা সৃষ্টি করেছেন। অলৌকিক, অতিমানবীয় ছিল তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা; তিনি

[illegible]

নাকি জন্মেছিলেন 'চোখ খোলা নিয়ে'; শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন দ্রষ্টা; "পনেরো বছর বয়সেই হয়ে উঠেছেন দার্শনিক"। "ছেলেবেলা থেকেই সেই গোল্লায়-যাওয়া ছেলে সমস্ত রকম শাসন ও শৃংখলার ঊর্ধ্বে।" বিদ্রোহী বালক পারি-কম্যুনের আন্দোলনে বীরতুল্য বিপ্লবীরূপে যোগদান করেছিলেন, এই মন-গড়া কাহিনীও অনেক জীবনী থেকে বাদ যায় নি। ভেরলেনের কাছ থেকে "চিঠি পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে ষোলো বছরের কিশোর সেই রাত্রেই লিখে ফেললেন 'মাতাল তরণী'। উনিশ বছর বয়সে 'নরকে এক ঋতু' লিখেই তিনি নাকি "কবিতা-লক্ষ্মীকে চিরবিদায় জানিয়ে" আরম্ভ করেছিলেন তাঁর "আমরণ ভ্রমণ।"*

আর্তুর র‍্যাঁবো ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর শার্লভিল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ফরাসী মধ্যবিত্ত ও ধর্মভীরু পরিবারের আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে ছেলেটি অসাধারণ অধ্যবসায় ও কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশুনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই বালকটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অপূর্ব স্মরণশক্তির সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর মায়ের কঠোর শাসনে ছেলেটি স্নেহের অভাবে মাঝে মাঝে নিজেকে বড় একা বোধ করতেন। ভালো ছাত্র হয়েও তিনি ভালো ছেলে ছিলেনই না। ঐ অহংকারী, ক্রোধপরায়ণ, স্বার্থপর ও মিথ্যাবাদী বালকটির বন্ধু বলে কেউ ছিল না শার্লভিল শহরে; দু-একবার তিনি পালিয়েও গিয়েছিলেন মহানগরী পারীর অভিমুখে। কিন্তু সেই তরুণ পড়ুয়ার মনে এক অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি মহৎ একজন সাহিত্যিক হবেন। ফরাসী সাহিত্যের বই তিনি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করতেন। উগো, ম্যুসে, কপেয়, স্যুলিপ্রুদম, গোতিয়ে প্রভৃতি কবির লেখা তিনি মুখস্থ করে আবৃত্তি করতেন, তাঁদের কবিতা থেকে বহু উপমা, বহু শব্দ তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে আহরণ করে লিখে রাখতেন। তাঁর প্রথম কবিতাগুলি পূর্ববর্তী কবিদের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু সেই অনুকরণের মধ্যেও এক মৌলিক সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রথম আভাস পাওয়া যায়।

ফ্রান্সের সাহিত্যিক জগতে রোমান্টিক কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে সেই সময় এক প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ল্যকোঁৎ দ্য লীল-এর নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণ কবি রোমান্টিক কাব্যের ভাষাগত শিথিলতা ও আত্মকেন্দ্রিক ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতিকার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের বস্তু-তন্ত্রী আদর্শে তাঁরা বাহ্য ও নৈর্ব্যক্তিক রূপের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যের পূজারী ছিলেন; তৎসঙ্গে কাব্যিক ভাষাকে নূতন ও কঠিনতর বন্ধনে সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই কবিগোষ্ঠীর নাম রাখা হয়েছিল 'পার্নাস্' (গ্রীক পুরাণে দেবগিরি পার্নাসস্' নাম অনুসারে)। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মোহিতলালের কাব্যাদর্শ সেই ফরাসী পার্নাসীয় আদর্শের কতকটা সদৃশ ছিল বলে মনে হয়। র‍্যাঁবো তাঁর প্রথম কাব্যসৃষ্টিপ্রয়াসে পার্নাস-কবি-গোষ্ঠীর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র আশা ছিল, তাঁর দু-একটি কবিতা পার্নাসীয় কবিতা-সংকলনে কিঞ্চিৎ স্থানলাভ করবে। ১৮৭০ সালের প্রথম দিকে কবি বাঁভিল-এর কাছে প্রেরিত এক পত্রে শার্লভিলের উচ্চাকাঙ্ক্ষী বালকটি পার্নাসের কবিগণের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা এবং তাঁদের মধ্যে পরিগণিত হবার অভিলাষ প্রকাশ করেছিলেন।

২। 'মাতাল তরণী'

ষোলো বৎসরের কিশোর পড়ুয়া একদিন বোদলেয়রের 'অশিব পুষ্প' আবিষ্কার করে যেন এক নূতন জগতে প্রবেশ করলেন। ভিইয়োঁর মতো বোদলেয়র নারকীয় কবি বলে আখ্যাত হয়েছেন। বীভৎস প্রেমের বিকার, কদর্য ও পাপিষ্ঠ অনাচার, গলিত শবদেহের ঘৃণ্য দৃশ্য—বোদলেয়রের এই নরকে প্রবেশ করলেন অনভিজ্ঞ বালক র‍্যাঁবো। কিন্তু এই নারকীয় আবহাওয়ার মধ্যে বোদলেয়রের অনিবার্য সৌন্দর্যপিপাসা, অন্ধকার বিতৃষ্ণা ও ধর্মদ্রোহিতার মধ্যে অভিশপ্ত কবির প্রাণে নূতনত্ব ও অনির্বচনীয়ের সন্ধান, গতানুগতিক সকল নিয়ম ও আদর্শের গণ্ডি অতিক্রম করে কোন্ অচেনা রাজ্যের অভিমুখে যাত্রার প্রয়াস 'অশিব পুষ্প' গ্রন্থে এমন ব্যঞ্জনাত্মক কাব্যরূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে যে, বোদলেয়র ফরাসী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে সকলের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছেন। র‍্যাঁবো বোদলেয়রের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী; বোদলেয়রের প্রভাব ছাড়া তিনি কোনও দিন তাঁর বিখ্যাত 'মাতাল তরণী' কবিতাটি লিখতে পারতেন না, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

র‍্যাঁবো ১৮৭১ সালের ১৩ই মে এক চিঠিতে তাঁর নূতন সংকল্প জানিয়েছিলেন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে। "আমি আজ দ্রষ্টা হতে চলেছি। অনির্বচনীয় বাকিছু, অজানা অচেনা যতই, তার সন্ধানে বেরিয়েছি।" নিজ মন ও ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছাকৃত বিকার ঘটিয়ে, আফিং, গাঁজা ও মদ্যপান করে [illegible] উন্মেষণের দ্বারা বোদলেয়রীয় দৃষ্টি লাভ করতে সচেষ্ট হলেন।

সেই বৎসরে তিনি তাঁর প্রথম সার্থক কবিতা রচনা করেন। 'স্বরবর্ণ' এবং 'মাতাল তরণী'ও র‍্যাঁবোর সেই বোদলেয়রীয় পর্যায়ের সৃষ্টি। রঙ ধ্বনি ও গন্ধের মধ্যে যেসব রহস্যময় 'সম্বন্ধ' রয়েছে, বোদলেয়র তার কথা ব্যক্ত করেছিলেন; গোতিয়েও বিচিত্রিত ধ্বনির কথা উল্লেখ করে সবুজ ধ্বনি, লাল ধ্বনি, নীল ধ্বনির বর্ণনা দিয়েছিলেন। 'স্বরবর্ণ' সনেটে র‍্যাঁবো সুদক্ষভাবে সেই একই প্রতীকী অনুভূতিকে রূপায়িত করে তুললেন। অনুকরণের ছাপ সুস্পষ্ট হলেও সনেটটির সৌন্দর্য অনস্বীকার্য।

'মাতাল তরণী' ১৮৭১ সালের আগস্ট মাসে রচিত। এই সুদীর্ঘ কবিতা (কবিতাটি ২৫ স্তবকে ১০০ পংক্তিতে সমাপ্ত) দেশে-বিদেশে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। কবিতাটি নিয়ে অনেক তর্ক চলেছে—'মাতাল তরণী' প্রতীক, না, রূপক? সাধারণত প্রতীকের সঙ্গে রূপকের প্রভেদ স্পষ্ট, কিন্তু এই কবিতার ব্যাখ্যা যাঁরা করেছেন, তাঁরা আজও একমত হননি। কবিতাটি পার্নাসীয় কাব্যধারার নিদর্শনবিশেষ, না, সিম্বলিস্ট

"মাতাল তরণী" [শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক অনূদিত; 'কবিতা' পৌষ ১৩৫৯]।

নিঃসাড় নদীর জলে ভেসে যেতে তরণ চঞ্চলে..
নদী ডাকে
আপন খুসির পথে অন্তহীন অবগাহনের।
ছুটেছি-শুনেছি যেই মদমত্ত জোয়ার-জঙ্গমা...
সমানে নেচেছি চ'লে তৃণ হ'য়ে তরঙ্গ-মালায়—
তখন হ'তেই সুরু সাগরিকা কবিতায় স্নান,
নিখিল আকাশগ্রাসী ছায়াপথ, তারার মূর্ছনা;
চিনি সেই সন্ধ্যা, ঘনঘূর্ণি, জলস্তম্ভ-আর্তি তার
বুক-ফাটা আকাশের লেলিহান বিদ্যুৎ-শিখায়...
স্বপ্ন দেখি, ঝলসিত তুষারের নীলিম রজনী
চুম্বনেচ্ছু হ'য়ে ধীরে ছোঁয় যেন সাগর-নয়ন—
অশ্রুত প্রাণের রসে নৃত্য করে শিরা উন্মাদনী,
সাগর, জোনাকি-জ্বলা, জাগে এক পীত জাগরণ।
দেখেছি, ঠেকেছি কত—জানে না তো কেউ,
অপরূপ
জলপরী, মানুষের মতো গাত্র, শ্বাপদ-নয়না—
আঘাতে সে বারবার কী জানায়, সে বাণী
নিশ্চুপ;
দিগন্ত বীণার তারে ইন্দ্রধনু অবর্ণবরনা।
নিরুদ্দেশ এই যাত্রা ধন্য করে ফেনিল মঞ্জরী,
কী এক পবনে আমি বারবার হয়েছি বলাকা!
আঁধার পুষ্পের দ্যুতি পীত হ'য়ে নয়নে ঘনায়,
আর আমি ব'সে থাকি নতজানু নারীর মতন।
যতই ছুটেছি চ'লে, শ্লথবন্ধে হারায় চেতনা,
পিছনে ডুবতে চেয়ে ঢেউগুলি ঘুমে ঢলে পড়ে।
ঝটিকা-তাড়িত আমি ঈশ্বরের হীন বিহঙ্গমে,
শিরায় শিরায় রক্তে বহমান বিদ্যুৎ-চেতনা,
ক্ষিপ্ত পাটাতন, মসীকৃষ্ণ সিন্ধুঘোটকের দল
ইঙ্গিতে দেখায় পথ—বর্ষা যেন মূর্ত উন্মাদনা,
আকাশ সাগরাতিগ অগ্নিমুখী আভায় বিহ্বল।
দেখেছি দ্বীপের পুঞ্জ নক্ষত্র-খচিত সারে সার,
উদাত্ত আকাশে যার যাত্রী শোনে চির-আমন্ত্রণ...
...জানি মর্মান্তিক ঊষার লালিমা,
চন্দ্রমা অসহ চিরকাল, তিক্ত রবি-রশ্মি-কণা...
[illegible]

---

* "মায়াবী কবি র‍্যাঁবো" প্রবন্ধে এবং "নরকে এক ঋতু" পুস্তকের ভূমিকায় শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য র‍্যাঁবো—রূপকের বহু কল্পিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। অনুবাদকের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়, চরিতকারের উৎসাহ কিন্তু নিছক ঐতিহাসিকতার [illegible]

কাব্যের শ্রেষ্ঠতম নমুনা? কবিতাটির রচনা সম্বন্ধে বহু কল্পিত কাহিনীও প্রচলিত হয়েছে।

'মাতাল তরণী' কবিতা অতি সুন্দর ও সার্থক এক কবিতা সন্দেহ নেই। বলিষ্ঠ ছন্দের উদাত্ত গতি, গভীর হতাশা ও জীবনবিমুখতার আবেগহীন অভিব্যক্তি, বিচিত্র উপমা ও অপ্রত্যাশিত ব্যঞ্জনাময় শব্দের সমাবেশ এবং রহস্যের সূক্ষ্ম সংকেত এই কবিতাকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। যে বালক-কবি ঐরূপ কবিতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি সত্যই একজন মহৎ কাব্যস্রষ্টা হয়ে উঠেন নি কেন? 'মাতাল তরণী'-র পর র‍্যাঁবো পদ্যে আর কোনও উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেন নি কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর সঠিক দেওয়া শক্ত। তবুও এইটি অনুমান করা যেতে পারে যে, 'মাতাল তরণী'র কৃত্রিম রচনাপদ্ধতি সেই পরবর্তী নিষ্ফলতার প্রধান কারণ। র‍্যাঁবো নিজ অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে 'মাতাল তরণী' লেখেন নি। 'মাতাল তরণী'র অপূর্ব সমুদ্র-বর্ণনা যেমন নিছক কল্পনা-প্রসূত (র‍্যাঁবো তখনও সমুদ্র কোন দিন প্রত্যক্ষ করেন নি), তেমনিও বালকের জীবন অভিজ্ঞতা অধিকাংশে কেতাবী বিদ্যার মতো বহু বইয়ের পাঠেই সমাহৃত। কবিতার শীর্ষনাম পর্যন্ত পরের অনুকরণেই মনোনীত। তিনি এই কবিতার রচনাকার্যে উগো ও বোদলেরকে এমন প্রচুর পরিমাণে নকল করেছেন* যে, তাঁকে 'প্রতিভাবান কুম্ভিলক' আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। এই কবিতা যতই সার্থক ও সুন্দর হোক না কেন, কবির ব্যক্তিগত প্রেরণা-প্রাচুর্য বা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকেই উৎসারিত নয়। সমুদ্রের বর্ণনা সম্বন্ধে কল্পনার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেই কল্পনাও ক্যাপ্টেন কুক ও জুল ভের্ন--এর ভ্রমণকাহিনীর দ্বারাই পুষ্ট। কবিতার প্রতিটি স্তবকে ঐ ভ্রমণকাহিনীর ছায়া অবাধে উদ্ধৃত হয়েছে। যে বর্ণনাত্মক বাক্যগুলি অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন দ্রষ্টা ও প্রতীকস্রষ্টার অভাবনীয় কাব্যিক স্বপ্ন বলে প্রশংসিত হয়েছে, তার অধিকাংশ হুবহুভাবে ক্যাপ্টেন কুক কিংবা জুল ভের্ন থেকেই সংগৃহীত। এই কৃত্রিমতা অনায়াসে সাধ্য নয় বটে তবু একজন বালক-কবির এইরূপ স্বাভাবিকতা ও মৌলিকতার অভাব মহৎ কবির পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তির গুরুতর অন্তরায় হতে পারে। র‍্যাঁবো ১৮৭১ সালে বোদলেরের 'মুখোস' পরেছিলেন, সহজাত অসাধারণ প্রতিভাকে নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে উদ্রেক করতে গিয়ে তিনি পরের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা, পরের হতাশা, পরের ভাষা পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবনে ও কাব্যসৃজনে অনিষ্টকর হয়ে উঠল। তৎসত্ত্বেও 'মাতাল তরণী' কবিতাটি এক আশ্চর্যজনক ও অমর রচনা, উগোর কবিতাগুলি ও ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণকাহিনী অসংখ্য ফরাসী বালক তো পাঠ করেছিল, কিন্তু একমাত্র র‍্যাঁবোই সৃষ্টি করলেন 'মাতাল তরণী'। র‍্যাঁবোর সৃষ্ট সেই পাল-ছেঁড়া মাস্তুল-ভাঙা সমুদ্রে-ভেসে-যাওয়া তরণীর ছবি মহৎ শিল্পীরই সৃষ্টি।

৩। 'নরকে এক ঋতু'

১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আর্তুর র‍্যাঁবো প্যারিসে আগমন করলেন। পাড়া-গাঁয়ের বালক মহানগরীর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ভেরলেন—বিদগ্ধ ও চরিত্রহীন, নিপুণ শিল্পী ও চঞ্চলমতি ভেরলেন—র‍্যাঁবোর অনভিজ্ঞ সরলতা ও বলিষ্ঠ তারুণ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে অন্তরঙ্গ সঙ্গিরূপে গ্রহণ করলেন। ভেরলেনের কাছে র‍্যাঁবো "মত্ততা অমিতাচার আর পাগলামির সব কথাই" শিখে নিলেন। "পাপের যতো অমূল্য উপচারে" তাঁর বিশৃঙ্খল জীবন ভর্তি হয়ে উঠল। বালকটি মধ্যবয়স্ক ভেরলেনকে প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিলেন। তাঁদের সেই উন্মত্ত ভালবাসা অবিলম্বে ঘৃণা রূপ ধারণও করেছিল। ভেরলেন নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে র‍্যাঁবোকে নিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেলেন। "সব নীতি থেকে যে-আমি পলাতক", র‍্যাঁবো ভেরলেনের সংস্পর্শে বাস্তব নরকের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, তাঁর মনে ভীষণ অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য সংক্রামিত হল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অপূর্ব প্রতিভার উন্মেষণও সেই সময়ে ঘটেছিল। র‍্যাঁবো পরের বই পাঠ করে আর লেখেন না; ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণা ও তিক্ততা, নিজের বিকৃত প্রেম ও নৈরাশ্যকে অগ্নিময় ভাষায় রূপায়িত করেন। ভেরলেনের সঙ্গে কয়েক মাস লন্ডনে কাটিয়ে তিনি আশ্রয় ও শান্তি খুঁজতে এসেছিলেন নিজ পল্লীগ্রামে; ১৮৭৩ সালের মে মাসে দ্বিতীয়বার তিনি ভেরলেনের সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে কিছুদিন পরে বেলজিয়ামে পৌঁছান। সেখানে দুজন বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়, ভেরলেন র‍্যাঁবোকে গুলী মেরে আহত করার দরুন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। র‍্যাঁবো অভিভ্রান্ত মন ও শরীর নিয়ে শার্লভিলে আবার শান্তি খুঁজতে আসেন। 'নরকে এক ঋতু' সেই সময়কার লেখা।

র‍্যাঁবোর [illegible] তাঁর [illegible]

[illegible]

রচনাই পরবর্তী বহু লেখকের মনে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। র‍্যাঁবোর লেখা দুরূহ, ব্যঞ্জনাত্মক, কবিত্বপূর্ণ; তার ছন্দ কাব্যের ধরাবাঁধা নিয়মে সম্বন্ধ না হয়েও প্রাণস্পর্শী। শব্দ ও চিত্রের প্রবাহ কোনও যুক্তিসংগত ধারাবাহিকতার নিগড়ে নিবদ্ধ নয়। আরোহণ অবরোহণ মূর্ছনা কম্পন তান লয় প্রভৃতি যোগে গায়কের আলাপ যেইভাবে চলতে থাকে, র‍্যাঁবোর লেখা সেইভাবে চলেছে।

> "স্মরণে যদি ভুল না থাকে তবে কোন এক সময়ে আমার জীবনটা ছিল মহা এক ভোজনোৎসব,—সেখানে সকল প্রাণই খুলতো, সকল সুরাই বইতো।
> এক সন্ধ্যাবেলা আমি সৌন্দর্যকে তুলে বসিয়েছিলাম কোলে। দেখেছিলাম সে নারী কটু, গালাগালি করেছিলাম তাকে।
> ন্যায়ের বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালিয়েছিলাম আমি।
> আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। ওরে কুহকিনীরা, ওরে ক্লেশ, ওরে বিদ্বেষ, তোদের কাছে গচ্ছিত ছিল আমার বিত্ত।
> নিজের অন্তরে প্রত্যেকটি মানবীয় আশাকে নিবিয়ে দিতে আমি পেরেছিলাম। প্রত্যেকটি উল্লাসের উপর গুঁড়ি মেরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আমি বন্য পশুর মত, গলা টিপে মেরেছিলাম তাদের। ....দুর্ভাগ্য ছিল আমার ভগবান। ক্লেদেতে আমি হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছি, আর গা শুকিয়েছি দুষ্কর্মের হাওয়ায়।...আর বসন্ত আমাকে দান করেছে জড়মূর্খের ভয়ংকর হাসি।
> ......একবার মনে হ'ল খুঁজে দেখি সেই বিগত দিনের মহাভোজনোৎসবের চাবিকাঠিটা; সেইখানে আবার নতুন করে হয়তো বা পেতে পারি বুভুক্ষা।
> 'ভালবাসা'-ই সেই চাবিকাঠি।......
> প্রিয় শয়তান, দয়া ক'রে একটু কম কুপিত দৃষ্টি হানো।......আমি আলগা ক'রে নিচ্ছি একটি নরকাভিশপ্ত আত্মার দিনপঞ্জিকা থেকে বিকট এই ক'টি পাতা।"
>
> [র‍্যাঁবো-র 'নরকে এক ঋতু'র ভূমিকা; দীপক চৌধুরীর অনুবাদ]

> "সমস্ত রহস্যকে আমি নগ্ন ক'রে দেবো—প্রকৃতির রহস্য, ধর্মের রহস্য, জন্ম-মৃত্যু, অতীত ভবিষ্যৎ, রহস্য বিশ্বসৃষ্টির অথবা শূন্যতার। আজগুবিতে আমার সঙ্গে পারবে কে?"

> "রূপ দিয়েছি মৌনকে, বাণী দিয়েছি রাত্রিকে, লিখে গেছি অনির্বচনীয়কে—স্থৈর্যে বেঁধেছি চিরচঞ্চল ঘূর্ণিকে।......এ ছাড়া শব্দের ছায়াবাজিতে বুঝিয়েছি কুহকের যতো কূটতর্ক।

> "অবশেষে আমার চেতনায় এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে খুঁজে পেলাম পবিত্রকে। তৃষ্ণায় ছটফট করেছি, আক্রান্ত হয়েছি প্রবল জ্বরে—ঈর্ষা করেছি পশুর সুখ, শুঁয়োপোকার নিরপরাধ বিস্মৃতিলোক, গন্ধমূষিকের কৌমার্যময় তন্দ্রা। তিক্ততায় ছেয়ে গেলো আমার চরিত্র—কয়েকটা গাথার মতো কবিতায় পৃথিবীকে বিদায় জানালাম।......
> "নিজেকে টেনে নিয়ে যাবো পচা দুর্গন্ধের অলিগলি দিয়ে বদ্ধ আঁখির কাছে, উৎসর্গ সূর্যের চরণে, আগুনের বিনি দেবতা।
> [illegible]

* উগো-র 'Pleine Mer' [উদার সমুদ্র] ও 'Plein Ciel' [উন্মুক্ত আকাশ] এবং "Les Travailleurs de la Mer" [Toilers of the Sea] আর বোদলেরের [illegible]

তরঙ্গে। দেখতে পেলাম সান্ত্বনাদায়ী ক্রুশখানির উদয়—সাগরের জলে আমার কলঙ্ক কি বিধৌত হবে?"

[ঐ; শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদ]

৪। 'চালচিত্র'

'নরকে এক ঋতু' ১৮৭৩ সালের শেষে লেখা হয়েছিল। দু'টি বৎসর বিশৃঙ্খলা ও উন্মাদনার মধ্যে কেটে গিয়েছিল। র‍্যাঁবো আত্মস্থ হলেন। ভেরলেনের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পুনরায় লাভ করলেন কিছুটা স্থিতি ও শান্তি। পূর্বেকার পথে তিনি আর চলতে চান না। কৃত্রিম উপায়ে সাধিত চেতনাবিলুপ্তি, মত্ততা, ইচ্ছাকৃত ইন্দ্রিয়ের অসংযম, সর্বপ্রকার দুর্নীতি থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে তিনি আবার তাঁর ছাত্র-জীবন আরম্ভ করলেন। নানা ভাষার অধ্যয়নে তিনি পরম অধ্যবসায় সহকারে আত্মনিয়োগ করতে লাগলেন।

১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে চিত্রকর জের্যামাঁ নুভো-র সঙ্গে র‍্যাঁবোর আলাপ হয়েছিল। আলাপ অবিলম্বে বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে উঠল। নুভো ছবি আঁকতেন, কবিতাও লিখতেন। ভক্ত, বিনয়ী, সচ্চরিত্র ও ধ্যানশীল মানুষ ছিলেন তিনি। র‍্যাঁবো তাঁর সঙ্গে ১৮৭৪ সালে লন্ডনে গেলেন; সেখানে তিনি ইংরেজি শিখলেন, জার্মানও শিখতে আরম্ভ করলেন। ১৮৭৫ সালে তিনি জার্মানির স্টুৎগার্ট শহরে একজন ডাক্তারের বাড়িতে গৃহশিক্ষক রূপে চাকুরি ক'রে জার্মান ভাষা আরও ভালোভাবে শিখতে যান। জার্মানি থেকে তিনি কয়েকমাস ইতালীতে গিয়ে অবস্থান ক'রে অসুস্থতার দরুন শার্লভিলে ফিরে আসেন। ১৮৭৫ ও ১৮৭৬ সালে আরব ও রুশ ভাষা আয়ত্ত করতে তিনি সচেষ্ট হন। ভাষা শেখার উদ্দেশ্য তাঁর কি-বা ছিল? তিনি তখন থেকে স্থির করেছিলেন যে, বিদেশে গিয়ে ব্যবসায় করবেন। ব্যবসায়ী কবি! দূরবর্তী দেশের আকর্ষণ ও ভবঘুরে জীবনের টান তখনও প্রবল তরুণ যুবকের প্রাণে।

তিনি কিন্তু সাহিত্যকে বিদায় দেন নি। মনের নিরাশায় একদিন তিনি 'নরকে এক ঋতু' লিখবার সময় "কবিতালক্ষ্মীকে চিরবিদায় জানিয়েছিলেন"। র‍্যাঁবোর কয়েকজন চরিতকার এই কথাও লিখেছেন যে, 'নরকে এক ঋতু' বইখানি রচনা করার পর লেখক আর কিছুই লেখেন নি; তাই র‍্যাঁবোর শেষ গ্রন্থখানি 'ইলিউমিনেশনস্' এর সন তারিখ আগিয়ে দিয়ে তাঁরা তার রচনাকাল ১৮৭২ বা ১৮৭৩ সালের প্রথম ভাগে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু নবপ্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা ও সমালোচনা থেকে এই কথা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, 'ইলিউমিনেশনস্'* বইখানির যত গদ্যরচনা সমস্তই ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ সালে লিখিত। লন্ডনে অবস্থানকালে শিল্পী নুভোর প্রভাবে র‍্যাঁবো এই নূতন লেখায় মন দিয়েছিলেন, বইটির শীর্ষনাম ফরাসী নয়, ইংরেজী একটি শব্দ। মধ্যযুগে ধর্মগ্রন্থের পুঁথিগুলি নকল করার সময় যেরূপ রঙিন চিত্র আঁকা হত গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, সেইরূপ চিত্রাঙ্কনকে ইংরেজীতে 'ইলিউমিনেশন' বলে। বাঙলা দেশের 'চালচিত্র' যাঁরা আঁকেন, তাঁদের সঙ্গে মধ্যযুগীয় 'লিমনার' শিল্পীদের কতকটা সাদৃশ্য আছে। বইটির কতকাংশ স্টুৎগার্ট-এ অবস্থানকালে রচিত হয়েছিল।

'চালচিত্র' বইটি র‍্যাঁবোর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর সৃজনীশক্তির পূর্ণ বিকাশ এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই রচনা আর অনভিজ্ঞ অনুকরণপ্রিয় পরের-মুখোস-পরা বালকের লেখা নয়; 'নরকে এক ঋতু'-র বীতস্পৃহ লেখক সর্বপ্রকার নৈরাশ্য অতিক্রম ক'রে এখন শ্রেষ্ঠতম আদর্শ অনুসারে তাঁর কবিমানসের অনুভূতি অভিব্যক্ত করতে শিখেছেন।

'চালচিত্রে'র গদ্য-কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য এবং র‍্যাঁবোর পূর্বেকার সকল রচনার সঙ্গে তাদের প্রভেদ ও স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। আনন্দ ও সৌন্দর্যের অনুভূতি এখানে প্রধান, 'চালচিত্রে'র স্রষ্টা তাঁর জীবনের এই পর্যায়ে যেন প্রশান্ত এক নূতন মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। প্রধান 'রাগ' প্রশান্ত হলেও পূর্বেকার রাগগুলি অবর্তমান নয়। কবির আনন্দ এক্ষণেও ক্ষণিক ও আংশিক এক নবলব্ধ অনুভূতির আভাস মাত্র।

'চালচিত্রের' কবিতাগুলির আরও একটি নূতন লক্ষণ উল্লেখযোগ্য—র‍্যাঁবো শব্দেরই সাহায্যে চিত্র আঁকেন। এই চিত্রাঙ্কনের রীতি বস্তুতন্ত্রী শিল্পীর রীতি নয়, 'ইমপ্রেশনিজম' ও 'সুররিয়ালিজম'-এর পূর্বাভাস এখানে সুস্পষ্ট।

আঁদ্রে জিদ্, পল ক্লোদেল, দ্যুয়ামেল, ভালেরি প্রভৃতি বহু ফরাসী লেখক 'চালচিত্রের' গদ্যশৈলীর অপূর্ব ও অতুলনীয় উৎকর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। মহাকবি ক্লোদেলের ব্যক্তিগত রচনাশৈলী র‍্যাঁবোর আদর্শে গঠিত। বলার ভঙ্গী ও ভাষার ব্যঞ্জনাময় ধ্বনির তুলনায় বক্তব্যটা অকিঞ্চিৎকর। র‍্যাঁবো যখন তাঁর 'চালচিত্র' রচনা করেন, তিনি তখন এক নূতন সাহিত্যিক মাধ্যম সৃষ্টি করেছিলেন। যদি অকালে সাহিত্যের ক্ষেত্র ছেড়ে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রবাসী না হতেন, কি জানি তবে এই নব মাধ্যমের দ্বারা কত মহৎ সাহিত্যের স্রষ্টা হতে পারতেন?

৫। স্বধর্মচ্যুতি ও মৃত্যু।

'চালচিত্রের' পুঁথি কোন্ বন্ধুর হাতে সমর্পণ ক'রে র‍্যাঁবো অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় দেশে-বিদেশে নানান ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে লাগলেন। সুদূর প্রাচ্যে তিনি কিছুদিন ওলন্দাজদের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থান করেছিলেন; পরে তিনি সাইপ্রাসের মর্মরখনিতে চাকুরি করেন; মিশরে ও আবিসিনিয়াতে অনেকদিন অতিবাহিত করেছিলেন। এক সময় তিনি ক্রীতদাসের ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসায়ে হাত দিলেন। সাহিত্যিক র‍্যাঁবো তাঁর কবিধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে কি উদ্দেশ্যে যে টাকার সংগ্রহে দীর্ঘ ১৫ বৎসর ধ'রে বিদেশে অবস্থান করেছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কখনও জানতে পারব না। অধীর প্রাণের চাঞ্চল্য, অচেনার টান, কৃত্রিম শহুরে সভ্যতার প্রতি বিমুখতা, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ ক'রেই সাহিত্যক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, কি জানি, তাঁর প্রবাসজীবনের উদ্দেশ্য আমাদের অপরিচিত। ১৮৯১ সালে র‍্যাঁবো সঞ্চিত অর্থ ও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে এলেন। মার্সেই শহরের এক হাসপাতালে তিনি কিছুদিন ভুগেছিলেন। তাঁর বোন ইসাবেল তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন; তাঁর এক বিবৃতিতে মুমূর্ষু র‍্যাঁবোর খৃষ্টের শরণগ্রহণের কথা পাওয়া যায়। কথাটি নির্ভরযোগ্য কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। তবে র‍্যাঁবোর নাস্তিকতা ও অধর্ম জড়বাদী বিজ্ঞানসর্বস্ববাদী বা যুক্তিবাদীর অবিশ্বাস থেকে ভিন্ন। অনির্বচনীয়কে তিনি ভাষার ধ্বনিতে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। নিজ পাপ ও অনাচারকে তিনি কোনদিন ভণ্ডের মত সৎ ও পুণ্য ব'লে ব্যাখ্যাত করেন নি। হয়তো তাঁর অস্থির মন শেষ যাত্রার প্রাক্কালে অনির্বচনীয়ের নাম গ্রহণ করেছিল। শ্রীখৃষ্টের প্রতি তিনি তার পূর্বেও বহুবার চেয়ে তাকিয়েছিলেন। 'চালচিত্রের' কয়েকটি পৃষ্ঠায় তিনি একদিন খৃষ্টের সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, পাস্কালের সময় থেকে সেইরূপ ভাষায় আর কোন সাহিত্যিক লিখেছিলেন কিনা জানি না।

[illegible]

---

* শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য-কৃত অনুবাদকে এখানে সামান্য রূপান্তরিত করলাম। 'মাতাল তরণী' ও 'নরকে এক ঋতু'-র অনুবাদ অনেক স্থানে সার্থক হয়েছে, কয়েকটি জায়গায় ফরাসী শব্দের সঠিক অর্থ না বুঝতে পেরে অনুবাদক কোন এক সমধ্বনি শব্দের অর্থ ধরেছেন [illegible] leve-র স্থানে lave [illegible] [illegible]

* Illuminations কথাটি 'দীপালি' [illegible] শব্দে অনূদিত হয়েছে। [illegible]

যে, "রবীন্দ্রকাব্য থেকে যা আমরা পেলাম, ...ঊনবিংশ শতকের ইয়োরোপীয় প্রতীকী কবি কিংবা তাঁদের ইংরেজ কবিশিষ্যদের কাব্য-আকৃতির চেয়ে তা যেমন নিরাময় তেমনি মূল্যবান—রবীন্দ্রনাথের মহত্তর ব্যক্তিত্বের সংশ্লেষ তাতে রয়েছে বলে।"
("রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা")।

এই 'মহত্তর ব্যক্তিত্বের সংশ্লেষ' র‍্যাঁবোর সাহিত্যে নেই বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নন। মানবীয় সত্তার উপলব্ধি তাঁর কাব্যের মধ্যে সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গীণ রূপে রূপায়িত হয়ে ফোটেনি। অধীরতা ও হতাশা, বীভৎস ও কদর্য, পাপ ও মতিভ্রম বাস্তব-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বটে; তাদের অস্বীকার করলে কিংবা সাহিত্য থেকে নির্বাসিত ক'রে রাখলে সাহিত্যসৃষ্টি অপূর্ণ ও অবাস্তব হতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু নরক যেমন সত্য স্বর্গও তেমনি সত্য, বীভৎসের চাইতে সুন্দর অবাস্তব নয়, মানবীয় জীবনের অসংলগ্নতা ও অশান্তির অভিজ্ঞতা যে অর্থে অতলস্পর্শ হতে পারে পূর্ণতা ও শান্তির অভিজ্ঞতা সেই অর্থে অতলস্পর্শ হবে না কেন? নরকে এক ঋতু কাটিয়ে যদি বাকী পাঁচটি ঋতু উপেক্ষা করা হয় তবে সত্যের অভিজ্ঞতা কি ব্যাপক ও পূর্ণ হয়ে উঠবে?

একথা মানলেও রবীন্দ্রনাথের অনেক পাঠককে তবু স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর সাহিত্যে ট্রাজেডির স্থান পরিমিত; নৈরাশ্য ও অবিশ্বাস, পাপবোধ ও মানসিক উন্মাদনার মর্মান্তিক সত্য তাঁর কাব্যে বড়-একটা সাহিত্যপ্রেরণার উপাদানরূপে স্বীকৃত হয় নি। সেই কারণে অনেক 'আধুনিক' মানুষ রবীন্দ্রীয় সাহিত্যের মধ্যে নিজেদের অস্থিরতা ও বিশ্বাসরিক্ততাকে প্রতিফলিত না হতে দেখে সেই সাহিত্যকে অবাস্তব ও ভাববাদী ব'লে সমালোচনা করেন। আশা ও বিশ্বাস, পুণ্যের উপলব্ধি ও মানসিক স্থিতপ্রজ্ঞতা যে কত দীর্ঘ সাধনার সাপেক্ষ, কত বাস্তব পূর্ণতার পরিচায়ক, সেই কথা অনেকে হয়তো বোঝেন না।

যাঁরা জড়বাদী বা দেহাত্মবাদী, তাঁদের মানববাদ সংকুচিত ও আংশিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাঁরা রবীন্দ্রনাথীয় ব্রহ্মোপলব্ধি এবং তাঁর ঔপনিষদ আনন্দ ও সত্যের অভিজ্ঞতাকে কল্পনাপ্রসূত এক মনোবিলাস মাত্র মনে করতে পারেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গীণ মানববাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা অসীম ও শাশ্বতকে সসীম ও অনিত্যের চাইতে কম বাস্তব ব'লে মনে করেন না।

র‍্যাঁবো এমন অনেক-কিছু লিখেছেন যা রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি, লিখতে হয়তো পারতেন না। পিকাসো এমন অনেক ছবি এঁকেছেন মাইকেল আঞ্জেলো যা আঁকতে পারতেন না, এজরা পাউন্ড্ ও জয়স্ এমন কাব্য ও উপন্যাস রচনা করেছেন দান্তে ও বালজাক যা রচনা করতে পারতেন না। তাঁরা মহৎ শিল্পী কবি বা ঔপন্যাসিক হলেও বিশ্বভূমিকায় তাঁদের স্থান কি মাইকেল আঞ্জেলো দান্তে ও বালজাকের ঊর্ধ্বে?

র‍্যাঁবো মানবীয় জীবনের কতকগুলি অভিজ্ঞতাকে অপূর্বসুন্দর ভাষায় রূপায়িত করতে পেরেছিলেন, তাঁর কয়েকটি অবিস্মরণীয় কবিতায় ও সাংকেতিক গদ্য-রচনায় নূতন এক প্রতীকী শৈলী ও গীতি-ধর্মী কাব্যের মাধ্যমও সার্থকরূপে তিনি প্রবর্তন করেছেন। তিনি মহৎ একজন কবি সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশ্বকবির সংজ্ঞা তাঁকে দেওয়া যায় না। ফরাসী সাহিত্যের মধ্যে তাঁর স্থান উচ্চ হলেও তিনি শ্রেষ্ঠতম ফরাসী কবিদের মধ্যে গণ্য নন; রাসিন উগো বোদলের ভালেরি ক্লোদেল র‍্যাঁবোর ঊর্ধ্বে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু যে বিশ্ব-সাহিত্যের ভূমিকায় শ্রেষ্ঠতম কবিদের মধ্যে গণ্য, এই কথা কি অগ্রাহ্য হতে পারে? কেবল বহুমুখীনতা ও প্রাচুর্যের গুণেই নয়, মানবীয় জীবনের অখণ্ড ও "অতলস্পর্শ" অভিজ্ঞতার গুণেও।

H. Mondor:—RIMBAUD ou le GENIE IMPATIENT, 1955.
DANIEL-ROPS: RIMBAUD, Le Drame Spirituel;
ETIEMBLE: Le Mythe de Rimbaud, 1952.
BOUILLANE DE LACOSTE: Rimbaud et le Problieme des Illuminations, 1949.
CLOUARD: LITTERATURE FRANCAISE DU SYMBOLISME A NOS JOURS, 1947.
লোকনাথ ভট্টাচার্য : মায়াবী কবি র‍্যাঁবো। [কবিতা, আশ্বিন, ১৩৬১]; 'মাতাল তরণী' [কবিতা, পৌষ ১৩৬১]।
লোকনাথ ভট্টাচার্য : নরকে এক ঋতু [নাভানা, ১৯৫৪]।

পাহাড়ী ঢল

সমরেশ বসু

নন্দলাল আর কপিলা ভারী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। প্রথম রাত্রি কেটেছে দুজনের রাক্ষুসে প্রেম মত্ততায়। মধ্যরাত্রি কেটেছে তার জের নিয়ে, দলা পাকানো নিদ্রাহীন অবসাদে। আর এখন মরার মত ঘুমোচ্ছে মদাবসানে।

পাশের মাল ঘরে, তন্দ্রা ভেংগে চমকে জেগে উঠল সহদেব। ঘুম এমনিতেও ছিল না চোখে। দুটি রাত্রি যাচ্ছে এমনিতেই সংশয়ের ধুকধুকুনি নিয়ে। তার উপর কাপড় টানাটানির খস্‌খস্‌, চুড়ির রিনিঠিনি, মেয়ে পুরুষ গলার চাপা গোঙানি ঘুম নিয়েছে কেড়ে। তন্দ্রাটুকু এসেছিল বুঝি এমনি চমকে জেগে ওঠার জন্যেই। তন্দ্রা ঘোরে হঠাৎ চোখ দুটি ঝলসে গেল। কানে এল এক তীব্র কোলাহল। চমকে জেগে বিমূঢ় বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল সহদেব, কে গো!

বাতাসের ঝাপটায় ছিটে বেড়ার ফাটা বাঁশ মড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠল। বেড়ার ফোকড়ে ফোকড়ে, চালার ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ ঝিলিক ধাঁধিয়ে দিল চোখ, তড়াক্‌ ক'রে উঠে বসল সহদেব। হেই গো মা গোসানী! যা মন গেয়েছিল, তা-ই হল শেষে! এত শব্দ কিসের!

জবাব এল দূরে আকাশের চাপা ব্যাকুল গুরু গুরু শব্দে। তারপরে সহদেবের কানের খুব কাছেই বেজে উঠল জলের খল্‌ খল্‌ ধ্বনি। কলকলানি নয় যেন, অসংখ্য খরশোলা ঝাঁক বেঁধে খেলে বেড়াচ্ছে, তারই কলতান। যেন তাদেরই পুচ্ছ দোলায় জল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। আর দূরে, বহুদূরে, সেই মেঘ ডাকার কাছাকাছি একটা তীব্র সোঁ সোঁ শব্দ উঠছে। উঠছে, বাড়ছে, এগিয়ে আসছে। জেগে উঠেছে গাঙ খুটোমারা।

বসেছিল, আবার তড়াক্‌ ক'রে উঠে, ছুটে বাইরে এল সহদেব।

গাঢ় অন্ধকার বাইরে। অন্ধকার নক্ষত্রহীন আকাশ। আকাশটা যেন ঝাঁপ দিয়েছে একটা [illegible] মত। পাথার তার [illegible] আর। [illegible]

আকাশ মহাজাদরের রুদ্রবেশে নামছে রুবে ফুঁসে। মাটি খেতে আসছে। হেই গো মা গোসানী! ফারাক ঠাহর হয়না আর আশমান জমিনের।

ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। একটানা রব তার থামছে থেকে থেকে। পরমুহূর্তে আরো তীব্র ব্যাকুলস্বরে উঠছে কাঁকিয়ে। যেন পোকাটাও আসন্ন বিপদের সংকেতে কান পেতে কি শুনছে আর চেঁচাচ্ছে। গাছে গাছে শোনা যাচ্ছে পাখীর ভীত ত্রস্ত ডাক আর পাখা ঝটপটানি। সাড়া পড়ে গেছে জলেস্থলের সারা জীবজগতে। সাপ-ইঁদুর-আরশোলা-টিকটিকির গর্ত থেকে মাকড়সার জালে, সর্বত্র টের পাওয়া যাচ্ছে ব্যস্ত সন্ত্রস্ত চলাফেরা।

টের পাচ্ছে সহদেব। টের পাচ্ছে, কালান্তক আসছে যাবৎ জীবের। সর্বগ্রাসী জিভ্‌ দিয়ে, লুপ্‌লুপ্‌ ক'রে মাটি খেতে খেতে আসছে এই লোকালয়ের বাইরে। লোকজন নেই মাইল তিনেকের মধ্যে। চারদিকে নদীনালা—গাঙবিল। জিয়ল-হিজল-বেত-মুরলী বাঁশঝাড়ের লকলকে ঢলঢলে অরণ্য। তার মধ্যে মাত্র তিনটি প্রাণী। না, প্রাণী আছে অনেক। শরীরী আর অশরীরী। মানুষ কুল্যে তিনটি। তিনটি, বড় একা। বড় ফাঁকা। রাক্ষুসে বুড়ো তোর্‌সা ঝাঁপ দিয়েছে উত্তরের উঁচু থেকে। হাঁক পেড়ে আসছে এদিকে, ধরলা নদীর ওপর দিয়ে। চাপ খেয়ে ধরলা ঠেলে ঠেলে উঠছে খুটোমারীর বুক ফাঁপিয়ে।

ন'দিনের নাগাড় জলে, আর একদিকে পাহাড়ী ঢলে, ভাসো ভাসো হয়েছিল জলপাইগুড়ি শহর। সংবাদ এসেছিল গোসানীমারী থেকে, তোর্সার কূল ছেড়ে লোকজন সব পুবে সরেছে। জায়গায় জায়গায় রেলগাড়ি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। উত্তর পশ্চিমে ডুবু ডুবু

হয়েছিল 'বার্নেসফট, ভুবকভাংগা, ফকিরগঞ্জ। এদিকে খাড়া উত্তরে ডুবু ডুবু মাদারীহাট, ফালাকাটা, মাথাভাংগা, সদর কুচবিহার। শোনা গেছল, মাথার ওপরে শীতলকুচির রাস্তায় হাঁটুজল, এদিকে রাজপাটের রাস্তাও ভেসেছে। পালাই পালাই রব উঠেছিল শীতলদহে।

তখন সহদেবের কর্তা নন্দলালও পালাবার কথা ভাবছিল। দিন গুনছিল মালপত্র পৌঁছুবার আশায়। এই লোকালয়ের বাইরে তার ব্যবসা। বড় জাতের ব্যবসা। কিন্তু প্রাণের ভয় বড় ভয়। গতিক দেখে তাল করছিল পালাবার।

ঠিক সেই সময় থম্ খেয়ে গেল আকাশ। ঠাস বুনোনি মেঘ হল ফালা ফালা কুটি কুটি। ফাঁকে ফাঁকে তার আলোর আভাস। চলানি গাঙ খুটামারী থ' খেয়ে গেল। থির হল স্রোত। টান দেখা দিল বাড়তি জলে।

নন্দলাল বেজায় ফুর্তিতে কাঁপলাকে নিয়ে পড়ল। ফাঁড়া কেটেছে।

মাল আসবে এবার।

কিন্তু মালের বদলে এখন শমন এসে হাজির। আর তার কর্তা এখনো সেই আনন্দে ঠাকরুনকে নিয়ে মহামাতনে অচৈতন্য।

এইটিই ভেবেছিল সহদেব মা গোঁসানীর থমকানো থামা নয়। দুদিন ধরে অষ্টপ্রহর মুখে ডিম নিয়ে সার বেঁধে পালাচ্ছে পিঁপড়ে। তবে এ সময়ে এমনিতেও পালায়, তাই বড় একটা চোখে পড়েনি। ভয় না ক'রে উঠেছে গাছের আগডালে।

আর দু' রাত্রি গেল না। গাঙ খুটামারী এখন বেজায় মাতনে ডাক ছেড়েছে। ডাক খুটামারীর নয়, বাবা বুড়া তোরসা হাঁক দিয়ে নেমে এসেছেন ওপর থেকে। এসেছেন ধরলার নদীর বুক ঠেলে। হাজা গাঙ সিঁগিমারীর গলা ডুবিয়ে, লালবাজারের পুব সীমানায় ঝাঁপ দিয়েছেন খুটামারীর থির উদাসী বুকে।

সব চেনে, জানে সহদেব। নিজে সে দূর দক্ষিণের পুবে কোণের মানুষ। পদ্মাপারের ছাওয়াল। কিন্তু উত্তরে আনাগোনা অনেকদিনের। দেশ ভাগাভাগির পর হয়েছে উত্তরের চিরদিনের মানুষ। পেটের ধান্দায়, এখানকার উঁচু-নীচু-জল-জংগল ভাংগা, সব নখদর্পণে।

সাপের মত ভাবলেশহীন গোল চোখে উত্তরে তাকাল সহদেব। ঢল নেমেছে মাথায় মেঘ নিয়ে। ওই অদূরে কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে কুলকান্দির হিজলবন। বাবা কুলচন্দ্রের বাস ওখানে। মা গোঁসানীর ঠাকুর। দুজনে মিলতে আসছেন, তাই বড় ডাক। যে ডাকে সংসার কাঁপে।

সহদেবের সর্পচক্ষু চকচক্ ক'রে উঠল। ডাক দিল, ওঠেন গো মহাজন কত্তা।

তিন ডাকে ঘুম ভাংগল নন্দলালের। বলল, কেন, রাতকাবার নাকি।

সহদেব বলল, আজ্ঞে না—

তর সইলনা নন্দলালের। বলে উঠল, বিজা হারামজাদা মাল নিয়ে এল বুঝি।

সহদেব আবার বলল, আজ্ঞে না—

কথার মাঝেই ঘুমভাংগা বিরক্তিতে খেঁকিয়ে উঠল নন্দলাল, না তো শালা বলবি তো। তোকে কি কালে ধরেছে?

বড় মেজাজী মানুষ নন্দলাল। এমনি ক'রে কথা বলে। সহদেব বলল, আজ্ঞে।

আজ্ঞে। সহদেব আবার বলল, মা গোঁসানী আবার নামলেন। ওঠেন তাড়াতাড়ি।

অন্ধকার ঘর থেকে নন্দলালের অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল, মা গোঁসানী!.........

সহদেবের গলা ক্রমেই চড়তে লাগল, হুঁ কত্তা, কুলচান্দির হিজলবনের বাবা বুঝিন্ আবার জটা খোললেন। সাতদিন ধইরে অ্যাত ব্যাগত্তা কল্লাম আপনারে, শোনলেন না।

আর সাড়া নেই নন্দলালের। তখন তার কানেও ডাক পৌঁছেছে। ভয়ে কথা বন্ধ হয়ে গেছে তার।

সহদেব আবার হাঁক দিল, কত্তা—

খুট ক'রে দরজা খুলে গেল। কাঁপলা তখনো অচৈতন্য। হাতে জ্বলন্ত হ্যারিকেন নিয়ে খালি গায়ে বেরিয়ে এল নন্দলাল। মধ্যবয়সী স্থূল মানুষ। কিন্তু চামড়ায় ভাজ পড়েনি। ফোলা ফোলা চাকাপানা মুখ। এখন কেমন গোল হ'য়ে উঠেছে। হেঁকে ডেকে শালা সুমুন্দি ক'রে কথা বলা অভ্যাস। এখন বাক্য হারিয়ে গেছে। হাতে পায়ে লেগেছে কাঁপন। কোমরের কাপড় সামলাতে সামলাতে এসে বলল, সদেব, জল কি ঘরের পৈঁঠেয়?

সহদেব বলল, আজ্ঞে না। গাঙ অখনো একশো হাত দূরে।

ঃ তবে এত শব্দ? খুটামারীতে এত শব্দ কিসের?

রোগা কিন্তু শক্ত হিলহিলে ডাঁটো কঞ্চির মত সহদেব। কালো রং চকচকে নয়, একটু খসখসা খসখসা। ছোট দুটি সাপের মত চোখ। কোন্ দিকে তাকিয়ে কথা বলে, কিছু বোঝা যায় না। জীবন কেটেছে বেশী অঘাটে। ভয় কাকে, তা' জানে। কিন্তু গলার স্বর বদলায় না ভয়ে ও উদ্বেগে। বরং কেমন যেন নির্বিকার উদাসীন। ওদের মানুষের এই এক জাত।

বলল, উনি কি আর খুটামারা আছেন কত্তা। অখন খুটা খোলা হইছেন। ওই যে, ওই শোনেন না ক্যান্ সোঁ সোঁ ডাক। পুবে ধলা, পশ্চিমে তিস্তা দুইজনে ওনার খুটা খোলছেন। আর হিংগিমারি (সিংগিমারি) গাঙ আইতেছেন জলডাহার ঠেলা খাইয়া।

ঃ জলঢাকা?

ঃ হ। জায়গাটা তো ভাল না। যাবৎ নদী আর গাঙের ঢলানি যে এইদিকে।

নন্দলালের হাতের বাতি কাঁপতে লাগল। বলল, এখন অবস্থা কেমন বুঝছ সদেব?

সহদেব যেন কী শোনে কান পেতে। শোনে, খুটামারা হাসছে খল্ খল্ ক'রে। বড় খ্যাপা হাসি। কাছের কথা শোনা যায় না। চেঁচিয়ে বলল, অবস্থা? অবস্থা তো কত্তা, সামনে নিদানকাল।

ঃ নিদানকাল?

ঃ হ। আপনারে কইলাম, সময় থাকতে চলেন। দুইদিনের থম্ দেইখ্যা আপনেও থম্ খাইলেন। অখন—

বলতে বলতে চকিতে উত্তর দিকে ঘাড় ফেরাল সে। বলল, আপনার বাত্তিটা এটু ওদিকে ওঠান তো।

নন্দলালের হাতে এখন আর নিশানা নেই। কোন রকমে বাত্তি উঁচু ক'রে ধরতে, দেখা গেল গাঙের জল আর একশো হাত দূরে নেই। তলে তলে এইবার তিস্তা ফুলছে নিঃশব্দে। কোটি কোটি খরগোশের ঝাঁকের মত ছুটে আসছে খুটামারা। কানের ভেতর দিয়ে সে শব্দ মর্মে গিয়ে ঘা মারছে। হ্যারিকেনের আলোর পরিধির মধ্যেই কয়েক হাত দূরে সহদেবের চোখে পড়ল একটি কালো সর্পিল রেখা। বলল, কত্তা, ওদিকে দেখেন। সবাই পলাইতেছে, আর সময় নাই।

নন্দলাল ফিরল। চমকে পেছিয়ে আসতে গিয়ে বুঝল, সাপ নয়, ফাটল নয় মাটির। মাংসখেকো কালো বড় জাতের ডেয়ো পিপড়ে সার বেঁধে ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। সারা উত্তরের উঁচু থেকে নামছে ঢল। মহাকাল নামছে মহানাদে। মেঘ নামছে পুঞ্জ পুঞ্জ। ঝিলিবিলি বিদ্যুৎ ছোবলাচ্ছে বন জিয়ল হিজলের মাথায়। নন্দলালের গলায় কান্নার আভাস। বলল, সদেব, গোঁসানীমারী থেকে আমার সাত্ত হাজার টাকার মাল আসার কথা। সাত হাজার টাকার মাল। বড় জাতের বাবসা। এ ব্যবসা বাজারে বন্দরে চলে না, চলে না লোকালয়ে। নন্দলালের মাল আসে কলকাতা থেকে, জলপাইগুড়ি হ'য়ে। আসে ময়নাগুড়ির তলা দিয়ে, বেলানদীর ফ্যাকড়া ধরে। মাথাভাঙ্গা মহকুমার ভিতর দিয়ে সতংগা নদী দিয়ে নেমে আসে তরতর্ ক'রে। তারপর খুটামারীর তীরে, এই বন জিয়ল-হিজলের রাজ্যে। এ রাজ্যের রাজা নন্দলাল স্বয়ং। মাঝি সহদেবকে নিয়ে, খুটামারীর কোল দিয়ে রতনাই গাঙের চোরাপথে যায় পাকিস্তানের সীমান্তে। চোরা ব্যবসা, কিন্তু জাতব্যবসা। কতগুণ লাভ, সে গুণাগুণের হিসাব নেই। আগে নেয় টাকা, তারপর মাল খালাস। মাঝি সহদেব নৌকা ঠেলেছে উজানে, মনিব গুনেছে টাকা।

কাস্টম্সের রাজস্ব আরো পুবে, রেল স্টেসন গীতলদহে। কুলচাঁন্দর এই দুর্গম হিজলবনে তাদের আইন ঢুকতে পারে না। তাই বাঘা বারিন্দীর গোঁসাই নন্দলাল ঠাঁই নিয়েছে এই বিষচক্কর নাগনাগিণীর রাজ্যে।

এখন বাঘা গোঁসাইয়েরও গলা কাঁপছে। আসার মাল আসবে সেই আশা! আর এতক্ষণে রোগা খেঁকি রতনাইও ফুঁসছে তিস্তার জল খেয়ে। খুটামারী পলে পলে বাড়ছে, আসছে, হাসছে খল্খল্ ক'রে। গলা আরো চড়িয়ে বলল সহদেব, কত্তা,

আশ্রমের ...ল আইব, এদিকে যে যাবৎ জীবের শমন আইছে।

ঃ শমন!

ঃ হ!
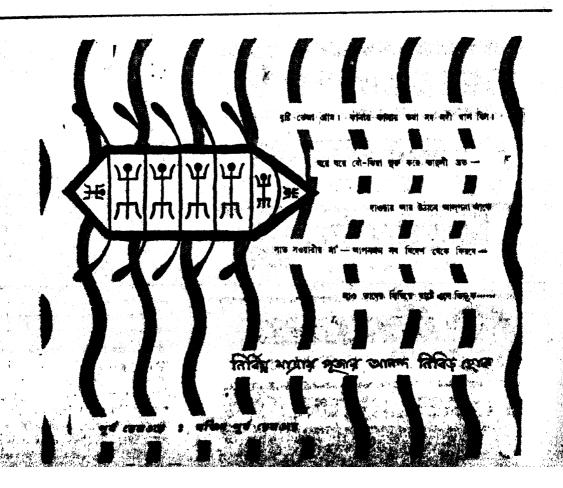
নন্দলাল অপলক সন্ত্রস্ত চোখে এক-মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সহদেবের দিকে। সহদেবের চোখে কী দেখে হঠাৎ তীব্র গলায় খেঁকিয়ে উঠল, হেই শালা, ভয় দেখাচ্ছিস, অ্যাঁ?

সে কথায় কান দিল না সহদেব। চীৎকার ক'রে বলল, আনু কথার সময় নাই কত্তা। আপনের ঠাইরেনরে ডাকেন।

ডাকতে হল না। কয়েক মুহূর্ত আগেই বাতাসের শব্দে আচমকা জেগেছে কাপিলা। ডাক শুনেছে খুটামারীর। পরমুহূর্তেই আলুথালু বেশে চীৎকার ক'রে ছুটে এল, ওগ' বান আসছে গ', বান!

নন্দলালের ঠাকরুন। বয়স অনুমান করা কঠিন। স্বাস্থ্য অটুট, কিন্তু সারা শরীরের বাঁকে বাঁকে কেমন একটা বেহায়া স্ফীতি। কটা রং গায়ে হার চুড়ি দুল। কোমরে রূপোর গোট। বাঁকা সিঁথেয় সিঁদুর। কপালের টিপ গেছে ঘষে। বগল কাটা এক চিলতে জামায় খোঁচা খোঁচা হ'য়ে আছে একটি নগ্ন উচ্ছৃংখলতা।

স্ত্রী নয়, গোঁসাইয়ের ঠাকরুন। এই জলে-জঙ্গলে, লোকালয়ের বাইরে থাকতে হয় দিবানিশি। তাই দিনহাটার মেয়েপাড়া থেকে কাপিলাকে নিয়ে এসেছিল নন্দলাল। কাজের মধ্যে মন ফস্ ফস্ করা ভাল নয়। কে আবার মেয়েমানুষের জন্য রোজ ছুটে যাবে গোঁসানীমারীতে।

এক মুহূর্ত সকলেই নির্বাক। সহদেব তার ভাবলেশহীন সাপ চকচকে চোখে দেখল কাপিলাকে। ওইটি তার চাউনির রকম।

কাপিলা নন্দলালের গা ঘেঁষে শিউরে উঠে বলল, ওই যে গ', মা গোঁসানী আসছে গ', আর দেরী নেই।

সবাই দেখল, খুটামারী আসছে।

লকলকিয়ে আসছে রাশি রাশি বাসুকীর মত কিলবিল করে। আবার হাঁক দিল সহদেব, হ, আইতেছে। কী লইবা গুছাইয়া লও ঠাইরেন। ব'লে সে ছুটল মালঘরে। নন্দলাল ছুটল তার ঘরে। সঙ্গে ছুটল কাপিলা। কোনদিকে না তাকিয়ে নন্দলাল আগে খুলল বাকসের ডালা। ভুঁড়ির ওপরে করল আর এক ভুঁড়ি। তার জীবনের সব পরমার্থ বালিশের খোলে ভরে কষে বাঁধল কোমরে। কাঁচা টাকা আর নোটে কুলো হাজার সাত আট।

কাপিলা এটা ধরতে ওটা টানে। এটা টানতে ওটা। জামাকাপড়ের ঠিক নেই। সর্বাঙ্গ উদাস। এদিকে বেড়ায় সর্‌সর্ চালায় মড়্‌মড়্। গায়ের উপরে উড়ে উড়ে পড়ছে দিশেহারা আরশোলা। পায়ের উপর দিয়ে ডাক ছেড়ে পালাচ্ছে ইঁদুর। মিথ্যে নয়, যাবৎ জীবের শমন এসেছে। মানুষের চেয়ে বড় ভয় যাকে, সে এসেছে। সবাই পালাচ্ছে। উঠোনের ডেয়ো পিপড়ের সার এ ঘরেরই বেড়া দিয়ে উঠছে মাচানে। মাকড়সা উঠছে সেখানে বাসা ছেড়ে। কাপিলা ডুকরে উঠল, আমি কি করব গ' গোঁসাই মহাজন।

নন্দলালের হাত কাঁপছে। তবু অদ্ভুত সাবধানী আর নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠেছে তার চোখ মুখ। খেঁকিয়ে বলল, করবি তোর মুণ্ডু। গয়নাগাটি যা আছে সব বেঁধে নে। এদিকে বান ওদিকে সাদেব শালার নজর দেখেছিস্।

সহদেবের নজর! ছোট দুটি সাপ চকচকে চোখ ভেসে উঠল সামনে। অমনি কাপিলার অনেক পোড় খাওয়া বারোজীবিনী মনটাও ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। বলল, খুন করবে নাকি?

নন্দলাল ফতুয়ার নীচে, কোমরে এক-খানি ধারালো ভুটানী দা' গুঁজতে গুঁজতে বলল চাপা গলায়, তা' করতে পারে।

ঃ করতে পারে?

ঃ পারে। সোনা আর টাকা নিয়ে কথা। সবাই সব করতে পারে।

ঃ ও গ' মা গোঁসানী গ'।

কানের দুল, গলার হার, হাতের চুড়ি, সব খুলে খুলে টিনের সুটকেসে ভরতে লাগল কাপিলা। তার কিছু সোনা, সামান্য টাকা, খান কয়েক কাপড় জামা। তার ইহকালের ধন, পরলোকের শান্তি। দিন-হাটার বাজার ভাল ছিল। তারো ছিল কিছু রূপ। আর কিছু করেছে সে। তারপর দিনহাটার বারোবাসর থেকে নন্দ-লালের এক বাসরে এসেছিল আরো সুখের আশায়। আরো আয়ের আশায়। এসেছে এই গাঙের বেড়ি লকলকে ঢলঢলে অরণ্যে। এখানে দিনহাটার কুড়ি গোনা হিসাবে সোহাগ বেচা নয়। নগদ কাঁড়ি উপচে ঢালা সোহাগ খেয়ে খেয়ে তারো রূপ হয়েছে লকলকে ঢলঢলে। নন্দলাল টাকার নেশায় সোহাগ করেছে, নতুন নতুন জিনিসের বায়না করেছে কাপিলা। করেছে, পেয়েছেও। সেই সোহাগ চেয়ে চেয়ে দেখেছে সহদেব। দেখেছে ওই চোখে। তখন যেন মনে হত, বেসামাল বাপ মায়ের এক কাণ্ড দেখছে অবুঝ ছেলেটা। কাপিলার রক্তে বারোবাসরের লীলা। সহদেবের ওই চোখের দিকে তাকিয়ে সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে হেসেছে খিল্‌খিল্ ক'রে। মাতলানী হয়েছে বাতাস লাগা বন জিয়ল-হিজলের মত।

নন্দলাল উঠেছে খ্যাঁক ক'রে, হেই, আরে হেই শালা, দেখছিস কি প্যাট্ প্যাট্ ক'রে, অ্যাঁ?

ওই নিষ্পলক গোল চোখ আরো গোল হয়েছে সহদেবের। বলেছে, আজ্ঞে?

ঃ আজ্ঞে? শালার আজ্ঞের নিকুচি করেছে। মায়ের সাঙা দেখছিস ...কা! যা, চুলোয় আগুন দি'গে যা।

মুখ ফিরিয়েছে, আগুনও ...য়েছে। কিন্তু হেঁড়ে গলায় আবার গা... ...রেছে,

বউ লইয়া যাইতেছিলাম
বউয়ের বাপেরবাড়ি
রাইক্কসী পদ্মায় খাইল হে।
না'য় দিছিলাম খাড়া পাড়ি
হায় কি অতিসারি হে
সোহাগীরে খাইল রাইক্কসী।

অর্থাৎ বাপের বাড়ি যাওয়ার পথে বউ ডুবে মরেছে পদ্মায়। গান শুনেও হেসে মরেছে কাপিলা। রঙ্গ ক'রে বলেছে, আহা গো আমার সোহাগীর ভাতার!

সহদেব অপলক গোল চোখ তুলে হেসেছে বোকার মত। সেই মুখ মনে ক'রে এখন আতঙ্কে মরছে নন্দলালের সোহাগী।

আরো গা'য় সহদেব,

আমার বাপ হইয়াছেন চোর
আমি হইয়াছি ছোঁচা
সরকার বাহাদুর দিছেন আমাগো
বড় একখান খাঁচা।

খাঁচা অর্থাৎ জেলখানা। বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে কাপিলার। হায় গো মা গোঁসানী!

চোরের ছেলে ছোঁচা নয়, ডাকাত হয়। এখন সেই অবুঝ গোল চোখের চাউনি মনে করে শিউরে শিউরে উঠছে বুকের মধ্যে।

বেড়ার গায়ে পড়ছে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। জলের খল খল ধ্বনি ছাপিয়ে চীৎকার ভেসে এল, বড় নিশিন্দার পায়ে খাইল কত্তা। শীগ্‌গির ....।

বড় নিশিন্দার পা! বড় নিশিন্দা গাছের গোড়ায় এসেছে খুটামারীর জল। অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে লাফ দিয়ে বেরুল নন্দলাল। পড়িমরি ক'রে কাপিলাও ছুটল। দেখল,

পুবের বাঁশঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সহদেব। কেন, ওদিকে কি।

কাঁপে নন্দলাল, তবু মেজাজ মানে না। বলল, আরে ওই হারামজাদা। ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস তুই?

—কুলচাঁদ্দির বাবার তলায়।

কুলচাঁন্দির বাবার তলায়। গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠল নন্দলাল আর কাঁপলার। ওই কুলচাঁন্দির হিজলবনে? যেখানে এক মানুষের ফাঁক নেই, আকাশ ছোঁয়া বিশাল হিজলবন জট পাকিয়ে আছে। সূর্যের আলো ঢোকে না, দিনমানেও যেন ঘুট-ঘুট্টি অন্ধকার। বাতাস ডাক ছাড়ে বিষাণ বাজিয়ে। আরো ডাক ছাড়ে হিস্‌হিস্‌ ক'রে শিস্ দিয়ে স্বয়ং কুলচন্দ্রের বাহন নাগ নাগেশ্বরেরা। হিল্‌বিলিয়ে খেলে ডালে ডালে পাতায় পাতায়, বিষের আনন্দে ছোবলায় খট্ খট্ ক'রে।

কেঁপে উঠল দুজনে চোখাচোখি ক'রে। কাঁপলা অবশ জিভে ডাকল, মহাজন!

মহাজন আবার চীৎকার ক'রে উঠল, ওখানে কি মরতে যাব রে হারামজাদা?

তেমনি চিৎকার ক'রে জবাব দিল সহদেব, না কত্তা, বাঁচনের লেইগ্যা। ওই উঁচান ছাড়া আর উঁচান নাই এই তল্লাটে। বাঁচাইলেও উনি, মারলেও উনি। আর দিক কইয়েন না। মটকুলা ঝাড়ে মুখ দিল খুটোমারী.

মটকুলাঝাড়ে মুখ দেওয়া মানে, জল ঘরের কোল ধরব ধরব করছে। পিছনে মরণ। সামনে মরণ। তবু সামনের মরণের কিছু দেখা বাকী আছে। পিছনে যে নির্ঘাৎ মরণ তেড়ে আসছে।

নন্দলাল ছুটল সহদেবের দিকে। কাঁপলা তার গায়ে গায়ে।

সত্যি, আর উঁচু জায়গা নেই এ তল্লাটে। কুলচাঁন্দির বন ছাড়া। কে কোন্ যুগে ওখানে শিব প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রতি চৈত্র-সংক্রান্তিতে সারা বছরে একদিন লোকে যায় ওখানে পুজো দিতে। মানত মানসিক বলি, ওই একদিনের জন্যে কুলচাঁন্দির হিজলবন মানুষের পুজো খায়। বলির মাথাগুলি দিয়ে যেতে হয়। কোন জায়গায় নয়, যেদিকে খুশি ছড়িয়ে ছুঁড়ে দাও। যার নেওয়ার সে নিয়ে যাবে। ফিরে তাকাতে নেই।

এখানে বাঁশ ঝাড়, ওখানে বেতবন। পাখী পাখা ঝাপটা দিচ্ছে। চোখে নজর নেই। যেন পাখা ঝাপটায় রাত কেটে আসবে দিনের আলো। তখন উড়বে।

বাঁয়ে রেখে খুটোমারী, কুলচাঁন্দির উঁচু জমির চড়াইয়ে পা' দিল তিনজনে। নন্দ-লালের হাত থেকে বাতি নিয়ে আগে আগে সহদেব। ওই দেখা যায়, কালোর 'পরে গাঢ় কালো কুলচাঁন্দির জটা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সহদেব। নন্দলাল চেঁচিয়ে উঠল, কী? কী দেখছিস্?

সহদেব বলল, দেখি, খুটোমারী বড় জবর খুটা খুলেছে কত্তা। কেমুন ভিলকাইয়া ছুটতেছে।

ব'লেই আবার হঠাৎ চলতে আরম্ভ ক'রে চীৎকার ক'রে গান ধরে দিল,

একবার গুরুর নাম নে রে বাশী
তর সব খেলা যে ফুরাইল--

ধক ক'রে উঠল নন্দলালের বুকের মধ্যে। কাঁপলারও। কেন, এই গান কেন গায়। কী বলতে চায়। চোখাচোখি করল দুজনে। নন্দলাল ডাকল, এই এই......

সহদেব গানে মত্ত। জবাব নেই। নন্দলাল চীৎকার ক'রে উঠল, হেই হেই শালা—

—আজ্ঞে।

সহদেব ফিরে তাকাল। হ্যারিকেনের আলোছায়ায় চকচক করছে সহদেবের গোল চোখ। কী দেখছে, বোঝা যায় না। কেবল চাউনিটা যেন আরো উদ্দীপ্ত দেখাচ্ছে। নন্দলাল কোমরে হাত দিয়ে বলল, গান কিসের গান এখন?

—কিস্যার গান? সহদেবের মোটা মোটা ছুঁচলো ঠোঁটের কোণে যেন কেমন একটু হাসি। বলল, কমু নে কত্তা, কিস্যার হাসি। অখন ওঠেন তাড়াতাড়ি। দেখেন নালীগাঙ রত্নাইও ফুঁসতেছেন। ব'লে পিছন ফিরে আবার হাঁটা ধরল। কথাগুলি যেন কেমন কেমন লাগে সহদেবের। নন্দলাল চায় কাঁপিলার দিকে, কাঁপিলা চায় নন্দলালের দিকে। একজনের টাকা, সোনা আর একজনের। কিন্তু পিছন ফিরতে পারে না। এগুতেই হয়।

সামনে হিজল বন, ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। মোটা মোটা ডাল, একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরেছে, পাকিয়ে পাকিয়ে যেন মাথার 'পরে ছাদ করে ফেলেছে। পাশে পাশে বেত, মটকুলা, বিষকাটালি, কালকাসুন্দের ঠাসাঠাসি বিস্তার।

যত ওঠে, ততই গলা চড়ে সহদেবের,

যত পাপ কইরাছ এই সংসারে আসি
(আইজ) সেই পাপ সেরেস্তার সরকার মশাই
আইলো।

অ'রে এইবার একবার গুরুর নাম নে। সুরের মধ্যে বেসুর বেশী। তার চেয়ে বেশী হুকুমের সুর। যেন কাকে হুকুম করছে। গুরুর নাম নে এইবার। তারপরে হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বলল, আসতেছেন কত্তা? আসেন, আসেন। বলে চীৎকার ক'রে উঠল হিজলবনের দিকে তাকিয়ে, চৈত মাসে অনেক মাথা খাইছেন গো আপনেরা, এইবার মাইনষের মাথা আইছে। একটু দয়া ধম্ম কইরেন, হেঁ হেঁ হেঁ.....।

কাঁপিলার দিকে চেয়ে চোখের চারপাশ কুঁচকে একটু যেন হাসল সহদেব। নন্দলাল দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বুকের মধ্যে কেমন যেন ঢিপ্‌ঢিপ্ করছে। খেঁকিয়ে উঠল, কাকে বলছিস। এ সব কাকে বলছিস্?

সহদেব অমায়িক ভঙ্গিতে বলল, আজ্ঞে, এই বাবার তলার ওনাগোরে একটু শুনাইয়া দিলাম আর কি!

একটু গূঢ় রহস্যের সুরে আবার বলল, দরকার, বোঝলেন কত্তা, এট্টু দরকার এইসব কওয়া।

হিজলের জটের গায়ে পৌঁছেচে তখন তিনজনেই। এখানে আকাশ নেই, বিজলী হানে হিজলের জটায়। বৃষ্টিটা নামল জোরে। কিন্তু এখানে জটার ফাঁকে ফাঁকে জল পড়ে টুপটাপ ক'রে। বাতাসে ঘর্ষণ লাগে ডালে ডালে, মনে হয় যেন দাঁত কড়মড় করে কারা মাথায় উঠবে।

হ্যারিকেনটার আলো টিকিয়ে রাখা দায়। বাতাসে মরো মরো শিখা, নিভু নিভু করে। বুকের কাছে প্রায় সাপটে ধরে সহদেব হ্যারিকেনটি। বলে, আস্তিক আস্তিক আস্তিক। জয়মা মনসা। এইখানে ঠাঁই করেন অখন কত্তা, আর যাওনের কাম নাই।

ব'লে ফিরে তাকাল। চোখাচোখি হল তিনজনের। কাঁপিলা লেপটে আছে নন্দলালের বুকের কাছে। যেন জলজ্যান্ত যম দেখছে চোখের সামনে।

সহদেবের চোখ পড়ল কাঁপিলার দিকে। সেই সাপ চকচক গোল চোখ। বলল, ঠাইরেন, তোমার শীতে ধরেছে। ওইটা শীত না, মরণ কপাট লাড়তেছে বুকের মধ্যে, হ। মন শক্ত কইরা থাক।

দুজনেই কাঁপছে গায়ে গায়ে। কুলচান্দির হিজল বনকে যত না ভয়, তার চেয়ে বেশী ভয় মানুষকে। সহদেবের মধ্যেই যেন হিজল বনের আসলমূর্তি উঠেছে ফুটে। কী বলতে চায় সাপটা! সব কথার মধ্যেই যেন কিসের একটা ইঙ্গিত। নন্দলাল ঢোক গিলে, রুদ্ধ গলায় বলল, কী বলছিস্ তুই—

সহদেবের চোখ পাকিয়ে উঠল। বলল, কই যে, দেখেন না চারদিকে, ওং পাইতা রইছে সব। আর ডরাইয়া কি হইব। এইবার পরাণ শক্ত করেন।

নন্দলাল অসহ্য ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল, কেন?

—ক্যান্? যেন সাপের ফনাটা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তাকাচ্ছে দুজনের দিকে। এক পা' এগিয়ে এল কাছে।

নন্দলাল চীৎকার করে উঠল, এই, এই, সহদেব গম্ভীর গলায় বলল, কই বোলে, কত্তা, ইষ্টনামে পরাণ ঠান্ডা হয়, ডর যায়।

ব'লে একবার তাকাল চারদিকে। নন্দলাল কাঁপিলাও তাকাল। টের পাওয়া যাচ্ছে। আশে পাশে গো-সাপ কিংবা আর কিছুবা সব চলেছে সরসর ক'রে। মাথার উপরেও ফোঁস ফোঁস করছে কিছু। বান দেখে রাগে ভয়ে দংশাচ্ছে হয় তো আগডালে।

সহদেবের নাকের পাটা সাপের মত ফুলে ফুলে উঠছে। জলের গর্জনের প্রতি ইশারা ক'রে বলল, ওই শোনেন বাবা বুড়া তোরসা কেমুন ডাক দিতেছে। সারা সংসারটা ধোঁয়াইব। রাইতটা না পোহাইলে কিছু বোঝা যাইব না।

মুখ ফিরিয়ে বুড়ো তোরসার গর্জন ছাপিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। চীৎকার ক'রে উঠল ভয়ার্ত তীব্র কণ্ঠে,

কামিনীজনরে মা বলিস্ নাই
সংসারে সার কাঞ্চন করছিস্
আইজ তোর ভরাডুবি,
একবার গুরুর নাম নে......

নড়তে পারে না, সরতে পারে না, কুলচান্দির জটের মত যেন জট পাকিয়ে গেছে নন্দলাল আর কাঁপিলা। আর দুজনের বুকের ধক ধকানিতে সত্যি যেন 'গুরু গুরু' ধ্বনি বাজছে। গুরু গুরু—গুরু গুরু! জলে স্থলে, গাছে, মেঘে, বুকে, সর্বত্র এক ধ্বনি।

তারপর রাত পোহাল। নিবিড় বন, দুর্জয় মেঘ আর সর্বনাশা জল। এই তিন ছাড়া নেই কিছু আর আকাশ পাতালে। তিনে মিলে দিনেরবেলাও ঘোর ঘোর অন্ধকার। সিঙ্গিমারি, রত্নাই আর থুটোমারী মিশেছে কুলচান্দির তলায়। ফুঁসছে, পাক খাচ্ছে, আবর্তিত হ'য়ে ছুটেছে খলখল ক'রে। নামছে দক্ষিণে, জিলা রংপুর ভাসিয়ে। নন্দলালের ঘর ডুবেছে অর্ধেক, এখনো ভাসেনি! চাল ডিঙিয়ে, ওপারে শিমুলের মাথাটা কাঁপছে থরথর

করে। যেন টঁুটি টিপে ধরে কেউ ঝাঁকুনি দিচ্ছে। ওখানে ঝাপাই ঝুরছে রক্তনাই আর খুটোমারী।

তিনজনেই ভিজে তখন ঢোল। হ্যারিকেন নিভেছে অনেকক্ষণ। সহদেব বলল, আর একখান বেলা। ওইবেলা আর ঘরখান থাকব না কত্তা। নন্দলাল আর কপিলার ভয় তখন একটু থম খেয়েছে যেন। নন্দলালের পরনের গোটা কাপড়টি গুটিয়ে এসেছে প্রায় কোমরে। সারারাত্রি ধরে টেনেছে উত্তেজনায়।

কপিলার বগলদাবায় টিনের সুটকেশ, তার জীবন-মরণ। চোখের কোলের পরিখায় এখনো মৃত্যুভয় কিলবিল করছে। চুল গেছে খুলে, আঁচল গেছে খসে। জামার আঁট এমনিতেও নেই, এখন পুরো উদাস। সোহাগে নয়, এখন ভয়ে খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে সর্বাঙ্গ। ঢলঢলে গাঙ যেমন টানে শুকিয়ে যায়।

দুজনে গায়ে গায়ে বসেছে গুটিয়ে। বলি-ভীত পশু দুটি এতক্ষণে একটু জীবনের সাড়া পেয়ে যেন দেখছে আশে-পাশে।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সহদেব, হিলহিলে কালো। নাক-মুখ নেই, গোল দুটি চোখ।

হিজলবন আরো উঁচুতে উঠেছে। জলে ভিজে আরো কালো চকচক করছে শত শত হিজলের বাকল ফাটা গা। তার ঠাস বুনোনি ফুঁড়ে বেশীদূর নজর চলে না।

হঠাৎ শিউরে উঠল কপিলা। নন্দলালও টের পেয়ে তাকাল। তারপর দুজনেরই নজর গিয়ে পড়ল সহদেবের উপর।

কী যেন দেখছে আতিপাতি করে সহদেব দুজনের দিকে। হাতের দিকে, কোমরের দিকে। আর একবার কোমরের কাপড় মুঠো করে ধরল নন্দলাল। বলল, কী, কী দেখছিস?

কোন ভাব নেই সহদেবের মুখে। বলল, দেখতেছি, কী আনছেন ঘর থেইক্যা।

কী এনেছি? প্রায় লাফ দিয়ে উঠল নন্দলাল। চীৎকার করে বলল, কেন রে, শালা, কেন অ্যাঁ?

মনে হল দুজনেরই বুক দুটো ফেটে যাবে এখুনি ভয়ে। হাত দিয়ে বোধ হয় ছুটোমীদাটা বের করতেও পারবে না।

সহদেব সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, তেমনি অপলক চোখে তাকিয়ে বলল, না, কই বোলে, আসার সময়; দুগা চিড়ামুড়ি লইয়া আইলেন না? প্যাটে কিছু পড়া তো দরকার।

কয়েক মুহূর্ত শুধু, নিষ্পলক চোখা-চোখি। তারপর নন্দলাল তাকাল কপিলার দিকে। কই, কাপড়েই তো বাঁধে পড়েনি চিড়ামুড়ির কথা। [illegible] পিছনে মরণ। একদিকে প্রাণ, আর একদিকে প্রাণপাত করা টাকা আর গয়না। [illegible]

দামী। তখন কি কারুর চিড়ামুড়ির কথা মনে থাকে।

সহদেব খুলে বসল বেতের ঝুড়িটি। ওইটি নিয়ে এসেছে সে। বেতের ঝুড়ি থেকে বার করল হুঁকো কলকে তামাক, টিকে আর খটখটে দেশলাই। বলল, আমার কাম আমি করছি কত্তা। তামুক সাজাই, এট্টু ভাল কইরা খাইয়া লন।

মেঘের ডাক নেই আর। বিদ্যুতের কষাঘাত নেই। বন্যার ঢলের মত ক্রমাগত মেঘও যেন ফেঁপে ফুলে ছুটে চলেছে। তার সঙ্গে বৃষ্টি।

এখানে, হিজলের তলায় জল কম পড়ে। বেশী পড়ে গাছের গা বেয়ে। তলায় মাটি নেই প্রায়। হিজলের গোড়া-ই কিম্ভূত আকৃতিতে ছড়িয়ে আছে। যেন উঁচুনীচু কালো পাথর ছড়ানো। ফাঁকে ফাঁকে তার বেত মটকুলার বিস্তার। হুঁকোটি নন্দলালকে দিয়ে সহদেব বলল, দেখেন, যেইদিক দিয়া আইছিলাম, সেইখানে অখন বুক-ডোবা জল হইছে। পলে পলে বাড়তেছে। পুবের রিফুজি ক্যাম্পটাও দেখা যায় না এইখান থেইক্যা। এতক্ষণে সব বোধ হয় ডুবল। জল যান কালী-নাচ নাচতেছে। দ্যান কত্তা কইলকাখান। তারপর একবার দেইখ্যা আছি উত্তরের গতিকটা।

নন্দলাল কলকেটি দিল। দুটি টান দিয়ে কলকে রেখে উঠে গেল সহদেব। বলল, বসেন এট্টু আপনেরা। জয় বাবা কুলচান্দি।

আরে মনে আর তর বেরথা ভাবনা
নিজের গত লীলা চাইয়া দ্যাখ্‌না।
এইবার ভবলীলার শেষে অক্কা,
একবার গুরুর নাম মে বাসী......

গান নয়, বন্যার রোল ফাটানো তীব্র চীৎকার করতে করতে হিজলের জটায় হারিয়ে গেল সহদেব। যেন কাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভয়ার্ত জেদী গলায় গান শোনাচ্ছে সহদেব সেই যাত্রার আসরের বিবেকের মত। হিজলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে গান সারা কুলচান্দিময় পাক খেতে লাগল।

হুঁকো ফেলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল নন্দলাল। কপিলাও উঠল। ডুকরে উঠল কপিলা, কী গোঁসাই, কী করবে?

সহসা যেন সুযোগ পেয়েছে নন্দলাল, এমনিভাবে উঠল লাফ দিয়ে। বলল, পালাব।

—পালাবে? কোথায় পালাবে গো?

একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠেছে নন্দলাল। কপিলার কথা শুনে হঠাৎ আবার নিভে গেল। সত্যি, কোথায় পালাবে। সে শূন্য উদ্দীপ্ত চোখে ফিরে তাকাল কপিলার দিকে।

খোলা চুলে বাতাস লেগেছে মেয়ে-মানুষটার। বুক এলোমেলো বেশে যেন সাক্ষাৎ কালীমূর্তি যা জেলেনী। [illegible] আসরের [illegible] একবার গুরুর নাম সে...।

আর মহামাত্তাংগিনী জল যেন বিদ্রূপ করে হেসে চলেছে চারপাশ দিয়ে। কোথায় যাবে। সহদেব সরে যেতেই হঠাৎ একটা মুক্তির পথ যেন স্বপ্নের মত দেখা দিয়েছিল।

তারপর গানটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল দূরে। অমনি নন্দলাল আরো শক্ত হয়ে উঠল। বলল, নজর রাখ কপিলে, শালা কোন্‌খান দিয়ে নিঃসাড়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারবে। নিশ্চয়, নিশ্চয়......

মুহূর্তে সারা হিজলবন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠল। কোন্‌খান দিয়ে শমন আসবে নিঃশব্দে, আচমকা।

হিজলের ডালে ডালে ঘর্ষণের কড়-মড়ানি। জলের খলখল্, কলকল। নন্দলালের হাতে চক্‌চক্ ক'রে উঠল ভুটানী দা'খানি।

কপিলা বলল, মহাজন, লোকটাকে তো কালে খেতে পারে। কোন সাড়াশব্দ নেই।

কি একটা বলতে যাচ্ছিল নন্দলাল। ঠিক সেই মুহূর্তে, কয়েক হাত দূরের একটি হিজলের আড়াল থেকে বলে উঠল সহদেব, কত্তা, গতিক কিন্তুন ভাল না।

দুজনেই চমকে ফিরে তাকাল। সহদেব এগিয়ে এসে বলল, চলেন, আর এট্টু উপুরে যাই।

—কেন?

—মনে লয়, বাবার এই পুণ্যের তলা-খানও ভাসাইয়া দিব। মইরচা লালবাজার শীতলকুচি সব ডুইব্যা গেছে দেখলাম।

—দেখলি?

—হ, দেখলাম কি আর অন্দুর গিয়া দেখলাম কত্তা? জল দেইখ্যা ঠাওর পাইতেছি। মনে হইল জলডাহা গাং আশমান দিয়া আইতেছেন। ওনার লগে মিশছেন সুঙ্কজনা আর দুদুয়া। ত'য় বোঝেন, ভাই বইনের হাত ধইরা মিশছেন তিস্তা আর তোরসা। মনে লয়, নীচের পুবে ফালিমারি গীতলদার মাটি আর কোনদিন দেখা যাইব না।

আর কোন কথা নেই কারুর মুখে। সহদেব বেতের ঝুড়ি আর হুঁকোটা তুলতে গিয়ে, কয়েক পলক তাকিয়ে রইল ভুটানী দা'য়ের দিকে। বলল, দা'ও আনছেন কত্তা? ভালই করছেন। খুব ধার মনে হইতেছে। এক কোপেই দুইডা মাইনষের গলা বোধ হয় কচুকাটা করা যায়। রাইখ্যা দেন। জায়গাটা তো ভাল না, দরকার হইতে পারে।

বলে উপরে উঠতে লাগল। নন্দলাল আর কপিলা উঠতে পারছে না। বুকের রক্ত তোলপাড়। কিন্তু শরীর যেন অবশ। গুরু গুরু ডাক ছাড়ছে বুকের মধ্যে।

জল উঠছে সত্যি। কুলচান্দির নীচে হিজলের পা ধরেছে।

নন্দলাল ফিস্‌ফিস্ করে বলল, শালা শেষ করবে বোধ হয়।

কপিলা বলল, তোমার হাতে দা। সাহস করে চল মহাজন। জল যে উঠছে!

সাহস করে উঠল দুজনে। একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে কুলচন্দ্রের লিঙ্গমূর্তি। কালো কুচকুচে, জলের ধারায় চক্‌চকে প্রস্তরলিঙ্গ, হিজলের বেষ্টনীতে।

জয় বাবা কুলচান্দি। যা কর বাবা তুমি, অগতির গতি। রাখলে বাঁচলাম, না রাখলে মরলাম। বস গো ঠাইরেন।

সহদেব বসল একটি গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে। বৃষ্টিটা ধরব ধরব করছে। কিন্তু এখান থেকে আকাশ প্রায় দেখাই যায় না। সেই রাতের অন্ধকারই ফিরে এসেছে আবার। বাতাস আর জলকল্লোলের শব্দ এখানে এসে পৌঁছুচ্ছে কেমন এক বিচিত্রনাদে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে গলা ফাটিয়ে।

সহদেব চোখ বুজে রয়েছে। নন্দলাল আর কপিলা তীব্র ভয়-সন্দেহান্বিত চোখে দেখছে সহদেবকে, মাঝে মাঝে আশেপাশে। আর গা থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলছে পিপড়ে। কাঠ পিপড়ে।

একটু বাদেই লক্ষ্য করে দেখল, সহ-দেবের মুখটা এক এক জায়গায় ফুলে উঠে ভয়াবহ দেখাচ্ছে। পিপড়ে কামড়েছে। চোখ বুজেছিল একটু। গাছ থেকে ঝরে পড়ছে টপ্‌টপ্ করে। মেরে মেরে শেষ করা যায় না যেন।

তারপর বলল সহদেব, মাইনষের মরণডা কিছু না, বোঝলেন নি? কিছু না। জলেরে লোকে কয় পরাণ। কিন্তুন এই জল মাইনসের পরাণ না খাইয়া থাকতে পারে না। যদি সজুত থাকেন, শক্ত থাকেন, তাইলে যুদ্ধ করেন। হ' যুদ্ধ, জলের লগে। হাত দিয়া, ঠ্যাঙ্গা দিয়া তো আর মারতে পারবেন না। তবে কি? না, বানের জল হইল কানা। সব দিকে তার টান সমান না। সেইটা দেইখ্যা আপনেরে ভাসতে হইব।... কত্তা, এই জীবনে দুইবার আমি কিত্তি-নাশার মুখের গরাস হইয়া ছাড়ান পাইছি। একলা না, গতরে ক্ষ্যামতা আছিল, দুই-চারজনরে বাঁচাইছি। এইবার তিনবার......

সহদেবের গলা ডুবে গেল যেন দূরে বুড়ো তোরসার পাগলা হাঁকে।

নন্দলাল আর কপিলা উৎকর্ণ হয়ে রইল, আরো কিছু শুনবে। আরো কিছু যা হোক, শুধু মানুষের গলার কথা। নইলে কুলচান্দির হিজলের জটায় যেন বুড়ো তোরসার ক্ষুধিত ক্রুদ্ধ গর্জন, জলঢাকার ঘূর্ণি-হুঙ্কার, ধরলার অট্টহাসি চারপাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে খেতে আসে।

নন্দলাল ঢোঁক গিলে বলল, তোর সেই গান......গানটা গা' না।

দাঁতে দাঁত পিষে, গলার শির ফুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল সহদেব,

চউখ না চাইলেও তর নিস্তার নাই
আন্ধারে শমন দ্যাখা দেয় রে
এইবারে আর ছাড়ান নাই,
একবার নাম নে বাসী।......

নন্দলাল শিউরে উঠে বলল, থাক, থাক, আর গাসনি।

সহদেব দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, ওই যে, ফাঁকে দেখা যায়, ঘরের চাল ধরতেছে জলে। কুলচান্দিরও কোমর ধরতেছে। একটা বেলা গেল।

একটা বেলা গেল। আর একটি বেলা আসছে, রাত্রিবেলা।

উঠতে গিয়ে হঠাৎ নন্দলালের কোমর থেকে বালিশের খোল পড়ে গেল। প্রাণের খোল। দু হাতে সাপটে ধরে সহদেবের দিকে তাকাল। সহদেবও তাকিয়েছিল থলিটির দিকে। নন্দলাল প্রাণপণে জোরে আঁকড়ে ধরল ভুটানী কাটারি। সহদেব চোখ ফেরাল একবার কপিলার দিকে। কপিলাও দাঁতের ফাঁকে তার সমস্ত চেতনাকে টিপে ধরে তাকিয়েছিল।

সহদেব চোখ বুজে একটি নিঃশ্বাস ফেলল। আর চোখ খুলল না। নন্দলাল আর কপিলা বিস্মিত ভয়ে চোখাচোখি করল। তারপর হঠাৎ নন্দলাল ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল, স'দেব, এই!

—আজ্ঞে!

তোকে আমি কিছু টাকা দেব।

সহদেব ততক্ষণে পিঁপড়ের জ্বালায় মাথায় গামছা জড়িয়েছে। গোল চোখ দুটি উদ্দীপ্ত করে বলল, টাকা দিবেন? ক্যান্?

নন্দলাল বলল, একবার যদি গোসানী-মারীতে আমার ভাগ্নেকে খবর দিতে পারিস্—

সহদেব মুখ ফিরিয়ে তাকাল উত্তর পুবে। কিছুই দেখা যায় না। জটিল জটা হিজল ঘিরে রেখেছে চারদিক। কেবল জলোচ্ছ্বাসের গর্জন।

নন্দলাল উৎকণ্ঠিত আশায় বড় বড় চোখে দেখছে সহদেবকে।

সহদেব বলল, জলডাহা চাকী ঘুরাই-তেছে গিদারী গাঙে। কত্তা, আপনারে কইতেছি না, যাবৎ গাঙের চলানী এই

পৌষের মেলা

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

ব্লক ও মুদ্রণ : বেংগল অটোটাইপ কোং

শ্রীরতন মণ্ডলের সৌজন্যে

দিকে। গিদান্নী আমারে আস্ত গিলব। পারলে যাইতাম।

যাবে না। বসে বসে দেখবে সকলের মরণ তারপর দ্ু' হাতে সাপটে নেবে সব। আবার বলল সহদেব, ক্ষ্ুধা লাগছে কত্তা, না? হ' লাগবই তো। যদি দ্ু'গা চিড়া-ম্ুড়ি আনতেন। প্যাটের জ্বালা, বড় জ্বালা। কি কও গো ঠাইরেন? ব'লে কপিলার দিকে তাকাল। কপিলা যেন ভয় পাওয়া একটি ছোট মেয়ে। ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

সহদেব আবার বলল, কত জ্বালা সম্সারে। জ্বালায় পাগল হইলে আরো জ্বালা। অখন মন থির রাখতে হয়।

যেন তার ক্ষিদে তেষ্টা নেই। কিন্তু অস্থির হয়ে উঠেছে নন্দলাল। অস্থির হ'য়ে উঠছে আবার হিজলের জটা। বাতাস লাগছে, রাত এসেছে। এ রাতে আর বাতি জ্বললো না। তেল নেই হ্যারিকেনে। ক্রমে সহদেবের গলা চড়ছে আবার। যা বলছে, সব চে'চিয়ে। চে'চিয়ে কুলচান্দির জয়ধ্বনি দিচ্ছে। আবার বলছে, প্যাটের জ্বালা প্যাট থেইক্যা পইড়াই দেখতেছি কত্তা। যাবৎ জীবের জ্বালা।

আবার বলছে, কই হে বাবার বাহনেরা! একটু ডাকডুক্ ছাড়েন। আমরা যে একলা রইছি। অর্থাৎ শেয়ালকে ডাকতে বলছে। কিন্তু তারা হয়তো এই তিনটে মান্ুষের ভয়েই ল্ুকিয়ে ফিরছে আশেপাশে।

ভোরবেলা দেখা গেল, ঘরের চাল ডুব্ু-ডুব্ু। নীচের হিজলের সারির ব্ুক ছাড়িয়ে জল উঠেছে। তিনজনেই গণ্ডূস ভরে খেল বানের জল।

খেয়ে শ্ুধ্ু গা বমি বমি করছে। বন্যা-জলের ঘ্ূর্ণির মত পেটে গিয়ে পাক দিচ্ছে জল। পাক দিয়ে ফিরছে মরণ। চার দিক দিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে গ্ুটিয়ে ফেলছে। তারপর এক গরাসে সাবড়াবে।

নন্দলালের পরনের কাপড় একেবারে ভেজা, দ্ুর্গন্ধ বের্ুচ্ছে। দেহের স্নায়্ু আর ইন্দ্রিয়ের বন্ধন ঘ্ুচে গেছে একেবারে প্রাণ ভয়ে। তার উপরে পেটের জ্বালা।

কপিলার ম্ুখের সব রস শ্ুষে নিয়েছে ম্ৃত্যুভয়। কিন্তু। চোখে এক অস্বাভাবিক চকচকানি। সরে এসেছে সহদেবের গায়ের কাছে। ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও যেন চিক্চিক্ করে। এ যে সেই সোহাগ-ঢলানী কপিলা। মরণের সময়ও রঙ্গ।

সহদেবের গোল চোখ লাল টকটকে হয়েছে। অপলক চোখে দেখছে কপিলাকে। নিঃশব্দে কী যেন ইশারা করছে কপিলা, লেপটে আসছে গায়ের সঙ্গে। চোখ নন্দলালের ফোলা ফোলা গোল মুখখানি আবার আলায় উদ্দীপ্ত হয়েছে।

সহদেব বলল, কিছ্ু কইবা, ঠাইরেন?

[illegible]

কপিলার চুল। চোখে এক বিচিত্র ইশারা হেনে বলল, তুমি কিছ্ু চাও না আমার কাছে?

সহদেব পোষমানা অবাক পশ্ুর মত তাকিয়ে রইল। যেন কী স্বপ্ন দেখছে, কান পেতে শ্ুনছে নিজেরই ব্ুকের মধ্যে। নন্দলাল দেখছে হাঁ ক'রে নীচের দিকে চোখ ক'রে।

খে'কী রতনাই গাঙ খ্ুটামারীর ব্ুকে ম্ুখ দিয়ে হাসছে খিল খিল ক'রে।

কপিলা বলল, কি চাও, বল। নাও না, যা খ্ুশি।

শরীর দিয়ে ঠেলা দিল সহদেবকে।

সহদেব দ্ুরের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল গলায় বলল, ঠাইরেন, কি কইবা, কও।

কপিলা ব্ুকের কাছে মিশে বলল, তুমি কিত্তিনাশার হাত থেকে মান্ুষ বাঁচিয়েছো। তুমি পার গোসানীমারীতে যেতে।

—গোসানীমারী! যেন কতদ্ুর থেকে বলছে সহদেব। বলল, একলা?

কপিলার নিশ্বাস দ্রুত, ব্ুকের ধ্ুকধ্ুকুনি চাপছে সহদেবের গায়ে। বলল, আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে তাকাল অবশ নন্দলাল। একলা ফেলে যাবে তাকে। দ্ুজনে প্রাণে বে'চে গো-গ্রাস গিলে খাবে।

সহদেব বলল, ঠাইরেন, হিংগমারী দ্ুইজনের চুলে বাইন্ধা ডুবাইয়া মারব। তোমারে আর আমারে। যাইতে পারবা না। পরাণ শক্ত কর। যে তোমার কপাট ঠেলতেছে, তারে ঠেকাইয়া রাখ।

কিন্তু কাকে ঠেকিয়ে রাখবে। কপিলা নিজেকে পারছে না ঠেকিয়ে রাখতে। ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না মরণের ঢল। সে নাকি কানা। উধ্বর্শ্বাসে ছ্ুটে এসে ঘেড় দিচ্ছে চারদিকে।

চিৎকার ক'রে আবার গেয়ে উঠল সহদেব—

অরে এত যে তর ধনজন
দারা-সুত-পরিবার
তাগো লেইগ্যা তর আর
কিছু নাই করিবার।
একবার নাম নে—

নন্দলাল সহসা চিৎকার ক'রে উঠল, তোকে অনেক টাকা দেব। একশ' টাকা আগাম। এই নে, নে, একবার যা।

টাকাগুলির দিকে তাকিয়ে রইল সহদেব ভাবলেশহীন গোল চোখে। সত্যি টাকা। হিজলের জটার ঘর্ষণেও যেন শোনা যাচ্ছে, যা—যা—একবার যা।

সহদেব দু' পা গিয়ে দূরের পূব-উত্তরে তাকাল।— কলকলিয়ে বাড়ছে জল। খলখলিয়ে হাসছে। আবার অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে। মেঘ-অন্ধকার নয়, দিন যায়। বুড়ো জোরসা ডাকছে যেন দক্ষযজ্ঞের শিব-নাদে।

আবার চিৎকার ক'রে উঠল সহদেব, 'অরে, পুতের হাত ছাড় কইন্যার হাত ছাড়, আমল হাতে ধরছে তরে,
এবার তারে কর না সার, একবার নাম নে—'

প্রাণের ধন খুলল কপিলা স্যুটকেশ থেকে। বারো বাসরের জ্বালা, এক বাসরের পোড়ানি, জীবনের অতল পঙ্কে ডুব দিয়ে পাওয়া সোনা। এই মৃত্যুবাসরে দেহের জ্বালায় ছাড়ান পাওয়া গেল না। সহদেবের পায়ে লেপটে, সোনার দুল তুলে ধরল চোখের সামনে। হাতে গুঁজে দিল। দিয়ে বলল, তুমি পার, একবার চেষ্টা দেখ। যাবার আগে, একবার বস মন ঠাণ্ডা ক'রে আমার কাছ।

যেন দু' হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে চায় কপিলা সহদেবকে। সহদেব দেখছে, যেন সেই অবুঝ ছেলেটা বাপমায়ের অদ্ভুত কাণ্ড দেখছে অবাক হয়ে।

সোনা, টাকা, মেয়েমানুষ। নিদানকালে এল জীবনের সব চাওয়ার ধন। চোখ দুটি ফেটে পড়তে চাইল সহদেবের। গলার শিরাগুলি ফুলে উঠতে লাগল। তাড়াতাড়ি দুল দুটি কপিলার হাতে দিয়ে আরো দু' পা এগিয়ে গেল। তাকাল আবার সেই পূর্ব-উত্তরে, যেখানে ধরলা-তোরসার মাতামাতি দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। চুল এলিয়ে রাক্ষুসী আসছে ছুটে।

চোখ ফেটে জল এসে পড়ল সহদেবের। ভাঙা গলায় হাউ হাউ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল,

অরে বউয়ের কান্দনে আর ফিরা চাইস্ না।
আকাল-মারী-বান-কম্প ফিরে,
একবার আইলে শমন ফিরে না—

আবার মেঘ ডাকছে। হিজলের শিহরিত মাথা ফোঁস ফোঁস করছে, বিদ্যুৎ হানছে। বাবা কুলচন্দ্রের কৃষ্ণপ্রস্তর-মূর্তি নিঃশব্দে হাসছে ঝিলিক দিয়ে।

আর অন্ধকারে জল কতখানি এগিয়ে আসছে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। ভয় আর ক্ষুধা আর অনর্থক চেষ্টার যন্ত্রণা এখানে পাক খাচ্ছে। কেবল পাগলের মত চীৎকার ক'রে যেন ফুঁসে গর্জে গান গাইতে লাগল সহদেব,

অরে বুড়া, তুই একবার সাহস দেখা
শমনেরে,
তর সাহস দেইখ্যা, সাহস করুক,
এই পোলাপানের সংসারে।

আর নোনা বন্যা নামল তার এবড়ো-খেবড়ো গাল ভেসে।

শেয়াল ডেকে উঠল। চমকে উঠল তিনজনেই। তিন রাত্রের মধ্যে এই প্রথম। আর একবার, যেন শেষবার, গোটা হিজলের জটা দলা পাকিয়ে দুলে উঠে মড় মড় ক'রে উঠল।

নন্দলাল ভীত ক্ষুধিত নিস্তেজ গলায় ফুঁপিয়ে উঠল, বাবা কুলচান্দির পাথর কাঁপছে।

পাথর কাঁপছে! কই, না তো! আকাশে আবার দিন দেখা দিচ্ছে। সহদেব তাকিয়েছিল দূরে। সহসা চীৎকার ক'রে উঠল, কত্তা, জল নামতেছে। ঘরের চাল জাইগা উঠছে, বেড়া দেখা যায়।

জল নামছে! নামছে নাকি! .....

হ্যাঁ নামছে, জ্যাঁটি খেলা শেষ ক'রে, জলের উপর দিয়ে কারা কেন ছুটে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। নামছে, কার হাত সরে যাচ্ছে।

ঘুরে ঘুরে, পাক খেয়ে খেয়ে নামছে। নামছে, নামছে!

অর্ধেক বেলা যাওয়ার আগেই একটা ডাক ভেসে এল, মা—মা!

লাফ দিয়ে উঠল নন্দলাল।—ওই, ওই এসেছে বিজা হারামজাদা, এই যে আমি—! চিৎকার ক'রে উঠল নন্দলাল। দুর্গন্ধ ময়লা কাপড়টাকে কোন রকমে জড়িয়ে ধরে ছুটে গেল জলের কাছে। কপিলাও ছুটল। সহদেব বলল, এইবার শ্যাষ।

নন্দলাল সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল, কিসের শেষ; এ্যাঁ, কিসের শেষ হারাম-জাদা?

সহদেব গোল চোখ তুলে বলল, পরাণের ডর!

নন্দলাল চেঁচিয়ে বলল, শালা, তোর শেষ [illegible]

নৌকা দেখা দিল। এই তো, ভাগ্নে বিজয়। নন্দলালের গোসানীমারীর দোকানের হিসাব সরকার, চাকর, থানার ছোটবাবু, দিনহাটা সদরের সারকেল অফিসার। সরকারী নৌকা। জীবন! আবার জীবন!

নৌকা একেবারে কুলচান্দির কূলে ঠেকল না। হাত পঁচিশ দূরে দাঁড়াল। উপায় নেই, ঠেকে যাবে। সারকেল অফিসার বললেন, যাক বেঁচে আছেন গোসাইবাবু।

নন্দলালের চোখে জল। কথা বলতে পারল না। প্রায় ঝাঁপ দেয় আর কি।

বিজয় বলল, সহদেব, এই সহদেব, মামাকে তুলে নিয়ে আয় কাঁধে ক'রে।

সহদেব এগিয়ে এল। নন্দলাল যেন একটি শক্ত গাছের গুঁড়ি ধরছে, এমনিভাবে ধরল সহদেবকে। ছুঁতে ও পারছিল না একটু আগে। সহদেব জলে নেমে বলল, হ, বড় টান অখনো, লইড়েন না কত্তা।

নন্দলাল তাকাল সহদেবের চোখের দিকে। বলল, শালা।

নন্দলালকে দিয়ে তারপর কপিলাকে বুকে তুলে নিল সহদেব। জলে নামল। বলল, ডরাইয়ো না ঠাইরেন।

আশ্চর্য! কপিলার চোখ দুটি ছলছল করছে। একটু বেশী ক'রে সাপ্টে ধরেছে সহদেবকে। ফিস্ফিস্ ক'রে বলল এক-দিন দিনহাটায় এসো।

হ', আবার যেন রূপ ঢলোঢলো ক'রে। সহদেবের বুকে নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে রইল।

জল নামছে, কিন্তু টান নীচে। সরকারি মাঝি বলল, যাব কি ক'রে?

জবাব দিল সহদেব। বলল, গিদারী দিয়া লামো হে ভাই, লাইমা, ধরলায় গিয়া গীতালদা'য় উঠতে হইব, তা' ছাড়া উপায় নাই।

সবাই বক্‌বক্ করছে। ভাগ্নে বিজয় মামাকে ফাঁকি দিয়ে ঘন ঘন দেখছে কপিলাকে। ছোটবাবু আর সারকেল অফিসার নন্দলাল আর কপিলাকে দেখে হেসে বাঁচছেন না। নন্দলাল ছেলেমানুষের মত চীৎকার করছে, ওই যে ঘর আমার, ভেসে উঠছে। আবার দেখব এসে ফিরে। এত পুরুষের মাঝখানে কপিলার ঠোঁটে আবার চমকাচ্ছে সেই বারোবাসরের হাসিটুকু।

সহদেব আবার চীৎকার ক'রে উঠল,

অরে ডবার বাটা পথা,
কিসের যে ডর আবার ডর
পাপের শাসন বারে বারে আসে,
পুণ্যের শাসন একদিন আসে
এই যাওয়া আসার শ্যাষ না হয়।

[illegible]

একজন অজ্ঞাত মহিলা কবি

সুধীর চক্রবর্তী

ঢের কথা বলিবার আছে,
যদি তুমি শুন মন দিয়া।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্র ইতিহাস
দলিত ব্যথিত ক্ষুদ্র হিয়া॥

এই বেদনাসম্ভব উক্তিতে যে কাব্যের (১) আদিপর্ব থেকে পরিণাম পর্যন্ত বিধুর, সেই কাব্যের ইতিহাস, বিশেষত কবির জীবন কাহিনী, আসলে কোন অর্থেই ক্ষুদ্র নয়। কবিতা যদি হয় বেদনা মন্থনের রশি তবে এই কাব্য মন্থনজাত অমৃত-যন্ত্রণা। সেই অমৃত অনুভবের চারপাশে বিষের নির্মমতা। তবু উচ্চকিত অমৃতাভাস; সংরুদ্ধ চেতনার অনন্তগতি, অর্থাৎ এ যেন মাটির অবরোধ ভেদ ক'রে তৃণমঞ্জরীর অঙ্কুর বিকাশ। যেখানে আলোর প্রবেশ অবরুদ্ধ, সেখানেও ফুল ফোটে। নীল-নলিনী দেবীর কাব্যগ্রন্থটি পড়লে তা বোঝা যায়। সে আলোচনার সূচিমুখ উন্মোচন করার আগে অন্ধকার সেই পরিবেশ সম্পর্কেও আলোচনা করতে হবে। পৃথিবীতে কত রকমের কবি দেখা যায়। কেউ জ্ঞাননির্ভর, কেউ কল্পনানির্ভর। কারোর পৃথিবীপ্লাবিত কলতান, কারোর নিভৃত আত্মার একান্ত প্রাণধ্বনি। নীল-নলিনী এই দ্বিতীয় দলের কবি। তাঁর কবিতা আত্মমগ্ন অনুভবে সন্দীপ্ত। রাখালের মধ্যাহ্ন বাঁশীর মত নিঃসঙ্গ। বাংলা দেশের সামাজিক পটভূমিতে মহিলা কবিদের ভাববৃত্তে কোন সময়েই যথার্থ গতি ছিল না। এক অভেদ্য অবরোধ আর বর্জারিত সামাজিক পীড়নের মধ্যে বাংলা দেশের মহিলা কবিদের কবিতা লিখতে হত। তাই সেযুগের বাংলার মহিলা কবির সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল।

'বালুকণা' কাব্যটির প্রথমেই আছে প্রকাশক লিখিত ভূমিকা 'স্বর্গীয়া নীল-নলিনী দেবীর জীবনের কয়েকটি কথা'। কবির জীবনের অধিকাংশ খুঁটিনাটি তথ্যই এখানে পাওয়া যায়। অন্যান্য কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় কবির পিতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখিত, আত্মজীবনীমূলক রচনা 'একটি ক্ষুদ্র জীবনের কথা' বইটি থেকে (২)।

নীলনলিনী দেবী

নদীয়া জেলার দিগনগর গ্রামের প্রখ্যাত চক্রবর্তী বংশে নীলনলিনীর জন্ম হয় ১৮৮৩ সালের মে মাসে (বঙ্গাব্দ ১২৯০ জ্যৈষ্ঠ)। তাঁর পিতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কৃতী পুরুষ। মাত্র প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আপন প্রতিভার সাহায্যে সামান্য কেরানীগিরি থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। সংগীতবিদ্যায় তিনি বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। কর্মব্যপদেশে নানা দেশ ঘুরেছিলেন। নীলনলিনীর মার নাম শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী। নীল-নলিনীর জীবন বিষয়ে অন্যান্য তথ্য-পরিবেশন ব্যাপারে এবার আমি তাঁর দাদা শ্রীরাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্তীর রচনা থেকে উদ্ধৃত করছি। 'স্বর্গীয়া নীলনলিনী আমার পিতৃব্যকন্যা।......শৈশব হইতেই নীল-নলিনীর অতীব সংগীতানুরাগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। পিতৃব্য মহাশয়ের বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। নীলনলিনীর চারি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাহার সুকণ্ঠ ও সংগীতানুরাগ দেখিয়া সুরেন্দ্রবাবু যত্নসহকারে হারমোনিয়ম সহযোগে তাহাকে দুই-চারিটি গান শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে সুযোগ অধিক দিন স্থায়ী না হইলেও পিতৃব্য মহাশয় অবসর সময়ে আপন কন্যাকে সংগীত শিক্ষা দিতেন। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি মানুষের নাই: সেইজন্য কেহই সে সময় বুঝেন নাই যে, কিরূপ সংসারে, কিরূপ পাত্রে নীলনলিনী পরিণীতা হইবে। সময়ের রুচি অনুসারে পিতৃব্য মহাশয় কন্যাকে একটু লেখাপড়া, একটু শিল্পকাজ, সংগীত ও হারমোনিয়াম বাদ্য এবং একটু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও শিক্ষা দিয়াছিলেন।

'দশম বর্ষ উত্তীর্ণ না হইতেই বিদ্যালয়ের সহিত নীলনলিনীর সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। কিন্তু স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভাবলে নীলনলিনী অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাঙলা লেখাপড়া, কবিতা লেখা, সুচীকার্য, হারমোনিয়াম বাদ্য ও রন্ধনাদি কার্যও উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন।' (৩)

নীলনলিনীর প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর পিতা লিখেছেন: "নীলনলিনীর ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবিনী ও সুচতুরা বালিকা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাইত না। বাল্যকাল অনর্গল কবিতা লিখিতে পারিতেন।' (৪) এগার বছর বয়সে নীল-নলিনীর বিবাহ হয় [illegible]

১। বালুকণা ঃ নীলনলিনী দেবী। কটন প্রেস, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। [illegible]

২। একটি ক্ষুদ্র জীবনের কথা ঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। [illegible]

হয় তাঁর জীবনের দুঃখ। তাঁর স্বামী ছিলেন উগ্র প্রকৃতির। এ বিষয়ে যোগেন্দ্রবাবু একটি পত্রে লিখেছেন, 'জামাতার প্রকৃতি কিছু উগ্র, অভিমান একটু বেশি এবং তাঁহার আরও একটি মহাভ্রম পরিলক্ষিত হইতেছে। সদয় মিষ্ট ব্যবহারে যে বালিকা পত্নীর হৃদয় ক্রমে ক্রমে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, বোধহয় তিনি জানেন না। সকল সময়েই তর্জনগর্জন, তিরস্কার, উপহাসাদির দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ও পত্নীর ভক্তিভালবাসা প্রভৃতি অর্জনের চেষ্টা করিতেছেন।......পত্নীর সহিত দিবারাত্র তর্কবিতর্ক লাগিয়াই আছে। উভয়েই পণ্ডিত, সুতরাং কেহই পরাভব মানিতে চাহেন না।......আরও এক বিড়ম্বনা, বাপাজির ভিতর Poetry একেবারেই নাই। যেন মানবদেহে একখানি প্রকাণ্ড মুগ্ধবোধ বা Evidence Act। অপরদিকে কন্যা কবিতা ও কল্পনারাজ্য লইয়াই আছেন। যাহাতে মৃদু কমনীয় ভাব নাই, যাহাতে হাসি বা কবিতা নাই, যাহাতে একটু কোনরূপ সৌন্দর্য বা মাধুর্য নাই, সে সকল বিষয় কন্যার একেবারে ভাল লাগে না।'(৫) —অর্থাৎ নীলনলিনী এবং তাঁর স্বামী ছিলেন দুই বিপরীত প্রকৃতির মানুষ। কাজেই মানসিক সংঘাত ছিল প্রায় নিয়তি-নির্দিষ্ট, অনিবার্য। স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সকলের কাছে নীলনলিনী নিগৃহীতা হতেন। তাঁর লেখা কবিতা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হ'ত। তাঁর অনুভূতিসম্পন্না একজন শিল্পীর পক্ষে এই অবিচার অত্যাচার অসহনীয় ছিল। মানসিক বেদনা দুর্ভার হ'য়ে উঠলো তাঁর পক্ষে। তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। এই সময়ে উভয় পরিবারের মধ্যে ক্ষুব্ধতা ক্রমশ বেড়ে চললো। নানা উত্তেজিত চিঠিপত্রে তার সাক্ষ্য মেলে। শেষ পর্যন্ত কয়েকজনের চেষ্টায় সাময়িক শান্তি স্থাপিত হ'ল। কিন্তু নীলনলিনীর উপর অত্যাচার সমানভাবেই চললো। সেই অত্যাচারের আনুষঙ্গিকতা বোঝাবার জন্য নীলনলিনীর লেখা একটি পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। 'এবার আমার লাঞ্ছনার সীমা নাই। উপহাস, বিদ্রূপ ও অপমান ত আমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে।......মাগো, কেন আমাকে প্রসব করিয়াছিলে; কেন আমি শৈশবে মরি নাই; তাহা হইলে আমাকে এ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।......মাগো, এখানে আসিয়া কিছু খাই বা না খাই, জুতা খাইয়া পেট ভরিয়া গেল। মাগো, জেলখানার কয়েদীর অপেক্ষাও আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে।...... অনেক বালিকার শাশুড়ি মন্দ ভাল হয় না, কিন্তু স্বামীর একটু আদর, একটু মিষ্ট ব্যবহার পাইলে সে-সকল অসুবিধা তুচ্ছ বোধ হয়।......মাগো, স্বামী যে স্ত্রীলোকের সর্বস্ব, স্বামীই যে আমাদের একমাত্র দেবতা, স্বামীর প্রিয় আচরণ করাই যে স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম, আশৈশব এই শিক্ষাই পাইয়াছি। আমি প্রাণপণে তাঁহার প্রীতিসাধনের চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রিয় হইতে পারিলাম না।......মাগো, আমি অবোধ বালিকা, ধর্মাধর্ম কিছুই জানি না; বোধহয় জন্মজন্মান্তরে কত মহাপাপই করিয়াছিলাম। আমি যে আমার স্বামীর ভিতর দেবতার কিছুই দেখিতে পাই না; যখনই নিকটে আসেন, তখনই ভ্রূকুটি, তখনই তর্জনগর্জন, তখনই অভদ্রলোকের ন্যায় উপহাস বিদ্রূপ। মাগো, তাঁহার সেই মূর্তি দেখিয়া অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়, তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে বুক ভাঙিয়া যায়; আমি কিছুতেই বুঝিতেছি না কেমন করিয়া আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভাবিব।'(৬)

এই মর্মন্তুদ পত্র পড়লেই বোঝা যায় নীলনলিনীর দুর্বিষহ জীবনের যথার্থ অবস্থা। বেদনায় বলিচিহ্নে ক্লিষ্টক্লান্ত,

৫। বালুকণা। পৃষ্ঠা ৯-১০।

৬ 'বালুকণা'-র ভূমিকায় উদ্ধৃত। পৃষ্ঠা ১৫—২০

সামাজিক [illegible] জীবনের সমস্ত আশা-ভরসার ব্যর্থতায় এই পত্র শোকজ্ঞাপক। নীলনলিনীকে এই সময়ে পিত্রালয়ে আনা হয় ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। পিতৃগৃহে অবস্থানকালে তাঁর স্বামী তাঁকে কয়েকটি পত্র দেন। সেই পত্রগুলি কদর্য। শরীর সুস্থ হ'লে নীলনলিনীকে স্বামীর কর্মস্থল খুলনায় পাঠানো হয়। সেখানেও পূর্ব অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। খুলনা থেকে লিখিত তাঁর পত্রগুলি নৈরাশ্য, দুঃসহ অন্তর্বাতনা ও করুণ কাতরোক্তিতে পূর্ণ; প্রতি পত্রেই মৃত্যু কামনা! পত্রগুলি পাঠ করিয়া বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, বালিকা যে আশায় বুক বাঁধিয়া স্বামীর নিকট গিয়াছিল, তাহা যেন পূর্ণ হয় নাই; অপমান, গঞ্জনা, উপহাস, বিদ্রূপ ও নিষ্ঠুরাচরণ যেন বাড়িয়া উঠিয়াছিল! মৃত্যুকামনা, নৈরাশ্য ও বিষাদপূর্ণ কবিতাগুলি অধিকাংশই এই সময়েই লিখিত হইয়াছিল।'(৭)

১৯০৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী নীলনলিনী একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন। তারপর তাঁর অসুস্থতার মধ্যে কয়েকটি দিন কাটে। এই সময় পরিণাম অবস্থা বুঝতে পেরে তাঁর স্বামী তাঁর সেবাশুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করেন। এ-সম্পর্কে যোগেন্দ্রবাবুর পত্রঃ 'স্বামীর এই কয়দিনের ব্যবহার দেখিয়া অভাগিনী অদ্য বৌমাকে বলিয়াছিল "বৌ, তোর দাদাবাবুর যত্ন দেখিয়া আবার আমার বাঁচিতে ইচ্ছা হইতেছে।" হায় হায়, তাহার জীবনপ্রদীপ ত নির্বাণোন্মুখ হইয়াছে; এই অন্তিম অবস্থাতেও স্বামীর একটু যত্ন একটু আদর পাইয়া দুঃখিনীর জীবনে আবার একটু মমতা হইয়াছে; আবার তাহার বাঁচিতে ইচ্ছা হইয়াছে। এ-ইচ্ছা কি জগদম্বা পূরণ করিবেন।'(৮)

নীলনলিনীর এই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। সন্তান প্রসবের কুড়িদিন পর অর্থাৎ ১৯০৩ সালের ২৫শে জানুয়ারী তিনি মারা যান মাত্র উনিশ বছর বয়সে।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জেঠতুতো দাদা কবিতাগুলি একত্রিত ক'রে প্রকাশ করেন ১৯০৩ সালের ২৫শে অক্টোবর। [illegible] সম্পর্কে তাঁর দাদা লিখেছেনঃ [illegible] পরলোকপ্রাপ্তির পর [illegible] হস্তলিপি [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] পুস্তকের মত [illegible] আমরাও সেই [illegible] করিয়াছি। [illegible] ব্যতীত [illegible] মুদ্রণ [illegible]

নীলনলিনী দেবীর কবিতার খাতার একটি পাতা

খাতার প্রারম্ভে লেখিকার স্বাক্ষরের প্রতিকৃতি

ঐরূপ কোন একটা বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে নীলনলিনী সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া রাখিতেন। এই সকল কবিতার মধ্যে কয়েকটিও এ-পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতাগুলির বালিকালেখনীপ্রসূত, তাহাতে আবার [illegible] আবর্তনে [illegible] বিকাশপ্রাপ্ত [illegible] হইয়া পড়িয়াছিল। [illegible] মধ্যে নানাপ্রকারের [illegible] সাধারণের পাঠের [illegible] প্রকাশিত [illegible] আদরের ও [illegible]

সামগ্রী মনে করিয়া যত্ন সহকারে মুদ্রিত করিতেছি।'(৯)

কাব্যটির প্রকাশপ্রসঙ্গে নীলনলিনীর পিতা যোগেন্দ্রবাবু একটি পত্র লিখেছেনঃ 'কিন্তুই সাধারণের পাঠের জন্য নীলনলিনীর দুঃখপূর্ণ জীবনকাহিনী ও কবিতাগুলি প্রকাশিত হইতেছে না। দেশে বিদেশে আত্মীয় বন্ধু অনেকেই আমার নীলনলিনীকে আশৈশব জানিতেন এবং তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহারা দুঃখপূর্ণ জীবনকাহিনী ও কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তাঁহারা একবিন্দু অশ্রুপাত করিলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।'(১০)

কাব্যপ্রকাশের উদ্দেশ্যটি বোঝা গেল। এই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণে রেখেই কাব্যটি বিক্রয় করা হয়নি। বিতরণ করা হয়েছিল আত্মীয় বন্ধু সুহৃদদের। অর্থাৎ এই নিভৃত প্রাণের নীরব বেদনাকে সকলের সামনে উপস্থাপিত করা হয়নি। মরমী দরদীর সহানুভূতির কেন্দ্রে এই কাব্যকে উৎসর্গ করা হয়েছে। বিতরণের সময়ে কাব্যটির সম্মুখভাগের একটি শাদা পাতায় লিখে দেওয়া হ'ত—'With tears of the Bereaved family'। মহাকালের নির্মম পরিহাসে আর পঞ্চাশ বছরের উপেক্ষায় কাব্যটি এখনও পর্যন্ত অনালোচিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যটির উল্লেখ নেই। বাংলার মহিলা কবিদের পঞ্জীতেও নীলনলিনীর নাম নেই। তাই আমার এই রচনার প্রয়াস। সামাজিক বেদনায় বিদীর্ণ, বঞ্চনার ক্রন্দমান এবং হাহাকারের অশ্রু-সিক্ত কাব্য 'বালুকণা' সম্পর্কে এবার আলোচনা করবো।

বাংলাদেশের মহিলা কবিদের কাব্য ব্যক্তিগত জীবনের হতাশা ও হাহাকারে বিধুর। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা এবং অপ্রাপ্তির মধ্য থেকেই তাঁদের বিশেষ কাব্য-দর্শন গড়ে ওঠে। উদাহরণত, বাংলার অন্যতম আদি মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর কাব্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে ব্যক্তিগত জীবনের কান্নার অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে কামিনী রায়, মানকুমারী বসু প্রভৃতির কবিতাও ব্যক্তিবেদনার অনুভবে ব্যক্ত।

নীলনলিনী দেবীর কাব্যও জীবনব্যাপী বেদনার প্রতিভাস। বস্তুত, তাঁর কাব্য এবং জীবনে কোথাও পার্থক্য নেই। জীবনের সমস্ত অস্পর্শ ব্যথা অনুভবের সংস্পর্শে কাব্য নিষিক্ত হয়েছে। অপমান আর উপহাসে যে যাতনা চেতনার অন্তস্তলে আঘাত করেছে তারই বহিঃপ্রকাশ তাঁর কবিতাগুলি; অর্থাৎ তাঁর জীবন এবং কাব্য পরস্পর পরিপূরক। এখন উদাহরণের সূত্রে নীলনলিনীর বিশেষ জীবনদর্শন এবং মানস-পরিচয় উন্মোচন করবো। তার থেকে বোঝা যাবে, একটি সৌন্দর্যমুগ্ধ সুস্থ মন কিভাবে সামাজিক আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে। ঈশ্বরনির্ভর, সঙ্গীতপ্রাণ, সৌন্দর্যপ্রিয় এই কবি বেদনায় পর্যুদস্ত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুপ্রার্থী হয়েছিলেন।

'বালুকণা'-র প্রথম দশটি কবিতা ঈশ্বর-বিষয়ক। এই ঈশ্বরভক্তি নীলনলিনী পরিবেশ থেকে পেয়েছিলেন। 'তাঁর পিতৃব্য দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব; এবং 'ধর্ম'-প্রাণ বৈষ্ণবশিরোমণি দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়োন্মত্তকারী নাম সংকীর্তনে শৈশব হইতেই নীলনলিনীর মন আকৃষ্ট হইত। দেবেন্দ্রনাথের মধুর ভক্তিরসাত্মক উপদেশ সাগ্রহে গ্রহণ করিতেন। জীবনের অধিকাংশ কার্যেই নীলনলিনীর হরিভক্তির পূর্ণ আভাস পাওয়া যাইত।'(১১) এই পরিবেশলব্ধ ঈশ্বরবিশ্বাস নীলনলিনীর জীবনের অন্যতম অবলম্বন ছিল। এই বিশ্বাসেই লিখেছিলেন:

তোমার প্রেমের নাথ কি দিব তুলনা?
আমার সুখের তরে সকলি রচনা॥

হাসে রবি হাসে শশি গায় নীলাকাশে বসি,
হাসে শত তারা বালা উল্লাসে ঝরিয়া যায়।
(ঈশ্বর)

ঈশ্বরপ্রত্যয়ের পাশাপাশি ছিল নীলনলিনীর পিতামাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। 'বালুকণা'-র প্রায় পাঁচটি কবিতা জনক-জননীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ রচিত। পিতার চরণপ্রান্তে কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন কবি। উৎসর্গপত্রে লিখেছেন:

সন্তানের মূল্যহীন তুচ্ছ উপহারে,
সযতনে পিতামাতা নয়নে নেহারে।
তাই আশা পাবে স্থান তুচ্ছ 'বালুকণা'
পিতার চরণপ্রান্তে মিলিবে করুণা॥

প্রথম কৈশোরে এবং যৌবনেও নীলনলিনী সঙ্গীতের অনুরাগিনী ছিলেন। লব্ধকীর্তি সঙ্গীতকার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে তিনি গান শিখতেন সে-কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আসলে সঙ্গীত ছিল তাঁর একটি অবলম্বন বিশেষ। এক স্বতোৎসারিত সুরধারাস্নানে তিনি সর্বদাই আবেগ-সিক্ত থাকতেন। এই মনোভাবেই লিখেছিলেন:

যে ক'দিন রব এ ধরায়
সে ক'দিন গাব শুধু গান।
....

সবে যাক তুচ্ছ করে মোরে,
রূপগুণবিহীনা বলিয়ে।
যাবে নাক গীত শুধু মোর,
কৃপা করে আমারে ছলিয়ে।
(গাইব গান)

অন্যত্র:

যে ক'দিন আছি পৃথিবীতে,
সে ক'দিন গাব শুধু গান
আর কিছু মাগিনা ধরায়
চাহিনাক' প্রেমে প্রতিদান।
দিগবধূ সবে চেয়ে রবে
বিস্মিত নয়নে মোর পানে
তাহাদের প্রেমের বারতা
ভাবিবে পশেছে মোর কানে।
....

আপনার গানে মগ্ন হয়ে
প্রাণ হবে স্বর্গস্বপ্নময়।
প্রভাতের শুকতারা
ম্লান আঁখি তুলি
হেরিবে গো গায়কের
আকুলি ব্যাকুলি। (গাব শুধু গান)

এই সঙ্গীতনির্ভর প্রাণ শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর অত্যাচারে অবিচারে মৃত্যুপ্রার্থী হয়েছে। মৃত্যুর সম্মুখীন হ'য়ে কবির তাই মনে হচ্ছে 'এ-ধরায় আর আমি গাহিব না গান।' মৃয়মান জীবনে সঙ্গীত কতখানি অবলম্বন ছিল বোঝা যায় যখন পড়ি:

শুধু আমার সহচর তাপদগ্ধ প্রাণ,
কাঁদিতে সঙ্গীত ছিল বিন্দু সান্ত্বনা।
ব্যথিত হৃদয় লয়ে
নীলিমা অম্বরে চেয়ে,
আনমনে ধীরে ধীরে গাহিতাম গান,
এসেছে লইতে মৃত্যু গীত অবসান।
([illegible])

নীলনলিনীর [illegible]

---

১১ বালুকণা। ভূমিকা। পৃষ্ঠা ৭

আপনার মৃত্যুর পরে পড়ে তাঁর কবিতা পড়লে। শুধু তাই নয়, তাঁর কবিতার অধিকাংশ রূপক গড়ে উঠেছে সংগীতের আশ্রয়। যে মেয়েটি অনাবিল আনন্দে গান করতো; মৃত্যু তার কণ্ঠ থেকে গান চুরি করলো—এটি তাঁর কবিতার একটি মূল রূপক। এই রূপকের ভঙ্গিতেই তিনি লিখেছেন:

গেয়েছিনু একদিন
করুণরাগিণী দীন,
ধীরে ধীরে সযতনে তুলিতে বেদন।
সহসা পশিল কানে,
তিরস্কার অপমানে,
অর্ধ বাকী গীত মোর গাওয়াত' হ'ল না
যাহা আশা করি তবে কিছু ত পূরে না।
(অপূরণ)

ঈশ্বরবিশ্বাস এবং সংগীত প্রাণতা ছাড়া নীলিমালিনীর কাব্যে আরেকটি প্রধান স্থান তাঁর মানসিক বিপ্লবের। অনাদর, উপেক্ষা আর বঞ্চনা ছিল তাঁর শিরোভূষণ। এই বিরসিঞ্চিত তাঁর মন পৃথিবী-সমাজ-মানুষ সম্পর্কে তীব্র বিপ্লব তুলেছে। প্রতিবাদ নয়, প্রত্যাঘাত নয়; একটি সুতীব্র অভিমানে তাঁর কবিতা অশ্রুদীপ্র। সকলের কাছ থেকে উপেক্ষা পেয়ে সবকিছু সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধাহীন মনোভাব এসেছিল তাঁর মনে। সমস্ত যন্ত্রণার কালীদহ থেকে মাথা তুলেছিল এক ক্রুর মৃত্যুঅভীপ্সা। সেই মৃত্যু-প্রার্থনার মধ্যে আত্মার এক নিভৃত কান্না স্তব্ধ হয়ে আছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

ক॥ সংসারের বিষের বাতাসে
হ'য়ে আছে প্রাণ জরজর।

খ॥ বিশাল ধরণী মাঝে, এতটুকু স্নেহ হায়,
কোথা কি মেলে না?

গ॥ দেখিনু পৃথিবী মাঝে
নাহি জুড়াবার ঠাঁই,
শ্মশান তোমার পাশে
আসিয়াছি আজি তাই।

ঘ॥ লও মৃত্যু আমার জীবন।
পারি না রাখিতে আর
এ জ্বলন্ত হৃদি ভার,
আশাহীন ভগ্ন বুক মলিন মরম,
লও মৃত্যু দীনার জীবন।

এই মানসিক বিপ্লব এবং বৈরাগ্যের পরিণাম প্রধানত নীলিমালিনীর একান্ত ব্যক্তি-জীবন থেকে এসেছে; অর্থাৎ [illegible] এর মূলে। এই সম্পর্কেও তাঁর অভিমান মর্মস্পর্শী। [illegible]

[illegible]

প্রশ্ন তুলেছেন:

দম্পতীর প্রেম মাঝে হলাহল কেন
একজন বাসে ভাল, হৃদয়ের প্রেমে আলো
নিভাইয়ে চলে হায় অন্যজন।
(মানবজীবন)

চিরজীবনের আহতব্যথার যন্ত্রণাক্রান্ত তাঁর সবশেষ অভিমান শুনতে পাই:

তুমি কাঁদিও তখন।
সখা! পবিত্র জাহ্নবী জল,
চিতাভূমি ছেয়ে মোর,
ধীরে ধীরে আসিবেন করিতে চুম্বন।
তুমি কাঁদিও তখন।

এই ধরনের মর্মস্পর্শী পংক্তি মাইকেল ছাড়া আর কেউ লিখেছেন বলে মনে হয় না। জীবনের সমস্ত অবরুদ্ধ অশ্রুর বাষ্পরাশি এখানে হাহাকারে বর্ষিত হয়েছে। অপরকে কাঁদাতে চেয়ে নিজেই কেঁদেছেন তিনি। এ আর্তির অনিঃশেষ দাহ মৃত্যুর মহাসাগর পেরিয়ে গেছে। বাংলা কবিতায় এমন জীবনের রক্ত দিয়ে বোধহয় আর কেউ কবিতা লেখেননি। আশ্চর্য হৃদয় বেদনার রক্তরাগে 'বালুকণা'-র কবিতাগুলি [illegible]

শান্ত, গভীর। ভাবতে কষ্ট হয়, মাত্র উনিশবছরেই এমন একজন কবির উপরে পেয়েছে মৃত্যুর নির্মম পদচিহ্ন।

নীলনলিনীর কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হবার আগে তাঁর সময়কার বাংলার কাব্যসাহিত্যের আলোচনা করা দরকার। যদিও মাত্র দশবছর বয়সেই তাঁর বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল তবু বিদ্যার সঙ্গে সংযোগ ছিল এ প্রমাণ কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নীলনলিনীর জন্ম; তাঁর জন্মের ঠিক দশবছর আগে মাইকেলের মৃত্যু হয়েছে। কাজেই নীলনলিনীর যে কাব্যপরিবেশে প্রথম চেতনার বিকাশ, সেই পরিবেশে মাইকেল ছিলেন এক অদ্বিতীয় কবি। এছাড়া হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-বিহারীলাল ছিলেন সে যুগের লব্ধকীর্তি কবি। নীলনলিনীর মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' পর্ব। অর্থাৎ বাংলা কবিতায় সে সময় একদিকে মহাকাব্যের ধারা এবং অন্যদিকে গীতি-কবিতার ধারা সমানভাবে চলেছে। এই যুক্তধারাস্নানে নীলনলিনীর কবিচেতনা গড়ে উঠেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, বালিকা নীলনলিনীর এই সব কাব্যের স্বাদ গ্রহণের সামর্থ্য সম্পর্কে। তাঁর কবিতাই এ প্রশ্নের উত্তর দেবে। অন্তত মাইকেল-হেম-নবীনের কাব্যাস্বাদ তিনি পেয়েছিলেন। আর নীলনলিনীর জীবনে রবীন্দ্র-সংস্পর্শ ঘটেছিল—সে অমৃতকথাও পরিবেশন করবো।

নীলনলিনীর জীবন এবং কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রসান্নিধ্যের প্রশ্ন তোলা হয়তো অস্বাভাবিক নয়। যদিও রবীন্দ্রজীবনের মধ্যলগ্নে তাঁর জীবনকাল, তবু সে সময় দিগনগরের মত প্রত্যন্ত গ্রামে রবীন্দ্রনাথের কবিতা একেবারেই দুষ্প্রাপ্য ছিল একথা মনে করা চলে। কিন্তু তবু নীলনলিনীর কবিতার কিছু অংশ সংশয় আনে। তাঁর লেখা 'প্রতিদিন নদীকূলে, এসেছি আপনাভুলে' এই পংক্তিটি পড়ে অনিবার্যভাবে 'সোনার তরীর' 'এতদিন নদীকূলে, যাহা লয়ে ছিনু ভুলে' মনে পড়েই। তারপর যখন পড়িঃ

> অলিক বিজলীরে রুচির চারু কায়।
> তিনিরা নীলাকাশ চিকুর শোভা পায়॥

তখনও মনে পড়ে 'হৃদয় আজি মোর কেমনে খুলি' কবিতাটির ছন্দস্পন্দের কথা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের এই রীতিটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। তাঁর আগে ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই ছন্দের কিছু আভাস দেখা যায়। কাজেই একথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, 'প্রভাত-উৎসব' কবিতাটি নীলনলিনীর পড়া ছিল, এবং তারই ধ্বনিস্পন্দনে আকৃষ্ট হয়ে তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন।

এ তো গেল কাব্যভঙ্গিগত মিল। খুঁজতে রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটগল্পের মিল পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্পটির নাম 'খাতা', গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডে আছে। গল্পের বিষয়বস্তু একটি বালিকাবধূর সাহিত্য সাধনার ট্র্যাজেডি। স্বামী ননদ প্রভৃতির উপহাস বিদ্রূপের মধ্যে বালিকা-বধূর করুণ লাঞ্ছিত একটি গল্প। গল্পটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে নীলনলিনীর জীবনের একটি ভাবগত মিল আছে। (১২) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোন ক্ষীণ যোগসূত্রও ছিল কিনা তা বিচার্য। আমি যতটুকু আবিষ্কার করেছি তাতে মনে হয় যোগসূত্রটি একেবারে অপ্রকৃত নয়। নীলনলিনীর স্বগ্রাম দিগনগরে রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর বিবাহ হয়েছিল শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই বিবাহ সম্পর্কে নীলনলিনীর পিতা যোগেন্দ্রবাবু তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখেছেনঃ 'যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জমিদার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীর সহিত জ্যেষ্ঠপুত্র সারদাপ্রসাদের বিবাহ দিয়াছিলেন।' (১৩) যাই হোক এই বিবাহের পরে রবীন্দ্রনাথ একবার দিগনগরে এসেছিলেন। সন তারিখ আমি উদ্ধার করতে পারিনি তবে আনুমানিক ১৮৯০ সালের কাছাকাছি। এ ছাড়াও আরেকটি সূত্র উল্লেখ-যোগ্য—নীলনলিনীর দাদা (অর্থাৎ শ্রীরাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্তী) রবীন্দ্রনাথের সাজাদপুরের জমিদারীতে প্রায় এগারো বছর (আনুমানিক ১৮৯০-১৯০১) ক্যাসিয়ারের কাজ করেছেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কাজেই একথা মনে করা অন্যায় হবে না যে, রবীন্দ্র-নাথ যে কোন প্রকারেই হোক, নীলনলিনীর কথা জানতেন; এবং পরবর্তীকালে তাকে নিয়েই 'খাতা' গল্পটি লিখেছেন। অবশ্য এ সবই অনুমান মাত্র। চরম কথা বলা যেতে পারে আরো গভীর অনুসন্ধানের সীমান্তে পৌঁছে।

'খাতা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প-সংকলন 'ছোট গল্প' বইটিতে প্রথম সন্নিবেশিত হয়েছিল। এই 'ছোট গল্প' বইটির প্রকাশকাল ১৫ই ফাল্গুন ১৩০০ সাল। অর্থাৎ নীলনলিনীর বিবাহের কিছু আগে। কিন্তু গল্পটি কবে লেখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি। শ্রীপুলিন-বিহারী সেন সংকলিত রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পের তথ্যপঞ্জীতে উল্লিখিত আছেঃ 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাশ অনুমান করিয়াছেন যে, "খাতা" গল্পটিও বোধহয় হিতবাদীতে সপ্তম সপ্তাহে বাহির হয়।' (১৪) 'হিতবাদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালের ৩০শে মে তারিখে। হিতবাদীর ফাইল পাওয়া যায়নি। কাজেই এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা অসম্ভব। তবে ব্যাপকভাবে বলা চলে মোটামুটি ১৮৯১-৯৪ সালের মধ্যে গল্পটি লেখা। অর্থাৎ নীলনলিনীর গল্প রবীন্দ্র-নাথের জানা ছিল; কেবল তার উপরে তিনি কিছু কল্পনার রং মিশিয়েছেন। যদি তাই তাই হয়, তবে সেই কল্পনা কি নির্মম সত্যই না ছিল!

নীলনলিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ-সূত্রের প্রসঙ্গে আপাতত ছেদ টানছি। এ বিষয়ে কোন প্রকৃত অনুসন্ধানী আলোক-পাত করলে প্রসঙ্গটির সত্যমিথ্যার ধূসরতা কাটে।

* * *

পূর্বজ এবং সমকালীন কোন কোন কবির প্রভাব নীলনলিনীর কবিতায় আছে। অবশ্য তাকে প্রভাব না ব'লে ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে। সেই বিষয়টির আলোচনার সূচনাতেই জানানো দরকার যে নীলনলিনী সেই ধরনের বিশিষ্ট কবি, যাঁর মধ্যে অন্য কাব্যের প্রভাব খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। তবু বোঝা যায়, তাঁর লেখা কতকগুলি কাহিনী কবিতার (সাবিত্রী, দময়ন্তী) পিছনে মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের ছায়াপাত। কবিতার মধ্যে 'হায়রে দারুণ বিধি' কথাটির বারবার ব্যবহার আর 'আত্ম-বিলাপ' নামে একটি কবিতা প'ড়ে মধুসূদনের কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি খুঁজে পাওয়া যায়। আর যখন পড়িঃ

> মৃত পতি ক্রোড়ে লয়ে, সেহারি সুন্দরী,
> বসিলা; চৌদিকে হাসে সতীত্ব মাধুরী
> (সাবিত্রী)

তখন স্পষ্টতই মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রমীলার চিতারোহণ দৃশ্য স্মরণে আসে। সেখানে আছেঃ

> চিতার আরোহী সতী (ফুলাসনে যেন)
> বসিলা আনন্দমতি পতিপদতলে, ১৫

কিন্তু নীলনলিনী মহিলা কবি ব'লেই বোধহয়, তাঁর কাব্যে সমকালীন মহিলা

---

১২ এই সাদৃশ্য সম্পর্কে আমাকে প্রথম সচেতন করেন আমার অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত। এ প্রসঙ্গ ছাড়াও সমগ্র প্রবন্ধটির পিছনে তাঁর সস্নেহ আনুকূল্য ও পরিশ্রমের কথা বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি।

১৪ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পঃ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। পুলিনবিহারী সেন সংকলিত তথ্যপঞ্জী। পৃষ্ঠাঃ ২৪

১৫ তাছাড়া 'বসিলা'-র ক্রিয়াপদ, অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত ছন্দ পদের আদিতে তিন মাত্রার পর [illegible] মাইকেলের, [illegible] ছাড়া আর কোথায়ই বা আছে? [illegible]

কবিদের প্রভাব একটু বেশী। সেই আলোচনা শুরু করা যাক বাংলা দেশের মহিলা কবিদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে।

বাংলা দেশের একেবারে আদি মহিলা কবি রামী চণ্ডীদাস (অবশ্য যদি তাঁর নামে প্রচলিত পদগুলিকে তাঁর নিজের লেখা বলে ধরা যায়।) তারপরে প্রথম উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী (পঞ্চদশ শতাব্দী)। তারপরে উল্লেখযোগ্য আনন্দময়ী (১৭৫২), গঙ্গামণি দেবী (ঐ সমসাময়িক), কামিনীসুন্দরী দেবী ওরফে দ্বিজ তনয়া (উনবিংশ শতাব্দী)। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের পর প্রকৃত বিদ্যা ও জ্ঞাননির্ভর প্রথম মহিলা কবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫) নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া প্রসন্নময়ী (১৮৫৬-৫৭), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮), মানকুমারী বসু (১৮৬৩), কামিনী রায় (১৮৬৪) এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর (১৮৭১) নাম বিশেষ স্মরণীয়। নীলনলিনীর শৈশবে এই সব মহিলা কবি বেশ প্রভাবশালী ছিলেন, বিশেষতঃ অন্দরমহলে। তাই অন্যান্য যে কোন কবির চেয়ে এই সব মহিলা কবি তাঁর কাছে অনেক আপন ছিলেন। তাই নীলনলিনীর সঙ্গে এইসব কবির সম্বন্ধসূত্র আবিষ্কার করতে করতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয়, এ'দের সঙ্গে তাঁর চেতনার এবং বিশেষতঃ mood-এর এক বিশেষ অন্বৈত সম্পর্ক আছে। বাংলা দেশের মহিলা কবিদের ইতিহাস সংকলক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর অভিজ্ঞতার সাহায্যে বলেছেনঃ 'মহিলা কবিদের প্রত্যেকের কবিতায়ই একটা বিষাদের সুর—একটা নিরাশার সুর প্রবাহিত।' এই ভাবগত সূত্রে নীলনলিনীর অন্যান্য মহিলা কবিদের সঙ্গে সম্ভাব। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে অন্যান্য মহিলা কবিদের সংযোগ বেদনার সেতুবন্ধে। যদিও সে বেদনা একই সমতলের হৃদয়জাত নয়।

নীলনলিনী দেবীর কাব্যের 'বালুকণা' নামটি অন্য মহিলা কবির প্রভাবজাত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্য 'অশ্রুকণা' নামটির সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা; কিন্তু 'বালুকণা' নামটির একটির বৃহত্তর ব্যঞ্জনা ও গভীর তাৎপর্য আছে। নীলনলিনীর ভাষায়ঃ

[illegible]

[illegible]

কোটি বিশ্বচূর্ণ এ মহাব্রহ্মাণ্ড
*   *   *
সে বিরাট বিশ্ব, পরমাণুকণা
*   *   *

শত তুলে আমি কত ক্ষুদ্রতম
অণুরেণুকণা পরমাণুসম।

অন্য দুটি কবিতায় 'বালুকণা' শব্দটিই আছে। একটিতে আছে 'ক্ষুদ্র এক বালিকণা' আর একটিতে আছেঃ

ওই দেখ! জীবন-বেলায়
এ ক্ষুদ্র বালিকা-কণা।

'বালুকণা' নামটির প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। এছাড়া মানকুমারী বসুর কবিতার কিছু প্রভাব নীলনলিনীর কাব্যে আছে। একটু সাবধানী দৃষ্টি মেললে কামিনী রায়ের প্রভাবও বেশ অনুভব করা যায়। কিন্তু এ সব প্রভাব নিতান্তই আপতিক। নীলনলিনীর কবিতার প্রধান পরিচয় অদ্বিতীয়ত্বে। তাঁর সঙ্গে বাংলা কবিদের একমাত্র সাযুজ্য ঈশ্বরবিশ্বাস আর মানসিক বেদনায়। কিন্তু তাঁর অভিনবত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব এক আশ্চর্য বিপ্লবী চেতনার অগ্নিস্পর্শে। তাঁর জন্মলগ্নে এবং কৈশোর-যৌবনে (অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুইদশক) বাংলা দেশের নারী আন্দোলনের তীব্র অভিঘাত এলেও প্রত্যন্ত গ্রামগুলি সেই অগ্নিস্পর্শ থেকে বঞ্চিত ছিল। অবশ্য তিনি গ্রামে আবদ্ধ ছিলেন না; তবু দশ বছর বয়সে যাঁর বিদ্যাচর্চায় মোটামুটি দাঁড়ি পড়েছে, এগারো বছর বয়সে যাঁর বিবাহ হয়েছে, তাঁর পক্ষে আন্দোলনের সঙ্গে যোগ রাখা অসম্ভব। তবু তিনি পত্রে লিখেছেনঃ "আমি যে আমার স্বামীর ভিতর দেবভাব কিছুই দেখিতে পাই না; যখনই নিকটে আসেন তখনই ভ্রূকুটি, তখনই তর্জন গর্জন, তখনই অজ্ঞলোকের ন্যায় উপহাস বিদ্রূপ। আমি কিছুতেই বুঝিতেছি না, কেমন করিয়া আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভাবিব।" এই অসমসাহসিক পত্র পড়ে স্তম্ভিত হতে হয়। কৌলীন্য-প্রথার বন্দিনী, এক অভেদ্য অবরোধে বাস করেও কোথায় পেলেন তিনি এই প্রতিবাদের রক্তমন্ত্র? ভাবতে আশ্চর্য লাগে, নিতান্ত বালিকাবয়সেও কোন্ এক গহন বেদনায় নির্মমতায়, যন্ত্রণায় বিদীর্ণ তাঁর মন সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছে। 'বালুকণা' কাব্যটির বিস্তৃত পরিসরে একটি বিদ্রোহিনীর মূর্তি খুঁজে পাই। তাঁর পূর্বজ এবং সমকালীন মহিলা কবিদের সঙ্গে এইখানেই তাঁর পার্থক্য। বস্তুত, কবিচেতনায় তিনি সমকালীন মহিলা কবি-দের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের বিচারে তাঁর কবিতা বেশ একটু প্রগতিধর্মী এবং উন্নত বলিষ্ঠতার স্পর্শে প্রদীপ্ত।

এইবার নীলনলিনীর কাব্যবিচার সুরু করা যাক। তাঁর কবিত্ব, শিল্পত্ব এবং কবিতার আঙ্গিক সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা দরকার। তাঁর কবিমানসটি উপলব্ধি করতে বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। বঞ্চনা-বেদনার মন্থনউদ্ভূত এক অভিমান-স্তব্ধ কবিসত্তাকে ইতোমধ্যে পাঠকও আশা করি অনুভব করেছেন। তাঁর জীবনের সমগ্র রূপটি তিনি কয়েকটি ইমেজের সাহায্যে প্রতিফলিত করেছেন। যেমনঃ

ক॥ না ফুটিতে পুষ্পদল
কীটদষ্ট ভূমিতল। (গাহিব না)

খ॥ দৈত্যসম একজন
দুটি ফুল ছিন্ন ক'রে,
একটি ফেলিয়া ভূমে
একটি রাখিল ধরে। (শুন তবে)

গ॥ যে আশ্রয় করি লতাসম উঠেছিনু,
তাহারি শাখায় থাক ভূমিতলে
পড়ে গেনু, (সমর্পণ)

এই তিনটি ইমেজের সাহায্যেই তাঁর প্রতিভার বলিষ্ঠতা বেশ বোঝা যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই তিনটি বর্ণনা ছাড়াও আরও বিভিন্ন উপমা ব্যবহারে তিনি উদ্ভিদ জগৎ থেকে বিশেষতঃ ফুলের প্রসঙ্গ এনেছেন। নীলনলিনীর জীবন এমনি এক স্ফুটন-আকাঙ্ক্ষায় অধীর ছিল। মূলতঃ উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং রূপক তাঁর কাব্যের ভূষণ। তবু তার মধ্যেই অভিনব চেতনার স্পর্শ রয়েছে। যেমনঃ

ক॥ নিবিড় আঁধার সম শোনিতের বিন্দুসম
খ॥ যাহার জীবন হায়
কীটদষ্ট পুষ্প প্রায়
গ॥ প্রাণ যেন বর্ষার আকাশ

তিনটি উদাহরণের সাহায্যেই বোঝা যায় যায়, প্রচলিত কোন পূর্বানুসারী ধারণা থেকে তিনি উপমা দেন না। তাঁর উপমা অন্তশ্চক্ষু দিয়ে দেখা, মমতায়, সকরুণ, অনুভবে আর্দ্র। বিশেষতঃ, 'প্রাণ যেন বর্ষার আকাশ'—এই উৎপ্রেক্ষাটি পড়ে স্তব্ধ হতে হয়। অন্ধকারের অন্তরঘন কোন্ অনুভবের নিস্তব্ধতে ফুটেছে এমন পূর্ণবৃন্তফুল?

এছাড়া নীলনলিনীর কবিতার শব্দ ব্যবহারও বেশ অভিনব। সমাসবদ্ধ ও সন্ধিযুক্ত বড় বড় শব্দ (যেমন 'বিটপীতিমির, বাতনাভাস্পদগ্ধপ্রাণ, সুশী-তলাশ্রয়, কণ্টকশাসন প্রভৃতি) বিস্ময়ের উদ্রেক করে। রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা কবিতায় পদান্তের মিলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য কোন কবির ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পদান্তের মিলগুলি সমধ্বন্যাত্মক, সমমাত্রিক ও চকিত। নীলনলিনীর কবিতার মিলগুলি (যেমনঃ বাণী ও পরাণী, সৌরভে ও নভে আদেশাকাঙ্ক্ষায় ও সত্যবানকায়, আলো ও অমলধবল, জন ও বিসর্জন, আজ ও সমাজ প্রভৃতি) যুগের তুলনায় অনেক অগ্রসর এবং আধুনিক। এই পদান্ত মিলগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, কবিতার কারুকর্মে তিনি ছিলেন প্রতিভাদীপ্ত শিল্পী। তাঁর কবিতার ছন্দবিচারে নামার আগে স্বীকার করতে হয়, যে 'বালুকণা' কোন কোন কবিতায় ছন্দশৈথিল্য আছে। সেই শৈথিল্য মূলত অনবধানতার জন্যই। তবু ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তিনি ব্যর্থ হননি। সে সময়ের বাংলা কবিতার ছন্দ মূলত একই ভঙ্গির ছিল। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সকলেই পয়ার, ত্রিপদী আর ঢিলে ধরনের মাত্রাবৃত্তে অভ্যস্ত ছিলেন। নীলনলিনীর কবিতার ছন্দও এই ধরনের, তবু তাঁর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। যেমনঃ

জীবনের কটা দিন বাকি
যাব চলে মরণের পারে
মোর সাথে পাশরিবে সবে
অভাগা এ পরিব্রাজকেরে।

এই ছন্দোভঙ্গির প্রধান লক্ষণীয় বিষয় এর প্রথম এবং তৃতীয় পদান্তের অমিল-রীতি। সে যুগে পদান্তের মিল ছিল স্বতঃসিদ্ধ, অনিবার্য। আর সেই পরিবেশেই নীলনলিনীর এই প্রয়াস স্মরণীয়। কিন্তু তাঁর প্রতিভার দীপ্ততম প্রকাশ তাঁর কাহিনী কবিতাগুলি। 'সাবিত্রী', 'দময়ন্তী' কবিতা দুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই দুজন নারীর জীবন নিয়ে কাহিনী কবিতা লেখার প্রয়াস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাবিত্রী এবং দময়ন্তী দুজনেই স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য আকুল। দুজনেরই স্বামীবঞ্চিত রূপটি প্রকটিত করেছেন নীলনলিনী। এই ব্যাপারে কবির নিজের মনের প্রক্ষেপ স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। নিজের জীবনের স্বামীহীন এককতার বেদনার উপমান খুঁজে পেয়েছেন তিনি এই দুই নারীর মধ্যে। এ ছাড়াও আছে 'সীতা' ও 'জোলেখা' নামে দুটি খণ্ড কাহিনী কবিতা। এ ছাড়াও বৈষ্ণব কবিতার ঢংএ লেখা তাঁর কয়েকটি কবিতা আছে। কবি নিজেকে খণ্ডিতা রাধার ভূমিকায় স্থাপিত ক'রে বলছেনঃ

মিনতি করিতে তোরে
তার কাছে যেওনা
মরে রাধা অভাগিনী
যেন তারে বলনা (খণ্ডিতা)

এবং

সুখে আছে থাক সখি
কাজ কি তোমার, নিয়ে
সে যদি রয়েছে সুখে
এ কালয়ে পাশরিয়ে। (খণ্ডিতা)

নিজের [illegible]

আমার পক্ষে আশ্চর্য চাতুর্যে মণ্ডিত মনে হয়। কৃষ্ণ-পরিত্যক্তা রাধিকার দুঃখের সঙ্গে স্বামীবঞ্চিতা নিজের দুঃখের এই সমীকরণ এক অভিনব চাতুর্যের অভিজ্ঞান কৌশলে একটি রূপের আড়ালে আর একটি রূপের উন্মোচন যেমন বিস্ময়কর তেমনই তাৎপর্য-মণ্ডিত। এই আঙ্গিকগত এবং ভাবগত কৌশল দেখে বোঝা যায় প্রকৃত কবিত্ব তাঁর মধ্যে ছিল। মৃত্যুর সংদাহ না নামলে, বেদনারঞ্জিত পথেই তিনি বাংলা কবিতায় উপহার দিতে পারতেন মহৎ কবিতার স্বর্ণশস্য।

নীলনলিনীর কবিত্ব বিচার করা প্রায় অসম্ভব; কেননা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কাব্য লেখেননি। সারা জীবনের সমস্ত হৃদয়ব্যথার জ্বালা ঢেলে দিয়েছেন তিনি কাব্যে। অন্যান্য অনেক বঞ্চিতা মেয়ের মত শুধু কেঁদে হয়তো এই জ্বালার উপশম হ'ত, কিন্তু পৃথিবী তাঁকে দিয়েছিল অনুভবের এক অনিরুদ্ধ প্রাণশক্তি। সেই প্রাণশক্তির অদম্য প্রকাশ তাঁর কাব্য। তাই তাঁর কবিতা পড়ে তাঁকে প্রণাম জানাতে হয়। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ আবহাওয়ায়, প্রতিকূল প্রতিবেশে আর অল্প বয়সে এমন হৃদয়-সম্ভব কবিতা আর কেউ লেখেননি। তাঁর কবিতায় কি আছে? নিরাশা আছে, বেদনা আছে, জ্বালা আছে; কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছে অভিমান।

প্রায় পঞ্চাশ বছরের অজ্ঞাতবাসের পর 'বালুকণা' এসে দাঁড়ালো প্রকাশের পাদপ্রদীপের সম্মুখে। পড়তে পড়তে হৃদয় উন্মূলিত হ'য়ে যায়—কোথায় সঞ্চিত থাকতো এত বেদনার উত্তাপ? চোখের সামনে ভেসে ওঠে কল্পপ্রতিমা; বেদনাবিধুর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠ কানে বাজে:

> ভেবেছিলে সুখী মোরে, কি ভ্রম তোমার,
> সুখ শশী নাই হৃদে, অমার আঁধার
> যাহার পরাণ হরে,
> কীটদষ্ট পুষ্প প্রায়,
> তার কি কখন হয় আনন্দসঞ্চার?
> ঝরিতে ঝরিতে শুধু সাধ হয় তার।

(শেষকথা)

বাংলা কবিতার ইতিহাসে নীলনলিনী এই কীটদষ্ট পুষ্পকলিকার অভিমান। মেঘরুদ্ধ নবীনসূর্যের বন্দনা নীলনলিনীর কবিতার আর বাতাসশিহরে ঘূর্ণিত নবীন বাল্যমঞ্জরীর হাহাকার।

জীবনের উপান্তে এসে নীলনলিনী লিখেছিলেন:

[illegible]

আঙুরলতা

বিমল কর

মনে হল না এই মাত্র অতিবড় একটা সর্বনাশ ঘটে গেল আঙুরের—আঙুরলতার ঘরে।

হাউমাউ করে কেঁদে নন্দর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না আঙুর। দুটো ঠান্ডা পা নিজের বুকের মধ্যে দু-হাতে জাপটে ধরে মাথা ঠুকতে শুরু করল না; আধ-ভেজান দরজাটা হাট করে দিয়ে ছুটে যে বাইরে যাবে, চেঁচামেচি করে কাউকে ডাকবে, তাও না। নন্দর চৌকির পাশে মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে একটু কাঁদল না পর্যন্ত।

মধুর সঙ্গে চ্যবনপ্রাশ মেড়েছিল আঙুর। আঙুল দিয়ে নন্দর জিবে আস্তে আস্তে সেটা মাখিয়ে দিতে মানুষটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল একটু আগে। নন্দর যখন সাড়া পাওয়া গেল না, দশ ডাকেও ঠোঁট ফাঁক করল না, জিব নাড় করল না একটুও—আঙুর তখন [illegible] তাকিয়ে লোকটার [illegible] দেখল সন্দেহভরে। [illegible]

[illegible]

ধরল। না, নিশ্বাস পড়ছে না নন্দর। আঙুলটা সরাতে গিয়ে নন্দর নাকের ডগার সঙ্গে ছুঁয়ে গেল। ঠান্ডা। নন্দর বুকে হাত রাখল, কান পাতল। কোনো শব্দ নেই। যাই যাই করছিল মানুষটা। আজ যাই কি কাল যাই! যাক্ শেষ পর্যন্ত চলেই গেছে।

মধু মাড়া খলনুড়িটা কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিতে এসে পশ্চিমের জানলাটা খুলে দিল আঙুর। হিমুদের পুরনো টিনের চাল্যর ওপর এখনও টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। মাটির দেওয়ালগুলো ভিজে সপ্‌সপ্‌। ডোবাটার নীল জলে শ্যাওলা থিকথিক করছে। আশশ্যাওড়া আর কচুর জঙ্গলে কটা কাক ভিজছে আর ডাকছে।

জানলার কাছ থেকেই ঘুরে দাঁড়াল আঙুর। নন্দর দিকে আর একবার চাইল। নড়বড়ে সরু চৌকিটার ওপর কঙ্কগুলো এলোমেলো হাড় যেন কেউ চিট্‌ ছেঁড়া কাঁথার তলায় চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছে। দুটো মাছি এসে বসেছে নন্দর মুখে।

নন্দ তো মরে জুড়োল কিন্তু আমায় যে এই শেষ সময়েও জ্বালিয়ে গেল! আঙুর ভাবছিল: এখন কি করি! কাকে ডাকি, কার পায়ে ধরি, কার কাছে হাত পাতি?

ভীষণ রাগ হচ্ছিল আঙুরের। পাজী নচ্ছারটা যেন বুঝেসুঝেই এসেছিল এখানে। যেন ঠিক করেই এসেছিল, এঁটো পাতটা আঙুরকে দিয়েই তুলিয়ে নেবে। সেই জেদ ও রাখল।

এখন কি করে আঙুর? এ-ভাবে [illegible] ঘরের মধ্যে মড়া [illegible]

[illegible]

হিংস্র হয়ে উঠল। খপ করে ধরে বেড়ালটাকে আধভেজানো চৌকাটের দিকে ছুঁড়ে মারল। ধপ্‌ করে একটা শব্দ, বেড়ালটার সামান্য একটু ককিয়ে ওঠা। দরজার ফাঁক দিয়ে পালাল জন্তুটা।

যেমন করে বেড়ালটার টুঁটি চেপে ধরেছিল আঙুর, তেমন করেই মাদুর, পোঁটলা-পুঁটলি, একটা উদোম বালিশ—মেঝের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ও। 'যত আপদ সব! আমার কপালেই জোটে গো—এও আশ্চর্যি! কেন, তোদের আর জায়গা হয় না! হারামজাদা, নচ্ছারের দল। অন্য ঠাঁই নেই?, শুতে পারিস না, মরতে পারিস না সেখানে! না থাকে রাস্তায় যা, ভাগাড়ে যা!'

আঙুরের গলা চড়ল। যখন বেশ চড়ায় উঠল—তখন আঙুর যেন থেমে গিয়ে প্রত্যাশা করছিল এইবার অন্য কেউ কথা বলবে। ম্লান বিষণ্ণ, ভাঙা ভাঙা, চাপা গলায়। কিন্তু কোনো জবাব আসছে না

দেখে মুখ ফিরিয়ে নন্দর দিকে তাকাতেই খেয়াল হল, লোকটা মরে গেছে।

রঙচটা, তোবড়ানো বাক্সটা খুলে বসল আঙুর। হাঠকাল, হাতড়াল। একটা পাটের ফাঁস-খাওয়া বাহারী শাড়ি বের করল, দুটো তাঁতের—ছেঁড়া পেঁজা। সায়াও একটা, সাটিনের একটা বডিজ—। কাঠের কোটো, প্রসাদী ফুল বাঁধা ন্যাকড়া, রোলড্-গোল্ডের মেড়মেড়ে কানপাশা, ঝুটো কাঁচের মালাও একটা। আর বেরুল একপাতা সিঁদুর। কঁটা মাথার কাঁটা।

আঙুর সিঁদুর আর মাথার কাঁটা কটা হাতে করে একটু চুপ করে বসে থাকল। নন্দর দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইল না, কিন্তু চোখ দুটো ওর মনে মনে নন্দকেই দেখছিল। বছর পাঁচেক আগেকার নন্দকে। তখন নন্দর গায়ে মাংস ছিল, হাড়টা চোখে পড়ত না। মুখটা ছিল চোখ-টানা। ভরাট গাল, বড় বড় চুল।

আঙুরের বুকের মধ্যে এতোক্ষণে টনটন করে উঠল। গলার কাছে নিশ্বাসটা একটু সময় চাপ হয়ে থাকল। চোখের সাদা জমি ব্যথা ব্যথা করে জল জমছিল। এক ফোঁটা জল একটা গাল ভিজিয়ে পড়ল টপ্ করে—হাতের ওপর। ঠিক কব্জির কাছটায়। আর আঙুর সে-দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বাক্সের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দিল।

না, নেই। সেই শাঁখা জোড়া আঙুর কবে যেন টান মেরে খুলে ফেলেছিল হাত থেকে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নর্দমায়। বিয়ের শাঁখা তো নয়, শখের শাঁখা; স্বামীর সিঁদুর তো নয়, যে-লোকটা তাকে রেখেছিল মেয়েমানুষ করে তার একচেটিয়া জবরদস্তির সিলমোহর ও-সিঁদুর। আঙুর শাঁখা ফেলে দিয়েছিল, সিঁদুরও মুছে ফেলেছিল। সে অনেকদিন হল।

চোখটা মুছে নিল আঙুর। এই যে তার মনটা খারাপ লাগছে, কান্না আসছে এর জন্যে নিজের ওপরই তার রাগ আর বিরক্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এবার সে ন্যাকামি শুরু করেছে। যেন এই ন্যাকামিটুক করা উচিত, করলে পাঁচজনে দেখবে, অন্তত নন্দ।

ঘাড় ঘোরাল আঙুর। না, নন্দ আর দেখবে না। ও মরেছে।

বাক্স হাতড়ে খুঁটে খুঁটে সবসুদ্ধ সাড়ে এগারো আনা জুটল। একটা অচল টাকা আছে। এমনই অচল যে, কোনো রকমে চালাবার উপায় নেই। যে হারামজাদা ফাঁকি দিয়ে এটা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—সে আর কোনোদিন এল না। এলে আঙুর তার কাছ থেকে টাকাটা ঠিক আদায় করে নিত। ঠাকুর বাড়িতে মানুষ অচল চালায় আর চালাবার চেষ্টা করে তাদের এই পাটিতে।

সাড়ে এগারো আনা—আর আঙুর মনে মনে খুঁজে-পেতে দেখল, কুলুঙ্গিতে গেলাস চাপা দেওয়া একটা আধুলি আছে, দোক্তার কৌটার মধ্যে একটা দুয়ানী। ও, হ্যাঁ—আর আনা ছয় পয়সা আছে চালের হাঁড়িটার মধ্যে। কতো হল সবসুদ্ধ তা হলে! সেই একটাকা সাড়ে এগারো আনা।

একটাকা সাড়ে এগারো আনায় কি একটা লোককে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া, পোড়ান-টোড়ান সম্ভব! আঙুর যদিও এমন ফ্যাসাদে আগে পড়েনি তবু জানা কথাই গোটা দুয়েক টাকায় শ্মশান-খরচ চলে না।

কি করবে, কি করা যায়—আঙুর ভাবছিল। কুল পাচ্ছিল না। বিক্রি করবে, বাঁধা রাখবে—এমন কোনো জিনিসই আর তার কাছে নেই। কি আছে আর তার এখন? এক রতি সোনা না, রুপো না, এমন কি কাঁসাও নেই। সোনা কোনোকালেই ছিল না! সোনার পাত পরানো হালকা চুড়ি চারগাছি ছিল এককালে, নন্দই করিয়ে দিয়েছিল তখন, সে-চুড়ি কবেই গেছে। কানের দু-তিন আনা সোনা ছিল—এটা অবশ্য আঙুর তার রোজগারে গড়িয়েছিল—সেটাও গেছে মাসদেড়েক আগে নন্দ আসার পর।

নন্দ এল, আর যেন মস্ত বড় হাঁ নিয়েই হারামজাদা এসেছিল, আঙুরের কানের তিনআনা সোনা গেল, খাঁটি সোনা; নাকের দেড় আনা—মাথায় গোঁজা রুপোর চিরুনিটা, দুখানা রেশমী শাড়ি, কাঁসার থালা, বাটি, গেলাস—টুকিটাকি আরও কতো কি!

কি করবে আঙুর! আহা, সে কী সেধে এনে ঘরে ঢুকিয়ে চৌকি পেতে দিয়েছিল! অত পিরীতের কেষ্ট ছিল না নন্দ তার। বরং ওই ছ্যাঁচড়া, শয়তান, ইতর, স্বার্থপর লোকটা যখন ধুঁকতে ধুঁকতে এসে উঠল, আঙুর তো তাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে গিয়েছিল।

মুখপোড়া মাগীচাটা তখন আঙুরের পা জড়িয়ে ধরে মেয়েমানুষের মত কেঁদেছে। আঙুরের নিজেরই তখন ঘেন্না করছিল। নন্দর সর্বাঙ্গে ঘা, পুঁজরক্তে ময়লা ছেঁড়া কাপড়জামা দাগ ধরে কড় কড় করছে; বিকট গন্ধ—দাঁতে পোকা, চুলে উকুন, এক-মুখ দাড়ি, হলুদ চোখ। আর বৈশাখ মাসের দুপুরের খড়ের গাদার মতন গরম গা।

'দুটো রাত আমায় থাকতে দাও, আঙুর; গায়ের তাপটা একটু কমুক আমি চ'লে যাব।' নন্দ বলেছিল আঙুরের পা সত্যি সত্যি জড়িয়ে ধরে।

'না, না, না। যেখানে কাটালে এতো-দিন—সেখানে যাও।' আঙুর রোদজলে পোড় খাওয়া কাঠের মত শক্ত। 'তোমার পয়সার সুখে যারা লুটেছে, যাদের পায়রা করে পুষেছ এতোদিন, শোয়াশুয়ি রঙ্গ করেছ,—তাদের কাছে যাও। কেন, তারা এখন রাখল না, লাথি মেরে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিল!'

নন্দ জবাব দিতে পারছিল না। তার জবাব দেবার কিছু ছিল না। শুধু জ্বরের ঘোরে, যন্ত্রণার বিকারে একটা মারাত্মক জখম-হওয়া-কুকুরের মতন ছটফট করছিল, মাথা খুঁড়ছিল।

আঙুর থাকতে দেবে না। নন্দও উঠবে না। ওঠার মতন ক্ষমতাটুকুও তার নেই যেন।

অগত্যা।

থাকছ, থাক—; কিন্তু জ্বর ছাড়লেই চলে যেতে হবে। আঙুর সাফসুফ বলে দিয়েছিল, শাসিয়ে দিয়েছিল। সেই গোড়াতেই।

নন্দ তো জ্বর ছাড়াতে আসেনি, এসে-ছিল আঙুরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করতে। কী ঝামেলা, কী ঝকমারি নন্দকে থাকতে দিয়ে। জ্বর তো যায়ই না, উপরন্তু বাড়ে। মাঝে মাঝেই নন্দ বেহুঁশ। হুঁশ থাকে যতক্ষণ কাটা ছাগলের মত ছটফট করে।

চোখের সামনে জবাই আর কতক্ষণ দেখতে পারে মানুষ। আঙুর বিরক্ত হয়ে, কোনো উপায় নেই দেখে, নন্দকে গালাগাল দিতে দিতে ডাক্তার ডেকে আনল। অম্বিকা ডাক্তারকে। এ-পাড়ার ডাক্তার। যার কাছে আঙুরদের লুকোন-চোরণ রোগ-গুলো জলের মতন পরিষ্কার। ও জ্বালা-টালা, ঘা-টা আপাতত সে চাপাচুপি দিয়ে দিতে পারে।

অম্বিকা ডাক্তার দেখল নন্দকে। আঙুরকে বলল, ও আঙুর—খারাপ ঘা-টাগুলো না হয় একটু সারিয়ে-সুরিয়ে দিলাম আমি; কিন্তু ওর লিভার যে পচে গেছে মদ খেয়ে খেয়ে। বড় কাহিল অবস্থা। সহজে মেরামত হবে না। হবে কি না তাও সন্দেহ! ওকে বরং কলকাতার হাসপাতালে দাও যদি কিছু হয়—এখানে তো সুবিধে দেখছি না।

আঙুরকে যেন কেউ উনুনের আঁচ থেকে টেনে চুল্লিতে ফেলল। জ্বলে যেতে লাগল আঙুর। কোথায় আপদ বিদেয় করতে পারলে বাঁচে, তা না নাড়িভুঁড়ি পচিয়ে, ফিঁচেল রোগে সমস্ত রক্তটাকে দুষিয়ে হারামজাদা তার কাছে আরাম করতে এসেছে!

মর, মর। অরুচি আমায়। খেলাম, শুলাম, সুখ করলাম পাটে; ছাই ঝাড়তে ওরে পচি, এলাম তোমার হাতে। বেইমান মিনসে কোথাকার! হবে না, শরীর তো পচে পচে গলে গলে ঝরবে। প্রায়শ্চিত্তি এমনি করেই হয়। কেন, যখন আঙুরকে ছেড়ে পথে বসিয়ে পালিয়েছিলে মনে ছিল না। আমার মা না হয় পা পিছলে কাদায় পড়েছিল। কিন্তু আমি তো আর সাত ভাতার করে বেড়াইনি। তখন ফুসফাস করে ভাগিয়ে নিয়ে এলে। কতো রস-আদিখ্যেতা, মধুমিছরির কথা—।

'আঙুর তখন বড্ড মিষ্টি, রস টুসটুসে। একাই চাখব, একাই খাব। ফন্দি-ফিকির, ছেনালি কত! শাঁখা পর, সিঁদুর দাও সিঁথিতে। বর-বউ; স্বামী স্ত্রী আমরা। ভগবান সাক্ষী, যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, এই মাটি সাক্ষী, এই ঘরের চুন, দেওয়াল-ছাদের বন্ধন—এরা সাক্ষী।

বছর কাটতেই আঙুরের রস শুষে শুষে ছিবড়ে করে ফেলল নন্দ। আর সুখ নেই, স্বাদ নেই, অরুচি ধরে গেছে। পালাল নন্দ। কিছু না বলে, ঘর-দেওয়ালের বন্ধন কাটিয়ে।

তারপর চার বচ্ছর আর এ-পথ মাড়াল না। আজ এসেছে—মরতে বসে যখন আর কোথাও জায়গা পাচ্ছে না দেহটা রাখে।

আঙুর চিৎকার করে করে শুনিয়ে শুনিয়ে এ-সব কথা দশবার করে বলে। দূরে দূরে করেই আছে। জিবের রাখঢাক নেই। সারাদিন বিরাগ আর বিরক্তি, রাগ-ঘেন্না উগরে যাচ্ছে।

অথচ নেহাতেই যেন এমন এক কলে পড়েছে যেখান থেকে উদ্ধার নেই তার লোকটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত—তাই ভীষণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পাপ বিদায়ের গুণাগার দেবার জন্যেই ডাক্তার আর ওষুধ আর এ-পথ্য সে-পথ্য।

অম্বিকা ডাক্তার কটা ছুঁচ ফুঁড়ল, দু-চার শিশি ওষুধ। ঘা ফোড়ার দগদগানি কমল একটু। আর কিছু না। চটকলের সেই বড় ডাক্তার—তাকেও একদিন দেখিয়ে আনল আঙুর। তার লিখে দেওয়া ওষুধ খাওয়াল। যে কে সেই। এই ডাক্তারও বলল, কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এস।

বিশ মাইল কলকাতা। যেতে আসতে চল্লিশ মাইলের রগড়ানি, রেল-ভাড়া, বাস-ভাড়া। নন্দর ওঠার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। তবু আঙুর একটা পচাগলা মাছের চেঙারির মতন নন্দকে কাঁধে-কোমরে ধরে তাও কলকাতার দু-দুটো হাসপাতালে ধরনা দিল। কিসের কি, কানে কথাই তুলল না কেউ। দেখলনা পর্যন্ত। এক নজর চেয়েই বলল, এখানে কেন এসেছো গো, নিমতলায় নিয়ে যাও। আর যদি আঁচলে নোট বেঁধে এনে থাক—টাকা দিয়ে ভর্তি করে দিয়ে যাও।

ফেরার পথে নন্দর সঙ্গে হাসপাতালেরও বাপান্ত করতে করতে ফিরল আঙুর। আর সেই যে এসে পড়ল নন্দ তারপর আর পাশ ফেরবার পর্যন্ত ক্ষমতা থাকল না। হোমিওপ্যাথি চলছিল শেষটায়। তবু দু আনা পুরিয়া পাওয়া যায় কালীকেষ্টর ডাক্তারখানায়। গত পরশু থেকে সত্য কবিরাজের কথা মতন মধু-চ্যবনপ্রাশ।

তারও শেষ হল। নন্দ মরল।

আঙুর রঙচটা তোবড়ানো ডালা খোলা বাক্সর অন্ধকারে বেহুঁশ হয়ে তাকিয়েছিল। চোখের পাতা পড়ছিল না, মনেই হচ্ছিল না ও আছে, ও কিছু ভাবছে, কিছু ওর করার আছে।

হুঁশ হল মেঘের ডাকে। খুব জোরে একটা মেঘ ডেকে উঠল বাইরে। আঙুর মুখ ফিরিয়ে দেখল, জানলার বাইরেটায় অনেকটা অন্ধকার জমে এসেছে।

বাক্সটা থেকে পাটের বাহারী শাড়িটা বের করে ডালাটা বন্ধ করে দিল। জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। তাকাল বাইরে। খানিকটা কালো মেঘ জমেছে বলে মনে হচ্ছে—কিন্তু বিকেলও হয়ে গেছে। বৃষ্টি অবশ্য আর পড়ছে না।

আঙুর শুনতে পাচ্ছিল তার ঘরের বাইরে চাঁপা, আভা, লাবণ্য, চামেলি, গোলাপ—দুপুরের গা-গড়ানো ঘুম শেষ করে, কেউ জল ভরতে, কেউ ছাই তুলতে, উড়ের দোকান থেকে চার পয়সার চা আনতে—উঠোন দিয়ে আসছে যাচ্ছে, কথা বলছে। আভার কির-কিরে গলা আর গোলাপের ভাঙা গলার বিশ্রী হাসিটা স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিল আঙুর।

আভা ছুঁড়িটার কপাল ভাল। পাটকলের একটা ছোঁড়া খুব যাচ্ছে আসছে। আগেরটা ভাগতে না ভাগতেই নতুনটা জুটে গেছে। আঙুর ভাবছিল : আভা কি এই পাটের বাহারী শাড়িটা নেবে? ওর তো এই সব রঙ, বাহার ভালই লাগে। যদি নেয় আভা, হোক না একটু ফাঁস খাওয়া—তবু এখনও ছটা মাস নিশ্চিন্তে পরতে পারবে। আহা, এই শাড়ি পরে তো আর বিছানায় ধামসাচ্ছে না!

যদি নেয়, আঙুর চার টাকাতেই দিয়ে দেবে। আর যদি না নিতে চায়? আঙুরের মনের মধ্যে আভা, পাটের শাড়ি, নন্দ সব এলোমেলো হয়ে গেল।

একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুর যেন সব ভেবে নিল, পর পর। কি করবে, কার কাছ থেকে কার কাছে যাবে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে এবার। বিকেল তো হয়েই গেল। আর কতক্ষণ ঘরে মড়া ফেলে রাখবে!

যাবার সময় নন্দর মুখের দিকে চেয়ে একটা কুৎসিত গাল আওড়াল আঙুর। বাইরে এসে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

আভা তার ঘরের কাছটিতে পিঁড়ি পেতে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। নিশ্চয় ওর বাবু কাল যাবার সময় ফেলে গেছে। কিংবা আভা সরিয়ে রেখে দিয়েছে নিজেই। সেই সিগারেটের ভাগ পাবার আশায় মানদা আভার চুলের জট ছাড়িয়ে দিচ্ছে, চিনু পায়ের কাছটিতে উবু হয়ে বসে ঝামা দিয়ে পা ঘষে দিচ্ছে।

পাটের শাড়িটা আঁচলের তলায় আড়াল করে নিয়েছিল আঙুর আগেই। আভার আশেপাশে অত ভিড় দেখে এখন আর যেতে ইচ্ছে হল না। মানদা যতক্ষণ কাছে থাকবে, শত খুঁত বের করবে, আভার ইচ্ছে থাকলেও মানদা কিনতে দেবে না। দর-দাম তো পরের কথা।

তার চেয়ে আগে হিমুর কাছেই যাওয়া যাক। বলতে গেলে হিমুই একমাত্র লোক যার সঙ্গে আঙুরের ভাবসাব আছে ভাল মতন। সুখ-দুঃখের কথা, তার সঙ্গেই যা হয়।

এত বড় বিপদের কথাটা তাকেই আগে জানানো দরকার।

আঙুর উঠোন পেরিয়ে তর তর করে সদর দিয়ে বাইরে চলে গেল। হিমুদের চালাটা পাশে।

চুল বাঁধতে শুরু করে দিয়েছিল হিমু। আঙুর এসে কাছে দাঁড়াল।

বিপদের কথাটা বললে আঙুর। হিমুর হাত থেমে গিয়েছিল। 'কখন ম'ল?'

'দুপুরে।'

'ঘণ্টা তিন চার হল তবে! আজ আবার শনিবার। দোষ না পায়!'

'পাবে পাক, আমি কি করব! আমার কাছে তো চিতেয় ওঠার খরচ জমা রেখে যায়নি!'

'কি করবি?' হিমু চুলের খোঁপাটা আবার গুছোতে শুরু করল।

'ক'টা টাকা জোগাড় করতে পারলে হারামজাদাকে চিতেয় উঠিয়ে আসব।' আঙুর দাঁতে দাঁত পিষে বলল।

'বিশুদের কাছে যা। ওদের বল। তবে মাগনায় মরা কাঁধে করে পোড়াতে যাবে না ওরা।'

'তা জানি।'

'দেখ্ তবু হাতে-পায়ে ধরে—যদি যায়।'

আঙুর তাকিয়ে তাকিয়ে হিমুর মুখ দেখল। হিমুকে দেখে মনে হচ্ছে, এ-ব্যাপারে তার কোনো গা নেই।

'তুই আমায় ক'টা টাকা দিবি হিমু?'

'টা—কা!' একটুক্ষণ আঙুরের দিকে চেয়ে থেকে হিমু হতাশ, বিষাদ-বিষাদ মুখ করল, 'তোকে বলছিলাম না সে-দিন! স্যাকরার জন্যে বারোটা টাকা রেখেছি অনেক কষ্টে, আর চারটে হলে—জিনিসটা হয়। তা পোড়া কপাল এমন চারটে টাকাও জুটোতে পারছি না।'

আঙুর হিমুর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। কি ভেবে হিমু বললে আবার, 'সিকি আধুলি, বড় জোর টাকাটা হয়, পারি আঙুর। তার বেশি আমাদের ক্ষমতা কি! তা তুই দুটো টাকা নে বরং আমার কাছ থেকে। পরে শুধে দিস।' বলেই হিমু একটু অন্য-রকম হাসল, 'তুই আর শুধবি কি—!'

হাত পেতে আঙুর দুটো টাকাই নিল। অন্য সময় হলে নিত না, কিছুতেই না।

হিমুর কাছ থেকে বেদানামাসির ঘরে।

মাসি শুনে খেঁকিয়ে উঠল, তখনই বলেছিলাম ও আপদ ঝেড়ে ফেল গা থেকে। শুনলি না। দরদে একেবারে উথলে উঠলি। যা এবার নিজেই কাঁধে করে নিয়ে যা। ছেনাল মাগী কোথাকার।

আঙুর কিছু বলল না। মনে মনে ভাবল শুধু, দরদেও উথলে উঠিনি, বিছানা পেতেও শুতে দিই নি। নন্দর আমি বিয়ে করা মাগ নয় যে, না খেয়ে সেবা-সুশ্রূষা করেছি ওই পচা মর-মর লোকটার। নেহাত ছিল, একই ঘর; ও চৌকিতে, আমি মেঝেতে; তাই জল চাইলে দিয়েছি, ওষুধটা ঢেলেছি মুখে। পথ্যটা দিয়েছি দায়ে পড়ে।

বেদানা মাসি বললে, আমি কি করব!

'মড়াটা ঘরে পড়ে থাকবে?' আঙুরের গলা যেন আর উঠছিল না।

'তা থাকবে বৈকি—আমার এখানে মড়া ধরা না থাকলে, না পচলে তোদের চলবে কেন! যা—যা—মেথর মুদ্দোফরাসকে খবর দিগে যা—হাতে আধুলিটা টাকাটা গুঁজে দিস—না হয় একদিন নিয়ে শুস বিছনায়—ওরাই ধড়টাকে পা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেবে।'

আঙুরের বুকটা ছ্যাক্ করে উঠল। মেথর, মুদ্দোফরাস! জিনিসটা কল্পনা করতে গিয়ে মনে পড়ল, মরা কুকুরকে কিভাবে পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় ওরা।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল নন্দর উপাধিটা। ও চক্রবর্তী। বামুন।

কেমন যেন শিউরে উঠল আঙুর।

বুকের মধ্যে সত্যি সত্যি একটা অদ্ভুত ব্যথা আর অসহায়তা জমে উঠতে থাকল।

বিকেল পড়ে সন্ধ্যে হয় হয়।

আঙুর তাড়াতাড়ি এল আতার ঘরে। আতা তখন সাজছে। ছেঁড়া সায়ার ওপর আর একটা নতুন লাল সায়া চড়িয়েছে। তা কোমর-টোমর ফুলেছে খুব। বডিজ এ'টে শাড়িটা সবে পরছে। ঘরে কেউ নেই।

কথাটা সরাসরি পাড়ল আঙুর। পাটের শাড়িটা একেবারে বের করে।

আতা দেখল হাতে নিয়ে, খুলে ফেলে, কোমরে পাক দিয়ে, গায়ে ফেলে। 'শাড়িটা তোমার বড্ড সেকেলে, আঙুরদি! পাড় ভাল না।'

আঙুর কি বলবে! তিন বছর আগের শাড়ি সেকেলে হয়ে গেছে! আঙুর শুধু বিড়বিড় করল, 'তোকে মানাবে। বেশ মানাবে।'

আতা হাসল। 'চারুবাবু সে-দিন আমায় একটা ছাপাই এনে দিয়েছে। এ-নিয়ে আর কি করব! বড্ড পুরোনো ছেঁড়া ফাটা।'

'নে না—!' আঙুর নিজের অজান্তেই কখন যেন মিনতি করে বসল, 'আমি বলছি আতা, নিয়ে নে। তোকে সুন্দর দেখাচ্ছে শাড়িটা গায়ে ফেলে। আর যদি শুনিস বাপু তবে বলছি,—এ-শাড়ি পরে তো আর ধামসাচ্ছিস না। রেখে রেখে পরিস—বছর খানেক চলে যাবে।'

আতা ভাবল। 'আমার কাছে তিনটে টাকা আছে—আড়াইটে টাকা দিতে পারি। না হলে তুমি নিয়ে যাও, আমার তেমন দরকার নেই।'

আড়াইটে টাকাই নিল আঙুর। ঘরের বাইরে এল। লণ্ঠন আর কুপি জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে সব তৈরি। সাজ-পোশাক শেষ করে ফেলেছে চামেলি, লাবণ্যরা। আকাশ লালচে লালচে, বৃষ্টি হয়ত আরও জোরে আসবে। টিপ্ টিপ্ পড়তে শুরু করেছে আবার। সেই বৃষ্টিতেই চামেলিদের কেউ মাথার ওপর আঁচল তুলে গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটি ছাতায় দু-তিনটে মাথাও জড়ো।

সরু গলিটা দিয়ে রাস্তায় চলে এল আঙুর। গলির আবছা আলো-অন্ধকারে তখন গোলাপদের জটলা, বিড়ি ফোঁকা, গা-ঢলাঢলি, হাসি। ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে সবে খদ্দেরদের।

রাস্তায় এসে মনে মনে টাকার পুরো হিসেবটা সেরে ফেলল আঙুর। এক টাকা সাড়ে এগারো আনা, হিমুর দুই আর আতার আড়াই—তা ছটা টাকা হয়ে গেছে। বিশুরা যদি এখন এই ছ টাকায় রাজী হয়। মনে হয়-না হবে—। কতোতে যে হবে—তাই বা কে জানে! হন হন করে এগিয়ে গেল আঙুর।

এখান ওখান খোঁজ নিয়ে বিশুকে পাওয়া গেল সাইকেল সারাবার দোকানটায়। টিনের নড়বড়ে চেয়ারে বসে দোকানের দরজার পাল্লায় পা তুলে কাচের গেলাসে চা খাচ্ছিল। কার্বাইডের আলো তার পাজামা আর মুখে পড়েছে।

আঙুর কাছে গিয়ে ডাকল। ইশারা করল কাছে আসবার।

চা শেষ করে, বিড়ি ধরিয়ে ফুঁকতে ফুঁকতে বিশু এল; মিটমিট চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে। 'কি রে পটলি, কি খবর?' বিশুর কাছে আঙুররা সবাই পটলি। কিন্তু আঙুর কিছু বলবার আগেই বিশু সামনের দিকে চেয়ে বলল, 'দাঁড়া, আগে মাইরি একটা পান খেয়ে লি। শালা চা নয় তো যেন ঘোড়ার পেচ্ছাপ। জিবটাই বেসাদ হয়ে গেল।' বিশু কথাটা শেষ করেই হাত বাড়াল। অর্থাৎ পান সিগারেটের পয়সাটা আগে ফেল। পরে বাতচিত্।

আঙুর এ-সব দস্তুর জানে। গরজ তার। আঁচলের খুঁট থেকে আধুলিটা দিল—আতার দেওয়া আধুলিটা। বললে, 'এক খিলি পান, একটা সিগারেট—তার বেশি নয়, কালীর দিব্যি থাকল।'

বিশু হাসল। 'খুব টাইট যাচ্ছে না রে পটলি! দিনকাল শালা যা যাচ্ছে—যেন সত্যযুগ। আয়—হায়, শালা আঙুরের রস চাটবে তাও মাছি আসে না।' বিশু হাসতে হাসতে চলে গেল।

এল খানিক পরে, জোড়া খিলি পানে গাল ভর্তি করে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে। পয়সা কিন্তু ফেরৎ দিল না। 'বল পটলি কী বলছিলি?'

আঙুর বলল সব। গলায় উদ্বেগ আর মিনতি।

বিশু রাস্তার ছিটে ফোঁটা আলোতে আঙুরের মুখটা ভাল করে দেখল। একটু ভাবল, 'ক টাকা আছে তোর কাছে?'

'ছ টাকা।'

'ছ-টাকা—। ছ টাকায় কি হবে রে, একটা ঠ্যাংও তো পুড়বে না নন্দর।' হো হো করে হেসে উঠল বিশু।

'কতো লাগবে তবে?' আঙুর বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে বিশুর অট্টহাসি শুনতে শুনতে শুধলো।

'দেড় টাকা মণ আম কাঠ। তা মণ সাতেক লাগবে। দশ টাকা তো তোর কাঠেই লাগবে; তারওপর হাঁড়ি কাঁড় ধুনো—ধর আরও এক টাকা। নতুন বস্তর পরাতে চাস তো—'

'না'। আঙুর তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। ওর বুকে শুকিয়ে আসছিল। নতুন বস্ত্রে আর দরকার নেই।

'এইতো আর কি; আর আমরা চারজন যাবো চারটে পাঁইট দিবি। তা দু নম্বরই দিস—দু টাকা ছ আনা করে ধরে নে—গোটা দশেক টাকা আর কি!'

আঙুরের পায়ের সাড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, হাতেরও। বিশুর মুখটা পর্যন্ত শুয়োরের মতন ছুঁচলো ঘিনঘিনে দেখাচ্ছিল।

খানিকটা সময় লাগল আঙুরের সইয়ে নিতে। বললে, 'অতো টাকা আমি কোথায় পাব? আমার বাপ না ভাতার যে তাকে পোড়াতে বিশ টাকা খরচা চাইছিস?'

'বাপ না, ভাতার না,—তো সেরেফ চেপে যা। থানায় গিয়ে খবর দিয়ে দে—ধাঙড় পাঠিয়ে নিয়ে যাবে।'

আবার সেই ধাঙড়! বুকটা ধক্ করে উঠল। আঙুর নিরুপায় হয়ে বলল, 'আমার খেমতা থাকলে বিশই দিতাম। চামারগিরি করিস না বিশু!'

'তুই মাইরি, অকারণে বিগড়োচ্ছিস, পটলি! এই বৃষ্টি বাদলার দিন—এখন শালা শ্মশানে যেতে হলে পেঁচো, বীরে, কেলো—তিন শালাকে খুঁজে বের করে ধরতে হবে। মুফতি কেউ যেতে চাইবে না। অন্তত গায়ের পায়ের ব্যথাটা মারবার খরচা দিবি তো। আচ্ছা যা, দুটো পাঁইটই দিস—তোর বাপ ভাতার এখন নয়—এক রকম আপনাকেই [illegible] উঠিয়ে দেব।

আর কিছু বলিস না মাইরি, তোর পায়ে পড়ি।'

আঙুর হাঁ হুঁ কিছু বললে না। মাথা নাড়ল না। সায় দিল না। রাস্তার আলো শোষা অন্ধকার, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি আর বিক্ষিপ্ত লোকজন, দোকানপাটের দিকে নির্জীবের মতন চেয়ে থাকল।

বিশু বললে, 'যা শালা, কাঠ না হয় পাঁচ মণের মধ্যেই সেরে দেব। বাপ, ভাতার কিছুই নয় যখন তোর—আধপোড়া হলেও ক্ষতি নেই। টান মেরে গঙ্গায় ফেলে দিলে হবে। আরও গোটা ছ'সাত টাকা যোগাড় করে ঝপ করে আয় দেখি, পটলি। আমি হাঁদুর দোকানে আছি।

বিশু চলে গেল। আঙুর চুপ করে দাঁড়িয়ে। আরও সাতটা টাকা সে কোথায় পাবে, কার কাছে হাত পাতবে!

ফিরতে লাগল আঙুর। যেন ভীষণ জ্বরে তার সর্বাঙ্গ অবশ, অচেতন। কিছু আর দেখতে পাচ্ছে না, ভাবতে পারছে না।

যাক, মেথর মুদ্দো-ফরাসেই টেনে নিয়ে যাক নন্দকে, টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দিক গে। কি করবে আঙুর, কি আর সে করতে পারে! নন্দর ওপর তার এত বেশি রাগ হচ্ছিল যে, লোকটাকে যদি বাঁচা অবস্থায় পেত, আঁচড়ে কামড়ে মেরে-ধরে কুরুক্ষেত্র করত আজ। মরেও আমার হাড়মাস জ্বালাচ্ছে গো! আর এ কী অসহ্য জ্বলন। আঙুরের কাঁদতে ইচ্ছে করছিল।

বড় রাস্তা ধরে আবার তাদের পটির কাছে এসে পড়ল প্রায় আঙুর। আসবার সময় চোখ রেখে রেখে আসছিল, যদি তেমন কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যার কাছে একটা দুটো টাকা হাত পেতে চাওয়া চলে।

লোক তো অনেক যাচ্ছে আসছে। কিন্তু ওরা কেউ আঙুরের আঁচলে টাকা ছুঁড়ে দেবে না মুফতিতে। না, নন্দর ভাগ্যে আর চিতেয় ওঠা হল না। হবে কোথা থেকে? অমন ঠগ, জোচ্চোর, শয়তান্ মানুষের কি আর দাহ হবার পুণ্য আছে। একে বলে প্রায়শ্চিত্য। বামুনের ছেলে—এবার মেথর ধাঙড়ের হাতে যা, যেমন করে কুকুর বেড়াল যায়, তাও আবার কোন ভাগাড়ে যাবি কে জানে!

আঙুরের ঘাড়ের কাছটা ব্যথা করছিল। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করছে, শিরদাঁড়াটা যেন মাঝখানে মচকে যাবে। চোখের সামনে সব ঝাপসা ঝাপসা—অদ্ভুত!

হল না। আর হল না। একটা মানুষ মরল; তার দাহ হল না। কেউ সে-দায় নিল না। কেন নেবে? নন্দ তাদের বাপ, ছেলে, স্বামী, ভাই—কেউ না।

হঠাৎ মানিকবাবুর সঙ্গে দেখা। হন-হনিয়ে [illegible] আঙুরের কি

যে হল, প্রায় ছুটে গিয়ে মানিকবাবুর পথ আগলে ফেলল।

মানিকবাবু চিনতেই পারলে না। কে? কি চাও? আঙুরকে দু হাত তফাতে রেখে মানিক মুন্সী যেন এ-পটির মেয়ের ছোঁয়া বাঁচাচ্ছিল।

আঙুরের অত আর দেখবার সময় নেই। গড়গড় করে বলে গেল আঙুর: আপনি বাবু, একদিন এসে আমাদের ভোট কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দাড়িবাবুর জন্যে। বলেছিলেন, অপদ-বিপদ সুখ-সুবিধে দেখবেন। আজ আমার বড় বিপদ। ঘরে মড়া পড়ে পচছে, পোড়োতে পারছি না। একটা ব্যবস্থা করে দিন বাবু। অন্তত দাড়িবাবুর ঠেঙে চেয়ে সাতটা টাকা দিন।

মানিক মুন্সী খিঁচিয়ে উঠল, আহা—কী আমার আব্দার রে মাগীর! টাকা দিন। কেন, দাড়িবাবু তোমায় টাকা দেবেন কেন? তোমার ঘরে লোক মরবে আর মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বারবাবু তাকে খরচা করে পোড়াবে! যাও, যাও,—ওসব আব্দার রাখ। দাড়িবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়, কিছু বলতে হয়, কাল বেলা দশটার পর অফিসে যেও।

মানিক মুন্সী চলে গেল। আঙুর থ। কাল বেলা দশটা! মানুষ মরল আজ দুপুরে, তার দাহের জন্যে পা ধরতে যেতে হবে কাল বেলা দশটায়! আর সারা রাত ভরে তার ঘরে মড়াটা পচুক!

আঙুর বুঝতে পারছিল, দায়টা আর কারুর নয়—তারই। দায়ের সময় মানিক মুন্সী তাদের বেশ্যাপটির ঘরে ঘরে ঘুরেছে, পান মিষ্টি থেকে জনে জনে টাকা দিয়েছে। আজ তার দায় নেই।

চোখ ফেটে কান্না আসছিল আঙুরের।

কিন্তু কাঁদল না আঙুর। চোখ পড়ল সামনের দোকানটায়। পানের দোকানের মতন এক ফালি দোকান। রাস্তার সঙ্গে মেশান নীচের দোকানটায় বসে মুড়ি, ছাতু-টাতু বিক্রি করে একজন। ওপরটায় অন্য জনের দোকান। আয়না দিয়ে সাজানো। হরেক রকম শিশির থাক। আতর, জর্দা, সুর্তি আর সুর্মার সঙ্গে মোদকও বিক্রি হয় ও-দোকানে।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখতে দেখতে আঙুরের দুটো চোখ হঠাৎ কিসের আঁচে যেন জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, লোকটাকে ভাল করেই চেনে আঙুর। ওর নাম প্রভুলাল। আর এও জানে আঙুর, ওকে দেখলে প্রভুলালের শরীরটা কেমন কিলবিল করে ওঠে। যেন জ্বর লেগে যায়। দাঁত, মুখ, চোখ, গা—সব যেন কসকস করে, কাঁপে ভেতর ভেতর, টসটসিয়ে ওঠে। তখন লোকটার একটা চোখ চকচক করে, ভীষণ চকচক, আর অন্য চোখটা—যেটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, ঝুলে পড়েছে, মাছের পিত্তির মতন গলাগলা, সবুজ—সেটা যেন আরও কুচ্ছিত হয়ে ওঠে। প্রভুলালের কালো কুচকুচে ফোলা ফোলা মুখ থেকে দাঁতগুলো তখন যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। জিব দিয়ে লালা পড়ে।

আঙুরের দিকে প্রভুলালের নজরটা বরাবরই এইরকম। কেন, কে জানে। আঙুর বুঝতে পারে না। এক একটা লোকের এক এক-জনের ওপর এ-রকম হয়। দাঁত উঁচু, ট্যাপা-কপালে ঝুমুরের ওপর তা না হলে অমন সুন্দর মানুষটার চোখ পড়ে। মন্টুবাবুর। মন্টুবাবু তো ঝুমুরকে এখান থেকে উঠিয়েই নিয়ে গেল।

আঙুর জানে, তার রূপ ঝরে গেছে। অমন ব্যাধি থাকলে না ঝরে উপায় নেই। আর ব্যাধির কি ঠাঁই বিচার আছে। এমন জায়গায় গুছিয়ে বসল যে, আঙুরের আসলটাই গেল। অম্বিকা ডাক্তার বলেই দিয়েছিল, খুব সামলে সুমলে থাকবে। বেশি অত্যাচার করো না। ছেড়ে দিতে পারলেই ভাল। নয়ত একদিন এতেই মরবে।

সেই থেকে আঙুরের অবস্থা পড়ে গেল। নয়ত আতা, চিনু, চামেলির বড়মুখ ওকে সইতে হত না। ঈশ্বর যাকে মারেন—তার আর উপায় কি! তাও একটা বছর আঙুর কতো সাবধানে থেকেছে। নেহাত যখন পেট ভরাবার চাল ডালটুকুই বাড়ন্ত হত—তখনই আঙুরকে গলির মুখে এসে দাঁড়াতে হত সেজেগুজে।

রোগটা ভেতরের—তাই ওপরটায় আজও আঙুরের কিছু কিছু আছে। মুখখানাই শুধু যে ভাল তা নয়; বুক কোমর চলন-টলনগুলোও এখন পর্যন্ত ভাল আছে। বিশেষ করে সামনাসামনি দেখলে—আঙুরের এই আশ্চর্য ভরাট গলা-ঘাড়-বুকের দিকে না চেয়ে পারা যায় না।

প্রভুলালের দোকানের দিকে পা পা করে এগিয়ে যেতে লাগল আঙুর। লোকটাকে কী ঘেন্নাই করত ও: প্রভুলালের কালো কুচকুচে, থলথলে মোটা ভোঁদড়ের মত শরীর—আর ওই কুচ্ছিত মুখ, মাছের পিত্তির মতন গলাগলা একটা চোখ, যেটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—দেখলেই আঙুরের গায়ে কাঁটা দিত, ঘিন ঘিন করত সারা গা, ভয় ভয় লাগত। বেশিক্ষণ তাকাতে পারত না লোকটার দিকে। নয়ত প্রভুলাল কতো-বারই তো ঘুর ঘুর করেছে—আঙুর এগুতে দেয়নি। মাগো, ওই লোকটার সঙ্গে কি শোয়া যায় নাকি? আঙুর তাহলে মরেই যাবে।

আজ আর অত কথা ভাল করে ভাবতে পারল না আঙুর। বরং ভাবছিল, প্রভুলালও যদি মাথা নাড়ে। না বলে।

ধুক ধুক বুকে প্রভুলালের দোকানের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল আঙুর।

'সুর্মা আছে?' মুচকি হাসল আঙুর। একটু হেলে দাঁড়াল।

প্রভুলাল প্রথমটায় অবাক। তারপরে যেন শরীরের কোথাও একটা পালকের সুড়সুড়ি খেয়ে সারাটা গা-মুখ বেঁকিয়ে-বুঁকিয়ে ফুলিয়ে হাসল। গলার মধ্যে সর্দি-জড়ানো আওয়াজের মতন ভাঙ্গা ভাঙ্গা আবেগ-স্বর উঠছিল।

সুর্মার দিকে হাত বাড়াল না প্রভুলাল। আঙুরের দিকে চেয়ে একটু ঝুঁকে পড়ল, 'কি খ-বর? আঁ—তুমি। কাঁহা ভাগ

গিয়েছিলে! শালা সারা পাটি আন্ধার হয়ে গেল।'

হাসি আসছিল না। তবু আঙুর হাসল। যেন একটা ঝাপটা খেয়ে প্রভুলালের কোলের ওপর পড়তে পড়তে উঠে সোজা হল। এলোমেলো আঁচলটা তো হাতে লুটোচ্ছিল, বুকের কাপড়টাও কখন সরিয়ে একপাশে গুটিয়ে দিয়েছে আঙুর। 'মস্‌করা থাক। সুর্মা আছে কিনা বলো। না থাকে তো যাই।' আঙুর মাঝ কোমর থেকে বুক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আবার টেনে নিল। ঠিক যেমন লাটু ঘুরোতে লেত্তিকে ছেড়ে দিয়ে টানতে হয়। গলা বেঁকিয়ে চোখের পাশ দিয়ে বিভ্রম ছুঁড়ল।

'আছে, আলবৎ আছে।' প্রভুলালের চোখ চকচক করছে, 'তোমাদের আঁখে সুর্মা লাগাতেই ত বসে আছি।'

'থাক, তোমায় আর লাগিয়ে দিতে হবে না। হাতে পিঁপড়ে ধরে যাবে।' আঙুর আর এক দফা হেসে—প্রভুলালের বসবার জায়গাটার কাছে বেঁকে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়াল। গালে হাত রাখল। ঘাড় হেলিয়ে মুখ-চোখ তুলে ধরল।

ঠেলে বেরিয়ে আসা মাছের পিত্তির মতন প্রভুলালের চোখটা যেন গলে গলে পড়ছিল। আঙুরে চোখ বুজল।

'কিরপা থোড়ি কুছ হো যাক আঙ্গুরী! শালা কী চোট্‌ যে আছে তুমার বাস্তে।' প্রভুলাল কখন তার গরম হাতটা দিয়ে আঙুরের কনুইয়ের ওপরটা ধরে ফেলেছে।

আঙুর সেই অবস্থায় জোরে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে টেনে টেনে একবার নিশ্বাস নিল, আস্তে আস্তে ছাড়ল। বুক উঠল, নামল। ঠোঁট কামড়ে, বাঁ চোখ টিপে হাসল আঙুর।

'তোমার পচা আতরের গন্ধ ক'দিন থাকবে গো!' আঙুর ঠোঁট উলটাল।

'পচা নেই, আসলি আতর দেব। যে ক'দিন রাখতে চাও।' প্রভুলাল আঙুরের গালে টোনা মারল।

আঙুর ভাবল। 'দশটা টাকা আজ দাও তবে?'

'দশ—?' প্রভুলাল থতমত খেয়ে গেল, 'দ-দ কি রে?'

'দরকার আছে, দশ দাও। আগাম দাও—।'

'আগ্‌লি?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল আঙুর, 'দশ না পারো—সাত—আটটা টাকা দাও।'

মনে মনে হিসেব করে নিল প্রভুলাল। তারপর নিচু গলায় বললে, 'বহুত আচ্ছা, আট টাকা দোবো। মাগর—' প্রভুলাল কুচকুচে কালো মুখে গোঁফের ডগায় [illegible] ছিলেকটা একটা হাসি ঝুলল। আঙুলের দিয়ে দেখাল দিনের হিসেবটা। প্রায় সপ্তাহভোর আর কি!

ও-সবের দিকে চোখ ছিল না আঙুরের। হাত পাতল আঙুর। টাকা।

প্রভুলাল আঙুরের গালটা টিপে দিল। 'তু যা পাগলি, ঘর যা—সুরতটুরত থোড়া ঠিক করে লিগে যা; একদম্‌ কলকত্তাবালী হয়ে যা দোকান বন্ধ করে আমি আসছি। টাকা লিয়ে যাব।'

আঙুর ভীষণভাবে চমকে উঠল। সমস্ত শরীরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পা পাথর। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল আঙুর প্রভুলালের দিকে।

'কি রে?' প্রভুলাল আতরের শিশি-টিশি, জর্দার নিক্তি ওজন গোছাতে লাগল।

আঙুর তার সাদা নিভন্ত চোখ তুলে আস্তে গলায় বলল, 'আমার ঘর না, তুমি অন্য কোথাও বল।'

এরকম কথা প্রভুলাল জীবনে আর শোনেনি যেন। 'বাঃ—! টাকা তুমি লেবে আঙ্গুরী—আর ঘর ঢুঁড়ব আমি। তব তো দুসরা আওরাত ভি—।'

আঙুরের চোখের ওপর প্রভুলালের মুখও আর ভাসছিল না। আলো, আয়না, হরেকরকম শিশি—আর ফাঁকা ফাঁকা ঝাপসা সব কি যেন। প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে হলদে বিকারের চোখে মানুষে যেমন কি দেখছে জানে না, বোঝে না, চেতনায় চিনতে পারে না, তেমনি।

একটু পরে আঙুর মাথা নাড়ল। বেশ, তবে তাই, আমার ঘরেই এসো তুমি। তাড়াতাড়ি।

প্রভুলালের দোকানের সামনে থেকে একটা অন্য রকম শরীর আর পা যেন জলো হাওয়া আর অন্ধকার আর প্যাচপেচে রাস্তা গলি দিয়ে নেশার ঘোরে টলতে টলতে মিশিয়ে গেল।

আঙুরের বুকের মধ্যে শাঁখগুলো এলো-মেলো। সমস্ত মাথাটা ঠাস; কিছু

বুঝতে পারছে না, চোখে ঠাওর করতে পারছে না। হাত-পা সাড় পাচ্ছে না। একটা দম দেওয়া পুতুলের মতন যা হবার হয়ে যাচ্ছে, আপনা থেকেই।

কুপি জ্বেলেছে আঙুর। ধুনো পুড়িয়ে দিয়েছে ঘরে। ক'টা ধুপও। বাক্স থেকে শাড়ি বের করতে গিয়ে পাটের শাড়িটা খুঁজেছে প্রথমে—তারপরেই মনে হয়েছে আতাকে বিক্রি করে দিয়েছে সেটা খানিক আগেই। তাঁতের ঘোর লাল রঙের ছেঁড়া ছেঁড়া শাড়িটা তাড়াতাড়ি গায়ে পরে নিয়েছে, সেই সাটিনের পুরনো বডিজটা পর্যন্ত। চুল বেঁধেছে। আলতা দিয়েছে পায়। টিপ আর কাজল।

প্রভুলাল এল। ঘরটা বড় অন্ধকার। লণ্ঠন কি হল? টুটে গিয়া—? আতরের গন্ধ প্রভুলালের জামায়। হাতে পানের ঠোঙা। মুখে একগাল পান, জর্দা।

প্রভুলালের চোখ লালচে, চকচকে। মাছের পিত্তির মতন চোখটা যেন গলেই গেল। ওর নাকের নিশ্বাসে হিসহিস শব্দ। লাল দাঁতগুলো তৈরি, খাবারটা পেলেই যেন চিবিয়ে চুষে সাবাড় করে দেয়।

আঙুরের শরীরটা যেন নদীর জলে ভাসছে—সাড় হারিয়ে। কি হচ্ছে ও জানে না, বুঝতেই পারছে না। মনটা শুধু সময় গুনছে—রাত কত হল! বিশু কি থাকবে হাঁদুর দোকানে? যদি বৃষ্টি আসে ঝম-ঝমিয়ে আবার! তবে কি হবে? সারারাত কি ফেলে রাখতে হবে! দোষ ধরল না তো! শনির দুপুরের মড়া।

নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না আঙুর। কুপির আড়াল পড়েছে। একটা ভাগাড়ের খ্যাপা কুকুর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তাকে।

মনের জ্বালাটা আরও বাড়ছে। বাড়ুক। কিসের ওপর, কার ওপর সে প্রতিশোধ নিচ্ছে তা জানে না। তবে অনুভব করতে পারছে, এই কষ্ট—এই যন্ত্রণা অনেকটা তেমনি।

আবার কি বৃষ্টি এল? না, বৃষ্টি নয়। বৃষ্টি যেন আর না আসে, হে মা কালী! কোনোগতিকে শ্মশান পর্যন্ত যেতে দাও। চরণে পড়ি তোমার।

প্রভুলাল খুশী। আঙুর হাত পাতলো। চোবা-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে যেমন হোটেলের দাম মেটায় মানুষ—তেমনি ঠিক তেমনি আরও দু'খিলি পান জর্দা মুখে দিয়ে, রুপোর দাঁত-খোঁটা কাটিটা দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আটটা টাকা দিল প্রভুলাল হেসে হেসে। আঙুরের গালটা আর একবার টিপে দিয়ে চলে গেল।

টাকা আটটা আঁচলে বেঁধে নিল আঙুর। আগের টাকাগুলোও। তারপর বাইরে এসে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। আঁট করে।

আতা চামেলিদের ঘরে তখন আলো, হাসি, হুড়োহুড়ি, ঝুম্ ঝুম্, তালি, বেসুরো গান আর দিশী মদের গন্ধ।

আঙুর তর তর করে দাবায় নেমে গেল। তারপর বাইরে। সদর রাস্তায়। হাঁদুর দোকানে বিশু কি আছে এখনও!

বিশুদের নিয়ে ফিরল আঙুর। দরজা খুলে ঢুকল। পিছু পিছু বিশু।

'কই মড়া কই! আ, খুব বাহারে ধুপ জ্বালিয়েছিস তো, পটলি!' বিশু নাক টেনে গন্ধ নিল ধুপের।

আঙুর লণ্ঠন জ্বালাল।

বিশু তাকাল এদিক, ওদিক। 'মড়া কই?'

আঙুর আঙুলে দিয়ে চৌকির তলাটা দেখিয়ে দিল।

বিশু মুখ নীচু করে দেখল। অবাক ও, চোখের পাতা পড়ল না। 'ওর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল কি করে?'

আঙুর সে-কথার কোনো জবাব দিল না।

বিশু একটু অপেক্ষা করে সঙ্গীদের ডাকল। ডাকবার আগেই পেঁচো, বীরে, ঢুকে পড়েছে।

বিশু বললে, 'বাঁশ এনেছিস তো, লে শালাকে টেনে বের করে বাঁধ।'

মড়া নিয়ে বিশুদের বেরুতে খুব একটা সময় লাগল না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আঙুর দাওয়ায় নামল।

আঙুর বলল, 'হরিবোল দিবি না?'

বিশু জবাব দিল, 'চল্ রাস্তায় গিয়ে দেব। এখানে রসের হাটে হরিবোল দিলে শালাদের মেজাজ গন্ডগোল হয়ে যাবে।'

বিশু, কেলো সামনে—পেঁচো আর বীরে পেছনে। মাদুরে জড়ানো-দড়ি দিয়ে বাঁধা নন্দর ধড়—বাঁশের ওপর চাপিয়ে চারটে লোক দাওয়া দিয়ে এগিয়ে গেল। চারটে ছায়া। আর আঙুর পিছন পিছন।

আতার ঘরে তখন বস্ত্রহরণ পালার হাসি-উল্লাসের ঝাপ্টা বয়ে যাচ্ছে।

শ্মশানে এসে পৌঁছতে প্রায় মাঝ রাত হয়ে গেল। কেলো গেল কাঠ আনতে, পেঁচো পাইট আনতে। কাছাকাছি সে-ব্যবস্থা আছে। বিশু বিড়ি ফুঁকতে লাগল। আর বীরে একটা সিনেমার গান গাইতে লাগল, সদ্য কেনা হাঁড়িটার পেছনে বোল তুলে।

আঙুর চুপ করে বসে থাকল এক পাশে।

বিশুর দলের বাহাদুরী বলতে হবে—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিক করে ফেলল। গঙ্গার জলে ধোয়ান হল নন্দর দেহ। চিতে সাজিয়ে শোয়ান হল। এবার মুখে আগুন দেওয়া।

পাকাটিতে আগুন ধরিয়ে বিশু আঙুরের দিকে এগিয়ে দিল। বললে, 'নে পটলি, মুখে আগুনটা দিয়ে দে।'

আঙুর চমকে উঠল। নন্দর মুখে আগুন দেবে ও? কেন? নন্দর সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের? কিছু না। কেউ না নন্দ ওর।

আঙুর মাথা নাড়ল। 'আমি কেন দেব! না—না,—তোমরা কেউ দিয়ে দাও।'

'দিবি না তুই? লে কেলো, তুই-ই তবে দিয়ে দে শালার মুখে আগুন।'

কিন্তু কেলো ততক্ষণে একটু পাশে গিয়ে পাইটে মুখ দিয়েছে। পে'চো বলল আঙুরকে, 'আহা দাও না তুমি। তোমার সংগে তবু তো জানাশোনা ভাবসাব ছিল খানিকটা, আমরা তো সব রাস্তার লোক।'

জানাশোনা, খানিকটা ভাবসাব? তা হ্যাঁ, তা ছিল বৈ কি। আঙুর সেটা অস্বীকার করতে পারে না। এতো লোকের মধ্যে একমাত্র আঙুরই তবু নন্দকে চিনত, জানত। ওর সংগে এক ঘরে থেকেছে, খেয়েছে শুয়েছে। শখের স্বামীস্ত্রী খেলা—তাও খেলেছে। শাঁখা-সিঁদুরও পরেছে।

পাঁকাটিটা জ্বলছিল। সে-দিকে তাকিয়ে আঙুর কেমন যে দিশেহারা হয়ে গেল। তারপর হাত বাড়াল বিশুর দিকে।

জ্বলন্ত পাঁকাটি নিয়ে নন্দর মুখের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আঙুর। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে পাঁকাটিগুলো। সেই আলোয় নন্দর শুকনো, তোবড়ানো, বাসি ডিমের মত সেদ্ধ মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যেন সব যন্ত্রণার শেষ ঘা খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

'সামলে রে পটুলি, শাড়িতে আগুন ধরে যাবে।' বিশু হাঁকল।

আঁচলটা সামলাতে গেল আঙুর। এক্ষুনি পাঁকাটির আগুনে লেগে যেত।

কিন্তু শাড়ির আঁচল সামলাতে গিয়ে—পাঁকাটির আগুনে যেন হঠাৎ কি দেখল আঙুর। দেখে নিথর হয়ে গেল। মনের মধ্যে কী যে অস্বস্তি জাগল! গা ঘিন ঘিন করে উঠল।

নিজেকে বড় অশুচি, অশুচি লাগছিল। এই শাড়ি পরে একটু আগে প্রভুলালের সংগে সে শুয়েছে। এখনো সেই ভাগাড়ে কুকুরটার—?—না, এই বস্ত্রে কারুর মুখে আগুনে দেওয়া যায় না। নন্দ স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে—কে জানে, তবে এই সংসার তো ছেড়ে চলল‌ই। এ-সময়ে আর খুঁত থাকে কেন!

পাঁকাটি ক'টা মাটিতে নামিয়ে রেখে আঙুর হনহনিয়ে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছিস আবার?' বিশু অবাক।

'আসছি। গংগায় একটা ডুব দিয়ে আসি।' আঙুর তরতরিয়ে ডাইনে ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ধাপ ভেঙে গংগার জলে এসে দাঁড়াল আঙুর। আকাশটা লাল। একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। হাওয়া বয়ে যাচ্ছে হু হু। গংগার জল কালো। একটা শব্দ উঠছে স্রোতের। ঘাটে আছড়ে পড়ার।

জলে পা দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে এই আকাশ—এই জল, এই নিস্তব্ধতা যেন মনে, বুকে, গায়ে মেখে নিচ্ছিল আঙুর। মাথাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল, ঘোলাটে মনটাকে ধুয়ে নিচ্ছিল। কেমন একটা পচা গন্ধ এসে নাকে লাগল আচমকা। নিশ্চয় কোনো গলা-পচা গরু ছাগল কি মোষটোষ হবে জলে ভেসে এসেছে। আধপোড়ান মানুষ-টানুষও হতে পারে।

বড় বিশ্রী গন্ধ। এদিক ওদিক চাইল আঙুর। নাক বন্ধ করল। একটু পরে আবার খুলল। আর ধক্ করে যে-বিশ্রী গন্ধটা নাকে এসে লাগল সেই গন্ধটা বড় চেনা চেনা ঠেকল। হ্যাঁ, বিশুর গায়ে এই গন্ধ ছিল, এই গন্ধ আছে আতা, বেদনামাসি, প্রভুলালের গায়। সর্বত্র।

আঙুর চোখের সামনে সত্যিকারের গংগা যেন এইবার আলো হয়ে উঠল। কোথায় সে পাপ ধুতে এসেছে, অশুচি ছাড়াতে—?

মাথার মধ্যে একটা শিরায় যেন ফস্ করে কেউ দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিল। জ্বলে উঠল সমস্ত শিরাস্নায়ুগুলো। অশুচি, কিসের অশুচি? গংগাজল তার কোনটা ধোবে—বস্ত্র না দেহ না মন! বেদনামাসি, হিমুরে গা অনেক ধুয়েছে গংগা। কি দিয়েছে?

গংগার জলে একটা লাথি মারল আচমকা আঙুর। আর তারপর ছুট। ছুটতে ছুটতে এসে জ্বলন্ত পাঁকাটি ক'টা নিয়ে নন্দর মুখে ঠেসে দিল।

আগুন ধরল। আঙুর চুপ করে দাঁড়িয়ে। এখানে আগুন, ওখানে আগুন। আ, সাজিয়েছে বটে খিলুরা চিতা! শুকনো কাঠ বেছে বেছে এনেছিল। চোখের পলকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা।

খানিকটা পিছিয়ে এসে আঙুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশুরা একটা পাইট শেষ করে আর একটা খুলল।

আকাশটা লাল। খুব লাল। বৃষ্টি না এসে পড়ে।

নন্দর মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না। বাঁশে খুঁচিয়ে দিচ্ছে এ-পাশ ও-পাশ। লাঠি মারছে।

আঙুর অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে এই অদ্ভুত দাহ দেখছে।

আগুনের হলকাটা হঠাৎ ধক্ করে বেড়ে উঠল। সমস্ত চিতাখানা টকটকে লাল। সে-দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আঙুর আচমকা খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামে না। যেন মাতাল হয়ে গেছে।

বাঁশে খোঁচাচ্ছে। বাঁশ দিয়ে পা ভেঙে দিচ্ছে শবের। পেটাচ্ছে। কাঠ পুড়ে পুড়ে ভাঙছে—মট্ মট্। হাড় ফাটছে নন্দর। ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না!

আর আঙুরের কানে সেই শব্দগুলো লাগছে ভয়ানক ভাবে। ছটফট করছে আঙুর। যেন তার বুকের হাড়গুলো কেউ মট্ মট্ করে ভেঙে দিচ্ছে। [illegible]

এক খাবলা কিছু নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওই আগুনে।

আঙুর আর পারছিল না। অস্থির হয়ে উঠছিল। কী যে অসহ্য একটা জ্বালা দাপাদাপি করছে তার মধ্যে। মোচড় দিয়ে উঠছে সারাটা বুক। কণ্ঠার কাছে টনটনে ব্যথাটা ফুলছে আর ফুলছে।

আঙুর পারছিল না। ওই চিতা দেখছিল নন্দর। আর মনে মনে ভাবছিল সব—সব তোমরা সমান। সবাই। তুমি, হিমু, বেদানা-মাসি, হাসপাতাল, ডাক্তার, আতা, বিশু, মানিকবাবু, প্রভুলাল—সবাই। তেমনি তোমাদের গংগা। সবই তো এ-সংসারেরই কাদা মাটি জল। এক ছাঁচ, একই নকশা।

আঙুরের কষ্ট হচ্ছিল, অযথাই সে একা নন্দর ওপরই রাগ আর ঘেন্না আর জ্বালা নিয়ে থাকল।

আঙুর কাঁদল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ফুঁপিয়ে। ঠোঁট কামড়ে ধরে। নন্দর চিতার আগুন যেন তার সমস্ত চোখ মন শরীর জুড়ে জ্বলছে। বড় দুঃসহ সে-আগুন। বড় স্পষ্ট। সবকিছু তার আলোয় ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। এই সংসার, এখানের ভালবাসা, ঘর গড়া, ঘর ভাঙা, মানুষ, মানুষের ব্যবহার, মন।

আঙুর ডুকরে উঠল। সকলকে চমকে দিয়ে। এই প্রথম। হঠাৎ, হঠাৎই। বর্শায় খোঁচা খাওয়া একটা পশুর মত সমস্ত জায়গা কাঁপিয়ে, থর থরিয়ে। তারপর গুমরে গুমরে। কাতরে কাতরে।

আঙুরের ইচ্ছে হচ্ছিল, ওই চিতার কাছে ছুটে গিয়ে নন্দর আধপোড়া ঝলসানো পা দুটো বুকে চেপে ধরে। মাথা খোঁড়ে।

আঙুর সত্যিই ছুটে যাচ্ছিল। বিশু খপ্ করে তার কোমর জড়িয়ে ধরল। 'কি রে পটুলি মরবি নাকি?'

না, আঙুর মরবে না। চোখ তুলে বিশুর দিকে চাইল ও। তারপর আকাশের দিকে। এ-পাশ ও-পাশ। চিতা এবং গংগার দিকেও। যেন এই সংসারের আকাশ, মাটি, মানুষ, জল—সব তার চেনা হয়ে গেল। আর সে মরবে না, কাঁদবে না।

॥ বর্তমান বাংলা ছবির লক্ষ্যপথ ॥

পঙ্কজ দত্ত

তৈরীর দোষত্রুটি বিচারে গুণাগুণ যে পর্যায়েরই বলে নির্ধারিত হোক, স্বাধীনতার আগের যুগে বাঙলা ছবি সাধারণত একটা বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই প্রখ্যাত হতো। সাধারণ গল্পের প্রতীকে "ভাবীকাল"এর মতো ছবিতে স্বাধীনতার প্রেরণা সঞ্চারের চেষ্টা হয়েছে, আবার, প্রধানতঃ শরৎচন্দ্রের রচনা অবলম্বনে, জমিদারীর বিরুদ্ধেও যেমন, তেমনি মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের নানাবিধ কুটিল সমস্যাকেও সামনে তুলে ধরার চেষ্টাও যথেষ্ট দেখতে পাওয়া গিয়েছে। হিন্দী বা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার ছবিতে এধরণের পরিচয় একেবারে অনুপস্থিত না থাকলেও বাঙলা ছবির মতো আঁতে লাগবার মতো অনুভূতিসম্পন্ন উপাদান থাকতো খুবই কম। বাঙলাতে "এপার ওপার" তুলে মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, তেমনি আবার "গরমিল"এর মতো ছবিতে ধনী-দরিদ্রের বিভেদ ও বিরোধের একটা দিক লোকচক্ষে এনে দেওয়া হয়েছে। এমনি আদর্শ নিয়ে বিরোধ-বিভেদের আরো অনেক নামকরা ছবি হয়েছে। সেসব সমস্যা এবং বিভেদ-বিরোধের অনেকই এখনও রয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, আধুনিক কালের বাঙলা ছবি যা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন বক্তব্যের দিকটা বড়ো ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। অনেকটা এ অবস্থা হয়তো এখনকার জীবনের দিশহারা বিক্ষিপ্তমতিরই প্রতিফলন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালের ছবির দৃষ্টি ঘোরালো, অনেক ক্ষেত্রে ফেলে আসা দিনের অন্ধ সংস্কারকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা, আবার কখনো বা দুর্বল মানুষকে আরো অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা। নতুন দিনের নতুন আলোয় উদ্ভাসিত দৃষ্টি বাঙলা ছবির চোখে চিকচিক করে উঠছে না আজ আর।

সমস্যা যে একেবারে তোলা হয়না তা নয়, কিন্তু বক্তব্যকে স্পষ্ট করে বলার পিছনে দ্বিধার পরিচয়ই থাকে বেশী। যেমন, "ভালোবাসা"তে মেয়েদের একটি জীবিকা হিসেবে ছবিতে অভিনয়ের পথ দেখিয়েই সঙ্গে সঙ্গে তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক বিরোধের উৎপাদন সৃষ্টি করে সে-প্রস্তাবকে কার্যকরী হতে না দিয়ে যেন চেপে দেওয়া হলো। সংখ্যাধিক্য না হলেও ছবির দর্শক হিসেবে মেয়েদের ওপরেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। ছবি তোলার কথা মনে করলেই বেশীর ভাগ চিত্রনির্মাতা এমন গল্পের দিকেই ঝোঁক দেন যাতে মেয়েদের মন পাবার মতো উপাদান থাকে বেশী। আজকাল তো সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ তুলে সতীত্ব নিয়ে এতো বেশী ছবি হতে আরম্ভ করেছে যে, ছবিকে যদি সমাজের চিন্তাধারার মুকুর বলে ধরা যেতো তাহলে এইসব দেখে বলতে হতো, বাঙলা দেশের মেয়েরা সতীত্ব ব্যাপারে বড়ো শিথিল। কথায় কথায় সীতা-সাবিত্রীর দেশ বলে উল্লেখ। তাদের দোহাই দিয়ে মেয়েদের সামনে কতো রকমেরইনা আদর্শ তুলে ধরা হয়। যেমন, রুগ্ন স্বামীর আরোগ্যের জন্য তার চিকিৎসার ব্যবস্থা নয়, তার জন্যে মানৎ করে স্ত্রীকে জলে ডুবে আত্মবিসর্জন করিয়ে "কঙ্কাবতীর ঘাট"এ সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখানো হলো। "সূর্যমুখী"তে বিয়ের কনে শ্বশুরবাড়ীতে প্রবেশের মুখেই তার সিঁথিতে এমন এক সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হলো যা হচ্ছে পরপুরুষের দৃষ্টিতে পড়লেই সতীত্ব নষ্ট হবার একটি প্রতীক।

ডি-লাক্স পরিবেশিত 'নবজন্ম'তে নবতর চরিত্রচিত্রনে অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায়

[illegible] সংস্কারকে যেনতেন প্রকারে

কার্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত "নীলাচলে মহাপ্রভু"র একটি দৃশ্যে শিখারাণী ও অনমীয়া শিল্পী জ্ঞানদা কাকতি

হয়। ছেলে মায়ের মৃত্যুর কারণ হবে, এই রয়েছে "জ্যোতিষী"তে, আর রয়েছে স্ত্রীর কুলত্যাগিনী হওয়া। যাকে দুর্ঘটনায় জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলে এবং স্ত্রীকে গুণ্ডা কর্তৃক অপহৃতা দেখিয়েও ভাগ্যের সেই লিখন অকাট্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অতৃপ্ত কামনা থাকলে মানুষ নাকি ভূত হয়ে তার কামনা পরিতৃপ্ত করে নিয়ে যায়। অন্ততঃ "দৃষ্টি"তে বা "ছায়াসঙ্গিনী"তে তো সেই তত্ত্বই পেশ করা হয়েছে। আবার, অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে দরকার হলে শাস্তি দেবার জন্য ভূত হয়ে আবির্ভূত হওয়ার কাহিনীও চালানো হয়েছে "মরণের পরে"তে। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, মারণ-উচাটনের যুগ পেরিয়ে এলে হবে কি, ওধরনের মনোবৃত্তি থেকে আমরা এখনো রেহাই পাইনি। বাস্তবের সামাজিক ছবিতেও তাই ক্রোধ-সঞ্জাত অভিশাপের অবাস্তব ক্রিয়া বংশ-পরম্পরায় ফলিয়ে দিতে দ্বিধা দেখা যায়না। "শাপমোচন"এ অপমানিত গুরু অভিশাপ দিলে, আর তিনপুরুষ ধরে সেবংশের গায়কেরা মুখে রক্ত তুলে মরে মরে যেতে লাগলো। কুসংস্কার ধারণা ও অবৈজ্ঞানিক মানসিকতাকেও প্রশ্রয় বড়ো কম দেওয়া হয় না। "নির্বাপিত"তে বোঝাবার চেষ্টা করা হলো যে, অন্ধ মাতার গর্ভজাত সন্তানও অন্ধ হয়। "চুক্ত সো"তে দেখানো হলো কোন দোষের দাগ একবার গায়ে লাগলে তা আর মুছে যাবার নয়। "আশা"তে রয়েছে আরেক রকমের বিভ্রান্তির পরিচয়। ওতে দেখানো হয়েছে যে প্রতিভাকে ঠেকেঠুকে তুলে না দিলে সে প্রতিভা চাপা পড়ে যায়।

রকমের মনোবৃত্তিকেই নানাভাবেই প্রশ্রয় দেবার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। এখনকার দিনে এক পত্নী থাকতে আর এক পত্নী গ্রহণ সামাজিক ছবিতে দেখানো আইনবিরোধী, তাই অমন ব্যাপার দেখাবার আধার নির্বাচিত হল পৌরাণিক কাহিনীতে, যেমন "শ্রীবৎস-চিন্তা।" এর বিপরীত দিকও আছে। বিয়ের কথা হতেই একজন পুরুষকে এমন কি নাগনেখেই তাকে পতি বলে জ্ঞান করাই শুধু নয়, কেবল সহবাস ছাড়া একেবারে পুরোদস্তুর পত্নীর মতো আচরণ করে যাওয়া এমন অলীক জিনিসও চিত্র-নির্মাতাদের কাছে খাতির পায়। যেমন দেখা যায় "ব্রতচারিণী"তে। "ছায়াসঙ্গিনী"তে তো বিয়ের ব্যাপারে পাত্র বেঁকে বসতেই পাত্রী সেই শকে মারা গিয়ে প্রেতিনী-রূপে পত্নীর পদ অধিকার করে নেয়। "শুভরাত্রি"তে আরও এগিয়ে গিয়ে আইবুড়ো মেয়েকে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে জাল পত্নী সাজিয়ে রগড় পাকানো হয়েছে। আবার দেখা যায়, সত্যি বিয়ে হলোনা কারণ মালা বদলের আগেই পুলিসের তাড়া খেয়ে বরকে পালাতে হলো, তারপর থেকে মেয়েটির সঙ্গে সে ব্যক্তির কোন সম্পর্কই হইলো না। কিন্তু ঘটনাক্রমে মেয়েটি ভুল-বশতঃ অপর এক ব্যক্তিকে তার স্বামী বলে মনে করতে, এবং তারপর সেই পলাতক বর ফিরে আসতে অনন্যোপায় হয়ে মেয়েটিকে দিয়ে আত্মহত্যা করিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে "অভাগীর স্বর্গ"তে।

মিথ্যা, কু-সংস্কার একদিকে; আর অপরদিকে দৃঢ়তার সঙ্গে বক্তব্য প্রকাশের ক্ষমতার একান্ত অভাব বক্তব্য বিষয়ে বাঙলা ছবির দীপ্তি দিনদিনই বড়ো ম্লান করে দিচ্ছে। গল্প নির্বাচিত হচ্ছে বিশেষ ধারার ঘটনা দেখে দেখে, নয়তো লেখকের নামের খ্যাতি দেখে। মূল বক্তব্যটা কি যে দাঁড়াবে সেটার দিকে অধিকাংশ ছবির ক্ষেত্রেই বিচারবুদ্ধির অতীব দীনতাই পরিলক্ষিত হয়। আর তাই, মেয়েদের জীবিকা অর্জনের মর্যাদাসম্পন্ন পথ থাকলেও শুধু গল্পের সুবিধে করে নিতেই স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীর সামনে বারাঙ্গনার জীবন ছাড়া আর কোন পথের ইঙ্গিতও না রাখাও ছবিতে চলতে দেওয়া হয় —হোকনা তা "নাগকাহিনী"র মতো রূপক

ছায়াবাণীর পরিবেশনায় মুক্তি-প্রতীক্ষিত "হারানো সুর"-এ সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

পায়। এখন জমিদারীগিরির ফলানো অচল। জমিদারের ছেলে বলে বরাবর পাপ করে গিয়ে শেষে একজনের প্রেমের মায়ায় কৃতপাপের জন্য অনুশোচনাগ্রস্ত হলেই রেহাই পেয়ে যাবে, এখনকার লোকের মনে অতটা নির্বিরোধীতা দেখা যায় না। তাই "পাপ ও পাপী"তে অমনিই এক পাপীকে ঘৃণা না করার উপদেশ কারুরই মনে ধরেনা। আবার "দস্যু মোহন"এর মতো চুরি ডাকাতির দ্বারা দুঃস্থের সেবা করে দেশের কাজ বলে বড়াইও মানে না না কেউ, যতোই কেননা পুলিসে আত্মসমর্পণ করা হোক আর,

জন্যে নতুন নীতিও গড়ে নিতে হয়, যার মধ্যে স্নেহ মায়া মমতা প্রভৃতি মনুষ্যশোভন হৃদয়বৃত্তি সমূহেরও মান অবশ্যই নির্দিষ্ট থাকবে।

বাঙলা ছবির দৃষ্টির ব্যাপকতা অনেক নীচের দিকে আর পিছনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সংকীর্ণতা ও সংস্কারাচ্ছন্নতার দিকেই বেশী নিবন্ধ হয়ে রয়েছে। তবুও এরই মধ্যে মাঝে মাঝে শাশ্বত সত্যের বাণীতে দীপ্ত নির্মল দৃষ্টিও পাওয়া যায়। অর্থ মানুষের জীবনের সবচেয়ে কাম্য নয়, বিত্তশালীতার আদর্শই সংসারের সবচেয়ে

মধু বসু পরিচালিত আগতপ্রায় চিত্র "শকুন্তলা"তে প্রণতি ঘোষ ও নির্মলকুমার

কাহিনী। "সাবধান" ছবিখানিতে তো বলেই দেওয়া হয়েছে যে মেয়েদের জীবিকা অর্জনের জন্য চাকরি করতে যাওয়া সংসারের, সমাজের এবং মেয়েদের নিজেদের পক্ষেও ঘোর অনর্থ। নির্বোধজনের প্রতি-ক্রিয়াশীল কতো রকমের ধারণা যে অকপটে ছবিতে চালিয়ে দেওয়া হয় তার দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করা যায়।

আগে যদিও বা লোকে সহ্য করে যেত, কিন্তু এখন দেখা যায় চিত্রনির্মাতাদের মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা, যার মূলে সাধারণতঃ থাকে সতীত্ব, তা আর বরদাস্ত হয় না। যতোই মেজেঘষে কৃত্রিমভাবে নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হোক না কেন, এখন আর "কালিন্দী", "কঙ্কাবতীর ঘাট"এর যুগ নেই। মানুষের মনই পাল্টে গিয়েছে, অথচ যারা ছবি তৈরী নিয়ে আছেন তারা থেকে গেছেন সেই আদি যুগে। বড়লোক হলেও, উপকারী ও দরিদ্রহিতব্রতে বন্ধুর বোনকে বিয়ে করার জন্যে তাকে তজ্যপুত্র করে দারুণ বিপত্তিজনের মধ্যে ফেলে দেওয়া এখনকার মন সহ্য করেনা—"পথের শেষে"র অনাদর তার দৃষ্টান্ত। জমিদার ও জমিদারী ব্যাপারের কিছুই এখন আর লোকের অনুভূতিতে রেখাপাত করেনা। প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে ধরলে একটা আদর্শ চরিত্র, কিন্তু সে কিংবদন্তী। জমিদারী কায়েম করার চেষ্টায় নিয়োজিত হলে কোন আবেদন জাগায় না, তা যদি হতো তাহলে "[illegible]"এ মনে রেখাপাত করতো। [illegible]

আক্রোশটা বিদেশী ইংরেজ শাসকের ওপর দেখানো হোক।

পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থার ওপর মায়া অনেকাংশেই বড়ো ভুলপথে প্রধাবিত করে নিয়ে যাচ্ছে। পুরাতনের ঐতিহ্যকে নতুন করে ততোটুকুই ফিরিয়ে আনতে হয় যতোটা নতুন দিনে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় খাপ খায়। "নিষ্কৃতি", "মামলার ফল", "ছোট বৌ", "ভাঙাগড়া", "ঝড়ের পরে", "অর্ধাঙ্গিনী" প্রভৃতি ছবির দৃষ্টিতে একান্নবর্তী পরিবার না থাকলেই সংসারে যতো বিরোধ ও অশান্তির আকর হয়ে ওঠে বলে যে তত্ত্ব উঁচিয়ে তোলা হয়েছে, এখনকার পরি-প্রেক্ষিতে তা জীবননীতির সার বলে গণ্য হবার মতো নয়। তাই বলে মানুষের মায়া মমতা স্নেহ থাকবে না তা নয়, স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে থাকবে তাও নয়। কিন্তু পরিবারে সকলকে নিয়ে না থাকলেই মনোমালিন্য ও দুর্দশা সৃষ্টি ও মনোভাবের পরিপোষণ [illegible]

অগ্রদূতের "[illegible]"-এর নায়িকা

সরোজ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত 'ঘুম'এ সন্ধ্যারাণী, মঞ্জু দে ও জহর গাঙ্গুলী

বড়ো ব্যাঘাত। মানুষকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য "ত্রিযামা"র মতো ছবিও আসছে। আবার "সাহেব বিবি গোলাম"-ও আসছে অনাচার শোষণ ও আলস্য-বিলাসের চরম পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। সাময়িক সমস্যাও বাঙলা ছবিতে একেবারেই বিলুপ্ত অবশ্য নয়, মাঝে মাঝে এমন ছবিও আসে যা জীবনের এক একটা সংকোচ ও সংশয়ের কথা সামনে তুলে ধরে। যেমন "চলাচল"এ রয়েছে মেয়েদের কাছে ছেলেদের পড়াশোনার ভার ন্যস্ত করার সামাজিক সংকোচ, কিংবা মেয়ে ডাক্তারের হাতে চিকিৎসার ভার দেওয়া নিয়ে সংশয়। দারিদ্র্য দেশব্যাপী, কিন্তু তাই বলে দারিদ্র্য মেনে নিয়ে কাতর হয়ে পড়ে থাকার দিন এখন চলে গিয়েছে— "প্রশ্ন"তে যেমন তেমনি দরিদ্রতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মন ও দৃষ্টির দীনতাকে পরাস্ত করে মাথা উঁচু করে চলার বলিষ্ঠতাই হচ্ছে কাম্য। "অন্নপূর্ণা"তে পাই উঁচুতলার সঙ্গে নীচুতলার দ্বন্দ্ব। "দুর্লভ জনম"এ পাওয়া সমাজ সংস্কারকের একটা দৃষ্টি যাতে এইটেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে যে, চোরের সন্তান সন্ততিও বংশ পরম্পরায় চৌর্য বৃত্তিরই উত্তরাধিকারী হবেই, না দারিদ্র্য ও অতীতের কলঙ্ক আচ্ছন্ন তাদের অন্ধকারময় জীবন সমাজের অনুদারতার শিকার হয়ে থাকে বলেই ভিন্ন পথে যাবার তারা রাস্তা খোলা পায় না?

এদেশের সমাজে ও মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়ে চলেছে। নতুন দিন নতুন কথা বলছে। নতুন আশায় উদ্দীপিত হতে চাইছে। কিন্তু কোথায় সে প্রেরণা? বাঙলার চিত্র-নির্মাতারা বড়ো কুণ্ঠাগতে পড়ে রয়েছেন। তা নয়তো তারা দেখতে পেতেন এখনকার চিন্তাধারা, এখনকার জীবন সমস্যা নিয়ে হিন্দী ছবি কতো এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আমরা মুখে বলি হিন্দুস্থান এক দেশ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থান যে নানাদেশে বিভক্ত এবং সেই সকল বিভাগকে এক করার দায়িত্ব যে সবায়ের মতো চলচ্চিত্রেরও আছে, সেটা যেন আমরা লক্ষ্য করতেই চাই না। কিন্তু হিন্দী ছবি এ বিষয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আন্তরাজ্য মিলনের জন্য ওরা চেষ্টা করেছে "গোপীনাথ"এ, কিন্তু তখনকার দিনে তা তেমন জোর না পাওয়ায় আবার তারা চেষ্টা করেছে "নিউ দিল্লী"তে। কোন বাধা নেই, কিন্তু তবুও একটা অলিক সংস্কার ভারতকে এক হওয়ায় বিঘ্ন হয়ে রয়েছে। বহু রকমারিত্ব নিয়েও ভারত যে একই এইটেকেই প্রমাণিত করে দেওয়া হয়েছে ছবিখানিতে। সমাজের দুর্নীতি নিয়ে হিন্দীতে হয় "শ্রী ৪২০" ও "জাগতে রহো"র মতো ছবি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙলা ছবির নির্মাতারা কালের আহ্বানে সাড়া দিতে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছেন।

আইনে আর নেই, তবুও প্রেম ঘটাতে গেলে জাত গোত্র মিলিয়ে তবেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জাতের সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক মিলনের সংকোচকে অতিক্রম করার মতো মনের জোর নিয়ে আসেনা কেন কোন ছবি? মানুষের অন্ধ কুসংস্কার দূর করে নতুন দিনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার চেতনা এনে দেওয়ার কোন বাধাই তো কেউ সামনে তুলে ধরে নেই, তবুও বাঙলা ছবি সেদিকে দৃষ্টি-পাত করছেনা। আজকের দিনে যেটা লক্ষ্য-পথ হওয়া কাম্য, সেটা পরিহার করে ছবিকে লোকের মনোমতো করে তোলা যায় না। এখন ভাষায় কতো নতুন শব্দ যোগ হয়ে যাচ্ছে নিত্যই, কতো নতুনভাবের উদ্দীপনা। কিন্তু ছবিতে সে সবের প্রতিফলন না থাকলে মানুষের এগিয়ে চলার অনুভূতিই যে অসাড় হয়ে পড়ে!

সেন্সর কর্তৃক নিষিদ্ধ হবার পরে ছাড়পত্র পাওয়া প্রভাত প্রভাতচন্দ্রের 'মা' চিত্রে অসিতবরণ ও চন্দ্রাবতী

বাংলা মহাকাব্য

॥ ভবতোষ দত্ত ॥

গত শতাব্দীতে রচিত বাংলা মহাকাব্যগুলি নিয়ে বাংলা সাহিত্যপাঠকের দ্বিধার অন্ত নেই। মহাকাব্য বস্তুত বাঙালী মানসের ঠিক উপযোগী নয় বলেই সকলের ধারনা। বাঙালীর সাহিত্যিক সাফল্য গীতিকাব্য। উনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্য পূর্বাপররহিত এবং স্বল্পকালস্থায়ী। এর উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাই মনে হয়েছে মহাকাব্য একটা কৃত্রিম অনুকরণ। সে-যুগে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুকরণেই বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্য এসেছিল। মহাকাব্য ছিল তার অন্যতম। অনুকরণ বলেই বোধহয় মহাকাব্যের ধারা রক্ষা পায়নি। যেখানে এর যতটুকু উৎকর্ষ অথবা প্রাণবত্তার অকৃত্রিম স্পর্শ পাওয়া গিয়েছে, ততটুকুই ঘটেছে লিরিকের অনিবার্য প্রভাবের ফলে। কারণ এটুকুই বাঙালী মন এবং বাংলা সাহিত্যের সংগে সম্পর্কান্বিত। অবশেষে মহাকাব্যের বিশাল দেহ থেকে লিরিকের প্রাণসম্পন্দনটুকুই বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বলে গণ্য হয়েছে। মহাকাব্যের রূপবন্ধও কারুর মতে বাংলা সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'শুধু যে বাংলা ভাষার প্রকৃতি বোঝেননি তা' নয়, সাহিত্যের আদর্শ নির্বাচনেও মাইকেল ভুল করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় পণ্ডিত হয়েও এ-কথাটা তাঁর উপলব্ধির অনায়ত্ত ছিলো যে আধুনিক কালে এপিকের জায়গা নিয়েছে গদ্য উপন্যাস।'

সাহিত্যের রূপবন্ধকে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রেরণার সংগে যুক্ত করে দেখা উচিত। সে-দিক থেকে দেখা দরকার, মধুসূদনের প্রতিভা এবং প্রেরণা উপন্যাসের কিনা। মধ্যযুগের অবসানে আধুনিক সাহিত্যে যে অনুপম বৈচিত্র্য এল, জীবনের অন্তর্লীন প্রয়োজনের সংগে তার কি যোগ ছিল না? নতুন প্রাণচেতনার বিচিত্র বিপুল আবেগকে বহন করবার জন্যই কি সাহিত্যের বিভিন্ন রূপবন্ধের প্রয়োজন হয়নি? জীবনে যখন প্রকাশের ব্যাকুলতা জাগে, প্রকাশের ভাষাও তখনই দেখা দেয়। বাংলা সাহিত্যে পৃথিবীর ক্লাসিক সাহিত্যের আড়ম্বর আদর্শ আমাদের সাহিত্যের রিক্ত শূন্য অন্তরকে লুব্ধ করেছিল সন্দেহ নেই; তবু মহাকাব্য জীবনের থেকে বিযুক্ত ছিল না। এই বিশিষ্ট কাব্যরীতি সে-যুগের একটা ব্যাকুল অন্তঃপ্রেরণাকে ভাষা দিয়েছে। মহাকাব্য রচনার গূঢ়তর উৎকণ্ঠা উনবিংশ শতকের বাংলা সমাজে পাওয়া যাবে।

তথাপি উল্লেখযোগ্য, মহাকাব্য রচনার সংগে সংগেই বাংলায় উপন্যাসেরও সৃষ্টি হলো। মহাকাব্য লুপ্ত হয়ে গেলেও উপন্যাস রচনার ধারা অব্যাহত। উপন্যাসের উদ্ভব শুধু আমাদের সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যেই আধুনিক। সভ্যতার অর্বাচীন বৈচিত্র্যবিকাশের সংগে এর যেন কোথায় গূঢ় যোগ আছে। আবার অর্বাচীন কালেও মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে যদিও প্রাচীন মহাকাব্যের আরণ্য বিশালতার সংগে এর বিশেষ সাদৃশ্য নেই। তাই কেউ কেউ মনে করেছেন, যাঁরা আধুনিক কালে মহাকাব্য লিখতে গিয়েছেন, তাঁরা গোড়াতেই ভুল করেছেন। সভ্যতার নবীন অধ্যায়টির অনিবার্য প্রকাশ-বাহন উপন্যাসই, মহাকাব্য নয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অত্যন্ত নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন মহাকাব্যের সংগে আধুনিক সভ্যতার অসহযোগ কোথায়। যে কারণে আধুনিক মানবমানস মহাকাব্যসৃষ্টির প্রতিকূল সেই কারণেই সে উপন্যাসসৃষ্টির অনুকূল। আমাদের বাংলা মহাকাব্যের পরবর্তী ইতিহাস ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে এই সত্যকে সপ্রমাণ করেছে।

ইংরেজ সমালোচক মহাকাব্যগুলোকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। চিরকালের জন্য এপিকের রূপ স্থির করে দিলেন হোমার; ভার্জিল সম্পূর্ণ করেছেন সেই রূপকে আর মিলটনের কাব্যে তারই চরম উৎকর্ষ সাধন। হোমার থেকে মিলটনে আসতে য়ুরোপের সভ্যতার বহু বদল ঘটে গিয়েছে। সভ্যসমাজে আদিম উদ্দাম সমাজ থেকে যেমন স্বভাবতই পৃথক, হোমারের কাব্য মিলটনের কাব্য থেকে তেমনি স্বভাবতই পৃথক। [illegible]

হয়েছে। এই শিল্প-বিবর্তনের পটভূমিতে রয়েছে জীবনচেতনার বিবর্তন। হোমারের যুগের যোধগোষ্ঠীর মিলিত রসোপভোগ তাদের কাব্যকে যে বিশিষ্ট আস্বাদ এবং রূপ দান করেছে, মিলটনের পিউরিটান মনোভাবে তার সাদৃশ্য নেই। আর তার সংগে আছে শিল্পচর্চার বিশিষ্ট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। মিলটনের এই মনোভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর একটি বিশিষ্ট বাণী মেলেছে। পিউরিটান কাজ এবং দেহের ক্ষুধার দ্বন্দ্বে আকীর্ণ তাঁর কাব্য। দান্তের কাব্যও এমনি করে একটি নীরব শতাব্দীকে ভাষা দিয়েছিল। আবারক্রম্বি মহাকাব্যের বিবর্তনধারায় প্রাচ্য কাব্যগুলিই উল্লেখ করেননি। ইংরেজ সমালোচকদের মধ্যে যতদূর মনে হচ্ছে থিওডোর ওয়াট্‌স্ ডানটন ছাড়া আর কেউ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের তুলনা করেননি। ওয়াট্‌স্ ডানটন মহাকাব্যকে দেখেছেন মানবজাতির এক এক অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ রূপে। সেদিক থেকে ভারতীয় মহাকাব্য এবং য়ুরোপীয় মহাকাব্যে পার্থক্য আছেই।

য়ুরোপীয় প্রাচীন মহাকাব্যগুলিতে বিদ্রোহী মানবসত্তাকে যত নিরংকুশ হতে দেখি, ভারতীয় মহাকাব্যে তা' হয়নি, তার কারণ অধ্যাত্ম-অনুভূতির নিকট ভারতীয় কবির প্রণাম। রামায়ণ-মহাভারতের বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সৃষ্টির পর কালিদাসের রঘুবংশ ইত্যাদি কাব্য শিল্পের একটা সীমা নির্দেশ করেছে। রঘুবংশে যে কালিদাস যুগ-প্রবৃত্তিকে রূপ দিয়েছেন, সে-কথাও রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক ঐতিহাসিক-সমালোচকরাও বলেছেন। আধুনিক কালের মহাকাব্য শিল্প-সতর্ক হয়েও যুগোচিত বাণীর সম্পদকে বহন করছে। কিন্তু মহাকাব্যের শিল্পবন্ধের শক্তি ক্ষয় পেয়ে এল। মহাকাব্য এবং উপন্যাসের সীমারেখা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সাহিত্যিক মহাকাব্যে শুধু জাতিগত প্রকৃতি নয়, তার সংগে থাকে যুগগত প্রবৃত্তি। এইজন্যই মনে হয় কাব্যে এমন একটি বিশিষ্ট যুগের প্রবণতা স্থান পায়, যা বাস্তব-সচেতন উপন্যাসেই স্বাভাবিক। তবু এই যুগপ্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নেবার বিশেষ ধরন আছে। যুগের প্রভাব মহাকাব্যে প্রেরণার আকারে আসে আর উপন্যাসে আসে বিষয়বস্তুর সুস্পষ্টতায়।

মধুসূদনের মহাকাব্যে উনবিংশ শতাব্দীর একটা কালোচিত প্রবণতাই যে শুধু রূপ নিয়েছে তা' নয়, এখানে জাতীয় প্রকৃতির লুপ্ত চেতনার আনন্দ এবং হাহাকার একই সংগে ধ্বনিত হয়েছে। প্রাচীন মহাকাব্যের প্রাণশক্তির সংগে এর তুলনা হয় না। প্রাচীন কাব্যে যুগরূপটাই বড়ো নয়, সেখানে জাতির সমগ্র মূলচেতনাটাই মথিত হয়ে সংহত রূপ লাভ করে। মধুসূদনের কাব্যে রূপকের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে যুগের সামগ্রিক উৎকণ্ঠা। উনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যগুলি এই যুগপ্রবণতাকে কতখানি বহন করতে পেরেছে, আমাদের বিচার্য তাই। বলিষ্ঠ কাহিনীর অরুগ্ন চরিত্র কল্পনাতে সে সীমায়িত। মনন-ধর্মের অতিচর্চা যেমন কাব্যকে শীর্ণ করে, আবেগের মত্ততাও তেমনি কাব্যকে করে ক্লান্ত।

আধুনিক বাংলার তিনজন মহাকাব্যকারের মধ্যে মধুসূদন এসেছিলেন সকলের প্রথমে। মেঘনাদবধ কাব্যেই সে-যুগের বাণীবন্যার প্রথম তরংগ। শুধু তাই নয়, এই কাব্যই বাংলাদেশের অমথিত প্রাণসমুদ্রের কাব্য। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাঙালীর এই প্রাণশক্তি ছিল স্তিমিত। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবীয় ভাবান্দোলনের পর সাহিত্যে বা জীবনে আর আবর্ত সৃষ্টি হয়নি, বরং পূর্বের সেই আবর্তই ধীরে ধীরে মিলিয়ে এসেছে। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্যে সুপরিচ্ছিন্ন ক্লাসিক শিল্পসৌষম্য এলেও বিষয় বা কল্পনায় কোনো দিক দিয়েই নবচেতনার লক্ষণ দেখা যায়নি। নানাকারণে সাহিত্যের আদর্শ একটা গতানুগতিকতায় রুদ্ধগতি। প্রেমের নতুন ধরনের কবিতাসৃষ্টি হয়েছিল সত্য। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাকৃত রূপক থেকে জন্ম নিয়েছিল এক ধরনের প্রণয়সংগীত। তার সংগে এল হিন্দুস্থানী গান ভেঙে বাংলা টপ্পা। এতে যুক্ত হলো ব্যক্তিচেতনার স্পর্শ। এ-সব কবিতা বা গানে চরিত-কবিত্ব থাকলেও এ-কথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, এই কাব্য বাঙালী মানসের কোনো বলিষ্ঠ হৃদয়বত্তার আভাস দেয় না। এই সব গানের ভাবাতিরেক কখনও কখনও মনোহারী কিন্তু অনেক সময়েই এরা দুর্বল, পৌরুষহীন। এমন এক হাওয়া এদের অংকুরিত করেছিল যা সমাজে রাষ্ট্রে নীতিতে বদ্ধ এবং দূষিত। বৈষ্ণব কাব্যের আদর্শায়িত প্রেমস্বপ্ন এই বদ্ধ পরিবেশে অনুপায় আত্মবঞ্চনে পরিণত হলো। অনেক সময়েই তা কথার চাতুর্যে এবং প্রণয়ের বিচিত্র ছলা-কলায় পর্যবসিত। নতুন ভাবে রক্তসঞ্চালনের অভাবে আমাদের জীবন কতখানি নিরালোক এবং নিস্তরংগ হয়ে পড়েছিল, এই যুগের সাহিত্যই তার পরিচয় দেয়।

তারপর এল উনবিংশ শতাব্দীর বন্যা। সেই বন্যায় পুরনো আদর্শ ভেসে গেল। আমাদের জীবনে এল নতুন আদর্শবোধ। চিন্তার কল্পনার এবং কর্মের একটা উদার মুক্তি এল সে-যুগের শিক্ষায়। এই শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হয়েছিল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজ থেকে নবীন চিন্তারীতির পথিক যে-সব বেরিয়ে এলেন, বাঙালীর জীবনে তাঁরাই ঘটালেন নতুন শক্তির জাগরণ। বাঙালী জাতির নবজাগরণের এই ইতিহাসকে এ-যুগের সাহিত্যসৃষ্টির পটভূমি রূপে স্মরণীয়। এই জাগরণের দুটি বিশিষ্টতা। সদ্যোবিগত বাঙালী সমাজের দীন শূন্যতা নতুন সভ্যতার আলোয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। আমাদের জাগরণ কোনো দিক দিয়েই পূর্বতন জীবনের রিক্তভাণ্ডার থেকে কোনো রত্নকণিকাই আর পায়নি। দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্য জীবনচর্চার একটা বলিষ্ঠ নীতি আমাদের দুর্বল হৃদয়কে প্রলুব্ধ করতে করল। পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং নীতি তাই সহজেই অভিভূত করতে পেরেছিল। তার দ্বারা আমাদের জীবনের পুনর্গঠন হলো প্রয়োজনীয়। প্রথম আবেগে, [illegible] না, ফলে [illegible]

এই হৃদয়োচ্ছ্বাস যুক্তিবিরহিত হয়ে বাঞ্ছিতকেও অবাঞ্ছিত করে তুলবার উপক্রম করেছিল। শক্তিমত্ত মনুষ্যত্বের বলিষ্ঠ আদর্শ আলোড়ন নিয়ে এল। কল্যাণ-অকল্যাণের সূক্ষ্মবিচারের কথা কারোই মনে পড়ল না।

মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়ে এলেন, ডিরোজিওর ছাত্ররা তখন বিদ্রোহের দম্ভ ছেড়ে বিদ্রোহের যথার্থ রূপায়ণে ব্রতী। মধুসূদন যখন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন, তখন ধর্মান্তরণের হুজুগ চলছিল বটে, কিন্তু যখন তিনি কাব্য রচনা করলেন, তখন বিদ্রোহের অন্ধতা হ্রাস পেয়ে এসেছে। তবু মেঘনাদবধ কাব্যটির প্রাণস্পন্দনটি আসলে হিন্দু কলেজের যুগের। ঠিক প্রত্যক্ষ আবর্তটির মধ্যে এই কাব্যটির জন্ম নয়। আবর্ত যখন স্থির হয়ে আসছে তখনই এর সৃষ্টি। মধুসূদনের কবিচেতনা বাংলাদেশের এই যুগপ্রেরণাকে সঙ্গীতের সুরে বাজিয়ে তুলল। এই সঙ্গীতে আবেগ ছিল, ব্যাকুলতা ছিল, কিন্তু চিন্তার সংযম ছিল না। রাবণের চরিত্রে যদি সে-যুগের বেদনা ধ্বনিত হয়ে থাকে, তবে সে-চরিত্রের স্নেহ এবং বীর্যের যুগ্ম স্ফুরণটিও মনুষ্যত্ববোধের নব আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আচারমুক্ত বন্ধনমুক্ত উচ্ছ্বসিত হৃদয়লীলার প্রতীক ওই রাবণ। রাবণ চরিত্র সূক্ষ্মতাবর্জিত ক্লাসিক কল্পনার সৃষ্টি; তেমনি নির্বিচারিত উচ্ছ্বাস একে করেছে কাব্যধর্মী। রাবণ উপন্যাসের চরিত্র নয়। তার চরিত্রে ঔপন্যাসিক চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের সূক্ষ্মতা কিংবা ক্রমোন্মেষ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উপন্যাসের বীজ সংবাদপত্রের টুকরো কাহিনীতে, ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থে দেখা গেলেও উপন্যাস সৃষ্টি তখন হতে পারেনি। এর কারণ শুধু গদ্যভাষার অভাব নয়; এর কারণ জীবনে উপন্যাসের যোগ্য জটিলতার অভাব। তখন জীবন শুধু এক-দিকেই অগ্রসর হয়ে চলেছে। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন সেই অগ্রসরণ সত্যকার কল্যাণচিন্তার দ্বারা প্রতিহত হোল তখনই জীবনে এল দ্বন্দ্ব। উপন্যাস সৃষ্টির সেই ছিল অনুকূল মুহূর্ত। আর মধুসূদন বাঙালী জীবনের যে সন্ধিক্ষণকে ভাষা দিলেন, সেটি ছিল মহাকাব্যের গভীর আলোড়নের যুগ।

মধুসূদনের কাব্য শুধু স্তিমিত বাঙালী জীবনের সঙ্গে দুর্মদ পাশ্চাত্য জীবনের সংঘর্ষের ছবি আঁকতে চায়নি। বস্তুত বাঙালী জীবন তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার যোগ্য মোটেই ছিল না। তাই বোধহয় এই সংগ্রাম ফুটিয়ে তুলবার প্রতীকটিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ভারতবর্ষের অমর জীবনাচরণের আদর্শলোক রামায়ণ থেকে। রাম-রাবণের [illegible] আর অন্তরের ভূমিকায়

সংকটকে তিনি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু মনে হয় কবি জানতেন ভারতবর্ষের আদর্শ দুর্বল বা রুগ্ন নয়। তাই প্রত্যক্ষ-ভাবে বাংলার কোনো লোক-কাহিনীকে না নিয়ে, নিলেন রামায়ণকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে যুদ্ধের ছবি আঁকবার উদ্দেশ্যে। আমরা জানি, এই শ্রদ্ধা ছিল সে যুগের সকল মনীষীরই। শ্রদ্ধা ছিল বলেই তাঁরা স্তিমিত বাঙালী জীবনাদর্শের পরিবর্তে প্রার্থনা করে-ছিলেন ভারতীয় গৌরবকে।

ভারতীয় আদর্শের অন্তঃসারশূন্যতাকে যদি দেখাতে হয়, রামচন্দ্রকে দিয়ে চলে না। তাই বাংলা দেশের মঙ্গল কাব্যের দুর্বল নায়কই রামচন্দ্রের মধ্যে ফুটে উঠল। রামায়ণের রামচরিত্রে সত্যিই কবিকল্পিত দুর্বলতাটি ছিল না, ছিল ঐ মঙ্গলকাব্যের দৈবানুগৃহীত নায়কচরিত্রে। মেঘনাদবধের রামচরিত্র আসলে ভারতীয় নয়, বাঙালী সমাজেরই একটি শূন্যতাকে প্রকাশ করেছে। কাহিনীভাগের দিক থেকে জাতিগত প্রেরণা বিভিন্ন রেখায় সম্মিলিত হলেও রাবণ-চরিত্রের জটিলতাবর্জিত ঋজু গতি একে এপিকোচিত গাম্ভীর্য দান করেছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক যাই হোক, এই কাব্যের নিত্য-আস্বাদনীয় রসকস্তুটি কি? মেঘনাদবধ কাব্যই বাংলা সাহিত্যের একটি সাহিত্যিক রূপ স্থির করে দিল। বৈচিত্র্যহীন অলস দীর্ঘতাকে একটা বিশিষ্ট রূপের মধ্যে ধরে দিতে শেখালেন মধুসূদন। মঙ্গলকাব্যের আকৃতি প্রকৃতিহীন পঙ্গুতার স্থলে একটা সুস্থ সমগ্রতার শিল্পকলায় কাহিনীকে পৌঁছে দিলেন। একটা চরিত্র কতটুকু শব্দ দিয়ে কতটুকু পরিসরে ফুটে উঠতে পারে তার একটা শিল্পিসুলভ আভাস মধুসূদন রেখে গেলেন। ছেদহীন সংযমহীন শিথিল পয়ার শ্লোকের বন্যায় মঙ্গলকাব্যের কোনো চেহারা ফুটে উঠতে পারেনি। মধুসূদনই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শিল্পচেতনা আনলেন। তাঁর কাব্যের সর্গভাগ, ঘটনার ঋজু রেখাটি শেষ দৃশ্যের চিতানল শিখায় অর্থবান। সমুদ্র-বন্ধুর বন্দীদশার দিকে তাকিয়ে রাবণের নিজের ভাগ্যলিপি পাঠ করবার চমৎকার নাটকীয় তাৎপর্য কিংবা চিত্রাঙ্গদা-মন্দোদরীর সঙ্গে রাবণের সাক্ষাৎ-কারের সংহত বাগ্‌নাগভীরতা মহাকাব্যের যোগ্য ভূষণ বটে। অনাবৃত শিল্পমানসের স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠাই এই কাব্যের অবিস্মরণীয় মূল্য। তার সঙ্গে আছে পূর্ণ
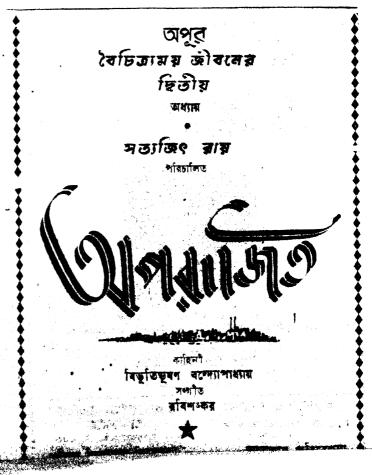
চরিত্রচিত্র। রাবণের হৃদয়টি ব্যক্তিত্ব চেতনায় সমুজ্জ্বল আবার তারই মধ্যে নিখিল মানবতার অমৃতময় রূপ—স্নেহ এবং বীরত্বের মিলিত শক্তির আত্মঘাতী মূঢ়তা। তারা-জ্বলা রাত্রির চন্দ্রালোকিত রহস্য-নীলিমার মতো মন্দোদরীর মাতৃহৃদয়টি, ব্যর্থ শোকাহত চিত্রাঙ্গদার ধিক্কার ধ্বনি আর বন্দিনী জানকীর অপরিসীম ক্ষমায় সমাহিত মহিমা—মেঘনাদবধ মহাকাব্য জীবন্ত মানুষের বক্ষস্পন্দনে, দীর্ঘশ্বাসে, হাহাকারে, গর্জনে, কলরবে, পদধ্বনিতে পূর্ণ। যাকে বলা যায় পেগান কল্পনা তারই একটি চিরন্তন রূপ আধুনিক সাহিত্যের ওই একটি কাব্যেই পাওয়া গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পর্বান্তরগুলি খুব দ্রুত ঘটেছে। যে-পর্বের প্রেরণায় মেঘনাদ-বধের অমিত্রাক্ষর সংগীত, সেই পর্বটি ক্রমেই পথ ছেড়ে দিল ধীরতর স্থিরতর চিন্তা-গভীর একটি যুগকে। রচনা সময়ের দিক থেকে হেমচন্দ্রের কাব্য মধুসূদনের বেশী দিন পরে নয়। নতুন মহাকাব্য গড়ে ওঠবার মতো ভাবের আলোড়ন নতুন করে আর হয়নি। তবু সৃষ্ট হোলো বৃত্রসংহার। বৃত্র-সংহার এবং মেঘনাদবধের মধ্যে তুলনার অভ্যাসটা আজকের নয়। সেই যুগ থেকেই তুলনা চলে আসছে এবং এক সময়ে হেমচন্দ্র মধুসূদনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথও সেই মত প্রকাশ করে-ছিলেন। কিন্তু মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রের মননভঙ্গিতে পার্থক্যের সীমা নেই। দুজনের কাব্য দুই ভিন্নতর প্রেরণার প্রতীক। মেঘনাদ-বধে চিন্তাহীন হৃদয়ধর্মের অবাধ উচ্ছ্বাস আর বৃত্রসংহারে প্রচ্ছন্ন আছে আধুনিক চিন্তার ছায়া। গ্রীক নিয়তির আবরণটি বৃথাই চেষ্টা করেছে তাকে ঢাকতে। কেউ কেউ মনে করেন, বৃত্রসংহার অন্তত কাহিনী-ভাগের দিক থেকে মহাকাব্যের উপযুক্ত এবং মেঘনাদবধের চেয়ে মহিমান্বিত। আধুনিক লেখকের কাছে কাহিনী বিশেষভাবে চিন্তনীয়, সন্দেহ নেই। মধুসূদনই তাঁর কাব্যে একটা স্পর্শবেদ্য প্লটের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন। কল্পনার সাবয়বতাকে প্লটের স্পষ্টতাই ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। তবু বলতেই হবে যতখানি নিবিড় হওয়া উচিত ছিল, মধুসূদনের প্লট ততখানি নিবিড় হয়নি। তাঁর কাব্যের দু একটি সর্গ মূল কাহিনীর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত শিথিলভাবে সম্পর্কিত। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে—আমি একজন গ্রীক কবির মতোই কাব্য লিখব। গ্রীক কাব্যশাস্ত্রে প্লটের সমস্যা ছিল একটি মুখ্য বিচার্য বিষয়। হোমারের The Iliad is a fine example of the Greek method of constructing of story or play.

সুতরাং মধুসূদনের উক্তিটি এই দিক দিয়েও ভেবে দেখা উচিত। তিনি যে বিশেষ করে গ্রীক প্লট-রচনার আদর্শ মনে রেখে কাব্য লিখতে যাবেন, তারও বিশেষ কারণটি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমাদের মধ্য-যুগীয় কাব্যে প্লটের কোনো চেহারা নেই। সে-সব কাহিনী অত্যন্ত শিথিল, অবিশ্বাস্য এবং পঙ্গু। প্লটের কোনো ভাবগত রূপই তাতে ছিল না। মেঘনাদবধ কাব্যে প্লটের একটি সম্পূর্ণ সমাপ্ত এবং রেখায়িত আকৃতি দেখা গেল। কিন্তু প্লট সম্পর্কে হেমচন্দ্র অধিকতর সতর্ক, এতই সতর্ক যে মনে হয় তাঁর মনোযোগ সেদিকেই নিঃশেষিত হয়ে-ছিল, চরিত্র সৃষ্টি বা কাব্যের অন্য প্রয়োজনে আর কিছুই উদ্বৃত্ত থাকেনি।

হোমারের কাব্যে প্লট প্রধান হলেও ব্যক্তি সৃষ্টি অধিকতর পর্যবেক্ষণযোগ্য। হোমারের ব্যক্তিচরিত্র পৃথিবীর বিস্ময়। মধুসূদন হোমারের অনুসরণে চরিত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য [illegible] উজ্জ্বল, হোমারের [illegible]

না হলেও অসামান্য প্রাণবত্তায় জাগ্রত। যাঁরা হেমচন্দ্রকে গ্রীক মহত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করেন, তাঁরা হেমচন্দ্রের প্লটের দক্ষতাতেই নিশ্চিন্ত, চরিত্রের কথা ভাবেননি। বৃত্রসংহারে স্বর্গ-মর্ত্যপাতালব্যাপী কাহিনী বিস্তার লক্ষ্য করি; কিন্তু এই ব্যাপ্তির অনুরূপ মহত্ত্ব বা বিশালতা একটি চরিত্রও অর্জন করতে পারেনি। প্লট শুধুই ঘটনা-যোজনা নয়, প্লটের একটি ভাবগত তাৎপর্য এবং সমগ্রতা থাকা চাই। এই তাৎপর্য প্রকাশ পায় চরিত্রের স্বাভাবিক প্রাণ-সত্তায়। বৃত্রসংহারে চরিত্র জীবন্ত নয়, তাই তারা প্লটের চিন্ময় রূপটিকে জাগিয়ে তুলতে পারেনি। বৃত্রসংহারের কাহিনী একটা বিশাল প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কালের মতো। সমগ্র কাহিনীটির আশ্রয়কেন্দ্র অত্যন্ত শিথিল—ঐন্দ্রিলার ঈর্ষা। নায়ক বৃত্র নির্জীব শক্তিহীন, বিবর্ণ। যদিও কখনই দেখলাম না গর্জন ছাড়া সে কখনও কথা বলেছে, তবু বৃত্রকে কখনই আত্মস্ফূর্তির স্বভাব চেতনায় জীবন্ত হতে দেখা গেল না। ঐন্দ্রিলার পদপ্রান্তে আপন ব্যক্তিত্বের অর্ঘ-দান করে সে দুর্বল, রিক্ত। বৃত্রসংহার নায়কের নিষ্ক্রিয় আত্মবিক্রয়ের উপর ভর করে আছে। ঐন্দ্রিলা হয়েছে বৃত্রের নিয়তি। কিন্তু সেই চরিত্রের অর্থ কী, সে বিপুল পর্বতসদৃশ দেহভারকে নীচ ঈর্ষার আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করল?

হেমচন্দ্রের কাব্য এবং মধুসূদনের কাব্য ভিন্ন প্রকৃতির। মেঘনাদবধ বাঙালীর চিত্ত-ক্ষেত্রে নবীন বর্ষার ফসল। বৃত্রসংহার রচনার কাল এবং প্রেরণা—দুই-ই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের। মধুসূদনের কোনো কাব্যেই তত্ত্ব বা চিন্তাপ্রবণতার ছাপ নেই। কিন্তু হেমচন্দ্রের চিন্তাতরঙ্গিণী বা দশ-মহাবিদ্যায় চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট। চিন্তা-তরঙ্গিণীর ঘটনা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ভ্রাতার অপমৃত্যু। এই মৃত্যুর সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ জড়িত। হেমচন্দ্র মনের দিক দিয়ে নীতি-সচেতন ছিলেন। সেদিক দিয়ে দেখলে হেমচন্দ্রের মনকে গ্রীক কিছুতেই বলা যায় না। বৃত্রসংহার কাব্যে তত্ত্বের ঠিক সোজাসুজি প্রয়োগ না থাকলেও সমস্ত কাব্যখানাকেই ব্যাপ্ত করে আছে এক নীতিবোধ। ঐন্দ্রিলার ঈর্ষায় কবির বিরূপ মনোভাব যেমন স্পষ্ট, নিয়তির ভবিষ্যদ্বাণীতে এবং বৃত্রের পতনে কবির কল্যাণচিন্তা তেমনি চরিতার্থ। শুধু তাই নয়, অসুরদের হাত থেকে স্বর্গকে উদ্ধার করার কল্পনায় সেকালের জাতীয়তাবোধও তৃপ্ত হয়েছিল। দধীচির আত্মত্যাগে পরার্থপরতার মানবিক আদর্শ। এসব দিক দিয়েই বৃত্রসংহার কাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের জাগ্রত আদর্শবাদিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত। মিলটনের সম্পর্কে সমালোচক মহলে একটি চলতি প্রবচন এই যে, মিলটন একটি নীতিবোধের দ্বারা প্রণোদিত হলেও তাঁর অন্তর অজ্ঞাতসারে শয়তানকেই ভালোবেসে ফেলে-ছিল। এই ঘটনাটি অর্থহীন নয়। নীতির চেয়ে বড়ো হলো জীবন। প্যারাডাইস লস্টে তাই রেনেশাঁ পরবর্তী য়ুরোপীয় সংস্কৃতির একটি গভীর আকৃতি বেজে উঠেছে। বৃত্রসংহারে আমাদের এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না।

সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই যে, বৃত্র-সংহারে স্বাভাবিক জীবনধর্মের চেয়ে মনন-ধর্ম বড়ো হয়েছে। একে ঠিক মহাকাব্যোচিত প্রাকৃতিক উদ্ভব বলতে পারি না। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র সম্পর্কে একথা সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করা যেতে পারে রূপবন্ধ নির্বাচনে তাঁরা ভুল করেছিলেন। মধুসূদনের কাব্য পরবর্তীকালে রচিত হলেও পূর্ববর্তী যুগের প্রেরণায় পুষ্ট। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্য পরের যুগের রচনা হলেও পরের যুগের স্বাভাবিক প্রকাশবাহনকে স্বীকার করেনি।

তখন উপন্যাসের যুগ এসে গিয়েছে। শুধু রীতি হিসাবে নয়, অন্তর্নিহিত প্রয়োজনে উপন্যাস তখন প্রত্যাশিত। উপন্যাস লেখকের যে বিশিষ্ট জীবনদর্শন কাহিনী এবং মন্তব্য সহযোগে প্রমূর্ত হয়, চতুষ্পার্শ্বের আবহাওয়া তখন তাকেই গড়ে তুলেছে। বিশেষত মানব-স্বভাবের সঙ্গে কবিকল্পিত আদর্শের সংঘাতে উপন্যাস দ্বন্দ্বসংকুল হয়ে ওঠে। যে যুগে জীবনে বিপরীতমুখী ভাব-ধারার সংঘাত না ঘটে সেই যুগে উপন্যাস হয় না। মহাকাব্যের যুগ ছিল ঋজু কল্পনার তত্ত্বহীন প্রাণচেতনার যুগ। উপন্যাস আধুনিক যুগের জটিল কুটিল রেখায় রচিত হয়। উপন্যাসে মনন-চেতনার প্রাধান্য স্বভাবতই ঘটে থাকে; নানাভাবেই লেখকের মন্তব্য বিশ্লেষণ, ব্যক্তিগত জীবনদর্শন এবং অভিপ্রায় দেখা দেয়। প্রাণের আত্মহারা লীলার স্থলে দেখা দেয় প্রখর মানসিকতা। নীতি, চিন্তা, কল্যাণবোধ, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রভৃতি আধুনিক সংস্কৃতির অনেক রকম প্রতিক্রিয়াই লেখকের ব্যক্তিত্বকে নির্মাণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই নীতি-বোধের এবং অন্যান্য গঠনমূলক নতুন নতুন চিন্তার জাগরণ ঘটল। এই যুগেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা মতবাদ এবং দার্শনিক চিন্তাকে দেখতে পাই। পূর্ববর্তী যুগের আবেগ এবং উচ্ছ্বাস এই দ্বিতীয় যুগেই অখণ্ড চিন্তায় রূপান্তরিত হোলো। জগৎটা যে একটা নীতির বাঁধনে বাঁধা—এ রকম একটা বিশ্বাস সেই সময়ে খুবই সাধারণ ছিল।

হেমচন্দ্রের সময়েই যার প্রেরণা ক্ষয় পেয়েছে, নবীনচন্দ্র চেয়েছিলেন তাঁকেই পুনরুজ্জীবিত করতে। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে হেমচন্দ্রের পার্থক্য এই যে, একজন তাঁর সমসাময়িক মননচেতনাকে কাব্যে টেনে এনে মহাকাব্যের অধিকার শিথিল করবার উপক্রম করেছিলেন, আর একজন ভবিষ্যতের স্বপ্নে মহাকাব্যকে রোমান্টিক গীতিরূপে রঞ্জিত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালীর চিত্তে যুগান্তরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। নবীনচন্দ্রের যুগটি অনেক দিক দিয়েই জটিল। কেশবচন্দ্রের মাধ্যমে বৈষ্ণবীয় ভক্তি-বাদ ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা, ভারত-বর্ষকে অতীত গৌরবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। বিশ্বমানবতাবোধের দ্বারা উদ্দীপিত মানুষের অধিকারবোধ তার সঙ্গে মিশেছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যের পশ্চাৎপটেও জাতীয়তা এবং মানবনীতির কল্যাণ-বাণী রয়েছে। মহাকাব্য লিখবার পূর্বে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন। তাতে তিনি মহাভারতকে নূতন করে ব্যাখ্যা করবার অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন। অতীতের অর্থোদ্ধারের আসলে তিনি বর্তমানের চাবিটি ব্যবহার করেছিলেন। এ কাজে কবির ভবিষ্যৎ স্বপ্ন মিশেছিল। একটি বিরাট আয়তনে তিনি নিয়ে আসতে চেয়েছেন একটি অখণ্ড রাষ্ট্রের সমগ্র রূপকে। এটা ছিল কবির আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাটি অবলম্বন করেছিল রাজনৈতিক বিষয়কে। দেহজীবনের প্রতি সানুরাগ প্রীতি মধু-সূদনের কাব্যে একটি শাশ্বত আকৃতি নিয়ে জেগে উঠেছিল। কিন্তু সেটা ছিল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। হেমচন্দ্রের সমস্যা ছিল অনেক-খানি নৈতিক আর নবীনচন্দ্রের সমস্যা হচ্ছে রাজনৈতিক। নবীনচন্দ্রের কাব্যে সমষ্টি চেতনার একটা রাজনৈতিক রূপ দেখা গেল।

আপাতদৃষ্টিতে নবীনচন্দ্রের যুগের বিভিন্নমুখী ভাবসমাবেশকে মহাকাব্যের যোগ্য উপাদান বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এসব স্বপ্ন আইডিয়ার আকারেই ছড়িয়ে আছে। এ রকম নির্বিশেষ তত্ত্বের লঘু আশ্রয়ে মহাকাব্যের বিশাল দেহ কখনই দাঁড়ায় না। অধ্যাপক কার বলেন,

Romance by itself is a kind of literature that does not allow the full exercise of dramatic imagination; a limited and abstract form as compared with the fulness and variety of Epic, though episodes of romance and romantic moods and digressions may have their place, along with all other human things, in the epic scheme.

নবীনচন্দ্রের কাব্যকেও এপিক না বলে রোমান্স বলাই সঙ্গত। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে অতীতবিহ্বলতা নবীন-চন্দ্রের কাব্যে সুলভ রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসে পর্যবসিত হয়েছিল। কিছুটা ইতিহাস, অধিকাংশ রোমান্সের অলীক কল্পনা, ধর্মগত একটা বিশিষ্ট প্রবণতা, আধুনিক নির্বিশেষে ভাবনিষ্ঠা এবং তার সঙ্গে উপন্যাসের মনস্তত্ত্ব—সব মিলে উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত একটি কাব্য-নীহারিকা।

বাঙালীর ভাবসর্বস্ব গীতি-প্রাণতার দৃষ্টান্তরূপে এই কাব্যত্রয়ী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত থাকল। মধুসূদনের চিন্তাহীন তত্ত্বহীন উদার দেহবাদ সম্ভবতঃ বাঙালীর ভাবুকতার একটা বিরোধী প্রবৃত্তি। তাই মেঘনাদ বধ একটা অব্যবহার্য শূন্য প্রাসাদপুরীর মতো পরিত্যক্ত। নবীনচন্দ্রের কাব্য বাঙালী মনের লিরিক উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। নবীনচন্দ্রের সময়টিকে মনে রাখলেও এই ঘটনা অস্বাভাবিক বোধ হবে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই গীতি কবিতার স্থান নিঃসংশয়িত হয়ে গেল। এই সময়েই রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভাসূর্য মধ্যাহ্ন যাত্রা করেছে। নবীনচন্দ্র এই যুগেই মহাকাব্য লিখলেন। যদিও বিহারীলালের মতো তিনি আত্মধ্যান-মগ্ন নন, তবু লিরিক মনোভাবের জন্য মহাকাব্যের আদর্শ থেকে অনেকটাই দূরে

সরে এসেছেন। শেলীর মতো তিনি অবাস্তব তারকা স্বপ্নে মগ্ন। শেলীর কল্পনাও ছিল

> but man
> Equal, unclassed, tribeless
> and nationless,
> Exempt from awe, worship,
> degree, the king
> over himself; just, gentle, wise;
> but man passionless;

নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণের স্বপ্নও এরই অনুরূপ—

> এক ধর্ম, এক জাতি
> এক রাজা, এক নীতি
> সকলের এক ভিত্তি—সর্বভূত হিত;
> সাধনা নিষ্কাম কর্ম
> লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম
> একমেবাদ্বিতীয়ং! করিব নিশ্চিত
> এই ধর্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত!

—এই আদর্শবাদিতার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য। কৃষ্ণকে নায়ক-রূপে কল্পনা করে নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনা করতে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু নিজের প্রেরণা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন কিনা সন্দেহ। কৃষ্ণ একদিকে ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র আর একদিকে একটি ধর্মের উপাস্য দেবতা। তিনি ভারতীয় কল্পনার মর্মকেন্দ্রে সুগভীর অধ্যাত্মপ্রভায় আলোকিত। কৃষ্ণ পার্থিব প্রেম স্নেহ ঈর্ষার মানবীয় দুর্বলতার অতীত শাশ্বত ইষ্টদেবতা। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে মানবীয় গুণের পূর্ণ বিকাশের দ্বারা পরম আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। ঈশ্বরকে মানবীকরণের প্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী দার্শনিকের নিকট থেকে পেয়ে থাকবেন। সে যুগের যুক্তিবাদী মানব-সাধনারই এটা ফল। নবীনচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণ মানবীয় রূপটিকেই তাঁর মহাভারতের কর্মী পুরুষ-রূপে ধ্যান করেছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণ অধ্যাত্মলোকের ভাব কল্পনার দেবতা নন। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ কর্মোৎসাহী নেতা। কিন্তু নবীনচন্দ্র তাঁকে কোনোরূপেই সম্পূর্ণ করে তুলতে পারেননি। নবীনচন্দ্রের কাব্যে কৃষ্ণ কর্ম-স্বপ্নের কবি; যথার্থ কর্মের মধ্যে তিনি জীবন্ত নন। উপরন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভক্তি-উচ্ছ্বাস কালদুষ্ট হয়ে মহাভারতের কৃষ্ণের রাজসিক উদ্যমী চরিত্রকে অস্পষ্ট এবং ভাবাতুর করে তুলেছে। শুধু তাই নয়। সম্ভবত এক বিপরীত আদর্শ কবিকে চেতনার অগোচরে প্রভাবিত করে থাকবে। কবি কৃষ্ণকে কল্পনা করতে চেয়েছেন নির্বিকার অবিচল পুরুষরূপে আর এক-দিকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞের হোতারূপে। তাঁর কর্মলীলায় সমস্ত ভারত-বর্ষ মুগ্ধ বিস্মিত। আবার তাঁর প্রেমে ধ্যানমগ্ন নারী আপন হৃদয়কে উপবাসী রেখে নির্জন তপস্যায় নিরত। কিন্তু নারীর প্রেম কৃষ্ণের জীবনে আনন্দ নিয়ে আসে, বাঁধে না। কৃষ্ণ চরিত্র পরিকল্পনাতে নবীন-চন্দ্র বায়রনের কাব্যের নায়কের দ্বারাও অজ্ঞাতসারে প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অনুসরণে অবশ্যই তিনি কৃষ্ণের লীলাকে অপ্রাকৃত বলবেন না। নারীর প্রেম তাঁর কাছে লৌকিক, ভারত-ব্যাপী হরিগুণগানও তেমনি যশঃকামনারই পূরণ।

বলা বাহুল্য এ রকম চরিত্র কখনই মহা-কাব্যের নায়ক হতে পারেন না। তেমনি এই কাব্যের নারী চরিত্রগুলিও মহাকাব্যোচিত নয়। তারা হৃদয়ভারে বিব্রত, আত্মবিশ্লেষণে নিপুণ। প্রেমের বিভিন্ন কাহিনীর সমাবেশে মহাকাব্যের মূল কাহিনী ম্লায়মান। নারীর প্রেম অনেক সময়েই কবিকে শৃঙ্গারলীলার অবশ স্বপ্নে আত্মহারা করেছে।—

> মানব তাহারা নহে যদি নাথ! তবে কেন
> একরূপে রক্তমাংস করিলা সৃজন?
> কেন বা হৃদয় দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম
> প্রেমেতে নিরাশা দিলে গভীর এমন?

আত্মভারাবনত প্রেমের এই অনুধ্যান নারী-চরিত্রকে সজাগ করেছে। প্রেমের অন্ধ প্রবৃত্তির আত্মঘাতী মূঢ়তার চেয়ে এই ধ্যান এবং ভাবনাই বড়ো হয়ে উঠেছে। আধুনিক আত্মকেন্দ্রিক গীতি কবির পক্ষেই এই রকম আত্মবিশ্লেষণ সম্ভব। নবীনচন্দ্রের কাব্যের প্রেমের এই আত্মসচেতনতায় এই যুগেই লিখিত রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যের প্রেমের কবিতাগুলিকে স্মরণ করায়। এমনকি নবীনচন্দ্রের কাব্যে কোনো কোনো স্থলে ভাষা এবং ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যের রসোচ্ছল ভাষারীতির সঙ্গে তুলনীয়—

> আমি কে? কার, কি? ধর্মপত্নী দুর্বাসার?
> না কি স্বপ্নরাজ্যে আমি কারুরূপী কেহ?
> এ হাত? কারুর বটে। কদম্ব দাড়িম্ব?
> কারুর। এ ক্ষীণ কটি? তাহাও কারুর।
> শ্রোণীভারে আর এই অলস গমন?
> কারু সুন্দরীর তাও। সর্বশেষ এই
> মার্জিত শাণিত বুদ্ধি?

রূপের এই sensuous এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা গীতিকাব্যেরই যোগ্য। নারীর প্রেম নারীর রূপের এই বর্ণনারীতি বারবারই মহাকাব্যের গাম্ভীর্যকে গীতিকাব্যিক সুরে উন্মনা করেছে। নবীনচন্দ্রের দিকে তাকিয়েই আমরা বুঝতে পারি, মহাকাব্য রচনার বিশিষ্ট শক্তি বাঙালীর পক্ষে সম্ভব নয়। তার হাতে পাখোয়াজ বাঁশীতে পরিণত হয়, মহাকাব্য পরিণত হয় রোমান্টিক উপন্যাসে। মেঘনাদ বধের তত্ত্বহীন চিন্তা-হীন অকুণ্ঠ হৃদয়ধর্মের লীলা ধীরে ধীরে কালের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বের সঙ্গে নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেল। আধুনিক যুগে মহা-কাব্য রচনার যে স্বল্পস্থায়ী সন্ধিক্ষণ এসে-ছিল, তাতে আমরা খাঁটি মহাকাব্য না হলেও একটি মহাকাব্যধর্মী রচনা পেয়ে-ছিলাম। তারপর মহাকাব্যের ধর্ম হারিয়ে গেল; থাকল আকার আর সূক্ষ্ম আইডিয়া। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি মনে পড়ে, সে-উক্তি যেমন সতর্ক তেমনই অর্থবান: তার পরে হেম বাঁড়ুয্যে বৃত্রসংহার, নবীন সেন রৈবতক লিখলেন; এ দুটিও মহাকাব্য; কিন্তু তাঁদের কাব্যের রূপ হল স্বতন্ত্র। তাঁদের মহাকাব্যও রূপের বিশিষ্টতার দ্বারা উপযুক্তভাবে মূর্তিমান হয়েছে কিনা এবং তাঁদের এই রূপের ছাঁদ ভাষায় চিরকালের মতো রয়ে গেল কিনা, সে তর্ক এখানে করতে চাই নে—কিন্তু রূপের সম্পূর্ণতা বিচারেই তাঁদেরও কাব্যের বিচার চলবে; তাঁরা চিন্তাক্ষেত্রে অর্থনীতি, ধর্ম-নীতি বা রাজনীতি সম্বন্ধে কোন্ কোঠা খুলে দিয়েছেন, সেটা কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে বিচার্য নয়। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রস-সাহিত্যে।

পরীর গল্প

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছেলেবেলায় রঞ্জন ও তার দিদি কাঞ্চন যে পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে ইস্কুলে যেত সে পথের দুই ধারে লোক দাঁড়িয়ে যেত। আর বলাবলি করত—

এরা কারা হে?

এরা নতুন পোস্টমাস্টারবাবুর মেয়ে। কলকাতা থেকে এসেছে।

বল কী। দুই বোন। কই, দেখতে তো দুই বোনের মতো নয়।

একেবারেই না। বোধ হয় দুই মা।

হতে পারে দুই মা। হতে পারে দুই—।

চুপ, চুপ। শুনতে পাবে।

শুনতে পেলে রঞ্জনের ও কাঞ্চনের কানের গোড়া লাল হয়ে উঠত। কিন্তু কী করবে! তখনকার দিনে ইস্কুলের বাস্ তো হয়নি। আর ইস্কুলটাও হাইস্কুল হয়ে ওঠেনি। মেয়েদের ইস্কুলে মেয়েরা পড়াবে, না বুড়োরা পড়াবে, তাই নিয়ে তর্ক চলছিল তখনো। রাজপথে আট দশ বছর বয়সের মেয়েদের চলাফেরা একটা দেখবার মতো ব্যাপার ছিল।

তারপর ইস্কুলে পা দিয়েও দুই বোন আবার তেমনি লোকজনের দৃষ্টি টেনে আনত। সহপাঠিনীরা ফিসফিস গুজগুজ করত—

দেখেছিস্ কেমন সুন্দরী। যেন ডানা-কাটা পরী।

পরী না ফরী। না ফরফরী।

না ফুরফুরী।

ওর নাম কাঞ্চন। ওর ছোট বোনের নাম রঞ্জন।

রঙ্গন না বেঙ্গন।

বেঙ্গন না ব্যাং।

আমি বলি ডানাকাটা বানরী।

দূর বোকা! বানরী কখনো ডানাকাটা হয়? বানরের কি ডানা আছে?

তা হলে ও ডানাকাটা ময়না।

না, না। অতটা কালো নয়।

তবে ডানাকাটা ময়ূর।

না, না। অতটা কুৎসিত নয়।

তবে ও ডানাকাটা পাতিহাঁস।

আসলে হয়েছিল কি, তাদের দুই বোনের চেহারায় বেশ কিছু বৈষম্য ছিল। এতখানি বৈষম্য বড় একটা দেখা যায় না। তা বলে কোথাও যে দেখা যায়নি তা নয়। রাজশাহী জেলার একটি বিশিষ্ট জমিদার বংশে দেখা গেছে। ভাই আর্য, বোন দ্রাবিড়। বোনের বিয়ে আটকায়নি। রূপের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে রূপো।

পোস্টমাস্টার মশায়ের কিন্তু রূপোর ঘরে শূন্য। সেইজন্যে একদিন তাঁর মা বলছিলেন তাঁর স্ত্রীকে, "বৌমা, তুমি আমার লক্ষ্মী। তুমি রত্নগর্ভা। তোমার বড় মেয়ের বড় ঘরে বিয়ে হবে। ও মেয়ে বেঁচে থাকলে হয়। কিন্তু—" তাঁর স্বর সহসা নেমে এলো—"ছোট মেয়েকে পার করতে ঘড়া ঘড়া সোনার মোহর লাগবে। ব্রজ অত টাকা পাবে কোথায়! শেষে কি ডাকঘরের তহবিল ভেঙে হাতে হাতকড়া পরবে!"

পৃথিবীতে সব চেয়ে ভালোবাসত যাকে সেই মানুষের মুখে এই উক্তি! রঙ্গন তা হলে কার কাছে সহানুভূতি পাবে! তখন তার বয়স এগারো কি বারো। বোঝে সবই। কিন্তু মেনে নিতে পারে না। কেন একযাত্রায় পৃথক ফল হবে? দিদি আর সে দুজনেই স্বর্গ থেকে এসেছে। ভগবান তাদের পাঠিয়েছেন। তা হলে একজনকে রাজ্যের সমস্ত রূপ উজাড় করে দিলেন কেন? একটুকুও পড়ে থাকল না আরেক জনের জন্যে! বেচারি দু'বছর পরে এসেছে বলে কি রূপলাবণ্যের তলানিটুকুও পাবে না।

দিদির সঙ্গে একসঙ্গে বেরোতেও তার লজ্জা করত। কাঞ্চন ওই অঞ্চলের সেরা সুন্দরী। যেমন তার রূপ তেমনি তার রং। তেমনি তার গড়ন। তেমনি তার বাড়ন। পাতলা ছিপছিপে দীঘল সরল, রজনীগন্ধার মতো শুভ্র, গোলাপের মতো পেলব, আঙুরের মতো স্বচ্ছ, শিরীষের মতো ফুরফুরে। খয়েরী চুল তার মতো আর কার আছে? নীল চোখের তারা তার মতো আর কোন মেয়ের? দিন দিন তার সৌন্দর্যের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে। কত লোক আসছে তাকে দেখতে। কত বাড়িতে তার জন্যে আদরের আসন পাতা। ধন্য মেয়ে কাঞ্চন।

আর রঙ্গন? অমন যার দিদি সে কিনা বেঁটে খাটো মোটা শ্যামলা শুকনো খসখসে খাপছাড়া ভারী। এত ভারী যে ডানা থাকলেও সে উড়তে পারত না, পাতিহাঁসের মতো আস্তে হেঁটে বেড়াত। মনের দুঃখে সে খাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছে। তবু তার ওজন কমতে চায় না। খেলাধুলো করলে কমত। কিন্তু তার বয়সের মেয়েদের খেলাধুলো বারণ। ছাড় কেবল ঘরে বসে দশপঁচিশ খেলা বা তাস খেলা। তখনকার দিনে মেয়েদের বাইরের খেলা কোথায়!

রঙ্গনদের ইস্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেছল। ওটা মাইনর স্কুল। বাড়িতে বসে থাকতে তো কেউ দেবে না। সংসারের কাজে রাতদিন খাটাবে। যাতে হয় সে গৃহকর্মনিপুণা, সূচীশিল্পদক্ষা। বিয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষায়।

ব্রজদুর্লভ কলকাতার লোক। ছুটি নিয়ে বড় মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গেলেন ও কলকাতাদুর্লভ জামাতা লাভ করলেন। ওরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদি মুৎসুদ্দি বংশ। বনেদী বলে বনেদী। এখনো কলকাতার একটা রাস্তার দু'ধারে যতগুলো বাড়ি সব ক'টাই ওদের। ভদ্রমহিলারা ও পথ দিয়ে যান না, ভদ্রলোকেরা যান সন্ধ্যার পরে। দেহ ভাড়া হিসাবে যে টাকাটা দেন তার সিংহের হিস্সা যায় বাড়িভাড়া হিসাবে।

ওরা কুবের আর ওদের ছেলেটি কার্তিক। কাঞ্চনের সঙ্গে রাজযোটক। এ বিবাহে সকলের মনে আনন্দ, কেবল রঙ্গন প্রাণ খুলে প্রফুল্ল হতে পারে না। ছেলেমানুষ হলেও সে এইটুকু বোঝে যে দুনিয়ার কোথাও সুবিচার নেই, ন্যায়ধর্ম নেই। যারা ভালো তারা খেতে পায় না, তাদের মেয়েদের ভালো বিয়ে হয় না। যারা খারাপ তাদের অঢেল টাকা। তারা সুন্দরী মেয়েদের বিনা পণে বিয়ে করে নিয়ে যায়। তাদের ছেলেরাও তাই সুপুরুষ হয়। তাদের মেয়েরাও বিদ্যাধরী।

কিন্তু এর থেকে ওর সিদ্ধান্ত হলো অদ্ভুত। যেমন করে হোক ওকে রূপসী

সম্পদও আসবে। অভাবের ঘরে ওর বিয়ে হবে না। হবে ঐশ্বর্যের ঘরে। যার সঙ্গে হবে সে হয়তো কার্তিক নয়। কাজ নেই অমন কার্তিকে। কিন্তু সে যেন দিদির বরের চেয়ে দীনহীন না হয়। লোকে যেন বলতে পারে যে, হাঁ, রঙ্গনেরও ভালো বিয়ে হয়েছে। হবে না কেন? ও মেয়ে কি কম সুন্দর নাকি?

ঠাকুরের উপর ওর বিশ্বাস টলেছিল। ও তাই একমনে ডাকতে লাগল পরীকে। যে পরীর গল্প ও ছেলেবেলায় পড়েছে। ও যেন সিণ্ডেরেলা। একদিন ওকেই ভালোবাসবে অচিন রাজপুত্র। পরী ইচ্ছা করলে কী না পারে! পরীর বরে রূপসী হওয়া এমন কী অসম্ভব!

রঙ্গন তাই পরীকে ডাকে। দিন-রাত ডাকে। ডাকতে ডাকতে মাস কেটে যায়। বছর কেটে যায়। কেউ জানে না ওর এই গোপন কথাটি। সমবয়সিনী সখীরাও না। ওর স্থির বিশ্বাস ওর ডাক ব্যর্থ হবে না। পরীর আসন টলবে। পরী বলবে, যাই দেখি কে আমাকে ডাকছে। এসে দেখবে—রঙ্গন।

ওদিকে ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল। যদি বা কেউ কালেভদ্রে দেখতে আসছিল রঙ্গনকে অচল টাকার মতো বাজিয়ে দেখে বলে যাচ্ছিল ফিরে গিয়ে খবর দেবে। খবর আর আসেই না। রিপ্লাই পোস্টকার্ড লিখলেও না। বয়স গড়াতে গড়াতে আঠারোয় ঠেকল। ঠাকুমা বলেন তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন যদি না ফোটে তো আর কোনো দিন বিয়ের ফুল ফুটবে না।

অগতির গতি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সঙ সাজিয়ে দেখানো হলো। কিন্তু ভবী ভোলে না। ভায়রাভাই শিবপদবাবু বললেন, "দাদা, তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোন। তোমার মেয়ের যত ওজন ঠিক তত ওজনের তামার পয়সা জড় করে তাই দিয়ে ডার্বির টিকিট কেনো। একরাশ টিকিট কিনলে একটা না একটা লেগে যাবেই। তোমার মেয়ের ঘোড়া যদি ডার্বি জেতে তা হলে তোমার মেয়ের ভেড়া হতে দশ বিশজন বাঙালীর ছেলে এগিয়ে আসবেই। তখন তুমি করবে স্বয়ংবর সভার আয়োজন।"

সমান ওজনের তামার পয়সা বলতে কয়েক হাজার চাঁদির টাকা বোঝায়। ব্রজদুর্লভ কোথায় পাবেন অত! তাঁর মেয়ে যদিও দুটি ছেলে তো অনেকগুলি। তাদের মানুষ করতে হবে না? ভদ্রলোক কোনো দিকে কোনো রকম সুরাহা না দেখে অবশেষে ঠিক করলেন যে, ডাকঘরের কেরানী শরদিন্দুর গলায় রঙ্গনের মালা পরিয়ে দেবেন।

ছেলেটি ভালো। অতি সচ্চরিত্র। [illegible] [illegible]। ব্রজদুর্লভবাবুর উপর তার অগাধ [illegible] থেকে। তার কোনো রকম দাবী নেই। তার দোষের মধ্যে সে পিতৃমাতৃহীন। গ্রামে পৈত্রিক ভদ্রাসন আছে, কিন্তু জমিজমার শরিক একাধিক। চাকরিই ধরতে গেলে সম্বল। আর চাকরি তো শেষ পর্যন্ত পোস্টমাস্টারি।

কোথায় কাঞ্চনের বর ঘর ধনদৌলৎ দাসীবাঁদি নফর মোটর। আর কোথায় রঙ্গনের ভিখারী দিগম্বর। বিয়ের পরে থাকতে হবে কেরানীবাবুর আধখানা চালাঘরে, রাঁধতে হবে আধখানা ঝি'র সাহায্যে। ষষ্ঠীর কৃপাও তো হবে একদিন। তখন ছেলের জন্যে দুধ ঘি জুটবে না। সরু চালের ভাত জুটবে কি না কে জানে, যদি বিধবা বোনটোন এসে জোটে।

রঙ্গন প্রাণপণে পরীর নাম জপে। ওই তার হরির নাম। পরী ইচ্ছা করলে কী না সম্ভব! কেন তবে সে শরদিন্দু কেরানীর বৌ হয়ে দিদির দাসীবাঁদির সমান হতে যাবে! না, সে বিয়ে করবে না।

২

পরী একদিন সত্যি দেখা দিল। স্বপ্নে। এই তো সেই পরী। সেই রূপকথার পরী। কেতাবের ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। দেখছ না কেমন বড় বড় দুটি ডানা! এমন ডানা কি মানুষের হয়।

পরী বলল, "বাছা রঙ্গন, তুমি কী চাও? কেন আমাকে অত করে ডাকছিলে?"

রঙ্গন হাটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে বলল, "পরী, আমার বড় দুঃখ। আমার রূপ নেই বলে এরা আমাকে ঝি'র মতো খাটায়। বিয়ে দিলে যার হাতে দেবে তার ঘরেও ঝি'র মতো খাটতে হবে। আমার দিদির কেমন বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকে। কিছু করতে হয় না। সব কাজ করে দেয় এক কুড়ি ঝি চাকর। দিদির বাড়ির কুকুর বেড়ালও আমাদের চেয়ে ভালো খায়, ভালো পরে। তাদের গরম জামা আছে, শীতকালে গায়ে দেয়। পরী, দিদির আমার এক গা গয়না। সিন্দুকে আরো কত আছে। তার লেখাজোখা নেই। আর আমার দেখছ তো! এই পাশা মাকড়ি আর সরু সরু চুড়ি। পরী, আমার তিনখানা মাত্র শাড়ী, বাইরে বেরোব কী করে? একখানাও কি রেশমের? আর ওদিকে দেখ গিয়ে দিদির কত বড় বড় আলমারি আর তোরঙ্গ শুধু শাড়ীতে পোশাকে ঠাসা। পরী, দিদির ছেলেমেয়েদের দেখলে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে। যখন যা চায় তখন তা পায়,

৫ই অক্টোবর
থেকে
কলিকাতা
এবং
অন্যান্য স্থানে
আর আর পিকচার্সের
গুলে বাকাওয়ালী
(হিন্দী)
অগ্রজ সিনে কর্পোরেশন পরিবেশনা
বাংলার পরিবেশক : মেসার্স মেহতা পিকচার্স, কলিকাতা

ক্ষীর সর ননী মাখন সন্দেশ রসগোল্লা। আর আমার যদি ছেলে হয় সে কি এক ফোঁটা দুধ খেতে পাবে, ভেবেছ?"

পরী হেসে বলল, "তা হলে তুমি কী চাও, তাই বল।"

রঙ্গন বলল, "কী না চাই! সব চাই। বর চাই ঘর চাই ধন চাই জন চাই। কিন্তু সকলের আগে চাই রূপ। দিদির মতো রূপ। পরী, তোমার পায়ে পড়ি। ঠাকুর আমাকে যা দিলেন না তুমি আমাকে তা দাও। রূপ দাও। বর দাও। ঘর দাও। জন দাও। সুখ দাও।"

পরী বলল, "তুমি যে আমাকে মহা বিপদে ফেললে, রঙ্গন। আমি কি ভগবান, না ভগবানের সমান। আমি তোমাকে সব কিছু দেব কী করে! দিলে দিতে পারি একটি জিনিস। সেটি কোন জিনিস তা তুমি ভেবেচিন্তে বল। মনে রেখো, একটির বেশী নয়। ঐ একটি নিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট হতে হবে। আর আমাকে ডাকতে পারবে না।"

রঙ্গন বলল, "বেশ। তবে আমাকে রূপ দাও। দিদির মতো রূপ।"

পরী বলল, "তথাস্তু।" এই বলে আকাশে মিলিয়ে গেল।

রঙ্গন জেগে দেখল, কেউ কোথাও নেই। ওটা নেহাৎ একটা স্বপ্ন। স্বপ্ন কি সত্য হতে পারে! সে একটু একটু করে ভুলে গেল স্বপ্নের সব কথা।

মাস কয়েক পরে তার পিসী পশ্চিম থেকে এলেন ভাইয়ের অসুখ শুনে। ঘোড়ার গাড়ী থেকে নেমেই বললেন, "ও কে! কাঞ্চন! তুই কবে এলি? তোর শাশুড়ী আসতে দিল? কিন্তু ও কী! তোর সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন?"

রঙ্গন প্রণাম করে বলল, "আমাকে চিনতে পারছেন না, পিসিমা? আমি যে রঙ্গন।"

পিসী বিশ্বাস করলেন না। রঙ্গন কখনো এত সুন্দর হতে পারে! ভিতরে গিয়ে বললেন, "রঙ্গনকে দেখছিনে কেন? আয় রে, রঙ্গন। তোর জন্যে কী এনেছি, দ্যাখ।"

এমন সময় রঙ্গনের মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, সত্যিই তো! কাঞ্চন! আরো কাছে গিয়ে চিবুকটি তুলে ধরলেন। না, কাঞ্চন নয়, কিন্তু কাঞ্চনের দোসর।

"ওমা, আমার কী হবে গো! ঠাকুরঝি, তুমি কি যাদু জান? আমার রঙ্গন কেমন করে কাঞ্চন হলো? তোমরা কে কোথায় আছো গো, দেখবে এস।"

অসুস্থ শরীরে উঠে এলেন জনার্দন। ঠাকুরঘর থেকে ছুটে এলেন তাঁর মা। বাড়ীর ছেলেরা যে যেখানে ছিল হৈ চৈ করে এলো। সবাই দেখল রঙ্গন কেমন করে কাঞ্চন হয়ে গেছে। অবশ্য বেমালুম এক নয়। বোঝা যায় এ রঙ্গন। এর বয়স কম। এ কুমারী।

তখন সে যে কী উল্লাস তা বলবার নয়। ঠাকুমা বললেন, "আমিই তোদের সকলের আগে লক্ষ্য করেছি। করেছি অনেক দিন। ও যা হয়েছে একদিনে হয়নি। তা হলেও মানতে হবে এমনটি আমার জীবনে আমি দেখিনি।"

পিসিমা বললেন, "এ যেন গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি।"

মা বললেন, "থাক, থাক, বলতে নেই। মেয়ের যা কপাল। সইলে হয়।"

বাপ বললেন, "ওকে আমি কলকাতা নিয়ে যেতে চাই। ওর উপযুক্ত বর এখানে বসে থেকে মিলবে না। ছুটির দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি। ওরে একটা টেলিগ্রামের ফরম নিয়ে আয় তো রে।"

কলকাতায় রঙ্গনের জন্যে চেষ্টা চলতে লাগল। একদিন খুব মজা হলো। কাঞ্চন তাকে নেমন্তন্ন করে গেছে। সে তার দিদির খোকাখুকুদের সঙ্গে খেলা করছে। এমন সময় জামাইবাবু এসে ডাকলেন, "কাঞ্চী, শোন তো।"

রঙ্গন বলল, "বা! আমি কাঞ্চী হতে গেলুম কবে! আমি যে রঙ্গন।"

জামাইবাবু বললেন, "রঙ্গন! কী আশ্চর্য! আমারই চিনতে ভুল হয়!"

তারপর কাঞ্চন এসে পড়ল। তখন জামাইবাবু ওর সামনেই ওর বোনকে আদর করে বললেন, "ছোট গিন্নী।" রসিকতা করে বললেন, "বড় গিন্নী না থাকলে বড় গিন্নীর কাজ ছোট গিন্নী চালাতে পারবে।"

এরপরে আপনার স্বার্থে কাঞ্চনের কর্তব্য হলো ছোট বোনকে পাত্রস্থ করা। চেষ্টা করতে করতে মনের মতো বর পাওয়া গেল ক্ষৌণীশচন্দ্রকে। উঁচু পায়াওয়ালা সরকারী কর্মচারী। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে প্রমোশনের সাধনায়। তবে তাঁকে দেখলে চল্লিশ বলে মনে হয় না। আর হলেই বা কী আসে যায়। রঙ্গনও তো ডাগর হয়েছে। বাঙালীর মেয়ে কি অত লম্বা হয়। যে—ই দেখবে সে—ই বলবে পাঞ্জাবী কি কাশ্মীরী। পাতলা ছিপছিপে হালকা ফুরফুরে। রজনীগন্ধা। গোলাপও আছে। খয়ের। সেটুকু উপমানের সঙ্গে উপমেয়।

[illegible]চন্দ্রও মনের মতো বৌ পেয়ে [illegible] তিনি যে এত দিন অবিবাহিত [illegible] রঙ্গনেরই প্রতীক্ষায়। যে

খুঁজে পাননি। পেলেন এত দিন পরে। আকস্মিক ভাবে।

বিয়ের পর রঞ্জন তার স্বামীর সঙ্গে পুনা চলে যায়। এমনিতেই সে গৃহকর্ম-নিপুণা। তার ঘরসংসার সে অল্পদিনের মধ্যে বুঝে নিল। চাকরগুলো দু'হাতে লুটে খাচ্ছিল। বাজার খরচ নাকি দিনে দশ টাকা। দশ টাকার নোটের একটা টাকাও বাজার থেকে ফিরত না। রঞ্জন সেটাকে চোখ বুজে করে দিল পাঁচ টাকা। তার থেকেও ফিরতে লাগল বারো তেরো আনা। নইলে নোকরি ছুটে যাবে। দেখাশুনো করত রঞ্জন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। তাই খাবার স্বাদ বদলে গেল। ক্ষৌণীশ বললে "মা বেঁচে থাকতে খেয়েছিলুম মনে পড়ে। তারপর এই খাচ্ছি। মাঝখানে পনেরো বছর অনাহারে কেটেছে।"

কিন্তু পড়াশুনো তো সে সামান্যই করেছে। অত বড় সরকারী আমলার ঘরে মানাবে কেন? তাই তার জন্যে গভর্নেস বহাল হলো। খাস ইংরেজ মেমসাহেব। বুদ্ধিমতী মেয়ে। চটপট শিখে নেয় আর মনে রাখে। বছর দুই যেতে না যেতে দেখা গেল সে ইংরেজের সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলছে। কোথাও একটুকু বাধছে না। কী চমৎকার উচ্চারণ! তবে সে বিদ্বানদের সঙ্গ পারতপক্ষে এড়ায়। তর্কবিতর্কের ধার দিয়ে যায় না। অতিথিরা গম্ভীরভাবে আলোচনা করছেন দেখলে সেলাইয়ের কাজ হাতে নিয়ে বসে। চোখ তুলে তাকায় না।

তারপর স্বামীর সঙ্গে একবার বিলেত ঘুরে আসতেই তার আদিপর্ব সাত সমুদ্রের জলে ভেসে গেল। যে সমাজে সে মিশত সে সমাজ তাকে জাতে তুলে নিল। সে না হলে পার্টি জমবে না। তাই নিত্য নিমন্ত্রণ। সে না হলে নাচ জমবে না। তাই অবিরাম সাধ্যসাধনা। বিস্তর খোসামোদ শুনতে হয় তাকে। তাতে যে তার মাথা ঘুরে যায় না এর কারণ সে তার দীনহীন অবস্থার দিনগুলি ভোলেনি, তাই অহঙ্কারী হয়নি।

তার একটা মস্ত গুণ সে সাধারণ গৃহস্থের পরিবারে আসাযাওয়া করে, অসুখের সময় ফলমূল কিনে দেয়, সুখের দিনে ফুল কিনে উপহার দেয়। সকলের সঙ্গেই সহৃদয় ব্যবহার করে হোক না কেন গরীব কেরানী। শরদিন্দুকে সে বিয়ে করেনি বটে, কিন্তু তার মতো মানুষই বা ক'টা দেখেছে বা দেখছে! মনুষ্যত্ব তার নতুন সমাজে বিরল।

মাঝে মাঝে তার ভীষণ মন কেমন করত মা বাবার জন্যে। ঠাকুমার জন্যে। ভাইগুলির জন্যে কিন্তু ফিরে যাবার পথ খোলা ছিল না। সে গেলে তারা ওকে রাখবে কোথায়! অত বড় লোকের বানীকে! তারাও যে আসবে তা নয়। পুনা অনেক দূর। খেটে খাওয়া লোকের অত সময় কোথায়? আর খরচাই বা জামাইয়ের সংসার থেকে নেবে কেন?

একমাত্র কাঞ্চনের সঙ্গেই তার সমস্যা। কিন্তু কাঞ্চন কিছুতেই তাকে ডাকবে না। ছোট গিন্নীর উপর কর্তার যা নেকনজর সেও কাঞ্চনকে আসতে বলবে না। ভিতরে ভিতরে বেশ একটু রেষারেষির ভাব [illegible] দিদির বোন বলেই [illegible] তুলনায় [illegible]

[illegible] মন্তব্য করছ? ডানাকাটা পরীর [illegible] না দেখলে কেউ কখনো মিল দিয়ে [illegible] না যে ডানাকাটা বানরী। এখন [illegible] সেও সমান সুন্দরী, সমান উচ্চ। [illegible] কী [illegible]কে ডেকে এনে? [illegible] খাল কেটে কুমীরকে ডেকে আনা। [illegible] কর্তাই হয়তো আফসোস হবে [illegible] ভুলই করেছি বড় গিন্নীকে বিয়ে না [illegible]।

কিন্তু একদিন এক অঘটন ঘটল। স্বামী [illegible] সঙ্গে বিলেত পালিয়ে যাচ্ছে বলে [illegible] পর্যন্ত ধাওয়া করে এলো কাঞ্চন। [illegible] থেকে টেলিগ্রাম করল রঞ্জনকে [illegible]। এরা [illegible] জোরসে মোটর [illegible] দিল। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে খাড়া [illegible] ব্যাংককাট। [illegible] কখন আসে। [illegible] নামল, তার [illegible] ছেলেটি নামল, [illegible] নামল, বেয়ারা নামল। কিন্তু পাখী [illegible] উড়ে গেছে, [illegible] 'কুপে' খালি। [illegible] বার্থের গায়ে [illegible] আঁটা—মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আর [illegible]।

[illegible] কাঞ্চন [illegible] পাখে [illegible] স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের [illegible] রঞ্জন তাড়াতাড়ি স্বামীর সঙ্গে কী পরামর্শ [illegible]। স্বামী তৎক্ষণাৎ [illegible] হয়ে গেলেন। পরদিন [illegible] বোম্বে [illegible] চলল তাজমহল হোটেলে।

৩

এরপর যা [illegible] তা গৌরচন্দ্রিকা। এখন [illegible] আসল গল্প।

সে পর্যন্তকে অনেক পেট্রোল পোড়াতে হলো। পুলিশ[illegible] খাতিরে কম নয়। [illegible] ওদের আবিষ্কার করা হলো। কিন্তু গ্রেপ্তার করবে যে—কী অপরাধে?

পাসপোর্ট [illegible] নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল [illegible] রায়ের চেহারা মিসেস রায়েরই মতো অর্থাৎ রায়ের সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁরই ফটো আঁটা।

"এক্সকিউজ মী। আপনি কি মিসেস কাঞ্চন[illegible]?" পুলিশের প্রশ্ন।

"[illegible]" ভদ্রমহিলার উত্তর।

এর উপর আর কথা চলে না। পুলিশ তো [illegible] মতো পাসপোর্টখানা ফেরৎ দিয়ে তাড়া তোবা করে সরে পড়ল। ক্ষৌণীশ [illegible] পড়ে গেলেন। রমেশ শাসিয়ে [illegible], "দেখে নেব। আমার স্ত্রীকে পুলিশ ডেকে এনে আমার স্ত্রী নয় বলে অপমান।"

সত্যি কাজটা ঠিক হয়নি। ক্ষৌণীশ [illegible] হয়ে গেলেন। রমেশ যে অত বড় [illegible] তা উনি কল্পনাও করেননি।

দাখিল করেছে সে বেনো কালোই কাঞ্চন-মালা নয়। সে কাঁকমালা। কাঞ্চনমালার দাসী। দু'পাতা ইংরেজী পড়েছে, সাজগোজ করতে শিখেছে, চেহারায় রস আছে। এখন বিলেত যেয়ে অম্লানবদনে কাঞ্চনমালা রায় বলে পরিচয় দেবে, ব্যাংকের কাগজপত্র সই করবে, একরাশ দলিল সৃষ্টি করবে। পরে এই নিয়ে আইন আদালত করতে হবে। কোর্টে দাঁড়াতে হবে দুই নারীকে। কে যে কাঞ্চনমালা কে যে কাঁকনমালা সাক্ষীপ্রমাণ নিয়ে সাব্যস্ত করতে হবে বিচারপতিকে। আর একটা ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা।

জাহাজ ছেড়ে দিল। কেউ আটকাতে সাহস পেলো না। জাহাজঘাটে যাবে বলে জেদ ধরেছিল কাঞ্চন। সে নাকি সাহেবকে বুঝিয়ে বলবে যে সে-ই সত্যিকার কাঞ্চন-মালা। ওটা মিথ্যেকার বকমালা। ওর প্রকৃত নাম বিন্দা। বাঁকুড়ায় ওদের বাড়ী। সাহেব যে কোন সাহেব সে জানে না, কিন্তু সাহেব যখন তখন নিশ্চয় সুবিচার করবে। সাহেব জাতটার উপর তার অগাধ বিশ্বাস।

ক্ষৌণীশ তাকে কোনো মতে নিরস্ত করতে না পেরে শুধু এই কথাটি বললেন, "সাহেব যদি দাবী করে যে যৌবন যখন রিজার্ভ হয়েছে তখন যার নাম কাঞ্চনমালা তাকেই জাহাজে করে বিলেতে যেতে হবে, তো উঠবেন আপনি জাহাজে?"

"না। না। আমার বাচ্চাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।" কেঁদে ফেলল কাঞ্চন। সে কী কান্না! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে হাত পা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কান্না।

"আপনি না গেলে আপনার জায়গায় যেতে হয় আরেকজনকে। কাঞ্চনমালা হয় রামশেব, সহযাত্রিনী হতে। ও বোধ হয় একা যেতে ভয় পায়।"

রঙ্গন চোখ টিপে স্বামীকে নিরস্ত করল। ভদ্রলোকের আড্ডা দেওয়া অভ্যাস। আমাদে লোক বলে সর্বত্র জনপ্রিয়। প্রমোশনের সেটাও একটা সংকেত।

বম্বে থেকে ওরা পুণা গেল সবাই মিলে। কাঞ্চনের বুক ভেঙে গেছে। এবং রঙ্গন লক্ষ্য করে অবাক হলো যে রূপ উবে গেছে।

"দিদি, তোর রূপ গেল কোথায়?"

"আমার রূপ! আমার রূপ আমি সাত ভাগ করে সাত ছেলেমেয়েকে দিয়েছি। আর দিয়েছি তাদের বাপকে। ও কার্তিক ছিল। কন্দর্প ছিল না। আমার রূপ নিয়ে হয়েছে কন্দর্প। ও এখন আমার দেওয়া রূপ দেবে কাঁকনকে। আমার বাঁদিকে। দিনে দিনে সুন্দর হবে কাঁকন। আমারি ছোঁওয়া দিয়ে আমার। যে ছিল দাসী সে

রঙ্গনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করল এই উক্তি। মেয়েরা বিজ্ঞ হয় মেয়েদেরই অভিজ্ঞতা শুনে। পুরুষের পুঁথি পড়ে নয়।

মাত্র সাতাশ বছর বয়সে কাঞ্চনের সব সুখ ফুরিয়ে গেল। এখন তাকে বাঁচতে হবে তার বাচ্চাদের মুখ চেয়ে। নইলে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ত, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ত, বাজার থেকে আফিং কিনে এনে খেত, কেরোসিন মেখে আগুন ধরিয়ে দিত, বিছানার চাদর ছিঁড়ে গলায় দড়ি দিত। বাঁদি হবে রানী! রানী হবে বাঁদি! ও হো হো!

"রংনী, আমার কি বুদ্ধি ছিল! রূপ থাকলে কী হবে। বুদ্ধি না থাকলে রূপও থাকে না রে! আর রূপ না থাকলে কিছুই থাকে না। না স্বামী, না সম্মান, না সম্পদ। আমি সোজা মানুষ। আমার ধারণা ছিল স্বামীকে যতগুলি সন্তান দেব তত বেশী ভালোবাসা পাব। সাতটি সন্তান দিয়ে সাত পাকে জড়াব। কই তা তো হলো না রে! গেল আমার রূপ। সেই সঙ্গে স্বামীর ভালোবাসা। ও হো হো!"

দিদিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রঙ্গন ভাষা খুঁজে পেলো না। গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। আর ভাবতে লাগল নিজের ভবিষ্যৎ।

"এমন হবে যদি জানতুম তা হলে কি আমি সাধ করে মা হতে যাই! হলে হতুম একবার কি দু'বার। আজকাল শুনি কত রকম নতুন উপায় বেরিয়েছে। দিদিমাদের মতো সাপখোপ খেতে হয় না। আমার শ্বশুরবাড়ীতেই কটি বুড়ি পাগল! কী সব খাওয়া হয়েছে লুকিয়ে লুকিয়ে। আমাকেও সিঁদুরের মতো লাল-লাল কী একটা এনে দিয়েছিল। খাইনি। এনে দিয়েছিল ওই কাঁকন। ওই বিন্দা। খেলে বাঁচতুম না রে!"

রঙ্গন এর মধ্যে রঙ্গীন হয়েছিল।

বলল, "আমাকে চিঠি লিখিস্‌নি কেন? আমার গভর্নেস আমাকে প্রথম থেকেই সাবধান হতে শিখিয়েছে। আমার তো হয় না।"

তাই তো। এটা কোনো দিন কাঞ্চনের মাথায় আসেনি। তার ধারণা ছিল রঙ্গন ঠাকুরদেবতা মানে না বলেই তার হয় না। মা ষষ্ঠীর রোষ।

"তা বলে কি একেবারেই হবে না রে?"

"হবে বই-কি। আগে তো জীবনটাকে উপভোগ করি। পঁচিশ বছর মাত্র বয়স। এ বয়সে মা হলে আমার ডানা কাটা পড়বে যে!"

"ও! তুই বুঝি ডানাওয়ালা পরী!"

"কেন? হতে দোষ কী? পরীদের ডানা থাকে কে না জানে? সেইটেই তো স্বাভাবিক। ডানাকাটা পরী শুনে শুনে তোর মাথা ঘুরে গেছে, তাই তুই বুঝতে পারিসনে যে ওতে পুরুষদেরই সুবিধে। ডানাদুটি কেটে রেখে তোকে ওড়বার অযোগ্য করে তোলা হয়েছে। নইলে ওর সঙ্গে এক জাহাজে বিলেত যাবার কথা তো সত্যিকার কাঞ্চনেরই। তুই উড়তে জানিস্‌নে তো উড়ো পাখীর সঙ্গে উড়বি কী করে? পুরুষ যে উড়ো পাখী এটাও কি জানতিস্‌নে?"

কাঞ্চন ধিক্কার দিয়ে বলল, "বিল্বদা উড়ল। উড়বে বলেই বুঝি তিন তিন বার মা হতে হতে মা হলো না। আমি পারতুম না রে। আমার ডানাকাটা বলে আমার দুঃখ ছিল না। তবু তো পরী ছিলুম লোকের চোখে। এখন যে বানরী! ও হো হো!"

তা নেহাৎ ভুল বলেনি দিদি। রঙ্গনের মনের কথাটা কেমন করে দিদির মুখে এসেছে। এত কাল পরে শোধবোধ হলো ইস্কুলের সেই ডানাকাটা পরী ও ডানাকাটা বানরী বলে অন্যায় তুলনার। ওরে তোরা আয় রে, ইস্কুলের ছুঁড়িরা! দেখে যা কে পরী, কে বানরী। এখন যে পরী সে ডানা-ওয়ালা পরী। আরো এক কাঠি সরেশ।

কাঞ্চন তার আর-সব খোকাখুকুদের কলকাতায় ফেলে এসেছিল। কোলেরটিকে নিয়ে আর কদিন ভুলে থাকা যায়। ওরা চিঠি লিখেছে, মা, তুমি জলদি এসো। তোমার জন্যে মন কেমন করছে। তা পড়ে কাঞ্চনের চোখে কোটালের বান ডাকল। আরব্য উপন্যাসের মায়া সতরঞ্চ পেলে সে দুদিন [illegible]রের পথ দুদণ্ডে পার হতো। তা যখন নেই তখন রেলগাড়ীতেই উঠে বসতে হলো।

দিদিকে বিদায় দিয়ে এসে রঙ্গনের প্রথম কাজ হলো মেডকে নোটিস দেওয়া। মেড কথাটা ইংরেজী হলেও মানুষটি কোঙ্কনী। সব রকম গৃহকর্মে সাহায্য করত। রঙ্গনের প্রয়োজনের পর্যাপ্ত থাকত, তারই সুলভ হস্ত। বয়স হয়েছে, বিয়ে হয়েছিল, স্বামী মারা গেছে। নিঃসন্তান। এত দিন তাকে সন্দেহ করেনি, সন্দেহের উপলক্ষ ঘটেনি। এই প্রথম মনে হলো যে সন্দেহ না করাটাই ভালোমানুষী। একদিন সে-ই হয়তো সাজবে রঙ্গনমালা দাস।

রঙ্গন তাকে বুঝিয়ে বলল যে আর্থিক অবস্থা মেড রাখতে অনুমতি দিচ্ছে না, মেড বলে কেউ থাকবে না, পদটাই ছাঁটাই হবে। যাঁরা মেড রাখতে পারেন তাদের নামে চিঠি লিখে দেওয়া হচ্ছে সুপারিশ করে। লেডী কারসেটজী একবার জানতে চেয়েছিলেন কে অমন সুচারুরূপে সাজায়। তিনি হয়তো সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দেবেন। ভয় নেই। ধন্যবাদ।

মেড চলে যাবার পর মনটা ফাঁকা হয়ে গেল। ছিল একটি সঙ্গিনী, যার সঙ্গে দুটো সুখদুঃখের কথা বলাবলি হতো। এখন এমন একটিও মেয়েমানুষ রইল না যে অসুখে বিসুখে সেবা করবে বা কাছে বসবে। বান্ধবীরা যদি দয়া করে আসে তবে সেটা হবে দয়ার দান। তার উপর নির্ভর করা যায় কি? দূর সম্পর্কের কোনো এক বিধবা আত্মীয়াকে আনিয়ে নিলে মন্দ হতো না। কিন্তু বয়স্ক হওয়া চাই। স্বামীর চেয়েও বয়স্ক।

এই সূত্র ধরে পিসী এসে পড়লেন। থাকতেই এলেন। সঙ্গে একটি ছেলে। চাকরির খোঁজ করবে। তা করুক। মেয়ে তো নয়। অরক্ষণীয়া কন্যা হয়ে থাকলে পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করা হতো। অত ভালোমানুষী ভালো নয়। দু'চার হাজার টাকা খরচ করে বিয়ে দেওয়া তার চেয়ে ভালো। আর্থিক অবস্থা অনুমতি দিতে পারে।

৪

মারাঠা মেয়েদের মতো মাথায় কাপড় নেই, খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো। আর-সব বাঙালীর মেয়ের মতো। ওরই নাম রঙ্গন। ওর সঙ্গে ওর স্বামী ক্ষৌণীশ। সাহেবদের মতো ডিনার পোশাক পরা। ফিরছিল দুজনে বিলিমোরিয়াদের সঙ্গে ডিনার খেয়ে। আধ মাইলটাক রাস্তা। তাই মোটর ছেড়ে দিয়ে পায়ে হাঁটছিল। যাতে খানা হজম হয়। চাঁদনী রাত। তেমন শীত নেই। পথ প্রায় ফাঁকা।

"শুনলে তো কী বলছিল বিলিমোরিয়া তার মিসেসকে?"

"কী বলছিল?"

"বলছিল—"

"চুপ করে গেলে যে? বল।"

"বলছিল তোমাকে লক্ষ্য করে নয়। মিসেস গুপ্তেকে লক্ষ্য করে।"

"কী বলছিল? বল না?"

"বলছিল, দেখছ তো মিসেস গুপ্তেকে।"